१८

মাসিক বসুমতী

১৪শ বর্ষ—প্রথম খণ্ড

(১৩৪২ সাল—বৈশাখ হইতে আশ্বিন সংখ্যা পর্য্যন্ত)

সম্পাদক

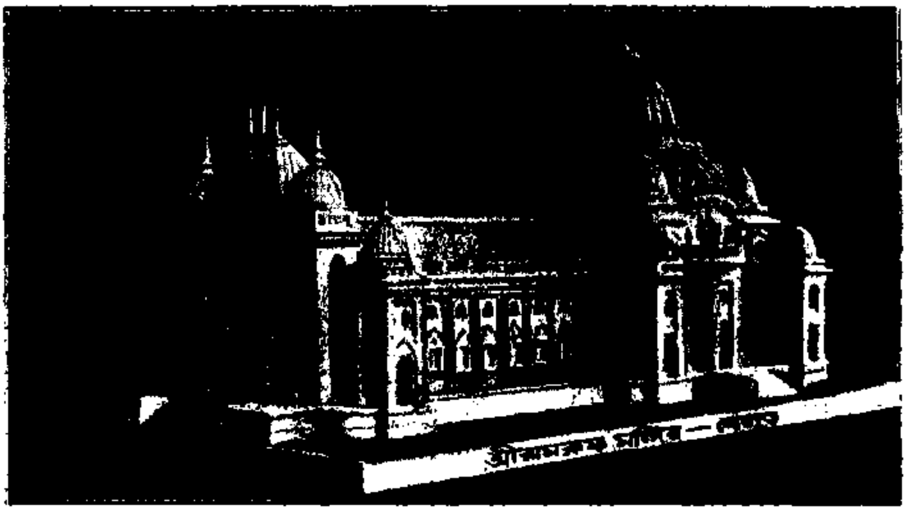
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়



কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক রোটারী-মেসিনে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বার্ষিক মূল্য ভারতের সর্ব্বত্র ৬৲ টাকা—বিদেশে ১২৲, প্রতি সংখ্যা ॥৹ আনা।

সচিত্র
মাসিক বসুমতী



১৪শ বর্ষ] বৈশাখ, ১৩৪২ [১ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথা

৭

জটাধারী দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করিয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তোতাপুরী নামে এক ব্রহ্মবাদী সন্ন্যাসী মধ্যভারত হইতে তীর্থপর্য্যটন উপলক্ষে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন। সুদূর মধ্যভারত হইতে পরিভ্রমণ করিতে করিতে কি আকর্ষণে তিনি বঙ্গদেশের অখ্যাত ও অজ্ঞাত দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, সে রহস্যের এখনও মীমাংসা হয় নাই। হৃদয়ের গভীর অন্তস্তলস্থিত যে অজ্ঞাত শক্তি মানবকে স্থান ও কালবিশেষে অচিন্তিত কার্য্যসমূহে হঠাৎ নিয়োজিত করিয়া থাকে, তাহার কারণ কোনও দর্শন অথবা বিজ্ঞান আজও নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই। কোথায় সুদূর মধ্যভারত, কোথায় শস্যশ্যামল বঙ্গদেশের এক প্রান্তে অবস্থিত দক্ষিণেশ্বরের নব-নির্ম্মিত ঠাকুর-বাড়ী। কিন্তু এই নিরাকারবাদী সন্ন্যাসী এক অচিন্তনীয় শক্তির আকর্ষণে দেশপরিভ্রমণচ্ছলে এক দিন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন অস্তগামী সূর্য্যের অরুণ কিরণজাল সায়াহ্নের পশ্চিম-গগনকে রঞ্জিত করিতেছিল, গঙ্গাবক্ষে তরঙ্গসমূহ গলিত স্বর্ণের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল, সমস্ত দেবীমন্দিরে যেন কৈলাসের দিব্যভাব-মাধুর্য্য লীলায়িত হইতেছিল। দিবস ও রাত্রির সন্ধিস্থলে এই যে রহস্যময় সময়, ইহাকে ঠাকুর চিরদিন বিশ্বপিতাকে স্মরণ করিবার এক শুভমুহূর্ত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। শ্রীপরমহংসদেব শিব-মন্দিরের নিকট তন্ময়চিত্ত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দীর্ঘাকার, তেজঃপুঞ্জকলেবর, উলঙ্গ সন্ন্যাসী সহসা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাপুরুষগণের জীবনে সংঘটিত ঘটনাবলী অনেক সময়ে কল্পনার চিত্রাবলী হইতেও বিস্ময়কর।

শ্রীপরমহংসদেবের অন্তর্দৃষ্টি [illegible] শারীরিক সৌন্দর্য্যের আবরণ ভেদ করিয়া মানব-চরিত্রের নিগূঢ় চিরন্তন বিশিষ্টতা দেখিতে পাইত বলিয়া, ঠাকুর সচরাচর শারীরিক সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতেন না। কিন্তু তাঁহার সাধক জীবনে যে সমস্ত মহাপুরুষ তাঁহাদের অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই দেহ এবং চরিত্র—উভয়বিধ সৌন্দর্য্যেরই আধার বলিয়া পরিগণিত হইতেন। দীর্ঘাকার তেজঃপুঞ্জ-কলেবর সন্ন্যাসী "আঁধারের পারে যিনি জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষ" তাঁহাকে জানিয়া সেই জ্যোতির্ম্ময় বপুই যেন ধারণ করিয়াছিলেন। যাঁহার জ্যোতিতে চন্দ্র সূর্য্য দীপ্তি প্রদান করে, সেই জ্যোতিঃস্বরূপকে জানিতে পারিলে মানবের শারীরিক যে অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হয়, তাহা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিকে না দেখিলে কল্পনার দ্বারা অনুমান করা যায় না। মহাকবির ভাষায় সে সৌন্দর্য্যের ঈষৎ আভাস আমরা পাই।

"প্রদীপ ধরিয়া হেরিল তাঁহার
নবীন গৌরকান্তি,
সৌম্য সহাস তরুণ বয়ান
করুণা কিরণে বিকচ নয়ান
শুভ্র ললাটে ইন্দু সমান
ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি!"

সন্ন্যাসী তোতাপুরী ঠাকুরের নিকট আসিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং মধুর বচনে সম্ভাষিত করিয়া, তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, তিনি ঠাকুরকে সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণে সমর্থ উপযুক্ত পাত্র বলিয়া মনে করিতেছেন, সুতরাং ঠাকুর আগ্রহ প্রকাশ করিলে সন্ন্যাসী তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিতে পারেন। যে ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসী ব্রহ্মের স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া ব্রহ্মবিদ্‌রূপে সমস্ত কর্ম্মপারাবারের সীমান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে এই ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিবার আগ্রহ বিচিত্র ও বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসী দেহবুদ্ধি অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেও যত দিন তাঁহাকে দেহ ধারণ করিয়া থাকিতে হয়, তত দিন তিনি উপযুক্ত আধার দেখিতে পাইলে নিজ ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করেন।

দেহে আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন মানব নিজ পুত্রের দেহের মধ্যে আপনার দোষ-গুণ বিজড়িত দেহ সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকে; কিন্তু ব্রহ্মে আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন সন্ন্যাসিগণ তাঁহাদের শুদ্ধ ও পবিত্র আত্মার উৎকর্ষ উপযুক্ত আধারে রক্ষা করিয়া জগতের মঙ্গলসাধন করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়া থাকেন। সাধারণ মানব সন্তানে তাহার দোষ ও গুণ উভয়ই রক্ষা করিয়া থাকে, সন্ন্যাসী নিজ আত্মার উৎকর্ষকেই অমর করিতে চাহেন, দেহ হইতে দেহ সৃষ্টি করিবার প্রয়াস তাঁহার নিকট



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব

মিথ্যা বলিয়া মনে হয়। অযোধ্যাধিপতি রঘুর পুত্র অজ তাঁহার পিতার গুণাবলীর অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা বর্ণনা করিবার সময় মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন—

"রূপং তদোজস্বি তদেব বীর্য্যং
তদেব নৈসর্গিকমুন্নতত্বম্।
ন কারণাৎ স্বাদ্ বিভিদে কুমারঃ
প্রবর্ত্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ॥"

(পিতার ন্যায় রূপ, দেহ, বীর্য্য ও প্রাকৃতিক গঠন এই বালক প্রাপ্ত হইল। প্রদীপ হইতে প্রদীপ প্রজ্বালিত করিলে যেরূপ উভয়ের কোনও পার্থক্য থাকে না, সেইরূপ পিতা ও পুত্রের মধ্যে কোনও বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হইত না।)

এরূপ সর্ব্বগুণের উত্তরাধিকারী, পিতার প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ পুত্র সংসারে অতীব বিরল। কিন্তু সন্ন্যাসীর মানসপুত্র গুরুর উৎকর্ষই নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিয়া থাকেন, তাঁহার দেহ-বিজড়িত দোষ শিষ্যকে কখনও স্পর্শ করে না। গৃহী ও সন্ন্যাসীর মধ্যে ইহাই প্রভেদ। সুতরাং যে সত্যের জ্যোতিঃ মহাপুরুষগণ নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই সত্য অপরের জীবনে সঞ্জীবিত রাখিবার প্রয়াস আমরা তাঁহাদের জীবনে দেখিতে পাই। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু নাম-মন্ত্রে সিদ্ধ হইয়া, নীরবে নাম জপ করিয়াই তৃপ্ত হইতে পারেন নাই, উচ্চকণ্ঠে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া পতিতগণের উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। যে নামের শক্তিতে আত্মহারা হইয়া তিনি পার্থিব সম্পদ, পাণ্ডিত্য, যশোগৌরব সমস্তই তৃণখণ্ডের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই নাম যদি কখনও কোনও ব্যক্তির কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার হৃদয়ে 'ভক্তিলতাবীজ' সঞ্জীবিত করিতে পারে, এই আশায় নাম-সঙ্কীর্ত্তন মহাধর্ম্মের এই প্রচারক উচ্চকণ্ঠে বিশ্বপিতার গুণকীর্ত্তনের বিধান করিয়া গিয়াছেন। যীশুখৃষ্ট ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য নিজ শিষ্যগণকে দেশ-দেশান্তরে প্রেরণ করিবার সময় বলিয়াছিলেন—

"What I tell you in darkness, that speak ye in light and what ye hear in the ear, that preach ye upon the housetops."

(আমি যে কথা তোমাদিগকে নির্জ্জনে বলিতেছি, তাহা তোমরা সর্ব্বজনসমক্ষে প্রচার করিবে; আমি তোমাদের কর্ণমূলে যে বাণী প্রদান করিতেছি, তাহা তোমরা উচ্চকণ্ঠে সর্ব্বত্র ঘোষিত করিবে।) তাই আমরা দেখিতে পাই, নিজ আত্মোৎকর্ষ জগতে সঞ্জীবিত রাখিবার ইচ্ছায় সংসারমুক্ত সাধকও উপযুক্ত শিষ্যকে নিজ বিদ্যা প্রদান করিবার প্রয়াসী হইয়া থাকেন।

কিন্তু জগতে উপযুক্ত শিষ্য সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। সাধারণ প্রচলিত একটি কথাই এই সত্যটিকে সর্ব্বদা প্রকাশ করিতেছে।—"গুরু মিলে লাখ তো চেলা মিলে এক।" এই ভাষার অত্যুক্তির মধ্যেই সত্য নিহিত রহিয়াছে। যে ভক্ত সৎস্বরূপকে হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন, তাঁহার সেই ব্যাকুলতাই যে তাঁহার নিকট প্রকৃত গুরুকে আকৃষ্ট করিয়া আনিবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আত্মার আকর্ষণী শক্তি জড় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী। অস্ত্রবিদ্যাশিক্ষার্থী একলব্যই ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যখন গুরু দ্রোণাচার্য্য একলব্যকে অস্ত্রবিদ্যা প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন, তখন কৃতসঙ্কল্প এই যুবক মৃত্তিকার দ্রোণমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহারই নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে নিরত হইল। আপনার অন্তর্নিহিত শক্তিবলে এই শিক্ষার্থী মৃন্ময় দ্রোণের নিকট হইতেই যে বিদ্যালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, সে বিদ্যা জাত্যভিমানী কুরুপাণ্ডবদিগকেও লজ্জা দিয়াছিল, আজিও মহাভারত তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। উপযুক্ত আধার হইলে শিষ্য মৃত্তিকানির্ম্মিত গুরু হইতেও শিক্ষা আকর্ষণ করিয়া নিজে গ্রহণ করিতে পারে। গ্রীস-দেশীয় দার্শনিক পণ্ডিত প্লেটো পার্থিব বিদ্যাসম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। আদর্শ শিক্ষক শিষ্যের মধ্যে কোনও নূতন জিনিষ প্রদান করেন না, শিষ্যের অন্তর্নিহিত উৎকর্ষকে পরিস্ফুরিত করিবার জন্য সাহায্য করিয়া থাকেন। কিন্তু অশেষ-শক্তিমান্ গুরু যদি সহস্র সহস্র অমূল্য রত্ন শিষ্যকে প্রদান করেন, তথাপি উপযুক্ত আধার না হইলে শিষ্য তাহার কণামাত্র নিজ জীবনে ধারণ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে না। সেই জন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, শক্তি গ্রহণ করিয়া সঞ্জীবিত রাখিবার উপযুক্ত শিষ্য সন্ধান করিয়াও অনেক সময়ে গুরুকে ব্যর্থমনোরথ হইতে হইয়াছে।

কোনও সদ্বস্তু জীবনে গ্রহণ করিবার আরও এক অন্তরায় আছে। মানবের ধর্ম্মজীবনে সন্দিগ্ধচিত্ততার ন্যায় চপলতা আর কিছুই পরিকল্পনীয় নহে। সরল বিশ্বাস ব্যতীত ধর্ম্মজীবনে কিছুই লাভ করা যায় না। সেই জন্য ধর্ম্মগুরুকে বিশ্বপিতার আসনে স্থান দিবার প্রথা এ দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত। কিন্তু কোমল পুষ্পের মধ্যে কীটের ন্যায় সন্দিগ্ধচিত্ততা মানব-জীবনে ভক্তিলতাবীজের অঙ্কুরকে সর্ব্বদাই ছেদন করিতেছে। যে মহাপুরুষ পার্থিব সমস্ত ঘটনাতেই বিশ্বপিতার অনন্তপ্রেমের আভাস দেখিতে পাইতেন, সেই শ্রীপরমহংসদেব এই আত্মঘাতী

সন্দেহকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "তিনি দয়া না কর্লে সন্দেহ যায় না।" গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে এই কথাই স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন—

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"

(শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে)

তিনি আরও বলিয়াছিলেন—

"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥"

(যে অজ্ঞানী, যাহার শ্রদ্ধা নাই, যাহার মন নিত্য সন্দিগ্ধ, তাহার বিনাশ হয়। সন্দিগ্ধচিত্ত পুরুষের ইহলোক ও পরলোক উভয়ই ধ্বংস হয়। সে কদাচ সুখ প্রাপ্ত হয় না।)

সন্দেহ বিমুক্তমনা শ্রদ্ধাসম্পন্ন ভাগ্যবান্কেই শ্রীভগবান্ জ্ঞানের উত্তম অধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সন্দেহকলুষিত মন কলঙ্কদুষ্ট দর্পণের ন্যায় সহজে কিছুই গ্রহণ করিতে পারে না। সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই সত্য বর্ণে বর্ণে উপলব্ধি করা যায়। যে শিক্ষার্থী নিজ শিক্ষকের উপর আস্থাস্থাপন করিতে পারে না, সেই শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদান করা অত্যন্ত দুরূহ হইয়া থাকে। শিক্ষকের চরিত্রের বিশিষ্টতা ও শিক্ষার্থীর শিক্ষকের প্রতি অনুরাগ ও বিশ্বাস, ছাত্রের জীবনে কি প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, তাহা ইংরেজ পণ্ডিত কার্লাইল্ নিজেই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—"A true university is a collection of books"

(প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয় পুস্তকাবলীর সমষ্টি মাত্র)

তাঁহার ধারণা ছিল যে, কেবলমাত্র কতকগুলি পাঠ্য পুস্তক সুনির্ব্বাচিত করিয়া ছাত্রদিগের সমক্ষে স্থাপিত করিলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত কর্ত্তব্য সাধিত হইল। কিন্তু শিক্ষকের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার চরিত্রের উৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিলে শিক্ষালাভ কত সহজ ও সরল হইয়া যায়, তাহা কার্লাইল বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উদাহরণ হইতেই শিক্ষাগুরুর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস ছাত্রজীবনে কত প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয় হইবে। হেন্‌রি ষ্টিফেন্ নামে এক মনস্বী বিদেশীয় অধ্যাপক এই বঙ্গদেশে বহুবর্ষ যাবৎ শিক্ষা প্রদান করিয়া ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে কর্ম্মজীবনের মধ্যেই দেহত্যাগ করেন। চিরকুমার-ব্রত অবলম্বন করিয়া এই মনীষী অধ্যাপক পবিত্র জীবন যাপন পূর্ব্বক সুদীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল বঙ্গদেশীয় যুবকগণকে শিক্ষা প্রদান করিয়া নিজ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের অনেক মনীষী তাঁহার ছাত্রস্থানীয়। যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই আজ একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, তাঁহার পবিত্র জীবন ও চরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়া পুস্তকের পাঠ্য বিষয়গুলি অপেক্ষাও চিরস্থায়ী অমূল্য শিক্ষা তাঁহারা জীবনে লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার উপর যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছাত্রগণ সর্ব্বদাই অর্পণ করিত, তাহাতে তাঁহার মুখনিঃসৃত উপদেশাবলী জীবন্ত শিক্ষারূপে ছাত্রগণের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের অশেষ কল্যাণসাধন করিত। সুতরাং কেবলমাত্র ধর্ম্মজীবনেই যে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা নহে, সাধারণ পার্থিব শিক্ষাক্ষেত্রেও সেই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রারম্ভেই আমরা দেখিতে পাই, সন্দেহকলুষিত মন লইয়া অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধস্থলে দণ্ডায়মান; স্বয়ং নারায়ণ যাঁহার সারথি, তিনিও স্ব-ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া মোহান্ধ ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করিতে উদ্যত। কিন্তু অর্জ্জুন এই মোহকলুষতার মধ্যেও আত্মবিস্মৃত হন নাই। তিনি আপনাকে শ্রীভগবানের নির্দ্দেশে স্থাপিত করিয়া, তাঁহাকে গুরুরূপে গ্রহণ করিয়া আপনার সন্দেহজাল ছিন্ন করিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্"

(আমি তোমার শিষ্য; তোমার শরণ লইয়াছি। আমায় পথ দেখাইয়া দাও।)

আত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে সুযুক্তিপূর্ণ বচন দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণ বীরবরকে ক্ষাত্রধর্ম্মোচিত কর্ত্তব্যপালনে প্রণোদিত করিতে পারিলেন না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন অর্জ্জুনের মনে উত্থিত হইতে লাগিল, এবং স্বয়ং নারায়ণ সেই সন্দেহজাল ছিন্ন করিতে করিতেই আমরা একাদশ সর্গে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বেই অর্জ্জুন আপনাকে শিষ্য বলিয়া শ্রীভগবানের নিকট আত্মনিবেদন করিয়াছেন; সুতরাং

তাঁহার সন্দেহজাল ছিন্ন করিতে গুরুরূপী শ্রীভগবান্ সর্ব্বদাই সচেষ্ট রহিয়াছেন। নিজ অনন্ত বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়া শ্রীভগবান্ যখন অর্জ্জুনকে কর্ম্মে প্রণোদিত করিলেন, তখন ধীরে ধীরে অর্জ্জুন আপনার বিনষ্ট সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইলেন এবং গুরূপদিষ্ট নিজ পথ দেখিতে পাইয়া অবশেষে বলিলেন—

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥"

(হে অচ্যুত, তোমার কৃপায় আমার মোহ বিদূরিত হইয়াছে, আমি স্মৃতিলাভ করিয়া সংশয়শূন্য হইয়াছি। আমি তোমার আদেশ পালন করিব।)

এইরূপ বিশ্বাস হইলে তবেই সন্দেহমুক্ত মন গুরূপদিষ্ট পথ অবলম্বন করিতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব জানিতেন যে, গুরূপদিষ্ট শিক্ষা জীবনে সফল করিবার শক্তি শিষ্যস্থানীয় সাধারণ ভক্তদিগের মধ্যে বিরল। উপযুক্ত ক্ষেত্র এবং অবিচলিত বিশ্বাস—এই উভয়ের সংমিশ্রণ মানবজীবনে সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। সেই জন্য আমরা দেখিতে পাই যে, গুরু বলিয়া কেহ সম্বোধন করিলে শ্রীপরমহংসদেব প্রসন্ন হইতেন না, তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিতেন—"আমার চেলা-টেলা নেই।" যশ ও অর্থপিপাসা-প্রপীড়িত মানবহৃদয়ে ধর্ম্মভাবের সাময়িক উচ্ছ্বাস কত ক্ষণস্থায়ী ও অকিঞ্চন, তাহা কোনও মহাপুরুষেরই অজ্ঞাত থাকিতে পারে না। যীশুখৃষ্ট এই সম্বন্ধে একবার একটি সুন্দর গল্প বলিয়াছিলেন। কৃষক বীজবপন করিলে সমস্ত বীজ হইতেই শস্য উৎপন্ন হয় না। বপনের সময় হয় ত কতকগুলি বীজ কর্ষিত ভূমিখণ্ডের বাহিরে যাইয়া পড়ে, বিহঙ্গগণ তাহা ভক্ষণ করিয়া ফেলে, সে বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না। কোন কোন বীজ কঠিন ভূমির উপর পতিত হইয়া অঙ্কুরিত হইবামাত্রই প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে দগ্ধ হইয়া যায়, আবার কতকগুলি বীজ কণ্টকসমাচ্ছন্ন হইয়া ফলবান্ হইতে পারে না। এইরূপে অসংখ্য বীজ নষ্ট হইয়া, হয় ত কয়েকটি বীজ উপযুক্ত ক্ষেত্রে পড়িয়া ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। অনন্ত তৃষ্ণার রঙ্গভূমি এই পৃথিবীতে অধিকাংশ মানবই বিহঙ্গভক্ষিত বা সূর্য্যকিরণদগ্ধ বা কণ্টকসমাচ্ছন্ন বীজের ন্যায় ধর্ম্মজগতে নিষ্ফল জীবন যাপন করিয়া থাকে।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে গুডফ্রাইডের ছুটীতে দেহত্যাগের প্রায় বর্ষাধিককাল পূর্ব্বে এক দিন শ্রীপরমহংসদেব আহিরীটোলা নিম গোস্বামীর লেনে মহেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে তাঁহার প্রিয়ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের নিমন্ত্রণে গমন করিয়াছিলেন।* সদানন্দময় ঠাকুর সে দিন আনন্দের মধ্যেও ক্ষণে ক্ষণে নিরানন্দ হইতেছিলেন। 'মাসিক বসুমতী'র সম্পাদক শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভাগ্যবান্ পিতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তখন ঠাকুরের নিকট উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার পদসেবা করিতেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি-



উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রচয়িতা অক্ষয়কুমার সেন † ঠাকুরের অন্য পা টিপিতেছিলেন। ভক্ত উপেন্দ্রনাথের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে তাঁহার প্রতি জিজ্ঞাসুদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন "এ কি পাড়া! এখানে দেখছি কেউ নেই।" ‡ সে দিন ঠাকুরকে দেখিবার জন্য আহিরীটোলায়

* এই পুণ্যদিনের স্মৃতির সম্মানার্থে প্রতি বর্ষে দেবেন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত ইটালীর শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয়ে উৎসব হইয়া থাকে

† ইনি পরবর্ত্তী জীবনে বসুমতীর উন্নতিবিধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

‡ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।

বহু লোক সমবেত হইয়াছিলেন, সকলের নয়নে কৌতূহল-দৃষ্টি। কিন্তু ঠাকুর যখন সেই জনমণ্ডলী লক্ষ্য করিয়া ইঙ্গিত করিলেন যে, সেই কৌতূহলপরায়ণ জনতার ভিতর প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি কেহই ছিলেন না, তখন ভক্তপ্রবর দেবেন্দ্রনাথ ও পদসেবারত উপেন্দ্রনাথ উভয়েই বিস্মিত দৃষ্টি বিনিময় করিলেন, ঠাকুরের ইঙ্গিতের যথাযথ অর্থ কেহই গ্রহণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে শ্রীপরমহংসদেবের



অক্ষয়কুমার সেন

যখন দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য ভক্তগৃহ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বহির্দ্দেশে আসিতেছিলেন, তখন দেবেন্দ্রনাথ লক্ষ্য করিলেন যে, সেই পল্লীস্থিত কোনও এক ব্যক্তি প্রাঙ্গণে মাদুর পাতিয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। দেবেন্দ্রনাথ তাহাকে জাগরিত করিলে সে নিদ্রোত্থিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "পরমহংসদেব কি এসেছেন?" ঠাকুর তখন প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য দ্বারদেশে উপস্থিত, সুতরাং তাহার কথা শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিলেন। শ্রীপরমহংসদেবের তথায় আসিবার পূর্ব্বেই লোকটি সেই বাটীতে আসিয়াছিল এবং কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অবশেষে মাদুর বিছাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ঐ ব্যক্তির আচরণ দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ ও অপরাপর ভক্তগণ ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত ইঙ্গিতের অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেন—"এ কি পাড়া, এখানে দেখছি কেউ নেই!" সাধারণ মানবের আচরণ ইহা হইতে কিছুই বিভিন্ন নহে। সাময়িক উচ্ছ্বাস হৃদয়কে অধিকার করিলে ধর্ম্মের প্রতি আগ্রহ মনে উদিত হয়, কিন্তু চরিত্রের সে দৃঢ়তা কোথায় যাহা সেই সাময়িক উচ্ছ্বাসকে জীবনে চিরন্তন



দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

সত্যরূপে পরিণত করিতে পারে? তাই ঠাকুর প্রায়ই বলিতেন—"আমার চেলাচেঁলা নেই।" মহাপুরুষ যীশুখৃষ্ট তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া এক দিন বলিয়াছিলেন

"Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven."

(আমাকে গুরু বলিয়া সম্বোধন করিলেই কেহ স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হইতে পারিবে না। যে লোক ভগবানের

ইচ্ছা নিজ জীবনে সফল করিবে, সেই প্রকৃত অধিকারিরূপে পরিগণিত হইবে।।

খৃষ্টধর্ম্মগুরু যীশুখৃষ্টের এই কঠোর নিয়মের দ্বারা প্রকৃত খৃষ্টান নির্ব্বাচিত করিতে হইলে কয় জনই বা স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হইতে পারে!

শ্রীপরমহংসদেব জানিতেন, ধর্ম্মোপদেশের প্রকৃত অধিকারী সংসারে বিরল। তাই বড়ই আক্ষেপের সহিত তিনি এক দিন বলিয়াছিলেন—"কারেই বা বল্‌ব, কেই বা বুঝবে!" তাঁহার প্রাণপ্রিয় শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে 'শতদল'স্বরূপ স্বামী বিবেকানন্দই নাই। শক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর ভক্তকে বিভিন্নরূপে আপনার প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত করিয়া গিয়াছেন; একই সুনির্দ্দিষ্ট কঠোর শিক্ষা সকল আধারের পক্ষে উপযুক্ত হইবে না বলিয়াই একই কঠিন ছাঁচে সকল শিষ্যকেই গড়িয়া তুলিবার নিষ্ফল প্রয়াসে তিনি ব্যর্থ-মনোরথ হন নাই। যাহার যেরূপ শক্তি, তাঁহাকে সেইরূপ শিক্ষার অধিকারিরূপে গণ্য করিয়া তাঁহাকে মুক্তি ও শান্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই শিষ্যনির্ব্বাচন সম্বন্ধে একবার ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের



স্বামী বিবেকানন্দ



কেশবচন্দ্র সেন

বা অনন্ত শ্রীরামকৃষ্ণচরিত্রের কতটুকু নিজ কর্ম্ম ও ধর্ম্ম-জীবনের ভিতর দিয়া জগতের সম্মুখে দেখাইতে পারিয়াছেন?

তথাপি, প্রকৃত শিষ্য বিরল হইলেও দুর্লভ নহে। নিজ আত্মার উৎকর্ষ জগতে সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য গুরুও উপযুক্ত শিষ্যকে সন্ধান করিয়া বাহির করেন। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, দয়াল ঠাকুর তাঁহার সকল ভক্তকে ব্রহ্মজ্ঞানের—কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগের মন্ত্রে সমভাবে দীক্ষিত করিয়া যান সহিত ঠাকুরের উপদেশপূর্ণ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। কুচবিহার-বিবাহ লইয়া যখন ব্রাহ্মসমাজের কোনও কোনও মনীষীর সহিত কেশবচন্দ্রের মতদ্বৈধ হইয়া সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ দুইটি বিভিন্ন সম্প্রদায়রূপে পরিণত হইয়াছিল, তখন কেশবচন্দ্রের শিষ্যমণ্ডলীর ভিতর হইতে কেহ কেহ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান পূর্ব্বক কেশবচন্দ্রের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার মনে অযথা বেদনা-প্রদান করিয়াছিলেন। ভক্ত

কেশবচন্দ্র এই সম্বন্ধে এক দিন ঠাকুরের নিকট দুঃখপ্রকাশ করিলে, ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন —"তুমি না দেখে শিষ্য কর কেন ? আমি লোক চিন্‌তে পারি।"* শ্রীপরমহংসদেব যে মানবচরিত্রের নিগূঢ়তম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া তাহার চিত্তবৃত্তিসমূহ স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্বিত চিত্রের ন্যায় দেখিতে পাইতেন, তাহা তাঁহার শিষ্যনির্ব্বাচন দেখিলেই সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। যে সমস্ত শিষ্য তাঁহার নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া ভাগ্যবান্ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও



মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—মাষ্টার মহাশয়

সম্বন্ধে ঠাকুরকে কখনও কোনও অনুযোগ করিতে হয় নাই। মানবের অন্তর্নিহিত যে শক্তি আছে, তাহার অধিক কিছু তাহার নিকট আশা করিতে গেলে আমাদিগকে স্বভাবতঃই তাহার সম্বন্ধে নিরাশ হইতে হয়। যে লোকের এক মণ ভার উত্তোলন করিবার শক্তি আছে, তাহার নিকট দুই মণ ভার উত্তোলনের আশা করিতে গেলে আমাদিগের নিরাশ হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে।

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।

এই প্রসঙ্গে ভক্তপ্রবর শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের কথা সহজেই আমাদের মনে উদিত হয়। যে সমস্ত ভক্ত শ্রীপরমহংসদেবের অন্তরঙ্গ আত্মীয় বলিয়া পরিগণিত হইতেন, মহেন্দ্রনাথ সেই ভাগ্যবান্ শিষ্যদিগের মধ্যে অন্যতম। ঠাকুর নিজ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সাধারণ কোনও লোকের নিকট হইতে গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু ঠাকুরের নিকট মহেন্দ্রনাথ এতই আত্মীয় বলিয়া বিবেচিত হইতেন যে, নিজ জামা, বস্ত্র অথবা অন্য কোনও প্রয়োজনীয় বস্তু ঠাকুর অসঙ্কোচে মহেন্দ্রনাথকে আনিয়া দিতে বলিতেন এবং দ্বিধাশূন্যচিত্তে তাহা গ্রহণ করিতেন। হৃদয়নাথ অথবা অন্য



স্বামী ব্রহ্মানন্দ—রাখাল মহারাজ

কাহাকেও কখনও অর্থসাহায্য করিতে হইলে ঠাকুর সর্ব্বাগ্রে মহেন্দ্রনাথকেই স্মরণ করিতেন। যে শিষ্য এতই প্রাণপ্রিয় ছিলেন, তাঁহারও নিকট হইতে শ্রীপরমহংসদেব কখনও তাঁহার শক্তির অতিরিক্ত কোনও কার্য্য প্রত্যাশা করেন নাই। কামিনীকাঞ্চনত্যাগ যে মহাপুরুষের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল, সেই ত্যাগীর অবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব মহেন্দ্রনাথকে সংসার ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণভাবে তাঁহার কার্য্যের মধ্যে আত্মনিয়োগ করিতে কখনও আহ্বান করেন নাই। কেহ কেহ হয় ত মনে করিবেন যে, ঠাকুরের সহিত পরিচয়ের

পূর্ব্বেই মহেন্দ্রনাথ বিবাহ করিয়া গৃহী হইয়াছিলেন। পিতার দায়িত্বও তখন তাঁহার জীবনের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল, সুতরাং সংসার ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবার পক্ষে ইহাই মহেন্দ্রনাথের জীবনে প্রধান অন্তরায় ছিল। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, বিবাহিত জীবন হইলেও ঠাকুর কোনও কোনও শিষ্যকে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করাইয়া তাঁহার আপনার কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। রাখাল মহারাজ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সুতরাং কোন্ ভক্তের নিকট হইতে কতদূর ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ আশা করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে ঠাকুরের অন্তর্দৃষ্টি কোথাও প্রতিহত হইত না বলিয়া, বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন শিষ্যগণের জন্য বিভিন্নরূপ সেবা ও কর্ম্ম তিনি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। তাই শিষ্যগণের সম্বন্ধে শক্তির অতিরিক্ত কিছু প্রত্যাশা করিয়া ঠাকুরকে কখনও তাঁহাদিগের সম্বন্ধে নিরাশ হইতে হয় নাই।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনেও এই অধিকারি-নির্ব্বাচন শক্তির পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। মহাপ্রভু ভোগ-বিলাস-রত গৃহীকে সর্ব্বদাই করুণার দৃষ্টিতে দেখিতেন; কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগের মহান্ আদর্শ নিজ জীবনে পালন করিয়া প্রিয় শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে সেই আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রচেষ্ট থাকিতেন। কিন্তু শিষ্যদিগের মধ্যে শক্তির পার্থক্য বিবেচনা করিয়া তিনিও অধিকারিভেদে বিভিন্ন ভক্তের জন্য বিভিন্ন পথ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাসগ্রহণের পর শান্তিপুরে আগমন করেন, সেই সময় রঘুনাথ দাস নামে জনৈক ভক্ত প্রভুর পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া, সন্ন্যাসগ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার শিষ্য হইবার অভিলাষ প্রকাশ করিল। তিনি রঘুনাথ দাসকে গ্রহণ করিলেন না, মধুর বচনে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"স্থির হঞা ঘরে যাহ, না হও বাতুল
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল।
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা।
অন্তরনিষ্ঠা কর বাহ্যে লোকব্যবহার
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥"

ভক্ত স্ত্রীলোকের নিকট হইতে ভিক্ষাগ্রহণ করার জন্য ছোট হরিদাসকে এই মহাপ্রভুই বর্জ্জন করিয়াছিলেন, আবার তিনিই রঘুনাথ দাসকে যথাযোগ্য বিষয় ভোগ করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। ভক্তের বিভিন্ন শক্তি পরিজ্ঞাত ছিলেন বলিয়াই একই মহাপুরুষ অবস্থাবিশেষে বিভিন্ন উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

গুরু তোতাপুরী ও শিষ্য পরমহংসদেবের সম্মিলন মণিকাঞ্চনযোগের ন্যায় হইয়াছিল। মায়াবাদী সন্ন্যাসী দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ করিতে করিতে জীবনের সায়াহ্নে ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণ করিবার উপযুক্ত শিষ্য দেখিতে পাইলেন। শ্রীপরমহংসদেবের অন্তর্নিহিত ভক্তি ও সাধনা ব্রহ্মবিদ্ সন্ন্যাসীকে দক্ষিণেশ্বরে আকর্ষণ করিয়া আনিল। যখন তোতাপুরী পরমহংসদেবকে দীক্ষা প্রদান করিতে চাহিলেন, তখন বিশ্বজননী শ্রীশ্রীভবতারিণীর অনুমতি গ্রহণ



শ্রীশ্রীভবতারিণী

করিবার জন্য ঠাকুর সন্ন্যাসীর নিকট সময় প্রার্থনা করিলেন। শ্রীপরমহংসদেব ইতিপূর্ব্বেই দেবীর নিকট নিজ

জীবনের শুভাশুভ সমস্তই অর্পণ করিয়াছিলেন, সুতরাং জীবনের কোনও কার্য্যেই তাঁহার স্বাধীনতা ছিল না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, শুভ এবং অশুভ, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম সমস্তই দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া তিনি জীবনের কর্তৃত্বভার সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীশ্রীভবতারিণীর অনুমতি ভিন্ন ধর্ম্মেরও কোনও বিশেষ পথ অবলম্বন করিবার স্বাধীনতা তাঁহার ছিল না। নিরাকার-বাদী সন্ন্যাসী 'পাষাণময়ী' দেবীর নিকট অনুমতি গ্রহণের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং পরমহংসদেবকে তাহার জন্য সময় প্রদান করিলেন। ঠাকুর দেবীর মন্দিরে যাইয়া তাঁহার আদেশের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

শ্রীপরমহংসদেবের জীবনে আমরা দেখিতে পাই যে, যখনই কোনও বিশেষ কর্ম্মের জন্য তাঁহাকে প্রস্তুত হইতে হইয়াছে, অথবা যখনই কোনও সন্দেহজাল তাঁহার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়াছে, তখনই তিনি বিশ্বজননীর নির্দ্দেশের জন্য তাঁহার শরণাগত হইয়াছেন। মানবী জননীকে যেমন শিশুসন্তানের সমস্ত কৌতূহলের নিবৃত্তি করিতে হয়, শ্রীশ্রীভবতারিণীকেও এই শিশুমনোবৃত্তিসম্পন্ন পরমহংসের সমস্ত প্রশ্নের সমাধান করিতে হইত। বিশ্বজননীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া জীবনের সমস্ত সন্দেহের মীমাংসা করিবার প্রচেষ্টা জগতের ইতিহাসে বিচিত্র নহে। ধর্ম্মজগতে অথবা কর্ম্মজীবনে আমরা অনেক মনীষীকেই এইরূপ দৈবী নির্দ্দেশের অনুসরণ করিতে দেখিতে পাই। বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়াও যখন সন্দেহের অন্ধকার মন হইতে বিদূরিত হয় না, তখন এই 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ'কেই সাধকগণ অন্বেষণ করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডের ধর্ম্মজীবনের ইতিহাসে কার্ডিনাল নিউ-ম্যানের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু এই ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষ এক দিন চতুর্দ্দিক্ গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন দেখিয়া ভগবানের আলোকের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

Lead, kindly light, amid the encircling gloom,
Lead thou me on ;
The night is dark, and I am far from home,
Lead thou me on.

(হে জ্যোতিঃস্বরূপ, সন্দেহের অন্ধকার চতুর্দ্দিক্ হইতে আমাকে বেষ্টন করিতেছে, তুমি আমাকে পথ দেখাইয়া দাও। রাত্রি ঘোর তমসাচ্ছন্ন, আমিও তোমার নিকট হইতে অনেক দূরে পড়িয়া আছি। আজ তুমিই আমাকে পথ-প্রদর্শন কর।)

বঙ্গগৌরব রবীন্দ্রনাথ এইরূপ অন্ধকারসমাচ্ছন্ন পথে এক দিন সেই বিশ্বজননীর নিকট পথ-নির্দ্দেশের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন -

"সারথি চালান যিনি জীবনের রথ
তিনিই জানেন শুধু কার কোন্ পথ।
আমি ভাবি আমি বুঝি পথের প্রহরী
পথ দেখাইতে গিয়ে পথ রোধ করি॥"

শ্রীশ্রীভবতারিণী ঠাকুরকে ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। এক দিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে পঞ্চবটী-তলে দীক্ষা গ্রহণের সমস্ত আয়োজন হইল। বৃক্ষতলে তখন একটি ক্ষুদ্র কুটীর ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বৃক্ষলতাপরিবেষ্টিত সেই নিভৃত কুটীরমধ্যে গুরু তোতাপুরীর সহিত উপবিষ্ট হইলেন। গুরূপদিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন,—

"চিদাভাস ব্রহ্মস্বরূপ আমি দারা, পুত্র, সম্পদ, লোকমান্য সুন্দর শরীর লাভের বাসনা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া নিঃশেষে ত্যাগ করিতেছি—স্বাহা।"

অনাদি অনন্তকাল হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত এই যে ত্যাগের মহামন্ত্র, উহা অর্থহীন বাক্যসমষ্টির মত শুধু মুখে উচ্চারিত হইল না, সমস্ত প্রাণ, মন ও শক্তির সঞ্চারে সঞ্জীবিত হইয়া সেই মন্ত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে চিরদিনের জন্য সত্যস্বরূপ হইয়া দেখা দিল। আহুতি শেষ হইলে যখন নিরাকার ব্রহ্মে চিত্তকে বিলীন করিবার জন্য গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিলেন, তখন সেই জ্যোতির্ম্ময় চিৎস্বরূপকে ঠাকুর যতবার ধ্যান করিতে চেষ্টা করিলেন, ততবারই কেবল শ্রীশ্রীভবতারিণীর আনন্দময়ী চিদ্‌ঘনমূর্ত্তি ঠাকুরের মানস-পটে প্রতিফলিত হইতে লাগিল।

বিশ্ব-জননীর সহিত ঠাকুরের কি বিচিত্র সম্বন্ধ! সর্ব্বদাই সেই মূর্ত্তি চিদাকাশে ভাসমান, সুতরাং জননীগতপ্রাণ সাধকের মনে জননীর স্নেহমূর্ত্তি ব্যতীত আর কিছুই সহজে উদিত হইল না। গুরু তোতাপুরী ব্রহ্মসাধনায় এই অপূর্ব্ব অন্তরায়ের কথা শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট-হৃদয়ে কুটীরমধ্যে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া এক খণ্ড কাচ দেখিতে পাইলেন। সেই কাচখণ্ড ঠাকুরের ভ্রূ-যুগলমধ্যে তীক্ষ্ণরূপে বিদ্ধ করিয়া

গুরু শিষ্যকে সেই বিন্দুতে ব্রহ্মচিন্তন করিতে উপদেশ দিলেন। ধর্ম্মসাধনায় ঠাকুর সমস্ত বাধাকেই অসীম শক্তিসহকারে অতিক্রম করিতেন। সমস্ত চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া, ঠাকুর যখন মনকে পুনর্ব্বার ব্রহ্মচিন্তনে নিয়োজিত করিলেন, তখন সেই আনন্দঘন ভবতারিণী-মূর্ত্তি চিন্ময় ব্রহ্মস্বরূপে পরিণত হইল। ঠাকুর দেখিলেন, ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। তখন মন সমাধিনিমগ্ন হইয়া ব্রহ্মস্বরূপে বিলীন হইয়া গেল।

এই যে সমাধি অবস্থা, ইহার ভাষা নাই, ইহার বর্ণনা হয় না; সমাধিনিমগ্ন লোকও এই পরমানন্দ অনুভূতির কথা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে পারেন না। সেই ব্রহ্মস্বরূপের পরিকল্পনা কি বস্তু, চিত্তের কি অবস্থা হয়, তাহার কোনও তুলনা নাই, সুতরাং তাহা অবাক্ত ও সাধারণ মানবের অগোচর। মহাকবি কালিদাস দেবাদিদেব মহেশ্বরের এই সমাধি অবস্থা বর্ণনা করিবার প্রয়াসে ইহার ঈষৎ আভাসমাত্র প্রদান করিয়াছেন—

"অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহম্,
অপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধাৎ
নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্॥"

(মহাদেব শরীরমধ্যস্থ বায়ুসকলকে নিরুদ্ধ করিয়া আসীন ছিলেন বলিয়া বর্ষণাড়ম্বরশূন্য জলধর, বীচিবিহীন সরোবর ও বায়ুবিরহিত স্থলে নিশ্চল প্রদীপের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন।)

ঠাকুর এই সমাধিনিমগ্ন অবস্থায় তিন দিন অবস্থান করিলেন। সন্ন্যাসী তোতাপুরী বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া দেখিলেন, প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী কঠোর সাধনা করিয়া তাঁহাকে যে সফলতা লাভ করিতে হইয়াছিল, তাহাই এই যুবক শিষ্য কি ঐশী শক্তিপ্রভাবে এক দিনের মধ্যেই আয়ত্ত করিল!

ব্রহ্মসাধনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই ঠাকুর শিখা ও যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়া, কাষায় কৌপীন গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেহ ও মন উভয়ই উপাধিশূন্য না হইলে চিত্ত কখনও ব্রহ্মে বিলীন হইতে পারে না। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর হইতে পুরাতন সমস্ত পরিহার করিয়া নূতন জীবন আরম্ভ হইল। পিতৃপ্রদত্ত নামও মানুষের একটি উপাধি, সেই জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নবজীবনের প্রারম্ভে পুরাতন নামরূপ উপাধিকেও পরিহার করিবার প্রথা সাধনজগতে প্রচলিত আছে। এই নূতন দীক্ষিত জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই গুরু তোতাপুরী তাঁহাকে "শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস" নামে অভিহিত করিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও যখন কাটোয়ার সন্নিধানে শিখাসূত্র পরিহার পূর্ব্বক শ্রীকেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখনও চিরপ্রথা অনুযায়ী পুরাতন নাম পরিত্যাগ করাইয়া গুরু তাঁহাকে তাঁহার সন্ন্যাস-জীবনের "শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য" নূতন নাম প্রদান করিয়াছিলেন।

"পাইয়া উচিৎ নাম কেশব ভারতী
প্রভুবক্ষে হস্ত দিয়া বোলে শুদ্ধমতি।
যত জগতের তুমি কৃষ্ণ বোলাইয়া
করাইলা চৈতন্য কীর্ত্তন প্রকাশিয়া।
এতেকে তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
সর্ব্বলোক তোমা হৈতে যাতে হৈল ধন্য॥"

গুরু তোতাপুরী-প্রদত্ত "শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস" নাম আজ জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিঘোষিত হইয়া সংসারবিরাগী কত সন্ন্যাসীকে জীবনের পথ প্রদর্শন করিতেছে, সংসারনিমগ্ন কত বিষয়ীকে পাপতাপের দহনের মধ্যেও শান্তি প্রদান করিতেছে; এই নামই অনাথ বালক-বালিকাগণের আশ্রয়মন্দিরে পরিণত হইয়াছে, এই নামের শক্তিই দুর্ভিক্ষ-বন্যা-মহামারী-প্রপীড়িত ভারতবাসীর সেবা করিতেছে, নিরন্ন দেশে বুভুক্ষুমুখে অন্ন তুলিয়া দিতেছে। আবার এই নামের পুণ্যপ্রভাবেই পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার মোহে আত্মবিস্মৃত, বিক্ষুব্ধ—পথিভ্রষ্ট ভারতবাসী যুগে যুগে স্বধর্ম্মগৌরবে সঞ্জীবিত হইবে।

সন্ন্যাসী তোতাপুরী তিন দিবসের অধিক কোথাও থাকিতেন না, কিন্তু শ্রীপরমহংসদেবকে দীক্ষা প্রদান করিয়া শিষ্যের আকর্ষণী শক্তিতে অবরুদ্ধ হইয়া, প্রায় একাদশ মাস দক্ষিণেশ্বরে যাপন করিয়াছিলেন।

শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় (অধ্যাপক)।



স্বচ্ছ-ছাদবিশিষ্ট মোটর-গাড়ী

ডেট্রয়েের হল্ হোলটম্ একপ্রকার স্বচ্ছছাদবিশিষ্ট মোটরগাড়ী উদ্ভাবিত করিয়া উহার সর্ব্বস্বত্ব রক্ষা করিয়াছেন। স্বচ্ছছাদে [illegible]স্থিতভাবে আলোকের বন্দোবস্ত আছে। সেই আলোকে



স্বচ্ছছাদবিশিষ্ট মোটরগাড়ী

চারিদিক আলোকিত হইয়া উঠে। এইরূপ গাড়ী লোকের দৃষ্টি সহজে আকৃষ্ট করিবে এবং তাহাতে বিক্রয়ের বিশেষ সুবিধা হইবে। এজন্যই এইরূপ ব্যবস্থা।

বস্ত্র শুকাইবার অভিনব ব্যবস্থা

ঘরে কাপড় কাচিয়া অল্পসময়ের মধ্যে শুকাইবার ব্যবস্থা বিজ্ঞানের সাহায্যে সম্ভবপর হইয়াছে। নাগরদোলার মত একটি যন্ত্র বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা চালিত হয়। এই নাগরদোলার ভিন্ন ভিন্ন



বস্ত্র শুকাইবার অভিনব ব্যবস্থা

অংশে কাচা কাপড় রাখিলে, যন্ত্রটি দ্রুততরবেগে আবর্ত্তিত হইতে থাকে। তাহার ফলে অল্পসময়ের মধ্যে বস্ত্রগুলি শুকাইয়া যায়।

বিচিত্রদর্শন এঞ্জিন

জর্ম্মাণ রেলওয়ে কোম্পানী অতিকায় গুবরীর আকারবিশিষ্ট এঞ্জিন তৈয়ার করিয়াছেন। ইহাতে বায়ুর প্রতিহত বেগ হ্রাস পাইয়াছে।

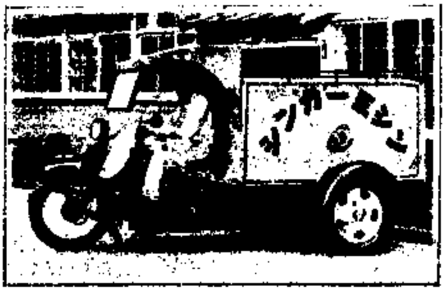


বিচিত্রদর্শন এঞ্জিন

যাত্রিবহনকার্য্যে এই এঞ্জিন ঘণ্টায় ১ শত ৩ মাইল বেগে ধাবিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞান প্রতি পদেই প্রকৃতিকে জয় করিবার জন্য প্রস্তুত, এই এঞ্জিন তাহার অন্যতম নিদর্শন।

তিন চাকার দ্রব্যবাহী গাড়ী

জাপানে তিন চাকার বড় বড় গাড়ী আছে। উহা জিনিষ বিলি করিয়া বেড়ায়। চারি চাকার এই জাতীয় গাড়ী অপেক্ষা তিন



তিন চাকার দ্রব্যবাহী গাড়ী

চাকার গাড়ীতে সুবিধা যথেষ্ট। অল্পস্থানের মধ্যে ইহা ঘুরাফিরা করিতে পারে। উহার পরিচালনব্যয়ও অল্প। গাড়ীর সম্মুখদিকে একটি চাকা আছে। ইহাতে অল্প স্থানেই গাড়ীটি ঘুরাফিরা করিতে পারে। গাড়ীর চালক এঞ্জিনের উপরে বসিয়া থাকে—পশ্চাতে নহে। এই গাড়ী ঘণ্টায় ৪৫ মাইল চলে।

দস্যু-তস্কর দলনের আধুনিক অস্ত্র

দস্যু-তস্কর এবং অন্যান্য অপরাধীর সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিবার জন্য নবোদ্ভাবিত অনেক অস্ত্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের

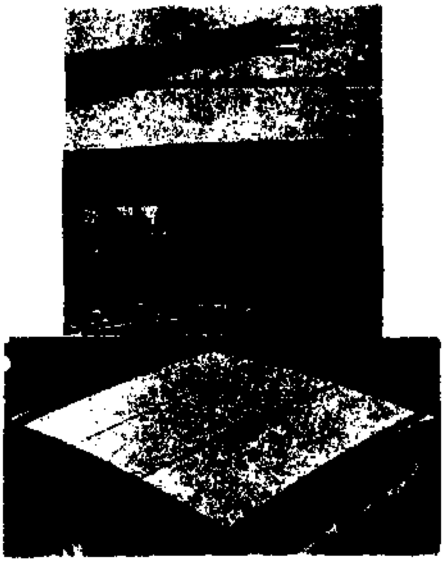


অপরাধী দলনের আধুনিক অস্ত্র

পুলিস বিভাগে সংগৃহীত হইয়াছে। যে সকল দস্যু বা তস্কর লোকের পরস্বাপহরণ করে, মানুষ খুন করে, তাহাদিগকে বলের দ্বারা পরাজিত করিবার অভিপ্রায়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকার এই সকল অস্ত্র-সংগ্রহ করিতেছেন। অস্ত্রগুলির মধ্যে এক প্রকার বন্দুক আছে, তন্মধ্য হইতে গ্যাস বাহির হয়। এই গ্যাসের এমনই শক্তি যে, কোনও দুষ্ট লোক আত্মগোপন করিয়া থাকিলে, গ্যাসের প্রভাবে সে আর লুক্কায়িত স্থানে অবস্থান করিতে পারে না। আর এক প্রকার বন্দুক আছে, ৪ মাইল দূর হইতে উহার গুলী নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

নূতন ধরণের জল ও অগ্নিনিবারক পদার্থ

সম্প্রতি স্বয়ংচালিত যান, কারখানা প্রভৃতির ছাদের জন্য এক প্রকার অগ্নিনিবারক ও জলপ্রতিরোধক পদার্থ উদ্ভাবিত হইয়াছে। ঐ পদার্থ দিয়া ছাদ নির্ম্মিত হইলে, সূর্য্যালোক অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেও জলকে প্রতিরোধ করিবে এবং অগ্নি উহাকে দগ্ধ করিতে



জল ও অগ্নি-নিবারক পদার্থ

পারিবে না। কি কি পদার্থ-যোগে উহা নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা প্রকাশ নাই, তবে এ কথা ঠিক যে, অগ্নিতে উহা দগ্ধ হইবে না এবং জলও উহা ভেদ করিতে পারিবে না।

আলোকিত পিস্তল

এইরূপ পিস্তল সাধারণতঃ পুলিস বিভাগের উপযোগী। পিস্তলে আলো জ্বালিবার বন্দোবস্ত আছে। লক্ষ্য অভিমুখে পিস্তল ধারণ



আলোকদীপ্ত পিস্তল

করিলেই আপনা হইতে পিস্তল হইতে একটা আলোকধারা নির্গত হয়, তাহাতে লক্ষ্যস্থল দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। রাত্রিকালেই এই শ্রেণীর পিস্তলের উপকারিতা অধিক।

মোটরচালিত প্রসিদ্ধ জলযান

দুই জন যাত্রী বহন করিবার উপযোগী একটি প্রসিদ্ধ জলযান নির্ম্মিত হইয়াছে। উহাতে মোটর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মোটর এক অশ্বশক্তিবিশিষ্ট। দুই জন যাত্রী বহন করিয়া এই সুদৃশ্য নৌকা যখন



মোটরচালিত প্রসিদ্ধ জলযান

নদীর উপর দিয়া চলিতে থাকে, তখন দর্শকদল উহার দিকে চাহিয়া থাকে।

ঘরের মেঝেতে দ্বার বন্ধ করিবার ব্যবস্থা

দরজা দিয়া অপরিচিত ব্যক্তি স্বচ্ছন্দে গৃহে প্রবেশ করিতে পারে। বাড়ীর লোক অপরিচিত ব্যক্তির গৃহে প্রবেশের কারণ না জানিয়া যদি তাহাকে প্রবেশ করিতে না দিতে চাহে, তাহা হইলে সকল সময়ে সে কার্য্য নিষ্পন্ন করা সম্ভব হয় না। এজন্য দ্বার বন্ধ রাখিবার একটা বিচিত্র উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। একটা ইস্পাতের দণ্ড দরজার ভিতরদিকে ভূমির সহিত সংলগ্ন করা থাকে। দণ্ডটির এক প্রান্ত জুতার তলায় দিবামাত্র অপর দিকে উত্থিত হইয়া দরজার কপাট চাপিয়া ধরে। তখন দরজা তিন চারি ইঞ্চি মাত্র ফাঁক হইয়া থাকে। সেই স্বল্পপরিসর পথে কোন মানুষ ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। গৃহকর্ত্রী নির্ভীকভাবে আগন্তুকের সহিত সেই স্বল্প ফাঁকের মধ্য দিয়া কথা কহিতে পারেন। তার পর যদি বুঝেন, আগন্তুককে ঘরে প্রবেশ করিতে দিতে পারা যায়, তখন পা সরাইয়া লইলেই দরজা মুক্ত হইবে। রাত্রিকালে দ্বারবন্ধের দণ্ড তুলিয়া রাখিলে সে দ্বার খুলিয়া কেহই প্রবেশ করিতে পারে না।



দ্বারবন্ধের বিচিত্র ব্যবস্থা

নিঃশঙ্ক জলক্রীড়া

সম্প্রতি নূতন একরূপ সাঁতারের পোষাক তৈয়ার হইয়াছে। এ পোষাক গায়ে থাকিলে যতক্ষণ খুসী জলে থাকো, ডুবিবার কোনও ভয় নাই।



নিঃশঙ্ক জল-ক্রীড়া

যাঁরা খুব ভালো সাঁতার জানেন, তাঁরা সাঁতার কাটিতে কাটিতে শ্রান্ত হইয়া ঝিমাইয়া পড়িয়াছেন, এবং সেজন্য জলের উপর নিজেদের ভাসাইয়া রাখিতে না পারায়, জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছেন এমন ঘটনা বিরল নহে।

এ পোষাক পরিয়া জলে নামিলে শ্রান্তিভরে অবশ হইলেও জলেই ভাসিয়া থাকিবেন—ডুবিবেন না—ডুবিতে পারিবেন না।

পোষাকটি তৈয়ার করা হইয়াছে বৈজ্ঞানিক কৌশলে এবং কৌশলটুকু সহজ।

সাঁতার কাটিতে জলাশয়ে নামিয়া স্নান করিতে গিয়া আমরা দেখিয়াছি, তলদেশ হইতে বাতাস উঠিয়া আমাদের কাপড়ে বেলুন গড়িয়া তোলে এবং সে বাতাসের গুণে আমরা দেহকে জলের বুকে অতি সহজে ভাসাইয়া রাখিতে পারি। এই নূতন পোষাক তৈয়ার হইয়াছে এবারে—পোষাকের সঙ্গে কতকগুলা পকেট আছে, পকেটের খোলা মুখ নীচের দিকে। এ পোষাক পরিয়া জলে নামিলে—যত গভীর জলে নামিব, ততই ঐ পকেটগুলা বাতাসে ভর্ত্তি হইয়া আপনা হইতে বন্ধ হইয়া যায়। তখন পকেটগুলা 'বাতাস-থলি' (air-filled bags)এর কায করে—কাযেই তাহা জীবনরক্ষার মস্ত সহায়ক (life preserver) হইয়া

উঠে। সুতরাং অগাধ জলে গিয়া শ্রান্ত হইলেও ডুবিবার শঙ্কা নাই এবং ভাসিয়া থাকা কালে কখনো-না-কখনো তীর হইতে সাহায্য পাওয়ার সুযোগও রহিবে প্রচুর। পাশের ছবিতে সে পোষাকের প্যাটার্ণ দেখা যাইতেছে।



সূর্য্যালোক-প্রভাবে ছোট মোটর পরিচালনা

বালক-নির্ম্মিত দূরবীক্ষণ যন্ত্র

আমেরিকার এক জন বালক ভাঙ্গা মোটর-গাড়ীর অংশ, ষ্টোভের নল প্রভৃতি লইয়া স্বহস্তে একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছে। উহার এমন শক্তি যে, এক মাইল দূরবর্ত্তী কোনও সংবাদপত্রের



বালক-নির্ম্মিত দূরবীক্ষণ যন্ত্র

বড় বড় অক্ষরবিশিষ্ট সংবাদকীর্ত্তিগুলি সুস্পষ্ট পাঠ করা যায়। উহা নির্ম্মাণ করিতে ১২ ডলার মূল্য ব্যয়িত হইয়াছে। এই দূরবীক্ষণ সাহায্যে বালকটি আকাশের নক্ষত্ররাজি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকে।

ক্ষুদ্র মোটরের শক্তি

এই সঙ্গে যে ছবি প্রদত্ত হইল, তাহাতে দেখা যাইতেছে, এই মোটর-উদ্ভাবয়িতা একটি ছোট মোটর যন্ত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।



ক্ষুদ্র মোটরযন্ত্রের শক্তি

ইহার ওজন ৫ পাউণ্ড, উহার এমনই শক্তি যে, একখানি বিমানকে ঘণ্টায় ৭৫ হইতে ১ শত মাইল বেগে পরিচালিত করিতে পারে। এই মোটরের এমন ক্ষমতা আছে যে, বাতাসের সাহায্য ব্যতিরেকে বিমানকে ঊর্দ্ধে ভাসাইয়া রাখে।

সূর্য্যালোক-সাহায্যে ক্ষুদ্র মোটর পরিচালন

সূর্য্যালোক নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে তাহার সাহায্যে মোটর চালনা করা যায়। ডাঃ এম্ সি, ডবলু হিউলেট সূর্য্যালোকচালিত মোটরের পরীক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। নানা প্রক্রিয়ার দ্বারা সূর্য্যালোককে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করিয়া ডাঃ হিউলেট তাঁহার গবেষণাগারে ক্ষুদ্র মোটর পরিচালনা করিয়াছেন।

রূপ-কথা

তাহারে খুঁজিয়া ফিরে রাজার কুমার
প্রবাল-দ্বীপের বনে। মণি-হার গলে—
দারুচিনি-কর্পূরের বৃক্ষ ছায়া তলে
সুপ্তি-মগ্ন। ওষ্ঠে কাঁপে আবেগ চুমার—
কোথা সে রাজার মেয়ে—সন্তান ভূ-মা'র,
যৌবন-উদ্বেল-দেহ, মুখে মুক্তা ফলে;
জ্বলে তার নয়নের রূপ-স্বপ্ন-দলে
দু'টি মণি স্যমন্তক লক্ষ কল্পনার!

কোথা সে কনক-পুরী মর্ম্মর-মন্দিরে,
স্বর্ণ-পালঙ্কে যার অচেতন ঘুমে
রূপসী রাজার মেয়ে। কেশদাম চুমে
মর্ম্মরের মর্ম্ম-তল নমি' বন্দিনীরে।
কপালে শোভিছে কিবা সুধা-গন্ধী টীপ,
শিথান-শিয়রে জ্বলে সোণার প্রদীপ।

কত বন-উপবন মরু-ভূ পর্ব্বত
লঙ্ঘি' চলে রাজ-পুত্র গন্ধর্ব্ব-নগরে।
সোণার কমল যেথা ক্ষীর-সরোবরে
ফুটে রয়! কল্পতরু রচে ছায়া-পথ।
রজত-সোপানে রাখি' চারু চিত্র-রথ
পরীগণ মনোরঙ্গে জল-কেলি করে।
যক্ষ নর-নারীরাও অদূরে বিহরে,
চমকে বিজলীসম রূপ-জহরত।

উদ্যানে মন্দার-চম্পা—বিহঙ্গের হাট,
পার্শ্বে তার নভশ্চুম্বী প্রাসাদ বিরাট।
সিংহদ্বারে মণিভদ্র জাগ্রত-প্রহরী,
কা'র সাধ্য ফাঁকি দেয় তার সে ঈক্ষণ।
শোনা যায় তক্ষকের নাসিকা-গর্জ্জন
কবোষ্ণ নিশ্বাসে তার কাঁপিছে নগরী!

বর্ষণ-মুখরা ধরা, ঝরে অবিরল—
আকাশ ভুবন প্লাবি' শ্রাবণের ধারা!
তারি মাঝে চলে ও কে পান্থ সর্ব্ব-হারা
পাদক্ষেপে কাঁপে বিশ্ব, জ্যোতিষ্কমণ্ডল!
(দেবত্বে হানিয়া বজ্র যৌবন চঞ্চল
ভেঙ্গে চলে বুঝি আজ ধূর্জ্জটীর কারা)
বাসুকি নোয়ায় মাথা—দুলে উঠে, সারা
পৃথিবীর প্রাণ-পুষ্পে বাসনার দল।

এমনি সে যাদুকর রাজপুত্র দলে
উত্তরিয়া বেদনার সপ্ত-সিন্ধু-নীর।
তার দুঃখে বন্যা ঝাঁপে অশ্রু-গোমতীর,
বনে কাঁদে পশু-পক্ষী, মৎস্য-কন্যা জলে।
কোথা সে রাজার মেয়ে? আজো হিয়া গলে,
মিলে নাক দেখা তার, চলে মুসাফির—

বিজন পুরীর মাঝে একান্ত একাকী,
বন্দিনী সে রাজ-কন্যা মর্ম্মর-মন্দিরে।
অবিরাম গাঁথে মালা তপ্ত-অশ্রু-নীরে,
পিঞ্জরের শারী সনে কথা কহে ডাকি'।
তিল-ফুল নাসা তার, কুন্দ-দন্তগুলি,
হরিণ-নয়নে জ্বলে কামনা-কজ্জল।
ভ্রূ বঙ্কিম, রক্ত ওষ্ঠ, চম্পক-অঙ্গুলি,
উড়ে মন্দ গন্ধবহে বিচূর্ণ কুন্তল।

পারে না বহিতে যেন ক্ষীণ কটি তার,
পীনোন্নত পয়োধরে। অলক্ত চরণ।
রাজ-হংসী জিনি গ্রীবা, গতি মন্দ-ভার,
পরিধানে শাড়ী ঘন মেঘের বরণ।
দিবানিশি ঘিরে তার শিখী-পক্ষী-তনু,
বর্ণের সহস্রদলে খেলে ইন্দ্রধনু।

কঙ্কণ-কেয়ূর হস্তে, মুক্তা-মালা গলে—
স্বর্ণ-মেখলা শোভে তার কটি ঘিরে।
হীরক-কুণ্ডল কর্ণে, শ্রোণী-যুগ শিরে
দুটি মণি পদ্ম-রাগ। সীঁথি-বন্ধে জ্বলে
সূর্য্যকান্ত মণি এক। ঝরে মধ্বাসব—
কথার বাঁধন টুটে বিদ্যুৎ মিলায়।
ভ্রূ-ভঙ্গে মদন কাঁপে, অপাঙ্গলীলায়
ছুটে কত বিস্ময়ের রহস্য-বিপ্লব!

গোলে-বাকাওলী বাঁধে চারু খোঁপা তার,
রজত-কাঠির স্পর্শে সে না কি ঘুমায়।
কালপরী নিদ্রাপরী চামর ঢুলায়,
জীয়ন-কাঠিতে বালা জাগে পুনর্ব্বার।

জল-কন্যা রুক্মিণীর অতন্দ্র নয়ন—
তাহারে ঘিরিয়া রচে সোনালী স্বপন।

বাহির ভুবনে রূপ-কুমারের মেলা
চলে আজি অনিবার। হিম-শীর্ণা ধরা
মেলিয়াছে শস্প-শ্যামে বর্ণের পসরা,
মায়া-গিরিবর্ত্মে কার তবু কাটে বেলা!
মান-পক্ষ চক্রবাক কল্পলোকে ফিরে,
পাথার বাতাসে ঝরে আকাশ-কুসুম।
হোথা রাজ-কুমারীর চক্ষে নাই ঘুম,
পরাণে হানিছে তার শব্দ-ভেদী তীরে!

প্রাচীর-বাহিরে বাজে তাহার বাঁশরী
নিশিদিন। সে শুধুই কাণ পে'তে শুনে।
নিশ্চল স্থাণুর সম করিয়া শয়ন
কল্পনার স্বর্ণ-সূত্রে স্বপ্ন-জাল বুনে।
পারে না দেখিতে তারে—দিবা-বিভাবরী
জাগ্রত প্রহরী হায় রাক্ষসী-নয়ন!

রিয়াজউদ্দীন চৌধুরী।



দান-প্রতিদান

(উপন্যাস)



[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

৩৯

দেখিতে দেখিতে কোথায় মিলাইয়া গেল পিতামাতার স্নেহ-বিমণ্ডিত কোমল সকরুণ মুখচ্ছবি ;—চিরপরিচিত প্রতি-বেশিনীর দল, স্নানের ঘাট, দেবালয়, বারোয়ারীতলা, নিবিড় বাঁশের বন, ঘন-পল্লবিত আম্রকানন ; কিন্তু বাহিরে মিলাইয়া গেলেও কুহুর অন্তর হইতে কিছুই মিলাইতে পারিল না।

বজরার বাতায়ন খুলিয়া কুহু দূরে—সুদূরের পানে চাহিয়া রহিল। ঘাটে ঘাটে বধূরা জল লইতে আসিয়াছে। ছেলেরা সাঁতার কাটিতেছে। ছিপে মাছ ধরিতেছে। ঐ ছেলেটির মুখখানি যেন তপুর মত। তেমনই কালো কোঁকড়ানো চুল, টানা টানা চোখ, সুগঠিত চিবুক, তবুও তপুর মত সুন্দর নহে।

কোমর-জলে দাঁড়াইয়া যে বর্ষীয়সী বিধবাটি আধঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া জপ করিতেছেন, উঁহাকে দূর হইতে মা বলিয়া ভ্রম হয়, ছিপছিপে লম্বা গড়ন, গৌর তনু। বজরা নিকটে আসিলে কুহু অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। না, তাহার মা'র মত নহে, তেমন মহিমময়ী মাতৃমুর্ত্তি একটিও ত চোখে পড়ে না ! মা যে মা, মা'র সমতুল্য আর কেহই হইতে পারে না। আসিবার সময় কেমন করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া-ছিলেন, মা'র স্পর্শ যেন এখনও সর্ব্বাঙ্গে লাগিয়া রহিয়াছে। মা কত যত্নে চুল বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। কুহু খোঁপায় হাত দিয়া মা'র হাতের সাতগুছির বিনুনিটা বারম্বার পরীক্ষা করিতে লাগিল। নাড়া পাইয়া একটি ত্রিদল বিল্বপত্র কুহুর স্কন্ধে ঝরিয়া পড়িল। বেলপাতাটি মা'র দেওয়া মাঙ্গলিক নির্ম্মাল্য। কুহু পাতাটা কপালে ঠেকাইয়া নাকের কাছে ধরিল। পাতার গন্ধ মৃদু মৃদু—মা'র অঙ্গ-সৌরভের ন্যায়। মা'র স্পর্শ, অঙ্গ-সৌরভ, দেহে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, কেবল মা নাই, তিনি অশ্রুসিক্ত হৃদয়াসনে বিরাজ করিতেছেন।

নিস্তার কর্ত্রীঠাকুরাণীর গুরুগম্ভীর মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া সরিয়া সরিয়া উঁকিঝুঁকি দিতেছিল। এখন সাহস সঞ্চয় করিয়া কুহুর পদতলে আসিয়া বসিল।

বার দুই কাসিয়া, মাথা চুলকাইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল ; "দুঃখ ক'রে কি করবেন, বৌরাণি ! বিয়ে হলেই ছিলোকের পরের খুসীর ওপরে চলতে হয়। এরে বলি বাবা, মা, কি আত্তি বাগাতা। ওঁনারা যে অমন মনিষ্যি, তাও ছোট রাজার মনে ধরে না। নিজে ত টঙ্গায় চ'ড়ে ব'সে রইলেন, আমারেও আপনার কাছে থাকতে দিলে না। কেবল হিরুদাদাকে আটকাতে পারে নি। হিরুদা যে ডানপিটে, ওঁনাক্ আর কারুর আটকাতে হয় না।"

কুহু তীরতরুর উপর হইতে উদাস বিহ্বল নেত্র ফিরাইয়া আনিয়া নিস্তারের পানে প্রসারিত করিয়া তেমনই নীরবেই রহিল।

এ নীরবতায় নিস্তার অপ্রসন্ন হইয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিল—"আজ আসতেন বড় রাজা, তিনি লোকের কদর জানেন। বড় রাজার তুলি্য লোক হয় না, বৌরাণি। কিন্তু ওঁনার কপালে সব উল্টো। সেবার বড় রাণীরে আনতে গেনু বড় রাণীর বাপের বাড়ী। মা গো, কি বলবো ! সেথাকার ব্যাভার দেখে নজ্জায় মরি। বাড়ীর সব্বাই যেন

গোরাপল্টন, যেমন কেতা, তেমনি কিড়িমিড়ি কথা। ঝি, বৌ সকলে মিলে টেবলে ব'সে খানা খায়। বড় রাজা যেমনি হেঁদু, তারা কি তেমনি যবন! তবুও বড় রাজার শ্বশুর-শাউড়ীর প্রিতি কি ছেরদা, কি মান্যি!"

নিস্তারের কথার উত্তরস্বরূপ কুহু একটা চাপা নিশ্বাস মোচন করিয়া আবার বাহিরের প্রতি নেত্রদ্বয় নিবদ্ধ করিল। নিস্তারের একা বকিতে ভাল লাগিতেছিল না, ক্ষণকাল পরে কাযের ছুতায় সে উঠিয়া গেল।

কুহুর পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে জয়ন্তর উচ্চহাসির সহিত হিরণের মৃদুসংমিলিত হাস্যধ্বনি কুহুর কর্ণকুহরে ভাসিয়া আসিতে লাগিল; কিন্তু স্বামীর হাসি কুহুকে আনন্দ দিতে পারিল না। জয়ন্তর প্রতি একটা ক্ষমাহীন ধিক্কারে কুহুর সর্ব্বাঙ্গ যেন রি-রি করিতেছিল। যে স্বামী তাহার দেবোপম স্নেহময় পিতাকে, করুণাময়ী মাতাকে অবজ্ঞা তাচ্ছীল্য করিয়া এত দুঃখ দিয়া আসিয়াছে, সে তাহার কেহ নহে। এ জীবনে সে তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিবে না। প্রস্ফুটিত ফুলদলের মত তাহার নির্ম্মল হৃদয়খানি অপার ভক্তিবিশ্বাসে স্বামীর চরণে নিবেদন করিতে পারিবে না। কুহু ভাসিয়া যাইবে। সম্মুখে অনন্ত জীবন-সমুদ্র, আশা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই, আশ্রয় মিলিবে না। জীবন-তরণীখানি আর তটে ভিড়িবে না। কেবল ভাসিবে; এ ভাসার শেষ যেন না হয়। বিরাম যেন না হয়।

দেখিতে দেখিতে মধ্যাহ্ন আসিল। শরতের হাসিমাখা রৌদ্র দ্বিপ্রহরের খরতাপে পরিণত হইল। প্রভাতের চঞ্চল বায়ু শান্তভাব ধারণ করিল। কর্ম্ম-কোলাহল ধীরে ধীরে থামিয়া আসিতে লাগিল। লোকবিরল এক স্নানের ঘাটে বজরা বাঁধিয়া মাঝি-মাল্লারা স্নানাহারের আয়োজনে ব্যাপৃত হইল।

কিয়ৎকাল পর নিস্তার আসিয়া হাঁকিল, "বৌরাণী তেমনি ব'সে রয়েছেন? রোদে গা যে পুড়ে যাচ্ছে। জানলা বন্ধ ক'রে দি? এখনকার রোদ ভাল নয়। অসুখ-বিসুখ হ'তে পারে। জানলা বন্ধ করবো না? তা হ'লেক আপনি এদিকে একটু স'রে বোসো। আজ ত চান করবেন না? রান্না হয়ে গেছে, খাবারের ঠাঁই ক'রে দি?"

কুহু মাথা নাড়িল—"না পুঁটুর মা, এবেলা আমি কিছু খাব না। ক্ষিদে হয়নি। আস্‌বার সময় মা খাইয়ে দিয়েছিলেন। বাবুদের খাওয়া হ'লে তোমরা খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে ফেল।"

"সেই কোন্ সকালে জল খেয়েছিলেন, এতটা বেলাতেও ক্ষিধে হ'ল না, এ আবার কেমন পেট?" বলিতে বলিতে নিস্তার দুম্-দাম্-পদক্ষেপে রন্ধনের পৃথক্ পান্সীখানার দিকে চলিয়া গেল। কুহুর আহারের অনিচ্ছায় নিস্তার অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। নিস্তার উত্তম আহার্য্যের অতিশয় পক্ষপাতী। কুহু অল্পাহারী হইলেও পাচক রাজরাণীর উপযুক্ত খাদ্যাদি কুহুকে সাজাইয়া আনিয়া দিত। কুহুর বিবাহের পর হইতে নিস্তার বরাবর পাতের প্রসাদ পাইয়া আসিতেছে। জয়ন্তর আদেশে কুহুর সহিত নিস্তার রাণীর পিত্রালয়ে থাকিতে না পারিয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। পোড়ারমুখো ঠাকুর ত তাহাকে ভিন্ন চোখে দেখিতে পায় না। সাধারণ দাসদাসীর পর্য্যায়ে ফেলিয়া সাধারণ জিনিস ভাগবণ্টন করিয়া দেয়। কাযেই এ কয়েক দিন নিস্তারের খাওয়া মোটেই ভাল হয় নাই। আশা ছিল, আজ কুহু যৎকিঞ্চিৎ খাইয়া নিস্তারকে প্রসাদ দিবে। তাহার অন্যথায় নিস্তার হতাশ হইল।

ক্ষণেক পর হিরণ আসিয়া কহিল, "দিদি, তুমি নাকি খাবে না বলেছ? সেই কোন্ সকালে একটু জল খেয়েছিলে, তাতে মানুষের আবার ক্ষিদে থাকে না? মা তোমার চেয়ে আমাকে ঢের বেশী খেতে দিয়েছিলেন। অনেক আগেই জলো হাওয়ায় আমার ত হজম হয়ে গেছে। তোমার বেলা হাওয়া ত অন্যরকম হ'তে পারে না। তপু বলেছিল, তুমি ইলিস মাছ খুব ভালবাস। আজকে কি সুন্দর টাটকা ইলিস কিনেছি। সরষে-বাটা দিয়ে ঝোল হয়েছে, ডিমের বড়া হয়েছে, তোমার দুটি না খেলে যে চলবে না, দিদি!"

কুহু আহারের অনিচ্ছা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত মুখ তুলিয়া তখনই নামাইয়া লইল। তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। আজ কয়েক দিন তাহার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ নাই। এতখানি বেলার ভিতর তিনি ভুলিয়াও একটিবার স্ত্রীর সন্ধান লইতে আসিলেন না। কুহু যদিও মনে মনে দৃঢ়সংকল্প করিয়াছে—স্বামীর সংস্পর্শে সে আর যাইবে না, তাহার নিষ্ঠুরতা ক্ষমা করিবে না, তবু পিপাসিত হৃদয় ভিতরে ভিতরে সেই হৃদয়হীনকেই খুঁজিয়া মরে কেন? যাঁহার আসিবার কথা, আগ্রহ করিবার কথা, তাহার পরিবর্ত্তে অনাত্মীয় হিরণের ব্যগ্রতায় কুহু আঘাত পায় কেন?

কুন্তর উদ্গত অশ্রু গোপন করিবার প্রয়াসকে হিরণ সম্মতির লক্ষণ ধরিয়া প্রফুল্লচিত্তে চলিয়া গেল।

তাহার পর রূপার থালা-বাটিতে নানারূপ তরকারী শুভ্র অন্ন লইয়া পাচক উপস্থিত হইল। দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন লইয়া নিস্তার হাসিমুখে দেখা দিল। যত্নের ত্রুটি নাই; অনুষ্ঠানের অন্ত নাই। কিন্তু এ রাজ-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ব্যথিত হৃদয় কাহাকে চায়? কি চায়? কে তাহার সন্ধান দিবে?

আহারের পর জয়ন্ত খাটে শুইয়া বই পড়িতেছিল। হিরণ পাণ চিবাইতে চিবাইতে বলিল, "পশ্চিমের এ ঘরটা বড্ড গরম, দুপুরের রোদে ভ'রে গেছে, এ ঘরে তোমার ঘুম হবে না। জয়ন্ত, তুমি মাঝের শোবার কামরায় যাও। সেটা বেশ ঠাণ্ডা আছে।"

ইঙ্গিতের ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে জয়ন্তর বিলম্ব হইল না। সে একটু হাসিয়া জবাব দিল, "রোদ গেলেও জলের ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে, এখানে আমার ঘুমের ব্যাঘাত হবে না। দরকার হ'লে বজরা ঘুরিয়ে নিতে বলবো।"

"তা যেন হ'ল, কিন্তু তোমার একবার ও কামরায় যাওয়া দরকার, ভাই। কুন্তদি সারাটা বেলা একা রয়েছে, বাপ-মাকে ছেড়ে এসে বেচারীর মন ভাল নেই, কারুর সাথে কথাবার্ত্তায় থাকলে তবু মনটা একটু ভাল থাকতো।"

"কচি খুকী, মন খারাপ হয়েছে? সেখানে রাজ-অট্টালিকায় ছিলেন, এখানে দুঃখের দশায় পড়েছেন। তোমার যদি এত দরদ হয়ে থাকে, তা হ'লে তুমিই যাও না কেন, হিরণ, স্তবস্তুতি ক'রে চিত্তবিনোদন কর গে। জানই ত, ন্যাকামী আমার দুচোখের বিষ। কুন্তকে আমি বিয়ে না ক'রে তুমি করলেই উভয় পক্ষের সুবিধা হ'ত। তুমি ভালবাসার স্ত্রী পেতে, আমি সুন্দরী বন্ধুপত্নী পেতাম। তোমারই মত আকর্ষণ হ'ত বেশী।"

"ছিঃ জয়ন্ত, চুপ কর। কুন্তকে আমি দিদি ব'লে ডাকি; বোনের মত স্নেহ করি। তার সম্বন্ধে আমাকে একটু সমীহ ক'রে কথা বলো।"

হিরণ রাগ করিয়া বজরার সম্মুখে উঠিয়া গেল।

৪০

সন্ধ্যাসমাগমে বজরা ইচ্ছামতী ছাড়াইয়া পদ্মায় পড়িল। বর্ষার সলিললীলা থামিয়া গেলেও ভয়ঙ্করী পদ্মা শান্ত হইতে পারে নাই; অশান্ত তরঙ্গে আবর্ত্তিত হইতেছে। এক দিকে ঘন বিটপিভূষিত সু-উচ্চ পাড় স্রোতের টানে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, নিকটে লোক নাই, লোকালয় নাই। আছে কেবল জলের কলকল্লোলধ্বনি, বনস্পতির সকরুণ বিলাপ।

পরপারে দিগন্তবিস্তৃত চড়া, অনন্ত বালুকাশয্যা বক্ষে লইয়া যোজন ব্যাপিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সমস্ত দিন বন্য হংসের দল চড়ার উপর বিচরণ করিয়া, শুভ্র বালুকায় পদচিহ্ন আঁকিয়া রাখিয়াছে। সূর্য্যাস্তের স্বর্ণচ্ছায়া মিলাইতে না মিলাইতেই শুক্লপক্ষের নির্ম্মল চন্দ্রালোকে স্থল-জল হাসিয়া উঠিল। বালির চরে তাদের অবারিত উন্মুক্ত জ্যোৎস্না একবারে আকাশের সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত হইল।

হিরণকে লইয়া জয়ন্ত বজরার ছাদে বসিয়াছিল। হিরণ গম্ভীর, অন্যমনস্ক; জয়ন্ত তরল উচ্ছ্বসিত। চারিপার্শ্বের অনবদ্য অপরূপ শোভাসম্পদ নিরীক্ষণ করিয়া কে না প্রফুল্লিত হয়?

জয়ন্ত প্রফুল্ল কণ্ঠে কহিল, "পদ্মায় না এলে এমন জ্যোৎস্না পাওয়া যায় না, হিরণ! মনে পড়ে, সেই ফাল্গুন মাসের কথা, সে দিনও এইখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। এম্নি জ্যোৎস্নার আলোয় পদ্মা ছেয়ে গিয়েছিল। তখন জানতাম না, এত সকালে আবার এ রাস্তায় আসা হবে।"

হিরণ সংক্ষেপে উত্তর করিল, "হাঁ"।

জয়ন্ত পুনশ্চ বলিতে লাগিল, "সে দিন তুই সুন্দর বাঁশী বাজিয়েছিলি, তখন মনে করেছিলাম, রোজ রাতে তোর বাঁশী শুনবো। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তার পর আর এক দিনও শোনা হয় নি। বাঁশীটা সাথে আছে ত? নিয়ে আয় না হিরণ, একটু শোনা যাক।"

হিরণ উদাসভাবে বলিল, "কি জানি কোথায় রয়েছে, কি হবে বাঁশী শুনে?"

"গান-বাজনা শুনে কি হয়? নিঃসঙ্গ সময় সহজে কাটে। কোথায় আবার থাকবে? তোর স্যুটকেশের ভেতর রয়েছে, সে দিনও দেখেছি। এত দিন শুনিনি ব'লে আজ শোনাতে ভাল লাগবে না নাকি? কিন্তু এমন সময় যে হয়নি, এ সময় বয়ে গেলে কেউ বাঁশী শুনতে চাইবে না।"

একবার ইতস্ততঃ করিয়া কাসিয়া নির্লজ্জ হিরণ বলিল, "আমি বাঁশী আনছি জয়ন্ত, তুমি একবার নীচে চল।

কুহুদিকে ডেকে আনবে। এখানে কি সুন্দর আলো, বাতাস রেখে সে কোথায় প'ড়ে রয়েছে।"

জয়ন্ত পরিহাসের স্বরে কহিল, "ও, এতক্ষণে তোমার আপত্তির কারণ আবিষ্কার করা গেল। কুহু না হ'লে তুমি তোমার গুণপণা আমার কাছে জাহির করবে না। তা আমার যেতে হবে কেন, হিরণ? তুমিই তাকে এখানে ডেকে নিয়ে এস। যেয়ে দেখ, তিনি আবার কোন্ খোস-মেজাজে রয়েছেন? মেজাজ আমার বরদাস্ত হয় না, তুমি যাও।"

হিরণ মহা উৎসাহে বাঁশী আনিতে যাইয়া কুহুর ঘরে উপনীত হইল। অন্ধকারে সাড়া-শব্দ নাই। দরজার সম্মুখে তন্দ্রাচ্ছন্ন নিস্তার ঢুলিতেছে।

হিরণ ডাকিয়া বলিল, "নিস্তার, ঘর অন্ধকার কেন? কুহুদি কোথায়?"

নিস্তার দুই হস্তে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া উত্তর করিল, "তিনি শুয়ে আছে। কইলেন শরীল ভাল নেই, আলো জেলো না। আমি এ বেলা কিছু খাব নি; আমায় ডেকো না কেউ। তাই দোর আগলে বোসে আছি দা'বাবুর যদি কিছু নাগে, টাগে।"

হিরণের বাঁশী বাজাইবার সমস্ত উৎসাহ সেই দণ্ডে নিবিয়া গেল। কুহুর শরীর ভাল নাই, কথাটা তাহার হৃদয়ের তারে কেবলই আঘাত দিতে লাগিল। দীপ-হীন নির্জ্জন কক্ষ তাহাকে প্রবলবেগে টানিলেও সে যাইতে পারিল না। তাহার স্নেহ-ভালবাসা অকৃত্রিম অনাবিল হইলেও অধিকার কি? সে যে অনাত্মীয়, সম্বন্ধহীন। স্বচ্ছন্দে কুহুর শিয়রে আশ্রয় লইয়া তাহার তপ্ত ললাটে একটুখানি স্নেহস্পর্শ দিতে শত দ্বিধা, সংশয়, সঙ্কোচ, সম্ভ্রম। স্নেহ করিলেও তাহাকে দূরে থাকিতে হইবে। অনাত্মীয়ের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া গোপনে ভালবাসিতে হইবে। যে শুক-তারাটি স্বজনহারা পরগৃহবাসী হিরণের অন্তরাকাশ আলোকিত করিয়াছে, হিরণের বিধিলিপি তাহা হইতে সরিয়া থাকা। তাহার নির্ম্মল স্নেহ-ভালবাসার মূল্য সংসার বুঝিবে না।

হিরণ অন্ধকার কক্ষে ব্যাকুল-নয়নে চাহিয়া আস্তে আস্তে ছাদে যাইতেই জয়ন্ত কহিল, "বাঁশী এনেছ, বাজাও। চুপ ক'রে রইলে কেন? ও, বুঝেছি যাঁকে ডাকতে গিয়েছিলে, তাঁর আগমন না হ'লে আজ বাঁশী বাজবে না?"

"ভাই, কুহুদির শরীর ভাল নেই, সে আসবে না।"

"কি হয়েছে?"

"তা ত জানি না। অন্ধকার ঘরে শুয়ে আছে, নিস্তার বললে, ডাকতে মানা ক'রে দিয়েছেন। তুমি একবার চল, কি অসুখ হ'ল দেখতে হয়। এখানে ডাক্তার পাওয়া যাবে না, আমার সাথে ক'টা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আছে, বই দেখে তা দিলেও হ'তে পারে।"

"তোমার সবতাতেই বাড়াবাড়ি, হিরণ! এ মাঝ-পদ্মায় ডাক্তার ওষুধ সুলভ নয়। বিশেষ কিছু হ'লে নিস্তার বলতো। তিনি মজা ক'রে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করছেন, আমি যাব তাঁর সাধ্যসাধনা করতে, আমার বয়ে গেছে। আমি পারবো না।"

জয়ন্তর বাক্যে হিরণের জবাব দিবার প্রবৃত্তি হইল না। সে ছাদের লোহার রেলিং ধরিয়া সুদূরের পানে দৃষ্টি প্রসারিত করিল। তাহার মনের মধ্যে বারম্বার প্রশ্ন উঠিতেছিল, কুহু তাহার কি করিয়াছিল? দরিদ্র কুটীরে যে স্নিগ্ধভাতি প্রদীপ প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহার উজ্জ্বল শিখায় কত কুটীর আলোকিত হইয়া কত পুণ্য শান্ত জীবন ধন্য হইতে পারিত। ধনসম্পদে ক্ষুদ্র হইলেও কত উদার-হৃদয়সম্পন্ন ত্যাগী মহৎ ব্যক্তি কুহুকে বিধাতার শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদস্বরূপ সাদরে বরণ করিয়া লইত। হিরণ কি করিয়াছে? বন্ধুকে সুপথে পরিচালিত করিবার দুরাশায় অমূল্য মুক্তামালা বানরের গলায় দোলাইয়াছে। যাঁহার নিকটে কাহারও পাপ-পুণ্য, উত্থান-পতন গোপন থাকে না, তিনি কি হিরণের এ স্বেচ্ছাকৃত পাপ ক্ষমা করিবেন? ক্ষমা না করুন, তাঁহার রোষানলে হিরণ দগ্ধ হউক, ভস্ম হউক। কিন্তু অনলের এতটুকু স্ফুলিঙ্গ কুহুকে যেন স্পর্শ করিতে না পারে।

কুহু হিরণকে কি ভাবিতেছে? তাহাকে নিষ্ঠুর, প্রতারক ভাবিয়া কুহু হয় ত গুমরিয়া কাঁদিতেছে, তাহারই অব্যক্ত ক্রন্দনধ্বনি বাতাসে ব্যাপ্ত; পদ্মা সকরুণ বিলাপের স্বরে গাহিতেছে, কুলু কুলু। চড়ার মধ্যস্থলে কাশগুচ্ছ যে ঝোপ রচনা করিয়াছে, উহা যেন ঝোপ নহে। শুভ্র কাশপুষ্প কুহুর বসনাঞ্চলনিম্নের মৃত্তিকায় মুখ লুকাইয়া যেন কাঁদিতেছে, তাহার নয়নাশ্রু পদ্মার সলিলরাশি। শুভ্রবসনা চড়ার প্রান্তবর্ত্তী মসীবর্ণ বনরেখা কুহুর ঘন কেশজাল। ঊর্দ্ধের উজ্জ্বল

নক্ষত্রমণ্ডলী কেবল নক্ষত্র নহে, উহাদেরই অভ্যন্তরে কুহুর জ্যোতির্ম্ময় বৃহৎ চক্ষুতারকা দুটি যেন হিরণকে বিদ্ধ করিয়া প্রশ্ন করিতেছে, "আমি তোমার কি করিয়াছিলাম ?"

"হিরণ এত গম্ভীর হয়ে গেলে কেন ? বাঁশী বাজাবে না ?"

হিরণের পাশে আসিয়া স্কন্ধে বাহু স্থাপন করিয়া জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করিল, "হিরণ, বাঁশী বাজাবে না ?"

হিরণ সচকিত হইয়া বলিল, "না, ভাল লাগছে না, আজ থাক।"

"বাঁশী আনলে, থাকবে কেন, হিরণ ? বাজাও একটু-খানি। আজ আমায় শুনিয়ে দাও। কাল তোমার কুহুদিকে শুনিও। এত দিন আমাকে নিয়েই ত তোমার আনন্দে দিন কেটে গেছে। এখন আর এক জন না হ'লে তোমার কিছু ভাল লাগে না। এর মানে কি ? তোমাদের ভাষায় প্রেম, না পীরিতি ?"

হিরণ জয়ন্তর বাহু ঠেলিয়া দিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, "চুপ কর জয়ন্ত, আর কথা বলো না। এমন নিম্নশ্রেণীর ঠাট্টা ভদ্র-লোকে শোনে না, ইতরে শোনে। আমি পরান্নভোজী—পরের আশ্রিত, তাই শুনছি। পৃথিবীতে এক প্রেম ভিন্ন মানুষের কি আর মনোবৃত্তি নেই ? ভালবাসা নেই ? তুমি ত ভাল করেই জান, আমার এক দিদি ছিলেন, তোমার স্ত্রীকে আমি সেই দিদি মনে করি। তার নাম নিয়ে তুমি যা তা বল্লে আমার তোমার কাছে থাকা হবে না। বাসনা তোমার যেমন বোন, কুহুও আমার তেমনি, তার চেয়েও বেশী ; কারণ, তোমার ধন-সম্পদ আছে, আত্মীয়-স্বজন আছে, আমার যে কিছুই নাই, ভাই !"

হিরণ আর বলিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

জয়ন্ত স্তব্ধ হইল। তাহার কথা জোগাইল না, হিরণের এ ধরণের বাক্যাবলী জয়ন্ত সহিতে পারিত না। তুচ্ছ উপহাসে হিরণ যে এত উত্তেজিত হইতে পারে, জয়ন্ত তাহা কল্পনা করে নাই। ইহার আভাস পাইলে জয়ন্ত কখনও এমনভাবে বলিত না। যাহা বলিয়াছে, তাহা আর ফিরিবে না, তবু যথাসাধ্য নরম স্বরে জয়ন্ত বলিতে লাগিল, "রাগ করলে, হিরণ ? তোমার স্ত্রী থাকলে আমায় যদি তুমি অমনি কিছু বলতে, তাতে আমি কখনও রাগ করতাম না। তোমাকে যেতে হবে না, আমি এবার থেকে সাবধান হচ্ছি, আর কিছু বলবো না। তুমিও ছুতোনাতায় পরান্নভোজী, আশ্রিত শব্দগুলোর অপব্যবহার করো না। কিসের তুমি স্বজনহীন, নির্বান্ধব। আমি এখনও আছি, ম'রে যাইনি। তোমার দিদিকে, বোনকে যত খুসী ভালবাসো, ভালবাসার সমুদ্রে ডুবিয়ে মারো, তাতে আমার কি ? এখন শান্ত হয়ে আমায় একটু বাঁশী শুনিয়ে দাও। আমার পাওনাটুকু আমারি থাকুক, সেটা আমি অন্যকে দিতে দেব না।"

হিরণের হৃদয়ের উত্তাপ সেই মুহূর্ত্তেই শীতল হইল। জয়ন্তর প্রতি কিছুতেই সে রাগ করিতে পারিত না। তাহার রূঢ়তায় কেবলই আঘাত পাইত। হিরণ সুবাধ্য বালকের ন্যায় নিরুত্তরে বাঁশী লইয়া বাজাইতে লাগিল —

"বেলা গেল, তোমার পথ চেয়ে।
শূন্য ঘাটে একা আমি, পার ক'রে নাও খেয়ার নেয়ে।"

পূরবীর সকরুণ স্বরলহরী আকাশে বাতাসে স্থলে জলে একটা অব্যক্ত বিলাপের মূর্চ্ছনা তুলিল। নদীর কলধ্বনির সহিত সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতি বাঁশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন রণিয়া রণিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল।

৪১

অনেকক্ষণ পর বাঁশী থামিলে জয়ন্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল, "কি সুন্দর ! বড় মিষ্টি লাগলো, আজ যেমন বাজিয়েছিস, হিরণ, এর আগে এক দিনও এমন শুনিনি, বাঁশীর গান নয় ত কান্না। রাজদরবারে যদি আজ এমনি বাজাতিস, তা হ'লে তোর ভাগ্যে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ হ'ত। কি করবো, ভাই ! আমি দেশের রাজাও নয়, এটা রাজদরবারও নয়, তবু একটা পুরস্কার দিতে ইচ্ছে হচ্ছে। কি পুরস্কার দেব ভেবে পাই না, তোর যোগ্য পুরস্কার আছেই বা কি ?"

হিরণ বাঁশী ফেলিয়া দুই হাতে জয়ন্তর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "আমায় কি পুরস্কার দিবি, জয়ন্ত ? আমার জীবনটাই যে তোর পুরস্কার। পথের ভিখারীকে ভাই ব'লে, বন্ধু ব'লে যে সম্মান দিয়েছে, তার কাছে আবার অন্য পুরস্কার ? তবু দাতার কাছে ভিক্ষুকের চাইবার অন্ত থাকে না। দিতেই যদি সাধ হয়, তবে একটি পুরস্কার আমায় দিতে হবে। বল দেবে ? না করবে না ?"

জয়ন্ত কোমল কণ্ঠে বলিল, "তোমাকে কিছু দিতে পারা কি আমার অনিচ্ছা, হিরণ?"

"জানি, অনিচ্ছা নয়, তাই চাইবারও সাহস আছে। আমার পুরস্কার অন্য কিছু নয়, ভাই, আমার দিদিকে, আমার বোনটিকে তুমি একটু যত্ন করো। কোন অবস্থাতেই তাকে ব্যথা দিও না, জয়ন্ত। কুহুদি সুখী হ'লে আমিও হব। এইটাই আমার সব চাওয়ার বড় চাওয়া।"

জয়ন্ত কি বলিবে? আধ আলো আধ অন্ধকারে সে বিস্মিত হইয়া হিরণের মুখের পানে কেবল চাহিয়া রহিল। এক অনাত্মীয়া, অর্দ্ধপরিচিতা মেয়ের প্রতি এত স্নেহ, এত ভালবাসা! মানুষ কি কখনও এমন নিঃস্বার্থভাবে প্রতিদানের আশা না রাখিয়া কাহাকেও এমন একান্তভাবে অজস্র স্নেহ-ভালবাসা দিয়া বেষ্টন করিয়া রাখিতে পারে?

কিয়ৎকাল পরে ভৃত্য আসিয়া জানাইল, খাবার প্রস্তুত, খাবারের ঘরে টেবলে খাবার দেওয়া হইবে কি?

জয়ন্ত আদেশ করিল, "আমার আর হিরণ বাবুর খাবার এখানে দিতে বল।"

তখনই হালকা বেতের একখানি টেবল ও দুইখানি চেয়ার আসিল। টেবলের উপর সদ্যধৌত, শুভ্র আচ্ছাদনে পাচক খাবার সাজাইয়া দিল—গরম লুচি, ভাজা, ডাল্‌না, মাছের ঝোল, মাংসের কালিয়া, চাটনি। কুহু সঙ্গে ছিল বলিয়া এ কয়েক দিন কলিমুদ্দির পরিবর্ত্তে উৎকলবাসী ব্রাহ্মণ পাচকের হাতেই জয়ন্তের খাদ্য গ্রহণ করিতে হইত।

আহারান্তে দুই বন্ধু নিঃশব্দে বসিয়া পাণ-সিগারের সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল। খণ্ড হীরকের ন্যায় ক্ষুদ্র ও উজ্জ্বল অযুত তারকা সুদূর নীলাম্বর হইতে তাহাদের পানে প্রসন্ন-নয়নে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। নিস্তব্ধতা নিবিড় হইয়া আসিল, একটি সীমাহীন দিশাহীন শূন্যতা ধীরে ধীরে চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। পদ্মার উত্তর পারে জনশূন্য, তৃণশূন্য ধূ ধূ বালির চড়ার গা ঘেঁসিয়া জেলে ডিঙ্গির মিটি মিটি প্রদীপগুলি জলের উপর আলোর মালা গাঁথিয়া তুলিল। দক্ষিণ পারের অস্পষ্ট বনচ্ছায়াতলে লক্ষ ঝিল্লীর ঐক্যতান রাত্রির অনাহত গাম্ভীর্য্যকে কম্পিত করিতে লাগিল। দূরে—সুদূরে কোন পল্লীপ্রান্তের খোলা-ঘর হইতে ডুগডুগির সহিত কৃষকের মেঠো গলার গ্রাম্য গান বাতাসে ভাসিয়া আসিতে লাগিল, ক্রমে তাহাও ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া চঞ্চল সমীরে মিশাইয়া গেল। জলে স্থলে শরতের শান্ত শ্রী, ঊর্দ্ধে আকাশে শরতের ম্লান জ্যোৎস্না, তটে আন্দোলিত শরতের কাশগুচ্ছ, উদাস সমীরের দীর্ঘনিশ্বাস, দুই বন্ধুর চিত্তকে যেন আরও নিকটে—আরও নিবিড় বন্ধনে টানিয়া আনিল।

অনেকক্ষণ পরে হিরণ কথা বলিল, মৃদুকণ্ঠে কহিল, "জয়ন্ত, এখন শুতে যাও। রাত মন্দ হয়নি। বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, এখনই হিম পড়বে, তোমার হিম সহ্য হয় না। আর এ সময়ে হিম ভালও নয়।"

দগ্ধ সিগারটা জলে ছুড়িয়া দিয়া জয়ন্ত আরাম-কেদারায় হাত-পা ছড়াইয়া কহিল, "ঠাণ্ডা কোথায়? এখনও হিম পড়ার ঢের দেরী আছে। আর একটু থাকি। মাল্লারা যে আজ চলেছেই। ওরা খাবে দাবে কখন্‌?"

"সাম্‌নে বাজার আছে, সেইখানে বজরা বেঁধে ওরা খাবে।" বলিয়া হিরণ আর একটা আরাম-কেদারায় শুইয়া পড়িল।

* * * *

কুহুর শরীরটা তেমন ভাল ছিল না, মনও অবসাদে আচ্ছন্ন। সমস্ত দিন বসিয়া কাটাইয়া সে আর পারিতেছিল না। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইবার পূর্ব্বেই কুহু শ্রান্ত-শরীরে বিছানায় ঢলিয়া পড়িল। প্রথমে এলোমেলো শত চিন্তা,—তার পর দূরে ফেলিয়া আসা প্রিয়জনদের প্রিয় মুখগুলি ভাসিয়া আসিয়া মনটাকে নিতান্তই ম্রিয়মাণ করিয়া তুলিল। নীরবে অশ্রুবর্ষণ, গোপনে দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া কুহু ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রিশেষের দিকে যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বজরা পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। শুক্লপক্ষের প্রফুল্ল চন্দ্রমা প্রথম রজনীতে পর্য্যাপ্ত আলো বিতরণ করিয়া বিদায় লইয়াছে। চারিদিক্ তরল অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, ম্লানচন্দ্রের অদৃশ্যপ্রায় মূর্ত্তির পাশে ঊষাদেবীর ললাটিকার মত শুক-তারাটি দীপ্তি পাইতেছে। বজরা তখনও পদ্মা অতিক্রম করিতে পারে নাই। অন্ধকারে বালির চড়া অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। চড়ার পরপারে পদ্মার একটি শাখা কৃষককুটীরের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়াছে, তীরে বৃক্ষগুলি দৈত্যের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদেরই পল্লবান্তরাল হইতে বিহগকাকলী জলে-স্থলে সুধাধারা বর্ষণ করিতেছে।

কুহু জাগিয়া দেখিল, শয্যায় সে একা নাই। তাহার অনতিপ্রশস্ত খাটের একাংশ অধিকার করিয়া জয়ন্ত গভীর নিদ্রামগ্ন। জয়ন্তের দুই বলিষ্ঠ বাহুর বন্ধনে কুহু আবদ্ধ হইয়া আছে। এ ব্যাপার কখন্, কেমন করিয়া সংঘটিত হইয়াছিল, কুহু তাহা জানে না। প্রথমে তাহার ইহা স্বপ্ন বলিয়াই অনুমান হইল। কুহু নড়িয়া চড়িয়া বুঝিল, ইহা স্বপ্ন নহে, সত্য। যাহাকে সে কিছুতেই ক্ষমা করিবে না, যাহার প্রতি প্রসন্ন হইবে না, আশ্চর্য্যের বিষয়, এখন সে বিনা দ্বিধায়, বিনা প্রশ্নে সেই পরম অপরাধীকেই তাহার সমস্ত দেহ, মন, জীবন, যৌবন সমর্পণ করিয়া নিতান্ত নির্ভরের সহিত তাহারই বক্ষে লগ্ন হইয়া। কুহু পুলকিত, উদ্বেলতচিত্তে নিমীলিত-নয়নে অনুভব করিতে লাগিল, গৃহের সঙ্কীর্ণ বেষ্টনের বাহিরে, অনাবৃত, অবারিত আকাশের নীচে, পদ্মার জলকলরোলের মধ্যে সে তাহার গম্যস্থানে পৌঁছিয়া গিয়াছে। তাহার আর দুঃখ-পরিতাপের কিছুই নাই। এবার পরিপূর্ণ চন্দ্রালোকে, প্রেমের দক্ষিণাবায়ুহিল্লোলে নূতন করিয়া তাহাদের যাত্রা আরম্ভ।

* * * *

পদ্মার বিশাল বক্ষের উপর, শারদ শোভার মধ্যে, প্রসন্ন আকাশের নিম্নে বজরা চলিতে লাগিল।

[ক্রমশঃ

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী।

বৈশাখী বসুমতী

জননি, তোমারে কে গো পরাইল গৈরিক বসন
গলে দিল রুদ্রাক্ষের মালা,
তোমার শ্যামল অঙ্গে বনানীর পাতা ঝরাইয়া
কে তোমারে করিল নিরালা?

তোমার সরস বুকে শীর্ণা করি' নদীধারাটিরে
কে করিল ফাঁকা,
উরঃস্থল হতে খুলি' তোর রঙ্গীন সে কুসুম-বলয়
পরাইয়া দিল রক্তশাঁখা?

সীঁথি হতে হরি' তোর বিলাসের স্বর্ণ-সীঁথিহার
কে পরা'ল সিঁদূরের টীপ,
শীর্ষে তোর বসন্তের উচ্ছ্বসিত আলোক নিভায়ে
জ্বেলে দিল তপন প্রদীপ?

কটি হতে খুলি' তোর দিগন্তের শ্যামচন্দ্রহার
কে দিল মা অগ্নিরেখা টানি,'
বাঁশীর স্বপন ভাঙ্গি' বাজাইয়া শিঙা তোর বুকে
কে এল মা প্রলয়সন্ধানী?

অলঙ্কার করি' ত্যাগ যৌবনেতে সাজিলি যোগিনী
ভেঙ্গে দিয়া নম্মলীলা-নাট,
কোন্ ভস্মমাখা যোগী ডমরুতে ভুলাইল তোরে
মাভৈমন্ত্রে করি চণ্ডীপাঠ।

নমি আজ তোরে অয়ি এ সৃষ্টির রাজকন্যা তুমি
রসে রসে রূপে বহে বান,
নিজের ও রসতনু যৌবনের ত্যাগ আহুতিতে
সন্ন্যাসীরে দিলি বলিদান।

রুদ্র সে বৈশাখ শিব উড়ায়ে ঝঞ্ঝার জটা তাই
তোরি গান গাহে অবিরাম,
যৌবনের লীলা ফেলি' অগ্নি-হোমে প্রেমলীলা তোর
হে বৈশাখি, লহ মা প্রণাম।

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।



বিষের ক্রিয়া



অখিলনাথ এম, এ ক্লাসের ছাত্র। গরীব বিধবার সন্তান সে। প্রসিদ্ধ উকীল ভুবন বাবুর নাবালক পুত্র-কন্যাগুলির সে গৃহ-শিক্ষক। ৩০ টাকা মাসে পায়। এই সংসামান্য আয়ের উপর নিজের ও বিধবা মায়ের সংসার-খরচ কোনমতে সে চালাইয়া আসিতেছে।

আজ এখনও মাষ্টার উপস্থিত হয় নাই। নির্দ্দিষ্ট সময় বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পড়িবার ঘরে ক্ষুদ্র একটি হাট বসিয়াছিল।

ইহাদের বড় বোন অস্তরা মাষ্টার মশায়ের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করিয়াছিল। সে আসিয়া চেয়ারে বসিয়া মাষ্টার সাজিয়া বসিল। ছাত্রদের পড়া বলিয়া দিবার সময় মাষ্টার মহাশয় যেমন চোখ-মুখের ভঙ্গী করিয়া বলেন, ভিতরে বসিয়া অস্তরা তাহা লক্ষ্য করিয়াছে। আজ সে এমন হুবহু নকল করিয়া দেখাইতে লাগিল যে, না হাসিয়া পারা যায় না। তাহার ভাইবোনগুলি হাসিতে হাসিতে এ উহার গায়ের উপর গিয়া লুটাইয়া পড়িতে লাগিল। মাষ্টার যেমন তর্জ্জনী তুলিয়া, ছাত্রবর্গকে শাসন করিয়া থাকেন, অস্তরাও ঠিক তেমনই ভাবে চোখ-মুখ ঘুরাইয়া, শাসন করিতে গিয়া আর পারিল না। চাপা হাস্যে মুখ-চোখ তাহার তখন ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। তবুও কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য পুরুষোচিত করিয়া চোখ পাকাইয়া আদেশ করিতে লাগিল, "এই—সব চুপ! সাধন! তোমার জিওগ্রাফীর পড়াটা নিয়ে এস ত। ময়না, তোমার সেই পদ্যটা মুখস্থ ক'রে ফেল দেখি। সুধা, তুমি বড্ড গোলমাল কচ্ছ!" বলিয়া নিজেই সে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে ছাত্রবর্গ সহসা সুবোধ ও সুশীল হইয়া যে যাহার পুস্তক আড়াল করিয়া ফুক্-ফাক্ করিয়া হাসিতেছে দেখিয়া অস্তরা প্রথমতঃ হেতুটা বুঝিতে পারিল না। সে দরজার দিকে পশ্চাৎ করিয়া বসিয়াছিল। এখন মুখ ফিরাইয়াই লজ্জায় সে মরিয়া গেল। দরজার উপর দাঁড়াইয়া মাষ্টার স্বয়ং। লজ্জার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আর হাত নাই। কোথায় গিয়া সে মুখ লুকাইবে, তাহার আর কূল-কিনারাই সে করিতে পারিল না।

এ দিকে দিদির অবস্থা দেখিয়া ছোট ছোট দুইটি বোন্ হাসিতে হাসিতে এ উহার গায়ের উপর গিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বড় কয়টি মুখের উপর খাতা-বই চাপা দিয়া হাসির বেগ নিরোধ করিতে লাগিল বটে; কিন্তু পুস্তকাবরণ ভেদ করিয়া, চাপা হাস্যের ফুক্-ফাক্ শব্দ ক্রমাগত বাহির হইতে লাগিল, একটি আর সামলাইতে পারিল না। হোঃ হোঃ শব্দে হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। আর তাহাদের দিদি, না পারিল শাসন করিতে, না পারিল নিজেকে লজ্জার হাত হইতে মুক্ত করিতে;—সে বেচারা লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া, এক কোণে দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল।

অস্তরা আঠার উনিশ বৎসরের সুশ্রী তরুণী। গত বৎসর সে ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে। পিতা ভুবন বাবু নব্য তন্ত্রের মানুষ। কন্যার বিবাহ "দেবো, দেওয়া যাবে," এমনি করিয়া এখনও বিবাহ তিনি দেন নাই। অস্তরা এখন বাড়ীতে বসিয়া ওস্তাদের কাছে গান-বাজনা শেখে। দরিদ্র অখিল ধনীর রূপসী কন্যার লজ্জাজড়িত মুখখানির পানে তাকাইয়া, একবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। কিছুক্ষণের জন্য তাহার সেই উলঙ্গ দৃষ্টিকে কোনমতেই সে ফিরাইতে পারিল না। অপলক-নয়নে এই অপরূপ রূপ ও সৌন্দর্য্যরাশি যেন দুই চোখ দিয়া সে পান করিতে লাগিল।

এই ভাবে কোন মহিলার পানে তাকান যে শুধু অন্যায়, তাহা নহে; অতিশয় অশিষ্ট এবং অভদ্র আচরণ।

মুহূর্ত্তের জন্য এই এম, এ ক্লাসের ছাত্রটির সেই সহজ ভদ্রতা-জ্ঞানটুকু পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল। পরক্ষণেই সে সংযত হইয়া গেল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে অস্তরা একরকম তাহার গায়ের উপর দিয়াই ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া

গেল। অন্তরা চলিয়া গেল বটে ; কিন্তু তাহার রূপ ও ভঙ্গিমা, তাহার সেই লজ্জারক্তিম মুখচ্ছবি, এই অদূরদর্শী যুবকটির অপূর্ণ বুকখানির পরতে পরতে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়া গেল।

অখিল আসনে গিয়া বসিল বটে, কিন্তু সমস্ত দেহটা তাহার তখনও তীব্র উত্তেজনায় কাঁপিতেছে। অন্তরার অঞ্চলপ্রান্ত, চলিয়া যাইবার সময় অখিলের গায়ের উপর পড়িয়াছিল, সেই স্পর্শ স্মরণ করিয়া, তাহার সমস্ত দেহ কাঁটা দিয়া উঠিতে লাগিল।

বাবুর বছর পাঁচেকের মেয়েটি হাততালি দিয়া নাচিতে নাচিতে আসিয়া হাজির হইয়া কহিতে লাগিল, "তা রে —মজা রে,—মাসতের মশাই দিদির বর। তা রে —মজা রে।" সতু ইহাদের মধ্যে বয়সে বড়। সে তখন অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়নে বিঘূর্ণিত-মস্তিষ্ক। কিছুতেই অঙ্কটা মিলিতেছে না। সতু তাড়া দিয়া উঠিল, "যাও মীনা, এখানে গান করতে হবে না তোমার।" মীনা কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল, "দাদা মশাই যে বলেছে।" সতু শ্লেট হইতে মুখ না তুলিয়াই কহিল, "আচ্ছা হয়েছে, তোকে আর চেঁচাতে হবে না। সে কথা আমরা জানি। তুই যা।"

মীনা কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া চলিল। "দ্যাখো দাদু, ওরা খালি আমায় বকছে। তুমি বল্লে, মাস্তার মশায় দিদির বর।" দাদু বারান্দায় পায়চারী করিতেছিলেন— নাতিনীকে কোলে তুলিয়া হাসিতে হাসিতে ভিতরে চলিয়া গেলেন। অখিলের সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া যাইতে লাগিল। ইহা যে সম্পর্ক হিসাবে নাতিনীকে বৃদ্ধ তামাসা করিতেও পারেন, এ সকল প্রশ্ন, এই উন্মত্ত অবস্থায়, মনের কোণে স্থান পাইবার কথা নয়। অখিলের তখন মাতালের মত অবস্থা। প্রতি ধমনীতে তাহার তখন উত্তপ্ত রক্তস্রোত নাচিতে নাচিতে ছুটিয়াছে। কোনমতে ঘণ্টাখানেক কাটাইয়া, সে যখন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার মনে হইতে লাগিল, পায়ের তলার মাটী পর্য্যন্ত দুলিয়া দুলিয়া সরিয়া যাইতেছে।

মাষ্টারের যন্ত্রণায় দুই চারি দিনেই ছাত্রবর্গ একবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। মাষ্টারমহাশয় আসিলে আর উঠিবার নাম করেন না। এ বাড়ীর চায়ের বৈঠক বসে অপরাহ্ণ পাঁচটায়। অন্তরা উপস্থিত থাকিয়া সকলকে চা বাঁটিয়া দেয়। এইটিই এখন হইয়াছে মাষ্টারের হাজির হইবার সময়।

চায়ের মজলিসের সম্মুখ দিয়াই পড়াইবার ঘরে ঢুকিবার রাস্তা। অন্তরাকে দেখিবার আশায় এই সময়টি আসা মাষ্টারের চাই-ই। কিন্তু লজ্জা যেন এই স্থানটিতে পৌছাইলেই তাহার ঘাড়ে চাপিয়া বসে। কোন দিনই সে চোখ উঁচু করিয়া তাকাইতে পারে না। অথচ প্রত্যহ স্থিরসঙ্কল্প করিয়া আসে, আজ সে প্রাণ ভরিয়া অন্তরাকে একবারটি দেখিয়া লইবে। অপরাহ্ণে আজ ঝড়-জল সুরু হইয়াছিল। এ দুর্য্যোগে মানুষ বাহির হইতে পারে না। সন্ধ্যার পর ঝড়-জল মাথায় করিয়া মাষ্টার আসিয়া হাজির হইল। অন্তরা বাহিরের দালানে দাঁড়াইয়া, মুগ্ধ-বিস্ময়ে প্রকৃতির তাণ্ডব-লীলা দেখিতেছিল। সে লক্ষ্য করে নাই। চমকাইয়া উঠিয়া কহিল, "কে?" মাষ্টার কহিল, "আমি মাষ্টার মহাশয়।" বলিয়া সে ছেলেদের পড়িবার ঘরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল।

অন্তরা বাধা দিয়া কহিল, "ঘর বন্ধ, আমি চাবি আনছি। আপনি দাঁড়ান।"

ছেলেরা তখন ভিতরে বসিয়া কলকণ্ঠে ঘর-বাড়ী মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে।

অন্তরা আসিয়া কহিল,—"সতু, শীগ্‌গির যা, দেখ্‌ গিয়ে তোর মাষ্টার মশাই ভিজে কি হয়ে এসেছেন।"

সতু বই-শ্লেট লইয়া বাহিরে যাইতেছিল। অন্তরা ডাকিয়া কহিল,—"তুই কি বোকা ছেলে রে? যা আগে কাপড় আর তোয়ালে ওঁকে দিয়ে আয়!" মাষ্টার উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল। সে একবারে আশায় আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। মন যখন মানুষের বশে থাকে না, তখন মানুষ বিচারবুদ্ধিটুকু হারাইয়া বসে। এই তরুণ যুবকটিরও হইয়াছিল তাহাই। আজ সে নিঃসংশয়ে ধরিয়া লইল, এ বাড়ীতে বিবাহ তাহার স্থির হইয়া গিয়াছে। অন্তরা সমস্তই জানে। তাই তাহার স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্যই অন্তরার এই অপরিসীম ব্যাকুলতা, কল্পনায় ইহাই স্থির করিয়া, সমস্ত চিত্ত তাহার হর্ষে ও পুলকে কানায় কানায় ছাপাইয়া উঠিল। এত বড় তৃপ্তি অখিল সারা জীবনে কখনও উপভোগ করে নাই। সে যেন বাতাসে ভাসিতে ভাসিতে গিয়া চেয়ারের উপর উপবেশন করিল।

বৃদ্ধ দাদামহাশয় একটা র‍্যাপার মুড়ি দিয়া আসিয়া, মাষ্টারের সম্মুখের চেয়ারে বসিলেন। বিবাহের প্রস্তাব লইয়াই যে আজ বৃদ্ধ অসময়ে উপস্থিত হইয়াছেন, এ বিষয়ে অখিলের আর বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না। তাহার তখন দুশ্চিন্তা হইল এই যে, বৃদ্ধের প্রস্তাবে সে এখন কি ভাবে জবাব করিবে? চরণ-ধূলা লইয়া নীরবে বৃদ্ধের প্রস্তাবে সম্মতি জানাইবে,—না কৃতজ্ঞতাপূর্ণ বাক্যে বৃদ্ধকে তুষ্ট করিবে? এমনই ধারা রকম-বিরকমের প্রশ্ন তাহার মগজের ভিতর ক্রমাগত পাক খাইতে লাগিল। কিন্তু বৃদ্ধ সেই যে একটু হাসিয়াই চুপ-চাপ বসিয়া রহিলেন, তেমনই ভাবেই মৌন হইয়া কাটাইয়া দিলেন।

সতু তাহার পুস্তক ইত্যাদি লইয়া ঘরে ঢুকিল। বৃদ্ধ এবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মাষ্টার এতক্ষণ আশায় আশায় ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। এবার তাহার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইল।

বৃদ্ধ ভদ্রতাসূচক একটু ঘাড় নাড়িয়া, মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার সেই মুখের দিকে চাহিয়া সহসা অখিলের মনের প্রদীপালোকশিখা নিভিয়া গেল — তাহার মুখমণ্ডলে কে যেন এক পোঁচ কালি মাখাইয়া দিল।

ছাত্রের দল একে একে ঘরে প্রবেশ করিতে লাগিল। মাষ্টারের সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। সে তখন দুঃখের ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। অকস্মাৎ অখিল স্থির করিয়া ফেলিল, এম-এ পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক করিয়া নিজেই সে বিবাহের প্রস্তাব করিবে। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আজ তোমরা যাও। আমার শরীরটা ভাল নাই," বলিয়া সে বাহির হইতেছিল। ভুবন বাবু হাসিতে হাসিতে আসিয়া কহিলেন, "ভাগ্যি, মা অম্বরা আমায় মনে করে দিলে। এই ত তুমি বেরিয়ে পড়ছ দেখছি।"

অখিল আশ্চর্য্য হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ভুবন বাবু পুনশ্চ কহিতে লাগিলেন, "অখিল, এ দুর্য্যোগে তোমাকে ত আমরা যেতে দিতে পারি নে। রাত্রিতে দু'টি আহারাদি ক'রে এখানেই থাকতে হবে, বাবা।"

অম্বরা বৈঠকখানা-ঘরে অর্গ্যান বাজাইয়া গান করিতেছিল। ভুবন বাবু অখিলকে সঙ্গে করিয়া সেখানে আসিয়া গান শুনিতে বসিলেন। অখিলের মন-প্রাণ তখন হাওয়ার সঙ্গে দোল খাইতে লাগিল।

অম্বরা অকস্মাৎ গান বন্ধ করিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আর নয়, উনি বিরক্ত হচ্ছেন, বাবা।"

অখিল তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। সে আত্মহারা হইয়া কহিল, "কে, আমি বিরক্ত—আমার জীবনে এমন কখনও—সে আপনাকে কি বলব।"

ভুবন বাবু স্মিতহাস্যে কন্যার দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "শুনলি ত, মা।"

অম্বরা কহিল, "মুখের উপর উনি কি আর নিন্দে করবেন, বাবা!"

অখিল সে কি করিবে, কেমন করিয়া তাহার প্রাণের কথা ব্যক্ত করিবে, তাহার কূল-কিনারাই সে করিয়া উঠিতে পারিল না। শেষ পর্য্যন্ত এক রকম মিনতি করিয়াই কহিল, "অন্ততঃ আর একখানা গান আপনাকে শুনাতেই হবে।"

অম্বরা হাস্যোজ্জ্বল-মুখে পুনশ্চ সঙ্গীত আরম্ভ করিল। অখিলের অবস্থা তখন বর্ণনাতীত। গান শেষ করিয়া, অম্বরা যখন ভিতরে চলিয়া গেল, অখিলের মনে হইতে লাগিল, তখনও তাহার দুই কাণে সেই সুমধুর সঙ্গীত-সুধা বর্ষিত হইতেছে।

সমস্ত রাত্রি অখিল ঘুমাইতে পারিল না। কেমন যেন একটা উন্মাদনায় সে বিভোর হইয়া পড়িয়া রহিল। আহারাদির এই বিরাট আয়োজন, অম্বরাকে দিয়া তাহার সম্মুখে সঙ্গীত আলোচনার ব্যবস্থা, এ সমস্তই যে বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপনের পূর্ব্ব-সূচনা, ইহাতে আর বিন্দুমাত্র সংশয় আজ তাহার মনে রহিল না।

অম্বরার অন্তরটি জয় করিবার জন্য অখিল আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া এম-এর পড়া পড়িতে লাগিল। সফলও হইল। কাছারীর আজ ছুটী। উকীল ভুবন বাবু বাহিরের দালানে আরাম-কেদারায় শুইয়া খবরের কাগজ দেখিতেছিলেন। কন্যা অম্বরা পার্শ্বের চৌকিটায় বসিয়া মোজা বুনিতেছিল। মাষ্টার আসিয়া ভুবন বাবুর পায়ের ধূলা লইয়া কহিল, "আমি এম-এ পরীক্ষায় ইংরাজীতে প্রথম হয়েছি।"

ভুবন বাবু অতিশয় অমায়িক প্রকৃতির মানুষ। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া, অখিলকে একবারে বুকে টানিয়া সহস্র আশীর্ব্বাদে অভিষিক্ত করিলেন। অম্বরা প্রসন্ন-মুখে

অখিলের পানে চাহিয়া রহিল। অন্তরার পাশেই একটা খালি চেয়ার ছিল। তাহারই উপরে অখিলকে বসাইয়া দিয়া, গদগদকণ্ঠে ভুবন বাবু কহিতে লাগিলেন, "কি আনন্দই যে আজ আমার হচ্ছে বাবা অখিল, তোমার এই সংবাদটুকু শুনে। কিন্তু তোমাকেও আমি খুসী করব আর একটি প্রিয় সংবাদ জানিয়ে।" বলিয়া তিনি অন্তরার মুখের পানে একবার চাহিয়া লইলেন।

অন্তরা লজ্জা-আরক্তিম-মুখে ঘাড় হেঁট করিল। আর সেই মুখের পানে তাকাইয়া, অখিলের আর বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না যে, তাহার ভাগ্যবিধাতা এত দিনে তাহার উপর প্রসন্ন হইয়াছেন।

কপালের চুলগুলিই যেন ঘুরাইতেছে, এমনই ধারা ভাব করিয়া, দুই হাত জড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া ভাগ্য দেবতাকে সে প্রণাম করিয়াও লইল।

ভুবন বাবু তখন নিজের আনন্দে বিভোর। চোখ বুজিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন। অখিল একবারে অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। ব্যাকুল হইয়া কহিল, "বলুন? আমি আপনার সন্তানেরই মত।"

ভুবন বাবু সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়া কহিলেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়, তুমি ত আমার,—বুঝলে কি না অখিলনাথ—"।

অখিল সমস্তই বুঝিল, এবং নিঃসংশয়ে বুঝিল বলিয়া প্রাণটা তাহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আসিবার উপক্রম হইল। ভুবন বাবু অন্তরাকে দেখাইয়া কহিতে লাগিলেন, "আমার এই মাকে একটি সৎপাত্রে দেব বলেই এত দিন বিবাহ আমি দিই নাই। বুঝলে, বাবা অখিল?"

সৎপাত্রটি যে কে, সে কথা অখিলের বুঝিতে আর বাকি রহিল না। সে উত্তেজনার আতিশয্যে একেবারে হাত যোড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল;—"আদেশ করুন, কি করিতে হইবে।"

ভুবন বাবু উল্লাসে অখিলের পিঠ চাপড়াইয়া কহিলেন, "এই ত চাই, বাবা। আপনার জনের কাছে লোকে এই ত প্রত্যাশা করে। আমাদের বাঙ্গালীর ঘরের কন্যাদায়, এর চেয়ে বড় দায় মানুষের ত আর নাই।"

অখিল আর নিজেকে সংযত রাখিতে পারিল না। গদগদ-কণ্ঠে প্রকাশ করিতে যাইতেছিল, "অন্তরাকে পাইলে জীবন তাহার ধন্য হইয়া যাইবে।" কিন্তু সে তথাপি ধৈর্য্য ধরিয়া রহিল।

ভুবন বাবু তাহার মুখের উপর বলিয়া ফেলিলেন, "আমার ভাবী জামাতাটি মানসিক ব্যাধির বিশেষজ্ঞ হয়ে আজ বিলেত থেকে ফিরেছেন। অন্তরার সঙ্গে গল্প ক'রে, গান-বাজনা ক'রে সারা দিনটা কাটিয়ে এইমাত্র তিনি বাড়ী ফিরে গেলেন।"

ক্রমাগত বুকের উপর মুগুরের ঘা মারিলে মুখ চোখের যেমন চেহারা হয়, এই সংসার-অনভিজ্ঞ দরিদ্র যুবকটির ঠিক সেই অবস্থা হইল।

ভুবন বাবু নিজের ভাবেই তখন বিভোর। তিনি উল্লাসে আত্মহারা হইয়া, পুনশ্চ কহিতে লাগিলেন, "বাবা অখিল, এই বিয়ের কয়টা দিন তোমাকে বাবা এই বাড়ীতেই থাকতে হবে। আমার বল, ভরসা, যা কিছু বল, সবই তোমরা পাঁচ জন।"

অখিলের মুখ দিয়া আর স্বর বাহির হইল না। কোন-মতে মুখখানা হাসিবার মত ভঙ্গী করিয়া, ঘাড় নাড়িয়া সে সায় দিতে লাগিল। ভুবন বাবু ভাবী জামাতার রূপ-গুণের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। অখিল এইবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "কিন্তু আমাকে যে এই গাড়ীতেই দেশে যেতে হবে।"

চলিবার মত শক্তি তখন তাহার ছিল না, কিন্তু না চলিয়া উপায় নাই, তাই সে টলিতে টলিতে বাহির হইয়া পড়িল, কিন্তু আর মেসে ফিরিল না। সেই অবস্থায় সে দেশে চলিয়া গেল। বাড়ীতে আসিয়াও সে স্থির থাকিতে পারিল না। পাঁচ ছয় দিন বাদেই রঙ্গীন খামে শুভ বিবাহের ছাপান আমন্ত্রণপত্র আসিয়া উপস্থিত হইল।

অন্তরার বিবাহ উপলক্ষে এই পত্র। ছাপান চিঠির ভিতর ভুবন বাবু নিজেও অখিলকে বিবাহ উৎসবে যোগদান করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধপত্র লিখিয়াছেন। অন্তরাকে সারা জীবনের মত আর একবার দেখিবার জন্য অখিল যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

জ্যৈষ্ঠ মাসের বেলা। তখন তৃতীয় প্রহর। স্নানাহার তখনও অখিলের হয় নাই। বেলার দিকে তাকাইয়াই তাহার আর সে কথা মনেও পড়িল না। কোনমতে এখন গাড়ী ধরিতে পারিলেই হয়। গাড়ীর সময় তখন হইয়া গিয়াছে। কোনমতে জামাটার ভিতর মাথা গলাইতে গলাইতে সেই প্রখর রৌদ্রে ক্ষিপ্তের মত ষ্টেশনের দিকে সে ছুটিতে লাগিল।

ভুবন বাবুর ফটকের সম্মুখে আসিয়া যখন সে উপস্থিত হইল, তখন বর আসিবার সময় হইয়াছে। ফটকের এক পাশে কাঙ্গালের মত দাঁড়াইয়া সে ভাবিতে লাগিল।

শোভাযাত্রা সহ বর আসিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিল। অখিলের বুকের ভিতর যেন কেমন করিয়া উঠিল। কোন মতেই সে তাহার অশান্ত চিত্তকে আর বশে আনিতে পারিল না। সে টলিতে টলিতে বাহির হইয়া পড়িল। লক্ষ্যহীন উন্মত্তের মত সে এ রাস্তা, সে রাস্তা ঘুরিয়া, এক যায়গায় আসিয়া দেখিল, বাহিরে চাঁদোয়া খাটাইয়া, বাইজীর নৃত্যগীত সেখানে চলিতেছে। অখিল আবিষ্টের মত সেইখানে ঢুকিয়া পড়িল।

বিহারী জমীদারের বাড়ী। তাতে গরম কাল। সিদ্ধির সরবতের সহিত বরফের টুকরা ফেলিয়া অকাতরে বিতরণ করা হইতেছে। অখিল উপযাচক হইয়া তাহার তিন চার গ্লাস পান করিয়া নেশায় চুর হইয়া বসিয়া রহিল।

তাহার এক সহপাঠী বিহারী যুবক বহুক্ষণ হইতে এই অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড লক্ষ্য করিতেছিল।

অখিলকে সে জানে অতিশয় নির্ম্মলচরিত্র বলিয়া কলেজের ছাত্র-মহলে অখিল সুপরিচিত। সে বায়োস্কোপ কখনও দেখে না, পান-সিগারেট পর্য্যন্ত খায় না যে, সে আসরে বসিয়া সিদ্ধির সরবৎ গিলিয়া বাইজীর গানের তারিফ করিয়া বাহবা দিতেছে! কাণ্ড দেখিয়া যুবকটি অবাক্ হইয়া গেল। সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; অখিলকে জোর করিয়া বাহিরে আনিয়া কহিল, "আর তোকে বসতে দেব না, চল্ এইবার আমার বাড়ী।"

অখিল হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, "নেহি, হাম্ আজ রাত ভর্ নাচ দেখেঙ্গে।"

যুবকটি অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। অখিলের দুই চক্ষুতে তখন অশ্রুবারি টলটল করিতেছে।

৮

অন্তরার স্বামী অমরনাথ উন্মাদরোগের বিশেষজ্ঞ হইয়া নাগপুরে ছিলেন। সম্প্রতি রাঁচির পাগলা হাঁসপাতালে বিশেষজ্ঞ হিসাবে কর্ম্মে যোগদান করিয়াছেন।

অন্তরার একটি কন্যাসন্তান। বছর পাঁচেক মেয়েটির বয়স। অন্তরা পিত্রালয়ে ছিল। সম্প্রতি কন্যাসহ স্বামীর কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে। হাঁসপাতালটি দেখিবার অন্তরার বড় ইচ্ছা; কিন্তু সময় করিয়া উঠিতে পারে নাই সব গুছান লইয়া এ কয়দিন সে ব্যস্ত ছিল।

আজ অপরাহ্নে স্বামী সহ সে হাঁসপাতাল দেখিয়া বেড়াইতেছিল। অমরনাথ স্ত্রীকে এই সকল উন্মাদরোগের সূত্রপাত ইত্যাদির মূলকারণ বিশদভাবে বুঝাইতে বুঝাইতে চলিয়াছিলেন। অন্তরা ঘন ঘন চোখ মুছিতেছিল এবং পরম আগ্রহ সহকারে প্রশ্ন করিতেছিল। অমরনাথ স্ত্রীকে কহিলেন, "দুই চোখ যে তোমার রাঙ্গা হয়ে উঠেছে। থাক, তোমার শুনে কাজ নাই।"

অন্তরা কহিল, "সকলেই ত আর তোমার মত পাষাণ নয়। মানুষ কি হয়ে এখানে রয়েছে, দেখেও কেউ চুপ ক'রে থাকতে পারে না কি? কিন্তু তুমি চুপ ক'রে না থেকে বল ওদের কথা।"

অদূরে এক জন পাগল দৃঢ়-মুষ্টিতে অনবরত কি যেন ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিবার চেষ্টা করিতেছে। অমরনাথ হাসিতে হাসিতে স্ত্রীকে ডাকিয়া কহিল, "ইনি এক জন এম এ। ইংরাজী সাহিত্যে অগাধ পণ্ডিত ইনি। এঁর রোগ হচ্ছে, পড়াশুনা সমস্তই ওঁর পণ্ডশ্রম হয়েছে। বোধ করি, ভালবাসার দিক দিয়ে কোথায় ব্যর্থও হয়েছিলেন। ওঁর যত কিছু আক্রোশ সেই এম এর সার্টিফিকেটখানির উপর।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে পুনশ্চ কহিলেন, "খালি হাত-মোচড়ান দেখছ ত? কিন্তু তা নয়, উনি সেই সার্টিফিকেটটা ছিঁড়ছেন।"

অন্তরা হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "আচ্ছা খেয়াল কিন্তু!"

লোকটা একবারে চঞ্চল হইয়া চতুর্দ্দিকে তাকাইতে লাগিল। পরক্ষণেই অন্তরার মুখের পানে চাহিয়াই সে চোখে আর পলক পড়িল না; যেন দুই চোখ দিয়া এই মুখখানিকে বুকের ভিতর সে ভরিয়া লইতে লাগিল।

মানুষটা যেমন ক্ষীণ, তেমনই দুর্ব্বল। পরম আত্মীয়ও বোধ করি সহসা তাহাকে চিনিতে পারিবে না। ক্রমাগত অনাহার ও অনিদ্রায় এবং উত্তপ্ত মস্তিষ্কের প্রবল তাড়নায় সে দেহে আর বস্তু বলিতে কিছুই নাই। সমস্তই শেষ হইয়াছিল। শুধু ছিল, সেই প্রশস্ত ললাটের উপর দীপ্ত চক্ষু দুইটি। সে যেন এখন ঠিক শুকতারার মত দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

অম্বরা ভয় পাইয়া গিয়াছিল। সে পিছাইয়া গিয়া স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিল। খুকী তাহার জননীকে জড়াইয়া ধরিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল। ডাক্তার নিজেও বিচলিত হইলেন।

এই উন্মাদগ্রস্ত লোকটি প্রায়ই চুপচাপ থাকে। সমস্ত ক্ষণ কাগজ ছেঁড়া ভিন্ন মুখে একটা শব্দও কখন করে না। অকস্মাৎ তাহার চোখ-মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া, ডাক্তার স্ত্রী ও কন্যাসহ সরিয়া যাইতেছিলেন। পাগল কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, "দাও খুকীকে একটিবার; এই বুকখানির উপর রাখব।"

অম্বরার নারীচিত্ত করুণায় বিগলিত হইয়া গেল। সে আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। খুকীকে তুলিয়া ধরিতেই ডাক্তার বাধা দিয়া কহিলেন, "ক্ষেপে গেলে না কি? দেখছ না ওর চোখ মুখের চেহারা? মেরে ফেলে দেবে যে।"

পাগল দুই চোখে আগুন ছুটাইয়া অমরের মুখের পানে চাহিল। কিন্তু সে পলকের জন্য। পরক্ষণেই শান্ত কোমল কণ্ঠে কহিল, "তুমি খুকীর বাবা যে।" বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রুবারি ঝরিতে লাগিল।

ডাক্তার বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন, "খুকীর বাবা আমি, তার জন্য তোমার কান্নার হেতু কি, তাই শুনি?"

পাগল এ প্রশ্নের জবাবও করিল না। সে নিজের বুকখানি দেখাইয়া কহিতে লাগিল, "দাও একবারটি এইখানটায় রাখতে, না পেলে আমি ম'রে যাব আজ।"

ডাক্তার হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, "জ্ঞান ত দেখছি বেশ আছে। কিন্তু আমি ডাক্তার। আমি জানি, তুমি মরবে না।"

অম্বরা কহিল,—"এমন ক'রে চাইছে যখন—"

তাহার কথা আর শেষ হইতে পারিল না। পাগল দুই বাহু প্রসারিত করিয়া, একবারে ঝাঁপাইয়া পড়িল। জমাদার ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল; কিন্তু আটকাইতে পারিল না। পাগল যেন আজ খেপিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। অপরিসীম বিক্রমে নিজেকে মুক্ত করিয়া, ছুটিয়া আসিবার উপক্রম করিতেই ওয়ার্ডারগণ পাগলকে আটক করিয়া ফেলিল। পাগলের অবস্থা তখন বর্ণনাতীত। সে যেন আজ নিজের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য আত্মঘাতী হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

পাগলের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের হেতু ডাক্তার নির্ণয় করিতে পারিলেন না। তিনি তখন হুকুম করিলেন, "একে ষ্ট্রেট জ্যাকেট পরিয়ে কর্কের কামরায় বন্ধ ক'রে দাও।"

হুকুম পাইয়া ওয়ার্ডারগণ পাগলকে টানিয়া লইয়া গেল এবং কর্কের ঘরে আনিয়া জ্যাকেট পরাইয়া আটক করিয়া রাখিয়া দিল।

পাগলের তখন নড়িবার চড়িবার উপায় নাই। কিন্তু তাহার সেই করুণ আর্ত্তনাদে সমস্ত হাসপাতাল বিকম্পিত হইয়া উঠিল।

অম্বরা মেয়েমানুষ। এ করুণ দৃশ্যে সে আর চোখের জল রোধ করিতে পারিল না। কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, "ওগো, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। তুমি চল।" বলিয়া সে স্বামীর হাত ধরিয়া অগ্রসর হইল।

পাগল এবার কর্ক দেওয়া দরজার উপর আছড়াইয়া পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "চ'লে যাচ্ছ যে? আর ত আমি দেখতে পাব না।" বলিয়াই এমনভাবে চাহিয়া রহিল যে, প্রাণটা তাহার এই পথে বুঝি বাহির হইয়া যাইবে।

অম্বরার তখন মনে হইতে লাগিল, এ মানুষটাকে কোথায় যেন সে দেখিয়াছে। কিন্তু সে তাহার স্মৃতির দ্বারে সহস্র আঘাত করিয়াও কোনমতেই স্মরণ করিতে পারিল না, এই বিকৃত মূর্ত্তিকে সে কোথায় দেখিয়াছে।

অদূরে ডাক্তারের দ্বিতল-আবাস। উন্মত্তের সেই করুণ আর্ত্তকণ্ঠ রহিয়া রহিয়া অম্বরার কাণে আসিয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিতে লাগিল।

* * * *

রাত্রি তখন গভীর। চতুর্দ্দিক্ নীরব—নিস্তব্ধ। অন্ধকার রাত্রি জমাট-বাঁধা মেঘে আরও অন্ধকার করিয়া তুলিয়াছে। অম্বরা কন্যা লইয়া পাশের ঘরে নিদ্রিতা ছিল। সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। উর্দ্ধশ্বাসে এ ঘরে ছুটিয়া আসিয়া, স্বামীকে জড়াইয়া ধরিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

অমরনাথ তাড়াতাড়ি স্ত্রীকে দুই হাতে বুকে টানিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, "কেন এমন করছ? কি হয়েছে, অসুখ?"

অম্বরা স্বামীর বুকের ভিতর মুখ লুকাইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিতে লাগিল, "ওগো, পাগলা আমায় কেবলই ডাকছে। আমি কি করব?" ভয়ে সে বার বার শিহরিয়া উঠিতে লাগিল।

ওয়ার্ডার নীচে হইতে চীৎকার করিয়া কহিল, "হুজুর, ওহি পাগলাঠো আভি মর্ গিয়া।"

অম্বরার সমস্ত দেহটা পলকের জন্য কাঁপিয়া উঠিয়াই স্বামীর বুকের উপর স্থির হইয়া রহিল।

অল্প পরেই চেতনা ফিরিল বটে, কিন্তু সে যেন কেমন স্তব্ধের মত হইয়া রহিল। তার পর স্বামীকে ডাকিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "মানুষটি যে কে, তা এতক্ষণে চিনতে পেরেছি। উনি সতুদের মাষ্টার ছিলেন।"

অমরনাথ আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "তাই না কি? তোমাকে তা হ'লে চেনে নিশ্চয়।"

অম্বরা কহিল, "হাঁ। আর কেন যে এমন ক'রে উনি প্রাণটা বিসর্জ্জন দিলেন, সে কথা আজ আমার চেয়ে কেউ বেশী বুঝতে পারে নাই।"

কথা কয়টা যখন সে শেষ করিল, তখন তাহার দুই চোখে অশ্রুর উৎস ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়।

নাই বা হ'ল

ছায়ায় ঢাকা কুসুম-ছাওয়া পথ
নাই বা হ'ল, দুঃখ তা'তে নাই;
গাছের কাঁটাই ফুটবে কুসুম হয়ে
সে পথেতে তোমায় যদি পাই।
যায় না যে-পথ নিয়ে তোমার পাশে,
হোক্ সে ভরা পুষ্প-মধু-বাসে,
মায়ায় ভরা মিথ্যা সুখের আশে
সে পথেতে চল্‌তে নাহি চাই;
কাঁটায় ঘেরা, তপ্ত রবির তেজে,
সে পথ ভাল তোমায় যদি পাই।

তৃণের আসন থাক্ বিছানো পথে,
ভরুক বাতাস নদীর কলতানে,
ভুলেও যেন না চাই তাদের দিকে
লক্ষ্য শুধু থাকে তোমার পানে।
মাড়িয়ে বাধা শতেক আঘাত লয়ে
সন্ধ্যা হ'লে যখন শ্রান্ত হয়ে
যা'ব তোমার কাছে বেদন বয়ে,
জানি তখন চাইবে আমার পানে,
আঘাত তখন ফুটবে কুসুম হয়ে,
বেদন ভুলে ভরবে হৃদয় গানে।

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

ভারতে লোকসংখ্যা-বৃদ্ধি

সম্প্রতি দিল্লীতে কাউন্সিল অব ষ্টেটের এক জন সভ্য ভারতে লোকসংখ্যাবৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন এবং অতিরিক্ত জনসংখ্যাবৃদ্ধি রহিত করিবার জন্য কোন উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে কি না, সে কথার উল্লেখ করেন। কিন্তু তাহার পর আর কোন কথা হয় নাই, কোন প্রস্তাব উপস্থিত করা হয় নাই, কথাটা চাপা পড়িয়া যায়। সভ্যদের এ বিষয়ে কি মত এবং গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতেই বা কি বক্তব্য হইতে পারে, তাহা জানিতে পারা গেল না।

পুরাকালে এ রকম কথা কোথাও শুনিতে পাওয়া যাইত না। সে সময় লোকসংখ্যা অল্প, যাহাতে সংখ্যা বাড়ে, সর্ব্বত্রই তাহার নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদে কথিত আছে—বিবাহিতা রমণী বীরপ্রসবিনী হইবে, দশ পুত্রের জননী হইবে। কন্যার স্বতন্ত্র উল্লেখ না থাকিলেও, পুত্র হইলে কন্যাও হইবে, ইহা জানা কথা। এক পত্নী হইতে পুত্র-সন্তান না হইলে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার পদ্ধতি ছিল, এখনও আছে। পুত্র না হইলে নিরয়গামী হইত। পুত্র শব্দের অর্থ—যে পুৎ নামক নরক হইতে ত্রাণ করে। পার্শী সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই বিধি ছিল। খোরদে আবস্থা নামক ধর্ম্মপুস্তকে আফেরীণ পয়গম্বর নামক অধ্যায়ে ধর্ম্মগুরু জরথুষ্ট্র রাজা বিশগস্পকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। ফরদৌসীর শাহনামা নামক প্রসিদ্ধ মহাকাব্যে এই বিশগস্পের নাম গুশতাস্প লেখা আছে। জরথুষ্ট্র রাজাকে বলিতেছেন, তোমার দশ পুত্র হউক, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করিবে। বাইবেলে এই কথার বার বার উল্লেখ আছে। নোয়া জলপ্লাবন হইতে রক্ষা পাইলে পর ঈশ্বর তাঁহাকে বলিলেন, Be fruitful and multiply। এব্রাহামকেও ঈশ্বর এই কথা বলিয়াছিলেন, —I will multiply thee exceedingly. Thou shalt be a father of many nations। খৃষ্টানদের মধ্যে একের অধিক ভার্য্যা নিষিদ্ধ; কিন্তু আমেরিকার মর্ম্মন সম্প্রদায় খৃষ্টান হইলেও বহু বিবাহ করিয়া থাকে; বংশবৃদ্ধিই তাহার উদ্দেশ্য। কোরাণে পয়গম্বর মহম্মদ চারি স্ত্রী বৈধ নির্দেশ করিয়াছেন; উদ্দেশ্য, যাহাতে বহু সন্তান-সন্ততি হয়। প্রায় সকল ধর্ম্মেই এইরূপ আদেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

লোকসংখ্যা যেমন বাড়িতে লাগিল, সেই সঙ্গে লোকক্ষয়েরও উপায় হইতে লাগিল। প্রথম নৈসর্গিক, যেমন মহামারী ও সংক্রামক রোগ। প্রধান মহামারী প্লেগ, প্রায় সকল দেশেই পূর্ব্বকালে শুনিতে পাওয়া যাইত। এই সংক্রামক রোগের সম্বন্ধেই প্রাচীন প্রবাদ আছে, —যঃ পলায়তি স জীবতি। এই রোগে লণ্ডন নগর প্রায় জনশূন্য হইয়াছিল। বসন্ত, ওলাউঠা রোগে সহস্র সহস্র লোক মারা যায়। ভারতে দুর্ভিক্ষও এক প্রকার মহামারী, অনশনে বহুসংখ্যক লোকের মৃত্যু হয়। য়ুরোপে নগর, গ্রাম, গৃহ পরিষ্কার রাখিবার কারণে বসন্ত কিংবা ওলাউঠা আর সংক্রামক আকারে দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু মড়ক হয় না, এমন কথাও বলা যায় না। হাম ও স্কার্লেট জ্বরে বহুসংখ্যক শিশুসন্তানের মৃত্যু হয়। স্পেনে ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা দিয়া জগতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে; য়ুরোপ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণনাশ করে। লোকক্ষয়ের দ্বিতীয় উপায় মানুষের স্বকৃত যুদ্ধবিগ্রহ। এমন যুগ হয় নাই যে কালে যুদ্ধ ও তাহার আনুষঙ্গিক প্রাণসংহার রহিত হইয়াছিল। জগতের সাহিত্যে যে কয়খানি মহাকাব্য আছে, সকলই যুদ্ধবিগ্রহঘটিত। রামায়ণের মূলভিত্তি রাম ও রাবণের যুদ্ধ। রাম সীতাকে উদ্ধার করিবার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া অভিযান করিয়া, সমুদ্রে সেতুবন্ধ করিয়া লঙ্কা আক্রমণ করেন। উভয়পক্ষে বহুসংখ্যক সৈন্য নিহত হয়। হনুমান লাঙ্গুলের অগ্নি দিয়া লঙ্কানগরী দগ্ধ করিয়াছিলেন। এই কারণে এখন পর্য্যন্ত

কোথাও বড় একটা আগুন লাগিলে লোকে বলে লঙ্কাকাণ্ড হইয়াছে। মহাভারতের কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের মত যুদ্ধবর্ণনা আর কোথাও নাই। সৈন্যসংখ্যা কবিকল্পিত হইলেও উভয় পক্ষে বহুসংখ্যক সৈন্য সমবেত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। যুদ্ধের শেষে কয়েক জন ব্যক্তিমাত্র জীবিত ছিলেন। কুরুক্ষেত্র-ব্যাপার প্রবচন হইয়াছে। সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া পরস্পর হত্যা করিয়া যদুবংশ ধ্বংস হয়। হোমরের ইলিয়ড ট্রোজন যুদ্ধের অবলম্বনে রচিত।

যুদ্ধে সভ্য অসভ্য জাতিবিচার নাই। য়ুরোপ সভ্যতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু য়ুরোপের তুল্য অসংখ্য যুদ্ধ ভূমণ্ডলে আর কোথাও হয় নাই। গ্রীস ও রোমের কাল হইতে আরম্ভ করিয়া য়ুরোপে চিরকাল যুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মাণী, রাসিয়া, ইটালী সকল দেশই সময়ে সময়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। বিনা যুদ্ধে এক শতাব্দী কাটিয়াছে কি না সন্দেহ। ফ্রান্সে প্রায় দেড়শত বৎসর লোকসংখ্যা বাড়ে নাই। তাহার কারণ, ক্রমাগত যুদ্ধ হইত। ফ্রান্সে বিপ্লবের সময় সহস্র সহস্র মুণ্ড ছেদন করা হয়। তাহা ছাড়া সেই সময়েই ফ্রান্সের সহিত অপর য়ুরোপীয় জাতিদিগের যুদ্ধ হইতেছিল। তাহার পরই নেপোলিয়ানের আবির্ভাব। য়ুরোপে এমন জাতি ছিল না যাহার সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ হয় নাই। সমস্ত ফ্রান্সে এমন পরিবার ছিল না যাহা হইতে এক জন বা ততোধিক পুরুষ যুদ্ধে নিহত হয় নাই। ওয়াটারলু যুদ্ধের পর নেপোলিয়ান ইংরাজদিগকে আত্ম সমর্পণ না করিয়া প্যারিসে ফিরিয়া গেলে ফরাসীরাই তাঁহাকে হত্যা করিত। নেপোলিয়ান বন্দী হইলে কিছুকাল পরে অষ্ট্রিয়া ও ইটালীতে যুদ্ধ বাধিল, ইটালী স্বাধীন হইল। আবার কিছুদিন পরে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ। তাহাতে রাসিয়া, তুর্কি, ইংলণ্ড, ফ্রান্স লিপ্ত ছিল। নেপোলিয়ানের ভ্রাতুষ্পুত্র তৃতীয় নেপোলিয়ানের রাজ্যকালে ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীতে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তাহাতে ফ্রান্সের সম্পূর্ণ পরাজয় হয় ও তাহার ফলে জার্ম্মাণী সাম্রাজ্য হয়।

সর্ব্বশেষে এই সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর চারি বৎসরব্যাপী জগৎ জুড়িয়া যুদ্ধ। কোথায় আমেরিকা, কোথায় কানাডা, কোথায় অষ্ট্রেলিয়া, কোথায় দক্ষিণ-আফ্রিকা, কোথায় ভারতবর্ষ, জগতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ লোক এই ভীষণ যজ্ঞের প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদত্ত হইয়াছিল। কেবল যুবক ও মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিরা এই যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে নাই, স্কুল কলেজের কিশোরবয়স্ক ছাত্রেরাও সমরাঙ্গনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। এই যুদ্ধে সমস্ত য়ুরোপের এবং অন্যান্য দেশেরও লোকসংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। পুরুষের সংখ্যা অনেক দেশে কমিয়া যায়, এমন কি, কোন কোন দেশে যুবতীদিগের বিবাহ হওয়া কঠিন হইয়া উঠে। এই যুদ্ধের পর এখনও আঠারো বৎসর অতীত হয় নাই, কিন্তু ইহারই মধ্যে আবার যুদ্ধের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। আবার যে শীঘ্রই যুদ্ধ হইবে, তাহা নয়; কিন্তু য়ুরোপের প্রায় সকল দেশেই সৈন্য-সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে। প্রকাশ্যে প্রচারিত হইতেছে যে, সৈন্যবৃদ্ধির মুখ্য উদ্দেশ্য য়ুরোপের শান্তিরক্ষা করা। বিষের দ্বারা বিষক্ষয় হইতে পারে, কিন্তু অগ্নি দিয়া যে অনল নির্ব্বাপিত হয়, এমন কথা কেহই বলিতে পারে না। সৈন্য বাড়াইলেই অবশেষে যুদ্ধ অনিবার্য্য, এবং যুদ্ধ হইলেই লোক-সংখ্যা হ্রাস হইবে। এই কারণে য়ুরোপে লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির সমস্যা উপস্থিত হয় নাই।

কয়েক দেশে এখনও লোকসংখ্যা বাড়িলে কোন ক্ষতি নাই। আমেরিকায় আদিম-নিবাসীদিগের সংখ্যা অল্প; য়ুরোপীয় জাতির সংস্রবে আসিয়া তাহারা প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। এখন পর্য্যন্ত আমেরিকায় স্থানাভাব নাই, অতএব জনসংখ্যা বাড়িতে কোন বাধা নাই। যে সকল বৃহৎ দীর্ঘ তৃণমণ্ডিত ভূমিখণ্ডকে প্রেরী বলে, সেখানে এখনও বহুতর লোকালয় স্থাপিত হইতে পারে। কানাডাতেও লোকের বাসোপযোগী অনেক স্থান পড়িয়া আছে এবং সেখানে লোকসংখ্যাও দ্রুত বাড়িতেছে। সকলের অপেক্ষা অষ্ট্রেলিয়ায় জনসংখ্যা অতি সত্বর বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহার কারণ, ইংরাজী অষ্ট্রেলিয়ানরা প্রায় সমুদ্রতীরে বাস করে, সমুদ্র হইতে দূরে অনেক স্থান পড়িয়া আছে, যেমন যেমন লোক বাড়িতেছে, সেইরূপ অপর স্থান অধিকৃত হইতেছে। আমেরিকার ন্যায় অষ্ট্রেলিয়ার আদিমনিবাসী মাওরি জাতিও প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। চীনদেশে লোকসংখ্যা অনেক, কিন্তু প্রজাবৃদ্ধি রহিত করিবার কোন প্রস্তাব শুনিতে পাওয়া যায় নাই। সেখানে মহামারী, সংক্রামক রোগ, যুদ্ধবিগ্রহ, সকল প্রকার উৎপাতই আছে।

ভারতবর্ষে দশ বৎসর অন্তর লোকসংখ্যা গণনা করা

হয়, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, লোকসংখ্যা বাড়িতেছে। অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রধান লক্ষণ দারিদ্র্য; কিন্তু অনেক অসভ্য জাতি সংখ্যায় অল্প হইলেও অত্যন্ত দরিদ্র। কারণ, তাহারা ধন উপার্জ্জনের কোন চেষ্টা করে না। ভারতবর্ষের ন্যায় দরিদ্র জাতি কোথাও নাই, কিন্তু একমাত্র লোকসংখ্যাবৃদ্ধিই কি তাহার কারণ? এ বিষয়ে যথাযথ বিচার এ পর্য্যন্ত হয় নাই। অতিরিক্ত লোকসংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়াতে যে কোনরূপ আশঙ্কা আছে, এমন কথা গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে প্রকাশিত হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে জনসংখ্যা কি ভাবে বাড়িতেছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। পার্শী সম্প্রদায় সংখ্যায় অল্প, কিন্তু ভারতবর্ষের একটি প্রধান জাতি। বোম্বাই, করাচি, নবসারি ও অন্যান্য স্থানে পার্শীদের নানারূপ কীর্ত্তি রহিয়াছে। দানে মুক্তহস্ত, এমন আর কোন জাতি নাই। ইংরাজী ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের জনসংখ্যায় পার্শীদের সংখ্যা এক লক্ষ দশ হাজার হইয়াছিল। পঞ্চাশ বৎসরে কেবল চল্লিশ হাজার লোক বাড়িয়াছে। এই জাতিতে লোকসংখ্যা না বাড়াই বিশেষ চিন্তার কারণ। আমার পঞ্চাশ বৎসরের অভিজ্ঞতা এই যে, ক্রমেই বিবাহের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে। পূর্ব্বে হিন্দু জাতির ন্যায় পার্শী কন্যাদের অল্পবয়সে বিবাহ হইত। এখন তাহা ত হয়ই না, কন্যাদের বিবাহ হওয়াই দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। কন্যারা বিশ, পঁচিশ, ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকে, অনেকের বিবাহ একেবারে হয় না। বোধ হয়, এমন কোন পার্শী পরিবার খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—যাহাতে সকল কন্যার বিবাহ হইয়াছে। অনেক পরিবারে কন্যারা চিরকাল অনূঢ়া থাকে। ইহার কারণ, বিবাহের প্রস্তাব হইলেই পাত্রের পক্ষ হইতে এমন অসম্ভব রকম যৌতুকের দাবী করা হয় যে, কন্যাপক্ষ তাহা কিছুতেই দিতে পারে না। বিবাহ হইবার উপায় নাই জানিয়া অনেক পার্শী কন্যারা বিবাহের নামে বিরক্ত হইয়া উঠে। এই রকম শত শত অবিবাহিতা কন্যা দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষদেরও অবিবাহিত থাকিতে হয়। কিন্তু পুরুষে আর স্ত্রীলোকে অনেক প্রভেদ। পুরুষ সংযত-চরিত্র না হইলে কিছুই যায় আসে না, স্ত্রীলোকের চরিত্র দুষ্ট হইলে তাহাকে গৃহবহিষ্কৃত হইতে হয়। পার্শী সমাজে স্ত্রীলোকদের চরিত্রদোষ অতি বিরল, কিন্তু অবিবাহিতা রমণীগণের স্বভাব যে রুক্ষ ও তিক্ত হইয়া যায়, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়।

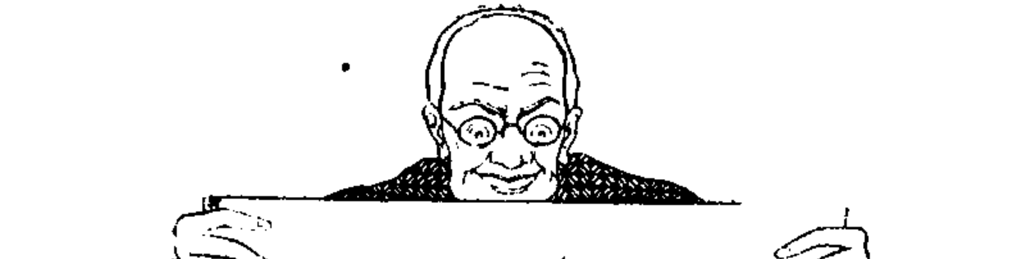
হিন্দু সমাজের অবস্থা কি? আমি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথা বলিতেছি। কিছুকাল পূর্ব্বে কন্যার বয়স বারো তের বৎসর হইলেই কন্যা অরক্ষণীয়া হইয়া উঠিত এবং পিতামাতা যেমন করিয়া হউক তাহার বিবাহ দিতেন। যৌতুকের জন্য পীড়ন আমাদের দেশেও ছিল। কন্যার পিতা অবস্থাপন্ন না হইলে যেমন তেমন করিয়া ধার কর্জ্জ করিয়া কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইতেন। কন্যাদিগের অল্পবয়সে বিবাহ হয় বলিয়া সমাজসংস্কারকদিগকে কোনরূপ আন্দোলন করিতে হয় নাই, দেখিতে দেখিতে বিবাহের বয়স আপনা-আপনি বাড়িয়া গিয়াছে। এখন কন্যাদিগের ষোল, সতের কিম্বা কুড়ি বৎসর বয়সে বিবাহ দিলেও সমাজে কেহ উচ্চবাচ্য করে না। শুধু তাহাই নহে, সময়ে সময়ে কন্যাদিগের বিবাহ দেওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে। আজকাল এমন অনেক পরিবার দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের মধ্যে চব্বিশ পঁচিশ বৎসর বয়সের কন্যা-গণ অবিবাহিতা রহিয়াছে। তাহাদের যে কোনকালে বিবাহ হইবে, সে আশাও বড় নাই। এরূপ অবস্থায় তাহাদের এমন শিক্ষা হওয়া উচিত যাহাতে তাহারা উপার্জ্জন করিতে শিখে, কিন্তু অনেক স্থলে তাহাও হয় না। ইহাতে নানারূপ আশঙ্কা। বাঙ্গালা দেশে অনেক যুবকও বিবাহ করিতে স্বীকার করে না। তাহাদের সংখ্যা ক্রমে বাড়িয়া চলিতেছে। বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে এখন পর্য্যন্ত প্রাচীন প্রথা প্রচলিত আছে; কিন্তু যুবকদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিবাহ করিতে অস্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ক্রমে কন্যাদিগের বিবাহ দেওয়াও কঠিন হইয়া উঠিতে পারে। পাঞ্জাবে বহুসংখ্যক লোক আর্য্যসমাজভুক্ত। ইহাদের মধ্যে অনেক পুরুষ অবিবাহিত, স্ত্রীলোকরাও সময়ে সময়ে বিবাহ করিতে অস্বীকার করে। অবিবাহিতের সংখ্যা বোম্বাই অঞ্চলে সকলের অপেক্ষা অধিক। পার্শীদের কথা বলিয়াছি, কিন্তু হিন্দুদিগের মধ্যেও অবিবাহিত পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়া যাইতেছে। মহারাষ্ট্রীয় জাতিরা ও গুজরাটীরা অনেকে বিবাহ করে না। কেবল অর্থাভাবে নয়; অনেক সঙ্গতিপন্ন লোকের কন্যারা বিবাহ করিতে অস্বীকার করে, যুবক-রাও বিবাহ করে না। কিন্তু স্ত্রীলোকরা বিবাহ না করিলেও কিছু কর্ম্মকায করে, সুতরাং বিবাহ না করা বিশেষ দোষের হয় না।

মধ্যশ্রেণীর লোকদের মধ্যে যে জনসংখ্যা বাড়িতেছে, এরূপ মনে হয় না, কিন্তু গ্রামবাসী দরিদ্র লোকদের মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, আবহমানকাল হইতে বিবাহ-পদ্ধতি চিরকাল এক রকম চলিয়া আসিতেছে। সন্তান থাকুক বা না থাকুক, পরিবারের সংখ্যা অল্প হউক বা অধিক হউক, বিবাহ কোনমতে নিবারিত হয় না। বালক-বালিকার অতি অল্পবয়সে বিবাহ দেওয়াই চিরন্তন প্রথা। সারদা আইনে বিবাহের বয়স কিছু বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বত্র যে এ আইন রক্ষিত হয়, তাহাতে বিশেষ সংশয়। খুব ছোট ছোট গ্রামে কি হয়, কেহ কোন খবর রাখে না, আইনভঙ্গ হইলে যে কর্তৃপক্ষীয়রা সকল সময়ে জানিতে পারেন, তাহাও বোধ হয় না। বিশেষতঃ গ্রামবাসীরা যদি সারদা আইন মানিয়াও চলে, তাহাতেও লোক-সংখ্যা হ্রাস হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। আট দশ বৎসরের বালক-বালিকার সন্তানাদি হয় না। বিবাহের পর বধূ পিত্রালয়ে থাকে, বয়স্থা হইলে দ্বিরাগমন হয়। হিন্দুস্থানীরা এই প্রথাকে গওনা বলে।

বিহার অঞ্চলে এবং যুক্তপ্রদেশের কয়েক জেলায় লোক-সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ভূমি উর্ব্বরা, নদী বিস্তর, ফসল যথেষ্ট, আহার্য্য শস্যাদির মূল্যও অল্প। তাহা হইলেও লোক-সংখ্যা এত অধিক যে, লোকের সঙ্কুলান হয় না, অর্থাভাবে অত্যন্ত কষ্ট হয়। এই অঞ্চল হইতে বহুসহস্র লোক অর্থ উপার্জ্জন করিবার নিমিত্ত মধ্যপ্রদেশে, বোম্বাই অঞ্চলে, সিন্ধুদেশে ও বৃটিশ বেলুচিস্থানে প্রবাস করে। ঐ সকল স্থানে ইহাদিগকে ভাইয়া বলে। ইহারা সকলপ্রকার কর্ম্ম করে। বোম্বাইয়ে দুধের ব্যবসা প্রায় সমস্তই হিন্দুস্থানীদের হাতে। অনেকে রেলওয়ে লাইনে কর্ম্ম করে। সিন্ধুদেশে অনেকে পাচক ও ভৃত্যের কর্ম্ম করে। বেলুচিস্থানেও তাহাই। তাহা ছাড়া, অনেক ফেরিওয়ালা, ফল-তরকারী-বিক্রেতা, মুড়ি-ভাজা-বিক্রেতা হিন্দুস্থানী। কলিকাতা ও কলিকাতার আশে-পাশে গ্রাম-সমূহ হিন্দুস্থানীতে ভরিয়া গিয়াছে। কলিকাতায় বাঙ্গালী আর বাসন বিক্রয় করে না, সন্ধ্যার পর পৌটাপাটা বেলফুল হাঁকে না। গঙ্গাতে বোট-পান্সীর মাঝিরা প্রায় হিন্দুস্থানী। টিটাগড় প্রভৃতি স্থানের কলে হিন্দুস্থানীরাই কাষ করে। বাঙ্গালী হয় চাকরী কিংবা ওকালতী ছাড়া অন্য কর্ম্মের জন্য দেশের বাহিরে যায় না। অনেক বাঙ্গালী দেশের বাস তুলিয়া দিয়া বিহারে নানা স্থানে, যুক্তপ্রদেশে ও অপর স্থানে বাস করে। দক্ষিণ-ভারতে বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানীর সংখ্যা অতি অল্প।

ভারতে লোকসংখ্যা হ্রাস হইবার প্রস্তাব উঠিতেই পারে না। তাহাতে সমূহ আশঙ্কা। এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা এই যে, কোন দেশের জনসংখ্যা কমিতে আরম্ভ করিলে তাহা ক্রমাগত হ্রাস হইতে থাকে ও অবশেষে লুপ্ত হয়। আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিম-নিবাসীদের এই দশাই ঘটিয়াছে। এ দেশে সে আশঙ্কা কিছুমাত্র নাই। কথা এই যে, লোকসংখ্যা যাহাতে অত্যন্ত অধিক না হয়, তাহার কোন উপায় হইতে পারে কি না। য়ুরোপে কোন কোন দেশে কয়েক প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া সন্তানাদির সংখ্যা অধিক হইতে দেয় না। এ দেশে গ্রামের লোকরা কোন-মতে সে সকল উপায় গ্রহণ করিবে না। জার্ম্মাণীতে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক পুরুষকে প্রমাণ করিতে হয় যে, দুই তিনটি সন্তান প্রতিপালন করিবার তাহার সঙ্গতি আছে। ভারতে এরূপ বিধান করাও অসম্ভব। একমাত্র উপায় শিক্ষাবিস্তার। একেবারে সঙ্গতিশূন্য লোকের বিবাহ করা অনুচিত, এরূপ ধারণা জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হওয়া কর্ত্তব্য। শিক্ষা ব্যতীত তাহা হইতে পারে না। দ্বিতীয় উপায়, প্রচার। গ্রামে গ্রামে অনবরত প্রচার করিতে হইবে যে, বিবাহ করিলে সন্তান-পালনের সঙ্গতি আবশ্যক, অল্পবিস্তর কিছু অর্থাগম থাকা চাই। যে নিঃস্ব অথবা যাহার উপার্জ্জনশক্তি নাই, তাহার পক্ষে বিবাহ করা অবৈধ। ইহা ছাড়া তৃতীয় কোন উপায় নাই। ভারতে লোকসংখ্যাবৃদ্ধি প্রকৃত সমস্যা নয়। অনাহারে সন্তানাদি না মারা যায়, সে উপায় দেখিতে হইবে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।



রঙ্-ছুট্

(গল্প)

রাত্রি প্রায় এগারোটা। দর্জ্জিপাড়ার এক সরু গলির মধ্যে জীর্ণ এক-তলা বাড়ীর দ্বারে দাঁড়াইয়া শিবচরণ ঘন ঘন কড়া নাড়িতেছিল। ঘামিয়া সারা হইয়াছে, জুতায় একটা পেরেক উঠিয়া পাখানাকে বিঁধিয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে, পা জ্বলিয়া যাইতেছে, তার উপর বিরাট নৈরাশ্য! মানুষের বেইমানীতে মন জর্জ্জরিত! একান্ত নিরুপায়! কোনোমতে বিছানায় পড়িতে পারিলে বাঁচিয়া যায়, এমন অবস্থা!

অনেকক্ষণ কড়া নাড়িতেছে। পাশের অনেকগুলা বাড়ী হইতে অনেকে সাড়া দিল; প্রশ্ন করিল, —কে?

নিজের গৃহে কাহারো কিন্তু সাড়া নাই। মানুষের মেজাজ ইহাতে সত্যই চড়িয়া যায়।

বহুক্ষণ পরে নিদ্রালু চোখে গৃহিণী প্রিয়বালা আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

শিবচরণ হুঙ্কার তুলিল, —এতক্ষণে ঘুম ভাঙ্গলো নবাব-নন্দিনীর!

প্রিয়বালা ফোঁশ্ করিয়া উঠিল, —ছোটলোকের মত গাল দিয়ো না! খবর্দ্দার!

—ইস্! আবার চোখ-রাঙানি! আয়েস করে ঘুম দেবেন, আমি থাকবো পথে দাঁড়িয়ে···আবার রাগ!

প্রিয়বালা কহিল—সিংহাসনে বসিয়ে রেখেচো আমায়,—না? দশটা বাঁদী দিন-রাত পাখা-চামর ঢুলোচ্ছে—আয়েসের আর সীমা-পরিসীমা নেই!

শিবচরণ এ কথার জবাব দিল না; গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া পা তুলিয়া জুতাজোড়াকে বজ্রের মত সবলে ছুড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করিল, তারপর কলতলায় গিয়া চৌবাচ্ছা হইতে জল লইয়া পায়ে ঢালিল; ঢালিয়া জামা খুলিয়া সামনের দড়িতে ঝুলাইয়া রোয়াকের উপর বসিল।

প্রিয়বালা সদর বন্ধ করিয়া কহিল —এবার থেকে যখন রাত করে ফিরবে, সদরে চাবি দিয়ে যেয়ো। এসে পাঁচজনের ঘুম ভাঙ্গিয়ে এমন জ্বালাতন করো না। আমাদের মানুষের শরীর!

শিবচরণ মুখ তুলিয়া স্ত্রীর পানে একবার চাহিল। মাথার উপর আকাশে ছিল খণ্ড চাঁদ, —তারারি খানিকটা জ্যোৎস্না আসিয়া ছোট উঠানে পড়িয়াছে। প্রিয়বালার মুখে বিরক্তি··· সে ঘরের দিকে চলিল রোয়াকের পরে ছোট দালান তার কোলে শয়ন-ঘর।

শিবচরণ নিশ্বাস ফেলিল, ভাবিল, হায় রে, দুর্দ্দিনে সকলেই মুখ ফিরায়! ভাই, বন্ধু···নিতান্ত যে আপন, অর্দ্ধাঙ্গিনী স্ত্রী—সে-ও! অথচ···

এই স্ত্রী! প্রথম যৌবনে যেদিন পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, সে যেন কোন্ মানস-লোকের প্রতিমা! তার বিবাহের প্রীতি-উপহারে বন্ধুরা পদ্য ছাপাইয়াছিল। কমলের লেখা পদ্য। লিখিয়াছিল

শিরে তোমার কুসুম-মালা,
নয়নে তোমার দিব্য বিভা,
বক্ষে প্রীতির স্নিগ্ধ নির্ঝর,
অধরে হাসি মধুর কিবা!

জীবন সত্যই সুরু হইয়াছিল ঐ কুসুম-মালার গন্ধে বিহ্বল, নয়নের দিব্য বিভায় উজ্জ্বল, প্রীতির নির্ঝর-ধারায় স্নিগ্ধ শীতল হইয়া! সামনে যতদূর দৃষ্টি চলিত, মেঘ-কজ্জলের চিহ্ন ছিল না।

কবিতা প্রিয়াকে শুনাইত। কবিতা শুনিয়া হৃদয়-মনের কবিকে কি উপহারেই না সে তুষ্ট করিয়াছে! তার পর কোথা দিয়া মেঘ আসিয়া জমিল···চমকিয়া শিবচরণ চাহিয়া দেখে, থিয়েটারের সেই দৃশ্য-পরিবর্ত্তনের মত প্রেমের

নিকুঞ্জ অদৃশ্য হইয়া সংসার-মরু দেখা দিয়াছে প্রচণ্ড দাহ লইয়া এবং সে দিব্য বিভা রৌদ্র-কিরণে ঝলসিয়া উঠিয়াছে!…

সংসার! রুক্ষ মূর্ত্তি…কোথাও এতটুকু তৃণ-পল্লবের চিহ্ন নাই! যেন ধূ-ধূ মরু! দিকে দিকে অভাব আর অভিযোগ… অভিযোগ আর অভাব!…

এমনি অনেক কথা মনে পড়িল। চোখের সামনে বায়োস্কোপের ছবি যেন রীলের পর রীল খুলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে…ঐ কুসুম-বন, পাশে নদী, আকাশের গায়ে আলোর পরশ! তারপর ছায়া…ছায়া জমিতেছে নিবিড় হইয়া! ফাগুন-বাতাস কালবৈশাখীতে গর্জ্জিয়া মাতিয়া উঠিল…ঐ অশনির হুঙ্কার…বিদ্যুতের ঝলক! কোথায় মুছিয়া গেল শ্রাবণের কাজল মেঘের মেলায় সে কুসুম বন, চাঁদের কিরণ…!

ঘর হইতে হুঙ্কার জাগিল,—ওখানে বসে থাকো যদি তো বলো, আমি ঘরের দোর বন্ধ করে দি। আলুথা ধরে আমার ঘুম হয় না গা ছমছম করে।

শিবচরণ একবার পিছন-পানে চাহিল, তারপর চৌবাচ্ছার কাছে গিয়া গায়ে জল ঢালিয়া স্নান করিল।

গায়ের জ্বালা কতক কমিল। স্নান করিয়া সে আসিয়া দালানে কাপড় বদলাইয়া দেওয়াল-ল্যাম্পের শিখা উজ্জ্বল করিয়া ঢাকা খুলিয়া খাইতে বসিল।

একরাশ রুটী…জল মাখানো। তাল পাকাইয়া যেন আটার পিণ্ড হইয়া আছে।

নিশ্বাস ফেলিয়া ডালে রুটী ভিজাইয়া মুখে দিল। বিস্বাদ! ডালে নুণ নাই। রাগ ধরিল। সারা দিনের পরিশ্রমের পর খাবারটা খাওয়ার যোগ্য মিলিবে না! গর্জ্জিয়া সে কহিল—আপনি ডাল মানুষ খেতে পারে!

ঘর হইতে প্রিয়বালা জবাব দিল,—নুণ তো পাতে আছে। নেওয়া যায় না? না, তার জন্যে পাঁচটা বাঁদীকে হাজির মোতায়েন থাকতে হবে!

শিবচরণ কহিল,—সে কথা হচ্ছে না। কাজ তো একটু রেঁধে দেওয়া! তাতেও এত ভুল!

গর্জ্জন করিতে করিতে প্রিয়বালা উঠিয়া আসিল,— দেখচো না, তোমার সংসারে সোনার পালঙ্কে শুয়ে আছি! খাটচো শুধু তুমি! যে-অন্ন মুখে দিই আর যে করে চালাই, ভগবান জানেন! আমি মেয়ে, তাই…

শিবচরণ কহিল,—থামো। আর গজ-গজ করতে হবে না। মানুষ এক তিল শান্তি পাবে না? এলুম তেতে-পুড়ে সারাদিনের পর…

প্রিয়বালা কহিল,—আমার গহনা গড়াবার ফরমাশ নিয়ে স্যাকরা-বাড়ীতে যাও নি তো! আমার কথাতে বেরোও নি! বেরিয়েছিলে আমোদ করতে ইয়ার-বন্ধুদের কাছে…

শিবচরণ কহিল,—আমোদ করেই বেড়াচ্ছি, দেখচো না! আমোদ করবার মত পয়সা রয়েছে, মন রয়েছে!… তা নয়। গিয়েছিলুম ঐ পঞ্চাননের কাছে। র‍্যাস্কেল! আজ ছ'মাস হলো, দশ টাকা ধার নেছে, হাতে-পায়ে ধরে বলেছিল, স্ত্রীর অসুখ; এক মাস পরে মাইনে পেলে দিয়ে দেবে। তা বয়ে গেছে! তাগাদা করতে করতে জিভ্ বেরিয়ে গেল! আজ তাই গিয়েছিলুম। সে দেখা করলে না। বাড়ীর লোক বললে, বেরিয়েছে। দোর চেপে বসে রইলুম… ভাবলুম, ফিরবে তো! রাত এগারোটা বাজলো, তবু ফিরলো না। বুঝলুম, বাড়ীর মধ্যে লুকিয়ে আছে, বেরুলো না। এত বড় বেইমান…ছোটলোক…জোচ্চোর…

বলিতে বলিতে রাগে দুই চোখ রাঙা হইয়া উঠিল। সে প্রিয়বালার পানে চাহিয়া রহিল।

প্রিয়বালা কহিল,—তা আমায় চোখ রাঙাচ্ছ কি! আমার পরামর্শ নিয়েছিলে ইয়ার-বন্ধুকে টাকা দেবার সময়! আমি বলে, এখানে সংসারের জন্য একটা টাকা বেশী চাইলে ঝঙ্কার দাও—টাকা বেরোয় না! আর ওদিকে…আমি তো ইয়ার নই! আমি যে স্ত্রী—বিয়ে-করা বাঁদী!

শিবচরণ কহিল,—তোমায় মধ্যস্থতা করতে ডাকিনি! কেন মিছে লেকচার দিচ্ছ!

প্রিয়বালা কহিল,—লেকচার দিইনি। আমি তোমায় লেকচার দেবো, এমন স্পর্দ্ধা আমার হয় নি! মুখ্যু মেয়ে-মানুষ…তুমি হলে পণ্ডিত। তার উপর রোজগার করে খাওয়াচ্ছ…

শিবচরণ কথা কহিল না। প্রিয়বালা চৌকাঠের উপর চাপিয়া বসিল, বসিয়া গজ-গজ করিতে লাগিল,—মা-বাপ জলে ফেলে দিতে পারে নি! মেয়ের বিয়ে দিয়েচে…… গলায় পাথর হয়ে ঝুলছিলুম! তাই!…একটা দিনের জন্য সুখী হলুম না! সারা জীবন নেই-নেই-নেই! কিছু

বল্‌তে গেলে মার-মূর্ত্তি ! মুখে একটা মিষ্টি কথাও নেই ! কার জন্যে রে বাপু ! আমি যেন সব বাপের বাড়ী পাঠাবো !···আমোদ নেই, আহ্লাদ নেই···কিছু না ! কি পাপ করেছিলুম···

শিবচরণ খাওয়া বন্ধ করিয়া প্রিয়বালার পানে চাহিল,—দুই চোখে আগুনের হল্কা ! গৃহিণীর সেদিকে লক্ষ্য নাই ! আপন-মনে বকিয়া চলিয়াছে—দুঃখ-দুর্দ্দশার সুদীর্ঘ কাহিনী—দুর্ভাগ্যের জীবন্ত ইতিহাস।

শিবচরণ কহিল,—খেতে দেবে, না কি ?

প্রিয়বালা কহিল,—তোমার রুটীর থালা আমি কেড়ে নিই নি তো ! তুমি খাও না !···আপন-মনে বকতেও পাবো না !

শিবচরণ কহিল,—না !

প্রিয়বালা এবার ফোঁশ্ করিল,—ওরে ব্যস্—না ! কেন বলো তো, আমার বাপ-মা তো আমায় বেচে দেয় নি তোমার কাছে যে তোমার মুখ চেয়ে চলতে হবে ? নিজের দুঃখ-দুর্দ্দশার চিন্তাও করবো না ?

—চেঁচিয়ে মানুষ চিন্তা করে না, আর একে চিন্তা বলে না ! এ হচ্ছে আমাকে বকা ! বলিয়া শিবচরণ আবার চুপ করিল। কিন্তু বৃথা ! কাহাকে বুঝাইবে ?

প্রিয়বালা বকিতে লাগিল—আমার মুখের কথা এখন হয়েছে বকুনি ! একদিন এই মুখের কথা শোনবার জন্যেই কি সাধ্য-সাধনা ছিল···

শিবচরণ কহিল—ছিল। তখন তুমিও এ-লোক ছিলে না ! তখন ছিলে মানুষ !

প্রিয়বালা কহিল,—আর এখন রাক্ষসী ! না ?

শিবচরণ কহিল—ভেবে দেখো নিজের মনে। দুঃখ-দুর্দ্দশার লম্বা ফিরিস্তি তো দিলে···চিরদিন দুঃখই পেয়েছো ? না, এক দিন···

প্রিয়বালা কহিল,—কবে ঘী খেয়েছি, মনে তো পড়ে না ! কবে খুশী করেছো ? কোনো দিন নয় !

শিবচরণ কহিল—আগে এত ঝগড়া করতে ?

দুই চোখ কপালে তুলিয়া প্রিয়বালা কহিল,—আমি ঝগড়া করি, তা তো বলবেই ! মুখ রগড়ে যে-কর্ণা করি, ঝগড়া করলে তোমাকে আর টেঁকতে হতো না !

শিবচরণ কহিল—ভয় নেই। আর বেশী দিন টেঁকে থাকবো না। যা করে তুলেচো—দেখো···

প্রিয়বালা কহিল,—ঐটুকুই জানো ! বিশের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, কুলোপানা চক্কর। পুরুষমানুষ কি না !

নিরুপায় হতাশ্বাসে শিবচরণ আবার চুপ করিল : খাইতে লাগিল···প্রিয়বালা বকিতে লাগিল।

শিবচরণের শেষে অসহ্য বোধ হইল। —নেঃ তোর খাওয়ার নিকুচি করেচে···বলিয়া সে উঠিল, উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া আসিল।

প্রিয়বালা কহিল,—আবার তেজটুকু আছে ষোল আনা ! বয়ে গেছে সাধতে ! আমি শুতে চললুম···

প্রিয়বালা সত্যই শুইতে গেল। শিবচরণ রোয়াকে বসিয়া রহিল।

প্রথম যৌবনের কথা তার মনে জাগিল। এই প্রিয়বালা···ছিল যেন কল্পলোকের প্রতিমা ! প্রাণে তার শুধু আলো···

সে আলো কোথায় মিলাইল ? কেন মিলাইল ? সব দুঃখ, সব জ্বালা শিবচরণ এক দিন ভুলিত এই প্রিয়বালার মুখ দেখিয়া। নৈরাশ্যের যত অন্ধকার—সব ঘুচিত এই প্রিয়-বালার চোখের দরদ-ভরা দৃষ্টিতে !

কোথায় আজ প্রিয়বালার চোখে সে দৃষ্টি···চাঁদের আলোর মত সেই আরাম-ভরা, স্নিগ্ধ-শীতল দৃষ্টি ! আজ তার চোখে শুধু আগুন জ্বলিতেছে···অহরহ। নিমেষের নির্ব্বাণ জানে না !

পয়সা ! পয়সাই দুনিয়ায় এত বড় যে, যতক্ষণ পয়সা থাকিবে, ততক্ষণ মিলিবে স্নেহ, প্রীতি, দরদ, ভালোবাসা ! সে পয়সা না থাকিলেই লাঞ্ছনা আর তিরস্কার !

সাধ হয়, ভগবান্ একবার যদি প্রাচুর্য্যে সংসারটাকে ভরিয়া দেন ! প্রিয়বালার সামনে সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিয়া দেখে, তার মুখে আবার হাসি ফোটে কি না ! তার মুখের কথায় আবার সেই আগেকার অমৃত ঝরে কি না !

কিন্তু পয়সা কি করিয়া মিলিবে ? কোথায় মিলিবে ? তার সাধনার সীমা নাই ! একদণ্ড সে বিশ্রাম জানে না··· বিরাম জানে না। তবু···

অদৃষ্ট !

প্রিয়বালা ডাকিল—ঘরে যদি না শোও আমাকে সেটা করে স্পষ্ট বলো। দরজা বন্ধ করে আমি শুই

ঘর আলগা থাকলে আমার ঘুম হয় না। বলচি, গা ছম্‌-ছম্‌ করে···

শিবচরণের মনের উপর যেন আগুনের ডেলা আসিয়া পড়িল। সে কহিল,—দোর বন্ধ করে তুমি শোও। আমি শোবো না।

—ও! তা বেশ!

স্বরে প্রচণ্ড তাচ্ছল্য আর অবজ্ঞা! প্রিয়বালা উঠিল, উঠিয়া শেষ-তীর হানিতে ছাড়িল না, কহিল,—খাওয়াটা বন্ধু-বাড়ীতে সেরে এলেই পারতে! কেন মিছে জ্বালানো!

শিবচরণ কহিল,—আমার খুশী!

প্রিয়বালা কহিল,—এ তেজ তোমার সাজে না—স্ত্রীকে পালন করতে পারো না,—তেজ দেখাও কি!···আমি তা হলে শুচ্ছি—দোর ঠেঙিয়ে ঘুম ভাঙ্গিয়ো না···

শিবচরণ কহিল,—ভয় নেই। আমি কিছু বল্‌বো না—কোনো দিন আর বল্‌বো না। তুমি যাও। সারা দিন ভারী ধকল গেছে, ভয়ঙ্কর খাটুনি! শোও গে। শুয়ে আরাম করো···

প্রিয়বালা আমার ঝাঁজিয়া উঠিল। কথা বলিয়া কেবল ভাবিতেছিল, এ-কথায় মস্ত জয়-লাভ করিবে, শিবচরণ তার কথার উপর আর একটি কথা বলিতে পারিবে না; এ-বাগ্‌যুদ্ধে তাহারি হইবে জয়! কিন্তু শিবচরণ কোনো কথা তেমন গায়ে মাখিতেছে না! তাই সে ঝাঁজিয়া উঠিল, ঝাঁজিয়া কহিল,—দেখচো না, আরামে একেবারে ঢেলে দিচ্ছ!··· আবার টিটকিরি! বেশ, কাল থেকে তোমার সংসার তুমি করো···আমি করবো না। করতে পারবো না···

শিবচরণ স্থির দৃষ্টিতে প্রিয়বালার পানে চাহিয়াছিল। বুঝি খুঁজিতেছিল, এ প্রিয়বালার মাঝে তার সেই প্রথম-যৌবনের প্রিয়বালার একটা কণাও আজ আছে কি না···

প্রিয়বালা কহিল,—কি! অমন করে চেয়ে আছো যে! মারবে না কি? তাই মারো···ওটুকু আর বাদ থাকে কেন? হয়ে যাক! যে রকম ইতর হয়েচো···

কথাটা শিবচরণের গায়ে লাগিল। সে ডাকিল,—প্রিয়···

—থাক্‌! আর মাতালের মত চেঁচাতে হবে না। নিশুতি রাত···পাড়ার লোকের আর কোনো পরিচয় পেতে বাকী রইলো না! ঘরের মধ্যে যা হচ্ছে হোক, পাড়ায় তা জানান্‌ দেবার দরকার কি!···ইস, চাইছে ত্যাখো···মারো···মারো···ওটুকু আর বাকী রেখো না। চূড়োন্ত হয়ে যাক!

শিবচরণ কহিল,—তেমন ইতর আমায় ভাবো—সত্যি?

প্রিয়বালা কহিল,—ইতর হতে আর বাকী কি! গায়ে হাত তুললেই মারা হয় না। মারতে আর বাকী আছে!

—কি! শিবচরণ উঠিয়া দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া প্রিয়বালার হাত ধরিয়া ডাকিল—শোনো···

মনে হইল, মিনতি-ভরে বলিবে, আমি বড় শ্রান্ত, প্রিয়···তোমার ও-ভর্ৎসনার অবসান করো। একটু দরদ, একটু প্রীতি···যে প্রীতি-দরদে বন্যা ঢালিয়া দিতে, তার একটি কণা···ওগো, একটি কণার ভিখারী আমি···

কিন্তু সে কথা বলা হইল না। প্রিয়বালা সবলে ধাক্কা দিয়া হাত ছাড়াইয়া লইল, বলিল,—মদ খেয়ে এসেচো, দেখচি। গায়ে হাত!

নিমেষে শিবচরণের মাথায় রক্ত নাচিয়া উঠিল। সে সব ভুলিয়া গেল। ওরে পিশাচিনী নারী, সত্যই আমাকে ইতর ভাবো!

ঝাঁপাইয়া সে প্রিয়বালাকে আক্রমণ করিল,—সবলে তার কণ্ঠ চাপিয়া রুক্ষ স্বরে কহিল,—তোমার এ চড়া কথা আর শুনতে পারি না। তুমি থামবে? না, তোমার এ কথা বন্ধ করে দিতে হবে। দেবো বন্ধ করে···

একটা অস্ফুট প্রতিবাদ···তার পর সব চুপ!

চেতনা ফিরিলে শিবচরণ কাঁপিয়া উঠিল; ডাকিল,—প্রিয়···

কোনো উত্তর নাই।

প্রিয়কে সে ধরিয়া ছিল; হাত সরাইয়া লইল। প্রিয়র দেহ ঢলিয়া পড়িল।

প্রিয়কে সেইখানে শোয়াইয়া দিল। এ কি! নিস্পন্দ দেহ! তবে কি···

আকাশের পানে শিবচরণ চাহিল। চাঁদের গায়ে কে যেন রক্ত মাখাইয়া দিয়াছে! সারা আকাশ রক্তে রাঙা!

গা ছমছম্‌ করিয়া উঠিল···নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে! শিবচরণ টলিতে টলিতে বাড়ীর বাহির হইয়া পথে নামিল।

এ-পথ ও-পথ ঘুরিয়া ভোরের দিকে সে অনুভব করিল, আসিয়া দাঁড়াইয়াছে বন্ধু বঙ্কুর গৃহ-দ্বারে!

দ্বারে করাঘাত করিল। বঙ্কু আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। ভিতরে তার গৃহিণীর কর্কশ স্বর ধ্বনিত হইতেছিল। শিবচরণের মনে হইল, প্রিয় এখানেও আসিয়াছে? কণ্ঠে সেই ভর্ৎসনার স্বর! সবিস্ময়ে সে বঙ্কুর পানে চাহিল।

হাসিয়া বঙ্কু কহিল,—গিন্নী। নৃমুণ্ডমালিনী মূর্ত্তি! এমনি হয়ে আছেন অষ্টপ্রহর!

শিবচরণ স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তার পানে চাহিয়া রহিল। বঙ্কু নেপথ্যাভিমুখে চাহিয়া সহজ শান্ত স্বরে কহিল,—এখন সন্ধি করো গো! আমি অপরাধী। ক্ষমা চাইছি!…শিবু এসেচে। ডু'জনকে একটু চা খাওয়াও…

অন্দরে উচ্চ রব থামিল। শিবচরণকে আনিয়া বঙ্কু বাহিরের ঘরে বসাইল, কহিল,—খপর কি! ভোরেই এখানে? কাল বুঝি কলহ গেছে?

শিবচরণ কোনো কথা কহিল না। বঙ্কু কহিল,—অন্যায় করেচো। ওরা সংসারের ভার মাথায় করে আছে…মেয়েমানুষ—একটুতে ধৈর্য্য হারায়। ওদের এ অধৈর্য্য হাসি-মুখে সয়ে যেতে হয়। স্থাখো না, আমার ইনি…কি না বলেন! আমি হেসে গায়ে মাখি তাতে আমার একটা লাভ এই হয়, মেজাজ বিগড়োয় না।

শিবচরণের মনে হইল, আশ্চর্য্য! ডুনিয়ার সর্ব্বত্র এই স্বর! সে তবে…

কিন্তু গৃহে ফিরিবার মুখ নাই! যে কাজ করিয়া আসিয়াছে…কে জানে, হয়তো এতক্ষণে পুলিশ আসিয়া উদয় হইয়াছে…পাড়ায় হৈ-হৈ রব উঠিয়াছে! হয়তো তার সন্ধানে…

শিবচরণ শিহরিয়া উঠিল।

বঙ্কু কহিল,—বসো। আমি আসচি। গৃহিণীকে একটু তোয়াজ করা চাই তো! ওঁর কাজে একটু সাহায্য! সত্যি, দোষ দিতে পারি না। শক্তি কত! আমাদের কি? দুটো পয়সা এনে ফেলে দিয়ে সকল দায়ে খালাশ। দায় যত পোহাতে হয় ওদের! মানুষের মন…ঠিক রাখা কতখানি শক্ত…বুঝি!

বঙ্কু চলিয়া গেল। শিবচরণ গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল।

…কিন্তু বঙ্কুর গৃহিণীর কথা ম ম পাঁচটা ছেলে-মেয়ে—দায় অনেক। তার গৃহে ছেলে-মেয়ে নাই, শুধু প্রিয়বালা! কম দরদ নাই…

তার অদৃষ্ট!

বঙ্কু ফিরিল; তার হাতে চায়ের পেয়ালা।

শিবচরণ পেয়ালা মুখে ধরিল। মনের মধ্যে যেন ঝড় বহিতেছে!

বঙ্কু কহিল—বেশ ঝাঁজ দেখিয়ে এসেচো বাড়ীতে—বুঝচি!…আমার মোটে রাগ হয় না। কার উপর রাগ করবো? সঙ্গে থাকি।

বঙ্কুর গৃহিণী কাদম্বিনী আসিয়া কহিল—শুধু চা খাবে? একটু মোহনভোগ করে দি! কি বলেন, শিববাবু?

শিবচরণ কহিল—না বৌদি…আর কিছু নয়।

বঙ্কু কহিল—শিবু মান করে এসেচে গো। গিন্নীর সঙ্গে কলহ হয়েচে।

কাদম্বিনী কহিল,—পুরুষমানুষ…মান করলেই হলো!

বঙ্কু কহিল—আমার কিন্তু ও বালাই নেই। কি বলো? এই যে তুমি দিবারাত্রি বকচো…

কাদম্বিনীর মুখ গম্ভীর হইল। সে কহিল,—আমি তোমায় দিবারাত বকে বেড়াচ্ছি…বটে এত বড় কথা তুমি অনায়াসে বললে! আচ্ছা, শিববাবুকে বলচি সব কথা। শুনুন। শুনে উনি বিচার করুন। আমার দোষ বলেন যদি তো গুণে পঁচিশ-ঘা জুতো খাবো।

বঙ্কু কহিল,—আহা, আমি কি seriously বলচি গা! একটু পরিহাস…

কাদম্বিনী কহিল—একে পরিহাস বলে না। মানুষের আঁতে ছুঁচ ফুটিয়ে…

বঙ্কু কহিল,—ছুঁচ আমি ফুটোইনি গো। দোহাই! আমার হাত খালি…এই দ্যাখো।

কাদম্বিনী সে কথায় কাণ দিল না, শিবচরণের পানে চাহিয়া কহিল,—আপনি শুনুন, শিববাবু। কাল গিয়েছিলেন রাত্রে বায়োস্কোপ দেখতে; ফিরলেন রাত বারোটায়। ফিরে গায়ের জামা ছাদের দড়িতে ঝুলিয়ে রাখলেন। বললুম, হিম পড়ে—জামা ভিজে যাবে। বলে তুলে রাখতে গেলুম। উনি বললেন, থাক একটু ছাদে; উনি শোবার সময় তুলে রাখবেন ঘরে। আমি বললুম, ক্লান্ত হয়ে ফিরেচো—তোমার কথ্খনো মনে থাকবে না। উনি বললেন, থাকবে।

' আমি বললুম, দেখবো। বলে আমি জামা তুললুম না। সকালে উঠে দেখি, জামা তোলেন নি। সারা রাত ছাদে ছিল, ভিজে স্যাঁৎ-স্যাঁৎ করচে। সকালে সেই কথা বললুম—তাতে একেবারে···

বাধা দিয়া বন্ধু কহিল,—কি! আমি রাগ করেচি? না, তোমাকে কোনো কথা বলেচি? বলো···

কাদম্বিনী কহিল—তা বলবে কেন! বললে স্বভাব শোধরাবার আশা থাকতো! বুঝলেন শিববাবু, এত অন্যায় করেন, বলি, তা চুপ করে থাকেন, নয় হাসেন। সবতাতে তামাসা! আচ্ছা, বলুন তো, আমি যে এই বকে মরি···

বন্ধু কহিল,—তখন আমি যদি তোমার সে কথায় কথা যোগ করে বকতে থাকি, তাহলে পৃথিবীখানা কথার ঝড়ে দুলে উঠবে। এক পক্ষ কথা বললে অপর-পক্ষ যদি চুপ করে শোনে, তাহলে বক্তার কথা বলা সার্থক হয়—কথা মাঠে মারা যায় না। সে সময় এ-পক্ষ থেকে কথা সুরু হলে দারুণ বিশৃঙ্খলা ঘটে। দুটো কথা এক হলে, সুর যায় কেটে—কোনো কথার আর মীমাংসা হয় না, শেষ হয় না। কি বলো শিবু···

কাদম্বিনী কহিল,—শুনলেন শিববাবু আপনার বন্ধুর তত্ত্ব-কথা! এ-মানুষকে নিয়ে ঘর করা যে কি ব্যাপার, তা আমি ছাড়া কেউ বুঝবে না!

বন্ধু কহিল—ঘর না করলে কি করে বুঝবে!

কাদম্বিনী নিরুপায় হতাশভাবে কহিল—যাই আমি। আর কথা-কাটাকাটি করতে পারি না। মোহনভোগ তাহলে চলবে না? বেশ!···

এই অবধি বলিয়া শিবচরণের পানে চাহিয়া কহিল,—স্নান করে এসেচেন, শুনচি। এখান থেকেই নেয়ে খেয়ে আপিসে যান। তারপর ওবেলায় বাড়ী ফিরবেন—ফিরে মানভঞ্জন করবেন। কেমন?

শিবচরণ গুম হইয়া রহিল; কোনো কথা বলিল না। সে ভাবিতেছিল···

বন্ধু কহিল—তাই হবে। তুমি সেই ব্যবস্থা করো।

কাদম্বিনী চলিয়া গেল। শিবচরণের পানে চাহিয়া বন্ধু কহিল—খুব ভালো বন্দোবস্ত। বলো, তোমার বাড়ীতে খপর পাঠিয়ে দিই। নাহলে মান হলেও তোমার জন্য দুশ্চিন্তার তাঁর সীমা থাকবে না! সে বিষয়ে ওঁরা খুব পটু! ঝগড়া করেন প্রাণপণে—আবার স্বামীর জন্য চিন্তারও সীমা থাকে না। কি চীজই ভগবান তৈরী করে ছেড়ে দিয়েচেন পৃথিবীর বুকে এই পুরুষের ভিড়ে!

কথাগুলা শিবচরণের মনকে ছুঁইয়া গেলেও স্পর্শ করিল না। মনে দারুণ আতঙ্ক···

গৃহে যা করিয়া আসিয়াছে···এতক্ষণে সব বোধ হয় প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে! পুলিশ···জেল···

কিন্তু সেগুলা মনে তত বিঁধিতেছে না, যত বিঁধিতেছে—নিমেষের অধৈর্য্যে কি কাণ্ড করিয়া বসিয়াছে, তাহা ভাবিয়া! মুখে প্রিয় না হয় দুটা রূঢ় কথা বলিয়াছিল···গায়ে ফোস্কা পড়ে নাই! এমন নিত্য বলে। আজ সে কথায় কেন যে ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল! কেন অমন দৈত্যের মত নিষ্ঠুর হিংসায় মাতিয়া উঠিল···

শত্রু নয়, বাহিরের লোক নয়—স্ত্রী! পরম-আত্মীয়-জন! ···যে স্ত্রী একদিন অশোক-বকুলের মালা গাঁথিয়া কণ্ঠে পরাইয়াছে! যে-স্ত্রীর অধর একদিন ছিল অমৃতের পাত্র—মুখের ভাষা ছিল অমরার সঙ্গীত!

কিন্তু সে স্ত্রী আজো আছে? প্রিয়বালার বুকে সে-স্ত্রী কবে মরিয়া গিয়াছে! আজ সে মুখরা, কর্কশভাষিণী··· দয়া-মায়া-বর্জ্জিতা পথের অপরিচিত-জনের মত!

এই বন্ধু···হাসিয়া সব কথা সহিয়া চলিয়াছে! আরামে আছে! বুঝাইয়া যখন বুঝাইতে পারিবে না, সেও তখন চুপ করিয়া থাকিলে পারে।

আগে থাকিত। এখন পারে না। দায় কত দিকে। কত সহিবে? স্ত্রী বোঝে না। যদি বুঝিত···

একবার যদি এখন সুযোগ পায়। অর্থাৎ প্রিয় যদি···

বাঁচিলেও তার সামনে শিবচরণ এখন কোন্ মুখে গিয়া দাঁড়াইবে? প্রহার করিয়াছে! সে আজ ইতর! পয়সা না থাকিলেও এতদিন ভদ্র ছিল। আজ ভদ্রতার আবরণও খশিয়া গিয়াছে! আজ সে ইতর!

বন্ধু অনেক কথা বলিয়া চলিয়াছিল, শিবচরণ শোনে নাই। নিজের চিন্তায় মন ভরিয়া আছে।

বন্ধু কহিল,—এখানে নেয়ে খেয়ে আপিস যাচ্ছো তো? আমি তাহলে সন্তুকে পাঠাই তোমার বাড়ী খপর দিতে···

বন্ধুর ছেলের নাম সন্তু।

বন্ধুর এ-কথায় শিবচরণ শিহরিয়া উঠিল। সত্য যদি গিয়া দেখে···

না, না!

সে কহিল—না। থাক্। আমি বাড়ী যাই।

বন্ধু কহিল—কিন্তু মনে রেখো, ঝগড়া নয়। কথা কাটাকাটি করো না। যা বলে, চুপচাপ শুনে যাবে। বকতে বকতে নিজে থেকেই শেষ চুপ করবে।

বন্ধু হাসিল। শিবচরণ মনে মনে ভাবিল, যদি কোনো অঘটন না ঘটিয়া থাকে, তবে এই কথাই শিরোধার্য্য করিয়া চলিবে।

মনটা কেমন করিয়া উঠিল। স্ত্রী···তার কাছে কত কি পাইবে বলিয়া আশা রাখে! কিন্তু উপায় নাই।

সে-স্ত্রী মরিয়াছে। এ তার কঙ্কাল! সে যেন মহাদেব! সতী প্রাণ দিয়াছে; তার শবটাকে মাথায় করিয়া দুনিয়ায় বিচরণ করিতেছে!

গৃহেই সে ফিরিল। বুক কাঁপিতেছিল। পা দুটা সেই সঙ্গে···

গলির মুখে ঢুকিয়া দেখে···

না। পুলিশ নাই। কেহ নাই।

সে আসিয়া নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল। সদরের দ্বার খোলা ছিল। কম্পিত দৃষ্টিতে সে চাহিল রোয়াকের দিকে। প্রিয়বালা রোয়াকে পড়িয়া নাই

উঠিয়াছে? চেতনা পাইয়াছে?···না, পুলিশ আসিয়া···

চুপ করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। দুই পায়ে যেন ভারী পাথর বাঁধা!

সে আজ খুনী। ফাঁশি-কাঠে জীবনের অবসান···এই ছিল ললাটের লিখন!

ঐ যে প্রিয়···

স্নান করিয়াছে। ভিজা চুলের রাশি পিঠ বহিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে।

প্রিয় তার পানে চাহিল। চারি চোখ মিলিল চকিতের জন্য।

শিবচরণের মুখে মৃদু হাসি···মস্ত বড় পাপের কলঙ্ক তাহাকে কালো করে নাই! আঃ!

কিন্তু অপরাধের কুণ্ঠা। ইতরের মত স্ত্রীর গায়ে হাত তুলিয়াছে!

প্রিয়বালা মুখ ফিরাইয়া ঘরের মধ্যে গিয়া ঢুকিল।

শিবচরণ রোয়াকে আসিয়া বসিল।···মন উদাস। সকল চিন্তা মন হইতে কে যেন উপড়াইয়া বাহির করিয়া দিয়াছে!

প্রিয়বালার স্বরে চেতনা জাগিল। প্রিয়বালা কহিল,—আপিস যেতে হয়, নিজে রেঁধে বেড়ে খেয়ো। আমি রাঁধতে পারবো না। আমি খাবো না। ভয় নেই। আমি পণ করেছি, যে-স্বামী গায়ে হাত তোলে, তার অন্ন আর নয়। মলেই ভালো ছিল। মরছিলুম। কেন যে আবার বাঁচলুম! দেখচি, অনেক ভোগ আছে বরাতে···কত পাপ করেছিলুম!

শিবচরণ কোনো কথা বলিল না; চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। প্রিয়বালা নিঃশব্দে গিয়া আবার ঘরে ঢুকিল।

পাড়ার আশপাশের বাড়ীগুলায় নানা কলরব চলিয়াছে। ভর্ৎসনা, অনুযোগ, মিনতি···

ঘেঁষাঘেঁষি ঠাশাঠাশি বাড়ী। ছোট কথাটুকুও পাঁচ কাণে আসিয়া বাজে।···

ঘড়িতে নটা বাজিয়া গেল। প্রিয়বালা আসিয়া কহিল,—জানি, যখন মেয়ে-জন্ম নিয়েচি, তখন কি আর মান-অপমান-বোধ রাখলে চলে! যাও, চান করো গে। আপিস আছে তো? না, চাকরিতে জবাব দিয়ে এসেচো আমাকে ভালো রকম দণ্ডাবে বলে···? পুরুষ-সিংহের আর রাগে কাজ নেই। দিই দুটি চড়িয়ে। জানি, মরণ না হলে ছুটী মিলবে না।

প্রিয়বালা গেল রান্নাঘরে। পুতুলের আঁকা চোখের মত শিবচরণের দুই আঁকা চোখের সামনে দিয়া···

তবু তার চেতনা নাই! সে যেন পাথরের মূর্ত্তি বনিয়া গিয়াছে, এবং সে-মূর্ত্তিকে কে রোয়াকের উপর বসাইয়া রাখিয়াছে!

দশ মিনিট···পনেরো মিনিট কাটিল। শিবচরণ তেমনি বসিয়া আছে। চোখের সামনে রান্নাঘরের কপাট ঠেলিয়া ঐ ধোঁয়ার কুণ্ডলী···

ঠিকা দাসী আসিল। তার হাতে মাছের টুকরি, আনাজ-তরকারী···সে বঁটি পাতিয়া মাছ কুটিতে বসিল।

প্রিয় তাহা হইলে নিত্যকার মত আজো সংসার-তরীর বাঁধন খুলিয়া সেটিকে জলে ভাসাইয়া হাল ধরিয়াছে !

প্রিয় আসিয়া কহিল,—নেয়ে নাও। সাড়ে নটা বাজে। আমার এখনি হয়ে যাবে। ভাতে-ভাত চাপিয়ে দিয়েছি। মাছগুলো চট্ করে দে রাধি…ভেজে দি। কড়াইয়ের ডাল হচ্ছে…আর একটা তরকারী। ভালো কিছু খাবার বরাত তো নয়…

যন্ত্র-চালিতের মত শিবচরণ উঠিয়া মাথায় তেল লেপিয়া দু' ঘটী জল ঢালিল। অফিস আছে। বসিয়া মনস্তত্বের আলোচনা—আর যার সাজুক, বাঙালী কেরাণীর সাজে না !

চট্‌পট্ আহার শেষ করিয়া ঘরে গিয়া গায়ে জামা গলাইতেছিল…প্রিয় আসিল। তার হাতে পাণ।

শিবচরণ তার পানে চাহিল। প্রিয়র মুখ গম্ভীর। ক্ষমার প্রার্থনায় মন ভরিয়া উঠিল। পাণ লইয়া একেবারে প্রিয়কে বুকে চাপিয়া ধরিল ; এবং উদ্যত অধর…

সবলে আপনাকে মুক্ত করিয়া কঠিন স্বরে প্রিয়বালা কহিল—না, খবর্দ্দার। ছাড়ো আমায়। আমি ঝী। পড়ে পড়ে মার খাবো,—মার খেয়ে গা ঝেড়ে উঠে পরিচর্য্যা করবো। বাঙালীর ঘরের বৌ—তার কি প্রাণ আছে ? না, মন আছে ?

শিবচরণ নিশ্বাস ফেলিল ; ফেলিয়া কহিল—আমায় মাপ করো। রাগ চণ্ডাল। আর কখনো রাগ করবো না।

প্রিয়বালা কহিল—কেন করবে না ? খুব রাগ করবে। পুরুষমানুষ…তুমি স্বামী ! লক্ষবার তুমি রাগ করবে ! অধিকার আছে !

বাহির হইতে রাধী ঝী কহিল,—সত্যি তুমি খাবে না, মা ?

প্রিয়বালা কহিল—না।

শিবচরণ কহিল—তার মানে ?

সে বসিল। প্রিয়বালা কহিল—দশটা বাজে। আপিস যাও। সোহাগ করে বসে থাকতে হবে না।

—তুমি খাবে না ?

—না।

—আমি মাপ চাইছি…তবু খাবে না ?

প্রিয়বালা কহিল—ও বাড়ীর মন্টু দিদি আমাকে খেতে বলেছে। আমিও বলেচি, খাবো। ওঠো, যাও, আপিস যাও।

প্রিয়বালা বাহিরে গেল। শিবচরণ স্তম্ভিতের মত বসিয়া রহিল…

দশটা বাজিল। একটা চমক…

একটা কঠিন কথা ঠোঁটের ডগায় আসিয়া উদয় হইল। শিবচরণ বাহিরে আসিল।

প্রিয়বালা তখন দাসীর কাছে বাজার বুঝিয়া লইতেছে…

সে কথা বলা হইল না।

প্রিয়বালা কহিল—পারো, ওবেলায় আপিসের ফেরত একখানা কাপড় এনো রাধীর জন্যে। ওর পাওনা হয়েচে।

শিবচরণ কোনো কথা না বলিয়া জুতা-জোড়ায় পা ঢুকাইল।

মনে পড়িল, পেরেক উঠিয়াছিল। জুতায় পা ঢুকাইয়া বুঝিল, পেরেক নাই। পা বাহির করিয়া জুতা হাতে তুলিয়া দেখিল। না, পেরেক নাই ! আশ্চর্য্য ! তার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

প্রিয়বালা কহিল—কি দেখা হচ্ছে ? জুতোর পেরেক ? হাতুড়ি দিয়ে রাধী ঠুকে বসিয়েছে। তাই বলি, সকল দিকে নজর রাখতে হবে। জুতোয় পেরেক উঠেছে কি না—তা পর্য্যন্ত। যেমন বরাত !

শিবচরণ দাঁড়াইল না ; জুতা-জোড়ায় পা ঢুকাইয়া গৃহের বাহির হইল।

হাজার স্মৃতিকে কেন্দ্র করিয়া একটা নিশ্বাস শুধু বুকের মধ্যে ফুঁশিয়া বেড়াইতে লাগিল।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়



ভারতে সাধারণতন্ত্র

ছেলেবেলা হইতে আমরা ভারতের ইতিহাসে সাধারণতঃ রাজাদের কথাই পাঠ করি, অজাতশত্রু, বিম্বিসার, চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, কনিষ্ক, সমুদ্রগুপ্ত, হর্ষবর্দ্ধন প্রভৃতির বিষয় আমরা বহুদিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু প্রাচীন ভারতের বুকে যে সাধারণতন্ত্রগুলি বিরাজ করিত, তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান আজিও আমাদের সীমাবদ্ধ। এই সে-দিন রিস্ ডেভিড্‌স্ প্রভৃতি কয়েক জনে আমাদের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করেন।

ভারতে সাধারণতন্ত্র যে অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান ছিল, সে সম্বন্ধে অনেক নিদর্শন এখন আমরা পাইয়াছি। খৃঃ অঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত বরাহমিহিরের পুস্তকে আমরা 'গণরাজ্যে'র উল্লেখ দেখিতে পাই। 'গণরাজ্য,' 'সঙ্ঘরাজ্য' প্রভৃতি প্রজাগণের দ্বারা শাসিত রাজ্য অর্থে বুঝায়। প্রয়াগে অশোকস্তম্ভের উপর সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেন নিজপ্রভুর দিগ্বিজয়ের যে বর্ণনা ক্ষোদিত করিয়াছেন, তাহাতে সাধারণতন্ত্র রাজ্যের উল্লেখ আছে। স্মিথ এই লিপির কাল ৩৬০ খৃঃ অঃ নিরূপণ করিয়াছেন। এই লিপিপাঠে জানিতে পারি যে, সে সময় পঞ্জাবে, রাজপুতনায় ও মালবে যৌধেয় অর্জ্জুনায়ন মালব প্রভৃতি অনেক জাতি পরাক্রমশালী সাধারণতন্ত্র গড়িয়া তুলিয়াছিল। ভারতের নেপোলিয়ান মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সমুদায় দেশ জয় করিয়া নিজরাজ্যভুক্ত করিলেও তাহাদের নিকট হইতে কর লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের পূর্ব্বে এই সকল দেশে প্রজাতন্ত্র ছিল। খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে যখন আলেকজান্দার ভারত আক্রমণে আসেন, তখন এই সকল স্থান কাথাইয়ই, অক্সিড্রাকই, মালই (মালব ?) প্রভৃতি সাধারণতন্ত্রের অধীন ছিল। আলেকজান্দারের সহিত তাহারা অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিল। আরিয়ন, টলেমি প্রমুখ গ্রীক ঐতিহাসিকরা এ কথা তাঁহাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আলেকজান্দারের প্রায় সমসাময়িক মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্যও 'রাজশব্দোপজীবিনঃ' সঙ্ঘের কথা জানিতেন। 'রাজশব্দোপজীবিনঃ' সঙ্ঘের অর্থ সঙ্ঘের প্রতি সভ্যই রাজা আখ্যাধারী। মেগাস্থিনিসও এ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ নহেন। পাণিনির সময় যে রাজ্যবিশেষে সাধারণতন্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহা কাত্যায়নের বার্ত্তিক হইতে বেশ বোঝা যায়। পাণিনিকে ম্যাকডোনেল খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে নিরূপিত করেন। প্রফেসর ভাণ্ডারকরের মতে তিনি খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীর লোক। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে 'জনপদ' রাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 'জনপদ' যে সাধারণতন্ত্রবিশেষ, তাহা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে ও জনপদের আবিষ্কৃত মুদ্রা হইতে জানিতে পারি। ম্যাকডোনেল বলেন, ঐতরেয় প্রভৃতি বেদের ব্রাহ্মণগুলি খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দী হইতে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থ হইতে খৃঃ পূঃ সপ্তম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে যে সাধারণতন্ত্র বিরাজ করিত, তাহা রিস ডেভিডস দেখাইয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম আবির্ভাবের সমসাময়িক কালে পাভা, মিথিলা, বৈশালী প্রভৃতি বহু স্থানে সাধারণতন্ত্র ছিল। তাহাদের মধ্যে শাক্যরাজ্য, বৃজিরাজ্য ও মল্লদের দুইটী রাজ্য বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। রিস্ ডেভিড্‌স্ শাক্যরাজ্যকে প্রজাতন্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই রাজ্যের শাসন ও বিচারসংক্রান্ত কার্য্যসমূহ কপিলাবস্তুর সন্থাগারে সাধারণসভায় অনুষ্ঠিত হইত, ইহা ব্যতীত স্থানীয় কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য রাজ্যের পল্লীতে পল্লীতে সাধারণসভার অধিবেশন হইত। শাক্যরাজ্যের কর্ত্তৃত্বভার গ্রীসের 'আর্কন' ও রোমের 'কন্সালে'র মত 'রাজা' আখ্যাধারী ব্যক্তির উপর ন্যস্ত থাকিত। তিনি কত দিনের জন্য নির্ব্বাচিত হইতেন, বলা যায় না। প্রফেসর ভাণ্ডারকর শাক্যরাজ্যের শাসনতন্ত্রকে প্রজাতন্ত্র শ্রেণীর মনে না করিয়া কুলাধিপত্য শ্রেণীর মনে করেন। তাঁহার মতে শাক্যরাজ শুধু শাক্যবংশের নেতা নহেন, তাঁহার আধিপত্য পুরুষানুক্রমিকভাবে শাক্যরাজ্যের উপরও প্রতিষ্ঠিত ছিল। বুদ্ধদেবের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দ্বিতীয় মতটীকেই অধিক সমীচীন মনে হয়। বুদ্ধদেব যুবরাজ বলিয়াই আখ্যাত হইয়াছেন ও তিনি যে শাক্যসিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী, এ কথা বেশ উপলব্ধি হয়। শাক্যরাজ যে অস্থায়িভাবে নেতৃত্ব করিতেন, এ কথা রিস্ ডেভিডসও অনুমান করিয়াছেন মাত্র, তিনি এ বিষয়ে কোন নিশ্চিত প্রমাণ দেন নাই। রাজ্যের প্রয়োজনীয় কার্য্যগুলি সাধারণ সভায় অনুষ্ঠিত হইত, এ কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এখন সাধারণের এ ক্ষমতা পুরুষানুক্রমিক রাজার বর্ত্তমানে কিরূপে সম্ভব? আশ্চর্য্য বোধ হইলেও এরূপ ঘটনা যে সম্ভব, বর্ত্তমান ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থা তাহা প্রতিপাদন করিবে। দ্বিতীয় কথা, আগেই বলিয়াছি, শাক্যনৃপতি শাক্যরাজ্য ও শাক্যকুল উভয়েরই নেতা ছিলেন। তিনি কুলসভ্যদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া যে কার্য্য করিবেন, ইহা স্বাভাবিক এবং ইহাও স্বাভাবিক যে, শাক্যকুল তাহাদের সভায় নিজেদের নেতার মতামত মান্য করিয়া চলিবে। তাই দেখি, কপিলাবস্তুর সাধারণ সভায় গুরুতর সকল বিষয়েরই আলোচনা হইত ও শাক্যরাজ তাহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেন।

বৃজিরাজ্যও শাক্যরাজ্যের মত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল। এই রাজ্য বর্ত্তমান আমেরিকান যুক্তরাজ্যের মত অনেকগুলি সম্মিলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সঙ্ঘবদ্ধ রাজ্য ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। একটা জাতকে দেখি যে, প্রত্যেক বৃজিরাজের উপরাজ, সেনাপতি প্রভৃতি বিভিন্ন কর্ম্মচারী ও এক একটা ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল, তবে সমগ্র

বৃজিরাজ্যের উপর সাধারণ ক্ষমতা পরিচালন করিবার ভার এই রাজাদের সম্মিলিত মহাসভার উপর ন্যস্ত ছিল। এই সকল নৃপতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্যের অধিপতি হইয়াও রাজ্যের প্রধান রাজধানীতে বাস করিতেন।

মল্লদের রাজ্য দুইটীর সম্বন্ধে আমরা অধিক কিছু জানি না। কুশীনগর ও পাভায় তাহারা রাজত্ব করিত। তাহাদেরও শাক্যদের ন্যায় সাধারণসভায় গুরুতর বিষয়ের আলোচনা হইত।

দাক্ষিণাত্যেও যে 'গণাধীন' রাজ্য ছিল, তাহা আমরা অবদান-শতক হইতে জানিতে পারি।

প্রাচীন গ্রীসে আমরা সাধারণতন্ত্রকে (republican Government) যেরূপ oligarchy democracy প্রভৃতি বহুরূপে দেখিতে পাই, ভারতেও সাধারণতন্ত্র যে সেইরূপ আপনাকে বহুভাবে বিকশিত করিয়াছিল, তাহা প্রফেসার ভাণ্ডারকর সাধারণ-তন্ত্রকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন। মোটামুটী তিনি চারিটী শ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রথম শ্রেণী—গণাধিপত্য। গণকে কতকগুলি বংশের সমষ্টি বলিয়া কাত্যায়ন উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধ বংশের নৃপতিরা পরস্পর মিলিত হইয়া এক গণরাজ্যের সৃষ্টি করিতেন। তাঁহারা আভিজাত্য ও কুলগৌরবে পরস্পর পরস্পরের তুল্য ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে লিখিত আছে যে, কুলসমূহের মধ্যে বিবাদ বাধিলে কুলমুখ্যদের উদাসীন থাকা কোন-ক্রমে উচিত নহে, তাহা হইলে গণরাজ্য ধ্বংস হইয়া যাইবে। গণসভারা পরস্পরে সমকক্ষ না হইলে শান্তিপর্ব্বে এ কথার উল্লেখ থাকিত না। এখন একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই সকল গণরাজা যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিল, তাহা আমরা কিরূপে জানিব? ইহার উত্তরে প্রফেসার ভাণ্ডারকর বলেন যে, অনেক স্থলে গণসঙ্ঘেরা যে বিরাট (রাজ্য)এর অধিকারী, সে কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; এই সঙ্ঘ যে দোষীকে হত্যা, দণ্ড অথবা নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিতেন, সে বিষয়ের বর্ণনাও পাওয়া যায়। এই সকল হইতে স্বতঃই উপলব্ধি হয় যে, গণসঙ্ঘেরা রাজ্যের অধিপতি ছিলেন।

দ্বিতীয় শ্রেণী—কুলাধিপত্য। কুলাধিপত্যে রাষ্ট্রনেতা রাজা ও বংশ উভয়েরই নায়ক। পুরুষানুক্রমিক রাজা ভদ্দিয় শাক্যরাজ্যের এইরূপ নেতা ছিলেন।

তৃতীয় শ্রেণী—মুখ্যতন্ত্র (Oligarchy)। রাজতন্ত্র রাজ্যে রাজার আত্মীয়েরা সাধারণতঃ দেশশাসন কার্য্যে অংশীদার হইয়া পড়িতেন। এইরূপে ক্রমে শাসনদণ্ড এক জন শাসকের পরিবর্ত্তে কয়েকটী বংশের উপর ন্যস্ত হইয়া পড়িত, রাজতন্ত্র রাজ্য মুখ্যতন্ত্রে রূপান্তরিত হইয়া যাইত। পাণিনির সময় যৌধেয় রাজ্যে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু খৃষ্টীয় শকের প্রারম্ভে তথায় যে মুখ্যতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা তাহাদের মুদ্রা হইতে জানিতে পারি।

চতুর্থ শ্রেণী—প্রজাতন্ত্র (democracy)। এই শ্রেণীকে পুনরায় 'জনপদ' ও 'নিগম'এ ভাগ করিতে পারা যায়। জনপদ অর্থে একটী প্রদেশব্যাপী ও নিগম অর্থে কোন নগরবিশেষের মধ্যে আবদ্ধ প্রজাতন্ত্র বুঝায়। শিবি প্রভৃতি জনপদের অনেক প্রচলিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। জনপদ রাজ্যের শাসনতন্ত্র যে রাজতন্ত্র রাজ্যের শাসনতন্ত্র হইতে বিভিন্ন, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে তাহা উক্ত হইয়াছে। নিগমের প্রচলিত মুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে। গণপ্রধান মত নিগম যে সংঘবিশেষ, যাজ্ঞবল্ক্য তাহা বলিয়াছেন। এলমভট্ট নিগমকে নাগরিকদের সমবায়-সমিতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বিশুদ্ধমার্গে নিগমএর যে মুদ্রাপ্রচলনের ক্ষমতা ছিল, তাহা জানিতে পারি। নাসিক গুহার শিলালিপিতে কোন নগরবিশেষের সমগ্র অধিবাসিবৃন্দের দ্বারা একটী পল্লী দান করার কথা ক্ষোদিত আছে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরের পর্য্যন্ত এইরূপ স্বাধীনতালাভ আশ্চর্য্যজনক হইলেও প্রাচীন ভারতে উহা সম্ভবপর হইয়াছিল। সংঘবদ্ধভাবে কার্য্য করা ভারতে অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছিল। ঋগ্বেদেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কি ধর্ম্ম, কি ব্যবসাবাণিজ্য, কি রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে সংঘের যে প্রচলন ছিল, রমেশ বাবু তাঁহার Corporate life in Ancient Indiaতে তাহা দেখাইয়াছেন। এই সকল সংঘের কার্য্য এত দক্ষতার সহিত সম্পন্ন হইত যে, তাহাদের প্রতিষ্ঠা ভারতে অটুট ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মে ভিক্ষুসংঘ বুদ্ধ ও ধর্ম্মের সহিত পূজা পাইয়া আসিয়াছে। ব্যবসায়ী সংঘও অনেক ছিল। বুদ্ধ-অজাতশত্রু-সংবাদে আমরা এইরূপ অনেকগুলির উল্লেখ দেখিতে পাই। তাহাদের নিয়ম-বদ্ধতাও বিচিত্র। প্রত্যেক সংঘের উপর এক জন করিয়া 'প্রমুখ' থাকিতেন, সংঘসভাদের মধ্যে বিবাদের মীমাংসা তিনি করিয়া দিতেন। এই সকল সংঘপ্রমুখদের উপর 'মহাশ্রেষ্ঠী' ছিলেন, রিস্ ডেভিড্স্ তাহার বর্ণনা দিয়াছেন। এই সংঘবদ্ধভাবে শাসনকার্য্য সাধারণতন্ত্রের একটী অপরিত্যাজ্য অঙ্গ। ভারত ইহাতে বেশ অভ্যস্ত হইয়া আসিতেছিল। দ্বিতীয়তঃ, পল্লীগুলিও আত্মনির্ভরশীল ছিল। এলফিনষ্টোন, ফিল্ড প্রভৃতির বর্ণনা হইতে দেখা যায় যে, সে সময় কোন কার্য্যের জন্য কোন পল্লীকে বাহিরের প্রতি নির্ভর করিতে হইত না। তাহাদের যাহা কিছু অভাব, তাহাদের মধ্যেই পূর্ণ হইত। পল্লীনায়ক বা নায়কেরা বিভিন্ন কর্ম্মচারীর সাহায্যে প্রতিবাসীদের পরামর্শ লইয়া মিউনিসিপ্যালিটী, পুলিস প্রভৃতির কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। রাজার কর্ম্মচারী বলিয়া বিবেচিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রজাদের প্রতিনিধি ছিলেন। সার চার্লস মেটকাফ পল্লীসংঘগুলিকে সাধারণতন্ত্র বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন,—"The village communities are little republics having nearly everything they can want within themselves and almost independent of any foreign relation. They seem to last where nothing else lasts. Dynasty after dynasty tumbles down ; revolution succeeds to revolution. Hindu, Patan, Mogul, Mahratta, Sikh, English are all masters in turn, but the village communities remains the same." ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ, সভায় প্রস্তাব উত্থাপন ও পেশ করা, গুপ্তভাবে ভোটপ্রদান, অনুপস্থিতের ভোট, জটীল প্রশ্নের সমাধান জন্য বিশেষ সমিতির গঠন, ভোটের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া প্রশ্নের সমাধান প্রভৃতি সাধারণতন্ত্রের আনুষঙ্গিক প্রথাগুলিও ভারতে প্রচলিত ছিল। বিনয়পীটকে ও অন্যান্য গ্রন্থে এ সম্বন্ধে উক্তি আছে। এইরূপে সাধারণতন্ত্র গড়িয়া তুলিতে যে সকল জিনিষ দরকার, ভারতে তাহা প্রচুর পরিমাণে ছিল। চতুর্থতঃ, অনেক

সংগবদ্ধ সভার যে নিজ নিজ সৈন্য-সামন্তও ছিল, সে সম্বন্ধে রাধাকুমুদ বাবু তাঁহার পুস্তকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে ভাবিতে যে সাধারণতন্ত্র আপনাকে ফুটাইয়া তুলিবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

সাধারণতন্ত্রগুলির শাসনপদ্ধতির কথা আজিও আমরা প্রায় কিছুই জানি না। চাণক্য এ বিষয়ে বিশেষ কিছু উল্লেখ করেন নাই। ইহার সম্বন্ধে দুই একটী কথা কেবল আমরা এ-স্থান ও-স্থান হইতে আহরণ করিতে পারি। স্বায়ত্তশাসনযুক্ত দেশমাত্রে ক্ষমতাশালী সাধারণ সভা প্রচলিত ছিল। গুরুতর বিষয়গুলির আলোচনা ও সিদ্ধান্ত এই সকল সভাতেই হইত। শাক্যরাজ্যের বর্ণনাপ্রসঙ্গে এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শাক্যরাজ্যের প্রধান রাজধানী কপিলাবস্তুতে বর্ত্তমান সময়ের টাউনহলের মত বিরাট গৃহ ছিল। সেই স্থানে যুবক বৃদ্ধ সকলেই সমবেত হইয়া জটিল প্রশ্নের সমাধান করিতেন। কোশলরাজের সহিত শাক্যকুমারীর বিবাহ সম্ভবপর কি না, এইরূপ সভাতেই স্থির হইয়াছিল। মল্লরাজ্যের এইরূপ সাধারণ সভায় আনন্দ তাঁহার বার্ত্তা প্রচার করেন। রাজধানী ছাড়া রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও স্থানীয় কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সাধারণ সভার অধিবেশন হইত।

সাধারণতন্ত্র রাজ্যে গণসভারা নিজেদের মধ্য হইতে কয়েক জন গণমুখ্যকে নির্ব্বাচিত করিতেন। বর্ত্তমান ক্যাবিনেটের মত তাঁহারা কার্য্যকরী সভা গঠন করিতেন। রাজ্যের গুরুতর ও গুহ্য বিষয়গুলি তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত থাকিত। গুপ্তচর বিভাগের উপরও তাঁহারা লক্ষ্য রাখিতেন। বৃহস্পতি এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন।

উপরি-উক্ত বর্ণনা হইতে স্বতঃই উপলব্ধি হয়, সেই সুদূর অতীতে মিশর, চীন প্রভৃতিও যখন সাধারণতন্ত্রের কথা জানিত না, গ্রীস রোম সাধারণতন্ত্রের সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিতেছিল, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই যখন অজ্ঞানের অন্ধকারে নিদ্রিত, ভারত তখন জ্ঞানের বর্ত্তিকা জ্বালাইয়া অন্যান্য বিষয়ের সহিত রাষ্ট্রনীতিতে প্রজাতন্ত্রের কিরূপ উৎকর্ষসাধন করিয়াছিল। ভারতের ইতিহাসের উপর আজিও যে অন্ধকার যবনিকা পড়িয়া আছে, তাহার অপনোদনের সঙ্গে সঙ্গে আরও কত নূতন তথ্য আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিবে, কে বলিতে পারে?

শ্রীপ্রমথভূষণ পাল চৌধুরী (এম, এ, বি, এল)

সাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী

১

কোন কার্য্যোপলক্ষে গুজরাত-অন্তর্গত বারিয়া রাজ্যে কয়েক দিবস অবস্থান করিতে হয়। এই সময়ে ভাটমুখে গাজনী-অধিপতি সাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী সম্বন্ধে যে কাহিনী শুনিয়াছিলাম, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

দিল্লীর রাজা অনঙ্গপালের কথা হয় ত অনেকে না জানিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার দৌহিত্র জয়চাঁদ ও পৃথ্বীরাজের কথা সকলেই শুনিয়াছেন। এই রাজা অনঙ্গপালের পুত্র ছিল না। কেবলমাত্র দুই কন্যা। কনিষ্ঠা কন্যার সহিত আজমীরের রাজা সোমেশ্বরের বিবাহ হয়। ইঁহারই গর্ভজাত পুত্র পৃথ্বীরাজ। এই কন্যা রাজার বড়ই প্রিয়পাত্রী ছিলেন বলিয়া তিনি বেশী সময় পিতার কাছে থাকিতেন।

এক দিন বৃদ্ধ রাজা অনঙ্গপাল অমাত্যবৃন্দে পরিবৃত হইয়া, নিজের পরলোকগমনের পর কে সিংহাসনে অধিরোহণ করিবেন, এই বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে এক ফকির আসিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। ফকিরকে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। কুশলাদি প্রশ্নের পর ফকির জানাইলেন যে, মহারাজের এখনও পুত্র হইবার সম্ভাবনা আছে। এই জন্য মহারাজের অবর্ত্তমানে কে রাজা হইবে, সে বিষয়ে আলোচনা করিবার এখনও উপযুক্ত সময় আসে নাই। ফকিরের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ রাজা না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু মন্ত্রিগণ ফকিরের বাণী উপহাস বলিয়া মনে করিলেন না। তাঁহারা বৃদ্ধ রাজাকে রাজি করিয়া টলকরাজকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির করিলেন। মহারাজ অনঙ্গপাল এই রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। কিছুকাল পরে নূতন মহারাণী গর্ভবতী হইলেন। ইহাতে অনঙ্গপালের কনিষ্ঠা কন্যা পৃথ্বীরাজমাতা বড়ই দুঃখিতা হইলেন, কারণ, জনরব এরূপ ছিল যে, মহারাজার মৃত্যুর পর পৃথ্বীরাজই দিল্লীর সিংহাসন পাইবেন। যথাসময়ে রাজা অনঙ্গপালের এক পুত্রসন্তান হইল। কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা এই পুত্রসন্তান-স্থানে এক নবজাত কন্যা রাখিয়া দিলেন। সাধারণের পক্ষে এই ব্যাপার বিশ্বাসযোগ্য না হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা রাজপুতনার ইতিহাস জানেন, তাঁহাদের নিকট ইহা অবিশ্বাসযোগ্য হইবার কোন কারণ নাই। পৃথ্বীরাজমাতা এই নবজাত শিশুকে একখণ্ড বস্ত্রের মধ্যে ঢাকিয়া আপনার বিশ্বস্তা দাসীকে এই শিশুকে হত্যা করিয়া ফেলিয়া দিতে বলিলেন। যদি কেহ এই শিশুকে দেখে, তবে সে ইহার অন্ত্যেষ্টিকার্য্য করিতে পারে, এই ভাবিয়া বস্ত্রের এক কোণে এক টুকরা হীরক বাঁধিয়াও দিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় শিশু-দর্শনে পরিচারিকার মনে স্নেহ আসিল। সে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, পূর্ব্বজন্মের কত পাপে এ-জন্মে দাসীবৃত্তি করিতে হইতেছে। এ-জন্মে যদি আবার শিশুহত্যা করি, না জানি, পরজন্মে কোন্ নরকের কীট হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এই ভাবিয়া দাসী আর শিশুকে হত্যা করিল না; নিকটবর্ত্তী এক কবরস্থানের ভিতরে এক ভগ্ন কবরের উপরে শিশুকে রাখিয়া চলিয়া আসিল। বালক তিন দিন এই স্থানে রহিল। ঈশ্বরের কি অদ্ভুত মহিমা! এই কবরের উপরস্থিত বৃক্ষশাখায় এক মধুচক্র ছিল তাহা হইতে ফোঁটা ফোঁটা মধু বালকের মুখে পড়িত এবং ইহাই বালকের প্রাণ-ধারণের উপায় হইয়াছিল। দিনের বেলা শিশুর রোদন বড় কেহ শুনিতে পাইত না। গভীর রাত্রিতে শিশুর রোদন শুনিয়া নিকটস্থিত ফকির বড়ই আশ্চর্য্য হইলেন। তিনি এত দিন এই কবরস্থানে বাস করিতেছেন, কিন্তু কৈ, গভীর রাত্রিতে ত' কোন দিনই শিশুর রোদন তাঁহার কাণে পৌঁছায় নাই। আজ কি হইল! প্রদীপ-হস্তে ফকির সেই রব অনুসরণে ভগ্ন কবরের নিকট আসিয়া শিশুকে দেখিতে পাইলেন এবং তদবস্থায় তাহাকে সেখান হইতে তুলিয়া লইয়া গেলেন।

যথাসময়ে মহারাজ অনঙ্গপালের নিকট সংবাদ আসিল যে, নূতন মহারাণী এক কন্যা প্রসব করিয়াছেন। বৃদ্ধবয়সে কন্যার জন্মগ্রহণে রাজা বিমর্ষ হইলেন।

সাত বৎসর কাটিয়া গেল। মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজা স্থির করিলেন যে, দৌহিত্র পৃথ্বীরাজকে দিল্লীর সিংহাসন দিবেন; এবং সুদিন দেখিয়া এই কার্য্য সমাধা করিবেন। পরে রাজা মনস্থ করিলেন, রাজ্য ছাড়িয়া জীবনের শেষভাগে কোন তীর্থস্থানে বাস করিবেন। শুভদিন দেখিবার জন্য রাজ-জ্যোতিষীর প্রতি আজ্ঞা হইল। জ্যোতিষী জানাইলেন, সেই দিনই প্রশস্ত দিন। মহারাজের যদি অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে তিনি দুর্গ ছাড়িয়া সহরের প্রান্তস্থিত বৃক্ষবাটিকাতে অবস্থান করিতে পারেন। পরে উপযুক্ত দিনে তীর্থযাত্রা করিবেন। রাজা অনঙ্গপাল তাহাই করিলেন।

সেই পরিত্যক্ত শিশু এখন সাত বৎসরের হইয়াছে। জানিয়াছে, সেই ফকিরই তাহার সব। ফকির অসুস্থ হওয়ায় শিশুকে উদ্যানস্থিত বাউলী হইতে নির্ম্মল জল আনিতে বলিল। বালক একটা ঘটী লইয়া জল আনিতে গেল। রাজা অনঙ্গপাল কূপের সন্নিকটে তখন পারিষদ্‌বর্গের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। এই বালককে দেখিবামাত্র তাঁহার মনে এক অদ্ভুত ভাব উপস্থিত হইল। তিনি এক পারিষদ্‌কে বালককে তাঁহার নিকট আনিতে বলিলেন। বালক রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইল। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে জানাইল, নিকটবর্ত্তী কবরস্থানে এক ফকির আছে। সে সেই ফকিরেরই সন্তান। রাজা ফকিরকে ডাকাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, ফকির হইয়া তাঁহার সন্তান কিরূপে হইল? তখন ফকির এই শিশুর বিষয়ে সব কথা রাজাকে জানাইলেন। ফকিরের কথা শুনিয়া রাজা তাঁহাকে সেই বস্ত্রখণ্ড আনিতে বলিলেন। ফকির সেই বস্ত্রখণ্ড যত্নের সহিত রাখিয়াছিলেন। তিনি তাহা আনিলে পর রাজা দেখিলেন, সেই বস্ত্রের এক কোণে এক ছোট গ্রন্থি আছে। রাজা এই গ্রন্থি খুলিলেন; তন্মধ্যে এক খণ্ড হীরক দেখিয়া তিনি বড়ই বিস্মিত হইলেন।

মহারাজ অনঙ্গপাল মন্ত্রীকে ডাকাইয়া বলিলেন, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কাশ্মীরী জহুরীর নিকট তিনি যে চারিখণ্ড হীরা ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহা মন্ত্রী তাঁহাকে দেখাইতে পারেন কি না। যথা আজ্ঞা বলিয়া মন্ত্রী চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে মন্ত্রী ম্লানমুখে ফিরিয়া আসিলেন। রাজাকে জানাইলেন, ছোট বাপুরার (পৃথ্বীরাজমাতার) নিকট তিনি এই চারি খণ্ড হীরক রাখিয়াছিলেন। বাপুরা এখন তিন খণ্ড হীরক রাখা হইয়াছিল, এই কথা জানাইতেছেন। তিনি তিন খণ্ড হীরা লইয়া আসিয়াছেন। তখন রাজা অনঙ্গপালের সমস্ত ব্যাপার জানিতে আর বাকি রহিল না।

রাজা এখন বড়ই বিপদে পড়িলেন। পৃথ্বীরাজকে রাজ্য তিনি ইতিপূর্ব্বেই দান করিয়াছেন। এখন এই বালককে তিনি কেমন করিয়া কিছু দান করেন এবং লোকেই বা তাঁহাকে কি বলিবে। অনেক চিন্তার পর তিনি ঠিক করিলেন, পৃথ্বীরাজের নিকট কয়েকখানি গ্রাম এই বালককে দান করিবার জন্য প্রস্তাব করিবেন। এই বিবেচনা করিয়া তিনি পৃথ্বীরাজকে ডাকাইলেন এবং আপনার অভিপ্রায় জানাইলেন। পৃথ্বীরাজ সসম্ভ্রমে বলিলেন, এ রাজ্য তাঁহার, ইহা লইয়া তিনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। অনঙ্গপাল বলিলেন, না, ইহা হইতে পারে না। তিনি রাজ্য দান করিয়াছেন, ইহাতে আর তাঁহার কোন দাবী নাই। পরে পৃথ্বীরাজ বারোখানি গ্রাম এই বালককে জায়গীরস্বরূপ দিতে স্বীকৃত হইলেন। রাজা অনঙ্গপাল এই প্রস্তাব সেই তেজস্বী বালকের নিকট করিলে, বালক বলিয়া উঠিল, আমি ফকিরের ছেলে, গ্রাম লইয়া কি করিব? এই কথা জানাইয়া সে ফকিরের হাত ধরিয়া চলিয়া গেল। কিম্বদন্তী আছে যে, রাজা অনঙ্গপাল এই সময়ে পৃথ্বীরাজের নিকট এই ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন—যদি কখনও এই বালক কোন গুরু অপরাধে দণ্ডনীয় হয়, তাহা হইলে তিনি যেন তাহার প্রাণদণ্ড না করেন।

ফকির সেই বালককে লইয়া আফগানিস্থানের দিকে চলিয়া গেলেন। আফগানিস্থানের সিংহাসনাধিকারীর তখন কোন পুত্রসন্তান ছিল না। তিনি নেজুমীদের (জ্যোতিষী) আপনার উত্তরাধিকারীর সম্বন্ধে ফল গণনা করিতে বলিয়াছেন। জ্যোতিষীরা প্রত্যূষে উঠিয়া সিংহদ্বারের নিকট যাহাকে দেখিবেন, তাহাকে কন্যা ও রাজ্য দান করিতে বলিলেন। যথাসময়ে তোরণ-দ্বার খুলিল। দ্বার খুলিবামাত্র এক তেজঃপুঞ্জকায় সুকুমার বালককে দেখিতে পাওয়া গেল এবং তাহার অনতিদূরে এক ফকিরকেও দেখা গেল। তখন নেজুমীরা এই বালককেই আফগান-অধিপতিকে কন্যা ও সিংহাসন দান করিতে বলিলেন। তাহাই হইল। এখন এই বালকের নাম হইল—সাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী।

ইহার দশ বৎসর পরেই সাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী দিল্লী আক্রমণ করেন। কথিত আছে, পৃথ্বীরাজ মাতামহের কথানুসারী একাদশবার এই বালকের জীবন দান করিয়া দ্বাদশবারে পরাজিত বালককে নিহত করেন।

এখন ঐতিহাসিকের উপর এই কাহিনীর সত্যাসত্য নির্ণয়ের ভার রহিল।

শ্রীগোবিন মুখোপাধ্যায়।

হুগলী জেলার ইতিহাস

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

নবাব খানজা খাঁ

শুজাকুলী খাঁ নামে জনৈক ইরাণী মোগল তিহারণ হইতে বাঙ্গালায় আসেন। নিজ বুদ্ধিবলে তিনি মোগল সরকারে নিজের অবস্থার উন্নতিসাধন করেন এবং হুগলীর ফৌজদার হয়েন। নবাব খানজা খাঁ তাঁহারই পুত্র। ওমরবেগের পর খানজা খাঁ হুগলীর ফৌজদার হন। তিনি মহারাজ নন্দকুমার কর্ত্তৃক একবার তাড়িত হইয়াছিলেন। পরে নন্দকুমারের মৃত্যুদণ্ডের পর পুনরায় হুগলীর ফৌজদার হয়েন। খানজা খাঁ নবাব না হইলেও, তিনি নবাবের মত বৃহৎ অট্টালিকায় বাস করিতেন—অশ্বশালা, হস্তিশালা ছিল। ওলন্দাজ পরিব্রাজক ষ্টাভারিনিয়াস লিখিয়া গিয়াছেন, খানজা খাঁর অট্টালিকা অশ্বশালা ইত্যাদি দেখিবার মত জিনিষ। খানজা খাঁ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সগর্ব্বে ভ্রমণ করিতেন—তাঁহার মেজাজও নবাবী মেজাজ ছিল। তিনি কখনও কাহারও কোন অনিষ্ট করেন

নাই—নিজের নবাবী লইয়াই থাকিতেন। গোঁদলপাড়া তাঁহার অন্যতম জমীদারি ছিল। দিনেমারগণ প্রথমে এই স্থানে খাজনায় বন্দোবস্ত করিয়া গোঁদলপাড়ায় আসিয়া বাস করে। পরে তাহারা যখন শ্রীরামপুরে স্থায়িভাবে বাস করিতে আরম্ভ করিল এবং গোঁদলপাড়া ছাড়িয়া দিল, তখন নবাব ঐ স্থান ফরাসীদিগকে নির্দ্দিষ্ট খাজনায় পত্তনী দিলেন। উহাতে এইরূপ বন্দোবস্ত হয় যে, তিনি ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ ঐ নির্দ্দিষ্ট হারে খাজনা পাইবেন, পরে উহা তিনি মীর্জা নসরৎ খাঁকে বিক্রয় করেন। তবে অদ্যাবধি গোঁদলপাড়া ফরাসীর আছে। নবাবের আর দুইটী তালুক ছিল—মানবিলারো এবং মহম্মদ আমীনপুর। শেষোক্ত তালুকটী বিশেষ লাভজনক তালুক। ঐ দুই তালুক পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হয়। ইহা ব্যতীত বেলকুলীর জায়গীর তাঁহার ছিল। ইহাও এখন ইংরাজরাজের হাতে গিয়াছে। ইংরাজের হুগলী জেলার ২৫টী খাসমহলমধ্যে ইহা অন্যতম। সুখের দিন চিরকাল সমান যায় না। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে বড়লাট উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক হুগলীর ফৌজদারের পদ উঠাইয়া দিলেন—নবাবেরও ভাগ্য-পরিবর্ত্তন হইল। এই সময় মহম্মদ মসীনের ভগ্নী মন্নুজানের বিবাহ-প্রস্তাব আসিতেছিল। নবাব দেখিলেন, যদি মন্নুজানের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, তবে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবেন, কিন্তু ভাগ্য যখন বিরূপ হয়, তখন সকল বুদ্ধিই অন্যরূপ হইয়া যায়। মন্নুজান বিবাহ-প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। ইতিপূর্ব্বে নবাবের সেকালের নবাবদের মত বহু বেগম ছিল, এখন বাধ্য হইয়া ক্রমে ক্রমে সকলকে পরিত্যাগ করিলেন—শুধু বিবাহিতা বেগম রহিলেন। ফৌজদারী পদ রহিত হইলে নবাব মাসিক ২৫০৲ টাকা পেনসন পাইতে লাগিলেন, তবে হুগলীর মোগল-কেল্লায় বাস করিবার হুকুম রহিল। একে একে নবাবের সব জমীদারী বিক্রীত হইল—নবাবের নাম মাত্র রহিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় বড়লাটের প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। লর্ড ওয়েলেসলি, নবাব খানজাকে ঐ প্রাসাদে বলনাচে নিমন্ত্রণ করেন এবং অন্যান্য নবাবদের সঙ্গে এক আসন দিয়া তাঁহার সম্মান রক্ষা করেন। হতশ্রী, দারিদ্র্য-পীড়িত হইয়া পরিণত বয়সে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী নবাব খানজা খাঁ দেহত্যাগ করেন। নবাবের মৃত্যুর পর তাঁহার বেগম ১০০৲ মাসিক বৃত্তি পাইতেন। নবাব খানজা খাঁর মৃত্যুর পর হুগলীর মোগল-কেল্লা ভূমিসাৎ করা হয়। হুগলীর মোগল-কীর্ত্তি নিশ্চিহ্ন হইল।

হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট চৌদ্দটী স্কুলের জন্য মাসিক আট শত টাকা সাহায্য করিতেন। ঐ স্কুলগুলি গঙ্গানদীর উভয় পার্শ্বেই অবস্থিত ছিল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর ঐ সাহায্য বন্ধ করিয়া দেন। সরকার বলিলেন যে, ঐ টাকায় স্কুল নির্ম্মাণ করা হউক, কিন্তু মাসিক সাহায্য পাইবে না। যদি কেহ ত্যাগ-স্বীকার করিয়া ঐ স্কুলগৃহে স্কুল চালাইতে পারেন, তবে ঐ গৃহ সকল তাঁহারা স্কুলের জন্য ছাড়িয়া দিবেন। তাৎকালিক স্কুল-সুপারিন-টেণ্ডেণ্ট লিউয়িস বেটস সাহেব অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ মাসিক সাহায্য মিলিল না; কেহই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্কুল স্থাপনও করিলেন না। এই সময় ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে মহামতি ডি, সি, স্মিথ সাহেব (তিনি তখন হুগলীর জজ) সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইলেন এবং হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল স্থাপন করিলেন। সরকার দুই বিঘা সাত কাঠা জমী দিলেন এবং দেশের ধনী, মহাজন, জমীদার-গণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করা হইল। প্রথম এই স্কুলের নাম হইয়াছিল "Subscription school" অর্থাৎ চাঁদার স্কুল। ঐ নামে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। এই খৃষ্টাব্দে উহা মহম্মদ মসীন কলেজের শাখা-বিদ্যালয় (Branch school) নামে অভিহিত হইল। ৺পার্ব্বতীচরণ সরকার (বিখ্যাত প্যারীচরণ সরকারের অগ্রজ) এই স্কুলের প্রথম হেডমাষ্টার হইয়াছিলেন। স্মিথ সাহেবের ঐ কীর্ত্তি অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে। ঐ স্কুল-গৃহে নিম্নলিখিত স্মারকলিপি আছে:

"This school house was erected in 1834 under the Patronage of D. C. Smyth Esquire, Judge and Magistrate of Hooghly, with the funds subscribed by the following gentlemen and others :—

D. C. Smyth Esquire.
Maharajah Dhiraj
Mahatab Chander Bahadour.
Badu Dwarka nath Tagore
" Callynath Moonshee
" Pran Chander Roy
" Sheebnaran Chowdery
" Ramnaran Mookerjee

Opened at the 4th December 1837 as a branch school to the college of Mahammad Mushen,

T. A. Wise Principal."

যখন "subscription" স্কুল নাম ছিল, তখন প্রথম হেড মাষ্টার হইয়াছিলেন, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার ভ্রাতা মহেশচন্দ্রও ঐ স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। বহুদিন স্কুলে কায করিবার পর ঈশান বাবু হুগলী কলেজের অধ্যাপক হইয়াছিলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এজেণ্ট

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সমস্ত বাঙ্গালার বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল হুগলী। কিন্তু হুগলী, মাদ্রাজ লাটের দ্বারা চালিত হইত—স্বাধীন ছিল না। তাঁহারা মাদ্রাজ হইতে হুগলীতে এজেণ্ট পাঠাইতেন; তাঁহারাই সমগ্র বাঙ্গালার ব্যবসায় পরিদর্শন করিতেন। পরে যখন উইলিয়ম-হেজ হুগলীর স্বাধীন গবর্ণর হইয়া হুগলী আসিলেন, তখন এজেণ্ট পদ রহিত হইয়া গেল। এজেণ্টের মাহিনা বার্ষিক ১০০ পাউণ্ড, পরে ২০০ পাউণ্ড হইয়াছিল এবং বকসিস ১০০ পাউণ্ড। এজেণ্ট-গণের তালিকা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

(১) ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে—কাপ্তেন জন ব্রুকাভেন
(২) ১৬৫৩ " —পল ওয়ালগ্রেভ (Paul Walgrave or Waldegrave)
(৩) ১৬৫৩-৫৭ " —জেমস্ ব্রিজ
(৪) ১৬৫৮ " —জর্জ্জ গটন
(৫) ১৬৫৮-৬৩ " —জোনাথান ট্রিভিস্

(৬) ১৬৬৩-৬৯ খৃষ্টাব্দে—উইলিয়ম ব্লেক
(৭) ১৬৬৯-৭৩ " —সেম গ্রীভ্‌স্
(৮) ১৬৭৩-৭৯ " —ওয়াল্টার ক্লেভেল
(৯) ১৬৭৯-৮২ " মেথিয়াস্ ভিনসেণ্ট

ইহার পর ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম হেজ হুগলীর স্বাধীন গভর্ণর হইয়া আসিলেন।

মডেল বা আদর্শ বিদ্যালয় *

হুগলী জেলায় প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-প্রতিষ্ঠিত

হারাপ—২৮শে আগষ্ট, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ
শিয়াখালা —১৩ই সেপ্টেম্বর ঐ
কৃষ্ণনগর—২৮শে " ঐ
কামারপুকুর ঐ " ঐ
ক্ষীরপাই—১লা নভেম্বর ঐ

"বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ" হইতে উদ্ধৃত।

হুগলী জেলার বালিকা-বিদ্যালয় (৬)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়-প্রতিষ্ঠিত

	গ্রাম	প্রতিষ্ঠার তারিখ	মাসিক খরচ
১	পোটবা	২৪।১১।১৮৫৭	২৯৲
২	দামপুর	২৬ ঐ	২০৲
৩	বৈঁচি	১ ডিসেম্বর ১৮৫৭	৩২৲
৪	দিগ্‌সুই	৭ই ঐ	৩২৲
৫	তালাণ্ডু	৭ই ঐ	২০৲
৬	হাতিনা	১৫ই ঐ	২০৲
৭	হয়েরা	১৫ই ঐ	২০৲
৮	নপাড়া	৩০।১।৫৮	১৬৲
৯	উদয়রাজপুর	২রা মার্চ্চ ঐ	২৫৲
১০	রামজীবনপুর	১৬ই " ঐ	২৫৲
১১	আকাবপুর	২৮শে ঐ	২৫৲
১২	শিয়াখালা	১লা এপ্রিল	২০৲
১৩	মাহেশ	১লা ঐ	২৫৲
১৪	বীরসিংহ	১লা ঐ	২০৲
১৫	গোয়ালাসারা	৪ঠা এপ্রিল	২৫৲
১৬	দণ্ডীপুর	৫ই ঐ	২৫৲
১৭	দেহপুর	১লা ঐ	২৫৲
১৮	বাউজ্ঞাপুর	১লা ঐ	২৫৲
১৯	মলয়পুর	১২ই ঐ	২৫৲
২০	বিষ্ণুদাসপুর	১৫ই ঐ	২০৲

বিদ্যাসাগর মহাশয় ইংরাজ সরকারের ভরসায় ঐ সকল বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু পরে তাঁহারা সাহায্য করিতে অস্বীকার করেন। ঐ সকল বিদ্যালয় স্থাপন জন্য ৩৪৩৯৮/৫ খরচ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দিয়া বিদ্যালয়গুলি ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দেই বন্ধ হয়।

—"বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ"।

হুগলী জেলার স্কুলসমূহ

গভর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত এইচ, ই, স্কুল :

(১) আরামবাগ (২) বাগাটী (৩) বৈঞ্চবাটী (৪) বলাগড় (৫) ভদ্রেশ্বর (৬) ভাণ্ডারহাটী (৭) ভাসতাড়া (৮) চাতর (৯) চুঁচুড়া ফ্রি স্কুল (১০) দশঘরা (১১) গুপ্তিপাড়া (১২) ইলছোবা (১৩) মাগুলাই (১৪) জনাই (১৫) কৈকালা (১৬) কোন্নগর (১৭) শ্রীরামপুর ইউনিয়ন (১৮) সোমড়া (১৯) মাহেশ (২০) রিষড়া।

যে সকল স্কুল গভর্ণমেণ্ট সাহায্য পায় না :—

(১) কিশোরীলাল ফ্রি স্কুল (২) চন্দননগর গড়বাটী (৩) চুঁচুড়া ট্রেণিং একাডেমি (৪) গরলগাছা (৫) সিকান্দারপুরের কে, পি, পালের ইনষ্টীটিউসন (৬) সেয়াখালা (৭) সিঙ্গুর (৮) শ্রীরামপুর ক্ষেত্রমোহন সাহার স্কুল। ১৯০৮-৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১২৬টী অপার প্রাইমারি স্কুল ছিল এবং ৯৩০টী লোয়ার প্রাইমারি স্কুল ছিল। লোয়ার প্রাইমারি স্কুলমধ্যে ৮১৮টী গভর্ণমেণ্ট সাহায্য পাইত এবং ১১২টী ঐ সাহায্য পাইত না।

১৯০৮-৯ খৃষ্টাব্দে ১৫৯টী বালিকা-বিদ্যালয় ছিল ; ইহার মধ্যে ১৪৫টী গবর্ণমেণ্ট সাহায্য পাইত এবং ১৪টী ঐ সাহায্য পাইত না।

হুগলী জেলার কলেজ

(১) শ্রীরামপুর কলেজ ১৮২১ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের পাদরী-গণ কর্ত্তৃক স্থাপিত।

(২) চন্দননগর ডুপ্লে কলেজ।

(৩) হুগলী কলেজ—১লা আগষ্ট ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত। মসীনকণ্ডের টাকায় নির্ম্মিত হয়।

(৪) উত্তরপাড়া কলেজ—১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়।

[ক্রমশঃ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (জ্যোতীরত্ন)।

* Education Cons. 24th january, 1856 N. 82 ; 13th March. 18_6 N: 79.

(৬) Education Cons. 5th August 1858 N: 16 ; Coes. 24 june 1858 N: 167 And B. H. I. k. I.. also 2nd December 1858 N: 5.



সমর্পণ

[গল্প]

বি, এ পরীক্ষা আসন্ন। সুষমা অনেক রাত্রি অবধি জাগিয়া পড়া মুখস্থ করে। সুরমা রাগ করিয়া সময়ে সময়ে বলেন, "সুষী, রাত জেগে মুখ-চোখের কি ছিরি হয়েছে, আরসির সামে দাঁড়াস্, দেখতে পাবি।"

প্রভাত অফিসের কাপড় পরিতে পরিতে উত্তর দিলেন, "যে দিন গেজেটের মাথায় নামটা ছাপা হবে, সে দিন মেয়ের মুখ দেখ।"

সুরমা হাসিয়া বলিলেন, "তাই হোক্। ঠাকুরকে সিন্নি দেব। তবু পাঁচ জনের কাছে একটা পরিচয়। আমাদের কালে ত অত ছিল না।"

এই ক্ষুদ্র পরিবারের আনন্দ যেন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ভাগ্য-দেবতা বোধ করি ভয়ানক হিংসুটে, নিরবচ্ছিন্ন সুখটা মানুষকে তিনি কিছুতেই দেন না।

জোয়ারের জল কূলে কূলে ফুলিয়া উঠিলেই ভাটার টান ধরিতে আরম্ভ হয়।

সে দিন অফিস হইতে প্রভাত যখন ফিরিলেন, আনন্দ যেন তাঁহার সমগ্র মুখখানাকে প্রদীপ্ত করিয়াছে। প্রফুল্ল কণ্ঠে তিনি হাঁক্ দিলেন, "ওগো, শুনে যাও।"

রান্নাঘর হইতে সুরমা কহিলেন, "এই যে যাচ্ছি। চায়ের জল হ'লো ব'লে।"

বারান্দায় বাহির হইয়া প্রভাত কহিলেন, "আহা, ওর জন্য ব্যস্ত হচ্ছ কেন? এ দিকে আগে এস না? দরকার আছে।"

সুরমা উঠিয়া আসিলেন, কহিলেন, "কি? কিসের এত তাড়া?"

ফ্যানের রেগুলেটারটা জোর করিয়া দিয়া হাসি হাসি মুখে প্রভাত কহিলেন, "তোমার মেয়ের যে বিয়ে গো!"

"বিয়ে?" সুরমা আকাশ হইতে পড়িলেন। অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া তিনি কহিলেন, "রঙ্গ করবার আর যায়গা জুটল না!"

অন্তর যখন আনন্দে ভরপূর থাকে, সব কথার আগেই মানুষের মুখে তখন হাসিটাই ফুটিতে থাকে।

পরিহাস-মাখা কণ্ঠে হাসিয়া প্রভাত কহিলেন, "কি ক'রে জুটবে? তুমি যে আছ! এখনই তা হ'লে সম্মার্জ্জনী হাতে—"

কৃত্রিম কোপ দেখাইয়া সুরমা কহিলেন, "হ্যাঁ গো, সম্মার্জ্জনী হাতেই ত আছি। এখন এই সব করতে আমায় ডাক্ছিলে?"

প্রভাত গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "দেখ, সুযোগ বার বার আসে না, বুঝেছ ত?"

"কি বুঝবো, তোমার হেঁয়ালী ত কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।"

প্রভাত কহিলেন, "আহা, এ ত সোজাই প'ড়ে রয়েছে। বিবাহযোগ্যা হিঁদুর ঘরের মেয়ে, বাপ-মা সুবিধা পেলেই বিয়ে দেবে।"

সুরমা ভিতরে ভিতরে অসহিষ্ণু হইয়া পড়িতেছিলেন। নীরস-কণ্ঠে কহিলেন, "কি সুবিধা পেলে? কোথা পেলে, তা ত জানলুম না। শুধু গৌরচন্দ্রিকাই শুন্‌ছি।"

প্রভাত উত্তর দিলেন, "গৌরচন্দ্রিকা যার ভাল হয়, কীর্ত্তনও তার ভাল জমে। মাথা ঠাণ্ডা ক'রে শোন। আমাদের অফিসের বড় বাবুর মাইনে কত জান? বারোশ টাকা।"

সুরমা অবাক্ হইয়া কহিলেন, "তুমি কি তাঁর সঙ্গে সুষীর বিয়ের সম্বন্ধ কচ্ছ না কি?"

প্রভাত হাসিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, "পাগল!

আমার মত তাঁর সেটিও ত বেশ টেঁকসই। যাকে বলে অজর অমর। কোন্ মান্ধাতার আমলে এসে যে দখল নিয়েছিলেন, ছাড়বার আর সম্ভাবনা নেই।"

সুরমাও হাসিলেন। কহিলেন, "তা ত বুঝলুম। তোমাদের মত দুর্ভাগা আর নেই। কিন্তু তার পর কি শুনি?"

"সেই বড়বাবুর যিনি একমাত্র বংশধর, যিনি মাতামহের বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, তাঁরই সঙ্গে। ভদ্রলোকের বছরখানেক হ'ল পত্নীবিয়োগ ঘটেছে; অথচ নিঃসন্তান।"

বর্ষার আকাশ যেন শরতের সোনার আলোয় হাসিয়া উঠিল। উজ্জ্বলমুখে সুরমা কহিলেন, "কে, শশাঙ্ক? এ ত ভাগ্যের কথা। কিন্তু শুনেছিলুম যে, সে আর বিয়ে করবে না? ওর মাতামহ যে আমাদের দেশের জমীদার।"

সহর্ষে প্রভাত কহিলেন,—"করবে না ত কি? মাতামহ কেমন উইল করেছেন। বিয়ে না কল্লে সম্পত্তি দেবোত্তর হবে।"

সুরমা ঈষৎ চিন্তিতমুখে কহিলেন,—"শশাঙ্কের প্রথম স্ত্রী খুব সুন্দরী মেয়ে ছিল। সে বছর পূজায় যখন বাপের বাড়ী গেছলুম, দেখেছি।"

সগর্ব্বে প্রভাত কহিলেন,—"সে ভাবনা তোমার নয়। তুমি এই বাইশে ফাল্গুন মেয়ের বিয়ে দিতে পারবে কি না বল?"

"বাইশে?" দুই চোখ কপালে তুলিয়া সুরমা কহিলেন, "মাঝে জোটে আট দিন?"

"কেন? আট দিনে কি বিয়ের জোগাড় হয় না?"

সুরমা ঈষৎ ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিলেন, "কেন হবে না? খুব হয়। তবে একজামিনের পরে হ'লে—"

বাধা দিয়া প্রভাত কহিলেন, "সুবিধা সব সময়ে আসে না।"

* * * *

সুরমা কক্ষে ঢুকিয়া স্বামীকে কহিলেন, "হ'ল না।" মুখ তাঁহার বিষণ্ণ, দৃষ্টিতে শুধু ক্রোধের আভাস ফুটিতেছে।

তাকিয়াটার উপর হেলিয়া প্রভাত শুইয়াছিলেন। বোধ করি, পত্নীর আগমনই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সোজা উঠিয়া বসিয়া উৎকণ্ঠিত-কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "সুধীকে তুমি বেশ ভাল ক'রে বুঝিয়েছিলে?"

নৈরাশ্যের ক্ষুব্ধতা রোষানল সৃষ্টি করে। সুরমা ঝাঁঝিয়া উঠিয়া কহিলেন, "আমি ত তোমাদের মত অত লেখা-পড়া শিখিনি; বোঝাতেও জানিনে। নিজে ডেকে বোঝাও।"

প্রভাত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "চট কেন? তোমার মত ছিল ব'লেই ত বড়বাবুকে পাকা কথা দিয়ে গায়ে হলুদের বাজার করতে বলেছিলুম।"

চিত্তে যখন জ্বালা ধরে, অপর পক্ষ তখন যতই শান্ত হউক, নিজের রুক্ষতা কিছুতেই কমে না। সুরমা তিক্তকণ্ঠে কহিলেন, "এখনই আমি মত বদল করেছি না কি? মেয়ে আমার একার নয়, নিজে ডেকে জিজ্ঞেস কর না?"

"আচ্ছা, তাই কচ্ছি।" প্রভাত ডাক দিলেন,—"সুধী, একবার শুনে যাও, মা।"

পিক্টগ্রাফ সেলাইটা হাতে লইয়া সুষমা পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইল।

প্রভাত কহিলেন, "আমার অবস্থাটা তোমার গর্ভধারিণীর মুখে অবগত হয়েছ বোধ হয়, আর যদি না ঠিক বুঝতে পেরে থাক, আমি স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছি। বসো।"

প্রভাত নিজের কার্পেটটার উপর কন্যাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া প্রভাত কহিলেন, "সুষমা, তুমি জান, ঐ চাকরী, আর এই বাড়ী, এই আমার দুটি সম্বল। একটি আমার জীবনকে বাঁচিয়ে রেখেছে, অপরটি বৃষ্টি-রৌদ্র হ'তে দেহটাকে রক্ষা কচ্ছে, কেমন, এই ত?"

সুষমা নীরব। তথাপি সে যে পিতৃকথা অনুমোদন করিল, এটুকু তাহার আয়ত নেত্রের দৃষ্টিটুকু হইতে বুঝা গেল। প্রভাত মেয়ের মুখের পানে চাহিয়া ঈষৎ সন্তুষ্ট হইলেন। কহিলেন, "কাযেই তোমার বিয়েতে যে দশ বিশ হাজার খরচ করবার সঙ্গতি আমার হবে না, এটুকু তুমি বুঝতে পাচ্ছ।"

সুষমা মাথা নাড়িয়া জানাইল যে, সে তাহা বুঝিতে পারিয়াছে।

প্রভাতের কণ্ঠস্বর কোমল হইল। তিনি কহিলেন, "বাপ-মায়ের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে—সন্তানকে এমনি পথে চালনা করবে, যাতে তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়। আমি যে সে বিষয়ে ত্রুটি করিনি, বরঞ্চ আমার সাধ্যের অতিরিক্ত ক'রে থাকি, এটা তুমি স্বীকার কর ত?"

সুষমা এবারও নীরব। শুধু মাথা নাড়িয়া পিতার কথার প্রত্যেক বর্ণটি যে সে স্বীকার করিতেছে, তাহা জনককে বুঝাইয়া দিল।

স্মিতহাস্যে প্রভাতের ভাবনামাখা মুখখানা এতক্ষণে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি গৃহিণীর পানে দৃষ্টিপাত করিলেন। ভাবটুকু এই যে, সুষমা বিদ্যাবুদ্ধির দৌড়ে যাহা পারিয়া উঠেন নাই, দক্ষ কৌঁসুলীর মত কথার জালে তিনি মুহূর্তে তাহাই করিতে সমর্থ হইয়েছেন।

প্রভাত কহিলেন, "এই ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল ক'রে তোলবার প্রথম সোপান হচ্ছে বিবাহ; বিশেষ মেয়েদের। কারণ, স্বামীর নামে সার পরিচয়। আমি যে সম্বন্ধটা খুঁজে এনেছি, শুধু তোমার সৌভাগ্যবলেই তা আমার পক্ষে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সুষমা, সে শুভকে একবার অনাদর করলে, জীবনে সে আর ফিরে আসে না।"

এতক্ষণে সুষমা কথা কহিল। সে বলিল, "এইটাই যে আমার জীবনের শুভ, সেটা কি নিশ্চিত প্রমাণ হয়ে গেছে?"

প্রভাত বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া পড়িলেন। কন্যা যে এরূপ উত্তর দিতে পারে, তাহা তিনি ধারণায় আনিতে পারেন নাই। মুহূর্ত হতবুদ্ধি হইয়া তিনি মেয়ের পানে চাহিলেন। পরক্ষণেই অসহিষ্ণুকণ্ঠে উত্তাপের সহিত কহিলেন, "বিচারবুদ্ধি ও পাঁচটা উদাহরণ দেখেই আমরা ফলাফলটা নির্ণয় করি। এখানে আমাদের বুদ্ধির দ্বারা যতটুকু বুঝতে পারছি, তাতে ত অমঙ্গলের কিছু খুঁজে পাচ্ছি না।"

সুষমা শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "যার পদার্পণে বিষাদ উদিত হয়, শুভকে সে জীবনে ডাকতে পারে না।"

প্রচণ্ড বিস্ময় ক্ষণকাল প্রভাতকে নির্ব্বাক্ করিয়া রাখিল। একটু পরে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে মেয়ের পানে চাহিয়া তিনি কহিলেন, "বিষাদ! কি বিষাদ?"

সুষমা কহিল, "এই দু'বছর ধ'রে যে বিষয়ে সাফল্যলাভ করবার চেষ্টা করছি, যে সাফল্যের আনন্দ কল্পনা ক'রে আপনি অনুক্ষণ উৎসাহিত হচ্ছেন, ভোরের শিশিরকণার মত তার আয়ু যার আগমনকালে নিঃশেষে শুকিয়ে যাবে, সে উত্তাপ আমার জীবনকে মরু ক'রে তুলবে।"

প্রভাত মৌন হইয়া রহিলেন। মেয়ের মুখের এই সাঙ্ঘাতিক অভিযোগ তাঁহার অন্তরে বোধ করি একটা ঘা মারিল। কিন্তু জন্মগত সংস্কার ওই চারিটি আঘাতে পড়ে না! ঈষৎ দুলিয়া উঠে মাত্র।

প্রভাত কহিলেন, "তোমার একজামিনের কথা বলছ? অবশ্য ওরা মস্ত বড় বনেদী বংশ। বিয়ের পর বৌকে পড়াশোনা না ক'রে গিন্নীপনা করতে হয় ত বলবে। কিন্তু লেখাপড়ারই বা আর প্রয়োজন কি?"

সুষমা কহিল, "এত দিন তা হ'লে এত অর্থ ব্যয় ক'রে আমাকে এতখানি পড়াবারই বা কি প্রয়োজন ছিল?"

প্রয়োজন? প্রভাত এতক্ষণে হাসিলেন। কহিলেন, "বাপ-মার একটিমাত্র প্রয়োজন—ভাল বিয়ে দেওয়া মেয়ের। দেশের হাওয়া যেমন বইছে, মেয়েরা উচ্চশিক্ষা না পেলে সে দিকে বিশেষ সুবিধা হবে না দেখেই এই দিকে এত ঝোঁক দিয়েছি, মা। তা না হ'লে কোন দিন তুমি নিবেদিতা বা নাইডু হবে, কল্পনাই করি নি, মা!"

চোখের সম্মুখে একান্ত ভালবাসার মনোরম প্রাসাদখানা যেন ভূমিকম্পের দুঃসহ আঘাতে নিমেষে চূর্ণ হইয়া পড়িয়া গেল! কুড়ি বছর বয়সের মাঝে সুষমা পিতার অন্তরের প্রকৃত ইচ্ছা—উদ্দেশ্য একটি দিনের তরেও বুঝিতে পারে নাই। শুধু কল্পনার তুলিতে ভবিষ্যতের সোনার ছবি আঁকিয়া তাহাই সার্থক করিতে প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছে। স্বর্ণপদক, লেটার, সবই বৃথা। কোন মূল্য, কোন সার্থকতা নাই। সেই কবে কোন্ আদি যুগে, কে নির্ণয় করিয়া দিয়াছিল, নারী গৃহস্থালীর ভার লইবে, আজও সে নিয়মের ব্যত্যয় এতটুকু হয় না। অদৃশ্য নাগপাশের এই বন্ধন চিরদিন শুধু নারীজাতির সব স্বাধীনতা নিঃশেষে হরণ করিবে! সুষমার সমস্ত অন্তঃকরণ বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল। আহত চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

পিতার পানে চাহিয়া মৃদু জড়িমাহীনকণ্ঠে সে কহিল, "না বাবা, এ হ'তে পারে না।"

"কি হ'তে পারে না? তোমার বিয়ে?"

বজ্রাহতের মত নিষ্পলকনেত্রে প্রভাত শুধু চাহিয়াই রহিলেন।

সুষমা আর কোন কথাই বলিল না।

* * * *

বাইশে ফাল্গুন সুষমার বিবাহ ঘটিল না। বড় বাবু ইন্দ্রনাথ বেশ হাসিমুখেই প্রভাতকে কহিলেন, "মেয়ে

সাবালিকা। তোমার মত চলবে কোথা হ'তে? তার পাঁচটি বন্ধুবান্ধব আছে, তাদের সঙ্গে কন্‌সল্‌ট করবে। বুঝেছ কি না, এটা হ'ল ওদের যুগ!"

কথাটার মাঝে কতখানি শ্লেষ ছিল, ছাই-চাপা আগুনের মত এই হাসির তলায় যে রোষবহ্নি ধিক্ ধিক্ করিতেছিল, তাহা যে প্রভাতের সামান্য ত্রুটির ফুৎকারে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে, তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না।

মাথা চুলকাইয়া অত্যন্ত বিনয়ের সহিত প্রভাত কহিলেন, "স্যার, ওর একজামিনের সময় কোন রকম গোলমাল করা আমি উচিত বুঝি না। আপনি ত ওর পরীক্ষার ফল-গুলো যা বরাবর হয়ে আস্‌ছে, তা জানেন।"

ইন্দ্রনাথ হো হো করিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "মেয়েকে যে কৌঁসুলী করতে বিলেত পাঠাবে দাদা, এ কথা চারদিন আগে যদি ভুলে ছিলে, তবে অফিসের হিসেব কোন্ স্মরণশক্তি দিয়ে মনে রাখবে বল?"

ক্যাসিয়ার বাবু কহিলেন, "ছেড়ে দিন, দাদা। ও বেচারার কাটা ঘায়ে আর নুণ ছিটোবেন না।"

ইন্দ্রনাথ মুখ বাঁকাইয়া একটা ঘৃণা প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "আরে হোঃ, শশাঙ্কর আমার কপাল ভাল। ছোঁড়াটা এ যাত্রা বেঁচে গেল। আমাদের গৃহস্থালী ঘরকন্নায় ও সব মেয়ে—" কথাটি শেষ না করিয়া ইন্দ্রনাথ নিজের টেবলের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

প্রভাতের সুগৌর মুখখানা অপমানের তীব্র তাড়নায় আগুনে-পোড়া লোহার মত রাঙ্গা হইয়া উঠিল। একটা কঠিন উত্তর তাঁহার ওষ্ঠাগ্রেও আসিয়াছিল, কিন্তু জলে বাস করিয়া কুমীরের সহিত বিবাদ করিতে নাই, অপমানটা যত প্রবল হউক, ক্ষতির পরিমাণটা স্মরণ করিয়া নিজের টেবলের সন্নিকটে তিনি সরিয়া গেলেন। দোষ যে তাঁহার।

প্রভাতের সমস্ত রাগটা গিয়া পড়িল মেয়ের ওপর। মা-বাপের যাহা কর্ত্তব্য, তিনি ত তাহাই করিয়াছিলেন।

ইন্দ্রনাথ যে দিন অফিসে বসিয়া দুঃখ করিলেন,—তাঁহার শ্বশুর দৌহিত্রের বিবাহের জন্য উইলে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাহা অতিক্রম করিলে সেই বিপুল সম্পত্তি দেবোত্তর হইয়া যাইবে, এবং সেই সময়টা পূর্ণ হইতে আর কুড়িটা দিন মাত্র বাকী আছে।

বড় বাবুর এই দুর্ভাবনায় নিরস্তমদের মুখ শুকাইল। চোখে যেন সকলেই ধোঁয়া দেখিতে লাগিল। অবশেষে বড় বাবু গল্প বলিলেন,—শ্বশুরের এরূপ উইল করিবার কারণ ছিল এই যে, নাতি বিপত্নীক হইলে তিনি নিজে বিবাহের জন্য তাহাকে ঢের সাধিয়াছিলেন। কিন্তু শশাঙ্ক যখন কিছুতেই সম্মতি দিল না, তখন নিজের ইচ্ছাকে জয়ী করিতে তিনি এই কৌশল করিয়া গিয়াছেন।

শশাঙ্কর এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য সকলেই ক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিল। পিতামাতার কথার মর্য্যাদা নাই। গুরুজনের সন্তোষ যে ভগবানের আশীর্ব্বাদ, এটুকু আজ-কালকার ছেলেরা বোঝে না। তাহাদের নীতি তাহারাই বোঝে ভাল। এমনই নানা মন্তব্যবৃষ্টির মাঝে বড় বাবু প্রকাশ করিলেন,—কাল রাত্রিতে গর্ভধারিণীর অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে শশাঙ্ক বিবাহে সম্মতি দান করিয়াছে।

বর্ষার মেঘমুক্ত আকাশে যেন শরতের সোনার আলো লাগিল। সকলের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তথাপি বড় বাবু কহিলেন, "এত তাড়াতাড়ি ভাল মেয়ে পাই কোথা? তার আবার শিক্ষিতা মেয়েদের দিকেই ঝোঁক বেশী। বিলেত ঘুরে এসেছে, রুচি আমাদের সঙ্গে মেলে না।"

আশায়, আনন্দে প্রভাতের বুকের মাঝটা বাতাসে কাঁপা তরুপল্লবের মত থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বুঝি তাঁহার মেয়েকেই সৌভাগ্যের মুকুট পরাইতে বিধাতা এমনই কৌশল সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষ ভবিষ্যৎ দেখিতে পায় না।

মনে মনে ইষ্টনাম স্মরণ করিয়া প্রভাত বিনীতকণ্ঠে ইন্দ্রনাথকে নিজের মেয়ের কথা বলিলেন।

ইন্দ্রনাথ কহিলেন, "তোমার মেয়ে! সুষমা? সে ত খাসা মেয়ে হে। বি, এ পড়ছে। তবে বাইশে ফাল্গুন দিতে পারবে কি?"

প্রভাতকে উত্তর দিতে না দিয়া অফিসের আর পাঁচ জন কহিল,—"কেন পারবে না? নিশ্চয় পারবে। এটা কলকাতা সহর, মশায়।"

ইন্দ্রনাথ কহিলেন, "তবু সামনে তার একজামিন।"

পূর্ব্বে যাহারা কথা কহিয়াছেন, এবারও তাঁহারাই কথা কহিলেন। বলিলেন, "রেখে দিন মশাই একজামিন। ও-সব ঢের জানি। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানর উদ্দেশ্য কি?—একটা রুই-কাতলা ধরা ত। এ যখন আপনিই জালে পড়েছে—"

কথাটা প্রভাতও সমর্থন করিলেন।

গভীর আনন্দ বুকে লইয়া প্রভাত সে দিন যেন পাখীর মত উড়িয়া বাসায় ফিরিতে চাহিয়াছিলেন। ট্রামের গতি মন্দ বোধ হইল। মাসিক পাশখানা বুকপকেটে রাখিয়া তিনি ট্যাক্সি ধরিলেন। বড় বাবুর বেহাই হইতে তিনি তখন চলিয়াছেন। আর কল্পনায় ফুটিয়া উঠিতে লাগিল মেয়ের সৌভাগ্যমণ্ডিত মূর্ত্তিখানা। সুদূর-ভবিষ্যতে হয় ত,—হয় ত কেন, নিশ্চিত তাঁহার কন্যা আইনসদস্যের গৃহিণী বলিয়া পরিচিতা হইবে। আশা আরও—আরও উচ্চে তাঁহাকে উঠাইল। কি হইবে, কি হইবে না, সবই যেন এলোমেলো হইয়া গুলাইয়া গেল। শুধু প্রভাত যে সুষমার পিতা, এই কন্যা-গর্ব্বে বুকখানা তাঁহার ভাদ্রের নদীর মত স্ফীত হইতে লাগিল।

* * * *

বাস্তবিক সুষমার মনে এরূপ কোন প্রতিজ্ঞা জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে কোথায়ও ছিল না যে, সে চিরকুমারী থাকিবে, অথবা নিজের স্বামী নিজেই নির্ব্বাচিত করিবে। তথাপি এমনধারা যে একটি গোল বাধিল, তাহার কারণ বিবাহের নির্দ্দিষ্ট সময়টার জন্য।

যে পিতা, পুত্রের বিবাহের ফলে সম্পত্তি এত দিন লাভ করিতে পারেন নাই, অথচ এই সম্পত্তিলাভের ব্যগ্রতা দেখিয়া মনে হয়, ইহার অন্তরালে অনুনয়, অনুরোধ সবই ছিল, কিন্তু পাথরে বীজ নিক্ষেপের মত তাহা এত দিন ব্যর্থ হইয়াছে। অথচ একটিমাত্র ব্যক্তির একটুখানি কলমের আঁচড়ে হঠাৎ যখন বড় স্বার্থে আঘাত দিল, তখন অপর পক্ষের লাভ-লোকসান কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া শুধু নিজেদের স্বার্থটুকুই বজায় করিতে, আটটা দিনের মধ্যে বিবাহ করার এই যে কঠোর জিদ্, এইটাই সুষমার নিকট ভয়ানক বিশ্রী বলিয়া বোধ হইল। পিতামাতা যতই তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন, এই বিবাহ না ঘটিলে ইন্দ্রনাথের রোষবহ্নি কেমন করিয়া তাহাদের অনিষ্টসাধন করিবে, ততই এই বিবাহের উপর সুষমার চিত্ত বিতৃষ্ণায় বিমুখ হইয়া বসিল। সে শেষে এমন যায়গায় আসিয়া উপনীত হইল যে, মৃত্যুকেও বরণ করিবে, তথাপি বিবাহে সম্মতি দিবে না। কেন? নিজের কি তাহার কোন মর্য্যাদা নাই?

তাড়না সব সময়ে জয়লাভ করিতে পারে না; বিপরীতটিকেই টানিয়া আনে।

সে দিন অফিস হইতে ফিরিয়া প্রভাত মেয়েকে কহিলেন, "সুষমা, তুমি আমার মুখ উজ্জ্বল করেছ। তোমার লেখাপড়ার ব্যয়ভার আমার আয়ে আর সঙ্কুলান হবে না।"

সুষমা নির্ব্বাক্ রহিল। একান্ত স্নেহময় জনকের এই অপরিচিত রূঢ়মূর্ত্তি চিত্তকে আহত করিল। তথাপি প্রতিবাদের একটি বাণীও সে ওষ্ঠ হইতে বাহির হইতে দিল না।

সুরমা রাত্রিতে মেয়েকে আহার করিতে ডাকিয়া জানিলেন, তাহার ক্ষুধা নাই, মাথা ধরিয়াছে।

ঘর হইতে প্রভাত চেঁচাইয়া কহিলেন, "বার বার অত ডাকাডাকি করতে হবে না। খাবার তুলে রেখে দাও। আমার পয়সা অত সস্তা নয়।"

গর্ভধারিণীর হাঁকাহাঁকিতে সুষমা আহারের দরজার কাছ অবধি আসিয়াছিল। পিতার উক্তিগুলা কাণে প্রবিষ্ট হইতে নিঃশব্দে সে নিজের কক্ষে ফিরিয়া গেল।

অভিমানাহত চিত্ত কান্নাকে দুই চোখে ডাকিয়া আনিয়াছিল। প্রাণপণ শক্তিতে সুষমা তাহার পথরোধ করিয়া দাঁত দিয়া ওষ্ঠ চাপিয়া রহিল।

* * * *

মানুষের হাসি-অশ্রুর অর্ঘ্যডালা লইয়া বছরগুলা দ্রুতপদে ছুটিয়া যায় এবং সেই বিদায়ী পদরেখা মুছিয়া দিয়া যায়

বছরখানেক হইল, পৃথিবীর আলো-বাতাসের সহিত প্রভাত সকল সম্বন্ধ মুছিয়া দিয়াছেন।

দীর্ঘ দিন ধরিয়া তিনি রোগ-শয্যায় শায়িত। পীড়ার গুরুব্যয় বহন করিতে বাস্তভিটা বন্ধক পড়িয়াছে। প্রভাত একবার আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন, "বড় বৌ! তোমাদের মাথা গোঁজবার স্থানটুকু অবধি ঘুচিয়ে আমার হাওয়া বদল করা, এ রকম রাজার হালে চিকিৎসা করা—"

সুরমা মেয়েকে কথাটা বলিলে সুষমা উত্তর দিয়াছিল, "মা! মানুষের জন্যই অর্থের প্রয়োজন, অর্থের জন্য মানুষের নয়। বাবার চিকিৎসার এতটুকু ত্রুটি আমি সইতে পারবো না।"

এ কথার আর সুরমা কি উত্তর দিবেন?

বেলাশেষে ম্লান আলোর রেখা যেমন দিনান্তের সঙ্কেত করে, তেমনই প্রভাতের দেহাভ্যন্তরের ব্যাধি তাঁহার পাণ্ডুর মুখে নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে ইঙ্গিত করিতেছিল—জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতাটাকে। তাহারই পানে চাহিয়া অবশেষে থাকিতে না পারিয়া এক দিন গভীর মিনতিতে সুরমা স্বামীকে কহিলেন, "আমাদের পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, ওই একটি মেয়ে। ওর ওপর কোন অভিমান রেখে তুমি—"

সুরমা কথাটা সমাপ্ত করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

প্রভাত কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিলেন। অশ্রুর আভাসে কোটরাগত দুই চোখ তাঁহার চক্‌-চক্‌ করিয়া উঠিল।

ক্ষণপরে তিনি কহিলেন, "বড়বৌ, মেয়েকে তুমি একলাই ভালবাস না। আমিও বাসতুম। কিন্তু আমার এতখানি ভালবাসার প্রতিদান আমি পাইনি।"

সুরমা প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন,—"কি বলছ তুমি! আমাদের উপর স্বর্ণীর ভক্তি, শ্রদ্ধা এতটুকু কম কোন দিন দেখিনি।"

গড়িয়ে-পড়া দিনের আলোর মত একটা বিষাদের হাসি প্রভাতের ওষ্ঠে ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "বড়বৌ, সে শ্রদ্ধা শ্রদ্ধাই নয়—নিজেকে যদি তার সঙ্গে না মিলিয়ে নিতে পারি? তুমি আমাকে কি বোঝাতে চাও, বড়বৌ? যা ভাঙ্গে, তা জোড়া দেওয়া যায়, কিন্তু যা গুঁড়িয়ে যায়, তাকে জুড়বে তুমি কি ক'রে?"

প্রভাত থামিলেন, কিন্তু শেষ অবধি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। দীর্ঘ দিনের রুদ্ধ বেদনা দুর্বল দেহমনের কোন অনুশাসন মানিল না। নিজেকে সংবরণ করা প্রভাতের পক্ষে যেন অসাধ্য হইয়া উঠিল।

প্রভাত কহিলেন, "এমন ক'রে এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েসে বিছানা নিলুম কেন জান, বড়বৌ? এ শুধু আমার নিবিড় কন্যাস্নেহের প্রতিক্রিয়া, বড়বৌ! তুমি তার মা হ'লেও বুঝতে পারবে না, এ ভালবাসা আমার কতখানি। তাই তোমাদের মুখের একটা সম্মতির অপেক্ষা না ক'রে, ইন্দ্রনাথকে মেয়ের বিয়ের পাকা কথা দিয়েছিলুম। আমি জানতুম, আমার চেয়ে, তার কল্যাণ কেউ বেশী খুঁজতে পারবে না—সে নিজেও না। কিন্তু আমার সে বিশ্বাস সে যে দিন ভেঙ্গে দিলে, সে দিন জগৎ আমার চোখে শূন্য বোধ হ'ল। আনন্দ আমার কাছ হ'তে চিরবিদায় নিলে।"

প্রভাত কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিবার পর বলিলেন, "নিত্য অফিস যেতুম, ইন্দ্রনাথের বক্রোক্তি, বিদ্রূপের হাসি, শ্লেষমাখা সম্ভাষণ, আর পাঁচ জনের সহানুভূতি আমায় যেন দিনের পর দিন ধ'রে পাগল ক'রে তুল্‌তে লাগল। এই জোর ব্লাডপ্রেসার, এই অকর্ম্মণ্যতার প্যারালিসিস্ এখন কোথা হ'তে এল বুঝতে পাচ্ছ? অতি জিনিষটা সংসারে ভাল ফল দিতে পারে না। আমার অতি স্নেহ, অতি ভালবাসা আমাকে ধ্বংস করলে।"

সুরমা স্বামীর পায়ে হাত বুলাইতেছিলেন, সেই হাতটাই পায়ের উপর চাপিয়া কহিলেন, "যা হবার হয়ে গেছে। তব আমরা মা, বাপ, সব অন্যায়, অপরাধ, যদি না সহ্য করবো, তবে দুনিয়াতে সইবে কে? তুমি সুষমাকে ডাকো।"

প্রভাতের বুকের তলদেশ হইতে একটা নিশ্বাস বাহির হইল। তিনি কহিলেন, "বড়বৌ, যদি সেই আগেকার মত ক'রে তাকে ডাকতে পারতুম, তবেই ডাকতুম। কিন্তু তা ত পারবো না। তাই ডাকবও না। বড়বৌ, তাকে আর ডাকতে পারি না, এ যে আমার কত বড় দুঃখ, তা তুমি বুঝতে পারবে না। আজ তুমি এমন যায়গাতে ঘা মারলে, যা নিজের বুকেই লুকিয়ে রেখেছিলুম। তাকেই তোমার কাছে প্রকাশ ক'র্ত্তে হ'লো। ক্ষমা করেছি বল্লেই কি যন্ত্রণাটা মিলিয়ে যায়? আর যতক্ষণ যন্ত্রণা থাকে, ততক্ষণ ক্ষমাও হয় না যে!"

সিঁড়িতে নারীর পায়ের জুতার অতি মৃদু শব্দ হইল। সুরমা তাহা শুনিতে পাইলেন না। কিন্তু আর এক জনের উৎকর্ণ শ্রবণে তাহা ধরা পড়িল। মানুষ সমস্ত অন্তঃকরণের স্নেহ-মমতা নিঃশেষে ঢালিয়া যাহাকে ভালবাসে, তাহার পদশব্দ হইতে নিশ্বাসের ধ্বনিটি অবধি সবই যেন অনুক্ষণ পরিচিত হইয়া স্নেহাস্পদের আগমনটা জানাইয়া দেয়।

প্রভাত কহিলেন; "তোমার মেয়ে এসেছে, পায়ের আওয়াজ হ'লো। যাও আগে।"

সুরমা অভিমান করিয়া কহিলেন, "আসুক গে।" কণ্ঠস্বরে উত্তাপটা প্রকাশ পাইল।

প্রভাত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "না, না,

বড়বৌ! তোমার যদি এতটুকু দরদ আমার ওপর থাকে ত আমি যেমন ক'রে তাকে ভালবাসতুম, তুমি তেমনি ক'রে তাকে ভালবাসো। এই আমার শেষ অনুরোধ। আমি পারলুম না, কিন্তু তুমি তাকে বঞ্চিত ক'রো না। তুমি বুঝে দেখ, সে বড় দুঃখী। ভুলে যেও না, সে বড় অভিমানিনী।" প্রভাতের কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া আসিল।

একটা দ্বিরুক্তি না করিয়া সুরমা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সকাল হইতে গোটাকয়েক ছাত্রী পড়াইয়া কন্যা ফিরিয়াছে। তাহার ক্লান্তিটুকু স্মরণ করিয়া নিজের কথার জন্য মাতৃচিত্ত ব্যথিত—সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

* * * * *

আকাশ ভাঙ্গিয়া মাথায় পড়া কথাটা সত্য। বিষাদের সঙ্গীন মুহূর্ত্তটা নিবিড় কুজ্ঝটিকার মত সম্মুখে দাঁড়ায়। দিক্‌হারা মানুষ নিকটের বস্তুও চিনিতে পারে না।

স্কুলের হিসাব-পরীক্ষক কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর করিলেন, অর্থের ঘাটতি সম্বন্ধে।

কর্ত্তৃপক্ষ মিস্ রায়ের কাছে কড়া ভাষায় কৈফিয়ৎ চাহিলেন।

সুষমা কোন উত্তর দিতে পারিল না। স্কুল-তহবিল হইতে যথার্থই সে পাঁচ শত টাকা লইয়াছিল। মনে করিয়াছিল যে, বাড়ীখানা বিক্রয় হইয়া গেলেই টাকা সে পূরাইয়া রাখিবে।

কিন্তু বিচার ত উদ্দেশ্যের হয় না—বিচার হয় আচরণের।

আকাশের বিদ্যুৎ এক নিমিষে অন্ধকারের পর্দা তুলিয়া মেঘাচ্ছন্ন পৃথিবীর বুকের চেহারা যেমন সুস্পষ্ট করিয়া দেয়, সুষমার অবস্থার গুরুত্বটা কর্ত্তৃপক্ষের সংক্ষিপ্ত জিজ্ঞাস্যের মাঝে ঠিক তেমনই অনাবৃত মূর্ত্তিতে দেখা দিল। আবরণের নীচে যাহা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহার নগ্নমূর্ত্তি দেখিয়া এইবার একটা অত্যন্ত কদর্য্য আন্দোলন সুরু হইবে। অপমান-লাঞ্ছনার গভীর খাদে পড়িয়া তাহার সারা দেহে পঙ্ক লিপ্ত হইবে। পরিচিত, অপরিচিত সকলের মুখেই একটানা ছি-ছি ভরিয়া উঠিবে। এমনই দুঃসহ দুর্দ্দিন তাহার অদৃষ্টে দেখা দিবে, মাত্র দুইটা দিন পূর্ব্বেও সে তাহা কল্পনা করিতে পারে নাই।

পিতৃবিয়োগের পর সুষমার মাতা যখন শয্যালীন হইলেন এবং ডাক্তার জানাইল, শোকাহত বক্ষোদেশে যক্ষ্মার ক্ষুদ্র জীবাণুর আক্রমণচিহ্ন দেখা যাইতেছে, এই মুহূর্ত্তে যদি বায়ু-পরিবর্ত্তন এবং উপযুক্ত চিকিৎসা না হয়, তবে অনতিকালমধ্যে তাঁহার সমস্ত বুকখানা ঝাঁঝরা করিয়া দিবে।

সুষমার বিচারবুদ্ধি লোপ পাইল। পরের অর্থ হইলেও নিজের অধীনে যে টাকা ছিল, তাহা ব্যাঙ্কে না পাঠাইয়া এক আত্মীয়ের সহিত সে গর্ভধারিণীকে পাঠাইল—'ধরমপুরে'।

হেড মিষ্ট্রেস্ মিসেস্ দত্ত কহিলেন,—"সুষমা! কলেজে তোমায় ভাল মেয়ে বলেই জানতুম। যদিও কানে গুজব এসেছিল, তোমার পিতার সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটেছে, তবু সেটা বিশ্বাস করি নি। কিন্তু বাইরে হ'তে মানুষকে চেনাও যায় না, দূর হ'তে বিচারও চলে না।"

সুষমা কোন উত্তর দিতে পারিল না। পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত নিঃশব্দে শুধু চাহিয়া রহিল।

মিসেস্ দত্ত ক্ষণকাল সুষমার নির্ব্বাক্ মূর্ত্তি ও পাংশু মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন,—"যা করেছ, তাতে কিছু করবার নেই। তবে মিঃ মিত্র এক জন ট্রাষ্টি, এবং কমিটীতে তাঁর মতামতের একটা দাম আছে। তাঁর বাবা তোমার বাবার অফিসের বড় বাবু ছিলেন শুনলুম। যদি দয়ার উদ্রেক করতে পার—সেই সূত্র ধ'রে চেষ্টা দেখো। ভারী সদাশয় তিনি শুনেছি।"

সুষমার সারা দেহটা এতক্ষণে থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কমলা-বিদ্যালয়ের এই চাকরিটা অনেক করিয়া সে জুটাইয়াছিল। বেতনও মন্দ ছিল না। তথাপি নিজের বুদ্ধির দোষে এই দুর্ব্বিপাক সৃষ্টি করিয়াছে।

সুষমা একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"এরা কি আমায় পুলিসে দেবে?"

মিসেস্ দত্ত চেয়ার হইতে উঠিয়া আসিলেন। সুষমার কাছে দাঁড়াইয়া কহিলেন,—"না, না, সুষমা! আমি থাকতে তা কিছুতেই হ'তে দেব না। আমি শুধু খুঁজে পাচ্ছি না, কেন তোমার এ মতিচ্ছন্ন ঘোটল! তোমাকে আমি ছোট-বেলা হ'তে জানি। ভালবাসি ব'লে ক্যাস ডিপার্টমেণ্টে দিয়েছিলুম। থাক ও কথা। তুমি মিঃ মিত্রকে একবার ধরতে চেষ্টা কর। আমি ইতিপূর্ব্বে তাঁকে তোমার তরফ হয়ে অনেক কথা ব'লে বুঝিয়ে এসেছি। তোমার জামীনও আমি দাঁড়িয়েছি। সুষমা! আমার মেয়েটা যদি বেঁচে

থাকতো আজ, তবে সেও এত বড় হ'তো! তারও নাম ছিল সুষমা।"

* * * *

মিঃ এস, মিত্র বার-এ্যাট-ল, কমলা-বিদ্যালয়ের রিপোর্ট দেখিতেছিলেন। সুষমার নামে যে কঠোর অভিযোগ উত্থিত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে মিসেস দত্ত অনেক কথা বলিয়া উপসংহারে বলিয়াছিলেন, সুষমা তাঁহার পিতৃবন্ধুর কন্যা।

বেহারা আসিয়া স্লিপ দিল। মিস্ সুষমা রায় বি, এ, বি, টী।

মিঃ মিত্র আসিতে আদেশ দিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই সঙ্কুচিতপদে, নতদৃষ্টিতে সুষমা আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। দুই হাত ললাটে ঠেকাইয়া মিঃ মিত্রকে সে নমস্কার করিল।

মিঃ মিত্র চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়াছিলেন। প্রতি-নমস্কার করিয়া সুষমাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সুষমা কহিল, "আমি আমার সব কথা বলতে পারবো না। কাগজে বক্তব্য লিখে এনেছি।"

ব্লাউসের অভ্যন্তর হইতে সুষমা ভাঁজ করা একখানা কাগজ বাহির করিয়া কম্পিতহস্তে মিঃ মিত্রের হস্তে দিল।

মিঃ মিত্র পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কেমন করিয়া রোগশয্যায় দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ভুগিয়া প্রভাত পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধ চুকাইলেন, উপার্জ্জনের একটি পথ ছিল পিতার চাকরী, তাহা যখন ঘুচিয়া গেল, কতখানি বেগ সুষমাকে সহিতে হইয়াছিল, কেমন করিয়া মুখ দিয়া রক্ত-তোলার মত অমানুষিক পরিশ্রমের উপার্জ্জনে পিতৃ-চিকিৎসা চালাইয়াছিল, প্রভাতের নিষেধ সত্ত্বেও বাস্ত-ভিটা—মাথা গুঁজিবার একটিমাত্র আশ্রয় বাঁধা দিয়া সে পিতার বায়ুপরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিল, সংসারের সেই দুঃসহ দরিদ্রতা, অনটনের তীব্র উৎপীড়ন সুষমাকে ধীরে ধীরে কেমন করিয়া বিভ্রান্ত করিতেছিল, ন্যায়বুদ্ধি লুপ্ত হইতেছিল, তাহারই বিশদ বিবরণ দিয়া সুষমা লিখিয়াছে, জগতে একমাত্র আপনার বলিতে যখন অবশিষ্ট রহিলেন শুধু জননী; নরহন্তা ব্যাধি সেই স্নেহবুকে নিজের তীক্ষ্ণদন্ত ফুটাইয়াছে—সুষমা যখন তাহা জানিতে পারিল, তখন সে পাগল হইয়া গেল। হিতাহিতজ্ঞানশূন্যা, পরিণামভয়হীনা উন্মাদিনীর মত সে দ্বিধাহীন হইয়া স্কুলের তহবিল হইতে টাকা লইয়াছিল। চুরীর অভিপ্রায় ছিল না। এটর্ণী-বাড়ীতে বাড়ী বিক্রয়ের ব্যবস্থা চলিতেছে। পিতার অবিদ্যমানে সে-ই বাড়ীর উত্তরাধিকারিণী। বাড়ী বিক্রয়ের সেই অর্থের দ্বারা এই ঋণ পনেরো দিনের মধ্যে সে পরিশোধ করিবে। মনের মধ্যে ইহাই নিশ্চিত ছিল। কিন্তু সাত দিনের ভিতর ঘটনা গুলাইয়া সবটা কালো করিয়া দিল। কমিটীর কাছে সুষমা দয়া ভিক্ষা করে।

আত্মপরিচয়ে সুষমা লিখিয়াছে, পরলোকগত প্রভাত রায় এম্, এ তাহার পিতা। স্কুলে সুনাম, য়ুনিভার্সিটির প্রশংসা, এক দিন সবই সুষমা অর্জ্জন করিয়াছিল। আজ শুধু গ্রহবৈগুণ্যে দরিদ্রতার কঠোর নিষ্পেষণে সে ভিখারিণীর অপেক্ষা নিঃস্ব, রিক্ত, অসহায়া। তাহার গর্ভধারিণী এখন বাঁচিয়া আছেন; রোগে, শোকে শয্যাগত। কন্যার এত বড় দুর্নাম বজ্রাঘাতের মত যে দিন তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে, সেই মুহূর্ত্তে প্রাণবায়ু তাঁহার দেহ হইতে বহির্গত হইয়া যাইবে এ দুঃসহ আঘাত তিনি কিছুতেই সহিতে পারিবেন না।

আবেদন-পত্রখানি পাঠ শেষ করিয়া মিঃ মিত্র মুখ তুলিলেন। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিয়া কহিলেন, "মিস্ রায়! এতক্ষণে বুঝ্‌তে পাল্লুম, আপনি কে? সঙ্গে সঙ্গে জানতে পাল্লুম, আপনি শুধু আমার জীবনে অনেকখানি ক্ষতি করেন নি, মস্ত বড় বোঝা আপনি নিজেও ব'য়ে বেড়াচ্ছেন।"

কোন কিছু বুঝিতে না পারিয়া সুষমা মিঃ মিত্রের মুখপানে চাহিল।

মিঃ মিত্র কহিলেন, "ও কথা থাক্। আপনি আমার যত বড় শত্রু হন, আপনার অবস্থার গুরুত্ব আমি উপলব্ধি করেছি এবং আপনার উপর আমার সহানুভূতি এসেছে। কমিটীতে যখন আমার বিশেষ ক্ষমতা আছে, আপনার চিন্তার বিশেষ কিছু নেই।"

দুরতিক্রমণীয় পর্ব্বত যেন দৈবসাধনায় অকস্মাৎ বিভক্ত হইয়া যাত্রীকে অগ্রসর হইবার পথ প্রদান করিল।

দুঃসহ দুঃখের মত প্রচণ্ড আনন্দও মানুষকে ক্ষণকাল মূক করিয়া দেয়। বুদ্ধিবৃত্তি যেন আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। সুষমা মুখে একটা সামান্য ধন্যবাদ-বাণীও উচ্চারণ করিতে পারিল না; মূর্ত্তির মত চেয়ারে উপবিষ্ট রহিল। শুধু শোণিত-লেশহীন মুখখানার উপর একটা রক্তের উচ্ছ্বাস

ছুটিয়া আসিয়া আবার তাহা পাংশু করিয়া দিল। শুভ্র ললাটে মুক্তাবলীর মত স্বেদ বিন্দু ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

মিঃ মিত্র তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া ফ্যানের রেগুলেটারটা বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। ঈষৎ শঙ্কিতকণ্ঠে কহিলেন, "মিঃ রায় কি অসুস্থতা বোধ কচ্ছেন?"

একটা গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সুষমা মাথা নাড়িয়া জানাইল, না এবং চেয়ার হইতে উঠিতে গিয়া বসিয়া পড়িয়া সে কহিল, "মিঃ মিত্র! অনুগ্রহ ক'রে আপনি আমায় বলুন, আমি আপনার জীবনে কি ক্ষতি করেছি? আমি ত কিছু বুঝতে পাচ্ছি না?"

পাতলা মেঘের অন্তরাল হইতে দীপ্তিহারা রৌদ্রের আত্মপ্রকাশটুকুর মত মিঃ মিত্রের ওষ্ঠে একটা ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "আমি ইন্দ্রনাথ বাবুর ছেলে শশাঙ্ক। বহুদিন পূর্ব্বের একটা ঘটনা আপনি বোধ হয় বিস্মরণ হয়েছেন! কিন্তু সেইটাই আমার জীবনে একটা ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি করেছে, কাযেই আমার পক্ষে তা ভোলা অসম্ভব। আমার মাতামহের উইলের কথা আপনি জানেন বোধ হয়?"

সুষমা মাথা নাড়িয়া জানাইল, সে জানে।

শশাঙ্ক কহিলেন, "তবেই বুঝছেন, আপনার বাবা প্রভাত বাবু যখন উইলের সর্ত্তের মাত্র চারিটি দিন পূর্ব্বে আমার বাবাকে জানালেন, বিবাহে আপনার অসম্মতি, তখন ক'নে খোঁজবার সময় আর কতটুকু? তবু বাবা একটি সদ্‌বংশের সুশ্রী মাতৃহীনা মেয়ের সঙ্গেই আমার বিবাহ দিলেন। বাকিটুকু আর জানবার অবসর রইল না। সেটা জানা গেল ফুলশয্যার দিন। বধূ ব'লে বাবা যাকে ঘরে এনেছেন, সে পাগল!"

সুষমা চমকিয়া উঠিল। মুখ তাহার এক নিমেষে ফ্যাকাশে হইয়া গেল। নিজের জীবনযাত্রার তীব্র দুঃখগুলা অসহনীয় হইয়া তাহাকে যখন বিঁধিত, ভগবানের উপর বিশ্বাস হারাইয়া অনেক সময়ে সুষমা ভাবিত, দুর্ব্বল ভীরুচিত্তরা ভগবান্ বলিয়া একটা ভয়ানক বুজরুকি সাজাইয়া রাখিয়াছে।

মনের সমস্ত কুয়াসা নিমেষে মিলাইয়া গেল। দীপ্ত সূর্য্যালোকমাখা বহুদূরপ্রসারিত দিগন্তের শেষ সীমা অবধি যেন তাহার দৃষ্টি বাধাহীন হইয়া চলিয়া গেল। সুষমা দেখিতে পাইল, পিতার কত বড় বিশ্বাসে আঘাত করিয়া অপর একটি পরিবারের পরিমাণহীন ক্ষতি সে অজ্ঞাতসারে করিয়াছে! জ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে হউক, ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া মানুষকে গ্রহণ করিতে হয়। কক্ষচ্যুত গ্রহের মত তাই সুষমা আজ আশ্রয়হারা—সহায়-সম্পত্তিহারা। পিতৃস্নেহের অবমাননার পর জীবনটা প্রতি পদক্ষেপে অভিশপ্ত হইয়া উঠিতেছে।

ঘড়ির দিকে তাকাইয়া শশাঙ্ক উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, "আমার পাগল স্ত্রী আমার হাতে না হ'লে খায় না। তাকে স্নান করিয়ে, খাইয়ে তবে আমি কোর্টে যেতে পারি।" শশাঙ্ক একটুখানি হাসিলেন।

সুষমা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শশাঙ্কর পানে চাহিতেই মনে হইল, এই উচ্চপ্রাণ, কোমলহৃদয়, একান্ত অহমিকাশূন্য ব্যক্তিটির ছবি এক দিন সে কল্পনার নেত্রে দাম্ভিকতা, স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচারিতার মসিরেখায় আঁকিয়াছিল! নিস্তরঙ্গ হৃদয়ের তলদেশ হইতে অকস্মাৎ অপরিচিত একটা চিন্তা, একটা উচ্ছ্বাস নিমেষে সমগ্র অন্তরকে যেন ছাইয়া ফেলিল।

সুষমা শশাঙ্কর দিকে অগ্রসর হইয়া পায়ে হাত দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। শশাঙ্ক চকিত হইয়া দুই পদ পিছাইয়া গেলেন! বিস্মিতকণ্ঠে কহিলেন, "ও কি! ও কি কচ্ছেন?"

দৃঢ়কণ্ঠে সুষমা কহিল, "না—। শুধু আপনার পায়ের ধূলা! এইটুকুই আমার জীবনের সম্বল জানবেন।"

সুষমা কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

বাস্ ধরিবার জন্য সুষমা যখন রাস্তার উপর দাঁড়াইল, তখন মনে মনে কেবলই সে বলিতে লাগিল, "বাবা, তোমারি জয়! সমস্ত অন্তর দিয়ে এক দিন তুমি যাঁর হাতে আমায় দেবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছিলে, আজ তাঁর পায়ের ধূলা—কিন্তু এ জন্মে—"

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।



গোধা-চর্ম্ম-ব্যবসায়

ভারতের চর্ম্মব্যবসায় পৃথিবীর বাজারে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে; নানাবিধ গৃহপালিত ও বন্যপশ্বাদি হইতে ব্যবসায়ের চর্ম্মসমূহ সংগৃহীত হয়। আমরা এ স্থলে যে চর্ম্মের বিশেষরূপে আলোচনা করিতেছি, তাহা সরীসৃপচর্ম্ম, প্রধানতঃ গোধা-চর্ম্ম। বাজারে অন্যান্য পশুচর্ম্মের তুলনায় ইহার অনুপাত সামান্য হইলেও এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়টি অল্পসময়ের মধ্যে বেশ প্রসারলাভ করিয়াছে; ব্যবসায়টি আরও আমাদিগের মনোযোগ আকর্ষণযোগ্য, কারণ, ইহা বাঙ্গালী-মস্তিষ্ক-প্রসূত।

কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে এই ব্যবসায়ের অস্তিত্ব ছিল না; কিন্তু প্রায় সেই সময়েই কটকপ্রবাসী জনৈক বিশিষ্ট বাঙ্গালীর মনে ধারণা হয় যে, সরীসৃপচর্ম্ম নানাবর্ণে বিচিত্রিত এবং টেকসইও কম নহে; সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ইহার ব্যবসায় বেশ চলিতে পারে। তিনি ২।৩ বৎসর ধরিয়া এতদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করেন, এবং তাঁহারই উদ্যোগে কটক হইতে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সরীসৃপচর্ম্মের প্রথম চালান পরীক্ষার জন্য বিলাতে প্রেরিত হয়। তাঁহার চেষ্টা অবিলম্বে সফল হইল এবং সরীসৃপচর্ম্ম বিলাতী সৌখীন সমাজে অনাদর লাভ করে না। সেই সময় হইতে সরীসৃপচর্ম্ম-ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। প্রথমতঃ ইহা বাঙ্গালীর হাতেই ছিল এবং অনেক সুপরিচিত পরিবার এই ব্যবসায়ে প্রচুর ধনার্জ্জন করিতেছিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে সাহেব কোম্পানীগুলিও এই কাজে নামিলেন; প্রতিযোগিতার তীব্রতায় লাভের মাত্রা এত কমিতে আরম্ভ করিল যে, বাঙ্গালী অথবা সাহেব কোম্পানী কেহই বিশেষ লাভবান্ হইতে পারিলেন না। এক্ষণ উত্তরভারতবাসী মুসলমান ব্যবসায়িগণই এই ব্যবসায় অধিকার করিয়া লাভবান্ হইতেছেন।

গোধা-বংশ

সরীসৃপ-চর্ম্ম-ব্যবসায় প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর সরীসৃপ লইয়া গঠিত;—সর্প, কুম্ভীর ও গোধা। সর্পচর্ম্ম খুব অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হয় না; কুম্ভীরচর্ম্ম বলিতে ঘড়িয়াল অর্থাৎ মেছো কুমীরই বুঝায়। য়ুরোপে ইহাদের ১৭ ইঞ্চ পর্য্যন্ত প্রশস্ত চামড়ার চাহিদা আছে এবং তদপেক্ষা বড় চামড়াও অষ্ট্রেলিয়াতে বিক্রীত হয়; কিন্তু প্রকৃত কুমীরের চামড়ায় অনেক দোষ থাকায় উহার তেমন আদর নাই। সেই জন্য সরীসৃপ-চর্ম্ম-সমূহের মধ্যে গোধাবংশীয় জীবের চর্ম্মই প্রধান। ভারতে পাঁচজাতীয় গোধা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয়; ইহাদিগকে সাধারণ ভাষায় গোসাপ বলে। ঘন তরুবীথিকা, বাঁশঝাড়, কিম্বা জঙ্গলপরিবেষ্টিত জলাশয়ে গোসাপ প্রায়ই দেখা যায়। ইহার বীভৎস আকৃতি, পিচ্ছিলদেহ, আঁকাবাঁকা গতিবিধি ও প্রচণ্ড চোয়াল দেখিলে দর্শকের মনে স্বভাবতঃ ভীতি ও ঘৃণার সঞ্চার হয়। ইহারা জলের সান্নিধ্যেই বাস করে এবং মাঠের উপর ইহাদের দৌড় দেখিয়া যদিও বিস্মিত হইতে হয়, তথাপি ইহারা মুখ্যতঃ জলচর জীব এবং জলে থাকিতেই ভালবাসে। ভেক ও মৎস্যাদি ইহাদিগের সাধারণ আহার্য্য; কিন্তু সুবিধা পাইলেই ইহারা গৃহস্থের পুকুরের মাছ, গৃহপালিত মুর্গীর ছানা এবং এমন কি, বন্য পক্ষী প্রভৃতিও ছাড়িয়া দেয় না। গোসাপ তাহার রাক্ষস-ক্ষুধা-পরিতৃপ্তির জন্য এক এক সময় গৃহস্থের বিশেষ অনিষ্টসাধন করে। ভীষণ চোয়ালের দংশন ও লাঙ্গুলের নিদারুণ আঘাতের ভয়ে লোকে সহজে গোসাপের নিকট অগ্রসর হইতে চাহে না। এতদ্ভিন্ন ইহাও সাধারণ-বিশ্বাস যে, ইহার, বিশেষতঃ ইহার শাবক—বিষকোবরার দ্বিখণ্ডিতাগ্র, সুদীর্ঘ, কৃষ্ণজিহ্বার স্পর্শই মারাত্মক। স্থলচর জীব হইলেও গোসাপকে কখন কখন পক্ষী ও পক্ষিডিম্ব অনুসন্ধানে গাছে

উঠিতে দেখা যায়। পূর্ব্বোক্ত পাঁচজাতীয় গোধার মধ্যে বঙ্গদেশে—**Varanus Salvator, Laur** এবং **V. bengalensis Daud** সুলভ; শেষোক্তটির তুণ্ডদেশ খুব উচ্চ। ইহাদের চর্ম্ম বহুবর্ণ ও দাগে চিত্রিত। কিন্তু উক্ত বর্ণাদি কেবলমাত্র অপিত্তকেই থাকে।



সাধারণ গোধা

বিভিন্ন শ্রেণীর চর্ম্ম

বাজারে যে সমস্ত গোধা-চর্ম্ম আসে, তৎসমুদয়কে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা—১ম সোনাগোধা। বঙ্গ, উড়িষ্যা ও আসামের জলপ্লাবিত ধান্যক্ষেত্রে ইহা সাধারণ; ইহার চর্ম্ম পীতাভ ও ডিম্বাকার দানাযুক্ত। আদিম পাতলা রং তুলিয়া তৎস্থলে অন্য হাল্‌কা রং প্রয়োগের উপযোগী বলিয়া এই শ্রেণীর গোধার চর্ম্ম অধিক মূল্যবান্‌। ইহাদের সাধারণ বর্ণের অনেক তারতম্য হয়; উজ্জ্বল রক্ত হইতে গাঢ় হরিত পর্য্যন্ত সকল রঙ্গের আভা এই প্রকার গোসাপে দৃষ্ট হয়। চর্ম্মও অল্পাধিক মজবুত এবং পাতলা অথবা পুরু হইয়া থাকে, তথাপি এইগুলি একশ্রেণীভুক্ত বলিয়াই পরিগণিত হয়। মধ্যবঙ্গ হইতেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সোনাগোধার চামড়া আসে। ২য় কালগোধা। ইহার দানাও ডিম্বাকার, কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট; ইহার সাধারণ বর্ণ গাঢ়তর এবং সেই জন্যই ইহার উপর মোটা রং প্রয়োগ করা চলে। ইহা হইতে দৃঢ়তর ও অধিক মজবুত চর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া ইতালীদেশে ইহার বেশী আদর আছে। সাধারণতঃ বাজারে যে সমস্ত গোধা-চর্ম্ম আসে, সেগুলি ৭ হইতে ১০ ইঞ্চ চওড়া হয়। ৩য় ক্ষুদ্রদানা চর্ম্ম। ইহা যুক্তপ্রদেশ প্রধানতঃ আগ্রা এবং মধ্যপ্রদেশ হইতে আমদানী হয়। এই সকল চর্ম্ম আকারে কিছু ছোট এবং ঘন গাঢ় বর্ণ ও দাগযুক্ত; কিন্তু বঙ্গের গোধাচর্ম্ম অপেক্ষা সুলভতর বলিয়া বাজারে ইহাদের যথেষ্ট কাটতি আছে।

বড় গোধাকে রামগোধা বলা হয়; সুন্দরবনে এই জাতীয় গোধা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার শ্বেত, গোলাকার দাগবিশিষ্ট চর্ম্ম চারি ফুট পর্য্যন্ত বড় হয়; কিন্তু স্থানে স্থানে এবং বিশেষ সময়ে ইহার বিনাশ আইনে নিষিদ্ধ হওয়ায় ইহার চর্ম্মের দাম অধিক। সেই জন্য ইহার ব্যবসায় অধিক প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। সম্ভবতঃ কলিকাতাই গোধাচর্ম্ম-ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র; মাদ্রাজেও গোধাচর্ম্ম পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা নিঃশ্রেণীর। সিংহলে প্রধানজাতীয় গোধাশিকার-সম্বন্ধীয় বিশেষ আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ায় তদ্দেশের গোধাচর্ম্ম-ব্যবসায়ও ক্রমশঃ অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

চর্ম্ম-ব্যবসায়িগণ

গোধা চর্ম্ম-ব্যবসায়ে চারি শ্রেণীর লোক নিযুক্ত রহিয়াছে; যথা—(১) নাশক; ইহারা খাল, বিল প্রভৃতি নানা স্থানে ঘুরিয়া গোসাপ মারিয়া চামড়া ছাড়াইয়া আনিয়া (২)

বেপারীর নিকট বিক্রয় করে; নাশকগণ নির্দ্দিষ্ট বেতন ব্যতীত প্রত্যেক চামড়া পিছু পারিতোষিক পাইয়া থাকে। বেপারীগণ মফঃস্বল হইতে উক্তরূপে চামড়া সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় বড় বেপারী অথবা (৩) মহাজনের নিকট বিক্রয় করে। মহাজনরা উক্ত চামড়া আবার গুদামে জমা রাখিবার ও বিক্রয় করিবার জন্য (৪) আড়ৎদারগণের নিকট দিয়া থাকে। যাহারা গোধা চর্ম্ম বিদেশে চালান দেন, তাঁহারা আড়ৎদারের নিকটই ক্রয় করেন। ব্যবসায়ের এই সাধারণ নিয়মের কিন্তু অনেক সময় ব্যতিক্রম হইতে দেখা যায়। সময়ে সময়ে বেপারী নিজে রপ্তানীওয়ালাকে চামড়া বিক্রয় করে; আড়ৎদাররা স্বয়ং বিদেশে চর্ম্ম চালান দেয় এবং রপ্তানীওয়ালাগণও চর্ম্ম সংগ্রহের জন্য নিজের লোক রাখে।

ব্যবসায়-রীতি

গোধাচর্ম্ম কাঁচা অর্থাৎ অকষা অবস্থায় বাজারে বিক্রয় হয়; উপরে লবণ-দ্রাবণ বারম্বার প্রয়োগ করিয়া শুকাইয়া লওয়া হয়; ফলে উহার উপর লবণের একটি পদ্দা পড়িয়া যায়। সর্ব্বপ্রকার গোধাচর্ম্মই চওড়া হিসাবে বিক্রয় হয়। অবশ্য ব্যবসায়ে বিভিন্ন মাপের চামড়া এক লাটে (Lot) চালান যায়। মূল্যবান্ বড় দানাদার চর্ম্ম সম্বন্ধে মাপের খুব বাঁধা-বাঁধি আছে। ১০০ খানা এইরূপ চামড়ার মধ্যে ৬০ খানা ৮ ইঃ, ৩০ খানা ৯ ইঃ এবং ১০ খানা ১০ ইঞ্চি চওড়া হওয়া দরকার। পূর্ব্বোক্ত অন্য দুই শ্রেণীর চামড়া বিষয়ে এরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই; কেবল সর্ব্বনিম্ন সাইজ ধার্য্য করা আছে; গড়পড়তায় চামড়া তদপেক্ষা ভাল হওয়া চাই। যুক্ত ও মধ্যপ্রদেশের গোধা রুক্ষ প্রকৃতির; প্রায়ই মারামারি করিয়া তাহাদের চর্ম্ম বিক্ষত হয়; সেরূপ চামড়ার লাটে শতকরা ২০ ভাগ সামান্য অপকৃষ্ট চামড়া চলিতে পারে; কিন্তু ডিম্বাকার দানাযুক্ত চামড়ায় শতকরা ১০ ভাগের অধিক অপকৃষ্ট চামড়া (seconds) চলে না।

গোধাচর্ম্ম-ব্যবসায়ে একটি গুরুতর দোষ—এই চামড়া টানিয়া বাড়ানো হয়। সাধারণতঃ ৭ ইঞ্চির অনতিপ্রশস্ত চামড়াতে এই দোষ অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। হাতে টানিয়া বাড়ান ব্যতীত, ভোঁতা ছুরি কিম্বা কোন প্রকার যন্ত্রের দ্বারা সুকৌশলে কোণ টানিয়াও কোন ব্যবসায়ীকে ছোট চামড়া বড় করিতে দেখা গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন গোধা-নাশকগণও বিক্ষত চামড়ার উপর কারিগরী করিতে ছাড়ে না, কাটা চামড়া তাহারা এমন বেমালুম ভাবে মেরামত করে যে, লবণাবৃত চর্ম্মে তাহা সহজে ধরা যায় না।

উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের অভাব

গোধাচর্ম্ম-ব্যবসায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে বটে, কিন্তু গোধা-বংশ হ্রাস পাইবার আশঙ্কাও আছে। এখনও বঙ্গদেশে প্রচুর পরিমাণে গোধা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্তবয়স্ক-নির্ব্বিশেষে গোধা মারিতে আরম্ভ করিলে, ক্রমশঃ উহাদের সংখ্যা কমিয়া যাওয়া খুবই সম্ভবপর। গোধা এক এক বারে প্রায় ৬০টি ডিম পাড়ে এবং এমন স্থানে ঐ সমুদয় রাখে যে, সহজে কোন অনিষ্ট হইতে পারে না; সুতরাং তাহাদের বৃদ্ধির হারও সামান্য নয়; তবুও ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হওয়া দরকার। গোধা অপর সর্পের ডিম এবং এমন কি, রামগোধা সর্প পর্য্যন্তও খাইয়া ফেলে: সেই হিসাবে তাহাদের কতক উপকারিতা আছে, কিন্তু তাহা না হইলেও বঙ্গদেশীয় গণ্ডারের ন্যায় আর একটি বন্য প্রাণীও যে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। বস্তুতঃ গোধার জীবনেতিহাস সম্বন্ধে এখনও বিশেষ কিছু জানা নাই। বিভিন্ন জাতীয় গোধার প্রকৃতি কিরূপ, বৎসরের কোন্ সময় এবং কয়বার তাহারা ডিম পাড়ে, গোধাবংশ-বৃদ্ধির অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থা কি কি, এই সমুদয় বিষয়ে কোন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান এ পর্য্যন্ত হয় নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গসরকার এ সম্বন্ধে কিছু খোঁজ-খবর লইয়াছিলেন; তাহার ফলে ফেব্রুয়ারী হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত গোধা-শিকার বন্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু এই আইনে যাহার নিকট মৃত গোধা পাওয়া যায়, সেই দণ্ডনীয় হয়; কাহারও নিকট চামড়া থাকিলে তাহার কিছুই হয় না। বলা বাহুল্য যে, এরূপ বিধির দ্বারা বিশেষ কোন সুবিধা হয় নাই। বরং ব্যবসায়িগণ যে জানুয়ারী হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত কারবার বন্ধ রাখেন, তাহা অনেকটা যুক্তিসঙ্গত; কারণ, গোধা যখন নিজে ডিমে তা দেয় না, স্বভাবতঃ ফুটিবার জন্য ছাড়িয়া দেয়, তখন ইহা বোধ হয় না যে, তাহারা বর্ষার সময় ডিম প্রসব করে—যখন ডিম্ব-রক্ষণের স্থানে বৃষ্টির জল পড়িয়া ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা খুব অধিক।

ইহাও বলা দরকার যে, গোধা-সংহার নিয়ন্ত্রণ খুব সোজা কার্য্য নহে। গোসাপ মারা বন্ধ করিলে নিম্নতন কর্ম্মচারিগণের উপর অধিক ক্ষমতা অর্পণ করা হয়, যদ্দ্বারা তাহার অপব্যবহার হইতে পারে। চামড়া স্থানান্তরিত করাও বন্ধ করা চলে না। কারণ, এরূপ মূল্যবান্ পণ্য সাধারণ উপায় ব্যতীত অন্য ব্যয়বহুল উপায়েও প্রেরণ করা যায়; চামড়া অনেক পূর্ব্ব হইতে সংগৃহীত ও গুদামজাত হইয়া থাকে, সেই জন্য নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্তও উহার ব্যবসায় বন্ধ করা চলে না; অন্যান্য প্রদেশও এইরূপ বিধি পালনে সম্মত না হইতে পারে; এবম্বিধ জটিল অবস্থায় সরকার একটি পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন, যদ্দ্বারা অপ্রাপ্তবয়স্ক গোধা-সংহার বন্ধ হওয়া ও তৎসহ ভারতীয় গোধা-চর্ম্ম-শিল্পের অভ্যুদয়, উভয়ই সম্ভবপর। আইনে চামড়া রপ্তানীর উপর শুল্ক নির্দ্ধারণের ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান অর্থাভাবের সময়ও সরকার নিজ ইচ্ছায় উক্ত ক্ষমতা পরিচালনা করেন না। যদি গোধা-চর্ম্মের উপর শুল্ক যথাযথভাবে ধার্য্য করা হয়, তাহা হইলে বাজারে যাহার দাম সামান্য, অথচ শুল্ক পূর্ণমাত্রায় দিতে হইবে, সেরূপ চামড়া-ব্যবসায়ে বিশেষ লাভ থাকিবে না এবং সেই কারণে শিশু গোধা মারিতে নাশকগণ স্বতঃই বিরত হইবে।

গোধা-চর্ম্ম-শিল্প

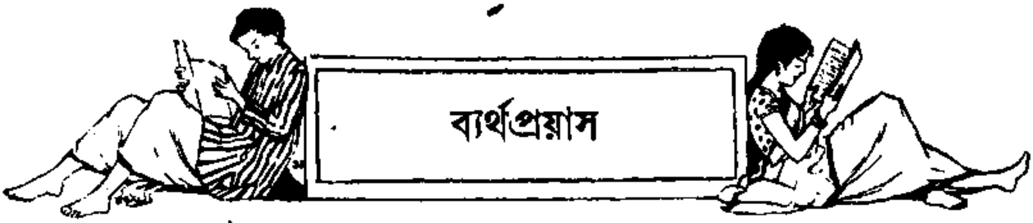
আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গোধা-চর্ম্ম বিদেশে কষ না করিয়াই চালান দেওয়া হয়; কেবলমাত্র যে সকল চামড়া 'গরম' হইয়া উঠে, অর্থাৎ পচিতে আরম্ভ করে, সেইগুলিই অর্দ্ধ-কষ করিয়া পাঠান হইয়া থাকে এবং সেরূপ চর্ম্মের অনুপাত মোটের উপর শতকরা ১০ ভাগের অধিক নয়; এগুলিকে আবার কষ করা দরকার হয়। কারণ, য়ুরোপীয় ব্যবসায়িগণ সাধারণতঃ গোধাচর্ম্ম উত্তমরূপে কষ করিয়া গুদামজাত করিয়া রাখেন। সরীসৃপচর্ম্ম, বিলাসিনী রমণীগণের বহুবিধ সৌখীন দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং সেরূপ সৌখীনতার লীলাভূমি—ফ্যাসানের কেন্দ্র প্যারী মহানগরী। প্যারীকেন্দ্রের অনুজ্ঞা অনুসারে ফ্যাসান ২।৪ মাস অন্তর প্রায়ই বদলাইয়া যায়। যখন যেরূপ রং ফ্যাসানসম্মত হয়, গোধাচর্ম্ম-ব্যবসায়িগণ তখন সেইরূপ বর্ণে চর্ম্ম রঞ্জিত করিয়া বিক্রয় করেন।

আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যে, কাঁচা কিম্বা অর্দ্ধকষ করা চামড়া বিদেশে চালান না দিয়া পূর্ণ কষকরা চর্ম্ম চালান দেওয়া। অর্দ্ধ-কষ দ্বারা প্রকৃতপক্ষে চামড়ার দর বাড়ে না, বরং উৎকৃষ্ট অ-কষা চামড়া অপেক্ষা কিছু কম হয়। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক বারে কষ করিবার সময় চামড়া কিয়ৎ-পরিমাণে সঙ্কুচিত হয়। তাহাতেও ব্যবসায়ীর ক্ষতি আছে। সুতরাং দেশমধ্যে চামড়া কষের ব্যবস্থা হইলে শুধুই যে চামড়ার দর বাড়িবে এবং লভ্যাংশের অনেক পরিমাণ দেশেই থাকিয়া যাইবে, তাহা নহে; অধিকন্তু এতদ্দ্বারা একটি নূতন শিল্পের সৃষ্টি হইয়া বেকার-সমস্যারও কিঞ্চিৎ সমাধান হইবে। এই শিল্পের জন্য বিশেষ কোন মূল্যবান্ কলকব্জা আবশ্যক হয় না; কুটীরশিল্পরূপে সহজেই ইহার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে এবং প্রয়োজনীয় কলকব্জাদি সামান্য খরচে দেশীয় মিস্ত্রী দ্বারা প্রস্তুত করান যায়। ইহার একমাত্র জটিলতা এই যে, কষ এরূপ নিখুঁত ভাবে হওয়া আবশ্যক যে, চর্ম্ম আবার কষ করিতে না হয়। ফলতঃ ইহা রাসায়নিক শিল্প এবং আমাদের দেশে কষ-রসায়নবিদের অভাব নাই। কষ করা চামড়া দেশে উৎপাদন করা খুবই সম্ভবপর; তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, ইতিমধ্যেই এতদ্দেশীয় একটি কোম্পানী এইরূপ চামড়া প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগের মাল দেশে ও বিদেশে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে।

রং সম্বন্ধে কিন্তু ঠিক তাহা বলা চলে না। অবশ্য কতিপয় সচরাচর-প্রচলিত বর্ণে রঞ্জিত চর্ম্ম বিদেশে ব্যবহৃত হইতে পারে; কিন্তু বিলাতী ফ্যাসানের যেরূপ চঞ্চল গতি, তাহাতে কোন নির্দ্দিষ্ট বর্ণে অধিকসংখ্যক চর্ম্ম রঞ্জিত করা দুঃসাহসের কর্ম্ম; কারণ, তদ্রূপ লাট চালান দেওয়ার সময় ফ্যাসান হয় ত বদলাইয়া যাইতে পারে। রং দেওয়ার পরে চামড়াকে আবার মসৃণ কাচখণ্ড দ্বারা পালিশ করিতে হয়।

গোধা-চর্ম্ম-ব্যবসায় অপেক্ষাকৃত নূতন হইলেও ইহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়। দেশীয় ধনী ব্যবসায়ি-বৃন্দের মনোযোগ যদি এই দিকে আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে গোধা-চর্ম্ম-শিল্প এতদ্দেশে অচিরাৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়া ধনাগমের আর একটি অভিনব পন্থা উদ্ঘাটিত হইতে পারে; সঙ্গে সঙ্গে বেকার-সমস্যারও কতকটা সমাধান হয়।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।



ব্যর্থপ্রয়াস

[গল্প]

১

আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না, কি যেন আমার বুকে চাপা ছিল।

রেলগাড়ী বেগে চলিতেছিল, তাহার গতি আমি অনুভব করিতেছিলাম। আমি প্রথম শ্রেণীর আরোহী, নিদ্রা যাইবার সময় গাড়ীতে আর কেহ ছিল না। শীতকাল বলিয়া আমার গায় রগ্-কম্বল ঢাকা ছিল।

চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম, এক জন লোক আমাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়াছে, আর দুই জন তাহার পাশে দাঁড়াইয়া আছে। তিন জনেরই মুখ মুখস দিয়া ঢাকা।

যে দুই জন দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এক জন আমার কাণের কাছে মুখ আনিয়া জোরে বলিল, চেঁচামেচি করো না, কোন রকম গোল করো না, তা হ'লে এখনই তোমাকে মেরে ফেলে গাড়ী থেকে ফেলে দেব। চুপ ক'রে থাকলে তোমার এখন কোন আশঙ্কা নেই।

আমি বলিলাম, বেশ, আমি কোন গোল করব না।

যে আমার বুক চাপিয়াছিল, সে আমাকে ছাড়িয়া দিল। আমি উঠিয়া ব'সিলাম। তিন জনের মধ্যে দুই জন দীর্ঘাকৃতি, এক জন খর্ব্বকায়। এই ব্যক্তি আমার সহিত কথা কহিয়াছিল। বুঝিলাম, এই সর্দ্দার। আমার কাছে যাহা কিছু আছে, কাড়িয়া লইবে, এই জন্য ইহারা আমার কামরায় প্রবেশ করিয়াছে। আমার মনে হইল, যদি কেবল চুরিই ইহাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমাকে জাগাইবার কি প্রয়োজন? আমার নিদ্রিত অবস্থায় ইহারা প্রবেশ করিয়াছিল, নিদ্রাভঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই আমার জিনিষপত্র লইয়া যাইতে পারিত। আমার পকেটে ছিল একটা ঘড়ী, আর একটা ছোট পর্সে কিছু টাকা আর রেলের টিকিট। আমার সঙ্গে বেশী টাকা কিংবা মূল্যবান্ কোন জিনিষ ছিল না।

আমি বলিলাম,—আমার কাছে যা আছে, তোমরা নিয়ে যেতে পার, আমি কোন আপত্তি করব না।

আমি সাহসী, বলবান্, কিন্তু তিন জনের বিপক্ষে আমি একা কি করিব? তিন জনেরই হাতে পিস্তল, গাড়ী থামাই-বার জন্য চেন টানিবার যায়গায় এক জন দাঁড়াইয়া।

খর্ব্বকায় ব্যক্তি বলিল, আমরা যা করব, তার জন্য তোমার অনুমতি আবশ্যক হবে না। তুমি চুপ ক'রে থাক, তা হলেই তোমার মঙ্গল।

গাড়ীর বেগ কমিতে আরম্ভ হইল। এক জন আমাকে ধরিয়া আমার জামার হাত গুটাইয়া উপরে তুলিল, আর এক জন তাহার পিস্তল আমার ললাটের কাছে ধরিল। বেঁটে লোকটি আমার হাতে ছোট পিচকারী ফুটাইয়া কি একটা ঔষধ আমার শরীরের ভিতর দিল। তাহার পর তাহারা আমাকে ছাড়িয়া দিয়া, আমার বিছানা বাঁধিয়া, আমার জিনিষ-পত্র গুছাইতে লাগিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই আমার বাক্‌শক্তি রহিত হইল। একেবারে জ্ঞানশূন্য হইলাম না, কিন্তু এক প্রকার মানসিক জড়তা আমাকে আচ্ছন্ন করিল, মস্তিষ্কের ধারণাশক্তি প্রায় লুপ্ত হইল। চক্ষুর দৃষ্টি রহিল, কিন্তু কি দেখিতেছি, তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারি নাই। কর্ণে শুনিতে পাইতেছিলাম, কিন্তু কি শুনিতেছি, তাহার অর্থ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা ছিল না।

গাড়ী ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইল। তিন জনই মুখস খুলিয়া ফেলিল। ইহাদের কাহাকেও কি কোথাও দেখিয়াছি? চিত্তের স্থিরতার অভাবে বুঝিতে পারিলাম না। বেঁটে লোকটি আমার পকেট হইতে রেলের টিকিট বাহির করিয়া লইল। ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে দীর্ঘাকৃতি দুই ব্যক্তি দুই দিকে আমার দুই হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইল। অপর ব্যক্তি কুলী ডাকিয়া গাড়ী হইতে মালপত্র নামাইয়া লইল। গার্ড আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এঁর কি হয়েছে?

বেঁটে ব্যক্তি বলিল, ওঁর মাঝে মাঝে ফিটের মত হয়, খানিকক্ষণ কথা কইতে পারেন না। আমরা সঙ্গে আছি, ভয়ের কোন কারণ নেই।

ষ্টেশনের বাহিরে একটা বড় মোটর-গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া মাল পিছনের ক্যারিয়রে বাঁধিয়া বেঁটে লোকটি আর এক জন আমার দুই পাশে বসিল। তৃতীয় ব্যক্তি শোফারের পাশে বসিয়া গাড়ী চালাইতে আদেশ করিল। গাড়ীর ভিতরে সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া দিল, কাচের পাশে পর্দা ছিল, টানিয়া দিল। গাড়ীর ভিতরের আলোক জ্বালিয়া দিল। বাহিরে কিছু দেখা যায় না। উত্তম মোটর নিঃশব্দে, দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। কেহ কোন কথা কহিল না।

আমি কিছুই ঠিক বুঝিতে পারিতেছিলাম না। একটা ভাব মনে আসে, আবার তখনই ভুলিয়া যাই। গাড়ী অনেকক্ষণ চলিল, কতক্ষণ, তাহা আমি বলিতে পারিব না। অবশেষে গাড়ী থামিল। আমাকে নামাইলে দেখিলাম, একটি ঘরের দরজার সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইয়াছে। আমাকে একটা বড় ঘরে লইয়া গেল, সেখানে খাট পাতা ছিল। বেঁটে লোকটি আবার আমার হাতে পিচকারী ফুটাইল, আমি অল্পক্ষণের মধ্যেই নিদ্রিত হইলাম।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম, অনেক বেলা হইয়াছে। কোথায় আমি? উঠিয়া আমি ঘরের জানালা খুলিয়া দিলাম। সম্মুখে খানিকটা বাগানের মত, তাহার পর উচ্চ প্রাচীর।

সকল কথা আমার স্মরণ হইল। দেখিলাম, আমার জিনিষপত্র সেই ঘরেই আছে। ঘড়ী পর্স পকেটে রহিয়াছে, সুটকেস, বাক্স খুলিয়া দেখি, জিনিষ সব ঠিক আছে।

আমি বাক্স বন্ধ করিতেছি, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে শুনিলাম, মাল সব ঠিক আছে ত?

চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলাম, সেই বেঁটে লোক। কুঞ্চিত অধরের কোণে শ্লেষপূর্ণ স্মিত হাস্য।

আমি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলাম, যদি আমার জিনিষ নেবার ইচ্ছে না থাকে, তা হ'লে এ রকম ক'রে আমাকে নিয়ে আসায় কি ফল? আমাকে কোথায় এনেছ? আমি মুক্ত না বন্দী?

—অতগুলা প্রশ্ন একসঙ্গে? তা জিজ্ঞাসা যত ইচ্ছে করতে পার, উত্তর পাবে কি না, সে আলাদা কথা। তোমাকে কেন আনা হয়েছে, তা জানতেই পারবে। তুমি হাত-পা বাঁধা বন্দী নও, তবে বাইরে কোথাও যেতে পাবে না। এখন মুখ-হাত ধুয়ে আহারাদি করতে পার। তোমাকে উপবাসী রাখবার আমাদের ইচ্ছে নেই।

আমাকে নাইবার ঘর প্রভৃতি দেখাইয়া দিল। মুখ ধুইয়া চা খাইলাম। দু এক জন চাকর দেখিতে পাইলাম, কিন্তু রাত্রির আর দুই জনকে দেখিতে পাইলাম না। তাহারা কোথায় গেল?

আহারাদি করিয়া আমি বাড়ীর ভিতর ঘুরিয়া দেখিলাম। দুই তিনটি ঘর খোলা, বোধ হয়—আমার ব্যবহারের জন্য। আর সব ঘর ভিতর হইতে বন্ধ, প্রবেশপথ অন্য দিকে। খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, বৈকালবেলা কিছু খাইয়া আমি বাহিরে গেলাম। আমি কি ভাবের বন্দী, জানিবার ইচ্ছা ছিল।

বাহিরে বাগান, কিন্তু অযত্নে চারিদিকে ঘাস জন্মিয়াছে, স্থানে স্থানে আগাছা। বাহিরের ফটক বন্ধ, সেখানে এক জন প্রহরী বসিয়া আছে, তাহার হাতে ভরা বন্দুক। বন্দুক দেখিয়া বুঝিলাম, আমি যথার্থই বন্দী, পলায়নের চেষ্টা করিলে হয় ত আমাকে গুলী করিবে। চারিদিকে ঘুরিয়া দেখিলাম, কোথাও প্রাচীর লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই, হয় সিঁড়ি দিয়া উঠিতে হয় অথবা দড়া বাহিয়া প্রাচীরের বাহিরে যাইতে হয়। সহজে পলায়ন করা অসম্ভব।

এই স্থান কোথায়? কোন্ ষ্টেশনে আমাকে গাড়ী হইতে নামাইয়াছিল? আমার যে ষ্টেশনে নামিবার কথা, সেখানে আমাকে নামায় নাই, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিলাম। কারণ, সেখানে আমার লোক থাকিবার কথা, আমাকে যাহারা এ রকম করিয়া লইয়া আসিয়াছিল, তাহারা ধরা পড়িত।

আমি একটা হিসাব করিবার চেষ্টা করিলাম। আমাকে যখন গাড়ী হইতে নামায়, তখন ষ্টেশনের ঘড়ী দেখিয়াছিলাম। আমার একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল, সে সময় রাত্রি তিনটা। রেলের টাইম-টেবিল খুলিয়া দেখিলাম, ঠিক সেই সময় রামপুর নামে একটা ছোট ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়ায়। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এ বাড়ী ষ্টেশন হইতে কত দূর? আমাকে কেন এমন করিয়া ধরিয়া আনিয়াছে, ইহাদের কি উদ্দেশ্য, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। কোন কোন দেশে এই রকম ধরিয়া লইয়া গিয়া ধৃত ব্যক্তির নিকট টাকা আদায়

করে, টাকা পাইলে ছাড়িয়া দেয়। ইহাদেরও কি সেই উদ্দেশ্য? বেঁটে লোকটা দিন দুই আমাকে কোন কথাই বলিল না।

সকালে বিকালে বাগানে খানিকক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইতাম, কেহ কোন আপত্তি করিত না। সূর্য্যের উদয় ও অস্ত দেখিয়া দিক্ নির্ণয় করিলাম। আকাশে চিল উড়িয়া বেড়াইত, তাহাদের অবারিত গতি দেখিয়া মনে বিষাদ উৎপন্ন হইত, মুক্ত ও বন্দীতে কি প্রভেদ, তাহা অনুভব করিতাম। মধ্যাহ্নের স্তব্ধতায় ঘুঘু ডাকিত, কাঠঠোকরা ক্রমাগত ঠক্-ঠক্ করিয়া শব্দ করিত। বাগানে বেজী, বুনো খরগোস দেখিতে পাইতাম। এক দিন ঘুরিতে ঘুরিতে কয়েকটা সজারুর কাঁটা কুড়াইয়া পাইলাম। বুঝিলাম, সজারুও রাত্রিকালে আসে। প্রাচীরে কোথাও গর্ত্ত করিয়া থাকিবে। খুঁজিয়া দেখিলাম, প্রাচীরের নীচে এক স্থানে সঙ্কীর্ণ গহ্বর আছে, প্রশস্ত করিলে হয় ত সে পথ দিয়া মানুষও বাহির হইতে পারে, কিন্তু তাহা পরিশ্রম ও সময়-সাপেক্ষ। আমার কাছে কোন যন্ত্র নাই, আর আমাকে খনন করিতেই বা দিবে কেন? রাত্রিকালে আমার ঘরে বাহির হইতে তালা দেওয়া থাকিত।

মুক্তির কোন উপায় আমি খুঁজিয়া পাইলাম না।

দিন দুই আমাকে কেহ কিছু বলিল না। খর্ব্বাকৃতি লোকটার সঙ্গে এক আধবার দেখা হইত, এই পর্য্যন্ত। অপর দুই জনকে দেখিতে পাইতাম না। তাহারা এ বাড়ীতে আছে কি না, তাহাও জানিতাম না।

তৃতীয় দিবস রাত্রিতে আহারাদির পর বেঁটে লোকটি আমার ঘরে আসিল; আমার নিকটে না বসিয়া একটু দূরে বসিল। হাত পকেটের ভিতর ছিল। আমি জানিতাম, পকেটে পিস্তল আছে।

সে চিবাইয়া চিবাইয়া বলিল, তোমাকে এখানে নিমন্ত্রণ ক'রে আনা হয় নি, বুঝেছ?

আমি তাচ্ছীল্যভাবে বলিলাম, তা ত বুঝতে পারছি।

—আমি কে, জান?

—পরিচয় না পেলে কি ক'রে জানব? তবে তুমি যে একটা মস্ত লোক, সে ত তোমার চেহারা দেখলেই বোঝা যায়।

আমার কথার শ্লেষ বুঝিতে পারিয়া সে রাগিয়া উঠিল। পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, ইচ্ছে করলে তোমাকে এখনই মেরে ফেলতে পারি কিংবা জখম করতে পারি। কিন্তু তাতে আমার কার্য্যসিদ্ধি হবে না। তুমি কার সঙ্গে কথা কইছ, মনে রেখো। আমি বংশী হালদার।

নাম শুনিয়া আমার আতঙ্ক হইল। মনের ভাব গোপন করিবার চেষ্টা করিলেও আমার মুখ ম্লান হইয়া গেল। বংশী হালদারের নাম কে না শুনিয়াছে? অত বড় দুর্দ্দান্ত, দুর্ব্বৃত্ত, পাষণ্ড দেশে আর ছিল না। তাহার নামে সকলে কাঁপিত, কিন্তু এ পর্য্যন্ত পুলিস তাহার বিরুদ্ধে কোন সাক্ষাৎ প্রমাণ পায় নাই। সকলে মনে করিত, লোকটা দেখিতে দৈত্যের মত হইবে, কিন্তু এই ক্ষুদ্রকায় ব্যক্তি বংশী হালদার? তাহার হাতে পিস্তল না থাকিলে আমি তাহাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে পারিতাম।

আমি কিছু বলিলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম। বংশী হালদার বলিল, তোমাকে দিয়ে আমার একটা কায হ'তে পারে, তাই তোমাকে এখানে এনেছি। আমি যা জানতে চাই, তা ঠিক ঠিক বলবে, তবেই তোমার মঙ্গল, নইলে তোমার নিস্কৃতি নেই।

এবারও আমি কোন কথা কহিলাম না, নীরব রহিলাম।

বংশী হালদার বলিল, দক্ষিণপাড়ার রায়েদের জান?

দক্ষিণপাড়ার রায়েদের জানি না? তাহাদের অত বড় সম্পত্তি, সমস্ত ভার আমার হাতে, আমি সমস্ত দেখি। এ কথা সকলেই জানে, গোপন করিবারও কোন আবশ্যক নাই।

আমি সংক্ষেপে বলিলাম, জানি।

বংশী মুখ বাড়াইয়া অতি কঠোর কণ্ঠে বলিল, আমি না জেনে শুনে তোমাকে এখানে ধ'রে আনি নি। এখন সম্পত্তির অধিকারিণী একটি আইবুড়ো মেয়ে, নাম বনলতা, সুন্দরী, বয়স পনের বছর, স্কুলে পড়ে। তুমি তার অভিভাবক। সেই মেয়ের জন্য আমি একটি পাত্র ঠিক করেছি। এক জাত, গোত্র আলাদা, বয়স অল্প। তার বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু বলবার নেই, তবে সে আমার দলের লোক, তোমাদের পছন্দ না হ'তে পারে। তার সঙ্গে বনলতার বিয়ে দিতে হবে।

লোকটার স্পর্দ্ধা দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিলাম, এত দিন তুমি নিজেকে বড় বাহাদুর মনে করতে, এইবার তোমার দফা শেষ হবে। রায়েদের কত লাঠিয়াল আছে, তার খবর রাখ? তোমার দল নিয়ে একবার তাদের সঙ্গে লাগ না?

বংশী হালদার হাসিল—নিষ্ঠুর, শ্লেষপূর্ণ হাসি। হাসিতে হাসিতে বলিল, তা হ'লে তোমার কি দরকার ছিল? লাঠা-লাঠির ত কোন কথা নয়, কুটুম্বিতার কথা হচ্ছে। তুমি হ'লে ও বাড়ীর সর্ব্বেসর্ব্বা, তুমি বিয়ে দেবে, তাতে আর কে কি বলবে?

আমি কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। উহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলাম। আমাকে ভয় দেখাইয়া অথবা পীড়ন করিয়া রায়েদের সম্পত্তি হস্তগত করিবার চেষ্টা করিবে। তাহার একটা লোকের সঙ্গে বনলতার বিবাহ দিবে। সাহসের ত সীমা নাই! বনলতা সাবালক না হইলে তাহার স্বামী তাহার সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না, এ কথা আমি চাপিলাম।

আমি বলিলাম, তুমি কি বরকর্ত্তা হবে, না বরযাত্রী হয়ে যাবে?

—বর যাবে না, কনেই আসবে। এই বাড়ীতে বর আর পুরুত উপস্থিত থাকবে, তুমি ক'নেকে এইখানে আনাবে। বিয়েতে বিশেষ সমারোহ হবে না, তার পর না হয় ঘটা হবে।

—ক'নে এখানে কি রকম ক'রে আসবে?

—মোটরে ক'রে। তুমি চিঠি লিখে দেবে যে, তুমি একবার বনলতার সঙ্গে দেখা করতে চাও, তা হলেই সে আসবে।

—তুমি ভাবছ, আমি চিঠি লিখে দেব?

—সহজে দেবে না, তা হ'লে রেলগাড়ী থেকে তোমাকে ও রকম ক'রে নিয়ে আসা হ'ল কেন? তুমি অমনি লিখে দেবে, না আর কোন উপায়ে তোমাকে দিয়ে লেখাতে হবে?

—আমি কখনও লিখব না।

—ও কথা এখন বলছ, এর পর লেখবার পথ পাবে না। তোমাকে কাল পর্য্যন্ত সময় দিচ্ছি, কাল রাত্রে যদি চিঠি না লেখ, তা হ'লে বুঝতে পারবে, বংশী হালদার কে।

সে উঠিয়া চলিয়া গেল, বাহির হইতে ঘরে কুলুপ বন্ধ হইল।

আমি বুঝিতে পারিলাম, এ বাড়ী রামপুর ষ্টেশনের নিকটেই বটে। দক্ষিণপাড়া ষ্টেশন হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে। মোটরের রাস্তা আছে।

ইহাও বুঝিলাম যে, পরদিবস হইতে আমার উপর কোন রকম অত্যাচার আরম্ভ হইবে। আমি যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া বংশী হালদারের আদেশমত চিঠি লিখিয়া দিব, তাহা সে স্থির করিয়া রাখিয়াছে। তাহার অসাধ্য কোন কর্ম্মই নাই। আমাকে কি করিবে?

দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া আমি বাক্স হইতে একখানা নোট-বুক বাহির করিলাম। তাহাতে পেন্সিল ছিল। কাগজ ছিঁড়িয়া সমস্ত ঘটনা লিখিলাম। বাড়ীর প্রাচীরের কথা লিখিলাম। রামপুর ষ্টেশন হইতে অধিক দূর নয়, তাহার উল্লেখ করিলাম। আমাকে শীঘ্র উদ্ধার না করিলে আমাকে বিশেষ যাতনা ভোগ করিতে হইবে, তাহা লিখিলাম। জোর করিয়া আমাকে দিয়া চিঠি লিখাইয়া লইতে পারে, সে কথা বলিলাম। পুলিসের সাহায্য লইয়া, রাত্রিতে নিঃশব্দে প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া, বাড়ী ঘেরাও করিয়া বংশী হালদার ও তাহার লোকগুলাকে ধরিয়া আমাকে মুক্ত করিতে লিখিয়া দিলাম।

চিঠি লিখিয়া খামে বন্ধ করিয়া রায়েদের বাড়ীর নায়েবের নাম লিখিলাম। আর এক খণ্ড কাগজে লিখিলাম, যে এই চিঠি কুড়াইয়া পাইবে, অবিলম্বে দক্ষিণপাড়ার রায়েদের বাড়ী লইয়া যাইবে, নহিলে এই বাড়ীতে খুন হইতে পারে।

এই কাগজ-খণ্ড আর পাঁচটি টাকা একখানি ফর্দ্দা রুমালের খুঁটে আঁটিয়া বাঁধিলাম। আর এক দিকে চিঠি বাঁধিলাম। তাহার পর আলো নিভাইয়া শয়ন করিলাম।

আমার দরজার তালা খুব ভোরেই খুলিয়া দিত। আমি সকালবেলা চা খাইয়া যেমন খানিক ঘুরিয়া বেড়াইতাম, সেই রকম পাইচারি করিতে লাগিলাম। যে লোকটা দরজার কাছে বসিয়া থাকিত, সে আমার দিকে পিছন করিয়া মশলা বাটিতেছিল। বন্দুক দেয়ালে হেলানো ছিল।

ঘুরিতে ঘুরিতে বাড়ীর যে অংশটা প্রাচীর হইতে

অপেক্ষাকৃত দূর এবং যেখান হইতে ফটক আড়াল পড়ে, সেই-খানে প্রাচীরের নিকট গমন করিলাম। চারিদিকে আগাছা। একটা নোনা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া আমি পকেট হইতে টাকা ও চিঠি-বাঁধা রুমাল সজোরে প্রাচীরের অপর পারে নিক্ষেপ করিলাম

সন্ধ্যার সময় বংশী হালদার আমার ঘরে আসিল। রেলগাড়ীতে তাহার সঙ্গে আর দুই জনকে দেখিয়াছিলাম, তাহারাও ছিল। আর এক জন লোক নূতন। দীর্ঘ, বিশাল দেহ, কবাটবক্ষ, অসুরের ন্যায় মূর্ত্তি। তাহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম, আমার প্রতি বলপ্রয়োগ করা হইবে।

বংশী হালদারের হাতে দোয়াত, কলম, চিঠি লিখিবার কাগজ, খাম ছিল। আমাকে বলিল, যদি যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পেতে চাও, তা হ'লে ভাল মানুষের মত আমি যা বলছি, লেখ। তোমাকে পাত্রের কথা বলেছিলাম। আমি তাকে সঙ্গে এনেছি। বেশ দেখতে, কুলীন, আর কি চাই?

যে দুই জন বংশী হালদারের সঙ্গে রেলগাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এক জনকে দেখাইয়া দিল। যুবা পুরুষ, দেখিতে মন্দ নয়, তবে চেহারা চোয়াড়ের মত।

আমি বলিলাম, আমি চিঠি লিখব না।

ঘরে একটা ছোট টেবিল ছিল। বংশী দোয়াত, কলম, কাগজ তাহার উপর রাখিল। বলিল, বাঁধ একে।

বলবান্ পুরুষ আমাকে ধরিয়া খাটের উপর ফেলিল। আমি যথাসাধ্য বলপ্রকাশ করিলাম, কিন্তু তাহার তুলনায় আমি শিশু। তিন জনে মিলিয়া আমাকে খাটে চিৎ করিয়া ফেলিয়া এমন ভাবে বাঁধিল যে, আমার নড়িবার ক্ষমতা রহিল না, বিশেষ দুই পা নাড়া একেবারে অসম্ভব হইল।

বংশী হালদার পকেট হইতে কি বাহির করিল। আমি ভাবিলাম, আমাকে যন্ত্রণা দিবার জন্য কোন যন্ত্র বাহির করিতেছে। দেখিলাম, কাগজে জড়ানো দুইটা বড় পালক, আর কিছুই নয়। সেই দুইটা আমাকে দেখাইয়া বংশী বলিল, তুমি ভাবছ, আমরা তোমাকে মারধর করব, তোমাকে পীড়ন করব? সে ভয় নেই। তুমি একটা মাতব্বর লোক, তোমাকে কি কোন রকম কষ্ট দিতে পারি? শুধু তোমার একটু পদসেবা হবে। রাজকুমারী ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যেত, জান ত? তুমি যেন পালকের ঘায়ে মূর্চ্ছা যেও না।

আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পালকে কি আবার যন্ত্রণা হয়? বলবান্ লোকটা আমার পাশে একটা চেয়ারে বসিল। অপর দুই ব্যক্তিকে বংশী হালদার পালক দুইটা দিল। নিজে একটা চেয়ার টানিয়া আমার অপর পাশে বসিল। যাহারা পালক লইয়াছিল, তাহারা আমার পায়ের কাছে দুইখানা চেয়ারে বসিয়া আমার পদতলে পালক বুলাইতে আরম্ভ করিল।

এ কি শাস্তি না কৌতুক? পায়ে সুড়সুড়ি লাগিতেই আমি পা টানিয়া লইবার চেষ্টা করিলাম, পা নাড়িতে পারিলাম না। ক্রমে অস্বস্তি আরম্ভ হইল, তাহার পর যাতনা। সুড়সুড়, সুড়সুড়, সুড়সুড়। বিরাম নাই, বন্ধ নাই। সর্ব্বাঙ্গে যন্ত্রণা হইতে লাগিল, মাথার ভিতর যেন সহস্র কীট দংশন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অসহ্য যন্ত্রণা আরম্ভ হইল, আমি একবার চীৎকার করিয়া উঠিলাম।

বংশী হালদার বলিল, এখন লিখবে?

আমি দন্তে দন্ত চাপিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। সুড়-সুড়ানি চলিতে লাগিল। আমার শরীরের ভিতর, মস্তিষ্কের ভিতর যেন অসংখ্য ঝিঁঝিপোকা ডাকিতে আরম্ভ করিল, সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল।

যাহারা পালক বুলাইতেছিল, তাহারা মাঝে মাঝে বন্ধ করিতে আরম্ভ করিল। পালক হাতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, অথচ আমার যাতনা কিছুই উপশম হয় না। মনে হইতেছিল, এখনও পায় সুড়সুড়ি দিতেছে। একটু যন্ত্রণা লাঘব হইলেই আবার পালক বুলাইতে আরম্ভ করে।

কি ভীষণ শাস্তি, কি অসীম যন্ত্রণা! আমি প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিলাম, তাহার পর চৈতন্য রহিল না। আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

জ্ঞান হইলে দেখিলাম, সকলেই দাঁড়াইয়া আছে, বংশী হালদার নৃশংসের ন্যায় অল্প অল্প হাসিতেছে। বলিল, কেমন? এবার চিঠি লিখতে পারবে?

আমি কোন উত্তর দিলাম না।

বংশী বলিল, একে খুলে দাও।

আমাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া বলবান্ ব্যক্তি আমার হাত টানিয়া আমাকে দাঁড় করাইল। আমার হাত, পা, সর্ব্বাঙ্গ ঠক-ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল, আমি খাটের উপর পড়িয়া গেলাম।

বংশী হালদার বলিল, আজ লিখতে পারবে না, হাতের ঠিক নেই। ওকে খেতে দাও, উপবাসী থাকলে চলবে না। কাল না লেখে, অন্য উপায় করা যাবে। ওর বাপ যে, সে লিখবে। ওকে রাত্রিতে একলা রেখো না।

বলবান্ ব্যক্তিকে বলিল, তুই রাত্রিতে এই ঘরে শুবি।

আমাকে দুধ ও আর কিছু খাওয়াইয়া শয়ন করিতে বলিল। ষণ্ডা লোকটা আর একখানা খাট আনিয়া আমার ঘরে শয়ন করিল।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার শরীরে একটা কম্পের ভাব রহিল। মাথা অনেকক্ষণ পরে স্থির হইল। বুঝিলাম, এখন হইতে আমাকে আর একা থাকিতে দিবে না। যদি চিঠিখানা আগে না ফেলিয়া দিতাম, তাহা হইলে আর সুযোগ হইত না। কেহ কি চিঠি কুড়াইয়া পাইয়াছে? রুমালে টাকা বাঁধা ছিল, টাকা লইয়া কি চিঠিখানা ফেলিয়া দিল? না, রুমালে বাঁধা চিঠি যেমন পড়িয়াছিল, তেমনি পড়িয়া আছে, কেহ দেখিতে পায় নাই? আশায় আশঙ্কায় আমার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। প্রায় রাত্রিশেষে নিদ্রা আসিল। নিদ্রিত হইয়া কত রকম স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম, অনেক বেলা হইয়াছে। ঘরে আর কেহ নাই। অল্প মাথাব্যথা ছাড়া শরীরে আর কোন গ্লানি ছিল না। সকালবেলা যেমন বেড়াইতাম, আজ আর সেরূপ যাইলাম না। ঘরের বাহিরে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। বংশী হালদার কিম্বা আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না।

আহার করিয়া দুপুরবেলা ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় এয়রোপ্লেনের শব্দ শুনিয়া বাহিরে আসিলাম। দেখি, একটা এয়রোপ্লেন খুব নীচু হইয়া বাড়ীর উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। বংশী হালদার ও অপর কয়েক জনও অন্য ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। আমাকে দেখিতে পাইয়া বলিল, তুমি এখানে কেন? তুমি ঘরের ভিতর যাও।

আমি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। এয়রোপ্লেন দুই তিনবার বাড়ীর উপর দিয়া গেল। শব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, এয়রোপ্লেন খুব নীচে দিয়া যাইতেছে।

আমি বুঝিতে পারিলাম, এয়রোপ্লেন হইতে কোন ব্যক্তি লক্ষ্য করিয়া বাড়ী দেখিতেছে। আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলাম, হয় ত আমাকেও দেখিয়া থাকিবে।

বংশী হালদার অনেক খবর রাখিত, কিন্তু সকল কথা জানিত না। দক্ষিণপাড়া হইতে ত্রিশ মাইল দূরে একটা এয়রোপ্লেন রাখিবার স্থান ছিল,—যাহাকে এরোড্রোম বলে। সেখানে কয়েকটা এয়রোপ্লেন ছিল। বনলতা মেমের কাছে ইংরাজী পড়িত, পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে সংস্কৃত পড়িত। ইংরাজীতে খুব সুন্দর কথা কহিতে পারিত। এয়রোপ্লেনে ওঠা তাহার একটা বাতিক ছিল, আমাকেও কয়েকবার ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। এয়রোপ্লেন হইতে রায়েদের বাড়ী পর্য্যন্ত টেলিফোন ছিল, যখন তখন টেলিফোনে কথা হইত। এরোড্রোমের সকলেই বনলতাকে আর আমাকে বিশেষরূপে চিনিত।

এয়রোপ্লেন দেখিয়াই আমি চিনিয়াছিলাম। হয় ত বনলতা নিজেই তাহাতে ছিল। সেই থাকুক, বাড়ী যে চিনিয়া গিয়াছে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। আমার মুক্তির আর বড় বিলম্ব নাই।

বৈকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল, মেঘগর্জ্জনে দিগন্ত পরিপূরিত হইল। মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর বংশী হালদার কলম লইয়া আসিল, বলিল, এবার কি বল? চিঠি লিখে দেবে?

আমি বলিলাম, আর আমার আপত্তি নেই। বনলতা আমার মেয়ে নয়, আমি কেন তার জন্য যন্ত্রণা ভোগ করি? তার অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে।

বংশী হাসিয়া বলিল, এইবার পথে এস। আজ রাজি না হ'লে আর এক রকম সুখ টের পাবে।

আমি বলিলাম, আজ রাত্রি থাক, কাল সকালবেলা লিখে দেব।

—কেন, এখন লিখতে কি হয়েছে?

—এখনও আমার হাত ঠিক হয় নি, লিখতে কাঁপছে, তা হ'লে তারা কিছু সন্দেহ করতে পারে। এই দেখ,—বলিয়া আমি দোয়াত-কলম লইয়া কাগজে কয়েক ছত্র লিখিলাম। লেখা বাঁকাচোরা হইল। যাহার সহিত বনলতার বিবাহ হইবার কথা, সে বোধ হয় উহাদের মধ্যে পণ্ডিত। আমার লেখা তুলিয়া লইয়া দেখিয়া বলিল, এ চলবে না, গোল হ'তে পারে। কাল রাত্রিতে একটু বেশী চাপ দেওয়া হয়েছিল। হাতের লেখা সহজ হওয়া চাই।

বংশী হালদার বলিল, ন্যাকামি করছে না ত?

আমি বলিলাম, তোমাদের সামনেই ত লিখেছি, আমার হাত এখনও কাঁপে।

—আচ্ছা, এখন থাক, কাল সকালবেলা বেশ ভাল ক'রে লিখে দেবে।

আজ রাত্রিতে আমার ঘরে কেহ রহিল না। বংশী হালদারের বিশ্বাস হইয়াছিল যে, আমি যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার আদেশ পালন করিতে স্বীকৃত হইয়াছি, আর আমি কোন আপত্তি করিব না।

রাত্রি দশটার সময় আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। আমার শরীরে এখনও ক্লান্তি ছিল, আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

গভীর রাত্রিতে আমার দরজায় প্রচণ্ড আঘাত হইল, কব্জা ভাঙ্গিয়া দরজা খুলিয়া গেল। আমি খাট হইতে লাফাইয়া উঠিলাম। একটা টর্চ্চের আলো আমার মুখে পড়িল। কে বলিল, এই যে গৌরবাবু? আপনাকে বেশী পীড়ন করে নি ত?

আমার নাম গৌরমোহন দত্ত। আমি বলিলাম, সে কথা বলছি। সব ধরা পড়েছে? কে কে এসেছে?

—সব ধরা পড়েছে। নায়েব মশায় এসেছেন, পুলিসের ইন্সপেক্টর আছে। কুড়ি জন ল্যাঠিয়াল, দশ জন পুলিস। ফটকের কাছে একটা লোক বন্দুক নিয়ে থাকে, তাকে বাঁধা হয়েছে।

দেখিতে দেখিতে সব ঘরে বারান্দায় আলোক জ্বলিয়া উঠিল। আমাকে একটা বড় ঘরে লইয়া গেল। নায়েব আর ইন্সপেক্টর আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার উপর কোনরূপ অত্যাচার হইয়াছিল কি না। আমি আদ্যোপান্ত সব কথা বলিলাম। বংশী হালদার, তাহার অনুচরগণ সকলেই গ্রেপ্তার হইয়াছে। বাড়ীর খানাতল্লাসী করিয়া সমস্ত জিনিষ পাওয়া গেল। অনেকগুলা পালক, শরীরে যন্ত্রণা দিবার কয়েক রকম যন্ত্র, চর্ম্ম ভেদ করিয়া ঔষধ দিবার পিচকারী সব বাহির হইল। ইন্সপেক্টর হাতে হাত ঘষিয়া বলিল, হালদার মশায়, এত দিনে তোমাকে পাওয়া গিয়েছে। সাতটি বছর ত শ্রীঘর যাও, তার পর বেরুলেও আমাদের হাত থেকে কখন ছাড়ান পাবে না। তোমার বিষ-দাঁত একে একে সব ভেঙ্গে দেব।

আমি আর এক জনকে দেখাইয়া দিয়া বলিলাম, এঁকে চেন? ইনি বনলতার বর। হালদার মশায় ঘটক।

বটে? বলিয়া ইন্সপেক্টর সেই যুবককে বুট শুদ্ধ এত জোরে লাথি মারিল যে, সে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল।

তখন আমারও হাত নিশপিষ করিতে লাগিল। বলিলাম, হালদার মশায়ের বাঁধন একবার খুলে দাও, ওঁর সঙ্গে আমার একটা হিসেব মেটাবার আছে।

এক জন পাহারাওয়ালা বংশী হালদারের হাত খুলিয়া দিল। আমি বলিলাম, আমার হাতে পিচকারী, ওষুধ, পালক কিছু নেই, শুধু আমার দুই হাত আছে। আমি তোমার রক্তপাত করব না, নাক দাঁত ভাঙ্গব না, কিন্তু বংশীবদন, গৌরমোহনের আর একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

ঘুসি-বিদ্যা আমার শেখা ছিল। দুই হাতের আস্তীন গুটাইয়া আমি বংশী হালদারের পাঁজরে এক ঘুষি মারিলাম। সে কোঁক করিয়া একটা শব্দ করিয়া বসিয়া পড়িল।

আমি জুতার ঠোকর দিয়া তাহাকে তুলিলাম। তাহার মুখ বাদ দিয়া তাহার বুকে পাঁজরে কয়েকটা ঘুষি মারিলাম। সে মাটীতে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

বংশী হালদারের দলে যে কয় জন ছিল, সকলের উত্তম-মধ্যম হইল। তাহার পর সকলকে বাঁধিয়া লইয়া গেল। বাড়ী হইতে কিছু দূরে তিন চারিটা বড় বড় বাস দাঁড়াইয়াছিল। তাহাতে পুরিয়া পুলিস ডাকাতদের সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল।

নায়েব আমাকে বলিল, দিদিমণি আপনাকে দেখবার জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছেন। নিজের গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আমি বলিলাম, চল, এখানে থাকবার আর কোন প্রয়োজন নেই।

মোটরের পিছনে আমার জিনিষপত্র বোঝাই করিয়া আমি রায়েদের অট্টালিকায় গমন করিলাম। রাত্রি তখন চারিটা বাজিয়াছে। বনলতা সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যায় নাই, আমি আসিয়াছি শুনিয়াই ছুটিয়া আসিয়া আমার গলা জড়াইয়া বলিল, কাকা বাবু, তোমার উপর কোন অত্যাচার করে নি ত?

আমি বলিলাম, সে কিছুই নয়। আর একটু হ'লে তোমাকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিয়ে দিত।

বনলতা উস্কোখুস্কো মাথা নাড়িয়া বলিল, আমার বিয়ে তুমি দেবে, ওরা কোথাকার কে?

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ (৪)

জ্ঞেয়ত্ব (অব্যক্তকে জানিতে হইবে, এরূপ কথা), অবচনাৎ চ (বলা হয় নাই—এজন্য অব্যক্তকে সাংখ্যের প্রকৃতি বলা যায় না)।

সাংখ্যদর্শনে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতি ও পুরুষের পার্থক্য জানিলে মোক্ষলাভ হয়। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কে জানিলে উভয়ের মধ্যে কি প্রভেদ, তাহা জানা যায়। অতএব প্রকৃতিকে জানিতে হইবে, ইহা সাংখ্যদর্শনের অভিপ্রায়। কিন্তু কঠোপনিষদে যে অব্যক্তের উল্লেখ আছে, তাহাকে জানিতে হইবে, এরূপ কোনও উপদেশ উপনিষদে কোথাও দেখা যায় না। অতএব এই অব্যক্ত সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি হইতে ভিন্ন।

বদতি ইতি চেৎ ন প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ (৫)

শঙ্কর-ভাষ্য—বদতি (অব্যক্তকে জানিতে হইবে, এই কথা উপনিষদ বলেন), ইতি চেৎ (যদি কেহ এরূপ আপত্তি করেন), ন (না, তাহা ঠিক নহে), প্রাজ্ঞো হি (উপনিষদ যাহাকে জানিবার কথা বলিয়াছেন, তিনি পরমাত্মা), প্রকরণাৎ (যে প্রকরণে এই বাক্য আছে, সেই প্রকরণে ব্রহ্মের কথাই হইতেছে)।

কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে—

অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্
তথাঽরসম্ নিত্যম্ অগন্ধবৎ চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবম্
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥

"উহা শব্দহীন, স্পর্শহীন, রূপহীন, ব্যয়হীন, রসহীন, নিত্য, গন্ধহীন, অনাদি, অনন্ত, মহত্তের পরবর্তী তত্ত্ব, ধ্রুব। তাহাকে জানিলে মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।"

সাংখ্যদর্শনেও প্রকৃতিকে মহত্তের পরবর্তী তত্ত্ব বলা হইয়াছে, এবং ইহার শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি গুণ নাই, ইহাও বলা হইয়াছে। এজন্য মনে হইতে পারে যে, কঠোপনিষদের এই বাক্যে সাংখ্যের প্রকৃতিকেই জ্ঞেয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কঠোপনিষদের এই বাক্যের পূর্বে আছে, "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ" অর্থাৎ পুরুষের (পরমাত্মা) পরে কিছুই নাই, তাহাই পরম গতি। অধিকন্তু ইহাও বলা হইয়াছে "এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়োঽত্মা ন প্রকাশতে" অর্থাৎ এই পরমাত্মা সকল প্রাণীর মধ্যে গূঢ়ভাবে বিদ্যমান থাকেন, প্রকাশ পান না। অতএব এখানে পরমাত্মার প্রকরণ হইতেছে এবং তাঁহাকেই "নিচায্য" অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বলিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিকে জানিলে মোক্ষলাভ হইবে, এরূপ কথা উপনিষদেও নাই, সাংখ্যদর্শনেও নাই। সাংখ্যে ইহা বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কে জানিলে মোক্ষ হয়, কেবলমাত্র প্রকৃতিকে জানিলে মোক্ষ হয়, ইহা বলা হয় নাই।

রামানুজও এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, উপনিষদে অন্যত্রও এ কথা বলা হইয়াছে যে, পরমাত্মার শব্দ স্পর্শ রূপ প্রভৃতি নাই। যথা—

যত্তদদ্রেশ্যম্ অগ্রাহ্যম্ ইত্যাদি।

"তাহাকে দর্শন করা যায় না, গ্রহণ করা যায় না।"

ত্রয়াণামেব চ এবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ (৬)

এখানে তিনটি বস্তুর উল্লেখ এবং তিনটি বিষয়ের প্রশ্ন আছে।

(শঙ্কর) নচিকেতা যমকে তিনটি বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—অগ্নি বিষয়ে, জীবাত্মা বিষয়ে এবং পরমাত্মা বিষয়ে। এতদ্ভিন্ন অব্যক্ত বা প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করেন নাই। সুতরাং প্রকৃতি সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হয়। অগ্নি সম্বন্ধে নচিকেতা এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—

স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো
প্রব্রূহি ত্বং শ্রদ্দধানায় মহ্যম্।

"হে মৃত্যো, যে অগ্নির উপাসনা করিয়া স্বর্গলাভ করা যায়, আপনি সেই অগ্নির তত্ত্ব অবগত আছেন। আমাকে বলুন, আমি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিব।"

জীবাত্মা বিষয়ে নচিকেতা এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥

"মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থা সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, কেহ বলেন, মৃত্যুর পরও আত্মা থাকে, কেহ বলে, থাকে না। আপনার উপদেশ পাইয়া আমি ইহা জানিতে ইচ্ছা করি। ইহাই তৃতীয় বর।"

পরমাত্মা বিষয়ে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—

অন্যত্র ধর্ম্মাৎ অন্যত্র অধর্ম্মাৎ
অন্যত্র অস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ
যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ॥

"যাহা ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম্ম হইতেও ভিন্ন, যাহা কার্য্য ও কারণ হইতে ভিন্ন, যাহা ভূত ও ভবিষ্যৎ হইতে ভিন্ন, তাহা আপনি জানেন, তাহা বলুন।"

আপত্তি হইতে পারে যে, যম নচিকেতাকে তিনটি বর দিয়াছিলেন—(১) পিতার প্রসন্নতা, (২) অগ্নিবিদ্যা, (৩) মৃত্যুর পর জীবের অবস্থা। যদি জীব ও পরমাত্মা এই দুইটি বিষয়ে উপদেশ থাকে, তাহা হইলে তিনটি বরের স্থলে চারিটি বর আসিয়া পড়ে। এই আপত্তি' উত্তর এই যে, জীব ও পরমাত্মা বাস্তবিক এক বস্তু, এ জন্য জীব ও পরমাত্মা একই প্রশ্নের অন্তর্গত বলা যায়।

রামানুজ বলেন, এখানে যে তিনটি বস্তুর উল্লেখ আছে, তাহারা হইতেছে—(১) উপায়, (২) উপেয় ও (৩) উপেতৃ। উপেয়,—যাহাকে পাইতে হইবে, তিনি ব্রহ্ম। উপেতৃ,—যিনি পাইবেন, তিনি জীব। উপায়,—যাহা দ্বারা পাওয়া যাইবে, তাহা অগ্নিবিদ্যা। বেদবিহিত কর্ম্ম এবং উপাসনা উভয়ের অনুষ্ঠান দ্বারা মোক্ষলাভ করা যায়।

মহদ্বচ্চ (৭)

(শঙ্কর) সাংখ্যদর্শনে 'মহৎ' শব্দের অর্থ বুদ্ধি। কিন্তু উপনিষদে 'মহৎ' শব্দ বুদ্ধি অর্থে প্রয়োগ করা হয় নাই। কঠোপনিষদে "বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ" এখানে জীবাত্মার বিশেষণরূপে মহৎ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে; আবার "মহান্তং বিভুমাত্মানং" এখানে পরমাত্মার বিশেষণরূপে মহৎ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। সেইরূপ "অব্যক্ত" শব্দ সাংখ্যদর্শনে যদিও প্রকৃতিকে বুঝায়, কিন্তু উপনিষদে অন্য অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

চমসবদবিশেষাৎ (৮)

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে এই শ্লোকটি আছে,—

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥

"একটি লোহিতশুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণের অজা সমানরূপসম্পন্ন বহু সন্তান প্রসব করে। তাহাকে ভোগ করিবার জন্য একটি অজ একত্র শয়ন করে। অপর অজ তাহাকে ভোগ করিয়া ত্যাগ করে।"

মনে হইতে পারে যে, এখানে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ও পুরুষের কথাই হইতেছে। 'অজা' যাহার জন্ম নাই, ইহা প্রকৃতির নাম। লোহিত রজোগুণ, শুক্ল সত্ত্বগুণ, কৃষ্ণ তমোগুণ। যে অজ ভোগ করে, সে সংসারী পুরুষ; যে ত্যাগ করে, সে মুক্ত পুরুষ। কিন্তু এই শ্লোকে যে সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। বেদান্তের প্রকৃতি ও জীবকেও এখানে লক্ষ্য করা সম্ভব। যে সকল লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, সে সকল লক্ষণ সাংখ্যের প্রকৃতি এবং পুরুষ সম্বন্ধেও বলা যায়, বেদান্তের প্রকৃতি এবং জীব সম্বন্ধেও বলা যায়। লক্ষণগুলি উভয় ক্ষেত্রেই সাধারণ "অবিশেষাৎ"। "চমসবৎ"—যেরূপ বেদে বলা হইয়াছে, "অর্ব্বাগ্ বিলঃ চমসঃ ঊর্দ্ধবুধ্ন"—নিম্নে ছিদ্রযুক্ত এবং ঊর্দ্ধে 'বুধ্ন'-(তাতল) যুক্ত চমসের কথা আছে। ইহা কোনও বিশেষ প্রকারের চমসকে নির্দ্দেশ করিতেছে না, যে-কোনও চমসকে বুঝাইতেছে। সেই প্রকার এখানেও

কোনও বিশেষ রকমের প্রকৃতি ও পুরুষকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহা বলা যায় না। সাংখ্য বা বেদান্ত যে কোনও দর্শনের প্রকৃতি ও পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলা যায়।

রামানুজও এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা সাংখ্যে উক্ত হইয়াছে ; বেদান্ত এবং গীতারও এই মত (উপনিষদ ও গীতা হইতে অনেক অংশ উদ্ধৃত করিয়া তিনি ইহা দেখাইয়াছেন)। প্রভেদের মধ্যে সাংখ্য বলেন যে, প্রকৃতি কাহারও অধীন নহে ; বেদান্ত বলেন যে, প্রকৃতি ব্রহ্মের অধীন।

জ্যোতিরুপক্রমা তু তথা হি অধীয়তে একে (৯)

(শঙ্কর) জ্যোতিরুপক্রমা (জ্যোতি অর্থাৎ অগ্নি, উপক্রমে অর্থাৎ প্রথমে, যাহার—অগ্নি, জল এবং পৃথিবীরূপ ভূতত্রয়), তথা হি অধীয়তে একে (এইরূপ বেদের এক শাখায় পাঠ করা হয়)।

ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, অগ্নি, জল এবং পৃথিবী ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় এবং তাহাদের রূপ যথাক্রমে লোহিত, শ্বেত এবং কৃষ্ণ।

যদগ্নেঃ রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং, যচ্ছুক্লং তদপাং, যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য অর্থাৎ অগ্নির যে রোহিত (লোহিত) রূপ, তাহা তেজের রূপ ; যে শ্বেত রূপ, তাহা জলের ; যে কৃষ্ণরূপ, তাহা অন্নের (পৃথিবীর)।

যে অগ্নিকে আমরা চক্ষু দিয়া দর্শন করিতে পারি (স্থূল অগ্নি), তাহার মধ্যে সূক্ষ্ম অগ্নি, সূক্ষ্ম জল এবং সূক্ষ্ম পৃথিবী এই তিনটি সূক্ষ্ম ভূতই বিদ্যমান আছে। এই তিনটি সূক্ষ্ম ভূতের লোহিত, শ্বেত এবং কৃষ্ণ রূপ স্থূল অগ্নির মধ্যে দেখা যায়।

পূর্ব্বের সূত্রে অজা সম্বন্ধে লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণের উল্লেখ আছে। এখানেও বলা হইয়াছে যে, সূক্ষ্ম অগ্নি, জল ও পৃথিবীর সেই তিনটি বর্ণ আছে। এজন্য বুঝিতে হইবে যে, এই তিনটি সূক্ষ্ম ভূতের বর্ণই "অজা" সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। পরমেশ্বরের যে শক্তি হইতে এই তিনটি সূক্ষ্ম ভূতের উৎপত্তি হয়, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া অজা শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

রামানুজ এই সূত্রের অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। শ্রুতিতে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে "তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" (দেবগণ তাঁহাকে জ্যোতির জ্যোতি বলিয়া জানিতেন)। "অথ যদ্ অতঃ পরো দিবো জ্যোতিঃ দৃশ্যতে" (স্বর্গের উপরে যে জ্যোতিঃ দেখা যায়)। এই ভাবে উপনিষদে জ্যোতিঃ শব্দ দ্বারা ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। 'জ্যোতিরুপক্রমা' শব্দের অর্থ 'যাহা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে'। এই 'অজা' যে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, ঐরূপ কথা বেদের একটি শাখায় পাঠ করা যায়। তৈত্তিরীয়নারায়ণ উপনিষদে জীবের হৃদয়ের মধ্যে উপাস্যরূপে ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, তাঁহা হইতে নিখিল জগতের উৎপত্তি হয় এবং তাহার পর "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটি প্রায় অবিকল পাওয়া যায়। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এই অজাও ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হয়। অতএব সাংখ্যদর্শনে যে প্রধানের উল্লেখ আছে, যাহা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র, সেই প্রধানকে অজা শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না। রামানুজ বলেন যে, এই উপনিষদ্-বাক্যে প্রকৃতিকে ছাগরূপে কল্পনা করা হয় নাই।

কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ (১০)

(শঙ্করভাষ্য) "কল্পনোপদেশাৎ" কল্পনার উপদেশ হেতু (এইরূপ বলা হইয়াছে), "মধ্বাদিবৎ" যেরূপ মধু প্রভৃতি বলা হইয়াছে, "অবিরোধঃ" এজন্য বিরোধ নাই।

আপত্তি হইতে পারে যে, ঈশ্বরের শক্তিকে কিরূপে অজা বলা যাইতে পারে ? ইহার অজার (ছাগীর) ন্যায় আকৃতিও নহে, এবং ইহা জন্মরহিতও নহে (অজ-জন্মরহিত), ইহার উত্তর এই যে, ঈশ্বরের শক্তিকে এখানে অজা (ছাগী) বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র। বহু সন্তানপ্রসবকারী ছাগীকে কোনও ছাগ উপভোগ করে, কোনও ছাগ ত্যাগ করে। সেইরূপ বহুবিকারজননী প্রকৃতিকে কোনও জীব (বদ্ধ জীব) উপভোগ করে, কোনও জীব (মুক্ত জীব) ত্যাগ করে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—"অসৌ আদিত্যো দেবমধু" অর্থাৎ এই সূর্য্য দেবগণের মধুর ন্যায়। এখানে সূর্য্য যদিও বাস্তবিক মধু নহে, তথাপি সূর্য্যকে মধুরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। বেদে অন্যত্র বাক্‌কে ধেনুরূপে, স্বর্গলোককে অগ্নিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এখানেও সেইরূপ প্রকৃতিকে ছাগীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

(রামানুজ ভাষ্য) প্রকৃতিকে অজা (জন্মরহিত) বলিলে, আবার তাহাকে জ্যোতিরুপক্রমা (ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন), ইহা বলা যায় না; কারণ, এই দুইটি কথা পরস্পর বিরুদ্ধ। ইহার উত্তর এই যে, প্রকৃতির দুইটি অবস্থা আছে,—কারণ-অবস্থা এবং কার্য্য-অবস্থা। প্রকৃতির যে অবস্থা হইতে জগতের উৎপত্তি হয়, তাহা কারণ-অবস্থা, সৃষ্টির পর প্রকৃতি যে অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে, তাহা কার্য্য-অবস্থা। প্রকৃতি একই, কেবল অবস্থার ভেদমাত্র। প্রকৃতির কারণ-অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া "অজা" বলা হইয়াছে এবং কার্য্য-অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া "জ্যোতিরুপক্রমা" বলা হইয়াছে। "কল্পনোপদেশাৎ" কল্পনা অর্থাৎ সৃষ্টির উপদেশ হেতু। "মধ্বাদিবৎ" সূর্য্য যেরূপ সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতির মধ্যে অপর দেবগণের সহিত একরূপে অবস্থান করেন, সৃষ্টির পর দেবগণের ভোগ্য হয়েন বলিয়া মধুরূপে কল্পনা করা হয়, এখানেও সেইরূপ।

ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাচ্চ (১১)

"সংখ্যার উপসংগ্রহ" হেতু (সাংখ্যোক্ত তত্ত্বগুলি গ্রহণ করা যায় না), "নানাভাবাৎ" অর্থাৎ এই বস্তুগুলি বিভিন্ন স্বভাবের বলিয়া, "অতিরেকাচ্চ" সংখ্যাধিক্য হইয়া যায়, এই কারণেও।

শঙ্করভাষ্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই বাক্যটি আছে,—

যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ।
তমেব মন্যে আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্॥

"যাহার মধ্যে পাঁচটি "পঞ্চজন" এবং আকাশ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাকেই আত্মা ব্রহ্ম ও অমৃত বলিয়া মনে করি— তাহাকে জানিলে অমৃতত্ব লাভ হয়।"

এখানে পাঁচটি "পঞ্চজনের" অর্থাৎ পঞ্চবিংশতিসংখ্যক পদার্থের উল্লেখ আছে। সাংখ্যদর্শনেও উক্ত হইয়াছে যে, জগতে সর্ব্বসমেত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব আছে,—প্রকৃতি, মহৎ (অর্থাৎ বুদ্ধি), অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র (যে পাঁচটি সূক্ষ্ম বস্তু হইতে পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয়, তাহাদিগকে পঞ্চতন্মাত্র বলা হয়), পঞ্চভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, পুরুষ। এরূপ মনে হইতে পারে যে, উক্ত উপনিষদ্বাক্যে যে পঞ্চবিংশতি বস্তুর উল্লেখ আছে, তাহারাই সাংখ্যদর্শনের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। সাংখ্যদর্শনে যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ আছে, তাহারা নানাবিধ বস্তু, তাহাদিগকে পাঁচটি পাঁচটি করিয়া একত্র উল্লেখ করিবার কোনও কারণ নাই। অধিকন্তু উপনিষদে পঞ্চবিংশতি পদার্থ ব্যতীত আরও দুইটি পদার্থের উল্লেখ আছে,—আকাশ ও আত্মা। সুতরাং উপনিষদে তত্ত্বের সংখ্যা সপ্তবিংশতি, সাংখ্যমতের সহিত মিল নাই।

রামানুজও এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ (১২)

"পঞ্চজন" শব্দ প্রাণ প্রভৃতি পাঁচটি বস্তুকে বুঝাইতেছে। "বাক্যশেষাৎ" কারণ, বাক্যের শেষে এই পাঁচটি বস্তুর উল্লেখ আছে।

পূর্ব্বসূত্রে যে উপনিষদ্বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পরে আছে,—"প্রাণস্য প্রাণম্ উত চক্ষুষশ্চক্ষুঃ উত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্ উত অন্নস্য অন্নং মনসো যে মনো বিদুঃ"—যাহারা সেই প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, অন্নের অন্নকে জানেন (এখানে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হইতেছে)। প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, অন্ন ও মন এই পাঁচটি বস্তুকে পঞ্চজন শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অথবা দেব, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও রাক্ষসকে পঞ্চজন বলা হইয়াছে। অথবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ এই পাঁচ বর্ণ।

জ্যোতিষা একেষাম্ অসতি অন্নে (১৩)

শুক্লযজুঃ—বেদের কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন দুইটি শাখা আছে। পূর্ব্বসূত্রোক্ত উপনিষদ্বাক্যটি মাধ্যন্দিন শাখায় পাওয়া যায়। কাণ্বশাখাতে এই বাক্যটি একটু পরিবর্ত্তিতরূপে পাওয়া যায়,—"অন্নস্য অন্নম্" এই বাক্যটি কাণ্বশাখাতে পাওয়া যায় না; অতএব কাণ্বশাখাতে চারিটি বস্তু পাওয়া যাইতেছে, কাণ্বশাখা অনুসারে "পঞ্চজনা" শব্দের কিরূপ ব্যাখ্যা হইবে? ইহার উত্তর এই যে, কাণ্বশাখাতে "জ্যোতি"র দ্বারা পঞ্চসংখ্যা পূরণ করিতে হইবে। কারণ, এই বাক্যের পূর্ব্বে আছে, "তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" দেবগণ তাঁহাকে জ্যোতিঃসমূহের জ্যোতিঃ মনে করেন। "জ্যোতিষা" জ্যোতিঃ শব্দের দ্বারা, "একেষাং" এক-শাখাবলম্বিগণের, "অসতি অন্নে" তাঁহাদের শ্রুতিবাক্যে অন্ন নাই বলিয়া।

রামানুজ বলেন যে, কাণ্বশাখায় পঞ্চজন শব্দ পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে বুঝাইতেছে, কারণ, পূর্ব্বে জ্যোতিঃ শব্দ আছে,

জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রকাশক, ইন্দ্রিয়-সকল বিষয়-সমূহকে প্রকাশ করে বলিয়া জ্যোতিঃ শব্দে অভিহিত হইয়াছে। প্রাণ—ত্বক্-ইন্দ্রিয়; মনঃ—ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় এবং রসনা-ইন্দ্রিয়। এই ভাবে অন্নের উল্লেখ না থাকিলেও পাঁচটি ইন্দ্রিয় পাওয়া যায়।

কারণত্বেন চ আকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ (১৪)

বিভিন্ন উপনিষদে জগৎসৃষ্টি বিভিন্ন প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে—"আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" আত্মা (ব্রহ্ম) হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছিল। অর্থাৎ আকাশের সৃষ্টিই সর্ব্বপ্রথমে হইয়াছিল। আবার ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—"তৎ তেজঃ অসৃজত" (সেই ব্রহ্ম তেজ সৃষ্টি করিলেন), ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে, তেজের সৃষ্টিই সর্ব্বপ্রথম। প্রশ্নোপনিষদে আছে—"স প্রাণম্ অসৃজত। প্রাণাৎ শ্রদ্ধাম্" অর্থাৎ ঈশ্বর প্রাণ সৃষ্টি করিলেন, প্রাণ হইতে শ্রদ্ধা। ইহা হইতে মনে হয়, প্রাণই প্রথমে সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সকল আপাততঃ বিরোধী বাক্যকে লক্ষ্য করিয়া সূত্রকার বলিয়াছেন—"কারণত্বেন চ আকাশাদিষু"—যে সকল বাক্যে ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলা হইয়াছে, সেই সকল বাক্যে আকাশ প্রভৃতি ক্রমনির্দ্দেশে পার্থক্য দেখা যায়, এজন্য মনে হইতে পারে যে, বাস্তবিকপক্ষে ব্রহ্ম জগতের কারণ নহেন। কিন্তু এই অনুমান ভ্রান্ত। "যথা ব্যপদিষ্টোক্তেঃ" সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম জগতের কারণ বলিয়া সকল উপনিষদেই উক্ত হইয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্ম যে জগতের কারণ, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। কোন্ পদার্থের সৃষ্টি প্রথমে হইয়াছিল, এ বিষয়ে যে বিরোধ দেখা যাইতেছে, তাহার সমাধান ব্রহ্মসূত্রে পরে করা হইয়াছে।

রামানুজের ব্যাখ্যা অন্যপ্রকার। 'আকাশাদিষু কারণত্বেন' আকাশ প্রভৃতির কারণরূপে, 'যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ'—যথা-ব্যপদিষ্ট, যেরূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মের উল্লেখ আছে, তিনিই উক্ত হইয়াছেন বলিয়া। সর্ব্বজ্ঞ শক্তিমান্ ব্রহ্মকেই কোথাও আকাশের, কোথাও তেজের কারণ বলা হইয়াছে। এজন্য অচেতন প্রকৃতি কারণ হইতে পারেন না।

মধ্ব বলিয়াছেন যে, যথাবর্ণিত ব্রহ্মই আকাশ প্রভৃতির মধ্যে কারণরূপে অবস্থান করেন। তাঁহার মতে "য আকাশে তিষ্ঠন্" যিনি আকাশে অবস্থান করেন; ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

সমাকর্ষাৎ (১৫)

উপনিষদে কোথাও জগতের কারণকে অসৎ বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহার পরে সেই অসৎ বস্তুকেই 'সমাকর্ষণ' করিয়া অর্থাৎ তাহারই প্রসঙ্গ অনুসরণ করিয়া সেই অসৎ বস্তুকেই সত্য বস্তু বলা হইয়াছে। যথা—তৈত্তিরীয় উপনিষদে প্রথমে বলা হইল, "অসৎ বা ইদম্ অগ্র আসীৎ"—অর্থাৎ ইহা (এই জগৎ) পূর্ব্বে অসৎ ছিল, তাহার পরে বলা হইল, "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়," অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব, এবং পরিশেষে বলা হইয়াছে "তৎ সত্যম্ ইতি আচক্ষতে" অর্থাৎ তাহাকে সত্য বলা হয়। অতএব বুঝিতে হইবে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম নাম ও রূপ গ্রহণ করিয়া বহু রূপ ধারণ করেন নাই বলিয়া ব্রহ্মকে অসৎ বলা হইয়াছে, কোনও অস্তিত্বহীন পদার্থকে লক্ষ্য করা হয় নাই।

রামানুজ বলিয়াছেন—"অসৎ বা ইদম্ অগ্র আসীৎ" এই বাক্যে ব্রহ্মেরই সমাকর্ষণ হইয়াছে, তাহার পরবর্ত্তী বাক্য আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়।

মধ্ব বলিয়াছেন যে, যে শব্দগুলি পরমাত্মাকেই বুঝায়, সেই শব্দগুলিকেই সমাকর্ষণ করিয়া অন্য অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (এম্, এ)।

অর্থী কবি

যা' কিছু সুন্দর তুমি দিয়েছ আমারে,
অনর্থ জানিয়া অর্থ দাও নাই মোরে;
এই অর্থ নাই ব'লে সব অর্থহীন,
অর্থ বিনা অর্থী কবি হইল বিলীন।

শ্রীঅন্নপূর্ণ ভট্টাচার্য্য (বি, এস্‌সি)।



। উপন্যাস

দুই দল পরীর কথা। এক দল ডানাওয়ালা, আর এক দল ডানাকাটা অর্থাৎ ডানা আদৌ নাই।

প্রশস্ত নদী, এপার হইতে ওপার ভাল দেখা যায় না। নদীর জল গভীর, কিন্তু স্রোত মন্দ, বায়ুবেগে অল্প তরঙ্গোচ্ছ্বাস। জল নির্ম্মল নীল, জলে কখন শুশুক ভাসিয়া উঠে, কখন জলচর পক্ষী উড়িয়া আসিয়া জলে বসে।

নদীর দুই তটে দুইটি নগরী। নগরের আয়তন বৃহৎ নয়, কিন্তু দেখিতে সুন্দর। দুই নগরে কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই, দুইটির আকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। নদী পশ্চিমবাহিনী, উত্তর ও দক্ষিণ কূলে নগর। যে নগর উত্তর-তটে অবস্থিত, তাহার গৃহগুলি অধিকাংশই দ্বিতল। কতক গৃহ সাধারণ গৃহস্থের ন্যায়, কতক অট্টালিকা। প্রত্যেক গৃহে বাগান আছে। গৃহের আকৃতি চতুষ্কোণ, মধ্যস্থলে প্রবেশদ্বার, চারিদিকে গবাক্ষ। দক্ষিণ-কূলের গৃহ-সমূহ দীর্ঘাকৃতি, ছাদের দৈর্ঘ্য প্রশস্ততার অপেক্ষা অনেক অধিক। প্রবেশদ্বার এক পার্শ্বে। উত্তর-কূলের গৃহ-সমুদায় শ্বেতবর্ণ, দক্ষিণের নীল। যাহাদের পাখা নাই, তাহারা উত্তর-তীরে বাস করে, যাহাদের পাখা আছে, তাহাদের বাস দক্ষিণ-তীরে।

উভয় নগরের পশ্চাতে বহুদূরব্যাপী উর্ব্বর ভূমি, তাহাতে কোথাও ফলের বাগান, কোথাও চাষের জমী। স্থানে স্থানে উচ্চ পাদপশ্রেণী, কোথাও বা নিবিড় অরণ্য। বহু দূরে আকাশপ্রান্তে পর্ব্বতমালা,—গোলাকারে চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া আছে। পর্ব্বত অত্যন্ত উচ্চ, দুর্লঙ্ঘ্য। উচ্চপ্রাচীর-বেষ্টিত দুর্গের ন্যায় সেই প্রদেশ স্বতন্ত্র বিরাজ করিতেছে, প্রবেশের অথবা নিষ্ক্রমণের পথ নাই। কোথাও অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ, পর্ব্বতের চূড়া তুষারমণ্ডিত, কোথাও ঘনবিন্যস্ত দেবদারু-বৃক্ষে পর্ব্বতের শীর্ষ গাঢ় হরিদ্বর্ণ। পর্ব্বতের স্থানে স্থানে হ্রদ, কোথাও নির্ঝর হইতে সলিল প্রবাহিত হইয়া নদীতে মিশিতেছে, কোথাও বা জলপ্রপাতের স্নিগ্ধ ঘোর রব। নিসর্গের অতুলনীয় সৌন্দর্য্যে সেই প্রদেশ ভূষিত।

২

দুই নগরের কোনটিতেই পুরুষ নাই। যে পরীদের পক্ষ নাই, তাহারা দেখিতে মানুষীর ন্যায়, কিন্তু কিছু প্রভেদ আছে। বর্ণের সেরূপ স্বচ্ছতা ও উজ্জ্বলতা নারীদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি, অনিন্দ্য মুখের ও অবয়বের সর্ব্বত্র উজ্জ্বল, অঙ্গের অভ্যন্তর হইতে যেন জ্যোতি স্ফুরিত হইতেছে। উজ্জ্বলতায় তাহাদের লাবণ্য অধিকতর বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। আয়ত চক্ষুর দৃষ্টি চঞ্চল, গতি লঘু, স্বভাবসুন্দর কমনীয়তা। পরিধানে সূক্ষ্ম বস্ত্র শিথিলভাবে অঙ্গ আবরণ করিয়াছে।

পক্ষযুক্ত পরীদের অঙ্গে পালক নাই। দুই স্কন্ধের পার্শ্ব হইতে পদতল পর্য্যন্ত অতি সূক্ষ্ম চর্ম্মের স্বর্ণাভ পক্ষ, সঙ্কুচিত করিলে প্রায় অঙ্গে মিলাইয়া যায়। ইহারাও উজ্জ্বল রূপবতী, তন্বী, অলৌকিক সৌন্দর্য্যমূর্ত্তি। পরিধেয় বাস অঙ্গলিপ্ত, তাহাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব অভিব্যক্ত হইতেছে। আকাশে

যখন বিচরণ করে, সে সময় ইহাদের পক্ষ হইতে সূর্য্যকিরণ বিচ্ছুরিত হইয়া ইহাদিগকে স্বর্ণবর্ণ পক্ষীর ন্যায় দেখায় ; কিন্তু ইহাদের উড়িবার সীমা পর্ব্বত পর্য্যন্ত। কেহ বহু উচ্চে উঠিয়া পর্ব্বত লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করে না, পর্ব্বতের অপর পারে কি আছে, জানিবার কোন প্রয়াস করে না। কি কারণে তাহারা এই সীমার মধ্যে বদ্ধ, তাহা তাহারাই জানিত, সে রহস্য আর কেহ জানিত না।

দুই দলে যাতায়াত ছিল। নদীতে কতকগুলা ডিঙ্গী, পান্সী, বোট ও বজরা। পক্ষশূন্য পরীরা তাহাতে করিয়া পরপারে যাইত, ওপারের পরীরা উড়িয়া এপারে আসিত। দুই দলে যেমন প্রীতি ছিল, সেইরূপ অল্প ঈর্ষারও ভাব ছিল। যাহাদের পাখা নাই, তাহারা ডানাওয়ালা পরীদিগকে মনে মনে হিংসা করিত। ভাবিত, উহাদের পাখা আছে, আমাদের নাই কেন ? উহারাই বা কেন আকাশে উড়িয়া বেড়ায়, আমরাই বা পারি না কেন ? যাহাদের পাখা ছিল, তাহারা মনে মনে পক্ষশূন্য পরীদিগকে অবজ্ঞা করিত। তাহারা ভাবিত, আমাদের সহিত উহাদের কিসের তুলনা ? উহাদের উড়িবার ক্ষমতা নাই, মাটীতে কীট-পতঙ্গের ন্যায় বেড়ায়। যাহাদের পাখা ছিল না, তাহারা বলিত, মানুষ ত আর পাখী নয়, পাখা লইয়া কি করিবে ? পাখা থাকিলে কুৎসিত দেখায়। এইরূপে তাহারা কথঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ অনুভব করিত। আরও একটা কথা ছিল। পাখা থাকিলেও পক্ষযুক্ত পরীরা উড়িয়া আর কোথাও যাইতে পারিত না। চক্রাকারে পর্ব্বতের গণ্ডী, তাহা অতিক্রম করিতে পারিত না। যদি অপর দলের কোন পরী পক্ষযুক্ত কোন পরীকে জিজ্ঞাসা করিত, তোমাদের ত পাখা আছে, তোমরা উড়ে পাহাড় পার হয়ে তার ওদিকে কি আছে, দেখে এস না কেন ? আমাদের যেন পাখা নেই, অত উঁচু পাহাড়ে আমরা উঠতে পারিনে। কিন্তু তোমরাও যদি পাহাড় পার হ'তে না পার, তা হ'লে তোমাদের পাখা থেকে কি লাভ ?

পাখাওয়ালা পরীরা ঘাড় নাড়িত, বলিত, আমাদের সে সাধ্য নেই। তোমরাই বা কেন হেঁটে পাহাড় পার হবার চেষ্টা কর না ? নৌকা ক'রে পাহাড়ের নীচে পর্য্যন্ত গিয়ে তার পর পাহাড়ে উঠে পার হও না কেন ? পক্ষশূন্য পরীরাও ঘাড় নাড়িত, বলিত, আমাদের দিয়ে তা হবে না।

ভিতরের কথা দুই পক্ষের কেহই প্রকাশ করিত না, মনের ভিতর চাপা দিত। দুই দলেরই কেহ কেহ গোপনে পর্ব্বত লঙ্ঘন করিবার প্রয়াস করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। কেন হইতে পারে নাই, সে কথা গোপন করিত।

ইহাদের আরও একটা রহস্য ছিল। দুই দলের পরীরাই যৌবনের প্রথম অবস্থায় নগর পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া যাইত। সঙ্গে থাকিত এক জন প্রৌঢ়া পরী। পক্ষশূন্য পরীরা নৌকায় করিয়া পশ্চিমদিকে, অর্থাৎ যে দিকে নদীর স্রোত, সেই অভিমুখে যাইত। যাহাদের পাখা আছে, তাহারা পূর্ব্বদিকে যাইত। কাহাকেও কিছু বলিয়া যাইত না, কেহ কিছু জিজ্ঞাসাও করিত না। তাহার পর এক বৎসর কিংবা দুই বৎসর তাহাদের দেখা নাই। কোন সংবাদও আসিত না। তাহার পর তাহারা ফিরিয়া আসিত, যুবতীর ক্রোড়ে একটি শিশুকন্যা। কখন কখন অমনি ফিরিয়া আসিত, যুবতী শূন্যক্রোড়, অশ্রুমুখী, বিষণ্ণ। ফিরিয়া আসিলেও কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিত না। যাহারা কিশোরী, এ পর্য্যন্ত কোথাও যায় নাই, তাহাদের কৌতূহল হইত, কিন্তু তাহারা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে অপর পরীরা বলিত, সময় হ'লে তোমরাও জানতে পারবে। এ সব কথা কাউকে বলতে নেই।

সূর্য্যোদয় হইলেই পরীরা নদীতে স্নান করিতে যাইত। সকলেই সাঁতার জানিত, অনেকে সাঁতার দিয়া অনেক দূর চলিয়া যাইত। যাহাদের পাখা আছে, তাহারা কেহ কেহ তীর হইতে জলে নামিত, কেহ কেহ আকাশে উঠিয়া, পাখা গুটাইয়া জলে ডুব দিত। বৈকালবেলা এক দল নৌকায় ভ্রমণ করিত, আর এক দল উড়িয়া বেড়াইত। পক্ষযুক্ত পরীরা ছাদে উঠিয়া, দীর্ঘ ছাদে দৌড়িয়া, নীচে লম্ফ দিয়া, পক্ষ প্রসারিত করিয়া উড়িয়া যাইত। আকাশে পাশাপাশি উড়িত, কখন অলসগতি, কখন তীরের ন্যায় দ্রুতগতি। কেহ কেহ নৌকাতে কোন পরিচিতা পরীকে দেখিয়া নৌকায় নামিয়া আসিত, নৌকায় বসিয়া গল্প করিত। জ্যোৎস্না-রাত্রে আকাশে, জলে পরীরা বিহার করিত।

পরীদের নাম অনেক রকম, কিন্তু দুই দলে একরকম নাম রাখিত না। পক্ষযুক্ত পরীদের যে সকল নাম, পক্ষশূন্য

পরীদের মধ্যে সেরূপ নাম পাওয়া যাইত না। পক্ষযুক্ত একটি পরীর নাম লুণা ; পক্ষশূন্য একটি পরীর নাম শিরী। এই দুই জনে খুব ভাব। দুই জনই নবযুবতী, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কেহ এ পর্য্যন্ত জাতীয় প্রথামত পূর্ব্বে অথবা পশ্চিমে গমন করে নাই। কোন্ সময় ইহাদের যাইবার পালা পড়িবে, তাহাও জানিত না। সেই প্রসঙ্গে ইহাদের পরস্পরে অনেক কথা হইত।

এক দিন সন্ধ্যার সময় দুই জনে নদীর ধারে বেড়াইতেছিল। দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া পাদচারণ করিতেছিল। শিরী বলিল, আমাদের কোথায় নিয়ে যায়, কিছুই জানবার উপায় নেই। তোমাদের নিয়ে যায় এক দিকে, আমাদের এক দিকে। যারা গিয়েছে, তাদের জিজ্ঞাসা করলে শুধু বলে, তোমরাও যখন যাবে, তখন জানতে পারবে। ও সব কথা বলতে বারণ।

লুণা বলিল, আর দেখেছ, যারা একা ফিরে আসে, সঙ্গে শিশু নেই, তাদের চোখে জল, মুখ শুকনো। তারাও জিজ্ঞাসা করলে কিছু বলে না।

—হয় ত তাদের শিশু-সন্তান ম'রে গিয়ে থাকবে, তাই কাঁদে।

লুণা বলিল, তাই হবে, কিন্তু সে কথা বলতে দোষ কি ?

শিরী কিছু বেগের সহিত বলিল, ঐ ত হয়েছে গোল, সব কথা সকলে লুকোয়, কেউ কিছু প্রকাশ করে না। আমাদের দেশ না হয় ভাল, কিন্তু আর কোথাও কি আর কোন দেশ নেই ? তা হ'লে আমরা দেখতে পাইনে কেন ? তোমাদের পাখা আছে, তোমরা উড়ে সব যায়গায় যেতে পার, তবু তোমাদের পাহাড়ের ওপারে যাবার জো নেই কেন ? আমরাও ত হেঁটে যেতে পারি। পাহাড়ে ওঠা শক্ত হলেও ত একটা অসাধ্য ব্যাপার নয়। এই যে পাহাড়ের গণ্ডী, তার ভিতর তোমরা খাঁচায় পাখীর মত আছ, আর আমরা যেন গোয়ালের গরু।

লুণা বলিল, পাহাড়ের পারে যাবার কথা পাড়লেই সকলে ভয় দেখায়, কিন্তু স্পষ্ট কথা ত কেউ বলে না যে, কিসের ভয়। কোন হিংস্র পশুর ভয় না আর কিছু ? ওদের কথার ভাবে মনে হয়, যেন যাবার পথ বন্ধ, উড়ে যাবার জো নেই, হেঁটে যাবারও উপায় নেই। আকাশে ত আর কোন জানোয়ার নেই যে, আমাদের খেয়ে ফেলবে, তবে কে আটক করে ? এ কি শুধু মিছিমিছি ভয় দেখায়, না সত্যি কিছু আছে ?

—মিছিমিছি ত আমার মনে হয় না, কেন না, আমাদের যেমন জানবার ইচ্ছে করে, তেমনি আর সকলেরও ত করে। কেউ ত কোন কথা খুলে বলে না, কিন্তু শুনতে পাই, অনেক দিন আগে না কি দু চার জন পাহাড় পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারে নি। তারা এমন ভয় পেয়েছিল যে, আর কখন যাবার নাম করত না।

লুণা পাখা নাড়া দিয়া বলিল, সত্যি মিথ্যে কিছুই যখন জানবার উপায় নেই, তখন কি বিশ্বাস করব ? আমি ভাবছি, একবার নিজে গিয়ে দেখে আসব—আসল কথাটা কি। আমি সহজে ভয় পাই নে। তুমি আমার সঙ্গে যাবে ?

শিরী আগ্রহের সহিত বলিল, যাব। আমিও কাউকে ভয় করিনে। কিন্তু আমাদের চুপি চুপি যেতে হবে, কেউ যেন টের না পায়। আর যদি আমরা দুজনে যাই, তা হ'লে কোন্ দিকে যাব ?—পূবে না পশ্চিমে ? যখন আমাদের নিয়ে যায়, তখন তোমাদের এক দিকে, আমাদের আর এক দিকে। একসঙ্গে গেলে ত তা হবে না, এক দিকে যেতে হবে। কোন্ দিকে যাবে ?

লুণা খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিল, পশ্চিমদিকে যাওয়া যাবে। ঐ দিকে তোমাদের নিয়ে যায়। তুমি উড়তে পার না, আমিও উড়বার চেষ্টা করব না। যা হবার, দুই জনের হবে।

অনেকক্ষণ পরামর্শ করিয়া দুই জনে স্থির করিল, নৌকায় করিয়া পশ্চিমে যাইবে। কাহাকেও কিছু না বলিয়া দুই জনে গোপনে প্রস্থান করিবে।

৪

কয়েক দিবস পরে এক রাত্রিতে আর সকলে নিদ্রিত হইলে লুণা ও শিরী নিঃশব্দে নৌকায় আরোহণ করিয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। নৌকায় আবরণ ছিল। নৌকার ভিতর একটি ছোট কামরা। দুই জনে কিছু বস্ত্রাদি ও আহার্য্য-সামগ্রী সঙ্গে লইয়াছিল।

নৌকা স্রোতে ভাসিয়া চলিল। দুই জনে পালা করিয়া হাল ধরিল। লুণা হালে বসিলে শিরী শয়ন করে, এক প্রহরের পর শিরীকে জাগাইয়া দিয়া লুণা শয়ন করে।

প্রভাত হইলে পর লূণা বলিল, দিনের বেলা আমাদের লুকিয়ে থাকতে হবে। আমাদের দেখতে না পেলে চারিদিকে খোঁজ পড়বে, আমাদের যদি দেখতে পায়, তা হ'লে আর আমাদের যাওয়া হবে না।

শিরী বলিল, আমরা সারা রাত নৌকায় এসেছি, নৌকা ক'রে আমাদের শীঘ্র ধরতে পারবে না।

—তা বটে, কিন্তু উড়ে আসতে কতক্ষণ? আর আকাশ থেকে অনেক দূর থেকে দেখতে পাবে।

দুই জনে দাঁড় বাহিয়া অনেক দূর গেল। রৌদ্র উঠিলে তাহারা নদীর এক ধারে বেতস-বন দেখিতে পাইল। জলের ধারে বড় বড় গাছ, গাছের ডালে লতা জড়াইয়া উঠিয়াছে। জলের উপর প্রসারিত বৃক্ষশাখা-সমূহ ও তাহাতে বেতসের লতাবিতান। সেখানে অত্যন্ত অন্ধকার, ভিতরে কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। দুই জনে বেত সরাইয়া নৌকা ঠেলিয়া ভিতরে লইয়া গেল। নদী হইতে অথবা আকাশ হইতে আর কিছু দেখা যায় না। জলের ধার দিয়া কেহ আসিলেও সহজে কিছু দেখিতে পায় না।

দুই সখীতে মৃদুস্বরে কথোপকথন করিতে লাগিল। মাথার উপর পাতার ফাঁক দিয়া আকাশ দেখা যায়, পাশে লতার ফাঁক দিয়া নদী দেখা যায়। দেখিতে দেখিতে আকাশে কয়েক জন পরী ঘুরিয়া ঘুরিয়া এদিক্ ওদিক্ দেখিতে আরম্ভ করিল, কয়েকখানা নৌকা দাঁড় টানিয়া বেগে আসিয়া উপস্থিত হইল। নৌকায় পরীরা বলাবলি করিতেছিল, এদিকে কখন আসে নি, পূবে গিয়ে থাকবে। আর যে দিকেই যাক, ফিরে আসতে হবে। যাবার ত কোন পথ নেই।

আর এক জন বলিল, ওরা যেমন নির্ব্বোধ। আমরা ত দেখে এসেছি, এ দিকে নৌকা ক'রে কি বেশী দূর যাবার জো আছে? আর খানিক গিয়ে ভয়ানক স্রোত, যেমন জলের টান, তেমনি ঘূর্ণী, জলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর। সেখানে নৌকা এক দণ্ড টেঁকে না, সামলাবারও কোন উপায় নেই। এক নিমেষে চুরমার হয়ে যাবে।

—হয় ত তাই হয়েছে।

—দূর বোকা! সে আরও পাঁচ ছয় দিনের পথ। মিছে খুঁজে আর কি হবে, তাদের কোন চিহ্ন নেই।

লূণা আর শিরী স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিল। এই কথা শুনিয়া এ উহার মুখ চাহিয়া দেখিল। আরও দূরে গিয়া নদীতে যে কোন আশঙ্কা আছে, তাহারা তাহা জানিত না। জানিয়া তাহারা সাবধান হইতে পারিবে।

মধ্যাহ্ন অতীত হইলে, যাহারা আকাশে ঘুরিতেছিল, তাহারা ফিরিয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে নৌকা সকলও ফিরিল।

দিনের বেলা শিরী ও লূণা ঘণ্টাকয়েক ঘুমাইয়াছিল। রাত্রি হইতেই নৌকা ছাড়িয়া দিল।

এইরূপে এক সপ্তাহ গেল। দিনমানে দুই জনে নৌকা লুকাইয়া রাখে, রাত্রিকালে নৌকা চালায়। দিনে শাখাপত্রের অন্তরাল দিয়া দূরে মাঠ, বন দেখিতে পাওয়া যায়, রাত্রি-কালে আকাশে চন্দ্রতারকা, জলের নিরবচ্ছিন্ন কলকল স্রোতঃশব্দ, কচিৎ জলপক্ষীর রব। নৌকা তীর হইতে অধিক দূরে লইয়া যাইত না, প্রয়োজন হইলে অথবা আশঙ্কার কোন কারণ হইলে তৎক্ষণাৎ তীরে ভিড়াইবে।

সপ্তম দিবসে তাহাদের পশ্চাতে আর কেহ আসিতেছে না দেখিয়া লূণা ও শিরী সাহস করিয়া দিনের বেলা নৌকা বাহিয়া চলিল। পর্ব্বতশ্রেণী পূর্ব্বের অপেক্ষা নিকটে দেখা যাইতেছিল। অকস্মাৎ দূর হইতে গম্ভীর গর্জ্জন শ্রুত হইল, জলের স্রোত তীব্রতর হইল, জলের ভিতর বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড-সমূহ দেখা যাইতে লাগিল, ফেনমণ্ডিত ঘূর্ণাবর্ত্ত লক্ষিত হইল।

লূণা ও শিরী তাড়াতাড়ি নৌকা তীরে লাগাইয়া নামিয়া পড়িল। নৌকা টানিয়া তীরে বাঁধিয়া রাখিয়া দুই জনে নদীর ধার দিয়া পদব্রজে পর্ব্বতের অভিমুখে চলিল। গর্জ্জনের শব্দ বাড়িতে লাগিল, জলের স্রোত আরও খরতর হইল, প্রস্তরখণ্ডে আহত হইয়া জলে বহুসংখ্যক আবর্ত্ত দেখা দিল। পর্ব্বতমূলে উপনীত হইয়া দুই জনে দেখিল, পর্ব্বতের নিম্নদেশে প্রকাণ্ড গহ্বর, সেই গুহায় ঘোররবে নদী প্রবেশ করিতেছে। গুহার মুখের কাছে জলকণা বাষ্পাকারে আচ্ছন্ন করিয়া আছে, তাহাতে সূর্য্যরশ্মি পড়িয়া বিচিত্রবর্ণ ইন্দ্রধনু রচিত হইতেছে। দুই জনে বিস্মিত হইয়া সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে লূণা শিরীর অঙ্গ স্পর্শ করিয়া কহিল, চল, পাহাড়ে উঠতে অনেক সময় লাগবে।

গুহা হইতে কিছু দূরে গিয়া উভয়ে পর্ব্বত আরোহণ করিতে আরম্ভ করিল। শিরী একবার লূণাকে বলিল, তুমি উড়ে খানিক উপরে যাও না, আমি তার পর যাচ্ছি।

লূণা বলিল, তোমাকে ছেড়ে আমি যাব না, মনে কর, আমারও পাখা নেই।

পর্ব্বত আরোহণে উভয়ে অনভ্যস্ত, সুতরাং ধীরে ধীরে উঠিতে লাগিল। মাঝে মাঝে শিরীর পদস্খলন হইতে লাগিল, লূণা তৎক্ষণাৎ তাহার হাত ধরিয়া পতন নিবারণ করে। লূণা শিরীর অপেক্ষা কৃশাঙ্গী, এই কারণে আরোহণে তাহার আয়াস অল্প হইতেছিল। কিছু দূর উঠিয়া দুই জনে বিশ্রাম করিবার জন্য একটু দাঁড়াইল। সেখানে ক্ষুদ্র-পরিসর সমতলভূমি, চারিদিকে বড় বড় বৃক্ষ, বৃক্ষের নীচে পুরু হরিদ্বর্ণ মখমলের মত শৈবাল।

উভয়ে আবার উঠিতে আরম্ভ করিল, শিরী অগ্রে, লূণা তাহার পশ্চাতে। যাইতে যাইতে শিরী হঠাৎ দাঁড়াইল, পশ্চাৎ হইতে লূণা জিজ্ঞাসা করিল, দাঁড়ালে কেন?

শিরী ভীতস্বরে কহিল, সামনে চেয়ে দেখ!

লূণা শিরীর পাশে আসিয়া দেখিল, তাহাদের সম্মুখে অল্প দূরে একটা দীর্ঘকায় জীব তাহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নিস্পন্দ প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় স্থির, মুখে কথা নাই।

উভয়ের মনে ভয় হইল, কিন্তু সেই সঙ্গে কৌতূহলও হইল। পুরুষ তাহারা পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই, পুরুষ কি, তাহারা জানিত না। তাহাদের দেশে সকল কথাই সকলে গোপন করিত, যাহারা কিছুদিন আর কোথাও গিয়া ক্রোড়ে কন্যা লইয়া ফিরিয়া আসিত, তাহারা কিছু বলিত না। যাহারা শূন্য ক্রোড়, মলিন মুখ, অশ্রুসিক্ত চক্ষু লইয়া ফিরিত, তাহারাও কিছু বলিত না। লূণা ও শিরী কতক ভয়ে, কতক বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। সে ব্যক্তিকে দেখিয়া নিজেদের অবয়ব দেখিল। এই পথরোধকারী মূর্ত্তি দেখিতে অনেকটা তাহাদেরই মত, তবে এত প্রভেদ কেন? হস্ত, পদ, মুখ, চক্ষু একই রকম, অথচ সম্পূর্ণ বিভিন্ন মূর্ত্তি। পরীদের দেশে কাহারও আকার এত দীর্ঘ হয় না, কাহারও মুখে এরূপ ঘন কর্কশ লোম হয় না। ইহার বক্ষঃস্থলও দেখিতে আর এক রকম, কটিতে অস্ত্র।

সে কোন কথা কহে না দেখিয়া লূণা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? আমাদের পথরোধ কর কেন?

সে ব্যক্তি কহিল, আমি প্রহরী। তোমাদের এ পথে যাবার কিংবা পর্ব্বত পার হবার আদেশ নেই।

কণ্ঠস্বরও আর এক রকম;—গম্ভীর, কোমলতাবর্জ্জিত, কিন্তু ধীর; শাসন করিবার অথবা ভয় দেখাইবার ভাব নাই।

শিরী বলিল, আমাদের দেশ থেকে ত অনেকেই এ দিকে আসে, এইখানে কোথায় কিছুদিন থাকে, তাদের ত কেউ আটকায় না।

প্রহরী বলিল, সে আর এক রকম। তখন তোমাদের সঙ্গে আর এক জন আসে।

তাহার পর লূণার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, ইনি কেন এসেছেন? এঁদের ত এ দিকে আসবার কথা নয়।

লূণা রাগিয়া বলিল, আমি ত উড়ে চ'লে যেতে পারি, তখন তুমি আমাকে কি ক'রে আটকাবে?

প্রহরী অল্প হাসিয়া বলিল, সে জন্য অন্য প্রহরী আছে, উড়েও যেতে পারবে না।

শিরী বলিল, আমরা যদি পাহাড় পার হয়ে যাই ত কাহার কি ক্ষতি?

প্রহরী বলিল, তা আমি জানিনে। আমাদের কায আদেশ পালন করা।

লূণা বলিল, তুমি যদি আমাদের পথ ছেড়ে না দাও, তা হ'লে আমরা আর কোন দিক দিয়ে যাব।

প্রহরী বলিল, কোন দিক দিয়ে যেতে পারবে না, সব পথ বন্ধ।

শিরী কহিল, তোমরা কি অনেক জন? তোমাদের ত আমরা কখন দেখিনি। তোমরা আমাদের নগরে এস না কেন?

প্রহরী বলিল, যাবার আদেশ নেই।

শিরী জিজ্ঞাসা করিল, কার আদেশ?

প্রহরী মাথা নাড়িল, বলিল, সে কথা বলতে নিষেধ আছে।

লূণা কহিল, কেউ কিছু বলে না, আমরা কিছুই জানতে পাই নে। আমরা যেখানে ইচ্ছা যেতে পারি না কেন? আমরা কি বন্দিনী?

প্রহরী বলিল, তোমাদের নিজের নগর আছে, অত বড় দেশ আছে, যেখানে ইচ্ছা যেতে পার। কেবল পাহাড়ের অন্য পারে যেতে পার না।

—পাহাড়ের ওদিকে কি আছে?

প্রহরী বলিল, তা বলতে পারি নে। আমাদের আর কোথাও যাবার হুকুম নেই।

শিরী হাসিয়া উঠিল, কহিল, তা হ'লে আমাদের যে দশা, তোমাদেরও সেই দশা। কিন্তু তোমরা দেখতে আর এক রকম কেন? আমাদের চেয়ে মাথায় এত লম্বা কেন, আর তোমাদের মুখে অত চুল কেন? আমাদের দেশে এক দলের ডানা হয়, আর এক দলের হয় না, কিন্তু কারুর মুখে ত চুল হয় না। পাহাড়ে বাস করলে কি মুখে চুল গজায়?

প্রহরী মুক্তকণ্ঠে উচ্চরবে হাস্য করিল। লূণা ও শিরী চমকিয়া উঠিল। এ রকম হাসি তাহারা ইতিপূর্ব্বে কখনও শুনে নাই।

সহসা পর্ব্বতের আর এক দিক্ হইতে তূর্য্যধ্বনি হইল। প্রহরী চকিত-ভীত হইয়া বলিল, তোমরা এখান থেকে শীঘ্র যাও, তোমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা কহিলে আমার শাস্তি হবে। আমার বিপদ হ'লে তোমাদের কি লাভ?

লূণা ও শিরীর কৌতূহল বাড়িতেছিল, তাহারা নড়িল না। লূণা জিজ্ঞাসা করিল, ও কিসের শব্দ? পাহাড়ে কোন জানোয়ার ডাকছে?

তূর্য্যনাদ তাহারা কখনও শুনে নাই।

প্রহরী অস্থির হইয়া উঠিল। কহিল, তোমরা কিছুই জান না। তোমরা এখনই নেমে যাও, তা না হ'লে আমি তোমাদের নামিয়ে দেব। তোমাদের গায়ে আমি হাত দিতে চাই নে, কিন্তু আমার কথা না শুনলে অগত্যা আমাকে বলপ্রকাশ করতে হবে।

লূণা ও শিরী হাসিতে লাগিল। বলিল, আমাদের কাকে ক'রে নিয়ে যাবে? আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে তুলতে পারবে?

প্রহরী আর কোন কথা না বলিয়া, দক্ষিণহস্তে শিরীর এবং বামহস্তে লূণার কটি ধারণ করিয়া, অবলীলাক্রমে দুই জনকে দুই কক্ষে গ্রহণ করিয়া দ্রুতপদক্ষেপে, অনায়াস লঘু-গতিতে পর্ব্বতের পাদমূলে অবতরণ করিল। সেখানে তাহাদিগকে নামাইয়া দিয়া, নীরবে আবার পর্ব্বত আরোহণ করিল। যাইবার সময় কোন কথা কহিল না, পর্ব্বতে উঠিবার সময় একবারও পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল না।

[ক্রমশঃ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

ভোরের ডাক

প্রভাতের আলো হেলিয়া যখন পড়িল ধরার বুকে,
তন্দ্রা তখনো ভাঙ্গেনিকো মোর ছিলাম শয়ান-সুখে,
নদীর বাঁকে মাঠের শেষে—
প্রাচীন বটের তলদেশে,
শিহর-লাগা ভোরের হাওয়া ডাক দিল,—ঐ জাগো,
আর কত কাল থাকবে ঘুমে? ওঠো কাযে লাগো।

দূরের পাখী আকাশ-পথে জানিয়ে দিল মোরে,
আর কেন ঘুম? জাগো! এলো ভোরের আলো দোরে।
সবাই কাযে লাগায় তাড়া,
জগত জুড়ে পড়লো সাড়া,—
সবাই চলে কাযের পথে সারা নিখিল জুড়ে—
জাগো! ওঠো! এগিয়ে চলো, নইলে রবে প'ড়ে।

তন্দ্রা আমার ভেঙ্গে গেল চমক-দেওয়া ডাকে,
উঠে দেখি, রোদ উঠেছে গাছের ফাঁকে ফাঁকে।
ছুটেচে সবাই তাড়াতাড়ি,
ভোরের খেয়া দিচ্ছে পাড়ি,
কেমন ক'রে ছিলাম আমি এমন ঘুমের ঘোরে!
আজ যে আমায় যেতে হবে ওগো, অনেক দূরে।

শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।



বিচিত্র-রূপিণী নারী

পুরুষের কাছে নারী চিরদিন বৈচিত্র্যময়ী—রহস্যময়ী! নারী যেন সমস্যা! এ সমস্যার সমাধান-কল্পে যুগ-যুগান্ত ধরিয়া কবি-দার্শনিকের দল বহু গবেষণা করিয়াছেন; তবু নারী-চিত্ত-রহস্যের একটি কণাও তাঁরা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই! ক্রোধে অন্ধ হইয়া কেহ বলিয়াছেন—নারী জ্বলন্ত পাপ-বহ্নি! নারী ধ্বংস-রূপিণী! আবার মুগ্ধ হৃদয়ে কেহ বলিয়াছেন—নারী সৃষ্টির ললামভূতা! নারী জীবের জীবন! নারী এই পাপ-মর্ত্ত্যে ভগবানের করুণার প্রতিচ্ছবি! কাযেই নারী সমস্যা!

অর্থাৎ কেহ বলেন, নারী প্রলয়ঙ্করী! কেহ বলেন, না, চিরকল্যাণময়ী!

কিন্তু নারী যত-বড় সমস্যাই হৌন্, পুরুষ কোনো দিন নারীকে বর্জ্জন করিয়া চলিতে পারে নাই! পারিবে না। নারীর চিত্ত-বিনোদনের জন্যই পুরুষ তার জীবনকে উৎসর্গ করিয়া বসিয়াছে। নারীকে সে চিরদিন কামনা করিয়াছে। নারী না থাকিলে সংসার কি হইত, তাহা কল্পনা করিতে শিহরিয়া উঠি!

সারা পৃথিবীতে এই যে সভ্যতার ধারা বহিয়া চলিয়াছে, সে ধারার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিব, এই ধারায় মিশিয়া আছে পুরুষের শক্তির সঙ্গে নারীর মমতা-স্নেহ; পুরুষের বুদ্ধির সঙ্গে নারীর ধৈর্য্য-করুণা। সভ্যতা-রচনার ব্যাপারে নারীকে বাদ দিবার প্রয়াস—মূঢ়তার নামান্তর।

ইতিহাসের ঘটনা-পরম্পরা বিশ্লেষণ করিয়া ঐতিহাসিক দেখাইয়াছেন, নারীর একটি ভ্রূ-ভঙ্গীতে পাকা-বনিয়াদের কত রাজ্য ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়াছে—কত শক্তিমান রাজা, রাজসৈন্য মরণাবর্ত্তে ডুবিয়া মরিয়াছে!

নারী মহিমময়ী—নারী করালিনী! দেশে-দেশে যুগে-যুগে নারীর কত মূর্ত্তিই ক ভাবে সৃষ্টি-স্থিতি-বিলোপ নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিয়াছে!

আমাদের ছোটখাট সংসারেও নারীর অমোঘ শক্তির



নাগুরি রমণী
— মাথায় চূড়া—চিবুকে নক্সা

কত লীলা-ছন্দ না আমরা প্রত্যক্ষ করি! সংসার শ্মশান হয়—নারীর প্রতাপে; আবার শ্মশানে নন্দন রচিত হয়, তাও এই নারীর স্নেহ-প্রীতি-মায়া-মমতার গুণে!

ভাঙ্গা-গড়ায় পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে অবিচল পাষাণের মূর্তি! যেন জড়! মহাকালীর চরণে লুণ্ঠিত শিবের মত!

আমাদের শাস্ত্রকার নারীর দশ রূপ কল্পনা করিয়াছিলেন। এ কল্পনায় অসাধারণ জ্ঞানের পরিচয় পাই। চাহিয়া ছাখো নিখিলের পানে—মাতৃরূপে নারী আত্মবলি দিতেছেন; ভগ্নীরূপে নারী স্নেহ বিতরণ করিতেছেন; পত্নীরূপে শক্তি সঞ্চার করিতেছেন; প্রেমের অনাবিল ধারায় দেহ-মনের শ্রান্তি হরণ করিতেছেন; কন্যারূপে সেবা-পরিচর্য্যা করিতেছেন। তার পর বিলাসিনী—গণিকা—রুদ্রাণী,—কত না মূর্তিতে নারী বিস্ময়-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিতেছেন!



নিউ জীলণ্ডের মাওরি-নারী। চিবুকে নক্সা

এই বৈচিত্র্যময়ী নারীর মনের নাগাল পাওয়া বড় কঠিন। কমলাকান্ত অহিফেন-প্রসাদে বলিয়াছিলেন, মেয়েমানুষকে কে কবে চিনিতে পারিয়াছে, বলো? কমলাকান্ত নেশার ঘোরে বলিলেও কথাটা নেশাখোরের কথা নয়—জ্ঞানীর কথা!

দেশ-বিদেশের নারীর কথা আলোচনা করিয়া আমরা একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব, আমাদের পার্শ্বচারিণী নারীর স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারি কি না! যদি না পারি, তথাপি এ আলোচনার ফলে নারীর স্বরূপ মূল্য নির্দ্ধারণে হয়তো একটু সুবিধা হইতে পারে!

এ আলোচনায় আমরা স্তুতি-নিন্দা পরিহার করিয়া যথাসাধ্য নিরপেক্ষ থাকিবার চেষ্টা করিব। পূর্ব্বাহ্নে সে-কথা বলিয়া রাখা ভালো। নচেৎ পুষ্পে-বাড়িরে যদি অসন্তোষের বহ্নি-কণা উদ্‌গীরিত হয়, তাহা হইলে আমাদের আক্ষেপের সীমা থাকিবে না!

নারীর প্রসঙ্গে সর্ব্বাগ্রে পুরুষের মনে জাগে—নারীর রূপশ্রী। নারীর রূপ দেখিয়া বিশ্বের কবি বিহ্বল হইয়াছেন চিরকাল। এই নারীর রূপে বিহ্বল কবি গাহিয়াছিলেন—

অপরূপ পেখনু রামা!

নারীর এই রূপই পুরুষের চোখে আগে পড়ে। তাই আমরা রূপের কথা আগে বলিব।

এই রূপ—ভিন্নরুচির্হি লোকঃ—দেশ-ভেদে রুচি-ভেদ এবং রুচিভেদে রূপের বিচার-ভেদ। আমরা বাঙ্গালী—আমরা রূপসী বলি সেই নারীকে—যার…

……………………বেণীর শোভায়
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়!
কে বলে শারদ-শশী সে মুখের তুলা?
পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা!
…………কামের ধনু ভুরুযুগ…
…মুক্তাপাঁতি দন্ত…মৃণাল ভুজ…
কুচ হইতে কত উচ্চ মেরুচূড়া ধরে—
শিহরে কদম্ব ফুল, দাড়িম্ব বিদরে!

পাশ্চাত্য দেশের পুরুষের চোখে রূপসীর ধারণা ঠিক আমাদের ধারণার মত নয়। কটা বা সোনালি চুল—blonde বা brunette—নীল চোখ, রূপসীর লক্ষণ! আফ্রিকার সুন্দরী—সে আবার আর-এক রকম!

সুতরাং রূপের বিচারে নানা standard বা মাপ-কাঠি বিদ্যমান দেখি। তবে রূপের কথায় দেহের বর্ণ-বিভা প্রথমে উল্লেখযোগ্য। এই বর্ণে বহু বৈচিত্র্য দেখি। গোলাপী, শ্যাম, 'দুধে-আলতা', 'হরিতাল'-সদৃশ, শ্বেত। 'কালো'ও উপেক্ষার নয়। বৃন্দাবনের গোপিনীরা বলিয়াছিলেন, 'কালো কি হয় না ভালো'!

আফ্রিকার সুন্দরী—হয়তো অপর জাতির চক্ষুশূল! তেমনি আবার শ্বেতাঙ্গিনীর পানে চাহিয়াও কাফ্রী-যুবা হয়তো

নাসা কুঞ্চন করে! ফিজি-দ্বীপের তরুণ কবির সামনে উর্ব্বশী আসিয়া দাঁড়াইলে তার কলমে এ ছন্দ কখনো ঝরিবে না—

কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্র-বন্দিতা
তুমি অনিন্দিতা!

বর্ণ-বিভার পর দেহের গঠন! এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কোনো দেশের নারী করেন নিজের দেহকে কৃশ বা স্থূল; অঙ্গে চারু-চিত্রাঙ্কন। উল্‌কি কাটা এই চিত্র-রুচির পরিচয়। কোনো দেশে আবার শৈশব হইতে অঙ্গ-বিশেষকে দুম্‌ড়ানো-মুচ্‌ড়ানোর ব্যবস্থাও আছে। কোনো দেশের নারী



মাওরি-সুন্দরী

নাসাকে সচ্ছিদ্র করেন; কোনো দেশের নারী নাসাকে চ্যাপ্‌টাভাবে গড়িয়া তুলিতে কোমর বাঁধেন। 'তিলফুল জিনি নাসা' সে দেশে কদর্য্যতার ব্যাপার! চীনের নারী চরণ দুখানিকে অতি ক্ষুদ্র করিতে একদিন তপশ্চরণ-রতা থাকিত! একজন চীনা নারী বলিয়াছিলেন—আমার পা দুটাকে কুঁকড়াইয়া ছোট করিয়াছি—কোমরকে করিয়াছি কাঠির মত সরু! না করিলে স্বামী বলিবে,—আমি কুরূপা, ! স্বামী ভালো বাসিবে না।

বস্তুতঃ নারীর রূপশ্রী-বিকাশের মূলে দেখি পুরুষের চিত্তে বিভ্রম জাগানোর উদ্দেশ্য! A woman's glamour is for purpose of dazzling the eyes of the male. এ কথা আবহমান কাল সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে এবং আসিবে—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের মোহমুদ্গর বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও! নারীর এই dazzle করা শক্তির ফলেই এখানে লঙ্কায় ঘটে রাবণের সবংশে উচ্ছেদ; ওদিকে ট্রয়-নিপাত। মিশরে মার্ক এণ্টনির জীবনে যে শোচনীয় ট্রাজেডি ঘটে, তার মূলেও নারীর এই দীপ্তি-ছটার মোহ!



বোর্ণিও-বালা। কাণে ঢেঁড়ি-ঝুম্‌কো।

অঙ্গরাগ, প্রসাধন প্রভৃতি রূপ-সজ্জার দিকে নারীর এই সহজাত প্রবৃত্তি—এ প্রবৃত্তির পরিচয় আমরা অতি প্রাচীন যুগের নারীর ইতিহাসেও পাই। পুরুষের চক্ষু ধাঁধাইয়া, চিত্ত মাতাইয়া তাকে নিজের আয়ত্তাধীন রাখা—নারীর পক্ষে ছিল খুব প্রয়োজন। নহিলে গ্রাসাচ্ছাদন জোগাইবে কে? নারী অবলা! মাঠ কোপাইবার শক্তি তাঁর ছিল না—পশু-পক্ষী মারিবার সামর্থ্যও ছিল না! আদি-দিনে জীবন ছিল সংগ্রাম। সে সংগ্রামে নারীর যুঝিবার মত বল ছিল না; কাজেই পুরুষের উপর সর্ব্ববিষয়ে তাঁকে নির্ভর করিতে

হইত। পরে শিক্ষা-সভ্যতা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নারীর চিত্তে যে সঙ্গ-কামনা জাগ্রত হইল, যে ভালোবাসার আশা, সোহাগ-আদরের কামনা,—সেজন্য বিধিবদ্ধ সংসারেও অঙ্গ-রাগাদির বিধি অটুট রহিয়া গেল। তবে তাহাতে বহু রূপান্তর ঘটিয়াছে।

বিলাতের নারী আজও ছুটি কপোলে ফলের বীজ, পল্লব-নির্য্যাস মাখে—স্বাভাবিক রঙের উপর রঙ ফলাইতে! আমাদের দেশে চরণে অলক্ত-রাগ; নখে হেনা বা গরীবের ঘরে মেহদি-পাতার রঙ মাখা—এ রেওয়াজ পারস্যে আজও



টোঙ্গা-রূপসীর বিরাম-বিলাস

বিদ্যমান। এ দেশে বিলাতী জুতার চাপে মেয়েদের পায়ের অলক্ত-রাগ আজ মুছিয়া গেছে! তাহাতে নারীর মনে হয়তো ব্যথা লাগে না! কিন্তু সৌন্দর্য্যপ্রিয় বহু পুরুষের সেজন্য মর্ম্ম-বেদনার অন্ত নাই। নারী যে আজ এই আলতা ফেলিয়া পায়ে জুতা আঁটিতেছেন, এ-ব্যাপারে দেখি, এ ফ্যাশনের মূলে তাঁর সেই একই উদ্দেশ্য—আলতায় এখনকার পুরুষের মন দোলে না—এখন দোলে নারীর পায়ের নাগরার দাবানিতে! তাই।

মাওরি-জাতির মেয়েদের গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল-গৌর—তবু অঙ্গে চিত্র-বিচিত্র নক্সা কাটার রেওয়াজ সে দেশে আজও সুপ্রচলিত। চিবুকে ও উপর-ওষ্ঠে তাঁরা নক্সা কাটেন—মনে হয় গোঁফ-দাড়ির রেখা! এ দৃশ্যে আমাদের বুক কাঁপিয়া চক্ষু মুদিয়া আসিলেও মাওরি পুরুষের চক্ষু আনন্দে বিস্ফারিত হয়!

বহু বর্ব্বর জাতির ঘরে মেয়েরা গা ফুঁড়িয়া গহনা পরে—(আমরা কালো-বরণ না হই, শ্যাম-বরণ। তাই বুঝি নাকেতে বেশর ঝুলইচি!) আলজিরিয়ান; সাইবেরিয়ার 'চুকচি' জাতি; ও-দিকে আফ্রিকার কঙ্গো জাতি; অষ্ট্রেলিয়া ও মঙ্গোলিয়ান জাতি—এ-সব জাতির মেয়েরা নাক-কাণ ফুঁড়িয়া এত গহনা পরে—গায়ে এত ভারী অলঙ্কারের বোঝা চাপায় যে, তাদের পানে তাকাইলে তাক্ লাগিয়া যায়! 'দন্তে' নক্সা কাটিয়া দন্ত-রুচি-বিকাশের দিকেও নারীর সখ অল্প নয়। বহু দেশে এ-রীতি আছে।

এ-ব্যাপার লইয়া তর্ক চলে না। আমরা যদি বলি,



সামোয়া দ্বীপের উচ্চ-বংশীয়া কিশোরী

দাঁতে নক্সা কাটো কেন দেবি? দেবী হয়তো জবাব দিবেন, তোমাদের দেবীরা কপালে টিপ কাটেন কেন? গলায় নেকলেশ ঝুলান্ কেন?

বলিয়াছি, প্রসাধন বা সজ্জা-বিধি নিয়ন্ত্রিত হয় মানুষের রুচির দ্বারা! এই বিভিন্ন-রুচির সন্ধান লইলে দেখিব—মূল এক, অবিভিন্ন; সভ্য-অসভ্য জাতি-নির্ব্বিশেষে তাহা অবিষম। অর্থাৎ পুরুষের চিত্তে বিভ্রম-জাগরণের অভিলাষে নারীর এত সাজের ঘটা! গা ফুঁড়িতে নারী কাতর নয়! ভার বহিতেও রাজী! নারীর সজ্জা নিজের জন্য নয়—সে সজ্জা পুরুষের জন্য! বেশ-ভূষাও পুরুষের জন্য! এ দেশে যে-নারী এক দিন ছিলেন অবগুণ্ঠিতা—সে-নারী আজ ঘোমটার পর্দ্দা খশাইয়াছেন পুরুষের তৃপ্তির জন্য—তাঁর নিজের খেয়ালে নয়! আজও এ-দেশের নারী মাথার কেশ বর্জ্জন করিয়া

shingle বা bob hair-এর ঝোঁকে মজেন নাই, তার কারণ, আমরা এখনো খোঁপার মায়ায় ভুলিয়া আছি! যেদিন আমরা বলিব, খোঁপা আবার কেন? সে-দিন নারী কেশ ছাঁটিয়া (অথবা তোব ড়াইয়া) বিলাতী বিলাসিনীর মত bob বা shingle-এর ভক্ত হইবেন। কয়েকটি অতি-সভ্য বঙ্গ পরিবারে এ-রীতি চলিয়াছে, দেখিয়াছি।



আলজিরিয়ার রূপসী— গোলাপী রঙেও লজ্জার মোহ!

তার কারণ, সে পরিবারের পুরুষ বলিয়াছেন,— খাটো চুল—কাটো খোঁপা। সন্ধান লইয়া দেখিবেন—হেতু তাই।

লজ্জা—নারীর রূপ বাড়ায়। কথাটা এখনো বাতিল হয় নাই। লজ্জার বাস সত্যই ঘোমটার আড়ালে নয়। Shyness-কে বলি লজ্জা; আবার modesty-কেও আমরা বলি লজ্জা। প্রগল্‌ভা নারীকে আমরা বলি লজ্জাহীনা; পুরুষের গায়ে-পড়া মেয়েদের আমরা বলি লজ্জাহীনা! লজ্জার নানা স্তর, নানা বিভাগ আছে! তথাপি এ-কথা সত্য, যে-নারী প্রগল্‌ভা নন্‌, বাচাল নন্‌, চঞ্চলা নন্‌, পুরুষের সঙ্গে টক্কর দিয়া চলিতে জানেন না— আমাদের দেশে সাধারণতঃ তাঁহাদের লজ্জাশীলা বলি। পূর্ব্বকালে লজ্জাশীলাকে ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া থাকিতে হইত। এ-কালে ঘোমটা খশিলেও নারীর লজ্জা সেই সঙ্গে খশে নাই! কাজেই দেশ-কাল-ভেদে যেমন রূপ-ভেদ, লজ্জার ধারণাতেও তেমনি বিভেদ আমরা দেখি।

এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকেরা বলেন, লজ্জাই মানব-জাতিকে



কাফ্রী-সুন্দরীর কেশ-বিন্যাস

বসনে আবৃত ও মণ্ডিত করিয়াছে। বসন-হীন নগ্ন পুরুষ ও নারী উভয়েই কদর্য্য। লজ্জা-হেতু নারীর অঙ্গাবরণের বৈচিত্র্য —বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। মুস্লিম নারী স্নান করিতে গিয়া মুখ ঢাকেন—পাছে মুখখানা দেখিয়া কেহ ফেলে! চীনা নারী পা'দুখানিকে নগ্ন করিতে লজ্জায় মরিয়া যান্‌! সুমাত্রার নারীর হাঁটু দেখানোর চরম নির্লজ্জতা প্রকাশ পায়! আফ্রিকার নারী হুঁশিয়ার থাকে—তাদের পল্লব-আবরণে লতার ঝালর যেন স্থানচ্যুত না হয়! এশিয়ার বহু জাতির মধ্যে দেখি, মেয়েরা হস্ত-পদের অঙ্গুলির অগ্রভাগ আবৃত রাখেন। কারিব-সুন্দরী পথে বাহির হইবার সময় অঙ্গাবরণ ফেলিয়া



কেরোলাইন-সুন্দরী—কাণে লোহা-লক্কড় !

মাতিয়াছেন ! তাও তার স্বাধীন ইচ্ছায় নহে ; পুরুষের ইঙ্গিতে —পুরুষের প্রেরণায় ! এ-আলোচনায় আরো দেখিব, নারীর চরিত্র-মহিমায় পুরুষ কি ভাবে আপনাকে কি বিচিত্র মূর্ত্তিতে গড়িয়া তুলিয়াছে !

এ আলোচনায় প্রগতি-বাদীরা দেখিয়া বিস্মিত হইবেন, সে-নারীকে সোনার তরণীতে তুলিয়া সে-তরণী পুরুষ ঠেলিয়া দিয়াছে অগাধ জলে—নিরুদ্দেশ যাত্রায়—বৈচিত্র্য-হিসাবে সে জল-যাত্রা নারীর ক্ষণেক তৃপ্তি সাধন করিলেও নারী আবার ফিরিতে চাহিয়াছেন নদীর পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা কূলে—এই গ্রামের বাটে !

দিতে রাজী—অঙ্গের নক্সা যেন লোকলোচনের বহির্ভূত না থাকে ! আফ্রিকার বহু প্রদেশের নারী অস্ত্র দিয়া অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া অঙ্গে নক্সা কাটেন,—সে ক্ষত তাঁরা প্রাণপণে জীয়াইয়া রাখেন। সে ক্ষতে অঙ্গের মাধুর্য্য প্রকাশ পায় ! আবার ভারতের কোনো কোনো প্রদেশে দেখি, সকল বয়সের নারীই মুখ ও সারা অঙ্গ প্রচুর আবরণে ঢাকিয়া পথে চলিয়াছেন, অথচ উদরের অংশ আছে অনাবৃত—তাহা ঢাকিবার প্রয়োজন তাঁরা মনে করেন না ! লজ্জা-বৈচিত্র্যের এ'ও এক অপরূপ নিদর্শন !

সারা পৃথিবীর নারী জাতির বিচিত্র সৌন্দর্য্য, প্রতিভা, রুচি, শিক্ষা-দীক্ষা ও শক্তির ধারাবাহিক আলোচনা করিয়া আমরা নারীর ইতিহাস-সঙ্কলনে প্রয়াস পাইব। সে আলোচনায় দেখা যাইবে, সৃষ্টির প্রথম যুগ হইতে সুরু করিয়া আজ পর্য্যন্ত নারী কি ভাবে পুরুষের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে আপনাকে গড়িয়া আসিয়াছেন ; বিদ্রোহিতার সুর তুলিয়া ক্ষণেকের জন্য অন্তরালে গেলেও আবার তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন পুরুষের পাশে—তার স্নেহ-কামনায় ! লজ্জাকে দেখি, কখনো গিয়া চরমে উঠিয়াছে, আবার কখনো নারী নির্লজ্জতায়



আরিজোনার কুমারী—মাথার দু'দিকে ঝুঁপি কৌমার্য্যের চিহ্ন

এবারে ভূমিকা ফাঁদিলাম। অতঃপর আলোচনা সুরু করিব।

শ্রীদিলীপ



উপন্যাস

প্রথম পাক

মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা

বিচার-কক্ষে এরূপ জনসমাগম হইয়াছিল যে, সেখানে তিলধারণেরও স্থান ছিল না; বহুজনের শ্বাস-প্রশ্বাসে সেই কক্ষের বায়ুস্তর উত্তপ্ত হওয়ায় সকলেরই পরিচ্ছদ ঘর্ম্মধারায় সিক্ত হইয়াছিল। অভিযুক্ত আসামীর মামলা শেষ হইতে আর অধিক বিলম্ব ছিল না। বিচার-ফল কিরূপ হইবে, তাহা বুঝিতে পারিয়া বিচারকের মুখমণ্ডল নিদাঘাপরাহ্নের মেঘকান্তির ন্যায় গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত হইয়াছিল! আসামীর কৌন্সিলীর মৃদু কণ্ঠস্বরে নিরাশা ও বিষাদ পরিব্যক্ত হইতেছিল। তিনি শেষ পর্য্যন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, আসামীর প্রাণরক্ষার সকল আশার অবসান হইয়াছে। জুরীরাও বুঝিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে কিরূপ অপ্রীতিকর রায় প্রকাশ করিতে হইবে। এজন্য তাঁহারা উৎকণ্ঠাকুল ম্লানদৃষ্টিতে এজলাসের চতুর্দ্দিকে চাহিলেও, আসামীর কাঠরায় দণ্ডায়মান আসামীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে সঙ্কোচবোধ করিতেছিলেন। তাঁহাদের রায় প্রকাশিত হইলেই প্রহরীরা তাহাকে প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীর জন্য নির্দ্দিষ্ট কারা-প্রকোষ্ঠে টানিয়া লইয়া যাইবে। দুই জন ওয়ার্ডার কাঠরার আসামীর দুই পাশে দাঁড়াইয়া যেন শেষ আদেশরই প্রতীক্ষা করিতেছিল। বহুজনপূর্ণ বিচার-কক্ষ যেন শ্মশানভূমির ন্যায় নিস্তব্ধ! সেই স্তব্ধতা প্রত্যেকেরই দুঃসহ মনে হইতেছিল।

তখন অপরাহ্ন চারিটা; সুতরাং দিবাবসানের অধিক বিলম্ব ছিল না। দায়রা আদালতে যে আসামীর বিচার চলিতেছিল, তাহার নাম ড্যান্ কার্থু। মামলাটি ইহার পূর্ব্বদিন আরম্ভ হইয়াছিল। মামলায় বিন্দুমাত্র জটিলতা ছিল না; রহস্য-ভেদের জন্য পুলিসকে বা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দাবিভাগকে মাথা ঘামাইতে হয় নাই। আসামীর অপরাধ সপ্রমাণের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর সাক্ষীর জবানবন্দী লইবার বা আড়ম্বর সহকারে তাহাদের জেরার জন্য আদালতের সময় নষ্ট করিবারও প্রয়োজন হয় নাই; এই জন্য দুই দিনেই মামলার বিচার শেষ হইবার সম্ভাবনা বুঝিতে পারা গিয়াছিল। এই মামলার আসামী ড্যান্ কার্থু ফ্লোরিজেল হোটেলে সার উইলিয়ম এডাম্‌সনকে হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিল। আইনের বিধান অনুসারে দায়রার বিচারে যে সকল মামুলী নিয়ম পালন করিতে হয়, সেই সকল নিয়ম পালন করিয়া বিচার শেষ করিতে দুই দিনই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। জুরীর অভিমত গ্রহণের পূর্ব্বে জুরীদের মামলা বুঝাইয়া দিতেও অধিক সময়ের প্রয়োজন ছিল না। জুরীদের অভিমত গ্রহণ করিয়া বিচারক সেই দিন আদালত বন্ধ হইবার পূর্ব্বেই রায় প্রকাশ করিয়া বিচারাসন ত্যাগ করিতে পারিবেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া অবশিষ্ট সময়টুকুর জন্য সকলেই অধীরভাবে অপেক্ষা করিতেছিলেন। আসামীকে ফাঁসে লট্‌কাইবার হুকুম হইলেই যেন সকলে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে—সকলেরই এইরূপ মনের ভাব।

আসামী ড্যান্ কার্থু শুষ্ক ও বিবর্ণ মুখে আসামীর কাঠরায় দাঁড়াইয়া নির্নিমেষনেত্রে তাহার কৌন্সিলীর মুখের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার বিস্ফারিত চক্ষুতে হতাশভাব সুপরিস্ফুট। মধ্যে মধ্যে সে জিহ্বা দ্বারা শুষ্ক অধরোষ্ঠ লেহন করিতেছিল। হত্যাকাণ্ডের রাত্রিতে তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করা হইয়াছিল। যে কক্ষে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে হইলে যে প্রসাধনের কক্ষ অতিক্রম করিতে হইত, ড্যান্ কার্থু সেই কক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিল, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছিল; কারণ, সেই দ্বারে যে অঙ্গুলি-চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা তাহারই অঙ্গুলির চিহ্ন।

তাহার অপরাধের এই প্রকার অকাট্য প্রমাণ থাকায় তাহার নিষ্কৃতিলাভের কোন আশা ছিল না।

এই জন্য সেই নিস্তব্ধ বিচার-কক্ষে দর্শকগণের কল্পনানেত্রের সম্মুখে বধমঞ্চের দৃশ্য, এবং ফাঁসের রজ্জু যেন আকার ধারণ করিয়া ভীষণতা পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছিল। ড্যান্ কার্থু তাহার সম্মুখস্থিত লোহার রেলিং দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়াছিল। অর্ণবযান সমুদ্রগর্ভস্থ কোন মগ্ন শৈলের সংঘর্ষণে বিদীর্ণ হইয়া জলমগ্ন হইলে, সেই মগ্নোন্মুখ পোতের আরোহী সমুদ্রবক্ষে নিক্ষিপ্ত হইবার পর কোন ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড যেরূপ আগ্রহ-ভরে উভয় হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম করে, ড্যান্ কার্থু তাহার অন্তিমকালের অবলম্বনস্বরূপ সেই রেলিংও সেইরূপই আগ্রহভরে দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া, তাহার কৌন্সিলীর মুখের উপর সতৃষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল।

আসামীর কৌন্সিলী সকল আশা ত্যাগ করিলেও, তাঁহার বক্তব্য-শেষে দুই একটি কথা বলিতেছিলেন। তিনি হঠাৎ নীরব হইয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিরাশা-পূর্ণ কণ্ঠস্বর শূন্যে বিলীন হইলে বিচার-কক্ষের নিস্তব্ধতা যেন শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরে নীরস কণ্ঠের কর্কশ স্বর বিচার-কক্ষের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনি তুলিল। সেই স্বর আসামী ড্যান কার্থুর কণ্ঠ-নিঃসৃত, তাহার আবেগকম্পিত কণ্ঠ-নিঃসারিত আকুল মর্ম্মোচ্ছ্বাস।

ড্যান্ কার্থু বলিল, "এ যাতনা আমার সহ্য হইতেছে না, সত্য কথা আর আমি চাপিয়া রাখিতে পারিতেছি না। আমি সাক্ষীর কাঠরায় প্রবেশ করিয়া, যে সকল কথা জানি—তাহা প্রকাশ করিব।"

তাহার উক্তি শুনিয়া শত শত চক্ষুর বিস্ময়াকুল দৃষ্টি আসামীর কাঠরায় দণ্ডায়মান সেই হতভাগ্য বন্দীর বিবর্ণ মুখের উপর নিক্ষিপ্ত হইল। এই কথা বলিবার সময় তাহার দুই কস বহিয়া লালা নিঃসারিত হইতেছিল। তাহার উভয় গণ্ড লোহিতাভ হইয়াছিল, এবং মানসিক উত্তেজনায় তাহার নিষ্প্রভ চক্ষু লগুড়াহত পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের চক্ষুর ন্যায় সহসা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

ড্যান্ কার্থু পুনর্ব্বার ব্যাকুলস্বরে বলিল, "আমার কথা শুনিতে পাইয়াছেন? সাক্ষীর কাঠরায় আমাকে খাড়া করুন। যে কথা খাঁটি সত্য, তাহাই আমি বলিব। যে এই কর্ম্ম করিয়াছে, সে ফাঁসে ঝুলিবে, আমাকে ঝুলাইবেন না। ফাঁসে আমি ঝুলিব না।"

তাহার এই উক্তি শুনিয়া জুরীদের চক্ষুর বিরক্তিব্যঞ্জক দৃষ্টি মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইল। বিচারকের মুহ্যমান দেহে যেন জীবনীশক্তি ফিরিয়া আসিল। আসামীর কৌন্সিলী আবেগ-কম্পিত, উত্তেজিত আসামীকে নিম্নস্বরে কি বলিয়া হাতের কাগজপত্র উল্টাইয়া দেখিলেন, তাহার পর বিচারককে দুই একটি কথা বলিলেন।

বিচারক আসামীর কৌন্সিলীকে লক্ষ্য করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আপনি আপনার মক্কেলকে সাক্ষীর কাঠরায় তুলিয়া তাহার জবানবন্দী লইবার প্রার্থনা করিলেন। উত্তম, আজ মামলা মুলতুবি থাকিল, উহার জবানবন্দী কাল হইবে।"

বিচারকের আদেশ শুনিয়া দর্শকমণ্ডলীর ভিতর হইতে মলিন পরিচ্ছদ-পরিহিত এক জন দর্শক তাহার জীর্ণ টুপীটি হাতে লইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ধীরে ধীরে বিচারালয়ের বাহিরে আসিল। তাহার পর সে অপরাহ্নের রৌদ্র-সমুদ্ভাসিত পথে আসিয়া সেণ্ট সিপল্কারের অভিমুখে দৌড়াইতে লাগিল। কিছু দূরে সেই পথের মোড়ে একটি লোক দাঁড়াইয়াছিল; তাহার পরিচ্ছদ অধিকতর মলিন ও জীর্ণ। তাহার বগলে এক তাড়া সান্ধ্য দৈনিক সংবাদপত্র। তাহাকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইত, সংবাদপত্র বিক্রয়ই তাহার পেশা।

আগন্তুক তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, একখানি কাগজ ক্রয়ের জন্য হাত বাড়াইয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "মামলা মুলতুবি হইল। ড্যানকে কাল সাক্ষীর কাঠরায় উঠিতে দেওয়া হইবে। সে সকল কথাই প্রকাশ করিবে—সংবাদটা চালাইয়া দাও।"

কাগজবিক্রেতার নিকট কাগজ কিনিতে কিনিতে তাহার কথা শেষ হইল। সে কাগজ লইয়া চলিয়া গেল। সংবাদ-পত্র-বিক্রেতা সেই স্থানে দাঁড়াইয়া কাগজ বিক্রয়ের চেষ্টা না করিয়া, কাগজের তাড়া বগলে লইয়া হলবর্ণের দিকে অগ্রসর হইল, যেন আর তাহার কাগজ বিক্রয়ের প্রয়োজন ছিল না।

হলবর্ণ-সার্কাশে একটি পথিক দাঁড়াইয়াছিল, তাহার দেহ নীল পরিচ্ছদে আবৃত, মস্তকে ফেল্টের টুপী। কাগজ-বিক্রেতা তাহার সম্মুখে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "কাগজ চাই, মশায়?" তাহার পর মৃদুস্বরে বলিল,

"ড্যান কাল সাক্ষীর কাঠরায় উঠিয়া সকল কথা প্রকাশ করিবে—এই সংবাদ চালাইয়া দাও।"

এই সংবাদ এই ভাবে চলিতে চলিতে লণ্ডনের পশ্চিম পল্লীর (ওয়েষ্ট এণ্ড) একটি আড়ম্বরপূর্ণ সৌখীন ভোজনালয়ে নীত হইল। যদি কোনও পথিক একটির পর একটি করিয়া প্রত্যেক সংবাদ-বাহকের পরিচ্ছদ লক্ষ্য করিতেন, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইতেন, প্রত্যেক পরবর্ত্তী সংবাদ-বাহক তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সংবাদ-বাহক অপেক্ষা সুবেশধারী। সংবাদটি সকলের শেষে যাহার নিকট পৌছাইল, সে তখন স্ফূর্ত্তি করিয়া মদ্যপান করিতেছিল। তাহার চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ ছিল, এবং তাহার সুদীর্ঘ কাঁচা-পাকা গোঁফ-জোড়াটা সূচ্যগ্র। এই ব্যক্তি সংবাদটি শুনিয়া ভোজনাগারের বাহিরে আসিল এবং ধীরে সুস্থে অদূরবর্ত্তী রাজপথ অতিক্রম করিয়া, ক্লোরিজেন হোটেলের মার্ব্বল-নির্ম্মিত প্রশস্ত সোপানশ্রেণী পার হইয়া হোটেলে প্রবেশ করিল। সার উইলিয়ম এডামসন এই হোটেলেই নিহত হইয়াছিলেন।

সূচ্যগ্র গুম্ফধারী, আভিজাত্যের দম্ভস্ফীত লোকটি হোটেলের আর্দ্দালীকে বলিল, "মিঃ ভান্সিটার্ট তাঁহার ঘরে থাকিলে তাঁহাকে জানাও, কর্ণেল গ্রেসন তাঁহাকে মুহূর্ত্তের জন্য কোনও কথা বলিবেন।"

মিঃ ভান্সিটার্ট তখন ঘরেই ছিল। আর্দ্দালী কর্ণেল গ্রেসনকে সঙ্গে লইয়া সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া দোতলায় উঠিল, এবং সুদীর্ঘ বারান্দা পার হইয়া একটি কক্ষের দ্বারদেশে আসিয়া রুদ্ধ দ্বারে অঙ্গুলীর টোকা দিল; তাহার পর ভিতর হইতে সাড়া পাইলে, সে দ্বার খুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "কর্ণেল গ্রেসন, মশায়!"

কর্ণেল গ্রেসন যতক্ষণ সেই কক্ষে প্রবেশ না করিল, ততক্ষণ তাহাকে প্রসন্নচিত্ত, সরলপ্রকৃতি, নির্ব্বিকার ভদ্রলোকের মতই দেখাইতেছিল; কিন্তু তাহার পশ্চাতে সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ হইবামাত্র তাহার মুখভাবের যে পরিবর্ত্তন হইল, তাহা অদ্ভুত—অত্যন্ত বিস্ময়জনক; তাহার প্রফুল্লতা, আত্মপ্রত্যয় এবং শিষ্টাচারের খোলস মুহূর্ত্তে যেন খসিয়া পড়িল। সে সেই কক্ষের মধ্যস্থলে সংরক্ষিত ডেস্কের নিকট এক ব্যক্তিকে উপবিষ্ট দেখিল; অন্য দিকে তাহার মুখ থাকিলেও সেই লোকটিকে দেখিয়াই সে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইল।

এই লোকটির দেহ অসাধারণ দীর্ঘ, পাতলা এবং অস্থিসার; সে আগন্তুককে দেখিয়াও যেন দেখিল না। কর্ণেল প্রায় এক মিনিট দ্বার-সন্নিকটে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে দুই এক পা অগ্রসর হইল। তখন সেই ব্যক্তি কঠোর দৃষ্টিতে কর্ণেলের মুখের দিকে চাহিল। তাহার উজ্জ্বল চক্ষু-তারকায় অবজ্ঞা ও বিরক্তি পরিস্ফুট, এবং কুঞ্চিত অধরোষ্ঠে—নিষ্ঠুরতা ও দৃঢ়তা পরিব্যক্ত। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কর্ণেল গ্রেসনের বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল। সে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

দীর্ঘদেহ লোকটি কঠোর স্বরে বলিল, "কি মতলবে এখানে আসিয়াছ? সোনার থানগুলা জলে পড়িয়াছে, না, খরিদ্দারের সঙ্গে দরদাম লইয়া বিরোধ হইয়াছে যে, তোমাকে ঘাঁটি ছাড়িয়া এখানে আসিতে হইল? আমি কি বলি নাই—তোমাদের কাহারও এখানে আসিবার প্রয়োজন নাই?"

কর্ণেল কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া বিচলিত স্বরে বলিল, "ওল্ড বেলী হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে কর্ত্তা, ড্যান কাল সাক্ষীর কাঠরায় উঠিয়া জবানবন্দী দিবে।"

কর্ণেলের কথা শুনিয়া লোকটির মুখভাবের কোন পরিবর্ত্তন হইল না, কিন্তু তাহার চক্ষু আরক্তিম হইল। সে কর্কশস্বরে বলিল, "ছুঁচো!—নর্দ্দামার পাঁকে বর্দ্ধিত, ঘৃণিত, ইতর ছুঁচোর এত স্পর্দ্ধা!"

সে ডেস্কের উপর হইতে কাগজ-কাটা ছুরি তুলিয়া লইয়া তাহার ডগায় চাপ দিয়া তাহা বাঁকাইয়া একটি হুকে পরিণত করিল। তাহার পর বলিল, "তাহার মুখ বন্ধ করিয়া ফেলিতে হইবে। ফরিয়াদী পক্ষ কিছুই সপ্রমাণ করিতে পারিবে না।"

অনন্তর সে চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া সেই কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। যতবার সে মুক্ত বাতায়নের নিকট দিয়া ঘুরিল, ততবারই অস্তোন্মুখ সূর্য্যের নিষ্প্রভ আলোকে তাহার দীর্ঘ দেহের ছায়া দীর্ঘতর হইয়া মেঝের গালিচার উপর প্রসারিত হইতে লাগিল।

সেই দীর্ঘমূর্ত্তি বিচলিতচিত্তে সেই কক্ষে ঘুরিতে ঘুরিতে, হঠাৎ থামিয়া বিকৃতস্বরে বলিয়া উঠিল, "নিয়ম বাঁধা আছে; হাঁ, বাঁধা নিয়ম আছে বলিয়াই তোমাদের মত কুকুরের দল বুঝিতে পারে যে, তোমাদের মাথার উপর একটা মনিব আছে।"

লোকটা সেই কক্ষের দ্বারের চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া, ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের দৃষ্টির ন্যায় প্রদীপ্ত দৃষ্টিতে কর্ণেলের মুখের দিকে চাহিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিতে লাগিল, "এই নিয়ম তোমাদের সকলেরই জন্য। হাঁ, ইহা সকলেরই প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য। সেই ছুঁচোটা—ড্যান কার্থু আমাকে প্রতারিত করিবার জন্য মিথ্যা কথা বলিয়াছিল। সে আমাকে বলিয়াছিল—সে আঙ্গুলের কোন চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই। সে ডান হাতের দস্তানা খুলিয়া ফেলিয়াছিল,—ইহা কোন দিন প্রকাশ করে নাই। আমি পূর্ব্বে জানিতে পারিলে তাহার সম্বন্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতাম।"

বক্তা নীরব হইল, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে কর্ণেলের সম্মুখে আসিয়া, নির্নিমেষনেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া পুনর্ব্বার কর্কশস্বরে বলিল, "ওরে কুকুরের দল, আমি তোদের আহার যোগাইতেছি; আমার অনুগ্রহে তোরা পরম সুখে কাল-যাপন করিতেছিস্। আমি আশ্রয় দিয়া তোদের রক্ষা করিতেছি। এ বিষয়ে কখন আমার কোন ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু কি নিয়মে তোরা আবদ্ধ, তাহা তোদের অজ্ঞাত নহে। তোরা সকলেই তাহা জানিস্।"

সহসা তাহার শিরাবহুল দীর্ঘ হস্তদ্বয় প্রসারিত হইল, এবং উভয় হস্তের অঙ্গুলীগুলি লোহার সাঁড়াসীর অগ্রভাগের ন্যায় বক্র হইয়া কর্ণেলের কণ্ঠনালী স্পর্শ করিতে উদ্যত হইল; সঙ্গে সঙ্গে সে বলিল, "মিথ্যা কথা বলিলে এবং আদেশপালনে অকৃতকার্য্য হইলে তাহার শাস্তি কি, তাহা তোর কাছেই শুনিতে চাই,—শীঘ্র বল্।"

তাহার কথা শুনিয়া কর্ণেলের মুখ পুরাতন পার্চ্চমেণ্টের বর্ণ ধারণ করিল। তাহার ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম ফুটিয়া উঠিল; তাহা সেই কক্ষের মৃদু আলোকে চিক্-চিক্ করিতে লাগিল। সে কথা বলিবার চেষ্টায় ওষ্ঠ কম্পিত করিল; কিন্তু আতঙ্কে তাহার জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়াছিল, মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, কোনও কথা বাহির হইল না। কিন্তু কর্ণেল পুনর্ব্বার ধমক খাইয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "প্রাণদণ্ড।"

দীর্ঘদেহ লোকটার বাহুদ্বয় তাহার দুই পাশে ঝুলিয়া পড়িল। তাহার কুঞ্চিত অধরোষ্ঠ ঈষৎ উন্মুক্ত হইল। সে ক্রুদ্ধ বুলডগের ন্যায় অস্ফুট গর্জ্জন করিয়া, দন্তে দন্ত স্থাপন করিয়া বিকৃতস্বরে বলিল, "হাঁ, প্রাণদণ্ড। ইহাই মিথ্যাবাদী অকর্ম্মণ্য তাঁবেদারের যোগ্য দণ্ড। হতভাগ্য কুচক্রী ড্যান কার্থুকে এই দণ্ডভোগ করিতে হইবে। এই অমোঘ দণ্ড তাহার মাথার উপর উদ্যত হইয়াছে।"

কর্ণেল কম্পিত, অবসন্ন পদদ্বয়ে ভর দিয়া সোজা দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া, অদূরবর্ত্তী দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর গলায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "আপনি যে কথা বলিলেন, তাহা সত্য, সর্দ্দার! কিন্তু কাল সেই সুযোগ চলিয়া যাইবে, তখন কিরূপে দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা হইবে? তাহাকে দণ্ডদান করিবেন, তাহার সময় কোথায়? তাহাকে আদালত বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিক্সটনের কারা-গারে প্রেরণ করা হইবে। আজ রাত্রিতে আমরা ত তাহাকে হাতে পাইব না। কাল সকালে আদালতের কায আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে সাক্ষীর কাঠরায় প্রবেশ করিয়া সাক্ষ্য দিতে আরম্ভ করিবে; সকল কথাই সে প্রকাশ করিয়া ফেলিবে।"

দলপতি অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে কর্ণেলের মুখের দিকে চাহিল। সেই দৃষ্টির অন্তরালে তীব্র বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন ছিল।

সে মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "যাহাতে অনুকূল অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে, সেরূপ ব্যবস্থা করা কি আমার অসাধ্য মনে করিতেছ? আমার সেরূপ শক্তি নাই, তোমার এরূপ ধারণার কারণ কি? আমি পূর্ব্বেই তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি, এ কথা শুনিয়া কি তুমি বিস্মিত হইবে?"

দলপতির কথা শুনিয়া কর্ণেল স্তম্ভিত হইল। সে নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে দলপতির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; কথাটা বিশ্বাস করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। কিন্তু সে জানিত, দলপতির মিথ্যা জাঁক করিবার অভ্যাস ছিল না। তাহার অসাধ্যসাধনের শক্তি ছিল।

কর্ণেল যথাসাধ্য চেষ্টায় আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল, "সর্দ্দার কি সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া এ কথা বলিয়াছেন? —আমার মনে হইতেছিল—"

দলপতি হাত তুলিয়া কর্ণেলের কথায় বাধা দিয়া বলিল, "তোমার পা কি ঠাণ্ডা হইয়া আড়ষ্ট, অচল হইয়াছে? যদি তোমার চলৎশক্তি রহিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি কয়েক জন অনুচরকে সঙ্গে দিয়া তোমাকে পর্য্যটনে পাঠাইব মনে করিতেছি। এই ভ্রমণই হয় ত তোমাদের শেষ ভ্রমণ, ভবিষ্যতে আর কখনও হয় ত তোমাদিগকে পা বাড়াইতে হইবে না।"

বক্তা হঠাৎ নীরব হইয়া দ্বারের দিকে অঙ্গুলী প্রসারিত করিল; তাহার পর বলিল, "শীঘ্র প্রস্তুত হইয়া লও। ড্যান কার্থ্ সাক্ষীর কাঠরায় প্রবেশ করিয়া কোন কথা বলিতে না পারে—তাহাই করিতে হইবে।—তাহার মুখ হইতে কোনও কথা বাহির হইবে না।—আমার এই আদেশ চালাইয়া দাও। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ঘোষণা করিবার ব্যবস্থা কর যে, আমি যে বন্দোবস্ত করিয়াছি, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে;—হাঁ, আজ রাত্রিতেই আমার হুকুম তামিল হওয়া চাই।—যাও। রুসিয়ার সে কালের জারের, জর্ম্মাণীর কৈশরের ন্যায় আমার আদেশ অমোঘ, অপরিহার্য্য এবং অবশ্য পালনীয়, ইহা বিস্মৃত হইও না, যাও।"

দ্বিতীয় পাক

দায়রার মামলার জুরী গুম্!

হ্যাম্বল্‌ডন হোটেলের একটি প্রশস্ত কক্ষে দ্বাদশ জন ভদ্র সন্তানকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। এই দ্বাদশ ব্যক্তি ওল্‌ড বেলীর দায়রা আদালতে ড্যান্ কার্থ্‌র বিরুদ্ধে আরোপিত নরহত্যার অপরাধের বিচারের জন্য জুরী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

জুরীরা উক্ত হোটেলের যে কক্ষে আবদ্ধ ছিলেন, সেই কক্ষের প্রশস্ত বাতায়নশ্রেণী রজ্জুনির্ম্মিত পর্দা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত হইয়াছিল। এই জন্য সেই কক্ষে বাহিরের বায়ু-প্রবাহ প্রবেশের কোন উপায় ছিল না। যে দ্বাদশ ব্যক্তি জুরীর কর্ত্তব্য পালনের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা যে নিরপেক্ষ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ভদ্রলোক, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না; তথাপি জুরীদের ব্যক্তিগত মনোভাবের উপর বাহিরের কোন প্রভাব পরিচালিত হইতে পারে কি না, তৎসম্বন্ধে সরকার কোন ঝুঁকি ঘাড়ে লইতে রাজী ছিলেন না। কাহার মনে কি আছে, অন্যের তাহা নিরূপণ করা অসাধ্য। বিশেষতঃ মানুষের মনের ভাব নানা কারণে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। ড্যান্ কার্থ্ তাহার প্রাপ্য সুবিচারে বঞ্চিত না হয়, এ বিষয়ে সরকারের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। নরহত্যার অভিযোগে সে দায়রা-সোপরদ্দ হইয়াছিল, কিন্তু সুবিচারের ত্রুটিতে অন্ধসংস্কারের বশীভূত হইয়া, ভ্রান্ত ধারণায় জুরীরা তাঁহাকে অপরাধী বলিয়া সিদ্ধান্ত না করেন, এই উদ্দেশ্যে সরকার তাঁহাদের সম্বন্ধে যতদূর সতর্কতা অবলম্বন করা যাইতে পারে, তাহার ত্রুটি করেন নাই। বিচারের আরম্ভকাল হইতে বিচার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা সেই কক্ষে আবদ্ধ ছিলেন। বিচারের সময় তাঁহাদিগকে আদালতে যাইতে হইত প্রহরী দ্বারা সুরক্ষিত শকটে,—আদালতের কার্য্য শেষ হইলে সেইভাবেই তাঁহারা সেই কক্ষে নীত হইতেন। তাঁহাদের বাহিরে যাইবার উপায় ছিল না, এবং বাহিরের সহিত সকল সংস্রব রহিত করিবার জন্য তাঁহাদের বাসকক্ষের বাতায়নগুলি পূর্ব্বোক্ত ভাবে রুদ্ধ করা হইয়াছিল।

বাহিরের বায়ুপ্রবাহ সঞ্চালনের অভাবে সেই কক্ষটি উত্তপ্ত হইয়াছিল। বায়ু-প্রবেশের অন্য কোন পথ না থাকাও ইহার একটি কারণ। এইরূপ বাঁধাবাঁধির জন্য জুরীদের স্নায়ু দুর্ব্বল হইয়াছিল এবং মানসিক স্বচ্ছন্দতারও অভাব হইয়াছিল। নির্ব্বাচিত দ্বাদশ জন জুরীর স্বার্থের মধ্যে ঐক্য ছিল না। তাঁহাদের বহুদর্শিতার ক্ষেত্রও বিভিন্ন ছিল। দুই দিন একত্র আবদ্ধ থাকায় তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের পরিবর্ত্তে একটা বিতৃষ্ণার সঞ্চার হইয়াছিল। কেবল এক বিষয়ে তাঁহাদের মতের ঐক্য হইয়াছিল, মামলার সকল বিবরণ অবগত হইয়া এবং সাক্ষ্য-প্রমাণে নির্ভর করিয়া তাঁহাদের ধারণা হইয়াছিল, অভিযুক্ত আসামী সত্যই অপরাধী, এবং প্রাণদণ্ডই তাহার যোগ্য দণ্ড। তাঁহাদের রায় সেই দিনই তাঁহারা প্রকাশ করিয়া আদালত হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে পারিতেন; কিন্তু বিচারক ড্যান কার্থ্‌র সাক্ষ্যদানের প্রার্থনা মঞ্জুর করায় তাঁহাদিগকে আর এক রাত্রি এবং একটি দিন গৃহ-সুখে বঞ্চিত থাকিতে হইবে। ড্যান্ কার্থ্ তাহার জবানবন্দীতে যাহাই বলুক, তাঁহারা তাহার সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না, তাঁহাদের এই সঙ্কল্পই দৃঢ়মূল হইল। বিচার শেষ হইতে এক দিন বিলম্ব হওয়ায় তাঁহাদের জিদ আরও প্রবল হইল।

একটি স্থূলকায় প্রকাণ্ড জোয়ান জুরী গরমে ধুঁকিতে ধুঁকিতে একখান আগড়া কাঠের চেয়ার হইতে উঠিয়া কোট খুলিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "কলিকাতার অন্ধকূপ-হত্যার গল্পটা (talk about the Black Hole of Calcutta) তবে মিথ্যা নয়! বাতাস না পাইলে আমাদেরও 'অন্ধকূপ-হত্যা' হইবে।"

ভদ্রলোকটি একটি বাতায়নের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার সম্মুখে প্রসারিত দড়ির পর্দ্দা অপসারিত করিবার চেষ্টা করিলেন। তাহা দেখিয়া জুরীর দলের মোড়ল লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "ও কি করেন, মিঃ এমারী? স্মরণ রাখিবেন, কাযটি বে-আইনী।"

স্থূলকায় লোকটি বিকট মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "বে-আইনী! প্রাণই যদি খাঁচা-ছাড়া হয়, তা' হইলে আইন মানিবে কে? তা, আইনের ভয়ই যদি এত সাংঘাতিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে 'সুইচ' টিপিয়া আলোটা নিবাইয়া দিন, আমি পর্দ্দা ফাঁক করি, অন্ধকারে কেহ তাহা দেখিতে পাইবে না। দম্ বন্ধ হইয়া মরিতে পারিব না।"

তাঁহার কথা আর অধিক দূর অগ্রসর হইল না, তাঁহার গলার কলার ঘর্ম্মাক্ত হইয়া গলায় আঁটিয়া বসিয়াছিল; তিনি অতিকষ্টে কলারের বোতাম অপসারিত করিয়া জানালার পর্দ্দা স্পর্শ করিলেন।

জুরীদলের 'ফোরম্যান' অর্থাৎ মোড়লমহাশয় তাঁহার সহযোগীর এই বে-আইনী কার্য্যে বাধাদানের জন্য তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া গম্ভীরস্বরে হাঁকিলেন, "মিঃ এমারী!"

সেই মুহূর্ত্তে সেই কক্ষের বিজলী-বাতি সহসা নির্ব্বাপিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে কক্ষগুলি গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। জুরীদের ঘর্ম্মপ্লাবিত উত্তাপক্লিষ্ট মুখগুলিও অদৃশ্য হইল। পর্দ্দাগুলির কাঠের আংটা আন্দোলিত হওয়ায় ঠক্‌-ঠক্‌ শব্দ ভিন্ন সেই অন্ধকারে অন্য কোন শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল না। তাহার পর শীতল নৈশ সমীরণ মুহূর্ত্তের জন্য উত্তপ্ত কক্ষে প্রবেশ করিল।

জুরীদলের মোড়ল তাঁহার চক্ষুর উপর এত বড় বে-আইনী কায ঘটিতে দেখিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে আসিয়াছে; কিন্তু আলো নিবাইল কে? শীঘ্র সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া দাও। কাযটা ভয়ঙ্কর নিয়ম-বিরুদ্ধ হইয়াছে।"

মোড়লের কণ্ঠস্বর নীরব না হইতেই একখান চেয়ার ঠেলিয়া ফেলিবার শব্দ হইল। লোহার রেলিংএ কোনও ব্যক্তির পা সশব্দে বাধিয়া গেল। অন্ধকারে অন্য দিকে ঠং করিয়া আর একটা শব্দ হইল। অন্ধকারের ভিতর কে এক জন বলিল, "বৈদ্যুতিক প্রবাহে কোন বিঘ্ন ঘটিয়াছে।"

হঠাৎ কে এক জন দিয়েশলাইয়ের কাঠী জ্বালিলে অন্ধকারে তাহার পীতাভ ক্ষীণ আলোক দৃষ্টিগোচর হইল। যে দিয়েশলাই জ্বালিয়াছিল, তাহার মুখমণ্ডলে সেই আলোক-শিখা প্রতিফলিত হইল। জুরীর দলের মোড়লের দীর্ঘ মূর্ত্তিও সেই মৃদু আলোকে লক্ষিত হইল। তিনি তখন বাতায়নের পর্দ্দার দিকে চাহিয়াছিলেন, অন্ধকারের সুযোগে পর্দ্দা অপসারিত হইয়াছিল।

মোড়ল হাঁকিলেন, "মিঃ এমারী!" কিন্তু কোন সাড়া না পাইয়া বলিলেন, "নাঃ, বিশ্রী কাণ্ড! লোকটা গেল কোথায়?"

অন্য কে এক জন দিয়েশলাইয়ের একটা কাঠী জ্বালিয়া তাহা মাথার উপর তুলিয়া ধরিল। সেই আলোকে বাতায়নের সম্মুখবর্ত্তী পর্দ্দাগুলি পূর্ব্ববৎ প্রসারিত দেখিতে পাওয়া গেল, কিন্তু সেই স্থূলদেহ কোটহীন লোকটি তখন অদৃশ্য হইয়াছিল।

তাহাকে সেই কক্ষে দেখিতে না পাইয়া আর এক জন বলিল, "আমার বিশ্বাস, তিনি শরীর ঠাণ্ডা করিবার জন্য একটু বাতাসের আশায় 'ফায়ার এস্‌কেপের' উপরে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন।"

দোতলার কোন কক্ষে হঠাৎ আগুন লাগিলে গৃহবাসীরা তাড়াতাড়ি পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিবে—এই উদ্দেশ্যে যে গুপ্তপথ থাকে, তাহাকেই 'ফায়ার এস্‌কেপ' বলে।

মুহূর্ত্ত পরে দীপশলাকা নির্ব্বাপিত হইলে পুনর্ব্বার চতুর্দ্দিক নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। সেই কক্ষ তখন এরূপ নিস্তব্ধ যে, সেই নিস্তব্ধতা অসহ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ক্ষণকাল কাহারও কণ্ঠস্বর বা পদশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল না। অতঃপর সেই কক্ষে সহসা সুশীতল নৈশ সমীরণ প্রবাহিত হইল। সেই সময় মনে হইল, কোন ব্যক্তি কোনও দিক হইতে সেই কক্ষে উপস্থিত হইয়াছে। অন্ধকারে সেই আগন্তুক দৃষ্টিগোচর না হইলেও, কেহ যে সেই কক্ষে আসিয়াছে, ইহা সুস্পষ্টরূপে অনুভূত হইল।

জুরীদের দলপতি সেই কক্ষের একটি বাতায়নের অদূরে হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। মিঃ এমারী ব্যতীত অন্য কেহ সেই কক্ষে তখন ছিলেন বলিয়া তাঁহার মনে হইল না, তথাপি—জুরীদের দলপতি সেই নিবিড় অন্ধকারে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া আবেগ-কম্পিত স্বরে ডাকিলেন, "মিঃ এমারী!"

তাঁহার মনে হইল, কোন একটা জিনিস তাঁহার অত্যন্ত নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাহা তিনি দেখিতে পাইলেন না, কেবল তাহার সান্নিধ্য অনুভব করিলেন মাত্র। তাঁহার মন অননুভূত-পূর্ব্ব, অজ্ঞাত ভয়ে পূর্ণ হইল। কিন্তু সেই আতঙ্কের কারণ তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার সহযোগী জুরীদের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার সংযত করিবার জন্য যে দায়িত্বভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বিস্মৃত হইয়া সভয়ে কিছু দূরে সরিয়া যাইতেই একটি বৃহৎ মেহগ্নি-টেবিলে বাধিয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেলেন। সেই সময় এক জন লোক তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত হইল। তিনি ব্যগ্রভাবে তাহার দিকে হাত বাড়াইতেই কেহ পরিচিত স্বরে তাঁহাকে বলিল, "আপনার কি হইয়াছে, মহাশয়!"

জুরীর ফোরম্যান এই কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; মানসিক দুর্ব্বলতার কথা চিন্তা করিয়া তাঁহার একটু লজ্জা হইল। তিনি অকারণ ভয় ত্যাগ করিয়া সহজ স্বরে বলিলেন, "যে কনষ্টেবল বাহিরে পাহারায় আছে, তাহাকে কেহ বলুক—বিজলী-বাতি নিবিয়া গিয়াছে। আমরা অন্ধকারে কি করিয়া বসিয়া থাকিব? অন্ধকারে থাকিতে আমাদের কোন অসুবিধা হইবে না, এরূপ আশা করা উচিত নহে।"

কিন্তু তাঁহার এ কথায় কেহই সাড়া দিল না। সেই নিস্তব্ধ কক্ষে পুনর্ব্বার বাহিরের বায়ুপ্রবাহ প্রবেশ করিয়া উত্তপ্ত বায়ুস্তর আলোড়িত করিল। জুরীদের মোড়ল-মহাশয়ের ধারণা হইল, পুনর্ব্বার কেহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। তিনি সভয়ে হাত তুলিয়া তদ্দারা তাঁহার শুষ্ক অধরোষ্ঠ মুছিয়া ফেলিলেন। তাঁহার মনে হইল, দ্বারের দিক হইতে কেহ নিঃশব্দপদ-সঞ্চারে সেই কক্ষের মেঝের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। পর-মুহূর্ত্তেই দ্বারে কে করাঘাত করিল, তাহার পর এক জন জুরীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া গেল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "কনষ্টেবল, বিজলী-বাতি নিবিয়া গিয়াছে, তুমি আসিয়া আলোর ব্যবস্থা কর। আমরা অন্ধকারে বসিয়া থাকিব, এরূপ আশা করিতে পার না।"

ক্ষণকাল পরে চাবি নাড়িবার শব্দ হইল, দরজার হাতল ঘুরাইবার শব্দও শুনিতে পাওয়া গেল; তাহার পর সব নিস্তব্ধ, আর কিছুই হইল না। অন্ধকারাবৃত কক্ষে আলো জ্বালিবার কোন চেষ্টারও পরিচয় পাওয়া গেল না। জুরীদের অসুবিধা কেহই লক্ষ্য করিল না।

জুরীদের মোড়ল টেবলে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার উভয় করতল দ্বারা মুখ আবৃত। সেই সময় সেই কক্ষের অন্য পাশে কে এক জন চাপা গলায় আর্ত্তনাদ করিল। যেন কেহ উৎপীড়িত হইয়া অসহ্য যন্ত্রণায় ব্যাকুল কণ্ঠে তাহার প্রতি কঠোর নির্য্যাতনের প্রতিবাদ করিল।

জুরীদের মোড়ল এবার উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "এ সকল কি ব্যাপার? কনষ্টেবলটা কোথায়? কেহ আসিয়া এখনও দরজা খুলিল না কেন?"

পুনর্ব্বার দ্বারে ঝন্ ঝন্ শব্দ হইল। কে এক জন এক বাক্স দিয়েশলাই বাহির করিল। তাহার পর খট্ করিয়া শব্দ হইল, এবং সেই কক্ষের বিজলী-বাতি সহসা জ্বলিয়া উঠিল।

সেই কক্ষের উজ্জ্বল দীপালোকে যে দৃশ্য লক্ষিত হইল, তাহা অতীব আশঙ্কাজনক, তাহা বিশ্বাসের অযোগ্য। এমারী নামক জুরী ব্যতীত অন্য সকলেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বা বসিয়াছিলেন; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, প্রত্যেক জুরীর দুই পাশে দুই দুই জন প্রকাণ্ড জোয়ান দাঁড়াইয়াছিল! কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত, প্রত্যেকেরই মুখমণ্ডল অবগুণ্ঠনাবৃত, কেবল প্রত্যেক অক্ষিকোটরের সম্মুখে কাল ক্রেপের গোলাকার সচ্ছিদ্র আবরণ। অবগুণ্ঠনে তাহাদের মস্তক আবৃত থাকায় কাহারও কেশরাশি দেখিবার উপায় ছিল না। সমগ্র মুখ-মণ্ডলের মধ্যে প্রত্যেকেরই কেবল চিবুকের নিম্নাংশমাত্র দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। সেই অদ্ভুত পরিচ্ছদে দীর্ঘদেহ জোয়ান মূর্ত্তিগুলি অতি ভয়াবহ দেখাইতেছিল।

তাহাদিগকে দেখিয়া জুরীদের ধারণা হইল, ভীষণমূর্ত্তি যমদূতের দল সেই রাত্রিকালে তাহাদের কঠোর কর্ত্তব্য-সাধনের জন্য স্থাম্বলডন হোটেলের সেই কক্ষে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের আকস্মিক আবির্ভাবের কারণ কি, তাহা কেহই বুঝিতে পারিলেন না। এই সকল অদ্ভুতাকৃতি আগন্তুক কোনও কথা না বলিয়া, সম্পূর্ণ নির্ব্বাক্-ভাবে বুকের পকেট হইতে এক একটি রিভলভার বাহির করিয়া, তাহা প্রত্যেক জুরীর ললাট লক্ষ্য করিয়া উদ্যত করিল। তাহাদের কাহারও মুখ হইতে কোন কথা নিঃসারিত

না হইলেও তাহাদের অভিসন্ধি এতই সুস্পষ্ট যে, তাহা বুঝিতে পারিয়া, এগার জন জুরীর প্রত্যেকেই উভয় হস্ত মস্তকের ঊর্দ্ধে প্রসারিত করিয়া তাহাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন ।

জুরীরা কম্পিতদেহে এবং হতাশভাবে দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সেখানে ঐ প্রকার আরও তিন জন লোককে দেখিতে পাইলেন ; এক জন পুলিসম্যানের সংজ্ঞাহীন দেহ দ্বারপ্রান্তে নিপতিত ছিল। সেই তিন জন লোক পুলিসম্যানের দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার অবস্থা লক্ষ্য করিতেছিল। পুলিসম্যান সহসা চেতনালাভ করিলেও তাহাদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিবে বা চীৎকার করিয়া কাহারও সহায়তা প্রার্থনা করিবে, তাহার উপায় ছিল না, জুরীরা তাহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া ইহাও বুঝিতে পারিলেন ।

জুরীরা আতঙ্ক-বিস্ফারিত নেত্রে সেই কক্ষের অন্য প্রান্তস্থিত অগ্নিকুণ্ডের দিকে চাহিয়া আর একটি দীর্ঘমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন ; তাহারও মুখমণ্ডল মুখোসে আবৃত। কিন্তু তাহার হাতে পিস্তল ছিল না, তাহার পিস্তলটি তখন সম্ভবতঃ তাহার বুকের পকেটেই বিশ্রাম করিতেছিল। সেই ব্যক্তি উভয় হস্তে দুইটি বৈদ্যুতিক তার লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল। সে সহসা তাহার সঙ্গীদের মুখের দিকে চাহিয়া, মাথা নাড়িয়া কি ইঙ্গিত করিল। তাহার সেই ইঙ্গিত অনুসারে পিস্তলধারী জোড়া জোড়া আততায়ী মুহূর্ত্তমধ্যে প্রত্যেক জুরীর উপর লাফাইয়া পড়িল এবং এক জন প্রত্যেক জুরীর দুই হাত ও মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই অবসরে প্রত্যেক জুরীর পদদ্বয় দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিল। এই কার্য্যে তাহারা এরূপ সুদক্ষ ছিল যে, চক্ষুর নিমেষে ঠিক একই সময়ে তাহাদের হাতের কায শেষ হইয়া গেল।

যে ব্যক্তি অগ্নিকুণ্ডের নিকট দাঁড়াইয়া বৈদ্যুতিক তারে মনঃসংযোগ করিয়াছিল, সেই ব্যক্তি পুনর্ব্বার ইঙ্গিত করিয়া তাহার হাতের তার দুইটির প্রান্ত ছাড়িয়া দিল। সেই মুহূর্ত্তে সেই কক্ষ পুনর্ব্বার গাঢ় অন্ধকারে আবৃত হইল। তাহার পর সেই কক্ষে মৃদু পদধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল।

সেই সময় গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছিল, সেই মেঘে সহসা বিদ্যুৎস্ফুরণ হইল, বিদ্যুতালোকে সেই কক্ষের পর্দ্দাহীন বাতায়ন মুহূর্ত্তের জন্য আলোকিত হইল। সেই আলোক রজ্জুবদ্ধ জুরীদের চোখে মুখে প্রতিফলিত হইল। তখন তাঁহাদের আততায়ীরা তাঁহাদের রজ্জুবদ্ধ অসাড় দেহ কাঁধে তুলিয়া লইয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিতেছিল!

সেই কক্ষের নীচেই সঙ্কীর্ণ গলি; গলিটি অদূরবর্ত্তী রাজপথ পর্য্যন্ত প্রসারিত। গলির মোড়ে একখানি বৃহৎ মোটর-লরী দাঁড়াইয়াছিল। জুরীদের বাহকরা রজ্জুবদ্ধ জুরীগণকে সেই লরীর অভ্যন্তরে সংস্থাপিত করিলে, তাহার এঞ্জিন দুই চারিবার ভস্-ভস্ শব্দ করিল ; তাহার পর তাহা সবেগে হলবর্ণের অভিমুখে ধাবিত হইল।

অতঃপর হ্যাম্বলডন হোটেলের কক্ষে আর জনপ্রাণীরও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। কেবল তাহার বাতায়নস্থিত পর্দ্দাগুলি নৈশ বায়ুপ্রবাহে আন্দোলিত হইয়া সেই কক্ষের শূন্যতাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। কনষ্টেবলটার দেহ তখনও দ্বারপ্রান্তে পড়িয়াছিল।

[ক্রমশঃ]

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।





সাহিত্যের বৈঠক

ভক্তি-ধর্ম্ম ও রাধাভাব

মনের স্মরণ প্রাণ, মধুর মধুর ধাম,
যুগল-বিলাস-স্মৃতি সার ;
সাধ্য সাধন এই, ইহা পর আর নেই,
এই তত্ত্ব সর্ব্ববিধি-সার।

প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকায় শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর এইভাবে ভক্তিধর্ম্মের মর্ম্মকথা ব্যক্ত করিয়াছেন। স্মরণ মনের প্রাণ-স্বরূপ। দেহ যেমন প্রাণ বিনা বৃথা, মনও তেমনি স্মরণ বিনা নিরর্থক। স্মরণের মধ্যে সার বস্তু মধুর হইতেও মধুর বৃন্দাবনধামে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। ইহাই সাধ্য, ইহাই সাধন ; ইহা ব্যতীত অন্য কোনও সাধ্য-সাধন নাই। এই তত্ত্বই সর্ব্ববিধ বিধি-উপদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

বাঙ্গালার এই প্রেমভক্তি এক অপূর্ব্ব সামগ্রী। ইহার সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক আলোচনা যথেষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু সাধারণ কৌতূহলী পাঠকের পক্ষে সে সকল সব সময়ে সুলভ নহে। আমি গত কার্ত্তিক মাসের 'উদয়নে' বাঙ্গালার প্রেমধর্ম্ম নামক প্রবন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। সুখের বিষয় যে, আমার সে প্রবন্ধ চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। গত পৌষমাসের উদয়নে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ রায় বাহাদুর বাঙ্গালার বৈষ্ণব-ধর্ম্ম শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। রমাপ্রসাদ বাবু সুপণ্ডিত ও রসজ্ঞ। ভক্তি-ধর্ম্মের আলোচনায় তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির যোগদানে শুধু যে আমার প্রবন্ধ গৌরবান্বিত হইয়াছে, তাহা নহে ; পরন্তু অনেক জটিল বিষয়ের সমস্যায় তাঁহার ঐতিহাসিক ও মূর্ত্তি-বিষয়ক গবেষণার সাহায্য পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা হয়।

তিনি কোনও কোনও বিষয়ে আমার সহিত একমত হইতে পারেন নাই। সেই সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা এই প্রবন্ধে বলিবার চেষ্টা করিব। আমার প্রথম কথা—চন্দমহাশয় তাঁহার বক্তব্য যে ভাবে বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বক্তব্য বিষয় আমি ঠিক বুঝিতে পারিয়াছি কি না, সে সম্বন্ধে আমার নিজেরই সন্দেহ হইতেছে। আমি প্রেমধর্ম্ম সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিলাম, তাহার একটু পুনরাবৃত্তি করিয়া চন্দমহাশয়ের বক্তব্য কি, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমি আমার কার্ত্তিক মাসের প্রবন্ধে বলিয়াছি—

(১) বাঙ্গালার প্রেমধর্ম্ম এক অভিনব বস্তু। শাণ্ডিল্য-সূত্র, নারদ-পঞ্চরাত্র, ভগবদ্গীতা এবং ভাগবতের মধ্য দিয়া যে ভক্তিধর্ম্মের সূত্র পাওয়া যায়, শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্মে তাহারই পরিণতি।

(২) শ্রীচৈতন্য এই অভিনব প্রেমধর্ম্ম দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। এই প্রেমধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য গোপীভাব বা রাধাভাব।

(৩) এই রাধাভাবের ব্যাখ্যা দেখিতে পাই রামানন্দ-মিলন সংবাদে। রামানন্দ যে কান্তাভাবকে সাধ্যশিরোমণি বলিয়া বর্ণনা করিলেন, তাহাই অঙ্গীকার করিয়া মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম গড়িয়া উঠিল।

(৪) রামানন্দ যে কান্তাভাবের কথা বলিলেন, তাহার মূল দাক্ষিণাত্য দেশেই পাওয়া যায়—যথা শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে এবং আলওয়ারদিগের সঙ্গীতে।

(৫) মহাপ্রভুর হৃদয়ে প্রেমের যে বীজ দাক্ষিণাত্যদেশে উপ্ত হইল, তাহা বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবি চণ্ডীদাসের ও বিদ্যাপতির রসপ্রপাতে ফলবান্ তরুতে পরিণত হইল।

আমার ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মোটামুটি সারমর্ম্ম বোধ হয় এই। এক্ষণে দেখা যাউক, চন্দমহাশয়ের প্রতিপাদ্য কি।

প্রথমতঃ চন্দমহাশয় বলিতে চাহেন, শাণ্ডিল্যসূত্র ভগবদ্‌গীতার পরবর্ত্তী। আমি ইহাদের জন্য প্রাচীনতার দাবী করিয়াছি, তাহা সমর্থনযোগ্য নহে।

শাণ্ডিল্য-সূত্র সম্বন্ধে আমি বলিয়াছিলাম, "শাণ্ডিল্য-সূত্রের এই ভক্তিসূত্র সম্ভবতঃ গীতারও পূর্ব্বে গ্রথিত হইয়াছিল। কারণ, গীতার পরে যে সকল ভক্তিশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে শরণাগতির ভাব সুস্পষ্ট।" ইহার দ্বারা শাণ্ডিল্যসূত্র যে গীতার পূর্ব্বে রচিত, ইহা আমি বলি নাই। বস্তুতঃ শাণ্ডিল্যসূত্র যে আকারে আমরা প্রাপ্ত হই, তাহা সম্ভবতঃ খুব প্রাচীন নহে। তবে শাণ্ডিল্য যে এক জন প্রাচীন ঋষি, তাহা ছান্দোগ্য উপনিষৎ হইতে জানা যায়। শাণ্ডিল্য পাঞ্চরাত্র মতের প্রবর্ত্তক, ইহা শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ ভগবদ্‌গীতা ভক্তিধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপন করে নাই।

এ সম্বন্ধে সুধী পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। ভগবদ্‌গীতারও যে একটি জ্ঞানপরা ব্যাখ্যা হইতে পারে, ইহা আমার অবিদিত নহে। শঙ্করমতাবলম্বী বা যোগদর্শনের পক্ষপাতী পণ্ডিতগণ ভগবদ্‌গীতা হইতে তত্ত্বজ্ঞানের প্রাধান্য আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সকলেই জানেন। এখনও কোনও কোনও নবীন মঠাধিকারীরা জ্ঞানের মুখ্যত্ব ও ভক্তির গৌণত্ব প্রচার করিতে তৎপর। রমাপ্রসাদ বাবু তাঁহাদের পন্থা অনুসরণ করিলে অবশ্যই গীতার তাৎপর্য্য ঐ ভাবে ব্যাখ্যা করিবেন। ইহা কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু বস্তুতঃ গীতায় কি জ্ঞানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? একবার বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং
স মে যুক্ততমো মতঃ।

আমি শুধু এই অংশ উদ্ধৃত করিয়াছিলাম; কিন্তু সমগ্র শ্লোকেরই অনুবাদ প্রদান করিয়াছিলাম, যথা— "হে অর্জ্জুন! যোগী তপস্বীদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; জ্ঞানী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; কর্ম্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; আবার যে যোগী আমাতে সমস্ত হৃদয়-মন সমর্পণ করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভজনা করেন, তিনি যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! এইরূপ তরতম নির্দ্দেশ হইতে নিঃসংশয়ে বুঝা যায় যে, গীতার ধর্ম্মমতের তাৎপর্য্য কি।"

ইহার সমালোচনায় চন্দ মহাশয় বলিলেন, "কিন্তু গীতার ধর্ম্মের তাৎপর্য্য দূরে থাকুক, অধ্যাপক মহাশয়ের নিজের মতের তাৎপর্য্য বুঝাই কঠিন মনে হয়।"

আমার মতের তাৎপর্য্য বুঝা এতই কঠিন হইল? আমি ঐ শ্লোকের সাহায্যে বলিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, জ্ঞানী হইতে ভক্ত শ্রেষ্ঠ: সুতরাং জ্ঞান হইতে ভক্তি শ্রেষ্ঠ। প্রকৃত কথা এই যে, চন্দ মহাশয় আমার এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি তাঁহার নিজের মতের অনুকূল ব্যাখ্যা চাহেন। যদি তাহাই হয়, তবে সেই কথা বলিলেই হইত। যাহা হউক, চন্দ মহাশয় বলেন, "জ্ঞানী হইতে ভক্ত শ্রেষ্ঠ, এ কথাই নয়। সুতরাং ৪৬ শ্লোকে যোগী অপেক্ষা হীন যে জ্ঞানীর উল্লেখ আছে, সেই জ্ঞানী অন্য রকম জ্ঞানী।" "শঙ্কর ৪৬ শ্লোকের ভাষ্যে "জ্ঞানী" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'জ্ঞানমত্র শাস্ত্রপাণ্ডিত্যং' "এখানে জ্ঞান শব্দে শাস্ত্রজ্ঞান বুঝায়।"

শাস্ত্রপাণ্ডিত্য বলিয়া যে জ্ঞানের কোনও বিশেষ সংজ্ঞা আছে, তাহা ত জানি না। শব্দের অর্থ নিজ নিজ সুবিধা অনুসারে করিয়া লইতে পারা যায়। শাস্ত্রজ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য কোথায়, তাহা না জানা পর্য্যন্ত এরূপ ব্যাখ্যা অনুমোদন করা কঠিন নহে কি?

বহূনাম্ জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।

এ শ্লোকের ব্যাখ্যায়ও কি রমাপ্রসাদ বাবু 'শাস্ত্রপাণ্ডিত্যং' ধরিবেন? যেখানে যেরূপ ব্যাখ্যা তাঁহার মতের অনুকূল, তাহাই গ্রহণ করিলে চলিবে কেন?

গীতার সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম দুইটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার মতের সারার্থ বুঝিতে পারা যায়। শ্লোক দুইটি এই—

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তৎ শৃণু॥
জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥

হে পার্থ, আমাতে মন আসক্ত হইলে (অর্থাৎ আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিলে) এবং একান্তভাবে আমার শরণাপন্ন হইলে, আমাকে নিঃসন্দেহে এবং সম্পূর্ণভাবে কেমন করিয়া জানিতে পারিবে, তাহা শ্রবণ কর। আমি তোমাকে

বিজ্ঞানসংযুক্ত জ্ঞান কিরূপ, তাহা অশেষপ্রকারে বলিব, তাহা জানিলে আর জ্ঞাতব্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না!

এখানে কথা এই যে, ভক্তি আর জ্ঞান ত পরস্পর বিরুদ্ধ নহে। যে ভক্তির দ্বারা আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছে, আমাকে আশ্রয় করিয়াছে, সেই আমাকে জানিতে পারে। ইহাই অভিপ্রেত। এখানে ভক্তই যে উত্তমাধিকারী এবং ভক্তিশূন্য জ্ঞানে যে ভগবান্‌কে জানা যায় না, তাহাই বলা হইতেছে। উপনিষদ বলিয়াছেন,

'তমেবং বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।'

এই বাক্যের সহিত যে কোনও বিরোধ নাই, ইহা দেখাইবার জন্যই গীতার শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, আমাতে একান্তভাবে মনোনিবেশ করিলে তবেই আমি তোমাকে সেই দুর্লভ জ্ঞান প্রদান করিতে পারি, যাহার পরে আর কিছু জানিবার থাকে না।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।

*　　*　　*　　*

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

যে সকল ব্যক্তি আমাতে প্রাণমন সমর্পণ করেন, (মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা) আমি তাঁহাদিগকে বুদ্ধি প্রদান করিয়া থাকি, যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়েন।

কিন্তু রমাপ্রসাদ বাবু উপরি-উক্ত শ্লোক (ময্যাসক্তমনা ইত্যাদি) হইতে সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, 'যাহার মন পরমেশ্বরে অভিনিবিষ্ট এবং অনন্যশরণ হইয়া ভক্তির সহিত যে যোগাভ্যাস করে, তাহার কি লাভ হয়? জ্ঞানলাভ হয়। ……সুতরাং গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষের শ্লোকে (তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী ইত্যাদি) প্রকৃতপ্রস্তাবে ভক্তিকে জ্ঞানের অপেক্ষা বড় করা হয় নাই। ভক্তিকে জ্ঞানের দ্বার বলা হইয়াছে।" (উদয়ন ১০৯৫ পৃঃ)

এ কথার উপর আর কিছু বলা বৃথা। কারণ, সমস্ত গীতাই ইহার প্রতিবাদ বলিয়া আমার মনে হয়। দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথমেই অর্জ্জুন এই প্রশ্নটিই করিয়াছিলেন :—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥

যে সকল ভক্ত তোমাতে সর্ব্বদা তদ্গতচিত্ত হইয়া তোমার উপাসনা করে, আর যাহারা তোমাকে অব্যক্ত ও অব্যয় ব্রহ্ম ভাবিয়া উপাসনা করে, ইহাদের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগী?

এই প্রশ্নের ভূমিকাস্বরূপ শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন :—

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে 'মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরমো মদ্ভক্তঃ' ইত্যেবং ভক্তিনিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বমুক্তং, 'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি' ইত্যাদিনা চ, তত্র তত্রৈব শ্রেষ্ঠত্বং নির্ণীতং, তথা 'তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে' ইত্যাদিনা, 'সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি' ইত্যাদিনা চ জ্ঞাননিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বম্ উক্তম্, এবমুভয়োঃ শ্রেষ্ঠোঽপি বিশেষজিজ্ঞাসয়া ভগবন্তং প্রতি অর্জ্জুন উবাচ।

অর্থাৎ জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়কেই কোনও কোনও শ্লোকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে, কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে বস্তুতঃ শ্রেষ্ঠ যোগী কে, ইহাই অর্জ্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ভগবান তাহার উত্তরে বলিলেন :—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥

রমাপ্রসাদ বাবু এই শ্লোকের কিরূপ ব্যাখ্যা করিতে চাহেন, শুনিতে কৌতূহল হয়। ভগবান্ এই যে 'পরা শ্রদ্ধা' বলিলেন, ইহারই নাম ভক্তি বটে ত? যদি কোনও সংশয় থাকে, তাহা হইলে ভগবান বলিতেছেন,—

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥

এইরূপ অসংশয়িতভাবে ভক্তিযোগের প্রাধান্য স্থাপন করা হইয়াছে বলিয়া দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ।

শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ।

*　　*　　*　　*

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ॥

ভক্তির প্রভাবে আমার স্বরূপ ও সর্ব্বব্যাপিত্ব জানিতে পারে।

জ্ঞান ও ভক্তি সাধনার দুইটি পথ। একান্ত পৃথক্ না হইলেও মুখ্যত্ব ও গৌণত্ব-ভেদে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র বলিয়া

স্বীকার করা যায়। জ্ঞান ও ভক্তির প্রাধান্য লইয়া মতভেদ আছে, থাকিবেও। কিন্তু গীতার অভিপ্রায় স্থিরভাবে বিচার করিলে ভক্তির প্রাধান্যই দেখা যায়।

তার পরে চন্দ মহাশয় গীতার্থ সংগ্রহের এক অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা দিয়াছেন। (উদয়ন ১০৯৬ পৃঃ) শ্রীধরস্বামিপাদ জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় করিতে গিয়া তাঁহার সুবোধিনী টীকার উপসংহারে বলিয়াছেন ঃ—

ভগবদ্ভক্তিযুক্তস্য তৎপ্রসাদাত্মবোধতঃ।
সুখং বন্ধবিমুক্তিঃ স্যাদিতি গীতার্থসংগ্রহঃ॥

এই শ্লোকের অর্থ অতি সহজ। যিনি ভগবানে ভক্তিযুক্ত, ভগবানের প্রসাদে তাঁহার আত্মতত্ত্ববোধ হয় এবং আত্মতত্ত্ববোধ হইলে অনায়াসে তিনি মোক্ষ লাভ করেন।

এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা মোক্ষকেই একমাত্র কাম্য বলিয়া মনে করেন এবং আত্মজ্ঞান তাহার সাধনস্বরূপ স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতের সহিত গীতার কোনও বিরোধ নাই। কারণ, ভক্তিমান ভগবানের অনুগ্রহে আত্মজ্ঞান লাভ করেন এবং তাহার যে অবশ্যম্ভাবী ফল মোক্ষ, তাহাও অনায়াসে প্রাপ্ত হয়েন। ভাবার্থ এই যে, ভক্ত মোক্ষ চাহেন না, কিন্তু ভক্তিযোগের ফলে মোক্ষ আপনি করতলগত হয়।

এক্ষণে রমাপ্রসাদ বাবু কি ব্যাখ্যা করিতেছেন, দেখা যাউক। "যাহার ভগবানে ভক্তি আছে, তাহার ভগবানের প্রসাদস্বরূপ আত্মজ্ঞান হইতে সুখ এবং মোক্ষ হয়।" 'সুখং বন্ধবিমুক্তিঃ স্যাৎ' ইহার অর্থ বুঝিতে রমাপ্রসাদ বাবু ভুল করিয়াছেন। তিনি হয় ত সুখও চান, মোক্ষও চান, কিন্তু স্বামিপাদের ঐ শ্লোক হইতে তাহা পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, গীতার অর্থ সম্বন্ধে রমাপ্রসাদ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহার বিচার যাঁহারা অভিজ্ঞ, তাঁহারা করিবেন। আমার মূল বক্তব্য সম্বন্ধে রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করা যাউক। আমার প্রবন্ধের প্রধান কথা ছিল এই যে, মহাপ্রভুর ধর্ম্মমতে ভক্তির যে অভিনব এবং স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি দেখিতে পাই, অন্যত্র তাহা নাই। চন্দ মহাশয় কিন্তু তাহা স্বীকার করেন না। মহাপ্রভু যে নূতন প্রণালীতে সাধ্য নির্ণয় করিলেন এবং রাধাভাব অঙ্গীকার করিয়া এক অপূর্ব্ব প্রেমধর্ম্মের প্রচার করিলেন, তাহাই ছিল আমার প্রতিপাদ্য। চন্দ মহাশয় বলেন, ইহাতে নূতনত্ব কিছু নাই। ভাগবত হইতে এই চৈতন্যপ্রচারিত ধর্ম্মের ধারা আসিয়াছে। 'শ্রীভাগবত এই ভক্তিরসের নির্ঝর।....ভাগবতের পঠন-পাঠনের সঙ্গে সঙ্গে এই ভক্তিরস-ধারার আর এক সহায় ছিল বৃন্দাবন-লীলার নায়ক গোপালকৃষ্ণের মূর্ত্তির উপাসনা। গোপাল-কৃষ্ণের উপাসনার প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রজলীলার সঙ্গিনী গোপীগণের ভাবে আরাধনার এবং প্রধানা গোপী রাধার ভাবে বিভোর হইয়া আরাধনার প্রবৃত্তির জাগরণ সহজ হয়।' চন্দ মহাশয়ের নিকট সহজ মনে হইতে পারে; কিন্তু সে জাগরণ হয় নাই। কল্পনার আশ্রয় লইয়া ইতিহাস রচনা করা আর কাহারও পক্ষে শোভনীয় হইলেও রমাপ্রসাদ বাবুর ন্যায় প্রবীণ ঐতিহাসিকের পক্ষে শোভন হয় না।

রাধার ভাব উপলব্ধি করা, নিজের জীবনে সেই "বিরহ-ব্যথা-মূর্ত্তি" ফুটাইয়া তোলা এবং তাহাকে ভজনের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা শ্রীচৈতন্যেরই শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি।

স্বীকৃত্য রাধিকাভাবকান্তী পক্ষদ্বয়চ্ছলে।
অন্তর্ব্বহী রসাম্ভোধিঃ শ্রীনন্দনন্দনোঽপি সন্॥
—গৌরগণোদ্দেশদীপিকা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্মমত কি, তাহা শ্রীল বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তীর নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে বুঝিতে পারা যায়;—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

মহাপ্রভুর মতে শ্রীকৃষ্ণই উপাস্য, তাঁহার ধাম শ্রীবৃন্দাবন; সেই বৃন্দাবনবাসিনীরা যে মধুরভাবে তাঁহাকে ভজন করিয়াছিলেন, তাহাই উপাসনা; এই ধর্ম্মের বিশুদ্ধ প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত, এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ প্রেম।

এই মতের বৈশিষ্ট্য বুঝিতে হইলে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মতের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক। মধ্বাচার্য্য শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এক জন আদিগুরু বলিয়া কথিত হয়েন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার মত নিম্নলিখিত শ্লোকে পাওয়া যায়।

শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতরঃ সত্যং জগৎ তত্ত্বতো
ভেদো জীবগণাঃ হরেরনুচরাঃ নীচোচ্চভাবং গতাঃ।
মুক্তির্নৈজসুখানুভূতিরমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধনং
হ্যক্ষাদি ত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ॥

মধ্বমতে হরি আরাধ্য, চৈতন্যমতে শ্রীকৃষ্ণ; মধ্বমতে পুরুষার্থ বা কাম্য নিজ সুখানুভূতিরূপ মুক্তি, তাহার সাধন বিশুদ্ধ ভক্তি; চৈতন্যমতে পুরুষার্থ বা একমাত্র কাম্য প্রেম এবং তাহার সাধন গোপীর ভাবে ভজন। মধ্বমতে ভগবৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানের প্রমাণ বেদ; চৈতন্যমতে ভাগবত।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বাচার্য্য হইতেও মহাপ্রভু এক নূতন পন্থা প্রবর্ত্তিত করিলেন। সেই পন্থার স্বরূপ কি, তাহাই আমার পূর্ব্ব-প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। 'রম্যা কাচিদুপাসনা'—এখানে রম্য অর্থে যাহা আমাদের রসানুভূতি বা Aesthetic sentimentকে পরিতৃপ্ত করে! 'কাচিৎ' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ইহা অনির্ব্বচনীয়। ব্রজবধূরা কি ভাবে ভজন করিতেন, তাহা মুখে বলিয়া বুঝানো যায় না। তাঁহাদের দাসীর দাসীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সাধন-পথে অগ্রসর হইলে জানিতে পারা যায় যে, গোপীদের ভজন কি বস্তু। ইহাই বৈষ্ণব আচার্য্যগণের অভিপ্রায়। প্রেমকে পুরুষার্থ বলায় বুঝিতে হইবে যে, এক নূতন রাজ্যের বার্ত্তা মহাপ্রভু জগতে প্রচার করিলেন। 'মুক্তি' 'মুক্তি' আবহমানকাল আমাদের দেশ শুনিয়া আসিতেছে। হঠাৎ এক নূতন সংবাদ আসিল 'প্রেম'। সম্ভবতঃ মাধবেন্দ্র পুরী এই 'প্রেম'তত্ত্বের আগমনী গাহিয়াছিলেন! তাঁহার শিষ্য ঈশ্বর পুরীকে তিনি দীক্ষা দিয়া

'বর দিলা কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন'।

মহাপ্রভু এই ঈশ্বর পুরীর শিষ্য। বৈষ্ণবরা যখন 'প্রেম'কে অঙ্গীকার করিলেন, তখন খ্রীষ্টানরা বলিয়া উঠিলেন, এ ত আমাদেরই জিনিষ। ভারতবর্ষ এই প্রথম তাহা আত্মসাৎ করিল। মহাভারতে নারদের শ্বেতদ্বীপ-গমন এই চৌর্য্যাপরাধের প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত হইল।

কিন্তু ব্যাপার এত সহজ নহে। মহাপ্রভুর ভাষায় যে 'প্রেম' মূর্ত্ত হইল, তাহা সাধারণ প্রেম নহে। এ প্রেমের কষ্টিপাথর—বিরহ। বিরহের ব্যথা তীব্র হইলে প্রেমের গভীরতা সপ্রমাণ হয়। নয় ত প্রেম প্রেমই নয়। মুরারি গুপ্ত বলিলেন—

খাইতে শুইতে রৈতে আন নাহি লয় চিতে
বঁধু বিনা আন নাহি তায়।

মহাপ্রভুও বলিলেন—

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥

গোবিন্দ-বিরহে এক নিমেষ যুগযুগান্ত বলিয়া মনে হয়, সমস্ত জগৎ শূন্য বলিয়া মনে হয়! ইহাই প্রেমের আদর্শ। যে প্রেমে ভগবান্‌কে লাভ করা যায়, যে দুর্ল্লভ প্রেম ভগবানেরও আস্বাদ্য, সে প্রেম কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়?

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম যেন জাম্বূনদ হেম
সেই প্রেম নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ না হয় তার বিয়োগ
বিয়োগ হইলে কেহ না জীয়য়॥

"বিরহে তোস্মাংশ ন কো জীয়ই"—এমন প্রেম হইলে তার বিরহে কেহ বাঁচিতে পারে না। ইহাই গোপীপ্রেমের আদর্শ। মহাপ্রভু নিজের জীবনে সেই আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন।

শ্রীরাধার ভাব সার আপনে করি অঙ্গীকার
সেই তিন বস্তু আস্বাদিল।

* * * *

এই গুপ্তভাব সিন্ধু ব্রহ্মা না পায় যার বিন্দু
হেন ধন বিলাইল সংসারে।

* * * *

কহিবার কথা নহে কহিলে কেহো না বুঝয়ে
হেন চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ।
সেই সে বুঝিতে পারে চৈতন্যের কৃপা যারে
হয় তার দাসানুদাস সঙ্গ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা।

কবি কর্ণপূর প্রতাপরুদ্র মহারাজের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

আদ্যঃ কোঽপি পুমান্
নবোৎসুক-বধূকৃষ্ণানুরাগব্যথা-
স্বাদী চিত্রমহো বিচিত্র-
মহহো চৈতন্যলীলায়িতম্।

এই যে 'নবোৎসুক-বধূকৃষ্ণানুরাগব্যথা,' ইহাই 'রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।'

আমার প্রবন্ধে জিজ্ঞাস্য ছিল এই যে, মহাপ্রভু এই নূতন ভজন-রীতি কোথায় পাইলেন ? শ্রীমদ্ভাগবতে 'প্রেম' আছে। গোপীদের প্রেমের পরাকাষ্ঠা আছে। কিন্তু নাই রাধাভাবের ভজন। সেই আত্মহারা প্রেমের অর্ঘ্য সাজাইয়া ভগবচ্চরণে অর্পণ করিবার পন্থা প্রদর্শন করিলেন শ্রীচৈতন্য। তিনি যে এই প্রেমকেই পরম পুরুষার্থ বলিলেন, ইহাই ভক্তিধর্ম্মের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিল। আমার প্রতিপাদ্য ছিল এই যে, সেই নূতন তত্ত্ব—বিশেষতঃ কান্তাভাবের ভজন সম্বন্ধে মহাপ্রভু সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্যদেশের ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যভ্রমণকালে তিনি অনেক সময়ে এই ভাব আস্বাদন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। প্রথমতঃ রায় রামানন্দ সাধ্যসাধনতত্ত্ব-নির্ণয়প্রসঙ্গে এই সুন্দর ভাবটির মর্ম্মোদ্ঘাটন করেন :—

'রায় কহে কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।'

রমাপ্রসাদ বাবু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের রামানন্দের উক্তি হইতে দেখাইতে চাহেন যে, ঐ তত্ত্ব মহাপ্রভুই তাঁহার মধ্যে সঞ্চারিত করেন।

এত তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন।
ব্রহ্মারে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ॥

এই শ্লোকটি উদ্ধার করিয়া তিনি বোধ হয় বলিতে চাহেন যে, ইহাতে রামানন্দের কোনও হাত ছিল না! ইহার কি উত্তর দিব, জানি না। শ্রীচৈতন্য নিজে কোনও গ্রন্থ লেখেন নাই, কিন্তু তাঁহার অনুপ্রাণনায় শ্রীরূপ সনাতন কত কাব্য দর্শন অলঙ্কারশাস্ত্র রচনা করিলেন! তাই বলিয়া কি বলিতে হইবে যে, ইহাদের কোনও কৃতিত্ব নাই ?

রমাপ্রসাদ বাবু বলেন—"যদি 'চৈতন্যচরিতামৃতের' রামানন্দ-মিলন-লীলার কোন ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করিতে হয়, তবে বলা যাইতে পারে, চৈতন্য এবং রামানন্দ উভয়েই মিলনের পূর্ব্বাবধি গোপীর ভাবে—বিশেষতঃ রাধার ভাবে বিভোর হইয়া কৃষ্ণের আরাধনায় রত ছিলেন। চৈতন্য রামানন্দের মুখে প্রাণের কথা শুনিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।"……(উদ্বোধন, ১০৯৮ পৃঃ) এ সংবাদ রমাপ্রসাদ বাবু কোথায় পাইলেন ? কান্তাভাবের শ্রেষ্ঠত্ব যদি শ্রীচৈতন্য অন্য কোথায়ও স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে কথা রমাপ্রসাদ বাবুর বলা উচিত ছিল। অন্যথা কল্পনার আশ্রয় করিয়া এত বড় কথা না বলিলেই বোধ হয় ভাল হইত।

ইহা হইতে আমার অনুমান হয় যে, রমাপ্রসাদ বাবু রাধা-ভাবের অর্থ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার লেখা হইতেই আমার এই ধারণা হইয়াছে। তিনি বলেন যে, "মাধবেন্দ্র পুরী কর্ত্তৃক যখন গোপাল বিগ্রহ পূজার জন্য বাঙ্গালী বৈরাগি ব্রাহ্মণের নিয়োগ হইয়াছিল এবং উড়িষ্যার গোপীনাথের (সাক্ষীগোপাল) পূজা দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন নিশ্চয়ই রাধাভাবের উপাসনা প্রচলিত ছিল। গোপীনাথের আরাধনার প্রধান ভাব অবশ্য গোপীর ভাব ; এবং গোপীগণের মধ্যে প্রধানা যখন রাধা, তখন গোপীনাথের আরাধনার প্রধানতম ভাব রাধার ভাব" (উদ্বোধন, ১০৯৯ পৃষ্ঠা) ; তাঁহার 'অবশ্য' শব্দটি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে, কত বড় অনুমানের আশ্রয় লইয়া রমাপ্রসাদ বাবু একটি মনগড়া সিদ্ধান্ত দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন !

যাহা হউক, ভক্তিধর্ম্মের প্রভাব যে দাক্ষিণাত্যদেশ হইতে আসিয়াছিল, এ কথা স্বীকার করিতে রমাপ্রসাদ বাবুরও আপত্তি নাই। 'এই ভক্তিধারা বৃন্দাবনের পথে বাঙ্গালায় পঁহুছিলেও ইহার মূল প্রস্রবণ বোধ হয় দাক্ষিণাত্যে।' 'শ্রীমদ্ভাগবত রচনার সময় অন্যান্য দেশে শুদ্ধাভক্তিসম্পন্ন লোক যখন অল্পসংখ্যক ছিল এবং তাম্রপর্ণী এবং কাবেরীর তীরে দ্রবিড়দেশে বহুসংখ্যক ছিল, তখন অনুমান করা যাইতে পারে, এই ভক্তির জন্মস্থান দ্রবিড় দেশ।' (উদ্বোধন)

এই সকল উক্তির দ্বারা রমাপ্রসাদ বাবু ত আমারই মতের সমর্থন করিয়াছেন। কান্তাভাবের উপাসনাও যে দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়াছে, এই নূতন কথাটি তিনি একটু প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারিবেন। রাধানাম পূর্ব্বে থাকিলেও, রামানন্দ-মিলনের আগে 'রাধাভাব' লইয়া এমন প্রেমভক্তির ধর্ম্ম গড়িয়া উঠে নাই। ইহাই আমার বক্তব্য। চৈতন্য-ভাগবতে দেখা যায়, মহাপ্রভু 'গোপী' 'গোপী' বলিয়া এক সময়ে কাঁদিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে রাধাভাবের কোনও উল্লেখ দেখা যায় না।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র (এম-এ, রায় বাহাদুর)।

ভাঙ্গা কপাল



| পল্লী-চিত্র |

১

দুইটী শিশু-পুত্র লইয়া সৌদামিনী যে দিন বিধবা হইল, সেই দিনই তাহার দেবর শশী দত্ত জ্যেষ্ঠের আজন্ম কষ্টার্জ্জিত দোকান-ঘরটায় একটা মস্ত বড় তালা ঝুলাইয়া দিল। ভ্রাতৃজায়া ও ভ্রাতৃষ্পুত্র দুইটীর ভার এখন হইতে এক রকম শশিভূষণের কাঁধে পড়িল। দাদা যে তাহাকে এমনভাবে পথে বসাইয়া মরিয়া পড়িবে, তাহা সে কোন দিনই ভাবে নাই। এত বড় সংসারের ঝামেলা সে সামলায় কেমন করিয়া?

শোকে মুহ্যমানা সৌদামিনী অন্নজল পরিত্যাগ করিয়া ভূমিশয্যা গ্রহণ করিল। তাহার চোখে আজ চারিদিক্ অন্ধকার।

পাড়াশুদ্ধ গ্রাম ভাঙ্গিয়া মেয়ের দল সান্ত্বনা দিতে ছুটিয়া আসিল। কেহ কেহ নিজেদের দুরদৃষ্ট-সম্ভূত জলন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা শোক-নিবারণের চেষ্টা করিল, কেহ বা মৃতের অনন্যসাধারণ গুণগান ও সুষ্ঠু গঠন-ভঙ্গীর সালঙ্কার বর্ণনা দ্বারা শোকাতুরার শোকাবেগ দ্বিগুণিত করিয়া সাশ্রুনেত্রে বেশ একটু উপভোগ করিয়া লইল।

শ্রাদ্ধের আর দুই দিন বাকী। শশী দত্ত জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর ঘরে ঘরে গিয়া ডাক দিল; দুই পাঁচ জন মুরুব্বী লইয়া সন্ধ্যার সময় দত্তদের উঠানে মজলিস বসিল। পাড়ার মোড়ল রাজীব নন্দী সযত্ন-বর্দ্ধিত কালো কুচকুচে ঝুঁটিটি চুলকাইতে চুলকাইতে মুসাবিদা কাঁদিতে লাগিল। হুঁকায় একটা সুখটান মারিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল,—"খরচের কর্দ্দটা কি রকম করছিস, শশি?"

শশী অতি বিনীতভাবে বলিল,—"অবস্থা ত আমার বুঝছোই, নন্দী জ্যেঠা। দাদা কতকগুলো দেনাই ক'রে গেছে, এক পয়সাও দিয়ে যায় নি। এ অবস্থায় আমি কি করতে পারি, তোমরাই বল।"

পাশের বাড়ীর বসাই দত্ত বলিল,—"তা বল্লে ত চলে না বাপু, শ্রাদ্ধ ব'লে কথা। দু'টো তিল-পিণ্ডি উচ্ছু গ্গু ক'রে দশ জন কুটুম্ব ভোজন করাতে হবে ত।"

রাজীব নন্দী সায় দিয়া বলিল,—"নিশ্চয়।"

পক্ক-কেশ ও সুপক্ক-মস্তিষ্ক হারাধন পোদ্দার বলিল,—"বড় বৌমাকে একবার ডাক্ না রে, শশি! তাঁরও ত একটা মতামত দরকার। ও-গো—অ বৌমা, ইদিকে একবার এসো ত, বাছা!"

মলিন-বেশা সৌদামিনী কোলের ছেলেটাকে লইয়া জড়সড়ভাবে এক পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

শশী দত্ত বলিতে লাগিল,—"আপনারা ত জানেন, জমী-জায়গা দোকানের আয়-ব্যয় দাদাই যা' খুসী করতো, নগদ ক্যাশ যদি কিছু থাকে, বড় বৌ-এর হাতেই। এই পাঁচ জন নারায়ণমণ্ডলীর সামনে ধর্ম্ম প্রমাণ বলুক, কত টাকা ওর কাছে আছে।"

শশিভূষণের কথা শুনিয়া সৌদামিনীর বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। এ কি সত্য—না, সে স্বপ্ন দেখিতেছে? সালিস করিয়া সৌদামিনীর সঞ্চিত অর্থের সে হিসাব-নিকাশ করিতে চাহে? কেন,—শশিভূষণ চাহিলেই ত স্বচ্ছন্দে পাইতে পারিত। এখন যে সেই তাহাদের অভিভাবক; তাহা ছাড়া শশীকে যে সে পুত্রের মতই স্নেহ করে। সৌদামিনী একবারে গুম্ হইয়া গেল।

হারাধন পোদ্দার বলিল—"খরচ-পত্তর কোত্থেকে হবে বল দেখি, বৌমা? শশী ত এক রকম জবাবই দিচ্ছে।"

নন্দী মহাশয় দন্তবিরল মুখখানা কিঞ্চিৎ বক্র করিয়া বলিল,—"কিন্তু আমরা থাক্তে ত একটা অনাছিষ্টি ঘটতে দেব না। অন্ততঃ জ্ঞাতিগুলিকে এক দিন ঘৃত-পক্ক, এক দিন শাক-অন্ন দিতেই হবে। তা' ছাড়া চণ্ডীমণ্ডপ মেরামত খরচটাও শশীর লাগবে।"

শশী দত্ত সৌদামিনীর দিকে চাহিয়া বলিল,—"কথাগুলো শুনছো ত, বৌ? যা হয় এখন কর, শেষে যেন আমাকে দোষ দিও না। তা' ছাড়া এই পাঁচ জনের কাছে দেনাপত্তর সম্বন্ধেও একটা আঁকামেল ক'রে নাও।"

হারাধন বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"ঠিক কথা।"

সৌদামিনীর তখন কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছে। অপরাধীর মত নিষ্প্রভ-দৃষ্টিতে মজলিসের দিকে চাহিতে চাহিতে শশিভূষণের কথার কি জবাব দিবে, সে তাহাই ভাবিতেছিল। তাহার চোখের সম্মুখে যেন ধূম্ররাশি ভাসিয়া উঠিয়া আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন করিয়া দিতেছে। বহুকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া চুপি চুপি সে শশী দত্তকে ডাকিল, শশিভূষণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

রাজীব নন্দী হারাধনের গায়ে একটা চিমটী কাটিয়া চাপা গলায় বলিল,—"বাবাজী, ওর হাতে টাকা আছে।"

হারাধন ঈষৎ দন্ত বিকশিত করিয়া বলিল,—"নিশ্চয়—নিশ্চয় খুড়ো! শশে কি আর মিছে বলবার ছেলে!"

অপর একটা ছোকরা বলিল,—"চণ্ডীমণ্ডপের কায কিন্তু কাল থেকেই শুরু হয়ে যাক, আমাদের আখড়াটা ঐখানেই খুলবো।"

নন্দী মহাশয় ইঙ্গিতে তাহাকে নিরস্ত করিয়া অর্থপূর্ণ বিকৃত হাসিটুকু চাপিতে চাপিতে একটু রাগতভাবে বলিল,—"বকিস না রে বাবা—থাম, রাজীব নন্দী আসল কায ভুলে না। চণ্ডীমণ্ডপের চাঁদা না নিয়ে ওর বাড়ীতে পাতা পাড়বে কে?"

ঘরের ভিতর হইতে শশী দত্তের গুন গুন স্বর ক্রমে সপ্তমে চড়িয়া আত্মপ্রকাশ করিল। সে বলিতেছিল,—"এ কি ভিক্ষে দিতেছ না কি? ও সব ন্যাকামি আমি শুনতে চাই না, ঘরে ঘরে এ সব মিটবে না, তা' আমি আগেই জানতুম।"

এই বলিয়া সে হন হন করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া উঠানের এক পাশে গিয়া বসিয়া পড়িল।

সৌদামিনী অপরাধীর মত আসিয়া এক ধারে দাঁড়াইল। তাহার আঁচল হইতে টাকাগুলি খুলিয়া অতি সঙ্কুচিতভাবে ধীরে ধীরে তাহাদের কাছে নামাইয়া দিল।

হারাধন পোদ্দার লণ্ঠনটা তুলিয়া ধরিয়া এক একটী করিয়া টাকাগুলি গুণিয়া বলিল,—"মাত্র সাতান্ন টাকা,—ছ'কুড়ি সতেরো?"

নন্দী মহাশয় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল,—"তার পর?"

সৌদামিনী নিশ্চল—নিরুত্তর। তার পরের জবাবদিহি কি আজ তাহাকেই করিতে হইবে? শশী দত্ত ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল, সে যেন এজলাসে বসিয়া খুনী আসামীর বিচার দেখিতেছে।

—"আচ্ছা বেশ, চণ্ডীমণ্ডপের টাকাটা আমরা এই থেকে নিলাম। তার পর শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা যা হয় কর।"

এই বলিয়া রাজীব নন্দী পঞ্চাশটী টাকা তুলিয়া লইয়া সযত্নে কোঁচড়গত করিল।

পোদ্দার-পাড়ার পুরোহিত শীতল চক্রবর্ত্তী বলিলেন—"বাবুর মায়ের শ্রাদ্ধ যেকদারেই ফর্দ্দ করা হোক, শ'তিনেক টাকার বেশী পড়বে না।"

অপর এক জন বলিল,—"দোকানের মাল-মশলা বোধ হয় মজুত আছে কিছু, তাতেও অনেক সাশ্রয় হ'তে পারে।"

সৌদামিনীরও ভরসা তাহাই। কিন্তু দোকানে মাল কোথায়! শশী দত্ত নাকি লোকজন ডাকিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখাইয়াছে—মাল-মশলা, চাল, ডাল এক রকম না থাকাই। যাহা পড়িয়া আছে, তাহা অতি সামান্য—দুই পাঁচ টাকার বেশী নহে।

সৌদামিনীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার স্বামীর চলতি কারবার, টাকাকড়ি, জিনিষপত্তর এক মাস না যাইতেই সব উড়িয়া গেল! দোকানে তালা বন্ধ করিয়াছে শশী, চাবিকাঠী ত তাহারই কাছে। তাহা ছাড়া জমী-যায়গা, ধান-চালের দেড়ি কারবার যা' কিছু, সব যে শশীর হাতেই। কিন্তু—এ কি! আজ সে এমন বিগড়াইয়া গেল কেন?

সৌদামিনীর গণ্ড বাহিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু দেখা দিল। বিহারী সম্মুখেই দাঁড়াইয়াছিল, মায়ের কান্না দেখিয়া তাহারও চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল।

রাজীব নন্দী মাটী হইতে হুঁকা-কলিকাটা তুলিয়া লইয়া বলিল, "আমাদের আর বাড়ী থেকে কষ্ট দেওয়া কেন বাপু, থাক্ ওরে একধারে হয়ে। উঠ হে সব উঠ।"

শান্ত সুবোধ শশিভূষণ হাত দুটী যোড় করিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল,—"দোহাই নন্দী জেঠা, দোহাই হারু খুড়ো—আমার একটা গতি ক'রে দিয়ে যাও তোমরা। বড় বৌ যে সর্ব্বস্ব তালাবন্ধ ক'রে আমায় পথে বসালে—"

রাজীব নন্দী গর্জ্জিয়া উঠিল,—"ও-সব ব্যাপার আমরা কি জানি রে ছুঁচো, সং দেখাতে ডেকে এনেছিস? চল হে দত্তজা,—চল সব চল। কিন্তু যাবার সময় ব'লে যাচ্ছি—আজ থেকে তোমরা পতিত; শ্লেচ্ছ-চরাড়ের হাতে গুড়শিমলার কোন্ বেটা জল খায়, তাই দেখবো!"

সৌদামিনীর বুক ফাটিয়া কান্না আসিতেছিল। তাহার মৃত-স্বামীর সদ্গতি হইবে না? তবে কি তাঁহার বুভুক্ষু আত্মা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ছটফট করিতে করিতে আকাশে-বাতাসে অশরীরী হইয়া অনন্তকাল ঘুরিয়া বেড়াইবে? না না—সৌদামিনী এখনও বর্ত্তমান, তাহার শিশু-পুত্র দুইটী ভবিষ্যতের আশা-ভরসা রহিয়াছে। শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা সে করিবে বৈ কি!

সৌদামিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বিক্ষুব্ধ সমাজচাঁইদের সম্মুখে আছাড় খাইয়া পড়িয়া আকুলকণ্ঠে বলিল,—"যাবেন না—যাবেন না আপনারা, দয়া ক'রে বসুন; ব্যবস্থা যা' হয়, আমিই কচ্ছি!"

আবার মজলিস বসিল। রাজীব নন্দী হারাধনকে চুপি চুপি বলিল,—"দেখলে বাবাজী, গাঁটের পয়সা কি সহজে বেরোয়!"

হারাধন পোদ্দার বলিল,—"সোজার কাল নয় খুড়ো, আমার ঢের দেখা আছে।"

শশী দত্ত কলিকা সাজিয়া আনিল। শীতল ঠাকুর একটা পেঁপের ডাঁটার মাঝখানে ফুটা করিয়া হুঁকা তৈরি করিতেছিলেন, কলিকাটা শশীর হাত হইতে লইয়া বলিলেন,—"বসো ভায়া, বসো।"

ঘরের মধ্যে বাক্স-তোরঙ্গ খোলার শব্দ হইতেছিল, হারাধন পোদ্দার একবার শশীর দিকে চাহিয়া নন্দী মহাশয়কে ইসারা করিয়া বলিল,—"দেখছ!"

সৌদামিনী একটা ক্যাশ-বাক্স আনিয়া বলিল,—"আমার এই গহনাগুলি আপনারা বিক্রী ক'রে দিন, পুরোনো হ'লেও এর তিন চার শ' টাকা দাম হবে।"

হারাধন পোদ্দার গহনাগুলি পরীক্ষা করিয়া বলিল,—"বেশ ত—এ ব্যবস্থা মন্দ নয়, কি বল, নন্দী খুড়ো?"

রাজীব নন্দী ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

"হারু খুড়োই গহনাগুলো রাখ। শ্রাদ্ধের খরচটা দাও এখন, তার পর হিসাব বাকী করা যাবে।"

হারাধন ঘাড় নাড়িয়া চিনাস্বরে বলিল,—"তা বাপু, হাতে টাকা থাকতে আর দেব না বলি কেমন ক'রে, একটা চক্ষুলজ্জাও ত আছে!"

সকালেই ফর্দ্দ করিবার জন্য বৈঠক বসিবে। হারাধন সেই মজলিসেই তিন শ' টাকা গুণিয়া দিতে রাজী হইল। শশী দত্ত সকলকে উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য সমাধা করাইবার জন্য গলবস্ত্র হইয়া অনুরোধ করার পর মজলিস ভাঙ্গিল।

নিস্তব্ধ রাত্রি। চারিদিকে শুধু জমাট-বাঁধা অন্ধকার। গ্রামখানি সুষুপ্তির কোলে অচেতন। মাঝে মাঝে ভিংলো নদীর ঠাণ্ডা বাতাস সোঁ সোঁ শব্দে ভাসিয়া আসিয়া সম্মুখের আম, কাঁটাল, অশ্বত্থ গাছের ডালগুলিকে এক একবার দুলাইয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে।

রান্নাঘরের দাওয়ার উপর ঘুমন্ত ছেলে দুইটীকে দুই পাশে লইয়া সৌদামিনী শুইয়াছিল। তাহার চোখে নিদ্রার লেশ নাই। চিন্তার পর চিন্তা আসিয়া তাহার মনকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া দিতেছে। এ চিন্তার শেষ নাই—কূল নাই—কিনারা নাই।

মনে পড়িল তাহার সেই দিন,—নয় বৎসর বয়সে যে দিন রাঙ্গা চেলি ও পায়ে মল পরিয়া এক হাত ঘোমটা দিয়া নববধূবেশে সে স্বামীর সঙ্গে এই দত্তবাড়ীতে আসিয়া পদার্পণ করিয়াছিল। শাশুড়ী তাহাকে গুড়জল খাওয়াইয়া কোলে করিয়া ঘরে তুলিয়াছিলেন। তার পর সেই ফুলশয্যার রাত্রি—স্বামী তাহার লুকাইয়া এক কোঁচড় ফুল লইয়া সে দিন তাহার সহিত দেখা করিল। সৌদামিনীর ঘোমটাটা খুলিয়া দিয়া আদর করিয়া সে বলিল,—"বউ, দেখ, তোর জন্যে কি এনেছি।"

লজ্জায় ও সঙ্কোচে তাহার কি তখন চাহিয়া দেখিবার শক্তি ছিল?

এক একটী করিয়া মালা গাঁথিয়া স্বামী তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভরাইয়া দিল। ফুলের গন্ধে বাসরঘর মাতিয়া উঠিল। তার পর দুই হাত দিয়া সৌদামিনীকে বক্ষোদেশে চাপিয়া ধরিল।

সৌদামিনীর তখন বুক ফাটিয়া কান্না পাইতেছিল। তাহার বাপ-মা এ কাহার সঙ্গে তাহাকে কোথায় পাঠাইয়া দিয়াছিল? স্বামীর আলিঙ্গন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সে দিন তাহার কি আকুলি-বিকুলি?

অবোধ বালিকা তখন জানিত না যে, এই আলিঙ্গনের মধ্যে তাহার অনাগত যৌবন-দেবতাটী আসিয়া এক দিন স্বপ্ন-কুঞ্জ রচিয়া বসিবে!

তার পর আরও কত দিন। বছরের পর বছর ধরিয়া দেবতার পায়ে কত ফুল—কত মানতই না চড়িয়াছে। হে ঠাকুর! কত দিনে অভাগীর কোল পূর্ণ করিবে!

স্বামী বলিত—"সদু, ভাবনা কি তোর? ছেলে যদি না'ও হয় তোর, তবু আর আমি বিয়ে করবো না।"

সৌদামিনীর চোখ ছল-ছল করিয়া আসিত। ভগবান কিন্তু তাহার কোন আশাই অপূর্ণ রাখিলেন না। সাত বৎসর আগে পিছে দুইটী শিশুর আগমনে সৌদামিনীর মাতৃত্ব কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল।

তার পর তাহারই কর্ত্তৃত্বে দীর্ঘকাল ধরিয়া দত্তবাড়ীর সংসার চলিল অতি সুশৃঙ্খলে। তখন কে জানিত যে অভাগিনীর কপাল ভাঙ্গিবে! কে জানিত যে রামকে বিদায় দিয়া তাহার লক্ষ্মণ ভাই সিংহাসন দখল করিবার জন্য সীতাদেবীকে পথে বসাইবার সঙ্কল্প করিবে! তাহা হইলে সে দুধের শিশু লবকুশকে লইয়া আজ কাহার দোরে গিয়া আশ্রয় মাগিবে?

সৌদামিনী একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ছেলে দুইটীকে দুই পাশে গভীরভাবে আঁকড়িয়া ধরিল। এমন সময় বাহির-দরজায় কপাট খোলার শব্দে সে চমকাইয়া উঠিল; দেখিল—শশিভূষণ অন্ধকারে সিঁড়ি বাহিয়া বড় ঘরের উপর কোঠায় উঠিতেছে।

বাতিটা উস্‌কাইয়া দিয়া শশী গিরিবালাকে ঠেলিয়া তুলিল; বলিল—"এই শুনছিস্, ওঠ ত একবার। এই ক্যাশবাক্সটা রেখে দে, আর টাকার থলেটা বের ক'রে দিস্।"

গিরিবালার মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ঈষৎ একবার মুচকি হাসিয়া ডবডবে চোখ দু'টীর অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে শশিভূষণকে যেন সে কৃতার্থ করিয়া দিল! টাকা তিন শ' গুণিয়া গাঁথিয়া শশিভূষণ বালিসের নীচে রাখিয়া দিল; ভোর না হইতেই হারাধন পোদ্দারকে নিয়া আসিতে হইবে। সৌদামিনীর অলঙ্কারগুলি বেনামী করিয়া তাহাকেই রাখিতে হইল; কি করে—দাদার শ্রাদ্ধ ত করিতে হইবে!

রাজীব নন্দী, হারাধন পোদ্দার প্রমুখ কৃতী পুরুষদিগের মহতী প্রচেষ্টায় পাঁচ টাকার যায়গায় সাড়ে দশ টাকা খরচ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে শ্রাদ্ধাদি নিষ্পন্ন হইয়া গেল।

সাংসারিক হাঙ্গামাও শশিভূষণ একরূপ মিটাইয়া ফেলিল। শ্রাদ্ধের পরই পুরাতন বাড়ীটা ও দুই চারিটী বাসনপত্র সৌদামিনীর অংশে বাঁটিয়া দিয়া, জমীযায়গা ও বাদবাকী তৈজসপত্র মহাজনের দেনার দায়ে সে গিরিবালার নামে খরিদ করিয়া লইল। তার পর একটা ভাল দিন দেখিয়া নবযৌবনা পত্নীসহ সে দাদার শেষ জীবনের কীর্ত্তি সদ্যোনির্ম্মিত নূতন ঘরটায় উঠিয়া গিয়া, তৎসংলগ্ন দোকানটাকে আবার সাজাইয়া গুছাইয়া নিজের নামে কারবার চালু করিয়া দিল।

২

পাঁচ বৎসর পরের কথা। অভাবের তাড়নায় বড় ঘরখানি আধা দামে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। ছোট রান্নাঘরটী সৌদামিনীর একমাত্র সম্বল, কিন্তু তাহারও অবস্থা জরাজীর্ণ। কোন দিন অনাহারে—কোন দিন অর্দ্ধাহারে তাহাদের দিন কাটে। দুর্দ্দশার চরমে পড়িয়া ছেলে দুইটীকে সঙ্গে লইয়া সৌদামিনী একবার বাপের বাড়ী গিয়াছিল যদি সেখানে কিছু দিনের জন্য আশ্রয় মিলে। কিন্তু নিঃসন্তান সৎমা তাহাকে তিন দিন পরে বিদায় করিয়া দিয়াছে। তাহার নিজের মা থাকিলে কি আর এরূপ হইত!

রান্নাঘরের ভাঙ্গা চালায় লাউ চড়িয়াছে, উঠান হইতে দুইটা শাকবেগুন তুলিয়া তরকারি কুটিয়া সৌদামিনী উনানে শুষ্ক পাতার জাল দিতেছে। ক্ষুদিরাম একটা শালিক পাখীর ছানা ধরিয়া আনিয়াছিল, বিহারী কঞ্চি কাটিয়া তাহার জন্য একটা খাঁচা তৈয়ার করিয়া দিতেছে। এমন সময় মা ডাকিল "বিহারী, এক পয়সার তেল নিয়ে আয়, বাবা!"

বিহারী ক্ষুণ্ণ হইয়া কান্নার স্বরে বলিল,—"রোজ রোজ আমি যেতে পারবো না, ক্ষুদো যাক্।"

ক্ষুদিরাম ঝাঁ করিয়া বলিয়া উঠিল,—"বা রে! আমি দোকান যাই আর পাখছানাটা আমার উড়ে যাক, ভারী ত বুদ্ধি তোর!"

মা বলিল, "তুই যা বাবা, ও কি পারে!"

বিহারী বলিল, "পয়সা দিবি ত?"

কিন্তু পয়সা যে আজ হাতে নাই। অগত্যা তেলের ভাঁড়টা তুলিয়া লইয়া শুধু হাতেই বিহারীকে দোকান যাইতে হইল।

দোকানে গিয়া তেল চাহিতেই শশী দত্ত বলিল,—"পয়সা এনেছিস্?"

বিহারী সঙ্কুচিতভাবে বলিল,—"না।"

শশী দত্ত খিঁচাইয়া উঠিল, "না' ত' কি এটা সদাব্রতের ভাঁড়ার না কি ?"

বিহারীর মুখ চুণ হইয়া গেল, বলিল, "কাল পয়সা দেব।"

"কাল পয়সা দিবি ত কালই তেল নিয়ে যাস্, বেরো এখান থেকে।"

এই বলিয়া শশী দত্ত অপর এক খরিদ্দারের জিনিস ওজন করিতে লাগিল।

বিহারী অস্ফুট দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, "বেরোবে তাই!"

"আবার বচসা হচ্ছে! কাণ দুটো ছিঁড়ে দেব জানিস্!"

বিহারীর আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল; সে হঠাৎ রাগিয়া উঠিল, —"দিলেই হলো, আমার বাবার দোকানে ব'সে আবার চালাকি!"

—"কি ?" শশী দত্ত উঠিয়া গিয়া বিহারীর কাণ ধরিয়া ঠাস করিয়া এক চড় বসাইয়া দিল। তেলের ভাঁড়টা কাড়িয়া লইয়া গলাধাক্কা দিয়া বলিল, "যা তোর কোন্ বাবা আছে, নালিশ কর গে যা।"

বিহারী কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সৌদামিনী দেখিল গালে তাহার পাঁচটা আঙ্গুলের দাগ বসিয়া গিয়াছে।

অবিলম্বে ভাঁড়টা হাতে করিয়া শশী দত্ত আসিয়া উপস্থিত। সৌদামিনী বলিল, "হাঁরে শশে, এমনভাবে ছেলেকে আমার মেরেছিস্ কেন ?"

শশী দত্ত দাঁত খিঁচাইয়া উঠিল, 'তোমার ছেলের গুণ কেমন!"

দাদার অপমানে ক্ষুদিরাম ভয়ানক চটিয়াছে, সে ছুটিয়া গিয়া শশী দত্তের হাত হইতে ভাঁড়টা কাড়িতে কাড়িতে বলিল, "ছাড়—ছেড়ে দে আমাদের ভাঁড়।"

শশী দত্ত লাফাইয়া উঠিল, "তবে রে নিমক-হারামের গুষ্ঠী!"

এই বলিয়া সে কাঁসার ভাঁড়টা দিয়া ক্ষুদিরামের মাথায় কষ করিয়া এক ঘা ঠুকিয়া দিল। ক্ষুদিরাম সহ্য করিতে না পারিয়া সেইখানেই লুটাইয়া পড়িল।

সৌদামিনী 'ও মা গো' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাড়াতাড়ি ছেলেকে কোলে তুলিয়া দেখে, তাহার চৈতন্য নাই, মাথা কাটিয়া ঝর্-ঝর্ করিয়া রক্ত পড়িতেছে। সৌদামিনী বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে শশী দত্তের পায়ের কাছে গিয়া মাথা কুটিতে লাগিল।

গোলমাল শুনিয়া দুই পাঁচ জন জড় হইয়াছিল। বনবিহারী নামক ওপাড়ার একটা ছোকরা বলিয়া উঠিল, "তুই কি মনে করিস্ রে শশে, গাঁয়ে বুঝি মানুষ নাই ? গুণ্ডোমি করা বের ক'রে দেব—জানিস্!"

"আরে যা যা—তোর মত ঢের দেখেছি।"

এই বলিয়া শশী দত্ত গিস্‌গিস্ করিতে করিতে প্রস্থান করিল। যাইবার সময় সৌদামিনীর সঙ্গে বনবিহারীর সম্বন্ধ লইয়া সে একটা কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়া গেল, তাহা না বলাই ভাল।

সৌদামিনী ডালা সাজাইয়া দেয়, চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক বিহারী মাঠে মাঠে ঘুরিয়া সেইগুলি বিক্রয় করে। সকালবেলা ডালা মাথায় লইয়া বাহির হয়, ফিরে সেই সন্ধ্যায়। ক্ষুদিরাম পাঠশালায় পড়ে, ছুটীর দিনে সেও দাদার সঙ্গে সঙ্গে যায়। কিছু দিন পরে পাঁচ জন কৃষাণ মিলিয়া মাঠের মাঝখানে বিহারীর দোকান পাতিবার জন্য একটা কুঁড়ে বানাইয়া দিল। বেচারীকে আর ডালা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না, সেইখানে আসিয়া সকলে জিনিষ লইয়া যায়। দুপুরবেলায় গামছায় ভাত বাঁধিয়া ক্ষুদিরাম কুঁড়েতে পৌঁছাইয়া দেয়, বাড়ী ফিরিবার সময় দুইপাঁচ সের ধানও সে লইয়া আসে। ভাত বহিবার অজুহাতে সে-বেলাটা আর সে পাঠশালায় যায় না। ফিরিবার পথে রাখালদের সঙ্গে খেলা করে, বাঁশী বাজায় ও গান গায়। মায়ের নিষেধ, দাদার শাসন ও 'গুরু পণ্ডিতের' যুক্তি তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে নাই। পাঠশালা ছাড়িয়া নাচিয়া কুঁদিয়া বাঁশী বাজাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে পাইলেই যেন সে বাঁচে! বিহারী কত দিন প্রহার করিয়াছে, কিন্তু মায়ের সম্মুখে তার শাসন সেরূপ কার্য্যকর হয় নাই। বিহারী বলিত, "তুই ওর মাথাটা খেলি!" মা বলে "ছেড়ে দে বাবা, লেখাপড়া আর ওর হবে না।"

খাবার বেলা অনেকক্ষণ গড়াইয়া গিয়াছে ক্ষুদিরামের দেখা নাই। আজ তাহার ভাত লইয়া আসিতে এত দেরী হইতেছে কেন ? কুঁড়ে-ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া বিহারী হাঁ করিয়া গ্রামের পথের পানে তাকাইয়া আছে। কিন্তু কোথায় ক্ষুদিরাম ? হয় ত কোথায় রাখালদের সঙ্গে আড্ডা মারিতেছে, না হয় বাগ্‌দীপাড়ায় মাদল বাজাইয়া চুণকালী মাখিয়া সং সাজিতেছে!

ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইয়া বিহারী দোকান তুলিয়া দিল। ডালাটা মাথায় করিয়া বাড়ী গিয়া দেখে, ক্ষুদিরাম কয়েকটা ছেলে জুটাইয়া দাওয়ায় বসিয়া তাহার শালিক পাখীটাকে বাঁশী শুনাইতেছে।

সৌদামিনী ডালাটা নামাইয়া বলিল,—"ঐ দেখ বাবা বজ্জাত ছেলের কাণ্ড দেখ; এত ক'রে বললুম, কিছুতেই ভাত নিয়ে গেল না!"

বিহারী ছুটিয়া গিয়া ক্ষুদিরামের কাণ ধরিল,—"বল্, কেন ভাত নিয়ে যাসনি ?"

ক্ষুদিরাম কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মা আমায় মানকের মত গায়ের কাপড় কিনে দিলে না কেন ? কাদুলা সব বেচতে এসেছে!"

"সেই জন্যে যাবিনে ? থাম, তোর বাঁশী বাজান, পাখী পোষা বের ক'রে দিচ্ছি।"

এই বলিয়া বিহারী ক্ষুদের হাত হইতে বাঁশের বাঁশীটা কাড়িয়া লইয়া খাঁচা খুলিয়া পাখীটাকে ছাড়িয়া দিল। বনের পাখী ক্ষুদিরামের মায়া পরিত্যাগ করিয়া কোন্ বনে যে উড়িয়া গেল, তাহা আর দেখিতে পাওয়া গেল না। ক্ষুদিরাম গড়াগড়ি দিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। বিহারী বাঁশী দিয়া তাহার পৃষ্ঠে কয়েকবার আঘাত করিয়া বলিল, "বেরিয়ে যা বাড়ী থেকে,—বেরো বলছি!"

সৌদামিনী বিহারীকে ধরিয়া আনিয়া খাইতে বসাইল, ক্ষুদিরাম জ্যেষ্ঠের উদ্দেশে পল্লীগ্রামসুলভ অমার্জ্জিত ভাষা বর্ষণ করিতে করিতে হনহন করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

ওপাড়ার রুক্ষ মুদীর দোকান হইতে কয়েকটা জিনিষ খরিদ করিয়া বিহারী বাড়ী ফিরিতেছিল। কালীতলায় আসিয়া দেখিল, সত্যই ত—সত্যই দুই জন কাবলীওয়ালা [illegible] জামাকাপড়

কার্ত্তিক হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত গ্রামের মাঠে ধান কাটা হয়। মাঠের কুলীমজুর কৃষাণেরা "ডাউরীওয়ালা"দের কাছ হইতে ধান দিয়া মুড়ি-মুড়কি, ছোলাভাজা, ঘুগ্‌নিদানা ও পান-তামাক কিনিয়া থাকে। সেই ধান পাইকারদিগকে বেচিতে পারিলে বেশ দু'পয়সা লাভ হয়।

বেচিতেছে! বিহারী একটু দাঁড়াইল, ভাবিল—ক্ষুদোর জন্য একটা কিনিবে না কি! কিন্তু—পয়সা?

দেখিল, জিনিস তাহারা ধারেই বেচিতেছে। তবে আর কি! গ্রামের এক জনকে সাক্ষী রাখিয়া পাঁচসিকা দামের একটা লাল রঙের গায়ের কাপড় সে কিনিয়া লইল; চারমাস পরে টাকা দিতে হইবে।

রাস্তায় যাইতে যাইতে ভাবিল—"মা যদি বকে!" আবার ভরসাও হইল, না—মা বরং তায় খুসীই হইবে।

বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, ক্ষুদো তখনও ফিরে নাই। কোথায় যে সে গেল! বোধ হয়, পাখীটাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

অশ্বত্থগাছের ডগায় সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুকু ঝিকিমিকি খেলিতে খেলিতে মিলাইয়া গেল। গোচর হইতে গাঁয়ের গরুগুলি ফিরিয়া আসিয়া গোয়ালে গোয়ালে বাঁধা পড়িল। নীড়াতুর পাখী সব সারাদিনের বিরহাবসানে মিলনানন্দে কূজন-কণ্ঠ।

সৌদামিনী তুলসীতলায় সন্ধ্যা দিয়া যুক্তকরে দেবতার নিকট পুত্রদের মঙ্গল প্রার্থনা করিল। বামুনপাড়ার দেবালয়ে তখন শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিতেছে। দেখিতে দেখিতে সমগ্র বিশ্ব অতল অন্ধকারে ডুবিয়া গেল।

বিহারী একবার এপাড়া ওপাড়া খুঁজিয়া আসিল, কিন্তু ক্ষুদিরামের কেহ কোন সন্ধান বলিতে পারিল না। সৌদামিনী অস্থির হইয়া শেষে কান্নাকাটী জুড়িয়া দিল। বিহারী নির্ব্বাক্, সেই ত এ অনর্থের মূল। কেন সে সেটারীর পাখীটাকে উড়াইয়া দিয়া মিছামিছি তাহাকে প্রহার করিল!

দুরন্ত শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে মাতাপুত্রে আবার খুঁজিতে বাহির হইল, সারা গ্রামখানা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও কিন্তু ক্ষুদিরামের পাত্তা মিলিল না। কি উদ্বেগেই যে তাহাদের বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হইল, তাহা ভগবানই জানেন!

সকালবেলা গ্রাম হইতে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিহারী সন্ধান করিতে লাগিল। কেহ বা তাহার কথা কাণেই তুলিল না, কেহ বা প্রতিকূলে ঘাড় নাড়িয়া প্রস্থান করিল।

গড়শিমুলা হইতে সে তিন ক্রোশ দূরে! আর বেশী দূর-গ্রামে গেলে ত আজ ফিরিতে পারিবে না! তখন তাহার মায়ের অবস্থা হয় ত আরও শোচনীয় হইবে। সাত-পাঁচ ভাবিয়া বিহারী ফিরিল। ক্ষুদিরামের জন্য তাহার বুকটা তখন আঁকুপাকু করিতেছে।

কিছুদূর আসিয়া বিহারী এক গ্রামবাসীর সাক্ষাৎ পাইল। তাহার নিকট শুনিল যে, ক্ষুদিরাম তখনও ফিরে নাই, আর তাহার মা কাঁদিতে কাঁদিতে ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাইতেছে।

বিহারী দৌড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু দেহে তাহার শক্তি কোথায়? সূর্য্য পশ্চিমদিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে, তখনও সে অনাহারে। যতই সে গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, দুশ্চিন্তায় মন তাহার ততই ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

তাই ত! ক্ষুদো তবে গেল কোথায়? সারা রাত্রি সে কাটাইলই বা কোন্‌খানে? রাগের বশে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া দারুণ শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে—হায় হায়;—তাহার গায়ে যে একটা ওড়নাও ছিল না! তার পর অন্ধকারে ভয় পাইয়া মাঠে ঘাটে কোথাও কি তবে;—তবে কি—তবে কি সে আর বাঁচিয়া নাই?

বিহারী কাঁদিতে লাগিল,—"ওরে ক্ষুদু রে—ভাই আমার—ফিরে আয় রে,—"

একটা সাঁওতাল-পল্লীর নিকট আসিয়া দেখিল দূরে একটা বিলের পাড়ে কাহারা যেন মহিষ চরাইতেছে। উহাদের মধ্যে কি ক্ষুদো আছে? ওই যে শাদা গেঞ্জি পরা একটা ফর্সা-পানা ছেলে মনে হচ্ছে না!

বিহারী অগ্রসর হইল। কাছে গিয়া দেখে,—হাঁ—ক্ষুদোই ত বটে। বাঁদরটার কাণ্ড দেখ দেখি!

কয়েকটা সাঁওতাল-ছেলের সঙ্গে ক্ষুদিরাম তখন মহিষের পিঠে চড়িয়া বিল পার হইতেছিল, শালিক পাখীটা তাহার হাতে।

বিহারী গর্জ্জন করিয়া বলিল,—"ক্ষুদো কি হচ্ছে ওখানে? ভাল চাস ত উঠে আয় বলছি!"

সাঁওতাল-বালক চুলকু মাঝি বলিল,—"বাঃ হে—সেই লেবেক, বাঃ—!"

ক্ষুদিরাম দাদার অপ্রত্যাশিত আগমনে ভীত হইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বিহারী তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে গড়শিমুলার সড়ক ধরিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

ঢোল-কাঁসি বাজাইয়া পাল্কী চড়িয়া বিহারীর যে দিন বিবাহ হইয়া গেল, সে দিন গাঁয়ের লোকে একবাক্যে বলিল, হাঁ একটা ব্যাটাছেলে বটে, দেখতে দেখতে তাক্ লাগিয়ে দিলে!

আজকাল বিহারীর আর সে অবস্থা নাই। এখন সে গাঁয়ের মধ্যে এক জন বিশিষ্ট কারবারী, তাহার বাবার মতই গোলদারি দোকান খুলিয়াছে। তাহা ছাড়া এখন খান দুই লাঙ্গলও তাহার নিজ জোতেই আবাদ হয়।

ক্ষুদিরাম চাষের কাযে হাত পাকাইয়া ফেলিয়াছে, কৃষাণের সঙ্গে সে মাঠে গিয়া মাটী কাটে। শাক-সব্জী, তরি-তরকারীও যথেষ্ট জন্মে; সংসারখরচ বাদ দিয়া উদ্‌বৃত্তগুলি ক্ষুদিরাম নিজে গিয়া কুণ্ডহিতের হাটে বিক্রয় করিয়া আসে। তাহার কর্ম্মপটুতা দেখিয়া বিহারীর বুক ফুলিয়া উঠে।

বাবুয়ানার দিকেও ক্ষুদিরামের ঝোঁক কিছু কম নহে। রোজ রোজ সন্ধ্যাবেলা সাদা ধপধপে সরু কাপড় পরিয়া, ডুরে ছিটের 'জাকিট' গায়ে দিয়া, শালদহার মুচিদের হাতের ইংরাজী জুতা ডাকাইতে ডাকাইতে যাত্রার আখড়ায় গিয়া হাজির হয়। তেল-পাকানো 'বেউড়' বাঁশের ছড়িগাছটা কোণে ঠেসাইয়া দিয়া দুপুর রাত পর্য্যন্ত গলা ভাঁজে, পিতলের বাঁশী বাজাইয়া সঙ্গত করে; 'বক্তিমা'ও মন্দ করে না, তবে সং সাজিয়া লোক হাসাইতে সে অদ্বিতীয় ছিল।

* * * *

কিছুদিন পরে কালীতলার কবচ-ফুল-জলের মাহাত্ম্যেই হউক অথবা গোঁসাই বাবার মন্ত্রপূত মাদুলীর জোরেই হউক, বিহারী একটা কন্যা-রত্ন লাভ করিল।

লক্ষ্মী যখন মুখ তুলিয়া চান, তখন এই রকমই হয় বটে! সৌদামিনীর পিত্রালয় হইতে সংবাদ আসিল,—সৎমা তাহার পটল তুলিয়াছে। সেখানকার জমী-যায়গা—বিষয়-সম্পত্তির একমাত্র মালিক এখন সৌদামিনীর ছেলেরা।

'ঠাকুরমা' আদর করিয়া নাতনীর নাম রাখিল—"লক্ষ্মী।"

সৌদামিনীর কপাল ফিরিয়াছে। এইবার ক্ষুদিরামের বউ দেখিয়া একবার গয়া-কাশী-বৃন্দাবন করিয়া আসিতে পারিলেই তাহার ষোলকলা পূর্ণ হয়। গ্রাম হইতে ক্রোশ তিনেকের মধ্যেই একটা কনে জুটিয়া গেল, দিব্য ফুটফুটে মেয়ে বয়স বছর এগারো।

বড় দুঃখের ক্ষুদো! তাহার বিবাহ বিহারী না' তা' করিয়া সারিতে চাহে না, যেমন করিয়াই হউক, একটু জাঁক-জমক করিতে হইবে। বৌ-মাকে দুই-পদ গহনা দেওয়া চাই, গাঁয়ের দশ-জনকে ভাল করিয়া 'বৌ-ভাত' খাওয়াইতে হইবে। রাণীগঞ্জ হইতে এক দল গোরা-বাজনা আনিবারও তাহার সখ আছে। অনেকগুলি টাকা খরচ, তাই সে মনে করিতেছিল, এ-কয়টা মাস পরেই ভাইয়ের বিবাহ দিবে। কিন্তু সৌদামিনীর আর দেরী সহে না, ঠুস করিয়া কোন দিন মরিয়া গেলে ক্ষুদিরামের বউ সে আর দেখিতে পাইবে না। কাজেই মায়ের মতেই বিহারীকে মত দিতে হইল। কন্যা আশীর্ব্বাদ করিয়া একবারে বিবাহের দিন স্থির করিয়া আসিল—'সাতাশে' জৈষ্ঠ। এই কয়টা দিনের মধ্যেই যাহা কিছু করিতে হইবে। তাহা হউক, বাকি সে কিছুই রাখিবে না, দরকার হইলে এখন দশ টাকা দেনা দিবে।

সেই দিনই বিহারী ক্ষুদিরামের কাছে একটা লোক পাঠাইয়া দিয়া বিবাহের ফর্দ্দ করিতে বসিল।

ক্ষুদিরাম এখন মানভূম জেলার এক পল্লীগ্রামে তাহার মামার বাড়ীতে থাকে। এক জন গিয়া সেখানে না থাকিলে বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, তাই বিহারী তাহাকে কয়েক মাস হইল মামার বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছে। সেখানকার আয়ও নেহাত কম নহে চার পাঁচখানা লাঙ্গলের চাষ।

ক্ষুদিরামের বিদেশ দেখিবার বিশেষ আগ্রহ ছিল, তাই সে যাইতেও কোন আপত্তি করে নাই। কিন্তু এক জন সঙ্গী না হইলে সেখানে থাকে কেমন করিয়া! তাই সে যাইবার সময় তাহাদের কৃষাণ-পুত্র বাঁকু বাগ্দীকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছে। বাগ্দীর ছেলে হইলে কি হয়, বাঁকুর চোখে-মুখে এমন একটা কমনীয় ভাব ছিল, যাহা নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। ক্ষুদিরামের সে সমজুটী অন্তরঙ্গ বন্ধু; তাহাকে সে 'ছুটু-মনিব' বলিয়া ডাকিত।

বাঁকুর গুণও ছিল অনেক। ক্ষুদিরামের মত সে-ও গাছে উঠিতে, সাঁতার কাটিতে, অমাবস্যার রাত্রিতে বাজি রাখিয়া 'খিল্লি-তলার' শ্মশান হইতে মড়ার মাথা আনিতে এবং এবম্প্রকারের আরও অনেক কাযে ওস্তাদ ছিল।

সব চেয়ে বড় গুণ ছিল তার গানের গলা। নাচিয়া নাচিয়া 'ভবপিতার' ঝুমুর গাহিতে গাঁয়ে তাহার জুড়িদার ছিল না। এইজন্য ছুটু-মনিব তাহাকে এত স্নেহ করিত।

যাইবার সময় ক্ষুদিরাম ইহাও বলিয়া গিয়াছে যে, মামার বাড়ী গিয়াই সে নিজে একটি কালীয়-দমনের দল খুলিবে—বাঁকু হইবে তাহার ডাকিনের দোহার।

সে-দিন সে যায়, সৌদামিনীর সে-দিন কি কান্না! উনিশ বৎসরের মধ্যে একটা দিনও সে ক্ষুদিরামকে চোখের আড়াল করে নাই। বিহারী সঙ্গে গিয়া তাহাকে পথ-ঘাট চিনাইয়া দিয়া আসিয়াছে, বাড়ী ফিরিবার সময় তাহারও চোখে জল দেখা দিয়াছিল। ক্ষুদো যে তাহাদের হৃদয়ের নিধি—সংসারের আলো!

যথাসময়ে লোক ফিরিল। ক্ষুদিরাম বড় বড় 'আঁখরে দাদাকে পত্র লিখিয়াছে—শনিবার দিন সন্ধ্যাতক সে জামতাড়ার 'ইষ্টিশনে' আসিয়া নামিবে।

সৌদামিনীর খাইতে শুইতে সময় নাই, বড় বউকে লইয়া সে মহা উৎসাহে কাযের ভিড়ে মাতিয়াছে। চাল ভাজা, বড়ী দেওয়া, ঘর নিকানো, কলাই খাঙ্গা, 'আক্‌ছাড়' পাতা—কায কি আর এক-আধটা!

অন্যান্য কায সব বিহারীকে জুটাইতে হইবে, এক বিন্দু ত্রুটী হইবার যো নাই। বাকি থাকিবে শুধু বরের পোষাক পরিচ্ছদ, জামা-জুতা ইত্যাদি খরিদ করা; ও-গুলি ক্ষুদোকে আনিতে গিয়া জামতাড়ার বাজার হইতে তাহার পছন্দমত কিনিয়া আনিলেই চলিবে।

দত্ত-বাড়ীতে বিবাহের আয়োজন চলিতে লাগিল পুরাদমে।

*　　*　　*　　*

বিবাহের খবর শুনিয়া ক্ষুদিরামের মনটা উসখুস করিতে লাগিল,—কতক্ষণে একবার গড়শিমুলায় গিয়া পৌঁছে! তাহার মনে হইতে লাগিল, যদি সে ঐ আমগাছটার ডগা হইতে এক লাফে তাহাদের উঠানে গিয়া পড়িতে পারিত, অথবা একবার চোখ বুজিয়া তখনই যদি চাহিয়া দেখিত যে, সে তাহাদের বাড়ীর পাশের চকমিলান পাথরটার উপর বসিয়া আছে; আঃ, তবে কি আরামই হইত!

কিন্তু এ-যুগে তাহা হইবার উপায় নাই; কাজেই ক্ষুদিরামকে চার ক্রোশ পথ হাঁটিয়া বি, এন, আর-এ ট্রেণ ধরিবার জন্য রওনা হইতে হইল। পথ চলিতে চলিতে বাঁকু বলিল,—"ছুটু মুনিব, আমি কিন্তু বরাবর তোমার পাল্কীর সঙ্গে ছুটতে ছুটতে যাব, মোদ্দাত বিয়ে ক'রে ফিরবার পথে বউ পেয়ে যেন আমায় ভুলে যেয়ো না; হেই ছুটু মুনিব!"

ক্ষুদিরাম হাসিয়া বলিল, "দূর বোকা!"

দেখিতে দেখিতে কখন যে তাহারা চারখানা পথ ভাঙ্গিয়া 'ইষ্টিশনে' আসিয়া পড়িল, তাহা পথই জানে!

সন্ধ্যার পর আসানসোল জংসনে আসিয়া ট্রেণ থামিল। এইবার মেন লাইনের জন্য গাড়ী বদল করিতে হইবে। দেখিয়া শুনিয়া বাঁকু একবারে অবাক, দিন না রাত প্রথমে সে ঠাহর করিতেই পারিল না। ভাবিয়া-চিন্তিয়া ঠিক করিল—না, এটা রাত্রি, কিন্তু এতগুলো আলো এখানে কে জ্বালিল?

ক্ষুদিরামও কম আশ্চর্য্য হয় নাই, আসিবার দিন দিবাভাগেই তাহার তাক লাগিয়া গিয়াছিল। তবে তাহার মায়ের কাছে কিছু কিছু শোনা ছিল—তাই রক্ষা, নহিলে বোধ হয় বাঁকুকেও হার সে মানাইত।

বাঁকু বলিল,—"হাঁ ছুটু-মুনিব, এ-আলাগুলু কিসের?

ক্ষুদিরাম একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "তিসিকুটীবির কাচের ভিতর চাদি-রূপোর সলতে লাগানো আছে রেড়ির তেলে জ্বলে!"

ছোট মনিবের পাণ্ডিত্যে বাঁকু অবাক্ হইয়া গেল। ক্ষুদিরাম বলিল, "আয়, তোকে হাওয়াগাড়ী দেখিয়ে আনি!"

ষ্টেশনের বাহিরে গিয়া মুসাফিরখানার আশে-পাশে তাহারা একটা চক্কর মারিয়া আসিল। ভাগ্যিস বাঁকু 'ছুটু-মনিবের' সঙ্গে আসিয়াছিল, নৈলে এই অপরূপ 'ইনদেভুবন' দর্শন হইতে তাহাকে বঞ্চিত হইতে হইত!

প্লাটফর্ম্মে ফেরিওয়ালারা হাঁকিয়া বেড়াইতেছে। ক্ষুদিরাম বলিল,—"বাঁকু, চা খাবি?"

"কই গ' ?" বলিয়া বাঁকু তাহার দিকে চাহিল। কিন্তু নিকটে গিয়া দেখে, ফেরিওয়ালা 'চা' খাওয়াইয়া পয়সা লইতেছে; খাইবার আর দরকার হইল না।

ক্ষুদিরাম হাঁকিল,—"এই বিড়িআওলা, এক পয়সার বিড়ি দেও।"

একটা বিড়ি ধরাইয়া টানিতে টানিতে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল বাঁকু নাই! এ কি, সে গেল কোথায়? ভিড়ের মধ্যে হারাইয়া গেল না কি?

ক্ষুদিরাম খুঁজিতে খুঁজিতে ওভারব্রিজের নীচে গিয়া দেখে,—একটা লোহার থাম ধরিয়া বাঁকু হামাগুঁড়ি দিয়া লুকাইয়া আছে। সে কথা কহিবার আগেই বাঁকু তাহাকে ফিস ফিস করিয়া ডাকিল,—"ছুটু মুনিব ইদিকে এসো, দেখছো ওগুলু কি?"

ক্ষুদিরাম হাসিয়া বলিল,—"দূর বেটা, সায়েব দেখিস নি কখনো? ওই বড়গুলো সায়েব আর ছোটগুলো মেম, ওরা খানা খায়।"

এমন সময় আপ প্ল্যাটফর্মে পাঞ্জাব মেল আসিয়া দাঁড়াইল।

এই ত জামতাড়া যাইবার গাড়ী ঠিক পশ্চিমমুখে চলিয়াছে; বাঁকু, বাঁচা গেল।

বাঁকুকে লইয়া ক্ষুদিরাম ফাঁকা দেখিয়া একটা সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় উঠিয়া বসিল। সব ট্রেণ যে সকল ষ্টেশনে থামে না, তাহা তাহাদের জানা ছিল না।

কয়েক মিনিট পরেই বাঁশী ফুঁকিয়া ট্রেণ ছাড়িল। ক্ষুদিরাম আনন্দাতিশয্যে পিতলের বাঁশী বাজাইতে সুরু করিয়া দিল, তার পর বাঁশী রাখিয়া বাঁকুর সঙ্গে গলা মিলাইয়া গান ধরিল; গান ছাড়িয়া শেষে ভাবী বধূর গল্প-গুজবে একবারে তন্ময় হইয়া গেল।

দুই তিনটী ষ্টেশন পার হইয়া গেল, কিন্তু গাড়ী থামিল না। ক্ষুদিরামের মনে একটু খটকা লাগিল। এ কি, এটা তবে কি রকম গাড়ী?

বাঁকু বলিল, "গাড়ীটা ভাল, কিন্তু কল-কব্জা খারাপ আছে।"

আরও এক ষ্টেশন ছাড়িয়া গেল, ট্রেণ ধরিল না। ক্ষুদিরামের মুখ শুকাইয়া গেল। বাঁকু বুঝিল গতিক বেশ সুবিধার নহে।

গাড়ী যখন মিহিজাম ষ্টেশন পার হইয়া গেল, তখন তাহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছে, তার পরেই জামতাড়া। সেখানেও যদি না থামে, তাহা হইলে উপায়? হয় ত না জামতাড়ায় গিয়া থামিতেও পারে, কারণ, টিকিট তাহারা ঠিকই কিনিয়াছে। ঐ ত জামতাড়ার আলো দেখা যায়, কিন্তু গাড়ী থামিবার কোন লক্ষণ নাই। ঐ যে প্ল্যাটফর্মে একটা চকচকে আলোর সম্মুখে তাহার দাদা বিহারী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে না? হাঁ তাহার দাদাই ত বটে, তাহাকে লইতে আসিয়াছে!

মুহূর্ত্তমধ্যে ট্রেণ বহু দূর পশ্চিমে ছুটিয়া গেল। দুইটী প্রাণী প্রাণভয়ে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, কোথায় যে তাহারা যাইবে—তাহা কে জানে!

ক্ষুদিরাম বলিল,—"ওরে—এটা সায়েবদের গাড়ী, বোধ হয় একেবারে বিলেতে গিয়ে থামবে।"

আসানসোলে সে অনেকগুলি ইংরাজ যাত্রীকে এই গাড়ীতে উঠিতে দেখিয়াছে।

"তা' হ'লে এক কাষ কর বাঁকু, পোঁটলাগুলো কোমরে বেঁধে বার দিকে লাফিয়ে পড়ি চল। না কি বলিস?"

বাঁকুর বলিবার কিছুই নাই, সঙ্গে সঙ্গে সে কাপড় সাঁটিতে লাগিয়া গেল। তার পর দরজা খুলিয়া এক ধাপ নীচে নামিল,—ক্ষুদিরাম আসিয়া দাঁড়াইল তাহার পশ্চাতে।

ডাকগাড়ী তখন বায়ুবেগে ছুটিতেছে। কালক্ষেপ নিষ্প্রয়োজন-বোধে বাঁকু আর বিলম্ব করিল না, দরজার হাতল ছাড়িয়া প্রাণপণ শক্তিতে বাহিরের দিকে লাফাইয়া পড়িল। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার।

ক্ষুদিরাম ডাকিল,—বাঁকু—বাঁকু!

কোন সাড়া নাই, সে বাঁচিল কি মরিল—কিছুই বুঝিতে পারা গেল না।

ক্ষুদিরামের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। কিন্তু আর ভাবিবার সময় নাই, যতই দেরি হইতেছে, ততই সে বাঁকুর নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে। একবার কি ভাবিয়া সে গাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল, আবার দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল; অবশেষে হৃদয়ের সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া বাঁকুর প্রদর্শিত পথই অবলম্বন করিল।

গাড়ী তখন পরবর্ত্তী ষ্টেশন কারমাটাড়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। লাইনের ধারে পাথরের গাদা ছিল, ক্ষুদিরাম একটা গাদার উপর গিয়া পড়িল। এক জন খালাসী দূর হইতে দেখিতে পাইয়া আলো হাতে করিয়া ছুটিয়া আসিল; দেখিল তাহার চৈতন্য নাই, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। মাথা ফাটিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছে,—বাঁ পায়ের হাঁটু ভাঙ্গিয়া হাড় বাহির হইয়া গিয়াছে! বাঁচিবার আশা খুব কম।

সঙ্গে সঙ্গে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। ষ্টেশন-মাষ্টার তদন্ত করিতে আসিয়া দেখিলেন, নিশ্বাস তখনও বন্ধ হয় নাই। তাহার ফতুয়ার পকেট হইতে জামতাড়ার টিকিট দুইখানা পাওয়া গেল, তাহা দেখিয়া ব্যাপারটা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না।

প্রাথমিক কর্ত্তব্য শেষ করিয়া ষ্টেশন-মাষ্টার পরবর্ত্তী মালগাড়ীতে অচৈতন্য ক্ষুদিরামকে মধুপুরের রেল-হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন।

৫

পরদিন বিকালে চারি ঘটিকার সময় বিহারী গিয়া মধুপুরে পৌঁছিল, সঙ্গে তাহার বাঁকু। কিন্তু ক্ষুদিরামের সন্ধান পাইবে কিরূপে, হাঁসপাতাল ত তাহারা চিনে না। কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলে পুলিসকেসে পড়িবার সম্ভাবনা, কারণ ক্ষুদিরাম অতিশয় বে-আইনী কাষ করিয়াছে এবং বিহারীর সে ভাই। রেল কোম্পানীর বড়-সাহেব হয় ত এর জন্য বিহারীকেও জেলে দিতে পারে। অতএব বিপদ বাড়াইয়া লাভ নাই, কোনরকমে হাঁসপাতাল খুঁজিয়া লইতে হইবে।

বিহারী অশিক্ষিত পাড়া-গাঁয়ের লোক, অহেতুক সত্যভীতিকে সে কোনরূপেই অতিক্রম করিতে পারে নাই।

মুসাফিরখানায় বসিয়া তাহারা বহুকষ্টে রাত্রি যাপন করিল। সকালবেলা সহরের এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু হাঁসপাতালের অস্তিত্ব উদ্ঘাটন করিতে পারিল না।

বেলা প্রায় দেড়প্রহর অতীত, ক্ষুদিরামের জন্য বিহারী একবারে অস্থির হইয়া উঠিল। অবশেষে সাহসে ভর করিয়া একটা লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল "হাঁ হে, হাঁসপাতাল কোনটা?"

লোকটা হাত বাড়াইয়া দেখাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল। বিহারীর একটু ভরসা হইল, কৈ, তাহাকে ত সে পুলিসে ধরাইয়া দিল না! কিন্তু বিশ্বাসই বা কি?

হাসপাতালের ফটকে আসিয়া বলিল, "চল বাঁকু, ঢুকে পড়ি যা' হয় হবে!"

বাঁকু বলিল, "না বড় মুনিব, আমাকে যদি ওর সঙ্গী ব'লে চিনতে পারে!"

দূরে সে দাঁড়াইয়া রহিল; এ-দিক্ ও-দিক্ চাহিতে চাহিতে বিহারী গিয়া হাসপাতালের বারান্দায় উঠিল। হঠাৎ সে দেখিতে পাইল, লোহার খাটিয়ার উপর ক্ষুদিরাম একধারে পড়িয়া আছে—সর্ব্বাঙ্গে তাহার নেকড়া জড়ানো। বিহারী থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

কম্পাউণ্ডার আসিয়া ক্ষতস্থান ধুইয়া ঔষধ লাগাইতেছিল, বিহারী জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল। ক্ষুদিরাম যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে একবার 'মা-গো'—বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বিহারীর বুকের শিরাগুলি তখন ছিঁড়িয়া যাইতেছিল; তাহার মনে হইল ছুটিয়া গিয়া একবার ক্ষুদিরামকে জড়াইয়া ধরে! কিন্তু তাহা নিরাপদ নহে, বহু কষ্টে সে আত্মসংবরণ করিল। ভাই তাহার এখনও বাঁচিয়া আছে, হয় ত দুই চারি দিনের মধ্যেই সারিয়া উঠিবে।

কিন্তু এ কি! এ আবার কি ভীষণ দৃশ্য—উঃ!

গায়ের চাদরখানা সরাইয়া দিতেই বিহারী দেখিল ক্ষুদুর বাঁ-পায়ের হাঁটুর নীচের দিক্‌টা নাই।

দুই হাতে চক্ষু বুজিয়া, 'বাবা গো'—বলিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল, পরমুহূর্ত্তে টলিতে টলিতে সেইখানেই পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে লোক জমিল, ডাক্তার আসিয়া দেখিলেন—তাহার চৈতন্য লোপ পাইয়াছে।

দূর হইতে বড় মনিবের ব্যাপার দেখিয়া বাঁকু তখন 'ষ্টেশনের' পথ ধরিয়াছে।

বিহারী যখন হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় নামিল—বেলা তখন দুই প্রহর। জ্যৈষ্ঠের খর রৌদ্রে পথের মাটী আগুন হইয়া গিয়াছে। বাঁকুকে যথাস্থানে না পাইয়া সে ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে দেখিল, দূর হইতে বাঁকু তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে।

সহরের বাহিরে গিয়া একটা গাছতলায় বসিয়া তাহারা পরামর্শ করিতে লাগিল, কি করা যায়? অবশেষে স্থির হইল—বাঁকু ফিরিয়া গিয়া বাড়ীতে সংবাদ দিবে, বিহারী কিছুদিন মধুপুরেই থাকিবে। মাঝে মাঝে হাসপাতালে গিয়া ভাইটিকে সে একবার করিয়া দেখিয়া আসিতে পারিবে ত!

দুই দিন তাহারা অনাহারে। বাঁকু বলিল,—"বড় মুনিব, দু'টা কিছু খাও।"

বিহারী বাঁকুর অনুরোধ এড়াইতে পারিল না, মাঠের একটা ডোবা হইতে জল আনিয়া চিঁড়া ভিজাইতে বসিল। দুই এক গ্রাস মুখে তুলিয়াছে, এমন সময় দেখিল—কয়েকটা লোক খাটে করিয়া একটা মড়া লইয়া যাইতেছে। বিহারীর বুক দুর দুর করিয়া উঠিল,—ঐ রকমের খাটিয়া সে হাসপাতালে দেখিয়া আসিয়াছে।

খাওয়া আর হইল না। মড়াটাকে কোথায় লইয়া যায়—কি করে দেখিবার জন্য দূর হইতে তাহারা বাহকগণের অনুসরণ করিল। বাহকগণ নদীতীরে মড়াটাকে ফেলিয়া দিয়া দুর্ব্বোধ্য ভাষায় গান গাহিতে গাহিতে—হাসিতে হাসিতে—হল্লা করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

বিহারীর বুকে ঝড় বহিতেছিল। তবে কি,—তবে কি সব শেষ হইয়া গিয়াছে? হাঁ সবই শেষ! নিকটে গিয়া দেখিল—ক্ষুদিরামের মৃতদেহ শ্মশানের ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে!

বিহারী নিশ্চল নির্ব্বিকার পাষাণ! সে কাঁদিতে পারিল না, হাত-পা ছুড়িয়া মাথা কুটিল না, তাহার দেহের রক্ত যেন জমিয়া পাথর হইয়া গিয়াছে। শুধু সে রুদ্ধনিশ্বাসে বুক চাপিয়া ক্ষুদিরামের বিকৃত-মুখের পানে ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

নিয়তির কি নির্ম্মম পরিহাস! সেই দিন ঠিক সেই সময়ে কন্যাকর্ত্তার বাড়ীতে মহানন্দে গায়ে-হলুদের উৎসব চলিতেছে!

ভাইয়ের শেষ কাযটুকু বাকি থাকে কেন! সহর হইতে কাঠ-কয়লা আনিয়া বিহারী বাঁকুর সাহায্যে চিতা প্রস্তুত করিল। এইবার মৃতদেহ চড়াইতে হইবে।

কিন্তু—এ কি, বিহারীর বুকের শিরাগুলিতে কে যেন মোচড় দিয়া টান মারিতে লাগিল! সে আর নিজেকে চাপিয়া রাখিতে পারিল না, ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল,"ওরে ক্ষুদে রে, ভাই আমার, কি করলি রে—"

এই বলিয়া সে মৃত-দেহের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল। বাঁকু কাঁদিতে কাঁদিতে কত বুঝাইল—কত আশ্বস্ত করিল, কিন্তু শোকের সাগরে একবার বাঁধ ভাঙ্গিলে তাহার গতিবেগ রুদ্ধ করা বড় কঠিন।

বহুক্ষণ পরে দুই জনে ধরাধরি করিয়া মৃতদেহ চিতায় তুলিল, দেখিতে দেখিতে ক্ষুদিরামের শেষ-চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। বিহারী একটা মাটীর ভাঁড়ে করিয়া কতকগুলি অস্থি কুড়াইয়া লইয়া বলিল, "চল বাঁকু, আর কেন?"

দুই জনে 'হরিবোল' দিয়া গাত্রোত্থান করিল।

* * * *

এ দিকে গড়শিমুলায় দত্ত-বাড়ীতে বিবাহের আয়োজন চলিতেছে। রাত পোহাইলেই অধিবাস; কুটুম্ব-স্বজন ও তাহাদের ছেলে-মেয়েতে ঘর একবারে গম্-গম্ করিতেছে। সৌদামিনী ছেলেদের পথ চাহিয়া আছে; এখনও তাহারা ফিরিল না কেন?

বিহারী যখন গ্রামে ঢুকিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। শুক্লাষ্টমীর চাঁদ যেন স্নিগ্ধ-জ্যোৎস্নায় গ্রামখানাকে স্নান করাইয়া দিতেছে। বিয়ে-বাড়ীর গোলমাল তাহার কর্ণগোচর হইল। বিহারী দরজার কাছে গিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল, হা ভগবান—কেমন করিয়া সে বাড়ী ঢুকিবে!

প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতেই তাহার সর্ব্বশরীর থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, মাটীর ভাঁড়টা হাত হইতে পড়িয়া গিয়া সশব্দে চূর্ণ হইয়া গেল। বিহারী সেইখানে বসিয়া পড়িয়া অতি শুষ্ক করুণকণ্ঠে ডাকিল, "মা—!"

বাঁকু আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, বালকের মত হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তার পর? তার পর আর কি হইবে? হতভাগিনী মা বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে ধরাশায়ী হইল, ছেলে-মেয়ে আত্মীয়-স্বজনরা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; মুহূর্ত্তমধ্যে দত্ত-বাড়ীর আকাশ-বাতাস শোকাবেগে উদ্বেল হইয়া উঠিল।

শশী দত্ত একটা কলের গান কিনিয়াছিল, তাহার বাড়ী হইতে নহবতের তীব্র-স্বর ভাসিয়া আসিয়া তাহাদের বিবাহোৎসবকে যেন ব্যঙ্গ করিতে লাগিল।

শ্রীকালীপদ ঘটক।

ভাষার জন্ম-কথা

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা !

আজ এ পৃথিবী নর-নারীর বিপুল মেলা হইয়া উঠিয়াছে ! দেশ যেমন বহু—বহু দেশে তেমনি আজ বহু বিভিন্ন জাতির বাস; এবং এই বিভিন্ন দেশ-বাসীর ভাষাও আবার তেমনি বিভিন্ন !

ইতিহাসে দেখি, এক দিন এই বিশাল পৃথিবীর অত্যল্প-পরিসর মাত্র ভূখণ্ডে ছিল নর-নারীর বাস। তাহাদের সংখ্যা ছিল অল্প। পরে বংশ-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিবার অপরিহার্য্য কারণে এই বংশ-ধারা দিকে দিকে আপনাকে বিস্তারিত, প্রসারিত করিয়া তোলে। বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন আবহাওয়া—বিচিত্র আবেষ্টনী—এবং মূল উৎস হইতে বহুদূরে থাকার কারণে বিভিন্ন দেশ-বাসী নর-নারীর আচারে-ব্যবহারে যেমন পার্থক্য ঘটে, তেমনি তাহাদের ভাষাতেও ঘটে পার্থক্য। এ-কথার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ভাষার ব্যুৎপত্তির সন্ধান লইলে।

আজিকার এই বহু-বিস্তৃত বিভিন্ন জাতীয় নর-নারীর ভাষায় বৈষম্য থাকিলেও একদা এ বৈষম্য ছিল না—সে অনুমান আদৌ অসঙ্গত নহে। তবে কি আদি-যুগে সমগ্র মানব জাতির ভাষা ছিল এক ও অবিভিন্ন ?

ইতিহাসে যে আদি মানব-জাতির সন্ধান আমরা পাই, সে জাতি পেলিওলিথিক (Paleolithic) জাতি নামে অভিহিত। সে জাতির অস্তিত্বের বহু নিদর্শন নানা শিলা-প্রস্তরে রেখায়-লেখায় গ্রথিত দেখিলেও তাহাদের ভাষা-সম্বন্ধে ইতিহাস আজিও কোনো সঠিক তথ্য আবিষ্কার করিতে পারে নাই। তবে এটুকু জানা গিয়াছে, চিত্রাঙ্কন সম্বন্ধে এই বহু প্রাচীন পেলিওলিথিক জাতির একটা ধারণা বা জ্ঞান ছিল। ইহা হইতে আরো জানা যায়, এ-জাতি মনের বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করিত বিভিন্ন ভঙ্গীর সাহায্যে। মনে হয়, আদিম মানব-জাতি কয়েকটি মাত্র শব্দে—ভয়,আনন্দ, বিস্ময়, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি মনোভাব প্রকাশ করিত; এবং তৎকালে প্রচলিত বিশেষ বস্তু বা বিষয়ের কয়েকটি নাম-মাত্র তাহারা নির্দ্দেশ করিয়াছিল। সার আর্থার ইভান্স প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ বলেন, যাহাকে আমরা ভাষা-সংজ্ঞায় (Language) অভিহিত করি, আদিম যুগে সে ভাষা বিদ্যমান ছিল না। আদিম মানবজাতি সঙ্কেত-ভঙ্গীর দ্বারা মনোভাব প্রকাশ করিত। এই সঙ্কেত-ভঙ্গীর নাম—sign-language. আজিও উত্তর আমেরিকার বহু আদিম জাতির মধ্যে মনোভাব প্রকাশে এই সঙ্কেত-ভঙ্গীর ব্যবহার দেখা যায়—অথচ তাদের পরস্পরের ভাষায় বিভিন্নতার অন্ত নাই।

ইতিহাসে এ তথ্য জানা গিয়াছে যে, আদিম মানব-জাতির ভাষা বলিতে—ছিল শুধু কয়েকটি মাত্র 'আঃ!' 'উঃ!' 'ইঃ!' 'বাঃ!' প্রভৃতি (interjections) ভাব-প্রকাশক ধ্বনি এবং কয়েকটি বিশেষ্য-পদ (nouns)। এই বিশেষ্য পদ-গুলি বিভিন্ন ভঙ্গীতে বিভিন্ন মাত্রা-পর্য্যায়ে (different intonations) উচ্চারিত হইত। পেলিওলিথিক জাতির নর-নারী 'ঘোড়া' বা 'গরু' বুঝাইতে নানা ধ্বনি প্রকাশ করিত—এই ধ্বনির বিভিন্ন ভঙ্গীর প্রকাশে তারা বুঝিত, ঘোড়া আসিতেছে, বা ঘোড়াটা মরিয়াছে; কিম্বা গরু খাইতেছে অথবা গরুটা চলিয়া গেল ! ইহার অতিরিক্ত বিশেষভাবে ঘোড়া বা গরুর সম্বন্ধে আর কিছু প্রকাশ করা সে জাতির পক্ষে তখনকার দিনে সম্ভব ছিল না।

মানবের মনের বিকাশ ঘটিয়াছে অতি ধীর গতিতে। বিভিন্ন আচরণ বা ক্রিয়াদির পারম্পরিক সম্পর্ক-নির্দ্ধারণ মানুষ করিতে পারিয়াছে বহু অভিজ্ঞতায়। এই অভিজ্ঞতা অনুসারী বিভিন্ন ব্যাপারে মানুষের জ্ঞান যেমন বাড়িয়াছে, ভাব-প্রকাশের ভঙ্গীও ঠিক সেই অনুপাতে বিস্তীর্ণ হইয়াছে। কালের প্রসারে প্রকাশ-ভঙ্গীর প্রসার বাড়িয়াছে।

আজ আমরা দেখিতেছি, যে-জাতির জ্ঞানের প্রসার সমধিক, সে জাতির ভাষাও তেমনি বহু-বিস্তৃত; যে জাতির জ্ঞানের প্রসার অল্প, সে জাতির ভাষার পুঁজি অল্প। শিক্ষিত ব্যক্তি যে পরিমাণ ভাষা জানেন ও ব্যবহার করেন, অশিক্ষিত ব্যক্তি সে-পরিমাণ ভাষা জানে না, কাজেই তার ভাষার ব্যবহারও খুব সংক্ষিপ্ত। রবীন্দ্রনাথ যে পরিমাণ বাক্য ও ভাষা জানেন এবং ব্যবহার করেন, গ্রামের

চাষা-ভুষা সে পরিমাণ বাক্য ও ভাষা জানে না, কাজেই তাহা ব্যবহার করিতে পারে না।

শিক্ষা ও সভ্যতার প্রসার যখন অল্প ছিল, তখন বাক্য ও ভাষার পুঁজি ছিল অল্প। তখন একশত বাক্য শিখিলেই তাহার দ্বারা জীবনের কাজ সারা চলিত। এখন শিক্ষা-সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার প্রসার বহুগুণ বাড়িয়াছে। **It is said that even modern European peasants can get along with something less than a thousand words, and it is quite conceivable that so late as the early Neolithic Period that was the limit of available vocabulary.**

আদিম যুগে লেখার পাট ছিল না; মনের ভাব-প্রকাশ চলিত পরস্পরের সামনা-সামনি; কাজেই আলাপ, বর্ণনা ও বিবরণ প্রদান-উদ্দেশ্যেই ছিল মানুষের বাক্যের ব্যবহার। খুব খানিকটা বর্ণনার বাসনা থাকিলে আদিম মানব বিচিত্র নৃত্য ও অঙ্গ-ভঙ্গিমার সাহায্যে সে ভাব প্রকাশ করিত (they danced and acted rather than told). সংখ্যা-গণনা তখন মানুষের সাধ্যাতীত ছিল।

অর্থাৎ বাক্যের ব্যবহার আদিযুগে খুবই পরিমিত ছিল। বংশ-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতা বাড়িতে লাগিল, সেই সঙ্গে বাক্য-সমষ্টিও প্রসারিত হইল। ব্যাকরণ প্রভৃতির কোনো বালাই তখন ছিল না। ব্যাকরণ রচিত হয় মানব-সমাজে যখন বহু বাক্য জমিয়া উঠিয়াছে এবং সে বাক্য-সমষ্টির বিশৃঙ্খল ব্যবহারে পরস্পরের মনোভাব বুঝিবার পক্ষে অসুবিধা ঘটিতেছে, তখন; অর্থাৎ মানবের চিত্ত যখন খানিকটা পরিণত হইয়া উঠিয়াছে, বহু ব্যাপারে সাদৃশ্য দেখিয়া মানুষ যখন সেগুলার সম্পর্ক বিচার করিয়া শ্রেণী বিভাগ করিতে শিখিয়াছে, তখন।

কিন্তু এ-কথার আলোচনা আজ আমরা করিতে বসি নাই। আজ আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নর-নারীর মধ্যে প্রচলিত যে বহু বিভিন্ন ভাষা দেখিতেছি, সেই ভাষা-সমূহের মূল কোথায়, তাহার নিঃসংশয়িত সন্ধান গ্রহণ করি।

যাঁরা ভাষা-তত্ত্বের অনুশীলন করিতেছেন, তাঁরাও এই চিত্রিত বিভিন্ন ভাষা-প্রবাহিণীর উৎসের সঠিক সন্ধান এ যাবৎ পান নাই। বহু ভাষার ব্যুৎপত্তি-গত সামঞ্জস্যের সন্ধান পাওয়া গেলেও এমন বহু ভাষা আমরা দেখিতে পাই, যে সব ভাষার আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে কোনরূপ সাদৃশ্য উপলব্ধি হয় না।

যেটুকু সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহার ফলে আমরা জানিতে পারি, একই মূল ভাষা অবস্থা-বিপর্যয়ে ও কাল-ক্রম অনুসারে বিভিন্ন রূপ ধরিয়া সারা য়ুরোপখণ্ডে এবং ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হয়। এই মূল ভাষার উত্তর-পুরুষরূপে আমরা পাই ইংরাজী, ফরাসী, জার্মাণ, স্পানিশ, ইতালীয়ান, গ্রীক, রাশিয়ান, আর্মাণী, পারস্য এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাগুলিকে। এই ভাষা-সমষ্টিকে Indo-European বা আর্য্যভাষা শাখা নামে অভিহিত করা হয়। এই বিভিন্ন ভাষা-সমূহে আমরা ব্যুৎপত্তি ও ব্যাকরণগত অবৈষম্য দেখি।

ইংরাজী father এবং mother কথা দুইটি দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যাক। জার্ম্মাণ ভাষায় এই দুইটি বাক্যের প্রতিরূপ পাই vater; mutter; লাটিনে pater; mater; সংস্কৃতে পিতৃ; মাতৃ; গ্রীক ভাষায় pater; mater; ফরাসী ভাষায় pere, mere; আর্ম্মাণী ভাষায় pair, mair, আরো দেখিতে পাই, দেশ-ভেদে বহু বাক্যে সামান্য অক্ষরভেদ ঘটিয়াছে। জার্ম্মাণ অক্ষর 'v'কে লাটিনে দেখি, 'p' রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। এই সকল ভাষা বিভিন্ন নহে—ইহারা এক মূল ভাষা হইতে সমুদ্ভূত। যে-সব বিভিন্ন জাতীয় নর-নারী এই সব ভাষা ব্যবহার করেন, তাঁদের মনের গতি, চিন্তার ধারা ও সে চিন্তা প্রকাশের ভঙ্গীতেও আমরা আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাই।

ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা অনুমান করেন, ৮ হাজার বৎসর কিম্বা তাহারও পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক নিওলিথিক যুগে এই আদিম আর্য্য-ভাষা ছিল নর-নারীর একমাত্র ভাষা। এই ভাষা যে সকল জাতি ব্যবহার করিত, তাহারা বাস করিত মধ্য-য়ুরোপে এবং পশ্চিম এসিয়ায়। পরে বংশ-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আদি-বংশীয়ের উত্তরপুরুষগণ দিকে দিকে যাত্রা করিলেন নব নব দেশে বাস করিবার অভিপ্রায়ে। এ জাতি—আর্য্যজাতি। (স্যর জনষ্টোনের মতে—Aryan Russians) এ জাতির বর্ণ ছিল শ্বেত, পীত, গৌর। এই জাতিই Nordic Race.

আর্য্য জাতির মধ্যে যে আর্য্যভাষা প্রচলিত ছিল—সে ভাষার উদয় দেখি খৃষ্ট-জন্মের ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে।

সে সময়ে অনার্য্য বা বর্ব্বর জাতিও ধরণী-বক্ষে বাস করিত। বর্ব্বর জাতি আর্য্য ভাষার ব্যবহার করিত না। বর্ব্বর জাতির ভাষা এ সময়ে কয়েকটা ধ্বনির সমষ্টি মাত্র ছিল। এই ধ্বনির দ্বারা ও বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে বর্ব্বর জাতি তাহাদের বিভিন্ন মনোভাব প্রকাশ করিত।

আর্য্যজাতির বহু বিভিন্ন শ্রেণী দিকে দিকে অভিযানে বাহির হইয়া চারি দিকে বাসের ব্যবস্থা করিল। সে বাসভূমির বিস্তার—উরাল পর্ব্বত হইতে কাস্‌পিয়ন হ্রদ; উত্তরে আর্কটিক মহাসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত; অর্থাৎ য়ুরোপে ও এশিয়ার প্রায় সমগ্র ভূভাগে এই জাতি আপনাকে বিস্তারিত করিয়া বসিল।

এখনও পর্য্যন্ত আদিম আর্য্য-ভাষা ছিল, এই যাযাবর জাতির ভাষা। তার পর ভিন্ন দেশ, ভিন্ন পারিপার্শ্বিকতার ফলে মূল আর্য্য-ভাষায় রূপান্তর ঘটিল। সে রূপান্তরের কাহিনী বলিবার পূর্ব্বে আর্য্যভাষার সমতুল্য আর কয়েকটি বিভিন্ন আদিম-ভাষার কথা বলিবার প্রয়োজন আছে।

ইহাদের মধ্যে প্রধান ভাষার নাম সেমিটিক ভাষা। খৃষ্ট-জন্মের ৪ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইতিহাসের ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই, আর্য্য-জাতির সহিত ভূমধ্যসাগর-সন্নিহিত বিরাট-ভূভাগে সে-ভূভাগনিবাসী অপর জাতির যুদ্ধবিগ্রহ যেমন চলিয়াছে, তেমনি চলিয়াছে ব্যবসায়-বাণিজ্য। এ জাতির ভাষা ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

এ-জাতির বাস ছিল দক্ষিণ-আরবে এবং আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চল প্রদেশে। এ-জাতিও প্রাচীন। এই জাতির ভাষার নাম সেমিটিক ভাষা। এই মূল সেমিটিক ভাষা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে হিব্রু-ভাষা, আরবী-ভাষা, আবিশীনীয়-ভাষা, প্রাচীন আশীরিয় ও ফিনিশীয় ভাষা।

ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা সেমিটিক ভাষাকে মূল ভাষার তালিকায় দ্বিতীয় স্থান দিয়াছেন (second primary language).

তার পর তৃতীয় মূল ভাষা দেখিতে পাই—হেমিটিক ভাষা (Hamitic language). প্রাচীন মিশরী, কোপ্‌টিক, উত্তর-আফ্রিকার পার্ব্বত্য জাতি, তুয়ারেগ প্রভৃতি জাতির মধ্যে এই হেমিটিক ভাষার প্রচলন ছিল।

চতুর্থ মূল-ভাষা—তুরানীয়। প্রাচীন লাপল্যাণ্ড, সাই-বিরিয়ার একাংশ, মাঞ্চু, মোঙ্গলিয়া, তাতার ও তুর্কি প্রদেশে তুরানীয় ভাষা প্রচলিত ছিল। ভারতে প্রচলিত দ্রাবিড় ভাষার সহিত এই তুরানীয় ভাষার ব্যাকরণগত বহু সৌসাদৃশ্য—হাল্‌বার্ট নামক ভাষা-তত্ত্ববিদ্‌ প্রদর্শন করিয়াছেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত চারি ভাষার পার্শ্বে আর একটি প্রাচীন ভাষার পরিচয় পাই আমরা চীনে। চীনা ভাষা এক-ধ্বন্যাত্মক mono-syllabic. চীন, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম ও তিব্বত—এই চারি প্রদেশের ভাষা চীনা-ভাষা হইতে উদ্ভূত।

চীনা-ভাষায় শব্দের অক্ষর ৪২০—প্রত্যেকটি অক্ষর বিভিন্ন অর্থ-জ্ঞাপক। উচ্চারণের বিভিন্নতায় একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইত। এ ভাষার আকৃতি-প্রকৃতির সঙ্গে আর্য্য-ভাষার কোথাও মিল নাই। চীনা-ব্যাকরণ এক অভিনব বস্তু—সে যেন এক নূতন সৃষ্টি। অনেকে বলেন, চীনা-ভাষায় ব্যাকরণ নাই। যে অর্থে আমরা ব্যাকরণ বুঝি, চীনে অবশ্য সে ব্যাকরণ নাই; এবং সে কারণে অন্য ভাষায় চীনা-ভাষার সাহিত্যের অনুবাদ কঠিন—সে যেন দুশ্চর তপঃ-সাধন!

আমরা যে কয়টি মূল ভাষার উল্লেখ করিলাম, সে কয়টি ভিন্ন ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ আরো কয়েকটি প্রাচীন ভাষার অস্তিত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। সে গুলির কথা বলি :—

১। বাণ্টু-ভাষা; এ ভাষা আফ্রিকার উত্তর ও দক্ষিণ অংশে চলিত।

২। দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত দ্রাবিড় ভাষা; পলিনে-শিয়ায় প্রচলিত মলয়-পলিনেশিয় ভাষা। এ দুই ভাষা ভারতীয় ভাষার অন্তর্গত।

আমাদের আলোচনা হইতে অনায়াসে আমরা এখন সিদ্ধান্ত করিতে পারি, আর্য্যজাতি যে সময় দিকে দিকে উপনিবেশ স্থাপন করিতেছিলেন, সে সময় পারিবারিক গোষ্ঠী-স্থাপনা অপেক্ষা বৃহত্তর সমাজ-গঠনে তাঁদের লক্ষ্য ছিল অনেক বেশী; এবং সেই গঠন-কার্য্যে বহু যুক্তি পরামর্শের প্ররোচনায় পারিপার্শ্বিক অবস্থান-হেতু তাঁহাদের মূল-ভাষায় বহু রূপান্তর ঘটিতে থাকে—অর্থাৎ যে প্রদেশে গিয়া তাঁহারা বাস নির্দ্দেশ করিতেছিলেন, সে প্রদেশের চলিত বহু ভাষা তাঁহাদের মূল ভাষার সহিত বিজড়িত হইতেছিল। তাঁহাদের ভাষাতেও উচ্চারণগত পার্থক্য সাধিত হইতেছিল, তাহার ফলে বর্ত্তমান লইয়া ব্যস্ত থাকার জন্য মূল আর্য্যভাষা-ভাষী আদিম-জাতির সঙ্গে তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতা হ্রাস পাইতেছিল

এবং তাঁহাদের সহিত কোনরূপ সম্পর্ক রাখাও দুর্ঘট হইয়া ওঠে। মূল-জাতির বংশধরগণ এই যে বিভিন্ন দেশে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন, পরস্পরের মধ্যে ভূধর, সাগর, বন, মরুভূমির সুদীর্ঘ-ব্যবধান রচিয়া উঠিল! মিলন ঘুচিয়া মূলের সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে পরস্পরের শিক্ষায়, সভ্যতায়, আচারে, ভাষায় পার্থক্য দেখা দেয়।

কাজেই বিভিন্ন দেশ-বাসী একবংশীয় আর্য্যজাতির বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা আচারে-ব্যবহারে সর্ব্বদিক দিয়াই স্বতন্ত্র হইয়া পড়িলেন।

নিওলিথিক যুগে আফ্রিকায় ও ভারতবর্ষে অনার্য্য বা বর্ব্বর জাতির বাস ছিল। সে জাতিগুলির সকল চিহ্ন আজ বিলুপ্ত। সে জাতি-সমূহে নর-নারীর আকার ছিল বানরের মত। দক্ষিণ-আফ্রিকার আদিম বর্ব্বর জাতির আকৃতি ছিল গরিলার তুল্য। তখন লোকালয়ের অস্তিত্ব ছিল না—বনে জঙ্গলে ছিল মানুষের বাস। কঙ্গোর জঙ্গলে আজও এই আদিম বর্ব্বর জাতির অস্থি-কঙ্কাল পাওয়া যাইতেছে।

কিন্তু জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে বারান্তরে আমরা আলোচনা করিব; সুতরাং আপাততঃ এ প্রসঙ্গে বিরত রহিলাম।

আরও কয়েকটি মূল প্রাচীন ভাষার কথা জানা গিয়াছে, সে ভাষাগুলি অবশ্য অপ্রধান।

এই অপ্রধান ভাষাগুলির মধ্যে হটেনটট্ ভাষার নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এ ভাষার সাদৃশ্য পাওয়া যায় পূর্ব্ব-আফ্রিকার 'বুশ্‌ম্যান' জাতির ভাষার সহিত। অনেকের মতে এই হটেনটট ভাষাই নাকি বাণ্টু ভাষার প্রাচীন রূপ।

নিউগিনি ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিম বর্ব্বর জাতির মধ্যে বিভিন্ন ভাষার প্রচলন আছে।

আর একটি ভাষা চলিত ছিল টাশমানিয়ায়। সে ভাষা আজ একেবারে সমূলে ধ্বংস পাইয়াছে।

হাচিনশনের Living Races of Mankind গ্রন্থে দেখি, গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—

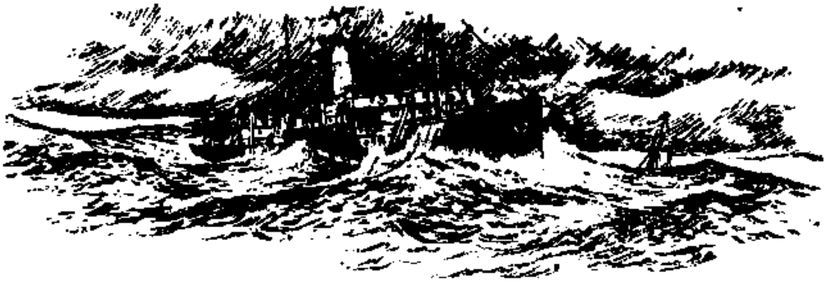
আদিম মানব-জাতির আদি ভাষা আজ আর বিদ্যমান নাই। দেশ-কালভেদে বহু পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়া সে ভাষা আজ সম্পূর্ণ নূতন রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। আদি ভাষার কয়েকটি মাত্র বাক্য কোনোমতে মামুলি-ভাষা গোষ্ঠীতে টিঁকিয়া আছে।

তবে বহু আলোচনায়, বহু যুক্তি-তর্কের সমাবেশে নিশ্চিত-ভাবে এটুকু জানা গিয়াছে, আদি যুগের মানব-জাতি যে ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিতেন, তাহাতে কোনো বিধি নিয়ম বা শৃঙ্খলা ছিল না; বাক্য-যোজনায় শব্দগুলার সম্বন্ধে তাঁদের সতর্ক মনোযোগের অভাব ছিল; মনোভাব-প্রকাশে ভাষার চেয়ে ভঙ্গী ও উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যের দিকেই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল সমধিক। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কাল-জ্ঞাপক ক্রিয়াদির প্রচলন যেমন তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল, ভাষায় তেমনি শৈথিল্য ছিল প্রচুর।

গুণবাচক শব্দ (abstract terms) তখন আদৌ ছিল না। দেবদারু বা অশ্বথ, বট, চম্পক—এ সকল বিভিন্ন বৃক্ষের বিভিন্ন সংজ্ঞা ছিল না! একটিমাত্র 'গাছ' কথার দ্বারা সব শ্রেণীর বৃক্ষ বুঝাইত। কঠিন বা কোমল; শীতল বা তপ্ত; দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত; গোল বা চৌকা—এসব বিশেষণ আদি ভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। এই সকল গুণ বুঝাইতে অপর বস্তুর সহিত সাদৃশ্য দ্যোতক বাক্য প্রকাশের ব্যবস্থা ছিল। অর্থাৎ কোনো বস্তুর আকার বা প্রকারগত বৈশিষ্ট্য বুঝাইতে আদিম যুগের নর-নারী হয়তো বলিতেন, "পাথরের মতন" (অর্থাৎ "কঠিন"); "চাঁদের মতন" (অর্থাৎ "গোল"); "জলের মতন" (অর্থাৎ "তরল")। ক্রিয়ার সহিত সাদৃশ্য রাখিয়া বাক্যের ব্যবহার চলিত এবং ভঙ্গী ভিন্ন অর্থ বুঝাইবার অন্য উপায় ছিল না।

ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে—মানবের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। শিক্ষায় অভিনিবেশে মন পরিণত হইতে লাগিল; সেই সঙ্গে নানা বিষয়ে সাদৃশ্য ও শৃঙ্খলা লক্ষ্য করিয়া সেগুলির পর্য্যায় ও শ্রেণী নির্ণয় করিয়া ক্রমে বিভিন্ন বস্তু, বিভিন্ন মনোভাব, বিভিন্ন ক্রিয়াদির বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হইতে লাগিল; এবং সমাজ-বন্ধন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সহায়তায় নব নব বাক্য রচিত ও তাহা সর্ব্ববাদিভাবে স্বীকৃত ও গৃহীত হইয়া কালের প্রভাবে ভাব-সাগরের বিশালতার সহিত ছন্দ রাখিয়া ভাষার এই বিপুল-বিশাল তরঙ্গমালা আজ মানব-চিত্ত-সাগরকে এমন উদ্বেল, ঐশ্বর্য্যময় করিয়া তুলিয়াছে!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।



যবদ্বীপে অগ্নিস্তম্ভন

(প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতি)

বঙ্গদেশের পল্লী অঞ্চলের সেকালের বৃদ্ধদের নিকট শৈশবকালে গল্প শুনিতাম, গাজনের সন্ন্যাসীরা চৈত্র-সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন রাত্রিকালে গ্রাম্য শিবমন্দিরের সম্মুখে আট দশ হাত উচ্চ বাঁশের মাচানের উপর হইতে মাচানের নিম্নস্থিত অগ্নিকুণ্ডের উপর লাফাইয়া পড়িত, এবং খালি পায়ে সেই অগ্নিরাশির উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইত। কুলের কাঠ অগ্নিতে দগ্ধ করিলে তাহার 'আঁচ' বা উত্তাপ অন্যান্য জ্বলন্ত কাঠের আঁচ অপেক্ষা অধিক প্রখর হইয়া থাকে, দুই তিন হাত দূরে থাকিলেও সেই উত্তাপ অসহ্য; কিন্তু গাজনের সন্ন্যাসীরা মাচা হইতে যে আগুনের উপর লাফাইয়া পড়িত, তাহা কুলের কাঠেরই গন্‌গনে আগুন! প্রায় এক হাত উঁচু করিয়া কুল-কাঠের স্তূপ সাজাইয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করা হইত। সেই আগুনে কাঠের স্তূপ জ্বলন্ত অঙ্গারে পরিণত হইলে, যখন দুই তিন হাত দূরের লোক সেই উত্তাপ অসহ্য মনে করিয়া তাহার নিকটে যাইতে সাহস করিত না, সন্ন্যাসীরা সেই সময় মাচা হইতে তাহার উপর 'বলো শিবো মহাদেব দেব!' বলিয়া যুক্তকরে অবনত-মস্তকে সেই অগ্নিকুণ্ডের উপর লাফাইয়া পড়িত; তাহার পর তিন চারি হাত প্রসারিত জ্বলন্ত অঙ্গারস্তরের উপর দিয়া স্বাভাবিক ভাবে হাঁটিয়া যাইত। যে সকল বৃদ্ধ এই অদ্ভুত দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, বহুকাল পূর্ব্বেই তাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে। একালের সন্ন্যাসীরাও ঐ প্রকার মহোৎসবের অনুকরণ করেন বটে, কিন্তু অগ্নিরাশি ভস্মে পরিণত হইলে তাঁহারা মাচান হইতে তাহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া নিয়ম রক্ষা করেন।

কিন্তু একালেও কোন কোন সাধু-সন্ন্যাসী বা যোগী যথা-বিহিত পূজার্চ্চনার পর আধ্যাত্মিক শক্তির বা যোগশক্তির বলে প্রজ্বলিত কাষ্ঠস্তূপের দাহিকাশক্তি স্তম্ভিত করিয়া, তাহার উপর দিয়া অনাবৃতপদে চলিয়া গিয়াছেন, এরূপ সংবাদ দুর্লভ নহে; এখনও মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রে এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়া থাকে। যাঁহারা এই প্রকার অলৌকিক অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই এদেশের লোক; প্রত্যক্ষ না করিলে জড়বাদী য়ুরোপীয়রা ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না। কিন্তু ভারতের বাহিরে চীনদেশীয় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সাধুরাও সংযম এবং মন্ত্রশক্তি-প্রভাবে অগ্নির দাহিকাশক্তি স্তম্ভিত করিতে পারেন। সম্প্রতি এক জন প্রত্যক্ষদর্শী ইংরাজ লণ্ডনের কোনও প্রসিদ্ধ মাসিকে ইহার যে সচিত্র বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল। আশা করি, নিরপেক্ষ ইংরাজ দর্শকের লিখিত এই সত্য ঘটনার বিবরণ পাঠক-পাঠিকাগণের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইবে।

এই ইংরাজ লেখক, মিঃ পিটার গেসি, যবদ্বীপের প্রধান নগর বাটাভিয়া-প্রবাসী। তিনি লিখিতেছেন, "প্রজ্বলিত অগ্নিরাশির উপর দিয়া হাঁটিয়া যাওয়ার প্রক্রিয়াকে মালয় দেশে 'ইন্‌য়েকাপি' বলে। যবদ্বীপবাসী চীনদেশীয় বৌদ্ধদের মধ্যে এই প্রক্রিয়া দিন দিন অধিকতর প্রচলিত হইয়া জনাদর লাভ করিতেছে। বাটাভিয়া-সন্নিহিত দুইটি বৌদ্ধ-মঠে প্রতিবৎসর একবার 'ইনয়েকাপি' উৎসব প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

যে কোনও ব্যক্তি নগ্নপদে জ্বলন্ত কাষ্ঠরাশির উপর দিয়া অনায়াসে হাঁটিয়া যাইতেছে, সুলোহিত অগ্নিশিখা পদদলিত করিয়া চলিয়া যাইতে তাহার পায়ে ফোস্কা উঠিতেছে না, ফোস্কা দূরের কথা, পায়ে আগুনের আঁচ পর্য্যন্ত লাগিতেছে না, ইহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ না করিলে বিশ্বাস করা যায় না, এবং ইহার কারণ নির্ণয় করাও অসাধ্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু

সাধুরা বিন্দুমাত্র কষ্ট বা অসুবিধা বোধ না করিয়া অতি সহজে এই অলৌকিক কার্য্য (miracle) সম্পন্ন করেন। তাঁহারা বলেন, দেবগণের আদেশপালনে নিয়োজিত প্রেতাত্মাসমূহের অতিপ্রকৃত শক্তির (Supernatural power) সাহায্যেই তাঁহারা ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। কিন্তু দেবতারাই যে যুগে সদলে অদৃশ্য হইয়াছেন, (এবং 'ঈশ্বরেরই সিংহাসন উঠিতেছে কাঁপিয়া'—মহাকবি হেমচন্দ্র) সেই জড়-বিজ্ঞানের যুগে, দেবতাদের কারপরদাজ প্রেতাত্মাগুলা মানুষের জন্য 'ভূতের বাগার' খাটিবে—ইহা কে বিশ্বাস করিবেন ? কিন্তু এই সকল সাধু স্বতঃপ্রবৃত্ত



উত্তাপ সহনাতীত হইয়া উঠিল

হইয়া এই কঠোর অগ্নি-পরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন এবং সেজন্য কোনপ্রকার পুরস্কার গ্রহণ করেন না ; কারণ, তাঁহাদের বিশ্বাস, এই কার্য্যের ফলস্বরূপ দেবতারাই তাঁহাদের উপর আশিস্-ধারা বর্ষণ করিবেন। (The gods will shower blessings upon them.)

যদিও যাভায় পাশ্চাত্যসভ্যতা দ্রুতবেগে সম্প্রসারিত হইতেছে, এবং 'রেডিও' ও 'টকি' ইহার অধিবাসিগণের নিকট এখন সুপরিচিত, তথাপি স্থানীয় আদিম অধিবাসীরা এবং প্রবাসী চীনাম্যানরা এখনও অত্যন্ত অনুন্নত ও কুসংস্কারান্ধ অবস্থায় কালযাপন করিতেছে। এই যুগেও ইহাদের অনেকের বিশ্বাস, চন্দ্রের সহিত সূর্য্যের বিবাহই গ্রহণের কারণ, এবং রামধনুরূপ সোপানের সাহায্যে প্রেতাত্মাগণ স্বর্গ হইতে সমুদ্রে অবতরণ করিয়া অবগাহন করেন। আদিম অধিবাসীরা রোগাক্রান্ত হইলে রোগের চিকিৎসার জন্য কোনও চিকিৎসককে না ডাকিয়া ঐন্দ্রজালিকের সহায়তা গ্রহণ করে। কারণ, তাহারা মনে করে, কোনও জন্তু-প্রকৃতির প্রেতযোনিই যে কোনও রোগের জন্য দায়ী।

তাহাদের ধারণা, রোজা ইন্দ্রজাল-কৌশলে রোগীর দেহ হইতে 'ভূত নামাইয়া', তাহাকে রোগমুক্ত করিতে পারে। অনেক চীনাম্যান চিকিৎসকের নিকট ঔষধের ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ না করিয়া, তাহাদের দেবমন্দিরে উপস্থিত হইয়া রোগমুক্তির প্রার্থনায় দেবতার নিকট ধর্ণা দিয়া থাকে।

এই সকল চীনা সাধু তাহাদের উপাস্য দেবতার প্রতি যেরূপ আদর-যত্ন প্রদর্শন করে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, তাহারা সেগুলিকে সজীব প্রাণী বলিয়াই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। চীনাম্যানরা তাহাদের প্রত্যেক মাসের প্রথম দিন এবং ১৫শ দিন দল বাঁধিয়া তাহাদের দেবমন্দিরে পূজা দিতে যায়, এবং ধূপধূনা, বাতি অর্থের বিনিময়সূচক নোট প্রভৃতি উপাচারে পূজা করে, বাজী পুড়ায়, করতাল ও দামামা-ধ্বনি দ্বারা প্রেতাত্মাদের আহ্বান করে। তাহারা আশা করে প্রেতাত্মারা তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিতে আসিবে ! কোন কোন দিন ইহাদের দেবতাদের জন্মদিন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই সকল দিনে তাহারা মহা সমারোহে উৎসবের আয়োজন করে ; যাত্রা, গান, সঙের অভিনয় প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান হয়, কিংবা আগুনের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাওয়ার কসরৎ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। দেবতারা বিশ্বাসী ভক্তদিগকে কিরূপ শক্তির অধিকারী করেন, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট বাটাভিয়ার ৪০ মাইল দূরবর্ত্তী একটি চীনা মঠে এইরূপ একটি অনুষ্ঠান সন্দর্শনের সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম। সেই দিন প্রাতঃকাল হইতে

আবাল-বৃদ্ধ-বানতা চীনা উপাসকমণ্ডলী দলে দলে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল; বহু দুরবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতেও সেই জনস্রোতের বিরাম ছিল না। কিছু কালের মধ্যেই ধূপ-ধূনার, প্রজ্বলিত বাতির ও রংমশালের ধূমে ক্ষুদ্র মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। সেই নিবিড় ধূমে সকলের শ্বাসরোধের উপক্রম হইয়াছিল।

মন্দিরাভ্যন্তরে দারু-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল; তাহাদের সম্মুখে সংরক্ষিত কয়েকখানি চতুষ্কোণ চৌকীর উপর রেকাবীপূর্ণ মাছ, মাংস, নিরামিষ ব্যঞ্জন, ফল, মিষ্টান্ন, কয়েক পেয়ালা চা ও মদ্য প্রভৃতি পূজোপচার শ্রেণীবদ্ধভাবে সংস্থাপিত ছিল। এতদ্ভিন্ন দুইটি নিহত শূকর-শাবক দুইখানি বারকোষে দুই পাশে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। একটি বৃহৎ মৃৎ-কলস দেবতাদের চরণামৃত দ্বারা পূর্ণ ছিল। ভক্তরা সেই পূত সলিলপানে সৌভাগ্য লাভের আশায় মধ্যে মধ্যে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল।



জ্বলন্ত অঙ্গারস্তূপের উপর একজনের পর অপরজন দৌড়িয়া চলিল

মন্দিরের সোপানশ্রেণীর ঠিক সম্মুখে জ্বলন্ত অঙ্গারের একটি স্তূপ প্রসারিত ছিল, তাহা প্রায় তিন ফুট উচ্চ, চার পাঁচ ফুট প্রশস্ত, এবং ত্রিশ গজ দীর্ঘ। এই অঙ্গারস্তূপের অঙ্গাররাশি সর্ব্বত্রই সমান লোহিতাভ, অর্থাৎ আগাগোড়া গনগনে লাল আগুন। শুনিলাম, সেই দিনের অনুষ্ঠানের জন্য পাঁচ জন লোক মনোনীত হইয়াছিল, তাহারা কয়েকবার উপর্য্যুপরি মুক্তপদে সেই অগ্নিরাশির উপর দিয়া যাতায়াত করিবে। সেই কার্য্যে যে কোনও প্রকার প্রতারণা চলিবে, তাহার উপায় ছিল না। সেই জ্বলন্ত অঙ্গারস্তূপ হইতে যে উত্তাপ বিকীর্ণ হইতেছিল, যে সকল স্থানীয় অধিবাসী, চীনাম্যান ও য়ুরোপীয় দর্শকমণ্ডলী—যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সেই উত্তাপ তাঁহাদের এরূপ প্রখর বলিয়া অনুভূত হইতেছিল যে, তাঁহারা সেই অঙ্গারস্তূপের চারিদিকে ভীড় করিয়া দাঁড়াইলেও তাহার দুই গজ দূরে থাকিতেও কষ্ট বোধ করিতে লাগিলেন।

সেই জ্বলন্ত অঙ্গারস্তূপে পর্য্যটনের পূর্ব্বে ভক্তগণকে শুদ্ধিক্রিয়া সম্পাদনের জন্য কোন কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে হয়। তৎপূর্ব্বে তাহাদিগকে সুদীর্ঘ চল্লিশ দিন সংযম করিতে হয়; এই সময় তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার মাংসভক্ষণ বর্জ্জন করিতে হয়। ক্রিয়ার দিন তাহারা দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করে—যেন তাহাদের বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়; কারণ, তাহারা অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, এই বিশ্বাস সুদৃঢ় না হইলে, তাহাদিগকে না কি অকৃতকার্য্য হইতে হয়। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত পুরোহিতরা যে কোনও ব্যক্তিকে এই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য অনুমতি দান করে, তবে যথানিয়মে উপবাস ও প্রার্থনাদির পরেই সেই ব্যক্তি ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারে।

অপরাহ্ন তিনটার সময় পরীক্ষার্থীরা সাদা হাফ প্যাণ্ট এবং হাত-কাটা ফতুয়া পরিধান করিয়া খালি পায়ে বেদীর সম্মুখে সমবেত হইয়া থাকে। তাহারা খানিক ধূপ-ধূনা পুড়াইয়া, নিমীলিত-নেত্রে গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। তখন আসন্ন অগ্নিপরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইবার জন্য তাহাদিগকে একাগ্রচিত্ত হইতে হয়। তাহার পর দামামা ও করতাল

সমতালে বাজিতে আরম্ভ করে, এবং সেই বাদ্যধ্বনির মধ্যে এক জন সুর করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে থাকে। এই মন্ত্র দ্বারা প্রেতাত্মাগণকে ভক্তবৃন্দের দেহে প্রবেশ করিবার জন্য আহ্বান করা হয়। সেই সময় সেই লোকগুলির ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে হয়, তাহারা মোহাচ্ছন্ন হইয়াছে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহারা সর্ব্বাঙ্গে একটা ঝাঁকুনী দিয়া জোরে জোরে শ্বাস গ্রহণ করে, এবং উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া লম্ফ-ঝম্প ও নৃত্য আরম্ভ করে।

মুহূর্ত্ত পরে তাহারা ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া, মন্দিরের সোপানশ্রেণী দিয়া দ্রুতবেগে নামিয়া যায়, এবং সেই জ্বলন্ত অঙ্গারস্তূপের কিনারায় আসিয়া একবার থমকিয়া দাঁড়ায়; তাহার পর উভয় হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া অর্দ্ধমুদিত-নেত্রে একে একে সেই জ্বলন্ত অঙ্গারস্তূপ পদদলিত করিয়া, তাহার উপর দিয়া দৌড়াইয়া যায়, এবং সেই অঙ্গারস্তূপের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়ায়, এবং পূর্ব্ববৎ দ্রুতবেগে সোপানপ্রান্তে ফিরিয়া আসে। তাহার পর ধীরে ধীরে মন্দিরে উঠিয়া যায়। সেই সময় তাহাদের ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া মনে হয়, তাহাদের বাহ্যজ্ঞান নাই।

তাহারা মন্দিরে ফিরিয়া আসিলে এক জন লোক পূর্ব্বোক্ত দেবচরণামৃত দ্বারা তাহাদের মস্তক অভিষিঞ্চিত করে। ইহার পর তাহাদের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসে। এই সময় আমি তাহাদের অনাবৃত পা পরীক্ষা করিয়া, তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় দেখিতে পাইলাম; তাহাদের পায়ে আগুনের বিন্দুমাত্র উত্তাপ লাগিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। তবে তাহাদিগকে দেখিয়া মনে হইল, তাহারা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, এবং তাহারা তখন হাঁপাইতেছিল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আমি স্বয়ং দেখিয়াছি (with my own eyes, I had seen) তাহারা যখন সেই জ্বলন্ত অঙ্গারস্তূপ অতিক্রম করিতেছিল, তখন তাহার ভিতর তাহাদের পায়ের পাতা পর্য্যন্ত ডুবিয়া গিয়াছিল; তথাপি তাহাদের কাহারও পদদ্বয়ে সামান্য একটি ফোস্কা পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম না! কিন্তু প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে তাহাদের পা পুড়িয়া ঝল্‌সাইয়া যাওয়াই ত উচিত ছিল।

এই অগ্নিপরীক্ষার ফলে দৈবশক্তির প্রতি ভক্তদের বিশ্বাস অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এইভাবে অনুষ্ঠান শেষ হইলে বিস্তর লোক সেই চরণামৃত-পূর্ণ কলস লইয়া কাড়াকাড়ি আরম্ভ করে; কেহ তাহা পান করে, কেহ বা বোতল পূর্ণ করিয়া বাড়ী লইয়া যায়। চীনাম্যানদের বিশ্বাস, এই জল ব্যবহার করিলে সৌভাগ্য এবং দেবতার আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে পারা যায়।

জ্বলন্ত অগ্নিরাশির উপর দিয়া লোকে এই ভাবে বিচরণ করিতে পারে, ইহা বিশ্বাস করিতে হইলে তাহা প্রত্যক্ষ করিতে হয়। মানুষ ইহার সঙ্গত কারণ নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া মূক হইয়া থাকে! চিকিৎসাশাস্ত্রে যাহারা বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানশাস্ত্রে যাহারা সুপণ্ডিত, তাঁহারা অগ্নিপরীক্ষার অব্যবহিত পরেই এই সকল ভক্তের পা অত্যন্ত সতর্কভাবে সযত্নে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন; কিন্তু কি কারণে তাঁহাদের পদদ্বয় সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকে, বিস্তর গবেষণা করিয়াও তাহা নিরূপণ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা সুস্পষ্টভাবে তাঁহাদের অক্ষমতার কথা স্বীকার করিয়াছেন। কেহ কেহ বিড়-বিড় করিয়া বলে, 'ওটা আত্মসম্মোহনের (selfhypnotism) ব্যাপার!' কাহারও কাহারও ধারণা, পুরোহিতগুলা অদ্ভুত দৈবশক্তির অধিকারী। কিন্তু আমার ন্যায় সাধারণ প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট ইহা চিরদিন জটিল রহস্য বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে।

জড়বাদী, বিশ্বাসহীন য়ুরোপীয় দর্শকগণকে মহাকবি সেক্সপীয়রের সেই অমর উক্তি স্মরণ করিতে বলি,—"There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy."

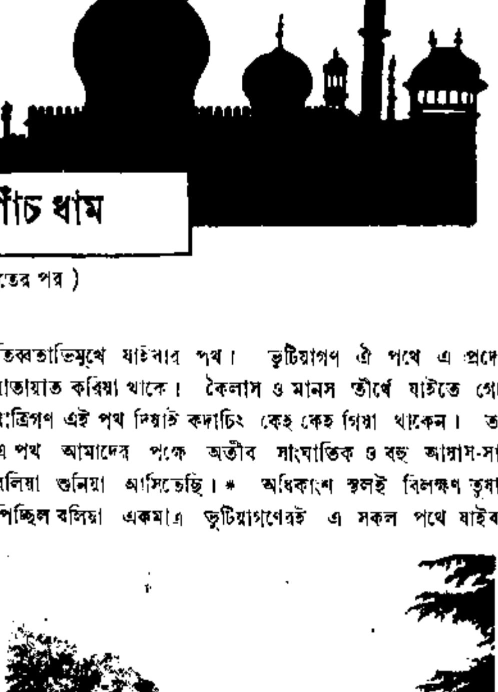
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

হিমালয়ে পাঁচ ধাম

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

"ধরালী" হইতে গঙ্গোত্রীর দূরত্ব প্রায় বারো মাইল হইবে। "সুখী" পাহাড় হইতে এক্ষণে আমরা বরফের স্তরের মধ্যেই আসিয়া পড়িয়াছি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পাহাড়ের গায়ে, মাথায় কেবলই এই শুভ্রোজ্জ্বল তুষারখণ্ডের বিস্তৃতি। দিন বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি যেন ক্ষণে ক্ষণে নবরূপ ধারণ করিতে থাকে। ধর্ম্ম-শালার পূর্ব্বভাগে নিকটবর্ত্তী একটি পাহাড়ের আপাদমস্তক এই তুষারে একবারেই কেমন আবৃত দেখিলাম! ঠিক যেন প্রকাণ্ড একখানি হীরক রৌদ্র-কিরণে ঝক্-ঝক্ করিতেছে। এ দৃশ্য সমতলদেশবাসী আমাদিগকে একবারেই উদভ্রান্ত করিয়া দিল। প্রকৃতির রাজ্যে ইহাই ত এখানকার অপরূপ, নূতন ও বিচিত্র বস্তু। বৃক্ষলতা-বর্জ্জিত নগ্ন পাহাড়ের শিরোদেশে, এ ভূষণ—বিভূতির মতই সাধক চক্ষুতে পবিত্র ও সুন্দর মনে হয়।

কলুষনাশিনী গঙ্গা এখানে ধর্ম্মশালার পশ্চিমভাগে প্রবাহিতা। কাচ-স্বচ্ছ নির্ম্মল জল; উচ্ছলগতিতে তাহা হইতে নিরন্তর কলকল-শব্দ উত্থিত হইতেছে। ওপারে পাহাড়ের গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘরগুলি দূর হইতে খেলা-ঘরের মত শোভা পাইতেছিল। শুনিলাম, গঙ্গোত্রীর পাণ্ডাগণ ঐখানে বাস করেন। সর্ব্বতাপ-হরা মায়ের পবিত্র তটে, সৌন্দর্য্য-বেষ্টিত এই উন্নত হিম-গিরি-শিরে বাস মায়ের পূজারিগণের পক্ষে যথোপযুক্ত স্থানই মনে হয়। এদিনে আমরা এখানেই রাত্রিযাপন করিয়া, পরদিন অর্থাৎ ২৭শে বৈশাখ বুধবার প্রত্যূষে গঙ্গোত্রী উদ্দেশে পুনরায় বহির্গত হইলাম। বেলা সাড়ে সাতটা আন্দাজ সময়ে গঙ্গা-বক্ষে পুলের পার্শ্বেই এক চটী দেখিয়া জিজ্ঞাসায় জানিলাম, ইহার নাম "জাংলা" চটী। ধরালী হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় চারি মাইল। এ পথে চলিয়া আসিতে তিন চারি স্থানে অল্প অল্প তুষারের স্তূপ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। পুল পার হইয়া গঙ্গাকে দক্ষিণে রাখিলাম। এইবার কতকটা পূর্ব্বাভিমুখ হইয়াই চড়াই-পথে ক্রমশঃ উপরে উঠিয়া চলিতেছি। পাহাড়ের গায়ে এ স্থানের পাইন-বনগুলি দেখিতে অতীব সুন্দর। স্থানের সংস্পর্শে ইহারাও যেন দৃশ্যের গাম্ভীর্য্য বাড়াইয়া দিয়াছে। বিশাল-কায় পাহাড়ের গা দিয়া উপরে উঠিতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চট্টানের নিম্নদেশে মায়ের প্রবাহ-শব্দ কোথায়ও অস্পষ্ট, কোথায়ও মধুর, আবার কোথাও বা প্রচণ্ডরূপে যাত্রীর কাণ বধির করিয়া দিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিতেছে। কিছু দূর আগে গিয়া বামভাগে উপরে যাইবার আর একটি রাস্তা দেখিলাম। ভগবান বলিল, "উহা তিব্বতাভিমুখে যাইবার পথ। ভুটিয়াগণ ঐ পথে এ প্রদেশে যাতায়াত করিয়া থাকে। কৈলাস ও মানস তীর্থে যাইতে গেলে যাত্রিগণ এই পথ দিয়াই কদাচিৎ কেহ কেহ গিয়া থাকেন। তবে এ পথ আমাদের পক্ষে অতীব সাংঘাতিক ও বহু আয়াস-সাধ্য বলিয়া শুনিয়া আসিতেছি। * অধিকাংশ স্থলই বিলক্ষণ তুষার-পিচ্ছিল বলিয়া একমাত্র ভুটিয়াগণেরই এ সকল পথে যাইবার



তুষারশোভী পাহাড় ও পাইন-বন—হরশিলা

সাহস আছে।" লেখক যে কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই সে তীর্থ দর্শনের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিল, আমাদের সহযাত্রী ভগবান্ তাহা এখানে আসিয়াই প্রথম জানিতে পারিল। সাধু-সন্ন্যাসী ছাড়া আমাদের মত সমতলদেশবাসী গৃহী যাত্রী যে কৈলাস যাত্রা করিতে সমর্থ,

* এ পথে অতি দুর্গম "নিলং" (Nelang pass) পাস্ অতিক্রম করিয়া "কৈলাস" যাইতে হয়।

ইহা তখনও পর্য্যন্ত তাহার ধারণার অতীত ছিল। তাই সে হতভম্বের মত জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "আপনারা কোন পথ দিয়া কৈলাসে গিয়াছিলেন?" "সেখানে কি দেখলেন?" "মানস-সরোবরে নীলপদ্ম দেখিতে কেমন" ইত্যাদি প্রশ্নের যথাসম্ভব উত্তর * শুনিয়াও সে যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না। ফল কথা, কৈলাস তীর্থ যে পাহাড়ীদের পক্ষেও বিলক্ষণ ভয়াবহ, এ কথা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না।

নীচের রাস্তা ধরিয়া এ পথে আমরা এক খরস্রোতা নদীর পুল পার হইলাম। নদীটির নাম শুনিলাম "জাহ্নবী"। এই জাহ্নবীর স্রোতোগর্জ্জন এতই ভয়াবহ যে, ইহার জন্যই এতদঞ্চলে এই নদী ভয়ঙ্করীরূপে পাহাড়ীদের নিকটে বিখ্যাত হইয়া আছে। পুলটির সাংঘাতিক ভগ্নাবস্থা হেতু তৎপার্শ্বেই আর একটি নূতন লৌহসেতু তখন নির্ম্মিত হইতেছিল। উপরের পথে যে আর একটি নূতন পুল নির্ম্মাণের কথা ইতিপূর্ব্বে শুনিয়া আসিয়াছি, তাহা যে ইহাই, ইহা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। এই ভৈরবঘাটীর কঠিন চড়াইপথে দুধারেই যেরূপ আকাশ-স্পর্শী ভীষণ পাহাড়, তাহাতে তমসাধ্যকার এই স্থান অর্থাৎ যেখানে এই প্রবল-স্রোতা



"জাংলা" চটীর নিকট গভীর খাদে গঙ্গার একটি দৃশ্য

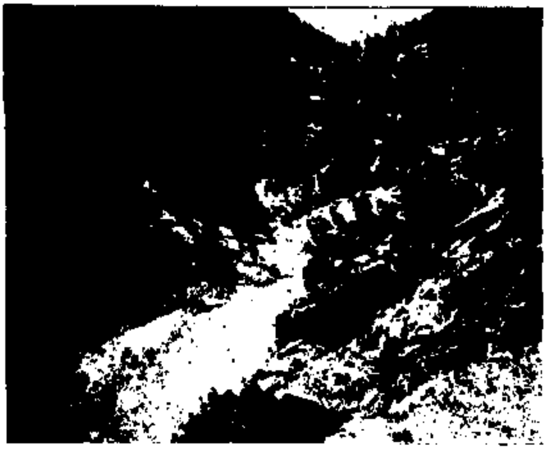
জাহ্নবী নদী গঙ্গার সহিত প্রচণ্ডবেগে সম্মিলিত হইয়াছে, সে স্থানের অবিরাম উত্তাল-তরঙ্গ-নিনাদিত জল-কল্লোল মানুষকে কিরূপ ভীত, বিস্মিত ও স্তব্ধ করিয়া দিয়া থাকে, তাহা প্রত্যক্ষদর্শী ভিন্ন অপর কেহই বুঝিতে সমর্থ হইবেন না, ইহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে। আমরা ভাগীরথীকে দক্ষিণে রাখিয়াই আগে যাইতেছিলাম। বামদিকে পাহাড়ের গা বাহিয়া গেরুয়া রংএ রঞ্জিত একটি ঝরণার ক্ষীণধারা নীচে নামিয়াছে। "ভগবান সিংহ সেই ধারায় ললাটদেশ রঞ্জিত করিল। পাহাড়ের উপরিভাগে ভৈরবনাথজী" বিরাজমান আছেন। এই ধারা তাঁহারই 'বিভূতি' ভিন্ন আর কিছুই নহে, এ কথা শ্রবণে আমরা সকলেই সে সময়ে এই পরম বিভূতি স্ব স্ব ললাটে লেপন করিয়াছিলাম। বেলা দশটা আন্দাজ সময়ে পাহাড়ের উপরিভাগের এই ভৈরবনাথজীর মন্দির-সমক্ষে উপস্থিত হইয়া পরিশ্রম বশতঃ সকলেই এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইতে বাধ্য হইলাম। মন্দিরের সুন্দর মূর্ত্তি সকলেরই মাথা নত করিয়া দিল। ভীষণ পার্ব্বত্য-পথের দুরধিগম্য স্থানে মধ্যে মধ্যে এইরূপ দেবমূর্ত্তিদর্শন যাত্রীর প্রাণে কতই না উৎসাহ ও আনন্দ আনিয়া দেয়! মন্দিরের আশে-পাশে কয়েকখানি ঘর ধর্ম্মশালার মতই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একখানি মাত্র ক্ষুদ্র দোকান, তাহাতে চাউল, আটা, ঘৃত প্রভৃতি কিছু কিছু আহার্য্য দ্রব্য পাওয়া যায়। তবে থাকিবার মহৎ অসুবিধা এই যে, এ স্থানে পানীয় জলের অত্যন্ত অভাব দেখিলাম। এক মাইল দূর হইতে একটি ক্ষীণধারা লম্বা লম্বা চীরগাছকে নালার আকারে কাটিয়া তৎসাহায্যে ধরিয়া আনা হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিতে সে ধারার এতই ক্ষীণাবস্থা যে, তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য এক অঞ্জলি জলের আশায় প্রত্যেক যাত্রীকেই ন্যূনপক্ষে পাঁচ মিনিট কাল অপেক্ষা করিতে হয়। এই দুঃখ নিবারণের নিমিত্ত কাণপুরের জনৈকা স্ত্রীলোক এ স্থানে ঐ জলসঞ্চয়ের একটি 'টঙ্কি' (চৌবাচ্চার মত) নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, অল্পে অল্পে সঞ্চিত ঐ টঙ্কির মধ্যগত জল এতই অপরিষ্কার যে, পান করা দূরের কথা, স্পর্শ করিতেই প্রত্যেকে যেন শিহরিয়া উঠেন! চড়াই পথের ক্লেশ দূর করিতে গিয়া, সকল প্রকার যাত্রীই ইহার যথেচ্ছ ব্যবহারে জলটুকু যে নিরন্তর দূষিত করিয়া রাখিতেছে—জলের অবস্থা দেখিয়া ইহা স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে।

আর ৬ মাইল আগে যাইতে পারিলেই আমাদের গঙ্গোত্রী পৌঁছিবার কথা, তাই আর কালবিলম্ব না করিয়াই এখান হইতে এবার উৎরাই-পথে নামিতে সুরু করিলাম। আঁকিয়া বাঁকিয়া এ পথ ক্রমশঃই উত্তরাভিমুখ হইয়াছে। দক্ষিণভাগে গঙ্গার ওপারেই বিশালকায় পর্ব্বত-শিখরের স্থানে স্থানে ঘন-সন্নিবিষ্ট পাইন বৃক্ষগুলি দেখিতে ঠিক যেন ধ্যানমগ্ন যোগিশ্রেষ্ঠের জটাজূটেরই মত! এবং সেই জটাজূট-সংশ্লিষ্ট শুভ্রোজ্জ্বল তুষারের বিস্তৃতি, ফেনপুঞ্জের মত পাহাড়ের গা দিয়া সর্পাকৃতি যেখানে নীচে নামিয়া গঙ্গায় সম্মিলিত হইয়াছে, সে স্থান—বলিতে কি, সুমধুর 'গঙ্গাবতরণে'র প্রত্যক্ষ দৃশ্যের মত কত রূপেই না যাত্রিগণের নয়ন-মন চরিতার্থ করিয়া থাকে। উৎরাই-পথে কিছুক্ষণ চলিয়া আসিতেই চোখের সম্মুখে উত্তর ভাগের তুষারের শুভ্র-সুন্দর শৃঙ্গগুলি সারি সারি অগণিত রজত-মন্দিরের সুবিমল জ্যোতির্বিম্বের মত সহসা ঝলসিয়া উঠিল। সূর্য্য-কিরণ-প্রতিবিম্বিত সে এক অপূর্ব্ব নৈসর্গিক সুষমা। ঐ সুষমাই যেন সুর-নরমুনি-বাঞ্ছিত স্বর্গের চির-সুন্দর দিব্য নিকেতন! সংসারের অসার বাসনার মোহ-শয়নে নিয়তই যাঁহাদের নেত্র-যুগল তন্দ্রা-জড়িত থাকে, বহির্জগতের এই অপরূপ শোভা-সন্দর্শনের সাক্ষাৎ-সৌভাগ্য তাঁহাদের পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। তাই ক্ষণেকের জন্য সে সময়ে দেশ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব- সকলেরই উদ্দেশে কে যেন জোর করিয়াই অন্তরের মাঝখানে ধাক্কা দিয়া জানাইতে চাহিল, "ওরে ভ্রান্ত, হিম-গিরির এই চিত্র-বিচিত্র পবিত্র চলচ্চিত্রের সুন্দরতার আকর্ষণে আজ পর্য্যন্ত কেহই মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে নাই! যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, প্রভৃতি যাঁহাদের কর্ম্মজীবনে বিরাট বিশাল মহাভারতের সৃষ্টি হইয়া

* এ সম্বন্ধে যদি কেহ সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে মৎপ্রণীত "মানস-সরোবর ও কৈলাস" পুস্তক পাঠ করিবেন।—লেখক।

গেল, তাঁহারাও কর্ম্মক্ষেত্রের শুভ অবসরে, এক সময়ে এই লোকালয়-বর্জ্জিত পবিত্র পথকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ ও চরম মনে করিয়া 'মহা-প্রস্থানে' ধন্য হইয়াছিলেন! আজিকার দিনে মানুষ কেবল তুচ্ছ মানাপমান, ভোগবাসনা ও কামিনী-কাঞ্চনের আসক্তির মধ্যে নিয়তই প্রপীড়িত হইয়া বাস করা স্বাচ্ছন্দ্যজনক মনে করিয়া থাকে। নতুবা পথ ভুলিয়াও একবার এই সকল প্রত্যক্ষ-পবিত্র সত্যপথে অগ্রসর হইবার জন্য কয় জনকে আগ্রহান্বিত দেখা যায়?"

আত্মহারার মত এইরূপ বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আগে চলিতেছিলাম। দুধারেই গঙ্গার তীরে তীরে এইবার অগণিত ঝাউ গাছের শ্রেণী। ধ্যানমগ্ন, ধীর, স্থির তাহারা যেন স্তিমিত লোচনেই মায়ের মহিমা-স্তবে সমাসীন! আশে পাশে চারিদিকেই কেবল খণ্ড খণ্ড তুষারের বিস্তৃতি। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে রৌদ্রকিরণে তাহারা কেমন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে! এই একান্ত নির্জ্জন পাহাড়পুরী দেবাদিদেব মহাদেবের শুভ্র অট্টহাস্যে যেন দিগ্‌দিগন্ত পরিপূর্ণ রাখিয়াছে! সংসারের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে নিরন্তর জর্জ্জরিত, কলুষিত চিত্ত আজ এই পবিত্র, স্বভাব-সুন্দর, বিরাট,



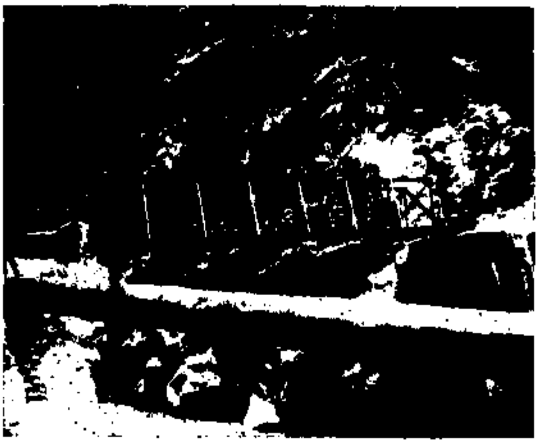
"ভৈরবঘাটীর" উচ্চ অধিত্যকা হইতে নিম্নে গঙ্গার দৃশ্য

গাম্ভীর্য্যময় দৃশ্যের মাঝখানে কোথায় যেন আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। এক স্থানে একটি বৃহৎ ঝরণার পার্শ্বে বরফের স্তূপে রাস্তা ঢাকা ছিল। তাহা অতিক্রম করিবার সময়ে বামদিকের পাহাড়টিকে ঠিক যেন জগন্নাথদেবের সুবৃহৎ মন্দিরের মত ভ্রম হইল! রাস্তার ধারে ধারে স্থানে স্থানে বিলক্ষণ বিস্তৃত উপলখণ্ড বহু দূর পর্য্যন্ত নীচের স্থান আচ্ছাদন করিয়া রাখায়—মুনি-ঋষি-গণের সমাধিস্থ হইবার এক একটি অন্ধকার নির্জ্জন গুহা বলিয়াই যেন মনে হয়। সকলের অলক্ষ্যে চক্ষুযুগল এক একবার এই সকল গুহার নিভৃত কন্দরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে-ছিল, যদি কোন সাধু মহাত্মার দর্শনলাভ ঘটে, নানা চিন্তায় অন্য-মনস্ক হইয়া সেদিন বেলা বারোটা আন্দাজ সময়ে আমরা সকলেই একে একে গঙ্গোত্তরীর পবিত্র মন্দির-সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

এই সেই হিমগিরি-নির্ঝরিণী, পূতসলিলা, সর্ব্বসন্তাপনাশিনী সুরধুনীর সুর-নর-মুনি-বাঞ্ছিত স্বচ্ছ সুশীতল প্রথম প্রবাহধারা। এ ধারা অদূরের ঐ উত্তরভাগস্থিত রজতগিরির অমল-ধবল পুণ্যময় পাদদেশ হইতেই নামিয়া আসিতেছে। কি উচ্ছলিত, তরঙ্গায়িত ইহার চঞ্চল গতি! অবিরাম কল-কল্লোল-মুখরিত হইয়া এই নিস্তব্ধ পাহাড়-প্রকৃতি যেন প্রাণময় করিয়া রাখিয়াছে। কত যুগ-যুগান্তরের এই অমৃত-শীতল প্রবাহধারা এবং ইহার ঠিক উৎপত্তি-স্থল কোনখানে, তাহা নির্ণয় করা একবারেই দুঃসাধ্য বলিলে হয়। এই সন্তাপনাশকর্ত্রী মায়ের মহিমা হিন্দুর প্রত্যেক সর্ব্বগ্রন্থেই শতমুখে প্রকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং ইহার উৎপত্তিস্থল বিচারের পূর্ব্বে একবার এই পুণ্য পীযূষ-ধারার বিশিষ্টতা সম্বন্ধে যদি আলোচনা করিতে অগ্রসর হই, তবে কোন্ কথাগুলি আমাদের প্রাণে বাজে?

"গঙ্গয়া ন সমং তীর্থং পাবনং সর্ব্বদেহিনাম্।
যতোঽসৌ বাসুদেবস্য তনুরেব ন সংশয়ঃ॥"

ইনি সেই মঙ্গলময় বাসুদেবেরই তনু, ইহাই তাঁহার প্রথম পরিচয় জানিয়া থাকি। এই 'সর্ব্বতীর্থময়ী' গঙ্গা কোথায় বাস করেন? তদুত্তরে—"যাং দধার পুরা ব্রহ্মা ব্যাপারকলসে বিভুঃ"



ভৈরবঘাটীর নিকট "জাহ্নবী" নদীর উপরে নবনির্ম্মিত লৌহ-সেতু

"মহাদেবস্য শিরসি বর্ত্ততে সরিদুত্তমা।" "স্ফুরদিন্দুকলাভাস্বজ্জটাটবীং বিরাজিনীম্।" প্রভৃতি শাস্ত্র-বচনেই তাহা সুস্পষ্ট উক্ত রহিয়াছে। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার কমণ্ডলুমধ্যে অথবা দেবাদিদেব মহাদেবের ঘন-সন্নিবিষ্ট জটামধ্যে যাঁহার বাস, তাঁহার উৎপত্তি মর্ত্ত্যের মানব চর্ম্মচক্ষুতে দর্শন করিবার সৌভাগ্যলাভ করিবে, এ আশা "পঙ্গুর গিরি-লঙ্ঘনের" মতই দুরাশা নহে কি?

শুনিলাম, এখান হইতে আরও ১৮ মাইল এই গঙ্গার তীরে তীরে উপরে যাইতে পারিলে, উজ্জ্বল তুষারের মধ্য দিয়া মায়ের এই প্রবাহধারা অধিকতর সূক্ষ্মরূপে নামিয়া আসিতে দেখা যায়। সে স্থানকে গো-মুখী-ধারা বলে।* আষাঢ়ের শেষভাগে তুষার কমিয়া

* বাচস্পত্যাভিধানে বা শব্দকল্পদ্রুম দৃষ্টে জানা যায়, "গোমুখী" অর্থে "হিমালয়াদ্‌গঙ্গা-পতনে গোমুখাকার গুহা ইতি লোক-প্রসিদ্ধিঃ।"

গেলে কোন কোন সাধু-মহাত্মা এই গোমুখী-ধারা দেখিবার জন্য অসহ্য ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু অনুসন্ধানে যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে এই দুর্গম-তম স্থানে উপস্থিত হইয়া এ যাবৎ চর্ম্মচক্ষুতে কেহই সে গোমুখাকারে গুহার প্রত্যক্ষ দর্শনলাভ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। অবশ্য "গো-মুখী" অর্থে গো-মুখাকার গুহা, ইহা কেবল 'লোকপ্রসিদ্ধি'ই চলিয়া আসিতেছে, শাস্ত্র-বচনের মধ্যে বিশেষভাবে এরূপ কিছু উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

রামায়ণ বা স্কন্দপুরাণান্তর্গত কেদারখণ্ডের মধ্য হইতে এই গঙ্গাবতরণের অধ্যায় বিশেষভাবে পাঠ করিয়া সুস্পষ্টভাবে আমরা কতদূর জানিতে পারিয়াছি?—মায়ের পুণ্য-প্রবাহ মর্ত্ত্যে আনিবার



গঙ্গোত্রীর গঙ্গা-মন্দিরের পশ্চাৎ-দৃশ্য। মন্দিরের উত্তরভাগে তুষার-গিরি, যেখান হইতে গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে

জন্য সগরকুলোদ্ভব রাজর্ষি ভগীরথের হিমালয়-গমন, * ও উগ্র তপস্যার দ্বারা শিবকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অভীষ্ট বরলাভ যথা,—

"ধারাং ত্রৈলোক্যপাপঘ্নীং গৃহাণ পিতৃমুক্তয়ে।
যস্যা দর্শনমাত্রেণ সর্ব্বে যান্তি শুভাং গতিম্॥"

এই ত্রিলোক-পাপঘ্নী-ভাগীরথী যে-দিন প্রথম প্রবাহরূপে প্রত্যক্ষ-প্রকাশ পাইলেন, সে-দিনের সেই সুমহান্ শুভক্ষণে, স্বর্গ হইতে নামিয়া ইন্দ্র আদি দেবগণ এবং যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, মুনি-ঋষি প্রভৃতি সিদ্ধচারী সকলেই যেরূপ সমস্বরে রাজর্ষি ভগীরথের জয়-গান গাহিয়াছিলেন, তাহা হইতেই আমরা ইহার গুরুত্ব বিশেষরূপেই উপলব্ধি করিয়া থাকি।

"ইন্দ্রোঽপি লোকপালৈশ্চ গঙ্গায়া দর্শনায় বৈ।
গায়ন্ত্যোঽপ্সরসাং শ্রেষ্ঠাস্তথা গন্ধর্ব্বসত্তমাঃ॥"

"বভূবুঃ সর্ব্বতো দিগ্ভ্যো জয় রাজন্ ভগীরথ।
রাজন্ জয়েতি সততং ঋষয়ঃ সিদ্ধচারণঃ॥"

ইত্যাদি বচনই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ।

এই মহোৎসব-সময়ের বাদ্যও ছিল নানাপ্রকার।

"নেদুঃ সর্ব্বাণি বাদ্যানি ভেরী ঢাক্কাবকানি চ।
শঙ্খানাং চ মৃদঙ্গানাং গো-মুখানাং * তথৈব চ॥"



গঙ্গামন্দির গঙ্গোত্তরী

সে সময়ে শঙ্খ, মৃদঙ্গ, গো-মুখ প্রভৃতি নানাপ্রকার মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইয়াছিল।

সেই মহীয়সী পুণ্য-বাহিনীর সুমধুর স্মৃতি লইয়া আজ আমরা সকলেই একে একে এই অমল-ধবল তুষার-কিরীট-পরিশোভিত হিমগিরির তপঃপূত জাগ্রত মহাপীঠ-সন্নিধানে ভাগীরথীর প্রথম প্রবাহ-ধারা প্রত্যক্ষ করিলাম। হৃদয়ের দৈন্য, ক্লেদ সমস্তই মুছিয়া গিয়া মায়ের চরণে লুটাইয়া পড়িতে ইচ্ছা হইল। পাণ্ডাকে সঙ্গে লইয়া যথাবিধি সঙ্কল্প-পূর্ব্বক স্নানের জন্য ব্যস্ত হইলাম।

মন্দিরের অল্প নীচেই গঙ্গা-পার্শ্বে "ভগীরথ-শিলায়" সঙ্কল্প করিবার নিয়ম। দুঃখের বিষয়, গত বৎসরের বর্ষাগমে মায়ের প্রচণ্ড স্রোত সে শিলার চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ করিয়া দিয়াছে। শুধু শিলা নহে, উপরের গঙ্গা-মন্দির-সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র শিব-মন্দিরের আশ-পাশ ও সমুদয় ঘাটটি একবারেই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কোথায় যে লীন হইয়াছে, বলিবার উপায় নাই! পাণ্ডা ঠাকুর উপরের মন্দির

* "হিমালয়ং নগং গচ্ছ ভাবিকার্য্যপ্রবর্ত্তনে।"
কেদারখণ্ডে—ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

* বাচস্পত্যাভিধানে গোমুখম্ অর্থে বাদ্যভাণ্ডম্। পাঠকগণ—এই গোমুখ শব্দকে যেন 'গোমুখী' মনে না করেন।—লেখক

সংলগ্ন ভগ্নাবস্থা দেখাইয়া যথেষ্ট দুঃখপ্রকাশ করিলেন। তদুত্তরে আমরা কেবল সহানুভূতিই দেখাইলাম। মনে করিলাম, রাজর্ষি ভগীরথ যখন 'ব্রহ্মলোকে,' তখন তাঁহার ভগীরথ-শিলা যে গঙ্গাগর্ভে লীন হইবে, বিচিত্র কি? তবে মর্ত্ত্যবাসীর জন্য সর্ব্বসন্তাপ-নাশিনী যে ধারা তিনি মর্ত্ত্যে আনিয়া দিয়াছেন, তাহার উত্তাল-তরঙ্গ রোধ করিতে যদি কোন শক্তিমান বর্ত্তমান থাকেন, তবে সে একমাত্র সেই জটাজূটধারী স্বয়ং স্বয়ম্ভূ ভিন্ন আর কেহ নহেন! মানুষ তাহার নিজের ক্ষুদ্র শক্তি অনুযায়ী যাহা করিতে পারে, এই দুর্গম বিশালকায় পার্ব্বত্য প্রদেশে কেবল তাহাই করিয়াছে। সুশোভন মন্দির, বাসযোগ্য ধর্ম্মশালা ও যথাসম্ভব আহার্য্য দ্রব্যের দোকান, এ কয়টির ব্যবস্থাই তাহার পক্ষে কঠিন ও আয়াসসাধ্য মনে হয়। ভাঙ্গা-গড়ার কর্ত্তা ভগবান!

এই গঙ্গোত্তরী সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রায় ১০ হাজার ৩ শত ফুট উচ্চে অবস্থিত। সুতরাং নিরন্তর তুষার-সমাচ্ছন্ন হিমগিরির এ স্থানে শীতের আধিক্য যথেষ্ট বলিলেই হয়। মসৌরী হইতে এ যাবৎ আমরা পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করিয়া একদম তুষারের রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি, শীতটা ক্রমশঃই যেন "গা-সওয়া-গোছ" হইয়া গিয়াছিল। তথাপি যমুনোত্তরী অপেক্ষা এ স্থানের শীত অনেক কম বলিয়াই মনে হইল। শীত অল্প বলিয়াই আমরা এখানে অবগাহন-স্নান করিবার সঙ্কল্প করিলাম। কাচ-স্বচ্ছ জলের দিকে তাকাইলে চক্ষু শীতল হয়, স্পর্শে শরীর-মন শিহরিয়া উঠে। হিম-শীতল প্রবাহ-ধারার পরিসর এখানে প্রায় ২০।২৫ হাত হইতে পারে, কিন্তু এত অধিক স্রোত যে, কোমর পর্য্যন্ত * জলে নামিতেই মনে হয় যেন, মায়ের স্রোতে ভাসিয়া চলিলাম। কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া সকলেই যখন ডুব দিয়া উপরে উঠিলাম, দেহখানি যেন শরীর ছাড়িয়া টলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ মুছিবার পর তবে আয়ত্তের ভিতর শরীর ফিরিয়া পাইলাম। এই সেই পাপাপহারী সদ্য-পবিত্র জাহ্নবী-ধারার অমৃত-স্পর্শ! যাহার সংস্পর্শে আসিয়া আধুনিক-যুগের জ্ঞানগুরু স্বামী বিবেকানন্দ, বিংশ-শতাব্দীর সভ্য-ভব্য নব-রুচিসম্পন্ন 'বাবুদের' সমক্ষে সেদিন প্রাণ খুলিয়া ঘোষণা করিয়া গেলেন, "এ ধারা পান করা মাত্র—লণ্ডন, প্যারী, রোম ও বার্লিনের ঐশ্বর্য্য, বিলাস, কর্ম্মপ্রবাহ, অগণিত জনস্রোত সবই যেন চক্ষুর সম্মুখ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেত।.........কেবল শুনতাম, স্বর-তরঙ্গিণী শিরায় শিরায় সঞ্চরণ করছেন, আর গর্জ্জে গর্জ্জে ডাকছেন,—"হর হর ব্যোম্ ব্যোম্।"

স্নানান্তে উপরে আসিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মন্দিরটি অতি সুশোভন। শুনিলাম, জয়পুরের মহামহিম মহারাজ-বাহাদুর আজ চারি বৎসর হইল, প্রায় তিন লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মন্দিরে বহু মূর্ত্তি বিরাজিত দেখিলাম। মধ্যস্থলে গঙ্গাদেবীর সুবর্ণ-প্রতিমা, তদ্দক্ষিণে ও বামে যথাক্রমে লক্ষ্মী ও যমুনাদেবীর শ্বেত ও কৃষ্ণ-প্রস্তরমূর্ত্তি; ইঁহাদের নীচে লক্ষ্মী-মূর্ত্তির দক্ষিণে জাহ্নবীর শ্বেতপ্রস্তরমূর্ত্তি, তৎপার্শ্বে রৌপ্যনির্ম্মিত সরস্বতী, তৎপার্শ্বেই অন্নপূর্ণা ও ভগীরথের কৃষ্ণপ্রস্তর-মূর্ত্তি, সকলেই যেন হাস্যবদনে শোভা পাইতেছেন।

যাত্রীরা সকলেই এখানে আনন্দগদ-গদচিত্ত। কি যেন দুর্লভ, পবিত্র ও মধুর বস্তু নিকটে পাইয়া তাহারা আপন আপন দেশ, আত্মীয়-স্বজন, মরতের শোকতাপ বিস্মৃতপ্রায়, একে একে এই বিশ্বপ্রকৃতির পর্ব্বতান্তরালে লুক্কায়িত স্বর্গের সৌন্দর্য্য-দুয়ারে 'ধর্ণা' দিয়া, শক্তি ও সামর্থ্যানুসারে শুধু বস্ত্র বা অর্থ দিয়া নহে, প্রাণ-মন পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছে না।

যথাশক্তি পূজা ও ব্রাহ্মণভোজনের দরুণ পাণ্ডাঠাকুরকে কথঞ্চিৎ দক্ষিণা প্রদান করিয়া আমরা এই গঙ্গোত্তরীর পবিত্র বারি আপন আপন হাঁড়া এনামেলের পাত্রে (জগে) সকলেই ভরিয়া লইলাম। ভগবান এই পাত্রের মুখ আঁটিয়া লইবার জন্য (গালার দ্বারা) একটি লোকের নিকটে দিয়া আসিল। বলা বাহুল্য, সে



গঙ্গা—মন্দিরের নিম্নে গঙ্গা প্রবাহিতা—গঙ্গোত্তরী

লোক এই কার্য্যে সেখানে প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতেই বেশ দু'পয়সা রোজগার করিয়া থাকে।

ধর্ম্মশালার অভাব নাই। একা কালীকমলীওয়ালারই সাতটি, জয়পুর রাজার একটি এবং রাজারাম ব্রহ্মচারীর একটি—সর্ব্বসমেত নয়টি ধর্ম্মশালায় বহু যাত্রীরই সমাবেশ হইতে পারে।

এখানে দুগ্ধ একবারেই দুষ্প্রাপ্য। দোকানে চাউল, আটা, ঘৃত, চিনি প্রভৃতি পাওয়া যায়, তবে চাউল আদৌ ভাল নহে। প্রতি সেরে আট আনা খরচ করিয়াও সে চাউলে অন্নের আস্বাদ পাই নাই। কেরোসিন তৈল প্রতি বোতল এগারো আনা মাত্র। এ তীর্থে যাত্রীর সংখ্যা নিতান্ত কম নহে, সুতরাং স্থানের গুরুত্ব হিসাবে এখানে যাত্রীদের সুখ-সুবিধার নিমিত্ত সরকারের তরফ হইতে ডাকঘরের ব্যবস্থা কেন হয় নাই, বুঝিলাম না।

আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত যমুনোত্তরী পথের সুরাটী যাত্রিদলের সহিত পুনরায় এখানে সাক্ষাৎ হইল। দলের কর্ত্তা-ব্যক্তি (নাম কালিদাস-দ্বারকাদাস) ধনবান, ধার্ম্মিক ও সদাশয় বলিয়াই মনে হইল। ইতিপূর্ব্বে তিনি "নাকুরী" নামক স্থানে "সোমেশ্বর" মন্দিরের মেরামত কার্য্যের জন্য এক শত টাকা এবং এইখানে ওপারে যাইবার এক পুল নির্ম্মাণকল্পে দুই শত টাকা দান করিয়াছেন শুনিলাম। ত্রিরাত্রি এ তীর্থে বাস করিয়া এক্ষণে অদ্যই আবার কেদার-বদরী উদ্দেশে যাত্রা করিতে কৃতসঙ্কল্প

* জলের গভীরতা ইহার বেশী নহে।

হইয়াছিলেন। যাত্রার পূর্ব্বে এবারে তাঁহার সহিত যথেষ্ট আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ পাওয়া গিয়াছিল। বিভিন্ন প্রদেশীয় হইলেও, স্ত্রীলোক সহ আমরা একসঙ্গে পাঁচ ধাম যাত্রার সহযাত্রী হইতে সাহস করিয়াছি, সংবাদে তিনি যথেষ্ট সাহস ও সহানুভূতি দেখাইয়া বলিলেন, "আপ লোঁগো কো ইস্ কঠিন যাত্রা মে বহুত হী তকলীফ্ উঠাওনা পড়েগা।" ভগবানের ইচ্ছা!

এই সুরাটী ভদ্রলোকের কথায় আমি বৈকালের দিকে এ দিন গঙ্গার ওপারের এক সাধু মহাত্মাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। সাধুটির নাম "কৃষ্ণাশ্রম"। "পাহাড়ী নঙ্গা বাবা" নামেই ইহার খ্যাতি।



তুষারপাতের পরের দৃশ্য—বামপার্শ্বে তুষারাবৃত গঙ্গামন্দির

দেখিলাম, কৃষ্ণকায় "গোল-গাল" আকৃতি, মহাদেবের মতই এই নির্জ্জন হিমপ্রদেশে উলঙ্গাবস্থায় বসিয়া আছেন। প্রণাম জানাইলে তাঁহার প্রসন্ন বদনে বালকের মতই হাসি ফুটিয়া উঠিল। কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম, ইনি মৌনব্রতধারী। সুতরাং বিরক্তির ভয়ে প্রথমতঃ তাঁহাকে বেশী কিছু জিজ্ঞাসার সাহস করি নাই। আকার-ইঙ্গিত ও প্রশ্নে যখন তাঁহার সন্তোষভাব পরিস্ফুট হইল, তখন তাঁহাকে লইয়া অনেক কথাই আলোচনা হইয়াছিল। কাশীতেই আমার উপস্থিত নিবাস জানিয়া তিনি আপনা হইতেই "কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের" কয়েকখানি নক্সা দেখাইয়া (হস্ত দ্বারা মাটীতে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে) বলিলেন, "কাশী হইতে মালব্যজী একবার আমাকে ভিত্তি স্থাপনের সময় ওখানে লইয়া গিয়াছিলেন; আবার সেখানে মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়েও হয় ত লইয়া যাইবেন, এইরূপ তাঁহার সহিত কথা হইয়াছে।" অধিকতর প্রসন্নচিত্তে তিনি অঙ্গুলী-সঙ্কেতে আমাকে নিকটস্থ একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের (মন্দিরাকারের) মধ্যে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। তাহাতেও মেঝের পরিবর্ত্তে তক্তাই বিছানো ছিল। তাহারই একখানি তক্তা উত্তোলন করত নিম্ন-দেশে বিস্তৃত এক ব্যাঘ্র-চর্ম্মাসন দেখাইয়া জানাইলেন, "আমার জপ-তপ-সাধনার জন্ম এই নির্জ্জন প্রকোষ্ঠ ও তন্মধ্যকার এই নিম্ন-প্রদেশের গুহা নির্ম্মিত হইয়াছে। কাশীর জনৈক ডেপুটী কলেক্টর (নাম "রামেশ্বর দয়াল") প্রায় ৪৫০৲ টাকা ব্যয়ে ইহা সম্প্রতি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।" ইহাতে তাঁহার কতই যে আনন্দ, তাহা তাঁহার সে সময়কার প্রসন্ন নেত্রযুগল দেখিয়াই স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হইল। উক্ত ডেপুটী মহোদয়ের ও মালবাজীর কয়েক-খানি চিঠিও সে সময়ে বাহির করিয়া আমাকে দেখাইলেন। সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি এই উলঙ্গ সাধুর নিঃসঙ্কোচে এরূপ অকপট ব্যবহার সে সময়ে আমাকে তাঁহার প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। এক যাত্রী তাহার ব্যাধির উপশম-মানসে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা জানাইল। তদুত্তরে তিনি কেবল তাঁহার উলঙ্গ দেহখানি দেখাইয়া সঙ্কেতে, তাঁহার নিকট যে কিছু নাই, এই ভাবেই প্রকাশ করিলেন, এবং উপরের দিকেই হাত জোড়পূর্ব্বক প্রার্থনা করিবার উপদেশ দিলেন। এ-কথা সে-কথার পর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, গোমুখী-ধারায় তিনি গিয়াছেন কি না? তদুত্তরে তিনি তিনবার সে ধারা দর্শনে গিয়াছেন জানিতে পারিলাম। ১৮ মাইল আগে তুষারের স্তূপ-মধ্য হইতেই এই পবিত্র ধারা নির্গত হইয়াছে, ইহা তিনি স্পষ্টতঃই প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন। গোমুখাকারে গুহার দর্শন তাঁহার চক্ষুতেও আদৌ পড়ে নাই এবং গোমুখ যে সেই ব্রহ্মলোকে, ইহাও তিনি ইঙ্গিতে না জানাইয়া থাকিতে পারিলেন না। দৈনন্দিন আহার সম্বন্ধেও তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসু হইলাম। তদুত্তরে তিনি বিলক্ষণ দুঃখ প্রকাশ করত পোড়া পেটের উপরে হাত দিয়া সহজ সরল ভাবেই ইঙ্গিত জানাইলেন, "সব জিনিষেরই পার পাইয়াছি, কিন্তু ইহার পার পাইতেছি না," এটুকু জানাইবার সঙ্গে সঙ্গে হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। কৃষ্ণকেশা জনৈকা বিধবার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করতঃ দেখাইয়া বলিলেন, "এই পোড়া পেটের জন্ম ইনিই আমার আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।"

নির্জ্জন গঙ্গোত্রীর উপকূলের এই উলঙ্গ সাধু মহাত্মার অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে বাদানুবাদ বা পরীক্ষার জন্ম আমার চিত্ত আদৌ সমুৎসুক ছিল না, তাই সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমি ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া, আবার এপারে ফিরিয়া আসিলাম।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সাহিত্যে হাস্যরস

১

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

বঙ্গদেশে বহুদিন হইতে একটা প্রবাদ আছে যে, মহাপণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ এবং বিদ্বান লোকদের মধ্যে যেন "বাহ্যজ্ঞান" ও বহির্জগতের সাধারণ অভিজ্ঞতা (common sense) কিছু কম হয়। এক জন নৈয়ায়িক পণ্ডিতের বাজারে যাইয়া গরু বিক্রয় করার চেষ্টা ও অবশেষে নিজের দোষে তাহা অবিক্রীত অবস্থায় বাড়ীতে ফিরাইয়া আনা—সে কাহিনী অনেকের মনে পড়িবে। পুরাকালে এক জন রাজা তাঁহার মন্ত্রীকে হুকুম করিলেন, "আমি ১০।১২ জন নেহাৎ মূর্খ লোক একত্রে দেখিতে চাই, তুমি শীঘ্র তাহাদের আন।" মন্ত্রী মহাশয় বিশেষ বিপদে পড়িলেন—কখনও কেহই স্বীকার করিতে চাহে না যে, সে মূর্খ। অনেক চিন্তা করিয়া তিনি শেষে ১০।১২ জন, অনেক প্রকার "তীর্থ"-সমন্বিত, বড় বড় পদবীধারী, পণ্ডিতদের ডাকিয়া আনিলেন এবং একটি ঘরে তাঁহাদের বাসস্থান স্থির করিয়া দিলেন। তাঁহারা ঘরে বসিয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন, রাজদর্শনের উৎকৃষ্ট সময় কি, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া তবেই রাজার সঙ্গে দেখা করিবেন। কতকগুলি পঞ্জিকা আসিল—কেহ জ্যোতিঃশাস্ত্রদীপিকা লইয়া বসিলেন—কেহ কেহ কাগজ-কলম আনাইয়া নিজের কোষ্ঠী-বিচার আরম্ভ করিলেন। প্রথমে তর্ক বাধিল—রাজদর্শন করিতে আসা—"বন্ধন" শ্রেণীর মধ্যে পড়ে কি না—"বন্ধন ভয়" না থাকিলে অথবা নক্ষত্র সমাবেশে এরূপ ফলাফল না হইলে—কেহ স্বেচ্ছায় রাজদরবারে আসিবে কেন অথবা আসিতে বাধ্য হইবে কেন? অথচ বিচারে তাহা পাওয়া যায় না। তার পর তর্ক উঠিল, চন্দ্রশুদ্ধি না হইলে কোন শুভকার্য হইতেই পারে না—অথচ যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের একত্র এক সময় চন্দ্রশুদ্ধি না হইলে তাঁহারা রাজদর্শনে যাইবেন কি প্রকারে? তাহাতে আবার বৃষ ও সিংহ লগ্নে, কেন্দ্র ও কোণে শুভগ্রহ, শুভতিথি হওয়াও দরকার। প্রত্যেকের রাশি নক্ষত্র লগ্ন সমান নহে। অনেক যুক্তি-তর্ক-গবেষণার পর স্থির হইল, রাত্রি ১।০ হইতে ২।০ পর্য্যন্ত যে "মাহেন্দ্র যোগ" আছে, তাহাতে সকলেরই এক রকম "শুদ্ধি" হইলেও হইতে পারে। তাহা স্থির হওয়ার পর রাত্রি ১।০টার সময় রাজা মহাশয়ের শয়নকক্ষের দেউড়ীর সম্মুখে সকলে উপস্থিত হইলেন ও রাজদর্শন কল্যাণে উপযুক্ত আশীর্ব্বচন ও শ্লোক উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। রাজা তখন ঘুমাইয়াছিলেন। তিনি চীৎকার শুনিয়া পাহারাদের ডাকিলেন ও পণ্ডিত মহাশয়দের তাড়াইয়া দিতে বলিলেন। তাঁহারা সকলে ক্ষুণ্ণমনে বিদায় হইলেন ও স্থির করিলেন, পঞ্জিকা কখনও ভুল হইতে পারে না, বরঞ্চ বাড়ী হইতে রওনা হওয়ার সময় "দিন" দেখিয়া আসিতে পারেন নাই এবং গণনার সময় দশমিক ভগ্নাংশ বাদ দেওয়াতে তাঁহাদের এরূপ দুরদৃষ্ট হইয়াছে। পরের দিন রাজা সভায় বসিয়া মন্ত্রী মহাশয়কে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "তুমি কোথা থেকে কতকগুলি বেকুব নির্ব্বোধ লোক ধ'রে এনেছিলে?" মন্ত্রী মহাশয় বলিলেন, "হুজুর, আপনার ত সে আদেশই ছিল।" রাজা তখন নিজের কথা স্মরণ করিয়া মন্ত্রী মহাশয়কে পুরস্কার দিলেন, পণ্ডিত মহাশয়দিগকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়া বিদায় করিলেন।

উপরি-উক্ত গল্প হইতে অনেকে মনে করিতে পারেন, আমি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের অযথা নিন্দা করিতেছি, সে জন্য এখানে আমি বলা আবশ্যক মনে করি যে, আধুনিক কালেও কয়েক জন ত্রিকালজ্ঞ মহাপণ্ডিতের দর্শনলাভ এ হতভাগ্য লেখকের ভাগ্যে ঘটিয়াছে—তাঁহাদের সহজ সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি গরিমা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা গল্পের পণ্ডিতগণের স্বভাব হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

প্রত্যেক দেশে ও প্রত্যেক সমাজে এমন অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের সরল নির্ব্বুদ্ধিতা (witless silly) নানা রকম রস-মধুর গল্পের উপাদান দিয়াছে। কবি কালিদাস "বরপুত্র" হওয়ার পূর্ব্বে কিরূপ বোকা ও বুদ্ধিহীন ছিলেন, তাহার অনেক কাহিনী আমরা এখনও শুনিতে পাই ও পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ অবস্থায় পড়িতে পাই। "উষ্ট্রে লুম্পতি রম্বা ষম্বা, তস্মৈ বিধত্তা নিবিড়নিতম্বা" এই উক্তি কালিদাসের নিজের লেখা কিম্বা তাঁহার সদ্যোবিবাহিতা স্ত্রীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ উক্তি কি না, সে সম্বন্ধে মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। কারণ, কালিদাসের পদ্যে আমরা এত রকম প্রবাদবচন পাইয়াছি যে, অন্য কবিদের পদ্যে তাহা ততটা নাই এবং "কিং ন করোতি বিধির্যদি তুষ্টঃ—কিং ন করোতি বিধির্যদি রুষ্টঃ" উপরি-উক্ত পদ্যের দুই চরণ এখন সকলেই প্রচলিত প্রবাদ-বাক্য মানিয়া লয়েন এবং কালিদাসের ভাষামাধুর্য্য ইহাতেও সমান আছে। তবুও রসপূর্ণ গল্পের মাধুর্য্য হিসাবে আমরা কবির মূর্খতার উদাহরণই শুনিতে পাই। কালিদাস নিজের Autobiography লিখিয়াছিলেন কি না, এখন তাহা জানা যায় না।

মহাপণ্ডিত নিউটন (যিনি আধুনিক বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্রের জন্মদাতা) একটি বড় ও একটি ছোট বিড়াল পুষিতেন। বড় বিড়ালের থাকিবার জন্য একটি বাক্স রাখিতেন। তাহার প্রবেশদ্বার বড় ছিল এবং ছোট বিড়ালের থাকিবার জন্য একটি ছোট বাক্স রাখিয়াছিলেন। তাহার প্রবেশদ্বার তদনুরূপ ছোট ছিল। ছোট বিড়ালটি সব সময় বড় বাক্সেই থাকিত—তাহা দেখিয়া তিনি মহা দুর্ভাবনায় পড়িয়া যান এবং সমস্যার মীমাংসা করিতে পারেন না, কি ভাবে এমনটি হইতে পারে। যিনি এত সব জটিল প্রশ্নের উত্তর ও মীমাংসা সহজে করিতে পারিয়াছিলেন, তিনি যে এই সামান্য সাধারণ তথ্যটি বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই, তাহা অবিশ্বাস্য মনে হইতে পারে, কিন্তু গল্প হিসাবে আমরা তাহা অবিশ্বাস করি না। কারণ, মহাপণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এমন এক এক সাধারণ ভুল করিয়া বসেন, যাহার কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ

অনেক সময় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যথা—প্রবীণ এক জন উকীলের গৃহে রাত্রিতে চোর প্রবেশ করিয়াছিল। বাড়ীর চাকর ও ছেলেরা সে চোরকে ধরিল। উকীল বাবু ঘুম হইতে উঠিয়া ব্যাপার দেখিলেন ও বলিয়া উঠিলেন, "আরে সর্ব্বনাশ করেছিস, শীগগির ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, wrongful confinement হবে যে,—পুলিস এসে ধরবে—তোরা ধরবি কেন?" তাঁহার আস্ফালনে বাড়ীর লোক চোর ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল, সকালে থানায় এজাহার দিতে উকীলবাবু নিজেই গেলেন।

এক জন খ্যাতনামা প্রফেসারের বড় ছেলের অসুখ হয়। ডাক্তারী ঔষধ খাওয়ানোর সময় ঔষধ এক দাগ ঢালিতে তুই দাগ ঔষধ পড়িয়া যায়, তাহা ছেলেকে খাওয়ানোর পর তাঁহার এ বিষয় লক্ষ্য হয়। তিনি তখন চীৎকার করিয়া বলেন, "ওরে, সর্ব্বনাশ করেছি—ডাক্তার ডাক্, ডাক্তার ডাক্,—এত ক'রে ঔষধের দাগ চেপে ধরলাম—তাও কি না তু'দাগ প'ড়ে গেল! হায়, হায়, ছেলে ত আর বাঁচিবে না," তাঁহার চীৎকার শুনিয়া বাড়ীর লোকরা সিভিল সার্জ্জেন হইতে আরম্ভ করিয়া যতগুলি ডাক্তারকে নিকটে পাইল, সকলকেই ডাকিয়া আনিয়া হাজির করিল। তিনি সকলকেই প্রশ্ন করিলেন, "দাগটা এত ক'রে চেপে ধরলাম, কিন্তু ঔষধ তু'দাগ পড়িল কি ভাবে?" সকলে ত হাসিয়া অস্থির। ছেলের অসুখ ত তখন মাথায় উঠিল—এত ডাক্তার দেখিয়া সে ত কাঁদিয়াই অস্থির। অতি কষ্টে তাহাকে শান্ত করা হইল। ডাক্তারপ্রবরগণ প্রফেসার বাবুর কথায় হাসিয়া ডবল ফিস্ আদায় করিয়াছিলেন কি না, তাহা বলিতে পারি না—তবে উচ্চশিক্ষিত প্রফেসার বাবুর এ ভুল সংশোধন হইতে অনেক দিন লাগিয়াছিল—ছেলের অবশ্য তেমন কিছু খারাপ ফল হয় নাই। (ঔষধ ভুল করিয়া দেওয়াতে যে মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়াছে, তাহা রহস্যজনক ব্যাপার নয়। সে রকম দৃষ্টান্ত বিরল নহে, তবে তাহা প্রকৃতই ভুল ও আকস্মিক দুর্ঘটনা)।

উপরি-উক্ত কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদাহরণস্বরূপ দেওয়া হইল, অনেকের জীবনেই এ রকম হাস্যজনক ছোট বড় ভুল সাধারণতঃ হইয়া থাকে। আলেকজান্দ্রা নগরের এক জন প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত Hirocles অনেকপ্রকার সাধারণ ভুলের তালিকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার সংগৃহীত তালিকা এখন আর পাওয়া যায় না। পুস্তকাকারে তাহা পরে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে অনেক আধুনিক জিনিষও সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। পুরাকালের রস-বোধ-কল্পনা হিসাবে এখানে কয়েকটি ভুল উদ্ধৃত করা হইল।

(১) এক জন জ্ঞানী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সমুদ্রযাত্রা করিতে গিয়া ঝড়-তুফানে জাহাজডুবীর মধ্যে পড়িয়াছিলেন। সকলেই হাল, মাস্তুল, দড়াদড়ি, তক্তার আশ্রয় লইল। তিনি আর কিছু না পাইয়া সেই জাহাজের নোঙ্গর (anchor) ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার অবস্থা কি হইল, গল্পে তাহার উল্লেখ নাই।

(২) এক জন বুদ্ধিমান্ তাঁহার বাড়ী বিক্রয় করিবেন স্থির করিলেন। খরিদদারদের নিকট বাড়ীর একখানি ইট দেখাইয়া তাহার দাম স্থির করিতে বলিলেন। সকলকে শুধু ইটখানাই দেখাইতেন।

(৩) এক জন মহাপণ্ডিতের একটি ঘোড়া ছিল—তাহার দানা খাওয়ানোর খরচ ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া ঘোড়ার খাওয়া কমাইতে আরম্ভ করিলেন। শেষে খাইতে না পাইয়া ঘোড়া মরিয়া গেল, তিনি সকলের কাছে দুঃখ করিয়া বলিলেন, "হায়, হায়, ঘোড়াটাকে যখন না খেয়ে বাঁচিয়া থাকিতে শিখাইলাম, তখনই সেটা মরিয়া গেল!" ("বামনের গরু, খাবে কম, দুধ দিবে বেশী," অনেকেই রাখিতে ইচ্ছা করেন)

(৪) এক পণ্ডিত নদী পার হওয়ার সময় ঘোড়াতে চড়িয়াই নৌকাতে উঠিলেন। অন্যান্য আরোহিগণ জিজ্ঞাসা করিল, তিনি এরূপ কেন করিলেন? উত্তরে তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমার বড় তাড়াতাড়ি—শীগ্‌গির যেতে হবে।"

(কেহ কেহ সব সময় ছাতা মাথায় দিয়া রাস্তায় চলেন, জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "কি জানি, বাবা, ভূমিকম্পে তলিয়ে যাব।" কেহ কেহ সম্বৎসর আলোয়ান ও সোয়েটার গায়ে দিয়া থাকেন, কেহ কেহ সম্বৎসর স্নান করেন না। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা অনেক রকম হাস্যকর যুক্তি দেখান, শুনিতে পাওয়া যায়। একটি ডোবা দেখিয়া, ম্যালেরিয়ার ভয়ে, এক জন সিভিল সার্জ্জন (মহা-পণ্ডিত ডাক্তার) কোন একটি মফঃস্বল সহরে কোনমতে বাস করিতে পারিলেন না, তাহা অনেকেরই জানা থাকিতে পারে। এ সব শ্রেণীর লোকদের Faddist নাম দেওয়া হয়—আধুনিক হাস্যরসময় চরিত্রের বিশিষ্টতা।

এইরূপ আরও অনেকপ্রকার "চুটকি" গল্পের উল্লেখ করা যাইতে পারে। Hirocles যে সব গল্পেরই স্রষ্টিকর্ত্তা, তাহা বলিতে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তবু সহজেই দেখা যায় যে, পুরাকালের হাস্যরস-বোধের সঙ্গে আধুনিক সময়ের রসবোধ বিশেষ পৃথক্ নয়।

অবোধ অশিক্ষিত সরল লোকদের (Simpleton) বুদ্ধিহীনতা ও জ্ঞানশূন্যতা অনেক সমাজেই একটা উল্লেখযোগ্য হাস্যকর জিনিষ হইয়া আসিয়াছে। গাছে বসিয়া যে ডালে বসিয়াছে, সেই ডাল কুড়ালী দ্বারা কাটিতে যাওয়া—এরূপ একটি গল্পের উল্লেখ কবি কালিদাসের প্রথম জীবনে পাওয়া যায় এবং দাঁতে লাল সূতা আটকাইয়াছে দেখিয়া একটি জোলা মরিয়া গিয়াছে মনে করে ও সেই বিশ্বাসে কবরে প্রবেশ করে, এরূপ কাহিনীও প্রচলিত শুনিতে পাওয়া যায়। Æsop's Fab e-এ নির্ব্বুদ্ধিতার গল্প অনেক আছে এবং কথাসরিৎসাগর, বেতালপঞ্চবিংশতি ইত্যাদি পুস্তকে এ রকম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পারস্য দেশের উপকথার মধ্যে একটি গল্প পাওয়া যায়, তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য মনে হয়।

এক জন বলিষ্ঠ ব্যায়ামপ্রিয় লোক পাড়াগাঁয়ে বনে-জঙ্গলে সময় কাটাইত। বাড়ীতে সকলে ভর্ৎসনা করাতে সে মনে স্থির করিল, সহরে যাইয়া সে খাটিয়া খাইবে। সহরের নিকটে আসিয়া বেশী লোকজন দেখিয়া তাহার মনে মহা দুর্ভাবনা হইল, সে ইহাদের মধ্যে থাকিলে নিশ্চয় হারাইয়া যাইবে। অনেক চিন্তা করিয়া সে তাহার এক পায়ে একটি কুমড়া বাঁধিল। তাহা লইয়া চলাফেরা করিতে লাগিল। একটি বাড়ীতে প্রথম রাত্রিতে সে আশ্রয় লইল। খাওয়া-দাওয়ার পর নির্দ্দিষ্ট স্থানে শুইয়া ঘুমাইল। গৃহস্বামী মনে করিল, ব্যায়াম-বীর নিশ্চয় কুমড়ার মধ্যে তাহার ধনসম্পত্তি রাখিয়াছে। সে তাহার পা হইতে কুমড়া খুলিয়া নিজের পায়ে তাহা বাঁধিল ও বলিষ্ঠ লোকটির কাছে শুইয়া ঘুমাইল। সকালে উঠিয়া সে অন্যের পায়ে নিজের কুমড়া দেখিয়া অবাক হইয়া গেল ও জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ হে, তুমি যদি তুমি হও, তবে তোমার পায়ে কুমড়া গেল কি ভাবে? আর তুমি যদি আমি হই, তবে আমার পায়ে কুমড়া নাই কেন?

এ সমস্যার মীমাংসা কেহই করিতে পারিল না। আর একটি গল্পও পারস্যদেশ হইতে আমরা পাইয়াছি।

এক জন বড়লোকের ইচ্ছা হয় যে, মৃত্যুর পর তাঁহাকে যে স্থানে যে ভাবে কবর দিবে, তাহা তিনি স্থির করিয়া যাইবেন। আত্মীয়-কুটুম্বদের ডাকিয়া স্থান নির্ব্বাচন করিতে চেষ্টা করিলেন। একটি স্থান সকলে মনোনীত করিলেন, কিন্তু তিনি বলিলেন, "স্থানটি বড় অস্বাস্থ্যকর, আমার পছন্দ হয় না।"

অনেকে হয় ত বলিবেন, উপরি-উক্ত গল্পগুলিতে অতিরঞ্জন ও অতিশয় উক্তি যাহা আছে, তাহা যেন বিশ্বাস্য নয়। কিন্তু আধুনিক সময়েও এরূপ Humour-এর নিদর্শন কিছু পাওয়া যায়। আয়ার-ল্যাণ্ডের কতকগুলি সাধারণ গল্প বহু পুরাকাল হইতে প্রচলিত আছে। তাহা যেন আধুনিক সময়েও সমান প্রযুজ্য। (সে দেশে যেন unconscious Humour কিছু বেশী। Scotchmanদের Humour যেন কিছু কম)।

এক জন ধনী লোক ভাল মদ একটি "পিপে" (Barrel) বোঝাই করিয়া তাহার মুখ তালা-চাবা দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়া-ছিলেন। তাঁহার চাকরগণ সে "পিপার" তলদেশে একটি ফুটো করিয়া মদ চুরি করিয়া খাইত। তিনি প্রায়ই দেখিতেন যে, শীলমোহর ঠিক আছে, অথচ মদ কমিয়া যাইতেছে। এক জন বন্ধুকে এ বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন এবং বন্ধু বলিল যে, নিশ্চয় তলে একটা ফুটো আছে। বিস্মিত হইয়া ধনী লোকটি বন্ধুকে বলিলেন, "তা কেমন ক'রে হ'তে পারে? মদ যে ক'মে যাচ্ছে উপর দিক্ থেকে?"

এক জন বিদ্বান্ পণ্ডিত লোককে তাহার বন্ধু একটি ক্রীতদাস উপহার দিয়াছিল। কয়েক দিন পর সে ক্রীতদাস হঠাৎ মরিয়া যায়। পণ্ডিত বন্ধুর কাছে দুঃখ করাতে, বন্ধু বলিয়া উঠিল, "সে কি কথা? আমার কাছে সে এত দিন ছিল, কৈ, এমন চালাকি ত সে কোন দিন করে নাই?"

এই প্রসঙ্গে কথামঞ্জরী হইতে একটি গল্পও উদ্ধৃত করা যায়। একটি চোর নারিকেলগাছ হইতে নারিকেল চুরি করিতেছিল। বাগানের মালিক আসিয়া তাহাকে ধরে ও জিজ্ঞাসা করে, সে কি করিতেছে? চোর বেগতিক দেখিয়া বলে, আমি ও আমার ভাই দেখতে এসেছিলাম—গরুর ঘাস এখানে পাওয়া যায় কি না? বাগানের মালিক চোরকে বলিল, "হতভাগা, আর যায়গা পাও নাই? গাছের মাথায় ঘাস খুঁজতে এসেছ?" চোর অম্লানবদনে উত্তর করিল, "হাঁ, ঘাস না পেয়েই ত আমি এখন নেমে আসছি—আর আপনি ধরেছেন।"

পারস্য দেশ হইতে পাওয়া একটি পুরাতন গল্প বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্নভাবে প্রকাশ করিয়া বলা হয়। এক জনের শাক-সবজীর জমীতে একটি মজুর নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সে গাছগুলিতে নিয়মিত জল দিত। এক দিন সে মজুর শাক চুরি করিয়া একটি ধামাতে বোঝাই করিতেছিল, এমন সময় মালিক আসিয়া তাহাকে ধরে। তখন তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কথোপকথন হয়।

মালিক। এ কি হচ্ছে তোমার এখানে?

মজুর। আজ্ঞা, গাছে জল দিচ্ছিলাম। গোড়া তুলে দেখছিলাম, গোড়ায় জল গিয়েছে কি না?

মালিক। তবে ধামার মধ্যে এগুলি এলো কেমন ক'রে?

মজুর। আজ্ঞা, আমি ত তাই ভাবছি, কি ক'রে এগুলি ধামার মধ্যে এলো?

আর এক রকম প্রশ্নোত্তর যথা—

মালিক। এ কি হচ্ছে তোমার এখানে?

মজুর। আজ্ঞা, বড় ঝড় উঠেছে, তুফানে আমি এখানে ছুটকে এসেছি।

মালিক। তা যেন হ'লো, গাছ উপড়ালো কে?

মজুর। আজ্ঞা, ঝড়ে উড়ে যাওয়ার ভয়ে গাছের গোড়া চেপে ধরেছিলাম। কিন্তু গোড়া কম পোক্ত ব'লে আপনি উঠে এসেছে।

মালিক। ঝুড়িতে গেল কেমন ক'রে?

মজুর। আজ্ঞা, আমিও ত ব'সে ব'সে তাই ভাবছি।

এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেকেরই মনে পড়িবে। শুধু মজলিশি গল্প যে পুস্তকে লিখিত ছিল, তাহা বলা উচিত হইবে না। কারণ, পুরাকালের কবিদের পদ্যেও এরূপ হাস্যরস পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটির অনুবাদ দেওয়া হইল।

(১) মশা পায়ে কামড়ায় দেখিয়া বিদ্বান্,
দাপ মিলাইয়া কহে, "দেখিতে পারিবে না যে
কাছে তুমি কেমনে হবে আগুয়ান।"

(২) ক্ষুধা তব প্রেম চির দিবে করি দূর
অথবা সময় আসি করিবে সংহার।
তাহাতে প্রেম যদি নাও ছাড়ে স্থর
লইও কলসী দড়ি জলেতে গঙ্গার॥

(৩) পুত্রকে ব্যাকরণ পড়িতে শুনিয়া, এক জন চিকিৎসক বলিয়াছিলেন,—

"পড়া তব ব্যর্থ পুত্র, চেষ্টা অকারণ,
মোর হাতে কত লোক, স্বেচ্ছায় গিয়াছে নরক,
জানি না আমি ত কভু, কিবা ব্যাকরণ॥

[Cf. মযা ন পঠিতা চর্চা, ত্বয়া নাপি চিকিৎসিতম্।
অকস্মাৎ নগরে ভ্রাতঃ কথং ধূমায়তে চিতা॥]
(নৈয়ায়িক পণ্ডিত ও চিকিৎসকের মধ্যে রহস্যালাপ)

পুরাকালের বৈদেশিক-সাহিত্য হইতে উপরি-উক্ত কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, হাস্যরস বিচার করিতে দেশ ও কাল ধরিয়া পার্থক্য করা যায় না। শ্রোতা অথবা পাত্র-হিসাবে পার্থক্য কিছু হয় ত থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা যেন চির-নূতন ও চির-আমোদজনক। পুরাকালের লিখিত ও প্রাপ্ত সংস্কৃত সাহিত্যের কথা সামান্য উল্লেখ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ অনেক সামগ্রী আমরা যেন এখন হারাইয়া ফেলিয়াছি। কবি কালিদাসের নাম বোধ হয় বেশী প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার লিখিত কাব্যগুলি হইতে শুধু কয়েকটি প্রবাদবাক্য (wits) এখানে উল্লেখ করিলাম।

"উদ্বাহুরিব বামনঃ"—বামন হয়ে চাঁদে হাত

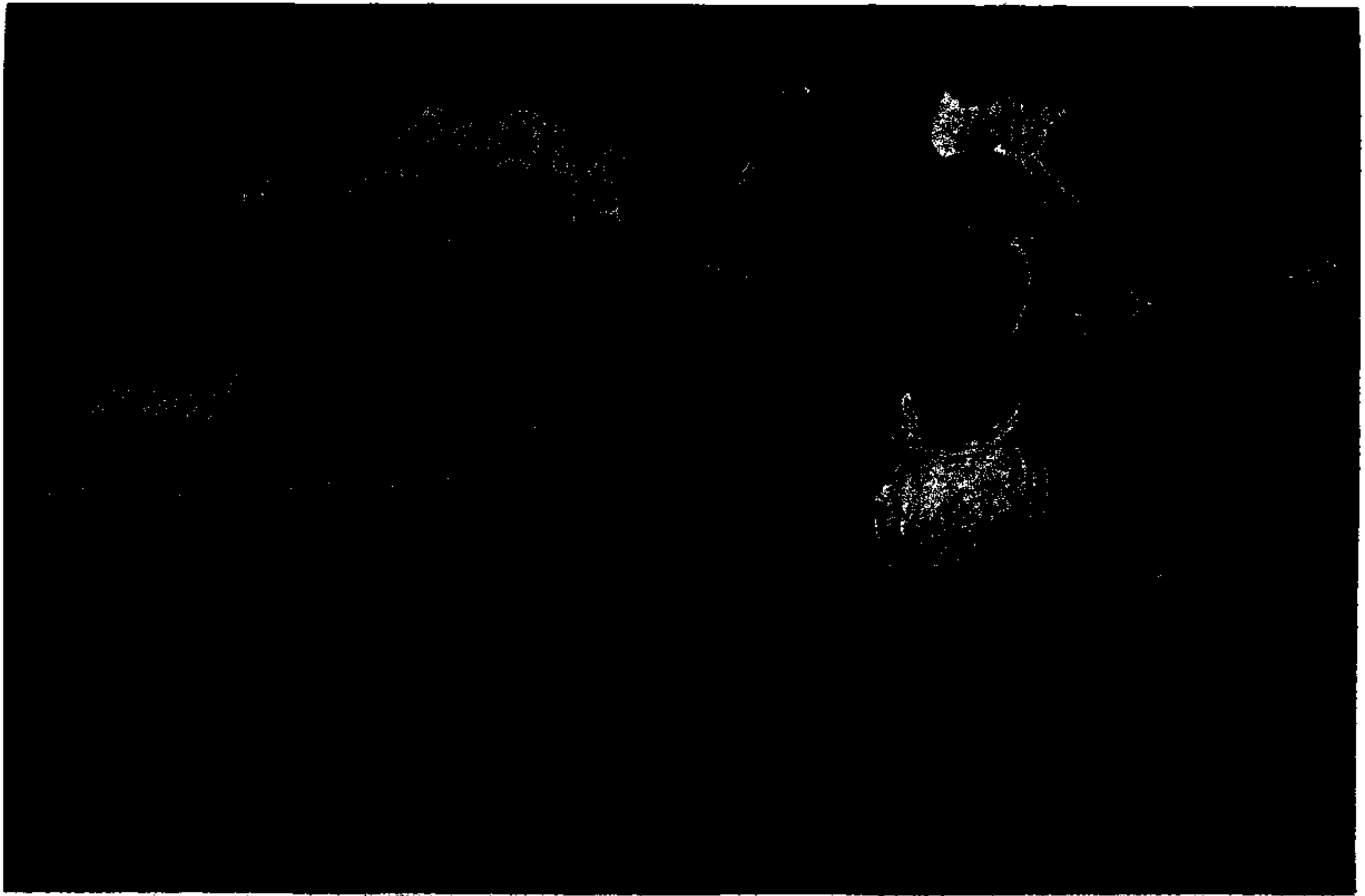
"ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলীভবন্তি"—

A stitch in time saves nine

"নহি সুখং দুঃখৈর্ব্বিনা লভ্যতে"—দুখ বিনা সুখ কোথা?

"যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা"—
ছোট লোকের খোসামুদি করা অপেক্ষা
বড়লোকের তাড়া খাওয়া অনেক ভাল।

"গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং জাতং"—"গোদের উপর বিষ-ফোড়া"।



বসুমতী-চিত্র-বিভাগ] জীবন-সাথী [শিল্পী—শ্রীভূপতিনাথ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকে শিকার-শ্রান্ত মাধব্য এবং রাজা দুষ্মন্তের কথোপকথন satire-এর দৃষ্টান্ত বলা যায়। বাহুল্যভয়ে বেশী উল্লেখ করিলাম না।

সংস্কৃত সাহিত্যে কোন এক অজ্ঞাত গ্রন্থকারের একটি পুরাতন গল্প পড়িয়াছিলাম, তাহা এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি। (পুস্তকখানির নাম ছিল "সংসার-সাগর-মন্থন")

ব্রহ্মা এক দিন বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকিয়া মানব সৃষ্টি করিতে বলিলেন। অনেক চিন্তা ও পরিশ্রমের পর বিশ্বকর্ম্মা একটি পুরুষ-দেহ তৈয়ারী করিলেন কিন্তু তাহাতেই তাঁহার সব বিদ্যাবুদ্ধি মালমশলা ফুরাইয়া গেল। ব্রহ্মা তাহা দেখিয়া বলিলেন, "এ কি হয়েছে?" "প্রকৃতি" ভিন্ন "পুরুষ" একা কি বাঁচিতে পারে?" বিশ্বকর্ম্মা মহাদুর্ভাবনাতে পড়িলেন। তিনি "প্রকৃতি"র অর্থ সম্যক্ বুঝিতে পারিলেন না। অনেক মাথা ঘামাইয়া প্রকৃতি হইতে নিম্নলিখিত জিনিষগুলি সংগ্রহ করিলেন :—

চন্দ্র হইতে গোল আকৃতি ও শুভ্র-জোৎস্না (পূর্ণিমা ও অমাবস্যা দুইই), লতাগুল্ম হইতে "নুইয়া পড়া" ও "আঁকড়াইয়া ধরা" ভাব, লম্বা ও ছোট ঘাসের ঈষৎ আন্দোলন, পুষ্প হইতে সৌরভ ও সৌন্দর্য্য, পত্রগুচ্ছের লঘুভাব, বালসূর্য্যের স্নিগ্ধ আলো, হাতীর শুঁড় হইতে ক্রমশঃ সরু অবস্থা, হরিণদের সকৌতুক দৃষ্টি, পদ্মপত্রের জল হইতে টলমলভাব, মেঘ হইতে অশ্রু বর্ষণ, বাতাসের ইতস্ততঃ গতি, মরালের হাঁটার পদ্ধতি, শশকের ব্যস্ততা, সজারুর নৃত্য ও অহঙ্কার, শুক পাখীর বক্ষের নরম স্পর্শ, ব্যাঘ্রের হিংস্রতা, পাষাণের দৃঢ়তা, নদীর কমনীয়তা, বকের ধার্ম্মিকতা, পায়রার কুজন ও প্রেমসম্ভাষণ, আগুনের দাহিকাশক্তি, বরফের শীতলতা, ফলের মিষ্টতা ও তিক্ততা, চপচাখীর একাগ্রতা এবং মৌচাকের মিষ্টত্ব (এবং বোধ হয় ওষ্ঠ ফুটান) ভরানদীর যৌবন।

এই সব পদার্থ একত্র mixture করিয়া বিশ্বকর্ম্মা একটি "নারী" সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মা তাহাদিগকে "প্রাণ" দিলেন ও স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে বিচরণ করিতে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সপ্তাহখানেক উভয়ে বসবাস করার পর, পুরুষ আসিয়া ব্রহ্মাকে বলিল,—

"দেব, আপনি আমাকে যে সঙ্গী দিয়েছেন, তাহার জ্বালায় প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে গেল। সে দিন-রাত্রি শুধু আমাকে শ্লেষ-বিদ্রূপ করে, সঙ্গ ছাড়ে না, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তার এটা চাই, ওটা চাই—না দিলেই কেঁদে অনর্থ বাধায়। কোন কাযকর্ম্ম করে না, শুধু আমার ওপর তম্বী ও ফরমায়েস হুকুম—আমি আর পারি না—আপনার জিনিষ ফিরিয়ে নিন।"

ব্রহ্মার আদেশমত বিশ্বকর্ম্মা নারীকে যমালয়ে লুকাইয়া রাখিলেন। পুনরায় এক সপ্তাহ পরে পুরুষ ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইল ও বলিল,—

"দেব, আমি দেখছি "নারী"কে তাড়িয়ে দিয়ে মহা বিপদে পড়েছি। একা নিঃসঙ্গ হয়ে আর আমি থাকিতে পারি না। সে যখন কাছে ছিল, তখন সে নাচিত, গাহিত, অপাঙ্গদৃষ্টিতে আমাকে মুগ্ধ করিত, খেলা করিত, আমার কতভাবে মনোরঞ্জন করিত। তাহার হাসি, স্পর্শ, আলাপ আমাকে যেন পাগল করিত। প্রার্থনা করি, আমার জীবনসঙ্গিনীকে ফিরিয়ে দেন।"

ব্রহ্মা তথাস্তু বলিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে আদেশ করিলেন। তিনি যমালয় হইতে নারীকে আনিয়া পুরুষকে দিলেন। ৩।৪ দিন যাইতে না যাইতে পুরুষ পুনরায় ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইল ও বলিল, "দেব, ক্ষমা করিবেন, আমি বুঝি না, আপনি নারীকে আমার কাছে দেওয়াতে আমার ভাল হয়েছে কি খারাপ হয়েছে, সে যে আমাকে কষ্ট বেশী দেয়, না, বেশী সুখী করে, তাহা যেন বুঝিতে পারি না। কষ্টটাই যেন বেশী প্রাণান্তকর মনে হয়।"

ব্রহ্মা আর তাহাকে বেশী কথা বলিতে দিলেন না এবং বলিলেন, "যাও, যাও, রোজ রোজ তোমার এ সব আবদার ও কাজলামি শুনিতে ভাল লাগে না। যা দিয়েছি, তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাক, পরস্পর পরস্পরকে মানিয়ে নিয়ে বসবাস করো।"

পুরুষ বলিয়া উঠিল, "দেব, কিন্তু আর ত আমি তার সঙ্গে পেরে উঠি না। বাস করিতে দেয় কৈ? দোহাই আপনার "

ব্রহ্মা বলিয়া উঠিলেন, "তাকে ছেড়েই বা তুমি বাঁচ কই?"

পুরুষ হতাশ হইয়া বলিল, "সেই ত মহাসমস্যা। ছেড়েও থাকতে পারি না, অথচ থাক্‌লে দেখছি বাঁচি না।"

ব্রহ্মার কাছে নালিশ করার জন্য, নারীর কাছে পুরুষ কি জবাব দিয়াছিল ও শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহা মান্ধাতার সময় হইতে এ পর্য্যন্ত পুরুষ অনেকভাবেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া আসিতেছে। বাধ্য হইয়া তাহার আধিপত্য মানিয়া লইয়াছে।

পঞ্চতন্ত্র এবং বিষ্ণুশর্ম্মার বিখ্যাত গল্পে বাঘ, শৃগাল, মার্জ্জার বায়স প্রভৃতি পশুপক্ষীদের মুখে অনেক সরস গল্পের আখ্যান দেওয়া আছে। অল্প আয়াসে সকলেই তাহা জানিতে পারেন। সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায়, কাব্য, দর্শন, ব্যাকরণ, ন্যায়, স্মৃতি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাপ্রদ মনোরম জিনিস যখন ক্রমশঃ গ্রন্থাকারে (হাতের লেখা পুঁথি) লিপিবদ্ধ হইতেছিল, তখন আর এক শ্রেণীর হাস্যরসাত্মক সাহিত্য ক্রমশঃ আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল। ঐতিহাসিক যুগ অথবা সময় নির্দ্ধারণ করা যায় না। উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহা এখন "উদ্ভট কবিতা" নামে পরিচিত। বঙ্গসাহিত্যেও এই শ্রেণীর কবিতা সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। উদ্ভট কবিতাকে ইংরাজী Epigramne Accrostic শ্রেণীতে ধরা যাইতে পারে। বৈদেশিক সাহিত্য হইতে তাহাদের স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ পৃথক্। নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে তাহাদিগকে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) প্রশ্নোত্তরমালা—যে কথা বলা হয়, তাহার মধ্যে প্রশ্ন এবং উত্তর একসঙ্গেই আছে, যথা,—

"কং বলবন্তং ন বাধতে শীতং"
"কা শীতলবাহিনী গঙ্গা"
"বয়ো গতে কিং বনিতাভিলাষৈঃ" ইত্যাদি।

"রবেঃ কবেঃ কিং সমরস্য সারং
কৃষের্ভয়ঃ কিং কিমদন্তি ভৃঙ্গাঃ।
সদা ভয়ঞ্চাপ্যভয়ঞ্চ কেষাং
ভাগীরথীতীরসমাশ্রিতানাম্।"

"কো ভাতি ভালে বরবর্ণিনীনাং
কা রৌতি দীনা মধুযামিনীষু।
কস্মিন্ বিধত্তে শশিনং মহেশঃ
সিন্দূরবিন্দুর্বিধবাললাটে।"

"কো বেত্তি গুপ্তস্য রসস্য ভাণ্ডং
মেঘাগমে কিং কুরুতে ময়ূরঃ।
সাধ্বী স্ত্রিয়ঃ কুত্র তনুস্ত্যজন্তি
পিপীলিকা নৃত্যতি বহ্নিকুণ্ডে॥"

ইত্যাদি।

(২) ব্যাজস্তুতি - ব্যঙ্গোক্তি, (Damning with faint praise) দ্ব্যর্থবোধক কথা দ্বারা বিষয় বর্ণনা, যথা

৺পুরীধামের জগন্নাথদেবের দারুময় মূর্ত্তি কেন হইয়াছে এই প্রশ্নের উত্তর -

"একা ভার্য্যা প্রকৃতিমুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া
পুত্রোঽপ্যেকো ভুবনবিজয়ী মন্মথো দুর্নিবারঃ।
শেষঃ শয্যা শয়নমুদধৌ বাহনং পন্নগারিঃ
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং দারুভূতো মুরারিঃ॥"

(এ রকম সাংসারিক জীবন হইলে সকলেই "কাঠ" হয়ে যেতে হয়)

যাঁহারা সর্ব্বদা দেবসেবা করেন ও লক্ষ্মীপূজা করেন, (পুরোহিত-বংশ) তাঁহারা কেন সাধারণতঃ দরিদ্র হন, সে সম্বন্ধেও একটি মনোরম কবিতা আছে।

এইখানে, বঙ্গভাষাতে যে দ্ব্যর্থবোধক কবিতা আছে, তাহার একটি উল্লেখযোগ্য মনে করি। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গলে অন্নপূর্ণা কর্ত্তৃক শিবের পরিচয়

ঈশ্বরীকে পরিচয় করেন ঈশ্বরী
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি।
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী।
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত।
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম।
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনই
জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি।
ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে।
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই
যে মোরে আপনা ভাবে তারই ঘরে যাই।"

বাহুল্যভয়ে বেশী উদ্ধৃত করিলাম না।

(৩) পদ্যের চারি পংক্তি একই রকম ভাষা, কিন্তু প্রত্যেক চরণের অর্থ অন্য রকমের। কিম্বা পদ্যের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িতে যেমন, শেষ হইতে প্রথম পর্য্যন্ত পড়িতে তেমনই। একটি অক্ষরের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিয়া অনুপ্রাস-সম্বলিত পদ্য, (শিবের স্তব, অর্চ্চনা, আরাধনা ইত্যাদি)। "অ"-ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ বাদ দিয়া পদ্য লেখা ("দশরথতনয় হতদশবদন") এইপ্রকার বিভিন্ন রকমের কসরৎ (gymnastic) দেখিতে পাওয়া যায়।

(বঙ্গভাষাতে "নবরচরণ-নমসকরণ" গল্প হাস্যরসাত্মক বলিয়া অনেকেই জানেন)

(৪) ন্যায়শাস্ত্রের "ঘটত্বপটত্ব" বিচার—মহাপণ্ডিতদের বিচার-বুদ্ধি প্রশংসার বিষয়। আমরা এখন তাহা হাস্যকর মনে করি, কিন্তু সে সব পণ্ডিত-সভার আলোচনা এবং মীমাংসা হইতে আমরা যে কয়েকটি ন্যায় পাইয়াছি, তাহা বাস্তবজীবনে অনেক সময় সাধারণ সমস্যারূপে প্রায় প্রত্যেকের জীবনেই কোন না কোন সময় দেখা দেয়। (অন্ধকুব্জ ন্যায়, বকাণ্ডপ্রত্যাশা ন্যায়, কাকতালীয় ন্যায়, সূচীকটাহ ন্যায়, অন্ধবৃক্ষন্যায় ইত্যাদি) বিষয়গুলি বিশেষ জটিল এবং আদৌ হাস্যরসাত্মক নহে, তবে আমরা এখন তাহাদিগকে শ্লেষ, বিদ্রূপ ও হাস্যমাত্রার বিষয় করিয়া তুলিয়াছি সে জন্য ইহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক নয়।

সংস্কৃত সাহিত্যে এমন কোন পুস্তক নাই, যাহাতে উপরি-উক্ত উদ্ভট-সাহিত্যের কোন না কোন একটি প্রকরণ দেখা যায়। ভক্তি-কাব্যেই বোধ হয় ইহা বেশী পাওয়া যায়। কালিদাসের গ্রন্থাবলীতেও দৃষ্টান্ত কম নাই। Glorifed imagination হাস্যরসের একটি অঙ্গ, তাহা উচ্চস্তরের বলিয়া সাধারণ লোক তাহাতে হাসি-উদ্রেককারক কিছু হয় ত পান না। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট-সাগর বঙ্গভাষায় উদ্ভটকবিতা সংগ্রহ করিয়া যে পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা উপভোগ্য অনেক জিনিষ পাই। কাব্য ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে বলা যায় যে, সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার মধ্যে এত প্রকার নিকট সম্বন্ধ ও সৌসাদৃশ্য আছে যে, অনেকে বলিয়া থাকেন, বঙ্গভাষা দেবভাষা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। এই মত-বাদের বিরুদ্ধে ও স্বপক্ষে যুক্তিতর্ক যেরূপ হইয়া থাকুক না কেন, সাহিত্য হিসাবে বঙ্গভাষার ভিত্তি যে সংস্কৃতের উপর বেশী নির্ভর করিয়া আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। উদ্ভট কবিতা সম্বন্ধে বঙ্গভাষাতে সংস্কৃত অপেক্ষা আর একটি বিষয় ক্রমশঃ স্থান পাইয়া-ছিল, তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইহাকে "পাদপূরণ-সমস্যা" বলা হইয়া থাকে। এক জন একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করিলেন, পদ্যে তাহার উত্তর দিতে হইবে। "গরুতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর" "হনুমান পুড়াইল লঙ্কা, কেঁদে ম'ল বিভীষণ" ইত্যাদি প্রশ্নোত্তরের কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দের পুস্তকে তাহা অশেষ কষ্টসাধ্য করিয়া, সংগ্রহ করা আছে। বিশেষভাবে উল্লেখ অনাবশ্যক। ইহা যেন হেঁয়ালী, Riddles, ধরণের বলা যায়। রসিকশেখর দীনবন্ধু মিত্রের লিখিত "চীনা জোঁকে কামড়াইলে তুরতুরাইয়া নাচে" রাম-মাণিক্যের প্রশ্নের কথা মনে হইবে।

সংস্কৃত ভাষাতেও অর্থশূন্য কথাসমষ্টি অথবা আপাত-দৃষ্টিতে অসম্ভব ঘটনাব্যঞ্জক কবিতা মধ্যযুগে হাস্যরসের সামগ্রী হইয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে :—

"হতো হনুমতা রামঃ সীতা হর্ষমুপাগতা।
রুদন্তি রাক্ষসাঃ সর্ব্বে হাহারাম হতাহতাঃ॥"
"কেশবং পতিতং দৃষ্ট্বা দ্রোণ হর্ষমুপাগতা।
রুদন্তি পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে হা কেশব হা কেশব॥"

আধুনিক যুগে সংস্কৃত ভাষা বিকৃত করিয়া একটি পদ্য রচনা করা হইয়াছে—যাহাতে অক্ষর ও ছন্দ মিল ভিন্ন কোন অর্থই বাহির করা যায় না।

হবর্ত্তাবা কহিপ্তাসা টজেগেন শকে ভূ এ।
আপ্তিই ব অগুক্রেন ম্যাসটষ্ট্রে সীবাঙ্গণ ॥

(উল্টা দিক হইতে পড়িলে কি হয় পাঠক দেখিতে পারেন, অথচ ইহা অর্থশূন্য সংস্কৃত পদ্য)

সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা একটি বিশেষ জিনিষ দেখিতে পাই, যাহার অনুরূপ অন্য সাহিত্যে ততটা পাওয়া যায় না। ইহা শিক্ষাবিষয়ক পরিকল্পনা বলা যাইতে পারে। পঞ্চতন্ত্র, ভট্টিকাব্য প্রভৃতি পুস্তক, রাজপুত্রদের সব রকম ব্যাকরণ, কাব্য ও সাধারণ জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য রচনা করা হইয়াছিল। সে ইতিহাস এখন সর্ব্বজন-বিদিত। ইহা ভিন্ন শ্রুতিবোধ, ধাতুরূপ, অমরকোষ প্রভৃতি পদ্য-গ্রন্থের কথা উল্লেখযোগ্য। যে ছন্দ যেরূপ আকৃতি-বিশিষ্ট, তাহা সেই পদ্যেই লেখা আছে—

স্যাদিন্দ্রবজ্রা যদি তৌজগৌ গঃ"

"ন ন ম য য যুতেয়ং মালিনী ভোগী লোকৈ" ইত্যাদি।

কোন্ ধাতুর কোন্ অর্থে কিরূপ আকৃতি ধারণ করিবে, তাহা পদ্যে লেখা আছে—যেমন "ধুনাতি চম্পকবনং ধুনোত্যশোকং" ইত্যাদি। আবার একটি কথার কত রকম অর্থ হইতে পারে, তাহা পদ্যে লেখা আছে—যেমন "নিশা নিশীথিনী রাত্রিস্ত্রিযামা ক্ষণদা ক্ষপা" "বাক্‌ ব্রাহ্মী তু ভারতী ভাষা গীর্বাক্ বাণী সরস্বতী" ইত্যাদি। শিক্ষা-বিষয়ক এ সব পদ্ধতিতে হাস্যরসের সামগ্রী বিশেষ কিছু আছে বলা যায় না। তবে ছোট ছেলেদের মনোরঞ্জন করার জন্য এই সব "Glorified methods" সাহিত্যে একটা বিশেষ সম্পত্তি এবং ইহা হাস্যরসের একটি পরিমার্জ্জিত উচ্চ অঙ্গ বলিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন। শুভঙ্করের আর্য্যা এই পদ্ধতিতে লিখিত। (Lullaby literature)

মধ্যযুগের কথা বলিতে গেলে সর্ব্বপ্রথম আরব্যোপন্যাসের কথাই মনে পড়ে। তাহাতে পুরাকালের গল্প ও ইতিহাস এবং সভ্যতার নিদর্শন প্রথম গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ তাহাতে আরও অনেক কাহিনী সংবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার সবগুলিই যে আরব দেশের, তাহা বলা যায় না। গ্রীক্, মিশর, ব্যাবিলোন, পারস্য ও ভারতবর্ষের অনেক গল্প তাহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছিল। গল্পের মধ্যে তাহার যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। অনেক গল্পের মধ্যে হয় ত হাস্যরসের উপাদান কিছু নাই এবং কতকগুলিকে অনর্থক বলা যায়। কিন্তু তবু ইহাতে সে সময়ের হাস্যরসবোধশক্তি সাধারণের মধ্যে কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে পারা যায়। এই সব কাহিনী পরে নাট্যাকারে হাস্যরস-সম্বলিত হইয়া সকলের কাছে বিশেষভাবে আদর পাইয়াছে। আলিবাবা, আলাউদ্দিনের আলো, কুঁজ ও দরজী প্রভৃতি গ্রন্থের নাম মনে পড়িবে। ইহা এতই মনোরম সুরস গল্প বোধ হয় পৃথিবীর সব রকম প্রচলিত ভাষাতে তাহার অনুবাদ করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি গল্প এত বড় যে, এখানে তাহার নমুনা উদ্ধৃত করা অসঙ্গত বোধ হইবে। যে জিনিষ এক হাজার এক রাত্রি পর্য্যন্ত বাদশাহকে অবাক্ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার বৈশিষ্ট্য অল্প কথায় বলা অসম্ভব।

ওমারখায়েম ও শেকসাদীর পদ্যগুলি এক প্রকার পরিমার্জ্জিত হাস্যরসসম্বলিত। তাহা বিশেষ বয়সে বিশেষ এক শ্রেণীর পাঠকদিগকে মুগ্ধ করে। সাধারণ পাঠকের অনেকে তাহার অর্থ হয় ত বুঝিতে পারে না। অনেক প্রকার ভাষাতে ইহার অনুবাদ হইয়াছে, তাহাই ইহাদের উৎকৃষ্টতা জানার পক্ষে বিশেষ প্রমাণ (যদি কোন প্রমাণের দরকার হইয়া থাকে)। কবি ফারদৌসী পারস্য দেশের মহাকাব্য-রচয়িতা। তাঁহার পদ্য এখন ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইয়া অনেকের নিকট পরিচিত হইয়াছে। একটি কবিতার (Epigramm) বাঙ্গালা ভাষাতে অনুবাদ। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"তোমরা সবাই বলতে পার, উদার রাজার মন।
গভীর ও বিস্তৃত, যেমন দেখ সমুদ্রের,
হয় ত তোমরা বল্‌তে পার ইচ্ছা যার যেমন,
জেনে আমার নাই কিছু লাভ—
কারণ, ঢেউ পেয়েছি নামতে গিয়ে, ডুব দিয়েছি সফল হয়ে।
পাইনি কিন্তু যোগাড় করে একটা মুক্তার টিপ !"

(কবির জীবনের একটি দীর্ঘনিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ যাহার উত্তাপ আধুনিক যুগে অনেকেই অনুভব করিয়া এরূপ বলিতে পারেন)

উপদেশমূলক প্রবাদবাক্য আমরা চাণক্য শ্লোক এবং মোহমুদ্গরে পাই। দেবদেবীর স্তব অর্চ্চনা অনুপ্রাসবহুল শব্দ যোজনাতে বেশী মনোরম বোধ হয়। ইহারা হাস্যরসের অঙ্গ নয় বটে, কিন্তু "wit" শ্রেণীর বাক্যলহরী, তাহা বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না।

মধ্যযুগ বলিতে, সাহিত্যধারা সম্পর্কে আমরা য়ুরোপ এবং ভারতবর্ষে যে যুগ কল্পনা করিতেছি, তাহার আরম্ভ হইয়াছে, যখন হইতে য়ুরোপে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আলোচনা আধিপত্য বিস্তার করে (Influence of the church) এবং ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশঃ প্রসারিত হইতে থাকে। ধর্ম্মকলহে এক দিকে যেমন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব দার্শনিক প্রভৃতি উন্নতিলাভ করে, অন্যদিকে আবার তাহাতে অধার্ম্মিকদের ঠাট্টা, বিদ্রূপ, রঙ্গ, ব্যঙ্গ, হাসি, সাহিত্য উদ্ভূত হয়। লোকশিক্ষা ও সাধারণ লোকদের বুঝাইবার জন্য উপদেশাত্মক গল্প (Parables Didactic stories) প্রচলিত হয় এবং বৌদ্ধ যুগের "জাতক" শ্রেণীর কাহিনী ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তার করে। অন্যদিকে আবার তাহা বিকৃত ও নিকৃষ্ট করিয়া অধার্ম্মিকগণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ করেন। ইহাদের কতকগুলি মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া ও সময়ে অতিরঞ্জিত অথবা ক্ষুদ্রাবয়ব হইয়া আমাদের কাছে আধুনিক যুগে আসিয়াছে। আবার কতকগুলি গ্রন্থে লিপিবদ্ধও হইয়া আসিয়াছে। ধর্ম্মযাজকদের মধ্যে পরস্পর যে হাসি-বিদ্রূপ হইত, তাহা মার্জ্জিত রুচি এবং জ্ঞানের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইত। অধিকাংশ গল্পে পশুপক্ষী কীট-পতঙ্গের মুখে ভাষা ও সামাজিক ভাব আরোপ করিয়া তাহাদের প্রত্যেক স্বভাব মানুষের সামাজিক রীতিনীতির মত করিয়া বলা হইত। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই, ভারতবর্ষের কথা-কাহিনী, "জাতক" প্রভৃতি কোন না কোন ভাবে যেন য়ুরোপেও প্রচলিত এবং আখ্যান-ভাগ উভয় দেশেই বস্তুতঃ যেন সমান—খুঁটিনাটির মধ্যে হয় ত কিছু পার্থক্য থাকিতে পারে। ধর্ম্ম-কলহ কেমন হাসিঠাট্টার পদার্থ হইয়াছিল, প্রচলিত ধর্ম্মকে বজায় রাখার জন্যও আবার হাসি-সাহিত্যের অবতারণা করিতে হইয়াছিল। বক্তৃতা, Sermon, ধর্ম্মোপদেশ, কথকতা প্রভৃতিতে রসপূর্ণ গল্পের আলোচনা করিতে হইয়াছিল। আরব্যোপন্যাসের গল্প এবং ভারতবর্ষের পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ প্রভৃতি পুস্তকের কথা তখন ক্রমশঃ য়ুরোপে প্রচারিত হয় এবং বাইবেলের

লিখিত গল্প (Parables) বিভিন্ন প্রকারে অতিরঞ্জিত করিয়া ব্যক্ত করা হয়। Æsop's Fablesএর সময় হইতে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের পুস্তক পর্য্যন্ত সবরকম ভাষাতে একটি রকমের গল্প বেশী প্রচলিত ছিল। এক লোকের দুই স্ত্রী ছিল একটি স্বামীর পাকাচুল তুলিত আর এক জন কাঁচা চুল তুলিত। স্বামী অল্পদিনেই "ইন্দ্রলুপ্ত" অবস্থা পাইলেন ও যন্ত্রণায় অস্থির হইলেন। (জামাইবারিক দ্রষ্টব্য)। ধর্ম্মকলহের ফলে যে যুগে যে সব শ্লেষব্যঞ্জক পুস্তকাদি বাহির হইয়াছিল, তাহার মধ্যে Gesta Romanorum, Heptameron, Decameron প্রভৃতি গ্রন্থ আজও প্রচলিত আছে। (Cf. Victoria Crossএর Seven nightএর কথাও মনে পড়িবে) সংস্কৃত সাহিত্যে এরূপ কোন পুস্তক এখন আর পাওয়া যায় না, তবে ২।৪টি শ্লোক ও কথা আমরা কিন্তু শুনিতে পাই— যেমন,—

চাণক্যশ্লোকের নীতিকথা

"আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
মাতৃবৎ পরদারেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥"

বিকৃত ও নিকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া হয়,

"মাতৃবৎ সর্ব্বভূতেষু, লোষ্ট্রেষু পরদ্রব্যবৎ।
আত্মবৎ পরদারেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥"

(আধুনিক সাহিত্যের গল্পলেখকগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন তাঁহাদের লিপিপদ্ধতি উদ্ধৃত করা আমার পক্ষে অন্যায় সন্দেহ নাই)

হিতোপদেশের বচন

সংসারবিষবৃক্ষস্য দ্বে এব মধুরে ফলে।
কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সজ্জনৈঃ সহ॥

বিকৃতরূপ ধারণ করিয়া অশ্লীল ভাবাপন্ন করা হইয়াছিল— ("কালের" পরিবর্তে" চুম্বন এবং অন্যত্র এইরূপ কথা প্রয়োগ) তাহা এতই Bachchalanian নীতি যে সাহিত্যের পবিত্রতা নষ্ট করিয়াছিল।

বৌদ্ধযুগের শেষ অবস্থায় নাস্তিকতার প্রভাব বেশী হইয়াছিল, বিদ্বোন্মাদতরঙ্গিণী নামক পুস্তকে ধর্ম্মের যুক্তি এরূপ দেখান হইয়াছে—

কা সৃষ্টিঃ পতিবেদনা যদি পুনঃ পিত্রোর্বপুঃ সম্ভবঃ।
কুষ্মাণ্ডাঃ প্রভবন্তি সন্ততমমী তত্তৎকুলাম্পালিতাঃ॥"

(ভাবার্থ মাতাপিতা হইতে পুত্র উৎপন্ন হইতেছে, সৃষ্টি কিরূপে হয়, তাহা ত চাক্ষুষ সকলেই দেখিতেছে। তাহার জন্য আবার এক জন সৃষ্টিকর্ত্তার স্বীকার করার প্রয়োজন কি? আর একটি শ্লোক এরূপ (বৌদ্ধধর্ম্মকে ঠাট্টা করিয়া)

অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ পাপমাত্মপ্রপীড়নম্
অপরাধীনতা মুক্তিঃ স্বর্গোঽভিলষিতাশনম্॥
স্বদারপরদারেষু যথেচ্ছং বিচরেৎ সদা।
গুরুশিষ্যপ্রণালীঞ্চ ত্যজেৎ স্বাতন্ত্র্যমাচরেৎ॥

(ভাবার্থ বিশ্লেষণ অনাবশ্যক)

এইখানে বোধ হয় উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, আধুনিক যুগে (১৯শ ও ২০শ শতাব্দীতে) ধর্ম্মকলহ উপলক্ষে আজু গোঁসাই এবং অ্যাণ্টনি ফিরিঙ্গির মধ্যে কবির লড়াই এবং রাজা রামমোহন রায়ের খৃষ্টিয়ান পাদরীদের উল্লেখ করিয়া আলোচনা—বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ও ধারা সকলকেই বিমুগ্ধ করে।

মধ্য যুগের হাস্য-সাহিত্য আলোচনা করিতে কয়েকটি ঐতিহাসিক তথ্য আলোচনা করিতে হয়। প্রথমে য়ুরোপের কথা ধরা যাউক। সে সময় সাধারণ লোকদের মধ্যে জাল-জুয়াচুরি প্রবঞ্চনা যেন প্রথম প্রসারিত হইতে আরম্ভ করে। বোধ হয়, বড়লোকদের সামাজিক প্রথা (Aristocracy) এবং ধর্ম্মযাজকদের নূতন গঠিত সমাজ (Ecclesiastical Hierarchy) এই দুই সমাজের মধ্যে পরস্পর সংগ্রাম আরম্ভ হয়। এই সব প্রচলিত সামাজিক বৃত্তি ও নীতি (এবং দুর্নীতি) প্রকাশিত করার জন্য ধূর্ত্ত শৃগালকে নায়ক সৃষ্টি করিয়া অনেক প্রকার গল্প ও কাহিনী তৈয়ারী হয়। Reynard the fox এবং তাহার খুল্লতাত Isengrin the wolf ইহাদের গল্পের কতক কতক অংশ আমরা ইংরাজী সাহিত্যে এখনও দেখিতে পাই। ধূর্ত্ত শৃগালকে স্কুলে পড়ান হইতেছে তাহাকে ধর্ম্মযাজক করান হইবে, কিন্তু তাহার খুল্লতাত তাহাকে লইয়া "নাস্তা-নাবুদ" করিতেছে এবং নিজেও "নাজেহাল" হইতেছে। ১২শ শতাব্দীর সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ঘটনা তাহাদের কাহিনীর মধ্যে যেন লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। ইহা সে সময়ের প্রধান হাস্যরসাত্মক satire হইয়াছিল এবং সে সময়ের সাহিত্যে প্রায়ই Reynard অথবা তাহার ছায়া অঙ্কিত চিত্রের ছবি বেশী পাওয়া যাইত। সে সময়ের স্থপতি বিদ্যা চিত্র এবং কাঠের কাজের মধ্যেও শৃগালের বিভিন্ন (সামাজিক) মূর্ত্তি অঙ্কিত ও খোদিত হইত। হয় ত ধর্ম্মযাজকভাবে শৃগাল পোষাক পরিয়া বেদীর উপর হইতে ধর্ম্মকথা বলিতেছে এবং একটি কুক্কুট তাহার Private secretaryভাবে কাগজ-কলম লইয়া বসিয়া আছে কিম্বা শৃগাল এক বিচারে জজ হইয়া বসিয়াছে এবং একটি শূকরের নালিশে আসামী কুকুরের বিচার করিতেছে। বড় লোকদের সমাজ ধর্ম্মযাজকদের সমাজের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিল বলিয়া মনে হয় না সেজন্য Duke, Lord, Marquis প্রভৃতিদের Fool, Buffoon (বয়স্য, সখা) যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা শ্লেষ-ব্যঞ্জক Caricature চিত্র ও গল্প সৃষ্টি করিত। পাল্টা জবাবে বিদ্বান ধর্ম্মযাজকগণও নিজেদের প্রাধান্য ও অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য লোকরঞ্জনমূলক গল্প ও কাহিনী সৃষ্টি করিয়া বড় লোকদের সমাজকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত।

মধ্যযুগেই যে শৃগাল কাহিনী প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা বলা হয় ত ঠিক হইবে না। কারণ, Æsop's Fables এবং বিষ্ণুশর্ম্মার গল্প ও কথাসরিৎসাগরেও শৃগালের কাহিনী পাওয়া যায় এবং তাহা বোধ হয় মধ্যযুগের পূর্ব্বে লিখিত। নবম শতাব্দীর একটি চিত্রে অঙ্কিত করা আছে, একটি শৃগাল ঘাড়ে "বাঁক" লইয়া যাইতেছে এবং বাঁকের দুই দিকে দুইটি মুরগী ঝুলাইয়া লইয়াছে, এবং নিজের পশ্চাৎ দুই পায়ের ভর দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছে। ফ্রান্স, বাভেরিয়া প্রভৃতি দেশের পুরাকালের গল্প ও কাহিনীতে ইহার পূর্ব্বে শৃগালের কাহিনী পাওয়া যায়। Caxton নামক এক জন গ্রন্থকার ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদেশী গল্পের একখানি পুস্তক অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করেন। তখন হইতেই ইংলণ্ডে শৃগাল-সাহিত্য যেন অল্পদিনেই বেশী জনপ্রিয় হইয়া উঠে। রঙ্গব্যঙ্গ-সাহিত্যে শৃগাল ও নেকড়ে বাঘের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জন্তুরাও ক্রমশঃ অভিনেতৃভাবে দেখা দিতে আরম্ভ করে এবং আধুনিক সাহিত্য পর্য্যন্ত জীবজন্তুদের অভিনয় আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছে—ইহা satire শ্রেণীর হাস্যরসের প্রধান প্রণালী। [ক্রমশঃ।

শ্রীকালিদাস বাগচী (এম্, এস্-সি)।

ব্রাহ্মণের জীবনবৃত্তি

সমাজের সর্ব্ববিষয়ক কল্যাণের জন্য প্রাচীন ঋষিগণ চারিটি শ্রেণী বা বর্ণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সুদীর্ঘ সাধনার দ্বারা ঋষিগণ দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া এই ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এজন্য ইহাও বলা হয় যে, স্বয়ং ভগবান্ এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা অনুসারে ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিবেন এবং সমাজে ধর্ম্মভাব প্রচার করিবার চেষ্টা করিবেন; ক্ষত্রিয়গণ রাজ্য শাসন করিবেন, দেশে শান্তিরক্ষা করিবেন এবং বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিবেন; বৈশ্যগণ কৃষি, গোপালন, ব্যবসা প্রভৃতির দ্বারা দেশের আর্থিক অভাব মোচন করিবার চেষ্টা করিবেন; এবং শূদ্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন। চারি বর্ণের চারি প্রকার বৃত্তিই সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। কেহই নিজ বৃত্তির জন্য লজ্জিত হইবেন না। প্রত্যেক বর্ণের বৃত্তি স্বয়ং ভগবান্ কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং তাহা পালন করিয়া সমাজের সেবার দ্বারা ভগবানেরই সেবা করা হয়, ইহা মনে করিয়া সকলে যত্নপূর্ব্বক নিজ বৃত্তি পালন করিবেন, এবং নিজ সন্তানগণকে সেই বৃত্তি পালন করিবার অনুরূপ শিক্ষা দিবেন। মধ্যে মধ্যে বৈলক্ষণ্য দেখা গেলেও সাধারণতঃ পুত্রকন্যাগণ পিতামাতার অনুরূপ গুণাবলী প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার উপর যদি তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে পুত্রকন্যাগণ বড় হইলে সর্ব্বতোভাবে পিতামাতার অনুরূপ বৃত্তি পালন করিবার উপযোগী হয়। ইহাই সাধারণ নিয়ম। সাধারণ নিয়ম অনুসারেই সামাজিক ব্যবস্থা প্রণীত হইয়া থাকে। বিশেষ কারণ অনুসারে মধ্যে মধ্যে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। কিন্তু সেজন্য ইহা বলা যায় না যে, সাধারণ নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা প্রণয়ন করা নিরর্থক।

ধর্ম্ম প্রচার করা যখন ব্রাহ্মণের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন তাহার এরূপভাবে জীবন যাপন করা উচিত, যাহাতে ধর্ম্মের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে। অহিংসা ধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ,—"অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ"। জগতের ব্যাপার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রায়ই বলশালী প্রাণী দুর্ব্বল প্রাণীকে বধ করিয়া আহার করে। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে—সর্ব্বত্রই এই ভাবে দুর্ব্বল প্রাণীর উপর অত্যাচার চলিতেছে। সাধারণ প্রাণীর ন্যায় মানবেরও এইরূপ দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিবার প্রবৃত্তি বিদ্যমান আছে। কিন্তু যিনি ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া জীবন যাপন করিবেন, তাঁহাকে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার হইতে বিরত থাকিতে হইবে। এজন্য মনু বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণকে এরূপভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে—যাহাতে কোনও প্রাণীর উপর অত্যাচার না হয়।

"অদ্রোহেণৈব ভূতানামল্পদ্রোহেণ বা পুনঃ।
যা বৃত্তিস্তাং সমাস্থায় বিপ্রো জীবেদনাপদি॥" ৪-২

"যেরূপ ভাবে জীবনযাত্রা করিলে কোনও প্রাণীর পীড়া হয় না, অথবা অল্পমাত্র পীড়া হয়, ব্রাহ্মণ সেইরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিবে। তবে আপৎকালে এই নিয়ম রক্ষা করা কঠিন হইতে পারে।"

এই নিয়ম অনুসারে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৃত্তির নাম 'উঞ্ছশিল'। পথে বা ক্ষেত্রে যে ধান্যাদি পড়িয়া থাকে, তাহাই এক একটি করিয়া কুড়াইয়া আনিয়া তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করাকে 'উঞ্ছশিল' বলা হয়। ইহাকে যখন জীবিকানির্ব্বাহের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, সে সময় জীবিকা খুব স্বচ্ছল ছিল, এবং সমাজে পরপীড়াবর্জ্জন সম্বন্ধে খুব উচ্চ আদর্শ পোষণ করা হইত। উঞ্ছশিল বৃত্তির অপর নাম হইতেছে 'ঋত'। এই বৃত্তি ঋত বা সত্যের ন্যায় ফলদায়ক বলিয়া ইহাকে ঋত বলা হইত। ঋত বা উঞ্ছশিল অপেক্ষা কিছু নিকৃষ্ট বৃত্তি হইতেছে, অযাচিত দানগ্রহণ। এই বৃত্তির অপর নাম 'অমৃত'। অযাচিত দান অমৃতের ন্যায় সুখকর বলিয়া ইহার নাম অমৃত। প্রাচীনকালে ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে প্রতিপালন করা সমাজের কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। এজন্য অনেক গৃহস্থ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতেন। উঞ্ছশিল এবং অযাচিত দান গ্রহণ, এই দুইটি বৃত্তি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, ইহাতে কাহাকেও পীড়ন করা হয় না। এই দুই জীবিকার কিছু নিকৃষ্ট বৃত্তি ভিক্ষা। ইংরাজী পড়িয়া আমরা শিখিয়াছি যে, যে ব্যক্তি পরিশ্রম করিতে পারে, তাহাকে ভিক্ষা দেওয়া এবং তাহার পক্ষে ভিক্ষা গ্রহণ করা অতিশয় গর্হিত। কিন্তু প্রাচীন হিন্দু-সমাজে ভিক্ষা-গ্রহণ ব্রাহ্মণের বৈধ জীবিকারূপে নির্দ্দিষ্ট হইত। কৃষি, বাণিজ্য এবং চাকুরী করা অপেক্ষা ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইত। আমরা একটু বিবেচনা করিলে দেখিতে পাইব যে, এই প্রাচীন মতটি যুক্তিযুক্ত ছিল। সকল সমাজেই অর্থ-সম্পত্তি অসমানভাবে বিভক্ত হয়। এমন কতকগুলি লোক থাকে—যাহারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ উপার্জ্জন করে। এই প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ তিন ভাবে ব্যবহার হইতে পারে;—প্রথম দান, দ্বিতীয় বিলাস, তৃতীয় সঞ্চয়। দান যদি সংপাত্রে করা হয়, তাহা হইলে ইহাই অর্থের শ্রেষ্ঠ ব্যবহার। সংপাত্রের দুইটি লক্ষণ থাকা চাই—সংস্বভাব এবং দারিদ্র্য। যিনি ধর্ম্মালোচনা, ধর্ম্মজীবন যাপন এবং ধর্ম্মপ্রচারই জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছেন, যিনি তাঁহার সমস্ত চেষ্টা এই উদ্দেশ্যেই নিযুক্ত করিয়াছেন, এমন কি, নিজের জীবিকার জন্যও চেষ্টা করেন না, তাঁহার অপেক্ষা সংপাত্র আর কে? আজ-কাল এত প্রকার বিলাসের উপকরণ হইয়াছে যে, যাহারা যথেষ্ট উপার্জ্জন করে, বিলাসে তাহাদের অনেক অর্থ ব্যয় হইয়া যায়, দানের নামে তাহারা বিরক্ত হয়। গ্রহীতার দিক্ হইতে দেখিলেও যে ব্রাহ্মণ ভিক্ষাই জীবিকারূপে গ্রহণ করেন, তাঁহার মনে কখনও অহঙ্কার আসিতে পারে না। তাঁহার জীবন বিলাসের দ্বারা দূষিত হয় না। ভিক্ষাবৃত্তি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট জীবিকা হইতেছে কৃষিকার্য্য। কৃষিকার্য্যে ভূমিস্থিত অনেক প্রাণী নিহত হয়। এজন্য তাহা নিন্দনীয় এবং স্মৃতিশাস্ত্রে তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে,—"প্রমৃত"। কৃষি অপেক্ষা হীনবৃত্তি হইতেছে বাণিজ্য। তাহার কারণ এই যে, বাণিজ্যে মধ্যে মধ্যে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। মনু বাণিজ্য-বৃত্তির নাম দিয়াছেন—"সত্যানৃত"। ইহা সত্য

এবং মিথ্যার সংমিশ্রণ। বণিক্ কখনও সত্য কথা বলেন, আবার কখনও মিথ্যা বলিতে হয়। সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বৃত্তি,—যাহা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে,—তাহা হইতেছে সেবা বা চাকরের কার্য্য করা।

"সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ।"

"সেবা বা চাকরী করা কুকুরের জীবন, এজন্য তাহা বর্জ্জন করিবে।" এই এক কথায় স্বাধীনতার কি তীব্র আকাঙ্ক্ষা, পরাধীনতার প্রতি মর্ম্মান্তিক ধিক্কার ধ্বনিত হইয়াছে। চাকুরী করিলে কেবল দেহের নয়, মনের দাসত্ব প্রায় অনিবার্য্য। দাসসুলভ মনোভাব (s .ive mentality) অতি ভয়ানক জিনিস। "এইরূপ কথা বলিলে প্রভু খুসী হইবেন," "এই প্রকার বেশ পরিধান করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন," "এইরূপ ভোজন, এইরূপ জীবনযাপন তাঁহার প্রিয়" দাসের পক্ষে ঈদৃশ চিন্তা প্রায় অপরিহার্য্য। এইরূপ মনোভাব হইলে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ একেবারে অবরুদ্ধ হয়। মনের স্বাধীনতা বা originality কিছুমাত্র থাকে না।

বর্ত্তমান সমাজে কৃষি, বাণিজ্য এবং চাকুরী এই তিনটি পথই খোলা আছে। মনুর মত অনুসারে এই তিনটির মধ্যে কৃষি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহার পর বাণিজ্য, এবং তাহার পর চাকুরী। কৃষিকার্য্যের দোষ এই যে, ইহাতে ইচ্ছাকৃত না হইলেও বহু ক্ষুদ্র জীব-হত্যা অনিবার্য্য। আমাদের দেশে যে একটি সংস্কার আছে, ব্রাহ্মণের লাঙ্গল ধরিতে নাই, তাহার কারণ এই যে, হল-চালনার সময় অনেক প্রাণিবধ হয়। কৃষি অপেক্ষা বাণিজ্য কিছু নিকৃষ্ট। বাণিজ্যে মিথ্যার আশ্রয় লইতে হয়, এই দোষ চাকুরী অতি হেয় কার্য্য। ভারতের অন্য প্রদেশবাসী অপেক্ষা বাঙ্গালী বেশী চাকরীপ্রিয় (আজকাল বোধ হয়, মান্দ্রাজীরা এ বিষয়ে বাঙ্গালীদিগকে ছাড়াইয়া যাইতেছে)। বেশ-ভূষা, আহার-বিহার, এমন কি, সমাজ এবং ধর্ম্ম বিষয়েও বাঙ্গালী অপর জাতি অপেক্ষা অনুকরণপ্রিয়। চাকরীপ্রিয়তা এবং অনুকরণ-প্রিয়তা একই মনোবৃত্তির বিভিন্ন অভিব্যক্তি। আজ এই ঘোর জাতীয় দুর্দ্দিনে, বাঙ্গালী যদি এই দাস-সুলভ মনোভাব হইতে মুক্ত হইতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার মনু-প্রচারিত মহামন্ত্র জপ করা উচিত,—

"সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ।"

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ যে দুইটি বৃত্তি,—উঞ্ছশিল এবং অযাচিতদানগ্রহণ,—তাহাদের মধ্যে উঞ্ছশিলবৃত্তি আজকাল দেখা যায় না। অযাচিতদানগ্রহণরূপ বৃত্তি সমাজে বিরল হইলেও একেবারে লোপ পায় নাই। আজও অনেক বড় সাধু এই বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ভাস্করানন্দ, তৈলঙ্গ স্বামী প্রভৃতি মহাত্মগণ এবং তাঁহাদের অনেক শিষ্যরাও এই বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। দুঃখজ্বালাময় সংসারে এই সকল সাধুর পুণ্যজীবন মরু-উদ্যানের ন্যায় সন্তাপহারক। যে সকল বস্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের দুঃখমোচনের জন্য প্রয়োজনীয় নহে, আমরা তাহাদের জন্য অস্থিরচিত্তে ছুটিয়া বেড়াই, তাহাদিগকে পাইবার চেষ্টার কত নূতন দুঃখের সৃষ্টি করি,—আর যে সকল বস্তু জীবনরক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়, যাহাদের অভাবে আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না, যথা—আহার, আশ্রয় এবং শীতবস্ত্র,—সাধু মহাত্মগণ সে সকল বস্তু পাইবার জন্যও কিছুমাত্র চেষ্টা করেন না। ঈশ্বরের উপর কেমন করিয়া সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে হয়, ইঁহারা নিজের জীবনে তাহা দেখাইয়া দেন।

ইঁহাদের জীবনে আমরা প্রায়ই দেখি যে, অনেক শিষ্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদিগকে খাওয়াইবার কিছুই সংস্থান নাই, অথচ কোথা হইতে রাশি রাশি খাদ্যদ্রব্য আসিয়া উপস্থিত হইল। তেমন করিয়া ভগবানের উপর নির্ভর করিতে পারিলে, ভক্তের অভাবমোচনের ভার ভগবান্ স্বয়ং গ্রহণ করেন। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।"

"যাহারা অপর সকল চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র আমাকেই চিন্তা করে, এবং আমার উপাসনা করে, সেই সকল নিত্য মদেকনিষ্ঠ ভক্তদের যাহা অপ্রাপ্ত, তাহা প্রাপ্ত করাইবার, এবং যাহা প্রাপ্ত, তাহা রক্ষা করিবার ভার আমি নিজে বহন করি।"

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এইভাবে ভগবানের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া জীবন-যাপন করিবার প্রণালীকে "আকাশবৃত্তি" বলিতেন। আকাশ হইতে জল পড়ে, তৃষ্ণা দূর করিব, নচেৎ নিজে জল আহরণ করিবার কোনও চেষ্টা করিব না, ইহাই আকাশবৃত্তি। যাহারা একান্ত অলসপ্রকৃতি, তাহাদের সহিত এই বৃত্তির অনেকটা সাম্য আছে। জগতে দুইটি একান্ত বিপরীত বস্তু প্রায়ই খুব কাছাকাছি আসিয়া থাকে। ইহা তাহারই একটি উদাহরণ। অত্যন্ত তমোভাবাপন্ন ব্যক্তি এবং আধ্যাত্মিকজগতের উচ্চতম শিখরে আরূঢ় ব্যক্তির বাহ্য আচরণ অনেক সময় একইরূপ হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণের জীবিকা নির্দ্দেশ করিয়া মনু ব্রাহ্মণের জন্য কয়েকটি নীতি প্রচার করিয়াছেন।

"ন লোকবৃত্তং বর্ত্তেত বৃত্তিহেতোঃ কথঞ্চন।"

"জীবিকার জন্য লোকবৃত্তি গ্রহণ করিবে না।"

টীকাকার কুল্লুকভট্ট "লোকবৃত্ত" শব্দের অর্থ করিয়াছেন, "অসৎ-প্রিয়াখ্যানং বিচিত্রপরিহাসকথাদিকং" যে সকল কথা বলিলে সাধারণ লোক আহ্লাদিত হয় অথচ যাহাতে তাহাদের চরিত্রের কোনও উন্নতি হয় না। অর্থাৎ শ্রেয়ঃ-বর্জ্জিত প্রেয়। সাধারণ লোককে খুসী করাই যাহার উদ্দেশ্য হইবে, যাহাতে লোকের চিত্ত আকর্ষণ করা যাইবে, সে তাহাই বলিবে, তাহাতে লোকের এবং নিজের উপকার হইবে, না অপকার হইবে, সে তাহা বিবেচনা করিবে না। অনেক সময় এইরূপ প্রসঙ্গ যে বলিবে, তাহার অবনতি হইবে এবং যে শুনিবে, তাহারও অবনতি হইবে। আজকাল একটা কথা শোনা যায়, Art for Art's sake। যাঁহারা এই মত সমর্থন করেন, তাঁহারা বলেন, কবির উদ্দেশ্য হইবে কেবল রসসৃষ্টি করা বা আনন্দ বিতরণ করা; কবি তাঁহার রচনার মধ্যে সাধারণের শিক্ষার উপযোগী কোনও বস্তু গ্রথিত করিলে, Art বা শিল্প হিসাবে সে রচনার মূল্য কমিয়া যায়। কিন্তু কেবল লোককে খুসী করার চেষ্টা, বিশুদ্ধ Artএর চর্চাকে মনু একটা জঘন্য বৃত্তি বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, সাধারণ লোকের মনোবৃত্তি এইরূপ যে, এক দিকে তাহার যেমন কতকগুলি শ্রেয়স্কর পদার্থ ভাল লাগে, আবার অপর দিকে কতকগুলি অকল্যাণকর পদার্থ আপাততঃ রুচিকর বলিয়া তাহাকে আকর্ষণ করে। ক্ষমা, দয়া, স্বার্থত্যাগ, ভগবদ্ভক্তির কাহিনী বলিয়া যেমন মানব-মন রসসিক্ত করিতে পারা যায়, ইন্দ্রিয়সুখ, ভোগবিলাস, এবং ব্যভিচারের কথাতেও সেইরূপ তাহাকে উপভোগ্য উত্তেজনা দেওয়া যায়। কেবল রস, কেবল আনন্দের সৃষ্টি করিব,—তাহার

মধ্যে সুনীতি থাকে বা দুর্নীতি থাকে, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না,—এই মত গ্রহণ করিলে অকল্যাণকর জিনিষগুলি ত বাদ দিতে পারা যায় না। ফলেও দেখা যায়, যাঁহারা এই মত বেশী জোরে প্রচার করেন, তাঁহাদের রচনার মধ্যে শ্রেয়োযুক্ত প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়ঃ-পরিপন্থী প্রেয়ের আধিক্য থাকে। কারণ, শেষোক্ত দ্রব্যের উগ্রতা বেশী, এজন্য মানব-মন সহজেই অধিক পরিমাণে বিচলিত করিতে পারে। গীতায় শ্রীভগবান্ সাত্ত্বিক এবং রাজসিক সুখের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাত্ত্বিক সুখে প্রথমে কষ্ট, শেষে সুখ; রাজসিক সুখে প্রথমে সুখ, শেষে কষ্ট।

"যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপম্।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্" ।১৮-৩৭

"যাহা অগ্রে বিষের ন্যায় এবং পরিণামে অমৃতের ন্যায়, তাহা সাত্ত্বিক সুখ। বুদ্ধি নির্ম্মল হইলে এই সুখ উৎপন্ন হয়।"

"বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগাদ্যত্তদগ্রেঽমৃতোপম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্। ১৮-৩৮

"বিষয় (ভোগ্যবস্তু) এবং ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে যে সুখ উৎপন্ন হয়, যাহা প্রথমে অমৃতের ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু পরিণামে বিষের ন্যায় কষ্টদায়ক, তাহা রাজসিক সুখ।"

Art for Art's sake এই নীতি অনুবর্ত্তন করিলে রাজসিক সুখের বাহুল্য অনিবার্য্য। সাত্ত্বিক সুখকে Artএর মধ্যে আনা কঠিন। কারণ, সাত্ত্বিক সুখের গোড়াতে কষ্ট, —ইন্দ্রিয়সংযম, তপস্যা—এই সকল কষ্টকর ব্যাপার সাত্ত্বিক সুখের গোড়ার জিনিষ। অথচ চিত্ত আকর্ষণ না করিতে পারিলে Art বা শিল্প হয় না। সাত্ত্বিক সুখের অভ্যাসে যে কষ্ট আছে, সেই কষ্টের অংশ বাদ দিয়া, তাহার আনন্দের অংশ সমুজ্জ্বল করিয়া তোলা উচ্চ অঙ্গের Artএর লক্ষণ। রাজসিক সুখের চিত্র অঙ্কিত করিয়া চিত্ত আকর্ষণ করা অপেক্ষা, সাত্ত্বিক সুখের চিত্র দ্বারা চিত্ত আকর্ষণ করা অধিকতর দুরূহ, ইহাতে কবির কৃতিত্ব অধিক। শুদ্ধসৌন্দর্য্যবাদী আধুনিক লেখকগণ এই তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া সমাজের যথেষ্ট অকল্যাণ সৃষ্টি করিতেছেন।

"ইন্দ্রিয়ার্থেষু সর্ব্বেষু ন প্রসজ্জেত কামতঃ।
অতিপ্রসক্তিং চৈতেষাং মনসা সংনিবর্ত্তয়েৎ ॥ মনু ৪-১৬

উপভোগের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে আসক্ত হইবে না। সংসারের অনিত্যতা, মানবদেহের পরিণাম প্রভৃতি বিষয়ে চিন্তা করিয়া ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে অতিরিক্ত আসক্তি নিবারণ করিবে।

"ন সীদেৎ স্নাতকো বিপ্রঃ ক্ষুধা শক্তঃ কথঞ্চন।
ন জীর্ণমলবদ্বাসা ভবেচ্চ বিভবে সতি।" মনু ৪-৩৪

সঙ্গতি থাকিলে ক্ষুধায় শরীরকে পীড়িত হইতে দিবে না। ছিন্ন এবং মলিন বস্ত্র পরিধান করিবে না।

"ক্লৃপ্তকেশনখশ্মশ্রুর্দান্তঃ শুক্লাম্বরঃ শুচিঃ।
স্বাধ্যায়ে চৈব যুক্তঃ স্যান্নিত্যমাত্মহিতেষু চ।" মনু ৪-৩৫

কেশ, নখ এবং শ্মশ্রু ছেদন করিবে, আত্মসংযম অবলম্বন করিবে, শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিবে, শরীর পবিত্র রাখিবে, শাস্ত্র পাঠ করিবে এবং যাহাতে নিজের কল্যাণ হয়, এরূপ আচরণ করিবে।

অনর্থক শরীরকে পীড়ন করিবে না, আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবে, আন্তরিক পবিত্রতা এবং বাহ্য শৌচ উভয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে, এই উদ্দেশ্যে উপরিলিখিত উপদেশগুলি দেওয়া হইয়াছে।

"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ং চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।" মনু ৪-১৩৮

যাহা সত্য এবং প্রিয়, তাহা বলিবে। যাহা প্রিয় নহে, তাহা সত্য হইলেও বলিবে না; যাহা সত্য নহে, তাহা প্রিয় হইলেও বলিবে না।

"যাহা প্রিয় নহে, তাহা সত্য হইলেও বলিবে না" এই উপদেশটি আপাততঃ উচ্চনীতিসঙ্গত বলিয়া মনে না হইতে পারে; কিন্তু অনর্থক কলহ ও অশান্তি নিবারণ করা এই নীতির উদ্দেশ্য। "সত্য কথা বল্‌ব, তাতে ভয় কি?" এই বলিয়া অনেকে কলহের সৃষ্টি করে। মনে করুন, এক ব্যক্তি কোনও স্থানে অপমানিত হইয়াছে। সেই অপমানের কথা অপরের সম্মুখে তাহাকে বলা উচিত নহে। এইরূপ স্থলে সত্য কথা অপ্রীতিকর বলিয়া বলা উচিত নহে। ছাত্র বা বালকদিগকে শিক্ষা দিবার সময় অপ্রীতিকর হইলেও সত্য কথা বলিতে হয়।

"বেদাভ্যাসেন সততং শৌচেন তপসৈব চ।
অদ্রোহেণ চ ভূতানাং জাতিং স্মরতি পৌর্ব্বিকীম্।" মনু ৪-১৪৮

সর্ব্বদা বেদ পাঠ করিলে, পবিত্র জীবন যাপন করিলে, তপস্যা করিলে এবং কোনও প্রাণীর অনিষ্ট না করিলে ব্রাহ্মণ পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করিতে পারে।

"পৌর্ব্বিকীং সংস্মরঞ্জাতিং ব্রহ্মৈবাভ্যসতে পুনঃ।
ব্রহ্মাভ্যাসেন চাজস্রমনন্তং সুখমশ্নুতে।" মনু ৪-১৪৯

যখন পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ হয় এবং ইহা দেখা যায় যে, বার বার সংসারে আসিয়া গর্ভবাস-দুঃখ, ব্যাধি, শোক, জরা, মৃত্যু, প্রভৃতি কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তখন অন্তরে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় এবং সংসারে সুখলাভ করিবার আশা ত্যাগ করিয়া মানব আগ্রহের সহিত ঈশ্বরলাভ করিবার জন্য ঈশ্বরবিষয়ক কথা শ্রবণ করে, সর্ব্বদা ঈশ্বর-বিষয়ক চিন্তা করে এবং মনকে দীর্ঘকাল ঈশ্বরবিষয়ে নিবিষ্ট রাখিবার চেষ্টা করে। এই সকল অভ্যাসের ফলে চিরকাল ধরিয়া অত্যন্ত সুখ পাওয়া যায়।

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ।" মনু ৪-১৬০

যে সকল দ্রব্য পরের অধীন, তাহারা সকলেই দুঃখজনক; যে সকল বস্তু নিজের অধীন, তাহারা সকলেই সুখকর। ইহাই সুখ এবং দুঃখের লক্ষণ।

"ন সীদন্নপি ধর্ম্মেণ মনোঽধর্ম্মে নিবেশয়েৎ।
অধার্ম্মিকাণাং পাপানামাশু পশ্যন্ বিপর্য্যয়ম্।" মনু ৪-১৭১

ধর্ম্মপথে থাকিয়া কষ্ট পাইলেও মন অধর্ম্মে নিবিষ্ট করিবে না। কারণ, যাহারা অধার্ম্মিক এবং পাপী, তাহারা পরিশেষে দুঃখ পায়।

"মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি।" মনু ৪-২৪১

আত্মীয়গণ মৃত ব্যক্তির শরীরকে কাষ্ঠ বা লোষ্ট্রের ন্যায় ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যায়। কেবল ধর্ম্মই পরলোকে মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করে।

"তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সংচিনুয়াচ্ছনৈঃ।
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরম্।" মনু ৪-২৪২

এ জন্য সর্ব্বদা ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম সহায়ের জন্য সঞ্চয় করিবে। ধর্ম্ম সহায় হইলে দুস্তর নরকাদি দুঃখ উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (এম এ)।



ইরাণে ভূমিকম্প

আজকাল পৃথিবীর নানা স্থান হইতেই ভূমিকম্পের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ইহার প্রত্যেক ভূমিকম্পেই বহু লোক হতাহত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে বলিয়া সংবাদ আসিতেছে। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে লিসবন সহরে যে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ভূমিকম্প ঘটিয়াছিল, সেই ভূমিকম্পে ৭৫ লক্ষ বর্গ-মাইল ভূমি কাঁপিয়া ও সাগরজল ৬০ ফুট উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল এবং ৫০ হাজার লোক মুহূর্ত্তমধ্যে প্রাণ হারাইয়াছিল। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে গোয়াডেলোপ দ্বীপে যে দারুণ ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহাতে ৩ হাজার মাইল দীর্ঘ এবং ৭০ মাইল প্রস্থ ভূভাগ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে মধ্য-আমেরিকার সাণ্টাফি হইতে পানামা পর্য্যন্ত ভয়ানক ভূমিকম্পে আন্দোলিত হইয়াছিল এবং এক সেকেণ্ডের মধ্যে ৪০ হাজার লোক ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে জাভা দ্বীপে এক ভূমিকম্প হয়, তাহাতে বড় বড় পর্ব্বত ধরাগর্ভে আত্মগোপন করে। সেবার তথায় কত লোক মরিয়াছিল, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। এইরূপ কত ভূকম্পনের কাহিনী প্রকৃতির জীবহত্যা-প্রবৃত্তির ঘোষণা করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীতে সানফ্রান্সিস্কোতে, জ্যামেকাতে, ইটালীতে, জাপানে, নিউজিলাণ্ডে এবং নিকারাগুয়াতে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহাতে বিস্তর ধনজন নষ্ট হইয়াছিল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন লণ্ডন সহরও ভূমিকম্পে কাঁপিয়াছিল। তবে তাহাতে বিশেষ লোকক্ষয় হয় নাই। তাহার পর বেহারের ভূমিকম্প, ফর্ম্মোজার ভূমিকম্প এবং ইরাণের এই ভূমিকম্প। ইরাণ প্রাচীন পারস্য দেশের নাম। ইরাণের ম্যাজানডেরান অঞ্চলে ১২ই এপ্রিল প্রথম ভূমিকম্প হয়। তাহার পর কয়েক দিবস ক্রমাগতই ভূমিকম্প হইয়াছে। প্রথমেই সংবাদ আসিয়াছে যে, এই ভূমিকম্পে ন্যূনকল্পে ৬ শত লোক মরিয়াছে। পরে সংবাদ আসে যে, বিস্তর লোক ভূমিকম্পে মরিয়াছে; সুতরাং মৃত লোকের সংখ্যা যে কত, তাহা এ পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই, তাহা বুঝা যাইতেছে। কাস্পিয়ান হ্রদের তীরবর্ত্তী সারী সহরের নিকটবর্ত্তী অনেকগুলি বড় বড় বাড়ী চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ধরা চুম্বন করিয়াছে। এখনও তথায় ভূমিকম্প হইতেছে। ম্যাজানডেরান (মাজান ডিরাণ ?) অঞ্চলটি এলবার্জ্জ পর্ব্বতের উত্তরে এবং কাস্পিয়ান হ্রদের দক্ষিণে। সারী বেল ষ্টেশনের সন্নিহিত একটি সহর। সমস্ত সারী অঞ্চলটিতে ভূকম্পনের বেগ অনুভূত হইয়াছে। ঐ অঞ্চলটি ত বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, এমন কি, বিধ্বস্ত অঞ্চল হইতে আড়াই শত মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে এই ভূকম্পনের প্রবল বেগ অনুভূত হইয়াছিল।

ফর্ম্মোজায় ভীষণ ভূকম্পন

ফর্ম্মোজা চীনভূমি হইতে ৯০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি বৃহৎ দ্বীপ। দ্বীপটি বরাবরই চীনের অধিকারভুক্ত ছিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে চীন উহা জাপানীদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। ফুকিয়েন প্রণালী এই দ্বীপটিকে চীনভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এই দ্বীপটির বিস্তার ১৩ হাজার ৯ শত ৪৪ মাইল। লোকসংখ্যা ৩৩ লক্ষ ৫৪ হাজারের উপর। গত ৮ই বৈশাখ প্রাতে এই দ্বীপটিতে ভীষণ ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। এই ভূমিকম্পের ফলে ২টি বিভাগ একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন প্রাতে স্থানীয় ৬টার সময় ভূকম্পন আরম্ভ হয় এবং পর পর কয়েকটি প্রবল ধাক্কা অনুভূত হইয়াছিল। পার্ব্বত্য প্রদেশের মধ্যভাগেই ক্ষতির পরিমাণ অধিক হইয়াছে। কতকগুলি সহরে আগুন ধরিয়া যায়, সে অগ্নি সহজে নির্ব্বাপিত করা যায় নাই। এই দৈবদুর্ব্বিপাকে বহু সহস্র লোক হতাহত হইয়াছে। কিন্তু নরখাদক অসভ্য জাতিরা মরে নাই। এইরূপ আকস্মিক দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইলে হতাহতের সংখ্যা কত, তাহা ঠিক নির্ণয় করা কখনই সম্ভব হয় না। ৯ই বৈশাখ (২২শে এপ্রিল) ফর্ম্মোজার টাইহোকু হইতে সংবাদ পাওয়া যায় যে, এই ভূকম্পনে প্রায় ৩ হাজার লোক নিহত হইয়াছে, দশ হাজার বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে এবং ১১ হাজার গৃহ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বিমানযোগে পরিদর্শন দ্বারা অনুমান করা হইয়াছে যে, প্রায় ২ হাজার বর্গমাইল স্থান বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং প্রায় আড়াই লক্ষ লোক হতাহত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। রাজপথে শঙ্কিত নারী এবং শিশুরা আশ্রয় লইয়াছে।

তবে এই ব্যাপারে ঐ অঞ্চলের আদিম-অধিবাসীদিগের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই বা ইক্ষুক্ষেত্রেরও কোনরূপ অনিষ্ট ঘটে নাই। যে অঞ্চল ভূমিকম্পের জন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে,—ইক্ষুক্ষেত্রগুলি সেই অঞ্চলের বাহিরে। জাপান সরকার ক্ষতিগ্রস্ত লোকদিগের সাহায্য করিতেছেন। জাপানী অধিবাসীদিগেরও বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। ইংরাজ ও মার্কিনীরা এই দ্বীপের আর্ত্তত্রাণ-কার্য্যে জাপানের সহায়তা করিতে চাহিয়াছিলেন। বিহারে যখন ভূমিকম্প হয়, তখন মহাত্মাজী বলিয়াছিলেন যে, বিহারে অস্পৃশ্যতা আছে, সেই পাপে তথায় ভূমিকম্পে অত লোক মরিয়াছে, এখন ফর্মোজার এই কাণ্ডে তিনি কি বলেন ?

ব্রেজিলে এবং মার্কিণে বাণিজ্য-চুক্তি

গত ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে প্যান্ আমেরিকান সমিতিতে মার্কিণের স্বরাষ্ট্র-সচিব কর্ডেল হাল প্রস্তাব করেন যে, আমেরিকায় প্রজাতন্ত্র



কর্ডেল হাল



প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট

রাজ্যগুলির মধ্যে যে সকল বাণিজ্যগত বাধা আছে, তাহা অপসারিত করিয়া তাহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিদানমূলক বাণিজ্য-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করা কর্ত্তব্য। ইহার পর হইতেই মার্কিণের প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এই পরামর্শ অনুযায়ী কার্য্য করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার সেই চেষ্টার ফলে কিউবার সহিত প্রথমে প্রতিদানমূলক বাণিজ্যসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পরই আবার গত ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে ব্রেজিলের সহিত মার্কিণের ঐরূপ প্রতিদানমূলক বাণিজ্য-সম্বন্ধের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়া গিয়াছে। এই প্রতিদানমূলক বাণিজ্যসম্বন্ধের মূল ব্যাপার এই যে, চুক্তিসূত্রে আবদ্ধ দেশ দুইটি পরস্পর পরস্পরের পণ্য অধিক পরিমাণে কিনিবেন।

এই ব্রেজিল রাজ্যটি বিস্তারে প্রায় য়ুরোপের অনুরূপ। ইহার অধিবাসিসংখ্যা ৪ কোটির কিছু অধিক। দেশটির অনেক স্থান জলাভূমিতে এবং জঙ্গলে আকীর্ণ, বহু স্থানে ম্যালেরিয়াও ছিল। এখন এই দেশের কর্ত্তৃপক্ষ বলিতেছেন যে, তাঁহাদের দেশের মন্দার বাজার অনেক কমিয়া গিয়াছে। ইঁহারা এখন তাঁহাদের দেশের পণ্য দিয়া তাহার বিনিময়ে বিলাতের নিকট হইতে রণতরী গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইঁহারা ভূরি পরিমাণে তূলার চাষ করিতেছে। মার্কিনীরা তূলার চাষ সঙ্কোচ করিবার যে ব্যবস্থা করিতেছে, সে জন্ত তাহাদিগকে বিব্রত হইয়া উঠিতে হইয়াছে। ব্রেজিল হইতে এখন অনেক তূলা রপ্তানী হইতেছে। ১৯৩৩ খৃঃ অব্দে ব্রেজিল হইতে যত তূলা রপ্তানী হয়, তাহা হইতে ১৯৩৪ খৃঃ অব্দে শতকরা ৩ হাজার ৯ শত গাইট হিসাবে তূলার রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর্জেণ্টিনা প্রজাতন্ত্র রাজ্যের সহিতই মার্কিণের অধিক বাণিজ্য হয়,—তাহার নিম্নেই ব্রেজিলের সহিত মার্কিণের বাণিজ্য হইয়া থাকে ব্রেজিল মার্কিণের একটি বড় খরিদদার, মার্কিণও ব্রেজিল হইতে অনেক পণ্যের আমদানী করিয়া থাকেন। ১৯২৮ এবং ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে মার্কিণ প্রতি বর্ষে ব্রেজিলে ১০ কোটি ডলার মূল্যের পণ্য বিক্রয় করিয়াছিল; কিন্তু ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ব্রেজিলে মার্কিণের বিক্রীত পণ্যের মূল্য দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার, কিন্তু ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ঐরূপ বিক্রীত পণ্যের মূল্য হইয়াছিল ৪ কোটি ডলার। এই বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য হ্রাসের আংশিক কারণ এই যে, এই সময়ে পণ্যমূল্য হ্রাস পাইয়াছিল। ব্রেজিল বাহির হইতে যে পরিমাণ পণ্য তাহার দেশে আমদানী করে, তাহার শতকরা ২৫ হইতে ৩৩ ভাগ পর্য্যন্ত সে মার্কিণ হইতে গ্রহণ করে; পক্ষান্তরে, মার্কিণও ব্রেজিল হইতে যত মূল্যের পণ্য বিদেশে রপ্তানী হয়, তাহার শতকরা ৪০ হইতে ৫০ ভাগ পর্য্যন্ত লইয়া থাকে। এই দুই দেশের উৎপন্ন পণ্যের অবস্থা এইরূপ যে, এক দেশ যে সকল পণ্য রপ্তানী করে, অন্ত দেশ সে সকল পণ্য আমদানী করিবার প্রয়োজন অনুভব করে। সুতরাং ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বাণিজ্য-সম্বন্ধ-প্রতিষ্ঠা স্বাভাবিক।

এই ব্যবস্থা ত বরাবরই চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু আলোচ্য সন্ধি বা চুক্তি দ্বারা স্থির করা হইয়াছে যে, মার্কিণ তাহার ম্যাঙ্গেনিজ ধাতুর উপর ধার্য্য শুল্কের হার শতকরা ৫০ ডলার হারে কমাইয়া দিবেন; ইহা ভিন্ন ব্রেজিলের নারিকেল, বেড়ির বীজ এবং অন্যান্য বহু সামান্য সামান্য পদার্থের উপর ধার্য্য শুল্ক অর্দ্ধেক পরিমাণে কমাইয়া দিয়াছেন; কফি এবং আর এগারটি ব্রেজিল পণ্যের উপর কোন আমদানী শুল্কই ধার্য্য করেন নাই। পক্ষান্তরে, ব্রেজিলের কর্ত্তৃপক্ষ মার্কিণ হইতে আমদানী ২৮ দফা পণ্যের উপর ধার্য্য শুল্ক হ্রাস করিয়া দিয়াছেন আর ১৩ দফা পণ্যের উপর ধার্য্য শুল্কের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ইহা ভিন্ন

মার্কিণে প্রস্তুত মোটর গাড়ী, গাড়ী, চাকার টায়ার, রেডিও, রং প্রভৃতির উপর আমদানী শুল্ক অত্যন্ত অল্প করিয়া ধরিয়াছেন। ফলে এই বাণিজ্য-সম্বন্ধে মার্কিণ এবং ব্রেজিল উভয় দেশের বিশেষ সুবিধা ঘটিবে আশা করা যায়।

রণচণ্ডীর অট্টহাস

য়ুরোপের আকাশে বাতাসে আবার রণচণ্ডীর অট্টহাস্য ভাসিয়া আসিতেছে। আবার য়ুরোপীয় জাতিরা আসন্ন সমরের শঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। জার্ম্মাণী আবার রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া উঠিয়াছেন, জার্ম্মাণীকে আর ভ্রূভঙ্গী দেখাইয়া শাসিত করা সম্ভব হইতেছে না, ইহা দেখিয়া ফ্রান্সের আর উৎকণ্ঠার অবধি নাই, ইংরাজ চিন্তাকুল, ইটালী যেন কতকটা সন্ত্রস্ত। জার্ম্মাণরা নির্জ্জীব জাতি নহে, তাহারা সজীব—কয়েক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে এই জার্ম্মাণ জাতি যে বীরত্ব দেখাইয়াছিল, তাহার কথা য়ুরোপীয় শক্তিধর সমরবিদ্যাবিশারদগণ এখনও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তাই জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রনায়ক হার হিটলারের হুঙ্কারে সমস্ত সভ্য বিশ্ববাসী চমকিত। জার্ম্মাণী যে ভিতরে ভিতরে রণচণ্ডীর আরাধনা করিতেছিল, এ কথা পূর্ব্বে কেহই অবগত ছিলেন না। বিগত বৎসরের জুন মাসের শেষভাগে যে সময় জার্ম্মাণ চান্সেলার এডলফ হিটলার প্রায় ৭৭ জন জার্ম্মাণকে বিপ্লবকারী বলিয়া প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন, তাহার পর হইতেই এই কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে যে, জার্ম্মাণী গোপনে ভবিষ্যৎ সমরের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। সেই হইতেই য়ুরোপীয় রাষ্ট্রপতিদিগের মনে জার্ম্মাণীর আচরণ সম্বন্ধে নানা সন্দেহের আবির্ভাব হইয়া আসিতেছে। তার পর হিটলারও স্পষ্টভাবে সে কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। মিউনিকের বার্ষিক সভায় এক সহস্র নাজি নেতার সমক্ষে হিটলার বলিয়াছিলেন, —"আমরা আন্তরিকতাশূন্য চেষ্টার ভাণমাত্র চাহি না, আমরা চাহি স্পষ্ট সিদ্ধান্ত। যাঁহারা আমাদিগকে বিশ্বাস করিবেন, তাঁহারা আমাদিগকে নিশ্চয়ই ভালবাসিবেন। যাঁহারা আমাদিগকে চাহেন না, তাঁহারা নিশ্চিতই আমাদিগকে ঘৃণা করিবেন। যে কেহ আমাদিগের স্বাধীনতা হরণ করিতে চাহেন, তাঁহাকে জোর করিয়া তাহা করিতে হইবে।" হার হিটলারের এই উক্তিতে বেশ একটু দৃপ্তভাব ছিল। সেই কথায় য়ুরোপীয় শক্তিধরগণ বুঝেন যে, জার্ম্মাণীকে আর চাপিয়া রাখা সম্ভব হইবে না। তাহার পর হইতেই য়ুরোপীয় রাজনীতিক মহলে খুব দৌড়াদৌড়ি এবং ছুটাছুটি চলিতেছে। হার হিটলারও মধ্যে মধ্যে দুই চারিটি তেজোদৃপ্ত বাক্য বলিয়া সেই দৌড়াদৌড়ির মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিতেছেন। সে সকল সংবাদ আমরা পূর্ব্বেই পাঠকগণকে প্রদান করিয়াছি। ইংরাজদিগের পক্ষ হইতে সার জন সাইমন প্রভৃতি বার্লিনে যাইয়া হার হিটলারের সহিত কথোপকথনে যেটুকু বুঝিয়াছিলেন, তাহা তিনি বিলাতের কমন্স সভায় বলিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া যাঁহারা বলপূর্ব্বক জার্ম্মাণীকে দমিত করিয়া রাখিতে চাহেন, তাঁহাদের অস্বস্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইটালী, ইংরাজ এবং ফরাসী এই তিন জাতির চিন্তাই সমধিক হইল। জার্ম্মাণী বলিয়াছিল যে, অস্ত্রবলে এবং সৈন্যবলে তাহারা অন্য জাতির সমকক্ষ হইতে চাহে। যে সকল অস্ত্রশস্ত্র অন্যান্য জাতিরা আত্মরক্ষার জন্য রাখিতেছে, জার্ম্মাণীও ন্যায় অনুসারে আত্মরক্ষার জন্য তাহা রাখিবার বাসনা ও দাবী করে। ইহা ঐ তিন শক্তি পছন্দ করিতেছেন না। তাঁহারা চাহেন যে, জার্ম্মাণী চিরদিন নত হইয়া থাকুক। জার্ম্মাণী তাহাতে একবারেই অসম্মত। কাযেই দল ঠিক রাখিবার এবং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কি করা কর্ত্তব্য,



হার হিটলার



সার জন সাইমন

তাহা সাব্যস্ত করিবার জন্য তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত মন্ত্রণা করিতেছেন। বৃটিশ জাতি শান্তিরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যস্ত। তাঁহারাই বার্লিনে প্রাগে, মস্কো সহরে ঘুরিয়া সকলের মনোভাব দেখিয়া এবং বুঝিয়া আসিয়াছেন। ফ্রান্সের সহিতও তাঁহাদের অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছে। শেষকালে ইটালীর ষ্ট্রেসা সহরে ত্রি-শক্তির গুপ্ত বৈঠক বসিয়াছিল। সেখানে তাঁহাদের মধ্যে কি পরামর্শ হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রকাশ নাই। য়ুরোপীয় রাজ-নীতিকরা ত ভাজেন ঝিঙ্গা,—বলেন পটোল। জার্ম্মাণী বলিতেছেন যে, তাঁহারা যত দিন তাঁহাদের উপনিবেশগুলি ফিরাইয়া না পাইবেন, তত দিন তাঁহারা জাতিসঙ্ঘে যোগ দিবেন না। সুতরাং এখন জার্ম্মাণ জাতি-সঙ্ঘের হুমার বাহিরে। প্যারাগুয়াও চাকোব্যাপারে জাতিসঙ্ঘের আদেশ মানিতে চাহে না বলিয়া জাতিসঙ্ঘের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়াছে। প্যারাগুয়ার মন্ত্রিমণ্ডলী, সংবাদপত্র এবং জনমত জাতিসঙ্ঘের সহিত প্যারাগুয়ার এই সম্বন্ধচ্ছেদের সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, জাতিসঙ্ঘের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলে

জাতিসঙ্ঘ আর কাহারও বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন না। সুতরাং জার্ম্মাণীর এই দাবী জাতিসঙ্ঘের অনুমোদিত না হইলেও জাতিসঙ্ঘ জার্ম্মাণীর বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিবেন না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইটালীর ষ্ট্রেসা নামক স্থানে রাজপ্রাসাদে ইটালীয়, ইংরাজ এবং ফরাসী প্রতিনিধিবর্গ একান্তে বসিয়া ঠিক কি পরামর্শ করিয়াছেন, তাহা যথাযথভাবে জানা যায় নাই। কূট রাজনীতিক কৌশল কখনই সরল পথ ধরিয়া চলে না। কার্ভেথ রীড (Carveth Read) তাঁহার Natural and Social Morals নামক পুস্তকে স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রতারণাই কূটরাজনীতির (Diplomacy) সার অংশ (পৃষ্ঠা ২১৫)। সুতরাং যবনিকার অন্তরালে যে কি কৌশল বিস্তৃত হইতেছে,



মঁসিয়ে লাভাল

তাহা কে বলিতে পারে? ফ্রান্স জাতিসঙ্ঘের নিকট আবেদন করিয়াছেন। তাঁহারা একটি প্রস্তাবও জাতিসঙ্ঘে উপস্থিত করিয়াছেন। এখন জিজ্ঞাস্য, সে প্রস্তাব গৃহীত হইলে কি হইবে? জার্ম্মাণী যে ভয়ে আড়ষ্ট হইবে, তাহা মনে হইতেছে না। তবে এখন কথা হইতেছে, এইরূপ পরস্পর দাপাদাপি কত দিন চলিবে? উহা অধিক দিন চলিবে বলিয়া আশা হয় না। তবে কি সত্য সত্যই রণচণ্ডী অট্টহাস্যে দশদিক্ প্রকম্পিত করিয়া আবার শীঘ্রই য়ুরোপে অবতরণ করিবেন? নিখিল বিশ্বের ভাগ্যবিধাতাই সে কথা বলিতে পারেন। য়ুরোপের এক শ্রেণীর রাজনীতিকদিগের বিশ্বাস, যেখানে কোন আইন নাই, সেখানে অবিচারও নাই বা কোনপ্রকার নৈতিক বাধ্যবাধকতাও থাকিতে পারে না। কথাগুলি নাস্তিক্য-বাদের। উহা সত্য কি না, বিধাতার রাজ্যে নিশ্চয়ই তাহার পরীক্ষা হইবে।

সকলেই এখন বলিতেছেন যে, যুদ্ধ যাহাতে সঙ্ঘটিত না হয়, তাহার জন্য সকলের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে, তাহারই উপায় নির্দ্ধারিত করিবার জন্য সকলেই চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু যে উপায়ে উহা সম্ভব হইবে, তাহা কেহ করিতেছেন না। মিষ্টার জে এল গার্ভিন কিছু দিন পূর্ব্বে সে কথা বিলাতের অবজারভার পত্রে বিশেষভাবে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, জার্ম্মাণীকে যদি অন্য সকল জাতির সহিত সমষ্টিবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলেই শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা সম্ভব হইবে, অন্যথা অস্ত্র-সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইবে না। শান্তি-প্রতিষ্ঠাকেও স্থায়ী করা যাইবে না। কথাগুলি যে সত্য, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু য়ুরোপের শক্তিশালী জাতিদিগের যেরূপ মনোবৃত্তি দেখা যাইতেছে, তাহাতে তাহা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। ভার্সাইলেস সন্ধির প্রাণ-শক্তি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন তাহার সেই শুষ্ক কঙ্কালকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিলে নিস্তার পাইবার উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। আজ ফ্রান্স, ইটালী এবং রুসিয়া প্রভৃতি সকলে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইতেছে আর জার্ম্মাণী তাহা করিতে যাইলে তাঁহারা রক্তচক্ষু দেখাইবেন, ইহা কখনই বিচারসঙ্গত হইতে পারে না।

বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতেই ফ্রান্স জার্ম্মাণীর শঙ্কায় অধিক শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। ফ্রান্সই জার্ম্মাণীকে চিরদিন পঙ্গু করিয়া রাখিতে চাহেন। ভার্সাইলস সন্ধির সর্ত্ত যাহাতে জার্ম্মাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া যান, সে দিকে ফরাসী রাজপুরুষদিগের শ্যেনদৃষ্টি রহিয়াছে। এই ফ্রান্সের মঁসিয়ে লাভাল জাতিসঙ্ঘের সমক্ষে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন যে, জার্ম্মাণী গত ১৫ই মার্চ্চ বাধ্যতা-মূলক সমরশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ভার্সাইল সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়াছে। অতএব জার্ম্মাণীকে অপরাধী বলিয়া ঘোষণা করা হউক। মঁসিয়ে লাভাল অবশ্য বলিয়াছেন যে, ফরাসীরা বরা-বরই য়ুরোপের শান্তিরক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন ইত্যাদি। কিন্তু ফরাসী মহাশয় জানা উচিত যে, পৃথিবীর কোথাও পক্ষপাতপূর্ণ ব্যবস্থার দ্বারা কোন দেশের বা মহাদেশের নির্ব্বিঘ্ন অবস্থা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। যাহা হউক, জাতিসঙ্ঘ লাভালের প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া লইয়াছেন। একমাত্র ডেনমার্ক ভিন্ন আর সকলেই সেই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছেন। এখন কি করা হইবে? জার্ম্মাণী ত সে কথা শুনিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়ে নাই। বরং জার্ম্মাণরা বলিতেছেন যে, জাতিসঙ্ঘের ঐ সিদ্ধান্ত পক্ষপাতিত্বপূর্ণ। জার্ম্মাণীর সংবাদপত্রগুলি সমস্বরে বলিতেছেন, "জার্ম্মাণ জাতি কাহারও ভ্রূভঙ্গীতে ভীত নহে। কতকগুলি জাতি চক্রান্ত করিয়া বলিতেছে যে, জার্ম্মাণরাই কেবল দোষী আর সকলে সাধু।" আর একখানা বড় জার্ম্মাণ সংবাদপত্র বলিয়াছেন,— "প্রস্তাবটি মিথ্যার মূর্ত্তি; সত্যের বিকৃতি চূড়ান্ত ভণ্ডামি এবং জার্ম্মাণীর পক্ষে অপমানজনক।" সুতরাং অবস্থা শঙ্কাপূর্ণ। এখন এই ব্যাপার লইয়া অনেক আস্ফালন এবং আস্ফোটন হইবে। কিন্তু শেষটা কি দাঁড়াইবে, কে বলিতে পারে? জার্ম্মাণীর যদি বুদ্ধি থাকে, তাহা হইলে সে কখনও অগ্রবর্ত্তী হইয়া কাহাকেও আক্রমণ করিবে না। ফ্রান্স ভিন্ন অন্য কাহারও এখন জার্ম্মাণীকে আক্রমণ করিয়া একটা ফ্যাসাদ বাধাইবার ইচ্ছা নাই। ফ্রান্সও সহজে একটি সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে চাহিবেন না। মার্কিণ এখন দূরে দাঁড়াইয়া ব্যাপারটি দেখিতে চাহেন। বৃটেন চাহেন ডানিউব প্যাক্ট ও অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে। ইটালী আবিসিনিয়ায় এক হাঙ্গামা বাধাইয়াছেন। তিনি তাহা লইয়াই ব্যস্ত। তবে অষ্ট্রিয়া যাহাতে জার্ম্মাণীর সহিত মিলিত না হয়, সে দিকে ইটালীর দৃষ্টি আছে।

সুতরাং ইটালী অগ্রে যুদ্ধে অগ্রসর হইবে না। কাযেই আমাদের মনে হইতেছে যে, আস্ফালন এবং আস্কালন-ভিন্ন উপস্থিত এই ব্যাপারে আর কিছুই হইবে না। তবে বিধাতার যাহা ইচ্ছা, তাহাই হইবে। ক্ষুদ্র মনুষ্যের তাহা অনুমান করা অসম্ভব।

উরুগুয়ায় বিদ্রোহ

উরুগুয়া দক্ষিণ-আমেরিকার একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। রাজ্যটিতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু অধুনা গেব্রিয়েল টেরা নামক উহার প্রেসিডেণ্ট তিন বৎসরকাল তথায় স্বৈরশাসকের হিসাবে কায করিতেছেন। এই রাজ্যটির ভূমি-পরিমাণ ৭২ হাজার ১ শত ৫১ বর্গ-মাইল, লোকসংখ্যা ১৮ লক্ষ ১০ হাজার আন্দাজ হইবে। রাজ্যটি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এই রাজ্যের অধিবাসীরা প্রায় শ্বেতাঙ্গ। ইহারা ইটালী ও অন্যান্য য়ুরোপীয় দেশ হইতে আমদানী। ইহার জনসাধারণ সকলেই সুশিক্ষিত। ইহার রাজধানী মন্টিভিডিও নগরে সর্ব্বস্বত্ববাদী, সমাজতন্ত্রবাদী, বিপ্লববাদী সকল সম্প্রদায়ের লোকই স্বচ্ছন্দে নিজ নিজ মত ব্যক্ত করিয়া থাকেন। এই নগরের দেওয়ালে এবং প্রাচীরে সকল মতাবলম্বী লোকই অবাধে আপনাদের বিজ্ঞাপন এবং প্রচারপত্র আঁটিয়া দিয়া থাকেন। এইরূপ বহুবিধ মতাবলম্বী লোকদিগকে শান্ত রাখা বড়ই কঠিন। এই দেশে দুইটি বড় বড় দল আছে, যথা—ব্লাঙ্কো (Blancos) এবং কোলোরেডো (Colorodo)। এই দুইটি দলই এখন তথাকার শাসক গেব্রিয়েল টেরার বিরুদ্ধাচারী হইয়া উঠিয়াছে। গত জানুয়ারী মাসের শেষ হইতে ইহাদের সহিত সরকারী সৈনিকদিগের সঙ্ঘর্ষ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখানকার এই দুই দলের মধ্যে কোলোরেডো দলই বিশেষ প্রগতিশীল। এই দুই দলে বিলক্ষণ বিরোধ আছে। তবে উপস্থিত এই দুই দলই প্রেসিডেণ্ট গেব্রিয়েলের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে।

আর্থিক কষ্ট, পৃথিবীব্যাপী মন্দা, বিদেশে মুদ্রার বিনিময় মূল্যের বিপর্য্যয় এবং গণতন্ত্রমূলক প্রতিষ্ঠানের উপর আস্থাহীনতার ফলে উরুগুয়ার প্রেসিডেণ্ট স্বৈর ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। দেশের জনমত তাঁহার হস্তে স্বৈর ক্ষমতা প্রদানের সমর্থন করিয়াছিল। ইনি ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে এই ক্ষুদ্ররাজ্যের প্রেসিডেণ্ট পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাহার পর দুই বৎসর ধরিয়া তিনি তথাকার প্রতিনিধি সভার অধিকার-সঙ্কোচের এবং ৯ জন সদস্য-সম্বলিত শাসন পরিষদের অস্তিত্ব বিলোপের জন্য চেষ্টা করিয়া আসিয়াছিলেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে টেরা ব্যাপক বিদ্রোহের ভয়ে পার্লামেণ্ট বা প্রতিনিধি সভা ভাঙ্গিয়া দিলেন, এবং শাসন পরিষদের কয়েক জন সদস্যকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং স্বহস্তে স্বৈরশাসনের ক্ষমতা লইয়াছেন। ইহার তিন মাস পরেই ঐ দেশের জনসাধারণ ইঁহার ঐ কার্য্যের সমর্থন করেন।

কিন্তু এইরূপ অবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। প্রেসিডেণ্ট গেব্রিয়েল টেরার পক্ষাবলম্বী লোকরা একে একে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে লাগিল। এখন তিনি বড় দুইটি রাজনীতিক দল কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন। ছোট ছোট দলগুলি একীভূত হইয়া এখন তাঁহার সমর্থন করিতেছে। তবে এখনও সৈনিকদিগের মধ্যে অসন্তোষের বিস্তার হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। এখনও সরকারী সৈন্যরা বিদ্রোহীদিগের সহিত সংগ্রাম করিতেছে,—কিন্তু উহারা বাঁকিয়া দাঁড়াইলেই বিপদ।

কিউবার বিপ্লব

কিউবার কথা আমরা পূর্ব্বে বহুবারই বলিয়াছি। এই দ্বীপটি ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান দ্বীপপুঞ্জের সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চিমে স্থিত এবং বৃহৎ দ্বীপ। দ্বীপটি ৪৪ হাজার ২ শত ১৫ বর্গ-মাইল বিস্তৃত। ইহার লোকসংখ্যা ৩৬ লক্ষের কম নহে। এই দ্বীপটি প্রথমে স্পেনের অধীন ছিল,



প্রেসিডেণ্ট কার্লো মেণ্ডিয়েটা

তাহার পর মার্কিণ ইহা দখল করিয়াছিলেন। এখন মার্কিণ এই দ্বীপটি ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিয়া ইহা একটি প্রজাতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর হইতেই এই রাজ্যে নানা গণ্ডগোল চলিতেছে। তথায় নানারূপ বিপ্লব নানাদিক দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এখানে নানা মতাবলম্বী লোক বিরাজ করিতেছে, কিন্তু তাহারা পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ সমন্বয়ীভূত করিয়া চলিতে পারিতেছে না।

গত বর্ষের বৈশাখ মাসে "কিউবার অদৃষ্ট" সম্বন্ধে আমরা তথায় যে গণ্ডগোল ঘটিবার আভাস দিয়াছিলাম,—এক বৎসর পরে দেখা যাইতেছে, তাহা অনেক ঠিক হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট কার্লো মেণ্ডিয়েটার বিরুদ্ধে ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট কার্লো মেণ্ডিয়েটা এক জন সাধু-চরিত্রের ভদ্রলোক। তাঁহার বয়স এখন প্রায় ৬১ বৎসর হইবে। তিনি অনেকটা রক্ষণশীল। যুবক দলের ন্যায় তিনি সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তছ্‌নছ্‌ করিতে চাহেন না। তরুণ দল কিন্তু তাহা পছন্দ করেন না। তাঁহারা চাহে,—উধাও হইয়া প্রগতির স্রোতে ভাসিয়া যাইতে। উদারনৈতিক দলের জননায়ক গেরার্ডো মেচাডো ইঁহার বিরুদ্ধ দলভুক্ত হইলেও

তিনি শতমুখে মেণ্ডিয়েটার প্রশংসা করিয়াছেন। ইনি এক জন সাধু-চরিত্রের এবং স্বদেশপ্রাণ ব্যক্তি বলিয়া এত দিন কিউবার প্রেসিডেণ্ট পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু আর তিনি তথায় অধিক দিন থাকিতে পারিবেন বলিয়া আশা হয় না। ধর্ম্মঘট, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, বিদ্রোহ, ষড়যন্ত্র, কূটকৌশল, বিপ্লব প্রভৃতি যত নীচ উপায় আছে, সমস্তই অবলম্বন করিয়া ইঁহার পতন-সাধনের জন্য ইঁহার বিপক্ষ দল চেষ্টা করিতেছেন। হাভেনা এবং মিয়ামি হইতে ষড়যন্ত্রকারীরা নানা ফন্দী চালাইতেছেন। প্রেসিডেণ্ট মেণ্ডিয়েটা ঐ সকল বিদ্রোহীকে প্রশমিত করিবার জন্য অনেক প্রকার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সর্ব্ববিধ চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট গ্রাউয়ের দল হাভেনা এবং মিয়ামি সহর হইতে বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তৃপক্ষদিগের বিরুদ্ধে নানাবিধ অপবাদ এবং কুৎসামূলক আন্দোলন চালাইতেছেন। এক দল লোক বলিতেছেন যে, প্রেসিডেণ্ট মেণ্ডিয়েটা এবং ব্যাটিষ্টা পদ ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের দলে যোগদান করুন, তাহা হইলে এই বিষয়ের আপোষের ব্যবস্থা হইবে। মেণ্ডিয়েটা সে প্রস্তাবে সম্মত নহেন। তিনি বলেন যে, তাঁহার স্থানে যত দিন নিয়মানুগভাবে কোন ব্যক্তি প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত না হইতেছেন, তত দিন তিনি প্রেসিডেণ্টের পদ পরিত্যাগ করিবেন না। ফুলজেনাসিয়া ব্যাটিষ্টা বিশেষ কোন কথা বলিতেছেন না সত্য, কিন্তু মেণ্ডিয়েটা যাহা করিতেছেন, তাহার মূলে তাঁহার পরামর্শ আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এখন অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিই বলিতেছেন যে, রাজনীতিক, আর্থিক এবং সামাজিক অবস্থার পরস্পর প্রতিক্রিয়ার ফলেই কিউবার এই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। কিউবাবাসীরা চারি শত বৎসর ধরিয়া স্পেনের এবং ৩৬ বৎসর ধরিয়া মার্কিণের অধীন ছিল বলিয়া তাহাদের আর স্বাধীনভাবে আর্থিক এবং রাজনীতিক কার্য্য পরিচালিত করিবার শক্তি নাই। তাহারা কখনই রাজনীতিক এবং আর্থিক ব্যাপার পরিচালিত করিতে শিক্ষা লাভ করে নাই। কিউবার প্রেসিডেণ্টগণ মার্কিণের পরামর্শ দ্বারা চালিত এবং কিউবার আর্থিক ব্যবস্থার পরিচালকবর্গ নিউ ইয়র্কের বণিক-সম্প্রদায়ের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়া আসিয়াছেন। ইঁহারা এ পর্য্যন্ত জাতীয় ভাবে এই সকল বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতে শিখেন নাই। সেই জন্য কতকগুলি লোক পরামর্শ দিতেছেন যে, কতকগুলি বিশিষ্ট বিদেশী বিশেষজ্ঞকে আহ্বান করিয়া এই বিষয়গুলি—বিশেষতঃ কিউবার আর্থিক ব্যাপারগুলি পরিচালিত করিবার বা ঐ সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার ব্যবস্থা করা বিধেয়। কিন্তু তাহা হইলেও এই দুঃসময়ে কিউবাবাসীদিগের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইতেছে না। তাঁহাদের এ বি সি দল এবং আটেন্টিকো দল নামধেয় দুই সম্প্রদায়ের লোক পরস্পর অত্যন্ত তিক্তভাবে কামড়া-কামড়ি করিতেছে। তাহাদের দেশাত্মবোধ এত দূর নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে যে, বর্ত্তমান সময়ে প্রেসিডেণ্ট মেণ্ডিয়েটা তাঁহার বুদ্ধি যে পরিমাণে দেশের কাযে বিনিয়োগ করিতে পারেন, তাহাও তাঁহারা করিতে দিতেছেন না। এমন কি, যে শর্করার কার্য্য কিউবার ধনাগমের প্রধান উপায়, প্রেসিডেণ্টকে বিব্রত করিবার জন্য তাঁহারা কিউবার সেই ইক্ষুক্ষেত্রে অগ্নি প্রদান করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেছেন না। সেই জন্য মেণ্ডিয়েটা আইন করিয়াছেন যে, ইক্ষুক্ষেত্রে অগ্নি প্রদান করিলে বা করিবার চেষ্টা করিলে অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইবে। নির্ব্বাচনের দিন পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু নির্ব্বাচনের ফল যাহাই হউক না কেন, তাহাতে বিশেষ কিছু আসিবে যাইবে না। গোলমাল এইরূপই থাকিয়া যাইবে। তবে যদি কোন শক্তিশালী পুরুষ ঐ দ্বীপের স্বৈর-শাসক হইতে পারেন, তাহা হইলে হয় ত কিউবাবাসীরা এই সঙ্কট হইতে ত্রাণ পাইতে পারে। নতুবা ঐ দ্বীপবাসীদিগকে আবার হয় ত মার্কিণের কবলে পড়িতে হইবে।

আবিসিনিয়ার ভাগ্য

আবিসিনিয়া বা প্রাচীন ইথিওপিয়ার ভাগ্যে যে বর্ত্তমান সময়ে অত্যন্ত দুর্গ্রহ ঝুলিতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যখন ইটালীর লোলুপ দৃষ্টি এই রাজ্যটির উপর পতিত হইয়াছে, তখন ইহার আর নিস্তার নাই, ইহা সহজেই মনে হইতে পারে। ইথিওপিয়ার রাজবংশ অতি প্রাচীন। প্রকাশ এই যে, এই রাজ্যের রাজা প্রথম হাইলসিলাসী রাজা সলোমন এবং তাঁহার পত্নী রাণী সেবার বংশধর। রাজা সলোমন খৃষ্ট জন্মিবার সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং এই হিসাবে রাজা হাইলসিলাসীর পূর্ব্বপুরুষগণ প্রায় তিন হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। এই রাজবংশের বিলোপ হইলে সমস্ত পৃথিবীবাসী লোকের বিশেষ ক্ষোভের কারণ হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মধ্যে এই ব্যাপারটা বিনা যুদ্ধে মীমাংসিত হইবে বলিয়া একটু আশা জন্মিয়াছিল, কিন্তু সামান্য চপলাচমকের ন্যায় সে আশা নৈরাশ্যের অন্ধকারে বিলীন হইয়া গিয়াছে। রাজা হাইলসিলাসী গত ১০ই জানুয়ারী তারিখে জেনিভার জাতিসঙ্ঘের নিকট ইটালীর আক্রমণ সম্বন্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিবার জন্য দূত পাঠান। এই বিষয় লইয়া বৃটিশ, ফরাসী এবং ইটালীর প্রতিনিধিদিগের মধ্যে এক পরামর্শও হইয়াছিল। ফরাসী এবং মার্কিণী প্রতিনিধিরা কতকটা আবিসিনিয়ার প্রতিনিধির পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। শেষে ২৪শে জানুয়ারী সাব্যস্ত হয় যে, ইটালী আর আবিসিনিয়ার নিকট হইতে ক্রটি স্বীকার বা ক্ষতিপূরণের দাবী করিবেন না। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ইটালী এবং আবিসিনিয়ার মধ্যে যে সন্ধি হইয়াছিল, তাঁহারা তদনুসারেই এই ব্যাপারের মীমাংসা করিয়া লইবেন। এই সময়ে আশা হইয়াছিল যে, ইটালী তাঁহার আবিসিনিয়ার উপর লোভ আপাততঃ সংযত করিবেন। বৃটিশ অধিকৃত সোমালিল্যাণ্ডের ও আবিসিনিয়ার মধ্যে যেরূপ সীমারেখা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেইরূপ সীমারেখাই ইটালী ও আবিসিনিয়ার মধ্যে ধার্য্য করিয়া এই সমস্যার সমাধান করা হইবে।

যাহা হউক, ইহার পর গত ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ইটালীর এক সরকারী সংবাদে প্রকাশ পাইল যে, উয়ালউয়ালের দক্ষিণস্থিত আর্কদার নামক স্থানে ২৯শে জানুয়ারী তারিখে আবিসিনিয়ার এক দল সৈন্য ইটালীয়ানদিগের সামরিক ছাউনি আক্রমণ করে এবং তাহার ফলে উভয় পক্ষেই কয়েক জন লোক হতাহত হয়। সেই জন্য ইটালী আদ্দিস আবাবাস্থিত ইটালীর দূতকে এই ব্যাপারের তীব্র প্রতিবাদ করিতে বলিয়াছেন। ইহার ঠিক পরদিনই রোমে এই মর্ম্মে এক সংবাদ প্রচারিত হয় যে, আবিসিনিয়ার সম্রাট গোপনে

যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছেন। তিনি দুই ডিভিসন সৈন্য, তোপখানা, ট্যাঙ্ক ও মোটরাদি লইয়া সজ্জিত করিয়া ইটালীর সোমালিল্যাণ্ডের সীমান্ত-সান্নিধ্যে রক্ষা করিয়াছেন। প্রত্যেক ডিভিসনে ২৫ হইতে ৩৫ হাজার সৈনিক আছে। এই ব্যাপারে নিউইয়র্ক টাইমস্ বলিয়াছেন যে, "মুসোলিনী সত্য সত্যই আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড পন্থা অবলম্বন না করিয়া ছাড়িবেন না।" সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা হইয়াছে যে, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়া গিয়াছে, তাহার ১৩শ দফায় গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স এবং ইটালীর মধ্যে আবিসিনিয়া রাজ্যটি বিভক্ত করিয়া লইবার কথা আছে। পক্ষগণ অবশ্য সে কথা স্বীকার করেন না। তবে গুজবে প্রকাশ যে, ইটালী আবিসিনিয়ায় তাহার অধিকার বিস্তৃত করিবার চেষ্টা করিলে, ফ্রান্স এবং বৃটেন তাহাতে আপত্তি করিবেন না। এই গুজব কতদূর সত্য, তাহা পরবর্তী ব্যাপারেই প্রকাশ পাইবে।

এ দিকে মার্কিণের নিগ্রোরা এই যুদ্ধে রাজা হাইলিসিলাসীকে সাহায্য করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছে। নিউইয়র্ক সহরে আবিসিনিয়াবাসীদিগের যে ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ্চ আছে, তাহাতে ৩ হাজার নিগ্রো ইটালীয়দিগের এই ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে এবং যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কিছু টাকা তুলিয়াছে। তাহারা তাহাদিগকে রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিবার জন্য মার্কিণী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদনও করিয়াছে। তাহারা সম্রাট হাইলসিলাসীর নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছে যে, মার্কিণবাসী প্রত্যেক নিগ্রোই ইটালীর সহিত সংগ্রামে আবিসিনিয়ার রাজাকে সাহায্য করিবে। এই ব্যাপারে আর একটা বড় দিক আছে। প্রকাশ—জাপানের সহিত আবিসিনিয়ার মিত্রভাব আছে। আবিসিনিয়া জাপানী বাণিজ্য বিস্তারের পক্ষপাতী। জাপানীরা আবিসিনিয়ার সৈনিকদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিতেছে। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, যুদ্ধ বাধিলে জাপান আবিসিনিয়ার সহায়তা করিবেন। ফলে মধ্যে মধ্যে ঠোকাঠুকি যুদ্ধ ত হইতেছে। সেই সকল সংবাদ এ দেশে আসিতেছে না। তবে ব্যাপারটা খুব সহজ হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। সেই জন্য মার্কিণ এবং জাতিসঙ্ঘ এই ব্যাপারের একটা মীমাংসা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন।

সম্প্রতি (গত ১০ই বৈশাখ) রোম হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, আবিসিনিয়া সরকার ইটালীকে সরকারী হিসাবে জানাইয়া দিয়াছেন যে, আবিসিনিয়ার সহিত ইটালীর সীমান্ত-সম্পর্কিত বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার ভার তাঁহারা ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের সন্ধিসর্ত্ত অনুসারে মিলন কমিটীর হস্তে সমর্পণ করিতে সম্মত আছেন। এই সংবাদ সত্য হইলে বুঝিতে হইবে যে, এখন উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠে নাই এবং আবিসিনিয়া শান্তভাবে আপোষ-নিষ্পত্তি করিতে চাহিতেছেন।

ফাসিজ্‌মের বিরুদ্ধে হাঙ্গেরীর অভ্যুত্থান

ইদানীং হাঙ্গেরী ফাসিজ্‌মের বিস্তার আশঙ্কায় শঙ্কিত। এই শঙ্কা তথাকার রাজনীতিকদিগের মনের অনেকটা স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে। গত মার্চ্চ মাসের প্রারম্ভে হাঙ্গেরীর মন্ত্রিসভা হইতে সেনাপতি জুলিয়াস গম্বোজের দলকে নির্ব্বাসন এবং বুডাপেষ্টের পার্লামেণ্টকে বিদায় দানের পর হইতে এই সমস্যা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। হাঙ্গেরী এখন যুরোপীয় রাজনীতির অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে বলিয়া উহার কথা বিশেষভাবে আলোচনা করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। উহার কথা বুঝিতে হইলে উহার পূর্ব্ববর্ত্তী ইতিহাস কিছু স্মরণ করা আবশ্যক।

যুরোপীয় মহাযুদ্ধ যখন ক্ষান্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহার পর তিন জন লোক হাঙ্গেরীর রাজনীতিক্ষেত্রে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ঐ তিন জনের নাম ভাইস এডমিরাল নিকলাস হর্দ্দি ডি নগাইবাঙ্গা, সেনাপতি জুলিয়াস গম্বোজ এবং কাউণ্ট ষ্টিফেন বেথলেন। এডমিরাল হর্দ্দির ক্ষমতা ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতে থাকে, পক্ষান্তরে, সেনাপতি গম্বোজ এবং কাউণ্ট ষ্টিফেন বেথলেন



জুলিয়াস গম্বোজ

পরস্পর অধিকতর ক্ষমতালাভের জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। ইঁহারা দুই জন পূর্ব্বে পরস্পর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। গত বৎসর ইঁহারা পরস্পর প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পরে গম্বোজই প্রাধান্য লাভ করেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বেলাকুনের নেতৃত্বে হাঙ্গেরীতে ইতর জনদিগকে লইয়া এক সরকার খাড়া করা হয়। রুমেনিয়ার সৈন্যদল হাঙ্গেরী আক্রমণ করিয়া ইহাদিগকে বিতাড়িত করিয়াছিল। সেই সময় এডমিরাল হর্দ্দি বুডাপেষ্টের জাতীয় সৈন্যদিগের নায়ক হইয়াছিলেন। ভিয়েনা হইতে সেনাপতি গম্বোজ এবং কাউণ্ট বেথলেন বিদ্রোহীদিগের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া এডমিরাল হর্দ্দিকে আয়ত্তমধ্যে রক্ষা করেন। এই সময় রাজতন্ত্রীদিগের বিদ্রোহ প্রশমিত করিয়া কাউণ্ট বেথলেন প্রধান মন্ত্রীর আসন অধিকৃত করিয়াছিলেন।

বেথলেন দশ বৎসরকাল মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া রাজনীতি-ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতার এবং সুবিধাবাদিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। ইনি বংশগত দাবীতে রাজ্যাধিকারের অধিকার স্বীকার করেন না এবং সমাজতন্ত্রবাদীদিগের ঘোর বিরোধী। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে কাউণ্ট বেথলেন প্রধান মন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করেন।

পরবৎসর গম্বোজই প্রধান মন্ত্রীর আসন অধিকৃত করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে গম্বোজ বেথ্লেনের সহিত স্বতন্ত্র হইয়া ফাসিষ্ট দল গঠিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি আবার সে মতভেদের সংশোধন করিয়া লইয়া জাতীয় একতাসাধক দলে যোগদান করিয়াছিলেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহুদীদিগের উপর তাঁহার যে বিরোধিতা ছিল, তাহাও কতকটা প্রশমিত করিয়াছিলেন। তিনি সামরিকতার পক্ষপাতী ছিলেন। হাঙ্গেরীর যুবকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তিনি সামরিক শিক্ষার তালিম দিতেছিলেন। তিনি প্রথমে ইটালীর ফাসিষ্টদিগের বিশেষ প্রশংসা করিতেন বটে, কিন্তু পরে জার্ম্মাণ নাজীদিগের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইতেন। তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক লইয়াই শাসনতন্ত্র পরিচালনা করিতেন; তাঁহার মন্ত্রিসভায় কোন খেতাব-ওয়ালা লোক ছিল না। তিনি ভূমিসম্পর্কিত বিধানগুলির সংস্কার-সাধন, তাহার প্রশান্ত অবস্থা এবং প্রগতিশীল পৌরুষ তাঁহার অনেক অনুরক্ত ভক্ত জুটাইবার হেতু হইয়াছিল। ডাক্তার ফ্রান্সিস কিসার ছিলেন পল্লী অঞ্চলের মন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্র-সচিব। তিনি পদত্যাগ করিলে পরে বিগত ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে গম্বোজ আবার মন্ত্রি-পরিষদের পুনর্গঠন করেন। এই উপলক্ষে কাউণ্ট বেথলেনের সহিত গম্বোজের আবার একটা বিচ্ছেদ ঘটে। ইহার পরই হাঙ্গেরীর পার্লামেণ্ট বা প্রতিনিধিপরিষদকে বিদায় দেওয়া হয়। দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে বেথলেন যে শাসনপদ্ধতি সংগঠন করিয়া ছিলেন, তাহা হইতে তিনি এই সময় সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং শাসনতন্ত্র-সংরক্ষণকল্পে একটি দল গঠন করিয়াছিলেন। এখন আবার হাঙ্গেরীতে এক জন স্বৈর-শাসক উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা জাগিয়া উঠিয়াছে। দেখা যাইতেছে যে, সমস্ত য়ুরোপে বুঝি গণতন্ত্র ঘুচিয়া যায় এবং স্বৈর-শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

বালক রাজা

শৈশবে কোন কোন লোকের ভাগ্যে রাজতক্ত মিলিয়া থাকে, ইহা ভাগ্যদেবতার এক দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকা। কিন্তু এরূপ কাণ্ড অনেক হয়। ভারতে আকবর বাদশাহ তের বৎসর বয়সে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীতে অনেকগুলি শিশু-রাজা আছেন। তন্মধ্যে যুগোশ্লেভিয়ার রাজা পিটারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহার পিতা আলেকজাণ্ডার ফ্রান্সের মার্শেইলিস্কে নিহত হইবার পর তিনিই যুগোশ্লেভিয়ার রাজা বলিয়া ঘোষিত হন। তিনি তখন বিলাতের কোভামের স্যাণ্ডরয়েড স্কুলে পড়িতেছিলেন। তাঁহাকে যখন বেলগ্রেডে যাইয়া রাজ্যভার লইবার কথা বলা হয়, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি রাজ্যভার গ্রহণের যোগ্য হইয়া উঠেন নাই। আবার গত ২রা মার্চ্চ শনিবার অপরাহ্ণে শ্যামরাজ্যের ভূতপূর্ব্ব ভূপতি রাজা প্রজাধিপক সিংহাসন পরিত্যাগ এবং রাজোচিত দায়িত্ব পরিহার করেন। তখন তাঁহার একাদশবর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্র আনন্দমহীদল স্থইটজারল্যাণ্ডের ল্যুসেনের এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। শ্যামদেশের আইনমতে তাঁহারই রাজা হইবার কথা। সে কথা সেই শিশু ভূপতিকে জানান হইলে, তিনি বলেন যে, তিনি রাজ্যে যাইতে চাহেন না।



রাজা প্রজাধিপক



আনন্দমহীদল

বিদ্যালয়ে থাকিয়াই খেলা করিয়া বেড়াইবেন। রাজ্যভার ঘাড়ে আসিয়া পড়াতে তিনি বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলেন। নিয়তির কি দুর্ব্বোধ্য উপহাস! তবে যুগোশ্লেভিয়ার শিশু রাজা পিটার যত দিন সাবালক (১৮ বৎসর বয়স প্রাপ্ত) না হইবেন, তত দিন তাঁহার রাজ্যাভিষেক হইবে না। শ্যামরাজ আনন্দমহীদল যত দিন নাবালক থাকিবেন, তত দিন তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া কয়েকজন রাজকার্য্য চালাইবেন। রিজেন্সিতে কে কে থাকিবেন, তাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই।

বালক রাজগণের মধ্যে রুমেনিয়ার বর্ত্তমান যুবরাজ মাইকেলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যখন তাঁহার বয়স কেবল পাঁচ মাস মাত্র, তখন ১ কোটি ৭০ লক্ষ রুমেনিয়াবাসীর শাসনভার তাঁহার স্কন্ধে ন্যস্ত হইয়াছিল। যে সময় তাঁহার পিতা কেরল (Carol) নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, সেই সময় যুবরাজ মাইকেল রাজা হইয়া তাঁহার দেশের পার্লামেণ্টের উদ্বোধন করিতেন, সৈন্যদিগের কুচ-কাওয়াজ দেখিতেন এবং সরকারী কাগজপত্রে স্বাক্ষর করিতেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁহার পিতা রাজা কেরল আবার তাঁহার রাজ্য

ফিরাইয়া পাইয়াছিলেন, তখন যুবরাজ মাইকেল স্বেচ্ছায় রাজ্য ছাড়িয়া আবার শিশুজনের স্বাভাবিক কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন।

এইরূপ অনেক বালকের ভাগ্যেই অতি শৈশবে রাজ্যলাভ ঘটিয়াছে। চীনের শেষ-মাঞ্চুরাজা স্বয়ানটাং তাঁহার পিতৃব্যের মৃত্যুর পর চীনের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন, তখন তিনি নিতান্ত শিশু ছিলেন। তাহার পর যখন ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মাঞ্চুবংশীয় রাজগণের অবসান করা হয়, তখন তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তখন তাঁহার বয়স ছিল সাত বৎসর মাত্র। তাহার পর আবার ৯১৭ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি চাং শুনের ষড়যন্ত্রে তিনি আবার আট দিনের জন্য পিকিনের সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। তিনি পনও শিশু সম্রাট বলিয়া পরিজ্ঞাত। তিন বৎসর পূর্ব্বে তিনি মাঞ্চুকুয়োর প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হইয়াছেন। শিশুরা বিনা চেষ্টাতেই রাজ্যলাভ করে ইহা বিদিত ভুবনে।



শিশুরাজা পিটার



রাজা কেরল

মাতৃত্ব ও শিশুমঙ্গল

পার্শীগ্রন্থে একটি প্রবাদ আছে,—"ফুল বনের মধ্যে ফোটে, প্রকৃতিকে তাহার সৌন্দর্য্য জানায়, বায়ুর সঙ্গে তাহার সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে, ক্রমে লীন হইয়া ঝরিয়া পড়ে; কিন্তু দুঃখ হয় যে, ফুল ফোটার পূর্ব্বেই ধরাশায়ী হয়। নারী জন্মার পৃথিবীতে আয়ুষ্মতী মাতারূপে সুসন্তান প্রসবের জন্য। মাতাই তাঁহার গর্ভস্থ শিশুকে পরিপুষ্ট করেন, জন্মের পর তাহাকে স্তন্যদান করিয়া পালন করেন। বর্দ্ধনশীল শিশুর খাদ্যের ও স্বাস্থ্যের জন্য তিনিই একমাত্র দায়ী। মাতার স্বাস্থ্য ভাল না হইলে প্রসবের সময় একটি সমস্যার কথা। বাঙ্গালাদেশে বোধ হয় ২৫।৩০ হাজার প্রসূতি প্রতিবৎসর সন্তান প্রসব-সংক্রান্ত কোন না কোন কারণে মারা যান। ইহার তুলনায় ইংলণ্ডে যে স্থলে এক জন প্রসূতি মারা যান, আমাদের দেশে সে স্থলে প্রায় ৫০ জন প্রসূতি অকালমৃত্যু বরণ করেন।

একালের অপেক্ষা পূর্ব্বে বাঙ্গালার নারীদের স্বাস্থ্য শতগুণে ভাল ছিল, জীবনীশক্তিও সমধিক ছিল। তখন মাতা-পিতা উভয়ের স্বাস্থ্য অটুট থাকায় তাঁহাদের সন্তানের স্বাস্থ্য অনেক ভাল হইত। কিন্তু বর্ত্তমানকালে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। জলবায়ুর দোষে, উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে, ভেজালের উপদ্রবে এবং অন্যান্য নৈসর্গিক অনৈসর্গিক কারণে দেশের স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছে। বাঙ্গালার শক্তিরূপিণী নারীগণ এখন রোগে জীর্ণা। এরূপ ক্ষেত্রে প্রসবের পর প্রসূতি ও সদ্যপ্রসূত শিশুর জীবন যে নিরাপদ হয়, এমন বলা যায় না। প্রসবের পর অতিরিক্ত দুর্ব্বলতা হেতু অনেক প্রসূতি অচৈতন্য হইয়া পড়েন; অতিরিক্ত রক্তস্রাবে মাতা মারাত্মক রক্তহীনতা রোগে ভোগেন, অনেক সময়ে একজনই মারা যান। সে অবস্থায় প্রসূতিকে রক্ষাকল্পে নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তদনুরূপ ঔষধপত্রাদির ব্যবস্থা করিবারও বিশেষ প্রয়োজন আছে।

প্রসবান্তে দেহের যন্ত্রপাতির শৈথিল্য ঘটে, প্রসূতি কতক পরিমাণে অপটু ও অশক্ত হন, এজন্য পরিপুষ্টির ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। প্রসূতিকে পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে হয়, ভাল থাকিতে হয়, কারণ, মাতার পোষণের সহিত ক্ষুদ্র শিশুর বর্দ্ধনের অতি নিকটতম সম্বন্ধ। ভুক্তদ্রব্যের সার যে সঞ্জীবন রস, তাহাই মাতৃশরীরে রক্ত ও রসে পরিণত হইয়া মাতৃস্তন্যের সুধা দিয়া সদ্যোজাত শিশুর প্রাণ ও শক্তির সঞ্চার করে। ভগ্নস্বাস্থ্য মাতার উপর শিশুর মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। প্রসূতির শরীর ও মনের স্ফূর্ত্তি বাড়াইয়া তাঁহার স্বাস্থ্য পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করাই পরিজনগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রসূতির ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরায় ফিরিয়া পাইবার জন্য—সন্তান-প্রসবের পর দেহের সাময়িক দারুণ অভাব দূর করিবার জন্য কার্য্যকর ও ফলপ্রদ ঔষধের দরকার হয়। এ সব ক্ষেত্রে "রচিটোন" ব্যবহারে যে অশেষ ফল পাওয়া যায়, ইহা নিঃসন্দেহ। পাশ্চাত্যদেশ-সমূহের বহু বিখ্যাত হাঁসপাতালে রোগীর উপর রচিটোন ব্যবস্থা করিবার পর দেখা গিয়াছে, অতি অল্প-দিনের মধ্যে প্রসূতি নষ্টস্বাস্থ্য পুনরায় লাভ করেন, রোগীর রক্তকণা দ্রুত বর্দ্ধিত হয়, তাহার মন প্রফুল্ল থাকে, এবং স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, অগ্নিমান্দ্য ও মারাত্মক সূতিকা রোগ শীঘ্র দূরীভূত হয়। প্রসবের পর সামান্য খাদ্যদ্রব্য জীর্ণ করিবার শক্তিও প্রসূতির পাকযন্ত্রে থাকে না; তজ্জন্য প্রসূতি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়েন ও তাঁহার স্তন-দুগ্ধ কমিয়া যায়। বহু চিকিৎসক রচিটোন ব্যবস্থা দ্বারা এ ক্ষেত্রে বিশেষ সুফল পাইয়াছেন। মাতৃদুগ্ধই শিশুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট আহার্য্য।

ডাঃ কে, পি, মুখার্জ্জি (এম, বি)।

হিন্দু আইন

(উপক্রমণিকা)

ভারতের অতীত কৃষ্টি পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে অনুপম বস্তু। সে কৃষ্টি সর্ব্বপ্রাচীন কি না, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ ও যুক্তিমার্গের পথিক অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতের আমাদের দেশে একান্ত অভাব। হিন্দু সভ্যতার ধারাবাহিক প্রগতির কাহিনী এখনও ভাবী গবেষকের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে।

আসিরিয়া, ব্যাবিলন, মিশর ও চীনের সভ্যতা ভারতের সমসাময়িক কিংবা কিছু পুরাতন, কিন্তু ভারতের মত সেই সব সভ্যতার ধারা আজ পর্য্যন্ত অব্যাহত নয়। ভারতের অনুপম শাস্ত্রগ্রন্থ মানুষের জয়যাত্রার ইতিহাস সুস্পষ্ট ও সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু আমরা সাধারণতঃ বড়াই করি যে, প্রাচীন হিন্দু কেবল অধ্যাত্মতত্ত্বরসে মগ্ন ছিল। ব্রহ্মবিদ্যার আকাঙ্ক্ষা তাহার জীবনের সর্ব্বোত্তম কাম্য ছিল। তাই তাহার জীবনের সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা ধর্ম্মেই আবদ্ধ ছিল। আর যাহা হউক, ইহা কখনই সত্য নহে। হিন্দু যখন প্রাণবান্ ছিল, তখন প্রাণের অব্যাহত লীলা তাহার সর্ব্বসাধনায় পরিস্ফুট ছিল। তাই জীবনের সকল অঙ্গে সকল বিভাগে তাহার পরিপূর্ণ অধিকার ছিল। কেবল দর্শনে নয়, অর্থতত্ত্বেও ভারতের মন বেশ নিপুণ ছিল।

হিন্দুর ব্যবহারও প্রাচীন হিন্দুর জাগতিক বিষয়ে নৈপুণ্য ও কার্য্যকরী দক্ষতার পরিচায়ক। সাধারণ লোকে নয়, বড় বড় পণ্ডিতরাও বলেন যে, হিন্দুর যে আইন ছিল, তা আইন নয়, তাহাকে ধর্ম্ম, নীতি ও আইনের জগাখিচুড়ি বলা যায়।

মনীষী গোর তাঁহার Hindu code নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—"Hindu law is in essence a purely religious law. Like the laws of other nations, it has never been secularized and its progress has in consequence been retarded."

অর্থাৎ বস্তুতঃ হিন্দু আইন ধর্ম্মতত্ত্ব। অন্য সভ্য জাতির আইনের মত হিন্দু আইন কখনও জাগতিক হয় নাই, তাই ইহার প্রগতি বন্ধ হইয়া রহিয়াছে।

এ কথা একান্ত মিথ্যা। নিরপেক্ষ সত্যান্বেষীর দৃষ্টিতে যদি আমরা হিন্দুর ব্যবহার আলোচনা করি, তবে আমরা নিঃসন্দেহে বুঝিব যে, কুশাগ্রবুদ্ধি হিন্দু ঋষিরা ধর্ম্মের ও আইনের তফাৎ বুঝিতেন।

হিন্দুদের বড় একটা কথা ধর্ম্ম। ইহা শুধু religion নয়—কথাটা অত্যন্ত ব্যাপক। বেদের যুগে ঋষিরা অনুভব করিলেন যে, জগৎ-চরাচরের পিছনে একটা বিশেষ নিয়ম বা ধারা আছে—সেই নিয়মকে—তাঁহারা বলিলেন ঋত। ইংরাজী right কথাটি ঋত শব্দেরই রূপান্তর। বৈদিক ঋষিদের ধারণায় জগতের চলার ছন্দই ঋত—দেবতারা এই ঋত অনুসরণ করিয়াই কায করেন।

"ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাৎ তপসোঽধ্যজায়ত"

তপস্যা হইতেই ঋত ও সত্যের জন্ম হইয়াছিল। ঋত তাহার আপন স্বভাবেই আপন স্বধাতেই জগৎ চালাইতেন।

এই বিশ্বছন্দের জাগতিক রূপের নাম ঋষিরা দিলেন ধর্ম্ম। ঋত যেমন বিশ্বকে চালায়, ধর্ম্মই তেমনই সমাজকে চালায়। ধর্ম্ম ধারণ করে—তাই ধর্ম্ম বলিতে মানুষের সকল কর্ত্তব্যই বুঝি।

কিন্তু মানুষের পারলৌকিক কর্ত্তব্যও কর্ত্তব্য, আর তাহার লৌকিক কর্ত্তব্যও কর্ত্তব্য। দুটির তফাৎ ঋষিরা বুঝিতেন।

মনুর টীকাকার মেধাতিথি ধর্ম্মের এক চমৎকার ব্যাখ্যান দিয়াছেন। তিনি বলেন, আমরা যে যাগযজ্ঞ করি, তাহার কারণ বেদ—যুক্তি দিয়া তাহার অর্থ বুঝা যায় না—আমরা যে কৃষিকর্ম্ম করি—তাহার কারণ যুক্তি—তাহার ভালমন্দ যুক্তি দিয়াই বুঝি। একটাকে বলা যায় দৃষ্টার্থ যুক্তিমূলক কর্ত্তব্য—আর একটা অদৃষ্টার্থ বেদমূলক কর্ত্তব্য। ব্যবহার যুক্তিমূলক দৃষ্টার্থ কর্ত্তব্য—ব্যবহার বুঝিবার জন্য যুক্তিই প্রমাণ।

রাজধর্ম্মের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে মেধাতিথি লিখিয়াছেন :—

"ধর্ম্মশব্দঃ কর্ত্তব্যতাবচনমিত্যুক্তম্। তদাশ্রঃ কর্ত্তব্যং তদিদানীমুচ্যত ইতি প্রতিজ্ঞা, কর্ত্তব্যঞ্চ দৃষ্টার্থং ষাড়্গুণ্যাদি অদৃষ্টার্থমগ্নিহোত্রাদি। তত্রেহ প্রাধান্যেন দৃষ্টার্থমুপদিশ্যতে অতৈব চ রাজধর্ম্মপ্রসিদ্ধিঃ।"

অর্থাৎ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধর্ম্ম মানে কর্ত্তব্য। রাজার কর্ত্তব্য এখন বর্ণনা করা হইবে। কর্ত্তব্য দুই প্রকার—এক যাহার ফল দেখিতে পাই, যেমন রাজার সামদানভেদাদি ষড়্গুণ। আর যাহার ফল দেখা যায় না—যেমন অগ্নিহোত্রাদি। এখন প্রধানতঃ দৃষ্টার্থ ধর্ম্ম বলা হইতেছে—এই জন্যই ইহাকে রাজধর্ম্ম বলা যায়।"

অতএব ধর্ম্মের সঙ্গে অলৌকিক বা অধ্যাত্মের সংযোগ নাই। ব্যবহার প্রধানতঃ দৃষ্টার্থ এবং যুক্তিমূলক। বেদমূলক যে ব্যবহার, তাহার কাম্য প্রায়শ্চিত্ত দণ্ড, কিন্তু রাজ-ব্যবহার তর্কপ্রত্যয় উৎপন্ন। রাজপালিত ব্যবহারই প্রজাপালক।

মহাভারতে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন যে, দণ্ডই ক্ষত্রিয়দের বেদ এবং সনাতন ব্যবহার।

শান্তিপর্ব্বের ব্যবহারের ব্যাখ্যার সহিত মেধাতিথির টীকা যদি আমরা মিলাইয়া পড়ি, তাহা হইলে আমরা নিঃসন্দেহে বুঝিব যে, হিন্দুরা জানিতেন যে, ব্যবহার তর্কপ্রত্যয় উৎপন্ন, দৃষ্টার্থ ও যুক্তিমূলক।

ব্যবহার কথায় নানা অর্থ দেখিতে পাই। ধাতু-প্রত্যয়ের যোগ ও বিয়োগে সংস্কৃতে একই শব্দের নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বাহির করা দুঃসাধ্য নয়। ব্যবহার কথাও নানা অর্থে ব্যবহার হইয়াছে।

মানুষের কল্পনায় অতীতে ছিল সত্যযুগ। তখন বাদ ছিল না, বিসংবাদ ছিল না। তার পর লোভ, দ্বেষ জাত হইলে ব্যবহার উৎপন্ন হইল। ব্যবহারের উদ্দেশ্য বিবাদভঞ্জন। সাংসারিক লোকের নানারূপ বাদবিতণ্ডা হয়, ব্যবহার তাহার মীমাংসা করে।

"বি নানার্থেঽব সন্দেহে হরণং হার উচ্যতে।
নানাসন্দেহহরণাদ্ব্যবহার ইতি স্থিতিঃ॥"

বি কথার মানে নানা, অব মানে সন্দেহ, যাহা নানা সন্দেহ হরণ করে, তাহাকে ব্যবহার বলে।

মনু আঠারো প্রকার বিবাদের কথা বলিয়াছেন। নারদ সেই আঠারো ভাগকে পুনরায় ১০৮ ভাগে ভাগ করিয়াছেন। কাত্যায়ন ক্রিয়াভেদ এবং বাদাভেদে বশতঃ ৮০০০ ভাগে ব্যবহার বিভক্ত, ইহাই বলিয়াছেন। লোভ ও দ্বেষ লইয়াই সংসারে কলহ ও বিবাদ হয়, মানুষ তখন যাহা বিধি, তাহা লঙ্ঘন করে, সেই জন্যই বিচারের প্রয়োজন হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন :—

"স্মৃত্যাচারব্যপেতেন মার্গেণাধর্ষিতঃ পরৈঃ।
আবেদয়তি চেদ্রাজ্ঞে ব্যবহারপদং হি তৎ॥"

যখন কেহ স্মৃতিবিধি বা আচার লঙ্ঘন করিয়া অপরকে শারীরিক বা আর্থিক পীড়া দেয়, তখন পীড়িত ব্যক্তি যদি রাজাকে নিবেদন করে, তখন ব্যবহারদর্শনের প্রয়োজন হয়।

কেহ নালিশ না করিলে রাজা আপনাপনি কোন বিবাদ উত্থাপন করিবেন না, ইহাই ছিল সাধারণ বিধি। অবশ্য এখনকার মত তখনও কোনও কোনও বিষয়ে রাজার নিজের অভিযোগে মোকদ্দমা হইত।

রাজা নিজে যে সমস্ত অপরাধে অভিযোগ করিতেন, বীরমিত্রোদয়ে তৎসম্বন্ধে পিতামহ, নারদ ও সংবর্তের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে পাই, রাজা নরহত্যা, করসংগ্রহবিরোধ, দুর্গে অনধিকারপ্রবেশ, রাজার গুপ্ত সন্দেশ বাহির করিয়া দিলে, জলাধার নষ্ট করিলে, অগ্নিদাহ করিলে, রাজার বিরুদ্ধে কোনও অন্যায় করিলে, রাজাদেশ অমান্য করিলে, নারীহত্যা, ব্যভিচার, চৌর্য্য, পশু, গোধন ও ব্রাহ্মণ নাশ করিলে, ভ্রূণহত্যা বা বালিকা হরণ করিলে নিজেই অভিযোগ করিতেন।

যাহা বলা হইল, তাহা হইতে জানি যে, বিবাদনিষ্পত্তিক বিষয়ই ব্যবহার। অতএব ব্যবহার বলিতে আইনই বুঝাইতেছে। কারণ, আইনের দ্বারাই বিবাদনিষ্পত্তি হয়। আমরা এখন যাহাকে আইন বলি, প্রাচীনরা তাহাকেই ব্যবহার বলিতেন। ব্যবহারকে চতুষ্পাদ বলা হইত। ব্যবহারস্বরূপনির্ণয় জন্য নারদের একটি সুন্দর বচন আছে।

"স চতুষ্পাচ্চতুঃস্থানঃ চতুঃসাধন এব চ।
চতুর্হিতশ্চতুর্ব্যাপী চতুষ্কারী চ কীর্ত্ত্যতে।
অষ্টাঙ্গোঽষ্টাদশপদঃ শতশাখস্তথৈব চ।
ত্রিযোনির্দ্বিরভিযোগো দ্বিদ্বারো দ্বিগতিস্তথা॥"

ব্যবহারের চার পা, চার স্থান, চার সাধন, চার প্রকারে হিতকর, চার রকম লোককে ব্যাপ্ত করে, চারটি জিনিষ করে, আটটি অঙ্গ, আঠারো ভাগ, তিনটি যোনি, দুই প্রকার অভিযোগ, দুইটি দ্বার এবং দুই রকম গতি।

ব্যবহারের চারি পাদ—ধর্ম্ম, ব্যবহার, চরিত্র, রাজশাসন।

"ধর্ম্মশ্চ ব্যবহারশ্চ চরিত্রং রাজশাসনম্।
চতুষ্পাদ্ ব্যবহারোঽয়ং উত্তরঃ পূর্ব্ববাধকঃ॥"

বিবাদ নির্ণয়ের চারিটি পন্থা :—ধর্ম্ম, ব্যবহার, চরিত্র, রাজশাসন। ইহার মধ্যে বিরোধে শেষেরটি পূর্ব্বের অপেক্ষা কার্য্যকর।

এই চারিটি সংজ্ঞা ধীরভাবে অনুসন্ধেয়। সন্দিগ্ধ অর্থ নির্ণয়ের জন্যই চারিটির প্রয়োজন হয়। কাত্যায়ন এই পারিভাষিক শব্দগুলির ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

"দোষকারী তু কর্ত্তৃকঃ ধনস্বামী স্বকং ধনম্।
বিবাদে প্রাপ্নুয়াত্তত্র ধর্ম্মেণৈব স নির্ণয়ঃ॥"

অপরাধী হিংসাদির কারণ যে সাজা পায়, ধনস্বামী যে কারণে ধন পায়, তাহা ধর্ম্মনির্ণয়ে পায়। ইংরাজীতে ধর্ম্মকে **Equity, justice and good conscience** বলা হয়।

দোষ করিলে সাজা পাওয়া নীতিসঙ্গত, ধনীর ধন কেহ লইলে তাহা ফিরিয়া পাওয়া তাহার উচিত, এই বিধানের ভিত্তি মানুষের অন্তর্নিহিত ধর্ম্মবুদ্ধি।

"স্মৃতিশাস্ত্রং তু যৎকিঞ্চিৎ প্রথিতং ধর্ম্মসাধকৈঃ।
কার্য্যাণাং নির্ণয়ার্থে তু ব্যবহারঃ স্মৃতো হি সঃ॥"

স্মৃতিকারেরা যে সমস্ত নিয়মকানুন লিখিয়াছেন, সেই স্মৃতির বিধান অনুসারে নির্ণয়কে ব্যবহার বলে। যেমন ধার নিলে সুদ দেওয়া নীতিসঙ্গত, কিন্তু কত সুদ, তাহার বিধান স্মৃতিতেই পাওয়া যাইবে। ব্যবহারকে **common law** বলিতে পারি।

চরিত্রকে **customary law** বলা যায়।

"যদ্যদাচর্য্যতে যেন ধর্ম্ম্যং বাঽধর্ম্ম্যমেব বা।
দেশস্যাচরণান্নিত্যং চরিত্রং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥"

দেশে ধর্ম্ম বা অধর্ম্মই হউক, যে যে নিয়ম বা প্রথা প্রচলিত আছে, নিত্যাচরিত সেই প্রথাকে চরিত্র বলা হয়।

"ন্যায়শাস্ত্রাবিরোধেন দেশদৃষ্টেস্তথৈব চ।
যং ধর্ম্মং স্থাপয়েদ্রাজা ন্যায্যং তদ্রাজশাসনম্॥"

রাজা শাস্ত্র এবং চরিত্রের সহিত অবিরুদ্ধ যে আইন বিধিবদ্ধ করেন, তাহাকে রাজশাসন বলে।

শেষ কেমন করিয়া প্রথমকে বাধা দেয়, স্মৃতিচন্দ্রিকায় তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। যদি কোনও রাজা কোন নারীর প্রতি অত্যাচার করে, তবে রাজা ধর্ম্মতঃ দণ্ডার্হ, কিন্তু রাজা যদি সাক্ষী-প্রমাণ হস্তগত করিয়া কেবল মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ায়, তখন ব্যবহারতঃ প্রমাণ না থাকায় দোষী রাজা নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হয়। অতএব ব্যবহার ধর্ম্মকে বাধা দিল।

যদি কোনও আভীর ব্যভিচার করে, তখন সাক্ষ্য-প্রমাণাদি দ্বারা অভিযোগ প্রমাণিত হইলেও আভীর চরিত্রের দ্বারা মুক্তি পাইবে, কারণ, তাহাদের মধ্যে এই প্রথা বিদ্যমান আছে।

লোকসমাজে প্রচলিত প্রথা যে, কেহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবে না, কিন্তু রাজার আদেশ পাইলে রাজপুরুষ এই প্রথা লঙ্ঘন করিতে পারে। কাজেই রাজশাসন চরিত্রের প্রতিবন্ধক হইল।

এই চারি পাদের চারি স্থান।

"তত্র সত্যে স্থিতো ধর্ম্মো ব্যবহারস্তু সাক্ষিষু।
চরিত্রং পুস্তকরণে রাজাজ্ঞায়াং তু শাসনম্॥"

ধর্ম্মনির্ণয় সত্যে প্রতিষ্ঠিত, সাক্ষীর দ্বারা ব্যবহার নির্ণয় হয়, চরিত্র পুস্তকে পাওয়া যায়, এবং রাজার আজ্ঞাই শাসন।

চাণক্য হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সে-কালের রাজারা বিভিন্ন দেশ ও জনপদে প্রচলিত আচার ও ব্যবহার লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন।

সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড—ব্যবহারের এই চারিটি সাধন। এই চারি সাধন দিয়া ব্যবহার চারি আশ্রমের হিত করে।

ব্যবহারের ফল বিচারককে এক পাদ, সাক্ষীতে এক পাদ, সভাগণে এক পাদ এবং রাজার এক পাদ সঞ্চারিত হয়, এই জন্য ব্যবহারকে চতুর্ব্যাপী বলা হয়।

ব্যবহার ধর্ম্ম, অর্থ, যশঃ ও লোকানুরাগের কারণ, এই জন্য ইহাকে চতুষ্কারী বলা হয়। ব্যবহারের আটটি অঙ্গ—রাজা, সভ্য, শাস্ত্র, গণক, লেখক, হিরণ্য, অগ্নি ও উদক।

তখনকার দিনে বিচার-সভায় রাজা প্রাঙ্মুখ হইয়া বসিতেন, রাজার সম্মুখে গণক বসিতেন, রাজার বামে লেখক বসিতেন এবং সভ্যেরা উত্তরে বসিতেন। শাস্ত্রানুসারে রাজা বিচার করিতেন, হিরণ্য ও অগ্নি দিব্যের জন্য রাখা হইত এবং তৃষ্ণানিবারণের জন্য জল রাখা হইত।

মনুর আঠারো ভাগের নাম ঋণাদান, উপনিধি, সম্ভূয়সমুত্থান, দত্তপ্রতিগ্রহণ, বেতনাদান, অস্বামিবিক্রয়, বিক্রয়ের পর অসম্প্রদান, ক্রীতানুশয়, স্বামিপাল বিবাদ, সীমাবিবাদ, দায়ভাগ, সাহস, স্ত্রী পুং-সম্বন্ধ, বাক্‌পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য, দ্যূতসমাহ্বয়, স্তেয় এবং সংবিদ্ব্যতিক্রম।

নারদ প্রকীর্ণক নামে নূতন একটি বিভাগ করিয়া তাহার মধ্যে বাকিগুলির থাকার ব্যবস্থা করেন।

কাম, ক্রোধ ও লোভ ব্যবহারের তিনটি যোনি, কারণ, সমস্ত বিবাদের মূলে ইহারা আছে। অভিযোগ দুই প্রকার; শঙ্কাকৃত সংসর্গদোষ হেতু যখন কাহাকেও সন্দেহ করা যায়, আর তত্ত্বতঃ যখন বিবদমান বিষয়ের কিয়দংশের সহিত বিবাদীর সংযোগ লক্ষ্য করা যায়।

পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ এই দুই পাদ—

"ভূতচ্ছলানুসারিত্বাৎ দ্বিগতিঃ সমুদাহৃতঃ।
ভূতং তত্ত্বার্থসংযুক্তং প্রমাদাভিহিতং ছলমিতি॥"

ব্যবহারের দুইটি গতি; সত্যানুসারী ও ছলানুসারী।

হিন্দুরা ছিলেন অত্যন্ত নৈয়ায়িক। সেই জন্য কত বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই। প্রচলিত মতের ধ্বনি করিয়া যাঁহারা বলেন, হিন্দুর ব্যবহার শাস্ত্র, ধর্ম্ম ও নীতির জগাখিচুড়ি, তাঁহারা হিন্দু ব্যবহারের মূল গ্রন্থ কখনও পড়েন নাই।

আদালতে নিত্য-দিনের কাজের প্রয়োজনে আমরা হিন্দু ব্যবহারের যে অংশের পরিচয় পাই, তাহা অসম্পূর্ণ। হিন্দুর ব্যবহার অতি প্রাচীন, যুক্তিমূলক। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা ব্যবহারবিদ্যাকে (Jurisprudence) কেবল লৌকিক বিধির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন।

হিন্দু ব্যবহারের আলোচনা ব্যবহারিক দর্শনের দিক দিয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়। অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানুষে মানুষে স্বার্থের সংঘাত চলিয়াছে। তাহা নিবারণ করিবার জন্য ও সমাজ-স্থিতির জন্য যুগে যুগে, কালে কালে, দেশে দেশে, নানাবিধ ব্যবহারের উদ্ভব হইয়াছে। কি সূক্ষ্মনিপুণ বিশ্লেষণে, কি প্রয়োগে, হিন্দু-ব্যবহার তাহাদের কাহারও ন্যূন নহে।

হিন্দুর অতীত ব্যবহার হিন্দুর দার্শনিক বুদ্ধির পরিচায়ক। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর বই। মনুসংহিতা তাহার আগের বই। এই সমস্ত পুস্তক হইতে আমরা হিন্দু ব্যবহারের যে সমুজ্জ্বল চিত্র দেখিতে পাই, বর্ত্তমান আইনের তুলনায় তাহা বহুলপরিমাণে সুসঙ্গত ও সুসজ্জিত। আমরা ক্রমে ক্রমে হিন্দু-ব্যবহারের নানা অঙ্গের আলোচনা করিব। কৌতূহলী পাঠক তাহা হইতে হিন্দু-আইনের সম্বন্ধে কিছু কিছু সামান্য জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

শ্রীমতিলাল দাশ (মুন্সেফ)

আজিকে তাহারে গো পড়িছে মনে

প্রভাতে আজি মোর
পড়িছে মনে,
পিছনে ফেলে আসা
অতীত ক্ষণে।
বঁধুর হাসিটুক্
ভরিয়া রাখে বুক,—
তবুও আঁখি-জল
নয়ন-কোণে
আজিকে তাহারে
পড়িছে মনে।

প্রভাত-শিশির
কাহার লাগি,
ফেলিছে আঁখি-জল
আজিকে জাগি'।
আমারি মত তার
বুঝি রে ব্যথা-ভার;
হারাল সে কি তার
আপন-জনে?
প্রভাতে তারে বুঝি
পড়িছে মনে!

শ্রীমতী নতিকা ঘোষ



নেপাল

নগাধিরাজ হিমালয়ে স্বাধীন নেপাল রাজ্য অবস্থিত। এই দেশের সম্বন্ধে অনেকে অনেক বিবরণ লিখিয়াছেন, অনেক বাঙ্গালী এই নেপালরাজ্যে অবস্থান করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রমুখাৎ বাঙ্গালী অনেক সংবাদ জানিতে পারিয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ সংবাদ কেহ দেন নাই। বহু য়ুরোপীয় মাঝে মাঝে নেপালরাজ্য ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের প্রদত্ত বিবরণও পূর্ণাঙ্গ নহে। সম্প্রতি শ্রীমতী পেনেলোপ চেটউড পত্রান্তরে নেপাল সম্বন্ধে অনেক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ এবং অন্যান্য বিবরণের সাহায্যে নেপালসম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য "মাসিক বসুমতীর" পাঠকবর্গকে উপহার দেওয়া যাইতেছে।

নেপাল অনেক বিষয়ে কৌতূহলোদ্দীপক। ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতুলনীয়। নেপালের পর্ব্বতমালার আকর্ষণও অল্প নহে। এই রাজ্যে অনন্যসাধারণ স্থপতি-শিল্পের বহু নিদর্শন আছে। জনসংখ্যার তুলনায় নেপালের সৈন্যসংখ্যা বিস্ময়োদ্দীপক। নেপালসরকারের রাজ্যশাসন পদ্ধতিও চমৎকার। সুশাসনের ফলে এই ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিবাসীরা যে শান্তি, উন্নতি লাভ করিয়া শান্তিতে বসবাস করিতেছে।

যে কেহ ইচ্ছা করিলেই নেপালরাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকারী নহে। যাহারা ভাগ্যক্রমে প্রবেশাধিকার পান, তাঁহারা সে রাজ্যে সর্ব্বত্র ইচ্ছানুসারে পর্য্যটন করিবার



কাটমুণ্ডু সহর—দূরে বাঘমতী নদী

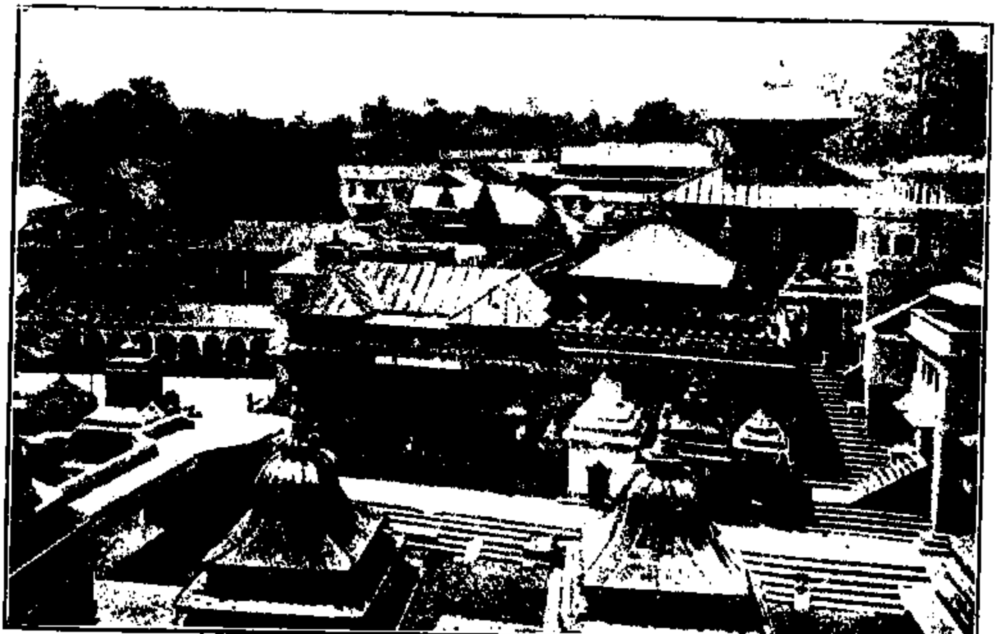


কাটমিণ্ডুর পথে—বাহক-স্কন্ধে পরিব্রাজক

সুবিধা পাইবেন, ইহাও সম্ভবপর নহে, ইহা শ্রীমতী চেটউডের উক্তি। তিনি রক্সৌলের পথে নেপালরাজ্যে প্রবেশলাভ করেন।

পাটনা হইতে রক্সৌল-যাত্রা সুবিধাজনক। খৃষ্টপূর্ব ২ শত ৫০ বৎসর পূর্বে বৌদ্ধ সম্রাট অশোক এই পথেই নেপাল-রাজ্যে তীর্থ করিতে গিয়াছিলেন। পাটনা হইতে নৌকাযোগে গঙ্গার উপর দিয়া ৫০ মাইল অতিক্রম করিবার পর নদীর অপর পারে ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতে হয়। রেলে চাপিয়া পরদিন রক্সৌলে পৌঁছান যায়।

উহার এক ধারে বিহারের বিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্র সমতলকে কমনীয় করিতেছে, অপর ধারেও ধান্যক্ষেত্র। যতদূর দৃষ্টি চলে, শুধু তৃণশ্যামল ক্ষেত্র নেত্রগোচর হইবে। এই বিস্তীর্ণ তৃণক্ষেত্র-সমন্বিত স্থানটি তরাই অঞ্চল বলিয়া অভিহিত।



পশুপতিনাথের মন্দির

পূর্ব্বপশ্চিমে ইহার বিস্তার ২ শত মাইল হইবে। এপ্রিল হইতে নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত এতদঞ্চলে ম্যালেরিয়ার ভীষণ প্রকোপ প্রকাশ পায়। সে জন্য শীতকাল ব্যতীত এই পথে নেপাল-রাজ্যে গমন নিরাপদ নহে। তরাই অঞ্চল অতিক্রম করিবার পর হিমালয়ের ছায়াময় বিরাট মূর্ত্তি প্রভাতের কুজ্ঝটিকার মধ্যেও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সে সময় দর্শকের মনে এই প্রশ্ন সমুদিত হয়, যে শ্বেতবর্ণ পদার্থ বহুদূরে দেখা যাইতেছে, তাহা এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গ কি না?

রক্সৌল হইতে ছোট মিটারগেজ ট্রেণ তরাই-বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া চলিয়াছে। প্রথমতঃ পথের ধারে নগরের অট্টালিকা, দোকানঘর প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হয়। তার পর মুক্ত ধান্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া ট্রেণ চলিতে থাকে। ব্যাঘ্র-গণ্ডার-সেবিত অরণ্যের মধ্যবর্ত্তী পথে ট্রেণ তার পর ধাবিত হয়।

নেপাল তরাই অঞ্চলের অরণ্য প্রধানতঃ দীর্ঘাকার শাল-তরুসমন্বিত, মাঝে মাঝে প্রকাণ্ডকায় সেগুনবৃক্ষ দেখা যাইবে। গাছে গাছে লতার বৈচিত্র্য, কোন কোন স্থানে বিস্তৃত নদীর শুষ্কদেহ।

নেপালে ব্যাঘ্র-শিকারে হস্তিযূথ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে অরণ্যে ব্যাঘ্র আছে বলিয়া জানা যায়, তাহার চারিদিক্ হস্তিযূথ বেষ্টন করে। ক্রমশঃ একটি সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে ব্যাঘ্রটিকে আনয়ন করা হয়। সকল হস্তীর পৃষ্ঠে সশস্ত্র শিকারী থাকে না। এ জন্য অনেক সময় ব্যাঘ্র পলায়ন করিয়া থাকে, ব্যাঘ্র যখন ভীষণ দংষ্ট্রাবিকাশ করিয়া হস্তীর দিকে লম্ফ প্রদান করে, তখন কোনও হস্তী তাহার সম্মুখে স্থির থাকিতে পারে না।



দুই মণ বোঝাবাহী নেপালী কুলী



নেপালী কৃষক—পুরুষ ও নারী

কোনও ব্যাঘ্র শিকারীর গুলীতে ইহলীলা সংবরণ করিলে, দেশীয়গণ বৃহৎ শালপত্রে নিহত-ব্যাঘ্রের উষ্ণ শোণিত সংগ্রহ করে—কালী-দেবতাকে উৎসর্গ করিবার জন্য। জঙ্গলের অধিবাসীরা ব্যাঘ্র-মাংসও ভক্ষণ করিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস, পুত্র-কন্যারা ঐ মাংস ভক্ষণ করিলে, ব্যাঘ্রের ন্যায় সাহসী ও দুর্জ্জয় হইয়া উঠিবে।

রেলপথ আমলেখগঞ্জে শেষ হইয়াছে। তথা হইতে কাটমুণ্ডু পর্য্যন্ত মোটরযোগে গমন করা যায়। ত্রিশ মাইল পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ণ, কিন্তু চমৎকার পথ আছে। পথটি ভীমফেদী পর্য্যন্ত প্রসৃত—অরণ্য ও শৈলসমাকুল।

এখান হইতে আর মোটর চলে না। তখন টাট্টু ঘোড়া বা ডাণ্ডিযোগে যাত্রীকে যাইতে হয়। ডাণ্ডি দুই প্রকার;—গদি-আঁটা চেয়ার এক শ্রেণীর ডাণ্ডি, অপর শ্রেণীর ডাণ্ডি ক্যাম্বিস-বস্ত্রের দোলা। ৬ জন কুলী এই ডাণ্ডি বহন করিয়া থাকে। যতক্ষণ কুলীরা হাঁটিয়া চলে, ডাণ্ডি চড়ায় ততক্ষণ আরাম আছে; কিন্তু একবার দৌড়াইতে আরম্ভ করিলে, যাত্রীর প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে থাকে।



নেপালের গুর্খা

অশ্ব-পৃষ্ঠে যাওয়াই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও আরামের। এই সকল অশ্ব তিব্বতের আমদানী। উহারা দুরারোহ শৃঙ্গের উপর সুদৃঢ় চরণে আরোহণ করিয়া থাকে। ভীমফেদী হইতে দুই মাইল দূরে ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য গ্রাম শিশাগড়ী দেখিতে পাওয়া যাইবে। সাধারণতঃ যাত্রীরা এইখানে রাত্রিবাস করিয়া থাকে। এখানে গুর্খা-সেনাদল আছে। শিশাগড়ী হইতে আরও কিছু দূর চড়াই উঠিলে প্রথম গিরিবর্ত্মে উপনীত হওয়া যায়। এই গিরিবর্ত্ম ৮ হাজার



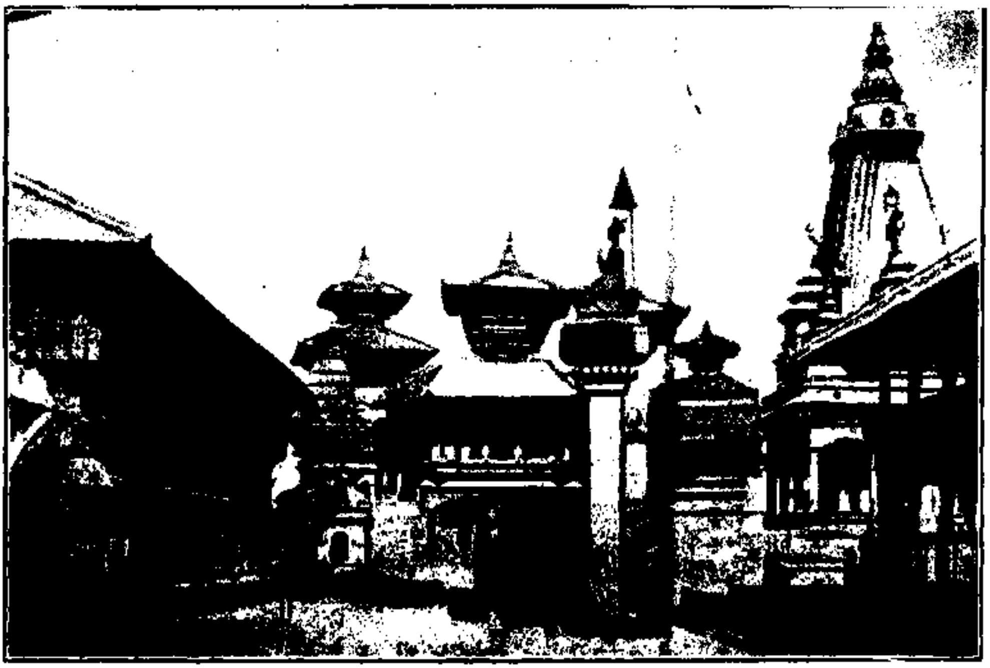
নেপাল রাজপ্রাসাদ

ফুট উচ্চে অবস্থিত। এখান হইতে নিম্নে দৃষ্টিপাত করিলে সুন্দর উপত্যকাভূমি দৃষ্টিগোচর হইবে। সূর্য্যালোকে পাহাড়ের সমুদ্র অতি চমৎকার দেখায়। তুষারমণ্ডিত পর্ব্বত-মালা যেন স্তব্ধ সমুদ্র-তরঙ্গের মত দেখায়।

এখান হইতে উৎরাইএর আরম্ভ—পথ বন্ধুর। অতি কষ্টে, সন্তর্পণে এই পথে উপত্যকাভূমিতে অবতীর্ণ হইতে হয়। এখান হইতে ৬ মাইল শস্যক্ষেত্র বিস্তৃত। ধান, গম, সরিষার ক্ষেত্র নয়নকে জুড়াইয়া দেয়। দূরে দূরে গ্রাম অপরাহ্ণ-সূর্য্যের লোহিত আভায় সমগ্র সহরটিকে পরম রমণীয় মনে হয়। দূরে তুষারকিরীটী হিমালয় অভ্রভেদ করিয়া উঠিয়াছে।

৪ হাজার ফুট নিম্নে আর একটি গিরিবর্ত্ম। উৎরাই-শেষে মোটর পাওয়া যায়। সেখান হইতে ৭ মাইল দূরে রাজধানী কাটামুণ্ডু।

রাজধানীতে নূতন ও পুরাতনের অপূর্ব্ব সমাবেশ। সহরের মাঝখানে দুই মাইল বিস্তৃত কুচকাওয়াজের তৃণাচ্ছন্ন



রাজা ভূপতীন্দ্র মল্লের মূর্ত্তি

অবস্থিত। পিত্তল-কলসী লইয়া গ্রাম্য নারীরা জল আহরণ করিতেছে দেখা যাইবে।

নেপালী কৃষকদিগের গৃহ সাধারণতঃ দ্বিতল—ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহ। বারান্দা কাষ্ঠনির্ম্মিত, ছাদ টালী-নির্ম্মিত। প্রাচীরের উপর মৃত্তিকার লেপ—দেখিতে অতি সুন্দর। সেখান হইতে চলিতে চলিতে চন্দ্রগিরি নামক গিরিসঙ্কটে উপনীত হইতে হয়।

চন্দ্রগিরি-সঙ্কটের উপর হইতে যে দৃশ্য নয়নপথে পতিত হয়, তাহা যেমন অপূর্ব্ব, তেমনই বর্ণনাতীত। নিম্নে ধান্যক্ষেত্র-বেষ্টিত বৃত্তাকার কাটামুণ্ডু সহর দেখিতে পাওয়া যাইবে। ভূমি। এই ময়দানের পশ্চিম অংশে পুরাতন সহর। পূর্ব্বভাগে নূতন সহর।

১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে গুর্খারা নেপাল জয় করে। তাহার পূর্ব্বে নেওয়ার জাতি এ দেশের শাসক জাতি ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগে তিব্বত হইতে নেওয়ারগণ নেপালে আসিয়া বসবাস করে। নেওয়ারগণ মঙ্গোলীয় জাতি হইতে উদ্ভূত বলিয়া কথিত আছে। তাহাদের প্রচেষ্টায় নেপালী শিল্পের অভ্যুদয় ঘটে।

গুর্খা বলিলে, নেওয়ার ব্যতীত বৈদেশিক রাজপুত এবং নেপালের অন্যান্য জাতির সমবায়ে গঠিত একটি বিশেষ

জাতি। পশ্চিম-নেপালে ঐ নামের একটি ক্ষুদ্ররাজ্য ছিল। ভারতবর্ষ হইতে যে সকল রাজপুত উপনিবেশ স্থাপন করিতে আসেন, তাঁহারা ঐ স্থানেই বসবাস করেন।

১৩০৩ খৃষ্টাব্দে মুসলমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য যে সকল রাজপুত চিতোর ত্যাগ করিয়াছিলেন, নেপাল রাজ্যের বর্ত্তমান শাসকের তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। এখানে আসিয়া তাঁহারা ক্রমশঃ শক্তিসঞ্চয় করিয়া রাজ্যের বিস্তারসাধন করিতে থাকেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে নেপাল জয় করিয়া তাঁহারা রাজ্যবিস্তারের আশা মিটাইয়াছিলেন।

শ্রমসহিষ্ণু অপরাজেয় যোদ্ধা। রাজপুত নেতাদিগের অধীনতায় এই সেনাদল পরিচালিত হয়। এই সকল রাজপুত সেনানায়ক রণপণ্ডিত প্রাচীন রাজপুতদিগের বংশধর। বিশ্ববিখ্যাত বীরপুরুষদিগের দ্বারা পরিচালিত হইয়া নেপালের গুর্খাবাহিনী অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ এবং অপরাজেয় হইয়া উঠিয়াছে।

কাটামুণ্ডু সহরে নেওয়ারদিগের শিল্পপ্রবণ মনোবৃত্তির সহিত আধুনিক যুগের শাসক সম্প্রদায়ের সামরিক মনোভাবের বিচিত্র সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। কুচকাওয়াজের



কাটামুণ্ডুর শস্যক্ষেত্র

হিমালয়ের অন্তর্গত এই রাজ্য তদবধি রাজপুতদিগের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া আসিতেছে। ললিতকলার বিকাশসাধন অপেক্ষা তাঁহারা সামরিক শক্তির বিকাশসাধনেই সমধিক মনোযোগ দিয়া আসিতেছেন। সমগ্র নেপাল-রাজ্যের লোকসংখ্যা ৫৬ লক্ষ। তন্মধ্যে ৪৫ হাজার সৈনিক। চেষ্টা করিলে এবং প্রয়োজন উপস্থিত হইলে সংরক্ষিত সেনাদল হইতে মোট সৈনিকসংখ্যা অনায়াসে ৭০ হাজার হইতে পারে।

গুরুং এবং মাগার সম্প্রদায় হইতেই প্রধানতঃ সেনাদল গঠিত হইতেছে। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ কঠোর

বিস্তীর্ণ মাঠের পশ্চিমাংশে রাজপ্রাসাদ এবং মন্দিরাদি সহ পুরাতন সহর অবস্থিত। এখানকার রাজপথগুলি সঙ্কীর্ণ এবং দুই পাশের অট্টালিকা-সমূহ অভ্রভেদী। দরবার স্কোয়ারে বড় বড় অট্টালিকা, প্যাগোডার আকার-বিশিষ্ট ছাদসহ প্রাসাদের অত্যুজ্জ্বল শোভা নয়ন-মন মুগ্ধ করে।

এক ধারে সুদৃশ্য রাজপ্রাসাদ (পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের রাজারা এখানে বাস করিতেন) এবং প্রশস্ত প্রাঙ্গণ অবস্থিত। উহারই সন্নিকটে রাজপরিবারের কুলদেবতার তালেজু মন্দির যেন গগন স্পর্শ করিতেছে। চারিদিকেই বহুবিধ মন্দির এবং অত্যুচ্চ স্তম্ভসমূহ বিদ্যমান। প্রত্যেক স্তম্ভে পূর্ব্ববর্ত্তী

নৃপতিগণের ব্রোঞ্জনির্ম্মিত মূর্ত্তি, তন্মধ্যে ধর্ম্মজগতে যাঁহারা খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের মূর্ত্তিও আছে। প্রত্যেক অট্টালিকা প্যাগোডার আদর্শে নির্ম্মিত। দরজা কাষ্ঠনির্ম্মিত, প্রত্যেক দ্বার ও বাতায়ন কারুকার্য্যখচিত, বিচিত্র বর্ণ-সমাবেশে নয়নরঞ্জক।

নেওয়ারদিগের শিল্পচাতুর্য্যপূর্ণ অট্টালিকাশ্রেণীর মধ্যে আধুনিক যুগের হনুমান দোখা অবস্থিত। এই অট্টালিকায় একটা বিশাল দরবার-কক্ষ আছে। বিশেষ প্রয়োজনে উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।



হাতীর সাহায্যে অরণ্যে ব্যাঘ্র শিকার

প্রকাণ্ড ময়দানের অপর ভাগে নূতন সহর অবস্থিত। এই সহরটি গুর্খারাজার নির্ম্মিত। এতদঞ্চলে কোন প্যাগোডা মন্দির নাই—আছে শুধু সেনাবারিক, বিদ্যালয়, কলেজ, হাসপাতাল, কারাগার· সবই য়ুরোপীয় আদর্শে নির্ম্মিত। এখানে রাজার আধুনিক প্রাসাদও বিদ্যমান। রাজমন্ত্রী ও অন্যান্য প্রধান আমীর-ওমরাহগণের বাসভবনও এই অঞ্চলে অবস্থিত। সবই ফরাসী স্থপতি-শিল্পের অনুকরণে নির্ম্মিত। এই অঞ্চলের রাজপথগুলি প্রশস্ত, সুরক্ষিত। মোটরগাড়ী, লরী সবই এখানে আছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, ঐ সকল পদার্থ কুলীর দ্বারা বাহিত হইয়া এখানে আসিয়াছে।

নেপালের রাজা প্রকৃতপ্রস্তাবে ধর্ম্মজগতের প্রধান। প্রধান মন্ত্রী,—দেশবাসী তাঁহাকে মহারাজা বলিয়াই অভিহিত করে, প্রকৃতপ্রস্তাবে দেশ শাসন করিয়া থাকেন। প্রধান মন্ত্রী আধুনিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন এবং সুশিক্ষিত। পৃথিবীতে যাহা কিছু নূতন উদ্ভাবিত হইতেছে, দেশের কল্যাণকর মনে করিলে, তিনি তাহা নেপালে



কাটামুণ্ডু উপত্যকা-পথে কুলীরা মোটর-কাঁধে চলিয়াছে



ভারবাহিকা নেপালী রমণী

অনুবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। তবে পশ্চিমের কোন কোন বিষয় তিনি নেপালে প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। তন্মধ্যে সিনেমা বা চলচ্চিত্র প্রধান। তাঁহার বিশ্বাস, প্রতীচ্যদেশের জীবনযাত্রার ঘনিষ্ঠ দৃশ্যগুলি দর্শকের মনে দুর্নীতির প্রশ্রয় দান করিবে।

শ্রীমতী পেনেলোপ চেটউড লিখিয়াছেন, "নেপালী দূতের মধুরস্বভাব পুত্র এক দিন আমায় বলিয়াছিলেন যে, একদা তিনি গুর্খা ভৃত্যদিগকে দিল্লীতে চলচ্চিত্র দর্শন করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা উহা দেখিয়া এমন আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিল যে, পুরুষ অভিনেতারা কখনই পুরুষ নহে। যদি পুরুষ হয়, তাহা হইলে তাহাদের বাঁচিয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই। সামরিক নেপালীরা চলচ্চিত্রের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদিগের সম্বন্ধে ঐরূপ অভিমত পোষণ করিয়া থাকে।"

কাটামুণ্ড এবং অপরাপর বড় সহরে এইরূপ সান্ধ্য আইন জারী আছে যে, রাত্রি দশটা বাজিলেই সকলকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। রাত্রি দশটার পর কাহাকেও রাজপথে দেখিতে পাওয়া গেলে, তাহাকে কারাগারে রাত্রিযাপন করিতে হইবে। কোন কোন উৎসব উপলক্ষে মানুষ দ্যূতক্রীড়া করিতে পারিবে, অন্য সময় দ্যূতক্রীড়া নিষিদ্ধ। উৎসবের মধ্যে দুর্গাপূজা প্রধান। দশ দিন ধরিয়া এই উৎসব চলে। ঐ সময়ে শত শত মহিষবলি হইয়া থাকে।



নেপালী সৈন্য

কাটামুণ্ডু ব্যতীত আরও দুইটি বড় সহর উপত্যকা-ভূমিতে আছে। ঐ দুইটি সহরই

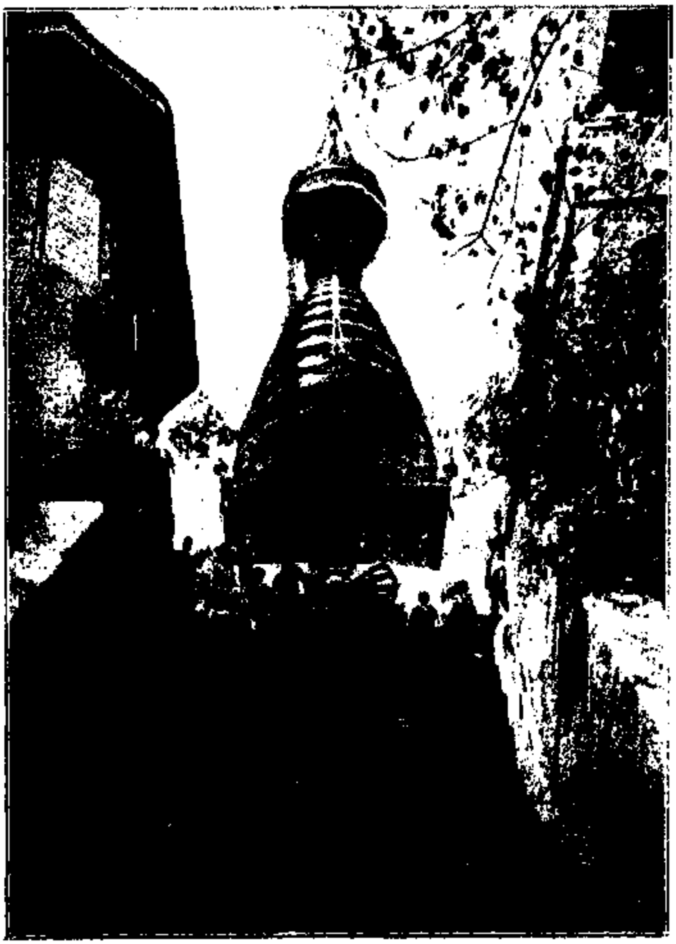
পূর্ব্বে নেপালের রাজধানী ছিল। পাটান সহর কাটামুণ্ডুরই সংলগ্ন সহর। এই সহরের রাজপথগুলি সঙ্কীর্ণ। দরবার স্কোয়ার অতি বিচিত্রদর্শন। উহার এক ধারে সারি সারি মন্দির। তাহাদের লোহিতবর্ণের প্যাগোডা সূর্য্যালোকে ঝলমল করিতে থাকে।

পাটানের মন্দিরগুলির মধ্যে মচেন্দ্রনাথ মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম। সহরের এক প্রান্তে উহা অবস্থিত। উহার তৃণাচ্ছন্ন প্রাঙ্গণ নয়নমুগ্ধকর। প্রাঙ্গণের চারিপার্শ্বে যাত্রি-নিবাস। বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে ইউক্যালিপ্‌টস্ গাছ উন্নতশিরে দণ্ডায়মান। মন্দিরের ছাদ হইতে বহু ঘণ্টা দোদুল্যমান।

স্থানীয় দেবদেবীদিগের মধ্যে মচেন্দ্রনাথ বিশেষ প্রসিদ্ধ। তিনি নেপাল-রাজ্যের রক্ষক। কথিত আছে, জাতীয় সঙ্কট-মুহূর্ত্তে তিনি দেশের রাজার নিকট মূর্ত্তি ধরিয়া আবির্ভূত হইয়া থাকেন। এই দেবতার উপলক্ষে মচেন্দ্রযাত্রা নামক উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই সময় বৃষ্টির আবির্ভাব ঘটে, তাহাতে নেপাল শস্যশালী হইয়া উঠে। জুন মাসে দেবমূর্ত্তি রথে করিয়া বাহির করা হয়। এই রথ ২৫ ফুট উচ্চ। পূর্ব্বে এইরূপ নিয়ম ছিল, নেপালের কোনও অট্টালিকা ২৫ ফুটের অধিক উচ্চ হইতে পারিবে না। বৌদ্ধ ও হিন্দু সমানভাবে এই দেবতার পূজা করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে বারিপাত না হইলেও মচেন্দ্রযাত্রা আরম্ভ হইলেই বারিপাত অবশ্যম্ভাবী। হইয়াও থাকে তাহাই। এ জন্য দেশের লোক এ ব্যাপারে চমৎকৃত হয় না। দেবতা তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সুতরাং তিনি বারিপাত করিবেনই, ইহা নেপালীদিগের ধ্রুববিশ্বাস।

নেপালের আর একটি প্রসিদ্ধ দেবতা আছেন, তাঁহার নাম মঞ্জুশ্রী। তিনি স্থানীয় দেবতা নহেন। চীনদেশ হইতে তিনি এখানে আসিয়াছিলেন। পূর্ব্বে চীনদেশে পঞ্চশিখর-সমন্বিত পর্ব্বতে বাস করিতেন। নেপালে তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে কাটামুণ্ডু একটি হ্রদে পরিণত ছিল। মঞ্জুশ্রী যখন আসেন, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে একখানি অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি তরবারি ছিল। কাটামুণ্ডুর বৃত্তাকার হ্রদের চারিপার্শ্বস্থ পর্ব্বতমালার এক স্থানে তিনি অস্ত্রাঘাত করেন। সেই অস্ত্রাঘাতের ফলে পর্ব্বতে যে ক্ষত হয়, সেই পথে হ্রদের



বৌদ্ধস্তূপ

সমুদয় জল নদীর আকারে বহির্গত হইয়া যায়। যেখানে মঞ্জুশ্রী অস্ত্রাঘাত করিয়াছিলেন, সেই স্থানকে "কট্-বার" (অস্ত্রাঘাতজনিত ক্ষত) বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। পবিত্র বাঘমতী নদী এই পথে প্রবাহিতা। উপত্যকাভূমির সমুদয় জল এই পথে বাহির হইয়া যায়।

মঞ্জুশ্রী বৌদ্ধদেবতা। চীন এবং তিব্বতে তাঁহার উপাসনা হইয়া থাকে। নেপালেও তাঁহার পূজা হয়। হিন্দুরাও বৌদ্ধদিগের ন্যায় এই দেবতাকে শ্রদ্ধাভরে পূজা করিয়া থাকে।

উপত্যকাভূমির তৃতীয় বড় সহরের নাম ভাটগাঁও। মোটরযোগে এই সহরে যাওয়া যায়। তবে পথ ভাল নহে।



নেপালী মন্দিরে উপবিষ্ট তৈজন

অশ্বতরী টাটু ঘোড়ার উপর চড়িয়া এই সহরে গমনই প্রশস্ত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজা ভূপতীন্দ্র মল্লের উহা রাজধানী ছিল। তিনি খুব সৌখীন রাজা ছিলেন। শিল্পের তিনি পরম অনুরাগী ছিলেন। তাঁহারই আমলে বিখ্যাত দরবারগৃহকক্ষ নির্ম্মিত হয়। উহার দ্বার স্বর্ণময়। স্বর্ণদ্বারের বিপরীত দিকে একটি অত্যুচ্চ প্রস্তর-স্তম্ভের উপর রাজার প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে। উহা ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত। মূর্ত্তির অদূরে পিত্তলের ঘণ্টা দোদুল্যমান। পূর্ব্বে এই ঘণ্টা নিনাদিত হইলে প্রজাবর্গ রাজপ্রাসাদের সম্মুখে সমবেত হইত।

ভাটগাঁও অতি বিচিত্র নগর। সমগ্র সহরটি দর্শনীয়। এই স্বর্ণদ্বার নেপালের এক বিচিত্র দর্শনীয় বস্তু।

রৌপ্যপ্রস্তরনির্ম্মিত একটি ছোট মন্দিরের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলে, তাহার ধারে ধারে অনেক বিগ্রহমূর্ত্তি দেখা যাইবে। একটি নীলবর্ণের দরজার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলে একটি সুপ্রশস্ত উদ্যান নয়নগোচর হইবে। সেই উদ্যানে নানাবিধ ফল ও ফুলের গাছ।

উদ্যান পার হইয়া গেলে যে রাজপথ পড়িবে, তাহার দুই ধারে সারি সারি দোকান ও বাসগৃহ। আরও কিছু দূরে অগ্রসর হইলে একটি ফাঁকা যায়গা দেখা যাইবে। সেখানে স্থপতিশিল্পের বিচিত্র নিদর্শন বিদ্যমান। নেপালের পঞ্চস্তর মন্দির এখানে অবস্থিত।

১৭০০ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির রাজা ভূপতীন্দ্র মল্লের পরিকল্পনা অনুসারে নির্ম্মিত হয়। রাজার এমনই উৎসাহ ছিল যে, তিনি স্বহস্তে মন্দির নির্ম্মাণের ইষ্টক বহন করিয়া আনেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রজাবর্গও ইষ্টকাদি বহনকার্য্যে আত্মনিয়োগ করে। তাহার ফলে পাঁচ দিনের মধ্যে মন্দির-নির্ম্মাণোপযোগী যাবতীয় সরঞ্জাম সংগৃহীত হয়।

প্রাচ্যদেশে এই মন্দিরটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিতে হইবে। পাঁচ ধাপ ভিত্তির উপর এই মন্দির গঠিত। ধাপে ধাপে নানাবিধ দেবদেবী ও পশুর মূর্ত্তি সংস্থাপিত। সর্ব্বনিম্ন ধাপে রাজপুতবীর জয়মল পুত্তের মূর্ত্তি। দ্বিতীয় ধাপে দুইটি হস্তীর মূর্ত্তি, তৃতীয় ধাপে দুইটি সিংহ, চতুর্থ ধাপে দুইটি শ্যেনসিংহমূর্ত্তি এবং পঞ্চম ধাপে সিংহী ও বাঘিনীর দেবমূর্ত্তি। ইহাদের মত বলবান পৃথিবীতে কেহ নাই। এই সোপান-শ্রেণীর পরই প্রকৃত মন্দিরের



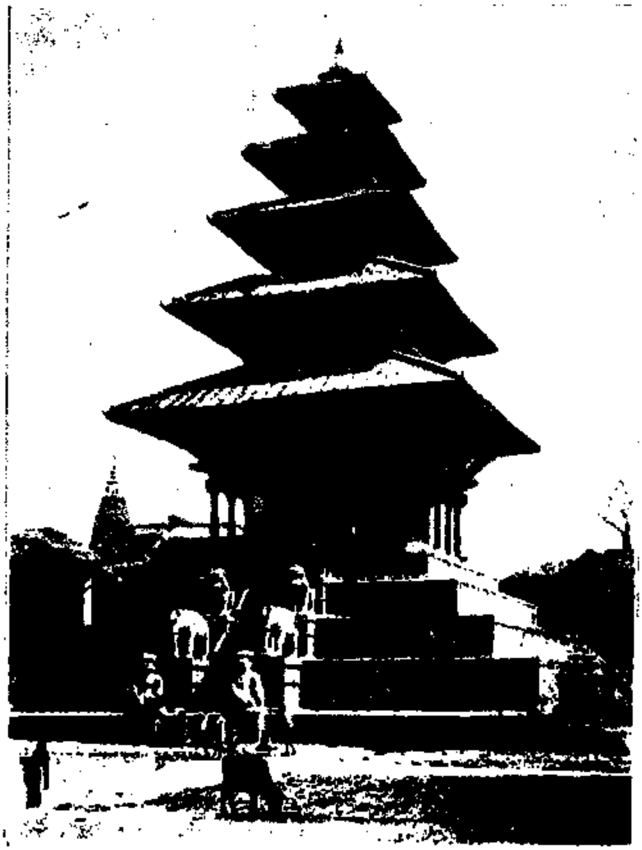
হিন্দুর পূজাপার্ব্বণে নেপালী সং

ভিত্তিভূমি। পাঁচতল প্যাগোডা যেন আকাশ চুম্বন করিতেছে। বিস্ময়ের বিষয় এই, মন্দিরে অধুনা কোনও বিগ্রহমূর্ত্তি নাই। প্রথমতঃ এই মন্দিরে কোনও গুপ্ত তান্ত্রিক দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করিবার কল্পনা হইয়াছিল। মন্দিরমধ্যে কোনও বিগ্রহ না থাকিলেও জনসাধারণের বিশ্বাস—এখানে ভৈরবগণ বাস করিয়া থাকে। কোনও নেপালী মন্দিরে য়ুরোপীয়ের প্রবেশাধিকার নাই।

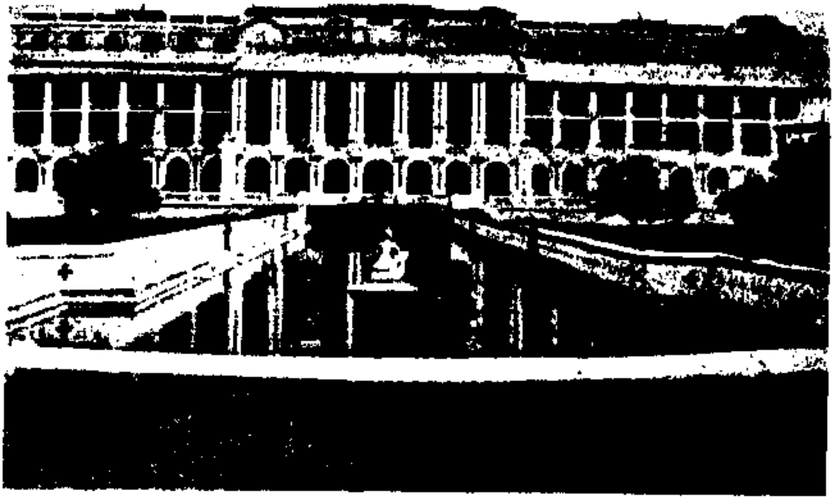
উল্লিখিত তিনটি প্রধান নগরের পর পশুপতিই বিশেষ আকর্ষণের স্থান। ইহা নেপালের বারাণসীধামের মত পবিত্র। শিবের নামে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। কথিত আছে, শিব একবার পশুমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এখানে আসিয়াছিলেন এবং ঘোষণা করেন, অতঃপর পশুদিগের অধিপতি হিসাবে তাঁহার পূজা এখানে চলিবে।

পবিত্রসলিলা বাঘমতী-তীরে পবিত্র হিন্দুগণের দেহ ভস্মীভূত করা হয়। তাঁহাদের চিতাভস্ম অবশেষে বাঘমতীসলিলে নিক্ষেপ করা হইয়া থাকে। কিছু দূরে সাধারণ শ্মশান অবস্থিত। নদীর মোহানার দিকে রাজা ও রাজপরিবারবর্গের জন্য স্বতন্ত্র ঘাট বিদ্যমান।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে নেওয়ারী রাণী গঙ্গারাণী পশুপতিনাথের মন্দিরের বৃহৎ ঘণ্টায় একটি রজ্জু ঝুলাইয়া দেন। এই রজ্জু ছুই মাইল দীর্ঘ। ইহার অপর প্রান্ত কাটামুণ্ডুর রাণীর প্রাসাদের সহিত সংলগ্ন।



ভাটগাঁওয়ের প্রসিদ্ধ মন্দির



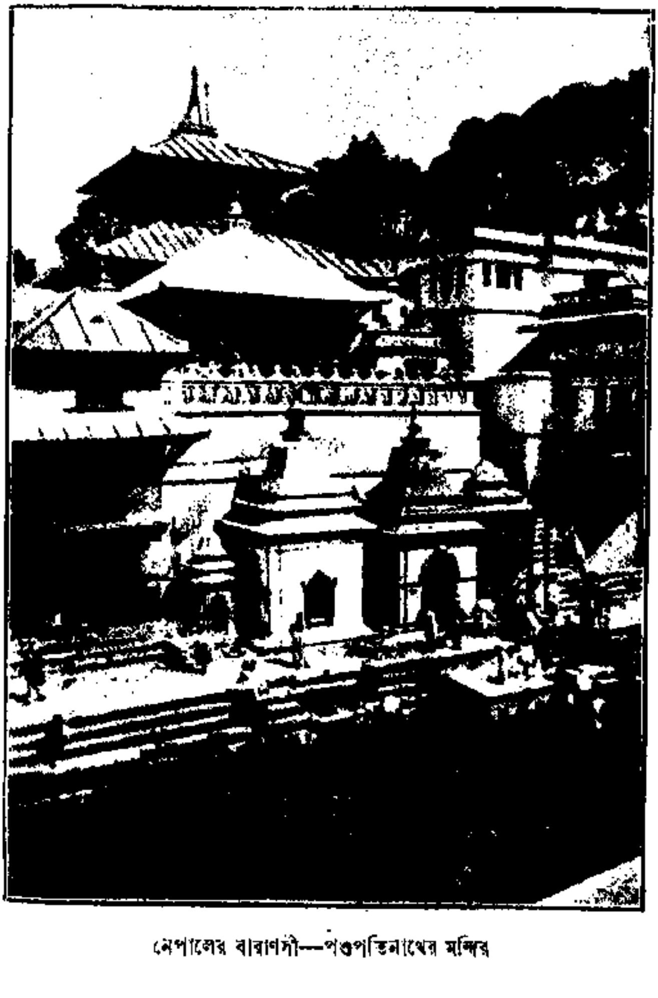
নেপালের সিংহ-দরবার

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রাজা বিক্রম শা পশুপতিদেবের পূজার জন্য ১ লক্ষ ২৫ হাজার কমলালেবু আনয়ন করেন। মন্দির-প্রাঙ্গণে উহা সমবেত হয়।

নেপালের হিন্দুধর্ম্মের সহিত উত্তরের বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক বিষয়ে সামঞ্জস্য আছে। উভয় ধর্ম্মই পাশাপাশি চলিয়াছে। একই বিগ্রহকে হিন্দুরা শিব বলিয়া পূজা করে, বৌদ্ধরা তাঁহাকে অবলোকিতেশ্বর বলিয়া অর্চ্চনা করিয়া থাকে। বৌদ্ধরা ভূতের নাচের পক্ষপাতী। উহা অনেকটা তিব্বতী নাচের সহিত সমান। হিন্দুরা অনেকটা বৌদ্ধদিগের ন্যায় মুখোস পরিয়া নৃত্য করিয়া থাকে।

হিন্দুজনসাধারণের মধ্যে যে উৎসব-নৃত্য প্রচলিত, তাহাতে ত্রিশক্তির বিকাশ দেখা যায়। সরস্বতী সৃষ্টিকারিণী, লক্ষ্মী পালনকারিণী এবং কালী সংহারিণী শক্তি। মন্দিরের সেবাদাসীরা এই নৃত্যে যোগ দেয় না। পুরুষগণই মুখোস পরিয়া এই ত্রিশক্তির নৃত্য করিয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে কালীমাতার ভৈরবগণ, লক্ষ্মীর সিংহ এবং সরস্বতীর ময়ূরও থাকে। সেই সঙ্গে এক জন ভাঁড়ও থাকে। তাহার পরিচ্ছদ য়ুরোপীয়গণের মত।

নেপালে বৌদ্ধদিগের প্রধান তীর্থ স্বয়ম্ভুনাথ। প্রাচীনকালে কাটামুণ্ড যখন হ্রদে পরিণত ছিল, সেই সময়ে বিপাস্য নামক এক জন বৌদ্ধ এইখানে আগমন করেন। তিনি হ্রদসলিলে নানাবিধ জলজগুল্ম দেখিয়াছিলেন, কিন্তু পদ্ম দেখেন নাই। এ জন্য তিনি একটি পদ্মের মৃণাল হ্রদসলিলে নিক্ষেপ করেন। সেই সময় তিনি ভবিষ্যবাণী করেন যে, মৃণাল যখন



নেপালের বারাণসী—পশুপতিনাথের মন্দির

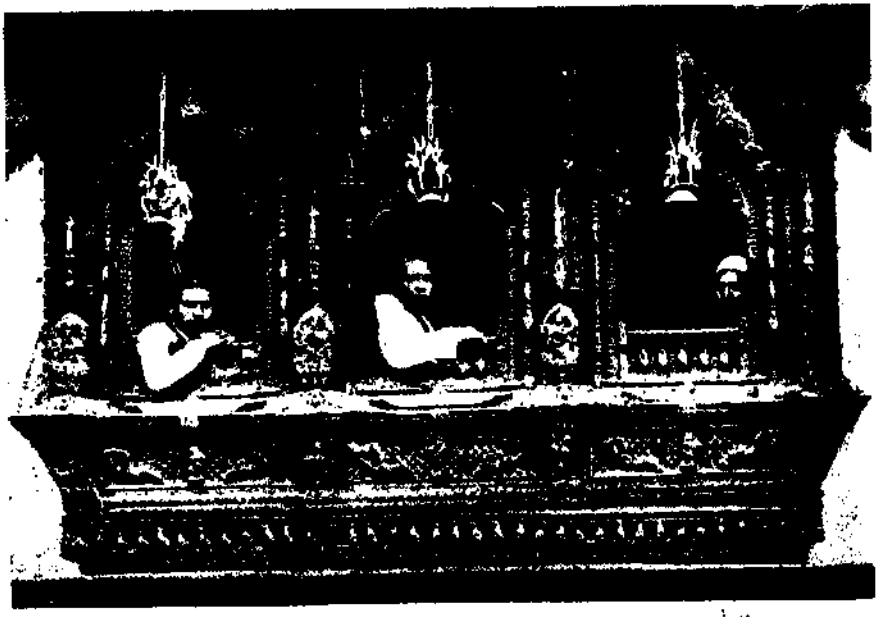


মঞ্জুশ্রীর



গরুড়মূর্ত্তি

শিকড় গাড়িবে, তখন ফুল ফুটিবে, আর সেই সঙ্গে স্বয়ম্ভূ লম্ফ দিয়া সেই পদ্ম হইতে জন্ম-গ্রহণ করিবেন। তাঁহার আকার অগ্নি-শিখার মত হইবে। আর সেই সময় হইতে হ্রদের পরিবর্ত্তে এই স্থান উর্ব্বরা ভূমিতে পরিণত হইবে। তদনুসারে স্বয়ম্ভূর আশীর্ব্বাদে বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী এই উপত্যকা-ভূমিতে আসিয়া পাহাড় কাটিয়া জল



কাটামুণ্ডুর কারুকার্য্যক্ষোদিত কাঠের বাতায়ন

নিকাশ করিয়া দেন। খৃষ্টপূর্ব্ব তিন শতাব্দীতে স্বয়ম্ভূনাথ হইয়াছিল। সমতলভূমি হইতে ৩ শত ফুট উচ্চ একটি
স্তূপ নির্ম্মিত হয় ক্রমে ক্রমে উহা পরিবর্দ্ধিত ও সংস্কৃত পাহাড়ের উপর এই মন্দির নির্ম্মিত। মন্দির পর্য্যন্ত



নেপালী ছাত্র



নেপালী নরসুন্দর



হিমালয়বাসী বিভিন্ন উপজাতির প্রতিনিধি

ছোট ছোট স্তূপ বিরাজিত। সেগুলি লামা ও সন্ন্যাসীদিগের স্মৃতিসৌধ। অনেকগুলি বানর এখানে থাকে। যাত্রীদিগের প্রদত্ত আহার্য্যে তাহারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে। বড় স্তূপের পার্শ্বে একটি দ্বিতল হিন্দুমন্দির। হারিতী বা শীতলা এখানে পূজিতা হইয়া থাকেন, ইনি বসন্তরোগের দেবী। প্রাঙ্গণে উহা একটি বৃত্তাকার সোপানাবলী রচিত, উহার ধাপে ধাপে পাঁচটি ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রস্তররচিত মন্দির-প্রাঙ্গণে অনেকগুলি ব্রোঞ্জনির্ম্মিত একটি প্রকাণ্ড বজ্র প্রস্তরখণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত।



স্বয়ম্ভুনাথ মন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী ব্রোঞ্জনির্ম্মিত বজ্র ও সিংহমূর্ত্তি

স্বয়ম্ভুনাথ স্তূপ ব্যতীত বোধনাথের স্তূপটিও দর্শনীয়। খৃষ্টীয় শতাব্দী আরম্ভ হইবার কিছু পূর্ব্বেই কোনও রাজা নিজপাপপ্রক্ষালনের জন্য এই স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

বোধনাথে চিনি লামা নামক এক জন সন্ন্যাসী থাকেন। তিনি চীনভাষা জানেন। তিনি কোন কোন বিষয়ে য়ুরোপীয় আচার-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকেন। বোধনাথ স্তূপ হইতে ২ বৎসর অন্তর একবার করিয়া জলধারা নির্গত হইয়া থাকে। বহু যাত্রী বহু দূরদেশ হইতে সে সময় এখানে সমবেত হইয়া ঐ জল অমৃতবোধে সংগ্রহ করিয়া থাকে। ঐ সুধা দালাই লামার কাছে বোতলে ভরিয়া প্রেরিত হয়।



নেপালী গায়ক ও বাদকদল

কাটামুণ্ডু হইতে এক মাইল কি দুই মাইল দূরে বালাজীর উদ্যান ও দর্শনীয়। ইহা ব্যতীত চঙ্গনারায়ণ নামক বৈষ্ণব মন্দির, কীর্ত্তিপুর সহর প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান। ইহাদের সম্বন্ধে বিবরণ লিখিতে গেলে প্রকাণ্ড পুস্তকের প্রয়োজন। নেপালের গ্রামবাসীরা বেশ সুখী। তাহাদের মুখ সদা প্রসন্ন—দুঃখের লেশমাত্র তাহাদের মুখে নাই। নারীরা ভারতবর্ষ ও জাপান হইতে নীত বস্ত্র দ্বারা অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া থাকে। উহারা কোমরে কাপড় ফেটী বাঁধিয়া জড়াইয়া রাখে। অনেকের গায়ে কালো জামাও দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষরা যোধপুরী পাজামা পরিধান করিয়া থাকে, অবশ্য যখন তাহারা কাম করে, তাহাদের চরণ নগ্ন থাকে। গুর্খারা কোমরে কুকরী রাখে। কৃষকরা হাস্যমুখে শ্রমকার্য্য করিয়া থাকে। তাহাদের আননে দুঃখ নাই। হিমালয়ের উপত্যকাভূমির এই সকল লোক হাস্যমুখেই মৃত্যুকে বরণ করে।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।



ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

নিশীথিনী

রাত্রি প্রায় বারোটা। কণিকাকে লইয়া নীপু অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে। লীনা গাড়ী-বারান্দার ছাদে মাতুর পাতিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া ছিল। নীচে দাসী-চাকরের কলরব এখনো থামে নাই। রানুর মা আসিয়া কহিল,—বাবু এসেচেন, দিদিমণি।

লীনা উঠিয়া বসিল, কহিল,—কোথায় ?

রানুর মা কহিল,—দোতলায়। তাঁর ঘরে।

—খাবার দিয়েচে ?

না। আমি বলেচি, বৌদি নেই ; তার এসেছিল, পশ্চিমে দাদামশায়ের খুব অসুখ, তাই চলে গেছেন নীপু দাদাবাবুর সঙ্গে।

লীনা কহিল,—কি বললে ?

—চুপ করে রইলেন।

—হুঁ······

লীনা আর কোনো কথা বলিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

রানুর মা কহিল,—খেতে বলবে না, দিদিমনি ?

লীনা কহিল,—খাবার আছে ?

রানুর মা কহিল,—নেই কি গো ! 'নিশ্চয় আছে।

লীনা কহিল,—আচ্ছা, আমি গিয়ে জিজ্ঞাসা করচি। এত রাত্রে ফিরেচে—কোথাও যদি খেয়ে এসে থাকে !

রানুর মা কহিল,—জিগ্‌গেস করো বাপু। ঠাকুর তো জিগ্‌গেস করতে পারে না, আমাকে তাই বললে।

লীনা উঠিয়া রাধাবিনোদের ঘরে গেল। ঘর অন্ধকার। লীনা সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া দেখে, রাধু বিছানায় শুইয়া আছে। লীনা কহিল,—শুলে যে ? খেয়ে এসেচো ?

রাধাবিনোদ উঠিল না, চোখ খুলিল ; খুলিয়া বলিল,—হ্যাঁ······

লীনা তার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল, আসিয়া কহিল,—হ্যাঁ-র মানে ?

মৃদু হাসিয়া রাধাবিনোদ কহিল,—হ্যাঁ-র মানে হ্যাঁ। হ্যাঁ-র মানে 'না' হতে পারে না।

কপট রোষের ভঙ্গীতে লীনা কহিল,—তোমার হেঁয়ালি রাখো। সত্যি, খাবে না ?

রাধাগোবিন্দ কহিল,—না, সত্যি খাবো না।

লীনা কহিল,—কোথাও খেয়ে এসেচো, সত্যি ? না, রাত বেশী হয়েচে, পাঁচ জনের উপর মমতা-বোধে রাত্তিরটা প্রায়োপবেশনে কাটাবে ?

রাধাবিনোদ উঠিয়া বিছানাতে বসিল, কহিল,—খাবার ভাবনা সত্যি আমার আছে না কি ?

লীনা কহিল,—অন্য ভাবনা যত থাকুক, এই ভাবনাটাই তোমার নেই, তা আমি জানি।

রাধাবিনোদ কহিল,—এ কথার মানে ? আর-কিসে তুমি আমার ভাবনা দেখলে যে, এমন কথা বলে বসলে ?

লীনা সে কথার জবাব না দিয়া কহিল,—যাই, বামুনটা বসে আছে বাবুর প্রত্যাশায়। তাকে বলে আসি, বাবু খেয়ে এসেচে ; তাঁর জন্যে ভাবতে হবে না ; তোমরা খেয়ে-দেয়ে হেঁশেল তুলে ফ্যালো···

কথার সঙ্গে সঙ্গে সে গমনোদ্যতা হইল; রাধাবিনোদ ডাকিল,—লীনা···

লীনা কহিল,—কেন ?

রাধাবিনোদ কহিল,—যাবার আগে কথাটার মানে বুঝিয়ে দিয়ে যেতে হবে।

—মানে আবার কি ! লীনা ফিরিল।

রাধাবিনোদ বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—মানে বলতে হবে। যখন-তখন তোমরা যে আমার সামনে হেঁয়ালি ফেঁদে বসো···আমি তার মানে জানতে চাই। যেন আমি···

কথাটা শেষ হইল না। সে যে কি—তাহা বলিতে পারিল না।

লীনা কহিল,—মানে জানি না, হেঁয়ালিও জানি না। যা দেখচি, যা শুনচি, তাতে যা মনে হয়, এমন কথাই শুধু বলি।

লীনা দু'পা অগ্রসর হইয়া দ্বারের দিকে চলিল; রাধাবিনোদ সামনে আসিয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। লীনা কহিল,—কি করো, রাধদা ? সরো।

রাধাবিনোদ কহিল,—কিছু করিনি। শুধু কথার মানেটুকু জানতে চাই। এই যে টীকা-টিপ্পনী চলে দিবা-রাত্র আমাকে লক্ষ্য করে—এর কারণ কি ? আমি কারো কোনো কথায় নেই···কারো ক্ষতি করিনি !

দুই চোখের দৃষ্টি রাধাবিনোদের মুখে অবিচলভাবে নিবদ্ধ রাখিয়া লীনা কহিল,—করো নি ?

—করেচি ! কার ? বলো।

লীনা কোন জবাব না দিয়া তেমনি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। মৃদু হাসিয়া রাধাবিনোদ কহিল,—অন্ততঃ তোমার তো নয়······

লীনা যেন চমকিয়া উঠিল ! পলকের জন্য ! পরক্ষণে অবিচল কণ্ঠে কহিল,—আমার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক রাধদা যে তুমি আমার ক্ষতি করবে ? আমার কথা বলচি না। আমি বলছিলুম তার কথা—যে-বেচারীকে বিয়ে করে পায়ের তলায় ফেলে থ্যাৎলাচ্চো !

দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া রাধাবিনোদ কহিল,—পায়ের তলায় ফেলে থ্যাৎলাচ্ছি ! ছি ছি···এত-বড় মিথ্যা অপবাদ দিয়ো না আমার নামে। যাকে শিরোধার্য্য করবার যোগ্যতা আমার নেই, তাঁকে আমি পায়ে রাখবো ? কি যে বলো লীনা !···তা ও-কথায় কাজ নেই। আমার পক্ষে অনধিকার-চর্চ্চা। ও-কথা নয় ! ঐ যে আমার ভাবনার কথা নিয়ে তুমি খানিকটা হেঁয়ালি রচনা করলে, আমি সেই কথা শুনতে চাই।···শুনবোই। না হলে ছাড়বো না—সত্যি, ছাড়বো না ! বলিতে বলিতে রাধাবিনোদ লীনার একখানা হাত চাপিয়া ধরিল।

—আঃ ! বলিয়া সবলে হাত ছাড়াইতে গিয়া লীনা একেবারে দ্বারের কপাটে হেলিয়া পড়িল, রাধাবিনোদ দ্রুত তাকে ধরিয়া ফেলিল। না ধরিলে হয়তো লীনা পড়িয়া যাইত।

কোনোমতে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সামনের দালানে দাঁড়াইবামাত্র লীনার কাণে গেল রাসুর মার কণ্ঠস্বর—দিদিমণি···সে-ডাক যেন কাঁটার মত বুকে বিঁধিল ! লীনা কহিল—আমি বলতে যাচ্ছিলুম রে···তোর দাদাবাবু খাবেন না। নেমন্তন্ন ছিল। খেয়ে এসেচেন।

রাসুর মা কহিল,—ঠাকুরকে তা হলে বলি, তার ছুটী ?

—হ্যাঁ···

রাসুর মা চলিয়া গেল। লীনার মনে হইল, তার মুখে-চোখে যেন বিদ্যুতের মত কৌতুকের একটা শিখা বহিয়া গেছে !···মনে মনে সে ফুঁশিল।

তারপর সে ঘরের মধ্যে আসিল। রাধাবিনোদ ততক্ষণে সোফায় বসিয়া পড়িয়াছে···বসিয়া সিগারেট ধরাইতেছে। লীনা কহিল—তোমার ছেলেমানুষী কি কোনো দিন যাবে না, রাধদা ?

রাধাবিনোদ কহিল—কি ছেলেমানুষী দেখলে ?

—অমন করে আমার হাত ধরে যে টানছিলে,—রাসুর মা ছিল ওখানে···দেখে গেল ! তার উপর বৌ এখানে নেই ! ও কি ভাবলে, বলো দিকিন্···? আমি খুকী নই,—তুমিও খোকা নও !···যে, এ-খেলা খেলবে ! ভালো দেখায় না।

রাধাবিনোদের সর্ব্বাঙ্গ ছমছম্ করিয়া উঠিল···রোমাঞ্চ ! কোনোমতে একটা নিশ্বাস চাপিয়া সে কহিল—এতে দোষের কি আছে, তা জানি না। আমি ভাই, তুমি বোন—কোনো বিষয়ে একটা তর্কই যদি হয়ে থাকে ?

গম্ভীর মুখে লীনা কহিল,—তর্ক ! তা ছাড়া তুমি-আমি

গ্লানি বটে এ সম্পর্ক—আর তা মানি। কিন্তু ছোটলোক দাসী-চাকর—তারা জানে, কিসের ভাই! কিসের বোন! কোথাকার কে পিসি—তার ভাশুরঝী! হুঁঃ! সে আবার বোন কিসের?···

কথার সঙ্গে সঙ্গে লীনার দুই চোখে এমন ভঙ্গী প্রকাশ পাইল যে, সে-ভঙ্গী দেখিয়া লজ্জায় রাধাবিনোদ মাথা নীচু করিল। তার মুখে কোনো কথা ফুটিল না।···

দু'জনেই চুপ। একটু পরে লীনা কহিল—তাহলে আমি যেতে পারি?···ভালো কথা, বৌ এখানে নেই। নীপুকে নিয়ে পশ্চিমে গেছে।

পশ্চিম! বিস্ময়ের আতিশয্যে রাধাবিনোদ যেন চমকিয়া উঠিল। হঠাৎ নীপুই বা তাহাকে কিছু না বলিয়া···

সে লীনার পানে চাহিয়া রহিল—দুই চোখের দৃষ্টি আগ্রহে অধীর!

লীনা কহিল—তোমার শ্বশুর মশায়ের খুব অসুখ··· টেলিগ্রাম এসেছিল···তোমার টিকি দেখা গেল না বাড়ীতে··· তাই অনুমতি নেওয়া হয়নি!···সঙ্গে কে যায়? বিপদ! নীপু বললে, আমি নিয়ে যাবো, চলুন আপনি—এটুকু কথা বলিতে বলিতে লীনার চোখে বিচিত্র ভঙ্গী খেলিয়া গেল—মমতা, মায়া, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ···কত কি!

রাধাবিনোদ কোন কথা কহিল না। কাজেই লীনা আবার কথা কহিল; বলিল,—যাবার সময় আমায় ভার দিয়ে গেছে বৌ—বলে গেছে, তুমি ভারী অশান্ত নিজের সম্বন্ধে খুব বেশী রকম বে-হুঁশিয়ার—আমি যেন তোমায় দেখি—যত্ন করি—দরকার হলে শাসন অবধি!···কথার শেষে লীনা হাসিল।

এ-কথায় রাধাবিনোদের বিস্ময় আরও বাড়িল। সে লীনার পানে চাহিল। লীনা কহিল—সেই অধিকারেই বলচি···শোও রাধদা। কিছু দরকার থাকে, তাও বলো! সত্যি, যাবার সময় বৌয়ের যে মলিন মুখ দেখলুম—যেতে চায় না! কি করে? বেচারী নেহাৎ নিরুপায় হয়েই···

আশ্চর্য্য! রাধাবিনোদ ভাবিল, যে স্ত্রীর পানে কখনো সে ফিরিয়া চায় না—তার সম্বন্ধে যে স্ত্রী অমন উদাসীন—সে এমন কথা বলিয়া গিয়াছে বিদায়-কালে···তার সম্বন্ধে!

লীনা কহিল—তোমার চোখ যে কপালে উঠলো!···কি শোবে? না, বসে থাকবে?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া রাধাবিনোদ কহিল—শুয়েই পড়চি। না, তোমাকে দরকার হবে না।···তুমি যাও লীনা। প্রতাপবাবু একা আছেন। রোগী মানুষ···

মৃদু হাস্যে লীনা কহিল—আমার মাথার উপর থেকে পাহাড় সরে গেছে।

—তার মানে?

—তিনি এ-বাড়ী থেকে চলে গেছেন।

রাধাবিনোদ ভাবিল, সে পাগল হইয়া যাইবে! এক দিন সে বাড়ী-ছাড়া! সেই একটা দিনে চারিদিকে এত কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে! নীপুর সঙ্গে কণিকার বিদেশ-যাত্রা, বিদায়-কালে তার প্রতি কণিকার এতখানি দয়া, মমতা—আর ওদিকে প্রতাপবাবু···

সে কহিল,—কেন গেলেন?

—রাগ করে···

—তোমার উপর?

লীনা কহিল—হ্যাঁ।···

রাধাবিনোদ ক্ষণেক লীনার পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল,—ভালো করোনি লীনা! স্বামী···

লীনার চোখ দুটা যেন জ্বলিয়া উঠিল। সে কহিল,—তুমি থামো। স্বামী! মন্ত্র পড়ে বিয়ে করেচো বলে তোমাদের মাথায় করে রাখবো—নিজেদের ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে—না? আমাকে তেমন মেয়ে পাওনি!

লীনার কথা শুনিয়া এবং মুখের সে-ভঙ্গী দেখিয়া রাধাবিনোদ অবাক্!

সত্যই তার মুখে কথা সরিল না। লীনাও চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বহুক্ষণ পরে একটা উদ্গত নিশ্বাস কষ্টে চাপিয়া রাধাবিনোদ কহিল—তুমি কোথায় শোবে লীনা? তোমাদের বৌ এখানে নেই—প্রতাপবাবু নেই···

লীনা কহিল—রামুর মাকে বলেচি, আমার ঘরে মেঝেয় সে শোবে।

রাধাবিনোদ কহিল—তাই যাও—শুয়ে পড়োগে। অনেক রাত হয়েচে। আমিও শুয়ে পড়ি। ভালো কথা, তুমি যাচ্ছো যদি তো ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিয়ে যেয়ো।

লীনা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুইচ টিপিয়া আলো নিবাইয়া দিল, তার পর দুম্ দুম্ শব্দে ঘর হইতে বাহিরে চলিয়া গেল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মুক্তির পথে

সকালে উঠিয়া রাধাবিনোদ নীচে নামিবে, লীনার সঙ্গে দেখা।

রাধাবিনোদ কহিল—প্রতাপবাবু কোথায় গেছেন, তাঁর ঠিকানা আমি জানতে চাই।

লীনা কহিল,—ঠিকানা আমি জানি না।

সবিস্ময়ে রাধাবিনোদ কহিল,—জানো না?

এতখানি বিস্ময় জীবনে আর কিছুতে বুঝি রাধাগোবিন্দ কখনো বোধ করে নাই!

লীনা কহিল,—আমায় বলে যায়নি।

রাধাবিনোদ কহিল,—কাল রাত্রে ভালো ঘুমোতে পারিনি···এই কথাটাই শুধু ভেবেচি, লীনা।···তোমার সময় হবে? তোমার সঙ্গে আমার দু'চারটে কথা আছে।

লীনা মুহূর্ত্তের জন্য কি ভাবিল, পরে কহিল,—এখনি?

—যদি বলি, হ্যাঁ?

লীনা কহিল,—স্নানটা সেরে নিতে দাও। সকালে উঠে স্নান আমার চিরদিনের অভ্যাস!

—বেশ। স্নান করে আমাকে ডেকে পাঠিয়ো। আমি বাইরের ঘরে আছি।

লীনা ঈষৎ হাসিল, হাসিয়া কহিল,—আজ বুঝি কোথাও গার্ডেন-পার্টি নেই?

উত্তর দিবার প্রয়োজন ছিল না। রাধাবিনোদ এ কথার উত্তর দিল না; না দিয়া সোজা বৈঠকখানার দিকে চলিয়া গেল।···

এখনো সে ঘরের সঙ্গি-সহচর কেহ আসে নাই। খবরের কাগজখানা লইয়া রাধাবিনোদ নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। চা আসিল···

বেয়ারা চা তৈয়ার করিয়াছে। মুখে দিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রাধাবিনোদ কহিল,—কে করেচে চা?

বেয়ারা কহিল—আমি।

ফশ্ করিয়া মুখ দিয়া কথা বাহির হইয়া গেল,—কেন? তোমাদের বৌমা···?

তখনি মনে পড়িল, কণিকা এখানে নাই! তাড়াতাড়ি নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া পরক্ষণে কহিল,—বৌমা নেই এখানে বুঝি! তাহলেও দিদিমণি তো আছে!···যাচ্ছেতাই হয়েচে···নিয়ে যা। এ চা মানুষে খায় না!

বেয়ারা দারুণ অপ্রতিভ হইয়া চায়ের পেয়ালা লইয়া প্রস্থান করিল।

রাধাবিনোদ আবার খবরের কাগজ খুলিয়া বসিল···

কিন্তু কিছুতে মন লাগে না। পৃথিবীর খানিকটা যেন কে উপড়াইয়া খশাইয়া লইয়া গিয়াছে! সে জায়গাটায় যেন মস্ত গহ্বর···

কণিকা চলিয়া গিয়াছে—তাই? না। কণিকা ছিল··· আর পাঁচটা আসবাব যেমন থাকে, তেমনি। তার সঙ্গে আলাপ করিয়া কথা কহিয়া রাধাবিনোদের সময় কাটে নাই কোনো দিন!

প্রতাপ?···প্রতাপের সঙ্গে কতটুকু তার অন্তরঙ্গতা! এখানে অতিথি...তাই কাছে গিয়া বসিত।

নীপু? তার সঙ্গে কথা কহিয়া সত্যই আনন্দ পাওয়া যায়। তার বুকে প্রাণ আছে। সে প্রাণের স্পর্শে রাধাবিনোদের অশান্ত মন একটু যেন শান্তি পায়!

কিন্তু তা নয়! ইহারা আজ কাছে নাই বলিয়াই যে এমন মনে হইতেছে, তা নয়। কেন এমন হইতেছে, রাধাবিনোদ বুঝিল না; না বুঝিয়া কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করিল।

ভাবিল, ইহাদেরও আজ কি হইয়াছে? বেলা আটটা বাজে—এখনো আসিয়া দেখা দিল না নবেন্দু, শ্রীশ, মহেন্দ্র, যতীশ···

বেয়ারা আসিয়া কহিল—দিদিমণি ডাকচেন।

—কে?···

—লীনা-দিদিমণি।

—ও!

তাই হোক! একজন কাহাকেও মন চাহিতেছে···যে কোনো কথা কহিয়া মনের এ অস্বস্তির ভাবটুকু কাটাইবার জন্য। তারপর দুপুর-বেলায় অজিত যা বলিতেছিল, মোটরে টানা পাড়ি ডায়মণ্ড হার্বার পর্য্যন্ত। মন্দ কি!

তাকে কেহ কাজ করিতে দিবে না—অথচ দীর্ঘ দিনগুলা কাটে কি করিয়া ?···

রাধাবিনোদ দোতলায় আসিল নিজের ঘরে। লীনা সেখানে নাই। কোথায় ?

লীনা তার নিজের ঘরে ছিল। রাধাবিনোদ সে ঘরে আসিল। স্নান সারিয়া লীনা মাথার কেশে চমৎকার ঢেউ তুলিয়া দিয়াছে! দীর্ঘ কালো কেশ—আগুল্‌ফলম্বিত··· কপালে সিঁদুরের ছোট একটি টীপ। নিজেকে বেশ সযত্নে সাজাইয়াছে! তার পানে চাহিলে এটুকু বুঝিতে কষ্ট হয় না। রাধাবিনোদ তার পানে চাহিবামাত্র তার দুই চোখের দৃষ্টি যেন লীনার অঙ্গে আঁটিয়া রহিল!

হাসিয়া লীনা কহিল—কি দেখচো ?

রাধাবিনোদ কহিল—কোথায় যাচ্ছো ?

—কেন ? বেশভূষায় কি দেখলে যে এমন কথা মনে হলো ?

অপ্রতিভভাবে রাধাবিনোদ কহিল—তা নয়। তবে মাথার সজ্জা করেচো···

লীনা কহিল,—সধবা মানুষকে স্নান করে এ আচার পালন করতে হয়। নিয়ম।

—ও!···তা আমাকে ডেকেচো যে ?

—হ্যাঁ।···লীনা নির্ব্বাক্‌ দাঁড়াইয়া রহিল; মুখের হাসি মিলাইয়া মুখে গাম্ভীর্য্য দেখা দিল।

রাধাবিনোদ কহিল—কেন ?

লীনার রাগ হইল। গম্ভীর স্বরে সে কহিল,—খেলা করবার জন্য ডাকিনি। তুমিই বলে গেলে, কি কথা আছে··· আমার স্নান হলে যেন তোমায় ডেকে পাঠাই, সে কথা ভুলে গেছ ?

রাধাবিনোদ কহিল,—সত্যি, ভুলে গেছলুম, লীনা। মনটা সকাল থেকেই যেন কেমন হয়ে রয়েছে···

লীনা কহিল—বৌয়ের একদিনের বিরহেই এমন! তবু যদি দুজনে মনের মিল থাকতো···

বাধা দিয়া রাধাবিনোদ কহিল,—বৌয়ের জন্য নয়··· কোনো কিছুর জন্য নয়। এমনি···

লীনা কহিল,—যাক! আমার সঙ্গে কি কথা আছে, বলো।

রাধাবিনোদ সত্যই বিপদে পড়িল। একটু আগে মনে হইয়াছিল—যেন অনেক কথা আছে! এখন মনে পড়ে না! সে কহিল—কি কথা মনে পড়চে না।

লীনার দুই চোখের দৃষ্টি বেশ কঠিন হইয়া উঠিল। সে রূঢ় মৌন দৃষ্টি রাধাবিনোদের সর্ব্বাঙ্গে বর্ষণ করিয়া কহিল,—তোমার এ খেলা···তুমি মনে করো, কেউ বোঝে না ? তা নয়। আমি বুঝি। এ খেলা খেলতে আর এসো না।···

—লীনা···

রাধাবিনোদ বেশ তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকিল—লীনা···

লীনা কহিল,—আগে চা খাও···তার পরে কথা হবে। শুনলুম, চা-খাওয়া হয়নি। আমার উচিত ছিল, চা তৈরী করে তোমায় পাঠিয়ে তার পর স্নান করতে যাওয়া। অভ্যাস তো নেই। তা দেরী হবে না। তুমি বসো···আমি এখনি আস্‌চি।

ঝড়ের মত লীনা ঘর হইতে বাহিরে চলিয়া গেল। রাধাবিনোদ কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে এমন বিমূঢ় হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া তার লজ্জার সীমা রহিল না!

দশ-বারো মিনিট পরে লীনা ফিরিয়া আসিল,—তার হাতে চায়ের পেয়ালা। ফিরিয়া সে কহিল,—আশ্চর্য্য! ঠায় দাঁড়িয়ে আছো, পুতুলের মত···সেই অবধি! মা গো, তোমায় নিয়ে বিপদে পড়লুম, রাঙদা···

এ কথায় রাধাবিনোদ নড়িল না।

সামনের ড্রেশিং-টেবলের উপর পেয়ালা রাখিয়া রাধাবিনোদের হাত ধরিয়া লীনা তাকে আনিয়া বিছানায় বসাইয়া দিল। রাধাবিনোদ বসিল। তার পর চায়ের পেয়ালা তার হাতে তুলিয়া দিয়া লীনা কহিল,—চা খাও, রাঙদা···

কথাটা বলিয়া লীনা গিয়া অদূরে মেঝের উপর বসিল। রাধাবিনোদ চা পান করিল। লীনা কহিল,—মনে পড়লো, কি কথা ?···যদি না পড়ে, কথার খেই আমি ধরিয়ে দিচ্ছি···তোমার ভগ্নীপতির কথা কইছিলে তুমি···

ঠিক। রাধাবিনোদ কহিল,—তাই। প্রতাপ বাবু কোথায় আছেন, তুমি জানো না ?

—না। বলেচি তো, আমায় সে-কথা বলে যায় নি।

—বাড়ীর কেউ জানে ?

—জানতো বো। তিনিই তোমার ভগ্নীপতির মন্ত্রী কি না সব বিষয়ে।…যাবার সময় কারো সঙ্গে কথা কওয়া হলো না! বিদায়-দৃশ্যের যা কিছু অভিনয় তা হলো করুণা-মমতাময়ী বৌ-ঠাকরুণের সঙ্গে…ইস্তক পায়ের ধুলো নেওয়া পর্য্যন্ত! সেটিও বাদ পড়েনি।…অমন পা…সে পায়ের ধুলোর দাম আছে রাধদা…কি বলো?

কথাটা গাম্ভীর্য্যের মধ্যে সুরু হইলেও তার সমাপ্তি ঘটিল দমকা হাসিতে।

কথার সবটুকু রাধাবিনোদের কাণে পৌঁছিল কি না, বুঝা গেল না। তার দৃষ্টি রহিয়া গেল তেমনি অবিচল—ভাবও তেমনি। কিছুক্ষণ পরে রাধাবিনোদ কহিল,—কি এমন কলহ হলো তোমাদের, যার জন্য…

কৌতুক-মিশ্রিত স্বরে লীনা কহিল,—আমাদের কলহ খুব বড় আয়োজনের উপর কোনো দিনই নির্ভর করে না তো! আতসী কাচ কখনো রোদে ধরেচো? কাচের নীচে কাগজ বা কাপড় রাখো…আয়োজন করতে হয় না—রোদ লাগামাত্র দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে! আমাদের তর্কও তেমনি। দুজনে একত্র হলেই আগুন জ্বলে।

রাধাবিনোদ কহিল,—সত্যি লীনা, একে তিনি রোগী মানুষ—রাগ করে এ শরীরে একা চলে গেলেন, তোমার মনে সেজন্য বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই…তুমি এমন কৌতুক করচো!

লীনা কহিল,—কেঁদে যখন কোনো ফল নেই, তখন হাসিটুকুকে বিদায় দি কেন? দুঃখ তাতে বাড়বে বৈ কমবে না…

রাধাবিনোদ নিঃশব্দে চাহিয়াছিল লীনার পানে। লীনা তার মুখের ভাব দেখিয়া কহিল,—এটুকু দেখে তুমি আশ্চর্য্য হচ্ছো! কিন্তু এর চেয়ে কত-বড় দুঃখ আমি এ-মনে সহ্য করচি কত কাল ধরে—তা তো জানো না! আমায় হাসতে ছাখো বলে ভাবো, মানুষটা ভারী হাল্কা!

একটা নিশ্বাস! লীনা এ নিশ্বাস চাপিতে পারিল না। রাধাবিনোদ কহিল,—কিন্তু প্রতাপবাবু লোক ভালো। গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ হলেও বইয়ের পোকা নন্। দেখেচি কথা কয়ে, মেলা-মেশা করে—কোনো অহঙ্কার নেই, দেমাক নেই! বেশ সরল-মনের মানুষ…

লীনা কহিল,—আমি তো কোনোদিন বলিনি, উনি খারাপ লোক, দারুণ বিভীষিকা…

—তবে কেন তোমাদের…

বাধা দিয়া লীনা কহিল,—নিজের পানে চেয়ে বুঝতে চেষ্টা করো রাধদা…বৌও দুরন্ত চেড়ী কিম্বা রাণী কৈকেয়ী নয়…তবু তুমি তার ধোঁচ সইতে পারো না কেন? তা যাক্—আমার কথা নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। আমার সব সয়ে গেছে…এমন কোন দুঃখ আর নেই যাতে আমি কাতর হবো। লোকের নিন্দা বলো, ঘৃণা বলো…কিছুতে আমার ভয় নেই! এখন তোমার কি কথা ছিল, বলো।

রাধাবিনোদের তখন এমন হইয়াছে যে, সে ভাবিতেছিল,—কোন ছলে পলাইতে পারিলে বাঁচিয়া যায়! সর্ব্বনাশ! লীনা কি যে বলে…কথাগুলা খুব স্পষ্ট নয়—তবু এ কুহেলি-জালের অন্তরালে যেটুকু দেখা যায়, বুঝা যায়, সেটুকু…

কামাখ্যার কথা মনে পড়িল…সেই যেদিন চলিয়া আসিবে, তার আগের রাত্রে…

কণিকা এখানে ছিল! তাহাতে আর কোনো লাভ না থাকুক, লীনার মনের সামনে যেন একটা পর্দ্দার আড়াল থাকিত। এখন কণিকা নাই…সে পর্দ্দার ব্যবধান কি করিয়া রহিবে?…ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিলেন, ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, অজিতবাবু আসিয়াছেন…

আঃ! এ আহ্বানে এমন নিরাপদ নির্ভর!

রাধাবিনোদ কহিল,—আমি আসচি লীনা…

বেলা প্রায় দুইটা। রাধাবিনোদ ডায়মণ্ড হার্বারে যাইবে স্থির করিয়া উপরে আসিল—বেশ পরিবর্ত্তন করিতে।

ও-দিকে ড্রাইভার গাড়ী বাহির করিয়াছে…

লীনা আসিয়া ডাকিল—রাধদা, আমি যাবো তোমার সঙ্গে। নিয়ে যাবে?

রাধাবিনোদ কহিল,—আমার সঙ্গে অন্য লোক আছে—আমার বন্ধু অজিত।

লীনা কহিল,—তা হোকগে! আমি তো পর্দ্দার জেনানা নই। তোমার বন্ধুর সামনে তোমার বোন্ যদি বেরোয়, তাতে লজ্জার কি আছে? আমার বিয়ে হয়ে গেছে…বয়স হয়েছে…আমি তোমাদের নভেলের কিশোরী রূপসী কুমারী cousin-ভগ্নী নই!

রাধাবিনোদের যাত্রার উৎসাহ নিবিয়া গেল। সে কহিল,—কিন্তু অজিত ভারী লাজুক। ওদের বাড়ীতে পর্দ্দার খুব কড়াক্কড়।

লীনা কহিল,—ওঁর স্ত্রী তো আসচেন না! আমি গেলে ওঁর বাড়ীর পর্দ্দা ছিঁড়বে না—ফাঁশবে না। নিয়ে চলো, রাধদা। তোমার পায়ে পড়ি। আমার মনের দুঃখ কারো কাছে গেয়ে বেড়াই না বলে তুমি ভাবো, আমি খুব আরামে আছি? তা নয়। নিয়ে চলো আমাকে একটু খোলা হাওয়ায়···এই ইট-কাঠের চাপ সরিয়ে একটু খোলা জায়গায়···লক্ষ্মীটি! একা নিঃসঙ্গভাবে থেকে আমি কি শেষে পাগল হবো?

বলিতে বলিতে লীনার স্বর আবেগে উচ্ছ্বসিত কম্পিত হইল। রাধুর পায়ের কাছে সে বসিয়া পড়িল।

রাধাবিনোদ তার হাত ধরিয়া তাকে উঠাইল। লীনার দুই চোখে অশ্রুর বাষ্প। সে কহিল,—বেশ, চলো···অজিতকে আমি বলে আসি। তুমিও তৈরী হও···

লীনা কহিল,—তৈরী আর কি হবো!

রাধাবিনোদ তাকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল,—তবু যা হোক···

এ-কথা শুনিয়া অজিত কহিল,—বেশ, এ গাড়ীতে তোমরা দুজনে চলো। আমি আমার টু-সীটারে যাবো।···এগুই তাহলে। তোমাদের তো দেরী নেই···আমারো দেরী হবে না। মাঝেরহাট ব্রীজের নীচে যে আগে যাবে, সে অপেক্ষা করবে।

—বেশ!···

···আধ ঘণ্টা পরের কথা। সজ্জিত বেশে লীনা ও রাধাবিনোদ গাড়ীতে উঠিবে, একখানা রিক্‌শ আসিয়া ফটকের সামনে দাঁড়াইল এবং রিক্‌শ হইতে আহ্বান জাগিল—রাধুদা···

এ স্বর? তাই তো! রিক্‌শ হইতে নামিল প্রতাপ।

রাধাবিনোদ যেন এতটুকু হইয়া গেল! লীনা সদর্পে মোটরে উঠিয়া বসিল।

প্রতাপ কহিল,—বেরুচ্ছেন! তা যান···আমি এসে-ছিলুম বৌ-ঠাকরুণের কাছে।

রাধাবিনোদ কহিল,—তিনি এখানে নেই। আমার শ্বশুরের অসুখ—টেলিগ্রাম এসেছিল···তিনি সেখানে গেছেন নীপুর সঙ্গে···

—ও! বলিয়া প্রতাপ রিক্‌শর দিকে ফিরিল।

রাধাবিনোদ কহিল,—চলুন না আমাদের সঙ্গে ডায়মণ্ড হার্ব্বার···

প্রতাপ কহিল,—না! যান, আপনারা বেড়িয়ে আসুন।

প্রতাপ রিক্‌শয় চড়িয়া বসিল। রাধাগোবিন্দ কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গাড়ীর ভিতর হইতে লীনা কহিল,—ওঠো রাধদা। দেরী হয়ে যাচ্ছে। ওদিকে অজিতবাবুকে কথা দিয়েছ। মনে নেই?

বজ্র-চালিতের মত রাধাবিনোদ আসিয়া মোটরে বসিল। ড্রাইভারকে লীনা কহিল,—চালাও···

মোটর চলিল। খানিকটা আসিয়া রাধাবিনোদ পিছনে চাহিয়া কহিল,—এই···রোখো···রোখো···

লীনা কহিল,—না! চালাও! কেন? গাড়ী রাখবে কেন?

রাধাবিনোদ আত্মগতভাবেই কহিল,—প্রতাপ বাবুর সঙ্গে দেখা হলো—ওঁর ঠিকানাটা জিজ্ঞাসা করা হলো না!

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া লীনা কহিল,—এই! আমি বলি, না জানি কি!

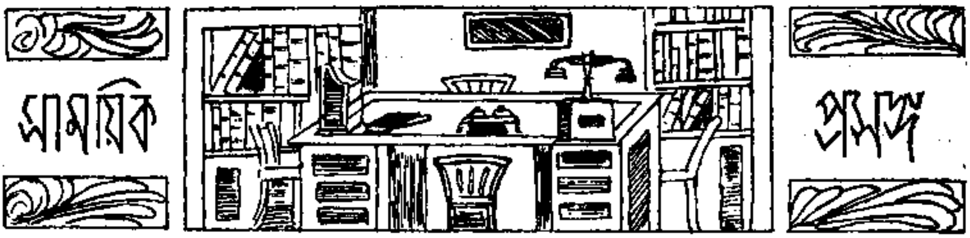
ড্রাইভার গাড়ীর গতি কমাইয়াছিল। ড্রাইভারের পানে চাহিয়া লীনা কহিল,—জোরসে যাও···

গাড়ীর গতি আবার বর্দ্ধিত হইল।

রাধাবিনোদ অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিল। মুখে হাসি নাই, কথা নাই। সে ভাব দেখিয়া লীনা ভ্রূ-ভঙ্গী করিল—করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। গাড়ী চলিল বেগে—ডায়মণ্ড হার্ব্বারের পথ লক্ষ্য করিয়া।

[ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়



সহশিক্ষার ফলাফল

নাগপুর হইতে সহশিক্ষার এক সুন্দর ফলের সংবাদ আসিয়াছে। নাগপুর মরিস কলেজে বিমললাল ধাওয়াল নামে এক পাঞ্জাবী যুবক অধ্যয়ন করিত। সেই কলেজে সহশিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। বিমললাল উক্ত কলেজের যে শ্রেণীতে পড়িত, সেই শ্রেণীতেই পার্শী যুবতী পেরিন ভারুচাও পড়িত। উভয়ের পিতামাতা বা অভিভাবক উভয়কেই বিদ্যার্জ্জনের উদ্দেশ্যে কলেজে পাঠাইয়াছিলেন। যৌবনকালটা সহজে মানুষের মনকে বিকারগ্রস্ত করে। উহা ঐ কালের স্বভাব। তাহার উপর কন্দর্প ঠাকুর কলেজের কোন নিভৃত কুঞ্জে লুকাইয়া থাকিয়া তাহাদের উভয়ের উপরই সম্মোহন এবং উন্মাদন সায়ক নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়ের যে মন ধবলগিরির ন্যায় অচল এবং অটল, সেই মন যখন মনসিজের প্রথম শরাঘাতেই টলিয়া উঠিয়াছিল, তখন ক্ষুদ্রশক্তি বিমল এবং পেরিনের মন যে তাহাতে থর থর কাঁপিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ কিছুই নাই। কাযেই উভয়ের মধ্যে হিয়া-দগদগি পরাণ-পোড়নী উপস্থিত হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি থাকিতে পারে? কাযেই উভয়ের মনের আগুন ফাল্গুনের মৃদু মন্দ অতি শীতল মলয়ানিল দ্বিগুণ জ্বালাইয়া তুলিয়াছিল। তাহারা উভয়ে আর সে জ্বালা সহিতে পারিল না। কিন্তু সে জ্বালা নিবাইবার কোন উপায় ছিল না। উভয়ে একধর্ম্মাবলম্বী ছিল না,—এক জন ছিল হিন্দু, আর এক জন ছিল পার্শী। কাযেই মিলনে কন্দর্প ঠাকুরের মত হইলেও প্রজাপতি ঠাকুর বিরোধী হইলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া সেই যুবক-যুবতী পরামর্শ করিয়া নাটুকেপণা দেখাইয়া এই মরজগতের পরপারে যাইবার সঙ্কল্প করিল। উভয়ে স্থানীয় এক ভীমা পুষ্করিণীর বারিরাশিতে দেহ ডুবাইল। আর উঠিল না। মরিবার পূর্ব্বে দুই জনেই পত্র লিখিয়া গিয়াছিল যে, তাহাদের উভয়ের দেহ যেন একই কবরে সমাহিত করা হয়। সেই অনুরোধ রক্ষিত হইয়াছিল কি না, সে বিষয়ে আমরা ঠিক সংবাদ পাই নাই। তবে এ ক্ষেত্রে মৃতদেহ সমাহিত করা প্রেমিক-প্রেমিকার কোন পক্ষেরই পৈতৃক ব্যবস্থা নহে। উহা উভয়ের কুলাচারের বিরোধী। হিন্দু বিমললালের শেষ শয্যা চিতানল, পার্শী পেরিনের কুলাচারসম্মত ব্যবস্থা অস্থিমাংস শকুনি-গৃধিনীদিগকে দান। সুতরাং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় বেশ একটু গোল বাধিবার কথা। কিন্তু কি হইয়াছে,—তাহা শুনিতে পাই নাই। সম্ভবতঃ কন্দর্প-শরে হত যুবক-যুবতীর শেষ প্রার্থনাই পূর্ণ হইয়াছিল। এই সহশিক্ষার ফলে ঐ দুইটি অপরিণামদর্শী যুবক-যুবতীর যে দেহান্ত হইল, তাহা নহে,—উভয়কেই পৈতৃক আচার এবং ধর্ম্ম ছাড়িতে হইল। এখন সবে কলির সন্ধ্যা বই ত নয়,—কখন বা কি হয়। এমন কাণ্ড আরও কত কি হইতেছে, কে বলিতে পারে? কিন্তু তথাপি ত সমাজসংস্কারকদিগের চৈতন্য হইতেছে না। যাহারা দেখিয়া এবং ঠেকিয়া শিখিবে না, তাহাদের উপায় কি?

অমৃতবাজারের দণ্ড

কলিকাতা হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চের বিচারে 'অমৃতবাজার-পত্রিকার' সম্পাদক শ্রীযুত তুষারকান্তি ঘোষের এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুত তড়িৎকান্তি বিশ্বাসের যথাক্রমে ৩ মাস এবং ১ মাস বিনা



শ্রীযুত তুষারকান্তি ঘোষ

শ্রমে কারাদণ্ড হইয়াছে। 'অমৃতবাজারে' কলিকাতা হাইকোর্ট সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। যে সময়ে এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছিল, সে সময়ে পত্রিকা-সম্পাদক তুষারকান্তি বাবু কলিকাতায় ছিলেন না—কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। প্রবন্ধটিতে হাইকোর্ট সম্বন্ধে যে মন্তব্য লিখিত হইয়াছিল, তাহা হাইকোর্টের অনুকূল নহে। এখন এই বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম প্রশ্ন হইতেছে যে, এই মন্তব্যপ্রকাশ ন্যায়সঙ্গত হইয়াছিল কি না? এখানে বলা আবশ্যক এই যে, সাধারণতঃ "নিরপেক্ষ মন্তব্য" বা "ন্যায়সঙ্গত মন্তব্য" কোন্‌টি, তাহা লইয়া মতভেদ ঘটিয়াই থাকে। বিভিন্ন পক্ষের স্বার্থের ঘাতপ্রতিঘাতেই এই বিষয়টির জটিলতা বৃদ্ধি পায়। মন্তব্য যতই ন্যায়সঙ্গত হউক না কেন, তাহা যে পক্ষের প্রতিকূলে যায়, সে পক্ষের মনে অসন্তোষের সঞ্চার প্রায়ই হইয়া থাকে। কেহ কেহ বা সে জন্য মন্তব্য প্রকাশের উপর ক্রুদ্ধও হইয়া থাকেন। ইহা সাধারণ নিয়ম। সেই জন্য এ দেশে একটা

চলিত কথা আছে যে—"উচিত কথা বল্লে পরে সুহৃদ্ বিগড়ে যায়।" কেবল এই দেশে যে এই কথা আছে, তাহা নহে,—অন্যান্য দেশেও এইরূপ বহুদর্শিতামূলক প্রবাদবাক্য আছে। বিলাতেও এই ন্যায্য মন্তব্য বা উচিত কথা (Fair comment) কি, সে সম্বন্ধে মতভেদ বিদ্যমান। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে The civilization of our day নামক পুস্তকে সার হিউ গিলজিয়ান রীড (Sir Hugh Gilgean Reid) এবং মিষ্টার পি জে ম্যাক্‌ডোনেল (Mr P J Macdonell) মুদ্রাযন্ত্র (Press) সম্বন্ধে এক সন্দর্ভ লিখিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, But there is still much doubt as to the meaning of "fair comment" and the courts often interpret the words in an illiberal spirit. ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, উচিত মন্তব্য শব্দের অর্থ সম্বন্ধে এখনও অনেক সন্দেহ বিদ্যমান রহিয়াছে এবং আদালতগুলি অনুদার মনোভাব লইয়া এই শব্দ দুইটি ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ইহা গেল সাধারণ কথা।

এখন 'অমৃতবাজারে' হাইকোর্ট সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে এখন আমরা কোন কথাই বলিব না। কারণ, সে সম্বন্ধে চুলচেরা বিচার করিয়া কোন লাভ নাই। কিন্তু যে ভাবে এই বিচার হইয়াছে,—তাহার সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার আছে। এই মামলার অভিযোগ এই যে, 'অমৃতবাজার পত্রিকা' অসঙ্গত মন্তব্য দ্বারা হাইকোর্টের সম্ভ্রম নাশ করিয়াছেন। সুতরাং হাইকোর্টই এই মামলার ফরিয়াদী। কারণ, হাইকোর্টই এই মন্তব্য দ্বারা আহত হইয়াছেন বলিয়া অভিযোগ করিতেছেন। বিচারপতি হইলেন, হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চ অর্থাৎ হাইকোর্ট। বিচার হইল সরাসরিভাবে। এ ক্ষেত্রে হাইকোর্টের সরাসরি বিচার করা সঙ্গত হইয়াছে কি না, তাহা লইয়া বিচারকালে তর্ক উঠিয়াছিল। অধিকাংশ বিচারপতির মতে এ ক্ষেত্রে আইন অনুসারে হাইকোর্টের সরাসরি বিচার করিবার অধিকার আছে। কিন্তু বিচারপতি সার মন্মথ মুখোপাধ্যায় স্বতন্ত্র রায় লিখিয়া বলিয়াছেন,—হাইকোর্টের সে অধিকার নাই। পণ্ডিতে পণ্ডিতে তর্ক, মূর্খে লাগে ধন্ধ। আইনের এই সব অতি জটিল ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামাইয়া কোন স্থির সিদ্ধান্ত করিবার মত সূক্ষ্ম আইন-জ্ঞান আমাদের নাই। কিন্তু সাধারণ জ্ঞানে আমরা এইটুকু বুঝি যে, যদি হাইকোর্টের ঐরূপ সরাসরি বিচার করিবার অধিকার আইন অনুসারে থাকে, তাহা হইলেও হাইকোর্টের তাহা করা উচিত নহে। কারণ, এ কথা শিষ্টজনসম্মত যে, যে ব্যক্তি অথবা যে পক্ষ অভিযোক্তা, সেই ব্যক্তি অথবা সেই পক্ষ কখনই সেই মামলার বিচারক হইতে পারেন না। ইহার উপর যদি সেই আদালত আসামীর অপরাধের সরাসরি বিচার করেন, তাহা হইলে উহা অসঙ্গতই হয়। সুতরাং ঐ আইনের পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত। হাইকোর্ট যদি 'অমৃতবাজারের' মামলার সরাসরি বিচার না করিয়া আসামীদিগকে আত্মপক্ষসমর্থনের জন্য যথেষ্ট সময় দিতেন, তাহা হইলে হাইকোর্টের সম্মানের চূড়া নিশ্চিতই ধূলায় লুটাইয়া পড়িত না। বিচারপতি লর্ট উইলিয়ম তাঁহার রায়ে বলিয়াছেন যে, বিলাতে এখনও প্রচলিত আইন অনুসারে আদালত অবমাননার মামলা হইতে পারে,—কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাহা হয় না। তাহার কারণ, উক্ত বিচারপতি মহাশয় বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে তথাকার জনসাধারণের মন্তব্যে ও উক্তিতে সার্ব্বজনীন শিষ্টাচার-রক্ষার (public decency) মানদণ্ড পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছে। তথাকার লেখক এবং বক্তারা ব্যক্তিত্বের ভদ্রতা বজায় রাখিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন। বিলাতের জনসাধারণ তথাকার আদালত সম্বন্ধে কিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন, সে সম্বন্ধে আমরা উপস্থিত কোন দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিতেছি না, কিন্তু তথাকার জনসাধারণের প্রতিনিধি-সভায় কিরূপ ভদ্রতাপূর্ণ ও সংযত ভাষা বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের উপর প্রযুক্ত হয়, তাহার দুই একটা নমুনা আমরা দিতে পারি। বড় দিনের ছুটীর পর যখন পার্লামেণ্টের বৈঠক বসিয়াছিল, তখন (২০শে জানুয়ারী) কমন্সসভায় জনৈক সদস্য প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডকে যে ভাষায় অভিনন্দিত করিয়াছিলেন, তাহা আমরা এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। উক্ত সদস্য বলিয়াছিলেন :

"The Prime Minister is a mountebank, he is worse than that. He is a swine. He is a low dirty cur, who ought to be horse whipped and slung out of public life."

ইহার মর্ম্মার্থ,—"প্রধান মন্ত্রী এক জন প্রতারক ব্যক্তি; তিনি তদপেক্ষাও হীন। তিনি একটি শূয়ার। তিনি অত্যন্ত নিকৃষ্ট ময়লামাখা কুক্কুর; তাঁহাকে ঘোড়ার চাবুক মারা এবং তাঁহাকে সাধারণের কার্য্যক্ষেত্র (রাজনীতিকক্ষেত্র) হইতে খেদাইয়া দেওয়া উচিত।" ইহাই হইল পার্লামেণ্টের সৌজন্যপূর্ণ ভাষার নমুনা। ইহা দেখিয়া আমরা কখনই মনে করিতে পারি না যে, বিলাতে সার্ব্বজনীন শিষ্টাচার রক্ষার মানদণ্ড উন্নত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, তথাকার আদালতগুলি জনমতের প্রতিকূলে যাইতে চাহেন না বলিয়া তথায় ঐরূপ আদালতের সম্ভ্রমহানির মামলা সর্ব্বদা উপস্থিত হয় না। সেই জন্য আমরা বলি যে, এই আইনের পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত।

আমাদের বিশ্বাস, অজ্ঞ বা অদূরদর্শী লোকের মিথ্যা অপবাদ কাহারও সম্ভ্রমহানি,—বিশেষতঃ কোন আদালতের সম্ভ্রমহানি করিতে পারে না। যে আদালতের সুবিচার সর্ব্বজনস্বীকৃত, সে আদালতের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করিয়া কি কেহ তাহার সম্ভ্রমের হানি করিতে পারে? সার বার্ণস্ পিকক, সার কোমর পিথারাম বিচারপতি স্বর্গীয় দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতির উপর প্রতিকূল মন্তব্য প্রচার করিয়া কি কেহ তাঁহাদের সম্ভ্রমহানি করিতে পারিয়াছেন? তাই বলি, এই সরাসরি বিচারের ব্যবস্থাটা উঠাইয়া দেওয়া উচিত। 'অমৃতবাজার' সম্পাদক ও প্রকাশক এই দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রিভি-কাউন্সিলে আবেদন করিবার জন্য হাইকোর্টের মঞ্জুরী প্রার্থনা করিয়াছিলেন, গত ২রা মে হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি সে প্রার্থনা নামঞ্জুর করিয়াছেন।

দিনাজপুর প্রাদেশিক সমিতি

সুদীর্ঘ চারি বৎসরের পরে এবার গত ৬ই বৈশাখ বাঙ্গালায় দিনাজপুর সহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এবার মূল সভার সভাপতি হইয়াছিলেন ডাক্তার ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভানায়ক হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ

চক্রবর্ত্তী। এবার সুদীর্ঘ চারি বৎসর পরে এই প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হইয়াছে বলিয়া ইহার উপর দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে পতিত হইয়াছে। উভয়ের অভিভাষণে অনেক চিন্তনীয় বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছিল। একসঙ্গে তাহার সকল কথার আলোচনা করা সম্ভবে না। এই চারি বৎসরমধ্যে বাঙ্গালার রাজনীতিক আকাশে যে ঝড়-ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে, তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালীই অবগত আছেন। বাঙ্গালার এবং বাঙ্গালীর এই দুরবস্থার কাহিনী কখনই ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া যাইবে না। বাঙ্গালী সে কাহিনী কখনই ভুলিয়া যাইবে না। বাঙ্গালীর সুখ-দুঃখ এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি ভিন্ন



ডাক্তার ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত

প্রদেশের জননায়কদিগের ঔদাসীন্য, বাঙ্গালীদিগের পরস্পরের মধ্যে আত্মকলহ এবং দ্বেষের বিদ্যমানতা এবং বাঙ্গালীর উপর শাসক-সম্প্রদায়ের অনাস্থা এবং অবিশ্বাস এবং তাহার ফলস্বরূপ বাঙ্গালার কঠোর দমননীতির প্রবর্ত্তন প্রভৃতি বাঙ্গালী জীবনকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। সভাপতি ডাক্তার সেনগুপ্ত সে কথাগুলি বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছেন, কিন্তু বড়ই নৈরাশ্যের বিষয় এই যে, তিনি তাহার প্রতিকারের কোন সহজ, সরল এবং অমোঘ পন্থা নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই, অথবা করেন নাই।

সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে সখেদে বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস আইন অমান্যের পথ ত্যাগ করিয়া আবার নিয়মানুগ পথ ধরিয়াছেন বটে, কিন্তু তথাপি সরকার তাঁহাদের দমননীতি কিছুমাত্র শিথিল করেন নাই। প্রেস আইন প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হয় নাই, বে-আইনী বলিয়া বিঘোষিত প্রতিষ্ঠানগুলির উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছিল, তাহার সকলগুলির উপর হইতে সেই নিষেধাজ্ঞা উঠাইয়া লওয়া হয় নাই এবং আইনভঙ্গ আন্দোলন-কালে যে সকল যুবককে বন্দী করা হইয়াছিল, তাহাদের সকলকে মুক্তি দেওয়া হয় নাই। আইন অমান্য আন্দোলনের দমন উপলক্ষে সরকার যে সমস্ত দমননীতিমূলক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রায় সমস্তগুলিই তাঁহারা বহাল রাখিয়াছেন। যথা—অযথা গ্রেপ্তার, পাইকারী জরিমানা, সান্ধ্য আইন, ধর-পাকড়, খানাতল্লাস, ছাড়পত্র, পরিচয়পত্র, কারণ নির্দ্দেশ না করিয়া অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আটক, বিদ্যালয়ের উপর পুলিস ও ম্যাজিষ্ট্রেটের নিয়ন্ত্রণভার, ছাত্রদিগের উপর শিক্ষকদিগের দৃষ্টি রাখিবার জন্য আদেশ প্রভৃতি এ সকল যে হইবে, তাহা সকলেরই জানা কর্ত্তব্য ছিল। বর্ত্তমান যুগে রাজনীতিক্ষেত্রে ধর্ম্মনীতির স্থান নাই। সর্ব্বত্রই বিজিত পক্ষের উপর বিজয়ী পক্ষ কিছু না কিছু প্রতিহিংসা লইয়াই থাকেন। সরকার যদি তাহা করেন, তাহা হইলে উপায় কি? উপায় কিছুই নাই।

সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সভাপতি যাহা বলিয়াছেন, তাহা ন্যায়সঙ্গত। কংগ্রেসের না গ্রহণ না বর্জ্জন নীতির অর্থ—উহাতে মৌনভাবে সম্মতি দান। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে—"আমাদের অত্যন্ত আনন্দের কথা এই যে, সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জনীয়, সে সম্বন্ধে বাঙ্গালার কংগ্রেসের মতদ্বৈধ নাই।" যদি মতদ্বৈধ নাই থাকিবে, তাহা হইলে বাঙ্গালার পক্ষ হইতে জন কয়েক লোক পার্লামেন্টারী বোর্ডে যাইয়া কংগ্রেসের "না গ্রহণ না বর্জ্জন" নীতিতে সম্মতি দিয়া আসিলেন কেন? এখন যাঁহারা বাঙ্গালার সর্ব্বনাশসাধনে বদ্ধপরিকর, তাঁহারা নিশ্চিতই ঐ কয় জনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিবেন,—কৈ, বাঙ্গালায় ত "না গ্রহণ না বর্জ্জন" সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ঐকমত্য নাই; শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র এত করিয়া বলিলেও যাহাদের চৈতন্য হইল না,—ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় কি হইতে পারে? মিষ্টার র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত যে দেশের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন; কিন্তু তাহার উপর মহাত্মাজী পুণায় প্যাক্ট করিয়া বাঙ্গালার যে ঘোর সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, বাঙ্গালী জাতি থাকিতে আর তাহার সংশোধন হইবে না,—ইহা নিশ্চিত কথা। সভাপতি যথার্থই বলিয়াছেন যে "১৯১৬ খৃষ্টাব্দে পৃথক্ নির্ব্বাচন স্বীকার করিয়া লওয়ায় যে পাপ জাতীয় জীবনে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাই আজ সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং ভারতবর্ষে জাতীয়তার অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক স্তরে স্তরে আমরা সাম্প্রদায়িক মীমাংসার অজুহতে জাতীয়তাকে বলি দিয়া সাম্প্রদায়িক দাবী পরিপূরণের চেষ্টা করিয়াছি এবং দাবীও ক্রমাগত বাড়িয়াছে। লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে ছিল পৃথক্ নির্ব্বাচন এবং আসন সংরক্ষণের দাবী। ক্রমশঃ তাহা বাড়িয়া জিন্না মহাশয়ের চতুর্দ্দশ দফা দাবী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতেই শেষ হইবে কি না, কে জানে? কারণ, গোল টেবল বৈঠকে এই চতুর্দ্দশ দফা দাবী স্বীকার করিয়া লইয়াও মহাত্মাজী মুসলমান পক্ষকে জাতীয় দাবী সমর্থন করিতে রাজী করাইতে পারেন নাই।" মহাত্মাজী ততদূর অগ্রসর হইয়া বিশেষ সুবুদ্ধির পরিচয় দেন নাই, এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি একটু ভাবিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

সরকারের দমননীতি

প্রাদেশিক সরকারের দমননীতির উগ্রতা দেখিয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি অনেক কথা বলিয়াছেন। তাঁহার কথাগুলি সত্য। তিনি বলিয়াছেন- "সরকারী ষ্টীম রোলার বাঙ্গালার বুকের উপর দিয়া নির্ম্মমভাবে চলিতেছে। যে সন্ত্রাসবাদীদিগের দমনের জন্য এই ষ্টীম রোলার চলিতেছে, তাহারা যে সংখ্যায় নগণ্য এবং কমিয়া আসিতেছে, এ কথা সরকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। ইহাদের হিংসানীতি আমরা সমর্থন করি না। তাহাদের হিংসানীতির ফলে যে সকল রাজকর্ম্মচারীর জীবনান্ত হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা দুঃখিত। কিন্তু এই সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য যেরূপ ব্যাপক দমননীতি চালানো হইতেছে, তাহাও কোনমতে সহ্য করা যায় না।" তাহার পর তিনি আবার বলিয়াছেন যে, "এই দমননীতি অবাধে চলিতে থাকিলে বাঙ্গালী ডুবিবে, বাঙ্গালা ডুবিবে। অতএব ইহার প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণ করাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য।" কিন্তু সেই প্রতিকার কি করিয়া করিতে হইবে, সভাপতি মহাশয় তাহার নির্দ্দেশ করেন নাই। আমাদের শাসনযন্ত্রের পরিচালক আমলারা দমননীতির উপর সমধিক আস্থাবান। এই দমননীতির অপকারিতার কথা তাঁহাদিগকে বলিলে তাঁহারা সে কথা কাণে তুলিবেন না। এ কথাও সত্য যে, দমননীতি যদি অত্যন্ত উগ্রভাবে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে যে দোষ-দমনের জন্য উহা প্রযুক্ত হয়, পরিণামে তাহাই বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সে কথা যতই সত্য হউক, সরকারী আমলারা যদি সেই কথা না বুঝেন, তাহা হইলে আমরা কি করিতে পারি? সুতরাং ইহার প্রতিকারের কোন উপায় নাই। যদি দেশের লোকের মধ্যে একতা থাকিত, যদি সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একযোগে এই সরকারী নীতির প্রতিবাদ করিতে পারিত,— তাহা হইলে হয় ত ইহার আংশিক প্রতিকার করা সম্ভব হইত। কিন্তু যখন দেশের জনসাধারণের মধ্যে একতা নাই, —যখন আমরা সকলে একযোগে কায করিতে পারি না,— তখন আমাদের বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবার পরামর্শ ব্যর্থ হইবেই। সুতরাং ঐ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করিয়া লাভ নাই। আমাদের মনে হয় যে, মহাত্মাজী আইন অমান্য আন্দোলন উপস্থিত করিয়া দেশের বর্ত্তমান অবস্থা উপস্থিত করিয়াছেন,—এখন তাঁহার রাজনীতিক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়ান উচিত হয় নাই। এই সময়ে তাঁহার একটি সুচিন্তিত কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য ছিল। অবশ্য তিনি যাহা নির্দ্দেশ করিবেন, তাহা প্রবর্ত্তিত করিবার পূর্ব্বে দেশের জনসাধারণকে সে বিষয়ে অবাধে আলোচনা করিতে দিতে হইবে। যিনি যত বড় বুদ্ধিমান্ লোকই হউন না কেন, কেবল আত্মবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া, —অথবা আপনার ভাবের ভাবুক লোকদিগের সহিত আলাপ করিয়া কাহারও কোন সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে। আমাদের দেশের প্রাচীন নীতিশাস্ত্রবিদ্‌রা বলিতেন যে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা যেমন উপায় চিন্তা করিবেন, তেমনই অপায় চিন্তা করিবেন। কেবল অভিমন্যুর ন্যায় শত্রুব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিবার উপায় জানিলে হইবে না,—প্রবেশ নিষ্ফল হইল দেখিলে, তাহা হইতে বাহির হইবার কৌশলও জানা আবশ্যক। নতুবা মরণ নিশ্চিত। মহাত্মাজী আইন অমান্য আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন দেশের লোক তাঁহার উপর শ্রদ্ধাবুদ্ধি বশতঃ তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়াছিল। এখন সে পথে চলিয়া কোন ফল হইল না বটে,— কিন্তু সে উপায় নিষ্ফল হইলে কোন্ পথ ধরিতে হইবে, তাহা কি তাঁহার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল না? কারণ, মানুষ যতই কুশাগ্রবুদ্ধি হউন না কেন, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট উপায় যে অমোঘ হইবে, তাহা কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই মনে করিতে পারেন না। এরূপ অবস্থায় তাঁহার নির্দ্দিষ্ট উপায়, কর্ম্মীর দোষেই হউক আর যে কারণেই হউক, যদি নিষ্ফল হয়, তাহা হইলে কি করিতে হইবে, তাহা সেই উপায়-প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বেই তাঁহার চিন্তা করা উচিত ছিল। কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই, ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। তাই আজ তাঁহার অনুচরগণের মধ্যে বহু লোক অত্যন্ত নিরাশ এবং নির্ব্বিণ্ণ হইয়া উঠিয়াছেন। এখন উপায় কি? এই ব্যাপারে তিনি নেতৃত্বশক্তির অভাবই সূচিত করিয়াছেন।

দিনাজপুরে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

দিনাজপুর প্রাদেশিক সমিতির অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে যে অভিভাষণ করিয়াছিলেন, তাহাতেও বর্ত্তমান-সময়োপযোগী অনেক কথা ছিল।



শ্রীযুত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

তিনি বলিয়াছিলেন যে, কংগ্রেস নিখিল ভারতের সাধারণ সমস্যার কথা আলোচনা করিয়া থাকেন, প্রাদেশিক সমিতিগুলি নিজ নিজ প্রদেশের সমস্যাগুলির কথা বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন। যেমন মারহাট্টি না হইলে অন্য কেহ মারহাট্টা দেশের ও সমাজের মর্ম্মান্তিক সমস্যা বুঝে না, বুঝিবার চেষ্টাও করে না, মাদ্রাজী না হইলে অন্য কেহ মাদ্রাজ দেশের বিশেষ সমস্যার তীব্রতা অনুভব করিতে পারে না, তেমনই বাঙ্গালী না হইলে কেহ বাঙ্গালার বিশেষ বেদনা অনুভব করিতে এবং বিশেষ সমস্যা অনুভব করিতে পারে না। সভাপতি মহাশয় এ কথাটি বোধ হয় বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন যে, আমরা প্রদেশ হিসাবে এরূপ সঙ্কীর্ণমনা এবং স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছি যে, আমাদের অন্যের বেদনা বুঝিবার মত হৃদয়ও নাই, প্রবৃত্তিও নাই। আজ নিখিল ভারত জুড়িয়া বেহারীদিগের জন্য বিহার, উড়িয়াদিগের জন্য উড়িষ্যা,— মারহাট্টাদিগের জন্য মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজীদিগের জন্য মাদ্রাজ, এই রব উঠিয়াছে, কেবল বাঙ্গালা দেশই এই নিখিল ভারতের আঁস্তাকুড় হইয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক দেশের যত জঞ্জাল সবই এইখানে আসিয়া স্থান পাইতেছে, জঞ্জালের সহিত যেমন দুই একটা ভাল জিনিসও সময় সময় আঁস্তাকুড়ে আসিয়া পড়ে, বাঙ্গালায় যে তাহা না পড়িতেছে, তাহা নহে। কিন্তু মোটের উপর প্রায় সবই জঞ্জাল আসিয়া পড়িতেছে। কেবল তাহাই নহে, প্রায় সকল প্রদেশের

লোকই বাঙ্গালীর উপর, বিশেষতঃ উচ্চ বর্ণের বাঙ্গালীর উপর ঘোর বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন। সুতরাং এক প্রদেশের লোকের পক্ষে অন্য প্রদেশের লোকের, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর পক্ষে অন্য প্রদেশবাসীর সহযোগিতায় কোন অসঙ্গত ব্যবহারের বা ব্যবস্থার প্রতিকার করিয়া লওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কংগ্রেস কর্ত্তৃক নিখিল ভারতের একতা-প্রতিষ্ঠার পরিণতি আজ এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই আন্তঃপ্রাদেশিক বিদ্বেষ এবং ঈর্ষা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। ইহার প্রতিকারের কোন উপায় আছে কি? যোগীন্দ্র বাবু এই আন্তঃপ্রাদেশিক ঈর্ষা-বিদ্বেষের কথা বলেন নাই, কিন্তু ইহা ক্রমশঃ একটা উৎকট সমস্যায় পরিণত হইতে চলিয়াছে।

ইহার পর যোগীন্দ্র বাবু বাঙ্গালার অর্থ-সমস্যার কথা আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"বাঙ্গালাদেশ অর্থ-সমস্যায় জর্জ্জরিত। পূর্ব্বে কখনও এরূপ ভীষণ অর্থসঙ্কট হইয়াছে বলিয়া জানি না। পর্ণকুটীরবাসী হইতে রাজপ্রাসাদের অধিকারী আজ সকলেই ভীষণ অর্থ-সঙ্কটের তলে নিষ্পেষিত হইতেছে। বাঙ্গালায় যাঁহারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তি, যাঁহারা বাঙ্গালার শিক্ষা ও সভ্যতা, বাঙ্গালার অর্থনীতি এবং রাজনীতি, বাঙ্গালার ধর্ম্ম এবং সমাজ, বাঙ্গালার শিল্প এবং বাণিজ্য, বাঙ্গালার কর্ম্মশক্তি এবং চিন্তার ধারা, বাঙ্গালার সাহিত্য-বিজ্ঞান এবং কলাবিদ্যা প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে যাঁহারা বাঙ্গালাদেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তাঁহাদের আজ কি অবস্থা হইয়াছে, সকলেই তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছেন।" সভাপতি মহাশয়ের কথাগুলি সত্য। কিন্তু ইহার প্রতিকারের উপায় কি, তাহা কি কেহ ঐকান্তিকভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? কতকগুলি হাতুড়িয়া চিকিৎসক উপস্থিত হইলে প্রত্যেকেই একই রোগী সম্বন্ধে যেমন নানারূপ ঔষধের ব্যবস্থা করেন,—আমাদের দেশের নেতারা সেইরূপ নানা জনে নানা প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন। এ বিষয়ে "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।" কিন্তু কেহই হাতে-হাতিয়ারে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট উপায় কিরূপ ফল প্রসব করিবে, তাহা দেখাইতে অগ্রসর হইতেছেন না। এ বিষয়ে ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের অভিভাষণ সম্বন্ধে আলোচনায় আমরা অন্যান্য কথা বলিলাম।

যোগীন্দ্র বাবু তাঁহার অভিভাষণে বাঙ্গালার বেকার-সমস্যার কথা পাড়িয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "প্রতি ঘরেই এই প্রশ্ন যে, আমাদের শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণ কি করিবে?" এ কথা খুবই সত্য। কিন্তু তাহার পর তিনি বলিয়াছেন যে, "কেবল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে বেকার-সমস্যা, তাহা নহে, এ বেকার-সমস্যা কৃষিজীবী এবং শ্রমজীবীদের মধ্যেও যথেষ্ট আছে।" কৃষিজীবী এবং শ্রমজীবী-দিগের মধ্যে যে বেকার-সমস্যা আছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন, কিন্তু শিক্ষিত ভদ্রলোকের মধ্যে উহা যত প্রবল, অন্য কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে উহা তত প্রবল নহে। আজকাল অনেক এম-এ পাশ করা ছেলে কুড়ি পচিশ টাকা বেতনের চাকুরী পাইবার জন্য দরখাস্ত করে, সুপারিশ যোগাড় করে এবং তোষামোদ করে। কিন্তু পরিচারকের কার্য্যের জন্য সহরে ত দূরের কথা, মফস্বলে কয় জন লোক পাওয়া যায়? যাঁহারা মফস্বলের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে বাঙ্গালী চাকর পাওয়া কঠিন। খোরপোষ, জলখাবার, চিকিৎসার খরচ, পার্ব্বণী ও মাসিক ৫ টাকা বেতন, মাসিক ২০ টাকা বেতন অপেক্ষা কোন অংশেই কম নহে। সেই জন্য দেশ বেহারী এবং উড়িয়া পরিচারকে ভরিয়া যাইতেছে। কেবলমাত্র মাসিক ৫ টাকা বেতনের (খোরপোষহীন) ভদ্রসন্তান পাওয়া যায়, কিন্তু পরিচারক মিলে না। তাই মনে হয়, এই বেকার-সমস্যা ভদ্রসন্তানদিগের মধ্যে অতিশয় প্রবল। এখন ইহার প্রতিকারের উপায় কি, সে সম্বন্ধে যোগীন্দ্র বাবু ত কোন কথাই বলেন নাই। উহা তাঁহার বলা উচিত ছিল।

দিনাজপুর কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনী

এবার দিনাজপুরে যে কৃষি ও শিল্পপ্রদর্শনী হইয়া গেল, তাহার উদ্বোধন করিয়াছিলেন ডক্টর শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। যোগ্য লোকের হস্তেই এই ভার অর্পিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কৃষি এবং শিল্পের উপরই সকল দেশের জীবন-মরণের সমস্যা বিশেষ-ভাবে নির্ভর করে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই দুইটি বিষয়ের উন্নতিসাধনের জন্য যদি কেহ কোন সদুপদেশ দিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি যে জাতির বিশেষ কল্যাণসাধন করেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। সেই জন্য আমরা ডাক্তার ঘোষের অভিভাষণকে বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করি। ইনি ইঁহার অভিভাষণের মুখবন্ধেই বলিয়াছেন যে, "ভারতবর্ষ বর্ত্তমানে মুখ্যতঃ কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু এমনটি চিরদিন ছিল না। ইহা জাতির পক্ষে কল্যাণকরও নহে। এ দেশকে পুনরায় কৃষি এবং শিল্পের দিক্ দিয়া বড় ক'রে তুলতে হবে।" কথাগুলি আমরা বহুকাল হইতেই বলিয়া আসিতেছি। তাহার পর তিনি বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালা আর সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা নাই। এই প্রদেশের ভূমির উৎপাদিকা শক্তি অনেক হ্রাস পাইয়াছে। কেন হ্রাস পাইয়াছে, সে সম্বন্ধে ডাক্তার ঘোষ বিশেষ কোন কথাই বলেন নাই। তাঁহার ন্যায় বিশেষজ্ঞের নিকট হইতে আমরা সে সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা শুনিবার আশা করিয়াছিলাম। বারিধিগর্ভ হইতে এই বাঙ্গালার ভূমি সম্প্রতি উত্থিত হয় নাই। বহু সহস্র বৎসর এই ভূমি স্বর্ণ প্রসব করিয়া আজ কয়েক বৎসর কেন আচম্বিতে উহা একেবারে যেন বন্ধ্যা হইয়া যাইবার মত হইল? এ কথা প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্য যে, যে অঞ্চলে ম্যালেরিয়া রোগ প্রবল হয়, সে অঞ্চলে জমীর শস্যোৎ-পাদিকা শক্তি কমিয়া যায়, গাভীরও দুগ্ধ কমিয়া যায়। ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ সত্য। ডাক্তার বেন্টলীও দেখাইয়াছেন, যে অঞ্চলে ম্যালে-রিয়ার প্রকোপ অধিক, সে অঞ্চলে জমীর উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পায়। ইটালীতে, মরিশসে এবং জর্জ্জিয়ায় বহুপূর্ব্বে এই ব্যাপার লক্ষিত হইয়াছে। বাঙ্গালাতেও এই ব্যাপার বহুদিন হইতে এদেশের লোকের নজরে পড়িয়াছে। এমন অনেক জমী আছে, যে জমীতে পূর্ব্বে বারো মণ ধান জন্মিত, এখন তাহাতে সকল বৎসর পাঁচ মণ ধানও জন্মে না। মধ্য-বঙ্গের বহু স্থানে বন্যা বন্ধ হইয়া যাওয়াতেই যে এই কাণ্ড হইয়াছে, ইহা বহুদিন পূর্ব্বে (সাপ্তাহিক) বসুমতীতে বলা হইয়াছিল। তখন স্যার উইলিয়ম উইলকক্স বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে অথবা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেন নাই। কেবল সার দিয়া জমীর উৎপাদিকা শক্তি বাড়াইবার চেষ্টা করা অপেক্ষা জমীর উপর দিয়া যাহাতে বন্যা

জল গড়াইয়া যায় এবং জমীর উপর হিমশৈল হইতে আনীত গঙ্গা-বাহিত পলিমাটী পড়ে, তাহা করাই ভাল। উহাতে জমীর উর্ব্বরতা বাড়িবে এবং ম্যালেরিয়াও লোপ পাইবে।

ডাক্তার ঘোষ বাঙ্গালার কুটীর-শিল্পের উন্নতিসাধন করিয়া বেকার-সমস্যা সমাধান করিবার উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "যদি আমরা আমাদের অসংখ্য কুটীরশিল্পের উন্নতিসাধন করিতে পারি, তাহা হইলে সহস্র সহস্র বেকার যুবকের কর্ম্ম মিলিবে।" সে কথা সত্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, যদি যুবকগণ পল্লীগ্রামে থাকিয়া অল্প খরচায় শিল্প-পণ্য প্রস্তুত ও বণ্টন করিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চিতই সুবিধা হওয়া সম্ভব। এখন পল্লীগ্রামে থাকিলে ত বৎসরের মধ্যে ৫ মাস ম্যালেরিয়ায় উলুটি-পালটি করিয়া জ্বরে ভুগিতে হইবে, আর তিন মাস তাহার ধাঁপা সামলাইতে যাইবে। আজকাল পল্লী অঞ্চলের অনেক স্থলে বৎসরে সাত আট মাস, কোন কোন অঞ্চলে বৎসরে বারো মাসই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা এরূপ স্থানের নাম করিতে পারি। সুতরাং ম্যালেরিয়া থাকিতে কৃষির ও কুটীর-শিল্পের উন্নতিসাধন সম্ভবে না। আমাদের এই কথা অনেকের মনঃপূত না হইতে পারে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে নামিলে তাঁহারা আমাদের কথা স্বীকার করিবেন। সে জন্য সর্ব্বাগ্রে ম্যালেরিয়া-দমনের একান্ত প্রয়োজন। পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে ডাক্তার ঘোষ যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। উপসংহারে ডাক্তার ঘোষ বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালার সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রাদেশিকতাই এই প্রদেশের আর্থিক এবং রাজনীতিক উন্নতির অন্তরায়। আমাদের বিশ্বাস, ঐ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বড় কারণ বাঙ্গালার স্বাস্থ্যহীনতা। যে দেশে প্রতিবৎসরই সাত আট লক্ষ লোক জ্বর-রোগে মরে এবং (পূর্ব্ববঙ্গ ভিন্ন) প্রায় সকল লোকই জ্বররোগে ভোগে, সে দেশের কি আর নিস্তার আছে? কেবল কতকগুলি সৌখীন সিদ্ধান্ত ধরিয়া থাকিলে চলিবে না।

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর পদত্যাগ

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু কলিকাতার অ-মুসলমান নির্ব্বাচকমণ্ডলী কর্ত্তৃক ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সরকার তাঁহাকে বিনা বিচারে আটক রাখিয়াছেন বলিয়া তিনি ব্যবস্থা পরিষদে তাঁহার কর্ত্তব্যপালন করিতে সমর্থ হইতেছেন না। যাহারা তাঁহাকে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতিনিধির পদ কার্য্যতঃ শূন্য রহিয়াছে। সরকারের কিন্তু সে দিকে দৃক্‌পাত নাই। প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনযন্ত্রের উপর এ দেশের সরকারের দরদ কত, তাহা এই ব্যাপার হইতেই বুঝা যায়। যাহা হউক, তাঁহার নির্ব্বাচকমণ্ডলীর এবং দেশের লোকের ক্ষতি হয় দেখিয়া বসু মহাশয় প্রতিনিধিগিরিতে ইস্তফা করিয়াছেন। এ কথা সত্য যে, এসেমব্লিতে খাঁটির ভবিষ্যতে দেশের লোকের প্রতিনিধিদিগের সহিত সরকারের মতামত লইয়া একটা সঙ্ঘর্ষ বাধিবে। এরূপ অবস্থায় এক দল লোকের প্রতিনিধি যে ব্যবস্থা পরিষদে থাকিবে না,—ইহা অতিশয় অশোভন হইবে,—অন্যায়ও হইবে। শরৎ বাবুর এই পদত্যাগ তাঁহার সদ্‌বিবেচনারই পরিচায়ক হইয়াছে। আমরা বিনা বিচারে কাহাকেও অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য আটক রাখিবার পক্ষপাতী নহি। উহা আমরা অত্যন্ত অবিচার বলিয়া মনে করি। যাহা হউক,



শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু

সরকার তাঁহাকে আটক রাখিলেও ব্যবস্থাপরিষদে উপস্থিত হইয়া ভোট দিবার সুযোগ প্রদান করিলেন না কেন? সরকারের পক্ষে এই সঙ্কীর্ণতার কার্য্য সমর্থনযোগ্য নহে।

আলীপুর আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়্‌যন্ত্রের মামলা

গত ১৮ই বৈশাখ বুধবার আলীপুর ষড়্‌যন্ত্র মামলার রায় প্রকাশিত হইয়াছে। আলীপুর বিশেষ আদালতে এই ষড়্‌যন্ত্র মামলার বিচার হইতেছিল। এই মামলার আসামীরা সকলেই ভদ্রসন্তান। অনেকেই বেকার, কেহ কেহ অস্থায়িভাবে কিছু কিছু কার্য্য করে। ইহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, ইহারা ভারতে আইরিশ পদ্ধতিতে সশস্ত্র বিদ্রোহ উপস্থিত করিবার জন্য ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছিল। আসামীদিগের সংখ্যা ছিল ৩৫ জন। মামলার রায় হইয়াছে ৭ শত পৃষ্ঠা। বিশেষ আদালত ৬ জন আসামীকে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন-দণ্ড প্রদান করিয়াছেন, ৩ জনকে ১০ বৎসর করিয়া, ৯ জনকে সাত বৎসর করিয়া, ৪ জনকে ৬ বৎসর করিয়া, ১ জনকে ৫ বৎসর, ৬ জনকে ৩ বৎসর করিয়া এবং ২ জনকে ১ বৎসর করিয়া সশ্রম

কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। সর্ব্বসাকল্যে ২১ জন আসামীকে দণ্ডিত করা হইয়াছে। আদালত ৪ জনকে মুক্তি দিয়াছেন। তন্মধ্যে ২ জন রাজার সাক্ষী আর দুই জন আদালত হইতে মুক্তি পাইলেও সরকার কর্তৃক অর্ডিনান্স অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছে। এই মামলার সাক্ষী ছিল ৫ শত জন আর দলীলাদি হাজির করা হইয়াছিল ২ হাজার। এই মামলার আসামীরা যে অত্যন্ত বিপজ্জনক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহারা যে কুবুদ্ধিচালিত হইয়া এই ভীষণ কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিল, তাহা সকল প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন। আমরা এই মামলা সম্বন্ধে অধিক কথা বলিতে চাহি না। তবে আমাদের একমাত্র বক্তব্য এই যে, বিশেষ আদালত যে দুই জনের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নাই বলিয়া ছাড়িয়া দিলেন, সরকার তাহাদিগকে অর্ডিনান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করিলেন কেন? আজ ধর্ম্মহীন শিক্ষার ফলে দুই চারি জন যুবক এইরূপ কুপথে চালিত হইতেছে,—ইহার প্রতিকারের উপায় কি, তাহা কি কেহ চিন্তা করিতেছেন?

জিন্নার শঙ্কা

মুসলমান সমাজের অন্যতম জননায়ক এবং সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয়-দাতা মিষ্টার মহম্মদ আলি জিন্না এখন অনেক সময় বিলাতেই অবস্থিতি করিতেছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি ভারতে আসিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি বিলাতে গিয়াছেন। বিলাতে যাইবার প্রাক্কালে তিনি মুসলমান ছাত্র সভায় এক বক্তৃতা করিয়া যান। মুসলমানরা স্বরাজ আন্দোলনে কেন হিন্দুদিগের সহিত যোগ দিতে পারেন না,—সেই বক্তৃতায় তিনি সে কথার অবতারণা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুসভার জন্যই মুসলমানগণ স্বরাজলাভের জন্য চেষ্টা করিতে পারেন না। কারণ,



মিষ্টার মহম্মদ আলি জিন্না

হিন্দুসভা যে ভারতে হিন্দুদিগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর, ইহা তীক্ষ্ণধী মুসলমানগণের বুঝিতে আর বাকি নাই। মিষ্টার জিন্নার এই উক্তি শুনিয়া অনেকে হাসিয়া খুন হইয়াছিলেন। মিষ্টার জিন্না কি বলিতে চাহেন যে, যত দিন হিন্দুসভার প্রতিষ্ঠা না হইয়াছিল, তত দিন মুসলমানগণ সকলে হিন্দুদিগের সহিত একপ্রাণ হইয়া ভারতে স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার বা ভারতের রাজনীতিক উন্নতিসাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন? যদি তাহা না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কি মুসলমানগণের রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান না করিবার কারণ হিন্দুসভার অস্তিত্ব, এ কথা বলা যাইতে পারে? হিন্দুসভা কস্মিন্‌কালেও এমন কথা বলেন নাই যে, ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে, উহা হিন্দু-স্বরাজই হইবে, মুসলমানদিগের বা অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের উহাতে কোন অংশ থাকিবে না। বরং তাঁহারা বরাবর বলিয়া আসিয়াছেন যে, হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টাননির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ই স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে সেই শাসনযন্ত্র পরিচালিত করিবার তুল্যাধিকার পাইবেন। তবে মিষ্টার মহম্মদ আলি জিন্না প্রমুখ ব্যক্তিগণের মনে ঐরূপ আশঙ্কা জাগে কেন? তিনি কি মনে করেন যে, ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারতের সিংহাসনে এক জন যথেচ্ছাচারী রাজাকে বসান হইবে? তাহা যে হইবে না, তাহা তাঁহার মত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিশ্চিতই বুঝেন। তবে তিনি এ কথা বলিলেন কেন? ইহাতে সকলেরই মনে হইতে পারে যে, তিনি মুসলমানদিগের এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সমর্থক কোন যুক্তি খুঁজিয়া পান নাই বলিয়া এইরূপ একটা বাজে কথা বলিয়াছেন। যদি হিন্দুসভা মুসলমানদিগের স্বরাজ আন্দোলনে যোগদানের অন্তরায় হইত, তাহা হইলে তাঁহারা হিন্দু-সভা প্রতিষ্ঠিত হইবার বিশ বৎসর পূর্ব্বে কখনই স্বতন্ত্রভাবে মুস্লিমলীগের প্রতিষ্ঠা করিতেন না। আসল কথা, অন্যের করুণা লাভ করিয়া আত্মপ্রাধান্য লাভ করা যাহাদের উদ্দেশ্য, তাহারা কখনই স্বাধীনভাবে কায করিতে সাহসী হয় না, তাহারা অনুগ্রহকর্ত্তাদিগের মন যোগাইয়াই চলিতে চায়। ইহা স্বাভাবিক। সে জন্য বিস্মিত হইবার কোন কারণ দেখা যায় না।

বাঙ্গালীর সম্মান

আন্নামালাই য়ুনিভারসিটির রসায়ন অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী অস্থায়ী ভাইস চ্যান্সেলার মনোনীত হইয়াছেন জানিয়া আমরা প্রীতি লাভ করিলাম। ডক্টর চক্রবর্ত্তী লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এস্-সি এবং এম, এস-সি তে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হন। পরে ইউ পি সরকারের স্কলারশিপ লইয়া অক্সফোর্ডে গমন করিয়া ডক্টরেট হন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। গত তিন বৎসর তিনি সায়েন্স ফ্যাকাল্টিতে 'ডিন' হইয়াছেন। আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ে



ডক্টর শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

তিনিই একমাত্র বাঙ্গালী অধ্যাপক—তাঁহার বয়স এখন মাত্র ৩১ বৎসর। বাঙ্গালার বাহিরে এই তরুণ বাঙ্গালীর কৃতিত্বে—সম্মানে আমরা গৌরব অনুভব করিতেছি।

রজত-জুবিলী

গত ২২শে বৈশাখ সম্রাট-সম্রাজ্ঞীর রাজ্যাভিষেকের রজত-জুবিলী উৎসব যথোচিত সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে



সম্রাট



সম্রাজ্ঞী

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে দরিদ্রনারায়ণসেবা—আলোকসজ্জা, ছাত্রদের জলযোগ—সিনেমা প্রদর্শন—আতসবাজী—বিবিধ আমোদ-প্রমোদে আনন্দোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু চিরাচরিত প্রথা অনুসারে রাজবন্দিগণকে মুক্তিদান সম্ভবপর হয় নাই। ভারতবাসীরা রাজভক্ত জাতি। বিশেষতঃ স্বর্গীয়া রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতি ভারতবাসীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অত্যন্ত অধিক ছিল। তাঁহার বংশধরদিগের উপরও ভারতের জনসাধারণের শ্রদ্ধা-বিশ্বাস অত্যন্ত অধিক হওয়াই স্বাভাবিক। প্রত্যেক ভারতবাসীই অবগত আছেন, শাসনকার্য্যে যে সকল দোষ এবং ত্রুটি ঘটে, তাহার জন্য সম্রাট্ দায়ী নহেন। সে জন্য শাসনকার্য্যের দোষে দেশের লোকের মনে ক্ষোভ জন্মিলে সে ক্ষোভ সম্রাট্-সম্রাজ্ঞীকে স্পর্শ করে না। তাঁহারা যেমনই শ্রদ্ধাপাত্র, তেমনিই শ্রদ্ধা-ভক্তির পাত্র থাকিয়া যান। গত ২৫ বৎসর সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের রাজত্ব-কালে ভারতীয় শাসনযন্ত্র কি ভাবে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে, ভারতের প্রজাগণ সেজন্যই এই আনন্দ-উৎসবের সময়ে সে কথার আলোচনা করিতে চাহে নাই। তাহারা ভগবানের নিকট কামনা করিয়াছে, সম্রাট্-সম্রাজ্ঞী দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালিত করুন। আমরা যেন বৃটিশ অধিকারের অন্যান্য অংশের সহিত সমকক্ষতা লাভ করিয়া প্রবলপ্রতাপান্বিত সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর শাসনাধীনে তাঁহাদের সিংহাসনারোহণের হীরক-জুবিলী উৎসব সম্পন্ন করিতে পারি। সুতরাং এই উপলক্ষে ভারতের রাজনীতিক অবস্থার আলোচনা না করাই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, লর্ড উইলিংডন এই উপলক্ষে যে ঘোষণাবাণী প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে তিনি ভারতের রাজনীতিক অবস্থার কথা তুলিয়া বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারেন নাই। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গের পর হইতে এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার রাজনীতিক ইতিহাস যে বাঙ্গালীর পক্ষে বিশেষ আশাপ্রদ, তাহা বলা যায় না। তাহার পর লর্ড রেডিং-এর আমল হইতে এ পর্য্যন্ত যাহা ঘটিয়াছে, তাহাকে কোনমতেই প্রগতির লক্ষণ বলিয়া গণ্য করা চলে না। এই সময়ে দমননীতিমূলক যত আইন রচিত হইয়াছে, এমন আর কখনই হয় নাই। কাহার দোষে এইরূপ ঘটিয়াছে, সে কথা আর এখানে তুলিব না। যাহার দোষেই ঘটুক, উহা রাজনীতিক প্রগতির লক্ষণ নহে। "এই সময়ে শাসনকার্য্য পরিচালনের সকল বিভাগের যে বিকাশসাধন করা হইয়াছে এবং সকল শ্রেণীর প্রজাগণের কল্যাণ ও ঋদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছে," এ কথা এ দেশের তথ্যজ্ঞ কোন ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন না। যাহা হউক, ঐ বিষয়ে লর্ড উইলিংডনের সহিত একমত না হইলেও প্রত্যেক ভারতবাসীই যে জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণনির্বিশেষে সম্রাটের দীর্ঘ জীবন এবং তাঁহার রাজ্যের শান্তিকামনা করিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মহরমের দাঙ্গা ও মুসলমান নেতা

করাচির গুলীবর্ষণ ব্যাপার সম্বন্ধে কংগ্রেসের সদস্যগণ সরকারের কার্য্যের সম্বন্ধে যে মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছিলেন,—তাহার পরই মহরম উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমানে যে সকল দাঙ্গা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। উত্তর-ভারতে এবার প্রায় সকল প্রদেশেই হিন্দু-মুসলমানে প্রবল দাঙ্গা ঘটিয়াছিল। বাঙ্গালা-দেশে চড়ক, মহরম এবং অন্য প্রদেশে মহরম এবং রামনবমী এক-সঙ্গে উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া শান্তিরক্ষা বিভাগের রাজপুরুষরা পূর্ব্ব হইতেই সম্ভবতঃ সতর্ক হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্বেও এবার হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা অনেক ঘটিয়াছে এবং ঘটিতে ঘটিতে রহিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে বাঙ্গালায় রাজসাহীতে কেবল মুসলমানে মুসলমানে দাঙ্গা হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন বিহারের রাঁচিতে, ভবনগরে, মালাবিয়াগঞ্জে এবং অন্য কয়েক স্থানে ছোটখাট রকমের গোলমাল ঘটিয়াছিল। কিন্তু আগ্রা জিলার অন্তর্গত ফিরোজাবাদে যে কাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহা অত্যন্ত ভীষণ। কারণ, এ স্থানে প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হয় নাই,—হিন্দুরা

অহিংস এবং অপ্রস্তুত থাকিয়াই মার খাইয়াছে। প্রকাশ—এই স্থানে মুসলমানদিগের একটি বুরাক মিছিল রামচন্দ্রজীর মন্দির অতিক্রম করিয়া যাইলে পর প্রধান বাজারের দক্ষিণদিকের ছাদ হইতে মিছিলের উপর ইট-পাটকেল নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। আগ্রার জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার বেনেসের বিবৃতিতে এই কথা ছিল। এই ব্যাপারে মিছিলের লোকদিগের মধ্যে বিষম চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এবং বহু লোক গলিগুলির মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধায়। তাহারা ডাক্তার জীবরামের বাড়ীতে এবং তাহার সংলগ্ন রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে অগ্নি প্রদান করে। ডাক্তার জীবরামের বাড়ীতে ১১ জন লোক পুড়িয়া মরিয়াছে। তন্মধ্যে তিনটি শিশু ও কয়েক জন রোগীও পুড়িয়া মরিয়াছে। পুলিস জনতাকে চলিয়া যাইতে বলে। জনতা সে কথা গ্রাহ্য করে নাই বলিয়া পুলিস বাধ্য হইয়া তাহাদের উপর গুলী চালায়। পুলিসের গুলীতে এক জন মুসলমান দাঙ্গাকারী নিহত এবং কয়েক জন আহত হইয়াছে। এই সংবাদ বড়ই ভীষণ। ইহা ভিন্ন দাঙ্গাকারীরা ১ জন হিন্দুকে নিহত এবং কয়েক জন হিন্দুকে আহত করিয়াছে। এই ব্যাপারে বুঝা যায় যে, দাঙ্গাকারীরা অত্যন্ত অন্যায়ভাবে ডাক্তার জীবরামকে সপরিবারে পুড়াইয়া মারিয়াছে। মিছিলের উপর যে লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহার নিশ্চিত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। 'ষ্টেটসম্যানের' স্থানীয় সংবাদদাতা ঘটনাস্থল হইতে যে সংবাদ পাঠাইয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ—হিন্দুরা কোনরূপ শান্তিভঙ্গ করে নাই বা চুক্তি লঙ্ঘন করে নাই। মুসলমানরাই নানারূপে শান্তিভঙ্গ এবং চুক্তিভঙ্গ করিয়াছিল। সুতরাং ব্যাপারখানা কি, তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হওয়া উচিত নহে।

এই উপলক্ষে স্যর মহম্মদ ইয়াকুব প্রমুখ মুসলমান নেতৃবৃন্দের মনোভাব যেরূপভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হওয়া উচিত নহে। ইহা দেখিয়াও যাঁহারা হিন্দু এবং মুসলমানদিগের মিলনের আশা এখনও মনে স্থান দিতেছেন,—তাঁহাদের ন্যায় নির্ব্বোধ জীব জগতে আর আছে বলিয়া মনে হয় না। স্যর মহম্মদ ইয়াকুব বলিয়াছেন :—"কানপুরে এবং যুক্তপ্রদেশের অন্যান্য স্থানে মুসলমানদিগকে যখন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়, তখন কোন হিন্দু নেতা বা হিন্দু প্রতিষ্ঠান সে অত্যাচারের নিন্দা করেন নাই। সেই জন্য ফিরোজাবাদে হিন্দুদিগের উপর অত্যাচার হইয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া মুসলিম লীগ এবং মুসলমান সমাজের অন্যান্য নেতারা উহার নিন্দা করেন নাই। সেজন্য মুসলমানদিগকে দোষ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে।" স্যর মহম্মদ ইয়াকুবের এই উক্তি হইতেই এক শ্রেণীর মুসলমানদিগের মনোবৃত্তি কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা অতি স্পষ্টভাবেই বুঝা যায়। মুসলমান সমাজের নেতৃগণ অথবা মুসলিম লীগ যদি বর্ব্বর প্রকৃতির গুণ্ডাদিগের নিন্দা করিতেন, তাহা হইলে নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে নিহত ডাক্তার জীবরাম ও তাঁহার পরিবারবর্গ যে লোকান্তরে বিশেষ শান্তি লাভ করিতেন, তাহা নহে। হিন্দুরা যে তাহার ফলে বিশেষ উপকৃত হইতেন, তাহাও নহে। উহাতে উক্ত সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের নৈতিক বুদ্ধির ও জ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া যায়। পৃথিবীর লোক সে পরিচয় পাইয়াছে ও পাইতেছে। শাসকগণও যে মনে মনে তাহা না বুঝিতেছেন, তাহা নহে। কানপুরের কোন দাঙ্গায় মুসলমানরা হিন্দুদিগের হস্তে নিষ্ঠুরভাবে প্রহৃত হইয়াছে, তাহা ত কেহ জানে না। ইয়াকুব সাহেব সে কথা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। যুক্তপ্রদেশে অনেক স্থানে অতি প্রাচীনকাল হইতে শোভাযাত্রা সহকারে রামলীলার অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে। ঔরঙ্গজেব বাদশাহের আমলেও উহা বন্ধ হয় নাই। কিন্তু খেলাফৎ আন্দোলনের পর যখন মুস্লেম লীগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে,—তাহার পর হইতে অনেক স্থানে রামলীলার শোভাযাত্রা বন্ধ হইয়াছে। হরতাল উপলক্ষে কানপুরে যে দাঙ্গা হইয়াছিল, তাহা বাধাইয়াছিল কাহারা, তাহা বিদিত ভুবনে। সুতরাং আমরা সে সম্বন্ধে অধিক কথা বলিব না। মুসলমান নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের সমাজের কল্যাণ কল্পে যাহা ইচ্ছা তাহা করুন,—আমাদের সে বিষয়ে তাঁহাদিগকে কোন উপদেশ প্রদান করিতে যাওয়াই ভুল।

দমদমায় বিমান-বিপত্তি

দমদমায় বিমানের আড্ডা হইতে প্রায় এক ক্রোশ উত্তরে গৌরীপুর গ্রাম। গত ১৭ই বৈশাখ প্রাতে এই গ্রামে দুইখানি বিমানে ধাক্কা লাগে, তাহার ফলে দুইখানি বিমানই চূর্ণ হইয়া যায়। দুই জন বাঙ্গালী এই দুইখানি বিমান চালাইতেছিলেন।



দেবকুমার রায়



বিনয়কুমার দাস

তাঁহাদের নাম শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় (মিঃ ডি, কে, রায়) এবং শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার দাস (মিঃ বি, কে, দাস)। ইঁহারা উভয়ে মরিয়া গিয়াছেন। দুইখানি বিমানে দুই জন যাত্রী ছিলেন। এক জনের নাম কুমারী ব্রাউনলো আর এক জনের নাম শ্রীযুত পি, গুপ্ত। ভূমি হইতে প্রায় ৬ শত গজ ঊর্দ্ধে এই বিমান দুইখানির পরস্পরের সহিত ধাক্কা লাগে। বৈমানিক বিনয় দাসের পরিচালিত বিমানখানিতে মিস ই এম ব্রাউনলো যাত্রী ছিলেন। মিঃ পি, গুপ্ত ছিলেন অন্য বিমানে। বিমান দুইখানি ভূতলে পতিত হওয়াতে চারি জনেরই মৃত্যু হইয়াছে। বিনয়কুমার বাবুর বিমানটি বাবুবাগান গ্রামের এক আম্রবৃক্ষের উপর পতিত হইয়া

পরে ঠিকরাইয়া মাটীতে পড়ে। মিষ্টার রায়ের বিমান উহার এক শত গজ দূরে ভূতলে পতিত হইয়াছিল। দুইখানি বিমানই পড়িয়া মাটীর মধ্যে বিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। মিষ্টার গুপ্ত কলিকাতাস্থিত একটি বীমা কোম্পানীর সহকারী ম্যানেজার ছিলেন। কুমারী ব্রাউনলো তাঁহার জননীর সহিত ৭নং ব্রয়েড ষ্ট্রীটে বাস করিতেন। শুনা গিয়াছে যে, তাঁহার জননী তাঁহার বিমানভ্রমণে আপত্তি করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স হইয়াছিল ২৪ বৎসর মাত্র।



মিঃ পি, গুপ্ত

মৃত ৪ জন ব্যক্তিই অল্পবয়স্ক। ইঁহাদের মৃত্যুর জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। আকাশে এত স্থান থাকিতে বিমানে বিমানে ধাক্কা লাগে কেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

বাঙ্গালার নদী-পথ

বাঙ্গালার নদী-পথ সম্বন্ধে পূর্ব্বে 'বসুমতীতে' বহুকাল ধরিয়া আলোচিত হইয়াছে। যে সময়ে বাঙ্গালার নদীগুলি বহতা ছিল,—সে সময়ে বাঙ্গালার স্বাস্থ্য সুন্দর ছিল, জ্বরজ্বালা একেবারেই ছিল না। নানা কারণে এই নদীগুলি হাজিয়া মজিয়া যাওয়াতে বাঙ্গালা ম্যালেরিয়া, কলেরা, টাইফয়েড, রক্তামাশয় প্রভৃতি বহু রোগের লীলানিকেতন হইয়া উঠিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই ব্যাপারের প্রতীকার করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত সরকার বিশেষভাবে কোন চেষ্টা করেন নাই। সার উইলিয়ম উইলকক্স বলিয়াছেন যে, দুই শত বা তাহার কিছু অধিককালব্যাপী অবহেলার জন্য বাঙ্গালার নদীগুলি হাজিয়া মজিয়া গিয়াছে এবং উহার ফলে দেশের স্বাস্থ্যহানি এবং শস্যহানি ঘটিতেছে। এই নদীগুলির সংস্কার করিবার কথা অনেক দিন হইতে উঠিয়াছে। শুনা যায় যে, সার এস্‌লি ইডেন যখন বাঙ্গালার ছোট লাট ছিলেন, তখন তিনি কৃষ্ণনগরের সফরে যাইলে তথায় তাঁহাকে যে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়, তাহাতে যমুনা নদীর সংস্কারসাধনের জন্য আবেদন ছিল। এই সময়ে মল্লিকবাগ প্রভৃতি গ্রামের অধিবাসীরা এই যমুনা নদীর সংস্কারকল্পে সরকারের নিকট আবেদন করেন। সে আজ প্রায় ৫৫ বৎসরের কথা। কিন্তু তদবধি এ পর্য্যন্ত উহার কিছুই হয় নাই। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তদানীন্তন ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট মাননীয় মিষ্টার এফ, এ স্লেক (Slacke) বলেন, The Bagerkhal project is a very old one অর্থাৎ উহা অত্যন্ত পুরাতন প্রস্তাব। ইহার পর যখন সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন, তখন এই নদীর সংস্কারকার্য্য আরব্ধ হইয়াছিল, সরকারের প্রায় দেড় লক্ষ টাকা এই কার্য্যে ব্যয় হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পরে Agricultural and Sanitary Improvement Act পাশ হইলে ঐ কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। এই নদীটির সংস্কার হইলে প্রায় সাড়ে ৩ শত বর্গ-মাইল স্থানের স্বাস্থ্যের এবং কৃষির উন্নতি হইত। দেশের লোকের চেষ্টা এবং ইচ্ছা সত্ত্বেও এই নদীসংস্কারকার্য্য কিরূপভাবে উপেক্ষিত হইয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহা দেখাইবার জন্যই আমরা এই দৃষ্টান্তটি দিলাম। মধ্য-বঙ্গের বহু নদীই এইরূপভাবে হাজিয়া মজিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। ভৈরব, অঞ্জনা, কপোতাক্ষী, বেত্রবতী (বেতনা), নাভাঙ্গা প্রভৃতি নদী এইভাবে মজিয়া যাওয়াতে যে কত জনপদ ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। সুতরাং এই সকল নদীর বা খালের সংস্কারসাধন একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এই সমস্যার বিস্তৃত আলোচনা এই স্থানে সম্ভব নহে। তবে বাঙ্গালার মর্ম্মান্তিক সমস্যা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই

অধ্যাপক প্রমথনাথ সরকারের আত্মহত্যা

কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগে কৌতূহলোদ্দীপক মামলা উপস্থিতকারী ফেণী কলেজের অধ্যাপক প্রমথনাথ সরকার আত্মহত্যা করিয়া নিজজীবনের অবসান করিয়াছেন জানিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। অধ্যাপক সরকার শিক্ষিত হইলেও কাপুরুষোচিতভাবে জীবন আহুতি দিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। এই মামলায় জেরা হইবার সময়েই অধ্যাপক সরকার কাহাকেও কিছু না বলিয়া হঠাৎ নিরুদ্দিষ্ট হন। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে প্রমথ বাবু যাইতেছিলেন এবং হাওড়া হইতে গাড়ী ছাড়িবার কয়েক ঘণ্টা পরে তাঁহাকে অচৈতন্য অবস্থায় জলেশ্বর হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহার চৈতন্য আর ফিরিয়া আসে নাই। প্রকাশ—তিনি পোটেশিয়াম সাইয়ানাইড বা অহিফেন সেবনে আত্মহত্যা করিয়াছেন। তাঁহার জামার পকেটে তাঁহার নামের একখানা কার্ড ছিল, এরূপ অবস্থায় তাঁহার মৃত্যুর এক পক্ষ কালের মধ্যে লাশ সনাক্ত হয় নাই কেন? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে দিন তাঁহার আনীত মামলার রায় বাহির হয় ঠিক সেই দিনই রায়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন, এই সংবাদ প্রকাশ

পায়। কিন্তু ঐ সংবাদ প্রকাশ হইতে এত অধিক বিলম্ব ঘটিল কেন? প্রমথ বাবু যে মামলা উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নাম সকল সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি যে আচম্বিতে অদৃশ্য হইয়াছেন, তাহাও সকল সংবাদপত্রে ঘোষিত হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় তাঁহার নামযুক্ত কার্ড যদি তাঁহার পকেটে পাওয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার লাস সনাক্ত করা কি এতই কঠিন হইয়াছিল? আমরা এই প্রহেলিকার উদ্ভেদ করিতে অসমর্থ। আমরা পুলিস কর্ত্তৃপক্ষকে এই বিষয়টির অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমাদের মনে হয়,—এই ব্যাপারে অনেকের প্রজ্ঞাচক্ষু উন্মীলিত হওয়া উচিত।

অধ্যাপক অভয়চরণ মুখোপাধ্যায় পরলোকে

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, অধ্যাপক রায় বাহাদুর অভয়চরণ মুখোপাধ্যায় অকালে পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। ইনি এলাহাবাদের মুরের সেন্‌ট্রাল কলেজের ইংরাজী-সাহিত্যের প্রবীণ অধ্যাপক ছিলেন। ইনি প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে এক জন বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং সুশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স ৫৬ বৎসর হইয়াছিল। ইনি এক জন মনস্বী ব্যক্তি ছিলেন। আমরা ইঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

ঋষিবর মুখোপাধ্যায় পরলোকে

২৫শে বৈশাখ, ৮৩ বৎসর বয়সে, রায় ঋষিবর মুখোপাধ্যায় বাহাদুর তাঁহার বালীগঞ্জ ভবন হইতে সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন।



ঋষিবর মুখোপাধ্যায়

বঙ্গগৌরব যে সকল মনীষী বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর নাম চিরগৌরব-সমুজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন—কাশ্মীর-রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি ঋষিবর মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম। ঋষিবর বাবুর স্বনামধন্য ভ্রাতা নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রিরূপে অতুলনীয় রাজনীতিক পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সুযোগ্য জামাতা সমালোচকচূড়ামণি—পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতির শাসনে তদানীন্তন সাহিত্য সমস্ত—নিয়ন্ত্রিত হইত। ঋষিবর বাবু তাঁহার সম্পত্তির অধিকাংশ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা মায়ের সুসন্তান—প্রতিভাধরগণ একে একে প্রস্থান করিতেছেন—লাঞ্ছনা-বিড়ম্বিত বাঙ্গালী তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণেও আজ অসমর্থ।

অতিথি

এস, অশোক-ফুলের পাপ্‌ড়ি মেখে রঙীন বেশে হে অতিথি!
বসন্ত আজ ডাক্‌ছে তোমায় সাজায়ে তার কুঞ্জবীথি!
হে অতিথি!

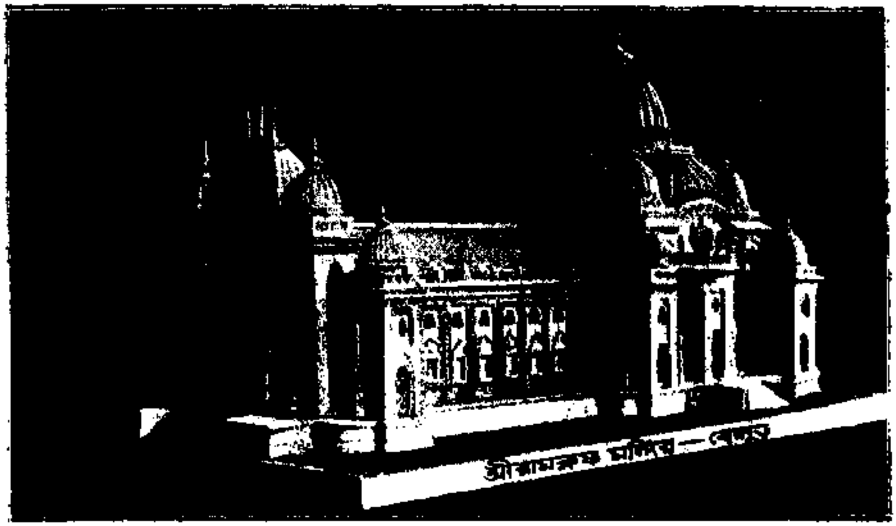
মাধবী আজ চাইছে তোমায় শ্যামল পাতার বাতায়নে,
দিনের শেষের আলোক এসে কি কথা কয় কাণে কাণে!
অনেক দিনের অনেক কথা
আস্‌বে যদি শুন্‌বে কি তা
নীরব ব্যথার সুরে সুরে বাজিয়ে বেণু গুঞ্জগীতি,
হে অতিথি!

তমাল-তলের কালো ছায়ায় বিরহ আজ চাইছে গো,
তোমায় পাবার লাগি পরাণ তাই তো আমার ধাইছে গো—
এস পথিক, এস প্রিয়!
কর সকল রমণীয়—
মিলন-মধুর পরশ দিয়ে জাগাও শত স্বপন-স্মৃতি!
হে অতিথি!

শ্রীপ্রমথনাথ রায়

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বসুমতী রোটারী মেসিনে শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সচিত্র মাসিক বসুমতী



১৪শ বর্ষ] ১৩৪২ [২য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথা

৮

ব্রহ্মবাদী সন্ন্যাসী তোতাপুরীর নিকট দীক্ষাগ্রহণের পর শ্রীপরমহংসদেব ছয়মাসকাল ব্রহ্মবিদ্যাসাধন করেন। এই সময়ে তিনি নিজ শয়নগৃহ হইতে সমস্ত দেবদেবীর চিত্র অপসারিত করিয়া, গুরুর উপদেশমত তদ্‌গতচিত্তে পরমব্রহ্মের ধ্যানে সমাহিত হন। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা ঠাকুরের সাধক জীবনে মনুষ্যগোচরীভূত শেষ উল্লেখযোগ্য সাধনা।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের কোনও সময়ে শ্রীপরমহংসদেব তাঁহার ইষ্টদেবীর নিকট লোকশিক্ষার জন্য আদেশ পাইয়া, ধর্ম্ম-গুরুপদে সমাসীন হইয়া, জগতে নিজ ধর্ম্মমত প্রচারের জন্য প্রস্তুত হন। বিশ্বের কল্যাণের জন্য ধর্ম্মপ্রচারের এই যে আদেশ-প্রাপ্তি, ইহা শ্রীপরমহংসদেবের জীবনে একটি বিশিষ্ট ঘটনা।

কোনও মহাপুরুষ ধর্ম্মগুরুর আসন গ্রহণ করিলে, ধর্ম্মপ্রচারের জন্য, বিশ্বপিতার আদেশ এবং তাঁহার নিজের সাধনা, উভয়ই প্রয়োজন হইয়া থাকে। কেবলমাত্র শাস্ত্রজ্ঞান অবলম্বন করিয়া জগতে ধর্ম্মপ্রচারের প্রয়াস সম্পূর্ণ নিষ্ফল। প্রাচী এই অমূল্য সত্য চিরদিন স্মরণ রাখিয়া ধর্ম্মজগতের শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছে। আদেশ এবং সাধনা এই উভয়ের সংমিশ্রণে প্রাচীর মহাপুরুষগণের জীবন মহীয়ান্ হইয়াই প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিষয়ে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে আদর্শের সম্যক্ বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা দেখিতে পাই যে, বিশ্বপ্রেমের পুরোহিত যীশুখৃষ্ট দরিদ্র সূত্রধরের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া দেশ-বিদেশে ত্যাগের মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন। এক দিন এই মহাপুরুষ গভীর মনোবেদনায় ক্লিষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন—

"Foxes have their holes, and birds of the air have their nests; but the Son of man hath not where to lay his head."

(পশুপক্ষীরও আশ্রয় লইবার স্থান আছে, কিন্তু জগতে আমার কোথাও আশ্রয়ের স্থান নাই)

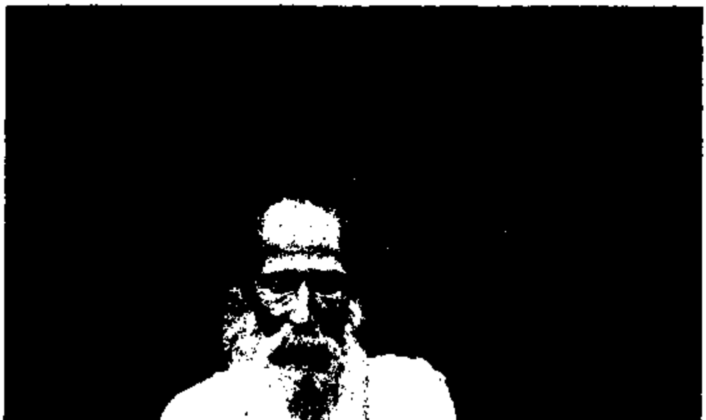
যে দরিদ্র সন্ন্যাসী এইরূপে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া দীনহীন-বেশে জগতে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া গিয়াছেন, সেই মহাত্যাগীর মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াও য়ুরোপীয় জাতিগণ হিংসা, দ্বেষ ও পরশ্রী-কাতরতায় জীবন উদ্ধত করিয়া তুলিয়াছে। যীশুখৃষ্টের মহান্ ত্যাগের ধর্ম্ম য়ুরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে সফল প্রসারতা লাভ করিতে পারে নাই। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, য়ুরোপে খৃষ্টানধর্ম্ম শুধু বাক্যের দ্বারাই গৃহীত এবং প্রচারিত হইয়াছে, প্রাণের সাধনার দ্বারা হয় নাই বলিয়া বিশ্বপ্রেমের মহামন্ত্র য়ুরোপে আজ—

জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্ম্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।

প্রাচী নিজের জীবনে ধর্ম্মগ্রহণ না করিয়া শুধু বাক্যের দ্বারা ধর্ম্ম প্রচারের কার্য্যে কখনও ব্রতী হয় নাই।

কিন্তু এই মহান্ আদর্শ প্রাচীও আজ বিস্মৃত হইতে বসিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে আমরা দেখিতে পাই যে, সকলেই ধর্ম্মশিক্ষকের পদে সমাসীন হইতে চায়। যে কার্য্যের দায়িত্ব জগতের সকল কার্য্য অপেক্ষা গরিষ্ঠ, সেই ধর্ম্মপ্রচারের কার্য্য আজ একটা তুচ্ছ আচারের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আদেশ নাই, সাধনা নাই, শাস্ত্রজ্ঞান নাই—অধিকার নাই অথচ ধর্ম্মসংস্কারই তাঁহার জীবনের ব্রত বলিয়া সদম্ভে ঘোষণা করিতেছেন। ধর্ম্মপ্রচারকার্য্য এত সহজ হইলে জগতে সাধনার প্রয়োজন হইত না, মহাপুরুষগণের অমূল্য উক্তিগুলি গানের কলের দ্বারা ধর্ম্মের বেদী হইতে তারস্বরে প্রচারিত হইতে পারিত। ভারতবর্ষে ধর্ম্মপ্রচার যে দিন হইতে আদেশ এবং সাধনার বস্তু না হইয়া কেবলমাত্র বাক্যসমষ্টিতে পরিণত হইয়াছে, সেই দিন হইতেই ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবর্ষের অবনতির সূত্রপাত।

একবার ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে, শ্রীপরমহংসদেব পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় শশধর তর্কচূড়ামণির সহিত সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তর্কচূড়ামণি



পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় শশধর তর্কচূড়ামণি

মহাশয় তখন হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়া কলিকাতা মহানগরীতে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি এক নূতন আগ্রহের সৃষ্টি করিতেছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর বিশ্বপিতার আদেশ পাইয়া ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কি না, ইহা জানিবার জন্য কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া, শ্রীপরমহংসদেব

তর্ক-চূড়ামণিমহাশয়কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ কোনও আদেশপ্রাপ্তির বিষয়ে পণ্ডিতপ্রবর উত্তর দিতে সমর্থ না হওয়ায়, ঠাকুর তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের চিরন্তন উপকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতপ্রবরের সহিত সাক্ষাতের সময় ঠাকুর বলিয়াছিলেন—"যখন প্রথমে তোমার কথা শুনলুম, জিজ্ঞাসা করলুম যে, এই পণ্ডিত কি শুধু পণ্ডিত, না বিবেক-বৈরাগ্য আছে। যে পণ্ডিতের বিবেক-বৈরাগ্য নাই, সে পণ্ডিতই নয়।……আদেশ পেয়ে যদি কেউ লোক-শিক্ষা দেয়, তাকে কেউ হারাতে পারে না।" * ঠাকুর এই প্রসঙ্গে নিজ জীবনে জগন্মাতার আদেশপ্রাপ্তির কথা ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার নিকট হইতে লোকশিক্ষার আদেশ আসিলে সেই ভাগ্যবান্ ব্যক্তিকে নিজ ধর্ম্মমত প্রচারের জন্য ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে হয় না, বক্তৃতা দিবার স্থান-কাল নির্দ্দেশ করিয়া সংবাদ জ্ঞাপন করিতে হয় না, চুম্বকের আকর্ষণী শক্তিতে আকৃষ্ট লৌহখণ্ডের ন্যায়, ভক্তগণ আপনিই সেই মহাপুরুষের মুখনিঃসৃত বাণী শুনিবার জন্য সাগ্রহে সমবেত হইয়া থাকেন। নিরক্ষর ব্যক্তিও আদেশ প্রাপ্ত হইলে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠরূপে জগতে পরিগণিত হইয়া থাকেন। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "এরূপ লোক পণ্ডিত নয় বটে তা ব'লে মনে ক'র না যে, তার জ্ঞানের কিছু কম্‌তি হয়। বই প'ড়ে কি জ্ঞান হয়? যে আদেশ পেয়েছে, তার জ্ঞানের শেষ নাই। সে জ্ঞান ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে, ফুরোয় না।……ওদেশে ধান মাপবার সময় এক জন মাপে আর এক জন রাশ ঠেলে দেয়, তেম্‌নি যে আদেশ পায়, সে যত লোকশিক্ষা দিতে থাকে, মা আমার পেছন থেকে জ্ঞানের রাশ ঠেলে ঠেলে দেন। সে জ্ঞান আর ফুরোয় না।" † সকল মহাপুরুষেরই এক কথা। যীশু-খৃষ্ট জ্ঞানের "রাশ" সম্বন্ধে তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন—

"**Take no thought how or what ye shall speak: for it shall be given you in that same hour what ye shall speak. For it is not ye that speak, but the siptit of your father which speaketh in you.**"

(কি কথা বলিবে অথবা কিরূপে তাহা বলিবে, সে সম্বন্ধে কোনও চিন্তা করিও না। প্রচারের সময় যাহা বলিবার প্রয়োজন হইবে, সেই বাণী তোমাদের কণ্ঠে প্রদত্ত হইবে। ইহা জানিও যে, তোমাদের শক্তিতে প্রচার হইতেছে না, বিশ্বপিতার বাণীই তোমাদের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতেছে।

আদেশপ্রাপ্তি ব্যতীত কোনও ধর্ম্মপ্রচারই জগতে কল্যাণকর হইতে পারে না, ইহা বুঝাইবার জন্য শ্রীপরমহংস-দেব প্রায়ই একটি সাধারণ ঘটনার উল্লেখ করিতেন। তাঁহার জন্মভূমি কামারপুকুর গ্রামে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী ছিল। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদাসীন আমাদের পল্লীগ্রামে সাধারণতঃ যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ কোনও কোনও গ্রামবাসী লোক রাত্রিকালে এই পুষ্করিণীর তটভূমিতে মল-মূত্রত্যাগ করিয়া পুষ্করিণীর জল দূষিত করিয়া তুলিতেছিল। কত লোকে এই সম্বন্ধে বাগ্‌-বিতণ্ডা করিয়া অপরাধীদিগের উদ্দেশে গালি-গালাজ প্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই, কিন্তু ফলতঃ এই স্বভাবের কোনও পরিবর্ত্তনই পরিলক্ষিত হয় নাই। এক দিন হঠাৎ কোম্পানীর জনৈক "চাপরাসী" পুষ্করিণীর তটদেশে এক আদেশ-ফলক সংলগ্ন করিয়া দিল এবং তাহার পর হইতেই আর কোনও লোক ঐরূপে জল দূষিত করিতে সাহস করিল না। ঠাকুর এই সাধারণ ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিতেন যে, 'চাপরাস' ব্যতীত লোকশিক্ষার প্রয়াস সম্পূর্ণ নিষ্ফল।

মহাপুরুষগণের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই আদেশ—"চাপরাস্"—প্রাপ্ত হইয়া তবে তাঁহারা ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ যীশুখৃষ্ট এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া নিজ ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। যখন জন্ (**John the Baptist**) জর্দ্দান-নদীর তীরে মানবমণ্ডলীকে অভিষিক্ত করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের জন্য তাহাদিগকে প্রস্তুত করিতেছিলেন, সেই সময়ে যীশুখৃষ্ট স্বয়ং আসিয়া তাঁহার দ্বারা জর্দ্দানের জলে অভিষিক্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। জর্দ্দান নদীর জলে অবগাহন পূর্ব্বক যখন যীশুখৃষ্ট তীরে আগমন করিলেন, তখন এই দৈববাণী হইল—

"This is my beloved Son, in whom I am well pleased."

(যীশু আমার প্রিয়পুত্র, ইহার প্রতি আমি অতীব প্রীত)

এই দৈববাণী আরও সুস্পষ্টরূপে পুনর্ব্বার বিশ্বপিতার আদেশ যীশুখৃষ্টের জীবনে ঘোষিত করিয়াছিল। সেই সময়ে যীশুখৃষ্টের প্রতি যে সমস্ত অন্যায় ও অত্যাচার সংঘটিত হইতেছিল, তাহা বিনয়াবনত-হৃদয়ে তিনি গ্রহণ করায় তাঁহার কোনও কোনও শিষ্য দুর্ব্বলতা সন্দেহ করিয়া তাঁহার জীবনের মহদুদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিল। সেই সময়ে এক দিন সমবেত শিষ্যমণ্ডলীর সমক্ষে পুনরায় দৈববাণী হইয়াছিল।

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। † শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

ভগবানের আদেশ মানুষের জীবনে কি আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত করে, তাহা খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারের ইতিহাসে সলের (Saul) জীবনে উজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। সলের জীবন ঋষি বাল্মীকির জীবনের ন্যায় অদ্ভুত ও বিস্ময়কর। যীশুখৃষ্টের মৃত্যুর কয়েক বর্ষ পরে খৃষ্টধর্ম্মবিদ্বেষী



যীশুখৃষ্ট

সল্ একবার জেরুজালাম হইতে দামাস্কাস নগরের দিকে গমন করিতেছিলেন। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ভক্তদিগের প্রতি অত্যাচার করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। দামাস্কাসের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র হঠাৎ দিব্যজ্যোতিতে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং সল্ (Saul) ভূমিতে নিপতিত হইয়া দৈববাণী শ্রবণ করিলেন—"Saul, Saul, why persecutest thou me?" (সল, কেন তুমি আমার প্রতি অত্যাচার করিতেছ?)। বিস্মিত হইয়া সল্ যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?" তখন পুনরায় দৈববাণী হইল, "আমি যীশুখৃষ্ট—যাহাকে তুমি নির্য্যাতিত করিতেছ।" ইহার পর অন্ধ হইয়া সল্ তাঁহার আদেশ প্রাপ্ত হইলেন এবং দামাস্কাসে গিয়া দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া যীশুখৃষ্টের ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। যে খৃষ্টধর্ম্মবিদ্বেষী লোক অসংখ্য ভক্ত নরনারীকে নির্য্যাতিত করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিতেন, সেই লোকই আদেশপ্রাপ্তির পর আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া দেশবিদেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়া সেণ্ট পল্ নামে, খৃষ্টধর্ম্মের দ্বিতীয় মহান্ প্রবর্ত্তকরূপে,—The Second Founder of Christianity—জগতে অমর হইলেন। দেবতার আদেশই তাঁহার জীবনে এই আমূল পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিয়াছিল।

ভগবানের আদেশপ্রাপ্তির আর একটি বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত জগতে ধর্ম্ম-জীবনের ইতিহাসে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তখন মধ্যযুগে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল, সাধনা ভুলিয়া মানব বাহিরের নিষ্ফল আচারকেই ধর্ম্মের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এই সময়ে ১১৮২ খৃষ্টাব্দে ইটালীর এসিসি (Assisi) নগরে জনৈক ধনী ব্যবসায়ীর গৃহে ফ্রান্সেস্কো (Francesco) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ধনী পিতামাতার একমাত্র সন্তান। সাধারণ ধনী দুলালের ন্যায় সুখের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইয়া প্রায় চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ বয়সে তিনি হঠাৎ কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী হইলেন। জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে বহুদিন অবস্থান করিয়া অবশেষে তিনি আরোগ্যলাভ করেন। কিন্তু এই সময় হইতেই তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। একটি ভগ্ন মন্দিরে গিয়া তিনি কাতর-হৃদয়ে ভগবানের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া এক দিন তাঁহার আদেশ প্রাপ্ত হইলেন।

"God met him and a voice said, Go and build my church again."

(তিনি ভগবানের দর্শন পাইলেন এবং এই বাণী শ্রবণ করিলেন,—যাও আমার মন্দির নূতন করিয়া গঠিত কর।)

আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ভক্তগণ সাকার উপাসনায় বিশ্বাস করেন না, নিরাকার ব্রহ্মই তাঁহাদের উপাস্য দেবতা। কিন্তু এই খৃষ্টান ভক্তপ্রবর ভগবানের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তের সহিত ভগবানের বিচিত্র সম্বন্ধ, তাহা লোকমত, শাস্ত্রমত অথবা ব্যক্তিগত ধর্ম্মবিশ্বাসের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ নহে। আদেশপ্রাপ্ত হইয়া, বিলাসিতার ক্রোড়ে লালিতপালিত, ধনী পিতামাতার একমাত্র সন্তান যখন ঐশ্বর্য্য ধূলিমুষ্টির ন্যায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক, যীশুখৃষ্টের আদর্শে দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিয়া, নগ্নপদে জীর্ণবস্ত্রে জগতের সম্মুখে আসিয়া

দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন এসিসির বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, সেই মূর্খ উন্মত্তের চিত্তবিকার দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারেন নাই!

"Great men smiled at the craze of the monomaniac.......That a man of business should be blind to the preciousness of money was a sufficient proof, then, as now, that he must be mad."

(ধনী ব্যক্তিগণ উন্মত্তের মত্ততা দেখিয়া মৃদু হাস্য করিলেন। ধনী ব্যবসায়ী অর্থের দিকে না চাহিয়া, স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করিতে পারে, ইহা যেমন বর্ত্তমান যুগে উন্মত্ততার নিদর্শন, মধ্যযুগেও ইহা সেইরূপ উন্মত্ততার লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।)

কিন্তু এই সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী দেশদেশান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া, ইন্দ্রিয়সুখ ও বিলাসিতায় আকণ্ঠনিমগ্ন মধ্যযুগের ব্যক্তিগণের মধ্যে যে আদর্শ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রভাব বহু শতাব্দী পরেও ক্ষুণ্ণ না হইয়া, আজিও জগতের এক জন মহান্ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকরূপে (one of the great movers of the world) তাঁহার সাধনা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত করিতেছে। আদেশপ্রাপ্তি ব্যতীত এরূপ শক্তি এবং ত্যাগ জগতে দুর্ল্লভ।

এই আদেশপ্রাপ্তিই ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে একমাত্র সহায়ক নহে, ধর্ম্মগুরুর নিজের সাধনারও প্রয়োজন হইয়া থাকে। একনিষ্ঠ সাধনা না থাকিলে আদেশপ্রাপ্তি সম্ভবপর নহে; সাধনা না করিলে "আদেশ" জীবনে নিষ্ফল হইয়া যায়। আদেশ সাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত; আদেশ সাধনার দ্বারাই জীবনে সফলতা লাভ করিয়া থাকে। ইংরেজীতে একটি প্রচলিত কথা আছে—"We teach more by our lives than by our words" (আমরা আমাদের জীবনের দ্বারা যাহা শিক্ষা দিই, তাহা বাক্যের দ্বারা শিক্ষাপ্রদান অপেক্ষা অধিকতর কার্য্যকরী) শ্রীপরমহংসদেবের জীবনে এই সত্য আমরা বর্ণে বর্ণে প্রতিফলিত দেখিতে পাই। ঠাকুর যে উপদেশ নিজ জীবনে পালন করেন নাই, সে শিক্ষা তিনি অপরকে কখনও প্রদান করেন নাই। মহাভারতে যখন বকরূপী ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরকে পরীক্ষা করিবার মানসে তাঁহাকে "কঃ পন্থাঃ" (ধর্ম্মের পথ কি ?) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেই প্রশ্নের উত্তরে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ধর্ম্মজগতে যে পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে, সেই পথই সর্ব্বাপেক্ষা সরল ও সুগম বলিয়া যুগযুগান্তর হইতে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।

(বেদ-সমূহ বিভিন্ন, স্মৃতিও বিভিন্ন মত প্রকাশ করে, এমন ঋষি নাই যিনি নূতন মত প্রবর্ত্তিত করেন নাই। ধর্ম্মের তত্ত্ব অতীব গভীর, সুতরাং মহাপুরুষগণ যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই ধর্ম্মের পথ বলিয়া গ্রহণ করিবে।)

এই সহজ উত্তরের মধ্যে ধর্ম্মজীবনের পথ যেরূপ সরলভাবে নির্দ্দেশিত হইয়াছে, সেইরূপ ধর্ম্মগুরুগণের কঠিন দায়িত্বও ইহার দ্বারা সমভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। মহাপুরুষগণ যে পন্থা কেবলমাত্র মুখের বাক্যের দ্বারাই নির্দ্দেশিত করিয়াছেন, তাহা পথ নহে; যে পন্থা দূর হইতে তাঁহারা অঙ্গুলিনির্দ্দেশ-পূর্ব্বক দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহাও পন্থা নহে; যে পথে তাঁহারা 'গতাঃ', যে পথ তাঁহারা নিজে অনুসরণ করিয়াছেন, সেই পথই সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে অবলম্বনীয়। মহাভারত পথ-নির্দ্দেশের জটিল প্রশ্নের যে মীমাংসা করিয়াছেন, সেই পথ সাধকগণের পদচিহ্নরঞ্জিত। সুতরাং নিজ জীবনে ধর্ম্মোপদেশ পালন না করিয়া শুধু বাক্যের দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার নিষ্ফল প্রয়াসমাত্র; মহাভারত ভক্তগণকে সে পথ অবলম্বন করিতে উপদেশ প্রদান করেন নাই।

মহাপুরুষগণ নিজ ধর্ম্মোপদেশ জীবনে পালন না করিয়া কেবলমাত্র বাক্যের দ্বারা তাহা প্রচার করিলে সেই ধর্ম্মপ্রচার নিষ্ফল হইয়া থাকে, ইহা শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীপরমহংসদেব একটি সুন্দর গল্পের অবতারণা করিতেন। জনৈক কবিরাজের নিকট কোনও পীড়িত ব্যক্তি ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থার জন্য আগমন করিয়াছিল। কবিরাজ মহাশয় তাহাকে ঔষধ প্রদান করিয়া পথ্যের ব্যবস্থা লইবার জন্য পরদিবস আসিতে অনুরোধ করেন। যথাসময়ে সেই পীড়িত ব্যক্তি পুনরায় উপস্থিত হইলে কবিরাজ মহাশয় তাহাকে গুড় খাইতে নিষেধ করিলেন। পীড়িত ব্যক্তি চলিয়া যাইবার পর কবিরাজের কোনও বন্ধু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, পূর্ব্বদিবসে এই সহজ ব্যবস্থা দিলেই হইত; ইহার জন্য পীড়িত ব্যক্তিকে পুনরায় আসিতে বলিয়া তাহার অসুবিধা করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কবিরাজ মহাশয় হাসিয়া বলিলেন যে, পূর্ব্বদিবসে তাঁহার ঘরে একটি বৃহৎ

পাত্রে গুড় রক্ষিত ছিল, সুতরাং সে দিন তিনি রোগীকে গুড় খাইতে নিষেধ করিলে, রোগী কবিরাজের নিজগৃহে গুড় দেখিয়া তাঁহার ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারিত না। সুতরাং গুড়ের পাত্রটি সরাইয়া তবে কবিরাজ মহাশয় তাহাকে গুড় খাইতে নিষেধের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীপরমহংসদেব ইহার দ্বারা ইঙ্গিত করিতেন যে, নিজে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিয়া ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিতে না পারিলে অপরকে সেই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও নিষ্ফল।

এই বিষয়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। এক দিন শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত (শ্রী-ম) নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) ও অন্যান্য ভক্তগণ সমবেত হইয়া ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। কঠোর সাধনা ব্যতীত ধর্ম্ম প্রচারের প্রচেষ্টা নিষ্ফল, ইহাই বুঝাইবার জন্য ঠাকুরের পরম ভক্ত শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প বলিয়াছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ম্মের মধ্যেই নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সাধারণতঃ ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করিতেন না। ইহাও উল্লেখ করিয়া শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত বলিয়াছিলেন, "বিদ্যাসাগর বলেন, আমি বেত খাবার ভয়ে ঈশ্বরের কথা কারুকে বলি না।" "বেত খাবার ভয়ে" কথাটি সম্যক্ বুঝিতে না পারিয়া নরেন্দ্র প্রশ্ন করিলে, ভক্ত মহেন্দ্র বলিয়াছিলেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন, মনে কর, মরবার পর আমরা সকলে ঈশ্বরের কাছে গেলুম। মনে কর, কেশব সেনকে যমদূতেরা ঈশ্বরের কাছে নিয়ে গেল। কেশব সেন অবশ্য সংসারে পাপ-টাপ করছে, যখন প্রমাণ হ'লো, তখন ঈশ্বর হয় ত বল্‌বেন, ওঁকে পঁচিশ বেত মার্! তার পর মনে কর, আমাকে নিয়ে গেল। আমি হয় ত কেশব সেনের সমাজে যাই। অনেক অন্যায় করেছি। তার জন্যে বেতের হুকুম হ'ল। তখন আমি হয় তো বল্‌লাম, কেশব সেন আমাকে এইরূপ বুঝিয়েছিলেন, তাই এইরূপ কায করেছি। তখন ঈশ্বর দূতদের আবার হয় ত বল্‌বেন, কেশব সেনকে আবার নিয়ে আয়। এলে পর হয় ত তাঁকে বল্‌বেন, তুই একে উপদেশ দিয়েছিলি? তুই নিজে ঈশ্বরের বিষয় কিছু জানিস্ না; আবার পরকে উপদেশ দিয়েছিলি? ওরে কে আছিস্,—একে আর পঁচিশ বেত দে। তাই বিদ্যাসাগর বলেন, নিজেই সাম্‌লাতে পারি না, আবার পরের জন্য বেত খাওয়া! আমি নিজে ঈশ্বরের বিষয় কিছু বুঝি না, আবার পরকে কি লেকচার দেবো।" *



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ভক্তিমার্গ ও জ্ঞানমার্গ নিজ জীবনে উপলব্ধি না করিয়া কেবলমাত্র বাক্যচ্ছটার দ্বারা যাহারা ধর্ম্মোপদেশ জগতে প্রচার করিয়া থাকেন, সেই অন্তঃসারশূন্য মিথ্যাভিমানী ব্যক্তিদিগকে লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মবীর ঈশ্বরচন্দ্র এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

জগতে মহাপুরুষগণের জীবনকাহিনী আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহারা নিজ-জীবনে তাঁহাদের সাধারণ উপদেশগুলিও নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া তবে সেই

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।



মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব

সম্বন্ধে অপরকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। মহাপ্রভু সম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে—

"প্রভু আপনি আচার ধর্ম্ম পরেরে শিখায়"

ধর্ম্মজীবনের ত কথাই নাই, সাধারণ উপদেশগুলিও নিজজীবনে পালন করিয়া মহাপ্রভু কিরূপে অপরকে শিক্ষাদান করিতেন, তাহা তাঁহার জীবনের দুই একটি ঘটনা হইতেই সহজে উপলব্ধি করা যায়। একবার মহাপ্রভু গুণ্ডিচা-মন্দিরের আবর্জ্জনারাশি দূর করিবার জন্য আপনি সম্মার্জ্জনীহস্তে ভক্তগণের সহিত তথায় গমন করিয়াছিলেন।

চারিপাশে শত ভক্ত সম্মার্জ্জনী করে
আপনি শোধয়ে প্রভু শিখায় সবারে।

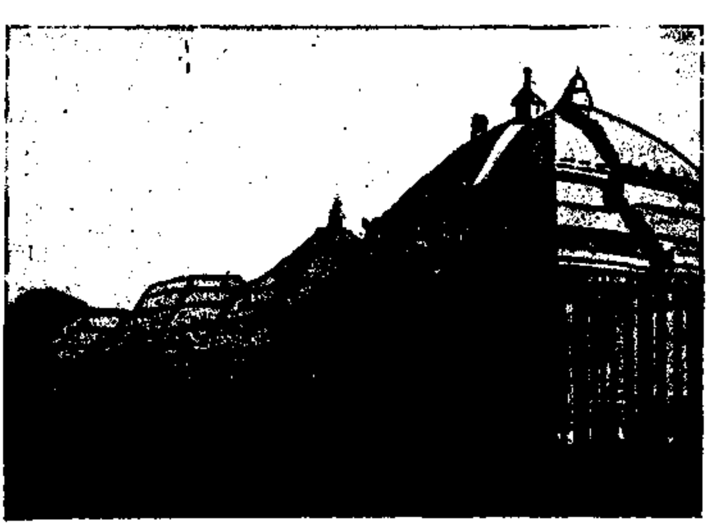
ভক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব যখন সম্মার্জ্জনীহস্তে মন্দিরের প্রাঙ্গণ হইতে আবর্জ্জনা দূর করিতেছিলেন, তখন তাঁহার 'ধূলিধূসর-তনু' হইল 'দেখিতে শোভন।' সেই তপ্ত-কাঞ্চনপ্রতিম দেহ যখন ধূলিধূসরিত হইয়াছিল, তখন সেই বরবপু কি শোভা ধারণ করিয়াছিল, তাহা আজ কল্পনার দ্বারা অনুমেয়, ভক্ত কৃষ্ণদাসের লেখনীও তাহা সম্যক্ পরিস্ফুট করিতে পারে নাই। যখন মন্দির 'মার্জ্জন' করিয়া ভক্তগণ বাহিরে আসিলেন, তখন দেখা গেল যে,—

"সবা হইতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল।"

একবার ভক্ত জগদানন্দ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ব্যবহারের জন্য সুগন্ধি চন্দনাদি তৈল আনয়ন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু তখন নীলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন। সংসারত্যাগী শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তগণকে আহার-বিহারে সর্ব্ববিধ বিলাসিতা বর্জ্জন করিতে সর্ব্বদাই উপদেশ প্রদান করিতেন, সুগন্ধি তৈলের কথা শুনিয়া প্রভু তাহা ব্যবহার করিতে অস্বীকার করিলেন।

প্রভু কহে, "সন্ন্যাসীর নাহি তৈলে অধিকার।
তাহাতে সুগন্ধি তৈল পরমধিক্কার॥
জগন্নাথে দেহ তৈল দীপে যেন জ্বলে।
তোর পরিশ্রম হবে পরম সফলে॥"

ভক্ত জগদানন্দ কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না, তিনি তাঁহার "জগন্নাথের" জন্য তৈল আনিয়াছিলেন, মহাপ্রভুর



গুণ্ডিচামন্দির

"জগন্নাথের" পূজায় তাহা ব্যবহৃত হইলে ভক্তের তৃপ্তি হইবে না, বারংবার জ্ঞাপন করিলেন।

শুনি প্রভু কহে কিছু সক্রোধ-বচন।
মর্দ্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দ্দন॥
এই সুখ লাগি আমি করিল সন্ন্যাস।
আমার সর্ব্বনাশে তোমা সবার পরিহাস॥
পথে যাইতে তৈলগন্ধ মোর যেই পাইবে।
'দারী সন্ন্যাসী' করি আমারে কহিবে॥

ভক্ত জগদানন্দ অভিমানে ব্যথিত হইয়া গৃহ হইতে 'তৈলকলস' আনিয়া আঙ্গিনাতে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। অভিমান ও দুঃখে সেবার দ্রব্য নষ্ট করিয়া, নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক জগদানন্দ শয্যাগ্রহণ করিলেন। প্রভু আসিয়া স্নেহার্দ্র-বচনে তাঁহার দুঃখ প্রশমিত করিলেন, কিন্তু তথাপি লোকশিক্ষার জন্য নিজ কঠোর আদর্শ হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না।

ভক্ত তুলসীদাস সাধনবর্জ্জিত মিথ্যা ধর্ম্মপ্রচারের নিষ্ফলতা সম্বন্ধে অন্যান্য মহাপুরুষগণের ন্যায় একই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

রাম নাম সব কোই কহে, ঠগ ঠাকুর ঔর চোর
বিনা প্রেমসে রীঝত নহি, তুলসী, নন্দকিশোর।

(হে তুলসী, সাধু এবং দুর্জ্জন ব্যক্তি সকলেই মুখে রামনাম করিয়া থাকে, কিন্তু প্রেমসাধনা ব্যতীত নন্দকিশোর কখনও প্রসন্ন হন না।)

তীব্র বিদ্রূপ করিয়া সেই মিথ্যাভিমানী ধর্ম্মপ্রচারকগণকে লক্ষ্য করিয়া ভক্ত তুলসীদাস বলিয়াছেন,—

পানি না মিলে আপকো, ঔরণ বক্সত ক্ষীর,
আপন মন নিশ্চয় নহী, আউর বাধাওত ধীর।

(আপনার একবিন্দু জলও সংগ্রহ করিবার সামর্থ্য-নাই, অথচ অপরকে ক্ষীরভোজন করাইবার আকাঙ্ক্ষা আছে। নিজ মন চঞ্চল, অথচ অপরকে সংযমী হইতে উপদেশ দেয়।)

ধর্ম্মের অনুভূতি ব্যতীত লোকশিক্ষাপ্রদানের প্রচেষ্টা ভক্তপ্রবর তুলসীদাসের মতে বারিবিন্দুবিহীন দরিদ্রের অপরকে ক্ষীরভোজন করাইবার আকাঙ্ক্ষার ন্যায় অলীক ও উপহাসের যোগ্য।

বীভৎস বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার অবসান হইলে মহাবীর নেপোলিয়ান যখন নির্ব্বাসিত হইয়া প্রশান্তদৃষ্টিতে জীবনের কঠোর সত্যগুলি ধীরে ধীরে দেখিতে পাইতেছিলেন, তখন অনুতাপে বিদ্ধ হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—

"Nations pass away; thrones crumble; but Christianity remains. Alexander, Cæsar, Charlemayne and myself founded empires. But on what did we rest creations of our genius? Upon Force. Jesus Christ alone founded his empire upon Love; and at this hour, millions of men would die for him."

(জাতিগণ কালে পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হয়, সিংহাসন ধূলিমুষ্টিতে পরিণত হয়, কিন্তু খৃষ্টধর্ম্ম সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যেও বিরাজ করিতেছে। আলেকজান্দার, সিজার, সারলামেন এবং আমি নিজে পশুশক্তির উপর সাম্রাজ্য স্থাপনা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কেবলমাত্র যীশুখৃষ্ট বিশ্বপ্রেমের উপর তাঁহার সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এবং আজিও লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতেছেন।)

জীবনের সায়াহ্নে নেপোলিয়নের মর্ম্মস্থল হইতে যে রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়াছিল, তাহার মধ্যে যে সত্য নিহিত ছিল, তাহা নেপোলিয়ন পূর্ব্বে কখনও অনুভব করেন নাই। তাঁহার বিজয়কাহিনী হয় ত এক দিন অলীক স্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হইতে পারে, কিন্তু যে সত্যবচন তাঁহার মর্ম্মন্তুদ বেদনার মধ্যে তিনি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিনের জন্য ধর্ম্মজীবনের ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

সাধনার দ্বারা সত্যানুভূতি না হইলে ধর্ম্মপ্রচারকার্য্য সম্পূর্ণ নিষ্ফল, তাহা শ্রীপরমহংসদেব জানিতেন বলিয়া, তাঁহার জীবনে, প্রতি পদবিক্ষেপে, আদর্শের পথ তিনি অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। ভগবানের দর্শনলাভ করিলে আর কোনও শাস্ত্রপ্রদিষ্ট কর্ম্মই অবশিষ্ট থাকে না, ইহা তিনি বারংবার বলিয়াও ভক্তগণের শিক্ষার জন্য শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্মসকল নিজ জীবনে অনুষ্ঠিত করিতেন। এক দিন সমবেত শিষ্যমণ্ডলীকে তিনি তাঁহার সরল ভাষায় এই কথাই বলিয়াছিলেন। "এখানকার (শ্রীপরমহংসদেবের) যা কিছু কথা সে তোদের জন্য। ওরে, আমি ষোল টাং (ভাগ) ক'র্লে তবে যদি তোরা এক টাং করিস্। আর, আমি যদি দাঁড়িয়ে মুতি, তা তোরা পাক দিয়ে-দিয়ে তাই কর্ব্বি।" আপনার এই অমূল্য উপদেশ চিরজীবন স্মরণ রাখিয়া জীবনের সায়াহ্ন পর্য্যন্তও কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান তিনি শিথিল হইতে দেন নাই।* "সন্ন্যাসী জগদ্গুরু, তাকে দেখে লোকে শিখবে"—এই অমূল্য সত্য জীবনে পালন করিয়া আজ এই সন্ন্যাসী দেহত্যাগের অর্দ্ধশতাব্দী পরেও জগদ্গুরুরূপে পৃথিবীর সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

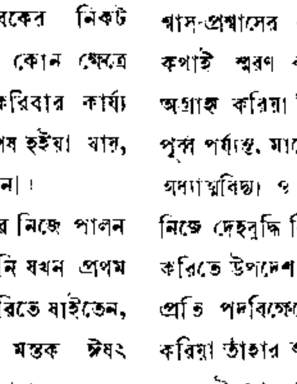
শ্রীপরমহংসদেব যখন দেবীর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া লোক-শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হন, তখন বঙ্গদেশের নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা শোচনীয়। পাশ্চাত্য-শিক্ষা তখন বঙ্গদেশে প্রসারলাভ করিতে কেবলমাত্র আরম্ভ করিয়াছে। পাশ্চাত্য আদর্শ অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তাহাদের শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে দেশে এক নূতন স্রোত প্রবাহিত করিতেছিল। বঙ্গদেশে তখন বিজিত জাতির সমস্ত আদর্শই হীন বলিয়া প্রতিভাত, অমিতশক্তিশালী বিজেতার আদর্শই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছিল। নিজের আদর্শ শিথিল অথচ বিদেশীর আদর্শ সম্পূর্ণ করায়ত্ত হয় নাই। এমনই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অমোঘ শঙ্খ দক্ষিণেশ্বরের ঘন বনরাজির মধ্য হইতে চতুর্দ্দিক্ প্রকম্পিত করিয়া ধ্বনিত হইল। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য-শিক্ষাভিমানী যুবকরা তখন মাথাটা নুইয়ে পেন্নামটা পর্য্যন্ত কর্ত্তে জান্তো না।" মস্তক অবনত করিয়া গুরুজনকে প্রণাম করাও ইংরেজী শিক্ষাসম্পন্ন যুবকের নিকট কুসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখনও কোনও কোন ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, গুরুজনকে প্রণাম করিবার কার্য্য দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী মস্তকে সংলগ্ন করিয়াই শেষ হইয়া যায়, দেহ ঋজুই থাকে, মস্তক কিছুমাত্র অবনত হয় না।

শ্রীপরমহংসদেবকেও এই সাধারণ শিষ্টাচার নিজে পালন করিয়া অপরকে শিক্ষা দিতে হইয়াছিল। তিনি যখন প্রথম প্রথম ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, তখন কেশবচন্দ্র চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া মস্তক ঈষৎ অবহেলন করিয়াই শ্রীপরমহংসদেবের প্রণাম গ্রহণ করিতেন। সেই যুগে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ন্যায় একাধারে ভক্তি এবং শাস্ত্রজ্ঞানের অধিকারী আর কেহই ছিলেন না। ঠাকুর বলিয়াছেন যে, তিনি প্রতিবার সাক্ষাতের সময় ভূমিতে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিবার পর অবশেষে কেশবচন্দ্র ভূমিতে মস্তক সংলগ্ন করিয়া শ্রীপরমহংসদেবকে প্রণাম করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে ঠাকুর সাধারণ কার্য্যও নিজে অনুষ্ঠিত করিয়া তবে জগতে শিক্ষাপ্রদান করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীপরমহংসদেব দেহে আত্মবুদ্ধি আরোপ করেন নাই। ভগবান্‌কে লাভ করাই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, ইহা তিনি আজীবন শিক্ষাপ্রদান করিয়াছিলেন। দেহ—"হাড়-মাংসের খাঁচা" মাত্র—যত দিন ভগবৎপ্রাপ্তি না হয়, তত দিন ইহার প্রয়োজনীয়তা। এই সম্বন্ধে তাঁহার মত এতই দৃঢ় ছিল যে, ভগবানের দর্শনলাভের পর সাধু ব্যক্তি আত্মহত্যা করিয়া দেহত্যাগ করিলেও তিনি তাহাতে দোষারোপ করিতেন না। জীবনে দেহকে তুচ্ছ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া, মরণেও তিনি সেই শিক্ষা সুদৃঢ় করিয়া গিয়াছেন। নিদারুণ ব্যাধিতে দুর্ব্বল অবস্থায় যখন কণ্ঠনালীর ক্ষত তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট সৃষ্টি করিয়া মুহুর্মুহুঃ তাঁহাকে দেহের কথাই স্মরণ করাইতেছিল, তখনও ব্যাধির অসীম যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করিয়া তিনি সমবেত শিষ্যমণ্ডলীকে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, মাসের পর মাস, দিনের পর দিন, ধর্ম্মপ্রচার, অধ্যাত্মবিদ্যা ও যোগ সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রদান করিয়াছিলেন। নিজে দেহবুদ্ধি বিস্মৃত না হইলে অপরকে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে উপদেশ প্রদান করা অলীক ও নিষ্ফল। ধর্ম্মজীবনে প্রতি পদবিক্ষেপে তিনি নিজ আচরণের দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া তাঁহার অনুভূত সত্য জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

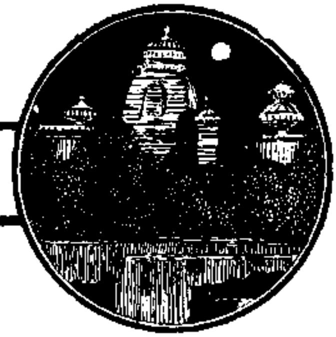
এইরূপে আদেশপ্রাপ্ত হইয়া এবং সাধনার দ্বারা সেই আদেশ নিজ জীবনে সফল করিয়া, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে শ্রীপরমহংসদেব লোকশিক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় (অধ্যাপক)।





ইতিহাসের অনুসরণ



পৃথিবীর প্রাচীনতম সাম্রাজ্য

মানুষ আজ পৃথিবীতে নিজের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে—জলে-স্থলে মানুষের আজ অমোঘ প্রতাপ। একদিন এই মানুষই পৃথিবীতে ছিল যাযাবর-জাতি। তার না ছিল গৃহ, না ছিল ক্ষেত-খামার, বাগান-পুষ্করিণী—না ছিল কোন সম্পত্তি। যেমন-তেমন অস্ত্র হাতে লইয়া সে বনে বনে পশু-পক্ষী শীকার করিয়া বেড়াইত; সেই পশু-পক্ষীর মাংস ছিল তার একমাত্র খাদ্য। মানুষ তখন মানুষ ছিল না; ছিল ইতর-পশুর একটু উচ্চ-স্তরের বর্ব্বর জীব।

ক্রমে সেই মানুষই দল গড়িয়া খানিকটা মহল্লার সৃষ্টি করিয়া তাহারি সীমারেখার মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। এ সীমা অতিক্রম করিত না, আত্মরক্ষা ও নিরাপদ শান্তি-লাভের অভিপ্রায়ে। এ সময়ে তার কথার ভাণ্ডার ছিল সঙ্কীর্ণ; অভাব ছিল প্রচুর; এবং সে অভাব-মোচনের প্রয়াসে তার জীবন ছিল সঙ্কটাচ্ছন্ন!

তার পর মানুষ শিখিল তৃণ-শস্য-ফসল বুঝিতে এবং সে শস্য সঞ্চয় রাখিতে। শস্য-রোপণের সঙ্গে সে শিখিল বৃক্ষাদির বীজ রক্ষা ও বপন করিতে। মাংসাহার ত্যাগ করিয়া উদ্ভিদে তার রুচি জন্মিল; পশু-পালনের উপকারিতা বুঝিয়া গো-মেষাদি পালন করিতে শিখিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন-মত তার অস্ত্র-শস্ত্র সংখ্যায় বাড়িতে লাগিল।

আট হাজার বৎসর পূর্ব্বে আত্ম-সর্ব্বস্ব মানব প্রথম সঙ্ঘ-বদ্ধ হইল; তাহার গোষ্ঠী বাড়িল। আবাস-গৃহ-নির্ম্মাণে সে পটুতা লাভ করিল এবং মানব-সমাজে পরিশ্রমের মূল্য নির্ণীত ও শ্রমের বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হইল। এ যুগে আহারের জন্য মৃগয়ার উপর আর নির্ভর রাখিতে হইল না। পূর্ব্বে আহারের সময় নিরূপিত ছিল না—থাকিবার উপায়ও ছিল না; এখন গৃহে আহার মজুত বলিয়া আহারের সময় নিরূপিত ও নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল। পূর্ব্বে যে-মানুষ দৈবের উপর নির্ভর রাখিয়া চলিত—এখন জীবনের সকল দিকে তার সুনিশ্চয়তা দেখা দিল।

পশু-পক্ষি-সমাজে বীভার, কাঠবিড়ালী, মৌমাছি, এমন কি, কুকুরও খাদ্য সঞ্চয় রাখিতে জানে; সঞ্চয় কাহাকে বলে, আদিযুগের মানুষ জানিত না; দীর্ঘ দীর্ঘ যুগের অভিজ্ঞতায় মানুষ সঞ্চয়ী হইয়াছে।

গৃহ রচনা করিয়া স্বগৃহে নিরাপদ শান্তিতে বাসের মূল্য বুঝিবার পূর্ব্বে মানুষের পরিশ্রম ও অস্বস্তির অন্ত ছিল না। কাজ সে তখন করিত, তবে সে কাজে কোন শৃঙ্খলা ছিল না। সে কাজের পরিণাম সম্বন্ধেও কোনরূপ বাছ-বিচার বা নিয়ম-রীতি মানুষ জানিত না। যে কাজে খেয়াল বা একান্ত প্রয়োজন হইত, শুধু সেই কাজ করিত। অস্ত্র-শস্ত্র আদিম যুগেও প্রস্তুত হইত—কিন্তু যে-অস্ত্রে যাদের প্রয়োজন ঘটিত, তারাই দায়ে পড়িয়া সেই অস্ত্র তৈয়ার করিত। সব চেয়ে বিপদ ছিল অগ্নি-প্রজ্বালনে। বার বার অগ্নি প্রজ্বালিত করা—সে ছিল বড় কঠিন কাজ। এজন্য অগ্নি একবার প্রজ্বলিত হইলে সে অগ্নিকে অনির্ব্বাণ রাখিবার জন্য নর-সমাজে নিদারুণ যত্ন ও অধ্যবসায় বিদ্যমান ছিল। দলের এক জনকে পরম নিষ্ঠায় এই অগ্নিকে অনির্ব্বাণ রাখিবার জন্য বিরামহীন সাধনা করিতে হইত।

শ্রমের কাজ বেশীর ভাগ করিত মেয়েরা। আদিম যুগে নারীর উপর পুরুষের মমতা বা শ্রদ্ধা আদৌ ছিল না। এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় বাসা তুলিবার খেয়াল পুরুষের মনে জাগিলে সে-খেয়ালের সব দায় বহিত মেয়েরা।—তারা মালপত্র বহিত; পুরুষের দল অস্ত্র-হাতে শুধু পথ-চলার শ্রমটুকু স্বীকার করিত।

নর-সমাজে কৃষির প্রবর্ত্তন ঘটে নারীর কল্যাণে ফল-খাওয়ার পর ফলের বীজ কুড়াইয়া জড়ো করিয়া রাখা—সেগুলা লইয়া অবসর-কালে খেলাধূলা—তাহা হইতেই বীজ-শস্যাদি বপনের প্রবর্ত্তন হয়। সখের জন্য নয়, বাগ-বাগিচার সৃষ্টি হইয়াছিল খাদ্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতে।

তার পর মানুষ ক্রমে অভিজ্ঞতায় বুঝিল, বর্ষার ধারায় বা বন্যার স্রোতে স্থলপ্রদেশ জলপ্লাবিত হইবার পর আবার যখন সে জল সরিয়া নামিয়া শুকাইয়া যায়, তাহারি অব্যবহিত পরক্ষণে সেই স্থল-ভাগে তৃণ-শস্যের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। ইহা প্রত্যক্ষ করার ফলে মনুষ্য-সমাজে সুশৃঙ্খল ধারায় কৃষির পত্তন সুরু হয়। প্রথমে এই সব নীচু জমিতেই—বর্ষার ও বন্যার জল শুকাইলে—শস্যাদি রোপণ করা হইত; ক্রমে ভূয়োদর্শিতার কল্যাণে উচ্চ ভূমি-ভাগ জলে সিক্ত ও উর্ব্বর করিয়া সেই ভূমির উপর শস্যাদি-রোপণের ব্যবস্থা হয়। সেই ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ খাল কাটিয়া বিভিন্ন ভূভাগে জল-সরবরাহ (irrigation) করিতে শিখে।

কৃষিকার্য্যে পারদর্শিতার উপর সভ্যতা নির্ভর করে না। এক জন সুধী লেখক সত্য কথাই বলিয়াছেন—Cultivation is not civilization. ধান-যবের চাষ—কৃষির ভাণ্ডারে সর্ব্বপ্রথম সম্পদ্। সভ্যতা-বিকাশের পনেরো-ষোল হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইহা প্রচলিত আছে।

কৃষি-প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে একই নির্দ্দিষ্ট ভূমিখণ্ডে প্রতি বৎসর চাষ-আবাদ করিতে করিতে মানুষ সেই নির্দ্দিষ্ট ভূমিখণ্ডকে নিজের সম্পত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিল এবং সে ভূমিখণ্ডের রক্ষায় সে তৎপর হইল। এমনি করিয়া বৃহত্তর মহল্লা, পল্লী ও প্রদেশাদি গঠিত হইয়া উঠিল।

নির্দ্দিষ্ট বাস-গৃহে বাস; নির্দ্দিষ্ট ভূমিতে চাষ-আবাদ; সেই সঙ্গে ক্ষেতের উন্নতি; স্নান ও পানীয় জলের ব্যবস্থা; গৃহ-পালিত পশু-পক্ষীর লালন-কার্য্য; গৃহ-রচনার প্রয়োজনীয়তা—এগুলার মূল্য ও উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া মানুষ পূর্ব্বেকার লক্ষ্যহারা যাযাবর-বৃত্তি ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ গৃহবাসী জীবে পরিণত হইল। বাসগৃহ-নির্দ্দেশের সঙ্গে সঙ্গে জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহের পক্ষে প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য যাহাতে অনায়াস-লভ্য হয়, তাহার ব্যবস্থা-কল্পে হাট-বাজার, গ্রাম-নগর সংস্থাপিত হইল। দিকে দিকে শৃঙ্খলা দেখা দিল। এমনি করিয়াই এশিয়া ও য়ুরোপ ভূখণ্ডে নানা প্রদেশ সংস্থাপিত হয়। যে প্রদেশে যে মানব-সঙ্ঘ বাস করিত, সে প্রদেশকে যথাসম্ভব সুখময় করিয়া তুলিতে, সুশৃঙ্খল শান্তিময় রাখিতে তাদের যত্ন ছিল অপরিসীম।

যে প্রদেশের ভূমি সমধিক উর্ব্বর, যে দেশ সমধিক 'সুজলা-সুফলা'—সে দেশ সমৃদ্ধতর হইতে লাগিল।

প্রাচীন যুগের ঐতিহাসিক প্লিনি বলিয়া গিয়াছেন,—শস্য-সম্পদে মেশোপটামিয়ার তুলনা ছিল না। বৎসরে দুইবার করিয়া প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইত। অন্নপূর্ণা দুই করতল ভরিয়া প্রচুর অন্ন দান করিতেন। মেষ, গাভী, মহিষ প্রভৃতি গৃহ-পালিত পশুর দল পেট ভরিয়া প্রচুর আহার পাইত,—ফলে তাদের পুষ্টি ছিল অসাধারণ; তাল-খর্জ্জুর ও বিবিধ ফলে তরুরাজি অবনমিত থাকিত; খাদ্যের দিক দিয়া প্রাচুর্য্য ছিল সীমাহীন। গৃহ-নির্ম্মাণের উপযোগী মাটী ও পাথর ছিল পর্য্যাপ্ত। মেশোপটেমিয়ার মাটী এমন ছিল যে, সে মাটী পুড়াইতে হইত না—রৌদ্র-তাপে আপনা হইতে তাহা ইষ্টকের মত কঠিন সুদৃঢ় হইত।

এমন দেশে মানুষের যাযাবর-বৃত্তি রুচিতে পারে না। নিরাপদ বসতি ও সেই সঙ্গে বংশবৃদ্ধি চলিল। লোকবল যেমন বাড়িতে লাগিল, বন-জঙ্গলের তেমনি উচ্ছেদ ঘটিতে লাগিল; হিংস্র পশুরা সভয়ে সদলে দূরে সরিয়া গেল। মানুষ পৃথিবীর বুকে ভালো করিয়া শিকড় গাড়িয়া বসিল।

বসতি-হিসাবে আদি যুগে মিশর ও মেশোপটামিয়া সব চেয়ে সমৃদ্ধ ছিল। তারপর সমৃদ্ধ হইল লোহিত সাগরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী উপত্যকা প্রদেশ—আরব ও মধ্য-এশিয়া।

এই সব প্রদেশের তুলনায় অপর প্রদেশের মনুষ্য-জাতি যাযাবর, বর্ব্বর রহিয়া গেল। খাদ্যাহরণে তাহারা আতুর; খাদ্য অপ্রচুর। সে জন্য তারা হইল হীনবল, শীর্ণকায়।

বংশ-বৃদ্ধির সঙ্গে পূর্ব্বোল্লিখিত মানবজাতি দিকে দিকে নব নব বসতি সন্নিবেশের সন্ধানে যাত্রা করিল। সে জাতির অস্ত্র ছিল বিবিধ—কৌশল অবার্থ—কার্য্য-তৎপরতা প্রচুর—বুদ্ধি তীক্ষ্ণ; কাজেই তাহাদের কাছে শীর্ণকায়, হীনবল, মাংসাহারী বর্ব্বর জাতি-সমূহ পরাভূত হইল। বিজয়ীর উপনিবেশ দিকে দিকে যেমন প্রসারিত হইয়া চলিল, পরাভূত হীন-বল বর্ব্বর জাতি তেমনি অনিশ্চিত আকাশ-কুসুম-খচিত বন-পথে সরিয়া পলাইতে লাগিল। যাযাবর জাতির জীবন-সংগ্রাম ঘুচিতে চাহে না।

সদা-ক্ষুধাতুর দেহ, সদা অপ্রসন্ন মন—তাহারা যেন দুর্গ্রহের মত অভিশাপের মত গ্রাম-নগরের বাহিরে বনে-জঙ্গলে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। নিরাপদ গৃহ-বাসী বিজয়ী জাতি ক্রমে শান্তি-সুখে মগ্ন থাকিয়া শৌর্য্য-বীর্য্যে উদাসীন হইল; ভোগ-সুখী, বিলাস-পরায়ণ হইল। দুশ্চিন্তা নাই—কাজেই

উদ্যম নাই ; ওদিকে অভাবগ্রস্ত ক্ষুধাতুর বর্ব্বর জাতি একদিন নিরুপায়ে নিতান্ত দুঃসাহসে ভর করিয়া খাদ্য-লোভে জনপদ-বাসী জাতির গৃহ আক্রমণে প্রবৃত্ত হইল। আহারের সন্ধানে মরিয়া-বর্ব্বর জাতির দুর্দ্ধর্ষতা দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতেছিল ; গৃহ-বাসী নিরীহ জাতি তাদের আক্রমণে সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। বর্ব্বর জাতির আক্রমণে নগর-সীমান্তবর্ত্তী দেশগুলি নিত্য-নিয়ত প্রপীড়িত, বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল। লুঠপাট করিয়া নগরে ইহারা থাকিত না—পলাইয়া যাইত।

নিরুপায় গৃহ-বাসীর অবস্থা শেষে এমন হইয়া উঠিল যে, বলবান বর্ব্বর জাতির পীড়নে তারা মথিত মর্দ্দিত হইয়া নিজেদের আর অটল রাখিতে পারিল না। বর্ব্বর জাতিরা ক্রমে মহা-বিক্রমে তাদের পরাভূত করিয়া সমস্ত গ্রাম-নগর অধিকার করিয়া বসিল। নিরীহ গৃহবাসীরা প্রথম তাদের অধীনতা শিরোধার্য্য ; অবশেষে নিজেদের এই জাতির দাস্যে নিয়োজিত করিয়া প্রাণ বাঁচাইল। তখন এই বিজয়ী বর্ব্বর জাতি হইল প্রভু, রাজা ; বিজিত জাতি হইল তাদের আজ্ঞাবহ নফর !

এই বর্ব্বর জাতি নগরে আসিয়া রাজত্ব করিতে বসিলেও দীর্ঘ দীর্ঘ যুগ ধরিয়া তাদের পুরানো অভ্যাস ছাড়িতে পারে নাই। পূর্ব্ব-অভ্যাসবশে তারা মৃগয়াদি ব্যসন-ক্রীড়ায় ও রথ-বাহিনী-চালনায় নিযুক্ত রহিল। কৃষিকার্য্যাদিকে তারা হীন চক্ষে দেখিত ; কৃষি ছিল তাদের কাছে ইতরের পেশা!

ইহাই মানবজাতির সাত হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এই সাত হাজার বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখি—মানব ছিল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

১। শাসক-সম্প্রদায়। ইহারা নিজেদের হাতে কোনো কাজ করে না—শুধু হুকুম করে। এবং ২। শাসিত সম্প্রদায় বা জন-সাধারণ। এ শ্রেণীতে জন-সংখ্যা বিপুল বিশাল। ইহারা কাজ-কর্ম্ম করে ; শাসক সম্প্রদায়কে মানিয়া চলে।

কালক্রমে এই শাসক সম্প্রদায় তাদের উচ্চ মঞ্চ ত্যাগ করিয়া একটু নীচে নামিয়া আসিল, আরিষ্টোক্রাশির দর্প ছাড়িয়া ললিত-কলার চর্চ্চায় রত হইল ; বিজিত জাতির প্রতি ঘৃণার ভাব বর্জ্জন করিয়া তাদের সুখ-দুঃখের সংবাদ লইয়া সহানুভূতি দেখাইতে লাগিল! উভয় সম্প্রদায়ে সম্পর্ক যখন ঈষৎ প্রীতি-মধুর হইয়া উঠিয়াছে, তখন আসিয়া উভয় দলে হানা দিল, বহির্দ্দেশ হইতে নূতন শত্রু। তাদের বিক্রম প্রচণ্ড। সে বিক্রম সহিতে না পারিয়া এ দুই সম্প্রদায় এই তৃতীয় নবাগত জাতির বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল।

বিজয়-কাহিনীর সহিত বিশ্ব-ব্যাপী সভ্যতার সম্পর্ক বিজড়িত রহিয়াছে। সভ্যতার কিরণে প্রথম উদ্ভাসিত হয়—মিশর ; ভারতবর্ষ ; চীন ; পশ্চিম এশিয়া-খণ্ড এবং আমেরিকা।

১। সুমেরিয়ান জাতি

টাইগ্রিশ ও ইউফ্রেটিশ নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ প্রাচীন যুগে সুমেরিয়া নামে অভিহিত ছিল। এই প্রদেশে ছিল সুমেরিয়ান জাতির বাস। এ জাতি সভ্য ছিল। নর-নারীর বর্ণ ছিল—(সম্ভবতঃ) গৌর ; অর্থাৎ ইবেরিয়ান বা দ্রাবিড় বংশীয়গণের সমতুল্য বর্ণ-বিভা। এ-জাতির মধ্যে লিখন-প্রথা বিদ্যমান ছিল। ইহারা লিখিতেন কর্দ্দমের গায়ে—চিত্র-বিচিত্র ছাঁদে। সম্প্রতি সে লেখার মর্ম্ম আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ জাতির ভাষা অতি প্রাচীন ককেশীয় ভাষার সগোত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। স্পেন হইতে পশ্চিম-য়ুরোপ—য়ুরোপ হইতে ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলস্থ প্রদেশ ভেদ করিয়া মধ্য-আফ্রিকা পর্য্যন্ত বিস্তারিত ভূখণ্ডে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, সেই ভাষার সঙ্গে এ জাতির ভাষার সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

বিগত জার্ম্মাণ যুদ্ধের অব্যবহিত পরে কাপ্তেন ক্যাম্বেলের অধিনায়কতায় এখানকার ধ্বংস-স্তূপের উদ্ধার-সাধন হয় এবং সে ধ্বংসস্তূপে যে লেখা দেখা যায়, সে-লেখার পাঠোদ্ধার করিয়া জানা গিয়াছে, সুমেরিয়া-জাতি ছিল কৃষি-সর্ব্বস্ব ;—ফশল-কাটা হইত মৃত্তিকা-নির্ম্মিত অস্ত্রে—এ তথ্যও অভ্রান্ত বলিয়া জানা গিয়াছে।

প্রাচীন সুমেরিয়ান জাতি মস্তক-মুণ্ডন করিতেন ; পাৎলা পশমী পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। তাঁরা আসিয়া সর্ব্বপ্রথম বাস করেন পারস্য উপসাগরের উপকূলে। রাজধানীর নাম ছিল এরিডু। খৃষ্ট-জন্মের ৬৫০০ বৎসর পূর্ব্বে এরিডুর অবস্থান ছিল সমুদ্রের তীরে। খাল কাটিয়া জল আনিয়া সে জল সেঁচিয়া জলাশয় হইতে দূরে অবস্থিত জমিসমূহকে তাঁরা সযত্নে সিক্ত ও উর্ব্বর করিতেন। উচ্চ ভূমিতে জল তুলিবার নানা কৌশল তাঁহাদের জানা ছিল ; গাভী, গর্দ্দভ, মেষ ও ছাগ তাঁহারা পালন করিতেন। অশ্ব

পালন করিতেন না। মাটীর কুটীরে তাঁরা বাস করিতেন; ঘেঁষাঘেঁষি পাশাপাশি বহু কুটীর রচনা করিয়া বহুজনে সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাস করিতেন। উপাসনার জন্ম বহু মন্দির রচনা করিয়াছিলেন। সাধারণ মাটী রৌদ্র-কিরণে তাতাইয়া তাহাতে ইট তৈয়ার করিতেন। সেই ইটে কুম্ভাদি পাত্র রচনা করিতেন; বিবিধ মূর্ত্তি গড়িতেন; বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া মেষ-চর্ম্মে তাঁহারা সে-রচনা রক্ষা করিতেন। কাগজ বা ভূর্জ্জপত্রের প্রচলন ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

নিপ্পুর নামক গ্রামে ইষ্টক-নির্ম্মিত মন্দিরের বহু ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। বিগ্রহের নাম ছিল এল্-লিল্।

সুমেরিয়ান জাতির মধ্যে নগর-রচনার বাঁধা-ধরা রীতি প্রচলিত ছিল। তাঁরা বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়াছিলেন; সামরিক বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁদের সৈন্য-বল ছিল প্রচুর। যুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে দীর্ঘ বর্শা ও বর্ম্ম ব্যবহার করিতেন। বাহিনী থাকিলেও যুদ্ধের প্রথা ছিল—দ্বৈরথ।

বহু বৎসর ধরিয়া সুমের প্রদেশ অপরাজেয় ছিল। কোন বিজয়ী শত্রু সুমের-জয়ে সক্ষম হয় নাই—তাদের বহু আক্রমণ বীর সুমেরিয়ানরা প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। জল-পথে তাঁরা বাণিজ্য করিতেন—নৌকার সাহায্যে। এ জাতির ক্রমে বিলোপ ঘটে অপর বহু জাতির মধ্যে বিলীন হওয়ার ফলে।

ইতিহাসে যে সকল প্রাচীন সাম্রাজ্যের পরিচয় পাই, সেগুলির মধ্যে এই সুমের সাম্রাজ্যই ছিল প্রাচীনতম। এ-রাজ্যের বিস্তার ছিল পারস্য উপসাগরের সীমান্ত-ভাগ হইতে ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত—সমগ্র ভূখণ্ড ব্যাপিয়া। এই ভূমি-তলে সমগ্র মানব-জাতির কৃষি-সাধনার প্রথমার্দ্ধভাগ সমাহিত রহিয়াছে। সুমের সাম্রাজ্য পরিচালনা করিতেন সুমেরীয় পুরোহিতগণ।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার বহু নিদর্শন এখনো পাওয়া যায়। সুমেরিয়ান জাতি আসিয়া ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাহাতে ভুল নাই। তবে জলপথে অথবা স্থলপথে তাঁরা ভারতে আসেন, সে সম্বন্ধে সঠিক তথ্য এখনো পাওয়া যায় নাই। অনুমান হয়, জল-পথেই আসিয়াছিলেন। গঙ্গা নদীর উপকূলবাসী ভারতীয় জাতির শিক্ষা-দীক্ষার সহিত এই প্রাচীন সুমেরিয়ান জাতির শিক্ষা-দীক্ষার বহু সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়াছে!

২। সেমিটিক জাতি

খৃষ্ট-জন্মের ৩০০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে সুমেরিয়ান জাতির উপর সেমেটিক জাতির আক্রমণ চলে। বার বার পরাজিত হইয়া অবশেষে খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ ২৭৫০ সালে সেমিটিক দলের নায়ক সারগন্ সুমেরিয়ান জাতিকে পরাভূত করেন। বিজয়-লাভের পর এই প্রদেশে তিনি রাজ্য স্থাপন করেন।

তারপর দু'হাজার বৎসর ধরিয়া সেমিটিক জাতির ভাগ্য-রবি উদয়াচলে বিদ্যমান থাকে। সেমিটিক জাতি জয়ী হইলেও সুমেরিয়ান জাতির শিক্ষা ও সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে। তাঁরা সুমেরিয়ান ভাষা ও লিখন-পদ্ধতিও অবলম্বন করেন। সুমেরিয়ান ভাষা ছিল শক্তিমানের ভাষা—শিক্ষিতের ভাষা; এবং এই ভাষা ক্রমে নানা পরিবর্ত্তন সহিয়া সমগ্র মধ্য-য়ুরোপে বিস্তারিত হইয়া পড়ে।

দু'হাজার বৎসর পরে পূর্ব্বাঞ্চল হইতে এলাশাইট জাতি এবং পশ্চিমাঞ্চল হইতে আমোরাইট জাতি আসিয়া সুমের-রাজ্য আক্রমণ করে। সুমের-রাজ্যকে এ দুই জাতি যেন ক্রমে দুই ভাগে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। আমোরাইট জাতি প্রাচীন হিব্রু জাতির সহিত সম্পর্কিত। আমোরাইট জাতির রাজধানী বাবিলন ২১০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে আমোরাইট-রাজ হামুরাবি সর্ব্বপ্রথম বাবিলন-সাম্রাজ্য স্থাপিত করেন।

এ সময় যুদ্ধ-বিরোধের অন্ত ছিল না। দুই শত বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে। পরে ক্যাসাইট নামে এক নূতন জাতি আসিয়া বাবিলন আক্রমণ করে। আমোরাইট জাতির পরাজয় হয়। ক্যাসাইট-রাজ বাবিলনের সিংহাসনে বসেন। এই ক্যাসাইট-জাতিই সর্ব্বপ্রথম অশ্ব-চালিত রথে চড়িয়া রণাঙ্গনে উদয় হন। অশ্বারোহী সৈন্যের আমরা প্রথম সাক্ষাৎ পাই এই যুদ্ধে।

[ক্রমশঃ]

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়



লক্ষ্যভেদের ব্যবস্থা

একটা মানুষের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ওয়াশিংটনের ধনভাণ্ডারের রক্ষি-সৈনিকগণ তাহার প্রতি গুলী নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ইহাতে লক্ষ্য-ভেদের কৌশল বেশ শিক্ষা করা যায়। ডমির দেহে রক্ষিসৈনিকগণ



লক্ষ্যভেদের ব্যবস্থা

গুলী নিক্ষেপ করার পর কাহার গুলী কোথায় লাগিয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখে। তার পর লক্ষ্য আরও যাহাতে ভাল হয়, তাহার চেষ্টা করিতে থাকে।

বিমানাকার পীড়িত-বহনকারী নৌকা

পোর্টল্যাণ্ডের পুলিস বিভাগের জন্য একজাতীয় নৌকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। উহার আকৃতি খ-পোতের ন্যায়। উহা জলে ডুবিবে না এবং উহার গতিবেগও ঘণ্টায় ৪০ মাইল। আহত ও পীড়িত-দিগকে বহনের জন্যই এই জলযানের সৃষ্টি। এই জলযান এমন



খ-পোত আকারবিশিষ্ট পীড়িত-বহনকারী জলযান

ভাবে নির্ম্মিত যে, যখন উহা পূর্ণবেগে ধাবিত হয়, তখন মনে হয়, বাতাসে ভর করিয়া উহা চলিয়াছে। নৌকার দীর্ঘতা ২৪ ফুট, উচ্চতা ৬ ফুট। নৌকা-পরিচালকের স্বতন্ত্র বসিবার স্থান আছে। দুই জন ষ্ট্রেচারবাহী লোক এবং ডাক্তারের জন্যও স্বতন্ত্র কক্ষ আছে। ষ্ট্রেচারগুলি যখন অব্যবহৃত থাকে, তখন তাহাদিগকে তাকের উপর তুলিয়া রাখা হয়। অক্সিজেন-পূর্ণ ট্যাঙ্ক অন্যান্য সরঞ্জাম নৌকার মধ্যে সঞ্চিত থাকে।

চারিতলা পথ

আমেরিকার সহরের রাজপথগুলিতে জনযান-নিয়ন্ত্রণ সমস্যা দূরীভূত করিবার জন্য চারিতল পথ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। রাজপথ-গুলিতে জন ও যানগুলির এত ভিড় হয় যে, এইরূপ পথ নির্ম্মাণের



চারিতল পথ

ব্যবস্থা না করিলে চলে না। চারিতল পথে একই সময়ে চারিগুণ জন ও যান চলাচল করিতে পারিবে। প্রথম তল বিমানগুলির জন্য। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তল দ্রুতগামী যানগুলির জন্য। চতুর্থ বা নিম্নতল পথচারীদিগের নিমিত্ত। এই পথের একটা সুবিধা এই যে, শীতকালে পূর্ণবেগে জনযান চলাফেরা করিতে পারিবে। ইহা ছাড়া টেলিফোন এবং তাড়িতালোকের তারের ব্যাঘাত ইহাতে ঘটিবে না।

কলেজের ছাত্রের বিচিত্র বাসভবন

উটা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্র তাহার বাসস্থানের সমস্যা সমাধানের জন্য চাকার উপর একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছে। সে ঐ ঘরে বাস করে, পড়ে এবং উহা লইয়া বিদ্যালয়ে গমন করে। তাহার এই ঘরটি ১২ ফুট দীর্ঘ, সাড়ে ৬ ফুট প্রশস্ত। এই ঘরের মধ্যে একটি ষ্টোভ, দুই জনের শয়নোপযোগী বাঙ্ক, ভাঁজকরা একখানি টেবিল, ভাঁজকরা চেয়ার, ঔষধের বাক্স, যন্ত্রাদি রাখিবার আলমারী, বই ও টুপী রাখিবার র‍্যাক, টাইপ-

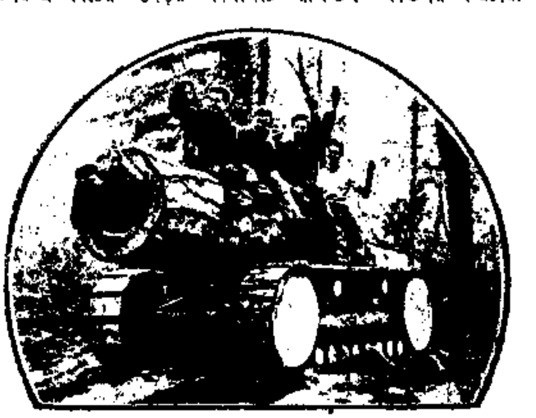


চাকার উপর কলেজের ছাত্রের বাসভবন

রাইটার যন্ত্র রাখিবার আধার, মুখ ধুইবার পাত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আছে। ঘরটি কাঠের নির্ম্মিত। এমনভাবে বহির্ভাগে সে রঙ্গ করিয়াছে যে, দেখিলেই মনে হইবে, ঘরটি ইটের নির্ম্মিত। ছাত্রদিগের মোটর-গাড়ীর সঙ্গে সে তাহার এই ঘরটি জুড়িয়া দেয়। এইভাবে সে স্থানে স্থানে গমন করিয়া থাকে।

কাঠের গুঁড়ির কামান

ওয়াশিংটনের চেলান নামক সরকারী অরণ্যে একটা বিরাট পাইন গাছের গুঁড়ি হইতে একটা ভীমদর্শন কামান প্রস্তুত হইয়াছে। কাঠের গুঁড়ি হইতে একটা ট্রাক্‌টরও নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার উপর ঐ কাঠের গুঁড়ির কামানটি রক্ষিত। কতিপয় কর্ম্মচারী



কাঠের গুঁড়ির কামান

অবসরকালে ঐ কামানটি ও তাহার আনুষঙ্গিক যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

কুকুর-শাবককে বাঁচাইবার ব্যবস্থা

কালিফোর্ণিয়ার কোনও ভদ্রলোকের একটি শিশু কুকুর আছে।



ড্রপারের সাহায্যে কুকুর-শাবককে আহার্য্য দান

তিনি তাহাকে জন্মাবধি ঔষধ নিক্ষেপের ড্রপারের সাহায্যে আহার্য্য দিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। এইভাবে নিয়মিতরূপে আহার্য্য না দিলে এই কুকুরশাবকটি বাঁচিত না। চিত্র দেখিলেই বুঝা যাইবে—কি ভাবে কুকুরশাবককে আহার্য্য প্রদান করা হইতেছে।

অন্ধের জন্য বিন্দুতোলা ঘড়ী

অন্ধরা যাহাতে ঘড়ীতে হাত দিয়া সময় নির্দ্দেশ করিতে পারে, এজন্য ঘড়ীর দেহে গা তোলা বিন্দুসমূহ রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কাঁটার স্থানে গা তোলা বিন্দুসহ ঘড়ীর 'ডায়াল' বা অঙ্কপট্ট থাকের



অন্ধের জন্য বিন্দুতোলা ঘড়ী

ভিতর দিয়া ঘুরিতে থাকে। উহার উপরিভাগ ঘণ্টা এবং নিম্নভাগ মিনিট নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। সমগ্র ঘড়ীটা একটা আধারের মধ্যে থাকে। তাহাতে ডায়াল বা শঙ্কুপটের কোন প্রকার ক্ষতি হয় না।

শত্রুর বিমান নির্ণয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা

আকাশপথে বিমান দ্বারা আক্রান্ত হইলেও যাহাতে উহাকে কাবু



শত্রুর বিমান ধ্বংসের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা

করা যায়, তাহার জন্য চীনদেশে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। চীন-কর্তৃপক্ষ, শক্তিশালী মার্কিণ সার্চ্চলাইট-যুক্ত ট্রাক্‌ ব্যবহার করিতেছেন। প্রত্যেক ট্রাকে যেমন শক্তিশালী সার্চ্চলাইটের ব্যবস্থা আছে, তেমনিই বৈদ্যুতিক শব্দনির্ণায়ক যন্ত্রও আছে। এই সকল ব্যবস্থার ফলে কোন্‌ দিক হইতে শব্দ আসিতেছে, তাহা জানা যায়। কামানের লক্ষ্যের মধ্যে আসিবার পূর্ব্বেই কোন্‌ দিক দিয়া বিমান আসিতেছে, তাহা জানা যায় এবং সার্চ্চলাইটের সাহায্যে তাহা বহুদূর হইতে দৃষ্টিগোচর হয়। তখন শত্রু-বিমান সতর্ক হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গোলন্দাজরা কামান দাগিয়া বিমানকে চূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে।

জলদস্যুর দুর্গ হোটেলে রূপান্তরিত

ভার্জ্জিনদ্বীপে, সেণ্টট মাস্‌ নামক স্থানে এক জন বিখ্যাত স্পেনীয় জলদস্যু দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। সেই জলদস্যুর নাম ব্লাক-বিয়ার্ড। যুক্তরাষ্ট্র সরকার সম্প্রতি এই দুর্গটিকে ভ্রমণকারীদিগের জন্য হোটেলে পরিণত করিয়াছেন। উক্ত জলদস্যুর আসল নাম ছিল—এডোয়ার্ড টিচ। জনসাধারণ তাহাকে ব্লাকবিয়াড বলিয়া অভিহিত করিত। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে সে একখানি প্রকাণ্ড ফরাসী বাণিজ্য-জাহাজ অধিকার করিয়া তাহাকে যুদ্ধজাহাজে পরিণত করে। এই জাহাজে ৪৫টি কামান ছিল। ঐ জাহাজ লইয়া সে স্পেনীয় সমুদ্রে ওয়েষ্টইণ্ডিজ এবং ক্যারোলিনা তটভূমিতে বোম্বেটেগিরি করিত। শীতকালে সে উত্তর ক্যারোলিনায় অবস্থান করিত। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ব্লাকবিয়াড একটা যুদ্ধে নিহত হয়। সেণ্ট টমাসএ যে দুর্গে বোম্বেটে টিচ থাকিত, তাহা এমন স্থানে অবস্থিত ছিল যে, সেই দুর্গ হইতে সমুদ্রগামী জাহাজগুলিকে শাসন করা চলিত। এই দুর্গটি প্রথমতঃ দিনেমারগণের অধিকারে ছিল। উহা হইতে সমুদ্রগামী জাহাজগণের গতিবিধি লক্ষ্য করা হইত। নিম্নতলে একটি সঙ্কীর্ণ অথচ দীর্ঘ কক্ষ আছে। উহাতে নিগ্রোদিগকে বন্ধ করিয়া রাখা হইত। পরে তাহাদিগকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করা হইত। মার্কিণ সরকার দুর্গটির সৌন্দর্য্য যথাযথভাবে রক্ষা করিতেছেন। ভ্রমণ-কারীদিগের সুবিধার জন্য দুর্গটিকে বড় করা হইয়াছে, অবশ্য তাহাতে দুর্গের পূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

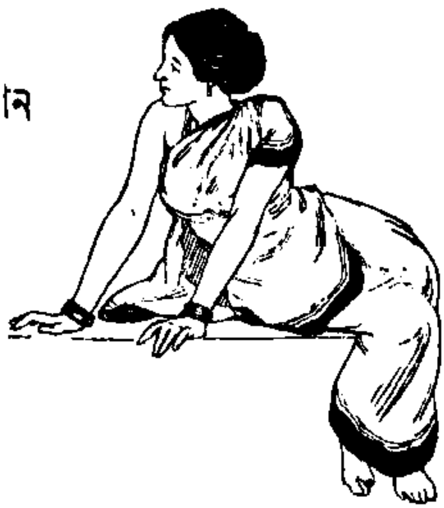


বোম্বেটের দুর্গ পান্থনিবাসে রূপান্তরিত



দান-প্রতিদান

[উপন্যাস]



[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

৪২

এক মাস জলে জলে ভাসিয়া কার্ত্তিকের প্রথমে কুহুরা বালিগঞ্জে ফিরিল। এত দিন ভাসমান অবস্থায় থাকা জয়ন্তর ইচ্ছা না থাকিলেও কুহুর আগ্রহে অনুরোধে তাহাকে বাধ্য হইয়াই বজরাতে ফিরিতে হইয়াছিল।

কুহু ফিরিবামাত্র বাসনা ছুটিয়া আসিয়া কুহুকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "এত দেরী ক'রে এলে কেন, বৌদি? জলে থাকতে তোমার এতও ভাল লাগে? নদীর ঢেউ দেখলে আমি কিন্তু ভয়ে সারা হয়ে যাই। দাদামণি বলেন, 'জলের হাওয়া খুব ভাল, শরীর ভাল হয়।' তোমার শরীর তেমন ভাল হয়নি ত? তবে মন খুব ভাল হয়ে গেছে।"

কুহু সস্নেহে বাসনার চিবুক ধরিয়া হাসিয়া বলিল, "আমি আসামাত্র তুমি আমায় দেখে কি ক'রে বুঝলে বাসনা, আমার মন ভাল হয়েছে? কবেই বা মন খারাপ ছিল? কবেই বা ভাল হ'ল? তুমি একরত্তি মেয়ে, মনের খবর জানো না কি?"

বাসনা কলকণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "মা গো, কথা শুনে বাঁচি না। আমি আবার একরত্তি হলেম কবে? মাথায় তোমার চেয়ে কতটুকুনই বা ছোট? এখন আমি বড় হয়ে গেছি, সব জানি। মন যে তোমার ভাল হয়েছে, তা কেন জানা যায় না? আগে তোমার গোম্‌ড়া মুখ ছিল, এখন বেশ হাসিখুসী হয়েছে।"

কুহু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে পারিল না। লজ্জায় তাহার চোখের পাতা দুটি নামিয়া আসিল। সে বাসনাকে যত ছোট, যত নির্বোধ ভাবিয়াছিল, বাসনা তাহা নহে। তাহার প্রতি এতটুকু মেয়ের লক্ষ্য এড়ায় নাই। এ এক মাসকাল দিবারাত্রি স্বামীর সঙ্গে থাকিয়া সত্যই সে নবজীবনের আস্বাদ পাইয়াছে, স্বামীর প্রতি তাহার আর বিন্দুমাত্রও বিরাগ নাই, সন্দেহ নাই। প্রাপ্তির পুলকে গত দিনের তুচ্ছ বিবাদ বিসংবাদ নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। নব প্রেমধারা আপনার অজ্ঞাতসারে জীবনের সম্মুখ দিয়া প্রবাহিত হইয়া তাহার দুই তীরে কত কুঞ্জবন, স্বপ্নপুরী রচনা করিতেছে।

কিয়ৎকাল পরে কুহু কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, "এক মাসেই যে তুমি মস্ত গণৎকার হয়ে উঠেছ, বাসনা! এত কাল আমি হাস্‌তে ভুলে গিয়েছিলাম না কি? এখন হাস্‌তে শিখেছ? বেশ ভাল, কিন্তু তুমি জানো না, আমিও গুণে অনেক কিছু বল্‌তে পারি। তোমার মুখে আগে হাসির পাখী বাসা বেঁধেছিল, এখন পালিয়ে গেছে। মনটা ভাল নেই, বড্ড রাগ হয়েছে, দুঃখ হয়েছে।"

বিস্মিতা বালিকা ক্ষণেক ভাবিয়া চুপে চুপে বলিল, "সত্যি বৌদি, তুমি গুণতে পার? এত দিন বল নি কেন?"

"বলবো কি? আগে জান্‌তাম না। এখন শিখেছি। তোমার রাগের কথা ঠিক বলিনি?"

"তুমি গুণে বল্লে তা কি অঠিক হয়, বৌদি?"

"না, তা হবে কেন? কিন্তু এত দুঃখ হবার কারণ কি, বাসনা?"

"কারণ বুঝি শোননি? শুনবেই বা কি ক'রে? তোমরা

ত এখানে ছিলে না, তাই জানো না। বৌদিমণি যে বিলেতে বেড়াতে যাচ্ছেন।"

"বিলেতে যাচ্ছেন? কার সঙ্গে?"

"বৌদিমণির বন্ধু তটিনীদিদের সঙ্গে। তটিনীদি যাবেন, তাঁর স্বামী বোস সাহেব যাবেন। আর বৌদি যাবেন, এই তিন জন। এক মাস পর রওনা হবেন। সমস্ত ঠিক হয়ে গেছে।"

"এ সাথে দাদামণি যাবেন না?"

"হ্যাঁ, দাদামণি আবার যাবেন? তিনি বলেন, 'আমাদের ভারতবর্ষে কত তীর্থ ভাল যায়গা রয়েছে, সেগুলো না দেখে আগে বিলেত যাওয়া হতেই পারে না।' দাদামণি বৌদিমণিকে বারণ করলেন, তিনি তা শুনলেন না। বৌদিমণি দাদামণির কোন কথাই শোনেন না। যা ইচ্ছে, তাই করেন। রামচরণ বলে, 'বড় রাজা দেবতা, কারুকে কিছু বলতে পারেন না ব'লে সকলে মাথায় চ'ড়ে ব'সে থাকে'।"

বাসনার নূতন সংবাদে কুহু অভিভূত হইল। স্বামীর অমতে এক অনাত্মীয়ের সহিত সত্যই ভাতি বিদেশভ্রমণে যাইবে? সেখানে কি আছে? কিসের প্রলোভন? এ বিশাল ভারতে কত নগর, জনপদ, পবিত্র তীর্থ, কত ত্যাগী ঋষির পূত পদরজোলিপ্ত পুণ্যভূমির এতটুকুও প্রত্যক্ষ না করিয়া সর্ব্বাগ্রে বিদেশের মোহে আকৃষ্ট হইয়াছে! স্ত্রীর অবাধ্যতায় জ্যোতির্ম্ময় না জানি কতই দুঃখ পাইবেন। সংসারে ভাল হইলে অনেক সহিতে হয়। অনেক ত্যাগ করিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

কুহু ম্লান হইয়া বলিল, "দিদি কোথায়? চল, দিদির সাথে দেখা ক'রে আসি? দিদি থাকবেন না ব'লে তোমার মন খারাপ হয়েছে?"

"না বৌদি, তা নয়; বৌদিমণি গেলে তুমি থাকবে, দাদারা থাকবে, আমি ত একলা থাকবো না। দাদামণির মন ভাল নেই; আমারও তাইতে ভাল লাগে না। বৌদিমণির যাওয়া ঠিক হবার পর থেকে দাদামণি বেশী কথা বলেন না। কেবল বই পড়েন।"

"তিনি কোথায়? চল, তাঁকে প্রণাম ক'রে আসি।"

"দাদামণি তাঁর পড়ার ঘরে পড়ছেন। বৌদিমণি ড্রেসিংরুমে; দরজি এসেছে কি না, জামা, কাপড় তৈরি করাচ্ছেন। দাদামণিকে প্রণাম ক'রে পরে বৌদিমণির কাছে যেও।"

উভয়ে জ্যোতির্ম্ময়ের পাঠগৃহের সম্মুখে উপনীত হইল।

সেই প্রশস্ত কক্ষ; মেঝেয় জাজিম, পাতা, চতুর্দ্দিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পুস্তকাবলি, মধ্যস্থলে সরল সুন্দর মুখচ্ছবি শান্ত স্নেহ হাস্যময় ধীপ্রদীপ্ত পাঠনিরত জ্যোতির্ম্ময়।

বাসনা অনুচ্চ কণ্ঠে ডাকিল, "দাদামণি, দেখ কে এসেছে!"

জ্যোতির্ম্ময় মুখ তুলিয়া প্রসন্ন হাস্যে সম্বর্দ্ধনা করিলেন, "এসেছ? কখন্ এলে? এস মা, এস।"

কুহু প্রণাম করিয়া পায়ের কাছে বসিল।

জ্যোতির্ম্ময় সস্নেহে কুহুর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "কৈ, শরীর ত তোমার সারে নি? এত দিন জলের ওপর রইলে, ভাল যায়গায় ঘুরলে, একটু মোটা-সোটা হ'তে পারনি। ক্ষীরপুরে কদিন ছিলে? তিন দিন। বাবা, মা ভাল আছেন? তপু ভাল আছে?"

কুহু সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল।

জ্যোতির্ম্ময় ক্ষণেক নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "তুমি খানিক বিশ্রাম ক'রে স্নান কর গে, মা। স্নান ক'রে, জল খেয়ে আমার পূজোর ঘরে একবার যেও। তোমার সাজানো ঘর, আমি সাজিয়ে রাখতে পারিনি।"

বাসনা বলিল, "ওটা ত তোমার একলার পূজোর ঘর নয়, দাদামণি। বৌদিরও পূজোর ঘর, ফুল সাজিয়ে, মালা দিয়ে তোমার শিবদুর্গার ছবিখানিকে বৌদি ত নিত্যি পূজো করতেন। তুমি বৌদিকে চান ক'রে জল খেতে বলছ, উনি আবার তাই খাবেন? তোমার পূজো না হ'লে—তুমি জল না খেলে বৌদি কিছু খায় না।"

জ্যোতির্ম্ময় আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "কেন মা? তুমি এত কষ্ট কর? তুমি ছেলেমানুষ, তোমার সকালে খাওয়া দরকার। তুমি আমার জন্যে অত কষ্ট করো না। যাও, স্নান কর গে।"

লজ্জিতা কুহু আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

৪৩

দরজীকে বিদায় দিয়া আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভাতি ওভারকোটটা গায়ে দিতেছিল, এমন সময় কুহু কাছে গিয়া ভাতিকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, কেমন আছ?"

বিদেশে যাইবার উৎসাহে ভাতির অপ্রসন্নতা কমিয়া গিয়াছিল, কোটটা আলনায় ঝুলাইয়া ভাতি কুন্তর হাত ধরিয়া তাহাকে একটা চেয়ারে বসাইয়া দিয়া নিজে বসিয়া বলিল, "কি গো, জললক্ষ্মি, কখন্ এলে? ভাল আছ? বাইরে না যেয়ে ঘরে বোসে থাকলে জীবনে বিচিত্রতা আসে না। ঘর মানুষের বুড়ো বয়সের আশ্রয়, বাইরে যৌবনের বিচরণক্ষেত্র।"

কুন্ত সহাস্যে প্রত্যুত্তর করিল, "এই ত আসছি দিদি; এসেই শুনলাম, তুমি বিলাত যাচ্ছ? বড় ঠাকুর নাকি অমত করেছেন, তবু যাবে, দিদি?"

"অমত করলে আর কি করবো, ভাই? ভাল কাজে ওঁর চিরকাল অনিচ্ছা। অত দেখতে গেলে কোনটাই হয় না। তটিনীরা যাচ্ছে, এ সুবিধা পাব কবে? আমার ত ত্রুটি নেই ভাই, আমি বল্লাম, তুমিও চল। বইয়ের পোকা হয়ে নিজেকে এমন ক'রে মাটী করো না।"

"সত্যি দিদি, তা হ'লে বেশ হ'ত। অত দূর বিদেশে পরের সাথে যাওয়া। তা তিনি কি বল্লেন?"

"যা চিরকাল বলেন। দেশের এত বড় দুর্দ্দিনে ফূর্ত্তি ক'রে বেড়ানোর জন্যে এত টাকা আমি নষ্ট করতে পারবো না, সুবিধা হ'লে পরে তোমায় নিয়ে যাব। বরং চল, এখন দিন কতক তীর্থে ঘুরে আসি। একটি ভাল দেশও ত তোমার দেখা হয় নি। আমায় যেন কচি খুকী পেয়েছেন। আমি তীর্থের নামে ভুলে যাব। তীর্থে আছে কি? যত ভণ্ড জুয়াচোর লম্পটের আড্ডা। ভদ্রলোক ওর ভেতর যায়? যায় কারা, যারা জন্মকাল ঘরে থেকে হাঁপিয়ে মরে, তারাই একটা ছল-ছুতো নিয়ে বাইরে বেড়াতে বার হয়। আসলে ও তীর্থের মূল্য নেই।"

কুন্ত ব্যথিত হইয়া কহিল, "আমি ভাল জানি না দিদি, তবে বড়দের কাছে শুনেছি, তীর্থে চোর জুয়াচোর থাকলেও তীর্থ তীর্থ-ই। যেখানে দেবতা, সেখানেই পুণ্য পবিত্রতা। কত মহা জ্ঞানী ধার্ম্মিক ধর্ম্মের আশায় তীর্থে ছোটেন দিদি, সবারই কি ভুল হয়? না তাঁরা বোঝেন না? একটা স্থানমাহাত্ম্য, এটা তোমাকে মানতেই হবে। আমরা যদি আমাদের দেশের সব উড়িয়ে দেই, তবে থাক্‌বেই বা কি? এখন বিলাত না যেয়ে চল না দিদি আমরা সকলে তীর্থভ্রমণে বার হই। সকলে একসঙ্গে গেলে কত আনন্দ হবে। কি মজা লাগবে?"

"অমন অসার মজার মুখে আগুন! আমি যাব পাণ্ডার পায়ে দণ্ডবৎ করতে, তবেই হয়েছে। বুঝবার কথা বলছ, অনেকে অনেক জিনিসই বুঝে থাকে ছোট লোকেরা যে ভূত মানে, তাদের ধারণা, ভূত না থেকেই পারে না। কারণ, তারা যে মানে। তেমনি সকলেরি অন্ধ বিশ্বাস, সে বিশ্বাস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাই না। তা হ'লে আবার তোমাদের আঁতে ঘা লাগবে। সকলে একেনে গেলে আনন্দ হবে, বল না ঠাকুরপোকে তোমাকে নিয়ে আমাদের সাথে হ'তে। জানি, আজ হোক দুদিন পরে হোক, ঠাকুরপো এক দিন বিলাতে বেড়াতে যাবেই। এ সঙ্গে তোমায় নিয়ে গেলে বেশ হ'ত।"

ভাতির সহজ কথাটা কেন কি জানি কুন্তর বুকে তীরের ফলার ন্যায় বিদ্ধ হইল। জয়ন্ত সুদূর-ভবিষ্যতে কখনও যে বিলাতে বেড়াইতে যাইতে পারে, কুন্ত তাহা যেন কল্পনা করিতে পারে নাই। সে যে অনেক দূর, দীর্ঘ পথ, জয়ন্ত সেখানে গেলে কুন্ত কোথায় থাকিবে? কি লইয়া থাকিবে? ভাতির বাক্যে কি যেন প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। কুন্তর বক্ষ স্পন্দিত হইতে লাগিল। সে নিরুত্তরে দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

ভাতি ক্ষণকাল চিন্তার পর পুনরপি কহিতে লাগিল, "আমার কথাটা ভাল ক'রে ভেবে দেখ, কুন্ত! পরে ঠাকুরপো নিশ্চয় যাবে। তোমার যাওয়া হবে কি না সন্দেহ। এ সাথে গেলে তোমার যাওয়া অবশ্য হ'ত। এমন সুবিধা হয় ত আর কখনও পাবে না। তোমার যেতে ইচ্ছা হচ্ছে কি না বল, আমি এখনি ঠাকুরপোকে ডেকে পাঠাচ্ছি। আমরা ঠিক করেছি, দু তিন বছর ফিরবো না, অনেক যায়গা দেখতে হবে।"

কুন্ত দৃঢ়স্বরে কহিল, "না দিদি, আমি তোমাদের সাথে যেতে চাই না। এখানকার কতটুকুই বা দেখেছি যে, দেখার শেষ ক'রে বিলাত দেখতে যাব? বড়ঠাকুর যেটা পছন্দ করেন না, আমি তা করতে চাই না। আমার বিলাতে বেড়াবার যোগ্যতাও নেই। শিক্ষা কম, পাড়াগেঁয়ে মানুষ, কিই বা জানি? এম্‌নিই ত তোমাদের সঙ্গে মিশবার উপযুক্ত নই, তাতে আবার বিলাত।"

"সকলেই সকল বিষয়ে যোগ্য থাকে না, চেষ্টা ক'রে শিখে নিতে হয়। আমার বাপের বাড়ীর যেমন কাল্‌চার, সবখানে যে তা থাকবে, তার মানে নেই। তোমার ভয়

কি কুহু ? আমি সাথে থাক্‌বো, জাহাজে নিরিবিলিতে আমি তোমায় ঠিক দুরস্ত ক'রে নিতে পারবো। এখন কথা হচ্ছে তোমার সাহস, তোমার ভাসুরের অমতে কিছু যায় আসে না। তিনি সকলের বড় হলেও ছোটরা তাঁর খেলার পুতুল নয়। সকলেরই ব্যক্তিত্ব আছে, স্বাধীনতা আছে। তবে ঠাকুরপোর অমতে তোমার কিছু আসে যায়, সেটা আর্থিক। কিন্তু তার অর্থে তার যে অধিকার, তোমারও তাই, তোমার সমস্ত খরচ বহন করতে সে বাধ্য। সে যদি না যায়, তাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই, তোমাকে খরচপত্র দিয়ে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিক। একবার সাগর পার হলেই তোমার ভেতরকার যা কিছু অপূর্ণতা, পূর্ণ হয়ে যাবে।"

"না দিদি, আমি যাব না। তুমি ওঁকে কিছু বলো না। তুমি বলছ, স্বামীর অর্থে স্ত্রীর সমান অধিকার, কিন্তু যে স্ত্রী স্বামীর মতাবলম্বিনী নয়, সে কেমন ক'রে স্বামীর অর্থ যথেচ্ছা ব্যবহার করবে ?"

ভাতি উত্তেজিত হইয়া বলিল, "কেন করবে না ? স্ত্রীকে কতটা ত্যাগ ক'রে যে স্বামীর ঘরে আসতে হয়, তারও যে একটা মূল্য আছে। সে ত্যাগ অর্থের বিনিময়ে। বাঙ্গালা দেশের মেয়েদের ভেতর বস্তু নেই। স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হয়ে ভাল নাম কিনবার লোভে এরা ভিজা বিড়াল সেজে থাকে। সব কাযে দ্বিধা, সঙ্কোচ, পায়ে পায়ে নিষেধের শেকল। য়ুরোপের মহিলারা কেমন তেজস্বিনী, তাই ওরা জগতের শ্রেষ্ঠ জাত। বাঙ্গালীর মেয়েরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নিজেদের দুর্ভাগ্য ডেকে আন্‌ছে। এক জন জেগে কারুর ঘুম ভাঙ্গাতে পারবে না। দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে মেয়েদের জাগতে হবে। নিজের প্রাপ্য নিজেদের কেড়ে নিতে হবে।"

ভাতির ওজস্বিনী বক্তৃতার মধ্যে কুহু দাঁড়াইয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, "দিদি, তুমি বোস, আমি এখন চান করতে যাই।"

ভাতির এমন হৃদয়গ্রাহী উপদেশে কুহু মুগ্ধ হইল না দেখিয়া ভাতি বিরক্ত হইয়া বলিল, "উঠলে, আচ্ছা। আর একটা কথা বোধ হয় শোননি ? বিকাশ ঠাকুরপোর সঙ্গে আমাদের সুরভির বিয়ে যে পাকা হয়ে গেছে। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমেই বিয়ে, কাকীমা সকলকেই যেতে লিখেছেন।"

বিবাহের সময় সুরভির সহিত কুহুর আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল, স্বল্পভাষিণী শান্তপ্রকৃতি সুরভিকে কুহুর মিষ্ট লাগিয়াছিল। সেই সুরভি তাহাদের বাড়ীতে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইতে আসিতেছে শুনিয়া কুহু পরম পরিতৃপ্ত হইল। হাসিয়া কহিল, "বাড়ীতে বিয়ে রেখে তোমার এখন যাওয়া হবে না, দিদি। যেতে হয়, বিয়ের পর যেও। কোথায় বিয়ে হবে ? বৌ-ভাত কোথায় ?"

"বিয়ে হবে মামীমার দেশের বাড়ীতে, বৌভাত হবে ভূষণডাঙ্গায়। তোমরা যেয়ে আমোদ করো, নেমন্তন্ন খেও। আমি বিয়ে দেখার চেয়ে ঢের ভাল জিনিষ দেখতে পাব। ভূষণডাঙ্গায় আর যাব না, ভূষণডাঙ্গার সাথে আমার সম্বন্ধ ঘুচেছে, সেখানে তোমারই পোয়া-বারো কুহু, তুমি ভূষণডাঙ্গার রাণী, রাজসম্মান পাবে।"

খোঁচা খাইয়া কুহুর মুখ মলিন হইয়া গেল। এত দিন সংসারের বাহিরে নদীর উচ্ছল স্রোতে ভাসিয়া কুহুর বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাহার চলিবার পথের সমস্ত বাধাবিঘ্ন অপসারিত হইয়াছে। আবর্জ্জনা উপলখণ্ড নদীর বিমল সলিলে ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। জীবন-পথে ফুটিয়াছে শত শত নয়নাভিরাম কুসুমস্তবক। সম্মুখের প্রশস্ত পথখানি নবীন দূর্ব্বাদলে মণ্ডিত। নিশার শিশির দূর্ব্বাদলকে আর্দ্র—সুকোমল করিয়া দিয়াছে। আশা-বিহঙ্গম সঙ্গীত-ঝঙ্কারে চারিদিক মুখরিত করিতেছে। কিন্তু সংসারে প্রবেশ করিবামাত্র কোথায় মিলাইল সেই স্বপ্নময়, আনন্দময়, সুন্দর পথখানি ? কোথায় মিলাইয়া গেল পাখীর সুধাময় স্বরলহরী ?

২২

ধীরে ধীরে ভাতির বিদেশযাত্রার দিন ও বিকাশের বিবাহের শুভক্ষণ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। গৃহে একটা সমারোহ পড়িয়া গেল, পিতৃহীন বিকাশের বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজনের ভার কাকীমা জ্যোতির্ম্ময়কেই সমর্পণ করিলেন।

দুই তিন দিনের জন্য জ্যোতির্ম্ময় ভূষণডাঙ্গা যাইয়া বিবাহের বন্দোবস্ত করিয়া আসিলেন। বিবাহের পূর্ব্বদিন ভাতির যাত্রার সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেই জন্য জ্যোতির্ম্ময় বিবাহে যোগ দিবার সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ভাতি স্বাধীনচেতা অবাধ্য হইলেও জ্যোতির্ম্ময়ের পরিণীতা, লোক-সমাজে তাহাকে অবজ্ঞা করিবার উপায় নাই। কিন্তু লোক-লোচনের অন্তরালে যেটুকু, তাহা জ্যোতির্ম্ময়ের নিকটে যেমন মর্ম্মান্তিক, তেমনই দুঃখবহ। তিনি কাহারও

প্রতি জোর খাটাইতে ভালবাসিতেন না ; নিম্নতম ভৃত্যটির প্রতি পর্য্যন্ত নহে।

কুহু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল, জ্যোতির্ম্ময়ের প্রসন্ন হাসিটি এখনও তেমনই অম্লান রহিয়াছে। সাধারণের প্রতি কোমল সদয় ব্যবহারের এতটুকুও পরিবর্ত্তন হয় নাই। তবুও কি বিপুল বেদনার বোঝা ঐ লোকটি যে নিঃশব্দে বহন করিতেছে, ভাতি কি তাহা দেখিতে পায় না? বালিকা বাসনা যাহা ধরিয়া ফেলিয়াছে, নিরক্ষর রামচরণ যাহার আভাস পাইয়াছে, সে তাঁহার সহধর্ম্মিণী, শুধু সেই কিছু অনুমান করিতে পারিতেছে না? এখানে নিরবচ্ছিন্ন সুখ কিছুতেই নাই। অতুল ঐশ্বর্য্য মান-প্রতিপত্তির অন্তরালে মানবের ব্যথিত হৃদয় কেবলই হাহাকার করে।

জ্যোতির্ম্ময়ের দুঃখের কল্পনায় কুহু দুঃখিত হইতে না হইতে তাহারও দুঃখের দিন সমাগত হইল। ক্ষিপ্রা তটিনী-বক্ষে যে চন্দ্রকরচ্ছবি কুহুর করতলে নামিয়া আসিয়াছিল, নগরের বিলাসভূমিতে পা দিতে না দিতেই আকাশের চাঁদ আবার আকাশে ফিরিয়া গেলেন।

বালিগঞ্জে ফিরিয়া জয়ন্ত নীপভাঙ্গা নদীর ন্যায় অনুচর পার্শ্বচর-বেষ্টিত হইয়া প্রমোদসাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। স্বামীর সহিত কুহুর মানাপথের ভেদ আরম্ভ হইল। কুহু ডাকিয়াও আর জয়ন্তর সাড়া পায় না।

বিবাহের পর প্রথম প্রথম স্বামীর রূঢ়তা কুহুকে আঘাত করিয়াছিল, কিন্তু তখনও জয়ন্তর স্বরূপ প্রকাশ পায় নাই। জয়ন্ত যে নামিতে নামিতে কোথায় গিয়া ঠেকিয়াছে, কুহু তাহা জানিত না। এখন এতটুকু আভাস পাইয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। সে স্ত্রী, সহধর্ম্মিণী, তাহার ভাগ্যে রত্নের পরিবর্ত্তে কাচ জুটিলেও স্বামী স্বামীই। স্বামী বিপথগামী হইলে স্ত্রী কি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে পারে? তাঁহাকে ছাড়িলে কি লইয়া থাকিবে? জীবনের অবলম্বন কি?

এখন জয়ন্তর ঘরে থাকিবার অবকাশ কম, কুহুর সহিত বাক্যালাপ করিবার অবকাশ কম। রাত্রিকালে শয়ন-কক্ষে থাকিবার অবকাশ নাই। জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের তুল্য কুহু স্বামীর নিকটে বড় পুরাতন তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে আর মোহিনী শক্তি নাই, আকর্ষণ করিবার কিছু নাই। তবু কুহু স্বামী হইতে দূরে থাকিতে পারে না, সরিয়া যাইতে পারে না। মাসাধিককাল তটিনীর কল-কল্লোলের মধ্যে যে সুধাপাত্র তাহাকে সঞ্জীবিত পুলকিত করিয়াছে, তরুণী নারী তাহার আস্বাদ ভুলিতে পারে না। সেই সুখস্বপ্নে হৃদয়-মন স্বপ্নভারাতুর হইয়া থাকে। প্রথম পরিচয়ে যে ভাববিহ্বলা কিশোরী তাহার প্রেমাস্পদের উদ্দেশে প্রেম পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে যাইয়া সংশয়ে সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ হইয়াছিল, সেই কোন্ মাহেন্দ্রলগনে তাহার দয়িতকে—প্রিয়তমকে আপনার সর্ব্বস্ব দান করিয়া রিক্ত হইয়াছে। জোয়ারের জলের ন্যায় প্রেমাবেগে, প্রীতিবেগে আজ তাহার হৃদয়-নদী স্ফীত, উচ্ছ্বসিত। স্বামীর দিক হইতে হৃদয়ের ছুনিবার স্রোত রোধ করিবার শক্তি কোথায়?

জ্যোতির্ম্ময় ভ্রাতার গতিবিধি জানিয়াই হউক, অথবা হিরণের নিকট ইঙ্গিত পাইয়াই হউক, জয়ন্তকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমাদের কিছুকাল ভূষণডাঙ্গায় যেয়ে থাকা উচিত, জয়ন্ত। থাকে থা প্রজারা খাজনা বন্ধ করেছে। যায়গায় যায়গায় চুরি-ডাকাতি রাহাজানি হচ্ছে। এ সময় নিজেদের যেয়ে দেখা শোনা দরকার। বাড়ীতে বিকাশের বিয়ে, আমার ইচ্ছে, বিয়ের আগেই তুমি বৌমাকে নিয়ে বাসনাকে নিয়ে দেশে যাও।"

দেশে যাইতে জয়ন্তর বিশেষ আপত্তি ছিল না। কারণ, সহরের আমোদ একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছিল। এখন নূতনত্ব চাই, বৈচিত্র্য চাই। কিন্তু প্রজাদের মধ্যে শান্তি সংস্থাপন করা, আর ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ করা তাহার কর্ম্ম নহে। সে বিরক্ত হইয়া কহিল, "ভূষণডাঙ্গায় যেতে আমার আপত্তি নেই। তবে আমি খাজনা আদায়ের বিলি-ব্যবস্থা, রাহাজানির মীমাংসা করতে পারবো না। দেওয়ান রয়েছেন, যা করবার করবেন। আমি ও সব জানিও না, পারবোও না।"

জ্যোতির্ম্ময় কহিলেন, "দেওয়ান কাকাই ত সব করবেন, তবু আমাদের উচিত, এ সময় তাঁকে সাহায্য করা। তোমার বৌদিকে বোম্বাই পর্য্যন্ত আমাকে পৌঁছে দিতে হবে। ওঁকে জাহাজে তুলে দিয়ে আমি ঐ অঞ্চলে একটু ঘুরে ফিরে ভূষণ-ডাঙ্গায় যাব। আরও একটু কাজ আছে, সুরাটে দিবাকরের সাথে একবার দেখা করতে হবে। এই সমস্ত কারণে এখন আমি যেতে পারছি না।"

জয়ন্ত কহিল, "তুমি যেয়ে দেওয়ান কাকাকে সাহায্য করো, দাদা, আমি যাব বিকাশের বিয়েয়। বিয়েতে কি করতে কর্ম্মাতে হবে, সেইটে বরং আমাকে বুঝিয়ে দিও।

আর একটা কথা, সেখানে গিয়ে আমার যদি ভাল না লাগে, তা হ'লে আমি থাকতে পারবো না, চ'লে আসবো। তুমি বৌদিকে তুলে দিয়ে যত সকালে পার, ভূষণডাঙ্গায় যেও।"

শীঘ্রই ভূষণডাঙ্গায় যাওয়া হইবে শুনিয়া কুন্তু অতিশয় আনন্দিতা হইল। সে পল্লীবাসিনী, চির-নবীন শান্ত শীতল পল্লী যেন তাহাকে অহরহ হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। এখানে শত আবিলতা, শত প্রলোভন, লোকের সহজ গতিকে বক্র করিয়া দেয়। দিকে দিকে বিলাসের, বিনাশের মায়াজাল, পদে পদে ভ্রান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। এ আবর্ত্তের মধ্য হইতে তাহার হৃদয়দেবতাকে কোথায় লুকাইবে ভাবিয়া কুন্তু ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। কুন্তু এখন জয়ন্তকে লুকাইতে ব্যগ্র। অন্তরের অন্তঃপুরে নয়ন পাহারা দিয়া জয়ন্তকে রক্ষা করিতে চায়। যখন পালাই পালাই মনের অবস্থা, তখন পল্লীর আহ্বান পাইয়া কুন্তু আশ্বস্ত হইল।

বিকাশ দাদার বিবাহে দেশে যাইবার উৎসাহে বাসনার লেখা-পড়া স্কুলে যাওয়া স্থগিত হইল। জ্যোতির্ম্ময় হিরণকেও ইঁহাদের সহিত যাইতে আদেশ করিলেন। জয়ন্তর অসংখ্য মুখোসধারী বন্ধু হইতে জ্যোতির্ম্ময় হিরণকে স্বতন্ত্র দেখিতেন। জয়ন্তর চিরশুভার্থী মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জানিয়া অকৃত্রিম স্নেহ করিতেন।

৪৫

শান্ত তন্বী নদীটির নাম ভূষণা, তাহার স্রোত আছে, কিন্তু উদ্দামতা নাই। নিরলসা পল্লীবধূর ন্যায় সে নিশিদিন আপনার কল্যাণকার্য্যে নিমগ্না। বর্ষাসমাগমে ভূকূল ভরিয়া গেলেও তাহার উচ্ছ্বাস নাই, অহঙ্কার নাই। নদীর নামে গ্রামের নাম ভূষণডাঙ্গা। নদীতীরবর্ত্তী জমীদারের রাজপ্রাসাদ, দেবালয়, অতিথিশালা। নগরীতুল্য সমৃদ্ধিশালী গ্রামখানি প্রকৃতির লীলানিকেতন। তীরলগ্ন একটি প্রশস্ত পাকা রাস্তা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চলিয়া গিয়াছে। পথিপার্শ্বে প্রাচীন বকুল ও বটবৃক্ষ পথিককে ছায়াদান করিতেছে। পরপারে শ্যামল শস্যক্ষেত্র, তাহারই শেষপ্রান্তে অস্পষ্ট গ্রামরেখা দিকচক্রবালের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

শ্বশুর-শাশুড়ীর শত স্মৃতিচিহ্নবিজড়িত পবিত্র পৈতৃক ভবনে আসিয়া কুন্তু পুলকিত হইল—বিস্মিত হইল। সে গ্রামের মেয়ে, এককালে গ্রামে তাহাদের প্রতিষ্ঠা ছিল, বৈভব ছিল। মার মুখে হৃত গৌরবের অনেক কাহিনী সে শ্রবণ করিয়াছে। কিন্তু এ তিন মহল রক্তবর্ণের অট্টালিকাটি তাহার নিকটে স্বপ্নের পাথরপুরী বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল।

বাড়ীতে দেওয়ান ও দাসদাসী ভিন্ন অন্য পরিজন কেহ ছিল না। ছোট তরফের কাকীমা, বিকাশের মা বিরাজমোহিনী আসিয়া কুন্তুকে সমাদরে ঘরে তুলিয়া লইলেন। কাকীমার বাড়ী দূরে নহে, জয়ন্তদের বাড়ীর গায়েই বলিতে হয়, মাঝে একটি নাতিদীর্ঘ পুষ্পোদ্যান, সেই বাগানটিই জ্যোতির্ম্ময়ের পুষ্পপ্রীতির প্রথম নিদর্শন। বাগানের চারিদিকে কামিনী, কুটরাজ, কুরুবক, চম্পক, গন্ধরাজ, টগর, জবা, স্থলপদ্ম, শেফালী—বড় ঝাঁকড়া গাছগুলি আকাশের পানে মাথা তুলিয়াছে। বৃক্ষের বেষ্টনীর মধ্যে ছোট ছোট গাছে গোলাপ, কুন্দ, যুঁই, দোপাটী, গাঁদা ফুটিয়া উদ্যান আলোকিত করিয়াছে। চতুষ্পার্শ্বের লোহার রেলিংএ জড়ানো লতায় থোকা থোকা ফুল ধরিয়াছে। অগ্রহায়ণের প্রথম—এখনও শীতের শিশির ও শীতলবায়ু প্রবল হয় নাই, তাই পুষ্পকাননে ফুলের অপরূপ বাহার খুলিয়াছে।

বিকাশের বিবাহে আসিয়াছে বলিয়া বিরাজমোহিনী সে-বেলার মত কুন্তু ও বাসনাকে নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। সমবেত আত্মীয়কুটুম্বে তাঁহার বাড়ী সরগরম হইয়া উঠিয়াছিল, জনতা কুন্তুর ভাল লাগিতেছিল না। বাহিরের কোলাহল হইতে আসিয়া সে পল্লীর নির্জ্জন শান্তিটুকু অনুভব করিতে চাহিতেছিল। কিন্তু সমস্ত দিবাব্যাপী কোলাহলে নির্জ্জনতা আর মিলিল না। জমীদার-বাড়ীর ডানাকাটা পরীরাণীর আগমনসংবাদ রাষ্ট্র হইবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের মেয়েরা দলবদ্ধ হইয়া বৌ দেখিতে আসিল।

স্নেহপ্রবণা সরলা কাকীমা কুন্তুর আনত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া সকলকে দেখাইতে লাগিলেন। দেখাইতে দেখাইতে আনন্দে গর্ব্বে কহিলেন, "জয়ন্ত আমার সাগরছেঁচা মাণিক এনেছে, দুঃখ শ্বশুরশাশুড়ী দেখলেন না। আজ দিদি থাকলে এমন চাঁদের টুকরা বৌ বুকে ক'রে রাখতেন।"

আপনার স্তবগান এবং নানা আলাপ-আলোচনা শুনিতে শুনিতে দিনের আলো ফুরাইয়া সন্ধ্যার ম্লানচ্ছায়া ঘনাইয়া আসিল, স্থলে জলে একটা শান্ত সজীবতা পরিস্ফুট

হইল। কাকীমার অনুমতি লইয়া নিস্তার কুহুকে বাড়ীতে লইয়া আসিল।

দ্বিতলের চাবীবন্ধ ঘরগুলি খুলিয়া ধুইয়া মুছিয়া সাজানো-গোছানো হইয়াছে। পরলোকগত কর্ত্রী ঠাকুরাণীর প্রশস্ত শয়নঘর কুহুর শয়নের নিমিত্ত মনোনীত করিয়া দেওয়ান প্রয়োজনীয় দ্রব্যে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঘরের সম্মুখেই শুভ্র পাথরের গোল বারান্দা, বারান্দার নীচে প্রশস্ত রাস্তা, রাস্তার পরে গীতিমুখরা তটিনী।

পুরাতন অন্তঃপুর রাখিয়া কর্ত্রীরাণী সাধ করিয়া নদী-তীরবর্ত্তী নব গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বারান্দায় বসিয়া পাথরের জালির ফাঁকে নদীতটে লহরীলীলা; বালক-বালিকার সলিলক্রীড়া, স্রোতে ভাসমান নৌকারোহীদের গতিবিধি প্রত্যক্ষ হইলেও নৌকারোহিগণ জালির নিমিত্ত বারান্দায় উপবিষ্টাদিগকে দেখিতে পাইত না।

কুহু গৃহে পদার্পণ করিয়া প্রথমেই শাশুড়ীর উদ্দেশে প্রণাম করিল। প্রণামান্তে বারান্দার জাফরি ধরিয়া পরপারের পানে চাহিয়া রহিল। দূরের গ্রামের উপর সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় যবনিকা টানিয়া দিয়াছে। নদী ও গ্রামের মধ্যস্থলে সাদা বালির চড়া ম্লান আলোকে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। কোথা হইতে দুই একখানি নৌকা ভাসিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে। নৌকার ক্ষীণ প্রদীপশিখা নীলজলে রশ্মি বিস্তার করিয়াছে। সন্ধ্যার শান্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে রাখিয়া যাইতেছে—নাবিকের আপনাভোলা উদাস-সঙ্গীতের একটুখানি রেশ।

পশ্চাতে ভারী দ্রব্য টানিবার শব্দে কুহু সচকিত হইল। সে দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া নিস্তার একটা গদি-আঁটা চেয়ার দুই হস্তে টানিয়া আনিতেছে। রাজবাড়ীর রাজোচিত কায়দায় মানুষের সহজ শান্তিটুকু অব্যাহত থাকিতে পারে না। ওঠা, বসা, শোয়া সমস্ত বিষয়ে ঐশ্বর্য্যের সম্মান রাখিতে হইবে।

কুহু বিরক্ত হইয়া ঈষৎ রুষ্টকণ্ঠে কহিল, "কে তোমায় ওটা আন্তে বলেছে, পুঁটুর মা? আমার ও সব কিছু লাগবে না, নিয়ে যাও।"

নিস্তার মুখ বাঁকাইয়া ঝঙ্কার দিল, "সাধে কি আনমু, বৌরাণি? দেওয়ানবাবু হুকুম দিলেন, 'বারান্দায় কুর্শী দিয়ে এস', নফরাকে বল্লু, 'এটা নিয়ে চ, ভাই?' তা রাজবাড়ীর মুখপোড়া চাকর কি আমার কথা শুনবে? হেলেদুলে নবাব বিন্দির কাছে পাণ খেতে গেলেন। বিন্দিমাগী যা বলবে, ও মিনসের তাই হ'ল গে বেদবাক্যি। অমনতর ঢং আমরা জানি না ব'লে এ জন্মটা দুঃখে গেল, মা। কপাল পোড়া হ'লেও গায়ে ত অসুরের বল পাইনি, দেওয়ানবাবু হুকুম দেলেন 'দিয়ে এস', আপনি হুকুম কল্লে, নিয়ে যাও। এক-বার বয়ে নিয়ে এনু, আবার নিয়ে যাই।"

কুহু কহিল, "থাকুক, তোমার আর নিয়ে যেতে হবে না। নফরা এ দিকে এলে তাকেই নিয়ে যেতে বলবো। এ বাড়ীতে মাদুর-টাদুর থাকে যদি, তুমি তাই একটা আমায় দিয়ে যাও।"

"ও মা, বলে কি গো? রাজ-বাড়ীতে নাকি মাদুর নেই? কত রকমারী মাদুর, শেতলপাটী, কুশাসন এক ঘর ভর্ত্তি করা রয়েছে। রাণীদিদি এখনকার কুর্শী-ফুর্শী ভালবাসতো না। তখনকার কালে ঘরে ঘরে এ সব ছেলও না। কত মুলুকের পাটীওয়ালা, মাদুরওয়ালা রাণীদিদিকে মাদুর, পাটী বেচে কেতা কেতা নোট নিয়ে গ্যাছে। আমি এখুনি তোমায় মাদুর এনে দিচ্ছি।" বলিয়া নিস্তার প্রস্থান করিল।

কিয়ৎকাল পর বিচিত্র ফুল-পাতা আঁকা একটা মাদুর ও বালিস লইয়া নিস্তার ফিরিয়া আসিল।

মাদুর বিছাইয়া দিতেই, কুহু মাদুরে শুইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এটা বুঝি মা'র মাদুর? এত কালের জিনিষ দিব্যি রয়েছে, মনে হয়, একেবারে নতুন।"

"নতুন কি সাধে থাকে বৌরাণি; সেটা তোমাদের নিস্তারের গতর খাটুনিতে। বড় রাজা মিছিমিছি নিস্তারের মাইনে গোণে না, নেমকহারাম বাপ-মার পেটে জন্ম হয় নি, দুঃখের ললাট করেছি ব'লে যার খাব, তারই বুকে ব'সে দাড়ি ছেঁড়ার জাত নই আমরা। এখানে এম্নি এম্নি থাকিনে, ঘরের দ্রব্যজাত মাসের ভেতর সাতবার ক'রে রোদে দি, ধুই, মুছি, যতন ক'রে রাখি। তবে না সব জাতে থাকে। করুক দিকিন এখনকার লোকজনেরা। তাদের দিন কাটলেই হ'ল, মাস কাবার হলেই হ'ল। আমার সাথে কি কারুর তুল্যি মূল্যি হয়, বৌ-রাণি?"

কুহু মাথার নীচে বালিসটা টানিয়া দিয়া শ্রান্তস্বরে বলিল, "তা কি ক'রে হবে, পুঁটুর মা? তুমি এখানে থাকতে

থাকতে বাড়ীর এক জনই হয়ে গেছ। তোমার সঙ্গে কার তুলনা? তুমি যা করবে, তা কি আর কেউ পারে?"

নিস্তার খুশীর সহিত কুন্তুর পায়ের দিকে সরিয়া গিয়া পা টিপিয়া দিতে উদ্যত হইল।

কুন্তু বলিল, "আমার পা টিপতে হবে না। তুমি এখন নীচে যাও। বাসনা যদি ও বাড়ী থেকে এসে থাকে, তা হ'লে তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।"

"তিনি বেড়াতে গ্যাছেন, বৌ-রাণি।"

"বেড়াতে? কোথায়? কার সাথে গেল?"

"রাজাবাবু আর হিরণদা নৌকোয় বেড়াতে গেলেন কি না, বেবীদি তেনাদের সাথে গ্যাছে। হিরণদা কিন্তুক বল্লে, 'দিদিরে ডেকে আনি।' রাজাবাবু মানা করলেন। হিরণদা বড্ড ভাল মনিষ্যি, ভারী দয়ার শরীল, সেই জন্যে বড় রাজা ছোট ভাই তুল্যি ভালবাসে।"

কুন্তু কিছুই বলিল না। একটা পঞ্জরভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস তাহার নাসাপথ দিয়া বাহির হইল। আজ সমস্ত দিনের ভিতর স্বামী একটিবারও তাহার সন্ধান লইলেন না, ছল-ছুতায় কাছে ডাকিলেন না। সে আজ নূতন স্থানে নূতন আবেষ্টনের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার জীবনের এ এক নূতন অধ্যায়। স্বামী একবার নিকটে আসিয়া বলিলেন না, 'আজ তুমি যথার্থ আপনার স্থানে আসিয়াছ, এখানেই তোমার অচল আসন পাতা।' হিরণ তাহাকে সঙ্গী করিয়া বেড়াইতে চাহিয়াছিল—তাহাতেও স্বামীর আপত্তি। ইহারই মধ্যে কুন্তু স্বামীর নিকটে বাসি মালার মত হতাদরের জিনিষ হইয়াছে! তাহাতে আর শোভা নাই, মোহ নাই।

নিশাচর পাখীর বিকট চীৎকারে কুন্তুর চিন্তাজাল ছিন্ন হইল। সে সচমকে আকাশের পানে চাহিল। কৃষ্ণপক্ষের শীর্ণচন্দ্র সন্ধ্যায় ভাসিয়া দিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে। তারকার দীপ্তি আজ ভাল করিয়া ফুটিতে পারে নাই। অন্ধকার আকাশের ন্যায় ধরিত্রী মুখের উপর একটা গাম্ভীর্য্যের আবরণ টানিয়া দিয়া নিঃশব্দে ঘুমাইতেছে। চরাচর স্তব্ধ হইয়া আসিতেছে। দেবালয়ের সান্ধ্য আরতির কাঁসর-ঘণ্টার সহিত গ্রামের কোলাহল থামিয়া গিয়াছে। কৃষককুটীর হইতে তন্দ্রাবিজড়িত শিশুর ক্রন্দনধ্বনির সহিত নদীর কলগান বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে।

এ পরিপূর্ণ শান্তির ভিতর মানব-হৃদয়ে অশান্তি কোথা হইতে আসে? অতৃপ্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা সকল অশান্তির একমাত্র মূল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী।

অন্ধ

(কবীর)

দেবতা তোদের থাকেন কোথায়
কোথা বা খুঁজিস তাঁরে,
হৃদয়-ভবনে রহিলি অন্ধ
পাবি কি বাহির দ্বারে?

সারা নিশিদিন চীৎকার করি
মরিলি বোকার মত,
নমাজ পড়িলি, সারা মুখে চোখে
তিলক লাগালি কত!

কীটেরও চরণ-নূপুরের ধ্বনি
পশে সদা যার কাণে,
সে কি রে বধির শুধু তোর বেলা
তোর চীৎকার-গানে?

হৃদয়ে যে তোর শাণিত খড়্গ
কঠোরতা বিষ মাখা,
হেন প্রাণ লয়ে পাবি না ত কভু
জীবন-পতির দেখা!

শ্রীকমলকৃষ্ণ মজুমদার।



ঘরের বউ

[চতুর্থ পর্ব্ব]

১

কিরণের পত্রখানি নীলাম্বর বাবু পড়িলেন। পড়িয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। গৃহিণী তিলোত্তমা কহিলেন, "কি লিখেছে? শরীরগতিক ভাল ত'?"

"শরীরগতিক—হাঁ, শরীর ভালই আছে। তবে—"

"কি তবে? কি হয়েছে?"

"চাকরী ছেড়ে দিয়ে চ'লে গিয়েছে।"

মূর্চ্ছাভঙ্গে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া কাছেই বরুণা শুইয়াছিল। সে কাঁদিয়া উঠিল। ত্রস্তে তিলোত্তমা কাছে আসিয়া, কন্যার গায়ে-মাথায় হাত বুলাইয়া কহিলেন, "এই আবার! এই ত' শরীরের অবস্থা, অত অধীর হ'স্‌নে, অধীর হ'স্‌নে! ভাল ক'রে সব শুনি, ব্যাপারটা কি। যা' হয় করা যাবে তখন। শরীর-গতিক ভাল আছে ত? ভাবনা কি?"

"আমার যে সর্ব্বনাশ হয়ে গেল মা—কিছুই আর করতে পারবে না"—আরও জোরে বরুণা কাঁদিয়া উঠিল।

"বালাই! বালাই! অমন অলক্ষুণে কথা মুখে আনতে আছে? সর্ব্বনাশটা কিসে হ'ল? শরীর-গতিক,—ষাট,—ভাল আছে ত?—ও সব কুকথা বল্‌তে নেই, বাছা! চাকরী ছেড়ে দিয়েছে—কত অমন চাকরী আবার হবে। বলি, হাঁ গা, কি হয়েছে, চাকরী ছেড়ে দিয়েছে—কেন, কি হয়েছিল? কোথায় গেল চাকরী ছেড়ে দিয়ে?"

বলিতে বলিতে তিলোত্তমা উঠিয়া স্বামীর কাছে আসিলেন।

"দেখ এই চিঠিখানা প'ড়ে!" বলিয়া পত্রখানা নীলাম্বর বাবু স্ত্রীর হাতে দিলেন।

পড়িতে পড়িতে চোখ-মুখ তিলোত্তমার লাল হইয়া উঠিল। জকুটী করিয়া একটু কাল বসিয়া রহিলেন, শেষে কহিলেন, "হুঁ সব চালাকী! এমনি বোকা আমরা—কিছু বুঝিনি, বটে!"

"চালাকী! চালাকীটা কি দেখলে? চাকরীটা ত ছেড়েই দিয়েছে।"

"সত্যি দিয়েছে, না ঘরোয়া একটা বন্দোবস্ত তাদের সঙ্গে ক'রে ছ' একটা বছরের জন্যে স'রে দাঁড়িয়েছে, কে জানে?"

নীলাম্বর বাবু কহিলেন, "প্রভিডেন্ট ফণ্ডের টাকা সব তুলে নিয়েছে, সাত হাজার টাকা বক্‌সিস্ তারা দিয়েছে, লিখেছে—"

মুখ বাঁকাইয়া তিলোত্তমা কহিলেন, "কি করেছে মাথামুণ্ডু, ওরাই জানে। ছেড়েই যদি থাকে—ইচ্ছে হ'লে আবার কোথাও কিছু করতে পারবে না? যদি চায়, ঐ চাকরীতেই আবার ফিরে আস্‌তে পারবে না? এলে ত ওরা মাথায় ক'রে নেবে?"

"কি যে বাজে বক্‌ছো, বুঝতে পারছি নে, তা হ'লে ছাড়লে কেন? চাকরী ছাড়লে, প্রভিডেন্ট ফণ্ডের টাকা—ইন্সিওর পলিসী গুলো ছেড়ে দিয়ে তার সব টাকায় অনেক লোকসানে আদায় ক'রে নিলে—"

"না ক'রে করবে কি? ওকে ত্যাগ করছে, সঙ্গে সঙ্গে বড় একটা পাওনা বুঝিয়ে দিতে হয় ত? নইলে লজ্জা থাকে না যে! পঁচিশ হাজার টাকা আর পোষাবে কি ক'রে? হতভাগা ভাবছে, না কিছু দিল, খুব বড়ই একটা দিল। ওতেই একেবারে ভুলে থাকুব, কথাটি আর কব না। পঁচিশ হাজার টাকা! ভেঙ্গে খেলে ক'দিন! আর ব্যাঙ্কেই রাখুক কি কোম্পানীর কাগজই করুক, কটা টাকা সুদ আসবে? দু'টো ছেলে নিয়ে ওতে চলতে পারে বরুণের মত কোনও মেয়ের?"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া নীলাম্বর বাবু কহিলেন, "না, তা—পারে না বটে, তবে ত্যাগ করবে, এমন কথাও ত কিছু বলছে না। বরং এই-ই লিখেছে, ও যদি পারে—"

"আহা তা! কি ভাল-মানুষ গো! ও তাই পারে? সেই কোন্ পাড়া-গাঁয়ে, ঝোপ-জঙ্গলে, পচা খাল-বিলের ভেতর গে কুঁড়ে বেঁধে সে থাক্‌বে—সে হয় ত দু'চার ছ'মাস থাকতে পারে—জন্মেছেও ত' অমনি ঘরে। কিন্তু বরুণা পারে দু'টি দিনও গিয়ে সেথায় থাকতে? বুঝতে পারছ না বজ্জাতী চালটা তার? আসল মতলব হচ্ছে, বরুণাকে ত্যাগ ক'রে, আগের সেই বৌটাকে নিয়ে এখন থাক্‌বে। তা খুলে ত আর সেটা বলতে পারে না। তাই এই চালটা দিয়েছে। জানে, বরুণা কখনো যাবে না। যেতে সে পারে না। ভেবেছে, পঁচিশ হাজার টাকা বুঝিয়ে দিলে, অগত্যে ঐ নিয়েই চুপ ক'রে সে থাক্‌বে। তার পর সেই বৌটাকে আনবে। দরকার যদ্দিন মনে করে, হয় ত তাকে নিয়ে ওখানেই থাকবে। শেষে কোথাও যদি ভাল আর একটা চাকরী নিয়ে যায়, কি করবে তুমি? আর টাকাও ত কম তাদের নামে রাখেনি! লিখেছে দশ হাজার, তা লুকিয়ে আরও সে কিছু রাখেনি, তাই বা কে জানে? তাই নিয়ে নিজেই একটা কারবার কিছু সুরু করতে পারবে না? নিজের হাতে রয়েছে অতগুলো দরকার হয়, একটা কোম্পানী ক'রে শেয়ার-টেয়ার মেলাই তুলে নিতেও ত পারবে।"

"হুঁ—"

"বুঝতে পারছ এখন, কি চালাকীটা করেছে? চালটা কি চেলেছে? আসল মতলব হচ্ছে—বরুণাকে ত্যাগ ক'রে সেই বৌটাকে নিয়ে থাকবে। তা সোজাসুজি ত আর তা পারে না। তাকও দেখায় না।' তাই এই চালটা এখন চেলেছে। একবার সে এসে

যদি তার সংসারে জুড়ে বসে, আর সঙ্গে সঙ্গে মা মাগীও তার ছেলে-মেয়ে ছ'টো নিয়ে এসে জোটে—তখন বরুণা আর পারবে তাদের ঠেলে ফেলে দিয়ে নিজে গিয়ে সেখানে ঠাঁই নিতে? এ কথাও ত তখন বলবে, দুঃখের বেলায় কেউ নন, সুখের সময় এসেছেন ষোল আনা ভাগ বসাতে। মা গো মা! পেটে পেটে কি বজ্জাতী গো!"

কথা শুনিতে শুনিতে বরুণা উঠিয়া বসিয়াছিল। বলিয়া উঠিল—"না না মা, ভুল বুঝো না। ঘটবে হয় ত শেষে তাই। কিন্তু সে রকম মতলব কিছু ক'রে যায় নি।"

"যায় নি? নিশ্চয়ই গিয়েছে! নইলে গেল কেন? পাড়া-গাঁয়ে গিয়ে চাষ ক'রে খাবে! তেমনি ছেলে কি না?"

ধীরে ধীরে বরুণা উত্তর করিল, "জিদ বড় বেশী—তেজীও বটে। ইচ্ছে করলে সব পারে। মানুষটাকে চেননি তোমরা। তবে যেত না। গেছে—গেছে—সে আমারই দোষে। থাকতে আমি দিলাম না—"

রোদনের উচ্ছ্বাসে বরুণার স্বর আবার ভাঙ্গিয়া পড়িল। অলক্ষ্যে আর্দ্র চক্ষু দুটি মুছিতে মুছিতে নীলাম্বর বাবুও উঠিয়া বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলেন। তিলোত্তমা কহিলেন, "হাঁ, তাও বলতে হয় বাছা, ব্যাটাছেলে—অত বাড়াবাড়ি করতে আছে? সে আছে এক রকম লোক—কাদা-মাটীর মত মেয়ে-মানুষের পায়ে জড়িয়ে থাকে—দশে ম'লে তাদের নিয়ে যা খুসী করা যায়। আর পাথরের কুঁচিতে ঘা দিতে গেলে নিজেরই হাত-পা ছ'ড়ে যায়, তাদের কিছুই হয় না। তিন শ টাকা ক'রে দেশে পাঠাত, পাঠাত! তোকেও ত কম দিত না! সংসারটা তাতেও বেশ চালিয়ে নেওয়া যায়। তা মাসে মাসে তুই গেলি ঠিক তিন শ' ক'রে টাকার বিল পাঠাতে। কদ্দিন সত্যি চালাতে পারত? কাযেই এখন স'রে পড়েছে। কে যে এ-বুদ্ধি তোকে দিয়েছিল—তাই বুঝতে পারি নে।"

"সইতে পারতাম না, মা! ঠিক টাকার জন্যেই যে করেছি, তা নয়! সইতেই পারতাম না! সে যদি না থাকত, কেবল যদি বাড়ীতে পাঠাত—তার মা ভাই-বোনকে—হয় ত—হয় ত কিছু বলতাম না! বরঞ্চ ও-ভাবে জব্দ করতে চাইতাম না—"

"লাভ কি হ'ল? জব্দ ত উল্টে নিজেই হলি! এখন কি আর সামলে সহজে ফিরিয়ে আনা যাবে?"

কাঁদিয়া বরুণা মায়ের গলাটি জড়াইয়া ধরিল। বুকে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "এলেই বা আর কি হবে, মা? আমাকে আর চায়ই না। টান গিয়ে সব এখন তারই ওপর পড়েছে। কিন্তু তবু—তবু—আমায় এভাবে ত্যাগ করেও যেত না। করতে বাধ্য আমিই শেষে করলাম।"

নীরবে এক হাতে চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে আর এক হাত তিলোত্তমা কন্যার মাথায় বুলাইতে লাগিলেন।

বরুণা কহিল, "কি করব, মা? জীবনটাই আমার পুড়ে গেল! সে আর চায়ই না আমাকে—এক সংসারে থাকলেও সুখী আর কেউ হব না। আমার সঙ্গে কেবল ভদ্রতা ক'রে চলবে, আর মনে মনে গুমরে মরবে তার জন্যে। কি ক'রে এটা আমি বরদাস্ত করব, মা? সে হয় ত সইতে পারবে—দিনগুলো কোনও মতে কাটিয়ে দেবে, কিন্তু আমি পারব না। রাগে দুঃখে কত দিন শরীর মন আমার জ্বলে যাবে—ভাল মুখে দুটি কথাও কখনও বলতে পারব না। অবিরত ঝগড়াঝাঁটি হবে। আর তখন তার সেই কাটা কাটা কথা—জান না মা—শোননি কখনও—একটুও খাতির ক'রে কথা কয় না—মেজাজ যখন গরম হয়ে ওঠে।"

বলিতে বলিতে বরুণা চক্ষু মুছিয়া সোজা হইয়া বসিল।

"এত বড় মেজাজই বা কোত্থেকে এল? এই ঘরের এত বড় একটা শিক্ষিতা মেয়ে তুই—আর কোথাকার কোন্ গেঁয়ো হাভাতে ঘরের ছেলে—"

"ছেলে যে ঘরেরই হ'ক, মেজাজ উঁচু—আর সত্যি মনও ছোট নয়। তার পর লেখাপড়া শিখেছে, কাযের যোগ্যতাও আছে। পয়সা রোজগারও ঢের করে। আর তার সেই ঘর—সে মনে করে, না, তোমাদের ঘরের চাইতে এতটুকুও তা ছোট নয়! কথা কিছু তুললে তা নিয়েও কড়া কড়া দশ কথা শুনিয়ে দেয়!"

"তা' কি করবি এখন? ঐ ত পঁচিশ হাজার টাকার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে। সব ছেড়ে-ছুড়ে কেবল ঐ সম্বল ক'রেই কি থাকতে পারবি?"

আবার বরুণা কাঁদিয়া উঠিল। আবার মাকে জড়াইয়া ধরিয়া মার বুকে মুখখানি রাখিয়া কহিল, "না, তাও পারব না, মা। টাকা চুলোয় যাক—তার জন্যে ভাবছি না! লাখ টাকা দু'লাখ টাকা দিলেও পারতাম না। বলতে লজ্জা নেই মা—তাকে ছেড়েই আমি থাকতে পারব না। আরও যখন তাকে নিয়ে আসবে—না মা, সে আমি কিছুতেই পারব না—পারব না—বুক ফেটে ম'রে যাব।"

"চুপ কর, চুপ কর্—অত অধীর হসনে। বুক ফেটে যে এখনই তা হ'লে মরবি।"

"ম'লেও সব চুকে যেত, মা। না, তাও বুঝি যেত না। যদি দেখতে পেতাম—তাকে নিয়ে সুখে সংসার করছে—আমায় ভুলে গেছে—না মা, সেই পরকালেও শান্তি এতটুকু পেতাম না, নরকের আগুনে জ্ব'লে মরতাম!"

"এই দেখ! কি বলে পাগলের মত। হাঁ, তা লিখেছে ত, তুই যদি যাস, সংসার তোকে নিয়েই করবে। তা গিয়ে কি সেখানে থাকতে পারবি?"

"না, তাও—তাও পারব না। হয় ত—কোন্ সে জলা-জঙ্গলে একটু কুঁড়ে ঘর ক'রে রয়েছে—"

"ঠিক তাই রয়েছে। গেলেও তুই না থাকতে পারিস—এমনি সব ব্যবস্থা ক'রেই রেখেছে। মাটীতে মাদুরে শুতে হবে—মাটীর হাঁড়িতে মোটা চালের ভাত সেদ্ধ ক'রে খেতে হবে, পানাপুকুরে গিয়ে নাইতে হবে,—বাসন মাজতে, কাপড় কাচতে হবে। গোবর-হাঁড়ি নিয়ে সেই কুঁড়ে ঘর নিকুতে হবে—"

"দুই এক দিনের কথা ত নয়। বরাবর কি ক'রে তা পারব, মা? আরও ঐ ছেলে দুটো রয়েছে—জ্বরে ভুগেই যে দু'দিনে ম'রে যাবে। কিন্তু—কিন্তু যদি পারতাম মা—ভেবেছি, ফিরে হয় ত তাকে পেতাম। যে টান তার ওপরে গিয়ে পড়েছে, ফিরে হয় ত আমার উপরেই আবার আসত।"

"হাঁ, তেমন গৌরীর তপস্যা করতে পারলে পাষাণ শিবের মন গলে বৈ কি? কিন্তু সে কি আর আজকালকার মেয়েরা পারে?"

"ঐ সুরবালা তাই ক'রেই বুঝি মনটা তার গলিয়েছে। নইলে ছেড়েই ত তাকে এসেছিল। কিন্তু আমি—আমি কি তা পারব, মা?" বলিতে বলিতে গভীর একটি নিশ্বাস বরুণা ছাড়িল।

তিলোত্তমা নীরবে বসিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। বরুণা কহিল, "ফিরিয়ে তাকে আনতে পার না, মা? ঐ চাকরীই চাইলে হয় ত আবার পাবে—বড় খাতির তারা করত। এখনও হয় ত খালি আছে—অন্ত লোক কাউকে নেয় নি। দেখতাম—প্রাণপণ চেষ্টা একটা ক'রে দেখতাম—মনের আগুন সব চেপে রেখে সুখী তাকে করতে পারি কি না। আর সেই সুখে মনটাও তার ফিরিয়ে আনতে পারি কি না। আগে—আগে—ভাল ত খুবই বাসত! এখনও সত্যিকার একটা ছিল, আর সেটা একেবারে গেছে ব'লেও মনে হ'ত না। অন্ততঃ চেষ্টা একটা করেছে, মনের সেই টানটা চেপে রেখেও আমাকে নিয়ে শান্তিতে সংসার করতে পারে কি না।"

"দেখি —সেই চেষ্টাই এখন করতে হবে।"

২

তিলোত্তমা উঠিলেন দরজার কাছে আসিয়া স্বামীকে ডাকিলেন, "বলি শুনছ? বাইরে গিয়ে ব'সে রয়েছ কেন? ভেতরে এস না?"

"কি?"

নীলাম্বর বাবু ভিতরে আসিয়া বসিলেন।

"বলি, এখন এর কিনেরা একটা কিছু করতে হবে না? মেয়েটাকে ত আস্ত ধ'রে জলে ফেলে দিয়েছ। একেবারে ঝড়ের দরিয়াতে—"

নীলাম্বর বাবু উত্তর করিলেন, "যেখানেই দেওয়া হ'ক, সে দায়িত্ব কেবল আমার নয়। আমার যেটুকু, তার চাইতে তোমার অনেক বেশীই বরং। একদম পাগল হয়ে ত তখন উঠেছিলে।"

"তা হয়েছিলাম। আমি মেয়েমানুষ—মেয়ের মা—ভাল একটি ছেলে দেখেছিলাম—আসত-যেতও খুব —"

"সেই আসা-যাওয়াও ত বন্ধ ক'রে দিয়েছিল এখন বুঝতে পারছি ঐ বিয়েটার পরে। একেবারে তখন অধীর হয়ে উঠলে—খোঁজ খোঁজ কোথায় গেল, কি হ'ল, কেন আসে না—তেমনি শেষে খুঁজে খুঁজে এক দিন ধ'রে নিয়ে এল। তখন আর পায় কে? একেবারে জামাই আদর সুরু হ'ল —"

"তা হয়েছিল। তখন কি আর জানতাম, গাঁয়ে গিয়ে একটা বিয়ে ক'রে এসে গা-ঢাকা দিয়েছিল? তা মেয়েমানুষ—ভুলচুক আমরা করতে পারি। তুমি ত পুরুষ-মানুষ—লোকেও খোঁজ খবর খুব করে—বিয়ে দেবার আগে কোথাকার কে, কার ছেলে, খোঁজখবর একটা নেওয়া উচিত ছিল না?"

"সেটা ভাববারই বা অবসর পেলাম কোথায়? সে থাক গে—এখন আর এ তর্ক মিছে। যা হবার হয়েছে, ফেরান ত আর যাবে না? তা কি করতে বল এখন?"

"সেও আমাকে ব'লে দিতে হবে? কেন, নিজের আক্কেল কিছু নেই?"

"না, সব হারিয়েছি। কিনেরা আর কি হ'তে পারে, বুঝতেই পারছি নি।"

"যেতে হবে সেখানে। ঠিকেনা ত দিয়েছে—গিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে।"

"কোথায় আনব? চাকরী ত ছেড়েই দিয়েছে। হিসেব নিকেশ সব চুকিয়ে পাওনা যা হ'তে পারে, সব আদায় ক'রে নিয়েই ত চ'লে গিয়েছে। আমি গিয়ে বল্লেই তোমার এই বাড়ীতে সে অমনি ছুটে আসবে কেমন?"

"সে কথা কে বলছে? তবে ঐ চাকরীতে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে।"

"একদম ছেড়ে দিয়ে গেল। এখন ওরা— —"

"নেবে। ক'দিন আর গেছে? ফিরে যদি আসতে চায়, অবিশ্যি নেবে, কেন নেবে না? আর সত্যি কথাও বলতে হয়, দোষ এদিকে যাই থাক, বুদ্ধি আছে, বিদ্যে আছে, কাযের একটা ক্ষমতাও আছে। নইলে সত্যি এত টাকা মাইনে দিয়ে ওরা রেখেছিল! আর যা লিখেছে, সত্যি যদি হয়, সাত সাতটি হাজার টাকা পুরস্কার ব'লেও দ'রে দিয়েছে আগে এলাহাবাদে যাও, গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা কর। বুঝিয়ে সব বলবে। খুলেই না হয় বলবে, স্বামি-স্ত্রীতে ঝগড়া হয়েছিল, রাগ ক'রে ছেড়ে দিয়ে গেছে। মাথা ঠাণ্ডা এদ্দিনে হয়েছে, ডাকলেই আবার আসবে। ওদের বড় ম্যানেজারের সঙ্গেও ত তোমার জানাশুনো খুব আছে—"

"তা আছে। বলতেও গিয়ে যা দরকার পারব। রাজিও হয় ত হবে—যদি না পাকা বন্দোবস্ত আর কারও সঙ্গে ক'রে থাকে। কিন্তু তাকে রাজি করাবে কে? আমার কোনও কথা গ্রাহ্যিও করবে ভাবছ? সেবার এলাহাবাদে গিয়ে বেকুব নাকাল হ'তে হয় হয়ে এসেছি।"

"তাই ব'লে হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ ঘরে ব'সে থাকবে? আর মেয়েটা কেঁদে কেঁদে মরবে?"

একটু কি ভাবিয়া নীলাম্বর বাবু কহিলেন, "আমাকে দিয়ে কিছু হবে না। তবে ও নিজে যদি যেতে পারে——"

"ওকেই তবে নিয়ে যাও। কেমন, যাবি বরুণা? যেতে পারবি?"

বরুণা কহিল, "যাব পারব বোধ হয় যেতে, মা। কিন্তু—কিন্তু গিয়েও কিছু হবে না। আসবে না —এখুনি কিছুতেই আসবে না। বলবে এসেছ, বেশ—থাক এইখানে। আর যদি আমি ফিরে আসি—"

বলিয়া বরুণা কাঁদিয়া উঠিল।

চক্ষু মুছিয়া নীলাম্বর বাবু কহিলেন, "হাঁ, ঠিক কথাই বলেছে বরুণা! ও যদি গিয়ে দু'চার ছ'মাস থাকতে পারে, আর তার মন-মত চলতে পারে, তবে পরে হয় ত ফিরিয়ে আনতে পারবে। আর এর ভেতর এলাহাবাদে গিয়ে ওদের বলতে পারি—ছ'মাস একেবারে পাকা ভাবে ওর কাযে আর কাউকে না নেয়।—"

"একটা বন্দোবস্ত না হয় সেই একবারই গিয়ে ক'রে ফেল। কিন্তু ও কি গিয়ে ওখানে ওভাবে থাকতে পারবে?"

"না, তা পারবে না। আরও, শরীরের যে অবস্থা এখন। অত দূর নিয়েই যাওয়া এখন যাবে কি না সন্দেহ।"

"ডাক্তারকে ডেকে দেখিয়ে একটা পরামর্শ বরং নেও। যেতে পারবে যদি তিনি বলেন, তবে নিয়ে ত একবার যাও। আমিও বরং সঙ্গে যাব। তার পর সেখানে গিয়ে কথাবার্ত্তা কয়ে ত দেখা যাক কি হয়। হাঁ, যায়গাটা কোথায়? কত দূর হবে কলকেতা থেকে?"

পত্রখানি আবার তুলিয়া লইয়া ঠিকানাটা দেখিয়া ভাবিতে

ভাবিতে নীলাম্বর বাবু কহিলেন, "ঠিক ধরতে পারছি নি, জেলা ত লিখেছে ২৪ পরগণা, গ্রাম আশাপুর—নামও শুনিনি কখনও। ক্যানিংএ নেমে যেতে হয়। সুন্দরবন টনের ওদিকেই হবে নাকি, কে জানে?"

"কি সর্ব্বনাশ! সুন্দরবন! কোথায় কি ক'রে যাব গো!"

"যেতেই হবে—যদি জামাইকে ফিরিয়ে আনতে চাও!"

ভীত বিবর্ণ মুখে তিলোত্তমা চাহিয়া রহিলেন।

৩

চাকরী ছাড়িবার সময় বন্ধু সতীশকে কিরণ জরুরী এক চিঠি লিখিয়া এলাহাবাদে আনাইয়াছিল। তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই সকল বন্দোবস্ত করে।

পঁচিশ হাজার টাকা বরুণাকে দিয়া দশ হাজার সে বাড়ীর পরিবারের জন্য রাখে। ইহার পাঁচ হাজারে সে মার নামে এবং পাঁচ হাজারে সুরবালার নামে, কতক সরকারী বণ্ড, কতক পোষ্টাল ক্যাস সার্টিফিকেট কেনে। সতীশের হাতে সব বুঝাইয়া দিয়া সে তাহাকে বাড়ীতে পাঠাইল। মার কাছে একখানা চিঠিতেও সব খুলিয়া লিখিল। নিজেও সেই সঙ্গে একেবারে এলাহাবাদ ছাড়িয়া আসিল।

সতীশের কাছে সব শুনিয়া, আর পত্রখানি পড়িয়া স্তব্ধভাবে কতক্ষণ সৌদামিনী বসিয়া রহিলেন। চক্ষু দুটিও অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। আঁচলে মুছিয়া কহিলেন, "এখন কি হবে, সতীশ? কি করব বল্ দিকি?"

"কি আর করবেন, কাকীমা? সে যা ক'রে ফেলেছে—"

"তুই কিছু বলি নি? অত বড় চাকরীটা—রাজার হালে ছিল—"

"রাজার হালে হাঁ, টাকা মেলাই রোজগার করত—খরচও খুব হ'ত। কিন্তু শুনলেন ত সব! সুখে মোটেই ছিল না। শেষ ক'মাস ত একেবারে অতিষ্ঠ হয়েই উঠেছিল—"

"তা মাসে অতগুলো ক'রে টাকা না হয় আমাদের নাই পাঠাত। হাঁ, এই ক'মাসে যে পাঠিয়েছে বাড়ী-ঘরটা একেবারে গোল্লায় যাচ্ছিল—সেরে-সুরে নিতে পেরেছি। নইলে অত টাকা মাসে আমাদের কিসেই বা লাগত?"

"সে বলে, অতগুলো ক'রে টাকা মাসে রোজগার করে, কেন ওটা আপনাদের পাঠাবে না? দাবী দাওয়া ত আপনাদেরও একটা আছে—"

"তা সে যাই থাক, তার নিজের ভালর চাইতে ত আর সে দাবী-দাওয়া বড় হ'তে পারে না। হাঁ, দুঃখেরেশ ওরা পাচ্ছিল—তা চল্লিশ পঞ্চাশটা ক'রে টাকা মাসে দিলেও ত স্বচ্ছন্দে চ'লে যেত। তবে ঐ বৌটো—তা সোয়ামীর সংসার করতে পেল না—মেলাই টাকা নেড়ে-চেড়ে আর কি সুখ তার হবে? ভাল দু'খানা কাপড় কিনেও পরবে না, গয়নাও গড়াবে না। বাপ যা দিয়েছিল, তাও ত বাক্সে প'ড়ে রয়েছে। গায়ে কখনও তোলে না। কোন্ সুখে তুলবে? কার জন্যে তুলবে? তা তুই বুঝিয়ে সব বলি নি?"

"বলেছিলাম অবিশ্যি দুই একবার। তা কাণেও তুললে না। বলে, না, এখানে এভাবে থাকতেই আর আমি পারব না। আর আমারে মা ভাই বোনকে খরচ দেব, তাতেও ওর খেয়ালে চলতে হবে? না, সেটা প্রাণ থাকতে পারব না।"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া সৌদামিনী কহিলেন, "তার এ বুদ্ধি আগে যে কোথায় ছিল—"

"বুদ্ধি, কাকীমা, অনেকেরই আগে তলিয়ে থাকে। দুঃখের ঘা খেয়ে খেয়ে শেষে ফুটে ওঠে। সেই কিরণ যে আজ এই হবে, সেটা কি আমরাই আগে ভাবতে পেরেছিলাম?"

সৌদামিনী কহিলেন, "যার এই আবাগীই বা কি? মানুষের মেয়ে না ডাইনী? এমনি ক'রে বাছাকে ছন্নছাড়া ক'রে দিলে! এখন তুইই বা কি করবি? সব গেল যে, তোরই ত গেল। পঁচিশ হাজার—সে ত ফুঁতে ওর উড়ে যাবে। আরও দুটো ছেলে রয়েছে। থাক্ এখন বাপের ঘরে প'ড়ে। বাপ মা চোখ বুজুক শেষে ভাজদের লাথি-ঝাঁটা খা। ও কি পারবে তাদের মন যুগিয়ে চলতে—নিজের সোয়ামীর মন জুগিয়ে যে চলতে পারলে না? ঝাঁটা মেরে দূর ক'রে দেবে, টুকনী হাতে ক'রে পথে পথে শেষে ঐ ছেলে দুটোকে নিয়ে ভিক্ষে ক'রে খেতে হবে।—চুলোয় যাক্, যা খুশী তার হ'ক গে, আমাদের কি? তবে, যা, ঐ গুঁড়ো দুটো রয়েছে—"

একটু হাসিয়া সতীশ কহিল, "তার জন্যে আজই আপনার এ ভাবনার দরকার কিছু দেখছি না, কাকীমা। তাদের বাপই ত রয়েছে। দুঃখে এমন পড়ে—ভাবতে যা হয়, সেই তখন ভাববে।"

সৌদামিনী কহিলেন, "ভেবে আর কি করবে তখন? চাকরী ছেড়ে দিয়ে এল। কোথায় সেই গাঁয়ে ভুঁয়ে গিয়ে থাকবে,—বলে, চাষ ক'রে খাবে। সে কি অমনি সুখের কথা, সতীশ? কত দুঃখ যে নিজেই পাবে।"

চক্ষুতে জল আসিল। একটু সামলাইয়া সৌদামিনী কহিলেন, "হাঁ, চলেই কি একেবারে এসেছে? তোর সঙ্গেই এসেছে?"

"হাঁ। কলকেতা তক্ একসঙ্গেই দুজনে এসেছি।"

"তার পর? কোথায় সে যায়গা নিয়েছে? গিয়ে কি বসেছেই সেখানে?"

"কলকেতা থেকে দেশে আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে বরাবর ত চলেই গেল।"

"কোথায়?"

"ঐ ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণে—সুন্দরবনের ওদিকে।"

"সুন্দরবনের ওদিকে? বাদায়? কি সর্ব্বনাশ! বাঘের ভয়—কুমীরের ভয়। কবে যে প্রাণটাই হারাবে! কথায়ই লোকে বলে—জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ, ক্যামনে বাঁচে বাদার লোক!"

হাসিয়া সতীশ কহিল, "না না, অত ভয় পাবেন না, কাকীমা। সুন্দরবনের ঠিক ভেতরে নয়, কাছে। অনেক আবাদ সেখানে হচ্ছে—গ্রাম পত্তন হচ্ছে। কি একটা জমীদার কোম্পানী এই সব গ্রামে সস্তায় জমী বিলি করছে। তারই শ' দুই বিঘে জমী সে নিয়েছে। মাঝে একবার গিয়ে দেখে শুনে সব ঠিকঠাক ক'রে আসে।"

"আমাকে নিয়ে যা, সতীশ। একবার দেখে শুনে গে আসি। সোস্তি ধ'রে থাকতে আর পারছি নি। যাবার আগে—এত কাছে এল—একটিবার দেখা দিয়েও যদি যেত—"

সৌদামিনী কাঁদিয়া ফেলিলেন। বারান্দায় বসিয়া ইঁহারা কথা বলিতেছিলেন। ঘরের দরজার আড়ালে সুরবালা বসিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতেছিল। চক্ষু মুছিয়া কণ্ঠস্বর কিছু সংযত করিয়া

তখন কহিল, "আর এক কায করুন না, মা? এতগুলো টাকা নিয়ে আমরা কি ক'রব? গিয়ে সব তাঁর হাতে দিয়ে দিন। কাযকর্ম্ম—সে এখন যাই করুন—কুল্লে দুই হাজার টাকা ত নিয়ে গেছেন—ওতে আর কি এমন সুবিধে হবে? এই দশ হাজার টাকা পেলে —"

"হাঁ, সে ত দিতেই হবে। এতগুলো টাকা দিয়ে সত্যি আমরা কি করব?—সব সে নিক, নিয়ে যাতে ভাল হয়, বুঝে নিজেই করুক। আমাদের নিয়ে চল্, সতীশ। তোর কাযকর্ম্ম রয়েছে—এই এলাহাবাদে ঘুরে এলি—তা আমাদের পৌঁছে দিয়েই বরং চ'লে আস্‌বি।"

একটু ভাবিয়া সতীশ কহিল, "সে যে এতে রাজি হবে—এমন ত মনে হয় না, কাকীমা।"

"হবে না? হতেই তাকে হবে। তুই নিয়ে চল্ আমাদের। রাজি হয় না হয়, সে তখন আমি দেখব।"

"কিন্তু আগে তাকে একবার লিখে —"

"না না, লিখবার কিছু দরকার নেই। হয় ত নিষেধ করেই চিঠি পাঠাবে। হয় ত বা আমরা যাবই বুঝতে পেরে স'রেই কোথাও যাবে। —শেষে কোথায় গে আমরা দাঁড়াব?"

"কিন্তু আর একটা কথাও ভাববার আছে, কাকীমা? ঐ বৌকেও ত লিখেছে —যদি ইচ্ছে হয়, ওখানে গিয়ে থাকতে পারে—"

"হাঁ।—পাগল হয়েছিস, সতীশ? ঐ বৌ ছুটে আসবে সুন্দরবনে? তাই যদি আসবে, তবে এমনি ক'রে ওকে ঐ চাকরী থেকে বের ক'রে দেয়?—এক একবার মনে হচ্ছে কি সতীশ জানিস? যা হয়েছে ভালই হয়েছে। সে আর আসবে না। এখন এই আবাগীর ওপর মা দুর্গা যদি মুখ তুলে চান। তবে, টাকাটাই এমন বড় কিছু নয়। ভাত-কাপড় যদি চ'লে যায় আর সোয়ামীর ঘরে সোয়ামীর আদরে মেয়েমানুষ থাক্‌তে পায়, রাজার ঐশ্বর্য্যও তার কোন্ ছার!"

"দেখুন। তবে—ও বৌয়েরও মতিগতি কখন কি হবে, কেউ বলতে পারে না। কিরণ নিজেও মনে করে, হয় ত সে আসবে। আর যদি আসে —থাক্, সে পরে যা হয় হবে। এখন— বেশ, যেতেই যদি চান, চলুন আমি নিয়ে যাব। তবে—ক'দিন দেরী করতে হবে, কাকীমা?—"

"ক'দিন?"

"এই ধরুন দিন পনের, কুড়ি। যেতেও দু'তিন দিন লাগবে,—আর গিয়েই অমনি আপনাদের রেখেই চ'লে আস্‌তে পারব না। কাযটা কতকগুলো আছে,—সেরেসুরে যেতে পারলেই ভাল হয়।"

"বেশ, তাই তবে যাবি।—একখানা চিঠি—যাবার কথা কিছু লিখব না—এমনিই একটা খবর নিই, কি করছে—কি ভাবে আছে—মনটা যে আমার কি করছে সতীশ, সে আর তোকে কি বলব? এক একবার মনে হচ্ছে, কেনই বা মরতে প্রয়াগ গেলাম। তবু সে ছিল—খুব সুখে না থাক, ভাল যায়গায় বড় একটা কাযে—ভাল ত ছিল।—এখন একলা সেই বাদাবনে—কি করছে, কি খাচ্ছে দাচ্ছে—বাঘের ভয়, কুমীরের ভয়—মশামাছি—হয় ত জ্বর-জারি হয়েই প'ড়ে আছে—"

বলিতে বলিতে গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া সৌদামিনী চক্ষু মুছিলেন। সুরবালারও সমস্ত শরীরটা কাঁপিয়া উঠিল। মনে হইল, যদি আকাশে উড়িয়াও একটিবার সে যাইতে পারিত!

বড় একটি নদী বা খাঁড়ির উত্তর পারেই গ্রামখানি। নূতন গ্রাম, ১৫।১৬ বৎসর মাত্র পত্তন হইয়াছে, নাম রাখা হইয়াছে আশাপুর। যে জমীদারী কোম্পানী এই অঞ্চলটা আবাদ করিয়া বসতিপত্তন ও জমীবিলি করিতেছিলেন, তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য এই ছিল যে, বেকার বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ছেলেদের একটা কৃষি-উপনিবেশ ইহাকে করিয়া তুলিবেন। তাঁহারা মনে করিতেন, বাঙ্গালার বেকার-সমস্যা সমাধানের বড় একটা উপায় হইতেছে এই। বাঙ্গালী ভদ্রলোকরা পূর্ব্বে সকলেই প্রায় ছিল গ্রামবাসী গৃহস্থ এবং গৃহসংলগ্ন ও নিকটবর্ত্তী জমাজমীর উপস্বত্বই ছিল অধিকাংশ গৃহস্থের জীবিকার প্রধান অবলম্বন। নানাদিক্ হইতে অবস্থার বড় পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, গ্রাম্য গৃহস্থালী ছাড়িয়া, উন্নতবুদ্ধি ও শিক্ষিত ভদ্রলোক সকলেই প্রায় চাকরী, ওকালতী, চিকিৎসা এবং অন্য নানাবিধ ব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় নূতন এই আমলের নূতন সব সহরে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালীর অর্থাগমের একমাত্র লক্ষ্য গিয়াও এই দিকে পড়িয়াছে। কিন্তু অধিকাংশের পক্ষেই জীবিকা এই সব ক্ষেত্রে অতি দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। এই জমীদারী কোম্পানী যাঁহাদের চেষ্টায় স্থাপিত হয়, তাঁহারা মনে করেন, ঠিক আগের মত না হউক, কতকটা সেই ধরণের গ্রাম্য গৃহস্থালীতেই ইহাদের জীবিকার একটা সংস্থান হইতে পারে। পুরাতন গ্রামগুলিতে জমীর অভাব হইয়া পড়িয়াছে। তবে বাদা জমী বাঙ্গালাদেশে অনেক স্থলে এখনও আছে। আবাদ যদি বসতির যোগ্য করিয়া তোলা যায়, তবে এই সব অঞ্চলে হয় ত বেকার যুবকরা আসিয়া বসিতে পারে। যদি পারে, আশু অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস হইতে হয় ত বাঙ্গালী ভদ্র-সম্প্রদায় রক্ষা পাইবে। প্রতিষ্ঠাতারা ভাবিয়াছিলেন, এইরূপ একটা চেষ্টাই এই অঞ্চলে আগে তাঁহারা করিবেন। এই সব যুবক যদি তেমন বেশী নাই আসে, জমী লইবার লোকের অভাব হইবে না। ছোট ছোট ভাগে সাধারণ চাষী গৃহস্থের মধ্যে তখন জমী তাঁহারা বিলি করিবেন এবং এরূপ লোক অনেক তাঁহারা পাইবেন। যে টাকা ফেলিয়াছেন, তাহা নষ্ট হইবে না। প্রথমেই এই গ্রামটি তাঁহারা পত্তন করেন এবং ভগবৎকৃপায় এই আশা তাঁহাদের পূর্ণ হইবে, এই আশায় গ্রামটির নাম রাখেন আশাপুর। এই আশাপুরকে কেন্দ্র করিয়াই কায তাঁহারা আরম্ভ করেন এবং তাঁহাদের এক জন ম্যানেজারও এই স্থানে আসিয়া বসেন। ম্যানেজার বাবুটির নাম ছিল—সুখময় ঘোষ। সপরিবারেই তিনি এখানে বাস করিতেন। কাছারীর নিকটে নিজেও কিছু জমী লয়েন, এবং এমন এক প্রণালীতে নিজেই দেখিয়া কাযকর্ম্ম করিতেন, যাহা নবাগত যুবকদের পক্ষে শিক্ষণীয় একটা দৃষ্টান্তস্থল হইতে পারে। লোকটি এখন প্রবীণবয়স্ক, যাহারা আসিত, কতকটা মুরুব্বীর মতই তাঁহাদের সঙ্গে ব্যবহার করিতেন। স্বভাবেও ছিলেন অতি অমায়িক।

অনেক বিজ্ঞাপন ইঁহারা প্রচার করিতেন। ইঁহাদের একটি বিজ্ঞাপন দেখিয়াই কিরণ এখানে আসিয়া জমীর বন্দোবস্ত করে

এবং বাসের যোগ্য দুই তিনখানি গৃহ-নির্ম্মাণের জন্ম ম্যানেজার সুখময় বাবুর কাছে কিছু টাকাও রাখিয়া যায়। নিজের নাম ও পৈতৃক বাসভূমি ব্যতীত আর কোন পরিচয় তাঁহাকে দেয় না। এইমাত্র বলে, চাকরী করিত, সামান্ত কিছু জমাইয়াছে, চাকরী ছাড়িয়া তাহা লইয়া চাষ-বাস করিয়া এইখানে থাকিয়াই জীবিকা সংগ্রহের চেষ্টা করিবে। পরিবার-পরিজন আপাততঃ দেশেই আছেন, সুবিধা হইলে পরে সকলকে এইখানেই লইয়া আসিবে।

১৫।২০ দিন হইল কিরণ আসিয়াছে, কয়েক জন লোক রাখিয়া কাযকর্ম্মও আরম্ভ করিয়াছে। লোক ম্যানেজার বাবুই সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। এ ভার তিনিই গ্রহণ করিতেন, আরও কয়েক জন ভদ্রলোক নিকটেই এখানে ওখানে জমী লইয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহাদেরও লোক যাহা দরকার হয়, তিনিই সংগ্রহ করিয়া দেন।

বৈকালে এক দিন কাছারীবাড়ীর বাহিরে একটি গাছতলায় কিরণ ও সুখময় বাবু বসিয়া আছেন। কিরণ বলিতেছিল, "গাঁয়ের নামটা ত খাসা রেখেছিলেন—আশাপুর, কিন্তু আশা যে কদ্দিনে কি ভাবে পূরবে, সেইটেই ত বুঝতে পারছি না, ঘোষ মশাই।"

হাসিয়া সুখময় কহিলেন, "আর বলো না, দাদা। বাবুদের আশা—তখনই বলেছিলাম, মিছে আশা, হবে-টবে না সব কিছু। তা বলেন, হতেই হবে। জাতটা কি মরবে? আরে, মরবেই ত। নইলে এমন দশাও হয়? সহরে ঠেলাঠেলি ক'রে সব মরছে, একটু চাকরী যদি পায়। কোথায় এত চাকরী? যারা না পায়, পাশ কোনও মতে করতে পারলে, উকীল-মোক্তার হয়ে গে বসে। তা মক্কেলই বা কোত্থেকে এত আস্‌বে? মক্কেলের চাইতে উকীল-মোক্তার হয়ে গেছে বেশী। সেবার বাবুদের এক মামলার তদ্বিরে হাইকোর্টে গেলাম—উকীলরা সব গাদাগাদি ব'সে আছে, যেন ক্লাসঘরে সব স্কুলের ছাত্র! আর ডাক্তার-কবরেজের ত অন্ত নেই, সহরে সহরে—দোকান সাজিয়ে সব হাঁ ক'রে ব'সে আছে, যদি একটা রোগী আসে—ঐ কাদের মত—সেটা আর বলতে চাইনে, দাদা। পয়সা যা দুটো পায়, আজকালকার ঐ যত সব ছাই-ভস্ম পেটেণ্ট ঔষধ বেচে। জাতটা মরবেই দাদা, নির্ঘাত মরবে। মরেছে বল্লেও হয়।"

"হুঁ—"

"এই ত ১৫।১৬ বছর দোকান সাজিয়ে ব'সে আছি—কটা ছেলে এসেছে? এসেছে যা দুই চার জন—একটু বয়েস হয়েছে—কিছু পুঁজি আছে—আর অনেক দেখে ঠেকে এখন শিখেছে—'নান্তঃ পন্থা বিদ্যতে।' তবে তোমাকে পেয়ে দাদা, একটু আশা এখন হচ্ছে। বয়েসটাও এমন বেশী কিছু হয় নি—হাঁ, কত এই হ'ল? বছর ত্রিশ?"

"এই বত্রিশ হ'ল—"

"ত্রিশ আর বত্রিশ—ও সমানই কথা। আর চালাক-চতুর বেশ আছ—চেহারাটাও খাসা—মনে হয়, সহরে ভাল চাকরীই একটা কিছু করতে। তা ভাল মন্দ যাই করতে, ছেড়ে ত এসেছ? যারা পায় না, তারাও আসে না, আর পেয়েও ছেড়ে এসেছ—ক'জন এমন আসে?"

"আচ্ছা, এই বেকার ছোক্‌রা—যাদের জন্তেই আপনারা এটা করেছেন—তারা কি এক দমই কেউ আসে না?"

"আসে কেউ কেউ, দু'চার দিন থাকে, দেখে-শোনে, চ'লে যায়। কেউ বলে ভাল লাগছে না, কেউ বলে থাকতে পারব না—শরীরটা খারাপ লাগছে। কেউ বলে—দেখি ভেবে-চিন্তে—দেখে আবার আসব। কেউ বলে পুঁজি-পাটা নেই।"

"ওটা একটা বড় কথাই বটে, ঘোষ মশাই। পড়াশুনো ছেড়ে যখন কাযে ঢুকবে—সবারই প্রায় এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় যে, তখনই দু'পয়সা আয় করতে না পারলে চলে না। জমী নিয়ে বস্‌তে হ'লে দু'চারটে বছর অন্ততঃ কেবল কায করেই যেতে হবে ঘরের খেয়ে, আয় বড় কিছু হবে না। পুঁজিপাটা কিছু হাতে থাকা চাই। কিন্তু ক'জনের তা আছে?"

সুখময় বাবু উত্তর করিলেন, "মরিয়া হয়ে যদি কাযে লাগে, পুঁজি-পাটা হয় ত জুটতে পারে। আর বাঁচতে যদি চায় ছোকরারা, জুটিয়ে তা নিতেই হবে। তবে আগে চাই, মরিয়া হয়ে কাযে লাগা।"

"বড় শক্ত, ঘোষ মশাই। যে শিক্ষা এরা পাচ্ছে—"

"ঐটেই ত হয়েছে সর্ব্বনাশের মূল, দাদা। ওতেই একেবারে দফা সেরে দিচ্ছে গোড়া থেকে। তবে আছে, এমন ছোকরাও আছে—চাকরী খুঁজে একেবারে হয়রাণ হয়ে পড়েছে সহরে আর দু'বেলা দু'টো ভাতও জুটছে না—পুঁজিপাটা কিছু পেলে হয় ত এসে বস্‌তে পারে। কিন্তু সেটা জুটিয়ে নেবার ক্ষমতা নেই; অন্ধি-সন্ধিও বোঝে না কিছু—"

"আচ্ছা, আপনাদের এই বাবুরা একটা ব্যাঙ্ক করতে পারেন না এখানে? ছোকরাদের এনে বসাবেন, টাকা দাদন দেবেন, কায নিজেরা কেউ দেখে করাবেন, যাতে টাকাটা না মারা যায়। তার পর ক্রমে আয় থেকে শোধ ক'রে নেবেন। ঠিক কড়া নিয়মে যারা কায ক'রবে, তাদের রাখবেন, যারা করবে না, তাদের সরিয়ে দেবেন—"

সুখময় বাবু কহিলেন, "সেটা করতে পারলে সুবিধে হয় ত একটা হ'ত। একবার তুলেছিলামও কথাটা। কিন্তু টাকা সব জমীতেই ঢেলেছেন। নতুন ক'রে আবার তুলতে হবে। সেটা শক্তও বটে, আর ভরসাও বড় পান না। একটু ভড়কেই বরং গেছেন—যে টাকাগুলো ঢেলেছেন, তাই বা সব শেষে মারা যায়! তার পর ব্যাঙ্কই একটা কেবল করলে ত হবে না। তুমি যেমন বল্লে, ঐ নিয়মে কড়া পাহারায় ছোকরাদের কায করানও চাই—নইলে হাজার হ'লেও একেবারে আনাড়ী ত সব? মতলব কিছু খারাপ না থাকলেও বেহিসেবেই দাদনের টাকা সব নষ্ট ক'রে ফেলবে। তখন?"

"হুঁ। কাযের একটা পাকা নিয়ম-কানুন ক'রে, কড়া ভাবে সেই নিয়ম ধ'রেই কায চালাতে হবে। টাকা যদি জুটত, ঘোষ মশাই—দেখতাম কিছু করা যায় কি না। যদি পারতাম—মনে হচ্ছে, ঘোষ মশাই, কাযের মত কায একটা হ'ত, জীবনটা আমার সার্থক হ'ত। এত দিন নিজের সুখ-দুঃখ নিয়েই কেবল ছিলাম। এ সব কথা মনে কখনও ওঠে নি—এ দিকে একটা কর্ত্তব্য থাকতে পারে, তাও ভাবি নি। যখন এখানে আসি—হঠাৎ একটা খেয়ালেই চ'লে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম, দেখি, কেমন লাগে। কতকটা—কতকটা—আর গত্যন্তর ছিল না ব'লেও এসেছিলাম। ভাল লাগবে কি না, থাকতে বরাবর পারব কি না, তাও বড় ভাবি নি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ঘোষ মশাই—থাকব, থাকতেই হবে। এসেছিলাম,

ভালই করেছিলাম। দেখব, প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে দেখব—গ'ড়ে তুলতে একটা কিছু পারি কি না, যাতে আপনাদের এই আশাপুর বাঙ্গালী জাতির মঙ্গল-সাধনায় একটা সিদ্ধপীঠ হয়ে ওঠে।"

চক্ষু-মুখ কিরণের অপূর্ব্ব এক দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কথাগুলির ধ্বনিতে যেন জাগ্রত কোনও দেবশক্তির বাণী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছিল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে সুখময় চাহিয়া ছিলেন,—মুগ্ধকর্ণে সেই ধ্বনির ঝঙ্কার শুনিতেছিলেন। সাশ্রুনয়নে কিরণকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। গদ্‌গদকণ্ঠে কহিলেন, "হবে, হবে দাদা। তোমাকে দিয়েই হবে, তুমিই পারবে। তোমার কথাগুলির ধ্বনিতে ঐ সিদ্ধির বাণীই আমি কাণে শুনলাম, চোখ-মুখের দীপ্তিতে সিদ্ধির মূর্ত্তিই আমার চোখে ফুটে উঠল।"

হঠাৎ হাসিয়া কিরণ কহিল, "অত বড় ভরসাও কিছু করবেন না, ঘোষ মশাই। আমি—আমি লোক যে বড় দরের—ভাল একটা লোক কেউ, তা নই। আবার অতি খেয়ালীও বটে। তবে এই যে খেয়ালটা মাথায় এল—আশীর্ব্বাদ করুন, সেটা পাকা একটা সঙ্কল্পেই যেন দাঁড়ায়। যদি দাঁড়ায়—হয় ত-হয় ত কায কিছু এগোতে পারব। আর টাকা—আগে ভাবিনি, ঘোষ মশাই। যদি ভাবতাম—হয় ত—হয় ত—একটা ব্যাঙ্ক সুরু করবার মত কিছু যোগাড় ক'রে আনতেও পারতাম।"

"সঙ্কল্প তোমার পাকা হ'ক—হ'ক কি, হয়েছে। চেষ্টা কর, এখনও পারবে। কাযের মত লোক যদি কাযে লাগে, টাকার অভাবে কায আটকে থাকে না, দাদা।"

৫

দুইটি যুবক তখন এদিকে আসিতেছিল। চাহিয়া দেখিয়া সুখময় কহিলেন, "ও কারা আসছে? খাসা ছেলে দুটি। হঠাৎ এ সময়ে—দেখ, তোমার মনের ডাকে আশাপুরের বাস্তুদেবতাই এদের এখানে টেনে আনলেন কি না।"

"ডাকটা যদি উঠেই থাকে, এই মুহূর্ত্তেই উঠল, কিন্তু ওরা এসে পৌঁছেছে তার অনেক আগে।"

"ডাকটা—টের পাও নি দাদা, তোমার মনের তলায় অনেক আগে থেকেই সুড়সুড় করছিল। এখন কেবল ফুটে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে অমনি—দেখ, ওরা কি বলে।"

যুবক দুইটি কাছে আসিয়া নমস্কার করিল, প্রতিনমস্কারে হাসিয়া ঘোষ মহাশয় তাহাদের স্বাগত অভিবাদন করিলেন; কাছেই আদর করিয়া বসাইলেন। একটি যুবক জিজ্ঞাসা করিল, "আপনিই এখানকার ম্যানেজার বাবু?"

"হাঁ, তোমরা—তা ছেলেমানুষ, তোমরা বলছি, কিছু মনে করো না—ঐ ভার-ভারিক্কী 'আপনি' 'মশাই' তোমাদের মত ছেলেদের কাছে আমার বড় আসেই না। তা তোমরা কি মনে ক'রে, দাদা?"

"জমী বিলি হচ্ছে এখানে, তাই একবার দেখতে এলাম।"

"কেবল দেখতেই এলে? তা দেখ, চার দিকে চোখ যদ্দূর যায়—সব এই কোম্পানীর জমী। দেখতে ত অনেকেই আসে। তা—তোমরা কি কেবল দেখবে, না নেবার মতলবও আছে?"

"পারলে কেন নেব না? নইলে কেবল দেখতেই কি এতদূর এসেছি? আর পথটাও ত এমন আরামের কিছু নয় যে, সখ ক'রে কেউ বেড়াতে আসবে। "ইষ্টেশন থেকে যে নদী পার হয়ে এলাম—একটা ঝড়-ঝাপটা উঠলে ঐ মাঝ-নদীতে এই নোণা জলেই সব সাবাড় হয়ে যেত। আঁতুড়ঘরে যে নুণ খাইয়ে কেউ মারেনি—সেটা এইখানেই হ'ত।" বলিয়া যুবকটি একটু হাসিল।

সুখময় ও কিরণ দুই জনেই হাসিয়া উঠিলেন। সুখময় শেষে কহিলেন, "তা বেশ। কথা-বার্ত্তায় ত বেশ চোস্ত-দোরস্ত দেখতে পাচ্ছি। তোমাদের নাম কি, দাদা?"

"আমার নাম বিমলাংশু রায়।"

দ্বিতীয় যুবক বলিল, "আর আমার নাম সুপ্রকাশ লাহিড়ী।"

"নাম দুটি ত খাসা সহুরে রোমান্টিক নাম। তা—"

বিমলাংশু কহিল, "আজ্ঞে, নামগুলো লোকের মা-বাপরাই রাখেন। আর যখন রাখেন, তখন ছেলেদের ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গে খাপ খাবে কি না, এটা তাঁরা বড় ভাবেন না।"

"অন্ততঃ আশা কিছু করেন বই কি? তা তোমরা কোত্থেকে আসছ?"

"আপাততঃ কলকেতা থেকে। তবে বাড়ী আমার যশোরে। আর এঁর বাড়ী রাজসাহী। দুজনে আমরা বন্ধু। এক মেসে থাকতাম।"

"করতে কি? চাকরীর উমেদারী?"

"হাঁ, তা ছাড়া আর করবারই বা কি আছে? দুজনেই আমরা গ্রাজুয়েট। আমার এই বন্ধু তার ওপর আবার এম এ পাশও করেছেন। উমেদারীটা বাজে কায। বেকারের দলই পুষ্ট ক'রে আছি। নাম দুটো যেমনই হ'ক্, রোমান্স যা ছিল, সব উড়ে গেছে। সহরেও আর অন্ন জুটছে না।"

"নামের কথা বলছ দাদা, তা নামটা আমারও সুখময়—"

"হাঁ, সেটা জানি। তবে সুখে কতটা এখানে আছেন, বলতে পারিনে।"

"তা এই জনশূন্য বাদা অঞ্চলে আছি—হাঁ, নিজের পক্ষে এক রকম সুখেই বটে। আর আমার পুরানো এই দাদাটির নামও কিরণ। ভরসা করছি, এই নির্জ্জন আঁধারেও খাসা একটা কিরণ ইনি ফুটিয়ে তুলতে পারবেন।"

"নমস্কার মশাই।"

"নমস্কার। বয়োজ্যেষ্ঠ আমি, আশীর্ব্বাদ করছি, তোমাদের আসাটা এখানে সার্থক হ'ক।"

করযোড়ে বিমলাংশু কহিল, "ভগবানের দয়া যদি হয়—"

সুখময় কহিলেন, "সে দয়াটা আদায় ক'রে নিতে হবে, দাদা। বি এ এম এ পাশ ক'রেছ, ইংরাজী বইতে ত প'ড়েছ, Heaven helps those who help themselves."

"পড়েছি ত। কিন্তু নিজেদের help করবার মত ক্ষমতা যদি থাকে, তবে ত।"

"কেন থাকবে না? থাকতেই হবে, যদি বাঁচতে চাও। ভগবানের দয়া? সব মানুষের কর্ম্মেরই ফল, দাদা। দয়া বল, আর দণ্ড বল, সব কর্ম্মফল। যেমনি করবে, তেমনি পাবে। ঐ যে ইংরেজি কথাটা Heaven helps those who help themselves—ওটাও কর্ম্মফলেরই কথা, দাদা। তা পারবে ত?"

"খাটতে পারব—যদি জমী কিছু পাই। দুঃখু ঢের পেয়েছি। আর যেন্না অপমান—সে কথা আর কি বলব, মশাই। মরীচিকার

মোহে ঘুরে হয়রানও হয়ে পড়েছি সেজন্য—ঘুরতে আর পা ওঠে না, মন চলে না।"

"হঁ—তবে এখানে এটা মরীচিকা নয়। জল আছে, ফল আছে, ছায়াও আছে ; তবে দূরে—হয় ত কিছু বেশীই দূরে!"

বিমল কহিল, "দূরে হ'লেও পাব, এ আশাটা ধরতে পারলে খাটতে পারব। খাটতে মনটাও আশায় চাঙ্গা হয়ে উঠবে। দু-তিনটে বছর কেবল পেটে খেয়েও কাষ করতে পারি, রোজগারের দরকার তেমন হবে না। আমার কাকা আছেন, ওর দাদা আছেন, সংসারটা চালিয়ে নিতে কোনও মতে পারবেন। কিন্তু জমীর কায চালাব, ছ'মাস চার মাস খাব, সে পুঁজিপাটাও কিছু নেই।"

"খাবারটা ত চার ছ'মাস কি বছরটাক চালিয়েও নেওয়া যেতে পারে। আমি আছি, আমার কিরণদাটি রয়েছেন, সেটা চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে, যদি সত্যি কাযের ছেলেই তোমরা হও।"

"কিন্তু কাযটা চালাব কি দিয়ে?"

"তার কি কোনও সম্বল নেই? তোমার কাকা আর কি নাম ব'লে? হাঁ সু—সু—"

"সুপ্রকাশ—"

"হাঁ, এই সুপ্রকাশের দাদা—"

"না, তাঁদের সে সামর্থ্য কিছু নেই।"

"কিন্তু জমী দেখতে এসেছিলে ত কেবে ব'লে?"

"দেখতে এসেছিলাম—দেখতেও ত আশে হয়। একটা কথা-বার্ত্তা ঠিক ক'রেও যাব ভেবেছিলাম। তার পর গিয়ে একবার চেষ্টা ক'রে দেখতাম, সুবিধে হ'ত আসতাম। আর না হ'ত—"

"কি করতে তা হ'লে?"

"অকূল পাথারে যারা ভেসেছে, তাদের আর করবার কি আছে? কাঠ-কুটো যখন যা পায়, ধ'রে উঠবার চেষ্টা করে। না পারে, ভেসেই চলে, ভাসতে ভাসতে শেষে যেখানে হয় এক জায়গায় ডুববে—ডুবতেই তাকে হবে!"

বলিতে বলিতে গভীর নিশ্বাস বিমলের ত্যাগ করিল ; চক্ষু দুটিও অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রকাশ, সুখময়, কিরণ—সকলেই চক্ষু মুছিলেন।

কিরণ কহিল, "একটা কাষ করবে, ভাই?"

"কি বলুন?"

"আমি কিছু জমী নিয়েছি, ত'পো বিঘে। পুঁজিও সংসামান্য কিছু আছে। এস না, একসঙ্গেই কাষ করা যাক। যতখানি জমীতে যখন কাষ হবে, ধর, তার অর্দ্ধেক সেটা আমার, আর বাকী অর্দ্ধেক সমানভাগে তোমাদের দু'জনকার। খাওয়া-দাওয়াটা—একাই আমি আছি—একসঙ্গেই চলতে পারবে। তার পর—দেখি, যদি—যা ভাবছি—গ'ড়ে কিছু তোলা যায়—টাকার ব্যবস্থা একটা কিছু হয়, তখন যেমন দরকার, আলাদা জমী নিয়ে আলাদাই কাষ করবে। আপাততঃ দু'টি ভাই হয়ে আমার সঙ্গেই এসে তোমরা থাক। আমারও বল বাড়বে! কি বল?"

"দাদা! দাদা!"

বিমল ও সুপ্রকাশ দুই জনেই উঠিয়া কিরণকে জড়াইয়া ধরিল। তার পর উভয়ে সুখময়কে প্রণাম করিতে অগ্রসর হইল। সুখময় লাফ দিয়া উঠিলেন, "আরে, কর কি, কর কি, দাদা! ওটি ত বামুনের ছেলে—আর আমি জেতে কায়স্থ—"

"আমিও কায়েতের ছেলে।"

"হাঁ, তোমার প্রণামটা তবে নিতে পারি।"

সুপ্রকাশ কহিল, "কিন্তু আপনি যে আমাদের দাদারও দাদা, গুরুজন।"

"তা, দাদার দাদা কি আরও দাদা—যত বড় গুরুজনই বল জাত-বিচেরটা মানি লোকের মানুষ। গলায় যার হয় পৈতেটাও আছে। দেবতার জাত বামুন তুমি, প্রণামটা নিতে পারছি নি। বরং আমাকেই প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলো নিতে হয়। দেও, দেও দেবতা—তাই একটু দেও।"

হাসিয়া সুপ্রকাশ সা'রয়া গিয়া কহিল, "না, না, দোহাই আপনার, অতটা আর করবেন না। আশীর্ব্বাদ করুন, দাদা পেলাম, যেন দাদার ভাই হয়ে কাছে থাকতে পারি। পরে আর কিছু হ'ক না হ'ক, এতেই কৃতার্থ হয়ে থাকব।"

"তা পারবে থাক, থাকবে। পরে আর কিছু তাও হবে, কেন হবে না? ঐ দাদাটি তোমাদের যেমন তেমন দাদা নন। তোমাদের ত কথাই নাই, আমাকেও বড় আশা দিয়ে চাঙ্গা ক'রে তুলেছেন। হবে হবে—অনেক কিছুই ওঁকে দিয়ে হবে। আর তোমরাও দুটিতে এসে জুটলে ঠিক সুসময়ে। সব হবে। আশাপুরে সোণা ফলবে। সোণার বাঙ্গালা আবার এই আবাদে মাথা তুলে উঠবে!"

কিরণ কহিল, "তা হ'লে তোমরা কি থেকেই যাবে একেবারে, না, ফিরে একবার কলকেতায় কি দেশে যেতে হবে?"

বিমল উত্তর করিল, "না, না, ফিরে আর কেন যাব? কাল থেকেই কাযে লেগে যাই। কি বল, সুপ্রকাশ?"

"হাঁ। গিয়ে আর কি হবে? যা পেলাম, মাথায় তুলে এখুনি নেব।"

"বেশ, সন্ধ্যে হয়ে এল। এস তবে আমার সঙ্গে—তোমাদের নতুন বাড়ীটিতে। আসি তবে ঘোষ মশাই, আজকের মত।"

"এস দাদা। চল, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাই, পৌঁছে দিয়ে আসি। সাধুসঙ্গ যতক্ষণ পাওয়া যায়, সেই লাভ।"

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ (এম-এ)।

সে কালের আরজি

মামলা মোকদ্দমা প্রাচীন যুগ হইতেই চলিতেছে। আজকাল যে সকল আইন প্রচলিত, তাহার কতক কতক আমরা প্রয়োজনের খাতিরে জানি, কিন্তু সে কালের আইন পড়িলে আমাদের কেবল কৌতূহল নিবৃত্ত হইবে, তাহা নহে—অতীতের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হইব।

প্রাচীনরা মোকদ্দমাকে ব্যবহার বলিতেন। হারীত বলিয়াছেন, ব্যবহারের একটা শিকড়, দুইটি উত্থান, দুইটি স্কন্ধ ও দুইটি ফল। কাত্যায়নে ইহার ব্যাখ্যা পাই :—

সাধ্যবাদস্য মূলং স্যাদ্বাদিনা যন্নিবেদিতম্।
দেয়াপ্রদানং হিংসা চেত্যুত্থানদ্বয়মুচ্যতে॥
ধর্মশাস্ত্রার্থশাস্ত্রে তু স্কন্ধদ্বয়মুদাহৃতম্।
জয়শ্চৈবাবসায়শ্চৈব দ্বে ফলে সমুদাহৃতে॥

বাদীর নিবেদনই ব্যবহারের মূল, প্রার্থিত বস্তুর প্রদান ও হিংসা ইহার দুইটি উত্থান, ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র ইহার দুইটি স্কন্ধ, জয় ও পরাজয় ইহার দুইটি ফল। দুইটি উত্থান হইতে বুঝি, তখন ফৌজদারী এবং দেওয়ানী মামলার তফাৎ ছিল। ফৌজদারী মামলায় শাস্তি দেওয়া হইত এবং দেওয়ানী মামলায় প্রার্থিত বস্তুর প্রদান হইত।

ব্যবহারের চারিভাগ—পূর্ব্বপক্ষ উত্তরপক্ষ, প্রত্যাকলিত ও ক্রিয়াপাদ। আজকালকার ভাষায় প্রথম দুটি আরজি ও জবাব। জবাব দেওয়ার পর কে প্রথম সাক্ষী প্রমাণ দিবে, তাহার নির্ণয়কে প্রত্যাকলিত বলিত। সাক্ষী ও প্রমাণ দেওয়াকে ক্রিয়াপাদও বলিত। কাত্যায়ন এইরূপ বলিয়াছেন। বৃহস্পতির ভাগ অন্য প্রকার—তাঁহার মতে ব্যবহারের চার পা—প্রথম পূর্ব্বপক্ষ, দ্বিতীয় উত্তরপক্ষ, তৃতীয় ক্রিয়াপাদ, চতুর্থ নির্ণয়। এই চারিপাদ ব্যবহার যখন দোতরফা বিচার হইত, তখন হইত। এখনকার মত তখনও স্বীকৃতি এবং সন্ধিতে নির্ণয় হইত। তাহার সম্বন্ধে বৃহস্পতি বলেন :—

মিথ্যোক্তৌ চ চতুষ্পাৎ স্যাৎ প্রত্যবস্কন্দনে তথা।
প্রাঙ্‌ন্যায়ে চ স বিজ্ঞেয়ো দ্বিপাৎ সংপ্রতিপত্তিষু॥

যখন বিবাদী অস্বীকার জবাব দেয়, কিংবা স্বীকার করিয়া দায়িত্ব না থাকার কারণ উত্থাপন করে, তখন চারিপাদ ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। স্বীকৃতি কিংবা পূর্ব্বে বিচার হইয়া গিয়াছে বলিয়া জবাব দিলে ব্যবহারকে দ্বিপাৎ বলা হইত। প্রথম পাদকে ভাষাপাদও বলা হইত। ভাষাপাদ আগে, তার পর উত্তর, উত্তর দেওয়া হইলে ক্রিয়াপাদ এবং ক্রিয়াশেষে নির্ণয়।

কেহ আরজি দাখিল করিলে অপরকে সমন দেওয়া হইত। বিবাদী আসিলে বাদীর অভিযোগ বিবাদীর সম্মুখে লিখিয়া লওয়া হইত। ইহাকে প্রতিজ্ঞাপাদ বা ভাষাপাদ বলিত।

আরজিতে কি কি লিখিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে কাত্যায়ন সুন্দর বিধি দিয়াছেন। প্রয়োজন অনুসারে কাত্যায়নের প্রদর্শিত বিষয়গুলি নিবেশিত করিতে হইত।

নিবেশ্য কালং বর্ষং চ মাসং পক্ষং তিথিং তথা।
বেলাং প্রদেশং বিষয়ং স্থানং জাত্যাকৃতী বয়ঃ॥
সাধ্যদ্রব্যপ্রমাণং চ সংখ্যাং নাম তথাত্মনঃ।
রাজ্ঞাং চ ক্রমশো নাম নিবাসং সাধ্যনাম চ॥
ক্রমাৎ পিতৄণাং নামানি পীড়ামাহর্তৃদায়কৌ।
ক্ষমালিঙ্গানি চান্যানি পক্ষং সঙ্কীর্ত্য কল্পয়েৎ॥

পক্ষ লিখিবার সময় নিম্নলিখিত ও অন্যান্য বিষয় যথাযথ সন্নিবেশিত করিবে—কাল, বৎসর, মাস, পক্ষ, তিথি ও বেলা; প্রদেশ, বিষয় ও স্থান; জাতি, আকৃতি ও বয়স; সাধ্যদ্রব্যের পরিমাণ ও সংখ্যা, বাদীর নাম, রাজার নাম, নিবাস, সাধ্যনাম, পিতৃনাম, পীড়া, আগমকর্ত্তা, দাতা, ক্ষমা করিবার কারণ ইত্যাদি।

বৃহস্পতি বলেন :—

নিরবদ্যং সপ্রতিজ্ঞং প্রমাণাগমসংযুতম্।
দ্রব্যসংখ্যোদয়ং পীড়াং ক্ষমালিঙ্গং চ লেখয়েৎ॥
স্বল্পাক্ষরঃ প্রভূতার্থো নিঃসন্দিগ্ধো নিরাকুলঃ।
যুক্তো বিরোধিকরণৈর্বিরোধিপ্রতিষেধকঃ।
এবমাদিগুণান্ সম্যগালোচ্য চ সুনিশ্চিতঃ।
পক্ষঃ কৃতঃ সমাদেয়ঃ পক্ষাভাসস্ততোঽন্যথা॥

আরজিতে প্রতিজ্ঞা থাকিত বলিয়া তাহার অপর নাম ছিল প্রতিজ্ঞা। নির্ভুল ও নির্দোষ করিয়া প্রতিজ্ঞা লিখিতে হইবে—তাহাতে বর্ত্তমানের সত্যপাঠের মত প্রতিজ্ঞা থাকিত। প্রমাণ, আগম, দ্রব্য ও সংখ্যা, উদয়, পীড়া, ক্ষমাকারণ প্রভৃতি বিস্তারিত লিখিতে হইত।

কাদম্বরী দেখিয়া আমরা মনে করি, সে কালে মানুষের সময় ছিল যথেষ্ট, তাই অবসরবহুল জীবনে বাহুল্য ও অত্যুক্তির প্রভাব ছিল। কিন্তু বৃহস্পতি বলিতেছেন—পক্ষ স্বল্পাক্ষরে অর্থভূয়িষ্ঠ করিয়া লিখিবে। ভাষা সুস্পষ্ট ও বিশদ হইবে, যাহাতে বর্ণনীয় বিষয়ে কোনও সংশয় বা আকুলতা না থাকে, আরজির বর্ণনা বিরোধী কর্ত্তৃক উত্থাপিত বিষয়ের প্রতিষেধক যাহাতে হয়, সেইরূপভাবে পর্য্যাপ্ত করিয়া লিখিবে। মোকদ্দমার কারণপরম্পরাও সুস্পষ্টভাবে লিখিবে। এই সমস্ত গুণযুক্ত সুনিশ্চিত পক্ষই গ্রহণীয়—এই সমস্ত গুণ না থাকিলে পক্ষ পক্ষাভাসদোষে দুষ্ট হইত।

অন্যত্র এ বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে জানি যে, ভাষাকে অর্থাৎ আরজিকে অর্থপূর্ণ, ধর্ম্মযুক্ত অর্থাৎ অল্পাক্ষর, প্রভূতার্থ প্রভৃতি পক্ষধর্ম্মযুক্ত, পরিপূর্ণ, অসন্দিগ্ধ, সাধ্যবিষয়যুক্ত, বাচকপদ-যোজিত এবং পূর্ব্বকথিত অর্থের অবিরোধী করিয়া প্রস্তুত করিবার বিধান ছিল। লোকপ্রসিদ্ধ বস্তু লইয়াই পক্ষ রচিত হইবে—

আকাশকুসুমের দাবী করিলে চলিবে না, পুররাষ্ট্রবিধির অবিরুদ্ধভাবে নিশ্চিত সাধনক্ষম সংক্ষিপ্ত, নিখিলার্থসম্বলিত করিয়া আরজি লিখিতে হইত। আরজিতে দেশ বা কালের যাহাতে বিরোধী না হয়,—যথা শরৎকালীন আম্রফলের প্রসঙ্গ না থাকে, সে বিষয়ে লক্ষ্য করিবার উপদেশ ছিল।

কাত্যায়ন স্থাবরবিষয়ে বিবাদে দশটি জিনিষ দিবার কথা বলিয়াছেন :—

দেশশ্চৈব তথা স্থানং সন্নিবেশস্তথৈব চ।
জাতিঃ সংজ্ঞা নিবাসশ্চ প্রমাণং ক্ষেত্রনাম চ॥
পিতৃপৈতামহশ্চৈব পূর্ব্বরাজানুকীর্ত্তনম্।
স্থাবরেষু বিবাদেষু দশৈতানি নিবেশয়েৎ॥

স্থাবর সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হইলে, দেশ, স্থান, যথার্থ সন্নিবেশ, অর্থাৎ চৌহদ্দী, পক্ষদ্বয়ের জাতি, নাম, নিবাস, পরিমাণ, ক্ষেত্রের পরিচয়, পক্ষগণ ও রাজার তিন পুরুষের নাম এই দশটি বিষয় উল্লেখ করিবে। কারণ, স্থাবরে এইগুলি জানা প্রয়োজনীয়।

যে সমস্ত পক্ষ এই সব নিয়ম মানিত না, তাহা খারিজ হইত। যে প্রতিজ্ঞায় দেশ, কাল, দ্রব্য ও সংখ্যা ও ক্রিয়া ও প্রমাণের কথা লেখা থাকিত না, তাহা বর্জ্জন করা হইত।

কাত্যায়ন বলেন :—

অপ্রসিদ্ধং নিরাবাধং নিরর্থং নিষ্প্রয়োজনম্।
অসাধ্যং বা বিরুদ্ধং বা পক্ষং রাজা বিবর্জ্জয়েৎ॥

যাহা লোকসমাজে অপ্রচলিত, তাহাকে অপ্রসিদ্ধ কহে—যেমন সহস্রপল থালা—লোকে কখনও এত ভারি থালা তৈয়ার করে না।—যাহা নিরাকরণ করা যায় না, তাহাকে নিরাবাধ বলে—যেমন রাম আমার ঘরের আলোকে পড়ে, যাহাতে স্বল্পাপরাধ হয় এবং যাহার মূল্য অতি সামান্য, তাহা লইয়া বিবাদ নিরর্থক, যেমন রাম আমাকে দেখিয়া বলিয়াছে—শ্যাম আমার গাছের পড়া পাতা লইয়াছে।

যেখানে পক্ষের কোনই ক্ষতি হয় না, সেখানে বিসংবাদ নিষ্প্রয়োজন, যেমন যজ্ঞদত্ত আমার বাড়ীর কাছে উচ্চৈঃস্বরে পড়ে, যাহা করা অসম্ভব, তাহাকে অসাধ্য বলে, অমুক আমাকে শশকের শৃঙ্গের ধনুঃ দিতে চাহিয়াছিল বলিয়া নালিশ চলে না। বিরুদ্ধ—বোবা লোকটি আমাকে গালি দিয়াছে—ইহা স্বতোবিরুদ্ধ। বিরুদ্ধ কথার অপর অর্থ করা হইয়াছে। যাহা পুর ও রাষ্ট্রের ক্ষতিকর, তাহা বিরুদ্ধ পক্ষ।

নারদ বলেন :—

অন্যার্থমর্থহীনং চ প্রমাণাগমবর্জিতম্।
লেখ্যহীনাধিকং ভ্রষ্টং ভাষাদোষা উদাহৃতাঃ॥

সাধারণের অর্থে বাদী যদি কেবলমাত্র আপনার দাবী উত্থাপন করিয়া ব্যবহার করে, তবে অন্যার্থ দোষ হয়, কিম্বা অনিযুক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক আরজি স্থাপিত হইলেও অন্যার্থ বলা হইত। এই সব স্থলে আরজি খারিজ হইত। যখন উক্তির সহিত সত্যের ভিন্নতা হইত, তখন আরজিকে অর্থহীন বলা হইত। যখন ক্ষেত্রগৃহাদির সীমা ও বৃত্তান্ত কিম্বা অন্য দ্রব্যের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইত না, তখন সেই ভাষাকে প্রমাণবর্জ্জিত বলা হইত, যেখানে প্রার্থিত সম্পত্তি কি প্রকারে বাদীর স্বত্বাধীন হইয়াছে, তাহা বলা হইত না, তখন তাহাকে অনাগম বলা হইল। প্রমাণ ও আগমহীন আরজি অগ্রাহ্য হইত। বর্ষ, মাস, পক্ষ, তিথি, বার যেখানে লেখা হইত না, তাহাকে লেখ্যহীন বলা হইত, অপর পক্ষ আসিবার পূর্ব্বে যদি বাদী সাক্ষী মানিত, তাহা হইলে অধিক হইত, যখন আরজি সন্দিগ্ধভাবে লেখা হইত, তখন তাহাকে ভ্রষ্ট বলা হইত। লেখ্যহীনা, অধিকা এবং ভ্রষ্টা ভাষা পরিত্যক্ত হইত।

নারদ পুনরায় বলিতেছেন :—

ভিন্নক্রমো ব্যুৎক্রমার্থ প্রকীর্ণার্থো নিরর্থকঃ।
অতীতকালো দ্বিষ্টশ্চ পক্ষোঽনাদেয় ইষ্যতে॥

প্রত্যেক শব্দই পারিভাষিক—তজ্জন্য তাহার কয়েকটির ব্যাখ্যা নিজেই দিয়াছেন :—

যথাস্থাননিবেশেন নৈব পক্ষার্থকল্পনা।
শক্যতে ন স পক্ষস্তু ভিন্নক্রম উদাহৃতঃ॥
মূলমর্থং পরিত্যজ্য তদ্‌গুণো যত্র লিখ্যতে।
নিরর্থকঃ স বৈ পক্ষো ভূতসাধনবর্জ্জিতঃ॥
ভূতকালমতিক্রান্তং দ্রব্যং যত্র বিলিখ্যতে।
অতীতকালো পক্ষোঽসৌ প্রমাণে সত্যপি স্মৃতঃ॥
যস্মিন্ পক্ষে দ্বিধা স্বাম্যং ভিন্নকালবিমর্শনম্।
বিমৃশ্যতে ক্রিয়াভেদাৎ স পক্ষো দ্বিষ্ট উচ্যতে॥

যে পক্ষ যথাযথ ক্রম না রাখিয়া উল্টা-পাল্টা করিয়া লেখা হয়, তাহাকে ভিন্নক্রম বলা হয়, যে পক্ষের অর্থ প্রতিপাদিত বস্তুর উল্টা, তাহাকে ব্যুৎক্রমার্থ বলা হয়, যাহার অর্থ এলোমেলো—যাহা হইতে বক্তব্য বুঝা দায়, তাহাকে প্রকীর্ণার্থ বলে, যাহাতে সম্পত্তির বর্ণনা না করিয়া, তাহার গুণেরই কেবল বর্ণনা আছে, তাহাকে নিরর্থক বলা হয়, যে দাবী তামাদি হইয়া গিয়াছে, সাক্ষী প্রমাণ থাকিলেও তাহাকে অতীতকাল বলা যায়, যে পক্ষে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন দাবী, ভিন্নকালে সংঘটিত দুইটি দাবী একত্র করা হয় ও যাহার প্রমাণ ভিন্ন ভিন্ন, তাহাকে দ্বিষ্ট বলা হয়। উপরি-উক্ত পক্ষগুলি গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত না।

নারদ আরও বলেন :—

অন্যাক্ষরনিবেশেন অন্যার্থগমনেন চ।
আকুলং তু ভবেল্লেখ্যং ক্রিয়া চৈবাকুলা ভবেৎ॥
উপেক্ষা যত্র সাধ্যস্য বিংশতির্বর্ষ বা সমাঃ।
শক্তেনাপি কৃতা যদি তস্য পক্ষো মৃষা ভবেৎ॥
সাহসং সহ সাধ্যেন নির্দ্দিষ্টং যত্র লেখয়েৎ।
উক্তিক্রমবিহীনত্বাৎ সোঽপি পক্ষো ন সিধ্যতি॥

যেখানে পক্ষে সাধ্যপ্রয়োজনহীন অন্যাক্ষর নিবেশিত হইত, কিম্বা যেখানে বাদী অনিযুক্ত হইয়া অপরের অর্থ দাবী করিত, তখন পক্ষকে অস্থির বিবেচনা করা হইত এবং সে ক্রিয়া অগ্রাহ্য হইত। যখন সাধ্যকে বিশ বছর উপেক্ষা করা হইত, তখন তাহার জন্য নালিশ চলে না, একসঙ্গে সাহস ও সাধ্যের জন্য নালিশ চলিবে না। একসঙ্গে ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলা মিশানো চলিত না—কারণ, তাহাতে উক্তিক্রমের বিশৃঙ্খলা হইবার সম্ভাবনা ছিল।

হারীতও বলেন—সাধনা করিতে উৎসুক সাধ্য যদি দ্বিধা হয়, যাহার প্রমাণ ভিন্ন ভিন্ন, কিম্বা আবেদিত সাধ্য যেখানে ভিন্ন ভিন্ন, সেখানে পক্ষ মিথ্যা হইত। আজকাল ইহাকে misjoinder of causes of action বলে। আজকালও আরজী misjoinder of claims দোষে দূষিত হইলে পরিত্যক্ত হয়। কাত্যায়নে পাই—অনেকবাদসংকীর্ণ পক্ষ সিদ্ধ হইবে না। ইহার ব্যাখ্যা লইয়া কিছু বিরোধ দেখা যায়।

অপরার্ক বলেন—একই আরজিতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় লইয়া মামলা করা চলে না; তাহা হইলে অনেকবাদসংকীর্ণতারূপদোষ হয়। মিতাক্ষরা এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। বিজ্ঞানেশ্বর বলেন—একই পক্ষে বিভিন্ন বিষয় লইয়াও মামলা করা চলে—তবে বিচারকালে বিভিন্ন বাদকে পৃথক্ রাখিয়া বিচার করিবে।

স্মৃতিচন্দ্রিকায় ভৃগুর বচনে পাই:—

উৎকৃষ্টং যত্র হীনেন কল্পং বাহপোকমেকতঃ।
তত্র পক্ষো ন সাধ্যঃ স্যাচ্ছাস্ত্রশিষ্টবিবর্জ্জিতঃ॥
বিরুদ্ধশ্চাবিরুদ্ধশ্চ দ্বাবপার্থৌ নিবেশিতৌ।
একস্মিন্ যত্র দৃশ্যেত তং পক্ষং দূরতস্ত্যজেৎ॥

উৎকৃষ্ট বস্তু লইয়া যখন হীনবাদী দাবী করে, কিংবা গণের জিনিষ একা একাকীই দাবী করে, কিংবা যেখানে বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ দুইই মিশেলি হয়, সে পক্ষ ত্যাজ্য।

পিতামহও বলেন, পরস্পর বিরুদ্ধ বা বিরুদ্ধপদসংকীর্ণ আরজি সিদ্ধ হইবে না। বাদীকে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে হইত যে, তাহার দাবী ন্যায্য—বিবাদী অন্যায় পূর্ব্বক তাহা দিতেছে না।

একটি প্রাচীন বচন আছে:—

আগমঃ পরিভাগশ্চ ব্যুচ্ছিত্তিঃ প্রার্থনা তথা।
এতচ্চতুষ্টয়ং প্রাহু র্ভাবাদোষাত্মকারণাঃ॥

আরজির চারিটি গুণ—আগম, পরিভাগ—ব্যুচ্ছিত্তি ও প্রার্থনা। সাধ্যের ক্রয়গ্রহাদি কারণ নিমিত্ত স্বত্বকে আগম বলে, দখলকে পরিভাগ বলে, দেশবিপ্লবাদি কারণে ভোগবিচ্ছিন্নতাকে ব্যুচ্ছিত্তি বলে, যুক্তির দ্বারা ভোগাগম কীর্ত্তনকে প্রার্থনা বলে। যে পক্ষে এই চারিটি থাকে না, তাহাতে ভাষাদোষ আছে বলিতে হয়।

এই জন্য তখনকার দিনে রীতি ছিল—পক্ষ প্রথমে ভূমিতে বা ফলকে লিখিয়া, পরে সংশোধন করিয়া পত্রে নিবিষ্ট করা হইত। যদি কিছু বেশী লেখা হইত, তাহা ছাঁটা হইত, কিছু পড়িয়া গেলে তাহা পূরণ করা হইত। আরজি যদি ব্যবহারধর্ম্মবিরুদ্ধ হয়, তবে লেখা থাকিলেও তাহা বলবান্ বলিয়া বিবেচিত হয় না।

বৃহস্পতি বলেন—পক্ষ চার রকম।

শঙ্কাহভিযোগস্তথ্যং চ লব্ধেহর্থেহভ্যর্থনং তথা।
বৃত্তে বাদে পুনর্ন্যায়ঃ পক্ষো জ্ঞেয়শ্চতুর্ব্বিধঃ॥

বাদীর জিনিষ বিবাদী লইয়াছে, এই সন্দেহে যে নালিশ, তাহাকে শঙ্কা বলে, বিবাদীর নিকট চোরিত দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে, এই বলিয়া সুনির্দ্দিষ্ট যে অভিযোগ, তাহাকে তথ্য বলে, প্রাপ্য ধন বা সম্পত্তির দাবীকে অভ্যর্থন বলে এবং নিষ্পন্ন বাদের পুনর্বিচারের প্রার্থনাকে পুনর্ন্যায় বলে।

প্রত্যর্থী যতক্ষণ উত্তর না দেয়, ততক্ষণ বিবক্ষিত বস্তুর সরল প্রকাশের জন্য বাদী আরজি সংশোধন করিতে পারিত। যদি অর্থী ব্যাকুল হইয়া বক্তব্য বলিতে না পারিত, তাহাকে শান্ত হইবার জন্য সময় দিতে বৃহস্পতি বলিয়াছেন।

আরজি সম্যক্ সংশোধন করিয়া লেখা হইবার পর প্রত্যর্থী জবাব দিবার পর আর সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হইত না। উপযুক্ত হইলেও এরূপ সংশোধনে অনাস্থা হইবার সম্ভাবনা থাকায় তাহা অগ্রাহ্য করা হইত।

কিন্তু যাহাতে সত্য নির্দ্ধারণের অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য নিম্নোক্ত স্থলে সংশোধন করিতে দেওয়া হইত।

মোহাদ্বা যদি বা শাঠ্যাদ্যন্নোক্তং পূর্ব্ববাদিনা।
উত্তরাহন্তর্গতং বাপি তদ্গ্রাহ্যমুভয়োরপি॥

উত্তর দেওয়া শেষ হইলেও যদি মোহ বশতঃ বা শাঠ্যহেতু বাদী যাহা না বলিত, তাহা গ্রহণ করা হইত। এরূপ স্থলে প্রতিবাদীর সংশোধনও লওয়া হইত।

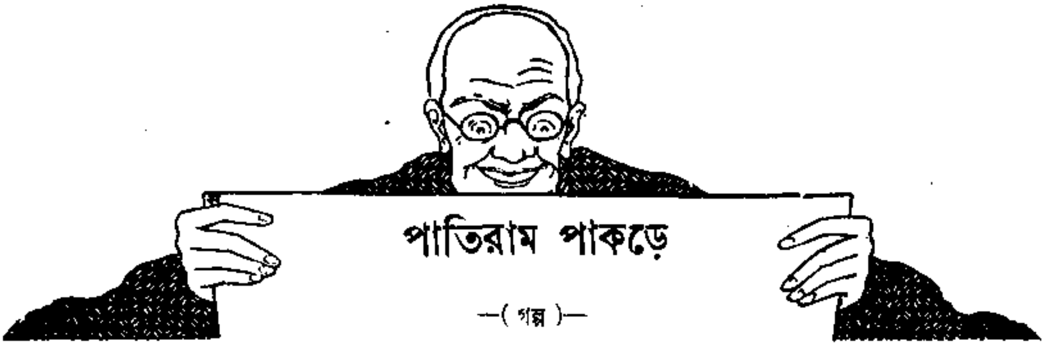
নারদ বলেন, একই লোক এক সময়ে বহুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারিবে না। গুরু শিষ্যের বিরুদ্ধে, পিতা পুত্রের বিরুদ্ধে, স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে, প্রভু ভৃত্যের বিরুদ্ধে, এবং ইহার বিপরীত স্থলে অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

অপরার্ক বলেন যে, বহুর বিরুদ্ধে সমকালিক অভিযোগ অগ্রাহ্য, পর পর অভিযোগে কোনও বাধা নাই।

উপরে আরজি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে দেখিতে পারি যে, প্রাচীন হিন্দুর সূক্ষ্ম ও কুশাগ্রবুদ্ধি ব্যবহার বিষয়েও সুপ্রযুক্ত হইয়াছিল। এই সমস্ত সুন্দর ও সুষ্ঠু বিধির অনেকগুলি বর্ত্তমান যুগের ব্যবহারাজীবগণও মনোযোগ করিয়া পড়িলে দেশের প্রভূত উপকার হইবে। আইন-আদালতের সহিত যাঁহাদের সাক্ষাৎ পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন যে, আমাদের আদালতে আরজিগুলি কিরূপ বিশৃঙ্খলভাবে রচিত হয়। নারদ ও কাত্যায়নের বচন হইতে আজকার দিনেও আমাদের অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে।

আরজি ব্যবহারের স্তম্ভ। তাহাকে সম্পূর্ণ ও শুদ্ধ করিবার জন্য প্রাচীনরা যে সমস্ত নিয়মাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা যে কোনও ব্যবহারজ্ঞ জাতির পক্ষে গৌরবজনক।

শ্রীমতিলাল দাশ (মুন্সেফ)।



পাতিরাম পাকড়ে

—(গল্প)—

দেবতার দুয়ারে ধরণা না দিয়া, পাড়াপ্রতিবাসীদের প্রচলিত বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া, নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া পাতিরাম পাকড়ে আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়া উঠিয়াছে! সহরের প্রান্তভাগে, নিকিরিপাড়ায় পাতিরামের প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনার অন্ত নাই।

পাতিরাম এখন পাড়ার মাথা, তাহার এই অভাবনীয় উন্নতিতে দরিদ্র নিরক্ষর প্রতিবাসীদের মুখগুলি উজ্জ্বল হইবার কথা; কিন্তু পাতিরামের অন্নপুষ্ট দুই চারি জন স্তাবক ব্যতীত পাড়ার কাহারও সহিত তাহার সম্প্রীতি নাই, সম্বন্ধ নাই, আদান প্রদান পর্য্যন্ত বন্ধ।

প্রতিবাসীদের সহিত পাতিরামের অসদ্ভাবের কারণ আলোচনা করিলে, পাতিরাম পাকড়ের অসামান্য দম্ভ ও আত্মশক্তির প্রতি অসীম বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়।

পাতিরামের বয়স তখন সতেরো, টালার বিদ্যাসাগর স্কুলে পড়ে। সারা নিকিরিপাড়ার মধ্যে সেই-ই একমাত্র ছেলে—শিক্ষার ফলে বামুন-কায়েতের ছেলেদের সহিত এক বেঞ্চিতে বসিতে পাইয়াছে এবং তাহাদের সহিত অবাধ মেলামেশা ও খেলাধূলায় প্রকৃতিগত যাহা কিছু সঙ্কোচ অনায়াসে নিশ্চিহ্ন করিতে পারিয়াছে।

নিকিরিপাড়ার ছেলেরা তাহাদেরই জাতিভাই পাতিরামের দুঃসাহস দেখিয়া অবাক্ হইয়া যায়!—স্কুলের ছুটীর পর বাড়ী ফিরিয়া সে পাড়ায় থাকে না, পাড়ার ছেলেদের সহিত মিশিতে চায় না, ভদ্দর পাড়ার সহপাঠীরাই এখন তাহার খেলার সাথী; তাহাদের সহিত মিশিয়া, গলা ধরা-ধরি করিয়া বেড়ায়,—গান গায়, গল্প করে, খাবার কাড়া-কাড়ি করিয়া খায়! পাড়ার ছেলেরা সে সময় কাছে আসিয়া পড়িলে, না চিনিবার ভান করিয়া মুখ ফিরাইয়া লয়!

সহরের সংস্পর্শে থাকিয়াও নিকিরিরা আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্মকর্ম্মে ছিল একান্ত রক্ষণশীল। এ সব বিষয়ে পাণটুকু হইতে চুণটুকু খসিলেই পাড়া হইত তোলপাড়! তখনই সালিসি বসিত, বিচার হইত, অপরাধীর দোষ প্রতিপন্ন হইলে দণ্ড না লইয়া তাহার অব্যাহতির উপায় থাকিত না।

এক সন্ধ্যায় পাড়ার সবাই জানিল, পাতিরাম কি প্রকারে পাণ হইতে চূণ খসাইয়াছে! সেহেতু, পাড়ার মোড়ল বা চাঁই কালাচাঁদ কোটালের এজলাসে তাহার তলপ হইয়াছে। পাড়ার মধ্যে অধিষ্ঠাত্রীদেবী শীতলা মাতার 'স্থান'টুকুই সার্ব্বজনীন কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পল্লীবাসিগণ সকলেই খোলার ঘরে বাস করে, কিন্তু চাঁদা করিয়া টাকা তুলিয়া তাহারা মায়ের আস্তানাটি পাকা করিয়া দিয়াছে। পাকা ঘরখানির ভিতর মায়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, ঘরের সম্মুখে পাকা দালান। দালানের নীচেই কাঠাতিনেক খোলা জমি, ইহাও দেবীস্থানের অন্তর্গত। মায়ের বার্ষিক উৎসবের সময় এই খোলা জমির উপর মেরাপ বাঁধিয়া আসর তৈয়ারী হয়, শীতলা মাতার গান, যাত্রা, তর্জ্জা প্রভৃতির আয়োজন চলে। অন্যান্য সময় দিবাভাগে পল্লীবাসীরা এই খালি জায়গাটুকুতে তাহাদের ভিজা জালগুলি শুকাইতে দেয় এবং সন্ধ্যার পর পাড়ার মাতব্বররা এখানে সমবেত হইয়া মায়ের আরতি দেখে, হরিনাম কীর্ত্তন করে, আবার প্রয়োজন হইলে সালিসী-পঞ্চায়েতীর কায চালায়। মায়ের মন্দিরের পাশেই মায়ের পূজক সারদা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাসা। সপরিবারে তিনি মায়ের মন্দিরসংলগ্ন খানতিনেক খোলার ঘর অধিকার করিয়া বাস করেন এবং একান্ত নিষ্ঠার সহিত মায়ের সেবায় অবহিত থাকেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রতি পল্লীর আবালবৃদ্ধবনিতার শ্রদ্ধাভক্তির অন্ত নাই।

মায়ের আরতির পর পাকা দালানের নীচে খোলা জায়গাটির উপর পঞ্চায়েতী বৈঠক বসিয়াছে। কালাচাঁদ কোটাল, হারাধন গালু, লখীন্দর গুণিন্, সহদেব সরদার,

ধর্ম্মরাজ ঢালী প্রভৃতি দলপতিগণ সদলবলে উপস্থিত। ছেলেদের দল একটু তফাতে সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছে। পাড়ার মেয়েরাও বাদ পড়ে নাই, তাহারা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাসার দিকে অপেক্ষাকৃত অন্তরালে আশ্রয় লইয়াছে। দালানের উপর একখানা কম্বল বিছাইয়া বসিয়াছেন সারদা চক্রবর্ত্তী স্বয়ং এবং তাঁহার আত্মীয়-স্থানীয় কয়েক জন ব্রাহ্মণ।

মায়ের মন্দিরের সম্মুখে সেই দালানটির উপর, বিশেষ কারণ ব্যতীত পাড়ার কেহ কখনও উঠিতে সাহস করিত না। পূজা দিবার প্রয়োজন হইলে, স্নানান্তে বিশুদ্ধ বস্ত্রে তাহারা কুণ্ঠিতভাবে আসিয়া নীচে দাঁড়াইত, চক্রবর্ত্তী মহাশয় আদেশ দিলে তবে তাহারা দালানে উঠিত—ঠিক যেন অপরাধীটির মত! অথচ এই মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্যে তাহারা অর্থ দিয়াছে, প্রচুর পরিশ্রম করিয়াছে, অধিকার তাহাদের যথেষ্টই আছে; কিন্তু এই সমানাধিকারবাদের দাবী তাহাদের মনের মধ্যে কোন দিন কোনও সময়ই তুলে নাই, সর্ব্বান্তঃকরণে তাহারা চিরদিন ইহাই বুঝিয়া আসিয়াছে যে, মন্দির মায়ের; চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার প্রতিনিধি এবং পাড়া শুদ্ধ তাহারা সবাই মায়ের সেবক! পূজা দিবার জন্য যে দিন তাহারা স্নান সারিয়া, শুদ্ধ হইয়া ঠাকুরের আজ্ঞায় মন্দিরের দালানটির উপর পূজার উপচার লইয়া উঠিত,—ঠাকুর তাহাদের হাত হইতে সে সমস্ত লইয়া মায়ের উদ্দেশে চড়াইতেন, তাহার পর প্রসাদের সহিত আশীর্ব্বাদী পুষ্প দিতেন, তাহারা যেন তখন কৃতকৃতার্থ হইয়া যাইত!

যে পবিত্র স্থানটির উপর প্রবীণদেরও এত শ্রদ্ধা, সে দিনের ছেলে হইয়া পাঁতিরাম তাহার অমর্য্যাদা করিয়াছে, শুধু তাহাই নয়, গ্রামবাসী সর্ব্বসাধারণ যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে দেবতার ন্যায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, এই সূত্রে পাঁতিরাম তাঁহারও অবমাননা করিয়াছে। ইহারই প্রতিবিধানের জন্য পঞ্চায়েৎ বসিয়াছে এবং গ্রামের 'ষোলো আনাকে' তলপ করা হইয়াছে।

পাঁতিরামের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে কাহাকেও গ্রাহ্য করে না, ব্রাহ্মণ দেখিলে মাথা নোয়ায় না, কোনও বিধিনিষেধ সে মানিতে চায় না; যখন তখন যা তা কাপড়ে সে পূজার দালানে গিয়া উঠিয়া থাকে, ঠাকুর নিষেধ করিলে অধিকার লইয়া তাঁহার সহিত তকরার করে এবং শেষে আস্পর্দ্ধা তাহার এত বাড়িয়া যায় যে, স্কুলের ছেলেদের ডাকিয়া আনিয়া আগের দিন দালানে উঠিয়া বসে, সকলে মিলিয়া সেখানে খাবার খায়, তাহাদের উচ্ছিষ্ট পাতা মায়ের মন্দিরের ভিতর বাতাসে উড়িয়া গিয়া পড়ে।

পাঁতিরামকে প্রশ্ন করা হইলে সে দম্ভের সহিত জবাব দিল,—আমি অন্যায় কিছু করি নাই।

দলপতি তাহাকে ধমক দিয়া বলিল,—বরাবর যে নিয়মকানুন চ'লে আসছে, তাকে ঠেলা করলেই অন্যায় করা হয়।

পাঁতিরাম তর্কের ছলে ঝাঁঝাইয়া উত্তর দিল,—তা ব'লে তোমরা যদি বরাবর ভুল ক'রে থাক, আমি তা কেন করব?

পাঁতিরামের কথা শুনিয়া সমবেত সকলেই অগ্নি অবতার। সে দিনের ছেলের এত বড় বুকের পাটা, মুখের দৌড় এত দূর! ষোলো আনার ভুল দেখাইতে আসে! কিন্তু নিরক্ষর হইলেও, তাহারা নির্ব্বোধ ছিল না, পাঁতিরামকে কথা কহিবার অবসর দিল। প্রশ্ন হইল,—কি ভুল আমরা করেছি?

পাঁতিরাম তখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি দক্ষিণের এক পদাবাজ বি, এ, পাশ করিয়া তাহাদের স্কুলে প্রথম মাষ্টারী করিতে আসিয়াছেন: পচিশ বছরের তরুণ যুবা, সাহিত্য শিক্ষা দিতে বসিয়া ক্লাসের মধ্যে যতটা সম্ভব বর্ণ-বিদ্বেষের বিষ উদ্গার করিতেন,—বিশেষ করিতেন প্রতি শনিবার ছুটীর ঘণ্টার পর ছেলেদের ডিবেটিং উপলক্ষে। এই শিক্ষকটি বিখ্যাত চর্চ্চমিশনারী স্কুল ও কলেজ হইতে আগাগোড়া শিক্ষালাভ করিয়া—সনাতন ধর্ম্ম ও সমাজের প্রতি একটা বিরুদ্ধভাব লইয়াই বিদ্যাসাগর স্কুলের ছেলেদের মুক্তির ভার লইয়াছিলেন এবং সুবিধা পাইলেই প্রচার করিতেন,—মানুষমাত্রেই অমৃতের পুত্র, কোনও পার্থক্য কাহারও মধ্যে নাই, সবাই সমান; জাতিভেদ কুসংস্কার, দেব-দেবীপূজা মন্ত্র সমস্তই মিথ্যা—সুবিধাবাদী স্বার্থপর ব্রাহ্মণ জাতির অলীক কল্পনা মাত্র!—বিদ্যালয়ে অধীত বিদ্যাংশ ত্যাগ করিয়া পাঁতিরাম এই মুখরোচক তথ্যগুলি যথাসাধ্য কণ্ঠস্থ করিয়াছিল এবং উত্তরচ্ছলে তাহার বিচারকদের নিকট উদ্গার করিয়া সভাস্থ সকলকেই চমৎকৃত করিয়া দিল।

কিন্তু পাতিরামের দুর্ভাগ্য, তাহার ব্রহ্মবিদ্যার পরিচয় পাইয়াও কেহই তাহাকে দৈত্যকুলের . প্রহ্লাদ বলিয়া বাহোবা দিল না, বরং তাহার বিরুদ্ধে এই 'রায়' বাহির হইল যে, সর্ব্বসমক্ষে তাহার মস্তক মুণ্ডন করাইয়া মুণ্ডিত মস্তকে এক বড়া ঘোল ঢালিয়া দেওয়া হইবে এবং সাত হাত মাপিয়া নাকখৎ দিবে!

পাতিরাম স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া তাহার দণ্ডাদেশ শুনিল, একটি কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না, ঠোঁটদুখানি পর্য্যন্ত নড়িতে দেখা গেল না।

কিন্তু সহসা ভীড় ঠেলিয়া পঞ্চায়েতদের সম্মুখে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল তাহার মা দ্রৌপদী! সরোদনে কহিল,—দুধের ছেলে আমার, ল্যাকাপড়া শিখেই না ওর কাল হ'ল! ওকে তোমরা এ যাত্রা ক্ষেমা-ঘেন্না কর, ও হুকুম ফিরিয়ে নাও,—দু চার গণ্ডা ট্যাকা বরং জরিমানা কর, আমি ভিক্ষে সিক্ষে করেও তা হাজির করব।

দণ্ড শুনিয়া যে পাতিরাম ধৈর্য্য হারায় নাই, মায়ের এই হীনতা দেখিয়া সে গর্জ্জিয়া উঠিল,—খবরদার মা! আমার হয়ে একটি পয়সা তুমি জরিমানা ব'লে দিতে পারবে না; তা হ'লে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব! কি করেছি আমি? চুরি করেছি, ডাকাতি করেছি, না কারুর বুকে ছুরি মেরেছি যে জরিমানা দেবে? ওরা সব এককাট্টা হয়েছে, আমি একলা, তাই যা ইচ্ছা তাই করতে চাইছে! কিন্তু আমি সইব না, এর শোধ নেবই।

সতেরো বছরের 'দুধের' ছেলের এই দুর্দ্দপনা কাহারও বরদাস্ত হইল না; সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ গোয়াল হইতে এক থাবা গোময় আনিয়া জোর করিয়া পাতিরামের মুখবিবরে গুঁজিয়া দেওয়া হইল এবং দুই জন যোয়ান তাহার দুই কাণ ধরিয়া পঞ্চাশবার ওঠব'স করাইল।

পুরোহিত ঠাকুর হাত তুলিয়া কহিলেন,—বাস্, বাস্, যথেষ্ট হয়েছে, ছেলেমানুষ কুসংসর্গে পড়েই মাথাটাকে বিগড়ে ফেলেছিল, এবার চৈতন্য হবে; চৈতন্যময়ী ওকে সুপথ দেখাবেন। এবারের মত তোমরা ওকে ক্ষমা কর,—আর ও সব শাস্তির দরকার নেই। কাছে আয় বাবা, কাছে আয়, আশীর্ব্বাদ নিয়ে যা—

মুখ বিকৃত করিয়া পাতিরাম উত্তর দিল,—থাক্ থাক্, তোমাকে আর "গরু মেরে জুতো দান" করতে হবে না; কে তোমার আশীর্ব্বাদ চায়, ঠাকুর? আশীর্ব্বাদ ওদের কর, পাতিরাম পাকড়ে কেয়ার করে না তোমাকে—তোমাদের বামুন জাতকে—তোমাদের ঠাকুর-দেবতাকে,—এ কথা জেনে রেখো।

পাতিরামের এত বড় স্পর্দ্ধার কথাটা ঠাকুর মহাশয় হাসিয়া উপেক্ষা করিতে চাহিলেও, সভার 'ষোল আনা' তাহা বরদাস্ত করিতে পারিল না। পুনরায় তাহার কাণ দুটি ধরিয়া 'পঞ্চের' সম্মুখে খাড়া করা হইল এবং 'পঞ্চের' মাথা হইয়া কালাচাঁদ কোটাল পাতিরামকে জানাইয়া দিল,—ষোল আনার সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে হ'লে, আর দশ জনের মত সবার 'সো' হয়ে থাকতে হবে; বামুন দেবতা নেমকম্ম মানবো না বললে চলবে না।

দুই চক্ষু পাকাইয়া গোঁয়ারের মত পাতিরাম কহিল,—আমি যদি না মানি?

জোর গলায় কোটাল তাহারও ব্যবস্থা দিল,—তা হ'লে ষোল আনা তোকে সার থেকে ছেঁটে ফেলে দেবে, কোন তোয়াক্কা তোর রাখবে না।

দৃঢ়স্বরে পাতিরাম জানাইল,—বেশ, তাই সই! আজই আমি ষোল আনাকে ছেঁটে আলাদা হলুম।

পঞ্চের আদেশে 'ষোল আনা' সকলেই তৎক্ষণাৎ পাতিরাম পাকড়ের সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিল। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও কলিকাতার প্রান্তদেশে নিরক্ষর নিকিরি-সমাজের মধ্যেও সামাজিক শাসনের প্রভাব এতটা তীব্র ছিল।

* * * *

দ্রৌপদী ছেলেকে তিরস্কার করিয়া কহিল,—দোষ ত তোর! তুই দুপাতা ল্যাকা-পড়া শিখে বেহ্মদের পাল্লায় পড়ে এত বড় নারেক হয়েছিস্ যে, দেবতা বামুন মান্‌তে চাস্ না, পঞ্চের সামনে তাই নিয়ে তকরার করিস্।

পাতিরামের রোখ তখনও কমে নাই, মায়ের কথায় ফোঁস্ করিয়া উঠিয়া উত্তর দিল,—আমার পুঁথী; তুই চুপ ক'রে থাক।

মা দীর্ঘ নিশ্বাস্ ফেলিয়া কহিল,—আমি ত চুপ করবই, আমার ক্ষ্যামতা কি, তোর সাথে কথায় পারি? কিন্তু, দেখতে পাচ্ছি, তোর কাণে পাক দিয়ে মুখের মধ্যে গোবোর গুঁজেও তেনারা তোরে আক্কেল দিতে পারে নি। তোর অদেষ্টে ঢের কষ্ট আছে।

পাতিরাম তথাপি দমিল না, তর্জ্জন করিয়া কহিল,—মরদকা বাত, হাতীকা দাঁত,—যা বেরোয়, ঢোকে না। আমি যা বলেছি, তাই করব; পাড়ার কারুর সঙ্গে আমি কোনও তোয়াক্কা রাখব না, দেবতা-বামুনকে কেয়ার করব না—

দ্রৌপদী এবার রাগের সুরে ঝঙ্কার দিয়া কহিল,—বামুন বামুন করছিস্, বামুনরা যেন তোরে সাধছে—তোর ভক্তি-ছেরেদ্ধা নেবার লালসে, তুই না হ'লে আর তাদের চলছে না। কিন্তু তুই এত বড় নেমকহারাম, এইটেই ভুলে যাচ্ছিস যে, বামুনের দৌলতেই তুই এত বড়টি হয়েছিস্—ল্যাকা-পড়া শিখিছিস্।

আগুনের উপর যেন জলের অঞ্জলি পড়িল। পাতিরাম বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করিল,—কি বল্‌লি,—বামুনের দৌলতে মানুষ হয়েছি আমি, লেখাপড়া শিখেছি?

দ্রৌপদী দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল,—হাঁ, যখন বিধবা হই, তুই তখন সবে পাঁচ বছরের কোলে পা দিয়েছিস্। একটি পয়সা তোর বাপ রেখে যায় নি। মুখুয্যে বাবুদের পুকুর-গুলো সে দেখাশোনা করত। তেনারা শুনেই গতির টাকা দেন পাঠিয়ে। পরে হামবাই হয়ে দাঁড়ান, যাতে তোকে নিয়ে না পথে দাঁড়াতে হয়। কর্ত্তাবাবু ওঁকে ছেলের মত ভালবাসতেন। তাঁরই দয়ায় শ্রেদ্ধায় বড় বড় ঘরে মাছের জোগান দিয়ে তোকে মানুষ করি। তোকে চালাক-চতুর দেখে তিনিই জিদ ক'রে বলেন, দ্রুপ! তোর ছেলেটার লক্ষণ আছে, কালে মানুষ হবে, একে আর মাছের ঝুড়ি বইতে শেখাসনি, স্কুলে পড়তে দে, যত দিন পড়বে, ওর মাইনে আর জামা-কাপড় বই-পত্তর জোগাবো আমি। কিন্তু খবরদার, এ কথা কাউকে বলতে পাবি নে; কথা ফাঁক হলেই আমিও হাত গুটোব।

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া পাতিরাম জিজ্ঞাসা করিল,—তা হ'লে ওপাড়ার সাতকড়ি মুখুয্যে আমার লেখা-পড়ার খরচ জোগায়,—সেই দেয় স্কুলের মাইনে? জামা, কাপড়, জুতো, বই, খাতা—সব?

দ্রৌপদী উত্তর দিল,—হাঁ, নইলে আমার কি ক্ষ্যামতা—তোকে এই হালে স্কুলে পাঠাই? পাড়ার দশ জনে এই নিয়ে কত কথাই আমাকে বলে, জিজ্ঞেসা করে, ল্যাকা-পড়া শিখে পতা তোকে কোন্ স্বর্গের সিঁড়ি বানিয়ে দেবে? আমি চুপ ক'রে শুনে যাই, কারুর কথায় রা কাড়ি না, তখন কি জানতুম, ল্যাকা-পড়া শিখে তুই এমনি নায়েক হয়েছিস্? দশ জনের সামনে আমার মুখে ভুষোকালি মাখিয়ে দিলি!—তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

পাতিরাম নরম হইয়া কহিল,—তুই কাঁদিস্‌নি, আর আমি লেখা-পড়া করব না,আজ থেকে ওপাটে ইস্তফা দিলুম।

অঞ্চলে দুই চক্ষু মুছিয়া দ্রৌপদী ছেলের শান্ত মুখখানির দিকে চাহিয়া কহিল,—আর ইস্কুলে যাবি নি?

—না।

—কি করবি তা হ'লে? কায ত কিছু করা চাই।

—কাযই করব; যাতে রোজগার হয়, পরের কাছে আর হাত পাততে না হয়।

—কায করবি, সে ত ভাল কথা; কি কায করবি, ঠিক করেছিস্?

—সে তোমাকে এখন বলব না, পরে জানতে পারবে। কিন্তু তোমাকে এই কাযের জন্য আমাকে কালই পঞ্চাশটি টাকা যোগাড় ক'রে দিতে হবে।

—বলিস কি! সে কত বল্‌লি? ক গণ্ডা টাকা?

—সাড়ে বারো গণ্ডা; এ তোমাকে দিতেই হবে। কিন্তু কারুর কাছ থেকে ধার ক'রে যদি তুমি টাকা এনে দাও, তা হ'লে আমি নেব না।

—তোর যত সব অনাছিষ্টির কথা! টাকা কি আমার ঘরে পোঁতা আছে যে, তুই চাইবামাত্রই তুলে এনে দেব? তোর সে খবরে দরকার কি, ধার ক'রে আনি, কি চেয়ে আনি;—তোর ত টাকা নিয়ে কথা?

—ধার করা টাকা নিয়ে আমি কায করতে নারাজ। তুমি বরং ঘটীবাটি বিক্রী করেও এই টাকা আমাকে যোগাড় ক'রে দাও, তুমি দেখে নিও, সম্বৎসরের ভিতর আমি এর তিনগুণ টাকা তোমাকে তুলে দেব।

দ্রৌপদী রাজী হইল। পরদিনই সেই টাকা হাতে লইয়া পাতিরাম কাযের সন্ধানে বাহির হইল। সমস্ত দিন বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া সন্ধ্যার সময় সে বাড়ী ফিরিয়া মাকে ডাকিয়া কহিল,—কায যোগাড় ক'রে ফেলেছি মা, টাকা সেখানে ছড়ানো আছে; তুলে আনতে পারলেই হ'ল।

দুই চক্ষু উজ্জ্বল করিয়া মা পুত্রের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—বলছিস্ কি?

পাতিরাম কহিল,—হাবড়া ষ্টেশনে গিয়েছিলুম মা, আগেই খবর একটু পেয়েছিলুম। পশ্চিম থেকে রেলে মাছ আসছে আজকাল, সেই মাছ ওখানে সস্তায় ডেকে নেব; তার পর কলকাতার সব বাজারে যোগান দেব। মাস কতক কায ক'রে, হাতে টাকা জমিয়ে নিজে আড়ত খুলে বসব। একটু মাথা খেলিয়ে তরিবদ্ ক'রে ও মাছ যদি বাজারে চালাতে পারি, দেখবে তখন—পয়সা কে খায়!

দ্রৌপদী অবাক্ হইয়া প্রশ্ন করিল,—পচ্চিম থেকে মাছ আসছে রেলে? বলিস্ কি রে। তা, সে মাছ ত প'চে ঢোল হবার কথা!

পাতিরাম কহিল,—বরফ দিয়ে তারা পাঠায় যে, পচবে কেন?

দ্রৌপদীর বিস্ময় যদি বা কাটিল, কিন্তু সমস্যা তুলিল,—চালানী মাছ লোকে নেবে কেন?

পাতিরাম জানাইল,—খদ্দেরের কাণে কাণে কি ব'লে বেড়াতে হবে যে মাছ এনেছি পশ্চিম থেকে! সবাই জানবে, ভিন্ গাঁয়ের পুকুরের মাছ।

দ্রৌপদী পুত্রের প্রস্তাব শুনিবামাত্রই শিহরিয়া উঠিল; কহিল,—এতে যে দুদিনেই জানাজানি হয়ে পড়বে বাবা, চালানা মাছ পুকুরের ব'লে চালাতে গেলেই ধরা পড়তে হবে, নিন্দে হবে—

পাতিরাম কঠিন হইয়া কহিল,—কিছুই হবে না। বাজারে দেখ নি, বড় মাছ পড়লে চীলের মত সবাই ছুটে এসে কাড়াকাড়ি লাগায়; কোথাকার মাছ, কখন্ ধরা হয়েছে, কটা লোকে তার খবর নেয়! পশ্চিম থেকে মাছের চালান আসতে পারে, এ কথা কেউ এখনো বিশ্বাসই করবে না, তার পর যখন জানাজানি হবে, তত দিনে আমরা কায গুছিয়ে নেব, মা! তুমি দেখে নিও, এই কাযে নেমে আমি কি ক'রে কায বাজাই, পয়সা পয়সা করি!

মা বুঝিল, পুত্রকে বুঝাইবার প্রয়াস বৃথা। সে অগত্যা চুপ করিয়া রহিল। পাতিরাম সেই দিনই তাহার লেখাপড়ার সাজসরঞ্জাম সমস্তই উঠানে আগুন জ্বালাইয়া পুড়াইয়া ফেলিল,—তাহার সখের জামা, জুতা, কাপড়, চাদর—সমস্তই তাহাতে আহুতি পড়িল। অগ্নিশিখা উঁচু হইয়া উঠিল। পাশের বাড়ীর মেয়েরা সভয়ে ছুটিয়া আসিয়া কহিল,—করছিস্ কি?

পাতিরাম দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল,—যজ্ঞ করছি—ঋণ-মুক্তির।

মাথা ন্যাড়া করিয়া তাহাতে নিত্য নিয়মিত ঘোল ঢালিবার যুক্তি দিয়া তাহারা চলিয়া গেল। মা বাজারে গিয়াছিল, ফিরিয়া কহিল,—এ কি সর্ব্বনাশ করেছিস্ রে?

পাতিরাম বিকৃতস্বরে কহিল,—মুখুয্যে বামুনের দেনার চিহ্নগুলো জ্বালিয়ে দিলুম, মা! দেনার খাতায় বামুনের হিসেবটা আগেই টুকে নিয়েছি, ঠিকঠাক সব হিসেবও ধরতে পারিনি, মোটামুটি ধ'রে নিয়েছি—আড়াইশো! মানুষ হয়েই সুদশুদ্ধ এইটে আগেই শুধবো।

অবাক্ হইয়া মা পুত্রের অগ্নির উত্তাপস্পৃষ্ট কৃষ্ণবর্ণ মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিল। বৃদ্ধার মনে হইল,—সে মুখ যেন মানুষের নয়, যেন এক ভয়াবহ মূর্ত্তির ছায়া সেই মুখখানির উপর পড়িয়া অতি কদর্য্য করিয়া তুলিয়াছে।

* * * * *

সতেরো বৎসর বয়সে পাতিরাম যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল, সামাজিক বিধি-নিষেধ, আইন-কানুন, নিন্দা-অপযশ, সদ্ভাব-সহযোগিতা সমস্তই কোতল করিয়া—সতেরো বৎসরের কঠোর সাধনায় তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

কার্য্যারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রচুর অর্থাগম হইতে থাকে এবং অর্থকে কঠিনভাবে আয়ত্তে রাখিতে তাহাকেও কঠিন হইতে হইয়াছে। তাহার বিধিবিগর্হিত কার্য্যের জন্য প্রতিবাসীরা তাহার সংস্রব ত্যাগ করিয়াছে, পাতিরাম কিন্তু পৈতৃক ভিটা ত্যাগ করে নাই বা তাহাকে কেহ কোনও দিন কোনও প্রতিবাসীর মুখাপেক্ষী হইতে দেখে নাই। পাছে কোন দিন প্রতিবাসীদের দ্বারস্থ হইতে হয়, এই আশঙ্কায় মায়ের পুনঃ পুনঃ অনুরোধেও সে বিবাহ করে নাই।

পাড়ার কথা উঠিলেই তাহার মার্জ্জারের মত অদ্ভুত দুই চক্ষু যেন জ্বলিয়া উঠে, বিড় বিড় করিয়া নিজের মনে কত কি বলে, কিন্তু তাহার সঙ্কল্পের কথা তাহার মনেই গুপ্ত থাকে; কি করিতেছে সে, বা কি করিবে, তাহা লইয়া সে যেমন আস্ফালন করে না, তেমনই কাহারও নিকট ব্যক্তও করে না। তবে তাহার মনের দৃঢ় ধারণা এই যে, এক দিন সে সমস্ত পাড়ার উপর তাণ্ডব-নৃত্য করিবে, সে দিন পাড়াপড়শীর একখানি মাথাও উঁচু হইয়া থাকিবে না—সকলেই মাথা পাতিয়া দিবে—তাহার নৃত্যচপল চরণযুগল সভয়ে তুলিয়া লইবার জন্য! আর পল্লীর ঐ দেবস্থান—পল্লীবাসীর সযত্ননির্ম্মিত মন্দিরটি নিশ্চিহ্ন করিয়া সে ঐ স্থানে এমন এক

স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ করাইবে, প্রতিসন্ধ্যায় সেখানে পল্লী-মাতব্বরেরা সমবেত হইয়া তাহার কৃষ্ণকর্ণ সঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিয়া নির্য্যাতনের দিনটি স্মরণ করিবার অবকাশ পাইবে।

মায়ের নিকট পাতিরাম যে টাকা লইয়া ব্যবসায়ে ব্রতী হইয়াছিল, সম্বৎসরের মধ্যেই তাহার ছয় গুণ টাকা মায়ের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। দ্রৌপদী এখন আর মাছের ঝুড়ি মাথায় করিয়া বাড়ী বাড়ী যোগান দিতে বাহির হয় না। এখন তাহার পুত্রের দৌলতে তাহার বাড়ীতে লোকের অভাব নাই। দেহাদ হইতে পাতিরাম ছয় জন নিকিরিকে মোটা মাহিনায় নিযুক্ত করিয়া বাড়ীতে রাখিয়াছে। তাহারা বাড়ীতে খায়, আড়তের কায করে, রাত্রিতে বাড়ীতে আসিয়া পাহারা দেয়। পাতিরামের এখন বেশ বোল-বোলাও হইয়াছে। যাকে তাকে টাকা ধার দেয়, কিন্তু দলীল বেশ কায়দা করাইয়া লিখাইয়া লয়—যাহাতে কোনও সূত্রে আইন-আদালতে না কাঁচিয়া যায়। ভাত ছড়াইলে কাকের অভাব হয় না, টাকা ধার দেওয়ার কথা প্রচার হইয়া পড়িলে সকল বাধা ঠেলিয়া উমেদারের দল দেখা দেয়। পাড়ার কয়েক জন সামাজিক প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করিয়া বিষম দায়ে পড়িয়া পাতিরামের খাতকশ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। বাহ্য ব্যাপারে মনে হয়, পাতিরামের মনে কোন বিকার নাই, আগেকার অপ্রিয় দাগটুকু সে মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছে; তাহার লক্ষ্য শুধু চড়া সুদ ও পাকা দলীল সম্পাদনের দিকে; টাকা ধার দিতে কোন দিন তাহাকে বিমুখ হইতে দেখা যায় না।

অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পৈতৃক সামান্য ভিটে-বাড়ীটিও যথাসম্ভব সংস্কার করিয়া লইয়াছে; কিন্তু ইমারত তুলে নাই। পাতিরামের প্রতিজ্ঞা, অন্ততঃ দশ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন না করিলে সে পাকা বাড়ীতে মাথা গলাইবে না। বাহিরে খোলার চালা দেওয়া লম্বা-চওড়া একখানা ঘর, লাল রংয়ের সিমেণ্ট করা গৃহতল, তাহার উপর ময়লা বিছানা পাতা, গোটা দুই তাকিয়া; বিছানার চাদর ও তাকিয়ার ওয়াড় কাবুলিওয়ালার অঙ্গ-বস্ত্রের মত এ পর্য্যন্ত স্থানচ্যুত হইবার অবকাশ পায় নাই, তেল ও ধূলার সংযোগে তাহারা বর্ণ-বিভ্রাট উপস্থিত করিয়াছে,—কিন্তু পাতিরামের এ সব বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। এই গদিঘরে—বিচিত্র গদিতে বসিয়া সে নিত্য হাজার হাজার টাকার লেন-দেন করে। বাহিরের সিমেণ্ট মণ্ডিত প্রশস্ত দাওয়াটির উপর তাহার মক্কেল ও খাতকরা অনুগ্রহ প্রত্যাশায় বসিয়া থাকে।

অদ্ভুত তাহার কার্য্য-পদ্ধতি,—সাধারণের পর্য্যায়ে আনিয়া যাহার তুলনা-মূলক সমালোচনা করা চলে না। রাত্রি ঠিক তিনটায় উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া সে তাহার কার্য্যারম্ভ করে। সমস্ত কায নিজের চক্ষুতে দেখিয়া ব্যবস্থা করা তাহার চিরন্তন অভ্যাস। নূতন রোজগার না করিয়া সে জল স্পর্শ করে না, বাসি পয়সায় খাইব না—এটিও তাহার অন্যতম প্রতিজ্ঞা। সহরের উপকণ্ঠে বিভিন্ন স্থানে তাহার শতাধিক পুষ্করিণী বিদ্যমান—দীর্ঘকালের মেয়াদে এ সকল পুকুর জমা করা আছে। আষাঢ়-শ্রাবণে গঙ্গার ঘোলা জলের সঙ্গে সঙ্গে ডিমের মরসুম যেই উপস্থিত হয়, পাতিরাম একাই সে সব কিনিয়া লয়, তাহার জমা করা পুষ্করিণীগুলিতে নিজে উপস্থিত থাকিয়া পরিমাণমত ফেলায়, —বক্রী চড়া দরে বাজারে বিক্রয় করে। আশ্বিনের শেষ হইতে পুকুর হইতে পুকুরে চারা পোনা চালাই ও পাইকারী বিক্রয় আরম্ভ হয়। তাহার পর সারা বৎসর ধরিয়া এই ব্যবসায় চলে,—কুনকে-ভরা ছোট পোনা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষে অতিকায় রুই-কাৎলা পর্য্যন্ত কিছুই বাদ যায় না। ভোর পাঁচটার মধ্যে পুকুরের ব্যাপার সারিয়া তাহাকে হাবড়ায় আড়তে ছুটিতে হয়, নয়টার পূর্ব্বেই সারাদিনের কায শেষ করিয়া সে বাড়ীতে ফিরিয়া আসে।

পাতিরামের আড়তের শাঁখের করাত আসিতে যাইতে দু তরফা কাটে! রেলের কল্যাণে নানা স্থান হইতে আড়ত-দারের নামে বাক্স-বন্দী হইয়া মাছের চালান আসে। পাতি-রাম বুদ্ধি খাটাইয়া মফস্বলের চালানদারদের নিকট বাক্স ও বরফ পাঠাইবার ব্যবস্থা করে, ইহার ফলে অন্য সব আড়তদারকে কাণা করিয়া দিয়া তাহারই আড়ত দেখিতে দেখিতে জমকাইয়া উঠিয়াছে। পাতিরামের ব্যবসায়ের ব্রহ্মাস্ত্র ছিল—পয়সা ছুড়িয়া মারা! জল-ঝড় বজ্রপাত—প্রাকৃতিক যত কিছু দুর্য্যোগ আসুক, হরতাল হউক বা আড়তের কায বন্ধ থাকুক,—চালানদারের নামে রোজকার টাকা পাঠান কিছুতেই বন্ধ থাকিবে না। পাতিরাম কোনও দিন স্থানীয় ব্যাপারীদের মুখ চাহিয়া থাকে না,—নিজেই সুবিধামত দর দিয়া নিজের লোকের দ্বারা বেনামীতে মাল কিনিয়া

লয় এবং নিজের লোক দ্বারা সহরের বিভিন্ন বাজারে, মেসে, হোটেলে বিক্রয় করিতে পাঠায়। অন্যান্য আড়তদাররা পাতিরামের শাঁখের করাত চালাইবার অপূর্ব্ব কৌশল দেখিয়া অবাক্ হইয়া যায়। কিন্তু পাতিরামের যেমন প্রতাপ, তেমনই দম্ভ, সমব্যবসায়ীদিগকে গ্রাহ্যও করে না কোন দিন।

পাতিরামের চেহারায় কোনও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। বেঁটেখেঁটে মানুষটি, সাদাসিধা মুখ, চোখদুটি ক্ষুদ্র ও ঘোলাটে, সময় সময় তাহা যেন জ্বলিয়া উঠে! নাকটি মোটা ও থ্যাবড়া, ওষ্ঠদুটি পুরু ও কতকটা ওলটানো,—সহসা দেখিলে কালঠুঁটি মার্জ্জারের মত বিভীষিকা আনে! মুখখানি স্বাভাবিক গম্ভীর হইলেও, দক্ষ অভিনেতার মত তাহাতে নানা ভাবভঙ্গীর বিকাশ দেখা যায়। ছোট ছোট উজ্জ্বল দুটি চক্ষুর ভিতর দিয়া তাহার অসামান্য কূটবুদ্ধি আত্মপ্রকাশ করিলেও, সে লোকের নিকট নিজেকে ন্তাকা-বোকারূপে পরিচিত করিবার প্রয়াস পায়। রাগের সূচনায় তাহার মুখে কালো কালো ঠোঁটদুটির ভিতর দিয়া হাসির ঝিলিক বাহির হয়, কিন্তু সে হাসিটুকু মেঘের বুক চিরিয়া সঞ্চারিত বজ্রদূতী বিদ্যুতের মত ভয়ঙ্কর! এই জাতীয় বিদ্যুদ্বিকাশের পরেই যেমন বজ্রনির্ঘোষ হয়, পাতিরামের ওষ্ঠে এই অদ্ভুত হাসির সঙ্গে সঙ্গে বোমার মত তাহার মুখখানি যেন ভীষণ হইয়া ফাটিয়া পড়ে!

* * * *

পুত্রের অর্থ-ভাগ্যে দ্রৌপদীর যতটা আনন্দ ও উল্লাস, পাড়া-প্রতিবাসীর সহিত মনোমালিন্যে তাহার মনের গোপন ব্যথাও ততটা গভীরভাবে প্রকাশ পায়। সদাসর্ব্বদাই তাহার সাধ হয়, ছেলের বিবাহ দিয়া রাঙ্গা টুকটুকে একটি বধূ বাড়ীতে আনে এবং সেই সূত্রে গোল আনাকে সন্তুষ্ট করিয়া আগেকার মত আবার দলভুক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু পাতিরামের কাছে যখনই সে কথাটা পাড়ে, তখনই সে গম্ভীর হইয়া উত্তর দেয়,—এখনও সে সময় আসেনি, মা।

মা সাগ্রহে সেই আকাঙ্ক্ষিত দিনটির প্রতীক্ষা করে, কিন্তু কবে যে সেই কাম্য দিনটি সহসা দেখা দিবে, তাহা ভাবিয়া পায় না।

পুত্রের আর একটি ব্যবহারে মায়ের প্রাণ ব্যথায় ভরিয়া উঠে। সে লক্ষ্য করে, চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়া পাতিরামের যেন একটা নেশা হইয়া পড়িয়াছে; টাকা ধার দিবার সময় সে খাতককে সে জামাই-আদরে থালাভরা খাবার খাওয়ায়, মাস কয়েক পরেই দেখা যায়, তাহারই সর্ব্বনাশে সে বদ্ধপরিকর, বাঘের মত সে তখন দুর্ভাগ্য খাতকের টুঁটি দাঁতে কাটিয়া তাহার রক্তপানের জন্য উন্মত্ত! তখন তাহার লঘুগুরুজ্ঞান থাকে না, পয়সার জন্য পিশাচেরও অধম হইয়া উঠে!

অবশ্য, এমন ঋণপ্রার্থীরও অসদ্ভাব দেখা যাইত না,—যাহারা অত্যাবশ্যক অর্থের মোহে আভিজাত্যের দর্পকে খর্ব্ব করিতে ঘৃণাবোধ করিতেন; কিন্তু পাতিরামের মিষ্টান্ন তাঁহারা উপেক্ষা করিলেও, পাতিরাম তাঁহাদের এই স্পর্দ্ধা উপেক্ষা করিতে পারিত না, চিত্রপটে তাঁহাদের নাম সে হিংসার অক্ষরে লিখিয়া রাখিত এবং এই সব ক্ষেত্রে ঋণদানে তাহাকে মুক্তহস্ত দেখা যাইত!

পুত্রকে বাগে পাইলে মা তাহাকে উপদেশ দেয়,—বাবা! ভগবান্ তোমাকে যখন কারবারে পয়সা ঢেলে দিচ্ছেন, তখন তেজারতী ক'রে লোকের শাপমন্যি কুড়িয়ে কি দরকার? পার ত, লোকের উপকার ক'রো দান ক'রে? নইলে, ধার দিয়ে এক দিন তার উপকার ক'রে তার পর শতেক দিন তার খোয়ার করার চেয়ে হাত গুটিয়ে নেওয়াই ভাল। টাকা ধার দেবার সময় সন্দেশ-রসগোল্লা খাইয়ে টস দেখানো, তার পর ধার শুধতে না পারলে তার বুকের কলজে ছিঁড়ে নেওয়া—এর চেয়ে মহা পাপ আর নেই, বাবা!

বাবা কিন্তু কথার এই আঘাতটুকু নিরুত্তরে সহ্য করিয়া যায়। তাহার উদ্ভাবিত এই বিচিত্র অর্থনীতির মূলে কি রহস্য নিহিত, সে ভিন্ন অন্যে তাহার মর্ম্ম কি বুঝিবে?

শীতলা-মন্দিরের পুরোহিত চক্রবর্ত্তী মহাশয় সে দিন গোপনে পাতিরামের সহিত দেখা করেন এবং কন্যাদায় উপলক্ষে তাঁহার দমদমার ভদ্রাসনবাটী ও জমীজমা বন্ধক রাখিয়া তিন হাজার টাকা ধার চাহেন, সে দিন পাতিরামের ওষ্ঠপুটে হাসির ঝিলিক দেখা দিয়াছিল। পাতিরাম তাঁহাকে টাকা দেয় এবং চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহাকে এই প্রতিশ্রুতি করাইয়া লন যে, এই লেনদেন ও বন্ধকী ব্যাপারটা গোপন থাকিবে। পাতিরাম বর্ণে বর্ণে এই

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিল, কাহারও নিকট এ তথ্য ব্যক্ত করে নাই।

কিন্তু বৎসরখানেক পরে আর এক কন্যার বিবাহ-ব্যাপারে উক্ত বন্ধকী সম্পত্তির উপর আরও হাজার টাকা ধার দিবার প্রস্তাব লইয়া যে দিন চক্রবর্ত্তী মহাশয় পুনরায় গোপনে পাতিরামের গদিতে পদার্পণ করিলেন; সে দিন সে গম্ভীরভাবে জানাইল;—হাত যে এখন একবারে খালি চক্রবর্ত্তী মশাই, থাকলে এখনি দিতাম। তা, আপনি এক কায করুন না কেন, বাজে জমীজমা বিক্রী ক'রে হাজার-খানেক টাকা তুলে নিন না!

চক্রবর্ত্তী মহাশয় সবিস্ময়ে জানাইলেন,—বন্ধকী জমী বিক্রী করবার অধিকার ত আমার নেই, পাতিরাম।

পাতিরামের ওষ্ঠে আবার সেই হাসি দেখা দিল; কহিল,—তাতে কি হয়েছে? বন্ধক রেখেছি ত আমি! আমার যখন আপত্তি নেই, কেন আপনি কুণ্ঠিত হচ্ছেন?

ব্রাহ্মণ একেবারে তন্ময়! কি মহাপ্রাণ এই ক্ষণজন্মা নিকিরিনন্দন! জাতিতে হেয় হইলে কি হয়? ব্যবহারে চণ্ডালও ব্রাহ্মণ হয়! পরক্ষণে প্রশ্ন তুলিলেন,—তা হ'লে তুমি কি বাবা, ঐ পরিমাণ টাকার ভূসম্পত্তি বিক্রী করবার সম্মতিপত্র দেবে লিখে একখানা?

পাতিরামের ওষ্ঠের দুই প্রান্তে হাসি এবার ফুটিয়া উঠিল; উপেক্ষার সুরে কহিল,—আপনি কি পাগল হয়েছেন, চক্রবর্ত্তী মশাই! এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ছুঁচোর বিষ্ঠে পঙ্কতে তুলতে চান! কাক-চীল এ ব্যাপার জানে না যখন, লেখা-লেখির দরকার? বন্ধকী ব্যাপারের নাম-গন্ধ না তুলে আপনি তাড়াতাড়ি কায হাসিল ক'রে ফেলুন! হ্যাঁ, তবে একটা কথা আমার বলবার আছে। বিক্রীর টাকা যদি হাজারের ওপর হয়, হাজার আপনি নিয়ে বাকিটুকু আমাকে জমা দিয়ে দলীলে উসুল করিয়ে নেবেন।

কায যথাসময় হাসিল করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিক্রীত জমির চৌহদ্দীসমেত ফিরিস্তি ও ক্রেতার নাম পাতিরামকে জানাইতে দ্বিধা করেন নাই। তবে মিলিলে কিছু টাকাই উসুল দিতে পারেন নাই। এক বন্দ বাগান ও কয়েক বিঘা ধান-জমী বিক্রয় করিয়া পৌনে নয় শত টাকার বেশী তিনি পান নাই।

কিন্তু এই ঘটনার পর মাস পূর্ণ হইতে না হইতে এই গুপ্ত কথাটি চারিদিকে সহসা ব্যক্ত হইয়া পড়িল। সকলেই শুনিয়া বিস্মিত হইল যে, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মত নিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ তাঁহার সম্পত্তি পাতিরাম পাকড়ের নিকট বন্ধক রাখিয়া, তাহার অজ্ঞাতে উক্ত বন্ধকী সম্পত্তির কিয়দংশ বিক্রয় করিয়াছেন!

যে ব্যক্তি পৌনে নয় শত টাকায় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাগান ও জমী কিনিয়াছিল; বেনামা-পত্রে বন্ধকী ব্যাপার জানিয়া সে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নামে উকীলের চিঠি দিল।

এইভাবে বিপদাপন্ন হইয়া এবার যখন চক্রবর্ত্তী মহাশয় পাতিরামের গদিতে আসিলেন, তখন তাহার মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মুখের সে ভঙ্গী নাই, ভাষায় সে মাদকতা নাই, বাহ্য মহানুভবতা খোলস ত্যাগ করিয়াছে!

চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে দেখিবামাত্র পাতিরাম কঠিন হইয়া রূঢ়স্বরে জানাইল,—আপনার কাছে আমি লোক পাঠাচ্ছিলুম, এসেছেন ভালই হয়েছে; টাকাগুলো আমাকে চুকিয়ে দিতে হবে—পনেরো দিনের মধ্যে।

চক্রবর্ত্তী অবাক্! তিনি আসিয়াছেন, গুপ্তকথা কেন ব্যক্ত হইয়াছে—তাহা জানিতে, উকীলের চিঠির কি জবাব দেওয়া যাইবে, তাহার যুক্তি লইতে!—কিন্তু আসিতে না আসিতে পাতিরামের মুখে এ কি কথা! সে ত তাগাদা করিবার পাত্র নয়, টাকা লইবার সময় কথা ছিল, মাসে মাসে সুদ দিয়া গেলেই চলিবে, আসলের জন্য ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। সুদ ত তিনি ফেলেন নাই; তবে?

উকীলের চিঠি দেখিতেই পাতিরামের মুখে ভাতিল নিষ্ঠুর হাসি, পরক্ষণেই যেন বোমা ফাটিয়া গেল! চীৎকারে খোলার ঘরে ঝনঝনা তুলিয়া ডাকিল,—জোচ্চোর, পাজী, বজ্জাত! জোচ্চুরীর আর যায়গা পাওনি! আমার কাছে জমী বন্ধক রেখে, সে কথা ভাঁড়িয়ে জমী বেচেছ অপরকে! এত বড় বুকের পাটা! তোমাকে যদি না আমি জেল খাটাই, আমার নাম পাতিরাম পাকড়ে নয়!

ব্রাহ্মণের সর্ব্বাঙ্গ তখন ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে! এত বড় অপমান এ পর্য্যন্ত কেহ তাঁহাকে কখনও করিতে পারে নাই। অতি কষ্টে আত্ম-সম্বরণ করিয়া তিনি কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন,—তুমি কি আজ নতুন হয়ে এলে, পাতিরাম! তোমার মুখে এ কথা শুনব, আমি কখনো প্রত্যাশা করিনি! বিনা অপরাধে তুমি আমাকে চোর-ছ্যাঁচড়ের মতন অপমান

করলে! বন্ধকী জমী আমি বিক্রয় করেছি সত্য, কিন্তু তুমিই কি আমাকে এ কার্য্যে প্ররোচিত করনি?

বোমা এবার ফাটিয়া চৌচির! হাত-মুখ খেঁচিয়া, কণ্ঠে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া পাতিরাম তারস্বরে গর্জ্জন করিল,—কি, মিথ্যাবাদী! আমি তোমাকে জুচ্চুরী করতে বলেছি? আমার কাছে যে জমী তুমি বন্ধক রেখেছ, জোচ্চোর, আমি তোমাকে তা বিক্রী করতে বলেছি? আমার নিজের পা দু'খানা তোমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আমি যোড়-হাত ক'রে দেখেছিলুম তোমাকে—দয়া ক'রে কুড়ুল চালাও ধর্ম্মাবতার!

ব্রাহ্মণের দুই চক্ষু ছাপাইয়া তখন অশ্রুর বন্যা ছুটিয়াছে। আর্ত্তস্বরে তিনি কহিলেন,—তোমার মত আমি ত চীৎকার করতে পারব না বাবা, সে শক্তি আমার নেই! তর্কও তোমার সঙ্গে আমি করব না, মা ব্রহ্মময়ী তোমার আমার সে দিনের কথা শুনেছেন, আজও শুনছেন। এখন তোমার কি হুকুম, তাই বল! আমি যখন তোমার কাছে ঋণী, যে কারণেই হোক, বন্ধকী সম্পত্তি যখন বিক্রয় করেছি, তখন অবশ্যই আমি অপরাধী। এখন কি তুমি আমাকে করতে বল?

পাতিরাম স্বর এবার অপেক্ষাকৃত নরম করিয়া কহিল,—আমার যা বলবার, প্রথমেই তা বলেছি। পনের দিনের মধ্যে যদি আমি সমস্ত টাকা বুঝে না পাই, তা' হ'লে যোল দিনের দিন দেওয়ানী ফৌজদারী দু দফা মামলাই আমাকে একসঙ্গে জুড়তে হবে।

একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন,—মা ব্রহ্মময়ীর যা ইচ্ছা, তাই হবে।

পাতিরামের ব্যবহার ও মিথ্যাচার নিষ্ঠাবান্ সরল ব্রাহ্মণের বুকে শেলের আঘাতের মত বাজিয়াছিল। এই বর্ব্বরের কঠোর ঋণপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তিনি সর্ব্বস্ব পণ করিলেন এবং পনের দিনের মধ্যেই তাঁহার ভদ্রাসন ও অবশিষ্ট সম্পত্তি বন্ধকের পরিমিত টাকাতেই বিক্রয় করিয়া অঋণী হইলেন। যে ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে কিয়দংশ সম্পত্তি পৌনে নয় শত টাকায় কিনিয়াছিল, সেই ব্রাহ্মণকে বিপদাপন্ন দেখিয়া ছয় হাজার টাকার সম্পত্তি তিন হাজারে ক্রয় করিল।

রেজিষ্টারী আফিসে টাকা উসুল করিতে গিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত পাতিরামের যখন চোখোচোখি হইল, পাতিরাম ওষ্ঠপ্রান্তে সেই হাসি টানিয়া ব্যঙ্গের সুরে কহিল,—মিছেই মা ব্রহ্মময়ীকে ডেকেছিলে ঠাকুর,—শেষরক্ষাটা তার সাধ্যে কুলোলো না!

চক্রবর্ত্তী মহাশয় মুখ ফিরাইয়া লইলেন, কোন উত্তর দিলেন না। সায়াহ্নে বাসায় ফিরিয়া মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সাশ্রুনয়নে আর্ত্তস্বরে কহিলেন,—মা ব্রহ্মময়ি! সর্ব্বহারা হয়ে তোর দ্বারকেই সার করতে হ'ল,—শেষরক্ষা তোরই হাতে।

* * * * *

ব্যবসায়-বুদ্ধির বিশেষত্ব স্বতন্ত্র জিনিষ; অখণ্ড আত্ম-বিশ্বাস, দুর্জ্জয় জেদ ও গভীর একাগ্রতা তাহার বাহন হইতে পারে,—কিন্তু বিপুল দম্ভ, মিথ্যাচার ও হঠকারিতা স্বতন্ত্র বস্তু, যেগুলি নির্দ্দিষ্ট আয়সম্পন্ন ধনাঢ্য ভূস্বামী বা রাজন্য-বর্গের পক্ষেই সাজে, ব্যবসায়ী ইহাদিগকে সাথী করিলে তাহার ব্যবসায়ের ভদ্রস্থ থাকে না।

হঠাৎ বাজার মন্দা পড়ায়, আড়তদারদিগকে মাথায় হাত দিয়া বসিতে হইল। পাতিরামের আড়তের বিপুল আয়ও সহসা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে দেখা গেল। যাহার কোনও পুষ্করিণীতে এ পর্য্যন্ত কখনো অজন্মা হয় নাই, অধিকাংশ পুকুরেই সে বৎসর মাছ আদৌ জন্মিল না; দীঘি-তুল্য যে কয়টি পুকুরে চারা মাছ রাখিয়া রীতিমত মাছের চাষ চলিত, সহসা সংক্রামকভাবে তাহাতে মাছের মড়ক দেখা গেল! অদৃষ্ট যখন উজ্জ্বল থাকে, সব দিক্ই জলজল করে, কিন্তু তৈলহীন প্রদীপটির মত অদৃষ্ট যখন নিজেই মিট-মিট করে, সবই বিসদৃশ দেখায়, ফলন্ত গাছগুলিও তখন আপনি শুকাইয়া যায়।

সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া পাকা ইমারত বানাইবার প্রবচন আমাদের দেশে শুনিতে পাওয়া যায়। কথাটার সার্থকতা বোধ হয় কোথায়ও আছে। আমাদের পাতিরামও অবশেষে সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া অট্টালিকা বানাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

চারিদিক্ দিয়া পাতিরামের ব্যবসায়ে যখন ভাঁটা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই সময় তাহার সহজাত দম্ভ—ও প্রতিবাসীদিগকে জব্দ করিবার মোহ তাহাকে দিক্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য করিয়া তুলিল। সমস্ত সঞ্চিত টাকা তুলিয়া সে

সস্ত সস্ত সমগ্র নিকিরিপাড়ার ইজারাদারী অপর ইজারাদারের নিকট হইতে খরিদ করিয়া বসে। অতিবুদ্ধিমান্‌কেও সময়বিশেষে এমন নির্ব্বোধের মত কায করিতে দেখা যায় যে, তাহার কার্য্যপদ্ধতির ত্রুটি বালকেরও বিস্ময় উৎপাদন করে! যুদ্ধক্ষেত্রে বিশ্ববিদিত বড় বড় জেনারলেরও এমন মারাত্মক ভুল প্রকাশ পাইয়াছে, ইতিহাসে যাহা পাঠ করিয়া আমরাও চমৎকৃত হইয়া থাকি। ছোটখাটো লেনদেনে দলিলের কাযে যে পাতিরামের অঙ্কুরন্ত অনুসন্ধিৎসা বিস্ময় বিস্ময় তুলিত,—লক্ষাধিক টাকার ব্যাপারে কিন্তু সেই উদ্দাম অনুসন্ধিৎসা মধ্যপথেই হোঁচট খাইল। পাছে সহরের কোনও অভিজাত শ্রেণীর প্রার্থী খবরটুকু জানিতে পারে, তজ্জন্য ব্যাপকভাবে বিশেষ কোনও তদন্ত না করিয়াই সে তাড়াতাড়ি ক্রয়কার্য্যটি সম্পন্ন করিয়া ফেলিল। ইহাই ছিল তাহার কর্ম্মজীবনের স্বপ্ন; সে স্বপ্ন আজ সিদ্ধ হইয়াছে, তাহার মত সুখী কে? এইবার সে সগৌরবে পল্লীভ্রমণের কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবে!

কথাটা কিন্তু পাড়ায় রাষ্ট হইতে বিলম্ব হইল না,—সকলেই এক দিন স্তব্ধবিস্ময়ে শুনিল, পাতিরাম পাকড়ে নিকিরিপাড়ার ইজারাদারী রাতারাতি কিনিয়া ফেলিয়াছে! তখনই পাড়ায় একটা বিভীষিকার ছায়া পড়িল, নানাস্থানে কাণাকাণি সুরু হইয়া গেল!

যেখানে যত খাতক ছিল, সকলকে কঠোরভাবে টাকা পরিশোধের তাগিদ দিয়া, কারবারের টাকা তুলিয়া পাতিরাম পাকড়ে অধিকার সাব্যস্ত করিবার জন্য বিপুল উদ্যমে পাড়ার বিশিষ্ট স্থানে ইট গাড়িতে উদ্যত হইল। তাহার খরদৃষ্টি সর্ব্বাগ্রেই মায়ের মন্দিরটির উপর! মন্দিরের সম্মুখে খোলা মাঠটির উপর যখন ইট, চূণ, সুরকীর গাড়ী আসিয়া গ্রামবাসীদিগকে ভীত চমকিত করিয়া তুলিয়াছে এবং তাহারা পাতিরাম পাকড়েকে কালাপাহাড়ের স্থলাভিষিক্ত করিয়া নিৰ্ব্বাক্ বিস্ময়ে সে দৃশ্য দেখিতেছে,—সেই সময় মূল জমীদার পালপাড়ার রাজাবাবুদের তরফ হইতে তাঁহাদের ম্যানেজার বহুসংখ্যক লাঠিয়াল ও পুলিস-প্রহরী সমভিব্যাহারে অকস্মাৎ অকুস্থলে উপস্থিত হইয়া পাতিরাম পাকড়ের এই ইটগাড়া কার্য্যে বাধা দিল।

পাতিরাম পাকড়ে এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে অগ্নিস্পৃষ্ট বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু স্থিরবুদ্ধি ম্যানেজার উচ্চ আদালতের ইনজংসনের আদেশ দেখাইয়া সেই মুহূর্ত্তেই তাহাকে স্তব্ধ করিয়া দিলেন।

সমাগত সকলেই উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, ভূতপূর্ব ইজারাদারের ইজারার মেয়াদ ফুরাইয়া গিয়াছে,—পাতিরাম পাকড়েকে তাহার ইজারাদারী বিক্রয় করিবার কোনও ক্ষমতা বা অধিকার নাই। পাতিরাম তদন্ত না করিয়া নিজের দায়িত্বেই এই বেকুবী করিয়াছে। আদালতের আদেশ অনুসারে রাজাবাবুর সরকার নিকিরিপাড়া মহলের উপর দখল লইতে আসিয়াছে, পাতিরাম পাকড়ের ইহাতে কোনও স্বত্ব-স্বামিত্ব নাই। সে এই মহলের এক জন সাধারণ প্রজা মাত্র।

শতকণ্ঠে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জনধ্বনি উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরাভ্যন্তর হইতে বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আবেগভরা কণ্ঠস্বর শুনা গেল,—মা রক্ষময়ি! সবই তোর ইচ্ছা। সর্ব্বহারা করতেও তুই,—সর্ব্বরক্ষা করতেও তুই।

পরক্ষণে দালানটির উপরে চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে দেখা গেল, সকলের স্তব্ধ দৃষ্টি তাঁহার দিকে। কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপন মনেই বৃদ্ধ গাঢ়স্বরে কহিলেন,—তোমারও শেষ রক্ষা হ'ল না, পাতিরাম। *

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* পাঠকপাঠিকাগণ পাতিরাম পাকড়ের চেহারাখানি মানসপটে আঁকিয়া রাখিতে ভুলিবেন না। কেন না, চলার পথে অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রথম এই হোঁচট পাইয়াও সে আত্মসংক্ষেপে তাল সামলাইয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল। মুখুয্যে বাবুদের ঋণের পরিমাণটুকু সে নোটবুকে টুকিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু এই সর্ব্বাগ্রে পরিশোধ্য ঋণটুকু পরিশোধ করিবার সুযোগ এ পর্য্যন্ত সে প্রাপ্ত হয় নাই। পাকড়ের পরবর্তী নূতন কর্ম্মজীবন—এই ঋণ পরিশোধের বিচিত্র বিবরণে সমুজ্জ্বল।



[উপন্যাস]

৩

লুণা এবং শিরী পরস্পরের মুখে চাহিয়া দেখিল। দুই জনেরই মুখে বিস্ময়ের ভাব, দুই জনেরই ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়াছে, দুই জনই যেন কি ভাবিতেছিল।

লুণা জিজ্ঞাসা করিল, কি ভাবছ?

শিরী বলিল, তা ত জানি নে। যেন কি রকম কি রকম মনে হচ্ছে।

—আমারও তাই। কি হয়েছে, বুঝতে পারছি নে।

আবার দুই জনে ভাবিতে লাগিল। হঠাৎ শিরী বলিল, এইবার বুঝতে পেরেছি। আমি তোমার গায় হাত দিলে কিছু মনে হয়?

এই বলিয়া শিরী লুণার কটিদেশ ধারণ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, আমি তোমাকে এ রকম ক'রে ধরলে কিছু মনে হয়?

—কৈ, কিছু না।

—আর যখন ঐ প্রহরীটা তোমাকে ধরেছিল?

লুণা বলিল, ঠিক কথা। তখন যেন কি রকম বোধ হচ্ছিল। হয় ত ভয় পেয়েছিলাম।

শিরী বলিল, উঁহু, ভয় নয়, ভয় পেলে ও রকম হয় না। এটা আর কিছু।

—তাই হবে। আমার এ রকম কখনও হয় নি তোমার হয়েছিল?

—না। এ যেন কি রকম।

দুই জনে হাসিতে লাগিল। হাসি থামিলে শিরী বলিল, দেখ, এ সব কথা কাউকে বলা হবে না। আমরা কি দেখেছি, আমাদের কি রকম ক'রে পাহাড়ে উঠতে দেয় নি, কোন কথা প্রকাশ করা হবে না।

লুণা বলিল, কোনমতেই নয়। তা হ'লে আমাদের রক্ষে থাকবে না। তবে আমরা কি বলব?

—আমরা বলব, বনের ভিতর ঘুরে বেড়াতাম, রাত্রিতে গাছতলায় শুয়ে থাকতাম। পাহাড়ে ওঠার কথা কিংবা মুখময় লোম কোন নতুন জীবের কথা কিছু বলা হবে না।

লুণা বলিল, কোনমতেই নয়, কিন্তু আমরা যাকে দেখলুম, ও কে? ও কি আর এক জাতের পরী? ওর মত কি আরও অনেক আছে?

শিরী বলিল, আছে নৈ কি! ঐ শুনলে না বললে, তারা পাহাড়ে চার দিকে পাহারা দেয়। ওরা আর এক জাতের পরীই হবে, তা নইলে আমাদের সঙ্গে কথা কইল কি রকম ক'রে? আমাদের কথা শিখলে কোথায়? এই দেখ, তোমরা পরী, আমরাও পরী, কিন্তু তোমাদের ডানা আছে, আমাদের নেই। তেমনি ওদের মুখে চুল আছে, আমাদের নেই।

এ যুক্তি খণ্ডন করিতে পারা যায় না। লুণা বিমনা হইয়া চুপ করিল। তাহার পর কতকটা নিজের মনে বলিল, তা যেন হ'ল, কিন্তু ওদের হাত আমাদের গায় ঠেকলে এ রকম হয় কেন?

শিরীও কি ভাবিতেছিল, বলিল, তা বলতে পারি নে। এ রকম ত আমাদের কখনও হয় নি, কি ক'রে জানব?

দুই জনে নৌকার অভিমুখে ফিরিয়া যাইতেছিল। দুই জনই কিছু অন্যমনস্ক, কাহারও মুখে বড় একটা কথা নাই। দুই জনের চিত্ত সঙ্কুচিত হইয়া আত্মগত হইয়াছিল। উভয়ের চিন্তা একই প্রকার। একটা নূতন অভিজ্ঞতা তাহাদের মনে হইতেছিল, কিন্তু সেটা যে কি, তাহা কিছুতেই স্থির করিতে পারিতেছিল না। পথে যাইতে যাইতে শিরী বলিল, এ দিকে ত পথ বন্ধ। একবার পূবদিকে দেখা যাবে?

লুণা একটা ডানা নাড়িয়া কহিল, সে দিকেও এই রকম হবে। এর পর কি আমরা আর যেতে পাব? এইবার দেখ না, ফিরে গেলে কি হয়।

এক রাত্রিতে লুণা ও শিরী ফিরিয়া আসিল। দুই জনে অলক্ষ্যে গোপনে নিজের নিজের গৃহে প্রবেশ করিল।

৬

পরদিবস দুই নগরে হই-চই পড়িয়া গেল। দলে দলে পরীরা লুণা ও শিরীর গৃহে উপস্থিত হইল। পথে দুই জনে দেখা হইলে এ উহাকে জিজ্ঞাসা করে, শুনেছ কথা? শিরী আর লুণা নাকি ফিরে এসেছে। ওদের বুকের পাটা দেখ, কাউকে কিছু না ব'লে কোথায় চ'লে গিয়েছিল।

ডানাওয়ালা পরীরা লুণাকে ঘিরিল। যাহাদের ডানা নাই, তাহারা শিরীর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। ছোট-বড়, বালিকা-যুবতী, প্রৌঢ়া-বৃদ্ধা নানা রকম পরীতে দুই গৃহ পূর্ণ হইল। বৃদ্ধারা দুই জনকে ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তোদের কি রকম আক্কেল দেখ দেখি! কাউকে কিছু না ব'লে কোথায় গিয়েছিলি? বালিকারা বলে, তোমরা কোথায় কোথায় গিয়েছিলে, কি দেখে এলে? সমবয়সীরা যাহারা এ পর্য্যন্ত কোথাও যায় নাই, চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করে, কোথায় গিয়েছিলে ভাই, আমাদের বল না, আমরা কাউকে বলব না। কেবল যাহারা সম্প্রতি পূর্ব্বদিকে অথবা পশ্চিমদিকে গিয়াছিল এবং যাহারা কন্যা-ক্রোড়ে অথবা পুত্রক্রোড়ে সাশ্রুনয়নে ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহারা প্রথমে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না, একদৃষ্টে লুণার অথবা শিরীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর অবসর পাইলে কাণের কাছে মুখ রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা পাহাড়ে গিয়েছিলে, সেখানে কাউকে দেখতে পেয়েছিলে? দেখতে আমাদের মত নয়, আর এক রকম?

এ প্রশ্ন আর কেহ শুনিতে পাইল না। সে জিজ্ঞাসা করিল, লুণা কিংবা শিরী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু দুই জনেরই মুখে এক কথা। দুই জনই বলিল, আমরা বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতাম। রাত্রিতে গাছতলায় শুয়ে থাকতাম। পাহাড়ে ওঠা শক্ত ব'লে আমরা পাহাড়ে উঠি নি। আমরা কোথাও কাউকে দেখতে পাইনি।

এ কথা মিথ্যা, কিন্তু দুই জনই পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছিল, সত্য কথা বলিবে না। উভয়ের বিশ্বাস, সত্য বলিলে বিপদ ঘটিবে।

আহারাদির পর মধ্যাহ্নের সময় লুণার ও শিরীর ডাক পড়িল। দুই দলে দুই জন বৃদ্ধা ছিলেন, সকল প্রকার অপরাধের বিচার তাঁহারাই করিতেন, তাঁহাদের আদেশ অনুসারে সকল কর্ম্ম হইত। ইঁহাদের আদেশ পালন করিবার জন্য উভয় প্রকারের কুড়ি জন যুবতী পরী নিযুক্ত ছিল। যে বৃদ্ধার পাখা ছিল, তাঁহার নাম হারা, যাঁহার পাখা নাই, তাঁহার নাম কামা। ইঁহাদের উপাধি ছিল প্রধানা। কেহ ইঁহাদের নাম ধরিয়া ডাকিত না, সকলে প্রধানা বলিত।

লুণাকে অপর পরীরা ঘিরিয়া রহিয়াছে, এমন সময় আর দুই জন আসিল। দুই জনের হাতে দুই গাছা যষ্টি, একটি সোনালি, আর একটি রূপালি। যাহার হাতে সোনালি ছড়ি, তাহার পাখা আছে, যাহার রূপালি ছড়ি, তাহার পাখা নাই। দুই জনকে দেখিয়া সকলেই চিনিল, সকলেই শঙ্কিত হইল।

যাহার হাতে সোনালি যষ্টি, সে লুণাকে বলিল, দুই প্রধানার আদেশ, তোমাকে তাঁদের সাক্ষাতে উপস্থিত হ'তে হবে। আমরা তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

লুণার হৃৎকম্প হইল, কিন্তু মুখে ভয় প্রকাশ করিল না, কহিল, শুধু আমাকে না আর কাউকে?

যাহার হাতে রূপালি ছড়ি, সে কিছু রুক্ষভাবে কহিল, তা আমরা জানি নে। আমাদের প্রতি যেমন আদেশ হয়েছে, তাই করছি।

লুণা উঠিয়া তাহাদের সঙ্গে গেল। আর কেহ কোন কথা কহিল না, সকলে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

দুই পাশে দুই যষ্টিধারিণী, মাঝখানে লুণা। পথে শিরীর সঙ্গে দেখা। তাহারও দুই পাশে সেই রকম দুই জন বেত্রবতী। শিরীকে নদী পার করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। দেখা হইতেই দুই জন হাসিয়া ফেলিল।

লুণা বলিল, এই যে, তুমিও ধরা পড়েছ।

শিরী বলিল, এক যাত্রায় পৃথক্ ফল হবে কেন?

লুণা বলিল, যাত্রা হ'ল আর কৈ? শুধু অযাত্রা সার।

এক বেত্রবতী বেত উঁচাইয়া বলিল, পথে কথা কহিবার হুকুম নেই।

লুণা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, হুকুম হ'লেই আমরা বোবা হই। কিন্তু তা হ'লে সেখানেও আমাদের মুখ দিয়ে কথা বেরুবে না। আর তুমি যে বেত উঁচিয়েছ, ও-গাছা কি আমাদের পিঠে পড়বে না কি?

বেত্রবতী যষ্টি নামাইল। বিরক্তভাবে কহিল, তোমরা ভেবেছ একটা তামাসা হচ্ছে, না? তামাসা কি কি, দেখলেই বুঝতে পারবে।

শিরী বলিল, সে ত আছেই, এখন তোমাদের সোণার কাঠি আর রূপার কাঠির বাহার দেখছি।

লুণা ও শিরীকে সঙ্গে করিয়া রক্ষিকারা একটা বড় বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

একটা প্রশস্ত কক্ষে হারা ও কামা বসিয়াছিলেন। উভয়ের শুভ্র কেশ, শীর্ণ দেহ, উজ্জ্বল চক্ষু। লুণা ও শিরী তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। হারা বেত্রবতীদিগকে আদেশ করিলেন, তোমরা বাইরে যাও।

তাহারা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

হারা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথায় গিয়েছিলে?

লুণা বলিল, আমরা বনে গিয়েছিলাম।

—কোন্ দিকে?

—পূর্বদিকে।

কামা বলিলেন, কাউকে ব'লে যাও নি কেন?

শিরী বলিল, তা হ'লে হয় ত আমরা যেতে পেতাম না।

হারা জিজ্ঞাসা করিলেন, বনে গেলে নৌকার কি আবশ্যক? আর নৌকা খুঁজে পাওয়া যায় নি। নৌকা কোথায় ছিল?

শিরী বলিল, আমরা খানিক দূর নৌকায় গিয়ে নেমে গিয়েছিলাম। নৌকায় বেশী দূর যাই নি। নেমে যাবার সময় নদীর ধারে খাগড়াবনে আমরা নৌকা লুকিয়ে রেখেছিলাম।

—বনে তোমাদের ভয় হ'ত না? রাত্রিতে কোথায় থাকতে?

লুণা বলিল, ভয় পাবার মত আমরা কিছু দেখতে পাই নি। রাত্রিতে গাছতলায় শুয়ে থাকতাম।

—তোমরা পাহাড়ে ওঠ নি?

—পাহাড় অনেক দূরে, অত দূর আমরা যাই নি।

—কোথাও কাউকে দেখতে পাও নি?

লুণা ও শিরী দুই জনে অত্যন্ত বিস্ময়ের ভাণ করিল। শিরী বলিল, কৈ, আমরা ত কাউকে দেখি নি।

কামা বলিলেন, মাঝে মাঝে তোমাদের মত যুবতীরা আর এক জনের সঙ্গে কোথায় যায় জান?

লুণা বলিল, তা ত আমরা জানি নে, আমাদের কেউ কিছু বলে না।

হারা বলিলেন, তোমাদেরও যাবার সময় হয়েছে, দুই এক মাসের মধ্যে তোমাদের পাঠানো হ'ত। তোমরা এক বছর যেতে পাবে না। এই তোমাদের শাস্তি।

লুণা ও শিরী চুপ করিয়া রহিল। হারা করতালি-শব্দ করিলেন। এক জন বেত্রবতী আসিল। হারা তাহাকে বলিলেন, এদের ছেড়ে দাও।

শিরী ও লুণা বাহিরে আসিল। শিরী রক্ষিকাদিগের প্রতি চাহিয়া, ব্যঙ্গ করিয়া কহিল, তোমরা কেউ আমাদের সঙ্গে যাবে না?

এক জন রক্ষিকা বলিল, তোমরা খালাস পেয়েছ, এই তোমাদের ভাগ্যি। এখন চুপচাপ ঘরে চ'লে যাও।

লুণা বলিল, কেন, গান গেয়ে যেতে দোষ কি?

দুই সখী মৃদুস্বরে গান করিতে করিতে চলিয়া গেল।

দুই জনে হাসিমুখে গৃহে ফিরিয়া গেল। নদী পার হইবার সময় শিরী বলিল, বিকেলবেলা আবার দেখা হবে। তুমি আসবে, না আমি যাব?

লুণা বলিল, আমিই আসব।

দুই জনের বাড়ীতে অপর পরীরা অপেক্ষা করিতেছিল।

যাহারা শিরীর বাড়ীতে ছিল, তাহারা বলিল, তুমি যে এরি মধ্যে ফিরে এলে ?

শিরী চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল, সেখানে ব'সে থেকে কি করব ? আমার কি খাবার নিমন্ত্রণ ছিল ?

—প্রধানারা কি বল্‌লে ?

—কি আবার বল্‌বে ? বল্‌লে, এক বছর আমরা কোথাও যেতে পাব না। না পেলাম বয়ে গেল।

যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহাদের মধ্যে এক জন এক প্রৌঢ়ার সঙ্গে গিয়া রিক্তক্রোড়ে সাশ্রু ম্লানমুখে ফিরিয়া আসিয়াছিল। সে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, গিয়েই বা কি হয় ? একবার বই ছুবার ত যেতে দেয় না।

শিরী তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল, বলিল, তোমরা সব কথাই চেপে রাখ, কারুর কিছু জানবার উপায় নেই। সবতাতেই যেন লুকোচুরী।

আর কোন কথা হইল না। লুণার বাড়ীতেও অনেকটা ঐ রকম কথা হইল।

সন্ধ্যার সময় লুণা শিরীর বাড়ী গেল। শিরী বলিল, দেখ, এখানে ত কারুর কাছ থেকে কোন কথা জানা যায় না, কিন্তু আমরা যা দেখে এসেছি, অপররাও তা দেখেছে। অনেকে আরও কিছু দেখে থাকবে। কেউ যখন কিছু বলে না, তখন আমরাই বা কেন বলতে যাব ? তবে একটা কথা আমার মনে পড়ছে। আজ অলকা এসেছিল, তার একটা কথায় আমার মনে হচ্ছে, সে কিছু বললেও বলতে পারে।

সে শিরীকে বলিয়াছিল, একবার বই ছুবার ত যেতে দেয় না, তাহার নাম অলকা।

লুণা বলিল, চল না তবে তাদের বাড়ী যাওয়া যাক।

ছুই জনে অলকার বাড়ী গেল। অলকাকে বলিল, আমাদের সঙ্গে একটু বেড়াতে যাবে এস।

প্রথমে অলকা একটু ইতস্ততঃ করিল, বলিল, তোমাদের আজ ডাক পড়েছিল, নিশ্চয় তোমাদের পিছনে কেউ না কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে। তোমরা কি কর, কোথায় যাও, সব খবর রাখে।

লুণা বলিল, আমাদের তাতে কিছু এসে যায় না। তুমি কি আমাদের সঙ্গে যেতে ভয় পাচ্ছ ?

অলকা বলিল, আমার যা হবার, তা ত হয়ে গিয়েছে, আমার আর কিসের ভয় ? কোথায় যাবে, চল।

নদীর ধারে না গিয়া তিন জন মাঠের দিকে গেল। অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, মাঠে কেহ কোথাও নাই। তিন জনে একটা গাছের গুঁড়ির উপর বসিল।

শিরী বলিল, তুমি যে তখন বললে, গিয়েই বা কি হয়, তার মানে কি ? একবার বই ছুবার যেতে দেয় না, সে কথা ত আমরা সকলেই জানি। কেউ মেয়ে কোলে ফিরে আসে, কেউ তোমার মত শুধু কোলে চোখের জলে ভেসে ফিরে আসে। এর মানে কি ? আর কেউ কোন কথা বলে না কেন ? যারা যায়, তারা ত চুপি চুপি যায় না, সঙ্গে আর এক জন থাকে। ফিরে এসে কাউকে কিছু বলে না কেন ?

অলকা নীরবে রোদন করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে অশ্রু সম্বরণ করিয়া, চক্ষু মুছিয়া বলিল, তোমরা এ সব কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন ? নিশ্চয় তোমরা কিছু দেখে এসেছ।

লুণা বলিল, তুমি যদি সব কথা আমাদের খুলে বল, তা হ'লে আমরাও বলব, কিন্তু আমাদের কথা বের ক'রে নিয়ে তুমি যদি কিছু না বল, সেটা ঠিক হয় না। প্রধানাদের আমরা কোন কথা বলিনি।

অলকা লুণার হাত ধরিল, বলিল, দেখ ভাই, আমি যেটুকু জানি, বলতে আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু আমাদের নিয়ে যাবার সময় আর ফিরে আসবার সময় এমন শক্ত দিব্য করতে হয় যে, তা কিছুতে ভাঙ্গা যায় না। তা ছাড়া ভয়ও আছে। তোমরা বুঝি শোননি যে, অনেক দিন আগে ছু এক জন ফিরে এসে কিছু কথা প্রকাশ করেছিল, তার পর তাদের আর কেউ দেখতে পায় নি ? কোথায় না কি নিয়ে গিয়ে বন্ধ ক'রে রাখে, আর ফিরে আসবার উপায় থাকে না। এ কথাও যেন তোমরা প্রকাশ কোরো না। সত্যি কথা এই যে, কেউ বিশেষ কিছুই জানে না। ছু চার মাস পরে তোমাদেরও যাবার কথা, তখন যা আমি জানি, তা তোমরাও জানতে পারতে। তোমরা কাউকে কিছু না ব'লে চ'লে গিয়েছিলে ব'লে তোমাদের যাওয়া এক বছর বন্ধ হ'ল। তোমরা কি দেখে শুনে এসেছ, তোমরাই জান।

শিরী বলিল, এ ত কিছুই বলা হ'ল না। দিব্য করলে তা ভাঙ্গা যায় না সত্যি, আর তা হ'লে তোমাকে আমরা কিছু জিজ্ঞাসাও করতে পারিনে। আমরা কারুর কাছে কোন দিব্য করিনি, সুতরাং আমরা যা জানি, বললে কোন দোষ নেই। আমরা কিছু প্রকাশ করিনি, তার কারণ, আমাদেরও

কেউ কিছু বলে না। প্রধানাদের কাছে ইচ্ছে ক'রে মিথ্যা কথা বলেছি; কারণ, ওদের কাছে সত্য কথা প্রাণান্তেও বলব না। তবে আমাদের মনে হয়, যা তুমি দেখেছ, সেটুকুও আমাদের দেখা হয়নি।

অলকা বলিল, তা আমারও মনে হয়। আমাদের পাঠিয়ে দেয়, আমরা প্রকাশ্যভাবে যাই। তোমরা লুকিয়ে গিয়েছিলে, তোমাদের কোন বাধা পড়া সম্ভব।

শিরী লুণার গা টিপিল। লুণা জিজ্ঞাসা করিল, বাধা আছে, তুমি তা জান?

অলকা বলিল, এ কথা ত পড়েই রয়েছে। বাধা না হ'লে তোমরা এত অল্পদিনে ফিরে এলে কেন? বন ত আর বেশী দূর নয়, তার পর চার দিকেই পাহাড়। নৌকা ক'রে যে দিকে যাও—পাহাড়। পাহাড়ে ওঠা কঠিন, আর হয় ত বাধাও থাকতে পারে, সেখানে—

অলকা হঠাৎ থামিয়া গেল, কি বলিতে যাইতেছিল, বলা হইল না।

শিরী বলিল, পাহাড়ে কি আছে, বল না। বলতে বলতে থামলে কেন?

অলকা বলিল, তোমরা যদি গিয়ে থাক ত দেখে থাকবে। হয় ত হিংস্র জন্তু আছে।

লুণা বলিল, জন্তু ছাড়া যদি আর কিছু থাকে? যদি আমাদের মত দেখতে কোন প্রাণী থাকে?

অলকা বিশেষ কৌতূহল প্রকাশ না করিয়া কহিল, তা থাকতে পারে। হয় ত তোমরা কিছু দেখেছিলে?

শিরী জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যখন গিয়েছিলে, কিছু দেখনি?

অলকা কহিল, সেই কথাই ত বলতে বারণ। হয় ত আমি যা দেখেছিলাম, তোমরাও তাই দেখেছ।

লুণা কহিল, আচ্ছা, আমরা যদি আবার যাই?

অলকা উত্তর করিল, তা হ'লে কি হবে, আমি বলতে পারিনে। হয় ত তোমাদের আর দেখতে পাব না!

লুণা ও শিরী কিছু জানিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিল। অলকা বাড়ী গেল। লুণা ও শিরী নদীর ধারে বসিয়া কথা কহিতে লাগিল।

শিরী বলিল, ওদের কাছ থেকে কোন কথা বেরুবে না।

লুণা কহিল, তা না হ'লেও আমরা কিছু কিছু বুঝতে পারছি। যখন আমাদের পাঠিয়ে দেয়, সে সময় কেউ আটকায় না। আর যাদের পাঠিয়ে দেয়, তারা অত দিন কোথায় থাকে? পাহাড়ে নিশ্চয় কোথাও থাকবার যায়গা আছে। যারা অমনি ফিরে আসে, তাদের মুখ কাঁদ-কাঁদ কেন হয়? যারা শিশু নিয়ে আসে, তারা তাদের কোথায় পায়? আর সব শিশুই দেখতে আমাদের মত। পাহাড়ে যাকে আমরা দেখলাম, তাদের মত কাউকে ত নিয়ে আসে না।

শিরী কহিল, তারা আর এক রকম জীব হবে। ঐ বললে শুনলে না, তাদের এখানে আসতে দেয় না। আমাদেরও না পাঠিয়ে দিলে অমনি যেতে দেয় না। ভিতরের কি যে ব্যাপার, কিছুই জানতে পারা যায় না। আর যারা কিছু বা জানে, তারা কোন কথা প্রকাশ করে না। তোমাদের নিয়ে যায় পূবে, আমাদের পশ্চিমে। এক দিকে যারা যায়, তারা অন্য দিকে কি আছে জানতে পায় না। যে পথে সকলে যায়, সে দিকে না গিয়ে আমাদের উত্তর কি দক্ষিণ দিকে গেলে হ'ত।

—তা হ'লে সমস্ত পথটাই হেঁটে যেতে হয়। আমি না হয় উড়ে যেতে পারি, কিন্তু তুমি তা ত পারবে না। আর চার ধারেই নিশ্চিত পাহারা আছে, তা নইলে এত দিনে কেউ পাহাড় পার হয়ে যেতে পারেনি কেন? আমি ভাবছি, আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখলে হয়।

শিরী বলিল, আমরা কখনই যেতে পাব না। একবার ধরা পড়েছি, আবার ধরা পড়লে আর হয় ত ছাড়ান পাব না। অলকা কি বললে শুনলে না? হয় ত আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে আর ফিরে আসতে পাব না, কারুর মুখও দেখতে পাব না! হয় ত আমাদের দুজনকেও একসঙ্গে রাখবে না।

লুণা কহিল, যদি ভেবে দেখ, তা হ'লে আমরা এখনি কারাগারে রয়েছি। খুব বড় কারাগার বটে, নদী আছে, নগর আছে, মাঠ-বন আছে, কিন্তু চারদিকে পাহাড়ের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। এ প্রাচীর লঙ্ঘন করবার আমাদের ক্ষমতা নেই। তোমার পা আছে, আমার পাখা আছে, তুমি হেঁটে যেতে পার না, আমি উড়ে যেতে পারিনে। পাহাড়ের গণ্ডীর মধ্যে আমরা আবদ্ধ, তার বাইরে পা ফেলবার উপায় নেই। এত কাল ধ'রে আমরা যে এখানে বাস করছি, কারুর কি কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না? পাহাড়ের ও পারে কি আছে, দেখতে ইচ্ছে হয় না? কত নগর, কত নদী, কত প্রকার জীব আছে, কে জানে?

আমরা ত পাহাড়ের উপর উঠতেই পাইনি, একটু যেতে না যেতে আমাদের আটকালে। যে প্রহরীকে আমরা দেখলাম; তার মত ত কাউকে এখানে দেখতে পাইনে। কি অসীম বল তার! আমাদের দুজনকে অনায়াসে শিশুর মত তুলে নিয়ে নীচে নামিয়ে দিল। তার স্পর্শে আমাদের ও রকম মনে হ'ল কেন? আর সেই ত বললে, তার মত পাহাড়ে আরও অনেক আছে। যাদের আদেশ তারা পালন করে, তারাই বা কে, কি রকম দেখতে? আমাদের প্রধানাদের মত বুঝি? আমরা এক রকম, ওরা আর এক রকম। আবার হয় ত পাহাড়ের ও দিকে আরও কত রকম আছে। কেন আমরা নিজের ইচ্ছে মত কোথাও যেতে পাব না, কেন আমাদের পথে কি পাহাড়ে আটকাবে?

শিরী বলিল, আমারও ঐ কথা। আমাদের জেলের ভিতর পুরে রেখেছে।

দুই বিদ্রোহী অনেকক্ষণ বসিয়া ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বসন্তসেনা

নিশীথে রাজপথটি বাহি' চলিয়াছিলে একাকী
জস্ত বনহরিণী সম চকিতে মেলি' দু' আঁখি।
দেখিনু নীল-নিচোল তব দোদুল দোলে বাতাসে,
মরি, কি রূপ মূরতিখানি! ভরিল প্রাণ পিয়াসে।

হাজার তারা মাথার পরে আলোকশিখা জ্বালিল,
রতনচূড় মুকুটখানি তোমারো শিরে শোভিল।
অঙ্গে আধ উত্তরীয় নিবিড়ভাবে জড়ায়ে
খানিক থামি', আবার দিলে চরণদু'টি বাড়ায়ে।

বিলোল দু'টি নয়নপাতে কি ভাষা পড়ে গোপনে!
যে মায়া জাগে অধরপরে দেখিনি তাহা জীবনে।
সারাটি দেহ ব্যাপিয়া কিবা ছড়ানো মধুমাধুরী!
চলিতে পথে চকিতে যেন ঝলকি পড়ে বিজুরী।

তরুণ তব প্রাণের পথে কে গেল চলি' নিভৃতে,—
ব্যাকুল নাকি মানসপটে তাহারি ছবি আঁকিতে?
চলিতে সে কি বারেক থামি' তোমার চোখে চেয়েছে?
প্রেমের মোহমন্ত্রে বুঝি তাইতে হিয়া গলেছে।

সে দিন মধুকাননে ছিল ফাগের খেলা ফাগুনে,
তরুণী যত বিবশা সবে মাখা'তে রঙ্ তরুণে।
তোমারো প্রাণে চকিতে কি গো খেলিয়া গেল বিজলী?
সরমে রাঙা কপোল-দুটি উঠিল আরো উজলি'!

গোপনে আসি' মলয় তব চুমিয়া গেল অলকে,
দেখিলে চাহি' অশোকশিরে চাঁদের আলো ঝলকে।
মুকুলপদে বসিলে আসি' মাধবীলতাবিতানে,
হারালে শিশুমনখানি কোথায় আজি কে জানে!

বিগত মধু—নিদাঘ এলো—কখন্ গেল জানি না!
বুঝি বা তব কেটেছে দিন শয়নে হয়ে বিলীনা।
শিয়রে অনাদরেতে বেলা ফুল ত ঝ'রে গিয়েছে,
বাজেনি বীণা, নয়নে শুধু অশ্রু ছেয়ে এসেছে।

আষাঢ়ে যবে আকাশ ছেয়ে ঘনায়ে এলো বরষা,
দেখিনু চাহি' চপলপদে বাহিরে এলে সহসা।

নগরপথে আলোকমালা নিবিয়া গেছে বাতাসে,
জীমূত-রবে কাঁপিল বুক, লুটালে ভূমে তরাসে।
কি মায়া ছিল নীরবে চাওয়া সলাজ দুটি নয়নে!
কি মোহ ছিল পাগল-করা করুণাভরা বচনে!
হৃদয়ে যত বাসনারাশি জুড়িয়া বসি' আঁখিতে
নিমেষে কি গো প্রেমিকাজনে শিখালো ভালোবাসিতে?

যে বলে বারবিলাসিনী তোমারে, ক'রে হেয় গো—
মিনতি করি—তাহার পানে হাসিয়া শুধু চেয়ো গো।
জানে না সে যে সর্ব্বহারা প্রেমের কত মহিমা,
জানে না প্রেমে দেবতা করে মুছিয়া পাপকালিমা।

নামে যে এত পুলক আনে তাহা ত আগে বুঝিনি,
তুমি যে "সেনা বসন্তের" সে কথা আগে জানিনি।
জানিনি, তব তরুণশোভা যে শুধু চেয়ে দেখেছে,
তখনি কেন অধররসে স্বরগসুধা মেখেছে!

বিভবসুখ ত্যজিয়া তুমি যাহারে ভালবেসেছ,
কাঁদায়ে তারে বেদনাভারে নিজেই কত কেঁদেছ।
রোদেতে আঁখি অরুণ করি' করুণা যেছ তুলিয়া,
তখনি অনুতাপের ভারে উঠেছে বুক ফুলিয়া।

ধন্য মরি, ভালবাসা ধন্য তারো মহিমা!
আজিও তব নামের সাথে জড়ায়ে আছে গরিমা।
আজিও সখি! তমাল কালো বাদল সাঁঝে গোপনে
তোমারি কথা স্মরিয়া মম অশ্রু ঝরে নয়নে।

ফাগুন আজি এসেছে ঐ আগুন জেলে ধরাতে,
বাতাবি আর অশোককলি মেতেছে রাগ ছড়াতে।
মুখের সুরাস্বরভিসেকে দোহদ মাগে বকুলে।
এসো গো সেনা! জড়ায়ে তনুদেহটি নীলদুকূলে।

হায় গো! কত উদাস সাঁঝে বাতাস মরে কাঁদিয়া!
বনের পথে বৃথাই মরে ফুলের রেণু ঝরিয়া!
আবার এসো স্বপন-গাঙে বাহিয়া প্রেম-তরণী,
তেমনি ক'রে ভাসুক পুনঃ পুলকস্রোতে ধরণী।

শ্রীবাসন্তীকুমার ভট্টাচার্য্য (এম্-এ)

বৈষ্ণব-মতবিবেক

৭

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য ও নিম্বার্ক সম্প্রদায়

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতে চতুঃসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব মত প্রচলিত। ইঁহাদের মধ্যে বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের স্থলাধিকারী শ্রীবল্লভ সম্প্রদায়ের মূলাচার্য্য শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্যের জীবনকথা, মতবাদ ও সাধনপ্রণালী পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। তৎপরে শ্রীমন্মধ্ব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন-কথা, দার্শনিক মতবাদ ও সাধনপ্রণালীরও আলোচনা করা গিয়াছে। তৎপরে শ্রীসম্প্রদায়ের প্রধানাচার্য্য শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যের জীবন-কথা, দার্শনিক মতবাদ ও সাধনপ্রণালীর আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এইবার প্রাচীন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যতম সম্প্রদায় শ্রীনিম্বাদিত্য বা নিম্বার্কাচার্য্য সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীমন্নিম্বার্কাচার্য্যের জীবন কথা, সাম্প্রদায়িক মতবাদ ও সাধন-প্রণালীর আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আচার্য্যগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির স্বরূপ নির্দ্দেশের আকাঙ্ক্ষা বশতঃই এই কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে হইয়াছে। ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাদের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক। তবে সাধুগণের কৃপা অযোগ্যের প্রতি সমধিক বর্ষিত হইয়া থাকে, এই জন্যই শ্রীসুদর্শনাবতার শ্রীমন্নিম্বার্কদেবকে প্রণাম পুরঃসর এই কার্য্যে হস্তার্পণ করা গেল।

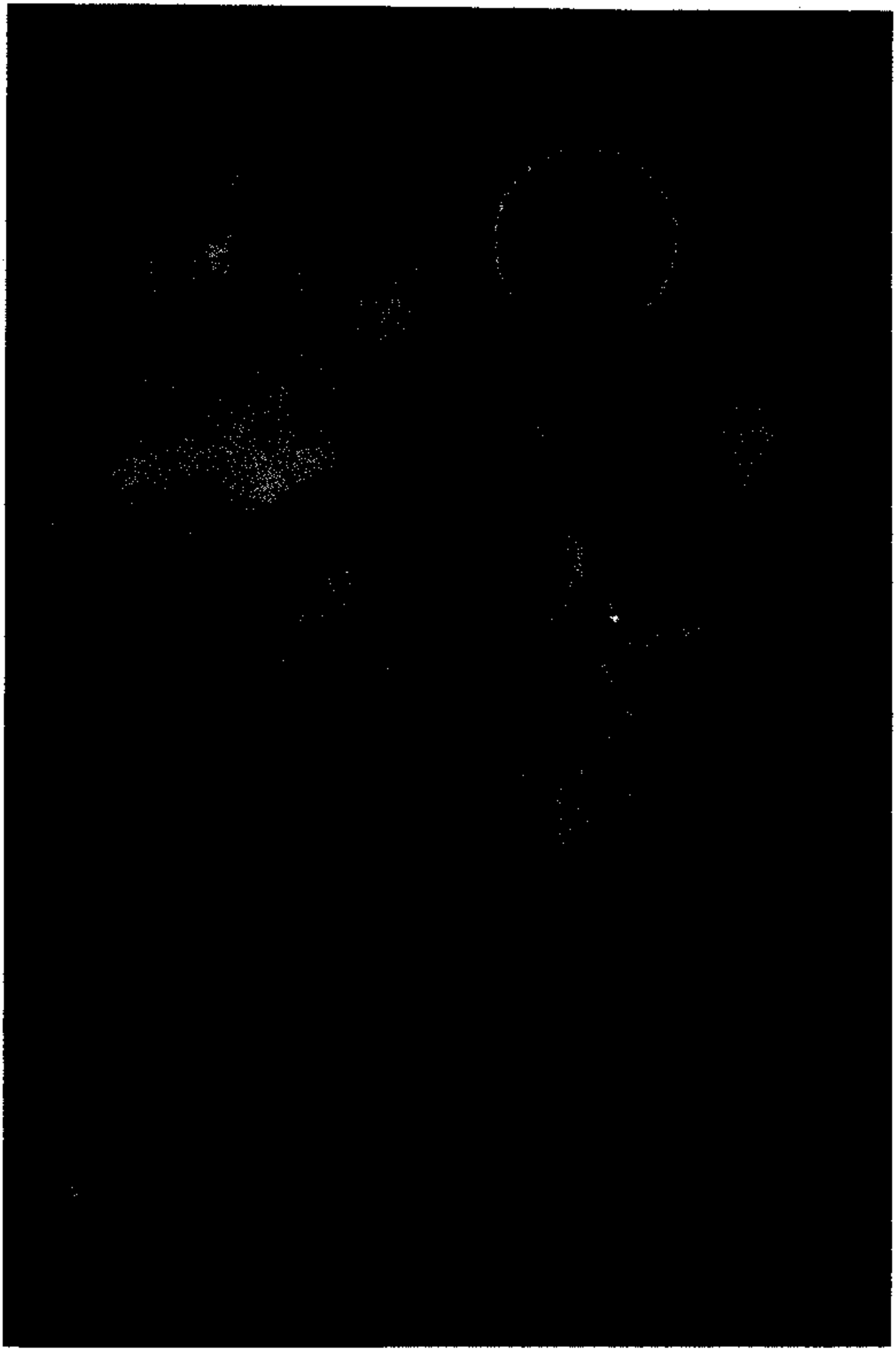
সময়-নির্দ্দেশ

শ্রীনিম্বার্ক, নিম্বাদিত্য বা নিয়মানন্দাচার্য্যের আবির্ভাব-সময় নির্দ্দেশ করা বড়ই দুঃসাধ্য। তবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে, ঐ সম্প্রদায়ের দেবাচার্য্যের সময় ১০৫৬ খৃষ্টাব্দ। যুগকরেন্দু অর্থাৎ ১১১২ সম্বতে তাঁহার জন্মকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ১১১২ বিক্রম সম্বতে ১০৫৬ খৃষ্টাব্দ হইয়া থাকে। গুরুপ্রণালী হইতে দেখা যায় যে, দেবাচার্য্য হইতে ১২ জনের পূর্ব্বে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য অবস্থিত। এই ১২ জনে স্থূলতঃ তিন শত বৎসর হইলে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীল নিম্বার্কাচার্য্য আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া স্থূলতঃ ধরিয়া লওয়া যায়। আবার অন্য দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরী শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হন। শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালীতে দেখা যায় যে, কেশব কাশ্মীরির ১৬ জনের পূর্ব্বে শ্রীল দেবাচার্য্যের আবির্ভাব হয়। স্থূলতঃ চারি জনে এক শত বৎসর করিয়া ধরিলে কেশব কাশ্মীরির আবির্ভাবের চারি শত বৎসর পূর্ব্বে দেবাচার্য্যের আবির্ভাবকাল ধরা যায়। ইহাতে দেখা যায় যে, ১০৮৬ খৃষ্টাব্দে দেবাচার্য্যের আবির্ভাবকাল। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, উহার ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ১০৫৬ খৃষ্টাব্দে দেবাচার্য্য আবির্ভূত হন। গুরুপ্রণালী অনুসারে কেশব কাশ্মীরীর ২৮ জনের পূর্ব্বে শ্রীনিম্বার্ক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সুতরাং এ মতে শ্রীমন্নিম্বার্কদেবের প্রাদুর্ভাবকাল স্থূলতঃ কেশব কাশ্মীরীর ৭ শত বৎসর পূর্ব্বে। ইহাতেও শ্রীনিম্বার্কের প্রাদুর্ভাবকাল অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। এইরূপ আনুমানিক গণনায় পঞ্চাশ বা এক শত বৎসরের প্রভেদ হওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তদনুসারে শ্রীমন্নিম্বার্কদেবের আবির্ভাব অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে না হইয়া সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগেও হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবকালও সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব শ্রীল নিম্বার্কদেব শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী হইতে পারেন।

শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অনেকেই শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীমদাচার্য্য শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারেন না বলিয়া আপত্তি করিয়া থাকেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, শ্রীপাদ নিম্বার্ক ও নিম্বার্কভাষ্য শঙ্করের শারীরক ভাষ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর অবশ্যই স্বীয় ভাষ্যে তাহার উল্লেখ করিতেন। কিন্তু এরূপও হইতে পারে যে, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সংখ্যাল্পতা হেতু ঐ সম্প্রদায় আচার্য্য শঙ্করের গোচরীভূত না হওয়ায় তাঁহার ভাষ্যে বা পরবর্ত্তী শঙ্করবিজয় গ্রন্থে নিম্বার্কের বা তাঁহার সম্প্রদায়ের কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। শ্রীমদাচার্য্য রামানুজ ও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য উভয়েই শ্রীমন্নিম্বার্কদেবের পরবর্ত্তী; কিন্তু তাঁহাদের কেহই তাঁহাদের ভাষ্যে নিম্বার্কমতের উল্লেখ করেন নাই; ইহাতে এ কথা প্রমাণ হয় না যে, শ্রীমদাচার্য্য ইঁহাদের পরবর্ত্তী।

পক্ষান্তরে এ আপত্তিও উঠিতে পারে যে, আচার্য্য শঙ্করের মতবাদ যখন নিম্বার্ক ভাষ্যে খণ্ডিত হয় নাই, তখন আচার্য্য শঙ্কর আচার্য্য নিম্বার্কের পরবর্ত্তী, কিন্তু ইহাও হইতে পারে যে, দেবর্ষি নারদের শিষ্য সত্ত্বগুণাবলম্বী নিম্বার্ক মাত্র ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্যমাত্র ব্যাখ্যা সম্প্রদায় রক্ষণের জন্য করিয়াছেন, বাদ প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্তই অনাবশ্যক মনে করিয়াছেন।

নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, তাঁহাদের আচার্য্যদেব যখন শ্রীমন্নারদের শিষ্য, তখন তিনি বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, দেবর্ষি নারদ ব্যাসদেব প্রমুখ ঋষিগণ কল্পান্তজীবী। তাঁহারা এখনও বর্ত্তমান আছেন। উপযুক্ত অধিকারী এখনও তাঁহাদের দর্শনলাভ করিয়া থাকেন, না হইলে মধ্বসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক আচার্য্য মধ্ব কি প্রকারে শ্রীমৎ ব্যাসদেবের শিষ্যত্ব লাভ করিলেন? আচার্য্য শঙ্করই বা কি প্রকারে ব্যাসদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন? সুতরাং শ্রীমন্নিম্বার্কাচার্য্যকে ঐতিহাসিককালে আনয়ন করিলেও তাঁহার ঋষি সম্প্রদায়ের সহিত যোগসূত্র ছিন্ন হইবে না। পরন্তু ঋষি সম্প্রদায়ের সহিত অদ্যাপিও বর্ত্তমান থাকিয়া তিনি স্বীয়



তরঙ্গ-দেবতা

বসুমতী-চিত্র-বিভাগ]

শিল্পী—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সম্প্রদায়ের পরম মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিতেছেন এবং উপযুক্ত অধিকারীকে তাঁহারা এখনও দর্শন দান করিয়া শক্তিসঞ্চার করিতেছেন, এ বিশ্বাস যেন তাঁহারা পরিত্যাগ না করেন।

শ্রীভগবান্ হংসাবতাররূপে আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্মার মানসপুত্র—সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার—এই চতুঃসনকে পরাবিদ্যা দান করেন। শ্রীমদ্দেবর্ষি নারদ ইঁহাদের নিকট হইতে সেই পরাবিদ্যা লাভ করেন। শ্রীমন্নারদ হইতেই শ্রীমদ্ ব্যাসদেব ও শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য এই বিদ্যা লাভ করেন। শ্রীমন্নিম্বার্কদেব শ্রীমন্নারায়ণের হস্তস্থিত সুদর্শনচক্রের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীমন্নিম্বার্কদেব নিজেই বলিয়াছেন যে, "পরমাচার্য্যৈঃ শ্রীকুমারৈরস্মদ্ গুরবে শ্রীমন্নারদায়োপদিষ্টো 'ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য' ......" ব্রহ্মসূত্র ভাষ—১।৩।৮ অর্থাৎ "আমার পরমগুরু শ্রীকুমারগণ বা চিরকুমার চতুঃসন আমার গুরু শ্রীমৎ দেবর্ষি নারদকে 'যাহা ভূমা, তাহা তুমি বিজ্ঞাত হও' বলিয়া উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।" ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্রীমন্নারদের প্রতি এই উপদেশের উল্লেখ আছে। এ স্থলে শ্রীমন্নিম্বাদিত্য শ্রীমদ্দেবর্ষি নারদকে নিজের গুরু ও চতুঃসনকে পরমগুরু বলিয়া স্বীকার করিতেছেন।

মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ে শ্রীমন্মধ্বও শ্রীব্যাসদেবকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং দেবর্ষি নারদ যে ব্যাসদেবের উপদেষ্টা, ইহাও শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের যে গুরুপ্রণালী স্বীকৃত হয়, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ হইতে ব্রহ্মা ও ব্রহ্মা হইতে নারদ ও দেবর্ষি নারদ হইতে ব্যাসদেবকে ও তদনন্তর শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই গুরুপ্রণালী স্বীকার করিলে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সহিত শ্রীমন্নিম্বার্কের সম্পর্ক নিতান্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়ে। মাধ্বসম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ উত্তরাদি মঠ হইতে যে গুরুপ্রণালী পাওয়া যায়, তাহাতে ১। হংস পরমাত্মার শিষ্য ২। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, তচ্ছিষ্য ৩। সনকাদি চতুঃসন। * এই গুরুপ্রণালী সত্য হইলে মাধ্বসম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠতা আরও অধিক বলিয়া ধরা যায়। কারণ, এমতে হংস ভগবান্ই নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ন্যায় মধ্ব সম্প্রদায়েরও আদি প্রবর্ত্তক এবং নিম্বার্কসম্প্রদায়ের গুরু সনকাদি মধ্বসম্প্রদায়েরও গুরু হইয়া পড়েন। ফলতঃ এ সম্বন্ধে বাদ বিতর্কাদির অবকাশ থাকিলেও সম্প্রদায় হইতে যাঁহাদিগকে আদিগুরু বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে, তাঁহাদিগকেই স্বীকার করিয়া লওয়া সামঞ্জস্যসম্মত বলিয়া মনে হয়।

শ্রীমন্নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মতে শ্রীমন্নিম্বার্কদেব খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে তৈলঙ্গদেশে আবির্ভূত হন। শ্রীবৃন্দাবনে ধ্রুবঘাটের গদীর মোহান্তগণ বলেন যে, নিম্বার্কদেব খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়া ঐ গদী প্রতিষ্ঠিত করেন। তদবধি শিষ্যপরম্পরাক্রমে শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক শ্রীল হরিব্যাসের অধস্তন সন্তানগণই ঐ গদীর মোহান্তপদে অধিষ্ঠিত হইয়া আসিতেছেন। শ্রীমদাচার্য্য নিম্বার্কদেবের আবির্ভাব-সময়ের সম্বন্ধে আমাদের মতভেদ ও তাঁহার ভিত্তিমূলক যুক্তি আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। আবির্ভাবসময় সম্বন্ধে মতভেদ হইলে ধ্রুবঘাটের বা ধ্রুবক্ষেত্রের গদীর প্রতিষ্ঠার সময় সম্বন্ধে মতভেদও অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে; কিন্তু তদ্ব্যতীত ধ্রুবঘাটের গদীর মোহান্তগণের বংশধরাদি সম্বন্ধে আমরা এই সম্প্রদায়ের অভিমতকে অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ দেখিতে পাই না।

একশ্রেণীর ঐতিহাসিকম্মন্য ব্যক্তিগণের মতে শ্রীমদ্ ভাস্করাচার্য্যই ভেদাভেদবাদের সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তক। ভাস্করাচার্য্য ও নিম্বার্কাচার্য্য একার্থবোধক, অতএব শ্রীমন্নিম্বার্কের স্বতন্ত্র কোনও অস্তিত্ব ছিল না। বৈদান্তিক ভাস্করাচার্য্যই পরবর্ত্তী কালে সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নিম্বার্ক নামে অভিহিত হইয়াছেন এবং তজ্জন্যই ঐ ভাস্কর সম্প্রদায়ই পরবর্ত্তী কালে নিম্বার্ক সম্প্রদায় নামে পরিচিত হইয়া পড়িয়াছেন। এই মত এত অসার, অনৈতিহাসিক ও অমূলক যে, ইহার আলোচনা করাও অনাবশ্যক বলিয়া মনে করি। একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সুপ্রাচীন সম্প্রদায়কে যাঁহারা এইরূপভাবে একবারে উড়াইয়া দিতে চাহেন, আমরা তাঁহাদের বুদ্ধির কোনওরূপে প্রশংসা করিতে পারি না। ভগবান্ নিম্বার্কদেব ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং তিনি নিজে আবির্ভূত হইয়া জীবের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া যে সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিয়া "বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ" নামক বেদান্তভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। তবে প্রাচীনকালে বর্ত্তমান কালের বৈষয়িক-জ্ঞানপ্রধান ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার প্রথা না থাকায় শ্রীল নিম্বার্কদেবের জীবনকথা বিস্তৃতভাবে জানিতে পারা যায় না, এ কথা সত্য; কিন্তু সুপ্রাচীন মহাজনগণের বা অবতারকল্প মহাপুরুষের বৈষয়িকজ্ঞান-প্রধান ইতিহাস রক্ষা করা হয় ত তখনকার স্বাধীন উন্নতজাতির পক্ষে প্রয়োজনীয় মনে হয় নাই। এ কথাও অসম্ভব নহে যে, নানাপ্রকার রাষ্ট্রবিপ্লব ও বিধর্ম্মীর অত্যাচারে বহু ধর্ম্মগ্রন্থ ও ইতিহাসগ্রন্থ ভারতবর্ষ হইতে চিরকালের জন্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

শ্রীনিম্বার্কদেব খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে বা অষ্টম শতাব্দীর প্রথমে তৈলঙ্গদেশীয় জগন্নাথ নামক এক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। সম্ভবতঃ উপযুক্ত বয়সে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নিয়মানন্দ নাম গ্রহণ করেন এবং শ্রীবৃন্দাবনের ও মথুরামণ্ডলের সর্ব্বতীর্থ ভ্রমণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের নিকটস্থ ধ্রুব পাহাড়ে আশ্রম স্থাপন করিয়া শ্রীভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত থাকেন। ইনি শ্রীভগবান্ নারায়ণের হস্তস্থিত শ্রীসুদর্শনচক্রের অবতার। অতি প্রাচীন কাল হইতে শ্রীসুদর্শনকে শ্রীভগবান্ নারায়ণের সহিত উপাসনা করিবার প্রথা আছে। শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমধামে ঐ জন্যই শ্রীসুদর্শনের বিগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ে আচার্য্য নিম্বার্ক সুদর্শনের অবতার বলিয়াই পূজিত হইয়া আসিতেছেন। শ্রীনিম্বার্কদেবের শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য শ্রীনিম্বার্কের বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ মতে বেদান্ত-কৌস্তুভ নামক ব্রহ্মসূত্রের একটি ভাষ্য রচনা করেন। ইঁহার প্রশিষ্য শ্রীল পুরুষোত্তমাচার্য্য 'বেদান্ত-রত্নমঞ্জুষা' নাম্নী টীকাগ্রন্থে শ্রীল নিম্বার্কাচার্য্যের পরিচয় প্রসঙ্গে বলিতেছেন ;—

"[illegible]বেত্তা শ্রীবাসুদেবেন বিষ্ণুনা আত্মজ্ঞাপিত-বেদমার্গ-

---

* উত্তরাদি মঠের গুরুপ্রণালী এইরূপ :—১। হংস ২। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ৩। সনকাদি ৪। দুর্ব্বাসা ৫। জ্ঞাননিধি ৬। গরুড়বাহন ৭। কৈবল্যতীর্থ ৮। জ্ঞানেশতীর্থ ৯। পরতীর্থ ১০। সত্যপ্রজ্ঞতীর্থ ১১। প্রাজ্ঞতীর্থ ১২। অচ্যুতপ্রেক্ষাচার্য্যতীর্থ ১৩। মধ্বাচার্য্য। এই গুরুপ্রণালীতে মধ্বাচার্য্য হংস ভগবান্ হইতে শিষ্যপরম্পরায় ত্রয়োদশ এবং নিম্বার্কসম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালী মতে শ্রীমন্নিম্বার্কদেব হংস ভগবান্ হইতে চতুর্থ স্থানীয়।

সংরক্ষণায় নিযুক্তঃ নিরতিশয়ঃ আত্মপ্রিয়ঃ আত্মশক্তি-উপবৃংহিতঃ অনন্তশক্তিস্বহস্তাবধারকঃ নিজায়ুধঃ কোটিসূর্য্যসমপ্রকাশঃ ভগবান্ সুদর্শনঃ অবনীতলাবতীর্ণ-তৈলঙ্গ-দ্বিজবরাত্মনা তস্মিন্নেব নিয়মানন্দাভিধ-ভগবদীয়াং সনাতনীং কলৌ নিষ্ঠাং বেদান্তসন্ততিং প্রবর্ত্তয়িষ্যন্ শারীরকমীমাংসাবাক্যার্থরূপঃ বেদান্তপারিজাতসৌরভাদি-গ্রন্থরচনাব্যাজেন সর্ব্ববেদান্তার্থং সংগ্রহেণ সন্দর্শয়ামাস।"

অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীবাসুদেব বিষ্ণু কর্ত্তৃক তাঁহার নিজস্থাপিত বেদমার্গ সংরক্ষণের জন্য নিযুক্ত সর্ব্বশক্তিসমন্বিত নিজপ্রিয় এবং নিজের শক্তির দ্বারা পরিপুষ্ট অনন্তশক্তিময় নিজহস্ত দ্বারা ধৃত নিজাস্ত্র কোটিসূর্য্যসমান প্রভান্বিত ভগবান্ সুদর্শন তৈলঙ্গদেশী দ্বিজবরের আত্মজরূপে অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া নিয়মানন্দ নাম ধারণ করেন। তিনিই কলিযুগে স্থাপিত ভগবদীয় সনাতন বেদান্তমার্গ প্রবর্ত্তন করত শারীরক-মীমাংসা-বাক্যার্থরূপ বেদান্তপারিজাত-সৌরভাদি গ্রন্থরচনাচ্ছলে সমস্ত বেদান্তের অর্থ-সংগ্রহপুরঃসর প্রকাশ করিয়াছেন।"

এই নিয়মানন্দ স্বামীই পরে অসাধারণ প্রভাবের পরিচয় প্রদান করায় ইনি পরবর্ত্তী কালে নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য নামে প্রসিদ্ধ হন। শ্রীবৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তী ধ্রুবটিলায় বা ধ্রুব পাহাড়ে আচার্য্য নিয়মানন্দ স্বামীর আশ্রম ছিল। এক দিন দিবাবসানে বহুসংখ্যক যতি আচার্য্যের আশ্রমে উপস্থিত হন। আচার্য্য এই যতিগণের আতিথ্যবিধানের জন্য যোগবলে বহুতর ভোজ্যসামগ্রী উপস্থিত করেন; কিন্তু যতিগণ সূর্য্যাস্তের পর ভোজন নিয়মবিরুদ্ধ বলিয়া ভোজ্যদ্রব্যগ্রহণে অস্বীকৃত হন। আচার্য্য তখন আশ্রমস্থ নিম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া শ্রীমন্নারায়ণায়ুধ শ্রীশ্রীসুদর্শন চক্রকে ঐ নিম্ববৃক্ষের উপরিভাগে আহ্বান করেন। যতিগণ কোটিসূর্য্যসমপ্রভ চক্রবরকে সূর্য্য বলিয়া ভ্রম করেন এবং তখনও দিবস প্রায় এক প্রহর অবশিষ্ট আছে বলিয়া অনুমান পুরঃসর আচার্য্যের প্রদত্ত ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণে স্বীকৃত হন। যতিগণের ভোজন শেষ হইলে আচার্য্য নিয়মানন্দ সুদর্শন চক্রকে নিম্ববৃক্ষ ত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিতে অনুমতি করেন। সুদর্শনচক্র অন্তর্হিত হইলে যতিগণ তখন বুঝিতে পারেন যে, রাত্রি প্রায় এক প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। আচার্য্য নিয়মানন্দ স্বামীর এই অপূর্ব্ব প্রভাব দর্শন করিয়া যতিগণ তখন আশ্চর্য্যান্বিত হন। এই সময় হইতে সাধু-সমাজে আচার্য্য নিয়মানন্দ নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য নামে বিখ্যাত হন। নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্‌ভজনপরায়ণ বৈষ্ণবরা স্বভাবতঃই ঐশ্বর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন। শ্রীমদাচার্য্য নিয়মানন্দ আতিথিসেবায় বিশেষ বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা না ঘটিলে এই প্রকার অদ্ভুতপূর্ব্ব প্রভাবের পরিচয় প্রদান করিতেন না। যতিগণের সেবার জন্যই তিনি যোগবলে আহার্য্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন,—ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি যোগীশ্বর হইলেও মাত্র সাধুসেবা বা ভক্তসেবার জন্যই স্বীয় যোগৈশ্বর্য্যের ব্যবহার করিতেন। যাহা হউক, যোগেশ্বর নারদের শিষ্য ভগবান্ নিম্বার্কদেব শ্রীভগবানের লীলাভূমি মধুবনের নিকটস্থ ধ্রুবটিলায় আশ্রম স্থাপন করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থানকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন। যতদূর জানা যায়, তাহাতে চতুঃসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের মধ্যে এই সম্প্রদায়ই সর্ব্বপ্রথমে মধুপুরীর সান্নিধ্যস্থিত শ্রীবৃন্দাবন ধামকেই বৈষ্ণবের অবশ্য আশ্রয়ণীয় তীর্থ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ এবং সর্ব্বাবতারের অবতারী পরতত্ত্বরূপে পরবর্ত্তী কালে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়েরই এক শাখা শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

অনেকে মনে করেন যে, আচার্য্য নিম্বার্কই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীরাধা-সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার প্রবর্ত্তন করেন। এই মতবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে বলিবার অনেক কথা আছে।

ঐ সকল কথা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলপ্রবাহ ও স্বরূপের সম্বন্ধে দুই একটি কথা আলোচনার প্রয়োজন। শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর গীতাভাষ্যের ভূমিকায় বেদোক্তধর্ম্মকে প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মের প্রচারের আদিকর্ত্তা সনকাদি চতুঃসন। আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—"সনকসনন্দাদীনুৎপাদ্য নিবৃত্তিধর্ম্মং জ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণং গ্রাহয়ামাস।" অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে মরীচ্যাদি ঋষিগণের দ্বারা প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মের প্রচার করিয়া শ্রীভগবান্ সনক-সনন্দাদিকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের দ্বারা জ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণযুক্ত নিবৃত্তিধর্ম্ম গ্রহণ করাইলেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম এই নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্ম হইতেই উদ্ভূত। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায় ও মধ্ব সম্প্রদায়ই চতুঃসনকে আদিগুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই ত্যাগপথাবলম্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ন্যাসিগণ চিরকাল হইতেই পূজিত হইয়া আসিতেছেন। আচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বলিয়া কোনও বিশেষ সম্প্রদায় ছিল না। মন্বাদি ঋষিপ্রদর্শিত পথানুসারে ত্রিবর্ণজাত ব্যক্তিগণ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ আশ্রম অতিক্রম করিয়া সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিতেন। এইজন্য পুরাণাদিতে বা ব্রাহ্মণাদি বা পুরাতন স্মৃতিগ্রন্থে বা সংহিতাগ্রন্থে বা গৃহ্যসূত্রের কুত্রাপি গিরি পুরী ভারতী প্রভৃতি দশনামধারী সন্ন্যাসীর কোনও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহাতে অনুমান হয়, গৃহস্থগণ বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বনের পর স্বভাবতই বৃদ্ধকালে চতুর্থাশ্রমে অরণ্য আশ্রয় করিতেন। সুতরাং সন্ন্যাসাশ্রম একমাত্র নিবৃত্তিপরায়ণ মানবগণেরই গ্রহণীয় ছিল। পরবর্ত্তী কালে উত্তরভারতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পরই এই বৈদিক সন্ন্যাস আশ্রমের অনুকরণে ভিক্ষুবেশের ও আশ্রমের প্রবর্ত্তন হয়। যখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রভাবে উত্তর-ভারতে সর্ব্বপ্রকার বৈদিকধর্ম্ম লোপ পাইবার উপক্রম হইল, তখন যিনি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রতিপক্ষরূপে দণ্ডায়মান হইলেন—তিনি এক জন গৃহস্থ, তাঁহার নাম কুমারিল ভট্ট। কিন্তু কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধধর্ম্ম নিরসনে সম্পূর্ণরূপে সফলকাম হইতে পারেন নাই। ইহার পরেই শঙ্করাবতার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ভারতবর্ষে প্রাদুর্ভূত হইয়া বৌদ্ধভিক্ষুর বেশের অনুকরণ করিয়া একদণ্ড সন্ন্যাসের—বিশেষতঃ প্রথমাশ্রমের পরেই বিবিদিষা সন্ন্যাসের ও দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করেন। এই দেশকাল-পাত্রোপযোগী অভিনব ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনের ফলেই যে মহাশক্তিশালী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হইল, তাহাদের দ্বারাই ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের সমূলে উচ্ছেদ সাধিত হইল। কিন্তু বৌদ্ধবাদ দূরীভূত করিতে যাইয়া মহামনস্বী আচার্য্য শঙ্করকেও কিয়ৎপরিমাণে বৌদ্ধভাব অবলম্বন করিতে হইয়াছিল; তাহার ফলেই মায়াবাদমূলক নির্ব্বিশেষবাদের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই অভিনব সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের দ্বারা

ভারতবর্ষ প্লাবিত হইলেও দক্ষিণভারতে তখনও অতি প্রাচীন ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। উত্তরভারতেও তখন নিম্বার্ক সম্প্রদায় ও বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায় এই দুই সম্প্রদায় প্রাচীন বৈদিক সন্ন্যাসপ্রথা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ইহারা ঐ সময় হইতে বৈষ্ণব-সাধু বলিয়া বিখ্যাত হন। এই বৈষ্ণব সাধুরা সকলেই ত্যাগপন্থী, এক দিকে বৌদ্ধ ও জৈনপ্রভাব, অপর দিকে তান্ত্রিক বীরাচার ও কাপালিক পাশুপতাদি শৈবাচার, অন্যদিকে অদ্বৈতবাদী নির্বিশেষ-বাদী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়—ইহাদিগের হস্ত হইতে বৈষ্ণবাচার ও বৈষ্ণবসাধন পদ্ধতিকে অতি গোপনে রক্ষা করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল, এই জন্য শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা, পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রে ও পদ্ম-পুরাণাদি পুরাণে উপদিষ্ট হইলেও সাধারণতঃ প্রকাশ্যভাবে তাহার উপদেশ দিবার বিধান ছিল না। এই জন্য শ্রীভাগবতেও শ্রীরাধার নাম প্রকাশ্যভাবে বিঘোষিত হয় নাই। সম্ভবতঃ শ্রীভগবান্ নারদ ঋষিই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার উপদেশ প্রদান করেন। এই নারদপঞ্চরাত্রেও দেখা যায় যে, কপিল পঞ্চরাত্র হইতে নারদ পঞ্চরাত্রে এই রাধাতত্ত্ব * গৃহীত হইয়াছে। অষ্টাদশ মহাপুরাণ যদি মহর্ষি বেদব্যাসের রচিত হয়, তবে পদ্মপুরাণে শ্রীরাধানামের উল্লেখ ও শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার প্রমাণ অবশ্যই এই উপাসনা-প্রণালীর প্রাচীনত্বের প্রমাণ। শ্রীভাগবতের টীকাকার শ্রীধর স্বামী শ্রীভাগবতের টীকার প্রারম্ভে শ্রীমদ্ভাগবতই অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্ব্বর্ত্তী মূল ভাগবত কি না, তাহার যে প্রমাণাদি উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা দেখিলে স্বতঃই মনে হয় যে, ঐ সময়ে শ্রীভাগবতের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে শ্রীদেবীভাগবতও বর্ত্তমান ছিলেন। এইজন্যই শ্রীধর স্বামিপাদকে বলিতে হইয়াছে—"অতএব ভাগবতং নামান্যদিত্যপি নাশঙ্কনীয়ম্" অর্থাৎ এখানে যে সকল প্রমাণ উপস্থিত করা হইল, তাহাতে ভাগবত নামে কোনও গ্রন্থ আছে, এই আশঙ্কা নিরাকৃত হইল। ইহা দ্বারা ঐ সময়ে শ্রীদেবীভাগবত নামক গ্রন্থকেও যে অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত পুরাণ বলিয়া কেহ কেহ আশঙ্কা করিতেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং ইহা দ্বারা অনুমান করা যায় যে, শ্রীধর স্বামীর আবির্ভাবকাল নবম শতাব্দী হইলে, দেবীভাগবতকে অন্ততঃ সপ্তম শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়া মনে করিতে হয়। ঐ দেবীভাগবত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তখনও শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা প্রচলিত ছিল। দেবীভাগবতে বর্ণিত আছে, মহর্ষি নারদ শ্রীমন্নারায়ণ ঋষিকে শ্রীরাধিকার উপাসনা-প্রণালী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, যথা—

"অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি রহস্যং বেদগোপিতম্।
রাধায়াশ্চৈব দুর্গায়া বিধানঃ শ্রুতিচোদিতম্॥"
(দেঃ ভাঃ ৯।৫০।২)

এই জিজ্ঞাসার উত্তরেই শ্রীরাধামন্ত্রের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ফলতঃ শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষে শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা প্রচলিত ছিল। অতএব শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যই ভারতবর্ষে শ্রীরাধাকৃষ্ণ উপাসনার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, এ কথা আমরা স্বীকার করিয়া লইতে পারি না। তবে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের প্রচারের ও প্রভাবের ফলেই যে ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ শ্রীমথুরাপুরীতে এই উপাসনা-প্রণালীর প্রাধান্য স্থাপিত হইতে পারিয়াছে, সে বিষয়ে মতভেদ না হওয়াই সঙ্গত। আচার্য্যদেব সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ শ্রীকৃষ্ণস্তবে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন—এই শ্রীরাধা ও শ্রীলক্ষ্মীতে স্বাতন্ত্র্য আছে বলিয়া মনে হয় না, তথাপি এই শ্রীরাধাকে তিনি নব গোপবালারূপেই দেখিয়াছেন। *

শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মতে গীতগোবিন্দের গ্রন্থকার শ্রীল জয়দেব গোস্বামী শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়েরই শিষ্য। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের "নিজ মত সিদ্ধান্ত" নামক হিন্দী গ্রন্থে জয়দেবকে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের শিষ্য বলা হইয়াছে। শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দ মহাকাব্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে অমৃতনিস্যন্দিনী লীলা-কথার বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার মূল উৎস শ্রীল জয়দেব গোস্বামী নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া বর্ত্তমানে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের কেহ কেহ দাবী করিয়া থাকেন। জয়দেবের কোমলকান্ত পদাবলী ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে প্রচলিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ উপাসনারই বিজয়-বৈজয়ন্তী। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও চণ্ডীদাস, জয়দেব ও শ্রীমালাধর বসু বা গুণরাজ খাঁ শ্রীরাধাকৃষ্ণ উপাসনার গীতি-কবিতায় দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছিলেন। রাজা লক্ষ্মণ সেনের রচিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ উপাসনার কবিতা ও গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের মন্ত্রী কেশব বসু ছত্রীর কবিতা ও শ্রীরূপের সংগৃহীত পদ্যাবলীর গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। ইহারা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-উপাসনার মূল ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অথচ ইহারা কেহই নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন। সুতরাং আমাদের ধারণা এই যে, বঙ্গ দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ উপাসনা প্রবর্ত্তিত ছিল। জয়দেব, চণ্ডীদাস ও মালাধর বসু সেই দেশপ্রচলিত উপাসনাই সঙ্গীতের ও কাব্যের দ্বারা পরিস্ফুট করিয়া জনসাধারণের হৃদয়গ্রাহিণী করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের কর্ত্তৃত্বের কথা উঠিতেই পারে না।

ফলতঃ আচার্য্য নিম্বার্কের উপাস্য "রমাকান্ত পুরুষোত্তমই" শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ এবং নারায়ণ অভিন্ন এবং শ্রীরাধা এবং লক্ষ্মী বা রুক্মিণীও অভিন্ন। আচার্য্য নিম্বার্কের এই উপদেশ অনুসারে লক্ষ্মীকান্ত শ্রীনারায়ণে এবং শ্রীরুক্মিণীকান্ত বা শ্রীরাধাকান্ত শ্রীকৃষ্ণে কোনও ভেদ নাই। এইজন্যই নিম্বার্কের পরবর্ত্তী কালে এই উভয়বিধ উপাসনাই প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ভক্তই শ্রীরাধা-সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মতে শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজও হইতে পারেন এবং চতুর্ভুজও হইতে পারেন এবং এই

* সংক্ষেপেণ চ কথিতং রাধাখ্যানং মনোহরম্।
কাপিলেয়-পঞ্চরাত্রে বিস্তীর্ণমতিসুন্দরম্॥
নারায়ণেন কথিতং মুনয়ে কাপিলায় চ।

* ব্রহ্মরুদ্র-সুররাজ-চর্চ্চিতঃ
পার্শ্বতশ্চ রময়াঙ্কমালয়া
চর্চ্চিতশ্চ নব গোপবালয়া
প্রেমভক্তিরসশালিমালয়া॥
(সবিশেষ নির্ব্বিশেষ শ্রীকৃষ্ণস্তব)

দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণের ও চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনায় কোনও তারতম্য নাই। কিন্তু আচার্য্যের মূল অভিপ্রায় দেখিলে মনে হয়, ইনি ব্রজলীলা ও দ্বারকালীলা—এই উভয় লীলা-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। এই শ্রীকৃষ্ণ সবিশেষ হইলেও নির্ব্বিশেষ, বা নির্ব্বিশেষ হইলেও সবিশেষ। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে এই সম্প্রদায়ে দুইটি শাখার উৎপত্তি হইয়াছে, এবং ইহাদের এক শাখা শ্রীরুক্মিণী-সত্যভামাদি সহ দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন, আর এক শাখা শ্রীরাধা-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন। বলা বাহুল্য, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে শেষোক্ত অর্থাৎ শ্রীরাধা সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসকগণেরই আধিক্য পরিদৃষ্ট হয়। যাহা হউক, নিম্বার্ক সম্প্রদায় শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনা না করিয়া শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের উপাসনা করায় "শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং ভগবান্" এ সিদ্ধান্ত ইঁহাদের দ্বারা বিস্তৃতভাবে প্রচার হইয়াছে।

আচার্য্য নিম্বার্কের তিরোভাবকাল ও তাঁহার জীবনের অন্যান্য কার্য্যের ইতিহাস জানিতে পারা যায় না। তবে শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালী আলোচনা করিলে এ কথা বিশেষভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এই সম্প্রদায় সুপ্রাচীন এবং বহু মহাপুরুষ এই সম্প্রদায়ে আবির্ভূত হইয়া এই সম্প্রদায়কে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন।

কৃষ্ণগড়ের অন্তর্গত সলিমাবাদে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের একটি গদী প্রাচীন কাল হইতে অবস্থিত। এই গদীর গুরুপ্রণালী অখণ্ডিত এবং বিশেষ প্রামাণিক। এই স্থানের শ্রীশ্রীরাধামাধব-বিগ্রহ জয়পুরের শৈব মহারাজ রামসিংহের পুত্র মাধোসিংহের দ্বারা স্থাপিত হইয়া অদ্যাবধি সম্পূজিত হইয়া আসিতেছেন। এই স্থানে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের যে গুরুপ্রণালী পাওয়া যায়, তাহা এইরূপ :—

১। শ্রীহংস (ভগবান্) ২। শ্রীসনকাদি চতুঃসন ৩। শ্রীনারদ ৪। শ্রীনিম্বার্ক ৫। শ্রীনিবাসাচার্য্য (ইনি আচার্য্য নিম্বার্কের "বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ" নামক বেদান্ত-ভাষ্যের উপর "বেদান্ত-কৌস্তুভ" নামক ভাষ্য রচনা করেন) ৬। বিশ্বাচার্য্য ৭। পুরুষোত্তমাচার্য্য (ইনি আচার্য্য নিম্বার্কের দশশ্লোকীর উপর "বেদান্তরত্ন-মঞ্জুষা" নামক বিবরণ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন) ৮। বিলাসাচার্য্য ৯। স্বরূপাচার্য্য ১০। মাধবাচার্য্য ১১। বলভদ্রাচার্য্য ১২। পদ্মনাভাচার্য্য (ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে "কেশব কাশ্মীরীর" যে গুরুপ্রণালী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে ইঁহাকে 'পদ্মাচার্য্য' নামে অভিহিত করা হইয়াছে) ১৩। শ্যামাচার্য্য ১৪। গোপালাচার্য্য ১৫। কৃপাচার্য্য ১৬। দেবাচার্য্য (এই সম্প্রদায়ে ইনি নারায়ণের হস্তস্থিত পদ্মের অবতার বলিয়া পূজিত, ইনি ব্রহ্মসূত্রের "বেদান্ত-জাহ্নবী" নামক বৃত্তি রচনা করেন এবং সর্ব্বপ্রথমে শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদের উপর আক্রমণ করেন। ইঁহার "ভক্তিরত্নাঞ্জলি" নামক অন্য একখানি গ্রন্থ এখনও মুদ্রিত হয় নাই) ১৭। সুন্দর ভট্ট (ইনি দেবাচার্য্যের "বেদান্ত-জাহ্নবীর" উপর 'সিদ্ধান্ত-জাহ্নবী সেতুক নামক ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন) ১৮। পদ্মনাভ ভট্ট ১৯। উপেন্দ্র ভট্ট ২০। রামচন্দ্র ভট্ট ২১। বামন ভট্ট ২২। কৃষ্ণ ভট্ট ২৩। পদ্মাকর ভট্ট ২৪। শ্রবণ ভট্ট ২৫। ভূরি ভট্ট ২৬। মাধব ভট্ট বা মাধ্ব ভট্ট ৩৭। শ্যাম ভট্ট ২৮। গোপাল ভট্ট ২৯। বলভদ্র ভট্ট ৩০। গোপীনাথ ভট্ট ৩১। কেশব ভট্ট (ইনি শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা-বিষয়ক প্রসিদ্ধ আগম গ্রন্থ "ক্রমদীপিকা" রচনা করেন) ৩২। শ্রীগোকুল ভট্ট (মতান্তরে গঙ্গল বা গাঙ্গল ভট্ট) ৩৩। কেশব কাশ্মীরী (ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক, ইঁহার 'লঘু কেশব' নামক শ্রীকৃষ্ণোপাসনা সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ আছে, ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্য কৃত "বেদান্ত-কৌস্তুভের" উপর "বেদান্ত-কৌস্তুভ-প্রভা" নাম্নী টীকা রচনা করেন। ইনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকা রচনা করেন। ইনিই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতরূপে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত বিচারে পরাভূত হন) "ভক্তিরত্নাকরে" এই সম্প্রদায়ের এই পর্য্যন্ত গুরুপ্রণালী প্রদত্ত হইয়াছে) ৩৪। শ্রীভট্ট (হিন্দী "যুগল-শতক" নামক পদাবলী গ্রন্থের গ্রন্থকার) ৩৫। শ্রীহরি ব্যাসদেব (হিন্দী পদ্যার গ্রন্থ "মহাবাণীর" গ্রন্থকার, ইনি নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে "হরিব্যাসী" নামক গৃহস্থ শাখায় প্রবর্ত্তন করেন, শ্রীবৃন্দাবনের ধ্রুবক্ষেত্রের মহান্তরা হরিব্যাসের সন্তান বলিয়া পরিচয় দান করেন এবং হরিব্যাস হইতে ৩৬। স্বভূরামদেব। ৩৭। কন্দুরদেব ৩৮। মধুরদেব ৩৯। শ্যামদেব ৪০। সেবাদেব। ৪১। নরহরিদেব ৪২। সুখদেব ৪৩। বসন্ত-রামদেব ৪৪। উদ্ধবদেব ৪৫। পুরুষোত্তমদেব ৪৬। গোপাল-দেব ৪৭। লাড়লীশরণ দেব ৪৮। নন্দকিশোর দেব ৪৯। গিরিধারী-শরণ দেব ৫০। মধুসূদনশরণ দেব ৫১। মনোহরশরণদেব) ৩৬। পরশুরাম ৩৭। হরিবংশ ৩৮। নারায়ণ ৩৯। বৃন্দাবন ৪০। গোবিন্দদেব ৪১। গোবিন্দশরণ ৪২। সর্ব্বেশ্বরশরণ ৪৩। নিম্বার্ক-শরণ ৪৪। গোপেশ্বরশরণ (ইনি জয়পুরের শৈবরাজা রামসিংহের অত্যাচারে জয়পুর পরিত্যাগ করেন) ৪৬। ঘনশ্যামশরণ ৪৭। বালকৃষ্ণ দেব।

এই গুরুপ্রণালী দেখিলে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রাচীনতা সহজেই উপলব্ধি হয়। এই গুরুপ্রণালীতে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের দুই জন সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবের নাম নাই। এক জনের নাম হরিদাস স্বামী। ইনি দিল্লীশ্বর আকবরের সভায় সঙ্গীতাচার্য্য তানসেনের গুরু। ইঁহার পিতামহ মুলতানের এক জন ধনী সারস্বত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি মথুরায় আসিয়া বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র আশাধীর রাযপুর নামক শ্রীবৃন্দাবনের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের গঙ্গাধর নামক এক জন ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়ে বাস করিতে থাকেন। আশাধীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিদাস ও কনিষ্ঠ পুত্র জগন্নাথ। হরিদাস বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতপ্রিয় ও ভক্তিপ্রবণ ছিলেন। তিনি বিবাহ না করিয়া প্রায় ২৫ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের পরপারে মান-সরোবর নামক কুণ্ডতীরে কুটীর বাঁধিয়া একাকী ভজন করিতেন। যখন গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন, তখন তিনিও শ্রীবৃন্দাবনে আসেন। ইনি গন্ধর্ব্ব কৃষ্ণদত্ত নামক এক জন সন্ন্যাসীর নিকট সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করেন। সঙ্গীতে ইনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং ইনি শ্রীকৃষ্ণকে শুনাইবার জন্য নিরপেক্ষভাবে নির্জ্জনে নিধুবনে বসিয়া সুমধুর ভজনগীতি গাহিতেন। শুনা যায়, প্রতিদিন একটি গোপবালক ইঁহার গান শুনিতে আসিতেন। নির্জ্জন বনে এই গোপবালককে দেখিয়া ইঁহার সন্দেহ হয়। পরে এক দিন তিনি ইঁহাকে ধরিয়া ফেলিলে ইনি পরিচয় দিয়া বলেন যে, ইনি বঙ্কবিহারীজি—নিধুবনের বিশাখা-কুণ্ডে অবস্থান করিতেছেন। অতঃপর হরিদাস স্বামী বিশাখাকুণ্ড হইতে ইঁহাকে উদ্ধার করিয়া ইঁহার সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। ইনিই বর্ত্তমান শ্রীবৃন্দাবনে বঙ্কবিহারীজি বা বাঁকেবিহারীজি নামে

বিখ্যাত। এই মূর্ত্তি বালগোপালমূর্ত্তি; এই মূর্ত্তির সহিত শ্রীরাধিকা নাই। হরিদাস স্বামীর ভ্রাতা জগন্নাথের দুই পুত্র মেঘশ্যাম ও মুরারিদাস ও তাঁহাদের বংশধরগণ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বঙ্কবিহারীজি ঠাকুরের অধিকারী ও সেবাইত গোস্বামী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইঁহাদের বহু শিষ্য আছে। 'সাধারণ সিদ্ধান্ত' ও 'রসকেপদ' নামক দুইখানি হিন্দী গ্রন্থ এবং "কেলমাল" নামক একখানি পদাবলী গ্রন্থ হরিদাস স্বামীর বিরচিত। তাঁহার শিষ্য বিহারিণী দাস মোহান্তও অনেক লীলাপদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। হরিদাস স্বামী মহা প্রভাবসম্পন্ন বৈষ্ণব ছিলেন। শুনা যায়, এক দিন হরিদাস স্বামী অপরাহ্নকালে যমুনাতীরে বসিয়া ভজন গাহিতেছিলেন, ঐ সময়ে দিল্লীশ্বর আকবর শাহ রাজকীয় বজরায় যমুনা দিয়া যাইতেছিলেন। হরিদাস স্বামীর অপূর্ব্ব সঙ্গীত শুনিয়া তিনি বজরা তীরে লাগাইয়া শেষ পর্য্যন্ত ভজন গান শ্রবণ করিলেন। পরে বাদশাহ হরিদাস স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে দিল্লীতে লইয়া গিয়া রাজ-গায়কের পদে নিযুক্ত করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। বিষয়বিরক্ত হরিদাস স্বামী কোনওক্রমে সে পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন। ঐ সময়ে রামতনু মিশ্র নামক একটি ব্রাহ্মণ যুবক হরিদাস স্বামীর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিতেছিল। বাদশাহের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া হরিদাস স্বামী রামতনুকে বাদশাহের সহিত দিল্লীতে প্রেরণ করেন। এই রামতনু মিশ্রই পরবর্ত্তী কালে মিঞা তানসেন নামে বিখ্যাত হন। কথিত আছে, আকবর শাহ হরিদাস স্বামীকে ধনরত্ন বা জায়গীর গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন। হরিদাস স্বামী তাহা লইতে অস্বীকার করিলে আকবর শাহ শ্রীবৃন্দাবনের কোনও কার্য্য করিয়া দিবার অনুমতি ভিক্ষা করেন। বার বার অনুরুদ্ধ হইয়া অগত্যা হরিদাস স্বামী দিল্লীশ্বরকে যমুনার একটি ভগ্ন সোপান মেরামত করাইয়া দিতে বলেন। বাদশাহ সোপান মেরামত করিতে যাইয়া দেখিতে পাইলেন যে, সোপানগুলি এত বহুমূল্য মণিরত্নাদিতে নির্ম্মিত যে, বাদশাহের ভাণ্ডারের সমগ্র ধনরত্ন ব্যয় করিলেও ভগ্ন সোপানটি মেরামত হইতে পারিবে না। বাদশাহ ইহা দেখিয়া স্বামীজির প্রভাবে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন। তিনি স্বামীজিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার শিষ্য রামতনুকে লইয়া আসিলেন।

বৃন্দাবনে হরিদাস স্বামীর ভ্রাতা জগন্নাথের পুত্ররা বঙ্কবিহারীজির অধিকারী হইলে তদ্বংশীয়রা শিষ্যদিগকে দীক্ষা দিতে লাগিলেন। এই মেঘশ্যাম ও মুরারির শিষ্যগণ ও তাঁহাদের বংশধরগণের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ অতঃপর নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের "হরিদাসী" শাখা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইঁহারাই প্রায় ৭০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া বঙ্কবিহারীজির বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। হরিদাস স্বামীর সমাধি নিধুবনে অবস্থিত।

মথুরায় ধ্রুবটিলায় যে হরিব্যাসের সন্তানেরা বাস করেন, আমরা পূর্ব্বেই তাঁহাদের গুরুপ্রণালীর পরিচয় প্রদান করিয়াছি। ঐ ধ্রুবটিলা মথুরা সহরের দক্ষিণে যমুনাতীরে অবস্থিত। এই স্থানটি উচ্চে প্রায় ৫০ ফুট হইবে। টিলাটি ২।৩ থাকে উঠিয়াছে। উত্তানপাদ রাজার পুত্র শিশু ধ্রুব এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা ধ্রুবটিলা নামে বিখ্যাত। উপরের থাকে ছোট মন্দিরের মধ্যে শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত, যোড়করে দণ্ডায়মান পঞ্চমবর্ষীয় শিশু ধ্রুবের একটি মূর্ত্তি আছে। এই টিলার উপরই নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের গদী অবস্থিত।

এই হরিব্যাসী ও হরিদাসী সম্প্রদায় ব্যতীত নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের কেশব ভট্ট হইতে বিরক্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এই সম্প্রদায়ের সাধুগণ সন্ন্যাসী। এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মাধবমুকুন্দ নামক এক জন সন্ন্যাসী "পরপক্ষ গিরিবজ্র" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। মাধবমুকুন্দ এই গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্য প্রচারিত মায়াবাদের সার্দ্ধত্রিশত দোষ প্রদর্শন করিয়া তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। মাধবমুকুন্দ এক জন বাঙ্গালী ছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনের কেমার বনে প্রসিদ্ধ শ্রীল রামদাস কাঠিয়া বাবার আশ্রম। এই আশ্রমে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহের সেবা হয়। ইঁহার শিষ্য শ্রীযুক্ত সন্তদাস বাবাজী হাওড়ার উপকণ্ঠে শিবপুরে একটি 'নিম্বার্ক আশ্রম' স্থাপন করিয়া বঙ্গদেশে নিম্বার্ক মত প্রচার করিতেছেন।

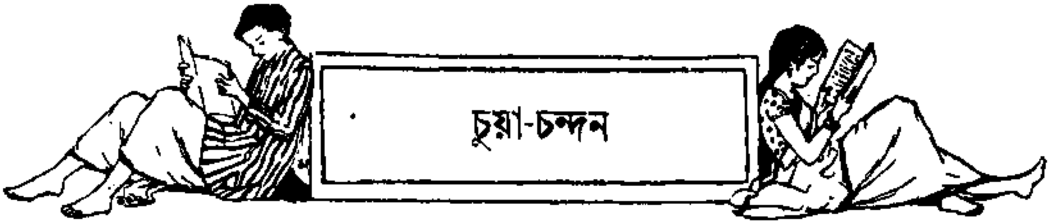
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)।

ব্যর্থ নয় মোর ভালবাসা

তোমারে পাই নি ব'লে ব্যর্থ হবে মোর ভালবাসা ?
না-পাওয়ার বেদনায় ভরি' রবে অন্তর আমার ?

জীবন ব্যাপিয়া শুধু কাঁদিবে নিষ্ফল হাহাকার
মর্ম্ম মাঝে ? বঞ্চিত হৃদয়ে বহি' সঞ্চিত পিপাসা
দগ্ধ-বন মৃগ সম ফিরিব এ সংসার-কান্তারে
ঘুরে' ঘুরে' আমি নিঃসঙ্গ পথিক ?—নয়, ওগো নয় ;
আপনার কল্পলোকে প্রেম মোর মহৈশ্বর্য্যময় ;—
চাহে নাই প্রতিদান, শূন্য করি' দেছে ভারে ভারে
প্রতিদিন হৃদয়ের যা-কিছু বিভব ; প্রাণে তবু
বহ্নি-শিখা জ্বলে নাই ; এ'র মাঝে ফুটে নাই কভু
পার্থিব-পরিধি-ছিন্ন লালসার বিলাস-মূরতি।
তোমারে সঁপিয়া সব, ওগো মোর মানসী প্রতিমা,
রিক্ত, দীন এ পরাণ পেয়েছে কি বিপুল গরিমা।
ব্যর্থ নয় মোর প্রেম, এ জীবনে তোমার আরতি।

শ্রীবিশ্বনাথ কাব্যবিনোদ।



চুয়া-চন্দন

গল্প

১

এক দিন গ্রীষ্মের শেষভাগে, সূর্য্য মধ্যাকাশে আরোহণ করিতে তখনও দণ্ড তিন-চার বাকি আছে, এমন সময় নবদ্বীপের স্নানঘাটে এক কৌতুকপ্রদ অভিনয় চলিতেছিল।

ভাগীরথীর পূর্ব্বতটে নবদ্বীপ। স্নানের ঘাটও অতি বিস্তৃত—এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে। ঘাটের সারি সারি পৈঠাগুলি যেমন উত্তর-দক্ষিণে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত, তেমনি প্রত্যেকটি পৈঠা প্রায় সে-কালের সাধারণ রাজপথের মত চওড়া। গ্রীষ্মের প্রখরতায় জল শুকাইয়া প্রায় সব পৈঠাই বাহির হইয়া পড়িয়াছে—দু'এক ধাপ নামিলেই নদীর কাদা পায়ে ঠেকে। স্নানের ঘাট যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখান হইতে বাঁধানো খেয়াঘাট আরম্ভ। তথায় খেয়ার নৌকা, জেলে ডিঙ্গী, দুই-একটা হাজার-মণী মহাজনী ভড় বাঁধা আছে। নৌকাগুলির ভিতরে দৈনিক রন্ধনকার্য্য চলিতেছে,—ছৈ ভেদ করিয়া মৃদু মৃদু ধূম উত্থিত হইতেছে।

বহুজনাকীর্ণ স্নান-ঘাটে ব্যস্ততার অন্ত নাই। আজ কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী। ঘাটের জনতাকে সমগ্রভাবে দর্শন করিলে মনে হয়, মুণ্ডিতশীর্ষ উপবীতধারী ব্রাহ্মণ ও প্রৌঢ়া-বৃদ্ধা নারীর সংখ্যাই বেশী। ছেলে-ছোকরার দলও নেহাৎ কম নয়; তাহারা সাঁতার কাটিতেছে, জল তোলপাড় করিতেছে। নারীদের স্নানের জন্য কোনও পৃথক্ ব্যবস্থা নাই, যে যেখানে পাইতেছে, সেখানেই স্নান করিতেছে। তরুণী বধূরা ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া টুপ্‌টুপ্ ডুব দিতেছে। পর্দ্দাপ্রথা বলিয়া কিছু নাই বটে, তবু অবগুণ্ঠন দ্বারা শালীনতা-রক্ষার একটা চেষ্টা আছে; যদিও সে চেষ্টা তনু-সংলগ্ন সিক্তবস্ত্রে বিশেষ মর্য্যাদা পাইতেছে না। সেকালে বাঙ্গালী মেয়েদের দেহলাবণ্য গোপন করিবার সংস্কার বড় বেশী প্রবল ছিল না; গৃহস্থ কন্যাদের কাঁচুলি পরিবার রীতিও প্রচলিত হয় নাই।

যে যুগের কথা বলিতেছি, তাহা আজ হইতে চারি শতাব্দীরও অধিককাল হইল অতীত হইয়াছে। সম্ভবতঃ আমাদের ঊর্দ্ধতন পঞ্চদশ পুরুষ সে সময় জীবিত ছিলেন। তখন বাঙ্গালার ঘোর দুর্দ্দিন যাইতেছিল। রাজশক্তি পাঠানের হাতে; ধর্ম্ম ও সমাজের বন্ধন বহুযুগের অবহেলায় গলিত রজ্জু-বন্ধনের ন্যায় খসিয়া পড়িতেছে। দেশও যেমন অরাজক, সমাজও তেমনি বহুরাজক। কেহ কাহারও শাসন মানে না। মৃত বৌদ্ধধর্ম্মের শবনির্গলিত তন্ত্রবাদের সহিত শাক্ত ও শৈব মতবাদ মিশ্রিত হইয়া যে বীভৎস বামাচার উত্থিত হইয়াছে—তাহাই আকণ্ঠ পান করিয়া বাঙ্গালী অন্ধ-মত্ততায় অধঃপথের পানে স্খলিতপদে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সহজিয়া সাধনার নামে যে উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচার চলিয়াছে, তাহার কোনও নিষেধ নাই। কে কাহাকে নিষেধ করিবে? যাহারা শক্তিমান্, তাহারাই উচ্ছৃঙ্খলতায় অগ্রবর্ত্তী। মাতৃকাসাধন পঞ্চমকার উদ্দাম নৃত্যে আসর দখল করিয়া আছে। প্রকৃত মনুষ্যত্বের চর্চ্চা দেশ হইতে যেন উঠিয়া গিয়াছে।

তখনও স্মার্ত্ত রঘুনন্দন আচারকে ধর্ম্মের নিগূঢ় বন্ধনে বাঁধিয়া সমাজের শোধন-সংস্কার আরম্ভ করেন নাই। বাপ ভট্ট রঘুনাথ মিথিলা জয় করিয়া ফিরিয়াছেন বটে, কিন্তু নবদ্বীপে সরস্বতীর পীঠ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। নদের নিমাই তখনও ব্যাকরণের টোলে ছাত্র পড়াইতেছেন ও নানাপ্রকার ছেলেমানুষী করিতেছেন। তখনও সেই হরিচরণস্রুত প্রেমের বন্যা আসে নাই—বাঙ্গালীর ক্লেদ-কলুষিত চিত্তের বহু শতাব্দী সঞ্চিত ময়লামাটী সেই পূত প্রবাহে ধৌত হইয়া যায় নাই।

১৪২৬ শকাব্দার প্রারম্ভে এক কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর পূর্ব্বাহ্নে বাঙ্গালার কেন্দ্র নবদ্বীপের ঘাটে কি হইতেছিল, তাহাই লইয়া এই আখ্যায়িকার আরম্ভ।

ঘাটে যে সকলেই স্নান করিতেছে, তাহা নয়। এক পাশে সারি সারি নাপিত বসিয়া গিয়াছে; বহু ভট্টাচার্য্য

গোঁসাই গলা বাড়াইয়া ক্ষৌরী হইতেছেন। বুরুজের গোলাকৃতি চাতালে এক দল উলঙ্গপ্রায় পণ্ডিত দেহে সবেগে তৈলমর্দ্দন করিতে করিতে ততোধিক বেগে তর্ক করিতেছেন। বাসদেব সার্ব্বভৌম মিথিলা হইতে সর্ব্ববিদ্যার পারঙ্গম হইয়া ফিরিয়া আসিবার পর হইতে নবদ্বীপে বিদ্যাচর্চ্চার সূত্রপাত হইয়াছিল। কিন্তু বিদ্যা তখনও হৃদয়ে আসন স্থাপন করেন নাই; তাই বাঙ্গালী পণ্ডিতের মুখের দাপট কিছু বেশী ছিল। শাস্ত্রীয় তর্ক অনেক সময় আঁচড়-কামড়িতে পরিসমাপ্তি লাভ করিত।

তৈল-মসৃণ পণ্ডিতদের তর্কও ন্যায়শাস্ত্রের সীমানা ছাড়াইয়া অরাজকতার দেশে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছিল। এক জন অতি গৌরকান্তি যুবা—বয়স বিশ বছরের বেশী নয়—তর্ক বাধাইয়া দিয়া পাশে দাঁড়াইয়া তাহাদের বিতণ্ডা শুনিতেছিল ও মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছিল। তাহার ঈষদরুণ আয়ত চক্ষু হইতে যেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, পাণ্ডিত্যের অভিমান ও কৌতুক একসঙ্গে ক্ষরিয়া পড়িতেছিল।

জলের কিনারায় বসিয়া কেহ কেহ পায়ে ঝামা ঘষিতেছিল। নারীরা বস্ত্রাবরণের মধ্যে ক্ষার-খৈল দিয়া গাত্র মার্জ্জনা করিতেছিল। কয়েক জন বর্ষীয়ান্ ব্রাহ্মণ আবক্ষ জলে নামিয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া আহ্নিক করিতেছিলেন।

এই সময় দক্ষিণদিকে গঙ্গার বাঁকের উপর দুইখানি বড় সামুদ্রিক নৌকা পালের ভরে উজান ঠেলিয়া ধীরে ধীরে নবদ্বীপের ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতেছিল—অধিকাংশ স্নানার্থীর দৃষ্টি সেই দিকেই নিবদ্ধ ছিল। সমুদ্রযাত্রী বাণিজ্যতরীদের দেশে ফিরিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; প্রতি সপ্তাহেই দুটি একটি করিয়া ফিরিতেছিল।

ক্রমে নৌকা দুটি খেয়ার ঘাটে গিয়া ভিড়িল। মধুকর ডিঙ্গার ছাদের উপর এক জন যুবা দাঁড়াইয়া পরম আগ্রহের সহিত ঘাটের দৃশ্য দেখিতেছিল; পাল নামাইবার সঙ্গে সঙ্গে সেও তীরে অবতরণ করিবার জন্য ছাদ হইতে নামিয়া গেল।

বড় নৌকা ঘাটের নিকট দিয়া যাইবার ফলে জলে ঢেউ উঠিয়া ঘাটে আঘাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; অনেক ছেলে-ছোকরা কোমরে গামছা বাঁধিয়া ঢেউ খাইবার জন্য জলে নামিয়াছিল। ঢেউয়ের মধ্যে বহু সন্তরণকারী বালকের হস্তপদসঞ্চালনে ঘাট আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল।

হঠাৎ তীর হইতে একটা 'গেল গেল' রব উঠিল। যে গৌরকান্তি যুবাটি এতক্ষণ দাঁড়াইয়া তর্করত পণ্ডিতদের রঙ্গ দেখিতেছিল, সে দুই লাফে জলের কিনারায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হয়েছে?"

কয়েক জন সমস্বরে উত্তর দিল,—"কাণা-গোঁসাই এতক্ষণ জলে দাঁড়িয়ে আহ্নিক করছিলেন, হঠাৎ তাঁকে আর দেখা যাচ্ছে না। ভাবে ভোলা মানুষ, হয় ত নৌকার ঢেউ লেগে তলিয়ে গেছেন।"

যুবা কোমরে গামছা বাঁধিতে বাঁধিতে শুনিতেছিল, আদেশের স্বরে কহিল,—"তোমরা কেউ জলে নেমো না, তা হ'লে গণ্ডগোল হবে। আমি দেখছি।" বলিয়া সে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

গ্রীষ্মকালে ঘাটে স্নান করা ভাবে-ভোলা মানবদের পক্ষে সর্ব্বদা নিরাপদ নয়। কারণ, জলের মধ্যে দুই ধাপ সিঁড়ি নামিয়াই শেষ হইয়াছে—তার পর কাদা। এখানে বুক পর্য্যন্ত জলে বেশ যাওয়া যায়, কিন্তু আর এক পা অগ্রসর হইলেই একবারে ডুবজল। যুবক জলে ঝাঁপ দিয়া কয়েক হাত সাঁতার কাটিয়া গেল, তার পর অগাধ জলে গিয়া ডুব দিল।

কিছুক্ষণ তাহার আর কোনও চিহ্ন নাই। ঘাটের ধারে কাতার দিয়া লোক দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। সকলের মুখেই উদ্বেগ ও আশঙ্কার ছায়া। কয়েক জন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক ক্রন্দন-করুণ সুরে হা-হুতাশ করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

পঞ্চাশ গণিতে যতক্ষণ সময় লাগে, ততক্ষণ পরে যুবকের মাথা জলের উপর জাগিয়া উঠিল। সকলে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল—কিন্তু পরক্ষণেই আবার নীরব হইল। যুবক নিমজ্জিত ব্যক্তিকে খুঁজিয়া পায় নাই, সে বারকয়েক সুদীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া আবার ডুব দিল।

এবারও সমধিক কাল ডুবিয়া থাকিয়া সে আবার উঠিল; একবার সজোরে মস্তক সঞ্চালন করিয়া এক হাতে সাঁতার কাটিয়া তীরের দিকে অগ্রসর হইল।

সকলে সচীৎকারে প্রশ্ন করিল,—"পেয়েছ? পেয়েছ?"

যুবক হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল,—"বলতে পারি না। তবে এক মুঠো টিকি পেয়েছি।"

যুবক যখন তীরে আসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল, তাহার বামমুষ্টি এক গুচ্ছ পরিপুষ্ট শিখা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া আছে এবং নিমজ্জিত পণ্ডিতের দেহসমেত মুণ্ড উক্ত শিখার সহিত সংলগ্ন হইয়া আছে।

কিয়ৎকাল শুশ্রূষার পর পণ্ডিতের চৈতন্য হইল। তিনি কিছু জল পান করিয়াছিলেন, তাহা উৎক্ষিপ্ত হইবার পর চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। যুবক সহাস্য-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "শিরোমণি মশায়, বলুন দেখি, বেঁচে আছেন, না ম'রে গেছেন? আপনার নব্য ন্যায়শাস্ত্র কি বলে?"

শিরোমণি একচক্ষু দ্বারা কিছুক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন,—"কে—নিপাতনে সিদ্ধ? ডুবে গিয়েছিলুম—না? তুমি বাঁচালে?" যুবককে শিরোমণি মহাশয় 'নিপাতনে সিদ্ধ' বলিয়া ডাকিতেন। একটু ব্যাকরণের খোঁচাও ছিল; কূটতর্কে অপরাজেয় শক্তির জন্য সমাদরমিশ্রিত স্নেহও ছিল।

নিপাতনে সিদ্ধ হাসিয়া বলিল,—"বাঁচাতে পেরেছি কি না, সেই কথাই ত জিজ্ঞাসা করছি। যদি বেঁচে থাকেন, ন্যায়ের প্রমাণ দিন।"

কাণভট্ট ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। এইমাত্র মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন—শরীরে বল নাই; কিন্তু এক চক্ষুতে প্রাণময় হাসি ফুটিয়া উঠিল; তিনি বলিলেন,—"প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। আমি বেঁচে আছি—এ কথা স্বয়ংসিদ্ধ। আমি বেঁচে নেই, এ কথা যে বলে, সে তৎক্ষণাৎ প্রমাণ ক'রে দেয় যে, সে বেঁচে আছে। বাজীকর যত কৌশলী হোক, নিজের স্কন্ধে আরোহণ করতে অক্ষম; মানুষ তেমনি নিজেকে অস্বীকার করতে পারে না।"

নৈয়ায়িকের কথায় সকলে হাসিয়া উঠিল। নিপাতনে সিদ্ধ বলিল,—"যাক, তা হ'লে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।—এখন উঠতে পারবেন কি?"

শিরোমণি তাহার হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন,—"হঠাৎ হাতে পায়ে কেমন খিল ধ'রে গিয়েছিল। নিপাতন, তুমিই জল থেকে টেনে তুলেছ—না?"

নিপাতন বলিল,—"উঁহু। আপনাকে টেনে তুলেছে আপনার প্রচণ্ড পাণ্ডিত্যের বিজয়-নিশান।"

"সে কি?"

"আপনার নধর শিখাটিই আপনার প্রাণদাতা। ওটি না থাকলে কিছুতেই টেনে তুলতে পারতাম না।"

"জ্যাঠা ছেলে!"

"আপনার পৈতে ছুঁয়ে বলছি—সত্যি কথা।—কিন্তু সে যা হোক, একলা বাড়ী ফিরতে পারবেন ত?"

"পারব, এখন বেশ সুস্থ বোধ করছি"—তার পর তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন,—"বিশ্বম্ভর, এত দিন জানতাম, তুমি নিপাতনেই সিদ্ধ, কিন্তু এখন দেখছি, প্রাণদানেও তুমি কম পটু নও। আশীর্ব্বাদ করি, এমনি ভাবে মজ্জমানকে উদ্ধার করেই যেন তোমার জীবন সার্থক হয়।"

নিপাতন হাসিয়া বলিল,—"কি সর্ব্বনাশ! শিরোমণি-মশাই, ও আশীর্ব্বাদ করবেন না। তা হ'লে আমার ব্যাকরণ টোলের কি দশা হবে?"

ও দিকে নৌকার মালিক যুবকটি এ সব ব্যাপার কিছুই জানিতে পারে নাই। সে নগর-ভ্রমণের উপযুক্ত সাজসজ্জা করিয়া ঘাটে নামিল। স্নান-ঘাটের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। দেখিল, এক অতি গৌর-কান্তি সুপুরুষ যুবা এক জন মধ্যবয়স্ক একচক্ষু ব্যক্তির সহিত দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে। এই গৌরাঙ্গ যুবকের অপূর্ব্ব দেহ-সৌষ্ঠব দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গেল। সে পৃথিবীর অনেক দেশ দেখিয়াছে; সিংহল, কোচিন, সুমাত্রা, যবদ্বীপ—কোথাও যাইতে তাহার বাকি নাই। কিন্তু এমন অপরূপ তেজো-দীপ্ত পুরুষমূর্ত্তি আর কখনও দেখে নাই।

এক জন জেলে মাঝি নিজের ক্ষুদ্র ডিঙ্গীতে বসিয়া জাল বুনিতেছিল, যুবক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাপু, ঐ লোকটি কে জান?"

জেলে একবার চোখ তুলিয়া বলিল,—"ঐ উনি? উনি নিমাই পণ্ডিত।"

যুবক ভাবিল—পণ্ডিত! এত অল্পবয়সে পণ্ডিত! যুবকের নিজের পাণ্ডিত্যের সহিত কোনও সংবাদ ছিল না। সে বেণের ছেলে, বুদ্ধির বলেই সাত সাগর চষিয়া সোণাদানা আহরণ করিয়া আসিয়াছে। সে আর একবার নিমাই পণ্ডিতের অনিন্দ্য দেহকান্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হৃষ্টচিত্তে নগর পরিদর্শনে বাহির হইল।

২

বেণের ছেলের নাম চন্দনদাস। বেশ সুশ্রী চোখে-লাগা চেহারা; বয়স একুশ বাইশ। বুদ্ধিমান, বাক্‌পটু, বিনয়ী—বেণের ছেলের যত প্রকার গুণ থাকা দরকার, সবই আছে; বরং দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া নানাজাতীয় লোকের সহিত মিশিয়া আরও পরিমার্জ্জিত হইয়াছে। বেশভূষাও ঘরবাসী

বাঙ্গালী হইতে পৃথক্। পায়ে সিংহলী চটি, পরিধানে চাঁপা রঙ্গের রেশমী ধুতি মালসাট করিয়া পরা ; স্কন্ধে উত্তরীয়। দুই কাণে হীরার লবঙ্গ ; মাথার কোঁকড়া চুল কাঁধ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে—মাঝখানে সীঁথি। গলায় সোণার হার বণিক্-পুত্রের জাতি-পরিচয় দিতেছে।

চন্দনদাস অগ্রদ্বীপের প্রসিদ্ধ সওদাগর রূপচাঁদ সাধুর পুত্র। রূপচাঁদ সাধুর বয়স হইয়াছে, তাই এবার নিজে না গিয়া উপযুক্ত পুত্রকে বাণিজ্যে পাঠাইয়াছিলেন। এক বৎসর নয় মাস পরে ছেলে বিলক্ষণ দু'পয়সা লাভ করিয়া দেশে ফিরিতেছে। বহুদিন একাদিক্রমে নৌকা চালাইয়া মাঝি-মাল্লারা ক্লান্ত ; তাই এক দিনের জন্য চন্দনদাস নবদ্বীপে নৌকা বাঁধিয়াছে। কাল প্রভাতেই আবার গৃহাভিমুখে যাত্রা করিবে।

চন্দনদাস হরষিত-মনে গঙ্গাঘাটের পথ ধরিয়া নগর-দর্শনে চলিল। সে-সময় নবদ্বীপের সমৃদ্ধির বিশেষ খ্যাতি ছিল। পথে পথে নাটশালা, পাঠশালা, চূণ-বিলেপিত দেউল, প্রতি গৃহচূড়ায় বিচিত্র ধাতু-কলস, প্রতি দ্বারে কারু-খচিত কপাট ; বাজারের এক বিপণিতে লক্ষ তঙ্কার সওদা কেনা যায়। পথগুলি সঙ্কীর্ণ বটে, কিন্তু তাহাতে নগরশ্রী আরও ঘনীভূত হইয়াছে। রাজপথে বহু লোকের ব্যস্ত যাতায়াত নগরকে সজীব ও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে।

অনায়াস-মন্থরপদে চন্দনদাস চারিদিকে চাহিতে চাহিতে চলিয়াছিল ; কিছু দূর যাইবার পর একটি জিনিষ দেখিয়া হঠাৎ তাহার বাইশ বছরের মুণ্ড ঘুরিয়া গেল, সে পথের মাঝখানেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়াইয়া পড়িল। বেচারা চন্দনদাস সাত সাগর পাড়ি দিয়াছে, কিন্তু সে বিদ্যাপতির কাব্য পড়ে নাই,—'মেঘজাল সঞে তড়িতলতা জনু হৃদয়ে শেল দেই গেল' এরূপ ব্যাপার যে সম্ভবপর, তাহা সে জানিত না। বিদ্যাপতি জানা থাকিলে হয় ত ভাবিতে পারিত—

অপরূপ পেখলুঁ রামা
কনকলতা অব- লম্বনে উয়ল
হরিণহীন হিমধামা।

কিন্তু চন্দনদাস কাব্যরসবঞ্চিত বেণের ছেলে, আত্মবিস্মৃত-ভাবে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল। প্রভাতে সে কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিল কে জানে, কিন্তু আজ তাহার সুন্দর মুখ দেখিবার পালা।

যাহাকে দেখিয়া চন্দনদাসের মুণ্ড ঘুরিয়া গিয়াছিল, সে মেয়েটি এক জন বয়স্থা সহচরীর সঙ্গে ঘাটে স্নান করিতে যাইতেছিল। পূর্ণযৌবনা ষোড়শী—তাহার রূপের বর্ণনা করিতে গিয়া হতাশ হইতে হয়। বৈষ্ণব রসসাহিত্য নিঙড়াইয়া এই রূপের একটা কাঠামো খাড়া করা যাইতে পারে। হয় ত এমনিই কোনও গোরোচনা গোরী নবীনার নববিকশিত রূপ দেখিয়া প্রেমিক বৈষ্ণব কবি তাঁহার রাই কমলিনীকে গড়িয়াছিলেন, কে বলিতে পারে ? মেয়েটির প্রতি পদক্ষেপে দর্শকের হৃৎকমল দুলিয়া দুলিয়া উঠে, যেন হৃৎকমলের উপর পা ফেলিয়া সে চলিয়াছে। তাহার মদির নয়নের অপাঙ্গদৃষ্টিতে মনের মধ্যে মধুর মাদকতা উন্মথিত হইয়া উঠে।

কিন্তু এত রূপ সত্ত্বেও মেয়েটির মুখখানি ম্লান, যেন তাহার উপর কালো মেঘের ছায়া পড়িয়াছে। চোখ দুটি অবনত করিয়া ধীরপদে সে চলিয়াছে ; তৈলসিক্ত চুলগুলি পিঠের উপর ছড়ানো ; পরনে আটপৌরে রাঙাপাড় সাড়ী। দেহে একখানিও গহনা নাই, এমন কি, নাকে বেসর, কাণে দুল পর্য্যন্ত নাই। কেবল দুই হাতে দু'গাছি শঙ্খ।

মেয়েটির সঙ্গে যে সহচরী রহিয়াছে, তাহাকে সহচরী না বলিয়া প্রতিহারী বলিলেই ভাল হয়। সে যেন চারিদিক হইতে তাহাকে আগলাইয়া চলিয়াছে। তাহাকে দেখিলেই বুঝা যায়, বিগত-যৌবনা দুষ্টা স্ত্রীলোক। আঁট-সাঁট দোহারা গঠন, গোলাকৃতি মুখ, কলহপ্রিয় বড় বড় দুটা চোখ যেন সর্ব্বদাই ঘুরিতেছে।

চন্দনদাস হাঁ করিয়া পথের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া রহিল, মেয়েটি তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল। পাশ দিয়া যাইবার সময় একবার চকিতের ন্যায় চোখ তুলিল, আবার তৎক্ষণাৎ মাথা হেঁট করিল। সঙ্গিনী স্ত্রীলোকটা কটমট করিয়া চন্দনদাসের পানে তাকাইল ; তাহার আত্মবিস্মৃত বিহ্বলতার জন্য যেন কিছু বলিবে মনে করিল। কিন্তু চন্দনদাসের বিদেশীর মত সাজ-সজ্জা দেখিয়া কিছু না বলিয়া সমস্ত দেহের একটা স্বৈরিণীসুলভ ভঙ্গী করিয়া চলিয়া গেল।

চন্দনদাসও অমনই ফিরিল। তাহার নগরভ্রমণের কথা আর মনে ছিল না, সে একদৃষ্টে মেয়েটির দিকে তাকাইয়া রহিল। মেয়েটিও কয়েক পা গিয়া একবার ঘাড় বাঁকাইয়া পিছু ফিরিয়া চাহিল। "গেলি কামিনী, গজহু গামিনী,

বিহঙ্গি পালটি নেহারি'—চন্দনদাসের যেটুকু সর্ব্বনাশ হইতে বাকি ছিল, তাহাও এবার হইয়া গেল।

সেও গঙ্গাঘাটের দিকে ফিরিল; অগ্রবর্ত্তিনী স্নানার্থিনী-দের দৃষ্টি-বহির্ভূত হইতে না দিয়া তাহাদের পিছু পিছু চলিল।

ক্রমে তাহারা ঘাটের সম্মুখে পৌঁছিল। এখানে চন্দনদাস আবার নিমাই পণ্ডিতকে দেখিতে পাইল। তিনি স্নান শেষ করিয়া বোধ হয় গৃহে ফিরিতেছিলেন; ভিজা গামছা গায়ে জড়ানো। চন্দনদাস লক্ষ্য করিল, মেয়েটির প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই নিমাই পণ্ডিতের মুখে একটা স্নিগ্ধ কারুণ্যের ভাব দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল। তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর স্ত্রীলোক দুইটি ঘাটে গিয়া স্নান করিল। চন্দনদাস একটু আড়ালে থাকিয়া চোরা চাহনিতে দেখিল। চন্দনদাস দুষ্মন্ত নয়,—"অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা" তাহার মনে আসিল না; কিন্তু নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণে তাহার ধারণা জন্মিল যে, মেয়েটি বেণের মেয়ে, তাহার স্বজাতি। কিন্তু একটা কথা সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না, এত বয়স পর্য্যন্ত মেয়েটি অনূঢ়া কেন? বিধবা নয়, হাতের শঙ্খ ও রাঙ্গা পাড় সাড়ী তাহার প্রমাণ। তবে ষোলো সতের বছরের মেয়ে বাঙ্গালা দেশে অবিবাহিত থাকে কি করিয়া?

কিন্তু সে যা হউক, স্নান সারিয়া তাহারা যখন ফিরিয়া চলিল, তখন সেও তাহাদের পিছু লইল।

চন্দনদাসের ব্যবহারটা বর্ত্তমানকালে কিছু বর্ব্বরোচিত বোধ হইতে পারে। কিন্তু এ কালের রুচি দিয়া সে কালের শিষ্টাচার বিচার করা সর্ব্বথা নিরাপদ নয়। তা ছাড়া, উপস্থিত ক্ষেত্রে শিষ্টাচারের সূক্ষ্ম অনুশাসন মানিয়া চলিবার মত হৃদয়ের অবস্থা চন্দনদাসের ছিল না। তাহার কাঁচা হৃদযন্ত্রটা একেবারেই অবশ হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষ দোষ দেওয়াও যায় না। অনুরূপ অবস্থায় পড়িয়া সে কালের ঠাকুর-দেবতারাও কিরূপ বিহ্বল বে-এক্তিয়ার হইয়া পড়িতেন, তাহা ত ভক্ত কবিগণ লিপিবদ্ধ করিয়াই গিয়াছেন।—"এ ধনি কে কহ বটে!"

মোট কথা, চন্দনদাস তাহার মন-চোরা মেয়েটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। এ পথ হইতে ও পথে কয়েকটা মোড় ফিরিয়া প্রায় একপোয়া পথ অতিক্রম করিবার পর মেয়েটি এক গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। চন্দনদাস দেখিল, পাড়াটা অপেক্ষাকৃত গরীব বেণে-পাড়া। অধিকাংশ বাড়ীর খড়ের বা খোলার চাল।

গলির মধ্যে কিছু দূর গিয়া মেয়েটি এক ক্ষুদ্র পাকা বাড়ীর দালানে উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। বাড়ীটা পাকা বটে, কিন্তু অতিশয় জীর্ণ ও শ্রীহীন। বাড়ীর সম্মুখীন হইয়া চন্দনদাস দেখিল, দালানের উপর একটি ক্ষুদ্র বেণের দোকান। আদা, মরিচ, হলুদ, লঙ্কা ছোট ছোট ধামিতে সাজানো আছে; এক জন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বেসাতি করিতেছে। দালানের পশ্চাদ্ভাগে একটি দ্বার, উহাই অন্দরে প্রবেশ করিবার পথ। চন্দনদাস বুঝিল, ঐ পথেই মেয়েটি ও তাহার সঙ্গিনী অন্দরে প্রবেশ করিয়াছে।

চন্দনদাস বড় সমস্যায় পড়িল; সে কোন মৎলব স্থির করিয়া ইহাদের অনুসরণ করে নাই, গুণের নৌকার ন্যায় অদৃশ্য রজ্জুবন্ধন তাহাকে টানিয়া আনিয়াছে। কিন্তু এখন সে কি করিবে? কেবলমাত্র মেয়েটির বাড়ী দেখিয়া ফিরিয়া যাইবে? চন্দনদাস বাড়ীর সম্মুখ দিয়া কয়েকবার অলস-ভাবে যাতায়াত করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল। তাহার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, তাহার মা তাহাকে নবদ্বীপ হইতে ভাল চুয়া কিনিয়া আনিতে বলিয়াছিলেন। সে কথা সে ভুলে নাই, আজ নগর-ভ্রমণের সময় কিনিয়া লইবে স্থির করিয়াছিল; কিন্তু চুয়া কিনিবার অছিলা এমন-ভাবে সদ্ব্যবহার করিবার কথা এতক্ষণ তাহার মনেই আসে নাই।

সে দৃঢ়পদে দোকানের সম্মুখীন হইল; মিঠা হাসিয়া বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁগো ভাল মানুষের মেয়ে, তোমার দোকানে ভাল চুয়া আছে?

৩

যে বৃদ্ধা বেসাতি করিতেছিল, তাঁহার দেহ-যষ্টিতে বিন্দু-মাত্র রস না থাকিলেও প্রাণটা তাজা ও সরস ছিল। চন্দন-দাসকে বাড়ীর সম্মুখে অকারণ ঘুর্ ঘুর্ করিতে দেখিয়া বুড়ী এই অনিশ্চিত ঘোরা-ঘুরির গূঢ় কারণটি ধরিয়া ফেলিয়াছিল এবং মনে মনে একটু আমোদ অনুভব করিতেছিল। পাড়ার কোনও চ্যাংড়া ছোঁড়া হইলে বুড়ী মুখ ছাড়িত; কিন্তু এই কান্তিমান সুদর্শন ছেলেটির বিদেশীর মত সাজ-পোষাক দেখিয়া সে একটু আকৃষ্ট হইয়াছিল।

চন্দনদাসের প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল, "আছে বৈ কি, বাছা। এসো, বোসো।"

চন্দনদাসও তাই চায়, সে দালানে উঠিয়া একটি জল-চৌকির উপর চাপিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল,—"হ্যাঁ গা, তোমাদের বাড়ীতে কি পুরুষমানুষ নেই? তুমি নিজে বেসাতি করছ যে?"

বৃদ্ধা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"সে কথা আর বোলো না, বাছা; একটা ব্যাটাছেলে ঘরে থাকলে কি আজ আমাদের এমন খোয়ার হয়?"—তার পর কথা পাল্টাইয়া বলিল,—"তা হ্যাঁ বাছা, তোমাকে ত আগে কখনও দেখিনি, নদের লোক নও বুঝি?"

চন্দনদাস বলিল,—"না, আমার বাড়ী অগ্রদ্বীপ।"

বুড়ী বলিল,—"ও—তাই। কথায় বার্ত্তায় যেন বেণের ছেলে ব'লে মনে হচ্ছে।"

চন্দনদাস তখন জাতি-পরিচয় দিল, নিজের ও পিতার নাম উল্লেখ করিল। বুড়ী দু'দণ্ড বসিয়া গল্প করিবার লোক পায় না, সে আহ্লাদে গদ-গদ হইয়া বলিল,—"ও মা, তুমি ত আমাদের ঘরের ছেলে গো—স্বজাত। আহা, যেমন সোণার কার্ত্তিকের মত চেহারা, তেমনি মা'র কোল জুড়ে বেঁচে থাক। —কোথায় বিয়ে-থা করেছ?"

চন্দনদাস কহিল,—"তের বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল আয়ি, এক বছর পরেই বৌ ম'রে যায়। তার পর আর বিয়ে করিনি।"

বুড়ী একটু বিমনা হইল; তার পর উৎসুকভাবে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

চন্দনদাস কথাপ্রসঙ্গে বলিল,—"সমুদ্রে গিয়েছিলাম আমি, দু'বছর পরে দেশে ফিরছি। তা ভাবলাম, নদেয় এক দিন থেকে যাই; মা'র বরাত আছে চুয়া কেনবার, চুয়া কেনাও হবে, একটু জিরেণ দেওয়াও হবে।"

বুড়ী বলিল,—"তা বেশ করেছ, বাবা। ভাগ্যিস এসেছিলে, তাই ত অমন চাঁদমুখখানি দেখতে পেলাম।—" বলিয়া বুড়ী একটা নিশ্বাস ফেলিল। তাহার প্রাণের ভিতরটা হায় হায় করিয়া উঠিল। আহা, যদি সম্ভব হইত!

চন্দনদাস এতক্ষণ ফাঁক খুঁজিতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল,—"আয়ি, তোমার আপনার জন কি কেউ নেই?"

"একটি নাতনী আছে, আর সর্ব্ব ম'রে হেজে গেছে। পোড়া-কপালী ছুঁড়ীর কপাল!" বলিয়া বুড়ী আঁচলে চোখ মুছিল।

"নাতনী!"—চন্দনদাস সচকিত হইয়া উঠিল; তবে বুড়ীর নাতনীকেই সে দেখিয়াছে।—"তবে তুমি বুড়ো মানুষ দোকান দেখ কেন? সে দেখতে পারে না?"

বুড়ী উদাস আশাহীন স্বরে বলিল,—"সে অনেক কথা, বাছা। আমাদের দুঃখের কাহিনী কাউকে বলবার নয়। সমাজ আমাদের বিনা দোষে পাতে ঠেলেছে, মুখ তুলে চাইবার কেউ নেই। আর, কাকেই বা দোষ দেব, সব দোষ ঐ হতভাগীর কপালের। এমন রূপ নিয়ে জন্মেছিল, সেই রূপ ওর শত্তুর।"

চন্দনদাসের কৌতূহল ও উত্তেজনা বাড়িয়াই চলিয়াছিল। সে সাগ্রহে প্রশ্ন করিল,—"কি ব্যাপার আয়ি? সব কথা খুলেই বল না।"

বুড়ী কিন্তু রাজি হইল না, বলিল,—"কি হবে বাবা আমাদের লজ্জার কথা শুনে? কিছু ত করতে পারবে না, কেবল মনে দুঃখ পাবে।"

"কে বললে, কিছু পারব না?"

"না বাবা, সে কেউ পারবে না।—আহা! সোণার প্রতিমা আমার কালই জলে ভাসিয়ে দিতে হবে রে—" বলিয়া বুড়ী হঠাৎ মুখে কাপড় চাপা দিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

চন্দনদাস বুড়ীর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—"আয়ি, আমি বেণের ছেলে, তোর গা ছুঁয়ে বলছি, মানুষের যা সাধ্য, আমি তা করব। তোর নাতনীর কি বিপদ বল্।"

বুড়ী উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বোধ করি তাহার ক্রন্দনের শব্দে আকৃষ্ট হইয়া সেই বিগতযৌবনা প্রহরিণী বাহির হইয়া আসিল, কর্কশ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"কাঁদছিস কেন রে, বুড়ী? কি হয়েছে?"

বুড়ী বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী, তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া আমৃতা আমৃতা করিয়া বলিল,—"কিছু নয় রে চাপা—অমনি। এই ছেলেটি দূর-সম্পর্কে আমার নাতি হয়, অনেক দিন পরে দেখলুম—তাই—"

চাপা চন্দনদাসের দিকে ফিরিল, বৃহৎ সুবর্ত্তুল চক্ষু তাহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া বুড়ীর উদ্দেশে বলিল,—"হুঁ, নাতি!—তোর নাতি আছে, আগে কখনও বলিস নি ত?"

বুড়ী কম্পিতস্বরে বলিল,—"বললুম না দূর-সম্পর্কে। আমার পিসতুত বোনের—"

চাঁপা বলিল,—"বুঝেছি"—তার পর চন্দনদাসকে প্রশ্ন করিল,—"তোমাকে আজ পথে দেখেছি না ?"

চন্দনদাস সটান মিথ্যাকথা বলিল,—"কৈ, না ! আমার ত মনে পড়ছে না !"

চাঁপা তীক্ষ্ণ-চক্ষুতে আরও কিছুক্ষণ চন্দনদাসকে নিরীক্ষণ করিল, শেষে মুখে একটু হাসি আনিয়া বলিল,—"তবে আমারই ভুল। বুড়ী, তুই তা হ'লে তোর নাতির সঙ্গে কথা ক'—আমি একটু পাড়া বেড়িয়ে আসি। তোর নাতি আজ এখানে থাকবে ত ? দেখিস, ছেড়ে দিস্‌নি যেন, এমন রসের নাতি কালেভদ্রে পাওয়া যায়।" বলিয়া চোখ ঘুরাইয়া বাহিরের দিকে প্রস্থান করিল।

চাঁপা দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া গেলে চন্দনদাস জিজ্ঞাসা করিল, —"এটি কে ?"

বুড়ীর তখনও হৃৎকম্প দূর হয় নাই, সে বলিল,—"ও মাগী যমের দূত। বাবা, এমন ভয় হয়েছিল—এখনি টুঁটি টিপে ধরত। তুই যা দাদা, আর এখানে থাকিস নি। ওরে, তুই আমাদের কি ভাল করবি, ভগবান্ আমাদের ভুলে গেছেন। তুই এখান থেকে পালা, শেষে কি মায়ের নিধি বেঘোরে প্রাণ দিবি ?"

চন্দনদাস বলিল,—"সে কি ঠানদি, নাতিকে কি এম্‌নি করেই তাড়াতে হয় ? একটা পাণ পর্য্যন্ত দিতে নেই। তা ছাড়া চুয়া কিনতে এসেছি, চুয়া না দিয়েই তাড়িয়ে দিচ্ছিস ? তুই কেমন বেণের মেয়ে ?"

বুড়ী এবার হাসিয়া ফেলিল। এই ছেলেটির মুখের কথা যতই সে শুনিতেছিল, ততই তাহার মন ভিজিতেছিল। তাহার প্রাণের একান্তে বিদলিত মুহ্যমান আশা একটু মাথা তুলিল। তবে কি এই শেষ সময়ে ভগবান্ মুখ তুলিয়া চাহিলেন ?

বুড়ী মনে মনে ভাবিল,—যা হয় তা হয়, একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিব। কে বলিতে পারে, হয় ত অভাগিনীর ভাগ্যে চরম দুর্গতি বিধাতা লেখেন নাই ; না হ'লে নিরাশার গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে এই অপরিচিত বন্ধু কোথা হইতে আসিয়া জুটিল ?

তখন বুড়ী সঙ্কল্প স্থির করিয়া বলিল,—"ও মা, সত্যি ত। চুয়ার কথা মনেই ছিল না। তা দেব দাদা—কিন্তু বড় দামী জিনিষ, দাম দিতে পারবে ত ?"

"দাম কত ?"

"জীবন যৌবন মন প্রাণ সব দিলেও সে জিনিষের দাম হয় না।"

চন্দনদাস একটু অবাক্ হইল, কিন্তু হারিবার পাত্র সে নয়, বলিল,—"আচ্ছা, আগে জিনিষ দেখি।"

"এই যে দেখাই, ওলো ও চুয়া, একবার এ দিকে আয় ত, দিদি।"

চন্দনদাস তাড়ংস্পৃষ্টের মত চমকিয়া উঠিল। তবে মেয়েটির নাম চুয়া। আর সে চুয়া কিনিতে এখানে আসিয়াছে। এ কি দৈব যোগাযোগ !

"কি বলছ, ঠান্‌দি"—বলিতে বলিতে চুয়া অন্দরের দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। চন্দনদাসকে দেখিয়া সে চমকিয়া বুকের উপর হাত রাখিল। চন্দনদাস সেই দিকেই তাকাইয়াছিল, দেখিল, চুয়ার কুমুদের মত গাল দুটিতে কে যেন কাঁচা সিঁদূর ছড়াইয়া দিল। তার পর ম্রিয়মাণ লজ্জায় তাহার চোখদুটি ধীরে ধীরে নত হইয়া পড়িল। চন্দনদাস বুঝিল, চুয়া তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে ; পথের ক্ষণিক দেখা মুগ্ধ পান্থকে ভুলে নাই।

বুড়ী বলিল,—"চুয়া, অতিথ এসেছে ; একটু মিষ্টি মুখ করা, পাণ দে।"

চুয়া মুখ তুলিল না, আস্তে আস্তে চন্দনদাসের সতৃষ্ণ চক্ষুর সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল।

কিছুক্ষণ কোনও কথা হইল না। চন্দনদাস দ্বারের দিকেই তাকাইয়া রহিল। শেষে বুড়ী বলিল,—"আমার চুয়াকে দেখলে ?"

"দেখলাম"—আগেও যে দেখিয়াছে, তাহা আর চন্দনদাস ভাঙ্গিল না। বুড়ীও সে দিক্ দিয়া গেল না, বলিল—"কেমন মনে হ'ল ?"

"মনে হ'ল—" সহসা চন্দনদাস বুড়ীর দিকে বাঁকিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"ঠানদি, চুয়ার কি বিপদ, আমায় বল। কেন তোমাদের সবাই জাতে ঠেলেছে ? ওর এখনও বিয়ে হয়নি কেন ?"

দ্বারের নিকট হইতে জবাব আসিল,—"কি হবে তোমার শুনে ?"

এক হাতে দুল-কাঁসার ছোট রেকাবির উপর চারখানি বাতাসা ও ছুটি পাণ; অন্য হাতে জলের ঘটি লইয়া চুয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। চন্দনদাসের শেষ কথাগুলি সে শুনিতে পাইয়াছিল; শুনিয়া লজ্জায় ধিক্কারে তাহার মন ভরিয়া উঠিয়াছিল। কেন এই অপরিচিত যুবকের এত কৌতূহল? তাহাকে বলিয়াই বা লাভ কি?—চুয়া রেকাবি ও ঘটি চন্দনদাসের সম্মুখে নামাইয়া আরক্ত-মুখে তীব্র অধীর স্বরে বলিল,—"কে তুমি? কোথা থেকে এসেছ? কি হবে তোমার আমাদের কথা শুনে?"

ক্ষণকালের জন্য চন্দনদাস বিস্ময়ে হতবাক হইয়া রহিল; তার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া চুয়ার মুখের উপর চোখ রাখিয়া শান্ত সংযত স্বরে বলিল,—"চুয়া, আমি তোমার স্বজাতি; আমার বাড়ী অগ্রদ্বীপ। নবদ্বীপের ঘাটে আমার ডিঙ্গা বাঁধা আছে। তোমার কি বিপদ, আমি জানি না; কিন্তু আমি যদি তোমার সাহায্য করতে চাই, আমার সাহায্য কি নেবে না?"

চুয়ার মুখ হইতে সমস্ত রক্ত নামিয়া গিয়া মুখখানা শাদা হইয়া গেল। তাহার চোখে পরিত্রাণের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষণ-বিস্ফারিত আশার আলো ফুটিয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্তের জন্য তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তার পর সে রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল,—"কেন আমাকে মিছে আশা দিচ্ছ?" বলিয়া দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

চন্দনদাস বসিয়া পড়িল। কিয়ৎকাল বসিয়া থাকিয়া অন্য-মনস্কভাবে একখানা বাতাসা তুলিয়া লইয়া মুখে দিল; তার পর আলগোছে ঘটির জল গলায় ঢালিয়া জলপান করিল। শেষে পাণছুটি মুখে পুরিয়া বুড়ীর দিকে তাকাইয়া মৃদুহাস্যে বলিল,—"ঠানদি, এবার তোমার গল্প বল।"

"বলব, কিন্তু তুমি আগে একটা কথা দাও।"

"কি?"

"তুমি ওকে উদ্ধার করবে?"

"করব। অন্ততঃ প্রাণপণে চেষ্টা করব।"

"বেশ, উদ্ধার করা মানে ওকে এ দেশ থেকে নিয়ে যেতে হবে। পারবে?"

"পারব—খুব পারব।"

"ভাল, কিন্তু তার পর?"

"তার পর কি?"

বুড়ী একটু দ্বিধা করিল; শেষে বলিল,—"কিছু মনে করো না, সব কথা স্পষ্ট ক'রে বলাই ভাল। তুমি জোয়ান ছেলে, চুয়াও যুবতী মেয়ে, তুমি ওকে চুরি ক'রে নিয়ে যাবে। তার পর?"

চন্দনদাস জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া রহিল।

বুড়ী তখন স্পষ্ট করিয়া বলিল,—"ওকে বিয়ে করতে পারবে?"

চন্দনদাসের চোখের সম্মুখে যেন একটা নূতন আলো জ্বলিয়া উঠিল; সে উদ্ভাসিত-মুখে বলিল,—"পারব।"

"তোমার বাপ-মা—"

"তাঁরা আমার কথায় অমত করবেন না।"

বৃদ্ধা কম্পিতস্বরে বলিল,—"বেঁচে থাকো দাদা, তুমি বড় ভাল ছেলে। কিন্তু ছুঁড়ীর যা কপাল—"

বুড়ী তখন চুয়ার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। চন্দনদাস করতলে কপোল রাখিয়া শুনিতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে সে টের পাইল, চুয়া কখন্ চুপি চুপি আসিয়া দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়াছে।

চুয়ার বাপের নাম কাঞ্চনদাস। বেণেদের মধ্যে সে বেশ সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ ছিল। চুয়ার বয়স যখন সাত বৎসর, তখন কাঞ্চনদাস বাণিজ্যের জন্য নৌকা সাজাইয়া সমুদ্রযাত্রা করিল। কাঞ্চনদাসের নৌকা গঙ্গার বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল—আর ফিরিল না। সংবাদ আসিল, নৌকাডুবি হইয়া কাঞ্চনদাস মারা গিয়াছে।

এই ঘটনার এক বৎসর পরে চুয়ার মা'ও মরিল। তখন বুড়ী ছাড়া চুয়াকে দেখিবার আর কেহ রহিল না। বুড়ী কাঞ্চনদাসের মাসী—আট বছর বয়স হইতে সে হাতে করিয়া চুয়াকে মানুষ করিয়াছে।

নৌকাডুবিতে কাঞ্চনদাসের সমস্ত সম্পত্তিই ভরা-ডুবি হইয়াছিল; কেবল এই ভদ্রাসনটি বাঁচিয়াছিল। বুড়ী দোকান করিয়া কষ্টে সংসার চালাইতে লাগিল।

এইভাবে বৎসরাধিক কাল কাটিল। চুয়ার বয়স যখন দশ বছর, তখন এক গৃহস্থের ছেলের সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ হইল।

এই সময় এক দিন জমিদারের ভ্রাতুষ্পুত্র ঘোড়া চড়িয়া এই পথ দিয়া যাইতেছিল। চুয়াকে বাড়ীর সম্মুখে খেলা করিতে দেখিয়া সে ঘোড়া হইতে নামিল। উদ্দাম জমিদারের মহাপাষণ্ড ভাইপো মাধবের নাম শুনিয়া দেশের লোক ত দূরের কথা, কাজী সাহেব পর্য্যন্ত থর থর করিয়া কাঁপে। রাজার শাসন—সমাজের শাসন কিছুই সে মানে না। জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলে কি হয়, স্বভাব তার চণ্ডালের মত। সে দশ বছরের চুয়াকে চিবুক তুলিয়া ধরিয়া দেখিল, তার পর বাড়ীতে আসিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল।

বুড়ী ভয়ে ভয়ে পরিচয় দিল। শুনিয়া মাধব বলিল, এ মেয়ের বিবাহ দেওয়া হইবে না, ইহাকে দৈবকার্য্যের জন্য মানত করিতে হইবে। ষোল বছর বয়স পর্য্যন্ত মেয়ে কুমারী থাকিবে, তার পর মাধব আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবে। তান্ত্রিক সাধনায় উত্তরসাধিকার স্থান অধিকার করিয়া কন্যার ষোল বছরের কৌমার্য্য সার্থক হইবে। সাধক—স্বয়ং মাধব।

এই হুকুমজারি করিয়া মাধব প্রস্থান করিল। বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল; তান্ত্রিক সাধনার গূঢ় মর্ম্মার্থ বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না। বণিক্-সমাজ মাধবের বিরুদ্ধে কিছু করিতে সাহস করিল না, তাহারা চুয়াকে জাতিচ্যুত করিল। বিবাহও ভাঙ্গিয়া গেল।

ক্রমে চুয়ার বয়স বাড়িতে লাগিল—বারো বছর বয়স হইল। বুড়ী দেশে কাহারও নিকট সাহায্য না পাইয়া শেষে চুয়াকে লইয়া দেশ ছাড়িয়া পলাইবার মতলব করিল। কিন্তু বুড়ীর হাতে পয়সা কম, আত্মীয়বন্ধুরও একান্ত অভাব। তাহার মতলব সিদ্ধ হইল না; মাধবের কাণে সংবাদ গেল।

মাধব আসিয়া বুড়ীকে পদাঘাত মুষ্ট্যাঘাত দ্বারা শাসন করিল; তার পর চুয়াকে পাহারা দিবার জন্য চাঁপাকে পাঠাইয়া দিল। নাপিত-কন্যা চাঁপা চুয়ার অভিভাবিকা-পদে অধিষ্ঠিত হইল। চাঁপা বয়সকালে তান্ত্রিক সাধন-ভজন করিয়াছিল, এখন যৌবনান্তে ধর্ম্মকর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, সে চুয়া ও বুড়ীর উপর কড়া নজর রাখিতে লাগিল।

এইভাবে চারি বৎসর কাটিয়াছে। কয়েক দিন আগে মাধব আসিয়াছিল। সে চুয়াকে দেখিয়া গিয়াছে এবং বলিয়া গিয়াছে যে, আগামী অমাবস্যার রাত্রিতেই চুয়াকে দৈবকার্য্যে উৎসর্গ করিতে হইবে—সে জন্য যেন সে প্রস্তুত থাকে। অনুষ্ঠানের যাহাতে কোনও ত্রুটি না হয়, এ জন্য মাধব নিজেই সমস্ত বিধান দিয়া গিয়াছে। অমাবস্যার সন্ধ্যার সময় চুয়া গঙ্গার ঘাটে গিয়া স্নান করিবে; স্নানান্তে রক্তবস্ত্র, জবামালা ও রক্তচন্দনের ফোঁটা পরিয়া ঘাট হইতে একেবারে সাধনস্থলে অর্থাৎ মাধবের উদ্যানবাটিকায় উপস্থিত হইবে। সঙ্গে ঢাক-ঢোল ইত্যাদি বাজিতে বাজিতে যাইবে।

মাধব এইরূপ শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিয়া চলিয়া যাইবার পর পাঁচ দিন কাটিয়া গিয়াছে। আজ কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী—কাল অমাবস্যা।

গল্প শেষ করিয়া বুড়ী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"দাদা, সব কথা তোমায় বললুম। এখন দেখ, যদি মেয়েটাকে উদ্ধার করতে পার। তুমি ছাড়া ওর আর গতি নেই।"

গল্প শুনিতে শুনিতে চন্দনদাসের বুকের ভিতরটা জ্বালা করিতেছিল, ঐ দানবপ্রকৃতি লোকটার বিরুদ্ধে ক্রোধ ও আক্রোশ অগ্নিশিখার মত তাহার দেহকে দাহ করিতেছিল। সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিয়া উঠিল,—"আমি যদি চুয়াকে বিয়ে ক'রে কাল আমার নৌকায় তুলে দেশে নিয়ে যাই—কে কি করতে পারে?"

দ্বারের আড়ালে চুয়ার বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল। কিন্তু বুড়ী মাথা নাড়িয়া রুদ্ধস্বরে বলিল,—"তা হয় না দাদা। চাঁপা রাক্ষুসী আছে—সে কখনই হ'তে দেবে না।"

চন্দনদাস বলিল,—"চাঁপাকে সোণায় মুড়ে দেব। তাতে রাজি না হয়, মুখে কাপড় বেঁধে ঘরে বন্ধ ক'রে রাখব।"

বুড়ী কাঁপিতে লাগিল, এতখানি দুঃসাহস তাহার পক্ষে কল্পনা করাও দুষ্কর। কিন্তু বুড়ীর প্রাণে আশা জাগিয়াছিল, আশা একবার জাগিলে সহজে মরিতে চায় না। তবু বুড়ী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "সে যেন হ'ল, কিন্তু বিয়ে হবে কি ক'রে? বিয়ে দেবে কে?"

"কেন—নদের কি পুরুত নেই?"

বৃদ্ধা মাথা নাড়িয়া বলিল,—"তুমি মাধবকে জানো না। তার ভয়ে কোনও বামুন রাজি হবে না।"

চন্দনদাস আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—"এখানকার বামুনরা এত ভীরু?"

"কার ঘাড়ে দশটা মাথা আছে দাদা যে, জমিদারের ভাইপো'র শত্রুতা করবে? তবে—শুনেছি, জগন্নাথ ঠাকুরের ছেলে নিমাই পণ্ডিত বড় ডাকাবুকো ছেলে, কাউকে ভয়

করেন না। বয়স কম কি না!—কিন্তু তিনি কি রাজি হবেন?"

চন্দনদাস মহা উৎসাহে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—"ভাল মনে করিয়ে দিয়েছ, ঠানদি,—নিমাই পণ্ডিতই উপযুক্ত লোক। তাঁকে আমি আজ গঙ্গাঘাটে দেখেছি; ঠিক দেবতার মত চেহারা—তিনি নিশ্চয় রাজি হবেন।—ঠানদি, আমি এখন তাঁর খোঁজে চললাম, ওবেলা সব ঠিক ক'রে আবার আসব। তখন—"

"কিন্তু তিনি যদি রাজি না হন?"

চন্দনদাস চিন্তা করিল,—"যদি রাজি না হন—! তিনি রাজি হোন বা না হোন, রাত্রিতে কোনও সময় আমি আসবই।—নাই বা হ'ল বিয়ে, আজ রাত্রিতে চুয়াকে চুরি ক'রে নিয়ে যাব। তার পর দেশে গিয়ে বিয়ে করব—কি বল?"

বুড়ীর মুখে আশঙ্কার ছায়া পড়িল। চন্দনদাসের যে কোনও দুরভিসন্ধি নাই, তাহা সে অন্তরে বুঝিতেছিল; কিন্তু তবু চন্দনদাস একেবারে অপরিচিত। সেও যে এক জন বড় প্রবঞ্চক নয়, তাহা বুড়ী কি করিয়া জানিবে? বারবার দাগা পাইয়া বুড়ীর মন বড় সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

এই সময় চুয়া দরজার আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিল। সংশয়-সঙ্কোচ করিবার তাহার আর সময় ছিল না। এক দিকে অবশ্যম্ভাবী সর্ব্বনাশ, অন্যদিকে সম্ভাবনা; চুয়া সজল চক্ষু চন্দনদাসের মুখের উপর রাখিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল,—"তুমি আজ রাত্তিরে এসো। নিমাই পণ্ডিত যদি রাজি না হন, তবু, তোমার ধর্ম্মের ওপর বিশ্বাস ক'রে আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

চন্দনদাসের বুক নাচিয়া উঠিল। সে আনন্দের উচ্ছ্বাসে কি বলিতে যাইতেছিল—এমন সময় বাধা পড়িল।

৫

গলির মধ্যে দ্রুত অশ্বখুর-ধ্বনি শুনা গেল। চুয়া একটা আর্ত চীৎকার গলার মধ্যে রোধ করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। বুড়ী থরথর করিয়া কাঁপিয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া পড়িল।

পরক্ষণেই এক জন অশ্বারূঢ় ব্যক্তি বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া ঘোড়া থামাইল। লোকটার গায়ে লালরঙের কোর্ত্তা, কোমরে তরবারি, মাথায় পাগ নাই, ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল কাঁধ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে; কপালে প্রকাণ্ড একটা সিন্দুরের ফোঁটা। ফোঁটার নীচে বিশাল ভাঁটার মত চোখ তাহাও প্রায় তদ্রূপ রক্তবর্ণ। মুখে ঘনকৃষ্ণ গোঁফ এবং গালে গালপাট্টা। বয়স বোধ করি পঁয়তাল্লিশ।

এই ভীষণাকৃতি লোকটার মুখের প্রতি অবয়বে যেন জীবনব্যাপী দুষ্কৃতি ও পাপ পঙ্কিল রেখায় অঙ্কিত হইয়া আছে; এমন দুষ্কার্য্য নাই যাহা সে করে নাই; এমন মহাপাতক নাই যাহা সে করিতে পারে না। একটা ঘৃণার শিহরণ চন্দনদাসের দেহের উপর দিয়া বহিয়া গেল; সে চিনিল, ইনিই জমিদারের তন্ত্রাধিকারপুষ্ট মাধব।

মাধব একলাফে ঘোড়া হইতে নামিয়া ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া দাওয়ার উপর উঠিল। সম্মুখেই চন্দনদাস; রক্তচক্ষু দ্বারা আপাদ-মস্তক তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া স্বভাবকর্কশ ভয়ঙ্কর স্বরে মাধব প্রশ্ন করিল, "তুই কে?"

চন্দনদাসের ইচ্ছা হইল, মাধবের দন্তবিকশিত পৈশাচিক বক্ত্রে একটা লাথি মারে, কিন্তু সে তাহা করিল না; তাহার মাথার মধ্যে বিদ্যুতের মত চিন্তাকার্য্য চলিতেছিল। মাধবের অভাবনীয় আবির্ভাবে তাহার সমস্ত মতলব পণ্ড হইয়া গিয়াছিল; সে ভাবিতেছিল, এ অবস্থায় কি করিলে সব দিক্ রক্ষা হয়? মাধবের সঙ্গে একটা গণ্ডগোল বাধাইলে লাভ হইবে না, বরং বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। উপস্থিত ক্ষেত্রে কোনও হাঙ্গামা না করিয়া অপসৃত হওয়াই সুবিবেচনার কাজ। অথচ এই পাষণ্ডটার মুখ দেখিলে ও কথা শুনিলে মেজাজ ঠিক রাখা দুষ্কর। চুয়ার সর্ব্বনাশ করিবার জন্যই এই নরপশু তাহাকে ছয় বৎসর জিয়াইয়া রাখিয়াছে, ভাবিতে চন্দনদাসের চোখের দৃষ্টি পর্য্যন্ত রক্তাভ হইয়া উঠিল।

তবু সে যথাসাধ্য আত্মদমন করিয়া মাধবের কথার উত্তর দিল, বলিল, "সে খোঁজে তোমার দরকার কি?"

মাধব একটা অকথ্য গালি দিয়া বলিল, "তুই এখানে কি চাস?"

চন্দনদাস আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিল না, তাহার মাথায় খুন চাপিয়া গেল। সে প্রত্যুত্তরে মাধবের নাসিকায় বজ্রসম কিল বসাইয়া দিয়া বলিল, "এই চাই।"

এই নিরীহদর্শন যুবকের নিকট হইতে মাধব এত বড়

দুঃসাহসিক কার্য্য একবারে প্রত্যাশা করে নাই, সে সর্ষিষার ফুল দেখিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িল।

চন্দনদাস দেখিল, আর বিলম্ব করা সমীচীন নয় ; সে নিরস্ত্র, মাধবের কোমরে তরবারি রহিয়াছে। ঘোড়াটা সম্মুখেই দাঁড়াইয়াছিল, সে দালান হইতে লাফ দিয়া তাহার পিঠে চড়িয়া বসিল। এই সময় মাধব ষণ্ডের মত গর্জ্জন করিয়া কোমর হইতে তরবারি বাহির করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু চন্দনদাস তেজী ঘোড়ার পেট দুই পায়ে চাপিয়া ধরিয়া সবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

৬

কেহ কেহ লুকাইয়া পাপাচরণ করে ; কিন্তু ধর্ম্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া পাশবিক বলে প্রকাশ্যভাবে পাপানুষ্ঠান করিতে যাহারা অভ্যস্ত, তাহাদের অপরাধ-ক্লান্ত জীবনে এমন অবস্থা আসে, যখন কেবলমাত্র রমণীর সর্ব্বনাশ করিয়া আর তাহারা তৃপ্তি পায় না। তখন তাহারা পাপাচারের সহিত ধর্ম্মের ভণ্ডামি মিশাইয়া তাহাদের দুষ্কার্য্যের মধ্যে এক প্রকার নূতন রস ও বিলাসিতা সঞ্চারের চেষ্টা করে। মাধব এই শ্রেণীর পাপী।

চন্দনদাস তাহারই ঘোড়ায় চড়িয়া তাহাকে ফাঁকি দিয়া পলায়ন করিবার পর মাধব নিষ্ফল আক্রোশে আর কাহাকেও সম্মুখে না পাইয়া বুড়ীকে ধরিল ; বুড়ীর চুলের মুঠি ধরিয়া তলোয়ার দিয়া তাহাকে কাটিতে উদ্যত হইল। কিন্তু কাটিতে গিয়া তাহার মনে হইল, বুড়ীকে মারিলে হয় ত সেই ধৃষ্ট যুবকের পরিচয় অজ্ঞাত রহিয়া যাইবে। কিল খাইয়া কিল চুরি করিবার লোক মাধব নয় ; তখনও তাহার নাকের রক্তে গোঁফ ভাসিয়া যাইতেছিল। সে বুড়ীর চুল ধরিয়া টানিতে টানিতে ভিতরে লইয়া চলিল।

আঙ্গিনার মাঝখানে বুড়ীকে আছড়াইয়া ফেলিয়া তাহার শীর্ণ হাতে একটা মোচড় দিয়া মাধব বলিল, "হারামজাদি বুড়ী, ও ছোঁড়া তোর কে বল্।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বুড়ী বুদ্ধিমতী ; তাই ভয়ে প্রাণ শুকাইয়া গেলেও তাহার চিন্তা করিবার শক্তি ছিল। সে বুঝিয়াছিল, সে কোনও কথা না বলিলেও প্রাণ যাইবে এবং ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিয়া ফেলিলেও প্রাণ যাইবে ; সুতরাং মধ্যপথ অবলম্বন করাই যুক্তি। সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইলে পণ্ডিতগণ অর্দ্ধেক ত্যাগ করেন, বুড়ীও তেমনই ষড়যন্ত্রের অংশটা বাদ দিয়া আর সব সত্য কথা বলিবে স্থির করিল। তাহাতে আর কিছু না হউক, মাধবের হাতে প্রাণটা বাঁচিয়া যাইতে পারে।

বুড়ী তখন অকপটে চন্দনদাসের যতটা পরিচয় জানিতে পারিয়াছিল, তাহা মাধবের গোচর করিল। চাঁপা পাছে অনর্থক হাঙ্গামা করে, এই ভয়ে মিছামিছি চন্দনদাসকে নাতি বলিয়া পরিচিত করিয়াছিল, তাহাও স্বীকার করিল। কাঁদিতে কাঁদিতে অনেক মাথার দিব্য—চোখের দিব্য দিয়া বলিল যে, চন্দনদাসকে সে পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই, আজ প্রথম সে তাহার দোকানে আসিয়া মিষ্ট কথায় তাহার সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করে। তাহার কোনও দুরভিসন্ধি ছিল কি না, তাহাও বুড়ীর অজ্ঞাত।

চাঁপা মাধবের বাড়ীতে খবর দিতে গিয়াছিল, এতক্ষণে এক ঝাঁক পাইক সঙ্গে লইয়া পদব্রজে ফিরিল। পাইকদের হাতে সড়কী, ঢাল ; জাতিতে তেঁতুলে বাগ্‌দী। ইহাদেরই বাহুবলে মাধব দেশটাকে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। প্রভু ও ভৃত্যে অবস্থাভেদ ছাড়া প্রকৃতিগত পার্থক্য বিশেষ ছিল না।

বুড়ীকে নানা প্রশ্ন করিয়া শেষে বোধ হয় মাধব তাহার গল্প বিশ্বাস করিল। চাঁপা সাক্ষ্য বলিল, তাহাতে বুড়ীর কথা সমর্থিত হইল। তা ছাড়া মাধবের রক্তচক্ষুর সম্মুখে বুড়ী মিথ্যা কথা বলিবে, ইহাও দাম্ভিক মাধব বিশ্বাস করিতে পারে না। সে এদিক্-ওদিক্ তাকাইয়া বলিল, "তোর নাতনী কোথায় ?"

বুড়ী বলিল, "ঘরেই আছে বাবা।"

মাধব চাঁপাকে হুকুম করিল, "দেখে আয়।"

চাঁপা দেখিয়া আসিয়া বলিল, চুয়া ঘরেই আছে বটে।

মাধবের তখন বিশ্বাস জন্মিল, চুয়া সম্বন্ধে ভয়ের কোনও কারণ নাই। তবু সে দুই জন পাইককে বুড়ীর বাড়ী পাহারা দিবার জন্য নিযুক্ত করিল, বলিল,—"কাল সন্ধ্যে পর্য্যন্ত এ বাড়ীতে কাউকে ঢুকতে দিবিনে। যদি কেউ ঢুকতে চায়, তার গলায় সড়্‌কী দিবি।" এইরূপে বাড়ীর সুব্যবস্থা করিয়া মাধব বাহিরে আসিল। এই সময় একবার তাহার মনে হইল, আর বৃথা দেরী না করিয়া আজই চুয়াকে নিজের প্রমোদ-উদ্যানে টানিয়া লইয়া

যায়। কিন্তু তাহা হইলে এত বৎসর ধরিয়া যে চরম বিলাসিতার আয়োজন করিয়াছে, তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। মাধব নিরস্ত হইল। তৎপরিবর্ত্তে যে স্পর্দ্ধিত বেণের ছেলেটা তাহার গায়ে হাত তুলিতে সাহস করিয়াছে, তাহার নৌকা লুঠ করিয়া তাহাকে নিজের চক্ষুর সম্মুখে কোমর পর্য্যন্ত মাটীতে পুতিয়া কুকুর দিয়া খাওয়াইবার আয়োজনে দিনটা সদ্ব্যয় করিতে মনস্থ করিল। এটাও একটা মন্দ বিলাসিতা নয়।

বাহিরে আসিয়া মাধব তাহার সর্দ্দার পাইককে বলিল,—"বদন, তুই দশ জন পাইক নিয়ে গঙ্গাঘাটে যা। সেখানে চন্দনদাস বেণের নৌকা আটক কর। আমি যাচ্ছি।" বলিয়া আর এক জন পাইককে ঘোড়া আনিতে পাঠাইল।

বদন সর্দ্দার প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া যখন ঘাটে পৌঁছিল, তখন চন্দনদাসের নৌকা দুখানি ভাগীরথীর বক্ষে শুভ্র পাল উড়াইয়া উজান বহিয়া চলিয়াছে; বহুপদবিশিষ্ট বিরাট জল-পতঙ্গের মত তাহাদের দাঁড়গুলি যেন গঙ্গার উপর তালে তালে পা ফেলিতেছে।

৭

ওদিকে চন্দনদাস তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিয়াছিল। দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, পথে লোকজন কম। চন্দনদাস ধাবমান ঘোড়ার পিঠে বসিয়া চিন্তা করিতেছিল—এখন কর্ত্তব্য কি? প্রথমতঃ চুয়াকে রক্ষা করিতে হইবে। মাধবের নাকে কিল মারার ফলে তাহার ক্রোধ কোন্ পথ লইবে, অনুমান করা কঠিন; মাধব চুয়ার কথা ভুলিয়া তাহার প্রতি ধাবমান হইতে পারে; তাহাতে চুয়া কিছুক্ষণের জন্য রক্ষা পাইবে। দ্বিতীয়তঃ তাহার নৌকা বাঁচাইতে হইবে। ক্রোধান্ধ মাধব প্রথমে তাহাকেই ধরিতে আসিবে; তখন তাহার অমূল্য পণ্য ও সোনাদানায় বোঝাই নৌকা লুণ্ঠিত হইবে। মাধব রেয়াৎ করিবে না।

ঘাটে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই চন্দনদাস কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। অশ্বথ-শাখায় ঘোড়া বাঁধিয়া সে দ্রুতপদে নৌকায় গিয়া উঠিল; দেখিল, মাঝি-মাল্লারা আহার করিতে বসিয়াছে। চন্দনদাস সর্দ্দার মাঝিকে ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিল,—"এখুনি নৌকা খুলতে হবে।"

হতবুদ্ধি মাঝি বলিল,—"এখনি? কিন্তু—"

"শোনো, তর্ক করবার সময় নেই। এই দণ্ডে নৌকা খোলো—পাল আর দাঁড় দুই লাগাও। আজ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যতদূর সম্ভব উজান বেয়ে যাবে, তার পর গাঙ্গের মাঝখানে নোঙ্গর ফেলবে। আমি যত দিন না ফিরি, সেইখানে অপেক্ষা করবে। বুঝলে?"

"আপনি সঙ্গে যাবেন না?"

"না। এখন যাও, আর দেরী করো না। যত দিন আমি না ফিরি, সাবধানে নৌকা পাহারা দিও।"

'যে আজ্ঞা' বলিয়া প্রাচীন মাঝি চলিয়া গেল। মুহূর্ত্ত পরে দুই নৌকার মাঝি-মাল্লার হাঁকডাক ও পালতোলার হুড়াহুড়ি আরম্ভ হইল। এই অবকাশে চন্দনদাস নৌকার পশ্চাতে মাণিকভাণ্ডারে গিয়া কিছু জিনিষ সংগ্রহ করিয়া লইল। প্রথমে সিন্দুক হইতে মোহর-ভরা একটা সর্পাকৃতি লম্বা থলি বাহির করিয়া কোমরে জড়াইয়া লইল। যে কার্য্যে যাইতেছে, তাহাতে কত অর্থের প্রয়োজন, কিছুই স্থিরতা নাই; অথচ বোঝা বাড়াইলে চলিবে না। চন্দনদাস ভাবিয়া চিন্তিয়া একছড়া মহামূল্য সিংহলী মুক্তার হার গলায় পরিয়া লইল। যদি মোহরে না কুলায়, হার বিক্রয় করিলে যথেষ্ট অর্থ পাওয়া যাইবে।

এ ছাড়া আরও দুইটি জিনিষ চন্দনদাস সঙ্গে লইল। একটি ইস্পাতের উপর সোনার কাজ করা ছোট ছোরা; এটি সে কোচিনে এক আরব বণিকের নিকট কিনিয়াছিল। দ্বিতীয়,—এক কাফ্রির উপহার একটি লোহার কাঁটা। কৃষ্ণবর্ণ দ্বিভুজ লোহার কাঁটা, সেকালে সৌখীন স্ত্রী পুরুষ এইরূপ কাঁটা চুলে পরিত। এ কাঁটার বিশেষত্ব এই যে, ইহার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ শরীরের কোনও অংশে ফুটিলে তিনবার নিশ্বাস ফেলিতে যতক্ষণ সময় লাগে, ততক্ষণের মধ্যে মৃত্যু হইবে। চন্দনদাস কাঁটার সূক্ষ্মাগ্র সোনার খাপে ঢাকিয়া সাবধানে নিজের চুলের মধ্যে গুঁজিয়া লইল।

নৌকা হইতে নামিয়া চন্দনদাস নগরের ভিতর দিয়া আবার হাঁটিয়া চলিল। ঝাঁ-ঝাঁ দ্বিপ্রহর, আশে-পাশে দোকানের মধ্যে দোকানী নিদ্রালু; মধ্যাকাশ হইতে সূর্য্যদেব প্রখর রৌদ্র ঢালিয়া দিতেছেন। গাছ-পালা পর্য্যন্ত নিঝুম হইয়া পড়িয়াছে; মানুষ গৃহতলের ছায়ার আশ্রয় লইয়াছে।

কিছু দূর যাইবার পর একটা মোড়ের মাথায় পৌঁছিয়া

চন্দনদাস এবার কোন্ পথে যাইবে ভাবিতেছে, এমন সময় তাহার চোখে পড়িল, একটা নয় দশ বছরের কটিবাস-পরিহিত শীর্ণকায় বালক প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-ময়ূখ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া পথের মধ্যে একাকী ডাণ্ডাগুলি খেলিতেছে। চন্দনদাস হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিল। বালক ক্রীড়ায় বিরাম না দিয়া, যষ্টির আঘাতে ক্ষুদ্র কাষ্ঠদণ্ডটিকে চন্দনদাসের দিকে তাড়িত করিতে করিতে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তার পর প্রবীণের মত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চন্দনদাসের বেশভূষা নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—"সওদাগর! সমুদ্দ্র থেকে আসছ—হ্যাঃ?"

বালকের ভাষা ও বাক্‌প্রণালী অতি অদ্ভুত—আমরা তাহা সরল ও সহজ-বোধ্য করিয়া দিলাম।

চন্দনদাস হাসিয়া বলিল,—"হ্যাঁ। নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী কোথায় জানিস?"

বালক বলিল,—"হিঃ—জানি।"

"আমাকে সেখানে নিয়ে চল্।"

বালকের ধূর্ত্ত মুখে একটু হাসি দেখা দিল, সে এক চক্ষু মুদিত করিয়া বলিল,—"ডাংগুলি খেলছি যে।"

"পয়সা দেব।"

আকর্ণ দন্তবিকাশ করিয়া বালক হাত পাতিল,—"আগে দাও।"

চন্দনদাস তাহাকে একটা কপর্দ্দক দিল, তখন সে আবার ডাংগুলি খেলিতে খেলিতে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল।

বেশী দূর যাইতে হইল না; নিম্ববৃক্ষচিহ্নিত বাড়ীটা যষ্টি-নির্দ্দেশে দেখাইয়া দিয়া বালক প্রস্থান করিতেছিল, চন্দনদাস তাহাকে ফিরিয়া ডাকিল, বলিল,—"তুই যদি আর একটা কায করতে পারিস, তোকে চারটে পয়সা দেব।"

"কি?"

"কাঞ্চন বেণের বাড়ী জানিস?"

বালকের চক্ষু উজ্জ্বল হইল,—"চুয়া? মাধায়ের কৈ মাছ? জানি।—হি হি!"

চন্দনদাসের ইচ্ছা হইল, অকালপক্ব ছোঁড়ার গালে একটা চপেটাঘাত করে; কিন্তু সে কষ্টে ক্রোধ সম্বরণ করিয়া বলিল,—"হ্যাঁ চুয়া। শোন্, তার বাড়ীর সামনে দিয়ে যাবি, কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করবি না, কেবল দেখে আসবি, সেখানে কি হচ্ছে। পারবি?"

বালক বলিল,—"হিঃ—পয়সা দাও।"

চন্দনদাস মাথা নাড়িয়া বলিল,—"না, আগে খবর নিয়ে আস্‌বি, তবে পয়সা পাবি। আমি এইখানেই থাক্‌ব।"

বালক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মনে মনে গবেষণা করিল, চন্দনদাসকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে কি না? শেষে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া পূর্ব্ববৎ ডাংগুলি খেলিতে খেলিতে প্রস্থান করিল।

চন্দনদাস তখন নিমাই পণ্ডিতের গৃহে প্রবেশ করিল। সম্মুখেই টোলের আটচালা; ছাত্ররা কেহ নাই, নিমাই পণ্ডিত একাকী বসিয়া আছেন। তাঁহার কোলে তুলটের একখানি নূতন পুঁথি; পাশে লেখনী ও মসীপাত্র। চন্দনদাসের পদশব্দে নিমাই পণ্ডিত মুখ তুলিলেন; প্রশান্ত বিশাল চক্ষুতে শাস্ত্র-চিন্তাজনিত স্বপ্নাচ্ছন্নতা দূর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাকে চান?"

চন্দনদাস বলিল,—"নিমাই পণ্ডিতকে।"

"আমিই নিমাই পণ্ডিত।"

পাদুকা খুলিয়া চন্দনদাস গিয়া নিমাই পণ্ডিতকে প্রণাম করিল। নিমাই পণ্ডিত বয়সে তাহার অপেক্ষা ছোট হইলেও ব্রাহ্মণ। তুলসীপাতার ছোট বড় নাই।

নিমাই পণ্ডিত প্রণাম গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—"দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে—আপনিই কি আজ দুখানি নৌকা নিয়ে সমুদ্রযাত্রা থেকে ফিরেছেন?"

চন্দনদাস বিনীতভাবে বলিল,—"আজ্ঞা হাঁ, আমিই।"

নিমাই পণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন,—"আজ আপনার নৌকার ঢেউয়ে নবদ্বীপের একটি অমূল্য রত্ন ভেসে যাচ্ছিল, অনেক কষ্টে রক্ষা করা গিয়েছে। যা হোক, আপনি—?"

চন্দনদাস নিজের পরিচয় দিয়া শেষে করযোড়ে বলিল,—"আপনি ব্রাহ্মণ এবং মহাপণ্ডিত, আমাকে 'আপনি' সম্বোধন করলে আমার অপরাধ হয়।"

নিমাই পণ্ডিত বলিলেন,—"বেশ, কি ব্যাপার বল ত?"

চন্দনদাস বলিল,—"একটা কাযে আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি। নবদ্বীপে কাউকে আমি চিনি না, কেবল আপনার নাম শুনেছি। শুনেছি, আপনি শুধু অপরাজেয় পণ্ডিত নন, সৎকার্য্য করবার সাহসও আপনার অদ্বিতীয়। আমাকে সাহায্য করবেন কি?"

নিমাই পণ্ডিত বুঝিলেন, বণিকতনয় আজ গুরুতর

কোনও কায আদায় করিতে আসিয়াছে, মৃদুহাস্যে বলিলেন,—"তোমার নম্রতা আর বিনয় দেখে ভয় হচ্ছে। যা হোক, প্রস্তাবটা কি শুনি।"

চন্দনদাসও হাসিল; বুঝিল, নিমাই পণ্ডিতকে মিষ্ট চাটু-কথায় বিগলিত করা চলিবে না, তাঁহার সহিত অকপট ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ। সে ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল,—"আপনি কাঞ্চন বেণের মেয়ে চুয়াকে জানেন?"

নিমাই পণ্ডিত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চন্দনদাসের মুখের পানে চাহিলেন। তাঁহার মুখ ঈষৎ গম্ভীর হইল, বলিলেন,—"জানি। চুয়ার কথা নবদ্বীপে সকলেই জানে।"

চন্দনদাস বলিয়া উঠিল,—"তবু তাকে উদ্ধারের চেষ্টা কেউ করে না?"

নিমাই পণ্ডিত স্থির হইয়া রহিলেন, কোনও উত্তর দিলেন না।

চন্দনদাস তখন বলিল, "আমি চুয়াকে বিয়ে করতে চাই। আপনি সহায় হবেন কি?"

নিমাই পণ্ডিত বিস্মিত হইলেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া কোল হইতে পুথি নামাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "কিন্তু চুয়া সম্বন্ধে সব কথা তুমি জান কি?"

"যা জানি, আপনাকে বলছি"—এই বলিয়া আজ নৌকা হইতে নামিবার পর এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত সবিস্তারে বর্ণনা করিল। শেষে কহিল, "এই নির্ব্বান্ধব পুরীতে চুয়া যেমন একা, আমিও তেমনই একা। এখন আপনি যদি সাহায্য করেন, তবেই কিছু করতে পারি। নচেৎ একটি বালিকার সর্ব্বনাশ হয়।"

নিমাই পণ্ডিত ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চিন্তামগ্ন হইলেন।

এই সময় সেই বালক ডাংগুলি হস্তে ফিরিয়া আসিল। চন্দনদাস সাগ্রহে তাহাকে কাছে ডাকিতেই সে বলিল, "চুয়ার বাড়ীর সামনে দুটো পাক্ ব'সে আছে, খে যাচ্ছে, তারে হুমকি দিচ্ছে।"

"আর কি দেখলি?"

"চুয়া আর তার ঠান্‌দি ঘরে আছে। চাঁপা নাপতিনী বুড়ীর সঙ্গে কোঁদল করছে।"

"আর কিছু?"

"আর মাধাই চন্নন বেণের ডিঙী লুঠ করতে গেছে। পয়সা দাও।"

খুসী হইয়া চন্দনদাস বালককে চার পয়সার স্থলে দু'গণ্ডা দিল। হৃষ্ট বালক তীক্ষ্ণস্বরে একবার "উ—" বলিয়া উল্লাস জ্ঞাপন পূর্ব্বক ডাংগুলি খেলিতে খেলিতে প্রস্থান করিল।

বালককে বিদায় করিয়া চন্দনদাস নিমাই পণ্ডিতের দিকে ফিরিতেই তিনি উদ্দীপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আমি তোমাকে সাহায্য করব। তোমার উদ্যম প্রশংসনীয়; আমরা গাঁয়ের লোক যা করিনি, তুমি বিদেশী তাই করতে চাও। তোমার স্বার্থ আছে জানি, কিন্তু তাতে তোমার মহত্ত্বের কিছুমাত্র হানি হয় না। আমি কি করতে পারি বল?"

চন্দনদাস বলিল, "তা আমিও জানি না। আপাততঃ পরামর্শ দিতে পারেন।"

"বেশ, এস, পরামর্শ করা যাক্। মাধব যে রকম দুর্দ্ধর্ষ পাষণ্ড, তার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগে কোনও ফল হবে না। আমার মনে হয়—"

চন্দনদাস বলিল, "একটি নিবেদন আছে। আমার বড় তৃষ্ণা পেয়েছে; ব্রাহ্মণবাড়ী একটু পাদোদক পেতে পারি?"

নিমাই সচকিত হইয়া বলিলেন, "তুমি এখনও আহার করনি?"

চন্দনদাস হাসিয়া বলিল, "না, কেবল চুয়ার দেওয়া একখানি বাতাসা খেয়েছি।"

"কি আশ্চর্য্য! এতক্ষণ বলনি কেন? দাঁড়াও, আমি দেখি" বলিয়া খড়ম পরিয়া ত্বরিতে অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

বেলা তখন তৃতীয় প্রহর। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ভৃত্য পরিজন সকলকে খাওয়াইয়া নিজে আহারে বসিতে যাইতেছিলেন, নিমাই গিয়া বলিলেন, "এক জন অতিথ এসেছে। খেতে দিতে পারবে?"

বিষ্ণুপ্রিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "পারব।" তার পর ক্ষিপ্রহস্তে দালানে জল-ছড়া দিয়া পিঁড়ি পাতিয়া নিজের অন্ন-ব্যঞ্জন অতিথির জন্য ধরিয়া দিয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিলেন।

নিমাই দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন, স্মিতমুখে চন্দনদাসকে ডাকিতে গেলেন। এই নীরব কর্ম্মপরায়ণা অনাদৃতা বধূটি ক্ষণকালের জন্য নিমাই পণ্ডিতের মন হইতে লক্ষ্মীদেবীর স্মৃতি মুছিয়া দিল।

অতঃপর চন্দনদাস পরিতোষপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগৃহে প্রসাদ পাইল।

৮

পরামর্শ স্থির করিতে অপরাহ্ণ গড়াইয়া গেল। যে সকল ছাত্র টোলে পড়িতে আসিল, নিমাই পণ্ডিত তাহাদের ফিরাইয়া দিলেন।

সঙ্কল্প স্থির করিয়া নিমাই বলিলেন, "এ ছাড়া আর ত কোনও উপায় দেখি না। তৃতীয় ব্যক্তিকে দলে টানিতে ভয় করে; কথাটা জানাজানি হয়ে যদি মাধবের কাণে ওঠে, তা হ'লে আর কোনও ভরসা থাকবে না।"

চন্দনদাস জিজ্ঞাসা করিল, "এ দেশের মাঝি-মাল্লাদের বিশ্বাস করা যেতে পারে?"

"অন্য ব্যাপারে বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু যে ব্যাপারে মাধব আছে, তাতে কাউকে বিশ্বাস করা চলে না। ঘুণাক্ষরে আমাদের মতলব টের পেলে তারা আমাদিগকেই মাধবের হাতে ধরিয়ে দেবে।"

"তা হ'লে—"

নিমাই হাসিয়া বলিলেন,—"হঁ্যা, মাঝিমাল্লার কায আমাকেই করতে হবে। কাণভট্টের আশীর্ব্বাদ দেখছি এরি মধ্যে ফলতে আরম্ভ করেছে।"

চন্দনদাস বলিল,—"চুয়াকে খবর আমি দেব। শেষ রাত্রির দিকে পাইকরা ঘুমিয়ে পড়বে—সেই উপযুক্ত সময়। কি বলেন?"

"হঁ্যা। তুমি তোমার নৌকা পাঠিয়ে দিয়ে বড় বুদ্ধিমানের কায করেছ। মাধব নিশ্চিন্ত থাকবে, হয় ত রাত্রিতে চুয়ার বাড়ীতে পাহারা না থাকতে পারে।"

"অতটা ভরসা করি না। যা হোক, দেখা যাক।"

সন্ধ্যার প্রাক্কালে দুই জনে বাহির হইলেন। ব্রাহ্মণপল্লী হইতে অনেকটা উত্তরে গঙ্গাতীরে নৌ-কর সূত্রধরদের বাস। সেখানে উপস্থিত হইয়া দুই জনে দেখিলেন, রাশি রাশি স্তূপীকৃত শাল, পিয়াল, সেগুন, জারুল কাষ্ঠের প্রাকারের মধ্যে ছোট বড় নানাবিধ নৌকা তৈয়ার হইতেছে। কোনটির কঙ্কালমাত্র গঠিত হইয়াছে, কোনটি পাটাতনে শোভিত হইয়া পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিতেছে। বড় বড় বজরা—পঞ্চাশ দাঁড়ের নৌকা—তাহারও হাঙ্গর-মুখ, কেহ বা ময়ূর-পঙ্খী, কেহ বা হংসমুখী। আবার ক্ষুদ্রকায় ডিঙ্গী, সঙ্কীর্ণদেহ ছিপও আছে। কোনটি সম্পূর্ণ হইয়াছে, কোনটি এখনও অসম্পূর্ণ।

দুই জনে অনেক নৌকা দেখিয়া শেষে একটি ছোট ডিঙ্গী পছন্দ করিলেন। ডিঙ্গীর সুন্দর গঠন, আড়াই হাত চওড়া, আট হাত লম্বা—শোলার মত হাল্কা। মাত্র চারি জন লোক তাহাতে বসিতে পারে।

নিমাই পণ্ডিত ছুতারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাম কত?"

ছুতার কিন্তু ডিঙ্গী বেচিতে রাজি হইল না, বলিল, ফরমাসী ডিঙ্গী।

চন্দনদাস জিজ্ঞাসা করিল,—"এ ডিঙ্গীর জন্য কত দাম পাবে?"

ছুতার একটু বাড়াইয়া বলিল,—"তিন তঙ্কা।"

চন্দনদাস নিঃশব্দে তাহার হাতে এক মোহর দিল। ছুতার স্বপ্নেও এত মূল্য কল্পনা করে নাই, সে কিছুক্ষণ হতবাক্ থাকিয়া মহানন্দে ডিঙ্গীর মালিকত্ব চন্দনদাসকে সমর্পণ করিল।

ডিঙ্গী তৎক্ষণাৎ গঙ্গার জলে ভাসানো হইল। নিমাই পণ্ডিত ও চন্দনদাস তাহাতে আরোহণ করিয়া দুই যোড়া দাঁড় হাতে লইলেন। দাঁড়ের আঘাতে ডিঙ্গী জ্যা-মুক্ত তীরের মত জলের উপর ছুটিয়া গেল।

কিছুক্ষণ গঙ্গাবক্ষে দাঁড় টানিয়া উভয়ে দেখিলেন, ডিঙ্গী নির্দোষ ও অতি সহজে নিয়ন্ত্রণযোগ্য। দুই জনে সন্তুষ্ট হইয়া তীরে ফিরিলেন। তার পর নৌকা ছুতারের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া নিমাই পণ্ডিত বলিলেন,—"কাল বৈকালে আমি এসে ডিঙ্গী নিয়ে যাব।"

ছুতার আহ্লাদে এক দিনের জন্য নৌকা রাখিতে সম্মত হইল।

অতঃপর নিমাই পণ্ডিত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। চন্দনদাসের তখনও কায শেষ হয় নাই, সে গঙ্গার ধার দিয়া ঘাটের দিকে চলিল।

যে ঘাটে দ্বিপ্রহরে নৌকা বাঁধিয়াছিল, সেই ঘাটে যখন উপস্থিত হইল, তখন সন্ধ্যার ছায়া ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। ঘাটে কয়েকটি ক্ষুদ্র ডিঙ্গী বাঁধা ছিল; চন্দনদাস কয়েক জন মাঝিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বাপু, তোমরা জেলে ত?"

"আজ্ঞে, কর্ত্তা।"

"তোমাদের মোড়ল কে ?"

এক জন বৃদ্ধ গোছের জেলে বলিল,—"আজ্ঞে কর্ত্তা, আমি মোড়ল। আমার নাম শিবদাস।"

"বেশ। তোমার সঙ্গে আমি কিছু কারবার করতে চাই। এখানে যত জেলে আছে, সবাই তোমার অধীন ত ?"

"আজ্ঞে।"

"কত জেলে ডিঙ্গী তোমাদের আছে ?"

"তা—ত্রিশ চল্লিশখানা হবে।"

"বেশ। শোনো; তোমাদের যত জেলে ডিঙ্গী আছে, সব আমি ভাড়া করলাম। তোমরা জেলে-মাঝির দল কাল বেলা তিন পহরের সময় বেরুবে; বেরিয়ে সটান স্রোতের মুখে দক্ষিণে গিয়ে শান্তিপুরের ঘাটে নৌকা বাঁধবে। তার পর সেখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমি যদি না যাই, তা হ'লে আবার ফিরে আসবে।—বুঝলে ?"

"বুঝলাম কর্ত্তা। কিন্তু কাযটা কি, তা ত এখনও জানতে পারিনি।"

"কাযের কথা শান্তিপুরের ঘাটে জানতে পারবে। কেমন, রাজি আছ ?"

"আজ্ঞে, গররাজি নই। কিন্তু ধরুন, শান্তিপুরের ঘাটে যদি আপনার দেখা না পাই ?"

"বলেছি ত, তা হ'লে ফিরে আসবে।"

"কিন্তু আমাদের যাওয়া আসা যে তা হ'লে না-হক হয়রানি হয়, কর্ত্তা। আপনাকে তখন পাব কোথায় ? আপনাকে ত চিনি না।"

চন্দনদাস হাসিয়া বলিল,—"তা হলেও তোমাদের লোকসান হবে না। তোমাদের অর্দ্ধেক ভাড়া আমি আগাম দিয়ে যাব। সব নৌকা শান্তিপুরে যাওয়া আসার জন্যে কত ভাড়া লাগবে ?"

শিবদাস মোড়ল বিবেচনা করিয়া বলিল,—"আজ্ঞে, দশটি তঙ্কার কমে হবে না।"

চন্দনদাস একটু ব্যবসাদারী করিল। কারণ, এক কথায় রাজি হইয়া গেলে জেলেরা কিছু সন্দেহ করিতে পারে। কিছুক্ষণ কসাকসার পর নয় তঙ্কা ভাড়া ধার্য্য হইল। চন্দনদাস পাঁচ তঙ্কা শিবদাস মোড়লের হাতে দিয়া বলিল,—"এই নাও। কিন্তু কথার নড়চড় যেন না হয়।"

"আজ্ঞে"—শিবদাস মুদ্রা গণিয়া লইল—"আপনি নিশ্চিন্দি থাকুন কর্ত্তা, ঠিক সময়ে আমরা শান্তিপুরের ঘাটে হাজির থাকব—"

"সব ডিঙ্গী নিয়ে যাবে, একখানাও বাদ না পড়ে।"

"আজ্ঞে, একখানাও বাদ পড়বে না।"

এইরূপে নবদ্বীপ হইতে সমস্ত ডিঙ্গী তফাৎ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া চন্দনদাস কতকটা নিশ্চিন্তমনে নিমাই পণ্ডিতের গৃহে ফিরিল। সেইখানেই তাহার রাত্রিতে থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

৯

রাত্রি তিন প্রহরে, চুয়ার বাড়ীর দালানে পাইক দুই জন বসিয়া বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। এক জন দেয়ালে ঠেস দিয়া পদযুগল প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল; দ্বিতীয় ব্যক্তি ঘুমের ঘোরে কখন্ কাৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল; তাহার নাসারন্ধ্র হইতে কামারের হাপরের মত এক প্রকার শব্দ নির্গত হইতেছিল।

চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার; কিন্তু অন্ধকারে চক্ষু অভ্যস্ত হইলে কিছু কিছু দেখা যায়। চন্দনদাস নিঃশব্দে ছায়ার মত দালানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার বাঁ হাতে সেই ক্ষুদ্র ছোরা। কিয়ৎকাল মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া সে পাইকের নাসিকাধ্বনি শুনিল; তার পর দালানের গাঢ়তর অন্ধকারের ভিতর তাহার চক্ষু বস্তু নির্ব্বাচন করিতে আরম্ভ করিল।

যে পাইকটা বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতেছে, তাহার পদদ্বয় ঠিক দরজার সম্মুখে প্রসারিত, ভিতরে প্রবেশ করিতে হইলে তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া যাইতে হইবে। তা ছাড়া দরজার কবাট ভেজানো রহিয়াছে, ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ কি না, বুঝা যাইতেছে না। চন্দনদাস ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে হাত বাড়াইয়া কবাট একটু ঠেলিল। মরিচা-ধরা হাঁস-কলে ছুঁচার ডাকের মত শব্দ হইল। দরজা ঈষৎ খুলিল।

হাঁস-কলের শব্দে পাইকের হাপর হঠাৎ বন্ধ হইল। চন্দনদাস স্পন্দিত-বক্ষে ছোরা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু পাইক জাগিল না, আবার তাহার নাক ডাকিয়া উঠিল।

চন্দনদাস তখন আবার কবাট একটু ঠেলিল, কবাট খুলিয়া গেল। এবারও একটু শব্দ হইল বটে, কিন্তু কেহ

জাগিল না। তখন চন্দনদাস ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিয়া নিঃশব্দে পাইকের পদযুগল লঙ্ঘন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

আঙ্গিনায় উপস্থিত হইয়া চন্দনদাস চারিদিকে চাহিল। সম্মুখে কয়েকটা ঘর অস্ফুটভাবে দেখা যাইতেছে। কিন্তু কোন্ ঘরে চুয়া ঘুমাইতেছে? চাঁপাও বাড়ীতে আছে; চুয়াকে খুঁজিতে গিয়া যদি চাঁপা জাগিয়া উঠে, তবেই সর্ব্বনাশ। চন্দনদাস কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় তাহার হাতে মৃদু স্পর্শ হইল।

চন্দনদাস চমকিয়া উঠিয়া অজ্ঞাতসারেই ছোরা তুলিল। এই সময় তাহার কাণের কাছে মৃদুশব্দ হইল—"এসেছ?"

চুয়া! কোমরে ছোরা রাখিয়া চন্দনদাস দুই হাতে চুয়ার হাত ধরিল, বলিল,—"চুয়া! এসেছি।"

চুয়ার নিশ্বাসের মত মৃদু চাপাস্বর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল; সে বলিল,—"তুমি আসবে বলেছিলে, তাই আমি তোমার জন্যে সারারাত জেগে আছি।"

অন্য সময় কথাগুলি অভিসারিকার প্রণয়বাণীর মত শুনাইত; কিন্তু বিপদের মাঝখানে দাঁড়াইয়াও চন্দনদাসের মনে হইল, এত মধুর শব্দসমষ্টি সে আর কখনও শুনে নাই। চুয়ার মুখখানি দেখিবার জন্য তাহার প্রাণে দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জাগিতে লাগিল; অথচ অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। চন্দনদাস চুয়ার কাণে কাণে বলিল,—"চুয়া, একটা আলো জ্বালতে পারো না? তোমাকে বড় দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

দু'জনে অন্ধকারে হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, চুয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল,—"আচ্ছা, এস"—বলিয়া হাত ধরিয়া লইয়া চলিল।

চন্দনদাস তেমনই মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"চাঁপা কোথায়?"

"ঘুমুচ্ছে।"

"ঠান্‌দি?"

"ঠান্‌দিও ঘুমিয়ে পড়েছে!"

গোহালের মত একটা পরিত্যক্ত ঘরে লইয়া গিয়া চুয়া চকমকি ঠুকিয়া আলো জ্বালিল। তখন প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে চুয়ার মুখ দেখিয়া চন্দনদাস চমকিয়া উঠিল। চোখদুটি জবাফুলের মত লাল, চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে; আশা, আশঙ্কা ও তীব্রোৎকণ্ঠার দ্বন্দ্বে চুয়ার অনুপম রূপ যেন ছিঁড়িয়া ভাঙ্গিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

চন্দনদাসের বুকে বেদনার শূল বিঁধিল, সে বাষ্পাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"চুয়া!"

চুয়া মাটীতে বসিয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল; রোদনরুদ্ধ স্বরে বলিল,—"তোমার নৌকা চ'লে গেছে শুনে এত ভয় হয়েছিল—"

চন্দনদাস চুয়ার পাশে বসিয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিল,—"চুয়া, আর ভয় নেই। তোমার উদ্ধারের সমস্ত ব্যবস্থা করেছি।"

চুয়া চোখ মুছিয়া মুখ তুলিল,—"কি?"

চন্দনদাস বলিল,—"বলছি। আগে বল দেখি, তুমি সাঁতার কাটতে জানো?"

অবসাদভরা স্বরে চুয়া বলিল,—"জানি। তাই ত ডুবে মরতে পারিনি। কতবার সে চেষ্টা করেছি।"

চন্দনদাসের ইচ্ছা হইল, চুয়াকে বুকে জড়াইয়া লইয়া সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু সে লোভ সম্বরণ করিল, বলিল,—"ও কথা ভুলে যাও! চুয়া, বুকে সাহস আনো। আমি এসেছি দেখেও তোমার সাহস হয় না?"

চুয়া কেবল তাহার কালিমালিপ্ত চোখদুটি তুলিয়া চন্দনদাসের মুখের পানে চাহিয়া রহিল; হয় ত নিজের একান্ত নির্ভরশীলতার কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে চাহিল; কিন্তু বলিতে পারিল না। চন্দনদাস তখন সংক্ষেপে প্রাঞ্জলভাবে উদ্ধারের উপায় বিবৃত করিয়া বলিল; চুয়া ব্যগ্র বিস্ফারিত-নয়নে শুনিল। শুনিতে শুনিতে তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

চন্দনদাসের বিবৃতি শেষ হইলে চুয়া কিছুক্ষণ হেঁটমুখে নীরব হইয়া রহিল। লজ্জা করিবার সে অবকাশ পায় নাই, হৃদয়ের তুমুল আন্দোলনের মধ্যে এই তরুণ উদ্ধারকর্ত্তাটিকে সে যে কি দৃষ্টিতে দেখিয়াছে, তাহা নিজেই জানিতে পারে নাই। তাই উদ্ধারের আশা যখন তাহার সংশয়ময় চিত্তে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল, তখন সে আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, চন্দনদাসের পায়ের উপর আছাড়িয়া পড়িল। দুই হাতে পা জড়াইয়া কাঁদিয়া কহিল,—"একটা কথা বল।"

চন্দনদাস চুয়ার মুখ তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল,—"চুয়া, চুয়া, কি কথা?"

"বল, আমায় বিয়ে করবে ? তুমি ত আমায় প্রবঞ্চনা করছ না ?"

চন্দনদাস জোর করিয়া চুয়ার মুখ তুলিয়া তাহার চোখের উপর চোখ রাখিয়া বলিল,—"চুয়া, আমার মা'র নামে শপথ করছি, তোমাকে যদি বিয়ে না করি, যদি আমার মনে অন্য কোনও অভিসন্ধি থাকে, তবে আমি কুলাঙ্গার।"

চুয়ার মাথা আবার মাটীতে লুটাইয়া পড়িল। তার পর সে চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল ; বলিল,—"তবে আমাকে এখনই নিয়ে যাচ্ছ না কেন ?"

চন্দনদাসের ইচ্ছা হইতেছিল, এখনই এই কারাগার হইতে চুয়াকে মুক্ত করিয়া লইয়া পলায়ন করে। কিন্তু সুবুদ্ধি নিষেধ করিল। রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে, ধরা পড়িবার সম্ভাবনা বড় বেশী। সে মাথা নাড়িয়া বলিল,—"না—এখন ভরসা হয় না। বাড়ীর দোরে পাহারা—যদি ওরা জেগে ওঠে—; কিন্তু আমার এখানে আর থাকা বোধ হয় নিরাপদ নয়—চাঁপার ঘুম ভাঙতে পারে।" বলিয়া চন্দনদাস অনিচ্ছাভরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

চুয়ার মনে আবার ভয় প্রবেশ করিল। সম্মুখে সমস্ত দিন পড়িয়া আছে ; কি জানি কি হয় ! সে ভয়-কাতর চক্ষুদুটি তুলিয়া বলিল,—"যাচ্ছ ?—কিন্তু—"

"কোনও ভয় নেই, চুয়া।"

"কিন্তু—যদি বিঘ্ন হয়—যদি—একটা জিনিষ দিতে পারবে ?"

"কি ?"

"একটু বিষ। যদি কিছু বিঘ্ন হয়—"

চন্দনদাস কিছুক্ষণ শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর ধীরে ধীরে নিজের চুল হইতে সেই কাঁটা বাহির করিয়া দিল। গাঢ়স্বরে বলিল,—"চুয়া, যদি দেখ, কোনও আশা নেই, তবেই ব্যবহার কোরো, তার আগে নয়।" বলিয়া কাঁটার ভয়ঙ্কর কার্য্যকারিতা বুঝাইয়া দিল।

এতক্ষণে চুয়ার মুখে হাসি দেখা দিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রোজ্জ্বল চক্ষুতে বলিল,—"আর আমি ভয় করি না।"

চন্দনদাসের মুখে কিন্তু হাসির প্রতিবিম্ব পড়িল না। সে চুয়ার দুই হাত লইয়া নিজের বুকের উপর রাখিয়া বলিল,—"চুয়া—"

বাক্‌পটু চন্দনদাস ইহার অধিক আর কথা খুঁজিয়া পাইল না।

চুয়া অশ্রু-আর্দ্র হাসিমুখ একবার চন্দনদাসের বুকের উপর রাখিল, অস্ফুটস্বরে কহিল,—"চুয়া নয়—চুয়া বৌ। এই আমাদের বিয়ে।"

ঘরের বাহিরে আসিবার পর একটা কথা চন্দনদাসের মনে পড়িল, সে বলিল,—"ঠান্‌দি'র কথা ভুলে গিয়েছিলাম। তাকে বোলো—কাল সন্ধ্যার পর বাড়ী থেকে পালিয়ে যেন নিমাই পণ্ডিতের বাড়ীতে যায়। সেখানে দু'এক দিন লুকিয়ে থাকবে, তার পর আমি তাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব।"

গ্রীষ্মের হ্রস্ব রাত্রি তখন শেষ হইয়া আসিতেছে। কাক-কোকিল ডাকে নাই, কিন্তু বাতাসে আসন্ন প্রভাতের স্পর্শ লাগিয়া আছে। পূর্ব্বাকাশে শুকতারা দপ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে।

আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া চন্দনদাস আর একবার চুয়ার দুই হাত নিজের বুকে চাপিয়া লইল। তার পর যে ভাবে আসিয়াছিল, সেই ভাবে ছায়ামূর্ত্তির মত বাহির হইয়া গেল।

পাইক দুই জন শেষ রাত্রির গভীর ঘুম ঘুমাইতে লাগিল।

১০

অমাবস্যার সংশয়পূর্ণ দিবস ধীরে ধীরে ক্ষয় হইয়া আসিল। অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটিল না। কেবল দ্বিপ্রহরে মাধব চুয়ার গৃহে আসিয়া তদারক করিয়া গেল ও জানাইয়া গেল যে, তাহার প্রদত্ত শাস্ত্রীয়-বিধান যেন যথাযথ পালিত হয়।

এখানে চাঁপার কায শেষ হইয়াছিল ; মাধবের অনুমতি-মত প্রমোদ-উদ্যানে সে পূজার আয়োজন করিতে গেল।

এদিকে সায়াহ্নে নবদ্বীপের ঘাটে স্নানার্থীর বিশেষ ভিড় ছিল না। দুই চারি জন নারী গা ধুইয়া যাইতেছিল, কেহ কেহ কলসে ভরিয়া গঙ্গাজল লইয়া যাইতেছিল। পুরুষের সংখ্যা অল্প। কেবল এক জন পুরুষ অধীরভাবে সোপানের উপর পদচারণ করিতেছিল ও মাঝে মাঝে স্থির হইয়া উৎকর্ণভাবে কি শুনিতেছিল। তাহার গলায় মুক্তাহার বিলম্বিত—অন্যথা সাধারণ বাঙ্গালীর বেশ। বলা বাহুল্য, সে চন্দনদাস।

ক্রমে সূর্য্য নদীর পরপারে অস্তমিত হইল।

নিদাঘকালের দ্রুত সন্ধ্যা যেন পক্ষ বিস্তার করিয়া আসিয়া ভাগীরথীর জলে ধূসর ছায়া বিছাইয়া দিল। পাশে নৌকা-ঘাট নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ। জেলে ডিঙ্গী একটিও নাই। দুই একখানি স্থূলকলেবর মহাজনী কিস্তি নিঃসঙ্গ অসহায়ভাবে বিস্তীর্ণ ঘাটে লাগিয়া আছে।

গঙ্গাবক্ষেও নৌকা নাই। কেবল দূরে উত্তরে একটি ক্ষুদ্র ডিঙ্গী স্রোতের মুখে ভাসিয়া আসিতেছে। অস্পষ্ট আলোকে মনে হয়, একটি লোক দাঁড় ধরিয়া তাহাতে বসিয়া আছে।

ক্রমে ডিঙ্গী মাঝগঙ্গা দিয়া ঘাটের সম্মুখীন হইল; কিন্তু ঘাটের নিকটে আসিল না, গঙ্গাবক্ষে স্থির হইয়া রহিল। নৌকারূঢ় ব্যক্তি মাঝে মাঝে দাঁড় টানিয়া নৌকা ভাসিয়া যাইতে দিল না।

চন্দনদাস চিন্তিতমুখে অধীরপদে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল—ঐ আসিতেছে। পথে দূরাগত বাদ্যোদ্যম শুনা গেল। চন্দনদাস একবার গঙ্গাবক্ষস্থ ডিঙ্গীর দিকে তাকাইল, তার পর স্পন্দিতবক্ষে একটা গোলাকার বুরুজের উপর গিয়া বসিল।

বাদ্যধ্বনি ক্রমশঃ কাছে আসিতে লাগিল। মহারোলে কাঁসর-ঘণ্টা শিঙা-ঢোল বাজিতেছে। তামাসা দেখিবার জন্য বহু স্ত্রী-পুরুষ বালক জুটিয়াছিল, তাহাদের কলরব সেই সঙ্গে মিশিয়া কোলাহল তুমুল হইয়া উঠিয়াছে।

ঘাটের শীর্ষে আসিয়া কোলাহল থামিল; বাজনা বন্ধ হইল। চন্দনদাস দেখিল, কৌতূহলী জনতাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া দুই সারি ঢাল-সড়কীধারী পাইক নামিয়া আসিতেছে। তাহাদের দুই সারির মধ্যস্থলে মুক্তকেশা জবামাল্যপরিহিতা চুয়া। চন্দনদাসও কৌতূহলী দর্শকের মত দাঁড়াইয়া উঠিয়া এই বিচিত্র শোভাযাত্রা দেখিতে লাগিল।

পাইকগণ সদম্ভে অস্ত্র আস্ফালন করিয়া দর্শকদের ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া ঘাটের দিকে নামিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের মধ্যবর্ত্তিনী চুয়া মন্থরপদে এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে সোপান অবরোহণ করিতে লাগিল।

তার পর চন্দনদাসের সঙ্গে তাহার চোখোচোখি হইল। নিমেষের দৃষ্টি-বিনিময়ে যে ইঙ্গিত খেলিয়া গেল, আর কেহ তাহা দেখিল না।

বুরুজের পাশ দিয়া যাইবার সময় চন্দনদাস অগ্রগামী পাইককে উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"হ্যাঁ সর্দ্দার, এ তোমাদের কিসের মিছিল?"

বদন সর্দ্দার প্রশ্নকারীর দিকে ভ্রূকুটি করিয়া তাকাইল, তাহার গলায় দোদুল্যমান মুক্তার হার দেখিল, তার পর রূঢ়স্বরে কহিল,—"তোর অত খবরে দরকার কি?"

চন্দনদাস মুখে বিনীতভাব প্রকাশ করিয়া বলিল,—"না না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।" মনে মনে বলিল,—"মালিক আর চাকরের রা দেখি একই রকম। দাঁড়াও, তোমার মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা করছি।"

পরবর্ত্তী পাইকগণ সকলেই চোখ পাকাইয়া চন্দনদাসের দিকে তাকাইল; তাহার গলার লোভনীয় মুক্তাহার কাহারও দৃষ্টি এড়াইল না। দুর্দ্দান্ত প্রভুর উচ্ছৃঙ্খল ভৃত্য—হারছড়া কাড়িয়া লইবার জন্য সকলেরই হাত নিশপিশ করিতে লাগিল।

জলের কিনারায় গিয়া পাইকের দল থামিল। চুয়া সোপান হইতে ঝুঁকিয়া গঙ্গাজল মাথায় দিল; তাহার ঠোঁট দুটি অব্যক্ত প্রার্থনায় একটু নড়িল। তার পর সে ধীরে ধীরে জলে অবতরণ করিল। প্রথমে এক হাঁটু, ক্রমে এক কোমর, শেষে বুক পর্য্যন্ত জলে গিয়া দাঁড়াইল। গলার মালা জলে ভাসাইয়া দিয়া ডুব দিল।

পাইকরা কিনারায় কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া গল্প করিতে করিতে গোঁফে মোচড় দিতে লাগিল।

এই সময় একটি ক্ষুদ্র ব্যাপার ঘটিল। চন্দনদাস ইতিমধ্যে বুরুজ হইতে নামিয়া পাইকদের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; হঠাৎ ব্যাকুলস্বরে বলিয়া উঠিল, "ঐ যাঃ!"

এক জন পাইক ফিরিয়া দেখিল, চন্দনদাসের গলার মুক্তাহার ছিঁড়িয়া গিয়াছে এবং মুক্তাগুলি সূতা হইতে ঝরঝর করিয়া ঘাটের শাণের উপর ঝরিয়া পড়িতেছে। সে লাফাইয়া আসিয়া মুক্তা কুড়াইতে লাগিল। তাহাকে মুক্তা কুড়াইতে দেখিয়া বাকি কয় জন পাইক হুড়মুড় করিয়া আসিয়া পড়িল। মুক্তার হরির লুঠ—এমন সুযোগ বড় ঘটে না। সকলে কাড়াকাড়ি করিয়া মুক্তা টুনিতে লাগিল, ঠেলা খাইয়া চন্দনদাস বাহিরে ছিট্‌কাইয়া পড়িল।

পাইকরা মুক্তা কুড়াইতেছে, দর্শকরা তাহাদের ঘিরিয়া লুব্ধচক্ষুতে দেখিতেছে। কেহ লক্ষ্য করিল না যে, এই

অবকাশে চন্দনদাস গঙ্গায় নামিল। চুয়া তখন সাঁতার দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

চুয়া ও চন্দনদাস পাশাপাশি সাঁতার কাটিয়া চলিল। অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে; তাহাদের কালো মাথা দুটি কেবল জলের উপর দেখা যাইতেছে। চুয়া চন্দনদাসের পানে তাকাইল, তাহার সিক্ত মুখের উচ্ছলিত হাসি চন্দনদাসকে পুরস্কৃত করিল।

তাহারা যখন ঘাট হইতে প্রায় চল্লিশ হাত গিয়াছে, তখন ঘাটে একটা হৈ-হৈ শব্দ উঠিল। তার পর "ধর ধর পালালো পালালো—" কয়েক জন পাইক জলে লাফাইয়া পড়িল; কয়েক জন নৌকার সন্ধানে ছুটিল। কিন্তু নৌকা কোথায়? বদন সর্দার ষাঁড়ের মত চেঁচাইতে লাগিল।

গঙ্গার বুকে যে ছোট্ট ডিঙ্গী ভাসিতেছিল, তাহা ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। চন্দনদাস বলিল, "চুয়া, যদি হাঁপিয়ে প'ড়ে থাকো, আমার কাঁধ ধর।"

চুয়া বলিল, "না, আমি পারবো।"

চন্দনদাস পিছু ফিরিয়া দেখিল, যে পাইকগুলা জলে ঝাঁপ দিয়াছিল, তাহারা সজোরে সাঁতারিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহারা এখনও অনেক দূরে, নৌকা সম্মুখেই। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে দু'জনে একসঙ্গে গিয়া নৌকার কাণা ধরিল।

নিমাই পণ্ডিত দাঁড় ছাড়িয়া চুয়াকে ধরিয়া নৌকায় তুলিলেন। চন্দনদাস তাহার পরে উঠিল।

যে পাইকটা সর্ব্বাগ্রে আসিতেছিল, সে প্রায় বিশ হাতের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। সে হাত তুলিয়া ভাঙ্গা গলায় চীৎকার করিয়া কি একটা বলিল। প্রত্যুত্তরে চন্দনদাস উচ্চ হাসিয়া দু'খানা দাঁড় হাতে তুলিয়া লইল। নিমাই পণ্ডিতও দাঁড় হাতে লইলেন।

দুই জনে একসঙ্গে দাঁড় জলে ডুবাইয়া টানিলেন। প্রদোষের ছায়ালোকে ক্ষুদ্র ডিঙ্গী পাখীর মত উড়িয়া চলিল।

১১

নবদ্বীপ হইতে পাঁচ ক্রোশ উত্তরে গঙ্গাবক্ষে চন্দনদাসের দুই সমুদ্রতরী নোঙ্গর করা ছিল। অন্ধকারে তাহাদের একচাপ গাঢ়তর অন্ধকারের মত দেখাইতেছিল।

রাত্রি এক প্রহরকালে ক্ষুদ্র নৌকা গিয়া চন্দনদাসের মধুকর ডিঙ্গার গায়ে ভিড়িল। মাঝিরা সজাগ ও সতর্ক ছিল; মুহূর্ত্তমধ্যে সকলে বড় নৌকায় উঠিলেন।

নিমাই পণ্ডিত বলিলেন, "আমার কাম ত শেষ হ'ল, আমি এবার ফিরি।"

চন্দনদাস হাত যোড় করিয়া বলিল, "ঠাকুর, এত দয়া করলেন, একটু বিশ্রাম ক'রে যান।"

নৌকায় দুইটি কুঠুরী, একটি মাণিকভাণ্ডার, অপরটি চন্দনদাসের শয়নকক্ষ। শয়নকক্ষের মেঝেয় রঙ্গীন পশম সূতীর আস্তরণ। ঘরে দীপ জ্বলিতেছিল; সকলে তাহাতে প্রবেশ করিলেন। চুয়া এক কোণে জড়-সড় হইয়া অর্দ্ধ-শুষ্ক বসন গায়ে জড়াইয়া দাঁড়াইল। চন্দনদাস তাড়াতাড়ি পেটারি হইতে নিজের একখানা ক্ষৌমবস্ত্র বাহির করিয়া চুয়ার গায়ে ফেলিয়া দিল। চুয়া কাপড় লইয়া পাশের ঘরে গেল।

নিমাই পণ্ডিত আস্তরণের উপর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন; চুয়া প্রস্থান করিলে চন্দনদাস চুপি চুপি বলিল,—"ঠাকুর, বিয়েটা আজ রাতেই দিয়ে দিলে ভাল হয়।"

নিমাই হাসিয়া বলিলেন,—"এত তাড়া কিসের? বাড়ী গিয়ে বিয়ে ক'রো।"

চন্দনদাস ভারি ভাল মানুষের মত বলিল,—"না ঠাকুর, চুয়া যদি কিছু মনে করে?—তা ছাড়া, নৌকায় একটি বৈ শোবার ঘর নেই।"

নিমাই বলিলেন,—"কিন্তু বিয়ে দিই কি ক'রে? উপকরণ কৈ?"

"ঠাকুর, আপনি পণ্ডিতমানুষ, সামান্য পুরুত ত নন। আপনি ইচ্ছে করলে শুধু-হাতেই বিয়ে দিতে পারেন।"

নিমাই স্মিতমুখে চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"মন্দ কথা নয়। তুমি কন্যাকে হরণ ক'রে এনেছ, সুতরাং তোমাদের রাক্ষস-বিবাহ হ'তে পারে। রাক্ষস-বিবাহে কোনও অনুষ্ঠানের দরকার নেই।"

চন্দনদাস মহা উল্লাসে উঠিয়া গিয়া চুয়ার হাত ধরিয়া লইয়া আসিল; বলিল,—"চুয়া, ঠাকুর এখনুই আমাদের বিয়ে দেবেন।"

পট্টাম্বরপরিহিতা চুয়া নত-নয়নে রহিল। নিমাই হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"চন্দনদাস নাছোড়বান্দা, আজই বিয়ে ক'রে তবে ছাড়বে"—চুয়ার মুখে অরুণরাগ দেখিয়া বুঝিলেন, তাহার অমত নাই, বলিলেন,—"বেশ। ফুলের মালা ত হবে না, দু'ছড়া হার যোগাড় কর।"

পুলকিত চন্দনদাস মাণিকভাণ্ডার হইতে দুগাছা মুক্তার মালা বাহির করিয়া দিল। তখন বিবাহ-ক্রিয়া আরম্ভ হইল।

নিমাই একটি হার চুয়ার হাতে দিয়া বলিলেন,—"দু'-জনে দু'জনের গলায় দাও।"

উভয়ে মালা বদল করিল।

নিমাই বলিলেন,—"ঈশ্বর সাক্ষী ক'রে গঙ্গার বুকের উপর ব্রাহ্মণ-সাক্ষাতে আজ তোমরা স্বামি-স্ত্রী হলে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের মঙ্গল হোক।"

উভয়ে নতজানু হইয়া ভক্তিপূত-চিত্তে এই দেবকল্প তরুণ ব্রাহ্মণের পদধূলি লইল।

তার পর উঠিয়া চন্দনদাস বলিল,—"ঠাকুর, এ বিয়ে লোকে মানবে ত?"

নিমাই পণ্ডিতের নাসা স্ফুরিত হইল, তিনি গর্ব্বিতস্বরে বলিলেন,—"নিমাই পণ্ডিত যে বিয়ের পুরুত, সে বিয়ে অমান্য করে কে?"

চন্দনদাস নিমাই পণ্ডিতের পদতলে একমুঠি মোহর রাখিয়া বলিল,—"দেবতা, আপনার দক্ষিণা।"

নিমাই এইবার হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—"ঐটি পারব না।—যাক, আজ উঠলাম। বুড়ীকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা শীঘ্র করো। আর, বাড়ী গিয়ে যথারীতি লৌকিক বিবাহ ক'রো। অধিকন্তু ন দোষায়।"

"তা করব। কিন্তু ঠাকুর, আপনি ক্লান্ত, পাঁচ-ছয় ক্রোশ দাঁড় টেনে এসেছেন, আজ রাত্রিটা নৌকায় কাটিয়ে গেলে হ'ত না?"

"না—আজই আমায় ফিরতে হবে। রাত্রিতে না ফিরলে মা চিন্তিত হবেন। তা ছাড়া, তোমার নৌকায় ত একটি বৈ ঘর নেই।" বলিয়া মৃদু হাসিলেন।

চন্দনদাস একটু লজ্জিত হইল।

তার পর সেই মসীকৃষ্ণ অমাবস্যার মধ্যখানে নিমাই পণ্ডিত ডিঙ্গীতে উঠিয়া একাকী নবদ্বীপের পানে ফিরিয়া চলিলেন। যতক্ষণ তাঁহার দাঁড়ের শব্দ শুনা গেল, চুয়া ও চন্দন যোড়হস্তে অনন্যচিত্তে নৌকার পাশে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল।

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (বি, এল)।

আজ ও কাল

আজি বন্ধু তোমাদের দ্বিধাহীন প্রাণে
কোন ঠাঁই কোন ফাঁক নাই;
সংসারের শত কর্ম্মে, কত হর্ষে গানে
ব্যস্ত, মত্ত আছ সর্ব্বদাই।

বর্ত্তমান, ভবিষ্যের আশা-নিরাশার
করিতেছ কত আলোচনা,
আজিকে ফিরিল জিনি' সমর দুর্ব্বার
পরাজয়ে কে ভোগে যাতনা!

কাল পুনঃ প্রতিপক্ষে করি পরাভূত
কে পরিবে বিজয়ের মালা;
কে করিবে সমাধান কর্ম্ম মনঃপূত—
কার ভাগ্যে শুধু বহ্নি-জ্বালা!

যে কল্য এসেছে, আর আসিবে যে কাল
তাদেরি কেবল প্রয়োজন;
রঙীন কল্পনা-লোকে রচি' মায়াজাল
ভবিষ্যের দেখিছ স্বপন

যে কল্য গিয়াছে হায়! তার পানে ফিরে
চাহি' কেহ ফেলিবে না শ্বাস,
কাল যে গিয়াছে, গেছে বিস্মৃতির তীরে,
আজি লুপ্ত তার ইতিহাস!

শ্রীরসময় দাস।



সর্ষপ ও সর্ষপ-তৈল

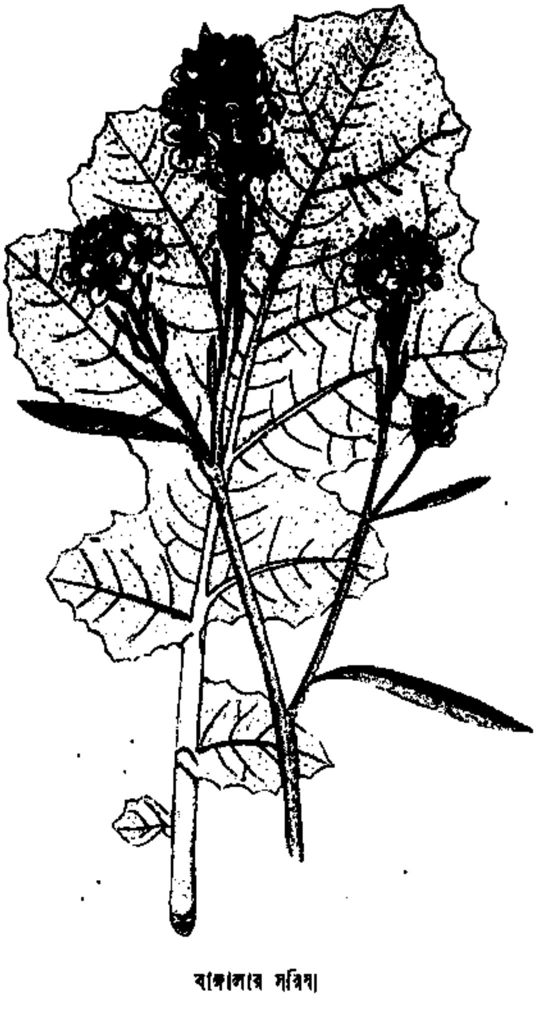
তিলের ন্যায় প্রাচীন না হইলেও সর্ষপ ভারতের একটি প্রধান তৈলবীজ। তিল হইতেই তৈল শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহার ব্যবহার অতি পুরাতন; সর্ষপ তৎপরে যে কোন্ সময় হইতে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা ঠিক বলা যায় না, তবে ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, বৈদিক যুগের অনতি পরেই সর্ষপ-চাষ উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সর্ষপের অনেক রকম ব্যবহার আছে; তন্মধ্যে একটি অতি অদ্ভুত। সর্ষপের অন্য একটি নাম আসুরী; সরিষা নানাপ্রকার যাদুকার্য্যে দরকার হয়; এখনও ভারতের স্থানে স্থানে ডাইনী স্ত্রীলোক মানবের—বিশেষতঃ শিশুগণের ঘোর অনিষ্টসাধন করে বলিয়া বিশ্বাস আছে। ডাইনী ধরার একটি প্রকৃষ্ট উপায়—কয়েকটি মৃৎপাত্রে জল ভরিয়া ও যাহাদের উপর সন্দেহ হয়, তদ্রূপ স্ত্রীলোকের নামাঙ্কিত করিয়া প্রত্যেক পাত্রে এক এক ফোঁটা সর্ষপ-তৈল ফেলিয়া দেওয়া। যে পাত্রে উক্ত তৈল-বিন্দু প্রসারিত হইয়া স্ত্রীলোকের আকার ধারণ করিবে, বুঝিতে হইবে যে, সেই পাত্রে যাহার নাম আছে, সেই ডাইনী। আয়ুর্ব্বেদে সর্ষপকে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—সিদ্ধার্থ অথবা শ্বেত সরিষা এবং রাজিকা অর্থাৎ কৃষ্ণ সরিষা। ইহাদের প্রত্যেকটির আবার দুই দুইটি উপবিভাগ আছে—গৌরসিদ্ধার্থ, রক্ত-সিদ্ধার্থ; এবং রাজিকা, কৃষ্ণরাজিকা; সিদ্ধার্থ সাধারণতঃ আহার্য্য তৈল এবং রাজিকা বাহ্য প্রয়োগের জন্য ব্যবহৃত হয়।

সর্ষপ জাতি

কপি, শালগম, মূলা প্রভৃতির ন্যায় সর্ষপও সর্ষপকী বর্গের (Cruciferae) অন্তর্ভুক্ত। ব্যবহারিক হিসাবে এতদ্দেশে প্রধানতঃ তিন জাতীয় সর্ষপই প্রধান, যথা—

Brassica nigra—কৃষ্ণ সর্ষপ, কালি রাই, তারামিরা; বীজ গোল, ঘোর পাটলবর্ণ, অমসৃণ, শ্বেতাভ সূক্ষ্ম পর্দ্দা দ্বারা আবৃত; ইহার গাছ ২।৩ ফুট বড় হয়; অল্পবিস্তর শাখা-প্রশাখাযুক্ত; উত্তর-ভারতেই ইহার চাষ অধিক।

B. campestris—পিলা সার্ষণ; সরিষা; বীজ প্রায় গোলাকার, পীত অথবা লোহিতাভ পাটলবর্ণ; ইহার কয়েকটি উপজাতি আছে—কতকগুলির ফল ঊর্দ্ধাভিমুখে এবং অন্য কতকগুলির ফল নিম্নাভিমুখে জন্মায়; ফলও



বাঙ্গালার সরিষা

অনুলম্ব পর্দ্দা দ্বারা দুই অথবা চারি ভাগে বিভক্ত ; গাছের শাখা-প্রশাখা নাই, অথবা কেবলমাত্র ঊর্দ্ধদেশে। পূর্ব্ব, পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গে ইহার চাষ হয়। তৈল প্রস্তুতের জন্য এই জাতির ব্যবহারই অধিক।

B. juncea—রাই ; ইহার চাষই বঙ্গদেশে অধিক ; রাইর তিনটি উপজাতি আছে, তন্মধ্যে একটি ৫।৬ ফুট দীর্ঘ ও নাবী এবং অন্য দুইটি হ্রস্ব ও জলদি ফসল। ইহার বীজ প্রায় গোল এবং রক্তাভ পাটলবর্ণ। এতৎপ্রদেশে স্থানে স্থানে তোরিয়া জাতীয় সর্ষপও কিয়ৎপরিমাণে উৎপাদিত হয়, কিন্তু তাহার পরিমাণ কম।

ভারতে কত জমিতে সর্ষপ উৎপাদিত হয়, তাহা নির্ণয় করা কিছু কঠিন ; কারণ, অনেক সময় ইহা মিশ্রিত ফসলরূপে কর্ষিত হয় ; কেবল রাইয়ের চাষ সাধারণতঃ স্বতন্ত্রভাবে হইয়া থাকে। যাহা হউক, সকল জাতীয় সর্ষপের মোট জমির পরিমাণ গড়ে ৬০ লক্ষ একর বলিয়া সরকারী বিবরণী প্রভৃতিতে প্রকাশ ; তন্মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ যুক্তপ্রদেশে, ২২ ভাগ বঙ্গে, ১৯ ভাগ পঞ্চনদে এবং ১০ ভাগ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে অবস্থিত। স্থানবিশেষে বীজবপনের ও ফসল তুলিবার সময়ের অনেক তারতম্য আছে ; কিন্তু সাধারণভাবে ইহা বলিতে পারা যায় যে, কার্ত্তিক মাসে চাষ আরম্ভ ও ফাল্গুন মাসে বীজ সংগৃহীত হয়। নিখিল ভারতে গড়ে প্রায় ১১ লক্ষ ৬০ হাজার টন সরিষা উৎপাদিত হইয়া থাকে।

তৈলের গুণাগুণ

সর্ষপ ও সর্ষপ-তৈলের বহুবিধ ব্যবহার সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে ইহার রাসায়নিক গঠন মোটামুটি জানা দরকার। সর্ষপের উপাদানের মধ্যে স্থায়ী তৈল, বায়ী তৈল, মাইরোণিক অম্ল, কটু লবণ, কোষসার (cellulose), সোরাজান-ঘটিত পদার্থ ও জল অন্যতম। সর্ষপে শতকরা ৪২ হইতে ৪৫ ভাগ স্থায়ী তৈল আছে,—যদিও তাহার সম্পূর্ণাংশ কার্য্যতঃ নিষ্কাষণ করা যায় না। তৈল সহজে শুষ্ক হয় না। প্রথম নিষ্কাষণের সুর্ম্ময় তৈলে তেমন



বাঙ্গালার রাই-সরিষা

ঝাঁঝ থাকে না ; খৈলে জল দিয়া আবার তৈল বাহির করিলেই তীব্র ঝাঁঝ ও কটু স্বাদ আইসে। সরিষার বায়ী তৈলের জন্যই প্রধানতঃ ডাক্তারী চিকিৎসায় ইহার ব্যবহার। সর্ষপস্থিত মাইরোসিন্ ও সিনিগ্রিন্ নামক দুইটি পদার্থের জল সহযোগে প্রতিক্রিয়া হইতেই বায়ী তৈল উৎপন্ন হয়। শীতল অথবা উষ্ণ, উভয় প্রকার জল দ্বারাই এই প্রতিক্রিয়া

সাধিত হইতে পারে, কিন্তু জলের উত্তাপ ১৪০° ডিগ্রি ফারন্‌হিটের অধিক হইলে অন্তরুৎসেচক (enzyme) মাইরোসিণ নষ্ট হইয়া যায়। বিভিন্ন দেশীয় সর্ষপে বায়ী তৈলের অনুপাত অবশ্য বিভিন্ন; সাধারণতঃ ভারতীয় সরিষায় শতকরা প্রায় ০·৬—০·৭ ভাগ বায়ী তৈল থাকে; ইহা ইতালীয় সর্ষপের সমতুল্য। মধ্য-য়ুরোপে কোলজা জাতীয় সর্ষপ-তৈল কৃত্রিম মাখম (margarine) প্রস্তুতের জন্য যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। এতদ্দেশীয় তোরিয়া সর্ষপ-তৈল সম উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা যাইতে পারে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তৎসম্বন্ধে কোন চেষ্টা করা হয় নাই।

সর্ষপ ও সর্ষপ-তৈল নানা প্রকারে চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়; কিন্তু এ স্থলে তৎসমুদয় আলোচনা করিবার স্থানাভাব। সংক্ষেপতঃ এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, সর্ষপের বায়ী তৈল জীবাণুনাশক এবং উগ্রতাসাধক। সর্ষপচূর্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া চর্ম্মের উপর লাগাইলে উহা প্রত্যুগ্রতা-সাধক- (counter-irritant) রূপে কার্য্য করে। স্নায়ুশূল ও রক্তসংগ্রহযুক্ত বেদনায় এইরূপ পুল্টিশ বিশেষ উপকার দেয়। রজোহল্পতা রোগে সর্ষপমিশ্রিত জলে তলপেট ডুবাইয়া কিছুক্ষণ বসিলে রজঃ নিঃসারিত হইয়া রোগের উপশম হয়। অল্পমাত্রায় সরিষা-চূর্ণ আগ্নেয় ও লালা-নিঃসারক, এবং সেই জন্য ইহা পরিপাকক্রিয়ার সহায়তা করে; অধিক মাত্রায় ইহা বমনকারক; আফিং প্রভৃতির বিষক্রিয়া প্রতিরোধ করিবার জন্য সর্ষপচূর্ণমিশ্রিত জল দ্বারা বমন করান হইয়া থাকে। সর্ষপ-বীজের ক্রিয়া সাধারণতঃ প্রায় উক্তরূপ, কিন্তু উহার উপর একটি পিচ্ছিল পদার্থযুক্ত আবরণ থাকায় উহার উগ্রতা খুব কম। রন্ধনে ও গাত্রমর্দ্দনে সর্ষপ-তৈলের ব্যবহার বঙ্গদেশেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহা দ্বারা চর্ম্ম যে স্নিগ্ধ, কোমল ও পরিষ্কার থাকে, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। কোন কোন প্রকার চর্ম্মরোগেও ইহা ফলপ্রদ। আজকাল মার্কিণে সর্ষপ-তৈলের গুণ কতকটা উপলব্ধ হইয়াছে; সময়ে সময়ে তথা হইতে সামান্য পরিমাণে তৈলের চাহিদাও দেখিতে পাওয়া যায়।

তৈল-শিল্পের অবস্থা

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে দেশে সরিষা-তৈলের কল ছিল না। সর্ষপতৈল-শিল্পের ভিত্তি ছিল দেশীয় ঘানি। ক্ষুদ্র বৃহৎ ভেদে প্রতি গ্রামেই কুটীর-শিল্পরূপে ২।৪টি ঘানি দ্বারা তৈল প্রস্তুত হইত এবং উক্ত তৈল মফঃস্বল হইতে সহরেও আসিত। সরিষার চাষও সেই সময়ে যথোপযুক্ত পরিমাণে হইত; সুতরাং তৈলবীজের জন্য আমাদিগকে অন্য প্রদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত না। সরিষা-তৈলে সাধারণতঃ কোন ভেজাল থাকিত না, কেবল নিষ্কাশনের সুবিধার জন্য সামান্য পরিমাণে সোর-গুঁজা সর্ষপের সহিত মিশ্রিত করা হইত। সেকালে তৈলের মূল্যও সুলভ ছিল, টাকায় প্রায় চারি সের। কিন্তু কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে কল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই সমুদয় অবস্থার শনৈঃ শনৈঃ পরিবর্ত্তন ঘটিল; তাহা হওয়াও আশ্চর্য্য নহে, কারণ, গরু-টানা একটি দেশী ঘানি ২৩ সের সরিষা হইতে ২৪ ঘণ্টায় মাত্র ৮ সের তৈল নিষ্কাশন করিতে পারে; সেই স্থানে শক্তি-পরিচালিত একটি ঘানি হইতে সমসময়ে আড়াই মণ সরিষা নিষ্পেষণ করিয়া ৩০ সের তৈল পাওয়া যায়। উক্ত হিসাবে ১ শত ঘানি-যুক্ত একটি কল ৪ শত দেশী ঘানির সমকক্ষ। উৎপাদনের পরিমাণে কিম্বা উৎপাদিত তৈলের মূল্যে দেশীয় ঘানি কলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে না।

যখন সাধারণ লোকে দেখিতে পাইল যে, দেশী ঘানি ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে এবং মহাজনগণের দ্বারা আমদানীকৃত কলের তৈল ঘানির তৈল অপেক্ষা সুলভতর, তখন তাহাদের তৈলের জন্য সরিষা-চাষ অনাবশ্যক বোধ হইল এবং তৎপরিবর্ত্তে তাহারা পাট প্রভৃতি অন্যান্য লাভকর ফসলের উপর মনোনিবেশ করিল। এ স্থলে ইহাও বলা দরকার যে, কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে তৈল থাকার জন্য কলওয়ালাগণ বঙ্গের সরিষা অপেক্ষা বিহার, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতির সরিষা অধিক পছন্দ করেন; ইহাও বাঙ্গলায় সরিষা-চাষের জমি সঙ্কুচিত হওয়ার একটি কারণ। বঙ্গদেশই সর্ব্বাধিক পরিমাণে সরিষা-তৈল ব্যবহার করে, কিন্তু এই প্রদেশেই খাঁটি সরিষার তৈলের এত অভাব যে, সময়ে সময়ে টাকায় ২ সের তৈল পাওয়া যায় না। সরিষা চাষ কমিয়া যাওয়া, সরিষা-বীজ রপ্তানী বর্দ্ধিত হইতে থাকা, এবং সরিষা ফসলের উৎকর্ষসাধনে অমনোযোগিতা—এই সমুদয় যে বর্ত্তমান অবাঞ্ছনীয় অবস্থার জন্য অনেকাংশে দায়ী, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

কলিকাতা সর্ষপ তৈল-শিল্পের একটি প্রধান কেন্দ্র। ইহার অবস্থা হইতেই বঙ্গদেশের সরিষা-তৈল-সংক্রান্ত অবস্থা অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। অল্পদিবস পূর্ব্বে প্রকাশিত অঙ্কাদি হইতে দেখা যায় যে, এই মহানগরীতে ৮ হাজার ঘানিযুক্ত ৮০টি বাষ্পীয় শক্তি-পরিচালিত ও ৪ হাজার ৫ শত ঘানিযুক্ত ৩ শত বৈদ্যুতিক শক্তি-পরিচালিত সরিষা-তৈল কল আছে। উক্ত ৩ শত ৮০টি কল হইতে প্রত্যহ ৯ হাজার ৯ শত মণ তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু এক্ষণে দ্রষ্টব্য যে, কলগুলি পূর্ণমাত্রায় চালাইবার মত সরিষা পাওয়া যায় কি না। যদি মাসে ৪ দিন বাদ দিয়া কলগুলিকে ২৬ দিনও পূরাদমে চালান যায়, তাহা হইলে প্রতিদিন ৯ শত টন সরিষা দরকার। অন্য দিকে, বিগত ৫ বৎসরে কলিকাতায় সরিষা আমদানীর অঙ্কাদি হইতে প্রকাশ পায় যে, প্রত্যহ আমদানীর পরিমাণ গড়ে ৩শত টন; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কলিকাতার বাজারে প্রাপ্তব্য সরিষা সপ্তাহে কেবলমাত্র দুই দিন কলগুলি পূরাদমে চালাইবার পক্ষে যথেষ্ট। এইরূপ অবস্থায় শীঘ্র উন্নতি হইবারও আশা নাই; কারণ, যে সমস্ত প্রদেশ হইতে কলিকাতায় সরিষা আমদানী হয়, সে সকল দেশেও সরিষা-তৈলের কল স্থাপিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য সরিষার স্থানীয় চাহিদা বাড়িয়া চলিয়াছে।

এক্ষণে তৈল উৎপাদনের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। বৃহত্তর কলিকাতার ১৪ লক্ষ লোক যদি প্রত্যহ অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে তৈল ব্যবহার করে, তাহা হইলে দৈনিক প্রয়োজন হয় এক হাজার মণ; সমভাবে বঙ্গের সাড়ে চার কোটি ব্যক্তির পক্ষে ব্যবহারের মাত্রা যদি সিকি ছটাক হিসাবে ধরা যায়, তাহা হইলে প্রত্যহ প্রায় ১৬ হাজার মণ তৈল দরকার; অর্থাৎ বঙ্গদেশে প্রত্যহ ন্যূনাধিক ১৭ হাজার মণ সরিষা-তৈল প্রয়োজনীয়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কলিকাতার কলসমূহে মোট ৯ হাজার ৯ শত মণ তৈল দৈনিক উৎপাদিত হয়। ইহা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, কলিকাতা বাঙ্গালার সরিষা-তৈলের চাহিদা কেবলমাত্র অর্দ্ধেক পরিমাণে পরিপূরণ করিতে পারে। অবশ্য কলিকাতার বাহিরেও বঙ্গদেশে সরিষা-তৈলের কল স্থানে স্থানে আছে; কিন্তু তাহাদিগের সংখ্যা ও উৎপাদনমাত্রা অধিক নহে। সরিষার তৈলের জন্য বঙ্গদেশকে অন্য প্রদেশের উপর যে বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতে হয়, তাহা বলা বাহুল্য।

সরিষার তৈল সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিবার চেষ্টায় অসাধু ব্যবসায়িগণ উহার সহিত যে কি না অনিষ্টকর দ্রব্য মিশ্রিত করে, তাহা বলা যায় না। কুসুমফল (পাকুড়া বীজ), তিসি, সোরগুজা ও অন্যান্য বীজের তৈল; লঙ্কার আরক, সজিনা-ছালের রস, ২।৪ প্রকারের রাসায়নিক পদার্থ—এ সমস্তই সরিষা-তৈলের নমুনায় সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায়। যখন কলিকাতা কর্পোরেশন এই প্রকার ভেজাল বন্ধ করিবার জন্য কয়েক দফা মামলা রুজু করিলেন, তখন ব্যবসায়িগণ 'জ্বালাইবার জন্য মিশ্রিত সরিষা তৈল' কিম্বা সমপ্রকার বর্ণনা দিয়া বাজারে তৈল বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। অবশ্য সরিষার সহিত অন্য কোন তৈল-বীজ মিশাইয়া তৈল প্রস্তুত এবং প্রকৃত সরিষার তৈলে অনিষ্টকর পদার্থ মিশ্রণ আইন দ্বারা সর্ব্বত্র বন্ধ না হইলে খাঁটি-সরিষার তৈল পাওয়া সহজ হইবে না। কিন্তু কতিপয় কলওয়ালা এ বিষয়েও আপত্তি উত্থাপন করেন। তাঁহারা বলেন যে, তাহা হইলে তাঁহাদের ক্ষতি হইবে; সরিষার অভাবে অনেক দিনই কল বন্ধ রাখিতে হইবে। সরিষা, তিল ও চীনের বাদাম—এই তিনটি বীজ হইতে যথাক্রমে মণ প্রতি ১৩, ১৬, ও ১৮ সের তৈল পাওয়া যায়। তিনটিই আহার্য্য তৈল। সরিষার সহিত উক্ত দুইটি বীজের মধ্যে যে কোনটি অর্দ্ধেকাংশে সংমিশ্রিত করিয়া তৈল নিষ্কাশন করিলে সমপরিমাণ কেবল মাত্র সরিষা-বীজ অপেক্ষা অধিক তৈল পাওয়া যায়। কলওয়ালাগণের যুক্তি এই যে, সংমিশ্রিত সরিষা তৈল যখন আহার্য্যরূপে ক্ষতিকর নয়, তখন এইরূপ মিশ্রিত তৈল উৎপাদন বন্ধ করা অবিধেয় ও বিশেষতঃ সাধারণ লোক যখন উচ্চমূল্যের জন্য খাঁটী সরিষার তৈল ব্যবহার করিতে পারিবে না, তখন এইরূপ মিশ্রিত তৈল তাহাদিগের কার্য্যে লাগিবে। তাঁহারা বলেন যে, সরিষা-তৈলের দর কমাইবার ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

আমরা কিন্তু উক্তরূপ যুক্তির সমর্থন করিতে পারি না। বহু শতাব্দীব্যাপী ব্যবহার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, সর্ষপ-তৈল গাত্র মর্দ্দন ও রন্ধনে ব্যবহারের জন্য বাঙ্গালীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। স্বতন্ত্র অথবা মিশ্রিতভাবে তিল ও চীনের বাদাম সম্বন্ধে তাহা প্রমাণিত হইতে এখনও অনেক

বিলম্ব আছে। রাসায়নিক উপাদান হিসাবে এই দুইটি তৈলে কোন অনিষ্টকর দ্রব্য না থাকিতে পারে, কিন্তু শরীর-পুষ্টির পক্ষে সেগুলি যে অনুকূল, তাহা দীর্ঘকালব্যাপী খাদ্যতত্ত্ব-সম্মত পরীক্ষা ভিন্ন সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না। এ সম্বন্ধে আমাদিগের আরও বক্তব্য এই যে, খাঁটি সরিষা-তৈল যথেষ্ট মাত্রায় উৎপাদন করা আমাদিগের লক্ষ্য হওয়া উচিত। যে সমুদয় কারণে সরিষা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে এবং খাঁটি সরিষা-তৈলের দর বাড়িয়াছে, সেগুলি কিছু চিরস্থায়ী নয়; উপযুক্ত ব্যবস্থা দ্বারা তাহার প্রতীকার করিতে পারা যায়, যদিও তাহা সময়সাপেক্ষ। খাঁটি সরিষা-তৈলের পরিবর্ত্তে মিশ্রিত তৈল চলনের একবার সুযোগ প্রদান করিলে পরে খাঁটি তৈলকে স্বস্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে যে অনেক বেগ পাইতে হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অনেক খাদ্যতত্ত্ববিদের মত যে, উদ্ভিজ্জ তৈলমাত্রেই খাদ্যপ্রাণ (Vitamin) নাই; অবশ্য সেই হিসাবে সরিষার তৈলও খাদ্যপ্রাণহীন। তাহা সত্য হইলেও বিশেষ ক্ষতি নাই, কারণ, কেহ ঘৃত অথবা মাখমের ন্যায় খাদ্যরূপে সরিষার তৈল ব্যবহার করে না। কিন্তু সম্প্রতি চিকিৎসা-জগতে ইহাও বলা হইতেছে যে, সরিষার তৈল বেরি-বেরি রোগ উৎপত্তির সহায়তা করে। কিরূপ অবস্থায় সর্ষপ-তৈল এই রোগ উৎপত্তির সহায়ক, তৎসম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যতদূর গবেষণা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, শুষ্ক, সুরক্ষিত টাট্‌কা সরিষা হইতে নিষ্কাশিত তৈল দ্বারা লোকে ব্যাধিগ্রস্ত হয় না; পুরাতন, অযত্নরক্ষিত, জল লাগিয়া অথবা অন্য কোন প্রকারে বিকৃতিপ্রাপ্ত সর্ষপ হইতে তৈল নিষ্কাশন করত ব্যবহার করিলে তাহা শরীরের অনিষ্টসাধন করিতে পারে। যাহারা তৈল ব্যবহার করেন, তাঁহারা অবশ্য জানিতে পারেন না যে, কিরূপ সর্ষপ হইতে উহা প্রস্তুত হইয়াছে। এ বিষয়ে কলওয়ালাগণের যথেষ্ট দায়িত্ব রহিয়াছে; কোন প্রকারে বিকৃত অথবা অতি পুরাতন বীজ তাঁহাদিগের পক্ষে বর্জ্জন করাই বিধেয়।

বীজ ও তৈল-ব্যবসায়

জগতের বাজারে সর্ষপ ও সর্ষপ-তৈলের চাহিদা নিতান্ত সামান্য নয়। উৎপাদনের যাবতীয় কেন্দ্র হইতে মোট ৩,৮৫,০০০ টন সর্ষপ-বীজ রপ্তানী হয়; তন্মধ্যে ভারতের অংশ ২৫৪০০০ টন; অর্থাৎ মোট রপ্তানীর শত-করা ৬৬ ভাগ ভারত হইতেই যায়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এতদ্দেশে বৎসরে প্রায় ১২,৬০,০০০ টন সর্ষপ উৎপাদিত হয়; উহা হইতে রপ্তানীর পরিমাণ বাদ দিলে দেখা যায় যে, দেশমধ্যেই প্রতি বৎসর কিঞ্চিদধিক ১০ লক্ষ টন সরিষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সরিষা-তৈলের রপ্তানীর পরিমাণ গড়ে প্রায় ৪ লক্ষ গ্যালন। বলা বাহুল্য, পৃথিবীর যে সকল স্থানে কার্য্য উপলক্ষে অধিকসংখ্যক ভারতবাসী বাস করিতেছে, সেই সকল স্থানেই যথা—মরিচ দ্বীপ, ফিজি, বৃটিশ গিনি ও নেট্যালে সরিষার তৈল প্রধানতঃ রপ্তানী হয়। কলিকাতা ও করাচী এই দু'টি বন্দর হইতেই সমধিক পরিমাণে সর্ষপ-তৈল বিদেশে চালান দেওয়া হইয়া থাকে। সর্ষপ-খৈলেরও সার হিসাবে চাহিদা ক্রমশঃ বাড়িতেছে; এবং ইদানীন্তন উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান মাত্রায় ষ্ট্রেট্ সেটেলমেণ্টস্ ও জাপানে খৈল চালান যাইতেছে। ফলতঃ ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, সর্ষপ-তৈল-শিল্প প্রসারের অনেক অবসর আছে; কিন্তু চাষের জমি এবং নির্ব্বাচন দ্বারা সর্ষপ-বীজের তৈলাংশ (oil-contents) না বাড়াইতে পারিলে, উক্তরূপ প্রসারসাধন সুসাধ্য হইবে না। এই বিষয়ে বঙ্গদেশেরই অগ্রণী হওয়া উচিত; কারণ, এই প্রদেশেই সর্ষপ-তৈলের চলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।



অতীত



[গল্প

বৃদ্ধ সরকার মহাশয়ের বিস্ময়ের আর অন্ত রহিল না।

দড়ি-বাঁধা চশমা-জোড়াটি একবার কপালের উপর তুলিয়া দিয়া, একবার নাকের ডগায় নামাইয়া দিয়া বারম্বার তিনি চিঠিখানা পড়িয়া দেখিলেন। অর্থবোধের এতটুকু কষ্ট নাই, তবু, কোথায় যেন কি-একটা বড়-রকমের খোঁচ্ রহিয়া গিয়াছে। কলিকাতার বাসা তুলিয়া দিয়া খোকাবাবু দেশে ফিরিতেছেন—একা নয়, সস্ত্রীক।

খুবই আনন্দের কথা! হ্যাঁ, আনন্দের কথাই ত বটে! কিন্তু—

এই ত সবে মাস-তিনেক হইল, কর্ত্তাবাবুর দেহান্ত ঘটিয়াছে, তাঁহার শ্রাদ্ধের উপলক্ষে যে বিরাট পর্ব্বটা সে-দিন এখানে হইয়া গেল, তাহার অনুপাতে খোকাবাবুর বিবাহ-উৎসবের একটা মোটামুটি খসড়া সরকার-মহাশয় মনে-মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু সবই যে পণ্ড হইয়া গেল!—একেবারে সস্ত্রীক!

কিছুদিন হইল, সরকার-মহাশয় সহরে একটি ছোট-খাট বাড়ীর পত্তন করিয়াছিলেন, স্বর্গীয় কর্ত্তাবাবুর শ্রাদ্ধখাতের হিসাবে তাহার দোতলাটুকু প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। মনে-মনে হিসাব ছিল, ছোট-মেয়েটিকে পাত্রস্থ করার খরচটা খোকাবাবুর বিবাহ-খাতেই নিষ্পন্ন হইবে, কিন্তু এ কোথা দিয়া কি হইল? কোন উৎসব নাই, এতটুকু একটু সংবাদ পর্য্যন্ত নাই, দত্তবংশের একমাত্র সন্তান খোকাবাবুর বিবাহ হইয়া গেল? আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য!

সম্মুখের মোটা খেরোয়-বাঁধা খাতার উপর চিঠিখানা আছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া সরকার বলিলেন, দুত্তোর! এ-কালের ছোক্‌রাদের পক্ষে সবই সম্ভব!

অন্দরে মেয়েদের মধ্যে একমাত্র দূর-সম্পর্কীয়া পিসী-মাতা, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। খোকাবাবুর চিঠির মর্ম্মটুকু সরকার তাঁহার নিকট নিবেদন করিয়া দিলেন। পিসীমা হইতে আরম্ভ করিয়া বাড়ীর দাস-দাসী পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। সে চাঞ্চল্যের মধ্যে আনন্দের রেশটুকুই যেন বেশী করিয়া বাজিল। সরকার কিন্তু গুম্ হইয়া রহিলেন।

তবু উপায় নাই। সস্ত্রীক খোকাবাবুর অভ্যর্থনায় কোন দিক্ দিয়া যাহাতে এতটুকু ত্রুটি না হয়, তাহারই আয়োজন চলিতে লাগিল।

ছোট একটি সহর। ছোট রেলষ্টেশন। সরকার-মহাশয় দুইজন চাকর সঙ্গে লইয়া বেলা ১০টা হইতে ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছেন। কিন্তু ১১টার গাড়ীও পার হইয়া গেল, খোকাবাবুর দেখা নাই। সুতরাং সরকার-মহাশয় পরের ট্রেণের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন।

ষ্টেশনের পাশে ছোট একটি পাঁচ-মিশেলী দোকানের ময়লা নড়বড়ে তক্তপোষের উপর বসিয়া বৃদ্ধ সরকার তামাক টানিতেছেন, এমন সময় বাড়ী হইতে পচা বাগ্দী আসিয়া খবর দিল, আপনারা এখানে ব'সে আছেন, বাবু ওদিকে বৌ-ঠাকরুণকে নিয়ে বাড়ীতে এসে হাজির।

অন্দর-বাড়ীর ফটকের সম্মুখেই লাল-রঙের চক্‌চকে একখানা মোটর। দরকার হইলে মুখও বুঝি দেখা যায়। সরকার অনেকক্ষণ গাড়ীর চারিদিক্ ঘুরিয়া-ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন। আন্‌কোরা নূতন গাড়ী! নূতন বউ-ঠাকরুণ

এবং নূতন গাড়ী! দুটাই বোধ হয় কর্ত্তাবাবুর মরার প্রতীক্ষায় ছিল!

তা, বৃদ্ধের অনুমান ভুল হয় নাই। প্রথম যৌবনের কোন্ এক অসতর্ক মুহূর্ত্তটিতে মণীশ গীতিকাকে ভালবাসিয়াছিল এবং সে-প্রণয়ের একাগ্রতা দিনে-দিনে এতটা বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, তাহাকে বিবাহ করিয়া গৃহলক্ষ্মীরূপে প্রতিষ্ঠা করার কোন বাধাই সে দেখিতে পায় নাই, ছিল শুধু সামান্য একটুখানি সঙ্কোচ, তাহার বাবার কথা ভাবিয়া। তাই, পিতার মৃত্যুতে সে-সমস্যাটুকু যখন অতি সরলভাবে মীমাংসা হইয়া গেল, তখন নিজেই উদ্যোগী হইয়া তাহাদের বিবাহ-কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া ফেলিল। গীতিকা সুন্দরী ত বটেই, গেল বছর সে বেথুন হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছে, গান-বাজনায় রীতিমত এক জন ওস্তাদ না-হইলেও যেটুকু গায়, মিষ্ট গলার সহিত প্রাণের স্পর্শটুকু মিশাইয়া সে তাহাকে অপূর্ব্ব করিয়া তুলিতে জানে। ইহার বেশী মণীশ আর কিছু চাহে নাই—কিছু না!

প্রথমে মণীশ ভাবিয়াছিল, কলিকাতাতেই একখানি বাড়ী কিনিয়া গীতিকাকে লইয়া থাকিবে, কিন্তু এখানকার হট্টগোল ক্রমশঃ যেন তাহার দুঃসহ বোধ হইতে লাগিল। সে ঠিক করিল, ফিরিয়া যাইবে সেই ছোট সহরখানিতে—তাহাদের পৈতৃক বাস-ভবনে। এখানে—কলিকাতার এই বিচিত্র আবেষ্টনীতে যে-গীতিকাকে নগণ্য মনে হয়, সেখানে সে-ই হইবে ঐশ্বর্য্য, মর্য্যাদা, এবং রূপের গরিমা—সব দিক্ দিয়াই অপূর্ব্ব এবং অননুকরণীয়।

কিন্তু, সেখানে থাকিতে হইলে প্রথমেই চাই একখানা মোটর—ঝাঝারি গোছের শব্দহীন একখানি মজবুত গাড়ী, তাহার স্বপ্ন-রঙ্গীন্ মনের কল্পনার মত যাহার অবাধ স্বচ্ছন্দ গতি—এমন একখানি গাড়ী। অনেক রং বাছিয়া-বাছিয়া সে টক্‌টকে লাল রংটিকেই পছন্দ করিল। কারণ, সে জানে, গীতিকা লাল রংটাই পছন্দ করে। তা ছাড়া, লাল-রংয়ের মধ্যে একটা আবেগের উদ্দামতা, চিরন্তন যৌবনের উচ্ছ্বাস!

•

মণীশ বলিল, গীতি, এই আমাদের বাড়ী, এই আমাদের ভিটে, যার মাটী, যার প্রত্যেক ইটখানি তোমার মধুর পরশটুকু পাবার জন্য এতকাল ধ্যান-স্তিমিত হয়ে অপেক্ষা করছিল।

নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল—কখনও মণীশের মুখের পানে, কখনও বা আশ-পাশের সব-কিছুর পানে। তাহার চোখে একটা স্বপ্নাচ্ছন্নতা, পাতলা গোলাপী ঠোঁট দু'খানিতে ছোট একটুখানি হাসির সুরভি মাখানো।

মস্ত বড় ড্রয়িং-রুম, তাহার পাশে লাইব্রেরী। দেয়াল-জোড়া বড়-বড় বুক-কেশে রাশি-রাশি বই ঠাসা, সোণার জলে নাম লেখা, ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত। মাঝখানে একটি টেব্‌ল্, চারি পাশে চেয়ার সাজানো। টেব্‌ল্-জোড়া একখানা বড় শ্বেত-পাথরের উপর ছোট-ছোট রকমারি আসবাব। ঝক্‌ঝকে পিতলের কাগজ-চাপা, ব্লটিং-প্যাড, দুইটা হরিণ, একটা ড্রাগন ইত্যাদি।

মণীশ বলিল, এই ঘরটিই আমার বাবার সব-চেয়ে প্রিয় ছিল, জানো গীতি! মা মারা যাবার পর থেকে এই লাইব্রেরীই হয়েছিল তাঁর প্রাণ। এমন কত দিন হয়েছে, পড়্‌তে-পড়্‌তে ঐ ইজিচেয়ার-খানিতে কখন্ ঘুমিয়ে পড়েছেন, একেবারে ভোর হয়ে গেছে। বলিতে-বলিতে মণীশের মুখের হাসিটুকুর পশ্চাতে কোথায় যেন একটুখানি মেঘের আভাস দেখা দিল।

গীতিকা টেবলের উপরকার ইংরাজী ও বাঙ্গালা মাসিকগুলি একবার নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। নূতন কয়খানির এখনো মোড়ক পর্য্যন্ত খোলা হয় নাই। গীতি বলিল, বাবা মারা যাবার পর থেকে এগুলো বুঝি আর কেউ খুলেও দেখেনি?

—কে খুল্‌বে বল! এত বড় বাড়ীর মধ্যে বাবা ত ছিলেন আমার একাই। বলিয়া সে মোড়কগুলি খুলিতে বসিল।

মুখে-চোখে উৎসাহের দীপ্তি ফুটাইয়া গীতিকা বলিল, এ ঘরখানাকে তুমি কিন্তু বন্ধ রেখো না তা ব'লে। এইখানে—বাবার এই আসনটিতে তুমি ব'সে পড়বে, আর আমি শুন্‌বো পাশের ঐ টুল্‌টিতে ব'সে।

মণীশ হাসিয়া বলিল, এতোগুলো চেয়ার থাক্‌তে শেষে ঐ টুল্‌টা ছাড়া এ-বাড়ীতে তোমার আর আসন জুটবে না, গীতি?

গীতি লজ্জায় পড়িয়া বলিল, য্যাঃ, তা কেন! ঐ টুল্‌টি বেশ, ঐ চেয়ারটির পাশেই বসানো, আর বেশ নীচু! ওতে বস্‌লে আমি তোমার মুখের সবটুকুই দেখ্‌তে পাবো।

বলিতে-বলিতে মণীশের মুখের পানে চাহিয়াই তাহার নিজের মুখখানি রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

উচ্চ হাসির সহিত মণীশ বলিল, ঐ টুলটাতে থাক্‌তো আমার বাবার গড়গড়াটি, এক হিসাবে সেইটিই ছিল তাঁর চিরসঙ্গী!

গীতিকা হাসিল—শিশুর মত প্রাণ খোলা হাসি! মণীশ মুগ্ধ হইয়া দেখিল। ঐ হাসির মধ্যেই নিহিত তাহার প্রণয়ের সবটুকু ইতিহাস। কলিকাতার ছাত্র-জীবনের মাঝখানে অনেকগুলি তরুণীর সহিত আলাপ করার সৌভাগ্য তাহার হইয়াছে, কিন্তু প্রায় সকলেরই ব্যবহারে কেমন-একটা পালিশ-করা ভদ্রতা, চোখে একটা ওজন-করা চাহনি, আর ঠোঁটে সেই একই ধরণের ধার-করা হাসি। কিন্তু এই মেয়েটির হাসিতে আছে কি যেন গভীর একটা প্রাণের মূর্চ্ছনা, মানুষের শিল্পসৃষ্টির বহু-পূর্ব্বের সে যেন কোন্ নির্ঝরিণীর কলগান!

মণীশ তাহাকে কাছে টানিয়া বলিল, গীতি, তোমার ঐ নামটিকে সার্থক করেছে একমাত্র তোমার হাসিটুকুই!

এ-ধরণের কথা গীতিকা তাহার মুখে আগেও শুনিয়াছে, তবু মধুরত্ব এতটুকু কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে অনেকখানি!

সেদিন রাত্রিতে আহারাদির পর গীতিকা বলিল, আজ কিন্তু এখুনি ঘুমিয়ে পড়্‌লে চল্‌বে না। আজ আমি অনেক গল্পের খোরাক জোগাড় ক'রে রেখেছি।

মণীশ বলিল, তার মানে, নীচে থেকে নতুন Strand খানা নিয়ে আসা হয়েছে ত?

গীতি বলিল, না গো না। আগে আমি বাঙ্গালাগুলো শেষ ক'রে তবে তোমার কাছে ইংরিজি মাসিকগুলো বুঝিয়ে নিয়ে পড়্‌বো'খ'ন।

—তবে?

—এ আর একটা জিনিষ, বলিয়া দেয়াল-আলমারির দরজা খুলিয়া ফ্রেমে-বাঁধা বড় ছবির মত কি-একটা বাহির করিল। তাহার পিছনদিক্‌টুকুই মণীশের চোখের উপর থাকায় সে কিসের ছবি বুঝিতে পারিল না এবং সেই কথাটাই জিজ্ঞাসা করিল। গীতিকা হাসিয়া বলিল, ছবি কেন? তোমাদের বংশের—কি বলে যে—

বলিয়া সে ফ্রেমখানা সোজা করিয়া ধরিতে মণীশ হাসিয়া বলিল,—ও! আমাদের বংশপঞ্জী!

গীতিকা বলিল,—নীচে ড্রয়িং-রুমে ছিল, তোমায় দেখাবো ব'লে আমি নিয়ে এসেছি। আচ্ছা, হ্যাঁ গো, এতে তোমার নাম নেই ত?

—না। ওটা আমার জন্মাবার আগেই তৈরী হয়েছিল—তখনকারই ছাপানো। বাবার নাম দেখতে পাওনি?

—পেয়েছি। এই—এই ত?

—হ্যাঁ।

গীতিকার নিষ্পলকদৃষ্টি সেই ফ্রেমে-বাঁধা বংশপঞ্জীর উপর হইতে যেন আর সরিতে চাহিল না।

মণীশ বলিল,—তা, এইটে নিয়ে বুঝি সারাটি রাত তুমি গল্প করবে ঠিক ক'রে বস্‌লে? আচ্ছা ছেলেমানুষ ত! রাখো, রাখো,—শোও—

গীতি কহিল, দাঁড়াও না! আচ্ছা, এঁরা তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ? এই নরেশ্বর, সীতারাম, চিরঞ্জীব?

—হ্যাঁ, পূর্ব্বপুরুষ বৈ কি!

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া গীতিকা একবার মুখ তুলিয়া বলিল, ভারি চমৎকার, না? এঁদের ছেলে হলেন এঁরা, আবার তাঁদের ছেলে এঁরা, আবার তাঁদের এঁরা—

মণীশ হাসিয়া ফেলিল।—হ্যাঁ গো পাগলী, হ্যাঁ, কুলজী-নামা মানেই যে তাই! ঠিক যেমন সেই ইস্কুলে প'ড়ে এসেছ, বাবরের ছেলে হুমায়ুন, তার ছেলে আকবর, তার ছেলে—

—জাহাঙ্গীর। হ্যাঁ, পড়েছি ত! আবার জাহাঙ্গীরের ছেলে সাজাহান, তার ছেলে ঔরংজীব, তার ছেলে —

—থাক্, আর বল্‌তে হবে না! এতেই পুরা নম্বর আমি তোমায় ফুল্-মার্ক দিলুম।...কিন্তু, বলি, রাত্রির এই দ্বিতীয় প্রহরটিতে কোথাকার কোন্ ভিন-মুল্লুকের মরা-লোকেদের নাম মুখস্থ করার কিছু কি সার্থকতা আছে, গীতি? জান্‌লা দিয়ে বাইরের পানে একবার চোখ মেলেছ কি? চাঁদের আলো যে আজ তোমার মনের নাগাল পাবার জন্যে বান ডাকিয়ে দিয়েছে চারিদিকে! চল, বাইরে বসি গে একটু!

ঘরের লাগাও খোলা ছাদ। সেখানে দুখানি বেতের ইজি-চেয়ার পাতা। গীতি বলিল, চেয়ারও রয়েছে দেখছি যে!

—নিশ্চয়! তুমি যেমন ঐ পুরোনো কুলজীনামাখানা

নিয়ে আজকের রাতটাকে সার্থক করবে ভেবেছিলে, আমারও তেমনি একটু কল্পনা ছিল বৈ কি! তাই চেয়ার-দুখানা আমিই আজ এখানে আনিয়ে রেখেছি।

—মা গো! এতও জানো তুমি!

ঘরের ভিতরের আলোটিকে অনেকখানি নামাইয়া দিয়া মণীশ তাহার চেয়ারখানি সরাইয়া একবারে গীতিকার চেয়ারের গায়ে-গায়ে বসিল। বলিল, কি ভাবছো বল ত?

গীতিকা বলিল,—আচ্ছা, তোমাদের বংশের ঐ যে সব-ওপরে নাম রয়েছে, তিনিও ত তা হ'লে ঐ বাবর হুমায়ুনের দিনকার লোক হ'তে পারেন?

মণীশ একবার হতাশার ভঙ্গীতে চেয়ারে হেলান দিয়া মুহূর্ত্তকাল চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। পরে উঠিয়া বসিয়া বলিল,—তার চেয়েও বরং পুরোনো লোক তিনি। বাবর-হুমায়ুনের সময়কার লোক ওর মধ্যে অনেক পাবে, হ্যাঁ, অনেক। এক জন আছেন, যিনি পাঠান শের সার হাতে বন্দী পর্য্যন্ত হয়েছিলেন।

—সত্যি? কৈ তাঁর নাম?

—তা তোমায় এখুনি বল্তে পারবো না। এতই যদি জান্বার সাধ হয়ে থাকে, কাল বলবো'খন! দেখ, দেখ, এমন চাঁদনীটুকু ঢেকে ফেল্বার জন্যে মেঘখানা কি-রকম ত্রস্ত ক'রে ছুটে আস্ছে। রাত্রে বোধ হয় বৃষ্টি হবে।

গীতি একবার আকাশের পানে তাকাইল, কিন্তু কিছুই বলিল না। পরে মণীশের দিকে ফিরিয়া বলিল,—কাল বল্বে ত তা হ'লে? আমার ভারী ভালো লাগবে কিন্তু, তোমাদের এই বংশাবলীর কথা। এত বড় বংশের একমাত্র বংশধর তুমি?

মণীশ কণ্ঠে বিরক্তির ঝাঁজ ঢালিয়া বলিল,—এ কি ভূতে পেলে তোমায় বল ত? তোমার মাথা থেকে কি ওটা নাম্বে না কিছুতেই?

গীতিকা ম্লানমুখে বলিল, তুমি রাগ করছো? তবে আর জিজ্ঞেস্ করবো না।

মণীশ দুই হাতে গীতির দুখানি হাত টানিয়া নিজের গলায় জড়াইয়া লইয়া বলিল, তাই ব'লে বুঝি অমনি মুখ শুকিয়ে বস্তে বলেছি তোমায়? আচ্ছা পাগ্‌লী ত!

অভিমানের সুরে গীতি বলিল, খালি-খালি তুমি পাগলই বল্‌ছো! কিছু ত করিনি আমি!

—তবে কথা বল্‌ছো না যে? তুমি কথা কও, আমি শুন্‌বো। ঠিক যেমন—ঐ শুন্‌ছো—কোথাকার ঐ পাখীটা আপনার মনে ডেকে যাচ্ছে, সমস্ত পৃথিবীটা তাই স্তব্ধ হয়ে শুনছে?

—পাখীটা নিশ্চয় পাগল হয়েছে। নইলে একঘেয়ে অমন ক'রে চেঁচাতে পারে?

—তা হোক্। তুমি অমনি পাগলের মতই কথা কও, গীতি! রাগ ক'রে চুপ ক'রে থেকো না। শুধু আজকের এমন রাত্রিতে—রঙ্গে-রঙ্গে বর্ত্তমানটা যেখানে আজ মধুময় হয়ে উঠেছে, সেখানে আর মরা-অতীতের অন্ধকারকে টেনে এনো না। আমাদের বংশাবলীর গৌরবের গল্প যদি শুন্‌তে চাও, শুনো কাল দিনের আলোয়, প্রকাণ্ড মোটা বই আছে লাইব্রেরীতে—

—বই? তোমাদের বংশের ইতিহাস বুঝি? সেই মোগলদের যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত? চমৎকার ত?

—ঐ! আবার তুমি মগগুল্ হ'তে সুরু করলে! আমি বল্‌ছি, চমৎকারিত্ব এতে কিছুমাত্র নেই। অতীত অতীতই; তার যা কিছু গৌরব থাক না কেন, সে কেবল ফাঁকা আত্মশ্লাঘা বই আর কিছুই নয়। আমি বর্ত্তমানের উপাসক।

—কাল সকালেই কিন্তু বইটা আমার চাই—

—দেবো; অবিশ্যি যদি বইখানা পেয়ে বইয়ের মালিককে শুদ্ধ মনে থেকে মুছে ফেলে না দাও।

—যাও, কি যে বল! আমি যে আজ শুধু অবাক্ হয়ে ভাবছি, তুমি কত বড়, সত্যি, কত বড়! তোমাকে জড়িয়ে আছে কত বড় গৌরব, কত বড় বংশমর্য্যাদা! এ সব যত ভাবছি, ততই যেন নিজেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছি।

—ঐ। আবার পাগ্‌লামী!

—পাগ্‌লামী বল্‌ছো? কিন্তু, সত্যি যে! তুমি না বুঝ্‌লেও আমি যে বুঝ্‌ছি আমার মনে-প্রাণে!

হতাশার নিশ্বাস ফেলিয়া মণীশ বলিল, না, তোমায় সত্যিই ভূতে পেয়েছে। চল, শোবে চল।...

বিছানায় মণীশের বুকে মাথা গুঁজিয়া গীতিকা শোনে, জ্যোৎস্নায়-ধোওয়া আকাশ মাতাইয়া সেই পাখীটার উদ্‌ভ্রান্ত কাকলী! কোন্ বহু—বহু দূরের অতীত হইতে ভাসিয়া আসা সে যেন কাহার আকুল ক্রন্দন!

কি-একটা জরুরী বৈষয়িক কাযে মণীশকে জেলায় যাইতে হইল। কথা ছিল, সকালে গিয়া সন্ধ্যাতেই ফিরিবার। কিন্তু সন্ধ্যার পূর্ব্বেই একখানা টেলিগ্রাম আসিয়া পৌঁছিল গীতিকার নামে। মণীশ লিখিয়াছে, হঠাৎ এক অনিবার্য্য কারণে ফিরিতে দুই দিন দেরী হইতে পারে। সাক্ষাতে সমস্ত জানাইবে।

গীতিকা টেলিগ্রামটি পড়িয়া মোটা বইখানার ভিতর গুঁজিয়া রাখিয়া আবার বইখানারই ভিতর ডুব দিল। আশ্চর্য্য বই! কত সুদীর্ঘ যুগের পর যুগ ব্যাপিয়া এই দত্ত-বংশের কাহিনী। কত কীর্ত্তি ইহাদের, কত বিরাট গৌরবময় অতীতের ইতিহাস!

পড়িতে-পড়িতে এক-একবার যেমন বই বন্ধ করিয়া ভাবিতে বসে, সে যেন তন্ময় হইয়া পড়ে। স্বামীর বংশ-গৌরবের একটা অস্পষ্ট বিপুলতা সুদূরস্থিত এক বিরাটকায় পর্ব্বতের মত তাহাকে বিহ্বল করিয়া তোলে। সে যেন কোন এক সম্পূর্ণ অপরিচিত রাজ্য—অপরিচিত বলিয়াই যেন তাহার মাদকতা এত বেশী। গীতিকা সব ভুলিয়া যায়, তার নিজের অস্তিত্বটুকু, এমন কি, তার স্বামীরও।

মণীশের পিসীমা হরসুন্দরী ঘরে ঢুকিয়া হাসিয়া বলিলেন, পাগ্‌লী মা আজ কি রূপকথার গল্প পেয়েছে গো, তাই একবারে সাড়াশব্দটি পর্য্যন্ত নেই।

গীতিকা চকিত হইয়া উঠিল। কোথাকার কোন্ রূপ-কথার দেশ হইতেই যেন এই মাত্র সে বাস্তবের মাটীতে ফিরিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি বইখানার পাতা মুড়িয়া বন্ধ করিয়া চোখ রগ্‌ড়াইতে-রগ্‌ড়াইতে হরসুন্দরীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, আপনার পূজোর জোগাড় আমি ক'রে রেখেছি, পিসীমা!

—তা জানি। আমার মা-টি যে কোন কাযে ভুল করবে না, সে-কথা আমার মনই আমায় ব'লে দিয়েছে। রঘুনাথজী কি আর যেমন-তেমন মেয়েকে এই দত্ত-বাড়ীর লক্ষ্মী ক'রে পাঠাতে পারেন, মা!

এই অতিরিক্ত আদরের কথায় গীতিকা যেন কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

হরসুন্দরী বলিলেন, কৈ, মণি ত এখনো ফিরলো না, মা!

ও-কথাটা গীতিকার মনেই ছিল না। বলিল, কেন, টেলিগ্রাম করেছেন ত, দুদিন এখন ফিরতে পারবেন না।

—দুদিন ফিরতে পারবে না? ও মা, কি হবে!

গীতিকার মনে হইল, পিসীমা তাহারই কথা ভাবিতে-ছেন। তাড়াতাড়ি সে বলিল, কি আবার হবে! বলিয়াই কিন্তু নিজেরই ভিতর বেশ-একটু লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া গেল এবং সেটুকু কাটাইতে গিয়া বলিল,—আপনার পূজো হয়ে গেছে, পিসীমা?

—হ্যাঁ মা, হয়েছে। রঘুনাথজীর আরতিও আরম্ভ হ'লো ব'লে। চল, যাবে না?

—যাবো বৈ কি! চট্ ক'রে কাপড় প'রে তৈরী হয়েই আমি আপনার ঘরে যাচ্ছি, আপনি চলুন।

একটু পরেই একখানি লাল বেনারসী শাড়ী পরিয়া গীতিকা যখন হরসুন্দরীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল, হরসুন্দরী যেন তাঁহার চোখদুটিকে আর ফিরাইতে পারিলেন না। সস্মিতদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে বুঝি বা চোখের পাতাদুটি একবার ভিজিয়া আসিল। ধরা-গলায় বলিলেন,—চল মা, যাই।

মন্দিরের পূজারী বৃদ্ধ ঘোষাল-ঠাকুর গীতিকাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে একটু সরিয়া বসিলেন। গীতিকা দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একান্ত নিবিষ্টমনে রঘুনাথজীর আরতি দেখিল এবং কি-একটা অব্যক্ত তন্ময়তার মধ্য দিয়াই সে বাড়ীর দিকে ফিরিল।

হরসুন্দরী বলিলেন, আজ তোমাকে দেখে অনেক দিন আগের আর একটি বউকে মনে প'ড়ে গেল, বৌমা! ঠিক অমনি একখানি লাল বেনারসী প'রে তোমার শাশুড়ী যেতো আরতি দেখতে। সে দিন এই দত্ত-বাড়ীতে যে সৌভাগ্য—যে আনন্দ ছিল, বহুদিনের পর মনে হচ্ছে, আজ তা ফিরে এসেছে। আজ মনে হ'লো, রঘুনাথজীর মুখেও একটা হাসির জ্যোতি ফুটেছে। বৌ মারা যাবার পর থেকে এ হাসি আমি ঠাকুরের মুখে এক দিনও দেখিনি, আজ দেখলুম।

সারা অন্তর জুড়িয়া কি-জানি কিসের এক আচ্ছন্নতা লইয়া গীতিকা একা বিছানায় চুপটি করিয়া পড়িয়া রহিল; মণীশের কথা মনে পড়িল, কিন্তু সে চিন্তা যেন নগণ্য। মনে পড়ে, তাহার স্বামীর এই ঘর, এই বাড়ী,—যে-বাড়ীর প্রতি গৃহ-কোণে, চত্বরে, আঙ্গিনায় লুকাইয়া আছে—ছড়াইয়া আছে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তিকাহিনী! মনে পড়ে, ঐ

কুল-দেবতা রঘুনাথজী—সুদীর্ঘ পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া যিনি এই বংশের মঙ্গলসাধন করিয়া আসিতেছেন। ইহাদের কাছে মণীশ যেন বিন্দুর মত কোথায় মিলাইয়া যায়। শুধু অপূর্ব্ব এক বেদনা-ময় অনুভূতির সঙ্গে মনে জাগে যে, এই বংশের গৃহিণী সে; এ-বংশের বর্ত্তমান এবং অতীতের সব-কিছুই এখন যেন তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চায়—সার্থক হইতে চায়। এ-চিন্তায় হৃদয় আনন্দে স্ফীত হইবারই কথা, কিন্তু গীতির মুখে আনন্দ আসে না। কেন? কেন সে শঙ্কিত—কুণ্ঠিত হইয়া উঠে? কেন মনে হয়, এ-বাড়ীর সহিত তাহার সত্যকার কোন সম্বন্ধ নাই—কোন সম্বন্ধই থাকিতে পারে না! ঝোঁকের বশে তাহাকে এই দুঃসহ গৌরবের আসনে টানিয়া বসাইয়া দেওয়া—এ যেন নিতান্তই একটা ছেলেখেলা বই আর কিছুই নয়।

অন্ধকারে বিছানার অপরার্দ্ধে হাত বাড়াইয়া সে কাহার যেন একটু স্পর্শ চায়, কিন্তু মণীশের যায়গা শূন্য। তাহার মাথার বালিশটির উপর একবার সন্তর্পণে হাত বুলাইয়া আবার হাতখানি গুটাইয়া আনিল। মণীশ আজ কাছে নাই। দুদিন আসিবে না। সুদীর্ঘ দুইটা দিন এবং রাত্রি! তাহাকে কাছে-না-পাওয়ায় যে কি গভীর বেদনা, গীতি তাহা অনুভব করিতে সুরু করিয়াছে। মণীশকে বাদ দিয়া এ-বাড়ীর যা-কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে সে যে কোনোমতেই হৃদয়ের সঙ্গে বরণ করিতে পারে না! বর্ত্তমানের সবটুকু মাধুর্য্যকে নিঃশেষ করিয়া যাহা থাকে, তাহা যে শুধু অতীতের রুক্ষ গৌরব, যাহা গীতিকাকে অভিনন্দন করে না, নিরন্তর শাসনের দৃষ্টিতে তাহার চোখো-চোখি চাহিয়াই থাকে!

জানালার বাহিরে বাগানের লীচু-গাছটার পাতায়-পাতায় চূর্ণ জ্যোৎস্নাগুলি নাচিয়া-নাচিয়া খেলা করিতেছে। দুইটা পেঁচা সম্মুখের ঐ উঁচু ডালটার উপর বসিয়া আছে।

পেঁচাকে তাহার বড় ভয় করে। যে পুরাণো বাড়ী, কে জানে, নীচের কোনো ঘরে হয় ত রাশি-রাশি পেঁচা বাসা বাঁধিয়া আছে। গীতিকা উঠিয়া জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল।

ঘর-জোড়া অতরল জমাট অন্ধকার। এই বিপুল অন্ধকার-রাশির মধ্যে গীতিকা একা! বান্ধবহীনা—সহায়-হীনা—এই অন্ধকার কারাগৃহের বন্দিনী বুঝি সে!

পরের দিন দুপুরের ট্রেণেই মণীশ ফিরিয়া আসিল। গীতি অনুযোগের কণ্ঠে বলিল, বেশ মানুষ যা-হোক!

মণীশ হাসিয়া বলিল, সত্যি, কাল সারাটা রাত ঘুমুতে পারিনি। ডাক-বাংলোর সেই ঘরে—চারদিক্ ভোঁ-ভোঁ কর্‌ছে, শুয়ে-শুয়ে কেবলি মনে হয়েছে, তুমি হয় ত একা কি যে কর্‌ছো! বল না, সত্যি খুব কষ্ট হয়েছিল?

গীতিকা নীরবে স্বামীর হাত দু'খানা লইয়া নাড়িতে লাগিল এবং আস্তে-আস্তে সে-দুটি লইয়া নিজের দুই গালের উপর রাখিল। তার পর যখন স্বামীর চোখের উপর চোখ তুলিল, তখন সেই শান্ত নীলাকাশে বর্ষা নামিবার উপক্রম হইয়াছে।

মণীশ তাহাকে বুকে টানিয়া বলিল, কি হয়েছে, গীতি?

চোখের জলে স্বামীর বুক ভিজাইয়া গীতি বলিল, তুমি এ-বাড়ীতে এমন ক'রে আমায় ছেড়ে যেও না! আমার ভারী ভয় করে।

কয়দিন ধরিয়া গীতিকাকে ভারী অন্যমনস্ক দেখাইতেছে। যে-হাসিটুকু তাহার অস্তিত্বের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়ানো ছিল, যাহাকে বাদ দিয়া মণীশ তাহার গীতিকাকে কল্পনাও করিতে পারিত না, সে-হাসি কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়াছে। কোথাকার নিষ্ঠুর বাতাসে ফুলের সবটুকু সুরভি হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, আছে শুধু তাহার রং, প্রাণহীন, উদ্দীপনাহীন নিশ্চেতন একটা শুভ্রতা!

মণীশ অনুযোগ করে, বিরক্ত হয়। গীতি একবার হাসিবার চেষ্টা করে। মণীশের মনে হয়, সে-হাসিতে তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিতেছে।

মণীশ বলিল, তোমার এখানে ভাল লাগছে না, নয়?

গীতি আস্তে-আস্তে বলিল, চল না, আবার আমরা কল্‌কাতা যাই!

মণীশ মৃদু বিরক্তির স্বরে বলিল, তুমি সত্যিই একটা পাগল! পূর্ব্বপুরুষের বাড়ী-ঘর ছেড়ে কল্‌কাতায় প'ড়ে থাক্‌লে কি চলে?

গীতি তাড়াতাড়ি বলিল, তাই কি বল্‌ছি আমি?

মনীশের মনে সম্ভব-অসম্ভব নানা-রকমের কল্পনা জাগিয়া তাহাকে সন্দিগ্ধ করিয়া তুলিল। সে-দিন বৈকালে সে বলিল, চল, একটু বেড়িয়ে আসি, গীতি!

গীতিকে পাশে বসাইয়া মণীশ মোটর চালাইয়া দিল। সারা রাস্তাটা অসংলগ্ন দু-চারিটা কথা ছাড়া দু'জনেই চুপচাপ রহিল।

সম্মুখেই মস্ত বড় একটা বাগান। মণীশ গাড়ী থামাইয়া বলিল, চল, বাগান দিয়ে ঘুরে আসি একটু!

চলিতে-চলিতে গীতিকা বলিল, কাদের বাগান?

মণীশ বলিল, আমাদেরই। এক দিন এখানে বাড়ীও ছিল, সে-বাড়ী আজ ভগ্নস্তূপ হয়ে প'ড়ে আছে। আমার কোন এক পূর্ব্বপুরুষের নিজের হাতে তৈরী এই বাগান।

নানারকমের গাছ শ্রেণীবদ্ধ প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া; বেলা-শেষের উতল বসন্ত-বাতাসে কচি-পাতার চামর দোলাইয়া যেন এই দম্পতিকে অভিনন্দন করিতেছে। গীতিকা মুগ্ধের মত দেখিতে-দেখিতে চলিল। মণীশ তাহার একখানি হাত টানিয়া লইয়া বলিল, ভালো লাগছে এখানটা?

গীতিকা বলিল, চমৎকার! তোমাদের ঐ বাড়ীর চেয়ে এখানটা অনেক ভালো।

মণীশ বলিল,—ঐ যে গাছগুলো দেখ্‌ছো, ও-গুলো মেহগনির গাছ। আরো অনেক ছিল। আমাদের বাড়ীর যা-কিছু কাঠের আস্‌বাব, সবই এই বাগানের গাছ থেকেই তৈরী করা।

গীতিকা বিস্ফারিত চোখে মণীশের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। বুকের মধ্যে কিন্তু কোথায় যেন কি একটা কাঁটার মত বিঁধিয়া উঠিল। এখানেও ত সেই বংশ-গরিমা! সেই সু-মহান্ অতীতের রুক্ষ কঠোর দৃষ্টি!

গীতিকার চোখে-মুখে একটা নিষ্প্রাণ নৈরাশ্য জমাট বাঁধিয়া আসিল। তাহার সহিত চোখোচোখি চাহিতে গিয়া মণীশ মুখ ফিরাইয়া লইল।

সম্মুখে অনেকগুলা ঝাউগাছ দুই দিকে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া। বাতাসের সহিত ঝাউয়ের কেশরগুলির কি নিরবচ্ছিন্ন আলাপ চলিয়াছে! তাহাদের চেহারায় যেমন একটা দুর্ভেদ্য গাম্ভীর্য্য, ঐ অব্যক্ত গুঞ্জরণেও যেন তেমনি একটা বিগত-যুগের গৌরব-গাথা, বর্ত্তমানের সঙ্গে যেন তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।

দুই জনে আসিয়া সবুজ ঘাসের উপর বসিল। মাথার উপর একটা প্রকাণ্ড পুষ্পিত শিরীষগাছ, আর তাহার গা বাহিয়া কি-একটা শীর্ণ বনলতা তাহার পত্রপুষ্পের সৌন্দর্য্য লইয়া তাহাকে বেষ্টন করিবার চেষ্টা করিয়াও যেন পারিতেছে না। রক্তাভ হলুদরঙের অনেকগুলি ফুল ঘাসের উপর ঝরিয়া-ঝরিয়া শুকাইয়া গিয়াছে।

গীতিকা জিজ্ঞাসা করিল, এটা কি গাছ?

কথা কহিবার একটা সুযোগ পাইয়া মণীশ বেশ-একটু উৎসাহের সঙ্গেই বলিল,—এ-গাছ জানো না? সেই কোন্ প্রাচীন যুগের সংস্কৃত কবি থেকে আরম্ভ ক'রে আজকের কবিরা পর্য্যন্ত এই শিরীষ-কুসুমের গুণকীর্ত্তন ক'রে আসছে যে।

ঘাসের উপর হইতে একটা ঝরাফুল কুড়াইয়া লইয়া গীতিকা বলিল, আর এই লতা?

মণীশ বলিল, কে জানে, এর নাম আমি জানি না, এ ফুলও কখনও দেখেছি ব'লে ত মনে হয় না।

গীতিকা করুণনেত্রে সেই বনলতাটির পানে চাহিয়া চাহিয়া একটা সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস চাপিবার চেষ্টা করিয়াও পারিল না হাতের ফুলটা তাহার দুইটা আঙ্গুলের চাপে নিষ্পীড়িত হইয়া গেল।

কি এক অজানা রুক্ষতায় মণীশের সমস্ত মুখখানা কালী হইয়া উঠিল। সে হঠাৎ গীতিকার একখানা হাতে ঝাঁকানি দিয়া বলিল, কি ভাবছো তুমি বল ত? বল, বলতেই হবে! দিনের পর দিন এম্‌নি ক'রে আমাকে পীড়ন করবার তোমার কোনও অধিকার নেই।

গীতিকা চমকিয়া উঠিল। মুখে হাসি টানিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, কি ভাবছো?

মণীশের কণ্ঠস্বর দৃপ্ত হইয়া উঠিল।

—আবার ঐ ছল। পরে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমার কি মনে হয় জানো?

গীতি শান্তকণ্ঠে বলিতে গেল, কি?

—মনে হয়, আমার সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় তুমি সত্যিকার সুখী হ'তে পার নি। তোমার মন যাকে চেয়েছিল, আমি শুধু জোর ক'রে তার কাছ থেকে তোমায় ছিনিয়ে নিয়ে এসেছি।

—কে সে?

—সেই সুখেন। নয় কি?

গীতিকা নিরুত্তর এবং নিশ্চল। বুঝি বা তাহার নিশ্বাসের শক্তিটুকুও দেহ হইতে বিদায় লইয়াছিল। কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্যই। হঠাৎ সে একটা ঝড়ের মত নিশ্বাস

ছাড়িয়া বলিল,—ঠিক তা না হ'লেও আজ আমারও মনে হয়, সেখানেই বিয়ে হওয়া হয় ত উচিত ছিল আমার।

স্তম্ভিত মণীশের নিষ্পলক স্থিরদৃষ্টি গীতিকার মুখের উপর নিবদ্ধ। সে-দৃষ্টি গীতিকা সহ্য করিতে পারিল না। নতমুখে সে ধীরে ধীরে বলিল, কেন না, তারও গৌরব করবার কিছু ছিল না—তার একশো টাকার চাকুরিটি ছাড়া। বাপ-মায়ের পরিচয়টুকু হয় ত তার আছে, আমার কিন্তু তাও নেই।

রুদ্ধনিশ্বাসে মণীশ বলিল, কি বল্‌ছো গীতি ?

গীতিকা মুখ তুলিয়া বলিল, সত্যি বল্‌ছি। কেন আন্‌লে তোমাদের এই বিরাট আভিজাত্যের দুর্গের মধ্যে এমন একটা মেয়েকে—যার অতীত বলে কোনও-কিছু ত নেইই, বাপ-মায়ের পরিচয়টুকু পর্য্যন্ত যে জানে না ? যাঁদেরকে আমি বাবা-মা বলি, তাঁরা শুধু আমায় পালনই করেছেন। পথের পাশ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া একটা মেয়েকে তাঁরা তাঁদের সমস্ত স্নেহের রস দিয়ে প্রাণ দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন, ভবিষ্যতের সম্ভাবনা দিয়েছেন, কিন্তু তার অতীতের চির-শূন্য গহ্বরকে পূরণ করতে পারেন-নি। সেই শূন্যতা আমাকে দিন-রাত রাক্ষসের মত গিল্‌তে আস্‌ছে যে! বিশেষ ক'রে তোমাদের এই বাড়ীতে এসে!

মণীশ অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিল না। তার পর ধীরে-ধীরে বলিল,—এ-কথা সবাই জানে ?

—কেউ না। কেবল আমি আর বাবা-মা জানেন। আমায় ছাড়া আর কাউকেই তাঁরা জানান নি, কারণ, আমি মেয়ে হয়ে জন্মেছি, আমার ভবিষ্যৎকে গ'ড়ে তোল্‌বার দায়িত্বটাই তাঁরা সব চেয়ে বড় ক'রে দেখেছেন।

মুখে-চোখে এক অদ্ভূত হাসির উচ্ছ্বাস তুলিয়া গীতিকা কোলের উপর মণীশের হাতখানি টানিয়া লইয়া বলিল, সত্যিই কি এখন তোমার মনে হচ্ছে না যে, আমার বিয়ে হওয়া উচিত ছিল সেই সুখেনের সঙ্গেই ?

মণীশ বলিল,—আবার পাগ্‌লামী সুরু হ'লো বুঝি ? গীতি! অনেক আগেই এক দিন বলেছি না, আমি অতীতের মানুষ নই, বর্ত্তমানের উপাসক আমি!

অস্ফুটকণ্ঠে গীতি বলিল, আমিও ত ছিলুম না কোনও দিন, কিন্তু আজ হয়েছি। এখানে এসে অবধি অতীত আমাকে সত্যি-সত্যিই ভূতের মত, পেয়ে বসেছে যে! কেবলই মনে হয়, যার অতীত ব'লে কোনও কিছু নেই, নাম-হীন, পরিচয়-হীন সে হতভাগ্যের বাঁচবার অধিকারটুকুও বুঝি এ-সংসারে থাকা উচিত নয়।

বলিতে-বলিতে সে একবার উপর-দিকে দৃষ্টি তুলিয়া বলিল, তাই ত থেকে-থেকে কেবলই মনে হচ্ছে, আমার অবস্থাটা ঠিক ঐ নামহীন লতাটার মতই!

মণীশ তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া বলিল, হয়েছে গো হয়েছে। চল, বাড়ী যাই।

নিজের মনেই মণীশ সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কোন কথা বলে নাই, এমন কি, গীতিকাকেও না। গোপনে-গোপনে কলিকাতার এক বন্ধুকে চিঠি লিখিয়াছে, সহরতলীর দিকে একখানি ছোট-খাট ফাঁকা বাড়ীর সন্ধান করিবার জন্য।

মাঝে-মাঝে একবার অনির্দ্দিষ্ট ব্যথার মত মনে জাগে, পুরুষ-পরম্পরার অধিকৃত এই বাড়ী-ঘর ছাড়িয়া দেশত্যাগীর মত চলিয়া যাওয়া—একবার যেন অতি-ক্ষীণ আশঙ্কার মত মনে হয়, প্রথম-যৌবনের খেয়ালের বশে হঠাৎ এই বিবাহ করিয়াছে বলিয়াই কি এমনই করিয়া তার শাস্তি-পর্ব্ব সুরু হইয়া গেল ? তখনই আবার দুই হাত দিয়া সমস্ত দুর্ব্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া নিজের মনকে বলে, অসম্ভব—অসম্ভব। গীতিকে বিবাহ করাতে ভুল সে এতটুকু করে নাই! নাই বা থাকিল তাহার আভিজাত্য, তাহার বংশ-পরিচয়। তাহার মূল্য দিবে সে শুধু তাহাকেই দেখিয়া, অতীতের মিথ্যা মোহ তাহার সরল সহজ দৃষ্টিটুকুকে বিকৃত করিতে পারিবে না।

হ্যাঁ, গীতির জন্য সে সব-কিছুই করিতে পারে এবং করিবেও। পিতৃপুরুষের ভিটা ছাড়িয়া এমন একটি যায়গায় নীড় রচনা করিবে, যেখানে গীতিকা নিশ্চিন্ত আরামে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিতে পারে, যেখানে পরস্পরের চোখের সম্মুখে চিরস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মত জ্বলিবে শুধু পরস্পরের সত্তাটুকু, আর কিছু নয়—কিছু নয়।

মাস দুই কাটিয়াছে।

সে-দিন সন্ধ্যায় রঘুনাথজীর মন্দির হইতে ফিরিয়া গীতিকা একবারে তাহার শয়ন-ঘরে ঢুকিল।

অন্ধকারে মণীশ একা খোলা জানালাটির সম্মুখে একখানি ইজিচেয়ারে পড়িয়া আছে।

গীতিকা বলিল, অন্ধকারে একলাটি ব'সে আছ, আলো দিয়ে যায় নি?

—কৈ, না।

গীতিকা আলো জ্বালিয়া আনিল। মণীশ দেখিল, তাহার পরনে টক্‌টকে লাল বেনারসী সাড়ীখানি, দেবতার প্রণামান্তে তাহার আঁচলটুকু এখনও তেমনই গলায় জড়ানো রহিয়াছে। সারা দেহে সজীবতার একটা অপূর্ব্ব সুষমা লীলায়িত। সর্ব্বোপরি তাহার মুখে একটা অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তির হাসি। আজ বহুদিন যাবৎ এই হাসি নির্ব্বাসিত হইয়াছিল।

মণীশের চমক লাগিয়া গেল; বলিল, আজ মুখে হাসি যে বড়?

গীতি একেবারে ইজিচেয়ারের হাতলের উপর বসিয়া বলিল, কি ভাবছো বল না গো?

মণীশ বলিল, ভাবছি অনেক কথা। দমদমা অঞ্চলে একখানা ভাল বাড়ীর দরদস্তর প্রায় সব শেষ হয়েছিল, কিন্তু শেষরক্ষা হ'ল না।

গীতিকা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, দমদমায় বাড়ী কিন্‌বে?

—না, ঠিক দমদমায় না হ'লেও ঐ রকমই কাছাকাছি কোথাও বটে, যেখানে তোমার পছন্দ হয়।

গীতিকা এবার চুপ করিয়া গেল। শরতের উজ্জ্বল আকাশ একটা আকস্মিক মেঘে আঁধার হইয়া আসিল। মণীশের হাতের মধ্যে তাহার পাতলা আঙ্গুলগুলি একবার যেন কাঁপিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পরে সে আস্তে-আস্তে বলিল,—কিন্তু আমার ত কোথাও যাওয়া চলবে না। এখান থেকে চ'লে গেলে রঘুনাথজী আমায় ক্ষমা করবেন না যে!

মণীশ অবাক্ হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

একটু যেন ইতস্ততঃ করিয়া গীতিকা বলিল,—আজ মন্দিরে ঘোষালঠাকুরের মুখে রঘুনাথজীর আশীর্ব্বাদ আমি শুন্‌তে পেয়েছি।

পরে যেন জোর করিয়া সব সঙ্কোচ ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিল, আর ত আমার কোন কিন্তু নেই। আমার অতীতের শূন্যতা ভ'রে উঠতে চলেছে আমার ভবিষ্যতের উজ্জ্বল গৌরবে। সে দিন তোমাদের ঐ বংশপঞ্জীখানাকে মনে হয়েছিল ছিঁড়ে ফেলে দিই টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে,—ভাগ্যিস্ দিইনি! আমার একটি কথা কিন্তু ব'লে রাখছি তোমায়—

—কি গীতি?

—কিছু ত বলা যায় না, যদিই আমার কিছু হয়, তা হ'লে বংশপঞ্জীর তলায় তোমার নামটি লিখে দিও, আর তার তলায় দিও তার নাম, যে আস্‌ছে আমার গৌরবের বার্ত্তাটুকু নিয়ে। এ-বাড়ীর কেউ যেন না ভুলতে পারে যে, এই দত্তবংশের বংশধরের মা ছিলুম আমি!

মণীশের মনে হইল, কি এক আচ্ছন্নতার মধ্য দিয়াই গীতির কথাগুলি উচ্চারিত হইতেছে। সে তাহার গায়ে ঠেলা দিয়া বলিল,—আঃ, কি সব বক্‌ছো বল ত, গীতি?

গীতিকার মুখে-চোখে একটা অনির্ব্বচনীয় হাসি! মণীশের মনে হইল, অশ্রুর সাগর মথিত করিয়া ঐ হাসির কমল বুঝি ফুটিয়া উঠিল!

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল।

আমরা ঘুমায়ে থাকি

আমরা ঘুমায়ে থাকি—
নিথর রজনী তন্দ্রা-মগন স্বপন মমতা মাখি'
আমরা ঘুমায়ে থাকি।

বাহিরে জ্যোছনা ঝ'রে শুধু ঝরে
ক্লান্তি-বিহীন নীরব অঝোরে—
সিন্ধুর কোল শুধু উতরোল
কারে যেন ডাকি ডাকি।

বিভাবরী জাগে আকাশের চাঁদ সে কাহার অনুরাগে
তারি ইশারায় দোলন-চাঁপার নবীন কলিটি জাগে।

প্রথম প্রেমের প্রথম যে ব্যথা
জেগে রয় আজো তারি ব্যাকুলতা
দূর হ'তে দূরে কোথা যায় উড়ে
মুশাফির এক পাখী—
আমরা ঘুমায়ে থাকি

শ্রীসুবোধ দাশগুপ্ত।



বিধবা-বিবাহ*

চৈত্রের মাসিক বসুমতীতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথা" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, 'বঙ্গদেশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, আতুর ও দরিদ্রের বন্ধু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম সকলেরই নিকট সুপরিচিত। এই কোমল-হৃদয় পুরুষসিংহের বিধবা-বিবাহ সংস্কারের চেষ্টা তাঁহার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘটনা।" বিধবাগণ জীবনের অনেক ভোগসুখ হইতে বঞ্চিত থাকে, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে তাহাদের ইহজীবনের ভোগসুখ বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টা "শ্রেষ্ঠ" বলিয়া প্রতীত হওয়াই স্বাভাবিক। তবে সন্দেহ হইতে পারে যে, বিধবাদের বিবাহ দিলে যদি তাহাদের সুখ-বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ ইহা স্পষ্টভাবে নিষেধ করিলেন কেন? বিধবাগণ সুখী হউক, ইহা কি তাঁহাদের ইচ্ছা নয়? এমন প্রকৃত হিন্দু খুব কম আছেন, যাহারা শাস্ত্রকারগণকে এরূপ নীচাশয় মনে করিবেন। তাহা হইলে এ প্রশ্নের উত্তর কি?

এই প্রশ্নের উত্তর নিম্নলিখিত বেদবাক্যে পাওয়া যাইবে, "যৎ কিঞ্চ মনুঃ অবদৎ তৎ ভেষজম্" (ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ), মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা ঔষধের ন্যায় হিতকর। ঔষধ তিক্ত, মনুর ব্যবস্থাও কষ্টকর; কুপথ্য মুখরোচক —মনুর বিরোধী ভোগের ব্যবস্থা আপাত-সুখকর। বিধবা সুখী হউক, ইহা মনুরও অভিপ্রেত। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি কেবলমাত্র ইহলোকে আবদ্ধ নহে। তিনি যোগদৃষ্টিতে বিধবার পূর্ব্বজন্ম, ইহজন্ম, পরজন্ম সকল দেখিতে পাইতেছেন। এই রমণী কেন বিধবা হইল? ইহার বৈধব্য কি একটা অহেতুক আকস্মিক ঘটনা? তাহা হইলে কি জগতের প্রত্যেক ব্যাপারের নিয়ামক পরমকারুণিক সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর নাই? না, তাহা হইতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তি ইহজন্মে বা পূর্ব্বজন্মে যে কর্ম্ম করে, তাহার ফল ভোগ করে। যিনি বিধবা হইয়াছেন, তিনি পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলে বিধবা হইয়াছেন, কর্ম্মফলেই বৈধব্য-দুঃখরূপ রোগের আবির্ভাব হয়। সে রোগের চিকিৎসা কি? মহর্ষি মনু দিব্যদৃষ্টিতে দেখিলেন, এই রোগের চিকিৎসা ব্রহ্মচর্য্য। আরও দেখিলেন, ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া মৃত্যুর পর রমণী দীর্ঘকাল স্বামীর সহিত সুখে বাস করিতেছে, রোগ সারিয়া গিয়াছে, আর দুঃখ নাই। আরও দেখিলেন, যে রমণী ব্রহ্মচর্য্য পালন করিল না, পুনরায় বিবাহ করিল, তাহার মৃত্যুর পর পুনরায় দুঃখ, অনেক সময় ইহজীবনেই দুঃখ। রোগের উপর কুপথ্য হইয়াছে।

রোগের কারণ নির্ণয় করিয়া যিনি ব্যবস্থা করেন, তিনিই বিচক্ষণ চিকিৎসক। রোগীর দেহ উত্তপ্ত হইয়াছে বলিয়া যিনি শীতল জল প্রয়োগ করিতে বলিবেন, তিনি কোমলহৃদয় হইতে পারেন, কিন্তু উত্তম চিকিৎসক নহেন। বিধবার স্বামী মারা গিয়াছে, তাহাকে অন্য স্বামী দাও, যিনি এরূপ ব্যবস্থা দেন, তিনিও কোমলহৃদয় সন্দেহ নাই, কিন্তু বিধবার কতদূর উপকার করিলেন, তাহা সন্দেহ।

প্রশ্ন হইবে, পুরুষের যখন স্ত্রী মারা যায়, তখন তাহার ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা দেওয়া হয় না কেন? ইহার উত্তর এই যে, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যে কর্ত্তব্য, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য তাহার সমান নহে। কেবল হিন্দুধর্ম্মে নহে, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মেও স্বামীর কর্ত্তব্য এবং স্ত্রীর কর্ত্তব্য সমান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় না। স্বামীর আদেশ পালন করা স্ত্রীর কর্ত্তব্য, কিন্তু কোনও ধর্ম্মেই বলে না যে, স্ত্রীর আদেশ পালন করা স্বামীর কর্ত্তব্য। অবশ্য, ইহার অর্থ নয় যে, স্বামী স্ত্রীর উপর অত্যাচার করিবে। স্বামী অবশ্য স্ত্রীকে আদর-যত্ন করিবে, কিন্তু স্ত্রী যাহা বলিবে, তাহা উচিত কিম্বা অনুচিত, ইহা বিচার না করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করা স্বামীর কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু স্ত্রীর তাহাই কর্ত্তব্য। নচেৎ "Obey thy husband" স্বামীর আদেশ পালন করিবে, এই কথার কোনও অর্থ হয় না। ন্যায়সঙ্গত মনে হইলে সকলের বাক্যই গ্রহণ করা উচিত, তাহাকে আদেশ পালন করা বলে না। ন্যায় বা অন্যায় বিচার না করিয়া তদনুসারে কার্য্য করাকেই আদেশ পালন করা বলা যায়। "আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া"। গুরুর আজ্ঞা বিচার করা উচিত নহে। স্বামীর আজ্ঞা বিচার না করিয়া পালন করা স্ত্রীর উচিত কেন? কারণ, যেরূপ কর্ম্ম করিলে রমণী হইয়া জন্মিতে হয়, সেই কর্ম্মজনিত সংস্কার যাহার আছে, তাহার পক্ষে অন্যরূপ আচরণ অধর্ম্ম। রমণীজন্ম যে পুরুষজন্ম অপেক্ষা দুঃখকর, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা সামাজিক অত্যাচারের ফল নহে, ইহা প্রাকৃতিক ব্যবস্থা। এ সম্বন্ধে গর্ভধারণ এবং সন্তান-প্রসবের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। দুঃখবহুল রমণীজন্মের কারণও পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম। সেই কর্ম্ম ক্ষয় করিবার জন্য প্রয়োজন, অবিচারে স্বামীর আজ্ঞা পালন করা। পুরুষের পক্ষে স্ত্রীর আজ্ঞা পালন করিবার আবশ্যকতা নাই। পুরুষের কর্ম্ম ক্ষয় করিবার জন্য প্রয়োজন—শাস্ত্রের আদেশ পালন করা, পিতামাতার আজ্ঞা পালন করা, (যদিও মাতা রমণী)। পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম অনুসারেই জন্ম নির্দ্দিষ্ট হয়, পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতে হয়, এ জন্য জন্মের সহিত কর্ত্তব্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এ জন্যই হিন্দুশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের

কর্ত্তব্য বিভিন্ন, স্ত্রী ও পুরুষের কর্ত্তব্য বিভিন্ন, বিধবা ও বিপত্নীকের কর্ত্তব্য বিভিন্ন।

আপত্তি হইতে পারে, বিধবার বিবাহ শাস্ত্র-বিরোধী নহে, পরাশর তাহার ব্যবস্থা দিয়াছেন :—

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে বা পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।"

কিন্তু পরাশরের এই বাক্যে বিধবাবিবাহ সমর্থন করা যায় না। ধর্ম্মবিষয়ে হিন্দুর বেদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। কিন্তু বেদের বহু অংশ এক্ষণে লুপ্ত হইয়াছে। সেই সকল লুপ্ত অংশে যে সকল বিধি-নিষেধ ছিল, স্মৃতিবাক্যে তাহা রক্ষিত হইয়াছে। সকল স্মৃতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনুস্মৃতি, কারণ, বৈদিক ব্যবস্থা মনুর মধ্যে খুব বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় :—

"যঃ কশ্চিৎ কস্যচিৎ ধর্ম্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।
স সর্ব্বোঽভিহিতো বেদে সর্ব্বজ্ঞানময়ো হি সঃ॥"

মনু যাহার যে ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন, সে সকল ধর্ম্ম বেদে উক্ত হইয়াছে, কারণ, বেদ সর্ব্বজ্ঞানময়। এই জন্যই বলা হইয়াছে—

"মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।"

যে স্মৃতি মনুর অর্থের বিরোধী, তাহাকে প্রশংসা করা যায় না।

মনু খুব স্পষ্টভাবে বিধবাবিবাহের নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ।"

"বিবাহবিধিতে বিধবার পুনরায় বিবাহ কোথাও উক্ত হয় নাই।"

যদি বেদে বিধবাবিবাহের বিধি থাকিত, তাহা হইলে মনু এ কথা বলিতে পারিতেন না।

মনু পুনরায় বলিয়াছেন,—

"ন চ নামাপি গৃহ্ণীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য চ।"

"পতির মৃত্যু হইলে অপরের নামও গ্রহণ করিবে না।"

কেবল মনু নহেন, যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, গৌতম, ব্যাস প্রভৃতি প্রধান স্মৃতিকারগণও এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন যে,—যে কন্যার পূর্ব্বে বিবাহ হয় নাই, তাহারই বিবাহ হইতে পারে। যথা, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

"অনন্যপূর্ব্বিকাং কান্তাম্ অসপিণ্ডাং যবীয়সীম্।"

"যাহার পূর্ব্বে বিবাহ হয় নাই, যে কমনীয়, সপিণ্ড নহে এবং বয়ঃকনিষ্ঠ" এরূপ কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে।

বশিষ্ঠ বলিয়াছেন :—

"অসমানার্ষীম্ অস্পৃষ্টমৈথুনাম্ যবীয়সীং সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেৎ।"

"যাহার সমান গোত্র, প্রবর নহে, যে মৈথুন দ্বারা স্পৃষ্ট হয় নাই, যে বয়ঃকনিষ্ঠ, এবং যে অনুরূপ, এরূপ ভার্য্যা গ্রহণ করিবে।"

গৌতম বলিয়াছেন, —"গৃহস্থঃ সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেত অনন্যপূর্ব্বাং যবীয়সীং" অর্থাৎ গৃহস্থ সদৃশী ভার্য্যা বিবাহ করিবে, যাহার পূর্ব্বে বিবাহ হয় নাই এবং যে বয়ঃকনিষ্ঠ।

ব্যাস বলিয়াছেন,

"সবর্ণামসমানার্ষীম্ অমাতৃপিতৃগোত্রজাম্।
অন্যপূর্ব্বিকাং লঘ্বীং শুভলক্ষণসংযুতাম্॥"

"স্বজাতীয়, বিভিন্ন প্রবরের, মাতা ও পিতার গোত্র ভিন্ন অন্য গোত্রীয়, যাহার পূর্ব্বে বিবাহ হয় নাই, যে লঘু এবং শুভলক্ষণ-সংযুক্ত।"

পরাশরের পূর্ব্বোক্ত বাক্যটির অর্থ যদি এই হয় যে, বিধবার পুনরায় বিবাহ হইতে পারে,—তাহা হইলে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস, বশিষ্ঠ, গৌতমের এই সকল বাক্য মিথ্যা হইয়া যায়। এজন্য বাধ্য হইয়া বিচার করিতে হয়, পরাশরবাক্যের অন্য কি অর্থ হইতে পারে। এই সমস্যা পূরণ করিবার জন্য বলা হইয়াছে যে, পরাশরের ঐ বাক্যে পতি শব্দের অর্থ বিবাহিত পতি নহে, বাগ্‌দত্ত পতি, পূর্ব্বে বাগ্‌দানক্রিয়া বৈদিকমন্ত্র পাঠ করিয়া করা হইত, বাগ্‌দানের পর এবং বিবাহের পূর্ব্বে পতি মৃত হইলে তাহার অন্য পতির ব্যবস্থা পরাশর এখানে দিয়াছেন। পরাশরবাক্যের এইরূপ কোনও অর্থ করিবার কারণগুলি নিম্নে একত্র করিয়া দেওয়া যাইতেছে :—

(১) নচেৎ মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস, বশিষ্ঠ, গৌতম প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ স্মৃতিকারদিগের সুস্পষ্ট ব্যবস্থা অমান্য করিতে হয়।

(২) পতি শব্দের সপ্তমীর এক বচনে হয় পত্যৌ, পরাশর লিখিয়াছেন পতৌ, এজন্য অনুমান হয় যে, পরাশর সচরাচর প্রচলিত অর্থে ইহা ব্যবহার করেন নাই।

(৩) পরাশর পরবর্ত্তী শ্লোকে আমরণ ব্রহ্মচর্য্যের বিধান দিয়াছেন।

(৪) পরাশরের পূর্ব্ব-উদ্ধৃত বাক্যে যদি "পতি" শব্দের অর্থ বিবাহিত পতি হয়, তাহা হইলে, কেবল যে বিধবার পুনরায় বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিতে হয়, তাহা নহে, "নষ্টে" অর্থাৎ স্বামী নিরুদ্দিষ্ট হইলে স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ দিতে হয়, "প্রব্রজিতে" স্বামী সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ দিতে হয়, "ক্লীবে বা পতিতে" স্বামী রুগ্ন হইয়া ক্লীব হইলে, অথবা পাতকের ফলে পতিত হইলেও স্ত্রীর বিবাহ দিতে হয়। সুতরাং কেবল বিধবা-বিবাহ নহে, অনেক ক্ষেত্রে সধবা-বিবাহও দিতে হয়।

(৫) আর্য্যরমণী বিধবা হইয়া পুনরায় বিবাহ করিয়াছেন, এইরূপ দৃষ্টান্ত পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতে দেখা যায় না। অনার্য্যরমণী বিধবা হইয়া বিবাহ করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত আছে।

(৬) যদি বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত হইত, তাহা হইলে শাস্ত্র সকলের মধ্যে উহার সমর্থনে কেবলমাত্র একটি বাক্য পাওয়া যাইত না; আরও অনেকগুলি বাক্য পাওয়া যাইত। কে দান করিবে, কি মন্ত্র হইবে, কি উত্তরাধিকার হইবে, এ সকল বিষয়ের উল্লেখ থাকিত। এ বিষয়ে বিখ্যাত সাহিত্যিক ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বলিয়াছেন যে, হিন্দু সমাজে দত্তকপুত্র-গ্রহণ লক্ষের মধ্যে একটা হয় কি না সন্দেহ; কিন্তু সেই দত্তক গ্রহণের ব্যবস্থার জন্য কত শাস্ত্র—কত বিধিব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। বিধবা-বিবাহের মত এত বড় ব্যাপার যদি হিন্দু সমাজে প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে সে বিষয়ে কেবল একটা মাত্র বাক্য থাকিত না, অনেক বাক্য থাকিত।

অনেকে বলেন যে, "কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ" অতএব কলিকালে অন্য স্মৃতির বিরোধী হইলেও পরাশরবাক্যই বেশী বলবান্। কিন্তু এই অর্থ গ্রহণ করিলে "যদ্ বৈ মনুঃ অবদৎ তৎ ভেষজম্" অর্থাৎ মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা ঔষধের ন্যায় হিতকারী, এই বেদবাক্য এবং "মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে" অর্থাৎ

যে স্মৃতি মনুর বিপরীত, তাহা প্রশংসার্হ নহে, এই স্মৃতিবাক্য উভয়ই মিথ্যা হইয়া যায়। কিন্তু "কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ" ইহার অর্থ যদি এরূপ করা যায় যে, পরাশরস্মৃতিতে যে সকল ব্রতের ব্যবস্থা আছে, সেগুলি কলিকালের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, অপর স্মৃতিতে সেরূপ বিধান পাওয়া যায় না,—তাহা হইলে পূর্বোদ্ধৃত তিনটি বাক্যের মধ্যে বেশ সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। সুতরাং এইরূপ অর্থই গ্রহণ করা উচিত। বহুকাল পূর্বে মধ্বাচার্যও এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, ঋষিগণ দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন এবং সকল জীবের হিতকারী ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বিধবা পুনরায় বিবাহ করিলে তাহার অকল্যাণ হইবে। কিন্তু যাঁহারা হিন্দুশাস্ত্র মানেন না, পূর্বজন্ম, কর্মফল এ সকল কিছুই মানেন না, তাঁহারা অবশ্য বিধবা-বিবাহ সমর্থন করিবেন।

কিন্তু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কি যথাযথভাবে হিন্দুধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাস করিতেন? শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত তাঁহার যে কথোপকথন লিপিবদ্ধ আছে, তাহা পড়িয়া ত' বোধ হয় না যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দুর ধর্মশাস্ত্রে বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ একটি পুরাতন দলিল পাইয়াছেন, যাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন যে, হিন্দুদর্শন পাঠ করিলে ছাত্রের যে অনিষ্ট হইবে, তাহা সংশোধন করিবার জন্য তাহাদের কিছু ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করা প্রয়োজন। বাস্তবিকপক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাহ্য বেশভূষায় স্বজাতীয় ভাব পরিস্ফুট হইলেও তাঁহার আন্তরিক মনোভাব যেন পাশ্চাত্য প্রভাবেরই পরিচয় দেয়। এ জন্যই কি তাঁহার চরিতাবলী পুস্তকে নীতিশিক্ষা দিবার জন্য কেবলমাত্র পাশ্চাত্যকাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, একটিও স্বদেশীয় কাহিনী নাই? বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল যে হিন্দুশাস্ত্রে বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন না, তাহা নহে, ঈশ্বর এবং পরলোক সম্বন্ধেও বোধ হয় তাঁহার বিশ্বাস শিথিল ছিল। শোনা যায় যে, তাঁহার বোধোদয় পুস্তকে প্রথমে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনও কথা লেখা হয় নাই। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এই ত্রুটি প্রদর্শন করিবার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ" এই প্রবন্ধটি সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনীপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কোনও কোনও দৈব-দুর্ঘটনার সংবাদে তিনি ব্যথিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "এই ঘটনার পরও কি তোরা বিশ্বাস করিতে বলিবি যে, ঈশ্বর আছেন?" বলা বাহুল্য, তিনি হিন্দুশাস্ত্রের উপর বিশেষ আস্থাবান্ না হইলেও তাঁহার ন্যায় দাতা এবং পরোপকারী ব্যক্তি অতিশয় বিরল। কিন্তু যিনি শাস্ত্রবিশ্বাসী নহেন, ঈশ্বর ও পরকাল সম্বন্ধে যাঁহার বিশ্বাস শিথিল, তাঁহার প্রদত্ত সামাজিক ব্যবস্থাকে হিন্দু বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত নিরীক্ষণ করিতে পারে না। বিনোদবাবু যে লিখিয়াছেন—"বাঙ্গালা-দেশের সহস্র সহস্র বৎসরের পুরাতন সামাজিক প্রথাগুলিকে ভাসাইয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিল।" তাঁহার এই উক্তি অতিরঞ্জিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও বিধবা-বিবাহ প্রথা বাঙ্গালাদেশে অতি সামান্য পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে মাত্র। "ভাসিয়া যাইবার" মত অবস্থা কখনও হয় নাই। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিলে হিন্দু সমাজে ভ্রূণ-হত্যার সংখ্যা কমিয়া যাইবে, ইহা যথার্থ নহে। যে সকল পাশ্চাত্য দেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত, সে সকল সমাজে ভ্রূণহত্যার সংখ্যা হিন্দু সমাজ অপেক্ষা অনেক বেশী (বিশেষতঃ আমেরিকায়)। বাস্তবিকপক্ষে বিধবাদের পুণ্যময় জীবন সমাজে সংযম ও পবিত্রতা বর্দ্ধিত করে। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে রমণী-সমাজ মোটের উপর বেশী সুখী হইবে, ইহাও যথার্থ নহে। কারণ, যে কয় জন বিধবার বিবাহ হইবে, সেই কয় জন কম কুমারীর বিবাহ হইবে। এখনই অনেক রমণীর বিবাহ হওয়া দুর্ঘট হইয়াছে, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে আরও দুর্ঘট হইবে। পুরুষরা নিজেদের স্বার্থের জন্য বিধবা-বিবাহ রহিত করিয়াছে, ইহাও যথার্থ নহে। ভগিনী বা কন্যা বিধবা হইলে তাহাদিগকে দুঃখভোগ করিতে হইবে, এ দুশ্চিন্তায় কাতর হয় না, হিন্দুসমাজ এত নিষ্ঠুর নহে। নিজের অবর্তমানে তাহার স্ত্রী পাছে বিবাহ করে, এই দুশ্চিন্তা অপেক্ষা ভগিনী বা কন্যা বিধবা হইলে বিবাহ করিতে পারিবে না, এই দুশ্চিন্তা অনেক বেশী প্রবল। সুন্দরী ধনবতী বিধবা রমণীকে বিবাহ করিবার প্রবৃত্তি পুরুষের স্বাভাবিক। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিলে পুরুষরা সে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারে। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিলে মোটের উপর পুরুষের ভোগের সুযোগ কমিয়া যাইবে, ইহা ভুল। ফলতঃ বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিলে পুরুষের সুখভোগের সুযোগ কিছুই বাধাপ্রাপ্ত হয় না, বরং বর্দ্ধিত হইবে। পুরুষের সুখের জন্য বিধবাকে বিবাহ করিতে দেওয়া হয় না, অথবা বিধবা পাছে সুখী হয়, এজন্য তাহাকে বিবাহ করিতে দেওয়া হয় না, যাঁহারা এরূপ মনে করেন, তাঁহারা হিন্দুসমাজ এবং হিন্দুশাস্ত্রকার সম্বন্ধে অযথা হীন ধারণা পোষণ করেন। রমণীগণের প্রকৃত কল্যাণের জন্যই দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ঋষিগণ এই ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা প্রথমে কষ্টকর হইলেও পরিণামে সুখাবহ।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (এম-এ)।

সাহিত্যে ধ্বনির আসন

সংস্কৃত সাহিত্যকে মৃত বলা হয়। কিন্তু যে সাহিত্যকে এই প্রবন্ধে আমি যে অর্থে জীবন্ত বলছি, সে হচ্ছে—তার ধ্বনিগত প্রাণের পরিপুষ্টতায়। ধ্বনিতে সংস্কৃত সাহিত্য অতি অপূর্ব। জগতে খুব অল্প সাহিত্যই আছে - যারা ধ্বনিতে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী নাম নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে উঠতে পারে। সংস্কৃত সাহিত্যের এই বিশিষ্ট ধ্বনির মধ্যে এমন একটি ঐন্দ্রজালিক মন্ত্র-বল নিহিত আছে, যাতে ক'রে সে সকল চিত্তকেই স্তম্ভিত করে—প্রলুব্ধ করে। সংস্কৃত-জানা-মন, না-জানা-মন, সকল মনের অভ্যন্তরেই এই ধ্বনির প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

কেবল প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের কথাই বা বলি কেন, ধ্বনির বর্তমানে মৃত বা অচল প্রাচীন যে কোন সাহিত্যকেই জীবন্ত বলা চলে এবং ইহারই অবর্তমানে আধুনিক যত কিছু সচল সাহিত্য আছে, সকল সাহিত্যই স্পন্দনহীন জড়পিণ্ডের সাহিত্য বই আর কিছুই নয়। কারণ, জীবন্ত সাহিত্য-নাড়ীর প্রাণ-সূচক স্পন্দনই হচ্ছে—ধ্বনি।

যে সাহিত্য ধ্বনি-উৎপাদনে অশক্ত, সে সাহিত্য দরিদ্র কৃপার পাত্র। সাহিত্য যে ধনী হয়ে ওঠে, তার সর্বপ্রথম নিদর্শনই—

ধ্বনি-সম্পদের ঝঙ্কার। তাই অর্জ্জন করে বলেই সে ধনী। ভাবের গভীরতায়—বিষয়-বস্তুর বিশুদ্ধতায় সাহিত্য যে ধনী হয়ে দেখা দেয়, সে বুদ্ধির বিচার-কাঠির মাপে—সে গৌণে। সে বয়স্ক-চিত্তে—বালক-চিত্তে নয়। সে পরিণত চিত্তে—অপক্ক চিত্তে নয়। সে মুষ্টিমেয় চিত্তে—অগণন চিত্তে নয়। সাহিত্যের ধ্বনিগত প্রাণে যে শক্তি নিহিত আছে, তাতেই যে সাহিত্য ধনী, তা চিত্তের জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকল চিত্তকেই আকর্ষণ করে। সর্ব্বপ্রথমে মনকে যা দোল খেলিয়ে টান দেয়, তা সাহিত্যের ভাব নয়, তা সাহিত্যের বিষয়-বস্তু নয়, তা হচ্ছে—সাহিত্যের ধ্বনি। এই দিক্ হতে ধ্বনিকেই সকলের উপরে আসন দিতে হয়। এই অর্থেই ধ্বনির আসন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সবার উপরে প্রথম আসন।

সাহিত্য যে রূপ নিয়ে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে, সে তার ধ্বনিতে। ধ্বনিই সাহিত্যের রূপ। সে রূপ কর্ণে এসে ধরা দেয়। কর্ণকে তৃপ্ত করে। চক্ষু দেখে দ্রব্য-জীবের রূপ। আর কর্ণ দেখে ধ্বনির রূপ। এই ধ্বনির রূপকে পদ্য লেখার লেখক যেমন ক'রে খেলায়—নাচায়—জাগায়, লেখনীর আগায় তেমন ক'রে নাচাতে জাগাতে খেলাতে পারে গদ্য লেখার লেখক—এমন সুযোগ তার নেই। তার কারণ—এই যে ধ্বনি, এই ধ্বনির আসন রচনার মূলে যে কটি শ্রেষ্ঠ উপাদান—তার ভাণ্ডারী হচ্ছেন কবি।

যে আসনের উপর ধ্বনি জেগে উঠে ব'সে আছে প্রথম—সে আসন ছন্দের আসন। ছন্দের আসনের পার্শ্বে যে যমজাসন, তাতে যে ধ্বনি জাগে, সে জাগে মিলের আসনে ব'সে। এই ছন্দের আসনের ধ্বনি, মিল-আসনের ধ্বনি—এই যমজধ্বনি, এরা তাদের কৌলীন্য ঘোষণা করে দৃপ্ত তেজে—অন্য কনিষ্ঠ ধ্বনিদের কাছে। এ জাতের ধ্বনি গদ্যের বংশে জন্মায়, এমনটি ঘটে না।

পত্রে পত্রে সংঘাত লাগায়, তবে যেমন মর্ম্মর-ধ্বনি জাগায়, তেমনি ক'রে জাগে ঘন-ঘটায় অনুপ্রাসের ধ্বনি, সমবর্ণের উচ্চারণ আঘাত পেয়ে—কবির কাব্য-কুঞ্জে। এ ধ্বনি কিন্তু ছন্দের ধ্বনি হতে—মিলের ধ্বনি হতে নিম্নগ্রামের ধ্বনি।

ভাষা শাস্ত্রে শব্দের Permutation-Combination (অনুলোম-বিলোম সন্নিবেশ বা সংযোগ) আছে, গণিত শাস্ত্রে যেমন Permutation-Combination আছে সংখ্যার। এর উপর লেখকরা লক্ষ্য রেখে থাকেন; কারণ, এতেও ধ্বনিকে জাগান যায়—এটিও ধ্বনির আসন।

কোন একটি শব্দের একাধিক প্রয়োগে বা পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ—এতেও ধ্বনি জাগে। কাব্য-কুঞ্জ এ সব ধ্বনির বিচরণ-ভূমি হলেও গদ্য সাহিত্যের মধ্যেও এদের চরণ-পাত পড়ে এমন দেখা যায়।

যে একটি ধ্বনি আসনের কথা না ব'লে এ ধ্বনির ক্ষেত্রে কলি টানতে পারছি না, সেটি হচ্ছে—বেগ পাওয়ায় ধ্বনির সৃষ্টি।

ছন্দ আর মিল—এই দুইএ মিলে মিত্রাক্ষরের পদ্য। সে তার চরণ-প্রান্তের মিলের মলে ঝঙ্কার তুলে চলে। এক দিন এমন এলো, মিত্রাক্ষরের এই মিল-মলের বেড়ী ভেঙ্গে দিয়ে অমিত্রাক্ষর পদ্য তার বিজয়-দুন্দুভি নিয়ে দেখা দিল। তার যদি কেবল ভাঙ্গাই কায হতো, যদি না কিছু গড়ার থাকতো, তবে তার আগমন অশুভই আনতো। কিন্তু সে নিজের ছন্দ অটুট রেখে, মিলের শৃঙ্খল ভেঙ্গে দিয়ে, দিয়ে গেল বেগ। সেই বেগে দিয়ে গেল ধ্বনি। অমিত্রাক্ষরের বেগে যে ধ্বনি—সেই বেগের আসন, সেই আসনের ধ্বনি, তাই হলো অমিত্রাক্ষরের বিশেষ দান।

এর পর দেখা দিল যে পয়ার—সেই পয়ার ছন্দে ভাঙ্গা মিল-মলের ফের জোড়া লাগলো। অথচ অমিত্রাক্ষরের বেগ ক্ষুণ্ণ হলো না—তাকে রক্ষা ক'রে চল্লো।

কবির লেখনী সে যে Magic wand (যাদু-দণ্ড) তার স্পর্শ পেয়ে মৃৎ বিষয়-বস্তুর তাল সুবর্ণ-তালে রূপান্তরিত হয়। মূক ভাষাকে সে মুখর ক'রে তোলে ধ্বনির ঝঙ্কারে। ছন্দের ধ্বনি, মিলের ধ্বনিবেগ-অনুপ্রাসের ধ্বনিতে; কাব্যসুন্দরীকে সে চির-লাবণ্য চির-যৌবন দান করে। রমণীর রূপ যেমন ঠিক্‌রে পড়ে তার দেহ-অলঙ্কারে, তেমনিতর কাব্য-সুন্দরীর অলঙ্কার—সে ছন্দ মিল আর অনুপ্রাস—তাদের ঝঙ্কারে রূপসীর রূপ ঝলসে যায়।

গদ্য-লেখকদের সীমার মধ্যে যে সব ধ্বনির আসন, তাদের প্রয়োগে যখন ধ্বনি রচনা ক'রে তোলেন তাঁরা তাঁদের লেখায়, তখন তাঁদের কবি বলা চলে ধ্বনির দিক্ থেকে বিচার করলে পর। তাঁদের গদ্য পদ্যের কবি নামে অভিহিত করতে হয়।

গদ্যে যে ধ্বনি, পদ্যে যে ধ্বনি এ যেন সাহিত্যের সঙ্গীত। কবিরাই এ সঙ্গীত বিশেষ ক'রে গেয়ে চলেন তাঁদের কাব্য-কুঞ্জে—অধিকতর মিষ্ট ক'রে করুণ ক'রে, অধিকতর মীড় তুলে ঝঙ্কার দিয়ে। কবিরাই এ সঙ্গীত গেয়ে চলেন—খেয়াল টপ্পায় ধ্রুপদে।

কবি ও গায়ক যেখানে এক, যেখানে অভিন্ন, সে কর্ণেন্দ্রিয়ের সাধনায়। এই ইন্দ্রিয়-পথে তাদের দুইএ ঘনিষ্ঠ যোগ। এই ইন্দ্রিয়ে দুইএরই জন্ম। স্থূল কর্ণে কবিও হয় না—গায়কও হয় না।

কবিকে বিশ্লেষণ করলে তার একাংশ গায়ক, অপরাংশ চিত্রকর। কবি ত কেবল কাণ নিয়ে কাণের সাধনায় কাব্যে গান গেয়ে যান গায়ক হয়ে, তা নয়, তিনি যে কাব্যে চিত্র এঁকে যান শব্দের তুলি-যোগে। দর্শনেন্দ্রিয় তাঁর আছে—চিত্রকরের যেমন থাকে। চক্ষু পেয়েও অন্ধ হলে মানুষের চিত্রকর হওয়া হয় না, এ যেমন সত্য—ধ্রুব, তেমনি সত্য তেমনি ধ্রুব দৃষ্টি হারিয়ে মানুষকে কবি হতে দেয় না। দর্শনেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে কবি ও চিত্রকরের যোগ বর্ত্তমান।

ইন্দ্রিয়ের দিক্ থেকে দেখতে গেলে কবির সাধনা গভীরতর সাধনা, উচ্চতর সাধনা, কঠিনতর সাধনা—কেন না, দুটিকে নিয়ে তার সাধনা। চিত্রকরের সাধনায় ইন্দ্রিয় দুই নাই—এক। গায়কের সাধনাও তাই একাকে নিয়ে—দুইকে নিয়ে নয়। চিত্রকর কবি নয়। কবিই চিত্রকর। গায়ক কবি নয়। কবিই গায়ক। চিত্রকর ও গায়ক মিলে কবি পরিপূর্ণ এক। তাই কবির আসন সর্ব্বোপরি—স্বর্ণাসন। চিত্রকরের চিত্রে—চিত্র আছে। গান কৈ? গায়কের গানে—গান আছে। চিত্র কৈ? কিন্তু কবির কাব্যে গানও আছে, চিত্রও আছে—দুই-ই আছে একত্র হয়ে। কাব্য একখানি সঙ্গীতপূর্ণ আলেখ্য। *

শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায়।

* প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত; ২৮শে ডিসেম্বর, ৩৩



সবাক-চিত্র



চলচ্চিত্রে প্রাণসঞ্চার

৬

চিত্র-গৃহে সবাক-ছবি দেখিতে গিয়া আমরা ভাবিয়া পাই না, কিরূপে ফিল্মের সূক্ষ্ম দাগগুলি হইতে অমন স্বাভাবিক কথাবার্তা বাহির হয়। আসল কথা, চলচ্চিত্রের প্রাণ-সঞ্চার হয় চিত্র-গৃহে—ষ্টুডিয়োয় নয়।

গতিশীল ক্যামেরার ন্যায় চিত্র-প্রদর্শন-যন্ত্রেরও গতি আছে। তাহার কায ফিল্ম্‌কে গতি দেওয়া। ইহাতে আছে উপরে ও নীচে দুইটা স্পুল, উপর হইতে ফিল্ম্ নামিয়া আসিয়া ফিল্ম্-গেট পার হইয়া যায়।

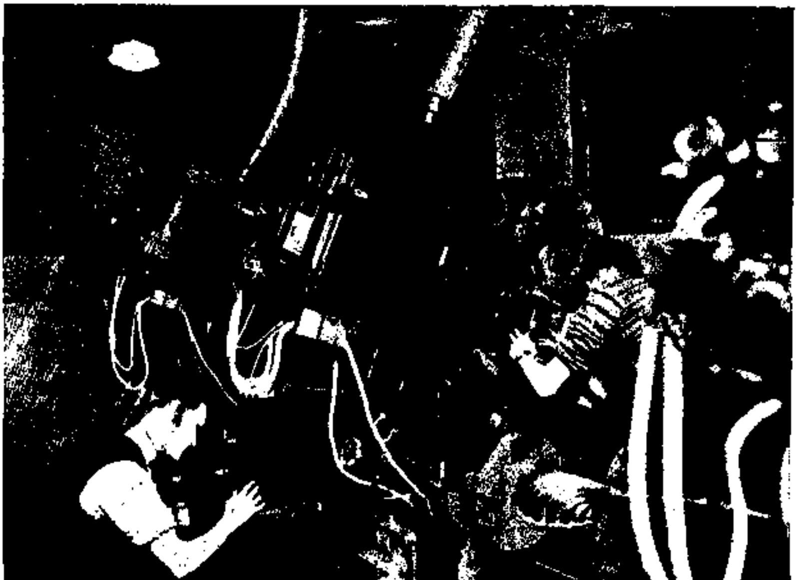
এই স্থানে বলিয়া রাখা ভালো যে, প্রদর্শন-যন্ত্রের ফিল্ম্-গেট হইতে প্রায় ১৫ ইঞ্চি বা সাড়ে ১৯ ঘর নীচে 'সাউণ্ডহেড' বসানো থাকে, ফিল্ম্ নামিয়া আসিয়া 'সাউণ্ড হেড' অতিক্রম করিয়া নীচের স্পুলে জড়াইয়া যায়।

ফিল্ম্-গেটের সামনে থাকে লেন্স, পিছনে থাকে কনডেন্সার ও তাহার পিছনে থাকে আর্ক-লাইট। পেন্সিলের মত দুইটা কার্বন-দণ্ড হইতে তীব্র আলোক-রশ্মি বাহির হয়। ক্যামেরার কায—বহি-র্জগতের যাবতীয় বস্তুকে ফিল্মে আবদ্ধ করা এবং প্রদর্শন-যন্ত্রের কায সেই আবদ্ধ বস্তুকে আলোক-সম্পাত-সাহায্যে পর্দায় ফলাইয়া তোলা।

ফিল্মে আগুন লাগিবার সম্ভাবনা আছে প্রচুর। সেজন্য ফিল্মের পথে 'সেফটি শাটারে' (Safety Shutter) আলোকের পথ রুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা আছে। কেহ কেহ ইহাকে বলেন 'লাইট কাটার' (Light cutter); ইহা ছাড়া সতর্কতা অবলম্বনের জন্য প্রদর্শন-কক্ষে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি রাখার প্রয়োজন। যেমন—Six Fire Buckets, one Blanket, Suitable fire-extinguishers প্রভৃতি।

এবারে সবাক-ছবি দেখাইবার কথা বলিব।

সবাক-ছবি চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের সমস্ত বিভাগকে নাড়া দিয়াছে। সেই সঙ্গে যাঁহারা চিত্র দেখান, তাঁহাদেরও কম গণ্ডগোলে ফেলে নাই। ফলে পুরাতন যন্ত্রপাতি বদলাইয়া চিত্র-গৃহের আমূল সংস্কার-সাধন করিয়া চিত্র-ব্যবসায়ীদিগকে নূতন উদ্যমে কার্যক্ষেত্রে নামিতে হইয়াছে।



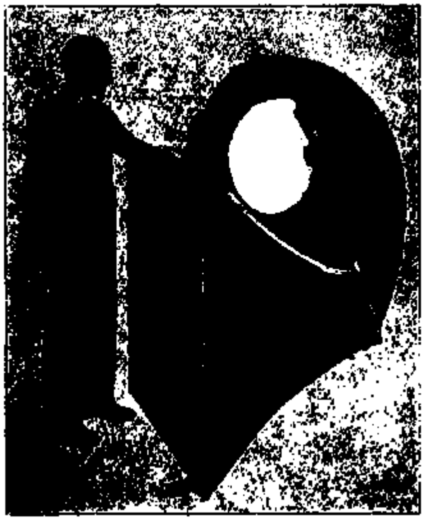
প্রদর্শন-যন্ত্র

পূর্ব্বে চিত্র-প্রদর্শকদের (operators) শুধু দেখিতে হইত যন্ত্রের মধ্য দিয়া ফিল্ম সহজ গতিতে অতিক্রম করিতেছে কি না, অথবা আলোক-সম্পাত ও ফোকাস্ (focus) ঠিক হই-তেছে কি না। এ-সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলেই তাঁহাদিগকে অভিজ্ঞ (experts) বলা হইত। এখন সে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। চিত্র-প্রদর্শক (অপারেটর) হইতে হইলে এখন হওয়া চাই বড় দরের ইলেক্‌ট্রিক মেকানিক (Electric Mechanic)। পুরাতন যুগের ন্যায় এ যুগে দ্রুত-গতিতে প্রদর্শন-যন্ত্র চালাই-বার উপায় নাই,—এমনভাবে চালাইতে হইবে, যেন প্রতি মিনিটে নব্বই ফুট ফিল্ম স্বাভা-বিকরূপে প্রদর্শন-যন্ত্রের ভিতর দিয়া যায়। তাঁহাকে সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি রাখিতে হইবে সাউণ্ড হেড-এর প্রতি। ফিল্ম-গেট হইতে এমন সুকৌশলে সাউণ্ড হেডে ফিল্ম পরাইতে হইবে, যেন তাহার এতটুকু ব্যতিক্রম না ঘটে, অথবা ফিল্মকে জখম না করে। এক্সাইটিং ল্যাম্প (Exciting Lamp) সুরক্ষিত হইল কি না, ফটো-ইলেক্‌ট্রিক-সেল (Photo Electric Cell) হইতে কোন প্রকার অতিরিক্ত শব্দ বাহির হইতেছে কি না, এ্যাম্‌প্লিফায়ার বোর্ডে কোন ভাল্‌ভের এমিসন্ কমিয়াছে কি না, ইলেক্‌ট্রিক তারের কোন্ স্থানে জখম আছে কি না, এ সব দিকে নজর রাখিতে হইবে। সবশেষে দেখা দরকার, লাউড-স্পীকারে কোন

দোষ আছে কি না, কিংবা উহা দর্শকদের দিকে যথানিয়মে বসানো আছে কি না।

চিত্র-প্রদর্শন গৃহে একটা করিয়া হর্ণ থাকে; তাহার নাম 'মনিটর হর্ণ' (Monitor Horn); ইহার দ্বারা প্রদর্শক আন্দাজ করিয়া লন, ছবির কথাবার্ত্তা সংযতরূপে হইতেছে কি না। কিন্তু অনেক সময় মনিটর হর্ণের সাহায্যে কথা শুনিয়া কিছুই আন্দাজ করা যায় না। প্রদর্শকের কর্ত্তব্য তখন চিত্রগৃহে নামিয়া আসিয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করা। এ দেশে এমন অনেক চিত্র-গৃহ আছে, যেখানে প্রকৃতই নিখুঁতরূপে সবাক-চিত্র প্রদর্শিত হয় না। মোটের উপর এতগুলি দায়িত্ব লইয়া যিনি কাযে নামিতে পারিবেন ও কৃতকার্য্য হইবেন, তাঁহাকেই আমরা অভিজ্ঞ সবাক-চিত্র-প্রদর্শক বলিব।

সবাক-ফিল্ম্ এমন সুকৌশলে চালাইতে হইবে, যেন কোন রকমে উহার বাম পার্শ্বস্থিত সাউণ্ড ট্রাকের স্থানটিতে কোন ক্ষতি না হয়। অপরিষ্কার পুরাতন ফিল্ম কিংবা joiningএর দোষ



হর্ণ

থাকিলে তাহা হইতে বিশ্রী শব্দ বাহির হওয়া বিচিত্র নয়, এই জন্যই অতি সাবধানে সবাক-ফিল্ম্ লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হয়।

কেহ কেহ হয় ত' ভিটাফোন রেকর্ডকে ভালো বলিবেন। রেকর্ড হইলে ছবি দেখানো হয় ত' সহজ, কিন্তু উহা ভাঙ্গিয়া গেলে কিংবা ফিল্মের কোন অংশ জখম হইলে ছবি দেখানো একপ্রকার অসম্ভব। তবে অল্প কয়েক ঘর ফিল্ম্ নষ্ট হইলে তাহা বাদ দিয়া সেই স্থানে শাদা ফিল্ম্ জুড়িয়া দিলে কায চলিয়া যাইতে পারে। হাজার ফুট ছবি দেখাইতে সময় লাগে প্রায় দশ মিনিট এবং রেকর্ডগুলি তৈয়ার করা হয় ঠিক সেই অনুসারে।

চিত্র-গৃহে দুইটা যন্ত্রের সাহায্যে সবাক-চিত্র দেখানো হইয়া থাকে। প্রত্যেক যন্ত্রের ডিস্ক্ অর্থাৎ রেকর্ডের শব্দ ও ফিল্ম্ ট্রাক হইতে শব্দ বাহির করিবার জন্য যন্ত্রাদি আছে। প্রদর্শন-যন্ত্র হইতে শব্দ বাহির হইয়া একগাছি circuit-এর মধ্য দিয়া আসিয়া সে শব্দ পৌছায় ফেডারে (Fader)। ফেডারের কায, শব্দকে কম-বেশী করা। ফেডার হইতে অন্য একগাছি circuit দিয়া পৌছায় একটা সুইচে। সেখান হইতে শব্দের বৈদ্যুতিক গতি চলিয়া যায় এ্যামপ্লিফায়ার বোর্ডে এবং তিনপ্রকার এ্যামপ্লিফায়ার হইতে শব্দ ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধিত হইয়া 'আউট-পুট্ কনট্রোল প্যানেলের' মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আসে। ইহার মধ্য হইতে মনিটর হর্ণের জন্য একটা তার বাহির করিয়া লওয়া হয়। এই 'আউট-পুট্ কনট্রোল প্যানেলের' কায আর কিছু নয়, শুধু শব্দকে লাউড স্পীকারে পাঠাইয়া দেওয়া।

সবাক-ছবি দেখাইতে হইলে তিনটি অতি-মূল্যবান্ দ্রব্যের প্রয়োজন। প্রথমে চাই একটা 'পিক্ আপ' বা শব্দ উত্থাপিত করিবার যন্ত্র। ইহার কায,—রেকর্ড হইতে শব্দ তুলিয়া



ফেডার

বৈদ্যুতিক শক্তির মধ্যে প্রেরণ করা। দ্বিতীয়, এ্যামপ্লিফায়ার সেট্। ইহার কায—শব্দের বৈদ্যুতিক শক্তিকে বর্দ্ধিত করা। তৃতীয়—লাউড স্পীকার। এ্যামপ্লিফায়ার হইতে প্রেরিত শব্দকে এই লাউড স্পীকার-যন্ত্র শ্রুতিকর করিয়া তোলে।

দুইপ্রকার নিয়মে ছবির প্রয়োজনীয় শব্দ শুনাইতে পারা যায়, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। 'পিক্ আপ' যে কি বস্তু, আপনারা বোধ করি তাহা দেখিয়া থাকিবেন। গ্রামোফোন বাজাইতে হইলে যেমন সাউণ্ড-বক্স চাই, তেমনি রেকর্ড হইতে ফিল্মের কথাবার্ত্তা শুনাইতে হইলে চাই পিক্ আপ্। ইহাতে পিন্ লাগাইয়া রেকর্ডের উপর বসাইতে হয়। পিক্ আপে একটা আর্মেচার থাকে

অতি ছোট কয়েলের মধ্যে। রেকর্ডের উপর পিন চলিলে সে স্পন্দন গিয়া পৌঁছিবে আর্মেচারে,—উহাকে ঘিরিয়া আছে একটা ম্যাগনেট্‌ বা চুম্বক। বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে উহা হইতে স্বতঃই শব্দ-তরঙ্গ বাহির হইয়া আসে।

ফিল্ম-ট্রাক্ হইতে বিভিন্ন উপায়ে শব্দ বাহির করা হয়। সবাক-ছবি তুলিবার সময় যে ভাবে কর্তৃপক্ষদের নানাপ্রকার লেন্স ও স্লিটের সাহায্য লইতে হয়, তেমনি হয় ফিল্ম্ হইতে শব্দ বাহির করিবার কালে। ফিল্ম্ হইতে প্রায় চারি ইঞ্চি তফাতে



এ্যামপ্লিফায়ার বোর্ড

একটা প্রজ্বলিত সূক্ষ্ম আলো থাকে ; ইহার নাম এক্সাইটিং ল্যাম্প। এই আলো কয়েকটি লেন্সের ভিতর দিয়া ট্রাক-বিশিষ্ট স্থান ভেদ করিয়া ট্রাকের ছায়া লইয়া পতিত হয় ফটো-ইলেক্‌ট্রিক্-সেলে। ইহাকে দেখিতে ভাল্‌ভের মত। ফটো-ইলেক্‌ট্রিক্-সেল তৈয়ার হইয়াছে সিলিনিয়াম, পটাশিয়াম প্রভৃতি রসায়নের দ্বারা। ইহাতে যদি কোনরূপ ছায়া পড়ে, তাহা হইলে শব্দ উত্থিত হইবে। ফটো-সেলের পাশেই একটা এ্যামপ্লিফায়ার ভাল্‌ভ থাকে। ইহা ফটো-সেলের শব্দটি পাইবামাত্র এই ভাল্‌ভ ঐ শব্দকে অল্প বর্দ্ধিত করিয়া ফেডারে প্রেরণ করে।

পিক্ আপ বা ফটো-সেল হইতে শব্দের যতটুকু শক্তি বাহির হইয়া আসে, তাহাকে বর্দ্ধিত করিবার জন্য প্রয়োজন হয় এ্যামপ্লিফায়ার সেট্। ফেডার হইতে শব্দের বৈদ্যুতিক শক্তি গিয়া পৌঁছায় একেবারে এ্যামপ্লিফায়ার বোর্ডে। ওয়েষ্টার্ণ কোম্পানীর রীতি অনুসরণ করিয়া ছবি দেখাইতে হইলে তিনপ্রকার এ্যামপ্লিফায়ারের সাহায্য লইতে হয়। যথা—৪১-এ (41-A), ৪২-এ (42-A), ৪৩-এ (43-A) এ্যামপ্লিফায়ার সেট। প্রথমটিতে থাকে 'গেইন' (gain) ও শেষের দুইটাতে থাকে পাওয়ার (power) এ্যামপ্লিফায়ার ভাল্‌ভ।

'গেইন এ্যামপ্লিফায়ার' সর্ব্বপ্রথম প্রেরিত শব্দকে ফেডার হইতে গ্রহণ করে এবং প্রয়োজন-মত তাহা পাঠাইয়া দেয় 'পাওয়ার এ্যামপ্লিফায়ারে'; সেখান হইতে শব্দ ছুটিয়া যায় আউট-পুট্ কন্‌ট্রোল প্যানেলে, তার পর তখনই চলিয়া যায় লাউড্ স্পীকারে। প্রায় বারো শত দর্শক বসিবার মত চিত্র-গৃহের পক্ষে প্রয়োজন হয়



ওয়েষ্টার্ণ ইলেক্‌ট্রিক্ ফটো সেল্

একসেট্ 'গেইন' ও একসেট্ পাওয়ার এ্যামপ্লিফায়ার। দুই হাজার দর্শক বসিবার মত চিত্র-গৃহে অতিরিক্ত আর এক সেট 'পাওয়ার এ্যামপ্লিফায়ার' প্রয়োজন হয়। সাধারণ চিত্র-গৃহের পর্দ্দার পিছনে দুইটা করিয়া লাউড-স্পীকার বসানো থাকে, একটা উপরে ও অপরটি নীচে। কেহ বা উপরে একটা ও দুই কোণে দুইটা রাখেন। ইহাই প্রচলিত নিয়ম।

সংক্ষিপ্তভাবে পাঠক-পাঠিকাদের সবাক-ফিল্মের যাবতীয় কথাই বলিয়াছি, এবার 'ওয়াইড ফিল্ম্' সম্বন্ধে কিছু বলিয়া এ পর্ব্ব শেষ করিব। ওয়াইড ফিল্মের ইতিহাস খুঁজিলে বহুপূর্ব্বে ইহার প্রচলন ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং পূর্ব্বে-ও ইহা ছিল এবং এখন আবার নূতন করিয়া দেখা দিয়াছে, হয় ত' ভবিষ্যতে ইহার খুবই প্রচলন হইবে। উপস্থিত ফক্স কোম্পানী—সত্তর, বার্ গ্রেন—তেবটি, প্যারামাউণ্ট—ছাপান্ন এবং অন্য একটা কোম্পানী পঁয়ষট্টি মিলিমিটারের ছবি তুলিয়াছেন। ফক্সের ছবি সত্তর মিলিমিটার হইলে-ও পর্দ্দার উপর কিন্তু পুরা ফিল্ম্‌টি দেখিতে

পাওয়া যায় না। চওড়ায় এই ছবিখানি ৪৮, উচ্চতায় সাড়ে ২২ মিলিমিটার। ছবির বামদিকে সাত মিলিমিটার স্থান রাখা হয় সাউণ্ড-ট্রাকের জন্ত। এই চওড়া ফিল্ম ও তাহার উপযোগী প্রদর্শন-যন্ত্র তৈয়ারী করিয়াছেন যথাক্রমে 'ইষ্টম্যান্' ও 'ইন্টার ন্যাশন্যাল প্রোজেকসন্ করপোরেসন্।'

ওয়াইড ফিল্মের নব-অভিযান দেখিয়া বিশেষজ্ঞরা বেশ ভালো অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন -ফিল্মের উপর দুই মিলিমিটার পরিমাণ সাউণ্ড ট্রাক দেওয়াতে ফিল্মের ঘর ছোট হইয়া গিয়াছে। ইহাতে প্রদর্শক ও নির্ম্মাণ-কর্ত্তা উভয়কেই স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, পূর্ব্বে যে-ছবি পর্দ্দার উপর দেখা যাইত, দর্শক সাধারণ এখন তাহা অপেক্ষা ছোট ছবি দেখিতে পাইতেছেন। ছবি ছোট হওয়ার ফলে চিত্র-শিল্পীদের ফিল্মের ফ্রেমিং করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়, তা' ছাড়া একই দৃশ্যকে দুই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া ছবি তোলা শেষ করিতে হয়, ইহাতে তাঁহাদের পরিশ্রম হয় যথেষ্ট। কিন্তু চওড়া ফিল্ম হইলে বড় একটা 'ক্লোজ আপ' দৃশ্য লইতে হইবে না।

শব্দযন্ত্রীরা বলেন—সাধারণ ফিল্মে তাঁহারা মাত্র দুই মিলিমিটার স্থান পাইতেছেন; চওড়া ফিল্ম হইলে তাঁহারা সাত মিলিমিটার স্থান পাইবেন এবং শব্দগ্রহণ কার্য্যের উন্নতি হইবে বেশী।

ফিল্ম প্রদর্শকগণ বলেন—চওড়া ফিল্ম না কি খুব ধীর গতিতে যন্ত্রের ভিতর দিয়া চলে। ইহাতে তাঁহাদের না কি বহুদিক দিয়া সুবিধা হয়।

ওয়াইড ফিল্মের জন্ম হইলে-ও ইহাকে লইয়া মাথা ঘামাইবার এখন কেহ প্রয়োজন বোধ করিতেছেন না। কেন না, সম্প্রতি সবাক-ছবি আসিয়া ফিল্ম-শিল্পকে সজোরে নাড়া দিয়াছে। কাযেই সে-ধাক্কা সামলাইতে না সামলাইতে আবার যদি তাঁহারা ওয়াইড-ফিল্ম লইয়া পড়েন, তাহা হইলে ফিল্ম-শিল্পের ও ব্যবসায়ের অনেক ক্ষতি হইবার আশঙ্কা আছে। উপস্থিত 'ওয়াইড রেঞ্জ' ও সবাক-ফিল্মকে আর-ও উন্নতির পথে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষজ্ঞগণ চেষ্টা করিতেছেন। তবে অদূর-ভবিষ্যতে যে ওয়াইড ফিল্ম দেখা দিবে না, এমন কথা বলিতে পারি না। তখন কত মিলিমিটারের ফিল্ম যে ওয়াইড ফিল্ম বলিয়া চলিবে, সে-কথা বলা শক্ত এবং এই ওয়াইড-ফিল্ম দেখিবার আগ্রহ আমাদের কবে মিটিবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে!

শ্রীসুকুমার হালদার ও শ্রীনিতাই ঘোষ।

অদেখা

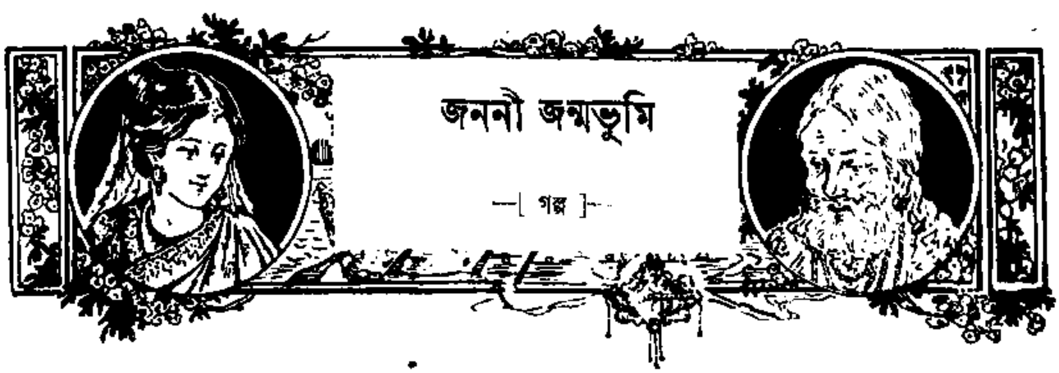
("Yarrow Unvisited" অবলম্বনে)

চক্রবালের নীল সীমানায় নদীটি কোথায় গিয়াছে বেঁকে!
বারাণসী যেথা গঙ্গার বুকে আধো চাঁদখানি দিয়াছে এঁকে।
স্নান সমাপিয়া চ'লে গেনু মোরা প্রয়াগ-তীর্থে এলাহাবাদে,
যেখানে আসিয়া মিলিত বীণায় গঙ্গা-যমুনা কণ্ঠ সাধে।
বন্ধু কহিল, "এলু এতো দূর, যমুনাই বাকি থাকে বা কেন,
বৃন্দাবনের সুনীল যমুনা! পেয়েছি যখন সুযোগ হেন?"
আমি কহিলাম, "ক্ষেপেছো, বন্ধু! এতোটা সময় নষ্ট হ'বে?
দেখার মতন কি আছে সেথায়? আরো কতো কিছু আছে ত' ভবে!
পুণ্যচয়ন ব্যবসা যাদের, মরুক্ তাহারা সেখানে গিয়া,
তা'দের পাণ্ডা করুক্ ঠাণ্ডা রজত-খণ্ড প্রণামি নিয়া।
যমুনা দেখিয়া কি লাভ, বন্ধু! সামান্য সে তো স্রোতস্বতী,
নীল জল যা'র প্রবাহিয়া যায় তৃণ-তট দিয়া শান্ত-গতি!"
বিস্মিত দু'টি করুণ নয়নে মোর পানে সখা তাকালো হেসে,
ভাবিল, বন্ধু এতো গান লিখে এতোটা অ-কবি বনিল শেষে!

"নয়ন জুড়ায় যমুনা-নদীটি, স্নিগ্ধ সুনীল!" কহিনু আমি,
"ঢেউয়ে-ঢেউয়ে তার নূপুরের সাথে কল-গীতি গাহে দিবস-যামী!
তীর-তরুতলে রাখালের দলে বাজায় আজিও করুণ বাঁশী!
আভরী-বালিকা জল নিয়ে যায় হাসিয়া তেমনই মধুর হাসি!
হো'ক্ না সে হাসি যতই উজল বাজুক্ সে বাঁশী করুণ স্বনে,
যাব না'ক মোরা যমুনার তীরে, যাব না প্রেমের বৃন্দাবনে।
কূলে কূলে তা'র দুলে তৃণসার, ফোটে ফুলভার তরুর শাখে!
প্রতিটি কুঞ্জে ভ্রমর গুঞ্জে, নিভৃত-নিলয়ে কপোত ডাকে!
নবীন কিশোর সারা নিশি'ভর বাঁশরী বাজাত রাধার আশে,
যমুনার তীরে শান্ত সমীরে আজো বুঝি তা'র স্বপন ভাসে!

"তাই ভাবিয়াছি, যাব না, বন্ধু, সাধের যমুনা নদীর কাছে;
এই হবে ঢের, মনে রাখি যদি হেন তটিনীও ভুবনে আছে!
বহুকাল ধ'রে কতো না আদরে প্রেম-তুলিকায় এঁকেছি যা'রে,
বাস্তব সাথে না মিলে যদি সে কি বা ফল বলো মুছিয়া তা'রে?
না যাইতে তাই মন চাহে ভাই, যমুনার তীরে যাই বা যদি,
যত সুন্দরই হো'ক্ না'ক তাহা, সে হবে আরেক যমুনা নদী!
"যদি আসে দিন ধরণী যে দিন রসলেশহীন ঠেকিবে মনে,
জরার ক্লান্তি নাশিবে শান্তি, বিরসে রহিব গৃহের কোণে,
সে দিনও হয় তো যমুনার ছবি মধুর করিবে জীবন-সাঁঝে,
ভাবিব, আবার আজো এ ধরায় চির-কিশোরের বাঁশরী বাজে!"

শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার।



জননী জন্মভূমি

—[গল্প]—

১

কন্‌ভেণ্ট স্কুলে সিষ্টারদের কাছে যখন আমি পড়িতাম, সেই সময়েই খাসা ইংরেজী বলিতে শিখিয়াছিলাম। ভাল ইংরেজী বলিতে পারিলেই হইল না, কায়দা-দোরস্ত হওয়া চাই। তার গলা চাই, তার স্বর চাই, তার চক্ষু ঘোরানো, কাঁধ নাচানো, হাত উল্টানো চাই। যদি সে সব বিষয়ে পরীক্ষা হইত, তাহা হইলে ফি বৎসর ক্লাসে আমি ফাষ্ট হইতাম। আমাদের দেশের ওল্ড ফ্যাসান ধরণ-ধারণ মোটেই আমার পছন্দ হইত না। স্কুল পার হইয়া যখন কলেজে প্রবেশ করিলাম, তখন ফ্যাসানের শিক্ষা আমার প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে। আমাদের বাড়ীতে থাকা সাহেবী ধরণের। বাবা ধুতি পরিতেন না, ইজারের উপর ড্রেসিং গাউন পরিয়া থাকিতেন; তামাক খাইতেন না, চুরুট খাইতেন; আমাদের সঙ্গে প্রায় ইংরেজী কথা কহিতেন। মায়ের হইয়াছিল একটু মুস্কিল। বেশী ইংরেজী জানিতেন না, শিখিবারও বয়স ছিল না। অনেক সময় তাঁহার বাধ-বাধ ঠেকিত। আদব-কায়দা তেমন সড়গড় হয় নাই, মাঝে মাঝে ভুলচুক হইত। আমি অনেক সময় মায়ের ভুল ধরিতাম, তিনি লজ্জিত হইয়া বলিতেন, ছেলেবেলা আমাদের মত তাঁহার শিক্ষা হয় নাই। দিদিমা বিধবা, নিজের বাড়ীতে থাকিতেন। তিনি একেবারে সেকেলে, আমাদের বাড়ী আসিতেন না, মা আর আমরা তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম। বাবার মুখে শুনিতাম, দিদিমার টাকা আছে, অনেক টাকা। এক কালে হয় ত তাঁহার টাকা মা-বাবার হাতে আসিবে, কিন্তু সে কথার কেহ উচ্চবাচ্য করিত না। দিদিমা এখনও দিব্য শক্ত-সমর্থ, কাযকর্ম্ম করেন, হিসাব-পত্র করেন, দান-ধ্যান করেন। ইংরেজী শিখিলে কি হয়, দিদিমার সঙ্গে আমরা কেহ পারিয়া উঠিতাম না। তিনি ঠাট্টা করিয়া আমাদের পাগল করিয়া দিতেন, কোন জিনিষে হাত দিতে দিতেন না, সকল রকম ইংরেজী ধরণ ঘৃণা করিতেন। বাবা কিংবা মা কখন তাঁহার কথার উপর কথা কহিতেন না, তিনি একটা শক্ত কথা বলিলেও কোন জবাব দিতেন না দেখিয়া আমরা ছেলেমেয়েরা আশ্চর্য্য হইতাম।

পাশ করিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইলে মা আমাকে দিদিমার সঙ্গে দেখা করিতে বলিলেন। বলিলেন, মা ইংরেজী না জান্‌লেও খুব ভাল লেখাপড়া জানেন, তোর উপর খুসী হ'তে পারেন।

দিদিমা চশমা পরিয়া একখানা মোটা কেতাব পড়িতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, কি রে, তোর ডানা কেমন গজিয়েছে, দেখি?

ডানা গজানো দূরে থাকুক, আমার হাত-পা গুটাইয়া গেল। শুষ্ক মুখে বলিলাম, কিসের ডানা?

চশমা খুলিয়া দিদিমা বলিলেন, শালিক পাখীর ছানা! ছেলেরা পাশ কর্‌লে ফাজিল হয়, আর মেয়েরা পাশ কর্‌লে তাদের ডানা ওঠে না? এই যেমন পিপড়ের পালক ওঠে।

—হাঁ দিদিমা, তুমি কি বলছ, এইবার আমি মরব?

—বালাই, তা ভেবে কি আমি এমন কথা বলতে পারি? পিপড়ের পাখা ওঠা ত নিয়ম নয়, তেম্নি মেয়ে-মানুষের পাশ করা যেন কি রকম কি রকম!

—আমি ভেবেছিলাম, আমি পাশ হ'লে তুমি খুসী হবে।

—খুব হতাম—যদি বুঝতাম, পাশ হ'লে লেখাপড়া শেখে।

—কি বল, দিদিমা, বি এ, এম এ পাশ করা লেখাপড়া শেখা নয়?

—কোন্ দেশের কতকগুলো কি ছাইভস্ম বই পড়া! এ বইখানা পড়েছিস্?

দিদিমা বই আমার হাতে দিলেন না, মলাটে নাম দেখাইলেন। পড়িলাম অধ্যাত্ম-রামায়ণ। রামায়ণ আছে জানি, এ আবার কি? আমি বলিলাম, না, দিদিমা, আমি পড়িনি।

—এই সব বই পড়লে শিক্ষা হয়, জ্ঞান হয়। ইংরিজি

পড়তে হয় পড়িস্, কিন্তু সেই সঙ্গে তোদের এ সব বই পড়ায় না কেন ?

—আমরা ত সংস্কৃত পড়িনে, ফ্রেঞ্চ পড়ি।

—সংস্কৃত পড়বি কেন ? এ দিকে ইংরিজি, তার সঙ্গে আর একটা কিচিমিচি ভাষা। ইহকাল পরকাল ত ভাল ক'রে ঝরঝরে করা চাই ! আর সাজগোজ, ধরণ-ধারণও হচ্ছে চমৎকার ! এখন আর কাঁসারী-পাড়ার সঙ দেখতে ছুটতে হবে না, ঘরে বসেই কত রকম সঙ দেখছি।

কাঁদ-কাঁদ মুখ লইয়া আমি বাড়ী ফিরিলাম। মাকে বলিলাম, তুমি বড় মুখ ক'রে তোমার মায়ের কাছে আমাকে পাঠিয়েছিলে। আমাদের থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গিয়েছে।

মা সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, হাজার হোক তোর দিদিমা ত বটে ! ওঁর উপর অভিমান করতে নেই।

২

পাশ করিয়া আমার কিছু প্রতিপত্তি হইল। কলেজে নূতন দলের আমি এক জন নেত্রী। বাড়ীতে ত কথাই নাই। আয়াকে ডাকিতাম সানা গলায়, শুনাইত যেন আয়ু—উ—উ—উ। আর সুর দ্বিতীয়ার চাঁদের মত সরু, সেই রকম খোঁচাল। ইংরেজী যেমন চাঁচাছোলা, হিন্দী তেমন হইত না, কারণ, হিন্দী শিখিয়াছিলাম বাড়ীর চাকরদের কাছে, আর তাহারা সব পাটনা জেলার লোক। ভাল হিন্দুস্থানী ভাষা শুনিলে হাঁ করিয়া থাকিতাম। বরং সেই পাটনেয়ে হিন্দী বলিতাম, তবু পারতপক্ষে বাঙ্গালা বলিতাম না। কেবল মায়ের কাছে বাঙ্গালা ছাড়া উপায় ছিল না।

ফ্যাসানের দিকে মন ছিল খুব। ভইল আর জর্জ্জেট ছাড়া কিছু চোখেই লাগিত না। সিল্ক পরিতাম ফ্রেঞ্চ, স্লিপার আর জুতা ভাল বিলাতী। ফ্যাসান চলিয়াছিল বেঁটের দিকে। বেঁটে ছাতার বাঁট, বেঁটে মাথার চুল, বেঁটে ঘাগরার কাট। ঘাগরা কিছুদিন আগেই আমার বাদ পড়িয়াছিল, সাড়ী পরিতাম। আমি আবার মাথায়ও বেঁটে, সেটা আমার ভাল লাগিত না। খুব উঁচু হীলওয়ালা জুতা পরিতাম। ছবিতে দেখিতাম, ফ্লাপররা ত বেঁটে নয়, ছিপছিপে, কাঠ-কাঠ গড়ন, আমার তেমন হইল না কেন ? রোগা হইবার জন্ত কত কি করিতাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইত না। আরসীতে দেখিতাম, গালদুটো ফুলোফুলো, নিজের গালে চড়াইতে ইচ্ছা হইত। এ-দিকেও বাড়িতে আরম্ভ হইয়াছিল, শেষে কি তেলের কুপো হইয়া উঠিব ? আমার নাম ললিতা, কিন্তু ডাকনাম লিলি। চিঠি-পত্রে আমি স্বাক্ষর করিবার সময় লিলিই লিখিতাম, কেবল স্কুল-কলেজের খাতায় আর এক্জামিনের কাগজে ও নাম চলিত না।

স্কুলে আর কলেজে আমাদের সঙ্গিনী ছিল অমলা। তাহার উপর আমাদের হিংসাও হইত, তাহাকে লইয়া স্পর্দ্ধাও করিতাম। হিংসা, কারণ, আমরা কেহই তাহার সমকক্ষ ছিলাম না। ইংরেজীতে প্রথম, গণিতে প্রথম। তাহার মত কেহ ইংরেজী লিখিতে বা বলিতে পারিত না। আমরা পড়িতাম ফ্রেঞ্চ, সে পড়িত সংস্কৃত। বাঙ্গালা সকলের অপেক্ষা ভাল জানিত। স্কুলে তাহার নাম সকলের মুখে, কলেজে প্রোফেসররা তাহাকে বিশেষ যত্ন করিয়া পড়াইতেন, সর্ব্বদা তাহার প্রশংসা করিতেন। শুধু লেখা-পড়ায় নয়, অমলার রূপের তুলনা ছিল না। আমাদের অপেক্ষা মাথায় অনেক বড়, তন্বঙ্গী, লাবণ্যময়ী। একমাথা চুল, আমাদের মত সে বব করিত না। সাদাসিধা কাপড়-চোপড়, কিন্তু তেমন রূপ সাজাইবার কি প্রয়োজন ? সদা হাস্তমুখী, অহঙ্কারের লেশ ছিল না। এ-দিকে অমলা ধনীর কন্যা, ব্যয়সঙ্কোচের কোন কারণ ছিল না। পরীক্ষায় স্কলারশিপ পাইয়াছিল। সমস্ত টাকাই দান করিত। সেই জন্য আমরা স্পর্দ্ধা করিতাম, বলিতাম, অমলার মত মেয়ে কোন স্কুল-কলেজে নাই।

এক দিন আমার কথায় অমলা দিদিমার ওখানে গিয়াছিল। অর্থাৎ তাহার মোটরে আমি তাহার সঙ্গে গিয়াছিলাম। তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া দিদিমার কি আহ্লাদ ! যে বইয়ের কথা পাড়েন, সেটাই অমলার পড়া, তার বিষয়ে সব বলিতে লাগিল। অমলা আজেবাজে কথা কহিবার মেয়ে নয়, সব তলাইয়া বুঝিত। দিদিমা সমাদর করিয়া অমলাকে আর আমাকে জলখাবার খাওয়াইলেন। বলিলেন, মেয়ে দেখলে চক্ষু জুড়োয়, কথা শুনলে কাণ জুড়োয়। যেমন রূপ, তেমনি গুণ। পাশ ক'রে এমন মেয়ে হয় ত বুঝি।

আমি বলিলাম, দিদিমা, অমলার কথা ছেড়ে দাও, ওর মত একটি মেয়েও পাবে না। তাই ত তোমাকে দেখাতে এনেছি।

—দেখে আমার চক্ষু সার্থক হ'ল।

বলিয়া দিদিমা অমলার মুখে মাথায় হাত বুলাইলেন।

তাহার গোঁপায় হাত দিয়া আমার বব করা চুল দেখাইয়া বলিলেন, এ রকম বাবরি কাটা চুল তোমার কেমন লাগে ?

অমলা হাসিমুখে বলিল, আজকাল ঐ রকম হয়েছে।

—আজকাল কি কাল বল দেখি ? দেখছ সব বেঁটে হয়ে আসছে ? মাথার চুল বেঁটে, গায়ের জামা বেঁটে, তার হাত উড়ে গিয়েছে, মাথায় দেবার ছাতা বেঁটে, আর যারা একেবারে মেম সাজেন, তাঁদের ফরাক বেঁটে। কেন সব বেঁটিয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পার ? বেগুন গাছে আঁকশি দিয়ে বেগুন পাড়বার আর বড় দেরী নেই।

অমলা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, দিদিমা ! এমন কথা ত কারুর মুখে শুনি নি। তা হ'লে ত কলির সন্ধ্যে নয়, দুপুর রাত।

—ঠিক কথা ! ভারি রাত্রি। কি রে ললিতে, তুই কি বুঝলি ?

দিদিমা আমাকে লিলি বলিতেন না। আমি বুঝিলাম আমার মাথা আর আমার মুণ্ড। মানুষ আঁকশি দিয়া বেগুন পাড়িবে, এ কথা কি গলিভরের গল্পে আছে ? তাহা হইলে দিদিমা জানিবেন কেমন করিয়া ? আমি বলিলাম, আমি ত বুঝতে পারলাম না।

দিদিমা অমলার গা টিপিয়া বলিলেন, শুনলে কথা ? পাশ করা মেয়েদের এই রকম বিদ্যে।

অমলা একটু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, আমাদের আগেকার ভাল বই সব এখন অনেকে পড়ে না। তাতে আমাদেরই ক্ষতি হয়।

আমরা আসিবার সময় দিদিমা অমলার থুঁতিতে হাত দিয়া, হাতে চুম্বন করিয়া বলিলেন, যদি পার ত কখনও কখনও এস। তোমার সঙ্গে কথা ক'য়ে আমার বড় তৃপ্তি হয়েছে।

গাড়ীতে আমি অমলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মানুষ আঁকশি দিয়ে বেগুন পাড়বে, ও কোন্ দেশী গল্প ?

অমলা বলিল, ও কলিকালের কথা। বড় মহাভারতে আছে।

আমি ত মহাভারতের সব খবরই রাখি !

দিদিমা অমলার বাড়ীর ঠিকানা জানিয়া লইয়াছিলেন। তাহার পরদিন কলেজে আসিয়াই অমলা আমাকে ধরিল। বলিল, ওরে লিলি ! কি হয়েছে জানিস ?

—কি হয়েছে ?

আজ সকালবেলা দিদিমা আমাকে তত্ত্ব করেছেন। একখানা ভাল দেশী সাড়ী আর দু'থালা সন্দেশ আর রসগোল্লা।

—তোর সব দিকেই কপাল-জোর ! দিদিমা আমাদের সেই পূজার সময় একবার মনে করেন।

—তত্ত্ব দেখে মায়ের এত আহ্লাদ হয়েছে যে, তিনি আমাকে নিয়ে দিদিমার সঙ্গে দেখা করবেন।

অমলার সঙ্গে কাহার কথা ! দিদিমা তাহাকে একবার দেখিয়াই মুগ্ধ হইলেন।

৩

ছিলাম আমরা দিব্য নিশ্চিন্ত হইয়া কলেজের আর ঘরের ছোটখাট সুখ-দুঃখ লইয়া, হঠাৎ সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সের পর্ব্বতপ্রমাণ ঢেউ লাগিয়া সব ভাসিয়া গেল। সব স্কুল-কলেজে পিকেটিং, সব যায়গায় জাতীয় ধ্বজা আর সকলের মুখে গানের ধুয়া—ঝণ্ডা উঁচু রহে হমারা ! কোথায় গেল পড়াশুনা, কোথায় রহিল ফ্যাসানের সাজগোজ ! খদ্দর না পরিলে পথে চলা ভার। পথের মাঝখানে ছোট ছোট মেয়েরা সাড়ীর আঁচল ধরিয়া জিজ্ঞাসা করে, এটা দেশী না বিদেশী ? কি জ্বালা ! কি কাপড় পরিয়াছি, তাহারও কৈফিয়ৎ দিতে হইবে, নহিলে নিস্তার নাই। বিদেশী কাপড় পরিয়া পথে বাহির হওয়া বিপদ। টিটকারী দেয়, ঠাট্টা করে, আবার এক এক মেয়ে বলে, আমরা খদ্দরের সাড়ী দিচ্ছি, ও কাপড় জ্বালিয়ে ফেল। বাড়ীতে বাবা মা ভয়ে কাঁটা, কখন্ কি হয়। পথে সব গান করিয়া চলিয়াছে আর মাঝে মাঝে জয়ধ্বনি। বৈঠকখানার ঘরে আসিয়া বাবাকে বুঝাইয়া বলে, বিদেশী সব বর্জ্জন করুন। মাকে বলে, আপনাদের বাড়ীতে চরকা আছে ? না থাকে, আমরা দিয়ে যাব, পরে দাম দেবেন। আমার হাতে দুইটা তকলি গুঁজিয়া দিয়া বলে, এতে সূতাকাটা খুব সোজা, পথ চলতে চলতে সূতা তৈরী হয়।

আমরা কয় জন পাশ কাটাইয়া বেড়াই, যে দিকে স্বদেশীর বেশী হাঙ্গামা, সে দিকে বড় একটা পা বাড়াই না, তবে সাহস করিয়া আগের মত বিদেশী কাপড় পরিয়া যেখানে সেখানে যাইতাম না। আমরা জানিতাম, চিরকাল যেমন আছে, সেই রকম থাকিবে, এ আবার কোথা হইতে একটা এলোমেলো বাতাস আসিয়া উপস্থিত। আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। অমলার কাণ্ড দেখিয়া

আমি অবাক। কোথায় রহিল তাহার স্কলারশিপ আর লেখাপড়া! পিকেটিং বল, প্রভাতফেরী বল, সভা বল, অমলা সকলের আগে। মেয়েদের বলিত, এখন কেতাব-পত্র রাখ, দেশের কায কর। দিন নাই, রাত্রি নাই, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, অমলা সকল কাযে সকলকে উৎসাহিত করিতেছে। সভাতে তাহার বক্তৃতা শুনিলে মনে হইত, যেন জ্বালাময়ী বিদ্যুৎশিখা তাহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া শ্রোতাদিগকে তড়িচ্চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে। কথা ত শুধু মুখের নয়, তাহার হৃদয় হইতে যেন প্রবল বন্যা উৎসারিত হইয়া শ্রোতাদের হৃদয় প্লাবিত করিত, তাহার নিজের উত্তেজনা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত। অমলার প্রখর বুদ্ধি তাহার মস্তিষ্ক ছাড়িয়া তাহার হৃদয়ে আশ্রয় লইল। আর যুক্তির প্রয়োজন নাই, তর্কের অবকাশ নাই। দেশের জন্য ত্যাগক্লেশ স্বীকার করিবে, সে কথা কি কাহাকেও যুক্তির সহায়তায় বুঝাইতে হইবে? দেশের দিকে চাহিয়া দেখ, নিজের হৃদয়ের প্রতি চাহিয়া দেখ। কাহাকেও কিছু বুঝাইতে হইবে না, কাহাকেও কিছু বলিতে হইবে না! যদি দেশকে মা বলিয়া জান, তাহা হইলে সন্তানের কায কর।

এ সকল কথা অমলার, আমার নয়। সে যেমন করিয়া বলিত, আমার সাধ্য নাই যে তাহার কিছুমাত্র আভাস দিতে পারি। ঘরে কি বাহিরে কে তাহাকে বুঝাইবে, কে তাহাকে আটক করিবে? অবশেষে পিকেটিং করিবার অপরাধে এক দিন তাহাকে পুলিস ধরিয়া লইয়া গেল।

আমি তাড়াতাড়ি দিদিমাকে খবর দিলাম। তাঁহার দুঃখ-ভাবনা হওয়া দূরে থাকুক, তিনি অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, বলিলেন, বেশ হয়েছে, আমি খুব খুসী হয়েছি, অমলার জন্য আবার দুঃখ কি?

অমলার দুই মাস কারাদণ্ড হইল। সে হাসিতে হাসিতে জেলে গেল।

এই সময় আমি দিদিমার কাছে ঘন ঘন যাওয়া-আসা করিতাম। দিদিমা ভারী ব্যস্ত। কত রকম লোক তাঁহার কাছে আসিত, কখন স্যাকরা, কখন বেনারসী সাড়ী-ওয়ালা, কখন জৈন জড়োয়া-গহনাওয়ালা। ইহাদের সহিত দিদিমার কি কায? আমি এক দিন রঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, হ্যাঁ, দিদিমা, তুমি কি গহনা গড়াবে না কি?

দিদিমা মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিলেন। তিনি যেন পাকা আমটি, হাসিমুখে তাঁহাকে বড় সুন্দর দেখাইত। বলিলেন, কবে কোন্ দিন ম'রে যাব, গহনা ত আমার পরতে নেই, দেখতে দোষ কি?

এক দিন গিয়া দেখি, দিদিমার বাড়ীর সম্মুখে একখানা চকচকে নূতন মোটর। মোটরে করিয়া কে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে?

দিদিমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, দিদিমা, বাইরে দাঁড়িয়ে কার মোটর?

—ওখানা আমি কিনেছি। রাখবার জন্য ঘর তৈরি হয়েছে, চালাবার লোকও রেখেছি। তোরা মাঝে মাঝে বেড়াতে যাস্।

ব্যাপারখানা কি? আগে গহনা, তার পর মোটর। দিদিমার মাথা খারাপ হয় নাই ত?

দুই মাস দেখিতে দেখিতে গেল। যে দিন সকালবেলা অমলার কারামুক্তি হইল, জেলের সম্মুখে লোকে লোকারণ্য। তাহার বাপ-মা গাড়ী করিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার পর দিদিমা তাঁহার নতুন মোটর হইতে নামিলেন। পরণে গরদ, এক জন দাসী ধান, দূর্ব্বা, কেশর, চন্দন হাতে নামিল। দিদিমার হাতে এক ছড়া যুঁই-ফুলের খুব মোটা গড়ে মালা। অমলার মা দিদিমাকে বেশ জানিতেন, পায় হাত দিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন।

অমলা বাহিরে আসিল। চারিদিকে হুলুধ্বনি, চারিদিকে শঙ্খধ্বনি। জয়ধ্বনিতে আকাশ মুখরিত হইল। অমলার রূপ কিছুমাত্র ম্লান হয় নাই। অল্প একটু শীর্ণ হইয়া থাকিবে, কিন্তু তাহাতে তাহার দেহকান্তি যেন আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। ছিল মানুষী, এখন দেখাইতেছিল, যেন দেবী। নিরাভরণা, উজ্জ্বল আয়তলোচনা, জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি। দিদিমাকে দেখিয়া প্রথমে তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। দিদিমা তাহার চিবুকে হাত দিয়া তাহাকে চুম্বন করিয়া, ধান-দূর্ব্বা-চন্দন দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহার ললাটে কেশরের কোঁটা পরাইয়া দিয়া তাহার গলায় মালা পরাইয়া দিলেন। অমলা আবার তাঁহাকে প্রণাম করিল। তাহার পর বাপ-মাকে প্রণাম করিল।

দিদিমা বলিলেন, অমলাকে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য আমি গাড়ী নিয়ে এসেছি।

অমলার বাপ বলিলেন, বেশ ত, আপনার গাড়ীতেই যাবে। আমরা নিজেদের গাড়ীতে যাচ্ছি

দিদিমা বলিলেন, তা কেন, তোমরা সকলেই আমার গাড়ীতে এস। তোমাদের গাড়ী বাড়ী ফিরে যাক্।

অমলার বাপ শোফরের পাশে বাহিরে বসিলেন। দিদিমা, অমলার মা আর অমলা ভিতরে।

জনতার লোকরা আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। মোটর চলিয়া গেল।

৪

তিন চারি দিন পরে দিদিমা অমলাকে দিনের বেলা আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। আমারও নিমন্ত্রণ হইল। আমাদিগকে আনিবার জন্য দিদিমা নিজের মোটর-গাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

আমরা গিয়া দেখি, দিদিমা একখানা মাদুরের উপর বসিয়া আছেন। অমলাকে সমাদর করিয়া নিজের পাশে বসাইলেন।

খাবারের ঘটা দেখিয়া অমলা বলিল, দিদিমা, এ কি করেছেন? এই এত রকম জিনিস কি আমরা খেতে পারব?

—যা পার, তাই খাও। তোমাকে খাবার সাজিয়ে দিয়েই আমার আনন্দ।

আহার সমাপ্ত হইলে দিদিমা বলিলেন, এইবার তোমাকে সাজিয়ে দেব।

অমলা অবাক্। বলিল, সে আবার কি, দিদিমা? আমাকে আবার সাজাবেন কেন?

দিদিমা অমলার মুখখানি দুই হাতের ভিতর লইয়া বলিলেন, আমার অনেক দিনের সাধ, সে সাধ আজ মেটাব।

ঘরের ভিতর অমলাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া দিদিমা বাক্স হইতে নূতন দামী বেনারসী সাড়ী বাহির করিলেন। খুব ফিঁকে বাদামী রং, তাহার উপর রূপার ফুল কাটা। অমলাকে বলিলেন, তুমি নিজের কাপড় ছেড়ে এই সাড়ী পর।

অমলা আর একটা ঘরের ভিতর গিয়া নূতন সাড়ী পরিয়া আসিল। তাহার পর দিদিমা লোহার সিন্দুক খুলিয়া, নূতন চামড়ার বাক্স বাহির করিয়া একটি ছোট চাবি দিয়া খুলিলেন। বাক্সর ভিতরের অলঙ্কার দেখিয়া আমাদের চক্ষু ঝলসিয়া উঠিল সমস্ত জড়োয়া:—হীরা, পান্না, মুক্তা, চুণি।

দিদিমা অমলাকে সাজাইতে আরম্ভ করিলেন। অমলা লজ্জাবনতমুখী, কুণ্ঠিতা। কহিল, দিদিমা, আমি ত আর রাজকন্যা নই যে, আমাকে এ সব গহনা পরাচ্ছেন?

দিদিমা বলিলেন, রাজকন্যার কি ধার ধারি? আমাদের দেশে কুমারী করে, আমি তোমাকে মা সাজাচ্ছি। তোমার মা, আমার মা, যাঁর কোলে মানুষ হয়েছি, যাঁর কোলে শেষে স্থান পাব। জননী জন্মভূমি। এক দিন তিনি যেমন হবেন, তোমাকে সাজিয়ে তাই মনে করি।

অমলার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দিদিমা তাহার সর্ব্বাঙ্গে আভরণ পরাইয়া দিলেন, তাহার মাথায় দীপ্তরশ্মি টায়রা সাজাইয়া দিলেন। তাহার পর একটু সরিয়া গিয়া অমলাকে দেখিতে লাগিলেন।

সহসা অমলার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইল, তাহার দুই চক্ষুতে কূলে কূলে অশ্রু পূরিয়া আসিল। কোথায় রহিল বহুমূল্য অঙ্গবস্ত্র, কোথায় রহিল রত্নখচিত অলঙ্কাররাশি। ছিন্ন বল্লীর ন্যায় অমলা ধরাতলে লুটাইয়া পড়িল।

মাটীতে মুখ দিয়া অমলা আকুল-কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল, ধরিত্রি, দ্বিধা হও, দেখাও আমার মাকে। একবার মা উঠেছিলেন, রত্নসিংহাসনে অধিষ্ঠিতা, চারিদিক্ আলো ক'রে, সীতাকে কোলে নেবার জন্য। ও মা, মা আমার, তুমি কি শুধু সীতার মা? কত কোটি সন্তান-সন্ততির মা তুমি, এস আবার তোমার সেই রাজরাজেশ্বরীর সিংহাসনে, চক্ষুর জলে তোমাকে অভিষেক করি, তোমার চরণারবিন্দে কোটি কোটি প্রণাম করি! এস মা! এস মা! এস মা!

দিদিমার দুই চক্ষু বহিয়া অজস্র অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। আমারও পোড়া চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল।

কতক্ষণ পরে অমলা স্থির হইল। উঠিয়া বসিয়া আত্মসম্বৃত হইল, অঙ্গের অলঙ্কার খুলিবার উদ্যোগ করিল। দিদিমা তাহার দুই হাত চাপিয়া ধরিলেন, বলিলেন, আমি তোমাকে দিয়েছি, তুমি খুলে ফেলছ কেন? এই রকম ক'রে বাড়ী যাও, তোমার মাকে বলো, তোমার দিদিমা তোমাকে দিয়েছে। তোমাকে আমার গহনা পরানো সার্থক হ'ল, তুমি মায়ের নাম শুনিয়েছ।

অমলা কোন কথা কহিল না, নীরবে দিদিমার পদধূলি লইল। বাড়ী ফিরিবার পথে আমার সঙ্গেও কথা কহিল না। দিদিমা সাড়ী ও গহনার বাক্স সঙ্গে দিয়াছিলেন। এক জন বলবান্ দরোয়ান সোফরের পাশে বসিয়াছিল।

এই সে দিন অমলার বিবাহ হইয়া গেল। দিদিমা খুব ঘটা করিয়া তত্ত্ব করিয়াছিলেন। সে সব কথা শুনিয়া কি হইবে?

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

সাহিত্যে হাস্যরস

৪

ইংলণ্ডে Reynard শৃগাল সাহিত্য যখন প্রচলিত হয়, ফরাসী দেশে তখন কিম্বা তাহার কিছু পরে, শৃগাল ও গৰ্দ্দভকে বাদ দিয়া ঘোড়াকে নায়ক ধরিয়া গল্প সৃষ্টি করা হয়। সামাজিক দুর্নীতি, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি তাহার চরিত্রে দেখান হইত। মধ্যযুগের প্রারম্ভে বিবাহপদ্ধতি কি রকম ছিল, তাহা ঘোড়ার কাহিনী হইতে এখন আমরা সংগ্রহ করি। সব দেশে সব সমাজেই বিবাহের সময় আনন্দ-স্ফূৰ্ত্তি করার একটা প্রথা বহুকাল হইতেই প্রচলিত আছে। "বাসর"-ঘরের কাহিনী এখনও হয় ত অনেকেরই মনে থাকিতে পারে। যখন কোন লোক দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিত অথবা যাহাদের বিবাহ প্রতিবেশিগণ বিশেষ প্রীতির সঙ্গে উপভোগ করিতে ইতস্ততঃ বোধ করিত, তখন বিবাহ-বাসরের সম্মুখে গ্রামের লোকেরা নানারকম বেসুর বাজনা আমদানী করিত। ইহাকে Charivari নাম দেওয়া হইত। কসাইদের মধ্যে বিবাহ হওয়ার সময় ইংলণ্ডে "হাড় ঠক্‌ঠকি" করার প্রথা ছিল। কোন কোন প্রদেশে বিবাহ-বাসর ভাঙ্গিয়া দেওয়ার চেষ্টা হইত এবং 'নাচন কুন্দন' অসম্ভব বিশ্রী শব্দ প্রভৃতি করা হইত এবং যৌতুক দ্রব্যাদি নষ্ট করার চেষ্টা হইত। তাহা শান্ত রাখার জন্য গ্রাম্য বিদায় ও প্রীতিভোজের আয়োজন হইত (বোধ হয়, এখনও আধুনিক সমাজে সে প্রথা আছে)। অশান্ত, নষ্ট করার উদ্যোক্তাগণ তখন শান্ত হইয়া নানারূপ হাসি-ঠাট্টা-বিদ্রূপে সকলের সঙ্গে প্রীতিসখ্য সংস্থাপনের চেষ্টা করিত। Chalvaricum অথবা charavallium কিম্বা corivarium প্রভৃতি আইন প্রণয়নের ঐতিহাসিক তথ্যের মধ্যে উপরি-উক্ত প্রথাগুলি আমরা এখন কল্পনা করিতে পারি। অভিধানে উপরি-উক্ত কথাগুলির অর্থ হইতে বিবাহসম্বন্ধীয় কুপ্রথাগুলির অস্তিত্ব ও ইতিহাস বিবেচনা করিতে পারি। ঘোড়ার কাহিনীতে ফরাসী দেশে এই সব আখ্যান বেশী ছিল। (ইংলণ্ডে আধুনিক সমাজে বিবাহের সময়, কাল বিড়াল দেখা, ঝাঁটা ও ছেঁড়া জুতা প্রদর্শন করা ইত্যাদি সৌভাগ্যের চিহ্ন বলিয়া এখনও সমাদৃত হয়। ইহা কুসংস্কার কি না, বিশেষজ্ঞরা বলিতে পারেন)।

মধ্যযুগে হাস্যরস ইতিহাস সম্বন্ধে য়ুরোপে একটি বিষয় লক্ষ্য হয়। পুরাকাল হইতে পোষাক-পরিচ্ছদ লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা প্রত্যেক সমাজেই একটা হাস্যরসের জিনিষ হইয়া আছে। এখন সার্কাসের clown এবং যাত্রাদলের সংয়ের যে পোষাক আমরা দেখি, তাহা পুরাকালের clown এবং সংএর পোষাক হইতে বেশী তফাৎ ছিল, তাহা মনে হয় না। পুরাকাল হইতে আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত প্রত্যেক সমাজে পোষাক-পরিচ্ছদের ক্রমশঃ যে পরিবর্ত্তন ও নূতন নূতন আয়োজন হইয়াছে, তাহা বিচার-বিবেচনা করিতে আমরা অনেক মনোরম শিক্ষাপ্রদ জিনিষ পাই। দেহের সৌন্দর্য্যবোধ, লজ্জা-নিবারণের চেষ্টা ও স্বাস্থ্য সহায় এই তিন উদ্দেশ্যে পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করি। তবে সামাজিক উৎসব, রাজদরবার প্রভৃতি বিষয়ে তাহার বিভিন্ন আকৃতি ও বিশেষ মূৰ্ত্তি প্রকরণ করা হইয়া থাকে। ১২শ শতাব্দীতে একশ্রেণীর পদ্য বিশেষ প্রচলিত হইয়াছিল (Danteর পদ্যাবলী দ্রষ্টব্য) যাহাতে পোষাক-পরিচ্ছদের আদবকায়দা (fashion) এবং অহঙ্কার বিশেষ শ্লেষাত্মক satireএ বিবৃত করা হইয়াছে। British museumএ একটি হস্তলিপি (manuscript) পাওয়া যায়, যাহাতে Demon (অথবা Satan, mephistopheles) এর চেহারা, পোষাক সম্বন্ধে শ্লেষ-বিদ্রূপএর সঙ্গে চিত্রিত করা রহিয়াছে। মধ্যযুগে রাস্তা-ঘাটে যাহারা অভিনয় করিয়া মনোরঞ্জন করিত অথবা আসরে বাসরে গান গাহিত, অভিনয় করিত (caricature), তাহাদের মধ্যেও পোষাক-পরিচ্ছদ অনুরূপ করার প্রথা ক্রমশঃ প্রবর্ত্তিত হয়। ভারতবর্ষেও এরূপ ইতিহাস এখনও পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, সব সময়ে এক দল লোক স্থানীয় সমাজে থাকেন—যাঁহারা হাসি-ঠাট্টা গান অভিনয় প্রভৃতি পছন্দ করেন না। মধ্যযুগে গম্ভীর প্রকৃতির ধর্ম্মযাজকগণ সাধারণ আমোদ-প্রমোদ ও কুৎসিত কাহিনী, অঙ্গভঙ্গীর বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হন। মুসলমানদের হদিসে এখন পর্য্যন্ত যেরূপ নিষেধবাক্য আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়, অনেকটা তদ্রূপ নিষেধ আজ্ঞা ও শাসন তাঁহারা করিতেন। কিন্তু যখন স্ত্রী যাজিকা (nuns) ক্রমশঃ ধর্ম্মাধিকরণ churchএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইলেন, তখন হইতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ব্যাপারেও পেশাদার নাচনদার গায়ক বাজীকর প্রভৃতি লোকেরা সংশ্লিষ্ট হইতে আরম্ভ করিল। ইহার ফলে সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উৎসবে হাসি-ঠাট্টা-বিদ্রূপগুলি গ্রাম্যদোষদুষ্টতা কতক পরিমাণে ত্যাগ করিল, তাহা বিশেষ পরিমার্জ্জিত ও উচ্চ অঙ্গের হইতে আরম্ভ করিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসেও এরূপ সামাজিক ধারা আমরা দেখিতে পাই।

ল্যাটিন ভাষার mimus, minister এবং অন্যান্য ভাষার প্রতিশব্দ Scurra, Jocifto, Pantomimus, Gioco, Jogelere menetrier, fabula, Troubadour প্রভৃতি শব্দের ঐতিহাসিক অর্থ হইতে আমরা বিভিন্ন সমাজের হাস্যরস সাহিত্যের ধারা অনুমান করিতে পারি। এ সম্বন্ধে কৌতূহলী পাঠককে ভাষাতত্ত্ব (philology) পড়িতে অনুরোধ করি।

Troubadour যাহাদিগকে বলিত, তাহারা ভারতবর্ষের পশ্চিমদেশীয় নাচওয়ালা এবং নাচ-ওয়ালীর মত রাস্তায় ও গৃহদ্বারে Guitar (এক রকম সেতার) নামক যন্ত্রের সাহায্যে গান করিত। তাহাদের গল্পের মধ্যে অনেক কুৎসিত অশ্লীলতা থাকিত। যাঁহারা তাহা শুনিতে ইচ্ছুক হইতেন, তাঁহারা তাহাদিগকে নিজের গৃহে লইয়া গোপনে আমোদ উপভোগ করিতেন। তাহাদের গান ও রচনা নিজেরাই তৈয়ারী করিত এবং তাহাতে বিরহব্যথা এবং সামাজিক দুঃখ কান্নাকাটি কিছু যেন বেশী থাকিত। মধ্যে মধ্যে দু'একটি গানে হাস্যরসমধুর আস্বাদ পাওয়া যাইত। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে একটি গান উদ্ধৃত

করিলাম। (পদ্যে অনুবাদ করিতে লেখক অক্ষম বলিয়া ইংরাজী ভাষাতেই তাহা দেওয়া হইল)

"My boy, if you'd wish to make
constant your Venus
Attend to the plan I disclose
Her first naughty word you must meet
with a menace
Her next—drop your fist on her nose.
When She's bad, be you worse,
When She Scolds, do you curse,
When She scratches just treat her to blows.

Defame and lampoon her, be rude and uncivil
Then you'll vanguish the haughtiest dame
Be proud and presumptuous, deceive like the d—l
And ought you wish you may claim
All the beautiful, slight
To the plain, be polite,
That's the way the proud hussies to tame."

ইহার উত্তরে "Venus" কি বলিয়াছিলেন, তাহা এখন আর পাওয়া যায় না। সে যুগে স্ত্রীকে "Goods and chattels" শ্রেণীতে গণ্য করা হইত এবং "গরু" ও "জরু"কে এক বিবেচনা করা হইত, তখন হয় ত উপরি-উক্ত উপদেশের সার্থকতা কিছু ছিল। মহাকবি সেক্সপীয়ার Taming of the Shrew নাটকে তাহার জলিত দৃষ্টান্ত দিয়া গিয়াছেন। আধুনিক suffragist ও নারী-প্রগতির যুগে এ রকম উপদেশ পালন করিতে যাওয়া কতখানি "মারাত্মক" ব্যাপার, তাহা সহজেই অনুমেয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, নারী ও পুরুষের উক্তি, "তোমরা ও আমরা" পদ্যে এইরূপ একটি প্রশ্নোত্তর দিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক কবি এবং মহীয়সী "কবিনী" পরস্পর কিরূপ উপদেশ দেন এবং প্রশ্নোত্তর করেন, তাহা জানিতে অনেকেই কৌতূহলী হইবেন সন্দেহ নাই। মধ্যযুগে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, যাহা সংক্ষেপে এখানে বলা যাইতে পারে। তখন কোন কোন স্থানে গোপনে অথবা প্রকাশ্যে একটা "ভালবাসার মজলিশ" (court of love) সংগঠিত হইয়াছিল,—সেখানে প্রেম ও ভালবাসার "সাহিত্য" চর্চ্চা করা হইত। আধুনিক সভ্যসমাজে তাহার অস্তিত্ব একেবারে যে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। তখন অবশ্য কতকগুলি আইন-কানুন বিধি মজলিশের সভ্যগণকে স্বীকার করিয়া লইতে হইত। মধ্যে মধ্যে সে মজলিশে প্রেমতত্ত্ব বিচার হইত এবং বিচারক থাকিতেন,—কোন উচ্চপদস্থ উচ্চবংশসম্ভূত বড়লোক শ্রেণীর শিক্ষিতা স্ত্রী। যে-সব আইন-কানুন ও বিধি স্বীকার করিয়া লইতে হইত, তাহার মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। (code of love), (বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত বিবাহ আইন দ্রষ্টব্য)

১। বিবাহ, ভালবাসার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে কোন ওজর ও জবাব নহে।

২। যে মনের কথা গোপন রাখিতে না পারে, তাহার বিবাহ করা উচিত নহে।

৩। কোন লোকের দু'জন ভালবাসার পাত্র এক সময় থাকিতে পারে না।

৪। যাহার বিবাহ করিতে দিধা ও শঙ্কা বোধ হয়, তাহার ভালবাসাই উচিত নয়।

৫। ভালবাসার নিজের ক্ষমতাতেই লোকে ভালবাসে, তাহার জন্য কোন বহিঃশক্তি দরকার হয় না, তাহা হয় ক্রমশঃ বাড়ে, নয় কমে—তাহা স্থির থাকে না লোপও পায় না।

৬। ভালবাসার উচ্ছ্বাস শীঘ্র ব্যক্ত করিলে, তাহা বেশী দিন স্থায়ী হয় না।

৭। যে নিজের আনন্দে বিভোর, সে বেশী ভালবাসে না।

৮। এক জন স্ত্রীলোককে দুই জন লোক অথবা এক জন লোককে দুই জন স্ত্রীলোক ভালবাসিতে পারে, তাহাতে কোন বাধা নাই, কিন্তু এক জন স্ত্রীলোক দুই জন লোককে ভালবাসিতে পারে না, ইত্যাদি, ইত্যাদি। (৩ নং দ্রষ্টব্য)

উপরি-উক্ত বিধি-নিয়মগুলি wit শ্রেণীর কথাসমষ্টি এবং ধর্ম্ম-যাজকদের (monk) উপদেশের মত শুনিতে বোধ হয়। শিক্ষিত রসিক সমাজের আড্ডাতে উপরি-উক্ত সূত্রগুলি লইয়া তর্ক ও বাগ্‌যুদ্ধ হইত, তাহার ইতিহাস কিছু পাওয়া যায়।

Court of love এ ভালবাসা তত্ত্বের মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রের মীমাংসার মত চেষ্টা ও তর্ক কিরূপ হইত, নিম্নে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল—

প্রশ্ন :—বিবাহিত স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কি যথার্থ ভালবাসা থাকিতে পারে?

উত্তর :—আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, তাহাদের মধ্যে ভালবাসা থাকিতে পারেই না। কারণ, বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষদের মধ্যে একে অন্যের জন্য অনেক জিনিষ ত্যাগ ও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু প্রকৃত ভালবাসাতে পরস্পর পরস্পরকে অযাচিতভাবে ও দরকার আবশ্যকতার মাপদণ্ডে ওজন না করিয়া, যথেচ্ছ দান করিতে পারে। অতএব বিবাহিত স্ত্রীপুরুষদের মধ্যে প্রকৃত ভালবাসা থাকিতে পারে না (উপরি-উক্ত বিচার করার ফলে বোধ হয় এখনও সাহেব মহালে শুনিতে পাওয়া যায়, বিবাহ করা অপেক্ষা courtship-এর সময়টাই বেশী সুখের। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে এরূপ Falacyর আধিক্য অধিক পরিদৃশ্যমান হয়)।

আর একটি প্রশ্ন :—যদি কেহ পূর্ব্বে এক জনকে ভালবাসে এবং পরে আর এক জনকে বিবাহ করে, তবে কি পূর্ব্বের ভালবাসা লোপ পায়?

উত্তর :—দুজনকে ভালবাসিতে কোন বাধা নাই, তবে যে কোন এক জনের ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করিতে হইলে তাহা মুক্তকণ্ঠে জানাইয়া দেওয়াই ভাল।

(আধুনিক উপন্যাস-সাহিত্যে এই প্রশ্নের মীমাংসা অসংখ্য-ভাবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়। ইহাকেই ইংরাজী ভাষাতে Eternal Triangle নাম দেওয়া হয়)।

মধ্যযুগের রসালাপের দৃষ্টান্ত হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, বহু পুরাকাল হইতে প্রত্যেক সমাজে ভালবাসা লইয়া এতরকম লীলাখেলা হয়, যাহা এতদিন পর্য্যন্ত সময় কোন মীমাংসা করিয়া দিতে পারে নাই। ইহা সাহিত্যের যেন একটা চিরন্তন ধারা।

Midsummer Night's Dream ভালবাসা সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট Satire অনেকে এরূপ বলিয়া থাকেন।

মধ্যযুগের হাস্যরস সম্বন্ধে উদাহরণ দিতে গেলে আর কয়েক প্রকার ধারা উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না। ইহা বিভিন্ন দেশের তদানীন্তন সাহিত্য। এখনও তাহার পুনরুল্লেখ ও চর্ব্বিত-চর্ব্বণ সময় সময় পাওয়া যায়। যথা—পারস্য দেশের "দোপেঁয়াজী অভিধান" হইতে উদ্ধৃত—

রাজা	=	দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মহীন অলস ব্যক্তি (unemp'oyed শ্রেণীর মধ্যে অবশ্য নয়)।
মন্ত্রী	=	জীবনের সব রকম দুঃখ-কষ্ট হা-হুতাশের লক্ষ্যপূর্ণ নিশানা (Target)।
শৌর্য্যবীর্য্য	=	ভয় পাইয়া ভয় গোপন করা।
সুমিষ্ট ফল	=	নিষিদ্ধ, অথবা চুরী করিয়া যে ফল খাওয়া যায়।
তোষামোদকারক	=	বিনা মূলধনে ভাল ব্যবসা করে।
উকীল	=	যাহার মিথ্যা কথা বলিতে কোনরূপ দ্বিধাসঙ্কোচ নাই। (অবশ্য পরের জন্য এবং দরকার হইলে নিজের জন্যও)
বিধবা	=	স্বামী মরিয়া গেলে যে তাহার প্রশংসায় মুখর।
আয়না	=	যে তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তোমাকেই মুখ ভেংচায়।
জাতীয় দুর্ঘটনা	=	রাজা প্রজা ভুলিয়া অন্দরমহলে আশ্রয় নেন।
চিকিৎসক	=	মৃত্যুর স্মারক দূত।
কবি	=	অহঙ্কারী ভিক্ষুক।
চাকুরী	=	নিজের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিক্রয়ের মূল্য।
সত্যবাদী	=	যাহাকে সকলেই শত্রুতার চোখে দেখে।
শাশুড়ী	=	গৃহপালিত গোপন চর।
বিশ্বাসী বন্ধু	=	অর্থ টাকাকড়ি (সন্দেহজনক ব্যাখ্যা)।
মিথ্যাবাদী	=	যে কথা বলিতে দশবার ঈশ্বরের নামে শপথ করে।
দারিদ্র্য	=	বিবাহের অবশ্যম্ভাবী ফল, (বাস্তবিক অথবা কাল্পনিক)।
শিক্ষিত লোক	=	যে সবই জানে, কিন্তু জানে না শুধু কি ভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

আকবর বাদশাহের সভাতে এক জন "দোপেঁয়াজী" দরবেশ ছিলেন। (পরিহাসরসিক ডি, এল্, রায়ের "সাজাহান" নাটকে এরূপ এক জন দরবেশের উল্লেখ আছে—অনেকটা বয়স্যের মত)। বাদশাহ এক দিন একটি চৌবাচ্চার ধারে বসিয়া রহস্যালাপ করিতেছেন। এক জন সভাসদের ইঙ্গিতমত বাদশাহ হুকুম করিলেন, প্রত্যেক চাকর তাহাতে একটি করিয়া ডিম রাখিবে এবং এমনভাবে তাহা রাখিবে, যাহাতে প্রত্যেকে প্রত্যেকের স্থাপিত ডিম বাছিয়া আনিতে পারে। ডিম সব রাখা হইলে দোপেঁয়াজী সাহেব আসিলেন। বাদশাহ ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, "আমি স্বপ্ন দেখেছি, এই চৌবাচ্চার মধ্যে অসংখ্য ডিম আছে—স্বপ্ন সত্য কি না দেখিব।" তাঁহার হুকুমমত প্রত্যেক চাকর জলে নামিয়া এক একটি ডিম আনিল। কিন্তু কে কাহার স্থাপিত ডিম আনিল, তাহা লইয়া গোলযোগ বাধিল। বাদশাহ দোপেঁয়াজীকে বলিলেন, "তুমি ডিম বাহির কর, তা' দেখে তবে বুঝিব, আমার স্বপ্ন সত্য।" দোপেঁয়াজী বুঝিলেন, বাদশাহের এ সব তাঁহাকে লইয়া রঙ্গ করা ভিন্ন আর কিছু নয়। আদেশমত তিনি পোষাক ছাড়িয়া চৌবাচ্চার জলে নামিলেন। নামিলেন, কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করিয়া কোন ডিম পাইলেন না। জল হইতে তিনি চীৎকার করিলেন, "কু—কে—ড়ুড়্‌লড়ু, কু—কে ড়ুডল ড়ু"। বাদশাহ আকবর অবাক্ হইয়া গেলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, "এর মানে কি? অমন কর্‌ছো যে?" দোপেঁয়াজী উত্তর করিলেন, "বাদশাহ, যাহারা জলে নামিয়া ডিম 'প্রসব' করিয়াছে, তাহারা সকলেই মুরগী, আমি যে মোরগ, আমি ডিম দিব কোথা হইতে? তাই ডাক দিয়া বাদশাহকে জানাইলাম। মোরগের ডাক কি ভোরে শোনেন নাই?" বাদশাহ উপস্থিত জবাব (wit) শুনিয়া দোপেঁয়াজীকে পুরস্কার দিলেন।

আধুনিক সাহিত্যে ইহার অনুরূপ একটি গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। তাহা শুধু তুলনার জন্য এখানে উল্লেখ করিলাম। একটি স্কুলে এক জন রাজ-কর্ম্মচারী পরিদর্শক যাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, "হংস-ডিম্ব, সন্ধি-বিচ্ছেদ কর ত?" প্রত্যেক ছেলেই উত্তর করিল—"হংসের ডিম্ব ইতি হংসডিম্ব, ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস।" পরিদর্শক মহাশয় বলিলেন, "তোমাদের কোন শিক্ষাই হয় নাই দেখছি, হংস কখন ডিম্ব দেয় কি? সমাস হইবে—হংসীর ডিম্ব।"

মধ্যযুগ হইতে আমরা হাস্যরসপূর্ণ কাহিনীতে দুই শ্রেণীর লোকের পরিচয় পাইয়া আসিতেছি। প্রথম শ্রেণীর লোকদের অলসতার উদাহরণস্বরূপ আমরা "গোঁপ-খেজুরে" নাম দিই এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের আমরা গ্রাম্য Simpleton Rustic Noodles বলিয়া থাকি। লোক কতখানি কি রকম অলস হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয় যে, খেজুর গাছের তলায় শয়ান অবস্থায় গোঁপের উপর একটি খেজুর পড়িয়াছে, রাস্তা দিয়া এক জন লোক ঘোড়ায় যাইতেছে, তাহাকে ডাকিয়া বলা হইতেছে, খেজুরটা তুলিয়া মুখের মধ্যে দিয়া যাও। তাহার আর মুখে দেওয়ার শক্তি, সাহস, ইচ্ছা ও ক্ষমতা নাই। আবার যখন চারি জন অলস ব্যক্তিকে একটি ঘরে বন্ধ করিয়া ঘরে আগুন দেওয়া হইয়াছে, তখন এক জন বলিয়া উঠিল, "কত রবি জ্বলে?" আর এক জন উত্তর করিল, "কে বা আঁখি মেলে?" আগুন যখন গায়ের কাছে আসিল, তখন তৃতীয় ব্যক্তি বলিল (নেহাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বে) "পী, পু" (অর্থাৎ পীঠ পুড়ছে) চতুর্থ ব্যক্তি উত্তর করিল, "ফি, শু" (অর্থাৎ "ফিরে শুও")। বলা বাহুল্য তাহারা আগুনে পুড়িয়া মরিল অথচ অলসতা ত্যাগ করিল না। গল্পটি বিশেষ অতিরঞ্জিত হইলেও "পীপু ফিশু" কথা অলসতার উপমা দিতে আমরা এখনও ব্যবহার করি।

উপকথার মধ্যে একটি গল্প আছে—এক জন রাজা বাধ্য করিয়া বলিলেন, "রাজপুত্রদের যে রকম আলস্যপ্রিয় ভাব দেখছি, তাহাতে যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অলস, তাহাকেই রাজত্ব দিব।" প্রথম পুত্র বলিলেন, "আমি এত অলস যে, আগুনের কাছে বসিয়া থাকিতে আমার এক পা পুড়িয়া গেল ও ফোস্কা উঠিল, তবু আমি সে পা

নড়াই নাই।" অর্দ্ধদগ্ধ পা তিনি দেখাইলেন। দ্বিতীয় পুত্র বলিলেন, "আমার গলাতে একটা দড়ী লাগিয়াছিল—দম বন্ধ হইয়া মারা যাই আর কি? হাতে একটি তরওয়াল ছিল, তবু আলস্যভরে দড়ী কাটি নাই; শেষে অজ্ঞান হইয়া পড়িলে ভৃত্যরা উদ্ধার করে।" তিনি তাঁহার গলায় দড়ীর দাগ দেখাইলেন। তৃতীয় পুত্র বলিলেন, "আমি বিছানাতে শুইয়া ছিলাম, বালিশে ছোট ছোট লাল পিঁপড়া আসিয়া আমাকে আক্রমণ করে। আমি এত অলস যে, চোখের অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত তাহারা কামড়াইয়া ক্ষত-বিক্ষত করিল—তবু আমি একবারও হাত তুলিলাম না, অথবা পাশ ফিরিলাম না।" তিনি ক্ষতবিক্ষত চোখ দেখাইলেন। রাজা স্থির করিতে পারিলেন না, কোন্ পুত্র বেশী অলস। প্রত্যেককেই বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিলেন ও বলিলেন, প্রত্যেকে আশ্চর্য্যজনক জিনিষ লইয়া ফিরিও এবং যাহার জিনিষ অত্যধিক আশ্চর্য্যজনক হইবে, তাহাকে রাজ্য দিব। ইহার পর রূপকথার উপন্যাস আরম্ভ হইল, তাহা শেষ করিতে গেলে, গল্প অনেক দিন পর্য্যন্ত করিতে হয়।

এইরূপ অলস লোকদের কাহিনী অসংখ্য পাওয়া যায়। এখন তাহা প্রবাদবাক্যের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে, উপরে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলাম। বোকা নির্ব্বোধ গ্রাম্য লোকদের কাহিনী তুর্কীস্থান, পারস্যদেশ, আরবদেশ, মিশর, ভারতবর্ষ ও চীনদেশে যেন বেশী প্রচলিত ছিল। এই সব স্থানের গল্প ও কাহিনী ক্রমশঃ য়ুরোপের বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। তুরস্ক দেশের খোজা নসরুদ্দিনের (এফেন্দি) গল্প এখন অনেক ভাষাতে অনুবাদ করা হইয়াছে। প্রবাদ আছে, খোজা সাহেবের বাড়ীতে একবার এক জন চোর ঢুকিয়াছিল। তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে ডাক দিয়া জাগায়। তিনি উঠিয়া চোর আসার কথা শুনিয়া বলেন, "শোভানাল্লা! গোল ক'রো না। চোর কি জিনিষ লয় দেখি—আমার যে কোন মূল্যবান্ সম্পত্তি আছে, তাহা তাহার কাছেই প্রথম দেখিব।"

এক দিন খোজা সাহেবের স্ত্রী তাঁহাকে জব্দ করার জন্য গরম পায়স রাঁধিয়া তাঁহাকে খাইতে দেন। নিজেও এক বাটি পায়স লইয়া তাঁহার কাছে খাইতে বসেন। পায়স যে গরম আছে, তাহা ভুলিয়া স্ত্রী প্রথমে চুমুক দেন ও মুখ পুড়িয়া যায়। তিনি কাঁদিয়া উঠেন। খোজা সাহেব জিজ্ঞাসা করেন—"কাঁদছ কেন?" তাঁহার স্ত্রী বলেন, "আহা, তা! আমার মা পায়স কত ভালবাসিতেন, পায়স পেয়ে তাঁর কথা মনে হওয়াতে শোকে কাঁদছি।" খোজা সাহেব পায়স চুমুক দিয়া গরম বোধ করিলেন ও তাঁহার চোখেও জল আসিল। তাঁহার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাঁদছ যে?" খোজা সাহেব বলিলেন, "আহাহা, কি শ্বাশুড়ীর মেয়েই আমার কাছে আছে, তাই ভাবছি।"

স্ত্রীর কাছে স্বামী, নিজের পিতার আমলে বিড়ালের বিবাহের ঘটা অহঙ্কার করিয়া জানাইলে, স্ত্রী নিজের পিতার "বানরের বিবাহের" ঘটার কথা উল্লেখ করিয়া ছিলেন, সে গল্প এই প্রসঙ্গে মনে পড়িবে।

এক জন লোক খোজা সাহেবের গাধাটি ধার করিতে আসে। খোজা সাহেব বলেন, "গাধা বাড়ীতে নাই, চরিতে গিয়াছে।" ইতিমধ্যে যে কোন কারণেই হউক, গাধা চীৎকার করিয়া উঠে ও লোকটি জিজ্ঞাসা করে—"ওই ত গাধা আছে, আপনি মিথ্যা কথা বলছেন?" খোজা এফেন্দি সাহেব বলিলেন, "তুমি কেমন লোক হে? আমার মত প্রবীণ প্রাচীন বৃদ্ধ ধার্ম্মিক লোকের কথা বিশ্বাস হ'লো না, আর বিশ্বাস করিলে ঐ গাধাকে?"

(পুরাকালের—অনির্দ্দিষ্ট কালের প্রচলিত একটি অনুরূপ গল্প পাওয়া যায় যে, এক জন পণ্ডিত কাহার কাছে শুনিয়াছিলেন যে, তাঁহার একটি বিশ্বস্ত বন্ধু মারা গিয়াছে। সে বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয় ও তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "অহে; আমি শুনেছি তুমি ম'রে গিয়েছ?" বন্ধু জিজ্ঞাসা করিল, "তাহা ত দেখতেই পাচ্ছ?" পণ্ডিত বলিলেন, "হাঁ, কিন্তু আমি যাহার কাছে শুনেছি, তাহাকে ত অবিশ্বাস করিতে পারি না")।

খোজা এফেন্দীর কাহিনী এত রকম আছে, যাহার সম্পূর্ণ তালিকা এখানে দেওয়া অসম্ভব। তিনি যে বোকা বুদ্ধিহীন ছিলেন, তাহা উপরি উক্ত গল্প হইতে মনে হইবে না, বরঞ্চ তাঁহার উপস্থিত জবাব (wit) প্রশংসনীয় মনে হইবে। কিন্তু তাঁহার আর একটি কাহিনীতে বালসুলভ চপলতা জানিতে পাওয়া যায়। এক দিন পুষ্করিণীর স্বচ্ছ জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাঁহার মনে হয়, কে যেন চন্দ্রকে চুরি করিয়া পুষ্করিণীর ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছে। তিনি বাঁশ দ্বারা একটি বড় 'আঁকশী' তৈয়ার করেন এবং তাহাতে প্রকাণ্ড পাথর বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দেন ও পার হইতে টানিতে আরম্ভ করেন। ইচ্ছা যে, চাঁদকে তুলিয়া স্বস্থানে রাখিবেন। টানিতে টানিতে হঠাৎ দড়ি ছিঁড়িয়া যায় এবং তিনি চিৎপাত হইয়া মাটীতে পড়েন। আকাশে তাকাইয়া দেখেন, চাঁদ আকাশে হাসিতেছে। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"বিস্‌মিল্লা রহিম! আমার ত হাত-পা ভাঙ্গলো, কিন্তু চাঁদকে তুলে ঠিক যায়গায় ত রেখেছি।"

বাদশাহ হারুণ-অল-রসিদের মত খোজা নসরুদ্দিন এফেন্দী জীবিত মানুষ না কাল্পনিক পুরুষ ছিলেন, তাহা এখন বলা সহজ নহে। বাদশাহ হারুণ অল-রসিদএর সম্বন্ধে অনেক প্রকার মনোজ্ঞ কাহিনী পাওয়া যায়। এখানে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। (বিক্রমাদিত্যের কাহিনী বেতাল পঞ্চবিংশতি নামক পুস্তকও উল্লেখযোগ্য)

বৌদ্ধ "জাতক" গল্পগুলি, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অনেক উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। তাহার অনেকগুলি উপদেশমূলক এবং কতকগুলি হাস্যরসাত্মক। মশা কামড়ায় ও অস্থির করিয়া তোলে, দেখিয়া এক জন বনে তীর-ধনুক লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করে, শেষে নিজেরাই মারামারি কাটাকাটি করিয়া হত হয়। "মশা মারিতে কামান দাগা" প্রবাদের উৎপত্তি এরূপ বলা যায়। আবার, রাজা মহাশয়ের খেজুর খাওয়ার ইচ্ছা হওয়াতে যখন তিনি হুকুম দিলেন খেজুর সংগ্রহ করিয়া আনিতে, তখন এক জন ভৃত্য খেজুর গাছ কাটিয়া ফেলিল ও জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, "গাছে ওঠা যে শক্ত, কেটে ফেললে ফল পাওয়ার কত সুবিধা। (Hen laying the golden eggs হত্যা করার মত) আবার তুলে বসিয়ে দিলেই গাছ বাঁচিবে" এরূপ বুদ্ধিমান্ (রূপকভাবে) যে আধুনিক জগতেও বিরল, তাহা বলা যায় না।

পিতার মৃত্যু হওয়ার পর দুই ভাইয়ের মধ্যে বিরোধ হয়। গ্রামের শালিস ডাকিলে তাহারা বিষয়সম্পত্তি ভাগ-বণ্টন করিয়া দেয়। তাহাতে উভয়ের বেশী বিশ্বাস হয়, অন্য ভাই ভাগে বেশী পাইয়াছে, ইহা লইয়া পুনরায় বিবাদ উপস্থিত হয়। শেষে দুই ভাই, প্রত্যেক জিনিষ, খাট, চৌকি, বিছানা, বাসন, ঘর-দরজা,

গরু ছাগল প্রভৃতি প্রত্যেকটি অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক ভাগ করিয়া উভয়ে লয়। তখন তাহারা শান্ত হয়। পুরাকালের গল্প হইলেও আধুনিক যুগেও এরূপ দৃষ্টান্ত যথেষ্ট পাওয়া যায়।

বুদ্ধিহীন ও সরল গ্রাম্য লোকদের কাহিনী পূর্ব্বে কিছু উদ্ধৃত করা হইয়াছে। চিকিৎসকের বিধানপত্রিকা (Prescription) খাইয়া ফেলিলে রোগ সারিয়া যাইবে, এইরূপ বিশ্বাসে তাহা খাইয়া ফেলা, গাধার পীঠে চড়িয়া যাওয়ার সময় পশ্চাৎ হইতে ঢিলএর আঘাত খাইয়া মনে করা যে গাধা পা ছুড়িয়াছে, চাল-ভাজা খাইতে ভাল, তাহা মনে করিয়া তাহা মাটীতে পুতিয়া গাছ হইবে মনে করিয়া জল ঢালা ইত্যাদি অনেক প্রকার ছোট বড় গল্প, Æsop's Fables, কথা-সরিৎসাগর প্রভৃতি গল্পে ও স্থানীয় কিম্বদন্তীর মধ্যে যথেষ্ট পাওয়া যায়। "আকাশকুসুম চয়ন" করার (Building castles in the air) বিভিন্ন গল্প প্রায় একই ধরণের, যদিও বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন ভাষাতে তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র ঘটনা ও কল্পনার বিষয় (Details) কিছু কিছু পার্থক্য করান, দেখা যায়। গোয়ালিনী বালিকা মাথায় দুগ্ধের ভাণ্ড লইয়া যাইতে যাইতে ভবিষ্যতে তাহার স্বামীর সঙ্গে মান অভিমান অভিনয় কিরূপ করিবে, তাহা মনে মনে কল্পনা করিতে করিতে অন্যমনস্ক হইয়া দুগ্ধের ভাণ্ড ফেলিয়া দেওয়া—এইরূপ গল্প এখন সর্ব্বজনবিদিত। আর একটি অতিরঞ্জিত গল্প পাওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে এইরূপ। এক নবপরিণীতা গ্রাম্য দম্পতি একটি সার গর্ত্ত খুঁড়িতেছিল। ক্ষুধার্ত্ত হওয়াতে স্বামী স্ত্রীকে জলখাবার আনিতে পাঠায়। স্ত্রী গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখে, মাথার ওপরে ঘোড়ার জিন লাগাম ঝুলিতেছে। তাহার কি রকম কেন যেন মনে হয় যে, যদি জিন্ লাগাম তাহার মাথায় পড়ে তবে সে নির্ঘাত মারা যাইবে ও তাহার স্বামীকে আর দেখিতে পাইবে না। এই মনে করিয়া সে কাঁদিতে আরম্ভ করে। মেয়ের মা আসিয়া তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করে যে, কেন কাঁদিতেছে। তাহার কাছে সব কথা শুনিয়া মাও তাহার সঙ্গে কাঁদিতে আরম্ভ করে। তাহার পিতা আসিয়া এই কথা শুনিয়া তাহাদের সঙ্গে ক্রন্দনে যোগদান করে। সোরগোল শুনিয়া স্বামী দৌড়াইয়া আসে ও ব্যাপার দেখিয়া হতভম্ব হইয়া যায়। তাহাদের ক্রন্দন থামাইতে পারে না। এমন "বেকুব" লোক দুনিয়াতে কত জন আছে, তাহা দেখিবে বলিয়া সে শ্বশুরবাড়ী পরিত্যাগ করে। দেশ-বিদেশ পরিভ্রমণ করিতে করিতে সে দেখে—কোন স্থানে সরল স্বামী স্ত্রীর আদেশমত উঠিতেছে ও বসিতেছে ও স্ত্রী বলিতেছে, তুমি মরিয়া গিয়াছ, স্বামীও তাহা বিশ্বাস করিয়া বিছানাতে আশ্রয় লইয়াছে, স্বামী উলঙ্গ হইয়া মনে ভাবিতেছে, সে রাজপোষাক পরিয়া আছে ইত্যাদি। এক দল লোকের সঙ্গে তাহার দেখা হয় ও সে শুনিতে পায়, তাহাদের দলের এক জন লোক হারাইয়াছে—প্রত্যেকবারই প্রত্যেকে নিজেকে বাদ দিয়া গণিতেছে এবং ১৩'র বায়গায় ১২ হইতেছে (ইংরাজী সাহিত্যে বোধ হয় ১৩কে এই জন্য unlucky number বলে) সমস্ত দুনিয়ার এরূপ চালচাল দেখিয়া স্বামী শ্বশুরবাড়ীতে ফিরিয়া আসে। রুশ ও ইংরাজদের মধ্যে এই প্রকার Noodle Stories অনেক পাওয়া যায়। বাহুল্য ভয়ে উল্লেখ করিলাম না।

চীন দেশের প্রচলিত একটি গল্প এখন অনেক স্থানে শুনিতে পাওয়া যায়। স্বামী অন্যমনস্ক হইয়া কোন এক সাংসারিক কাজে লিপ্ত ছিল। নবপরিণীতা বধূ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাহাকে গাঢ় চুম্বন করিল। স্বামী চমকাইয়া উঠিল এবং মুখ ফিরিয়া বধূকে দেখিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিল। স্ত্রী বলিয়া উঠিল, "পায়ে পড়ি ক্ষমা করো, আমি জানতাম না যে এটা তুমি।" চীন সভ্যতা বহুদিনের পুরাতন—সেজন্য মনে হয়, উপরি-উক্ত গল্পের মধ্যে আধুনিক হাস্যরসের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। গ্রাম্য লোকরা অনেক সময় ছোটখাট সমস্যার অদ্ভুত মীমাংসা করে, তাহার দৃষ্টান্ত সব দেশেই কিছু না কিছু পাওয়া যায়। বিবাহের সময় দেখা গেল, কন্যা এত বড় ও দরজা এত ছোট যে, কন্যাকে তাহার মধ্যে লইয়া যাওয়া যায় না, তাহার জন্য হয় কন্যার গলা কাটা দরকার অথবা ঘর ভাঙ্গা প্রয়োজন, কিম্বা ছেলেকে মুড়ি-মুড়কী দেওয়ার সময় সে যখন অঞ্জলি আবদ্ধ করিল, তখন তাহার দুই হাতের মধ্যে ঘরের খুঁটি আবদ্ধ হইল, হয় ছেলের হাত কাটিতে হইবে, নচেৎ ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে, এই সব বিষয় লইয়া গ্রাম্য মজলিস ডাকিয়া মীমাংসা করার কাহিনী বোধ হয় অনেকেই জানেন। Gordian knot কাটিয়া ফেলা, "when the egg is cut it is easy" ইত্যাদি বাক্যের মধ্যেও এরূপ গ্রাম্য সমস্যার আভাস পাওয়া যায়।

Noodles অথবা সরল গ্রাম্য লোকদের হাসি-সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষতঃ বঙ্গদেশের কথাই আমি বলিতেছি—একটি বিশেষ পরিতাপের বিষয় আছে। ইহা আধুনিক সাহিত্যের বিষয় হইলেও এইখানে উল্লেখযোগ্য মনে করি। হিন্দুদের আরাধ্য দেবদেবীগণ কি এমন অপরাধ করিয়াছিলেন, তাহা জানি না। খৃষ্টিয়ান মিশনারীগণ বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম তাঁহাদিগকে উল্লেখ করিয়া প্রকাশ্যে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করেন। রাজা রামমোহন রায় বোধ হয় বঙ্গদেশে প্রথম তাঁহাদের বিরুদ্ধে (অথবা পৌত্তলিক পূজার বিরুদ্ধে) সংগ্রাম আরম্ভ করেন। তাহার ফল ক্রমশঃ এই হয় যে, বঙ্গ-সাহিত্যে দেবদেবীকে Noodle শ্রেণীর মধ্যে ধরিয়া তাহাদিগকে হাস্যরসের সামগ্রী করিয়া তোলা হইয়াছে। আমাদের দেশের পূর্ব্বপ্রচলিত যাত্রার দলের অভিনয়কে অনেকে ইহার জন্য দায়ী করেন এবং কবি কালিদাস (কুমার-সম্ভব) হইতে আরম্ভ করিয়া খার্ত্তি রঘুনন্দন পর্য্যন্ত সকলকেই, অনেকে দেবদেবীর মধ্যে অশিক্ষিত মানবধর্ম্ম আরোপ করার জন্য, সমান দায়ী করেন। কিন্তু যখন "দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন" নামক পুস্তক সাহিত্য-সমাজে উচ্চ প্রশংসায় আদৃত হয়, ছেলেদের পাঠ্য পুস্তকে, আবৃত্তি রচনাতে, দেবদেবীকে জঘন্য চরিত্রে দেখাইয়া, তাহাদের-মনে ছোটকাল হইতেই অভক্তি ও ঘৃণা শিখান হয় এবং জেলাবোর্ডের Public Health Departmentএর অফিসারগণদের দেখান চিত্রাবলী ও নাটকে দেবদেবীকে লইয়া ইতর ঠাট্টা করান হয়, তখন মনে হয়, এই অশ্রদ্ধা, ঘৃণা এবং অভক্তি, Noodles সাহিত্যের মধ্য দিয়া বঙ্গদেশে সমাজে এতটা ক্ষতি করিয়াছে, বোধ হয়, ততটা আর কিছুতেই করে নাই। মুসলমান-খৃষ্টানদের দেবতা, দেবতা, আর হিন্দুর দেবতা দেবতা নহে—তাহারা যেন গ্রাম্য Noodles অশিক্ষিত, অশিষ্ট ব্যক্তি—এরূপ একটা ভাব ও ধারণা আমরা বঙ্গদেশের সাহিত্যে অনেক পাই। ইহার জন্য দায়ী হয় ত আমরাই এবং হয় ত অনেকে বলিবেন, রসসাহিত্য হিসাবে উপভোগ করিতে এরূপ কোন অসমীচীন কল্পনা করা আমার অন্যায়। আমরা হিন্দুরা এখন Godless হইয়াছি, আমাদের Education Godless, Godhood বিহীন

ইত্যাদি বিষয় লইয়া আমরা অহরহঃ আক্ষেপ করি ও পরিতাপ করি, অথচ আমাদের সাহিত্যই যে Godhood-এর মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে, তাহা অস্বীকার করি। ইংরাজী সাহিত্য আমাদের শিখাইয়াছে **"A Negro is a God's figure cut in Ebony"**, ইংরাজদের স্থাপিত ও বিধিবদ্ধ আইনে Religious Susceptibilitiesকে আঘাত করার বিরুদ্ধে দণ্ড শাস্তি বিধান করা আছে (কার্যক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ যৎসামান্য যাহাই থাকুক না কেন), তাহাদের সাহিত্যে কোন স্থানে Christকে দেবচরিত্র হইতে বিচ্যুত করিয়া দেখান হয় নাই। তাহাদের প্রদত্ত শিক্ষা পাইয়াও আমরা যে এই পরিতাপপূর্ণ ও চির-আক্ষেপ-বিজড়িত বিষয় সাহিত্যে স্থান দিয়াছি—ইহা আশা করি, সকলেই দুঃখের বিষয়ই মনে করিবেন। ধর্মকলহ হইতে আমরা যে এরূপ মনোবৃত্তি পাইয়াছি, তাহা ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে সমর্থনযোগ্য হইলেও চিরন্তন সাহিত্যে তাহার স্থান ও প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। বৌদ্ধযুগের শেষ সময় হইতে বঙ্গসাহিত্যে দেবদেবীদের লইয়া, "Noodles" সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহার বিষম বিষময় ফল আমরা এখন ভোগ করিতেছি।

মধ্যযুগের হাস্যরসধারার মধ্যে আমরা আর দুইটি জিনিষ দেখিতে পাই—আধুনিক সাহিত্যে তাহা এখনও প্রচলিত আছে :— (১) Parables অথবা শিক্ষাপ্রদ উপাখ্যান এবং কথকতা (২) Proverbs—প্রবাদবাক্য যাহাকে 'প্রমোদ'ও বলা যায়। লোকরঞ্জন, শিক্ষা ও মনোমুগ্ধকর কথা হিসাবে Parables এবং কথকতার প্রয়োজন ও সার্থকতা আছে, তাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছি। ইংলণ্ডেও ধর্মযাজক Monks কিরূপ গল্প বলিতেন, নিম্নে তাহার একটি উদাহরণ দিলাম। বঙ্গদেশে আধুনিক সময়ে কথকতা প্রায় উঠিয়া যাইতেছে।

এক জন রাজার রাণী দুশ্চরিত্রা ছিলেন। প্রথমে তাঁহাদের ৩ পুত্র হয়, কিন্তু কেহই রাজার ঔরসজাত নয়। ৪র্থ পুত্র যে জন্মায়, সে রাজার প্রকৃত পুত্র। রাজার মৃত্যুর পর রাজ্য লইয়া চারি ভাইয়ের মধ্যে গৃহ-কলহ আরম্ভ হয়। মৃত রাজার প্রিয় সেনাপতির কাছে সকলেই উপস্থিত হয়। তিনি উপদেশ দেন, মৃত রাজার দেহ তুলিয়া দাঁড় করান হউক এবং যে পুত্র তীর দ্বারা দূর হইতে তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিতে পারিবে, সেই রাজত্ব পাইবে। প্রথম পুত্র তীর ছুড়িল—রাজার হাতে লাগিল, সে বলিল, বক্ষের নিকটে সে তীর লাগাইয়াছে, অতএব সে রাজ্য পাইবে। দ্বিতীয় পুত্র গলার নিকট আঘাত করিল ও বলিল, সে আরও নিকটে বিদ্ধ করিয়াছে। তৃতীয় পুত্র বক্ষ লক্ষ্য করিয়া তীর মারিল ও রাজত্ব চাহিল। ৪র্থ পুত্র এই অবস্থা দেখিয়া, কাঁদিয়া অস্থির হইল ও বলিয়া উঠিল, "হে পিতঃ, আমার অদৃষ্টে ইহাও দেখিতে হইল? তোমার পুত্ররা তোমাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল। আমি ত জীবিত ও মৃত কোন অবস্থাতেই পিতার শরীরে হাত দিতে পারি না।" এই কথা শুনিয়া রাজ্যের সমস্ত লোক আসিয়া ৪র্থ পুত্রকেই রাজা করিল ও অন্য ৩ পুত্রকে রাজত্ব হইতে তাড়াইয়া দিল।

গল্পের অর্থ :—

কথিত রাজা হইতেছেন ঈশ্বর এবং রাণী তাঁহার মনুষ্যদেহ। তিন পুত্র বিধর্ম্মী ৩ শ্রেণীর লোক :—নাস্তিক, পৌত্তলিক এবং ...বাদী। তাহারা প্রভু ঈশ্বরের তিন অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে। ৪র্থ পুত্রই বাস্তবিক ধর্ম্মপ্রাণ লোক।

বলা বাহুল্য, ইহা রাজা Solomon-এর, পুত্রদাবীকারিণী দুই স্ত্রীলোকের বিচার-কাহিনীর অনুরূপ। আধুনিক সময়ে কাজীর বিচার কতকটা এই ধরণের ছিল।

চীন দেশের ধর্মাবতার Confucius প্রবাদ ও প্রমোদবাক্যের সাহায্যে অনেক উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, যথা :—

"প্রকৃত পণ্ডিত লোক, ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ি নয়"

"চারটা ঘোড়ার বেগ জিহ্বার শক্তির সমকক্ষ হয় না"

"৪০ বৎসর বয়সে যে লোক প্রিয় হইতে পারে না, সে কোন কালেই প্রিয় হয় না।" ইত্যাদি।

সংস্কৃত কবি ভর্তৃহরির কাছেও আমরা অনেক প্রবাদবাক্য পাইয়াছি। যথা :—

"কুমীরের মুখ হইতে মুক্তা সংগ্রহ করা বরং সহজ, মস্তকে সর্পবিশিষ্ট রাজমুকুট পরাও বরং সহজ, কিন্তু যে ইচ্ছা করিয়া বোঝে না, তাহাকে বুঝান যায় না।"

"যে জীবনে ধনী হয়, তাহাকেই লোকে বলে সদ্বংশের, সচ্চরিত্র, বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্, ধার্ম্মিক ইত্যাদি। টাকাতেই সব আকর্ষণ করে।"

"স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য কবিগণ কত রকম উপমা দ্বারা তুলনা করিয়া দেখান—বক্ষ "কনককটোরা", মুখ চন্দ্রের চন্দ্রিমা, করভোরু, নিতম্ব, হস্তিমস্তক ইত্যাদি। কিন্তু সৌন্দর্য্যের কি বাস্তবিক প্রশংসা করা যায়?" ইত্যাদি ইত্যাদি।

চাণক্য শ্লোক ও বিষ্ণুশর্ম্মার গল্পেও আমরা অনেক প্রবাদ পাইয়া থাকি। পারস্য কবিদের গ্রন্থাবলীতে ("গুলেস্তান", "বাস্তান") আমরা অনেক প্রকার Glorifid ও witty বাক্য পাইয়াছি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—এক জন ভিক্ষুক একটি গৃহে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। বাড়ীর মালিক ভিতর হইতে উত্তর করিল, "মেয়েরা কেহ বাড়ীতে নাই।" ভিক্ষুক বলিল, "আমি ভিক্ষা চাহিতে এসেছি—মেয়েদের আলিঙ্গন করিতে ত আসি নাই।" (বিকল্পে উত্তর পাওয়া যায়, "শরীর খাটানের উপদেশ নিতে ত আসি নাই।"

এক জন পণ্ডিত লক্ষ্য করিলেন, একটি স্ত্রীলোক তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। তিনি অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও?" উত্তরে সে বলিল, "আমি চোখ দিয়ে অন্য এক জন লোককে সতৃষ্ণভাবে দেখে, বড় পাপ করেছি, তাই তোমার বিশ্রী মুখের দিকে তাকিয়ে চোখকে শাস্তিভোগ করাচ্ছি।"

এক জন বেদুইনের একটি ঘোড়া হারাইয়াছিল। সে ঘোষণা করিল, "যে আমার ঘোড়া খুঁজিয়া দিবে, তাহাকে দুইটি ঘোড়া পুরস্কার দিব।" এক জন বন্ধু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ত বেকুব কম নও—একটা ঘোড়ার জন্য দুটি ঘোড়া?" বেদুইন উত্তর করিল, "বেকুব আমি না তুমি? হারান জিনিষ ফেরৎ পাওয়ার যে আনন্দ ও খোঁজার চেষ্টায় যে সুখ, তাহা কি মূল্য দিয়ে ঠিক করা যায়?" (Pleasures are more in the attempt than in its fruition)

তুলনা করার উদ্দেশ্যে এই প্রসঙ্গে আধুনিক একটি গল্পের উল্লেখ করিতেছি। এক জন লোকের দশ হাজার টাকার গহনা ও নগদ টাকা চুরি যায়; সে ঘোষণা করে, যে চোর ধরিয়া দিবে ও মাল উদ্ধার করিয়া দিবে, তাহাকে সে ৫০০৲ পাঁচ শত

টাকা পুরস্কার দিবে। মাসখানিক পর সে ডাকযোগে একখানি চিঠি পাইল।

"তুমি দেখ্ছি মহাবেকুব, ৩।৪ হাজার টাকার বিনিময়ে কে তোমার ৫০০্ পাঁচ শত টাকা লইবে? যে খবর দিবে, মনে কর, তাহাকে আমি তাহা অপেক্ষা বেশী টাকাই ভাগ দিব। ইতি

শ্রীচোর"

পারস্য কবিদের মধ্যে একটি প্রচলিত রহস্যালাপ আমরা দেখিতে পাই, তাহার পদ্য অনুবাদ নীচে দেওয়া হইল

"কবি এক শুনাইল, জঘন্য কবিতা
তাহাতে ছিল না কোন রসের বিচার।
বলিলাম তা'রে আমি লিখো না যা'তা'
লিখিও যাহাতে নাই অক্ষরের বাহার।"

বাহুল্যভয়ে আর বেশী উদ্ধৃত করিলাম না। মধ্যযুগেই প্রকৃত রস-সাহিত্যের সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে বলা যায়। যদিও প্রত্যেক বিভিন্ন বিষয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ দিয়া বিষয়টি মনোজ্ঞভাবে বুঝাইতে ও দেখাইতে পারিলাম না, তবু উপরে যে সব সামান্য আভাস দিয়াছি, তাহাতে বিভিন্ন দেশের হাস্যরসের চিরন্তন ধারা অনেকেই অনুমান করিতে পারিবেন। কোন মহাপুরুষএর আবির্ভাব অথবা জাতীয় যুদ্ধবিগ্রহ, গোলমাল প্রভৃতি সময়ে সব রকম শিল্পকলাই যেন নানারূপ বাধা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেহ কেহ সে জন্য বলেন যে, সভ্যতার প্রথম বিকাশ ও উন্মেষের সময় মানুষ যেন হাস্যরস বুঝিতই না। রস বুঝিতে পারুক আর না পারুক, তখন যে মানুষ হাসিত না, তাহা বলা যায় না। মধ্যযুগে হাস্যরসধারা যেরূপে যাহা উদ্ভূত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত ও উপদেশের উপরই আধুনিক হাস্য-রসের উন্নত পরিমার্জ্জিত সংস্করণ সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আছে এবং আধুনিকে রসধারা বিবেচনা করিতে, ঐতিহাসিক ভিত্তি হিসাবে মধ্যযুগের ক্রমবিকাশ অস্বীকার করা যায় না। আধুনিক সাহিত্যে এখন দেখা যায় যে, সমাজের প্রত্যেক বিভিন্ন স্তরে, জাতি-ধর্ম্ম অনুসারে, বিভিন্নভাবে, হাস্যরসের মধুর উজ্জ্বল কিরণ যেন ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং তাহারই আলোকে জাতীয় ও সামাজিক জীবনে সামান্য একটু সুখশান্তির আস্বাদন পাইয়া আমরা প্রত্যেকে জীবন অতিবাহিত করিতেছি। অন্ধকার রাত্রিতে নক্ষত্রালোকে পথ দেখাইয়া দেওয়ার মত অন্ধকারময় জীবনেও যেন তাহারা আমাদের সামান্য তৃপ্তি ও আনন্দের পথ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীকালিদাস বাগচী (এম্-এস-সি)।

কৃষকের দুঃখ

মায়ার বাধনে বেঁধে দিয়ে মোরে কোথা চ'লে গেলে তুমি!
বাড়ী-ঘর-দোর, কচি মেয়েটারে, একাই দেখিব আমি?
লাউ-কুমড়োতে 'মাচা' ভ'রে গেছে, এতটুকু বাকি নাই,
সজিনার ডাঁটা থরে থরে গাঁথা, ভাকিতেছে বুধী গাই।
'সিকের' উপরে 'আচারের' হাঁড়ি আজও তেমনই আছে;
সাঁজের প্রদীপ এখনও রয়েছে তুলসী গাছের কাছে।
সবই আছে শুধু তুমি নেই কাছে, থাকি তাই আনমনে,
গোপালী কেমন 'মা' ব'লে ডাকিছে একবার যাও শুনে!

রাত্তির শেষ না হ'তে উঠেই থালা, ঘটী, বাটি নিয়ে
ঘাটেতে গিয়েছ—কাপড় কেচেছ, শুধু দুটো 'ডুব' দিয়ে;
ঘরে ফিরে এসে কাযেতে লেগেছ, হাসি-হাসি-মাখা মুখে
গোপালীর গালে চুমোটি দিয়েছ জড়ায়ে ধরিয়া বুকে।
'মুড়ি-গুড়' খেয়ে আমি চ'লে গেছি হাঁটিতে হাঁটিতে মাঠে,
দুইটি চোখের সজল-চাহনি আছাড়ি প'ড়েছে পিঠে!
তবু চ'লে গেছি আপনার কাযে, ফিরে দেখি হাসি মুখে
আমার পানেতে চেয়ে আছ পলক পড়ে না চোখে।

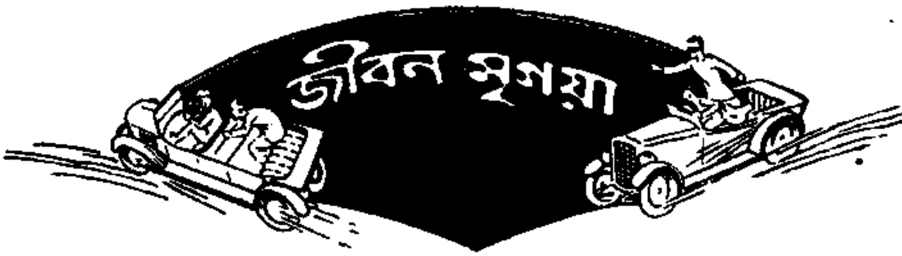
দুপুরের রোদে বাড়ী ফিরে এসে 'দাওয়াতে' পড়েছি শুয়ে,
দর-দর ঘাম মুছায়ে দিয়েছ তোমার 'আঁচল' দিয়ে।
তালপাখা নিয়ে বাতাস করেছ, কতই বলেছি থাক্,
মধু-মাখা স্বরে বলেছ আমারে—"ঘামটা শুকিয়ে যাক্।"
নিজের হাতেতে সাঁড়'টি করিয়ে ভাতের থালাটি রেখে
বলেছ আমারে—"সব খেতে হবে, নিয়ে আসি গোপালীকে।"
কৌতুক ক'রে আমি বলিয়াছি—"লক্ষ্মী-প্রতিমা তুমি!"
মুখ নীচু ক'রে অমনি বলেছ—"নারায়ণ! তুমি স্বামী!"

ওটা দিতে হ'বে কখন আমারে বলনি মুখটি ফুটে,
যা দিয়েছি তাই হাসিমুখে নেছ, কথাটি ছিল না মোটে।
সেবার পূজায় 'বাউটি'টি পেয়ে কতখানি খুসী হ'লে,
আমার রোগেতে ওষুধ যোগাতে তাও তুমি খুলে দিলে।
দুঃখ-কষ্ট কত না সয়েছ শুধুই আমার লাগি',
মাথার শিয়রে দিন-রাত ধ'রে ছিলে বসে জাগি'।
শুধু মুখ বুজে সয়েছ আহা রে! কিছুরই করনি দাবী,
কি যে শেল বুকে বিঁধে দিয়ে গেলে আজ সেই কথা ভাবি!

আজও মনে আছে নিদারুণ জ্বরে ছিলে ঘরে তুমি শুয়ে,
'ওষুধের শিশি' আনিতে, বলেছ "কি হবে ওগুলো খেয়ে?"
রোগের যাতনা তখনি ভুলেছ, যেই বসিয়াছি কাছে,
দুটি চোখ হ'তে ঝর-ঝর জল অবিরাম ঝরিয়াছে!
ক্ষণপরে মোরে ডাকিয়া বলেছ—"ওগো বল একবার
যা চাহিব তাই হাসিমুখে দেবে না করি' কোন বিচার?
শপথ করেছ, মনে থাকে যেন?—শেষ বিদায়ের ক্ষণে
গোপালীকে আমি সঁপে দিয়ে গেনু রেখ তারে সযতনে!"

এই ঘরে ঠিক এইখানটিতে সে দিনের অনুরোধ
আমার পরেতে দিয়ে চলে গেলে ম'রে নিলে প্রতিশোধ!
তোমার স্মৃতিটি সবখানে আছে যে দিকে ফিরাই আঁখি,
গোপালী যে বড় 'দামাল' হয়েছে কি ক'রে তাহারে রাখি!
দিন-রাত শুধু 'মা, মা' ব'লে ডাকে তাহারে ধরিতে গেলে
আঙ্গিনার কাছে ছুটে চ'লে যায়, ধরি তারে তুলি কোলে।
আরও কতকাল আমার উপরে বোঝাটি রাখিবে তুমি?
একবার ওগো ফিরে 'এস' আজ দেখিব তোমারে আমি!

শ্রীবিষাদ চম্পটী।



তৃতীয় পাক

রহস্য-সিন্ধুর সুধাকর

নব বসন্তে যখন লণ্ডনের লিঙ্কন্স ইনের সন্নিহিত প্রান্তরস্থিত বৃক্ষগুলিতে নব-কিশলয় অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন ম্যান্সন এবং প্রীড নামক সলিসিটার কোম্পানীর অন্যতর মালিক মিঃ প্রীড তাঁহার ক্লাবেও অত্যন্ত নির্জ্জনতা অনুভব করেন। মিঃ প্রীড যৌবন-সীমা অতিক্রম করিলেও বিবাহ করেন নাই, এবং একক জীবনের নিঃসঙ্গতা তাঁহার প্রার্থনীয় না হইলেও সেই অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহার আগ্রহ ছিল না। তিনি লণ্ডনের পশ্চিম-পল্লীস্থিত তাঁহার সুবৃহৎ অট্টালিকার লিফ্ট হইতে কক্ষদ্বারে নামিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন; কিন্তু তাহার প্রকৃত কারণ তিনি হয় ত বলিতে পারিতেন না।

রাত্রি আটটা তাঁহার ডিনারের সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল; কিন্তু তাহার পর আর তাঁহার সহিত গল্প করিবার লোক সেখানে কেহই থাকিত না। তখন থিয়েটার দেখিতে যাওয়ার সময় অতীত হইত; বিশেষতঃ, চিত্র-সন্দর্শনও তাঁহার রুচিকর ছিল না। আগষ্ট মাসে আল্প্স্ গিরি-বিহারের জন্য তিনি উৎসুক হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই সময় তাঁহার কোনও ধনাঢ্য মক্কেলের সম্পত্তির ব্যবস্থা করিবার জন্য তাঁহাকে নগরেই থাকিতে হইল। তিনি দরজার চাবি খুলিতে উদ্যত হইয়া মনে মনে বলিলেন, অগত্যা লেখাপড়া লইয়াই তাঁহাকে সময় কাটাইতে হইবে।

ঠিক সেই সময় তাঁহার প্রবীণ ভৃত্য দ্বার খুলিয়া, তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "আপনি আমার গোস্তাকি মাফ করুন। আমি অন্যায় কায করিয়াছি,—আশা করি, এরূপ আপনি মনে করিবেন না। মিস্ হ্যালাম—"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সেই কক্ষের ভিতর হইতে নারীকণ্ঠের সুকোমল মৃদু-স্বর তাঁহার কর্ণগোচর হইল। "কিন্তু এ বড় অসঙ্গত ব্যাপার! তাহাকে মুঠায় পুরিবার কোন না কোন উপায় আছেই আছে। বিষয়টা কেউই জরুরী যে—"

মিঃ প্রীডের মুখ স্বভাবতঃই ভাবসংস্পর্শহীন, যেন কাঠের পুতুলের মুখ; কিন্তু ঐ কথাগুলি শুনিয়া তাঁহার মুখে কৌতূহল ফুটিয়া উঠিল।

ভৃত্য নিম্নস্বরে বলিল, "উনিই মিস্ হ্যালাম, হুজুর! উনি এই বাড়ীর ঐ পাশের অংশটা ভাড়া লইয়াছেন। উঁহার টেলিফোন্টা না কি হঠাৎ বিগড়াইয়া গিয়াছে; এই জন্য উনি আমাকে বলিয়াছিলেন,—একটা জরুরী কাযের জন্য যদি আমরা আমাদের টেলিফোনটা কয়েক মিনিটের জন্য উঁহাকে ব্যবহার করিতে দিই, তাহা হইলে উনি—"

মিঃ প্রীড তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "দিয়াছ ভালই করিয়াছ, তাহাতে আপত্তি কি?" তিনি তাঁহার টুপী এবং ফিতা-বাঁধা ছাতাটি তাহার হাতে দিলেন; তাহার পর তাঁহার উপবেশন-কক্ষের দ্বার খুলিয়া দেখিলেন, একটি তরুণী ব্যগ্রভাবে টেলিফোন-ডাইরেক্টরীর পাতাগুলি উল্টাইতেছিল।

মিঃ প্রীড তাঁহার প্রতিবেশিনী মিস্ এঞ্জেলা হ্যালামের সকল সংবাদই জানিতেন। তাহার কথা কে-ই বা না জানিত? সে যে-ভাবে একাকিনী য়ুরোপ হইতে উড়িয়া দক্ষিণ-আমেরিকায় গমন করিয়াছিল, তাহা নাটকে ঘটনার ন্যায় বিস্ময়জনক! তাহার পর সে যখন আমেরিকার এক মুড়া হইতে অন্য মুড়ায় উড়িয়া যায়, তখনও তাহার সাহস ও আত্মনির্ভরের পরিচয় পাইয়া পুরুষ-সমাজ তাহাকে দেবীর-আসনে স্থাপিত করিয়াছিল, তাহার প্রশংসার দুন্দুভি-নিনাদে রাজ্যের কাণে তালা লাগিয়াছিল। মিঃ প্রীড তাহার জগৎ-জোড়া খ্যাতির কথা শুনিলেও, পূর্ব্বে কোনও দিন তাহাকে প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগলাভ করিতে পারেন নাই; কিন্তু সে অত্যন্ত রহস্যময়ী বলিয়াই তাঁহার ধারণা ছিল।

তাহার দেহ- সুগঠিত হইলেও সে খর্ব্বাঙ্গী, তাহার মুখখানি যেন একটি প্রস্ফুটিত গোলাপ। চক্ষু দুটি আয়ত, এবং চক্ষু-তারকা কৃষ্ণবর্ণ; সাধারণ ইংরাজ-মহিলার ন্যায় সে বিড়ালাক্ষী নহে। সেই সময় তাহার চক্ষু ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়াছিল। তাহার অধরোষ্ঠে চরিত্রের দৃঢ়তার, সঙ্কল্পের অটলতার, এবং অন্তর্নিহিত রসমাধুর্য্যের পরিচয় পাওয়া যাইত। দলীল ও নথিপত্রাদির নীরস স্তূপ দিবারাত্রি ঘাঁটিয়া-ঘাঁটিয়া সে সকল ব্যবহারাজীবের জীবন মরুময় হইয়া থাকে, এই যুবতীর ব্যক্তিগত প্রভাব তাঁহাদের পক্ষে মরুবক্ষস্থ শীতল-জলের উৎসপূর্ণ ওয়েসিস-তুল্য প্রীতিদায়ক ও অবসাদনাশক।

মিঃ প্রীডকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মিস্ হ্যালাম তাহার সম্মুখস্থিত ডাইরেক্টরী হইতে মুখ তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর কোমলস্বরে বলিল, "দেখুন, আপনার ঘরে আসিয়া আমাকে এই রকম বেয়াদপি করিতে দেখিয়া আপনার গোসা করা চলিবে না; আমার এই বেয়াদপি- আপনাকে মাফ করিতে হইবে। যে সময় আমার ঘরের টেলিফোনটা কোনও জরুরী কামের জন্য ব্যবহার করা ভারী দরকার মনে হইল, ঠিক সেই সময়টিতেই আমার টেলিফোন বিগড়াইয়া বসিল! দেখুন দেখি, এ কি রকম বিড়ম্বনার বিষয়!"

মিঃ প্রীড বিনীতভাবে বলিলেন, "আমি আপনার কোনও কাযে লাগিলে অত্যন্ত আনন্দলাভ করিব।"

যুবতী মৃদু হাসিয়া মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গীতে বলিল, "আপনার সৌজন্য ভারী চমৎকার! কিন্তু আপনি কি ভাবে আমাকে সাহায্য করিতে পারেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমি কোন প্রয়োজনের জন্য এক জন আইন-ব্যবসায়ীর সন্ধান করিতেছি; কিন্তু তাঁহাদের কাহাকেও আফিসে পাওয়া যাইতেছে না; সকলেই বোধ হয় ছুটী উপলক্ষে স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছেন।"

মিঃ প্রীড হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু এক জন এখানে আছেন—যিনি ছুটী-উপলক্ষে স্থানান্তরে যান নাই।"

যুবতী সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি কি আইন-ব্যবসায়ী?—সলিসিটার?"

মিঃ প্রীড্ বলিলেন, "হাঁ, আমি সলিসিটার! লিঙ্কন্স-ইনের কার্য্যক্ষেত্রে মেসার্স ম্যানসন এণ্ড প্রীড্ নামক সলিসিটার কোম্পানীর আমিই একমাত্র প্রতিনিধি।"

যুবতী ডাইরেক্টরীখানা বন্ধ করিয়া সকৌতুকে বলিল, "কি আশ্চর্য্য! ইহা যে দৈবঘটনার ন্যায় অদ্ভুত!"

মিঃ প্রীড্ বলিলেন, "দৈবানুগ্রহ দ্বারা কতটুকু সুবিধা ঘটিয়া উঠে, তাহা আমার জানা নাই; তবে আমি যদি আপনাকে কোন রকম সাহায্য করিতে পারি, তাহা হইলে আমার সহায়তা দৈবানুগ্রহ বলিয়া আপনার ধারণা হউক বা না হউক, আমি তাহাতে অত্যন্ত আনন্দলাভ করিব।"

যুবতী মিঃ প্রীডের সম্মুখে এক পা সরিয়া আসিয়া তাঁহার বাহুর উপর অসঙ্কোচে করতল সংস্থাপিত করিল। তাহার পর গভীর আগ্রহভরে বলিল, "দেখুন মিঃ প্রীড্, আপনি আমার মনের উপর হইতে কি দুর্ব্বহ ভার অপসারিত করিলেন, তাহা ধারণা করা আপনার অসাধ্য। আপনি ড্যান কার্থুর পক্ষসমর্থন করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।"

তাহার অনুরোধ শুনিয়া মিঃ প্রীডের মুখভাবের কোন পরিবর্ত্তন হইল না, এবং তিনি তৎক্ষণাৎ কোন অভিমতও প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া মিস্ হ্যালামের ধারণা হইল, এই চাঞ্চল্যজনক মামলা সম্বন্ধে কোন কথাই তিনি জানিতে পারেন নাই। এই জন্য সেই ঘটনাটির বিবরণ তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য সে সংক্ষেপে বলিল, "ফ্লোরিজেল হোটেলের নাম সম্ভবতঃ আপনার অপরিচিত নহে, সেই হোটেলে সার উইলিয়ম আডাম্সনের কামরায় প্রবেশ করিয়া, ড্যান কার্থু তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে, এই অভিযোগে ওল্ড বেলীর বিচারালয়ে এই বেচারা দায়রা-সোপরদ্দ হইয়াছে; এই মামলা এখন পুরাদমে চলিতেছে। আমার আগ্রহপূর্ণ অনুরোধ,—এই মামলায় আপনি আসামীর পক্ষসমর্থন করুন। কি বলেন আপনি?"

মিঃ প্রীড্ স্বাভাবিক স্বরে বলিলেন, "হাঁ, আমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে, এই আসামীর নাম আমার অপরিচিত না হইলেও আমার তাহা স্মরণ ছিল না। এখন আমার মনে পড়িতেছে, গত দুই দিন ধরিয়া এই মামলার শুনানী হইয়াছে। সুতরাং আদালতে বিচারকালে বৈধ-ভাবেই তাহার পক্ষ সমর্থিত হইতেছে। এইরূপ অবস্থায় সে নিশ্চিতই কোনও ব্যবহারাজীবকে তাহার পক্ষসমর্থনের জন্য যথাযোগ্য উপদেশ দিয়াছে। কোন না কোন সলি-সিটার তাহার মামলা বুঝিয়া লইয়াছেন।"

মিস্ হ্যালাম বলিল, "আপনার কথা সত্য, মিঃ ব্লীড্। সে তাহার সলিসিটারকে মামলা বুঝাইয়া দিয়াছে। কিন্তু এখন সে তাহার সলিসিটার পরিবর্ত্তন করিতে চাহে। ব্রিক্সটনের কারাগারে পুলিস আমাকে তাহার সহিত দেখা করিতে দিয়াছিল। আমি সেখানে আসামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে, সে আমাকে তাহার পক্ষসমর্থনের জন্য আর এক জন সলিসিটার নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছে। আমি ব্রিক্সটন-কারাগার হইতে সোজা এখানে আসিয়া টেলিফোনে আমার পরিচিত তিন জন ব্যবহারাজীবের সন্ধান লইয়াছি; কিন্তু তাঁহাদের কাহাকেও হাতে পাইলাম না। তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের আফিস হইতে স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছেন।"

মিস্ হ্যালামের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লীডের মুখে বিস্ময়ের ভাব পরিস্ফুট হইল। ক্লেরিজেস হোটেলে যে শোচনীয় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার সকল বিবরণই তাঁহার সুবিদিত ছিল। তিনি ইহাও জানিতেন যে, এই মামলার বিচারভার-প্রাপ্ত জুরীরা আসামী ড্যান কার্থুকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া অভিমত প্রকাশে উদ্যত হইয়াছিলেন, এবং তদনুসারে বিচারক রায় প্রকাশ করিতেন; কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে আসামী তাহার কাঠরা হইতে এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল যে, সে সাক্ষীর কাঠরায় উঠিয়া নিজের অনুকূলে সাক্ষ্যদান করিবে। মিঃ ব্লীড্ এই সকল সংবাদ জানিলেও মিস্ হ্যালামের ন্যায় প্রসিদ্ধা নারী—এই অসামান্য সুন্দরী, কি কারণে ড্যান কার্থুর ন্যায় দুর্নামভাজন দায়রার আসামীকে সাহায্য করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিল, তাহার সহিত এই যুবতীর কি সম্বন্ধ, তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। নরহত্যার অপরাধে যে অভিযুক্ত, সে কলঙ্কপসরা সে বহন করিতেছিল এবং ভদ্র সমাজের সহিত যাহার কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, তাহাকে কলঙ্ক-মুক্ত করিবার জন্য এই সম্ভ্রান্ত সমাজ-ভুক্তা নারী তাঁহার ন্যায় অপরিচিত ভদ্রলোককেও অনুরোধ করিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করিল না—ইহা জটিল রহস্য বলিয়াই মিঃ ব্লীডের ধারণা হইল।

মিঃ ব্লীড্ এই সকল কথা চিন্তা করিতেছিলেন; তাহাকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া মিস্ হ্যালাম কিঞ্চিৎ বিচলিত স্বরে বলিল, "মিঃ ব্লীড, এ সকল কথা আমি আজই শুনিতে পাইয়াছি। তাহার পর আমি আদালতেও উপস্থিত হইয়াছিলাম। আহা বেচারা ড্যান! আমি জানি, তাহার বাড়ী ঘর বলিয়া মাথা রাখিবার কোন স্থান নাই, জানি-দস্যু বলিয়া তাহার দুর্নাম আছে, জানি, সে তাহার অভিশপ্ত মস্তকে কলঙ্ক-পসরা বহন করিতেছে। সে কোনও দিন সুপথে চলিয়াছে, তাহার অনুকূলে এ কথা কেহই বলিতে পারিবে না; এ অবস্থায় আমি তাহার প্রাণরক্ষার জন্য কি কারণে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি, তাহা বুঝিতে না পারিয়া আপনি বোধ হয় ধাঁধায় পড়িয়াছেন; বিস্ময়াকুল-চিত্তে কত কথাই ভাবিতেছেন! কিন্তু আমার এই প্রকার আগ্রহের কারণ, আমি তাহার নিকট কৃতজ্ঞ। সে ফ্রান্সদেশে আমার ভাই জেরাল্ডের প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। বোমাবৃষ্টির ভিতর হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া দেশে আনিয়াছিল। সে জেরাল্ডকে এই ভাবে সাহায্য না করিলে তাহার প্রাণরক্ষা হইত না। আমি ব্রিকস্টনের কারাগারে তাহার সঙ্গে দেখা করিলে সে আদালতে তাহার পক্ষসমর্থনের জন্য আর এক জন সলিসিটার নিযুক্ত করিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছিল। আমি তাহার ব্যাকুল প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলাম—তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিব। যদি স্বীকার করিয়া লই যে, সে মহাপাপিষ্ঠ, সমাজদ্রোহী ও নরপিশাচ, তথাপি তাহাকে যে অপরাধে অভিযুক্ত করা হইয়াছে, সে যে সত্যই সেই অপরাধ করিয়াছে—ইহা প্রমাণ-সাপেক্ষ। যে চিরদিন পরস্বাপহরণ করিয়াছে, সে কি কারণে নরহত্যায় কুণ্ঠিত হইবে? এরূপ প্রশ্ন যে যুক্তিসহ নহে, ইহা আপনাকে বুঝাইতে যাওয়া আমার পক্ষে অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা।"

মিস্ হ্যালামের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লীড বিব্রতভাবে দাড়ি চুলকাইতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন, মিস্ হ্যালামের অনুরোধ রক্ষা করিবেন; কিন্তু এই কার্য্যে যে যথেষ্ট অসুবিধা ছিল, তাহাও তিনি জানিতেন।

মিঃ ব্লীড এই সকল কথা চিন্তা করিয়া মিস্ হ্যালামকে বলিলেন, "যদি আমাকে ড্যান কার্থুর সমর্থন করিতে হয়, তাহা হইলে আগামী কল্য সকালে তাহাকে আদালতে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে কারাগারে আমাকে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে হইবে। কারণ, তাহার নিকট আমার অনেক কথা জানিয়া লইবার প্রয়োজন হইবে। তবে পেশাগত

শিষ্টাচারের অনুরোধে তাহার কৌন্সিলীর সঙ্গেও তাহার মামলা সম্বন্ধে আমাকে আলোচনা করিতে হইবে। যে ডাক্তার রোগীর চিকিৎসা করেন, তাঁহার পরিবর্ত্তে যদি নূতন ডাক্তার ডাকিতে হয়, তাহা হইলে নূতন ডাক্তার সাবেক ডাক্তারের নিকট রোগের অবস্থা ও রোগীর চিকিৎসার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা জানিয়া লইয়া থাকেন, ইহাই পেশাগত শিষ্টাচার, এবং ইহা কর্ত্তব্যও বটে। আইনের ব্যবসায়েও এই পন্থা অবলম্বনীয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় বটে। আমি ইহার ব্যতিক্রম করিলে নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে। আমরা ব্রিক্সটনের কারাগারেও পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি। অবশ্য, আদালতেও তাহার সহিত আমার আলোচনা চলিতে পারে; কিন্তু তাহাতে তাঁহার সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। আপনি কার্থুর বর্ত্তমান সলিসিটারের নাম জানেন কি?"

মিস্ হ্যালাম বলিল, "তাঁহার নাম লিসেষ্টার স্প্রিং, ঠিকানা ৬নং হ্যাম্বলডন কোর্ট।"

মিঃ ব্লীড টেলিফোন-ডাইরেক্টরী টানিয়া লইয়া তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। তাহার পর মিঃ লিসেষ্টার স্প্রিংএর টেলিফোনের নম্বরটি দেখিয়া লইয়া টেলিফোনের 'এক্সচেঞ্জ' আফিসে সেই নম্বরটি বলিলেন।

এক জন লোক সেই ঠিকানা হইতে মিঃ ব্লীডকে সাড়া দিয়া বলিল, "না, মিঃ স্প্রিং এখন এখানে নাই। আপনি কথা বলিতেছেন কে মহাশয়?"

মিঃ ব্লীড এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "আজ সন্ধ্যার মধ্যে মিঃ স্প্রিং কি তাঁহার আফিসে ফিরিবেন বলিয়া আপনার মনে হয়? আমি ড্যান কার্থুর মামলা সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাই। হ্যাঁ, ড্যান কার্থু, ওল্ড বেলীর দায়রা-আদালতে নরহত্যার অভিযোগে তাহার বিচার চলিতেছে।"

মিঃ ব্লীড টেলিফোনের রিসিভার কাণের কাছে ধরিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, দুই এক মিনিট পরে তিনি উত্তর পাইলে, রিসিভারটা ঝুলাইয়া রাখিয়া মিস্ হ্যালামকে বলিলেন, "দেখুন মিস্ হ্যালাম, আমাদের এই সহযোগী বন্ধুটি—আমি মিঃ লিসেষ্টার স্প্রিংএর কথা বলিতেছি—অসময়েও আফিসে থাকেন শুনিলাম। সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলাম, রাত্রি নয়টার সময় যাইলেও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। আমার পক্ষে ইহা অল্প সুবিধার কথা নহে; তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার পূর্ব্বে আমি ডিনারটা সারিয়া লইতে পারিব। আপনি ড্যান কার্থুর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন বলিলেন, সে কি তাহার অনুকূলে আর এক জন সলিসিটার নিযুক্ত করিবার জন্য আপনাকে কোন দরখাস্ত লিখিয়া দিয়াছে? সে যে এক জন নূতন সলিসিটার নিযুক্ত করিতে চায়, ইহার প্রমাণ কি?"

"প্রমাণ?"—বলিয়া মিস্ হ্যালাম, ঈষৎ ভ্রূ কুঞ্চিত করিল; তাহার সেই ভ্রূভঙ্গী মন্মথের শরাসন অপেক্ষা ভুনিবার!—সে তাহার হাতব্যাগ হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির করিল। কাগজখানির মাথায় ব্রিক্সটন-কারাগারের নাম মুদ্রিত ছিল, তাহাতে যে কয়েক ছত্র লেখা ছিল, তাহাতে আট দশটি বর্ণাশুদ্ধি থাকিলেও সেই সংক্ষিপ্ত দরখাস্তখানি সর্ব্বপ্রকার বাহুল্য-বর্জ্জিত; কাযের কথায় পূর্ণ।

দরখাস্তখানি এইরূপ,—

"আমি এক জন নূতন সলিসিটারের সাহায্য চাই। মিঃ লিসেষ্টার স্প্রিংকে আর আমি চাহি না, আমি তাঁহার সম্বন্ধ ত্যাগ করিলাম। ডি কার্থু।"

এই ভার গ্রহণের পর, মিঃ ব্লীড কত দূর কি করিতে পারিবেন, তাহা তিনি মিস্ হ্যালামকে যথাসময়ে জানাইবেন, ইহা অঙ্গীকার করিয়া, একখানি ট্যাক্সি ডাকাইয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলেন, এবং রাত্রি নয়টা বাজিবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে নিস্তব্ধ নগর-পথের একস্থানে অবতরণ করিলেন। কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে যে স্থান জনকোলাহলে মুখরিত ছিল, সেই সময় সেই স্থান শ্মশানভূমির ন্যায় নিস্তব্ধ। একটি সঙ্কীর্ণ গলির মাথায় 'হ্যাম্বলডন কোর্ট' এই নামটি লেখা ছিল। মিঃ ব্লীড ট্যাক্সি হইতে নামিয়া পদব্রজে সেই গলির ভিতর অগ্রসর হইলেন। সেই গলির এক প্রান্তে সংস্থাপিত একটি অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া, নীচের তলায় সিঁড়ির ধারের পার্শ্বস্থ একটি কক্ষে সন্ধান লইয়া তিনি জানিতে পারিলেন, মিঃ লিসেষ্টার স্প্রিংএর আফিস-কামরা তাহার অন্য পার্শ্বে অবস্থিত।

মিঃ ব্লীড একটি আসবাব-বিরল ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; তাঁহার মনে হইল, সম্ভবতঃ তাহা মিঃ স্প্রিংএর মুহুরীর কামরা। সেই কামরার

এক প্রান্তে তিনি খর্ব্বাকৃতি একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোককে উপবিষ্ট দেখিলেন। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর মুখের মত তাঁহার মুখ বিবর্ণ, নাকের ডগায় শিং-বাঁধানো চশমা; তাঁহার গোঁফগুলি কদম্বকেশরের ন্যায় কণ্টকিত। লোকটির ভাব-ভঙ্গী দেখিলে তাঁহাকে কোন গৃহস্থের বাজার-সরকার বলিয়াই ভ্রম হইত; কিন্তু মিঃ ব্রীডের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানাইলেন, তিনিই সলিসিটার মিঃ লিসেষ্টার স্প্রিং।

লিসেষ্টার স্প্রিং নিজের পরিচয় দিয়া মিঃ ব্রীড্‌কে বলিলেন, "আপনি কি চাহেন মহাশয়!" তিনি কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়াই তীক্ষ্নদৃষ্টিতে মিঃ ব্রীডের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। মিঃ ব্রীডের মনে হইল, তাঁহার দেহের উপর দিয়া বিষাক্ত বাষ্পের একটা স্রোত চলিয়া গেল!

মিঃ ব্রীড্‌ অপ্রসন্ন-মনে তাঁহার পেশার পরিচয়সূচক কার্ড বাহির করিয়া মিঃ স্প্রিংএর হাতে দিলেন, এবং সেই সঙ্গে বলিলেন, "আমি টেলিফোনে আপনার সাড়া লইয়াছিলাম, এবং আপনার সহিত সাক্ষাতের জন্য সময় ধার্য্য করিয়াছিলাম। ড্যান্‌ কার্থুর মামলা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্যই আমি আপনার সঙ্গে দেখা করিতে চাহিয়াছিলাম।"

মিঃ ব্রীডের কথা শুনিয়া মিঃ লিসেষ্টার স্প্রিংএর মুখমণ্ডল সহসা বর্ষার আকাশের ন্যায় মেঘাচ্ছন্ন হইল। তাঁহার কুটিল নেত্রের দৃষ্টি নিষ্প্রভ হইল। তিনি অপ্রসন্নভাবে বলিলেন, "আমি জানিতাম না যে, আমার সমব্যবসায়ী কোন বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য উমেদারী করিয়াছিলেন। মিঃ ব্রীড্‌, সেই সময় আপনার নামটি প্রকাশ করাই উচিত ছিল।"

সেই কক্ষের পার্শ্বে কাঠের তক্তানির্ম্মিত একখানি পর্দ্দা প্রসারিত ছিল। মিঃ স্প্রিং সেই পর্দ্দা অপসারিত করিয়া মিঃ ব্রীড্‌কে সঙ্গে লইয়া অন্য একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর পুনর্ব্বার তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমার মক্কেলের কাযে লাগিতে পারে, এরকম কোন খবর-টবর বুঝি আমাকে বলিতে আসিয়াছেন?"

মিঃ ব্রীড্‌ যে কক্ষে প্রবেশ করিলেন, সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিলেন; বাঘের খাঁচার কথাই হঠাৎ তাঁহার মনে হইল। তিনি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রের সহযোগীর মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার চোখে মুখে শৃগালের ধূর্ত্ততা প্রতিফলিত দেখিলেন। একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাঁহার বুক দুরু-দুরু করিতে লাগিল।

মিঃ ব্রীড্‌ কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "আপনার সহিত আমি যে প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে আসিয়াছি, তাহা আমাদের কোন পক্ষেরই প্রীতিকর নহে; কিন্তু আপনি বোধ হয় ভালই জানেন যে, আমাদের মক্কেলগুলার খেয়ালের অন্ত নাই, এবং ইচ্ছা না থাকিলেও আমাদিগকে অনেক সময় তাহাদের খেয়াল অনুসারেই চলিতে হয়। আজ রাত্রিতে আমি মিঃ কার্থুর নিকট হইতে উপদেশ পাইয়াছি, আমাকে দায়রা আদালতে তাহার পক্ষে দাঁড়াইতে হইবে।"

যদি কোন মক্কেল তাহার উকীলকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য উকীল নিযুক্ত করে, তাহা হইলে তাহার উকীলের আত্মসম্মানে আঘাত লাগিবারই কথা; এই প্রকার ব্যবহার অপমানজনক। কিন্তু মিঃ ব্রীডের কথা শুনিয়া মিঃ স্প্রিংএর মুখভাবের যে পরিবর্ত্তন হইল, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়জনক বলিয়াই ব্রীডের মনে হইল। মিঃ স্প্রিংএর মুখ মৃতব্যক্তির মুখের মত বিবর্ণ হইল, এবং তাঁহার চক্ষুতে ভীষণ আতঙ্ক পরিস্ফুট হইল। মিঃ স্প্রিং দুই তিন মিনিট স্তম্ভিতভাবে বসিয়া থাকিয়া নীরস স্বরে বলিলেন, "আপনি বলিলেন, আপনি আমার মক্কেলের নিকট হইতে উপদেশ পাইয়াছেন। মিঃ কার্থু কখন্‌ আপনাকে উপদেশদানে অনুগৃহীত করিয়াছে?"

মিঃ ব্রীড বলিলেন, "মিস এঞ্জেলা হ্যালাম, মিঃ কার্থুর পরম হিতৈষিণী; তিনি আজ সকালে ব্রিক্সটনের কারাগারে মিঃ কার্থুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিঃ কার্থু তাঁহাকে যে লিখিত উপদেশ দান করিয়াছেন, আপনি তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।"

মিঃ ব্রীড ডেস্কের উপর দিয়া হাত বাড়াইয়া কার্থু-লিখিত পত্রখানি মিঃ স্প্রিংএর হাতে দিলেন। লিসেষ্টার স্প্রিং সেই সংক্ষিপ্ত পত্রখানির দিকে দুই তিন মিনিট নির্নিমেষ-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর চেয়ার হইতে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া অস্ফুটস্বরে দুই একটা কথা বলিয়াই দ্বার খুলিয়া তাড়াতাড়ি ভিতরের দিকের একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

মিঃ গ্রীড একাকী বসিয়া নানা কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া একটি বাতায়ন দেখিতে পাইলেন, তাহার দ্বার উদ্ঘাটিত ছিল। সেই বাতায়নের বাহিরে অবস্থিত একটি বৃহৎ অট্টালিকা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। সেই অট্টালিকার প্রাচীরে মোটা মোটা অক্ষরে লিখিত ছিল, "হ্যাম্বলড্ন হোটেল।" পথপ্রান্তবর্ত্তী আলোকে তিনি সেই অক্ষরগুলি সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন।

হোটেলটি সেই কক্ষের অদূরে অবস্থিত হইলেও মিঃ গ্রীড তত রাত্রিতে হোটেলে জনকোলাহল শুনিতে পাইলেন না। চতুর্দ্দিকে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজিত। মিঃ স্প্রিংকে প্রায় পনের মিনিটের মধ্যে প্রত্যাগমন করিতে না দেখিয়া মিঃ গ্রীড ভাবিলেন, লোকটা ফিরিতেছে না কেন? হঠাৎ অসুস্থ হইয়া উত্থানশক্তিরহিত হইল না কি?

যাহা হউক, আরও কয়েক মিনিট পরে মিঃ লিসেষ্টার স্প্রিং মিঃ গ্রীডের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তিনি বলিলেন, "মিঃ গ্রীড, আপনাকে দীর্ঘকাল এখানে একাকী বসিয়া থাকিতে হইয়াছে—এজন্য আমি দুঃখিত, আমার যে মুহুরীর উপর কার্থুর মামলার তদ্বিরের ভার আছে, তাঁহাকে টেলিফোনে ডাকিয়া উপদেশ দিতে হইল বলিয়া আপনার নিকট ফিরিতে আমার বিলম্ব হইয়াছে। আইন-আদালত-সংক্রান্ত কার্য্য দস্তুরমত সম্পন্ন করাই উচিত। এই জন্য আপনি যে মহিলার নিকট হইতে—তাঁহার নাম মিস হালাম বলিলেন না?—হাঁ, যে মিস্ হালামের নিকট হইতে কার্থুর চিঠিখানি পাইয়াছেন বলিলেন, তাঁহার পূর্ণ নাম ও ঠিকানাটি আপনি আমাকে জানাইবেন, এরূপ আশা করিতে পারি। তাঁহার পূর্ণ নাম ও ঠিকানাটি আমাকে জানাইলে আমি বাধিত হইব।"

মিঃ গ্রীডের মনে হইল, মিঃ লিসেষ্টার স্প্রিংএর এই অনুরোধ অসঙ্গত নহে। মিস্ হালাম কি উপায়ে অভিযুক্ত আসামী মিঃ স্প্রিংয়ের মক্কেল ড্যান কার্থুর পত্রখানি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, মিঃ স্প্রিং তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে, তাহা তাঁহার অশিষ্ট কৌতূহল বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। এই জন্য মিঃ গ্রীড মিঃ স্প্রিংকে মিস্ হালামের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা বলিয়া দিলে মিঃ স্প্রিং তাহা লিখিয়া লইলেন। তাহার পর মিঃ স্প্রিং একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া, তাঁহার সিগারেটের কৌটাটি খুলিয়া তাহা মিঃ গ্রীডের সম্মুখে ঠেলিয়া দিলেন, এবং বলিলেন, "দেখুন মিঃ গ্রীড, একটু আগেই আপনি বলিলেন না—ড্যান কার্থুদের মত মক্কেলগুলার খেয়ালের অন্ত নাই? তাহার উদ্ভট খেয়ালের জন্যই এই রাত্রিকালে আপনাকে এতখানি অসুবিধা ও কষ্ট সহ্য করিতে হইল। অন্ধকারে আপনার বাহিরে যাইতে কষ্ট হইবে। আপনাকে একটা আলো দিই।"

মিঃ স্প্রিং দিয়াশলাইয়ের একটা কাঠী জ্বালিয়া চেয়ার হইতে উঠিলেন এবং সেই জ্বলন্ত কাঠীটা হাতে লইয়া, ডেস্কের পাশ দিয়া ঘুরিয়া মিঃ গ্রীডের চেয়ারের পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। মিঃ গ্রীড প্রসারিত হস্তে আলোটি গ্রহণোদ্যত হইয়াছেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে নিকটে কোথাও 'খট্' করিয়া একটা শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চেয়ারখানি প্রচণ্ডবেগে আন্দোলিত হইয়া পশ্চাতে উল্টাইয়া পড়িল। মিঃ গ্রীড উভয় হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া আশ্রয়লাভের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হইল না; তিনি হেঁটমুণ্ডে ও ঊর্দ্ধপদে চেয়ার হইতে গড়াইয়া সেই কক্ষের মেঝের পরিবর্ত্তে, অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীর গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইলেন। (he found himself falling into a dark abyss) মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার ঊর্দ্ধস্থিত আলোকিত কক্ষটি আতঙ্ক-বিস্ফারিত নেত্রের সম্মুখে যেন আতসবাজির আলোকের প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই সেই আলোকরাশি অদৃশ্য হইল, এবং মিঃ গ্রীড ভূগর্ভস্থ পাষাণ-নির্ম্মিত কঠিন শাণের উপর পড়িয়া অচেতনপ্রায় হইলেন; কিন্তু সেই শাণের উপরেও তিনি আশ্রয়লাভ করিতে পারিলেন না। ভূবিবরস্থ সেই মেঝেটি ক্রমশঃ ঢালু হইয়া নিম্নাভিমুখে প্রসারিত থাকায় তিনি গড়াইতে গড়াইতে আরও নীচে পড়িলেন; শেষে এক স্থানে তাঁহার গতিরোধ হইল। সেই স্থানে তিনি অসাড়-দেহে পড়িয়া রহিলেন।

কিন্তু তখনও তাঁহার চেতনা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইল না: কয়েক মিনিট তিনি নিস্তব্ধভাবে পড়িয়া রহিলেন, নড়িবার চেষ্টা করিলেন না বা করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি বেদনাপ্লুত-দেহে বহুকষ্টে উঠিয়া বসিলেন। সৌভাগ্যক্রমে শ্রমসাধ্য ব্যায়ামে তিনি সুনিপুণ ছিলেন। লিঙ্কন্স ইনের ক্রীড়াক্ষেত্রে ব্যায়ামে আর কেহই তাঁহার স্মা

দক্ষতালাভ করিতে পারেন নাই। এই জন্য পতনকালে তিনি উভয় হস্ত ও পদদ্বয় এভাবে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার দেহের সমস্ত ভার তাঁহার পেশীসমূহে নির্ভর করায় তিনি অল্পাধিক আহত হইলেও, তাঁহার দেহের কোন অস্থি স্থানচ্যুত হইল না বা ভাঙ্গিল না।

তিনি সেই স্থানে উপবেশন করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু সেই গহ্বর এরূপ নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল যে, সেই অন্ধকারের ভিতর কিছুই তিনি দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু আরও কিছু নীচের দিকে একটা অস্ফুট অশ্রান্ত কল-কল শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি কাণ পাতিয়া সেই শব্দ শুনিতে লাগিলেন, তাহা জলপ্রবাহের কল্লোলধ্বনি বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। তিনি জোরে জোরে শ্বাসগ্রহণ করিতে লাগিলেন।

সেই স্থানে একটা অদ্ভুত গন্ধ তাঁহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহা কোন পচা নর্দ্দামার গন্ধ বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইল না। বাল্যকালে তিনি সাদা ইঁদুর পুষিয়াছিলেন, তাঁহার মনে হইল, সেই ভূবিবরস্থ বায়ুস্তরের গন্ধ সেই গন্ধেরই অনুরূপ, তবে তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক তীব্র। সেই গন্ধের স্বরূপ কি, এবং কোথায় তাহার উৎপত্তি, তাহা তিনি নির্ণয় করিতে পারিলেন না।

মিঃ গ্রীড চিন্তাকুল-চিত্তে এই সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা করিতে করিতে তাঁহার বেদনাপ্লুত বাহু ডলিতেছিলেন, সেই সময় ভূগর্ভস্থিত অশ্রান্ত জলকল্লোলধ্বনির সহযোগে আর এক প্রকার শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। হাজার জোড়া নূতন রেশমী কাপড় কড়া করিয়া ভাঁজ করা থাকিলে, তাহা একসঙ্গে টানিয়া খুলিবার সময় যেরূপ ক্যাঁস্-ক্যাঁস্ শব্দ শুনিতে পাইবার সম্ভাবনা, এই নূতন শব্দটির প্রকৃতি অনেকটা সেই রকম। অন্ধকারে সেই শব্দ ক্রমশঃ সুস্পষ্টতর হইতে লাগিল। মিঃ গ্রীডের মনে হইল, শব্দটা ধীরে ধীরে তাঁহার দিকে সরিয়া আসিতেছে।

মিঃ গ্রীড অস্বস্তি অনুভব করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তিনি যে ছাতাটি হাতে লইয়া মিঃ লিসেষ্টার স্প্রিংএর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার হাতেই ছিল, তিনি তাঁহার ডাণ্ডিতে ভর দিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার মুখে যেন বায়ুপ্রবাহ সঞ্চালিত হইল, তাহা বৈদ্যুতিক পাখার আবর্ত্তনজনিত আলোড়িত বায়ু-প্রবাহের অনুরূপ। মিঃ গ্রীড তৎক্ষণাৎ কয়েক ফুট পশ্চাতে সরিয়া গিয়া ম্যাচ-বাক্সটা পকেট হইতে বাহির করিলেন। তিনি খট্ করিয়া একটা কাঠী জ্বালিতেই তাহার পীতাভ রশ্মিতে সেই জমাট অন্ধকারের মধ্যে কয়েক গজ ব্যাপিয়া ঈষৎ আলোকিত হইল। সেই ক্ষীণ আলোক-প্রভায় সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি সভয়ে আর্ত্তনাদ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে এক পাশে লাফাইয়া পড়িলেন। দিয়াশলাই-এর কাঠীটা তাঁহার ভয়কম্পিত হস্ত হইতে খসিয়া পড়িয়া নিবিয়া গেল।

তিনি দিয়াশলাইয়ের কাঠীর সেই মুহূর্ত্তকালস্থায়ী আলোকে সম্মুখে যে দৃশ্য দেখিতে পাইলেন, তাহা অতি ভীষণ! তাঁহার মনে হইল, তিনি নিদ্রাঘোরে কি একটা উৎকট স্বপ্ন দেখিয়া আতঙ্কাভিভূত হইয়াছেন। তিনি দেখিলেন, প্রায় পাঁচ হাত দীর্ঘ একটা বিষধর সর্প লাঙ্গুলে ভর দিয়া প্রায় চারিহাত ঊর্দ্ধে মাথা তুলিয়াছিল, এবং কুলার মত ফণা প্রসারিত করিয়া, তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া সক্রোধে গর্জ্জন করিতেছিল।

সেই সুবৃহৎ অজগরের ফোঁস-ফোঁস শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইতেছিল; তাহার নিশ্বাস-বায়ু তাঁহার চোখে মুখে যেন বিষ ছড়াইতেছিল। মিঃ গ্রীড বুঝিতে পারিলেন, সেই অজগরের গুহা হইতে আর তাঁহার উদ্ধার নাই।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

[ক্রমশঃ।



সাহিত্যের বৈঠক

সাহিত্য ও সমাজ

পুস্তকালয় কল্যাণময় অনুষ্ঠান, লোকশিক্ষার এবং লোকরঞ্জনের একটি প্রধান উপায়। পুস্তকালয়ের উন্নতি দেশের উন্নতির নিদর্শন এবং নিদান। পুস্তকালয়-পরিচালন একটি আনন্দময় মহাব্রত। কিন্তু বর্তমানে এই মহান্ ব্রতের অনেক ব্রতীর, অর্থাৎ পুস্তকালয়-পরিচালকগণের অনেকের মধ্যে উদ্বেগের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এই উদ্বেগের কারণস্বরূপ তাঁহারা বলেন, "যে সকল উপন্যাসে বিবাহ-বন্ধন-মুক্ত স্বাধীন প্রণয়ের চিত্র এবং ইন্দ্রিয়লালসা-উত্তেজক বর্ণনা থাকে, পাঠক-পাঠিকাগণের মধ্যে তাহা পাঠ করিবার জন্ম বেশী আগ্রহ দেখা যায়। এই প্রকার সাহিত্য সমাজের ঘোরতর অনিষ্ট করিতেছে, যুবক-যুবতীগণের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি করিতেছে। অথচ ইহাতে বাধা দিবারও উপায় নাই। চাদাদাতৃগণ যেরূপ পুস্তক পড়িতে চাহেন, তাহা না যোগাইলে পুস্তকালয় চলে না।" সমাজের স্থিতির হিসাবে দেখিতে গেলে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর। সুতরাং এই প্রস্তাবে আমি এই বিষয়টির আলোচনা করিব। এই আলোচনার এমন কতকগুলি কথা বলিতে হইবে, যাহা সাধারণতঃ প্রকাশ্যে বলা হয় না। কিন্তু এখন খোলাখুলি আলোচনা না করিয়া উপায় নাই।

কোনও একটিমাত্র কারণে যে আমাদের সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত হইয়াছে, এমন মনে করা কর্তব্য নহে। উচ্ছৃঙ্খলতার বীজ মানুষের দেহে এবং মনে নিহিত রহিয়াছে। ধর্মের শাসন, সমাজের শাসন, পরিবারের শাসন এই বীজের উপর পাষাণ চাপা দিয়া রাখে। সেই বাধা লঙ্ঘন করিয়া বীজের অঙ্কুর উদ্গম সহজ নহে—যদিও অসম্ভব নহে। কি প্রকারে যে উচ্ছৃঙ্খলতার এই সকল বাধা লঙ্ঘন করা বর্তমানে এত সহজ হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করিতে হইলে অদূর-অতীতের এবং বর্তমানের সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করা কর্তব্য। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে সমাজের এক অংশের গত অর্দ্ধ শতাব্দীর ইতিহাস সঙ্কলন করিতে পারি। এই ইতিহাসে এইরূপ স্তরভেদ দেখা যায়:—

(১) আগে ৯।১০ বৎসরের মেয়ের সহিত ১৪।১৫ বৎসরের ছেলের বিবাহ হইত। এইরূপ ছেলে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পরিবার প্রতিপালনের উপযোগী টাকা রোজগার করিতে পারিবে কি না, সে কথা তখন কেহ বড় হিসাব করিত না।

(২) তার পর ক্রমশঃ দেখা গেল, সকল ছেলে বড় হইয়া পরিবার প্রতিপালনের উপযোগী টাকা রোজগার করিতে পারে না। চাকুরী-বাকুরী করিয়া বা ওকালতী ডাক্তারী প্রভৃতি করিয়া টাকা রোজগার করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করা দরকার। তখন পাশ করা বরের চাহিদা হইল, এবং বাজারে চাহিদার অনুযায়ী বরের আমদানী না থাকায় দিন দিন বরের মূল্য বা পণ বাড়িতে লাগিল।

(৩) কিছুদিন পর দেখা গেল, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করিলেই চাকুরী মিলে না, বা ওকালতী পাশ করিলেই পসার হয় না। তখন কেবল পাশ করা নয়, রোজগারী, সুতরাং বয়স্ক বরের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। বারো বৎসর বয়সের মধ্যে যাহাতে মেয়ের বিবাহ হয়, এত দিন হিন্দু অভিভাবকের সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল। কিন্তু যখন রোজগারী বর ভিন্ন কন্যা দান করা বিপজ্জনক বিবেচিত হইল, তখন বরের মূল্য আরও চড়িয়া গেল, বিবাহ-ঘটন আরও কঠিন হইল। সুতরাং তখন আর বার বৎসরের মধ্যে মেয়ের বিবাহ দেওয়া সম্ভব হইল না। মেয়ে বড় করিয়া বিবাহ দেওয়া আরম্ভ হইল। আর এক দিকে বয়স্থা মেয়ে ঘরে থাকিয়াই বা কি করিবে। সুতরাং অবিবাহিতা মেয়েদিগকে ইংরেজী হাই স্কুলে এবং তার পর কলেজেও পাঠান হইতে লাগিল। এইরূপে মেয়েদিগের মধ্যে যৌবন-বিবাহ ক্রমশঃ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল।

(৪) শেষে অর্থাৎ বর্তমানে উপস্থিত হইয়াছে বেকার-সমস্যা, আর্থিক অবস্থার বিপর্য্যয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ-সমস্যা। এখন অনেক ক্ষেত্রে বিবাহই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। বেকার অবস্থাও সকল সময় অবিবাহের কারণ নহে; জীবনযাত্রার চাল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়বৃদ্ধি অনেক ক্ষেত্রে অবেকার যুবকের পক্ষে বিবাহ অসুবিধাজনক করিয়া তুলিয়াছে।

এইরূপে অবিবাহিত এবং অবিবাহিতা যুবক-যুবতীর সংখ্যা এবং কলেজে এবং অন্যান্য স্থানে তাহাদের মিলনের সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহারা পারিবারিক শাসনের বাহিরে গিয়া পড়িল। উচ্ছৃঙ্খলতার বীজের উপর যে পাষাণ চাপা ছিল, তাহা ক্রমে সরিয়া যাইতে লাগিল। এই সুযোগ উপস্থিত হইবামাত্র চারিদিক হইতে সেই বীজের উপর জলসেচন আরম্ভ হইল। যথা—

(১) য়ুরোপীয় সিনেমা, য়ুরোপীয় তরুণ সাহিত্য, এবং য়ুরোপের ও আমেরিকার সমাজ-বিপ্লবের গুজব।

(২) তরুণ বাঙ্গালা-সাহিত্য। এই সাহিত্যের দুইটি সুর এখানে উল্লেখযোগ্য। এক সুর স্বাধীন প্রেমের মহিমা। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "সবলা" নারীর মুখের এই দুইটি পংক্তি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

যাব না বাসর-কক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী,
আমারে প্রেমের বীর্য্যে করো অশঙ্কিনী।

তরুণ সাহিত্যের আর এক সুরে শারীরিক পিপাসার উদ্রেক

(৩) প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীর অপব্যবহার। প্রকৃত বৈষ্ণবরা মনে করেন, রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক মহাজন-পদাবলী পবিত্র এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণকর। এই পদাবলীর শ্রবণ-কীর্ত্তনে সকলের অধিকার নাই। এক সময়ে পুণ্য-কর্ম্ম বলিয়া বৈষ্ণব পদাবলী গীত হইত। তাই রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন :—

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান !
পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মান অভিমান,
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ মিলন,
বৃন্দাবন-গাথা,—এই প্রণয়-স্বপন
শ্রাবণের শর্ব্বরীতে কালিন্দীর কূলে,
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
সরমে সম্ভ্রমে,—এ কি শুধু দেবতার !
এ সঙ্গীত-রসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্ত্তবাসী এই নর-নারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্ত প্রেমতৃষা !

"সোনার তরী"তে প্রথম প্রকাশিত এই কবিতায় রচনার তারিখ আছে ১৮ আষাঢ়, ১২৯৯। তার পর বিগত ৪৩ বৎসরের মধ্যে দেশের রুচির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বৈষ্ণব-পদাবলী এখন সৌখীনের সখের সামগ্রী ; অতি শিক্ষিতগণের বিশেষ অনুগৃহীত।

(৪) স্বরাজ-সাধনায় নারীর আহ্বান। এই আহ্বান বোধ হয় বাঙ্গালা দেশেই প্রথম উচ্চারিত হয়। আহ্বানকারিগণের মধ্যে এক জন অগ্রণী ছিলেন, প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি ১৩২৮ সালের পৌষ মাসে শিবপুর ইনষ্টিটিউটে যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন,

"মেয়েমানুষকে আমরা যে কেবল মেয়েমানুষ করেই রেখেছি, মানুষ হ'তে দিই নি, স্বরাজের আগে তার প্রায়শ্চিত্ত দেশের হওয়া চাই। অত্যন্ত স্বার্থের খাতিরে যে দেশ, যে দিন থেকে কেবল তার সতীত্বটাকেই বড় ক'রে দেখেছে, তার মনুষ্যত্বের কোন খেয়াল করে নি, তার আগে শেষ করতেই হবে।" *

তার পর শরৎ বাবু লিখিয়াছেন, "সতীত্বটাকে আমি তুচ্ছ বলিনি, কিন্তু একেই তার নারী-জীবনের চরম ও পরম শ্রেয় জ্ঞান করাকেও কুসংস্কার মনে করি।" তার পর স্বয়ং মহাত্মা নারীদিগকে নিরস্ত্র বিদ্রোহের সহযোগিনী হইতে এবং কারাবরণ করিতে আহ্বান করিলেন।

এইরূপ যোগাযোগের দিকে লক্ষ্য করিলে শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক মনে পড়ে। শ্রীমদ্ভাগবতে বিষ্ণুর অবতার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—

ততঃ কলৌ সম্প্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধো নাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি।

"তার পরে (কৃষ্ণ অবতারের পর) কলিযুগ আরম্ভ হইলে দেবদ্বেষীদিগকে সম্মোহিত করিবার জন্য বুদ্ধ নামক অঞ্জনের পুত্র কীকট দেশে (গয়া প্রদেশ) আবির্ভূত হইবেন।"

* "স্বদেশ ও সাহিত্য," ১৩ পৃঃ।

বর্ত্তমানে এদেশের শিক্ষিত সমাজের বেকার যুবক-যুবতীদিগকে সম্মোহিত করিবার জন্য অবতীর্ণ নারায়ণ যেন চারি হস্তে সমানে অস্ত্রাঘাত করিতেছেন।

প্রগতিশীল সমাজ-সংস্কারকগণ বলিবেন, "এ ত বেশ কথা। এতে ভীত হইবার কোন কারণ নাই। এ দেশে য়ুরোপীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ এত দিনে উপস্থিত হইয়াছে।" য়ুরোপের অনুকরণপ্রবৃত্তি আমাদের অনেক বিপদের মূল। কিন্তু খাস য়ুরোপে স্বাধীন প্রেমের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কি না, না একনিষ্ঠা এখনও সেখানকার দাম্পত্য-জীবনের আদর্শ, তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত। য়ুরোপে সহজ প্রেমের প্রচারক আছে সন্দেহ নাই এবং সেখানেও অবশ্য অনেক উচ্ছৃঙ্খল নর-নারী থাকা সম্ভব। কিন্তু তাই বলিয়া উচ্ছৃঙ্খলতাকে পাশ্চাত্য আদর্শ বলা যায় না। পাশ্চাত্য জগতের অধিকাংশ লোক যে আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাহাকে পাশ্চাত্য আদর্শ বলা কর্ত্তব্য। য়ুরোপের জন কয়েক খেয়ালী লোকের আচরণকে বা মতকে পাশ্চাত্য আদর্শ বলা যায় না। আদর্শ হিসাবে য়ুরোপে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রগত সোসিয়ালিষ্ট বা আর্থিকসাম্য (equality of income) বাদিগণ। সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার এবং সুরসিক লেখক বার্ণার্ড শ সোসিয়ালিষ্টগণের এক জন নেতা। বার্ণার্ড শ অত্যন্ত স্পষ্টবাদী। বার্ণার্ড শর লেখা হইতে প্রমাণ সংগ্রহের পূর্ব্বে তাঁহার একটি মতের কথাও বলিয়া রাখা আবশ্যক। বিবাহ—অবিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে শ'র মতামত প্রধানতঃ "বিবাহ করা" (Getting Married) নামক ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত নাটকের মুখবন্ধে বিবৃত হইয়াছে। শ'র প্রধান বক্তব্য, স্বামী বা স্ত্রী কোন পক্ষে আদালতের নিকট বিবাহের বিচ্ছেদ (divorce) প্রার্থনা করিলেই কোন কৈফিয়ৎ বা কোন সাক্ষী-সাবুদ তলব না করিয়া অবিলম্বে সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করা উচিত। এই মতের অনুকূলে শ অনেক যুক্তি-প্রমাণ দিয়াছেন। য়ুরোপের সামাজিক অবস্থা হিসাব করিলে তাঁহার কতকগুলি যুক্তি অকাট্য মনে হয়। কিন্তু এই বিষয়টি আমাদের বিচার্য্য নহে। মুখবন্ধসহ পূর্ব্বোক্ত নাটক প্রথম প্রকাশিত হইবার ২৫ বৎসর পরে, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে, শ মুখবন্ধের পরিশিষ্টরূপে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিব। এই কয়েকটি পংক্তিতে য়ুরোপের জনসমাজের বর্ত্তমান নৈতিক অবস্থার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। শ লিখিয়াছেন,—

"যে সকল দেশে সন্তানের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিলে, এক পক্ষের প্রার্থনা অনুসারেই অবিলম্বে অল্প ব্যয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে এবং ব্যভিচারের কোন কারণ থাকে না, আমাদের দেশ (ইংলণ্ড) অপেক্ষা সেই সকল দেশে ব্যভিচার অধিকতর নিন্দনীয় ; এবং আমাদের দেশে যাঁহারা বিবাহ-বন্ধন অচ্ছেদ্য মনে করেন, তাঁহারা অবাধ বিবাহ-বিচ্ছেদ হইতে যে সকল বিষময় ফল ফলিবে বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, অবাধ বিবাহ-বিচ্ছেদ কোথাও সেই সকল বিষময় ফল উৎপাদন করিয়াছে, এমন অভিযোগ শুনা যায় না।" *

* "Meanwhile in countries where marriages can be dissolved at the demand of either party without delay or serious expense, subject only to provision

উপরি-উক্ত নাটকের মূল মুখবন্ধের গোড়ায় বার্ণার্ড শ লিখিয়াছেন, অনেক যুবতী আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, যে পুরুষের সহিত তাঁহারা একত্র বাস করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে বিবাহ করিয়া লইবেন কি না; এবং শ যখন তাঁহাদিগকে বিবাহ করিতে উপদেশ দেন, তখন তাঁহারা বিস্মিত এবং বিরক্ত হয়েন। তার পর এই সকল যুবতী যখন রেজেষ্টারী আফিসে বা গির্জ্জায় গিয়া বিবাহ করেন, তখন স্বামি-স্ত্রী চুক্তি করিয়া লয়েন যে, তাঁহাদের উভয়ের ব্যভিচারের সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে। এই প্রকার চুক্তিসহ বিবাহের পরিণাম সম্বন্ধে শ লিখিয়াছেন—

"I do not observe that their unions prove less monogamic than other people's: rather the contrary, in fact."

"অন্যান্য দম্পতির তুলনায় এইরূপ দম্পতির মধ্যে একনিষ্ঠা কম দেখিতে পাই না; প্রকৃতপ্রস্তাবে বেশী দেখিতে পাই।"

স্বামি-স্ত্রীর একনিষ্ঠাই সতীত্ব। রাসিয়ার বোলশেবিকগণের আচার-ব্যবহার হইতে দেখা যায়,তাহারা দাম্পত্য জীবনের একনিষ্ঠার বিশেষ পক্ষপাতী। বোলশেবিক রাসিয়ার বিবাহবিধি এবং বিবাহবিচ্ছেদ-বিধি অনেক পুস্তকেই বর্ণিত হইয়াছে। আমি দুইখানি পুস্তক হইতে কিছু কিছু প্রমাণ উদ্ধৃত করিব। প্রথম পুস্তক বার্ণার্ড শ-প্রণীত The Intelligent woman's guide to socialism and capitalism (৪০)। শ লিখিয়াছেন, জারের শাসনের সময় রাসিয়ায় বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্ভবপর ছিল না, কিন্তু সমাজে যথেষ্ট ব্যভিচার ছিল। বোলশেবিক সরকার বিবাহভঙ্গ অতি সহজ করিয়াছেন, অথচ ব্যভিচার সহ্য করেন না। কোন পুরুষ যদি কোন স্ত্রীলোকের সহিত স্বামি-স্ত্রীর মত বাস করে, তবে সেই স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে হয়। সেই পুরুষের পূর্ব্ব-বিবাহের স্ত্রী থাকিলে তাহাকে ত্যাগ করিয়াও সঙ্গিনীকে বিবাহ করিতে হয়। সঙ্গিনীর বিবাহিতা পত্নীর মর্য্যাদা দাবী করিবার অধিকার আছে, এবং তাহাকে সেই মর্য্যাদা দাবী করিতে হয়।"*

এক জন কেনাডাবাসী সংবাদ-সংগ্রহকার, ফ্রেডারিক গ্রিফিন † লিখিয়াছেন, রাসিয়ার বাহিরে জনসাধারণের ধারণা যে,

for the children so that there is no luger any excuse for illicit dissolute relations, public opinion on questions of sexual behaviour is sterner than with us; and none of the disastrous consequences of unimpeded divorce predicted by our upholders of indissoluble marriage are complained of."

* In Russia under the Communist Soviet this state of things has been reversed. If a married couple can not agree, they can obtain a divorce without having to pretend to disgrace themselves as in Protestant England.....But the Soviet does not tolerate illicit relations. If a man lives with a woman as husband and wife he must marry her, even if he has to divorce another wife to do it. The woman has the right to the status of a wife, and must claim it."

† Frederrick Griffin, *Soviet Scene*, Toronto, 1933.

বোলশেবিক সরকার বিবাহ তুলিয়া দিয়াছেন, সেখানে পরিবার বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই, এবং বিবাহবন্ধন খুব তাড়াতাড়ি ছিন্ন হইতেছে। সত্য বটে, রাসিয়ায় বিবাহ করা এবং বিবাহ বিচ্ছিন্ন করা পোষাক-পরিবর্ত্তনের মত সহজ হইয়াছে। কিন্তু তাহার ফলে বিবাহ বা পারিবারিক জীবন যে বাজে কাজ বলিয়া গণ্য হইতেছে, তাহা বলা যায় না। এখানে মানব-প্রকৃতির কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, এবং লেখকের ধারণা, মূল নৈতিক আদর্শ কানাডায় যত উচ্চ, রাসিয়ায় ততোধিক উচ্চ না হইলেও, ততটা উচ্চ ত বটেই। বিবাহভঙ্গ সহজ হইলেও আমেরিকার লোকের অপেক্ষা রাসিয়ার লোকের মধ্যে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিবার অধিকতর গরজ দেখা যায় না।

এখানে লেখক একটি গুরুতর বিষয় উত্থাপিত করিয়াছেন। তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, বর্ত্তমান রাসিয়ায়ও মানব-প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটে নাই (But humanity here is unchanged)। এই পরিবর্ত্তনহীন মানব-প্রকৃতির সঙ্গে লেখক জড়াইয়াছেন, "মূল নৈতিক আদর্শ" (essential morality)। মানুষের পশুর মধ্যে সুলভ অনেক লক্ষণ আছে; তাহার উপর আবার মনুষ্যত্ব আছে। কতকগুলি সুমতি এবং সুবুদ্ধি মনুষ্যত্ব নামে কথিত হয়। তন্মধ্যে একটি—স্বামি-স্ত্রীর একনিষ্ঠতা বা সতীত্ব। এখন জিজ্ঞাস্য এই, একনিষ্ঠতা কি মানুষের পক্ষে যথার্থ ই স্বভাবসিদ্ধ, না অভ্যাসসিদ্ধ, অর্থাৎ সুবিধাজনক বলিয়া অবলম্বিত? একনিষ্ঠতা যদি মানুষের স্বভাবসিদ্ধ হয়, তবে স্বাধীন প্রেম কখনও ব্যাপকভাবে চলিতে পারে না; আর যদি অভ্যাসসিদ্ধ, অর্থাৎ সমাজের পক্ষে সুবিধাজনক বলিয়া কোন সময় গৃহীত হইয়া থাকে, তবে স্বাধীন প্রেমের পথ পুনঃ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা থাকিতে পারে। স্বামি-স্ত্রীর একনিষ্ঠার মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে প্রথমতঃ বিবাহের মূল অনুসন্ধান করিতে হয়, কেন না, বিবাহ না থাকিলে একনিষ্ঠতার অবকাশ থাকে না। বিবাহের মূল সম্বন্ধে সমাজ-বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মধ্যে দুই প্রকার মত প্রচলিত আছে। এক মতে মানব-সমাজে আদৌ যথেচ্ছা সম্ভোগ-রীতি (primitive promiscuity) প্রচলিত ছিল এবং তার পর এইরূপ যথেচ্ছাচার অসুবিধাজনক বিবেচিত হওয়ায় বিবাহপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আর এক মত, বিবাহ সনাতন প্রথা। আদিম অবস্থায়ও মানব-সমাজে বিবাহ প্রচলিত ছিল। শরৎবাবু তাঁহার "নারীর মূল্য" নামক প্রসিদ্ধ পুস্তিকায় প্রথমোক্ত মতই বিবৃত করিয়াছেন, এবং এই মতের আকরস্বরূপ মেকলেনান (Maclennan) প্রণীত "আদিম মানব-সমাজে বিবাহ" (Primitive marriage) নামক পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন। ৭০ বৎসর পূর্ব্বে, ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে মেকলেনানের এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শরৎবাবুর আর এক জন পথিপ্রদর্শক হার্বার্ট স্পেন্সারও অনেক পরিমাণে এই মতাবলম্বীই ছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক ওয়েষ্টারমার্ক (Edward Westrmarck) ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মানুষের বিবাহের ইতিহাস (The history of human marriage) নামক পুস্তকে মেকলেনান প্রমুখ পণ্ডিতগণের মত খণ্ডন করিয়া বিবাহ-প্রথার সনাতনত্ব প্রতিপাদন করেন। তার পর অধিকাংশ সমাজ-বিজ্ঞানবিৎ ওয়েষ্টারমার্কের মতের সমর্থন করিয়াছেন। মেকলেনানের মত কেহই এখন সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেন না। কিন্তু কয়েক জন পণ্ডিত অনুমান করেন, আদিম অবস্থায় মানব

সমাজে কতক পরিমাণে যথেচ্ছা সম্ভোগরীতিও প্রচলিত ছিল। শরৎবাবুর "নারীর মূল্য" "যমুনা" নামক মাসিক পত্রে ১৩২০ সনে (১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে) প্রথমতঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে ওয়েষ্টারমার্কের পুস্তকের চারিটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিক মতবাদের সম্যক্ আলোচনার জন্যই যে কেবল সদ্যঃ প্রকাশিত (up to date) বৈজ্ঞানিক পুস্তক দেখা আবশ্যক, তাহা নহে; নবাবিষ্কৃত প্রমাণের আকররূপে সদ্যঃ প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক পুস্তক দেখিয়া লওয়া নিতান্ত আবশ্যক। পর্য্যটক এবং খৃষ্টান মিশনারীগণ আদিম জাতিনিচয়ের যে বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, আদৌ সেই সকল বিবরণ অবলম্বন করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-তত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁহাদের গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। হার্বার্ট স্পেন্সার নিজের শিষ্য এবং সহযোগিগণের দ্বারা এক গ্রন্থ সমাজ-বিবরণ (Descriptive Sociology) সংগ্রহ করাইয়াছিলেন। দেখা গিয়াছে, এই সকল বিবরণ সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নহে। এই নিমিত্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে অনলসকর্ম্মা তথ্য-সংগ্রাহকগণ আদিম জাতিনিচয়ের বিবরণ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শরৎবাবুর "নারীর মূল্য" রচনার অনেক পূর্ব্বে এই শ্রেণীর বিবরণ-গ্রন্থমধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসিগণের সম্বন্ধে Spencer এবং Gillonএর Native Tribes of Central Austra'ia (1899) এবং Howittএর Native Tribes of South-East Australia (1904) প্রকাশিত হইয়াছিল। "নারীর মূল্য" পুস্তিকায় শরৎবাবু অষ্ট্রেলিয়ার আদিম-বাসিগণের অনেক অনাচারের বিবরণ দিয়াছেন, কিন্তু এই দুইখানি প্রামাণ্য গ্রন্থে ঐ সকল বিবরণ আছে কি না, তাহার উল্লেখ করেন নাই। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া মানুষ পৃথিবীতে বাস করিয়া আসিতেছে। ইতিহাসে মানব-সমাজে জীবনের অতি অল্প অংশের, মাত্র ৫।৬ হাজার বৎসরের বিবরণ আছে। বর্ত্তমানে যে সকল বর্ব্বর জাতিকে আদিম (primitive) বলা হয়, তাহাদিগের আচার-ব্যবহারকে মানবের আদিম সমাজের আচারের নমুনা বলিয়া গণ্য করিতে হইলে ধরিয়া লইতে হয়, লক্ষ লক্ষ বৎসরে কতকগুলি জাতির আচার-ব্যবহারের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। বিজ্ঞানের পক্ষে এইরূপ ঢেঁকি গিলিয়া হজম করা সম্ভব নহে। সুতরাং মানবের আদিম সমাজে বিবাহবিধি চলিত ছিল কি না, এই বিষয়ে অনুমান (hypothesis) গঠন ভিন্ন আর বেশী কিছু করিবার উপায় নাই। এই অনুমানের ক্ষেত্রে এক প্রকার মতকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলে সুবিচার হয় না।

বিবাহপ্রথা এবং একনিষ্ঠা সনাতনই হউক, অথবা বানাওটী ব্যাপার হউক,—বোলশেভিক রাসিয়ার সামাজিক ইতিহাস সপ্রমাণ করে দাম্পত্য-জীবনের একনিষ্ঠার বীজ মানব প্রকৃতিতে দৃঢ়বদ্ধ রহিয়াছে। অবশ্য তাহারই সঙ্গে যথেচ্ছাচারের বীজও আছে। আমাদের শাস্ত্রানুসারে মনুষ্য-প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী;—সত্ব, রজঃ তমঃ এই তিন গুণে বা তিন উপাদানে গঠিত। দম্পতির একনিষ্ঠা সত্বগুণের উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি প্রবাদ আছে—

এক নারী ব্রহ্মচারী।
সদাব্রতী একাহারী॥

মানবের প্রকৃতি-নিহিত একনিষ্ঠার বীজ অঙ্কুরিত হইয়া সুফল উৎপাদন করিবে, না যথেচ্ছাচারের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বিষময় ফল উৎপাদন করিবে, তাহা কতকটা নির্ভর করে সংসর্গের এবং বাহিরের অবস্থার উপর। ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে রচিত শরৎবাবুর "নারীর মূল্য" পাঠ করিলে দেখা যায়, তখনও ১১।১২ বৎসর বয়সে মেয়ের বিবাহ দেওয়ার প্রথাই প্রবল ছিল। তার পর য়ুরোপের মহাযুদ্ধ। যুদ্ধের পর আর্থিক অবনতি, ক্রমশঃ বেকার যুবকের সংখ্যাবৃদ্ধি, বিবাহে বিরতি; কন্যাপক্ষে যৌবন-বিবাহ, প্রায়শঃ অবিবাহ; স্কুল-কলেজে পড়াশুনা এবং স্বাধীনভাবে চলাফেরা। যে দেশে কখনও অবরোধ-প্রথা ছিল না, যে দেশে যৌবন-বিবাহ বরাবরই চলিয়া আসিয়াছে, যে দেশে বরাবরই স্ত্রী-পুরুষের স্বচ্ছন্দ মিলনের রীতি আছে, সে দেশে নেহাত অপদার্থ ভিন্ন সকল যুবক-যুবতীরই সংযমের সামর্থ্য জন্মে। কিন্তু যুগ-যুগান্তের পর হঠাৎ এদেশের যুবক-যুবতীর স্বচ্ছন্দ-মিলন আরম্ভ হইয়াছে। কবি কালিদাস লিখিয়াছেন—

বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ॥

চিত্তবিকারের কারণ বিদ্যমান থাকিলেও যাঁহাদের চিত্তবিকার উপস্থিত হয় না, তাঁহারাই ধীর।

কালিদাসের "কুমারসম্ভবে"র শিবের মত ধীর কয় জন? ধীর হইতে হইলে সাধন দরকার অর্থাৎ ধীরতা অভ্যাস করা দরকার। আমাদের যুবক-যুবতীগণের সম্মুখে চিত্তবিকারের কারণ উপস্থিত হইয়াছে মাত্র। এ সময় তাহাদিগকে ধীরতার অনুশীলনে সহায়তা না করিয়া লোভের অগ্নিতে ইন্ধন যোগাইলে ঘোরতর অনিষ্ট করা হয়। স্ত্রীস্বাধীনতা বা স্ত্রীপরাধীনতা অবস্থার অনুযায়ী। মনু ব্যবস্থা দিয়াছেন:—

অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাঃ পুরুষৈঃ স্বৈর্দিবানিশম্।
বিষয়েষু চ সজ্জন্ত্যঃ সংস্থাপ্যা আত্মনো বশে॥
পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥

অদূর-ভবিষ্যতে আমাদের সমাজের স্ত্রীলোকদিগকে অস্বতন্ত্রা বা অধীনা রাখিবে কে? যে ভরণপোষণ করে, সেই ত এই দাবী করিতে পারে। পিতা যেন ভরণপোষণ করিতেছেন। বিবাহ হইতেছে না; সুতরাং পিতৃবিয়োগের পর পোষণই বা কে করিবে এবং অধীনেই বা কে রাখিবে? ভাই ত বেকার। অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে, স্ত্রীকে পরাধীনতা-পাশে বদ্ধ করিবার মত পর অর্থাৎ স্বজনই দুর্ল্লভ। মনুর ব্যবস্থা আর চলিতে পারে না। কিন্তু তাতেই কি স্ত্রী-স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হইয়াছে বলা যাইতে পারে? নিজে নিজেকে ভরণপোষণ করিতে না পারিলে মেয়েরা স্বাধীনা হইবে কি প্রকারে? মেয়েরা যাহাতে আপনার পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে পারে, এরূপ শিক্ষা দিবার, এরূপ সুযোগ দিবার ত বিশেষ কোন আয়োজন দেখিতেছি না। বেশীর ভাগ আয়োজন, মেয়েদিগকে ছেলেদের মত পরীক্ষার পাশ করিবার শিক্ষা দিয়া জীবিকা অর্জ্জনের অযোগ্য করিয়া তুলিবার দিকে। এইবার আমাদের মেয়েদিগকে জীবিকা উপার্জ্জনের উপায় না শিখাইলে অল্পকালের মধ্যে তাহাদের ভাগ্যে যে পরাধীনতা ঘটিবে, তাহা দেখিয়া মনু-যাজ্ঞবল্ক্যও শিহরিয়া উঠিবেন।

এই সমস্যার সমাধানের জন্য য়ুরোপে নানাপ্রকার চেষ্টা চলিতেছে। সুতরাং মেয়েদের আর্থিক স্বাধীনতার (economic independence) ব্যবস্থা সম্বন্ধে এবং পুরুষদেরও প্রকৃত আর্থিক স্বাধীনতার ব্যবস্থা সম্বন্ধে যথাসম্ভব য়ুরোপের অনুসরণ করা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু আমরা তেমন কিছু করিতেছি কি? অতি হীন অবস্থায় পতিত নরনারীর আর্থিক স্বাধীনতা-বিধানের বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে রাশিয়ায়। রাশিয়ার সোভিয়েট সরকার দেশময় সমানভাবে ধনবিভাগের ব্যবস্থা করিয়া, এবং স্ত্রী-পুরুষ সকলকে উপার্জ্জনের জন্য সমানভাবে সুশিক্ষিত করিয়া, আপামর সাধারণের মধ্যে আর্থিক সাম্য এবং স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন। সোভিয়েট রাশিয়ার নূতন শিক্ষাবিধি এই ক্ষেত্রে বিস্ময়কর ফল উৎপাদন করিয়াছে। সুতরাং সোভিয়েট সরকারের শিক্ষানীতি পর্য্যবেক্ষণ করা এবং দেশ-কাল-পাত্র বিচার করিয়া যথাসম্ভব তাহার অনুসরণ করা আমাদের কর্তব্য। এই মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি যাহা দেখিয়া শুনিয়া আসিয়াছেন, তাহার বিবরণ "রাশিয়ার চিঠি" নামক পুস্তকে প্রকাশিত করিয়াছেন। এই পুস্তকের প্রথম চিঠির উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"শান্তিনিকেতনে আমি চিরকাল এই সমস্ত নিয়ম প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেছি, কেবল নিয়মাবলী রচনা হ'য়েছে, কোনো কাজ হয়নি। তার অন্যতম কারণ হ'চ্ছে, স্বভাবতই পাঠবিভাগের চরম লক্ষ্য হয়েছে পরীক্ষা পাস করা, আর সব কিছুই উপলক্ষ; অর্থাৎ হ'লে ভালোই, না হ'লেও ক্ষতি নেই। আমাদের অলস মন জবরদস্ত দায়িত্বের বাইরে কাজ বাড়াতে অনিচ্ছুক। তা ছাড়া শিশুকাল থেকেই আমরা পুঁথি-মুখস্থ বিদ্যাতেই অভ্যস্ত। নিয়মাবলী রচনা করে কোন লাভ নেই, নিয়ামকদের পক্ষে সেটা আন্তরিক না হোলে উপেক্ষিত না হয়ে থাকতে পারে না। আমার কাছে এ শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে আমি যে সব কথা এতকাল ভেবেছি, এখানে তার বেশী কিছু নেই, কেবল আছে শক্তি, আছে উদ্যম, আর কার্যকর্তাদের ব্যবস্থা-বুদ্ধি। আমার মনে হয়, অনেকটাই নির্ভর করে গায়ের জোরের উপর—ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ অপরিপুষ্ট দেহ নিয়ে সম্পূর্ণ বেগে কাজ করা দুঃসাধ্য—এখানকার শীতের দেশের লোকের হাড় শক্ত ব'লেই কাজ এমন ক'রে সহজে এগোয়—মাথা গুনতি ক'রে আমাদের দেশের কর্মীদের সংখ্যা নির্ণয় করা ঠিক নয়—তারা একখানা মানুষ নয়।"

৫নং চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন

"কিন্তু এখানে দেখলুম, বেশ পাকা রকমের শিক্ষা, মানুষ ক'রে তোলবার উপযুক্ত, নোট মুখস্থ ক'রে এম-এ পাশ করবার মতন নয়।

* * * *

এখানকার শিক্ষার ব্যাপারে যে প্রবল উদ্যম, সাহস, বুদ্ধিশক্তি, যে আত্মোৎসর্গ দেখলুম, তার অতি অল্প পরিমাণ থাকলেও কৃতার্থ হতুম। আন্তরিক শক্তি ও অকৃত্রিম উৎসাহ যত কম থাকে, টাকা খুঁজতে হয় ততই বেশি ক'রে।"

৬নং চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"কিন্তু আমাদের যুবকেরা ইস্কুলে পড়া ছেলে, তাদের বই মুখস্থ করার মন। যে শিক্ষা আমাদের দেশে প্রচলিত, তাতে ক'রে আমাদের চিন্তা করবার সাহস, কর্ম করবার দক্ষতা থাকে না, পুঁথির বুলি পুনরাবৃত্তি করার পরেই ছাত্রদের পরিত্রাণ নির্ভর করে।"

রাশিয়া ছাড়িয়া বার্লিনে আসিয়া রবীন্দ্রনাথ ৮নং চিঠিতে (২ অক্টোবর ১৯৩০) রাশিয়ায় সুশিক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"রাশিয়ায় গিয়েছিলুম ওদের শিক্ষাবিধি দেখবার জন্যে। দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছি। আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদলে দিয়েছে। যারা মূক ছিল, তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল, তাদের চিত্তের আবরণ উদ্‌ঘাটিত, যারা অক্ষম ছিল, তাদের আত্মশক্তি জাগরূক, যারা অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিল, আজ তারা সমাজের অন্ধকুঠরী থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী। এত প্রভূত লোকের যে এত দ্রুত এমন ভাবান্তর ঘটতে পারে তা কল্পনা করা কঠিন।"

রবীন্দ্রনাথের এই সকল বচন পাঠ করিয়া মনে হইতে পারে, তিনি এবার এদেশের লোককে মনের আলস্য ত্যাগ করিয়া, উদ্যম এবং উৎসাহের সহিত শিক্ষারীতি সংস্কারের জন্য আহ্বান করিবেন। কিন্তু তার পরদিনই আটলান্টিক মহাসাগরে ভাসমান ষ্টীমারে বসিয়া যে চিঠিখানি লিখিয়াছেন তাহাতে "রাশিয়ায় সব কিছু মিলে গেছে একটি অখণ্ড সাধনার মধ্যে" বলিয়া তার পর লিখিয়াছেন—

"এ দেশের ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরতর দুর্দিন দুর্ভিক্ষের মধ্যেই এরা নেচেছে, গান গেয়েছে, নাট্যাভিনয় করেছে—এদের ঐতিহাসিক বিরাট নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে তার কোনো বিরোধ ঘটেনি।" তার পর

"অতএব আমি পার্থপুরুষদের বলে রাখছি এবং তপস্বীদের সাবধান করে দিচ্ছি যে, দেশে যখন ফিরে যাবো পুলিসের যষ্টিধারার শাসন বলেও আমার নাচ গান বন্ধ হবে না।"

এই প্রতিজ্ঞা অবশ্য প্রতিপালিত হইয়াছে। এ দেশের গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা উৎসব উপলক্ষে বরাবরই গান গাহিয়াছে, কিন্তু একালে কখনও নাচে নাই বা নাট্যাভিনয় করে নাই। গত ৫ বৎসরের মধ্যে নাচ-নাট্যাভিনয় সংক্রামিত বহু লোকের মধ্যে বিস্তারলাভ করিয়াছে। শিক্ষাবিষয়ে রাশিয়ায় এত প্রভূত লোকের এত দ্রুত এমন ভাবান্তর ঘটনা যেমন রবীন্দ্রনাথ কল্পনাতীত মনে করেন, আমাদের এদেশেও গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের নাচ-নাট্যাভিনয় বিষয়ে এত প্রভূত লোকের এত দ্রুত এমন ভাবান্তর ঘটনা আমাদের কাছে তেমনি কল্পনাতীত মনে হয়। অবসরসময়ের নাচ-নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে, অনবসরসময়ে যদি আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে "অখণ্ড সাধনা" বা "বিরাট নাট্যাভিনয়" চলিত, তবে নাচ-নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে কোন অভিযোগ চলিত না। অনেকে বলিবেন, অবসর সময়ে নাচ-নাট্যাভিনয় সঙ্গে এখন অনবসরসময়ে "অখণ্ড সাধনা" এবং "বিরাট নাট্যাভিনয়"ও চলিতেছে, এবং এই কথার প্রমাণ-স্বরূপ মেয়ে-গ্রাজুয়েটের সংখ্যাবৃদ্ধির উল্লেখ করিবেন। সৌভাগ্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ তাহা করিবেন না। তিনি তাহাদের বর্তমান শিক্ষার ত্রুটি পুনঃ পুনঃ অতি পরিষ্কার করিয়া বলিয়া রাখিয়াছেন। য়ুরোপীয়দিগের অনুকরণ করিতে গিয়া আমাদের কি বিড়ম্বনা

ঘটিতেছে, তাহার সম্বন্ধে আমার একটি বন্ধু বলেন, "আমরা বস্ত্র-হরণ করিতে পারি, কিন্তু গোবর্দ্ধন ধারণ করিতে পারি না। যদি গোবর্দ্ধন ধারণ করিতে না পারি, তবে বস্ত্রহরণ করিবার আমাদের কি অধিকার আছে? যদি অনবসরসময়ে "বিরাট নাট্যাভিনয়" বা "অখণ্ড সাধন" করিতে অসমর্থ হই, তবে অবসরসময়ে হঠাৎ এত বাড়াবাড়ির আমাদের কি অধিকার আছে? অথবা আমাদের অবসরেরই বা কি দাবী আছে? অনিবার্য্য কারণে আমাদের আর্থিক অবস্থার গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখন মেয়েদের স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জনের চেষ্টা না করিয়া উপায় নাই। এ সময় সকলেরই মেয়েদিগকে জীবিকা উপার্জ্জন বিষয়ে স্বাধীনতালাভে সহায়তা করা কর্তব্য। সমস্ত হইয়া চেষ্টা না করিলে তাহারা এই জীবনসংগ্রামে কিছুতেই জয়লাভ করিতে পারিবেন না। এখন [illegible] এই সংগ্রামে মেয়েদিগকে সাহায্য সম্বন্ধে সহায়তা করিতে না [illegible], প্রত্যেকের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের কঠোর কর্তব্যের [illegible] ব্যাঘাত করা আমাদের কর্তব্য নহে।*

[illegible]

* রিষড়া ক্ষেত্রমোহিনী [illegible] বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

"শকুন্তলা"

ফুল হয়ে যবে ফুটেছিলে তপোবনে
তার ক্ষুধায় ভরেনি পরাণ তলে,—
প্রেমের জোয়ার তখনো আসেনি মনে
অজানা আবেগে নাচেনি আপনা ভুলে।
হৃদয়ে বহেনি প্রেমের ফল্গু-ধারা,
বিরহ-বেদনা হওনি কো দিশেহারা,
ব্যথা বেদনার পাওনি এখনো সাড়া
কাঁদে নাই কেহ জীবন-নদীর কূলে।
ফুল হয়ে যবে ফুটেছিলে তপোবনে
তার ক্ষুধায় ভরেনি পরাণ তলে।

জানিতে না কোন পার্থিব অভিনয়
অপরূপ রূপে আলোকিতে বনভূমি,
পৃথিবীর সনে হয়নিকো পরিচয়,
প্রকৃতিরে ছাড়া না জানিতে কিছু তুমি।
বন ফলফুল প্রকৃতির নব বেশ,
উল্লাসে তব ভরাত হৃদয়দেশ,
মনেতে তোমার ছিল না দুখের লেশ
কত সুখ পেতে হরিণ-শিশুরে চুমি।
জানিতে না কোন পার্থিব অভিনয়—
অপরূপ রূপে আলোকিতে বনভূমি।

তার পর সেই তপোবন-উদ্যানে
মনচোর তব দাঁড়াল মোহন বেশে,
অজানা ভাবের উদয় হ'ল গো প্রাণে,
মদন হানিল ফুলশর অনিমেষে।
আপনারে তুমি হারায়ে ফেলিলে হায়,
দুর্ব্বাসা এসে শাপ দিয়ে চ'লে যায়,—
[illegible] সখা বন [illegible],
তুমি যে তখন চলেছ অকূলে ভেসে।
তার পর সেই তপোবন-উদ্যানে
মনচোর তব দাঁড়াল মোহন বেশে।

প্রতীক্ষা পালা শুরু হ'ল তব তাই
[illegible],
নিরালিনি কত সহিলে বিরহ-জ্বালা
কি করিবে তুমি [illegible] লেখা!
তাহার [illegible] স্মারক-অঙ্গুরীয় [illegible],
সে যেন কোথা [illegible] না দিয়ে আসে,
[illegible]
[illegible],
প্রতীক্ষার পালা শুরু হ'ল তব তাই
[illegible]।

কণ্বমুনির তপোবন ছাড়ি তুমি
পতিগৃহে যাও বিদায় হইলে যবে
বিরহে তোমার কাঁদিল গো বনভূমি
[illegible] সবে!
কত সাধে তারে চিনিলে গো তুমি সেথা,
তোমার স্বরূপ না চিনিল কেহ সেথা,
বাজিল [illegible] হৃদয়ে [illegible]
প্রথম সে দিন [illegible] হ'ল ভবে!
কণ্বমুনির তপোবন ছাড়ি তুমি
পতিগৃহে যাও বিদায় হইলে যবে।

যোগিনীর বেশে নিমগন হ'লে ধ্যানে
পারিবে [illegible] করিতে বরণ,
কত দিন তব কাটিল [illegible]
[illegible] বিরহ [illegible]।
পারিবে [illegible] বরণ [illegible]
[illegible],
[illegible],
[illegible]।
যোগিনীর বেশে নিমগন হ'লে ধ্যানে
পারিবে [illegible] করিলে [illegible]।

শ্রী[illegible] রায়



স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং

শিক্ষিত-সমাজ বলেন,—নারীর প্রধান ভূষণ লজ্জা! লজ্জা-সরম-রাগে নারীকে দেখায় ভালো।

এই ভূষণের সন্ধান নারী-সমাজে কি করিয়া আসিল, তাহার আলোচনা করা যাক্। বর্ব্বর যুগে নারীকে আবাস



ফুল-সাজে শ্যামোয়া-কিশোরী

ও আহারের জন্য পুরুষের উপর একান্তভাবে নির্ভর করিতে হইত। শারীরিক শক্তিতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ; সে-যুগে আহার্য্য-সংগ্রহের উপায় ছিল কঠিন। মৃগয়াদি ব্যসন ব্যতীত আহার্য্য সংগ্রহের আশা ছিল না। তার উপর গর্ভ-ধারণ, সন্তান-প্রসব—আদি-যুগেও এ সব উপসর্গ হইতে তো নারীর মুক্তি ছিল না। এইরূপে নানা অক্ষমতা-বশতঃ নারীকে পুরুষের মুখাপেক্ষী থাকিতে হইত। বিবাহ-রীতির প্রচলন ছিল না; নারী ছিল শক্তিমান পুরুষমাত্রের ভোগ্যা, এবং পুরুষের উপভোগ লালসার পীড়ন-অত্যাচার ও অশান্তির তখন সীমা ছিল না। নারীর দেহকে লইয়া পুরুষ যেন ছিনিমিনি খেলিত! প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতায় বর্ব্বর যুগের নারী বুঝিল—শক্তিমান পুরুষকে আশ্রয় করা ব্যতিরেকে তার নিরাপদ-বাসের সম্ভাবনা নাই। তাই শক্তিমান পুরুষকে মুগ্ধ ও লুব্ধ করিয়া নিজের প্রতি মনোযোগী ও অনুরাগী রাখিবার উদ্দেশ্যে নারীকে নানা ছলা-কলা ও বুদ্ধি-কৌশল উদ্ভাবন করিতে হয়। নিজের অনাবৃত দেহকে আবরণ-তলে কতক প্রচ্ছন্ন রাখিলে কিম্বা এই দেহকেই সুকৌশলে রাখিতে-ঢাকিতে পারিলে দেহ যে-রহস্যে পরিপূর্ণ থাকিবে, সে-রহস্য পুরুষের চিত্তে বিভ্রমের সৃষ্টি করিবে! সুতরাং এ-উপায়ে পুরুষের চিত্তে যে-দুর্ব্বার কৌতূহল জাগ্রত রাখা সম্ভব, সেই কৌতূহল-বশেই নারীকে পুরুষ দেখিবে গোপন-রহস্যের মাধুর্য্যে-বৈচিত্র্যে পরম-রমণীয়া—এবং সে দেখায় নারীকে সে কায়-মনে কামনা করিবে!

অশিক্ষা এবং জীবিকার অনিশ্চয়তার ফলে বর্ব্বর যুগের পুরুষ ছিল—স্বার্থপর, উদ্ধত, নিষ্ঠুর, কোপনশীল; এই পুরুষের আশ্রয়ে নারীর নির্য্যাতনের অভাব ছিল না! পাণ হইতে চূণ খশিলে পুরুষ নির্দ্দয় প্রহারে নারীকে অর্দ্ধমৃত করিয়া তুলিত—তাকে বিকলাঙ্গ করিয়া দিত! এখনো আমাদের আশেপাশে পুরুষের নির্দ্দয় পীড়ন চোখে পড়ে! ফৌজদারী আদালতে এই সভ্য যুগেও এমন অভিযোগের অন্ত

নাই। এই কঠিন পুরুষকে শান্ত রাখিবার জন্য নিজের বেদনা বুকে চাপিয়া নারী চিরদিন পুরুষকে দিয়া আসিয়াছে হাসি, প্রীতি! আপনাকে তো রক্ষা করা চাই! এই রক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে বসিয়া নারী দেখিল, পশু-পুরুষকে কোনোমতে মুগ্ধ, প্রলুব্ধ রাখিতে হইবে। তাহা হইলে পীড়ন-অপমান কমিবে।

নিজেকে রক্ষা করিবার এই সহজাত প্রবৃত্তির বশেই নারী আপনাকে নানা বেশে, নানা ভূষায়



শিশু-মোজেশ-

ভূষিত করিতে প্রবৃত্ত হইল। বৈজ্ঞানিক লেখকগণ নারীর ভূষণ-প্রীতির ইতিহাস আলোচনা করিয়া এই তথ্যই আবিষ্কার করিয়াছেন। অতি প্রাচীন যুগে বসন-হীনতার দিনে অঙ্গে নানা নক্সা কাটিয়া নারী পুরুষের চিত্তে বিভ্রম উৎপাদন করিত—দেহকে এই উপায়ে লোভনীয় রাখিত। তার পরে দেহকে বল্কলে বা বসনে আবৃত করিতে নারী উদ্যত হইল। উদ্দেশ্য সেই এক, অবিরম—নিজের দেহের কমনীয়তা ও লোভনীয়তা বাড়াইয়া তোলা; (to enhance their attractions).

পুরুষের চিত্ত-জয় করিতে পাশ্চাত্য নারী চাহিলেন কটিদেশ ক্ষীণ করিতে। তাঁরা মুখে মাখিলেন পাউডার, রুজ, ব্লুম; (মাথায় সেকালে পরচুলা আঁটিতেন দীর্ঘকেশী দেখাইবে বলিয়া; এখন ফ্যাশন বুঝিয়া মাথার চুল ছাঁটিতেছেন ছোট করিয়া! কখনো বা নির্ম্মূল করিতে দিধা নাই!) আমাদের দেশের নারী চরণ রাঙাইলেন আলতার রঙে; চোখে আঁকি-



ভেনাসের জন্ম

লেন কাজল। কোমরে এককালে পরিতেন চন্দ্রহার, এখন সে ফ্যাশন নাই। খোঁপায় দিলেন ফুল, ললাটে আঁকিলেন টিপ। এমনি ভাবে নানা দেশে সজ্জায় বিচিত্র রীতির প্রবর্ত্তন ঘটিল।

অনেকে বলেন,—তনুর নগ্নতায় নারীর মনে লজ্জা জাগিয়াছিল বলিয়াই সমাজে বসনের প্রচলন হয়, এ-কথার কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। বসনাবরণ প্রচলিত হইবার পরে লজ্জা-সরম আসিয়া সমাজে দেখা

দিয়াছে। এ কথার প্রমাণ পাই—নানা সমাজে বসনাবরণের আদর্শ-ভেদে; তা'ছাড়া লজ্জার মাত্রা-বোধ সকল সমাজে সমান নয়। নগ্ন-দেহে জাপানী নর-নারী সাধারণ স্নানাগারে অসঙ্কোচে স্নান করে; কাবিল-রমণী গৃহে থাকিবার কালে বসনে অঙ্গ আবৃত রাখে—পথে বাহির হইবার সময় বসন ফেলিয়া দিতে তার দ্বিধা বা কুণ্ঠার পরিবর্ত্তে আগ্রহ দেখা যায়। এ-রীতি-ভেদের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই যে চিত্র-শিল্প-রাজ্যে আমরা দেখি—প্রতিভাধর শিল্পীর রচিত চিত্রে ও মর্ম্মর-মূর্ত্তিতে নারীর নগ্ন তনুর বিলাস-



কাবিল-সুন্দরী

লীলা। আর্ট-হিসাবে সে রচনা শ্রেষ্ঠ বলিয়া চিরদিন গণ্য হইয়া আসিতেছে। নগ্ন-তনুর সে মাধুরী-ছবি ললিত-কলার পরম সম্পদ বলিয়া সমাজে জয়টীকা পাইয়া আসিতেছে; সে চিত্রে সংস্কার-মুক্ত মানব-চিত্তের অনাবিল সারল্যই প্রতিভাত হয়। ইহা হইতে এ-কথা বুঝিতে বিলম্ব ঘটে না যে, নগ্ন-তনু লজ্জার বিষয় নয়! তা যদি হইত, তাহা হইলে শিক্ষিত-সমাজ এ নগ্নতার ছবি দেখিয়া শিহরিয়া চক্ষু মুদিত! তা যখন ঘটে না, তখন লজ্জাকে বসনাবরণের হেতু বলিয়া মানিব কি করিয়া?

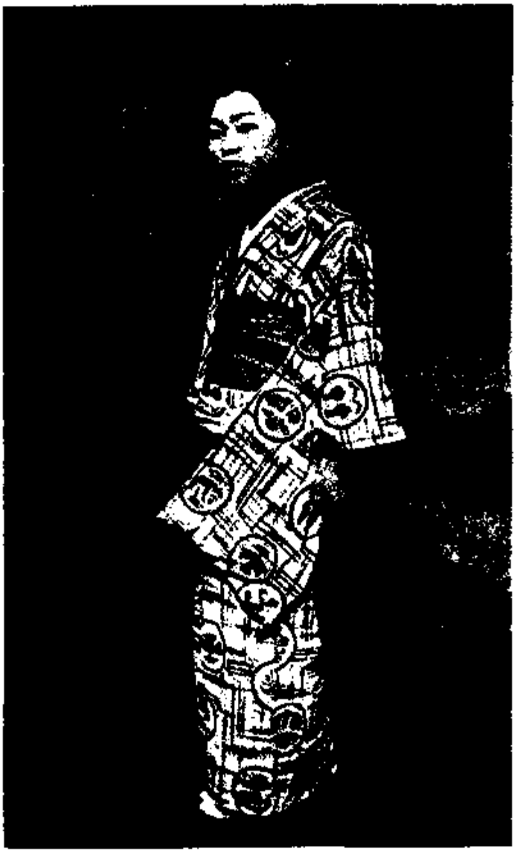
বসনাবরণের প্রচলন হইলে সমাজে লজ্জা আসিয়া প্রথম দেখা দেয়; এবং শিক্ষা ও সভ্যতা-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এ লজ্জায় আমরা প্রকার-ভেদ দেখিতে পাই। পাশ্চাত্য নারীর বেশ-ভূষার ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করিলে কি দেখিব? দেখিব, প্রাচীন যুগের পাশ্চাত্য নারী বসন-প্রাচুর্য্যে কণ্ঠ হইতে পদতল পর্য্যন্ত আবৃত রাখিত। 'নেংটো পা'—সেকালে ছিল দারুণ বিভীষিকা! নেংটো 'গা' দেখিলে সমাজ মূর্চ্ছাতুর



আলজিরিয়ার সালঙ্কারা বালিকা

হইয়া টলিয়া পড়িত—সে যুগে 'নেংটো পা' বা 'নেংটো গা' পাশ্চাত্য নারীর কাছে ছিল স্বপ্নের অতীত ব্যাপার! টাইট আবরণে অঙ্গকে কষিয়া আবৃত করিত—অথচ বক্ষো-যুগলকে সুমেরু-শিখরবৎ সাধারণ-দৃষ্টির কেন্দ্রিত রাখিয়া পথে-ঘাটে বিচরণ—তাহাতে বাধিত না! প্রাচ্য ভূখণ্ডে লজ্জাবোধের মাত্রাভেদ-বশতঃ প্রাচ্য নারী এমন ভাবে আপনাকে বসনাবরণে মণ্ডিত রাখিতেন, যেন বক্ষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহারো মনে চেতনা না জাগে! কালক্রমে

শিক্ষা-সভ্যতার আদর্শ-ভেদের সঙ্গে ভূষণ-রীতিতেও প্রভেদ দেখা দিল। পাশ্চাত্য নারীর পায়ের মোজা প্রথমে হাঁটু হইতে অনেকটা নীচে নামিল; পরে সে মোজা এখন চরণ-স্পর্শে বঞ্চিত, অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। নগ্ন-চরণের সুডৌল ছাঁদ ও বর্ণ-বিভায় নারী এখন পথে-ঘাটে অনুপ ছড়াইয়া ফিরিতেছে। অঙ্গের আবরণও কণ্ঠ হইতে খশিয়া



জাপানে চাষার মেয়ে

ক্রমে অধোমুখী হইতে লাগিল এবং নিম্নাঙ্গের স্কার্ট প্রভৃতি জঙ্ঘা-বন্ধনী ছাড়াইয়া ঊর্দ্ধে, ক্রমে আরো ঊর্দ্ধে উঠিয়া পড়িয়াছে! নগ্ন তনু-বিলাসের আর বড় বেশী বাকী নাই!

এ ব্যাপার হইতে প্রমাণ পাই যে, এই বসন-ভূষণের প্রবর্ত্তনের মূলে লজ্জার ক্রিয়া নাই—বরং বসন-ভূষণের সঙ্গেই লজ্জা আসিয়া সমাজে দেখা দিয়াছে! অর্থাৎ নারীর বসন-ভূষণানুরাগের মূলে আছে পুরুষের চিত্তে বিভ্রম জাগাইবার অভিলাষ—বিভ্রমে পুরুষ-চিত্তকে মশগুল রাখা—পুরুষকে মৃগয়ালব্ধ করা! আজও সে উদ্দেশ্যের একতিল ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

এই প্রসঙ্গে নারীর বুদ্ধি-প্রতিভার কথা আপনা হইতে আসিয়া পড়িতেছে। শারীরিক শক্তিতে পুরুষের চেয়ে নারী দুর্ব্বল; তাই বলিয়া বুদ্ধি-বৃত্তিতে পুরুষ নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ-তর, এমন ধারণা যদি কেহ মনে পোষণ করিয়া থাকেন



আলজিরিয়ার রূপসী

তো তিনি ভ্রান্ত! শারীরিক শক্তির কথা যা বলিয়াছি, তাহাতেও প্রকার-ভেদ আছে। আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, সাধারণ শ্রম-শক্তি; দীর্ঘকাল ধরিয়া একই কাজ করিবার শক্তি পুরুষের চেয়ে নারীর অনেক বেশী। কাজ-কর্ম্ম করিয়া পুরুষ যত সহজে ক্লান্ত হয়, নারীর ক্লান্তি তত সহজে ঘটে না। নারীর কর্ম্মশক্তি পুরুষের চেয়ে ক্ষিপ্রতর। একটা কাজ করিতে গিয়া পুরুষের চিত্ত একসঙ্গে আরো পাঁচটা ক্ষেত্রে ধাবিত হয়, নারীর তেমন হয় না। অর্থাৎ পুরুষের মনোযোগিতা বা একাগ্রতার

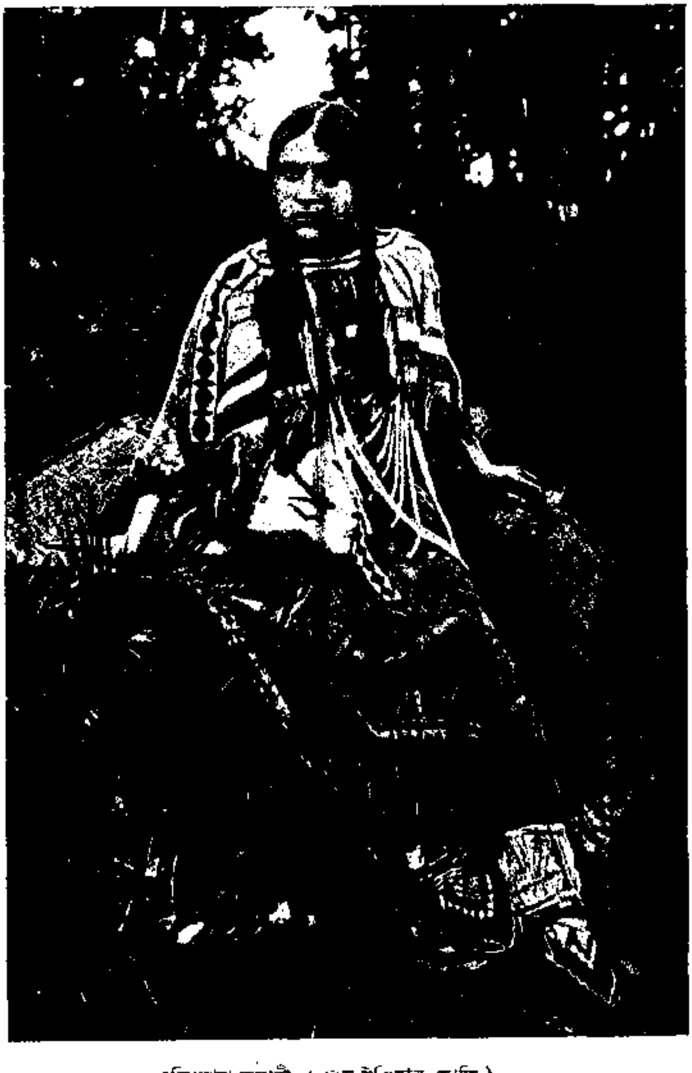
চেয়ে নারীর মনোযোগিতা ও একাগ্রতা অনেক বেশী। এ যুগের কয়েকজন তরুণ মার্কিণ ছাত্র-ছাত্রী লইয়া বৈজ্ঞানিক মহলে পরীক্ষা ও গবেষণা চলিয়াছিল, এবং সে পরীক্ষায় এ-কথা সত্য বলিয়া প্রমাণ মিলিয়াছে।

নারীর কয়েকটি ইন্দ্রিয় পুরুষের চেয়ে প্রখরতর। শ্রুতি, ঘ্রাণশক্তি এবং স্পর্শ-বোধ পুরুষের চেয়ে নারীর উগ্রতর। আলোক-রশ্মির সূক্ষ্মতম অংশ-নির্ণয়ে পুরুষের পটুতা অধিক; গন্ধ, বর্ণ ও স্পর্শবোধ কিন্তু নারীর উগ্রতর। গান শুনিয়া সুরের সূক্ষ্ম পার্থক্য নারী যেমন বুঝিতে পারে—পুরুষ তেমন পারে না। আবার ওজনের মাত্রা, স্বাদের বিভিন্নতা—যেমন এগুলা পুরুষ হৃদয়ঙ্গম করে, নারী ততখানি পারে না।

তথ্যাবিষ্কার প্রভৃতির ব্যাপারে পুরুষের পটুতা সমধিক; নারীর উদ্ভাবনী-শক্তি অধিকতর। নারীর স্মৃতি পুরুষের চেয়ে প্রখর; নিষ্ঠা, বিশ্বাস ও ধর্ম্ম-প্রবণতা পুরুষের চেয়ে নারীর অনেক বেশী।

উদ্ভাবনী শক্তির সম্বন্ধে বহু সুধী বলিয়াছেন—এরোপ্লেন, বায়োস্কোপ, বেতার প্রভৃতির আবিষ্কারে নারীর শক্তি না থাকুক—নর-সমাজে এই যে উপযোগী খাদ্যাদির প্রবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ইহার মূলে আছে নারীর সন্ধানী মন ও সে-মনের উদ্ভাবনী শক্তি। অতি প্রাচীন যুগে নারীই বিবিধ উদ্ভিদের মধ্য হইতে খাদ্যোপযোগী উদ্ভিদ বাছিয়া লইয়াছিল; তা ছাড়া ভোজ্য-রচনায় নারীর নব নব উদ্ভাবনী প্রতিভা নর-সমাজের খাদ্যে বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য্য আনিয়াছে।

সাধারণ বুদ্ধির বিচার করিলে আমরা দেখিব, নারী কোনো অংশে পুরুষের চেয়ে হীন নহে। কর্ম্মতৎপরতা পুরুষ লাভ করিয়াছে পুরুষানুক্রমিকভাবে বহু যুগযুগান্তরের সাধনায়। সমাজ-সংসারে নারী ও পুরুষ বিভিন্ন কার্য্যের ভার লইয়া আছে বহুকাল ধরিয়া; এই দীর্ঘকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উভয় জাতির বুদ্ধি খুলিয়াছে ও খেলিয়াছে। একই সংসারে সমবয়সী ছেলেমেয়েদের লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিব, মেয়েদের কর্ত্তব্য-জ্ঞান ছেলেদের চেয়ে বেশী; সেবা-



ওজিবোয়া-কুমারী (রেড-ইণ্ডিয়ান জাতি)

পরিচর্য্যার কাজ বলুন, ফাই-ফরমাশ খাটা বলুন, গোছ-গাছ করা বলুন—মেয়েদের পটুতা এ সব কাজে ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশী। আবার অন্দরের কাজে নারীর বুদ্ধি-কৌশল অপূর্ব্ব বলিয়া সদরে যে সে-বুদ্ধি অপূর্ব্ব

কুশলী হইবে না, ইহা অনুমান করিবার হেতু নাই। সমাজ-সংসারে প্রয়োজন-বশে বহু নারীকে বুদ্ধিকৌশলে কার্য্য সম্পাদন করিতে দেখিতে পাই; সুতরাং এ ব্যাপার লইয়া উৎকর্ষ বা অপকর্ষের রেখা টানিতে বা সীমা রচিতে যাওয়া সঙ্গত হইবে না।



জেকোশ্লোভাকিয়ার নব্যা বিলাসিনী

বিদ্যাতেও নারী ছোট নয়। আমাদের দেশে বিদ্যার দেবী নারী-রূপেই কল্পিতা। পাশ্চাত্য জগতেও বিজ্ঞানকে কল্পনা করা হইয়াছে নারী-রূপে। বিদ্যা-বুদ্ধিতে নারীকে পুরুষ শ্রদ্ধা-সম্মান করিয়া আসিতেছে বহু প্রাচীন যুগ হইতে। সুতরাং এ তর্কের প্রয়োজন নাই।

নারীর শারীরিক শক্তির সঙ্গে মানসিক শক্তির আলোচনা প্রাসঙ্গিক। এই মানসিক শক্তির সহিত নারীর নিষ্ঠা বিজড়িত আছে। এ নিষ্ঠার অর্থ—সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়নিষ্ঠা, প্রেমের নিষ্ঠা বা সতীত্ব। অবিচার সহিতে নারী নারাজ!

নারীর বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ বহু সুধী নির্ব্বিচারে দিয়া আসিতেছেন—নারীর শরীর দুর্ব্বল, অতএব মনও দুর্ব্বল। অর্থাৎ নারী অতি-সহজে আপনার নারীত্ব বিসর্জ্জন দিয়া ফেলে। এজন্য বহু দেশে বহু বিধির ব্যবস্থা হইয়াছে—ওগো নারী, তোমার স্বাতন্ত্র্য খাটিবে না। তোমার মন বড় চপল। আজ ইহাতে তোমার অনুরাগ—কাল বিরাগ জন্মিয়া তুমি অপর বস্তুতে অনুরাগী হইবে! এমনি বহু ইতর কটু বাক্য-বাণে বহু মনীষী বহু যুগ ধরিয়া নারীকে বিঁধিয়া আসিতেছেন। এ কথার একটু ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক আলোচনা অসঙ্গত হইবে না।

এই যে মনের নিষ্ঠা—এ নিষ্ঠা নির্ভর করে সামাজিক আচার-নীতির উপর। এ নিষ্ঠার আদর্শ নির্ভর করে সামাজিক আচার-নীতির আদর্শ-ভেদের উপর। এ আদর্শভেদেও আবার কালভেদে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে; এবং আজো ঘটিতেছে।

বহু সমাজে বিধি দেখি,—এক নারী বহু পুরুষের ভোগ্যা হইবে; তাহাতে বাধা নাই। যে সব সমাজে এ-রীতি প্রচলিত, সেখানে এক নারী যদি বহু পুরুষের পরিচর্য্যা-রত হয়, তাহা হইলে কি করিয়া বলিব, মানসিক নিষ্ঠায় নারী অতি হেয়? এদেশে এক জন পুরুষ (সেকালে) শতাধিক পত্নী

গ্রহণ করিত ; তাহাতে কেহ বিন্দুমাত্র দোষ দেখে নাই। আজ যদি এক জন পুরুষ একাধিক পত্নী গ্রহণ করে—তবে সে-কাজ অত্যন্ত গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হয়। কোনো সমাজে বিধি আছে, এক জন পুরুষ এককালে চারিটি পত্নী গ্রহণ করিতে পারে—করিলে সে সম্বন্ধে কোনোদিক হইতে নিন্দা বা গ্লানির কথা ওঠে না। এককালে যে ভদ্রলোক চারিটি পত্নী গ্রহণ করিতে পারে, পাঁচটি পত্নীগ্রহণে তার কি মহাভারত অশুদ্ধ হইবে, বুঝিতে পারি না! কোনো-কোনো সমাজে বিধি দেখি,—এক স্বামী বা এক স্ত্রী বর্ত্তমানে পত্যন্তর বা পত্ন্যন্তর গ্রহণ—আইনানুসারে অপরাধ। সে অপরাধ চুরি বা ডাকাতির মত দণ্ডনীয়! কোনো সমাজে দেখি, বিধবা-বিবাহ-রীতি প্রচলিত ; আবার কোনো সমাজে বিধি,—নারী একবার মাত্র 'দেয়া' ; অর্থাৎ বৈধব্য ঘটিলে পুনর্বিবাহে নারীর কোনো অধিকার নাই। পুনর্বিবাহ দোষের। অথচ সেই সমাজেই এ যুগে আইন পাশ করিয়া বিধবা-বিবাহকে মঞ্জুর ও পাংক্তেয় করা হইয়াছে—সে-বিবাহের দোষ 'কাটানো' হইয়াছে!



জাঞ্জিবার-জায়া

সুতরাং এ-সব ব্যাপার লইয়া নারীকে মানসিক দৌর্ব্বল্য, চপল-চিত্ততা বা নিষ্ঠাহীনতার অপবাদ দেওয়া মূঢ়তা।

হেলায় দেহ-দানের পরিবর্ত্তে নারীর দেহ যাহাতে স্পর্শকলুষহীন, পবিত্র থাকে—সে-রীতি যে শুধু শিক্ষার সঙ্গেই সমাজে প্রচলিত হইয়াছে, এ-ধারণা সত্য নহে। যে সব আদিম জাতি আজও সম্পূর্ণ নিরক্ষর রহিয়া গিয়াছে, এবং যে-সকল জাতিকে আমরা বর্ব্বর অমানুষ বলিয়া তুচ্ছ মনে করি, এমন জাতির মধ্যেও নারী-দেহের পবিত্রতা-রক্ষায় সমাজকে খুব সচেতন দেখিতে পাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ মেলানেশিয়া-দ্বীপপুঞ্জবাসী আদিম-জাতির কথা ধরা যাক!

সেখানে কুমারী-কাল হইতেই নারীকে বড় সাবধানে আপনার দেহকে পুরুষের স্পর্শ-কলুষ বাঁচাইয়া বিশুদ্ধ রাখিতে হয়। যথেচ্ছ দেহ-সম্ভোগে সেখানে প্রাণঘাতী ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কন্যাদের উপর সতর্ক প্রহরা চলে। যে-কন্যা পুরুষের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করে—সে-কন্যার বিবাহে বহু বিঘ্ন ঘটে। কোনো পুরুষ গোপনে যদি কোনো কুমারীর দেহের অমর্য্যাদা সম্পাদন করে ত সে-কথা প্রকাশ পাইলে সে-পুরুষকে সেই কুমারীর পাণি-গ্রহণে বাধ্য করা হয়! বিবাহে বাধ্যতা শুধু নয়—বিবাহের সময় সেই কুমারীর জন্য বৈষয়িক ব্যবস্থাও অনিবার্য্যভাবে করিতে হয়। এমনি সমাজ-বিধির বশে এই বর্ব্বর-জাতি অসংযম-দমনের আয়োজনটুকু পাকা রাখিয়াছে।

নিউ-ব্রিটেন দ্বীপপুঞ্জে কুলত্যাগিনী নারীকে বর্শায় বিদ্ধ করা হয় এবং যে-পুরুষ অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হয়—তাহাকে প্রকাশ্য হাটে-বাজারে টানিয়া আনিয়া নির্দ্দিষ্ট তারিখে তাহার গলায় পাক দিয়া অসহ্য যাতনায় জর্জ্জরিত করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলা হয়।

সলোমন দ্বীপপুঞ্জে কুলটা পত্নীকে গাছে বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং সমাজের বা মহল্লার প্রত্যেক ব্যক্তি আসিয়া তার অঙ্গে বাণ বিদ্ধ করে। এ-শর-জাল ব্যর্থ করিয়া কোন কুলটা ভাগ্যবশে যদি প্রাণে বাঁচিয়া যায়, তাহা হইলে সমাজ তাহাকে কলঙ্কমুক্ত বলিয়া আবার গ্রহণ করে। সলোমন দ্বীপপুঞ্জে আরো এক কৌতুককর ব্যবস্থা আছে। এক জন পুরুষ সেখানে একাধিক পত্নী গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু যে পত্নী স্বামীর 'সুয়ো রাণী' বা 'প্রিয়তমা' হয়, স্বামীর মৃত্যু ঘটিলে গলায় দড়ি দিয়া বা জলে ডুবিয়া কিম্বা ছুরিকাঘাতে তাহাকে আত্মঘাতিনী হইতে হয়। সে-দেশের ইহাই বিধি।

নানা দেশের আচার-রীতি ও আবহাওয়ার আলোচনা করিয়া আমরা দেখিতেছি,—নারীর নিষ্ঠা বা সতীত্ব শিক্ষিত ও সভ্য সমাজের বৈশিষ্ট্য নহে। সভ্য ও শিক্ষিত সমাজে দেহ-মনের নিষ্ঠায় স্ত্রী-পুরুষের ঔদাস্যই আমরা লক্ষ্য করি। শিক্ষা-সভ্যতার যুগে কোনো পুরুষকে এককালে একাধিক পত্নী গ্রহণ করিতে দেখিলে ঘৃণায় আমরা অধোবদন হই ; অথচ আমাদেরই ভাই, বন্ধু, আত্মীয় ও পেট্রনদিগকে স্ত্রী-বিদ্যমানে পর-নারী বা বারনারীতে আসক্ত দেখিলে, কিম্বা শিক্ষিতা, বিবাহিতা নারীকে নিজের দেহ অসঙ্কোচে হেলা-ভরে পাঁচ জনের হাতে বিনা-দ্বিধায় তুলিয়া দিতে দেখিলেও তাঁহাদিগকে আমরা সম্ভ্রমে, শ্রদ্ধায় এতটুকু বঞ্চিত করি না!

এ-কথা এ-প্রসঙ্গে একেবারে অবান্তর না হইলেও

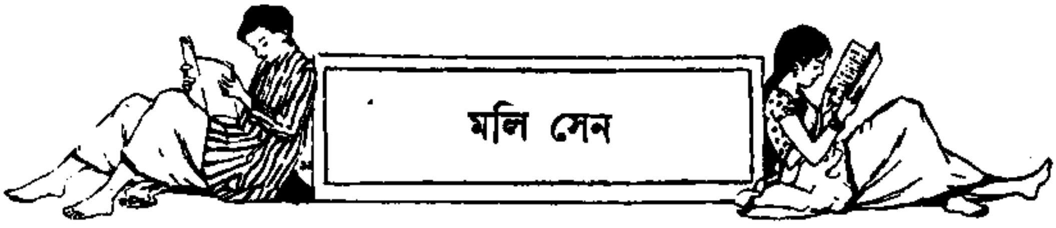
আমাদের আজিকার বক্তব্যের ঠিক অঙ্গীভূত নয়। সে-কারণে এ-তত্ত্বের বিশদ আলোচনায় নিবৃত্ত রহিলাম।

যে-কথা বলিতেছিলাম,—শিক্ষা-সভ্যতার উপর নারীর দেহ ও মনের পবিত্রতা যেমন নির্ভর করে না, তেমনি নারীর লজ্জাও অঙ্গাবরণের অন্তরালে নিবদ্ধ নয়! কাশ্মীরে দেখিয়াছি, মহিলারা প্রকাণ্ড নদীর ঘাটে অঙ্গাবরণ খুলিয়া কূলে রাখিয়া নগ্ন-দেহে স্নানার্থে জলে নামেন—সেজন্য তাঁহাদের সম্ভ্রমের হানি হইয়াছে বা নীতির দোষ ঘটিয়াছে বলিয়া কোথাও কখনো কোনো কলরব শুনি নাই! মুস্লিম-সমাজে গৃহ-নারী আপাদ-মস্তক বোর্খায় ঢাকিয়া পথে বাহির হন; ভারতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে অঙ্গাবরণে লজ্জা-সংস্থান সম্বন্ধে মতভেদ লক্ষিত হয়। বাংলার পল্লী-সমাজে এককালে রীতি ছিল—খুব সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারা শুধু একখানা শাড়ীতেই দেহের লজ্জা রক্ষা করিতেন; সেমিজ বা জ্যাকেট-ব্লাউশ গায়ে দিতেন না। আজিও বহু প্রাচীন পরিবারে মহিলাদের মধ্যে সেমিজ ও ব্লাউশ-জ্যাকেটের রেওয়াজ ওঠে নাই। মাড়োয়ারী সমাজে দেখি, বহু মহিলার মাথার ঘোমটা ঝোলে জানু পর্য্যন্ত; অথচ উদরের নিম্নার্দ্ধভাগ তাঁরা সম্পূর্ণ অনাবৃত রাখেন! পাশ্চাত্য সমাজের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সে সমাজে সময় ও স্থান-ভেদে অঙ্গাবরণের ঝুল কমে, বাড়ে। রাত্রে যে-বেশ পরিয়া পাশ্চাত্য মহিলা সিনেমায় বা নাচের আসরে বাহির হন, তাহাতে মনে হয় সৌন্দর্য্য-বিলাসে নগ্ন-আবরণই ভূষণ! নারীর সাঁতারের পোষাকের ফ্যাশন বদলাইতেছে প্রতিদিন। পাথারে সাঁতার কাটিতে টাইট পোষাক সব চেয়ে উপযোগী, মানি; কিন্তু যে-বেশে পাশ্চাত্য নারী পাথারে সাঁতারে নামেন—শুধু স্নানের উপযোগিতার জন্যই কি সে-বেশের ফ্যাশন বদ্লাইয়াছে? সাঁতারের



পাথারে সাঁতার-সজ্জা

লীলায় অঙ্গ-বিলাসে মাধুরী-বিভ্রম জাগাইবার সাধ কি নাই? কাজেই যে-কথা বলিতেছিলাম,—নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখিব, লজ্জা-রক্ষা-কল্পে নারীর বেশ-ভূষার প্রবর্ত্তন ঘটে নাই। বেশ-ভূষার সৃষ্টি হওয়ায় বিভিন্ন সমাজে লজ্জার 'ষ্টাণ্ডার্ডে' কালের তালে শিক্ষায় ও রুচিতে প্রত্যহ পার্থক্য ঘটিতেছে। বাঙালীর মেয়ের যে লজ্জা এক দিন শুধু ঘোমটার আড়ালে পুঞ্জিত-নিবদ্ধ ছিল, আজ সে ঘোমটা-অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী নারী লজ্জার মাথা একেবারে খাইয়া বসিয়াছেন, এ-কথা বলিবে কোন্ মূর্খ?



মলি সেন

—(গল্প)—

১

৩রা জুন······

প্রিয় অজিত বাবু,

অপরিচিতের পত্র পাইয়া আপনি খুব বিস্মিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

আপনার বন্ধু শ্রীযুক্ত ভূপতি রায়ের কথায় আপনাকে পত্র লিখিতেছি। সে-দিন মোটরে চোট্ খাইয়া আমাদের হাসপাতালে আসিয়া তিনি আশ্রয় লইয়াছেন। চোট্ সামান্য নয়। পায়ের হাড় ভাঙ্গিয়াছে; হাত কাটিয়াছে। নিজের লিখিবার শক্তি নাই। পায়ের হাড় আমরা 'সেট্' করিয়া দিয়াছি; তবে মাসখানেক বিছানায় পড়িয়া থাকিতে হইবে। হাতের কাটা-ছড়া সারিতে পাঁচ-সাত দিন সময় লাগিবে। তাঁহাকে পত্র লিখিলে তাঁর মন ভালো থাকিবে, এই জন্য আমাকে দিয়া সে অনুরোধ জানাইতেছেন। আপনি তাঁকে পত্র লিখিবেন। কলিকাতায় থাকিলে তাঁকে নিত্য দেখিতে আসিতেন—এ বিশ্বাস তাঁর আছে। যখন দূরে আছেন, তখন তিনি পত্রের কামনা করেন।

তাঁর জন্য দুশ্চিন্তার কারণ নাই। আরোগ্য-লাভ সময়-সাপেক্ষ।

তিনি বই পড়িতে ভালোবাসেন—এ কথা আপনি জানেন। আপনার কাছে যদি নূতন কোনো বই থাকে—বাঙলা হোক, ইংরাজী হোক্—তাঁর রুচি বুঝিয়া ফেরত-ডাকে কয়েকখানা বই আমার নামে পাঠাইলে তাঁর সময় কাটিবে ভালো। খপরের কাগজ তিনি পড়িতে চাহেন না। আমরা দু'চারিখানা বই সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি। শুনিলাম, তাঁর বাবা-মা তীর্থে গিয়াছেন। এ-সংবাদ তাঁদের দিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাঁরা দেশে-দেশে ঘুরিতেছেন, এজন্য তাঁরা ভূপতি বাবুর পত্র নিয়মিত পাইবার আশা রাখেন না। আমাকে বলিলেন, তাঁর বাড়ীতে যেন কেহ এ সংবাদ না জানিতে পারে। কলিকাতার বাড়ীতে তাঁর কথা-মত সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, তিনি দার্জ্জিলিং গিয়াছেন।

ভূপতি বাবুর বয়স অল্প। সংসারে কোনো দায়িত্ব নাই; এ-কারণে হাসপাতালে কিছুদিন যদি পড়িয়া থাকেন, তাঁর আপত্তি নাই।

তিনি স্নেহ-হীন হাসপাতালে পড়িয়া আছেন, মনে করিবেন না। আমাদের সঙ্গে ক'দিনে তাঁর খুব অন্তরঙ্গতা হইয়াছে। তাঁর হাতে ব্যাণ্ডেজ; ব্যাণ্ডেজ খুলিলে তাঁকে লইয়া আমাদের একটু-আধটু ব্রিজ খেলা চলিবে; তাহাতেও সময় মন্দ কাটিবে না।

এ পত্র পাইবামাত্র আপনি তাঁকে পত্র লিখিবেন। আপনার পত্রের প্রতীক্ষায় তিনি অধীর রহিলেন, জানিবেন। ভালো কথা, কয়েকখানা বাঙলা মাসিক-পত্র যদি পারেন, পাঠাইবেন। বিশেষ করিয়া, যে কয়টায় ভূপতি বাবুর লেখা কবিতা ছাপা হইয়াছে। সে কবিতা আমাদের তিনি পড়াইতে চান।

আপনার কথা ভূপতি বাবুর কাছে নিত্য শুনি· শুনিয়া আপনার সম্বন্ধে একটা ধারণা···

কিন্তু সে ধারণার কথা থাক্। যদি কখনো দেখাশুনা হয়, বলিব। আশা করি, আপনার কুশল।

পরিশেষে নিজের একটু পরিচয় দিই। আমি এই হাসপাতালে ডাক্তার। দু'বৎসর মাত্র পাশ করিয়া বাহির হইয়াছি। হাসপাতালের ঠিকানায় আমার 'কেয়ারে' আপনার বন্ধুকে পত্র লিখিবেন। সে পত্র অবশ্য confidontial থাকিবে। আমার নাম

শ্রীনলিনাক্ষ দত্ত

২

আশ্রম

রাঁচি, ৫ই জুন···

ভাই ভূপতি

ডক্টর নলিনাক্ষ বাবুর চিঠিতে তোমায় হাল-সাকিমের বৃত্তান্ত অবগত হলুম। এ এ্যাডভেঞ্চারে প্রবৃত্তি হলো কবে, ভেবে বিস্মিত হচ্ছি! যাক, ভাঙ্গা পা জোড়া লেগেছে শুনে নিশ্চিন্ত হলুম। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, ডক্টর

নলিনাক্ষ বাবু এবং তাঁর সহযোগীদের চিকিৎসায় ও সেবায় অচিরে পদ-মর্য্যাদা ফিরে পাও! এ খবর জানা ছিল না; কাজেই তোমার চিঠি আসেনি বলে' তোমার উপর দারুণ অভিমান হয়েছিল; এবং সেই অভিমান-বশে তোমাকে চিঠি-পত্র লিখিনি। এখন এ বিপদে আমার হৃদয় তোমার প্রতি সমবেদনায় পূর্ণ করে এই পত্র-মারফৎ পাঠাচ্ছি।

এখানে এসে বাবার শরীর ভালো আছে। আমার কাজ রুটীনে বাঁধা। বাবাকে নিয়ে সকালে-সন্ধ্যায় খুব খানিকটা টহল দিয়ে আসি; মধ্যাহ্নে ভোজন-পর্ব্ব চুকিয়ে ক্ষণেক বিশ্রাম; তার পর বাবার ইচ্ছা-মত বই পড়ে তাঁকে শোনাই।

নিজের যেটুকু অবসর মেলে—সত্যি, চারিদিকে চেয়ে দেখি, মন আনন্দে ভরে ওঠে! কবিতা লেখা যায় কি করে—একটু হদিশ দিতে পারো? মাঝে মাঝে সাধ হয়, লিখি! নীল আকাশ—মুক্ত প্রান্তর—ওদিকে পাহাড়ের শ্রেণী—আর সব-চেয়ে মধুর···

পাশের প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডওয়ালা বাঙলোয় কিশোরী প্রতিবেশিনী! তাঁর কথা বলি। একখানি বাঙলো। সেটিকে ঘিরে মস্ত বাগান। দুটো গাছের ডালে বাঁধা একটি দড়ির দোলনা—যাকে বলে, হ্যামক। মধ্যাহ্নে সেই হ্যামকে অর্দ্ধশায়িতভাবে বিশ্রাম-রতা হন্ এই কিশোরী প্রতিবেশিনী। তাঁর হাতে সে-সময়ে থাকে একখানি বই। বাঙলা কি ইংরেজী, নজর চলে না। তবে সূর্য্য যতক্ষণ না পাহাড়ের আড়ালে সরে পড়ে, ততক্ষণ সেই হ্যামকে শুয়ে তিনি বই পড়েন। দিকে দিকে পাখীর কূজন, ফুলের বর্ণ-বিভব—সেদিকে কোনোদিন তাঁকে ফিরে তাকাতে দেখলুম না! হ্যামকের নীচে পড়ে থাকে ছোট একজোড়া লাল নাগরা। আমি সেই নাগরা জোড়ার পানে চেয়ে থাকি। মনে হয়, যদি কবি হতুম···ঐ হ্যামক, ঐ কিশোরী, আর ঐ নাগরা—এ নিয়ে অজস্র কবিতা লিখে তাতে গজল-সুর চাপিয়ে ছেড়ে দিতুম বাঙলা মাসিক পত্রগুলোর বুকে।·বাঙলাদেশের তরুণ-দের মন ছুঁয়ে আমার সে কবিতা কি দোলাই না জাগাতো!

এ কথায় মনে করো না, কিশোরীকে আমি ভয়ঙ্কর ভালোবেসেছি! তোমাদের নভেলে-কবিতায় যেমন ঘটে, সেই রকম! তা নয়। এ প্রেম নয়।

তবে এ নিয়ে চমৎকার গল্প লেখা যায়, তা বুঝতে পারছি। লেখবার শক্তি ভগবান্ দেননি বলে এত দিন কোনো অনুযোগ তুলিনি, এখন এ-অনুযোগে মন ভরে আছে। বাঙলা মাসিক পত্রে এমনি গল্প কতই পড়ি। প্রতিবেশিনী কিশোরী···

এখানে আবার কিশোরীর সঙ্গে আছে ঐ হ্যামক, তরুকুঞ্জে দুলন্ত ঝুলন-দোলা—আর পায়ের তলায় লাল নাগরা!

তাঁর কালো কেশের রাশি তিনি এলিয়ে দেন চামরের মত—পরণে থাকে নিত্যই দেখি, রঙীন শাড়ী। শাড়ীর রঙ নিত্য বদলায়, এবং সে রঙ-বদলানোর ব্যাপারে কিশোরীর আর্টিষ্টিক রুচির পরিচয় ভাঁজে ভাঁজে ফুটে ওঠে!

আশা করি, সে-ছবির আভাস কলমের রেখায় চিঠির বুকে এঁকে পাঠাচ্ছি, তা থেকে সমগ্র ছবির কমনীয়তাটুকু তুমি বুঝবে।

আমার ঘরের ঠিক পাশেই বাগান। তাঁকে আমি নিত্য দেখি। দেখাটা আমার নিত্যকার রুটীনের কাজ হয়ে উঠেছে। এখানে এসেছি আজ ষোল দিন। এর মধ্যে একটা দিনও দেখায় ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে আমি যে তাঁকে দেখি, এ খপর তিনি জানেন না। দেখতে আমার ভালো লাগে, সে কথা গোপন করবো না।

তাঁকে দেখবার সময় তোমার কথা মনে জাগে। তুমি এ দৃশ্য দেখলে এ ক'দিনে মাইকেলের 'ব্রজাঙ্গনার' মত নিশ্চয় 'কাননাঙ্গনা' কাব্য লিখে ফেলতে।

তোমার ডাক্তারবাবু বই পাঠাবার জন্য বলেছেন—বই তো সঙ্গে আনিনি। বইয়ের মধ্যে আছে ওয়েল্‌শের Origin of Life; গ্রাকি রোমারের এক-গাদা বিভীষিকাময় উপ-ন্যাস; আর কোনান্ ডয়েলের বই। বাবার সখ। এ সব বই তাঁকে পড়ে শোনাতে হয়। এ বই তোমার ভালো লাগবে কি?

বাঙলা মাসিক-পত্রের বালাই এখানে নেই। তবু চেষ্টা করবো···

এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। থাকেন ভুরাণ্ডায়। তাঁর স্ত্রী বাঙলা-সাহিত্যের মস্ত পেট্রন—ক্যাটালগ দেখে বাঙলা বই কেনেন। কোনো বই কিনতে বাকী রাখেন নি। তাঁদের কাছ থেকে চেয়ে তোমাকে পাঠাবো।

হাতের ব্যাণ্ডেজ খোলা হলে যত শীঘ্র পারো, চিঠি লিখো।

আশা করি, দিনে দিনে রাহুগ্রস্ত চরণ আবার ষোল কলায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠচে।

তোমার বাবা-মা এখন কোথায়? তাঁদের খপর পাও তো?

তোমার অজিত

৩

কলিকাতা, ৮ই জুন…

ভাই অজিত

স্বহস্তে পত্র লিখচি—তাই এক দিন দেরী হলো। আজ সকালে হাতের ব্যাণ্ডেজ খোলা হয়েচে। হাতে কলম ধরবার অনুমতি পেয়েছি।

তোমার চিঠি—আমার কাছে যেন বিধাতার আশীর্ব্বাদ! আমার অবস্থা একবার ভাবো! জ্ঞান হয়ে অবধি কখনো রোগে শয্যা নিয়েছি বলে মনে পড়ে না। এখনো পায়ে কাঠ বাঁধা—উত্থান-শক্তি-রহিত। আমি যেন সেই মিশরের ম্যমি—পায়ে কাপড় জড়ানো। হয়তো কোন্ অতীত জন্মে মিশরের কোনো ফ্যারাও ছিলুম! সারাদিন শুয়ে আছি তো শুয়েই আছি! শুয়ে শুয়ে মনে হয়, সকালে সারা সহর জুড়ে কাজ আর অকাজের বাণ ডাকলো ঐ! আমাদের বাড়ীর সামনে সেই চায়ের দোকানটা মনে আছে? সে দোকানে আন্তর্জাতিক কংগ্রেস বসলো—চায়ের পেয়ালায় মুখ দিয়ে দেশ-উদ্ধারের নানা প্ল্যান, সমাজ-সংস্কারের বিচিত্র আলোচনা, নীতির লাঞ্ছনা এবং আধুনিকতার বিরুদ্ধে সর্ব্বরকমের তীব্র আলোচনা সুরু হলো! আমার এখানেও চাঞ্চল্য জাগে। এখনি অস্ত্র-শস্ত্র হাতে আসবেন ডাক্তারের দল। আমাকে মিউজিয়ম পেয়ে বিরাট উদ্যমে তাঁদের কত তত্ত্বানুসন্ধান চলবে। কিন্তু যাক—এ সব বাজে কথা লিখে চিঠি ভরাবার কোনো প্রয়োজন দেখচি না।

চিঠি দিতে এতটুকু দেরী করো না। রোজ যদি একখানা চিঠি লেখো, তাতে রাজ্যের কোনো আদব-কায়দায় কোনো ত্রুটি ঘটবে না। আমার অবস্থার কথা স্মরণ করো। তাহলে বুঝবে, এ প্রার্থনা কতখানি সঙ্গত!

জীবনে কখনো যে-লোক অলস শয়নে আশ্রয় নেয়নি—সে লোকটার পা বেঁধে সকলে তাকে বিছানায় ফেলে রেখেছে! দিনের পর দিন কাটছে—তার নড়বার শক্তি নেই।

তোমার চিঠিতে পাশের বাড়ীর যে ছবি এঁকে পাঠিয়েছ, সে ছবি দেখে কার আর কিসের তারিফ করবো, বুঝতে পারচি না। তোমার কলমের রেখায় পাশের বাড়ীর ছবি এমন বর্ণ-বিভবে ফুটে উঠেচে যে ভাবচি, পাশের বাড়ীর বাগানের হ্যামকের দোলায় তোমার কলমে ভাবের ছন্দ জাগলো—না, প্রতিবেশিনীর রূপের জ্যোতিতে ভাব-কমল তোমার চিত্তে সহস্র দলে ফুটে উঠলো! এ রহস্য রসিক-জনের অনুশীলনের যোগ্য!

তোমার চিঠি পড়ে ছবির একটা আদরা আমি মনে মনে এঁকে ফেলেছি। দ্যাখো তো—সত্য ছবির সঙ্গে আমার এ ছবির কতখানি মিল আছে।

বাঙলোখানি ছবির মত! তার গা বেয়ে লতানে গাছ; সে গাছে অজস্র ফুল! বাঙলোর বারান্দায় কতকগুলো অর্কিড; কতকগুলো খাঁচাও আছে। খাঁচায় নানা জাতের পাখী—ক্যানারি, মুনিয়া, অষ্ট্রেলিয়ান প্যারাকিট, জাভা-স্প্যারো। নয়? তারপর বাঙলোখানিকে ঘিরে ফল-ফুলের বাগান। এই বাগানে তোমার ঘরের পাশটিতে ছায়া-নিবিড় তরুশ্রেণী; তার দুটি তরুর শাখায় বাঁধা দড়ির দোলা; সেই দোলায় শুয়ে তোমার কিশোরী মনোহারিকা! তাঁর হাতে বই; চোখের দৃষ্টি বইয়ের পাতায় তন্ময়! কিশোরীর দুটি গালে গোলাপের আভা; ছোট কপালখানির উপর পুঞ্জিত কেশের ঝালর—একগোছা রেশমের মত বাতাসে দুলে খেলা করচে! এলায়িত কালো কেশে পুষ্প-সুরভি; পরণে একখানি ডুরে শাড়ী—তাতে নানা রঙের রামধনু ফুটেছে! হ্যামকখানি মৃদু দোলায় দুলছে; হ্যামকের নীচে পড়ে আছে লাল ভেলভেটের নাগরা। নাগরার ডগা একটু মাথা তুলে আছে—যেন পায়ের পরশ-হারা হয়ে দুঃখে মলিন—মাথা তুলে পা দুখানির পানে চেয়ে আছে!

কিন্তু এই কিশোরীটি কে? তাঁর পরিচয় জানো? কার কন্যা? কুমারী? না, বিবাহিতা? কি বই পড়েন? L'Allegro? না, Prometheus Unbound? না, হালের বই—ইয়েট্সের কবিতা? আলডুস্ হাক্সলির

বিজ্ঞান? কোনো কলেজে ইনি পড়া-শুনা করচেন? গান-টান শোনো? রোগ-শয্যায় এ-সব সংবাদ পেলে একটু বৈচিত্র্য বোধ করবো। না হলে এই এক-ঘেয়ে জীবন—সত্যই দুর্ব্বহ হয়ে উঠেচে! এর চেয়ে civil disobedience করে জেলে পচা ছিল ভালো! তাতে প্রকাণ্ড company পাওয়া যেতো—হাত-পাগুলোকে অটুট অক্ষত রেখে নাচ-গান হাসি-খেলা করে আরাম পেতুম।

আমার এ বিচিত্র কৌতূহলে বিস্মিত হয়ো না, বন্ধু। আমার নিরুপায় অবস্থা কল্পনা করো। যে-কোনো নূতন সংবাদ আমার কাছে পিপাসার বারির মত প্রার্থনার বস্তু! এখন যদি ওখানকার ওরাওঁদের বিবরণ প্রবন্ধাকারে লিখে পাঠাও, তাও আমার কাছে পাবে right royal welcome!

আশা করি, ভালো আছ। কেন না থাকবে? পাশে অমন বাগান—সে বাগানে অমন নয়ন-ভুলানো বসন্ত-মাধুরী!

তোমার বাবাকে প্রণাম জানিয়ো।

হতভাগ্য ভূপতি

৪

রাঁচি,

বন্ধু ১০ই জুন···

চিঠি পেয়েচি। বহুৎ আচ্ছা! কল্পনার চোখে দেখে পাশের বাড়ীর যে ছবি এঁকেছো—তা একেবারে বর্ণে বর্ণে মিলে গেছে। এঁর পধনে ডুরে শাড়ীর রঙে নিতাই বৈচিত্র্য! রামধনুর উপমাই মনে জাগে।

এখন তিনি হ্যামকে শুয়ে বই পড়চেন। কি বই, বলা দুষ্কর। তাঁর পরিচয় সংগ্রহ করেছি। লিখি। সমাধসিহি!

কিশোরীর নাম মলিনা সেন। ডাক-নাম মলি। এঁর বাবার নাম হরগোবিন্দ সেন। ছিলেন ডিষ্ট্রিক্ট জজ; রিটায়ার করে এখানে আস্তানা পেতেছেন। চাল-চলনে সাহেব। একটি ছেলে প্রভাত—বিলাতে আছেন,—পাকা আই-সি-এস হতে গেছেন। আর একটি ছেলে নিশীথ—৩ বৎসর পূর্ব্বে টাইফয়েডে মারা গেছেন। এ সংবাদ সংগ্রহ করেছি সেন সাহেবের খানশামার কাছে। তার সঙ্গে পথে সেদিন দেখা। খুব খাতির দেখিয়েছি। ও-বাড়ীর সঙ্গে আলাপের আয়োজন করছি। ওঁরা বেড়াতে বেরোন—পিতা ও পুত্রী—তবে আমাদের চেয়েও ভোরে ওঁরা বেরোন। যান মোরাবাদির দিকে। বাবাকে বলেছি, রোদ ফোটবার আগে বেরুতে পারলে বেশী আরাম পাবেন। বাবা বলেচেন—তা ঠিক। আমরাও বেরুবো ভোরে—এবং যাবো মোরাবাদির পথে।

কিশোরীকে কাল দেখেচি। একা—বাঙলোর ফটকের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। বাবার সঙ্গে আমি তখন বেড়াতে বেরিয়েছি; কিশোরী ছিলেন ফটকে দাঁড়িয়ে। বুঝি, তাঁর পিতার প্রতীক্ষায়। আমি তাঁর পানে চাইলুম। আমার চরণ চকিতের জন্য চলা ভুলে থমকে দাঁড়ালো। বাবা বললেন,—কি হলো? তাঁর কথায় চমক ভাঙ্গলো। অপ্রতিভ হলুম। সঙ্গে সঙ্গে কিশোরী ফিরে চাইলেন আমার দিকে। চার চোখে চাহনির চকিত মিলন! আমি বললুম—জুতার মধ্যে কাঁকর। ঝুঁকে মিছিমিছি জুতো খুলে উল্টে ধরলুম। কাঁকর ছিল না, বুঝেচো নিশ্চয়! তবু···অভিনয়ের প্রয়োজন ছিল। পায়ে জুতো এঁটে আবার চাইলুম কিশোরীর পানে। কিশোরী তখন ফটকের মধ্য দিয়ে আবার তাঁর বাঙলোয় পুনঃ-প্রবেশ করেচেন।

আমার দাঁড়ানো চললো না। উচিত নয়। কাজেই দাঁড়ানো হলো না—বাবার সঙ্গে চললুম। একবার বললুম—মোরাবাদির দিকে চলুন না! বাবা বললেন—না, যাবো বরিয়াতুর দিকে।

আমার মনে ছিল অভিসন্ধি। কাজেই ধরা পড়বার ভয়ে প্রতিবাদ তুলতে পারলুম না। তারপর অকস্মাৎ ঘটলো অসম্ভব ঘটনা—ফেরবার মুখে।

ফটকের সামনে দেখা সেন সাহেবের সঙ্গে। সাহেব বলচি,—তিনি বেড়াতে বেরোন সাহেবী-বেশে; বাড়ীতে আছে বাবুর্চ্চি-খানশামা—তাই। ফটকের সামনে তিনি ছিলেন দাঁড়িয়ে। বাবাকে দেখে প্রশ্ন করলেন,—আপনি আছেন পাশের বাঙলায়? কদ্দিন?

প্রশ্ন বাঙলা ভাষায়। বাবা জবাব দিলেন—আমরা আছি তিন হপ্তা।

তারপর হলো সংক্ষিপ্ত পরিচয়। পরিচয় শুনে বললেন—আপনিই অটলবাবু? পোষ্টাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন? নাম শুনেছি। রায় বাহাদুর অটলবিহারী গুপ্ত।

তারপর আমার পানে চেয়ে বললেন—এই একটি ছেলে? এম-এ পাশ করে বসে আছে? বসে থাকাটা উচিত নয়। বিলেতে পাঠিয়ে দিন। ব্যাঙ্কিংয়ে টেষ্ট আছে। কাজ শিখে আসুক। We need bankers.

টেনিশ খেলার ব্যবস্থা করতে বললেন। নিজের খুব খেলার সখ। সঙ্গী পান্ না। বাবার টেনিশে খুব ঝোঁক শুনে বললেন—কালকের মধ্যে ব্যবস্থা করা যাক! অজিত, ভার নাও। আমার মেয়েও টেনিশ খেলে। খেলার এখানে সুবিধা নেই! মাঝে মাঝে জানাশোনা কেউ এলে খেলা চলে। দরকার একটু এক্সারসাইজ। উপায় নেই বলে শুধু বেড়িয়ে বেড়াই; পা দুটোর এক্সারসাইজ চলে। খেলার দাম বেড়ানোর চেয়ে অনেক বেশী।

আজ চিঠি লেখা সেরে ওখানে যাবো টেনিশের ব্যবস্থা করতে। এবেলায় যাবো না—অন্ততঃ যতক্ষণ মলি সেন হ্যামকে থাকেন, ততক্ষণ বাড়ী থেকে বেরুনো সম্ভব হবে না। তাঁকে দেখে যে আনন্দ পাই—টেনিশের আয়োজন করতে সে আনন্দ নিশ্চয় পাবো না!

আবার বলি বন্ধু, এ প্রেম নয়। নিছক কৌতূহল! শুধু চোখে দেখা! সম্পূর্ণ নিষ্কাম। কারণ, প্রেমের শেষ অঙ্কে এদেশে সেই এক ধারা—বিবাহ! তুমি জানো, বিবাহে আজও আমার রুচি জাগেনি। সুতরাং আমার সম্বন্ধে প্রেমের ভয় নেই!

আশা করি, পরের চিঠিতে আরো বহু বিচিত্র সংবাদ দিয়ে তোমায় অনেক বেশী খুশী করতে পার্‌বো।

অজিত

৫

রাঁচি

১১ই জুন

ভূপতি

তোমার চিঠি পাবার আগেই দু'নম্বর চিঠি ছাড়চি—ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাসের আর একটা চ্যাপ্টার। না লিখে থাকতে পার্‌লুম না। কালই টেনিশের ব্যবস্থা করে' অযাচিতভাবে গিয়েছিলুম সন্ধ্যার পর সেন সাহেবের বাঙলোয়।

সেন সাহেব তখন মলির সঙ্গে খেতে বসেচেন। এঁরা দেখলুম, একটু সকাল সকাল খাওয়ার পাট চুকিয়ে নেন। আমাকে বসতে হলো ড্রয়িং-রুমে। আহারাদি শেষ হলে সেন সাহেব এলেন,—টেনিশের আয়োজন কম্‌প্লিট্ শুনে খুব ধন্যবাদ জানালেন। তার পর আলাপ হলো মলি সেনের সঙ্গে।

তুমি জানো, কবিতা আমার আসে না। ভালো বুঝি না বটে; তা'ছাড়া যে-কাজে ঢুকেচি, তাতে অঙ্ক কষার সঙ্গেই আমার সম্পর্ক! তবু এ-কথা স্বীকার করতে বাধা নেই, মলিনা সেনকে দেখে আমার মনে পড়ছিল সেই কলেজে-পড়া ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা—She is a Phantom of Delight.

Phantom বল্‌লুম—তার কারণ, পল্লবের মত তাঁর দেহ-লতা পৃথিবীর বুকে কোথাও যেন ভারী হয়ে বসেনি! চল্‌ছেন, ফির্‌ছেন,—যেন বিদ্যুতের ঝলক! পৃথিবীর মাটী যেন কোথাও তাঁকে ধরতে বা ছুঁতে পারচে না! Delight বল্‌চি—তার কারণ, তাঁর চেহারা বিস্ময়ের বস্তু না হলেও মাধুর্য্যের আধার! তাঁর আলাপের ভঙ্গী সহজ, সরল; মুখের কথাগুলি···তার আর তুলনা নেই!

ভেবো না, প্রেমে পড়ে গেছি গভীরভাবে। তা নয়। কবিরা রূপসীর বহু বর্ণনা করেচেন—মনে রূপের যে মাধুরী ফোটে, তারই অকপট প্রকাশ! ডেশ-ডেমোনার উপর সেক্সপীয়রের প্রেম জাগে নি—মিরান্দার উপরেও নয়! শকুন্তলার উপর মহাকবি কালিদাস প্রণয়াসক্ত হয়েছিলেন, এমন কথা কোনো দিন কারো মনে জাগে না। অথচ শকুন্তলা, মিরান্দা, ডেশডেমোনাকে—কালিদাস আর সেক্সপীয়র কি সুন্দর করেই না তুলির লেখায় এঁকে গেছেন! আমার কলমের মুখে কুমারী মলিনা বা মিস্ মলি সেনের যে বর্ণনা দিচ্ছি—তা পড়ে আমাকে কালিদাস বা সেক্সপীয়রের আসনে বসাতে পারো—ভুল হবে না। কিন্তু তার বদলে দুষ্মন্ত কিম্বা ফার্দিনান্দ কিম্বা ওথেলো বলে ভাবলে দারুণ ভুল করবে।

ভালো কথা, যে খপর দেবার জন্য তাড়াতাড়ি আজ তোমায় চিঠি লিখচি—সেই খপরই দেওয়া হয়নি।

একটু আলাপে বোঝা গেল, মিস্ মলি এবং সেন সাহেব দুজনেই বাঙলা-সাহিত্যের সংবাদ রাখেন। কুমারী সেন এ-যুগের তরুণ কবি ভূপতি রায়ের কবিতা পড়েচেন। সে কবিতা তাঁর ভালো লাগে এবং এই তরুণ কবির

ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে এমন সুমধুর সম্ভাব্যতার ইঙ্গিত করলেন যে, আমি সগর্ব্বে প্রকাশ করেছি—শ্রীযুত ভূপতি রায় আমার পরম বন্ধু; মোটরে চোট খেয়ে তিনি হাসপাতালে সম্প্রতি শয্যাগত আছেন; এবং আমার সঙ্গে তাঁর পত্র-বিনিময় হয়।

এ পরিচয়ে আমার আদর বেড়ে গেছে। তার প্রমাণ, আজ সকালে ও-বাড়ীতে চায়ের পেয়ালায় আমার নিদ্রার জড়তা ভঙ্গ হয়েছে। তার পর প্রাতর্ভ্রমণে বাবা ও আমি আজ ওঁদের সঙ্গ-লাভে কৃতার্থ হয়েছি। পথে ওঁরা হলেন এক জোট—আমরা দুজনে আর-এক জোট। নানা কথা হলো। স্বরাজ-সমস্যা থেকে সুরু করে বাঙলার আধুনিক কাব্য-সাহিত্য। যে কজন তরুণ কবির বন্দনা গান করলেন, সে দলে তুমিও আছ! তোমার কথা জিজ্ঞাসা করলেন, পায়ের জন্য দুঃখ জানালেন—তোমার স্পোর্টিং-স্পিরিটের তারিফ করলেন—তোমার কবিতার inspiration কি, তাও জিজ্ঞাসা করলেন। মানে, interest নিলেন!

হাসপাতালে পড়ে থেকে দুটো কবিতা লিখতে পারো না? লিখে যদি পাঠাও তো কবি-প্রশস্তি মেলে। শুনেছি, ব্যথার দিনেই কবিরা ভালো কবিতা লেখেন। Our sweetest songs…জানো তো? যদি লেখো, পাঠিয়ো। আমার খাতিরও তাহলে বাড়বে। এতদিন তোমাদের পুঁছতুম না—কবিতা লেখাকে ভাবতুম, idling away good time! কিন্তু এখন মিস্ মলি সেনের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় বুঝচি, উর্ব্বর মনে তোমরা বেশ শিকড় চালাতে জানো! এর জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আজ আসি। ও-বাড়ী থেকে ডাক এসেছে—টেনিসে। চিঠির জবাব দিয়ো। পারো, কবিতা পাঠিয়ো। পায়ের অবস্থা কেমন?

তোমার অজিত

৬

১২ জুন

অজিত

তোমার দুখানি চিঠিই পেয়েছি। দ্বিতীয় পত্রখানি যেন বসন্তের বার্ত্তা বয়ে এনেছে!

রোগশয্যায় তোমার চিঠি আমার পথ্য—আমার মেওয়া! এর ঝলকে ঝলকে জীবনী-শক্তি ফিরে পাচ্ছি। তুমি ভাগ্যবান্। তোমার শৈল-বাস দিনে দিনে শুধু মোহনীয় নয়, লোভনীয় হয়ে উঠছে। খোঁড়ার পা খানায় পড়ে—এ কথা যিনি বলে গেছেন, তাঁকে আমি আসন দিই বেদব্যাসের উপরে। না হলে আমাকে আজ হাসপাতালে বন্দী থাকতে হয়!

কবিতা লেখার কথা বলেছ! দুঃখ এই, আমার কবিতা যাদের ভালো লাগে না, সংসারের পথে দু'বেলা তাদের সঙ্গেই দেখা হয়; যাঁদের ভালো লাগে, তাঁদের না পাই দেখা, না শুনি তাঁদের মুখের ভাষা। কাজেই কবিতা লেখার উৎসাহে যদি ভাঁটা পড়ে, সে দোষ কবির নয়—পাঠকের।

কিন্তু সে কথা যাক। একটা কবিতা লিখেছি—তোমার চিঠিতে inspiration পেয়ে। পাঠালুম। এটা তোমার বান্ধবীকে দেখানো হয়তো উচিত হবে না। তবু এ সম্বন্ধে তোমার বিচারকে শিরোধার্য্য করচি। যা ভালো বোঝো, করো।

আজ আসি। কিছু ভালো লাগচে না। বাহিরে খুব বর্ষা নেমেছে। দিনের আলো মুছে গেছে। আমার মনেও এমনি বর্ষা। শুধু কালো মেঘের পাথার।

চিঠির জবাব দিয়ো। শুধু তোমার কথা লিখো না। যে বৃহত্তর মধুরতর গণ্ডী রচনা করচো, তার খুঁটিনাটি সমস্ত খবর লিখো। তোমার পত্রের আশায় পথ চেয়ে রইলুম।

৬ (ক)

কবিতা

কোথা কোন্ গৃহকোণে—কোন্ নিরালায়
কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতা?
মোর হৃদয়ের যত সুখ-দুখ-আশা
তারি সাথে পরিচয় হে অপরিচিতা?
কখনো অধরে হাসি,—কভু আঁখি-কোণে
মুক্তাফল দেয় দেখা! বুঝি, আমি বুঝি।
নহিলে ব্যথার সুরে নিখিল ভরিয়া
কি ফল? ব্যথায় তব ওই অশ্রু খুঁজি।
কবিতা এ নয়, বন্ধু,—পরাণের ভাষা
কাঁদিয়া ফিরিছে নিত্য আরেকটি প্রাণ
সপ্ত মহাসমুদ্রের ব্যবধান টুটি!
শুনিবে না? শুনিবে না আমার এ গান?

শ্রীভূপতি রায়

৭

১৫ই জুন…

অজিত

ব্যাপার কি? ক'দিন চিঠি লেখোনি কেন? ভালো আছো তো? তোমার বান্ধবী ভালো আছেন? শীঘ্র উত্তর দিয়ো। নাহলে টেলিগ্রাম করবো।

ক'দিন আগে একটি কবিতা পাঠিয়েছি। পেয়েছ তো?

ভূপতি

৮

ভূপতি

মাপ করো। ক'দিন চিঠি লেখা হয়নি। এখানে ছিলুম না। গিয়েছিলুম সকলে মিলে হুণ্ড, দেখতে—মিস্ মলি সেনের আগ্রহে। আজ ফিরছি। ফিরেই তোমার চিঠি ও কবিতা পেলুম। কবিতাটি নিয়ে তখনি গিয়ে মিস্ মলি সেনকে পড়িয়েছি। কবিতা পড়তে পড়তে তাঁর মুখে রঙের যে বিচিত্র আভা ফুটলো—তুমি দেখলে 'রঙবাহার' কাব্য লিখে ফেলতে! তোমার খুব admirer—বললেন, —আপনি বুঝি আমার কথা লিখেছিলেন? আমি মিথ্যা কথা বলতে পারলুম না; স্বীকার করতে হলো। তাতে সলজ্জভাবে বললেন,—এ কবিতাটি আমাকে উদ্দেশ করে লেখা, নিশ্চয়। এ কবিতাটি আমি রাখবো।

তাঁর স্বরে ছিল মিনতি! 'তথাস্তু' বলে কবিতাটি তাঁকেই দান করে এসেছি।

আজ এই অবধি থাক্। এ পর্য্যন্ত টেনিশ খেলা হয়নি। মিস্ রায় বলেছেন, আজ খেলা চাই। তাঁর আরো কে-কে বন্ধু আসবে খেলতে—তাঁদের নাকি আসতে বলেছেন।

শ্রীচরণ কেমন? শুধু কবিতায় চরণই পূরণ করবে? নিজের চরণ-পূরণের আর কত দেরী?

অজিত

৯

১৮ই জুন

অজিত

কিছু ভালো লাগছে না। এ বন্দিত্বের চেয়ে মৃত্যু ভালো। বলো কি, দুনিয়ায় রূপ-রসের লীলা চলেছে—আর আমি উৎসবের আড়ালে একটা লোহার খাটে পড়ে বাঁধা! যদি তোমার পাশে থাকতে পেতুম!

ডাক্তারদের বলেছি, আমায় যদি কোনোমতে ছেড়ে দেন! তাঁরা বলেন—পাগল!

হয়তো আমি তাই!

কি লিখবো—ভেবে পাচ্ছি না। লেখবার কিছু নেই। আমার পৃথিবী ক্রমেই বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে!

চিঠি লিখো—চিঠি লিখো—চিঠি লিখো। আমার বুকে যদি আবার প্রাণ ফিরে আসে তো জেনো, সে আসবে শুধু তোমার চিঠির স্পর্শে!

ভূপতি

১০

রাঁচি

ভূপতি ২০ জুন…

চিঠির সঙ্গে আলাদা প্যাকেটে একটি সূর্য্যমুখী ফুল পাঠালুম। এ ফুলটি মিস্ সেন স্বহস্তে আমাকে উপহার দিয়েছেন—আজ সকালে। তাঁর নিজের হাতে পোঁতা গাছ; সে গাছে এটি প্রথম ফুল। ফুলটি ফুটে ছিল গাছ আলো করে। ফুলের আমি সুখ্যাতি করছিলুম। বলেছিলুম —এত বড় সূর্য্যমুখী কখনো দেখিনি। হেসে ফুলটি তুলে আমার হাতে দিলেন, বললেন—আমার হাতের গাছ—সে গাছে এটি প্রথম ফুল।

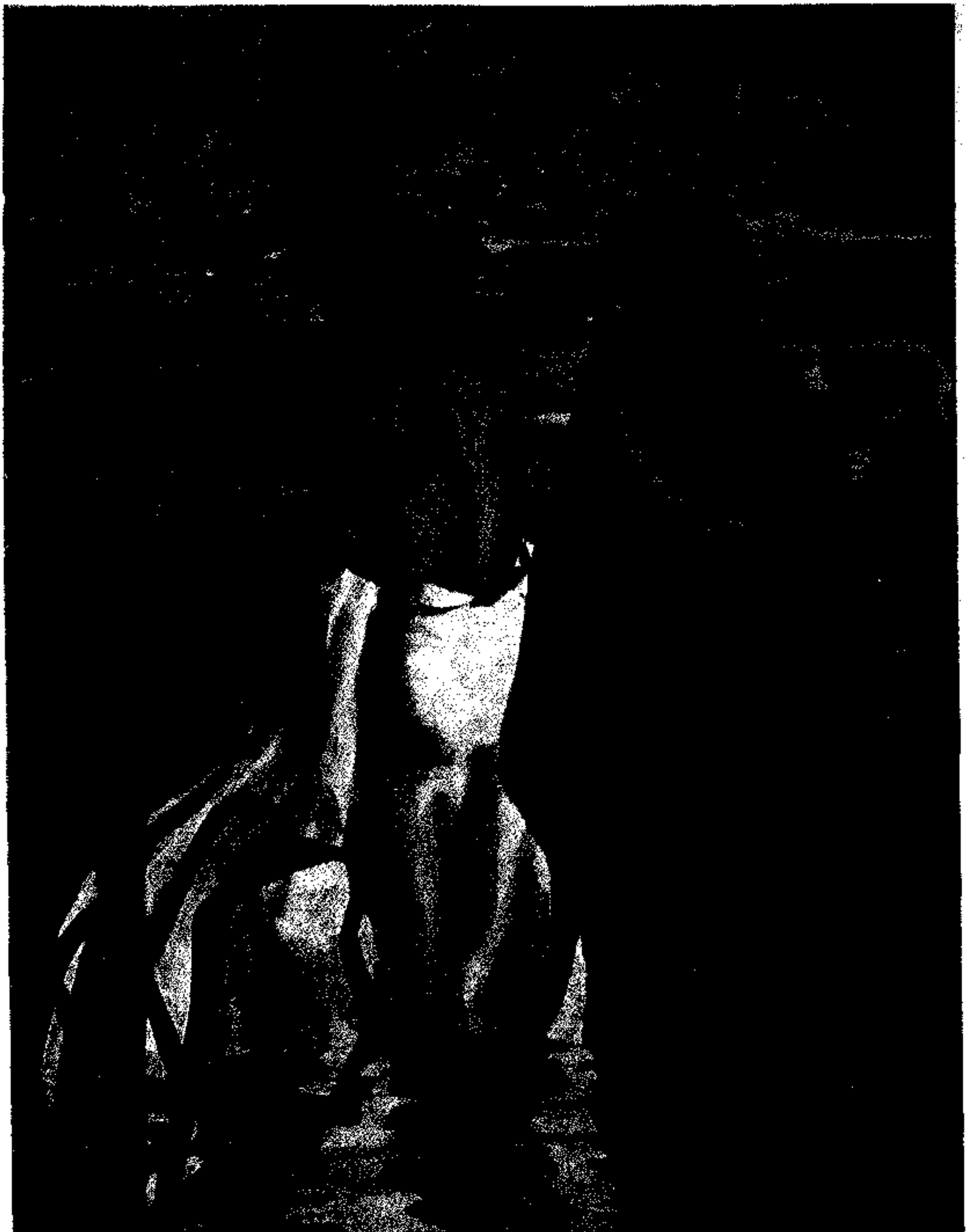
তোমার ভক্ত মলি সেন। তাই এ ফুল তোমাকে পাঠালুম।

অপরাধ করিনি। তাঁকে বলেছি—হাসপাতালে শয্যা-গত রোগী-বন্ধুকে পাঠাবো—কবি ভূপতি রায়। এ কথায় তাঁর মুখে যে ভাবান্তর ঘটলো…

দান্তে আর বিয়েত্রিসের সে গল্পটা কি হে? আমি জানি না। কখনো সাহিত্যের কারবার করলুম না! কোনো মতে পাঠ্যগ্রন্থের নোট মুখস্থ করে শুধু এগজামিনে 'মার্ক' রেখে পাশই করেছি।

তোমার কবিতার কথা আজও হচ্ছিল। উনি নিজে থেকে বলছিলেন! ভালো কথা, তোমার লেখা সেই অপরিচিতা কবিতাটি সুন্দর দামী ফ্রেমে বাঁধিয়ে নিজের ঘরে রেখেছেন।

আমার মনে এক একবার সন্দেহ জাগছে—এ কি প্রেম? রবিবাবু লিখেছেন—এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশী শুনেছি।



"দীঘির কালো জলে
সাঁঝের আলো ঝলে···" রবীন্দ্রনাথ

বসুমতী-চিত্র-বিভাগ] [শিল্পী—আর, মুখার্জ্জী

কলেজে একদিন লজিক নামে একখানা বই পড়েছিলুম, মনে আছে? সেই লজিকের নিয়মে যদি অনুমান করি, বাঁশী শুনলে যদি এমন ভাবান্তর ঘটে—অর্থাৎ পরের লাইনে রবিবাবু যে-কথা লিখেছেন—"মন-প্রাণ যাহা ছিল, দিয়ে ফেলেছি", তাহলে চোখে না দেখে শুধু কবিতা পড়েই বা 'মন-প্রাণ' কেন দেওয়া যাবে না?

তোমার অনুমতি চাইছি। কথাটা কোনো ছলে পাড়বো না কি?

কিন্তু কি করে'—হদিশ দিতে পারো? বাক্য-বিন্যাসের আর্ট জানি না—নিরেট গণ্ড-মানুষ!

পায়ের খপর দিতে তোমার এত আপত্তি কিসের, বুঝি না। পায়ের কথা যদি না লেখো, তাহলে আমিও পোষ্টকার্ডে শুধু দুটি মাত্র কথা লিখবো—

১। কেমন আছ?

২। ভালো আছি।

ব্যস্! এর বেশী তৃতীয় কথা পাবে না আমার কাছ থেকে। Beware!

অজিত

১১

২২ জুন

অজিত

রাগ করো না, বন্ধু। আমার কথা জিজ্ঞাসা করো না। লেখবার মত আমার কোন কথাই নেই।

তুমি শুধু তাঁর কথা লিখো—তোমার বান্ধবী মিস্ সেনের কথা। তোমার প্রিয়-বান্ধবীকে তোমার প্রেয়সী-রূপে দেখবার বাসনায় আকুল হয়ে আছি আমি তোমার দুর্ভাগা আহত শয্যাগত বন্ধু

শ্রীভূপতি রায়

১২

রাঁচি

২৪ জুন…

ভূপতি

রবি বাবুর সেই কবিতাটা (না, গান?) মনে আছে? সেই যে, কত দিন সন্ধ্যায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে মাঠে বসে তুমি গাইতে—

প্রভাত-কিরণে সকাল বেলাতে
মন লয়ে সখি গেছিনু খেলাতে,
মন কুড়াইতে, মন ছড়াইতে,
মনের মাঝারে খেলি বেড়াইতে,
মন-ফুল দলি চলি বেড়াইতে—

অর্থাৎ তার পরে শেষের লাইনে সেই "হৃদয় আমার হারিয়েছি!" তোমার কবিতার আলোচনায় এখানে দেখছি, বিপত্তি বাধিয়ে বসেছি!

আমাদের টেনিশ-পার্টিতে যথাসময়ে নিত্য এসে এখন উদয় হন্—শিশির রায়। পুনার সিভিল সার্জ্জন মহেন্দ্র রায়ের পুত্র। শিশির রায় পূজার পর যাচ্ছেন এডিনবরায়। ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস তাঁর লক্ষ্য। খুব সাহেব এই শিশির রায়।

এই শিশির রায়ের উপর সেন সাহেবের নজর আছে। কন্যাটিকে তাঁর হাতে সম্প্রদান করবেন,—উদ্দেশ্য। পরশু থেকে তা নিয়ে আলোচনা এবং কাল সকালে বেড়াতে গিয়ে মোরাবাদি পাহাড়ে আমাদের সামনে মেয়ের কাছে স্পষ্ট ভাষায় সে বাসনা তিনি প্রকাশ করেন। মিস্ রায়ের মুখখানি নিমেষে বিবর্ণ হয়ে উঠলো—বৈশাখী তাপে মলিন ফুলের মত! সে প্রস্তাবে হাঁ-না কোনো কথাই তিনি বল্লেন না। তার পর দুপুর বেলায় ছোট একটি চিঠি আমাকে লিখে পাঠান—"একবার দয়া করে আস্‌বেন?"

এ ডাক প্রত্যাখ্যান করিনি। তৎক্ষণাৎ গেলুম। গিয়ে দেখি, মিস্ রায়ের দুটি চোখ রাঙা হয়ে আছে। তিনি কেঁদেছেন। আমি অবাক্! বল্লেন—আমায় রক্ষা করুন…

নানা আবেদন-নিবেদনে বোঝালেন,—তোমার কবিতার উপরই শুধু তাঁর অনুরাগ নয়—কবিকে চিরকালের জন্য যদি পাশে পান, তা হলে সারা জীবন তাঁর বাঁশীর সুরে বিভোর বিমুগ্ধ থাকেন!

বাঁশী বা সুর নিয়ে এই বিভোর বিমুগ্ধ হওয়ার কথা অবশ্য স্পষ্টভাষায় বলেন নি। কথা যা বলেছেন, তার অর্থ দাঁড়ায়—তোমার উপর তাঁর interest অপরিসীম। সে কথা প্রকাশ করেছেন। প্রকাশের ভঙ্গীতে যেমন লজ্জা, তেমনি সম্ভ্রম-মর্য্যাদা—এক কথায় with admirable modesty and dignity!

সে সব কথার খুঁটিনাটী বর্ণনায় পাছে তাঁর অসম্ভ্রম হয়—তাই সে বিবৃতি দিতে পারলুম না।

বড় ঘুম পাচ্ছে। রাত এখন কটা, জানো? বারোটা বেজে গেছে। আজ সেন সাহেবের গৃহে ছিলুম রাত্রি সাড়ে এগারোটা পর্য্যন্ত। একদিকে সেই শিশির রায়ের প্রমত্ত তাণ্ডব—গানের আসর বসিয়েছিল। তার ফাঁকে ফাঁকে মলি সেনের সজল চোখে করুণ মিনতি আমাকে উদ্বেল করে তুলছিল!

২৬ জুন—ভোর ৫টা

তোমার চরণ কেমন? যদি সুস্থ থাকতে, আসতে বলতুম। কুমারী সেনের কুমারী-জীবনের তটপ্রান্তে দাঁড়িয়ে হয়তো একটু আলাপ!

কাল রাত্রে ওঁর বিবাহের তারিখ ঠিক হয়েছে—শ্রাবণ মাসের ২৭শে।

শ্রাবণে ঘন-ঘোর বরিষায়
কুমারী-তিয়া বুঝি ঝরে যায়!

অজিত

১৩

রাঁচি
২৮ জুন…

ভূপতি

এখানে ছিলুম না। বাবা আমাকে পাঠিয়েছিলেন ঝালদায়। ওখানে লোহা-লক্কড়ের কারবার আছে—একটু study করতে। এজন্য চিঠি দেওয়ায় ত্রুটি ঘটেছে। মাপ করো।

এসে দেখি, তোমার দু'খানি চিঠি এসে মলিন মুখে পড়ে আছে। চিঠিতে তারিখ নেই। ক'ছত্র লেখা যা আছে, তা থেকে বুঝলুম, তোমার চরণ সবল হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে! কুমারী মলি সেনের নামে কবিতা লিখে পাঠাবে—জানিয়েচো। এ ক'দিন তাঁকে উদ্দেশ করে যত কথা ছন্দে গেঁথেছ, তারি মালা দিতে চাও কুমারী সেনের চরণে উপহার!

পাগল! এমন কাজ করো না। তোমার সঙ্গে মিস সেনের চাক্ষুষ আলাপ-পরিচয় নেই। তাঁর যেটুকু পরিচয় জানো, তা শুধু আমার চিঠির মারফৎ! তাঁর কাছে তুমি—শুধু একটা আইডিয়া…একটা কল্পনা—একটা স্বপ্ন! তোমার চিঠিতে ওঁর সে-স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে! রক্ত-মাংসের মানুষ হয়ে সামনে এসে দাঁড়ালে তোমাকে উনি বোধ হয় চিনতেও পারবেন না। রবিবাবুর সেই কবিতা মনে নেই—

কেন তুমি মূর্ত্তি হয়ে এলে?
রহিলে না ধ্যান ধারণার?

আমার কথার ভাবার্থ এই আর কি!

তুমি হয়তো আশ্চর্য্য হচ্ছো—আমার প্রাণে এত ভাব জাগলো কোথা থেকে! কারণ ঐ মলি সেন। তাঁর সঙ্গে এখন আমার মধ্যাহ্নবেলা কাটচে—নিছক কাব্য-আলোচনায়। কি রাজ্যেই তখন বিচরণ করি! এবারে কবিতা লেখবার চেষ্টা করবো, ভাবচি।

তোমার পায়ের ব্যাণ্ডেজ খোলা হয়েছে শুনে খুশী হলুম। ঘরের মধ্যে লাঠি ধরে কোনোমতে একটু আধটু পায়চারি করচো—খুবই শুভ সমাচার! সেরে উঠে একবার বরং রাঁচি এসো! আরাম পাবে—bracing বোধ করবে।

আজ সকালে একখানি গ্রুপ-ফটো তোলা হয়েছে—ছ'বাড়ীর। সে গ্রুপে আছেন মিষ্টার সেন, মিস মলি সেন, বাবা আর আমি। ফটোগ্রাফারের কাছে যাচ্ছি—ছবির একখানা প্রিন্ট কাল যদি তোমাকে পাঠাতে পারি, দেখবো। তোমার ভক্তের ছবি চোখে দেখে ধন্য হবে। লেখায় আরো inspiration পাবে। সত্যি, কবিতার এমন ভক্ত পাঠিকা আছে যার, তারি কবিতা লেখা সার্থক। নাই বা পেলে নোবেল প্রাইজ—নাই বা কোনো বচন-রঞ্জন সমালোচক সে কবিতার স্তুতি লিখে মাসিকে ছাপালো!

চিঠি এইখানে বন্ধ করছি। ও-বাড়ী থেকে ডাক এসেছে—কেন, জানি না। তবে ও-বাড়ীতে শিশির রায়ের গলা শুনছি। গান ধরেছে! বর্ব্বর! ইচ্ছা করে, ওর কাণ ধরে বলি, কুমারী মলিনার জীবন-পথ থেকে তুই সরে দাঁড়া! উনি তোকে চান না!

বুঝতে পারছি, কুমারী মলিনা লেখাপড়া শিখলে কি হবে? তাঁর শিরায় বঙ্গ-নারীর সেই লজ্জা-সরম-ভরা রক্ত-ধারা প্রবাহিত হচ্ছে! এ বিবাহে মুখ ফুটে কোনো প্রতিবাদ তিনি তুলচেন না। পিতার দান—যত কঠিন হোক—নীরবে শিরোধার্য্য করবেন। এত লেখাপড়া শিখেও এমন দাস্য—ভয়ঙ্কর অন্যায়! অশোভন!

সেন সাহেবেরও অন্যায়, মেয়েকে ডাগর করে রেখেচেন—লেখা-পড়া শিখিয়েচেন! মেয়ের নিজের একটা চেতনা আছে—সে কথা ভাববেন না?

এ নিয়ে সমাজে আন্দোলন দরকার। স্বরাজ কি শুধু কৌন্সিলে ভোট কুড়োলেই মিলবে? সমাজের এ ত্রুটি কারো চোখে পড়ে না?

কিন্তু অরণ্যে রোদন, বন্ধু।

অজিত

১৪

রাঁচি

১লা জুলাই

ভূপতি

না, না—এমন কাজ করো না। এখানে আসবে কি হে? কুমারী মলি সেনের বিবাহ যদি শিশির রায়ের সঙ্গেই হয়, তাতে প্রতিবাদ তোলবার তুমি কে?

যদি বলো, member of society! আর-এক জন memberকে তাঁর সাংঘাতিক বিপদে উদ্ধার করতে চাও! এ ঠিক তা নয়, বন্ধু! কুমারী সেনের জীবনে হস্তক্ষেপ করবার অধিকার তোমার-আমার নেই।

এ জীবন, রোমান্স নয়—সমাজ-সংস্কারের মিটিংও নয়। চারি ধারে নানা জটিল জাল। যেদিকে পা বাড়াবে, বাঁধন আর বাঁধন। খবর্দ্দার! এমন কাজ করো না। **It would be ugly and impertinent.**

১৫

টেলিগ্রাম

(১)

অজিত গুপ্ত

আমি রাঁচি চলিয়াছি। সংবাদ গোপন রাখিয়ো। তাঁকে দেখিতে চাই।

ভূপতি

(২)

ভূপতি রায়

তুমি আসিবে না। আসা নিষ্ফল। বিরোধ হইয়া গিয়াছে। মলি প্রতিবাদ তোলেন। বাপ তাই ঘরে তাঁকে চাবি বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

অজিত

(৩)

অজিত গুপ্ত

এমন নিষ্ঠুর বর্ব্বর বাপ! রাত্রের এক্সপ্রেসে কলিকাতা ছাড়িতেছি। লক্ষ্য রাঁচি।

ভূপতি

১৬

৪ঠা জুলাই।

রাঁচি ষ্টেশনে ট্রেণ থামিলে সেকণ্ড ক্লাস কামরা হইতে এক তরুণ যুবা নামিল প্লাটফর্ম্মে। সঙ্গে একটি ভৃত্য। যুবার হাতে মোটা লাঠি। সেই লাঠিতে ভর করিয়া যুবা আসিয়া কষ্টে দাঁড়াইল ষ্টেশনের বাহিরে। ট্যাক্সি ছিল। একখানা ট্যাক্সিতে চড়িয়া যুবা রাঁচির "আশ্রম"-অভিমুখে যাত্রা করিল।

আশ্রমে ছিলেন বৃদ্ধ গুপ্ত মহাশয়—অজিতের পিতা।

যুবার প্রশ্নে বৃদ্ধ কহিলেন,—অজিত গেছে হিমু। চালানী-কাজের কি ব্যবস্থা করতে।

যুবা কহিল,—আমার নামে কোনো চিঠি রেখে গেছে?

বৃদ্ধ কহিলেন,—তোমার নাম?

যুবা কহিল,—ভূপতি রায়।

বৃদ্ধ কহিলেন,—কলকাতা থেকে আসচো? বটে! অজিতের বন্ধু। হ্যাঁ, চিঠি আছে। তোমার লগেজ কোথায়? অজিত বলছিল, বড্ড ভুগেছো; এখানে আসচো হাওয়া বদলাতে। তা এখানে আরামে থাকবে, বাবা।

বৃদ্ধ চিঠি দিলেন; চিঠি হাতে ভূপতি বাঙলোর বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। পাশের বাঙলোর সন্ধানে দৃষ্টি ফিরাইল।

কোথায় সে বাঙলো? এ বাঙলোর এক দিকে একটা পোড়ো মাঠ; অপর দিকে মদের ভাঁটী। চিমনির মুখে কাফ্রীর কোঁকড়া চুলের মত কালো ধূম কুণ্ডলী পাকাইয়া বাহির হইতেছে!

ভূপতি সবিস্ময়ে খাম ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিল। চিঠিতে লেখা আছে—

১৮

রাঁচি

৩রা জুলাই

বন্ধু

তোমার এ-কীর্ত্তি আমার দু'গালে কালি লেপিয়া দিল! তোমার সঙ্গে মলি সেনকে লইয়া যে চিঠি-পত্র লিখি—তা

নিছক কৌতুকের বশে! তুমি কবি—রোমান্সের স্বপ্ন ছাখো—তাই! এ রোমান্সের রঙে তোমার রুগ্ন ব্যথাতুর নিঃসঙ্গ জীবনে রামধনুর বর্ণ ফুটিবে, ভাবিয়াছিলাম! তার পরিণাম এমন মর্ম্মান্তিক হইবে, স্বপ্নে ভাবি নাই। আমায় মাপ করো! মাপ করো!

আমার সে কৌতুকে তোমার মনে আকাশ-কুসুম রচিয়া তুলিয়াছ! ছি ছি! তোমাকে মুখ দেখাইব কি বলিয়া? তাই পলাইতেছি।

আসিয়া দেখিবে, আমাদের বাঙলোর পাশে কোনো বাঙলো নাই, কম্পাউণ্ড নাই, বাগান নাই, হ্যামক নাই, সেন সাহেব নাই, মলি নাই; আছে একটা মদের ভ তার দেউড়িতে বসে মোটা কালো যমদূতের মূর্ত্তি—এক চৌকিদার। তার হাতে খৈনী! দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া দু'হাতে সে সেই খৈনী পিষিয়া গুঁড়াইতে থাকে; মাঝে মাঝে বিকট স্বরে গান ধরে—"এ চুণরিয়া"! পাগল হইবার জো!

হায়রে, যে মলি সেনের কল্পনা করিয়া চিঠি লিখিতাম—সে মলি সেন আমার কল্পনা-লোকে বাস করেন। সে মলি সেনের দেখা জীবনে মেলে না!

উপন্যাসে নিত্য এমন কাহিনী পড়ি। তাই পশ্চিমে হাওয়া খাইতে আসিয়া এমনি মলি সেনের সন্ধানে পথে-বিপথে কত না ঘুরিয়া বেড়াই! কিন্তু কোথায় মলি সেন?

নিত্য তারে চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া বরণ করি।
সে আছে মোদের
(কথাগুলায় একটু-আধটু বদল করিয়াছি।)
জীবন-মরণ হরণ করি!

অপরাধ আমার নয়, বন্ধু। যারা মিথ্যা কথা-কাহিনী লিখিয়া আমাদের মনকে তাতাইয়া মাতাইয়া তোলেন, অপরাধ তাঁদের—গল্প-লেখকদের।

ইহা বুঝিয়া আমাকে ক্ষমা করিয়ো?

অর্চ্চিত।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বিষ্ণুপ্রিয়া

চৈতন্যের তপোবাধা, বেদনার রুদ্ধ হাহাকার,
নদীয়ার বক্ষ-ক্ষত, অভিশাপ ক্রুদ্ধ বিধাতার,
বিগ্রহিণী বিফলতা, অবিচ্ছিন্ন কঠোর সংগ্রাম,
কারুণ্যের সুরধুনী বিষ্ণুপ্রিয়া, সহস্র প্রণাম!

লভ' নাই পতিরতা, স্নেহ প্রেম মর্ম্ম-রসায়ন;
বৈরাগ্য-বিরস স্বামী করে নাই মর্ম্ম-সম্ভাষণ!
দারা তুমি, মোক্ষপথ-পরিপন্থী—অনাদরে তাই
সতর্ক সন্ন্যাসী তব মুখপানে ফিরে চাহে নাই।

পর-দুঃখে দীর্ণ-হিয়া নিমাইয়ের চক্ষু হতে হায়,
ঝরে নাই বারিবিন্দু তোমা তরে সমবেদনায়!
ভক্তদল মাতিয়াছে মহোৎসবে চৈতন্যে ঘিরিয়া,
করুণা-সরস-নেত্রে তোমা পানে চাহেনি ফিরিয়া।

একাকী ভবন-কোণে অশ্রু চোখে গেছে নিশি-দিন;
শত আশা অভিমান দীর্ঘশ্বাসে হয়েছে বিলীন।
ব্যথাহত বক্ষ-তলে যোগিনীর রুক্ষ আবরণে
যৌবনের মধুরিমা অনাদৃত—মিশেছে স্বপনে!

তোমার ব্যথার অশ্রু, উপেক্ষিতা, বক্ষে নদীয়ার
রচিয়াছে যে পবিত্র মহাতীর্থ, কারুণ্য-পাথার,
নীরে তার শুচি-স্নাত দীন ভক্ত আজি অশ্রুধারে
বেদনা-বিধুর-চিত্ত শ্রীচরণে নত নমস্কারে।

শ্রীকমলাকান্ত কাব্যতীর্থ



পিলসুডস্কির তিরোভাব

গত ১২ই মে রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় বর্ত্তমান পোল্যাণ্ডের রাজনৈতিক তরণীর কাণ্ডারী মার্শাল পিলসুডস্কি ইহ-জগৎ হইতে চির-বিদায় লইয়াছেন। ইনিই কার্য্যতঃ বর্ত্তমান পোল্যাণ্ডের ভাগ্য-নিয়ন্তা ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে পোল্যাণ্ডে যেরূপ হাঙ্গামা উপস্থিত হইয়াছে, যেরূপ রাজনীতিক ঘূর্ণীবায়ু বহিয়া যাইতেছে, তাহাতে এই সময়ে মার্শাল পিলসুডস্কির মৃত্যুতে নানাদেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি


মার্শাল পিলসুডস্কি

হইয়াছে। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স ৬৭ বৎসর হইয়াছিল। ইনি যে অকস্মাৎ কালগ্রাসে পতিত হইবেন, তাহা কেহ মনে করে নাই। বর্ত্তমান সময়ে য়ুরোপের রাজনীতিক আকাশে নিবিড় মেঘমালার সঞ্চার হইয়াছে। কখন্ কোথায় আচম্বিতে বজ্রপাত হয়, তাহা বলা বড়ই কঠিন। মৃত্যুর কয়েক দিনমাত্র পূর্ব্বে পোলদিগের ফরাসীদিগের সহিত মিতালি করিবার কথাবার্ত্তা হইয়া গিয়াছিল। সে বিষয়ে কোন পাকা লেখাপড়া হইয়া গিয়াছে কি না, তাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই। বিগত মহাযুদ্ধের পর পোল্যাণ্ড রাজ্যটি গঠিত হইবার পর হইতে ইনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া এই রাজ্যটি পুনর্গঠিত করিবার বিশেষ সহায়তা করিয়া আসিতেছিলেন। ইনি নামে পোল্যাণ্ডের সমর-সচিব ছিলেন সত্য,—কিন্তু কার্য্যতঃ পোল্যাণ্ডের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমান য়ুরোপে ইঁহার ন্যায় তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি অতি অল্পই আছেন। জার্ম্মাণীর সহিত ইনি দশ বৎসরের জন্য একটা চুক্তি করিয়া গিয়াছেন। জার্ম্মাণ রাজপুরুষগণ বলিতেছেন যে, ইঁহার মৃত্যুর ফলে পোল্যাণ্ড-ভূমি এক জন বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞকে হারাইলেন এবং জার্ম্মাণ জাতিও এক জন জার্ম্মাণীর ব্যথার ব্যথী বন্ধুকে হারাইয়াছেন। বিগত মহাযুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত পোল্যাণ্ডভূমি তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। তাহার ফলে তথাকার অধিবাসীদিগের মধ্যে জাতীয়ভাব অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। মার্শাল পিলসুডস্কি পোলজাতি-দিগের মধ্যে সেই ক্ষীণ জাতীয়ভাব সম্বর্দ্ধনের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। ইঁহার মৃত্যুর পর পোলিস গণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট মোস্টিকি যে বাণী প্রচারিত করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। তিনি বলিয়াছিলেন যে, "পোল্যাণ্ডের ইতিহাসে ইঁহার ন্যায় উচ্চমনা কর্ম্মী আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আইস, তিনি আমাদিগকে যাহা দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা দৃঢ়ভাবে রক্ষা করি।" যাহাতে য়ুরোপে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহার জন্য ইঁহার বিশেষ যত্ন এবং চেষ্টা ছিল। সেই জন্য তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ওয়ার্স সহরে ফরাসী পররাষ্ট্রসচিব মসিয়ে লাভাল এবং পোল্যাণ্ডের পররাষ্ট্রসচিব কর্ণেল বেকের যে চুক্তির কথা-বার্ত্তা হইয়াছিল, য়ুরোপে শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বন্ধু রাইডসমিগলি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন।

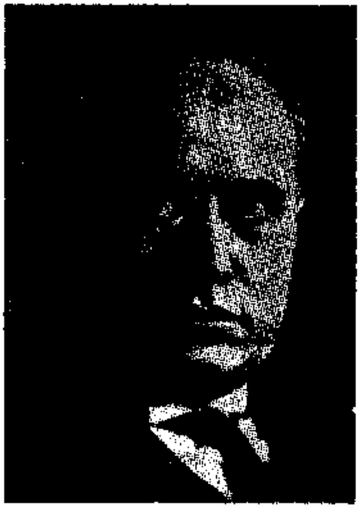
ইনি কিছুদিন ধরিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক রোগ ভোগ করিতে-ছিলেন। তাঁহার পাকস্থলীতে এবং যকৃতে ক্যান্সার নামক দুষ্ট ব্রণ জন্মে, তাহা হইতে রক্তপাত হওয়াতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। যে সময়ে ফ্রান্সের পররাষ্ট্রসচিব লাভাল পোল্যাণ্ডে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি মূত্ররোগনিবন্ধন পীড়ায় কাতর ছিলেন

বলিয়া লাভালের সহিত দেখা করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তিনি ইংরাজ দূত মিষ্টার এণ্টনী ইডেনকেও অভ্যর্থনা করিবার জন্ম উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার জন্ম তাঁহার দেশবাসী সকলেই দুঃখিত।

রণঢক্কার নিনাদ

আবিসিনিয়ার সহিত ইটালীর যুদ্ধ বোধ হয় অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। যেরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে মনে হইতেছে যে, উভয় পক্ষই যুদ্ধের জন্ম প্রস্তুত হইতেছেন। বিধাতার মনে কি আছে, তাহা মানুষ ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং সুদূর-আফ্রিকার এক ক্ষুদ্রদেশে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উদ্ভব হইবে, তাহার ফলে একটা প্রবল দাবানল সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে কি না, তাহা পৃথিবীর ভাগ্যবিধাতাই বলিতে পারেন। কেহ কেহ বলিতেছেন, "এই জনরব যদি সত্যই হয় যে, ইটালী রাজ্যাধিকার চাহেন না,—তাঁহারা চাহেন কেবল কার্পাস উৎপাদনের সুবিধা এবং অনুমতি এবং রেলপথ দ্বারা ইউরি-ট্রিয়ার সহিত ইটালী অধিকৃত সোমালিল্যাণ্ডের সংযোগসাধন, তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, আফ্রিকার সিকতাময় মরুকান্তারে রণঢক্কার নিনাদ বৃথায় উত্থিত হইতেছে।" কিন্তু মার্কিণের বাল্টিমোর সহর হইতে প্রকাশিত 'সান' পত্র লিখিয়াছেন, "ইটালী যাহা চাহেন, তাহা যদি তাঁহারা না পান, ইথিওপিয়া-(আবি-সিনিয়া) বাসীরা যদি ইটালীকে সেইটুকু সুবিধা দিতে সম্মত না হন, তাহা হইলে মুসোলিনী যুদ্ধ করিবেন। তবে যদি য়ুরোপের অবস্থা এরূপ দাঁড়ায় যে, তথায় একটা হাঙ্গামা বাধিবেই বাধিবে, তাহা হইলে তিনি তাঁহার দেশে তাঁহার সৈন্তদিগকে রাখিয়া দিবেন,—তাহাদিগকে বিদেশে পাঠাইবেন না।" উপস্থিত ফ্রান্সে এবং য়ুরোপের অন্যান্ত দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ যেরূপ ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে অনুমান হইতেছে যে, মুসোলিনী আপাততঃ ইটালীতে সৈন্ত পাঠাইতে কুণ্ঠাবোধ করিবেন না। ইটালীর সমর-বিভাগের কর্ত্তারা বলিতেছেন যে, উত্তর-ইথিওপিয়া হইতে সামরিক ঢক্কার দূরশ্রুত নিনাদ তাঁহাদের কর্ণে ভাসিয়া আসিতেছে। এ দিকে আবিসিনিয়ার নরপতিও জাতিসঙ্ঘের নিকট এই বিবাদ মিটাইয়া দিবার জন্ম আবেদন-নিবেদনও করিতেছেন। সম্রাট হাইলি সিলাসী নিউইয়র্ক টাইমসের সংবাদদাতাকে বলিয়াছেন যে, ইটালী মিটমাটের জন্ম যাহা দাবী করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারা কিছুতেই সম্মত হইবেন না। ইথিওপিও সরকার বলিতেছেন যে, স্থানবিশেষে দুই একটা প্রতিকূল ঘটনা ঘটিলে বা হাঙ্গামা উপস্থিত হইলে যুদ্ধ বাধিয়া উঠিতে পারে। সেই হেতু আবিসিনিয়ার সম্রাট তাঁহার প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগকে নিজ নিজ স্থানে সতর্ক-ভাবে উপস্থিত থাকিবার জন্ম আদেশ দিয়াছেন। পক্ষান্তরে, ইটালী বলিতেছেন যে, পূর্ব্বের চুক্তি এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। ইথিওপিয়া সামরিক সজ্জায় সজ্জিত হইতে থাকিবে আর ইটালী চুপ করিয়া থাকিয়া তাহা দেখিবেন,—ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না।

মুসোলিনী এই সমরায়োজন করিবার জন্ম প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা (৫ লক্ষ ডলার) ব্যয় করিয়াছেন। সুতরাং তিনি যে ইহা হইতে নিবৃত্ত হইবেন, তাহা মনে হয় না। তিনি ঐ কার্য্যকে ইটালীর আত্মরক্ষাকর কার্য্য বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। বিগত ২৩শে মার্চ্চ ইটালীর ইউরিট্রিয়া সীমান্তে একটি ছোটখাট লড়াই হয়, সেই লড়াইয়ে এক জন হাবসী নিহত হইয়াছিল। ইহার পরই সেনাপতি এমিলিও ডি বোনো ইটালী অধিকৃত ইউরিট্রিয়ায়



মুসোলিনী



এমিলিও ডি বোনো

এবং সোমালিল্যাণ্ডের নায়কপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। ইহার বয়স ৬৯ বৎসর। পূর্ব্বে ইনি ইটালীর উপনিবেশসচিব ছিলেন। এ দিকে ইটালীর সোমালিল্যাণ্ড উপনিবেশে ইটালীর বিখ্যাত যোদ্ধা এবং সাহিত্যিক সেনাপতি গ্রেজিয়ানীই সেনা-বিভাগের পরি-চালক নিযুক্ত আছেন। শুনা যায়, মরুস্থলীতে যুদ্ধ করিতে ইনি যেরূপ পারদর্শী, এরূপ পারদর্শী সেনাপতি আর ইটালীতে নাই। সুতরাং সেনর মুসোলিনী যে আবিসিনিয়ারাজের সহিত যুদ্ধ করি-বার জন্ম বিশেষ আয়োজন করিতেছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। ইহার পূর্ব্বে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইটালীর সহিত আবিসিনিয়ার যে যুদ্ধ হইয়া-ছিল, সেই যুদ্ধে আবিসিনিয়ার রাজা দ্বিতীয় মেনেলিক আক্রমণ-কারী ইটালীয়ান সৈন্তদিগকে এরূপভাবে পর্য্যুদস্ত করিয়া দিয়াছিলেন যে, ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ত্রিপলী অধিকারের সময় পর্য্যন্ত ইটালীর আর রণকণ্ডূতি উপস্থিত হয় নাই। সেই জন্ম মুসোলিনী এবার বিশেষ উৎসাহের সহিত সমরায়োজন করিতেছেন।

"জিয়ার্ণেল ডি ইটালীয়া" নামক ইটালীয় পত্রে উভয় পক্ষের সমরায়োজন সম্বন্ধে কতকটা বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে। উহাতে ইটালীয়দিগের পক্ষের কথাই বিশেষভাবে এবং ওজস্বিনী ভাষায় বিবৃত এবং আবিসিনিয়াকে দোষী প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইতেছে। উক্ত পত্র বলিতেছেন যে, আবিসিনিয়ার পক্ষ হইতে ইটালী কর্ত্তৃক অধিকৃত সোমালিল্যাণ্ডের এবং ইউরিট্রিয়ার সম্মুখস্থ বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সহস্র সহস্র হাবসী সৈন্য জমায়েৎবস্ত করা হইতেছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইলেই এই সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে। সৈন্যদিগের মধ্যে রাইফেল বন্দুক এবং গুলী-বারুদ দেওয়া হইতেছে। সোমালিল্যাণ্ডের সান্নিধ্যে রণবিমানের আড্ডা স্থাপন করা হইতেছে। তারহীন বার্ত্তা-বহের আড্ডা, টেলিগ্রাফের আফিস প্রভৃতিও নির্ম্মিত হইতেছে। এই পত্রখানিতে আরও বলা হইয়াছে যে, য়ুরোপ হইতে আবিসিনিয়ায় ভূরি পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী হইতেছে।



সেনাপতি গ্রেজিয়ানী

জার্ম্মাণী সম্প্রতি আবিসিনিয়াকে কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য সরবরাহ করিয়াছে। ঐ পদার্থ কিরূপে কাযে লাগাইতে হইবে, তাহা বাহিরের লোক কেহ কিছু জানে না। জার্ম্মাণী আবিসিনিয়াকে নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্রও না কি যোগাইয়াছেন। ইহা ভিন্ন "জিয়ার্ণেল ডি ইটালীয়া" এই অস্ত্রশস্ত্র যোগান ব্যাপারে য়ুরোপের অন্যান্য কয়েকটি দেশকেও অভিযুক্ত করিতেছেন। উক্ত পত্র এমন কথাও বলিয়াছেন যে, বিগত মহাযুদ্ধে যে সকল য়ুরোপীয় জাতি ইটালীর দ্বারা উপকৃত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন জাতি এইরূপ করিতেছেন। তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, ঐ সকল মারাত্মক অস্ত্র তাঁহাদের বিরুদ্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে। ঐ ইটালীয় পত্রখানি কতকগুলি য়ুরোপীয় জাতির বিরুদ্ধে গুরু অনুযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। প্রকাশ—ইটালীর কর্ত্তৃপক্ষ এই সম্বন্ধে ফ্রান্স এবং বৃটেনের নিকট অনুযোগপত্র প্রদান করিয়াছেন।

এ দিকে ইটালী আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন,—আবিসিনিয়া তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। সেই প্রতিবাদপত্র আদ্দিস আবাবাস্থিত ইটালীয় দূতকে প্রদান করা হইয়াছে। জনরবে প্রকাশ, মধ্যে সংগ্রাম বাধিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু আপাততঃ যুদ্ধ স্থগিত রাখা হইয়াছে। এখন আবার একটি কমিশন বসাইয়া এই ব্যাপারের মীমাংসার কথা উঠিয়াছে। আয়োজন দেখিয়া মীমাংসা হইবে বলিয়া মনে হয় না। তবে যুদ্ধ বাধিলে যে সে যুদ্ধ তুমুল হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আবিসিনিয়া এখনও সন্ধি করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে না, এমন কথা কোনমতেই বলা যাইতে পারে না। ইটালীর সহকারী উপনিবেশ-সচিব লেসনস্ আবিসিনিয়ার উপর অনেক দোষের আরোপ করিয়াছেন,—কিন্তু একতরফা অভিযোগ শুনিয়া এ বিষয়ের একটা সিদ্ধান্ত করা যায় না। যদি একটা নিরপেক্ষ কমিশন বসাইয়া উভয় পক্ষের অনুযোগ অভিযোগের তদন্ত করা হইত,—তাহা হইলেই প্রকৃত ব্যাপার বুঝা যাইত। এ দিকে আবার শুনা যাইতেছে যে, জার্ম্মাণী হইতে বহু লোক আবিসিনিয়ার সমর-বিভাগে প্রবেশ করিবার জন্য হাবসীরাজ হাইলাম সিলাসীর নিকট আবেদন করিয়াছে, কিন্তু হাবসীরাজ তাহাদের সে আবেদন নামঞ্জুর করিয়াছেন। এই সংবাদটি সত্য, কি জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে য়ুরোপের অন্যান্য জাতির ক্রোধ উদ্দীপ্ত করিবার জন্য পরিকল্পিত তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না। সম্ভবতঃ এ সংবাদটি মিথ্যা। আরও প্রকাশ—রাজা হাইলাম সিলাসী জার্ম্মাণদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি বিদেশীকে যুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার সেনা-বিভাগে গ্রহণ করেন না। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তিনি যে বিলক্ষণ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখনও যুদ্ধ বাধে নাই,—কখন্ উহা বাধিয়া উঠিবে, তাহা বলা বড় কঠিন। ইহার পর সংবাদ আসিয়াছে যে, ইটালী মিটমাট করিতে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা যুদ্ধোদ্যম করিতে বিরত হইবেন না। এ রহস্য বুঝা ভার।

হেতির হাঙ্গামা

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জস্থিত হেতি দ্বীপের কথা আমরা ইতঃপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। এই দ্বীপটি মার্কিণের শাসনাধীন ছিল, এখন মার্কিণ ঐ দ্বীপটি ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও এই দ্বীপবাসীদিগের এখনও দুর্ভোগের অবসান হয় নাই। এখন একটা বিষয় লইয়া তথায় দুই দলে বিশেষ বিবাদ চলিতেছে। সেটি তথাকার জাতীয় ব্যাঙ্কটি ক্রয় করা লইয়া। এক দল লোক বলিতেছে যে, উহার যে সকল মার্কিণী স্বত্বাধিকারী আছেন, তাঁহাদিগের অংশ ক্রয় করিয়া লইতে হইবে। মার্কিণের সহিত হেতিবাসীদিগের যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, তাহাতে ঐরূপ সর্ত্ত ছিল যে, হেতি-বাসীদিগকে মূল্য দিয়া ঐ স্বত্ব কিনিয়া লইতে হইবে। কিন্তু সকলে এই সর্ত্তে সম্মত হন নাই। হেতি সিনেটের একাদশ জন সদস্য এই সর্ত্তে সম্মত হন নাই। তন্মধ্যে ঐ দ্বীপের কয়েক জন সাধু এবং একনিষ্ঠ স্বদেশ-হিতৈষী আছেন। ইহারা বলেন যে, মার্কিণীরা হেতি দ্বীপ দখল

করিয়া থাকিবার নৈতিক অধিকার বহুদিন পূর্ব্বেই হারাইয়াছেন ; সুতরাং তাঁহাদিগকে মূল্য দিয়া তাঁহাদের সর্ত্ত খরিদ করিবার প্রয়োজন নাই। হেতি দ্বীপের প্রেসিডেণ্ট ষ্টেনিও ভিন্‌সেণ্ট প্রস্তাব করেন যে, তাঁহারা ঐ সর্ত্ত মূল্য দিয়া কিনিয়া লইবেন কি না, তাহা স্থির করিবার জন্য তথাকার সর্ব্বলোকের ভোট-গ্রহণ করা হউক। বিরোধী সদস্যগণ সেই প্রস্তাবে আপত্তি করেন। তাঁহারা বলেন, ঐ বিষয়ে জনসাধারণের মত গ্রহণ করা বিধি-সঙ্গত হইবে না,—অতএব ঐ ভোট গ্রহণের ফলাফল বাতিল হইবে, তাহা তাঁহারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনিবেন না।

যাহা হউক, প্রেসিডেণ্ট ষ্টেনিও ভিন্সেণ্টের ব্যবস্থা অনুসারে গত ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সর্ব্বসাধারণের মত গ্রহণ করা হয়। উহাতে প্রকাশ পায় যে, ৪ লক্ষ ৫৪ হাজার ৩ শত ৫৭ জন ভোট-দাতা মার্কিণীদিগের ঐ স্বত্ব অর্থ দিয়া খরিদ করিয়া লইবার অনুকূলে এবং ১ হাজার ১ শত ৭২ জন উহার প্রতিকূলে ভোট দিয়াছিলেন। সিনেটের ঐ সকল সদস্য একবারে নাছোড়বান্দা হইয়া দাঁড়াইয়া-ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে সিনেট হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তথাকার প্রতিনিধি সভা তাঁহাদের স্থানে নূতন ১১ জনকে সদস্য নির্ব্বাচিত করেন। সুতরাং প্রতিনিধি সভায় এবং সিনেট সভায় উভয় সভাতেই প্রেসিডেণ্ট ভিন্সেণ্টের পক্ষাবলম্বী সদস্য অধিক হয়। কিন্তু ইহাতে আর একটা বড় অসুবিধা ঘটে। এই ব্যাপার লইয়া হেতির প্রতিকূলবাদী রাজ-নীতিকগণ ধীরভাবে শাসনযন্ত্র গঠন করিবার প্রতিকূলতা করিতে থাকেন। ফলে তাঁহারা কেবল এই কথা রটাইতে থাকেন যে, মার্কিণ হেতির ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন সত্য, কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহারা প্রেসিডেণ্ট ষ্টেনিও ভিন্সেণ্টের সাহায্যে ঐ দ্বীপকে শাসন করিতেছেন। হেতির এই উগ্রপন্থী রাজনীতিক দল কার্য্যতঃ হেতির ঘোর অনিষ্টসাধন করিতেছেন।

যুদ্ধের পর শান্তি

য়ুরোপীয় রাজনীতিকগণ বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা পৃথিবী হইতে অশান্তি নির্ব্বাসিত করিবার উদ্দেশ্যে এত ধন-জন ক্ষয় করিয়া সংগ্রাম চালাইতেছেন। অর্থাৎ যাহাতে আর কোন জাতি সংগ্রামে লিপ্ত না হয়েন, তাঁহারা তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু সেই কার্য্যে তাঁহারা কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা পৃথিবীর ঘটনাবলী হইতেই বুঝা যায়। ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বিগত মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীতে এক দিনের জন্যও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভার্সাইলের সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। সে আজ ১৬ বৎসরের কথা। এই ষোল বৎসরে পৃথিবীতে শান্তি ঘটে নাই। অবিরাম হাঙ্গামা-হুজ্জৎ চলিয়াছে। এই সময়ে কোন না কোন দেশে অন্তর্ব্বিবাদ তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যদিও যুদ্ধ বিঘোষিত হয় নাই, তাহা হইলেও আন্ত-র্জ্জাতিক কলহের বিরাম ছিল না। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বরাবরই সোভিয়েট-শাসিত রুসিয়া তাঁহার প্রতিবেশী রাষ্ট্রপতিদিগের সহিত কলহে লিপ্ত ছিলেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে পোলাণ্ডের সহিত রুসিয়ার হাঙ্গামা হইয়াছিল। রুসিয়া পোলণ্ড আক্রমণে যৌথে রুস বৈমানিক সৈন্য পোলদিগের একটি বিমানের আড্ডায় অগ্নি প্রদান করিয়াছিল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে লীগ অব নেসন্স বা জাতিসঙ্ঘ কার্য্য আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে ইহার অধিকারের বাহিরে ব্যাভে-রিয়ায়, কোরিয়ায়, মিশরে, হাঙ্গেরীতে এবং পারস্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। পাঞ্জাবের অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় এবং হাঙ্গেরীতে ইহুদী এবং সমাজতন্ত্রবাদীদিগের উপরে নির্য্যাতন ঘটে।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে গ্রীসের সহিত তুরস্কের বিবাদ বাধিয়াছিল। মিত্রশক্তিবর্গ গ্রীকদিগকে যে সকল স্থান দান করিয়াছিলেন, তুরস্ক সেই সকল স্থান পুনরায় অধিকৃত করিবার জন্য গ্রীসকে আক্রমণ করেন। তুর্ক সৈন্য তাহাদের যাইবার পথের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত গ্রীকদিগের যে সমস্ত সমৃদ্ধ নগর ও জনপদ দেখিতে পাইয়াছিল, তাহা প্রায় সমস্তই বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিল এবং প্রায় ১০ লক্ষ লোককে আশ্রয়হীন করিয়া দিয়াছিল। জাতিসঙ্ঘ গ্রীসকে স্মার্ণা সহর শাসন করিবার অধিকার দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তুরস্ক সৈন্য ইজিয়ান সাগর-তীরস্থ স্মার্ণা সহরে প্রবেশ করিয়াছিল। স্মার্ণাস্থিত তুর্ক দুর্গের বাহিরে বামদিকে গ্রীকসৈন্যদিগের একটি ছাউনী ছিল। যে সময় কামাল পাশা কর্ত্তৃক পরিচালিত তুর্কসৈন্যের সম্মুখ হইতে গ্রীকসৈন্য হটিয়া যাইতেছিল, সেই সময় তুর্কসৈন্য সেই ছাউনীটিও দখল করিয়া লইয়াছিল।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে আইরিশ ফ্রী ষ্টেট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে আয়ার্লাণ্ডে নানা হাঙ্গামায় আয়ার্লণ্ডের ভূমি নরশোণিতে লোহিতাকার ধারণ করিয়াছিল। ব্লাক এণ্ড টান সৈন্যদিগের সহিত ইংরাজসৈনিকদিগের তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল এবং সেই সংগ্রামে অনেক ধ্বংসকর কার্য্যের অনুষ্ঠানও হইয়াছিল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে এইরূপ হাঙ্গামাই ক্রমাগত চলিয়াছিল। এই হাঙ্গামায় কর্ক সহরের কিয়দংশ অগ্নিসাৎ করিয়া ফেলা হইয়াছিল। উত্তর এবং দক্ষিণ আয়ার্লণ্ডের অধিবাসীদিগের ধর্ম্মসম্পর্কিত বিদ্বেষভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। ডবলিনের কাষ্টম হাউসটি সিনফিনরা আগুন দিয়া ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছিল। ইহার পরবৎসর ফাসিষ্টদল ইটালীতে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠে এবং মরক্কোতে ও চীনে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। ব্যাভেরিয়াতে, বুলগেরিয়াতে, ব্রেজিলে, মেক্সিকোতে এবং স্পেনে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি টেলিনী এবং ইটালীর ৪ জন সামরিক কর্ম্মচারী গ্রীস এবং আলবেনিয়ার সীমান্তস্থিত জেনিনা নামক স্থানে নিহত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে ইটালী গ্রীসকে এক চরম পত্র প্রদান করেন এবং তাহার পর কর্ফু দ্বীপে গোলাবর্ষণ করত উক্ত দ্বীপটি দখল করিয়া লইয়াছিলেন। এই বৎসরেই রুঢ় অঞ্চলে জার্ম্মাণ সৈন্যদিগের সহিত ফরাসী এবং বেলজিয়ান সৈন্যের ঠোকা-ঠুকি হইয়াছিল। জার্ম্মাণরা ক্ষতিপূরণের টাকা কম দিয়াছিল বলিয়া ফরাসী এবং বেলজিয়ান সৈন্যগণ রুঢ় অঞ্চল দখল করিতে উপস্থিত হইয়াছিল। ১৯২৫—২৬ খৃষ্টাব্দে সিরিয়ার ড্রুসেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠাতে ফরাসীরা সিরিয়াতে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং ডামাস্কাস সহরের উপর গোলাবর্ষণ করিয়াছিলেন। এ দিকে মরক্কোতেও ঘোর অশান্তি উপস্থিত হইয়াছিল। তথাকার দুর্দ্ধর্ষ আরব জাতি স্পেনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে। এই আরব জাতিরা রিফ (Riff) অঞ্চলের অধিবাসী। ইহারা রিফিয়ান নামে

অভিহিত। ইহাদের সর্দ্দার আব্দেল করিম। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে আবেদল করিমের নেতৃত্বাধীনে রিফিয়ানরা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। স্পেনের পক্ষ হইয়া যে সমস্ত দেশীয় সৈন্য যুদ্ধ করিতেছিল, তাহারা রিফিয়ানদিগের হস্তে পরাজিত হয়।

ইহা ভিন্ন অন্যদিকেও হাঙ্গামা অল্প হয় নাই। সেই হাঙ্গামার ফলে বহুবার যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইয়াছে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে মার্কিণের নৌবাহিনী আবার তিন বৎসর পরে নিকারাগুয়াতে যাইয়া হাজির হইয়াছিল। উহারা তথায় ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিল। স্থানীয় বিদ্রোহীদিগকে দমন করিবার জন্য মার্কিণী নাবিক সৈন্য তথায় আহূত হইয়াছিল।

চীনভূমিতে বারংবার বিপ্লব আবির্ভূত হইয়াছিল। গ্রীসে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং স্পেনে পর্টুগালে ঐরূপ অশান্তি আত্ম-প্রকাশ করে। ইহার পরেই ইংরাজ জাতি আরবদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করে। ত্রিপলীতে ইটালীয় সৈন্যদিগের সহিত তথাকার স্থানীয় বিদ্রোহীদিগের সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। বলিভিয়াতে, পানামায়, চিলিতে, প্যারাগুয়ায় এবং সালভেডরে লোক শাসকদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠে।

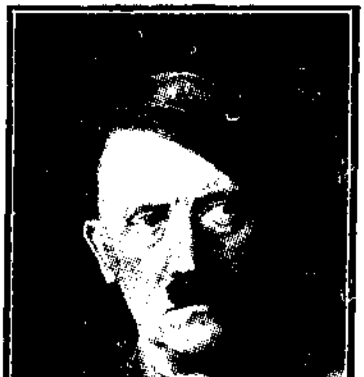
১৯২৮ খৃষ্টাব্দে মেক্সিকোতে বিখ্যাত বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ বৎসর তথাকার বিপ্লবপন্থীরা তথাকার নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্ট ওব্রেগণকে হত্যা করে। ইহার পরেই ভেরাক্রুজ সহরে সকলে সম্মিলিত হইয়া এক বিষম বিদ্রোহ উপস্থিত করে, ঐ বিদ্রোহ উত্তর অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই উপলক্ষে সরকারী সৈন্যদিগের সহিত বিদ্রোহীদিগের বহু স্থানে যুদ্ধ ঘটে। শেষে জিমিনেজ এবং লারিকন্মার সংগ্রামে বিদ্রোহী দল দলিত হইয়া যায়। কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। ইহার পর ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে বোলিভিয়ায় বিদ্রোহ ঘটে। পেরুতে প্রেসিডেণ্ট লেগুইয়া পদত্যাগ করেন এবং তথায় সামরিক আইন জারি হয়। এই বৎসর যে সময়ে ফরাসী সৈন্য রাইনল্যাণ্ড ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেছিলেন, সেই সময়ে ব্রেজিলের প্রেসিডেণ্ট ওয়াসিংটন লুই এক দল বিদ্রোহী কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া-ছিলেন। এই বৎসরের শেষভাগে স্পেনের জাকা নামক স্থানে বিপ্লবীদিগের হাঙ্গামা দেখা দিয়াছিল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে জাপানীরা মাঞ্চুরিয়ায় সামরিক দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত কতকগুলি স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। জাপানী রণবিমান হইতেও চীনা সৈন্যদিগের উপর বোমাবৃষ্টি করা হইয়াছিল। জাতিসঙ্ঘ মীমাংসার জন্য যে ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, জাপান তাহা গ্রাহ্য না করিয়াই চীনের সাংহাই বিভাগের চেপাই নামক স্থান আক্রমণ করিয়াছিল। মার্কিণ এবং বৃটিশ জাতির আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়াই জাপানীরা ইউনিয়ন ষ্টেশনটি ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছিল।

এ দিকে দক্ষিণ-আমেরিকার নানা স্থানে নানা প্রকারে বিপ্লব ও বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল,—তন্মধ্যে চিলির বিপ্লবই সর্ব্বপ্রধান। উহা ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। ও দিকে আবার প্যারাগুয়ার সহিত বোলিভিয়ায় সংগ্রাম বেশ জাঁকিয়া উঠে। প্যারাগুয়া সেই সময় পর্য্যন্ত বোলিভিয়ার সৈন্যদিগকে প্রায় হটাইয়া দিতেছে। এ সংগ্রাম বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। এ দিকে সাউদী আরবদিগের রাজা আরবে অখণ্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিয়া আসিতেছিলেন, গত বৎসর মে মাসে তিনি য়িমেনের ইমাম যাহ্যায়াকে পরাজিত করিয়াছেন। এ দিকে বর্ত্তমান বৎসরে ইটালীয় সৈন্য আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান করিতেছে। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত পৃথিবী হইতে সমর নির্ব্বাসিত হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা জন্মিয়াছে, এমন কথা কেহই বলিতে পারিবেন না। ভার্সাইল সন্ধির পর হইতে এ পর্য্যন্ত এক বৎসরও শান্তিতে কাটে নাই। অশান্তি যেন সমস্ত পৃথিবীকে জুড়িয়া বসিয়াছে। সুতরাং বাহ্য এবং আভ্যন্তর অবস্থা চিন্তা করিয়া অনেকের মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে পৃথিবী হইতে সমর-নির্ব্বাসনের অবস্থা সৃষ্ট না হইয়া সমর-সংঘটনের অনুকূল অবস্থাই সৃষ্ট হইতেছে। "ভাবতবাং ভগবতোব মধিমে-ষ্মনসি স্থিতম্।"

—

হিটলারের বাহাদুরী

দেখা যাইতেছে যে, য়ুরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে হার হিটলারই বাহাদুর পুরুষ। তিনি সমস্ত য়ুরোপকে যেন অশ্বচক্রে ঘুরাইতেছেন। ভার্সাইলের সন্ধি যে অন্যায় এবং অসঙ্গত হইয়াছিল, তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। উহা



হার হিটলার

যেন পরাজিত এবং ধূলাবলুণ্ঠিত জার্ম্মাণীকে চূর্ণ করিবার জন্য পরিকল্পিত হইয়াছিল, তাহা যে সময়ে ঐ সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, সেই সময়েই সকলেই বুঝিতেও পারিয়াছিলেন। কিন্তু জার্ম্মাণীর তখন এতই দুরবস্থা ঘটিয়াছিল যে, তখন তাহাকে অবনতমস্তকে ঐ সকল সর্ত্তই মানিয়া লইতে হইয়াছিল। এত দিন চুপ করিয়া থাকিয়া জার্ম্মাণী এখন সেই ভার্সাইলের সন্ধি এবং জেনিভার ব্যবস্থা সমস্তই অগ্রাহ্য করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, যে সময়ে বিজেতা মিত্র-শক্তিবর্গ জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসঙ্কোচ করিতে হইবে বলিয়া সর্ত্ত

করিয়াছিলেন,—সেই সময়ে তাঁহারা প্রত্যেকেই বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সামরিক সজ্জা কমাইয়া ফেলিবেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে কার্য্যতঃ তাঁহারা তাহা করেন নাই, আন্তরিকভাবে তাহা করিবার চেষ্টাও করেন নাই। তাঁহারা কয়েকবার নৌবাহিনী সংকোচের এবং অস্ত্রসংকোচের জন্ম পরামর্শ সভা বসাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবার পরামর্শ-সভার মত তাঁহাদের সেই পরামর্শ-সভা নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। বরং তাঁহারা ক্রমাগতই সমর-সজ্জা বৃদ্ধি করিবার জন্ম চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। বিগত য়ুরোপীয় মহা-যুদ্ধের পূর্ব্বে ইহাদের প্রত্যেকের যেরূপ রণসজ্জা ছিল, এখন তাহা অপেক্ষা উহা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং জার্ম্মাণী আর ধর্ম্মনীতি হিসাবে সেই সর্ত্ত মানিতে সম্মত নহেন। এ কথা এত দিন কাহারও বলিবার সাহসে কুলায় নাই, এখন হার হিটলারই সেই কথা স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, জার্ম্মাণী আত্মরক্ষার জন্ম আপাদমস্তক যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া সে গায়ে পড়া হইয়া কাহাকেও আক্রমণ করিবে না বা য়ুরোপের শান্তিভঙ্গ করিবে না। জার্ম্মাণী শান্তিরক্ষার পক্ষপাতী। জেনিভা প্রস্তাবে য়ুরোপীয় শক্তিবর্গ এইরূপ সর্ত্ত করিয়াছিলেন যে, সকলের সম্মতি ব্যতিরেকে কোন পক্ষই কোন সন্ধি অগ্রাহ্য অথবা উহার কোন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না। এই প্রস্তাব যে ন্যায়সঙ্গত হইয়াছিল, তাহা কোনমতেই স্বীকার করা যাইতে পারে না। যদি কোন সর্ত্ত বা ব্যবস্থা ধর্ম্মনীতির মূলসূত্রের বিরোধী বা প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে তাহা যে সকলেই অবিচারিতভাবে মানিয়া লইবে, তাহা আশা করা যাইতে পারে না। হার হিটলার সম্ভবতঃ এইরূপ মতাবলম্বী লোক। তাই তিনি সাহসে ভর করিয়া জাতিসঙ্ঘকে বর্জ্জন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন এবং মিত্রশক্তি-বর্গকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি হীনতার ভস্মতিলকে জার্ম্মাণীর ললাট লাঞ্ছিত করিয়া রাখিতে চাহেন না;—জার্ম্মাণী চাহেন যে, তিনি ধরাতলে অন্যান্য জাতির সমকক্ষ হইয়া বিরাজ করিবে। তবে জার্ম্মাণী স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ধরিত্রীর শান্তি ভঙ্গ করিবেন না। জার্ম্মাণীর এই স্পষ্ট ভাষণে ফরাসী এবং রুস ভিন্ন অন্য কেহ অসন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। ইংরাজ জাতিও এই কথায় অসন্তুষ্ট হন নাই। হার হিটলার সম্প্রতি জার্ম্মাণীর প্রতিনিধি সভায় বলিয়াছেন যে, জার্ম্মাণী কাহাকেও ভয় দেখাইতে চাহে না,—তবে সে কোন অবস্থাতেই আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইতে পশ্চাৎপদ হইবে না। কিন্তু জার্ম্মাণী যখন দেখিবে যে, অন্যান্য সকল রাষ্ট্র-পতিরা অস্ত্র সম্বরণ করিতেছেন বা যুদ্ধসজ্জা কমাইতেছেন, তখন জার্ম্মাণীও যুদ্ধসজ্জার সঙ্কোচ করিবেন। জার্ম্মাণীর এ কথায় কাহারও আপত্তি হওয়া উচিত নহে।

তবে অনেকে সন্দেহ করিতেছেন যে, হার হিটলার এখন মুখে বলিতেছেন যে, জার্ম্মাণী কেবল আত্মরক্ষার জন্ম সমরসজ্জা বৃদ্ধি করিতেছেন, তিনি য়ুরোপের শান্তিভঙ্গ করিবেন না; কিন্তু তাঁহার সে কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা যায় কি না, তাহাই বিবেচ্য। জার্ম্মাণী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইলেই হয় ত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইতে পারে। কিন্তু এই শঙ্কা কতটা সত্য হইবে, তাহা বলা বড়ই কঠিন। সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হয়, জার্ম্মাণী এখন ইচ্ছা করিয়া কোন সংগ্রামে লিপ্ত হইবে না। কারণ, সংগ্রাম করিতে হইলে অনেক অর্থের প্রয়োজন, ইহা জার্ম্মাণী বেশ বুঝে। কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, জার্ম্মাণীর আর্থিক অবস্থা এখন একবারেই ভাল নহে। জার্ম্মাণীর বাণিজ্য যে বিশেষ বিস্তার লাভ করিয়াছে, এ কথাও বলা যায় না। সত্য বটে, জার্ম্মাণীতে বর্ত্তমান বৎসরের জানুয়ারী মাসে গত বৎসর অপেক্ষা বেকার লোকের সংখ্যা শতকরা ২১ জন হারে কমিয়াছে, কিন্তু তথাকার জনসাধারণের গড় আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে। তাহারা পূর্ব্বে যেরূপ আর্থিক সচ্ছলতা ভোগ করিত, এখন তাহা ভোগ করিতে পারে না। তথায় খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার উপর জার্ম্মাণী বুঝিতে পারিতেছে যে, য়ুরোপে তাহার শত্রুসংখ্যা অধিক এবং তাহারা প্রত্যেকেই বলবান্। এরূপ অবস্থায় জার্ম্মাণীর পক্ষে গায়ে পড়িয়া কাহারও সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে যাওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ জার্ম্মাণী এ কথা স্বীকার করিতেছে যে, সমুদ্রপারে বৃটিশ জাতির অধিকার অত্যন্ত বিস্তৃত, অতএব বৃটিশ জাতির নৌবাহিনী-সংখ্যা অধিক থাকা আবশ্যক। সুতরাং জার্ম্মাণী বৃটিশ নৌবলের শতকরা ৩৫ ভাগ রণতরী রাখিলেই সন্তুষ্ট হইবে। তবে পশ্চিম-য়ুরোপে সকল জাতিকেই সমান বিমান-বাহিনী রাখিতে হইবে। এই সকল কথা পর্য্যালোচনা করিলে স্বতঃই মনে হয় যে, জার্ম্মাণী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আপাততঃ কোন যুদ্ধে লিপ্ত হইবে না। হিটলার কেবল বৃটেন অপেক্ষা অল্প রণতরী রক্ষা করিতে চাহেন নাই,—ফ্রান্স অপেক্ষাও শতকরা ১৫ ভাগ কম রণতরী রাখিতে সম্মত হইয়াছেন। হিটলার আরও বলিয়াছেন যে, অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে জার্ম্মাণীর কোন-রূপ ইচ্ছা বা মতলব নাই।

হিটলারের এই বক্তৃতা শুনিয়া গ্রেট বৃটেনের সংবাদপত্রগুলি শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিতেছেন। তবে ইঁহাদের এই প্রশংসা কত দিন স্থায়ী হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? যুদ্ধ করিয়া যে যুদ্ধের অবসান করা সম্ভবে না,—কতকগুলি শক্তিধর রাজ্য সম্মিলিতভাবে যুদ্ধের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেই যুদ্ধ দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইবে, ইহা যে সম্ভব নহে, তাহা বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ হইতেই বুঝা গিয়াছে। আসল কথা, মানুষ যত দিন ক্ষমতা-লোলুপ থাকিবে, যত দিন তাহারা জাতিধর্ম্ম এবং বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকল মানুষকে সমান ভাবিতে না পারিবে, তত দিন পৃথিবী হইতে সমর, বিবাদ-বিসংবাদ প্রভৃতি কিছুই নির্ব্বাসিত হইবে না।

ইংরাজ ও রুস

বিগত মার্চ্চ মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে গ্রেট-বৃটেনের সহিত সোভিয়েট সরকারের গা-চাটাচাটি খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐ সময়ে গ্রেট-বৃটেনের লর্ড প্রিভীসীল মিষ্টার ইডেন এইরূপ একটা সর্ত্ত করিতে সম্মত হইয়াছিলেন যে, গ্রেটবৃটেন এবং রুসিয়া মিলিয়া য়ুরোপের শান্তি এবং নির্ব্বিঘ্নতা রক্ষার জন্ম ব্যবস্থাপূর্ব্বক একটা পরিকল্পনা করিবেন। মিষ্টার ইডেনের মস্কো গমনের পর এই

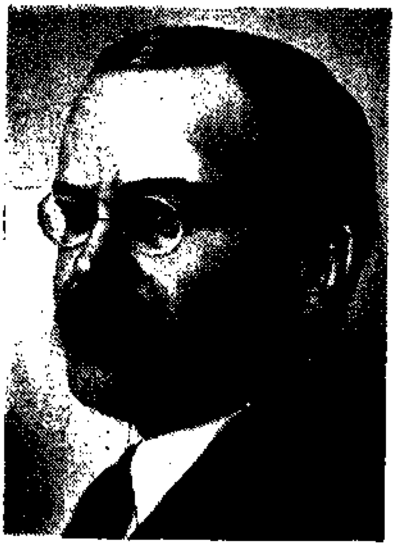
সম্বন্ধে উভয় সরকারের একটা বিবৃতি বাহির হইয়াছে। মিষ্টার ইডেন, ষ্টালিন, প্রধান সচিব মোলোটভ এবং লিটভিনফ ইহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, লীগ অব নেসন্স বা জাতি-সঙ্ঘের পরিকল্পনা অনুসারে ইঙ্গফরাসী ইস্তাহারের অনুযায়ী ভাবে য়ুরোপে শান্তিরক্ষার জন্য একটা ব্যবস্থা না করিলে নয়, ইহাতে কোন রাজ্যকেই বাদ দেওয়া হইবে না। য়ুরোপের সকল রাজ্যের শান্তিরক্ষাই ইহার লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক। এখন চারিদিক হইতে ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গিয়াছে যে, এইবার নিখিল য়ুরোপ হইতে সমরাদি বিঘ্ন নির্ব্বাসিত করিবার বিশেষ সুবিধা উপস্থিত হইয়াছে। এই ব্যাপারে কেবলই যে যুধ দেখার ব্যবস্থা (অর্থাৎ শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করা) হইয়াছে, তাহা নহে, কল্লা বেচিবার (বাণিজ্য-বিস্তারের) ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। মিষ্টার ইডেন গোড়া হইতেই বলিয়া-ছেন যে, তিনি যদিও বৃটিশ জাতির পক্ষ হইয়া কোন একটা নির্দ্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি করিতে পারেন না সত্য, কিন্তু তিনি এ কথাটা নিশ্চিতই বলিতে পারেন যে, তিনি গ্রেটবৃটেনের এবং রুসিয়ার মধ্যে বাণিজ্যগত যতটা সুবিধা করা যায়, তাহা করিবেন। পক্ষান্তরে, রুসিয়ার পক্ষ হইতেও বলা হইয়াছে যে, রুসিয়াকে বিদেশ হইতে যত শিল্প-জাত পণ্য আমদানী করিতে হয়, তাহার অধিকাংশ শ্রমশিল্পজাত পণ্যের আমদানী তাঁহারা গ্রেটবৃটেন হইতে করিবেন। গ্রেটবৃটেন এ পর্য্যন্ত সোভিয়েট রুসিয়ার কাছে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শিল্পজাত পণ্য বিক্রয় করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং ঐ দিক দিয়া যে বৃটেনের উপস্থিত অধিক লাভ হইবে, তাহা মনে হয় না। কিন্তু গ্রেটবৃটেনের পক্ষে রুসিয়া হইতে অনেক কৃষিজ পণ্যাদি আমদানী করিবার অসুবিধা ঘটিবে। রুসিয়া হইতে বৃক্ষকাণ্ড বা কাঠের চকোর আমদানী করিতে গেলে কানাডা বলিবে যে, ইহার দ্বারা বৃটিশ জাতি অটোয়ার চুক্তিভঙ্গ করিলেন। রুসিয়া হইতে খনিজ তৈল আমদানীতেও ঐরূপ বাধা ঘটিবে। স্কটল্যাণ্ডের মেটে তেল (Naptha) উৎ-পাদকরা ইতোমধ্যে উহাতে আপত্তি তুলিয়াছেন। বৃটেন এখন সস্তা পাইয়া বিদেশীতে মজিলেন। এইরূপ গণ্ডগোল ত উঠিতেছে। ইংরাজ ও ফরাসী জাতি এখন রুসিয়ার নিকট অধিক পণ্য বেচিতেছে, কিন্তু সোভি-য়েট ইউনিয়নের নিকট মার্কিণ তত অধিক পণ্য বেচিতে পারিতেছেন না। রুসিয়া পূর্ব্বে মার্কিণ মুলুক হইতে অনেক তুলা আমদানী করিত, এখন রুসিয়াই তাহার দেশে অনেক তুলা উৎপাদন করিয়া তাহা বিদেশে চালান দিতেছে। জার্ম্মাণী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইবে বলাতে য়ুরোপের রাজনীতি-ক্ষেত্রে এক বিষম আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে। অনেক শত্রু মিত্র হইয়া পড়িতেছে, কোন কোন মিত্রও বা তলে তলে শত্রু হইয়া দাঁড়াইতেছে। কিন্তু এই প্রকার দল পাকাপাকির দ্বারা শান্তির প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে কি ? সমস্যা বড়ই সঙ্গীন। মনে করুন, ইংরাজ, ফরাসী, ইটালী এবং রুস একযোগে জার্ম্মাণীকে অস্ত্রবৃদ্ধি



মিষ্টার এণ্টনি ইডেন



ষ্টালিন



মোলোটভ



লিটভিনফ

করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু জার্ম্মাণী তাহা শুনিলেন না। তখন? তখন ত যুদ্ধ ভিন্ন আর গতি থাকিবে না। তাই মনে হয়, দল পাকাপাকিতে সুবিধা হয় না।

প্রাচীতে রাজনীতিক মেঘ

সুদূর প্রাচীতে রাজনীতিক অবস্থা শান্তির অনুকূল নহে। পৃথিবীর কুত্রাপিই ভবিষ্যৎ আকাশ মেঘমুক্ত নাই। এই মেঘমালা পুঞ্জীভূত হইয়া কখন্ অশনিবর্ষণ করে, তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারা যাইতেছে না। অনেক মনীষাসম্পন্ন রাজনীতিক কি প্রকারে এই রাজনীতিক আকাশকে মেঘমুক্ত করিতে পারা যায়, সে বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে কোনরূপ সমাধানের উপায় হইতেছে না। এসিয়ার প্রাচ্য খণ্ডে জাপান এখন এক মহাসমস্যারূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। এখন য়ুরোপের শক্তিবর্গ, বিশেষতঃ রুসিয়া, মার্কিণ এবং গ্রেট বৃটেন জাপানকে যেন কতকটা ভয় করিয়া থাকে। এরূপ ভয় তাহারা এসিয়ার আর কোন জাতিকে করে না। তাহার কারণ, জাপান এখন এসিয়াখণ্ডে পীত জাতির নিয়ামকত্ব



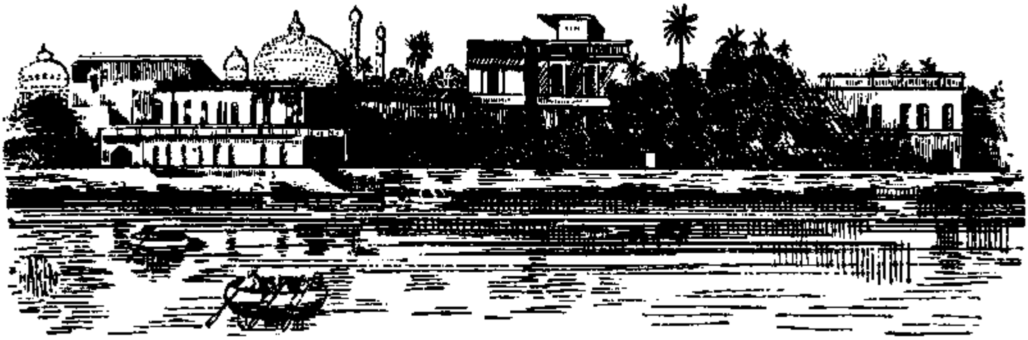
হিরোটা

প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। জাপান এখন জাতিসঙ্ঘ ছাড়িয়া দিয়াছে, ওয়াশিংটনের চুক্তি আর মানিয়া চলিবে না বলিয়া জানান দিয়াছে এবং ভিতরে ভিতরে বোধ হয় জার্ম্মাণীর সহিত ভাব করিয়া ফেলিয়াছে। শেষোক্ত ব্যাপারটা আন্দাজী বলিয়া মনে হয়, কিন্তু কোন কোন পাশ্চাত্য রাজনীতিক বলিতেছেন যে, লক্ষণ দেখিয়া ঐ অনুমান সত্য বলিয়াই ধারণা জন্মে। কিন্তু জাপানের পররাষ্ট্রবিভাগের সেক্রেটারী হিরোটা স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন যে, ঐ অনুমান সত্য নহে।

জাপান এখন এসিয়াখণ্ডে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করিবার প্রয়াসী। তাঁহারা চীনকে জাতিসঙ্ঘ ছাড়িয়া দিতে উপদেশ দিতেছেন বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কারণ, তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে দেখাইয়াছেন যে, চীনের দুঃসময়ে জাতিসঙ্ঘ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। অতএব চীন যদি এসিয়াখণ্ডে এসিয়াবাসীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া জাপানের সহিত যোগ দেয়, তাহা হইলে চীনের মঙ্গল হইবে। জাপান চীনাদিগকে সুস্পষ্ট ভাষায় এই কথাগুলি না বলিলেও ভাবে ভঙ্গীতে এইরূপ কথা জানাইতেছে, ইহাই অনেকের অনুমান। সে অনুমান সত্য না হইতেও পারে।

জাপানের আর্থিক অবস্থা ভাল নহে। জাপানীরা নিজ দেশে আপনাদের সমস্ত খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারে না। তাহাদের দেশে যে পরিমাণ ভূমি আছে, তাহার শতকরা ১৬ ভাগ জমীতে শস্যাদি উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং স্বদেশে জাপানের খাদ্য সঙ্কুলান হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় জাপানকে হয় বিদেশ হইতে খাদ্য প্রভৃতি কৃষিজ পণ্য আমদানী করিতে হয়, না হয়, বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তথায় দেশের অতিরিক্ত লোকদিগকে বসবাস করিবার সুবিধা করিয়া দিতে হয়। বিদেশ হইতে কৃষিজ পণ্য আমদানী করিতে হইলে সেই পণ্যের মূল্য দিবার জন্য বিদেশে শিল্পজ পণ্য বিক্রয় করিতে হয়। শিল্পজ পণ্য প্রস্তুত করিতে হইলেও বিদেশ হইতে তাহার উপাদান, কৃষিজ—খনিজ এবং জান্তব উপাদান কিনিয়া আনিতে হয়। জাপান অবশ্য তাহা করিতেছে এবং সেই কার্য্য করিতে যাইয়া য়ুরোপীয় জাতিবর্গের সহিত তাহার বাণিজ্য বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটিতেছে। তাহারা যদি বিদেশী বাজার দখল করিতে না পারে, তাহা হইলে এই বিষয়ে তাহাদের অধিক দূর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ জাপানের পক্ষে বিদেশে উপনিবেশ স্থাপনও সহজ নহে। যে সকল স্থান য়ুরোপীয়রা দখল করিয়া বসিয়াছে, তাহারা সে সকল স্থানে পীতকায় জাপানীদিগকে কিছুতেই প্রবেশ করিতে দিবে না। কারণ, শ্বেতকায় জাতিদিগের বর্ণবিদ্বেষ অত্যন্ত অধিক। কাজেই জাপানকে এসিয়া খণ্ডে মাঞ্চুরিয়া এবং সাইবেরিয়া অঞ্চলে অধিকার স্থাপনের চেষ্টা স্বতঃই করিতে হয়। এই উপলক্ষে রুসিয়ার সহিত জাপানের বৈরিভাব বর্দ্ধনের সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক। এ দিকে রুসিয়ার সহিত জার্ম্মাণীরও বৈরিভাব জন্মিয়া উঠিয়াছে। কাজেই জার্ম্মাণীর এবং জাপানের একই প্রবল শত্রু হওয়াতে উহাদের পরস্পর মিত্রতা হওয়া স্বাভাবিক। উহাদের পরস্পরের মধ্যে সন্ধিপত্র বা চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত না হইলেও উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে।

এ দিকে মার্কিণের সহিত জাপানের বৈরিতা ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা জন্মিয়াছে। য়ুরোপীয় জাতিদিগের একটু স্বার্থ-হানি ঘটিলেই সহজে মনকষাকষি ঘটে। আগামী ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ওয়াশিংটনের চুক্তির অবসান হইবে। জাপান ইহার পর আর ঐ চুক্তিতে আবদ্ধ থাকিতে পারিবেন না বলিয়া জানান দিয়াছেন। এই ব্যাপারে মার্কিণ চঞ্চল হইয়াছেন। তাঁহারা অত্যন্ত দ্রুতবেগে তাঁহাদের নৌবাহিনী বৃদ্ধি করিতেছেন। জাপান চাহেন নৌশক্তিতে মার্কিণের সমকক্ষ হইতে। মার্কিণ তাহাতে সম্মত নহেন। ফলে ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মার্কিণ জাপানের সহিত সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার প্রয়াস পাইতেছেন। রুসিয়া জার্ম্মাণীর সহিত মিত্রতা করিবার চেষ্টায় আছেন। সেই জন্য কাহারও কাহারও মতে রুসিয়া জাপানকে তুষ্ট করিবার জন্য চাইনিজ ইষ্টার্ণ রেলওয়েটি বিক্রয় করিতে সম্মত হইয়াছেন এবং মাঞ্চুরিয়ার সীমান্ত হইতে সৈন্য সরাইয়া লইয়াছেন। এখন দেখা যাউক, শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়ায়।



মেইন্

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম রাষ্ট্র মেইন্। উহারই নামানুসারে মেইন উপসাগর ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ১৬টি বিভিন্ন অঞ্চলের (counties) মধ্যে ৫টি মাতৃভূমির নামানুসারে প্রসিদ্ধ অর্থাৎ ইংলণ্ডের শায়ারগুলির নামানুসারে পরিচিত। ৫টি অঞ্চল আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের সময় কোন কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নামরূপ গ্রহণ করিয়াছিল। বাকি ছয়টি, সীমান্তস্থিত নদীর ইণ্ডিয়ান্ নাম অনুসারে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

প্রথম হইতেই মেইনের অর্থাগম হইতে থাকে মৎস্য, লোম এবং অরণ্য হইতে। এই তিনটি বস্তুর লোভে মেইন অঞ্চলে আবিষ্কারকগণ আগমন করিয়াছিলেন। উহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় দেখিয়া অবশেষে এই অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপিত হয়

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরাজ ধীবরগণ মেইন উপসাগরে মাছ ধরিবার অধিকার লাভ করে। পার্লামেন্ট ও রাজার সনদ এ বিষয়ে তাহারা আদায় করিয়া লইয়াছিল।

মৎস্য-ব্যবসায়ই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। মেইন ষ্টেটএ বৎসরে ৩০ লক্ষ ডলার মূল্যের মৎস্য ধরা



উইস্‌কাসেটের ঔপনিবেশিক ভবন এবং ছায়াচ্ছন্ন পথ



কপাবির গির্জা—এখানে প্রাচীন কলেজ আছে

পড়িত। গত বৎসর বাহির হইতে ৩৫ হাজার ধীবর ও ধীবর-রমণী এবং উহার ৫ গুণ মেইনের অধিবাসী মৎস্য ধরিবার লাইসেন্স পাইয়াছিল।

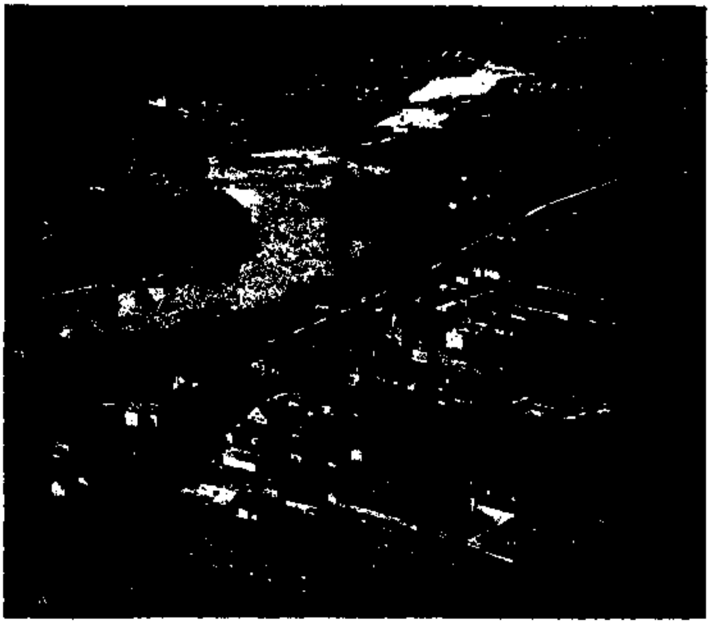
আরণ্য জীবদিগকে অযথা হত্যা হইতে রক্ষা করিবার জন্য মেইনের অরণ্যে এক দল অরণ্য-রক্ষক নিযুক্ত আছে। তাহাদের সংখ্যা এক শত।



মেইন্ অরণ্য হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ

হরিণ প্রভৃতির সংখ্যা এই অরণ্যে প্রচুর। অন্যান্য অঞ্চলে যত ভল্লুক শিকার করা হয়, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তদপেক্ষা অনেক অধিকসংখ্যক ভল্লুক মেইনের অঞ্চলে শিকারীর গুলীতে প্রাণ দিয়াছিল।

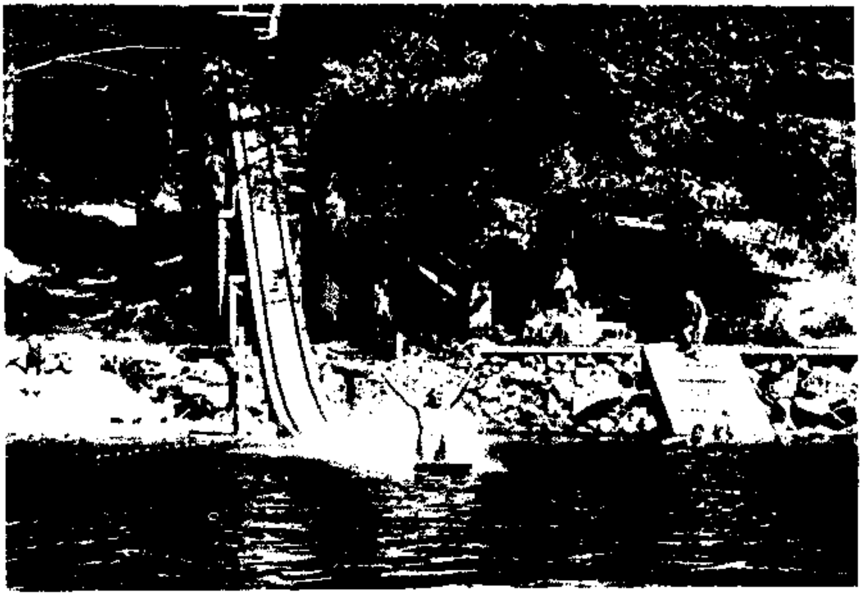
১৬০৫ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন জর্জ ওয়েমাউথ এবং তাঁহার সহচরগণ আর্চেঞ্জেল পোত হইতে মেইনের একটা নদী দেখিতে পান। ক্যাপ্টেন ঐ নদীর নাম রাখেন, সেণ্ট জর্জ। তীরে নামিয়া এক দল আবিষ্কারক উক্ত অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং নদীর বিশালতায় তাঁহারা ঐ নদীতে বন্দর প্রতিষ্ঠারও কল্পনা করেন।



নদীতীরবর্ত্তী ওরনো—মেইন বিশ্ববিদ্যালয় এখানে অবস্থিত

কয়েক বৎসর পরে—১৬১৪ খৃষ্টাব্দে, ক্যাপ্টেন জন স্মিথ এতদঞ্চল দর্শন করিয়া কিন্তু ততটা আকৃষ্ট হইতে পারেন নাই। সে কথা তাঁহার বর্ণনাপত্রে লিপিবদ্ধ করেন। ঐ ঘটনার দ্বাদশ বর্ষ পরে ক্যাপ্টেন ক্রিষ্টোফার লেভেট্ এতদঞ্চলে

তিনি আগমন করেন। ১৬২৩-২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বর্ণনা করেন যে, প্রচুর মৎস্য এই অঞ্চলের সম্পদ্। মেইনে প্রথমেই ফরাসীরা উপনিবেশ স্থাপন করেন।



হ্রদের জলে তরুণীদিগের জলক্রীড়া



জেম্স্ ব্লেনের বাসভবনে গভর্ণরের আবাস

সিয়ের দে মঁস্ ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরাজের নিকট হইতে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে একটি সনন্দ প্রাপ্ত হন। চ্যাম্প্লেনকে তাঁহার সহকারী করিয়া দে মঁস্ নূতন জগতের অভিমুখে জাহাজ ভাসাইয়া দেন। উপনিবেশ স্থাপনের যাবতীয় সরঞ্জাম তিনি সঙ্গে আনিয়াছিলেন।

১৬০৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে নদীগর্ভস্থ একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ তিনি বাসস্থান স্থাপনের উপযোগী বলিয়া মনোনীত করেন। এই দ্বীপের নামকরণ হয় সেণ্ট-ক্রয়। এই দ্বীপে ফ্রান্স হইতে আনীত বড় বড় কাঠ দিয়া কতিপয় বাসভবন নির্ম্মিত হইয়াছিল। গুদামঘর, ভোজনাগার, রন্ধনশালা এবং কামারশাল স্থাপিত হইল, উদ্যানও রচিত হইল। চ্যাম্প্লেনই এই সব গৃহের নক্সা করেন।

এক জন ধর্ম্মযাজক এবং ৭৯ জন লোক সেখানে বসবাস করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিবেন স্থির হইল। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে উদার সাম্যবাদ থাকিবে, ইহা পরিকল্পিত হইল। কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধতা দে মঁসের পরিকল্পনাকে ফলপ্রসূ হইতে দিল না। ফ্রান্স এ-অঞ্চলে উপনিবেশস্থাপনে কৃতকার্য্য হইলেন না।

প্রচণ্ড শীত ঋতু দীর্ঘকালস্থায়ী হওয়ায় বসন্তঋতু যখন আসিল, তখন আহার্য্য দ্রব্যাদি আনিল। কিন্তু তত দিন অর্দ্ধাহারে অনাহারে অর্দ্ধেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল। দে মঁস এবং চ্যাম্প্লেন দ্বিতীয়বার ঐরূপ শীতাবর্ত্তে পড়িয়া নিদারুণ কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহারা সমুদ্রতীর ধরিয়া কড্ অন্তরীপের অদূরে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানের সন্ধানের জন্য যাত্রা করিলেন। আগষ্ট মাসে যখন তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন, তখন ক্ষুদ্র দল নেভোস্কোসিয়ার রয়াল বন্দরে চলিয়া গেল। এখন তাহার নাম একপলিস্ রয়াল। দুই বৎসর পরে লোম-ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার লাভের চেষ্টায় দে মঁসকে উপনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে হয়। অল্পকালস্থায়ী এই

প্রথম উপনিবেশ এখনও সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই।

১৬০৬ খৃষ্টাব্দে চ্যাম্প্লেন যে উদ্যান রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে কতিপয় চারাগাছ বাঁচিয়া রহিয়াছে দেখিতে পান। চারি বৎসর পরে দে মঁসের আর এক জন সহকর্মী ঐ স্থানে গমন করিয়া মৃত ব্যক্তিদিগের জন্য প্রার্থনা করেন। পর-বৎসরে ফরাসীদেশ হইতে ব্যবসায় উপলক্ষে এক দল অভিযানকারী সেইখানে শীতকালে বাস করেন। কিন্তু ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে ভার্জ্জিনিয়া হইতে এক দল অভিযানকারী আসিয়া পরিত্যক্ত বাসভবনগুলি ধ্বংস করিয়া ফেলে। প্রায় দুই শতাব্দী পরে এই ধ্বংসস্তূপ আন্তর্জ্জাতিকব্যাপারে তাহাদের ভূমিকার অভিনয় করিয়াছিল।



পেনবস্কট নদের তীরবর্ত্তী নক্স দুর্গ

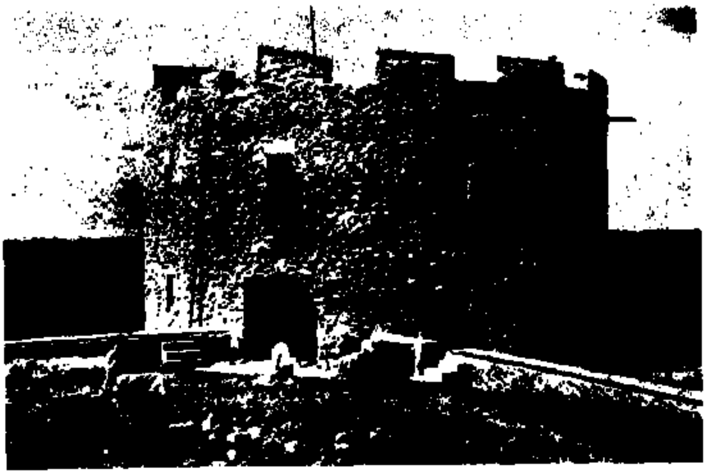
এক শত বৎসর পরে কংগ্রেসের এক বক্তৃতায়, মেইনকে রাষ্ট্রপদবীতে উন্নীত করিয়াছিল। মাসাচুসেটস্‌এর প্রতিনিধি রবার্ট লিউস বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন যে, মেইন্ মাসাচুসেট্‌এর ভগিনী, কন্যা নহে। তিনি মেইনএ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।



১৮১২ খৃষ্টাব্দের যোদ্ধা স্যামুয়েল ব্লিথ ও ক্যাপ্টেন উইলিয়ম্ বরোজের সমাধি

নিউ ইংলণ্ডের যে মানচিত্র ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন স্মিথ প্রস্তুত করেন, তাহাতে যে স্থানকে এখন ইয়র্ক বলা হয়, তাহা বোষ্টন নামে অভিহিত করা হইয়াছিল। উহা মেইনের অন্তর্গত। তখনও পিলগ্রিমস্‌রা সেখানে পদার্পণ করে নাই।

পিলগ্রিমস্‌রা যখন প্লাইমাউথ পাহাড়ে পদার্পণ করিয়াছিল, তখন মেইন তটভূমিতে অল্পসংখ্যক ইংরাজ বসবাস করিতেছিলেন না। প্রকৃতপ্রস্তাবে ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে



পুনর্গঠিত ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ

ভারবাহী জাহাজ রাখিয়াছিলেন। নিউ ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক প্রচেষ্টার প্রথমাবস্থায় মেইন অঞ্চলের আর্থিক অবস্থার পরিচয় প্লাউমাউথ উপনিবেশ হইতে পাওয়া যায়। পিলগ্রিমস্‌দের অবস্থানের দ্বিতীয় বৎসরে যখন খাদ্যাভাব ঘটে, তখন এমন কোন সরকারী ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে নাই, যাহার কাছে সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। পিলগ্রিমস্‌দিগের ধর্ম্মযাজকগণ তখন বাধ্য হইয়া মেইন তটভূমিতে এক দল লোক প্রেরণ করেন। ধীবরগণ তাঁহাদিগকে যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্য প্রদান করে। ধীবরগণ তখন মন্‌হেগান্ দ্বীপের সন্নিহিত স্থানে তাহাদের প্রধান শিবির সংস্থাপিত করিয়াছিল, প্লাইমাউথ উপনিবেশের গভর্ণর এডোয়ার্ড উইন্‌স্‌লে একখানি ইংরাজ মৎস্য-সংগ্রাহক জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষকে যথেষ্ট উপঢৌকন প্রদান করেন। কারণ, জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষ স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিয়াছিলেন।



অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকগণ অরণ্য-ভূমি-রক্ষাকার্য্যে নিরত

পিলগ্রিমস্‌রা যে স্থান নির্ব্বাচিত করিয়া বসবাস করিতেছিলেন, সেখানে উৎপাদিকা শক্তি তেমন ভাল ছিল না। কাযেই রপ্তানী করিবার মত বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকিত না। সুতরাং তাঁহারা ইণ্ডিয়ান-দিগের সহিত পশুলোমের ব্যবসায় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

পিলগ্রিমস্‌দিগের আগমনের ১৩ বৎসর পূর্ব্বে পোপহাম্ ঔপনিবেশিকগণ একটা দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা একটা ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সমুদ্রজলে ৩০ টন



মুসহেড হ্রদ



পিপীলিকা-খাদক পক্ষী



সহস্র বৎসরের স্তূপীকৃত শুক্তির পাহাড়



অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সমুদ্রকূলবর্ত্তী গ্রীষ্ম বন্দর



হবার্ডহল পুস্তকালয়



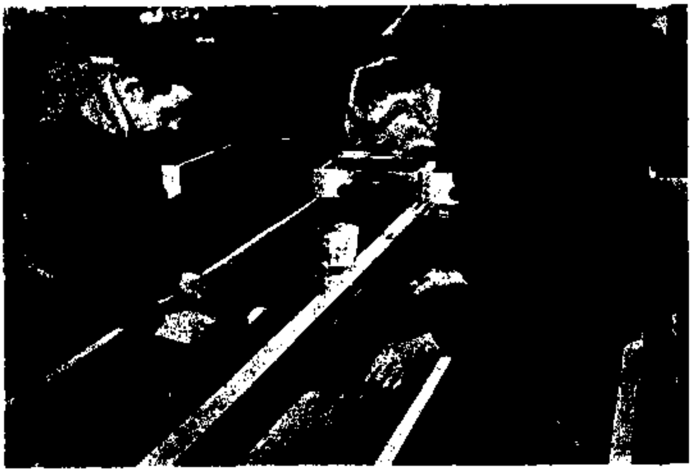
মকৃসি জলপ্রপাত

মেইন অঞ্চল প্রথমতঃ মেরিম্যাক্ নদ হইতে মাগাডাইক্ (বর্ত্তমান কেনেরেক) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু ১৬২৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই নবেম্বর ক্যাপ্টেন মেসন্, মেরিম্যাক্ হইতে পিস্‌কাটাকুয়া নদ পর্য্যন্ত ভূভাগ প্রাপ্ত হন। এই অঞ্চলের নাম হয় নিউ হ্যাম্পসায়ার। যাহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বাধীনতাবাদী, তাহারাই অঞ্চলে আসিয়া আশ্রয় লইত।



এই বাটীর মধ্যে হ্যারিয়েট বিচার ষ্টো "টমকাকার কুটার" রচনা করিয়াছিলেন

সপ্তদশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিকগণ সমুদ্র পার হইয়া এখানে আসিত। কিন্তু মেসাচুসেট্‌স হইতে নিউ হ্যাম্পসায়ারে তাহার পূর্ব্ব হইতেই নর-নারীগণ আগমন করিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

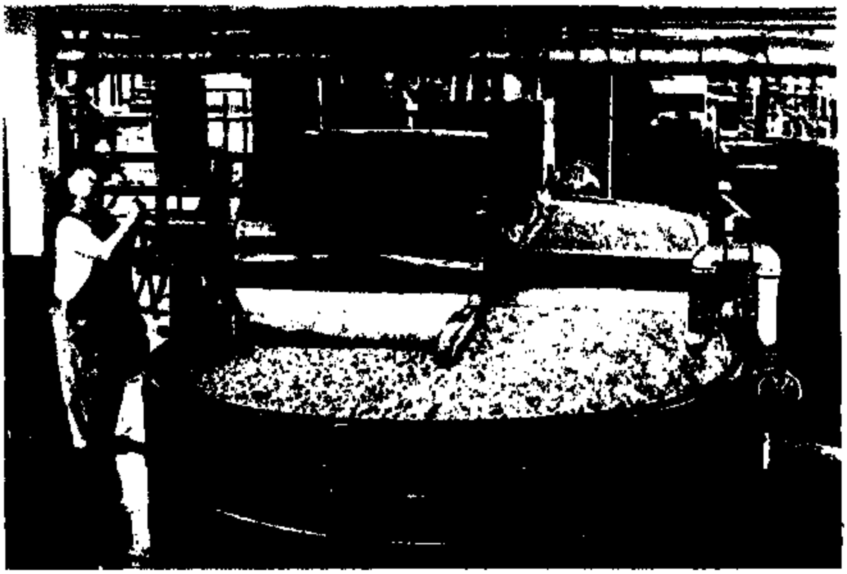


মাছের পোণা বাচ্চা হইতেছে

মেইনের জনসাধারণ সীমান্ত-প্রদেশ রক্ষার জন্য ফরাসী ও ইণ্ডিয়ানদিগের সহিত বহুবার যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। এ জন্য তাহারাই আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে সর্ব্বাগ্রে সাহায্যার্থ যোগদান করিয়াছিল। প্রকৃতপ্রস্তাবে, স্বাধীনতা ঘোষিত হইবার এক মাস পূর্ব্বে ইয়র্ক সহরের জনসাধারণ মেসাচুসেট্‌স্‌এর সভায় এই মর্ম্মে স্বীকৃতিপত্র পাঠাইয়াছিল যে, উপনিবেশের স্বাধীনতা যদি কংগ্রেস ঘোষণা করেন, তাহা হইলে ইয়র্ক তাহার অর্থ, সামর্থ্য এবং সর্ব্বস্ব দিয়া সহায়তা করিবে।

যুদ্ধকালে সীমান্তপ্রদেশে যে সেনাদল গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে তাহারা শপথ পালন করিয়াছিল। ১৭৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে নিদারুণ শীত-ঋতুতে ভ্যালি ফোর্জ্জে মেইনের সহস্রাধিক সৈনিক দেশাত্মবোধের জন্য যে কষ্ট সহ্য করিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত।

যখন ইংলণ্ড আমেরিকাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন, তখন পুরাতন মেইনের জনসাধারণ তাহাদের প্রাচীন সুবিধাগুলির দাবী করিল। অবশেষে মেইন স্বতন্ত্র অঞ্চল বলিয়া ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ঘোষিত হয়।



দারুখণ্ড হইতে কাগজ প্রস্তুত

দেশের উত্তর-পূর্ব্ব সীমা রক্ষার জন্য ৫০ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিবার ভার অর্পণ করে। প্রকৃতপ্রস্তাবে, জেনারেল উইল ফিল্ড স্কট মেইনে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করায় আর যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটে নাই।

আধুনিক মেইন অঞ্চলের প্রধান সহর পোর্টল্যাণ্ড। এই বন্দরটি অত্যন্ত প্রগতিশীল এবং ঐশ্বর্য্যশালী। সহরটি বন্দর হিসাবে যেমন বড় ও প্রসিদ্ধ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হিসাবেও তাহাই। এখানকার প্রত্যেক রাজপথই বৃক্ষচ্ছায়াচ্ছন্ন। কবি হেনরী, ও, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ লংফেলো বালককালে এই বৃক্ষবীথির ভিতর দিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন।



গৃহযুদ্ধকালে নির্ম্মিত দুর্গের অভগ্ন সোপানশ্রেণী

প্রতি গ্রীষ্মকালে অবসর-বিনোদনের জন্য দলে দলে লোক পোর্টল্যাণ্ডে আসিয়া থাকে। ইহাকে আরণ্য সহর বলিয়া অভিহিত করা হয়। এখান হইতে মেইন অরণ্য ও মাছ ধরিবার প্রসিদ্ধ দর্শনীয় স্থান খুব কাছে।

প্রশস্ত একটি রাজপথ যুক্তরাষ্ট্র হইতে মেইনে প্রসারিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই রাজপথ কেণ্টফোর্ট পর্য্যন্ত প্রায় ৫ শত ৬৪ মাইল দীর্ঘ। কেণ্ট দুর্গ একটি দ্বিতল অট্টালিকাকে বলা হয়। মেইনবাসীরা ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ভয় দেখাইবার জন্য এই দুর্গটি নির্ম্মাণ করে। সেই সময় মেইন ষ্টেট হইতে সৈন্য-সংগ্রহের জন্য ঘোষণা বাহির হয়। কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টকে

নগরে শ্বেত মর্ম্মরপ্রস্তররচিত "সিটি হল" আছে। সঙ্গীতরস-পিপাসুরা সেখানে গীতবাদ্য শ্রবণের জন্য গমন করিয়া থাকেন। পোর্টল্যাণ্ডে সঙ্গীতচর্চ্চা খুব ভালভাবেই হইয়া থাকে। পোর্টল্যাণ্ডে বহু মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। লংফেলো, টমাস বি, রিড্, কমোডোর প্রেবল, নীল ডৌ প্রভৃতি স্মরণীয় ব্যক্তি।

পোর্টল্যাণ্ডের পূর্ব্বভাগে সমুদ্রতটভূমির প্রকৃতির বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইবে। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ দেখিতে

পাওয়া যাইবে। বর্ত্তমানের তটভূমি পূর্ব্বে সমুদ্রগর্ভে ছিল। ক্রমশঃ জল সরিয়া গিয়া দ্বীপগুলি জলের উপর ভাসিয়া উঠিতেছে।

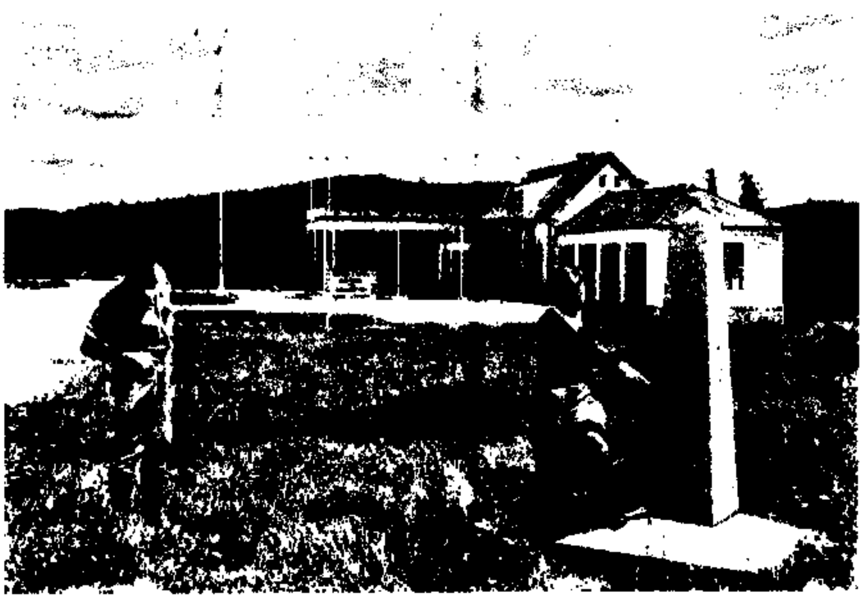
নরওয়ে এবং মেইনের বিচিত্র সৌন্দর্য্য প্রায় একই প্রকারের। প্রাচীনকালে যে সকল জলদস্যু মেইন সমুদ্রতটের নিকট দিয়া জাহাজ ভাসাইয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহারা তখন জলমগ্ন শৈলগুলির অস্তিত্ব অবগত ছিল না।

বাথের নিকট কেনেবেক্ নদ পার হইলে দক্ষিণদিকে যাইবার ইচ্ছা প্রবল হয়। জর্জ্জ টাউন, বুথবে অঞ্চল, নিউয়াগেন্, ব্রিষ্টল, ক্রিশমাস্ কোভ এবং প্রাচীন পেমাকুইড যেখানে ইচ্ছা গমন কর। নিকটেই স্কুইরেল দ্বীপ। সেখানে বহু সাহিত্যিক এবং ব্যবসায়ী উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। গ্রীষ্মাবকাশে বা অন্য সময়ে তাঁহারা এখানে আসিয়া অবসর-জীবন যাপন করেন। বুথবে বন্দরে গ্রীষ্মকালে ২০ হাজার হইতে ২৫ হাজার লোক দেখিতে পাওয়া যাইবে। শীতকালে উহার এক-চতুর্থাংশ লোক এখানে থাকে।

ব্রিষ্টল বন্দর, বিলাতের ঐ নামের বন্দরের সুনাম বজায় রাখিয়াছে। জন ব্রাউন ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে কোনও ইণ্ডিয়ানের নিকট হইতে এক খণ্ড জমি লেখাপড়া করিয়া প্রাপ্ত হয়েন। বর্ত্তমান বৃটিশ সহরের অধিকাংশই এই জমির উপর প্রতিষ্ঠিত।

নিউ হার্ব্বার ইদানীং একটি গ্রীষ্ম উপনিবেশ। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে র‍্যালে গিলবার্ট ৫ জন বন্দী ইণ্ডিয়ানের মধ্যে এক জনকে এখানে নামাইয়া দেন। তার পর তাঁহাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হয়। ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন জন্ স্মিথ, সার জন পোপহামের পুত্রকে এখানে ইণ্ডিয়ানদের সহিত ব্যবসায়ে লিপ্ত দেখিতে পান। নিউ হারবারের সন্নিকটেই পুরাতন পেমাকুইড অবস্থিত। জলদস্যু এবং ইণ্ডিয়ানগণ পেমাকুইড আক্রমণ করিয়া উহার যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছিল। অবশ্য নগর-রক্ষার যথেষ্ট আয়োজন থাকা সত্বেও দস্যুদিগের অত্যাচার নিবারিত হয় নাই।

সেণ্ট জর্জ্জ নদ পার হইয়া সেণ্ট জর্জ্জ সহর বা বন্দর এবং টেনান্টস্ বন্দর ও ক্লাইড বন্দরে যাওয়া যাইবে। ক্লাইড বন্দরের সম্মুখেই আলেন দ্বীপ অবস্থিত। এই দ্বীপে ক্যাপ্টেন ওয়েমাউথ একটি ক্রুশ স্থাপন করেন। উহার দুই বৎসর পরে পোপহামের ঔপনিবেশিকগণ ঐ দ্বীপে অবতীর্ণ হন।



আন্তর্জ্জাতিক সীমা-নির্দ্দেশক স্তম্ভ

সেণ্টজর্জ্জ নদের মোহানার দক্ষিণে, দশ মাইল দূরে সমুদ্র-মধ্যে মনহেগান দ্বীপ মাথা উঁচু করিয়া দণ্ডায়মান। শিল্পীরা এই নির্জ্জন স্থানে ইদানীং শান্তিতে শিল্পচর্চ্চা করিয়া থাকেন। এইখানে ক্যাপ্টেন স্মিথ উদ্যান রচনা করিয়াছিলেন। এখন সেখানে নানাবিধ ফল-ফুলের বাগান হইয়াছে।

একটা পথ পেনবস্কট নদ পর্য্যন্ত আসিয়া নক্সদুর্গ পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে। এক শত বৎসর পূর্ব্বে এই দুর্গটি নির্ম্মিত হয়। নদীপথে কেহ আক্রমণ করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যেই দুর্গটি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

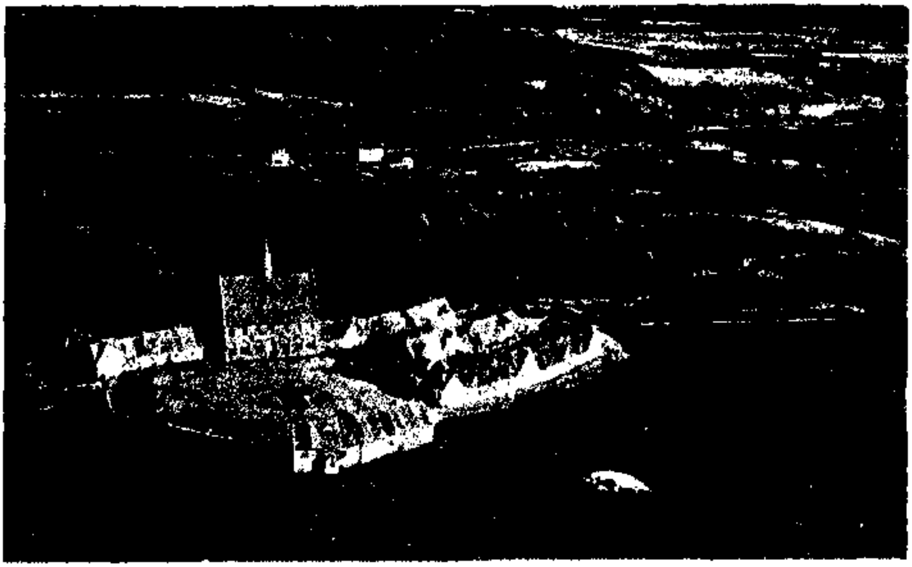
চামপ্লেনের পেন্টিগোয়েট ১৬৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভাল

ব্যবসায়ের স্থান ছিল। পিলগ্রিমদেরা এখানে থাকিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। তার পর ফরাসীরা এই স্থান আক্রমণ করে। পরে কুইবেক হইতে সাহসী যুবক ব্যারন-কাষ্টিন এখানে আগমন করেন এবং আকাডিয়ার অরণ্যে সাধাসিধাভাবে জীবনযাপন করিতে থাকেন। স্থানীয় এক জন ইণ্ডিয়ান সর্দ্দারের কন্যাকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন।

ব্লুহিল, সেজউইক এবং অন্যান্য গ্রামগুলি বেশ চিত্তাকর্ষক। সমুদ্র-জীবনে ক্লান্ত হইয়া বহু জাহাজের অধ্যক্ষ এইখানে জাহাজ নোঙ্গর করিয়া অবস্থান করিতেন। রাজা জর্জ্জ সেই দানপত্র মঞ্জুর করেন। দীর্ঘকাল বিবাদের পর এই স্থির হয় যে, ক্যাডিলাকের পৌত্রী অর্দ্ধেক এবং বার্ণার্ডের পুত্র অর্দ্ধেক পাইবেন।

এই দ্বীপে একাডিয়া ন্যাশনাল পার্ক রচিত হইয়াছে। চার্লস ডবল্যু এলিয়ট, জন, ডি, রকফেলার (জুনীয়র) এবং জর্জ্জ বি, ডরের প্রচেষ্টায় জনসাধারণ জমি কিনিয়া ঐ উদ্যান রচনা করেন।

ম্যাচিয়াস্ একটি ছোট সহর। এখানে পূর্ব্বে ব্যবসা বাণিজ্য চলিত। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এখানে নানা প্রকার গোলযোগের উদ্ভব হইত। ১১ বৎসর পরে



পোর্টল্যাণ্ডের বাহিরে একটি ভেনিস গ্রাম

শীতকালে যখন বহুলোক অন্যত্র চলিয়া যাইত, তখন তাঁহারা এখানে সামুদ্রিক জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথা আলোচনা করিয়া অবসরবিনোদন করিতেন।

মাউন্ট ডেজার্ট অতুলনীয় দ্বীপ। যুক্তরাষ্ট্রের কোনও আটলাণ্টিক দ্বীপ এত উচ্চ নহে। নিউইয়র্কের লংদ্বীপ কেবল আয়তনে বড়। বিপ্লবের পরে মাউন্ট ডেজার্টের জন্য বহু দাবীদার উপস্থিত হন। চতুর্দ্দশ লুই ক্যাডিলাকের উত্তরাধিকারিগণকে ঐ দ্বীপ প্রদান করেন। সার ফ্রান্সিস্ বার্ণার্ডকে মেসাচুসেটস্এর দরবার ঐ দ্বীপ প্রদান করেন। মেসাচুসেটস্এর সীমান্ত উপনিবেশ হিসাবে উহাকে গণ্য করা হয়। সহরবাসীরা এখানে একটা স্তম্ভ নির্ম্মাণ করে। একখানি সশস্ত্র বৃটিশ জাহাজের অধ্যক্ষ তাহাদিগকে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আদেশ দেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়, তাহার ফলে বৃটিশ জাহাজখানিকে মার্কিণরা অধিকার করে। ইহার পর আর একখানি সশস্ত্র জাহাজ আসে। সহরবাসীরা উহাও গ্রেপ্তার করে। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দ নোভাস্কোসিয়ার বৃটিশ কর্তৃপক্ষ আবার কতিপয় সশস্ত্র জাহাজ পাঠাইয়া মাচিয়ার বিদ্রোহীদিগকে ধরিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু

গ্রামবাসীরা ৪০ জন ইণ্ডিয়ানের সাহায্যে নদীপথ এমন সুরক্ষিত করিয়াছিল যে, রণতরীবহর গ্রামটিতে পৌঁছিতে না পারিয়া পলায়ন করে।

পূর্ব্ব মেইনের প্রধান সহর ব্যাঙ্গর। এই সহরের ধনৈশ্বর্য্য প্রচুর বলিয়া প্রবাদ ছিল। এই সহরের অট্টালিকাগুলি স্ফটিক ও রৌপ্যস্তম্ভের উপর নির্ম্মিত। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে মেইনের প্রথম রেলপথ নির্ম্মিত হয়। ব্যাঙ্গরের পশ্চিম দিক্ দিয়া দুই নম্বরের প্রশস্ত রাজপথ চলিয়া গিয়াছে। এই পথের উত্তরদিকে অনেকগুলি হ্রদ অবস্থিত।

এই পথের প্রায় ৪০ মাইল চলিয়া গেলে একটি মুক্ত উপত্যকাভূমি দেখিতে পাওয়া যাইবে। বেলগ্রেড হ্রদগুলি অরণ্যসমাকুল পাহাড়ের অন্তরালে অদৃশ্য থাকিয়া যায়।

ষ্টেটের পশ্চিম সীমান্ত পার হইয়া পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিলে দুইটি তোরণ-পথ পড়ে। এক পথে জেস্যুইট ধর্ম্মযাজকগণ এবং ফাদার গেব্রিয়েল ড্রুইলেটস্ কানাডা হইতে ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে মেইনএ আগমন করেন।

এই পথে কর্ণেল বেনেডিক্ট্ আর্ণল্ডও আগমন করেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে কুইবেকের বিরুদ্ধে তিনি যে অভিযান করেন, তাহা ব্যর্থ হয়। এ যাবৎ এই পথের কোনও উন্নতি হয় নাই। শুধু মোটর-গতায়াতের পথ দুই বৎসর যাবৎ সংস্কৃত হইয়াছে।

কুইবেক হইতে পশ্চিম মেইনএ মোটরযোগে গমন করিবার একটি পথ আছে, তাহার নাম 'জ্যাক্‌সন রুট'। এক শতাব্দী পূর্ব্বে এই পথ দিয়া কোনও মতে গতায়াত চলিত। সহস্র সহস্র শ্রমসহিষ্ণু ফরাসী ক্যানাডিয়ানরা এই পথে উত্তর-মেইনএ বসবাস করিতে আসিয়াছিল।

মেইনএ হ্রদের সংখ্যা অপর্য্যাপ্ত। হ্রদ ও পুষ্করিণী গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে, উহাদের সংখ্যা ২ হাজার ২ শত ২২। তিনটি বড় নদী—সেণ্ট জন, পেনবস্কট্ এবং কেনেবেক যেখান হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই পিস্‌কাটাকুই অঞ্চলে মেইনের উচ্চতম পর্ব্বত কাটাডিন অবস্থিত। উহার উচ্চতা ১৩ ফুট কম এক মাইল। এই অঞ্চলে মেইনের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হ্রদ মুসহেড অবস্থিত। উহা সমুদ্র হইতে হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত হইলেও আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের একটি বাহু বলিয়া মনে হইবে। উহা দৈর্ঘ্যে ৩০ মাইল। হ্রদের তটভূমি মাপিয়া দেখিলে ৩ শত মাইল হইবে। মুস্‌নদের মোহানায় একটি বিস্তৃত উপত্যকা এবং কৃষিক্ষেত্র ও কৃষকবাটীসমূহ আছে। হ্রদের চারিদিকে নীলবর্ণের পর্ব্বতমালা বিদ্যমান।

পিস্‌কাটাকুই অঞ্চল একাই যে হ্রদমালায় সুশোভিত, তাহা নহে। উহার পার্শ্বস্থ অঞ্চল, সমারসেট, পেনবস্কট্, এরুসটুক্ অঞ্চলেও বহু হ্রদ আছে। বেলগ্রেড হ্রদগুলির মধ্যে মেসালন্‌স্কি, ম্যারনিকেফ, আনাবেসাকুক্ এবং কবোসেকন্‌টি যেন কেনেবেক নদের শাখানদীর স্বরূপ।



পুরাতন কারাগার যাদুঘরে রূপান্তরিত হইয়াছে

উহাদের তীরে বালক-বালিকাদিগের শিবির সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে।

কেনেবেক নদের উৎপত্তিস্থানের সন্নিহিত অঞ্চলে ওয়েসারঅনসেট্ হ্রদের তীরদেশে শিল্পীদিগের একটি গ্রীষ্ম-উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে। নাট্যকার, প্রযোজক, অভিনেতা, অভিনেত্রী এখানে আসিয়া গ্রীষ্মজীবন যাপন করিয়া থাকে।

উহার দক্ষিণে পূর্ব্ব-মেইনের সঙ্গীতশিবির। এখানে তরুণ সঙ্গীতশিক্ষাভিলাষী যুবকগণ মেসালন্‌স্কি হ্রদের তীরবর্ত্তী বৃক্ষকুঞ্জের মধ্যে বসিয়া সঙ্গীত-শিক্ষা করিয়া থাকে।

মেইনএ নবাগত ব্যক্তির মনে হইবে, এই অঞ্চল শুধু বৃক্ষের রাজ্য। সমগ্র স্থানের বারো আনা অরণ্যসমাকুল। এই অরণ্য মেইনের একটা সম্পদ। অরণ্যে শাল, সেগুন, ওক, দেবদারু প্রভৃতি বড় বড় বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হইয়া থাকে। মেইনএ অসংখ্য করাতের কল চলিতেছে। বড় বড় কাঠ অরণ্য হইতে আনিয়া চেরাই, ফাড়াই হইয়া থাকে। মেইনএ কাঠের পাল্‌প হইতে কাগজ প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই কাগজই এখন এই অঞ্চলের প্রধান শ্রমশিল্প। মেইনএ জাহাজনির্ম্মাণকার্য্য প্রায় আড়াই শত বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। ৫০টি সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানে জাহাজ নির্ম্মিত হয়। অতি সুন্দর সুন্দর জাহাজ এই অঞ্চলে নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

এ বিষয়ে বাথ্ বন্দর সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বাথ্‌এ ইস্পাতের জাহাজও তৈয়ারী হইতেছে। এই বন্দরেই ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টনেরও অধিক ভারবাহী জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে। তন্মধ্যে রণতরী, ক্রুজার, গন্‌বোট্, ডেষ্ট্রয়ার প্রভৃতিও আছে।

মেইনএর প্রধান শস্য আরুস্‌টুক্ আলু। মটর, শিম, জাম, আপেল প্রভৃতি এখানে উৎপাদিত হয়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে ঐ সকল ফল টিনে ভরিয়া মেইনের লেবল আঁটিয়া দেশদেশান্তরে বিক্রীত হইয়া থাকে।

সার্ডিন মৎস্য ও মোচা চিংড়ী মেইনে প্রভূতপরিমাণে উৎপাদিত হইয়া থাকে। বরফ কাটিয়া দক্ষিণাঞ্চলে প্রেরণের ব্যবসাও বেশ চলিয়া আসিতেছে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ৩০ লক্ষ টন কাটা বরফ মেইন হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। এখন কৃত্রিম উপায়ে বরফ প্রস্তুত হয় বলিয়া বরফ কাটা হ্রাস পাইয়াছে।



পরিত্যক্ত জাহাজের কামরায় টার্কিংটনের পাঠাগার

জলের শক্তিতে শ্রমশিল্পজাত দ্রব্য প্রচুর উৎপন্ন হয় বলিয়া এখানে বহু কলকারখানা নির্ম্মিত হইয়াছে। মেইন, বিডারফোর্ড, সাকো, ব্রন্সউইক্, লিউইস্‌টন্, অবরণ, অগষ্টা, ওয়াটারভিলি, ফোহেস্‌ান্, ব্যাঙ্গর, ওরোনো এবং ক্যালে নামক সহরে অসংখ্য কলকারখানা নির্ম্মিত হইয়াছে।

প্রত্যেক শ্রমশিল্পকেন্দ্রে মেইনের কলেজ প্রতিষ্ঠিত আছে, ব্রন্‌সউইকের বোডোইন, ওয়াটারভিলির কল্‌বি, লিউইস্‌টনের বেট্‌স্ এবং ওরোনোর মেইন বিশ্ববিদ্যালয় সুপ্রসিদ্ধ।

বোডোইন কলেজ ১৮০২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের চতুর্দ্দশ প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন পিয়ার্স ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে এইখানে গ্রাজুয়েট হন। উহার এক বৎসর পরে

লীনার কথায়, লীনার দৃষ্টিতে রাধাবিনোদের চিত্ত নিমেষে সাড়া পাইয়া জাগিয়া উঠিল। চারিদিকে চাহিয়া রাধাবিনোদ কহিল—শোনো লীনা, যেজন্য আমি এসেছি। ধ্যানলোক থেকে একবার তোমাকে নামতে হবে অতি দীন আমাদের এই জীবলোকে। পিপাসায় আমাদের কণ্ঠ শুষ্ক…

দুই চোখে বিদ্যুৎ ফুটাইয়া লীনা কহিল—এত পিপাসা! এ পিপাসা মেটাবার সামর্থ্য আমার কোথায়, রাধদা?

এ-উত্তর গায়ে না মাখিয়া রাধাবিনোদ সহজ স্বরে কহিল,—সামর্থ্য তোমার ছাড়া আর কারো নেই, লীনা। একবার ওঠো। অজিতের গাড়ীতে চায়ের সরঞ্জাম মজুত। উঠে আমাদের পেয়ালায় চা-পানীয় ভরে মুখের সামনে ধরো। আমরা দুটি পিপাসিত জন—উৎফুল্ল চিত্তে তোমাকে বহু সাধুবাদ দেবো।…তোমারো পিপাসা পেয়েছে বোধ হয়?

লীনা একটা নিশ্বাস ফেলিল। প্রচণ্ড নিশ্বাস। সে নিশ্বাসের বাতাসে বুক দুলিয়া উঠিল…ঝড়ো বাতাসে ঢেউয়ের বুকে নৌকার মত। নিশ্বাস ফেলিয়া লীনা কহিল,—আমারো দারুণ পিপাসা, রাধদা…

রাধাবিনোদ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া লীনার মাথা ধরিয়া তুলিয়া ধীরে ধীরে তাকে বসাইয়া দিল; পরে কহিল,—এসো…অজিত অপেক্ষা করচে আমাদের জন্য। ষ্টোভ জেলে তার উপর জলের কেট্‌লি চাপিয়ে দেবো। তুমি পানীয় রচনা করবে।

লীনা উঠিল এবং নিজেকে সংবৃত করিয়া লইয়া রাধাবিনোদের সঙ্গে এভেন্যুরে প্রকাণ্ড ঝাউগাছগুলার তলায় আসিল।

বাতাসে মাতন চলিয়াছে। প্রমত্ত মাতন! দুটি পেয়ালায় চা-চিনি-দুধ মিশাইয়া অজিত ও রাধাবিনোদের সামনে লীনা ধরিয়া দিল; অজিত গাড়ী হইতে ছোট টুকরি নামাইতে গিয়াছে; টুকরিতে আছে, কেক্, কলা, কমলালেবু, আপেল প্রভৃতি ভোজ্য।

টুকরি লইয়া ফিরিয়া রাধাবিনোদকে উদ্দেশ করিয়া সে কহিল,—দু'পেয়ালা কেন? উনি খাবেন না?

রাধাবিনোদের হুঁশ হইল। বিস্মিত দৃষ্টিতে লীনার পানে চাহিয়া সে কহিল—সত্যি! তোমার পেয়ালা শূন্য কেন লীনা? চায়ে পূর্ণ করো!

লীনা কহিল— আমি খাবো না।

রাধাবিনোদ কহিল,—অপরাধ? এই যে বললে, পিপাসায় তোমার কণ্ঠ শুষ্ক!

মৃদু হাস্তে লীনা কহিল—চায়ে আমার তেষ্টা মেটে না কোনো কালে।

অজিত কহিল—তাহলে আমি ডাব নিয়ে আসি। পথের বাঁকে দেখেছি, অনেক ডাব আছে।

অজিত গমনোদ্যত হইল। লীনা কহিল—না, না, ডাবের কোনো দরকার নেই।

অজিত কহিল—তা হয় না। আমি যাবো আর আসবো।

অজিত দাঁড়াইল না; ডাব আনিতে গেল।

রাধাবিনোদ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, লীনা কহিল—পেয়ালা মুখে তোলো, রাধদা। এইমাত্র বললে, দারুণ পিপাসা…তোমার একেবারে ফাটি যাওত ছাতিয়া!

রাধাবিনোদ কহিল—ব্যস্ত কেন? হবে'খন। পিপাসা আমার তেমন প্রবল হয়নি, সত্যি! তাছাড়া ঘটনাক্রমে আমি সংযম আয়ত্ত করেছি। কোনো-কিছুতে আর চঞ্চল হই না।

লীনা কহিল,—তা জানি। নাহলে বৌয়ের এতখানি অবহেলা অমন হাসি-মুখে সহ্য করো!

—অবহেলা! রাধাবিনোদের স্বরে বিস্ময়।

লীনা কহিল—সংসারের রঙ দিনে দিনে কি রকম বদলে যাচ্ছে!…তবে এক-একজন কেমন…যেমন দুঃখী, তেমনি দুঃখী থেকে যায়। তার দুঃখে কেউ এখানে ফিরে তাকায় না। অথচ কারো দুঃখ দেখলে আমার মনে হয়, আমার বুকটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিলে যদি ওর দুঃখ ঘোচে তো তাই করি।

রাধাবিনোদ লীনার পানে চাহিয়াছিল,—লীনার কথায় কৌতুক বোধ করিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা আঘাত দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না; সে কহিল—এই অথই অতল গঙ্গার দিকে মুখ করে এ কথা তুমি বলচো, লীনা?

লীনা কহিল—গঙ্গা জানি না, সাগরও জানি না—যা আমার মনে হয়, বললুম।

রাধাবিনোদ কহিল—তাই যদি তো বেচারী প্রতাপবাবু এত দুঃখ বয়ে বেড়ান কেন? তাঁর দুঃখ দূর করতে তুমি কি করবো, ভাবি…

অবিচল দৃষ্টিতে লীনা রাধাবিনোদের পানে চাহিয়া রহিল। রাধাবিনোদ কহিল—কি! জবাব দাও!—

তার স্বরে কৌতুক।

লীনা কহিল—তাঁর মনে দুঃখ যদি সত্যই থাকতো, তাহলে আমাকেও আজ এত-বড় দুঃখ বুকে বয়ে বেড়াতে হতো না, রাধদা!

এ স্বরে বেদনার সজল সুর! রাধাবিনোদ কোন কথা বলিল না।

ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া লীনা কহিল,—তোমরা মানুষের কি দেখে সুখ-দুঃখের বিচার করো—কিছু বুঝি না!···আমায় ছাখো, দিব্যি সাজগোজ করচি, হাসি-গল্প করচি—দেখে ভাবো, খুব সুখে আমি বাস করচি! কিন্তু কতখানি দুঃখ চেপে রাখবার যে ব্যর্থ চেষ্টা এ, তার কোনো খপর তোমরা রাখো! সে খপর নেবার ইচ্ছাও কারো দেখলুম না কোনো দিন!···স্বামী!···কথায় বলে, মেয়েমানুষের দেহ-মনের রাজা! রাজার উচিত রাজ্যের সব খপর সন্ধান নিয়ে জানা। মন্ত্রী বা শান্ত্রী-পাহারার মুখের রিপোর্ট নিয়ে যে-রাজা খুশী-মনে সিংহাসনে বসে থাকে, তার রাজ্য অতি শীঘ্র চুরমার হয়ে ভেঙ্গে পড়ে! আমাদের দশা তাই। স্বামীর মন জোগাবার জন্য আমাদের জন্ম! অথচ সে মনের ত্রিসীমায় কখনো ঘেঁষতে পাই না। কোথায় থাকে পুরুষের সে মন···কোন্ নেপথ্যে—নাগাল পাবো, তারো উপায় নেই!

রাধাবিনোদ কেমন হতভম্ব হইয়া রহিল। লীনা কি যে বলে, সব কথার সঠিক মর্ম্ম সে বুঝিতে পারে না! এক আধটা কথার অর্থ আভাসে মনে জাগে; সে অর্থ ধরিয়া সমস্ত কথার পারম্পর্য্য আর মর্ম্ম খুঁজিতে যায়—অমনি খেই হারাইয়া সমস্তটা বিশৃঙ্খল বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে!

লীনার এ কথার মর্ম্ম সে ঠিক গ্রহণ করিতে পারিল না। একটু আগে পিপাসার কথা তুলিয়া মনের যে পরিচয় লীনা আভাসে জানাইতে গিয়াছিল, এখন আবার প্রতাপকে ঘিরিয়া এই মনোবেদনার ইঙ্গিত···সমস্তটা মিলিয়া তার কাছে অস্পষ্টতার সৃষ্টি করিল। এ কথার সঙ্গে নিজের কথা জুড়িয়া দিলে কোথায় গিয়া যে সে কথার শেষ হইবে, কে জানে! তাই কোনো কথা বলিতে সাহস হইল না।

সাহস না হইলেও লীনার এই অস্পষ্ট কাকলী···ছাড়া-ছাড়া এই যে কথার লহর—এ কথার সুস্পষ্ট অর্থ বোধ না হইলেও এ কথা-গুলা শুনিতে তার ভালো লাগে। এ কথায় ফাগুন-বাতাসের স্নিগ্ধ পরশ সমস্ত মনকে পুলকাকুল করিয়া তোলে—স্বপ্নাবেশে ভরিয়া দেয়!···

কথাগুলা সুস্পষ্ট হইলে কেমন লাগিত, অলস অবসরে বহুবার সে তাহা কল্পনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছে; কিন্তু কল্পনা কোথাও থিতাইতে পারে নাই!

লীনার কথা চুপ করিয়া সে শুনিতে লাগিল···সে কথার সুরে বাতাস যেন বেদনায় হা-হা করিতেছে বলিয়া তার মনে হইল।

অজিত ফিরিল; তার পিছনে একটা লোক। লোকের মাথায় ডাবের বাজরা।

অজিত কহিল—নাও, ডাব এনেছি।

হাসিয়া রাধাবিনোদ কহিল—বিশল্যকরণীর সন্ধানে গিয়ে এ যে একেবারে গোটা গন্ধমাদনটাকে উপড়ে এনেচো! এত ডাবে প্রয়োজন?

অজিত কহিল,—উনি একাই বুঝি ডাব খেতে জানেন? আমাদের মুখ নেই? না, ডাবে রুচির অভাব?

রাধাবিনোদ কহিল,—আমাদের আছে চা।

অজিত কহিল—চা চলুলে ডাব নিষেধ—কোনো শাস্ত্রে এমন বিধান আছে বলে আমার জানা নেই।···

ডাবওয়ালা বাজরা নামাইল। অজিত কহিল—বেশ ভালো দুটো নেয়াপাতি ডাব বাছো তো বাপু। যেন বেশ মিষ্টি হয়! না হলে দাম দেবো না।

ডাবওয়ালা ডাব বাছিল। তারপর সে ডাব কাটিয়া দিলে অজিত ডাব লইয়া কাচের গ্লাস আনিয়া তাহাতে জল ঢালিল, ঢালিয়া লীনার হাতে গ্লাস দিল। লীনা ডাবওয়ালার পানে ফিরিয়া তাকাইয়া কহিল—আর একটা কি হবে? আমি কি অগস্ত্য মুনি—ঠাওর করেচেন?

হাসিয়া অজিত কহিল—আর একটা ডাব আপনার জন্য ফরমাশ করেচি, এ সিদ্ধান্তই বা আপনি করেন কেন? আমরা আছি। ডাবের সদ্ব্যবহারে উদ্যোগী আর পারদর্শী বলেই আমাদের জানবেন।

কোনো কথা না বলিয়া লীনা গ্লাসে চুমুক দিল। সঙ্গে

সঙ্গে ফলের টুকরি লীনার সামনে অগ্রসর করিয়া দিয়া অজিত কহিল,—নিন...

লীনা কহিল,—না, না, আপনারা খান।

অজিত বেশ সপ্রতিভ ভাবে কহিল,—খাবো বলেই এ টুকরি আপনার সামনে ধরে দিচ্ছি। আমরা খাবো, আপনি খাওয়াবেন। টুকরিতে ছুরি আছে। নিন। সঙ্গে যারা এসেচে, তাদের যত্ন করে খাওয়ান। কোন্ বইয়ে যেন পড়েচি—সুগৃহিণী বনে গেলে বনকেও তাঁরা আরাম-নীড় করে তোলেন। আমাদের এ বনও আজ আরাম-নীড়ে পরিণত হোক!

হাস্যে বাক্যে আনন্দ যেন উছলিয়া উঠিল। অজিতের সঙ্গে আলাপও লীনার পক্ষে অনায়াসে সহজ হইয়া গেল।

আহারাদি চুকিলে অজিত কহিল—বোটে বেড়াবেন একটু?

লীনা কহিল—না। তার চেয়ে চলুন, হেঁটে খানিকটা বেড়িয়ে আসি।

অজিত কহিল—বেশ।

তিন জনে বেড়াইতে চলিল।...ক্র্যাগ ষ্টাফের ওদিকে অনিবিড় বন। একটা গাছ বেড়িয়া কতকগুলা পরগাছা লতাইয়া উঠিয়াছে—অঙ্গে অঙ্গে বিচিত্র বর্ণের ফুল।

লীনা কহিল—ভারী চমৎকার ফুল তো! বাঃ!

—নেবেন?

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া অজিত মালকোঁচা আঁটিয়া গাছে চড়িল। রাধাবিনোদ কহিল—গন্ধমাদনের উপমা সাধে আমি দিয়েছিলুম।

হাসিয়া লীনা কহিল—ও কি বলচো, রাধুদা?

রাধাবিনোদ কহিল—ছাখো না কাণ্ড! গাছে উঠে বসলো! তার পর যদি পপাত ধরণীতলে হয়, তখন?

অজিত কহিল—তোমার কোনো বুদ্ধি নেই, রাধু। উনি রয়েচেন। জন্ম-গত অধিকারে রোগাতুরের সেবায় expert করুণাময়ী!

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে রাধাবিনোদ লীনার পানে চাহিল; লীনার চোখের দৃষ্টিতে ভর্ৎসনার মৃদু স্ফুলিঙ্গ!

গাছ হইতে অজিত নামিল—হাতে পুষ্পগুচ্ছ। সে পুষ্পগুচ্ছ আনিয়া সে লীনার হাতে দিল।

সস্মিত মুখে লীনা কহিল—উপহারের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অজিত দুই পাণি অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া মাথা নীচু করিয়া হাসিল। হাসিয়া কহিল—উপহারে যদি খুশী হয়ে থাকেন, তাহলে আমাকেও একদিন খুশী করে দেবেন।

লীনা কহিল,—কিসে আপনি খুশী হবেন? বলুন।

অজিত কহিল,—স্বহস্তে বিচিত্র ভোজ্য তৈরী করে এই গন্ধমাদন-বাহীকে ভোজনে পরিতৃপ্ত করবেন। আপনি রাধুর ভগ্নী—তাই এ-কথা বলবার সাহস হচ্ছে।

হাসিয়া লীনা কহিল—বেশ। কবে খাবেন, জানাবেন।

অজিত কহিল—নিশ্চয়।

রাধাবিনোদ কহিল,—এত বড় ঔদরিক তুমি আর কোথাও পাবে না, লীনা। খেতে পেলে অজিত আর কিছু চায় না। ওর স্ত্রী-বেচারী ওর পেটুকতার জ্বালায় অস্থির। থেকে থেকে এমন ফরমাশ চালায়...আমরা দেখেছি তো!

অজিত কহিল—ভোজন-বিলাসের মত বিলাস আর আছে!...আপনি কি বলেন? আপনাকে বিব্রত করবো না তো? দেখুন, তাহলে ক্ষমা প্রার্থনা করচি।

লীনা কহিল,—না, না...আপনি খাবেন, সে আমার ভাগ্যের কথা।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

ছুরে বাণ

অজিতের ভোজন-নাটক সমারোহে জমিয়া উঠিল। ভোজের বায়না ক্রমে নিত্য-নৈমিত্তিক হইল।

রাধাবিনোদ সকল পর্ব্বে যোগ দিতে পারিত না। কোনো কাজে কায়-মনে দীর্ঘকাল লাগিয়া থাকা তার অভ্যাসের বাহিরে।

সেদিন সে এক বন্ধুর অনুরোধে মাছ ধরিতে বাহির হইবে, লীনা কহিল—বেরুচ্ছ, রাধুদা?

রাধাবিনোদ কহিল—হ্যাঁ।

লীনা কহিল—কখন্ ফিরবে?

রাধাবিনোদ কহিল—ফিরতে রাত্তির হবে। মাছ ধরবো; তারপর সে মাছ রান্না হবে; তার পরে হবে ভোজ।

লীনা কহিল—তবে উপায়? অজিতবাবু যে লিখে পাঠিয়েচেন—আজ রাত্রে এখানে খাবেন। বিশেষ করে খেতে চেয়েছেন মাছের ফ্রাই আর পাটিশাপটা।

রাধাবিনোদ কহিল—খেতে চেয়ে থাকেন, খাবেন।

লীনা কহিল—তুমি বাড়ী থাকবে না…

রাধাবিনোদ কহিল—বাড়ীখানা থাকবে—আমিই বাড়ীতে থাকবো না। কাজেই অজিতের অসুবিধা হবে না। আশ্রয় পাবে।

লীনা কহিল—কিন্তু…

রাধাবিনোদ কহিল—কদিনের আলাপে আবার এ কিন্তু কেন, লীনা? তাছাড়া আমাদের ও-দলে অজিত নেই। এ হলো ভিন্ন-দলের বন্ধু।

লীনা কোনো জবাব দিল না, শুধু একটা ছোট নিশ্বাস ফেলিল।

রাধাবিনোদ বাহির হইয়া গেল। লীনা চুপ করিয়া ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিল ; তারপর…

রাত্রি নটা বাজিয়া গিয়াছে। অজিতের এখনো দেখা নাই।

লীনার ভালো লাগিতেছিল না। একা—রান্নার পাট সারিয়া ফেলিয়াছে—শুধু মাছের ফ্রাই কখানা ভাজিতে বাকী। অজিতের আসন পাতা হইলে তার কাছে বসিয়া ষ্টোভ জ্বালিয়া ভাজিয়া দিবে।

বাহিরে এক-আকাশ জ্যোৎস্না। দোতলায় রাধাবিনোদের ঘরের সামনে বারান্দায় ইজিচেয়ার পাতা আছে। একখানা বাঙলা বই হাতে করিয়া লীনা আসিয়া ইজিচেয়ারে দেহ-ভার এলাইয়া দিল।

নীচে বাগান। বাগানে আম গাছের শাখা দুলাইয়া বাতাসের মাতন। ডায়মণ্ড হারবারের সেই মাতন মনে পড়িল। লীনা গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। এমন দুর্ভাগ্য এ বয়সে কোন্ নারী সহিতেছে? মনের কাননে রাশি রাশি ফুল—সে ফুলে মালা গাঁথিয়া সে বসিয়া আছে ; নিত্য থাকে! এ মালা দিবার জন্ম দুই হাত বাড়াইয়া আছে। এ মালা লইবে—এমন তার কেহ নাই!

প্রতাপ?…ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া লীনা বই খুলিল।

হালের লেখা নূতন উপন্যাস। উপন্যাসের নাম, "বিশুষ্ক মরু।" নায়িকা অনিন্দ্যা ধনীর গৃহিণী ; বয়সে কিশোরী, রূপসী। সংসারে দায় নাই, দায়িত্ব নাই। অহর্নিশি নিজেকে লইয়া মাতিয়া আছে। কত ছাঁদে কত বেশে পলে-পলে নিজেকে সাজাইয়া আয়নার সামনে গিয়া দাঁড়াইতেছে! আয়নার বুকে নিজের মূর্ত্তি দেখিয়া চঞ্চল উদ্দাম হইয়া উঠিতেছে! কিন্তু বৃথা এ-রূপ—বৃথা এ সজ্জা! স্বামী দুলাল এ-রূপ কখনো চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখে না।

জানালায় বসিয়া থাকে অনিন্দ্যা। আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না সারা অঙ্গে লুটাইয়া পড়ে! পাশের বাড়ীতে কে গান গায়…

যেন অধীর প্রতীক্ষায় নায়িকা বসিয়া আছে নায়কের পথ চাহিয়া। পথে লোক চলিয়াছে দলে দলে। এ পথে নায়ক আসে না। পথে এত পথিক—তারাও কোনদিন চোখ তুলিয়া জানালার পানে তাকাইয়া দেখে না, উদাস নয়নে কে ও বসিয়া আছে—তার বুকে কি দুঃখ গো?…

অনিন্দ্যার শিরায় রক্ত নাচিয়া উঠিল। এ তারি কথা গানে গাঁথা! কে তার মনের পরিচয় পাইয়া এ গান লিখিয়া বাতাসে এমন ব্যথার মালা দুলাইয়া দিয়াছে?

সেদিন চোখে-চোখে মিলন। অনিন্দ্যার দু'চোখে জলের ধারা। পথের ওদিককার গৃহ-বাতায়নে দাঁড়াইয়া সে—যে গান গায়! এদিককার গৃহ-বাতায়নে বিরহিণী অনিন্দ্যা। মন বলিল—ওগো…

দাসী আসিয়া খবর দিল, অজিত বাবু আসিয়াছেন।

লীনার চমক ভাঙ্গিল। লীনা কহিল—কোথায়?

দাসী কহিল—বাবুর ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমায় বললেন, খপর দিতে।

লীনা কহিল—ডেকে আন্।

অজিত আসিল। লীনা ইজিচেয়ারে তেমনি হেলিয়া বসিয়া রহিল। মন একান্ত শ্রান্ত…অনিন্দ্যার ভাগ্য অনুসরণ করিয়া তাহারি কাছে পড়িয়াছিল। তার ব্যথার রেশে লীনার মন এখনো কাতর!

অজিতকে দেখিয়া লীনা কহিল—আসুন।

বসিবার জন্য আসন ছিল না! অজিত চারিদিকে চাহিয়া ইজিচেয়ারের পাশে একেবারে লীনার চরণ-প্রান্তে বসিয়া পড়িল।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া লীনা কহিল—ও কি! পায়ের কাছে বসলেন কেন?

হাসিয়া অজিত কহিল,—দোষ কি?

লীনা ডাকিল,—বাসি…

দাসীর নাম বাসি। বাসি আসিল। লীনা কহিল—ও-ঘর থেকে একখানা চেয়ার এনে দে!

অজিত কহিল—চেয়ারে কি দরকার! দিব্যি ঠাণ্ডা মেঝে…খাশা বসেছি।

লীনা কহিল—তা বলে পায়ের কাছে বসবেন না। উঠে বসুন। চেয়ার থাকুক—তুই যা বাসি…

বাসি চলিয়া গেল।

অজিত কহিল—এমন জ্যোৎস্নার আলো! এর উপরে বিজলী-বাতি জ্বেলে বসেচেন! জ্যোৎস্নাকে এভাবে লজ্জা দেবার কারণ?

হাসিয়া লীনা কহিল—একখানা বই পড়ছিলুম।

—কি বই?

লীনা কহিল—একটা বাঙলা নভেল।

—দেখি, কোন্ নভেলের এমন ভাগ্য…

লীনা বইখানা বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।

অজিত লক্ষ্য করিল, কহিল—দেখবার যোগ্য আমি নই?

—না, না—তা নয়। বাজে বই। কোনো নামজাদা লেখকের লেখা নয়।…লাইব্রেরী থেকে ওরা এনেছিল…

—দেখি না!…আমি পেটুক হলেও সাহিত্যের খবরা-খবর একটু রাখি।

অজিত হাত বাড়াইল। লীনা তার হাতে বই দিল।

দেখিয়া অজিত কহিল—গগন বিশ্বাসের "বিশুষ্ক মরু"! নাম আছে। লেখক নামজাদা না হলেও অচিরে এঁর নাম নামজাদাদের নামগুলোকে ঢেকে দেবে!…

অজিত অন্যমনস্কভাবে বইখানার পাতা উল্টাইতে লাগিল।

লীনা কহিল—এত দেরী যে?

অজিত কহিল—হ্যাঁ, অপরাধ হয়ে গেছে। সেজন্য ক্ষমা চাইছি।

লীনা কহিল—ভুলে গেছলেন বুঝি, এখানে খাবার কথা আছে?

অজিত কহিল—ভুলিনি। আপনার হাতের দান—ভুলবো? অসম্ভব! তা নয়। সন্ধ্যার আগে গৃহিণী ভীষণ জেদ ধরলেন, তাঁকে নিয়ে বায়োস্কোপে যেতে হবে। একখানা বিলিতি ছবি তাঁর বান্ধবীরা দেখে এসে পঞ্চমুখে প্রশংসা করেচেন—সে ছবি না দেখলে তাঁর আর অস্বস্তির সীমা থাকবে না।—আজ খাবার শুক্রবার—লাষ্ট চান্স—তাই তাঁকে বহন করে বায়োস্কোপে যেতে হলো। একটা নিশ্বাস। সে নিশ্বাস চাপিয়া লীনা কহিল—এ দুর্ভোগ যদি করলেন, না হয় আমাকেও একটা খপর দিতেন! সঙ্গে যেতুম।

অজিত কহিল—যেতেন?

লীনা কহিল—যেতুম বৈ কি! ঐ একটি জিনিষ আছে, যাতে সব দুঃখ ভুলে থাকি।

—বটে!

কথার সঙ্গে সঙ্গে অজিতের দুই চোখের দৃষ্টি কৌতূহলে ভরিয়া উঠিল।

লীনা কহিল,—তাই দেখি আর পাঁচজনের ভাগ্য, আর আমার ভাগ্য! তারা যা চায়, ভগবান তা দেন। আমারি ভাগ্যে শুধু ঘরের কোণে পড়ে হাঁফিয়ে মরা সার হয়। বায়োস্কোপ দেখতে এত ভালো লাগে…রাধদাকে বলি—রাধদা সে-কথা কাণেও তোলে না। কদিন আগে একবার নিয়ে গিয়েছিল…সে যেন এক যুগ।

অজিত কহিল,—ক্ষমা করবেন,—আমি জানতুম না। আজ জানলুম। বেশ, যেদিন বলবেন, নিয়ে যাবো। রাধুকেও আগে থেকে বলে রাখবেন। নাহলে জানেন তো তার স্বভাব। আমরা যখন তাকে খুঁজে মরচি কলকাতায়, সে হয়তো তখন কোয়েট্টা ফোর্টে দাঁড়িয়ে আফ্রিদীদের ছাউনি দেখতে মত্ত! চিরদিন এক রকমে কাটলো! স্বভাব একটু বদলালো না!…শুনেচি, ওর স্ত্রী যেমন রূপে, তেমনি গুণে—অথচ দুজনে কোনো সম্পর্ক নেই! ভাবুন তো, কি অনাসৃষ্টি ব্যাপার! তা, রাধু যাবে তো?

লীনা কহিল—নাই গেল!…আমি একলা যাবো। আপনি নিয়ে যেতে পারবেন না?

অজিতের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সে কোনো কথা বলিল না, বলিতে পারিল না।

লীনা তার ভঙ্গী দেখিয়া হাসিল; হাসিয়া বলিল—না হয় আপনার স্ত্রীর সঙ্গেই নিয়ে যাবেন—তাঁর সখী কিম্বা পরিচারিকা সাজিয়ে…

অজিত কহিল—কি যে আপনি বলেন!

লীনার পানে অজিত চাহিয়া দেখিল। লীনার চোখে কৌতুকের তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ-শিখা!

রহস্যময়ী লীনা! এ কয়দিনের অন্তরঙ্গতায় লীনার

কি বিচিত্র মূর্ত্তিই সে চোখে দেখিতেছে! এ মূর্ত্তিগুলার মধ্যে তার আসল মূর্ত্তি যে কি…

লীনা কহিল—তার আগে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করবার দরকার হবে না?…কিন্তু মুস্কিল কি, জানেন? আমাকে কেউ বুঝতে পারলো না! না, নিজের আত্মীয়-বন্ধুরা, না, বাহিরের অপরিচিত অনাত্মীয়েরা!

কথায় আবার সেই হেঁয়ালি। এ হেঁয়ালি অজিত বহুদিন লক্ষ্য করিয়াছে…কিন্তু সে হেঁয়ালি লীনা বুনিত রাধুকে কেন্দ্র করিয়া…অজিত ছিল সে হেঁয়ালি-নাট্যের দর্শক মাত্র!

একটা কথা কয়দিন ধরিয়া অজিতের মনে জাগিতেছিল—সে কথার পিছনে অজস্র প্রশ্ন!

অজিত কহিল—একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?

লীনা কহিল,—বলুন…

অজিত কহিল—আপনার স্বামী থাকেন আসামে। তিনি…

বাধা দিয়া লীনা কহিল—আসামে থাকতেন। সম্প্রতি এখানে এসেচেন চিকিৎসার জন্য…

কুতূহলী বিস্ফারিত নেত্রে অজিত কহিল,—ক'দিন আসচি, যাচ্ছি, তাঁর সঙ্গে কৈ…

কথা শেষ না করিয়া এইখানেই থামিল।

লীনা কহিল,—না। এ বাড়ীতে তিনি থাকেন না। এ হলো দূর সম্পর্কের সম্বন্ধী রাধদা—তার বাড়ী।… এ সম্পর্কও এক রকম জোর করে টেনে গড়া…নাহলে রাধদার সঙ্গে আমার এমন কিছু সম্পর্ক নেই। রাধদা হলো আমার খুড়িমার ভাইপো!

অজিত কহিল,—কিন্তু বললেন আপনার স্বামী থাকেন অন্যত্র…তাঁর অসুখ…চিকিৎসার জন্য! আর আপনি…

হাসিয়া লীনা কহিল,—সতী-সাধ্বীর উচিত কাজ নয়—এই কথা বলতে চান? কি করবো, বলুন? আমার মনকে ভগবান যে কি ছাঁচে গড়েচেন—আমি নিজেও সে ছাঁচের কোনো সন্ধান পেলুম না আজ পর্য্যন্ত!…কিন্তু সে কথা নয়। আসলে আমার স্বামী আমাকে দেখতে পারেন না। তিনি এক রকমের মানুষ। বইয়ের আদর তাঁর কাছে এত বেশী যে, বৌয়ের সাধ্য নেই সে বইয়ের আড়াল সরিয়ে পাশে ঘেঁষবে! পারলুম না এত দিনের চেষ্টাতেও…

কথার শেষে লীনা মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিল। অজিত হতভম্বের মত বসিয়া রহিল। তার দুই চোখের দৃষ্টি লীনার মুখে নিবদ্ধ।

সে ভাবিতেছিল, এই রূপসী কিশোরী—এমন বাক্‌-পটুতা, এমন বুদ্ধি লইয়াও স্বামীর দরবারে দাঁড়াইতে পারিল না! কেমন সে স্বামী? কিম্বা কি দুষ্প্রাপ্য-দুর্লভের পিয়াসী এই লীনা…যে, তার মনের পিপাসা মিটাইবে, এমন অমৃত স্বামীর ভাণ্ডারে নাই?…

লীনা চুপ করিয়া বসিয়াছিল—চোখের উদাস দৃষ্টি ঊর্দ্ধে আকাশে প্রসারিত। তার পানে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে নিজের অজ্ঞাতে অজিত বলিয়া ফেলিল,—সত্যি, আপনার কথা শুনে বড় ব্যথা পেলুম।…বাঙালীর ঘরে আপনার মত মেয়ে চোখে আমি কখনো দেখিনি। এমন বুদ্ধি—এমন social…আর আপনি…

মৃদু হাস্যে লীনা কহিল,—আমার কথা ছেড়ে দিন। আমার সকলি অনাসৃষ্টি! সকলে জানে, আমার সব মন্দ। আমার আর ও-সব মনে লাগে না—সয়ে গেছে। এই পাথরের মেঝে যেমন দেখচেন—প্রাণহীন পড়ে আছে, যে-খুশী তাকে মাড়িয়ে চলেছে—আমার মনও এর মত। যে যা খুশী বলুক—ভালো কথা, মন্দ কথা—আমার কাছে ভালো-মন্দ দুয়েরই এক দাম!…ও কথা ছেড়ে দিন। আপনি আপনার কথা বলুন। স্বামি-স্ত্রীতে দুজনে দেখে এলেন বায়োস্কোপ! ছবি দেখতে দেখতে দুজনে সমালোচনা করেন? খুব তর্ক হয়?…সত্যি বলুন…ও জিনিষ আমার জানা নেই…আর পাঁচজন স্বামি-স্ত্রীর বাক্‌-বিতণ্ডার কথাও আমার খুব ভালো লাগে। সে করে আমার দিন আমি কাটিয়ে চলেছি! আচ্ছা, আপনাদের স্বামি-স্ত্রীতে খুব মনের মিল?

পৃথিবীর চেহারাখানা যেন বদলাইয়া গেল! এ যেন সত্যকার পৃথিবী ছাড়িয়া অজিত কোন্ অজানা কল্প-লোকের মাটীতে আসিয়া পা দিয়া দাঁড়াইয়াছে! এ যেন সেই আরব রজনীর কাহিনী! পথের পথিককে ডাকিয়া আনিয়া রূপসী শাহজাদী নিজের মর্ম্মবেদনার করুণ কাহিনী শুনাইতেছে!

লীনা কহিল,—বলুন না! লজ্জা কি এতে? এই তো দুনিয়ার নিয়ম, দেখি। স্বামি-স্ত্রী পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি বাস

করে। শুধু আমাদের দু'জনের বেলায়···রাধদা আর আমি—আমাদের দু'জনকে বিধাতা ডান হাতে সৃষ্টি না করে বাঁ হাত দিয়ে গড়েচেন, বোধ হয়! না হলে এমন স্বামি-স্ত্রী কেন হবো আমরা?···আপনি আপনাদের কথা বলুন। আপনাদের স্বামি-স্ত্রীতে খুব ভাব?

একটা ঢোঁক গিলিয়া অজিত বলিল,—ভাবের অভাব নেই। হাসি-গল্প যেমন করি, তেমনি আবার বিরোধও খুব হয়।

—তা তো হবেই। অমাবস্যা না থাকলে পূর্ণিমার আদর হবে কেন? একেই বলে প্রেমের লীলা-ছন্দ। দু'চরণে মিল নেই—আবার কোথাও দু'চরণে মিল—এতে কবিতার বৈচিত্র্য বলুন, মাধুর্য্য বলুন—চমৎকার খোলে।

কথাগুলা চমৎকার! প্রণয়ের স্বপ্নে বিভোর হইয়া স্ত্রীর সঙ্গে নিজের দিন যত স্বচ্ছন্দে কাটুক—অজিতের মনে হইল, তাহাতে কি প্রাণ আছে? সেই রুটীনে বাঁধা জীবন··· এক স্রোতে বহিয়া চলিয়াছে···নিত্য সেই এক পথে··· বৈচিত্র্যহীন গতিতে! তার চেয়ে···

পিপাসার এই উগ্রতা···

যেন মরুর বুকে ওয়েসিস! ইহাতে প্রাণ আছে!—রেলে চড়িয়া কলিকাতা হইতে সমরখন্দ যাও—বাসায় ফেলিয়া শুইয়া—নিতান্ত নির্জীব অলস অভিযান!

লীনা কহিল,—আর পাঁচ জন স্বামি-স্ত্রীর কথা শুনতে আমার এত ভালো লাগে···ভাবি, আমার যদি এমন হতো, আমি এই রকম করতুম! কিন্তু কি বাজে বকচি, বলুন তো আপনাকে নিয়ে! রাত হয়ে গেছে, আপনার খাওয়া হয়নি···

মিনতির স্বরে অজিত কহিল,—থাকগে খাওয়া···এ আমার খুব ভালো লাগচে! আপনি গল্প করুন—খাওয়ার জন্য ভাবতে হবে না।

—তাও কি হয়? বলিয়া লীনা উঠিয়া পড়িল, এবং পনেরো মিনিটের মধ্যে···

আহারের পর অজিত কহিল,—আপনি খেয়ে নিন্—তার পর বসে বসে গল্প করবো'খন।

লীনা কহিল,—ফিরতে খুব বেশী রাত হলে বাড়ী ফিরে বৌয়ের কাছে কি জবাবদিহি করবেন?

অজিত কহিল,—কোনো জবাবদিহির দরকার হবে না। তার এখন ঘুমের তৃতীয় অঙ্ক চলেছে—জমজমাট!

—খুব ঘুম-কাতুরে বুঝি?

—ভয়ঙ্কর! এক এক সময় বলি, কুম্ভকর্ণ মারা যাবার সময় তার চোখের যত ঘুম কি তোমার নামে দানপত্র লিখে দিয়ে গেছে!

লীনা হাসিল।

অজিত কহিল,—আপনি যান, খেয়ে আসুন···

লীনা কহিল,—আমি খাবো না···আমার শরীরটা ভালো নেই।

কথাটা বলিয়া নিজের বাঁ হাতের মণি-বন্ধ সে ডান হাতে চাপিয়া ধরিল।

অজিত কহিল,—জ্বর হয়েচে? দেখি হাত···

লীনার বাঁ হাতের মণি-বন্ধ অজিত নিজের হাতে চাপিয়া ধরিল।

লীনা কহিল,—আঃ! কি করেন···

অজিত হাত ছাড়িল না; কহিল,—নাড়ী দেখতে আমি জানি। মেডিকেল কলেজে পড়েছিলুম তিন বৎসর। তার পর তারা ফোর্থ ইয়ারের দরজা রাখলো কষে বন্ধ করে। অনেক টানাটানি করেও সে-দোর খুলতে না পেরে ফিরে এসেছি···হ্যাঁ, জ্বর একটু হয়েচে!···মাথা ধরেছে?

লীনা কহিল,—না।

—না কি! নিশ্চয়ই হবে মাথা। দেখি···বলিয়া অজিত লীনার দুই রগ টিপিয়া ধরিল।

ঝাঁকিয়া মাথা নাড়িয়া লীনা কহিল,—আপনি দেখচি ভারী জ্বালাতন করলেন!

লীনার দুই চোখে স্বপ্নময় আবেশ! জ্বরের মত স্পর্শে চোখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে···

কি তাহাতে মোহ!

অজিত স্থির দৃষ্টিতে লীনার পানে চাহিয়া কহিল,—আপনি এই ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়ুন···বাড়ীতে ল্যাভেণ্ডার কিম্বা ও-ডি-কলোন আছে নিশ্চয়?

অপাঙ্গ দৃষ্টিতে হাসির মৃদু ঝলক! লীনা কহিল,—কেন? ল্যাভেণ্ডার নিয়ে কি হবে?

—আপনার কপালে পটী দেবো···এখনি আরাম বোধ করবেন। উত্তাপের তাতে জ্বর করেচেন—নিশ্চয়।

লীনা কহিল,—কিছু করতে হবে না আপনাকে বাড়ী যান। অনেক রাত হয়েছে।

অজিত কহিল,—হোক রাত। আমি দুগ্ধপোষ্য শিশু নই—যে রাত হলেই বিছানায় শুইয়ে দেবেন। আপনি আনবেন না ল্যাভেণ্ডার?

—আপনি বড় বিরক্ত করেন! নাঃ!…কি করি, বলুন? দায়। আপনি আমার অতিথি…

ও-ডি-কলোঁর শিশি ছিল পাশে রাধাবিনোদের ঘরে আরসির টেবিলের উপর।

লীনা শিশি আনিল; সেই সঙ্গে আনিল ছোট একটি পেয়ালা ভরিয়া জল।

অজিত কহিল,—আপনি ইজি চেয়ারে শুয়ে পড়ুন…

লীনা তাহাই করিল। অজিত তার পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া রুমালের পাড় ছিঁড়িয়া পেয়ালার জলে ভিজাইয়া লীনার কপালে সেই সিক্ত রুমাল সযত্নে চাপিয়া ধরিল।

লীনার দুই চোখ অর্দ্ধ-মুদ্রিত…অজিত কহিল,—আরাম পাচ্ছেন?

সনিশ্বাসে লীনা জানাইল,—খুব।

অজিত হাত সরাইল না।

লীনা নিশ্বাস ফেলিল, ফেলিয়া কহিল,—নিশুতি রাত… কোথাও কেউ নেই—আপনার এ কাণ্ড দেখলে লোকে কি ভাববে, বলুন তো?…

অজিতের হাত কাঁপিল। লীনার নিশ্বাসের তপ্ত বায়ু তার কর-তলে লাগিতেছে!…

একটা ব্যর্থ জীবনের যত তাপ, যত দাহ যেন নিশ্বাসের সে বাতাসে…

সহসা পিছনে রাধাবিনোদের স্বর কি হচ্ছে তোমাদের?

চমকিয়া হাত সরাইয়া অজিত পিছনে ফিরিল। লীনা চক্ষু মুদিল—তার কপালে ও-ডি-কলোঁর পটী।

রাধাবিনোদ কহিল, অসুখ করেছে না কি?

অজিত কহিল,—জ্বর। তার উপর আতিথ্য-ধর্ম্ম পালনের জন্য রান্নাবান্না করেছেন।

—হুঁ!

রাধাবিনোদ দাঁড়াইয়া রহিল। চোখ মেলিয়া লীনা রাধাবিনোদের পানে চাহিল, তার পর ডাকিল, অজিত বাবু…

অজিত কহিল,—ডাকচেন?

তার বুকের মধ্যে অস্থি-পঞ্জরগুলা পর্য্যন্ত প্রচণ্ড দোলায় দুলিতেছে!

লীনা কহিল,—মাথা খসে যাচ্ছে—পটীটা তেমনি করে চেপে ধরে থাকুন তো।…তুমি শুতে যাও রাধ্‌দা…সারা দিন খেটে-খুটে এসেচো! অজিত বাবু ডাক্তারী পড়েচেন, তা কখনো শুনিনি। কি আরাম যে দিয়েচেন…আঃ! সত্যি বলচি। আপনাকে আজ ছাড়চি না।—যত রাত্তিরই হোক—আমার মাথা-ধরা সারিয়ে তবে আপনি বাড়ী যেতে পাবেন। ক্রমশঃ

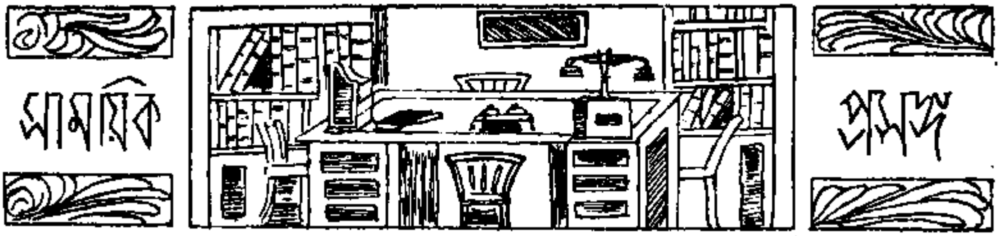
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

রক্তাল্পতা ও তাহার প্রতিকার

বাস্তবিকপক্ষে স্বাস্থ্যহীন জাতির উন্নতিলাভ অসম্ভব। যে সমস্ত উৎকট রোগ বর্ত্তমানে সামাজিক উন্নতির প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, রক্তহীনতা রোগ তাহাদের মধ্যে অন্যতম। এই রোগ পুরুষ অপেক্ষা মাতৃজাতির মধ্যেই বেশী প্রকট। বহুদিনব্যাপী ম্যালেরিয়া, টায়ফয়েড, ইনফ্লুয়েঞ্জা ও অন্যান্য দুর্ব্বলকর রোগভোগ, রক্তক্ষয়, অতিরিক্ত পরিশ্রম অথচ উপযুক্ত পুষ্টিকর আহারের অভাব, অমিতাচার প্রভৃতি নানাকারণে এই রোগ হইতে পারে। স্ত্রীলোকের মধ্যে অতিরিক্ত রক্তস্রাব, অল্পবয়সে বিবাহ, পুনঃ পুনঃ সন্তানপ্রসব, শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর প্রভৃতি কারণে এই রোগ হইতে দেখা যায়। সম্প্রতি লণ্ডনের রয়েল ফ্রি হাসপাতালের চিকিৎসকবৃন্দ বহুপরীক্ষার পর স্থির করিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে মেয়েদের মধ্যে গর্ভাবস্থায় এবং প্রসবের পর যে রক্তাল্পতার প্রকোপ দেখা যায়, তাহার প্রধান কারণ হইতেছে—পাকস্থলী হইতে উপযুক্তমত হজমকারক রস উদ্ভবের অভাব। যাহাদের এই রস নিয়মিতভাবে উদ্ভূত হয়, তাহাদের মধ্যে গর্ভাবস্থায় বা প্রসবের পর এই রোগ দেখা যায় না। এই রোগের পরিণাম অতি ভীষণ। ইহা জীবনকে বিষময় করিয়া তোলে। অনেক ক্ষেত্রে, এমন কি, যক্ষ্মারোগে পরিণত হইতে পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে।

এই রোগে পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। দুগ্ধ, ঘৃত, মাংস, তাজা শাকসব্জী ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে খাওয়া উচিত। কারণ, পাকস্থলী হইতে উপযুক্তমত হজমকারক রস নির্গত হইলেও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব বশতঃ কোন কোন গর্ভবতী স্ত্রীলোকের রক্তাল্পতা রোগ হইতে দেখা গিয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুনির্ব্বাচিত ঔষধের দ্বারা দ্রুত ও কার্য্যকর ফল পাওয়া যায়। রুচিটোন প্রকৃতিজাত দ্রব্য এবং মহোপকারী ধাতু সমূহে গঠিত বলিয়া একটি মহোপকারী মৃদু উত্তেজক টনিক। রুচিটোন যে কেবল দেহের ওজন ও ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, তাহা নহে, পরন্তু ইহা শরীরে নবরক্তকণিকা দ্রুত বৃদ্ধি করিয়া রক্তকে সতেজ করে, এবং শরীরে নববল ও নূতন জীবনীশক্তির সঞ্চার করে।

ডাঃ আর, এম, চৌধুরী, এম, বি।



সংবাদ প্রকাশ নিষেধ

ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিকে কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ সুনজরে দেখেন না, এইরূপ বিশ্বাস এ দেশের লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে। তাঁহারা সংবাদ-পত্রগুলির সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিও উপেক্ষা করেন না। মানুষমাত্রেরই ভুল-ভ্রান্তি ঘটে, সংবাদপত্র-লেখকরাও মানুষ, তাঁহারাও যে ভ্রম-প্রমাদের অধীন হইবেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? কাজেই সংবাদপত্র-লেখকদিগের কখনও না কখনও একটা না একটা ভুল হইয়াই পড়ে। সেই ভুলের জন্য শাসন বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ যদি সংবাদপত্র-লেখকদিগকে কঠোরভাবে শাস্তি দেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে সংবাদপত্রগুলিকে বিশেষ সুনজরে দেখেন, তাহা কেহই মনে করিতে পারেন না। সংবাদপত্রগুলির উপর ত' আইনের খড়্গ সদাই উদ্যত রহিয়াছে, তাহার উপর যদি মধ্যে মধ্যে সরকার সংবাদপত্রগুলির উপর বিশেষ আদেশ জারি করেন যে, তাঁহারা কোন কোন বিষয়ে কোন সংবাদ প্রকাশ করিতে পারিবেন না, তাহা হইলে যেন স্বতঃই মনে হয় যে, সংবাদপত্রগুলিকে অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখাই সরকারের উদ্দেশ্য। এবার ডেটিনিউ দিবসের পূর্ব্বদিন সরকার আচম্বিতে এইরূপ এক আদেশ জারি করেন যে, সংবাদপত্রগুলি আটক আসামীদিগের জন্য ডেটিনিউ দিবসে যে সমস্ত সভাসমিতি হইবে, তাহার কোন সংবাদ এবং বিবরণ প্রকাশ করিতে পারিবেন না। এইরূপ আদেশ দ্বারা যে সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতা বিশেষভাবে সঙ্কুচিত করা হইয়াছে, তাহা নহে, অধিকন্তু সংবাদপত্রগুলির নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনে বাধা জন্মান হইয়াছে। ডেটিনিউ বলিতে যাহারা বিনা বিচারে সরকার কর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়াছে, তাহাদিগকেই বুঝায়। প্রকাশ্য আদালতে যাহাদিগের অপরাধের বিচার করা হয় নাই এবং যাহাদিগকে আত্মপক্ষসমর্থন করিবার যথেষ্ট অবকাশ দেওয়া হয় নাই, তাহারা সরকার কর্ত্তৃক আটক হইয়াছে বলিয়াই যে অপরাধী, এ কথা যদি সকলে মনে না করিতে পারে, তাহা হইলে কি লোককে দোষ দেওয়া যায়? বিনা বিচারে কাহাকেও দোষী বলিয়া সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে।

সরকারের এইরূপ আদেশ জারি করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ কি থাকিতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। আটক আসামীদিগকে এবং তাহাদের প্রতিপাল্য ব্যক্তিদিগকে অর্থ-সাহায্য করিবার উদ্দেশে সভাসমিতি এবং জনসাধারণের নিকট আবেদন-নিবেদন করিবার জন্য ঐ দিন নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেই সমস্ত সভা-সমিতির বিবরণ প্রকাশ করাই সরকার কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে। সভাসমিতি করিয়া তাহাদিগের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা নিষিদ্ধ হয় নাই। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, আটক ব্যক্তিদিগের সাহায্যকল্পে সভাসমিতি কিম্বা বক্তৃতা করা সরকারের মতে দোষাবহ নহে, কেবল ঐ সম্বন্ধে সংবাদ প্রকাশ করাই সরকারের মতে দোষাবহ। ইহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝা কঠিন। সভাসমিতির বিবরণও সংবাদ। সরকার বলিতেছেন যে, আটক আসামী ও তাহার পোষ্যবর্গের জন্য সরকার যথাযোগ্য অর্থ-সাহায্য করিতেছেন; কিন্তু সে সাহায্যব্যবস্থা যে পর্য্যাপ্ত নহে, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এরূপ অভিযোগ প্রায়ই শুনা গিয়াছে যে, অনেক স্থলে আটক আসামীদিগের পোষ্যবর্গের অর্থাভাবে বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। এখানে একটা কথা বিশেষভাবে বলা আবশ্যক। যদি তর্কের অনুরোধে এ কথা স্বীকার করা যায় যে, প্রত্যেক আটক আসামীই সত্য সত্য দোষী, তাহা হইলেও কি সে জন্য তাহাদের পোষ্যবর্গকে দায়ী করা সঙ্গত? অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অনেক পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা, ভগিনী লোককে অপরাধ করিতে নিষেধ করে। কিন্তু যাহারা অপরাধ করে,—তাহারা কি সেই নিষেধবাক্য শুনিয়া থাকে? অনেকে এই কথা তাহাদের আত্মীয়-স্বজনকে জানিতে দেয় না। চোর-ছ্যাঁচোড়, গুণ্ডা-লম্পট প্রভৃতির পোষ্যবর্গ জানিতে পারিলে তাহাদিগকে কুকার্য্য করিতে বা কুবৃত্তি ধরিতে নিষেধ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে শতকরা দুই এক জন ভিন্ন অন্যে সে নিষেধ-বাক্য শুনে না। হিংসামূলক বিপ্লবপন্থীরাও কাহারও কথা শুনে না। কুপথের প্রলোভনই এইরূপ। সুতরাং হিংসাপন্থী বিপ্লব-বাদীদিগের হতভাগ্য পোষ্যবর্গের জন্য অর্থ-সাহায্য করা কোন-মতেই অন্যায় বলিয়া মনে হয় না। সরকারও তাহা মনে করেন না। তাঁহারা যদি তাহা মনে করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা উহাদিগকে সাহায্য করা বা সাহায্য করিবার জন্য সভা করা নিষিদ্ধ করিয়া দিতেন। সরকার স্বীকার করিয়াছেন যে, ঐরূপ সাহায্যদান লোকহিতৈষণামূলক কার্য্য। সরকার সেই জন্য উহাদের জন্য যথাযোগ্য সাহায্যদান করিতেছেন। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে ঐ সম্বন্ধে সংবাদ প্রকাশ সরকার নিষেধ করিয়াছিলেন কেন? ইহাতে কি প্রকারান্তরে ঐ জনহিতৈষণার কার্য্যে বাধা দেওয়া হয় নাই? সরকার পক্ষের বিশ্বাস, ঐরূপ সাহায্যদান বিপ্লবপন্থীদিগকে উৎসাহিত করিবে। আমরা সে কথা স্বীকার করিতে পারি না। ঐ সকল বিপ্লবপন্থীর মধ্যে অত্যন্ত অধিকসংখ্যক লোক এতই বিকৃতমস্তিষ্ক যে, তাহারা তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন এবং পোষ্যবর্গের উপর কোনরূপ মমত্ব বোধ বা দায়িত্ব অনুভব করে না। তাহা যদি করিত, তাহা হইলে তাহারা কখন ঐরূপ গর্হিত কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারিত না। সরকারের এই কার্য্য অসঙ্গত মনে করিয়া জার্ণালিষ্ট এসোসিয়েসন গত ৭ই জ্যৈষ্ঠ সমস্ত সংবাদপত্র বন্ধ রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মহাসম্মেলন

গত ৫ই এবং ৬ই জ্যৈষ্ঠ যশোহর জিলার ঝিনাইদহ নামক গণ্ডগ্রামে নিখিল বঙ্গীয় অনুন্নত লোকদিগের এক মহাসম্মেলন হইয়া গিয়াছে। বঙ্গের নানা স্থান হইতে কয়েক জন করিয়া অনুন্নত

জনের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। উকিল শ্রীযুত রজনীকান্ত দাস এই সম্মেলনের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ আমরা যাহাদিগকে অনুন্নত সম্প্রদায় বলিয়া অভিহিত করিতেছি, তাহাদিগকে ঐ নামে কেন অভিহিত করা হইতেছে, তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না। সরকার উহাদিগকে Depressed caste বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন,—সেই জন্য আমরা সরকারের সুরে পোঁ ধরিয়া উহাদিগকে দলিত, দমিত, অবনমিত এবং অনুন্নত জাতি বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি। কিন্তু উহাদিগের ঐ নামের সার্থকতা আছে কি না, তাহা ভাবিয়া দেখি না। বাঙ্গালায় আজকাল সরকারের অভিধানে যাহারা অনুন্নত বলিয়া কথিত, তাহারা যে অস্পৃশ্য, এ কথা বলা যায় না। এই অঞ্চলে অস্পৃশ্য জাতি অল্পই আছে। একমাত্র নমঃশূদ্র জাতি ভিন্ন উহাদের সংখ্যা অতি অল্প। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি জাতি আছেন, যাঁহাদের আর্থিক অবস্থা অনুন্নত। তাঁহাদের সেই অনুন্নতির হেতু বা মূল কারণ কি, তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না। উহা যে আর্থিক, তাহা একটু ভাবিলেই বুঝা যায়। অর্থাভাবে উহারা বিদ্যাশিক্ষা করিতে পায় না। প্রাচীনকালে এই সকল জাতি প্রধানতঃ শিল্পজীবী ছিল। সে শিল্প নষ্ট হইয়া গিয়াছে কি কারণে?—পাশ্চাত্য শিল্পের প্রতিযোগিতায়। কিন্তু মিশনরীরা শিখাইয়াছেন যে, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তাহাদিগকে এইরূপ হীনাবস্থ করিয়া রাখিয়াছে, আমরা অবিচারিতচিত্তে তাহাই মানিয়া লইতেছি। যাহা হউক, এই প্রকারে সমাজে ভেদনীতি বপন করিবার জন্য যখন জমি প্রস্তুত হইয়াছে, তখন সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনরূপ ভেদের বীজ এই হিন্দু সমাজে উপ্ত হইয়াছে। তখন উহা দ্রুত বর্দ্ধিত হইবার লক্ষণ প্রকটিত করিতেছে। সেই জন্য যশোহর ঝিনাইদহে এই সম্মেলনের আয়োজন হইয়াছে। এই সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুত রজনীকান্ত দাস যে অভিভাষণ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। তিনি বলিয়াছেন যে, সরকার ভারতের শাসনযন্ত্র সংস্কৃত করিবার জন্য যে 'ইণ্ডিয়া বিল'খানি রচনা করিয়াছেন, অনুন্নত সম্প্রদায় তাহা গ্রাহ্য করিতে সম্মত নহেন। উহা বর্জ্জনীয়। দ্বিতীয়তঃ তিনি প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং পুণা চুক্তির সন্তোষজনকভাবে সংশোধন করিবার কথা বলিয়াছেন। সম্মেলনও ঐ প্রস্তাবগুলি গ্রাহ্য করিয়া লইয়াছেন। ইহাতে মনে হইতেছে যে, এ ক্ষেত্রে ভেদনীতি তেমন সুফল প্রসব করিতে নাও পারে। কিন্তু আর কিছুদিন অপেক্ষা না করিলে ব্যাপারটা কিরূপ দাঁড়ায়, তাহা বুঝা যাইতেছে না। কারণ, ভেদনীতির বীজ যেখানে একবার পড়ে, সেখানে উহা কচুরী পানার মত সমস্ত স্থান আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। কারণ, স্বার্থভেদবুদ্ধির উদ্ভব করাই উহার উদ্দেশ্য। কিন্তু হিন্দুরা যদি বুঝিতে পারে যে, হিন্দুসমাজকে অখণ্ড রাখিতে পারিলে এই দেশে তাহারা আপনাদের অস্তিত্ব বিশেষভাবে রক্ষা করিতে পারিলেই তাহাদের মঙ্গল, তাহা হইলেই এই জাতি স্থায়িত্বলাভ করিবে, নতুবা মিশরের প্রাচীন জাতিদিগের ন্যায় তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইবে। সেই জন্য আমরা ঝিনাইদহ অনুন্নত সমাজের মহাসম্মেলনের সিদ্ধান্তে বিশেষ সন্তুষ্ট।

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের বক্তৃতা

অধ্যাপক শ্রীযুত বিনয়কুমার সরকার ঝিনাইদহ সম্মেলনের অর্থনীতি শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। অর্থনীতি শাস্ত্রে তাঁহার ব্যুৎপত্তি আছে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তিনি তাঁহার অভিভাষণে বার্ত্তাশাস্ত্রের কথা বিশেষভাবে না বলিয়া হিন্দুর সমাজতত্ত্বের কথা বলিতে যাইয়া আপনার সাম্প্রদায়িক ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। অনুন্নত জাতির তিনি একটা সংজ্ঞা দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, উহা বার্ত্তা-শাস্ত্রের বিষয় নহে। তিনি বলিয়াছেন যে, যে জাতি বংশ-বিশেষে জন্মহেতু কতকগুলি অসুবিধা ভোগ করে, সে জাতি অনুন্নত। কিন্তু বার্ত্তাশাস্ত্রমতে যে জাতি বা ব্যক্তি যত দরিদ্র, সে জাতি বা ব্যক্তি তত অনুন্নত। কারণ, অর্থের অভাবে সে জাতি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের মানদণ্ড উচ্চ রাখিতে পারে না। উচ্চবংশে জন্মিলেও হিন্দুসমাজে লোকদিগকে কতকগুলি বিশেষ অসুবিধা



শ্রীযুত বিনয়কুমার সরকার

ভোগ করিতে হয়, আবার অন্য বংশে জন্মিলেও লোককে কতকগুলি করিয়া বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কাহাদের অসুবিধা ও সাধনা অধিক কষ্টসাধ্য, সে কথা লইয়া তর্ক করিবার স্থান ইহা নহে। সুতরাং ঐ সংজ্ঞা অনুসারে কে উন্নত, কে অবনত, তাহা ঠিক করা সহজ নহে। বিনয় বাবু কিন্তু উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগের গুণগুলি একেবারেই বলেন নাই। উচ্চবর্ণ হিন্দুদিগের উপর মর্মান্তিক বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "যদি

কাউন্সিলের এবং এসেমব্লির সমস্ত হিন্দুদিগের আসনগুলি অনুন্নত সমাজের লোকদিগকে প্রদান করা হয়, অথবা যদি তাহারা স্বাধীনভাবে ঐ সকল আসন দখল করে, কিম্বা যদি কয়েক লক্ষ উচ্চ বর্ণের হিন্দুকে একেবারে ধুইয়া মুছিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলেও বাঙ্গালার কৃষ্টি এবং ঋদ্ধি বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হইবে না, বরং বৃদ্ধি পাইবে।" বিনয় বাবু য়ুরোপের বহু দেশ দেখিয়াছেন। তিনি যে সাম্প্রদায়িকভাবে আত্মহারা হইয়া এইরূপ হাস্যজনক কথা বলিবেন, তাহা আমরা মনে করিতে পারি নাই। বাঙ্গালার কৃষ্টি এবং উহার বৈশিষ্ট্য কি, অধ্যাপক সরকার তাহা কিছুমাত্র অবগত আছেন কি? সে কৃষ্টি সম্বর্দ্ধনের জন্য অতি নিম্নবর্ণের লোকরা কতটা সহায়তা করিয়াছে, তাহা ভাবিবার মত বিদ্যা তাঁহার মগজে আছে কি? হিন্দু জাতির, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগের বৈশিষ্ট্য কি, সভ্যতার স্বরূপ কিরূপ, তাহার সম্বন্ধে ম্যাগাস্থিনিস হইতে বর্ত্তমান যুগের অধ্যাপক ষ্টার্ণার পর্য্যন্ত কি বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার পড়াও উচিত ছিল। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মার্কো পলো লিখিয়া গিয়াছেন—You must know that these Brambins are the best merchants in the world and the most truthful, they would not tell a lie for anything on earth. ইহার অর্থ, "তোমরা নিশ্চয় জানিবে যে, ঐ সকল ব্রাহ্মণ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যবসায়ী এবং অতিশয় সত্যবাদী, তাহারা কোন পার্থিব লাভের জন্য মিথ্যা কথা বলিতে চাহে না।" বলা বাহুল্য যে, ইহা পতিত ব্রাহ্মণদিগের কথা; কারণ, উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণরা সেকালে ব্যবসা-বাণিজ্য করা অন্যায় বলিয়া মনে করিতেন। আর এক জন ফরাসী ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়াছেন যে, "ধনী হিন্দুরা এতই বদান্য এবং লোকহিতৈষী ছিলেন যে, তাঁহারা আপনাদিগকে আপনাদের ধনের অধিস্বামী মনে করিতেন না,—অন্যের ধনের ন্যাস রক্ষক বলিয়াই মনে করিতেন।" সেই জন্য তাঁহারা বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ করিয়া যাহা কিছু আছে, তাহা দরিদ্র-নারায়ণের ভোগের জন্য ব্যয় করিতেন। ফা হিয়ান বলিয়া গিয়াছেন, "এই দেশের অভিজাত এবং গৃহস্থগণ আর্ত্ত এবং পীড়িত ব্যক্তিদিগের সেবার জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করিয়া অকাতরে ঔষধ এবং পথ্য বিতরণ করিতেন।" হিন্দুরাজা হর্ষ শিলাদিত্য প্রয়াগের অর্দ্ধকুম্ভমেলায় প্রতি ছয় বৎসর অন্তর অকাতরে তাঁহার সমস্ত সঞ্চিত অর্থ দরিদ্রদিগকে দান করিতেন, ইহা তিনি দেখিয়া গিয়াছেন। হিন্দুর যে কৃষ্টি সর্ব্বদেশের লোক কর্ত্তৃক চিরদিন প্রশংসিত হইয়া আসিতেছে, ভারতের সেই কৃষ্টি অতি নিম্নবর্ণের হিন্দুরা রক্ষা করিবে, এ কথা বিনয়কুমারের ন্যায় লোকের মুখ হইতে যখন বাহির হইয়াছে, তখন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ কতদূর ব্যাপিয়া পড়িয়াছে, তাহা সকলে একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

বিনয় বাবু এত বড় বার্ত্তাতত্ত্ববিৎ হইয়া কি করিয়া বলিলেন যে, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা যদি একেবারে লোপ পায়, তাহা হইলে বাঙ্গালার সমৃদ্ধি লোপ পাইবে না। ব্রাহ্মণরা কোন শিল্প বা কোন অর্থকরী বৃত্তি স্বহস্তে রাখেন নাই; সবই অন্য বর্ণের লোকদিগকে দিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ দেখান যাইতে পারে যে, তাঁহারা চর্ম্মকার জাতিকে চর্ম্মশিল্পের উৎকর্ষবিধান করিতে বলিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যখন বিদেশী চর্ম্মকারদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় এই শিল্পের অবনতি ঘটিয়াছে, তখন তাহা রক্ষা করিবার জন্য ঐ জাতি কি চেষ্টা করিয়াছে? আজ গ্রেটবৃটেনে, মার্কিণে, এমন কি, বিনয় বাবুর শ্বশুরবাড়ী জার্ম্মাণীতে চর্ম্মশিল্পের কত উন্নতি হইয়াছে, তাহা বিনয় বাবু নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু চর্ম্মকার জাতিরা ঐ শিল্পরক্ষার জন্য কিছুই করিতে পারে নাই। বরং উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা উহাতে হাত দেওয়াতে এখন উহার কিছু উন্নতি হইয়াছে। ডোমজাতির হস্তে ঝুড়ি, টুকরী প্রভৃতি নির্ম্মাণ-শিল্প (Basket works) ন্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু চীনাদের ন্যায় তাহারা কি এই শিল্পের উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে? আজ যদি উচ্চ বর্ণের লোক এই শিল্পসেবায় আত্মনিয়োগ করে, তাহা হইলে ইহার উন্নতি হইবে। বর্ত্তমান যুগে ঐ সকল শিল্পসেবায় প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করা যায়। তাহা যদি ঐ সকল জাতি না পারে, তাহা হইলে সে জন্য উচ্চবর্ণ জাতিকে দোষ দেওয়া ঘোর অন্যায়। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই ঐ সকল নিম্নবর্ণের লোক থাকিলেই ভারতীয় কৃষ্টি ও ঋদ্ধি বজায় থাকিবে,—এরূপ সিদ্ধান্ত করা অত্যন্ত অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। তিনি ঐ সভায় আর্থিক বিষয়ের আলোচনা করিবার জন্য আহূত হইয়াছিলেন, তাঁহার মুখে জাতি-তত্ত্বের কথা শুনিতে কেহ চাহে নাই, অথচ সেই কথা বলিয়া তিনি সমস্ত হিন্দু সমাজের হাস্যভাজন হইতে গেলেন কেন, তাহা আমরা বুঝিলাম না। কামারের কুমারবৃত্তি করিতে গেলে এইরূপই হয়।

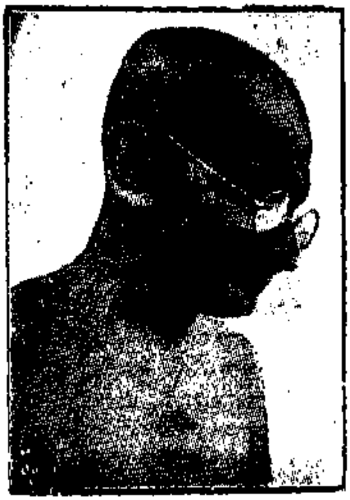
বাঙ্গালায় অশান্তি

বাঙ্গালায় দেখিতেছি, অশান্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশের সর্ব্বত্র চুরি-ডাকাতি অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত, ১৮ই মে বা ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বাঙ্গালায় ৫৭টি ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। বড় সহজ কথা নহে। যে মেদিনীপুর জিলা পুলিসের পদভরে কম্পমান, সেই মেদিনীপুরেই সাত দিনে ৯টি স্থানে ডাকাতি হইয়াছে; পুলিস উহার কোনটিরও কিনারা করিতে পারে নাই। এ দিকে দেশে খুন-জখমও বেশ বাড়িয়া যাইতেছে। প্রায়ই ত শুনা যায় যে, অমুক স্থানে একটি মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে,—অমুক স্থানে একটা লোক নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে, তাহার আর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। অমুক স্থানে নদীসঙ্গে একটি ভাসমান নরদেহ পাওয়া গিয়াছে, তাহার পরিচয় অজ্ঞাত। রেলওয়ে ট্রেণের নির্জ্জন কামরাতেও অনেক সময় মৃত বা মৃতকল্প লোক পাওয়া যায়। নারী-প্রগতির সহিত নারীর মৃতদেহও স্থানে স্থানে পাওয়া যাইতেছে। ঐ সকল ব্যাপারের কিনারা ত কিছুই হইতেছে না। ইংরাজ রাজত্বের প্রথম আমলে এ দেশে ডাকাত, ঠগী প্রভৃতির উপদ্রব যথেষ্ট ছিল। কিন্তু কর্ণেল শ্লীমান্ প্রভৃতি তাহা সহজে দমন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু এখন ডাকাতি এবং নরহত্যা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকার বৎসর বৎসর পুলিসের ব্যয় বর্দ্ধিত করিয়া দিলেও জনসাধারণের এই সকল অশান্তিজনক উপদ্রব ত নিবারিত হইতেছে না,—বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়াই বোধ হইতেছে। পুলিস এখন রাজনীতিক অপরাধীর সন্ধান করিতেই ব্যস্ত,—কাজেই জনসাধারণের অশান্তিকর এই সকল ব্যাপারে তাহারা মনোযোগ দেয় না বা দিতে পারে না।

উপরওয়ালাদিগকে একটা-না-একটা কৈফিয়ৎ দিয়াই নিশ্চিন্ত হইতেছে। কাযেই দুষ্ট লোকরা প্রশ্রয় পাইতেছে, তাহারা আর শাসনের তোয়াক্কা রাখিতেছে না। ইহা অবশ্য শুভলক্ষণ নহে।

সত্যমূর্ত্তি প্রকাশ

মহাত্মা গান্ধী রাজনীতিক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িবার পর একে একে কংগ্রেসের অনেক পূর্ব্বীরই রাজনীতিক আসর হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িতেছেন। ডাক্তার আন্সারীও শরীর অসুস্থ বলিয়া দর্শকবৃন্দকে দীর্ঘ সেলাম দিয়া রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চ হইতে নিক্রান্ত হইলেন। দেখিতে দেখিতে মহাত্মাজীর অভিন্নহৃদয় বৈবাহিক শ্রীযুত রাজাগোপালাচারীও সেই পথ ধরিলেন। এইরূপে কংগ্রেসের অনেক প্রবীণ যোদ্ধা কর্মক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সকলেরই প্রায় একই অজুহাত, "শরীর ভাল নয়, আর পারি না।" মানুষের শরীর ক্ষণবিধ্বংসী, উহা জরা-মরণের অধীন,—ইহা বিদিত ভুবনে। সুতরাং স্বাস্থ্য ভাল নয়, আর কায করিতে পারিতেছি না বলিয়া কার্য্যক্ষেত্র হইতে চম্পট দিলে আর কাহারও কিছু বলিবার থাকে না। যাহা হউক, তামিল নাইডু ওয়ার্কিং কমিটির সভাপতি রাজাগোপালাচারী এই সংক্রামক স্বাস্থ্যভঙ্গের হিড়িকে পদত্যাগ করিলে তাঁহারই প্রস্তাবে শ্রীযুত সত্য-মূর্ত্তি এই পদে নির্ব্বাচিত হন। মিষ্টার সত্যমূর্ত্তি কয়েকবার কারাগারে যাইলেও আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তাঁহার বাস্ফোট বড় একটা শুনা যায় নাই। সম্ভবতঃ আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি মহাত্মাজীর সহিত একমত হইতে পারেন নাই। যাহা হউক, এখন তিনি পুনশ্চ কংগ্রেসের এক জন 'কেষ্টবেষ্ট' হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। সুতরাং তিনি এখন কংগ্রেসের কার্য্যপদ্ধতি বাংলাইয়া দিবার এক জন বিশিষ্ট অধিকারী। কিছুদিন পূর্ব্বে মাদ্রাজের ত্রিচিনোপলী সহরে এক সভায় তিনি নিখিলভারতে একতা-সম্পাদন প্রভৃতি বড় বড় বিষয়ে বক্তৃতা করিবার পর শ্রোতাদিগের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন, "বর্ত্তমান শাসনসংস্কার প্রব-র্ত্তিত হইবার পর কংগ্রেসওয়ালারা সরকারী পদ বা চাকুরী লইবেন কি না?" উত্তরে শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তি মহাশয় তাঁহার সত্য মূর্ত্তি প্রকট করিয়া নাকি বলিয়াছিলেন, "নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবেন, জাষ্টিস দলের লোক মন্ত্রিত্ব করিলে কিরূপ কায হয়, আর কংগ্রেসওয়ালারা মন্ত্রিপদ প্রভৃতি লইলে কিরূপ কায হয়, তাহা দেখাইবার জন্যই কংগ্রেসওয়ালারা ঐ সকল মোটা বেতনের পদ লইবেন।" ইঁহার এই কথার পরে একটা হৈ-চৈ হইয়া উঠে। তখন তিনি বলেন যে, তিনি ঠিক ঐরূপ কথা বলেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে, যদি সেরূপ রাজনীতিক অবস্থা ঘটে, তাহা হইলে আমাদের সরকারী পদগুলি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য হইবে—ইহাই তাঁহার ব্যক্তিগত মত। এমন না হইলে রাজনীতিক বুদ্ধির বাহাদুরী! তবে আমরা সুদূর ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া বলিতে পারি যে, মেঘের কোলে তীব্রপ্রভা বিদ্যুল্লহরী দেখা দিবার অল্পক্ষণ পরে যেমন মেঘের গর্জ্জন



মহাত্মাজী



শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তি



ডাঃ আন্সারী



শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী

লোকের কর্ণপটহে তীব্র আঘাত করে, সেইরূপ এই কাউন্সিল-প্রবেশের কিছুকাল পরে যে সরকারী চাকুরী গ্রহণের হিড়িক পড়িবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নতুবা ঠুঁঠা জগন্নাথ হইয়া বসিয়া কংগ্রেস-ওয়ালারা কি করিবেন? কেবল বাক্যের ফোয়ারা ছুটাইলে ত আর ভারত উদ্ধার হইবে না। এখন যখন সবই গেল, তখন মডারেটদিগের ন্যায় আবার আবেদন-নিবেদনের থালা মাথায় লইতে লজ্জা কেন?

—

সমাজতন্ত্রবাদীদিগের অভ্যুদয় এবং বিকাশলাভ

যাহাদের নিজের চিন্তাশক্তি এবং বিচারশক্তি নাই, তাহারা বিদেশ হইতে যে কোন আপাতরম্য মতবাদের আমদানী হয়, তাহাই গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহভরে উভয় বাহুই প্রসারিত করিয়া থাকে এবং উহাকে পাইলে ধেই ধেই নাচিতে আরম্ভ করে। সম্প্রতি য়ুরোপ হইতে, বিশেষতঃ রুসিয়া হইতে সমাজতন্ত্রবাদ এবং সর্ব্বস্বত্ববাদ মত এ দেশে আমদানী হইয়া দ্রুত প্রসারলাভ করিতেছে। ঐ সকল মত সাম্যমূলক, সুতরাং আপাত-মনোরম। এই মতবাদীরা এখন কংগ্রেসকে দখল করিবার জন্য প্রয়াস



শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়

পাইতেছে। সম্প্রতি কেরল অঞ্চলে এবং আসামের সুর্ম্মা উপত্যকায় সমাজতন্ত্রবাদীদিগের দুইটি বৈঠক বসান হইয়াছিল। প্রথমটির সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীযুত মাসানী এবং দ্বিতীয়টির সভানেত্রী হইয়াছিলেন শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়। তাঁহাদের অভিভাষণ হইতে বুঝা যায় যে, তাঁহারা কংগ্রেসে সমাজ-তন্ত্রবাদের প্রভাব বিস্তৃত করিবার প্রয়াসী। মিষ্টার মাসানী তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন যে, "কংগ্রেসে কাযের ভাগ করিয়া লইবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। সমাজ-তন্ত্রবাদীরা তাঁহাদের মত দ্বারা কংগ্রেসকে প্রভাবিত করিতে চাহেন। তাঁহারা এই দেশের কৃষক এবং শ্রমিকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া দেশের সমস্ত শক্তিকে কার্য্যক্ষেত্রে নিয়োগ করিতে চাহে।" ইহাতে বুঝা যায় যে, ইঁহারা কেবল শ্রমিক এবং কৃষকদিগের স্বার্থকে বড় করিয়া দেশের সমৃদ্ধ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এবং জমিদারদিগের স্বার্থের সঙ্কোচসাধন বা বিলোপসাধন করিবার প্রয়াসী। উঁহারা এমন কথাও বলিয়াছে যে, "ভারতবাসীরা যে মুক্তিলাভের জন্য প্রয়াস পাইতেছে, তাহা জাতির সহিত জাতির বা কোন বিশেষ শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন জাতির যুদ্ধ নহে, উহা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এ দেশের শ্রমজীবীদিগের অভিযান।" এ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের উহা লক্ষ্য বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। শ্রীযুক্তা কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় সুর্ম্মা উপত্যকার বৈঠকে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, সমাজ-তন্ত্রবাদীরা কংগ্রেসের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া কায করিতে চাহেন না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সমাজতন্ত্রবাদীরা যেন কংগ্রেস হইতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া কংগ্রেসের অঙ্গীভূত হইয়াই থাকেন। মিষ্টার মাসানীর মতের সহিত শ্রীযুক্তা কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়ের মতের কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। এখানে বলা আবশ্যক, পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্রবাদ হুবহু এ দেশে আমদানী হইলে, বিশেষ বিভ্রাট বাধিবে। হিন্দু সমাজের এমন সুন্দর ব্যবস্থা আছে যে, তদ্দ্বারা সমাজতন্ত্রবাদের বৈচিত্র্য নানা সাম্যবাদ বর্জ্জন পূর্ব্বক সমাজতন্ত্রবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য যথাযথভাবে সাধিত হইয়া আসিতেছিল। বর্ত্তমান যুগের স্বার্থপরতা-মূলক শিক্ষার দোষে তাহা নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এ সকল কথার আলোচনা করিবার স্থান এখানে নাই।

ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাধা

সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ মোহনলালগঞ্জ হইতে একটি অদ্ভুত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সেই সংবাদটি এইরূপ:—"মোহনলালগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ১৪৪ ধারা অনুসারে এক আদেশ জারি করিয়াছেন যে, মহরম উৎসবে তাজিয়া শোভাযাত্রার সময় সকাল ৮টা হইতে বিকাল ৫টা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শোভাযাত্রার পথে যে সমস্ত মন্দির আছে, ঐ সময়ে সেই সমস্ত মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই সমস্ত মন্দিরে শঙ্খধ্বনি অথবা অন্য কোন প্রকার গীতবাদ্য হইতে পারিবে না। শোভাযাত্রীরা লাঠি বা অন্য কোন অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে না।" অর্থাৎ মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এক হুকুমে একটা অঞ্চলের সমস্ত দেব-মন্দিরের পূজা-পাঠ সমস্ত বন্ধ হইতে পারে,—এ বিশ্বাস এদেশের অনেকের ছিল না। ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই হিন্দু-দেবতার পূজা, আরতি এবং ভোগ হইয়া থাকে। ঐ কার্য্যে বাধা দিলে হিন্দুদিগের ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানে বাধা দেওয়া হয়। সুতরাং নিরপেক্ষ বৃটিশ সরকারের কোন কর্ম্মচারীই ভারতঃ ঐরূপ আদেশ দিতে পারেন কি না, তাহাও কর্ত্তৃপক্ষের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। মোহনলালগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের ঐরূপ আদেশ দিবার ক্ষমতা আছে কি না, তাহাও আদালতের বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ঐরূপ অদ্ভুত

আদেশের হেতুবাদ দর্শাইতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, ঐ স্থানে হিন্দু এবং মুসলমান অধিবাসীদিগের মধ্যে মনোমালিন্য চলিতেছে,—সেই হেতু সতর্কতা অবলম্বনের উদ্দেশে ঐরূপ আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা কিরূপ অদ্ভুত সতর্কতা, তাহা আমরা বুঝিলাম না। এক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মহানি না করিয়া কি উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মকার্য্যের সম্পাদনের সময়ের কি একটা সামঞ্জস্যসাধন করা সম্ভব হইত না? এ বিষয়ের একটা সুমীমাংসাসাধন যে বিশেষ কঠিন, তাহা কোন-ক্রমেই মনে হয় না। যে সময়ে লক্ষ্ণৌ নবাব ওয়াজিদালি শাহের ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নবাবদিগের শাসনাধীনে ছিল, সেই সময় কি লক্ষ্ণৌ সহরে মহরমের শোভাযাত্রা বাহির হইত না? না ঐ পথি-পার্শ্বে কোন হিন্দুর দেবালয় ছিল না? যদি উহা থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তখন কিরূপ ব্যবস্থা ছিল? তখন কি ঐ শোভাযাত্রা লইয়া যাইতে অত দীর্ঘ সময় লাগিত? না হিন্দুর দেবকার্য্য অতক্ষণ বন্ধ রাখা হইত? হিন্দুর ঐ দেবকার্য্য অতক্ষণ বন্ধ রাখা হইত, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাহার পর ইংরাজ সরকারের আমলে এ পর্য্যন্ত এরূপ কার্য্যে কত সময় লাগিয়া আসিয়াছে, তাহাও দেখা আবশ্যক। ইহা দেখিয়া চিরাচরিত ব্যবস্থা অনুসারে ঐ কার্য্য না করিতে দিয়া আবার এক নূতন ব্যবস্থাই বা করা হইল কেন? দিনের মধ্যে ৯ ঘণ্টাকাল হিন্দুর ধর্ম্মকার্য্য বন্ধ রাখিবার কি প্রয়োজন ঘটিয়াছিল? শুনিতেছি, বলশেবিকশাসিত রুসিয়ায় ধর্ম্মকার্য্যসাধনে অনেক বাধা প্রদত্ত হইতেছে। তথায় মুসলমানদিগের মসজেদগুলি ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত করা হইয়াছে। নিরপেক্ষ বৃটিশ সরকারের শাসনাধীনে সেরূপ ব্যবস্থা কস্মিন্‌কালে হইতে পারিবে বলিয়া কেহই এখনও আশঙ্কা করিতে পারেন না, এবং ঐরূপ আশঙ্কা এখনও কেহ করেন না। কিন্তু এই ভাবে যদি কার্য্য করা হয়, তাহা হইলে ঐরূপ আশঙ্কা যে অচিরকালের মধ্যে জাগিয়া উঠিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যুক্তপ্রদেশে হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। এই ব্যাপারে সমস্ত হিন্দুসমাজের জনগণের মনে যে তীব্র অসন্তোষ জন্মিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই মিছিলের সময় এত দীর্ঘ না করিলে কি চলিত না? শুনা যাইতেছে যে, ফিরোজাবাদে মিছিলের সময় অত্যন্ত অধিক বর্দ্ধিত করাতে যত হাঙ্গামা উপস্থিত হইয়াছিল। এরূপ অন্যায় ও অসঙ্গত ব্যবস্থা কখনই পরিণামে সন্তোষজনক হইতে পারে না। সেই জন্য আমরা কর্ত্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে বিশেষ অবহিত হইবার জন্য অনুরোধ করি। বৃটিশ সরকারের এক জন পদস্থ রাজপুরুষ যে সত্য সত্যই এরূপ আদেশ জারি করিয়াছেন, ইহা যেন এখনও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। তবে মানুষ ভ্রান্ত হইয়া সবই করিতে পারে।

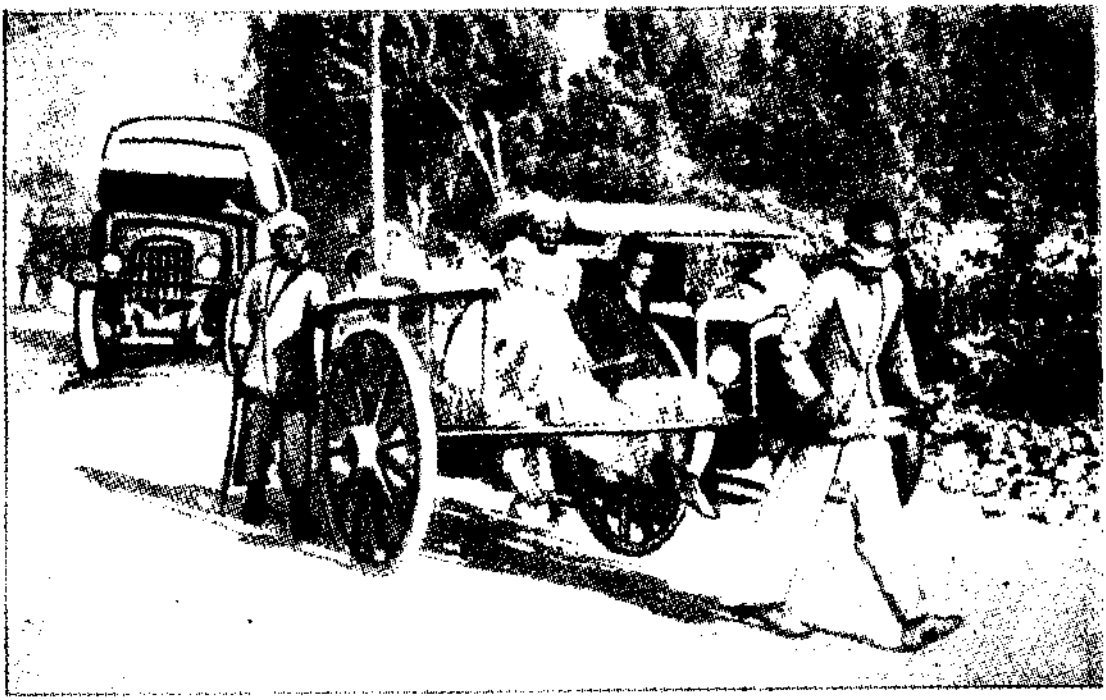
——

কোয়েটায় ভীষণ ভূমিকম্প

বোলান গিরিসঙ্কটের শেষে বৃটিশ অধিকৃত বেলুচিস্থানে কোয়েটা একটি বড় সহর। এই স্থান দিয়া কান্দাহারে যাইতে হয়। এখানে ইংরাজদিগের একটি সামরিক ছাউনী এবং বিমানের একটা বড় আড্ডা আছে। বহু ইংরাজ এ স্থানে বাস করেন। স্থানটি য়ুরোপীয়দিগের পক্ষে স্বাস্থ্যকর। এ স্থানে ভূমিকম্প হয় না বলিয়া লোকের ধারণা ছিল। গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ নিশা প্রভাত হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ বাঙ্গালা ১৬ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার শেষরাত্রি পৌনে ৩টার সময় আচম্বিতে এই পর্ব্বতাকীর্ণ স্থানটি কাঁপিয়া উঠে। নগরবাসী তখন সুপ্ত ছিল। দেখিতে দেখিতে বাড়ী-ঘরদ্বার অনেক পড়িতে থাকিল, আর সুপ্ত নরনারীগণ গৃহাদি চাপা পড়িয়া মরিতে লাগিল। রেলওয়ে ষ্টাফের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু পুলিস ফৌজ এবং বিমান-বাহিনীর লোক মরিয়া গিয়াছে। পুলিস-বাহিনীরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকক্ষয় হইয়াছে।

এই ভূকম্পনের মূল কেন্দ্র কোয়েটা এবং খেলাতের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে। সিভিল অফিসর মিষ্টার জোন্স, তাঁহার পত্নী এবং শাশুড়ী এবং সেচ বিভাগের এঞ্জিনিয়ার মিষ্টার ফ্রান্সিস এবং তাঁহার পত্নী মরিয়া গিয়াছেন।

যত দিন যাইতেছে, ততই কোয়েটা অঞ্চল হইতে ভীষণ হইতে ভীষণতর সংবাদ আসিতেছে। সিন্ধীরাই অধিক মরিয়াছে। যতদূর জানা গিয়াছে, বিভিন্ন সিন্ধী পরিবারের মৃত্যু-সংখ্যা শতকরা ৮০ হইতে ৯০। কোন কোন পরিবার একবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত প্রকাশ পাইয়াছে, সিন্ধীদিগের ৯ হাজার নরনারী মারা গিয়াছে। তাহাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ দেড় কোটি টাকা বলিয়া অনুমিত হইতেছে। এ পর্য্যন্ত একমাত্র কোয়েটা সহরে ঠিক কত লোক মরিয়াছে,—কত লোক জখম হইয়াছে, তাহা ঠিক হয় নাই। তাহার পর কোয়েটা সহরের বাহিরে পল্লী অঞ্চলে, ভূমিকম্প-প্রপীড়িত স্থানে ঠিক কত লোক মরিয়াছে, কত লোক জখম হইয়াছে, তাহা এখনও জানিতে পারা সম্ভব নহে। শুনা গিয়াছিল যে, কোয়েটা সহরে ২৬ হাজার লোক মরিয়াছে। ভগ্ন-স্তূপের মধ্যে কত মৃত এবং মুমূর্ষু ব্যক্তির দেহ রহিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? কত ধনরত্ন চাপা পড়িয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই স্থানে প্রায় ২ শত য়ুরোপীয়ের জীবনান্ত হইয়াছে, শুনা যাইতেছে। দেশীয় লোক অনেক মরিয়াছে, কেহ কেহ বলিতেছেন যে, প্রায় ২৯ হাজার লোক মরিয়াছে। কোয়েটা সামরিক সহর। এখানে ইংরাজের কেল্লা এবং অনেক গোরা সৈন্য আছে। সেনাগণ দুর্গে থাকে, দুর্গের গাঁথুনি শক্ত, সুতরাং তথায় অধিক লোক মরে নাই,—কিন্তু পুলিসের ফৌজ প্রায় সকলেই মরিয়াছে। সহরের সংবাদ যত শীঘ্র পাওয়া যায়, পল্লী অঞ্চলের সংবাদ তত শীঘ্র পাওয়া যায় না। সৌভাগ্যক্রমে এই মরু-কান্তার-বেষ্টিত পার্ব্বত্য অঞ্চলে লোকের তেমন ঘন বসতি নাই। তাহা হইলেও শুনা যাইতেছে যে, তথায় গ্রামকে গ্রাম একেবারে যেন নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে হতাহতের সংখ্যা অল্প হইবে না। খেলাত বেলুচিস্থানের আর একটি সহর। এই সহরে মোট অধিবাসীর সংখ্যা ১০ হাজার। তথায় নিহত হইয়াছে ২৯ শত এবং আহত হইয়াছে ৫ হাজার। অনেক ধনী ব্যবসায়ী, আত্মীয়-স্বজনের বিয়োগ-শোকে এবং সম্পত্তিনাশে পাগল হইয়া গিয়াছেন। খেলাতে আফগান-রাজের বিখ্যাত মিরি প্রাসাদটি ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। মাসটাং বেলুচিস্থানের আর একটি সহর। ঐ সহরে দুই হাজার লোক মরিয়া গিয়াছে বলিয়া গত ৩রা জুন শিমলা হইতে সংবাদ আসিয়াছে। এখন শুনা যাইতেছে যে, এই ভূমিকম্পে প্রায় ৫০ হাজার লোক হতাহত হইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত এই হতাহতের সংখ্যা কত দাঁড়াইল, তাহা বলা যায় না। বেহারে প্রথম যত লোক মরিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ পায়, তাহা অপেক্ষা পরে জানা যায় যে,



ভূমিকম্পে আহতগণকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছান হইতেছে



ভূমিকম্পে কোয়েটা সামরিক বিমানাশ্রয়ের অবস্থা

তাহার অনেক গুণ লোক অধিক মরিয়াছিল। এখানেও যে তাহা হইবে না, তাহা কোনমতেই বলা যায় না। পাঠক ঐ সকল সংবাদ ক্রমশঃ পাইবেন। কোয়েটা-প্রত্যাগতরা বলিতেছেন, সকল মৃতদেহ খুঁড়িয়া বাহির করিতে প্রায় ২ মাস সময় লাগিবে।

এরূপ ভয়াবহ সংবাদ এখন কিছুদিন ধরিয়া আসিতে থাকিবে। মৃতের এবং কারিজখমের সংখ্যা এখন ৫০ হাজার অনুমিত হইতেছে, ক্রমে হয় ত মৃতের সংখ্যা ৫০ হাজারে দাঁড়াইতে পারে। এইরূপ দুর্যোগে বহু লোক যেন নিয়তির পাশে বদ্ধ হইয়া মরিয়াছে, আবার কতকগুলি লোক যেন বিস্ময়করভাবে বাঁচিয়া গিয়াছে, এরূপ সংবাদ প্রায় পাওয়া যায়। এখানেও যে তাহার ব্যতিক্রম হইবে, তাহা মনে হয় না। এইরূপ সংবাদে লোকের মনে সহজেই নানা তর্ক উঠে। এই প্রকার দৈব-দুর্বিপাকে পুরুষকার-প্রদর্শনের

কোন অবকাশ নাই। এইরূপ বিপদ-সঙ্ঘটনের সম্ভাবনা মানুষ পূর্ব্বে বুঝিতে পারে না,—শুনিতে পাই, তির্য্যক্‌প্রাণীরা বুঝিতে পারে। বিহারে ভূমিকম্প ঘটিবার পূর্ব্বে মোরগ, কপোত, অশ্ব প্রভৃতি চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল, যাহারা পারিয়াছিল, তাহারা দূরে পলাইয়াছিল, কিন্তু মানুষ কিছুই বুঝিতে পারে নাই। এই ত মানুষের জ্ঞানগর্ব্ব! এই ত মানুষের বুদ্ধিমত্তার অহঙ্কার! দ্বিতীয়তঃ এতগুলি লোক ঠিক একই সময়ে, একই স্থানে, প্রায় একই প্রকার ভীষণভাবে যে নিহত হইল, -ইহার জন্য মানুষের মনে একটা বিষাদময়ী চিন্তার আবির্ভাব হওয়া স্বাভাবিক। কত উৎকট এবং অদম্য আশা এবং আকাঙ্ক্ষা লইয়া যাহারা সেই স্থানে নিশ্চিন্ত-মনে অবস্থিতি করিতেছিল, যে নিয়তি এক উৎকট অট্টহাস্য হাসিয়া একই মুহূর্ত্তে তাহাদের জীবনান্ত করিয়া সমস্ত আশার সমাধি করিয়া দিলেন,—তাঁহার লীলা বুঝা মানুষের সাধ্য নহে। শাস্ত্র বলেন, "কর্ম্মক্ষয়ে জন্মনাশঃ প্রাণিনাং নাত্র সংশয়ঃ।" কর্ম্মক্ষয়েই প্রাণীদিগের জন্মনাশ অর্থাৎ মৃত্যু হয়। এ অঞ্চলের এতগুলি লোকের কি একই মুহূর্ত্তে কর্ম্মক্ষয় হইয়া গেল? কর্ম্মের এই গহনা গতি বুঝা মনুষ্যবুদ্ধির অতীত। তবে এ কথা সত্য যে, জীবমাত্রেই "জননং মরণং দুঃখং সুখং প্রাপ্নোতি চাবশঃ" অর্থাৎ দেহধারী জীবমাত্রই অবশ হইয়া (অর্থাৎ দৈবের অধীন হইয়াই) জন্মে, মরে এবং সুখ ও দুঃখ ভোগ করে।" আমরা এখন এই ভাবে মৃত ব্যক্তিদিগের জন্য এক বিন্দু অশ্রুত্যাগ ভিন্ন আর কি করিতে পারি? বড়লাট, বাঙ্গালার লাট প্রভৃতি অর্থসাহায্য চাহিতেছেন।

পরলোকে

রাজা স্যর হৃষীকেশ লাহা

গত ২রা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় কলিকাতার ধনাঢ্য ও স্বদেশবৎসল জমিদার রাজা হৃষীকেশ লাহা ৮৪ বৎসর বয়সে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে বাঙ্গালী সমাজ যে এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে হারাইল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাঁহারা তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন যে, তাঁহার ন্যায় কর্ম্মবীর বাঙ্গালার ধনী সমাজে অত্যন্ত বিরল। তাঁহার চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ এই ছিল যে, তিনি কোন কাযই অন্যের উপর ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। লাহা-পরিবারের জমিদারী বাঙ্গালার ২৪ পরগণা, যশোহর, খুলনা, মেদিনীপুর, কুমিল্লা প্রভৃতি জিলায় বিস্তীর্ণ। তাঁহার পিতৃব্য স্বর্গীয় শ্যামাচরণ লাহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইবার পর এই জমিদারী পরিদর্শনের ভার রাজা হৃষীকেশ লাহার উপরই ন্যস্ত হইয়াছিল। সেই সময় তিনি মফস্বলের কর্ম্মচারীদিগের নিকট হইতে আগত প্রত্যেক চিঠিখানি পড়াইয়া শুনিতেন, এবং প্রজাদিগের অভাব অভিযোগের প্রতি বিশেষ ভাবে অবহিত হইতেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স ৫৪ বৎসর। তিনি এই সময়ে এই বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের প্রভাব বৃদ্ধি করিবার জন্য অকাতরে পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি বেশ বুঝিতেন যে, শাসনকার্য্য-পরিচালনে ভারতীয় বণিক সমাজের প্রভাব থাকা আবশ্যক। সেই জন্য তাঁহারই চেষ্টায় কাউন্সিলে এই প্রতিষ্ঠান হইতে এক জনের স্থলে দুই জন সদস্য নির্ব্বাচনের অধিকার এবং পোর্ট ট্রাষ্টে ১ জনের স্থানে ৩ জন সদস্য প্রেরণের ব্যবস্থা হয়। ইহা ভিন্ন উঁহারই আমল হইতে সকল বিষয়ে সরকার বঙ্গীয় বণিক সমিতির (Bengal National Chamber of Commerce) মতামত গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লর্ড হার্ডিং এ কথা মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানে যে বক্তৃতা করিতেন, তাহাতে দেশের আর্থিক এবং রাজনীতিক অবস্থার গভীর জ্ঞানের পরিচয় থাকিত। তিনি সর্ব্ববিষয়েই অকুণ্ঠিতভাবে মতামত ব্যক্ত করিতেন। এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি থাকিয়াই তিনি ব্যবসায়-বাণিজ্যে বাঙ্গালীর হীনতার কারণ কি, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, এবং অল্পদিন পরেই বুঝিতে পারেন যে, কেবলমাত্র সাহিত্যশিক্ষায় দত্ত দৃষ্টি, এবং একপদী শিক্ষাপদ্ধতিই এই দোষের প্রধান কারণ। সেই জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতিতে তিনি



রাজা হৃষীকেশ লাহা

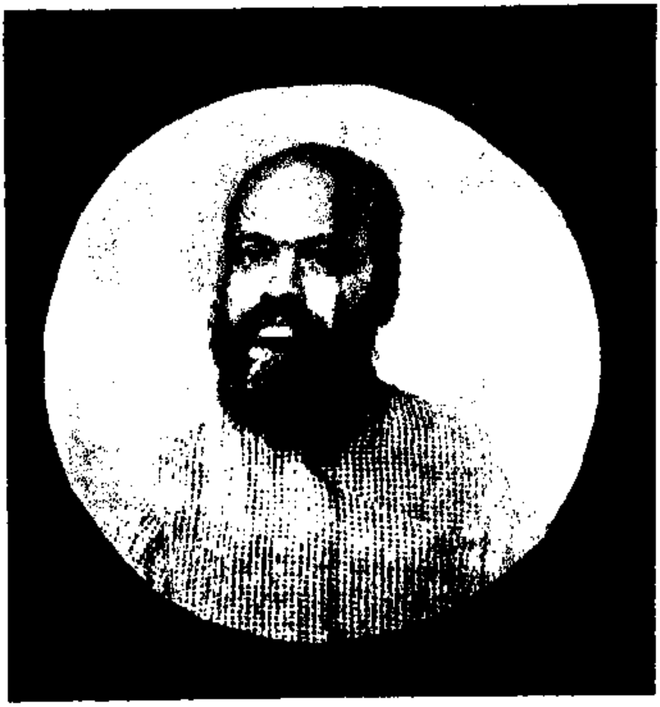
বিজ্ঞান শিক্ষা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যকর শিল্পতত্ত্ব ও বাণিজ্য-তত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই বণিক-সভার পক্ষ হইতে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তদানীন্তন বড় লাটকে যে অভিনন্দন করা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি শিক্ষার এই ত্রুটির কথা বিশেষভাবে বলিয়াছিলেন। বড়লাটও উহার প্রতীকার করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন।

পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনের জন্য তাঁহার একান্ত যত্ন এবং চেষ্টা ছিল। ম্যালেরিয়া-ব্যাধি পল্লী অঞ্চলের যে কি সর্ব্বনাশ-সাধন করিতেছে, রাজা তাহা বেশ বুঝিতেন। সেই জন্য তিনি রোড্‌সেস বা পথকরের লব্ধ অর্থ হইতে কিছু টাকা পল্লীগ্রামে পানীয় জল সরবরাহের জন্য এবং নদী-পথ পরিষ্কৃত রাখিবার জন্য বিশেষ-ভাবে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন এবং সে চেষ্টায় তিনি সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনিই সরকারকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন যে, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ৯ আইনের (সেস আইনের) মুখবন্ধে পানীয় জল

সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। অতএব রোডসেস ফণ্ডের কিছু টাকা পল্লীবাসীদিগের জন্ম নির্ম্মল পানীয় জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে পৃথক্ করিয়া রাখা আবশ্যক। তিনি জমিদার সভার এবং ২৪ পরগণা জিলাবোর্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় এই কার্য্য করিবার বিশেষ সুবিধা পাইয়াছিলেন। প্রায় ৩৭ বৎসরকাল তিনি ২৪ পরগণা জিলাবোর্ডের সদস্য ছিলেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের পর হইতে কয়েকবার তিনি উক্ত জিলাবোর্ডের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বৃদ্ধবয়সেও ম্যালেরিয়াপ্রপীড়িত অঞ্চলগুলি দেখিয়া বেড়াইতেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে রাজা হৃষীকেশ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন এবং এই সময়ে তিনি অনেক কায করিয়াছিলেন। তিনি বেঙ্গল ন্যাসান্যাল চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেণ্ট, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী এবং ২৪ পরগণা জেলাবোর্ডের সদস্য এবং চেয়ারম্যান ছিলেন বলিয়া বঙ্গদেশ সম্বন্ধে অনেক তথ্যের সহিত পরিচিত হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার বিশেষ বাগ্মিতা ছিল না সত্য, কিন্তু তিনি সুন্দর-ভাবে তথ্য বিন্যাস করিয়া তাঁহার সে অভাব পূরণ করিয়া লইতেন। তিনি কোন কথা নির্ভয়ে বলিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারের সমালোচনা উপলক্ষে তিনি বলিয়াছিলেন—The unequal treatment meted out to India as a dependency is not and can never be in keeping with the natural self-respect of India. অর্থাৎ অধীন রাজ্য বলিয়া ভারতের প্রতি যে বৈষম্যসূচক ব্যবহার করা হইতেছে, তাহা কখনই ভারতের আত্মসম্মানের সহিত সমঞ্জসীভূত হইতে পারে না। তিনি দ্বৈত শাসনেরও তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের সমস্ত কর্ম্মের তালিকা প্রদান করা এ স্থানে অসম্ভব। তিনি ছিলেন দরিদ্রের বন্ধু, মফস্বলবাসীর সহায়। তিনি অনেকগুলি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। রামমোহন লাইব্রেরীর জমি ও অনেক পুস্তকাদি রাজার দান। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি বর্ত্তমান যুগে বড় বিরল। আশা করি, তাঁহার পুত্রদ্বয় তাঁহাদের পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যশস্বী হইবেন।

সত্যচরণ শাস্ত্রী পরলোকে

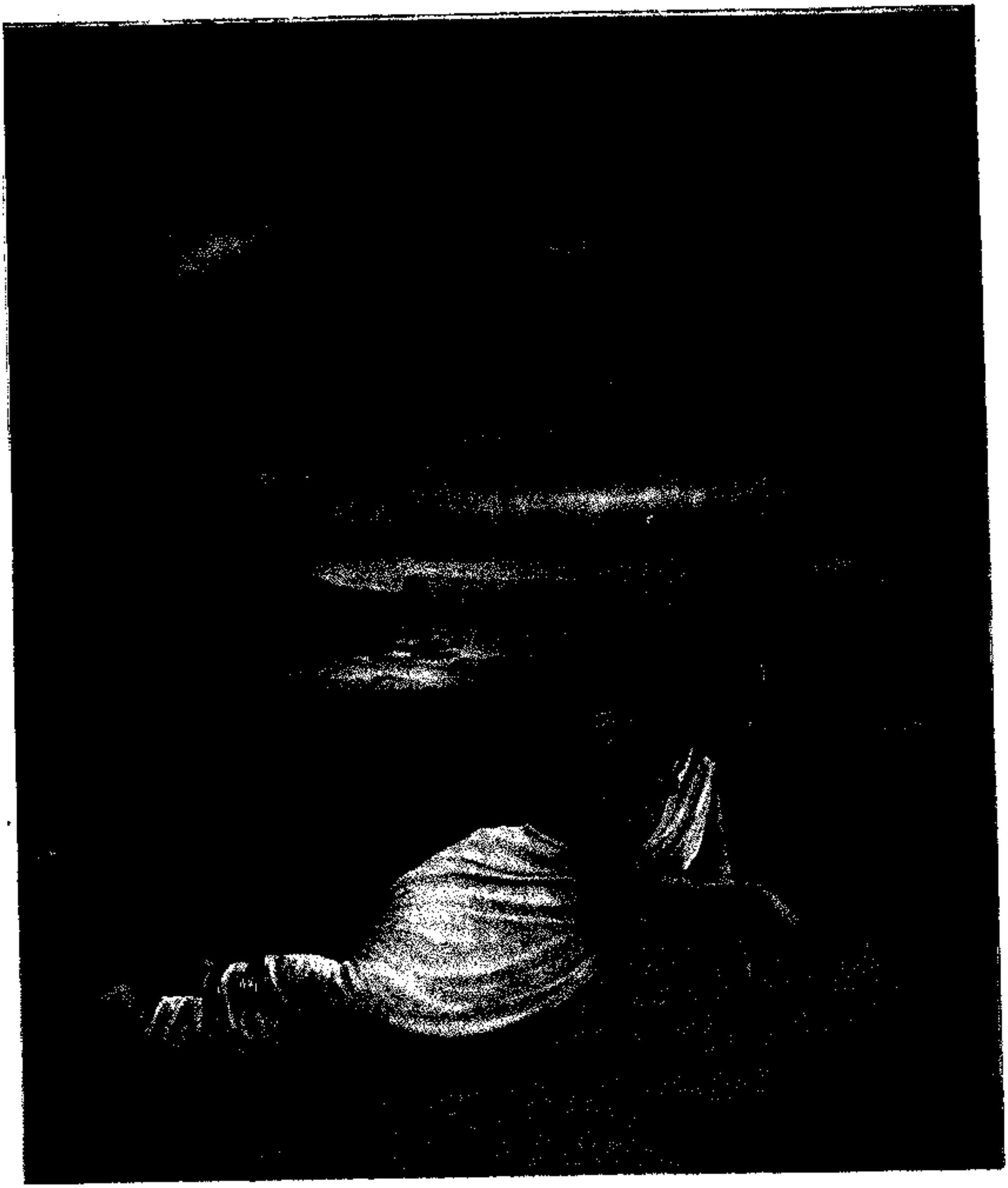
গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার বিখ্যাত সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী তাঁহার রিষড়াস্থিত ভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। কিছুকাল হইল, তাঁহার রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সেই হইতেই তিনি প্রায় আর কলিকাতায় আসিতেন না। তিনি ভারতের নানা স্থানে, কৈলাসে এবং সিংহলে, বালীদ্বীপে এবং শ্যামদেশে ভ্রমণ করিয়া ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শিবাজী, জালিয়াৎ ক্লাইভ, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি কয়েকখানি



সত্যচরণ শাস্ত্রী

গ্রন্থও তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি সংস্কারপন্থী হিন্দু ছিলেন। স্বদেশের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের কৈলাস-যাত্রা মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের ঐকান্তিক সমবেদনা জানাইতেছি।

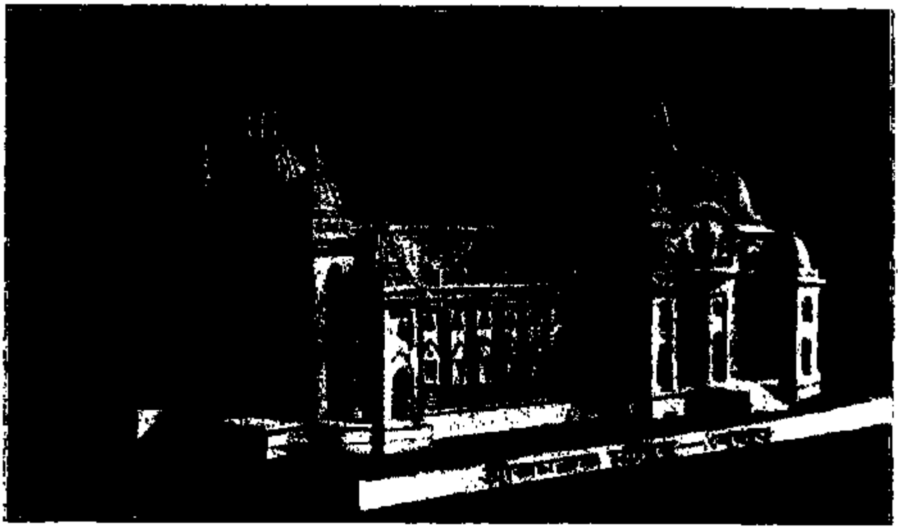
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বসুমতী রোটারী মেসিনে শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



শুধু অকারণ পুলকে

বসুমতী-চিত্র-বিভাগ] —রবীন্দ্রনাথ [শিল্পী—মিষ্টার টমাস।

সচিত্র
মাসিক বসুমতী



১৪শ বর্ষ] আষাঢ়, ১৩৪২ [৩য় সংখ্যা

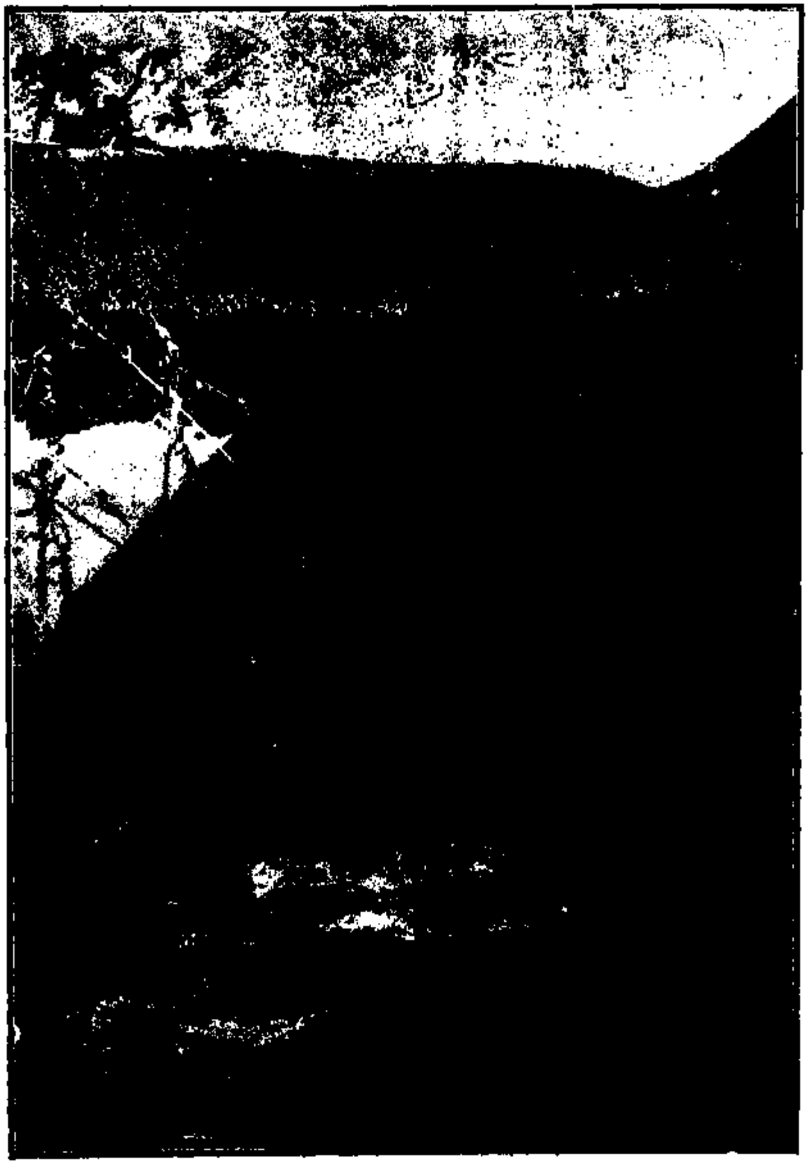
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথা

৯

দেবীর নিকট হইতে ধর্ম্মপ্রচারের আদেশ-প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই শ্রীপরমহংসদেব ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে একবার কামারপুকুর গমন করিয়াছিলেন। তথায় প্রায় ৬।৭ মাসকাল অবস্থান করিবার পর তিনি পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করেন।

এই সময়ে কামারপুকুর হইতে কয়েক দিনের জন্য ঠাকুর নিজ ভাগিনেয় হৃদয়নাথের গ্রাম শিওড়ে গমন করিয়াছিলেন। তথায় অবস্থানকালীন হৃদয়ের একটি শিশুপুত্র শ্রীপরমহংস-দেবের অনুক্ষণের সঙ্গী হইয়াছিল। এই গ্রামের বিষয়বুদ্ধি-সম্পন্ন বয়স্ক ভদ্রলোকদিগের সহিত ঠাকুর মিশিতে পারিতেন না বলিয়া এই শিশুকেই তিনি স্নেহে আকর্ষণ করিয়া তাহার সরল ও পবিত্র জীবনের সংস্পর্শে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিতেন। শিশুটিও তাঁহার স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া সমস্ত দিবস তাঁহার সহিত ক্রীড়াকৌতুকে নিমগ্ন থাকিত। কিন্তু দিবসের উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত চতুর্দ্দিক্ যখন সন্ধ্যাসমাগমে ক্রমশঃ অন্ধকারে মলিন ও অস্পষ্ট হইয়া আসিত, তখন ব্যাকুল হইয়া শিশু "মা যাব" বলিয়া রোদন করিয়া উঠিত। সমস্ত দিবসের ক্রীড়াকৌতুক তখন মিথ্যা হইয়া যাইত, অন্ধকারের মধ্যে শিশু একটি সুপরিচিত ক্রোড়ের অন্বেষণ করিত। খেলানা, পাখী প্রভৃতি কত কি জিনিষের প্রলোভন দেখাইয়া ঠাকুর তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইত। ক্ষণে ক্ষণে শিশু অশ্রুসিক্ত কম্পিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিত—"মা যাব"। এই শিশুকণ্ঠোত্থিত সহজ দুইটি ক্ষুদ্র কথা ঠাকুরের সমস্ত হৃদয় আলোড়িত করিয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিত, তিনি শিশুকে সান্ত্বনা দিবার কথা বিস্মৃত হইয়া নিজেই কাতরকণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিতেন। শিশু কাঁদে, ঠাকুরও কাঁদেন, সে এক

অপূর্ব্ব দৃশ্য। "মা যাব" দুইটি ক্ষুদ্র সহজ শব্দ দুইটি বিভিন্ন হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রী কম্পিত করিয়া একসুরে বাজিয়া উঠিত, আর সেই সুর সীমার সমস্ত বন্ধন অতিক্রম করিয়া বিশ্বজননীর সহিত মিলনের যুগযুগান্তসঞ্চিত অসীম ব্যাকুলতায় পরিণত হইত। ঠাকুর নিজের ইষ্টদেবীর কথা স্মরণ করিতেন, দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য ব্যাকুল হইতেন; দেশ, কাল, অবস্থা সমস্ত বিস্মৃত হইয়া পুনরায় যেন শিশু হইয়া শিশুর সহিত এককণ্ঠে রোদন করিতেন। সাধারণ মানুষ সমস্ত জীবন কামিনী এবং কাঞ্চনের উপভোগে নিমগ্ন থাকিয়া অন্তিমকালে যেমন বিশ্বজননীর শান্তিময় ক্রোড়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, অর্থপিপাসা, ভোগলিপ্সা যশস্পৃহা কিছুই তখন তাহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারে না, হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে ক্ষণে ক্ষণে কেবল "মা যাব" এই নীরব শব্দ উত্থিত হইয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলে, সেইরূপ নিখিল বিশ্বজননীর বিরহী অন্তরের যুগযুগান্তপুঞ্জীভূত ব্যাকুলতা শিওড়ের সেই সায়াহ্নকালে শিশুর মুখনিঃসৃত দুইটি সহজ কথায় শ্রীপরমহংসদেবের হৃদয়ে জাগরিত হইয়া রোদনের শতধারায় বিশ্বজননীর চরণে নিবেদিত হইত। এই "মা যাব" ব্যাকুলতাই কত বর্ষ পূর্ব্বে কোন্ এক বর্ষাদিনে মসীমাখা আকাশের অন্ধকারের ভিতর দিয়া ভক্তকবি বিদ্যাপতির সমস্ত হৃদয় মথিত করিয়া অসীম রোদনরূপে তাঁহার বন্ধনের ভিতর আপনার মুক্তির সন্ধান করিয়াছিল। সে দিন হয় ত আষাঢ়ের নবমেঘরাজি গিরিনদীপ্রান্তরের সন্ধ্যার অন্ধকারকে দ্বিগুণতর ঘনায়িত করিয়াছিল, তারাশশিবিলুপ্ত



কামারপুকুর

সমস্ত আকাশ মেঘলিপ্ত হইয়া একখণ্ড জমাটবাঁধা কঠিন অন্ধকারস্তরে পরিণত হইয়াছিল, ছায়াবৃত অরণ্য, নীলিমাচ্ছন্ন গিরিশিখর এক অব্যক্ত অন্ধ ব্যাকুলতায় একাকার হইয়া বিদ্যাপতির অন্তরেও এক গাঢ়তর অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছিল, আর সেই পুঞ্জীভূত অন্ধকার ভেদ করিয়া কবির হৃদয়ের অনন্ত ব্যাকুলতা ক্ষণে ক্ষণে গুমরিয়া উঠিতেছিল—

তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাতিয়া।
বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি
হরি-বিনে দিন রাতিয়া।

অনন্তকালের পুঞ্জীভূত এই একই ব্যাকুলতা হৃদয়নাথের শিশুপুত্রের "মা যাব" কথায় শ্রীপরমহংসদেবের অন্তরে জাগরিত হইয়া উঠিত, আর তিনি বালককে ভুলাইতে যাইয়া তাহারই সহিত এককণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিতেন।


হৃদয়নাথ

যে শ্রীপরমহংসদেব তাঁহার সাধনকালের অব্যবহিত পূর্ব্বে এবং পরে বিষয়িসংস্পর্শ বিষবৎ পরিহার করিতেন, সেই ঠাকুর শিওড়গ্রামে এই শিশুর সাহচর্য্যে দিবসের পর দিবস কিরূপে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা সম্যক্ বুঝিতে হইলে শিশুচরিত্রের রহস্য বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজন হইবে। শিশুদিগের সম্বন্ধে মহাপুরুষগণের অভিমত বড়ই সুন্দর ও বিচিত্র। শ্রীপরমহংসদেব একবার বলিয়াছিলেন—"পরমহংসরা তাই ছোট ছোট ছেলেদের কাছে আসতে দেয়, তাদের স্বভাব আরোপ করবে ব'লে।" * যে শিশু-স্বভাবের বিশিষ্টতা নিজ চরিত্রে সংক্রামিত করিবার জন্য পরমহংসগণও উৎসুক হইয়া থাকেন, সেই শিশুচরিত্রের অন্তরালে কি রহস্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা মহাপুরুষগণের বিশ্লেষণ হইতেই সহজে উপলব্ধি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, শিশুগণ কখনও কুটিলপ্রকৃতি অথবা অপরের অনিষ্টচিন্তানিরত বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। শিশু এবং বয়স্ক লোকের মধ্যে উভয়ের প্রতি উভয়ের আকর্ষণ লক্ষ্য করিলে অনেক সময়ে মানুষের চরিত্র উপলব্ধি করা যাইতে পারে। আমরা কখনও কখনও লক্ষ্য করিয়া থাকি যে, শিশু হয় ত কোনও অপরিচিত লোকের ক্রোড়ে আনন্দচিত্তে সহজেই আপনাকে ধরা দিয়া থাকে, আবার কোনও ব্যক্তিবিশেষ সেই শিশুকেই ক্রোড়ে লইবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াও বিফলমনোরথ হইয়া থাকে। কোনও কোনও ব্যক্তি নিজ সন্তানগুলি ব্যতীত অপর কোনও শিশুকে স্নেহ অথবা প্রীতিপ্রদর্শন করিতে পারে না—শিশুজগৎ তাহার নিকট অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং সীমাবদ্ধ। শিশু এরূপ লোককে ভীতিস্বরূপ বলিয়া জানে এবং কখনও শিশুর দৌরাত্ম্য অথবা আবদার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পিতামাতা রাত্রিকালে যেরূপ ভূতপ্রেতের ভীতিপ্রদর্শন করিয়া থাকে, সেইরূপ দিবাভাগে এই শিশুভীতির আকরস্বরূপ প্রতিবেশিবিশেষের আশ্রয় তাহারা গ্রহণ করে। সামাজিক সৌজন্য প্রকাশ করিবার সময় চেষ্টা করিয়া বন্ধুবান্ধবদিগের পুত্রকন্যাগণকে কখনও স্নেহব্যবহার প্রদর্শন করিতে হইলে তাহারা অনেক সময়ে এরূপ নীরস এবং প্রাণহীন ব্যবহার করিয়া থাকে যে, সহজেই সেই স্নেহবিহীন কৃত্রিম ব্যবহার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, শিশু হঠাৎ বিনা কারণেই কোনও ব্যক্তিবিশেষের নিতান্ত আপনার হইয়া পড়িয়াছে, রোদনের সময় তাহার ক্রোড়ই শিশুকে শান্তি প্রদান করে, ক্রীড়াকৌতুকের সময় তাহার সঙ্গই শিশুর আনন্দ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। পিতামাতার ক্রোড় হইতেও শিশুকে এইরূপ অপরিচিত অনাত্মীয় লোকের ক্রোড়ে আশ্রয় লইতে দেখা গিয়াছে, কখনও বা শিশু নিজ কোমল হস্ত দুইটি দ্বারা এই অপরিচিত বন্ধকে আবেষ্টন করিয়া পিতামাতার সস্নেহ আহ্বানকেও উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছে। সাধারণতঃ মানুষ অপর ব্যক্তিকে তাহার বাক্য এবং বাহ্য আচরণের দ্বারা বিচার করিয়া থাকে, কিন্তু শিশুর বিচারদৃষ্টি অপরের বাক্য অথবা বাহ্য আচরণের দ্বারা প্রতিহত

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।

নহে, সে নিজের প্রাণ দিয়াই অপরের প্রাণকে উপলব্ধি করিয়া থাকে।

মানুষ সংসারে যতই প্রবেশ করিতে থাকে, ততই তাহার প্রাণ কোমলতা পরিহার করিয়া স্বার্থের বীভৎস ঘাতসংঘাতে কঠিনতা ধারণ করে, প্রাণের পরিবর্ত্তে মুখের কথা এবং কৃত্রিম ব্যবহারই তাহার জীবনের সর্ব্বস্ব হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং এরূপ মানুষ অপরকে তাহার নিজ আদর্শের দ্বারাই বিচার করিয়া থাকে। কিন্তু শিশুর বাক্যও নাই, বাহ্য আচার-ব্যবহারও নাই, আছে শুধু তাহার সরল সুমধুর প্রাণ। সুতরাং অপরকে বিচার করিবার তাহার শুধু প্রাণশক্তিই আছে এবং কেবলমাত্র সেই শক্তির দ্বারাই সে অপরকে বিচার করিয়া থাকে। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, কোনও লোক হয় ত সংসারের আচার-ব্যবহারে অত্যন্ত গম্ভীর, যাহাদের সহিত তাহার স্বার্থের সম্বন্ধ, তাহাদের নিকট সে সহজবোধ্য অথবা সহজপ্রাপ্য নহে। সাধারণ ব্যবহারে তাহার অপরিসীম ক্রোধেরও পরিচয় সময় সময় পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু হয় ত লোকচক্ষুর অন্তরালে, মনুষ্য-দৃষ্টির অগোচরীভূত তাহার এমন তরল ও মধুর প্রাণ আছে, যাহা পৃথিবীর জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ দেখিতে না পাইলেও শিশুর প্রাণের নিকট তাহা ধরা পড়িয়া যায় এবং আমরা সেই মনুষ্য-চরিত্রের বাহিরের দিক্ দেখিয়াই বিস্মিত হই যে, এরূপ গম্ভীর এবং কোপনপ্রকৃতির লোক কিরূপে শিশুর প্রিয় হইয়া থাকে। এমন দেখা গিয়াছে যে, এরূপ লোকের সহিত সাধারণ বয়স্ক লোকের প্রীতি অথবা মিত্রতা বিরল, কিন্তু পল্লীর সকল শিশুরই সে বন্ধু, সকলেই তাহাকে নিতান্ত আপনার বলিয়া মনে করিয়া থাকে। শিশুর সান্নিধ্য ও সাহচর্য্যে এই অসামাজিক গম্ভীরপ্রকৃতির লোক অনেক সময়ে প্রহরের পর প্রহর কাটাইয়া দেয়, তখন অনাবিল তরল হাস্যমুখরিত এই প্রহরগুলি সংসারের গুরুভারক্লিষ্ট দিবসের তুলনায় একান্ত অপার্থিব এবং অমূল্য বলিয়া মনে হয়। শিশু মানুষের প্রাণ, নিজ প্রাণ দিয়া বিচার করিয়া থাকে এবং কোথাও এই বয়োবৃদ্ধ শিশু ও বয়ঃকনিষ্ঠ শিশুর মধ্যে চরিত্রের সামঞ্জস্য আছে বলিয়াই উভয়ের ভিতর এরূপ স্নেহ ও প্রীতিবন্ধন সম্ভবপর হইয়া থাকে।

সুবিখ্যাত ইংরাজ কবি গোল্ডস্মিথ জনৈক ধর্ম্মযাজকের চরিত্র বর্ণনা করিবার সময় শিশুর সাহায্যেই সে চরিত্র আদর্শ করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। এই ধর্ম্মযাজক তাঁহার যজমানবর্গের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন। তাঁহার নানাবিধ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলী বর্ণনা করিয়া অবশেষে গোল্ডস্মিথ বলিয়াছেন যে, প্রাতঃকালের উপাসনা শেষ হইলে শিশুগণ তাঁহাকে চতুর্দ্দিক্ হইতে বেষ্টন করিত এবং ধর্ম্মযাজকের সুদীর্ঘ অঙ্গবস্ত্র ধরিয়া তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। সরল ও মধুরস্বভাব এই ধর্ম্মযাজক তাহাদের প্রতি প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুহাস্য করিতেন এবং শিশুগণ সেই মৃদুহাস্যে আনন্দিত হইয়া নিজ নিজ মাতার সহিত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। যেন তাহাদের ধর্ম্মমন্দিরে আগমনের সমস্ত উদ্দেশ্য এই একটি মধুর হাসিতেই চরিতার্থ হইত। বাক্যের আড়ম্বর ছিল না, কেবল একটি মধুর হাসি, ইহাতে শিশুর সরলপ্রাণ ধর্ম্মযাজকের সরলপ্রাণের যে পরিচয় পাইত, তাহা অন্য কোনও ঘটনা হইতেই এরূপ বিশদভাবে প্রকাশিত হইত না। শিশুদের সহিত ধর্ম্ম-যাজকের এই যে মধুর সম্বন্ধ কবি একটি সরল হাসির ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ধর্ম্মযাজকের চরিত্র যেরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে, এরূপ কোনও সুদীর্ঘ বর্ণনা হইতে সম্ভবপর হইত না।

এক দিন যীশুখৃষ্টের নিকট তাঁহার শিষ্যগণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, কিরূপ লোক ভগবানের নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে? এই প্রশ্নের মধ্যে যে অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা মানবচরিত্র-পরিজ্ঞাত মহাপুরুষের নিকট অজ্ঞাত রহিল না। যীশুখৃষ্ট তাঁহাদের ধার্ম্মিকাভিমান দূর করিবার জন্য একটি শিশুকে তাঁহার নিকট আহ্বান করিয়া শিষ্যগণকে বলিলেন,—

"Except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the Kingdom of heaven."

(তোমাদের চরিত্র আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া যত দিন শিশুর বিশিষ্টতা চরিত্রে পরিস্ফুরিত না হইবে, তত দিন তোমরা কেহই স্বর্গরাজ্যের অধিকারী বলিয়া পরিগণিত হইবে না।)

শিশুর চরিত্রের বিশিষ্টতা বলিয়া যীশুখৃষ্ট কি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা ভক্তগণ বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশ করিয়াছেন। বিখ্যাত ইংরাজ লেখক রাস্কিন্ এই শিশু-চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন—

"So then, you have the child's character in these four things—Humility, Faith, charity and cheerfulness."

(অতএব দেখা যাইতেছে যে, শিশুচরিত্র বিনয়, বিশ্বাস, ভালবাসা ও আনন্দচিত্ততা, এই চারিটি গুণের সমষ্টি মাত্র।)

বিনয় শিশুচরিত্রের একটি প্রধান বিশিষ্টতা। শিশু কখনও আপনাকে জ্ঞানী মনে করে না, সে সর্ব্বদাই শিক্ষা করিবার জন্য উৎসুক। যে কোনও ব্যক্তির নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিবার স্পৃহা তাহার মনে বিশেষ বলবতী। আত্মাভিমান ও অহঙ্কার শিশুর চরিত্রকে কখনও কলুষিত করিতে পারে না।

"To know that he knows very little;—to perceive that there are many above him, wiser than he; and to be always asking questions, wanting to learn, not to teach."

(শিশু জানে যে, সে কিছুই জানে না, তাহার অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী অনেক লোক আছেন; সে সর্ব্বদাই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, সে শিক্ষা গ্রহণ করিতে চায়, শিক্ষা প্রদান করিবার অহঙ্কার তাহার নাই।)

অগাধ বিশ্বাস শিশুচরিত্রের অন্য একটি বিশিষ্টতা। পিতামাতার উপর নির্ভরতা এই বিশ্বাস হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে। পিতামাতা হাত ধরিয়া গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়া, অথবা মরুভূমির উপর দিয়া লইয়া যাইলেও শিশু তাহার প্রতিবাদ করে না, যতক্ষণ পিতামাতার হাত ধরা থাকে, ততক্ষণ তাহার সাহসেরও অবধি থাকে না। এই বিশ্বাসপূর্ণ নির্ভরতা শিশুচরিত্রের পরিলক্ষণীয় বস্তু।

শিশু মানবকে সহজেই ভালবাসিতে পারে। এই নিঃস্বার্থ ভালবাসা শিশুচরিত্রে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বস্তু।

"Give a little to a child, and you get a great deal back."

(শিশুকে যতটুকু ভালবাসা আমরা দিই, তাহার অধিক শিশুর নিকট হইতে আমরা ফিরিয়া পাই।)

আনন্দচিত্ততা শিশুচরিত্রের অন্যতম বিশিষ্টতা। কোনও দুঃখ-শোকই শিশুর চিত্তকে অধিকক্ষণ অধিকার করিতে পারে না, অতি সহজে এবং অল্পসময়ের মধ্যেই দুঃখতাপ সমস্ত ভুলিয়া গিয়া সে আপনার অন্তরের আনন্দে আপনি বিভোর হইয়া থাকে। শিশুর জীবনে অতীত নাই, সুতরাং জ্বালাময়ী অতীতের স্মৃতি তাহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, ভবিষ্যতের চিন্তা তাহাকে স্পর্শ করে না, সুতরাং ভবিষ্যতের অলীক মোহে তাহার মন আচ্ছন্ন নহে। বর্ত্তমান তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় আনন্দস্রোতে শিশু অবিরাম ভাসিয়া চলিয়াছে। ক্ষণিকের জন্য কোন দুঃখ মনে উদিত হইলেও জলরেখার ন্যায় তাহা অচিরেই বিলুপ্ত হইয়া যায়, জীবনের কোথাও তাহার কোনও চিহ্ন রাখিয়া যায় না।

মহাপুরুষ যীশুখৃষ্ট শিশুর চরিত্রের যে বিশিষ্টতার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া ইংরাজ লেখক রাস্কিন্ যাহা দেখাইয়াছেন, তাহা সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্রীপরমহংসদেব শিশুচরিত্রের বিশিষ্টতা তাঁহার অপূর্ব্ব মনোরম ভাষায় যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, শিশুর সেই চরিত্রবিশ্লেষণ অপূর্ব্ব শিক্ষাপ্রদ ও হৃদয়স্পর্শী। সে দিন তাঁহার নিকট ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার উপস্থিত ছিলেন।



ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার

বিষয়রসপ্রলুব্ধ বয়স্ক মানবের চরিত্রের সহিত সরল ও পবিত্র শিশুর প্রভেদ বর্ণনা করিবার সময় ঠাকুর বলিয়াছিলেন—

"কাঁচা 'আমি' কি জান? আমি কর্ত্তা, আমি এত বড়লোকের ছেলে, বিদ্বান্, আমি ধনবান্, আমাকে এমন

কথা বলে!—এই সব ভাব। যদি কেউ বাড়ীতে চুরি করে, তাকে যদি ধরতে পারে; প্রথমে সব জিনিষপত্র কেড়ে লয়, তার পর উত্তম-মধ্যম মারে; তার পর পুলিসে দেয়! বলে, 'কি! জানে না, কার চুরি করেছে!'

"ঈশ্বরলাভ হ'লে পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব হয়। বালক কোন গুণের বশ নয়। ত্রিগুণাতীত। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ কোন গুণের বশ নয়। এইমাত্র ঝগড়া-মারামারি করলে, আবার তৎক্ষণাৎ তারই গলা ধ'রে কত ভাব, কত খেলা! রজোগুণেরও বশ নয়। এই খেলাঘর পাতলে, কত বন্দোবস্ত, কিছুক্ষণ পরেই সব প'ড়ে রইলো; মার কাছে ছুটেছে! হয় ত একখানি সুন্দর কাপড় প'রে বেড়াচ্ছে, খানিকক্ষণ পরে কাপড় খুলে প'ড়ে গেছে! হয় কাপড়ের কথা একেবারে ভুলে গেল—নয় বগলদাবায় ক'রে বেড়াচ্ছে!

"যদি ছেলেটিকে বল, 'বেশ কাপড়খানি, কার কাপড় রে?' সে বলে, 'আমার কাপড়, আমার বাবা দিয়েছে!' যদি বল, 'লক্ষী ছেলে, আমায় কাপড়খানি দাও না', সে বলে, 'না, আমার কাপড়, আমি দেব না।' তার পর ভুলিয়ে একটি পুতুল কি আর একটি বাঁশী যদি হাতে দাও, তা হ'লে পাঁচ টাকা দামের কাপড়খানা তোমায় দিয়ে চ'লে যাবে। আবার পাঁচ বছরের ছেলের সত্ত্বগুণেরও আঁট নাই। এই পাড়ার খেলুড়েদের সঙ্গে কত ভালবাসা, এক দণ্ড না দেখলে থাকতে পারে না। কিন্তু বাপ-মার সঙ্গে যখন অন্য যায়গায় চ'লে গেল, তখন নূতন খেলুড়ে হ'ল। তাদের উপর তখন সব ভালবাসা পড়লো। পুরাণো খেলুড়েদের একরকম একেবারে ভুলে গেল। তার পর জাত অভিমান নেই। মা ব'লে দিয়েছে, ও তোর দাদা হয়, তা সে ষোল আনা জানে যে, এ আমার ঠিক দাদা। তা এক জন যদি বামুনের ছেলে হয়, আর এক জন যদি কামারের ছেলে হয় ত এক পাতে ব'সে ভাত খাবে। আর শুচি অশুচি নাই। আবার লোকলজ্জা নাই, ছোঁচাবার পর যাকে তাকে পিছন ফিরে বলে—দেখ দেখি, আমার ছোঁচান হয়েছে কি না?

"আবার বুড়োর 'আমি' আছে (ডাক্তার মহেন্দ্রলালের হাস্য) বুড়োর অনেকগুলি পাশ। জাতি, অভিমান, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়; বিষয়বুদ্ধি, পাটোয়ারী, কপটতা। যদি কারুর উপর আক্রোশ হয় ত সহজে যায় না;—হয় ত যত দিন বাঁচে, তত দিন যায় না। তার পর পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার। বুড়োর 'আমি' কাঁচা আমি।" *

শিশুচরিত্রের এই অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ হইতে শ্রীপরমহংসদেবের নিজচরিত্রের বিশিষ্টতা আমরা কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারি।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কামারপুকুর হইতে ঠাকুর পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন:

শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় (অধ্যাপক)।

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

অ-দেখা পৃথিবী

মানুষের প্রাণে অ-দেখা পৃথিবী পৃথিবীর চেয়ে বড়,
তার উপকথা উপনিষদের চেয়েও মহত্তর।
তাহার গাঙের কত গুলি ঢেউ গণিয়া পাবে না ভাই,
কত জনমের ধারা এসে মেশে, কোনখানে সীমা নাই!
কত জীবনের খেয়া পার হয়ে আসিয়াছি এই ঘাটে,
এ প্রাণের কত লেনা-দেনা হ'ল কত পৃথিবীর হাটে।
মানুষের পর মানুষ আসে ও যায়,
কারে দিছি রূপ কারে দিছি প্রাণ সকলি ভুলেছি হায়।

রাত হ'লে যবে ঘরে ফিরি একা, মনের পৃথিবীখানি
মন হ'তে এসে সমুখে দাঁড়ায়, করে কত কাণাকাণি।
পিছনে ফেলিয়া এসেছি যে ঘর সুদূর যুগান্তরে,
আজো সেই ঘর খুঁজে খুঁজে ফিরি জন্ম জন্ম ধ'রে।
কোন পাণ্ডিনীর কোন উপকূলে তেপান্তরের মাঠে
মনের মানুষ রয়েছে সেখানে, হেথা মোর দিন কাটে।
সকল মানুষে প্রেম বিলায়েছি ভাই,
সকলের মাঝে যদি এক দিন তাহারে খুঁজিয়া পাই!

শ্রীকরুণাময় বসু।



দান-প্রতিদান

[উপন্যাস]



পূর্ব্বানুবৃত্তি।

৪৬

চিন্তাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কখন্ যে ক্লান্ত কুহু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহা সে জানে না। যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন প্রভাতের বিলম্ব নাই। আকাশের পূবের দিকে নব আলোর আমেজ দিয়াছে। বনস্থলী পাখীর প্রভাত-বন্দনায় ঝঙ্কৃত হইতেছে। দুই একটি ধান-কাটার নৌকা শান্ত জলের উপর ভাসিয়া যাইতেছে। নদীর শীতল বায়ু-স্পর্শে কুহু গায়ের কাপড় টানিয়া দিতে যাইয়া সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল, ঘুমন্ত অবস্থায় কে যেন একখানা পশমী গায়ের কাপড় দিয়া সযত্নে তাহাকে ঢাকিয়া দিয়াছে। কাপড়ের এক অংশ চোখের কাছে ধরিতেই এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে কুহু অভিষিক্ত হইল। গায়ের কাপড়টা জয়ন্তর। কুহুর ঘুম না ভাঙ্গাইয়া জয়ন্ত ভিন্ন কে আর কুহুকে আবৃত করিয়া দিবে? পাছে তাহার শীতানুভব হয়, হিম লাগিয়া অসুখ করে, এই আশঙ্কায় স্বামীর এ ব্যগ্রতা কুহুর আশাহত অভিমান-ক্ষুব্ধ হৃদয়ে নববল সঞ্চয় করিল। এ যেন তুচ্ছ একটা আলোয়ান নহে, ইহার মধ্যে স্বামীর অব্যক্ত ভালবাসা, অনন্ত স্নেহ নিহিত হইয়া রহিয়াছে। সেই যত্নটুকু কুহুর মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়া তাহাকে তাহার স্বামীর দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

কুহু উঠিয়া নিঃশব্দে শয়নকক্ষে উপনীত হইল। শীত ও গ্রীষ্মে ঘরের দরজা-জানালা খুলিয়া শয়ন করা জয়ন্তর চিরকালের অভ্যাস। এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

হলের মধ্যস্থলে এক বৃহৎ খাটে জয়ন্ত গভীর নিদ্রায় মগ্ন। শিয়রের মুক্ত বাতায়ন-পথে আসন্ন প্রভাতের স্নিগ্ধ আলো তাহার মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। সে মুখে দিবসের ক্লান্তি ও কর্কশতার চিহ্নও নাই। একটি সুস্নিগ্ধ শান্তি, অম্লান নির্ম্মলতা বিরাজ করিতেছে।

কুহু পলকহারা নেত্রে স্বামীর পানে তাকাইয়া জয়ন্তর বাহুতে মৃদু চাপ দিতে দিতে ডাকিল, "শুনেছ? আমায় বারান্দায় র‍্যাপার চাপা দিয়ে দিব্যি আরামে ঘুম দেওয়া হচ্ছে। ভারী মজার মানুষ ত? ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ব'লে ডাকতে মানা করেছিল কে?"

জয়ন্ত তন্দ্রালস চক্ষু মেলিয়া বলিয়া উঠিল, "আঃ, জ্বালাতন করো না, কে তোমায় এখানে আসতে বল্লে!" বলিয়াই জয়ন্ত মোটা পাশ-বালিশটা আঁকড়িয়া কুহুর দিকে পিছন ফিরাইয়া শুইল।

কুহুর হাসিমুখের সমস্ত দীপ্তি নিমিষে নিবিয়া গেল। লজ্জায় সঙ্কোচে তাহার নড়িবার শক্তি তিরোহিত হইল। যে এ পর্য্যন্ত উপযাচিকা হইয়া স্বামীর নিকটে আসিতে পারে নাই, সংশয়ে সন্দেহে দুই পদ অগ্রসর হইয়া চারি পদ সরিয়া গিয়াছে, উদ্বেলিত হৃদয়কে অহরহ শাসন করিয়াছে, সংযত করিয়াছে, ভোরের আলো তাহাকে এ লজ্জাহীনা অভিসারিকার বেশে সাজাইয়া এখানে টানিয়া আনিল কেন?

কুহু সভয়ে চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিল। চির-অধিকারের ভিতর আসিয়া সে যেন কত বড় একটা অপরাধ করিয়া বসিয়াছে। তাহার দৈন্য নিরীক্ষণ করিয়া কেহ ত বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছে না?

আসা যত সহজ হইয়াছিল, ফিরিয়া যাওয়া ততোধিক কঠিন হইলেও কুহুকে ফিরিতে হইল। চোরের ন্যায় পা

টিপিয়া টিপিয়া বাহিরে আসিতেই কুহু একবারে নিস্তারের সম্মুখে পড়িয়া গেল। নিস্তার পাশের ঘরে বাসনার প্রহরি-স্বরূপ শয়ন করিয়াছিল।

নিস্তার চোখ মুছিতে মুছিতে কুহুর সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাল রাতে তোমার কি হয়েছিল, বৌ-রাণি? খেতে উঠলে না, শুতেও উঠলে না। আমি ভাবনু, মাথা-টাথা ধরেছে, তাই বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছ। ভয়ে ভাল ক'রে ডাকতে পারনু না, কি জানি কাঁচাঘুম ভাঙ্গলে মাথাধরা বাড়ে যদি। ভেবেছিনু, শোবার সময় রাজাবাবু তোমায় ডেকে তুলবে। ডাকলে না দেখে কি আর করি, সাত তাড়াতাড়ি একটা গায়ের কাপড় নিয়ে তোমার গায়ে চাপা দিনু। নিস্তার ত এক দিনের নয়, লোকের ভালমন্দ তারেই দেখতে হয়।"

গায়ের কাপড়ের ইতিহাস প্রকাশ হওয়ামাত্র কুহু নিস্তারের দিকে চোখ তুলিতে পারিল না। লজ্জায় সঙ্কোচে তাহার মাথা নত হইয়া পড়িল। কোথায় গেল স্বপ্নের জড়িমা, কোথায় গেল পতি-প্রেমের কল্পনার স্বর্গ। সে নিরুত্তরে দালানের শেষ প্রান্তে সরিয়া গিয়া উত্তরের জানালার ধারে দাঁড়াইল।

তখন দিনের আলো উজ্জ্বল হইয়া আসিয়াছে। স্তব্ধ জগতে পুনরায় কর্ম্মের প্রবাহ বহিতেছে। গো-পালের পশ্চাতে রাখালের দল মলিন গামছায় মুড়ি-মুড়কি বাঁধিয়া মাঠের পথে যাইতেছে।

কুহু দুই বিহ্বল-নেত্র বাহিরে প্রসারিত করিয়া দিল। প্রভাতের রূপ কি সুন্দর, মনোহর, নীল জলের উপর সাদা পাল তুলিয়া দুই একটি নৌকা ভাসিয়া যাইতেছে। পরপারের অস্পষ্ট গ্রামরেখা, গ্রামের কোল ঘেঁষিয়া শুভ্র বালির চড়ায় বনহংসের দল বিচরণ করিতেছে। দূরত্ব বশতঃ বিহগের কলরব শ্রবণপথে না আসিলেও শুভ্র মল্লিকা-স্তূপের ন্যায় তাহাদের উল্লম্ফনশীল মূর্ত্তি প্রশান্ত নীলাকাশের নিম্নে সহজেই দৃষ্টিগোচর হইতেছে। স্বচ্ছ জলে ছায়া ফেলিয়া এক দল গাঙ-শালিক শিকারের আশায় উড়িয়া বেড়াইতেছে। দুই একটি নত হইয়া জল স্পর্শ করিয়া আবার সহচরদের সহিত মিলিত হইতেছে। দূরে দিগন্তসীমায় বাঁশবনের ক্রোড় ঘেঁষিয়া একখানি ক্ষুদ্র ধান্যক্ষেত্র। অগ্রহায়ণের দান, সুবর্ণপ্রভ ধানগাছগুলি মৃদু সমীরণ-সহকারে এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। কুহুর কবেকার পড়া কয়েকটি লাইন মনে পড়িল—

ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কিবা মৃদুবায়,
তটিনী হিল্লোল তুলি কল্লোলে মিশিতে চায়,
পিক কিবা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহু কুহু কুহু গায়,
কি জানি কিসের লাগি প্রাণ করে হায় হায়।

প্রফুল্ল প্রভাতের অনাবিল শ্রী তাহার ব্যথিত মনের মেঘরেখা অপনীত করিতে পারিল না। শাশ্বত নারী-হৃদয়ের অতৃপ্তির হাহাকার প্রভাতের সকল মাধুরীর মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল।

কুহু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দৃষ্টিটা দূর হইতে নিকটে আনিতেই তাহার দৃষ্টিপথে পড়িল গুটি-তিনেক কুটীর-বেষ্টিত এক ক্ষুদ্র অঙ্গন। তাহাদের কাছারী-বাড়ীর পশ্চাতে গৃহটি অবস্থিত। দোচালা খড়ের ঘরের দাওয়ায় বসিয়া এক বর্ষীয়সী বিধবা পায়ে হাত বুলাইতেছেন, তাঁহার বদনে বেদনার কুঞ্চন-রেখা। যৌবনের রূপের জ্যোতি এখনও বিধবার শরীর হইতে একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। তাঁহার পরিধানে একখানা আধময়লা সাদা ধুতি। বিধবা কিয়ৎকাল বসিয়া ডাকিলেন, "মাধুরী, ও মাধু, আজ কি ঘরের বার হবি নে? কাযকর্ম্ম বাসি-পাট হবে কখন্? খানিক না বসলে আমি যে উঠতে পারি না। পাটা আজ বড্ড কন্ কন্ করছে।"

"তুমি বোসো, মা, এখন নড়া-চড়া করো না। বাবলির জামা পরানো হয়েছে, কাজল পরিয়ে দিয়েই আমি আসছি।" বলিতে বলিতে একটি তরুণী বছর দুই বয়সের শিশুকে কোলে লইয়া বাহিরে আসিল। মেয়েটি কুহুদের বয়সীই হইবে। সাদা সেমিজের উপর একখানি চওড়া লাল পাড় শাড়ীতে তাহার কমনীয় তনু আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। কবরীচ্যুত কেশগুচ্ছ গৌর কপোলে লুটাইতেছে। কাণে রাঙ্গা পাথরের দুইটি দুল, হাতে সাদা শাঁখার উপর তামা বাঁধানো চুড়ি।

কুহুর মনে হইতেছিল, শিশিরসিক্ত প্রভাতে বন-বিতান পরিত্যাগ করিয়া সাক্ষাৎ হেমন্তলক্ষ্মী গৃহলক্ষ্মীর বেশে অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কোলে তাঁহার নবোদিত ঊষা। দরিদ্রের দীন কুটীরে এত রূপ!

কাল সমস্ত দিন কুহু শুনিয়াছে, তাহার মত রূপসী না কি এ অঞ্চলে আর নাই। কিন্তু সে রূপের খ্যাতি কাহার?

কুহুর, না হীরা-মুক্তার গহনার? না মহার্ঘ বসনের? রাজ-উদ্যানে যে ফুল ফোটে, মত্ত পবনে তাহারই সুবাস দিকে দিকে বিলাইয়া দেয়, নির্জ্জন বনের বন-ফুলটির সুগন্ধ কয় জন জানিতে পারে? তরুণী মেয়েটি যেন আজিকার প্রভাত-পদ্মের মত পবিত্র নির্ম্মলতায় প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তরুণী বা কিশোরী বলিলে উহাকে যেন ঠিক বলা হয় না, ও যেন মা যশোদা গণেশ-জননীর প্রতিচ্ছবি।

মেয়েটি কোলের সন্তানটিকে বিধবার পাশে বসাইয়া দিয়া ত্বরিত-পদে কুটীর হইতে একটি মালিসের ঔষধ আনিয়া বিধবার পদতলে বসিল।

প্রৌঢ়া বলিলেন, "শিশিটে আমায় দিয়ে তুই কাযে হাত দে, মাধুরী, বেলা হয়ে গেল, এখুনি গয়লা দুধ নিয়ে আসবে। বাবলি রাতে দুধ খায় নি, শীগ্‌গির শীগ্‌গির ওকে দুধ জ্বাল দিয়ে খাওয়াতে হবে।"

"তোমার পায়ে একটুখানি মালিষ ক'রে এখুনি যাচ্ছি, মা। বেলা বেশী হয় নি। নিজে নিজে মালিষ করলে তেমন ফল হয় না। বাবলিকে দুটো টাটকা মুড়ি দিয়ে সব সেরে নিচ্ছি। তুমি ব্যস্ত হও না, মা। পা মেলে দাও।"

কুহু অনুমান করিতে লাগিল, বর্ষীয়সী মা, মাধুরী মেয়ে, মাধুরীর কন্যা বাবলি। উহারা তাহাদেরই প্রতিবেশিনী; বোধ হয় বড় গরীব। গরীব মনে করিতেই কুহুর শুষ্ক ওষ্ঠে মলিন হাসির ঝলক দেখা দিল। তাহারাও ত গরীব, বাবা, মা, ভাইরা এখনও গরীবই আছেন, সেই কেবল ভাগ্যের চক্রান্তে শান্তির দারিদ্র্য হইতে দুঃখের ঐশ্বর্য্যের ভিতর আসিয়াছে। কুহু এখন ধনী—মহা ধনী, কিন্তু এ ধনের বিনিময়ে সে পাইয়াছে কি? প্রাপ্তির হিসাব করিতে গেলে দারিদ্র্যের মাধুর্য্যটুকু তাহাকে রুক্ষ ক্লিষ্ট করিয়া তোলে কেন? বৈভব সকলেরই কামনার বস্তু, আশার স্বর্গ, কিন্তু সে যে বাহিরের সম্পদ, তাহাতে অন্তর ভরে না। ঐশ্বর্য্য মিথ্যা মরীচিকা, সুখ-শান্তি ঐশ্বর্য্যের আয়ত্তের বাহিরে।

"বৌ-রাণি, আপনার মুখ ধোবার বুরুশ, আরক, তেল, মাজন সমস্ত বড় বাথরুমে রেখে এলাম। নফরা চানের জল দিয়ে গেছে। এখুনি কি চুল খুলে তেল মাখিয়ে দেব?"

কুহু ঘাড় নাড়িল, "না, পুঁটুর মা, এখন আমায় তেল মাখাতে হবে না। আচ্ছা, ও বাড়ীটা কাদের বলতে পার? ঐ যে একটি বৌ, তার কাছে ছোট্ট মেয়েটি খেলা করছে?"

নিস্তার বাহিরে উঁকি দিয়া তাচ্ছীল্যের সহিত উত্তর করিল, "ওটা কাদের বাড়ী, তাই আবার কইতে পারবো নি। তোমাদেরি তশীলদার পরাণ চক্রবর্ত্তী ওইখানে থাকে। বাড়ীটা তোমাদেরি, সেবার বড় রাজাবাবু এসে করিয়ে দেছে। বাতের ব্যামোতে মুণ্ড-পুণ্ড যে ব'সে রইছে, ওই হোল যে পরাণ চক্রবর্ত্তীর শাউড়ী, ওই বৌ আর মেয়ে।"

"ওরা বড্ড গরীব না?"

"হ্যাঁ বৌ-রাণি, গরীব বৈ কি। লোকে কথায় বলে না, "কখনো সিংহাসনে, কখনো বনে, ওদের সেই দশা। সাগর-গাঁয়ের বাসীন্দা ওরা, সেখানে ওদের ঘরবাড়ী ছেল, ক্ষেত-খামার ছেল, গাঙ-ভাঙ্গুনিতে সর্ব্বিস্থি খুইয়ে এখানে এসে বড় রাজার কাছে কেঁদে পড়লো। ভদ্দর লোক হলে কি হবে, চিরকাল ক্ষেত চষিয়ে ধান কাটিয়ে চাষাভুষার ভেতর সে ছেল, তাকে দিয়ে লেকাপড়ার কায হয় না। তাই বড়রাজা উঁনারে তশীলদার ক'রে ঘর বানিয়ে একটা স্থিতি ক'রে দিলেন।"

"আজ দুপুরবেলা আমায় একবার ওখানে নিয়ে যেতে পার, পুঁটুর মা? রান্নাবাড়ীর পিছনেই ত ওদের বাড়ী, দুপুরবেলা রান্নাবাড়ীতে কেউ থাকেও না, তখন যাব। বৌটি বেশ সুন্দর দেখতে। খুকুটাও বেশ মিষ্টি, আমার ওদের সাথে আলাপ করতে ইচ্ছে করছে। বড্ড ভাল লাগছে।"

নিস্তার দুই চোখ কপালে তুলিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "ও মা, কোথাকে যাব গো! বৌ-রাণী বলে কি? আপনি যাবেন তোমার চাকর নফর তশীলদারের বাড়ী? লোকে দেখলে বলবে কি গা? ভাল লেগেছে, হুকুম পাঠাও, এখুনি যোড়-হাতে ছুটে আসবেখ'ন। আকাশের চাঁদ ভুঁয়ে নামে না কখনো, এ কথা সব্বাই জানে।"

কুহু নিরুত্তর। ধনের কত ব্যবধান, অহঙ্কার! হীরার থামের সহিত সুবর্ণ-শৃঙ্খলে তাহাকে বন্দী করা হইয়াছে। আমরণকাল বন্ধনযন্ত্রণা ভোগ না করিলে তাহার কি নিস্তার নাই? মুক্তি নাই? নারায়ণ, এ তোমার কেমন বিধান? হৃদয়কে কাঙ্গাল অপেক্ষাও কাঙ্গাল করিয়া পথের ধূলায় দলিয়া পিষিয়া বাহিরের আড়ম্বর অটুট রাখিতেছ? বল দাও, সহিবার বল দাও। শক্তিহীনা করিয়া আর তাহাকে অগ্নি পরীক্ষায় ফেলিও না। যে দুর্ব্বল শক্তিহারা, তাহাকে লইয়া বেশী খেলা ভাল নয়।

৪৭

মধ্যাহ্নে বিরাজমোহিনীর কাছে আহারাদি সারিয়া কুহু বাড়ী আসিল। এ বাড়ীতে নিয়মিত রান্না খাওয়া হইলেও কাকীমা এ কয় দিন কুহুকে ও বাসনাকে তাঁহার নিকটেই খাইতে বলিয়াছেন। স্নেহময়ী খুড়-শাশুড়ীর আগ্রহে কুহু আপত্তি করিতে পারে নাই। বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী, কুটুম্ব-সমাগমে চতুর্দ্দিক্ গমগম করিতেছে। বাসনা সমাগত কুটম্বিনীর দলে ভিড়িয়া গিয়াছে। কাকীমা বধূকে খাওয়াইয়া বিশ্রামের অছিলায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। জয়ন্ত এ কালের ছেলে, বধূর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে যদি বিরক্ত হয়? কিন্তু কোথায় জয়ন্ত? কোথায় বধূ?

কুহু স্নান সারিয়া আসিতে না আসিতেই জয়ন্ত বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে গিয়াছিল। বাহিরেই তাহার চা-পান আহারাদি সমাধা হইয়াছে। খানিক আগে নিস্তার খবর দিয়া গিয়াছে, "রাজাবাবু বাহিরে ঘুমাইতেছেন।"

কুহু আশা করিয়াছিল, আজ দুপুরবেলা জয়ন্ত নিশ্চয় কুহুর সন্ধানে আসিবে; কুহুকে নিকটে ডাকিবে; কিন্তু আশা করিলেই কি সফলতা মেলে? মিলিলে দুঃখ বলিয়া কিছুই থাকিত না, নিরাশা বলিয়া কিছুই থাকিত না।

গদি-আঁটা শুভ্র বিছানা রাখিয়া কুহু একটা মাদুর টানিয়া মেঝেয় লুটাইয়া পড়িল। মাঠের দিক হইতে আসন্ন শীতের বারতা বহিয়া শীতল ঝিরঝিরে বাতাস আসিতেছিল। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে বারান্দা ভরিয়া গিয়াছে। সে রৌদ্রে প্রখরতা নাই। উত্তাপ নাই। অদূরে শ্যামচিক্কণ নারিকেল-বৃক্ষে বসিয়া একটি পাখী কোমল সকরুণ স্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছে—"বৌ কথা কও, বৌ কথা কও।" সে বিষাদের স্বর শুদ্ধ ধরণীর দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তবু অভিমানিনী বিহগবধূর মুখ খুলিবার সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। বনের পাখী, তাহারও অভিমানের মূল্য আছে, কিন্তু ঘরের বধূর অভিমান করিবার কি কিছুই নাই?

মৃদুস্বরা নদীটি যেন বিশ্বপ্রকৃতির সহিত বিশ্রাম-সুখে মগ্না। ঘাট জনশূন্য বলিলেই চলে, দুই একটি রাখাল কেবল মাঠ হইতে ফিরিবার সময় গোরুগুলিকে জলে নামাইয়া নিজেরা গোরুর পিঠে বসিয়া স্নান সারিয়া লইতেছে। কিয়ৎকালের নিমিত্ত নৌকা-চলাচল বন্ধ হইয়াছে। পর-পারের বালির চড়াটি সূর্য্যকিরণে ঝকমক করিয়া জ্বলিতেছে।

কুহু একদৃষ্টে চড়ার পানে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিল, তাহার জীবন যেন ঐ তৃণশূন্য, বৃক্ষশূন্য ধূ ধূ বালির চড়া। আশাহীন, আনন্দহীন সুখের সহস্র উপকরণ নদীর তরঙ্গের ন্যায় হৃদয়ের তটভূমি ছুঁইয়া ছুঁইয়া সরিয়া যাইতেছে, সে তরঙ্গে তাহাকে প্লাবিত করিতে পারে না—সিক্ত করিতে পারে না। স্নেহ, প্রেম সুকোমল মনোবৃত্তিগুলি বন্য হংসের মত হৃদয়-চড়ায় বিচরণ করিতে আসিয়া উত্তপ্ত বালুকার ভয়ে আতঙ্কে পলায়ন করে। তাহারা গগনমণ্ডল কেবলই দহন করিতে পারে, শিশির ঢালিতে জানে না। তাহাতে দাহিকা শক্তি আছে, কিন্তু বর্ষণ করিবার শক্তি নাই।

পদশব্দে চকিত হইয়া কুহু মুখ ফিরাইয়া উঠিয়া বসিল। নিস্তারের সহিত মাধুরী, মাধুরীর মা ও বাবলি বেড়াইতে আসিয়াছে।

কুহু বিস্মিত বিহ্বল নেত্রে কেবল তাকাইয়া রহিল, অভ্যর্থনা করিবার কথা ভুলিয়া গেল।

কুহু ভুলিলেও নবাগতারা ভুলিলেন না। মাধুরী ও তাহার মাতা ক্ষান্তমণি অগ্রসর হইয়া যুক্তকরে কুহুকে নমস্কার করিলেন।

প্রতিনমস্কারস্বরূপ কুহু ক্ষান্তমণির পদতলে ভূমিষ্ঠ হইতেই ক্ষান্তমণি তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন। ধরিয়া প্রতিবাদ করিলেন, "না, না, এ হতেই পারে না। আমরা আপনাদের আশ্রিত, অনুগত, আমাদের দয়া ক'রে ডেকেছেন, এই ভাগ্যি।"

কুহু সকলকে বসাইয়া নিস্তারের দিকে চোখ তুলিতেই নিস্তার বলিল, "তখন আপনি এনাদের কথা বলেছিলে, তাই ডেকে আনলাম, বৌরাণি।"

কুহু নিস্তারকে পাণ আনিতে আদেশ করিয়া, বাবলির দিকে হাত বাড়াইল।

সম্পূর্ণ নূতন স্থানে অপরিচিতের মধ্যে আসিয়া বাবলি প্রথমে ভীত হইয়াছিল। কুহুর আদরে তাহার ভয় ভাঙ্গিতে বিলম্ব হইল না।

বাবলিকে কোলের উপর বসাইয়া কুহু বাবলির মাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, মাধুরী কুহুর একবয়সীই হইবে। তাহার শরীরটি কৃশ, কিন্তু মুখখানি বড় মিষ্ট। তাকাইলে চোখ নামাইতে ইচ্ছা হয় না। আয়ত উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি যেন স্বচ্ছজলে নীলপদ্ম। রাঙ্গা বাঁকা ঠোঁট হইতে হাসির

অমৃত ঝরিয়া পড়িতেছে। গায়ের বর্ণ কুহুর মত অত উজ্জ্বল না হইলেও গৌরই বলিতে হয়। প্রভাতের দেখা সেই চুড়ি ও দুল ভিন্ন অঙ্গে আর কোন অলঙ্কার নাই। একটি সাদা সেমিজের উপর একখানি মিলের কালোপাড় শাড়ী পরিয়া মাধুরী বেড়াইতে আসিয়াছিল। কুহু মনে মনে স্বীকার করিল—"হ্যাঁ, ইহারই নাম রূপ বটে। ইহাদের শাড়ী-গহনায় সাজিতে হয় না। 'পাউডার' 'স্নো' দরকার হয় না। সজ্জা ইহাদের কাছে আসিতেও লজ্জা পায়। যেমন মধুর মূর্ত্তি, তেমনই মধুর নামটি 'মাধুরী'। এ যেন নারীজাতির মাধুরী, দরিদ্রের জীর্ণ কুটীরের মাধুরী, বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টিলীলার অপরূপ মাধুরী।

মাধুরীর একটি হাত হাতের মধ্যে লইয়া কুহু কহিল, "তোমার নাম ত মাধুরী? আজ সকালে আমি জানলায় দাঁড়িয়ে তোমাকে দেখে নিয়েছি, তোমার নামও শুনেছি। নামটি বড় সুন্দর, চেহারার সাথে মিলিয়ে রাখা।"

মাধুরী লজ্জায় রক্তিম হইয়া সসঙ্কোচে প্রত্যুত্তর করিল, "ভোরবেলা আপনি বুঝি জানলায় দাঁড়িয়েছিলেন? আমি এর আগে আপনাকে দেখিনি কি না, কে না কে ভেবে স'রে গিয়েছিলাম।

ক্ষান্তমণি পাকা লোক, তাঁহার নির্বোধ কন্যা যে নিজের প্রশংসা গায়ে মাখিয়া উত্তর দিতে পারিল না, ইহাতে তিনি মেয়ের প্রতি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আপনাকে চিনলে মাধু স'রে যেতো না, রাণীমা; সেখান থেকেই দণ্ডবৎ করতো। ওকে আপনার ভাল লাগছে, নাম ভাল লাগছে, এ ত ভাগ্যি। এত দিনে আমার নাম রাখা সার্থক হ'ল। কিন্তু নামেতে কিছু হয় না, চেহারাতেও না, কপাল থাকা চাই। মেয়েটা ভাল হলেও ভাগ্যি ভাল নয়। জন্মের পরেই ওর বাপ মারা যায়। আমার বড় মেয়েটি বিধবা হয়। সংসারে দুরবস্থার একশেষ। দুঃখে কষ্টে কোন রকমে অল্পবয়সেই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম। দুই মেয়ে ছাড়া আমার যেমন কেউ ছিল না, জামাইয়েরও তাই। তবে ঘরে খাবার সংস্থান ছিল, ভেবেছিলাম, মাধুরী কখনও খাওয়া-পরার কষ্ট পাবে না। কিন্তু ওর অদৃষ্টে কিছু রইল না। নদীর জলে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়ে অবশেষে আপনাদের আশ্রয়ে আসতে হ'ল। যার বাড়ীতে দশটা মজুর ক্ষেতের কায করতো, সে আপনাদের চাকর হ'ল।"

কুহুর সুকোমল অন্তঃকরণ করুণায় আর্দ্র হইল। এই ত ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার, অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে সময় লাগে না। কয়েক দিন পূর্ব্বে কুহুও মাধুরীর ন্যায় গরীবের মেয়ে ছিল, ভাগ্যচক্রে সে আজ 'রাণীমা'; কিন্তু এ রাণীত্বের অন্তরালে যে নারী-প্রকৃতি অহরহ ব্যথায় কাঁদিতেছে, সে মাধুরী অপেক্ষাও দীনা। তবুও মাধুরী ভৃত্যপত্নী, কুহু রাজরাণী। কুহুর বাঁকা ঠোঁটে একটু বাঁকা হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে ক্ষান্তমণির প্রতি তাহার ডাগর চক্ষু মেলিয়া কুণ্ঠার সহিত বলিল, "আপনি আমাকে বার বার রাণীমা বলছেন কেন? বয়সে আপনি আমার মা'র মত, বামুনের মেয়ে, আমার নাম ধ'রে ডাকবেন, 'তুমি' বলবেন, তাতেই আমি সন্তুষ্ট হব বেশী। মাধুরী, তুমি আমায় রাণী-মা বলো না, ভাই! রাণী-মা শুনতে আমি ভালবাসি না।"

নিস্তার পাণ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। পাণের ডিবা কুহুর পায়ের কাছে নামাইয়া দিয়া ঠোকর দিয়া বলিল, "রাণী হলেই লোকে রাণী-মা বলবে, বৌ-রাণি। আর কারুকে কেউ ত রাণী ব'লে ডাকতে যায় না? যারা তোমার চাকরী করবে, তারা কি নাম ধ'রে ডাকতে পারে? সে যে বেয়াদপি হয়।"

ক্ষান্তমণি সায় দিলেন, "সে ত সত্যি কথা, হক কথা, তা হয় না, রাণী-মা? আপনি ছেলেমানুষ হলেও রাজবাড়ীর নিয়ম আমাদের মানতে হবে। আমার জামাই আপনাদের চাকর, আমরা কি আপনাকে নাম ধ'রে ডাকতে পারি? লোকে শুনলে বলবে কি? বলবে—মাগীদের আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ।"

কুহু উত্তেজিত হইয়া জবাব করিল, "অন্যের কথায় আপনার আমার ক্ষতি নেই। আপনার জামাই খেটে কায করছেন ব'লে আপনারা আমাদের কেনা গোলাম নন। তিনি পরিশ্রম করেন, এরা তার মূল্য দেয়, পরিশ্রম ও অর্থ তার বিনিময়েই সংসার চলে। জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, বড় বড় ক্ষমতাশালী যারা, তাঁরাও ত চাকর, শক্তির তারতম্যে ছোট-বড়; কিন্তু আসল এক। আপনার জামাই কায করেন বটে, আপনারা ত কায করেন না? আপনাকে আমি মাসীমা বলবো, আপনি বলবেন কুহু। হ্যাঁ, আমার নাম কুহু, অদ্ভুত নাম। মাধুরী হাসছ, কি করবো বল? তোমার মত সুন্দর নাম আমার নয়।"

অপরিচিতা প্রভুপত্নীর সরল সৌজন্যে সরলা মাধুরী বিস্মিত হইল। প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ ভুলিয়া, ধনি-দরিদ্রের পার্থক্য ভুলিয়া, সেই মুহূর্ত্তেই সে কুহুর সহিত একটি অচ্ছেদ্য প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইল। এখানে মাধুরীর সঙ্গী-সাথী ছিল না। সে দরিদ্র তশীলদারের পত্নী বলিয়া পাড়ার মেয়েরা তাহাদিগকে নিতান্ত উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিত; প্রকাশ্যে তুচ্ছ-তাচ্ছীল্য করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। সেই জন্য মাধুরী কোথাও যাইতে ভালবাসিত না; কাহারও সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে সঙ্কুচিত হইত। এখানেও তাহার আসিবার আগ্রহ বা ইচ্ছা ছিল না। নিস্তারের মুখে জমিদার-পত্নীর আহ্বান জানিয়া বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে আসিতে হইয়াছিল।

কুহুকে দেখিবামাত্র মাধুরীর হৃদয়ে সৌহার্দ্দভাব জাগিলেও দ্বিধা-সংশয়ে সে কুহুর নিকটস্থ হইতে পারিতেছিল না। কেমন করিয়া হইবে? ক্ষুদ্র খদ্যোতের স্থান মাটীর বক্ষে, উদার নীলাকাশে নহে। বনলতা বনেই থাকে, উদ্যান-লতার পাশে আসিতে পারে না, কিন্তু আকাশ যদি নীচে নামিয়া খদ্যোতিকাকে বক্ষে টানিয়া লয়, তবে কি তাহার দূরে থাকা চলে? উদ্যানলতা বনলতাকে জড়াইয়া ধরিলে বনলতা লতার ফাঁস ছাড়াইতে পারে না। জগতের চিরন্তন নিয়ম—এক অপরকে আকর্ষণ করিলে অপর তাহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া পারে না। তটিনী তটভূমিকে আলিঙ্গন করিলে তট তটিনীর কোলেই আশ্রয় লয়।

নিমেষে মাধুরী ভেদাভেদ ভুলিয়া কুহুর পাশে আরও একটুখানি সরিয়া গাঢ়কণ্ঠে কহিল, "আপনার নামটিও বেশ, খুব নতুন, এমন আর শুনিনি। আমি আপনাকে রাণীমা না ব'লে দিদিরাণী ব'লে ডাকবো। আপনি বয়সে আমার চেয়ে বড় নন, মা না ব'লে দিদি বল্লেই ভাল শোনাবে।"

নিস্তার পা ছড়াইয়া পাণ চিবাইতে চিবাইতে সায় দিয়া কহিল, "ওনার শাউড়ীকে ত আমি রাণীদিদি বলেই ডাক্‌তাম। তিনি যে ভাল ছেলেন, আমারে কইতেন 'তুই আমার বাপের আমলের নোক নিস্তার, আমাকে দিদি বলিস!' তিনি কইলে কি হবে, মা? হাজার হোক রাজা মনিব তো। মনিবের প্রিতি ছেরদা ভক্তি না দেখালে চলবে কেনে? তা বাবুলির মা, তুমি আমাদের বৌ-রাণীকে রাণীদিদি বলেই ডেকো।"

কুহু নিস্তারের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া মাধুরীর কথার সূত্র ধরিয়া বলিতে লাগিল, "আমি তোমার চেয়ে বয়সে ছোট হব না মাধুরী, তুমিই আমার ছোট। তোমার বয়স কত? আঠারো? আমার উনিশ, আমি তোমার এক বছরের বড়। তোমার দিদি হবার অযোগ্য নই। কিন্তু আগের অক্ষর দুটো বাদ দিয়ে দিদি বল্লেই আমার বেশী মিষ্টি লাগবে।"

মাধুরী নিরুত্তরে একটুখানি সুমিষ্ট হাসি হাসিল।

নূতন স্থানে আসিয়া, নূতন লোকের কোলে বসিয়া বাবলির ভাল লাগিতেছিল না। সে খানিক মা ও দিদিমার দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া প্রথমে উস্‌খুস করিয়া তার পর ঠোঁট ফুলাইতে লাগিল।

কুহু এতক্ষণ আগন্তুকদের সহিত বাক্যালাপে তন্ময় হইয়াছিল, বাবলির প্রতি মনোযোগ দিবার অবকাশ ছিল না। এখন আদর করিতে লইয়া প্রসারিতাধরা খুকীকে সে তাড়াতাড়ি মাধুরীর কোলে দিয়া বলিল, "ও এখুনি কাঁদবে, আর দেরী নেই। দেখ দেখ, মুখ কেমন করছে? কি সুন্দর দেখাচ্ছে। ওর ক্ষিদে পেয়েছে, পুঁটির মা, খুকুকে ভাঁড়ার থেকে দুটো সন্দেশ এনে দাও।"

শ্যামমণি কহিলেন, "না, সন্দেশ দিতে হবে না। দুধ ছাড়া ও কিছু খায় না। সকালবেলা দু'একটা মুড়ি মুখে দেয়। মেয়ে হবার পর থেকে মাধুর শরীর ভাল নয়, গোরুর দুধ খেয়েই বাবলি এত বড়টি হয়েছে। কিন্তু এখন আর খালি দুধ খাইয়ে রাখা চলছে না, কুড়িটি টাকা সম্বল, তাতে তিনটি লোকের খাওয়া পরা, মেয়ের দুধ। বড্ড টানাটানিতে সংসার চালাতে হয়। মেয়ে ত না খেয়ে শুকোলেও অন্য দ্রব্য দাঁতে কাটবে না, পরাণ বলে, বাবুলের দুধ ঠিকমত চলুক মা, আমরা না হয় একবেলা না খেয়েই থাকবো। মেয়ে বলিতে বাপ অস্থির, একরত্তি সোনার দানা গায়ে দিতে পারে না ব'লে কত আক্ষেপ করে। আমি বলি, 'ভগবান দেবার মালিক, আক্ষেপ করো না বাবা, রাজার আশ্রয়ে রয়েছ, তোমার রাজা মনিবই মুখ তুলে চাইবেন।' তা মা, তুমি যদি দয়া ক'রে একবার রাজাবাবুকে ব'লে বেশী নয়, আর দুটো টাকা বাড়িয়ে দিতে পার, তা হ'লে বাবুলের দুধের ভাবনা থাকে না। পরাণ মুখচোরা মানুষ, না খেয়ে থাকলেও কারুকে বলবে না, সেই জন্যে তোমায় মা বিরক্ত করলাম।"

বিবাহের পর কুন্তর নিকটে এই প্রথম প্রার্থীর নিবেদন, কুন্ত অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিল, তাহার বুকের ভিতর দুরু দুরু করিয়া উঠিল। সে সনিশ্বাসে কহিল, "বিরক্ত কিসের, মাসীমা? আপনাদের চল্‌ছে না, এটা না জানালে প্রতীকার হবে কি ক'রে? আমার ভাসুরের শীগ্‌গির আস্‌বার কথা আছে, তিনি এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"তাঁর আসবারই বা দরকার কি, মা? ছোট রাজাবাবু যদি হুকুম দেন, তা হ'লে বড় রাজাবাবু আপত্তি করবেন না। তুমি মা দয়া ক'রে ছোট রাজাবাবুকেই ব'লো।"

কুন্ত অবনতমস্তকে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল; দুই চারিটা অবান্তর কথার পর মাধুরী সে দিনের মত কুন্তর নিকটে বিদায় চাহিল।

কুন্ত উঠিয়া পাশের ঘর হইতে মুঠা ভরিয়া কি যেন লইয়া তখনই ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া বাবলির হাত দুইটি টানিয়া লইয়া তাহার উপর রাখিল চারিখানা গিনি, কুড়ি টাকার দুইখানি নোট। বাবলির হাতে গুঁজিয়া দিয়া কুন্ত চুপে চুপে বলিল, "মাধুরী, তুমি আমার ছোট বোন, আমি বাবুলের মাসীমা। তাই বাবুলের বালা গড়িয়ে দিতে গিনিকটা দিলাম। বালার মজুরী দিয়ে যা টাকা বাঁচে, তা দিয়ে বাবলির কয়েকটা ভাল জামা ক'রে দিও। এতে মনে কিছু করো না ভাই, মাসীমা হলেই দিতে হয়।"

ক্ষান্তমণি আনন্দোজ্জ্বল মুখে বলিলেন, "তুমি ভালবেসে দিলে মা, এতে মনে করবার কি আছে? ওরা ত তোমাদেরই খেয়ে-পরে মানুষ। চারখানা গিনিতে কেবল বালা কেন, হারও হবে, মজুরীর টাকাও দিয়ে দিলে, আজকেই সেকরা ডেকে গড়তে দেব। যেমন রাজরাণীর রূপ দিয়ে বিধাতা পাঠিয়েছেন, তেমনি রাজরাণীর দরাজ দৃষ্টিও দিয়েছেন। আমি বামুনের মেয়ে আশীর্ব্বাদ করছি,তোমার ভাল হবে।"

মার আনন্দে মাধুরী যোগ দিতে পারিল না। দানের ভারে তাহার উন্নতমস্তক ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। লজ্জায় সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ হইয়া মাধুরী কোনরূপে বলিতে পারিল, "এ সব কেন, রাণীদিদি? আপনি আমাদের স্নেহ করেছেন, এই যে ভাগ্যি।"

এ উপহারের ব্যাপারে নিস্তারের আক্রোশের সীমা রহিল না। কি বোকা বৌ, এমন জন্মে দেখিনি, হা-ঘর থেকে এসে বেলাবেলিই রাজত্বটা উড়িয়ে দিতে চায়। বড় রাজার খেয়েদেয়ে কাম ছিল না, বৌকে ভুষণডাঙ্গায় পাঠাবার সময় মুঠো মুঠো টাকা দিয়ে দিয়েছিলেন। সেই টাকার এহেন দুর্গতি। লোকে সাধ ক'রে ভালুকের হাতে খন্তা দেয় না, দান করতে ইচ্ছে হয় বাপু, দে না আমায় দুটো টাকা, রাত দিন বুক দিয়ে ঠেলছে কে? সেখানে প্রাণ ধ'রে বের হবে না, যত ফরফরানি পরের বেলায়, উড়ে এসে জুড়ে বসাদের ওপর।

৪৮

কাকীমার নিকটে আহারাদি করিয়া কুন্ত অনেক রাত্রিতে এ বাড়ীতে আসিয়া দেখিল, জয়ন্ত বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে। সে নিদ্রিত কি জাগরিত, ম্লান আলোকে কুন্ত তাহা ঠাহর করিতে পারিল না। গত রজনীর বিদ্যুৎবৎ আঘাতে তাহার বুকের ক্ষত তখনও টন-টন করিতেছিল। স্বামীর শয্যাপ্রান্তে উপনীত হইয়া স্বামীর সহিত বাক্যালাপ করিবার কল্পনায় কুন্ত প্রীত হইতে পারিল না। কিন্তু তাহার নিজের জন্য নহে, মাধুরীদের নিমিত্ত স্বামীর সহিত তাহাকে কথা বলিতেই হইবে। বেশী নহে, দুইটি টাকার ব্যবস্থা তাহাকে করিয়া দিতেই হইবে। না দিতে পারিলে কোন্ লজ্জায় পুনর্ব্বার উহাদিগকে মুখ দেখাইবে?

প্রথমে চুড়ি-বালার শব্দে স্বামীর মনোযোগ আকর্ষণের বৃথা চেষ্টা করিয়া অবশেষে কুন্ত জয়ন্তর পদতলে বসিয়া পায়ে চাপ দিয়া ডাকিল, "ওগো শুনছ? ঘুমুলে না কি? এত সকালেই ঘুম?"

জয়ন্ত পা টানিয়া লইয়া বলিল, "এত রাতে কি উৎপাত, এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

"কাকীমার কাছে, এই ত এখুনি খাওয়া হ'ল, খেয়েই আসছি।"

"পরের বাড়ীতে খাওয়া কেন? এ বাড়ীতে কি খাবার মেলে না? বেবী কোথায়?"

"সে কাকীমার কাছেই আজ শোবে, সেখানেই রয়েছে। এ বাড়ী খাবার থাকবে না কেন? কাকীমা স্নেহ ক'রে বিয়ের কটা দিন তাঁর ওখানে খেতে বলেছেন, তাই—বিয়ের ত দেরী নেই, কাল গায়ে হলুদ, পরশু বিয়ে। এর পর কেউ খেতে বলবে না।"

জয়ন্ত ধমকাইয়া উঠিল, "বেশ, বেশ, এর পরেই বা খাবে

না কেন? হা-ভাতেদের পেশাই যে পরের বাড়ী পাত পাড়া, এটা নতুনও নয়, আশ্চর্য্যও নয়। তা যেখানে খাওয়া চলছে, সেখানে শোবারই বা বাধা কি? এখানে দুপুর রাতে বিরক্ত করতে না এসে, সেখানে আনন্দটা পূরোমাত্রায় উপভোগ করলেই হয়।"

কুহুর বক্ষ স্পন্দিত হইয়া চক্ষু জ্বালা করিতে লাগিল। তখনই ছুটিয়া পলায়ন করিতে ইচ্ছা হইল। সে কষ্টে নিজেকে দমন করিয়া ধরা গলায় বলিল, "আমি এম্‌নি তোমায় বিরক্ত করতে আসিনি, একটা কথা ছিল। তোমাদের তশীলদার পরাণ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী থেকে দুপুরে সকলে বেড়াতে এসেছিলেন, ওঁদের বড় কষ্ট, মোটে কুড়িটি টাকা মাইনা, তাতে কুলোয় না। ওঁরা তোমার কাছে অনুরোধ জানিয়ে গেছেন, আর দুটো টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিতে।"

"বাঃ, এরি ভেতর আবেদন-নিবেদন আরম্ভ হয়ে গেছে, যত সব ছোট লোকের. দরবার। কারুর মাইনে বাড়ানো-কমানোর মধ্যে আমি নেই, দেওয়ান কাকা রয়েছেন, তাঁকে কিছু না ব'লে অন্দরে মধ্যস্থ মানা হয়েছে।"

"তাঁরা আমায় মধ্যস্থ মানেন নি, নিস্তার ডেকে এনেছিল ব'লে এসেছিলেন। মানুষ গরীব হলেই ছোটলোক হয় না। পরাণ বাবুর স্ত্রী মাধুরীর মত মেয়ে বড় ঘরেও পাওয়া যায় না।"

জয়ন্ত বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া কহিল, "মাধুরী, কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন। এ দিকে পেটে ভাত নেই, ও দিকে নামের বাহার আছে। যে বড়র উপযুক্ত, সে ছোটর কাছে না থেকে, বড়র আশ্রয়ে গেলেই ত ভিক্ষে করতে হয় না।"

এক অপরিচিতা কুলবধূর প্রতি এ হীন ইঙ্গিতে কুহু আর সেখানে বসিয়া থাকিতে পারিল না। লজ্জায় ঘৃণায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। যে চরিত্রের নির্ম্মলতা হারায়, বাক্যের সংযমও কি তাহার থাকিতে নাই? ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে যাহার সম্মানজ্ঞান নাই, সম্ভ্রম নাই, তাহার আছে কি? ইনিই কি কুহুর স্বামী, দেবতা, প্রিয়তম?

কুহু যন্ত্রচালিতের ন্যায় শয়নকক্ষ পরিত্যাগ করিয়া বাসনার বিছানায় গিয়া লুটাইয়া পড়িল। তাহার মস্তিষ্ক দপ্‌-দপ্‌ করিতে লাগিল, চোখ করকর করিয়া উঠিল; কিন্তু অশ্রুর স্নিগ্ধধারা বহিয়া শীতল হইল না। দিনে দিনে কুহুর ভিতর বাহির যেন শুকাইয়া আসিতেছিল, স্বপ্নময় সুখময় জীবন তিক্ততায় ভরিয়া গিয়াছিল। স্বামী হইতে সে পৃথক্ হইতে চাহিলেও হইতে পারে না, ইহাই যে তাহার সকল দুঃখের চরম দুঃখ। বিমুখ চিত্ত দিবানিশি স্বামীর দিকেই ধাবিত হয় কেন? এই মুহূর্ত্তে সদর্পে যে স্থান হইতে সে চলিয়া আসিয়াছে, তাহার কাঙ্গাল হৃদয় সেইখানেই ছুটিয়া যাইতে নীড়ভ্রষ্ট বিহগীর মত ছট্‌-ফট করিয়া মরিতেছে। ছিঃ ছিঃ! নারী-প্রকৃতি এমন লঘু মর্য্যাদা-বিহীন! যে চাহে না, সে তাহাকেই পাইতে চাহে।

"বৌ-রাণি, আজ কি আপনি আপনার ঘরে যেয়ে শোবে না? এ ঘরে শুলে আমি ত মেঝেয় শোব?"

কুহু চক্ষু মেলিল। নিস্তার অন্ধকার গৃহে আলো জ্বালাইয়া প্রশ্ন করিতেছে। নিস্তার কখন্ আসিয়াছে, কখন্ আলো জ্বালাইয়াছে, চিন্তামগ্না কুহু তাহার কিছুই জানে না।

কুহু হাতখানা চোখের কাছে ধরিয়া আলোর আড়াল করিয়া কহিল, "তুমি তোমার ঘরেই শোও গে, পুঁটুর মা, এখানে শুতে হবে না। আমি এখ্‌নি শুতে যাচ্ছি।"

নিস্তার নম্রকণ্ঠে কহিল, "তা হ'লে ওঠো, বৌরাণি, কালকের মত শেষকালে এখানেই ঘুমিয়ে পড়বে। নতুন গাঁয়গাঁয় এসেছ, একলা ঘরে ভয় পেলে অনর্থ হবে। লোকে দুষতে আমারেই দুষবে। বলবে, বুড়ো মাগী একটা ছেলে-মানুষকে আগলাতে পারে না। আমাদের মত তোমরা ত রামী, শ্যামী নও যেখানে সেখানে প'ড়ে রইলে। তোমরা হলেক্ রাজার রাণী, তোমাদের 'প্রিতি' চোর-ডাকাতের কি কম লোভ! চল বৌরাণি, তোমায় ঘরে দিয়ে আসি।"

কুহু বিষাদের হাসি হাসিয়া কহিল, "আমায় দিয়ে আসতে হবে না, পুঁটুর মা, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। আমরা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, চোর-ডাকাতের ভয় করি না। এখানে ত চোর-ডাকাত নেই, দেউড়ীতে ভীম সর্দ্দার, তেজ সিং বন্দুক নিয়ে জেগে রয়েছে, তবু তোমার এত ভয়! তুমি আলো নিভিয়ে দিয়ে যাও, শোও গে।"

রাত্রিতে চোর-ডাকাতের নামেও যে মেয়ের ভয় নাই, তাহার কাছে বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া নিস্তার আলো নিভাইয়া মুক্তদ্বার ভেজাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

কুহু উঠিয়া দরজা ঠেলিয়া তখনই বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। জয়ন্তর শয্যায় সে আজ যাইবে না, যাইতে পারিবে না, ইহা সে সামান্য দাসী নিস্তারকে জানাইতে পারিল

না। নিস্তার ভাবিবে কি? অন্য কেহ শুনিলে বলিবে কি? তাহার লজ্জা তাহারই অন্তরে গোপনে থাকুক। বাহিরে সে স্বামীর প্রণয়ভাগিনী রাজরাণীই থাকিবে, অন্তরের দীনতা বাহিরে প্রকাশ করিতে পারিবে না।

একে একে গৃহের প্রদীপমালা নির্ব্বাপিত হইল। চরাচর যেন শান্তির সুপ্তিময় ক্রোড়ে নয়ন মুদ্রিত করিল। কুহু পা টিপিয়া টিপিয়া আপনার পরিত্যক্ত শয্যায় ফিরিয়া শয়ন করিল।

কুহুর যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বেলা হইয়াছে। শিশির-সিক্ত আম্রকাননের সু-উচ্চ শাখায় প্রভাতের রৌদ্র সোণার রেখা টানিয়া দিয়াছে। কুহু ব্যস্তসমস্তভাবে উঠিয়া রুদ্ধ বাতায়ন খুলিয়া সেইখানে দাঁড়াইল। বাতায়ন হইতে মাধুরীদের কুটীরের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। ইহারই ভিতর ক্ষুদ্র অঙ্গন গোবর-জলের ছড়া দিয়া ঝাঁট দেওয়া হইয়াছে। মৃন্ময় কুটীর দুটি সদ্যলেপিত হইয়া তক-তক করিতেছে। দাওয়ার নীচে চোখ-জুড়ানো গাঁদার ঝাড়। রান্নার চালার চালে দড়ি ও কঞ্চির সাহায্যে একটি শিম-লতা উঠিয়াছে। শিম দেখা যায় না, কিন্তু বেগুনি ফুলে চাল ভরিয়া গিয়াছে। শয়ন-কুটীরের বারান্দায় এক ঝলক রৌদ্র লুটাইয়া পড়িয়াছে। সেই রৌদ্রে পিঠ দিয়া একটি সাতাশ আটাশ বছরের সুশ্রী শ্যামবর্ণের যুবক ছেলে৷ হুঁকায় তামাক টানিতেছে। তাহার কোলের কাছে বাবলি। কুহু তাড়াতাড়ি দৃষ্টিটা টানিয়া লইয়া আর একটা জানলার পাশে সরিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কুয়াতলার অংশটা স্পষ্টই দেখা যাইতেছিল। ক্ষান্তমণি বেতের মোড়ায় বসিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া শাক তুলিতেছেন। মাধুরী কোমরে কাপড় জড়াইয়া কূপ হইতে বালতি ভরিয়া জল তুলিতেছে। কর্ম্মের ব্যস্ততায় মাধুরীর মাথার কাপড় খসিয়া গিয়াছে। শিথিল কবরীটি শুভ্র মরালগ্রীবার 'উপর লুণ্ঠিত। ছোট বালতি করিয়া জল তুলিয়া তুলিয়া মাধুরী বড় বালতি ভরিতেছিল।

ভরা বালতি তুলিতে যাইয়া ত্রস্তা হরিণীর মত মাধুরী এমনভাবে পলায়ন করিল কেন? বাহিরে কে যেন শিষে গান গাহিতেছে। কুহুদের রান্নাবাড়ীর চাকর, না ঠাকুর? উহাদেরই ইতরোচিত ব্যবহারে মাধুরী বোধ হয় পলাইয়াছে?

ঘর হইতে রান্না-বাড়ী ভাল দেখা যায় না বলিয়া কুহু বারান্দায় বাহির হইতেই জয়ন্তর সহিত চোখোচোখি হইল। জয়ন্ত মুখ ফিরাইয়া গর্ব্বিত পদক্ষেপে কুহুর সম্মুখ দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

৪৯

বেলা দশটায় বিকাশের গায়ে হলুদ, পরদিন বিবাহ। উৎসব আনন্দে সারাটা দিন অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার পর কুহু বাড়ী ফিরিয়া আসিল। সকলে আনন্দে যোগ দিলেও তাহার মনে আনন্দের লেশও ছিল না। নিরালায় আসিয়া তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, রজনীর গাঢ় অন্ধকারের মত এক অজানা অন্ধকার তাহার জীবনে ঘনাইয়া আসিতেছে। তাহার সাধ্য নাই, সে আঁধার ভেদ করিয়া আলোয় আসিয়া বাঁচে। আলো যেন দূরে—বহু দূরে তাহার নাগালের বাহিরে সরিয়া যাইতেছে। এ অন্ধকারের বিভীষিকা হইতে কুহুকে রক্ষা করিবার কেহই নাই। সহসা বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়ের দেবোপম স্নেহময় মূর্ত্তি তাহার হৃদয়-দর্পণে পরিস্ফুট হইল।

কুহু টেবলের পাশে চেয়ার টানিয়া লইয়া কাগজের প্যাডে লিখিতে লাগিল, "বাবা, এখানে আসিয়া আমার বড় ভয় করিতেছে, আপনি কাছে আসিয়া আপনার স্নেহের আবেষ্টনে আমাকে ঢাকিয়া রাখুন। নহিলে আমি সাহস পাই না।"

এইটুকু লিখিবার পর কুহু লাইন কয়েকটির প্রতি চাহিয়া কাগজখানা ছিঁড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া ভাবিতে লাগিল, এমন চিঠি কি ভাসুরের নিকটে পাঠান যায়? চিঠি পড়িয়া তিনি কি ভাবিতেন? আজকাল তাহার এ কি হইয়াছে? সামান্য কারণে সে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া যা তা করিতে উদ্যত হয় কেন? তাহার কিসের আতঙ্ক? কিসের আশঙ্কা? সংসারে সকলেই কি স্বামীর প্রণয়ভাগিনী হইতে পারে? স্বামীর একনিষ্ঠ প্রেমপারাবারে সকলেই কি ভাসিয়া যাইতে পারে? স্বামী অন্যের প্রতি চোখ তুলিয়া চাহিলেই বা এত কষ্টের কারণ কি? সুন্দরকে কে না দেখে? সৌন্দর্য্যে কে আকৃষ্ট না হয়? মাধুরীকে কুহুর ভাল লাগিয়াছে, জয়ন্তর লাগিলেই বা দোষ কি? কিন্তু ভোরে উঠিয়া কুলবধূর প্রতি তাকাইয়া শিষে গান গাওয়া দোষ ভিন্ন কি

হইতে পারে? জয়ন্তর মাধুরীকে দেখিবার কৌতূহল হইলে কুহুকে বলিলে কি কুহু গোপনে মাধুরীকে দেখাইতে পারিত না?

কুহু বেশী ভাবিতে পারিল না। বিক্ষিপ্ত মনকে অন্য-কার্য্যে ব্যাপৃত করিবার আশায় সে আর একখানা কাগজ লইয়া জ্যোতির্ম্ময়কে পত্র লিখিতে লাগিল—

"শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

আপনার আশীর্ব্বাদে আমরা এখানে আসিয়া ভাল আছি। আমাদের পৌঁছা সংবাদ পূর্ব্বেই জানান হইয়াছে। এ জন্য আমি দেরী করিয়াই পত্র লিখিতেছি।

এ যায়গা আমার খুবই ভাল লাগিতেছে। নদীর উপরের বারান্দায় বসিলে মনে হয় বজরায় ভাসিয়া যাইতেছি। সুন্দর যায়গা, কাকার যত্নে কোনই অসুবিধা নাই।

আজ ঠাকুরপোর গায়ে হলদ হইয়া গেল, কাল বিয়ে। আপনি বিবাহে আসিতে পারিলেন না বলিয়া কাকীমা খুব দুঃখ করিতেছেন।

দিদিদের জাহাজ বোধ হয় ছাড়িয়া দিয়াছে? আপনি আর কত দিন ও অঞ্চলে থাকিবেন? শীঘ্র এখানে আসিলে আমরা সকলেই আনন্দিত হইব। দাদার সহিত দেখা করিতে পারিয়াছেন কি?

আমরা সকলে ভাল আছি। বাসনা ভাল আছে। আমার প্রণাম জানিবেন।"

সেবিকা
কুহু"

শিরোনামা লিখিয়া চিঠি খামে ভরিয়া কুহু একখানা মাসিক পত্রিকার পাতা খুলিল, এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে চোখে মুখে হাসির লহর ছুটাইয়া মাধুরী আসিয়া উপস্থিত হইল।

কুহু মাধুরীর দিকে চাহিতে পারিল না। স্বাগত সম্ভাষণ করিতে পারিল না। মাধুরী এ সময় কেন? সকাল-বেলার কথা লইয়া জয়ন্তর বিরুদ্ধে কুহুকে অনুযোগ করিতে আসে নাই ত?

কুহুর বিমনাভাব লক্ষ্য করিয়া মাধুরী তাহার নিকটস্থ হইয়া কহিল, "অসময় বিরক্ত করতে এলাম, রাণীদিদি, আপনি পড়াশোনা করছেন? তা হ'লে আমি এখন"—

"না না, পড়াশোনা কিছু নয়, এমনিই ব'সে রয়েছি, তুমি বোসো।" বলিয়া কুহু একখানা চেয়ার মাধুরীর উদ্দেশে ঠেলিয়া দিল।

মাধুরী চেয়ারে না বসিয়া মেঝের গালিচার উপর বসিয়া বলিতে লাগিল, "ভাল লাগছিল না, তাই এলাম, আজ দরিয়াপুরে গেছেন, এবেলা রান্নাবাড়াও নেই, বাবলি ঘুমিয়ে পড়লো, মা জপের মালা নিয়ে বসেছেন, আমি এই ফাঁকে আপনাদের রান্নাবাড়ীর বিলাসীঝিকে ডেকে একটু-খানি বেড়াতে এলাম।"

অনুযোগ অভিযোগের আভাস না পাইয়া কুহু প্রসন্ন হইয়া জবাব করিল, "এসে বেশ করেছ, দুপুরবেলা আমি বিয়েবাড়ীতে ছিলাম, নইলে তোমাকে ডেকে পাঠাতাম। আচ্ছা, বাবুল এরি ভেতর ঘুমিয়ে পড়েছে! জেগে থাকলে তোমার সঙ্গে আসত। পরাণ বাবু রোজ বুঝি বাড়ী থাকতে পারেন না? তুমি ওখানে বসলে কেন, মাধুরী? চেয়ারে বসতে মানা আছে না কি?" বলিতে বলিতে কুহু চেয়ার ছাড়িয়া মাধুরীর পাশে উপবেশন করিল।

মাধুরী শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল, "এ কি রাণী-দিদি, আপনি এ পায়ের ধুলোর ভেতর বসলেন কেন? উঠে বসুন, উঠে বসুন।"

"তুমি বসতে পেরেছ, আমি কি পারি না, মাধুরী? উঠতে হবে না। বেশ বসেছি।"

"আমি আর তুমি দিদি"—মাধুরী জিব কাটিয়া তখনই ত্রুটি সংশোধন করিয়া কহিল, "আপনি রাণী, আমরা আপ-নার দাসী, আমাদের কি আপনাদের সমান সমান বসা চলে, রাণীদিদি?"

কুহু আবেগভরে মাধুরীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "রাজার বাড়ী এসেছি বটে, কিন্তু আমি রাণী নই, তোমারই মত গরীব ঘরের মেয়ে। 'রাণী, রাণী' শব্দে প্রাণ আমার হাঁপিয়ে উঠেছে, এত রাণীগিরি আমি সহিতে পারছি নে, মাধুরী। তোমায় আমি ছোট বোনের মত ভালবেসেছি, তুমি এখুনি ভুল ক'রে যা বল্লে, তা বল্লেই জানবো, তুমিও আমায় ভালবেসেছ।"

মাধুরী জবাব দিতে মুখ তুলিয়া বিস্মিত হইল। কুহুর আঁখিপ্রান্তে অশ্রু টল-টল করিতেছে। এত ঐশ্বর্য্য, ভোগ-বিলাস ইহার অভ্যন্তরেও কি দুঃখ থাকে? মাধুরীর বিশ্বাস,

যত কিছু মনস্তাপ, কষ্ট সমস্তই দারিদ্র্য হইতে উদ্ভব। সরলা মাধুরী কি বলিবে খুঁজিয়া না পাইয়া বিগলিত-হৃদয়ে কহিল, "তাই হবে, দিদি। আমরা সামান্য মানুষ, মান্য ক'রে কথা না কইলে রাগ করবে বলেই না, 'রাণী' বলেছিলাম। আপনি ক'রে কথা কয়েছিলাম, নইলে তোমাকে দেখা মাত্তর, তোমার কথা শোনা মাত্তর তোমাকে দিদি ডেকে আমার জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে হয়েছিল। ভাল না বাসলে এমন ক'রে কি কেউ ছুটে আসে, দিদি?"

মাধুরী ক্ষণেক চুপ করিয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিল, "আজ তোমার মন খারাপ হয়েছে, আগে জানলে আমি আরও খানিকটা আগেই আসতাম। এলাম না তখন রাজাবাবু বাড়ী ছিলেন ব'লে। তিনি বাড়ী থাকলে ত আসা চলে না, দিদি, কি জানি, তোমার কাছে কখন্ থাকেন, তা ত জানি না। এই একটু আগেই আমাদের ঘাটের ওপর দিয়ে বাচ খেলতে গেলেন, তাই দেখেই আমি ছুটে এসেছি। হ্যাঁ দিদি, তুমি কেন ওঁর সঙ্গে নৌকায় বেড়াতে বার হও না? তোমরা সহরে, রোজ থিয়েটার বায়স্কোপ দেখতে, এখানে কোণে ব'সে থাকলে ভাল লাগবে কেন?"

কুহু নিরুত্তরে একটুখানি করুণ হাসি হাসিয়া মাধুরীর মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। মুখখানি যেন মনের প্রতিচ্ছবি, সরসতায় সরলতায় সমুজ্জ্বল। যেমন সুকুমার প্রতিমূর্ত্তি, তেমনই সুকোমল অন্তঃকরণ। পাপ, তাপ, মলিনতা উহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। মাধুরীর নয়ন দুইটি তপুর মত সারল্যে ভরা, হাসিটুকু সুলোচনার মতই সুমিষ্ট সুন্দর। মাধুরী কুহুর যেন কত আপনার, কত অন্তরঙ্গ। দূরদূরান্ত হইতে হৃদয়ের টানে দুই জন একত্র হইয়াছে। কুহু কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিল না, মাধুরীর সান্নিধ্য লাভ করিতে তাহার অন্তঃকরণ এত উন্মুখ হয় কেন? স্নেহ, করুণা, ভালবাসা গিরিনদীর ন্যায় পাষাণরন্ধ্র ভেদ করিয়া মাধুরীর অভিমুখে ধাবিত হয় কেন?

কুহুর নীরবতায় মাধুরী বিস্মিত হইতেছিল। আজ ইহার হইল কি? কাল ত দিব্য হাসিখুসীতে ছিলেন, কথাবার্ত্তা কহিলেন। যদিও ক্ষান্তমণি ঘরে ফিরিয়াই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, "হ্যাঁ, দেখে এলাম রাণী বটে, রাণীর রূপ, রাণীর দরাজ হাত, কিন্তু স্বভাব বড় গম্ভীর। দিল খুলে কথা কইতে চায় না।"

মাধুরী প্রতিবাদ করিয়াছিল, "এ কি গরীব-কাঙ্গালের বৌ-ঝি মা, যে, সবতাতেই ফর্ ফর্ করবে? লেখাপড়া জানা মেয়ে, এসেছে রাজার ঘরে, ছ্যাবলামি করলে কি ওদের মানায়? তুমি যাই বল না, আমার বৌ-রাণীকে বড্ড ভাল লেগেছে। এত ভাল আমি কাউকে দেখিনি, এত সুন্দরও নয়, আমার মনে হয়, উনি মানুষ নয়, দেবতা।"

মাধুরীর সেই ধ্যানের দেবতার রক্তে মাংসে গড়া মানবীর বিষাদ-ম্লানিমা নিরীক্ষণ করিয়া মাধুরী ক্ষুব্ধ হইল। সহসা তাহার অনুমান হইল, খুঁটিনাটি লইয়া হয় ত রাজাবাবুর সহিত রাণীর ঝগড়া হইয়াছে। তাহারই ফলে রাণী বিমর্ষ হইয়া রহিয়াছেন। নিজেদের তুচ্ছ বাদানুবাদকলহের বিষয় স্মরণ করিয়া মাধুরী সুখের হাসি হাসিয়া কহিল, "দিদি, একটা কথা বলি, রাগ করো না। তোমার মন খারাপ হয়েছে কেন, আমি তা জানি। রাজাবাবুর সাথে বেড়াতে গেলে না কেন, তাও বুঝেছি। রাগ হয়েছে, অমন রাগ আমাদেরও হয়। আবার তখনি মিটে যায়। এই ত আজ দরিয়াপুরে যেতে মানা করলাম। শুনলেন না, দেখে রেগে শুয়ে রইলাম। উনিও বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু ফিরে আসতে হ'ল দিদি। পথ থেকে ফিরে এসে কত সাধ্যসাধনা করলেন, তবে না আমার রাগ গেল। বল্লেন, পরের কাযে কি নিজের ইচ্ছা খাটে? যাবার হুকুম হয়েছে, না গেলে চলে কি ক'রে? আবার যদি কোন দিন দিন পাই, ক্ষেত-খামার করতে পারি, তা হ'লে ঘর ছেড়ে কোথাও এক পা নড়বো না। দিন-রাত আমার সঙ্গে থাকতে থাকতে তোমার অরুচি ধ'রে যাবে।" মাধুরী চুপ করিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

কুহুর তৃষিত-হৃদয়ে কে যেন অলক্ষ্যে থাকিয়া সুধা বর্ষণ করিতে লাগিল। প্রেমের দেবতা তাহার সহিত ছলনা করিলেও সকলের প্রতি তিনি অকরুণ নহেন। তাঁহারই দয়ায় মাধুরীর আঁধার কুটীরে আলো জ্বলিয়াছে শুষ্ক সরোবরে পদ্ম ফুটিয়াছে। নিঃস্ব মাধুরীর ঐটুকুই যে সম্বল, উহা না থাকিলে সে কি লইয়া থাকিত?

কুহু বলিল, "তুমি ঠিক বলেছ, মাধুরী, তোমার কিছু ভুল হয় নি। তবে একটা জিনিষ তোমার জানা নেই। মাটীতে যে ফুল ফোটে, সোণার পাতে তা ফোটে না। নদীর গতি হীরার পাহাড় দিয়ে বন্ধ করলে স্রোত আপনি থেমে যায়।"

মাধুরী কুহুর হেঁয়ালির ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া হাসিয়া জবাব দিল, "নদী, ফুল তোমাদের কবিতা-টবিতা আমি জানি না, দিদি। আমি মূর্খ, শুধু এইটুকু জানি, আমার দিদির রাগ আজ কিছুতেই যাবে না—রাজাবাবু এসে পায়ের তলায় লুটিয়ে না পড়া পর্য্যন্ত। তা বেশী দেরী নেই, তিনি এলেন ব'লে। দুপুরে বিয়েবাড়ী ছিলে, রাগ ভাঙ্গানর সময় পান নি, তোমার সারাদিনের রাগ সহজে যাবে না, দিদি।"

কুহু অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, "সারা দিনের রাগ ?"

"হ্যাঁ দিদি, আমি ভাল করেই জানি, তোমার সারাদিনের রাগ, তুমি রেগেছিলে বলেই না আজ আমি লজ্জা পেয়েছি। তোমাদের এ মহলটা আমার আসা অবধি বন্ধই দেখছি, দেখে দেখে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। সকালে মাথার কাপড় ফেলে কুয়োতলায় জল তুলছিলাম, জল তোলা হ'লে চেয়ে দেখি, ও মা, কি কাণ্ড, রাজাবাবু জানলায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। লজ্জায় পালিয়ে গেলাম, তখনি মনে হয়, তোমার রাগ হয়েছে, দিদির নাগাল না পেয়ে রাজাবাবু অন্যদিকে চাইবার অবসর পেয়েছেন।"

কুহুর কৌতুক বোধ হইল। মেয়েটা বড় বোকা, কিছুই জানে না, সকলকেই নিজেদের মত ভাবে। অন্তরের যে সে লালসাপূর্ণ দৃষ্টির সহিত কুহু বিলক্ষণরূপে পরিচিত ; কিন্তু মাধুরী এখনও তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারে নাই জানিয়া কুহু আরাম বোধ করিল। ক্ষণেক মৌন থাকিয়া ম্লান হাসির সহিত কহিল, "তোমাদের রাজাবাবু কি সাধে দাঁড়িয়ে ছিলেন, মাধুরী ? তুমি আমায় দিদি বলেছ, দিদির ছোট বোনের সাথে সম্বন্ধ যে মধুর। এদিকে রাগ, ওদিকে আদরের লোভ, কাযেই লোকটির দোষ দেওয়া যায় না।"

মাধুরী হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল, "দিদির কথা শুনে বাঁচি না। মা গো, এমন করেও বলতে পারেন ? বল্লেই হ'ল কি না, আমি কি জানি না ? যেখানে রাগ, সেইখানেই আদর থাকে। এক জন ছাড়া আর কেউ রাগের আদর দিতে পারে না।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী।

শিমুল

সাজি ভ'রে কেহ লয় নাই মোরে তুলে
পরেনি খোঁপায় কেহ,
দেউলে কভুও ঠাঁই নাহি পেনু ভুলে
অশুচি ব'লে কি দেহ ?

রাঙিয়া উঠিনু কবে কা'রে খুন ক'রে
আমি তা জানি না কিছু,
বিধাতা কি দিল অভিশাপ তাই মোরে
ফুল-জনমের পিছু ?

নাই ব'লে কি গো সঞ্চিত বুকে মধু
আসিল না মোর কুঞ্জে ভ্রমর-বঁধু,
প্রেম-গুঞ্জনে কহিল না, "সখি জাগো",
মধু-কৈশোর প্রাতে !
আনিনু যে দিন যৌবন-সম্ভার—
আসিল না কেহ রাতে।

কা'র আসা-পথে অকারণে চেয়ে থাকি
বেদনা-সলিলে ডুবে যায় দু'টি আঁখি,
রজনীর শেষে তন্দ্রার ঘোরে শুনি—
অনিল-বঁধুয়া এসে—
ঝ'রে পড়া মোর দলগুলি বুকে লয়ে
চুম্বিছে ভালোবেসে !

শ্রীপ্রতিভা ঘোষ।

জগদ্বাচিত্বাৎ (১৬)

(শঙ্কর) কৌষীতকি ব্রাহ্মণে আছে,—"যো বৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা, যস্য বা এতৎ কর্ম্ম,—স বৈ বেদিতব্যঃ"—রাজা অজাতশত্রু বালাকি নামক ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন, "হে বালাকে, এই সকল পুরুষের যিনি কর্ত্তা, ইহা যাঁহার কর্ম্ম, তাঁহাকে জানিতে হইবে।" এখানে যাঁহাকে জানিতে হইবে বলা হইয়াছে, তিনি ব্রহ্ম। কারণ, "তোমাকে ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিব" ইহা বলিয়া এই প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে। "জগদ্বাচিত্বাৎ"—পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে "এতৎ" শব্দ জগৎকে নির্দ্দেশ করিতেছে। উপনিষদ্‌বাক্যের অর্থ এইরূপ; এই সকল পুরুষের যিনি কর্ত্তা, কেবলমাত্র যে পুরুষগণের কর্ত্তা, তাহা নহে, সমগ্র জগতেরই যিনি কর্ত্তা,—তাঁহাকেই জানিতে হইবে।

(রামানুজ) পূর্ব্বে বলা হইল যে, সাংখ্যের প্রকৃতি জগতের কারণ নহেন। এই সূত্রের উদ্দেশ্য এই যে, সাংখ্যের পুরুষও জগতের কারণ হইতে পারে না। প্রত্যেক জীব যেরূপ কর্ম্ম করে, তদনুরূপ ফলভোগ করিবার উপযুক্ত বস্তু জগতে উৎপন্ন হয়। এ জন্য মনে হইতে পারে যে, জীবই জগতের কর্ত্তা, অপর কোনও কর্ত্তা (ব্রহ্ম) নাই। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। জীবের কর্ম্ম অনুসারে জগতের বস্তু সকল সৃষ্ট হয়, ইহা সত্য; কিন্তু সৃষ্টি করেন ব্রহ্ম; সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা জীবের নাই।

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ ন ইতি চেৎ তৎ ব্যাখ্যাতম্ (১৭)

"জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ" জীবের লক্ষণ এবং মুখ্য প্রাণের (প্রাণবায়ুর) লক্ষণ, এখানে দেখা যায়, অতএব এখানে ব্রহ্মের প্রসঙ্গ নাই। "ইতি চেৎ" যদি ইহা বলা হয়। "তৎ ব্যাখ্যাতম্" ইহার উত্তর পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

(শঙ্কর) ১।১।৩১ সূত্রে বলা হইয়াছে, "জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ ন ইতি চেৎ ন উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ আশ্রিতত্বাৎ ইহ তৎ-যোগাৎ"—জীবের লক্ষণ এবং মুখ্য প্রাণের লক্ষণ দেখিয়া মনে হইতে পারে যে, এখানে জীব এবং মুখ্য প্রাণের প্রসঙ্গ হইতেছে, কিন্তু তাহা নহে। কারণ, তাহা হইলে একই বাক্যে তিন প্রকার উপাসনা উপস্থিত হয় (জীবের উপাসনা, মুখ্য প্রাণের উপাসনা, এবং ব্রহ্মের উপাসনা)। ১।১।৩১ সূত্রে যে যুক্তি দেওয়া হইয়াছে, সেই যুক্তি অনুসারে এখানেও বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মেরই প্রসঙ্গ হইতেছে।

রামানুজ বলিয়াছেন যে, জীবের লক্ষণ এবং প্রাণের লক্ষণ ব্রহ্ম-বিষয়েও প্রয়োগ করা যায় এবং এই সকল স্থানে সেই ভাবেই প্রয়োগ করা হইয়াছে।

অন্যার্থং তু জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাম্
অপি চ এবম্ একে (১৮)

"অন্যার্থং তু জৈমিনিঃ" জৈমিনি আচার্য্যের মত এই যে, এখানে জীবের উল্লেখ "অন্যার্থে" করা হইয়াছে, জীব ভিন্ন অন্য বস্তু (পরমাত্মাকে) বুঝাইবার জন্য করা হইয়াছে।" "প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাং" এইরূপ প্রশ্ন এবং ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। উপনিষদে এই প্রসঙ্গে জীবের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি নিদ্রিত ছিল, তাহাকে আহ্বান করা হইয়াছিল, সে উত্তর দেয় নাই, তাহাকে যষ্টি দ্বারা প্রহার করিবার পর সে উত্থান করিল। তাহার পর এই প্রশ্ন আছে,—"ক এষ এতৎ বালাকে পুরুষঃ অশয়িষ্ট, ক বা এতৎ অভূৎ, কুত এতৎ আগাৎ," হে বালাকে, এই পুরুষ কোথায় শয়ন করিয়াছিল, কোথায় বা ছিল, কোন্ স্থান হইতে আসিল? তাহার পর উত্তর দেওয়া হইল —"যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি অথ অস্মিন্ প্রাণ এব একধা ভবতি" যখন নিদ্রিত ব্যক্তি কোনও স্বপ্ন দর্শন করে না, তখন সে প্রাণের সহিত এক হইয়া যায়, (এখানে প্রাণ=ব্রহ্ম) "এতস্মাৎ আত্মনঃ প্রাণাঃ যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যঃ দেবাঃ দেবেভ্যঃ লোকাঃ" অর্থাৎ এই আত্মা (পরমাত্মা) হইতে প্রাণগণ (এখানে প্রাণ=ইন্দ্রিয়) নিজ নিজ আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রাণ হইতে দেবগণ, দেব হইতে লোক সকল। সুতরাং যে পরমাত্মা হইতে জীবের উৎপত্তি, সেই পরমাত্মাকে বুঝাইবার জন্য জীবের প্রসঙ্গ অবতারণ করা হইয়াছে।

"অপিচ এবম্ একে" অধিকন্তু বেদের এক শাখায় (বাজসনেয়ি শাখায়) স্পষ্টভাবে বিজ্ঞানময় শব্দে জীবকে বুঝাইয়া, জীব হইতে ভিন্ন পরমাত্মার উল্লেখ করা হইয়াছে।

রামানুজও এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মধ্বের ব্যাখ্যা অন্যরূপ। তিনি বলেন, 'অন্যার্থ' অর্থাৎ পরমাত্ম-জ্ঞানের জন্য কর্ম্মের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার মতে উপনিষদের নিম্নলিখিত প্রশ্নোত্তর এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে, —"কস্মিন্ নু ভগবঃ বিজ্ঞাতে সর্বং ইদং বিজ্ঞাতং ভবতি" হে ভগবন্! কাহাকে জানিলে এই সমস্ত জানা যায়? "তস্মৈ সহ উবাচ দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে" তাহাকে তিনি বলিলেন, দুইটি বিদ্যা জানা প্রয়োজন, (পরা ও অপরা) অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞান। বেদের এক শাখায় বলা হইয়াছে, "যে তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানে না, বেদের ঋক্ সকল দ্বারা সে কি করিতে পারিবে?"

বাক্যান্বয়াৎ (১৮)

(শঙ্কর) বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, "ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি" অর্থাৎ পতির প্রীতির জন্য পতি প্রিয় হয় না, আত্মার প্রীতির জন্য পতি প্রিয় হয়। ইহার পরে বলা হইয়াছে যে, পত্নী, পুত্র, বিত্ত প্রভৃতি সকলই আত্মার প্রীতির জন্যই প্রিয় হয়; এবং পরিশেষে বলা হইয়াছে, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ, আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন, ইদং সর্বং বিদিতম্" অর্থাৎ আত্মাকে দর্শন করিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, বিচার করিতে হইবে, ধ্যান করিতে হইবে, আত্মার দর্শন, শ্রবণ, বিচার ও বিজ্ঞান দ্বারা এই সমস্তই জ্ঞাত হওয়া যায়। মনে হইতে পারে যে, এখানে আত্মা শব্দের অর্থ জীবাত্মা। কারণ, জীবাত্মার প্রীতি হয়, ইহা কল্পনা করা যায়, পরমাত্মার প্রীতি হয়, এরূপ কল্পনা যুক্তিবিরুদ্ধ, যেহেতু পরমাত্মা বিষয় ভোগ করেন না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে আত্মা শব্দের অর্থ পরমাত্মা। "বাক্যান্বয়াৎ" এই শ্রুতি-বাক্যগুলি বিচার করিলে এইরূপ সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। কারণ, ইহার পূর্ব্বে আছে যে, মৈত্রেয়ী তাঁহার স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিতেছেন, "যেনাহং ন অমৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং যৎ এব ভগবান্ বেদ, তৎ এব মে ব্রূহি।" অনুবাদ—"যাহার দ্বারা আমি অমৃত হইব না, তাহার দ্বারা কি করিব? আপনি যাহা জানেন, আমাকে তাহা বলুন।" ইহার পরে যাজ্ঞবল্ক্য আত্ম-বিজ্ঞান উপদেশ দিয়াছেন। যেহেতু মৈত্রেয়ী অমৃতত্ব আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, অতএব পরমাত্মার উপদেশ ভিন্ন অন্য উপদেশ যুক্তিসঙ্গত হয় না। কারণ, বেদ এবং স্মৃতিতে বহু স্থানে বলা হইয়াছে যে, পরমাত্মার জ্ঞান ব্যতীত অমৃতত্ব লাভ হয় না। অধিকন্তু যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন যে, এই আত্মবিজ্ঞান দ্বারা সকল বস্তু বিজ্ঞাত হওয়া যায়। ইহা সুবিদিত যে, পরমাত্মার জ্ঞান হইতে সর্ব্ববস্তুর জ্ঞান লাভ করা যায়, জীবাত্মার জ্ঞান হইতে সর্ব্ববস্তুর জ্ঞান লাভ হয় না।

(রামানুজ) "ন বা অরে পত্যুঃ কামায়" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য হইতে কেহ এইরূপ মনে করিতে পারেন:—"এখানে জীবাত্মার কথা হইতেছে এবং বলা হইয়াছে যে, জীবাত্মাকে জানিলে সকল বস্তু জানা যায়, জীবাত্মাই শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। অতএব এখানে সাংখ্যদর্শনের মত সমর্থিত হইতেছে, কারণ, সাংখ্যদর্শনে বলা হইয়াছে যে, পুরুষকে জানিলে মোক্ষ লাভ করা যায়, সাংখ্যের পুরুষ এবং বেদান্তের জীব বাস্তবিকপক্ষে একই তত্ত্ব।" কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। এই উপনিষদ্‌বাক্যে জীবাত্মার কথা হইতেছে না, পরমাত্মার কথা হইতেছে। "ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি" ইহার অর্থ এইরূপ—"পতি 'প্রিয় হইব' এইরূপ ইচ্ছা করেন বলিয়া প্রিয় হন না; পরমাত্মার ইচ্ছা হয় বলিয়াই পতি প্রিয় হন।" পরমাত্মাকে যে যেরূপ আরাধনা করে, পরমাত্মা তাহাকে পতি, পুত্র, বিত্ত প্রভৃতির দ্বারা তদনুরূপ সুখ প্রদান করেন; পরমাত্মার ইচ্ছা না হইলে পতি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুখদায়ক হয় না; যে পরমাত্মা স্বয়ং নিরতিশয় আনন্দ-স্বরূপ হইয়া নিজের আনন্দের লেশমাত্র প্রদান করিয়া পতি প্রভৃতিকে আনন্দদায়ক করেন, সেই পরমাত্মাকে জানা উচিত।

এই বাক্যের এরূপ অর্থ করা যুক্তিযুক্ত হয় না, জীবাত্মার প্রিয় বলিয়াই পতি প্রিয় হয়, অতএব জীবাত্মাকে জানা প্রয়োজন। কারণ, পতি প্রভৃতি যে সকল বস্তু প্রিয়, তাহাদিগকেই জানা উচিত; জীবাত্মাকে জানিয়া কি লাভ হইবে?

বরং এই বাক্যের এরূপ অর্থ করা যায়, যেহেতু, জীবাত্মার প্রিয় বলিয়াই পতি প্রিয় হন, এবং যেহেতু পতি প্রভৃতি বস্তু জীবাত্মাকে চিরকাল সুখ দিতে পারে না, কেবল পরমাত্মাই পারেন, অতএব পরমাত্মাকে জানা উচিত।

মধ্ব বলেন, "বাক্যান্বয়াৎ" ইহার অর্থ এই যে, পৃথক্ পৃথক্ বাক্যের পরমাত্মাতেই অন্বয় হয়, অর্থাৎ পরমাত্মাকে বুঝাইয়া থাকে।

প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ ২০

প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইয়াছে, ইহার চিহ্ন এখানে পাওয়া যায়, ইহা আশ্মরথ্য মনে করেন।

(শঙ্কর) পূর্ব্বসূত্রে উদ্ধৃত উপনিষদ্বাক্যের পূর্ব্বে আছে, "আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি" অর্থাৎ আত্মাকে জানিলে ইহা সব (সকল জগৎ) জানা যায়, "ইদং সর্ব্বং যদ্ অয়ম্ আত্মা" অর্থাৎ এই সবই আত্মা। জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন হইলে এই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হয় না। অতএব জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন। ইহা আচার্য্য আশ্মরথ্যের মত।

(রামানুজ) জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হয়, পুনরায় পরমাত্মায় বিলীন হয়। এজন্য জীবাত্মা পরমাত্মা ভিন্ন অন্য বস্তু নহে। এজন্য জীবাত্মাবাচক শব্দ দ্বারা পরমাত্মাকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এক পরমাত্মাকে জানিলে সকলই জানা হইবে, এই প্রতিজ্ঞা এই ভাবে সিদ্ধ হইয়াছে। ইহা আশ্মরথ্যের মত।

"তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি।
নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায় ॥"

(মধ্ব) অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিলে মৃত্যু অতিক্রম করে, মুক্তিলাভের অন্য পথ নাই। এই প্রতিজ্ঞাসিদ্ধির চিহ্ন-স্বরূপ কর্ম্ম প্রভৃতির উল্লেখ আছে। কর্ম্মের ফল অনিত্য, একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানের ফল অনন্ত।

উৎক্রমিষ্যতঃ এবম্ভাবাৎ ইতি ঔড়ুলোমিঃ (২১)

(শঙ্কর) জীবাত্মা যখন এই ভাব হইতে (অর্থাৎ জীব-ভাব হইতে) উৎক্রমণ করেন, তখন পরমাত্মার সহিত এক হইয়া যান, ইহা আচার্য্য ঔড়ুলোমির মত।

জীববাচক আত্মশব্দের দ্বারা পরমাত্মাকে নির্দ্দেশ করিবার কারণ (আচার্য্য ঔড়ুলোমির মতে) এই যে, জীবাত্মা যখন জীবভাব হইতে উৎক্রান্ত হয় (অর্থাৎ যখন মোক্ষ লাভ করে), তখন পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে,—

এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায়, পরং জ্যোতিঃ উপসংপদ্য, স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে।

অর্থাৎ "এই জীব এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া পরম জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া নিজ রূপে পরিণত হয়।"

মুক্তি হইলে সে জীবের নাম ও রূপ থাকে না (অতএব পরমাত্মার সহিত এক হইয়া যায়), তাহা মুণ্ডক উপনিষদে বলা হইয়াছে :—

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
(অ) স্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎ পরং পুরুষম্ উপৈতি দিব্যম্ ॥

"নদী সকল প্রবাহিত হইয়া যে প্রকার নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে অস্তমিত হয়, সেইরূপ বিদ্বান্ নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া দিব্য পরাৎপর পুরুষের নিকট উপস্থিত হয়।"

(রামানুজ) আশ্মরথ্য বলিয়াছেন যে, জীব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় এবং প্রলয়ের সময় ব্রহ্মেই বিলীন হয়, অতএব জীব শব্দ দ্বারা পরমাত্মাকে নির্দ্দেশ করা যায়। এই কথায় আপত্তি হইতে পারে যে, জীবকে শ্রুতি অন্যত্র জন্ম-রহিত বলিয়াছেন, যথা "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" (কঠোপনিষৎ) বিদ্বানের জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। এই আপত্তির সামঞ্জস্যবিধান করিবার জন্য ঔড়ুলোমি বলিয়াছেন যে, জীব মুক্তিলাভ করিলে পরমাত্মভাব প্রাপ্ত হয়, এজন্য জীববাচক শব্দের দ্বারা পরমাত্মাকে নির্দ্দেশ করা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে।

অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ (২২)

(শঙ্কর) অবস্থিতেঃ (পরমাত্মাই জীবরূপে অবস্থান করেন বলিয়া,—পরমাত্মাকে জীব-বাচক শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে) ইহা আচার্য্য কাশকৃৎস্নের মত। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায় যে, পরমাত্মা বলিতেছেন— "অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" অর্থাৎ সৃষ্ট জগতের মধ্যে জীবরূপ আত্মার দ্বারা প্রবেশ

করিয়া নাম ও রূপ রচনা করিব। এখানে পরমাত্মা জীবকে "আত্ম" শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। অতএব পরমাত্মাই জীবভাবে অবস্থান করেন।

এই প্রসঙ্গে শঙ্কর বলেন যে, আচার্য্য আশ্মরথ্যের মত এইরূপ যে, জীব পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হয় এবং পরমাত্মাতেই বিলীন হয়। ঔডুলোমির মত এইরূপ যে, জীব ও পরমাত্মা একই বস্তুর বিভিন্ন অবস্থা, সুতরাং উভয়ের মধ্যে ভেদও আছে, অভেদও আছে। কাশকৃৎস্নের মত যে, উভয়ে সম্পূর্ণ এক। কাশকৃৎস্নের মত অদ্বৈতবাদের অনুকূল। শঙ্কর বলিয়াছেন যে, শ্রুতির ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য।

(রামানুজ) ঔডুলোমি বলিয়াছেন যে, জীব মোক্ষলাভ করিলে ব্রহ্ম হইয়া যায়। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। কারণ, এই মতে মোক্ষলাভের পূর্ব্বে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কিরূপ প্রভেদ ছিল, তাহা প্রতিপাদন করা যায় না। স্বাভাবিক প্রভেদ ছিল, ইহা বলা যায় না, কারণ, দুইটি বস্তুর মধ্যে স্বাভাবিক প্রভেদ থাকিলে একটি বস্তু আর একটি বস্তু হইতে পারে না। উভয়ের মধ্যে উপাধিগত প্রভেদ স্বীকার করিলে জিজ্ঞাসা করা যায়, এই উপাধির প্রকৃত অস্তিত্ব আছে, অথবা নাই? যদি উপাধির প্রকৃত অস্তিত্ব থাকে এবং যদি ব্রহ্মের উপাধি এবং জীবের উপাধির মধ্যেই কেবল প্রভেদ থাকে, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে প্রভেদ না থাকে, তাহা হইলে জীব পূর্ব্ব হইতেই ব্রহ্ম ছিল, সে মোক্ষ লাভ করিলে ব্রহ্ম হইয়া যায়, ইহা বলা যায় না। যদি বলা যায় যে, উপাধির প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করা যায়, ব্রহ্ম কি প্রকারে জীবভাব প্রাপ্ত হইল? যদি উত্তরে বলা হয় যে, ব্রহ্মের প্রকাশ তিরোহিত হইলে তিনি জীবভাব প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে গোল হয়। কারণ, প্রকাশই ব্রহ্মের স্বরূপ, সেই প্রকাশ তিরোহিত হইলে ব্রহ্মের স্বরূপ বিনষ্ট হইবে। তাহা ত হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্মের প্রকাশ তিরোহিত হইলে তিনি জীবভাব প্রাপ্ত হন, ইহা বলা যায় না। এ ক্ষেত্রে জীবভাব কি, তাহা বলা যায় না।

এজন্য কাশকৃৎস্ন ঔডুলোমির মত গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন, শরীর ও আত্মার মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে সেইরূপ সম্বন্ধ। জীবাত্মা শরীর, পরমাত্মা তাহার আত্মা। এই ভাবে পরমাত্মা জীবাত্মার মধ্যে অবস্থান করে—"অবস্থিতেঃ।" এজন্য জীব-বাচক শব্দের দ্বারা পরমাত্মাকে অভিহিত করা সঙ্গত হয়। কাশকৃৎস্নের মতই সূত্রকার বাদরায়ণ সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

মধ্ব বলিয়াছেন যে, "অবস্থিতেঃ" শব্দের অর্থ এই যে, জীবাত্মা পরমাত্মাতে অবস্থান করে। এজন্য জীবাত্মা-বাচক শব্দের দ্বারা পরমাত্মাকে নির্দ্দেশ করা যায়।

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ (২৩)

(শঙ্কর) ব্রহ্ম হইতেছেন জগতের "প্রকৃতি" অর্থাৎ উপাদানকারণ, "চ" এবং (নিমিত্তকারণ)। উপনিষদ্-বাক্যে যেরূপ "প্রতিজ্ঞা" করা হইয়াছিল এবং যেরূপ "দৃষ্টান্ত" দেওয়া হইয়াছে, তাহারা যাহাতে বাধা প্রাপ্ত না হয়, এজন্য এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

জন্মাদ্যস্য যতঃ (ব্রহ্মসূত্র ১।১।২) এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মই জগৎ উৎপত্তির কারণ। মনে হইতে পারে যে, ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ মাত্র, যেরূপ কুম্ভকার কুম্ভের নিমিত্তকারণ, কুম্ভের উপাদানকারণ যেরূপ মৃত্তিকা, সেইরূপ জগতের ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য উপাদানকারণ থাকা সম্ভব, যেহেতু সাধারণতঃ বস্তুর উপাদানকারণ বস্তুর অনুরূপ গুণযুক্ত হয়। জগৎ যখন অবয়বযুক্ত, অচেতন, অশুদ্ধ, জগতের উপাদান-কারণও ঐরূপ হওয়া যুক্তিযুক্ত। এই সকল কারণে মনে হইতে পারে যে, ব্রহ্ম হইতেছেন জগতের নিমিত্তকারণ মাত্র, উপাদানকারণ নহেন। কিন্তু এই কল্পনা ভ্রান্ত। ব্রহ্মই জগতের উপাদানকারণ; যেহেতু, উপনিষদে ব্রহ্ম-বিষয়ে উপদেশ দিবার পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, "উত তম্ আদেশম্ অপ্রাক্ষ্যো যেন অশ্রুতম্ শ্রুতম্ ভবতি, অমতম্ মতম্, অবিজ্ঞাতম্ বিজ্ঞাতম্"—শ্বেতকেতু গুরুগৃহে বিদ্যালাভ করিয়া ফিরিয়া আসিলে তাহার পিতা তাহাকে বলিতেছেন, "তুমি কি সেই উপদেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, যাহার দ্বারা সমুদয় অশ্রুত বস্তু শ্রুত হয়, অবিচারিত বস্তু বিচারিত হয়, এবং অবিজ্ঞাত বস্তু বিজ্ঞাত হয়।" ব্রহ্ম যদি জগতের উপাদানকারণ হয়েন, তাহা হইলে ব্রহ্মকে জানিলে জগতের সমুদয় বস্তুকে জানা হয়। ব্রহ্ম যদি জগতের কেবলমাত্র নিমিত্তকারণ হয়েন, তাহা হইলে ব্রহ্মকে জানিলে জগৎকে জানা হয় না। কুম্ভকারকে জানিলে কুম্ভকারনির্ম্মিত সকল বস্তুকে জানা যায় না, মৃত্তিকা কি বস্তু, তাহা জানা থাকিলে মৃত্তিকাগঠিত সকল বস্তুই জানা

হয়। এই ভাবে উপনিষদে যাহা প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল, তাহা আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে, ব্রহ্ম অবশ্য জগতের উপাদানকারণ হইবেন। উপনিষদে যে সকল "দৃষ্টান্ত" দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি আলোচনা করিলেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। একটা দৃষ্টান্ত এইরূপ, "যথা সৌম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং ভবতি, বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং, মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যং" অর্থাৎ হে সৌম্য, যেরূপ একটি মৃৎপিণ্ডকে জানিলে মৃত্তিকা-রচিত সকল বস্তু জানা যায়, ঘট প্রভৃতি বিকার কেবল কথামাত্র, মৃত্তিকা ইহাই সত্য।"

ব্রহ্ম যে জগতের নিমিত্তকারণ, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। প্রলয়ের সময় ব্রহ্ম ব্যতীত যখন আর কিছুই থাকে না, তখন ব্রহ্ম ব্যতীত আর কি নিমিত্তকারণ হইতে পারে?

অতএব ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ এবং উপাদান-কারণ উভয়ই।

রামানুজও এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি "তম্ আদেশম্ অপ্রাক্ষ্যো" পূর্ব্বোদ্ধৃত এই শ্রুতিবাক্যের অন্তর্গত আদেশ শব্দের অর্থ করিয়াছেন —"আদেশকর্ত্তা - ব্রহ্ম"। তিনি বলিয়াছেন যে, শ্রুতিতে যে স্থানে ব্রহ্ম কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত প্রকৃতিকে জগতের কারণ বলা হইয়াছে, সেখানে অব্যাকৃত নামরূপ ব্রহ্মকেই প্রকৃতি শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে। সাধারণতঃ উপাদান-কারণ এবং নিমিত্তকারণ ভিন্ন থাকে বটে। যেমন কুম্ভকার—নিমিত্তকারণ এবং মৃত্তিকা—উপাদানকারণ কিন্তু ব্রহ্ম নিজেই নিমিত্তকারণ এবং উপাদানকারণ উভয়ই হইতে পারেন। ব্রহ্মের স্বভাব জগতের অপর বস্তুর স্বভাব হইতে ভিন্ন। কুম্ভকারের সর্ব্বশক্তিমত্তা নাই, ইচ্ছামাত্র সে ঘট উৎপাদন করিতে পারে না, এ জন্য তাহার পক্ষে মৃত্তিকা প্রয়োজন। কিন্তু ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান, তিনি ইচ্ছামাত্র জগৎ রচনা করিতে পারেন, এ জন্য অন্য কোনও উপাদান-কারণের প্রয়োজন থাকে না।

মধ্ব এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, উপনিষদে প্রকৃতি শব্দের দ্বারা ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কারণ, শ্রুতিতে আছে, "হও এতমেব পুরুষং সর্ব্বাণি নামানি অভিবদন্তি"—এই পুরুষকেই সকল নামের দ্বারা নির্দ্দেশ করা হয়।

অভিধ্যোপদেশাচ্চ (২৪)

অভিধ্যা অর্থাৎ ধ্যানের উপদেশ আছে (এ জন্যও বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ এবং উপাদান-কারণ উভয়ই)। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে, "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি" অর্থাৎ তিনি (ব্রহ্ম) ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, "তৎ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" অর্থাৎ তাহা (ব্রহ্ম) ইচ্ছা করিয়াছিলেন, আমি বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব। এইরূপ ইচ্ছার উল্লেখ আছে, এ জন্য বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মই জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ এবং উপাদানকারণ।

রামানুজও এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মধ্ব বলিয়াছেন, ব্রহ্মের অভিধ্যা অর্থাৎ ইচ্ছাকেই প্রকৃতি শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। এই অভিধ্যা বা ইচ্ছাকে কোনও কোনও স্থলে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে।

সাক্ষাৎ চ উভয়াম্নানাৎ (২৫)

(শঙ্কর) 'সাক্ষাৎ' স্পষ্টভাবে 'উভয়াম্নানাৎ' উৎপত্তি ও প্রলয় উভয়ের উল্লেখ আছে (অতএব ব্রহ্ম জগতের প্রকৃতি)। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাৎ এব সমুৎপদ্যন্তে আকাশং প্রতি অস্তং যন্তি" অর্থাৎ এই সমস্ত প্রাণী আকাশ হইতে উৎপন্ন হয়, আকাশেই বিলীন হয়। এখানে আকাশ শব্দের অর্থ—ব্রহ্ম। যাহা হইতে জগতের উৎপত্তি হয় এবং যাহাতে প্রলয় হয়, তাহা অবশ্য জগতের উপাদানকারণ হইবে।

(রামানুজ) ব্রহ্মের নিমিত্তত্ব এবং উপাদানত্ব উভয়ই সাক্ষাৎভাবে কথিত আছে। তিনি একটি শ্রুতি-বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—"সেই বনটি কি এবং সেই বৃক্ষটি কি, যাহা হইতে ব্রহ্ম স্বর্গ ও জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং জগৎ ধারণ করিয়া যাহাতে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন? (উত্তর) ব্রহ্মই সেই বন এবং ব্রহ্মই সেই বৃক্ষ।"

(মধ্ব) ব্রহ্মকে সাক্ষাৎভাবে প্রকৃতি ও পুরুষ বলা হইয়াছে। তিনি একটি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার অর্থ এইরূপ -ইনি স্ত্রী, ইনি পুরুষ, ইনি প্রকৃতি, ইনি আত্মা, ইনি ব্রহ্ম ইত্যাদি।

আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ (২৬)

(শঙ্কর) এ কারণেও ব্রহ্ম নিমিত্তকারণ এবং উপাদান-কারণ উভয়ই, যেহেতু জগৎসৃষ্টি বিষয়ে ব্রহ্মকে কর্ত্তা এবং কর্ম্ম উভয়রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। "তৎ আত্মানং স্বয়ং অকুরুত" অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম আত্মাকে "করিলেন" (আত্মকৃতেঃ) অর্থাৎ জগৎরূপে পরিণত করিলেন ("পরিণামাৎ")।

রামানুজ "আত্মকৃতেঃ" এবং "পরিণামাৎ" ছুইটি স্বতন্ত্র সূত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। "আত্মকৃতেঃ" অর্থাৎ তিনি নিজেকে (বহু) করিয়াছিলেন, এ জন্য বুঝিতে হইবে, তিনিই নিমিত্ত ও উপাদানকারণ।

"পরিণামাৎ" এই সূত্রের ভাষ্যে রামানুজ বলিয়াছেন যে, জীবাত্মা ও অচেতন জগৎ ব্রহ্মের শরীর ; প্রলয়ের সময় তাহারা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন অবস্থায় থাকে, তাহার পর ব্রহ্মের জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হয়, তিনি পূর্ব্বকল্পের অনুরূপ জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করেন, সৃষ্ট জগৎ তাঁহার শরীররূপে অবস্থান করে। যদিও তিনিই জীব এবং জগৎরূপে পরিণত হন, তথাপি জীব ও জগতের দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করে না। "তৎ আত্মানং স্বয়ং অকুরুত" এখানে আত্মা শব্দের অর্থ ব্রহ্মের শরীরভূত জীব ও জগৎ, যাহা প্রলয়সময়ে সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মের সহিত অবিভক্ত-ভাবে অবস্থান করে।

মধ্ব "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" একটি সূত্রই ধরিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রকৃতির পরিণাম সম্পাদন করেন এবং আত্মাকে বহুরূপে পরিণত করেন।

যোনিশ্চ হি গীয়তে (২৭)

ব্রহ্মকে যোনি বলা হইয়াছে। যথা মুণ্ডক উপনিষদে—'কর্ত্তারম্ ঈশম্ পুরুষম্ ব্রহ্ম যোনিম্' (তিনি কর্ত্তা, ঈশ্বর, পুরুষ, ব্রহ্ম ও যোনি,) পুনশ্চ 'যৎ ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ' (পণ্ডিতগণ যাঁহাকে প্রাণীদের উৎপত্তিস্থলরূপে দর্শন করেন)। যোনি শব্দের প্রয়োগ হেতু বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রহ্মই জগতের প্রকৃতি বা উপাদানকারণ।

এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ (২৮)

(শঙ্কর) ইহা দ্বারা সকলই ব্যাখ্যাত হইল (অধ্যায়-সমাপ্তি হইল বলিয়া ব্যাখ্যাত শব্দটি ছুইবার ব্যবহার করা হইয়াছে)। কেহ বলেন, সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায় ; কেহ বলেন, বৈশেষিক দর্শনের পর-মাণুবাদ উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায় ; এই ভাবে অন্য দর্শনের তত্ত্বগুলি উপনিষদ্‌বাক্যের দ্বারা সমর্থন করিবার চেষ্টা অনেকে করিয়া থাকেন। এই সকল প্রতিপক্ষের মধ্যে সাংখ্যমতাবলম্বীই প্রধান। এ জন্য সাংখ্যবাদ খণ্ডন করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করা হইয়াছে। এই ভাবে বৈশেষিক প্রভৃতি অন্য সকল দর্শনের মতবাদ খণ্ডন করা যায়। এই সকল দর্শনের তত্ত্বগুলিও উপনিষদ্‌বাক্যের দ্বারা সমর্থন করা যায় না এবং উপনিষদের সিদ্ধান্তের প্রতিকূল।

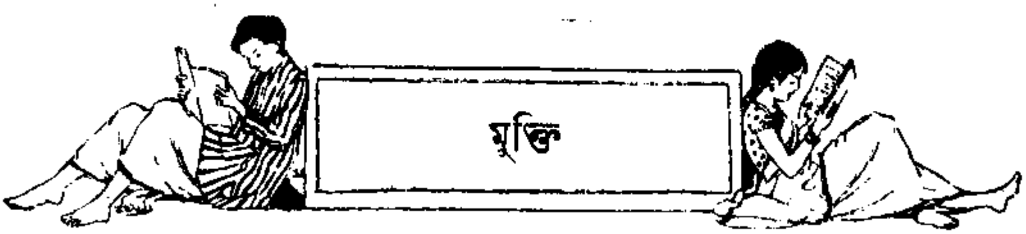
(রামানুজ) ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের চারি পাদে যে যুক্তি-প্রণালী দেখান হইল, তাহা দ্বারা সকল বেদান্তবাক্য ব্যাখ্যাত হইল, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্মই জগতের কারণ, ইহা শ্রুতির উদ্দেশ্য বলিয়া প্রদর্শিত হইল।

(মধ্ব) এই যুক্তি-প্রণালীতে ব্যাখ্যা করা যায় যে, শূন্য, তুচ্ছ, অভাব প্রভৃতি সকল শব্দই ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

[ক্রমশঃ।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, (এম এ)।



মুক্তি

(বড় গল্প)

১

নরনারায়ণ তরুণ চিত্রকর। বয়স তাহার এখনও ছাব্বিশ পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু এই বয়সেই সে সহজাত-সংস্কারের মত চিত্রবিদ্যাটি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। আলোক-চিত্র হইতে আরম্ভ করিয়া, আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া অথবা আপনার মৌলিক পরিকল্পনায় উচ্চাঙ্গের চিত্রাঙ্কন পর্য্যন্ত—চিত্র-বিভাগের সকল বিষয়েই সে শিক্ষিত, পটু। কিন্তু যশঃ তাহার অদৃষ্টে অনায়াসলভ্য হইয়া যে পরিমাণে তাহাকে ধন্য করিয়াছে, অর্থ-সম্পদ্ ততটা দুর্লভ হইয়া তাহার তরুণ চিত্তকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। নিত্যই সে নিয়মিতরূপে পরিশ্রম করিয়া হাতের কাযগুলি শেষ করে, কিন্তু অর্থ আসে এমন অনিয়মিতরূপে—যাহাতে তাহার কোনও অভাবই যথাযথভাবে মোচন হয় না এবং একান্ত প্রয়োজনের সময় তাহার দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের অন্ত থাকে না। বিধাতা তাহাকে রূপ দিয়াছেন, খাটিবার শক্তি দিয়াছেন, প্রতিভার অধিকারী করিয়াছেন, বঞ্চিত করিয়াছেন শুধু অর্থ উপার্জ্জনে এবং উপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহারে। অর্থ উপার্জ্জন করিবার পটুতাও তাহার যেমন সামান্য, অর্থের যথাযথ ব্যবহার সম্বন্ধে তাহার অজ্ঞতাও তেমনই অসামান্য।

সংসারে তাহার চাল নাই, চুলা নাই, আপনার বলিতে কেহ নাই। শৈশবে সে পিতৃমাতৃ-হীন হইয়া মাতুলালয়ে প্রতিপালিত ও ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পরেই মহাজনের পরোয়ানা ও মহাকালের তাড়নায় মাতুলকুলের উচ্ছেদ হয়। অতঃপর নিজের পথ তাহাকে নিজেই খুঁজিয়া লইতে হয়;—সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা পাইয়া, চাকুরীর দিকে না ঝুঁকিয়া স্বাধীনভাবে চিত্রসাধনাকেই সে জীবিকার অবলম্বন করিয়া লয়।

কলিকাতার একটা সাধারণ মেসে নরনারায়ণের দিন কাটে। দুই সিটের একখানি ছোট ঘরে সে থাকে ও তাহার হাতের কাযগুলি সম্পন্ন করে। এইভাবে যখন তাহার দিন যাইতেছিল, সেই সময় এক দিন সহসা ভোজের কোন মজলিসে এক বর্ষীয়ান্ পুরুষের সহিত তাহার পরিচয় হয়। সেই দিনই নরনারায়ণ সর্ব্বপ্রথম জানিবার অবকাশ পায় যে, ইহসংসারে সে একবারেই অনাত্মীয় নয়, মাতুলকুলের সংস্রবে নবপরিচিত এই সদালাপী পুরুষটি তাঁহার আত্মীয়স্থানীয়,—সম্পর্কে হন দাদামহাশয়।

কথাপ্রসঙ্গে নরনারায়ণ জানিতে পারিল, বৃদ্ধের অবস্থা খুব স্বচ্ছল। বোম্বাই সহরে দীর্ঘকাল কাটাইয়াছেন, এখনও সেখানে কারবার চলিতেছে, সেইখানেই তাঁহার পরিজনরা থাকেন। সম্প্রতি লেক্ রোডে জমি কিনিয়া এক বাড়ী ফাঁদিয়াছেন, বাড়ীর নির্ম্মাণকার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ইচ্ছা আছে, লেক রোডের নূতন বাড়ীতেই তিনি সস্ত্রীক বাস করিবেন। গৃহপ্রবেশের স্মরণীয় দিনটি জানাইয়া সেই মজলিসেই তিনি নরনারায়ণকে সাদর নিমন্ত্রণ করিয়া রাখেন।

সে নিমন্ত্রণ নরনারায়ণ উপেক্ষা করিতে পারে নাই। গৃহপ্রবেশের দিনটিতে এমন এক ক্ষণে সে তাহার আত্মীয় দাদামহাশয়ের নূতন গৃহে প্রবেশ করে যে, তাহার পর নির্গমের আর পথ পায় নাই

আত্মীয়তাসূত্রে কয়েক দিনের মেলামেশায় তরুণ ও প্রবীণ দুই আত্মীয়ই দুই জনকে চিনিতে সমর্থ হন। নরনারায়ণ বুঝিয়াছিল, বৃদ্ধের গুণ অনেক, কিন্তু অত্যন্ত কৃপণ, একটি পাই এদিক্ ওদিক্ হইতে দেন না। নিক্তির ওজনে সংসারের সমস্ত কায নির্ব্বাহ করেন। দাদামহাশয়ও চিনিলেন, ছেলেটি বিনয়ী, স্বভাব ভাল, কিন্তু অত্যন্ত বেহিসেবী। তবুও কি মনে করিয়া তিনি তাহার দিকে ঢলিলেন, এবং এক দিন নরনারায়ণকে ডাকিয়া তিনি কহিলেন,—এক কায কর নরু, মেসের পাট উঠিয়ে ফেল, আমরা ত দুটি প্রাণী—স্বামি-স্ত্রী, এত বড় বাড়ী, অনায়াসেই তুমি এখানে থাকতে পার।

সহরের প্রান্তদেশে পল্লীশ্রীমণ্ডিত এই মনোরম স্থানটি

তরুণ শিল্পীর চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিল, আনন্দে দুই চক্ষু তাহার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

প্রশ্ন হইল,—মেসে তোমার খরচ পড়ে কত?

নরনারায়ণ উত্তর দিল,—তা, ঘরভাড়া নিয়ে টাকা আঠারো হবে।

দাদামহাশয় মীমাংসা করিয়া দিলেন,—বেশ, তুমি আমাকে পনেরো টাকা মাসে দিয়ো। নীচে বৈঠকখানার পাশের ঘরখানায় তুমি তোমার মাল-পত্তর এনে ফেলো, ঐ ঘরে থাকবে, ছবির কায করবে; দুটি বেলা আমার সংসারেই খাবে, মেসের যাচ্ছেতাই খেয়ে ডিসপেপসিয়ার ভয় এড়াবে। বাড়ীর ছেলে হয়েই থাকবে তুমি, কি বল?

নরনারায়ণের কিছুতেই 'না' বলা অভ্যাস ছিল না। এ ক্ষেত্রেও বলিল না;—যদিও মাসে নিয়মিতভাবে পনেরোটি করিয়া টাকা দাখিল করিবার সমস্যা তাহার মনটির মধ্যে খোঁচা দিতেছিল। মেসের ম্যানেজারের নিকট তাঁড়াতাঁড়ি ও তাহার জন্য খোঁটা শোনাটা তাহার সহ্য হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু এখানেও যদি তেমনই খেলাপ করিতে হয় তাহাকে! তখন? ভবিষ্যতের ভাবনাও তাহাকে কাবু করিতে পারিত না। আচ্ছা, দেখা যাবে তখন,—ইহাই ছিল তাহার সান্ত্বনা। সুতরাং এ সমস্যাও তাহার তরুণ মনটির উপর গভীর রেখাপাত করিতে পারিল না।

কিন্তু আটটি মাস এ বাড়ীতে কাটাইয়া নরনারায়ণ পঞ্চাশটি টাকা গৃহস্বামী আত্মীয়ের বরাবর অতিকষ্টে দাখিল করিতে পারিয়াছিল, তাহাও ন্যূনকল্পে পনেরোটি দফায় এবং অজস্র তাগাদায়। আবার রহস্য ছিল এইটুকু যে, তাহার হাতে যে দিন কিছু টাকা আসিত, পাওনা বাবদ গৃহকর্ত্তাকে যেটুকু উশুল দিত, তাহার দ্বিগুণ ব্যয় করিয়া এমন একটা ডালি আনিয়া উপস্থিত করিত, যাহার প্রাচুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া গৃহস্বামী গৃহিণীকে বলিতেন,—দেখেছ, ছোকরার নজর! দেনার টাকা দিতে কাঁদে, কিন্তু সওগাত দিতে একবারে যেন কল্পতরু!—বস্তুতঃ, নরনারায়ণের হাতে পয়সা আসিলে তাহার আর জ্ঞান থাকে না, দুই হাতে এমন বেপরোয়াভাবে খরচ করিয়া যায় যে, কে বলিবে—এই লোকই এক দিন ট্রাম ভাড়ার কয়টি পয়সার অভাবে হাঁটিয়া বালিগঞ্জ হইতে ধর্ম্মতলায় পাড়ি দিয়া থাকে! হাতে পয়সা পড়িলে, নরনারায়ণের মনেও সে দুর্দ্দিনের কথা জাগিয়া উঠিবার অবসর পায় না।

হঠাৎ গৃহস্বামীর ডাক পড়িল সুদূর বোম্বাই সহরে। সেখানে তাঁহার ফ্যালাও কারবার। দুই জামাতার উপর কারবার চালনার ভার ন্যস্ত করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত। কন্যারাও কর্ম্মস্থলে স্বামীদের নিকট। পুত্র নাই, দুই কন্যাই বৃদ্ধের বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। দুই কন্যাই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন, বিশেষ প্রয়োজন, মাস কয়েক তাঁহাদিগকে বোম্বাইবাস করিতে হইবে। বালিগঞ্জের বাড়ী ভাড়া দিয়া, তাঁহারা যাহাতে সত্বর রওনা হইয়া পড়েন, তজ্জন্য অনুরোধ ও প্রার্থনার অন্ত ছিল না।

বাড়ীতে ভাড়াটিয়া বসাইবার এবং বাড়ীর কর্ত্তার সস্ত্রীক বোম্বাই রওনা হইবার সাড়া পড়িয়া গেল। নরনারায়ণ বুঝিল, এখান হইতে অন্ন তাহার উঠিয়াছে, আবার মেসে গিয়া আস্তানা পাতিতে হইবে, 'পুনর্মূষিকো ভব' তাহার এখন অবস্থা; কিন্তু এখানকার দেনা সে কি করিয়া শোধ করিবে, ইহাই এখন কঠিন সমস্যা।

এই সমস্যার সমাধান করিতে কর্ত্তা নিজেই তাহার ছোট ঘরখানির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নরনারায়ণ কর্ত্তাকে দেখিয়া হাতের কায ফেলিয়া শশব্যস্তে দাঁড়াইয়া উঠিল। কর্ত্তা কোনও রূপ ভূমিকা না করিয়া সোজাসুজি কহিলেন—আমাদের যাবার দিন ত এগিয়ে এল, নরু। এখন তোমার ব্যবস্থাটা ত সেরে ফেলা দরকার। কম্বলখানা ভিজিয়ে তুমি কি রকম ভারি ক'রে তুলেছ, তা ত দেখতেই পাচ্ছ! এখন কি করতে চাও?

মুখখানি নত করিয়া জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নরনারায়ণ কহিল,—দিতে হবে বই কি, দাদামশাই! কিন্তু উপস্থিত ত কিছুই ক'রে উঠতে পারছি না, হঠাৎ যে আপনারা যাবেন, তাও ভাবি নি, দিন কতক সময় পেলে—

—দশ বছর সময় পেলেও তুমি কিছুই ক'রে উঠতে পারবে না, নরু, আমি তোমাকে চিনে নিয়েছি; তোমার আয়েরও ঠিক নেই, কথারও ঠিক নেই।

—আপনি এত দিনে রোগ ঠিক ধরেছেন, দাদামশাই! এখন আপনিই বলুন ত কি করি? কি উপায়ে আপনার দেনা শোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়—উপস্থিত অবস্থায়?

—উপায় আমি স্থির করেছি শোনো। আমি বেশ বুঝেছি, টাকা তুমি দিতে পারবে না; অথচ আমি আমার টাকাগুলো ছাড়তেও পারি না। তুমি এক কায কর যদি

তোমার দেনাও শোধ হয়ে যায়, আর এ বাড়ীতে তোমার থাকাও চলে।

নরনারায়ণ স্তব্ধবিস্ময়ে বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকাইল।—কি উপায় তিনি দেখাইতে চান! তাহার মুখ দিয়া কথা আর ফুটিয়া বাহির হইল না।

গৃহস্বামী ঘরখানির চারিদিকে নরনারায়ণের হাতের সমাপ্ত অসমাপ্ত বিভিন্ন চিত্রপটগুলির উপর দৃষ্টি সঞ্চারিত করিয়া সহসা প্রশ্ন করিলেন,—পুরোনো ছোট ফটো দেখে তুমি অয়েল পেইণ্টিং করতে পার?

সোল্লাসে নরনারায়ণ উত্তর দিল,—নিশ্চয়ই, এই ত আমার কাষ, দাদামশাই।

—তা হ'লে তুমি এই কাষই কর। চারখানা পুরোনো ফটো আমি তোমাকে দেব, তাই দেখে ফুল সাইজ অয়েল পেইণ্টিং তোমাকে চারখানা ক'রে দিতে হবে। পারবে ত?

—চারখানা?

—হাঁ হে! একখানা হচ্ছে আমার বাবার, আর তিনখানা আমার তিন মেয়ের। চারখানা ফটোই আছে ঠিক, তবে যায়গায় যায়গায় একটু আধটু ফেণ্ট হয় ত হয়ে থাকবে; তা তাতে কি এমন এসে যাবে আর! তোমাদের ত রং গুলে তুলি চালানো কাষ, দেবে ঠিকঠাক চালিয়ে।

—আচ্ছা, আমাকে ফটোগুলো আগে দেখাবেন, আমি দেখে—

—আহাহা, দেখে ভাববার মত এতে কিছু নেই হে, কথা হচ্ছে, ওগুলো করতে হবে, করা চাই; তোমার হাতেই ধ'রে দিচ্ছি সব এখুনি। হাঁ, ভাল কথা, তোমার মজুরী সম্বন্ধে কি করা যায় বল? পরের ছেলে হচ্ছ তুমি, আর—এও ত তোমার ঘরের কাষই হে! পয়সা-কড়ির কথা এখানে উঠতেই পারে না, তবে কি না—তোমাকে হয় ত রং কিনতে হবে, কিছু খরচ-পত্তরও হয় ত হ'তে পারে, তা ছাড়া, খাটতেও ত হবে দিন কতক! তা দেখ, এই বাবদে আমি তোমার দেনাটা বেবাক রেহাই ক'রে দিচ্ছি; ও বাবদে একটি পয়সাও আর তোমার কাছে চাইব না। তা ছাড়া তুমি যেমন আছ, তেমনই থাকবে, এর জন্যে তোমাকে ভাড়াটাড়াও কিছু দিতে হবে না! একটা ইক্‌মিক্ কুকার কিনে নিয়ো, খাবার বিশেষ কোনও কষ্ট বা ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে না। কিন্তু বাপু, ফিরে এসে যেন দেখতে পাই, কাষগুলো আমার শেষ ক'রে ফেলেছ,—টাকার মত যেন না হয়।

নরনারায়ণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া গৃহস্বামীর পদধূলি মাথায় তুলিয়া কহিল,—আজ আমার মাথার ওপর থেকে মস্ত একটা দুশ্চিন্তা নেমে গেল, দাদামশাই। আমাকে আপনি বাঁচালেন।

কিন্তু অবস্থা যাহার অগ্র ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ, তাহার পক্ষে চারখানা অয়েল পেইণ্টিং বিনা পুঁজিতে দেনার দায়ে সম্পন্ন করিয়া দিয়া দিন গুজরান করা কতটা সম্ভবপর, এ চিন্তাটুকু কাহারও চিত্তে সংশয় তুলিবার অবসর পাইল না!

* * * *

বিচক্ষণ দাদামহাশয় বাড়ীখানি এমন কায়দায় তৈয়ারী করাইয়াছিলেন যে, মধ্যাংশের বড় অংশটি নিজ ব্যবহারে রাখিয়াও, দুই পার্শ্বের অপেক্ষাকৃত দুইটি ক্ষুদ্র অংশ স্বতন্ত্রভাবে অনায়াসে ভাড়া দেওয়া যায়। তাঁহার অধিকৃত মধ্যাংশের নীচের তলায় দালানটির দুই দিকের দুইটি দরজা খোলা থাকিলে সমস্ত বাড়ীখানিই এক হইয়া যাইত, আবার ঐ দুইটি দ্বার বন্ধ করিয়া দিলে—বাড়ীর তিনটি অংশই স্বতন্ত্র হইয়া পড়িত। হইয়াছিলও তাহাই। তাঁহার শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কের এক আত্মীয় বাড়ীর পশ্চাতের অংশটুকু কায়েমীভাবেই ভাড়া লইয়াছিলেন। বাড়ীর কর্ত্তা নবগোপাল রায় এক প্রতিষ্ঠাপন্ন ইনসিওরেন্স কোম্পানীর এজেণ্ট। তাঁহাকে প্রায়ই বাহিরে বাহিরে ঘুরিতে হইত, বাড়ীতে তিনি খুব কম সময়ই থাকিতেন। প্রবীণ আত্মীয়—নরনারায়ণের দাদামহাশয়—কালীপদ বোসের বাড়ীতে ও তাঁহার তত্ত্বাবধানে স্ত্রী-কন্যাকে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াই বাহিরে বাহিরে ঘুরিতেন। বাড়ীতে থাকিতেন তাঁহার স্ত্রী শান্তমণি ও কন্যা মালতী। স্ত্রী ও কন্যার খরচের জন্য মাসে মাসে যে পরিমাণ টাকা তিনি দিয়া যাইতেন বা কর্মস্থান হইতে পাঠাইতেন, তাহাতে তাহাদের কোনও অভাব অসুবিধা হইবার কথা নয়,—কিন্তু মা ও মেয়ে উভয়েই সহরের আপাত-মধুর সভ্যতার মোহে পড়িয়া অবস্থার অতীত ব্যয়বাহুল্যে এরূপ অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, মাসিক নির্দ্দিষ্ট টাকায় কিছুতেই তাঁহারা ব্যয়সঙ্কুলান করিতে পারিতেন না। মানুষ যতক্ষণ নিজের অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া তুষ্ট থাকে, অভাব ততক্ষণ তাহাকে কিছুতেই আক্রমণ

করিতে পারে না,—কিন্তু নিজের অবস্থার উপর শ্রদ্ধা হারাইয়া, অন্যের আড়ম্বর দেখিয়া যখনই সে তাহার অনুকরণে ব্যগ্র হইয়া উঠে, অভাবও অমনি উপযুক্ত অবসর পাইয়া তাহাকে ভয়াবহ 'অক্টোপাসের' মত অষ্টপদে আষ্টে-পৃষ্ঠে বন্ধন করিয়া ফেলে!

নিত্য নিয়মিতরূপে সিনেমায় যাওয়া, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের তড়াগতটে বসিয়া হাওয়া খাওয়া, প্রতিবেশীদের সচকিত করিয়া ট্যাক্সি চড়িয়া ফেরা এবং সোফারের সশ্রদ্ধ সেলামটুকু উপভোগ করিবার মোহে ভাড়ার ভগ্নাংশে দৃক্‌পাত না করিয়া পূরা টাকা বা নোট ফেলিয়া দিয়াই সদর্পে চলিয়া যাওয়া—এক শ্রেণীর মেয়েদেরও ইদানীং ফ্যাসান হইয়া পড়িয়াছে। অথচ তাহাদের সংসারের রোজনামচার অনুসন্ধান করিলে সহজেই জানিতে পারা যায় যে, সেখানে অভাবের অন্ত নাই। বাড়ীর কর্ত্তার তরফ হইতে যথাসময়ে নির্দ্ধারিত টাকা আসা সত্ত্বেও, বাড়ীর ঝি সময়মত তাহার বেতন পায় না, গয়লা, মুদি, কয়লাওয়ালা —পূরা পাওনা লইয়া কেহই কোন মাসে হাসিমুখে ফেরে না, ধোপা দুটি বেলা হাঁটে, অথচ নগদ দক্ষিণায় 'ডাইং ক্লিনিং' হইতে তিনগুণ মজুরী দিয়া সদ্য ধৌত কাপড় পরিতে তাহাদের বিবেকে কিছুমাত্র আঘাত পড়ে না।

শান্তমণি ও মালতীর প্রকৃতি এই উচ্ছৃঙ্খল সভ্যতার আলোক-সম্পাতে পুরাপুরিভাবেই অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। হিসাবী দাদামহাশয় এ জন্য সদাসর্ব্বদাই খিট্‌-খিট্ করিতেন, বুঝাইবার প্রয়াস পাইতেন, কিন্তু মা ও মেয়ে তাঁহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। মা বলিতেন,— লজ্জা-সঙ্কোচের যুগ চ'লে গেছে, এখন মেয়েদেরও পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলবার যুগ এসেছে।

মেয়ে মালতীর মত,—লজ্জা, সঙ্কোচ, জড়তা এগুলো অত্যাচারের বাহন। ও সব এখন অচল হয়ে গেছে। 'আপটুডেট' না হ'লে আমাদের আর নিস্তার নেই।

নরনারায়ণ নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে মা ও মেয়ের কথা শুনিত। তাহাদের কুণ্ঠাশূন্য সপ্রতিভ ভাব, যখন তখন তাহাদের সাজ-সজ্জার বাহার ও প্রসাধন-পারিপাট্যের অভিনবত্ব তাহার সাদাসিধা নির্ম্মল অন্তরে বিস্ময়ের হিল্লোল তুলিত।

মালতীর বয়স যদিও আঠারো পার হয় নাই, কিন্তু তাহাকে দেখিলে আরও অধিকবয়স্কা বলিয়া ভ্রম হয়। দেহের রংটুকু তাহার যতখানি ফর্সা, তাহাতে লাবণ্যের অভাবও ঠিক ততখানি! এ অভাবটুকু সদাসর্ব্বদাই তাহাকে প্রসাধনের সহায়তায় পূরণ করিয়া লইতে হয়। দেহযষ্টি তাহার যে অনুপাতে ঢ্যাঙ্গা, দেহের বাঁধুনিও সেই অনুপাতে অনেকখানি যেন আলুগা; মুখের ছাঁদটুকু কিন্তু তাহার চমৎকার, আকৃতিগত চটকের উপর প্রকৃতিগত চাঞ্চল্য ও চটুলতার সমাবেশে মালতীর মুখখানি যেন রূপের আর-সব ক্রটি ঢাকিয়া, একাই চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে। সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র, সুতরাং অঙ্গে লাবণ্যের অভাবই থাকুক, আর গঠনগত যত খুঁতই হউক, শুধু এই সপ্রতিভ মুখ-খানির চটকে মালতীর স্থান সকলের আগে, আদর তাহার সর্ব্বত্র, রূপমুগ্ধের দল তাহার দিকেই সর্ব্বাগ্রে ঝুঁকিয়া পড়ে। মালতীর অন্তর অহঙ্কারে সর্ব্বদাই স্ফীত।

মালতী বেথুনে পড়িয়াছে, বিভিন্ন পার্টিতে মিশিয়াছে, দোষগুলি অনুকরণ করিয়াছে পূর্ণমাত্রায়, গুণগুলি বর্জ্জন করিয়াছে অতি সন্তর্পণে। বেথুনে পড়িয়া, পাশ করিয়া যাঁহারা আদর্শ জায়া ও জননী হইয়া নারীসমাজের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, মালতী কোনও দিনই তাঁহাদের পদাঙ্ক অনু-সরণে কিছুমাত্র প্রয়াস পায় নাই, শিক্ষা ত তাহার লক্ষ্য নয়, —বই লইয়া সে কলেজে চলিয়াছে, দশ জনে দেখিবে, দেখিয়া বাহোবা দিবে,—ইহাই তাহার লক্ষ্য! এই সূত্রে যত কিছু সুযোগ-সুবিধা লওয়া সম্ভব, তাহার পক্ষ হইতে তাহার কোন অসদ্ভাবই হয় নাই। চক্ষু তাহার বরাবরই ভাল, রোগের কোনও চিহ্নই তাহাতে পড়ে নাই,—কিন্তু তথাপি তাহার দুই চক্ষুর উপর চশমা উঠিয়াছে এবং এজন্য পিতাকে দক্ষিণা দিতে হইয়াছে একটি মুষ্টি টাকা! বড়লোকের মেয়েদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিয়া সে চলে, তাহাদের অনুরূপ বেশভূষা, সাজ-সজ্জা তাহার চাই-ই! কিন্তু সেনেটের হলে ঢুকিয়া হোঁচট খাইয়া পড়িবার সৌভাগ্যটুকুও তাহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। অগত্যা বেথুন হইতে নাম কাটাইয়া অন্য পথে নাম জাহির করাই এখন তাহার পক্ষে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এ কার্য্যে সহায়ক হইয়াছেন তাহার মাতাঠাকুরাণী শান্তমণি স্বয়ং!

নরনারায়ণের সুন্দর চেহারা ও তাহার বৃত্তি মালতীর মনে প্রথম প্রথম একটু হিল্লোল তুলিলেও, তাহার অর্থ-কৃচ্ছ্রতাই তাহাতে অন্তরায় উপস্থিত করে। নরনারায়ণের

ঘরে ঢুকিয়া মালতী প্রায়ই তাহার ছবি দেখে, ছবি আঁকা সম্বন্ধে দু একটি কথাও জিজ্ঞাসা করে। নরনারায়ণ প্রথম প্রথম একবারে হতভম্ব হইয়া পড়িত, স্তব্ধ জিহ্বা তাহার উত্তর যোগাইতে পারিত না। কিন্তু ক্রমেই তাহার সে ভাব কাটিয়া যায়,—মালতীর সহিত কথা কহিতে তাহার আর বাধে না। কিন্তু শান্তমণির ইচ্ছা নয় যে, তাহার রূপসী কন্যা যাহার তাহার সহিত মেলামেশা করে, কথাবার্ত্তা কয়। কন্যা বাড়ী যাইলে, মা নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করে,—ঐ হতচ্ছাড়াটার ঘরে গিয়ে, তার সঙ্গে কথা কইতে তোর লজ্জা করে না, মালা?

মালতীর নাম সংক্ষিপ্ত করিয়া মা তাহাকে মালা বলিয়া ডাকিত। মায়ের কথা শুনিয়া মেয়ে উত্তর দিল,—তোমারই বা ওর ওপর এত রাগ কেন, মা? দুটো কথা কয়েছি, তাতে হয়েছে কি? দিব্যি ছবি আঁকে, তাই দেখি।

—ছাই আঁকে! তবু যদি পয়সা আনবার থাকত মুরদ! পরের বাড়ীতে প'ড়ে প'ড়ে তার ঘাড় ভেঙ্গে দুটি বেলা কাঁড়ি গিলছে, একটি পয়সা দেবার নাম নেই, ও আবার মানুষ? দূর্! দূর্!

অমানুষের কথায় মেয়ের মনটিও বিষিয়া উঠিল। অর্থহীনের প্রতি মালতীরও মর্ম্মান্তিক বিরাগ। কিছুদিন সে নরনারায়ণের ঘরের দিকে ফিরিয়াও দেখিল না। নরনারায়ণের মন উসখুস করিতে লাগিল। ঘরের বাহিরে কোনও পরিচিত পদশব্দ শুনিবার জন্য তাহার কাণ দুটি পড়িয়া থাকিত। এমনই যখন অবস্থা, তখন দাদামহাশয়ের বোম্বাই যাত্রার ব্যবস্থা অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বোম্বাই যাত্রার দিন প্রত্যূষে দাদামহাশয় নরনারায়ণকে ডাকিয়া কহিলেন,—ও পাশের ব্লকটাও ভাড়া দিয়ে যাচ্ছি নরু, ওবেলাতেই তারা জিনিষ-পত্তর নিয়ে আসবে। আর আমাদের ব্লকের ঘরগুলোই বা মিছি-মিছি প'ড়ে থাকে কেন? দোতলাটা ভাড়া দেবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ভাড়াটে আজ পর্য্যন্ত যোগাড় করতে পারি নি। অগত্যা দুখানা ঘরে জিনিষ-পত্তর বন্ধ ক'রে চাবি দিয়ে যাচ্ছি, বাকি ঘরগুলো রইল তোমারই জিম্মায়। ঘর পিছু দশটি ক'রে টাকা, আর ছ'মাসের আগাম যদি কেউ দিতে রাজি হয়, তা হ'লে তৎক্ষণাৎ আমাকে লিখবে।

অপরাহ্ণের দিকে অপর ব্লকের নূতন ভাড়াটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। মটরের হরণের সঙ্গে চারিদিকে হাঁক-ডাক পড়িয়া গেল। সাহেবী পোষাকে সজ্জিত এক ব্যক্তি ছড়ি হস্তে মোটর হইতে নামিল। বয়স আন্দাজ বত্রিশ, চেহারা মোটের উপর মন্দ নয়, বেশ ফিটফাট ও হৃষ্টপুষ্ট আকৃতি; নাম অবিনাশ সরকার; কার্নিভাল চালাইতে সিদ্ধহস্ত; বাঙ্গালা দেশে ও বাঙ্গালার বাহিরে নানা স্থানে তাহার কার্নিভাল চলিতেছে। যেমন দেদার উপায় করে, তেমনই দুই হাতে খরচ করিয়া তৃপ্তি পায়।

দাদামহাশয় নরনারায়ণকে নবাগত ভাড়াটিয়ার সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। করমর্দ্দনে নরনারায়ণকে আপ্যায়িত করিয়া সরকার সাহেব তাহার ব্লকে প্রবেশ করিল। সঙ্গে লোকজন ছিল, তাহারা মালপত্র লইয়া পড়িল।

শান্তমণি মন্তব্য প্রকাশ করিলেন,—দিব্যি মানুষটি, দেখলেই শ্রদ্ধা হয়। আসতে না আসতেই পাড়া গুলজার, যেন কোথাকার কে রাজা এল! এই ত চাই।

দাদামশাই হাসিয়া কহিলেন,—নিশ্চয়ই, সাহেব সুবো এসেছে, হাতে ছড়ি, মাথায় টুপি, সঙ্গে দু তিনখানা মটর, এত লোকজন,—শ্রদ্ধা ত হবারই কথা।

নূতন ভাড়াটিয়াকে বাসায় স্থিতি করিয়া দিয়া—সায়াহ্নেই দাদামহাশয় সস্ত্রীক বোম্বাই যাত্রা করিলেন।

* * * * *

সহরের এক খ্যাতনামা অধ্যাপক নরনারায়ণকে কিছু কায দিয়াছিলেন। দাদা মহাশয়কে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া, সে কাযগুলি লইয়া অধ্যাপক মহাশয়ের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল। প্রণষ্টপ্রায় ফটোচিত্র হইতে কয়েকখানি পরিপূর্ণ চিত্র তাহাকে নিজের পরিকল্পনায় আদর্শ বজায় রাখিয়া সম্পূর্ণ করিতে হইয়াছিল। চিত্রগুলি দেখিয়া অধ্যাপক মহাশয় চমৎকৃত! তাঁহার মৃত পিতা, মাতা ও ভগিনীর তিনখানি দুষ্প্রাপ্য ফটোচিত্র এমনভাবে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার যথাযথ আলেখ্য পাইবার আশা তিনি পরিত্যাগই করিয়াছিলেন। কতিপয় নামজাদা ষ্টুডিও এ কার্য্য গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হয় নাই। এক বন্ধুর অনুরোধে অনিচ্ছাসত্বে তিনি নরনারায়ণের হাতে প্রণষ্টপ্রায় ফটো তিনখানি সমর্পণ করিয়াছিলেন। তখন কল্পনাও করেন নাই যে, এই অখ্যাতনামা তরুণ শিল্পী এত শীঘ্র এমন নিখুঁতভাবে তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিবে।

নিরুদ্দিষ্ট প্রিয়জনকে ফিরিয়া পাইলে মনে যেরূপ উল্লাস উপস্থিত হয়, অধ্যাপক সেইরূপ উল্লাসের সহিত নরনারায়ণের সম্বর্দ্ধনা করিলেন, প্রশংসা আর তাঁহার মুখে ধরিল না।

অনেক বড়লোকের কায সে করিয়াছে, বড় বড় কলেজের সম্পর্কেও তাহাকে যাইতে হইয়াছে; সর্ব্বত্রই সে মনোনিবেশের সহিত কায করিয়া যায়, ইহাই তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব। কিন্তু কায পাইয়া এভাবে তাহার সম্মুখে কেহ কোন দিন এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে নাই, এমন উচ্চ সুখ্যাতিও সে কাহারও মুখে শুনিবার অবকাশ কোন দিন পায় নাই। আজ সেও চমৎকৃত হইয়া চাহিয়া রহিল।

শুধু মুখের প্রশংসাও নয়,—অধ্যাপক মহাশয় যখন দশ টাকার দশখানি নোট তাহার হাতে নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে গুঁজিয়া দিলেন, তখন নরনারায়ণের বিস্ময় একবারে যেন ছাপাইয়া উঠিল!—একশো টাকা! সে যে বিশ টাকার বেশী প্রত্যাশা করে নাই; তাহাও যে আজই সদ্য সদ্য পাইবে, সে সম্বন্ধেও তাহার গভীর সংশয় ছিল। অভিভূতের মত সে কহিল,—এ কি স্যর! দশ খানা নোট যে, সবই দশ টাকার!

নরনারায়ণের বিস্ময়-বিহ্বসিত মুখখানির দিকে চাহিয়া অধ্যাপক উত্তর দিলেন,—এর বেশী আমার কাছে নেই, থাকলে সবটাই দিতাম। আসছে মাসের ১লা তারিখে এই সময় এস। বাকিটা দেব।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! নরনারায়ণ গাঢ়স্বরে কহিল,—আপনি তা হ'লে আমার কথা ঠিক বুঝতে পারেন নি, স্যর! আমি বলছি, আপনি আমাকে অনেক বেশী দিয়েছেন। আমি ত এত টাকা পাবার প্রত্যাশা নিয়ে আপনার কাযে হাত দিই নি।

বদ্ধদৃষ্টিতে অধ্যাপক নরনারায়ণের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—তার কারণ, তুমি তোমার প্রতিভা ওজন করবার সুযোগ এখনো পাও নি। আমি বুঝতে পেরেছি, আর্টকে তুমি সাধনা বলেই বরণ করেছ, অর্থ দিয়ে তার যাচাই করতে শেখ নি! কিন্তু এ ঠিক নয়। এতে চলার পথে পদে পদে হোঁচট খেতে হবে। আমি তোমাকে একশো টাকা মাত্র দিয়েছি যে কাযের বিনিময়ে,—তুমি বলছ, বেশী দিয়েছি। জান, পাঁচটা বড় বড় ষ্টুডিও এ কায নিতে ভরসা করে নি! আর, যদি তাদের মধ্যে কেউ এ কায করত, কত বিল করত বলতে পার?—সাড়ে চারশোর কম নয়! আমি তোমাকে একশো দিয়েছি, পয়লা তারিখে মাইনে পেলে আরও একশো দেব। নিজেকে সস্তা কর না, নিজের ওজন বুঝে দর হেঁকো, নইলে বড় হ'তে পারবে না কোন দিন। হাঁ, ভাল কথা, এক দল সাহেব গ্রাণ্ড হোটেলে পিকচার একজিবিসন খুলছে জান ত?

নরনারায়ণ কহিল,—ও সব বড় ব্যাপার, আমাদের জেনে ত কোন লাভ নেই, স্যর।

—লাভ নেই কি হে! লাভ হয় ত এই পথেই। আমি একখানা পামফ্লেট ওদের পেয়েছি, তুমি নিয়ে যাও; ওতে সব লেখা আছে। তুমি একখানা ছবি দেবার চেষ্টা কর। আমি তোমার প্রতিভার যে পরিচয় পেয়েছি, তাতে আমার বিশ্বাস, তোমার ছবি একটা 'প্রেস' পাবেই। আমেরিকা থেকে বাছা বাছা দেড়শো ধনকুবের আসছে কলকেতায় টুর করতে। তাদের জন্যই এই একজিবিসন। এ দেশের ভাল ভাল ছবি নামী হীরে-জহরতের দরে কেনা এদের একটা মস্ত নেশা। আমি জানি, কোনও বৈশিষ্ট্য বা অসাধারণত্ব আছে, এমন কোনও কোনও ছবির দর পঁচিশ হাজার পাউণ্ড পর্য্যন্ত উঠেছে। কখন্ কোন্ দিক্ দিয়ে অদৃষ্ট ফেরে, কে বলতে পারে? চেষ্টা করতে ক্ষতি কি? ছবি তৈরী হ'লে বরং আমার কাছে এনো, আমি সেখানে পাঠাবার সব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে দেব।

পামফ্লেটখানি হাতে করিয়া, সেই মহানুভব অধ্যাপককে সশ্রদ্ধ-নমস্কার জানাইয়া নরনারায়ণ বিদায় লইল। কায করিয়া কাযের এমন উচ্চ পারিশ্রমিক এ পর্য্যন্ত সে পায় নাই; ইহা তাহার পক্ষে যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনই আকাঙ্ক্ষার অতীত। পনের দিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া সমাপ্ত কাযের জন্য যেখানে সে দশটি টাকা পাইবার প্রত্যাশা করিয়াছে, কাযে নানাবিধ ত্রুটি দেখাইয়া কর্ম্মকর্ত্তা সেখানে হয় ত সাত টাকায় রফা করিয়াছেন, তাহাও এক দফায় নয়,—অন্ততঃ সাত দিন হাঁটিয়া সাতটি টাকা আদায় লইতে হইয়াছে। আবার এমন অনেক হৃদয়বান্‌ও আছেন, বার বার হাঁটাইয়া চুক্তির অর্দ্ধেকটা দিয়া, বাকিটুকু দিবার আর লক্ষণ প্রকাশ করেন না। কত স্থানে এমন কত টাকাই

তাহার মারা গিয়াছে। কাম করিয়া টাকার জন্য প্রার্থী হওয়াটাই যেন তাহার পক্ষে একান্ত লজ্জার বিষয়। অথচ তাহার অভাবের অন্ত নাই। একসঙ্গে এতগুলি টাকা হাতে পাইয়া, সে ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কি ভাবে টাকাগুলি খরচ করিবে, কি কিনিবে, সহরের কোন্ কোন্ বস্তুগুলি তাহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ও একবারে অপরিহার্য্য!

দাদামহাশয়ের দেওয়া ছবিগুলির কাম আরম্ভ করিবার জন্য ধর্ম্মতলা হইতে রং ও ক্যাম্বিশ-লাগান ফ্রেম পঁচিশ টাকা খরচ করিয়া প্রথমেই কিনিয়া ফেলিল। তাহার পর কলেজ ষ্ট্রীট হইতে কুকার কেনা হইল। সেই সঙ্গে একটা ষ্টোভও বাদ পড়িল না; এনামেল ও এলুমিনিয়মের কয়েকখানা তৈজসপত্রও। তখনও পকেটে সাতখানি নোট ও খুচরা কয়েকটি টাকা রহিয়াছে, সুতরাং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে লেক রোডে ট্যাক্সীযোগে পাড়ি দিয়া উপার্জ্জিত অর্থের সার্থকতা সম্পাদনে তাহার পক্ষে কোনও ত্রুটি রহিল না।

দোতলার একখানি ঘরে দাদামহাশয়ের দেওয়া ছবি কয়খানি সাজাইয়া নরনারায়ণ তাহাদের প্রসাধনে ব্রতী হইয়াছে। চারখানি ফটোর মধ্যে একখানি পাঁচ ছয় বৎসরের এক বালিকার ছবি। যদিও তাহা মলিন ও অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, তথাপি ছবির মেয়েটির মুখখানি কি চমৎকার। ছবির মুখটিকে পরিপূর্ণরূপে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে তাহার আকর্ণ-বিসারী অপূর্ব্ব সুন্দর দুইটি চক্ষু বালিকার এই অপরূপ আলেখ্যটি তরুণ শিল্পীকে আকৃষ্ট করিল, অভিভূত করিয়া ফেলিল। অনেক চিত্রের উপর সে তুলিকা চালাইয়াছে, বহু আয়তনেত্রার আলেখ্য তাহার নেত্রপথে পড়িয়াছে, কিন্তু এমন অপূর্ব্ব দুইটি চক্ষু বুঝি সে কোথায়ও দেখিবার অবকাশ পায় নাই। আর তিনখানি ছবি তুলিয়া রাখিয়া, এই ছবিখানিই সর্ব্বাগ্রে শেষ করিবার জন্য সে ঠিক সম্মুখেই বিশেষভাবে রাখিয়া দিল; সঙ্গে সঙ্গে ইজেলএ ক্যানভাস লাগাইয়া ব্যাক গ্রাউণ্ডে রঙ ফলাইতে মনোনিবেশ করিল।

ঘরের বাহিরে দালানটির এক পার্শ্বে নরনারায়ণ নূতন কুকার চড়াইয়াছে। তাহার শিল্পি-জীবনে স্বহস্তে রন্ধন এই প্রথম। কুকারের ক্ষুদ্র কেতাব পড়িয়া, সে যথাযথভাবে রন্ধনের আয়োজন করিয়াছে। ভাত, ডাল, ডিম, তরকারী,—চারিটি বাটি ভরিয়া সিদ্ধ হইতেছে।

ব্যাক গ্রাউণ্ড শেষ করিয়া নরনারায়ণ মেয়েটির অপূর্ব্ব মুখখানির কিয়দংশ আঁকিয়াছে, এমন সময় দমকা হাওয়ার মত রুদ্ধ দরজাটি সশব্দে ঠেলিয়া প্রবেশ করিল মালতী। নীচের দালানে মালতীদের ব্লকের দিকের দরজাটি সম্ভবতঃ সে ইচ্ছা করিয়াই বন্ধ করে নাই।

চমকিত নরনারায়ণকে কথা কহিবার বা তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার অবসর দিবার পূর্ব্বেই মালতী কলকণ্ঠে কহিল,—বাঃ! আপনি ত বেশ লোক মশাই, বুড়ো যেতে না যেতেই তার দোতলার ঘরখানি দখল ক'রে তোড়জোড় পেতে বসেছেন।

অপ্রস্তুতের ভঙ্গীতে নরনারায়ণ কহিল,—না, না, তা কেন? এ সব তাঁরই তোড়জোড় যে; চারখানা অয়েল-পেন্টিং-এর বরাত দিয়ে গেছেন, আপনি ত শুনেছেন সে কথা।

—ছবির খুকীটি বুঝি তাঁর বরাতের প্রথম নমুনা?

—হাঁ। এইটিই প্রথম ধরব মনে করেছি।

নাসিকা কুঞ্চিত ও সুন্দর মুখখানি বিকৃত করিয়া মালতী কহিল,—আহা—কি বিউটি!

নরনারায়ণ মালতীর কথায় ব্যথা পাইয়া কহিল,—ছবিখানি ফেন্ট হয়ে গেছে, তাই বুঝতে পারেন নি। কিন্তু যাঁর ছবি, তাঁর ওপর কটাক্ষ করলে অবিচার করা হয়। এমন মুখ, এমন চোখ, এমন আশ্চর্য্য ভুরু হাজারের মধ্যে এক জনের থাকে কি না সন্দেহ!

মুখখানা মচকাইয়া মালতী কহিল,—তবু যদি থাকত বেঁচে!

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে নরনারায়ণ মালতীর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—কার কথা বলছেন?

মালতী শ্লেষের সুরে কহিল,—যার রূপসজ্জায় উঠে প'ড়ে লেগেছেন! বুড়োর ছোট মেয়ে,—আপনি হয় ত ভাবছেন, ছেলে বেলার ছবি, এখন হয় ত পূর্ণ যুবতী; ছবি তুলে বাহোবা নেবেন,—কিন্তু সে গুড়ে বালি! পটল তুলেছে অনেক দিন।

নরনারায়ণের কোমল চিত্তটি ব্যথায় ভরিয়া গেল। আহা! এমন অপূর্ব্ব কুসুম-কোরকটি অকালে কালের

কোলে ঝরিয়া পড়িয়াছে! তাহার অজ্ঞাতে একটি নিশ্বাস দীর্ঘতর হইয়া বাহির হইল।

মুখে দুষ্টামীর হাসি টানিয়া মালতী কহিল,—আমি তা হ'লে রোগ ধরেছিলুম ঠিক বলুন!

নরনারায়ণ আর্ত্তস্বরে কহিল,—আপনি আমাকে অনর্থক আঘাত করছেন! রহস্যেরও বোধ হয় একটা সীমা আছে।

মালতী কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া কহিল,—নিশ্চয়ই; রহস্যের যেমন সীমা আছে, রহস্যের পাত্রও তেমনই বিচার-সাপেক্ষ। আপনি হচ্ছেন এ যুগের শ্রেষ্ঠ আর্টিষ্ট, আপনার সঙ্গে রহস্য করবার যোগ্যতা আমার কতটুকু বলুন!

নরনারায়ণ মালতীর কটাক্ষে নিজেকেই অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া কহিল,—দেখুন, আমি অতি নগণ্য চিত্রশিল্পী, রং-তুলি নিয়ে আমার কারবার, কথাশিল্পী আমি নই যে, গুছিয়ে কথা বলব। আমার কথায় যদি কোনও দোষ-ত্রুটি হয়ে থাকে, ক্ষমা করবেন।

মালতী তৎক্ষণাৎ ভাব-পরিবর্ত্তন করিয়া কহিল,—ক্ষেপেছেন আপনি! ঠাট্টা বোঝেন না? আমি এ বাড়ীতে এসে অবধি দেখছি, বরাবরই আপনার উপর এক তরফা ডিক্রী-হচ্ছে, আর আপনি প'ড়ে প'ড়ে সহে যাচ্ছেন! তাই ইচ্ছে হ'ল, দেখি আপনাকে খোঁচা দিয়ে রাগিয়ে তোলা সম্ভব কি না!

নরনারায়ণ প্রশ্ন করিল,—কি দেখলেন?

মালতী গম্ভীরভাবে উত্তর দিল,—একেবারে হোপলেস্! বুঝলুম, এক তরফা ডিক্রী-জারীর যোগ্য পাত্রই আপনি; প'ড়ে প'ড়ে শুধু মার খাবেন বলেই দুনিয়ায় অবতীর্ণ হয়েছেন!

আবার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নরনারায়ণ হাতের তুলিটি প্যালেটের গর্ত্তে গুঁজিয়া নূতন একটি তুলি টানিয়া লইল। মালতী বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—কি হবে এখন,—ঐ মৃতা বালিকাটির রূপসজ্জা?

দৃঢ়স্বরে নরনারায়ণ কহিল,—হাঁ। আমার সমস্ত শক্তি ও সাধনা দিয়ে আমি এই মেয়েটির এমন একটা ছবি আঁকব, যাতে আমার শিক্ষা হবে সার্থক, আর দাদামশাই ফিরে এসে এই ঘরে ঢুকেই স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখবেন—তাঁর মৃত মেয়ে যেন জীবন্ত হয়ে তাঁর প্রতীক্ষা করছে এখানে।

চাপা নিশ্বাসের সহিত বিষাদের সুরে মালতী কহিল,—তা হ'লে দেখছি, আমার আর কোন আশাই নেই এ ক্ষেত্রে।

অতি বিস্ময়ে দুই চক্ষু তুলিয়া নরনারায়ণ মালতীর দিকে চাহিতেই মালতী অভিনয়ভঙ্গীতে কহিল,—আমার এ আক্ষেপের অর্থ বোধ হয় হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি! আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল, হাতের সব কায ফেলে আপনি সর্ব্বাগ্রে আমার একখানি ছবি আঁকেন। এই প্রস্তাব নিয়েই এসেছিলাম আপনার কাছে। কিন্তু আপনি ত এখন মৃত শিশুর ছবি নিয়েই ব্যস্ত।

মালতীর কথায় নরনারায়ণ যেন সহসা উৎসাহিত হইয়া উঠিল; হাতের তুলিটি প্যালেটের মধ্যে রাখিয়া বিস্ময় ও কৌতূহল-বিজড়িত দৃষ্টিতে ক্ষণকাল তাহার দিকে চাহিয়া কহিল,—আপনি ছবি আঁকাতে চান আমাকে দিয়ে?

—এটা বুঝি খুবই ধৃষ্টতার কথা আমার পক্ষে?

—আপনার পক্ষে নয়, আমার পক্ষে; শুধু ধৃষ্টতা নয়, বিস্ময়ের কথা।

—কেন বলুন ত?

—কোনও একটা বিশেষ কারণে কাল রাতে আমার মনে ঠিক এই সঙ্কল্পই হয়েছিল।

—কি সঙ্কল্প,—আমার ছবি তোলবার? দুজনের মনে যুগপৎ একই চিন্তা!. তা হ'লে ত বিস্ময় হবারই কথা। আচ্ছা, বলুন ত সেই বিশেষ কারণটি কি, যার জন্য আমার ছবি নেবার সঙ্কল্প আপনার মনেও শিহরণ তুলেছিল?

—খুব ঘটা ক'রে ছবির একটা একজিবিসন খোলা হচ্ছে। আমি তাতে একখানা ছবি দেব স্থির করেছি। খবরটা কালই পেয়েছি। কেন বলতে পারি না, হঠাৎ আমার মনে হ'ল, আপনাকে আদর্শ ক'রে যদি একখানা ছবি আঁকি, সেটা ব্যর্থ হবে না।

—কি সর্ব্বনাশ! এত বড় কলকেতা সহরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ রূপসী মেয়ে থাকতে আমাকেই আপনি আদর্শ স্থির করলেন?

—দেখুন, আপনার কতকগুলো ভঙ্গীতে এমন বৈশিষ্ট্য আছে, যেটা আর্টের দিক দিয়ে একেবারে নিখুঁত! আমি সেইগুলো বজায় রেখে একটু নতুনভাবে আপনার ছবি আঁকতুম।

—কিন্তু আপনি নিজে থেকে আমাকে ত কিছুই বলেন নি ?

—সাহস পাইনি ; যদি আপনি অন্য কিছু মনে করেন, এই ভয়ে।

—তা হ'লে টোপ ফেলবার আগেই মাছ আপনাকে ধরা দিয়েছে বলুন! এখনও ঐ সঙ্কল্প আপনার মনে আছে না কি ?

—যদি আপনি অনুগ্রহ ক'রে কথা দেন, তা হ'লে আজই আমি কায আরম্ভ করি ; কেন না, সময় খুবই কম,—পনেরো দিনের মধ্যে ছবি সেখানে পাঠাতে হবে।

—এতে কি লাভ বলুন ত ?

—লাভ-লোকসান হিসেব ক'রে কাষ ত কোন দিন করিনি আমি।

—তা আমি খুব জানি ; উদয় অস্ত খেটেই মরেন, পয়সার বেলায় ঢু ঢু ; অথচ এইটিই হচ্ছে সব চেয়ে বড় বস্তু।

—আপনি ভুল বুঝেছেন। কাষ ক'রে, তার সফলতায় যে আনন্দ, সেইটিই আমার কাছে সব চেয়ে বড় বস্তু—পয়সা নয়।

—হ'তে পারে, পয়সা আপনার কাছে হয় ত হাতের ময়লা, কিন্তু আমার কাছে ওরই সার্থকতা সব চেয়ে বেশী। আপনি লাভ-লোকসান না খতিয়েই কাযে নামতে পারেন, কিন্তু আমরা তা পারি না ; কাযেই আপনাকে কথা দেবার আগে আমার জানা দরকার—এ কাযে আমার লাভের পরিমাণ কতটুকু !

—সবটুকুই আপনার প্রাপ্য, আমি তার কোন অংশই চাই না। ছবিখানা বিক্রী হয়ে গেলে সব টাকাই আপনি বুঝে নেবেন।

—আর যদি বিক্রী না হয়,—ধরুন, কেউ যদি না কেনে ?

—তা হ'লে ছবিখানাই আপনি নেবেন,—সেইটুকুই আপনার লাভ।

—আর আপনার লভ্যাংশ বুঝি—শুধু যশ ?

—লোকসান যদি খতান—তা হ'লে হয় ত গভীর অপযশ!

—সে আপনি বুঝবেন। আমরা হচ্ছি সুখের কপোতী, নিন্দা অপযশের ধার ধারি না।—তা হ'লে কি ভাবে আমার ছবি নিতে চান ?

—প্রত্যহ আপনাকে নিয়মিত বসিয়ে 'সিটিং' নেওয়া ত সম্ভবপর হবে না, তাই মনে করেছি, এক দিন আপনাকে কষ্ট দিয়ে নতুন পরিকল্পনায় একখানা ফটো তুলে তাকেই আমার সাবজেক্ট করব।

—অর্থাৎ দুধের সাধটুকু ঘোলেই মেটাতে চান! তা হ'লে ছবি তুলবেন কখন্ ?

—আজই বৈকালে ঠিক চারটেয়।

—এই ঘরেই ?

—না,—এ ছবি নেওয়ার ভজকট অনেক ; বাইরে ছবি নিতে হবে। 'লেকে'র শেষদিকে—যেখানটা খুব নিরিবিলি।

—অসম্ভব! বেলা ঠিক তিনটেয় আমার যে এন্‌গেজমেণ্ট আছে কালীঘাটে। সেখানে আধঘণ্টা থাকতে হবে। দুটো গান গেয়ে তবে ছুটী।

—বেশ ত, ছুটী পেলেই লেকে আসবেন ; পনেরো মিনিটও লাগবে না।

—ট্যাক্সিভাড়া ত লাগবে ?

—নিশ্চয়ই, তার ভাড়া আমি এখনই আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি।

ঘরের আলনায় নরনারায়ণের সার্টটি ঝুলিতেছিল। পকেট হইতে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া মালতীর হাতে দিল। টাকা কয়টি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মালতী হর্ষোৎফুল্ল মুখে প্রশ্ন করিল,—তা হ'লে আপনাকে কোথায় পাব ?

নরনারায়ণ তৎক্ষণাৎ একখানি কাগজে পেনসিল দিয়া নক্সা করিয়া কাগজখানি মালতীর সম্মুখে ধরিয়া কহিল,—এই দেখুন, যায়গাটা আপনাকে চিনিয়ে দিচ্ছি পেনসিলে এঁকে,—এইটে হচ্ছে ইষ্ট-লেক্ ; কাটানো মাটীগুলো বালিয়াড়ির মত উঁচু হয়ে আছে, ঠিক যেন পাহাড়ের উপত্যকা ; এদিক্‌টা এখনও গ'ড়ে ওঠেনি ব'লে বেশ নিরিবিলি। এই চিহ্নিত স্থানটিতে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ, এরই তলায় আমি তোড়-জোড় নিয়ে থাকব।

মালতী কাগজখানা লইয়া হাসিয়া কহিল,—ভাগ্যিস এর ওপর আপনি কবি হননি, তা হ'লে স্থাননির্দ্দেশ সম্বন্ধে একটা কবিতাই লিখে ফেলতেন।—আচ্ছা, তা হ'লে এখন চললুম ;—হাঁ, ভাল কথা,—কি কাপড় প'রে যাব ?

—আপনার যা খুসী। অবশ্য, সিটিং যখন দেবেন, তখন কাপড় আপনাকে বদলাতে হবে; সে কাপড় আমি সঙ্গে নিয়ে যাব।

—কাপড়ের ব্যবসাও আপনার আছে না কি?

—আমার নেই, তবে আমি যাদের কাযকর্ম্ম করি—তাদের আছে। বেঙ্গল ষ্টোরের ছবির কায আমাকে করতে হয়। কাপড় আমি সেখান থেকেই আনব। কেন না, রূপ তোলার মত রূপসজ্জাও শিল্পীর কায।

মনে মনে নরনারায়ণকে মালতী যতটা অপদার্থ ভাবিয়াছিল, তাহার অগ্রকার কথাবার্ত্তায় সে ভাব অনেকটা কাটিয়া গেল; বুঝিল, মানুষটি একবারে অবহেলার মত নয়, তাহাতে বস্তু কিছু আছেই।

কুকারের ভেপ্যার তখন সশব্দে দরদালানটিকে গুলজার করিয়া তুলিয়াছিল। বাহিরে আসিয়াই মালতী কলকণ্ঠে কহিল,—এখানে আবার এ কি কাণ্ড!

নরনারায়ণ দরজার সম্মুখে আসিয়া কহিল,—কুকার। শিল্পীর আহার যোগাবার আয়োজন করছে।

—তা ত দেখতে পাচ্ছি,—কিন্তু একাই উপভোগ করবেন?

—বেশ ত, আপনিও লেগে পড়ুন,—আনাড়ী আমি, তা হ'লে ত বেঁচে যাই!

—রক্ষা করুন মশাই, রন্ধন-কার্য্যে আমি আবার আপনার চেয়েও বেশী আনাড়ী,—রাঁধুনীর ওপর এ ভার দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত; আমি এবং আমার মাদার দুজনেই!

—পুরুষদের পক্ষে এটা কিন্তু খুবই চিন্তার কথা, কেন না—রান্নাটাই মেয়েদের উচুদরের কলাবিদ্যা।

—কিন্তু এই উচুদরের কলাবিদ্যার ঠেলায় বাঙ্গালার রন্ধনশালায় ওঠে রীতিমত হাহাকার, তাই না প্রভু জগন্নাথ তাঁর সেবকদের লেলিয়ে দিয়ে এই কলা-চর্চা থেকে মেয়েদের দিয়েছেন বেকসুর খালাস! তবেই মেয়েরাও অবসর পেয়ে হাতা-বেড়ী হাঁড়ী ছেড়ে পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলেছে! সুতরাং তাঁদের ত চিন্তা হবার কথাই।

—আমাকে মাপ করবেন, আমার কথা আমি প্রত্যাহার করছি। এখন বুঝতে পারছি, ডাক্তার মল্লিক বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ভেবেই এই যন্ত্রদেবতার সৃষ্টি করেছিলেন; আমাদের মত অভাগার এ ছাড়া আর গতি কি!

—পয়সা থাকলে গতি হয় স্বাভাবিক, প্রভু জগন্নাথের সেবকসঙ্ঘ সহরের প্রায় সমস্ত রন্ধনশালা দখল ক'রে কলা-বিদ্যার চর্চ্চায় অবহিত—এ কথা ভুলে যান কেন?

—কিন্তু ভয় হয় কি জানেন,—এঁরাও যখন আপনাদের পর্য্যায়ে উঠে বেকসুর খালাস চাইবেন, তখন প্রভু পয়গম্বর হয় ত ব্যথিত হয়ে খালাসীদের ঐখানে লেলিয়ে দেবেন হাতা বেড়ী হাঁড়ীর তদ্বির করতে!

—ও! ভল্‌গার!—আপনি দেখছি এখনো সেভেন-টিন্থ সেঞ্চুরীতে পিছিয়ে আছেন, তাই আপনার এই পচা অর্থোডক্স মনোবৃত্তি। ছি!

যেমন উদ্দাম বায়ুর মত সে ঘরটির ভিতর ঢুকিয়াছিল, তেমনই ভাবেই দালান হইতে সিঁড়ির দিকে ছুটিয়া গেল। নরনারায়ণ এই প্রগল্‌ভা মেয়েটির সপ্রতিভ চঞ্চল গতির দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া—ভোজনের উদ্দেশে কুকার লইয়া পড়িল।

* * *

ঠিক এই সময় বাড়ীর দরজার সম্মুখে একখানা ট্যাক্সী আসিয়া থামিল। মালতী দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিল, পাশের বাড়ীর নূতন ভাড়াটিয়া অবিনাশ সরকার ট্যাক্সী হইতে নামিতেছে। তাহার হাতে ছিল একটি চমৎকার ফুলের তোড়া। প্রবেশপথে মালতীর সহিত চোখোচোখি হইবামাত্র সরকার সাহেব সাহেবী কায়দায় টুপী খুলিয়া মাথাটি ঈষৎ নত করিয়া শিষ্টতার পরিচয় দিল, মালতীও সঙ্গে সঙ্গে নমস্কারের ভঙ্গীতে হাতদুটি তুলিয়া হাসিয়া প্রশ্ন করিল,—আপনিই বুঝি এ সাইডটা ভাড়া নিয়েছেন?

অভিনেতার ভঙ্গীতে অতিরিক্ত বিনয় প্রকাশ করিয়া সরকার সাহেব জানাইল,—আপনাদেরই আশ্রিত হয়ে ধন্য হয়েছি। আপনিই বোধ হয় মিস মালতী! আপনার গানের খ্যাতি শুনে আসছি অনেক দিন থেকেই; কিন্তু চাক্ষুষ দেখছি এই প্রথম! অবশ্য কাল এসেই জানতে পারি—আপনি এই হাউসের অদার সাইডে থাকেন।

—এই আশ্চর্য্য খবরটুকু কে আপনাকে জানিয়েছিলেন?

—আপনার মা। বলতে পারি না—শুনে আপনার হিংসে হবে কি না—এরই মধ্যে তিনি আমারও মা হয়ে গিয়েছেন।

—How Interesting! কিন্তু এ ইতিহাস এ পর্য্যন্ত আমার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত!

—সম্ভবতঃ তিনি অবকাশ পাননি আপনাকে শোনাতে! আপনিও তখন প্রেজেন্ট ছিলেন না!

—বিকেলের দিকে কোনো দিনই আমার বাড়ীতে প্রেজেন্ট থাকবার উপায় নেই! কাল ছিল তিনটে এনগেজমেন্ট! বলেন কেন!

—আপনার মা আমাকে সে সব বলেছিলেন! অনেক কথাই হয় তাঁর সঙ্গে আপনার সম্বন্ধে; সে সব শুনে আপনার ওপর আমার শ্রদ্ধা আশ্চর্য্য-রকম বেড়ে গিয়েছে!

—মা'র কাণ্ডই ঐ রকম! আমাকে বাড়াতে পারলে আর কিছু চান না।

—তিনি ত বাড়িয়ে বলেন নি কিছু! আপনার কথা আমি এখানে আসবার আগেই শুনেছি!

—আচ্ছা, আপনার কার্ণিভ্যালে কি কি 'সো' হয়?

—অনেক কিছুই Splendid performance দেখান হয়; যেমন—হাইজাম্প—ধরুন, এইট্টি ফিট হাইয়েষ্ট ল্যাডার থেকে লাফিয়ে ট্যাঙ্কের জলে পড়া, ফায়ারের ভেতর দিয়ে সাইকেল-রেস, তলোয়ার-খেলা, লক্ষ্যভেদ—এমন কত কি! যাবেন আজ ম্যাটিনি-সো দেখতে?

—আপনি যে রকম বর্ণনা করলেন, তাতে দেখবার কৌতূহল হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে কি না, আজ আমার এনগেজমেন্ট আছে বিকেলে গোটাকতক। তাই ভাবছি, কি করা যায়!

—আজকের এনগেজমেন্টগুলো পেছিয়ে দেওয়া যায় না? মাপ করবেন, আজকে আপনাকে এভাবে ইনভাইট করবার বিশেষ কারণ এই যে, বেলজিয়ম থেকে এক জোড়া 'বিউটি' বেরিয়েছিল ইণ্ডিয়া টুর করতে; বোধ হয় কাগজে প'ড়ে থাকবেন;—তারাই আজ অ্যাপিয়ার হবে ক্যালকাটায় এই ফার্ষ্ট—আমার কার্ণিভ্যালে। তাদের নাচ সত্যই দেখবার জিনিষ,—আপনি ডীপলি এন্‌জয় করতে পারবেন এবং খুসী হবেন।

বেলজিয়মের বিউটিদের নাচের কথায় মালতীর দেহ-মন নাচিয়া উঠিল এবং তাহার আবর্ত্তে পড়িয়া কালীঘাটের গানের এনগেজমেন্ট ও লেকে নরনারায়ণকে সিটিং দিবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, সব গেল তলাইয়া; বেচারী শিল্পীর নিকট হইতে এইমাত্র যে পাঁচটি টাকা ট্যাক্সীভাড়া বাবদ লইয়াছে, সে সম্বন্ধেও কোনও অনুভূতিই তাহার চিত্তে বিক্ষোভ তুলিল না।

মালতী হাসিয়া কহিল,—আপনি যখন এমন ক'রে আমাকে রিকোয়েষ্ট করছেন, তখন অসুবিধা হলেও—আজকের এনগেজমেন্টগুলো ক্যানসেল করা ভিন্ন আর উপায় কি!—বেশ, তাই হবে; আমি আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম, মিষ্টার সরকার।

মাথা নত করিয়া সরকার সাহেব সহর্ষে কহিল,—ধন্যবাদ! আমি আপ্যায়িত হলেম। তা হ'লে আপনি প্রস্তুত থাকবেন; ঠিক চারটের সময় আমার 'কার' আসবে,—আমরা একসঙ্গেই যাব!

সহাস্য ভঙ্গীতে সম্মতি জানাইয়া মালতী সরকার সাহেবের হাতের সুন্দর তোড়াটির দিকে কটাক্ষপাত করিয়া প্রশ্ন করিল,—ওটি সংগ্রহ করলেন কোথা থেকে,—নিউ মার্কেট থেকে নিশ্চয়ই?

সরকার সাহেবের বুঝিতে বিলম্ব হইল না, ফুলের তোড়াটির উপর তাহার নবপরিচিতা বান্ধবীর লোলুপ দৃষ্টি পড়িয়াছে। তৎক্ষণাৎ সে সপ্রতিভভাবে উত্তর দিল—গ্র্যাণ্ডহোটেলে গিয়েছিলাম এক সাহেব বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে, তিনি এটি প্রেজেন্ট করেছেন; এখন আপনি যদি এটি অনুগ্রহ ক'রে গ্রহণ করেন, তা হ'লে আমি কৃতার্থ হই।

অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই কথার সঙ্গে সঙ্গে সরকার সাহেব হাতের সুন্দর তোড়াটি মালতীর হাতে গুঁজিয়া দিল এবং তাহার আরক্ত মুখ হইতে মৃদু স্বর বাহির হইল—থ্যাঙ্কস্!

* * * * *

বালিগঞ্জ লেকের এক প্রান্তে যথানির্দ্ধারিত স্থানটি অধিকার করিয়া নরনারায়ণ তাহার সাজ-সরঞ্জামগুলির সহিত বেশ জমকাইয়া বসিয়াছে। ঘাসের উপর গ্রীণ-রঙের একখানা সতরঞ্চ পাতা হইয়াছে; তাহার উপর পড়িয়াছে একখানি বেশ সুদৃশ্য বেতের ক্যাম্বী টেবল, সামনাসামনি দুইখানি বেতের চেয়ার; বৈঠকের এক ধারে হাত দুই স্থান স্ক্রীন দিয়া ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে; উদ্দেশ্য, মালতী এই সুরক্ষিত স্থানটুকুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বেশ-পরিবর্ত্তন ও প্রসাধন-পর্ব্ব সারিয়া লইবে। তাহার মধ্যেও বেতের একটি ছোট টীপয় স্থান পাইয়াছে; তাহাতে আছে ছোট একখানা

আয়না, চিরুণী, ব্রস ও কয়েকটি সেফটি পীন। নিকটের এক পরিচিত দোকান হইতে একটি টাকা দক্ষিণা দিয়া কয়েক ঘণ্টার জন্ম এগুলি ভাড়া করিয়া আনা হইয়াছে। দোকানের ভৃত্য জিনিষপত্রগুলি বহিয়া আনিয়া সাজাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে, সাতটার সময় আসিয়া পুনরায় লইয়া যাইবে।

নরনারায়ণের ধারণা, সে দরিদ্র বলিয়া মালতী তাহাকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখে; কিন্তু আজ সে মালতীকে দেখাইয়া দিবে যে, দরিদ্র হইলেও রুচির সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। মালতীর প্রকৃতি বুঝিয়াই সে এখানে এতটা আড়ম্বর করিয়া ফেলিয়াছিল; নতুবা লোকে যাহারা ফটো তুলিতে আসে, এ সব সাজ-সরঞ্জামের অভাবে তাহাদের কোনও অসুবিধা ঘটে না।

ক্যামেরা ঠিক করিয়া রাখিয়া নরনারায়ণ বেতের কেদারায় বসিয়া মালতীর প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া আছে। সম্মুখে টেবলের উপর মেঘ রংএর একখানি সিল্কের শাড়ী ও ব্লাউস ভাঁজখোলা অবস্থায় রহিয়াছে; মালতী আসিয়াই সেই শাড়ী ও ব্লাউস লইয়া স্ক্রীনের ভিতর ঢুকিবে। বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া বাহিরে আসিবে, যে খুঁৎটুকু থাকিবে, নরনারায়ণ তাহা ঠিক করিয়া দিবে।

কিন্তু যাহার ছবি লইবার এবং সেই সূত্রে শিল্পীর রুচিবিলাস দেখাইবার এত আয়োজন ও আকুল প্রতীক্ষা, চারটা বাজিয়া পাঁচশ মিনিট হইয়া গেল, তথাপি তাহার দেখা নাই! নরনারায়ণের দুই চক্ষু হাতের ঘড়ি ও দূরের পাকা রাস্তাটির উপর পর্য্যায়ক্রমে ফিরিতেছিল। মটরের হর্ণ শুনিবামাত্র সে সচকিত হইয়া উঠে, কিন্তু যখন দেখা যায়, মটরের গতি হ্রাসপ্রাপ্ত না হইয়া পূর্ণ গতিতেই ঢাকুরিয়ার পথে চলিয়াছে, কিম্বা মটর সহসা থামিয়া গেলে, তাহার ভিতর হইতে যে বা যাহারা নামে, তাহারা তাহার আকাঙ্ক্ষিত "মডেল" নয়,—তখন নরনারায়ণের উৎসাহ যেন শিথিল হইয়া পড়ে।

এই ভাবে আরও কিছুক্ষণ কাটিল,—হাতঘড়ির কাঁটাটি নিষ্ঠুরের মত সাড়ে চা'রের এলাকাও পার হইয়া গেল; এবার নরনারায়ণের ধৈর্য্যের বাঁধন খুলিয়া পড়িল, বিরক্তি ও অসহিষ্ণুতার সুরে আপন মনে সে কহিয়া উঠিল,—এল না সে,—হোপলেস্!

সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গ যেন তাহার অবসন্ন হইয়া পড়িল, মাথাটি টেবলের দিকে ঝুঁকিয়া আসিল। নানা স্থানে ছুটাছুটি করিয়া তোড়জোড় সব সংগ্রহ করিতে বেচারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর আশাভঙ্গের এই মনস্তাপ! টেবলের উপর হাত দুইখানি পাতিয়া, তাহার উপর অবনত মুখখানি নামাইয়া মুদিত-নেত্রে মনে মনে সে প্রশ্ন করিল—এখন কি করা যায়! সঙ্গে সঙ্গে উত্তর মিলিল,—দোকানদারের লোক লটবহরগুলি লইতে না আসা পর্য্যন্ত এখানে থাকা চাই।

দুই চক্ষু রগড়াইয়া নরনারায়ণ সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সম্মুখে দৃষ্টি পড়িতেই সে বিস্ময়ে একেবারে অবাক্! দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সে দেখিল,—টেবলের অপর পার্শ্বে ঠিক তাহার সম্মুখে যে চেয়ারখানি মালতীর জন্ম পাতা আছে, তাহা দখল করিয়া বসিয়াছে এক পাগড়ীওয়ালা পরদেশী! বিচিত্র তাহার পরিচ্ছদ; পরণে খাকী হাফ প্যাণ্ট, গায়ে একটা ময়লা রঙ্গীন জামা, তাহার ছাঁটকাটও অদ্ভুত, গলাবন্ধের আকারে নীল রঙের একখণ্ড রেশমী বস্ত্র পিনবদ্ধ হইয়া কণ্ঠ হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত আবৃত, মাথায় গেরুয়া রঙের এক অতিকায় পাগড়ী—তাহার প্রাচুর্য্যে আগন্তুকের মুখের কিয়দংশ ঢাকা পড়িয়াছে, কিন্তু এই বিসদৃশ পরিচ্ছদের ভিতর দিয়া এই অজাতশ্মশ্রু তরুণ আগন্তুকের স্বাস্থ্যপুষ্ট নিটোল দেহের এমন এক অপূর্ব্ব লাবণ্য বিচ্ছুরিত হইতেছিল, যাহার বৈশিষ্ট্যময় সৌন্দর্য্য রূপনিষ্ঠ শিল্পীকে ক্ষণকালের জন্ম তন্ময় করিয়া দিল।

সে ভাব কাটিতেই নরনারায়ণ রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করিল,—তুম্ কোন্ হ্যায়?

আগন্তুক অসঙ্কোচে উত্তর দিল,—মৈঁ ইন্সান হুঁ।

মনে মনে হিন্দী তরজমা করিতে করিতে নরনারায়ণের বিরক্তির ঝাঁঝ দুস্থ হইয়া আসিল; পুনরায় প্রশ্ন করিল,—তুম্ হামারা হিঁয়া কেঁও আয়া?

কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বরং নরনারায়ণের হিন্দী বলার ভঙ্গীতে মুখের হাসি চাপিয়া সেও সঙ্গে সঙ্গে সমান সুরে প্রশ্ন করিল,—আপ্ য়হাঁ পুর্জাওগেরা লেকর কোঁ আয়ে?

কি স্পর্দ্ধা এই তরুণ পরদেশীর! কিন্তু তাহার ভঙ্গী ও উর্দ্দু সুরে বিশুদ্ধ উচ্চারণ নরনারায়ণকে যেন অপ্রস্তুত করিয়া দিল; তাহার ন্যায় শিল্পীকে এক বিদেশীর এরূপ

প্রশ্ন অনধিকারচর্চ্চা বুঝিয়াও সে তাহার উত্তর না দিয়া পারিল না ; কহিল,—হাম্ হিঁয়া ফোটো তুল্‌নে আয়া।

—ক্যা, আপ ফোটু উতারতে হৈঁ,—তো হমারী এক উতার দীজিয়ে ন ?

ছুই দফা হিন্দী কহিয়া নরনারায়ণ হাঁপাইয়া পড়িয়াছিল ; এবার কি উত্তর দিবে ভাবিতেছে, এমন সময় টেবলের উপরে রক্ষিত শাড়ী-ব্লাউসের উপর আগন্তুকের দৃষ্টি পড়িল, অমনি সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল,—অরে, ইয়ে শাড়ী কিস্‌কী হৈ ? শাড়ীওয়ালী কিধর গয়ী ?

মুস্কিলের উপর মুস্কিল ! আগন্তুক তখন টেবলের উপর ঝুঁকিয়া একান্ত আগ্রহসহকারে শাড়ীর উপর হাতখানি রাখিয়াছে। নরনারায়ণ খপ করিয়া শাড়ীখানা টানিয়া লইয়া কহিল,—নেই, নেই, ইসমে হাত দেও মৎ ? ই শাড়ী এক লেড়কী কো ওয়াস্তে হিঁয়া হ্যায়, হাম উসিকো ফোটো হিঁয়া লেগা, যব সে হিঁয়া আ কর এই শাড়ী পিনেগা !

চীল যেমন অতর্কিতভাবে অসতর্কের হাত হইতে খাবার ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লয়, সেইভাবে সহসা শাড়ী-ব্লাউস নরনারায়ণের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া আগন্তুক তাহার বৃহৎ পাগড়ীসমেত মাথাটি নাড়িয়া কহিল,—হাম পহনে তো কেয়া হরজ ?

নরনারায়ণের এবার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, দুই চক্ষু প্যাকাইয়া, সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—তোমারা ত ভারী আস্পর্দ্ধা হ্যায়,—জবরদস্তি করনে আয়া তোম ? ছোড় দেও হামারা চীজ, আবি ছোড়ো—

আগন্তুকও তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, নরনারায়ণের কথায় কিছুমাত্র ত্রস্ত না হইয়া বেশ সপ্রতিভভাবেই সে কহিল,—অজী, পহন্‌নে তো দো, হাম ওহী লেড়কী তো জাতী হৈ।

পরক্ষণে স্ক্রীন-ঘেরা স্থানটির দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িতেই সে দিব্য মেয়েলী সুরে বাঙ্গালায় কহিল,—ও মা ! গ্রীন-রুমের ব্যবস্থাও রয়েছে দেখছি ! তবে ভাবনা কি, বেশটা তা হ'লে ঐখানেই বদলানো যাক্।

নরনারায়ণ অবাক্ ! অত বড় পাগড়ীধারী জবরদস্ত উর্দ্দু-ভাষী পরদেশীর মুখে এমন সুন্দর বাঙ্গালা ! কথাগুলিও কি চমৎকার, কেমন মধুর ! তাহার মুখের রাগ মুখেই মিলাইয়া গেল, কৌতূহলের সুরে জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি বাঙ্গালা জান ?

—বাঙ্গালা না জানলে বাঙ্গালা বলতে পারব কেন ?—

—তুমি হিন্দুস্থানী, না বাঙ্গালী ?

—এত দিন হিন্দুস্থানীই ছিলুম, কিন্তু বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালা মায়ের কোলে এসে আজ আবার বাঙ্গালী হ'তে সাধ হয়েছে।

—তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—আপনার বোধশক্তি খুব উঁচুদরের নয় বলেই আমি আপনাকে এত শীঘ্র বিশ্বাস করতে পেরেছি, আর এই জন্যই আপনার কাছেই আজ এই প্রথম ধরা দিচ্ছি। মানুষ আমি এই বয়সে অনেক দেখেছি, এক আঁচোড়েই মানুষ চেনবার শক্তি আমাকে ভগবান্ দিয়েছেন, তাতেই আমার ধারণা হয়েছে, আপনার কাছ থেকে আমার কোনও ক্ষতি হবার ভয় নেই।

—সে ভরসা যদি তোমার থাকে, তা হ'লে আমাকে সন্দেহের মধ্যে না রেখে তোমার যা বলবার, স্বচ্ছন্দে বলতে পার। নামটাই তোমার আগে বল।

—আমার নাম ? কত নামই এ বয়সে গয়নার মত পরেছি, আবার ছাড়তেও হয়েছে দু চার দিন ব্যবহার করেই ! চুলোয় যাক্ সে সব ! হাঁ, নাম জানতে চাইছিলেন ? ধরুন, আজ থেকে আমার নাম—শ্রীমতী মুক্তি !

—শ্রীমতী মুক্তি !

—আমি পরদেশী তরুণ নই, আমি বাঙ্গালীর মেয়ে। এ যা দেখছেন, আমার ছদ্মবেশ !

—ছদ্মবেশ !

—হাঁ, আমি একটা 'গ্যাঙ্গের' সংস্রবে ছিলুম। দলের সবাই ধরা পড়েছে, আমি একাই য়্যাবসকনডেট টু হাইড ! স'রে পড়েছি পুলিসের চোখে ধূলো দিয়ে, বুঝতে পারছেন ত আমার অবস্থা !

কি সর্ব্বনাশ ! কেঁচো খুঁড়িতে খুঁড়িতে একবারে বিষধর সাপ ! একে ছদ্মবেশিনী নারী, তার ওপর আবার ফেরারী আসামী ! কথার মধ্যে আবার ইংরেজী বুক্‌নি ছাড়ে ! কি কুক্ষণেই মালতীর সহিত আজ সে এনগেজমেণ্ট করিয়াছিল ! তাহার জন্যই ত এই দুর্ভোগ ! মুখ তুলিয়া কম্পিত-কণ্ঠে নরনারায়ণ প্রশ্ন করিল,—পুলিস তা হ'লে আপনাকে 'ফলো' করেছে বলুন ?

—নিশ্চয়ই ; আমি যেমন গা ঢাকা দিয়ে নিরাপদ

আশ্রয় অন্বেষণ করছি, তারাও তেমনি আমার সন্ধানে সহর-তলী তোলপাড় করছে এতক্ষণ!

—অথচ, আপনাকে দেখছি বিলক্ষণ নিশ্চিন্ত; সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নেই আপনার!

—এ ব্যাপারে এ রকম নিশ্চিন্ত ভাবটুকুই যে নিষ্কৃতির পথ! পালাবার সময় কিন্তু ঠিক এই সজ্জা আমার ছিল না, তখন ছিলুম গেরুয়াবসনা বৈষ্ণবী,—পরে সেই বসন পাগড়ী হয়ে মাথায় উঠেছে,—আর এই বেশ ছিল গেরুয়ার ভেতরে গোড়া থেকেই; এখন চিনবে হঠাৎ কে বলুন?

—এখন, পুলিস যদি ফলো ক'রে এখানেই এসে পড়ে?

—পুলিসের আসাটা আশ্চর্য্য নয় মোটেই,—কিন্তু তার আগেই এ ভোলও আমি বদলে ফেলুব একেবারে! ভগবান্ আজ আমার সহায়, আমায় ধরে কে!

—এই শাড়ী-ব্লাউস প'রে বুঝি ভোল বদলাবার মতলব করেছেন?

—তবু ভাল, উদ্দেশ্যটি আমার এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন! এখানে এসেই এই সব তোড়-জোড় নিয়ে আপনাকে দেখে আমি আমার মুক্তির পথ স্থির ক'রে ফেলেছি। এখন আপনার দয়া!

—আমাকে কি করতে বলেন?

—পুলিস আমাকে তাড়া করেছে, আর আমি তাদের লক্ষ্য থেকে নিজেকে লুকুতে ব্যগ্র,—এই সংবাদটুকুর ওপর নির্ভর ক'রে এখনই আপনি আমার বিচার করতে ব্যস্ত না হ'ন! কেন আমি এই অবস্থায় এসে পড়েছি—পুলিস আমার পেছনে ছুটেছে, এর কাহিনী আপনাকে পরে সব বলুব। উপস্থিত আমি আপনার আশ্রিতা, আপনার সাহায্য ভিক্ষা করছি।

—আমি আপনার কি সাহায্যে আসতে পারি বলুন?

—আসন্ন বিপদের মুখ থেকে অসহায়কে রক্ষা করবার ক্ষমতা রয়েছে এইখানেই আপনার হাতে। আপনি যে তা বুঝতে পারেন নি, এমন বোধ হয় না।

—বেশ, আপনি ঐ স্ক্রীন তুলে ভেতরে যান, কাপড়-জামা ত আগেই গুছিয়ে নিয়েছেন, তাড়াতাড়ি ড্রেসটা বদলে আসুন, আমি ক্যামেরা ঠিক করছি! আমার পক্ষ থেকে আপনার আশঙ্কার কোনো কারণ নেই।

—ধন্যবাদ!

স্ক্রীনটি তুলিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিল। নরনারায়ণের মনে অনেক কথাই সংশয়ের দোলা দিল। এ কি অদ্ভুত মেয়ে! এতটুকু ভয়ডর মনে নেই! একবারে বে-পরোয়া! কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে কে জানে! ভাল কথা,—এনার্কিষ্ট নয় ত? আজকাল বাঙ্গালীর মেয়েরাও রিভলভার লইয়া—নরনারায়ণের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, মাথা তাহার ঘুরিয়া গেল; কিয়দ্দূরে লেকের প্রকাণ্ড স্থানগুলি ব্যাপিয়া যে সকল নরনারী সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতেছিল, এখান হইতে কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল, নরনারায়ণের মনে হইল, তাহারা যেন আর দূরে নাই, এই পরিত্যক্ত স্থানটিও যেন বহুজনে ভরিয়া গিয়াছে, আশে-পাশের গাছগুলি যেন লালপাগড়ী পরিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে এবং লেকের সমস্ত লোক এই নির্জ্জন স্থানটিতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া তাহার নিগ্রহ দেখিতেছে।

—আমি ত রেডী, কিন্তু আপনি দেখছি ঠায় ঠিক তেমনি ব'সে!

নরনারায়ণের আতঙ্কজড়িত চিন্তার জাল সহসা ছিঁড়িয়া গেল। চমকিয়া চাহিতেই সে যাহা দেখিল, তাহাতে সমস্ত দুশ্চিন্তা তাহার সেই মুহূর্ত্তেই লুপ্ত হইয়া গেল। কি অপূর্ব্ব মনোমোহিনী মূর্ত্তি তাহার সম্মুখে! কে বলিবে, কয়েক মিনিট পূর্ব্বে এই মূর্ত্তিই প্যাণ্ট-পাগড়ীর আবরণে তাহাকে সমস্যায় ফেলিয়াছিল। ক্ষণকালের মধ্যেই কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! অগ্নিশিখার মত কি তাহার প্রখর রূপ, চক্ষু-বিমোহনকারী কি নিখুঁত সুন্দর মুখ, সুশ্রী দুটি ভ্রূ যেন দক্ষ-শিল্পীর হাতের তুলিকায় গাঢ় কালি দিয়া আঁকা, আয়ত দুই দিব্যচক্ষুর প্রভাও অতুলনীয়; পরিধেয় বসনখানির অঞ্চলটি পিঠের উপর দিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে,—অমার্জ্জিত রুক্ষ কুন্তলগুলি মুখের দুই পার্শ্বে ও পৃষ্ঠদেশ ব্যাপিয়া আগুল্ফ ছড়াইয়া পড়িয়াছে; অঙ্গের কোথায়ও কোনও অলঙ্কারের বালাই নাই, কিন্তু তথাপি এই নিরাভরণাকে এই সাধারণ সজ্জায় কি চমৎকারই মানাইয়াছে,—দাঁড়াইবার ভঙ্গীটুকুও তাহার কি সুন্দর!

অপর কেহ হইলে নির্নিমেষ-নেত্রে দীর্ঘকাল হয় ত মন্ত্রমুগ্ধের মত এই অপূর্ব্ব রূপসীর দিকে চাহিয়া থাকিত,—কিন্তু নরনারায়ণ সত্যকারের শিল্পী, অতুলনীয় রূপের আদর্শ গ্রহণের এই অপ্রত্যাশিত ক্ষণটি সে পরিহার করিতে পারিল

না,—সহসা সুপ্তিভঙ্গের মত সচকিতভাবে সে তাহার ক্যামেরার দিকে ছুটিয়া গেল।

হাতের কায করিতে করিতে সে হাঁকিল,—ঠিক্ অমনি দাঁড়িয়ে থাকুন, যেমন আছেন।

—আমি ঠিকই আছি, শেষ পর্য্যন্তই থাক্‌ব ঠিক এই ভাবেই ; কিন্তু আপনি যেন ঘাবড়াবেন না পুলিস দেখে!

—পুলিস!

—হাঁ; তাঁরা আসছেন আসামীর সন্ধানে! ও কি! করেন কি? আপনার যন্ত্র থেকে চোখ তুলে বাইরে চাওয়া—একান্ত অনুচিত। চন্নমন্ করেছেন কি—সব ফাঁস ক'রে ফেলেছেন;—ফটো তোলা আর আমার এই লুকোচুরি খেলা ছুটোই! আপনি কায করুন আপনার, আমি আছি ঠিক প্রতীক্ষায়;—আপনার সাবজেক্ট হবে খুব চমৎকার,—পুলিস যাকে ধরতে আসছে তোড়জোড় ক'রে, সে ভোল বদলে তোলাচ্ছে তার ছবি! কি হয়, কি হয় রণে জয় পরাজয়!—নয় কি?

নরনারায়ণের দুই চক্ষু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—পিকচার একজিবিসনে চিত্রপ্রতিযোগিতার উন্মাদনাময় স্মৃতি তাহাকে উত্তেজিত করিয়া দিল—এই আশ্চর্য্য সুন্দরীর শেষের কথায়! মুহূর্ত্তমধ্যে প্রস্তুত হইয়া সে হাঁকিল,—রেডী!

* * * *

হাতের কাযটুকু সারা হইতেই কাণে তাহার বাজিল—যুগপৎ কয়েক জোড়া জুতার মচ্ মচ শব্দ; চক্ষু তুলিয়া চাহিতেই দেখিতে পাইল—লাল পাগড়ীধারী দুই জন পুলিস-প্রহরী ও টুপীপরা এক অফিসার তাহাদের পার্শ্বেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেশবন্ধু-তর্পণ

(গান)



আষাঢ়ের রাতে নব ধারা-পাতে
আজি নব তৃণদলের মত,
তব মধু স্মৃতি লয়ে দেশ-প্রীতি
হৃদয়ে হৃদয়ে সমুদ্গত।

স্মরি তব রথযাত্রার কথা
আজি এ আষাঢ়ে বিগলিত ব্যথা
নব মেঘদূত তোমার বারতা
বহি দিগন্তে শ্রদ্ধানত॥

তুমি চ'লে গেছ তার পর হ'তে
দেশ-হৃদয়ের সিংহাসনে,
কেহ নাই দেব, আজো তা' শূন্য,
বসিতে পায়নি অন্য জনে।

যে শ্যামা মায়েরে বেসেছিলে ভালো,
সুধায় যে তব হৃদয় জুড়ালো,
আজিকে তোমার বিদায়ের দিনে
নবীভূত তার বুকের ক্ষত॥

তুমি চ'লে গেছ শ্রীবাসাঙ্গনে
প্রেম-মৃদঙ্গ বাজে না আর।
তোমারে হারায়ে আজো মণিহারা
বঙ্গবাণীর কণ্ঠহার।

তোমার কেতন কে বহিবে আর?
আজিও ধূলায় প্রতীক্ষা তার,
তোমার স্বপ্ন আজিও মুকুলে
শ্মশানে লুটায় তোমার ব্রত॥

শ্রীকালিদাস রায়।



হিমালয়ে পাঁচ ধাম

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

আমাদের দুই ধাম যাত্রা সম্পূর্ণ হইল। ইতিপূর্ব্বে যমুনোত্তরী ধামে যে ভাবে কুলীগণকে "ইনাম-খিচুড়ী" দিয়া আসিয়াছি, এখানেও সেই ভাবে তাহাদের পাওনা মিটাইলাম। এতদতিরিক্ত এইবার তাহারা "চানা-চবৈনি"র দাবী জানাইল। জিজ্ঞাসায় বুঝিলাম, ইহা আর কিছুই নহে—নির্দ্দিষ্ট মজুরী ব্যতীত প্রত্যেক কুলীরই দৈনন্দিন এক আনা হিসাবে অতিরিক্ত দক্ষিণা! ইহা তাহারা যাত্রীর নিকট হইতে চিরদিনই পাইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, চানা-চবৈনির এই ইতিহাসে আমরা বিস্মিত হই নাই। দুর্গম পার্ব্বত্য পথে তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইয়া যাত্রী বা যাত্রীর বোঝা যখন ইহাদের স্কন্ধে উঠিয়া চলিয়াছে, তখন যেন তেন প্রকারেণ ইহারা যে আপন আপন প্রাপ্য গণ্ডা এই ভাবে আদায় করিয়া লইবে, বিচিত্র কি? কুলীদিগের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। দুই ধাম সম্পূর্ণ করিতে আজ পর্য্যন্ত তাহারা আমাদের সহিত ২৪ দিন ক্রমান্বয়ে চলিয়া আসিতেছে। হিসাব করিয়া দেখিলাম, প্রায় ১৯৬।• মাইল যাত্রা সম্পূর্ণ হইয়াছে। * সুতরাং প্রত্যেক কুলীরই আজ চল্লিশ আনা অতিরিক্ত লাভ ঘটিল। যাত্রী অর্থাৎ আমাদের মনে সন্তোষ ইহাই ছিল যে, বদরী-কেদার অপেক্ষা অধিকতর দুর্গম যাত্রাপথ আমরা শেষ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

সন্ধ্যাকালে হিমগিরি-প্রবাহিণীর এই নির্জ্জন গঙ্গাতটে ও গঙ্গামন্দিরে আরতি দর্শন করিয়া সকলেই আনন্দ-সম্মিত-চিত্তে রাত্রিযাপন করিলাম। ধর্ম্মশালায় সুব্যবস্থা থাকায় কাহারও কোন বিষয়ে কষ্ট মনে হয় নাই।

পরদিন গঙ্গোত্তরীর পবিত্র-ধারা মস্তকে রাখিয়া আহারান্তে পুরাতন পথে আবার ১২ মাইল দূরের ধরালী ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিয়া রাত্রি কাটিল। মন এক্ষণে এইবার "কেদারনাথ" তীর্থের পথান্বেষণে চঞ্চল হইয়াছে। দ্বিতীয় দিনে "সুখীর" ধর্ম্মশালায় মধ্যাহ্নকৃত্য শেষ করত একেবারে ১৮ মাইল পথ ফিরিয়া আসিয়া 'গাঙ্গনানি'তে বিশ্রামলাভ ঘটিল। তৎপরদিন বেলা সাড়ে দশটায় একেবারে "ভাটোয়ারী" আসিয়া হাজির দিলাম। এখানে এক দিন থাকা সাব্যস্ত হওয়ায়, আমরা সকলেই সন্ধ্যাকালে জনৈক বাঙ্গালী সাধুকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। ইহার নাম প্রজ্ঞানন্দ ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচারীর বয়স খুব বেশী মনে হইল না, তথাপি আলাপ-পরিচয়ে তাঁহার শাস্ত্র-চর্চ্চায় বিলক্ষণ অনুরাগ প্রত্যক্ষ করিলাম। উপস্থিত তিনি গীতা, উপনিষদ্ ও ভাগবত গ্রন্থের অনেক কিছু টীকা-টীপ্পনী সংগ্রহ করিয়া সেগুলিকে পুস্তকাকারে মুদ্রণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। বৎসরের মধ্যে অর্দ্ধেক সময় ইনি উত্তর-কাশীতে এবং অর্দ্ধেক সময় এই ভাটোয়ারীর নির্জ্জন গঙ্গাতটের আশ্রমে দিনযাপন করেন শুনিলাম। পাঁচ বৎসরকাল এই ভাবে চলিয়া আসিতেছে। তৎপূর্ব্বে তিনি চারি বৎসর মৌনী ছিলেন। তাঁহার প্রমুখাৎ অবগত হইলাম, এই ভাটোয়ারীতে ৬৫ ঘর ব্রাহ্মণের বসবাস আছে। তাঁহাদেরই দেওয়া ভিক্ষায় তাঁহার "দিন-গত-পাপক্ষয়ে"র ব্যবস্থা। তাঁহার পূর্ব্ব-জীবনের কতক কতক ইতিহাস তিনি আমাদের সমক্ষে সরল-চিত্তেই প্রকাশ করিলেন; এক সময়ে তিনি এক গভীর কূপমধ্যে তিন দিন অজ্ঞানাবস্থায় কাল কাটাইয়াও এখনও পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছেন। সুতরাং জীবন মরণ উভয়ই যে ভগবান্ ভিন্ন অপরের ইচ্ছায় চালিত হইতে পারে, ইহা তাঁহার ধারণাতীত।

সারা রাত্রি অজস্র শিলাপাত ও সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি হয়। প্রভাতে সদ্যঃস্নাত গোলাপের গন্ধে ভরপুর থাকিয়া আমরা প্রায় ১।• মাইল পথ অতিক্রম করত এইবার "বেলা-টিপরীর * নূতন চটীতে উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বাভিমুখী চড়াই পথে উঠিতে হইবে। গঙ্গাতটে সম্প্রতি একটি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। শুনিলাম, অর্থ সংগ্রহ করিয়া এইবার সেখানে "ভোলেশ্বর" মহাদেব প্রতিষ্ঠিত হইবেন। ঘাটের নাম "বেদ-প্রয়াগ"। পাণ্ডা বলিল, গঙ্গোত্তরী, কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণ এই তিন তীর্থের মধ্যগত একটি পাহাড়ে "কমল-নাভি"-পরিশোভিত একটি 'তালাব' আছে। উহার নাম "শতরুদ্র তালাব।" সেখান হইতে শতরুদ্র গঙ্গা নামিয়া আসিয়া এই বেদপ্রয়াগে মিলিত হইয়াছে।

বেলা-টিপরী হইতে আরও দুই মাইল পর্য্যন্ত পথের দুই পাশেই আবার গোলাপের জঙ্গল। তার পর "হারি" নামে এক গ্রাম অতিক্রম করিলাম। গ্রামের সন্নিকটে স্থানে স্থানে কতকটা

* যাত্রীর সুবিধার্থে আমরা এই দুই তীর্থপথের সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থানান্তরে লিপিবদ্ধ করিলাম। (লেখক)

* কেহ কেহ ইহাকে "মল্লা" চটীও বলিয়া থাকেন।

ধান্যের ক্ষেত, আবার কতকটা বা আফিমের চাষ। সে সময়ে আফিম গাছে অজস্র ফুল ধরিয়াছিল। এখানে একটি বড় ঝরণার পুল পার হইতে হইল। ঝরণার পার্শ্বে "তুতরানা" নামক দুইটি জন্তুকে দৌড়াইয়া যাইতে দেখিলাম। ইহা অনেকটা ধূসর বর্ণের শিয়ালের মত। তবে আকারে ইহার লেজের দিকটা একটু বেশী লম্বা। এখানে এই ঝরণার নিকটে জনৈক দোকানদার একটি ছপ্পর-ঘরে সামান্য রকমের দোকান সাজাইয়া রাখিয়াছে। নাম শুনিলাম "সৌরগড়" চটী। এইবার এখান হইতে একদম খাড়া চড়াই-সংযুক্ত সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে এই চড়াই পথ উঠিয়া চলিতে, আমরা পদব্রজের যাত্রী, সকলকেই বিলক্ষণ গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠিতে হইল। ডাণ্ডি-বাহকদিগের ক্লেশের অবধি ছিল না। প্রথমে তাহারা স্ত্রীলোক-সওয়ারকে নামাইয়া দিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, একমাত্র ক্ষীণ-শরীরা বৃদ্ধা দিদি ভিন্ন অপর কেহই চড়াই পথে উঠা-নামা করিতে আদৌ অভ্যস্ত ছিলেন না। "ক্লান্তি-পত্নী" চড়াই-পথ সম্মুখে দেখিলেই একেবারে অস্থির হইয়া পড়েন। আজিকার চড়াই-পথে তাঁহার মুখ দিয়া নূতন কথা বাহির হইল। বলিলেন, "চড়াই



গঙ্গাতটে কাষ্ঠনির্ম্মিত কুটীর-শ্রেণী (ঝালা গ্রাম)

পথগুলি যেন সাধন-মার্গের সোপান, একবারেই দুরারোহ। আর উতরাই কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীত, একবারে পাপমার্গে লইয়া যাইবার সহজ সরল সিঁড়ি—মনে করিলেই নামিয়া যাওয়া যায়।" কথাগুলি মন্দ লাগিল না। কোন্‌খান হইতে অন্তরের এই বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে, বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। কলিকাতা নগরীর বিদ্যুৎযন্ত্র-চালিত পাখার নিম্নে আরাম-কেদারায় বসিয়া যাঁহাদের সুখ-সেবা জীবন পরিচালিত হয়, আজ তাঁহাদিগকে দৈব-বশে এই কঠিন জঙ্গলাকীর্ণ পার্ব্বত্য চড়াইপথ পদব্রজে উঠিয়া চলিতে হইবে! মাথার উপরে দারুণ রৌদ্র প্রতিক্ষণেই সকলকে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর করিয়া তুলিতেছিল! অসহায় যাত্রীর মত কখনও তাঁহারা ডাণ্ডিওয়ালার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে কিছু দূর উপরে উঠেন—কখনও বা পরিশ্রান্তি বশতঃ একবারে ডাণ্ডির মধ্যে সওয়ার হইয়া বসেন—মুখে কেবল অস্বস্তির নিশ্বাস ভিন্ন বাক্যান্তর নাই—এইভাবে এক মাইল উঠিয়া আসিয়া "সালু" গ্রাম অতিক্রম করিলাম। এইবার এখান হইতে আর একটি পাহাড়ের স্তর উঠিয়া চলিতে হইবে। পাহাড়ের গায়ে কেবলই নানা জাতীয় বৃক্ষের জঙ্গল ভিন্ন দেখিবার অন্য কিছুই নাই। দেড় মাইল উপরে উঠিয়া একটি ছপ্পরঘর দৃষ্ট হইল। নাম শুনিলাম "ফিয়ালু"। এই ফিয়ালু চটীতেই দ্বিপ্রহরের আহারাদি সম্পন্ন করিতে সকলেই ব্যস্ত হইলেন। পাহাড়ের গা বাহিয়া একটিমাত্র ক্ষীণ ধারা নামিয়া আসিয়াছে। তাহা এতই অল্প যে, তাহাকে কাযে লাগাইবার জন্য তাহার গায়ে একটিমাত্র নালা সংযুক্ত করিয়া, তাহারই অগ্রভাগ দিয়া নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দ্বিপ্রহরের ক্ষুৎপিপাসাতুর আমরা সকলেই এই ক্ষীণ ধারার সাহায্যেই স্নানাহার সম্পন্ন করিলাম। এখান হইতে উত্তরদিকের তুষারাচ্ছাদিত পাহাড়ের অমল-ধবল দৃশ্যগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। যাহা হউক, আহারান্তে ধরিত্রপতি আমরা বেলা দুইটা আন্দাজ সময়ে যাবার উপরে উঠিতে সুরু করিলাম। নিস্তব্ধ পাহাড় ও জঙ্গলের মাঝখানে কোথাও এতটুকু শব্দ নাই! কি যেন অজানা নেশার ঘোরে মন্ত্রচালিতের মত আমরা কয় জন যাত্রী নিঃশব্দে উপরে উঠিয়া চলিতেছি। কেবল অলক্ষ্যে একপ্রকার ঝিঁঝিঁপোকার ডাক নূপুরধ্বনির



ভৈরব ঘাটির নিকট "জাহ্নবী" নদীর দৃশ্য

মতই মৃদু মধুর শুনা যাইতেছিল। ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতম জঙ্গলের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। পথও বিলক্ষণ পাতা-ঢাকা ও অস্পষ্ট হইয়া উঠিল। এইরূপে জঙ্গল ভেদ করিয়া আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে "ছুনা" চটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ভাটোয়ারী হইতে এ পর্য্যন্ত আজ সাড়ে নয় মাইল পথ মাত্র আসা হইল।

মহাজঙ্গলের মাঝখানে ছুনার ধর্ম্মশালা "সবে ধন নীলমণি"র মত যাত্রিগণের একমাত্র বিশ্রামের স্থান। চারিদিকে নিকটে কোথায়ও গ্রামের চিহ্নমাত্র নাই। যত দূর দৃষ্টি যায়—কেবলই ঘন-সন্নিবিষ্ট পাহাড়ী নানা জাতীয় গভীর অরণ্য দিনের বেলায়ই মানুষকে ভয়-চকিত করিয়া তুলে। ধর্ম্মশালাটিতে মাত্র চারিখানি ঘর। শুনিলাম, রুড়কী প্রদেশের গোকুলচাঁদ নামক এক ব্যক্তি

ইহার নির্ম্মাতা। একখানি ঘরে হৃষীকেশের "পঞ্জাব-সিন্ধ-সত্রে"র তরফ হইতে এখানে 'সদাব্রত' দেওয়ার ব্যবস্থা থাকায় আটা, গুড়, চিনি, প্রভৃতি লইয়া এক জন হিন্দুস্থানী ব্যক্তি এ স্থানটি আগলাইয়া বসিয়া আছেন। উক্ত সত্রের তরফ হইতে ইহার মাহিনার ব্যবস্থা আছে। এই লোকালয়বর্জ্জিত ভীষণ অরণ্যের পথে অকুণ্ঠিতচিত্তে যাঁহারা যাত্রীর মুখ চাহিয়া এই সেবাব্রতের আয়োজন করিয়াছেন, তাঁহাদের দানধর্ম্মের বিশেষত্ব কয় জনে জানিতে পারেন? আড়ম্বরহীন এই গোপন দানের কথা সংবাদপত্রে কখনও উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয় না—লক্ষ লক্ষ নরনারীর সম্মুখে দাতাদের জয়ধ্বনি নানারূপে আত্মপ্রকাশ করিবার অপেক্ষা না রাখিয়াই তীর্থ-যাত্রি-সেবারত এই ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মগণ এইরূপ সৎসাহসে আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

ছুনা হইতে পরদিন আগে যাইবার রাস্তা আরও ভীষণ মনে হইল। দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে এখানে মানুষ প্রবেশ করা দূরের কথা—স্বয়ং মার্ত্তণ্ডদেব আপনার অণুমাত্র কিরণ প্রকাশ করিতে একবারেই অক্ষম হইয়াছেন! লতা-পাদপ শাখা-প্রশাখা সমস্তই এ স্থানে বিলক্ষণ শৈবালপরিপূর্ণ; পথও একবারে অস্পষ্ট বলিলেই চলে। কোন স্থানে এইরূপ পথের উপরেই আবার



ভৈরব ঘাটির নিকট পাইনের বন

বৃক্ষগুলি লম্বমান হইয়া রহিয়াছে। যাত্রিগণের আগে যাইতে ইহাই যে একমাত্র নির্দ্দিষ্ট পথ, তাহা বুঝিবার কিছুমাত্র উপায় নাই। এক স্থানে উপর হইতে নালার আকারে একটি ঝরণা আঁকিয়া-বাঁকিয়া নামিয়া আসিয়াছে—তাহারই স্রোতঃসিক্ত পিচ্ছিল স্থানের উপর দিয়া উপরে যাইতে ডাণ্ডিওয়ালা দুই দুইবার সওয়ার স্কন্ধে পতিত হইল—অসহায় যাত্রীর জন্য এমন জঘন্য রাস্তা যে এখনও ব্যবহৃত হইতে পারে,—ইহা আমাদের একবারেই ধারণাতীত মনে হইল। এই জঙ্গলের মধ্যে দু'একটি কঠিন-দর্শন পাহাড়ীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাহাদের প্রমুখাৎ ইহাও জানিলাম যে, আজ কয়েক সপ্তাহ হইতে এ জঙ্গলে হিংস্র জন্তুর উৎপাতও চলিতেছে। দিনের বেলায় গরু মহিষ অদৃশ্য হইয়া যায়। এ সংবাদ আমাদের বড় ভাল লাগে নাই—তাই ডাণ্ডি-বাহক, বোঝা-বাহক প্রভৃতি সকলকেই এদিন

একসঙ্গে সঙ্গী করিয়া লইয়া আগে চলিয়াছিলাম। রাস্তার দুর্দ্দশার কথা বর্ণনা করিয়া কুলীগণ এখানে সরকার বাহাদুরকে যথেষ্ট গালিগালাজ করিল এবং ইহা যে স্বাধীন টিহিরীরাজের কলঙ্ক-বিশেষ, এ কথা স্পষ্টতঃ জানাইতে অণুমাত্র দ্বিধা বোধ করিল না। এ পথে চারি মাইল অতিক্রম করিবার পরে এক শ্যামশষ্পশোভিত প্রশস্ত ময়দানের উপর আসিয়া সকলেই হাঁফ ছাড়িলাম। এতক্ষণ যেন আলোকের দেশ হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছিলাম।

এখানে একখানিমাত্র ছপ্পর ঘর। নাম শুনিলাম "বেলক" চটী। একটিমাত্র ঝরণা ঝির ঝির রবে পাশে নামিয়া গিয়াছে। চটী হইতে দুগ্ধ ও চিনি খরিদ করিয়া সকলেই অল্পাধিক পরিতৃপ্ত হইলেন। তার পর বরাবর পাঁচ মাইল উতরাই পথ নামিয়া আসিয়া বেলা ১২টা আন্দাজ সময়ে "পঙ্‌রানার" ছপ্পরযুক্ত লম্বা চটীতে সকলেই সেদিনকার মত বিশ্রাম লইতে বাধ্য হইলাম।

এখান হইতে আবহাওয়া যেন একটু গরম মনে হইল। সে কঠিন শীত যেন এ দেশে নাই। আহারান্তে বিশ্রামের পর, বহুদিন পরে আজ "পিও কঁহা" পাপিয়ার সুমধুর স্বর কাণে পৌঁছিল। পরদিন অর্থাৎ ৩রা জ্যৈষ্ঠ বুধবার প্রত্যূষে এখান হইতে আবার কতক চড়াই ও কতকটা বা উতরাই পথে * ধীরে ধীরে



ভৃগুনদী কলকল শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে

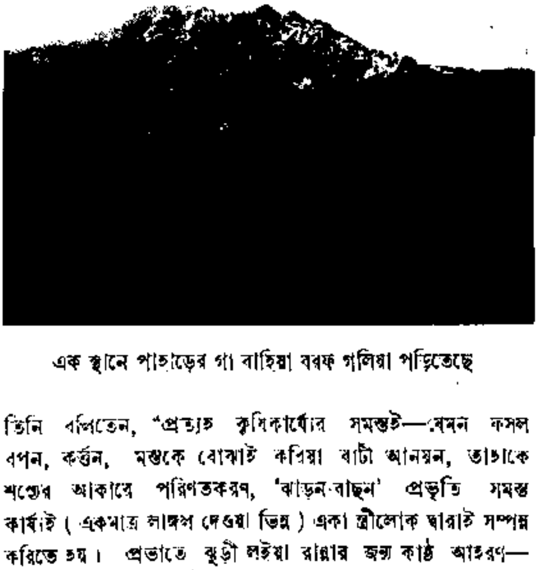
নামিয়া আসিয়া "বালগঙ্গা" নদীর তীরে "বগনা"র দ্বিতল ছপ্পর-যুক্ত চটী অতিক্রম করিলাম। এই নদী পার হইবার একটি নূতন পুল নির্ম্মিত হইয়াছে। নদীকে দক্ষিণে রাখিয়া এইবার তীরে তীরে সমান-পথে বরাবর চলিয়া আসিতেছি। দুধারেই অজস্র শ্বেত-গোলাপ ও বক-ফুলের মত এক প্রকার সবুজ গাছ শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। পূর্ব্বের মত ভয়াবহ ভীষণ জঙ্গল আর নাই! আজ দুই তিন দিন বাদে এ পথে "অস্নুস্তা" নামক একখানি গ্রাম এতক্ষণে চোখে পড়িল। গ্রামের আশে-পাশে নদীতটে বিস্তীর্ণ শস্যভূমি! দেখিতে দেখিতে বেলা সাড়ে দশটা আন্দাজ সময়ে আমরা হিমগিরির আর এক নূতন তীর্থ "বুড়া-কেদারে" আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

* এ উতরাই পথ বেশী না হইলেও নিতান্ত সাংঘাতিক। খাড়া নীচে নামিতে গিয়া এ পথে সাবধানতা সত্ত্বেও পড়িয়া যাইবার যথেষ্ট আশঙ্কা বিদ্যমান।

পণ্ডুয়ানা হইতে ইহার দূরত্ব মাত্র নয় মাইল হইবে। উত্তরাখণ্ডের তীর্থরাজিমধ্যে সাতটি কেদার-তীর্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয় ;—কেদারনাথ, মধ্যমেশ্বর, তুঙ্গনাথ, রুদ্রনাথ, কল্পেশ্বর, বিঘকেদার ও বুড়ো-কেদার। সুতরাং এই সপ্তম কেদার যাত্রিগণের এক দর্শনীয় বিশিষ্ট তীর্থ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গ্রামটি নিতান্ত ছোট নহে, বহু লোকের বসবাস আছে। কালী কম্‌লীওয়ালার দ্বিতল পাকা ধর্ম্মশালার একখানি ঘরে আমরা একে একে আশ্রয় লইয়া আজ আসবাবাদি যথাস্থানে 'গোছ' করিয়া রাখিলাম। কারণ, এখানে কয়েক দিন থাকিবার সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। কেন সিদ্ধান্ত হয়, তাহারও একটু কারণ ছিল। সাধারণতঃ এখান হইতে শ্রীশ্রীকেদারনাথ মাত্র সাত আট দিনের পথ জানিয়াছিলাম। কালশুদ্ধি না থাকায় ১৬ই তারিখের পূর্ব্বে আমরা কেদারনাথ দর্শন করিব না, ইহাই আমাদের পূর্ব্ব হইতে স্থির ছিল। অথচ আজ ৩রা জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত আমরা ক্রমান্বয়ে এই বুড়া কেদারে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, কেদারনাথের মত শীতবহুল স্থানে অধিক দিন অপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত মনে করি নাই। আর এক কথা, এখানকার আব-হাওয়া (না-শীত না-গ্রীষ্ম) আমাদের ভাল বোধ হইয়াছিল। জিনিষপত্রেরও দর এখানে অপেক্ষাকৃত সস্তা। আমাদের তিনখানি ডাণ্ডির বাহক এবং বোঝা-বাহক সমস্ত কুলীকেই ত এ তীর্থে অপেক্ষা করিবার দরুণ দণ্ড দিতে হইবে, সুতরাং অর্থের দিক দিয়াও এখানে অবস্থান অধিকতর শ্রেয়ঃ বোধ হইল।

গ্রামের একটু নীচে পূর্ব্বদিক হইতে দক্ষিণভাগে যেমন "বালগঙ্গা" নদী কলকল শব্দে বহিয়া চলিয়াছে, উত্তরদিক হইতে আর এক নদী "ধর্ম্মগঙ্গা" নামিয়া আসিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ইহার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। পাহাড়ের গায়ে এই উভয় নদীর সঙ্গমস্থল দেখিতে অতীব সুন্দর। সঙ্গমস্থলে "শৈলেশ্বর" মহাদেবের ও জাহ্নবী দেবীর মন্দির বিরাজ করিতেছে। দুই নদীরই উভয় তটে মধ্যে মধ্যে অজস্র শ্বেত গোলাপ-সংযুক্ত বৃক্ষগুলি গ্রাম হইতে অদূরে দেখিতে কুঞ্জের মত সুন্দর ও শোভাযুক্ত মনে হয়। গ্রামের মধ্যস্থলে "বুড়া কেদারের" প্রাচীন মন্দির। মন্দিরের সুবৃহৎ মূর্ত্তিটি ঠিক লিঙ্গমূর্ত্তি নহে ; একটি প্রস্তরস্তূপের চতুর্দ্দিকেই সুন্দরভাবে কতকগুলি ক্ষোদিত মূর্ত্তি ; যথা—মহাদেব, শিবমূর্ত্তি, পার্ব্বতী, গণেশজী, দ্রৌপদী, নন্দিগণ ও পঞ্চপাণ্ডবমূর্ত্তি সকলেই যেন এই প্রস্তরের চতুর্দ্দিকে একসঙ্গে বেড়িয়া শোভা পাইতেছেন। এরূপভাবে এতগুলি দেবতা লইয়া এই বৃত্তাকার বুড়া কেদারের দর্শন আমাদের চক্ষুতে আজ একবারেই নূতন ঠেকিল। মূর্ত্তিতে গঙ্গাজল দিয়া পূজা করিতে গেলে সেই জল এই মূর্ত্তির পাশ দিয়া নিম্নভাগে কোথায় বহিয়া যায়, বুঝিবার উপায় নাই। একটু অন্ধকারও আছে। পার্শ্বের ঘরে ব্যাঘ্রের উপরে অধিষ্ঠিতা অষ্টভুজা মূর্ত্তি এবং হরিহরমূর্ত্তি বিরাজমান রহিয়াছেন। হরিহর-মূর্ত্তিটি চতুর্ভুজ, দেখিতে আরও সুন্দর। এক দিকে চক্র ও গদা, অন্য দিকে ডমরু ও ত্রিশূল ; একই মূর্ত্তিতে দুই মূর্ত্তি বড়ই মধুর মনে হয়। এ স্থানে দুই গঙ্গার নামের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইলে পাণ্ডাগণ বলিয়া থাকে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও বাল্মীকি মুনি এককালে যখন এ স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন, তখন হইতেই উত্তরাখণ্ডে এই "ধর্ম্মগঙ্গা" ও "বালগঙ্গা" নামে যথাক্রমে প্রসিদ্ধি চলিয়া আসিতেছে। যাহা হউক, চতুর্দ্দিক পাহাড়বেষ্টিত এই দুই প্রশস্ত নদীর তটদেশে অবস্থিত বুড়া কেদার স্থানটি সাধকের চক্ষুতে যে পরম রমণীয় ও সাধন-সুন্দর স্থান, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ধর্ম্মশালার পার্শ্বেই স্থানীয় স্কুল-গৃহ। স্কুলে প্রায় ৫০টি ছোট ছোট ছাত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকে। সাধারণতঃ হিন্দী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়। "কেশবানন্দ" নামক জনৈক হিন্দুস্থানীয় (ইনি আলমোড়ার অধিবাসী) সে সময়ে এই স্কুলের শিক্ষক-পদে নিযুক্ত ছিলেন। বেশ নম্র ও অমায়িক তাঁহার ব্যবহার। আমরা যে কয় দিন এখানে ছিলাম, আমাদের অভাব-অভিযোগ পূরণে তিনি কতই যত্নবান্ থাকিতেন। শুধু তিনি নহে, তাঁহার 'পর্দ্দানশীন' পরিবারও আমাদের অলক্ষ্যে সহযাত্রিণীদের দলে মিশিয়া নানান কথাই আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইতেন। এই "মাষ্টার-গৃহিণী"র একটি কথা সে সময়ে সহযাত্রিণী-মণ্ডলের বেশ একটু উপভোগ্য হইয়াছিল। "পাহাড়ী স্ত্রীলোকের জীবনে আদৌ সুখ নাই", "গৃহস্থালীর কার্য্য হইতে এতটুকু বিশ্রাম পাইবার উপায় নাই" ইত্যাদি আক্ষেপোক্তি প্রতি কথায় তাঁহার মুখ দিয়া প্রকাশ পাইত।



এক স্থানে পাহাড়ের গা বাহিয়া বরফ গলিয়া পড়িতেছে

তিনি বলিতেন, "প্রত্যহ কৃষিকার্য্যের সমস্তই—যেমন ফসল বপন, কর্ত্তন, মস্তকে বোঝাই করিয়া বাটী আনয়ন, তাহাকে শস্যের আকারে পরিণতকরণ, 'ঝাড়ন-বাছন' প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই (একমাত্র লাঙ্গল দেওয়া ভিন্ন) একা স্ত্রীলোক দ্বারাই সম্পন্ন করিতে হয়। প্রভাতে ঝুড়ী লইয়া রান্নার জন্য কাষ্ঠ আহরণ—তাহাও স্ত্রীলোকদিগের দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে। অধিকন্তু রন্ধন দ্বারা পুরুষদিগের আহার পর্য্যন্ত যোগাইতে হয়। সে আহারে পুরুষের আব্দারও আবার যথেষ্ট। শুধু 'রোটি' তাহাদের আদৌ রুচিকর নহে। রোটির সহিত ভাজি চাই-ই। এই ভাজির জন্য আবার শাকসব্জী খুঁজিয়া আনিতে হয়। আহার করিতে বসিয়া যে দিন এই রোটির পার্শ্বে ভাজি না দেখিয়াছেন, ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা কর্ত্তামহাশয় তৎক্ষণাৎ থালা ছুড়িয়া প্রহারে উদ্যত হইয়া থাকেন। এ বিষয়ে পুরুষদিগের সে সময়ে যথেষ্ট বীরত্ব প্রকাশ পায়।" বলা বাহুল্য, মাষ্টার-গৃহিণীর এ দুঃখ ও দরদে সহযাত্রিণীগণ

মনে মনে হাস্য সম্বরণ করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। "পুরুষেরা তবে কি উপকারে আসে" এ কথার উত্তরে মাষ্টার-গৃহিণী কেবল ইহাই প্রকাশ করিলেন, "শুধু টুপী ও কোর্ত্তা পরিয়া সারাদিন গল্প-গুজবে, হাসি-তামাসায় সময় কাটানো ভিন্ন ইঁহাদের আর কোন কায নাই।" এ কথার সহিত তিনি যেন পরজীবনে বাঙ্গালী স্ত্রীলোক হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন, ইহাই বারম্বার সে সময়ে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন।

পুরুষদিগের আলস্য-প্রিয়তা, ক্রোধ ও 'ভাজ্জি'র আকার এই একাধারে তিন গুণ-বিশিষ্ট জীবের জন্ম আমার পূজনীয়া বৌদিদি অগ্রজ মহাশয়কে লইয়া সে সময়ে বেশ একটু হাসি-তামাসা জানাইলেন, পাল্টা জবাবে অগ্রজ মহাশয় ইহাই বলিলেন, "পাহাড়ী স্ত্রীলোক যাহারা এতটা গৃহস্থালীর কায জানে, তাহারা সকলেই যদি বাঙ্গালী-ঘরের গৃহিণী হইতে চাহে, তবে বৌদিদিদের মত স্ত্রীলোকদের কি গতি হইতে পারে, এ বিষয় একবার ভাবিয়া দেখিবার উপদেশ দিতে তিনি বিস্মৃত হইলেন না।

এখানে সপ্তাহে এক দিন করিয়া ডাক লইয়া যাইবার ব্যবস্থা আছে। সে ডাক "টিহিরী" হইয়া যায়। দোকান-পসারও যথেষ্ট, সুতরাং সব জিনিষই অপেক্ষাকৃত সুলভ। কেবল বাঙ্গালী যাত্রিগণ এখানে ছুইটা অস্বস্তি বিলক্ষণভাবে অনুভব করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ জলকষ্ট:—জলের জন্ম ধর্ম্মশালা বা গ্রাম হইতে অনেকটা নীচে নদীতটে নামিয়া যাইতে হয়। আশে-পাশে কোন ঝরণাই নিকটে নাই। দ্বিতীয়তঃ—অসম্ভব মাছির উৎপাত। এ উপদ্রবের আদৌ নিস্তার নাই। আহার্য্য দ্রব্যের সম্মুখে বসিয়া আপনি দুগ্ধ, গুড়, চিনি ত দূরের কথা, চাউল, আটা, তরকারি প্রভৃতি যে দ্রব্যই আলগা রাখুন না কেন, এত অতিরিক্ত মাছি তাহাতে ভরিয়া যাইবে যে, ইহাদের কালো রূপে জিনিষ-গুলির সর্ব্বাঙ্গ একবারে ঢাকিয়া যায়। আহার-কালে পাখার বাতাস ভিন্ন আপনাকে বিরক্ত হইয়াই উঠিয়া আসিতে হইবে। জল পর্য্যন্ত আলগা রাখা চলে না। আমরা এ স্থানে তিন দিন অতিরিক্ত বিশ্রামের দরুণ কুলীদিগকে প্রায় বারো তেরো টাকা দণ্ডস্বরূপ দিলাম। শেষ পর্য্যন্ত সকলেই "চাঙ্গা"র পরিবর্ত্তে কেবল এই লক্ষ লক্ষ মাছির উৎপাতেই আহার্য্য দ্রব্যে বিলক্ষণ অরুচি লইয়াই ধীরে ধীরে আগের পথে রওনা হইলাম। ৭ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার আহারান্তে বেলা বারোটা আন্দাজ সময়ে আমরা বুড়া-কেদার পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। গ্রামের বাহিরে বাল-গঙ্গার পুল পার হইয়া প্রথমেই দারুণ রৌদ্রে ১ মাইল চড়াই উঠিতে হইল। একে দ্বিপ্রহর, তায় কম শীতের দেশে চড়াই-পথ অতিক্রম করা এত অধিক ক্লেশকর হইবে, পূর্ব্বে আমরা কেহই ভাবি নাই। যেমন তৃষ্ণা, তেমনই কি এ পথে জলকষ্ট! বেলা ১।০টা আন্দাজ সময়ে আমরা তিন মাইল দূরে ভিটি গ্রাম অতিক্রম করিলাম। আরও ১ মাইল আগে আসিয়া "কুলু" চটী। তার পর সেখান হইতে এক মাইল অর্থাৎ ৫ মাইল সর্ব্বসমেত চলিয়া আসিয়া "মালথা" চটীতে সেদিনের মত বিশ্রাম লইতে বাধ্য হইলাম। শেষের দিকে রাস্তার পাশে পাশে কেবলই গোলাপের জঙ্গল ও অজস্র পাহাড়ী বৃক্ষে ভরা ছিল।

মালথার ছপ্পর ঘরে রাত্রি কাটাইয়া পরদিন প্রত্যূষে আবার চড়াই পথ উঠিতে থাকিলাম। ... মাইল বাদে "জঙ্গল" চটী, তার পর পাহাড়ের দ্বিতীয় স্তরে উঠিয়া আর এক চটী (নাম হাটকুলী বা ভৈরব চটী) দৃষ্ট হইল। জঙ্গলের মাঝে এখানে শ্যাম-শস্য-শোভিত কিছু দূর বিস্তৃত ময়দান ও তদুপরি অগণিত হলদে রংএর ছোট ছোট এক প্রকার ফুল (চন্দ্রমল্লিকার মত) লক্ষ লক্ষ তারকার মত দেখিতে কেমন সুন্দর! ময়দানের মধ্যস্থলে ভৈরবজীর মন্দির বিরাজ করিতেছে। এখান হইতে উত্তরভাগের শ্বেত-শুভ্র তুষারাদ্রিগুলি চোখের সম্মুখে নিয়তই উজ্জ্বল দেখায়। ভৈরব চটী হইতে অর্দ্ধ-মাইল আন্দাজ আগে আসিয়া উতরাই পথে গভীর জঙ্গলের মধ্যে নামিতে হইল। দিনের বেলায় সে পথ এত অন্ধকার, নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ যে, গাছ হইতে প্রতি পাতার মর্ম্মর শব্দে মনে হইতেছিল, যেন কোন হিংস্র জন্তু পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে। ভীতি-বিহ্বল-চিত্তে নিঃশব্দে সকলেই সে স্থান পার হইয়াছি। কাণের মাঝে সেই ঝিঁঝিঁ পোকার এক-টানা সুর ও মধ্যে মধ্যে দু'একটি পাহাড়ী-পাখীর কর্কশ ধ্বনি ভিন্ন এ জঙ্গলে শুনিবার কিছু ছিল না। বেলা সাড়ে আটটার সময়ে আমরা এ পথে "ভোট" চটী উপস্থিত হইলাম। এখানে দুই তিনখানি দোকান ও তৎসহ লম্বা লম্বা 'চটাই' বিস্তৃত ছপ্পর ঘরের একটিতে সে দিন বিশ্রাম লওয়া হইল। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে যাহাতে কেদারনাথ না পৌঁছাই, সে জন্যই এইরূপ ভাবে অল্পদূর গিয়াই আজ ক্ষান্ত হইলাম।

৯ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার প্রত্যূষে "ভোট" চটী পশ্চাতে রাখিয়া প্রায় পাঁচ মাইল দূরে "পেরেটি" নামক স্থানে পৌঁছিলাম। এখানে খাড়া পাহাড়ের গা বাহিয়া প্রায় দুই ফর্লং উতরাই-রাস্তা অত্যন্ত সাংঘাতিক দেখিলাম। রাস্তার পরিসর সেখানে এক হাতের বেশী নহে। বলা বাহুল্য, সকলকেই খুব সন্তর্পণে নামিয়া আসিতে হইল। পেরেটি হইতে দুই মাইল আগে যাইতে পারিলেই "গুত্তু" চটীতে অন্ত বিশ্রামের কথা, তাই যত শীঘ্র সম্ভব এখান হইতে অর্দ্ধমাইল আন্দাজ দূরে পূর্ব্বাভিমুখ পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলাম। দক্ষিণভাগে এতক্ষণে "ভৃগু" নদী দেখা গেল। ইহারই তীরে তীরে দুই মাইল পথ চলিয়া আসিয়া বেলা ৮টা আন্দাজ সময়ে "গুত্তু" আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে কালী কমলী-ওয়ালার একখানি ঘর ও তৎসংলগ্ন বারান্দা ধর্ম্মশালারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, তাহা তখন "সদাব্রতের" জিনিষ-পত্রাদিতেই পরিপূর্ণ থাকায়, আমরা এক দোকানীর ছপ্পরযুক্ত চটীতে আশ্রয় লইলাম। এখনও পর্য্যন্ত এ সকল স্থান বুড়া কেদারের মতই উষ্ণপ্রধান, সুতরাং ৮টা বাজিতে না বাজিতে কঠিন রৌদ্রে সকলকেই বিলক্ষণ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতে হয়। প্রাকৃতিক দৃশ্য হিসাবে এ স্থানটি অধিকতর রমণীয় দেখিয়া আমরা এখানেই রাত্রিবাসের সঙ্কল্প করিলাম। ধর্ম্মশালার নিম্নেই ভৃগু নদী কলকল শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে। সে তর্জ্জন-গর্জ্জন এতই গুরুগম্ভীর যে, দুই দিকের বিরাটকায় পাহাড়কে যেন প্রতিক্ষণেই স্তম্ভিত করিয়া দিতেছে। এ স্থানে নদীর উপরে একটি পুল আছে। পুলের উপর দাঁড়াইয়া দুই দিকের পাহাড়ের মাঝে এই বিপুল বেগে প্রবাহিতা নদীর গতি দেখিতে পারিলে সত্যই আত্মহারা হইতে হয়। দূরে উত্তর কোণের এক স্থানে উজ্জ্বল রজতশৃঙ্গ শোভা পাইতেছিল। শুনিলাম, এই শৃঙ্গের পার্শ্ব দিয়া পঁওয়ালীর ভীষণ তুষার-পথে এইবার অগ্রসর হইতে হইবে।

ডাণ্ডিওয়ালা, বোঝাওয়ালা সকলেই এই পঁওয়ালীর নামে যেন ভীত-ত্রস্ত হইয়া উঠে। সে রাস্তা না কি এতই ভীষণ ও কঠিন! শুনিলাম, এই রাস্তায় সবে মাত্র ৫।৬ দিন হইল যাত্রি-চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। এখান হইতে পঁওয়ালীর দূরত্ব প্রায় সাড়ে বারো মাইল হইবে। এ পথের আগা গোড়াই কেবল ক্রমিক চড়াই, সুতরাং এইবার যে সকলেরই প্রাণান্ত পরিশ্রম আছে, তাহা ফতে সিং, ভগবান সিং প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে জানাইয়া দিল।

যাত্রিগণ এখানে ভৃগু নদীতে স্নান ও মন্দিরে রাম-লক্ষ্মণ-সীতার পূজা করিয়া থাকেন। মূর্ত্তিগুলি সুন্দর। এই মন্দিরের পার্শ্বে আর একটি জরাজীর্ণ ভগ্নপ্রায় শিবমন্দির এ স্থানের প্রাচীনত্ব সূচিত করিতেছে। ও-স্থানের লোকপরম্পরায় অবগত হইলাম, পঁওয়ালীর রাস্তা খুলিবার পূর্ব্বে যাঁহারা কেদারনাথ গিয়াছেন, তাঁহারা "কল্যাস্" পাহাড়ের "দাঁড়া" ধরিয়া ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে * বিশ মাইল ঘুরিয়া "ভীরী"র পথে 'গুপ্তকাশী' গিয়াছেন। সেখান হইতে কেদারনাথ প্রায় ২৪৷৷॰ মাইল উল্টা পথে আসিতে হয়। যাহা হউক, এক রাত্রি বিশ্রাম করিয়া পরদিন প্রত্যূষেই আমরা পঁওয়ালী উদ্দেশে আগে বহির্গত হইলাম। প্রথমে এক মাইল আন্দাজ চড়াই পথে "গাঁওয়ানা", সেখান হইতে আবার চড়াই উঠিয়া আড়াই মাইল বাদে "পোঁ" চটী প্রাপ্ত হইলাম। এই আড়াই মাইল চড়াই পথে কেবলই সরু 'পাকদাণ্ডী' ভিন্ন রাস্তা বলিতে কিছুই ছিল না। তার পর তৃতীয়বার আড়াই মাইল চড়াই ভাঙ্গিয়া পরিশ্রান্ত-চিত্তে সকলেই বেলা সাড়ে নয়টা আন্দাজ সময়ে গাঁওয়ান কী মাড়ায় উপস্থিত হইয়া এখানকার লম্বা ছপ্পরযুক্ত ভীষণ সেঁতসেঁতে ঘরেই আশ্রয় লওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম। এত উচ্চ পাহাড়ের উপরেও মাটীর মেঝে এত দূর ভিজা! লম্বা লম্বা চটাই বিস্তৃত থাকিলেও তদুপরি কম্বল বিছাইলে, কম্বল পর্য্যন্ত যেন "কন্‌কনে" ঠাণ্ডা মনে হইল। ক্রমশঃই আবার আমরা যেন ভীষণ শীতের দেশে উপনীত হইতেছি। এখানে জলকষ্টও যথেষ্ট। চটী হইতে প্রায় ৩ ফার্লং দূরে পাহাড়ের গা দিয়া এক স্থানে একটি ক্ষীণধারা ঝির-ঝির শব্দে নামিয়া গিয়াছে, সেখান হইতে জল আনাইয়া যাত্রিগণ নিজেদের তৃষ্ণা দূর করিয়া থাকেন। চটীতে মোটামুটি আহার্য্য দ্রব্য পাওয়া গেল, কেবল আলুর অভাবে তরকারি জুটিল না। বৈকালের দিকে ঘন মেঘে আকাশ বিলক্ষণ ছাইয়া ফেলিল, এবং দেখিতে দেখিতে গর্জ্জন ও বর্ষণ সহ আবার অজস্র করকায় পাহাড়ের চতুর্দ্দিক এক অপরূপ শ্রী ধারণ করিল। পটপরিবর্ত্তনের ন্যায় এখানকার দৃশ্য যেন অকস্মাৎ নূতন ও ভয়ঙ্কররূপে আমাদের চোখের সম্মুখে কি এক ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে সকলকেই অভিভূত করিয়া দিল।

* এ পথে 'দাঙ্গী খোড়' ও "গোঁঠনা বধানি" গ্রাম পড়ে। কোথায়ও পাকডাণ্ডি, কোথায়ও বা নালা ধরিয়া (পথ নাই) যাত্রিগণকে যাইতে হইয়াছে, সুতরাং যাত্রীদের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না।

যমুনোত্তরী হইতে গঙ্গোত্তরী যাত্রাপথের বিবরণ

স্থান	দূরত্ব	চটীর নাম	পৌঁছিবার তারিখ	বিশেষত্ব
যমুনোত্তরী	৪ মাইল	মার্কণ্ডেয় ঋষি	১৬ই বৈশাখ ১৩৪॰	
মার্কণ্ডেয় আশ্রম	১॰ "	ওর্জ্জির	১৭ই " "	
ওর্জ্জির	৯ "	গঙ্গানি	১৮ই " "	পাকা ধর্ম্মশালা আছে।
গঙ্গানি	১৷৷॰ "	সিমল্	১৯শে " "	ছপ্পর ঘর, তবে চতুর্দ্দিকেই আচ্ছাদন আছে।
সিমল্	৪ "	জঙ্গল	" " "	ছপ্পর ঘর মাত্র।
জঙ্গল	৫ "	সিঙ্ ঠা	" " "	ভীষণ উত্তরাই পথ পড়ে।
সিঙ্ ঠা	৩৷৷॰ "	নাকুরী	" " "	
নাকুরী	৬৷৷॰ "	উত্তর-কাশী	২॰শে " "	সুবৃহৎ ধর্ম্মশালাযুক্ত অতি সুন্দর রমণীয় স্থান।
উত্তর-কাশী	৩ "	নাগানি	২২শে " "	
নাগানি	৩ "	নিতালা	" " "	
নিতালা	৬ "	মনেরী	" " "	দুইটি ধর্ম্মশালা বিদ্যমান।
মনেরি	৪ "	কুমাল্‌টি	" " "	
কুমাল্‌টি	৫ "	ভাটোয়ারী	২৩শে " "	টিহিরীরাজ-তরফ হইতে এখানে যাত্রীদিগের মাল প্রভৃতি ওজন করিয়া মাশুল লওয়া হয়। পাকা ধর্ম্মশালা আছে।
ভাটোয়ারী	৬ "	সতীনারায়ণ চটী	২৪শে " "	
সতীনারায়ণ চটী	৩ "	গাঙ্গনানি	" " "	ধর্ম্মশালা দ্বিতল ও প্রশস্ত।
গাঙ্গনানি	৫ "	লোহরীনাগ	২৫শে " "	
লোহরীনাগ	৪ "	সুখী	" " "	চড়াইএর উপরে ধর্ম্মশালা।
সুখী	৩ "	ঝালা	২৬শে " "	
ঝালা	৩ "	হরশিলা	" " "	গঙ্গাতটে লক্ষ্মীনারায়ণজীর মন্দির ও পাকা ধর্ম্মশালা আছে।

স্থান	দূরত্ব	চটীর নাম	পৌছিবার তারিখ	বিশেষত্ব
হরশিলা	৩ "	ধরালী	২৬শে বৈশাখ ১৩৪০	প্রশস্ত ধর্ম্মশালা বিদ্যমান।
ধরালী	৪ "	জাংলা	২৭শে " "	
জাংলা	২ "	ভৈরবঘাটি	২৮শে " "	চড়াই সাংঘাতিক ও চটীতে জলকষ্ট।
ভৈরবঘাটি	৬ "	গঙ্গোত্তরী	" " "	এখানে নয়টি ধর্ম্মশালা আছে।

সর্ব্বসমেত—১০০৷৹ মাইল মাত্র।

মসৌরী হইতে যমুনোত্তরী যাত্রা-পথের বিবরণ

স্থান	দূরত্ব	চটীর নাম	পৌছিবার তারিখ	বিশেষত্ব
মসৌরী	৬ মাইল	ঝাল্‌কী	৫ই বৈশাখ ১৩৪০	এখানে অসম্ভব জলকষ্ট আছে।
ঝাল্‌কী	২৷৹ "	কোটলী	" " "	এখানে পাকা ধর্ম্মশালা, তবে জলকষ্ট কম নহে।
কোটলী	৬৷৹ "	ধনোটি	৬ই " "	মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দ্বিতল ধর্ম্মশালা ও ডাকবাংলো আছে।
ধনোটি	৮ "	কাণাতাল	" " "	
কাণাতাল	১৷৹ "	বলডানাকাঠাং	৭ই " "	এখান হইতে টিহিরীর পথ ছাড়িয়া উত্তরাই পথে নামিতে হয়।
বলডানাকাঠাং	৮৷৹ "	বলডানা	" " "	
বলডানা	২ "	শাঁতুগ্রাম	৮ই " "	
শাঁতুগ্রাম	২ "	বন্দরকোটি	" " "	
বন্দরকোটি	১ "	ছাম	" " "	সুন্দর দ্বিতল ধর্ম্মশালা।
ছাম	৪ "	থরোট	" " "	
থরোট	১ "	নগুনা	" " "	দ্বিতল ধর্ম্মশালা।
নগুনা	৫ "	ধরাস্থ	৯ই " "	সুন্দর ধর্ম্মশালা। নীচের পথ গঙ্গোত্রী গিয়াছে।
ধরাস্থ	৪ "	কল্যাণী	১০ই " "	
কল্যাণী	৪ "	কুমরাণা	" " "	একখানি ঘর মাত্র, অর্দ্ধেকাংশে দোকান।
কুমরাণা	৫ "	সিল্‌কারা	১১ই " "	
সিল্‌কারা	৮ "	ডস্তাল গাঁও	" " "	ভীষণ চড়াই ও উত্তরাই।
ডস্তাল গাঁও	২৷৹ "	সিমল্	১২ই " "	যমুনোত্তরীফেরত যাত্রী এখান হইতে গঙ্গোত্তরীর পথ ধরিয়া থাকেন।
সিমল্	১৷৹ "	গঙ্গানি	" " "	পাকা ধর্ম্মশালা আছে।
গঙ্গানি	২ "	থরাদ	" " "	
থরাদ	৩ "	কুত্‌নৌর বা জগন্নাথ	" " "	ছপ্পর ঘর।
জগন্নাথ	১৷৹ "	যমুনা চটী	" " "	ছপ্পর ঘর।
যমুনা	১২৷৹ "	মার্কণ্ডেয় ঋষি	১৩ই ও ১৪ই "	পাকা ধর্ম্মশালা আছে।
মার্কণ্ডেয় ঋষি	৪ "	যমুনোত্তরী	১৫ই " "	পাকা দ্বিতল-ধর্ম্মশালাযুক্ত স্থান।

সর্ব্বসমেত—৯৬ মাইল মাত্র।

[ক্রমশঃ]

শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।



(উপন্যাস)

৮

লুণার বাড়ী ঠিক নদীর ধারে। বাড়ী বেশ বড়, চারিদিকে বাগান, তাহাতে নানা জাতির ফুল ও ফলের গাছ। দ্বিতল গৃহ, অনেকগুলি ঘর। বাড়ীতে বাস করিত লুণা ও তাহার বৃদ্ধা দিদিমা, আর কেহ ছিল না। দিদিমা উপরের একটি ঘরে থাকিত, বয়স অধিক হইয়াছে বলিয়া সংসারের কাযকর্ম্ম বড় একটা করিতে পারিত না। তথাপি নিজের অল্প-স্বল্প কায নিজেই করিত, অবশিষ্ট সময় ছাদে উঠিয়া, পাখা ছড়াইয়া বসিয়া রৌদ্র পোহাইত। লুণা নিজের মনে বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইত, কখন ঘরে বসিয়া কিছু কায করিত, যখন ইচ্ছা হইত বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইত, সমবয়সী পরীদের সঙ্গে গল্প-গুজব করিত। দিদিমা তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিত না, কোন কথা বলিত না। লুণা শিরীর সঙ্গে চলিয়া গিয়া ফিরিয়া আসিলে পর দিদিমা জিজ্ঞাসা করিল, ক'দিন বাড়ীতে দেখতে পাই নি, কোথায় গিয়েছিলি?

লুণা বলিল, দিন কতক ঘুরে এলাম।

বৃদ্ধা হাসিল, বলিল, কোথাও যাবার পথ নেই। যেখানেই যাবি, আবার ফিরে আসতে হবে।

প্রধানাদের কাছে গিয়া লুণা ফিরিলে পর দিদিমা জিজ্ঞাসা করিল, কি লো, কি হ'ল? তোকে কি বললে?

লুণা বলিল, এই যে আমাদের কোথায় পাঠিয়ে দেয়, সেখানে এক বছর যেতে দেবে না।

বুড়ী বলিল, তত দিন আমি হয় ত থাকব না।

লুণা বলিল, কেন, তোমার কি হয়েছে? তোমার চেয়েও বেশী বয়স কত সব বেঁচে আছে।

বৃদ্ধা আর কিছু বলিল না।

লুণা দেখিল, প্রধানাদের নিকটে যাইবার পর আর কেহ বড় একটা তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসে না, তাহাকে দেখিলে পাশ কাটায়। কেবল শিরীর সহিত যেমন যাওয়া আসা ছিল, তেমনি রহিল, বরং পূর্ব্বের অপেক্ষা ইহাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়িল। তাহারা দুই জনে কৌতুক করিয়া বলিত, দেখেছিস্, আমাদের একঘরে করেছে।

লুণা বলিত, দশ-ঘরে থেকে আমাদের কি লাভ? যখন কোন কথা জানা যাবে না, সে অবস্থায় আমাদের এই রকম থাকাই ভাল।

শিরীর বাড়ীও নদীর ধারে। লুণার মত অত বড় বাড়ী নয়, কিন্তু বেশ সুন্দর খটখটে, ঘরগুলি ঝরঝরে তকতকে। শিরীর কেহই ছিল না, এক বৃদ্ধা তাহার কাযকর্ম্ম করিত ও বাড়ীতে থাকিত। অনেক সময় শিরী বাড়ীর ছাদের উপর উঠিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিত। চারিদিকে দিগন্তে আকাশ-লগ্ন পাষাণের প্রাচীর, এ প্রাচীর ভেদ করিবার কি কোন উপায় নাই? পা থাকিতে সে পঙ্গু, পর্ব্বত লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা নাই। একবার চেষ্টা করিয়া বিফল-প্রয়াস হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। তাহাদের জীবনে কি এমন রহস্য আছে—যাহা কেহ ভেদ করে না? যাহারা কিছু জানে, তাহারা কি কথা গোপন করে, কেন গোপন করে? পাহাড়ে

প্রহরী তাহাদের পথ রোধ করিল কেন, তাহারা কি অনিষ্ট করিয়াছিল? প্রহরীই বা দেখিতে ওরূপ কেন, তাহার স্পর্শে শিরী ও লুণার ওরূপ অজ্ঞাতপূর্ব্ব অনুভূতি হইল কেন? কত রকম কল্পনায় শিরীর চিত্ত মথিত আলোড়িত হইত। সে ভাবিত, কোনরূপে পর্ব্বত অতিক্রম করিতে পারিলে নূতন জগৎ তাহার চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হইবে। সেখানে কত রকম নয়নলোভন দিব্যকান্তি জীব আছে, কোন রহস্য নাই, কেহ কোন কথা গোপন করে না। তাহারা দেখিতে কি রকম, তাহাদের স্পর্শে কিরূপ চিত্তবিকার হয়? ভাবিতে ভাবিতে শিরীর অঙ্গ আবেশপূর্ণ হইত, চক্ষু কোমল, আলস্যপূর্ণ হইত। দিবাস্বপ্ন ভঙ্গ হইলে শিরী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিত।

লুণার চিত্তের অস্থিরতা আরও অধিক। শিরীর চঞ্চলতা শুধু চরণে, সে হাঁটিয়া কত দূর যাইতে পারে? কিন্তু লুণার গতি আকাশমার্গে, সে ইচ্ছা করিলে যেখানে ইচ্ছা উড়িয়া যাইতে পারে। আকাশে কে তাহার গতিরোধ করিবে? সে যদি উড়িয়া, আকাশে বহু উচ্চে উঠিয়া পর্ব্বত উত্তীর্ণ হয়, তাহা হইলে কে তাহাকে নিষেধ করিবে? স্বেচ্ছামত সর্ব্বত্র যাইতে যদি না পারিবে, তাহা হইলে পক্ষ থাকিয়া তাহার কি লাভ? পাহাড়ে উঠিতেই সে যে প্রহরীকে দেখিয়াছিল, তাহার ন্যায় আরও কত আছে, কে জানে? পাহাড়ের পারে কাহারা বাস করে? তাহারাই বা দেখিতে কি রকম, তাহাদের দেশ কি রকম? তাহাদের কেহ পর্ব্বত পার হইয়া এ দেশে আসে না কেন? সম্ভবতঃ প্রহরীরা তাহাদেরও পথ রোধ করে। যেমন এ দেশের বাহিরে যাইবার পথ রুদ্ধ, সেইরূপ বাহির হইতে কাহারও আসিবার পথ নাই। এক একবার লুণা বেগে পক্ষসঞ্চালন করিয়া পর্ব্বতের অভিমুখে উড়িয়া যাইত, অনেক দূরে গিয়া দেখিত, তাহার পশ্চাতে এক জন রক্ষিকা উড়িয়া আসিতেছে। লুণা জানিত, রক্ষিকাকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইবার সাধ্য নাই, কেন না, আকাশে তাহাদের তুল্য বেগে কেহ উড়িতে পারিত না, মাটীতে তাহাদের সমান কেহ ছুটিতে পারিত না। রক্ষিকাকে দেখিয়া লুণা ফিরিত। রক্ষিকা ডাকিয়া বলিত, পাহাড়ের কাছে যেও না, বারণ আছে।

এক একবার লুণা ভাবিত, রাত্রিতে উড়িয়া যাইবে। রাত্রিতে ত কেহ দেখিতে পাইবে না, আকাশে রাত্রিকালে কেহ তাহাকে খুঁজিয়া পাইবে না। কিন্তু লুণার অতটা সাহস হইত না। একে স্ত্রীজাতি, তাহাতে বয়স অল্প। নিশা সকলের পক্ষেই শঙ্কাপূর্ণ। নীল, নির্ম্মল, শঙ্কাশূন্য আকাশ রাত্রিকালে আর এক মূর্ত্তি ধারণ করে। জ্যোৎস্নারাত্রি হইলে বরং কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আলোক থাকিলে ধরা পড়িবার আশঙ্কা। চাঁদ না উঠিলে নক্ষত্রালোকে অন্ধকার দেখিলে ভয় করে। রাত্রিতে আকাশে কত নিশাচর ভ্রমণ করে, কে জানে? কোথায় গিয়া উপস্থিত হইবে, কে বলিতে পারে? হিংস্র পশু ছাড়া অন্য রকম হিংস্র জীবও থাকিতে পারে।

লুণা ও শিরী ষড়্‌যন্ত্র করিয়া কি করিবে? তাহাদের ইচ্ছা, কোথাও চলিয়া যায়, কাহারও নিষেধ না মানিয়া পর্ব্বত লঙ্ঘন করে, কিন্তু কোন উপায় খুঁজিয়া পাইত না। দুই জনে একত্রে বা স্বতন্ত্রভাবে পলায়নের উপায় চিন্তা করিত, কিন্তু ফলে কিছুই করিতে পারিত না। অপরে যাহা জানিত, তাহাও তাহারা এক বৎসর জানিতে পারিবে না। কেবল চিত্তের চঞ্চলতা বাড়িতে লাগিল।

৯

যাহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাইবার অনুমতি পাইত, যাহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে এক জন প্রৌঢ়া গমন করিত, তাহারা কি দেখিয়া আসিত, কি জানিতে পাইত? যাহারা পূর্ব্বদিকে যাইত, তাহারা কি দেখিত, আর যাহারা পশ্চিমদিকে যাইত, তাহারাই বা কি দেখিত? কি এমন রহস্যের কথা— যাহা তাহাদের বলিতে নিষেধ, যাহা তাহারা প্রকাশ করিতে পারিত না?

কোন নব-যুবতীর যাইবার সময় উপনীত হইলে তাহাকে প্রথমে প্রধানাদের নিকটে লইয়া যাইত। এক জন প্রধানা বলিতেন, তোমার নাম ছায়া?

যুবতীর পাখা আছে, সে পাখা আরও গুটাইয়া, সঙ্কোচের সহিত মৃদুস্বরে বলিত, হাঁ।

প্রধানা অত্যন্ত গম্ভীরভাবে কহিতেন, আমাদের যেমন সনাতন প্রথা আছে, সেই অনুসারে তোমাকে পাঠানো হবে। ইনি তোমার সঙ্গে যাবেন।

সেইখানে দাঁড়াইয়া এক জন প্রৌঢ়া। তাহার নাম নন্দিনী। প্রধানা ছায়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি নন্দিনীকে জান?

ছায়া পূর্ববৎ মৃদুকণ্ঠে বলিল, জানি।

প্রধানা বলিলেন, তোমাকে কোথায় যেতে হবে, কি করতে হবে, নন্দিনী সব জানে। যাবার আগে তোমাকে শপথ করতে হবে, কখনও কোন কথা প্রকাশ করবে না।

ছায়া বলিল, কিছু প্রকাশ করব না।

প্রধানা দুই জন আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। যিনি ছায়ার সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, আমাদের সঙ্গে এস।

ছায়া এবং নন্দিনী তাঁহাদের পশ্চাতে চলিল। প্রধানারা আর এক প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। সে কক্ষে তেমন আলোক নাই। ঘরের ভিতর কয়েকটা আলোক জলিতেছে। সেই আলোকে ছায়া দেখিল, গৃহের মধ্যস্থলে ধাতুনির্ম্মিত বৃহৎ মূর্ত্তি। দুই দিকে দুই প্রসারিত পক্ষ, দক্ষিণ হস্তে খড়্গ। আকৃতি ভীষণ, মুখ বিকট, গোল চক্ষু। সেই ভয়ানক মূর্ত্তি দেখিয়া ছায়ার হৃৎকম্প হইল।

প্রধানা বলিলেন, ইনি শাস্তিবিধানের দেবতা। আমরা ইঁহার আদেশে শাসন করি। ইঁহার সাক্ষাতে শপথ কর, যা দেখবে, যা ঘটবে, কিছু প্রকাশ করবে না। এই মূর্ত্তি দেখেছ, তাও বলবে না। ইচ্ছাপূর্ব্বক কিংবা অসাবধানে ঘুণাক্ষরে কিছু প্রকাশ হবে না।

ছায়া কম্পিত, জড়িত স্বরে শপথ করিল।

প্রধানা কঠিন-কণ্ঠে বলিলেন, শপথভঙ্গ হলে আমরা জানতে পারব। তার পর তোমাকে আর কেউ দেখতে পাবে না, তুমিও কখনো কারুর মুখ দেখতে পাবে না।

ছায়ার নিশ্বাস রুদ্ধ হইল, হৃদয়ের স্পন্দন রহিত হইল।

নন্দিনীকে প্রধানা বলিলেন, তুমিও শপথ কর।

নন্দিনী শপথ করিল।

প্রধানারা নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া, একখণ্ড ভূর্জ্জপত্র বাহির করিয়া তাহাতে কি লিখিয়া দিলেন। নন্দিনীর হস্তে দিয়া কহিলেন, আবশ্যক হ'লে এইটে দেখাবে। তোমরা আজই চ'লে যাবে।

ছায়া ও নন্দিনী বাহির হইয়া আসিল। ছায়ার শুষ্ক মুখ দেখিয়া নন্দিনী বলিল, বাড়ীতে কোন কথা বলো না। কিছু না বললে কোন ভয় নেই। তুমি প্রস্তুত হয়ে থেক, আমি খানিকক্ষণ পরে এসে তোমাকে নিয়ে যাব।

ছায়া বাড়ীতে ফিরিয়া যাইলে তাহাকে সকলে জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'ল? তোমাকে কি বললে?

ম্লানমুখে ছায়া বলিল, তোমরা যদি আমার ভাল চাও, তা হ'লে কোন কথা জিজ্ঞাসা করো না।

এই সময় হইতে কথা গোপন করা আরম্ভ হইল।

কিছুক্ষণ পরে নন্দিনী আসিয়া ছায়াকে সঙ্গে লইয়া পূর্ব্বদিকে চলিয়া গেল। পর্ব্বতে আরোহণ করিতেই এক জন প্রহরী তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। গিরী ও রূপা যে প্রহরীকে দেখিয়াছিল, এ ব্যক্তি দেখিতে ঠিক সে রকম নয়। ইহার পক্ষ আছে, দেহের সেরূপ স্থূলতা নাই, কিন্তু শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখশ্রী। ছায়া অবাক্ হইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল।

প্রহরী বলিল, তোমাদের সঙ্গে আদেশপত্র আছে?

নন্দিনী ভূর্জ্জপত্র বাহির করিয়া দেখাইল।

প্রহরী বলিল, আমার সঙ্গে এস।

প্রহরী পথ দেখাইয়া পর্ব্বত আরোহণ করিতে আরম্ভ করিল। অনেক উচ্চে উঠিয়া তাহারা প্রস্তরনির্ম্মিত একটি ছোট বাড়ীর সম্মুখে উপনীত হইল। সেখানে দাঁড়াইয়া আর এক জন প্রহরী। প্রথম প্রহরী তাহাকে বলিল, এদের কাছে আদেশপত্র আছে, এদের নিয়ে যাও।

প্রথম প্রহরী ফিরিয়া গেল। দ্বিতীয় প্রহরী নন্দিনী ও ছায়াকে ডাকিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল। একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া নন্দিনী ও ছায়া দেখিল, শুভ্রকেশ এক বৃদ্ধ ব্যক্তি সেখানে বসিয়া আছে। সে নন্দিনীর নিকট হইতে ভূর্জ্জপত্র চাহিয়া লইয়া তাহাদিগকে বসিতে বলিল। প্রহরী বাহিরে গেল।

বৃদ্ধ ভূর্জ্জপত্র পড়িয়া তাহার পার্শ্বস্থিত অনেকগুলি অপর ভূর্জ্জপত্র উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল। তাহার পর বলিল, আজ তোমরা এইখানে থাক। কাল সমস্ত ব্যবস্থা হবে।

বৃদ্ধ উঠিয়া নন্দিনী এবং ছায়াকে আর একটা ঘর দেখাইয়া দিল। সেখানে শয্যা, আহার্য্য সামগ্রী ও পানীয় ছিল। বৃদ্ধ বলিল, আহারাদি ক'রে এই ঘরে তোমরা শয়ন কর, বাইরে কোথাও যেও না। প্রহরীর প্রতি আদেশ আছে, তোমাদের কোথাও যেতে দেবে না।

বৃদ্ধ চলিয়া গেলে পর ছায়া নন্দিনীকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। বলিল, এরা কে? দেখতে ত আমাদের

মত নয়। এদের মুখে ও-রকম কেশ কেন? কাল কি হবে?

নন্দিনী বলিল, যা হবে, দেখতেই পাবে। এরা কে, তাও জান্‌তে পারবে। আমাকে জিজ্ঞাসা করা মিথ্যা। জানই ত আমাদের মুখ বন্ধ, কোন কথা বলবার অনুমতি নেই।

ছায়া নীরব হইল। যেমন তাহাদের নিজের দেশে, তেম্‌নি এখানে সকলের মুখ আঁটা, কাহারও কোন কথা প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই। সবই রহস্যপূর্ণ, সকল বিষয়েই আশঙ্কা। ছায়া শিরী ও লুণার ন্যায় নির্ভীক নয়, তাহার না ছিল সাহস, না ছিল প্রগল্‌ভতা। সর্ব্বদাই তাহার আশঙ্কা, সর্ব্বদাই তাহার সঙ্কোচ। সে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

প্রভাতে উঠিয়া নন্দিনী ও ছায়া দেখিল, ঘরের বাহিরে স্নানাগার আছে, নির্ঝর হইতে জল পড়িতেছে। স্নানাদি করিয়া তাহারা বাড়ীর বাহিরে গিয়া দেখিল, প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে, বৃদ্ধের দেখা নাই।

নন্দিনী প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিল, আমরা বেড়াতে যেতে পারি?

সম্মুখে এক খণ্ড ভূমি দেখাইয়া দিয়া প্রহরী কহিল, এইখানে বেড়াতে পার, দূরে যেও না।

দুই জনে সেখানে খানিকক্ষণ বেড়াইল। চারিদিকে গাছপালা, পাহাড়, দূরে কিছু দেখা যায় না। ফিরিয়া আসিয়া নন্দিনী আবার প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিল, কাল যাঁকে দেখেছিলাম, তিনি কোথায়?

—কোন কাযে গিয়ে থাকবেন, আমাকে কিছু ব'লে যান নি।

দিনের বেলা ছায়া ও নন্দিনী বৃদ্ধকে দেখিতে পাইল না। সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে বৃদ্ধ তাহাদিগকে ডাকিলেন, বলিলেন, আসবার সময় তোমরা শপথ ক'রে এসেছ, কখনও কোন কথা প্রকাশ করবে না?

দুই জনে বলিল, আমরা শপথ করেছি।

তাহাদিগকে ডাকিয়া বৃদ্ধ একটা ঘরে লইয়া গেলেন। ছায়া সভয়ে দেখিল, যে করাল দেবমূর্ত্তি প্রধানারা দেখাইয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তি!

বৃদ্ধ কহিলেন, এঁর সম্মুখে শপথ করেছিলে?

—হাঁ।

—আবার কর। এখানে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করবে বা ঘটবে, কিছু প্রকাশ করবে না।

ছায়া ও নন্দিনী আবার শপথ করিল।

বৃদ্ধ কহিলেন, তোমরা নিজের ঘরে যাও। একটু পরে তোমাদের ডাকব।

গোধূলির সময় বৃদ্ধ নন্দিনী ও ছায়াকে তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। ছায়াকে বলিলেন, পাশের ঘরে নতুন বস্ত্র আছে, তুমি কাপড় ছেড়ে নতুন কাপড় প'রে এস।

ছায়া পাশের ঘরে গিয়া বাস-পরিবর্ত্তন করিয়া আসিল। বৃদ্ধ যেখানে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহার সম্মুখে আর দুইটি আসন ছিল। একটিতে ছায়া বসিল, দ্বিতীয় শূন্য রহিল। নন্দিনী বৃদ্ধের আদেশে কিছু দূরে একটা স্বতন্ত্র আসনে উপবেশন করিল।

বৃদ্ধের পাশে একটা পাত্রে পুষ্পচন্দন ছিল। একটু পরে প্রহরীর সঙ্গে আর ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করিল। প্রহরী তাহার পর বাহিরে গেল।

ছায়া দেখিল, নূতন ব্যক্তি প্রিয়দর্শন, মনোহরকান্তি, যুবা পুরুষ। বৃদ্ধের সঙ্কেত অনুসারে সে ছায়ার নিকটে দ্বিতীয় আসন গ্রহণ করিল।

বৃদ্ধ বলিলেন, সুনন্দ, তোমার এবং এই কন্যা ছায়ার বংশপরিচয় আমি অবগত আছি। তোমাদের মিলনে কোন বাধা অথবা আপত্তি নাই। মিলন অল্পকালের নিমিত্ত, ইহাই এখানকার চিরন্তন প্রথা। সম্মুখে এই কুণ্ডে অগ্নি রহিয়াছে, তোমরা উভয়ে অগ্নি সাক্ষী করিয়া মিলিত হও। আমি মন্ত্র বলিব, তোমরা আবৃত্তি কর।

সুনন্দ ও ছায়ার গলদেশে বৃদ্ধ মাল্য অর্পণ করিলেন, মস্তকে পুষ্প দিলেন, ললাটে চন্দনের টীকা দিলেন। তাহার পর দুই জনকে মন্ত্র উচ্চারণ করাইলেন। সুনন্দকে বলিলেন, তুমি এই কন্যার পাণিগ্রহণ কর।

সুনন্দ ছায়ার হস্ত ধারণ করিল। এতক্ষণ ছায়া ভাবিতেছিল, স্বপ্ন দেখিতেছে, যুবক তাহার হস্ত ধারণ করিতে তাহার অঙ্গ পুলকাঞ্চিত হইল, আবেশে সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইল, চক্ষু আর্দ্র হইল। যুবকের হস্তের মধ্যে তাহার হস্ত থর-থর কম্পিত হইল।

বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, আমার পৌরোহিত্য

সমাধা হইল। তোমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, প্রহরী দেখাইয়া দিবে। নন্দিনী তোমাদের সঙ্গে থাকিবে। আবশ্যক সকল সামগ্রী তোমরা পাইবে।

বৃদ্ধ নবদম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাহারা নন্দিনীর সহিত বাহিরে আসিল। প্রহরী পথ দেখাইয়া চলিল। প্রহরীর পশ্চাতে নন্দিনী, তাহার পশ্চাতে সুনন্দ ও ছায়া। অন্ধকার হইয়াছে, পর্ব্বতের পথ বন্ধুর, পথে উপলখণ্ড আকীর্ণ। সুনন্দ আবার ছায়ার হাত ধরিল, ছায়া স্বপ্নাবিষ্টার ন্যায় তাহার সঙ্গে চলিল।

তাহারা অনেক দূর গেল। অবশেষে বনবিন্যস্ত তরুবনের মধ্যে একটি গৃহের সম্মুখে উপনীত হইল। 'এই তোমাদের বাড়ী' বলিয়া প্রহরী ফিরিয়া গেল।

গৃহের দ্বার গবাক্ষ সমুদায় মুক্ত। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাড়ী, পাঁচ ছয়টি ঘর, সকল ঘরে আলোক জ্বলিতেছে, সংসার নির্ব্বাহ করিবার সকল উপকরণ সজ্জিত রহিয়াছে। একটি ঘরে প্রশস্ত শয্যা, শয্যায় ফুল, প্রদীপে সুবাসিত তৈল। নন্দিনী বলিল, এই তোমাদের শোবার ঘর।

ছায়া বলিল, আমি ত তোমার কাছে শোব, তোমার শোবার ঘর কোথায়?

নন্দিনী হাসিয়া উঠিল, বলিল, দূর পাগলি, তুই কিছুই জানিস নে। তুই আর সুনন্দ এই ঘরে শুবি। আমার ঘর ঐ যে ওপাশে রয়েছে।

বিস্ময়ে ছায়ার চক্ষু বিস্ফারিত হইল। তাহার পর তাহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। এরূপ ইতিপূর্ব্বে তাহার কখনও হয় নাই।

আহারান্তে নন্দিনী বলিল, এইবার তোমরা শোও, আমিও শুতে যাই।

অপর সব ঘরের আলোক নিভাইয়া দিয়া, দরজা বন্ধ করিয়া নন্দিনী শয়ন করিতে গেল। সুনন্দ শয়ন-কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, ছায়ার হাত ধরিয়া তাহাকে শয্যায় বসাইয়া, তাহার পাশে বসিল। ছায়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে?

সুনন্দ স্মিত-মুখে বলিল, ও কথা ত আমিও বলতে পারি। তুমি কে?

ছায়ার মুখেও হাসি ফুটিল, কহিল, আমার নাম ত শুনেছ। আমি নদীর ধারে সহরে থাকি। আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে।

সুনন্দ বলিল, তুমিও আমার নাম শুনেছ। আমি এই পাহাড়ে থাকি। তুমি আস্‌বে, সে কথা আমাকে ঐ বুড়ো ব'লে রেখেছিল।

ছায়া দুইটি অঙ্গুলী দিয়া সুনন্দের মুখ স্পর্শ করিল। সুনন্দের মুখে অল্প কোমল শ্মশ্রু দেখা দিয়াছিল। ছায়া বলিল, তোমাদের মুখে চুল হয় কেন? আমাদের দেশে ত কারুর হয় না।

সুনন্দ দুই হস্তে দিয়া ছায়ার মুখ গ্রহণ করিল। বলিল, তোমাদের মুখ এ রকম কেন? আমাদের পাহাড়ে ত কারুর হয় না।

দুই জনে হাসিয়া ফেলিল। দুই জন অনেকক্ষণ ধরিয়া পরস্পরকে নীরবে নিরীক্ষণ করিল। সুনন্দ দুই বাহু দ্বারা ছায়াকে বেষ্টন করিয়া তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইল। ছায়া অস্ফুট পুলকধ্বনি করিয়া সুনন্দের কণ্ঠলগ্ন হইল। দুই জনের মুখে মুখ মিলিল।

১০

অভাবনীয়, অজানিত, অশ্রুতপূর্ব্ব রহস্য সহসা ছায়ার জীবন আচ্ছন্ন, অভিভূত করিয়া ফেলিল। বিবাহ শব্দ সে কোন কালে শুনে নাই, বিবাহ কাহাকে বলে, জানিত না। সুনন্দকে সে কখন দেখে নাই, পুরুষের মর্ম্ম কিছুমাত্র জানিত না। অকস্মাৎ তাহার এরূপ চিত্তবিকার কেন হইল? সুনন্দকে দেখিয়া তাহার আশা মিটিত না, তাহার মুখের কথা শুনিয়া তাহার পরিতৃপ্তি হইত না। তাহাকে এক দণ্ড দেখিতে না পাইলে ছায়া আকুল হইয়া উঠিত, সূর্য্যের আলোক তাহার চক্ষুর সম্মুখে নিভিয়া যাইত। সুনন্দেরও সেই অবস্থা। ছায়াকে দেখিতে দেখিতে চক্ষুর নিমেষ অসহ্য বোধ হইত।

দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া সারাদিন ঘুরিয়া বেড়াইত। যেখানে পথ কঠিন, দুরারোহ, সেখানে সুনন্দ ছায়াকে তুলিয়া লইয়া যাইত। ছায়া তাহার গলা ধরিয়া, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিত। সুনন্দ পর্ব্বতবৃক্ষজাত সুমিষ্ট ফল ছায়াকে পাড়িয়া দিত, ফুল তুলিয়া তাহার মাথায় গুঁজিয়া দিত। নির্জ্জনে বসিয়া দুই জনে স্বভাবের সৌন্দর্য্য

দেখিত; কিন্তু অন্য দিকে কাহারও অধিকক্ষণ দৃষ্টি থাকিত না, ঘুরিয়া ফিরিয়া চারি চক্ষুতে মিলন। আর সব সাধ মিটিত, কেবল পরস্পরের মুখ দেখিবার সাধ কিছুতে মিটিত না। ছায়া স্থনন্দের হস্ত গ্রহণ করিয়া, তাহার অঙ্গুলী লইয়া খেলা করিত, সুনন্দ ছায়ার কেশ গ্রহণ করিয়া নিজের অঙ্গুলীতে জড়াইত।

পর্ব্বতে আসিবার পূর্ব্বে ছায়া মনে করিত, পাহাড়ে উঠিলেই তাহার নীচে অন্য দেশ দেখিতে পাওয়া যায়, ইচ্ছা করিলেই অন্য দেশে নামিয়া যাওয়া যায়। সুনন্দের সহিত একটা পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিয়া ছায়ার সে ভ্রম ভাঙ্গিয়া গেল। কোথায় দেশ? পর্ব্বতশ্রেণীর পর পর্ব্বতশ্রেণী, প্রসারের পর প্রসার, কোথাও গিরিশৃঙ্গ তুষারমণ্ডিত, কোথাও নিবিড় পাদপে আচ্ছন্ন। ছায়া জিজ্ঞাসা করিত, পাহাড়ের নীচে দেশ নেই?

সুনন্দ বলিত, থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের ত যেতে দেয় না।

—কে বারণ করে?

—তা বলতে পারিনে। প্রহরীরা বলে, যাবার হুকুম নেই।

—কার হুকুম?

—তা তারাই জানে, আমাদের কিছু বলে না।

পাহাড়ে বেড়াইবার সময় অনেকের সঙ্গে দেখা হইত। প্রায় সকলেই পুরুষ, দৈবাৎ ছায়ার মত দুই চারি জন ছায়াদের নগর হইতে আসিয়াছে। যেমন ছায়াকে পাঠাইয়া দিয়াছিল, তাহাদিগকেও সেইরূপ পাঠাইয়া দিয়াছে। ছায়া তাহাদিগকে চিনিত, পথে দেখা হইলে দাঁড়াইয়া তাহাদের সঙ্গে গল্প করিত।

তরুণবয়স্ক ও প্রাচীন লোক ছাড়া পথে ছায়া বালক দেখিতে পাইত। সুনন্দকে জিজ্ঞাসা করিত, এরা কে?

সুনন্দ বলিত, এরা ছেলে। ছেলে হ'লে এখানে রাখে, মেয়ে হ'লে তোমাদের দেশে পাঠিয়ে দেয়।

ছায়া ঠিক বুঝিতে পারিল না, কিন্তু একটা কিসের আশঙ্কায় তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল।

কখন কখন দুই জনে আকাশে বিচরণ করিত। অধিক উপরে উঠিলে অত্যন্ত শীত অনুভব হইত, নিশ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হইত। পাহাড়ের দিকে বড় একটা কিছু দেখা যাইত না, সহরের দিকে বিপুলসলিলা নদী শীর্ণরেখা নির্ঝরিণীর ন্যায় দেখা যাইত। স্থানে স্থানে প্রহরা, প্রহরীরা ঊর্দ্ধমুখ হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

পর্ব্বতের অভ্যন্তর হইতে যেখানে নদীর নির্গমন-পথ, সুনন্দ ছায়াকে তাহা দেখাইতে লইয়া যাইত। শিরী ও লূণা পশ্চিমদিকে দেখিয়াছিল, নদী পর্ব্বতের ভিতর প্রবেশ করিতেছে, পূর্ব্বদিকে ছায়া দেখিল, বিশাল পর্ব্বতকন্দর হইতে নদী নির্গত হইতেছে। এখানে দেখিতে আর এক রকম। জলের সে রকম উচ্ছ্বাস নাই, সেরূপ বজ্রনিনাদ নাই, স্রোত সেরূপ আবর্ত্তবহুল নয়। কল-কল ছল-ছল তর-তর রবে অজস্র, অবিশ্রান্ত প্রবাহ, পর্ব্বতের নীচে দুই তট পরিপূর্ণ, উদ্বেলিত করিয়া বহিয়া যাইতেছে। কিছু দূর নদী সঙ্কীর্ণ, তাহার পর ক্রমেই তাহার প্রসার বাড়িয়া গিয়াছে। ছায়া বৈকালবেলা অনেক সময় সুনন্দের সঙ্গে গিয়া সেখানে বসিত।

কলবাহিনী স্রোতস্বিনী দেখিয়া ছায়া বলিত, এখানে একখানা নৌকা থাকলে আমরা আমাদের দেশে চ'লে যেতে পারি।

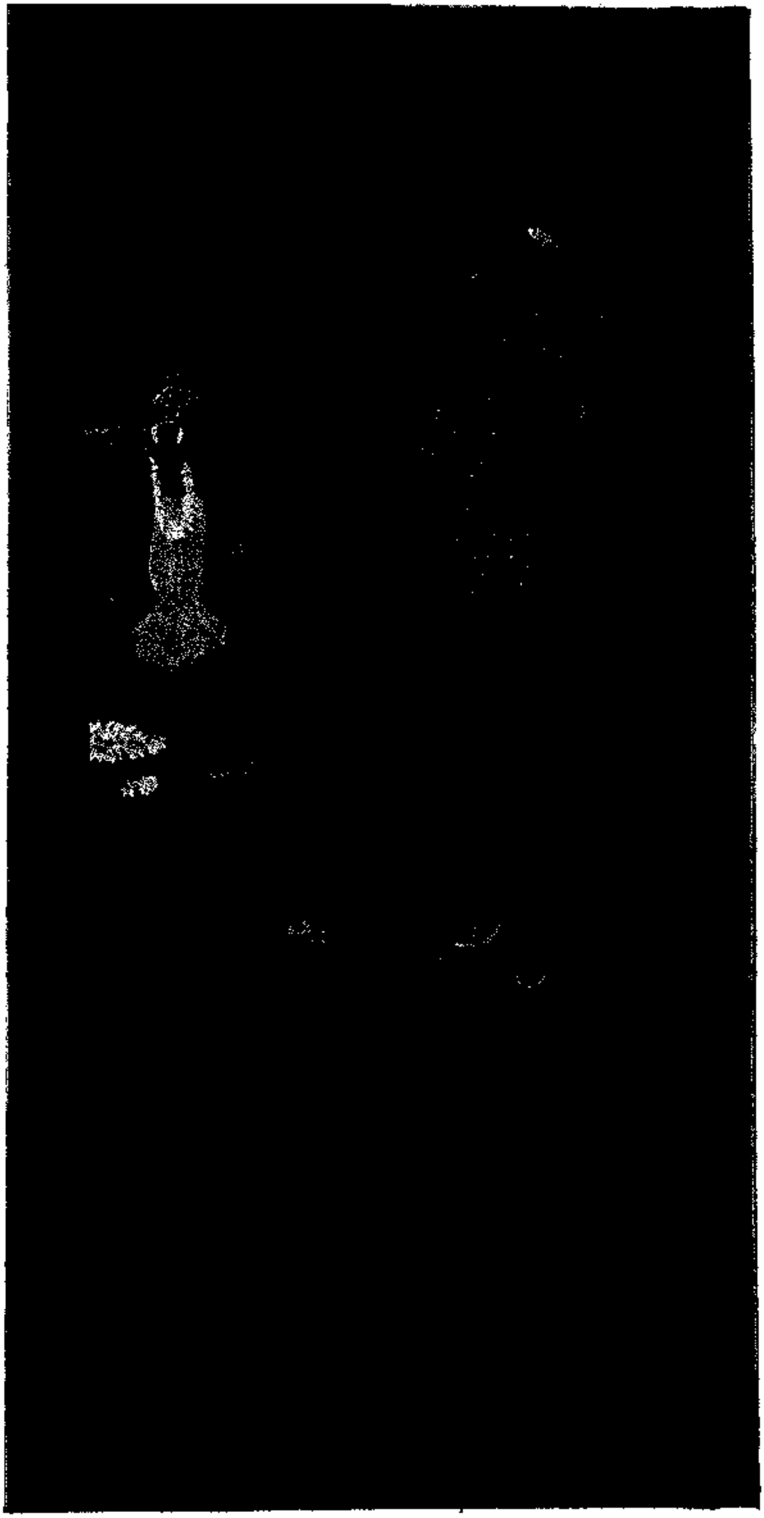
সুনন্দ উপরদিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিত, ওখানে কে দাঁড়িয়ে আছে দেখেছ? আমাদের কি সাধ্য যে আমরা চ'লে যাব?

ছায়া দেখিত, এক জন প্রহরী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ছায়া বিরক্ত হইয়া বলিত, সেখানেই নাই, ওরা দাঁড়িয়ে আছে। ওদের দৃষ্টি কি এড়াবার উপায় নেই?

সুনন্দ মাথা নাড়িয়া বলিত, এখান থেকে যাবার কোন উপায় নেই, ওরা সব পথ আগ্‌লে থাকে।

সুনন্দ ও ছায়া সুখে আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকিত, ভবিষ্যতের কথা তাহাদের মনে হইত না। তথাপি সময়ে সময়ে তাহাদের চিত্তমুকুরে বিষাদের ছায়া পতিত হইত, ভাবী আশঙ্কায় তাহারা শিহরিয়া উঠিত। রাত্রিকালে দুই জনে নিদ্রিত রহিয়াছে, অকস্মাৎ শীতলস্পর্শ সর্পের ন্যায় আতঙ্ক তাহাদের বক্ষ স্পর্শ করিত, সুনন্দ চকিত হইয়া ছায়াকে ডাকিত, ছায়া! ছায়া!

ছায়া নিদ্রোত্থিত হইয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিত, কি হয়েছে? কিসের ভয়?



বসুমতী-চিত্র-বিভাগ

মীরা

[শিল্পী—শ্রীঅরুণচন্দ্র মুখোপাধ্যা

সুনন্দ রুদ্ধকণ্ঠে বলিত, আমার মনে হচ্ছিল, তুমি এখানে নেই, তোমাকে কোথায় নিয়ে গিয়েছে।

ছায়া দুই হস্তে সুনন্দের হস্ত চাপিয়া ধরিয়া বলিত, আমি তোমাকে ছেড়ে কখনো যাব না।

১১

এক বৎসর পরে ছায়ার একটি পুত্রসন্তান হইল। দ্বাদশ দিবসে পুরোহিত পুত্রের নামকরণ করিলেন। শিশুর নাম হইল কুবলয়।

সুনন্দের সহিত বাস করিয়া ছায়া ভাবিত, জীবনের সুখ পূর্ণ হইয়াছে, হৃদয়ের সকল দ্বার মুক্ত হইয়া সকল কক্ষ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ হইয়াছে, আর কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, কোন কামনা নাই। এখন দেখিল, হৃদয়ের একটি প্রকোষ্ঠের দ্বার রুদ্ধ ছিল, নবজাত বালকের ক্ষুদ্র করস্পর্শে দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া গেল, শিশু সেই কক্ষে রত্ন-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইল। দাম্পত্য প্রেমের একচ্ছত্র রাজ্য মাতৃস্নেহে বিভক্ত হইয়া গেল।

ছায়া বাড়ীর বাহিরে আর কোথাও যাইত না, শিশু-সন্তানকে লালন করিতেই তাহার সমস্ত সময় কাটিয়া যাইত। তাহার পাশে বসিয়া সুনন্দ একদৃষ্টে বালকের মুখ নিরীক্ষণ করিত ;—শিশুর বাল্যলীলা দেখিয়া বিস্মিত, পুলকিত হইত। বালকের কারণে দম্পতির পরস্পরের প্রতি অনুরাগ দৃঢ়তর হইল। পূর্ব্বে দুই জন পরস্পরের মুখ দেখিয়া দর্শনসাধ মিটাইতে পারিত না, এখন পুত্রের মুখ দেখিয়া উভয়ের তৃপ্তি হইত না।

ছায়ার স্নানাহারের সময় নন্দিনী বালককে ক্রোড়ে করিয়া তাহাকে আদর করিত। ছায়া ও সুনন্দের অলক্ষ্যে নন্দিনী অশ্রুমোচন করিত, পাছে তাহারা কেহ তাহার চক্ষুর জল দেখিতে পায়, এই আশঙ্কায় তখনি চক্ষু মুছিয়া ফেলিত।

কুবলয় ছয় মাসের হইলে পুরোহিত আসিয়া ছায়াকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন, তোমাকে একবার আমার সঙ্গে যেতে হবে, প্রধান তোমাকে ডেকেছেন।

ছায়ার বুক কাঁপিয়া উঠিল, মুখ শুকাইয়া গেল। শুষ্ক-মুখে কহিল, কেন? কিসের জন্য আমাকে ডাকা হয়েছে?

পুরোহিত কহিলেন, সেখানে গেলেই জানতে পারবে।

ছায়া কুবলয়কে ক্রোড়ে করিয়া পুরোহিতের সঙ্গে গমন করিতে উদ্যত হইল। সুনন্দ বলিল, আমিও যাব।

তাহারা বাহিরে আসিয়া দেখিল, দুই জন প্রহরী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পুরোহিত সুনন্দকে বলিলেন, তোমার যাবার আদেশ নেই।

সুনন্দ পাষাণ-মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। নন্দিনী দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া অশ্রুমোচন করিতেছিল।

পুরোহিত ও প্রহরিদ্বয়ের সঙ্গে ছায়া চলিয়া গেল। কিছু দূর গিয়া একটা পর্ব্বতের শিখরদেশে প্রস্তরনির্ম্মিত একটা বড় বাড়ী দেখিতে পাইল। পুরোহিতের সহিত ছায়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল। প্রহরীরা বাহিরে দণ্ডায়মান রহিল।

একটি প্রশস্ত কক্ষে বহুমূল্য আসনে এক জন বৃদ্ধ বসিয়া-ছিলেন। দীর্ঘ, শীর্ণ-মূর্ত্তি, শুভ্র শ্মশ্রু-কেশ, তীব্র চক্ষু। তাঁহাকে দেখিয়া ছায়ার স্বদেশের প্রধানাদিগকে মনে পড়িল। পুরোহিত অগ্রসর হইয়া কহিলেন, ইনি ছায়া। আদেশমত ইহাকে লইয়া আসিয়াছি।

প্রধান কহিলেন, উত্তম। ছায়া ও তাহার ক্রোড়স্থ শিশুর প্রতি একবার কটাক্ষপাত করিয়া ছায়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে কেন ডাকিয়াছি, জান?

ছায়ার মুখে কথা বাহির হইতেছিল না। মৃদুস্বরে বলিল, আমি কিছু জানি নে।

বৃদ্ধ কহিলেন, তোমার স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার সময় হইয়াছে। তোমার শপথ মনে রাখিও। শপথ ভঙ্গ করিলে নির্ব্বাসিত হইবে, আর কেহ কখন তোমাকে দেখিতে পাইবে না। কন্যা হইলে তুমি সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিতে, পুত্রসন্তান লইয়া যাইবার নিয়ম নাই। শিশুকে তুমি এইখানে রাখিয়া যাইবে, আমরা উহাকে পালন করিব।

শাবকহারা হইলে ব্যাঘ্রী যেরূপ উন্মত্ত ভীষণ হইয়া উঠে, ছায়া সেইরূপ উন্মাদিনীর ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিল, কহিল, আমার সন্তান আমি রেখে যাব? প্রাণ থাকতে নয়।

ছায়া কুবলয়কে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। বৃদ্ধ উঠিয়া ছায়ার নিকটে আসিলেন। ছায়া আর কথা কহিতে পারিল না, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্থির, নিমেষহীন নয়নে বৃদ্ধের প্রতি চাহিয়া রহিল। বৃদ্ধ কয়েকবার ছায়ার চক্ষু

ও মুখের সম্মুখে অঙ্গুলি চালনা করিলেন। ছায়া নিস্পন্দ হইল। বৃদ্ধ তাহার ক্রোড় হইতে শিশুকে গ্রহণ করিলেন। ছায়াকে বলিলেন, এখন তুমি এই ভাবে থাকিবে। এই শিশুকে অথবা তোমার পতিকে এখন তোমার স্মরণ হইবে না। এই অবস্থায় তুমি দেশে ফিরিয়া যাও। সেখানে তোমার স্মৃতিশক্তি ফিরিয়া আসিবে। এখন এই পুরোহিতের সঙ্গে গমন কর।

ছায়া একটি কথাও না কহিয়া, পুত্রের প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত না করিয়া পুরোহিতের সঙ্গে চলিয়া গেল। ছায়াকে শূন্য-ক্রোড় দেখিয়া প্রহরিদ্বয় কিছু বলিল না, নীরবে তাহার পশ্চাতে চলিল।

নন্দিনী এবং সুনন্দ ছায়ার প্রতীক্ষায় গৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল। ছায়াকে রিক্তক্রোড়ে আসিতে দেখিয়া সুনন্দ আকুল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কুবলয় কোথায়? তাকে কোথায় রেখে এলে?

ছায়া কোন কথা কহিল না, সুনন্দ অথবা নন্দিনীকে সম্ভাষণ করিল না, কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় স্থির হইয়া রহিল। সুনন্দ তাহার হাত ধরিয়া, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, তোমার কি হয়েছে? কোন কথা কইছ না কেন? তোমাকে কে কি করেছে? তুমি আমাকে চিনতে পারছ না?

ছায়া পূর্ববৎ স্থির, মুখে কথা নাই, চক্ষুতে অশ্রু নাই, শূন্যদৃষ্টি।

পুরোহিত নন্দিনীকে বলিলেন, তোমার প্রতি আদেশ— তুমি ছায়াকে সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরে যাও।

নন্দিনী ছায়াকে বলিল, এস, আমরা ফিরে যাই।

সুনন্দ উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

দুই জন প্রহরী বলপূর্ব্বক তাহাকে ধরিয়া রাখিল। নন্দিনী ও ছায়া চলিয়া গেল।

গৃহে ফিরিয়া ছায়ার সকল কথা স্মরণ হইল। সে কাহাকেও কিছু বলিল না, রোদন করিল না, দগ্ধ হৃদয়, শুষ্ক চক্ষু লইয়া গৃহে বাস করিতে লাগিল। নন্দিনীও কোন কথা প্রকাশ করিল না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

দুঃখের গর্ব্ব

দুঃখ যদি দেছ মোরে হে মোর ঈশ্বর
ক্ষতি নাহি গণি তাহে, মাগি এই বর
তোমারে আপন করি, পারি যেন নিতে
মোর দুখে দুখ বলি না পারি ভাবিতে।

হোক সে যতই ব্যথা যত না কঠিন,
পলে পলে যদি মোরে দহে রাত্রি-দিন,—
তবু সে তোমারি দান মনে যেন রয়
স্নেহ-হীন বলি যেন না জাগে সংশয়!

দুখ দিয়ো ক্ষতি নাই ওগো দীননাথ,
স্নেহ-ভরে দুখ'পরে কোরো অশ্রুপাত;
চাহি না লভিতে সুখ অলস পরাণ
রচিবে মোদের মাঝে কত ব্যবধান।

দুখ দিয়ে সাথে থেকো প্রতি রাত্রিদিন,
সুখ দিয়ে হয়ো নাক করুণা-বিহীন।

শ্রীকমলকৃষ্ণ মজুমদার



সাহিত্যের বৈঠক

ভগবদ্‌গীতা ও বাঙ্গালার প্রেম-ধর্ম্ম

গত পৌষ মাসের "উদ্বোধনে" অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র রায় বাহাদুরের গত কার্ত্তিকের "উদ্বোধনে" প্রকাশিত "বাঙ্গালার প্রেম-ধর্ম্ম" নামক প্রবন্ধের যে সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলাম, বৈশাখের "মাসিক-বসুমতী"তে অধ্যাপক মিত্র মহাশয়ের লিখিত "ভক্তি-ধর্ম্ম ও রাধাভাব" নামক তাঁহার প্রতিবাদ পাঠ করিয়া লেখককে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। পাশ্চাত্য রীতিতে নির্লিপ্ত-(objective) ভাবে বাঙ্গালার বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ভাবধারার উৎপত্তি এবং পরিণতির ইতিহাস আলোচনা আমার উদ্দেশ্য। এইরূপ আলোচনায় সফলতা লাভ করিতে হইলে যাঁহারা ভাবের ভাবুক, তাঁহাদের অভিমত যত জানা যায়, ততই ভাল। অধ্যাপক মিত্র মহাশয় ভাবের ভাবুকও বটেন এবং ভাবধারার ঐতিহাসিকও বটেন। আমি তাঁহার লিখিত বৈষ্ণবধর্ম্মভাবের ব্যাখ্যান পাঠ করিয়া উপকৃত হইয়াছি। তাঁহার দুইটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত আমি স্বীকার করিতে পারি নাই। প্রথম সিদ্ধান্ত, গীতায় জ্ঞানের তুলনায় ভক্তির প্রাধান্য। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত, রামানন্দ রায়ের নিকট শ্রীচৈতন্যের রাধাভাব শিক্ষা; শ্রীচৈতন্যের সহিত রামানন্দের মিলনের পূর্ব্বে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে রাধাভাবের অভাব। অধ্যাপক মিত্র মহাশয়ের প্রতিবাদ পাঠ করিয়া আমার মনে হয়, তিনি এবারেও তাঁহার সিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তাঁহার প্রতিবাদের আলোচনা করিয়া আমার এইরূপ মনে করিবার হেতু দেখাইতেছি।

(১) গীতার ভক্তিধর্ম্ম

ভগবদ্‌গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ দুইটি শ্লোক (৪৬।৪৭) এই—

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥"

অধ্যাপক মিত্র মহাশয় তাঁহার প্রথম প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন মাত্র এই চারি পংক্তির শেষ পংক্তিটি, এবং উভয় শ্লোকের অনুবাদ প্রদান করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, জ্ঞানী হইতে ভক্ত শ্রেষ্ঠ। এবারেও লিখিয়াছেন, "আমি ঐ শ্লোকের সাহায্যে বলিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, জ্ঞানী হইতে ভক্ত শ্রেষ্ঠ; সুতরাং জ্ঞান হইতে ভক্তি শ্রেষ্ঠ।" তাহার পর আমার কথা উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—

"প্রকৃত কথা এই যে, চন্দ মহাশয় আমার এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি তাঁহার নিজের মতের অনুকূল ব্যাখ্যা চাহেন। যদি তাহাই হয়, তবে সেই কথা বলিলেই হইত। যাহা হউক, চন্দ মহাশয় বলেন, 'জ্ঞানী হইতে ভক্ত শ্রেষ্ঠ, এ কথাই নয়। সুতরাং ৪৬ শ্লোকে যোগী অপেক্ষা হীন যে জ্ঞানীর উল্লেখ আছে, সেই জ্ঞানী অন্য রকম জ্ঞানী।' "শঙ্কর ৪৬ শ্লোকের ভাষ্যে 'জ্ঞানী' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'জ্ঞানমত্র শাস্ত্রপাণ্ডিত্যং' এখানে জ্ঞান শব্দে শাস্ত্রজ্ঞান বুঝায়।"

ঠিক এই কথার পর এই ৬।৪৬ শ্লোকে ব্যবহৃত 'জ্ঞানী' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে আমি যে আর একটি প্রমাণ দিয়াছি, অধ্যাপক মিত্র মহাশয় তাহা উদ্ধৃত করেন নাই। সেই অবজ্ঞাত প্রমাণটি এই—

"শ্রীধরস্বামী এই জ্ঞানী অর্থ লিখিয়াছেন—'শাস্ত্র-বিজ্ঞানবিদ'।"

অধ্যাপক মিত্র মহাশয় কেন যে শঙ্করের এবং শ্রীধরস্বামীর মত আমার স্কন্ধে চাপাইয়াছেন, তাহার কারণ বুঝিতে পারি না। তার পর লিখিয়াছেন—

"শাস্ত্রপাণ্ডিত্য বলিয়া যে জ্ঞানের কোনও বিশেষ সংজ্ঞা আছে, তাহা ত জানি না। শব্দের অর্থ নিজ নিজ সুবিধা অনুসারে করিয়া লইতে পারা যায়। শাস্ত্রজ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য কোথায়, তাহা না জানা পর্য্যন্ত এরূপ ব্যাখ্যা অনুমোদন করা কঠিন নহে কি?" (৯৫ পৃঃ)

আমাকে সুবিধাবাদী প্রতিপন্ন করিবার জন্য অধ্যাপক মিত্র মহাশয় এখানে অসাধ্যসাধন করিয়াছেন। পরের পৃষ্ঠায় (৯৬ পৃঃ) তিনি লিখিয়াছেন, সমস্ত গীতাই নাকি আমার প্রতিবাদ করে। অথচ তিনি এখানে স্বচ্ছন্দে ভুলিয়া যাইতে পারিয়াছেন, গীতার ৬।৮ শ্লোকের "জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা" অর্থে শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন, "জ্ঞানমৌপদেশিকং বিজ্ঞানমপরোক্ষানুভবঃ," এবং ৭।২ শ্লোকের "জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানম্" অর্থে লিখিয়াছেন, "জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং বিজ্ঞানমনুভবঃ।" তাঁহার আলোচ্য প্রবন্ধ উপলক্ষেই বিগত ৮।৯ মাস ধরিয়া অধ্যাপক মিত্র মহাশয় গীতার ৬।৪৬-৪৭ শ্লোক আলোচনা করিতেছেন। এই দীর্ঘকাল তিনি কেমন করিয়া এত নিকটবর্ত্তী শ্লোক (৬।৮ এবং ৭।২) উপেক্ষা করিতে পারিলেন, ইহা বুঝিতে পারা যায় না। এইরূপ বিস্মরণ অসাধ্য-সাধন।

তার পর অধ্যাপক মহাশয় আমাকে প্রশ্ন করিয়াছেন—

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।"

এ শ্লোকের ব্যাখ্যায়ও কি মর্ম্মপ্রসাদ, বাবু 'শাস্ত্রিপাণ্ডিত্যং' ধরিবেন ? যেখানে যেরূপ ব্যাখ্যা তাঁহার মতের অনুকূল, তাহাই গ্রহণ করিলে চলিবে কেন ?"

শঙ্করের ভাষ্য এবং শ্রীধরস্বামীর টীকা দেখিলেই এই শ্লোকে (৭।১৯) এবং ইহার পূর্ব্ব তিনটি শ্লোকে একই প্রসঙ্গে ব্যবহৃত "জ্ঞানী" শব্দের অর্থ পাওয়া যায়। ৭।১৬ শ্লোকে ব্যবহৃত "জ্ঞানী" শব্দের অর্থ শঙ্কর লিখিয়াছেন "বিষ্ণোস্তত্ত্ববিৎ," এবং শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন "আত্মবিৎ।" আচার্য্যকে এবং স্বামীকে লঙ্ঘন করিয়া ইহার অধিক আমার কিছু বলিবার নাই।

আমি লিখিয়াছিলাম, "সুতরাং গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষের শ্লোকে (তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী ইত্যাদি) প্রকৃতপ্রস্তাবে ভক্তিকে জ্ঞানের অপেক্ষা বড় করা হয় নাই। ভক্তিকে জ্ঞানের দ্বার বলা হইয়াছে।" ইহার উপর অধ্যাপক মিত্র মহাশয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—

"এ কথার উপর আর কিছু বলা বৃথা। কারণ, সমস্ত গীতাই ইহার প্রতিবাদ বলিয়া আমার মনে হয়।" (৯৬ পৃঃ)

কিন্তু বৃথা হইলেও অধ্যাপক মিত্র মহাশয় আরও অনেক কিছু না বলিয়া ছাড়েন নাই। তিনি গীতার দ্বাদশ অধ্যায় হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, "এইরূপ অসংশয়িতভাবে ভক্তিযোগের প্রাধান্য স্থাপন করা হইয়াছে বলিয়া দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ।" গভীর গীতাশাস্ত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ের সম্বন্ধ-নির্ণয় আমার অসাধ্য। কিন্তু অধ্যাপক মিত্র মহাশয় পূর্ব্বাপর উপেক্ষা করিয়া নিজের মতের সমর্থনে যে ভাবে গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত মনে করি। তাহার কারণ, ভাষ্যকার শঙ্কর এবং শ্রীধরস্বামী ইঁহারা কেহই গীতার দ্বাদশ অধ্যায়কে অর্থাৎ "ভক্তিযোগকে" উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ১২।১ শ্লোকের ভাষ্যের আরম্ভে শঙ্কর লিখিয়াছেন—

"দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত গীতা-শাস্ত্রে [প্রধানতঃ] দুইটি বিষয় বলা হইয়াছে : প্রথম, সেই অবিনাশী, সকল প্রকার নামরূপ-বিনির্ম্মুক্ত নির্ব্বিশেষণ পরব্রহ্মের উপাসনা ; দ্বিতীয়, সর্ব্বপ্রকার যোগৈশ্বর্য্যসম্পন্ন সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞানশক্তিসমন্বিত যে [মায়া নামক] সত্ত্ব, তাহার দ্বারা বিশেষিত যে পরমেশ্বর, তাঁহারই উপাসনা ; এই দ্বিবিধ উপাসনার বিষয় দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত গীতাশাস্ত্রে প্রতিপাদন করিয়া বিশ্বরূপাধ্যায়ে অর্থাৎ একাদশাধ্যায়ে প্রথমতঃ সকল জগতের আত্মস্বরূপ আদ্য ঐশ্বরসম্বন্ধি ত্বদীয় বিশ্বরূপ দেখাইয়াছ ; দেখাইয়াছ যে, কেবল উপাসনার জন্য [সে বিষয়ে সন্দেহ নাই] এইপ্রকার বিশ্বরূপ দেখাইয়া তুমি [হে ভগবন্] পরে মৎকর্ম্মকৃৎ ইত্যাদি শ্লোকের (১১।৫৫) দ্বারা ইহাও বলিয়াছ যে, এই বিশ্বরূপের উপাসকগণ তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ; তবেই ফলতঃ দাঁড়াইতেছে যে, নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা এবং সগুণ ব্রহ্মোপাসনা এই দ্বিবিধ উপাসনাই তুমি গীতাশাস্ত্রে বুঝাইয়াছ ; এক্ষণে এই দুইটি উপাসনার মধ্যে [মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে] কোন্‌টি উৎকৃষ্টতর, তাহাই বুঝিবার ইচ্ছায় আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি" এই প্রকার মনে করিয়া অর্জ্জুন বলিতেছেন (মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণকৃত বঙ্গানুবাদ)—

শ্রীধর স্বামী ১২।১ শ্লোকের টীকার আরম্ভে এই সংগ্রহ শ্লোক লিখিয়াছেন—

নির্গুণোপাসনস্যৈবং সগুণোপাসনস্য চ।
শ্রেয়ঃ কতরদিত্যেতন্নির্ণেতুং দ্বাদশোদ্যমঃ ॥

নির্গুণ ব্রহ্মের এবং সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়ঃ, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য দ্বাদশ অধ্যায়ের সূচনা করা হইয়াছে।

শঙ্কর এবং শ্রীধরস্বামী গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া ত মনে হয় না যে, "অসংশয়িত-ভাবে ভক্তিযোগের প্রাধান্য স্থাপন" গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। তবে কি গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের উদ্দেশ্য অসংশয়িতভাবে কর্ম্ম-যোগের প্রাধান্যস্থাপন, এবং চতুর্থ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য অসংশয়িত-ভাবে জ্ঞানযোগের প্রাধান্যস্থাপন ? অধ্যাপক মিত্র মহাশয়ের গীতাব্যাখ্যার প্রণালী অনুসরণ করিলে বলিতে হয়, গীতায় বিভিন্ন মতের কোন সমন্বয় নাই ; ইহা কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি বা গম-চাউল-দালের খিচুড়ী। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সূচনায় শঙ্কর এবং স্বামী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, দ্বাদশ অধ্যায়কে তাঁহারা গীতার পরবর্ত্তী ভাগের সহিত অসংলগ্ন মনে করেন না। ১৩।১ শ্লোকের ভাষ্যের আরম্ভে কথিত হইয়াছে—

দ্বাদশাধ্যায়ের 'অদ্বেষ্টা' 'সর্ব্বভূতানাং' (১২।১৩) ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা ঐ অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানী সন্ন্যাসি-গণের নিষ্ঠা, অর্থাৎ তাঁহারা কি প্রকার ব্যবহার করেন, তাহা বলা হইয়াছে। কিরূপ তত্ত্বজ্ঞানযুক্ত হইয়া যথোক্ত ধর্ম্ম-সমূহের আচরণ দ্বারা তাঁহারা ভগবানের প্রিয় হইয়া থাকেন, তাহা বুঝাইবার জন্য এই অধ্যায়ের আরম্ভ হইয়াছে (তর্কভূষণের অনুবাদ)।

১৩।১ শ্লোকের টীকার আরম্ভে শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকটি লিখিয়াছেন—

ভক্তানামহমুদ্ধর্ত্তা সংসারাদিত্যবাদি যৎ।
ত্রয়োদশেঽথ তৎসিদ্ধ্যৈ তত্ত্বজ্ঞানমুদীর্য্যতে ॥

সংসারসাগর হইতে আমি ভক্তগণের উদ্ধারকারী ইত্যাদি (১২।৭) যে বলিয়াছেন, অনন্তর ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তাহা সিদ্ধির জন্য তত্ত্বজ্ঞান কথিত হইয়াছে।

সুতরাং দ্বাদশ অধ্যায়ে যে ভক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহাকে জ্ঞানের দ্বার বলা যায় না কি ?

অধ্যাপক মিত্র মহাশয় এই গীতার ১২।২ শ্লোক—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥

উদ্ধৃত করিয়া আমার নিকট জানিতে চাহেন, 'পরা শ্রদ্ধা' অর্থ ভক্তি কি না ? আমার উত্তর, 'পরা শ্রদ্ধা' অর্থ ভক্তি নহে। এই শ্লোকের স্বামীর টীকা অতি সংক্ষিপ্ত। স্বামী শ্রদ্ধার কোন প্রতিশব্দ দেন নাই। শঙ্করও শ্রদ্ধা শব্দের কোন প্রতিশব্দ দেন নাই। কিন্তু 'শ্রদ্ধা' অর্থ যে এখানে ভক্তি নয়, তাহা তিনি প্রকারান্তরে বলিয়াছেন ; অবশ্য ভক্তি উড়াইয়া দিয়া নয়, ভক্তি রাখিয়া। শঙ্কর শ্লোকের প্রথম পাদের অর্থ লিখিয়াছেন—

ময়ি বিশ্বরূপে পরমেশ্বরে সমাধায় মনঃ যে ভক্তাঃ সন্তঃ।
যাহারা আমাতে অর্থাৎ বিশ্বরূপে পরমেশ্বরে মন সমাহিত করিয়া ভক্তিযুক্ত হইয়া ইত্যাদি।

একাদশ অধ্যায়ের শেষ (৫৫) শ্লোকে বিশ্বরূপের প্রসঙ্গে ভক্তির উল্লেখ আছে। সেখানে মদ্ভক্তের বিশেষণ আছে "মৎ-কর্ম্মকৃৎ মৎপরম।" এখান হইতেই ১২।২ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ভক্তি ও ভক্ত টানিয়া আনা হইয়াছে। শ্রীধর স্বামী ভক্তশব্দের অর্থ লিখিয়াছেন, আশ্রিত। গীতার ১৭।১ শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন, "আস্তিক্যবুদ্ধিই শ্রদ্ধা।" শঙ্করও শ্রদ্ধা অর্থ আস্তিক্য-বুদ্ধিই লিখিয়াছেন। আস্তিক্যবুদ্ধি শ্রদ্ধাশব্দের মুখ্য অর্থ।

তার পর অধ্যাপক মিত্র মহাশয় স্বমত-সমর্থনের জন্য এক আশ্চর্য্য রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ।
* * *
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ভক্তির প্রভাবে আমার স্বরূপ ও সর্ব্বব্যাপিত্ব জানিতে পারে।"

দ্বিতীয় পংক্তিটি গীতার ১৮।৫৫ শ্লোকের প্রথম পংক্তি। অধ্যাপক মিত্র মহাশয় এই পংক্তির পর দুইটি দাঁড়ি বসাইয়াছেন। প্রথম পংক্তিটি গীতার ১২।২০ শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তি। এই পংক্তির পরে অধ্যাপক মিত্র মহাশয় একটি দাঁড়ি বসাইয়াছেন। এইরূপ লম্বা দাড়ি দিয়া শ্লোক যোজনার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। ভক্তির প্রভাবে যদি আমার, অর্থাৎ ভগবানের, স্বরূপ জানা যায়, তবে সেই ভক্তি ত জ্ঞানের দ্বারই হইল। সুতরাং তিনি যে ভাবে গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আমার কথার প্রতিবাদ না করিয়া সমর্থন করিতেছে।

অধ্যাপক মিত্র মহাশয় তার পর ধরিয়াছেন, শ্রীধর স্বামীর গীতার্থসংগ্রহ শ্লোক। এই শ্লোকের কোন টীকা আমি পাই নাই, এবং "সুখং" শব্দটি "স্যাৎ" ক্রিয়ার কর্ত্তারূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম। অধ্যাপক মহাশয় বলেন, ইহা ভুল। কেন যে ভুল, কেন যে এইরূপ অর্থ হইতেই পারে না, তাহা জানিতে পারিলে বাধিত হইব। ভুল স্বীকার করিতে আমার কোন সঙ্কোচ নাই। "তৎপ্রসাদাত্মবোধতঃ" পদের আমার পূর্ব্বকৃত "তৎপ্রসাদ-স্বরূপ আত্মজ্ঞান" হইতে "তৎপ্রসাদ হইতে উৎপন্ন আত্মজ্ঞান" অর্থই সহজ। কিন্তু যে ভাবেই শ্লোকের অর্থ করা যাউক, এই শ্লোকে পাওয়া যায়, ভক্তি আত্মজ্ঞানের দ্বার। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী রামানন্দ রায়ের মুখে গীতার ১৮।৫৪ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া গীতার ভক্তিকে বলিয়াছেন "জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি" (মধ্য, ৮।৬৪-৬৮)। অধ্যাপক মিত্র মহাশয় এই নামকরণ স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন কি?

(২) শ্রীচৈতন্যের রাধা-প্রেম

আমি লিখিয়াছিলাম, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্রীচৈতন্য-রামানন্দ-সংবাদ পাঠ করিলে এই ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়,—উভয়েই রাধার ভাবে কৃষ্ণের আরাধনায় রত ছিলেন, এবং শ্রীচৈতন্য রামানন্দের মুখে প্রাণের কথা শুনিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক মিত্র মহাশয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "এই সংবাদ রমাপ্রসাদ বাবু কোথায় পাইলেন?" "ইহা কল্পনার আশ্রয় লইয়া ইতিহাস রচনা," "একটা মনগড়া সিদ্ধান্ত" ইত্যাদি। অধ্যাপক মিত্র মহাশয় যদি কবিরাজ গোস্বামীর লেখা আগাগোড়া বিচার করিতেন, তবে আমার সিদ্ধান্তকে এইরূপ সরাসরি ডিস্‌মিস্ করিতে পারিতেন না। কবিরাজ গোস্বামীর এই প্রকার লেখা বিচার করিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে, তিনি শ্রীচৈতন্যকে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। সুতরাং রামানন্দের মুখে রাধাপ্রেমের ব্যাখ্যা করাইয়া (মধ্য ৮।১০৩-১১৫) তিনি যখন শ্রীচৈতন্যকে দিয়া বলাইলেন,—

প্রভু কহে যে লাগি আইলাম তোমা স্থানে।
সেই সব তত্ত্ববস্তু হৈল মোর জ্ঞানে॥
এবে জানিল সেব্য-সাধন নির্ণয়।
আগে আর আছে কিছু শুনিতে মন হয়॥—

তখন সর্ব্বজ্ঞকে সেব্য-সাধন সম্বন্ধে অজ্ঞ প্রতিপাদন করা তাঁহার উদ্দেশ্য হইতে পারে না, ভক্তের মহিমা বৃদ্ধি করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। অধ্যাপক মিত্র মহাশয় বলিতে পারেন, "সকলে শ্রীচৈতন্যকে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন না। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহাদের পক্ষে কবিরাজ গোস্বামীর লিখিত শ্রীচৈতন্যের উক্তির ভাষাগত অর্থ গ্রহণ করিয়া রামানন্দের সহিত মিলনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাধাপ্রেম সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যের অজ্ঞতা স্বীকার করিবার কোন বাধা নাই।" কিন্তু এইরূপে লেখকের ভাব (spirit) উপেক্ষা করিয়া তাঁহার লেখার ভাষাগত অর্থের উপর নিজের সুবিধামত সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলে সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা হয়।

যদি কোন ব্যক্তি, কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের সর্ব্বজ্ঞতা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া, শ্রীচৈতন্যের রাধাপ্রেম সম্বন্ধে অজ্ঞতা-বিষয়ক উক্তি আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চাহেন, তবে সেইখানেই তাঁহার ক্ষান্ত হইবার সাধ্য নাই, কবিরাজ গোস্বামীর লেখার ভাষাগত অর্থ অনুসরণ করিয়া শ্রীচৈতন্যের অজ্ঞতার সীমানা তাঁহাকে আরও অনেক বাড়াইয়া লইতে হইবে। শ্রীচৈতন্য-রামানন্দ-সংবাদে কবিরাজ গোস্বামী "জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি" পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যের দ্বারা বরাবর প্রশ্ন করাইয়াছেন, "এহো বাহ্য, আগে কহ আর," এবং শেষ প্রশ্নের উত্তরে যখন—

রায় কহে, 'জ্ঞানশূন্য ভক্তি সাধ্যসার॥'

তার পরেই চৈতন্যের প্রশ্নে আর 'এহো বাহ্য' নাই; তাহার স্থানে আছে 'এহো হয়'। যথা—

প্রভু কহে, 'এহো হয়, আগে কহ আর।'
রায় কহে, 'প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার।'
প্রভু কহে, 'এহো হয়, আগে কহ আর।'
রায় কহে, 'দাস্য-প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥'
ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই সকল বচনের ভাষাগত অর্থমাত্র স্বীকার করিলে বলিতে হয়, রামানন্দের সহিত মিলনের পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য যে কেবল রাধাপ্রেম সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন, তাহা নয়, তিনি প্রেমভক্তি, দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম, কান্তাভাব প্রভৃতিরও কোন সংবাদ

রাখিতেন না। কবিরাজ গোস্বামী সতর্ক লেখক। তিনি ভাষার তাল ঠিক রাখিয়া রূপগোস্বামীর শিক্ষাদান প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন (মধ্য ১৯।১১৬)—

"রামানন্দ-পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিলা।
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিলা॥"

অর্থাৎ রামানন্দের নিকট শ্রীচৈতন্য যত সিদ্ধান্ত শুনিয়াছিলেন, সকলগুলির সম্বন্ধেই তিনি যেন পূর্ব্বে অজ্ঞ ছিলেন এবং রামানন্দের নিকট ঐ সকল সিদ্ধান্ত শিখিয়া রূপগোস্বামীকে শিক্ষা দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অধ্যাপক মিত্র মহাশয় কবিরাজ গোস্বামীর শব্দের অনুসরণ করিয়া এতদূর যাইতে প্রস্তুত আছেন কি ?

"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের" অন্ত্যলীলার সপ্তম পরিচ্ছেদে—

"রামানন্দ রায় কৃষ্ণরসের নিধান।
তেঁহ জানাইল কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।"—

এই পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া—

এ সব শিখাইল মোরে রায় রামানন্দ।
সে সব শুনিতে হয় পরম আনন্দ॥
কহ না যায় রামানন্দের প্রভাব।
রায় প্রসাদে জানিলুঁ ব্রজের শুদ্ধভাব॥ (২৩-৩৭)—

পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য বল্লভভট্টকে বলিয়াছিলেন, তিনি যাহা কিছু জানেন, সকলই শিখিয়াছেন রামানন্দ রায়ের নিকট। অধ্যাপক মিত্র মহাশয় এই সকল বচন উপেক্ষা করিয়া রাধাপ্রেম-সম্বন্ধীয় ঋণের উপর এত জোর দিলেন কেন, তাহা বুঝা যায় না। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে বিপরীত সংবাদ পাওয়া যায়। গয়ায় ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষার পর নবদ্বীপে ফিরিয়া বিশ্বম্ভর কি করিলেন ?

দীক্ষা অনন্তর হৈল প্রেমের প্রকাশ।
দেশে আগমন পুনঃ প্রেমের বিলাস॥

অদ্বৈতকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন ; নিত্যানন্দকে দেখাইলেন প্রথমতঃ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শার্ঙ্গ-বেণুধর ষড়্ভুজ মূর্ত্তি, তার পর দুই হাতে শঙ্খচক্র এবং দুই হাতে বেণু বাজাইতে রত ত্রিভঙ্গ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, এবং শেষে দ্বিভুজ বংশীবদন শ্যাম-অঙ্গ পীতবস্ত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন মূর্ত্তি। কবিরাজ গোস্বামী যাঁহাকে বংশীবদন ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, রামানন্দের সহিত আলাপের পূর্ব্বে তিনি যে প্রেমভক্তি-বিষয়ক সিদ্ধান্ত সকল একেবারে জানিতেন না, এইরূপ বিশ্বাস কবিরাজ গোস্বামীর স্কন্ধে চাপান যাইতে পারে না।

আদিলীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, বিশ্বম্ভর প্রচার করিয়াছিলেন—

জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ হেতু এক, কৃষ্ণ-প্রেমরস। ৭৫॥

এই প্রেমরস কি শান্ত, না দাস্য, না বাৎসল্য, না মাধুর্য্যরস, না এই সকল রসই ইহার অন্তর্গত, তাহা এখানে খোলাখা করিয়া বলা হয় নাই। কিন্তু খোলাখা করিয়া বলা হয় নাই বলিয়াই যে কোন রস বাদ পড়িয়াছে, এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। আদিলীলার এই একটি পয়ার হইতেই বুঝিতে পারা যায়, কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-রামানন্দ-সংবাদে যেরূপ ভাবাই প্রয়োগ করিয়া থাকুন,—তিনি জানিতেন, সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্বেই বিশ্বম্ভর কৃষ্ণপ্রেমধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক মিত্র মহাশয় স্বীকার করেন, বিশ্বম্ভর সন্ন্যাসের পূর্ব্বে মধুর রসের এক অঙ্গ, গোপীভাব পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন ; বাকী ছিল রাধাভাব। তিনি যে তখন ভাবাবেশে 'গোপী' 'গোপী' নাম লইয়াছেন, এমন প্রমাণ শ্রীচৈতন্যভাগবতে এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে, কিন্তু রাধা ভাবে 'রাধা' 'রাধা' নাম করিয়াছেন, এমন প্রমাণ এই দুই গ্রন্থে নাই। কিন্তু বিশ্বম্ভর কখনও 'রাধা' 'রাধা' নাম নাই করুন, তিনি যে রাধাপ্রেমের সংবাদ রাখিতেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। জয়দেবের "গীতগোবিন্দের" নায়িকা রাধা।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার ষোড়শ পরিচ্ছেদে নিমাইপণ্ডিত দিগ্বিজয়ীকে বলিতেছেন—

ভবভূতি, জয়দেব, আর কালিদাস।
তাঁ-সবার কবিত্বে হয় দোষের প্রকাশ। ১০১॥

এখানে জয়দেব বলিতে "শ্রীগীতগোবিন্দ" বুঝায়, এইরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে। দীক্ষার পর যাঁহার "প্রেমের প্রকাশ" হইয়াছিল, "প্রেমের বিলাস" আরম্ভ হইয়াছিল, যিনি প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, "কৃষ্ণবশ হেতু এক, কৃষ্ণপ্রেমরস," এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দের সহিত যাঁহার পরিচয় ছিল, তিনি যে রামানন্দ রায়ের সহিত আলাপের পূর্ব্বে রাধাপ্রেম সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন, এ কথা স্বীকার করা যায় না।

"বিশ্বম্ভরের রাধাপ্রেমের সহিত পরিচয়ের দ্বিতীয় প্রমাণ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি, ১৭।২৪১—২৪২) সূচিত হইয়াছে—

"তবে আচার্য্যের ঘরে কৈল কৃষ্ণলীলা।
রুক্মিণ্যাদিরূপ প্রভু যাতে আপনে হৈলা॥
কভু দুর্গা, লক্ষ্মী হয়, কভু বা চিচ্ছক্তি।
খাটে বসি ভক্তগণে দিল প্রেমভক্তি॥"

চন্দ্রশেখর আচার্য্যের ঘরে এই কৃষ্ণলীলাভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ শ্রীচৈতন্যভাগবতে (মধ্যখণ্ড, অষ্টাদশ অধ্যায়ে) পাওয়া যায়। এই অভিনয়ে বিশ্বম্ভর রুক্মিণীর ভূমিকা, নিত্যানন্দ বড়াইবুড়ীর ভূমিকা, এবং শ্রীবাস নারদের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রুক্মিণীর বেশে নৃত্য করিতে করিতে বিশ্বম্ভর নানাভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে এক ভাবে—

ক্ষণে বলে, "চল বড়াই, যাই বৃন্দাবনে।"
গোকুল-সুন্দরী-ভাব বুঝিয়ে তখনে॥

* * *

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত নিজ শক্তি আছে।
সকল প্রকাশে প্রভু রুক্মিণীর কাছে॥

এই "গোকুল-সুন্দরী" রাধা ভিন্ন আর কে হইতে পারেন ? পরমানন্দদাস কবিকর্ণপূর বিরচিত "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়" নাটকের তৃতীয় অঙ্কে কথিত হইয়াছে, রাধার ভাবের অনুকরণ করিতে ইচ্ছা করিয়া (বৃন্দাবনেশ্বরীভাবমহটিকীর্ষোরমুষ্য) বিশ্বম্ভর এই অভিনয়ের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, এবং স্বয়ং রাধার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় জীবনচরিত নহে,

নাটক। কিন্তু এই নাটকের আখ্যানবস্তু জীবনচরিতমূলক। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ের উপসংহারে কবি লিখিয়াছেন—

শ্রীচৈতন্যকথা যথামতি যথাদৃষ্টং যথাকর্ণিতং জগ্রন্থে কিয়তী তদীয় কৃপয়া—

"যেমন দেখিয়াছি এবং যেমন শুনিয়াছি, তদনুসারে শ্রীচৈতন্যের কৃপায় শ্রীচৈতন্যকথা লিখিলাম।"

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ের রচনাকাল ১৪৯৪ শকাব্দ, অর্থাৎ ১৫৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দ। ইহার ৪০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত বোধ হয় ইহার কিছু পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের শিষ্য ছিলেন, এবং নিত্যানন্দের আদেশমত শ্রীচৈতন্যভাগবত (শ্রীচৈতন্যমঙ্গল) রচনা করিয়াছিলেন। যথা (আদি, ১।৮০)

অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে।
* * *
বেদগুহ্য চৈতন্যচরিত্র কে বা জানে ?
তাই লিখি যাহা শুনিয়াছি ভক্ত-স্থানে।

বৃন্দাবনদাস এবং কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যের পার্ষদগণের মুখে শুনিয়াই শ্রীচৈতন্যের চরিতকথা সঙ্কলন করিয়াছিলেন। এই উভয় লেখক বিশ্বম্ভরের শ্রীকৃষ্ণলীলাভিনয়ের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহার মধ্যে কোন কোন বিষয়ে বিরোধ থাকিলেও উভয়ের মূলই সত্য বলিয়া মনে হয়, অর্থাৎ বিশ্বম্ভর বোধ হয় রুক্মিণী এবং রাধা এই উভয় নায়িকার বেশে এবং আবেশেই অভিনয় করিয়াছিলেন। "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়" নাটকের তৃতীয় অঙ্কে বিশ্বম্ভরের শ্রীরাধার ভূমিকায় অভিনয় বর্ণনা করিয়া কবিকর্ণপুর সপ্তমাঙ্কে রামানন্দের মুখে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণ-রাধার প্রেমের মহিমা শুনাইয়াছেন। এই নাটকের অষ্টম অঙ্কে এই কথোপকথন আছে—

শ্রীকৃষ্ণ। সার্ব্বভৌম এতাবদ্দূরং পর্য্যটিতং ভবৎসদৃশঃ কোঽপি ন দৃষ্টঃ কেবলমেব রামানন্দরায়ঃ। স ত্বলৌকিক এব ভবতি।

সার্ব্ব। দেব অতএব নিবেদিতং সোঽবশ্যমেব দ্রষ্টব্য ইতি।

শ্রীকৃষ্ণ। কিয়ন্ত এব বৈষ্ণবা দৃষ্টাস্তেঽপি নারায়ণোপাসকা এব। অপরেত্তত্ত্ববাদিনস্তে তথাবিধা এব। নিরবদ্যং ন ভবতি তেষাং মতম্। অপরে তু শৈবা এব বহবঃ। পাষণ্ডাস্তু মহাপ্রবলভূয়াংস এব। কিন্তু ভট্টাচার্য্য রামানন্দমতমেব মে রুচিতম্।

সার্ব্ব। ভবন্মত এব প্রবিষ্টোঽসৌ ন তস্য মতকর্ত্তৃতা। স্বামিন্নতঃপরমস্মাকমপ্যেতদেবমতং বহুমতং সর্ব্বশাস্ত্র-প্রতিপাদ্যঞ্চৈতদিতি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বাক্যে যাঁহাদিগকে নারায়ণ-উপাসক বৈষ্ণব বলা হইয়াছে, তাঁহারা শ্রীবৈষ্ণব, এবং দাক্ষিণাত্যের মাধ্ব বৈষ্ণবগণ তত্ত্ববাদী নামে অভিহিত হইয়াছেন। রামানন্দ সম্বন্ধে কবিকর্ণপুর এখানে শ্রীচৈতন্যকে বলাইতেছেন, "রামানন্দের মত আমার কাছে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগে।" সার্ব্বভৌম উত্তর করিলেন, "আপনার মতই রামানন্দ গ্রহণ করিয়াছে; সে মতকর্ত্তা নহে।" তার পর সার্ব্বভৌম বলিতেছেন, "স্বামিন্, অতঃপর ইহাই আমাদের বহুমান্য মত; এবং সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত এই মত।" কবিকর্ণপুরের এই বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায়, তিনি মনে করিতেন, চৈতন্য এবং রামানন্দ উভয়ে পূর্ব্বাবধিই এক প্রকার মত পোষণ করিতেছিলেন।

কি অর্থে যে কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের মুখে রামানন্দ রায়ের সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্তরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, অন্ত্যলীলার পঞ্চম অধ্যায়ে প্রদ্যুম্ন-মিশ্র-সংবাদে তিনি স্বয়ং তাহার সন্ধান দিয়াছেন। শ্রীহট্টবাসী প্রদ্যুম্ন মিশ্র পুরী গিয়া শ্রীচৈতন্যের নিকট কৃষ্ণকথা শুনিতে চাহিলেন। তখন—

প্রভু কহেন, "কৃষ্ণ কথা আমি নাহি জানি।
সবে রামানন্দ জানে তাঁর মুখে শুনি।"

কৃষ্ণকথা সমাপ্ত করিয়া (অন্ত্য ৫-৭) রামানন্দ প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে বলিলেন—

"কৃষ্ণকথাবক্তা করি না জানিহ মোরে।
মোর মুখে কথা কহেন আপনে গৌরচন্দ্র।
যৈছে কহায়, তৈছে কহি, যেন বীণাযন্ত্র।" (৭২-৭৩)।

এই সংবাদ শুনিয়া

প্রভু কহে, "রামানন্দ বিনয়ের খনি।
আপনার কথা পরমুণ্ডে দেন আনি"। ৭৭।

এই সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—

"ভক্তগুণ প্রকাশিতে প্রভু ভাল জানে।
নানা-ভঙ্গীতে প্রকাশি নিজ লাভ মানে।"

বৈষ্ণব সাহিত্যের অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় এবং প্রচারে রত অধ্যাপক মিত্র মহাশয়ের পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া আমার সিদ্ধান্তকে মনগড়া কল্পিত কথা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া বড়ই বিস্ময়কর।

কেবল রামানন্দ রায়ের গুণ প্রকাশিত করিবার জন্যই যে শ্রীচৈতন্য এইরূপ ভাষা ব্যবহার করিতেন এবং চরিতকারগণও তাঁহার মুখে এইরূপ ভাষা আরোপ করিয়াছেন তাহা নয়, এই দীনতা এই মহাপুরুষের স্বভাবসিদ্ধ ছিল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার ষষ্ঠ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে, গৃহত্যাগী রঘুনাথ দাস পুরীতে গিয়া যখন শ্রীচৈতন্যকে বলিলেন

কি মোর কর্ত্তব্য মুই না জানি উদ্দেশ।
আপনি শ্রীমুখে মোর করুন উপদেশ।
হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল।
"তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল।
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব শিখ ইঁহার স্থানে।
আমি যত নাহি জানি, ইঁহো তত জানে।"

কবিরাজ গোস্বামীর এই বিবরণ যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলায় কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যভাগবতের অতিরিক্ত যে সকল ঘটনা লিখিয়াছেন, তাহা প্রধানতঃ সংগ্রহ করিয়াছেন স্বরূপ—দামোদরের কড়চা হইতে। এই কড়চা স্বরূপ লিপিবদ্ধ করেন নাই, প্রিয় শিষ্য রঘুনাথ দাসকে মুখে মুখে শিখাইয়াছিলেন, এবং কবিরাজ গোস্বামী রঘুনাথের নিকট তাহা পাইয়াছিলেন। যথা (মধ্য ২।৮৪)—

চৈতন্যলীলারত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার,
তিঁহো থুইল রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাঁহা কিছু যে শুনিল, তাহা ইহা বিস্তারিল
ভক্তগণে দিল এই ভেটে॥

রঘুনাথদাস স্বরূপের মুখে শুনিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শোনা কথা, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অবশ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এইরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কবিরাজ গোস্বামী যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য মনে করা যাইতে পারে। দীনতা, সম্পূর্ণ আমিত্বহীনতা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের স্বভাবসিদ্ধ ছিল। এই নিমিত্তই তিনি নিজে কোন পুস্তক লিখিয়া যান নাই, মঠ প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান নাই, নিজের দীক্ষিত শিষ্য-সম্প্রদায় প্রবর্তিত করিয়া যান নাই।

(৩) শ্রীচৈতন্যের নূতনত্ব

অধ্যাপক মিত্র মহাশয় আমার সমালোচনার জবাব দিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, তিনি একটি শক্ত চাপানও দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

মহাপ্রভু যে নূতন প্রণালীতে সাধ্য নির্ণয় করিলেন এবং রাধাভাব অঙ্গীকার করিয়া এক অপূর্ব্ব প্রেমধর্ম্মের প্রচার করিলেন, তাহাই ছিল আমার প্রতিপাদ্য। চন্দ মহাশয় বলেন, ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। ভাগবত হইতে এই চৈতন্য-প্রচারিত ধর্ম্মের ধারা আসিয়াছে। (৯৭ পৃঃ)।

চৈতন্য স্বয়ং নূতন প্রণালীতে সাধ্য নির্ণয় করিয়াছিলেন, ইহা যে অধ্যাপক মিত্র মহাশয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, তাহা আমি তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বুঝিতে পারি নাই। আমি বুঝিয়াছিলাম, এই সাধ্য-নির্ণয়ের কর্তৃত্ব তিনি আরোপ করিয়াছেন রামানন্দ রায়ের উপর। আমার বোধ হয়, বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহারেও তিনি রামানন্দ রায়ের কর্তৃত্বই স্বীকার করিয়াছেন। যথা—

কান্তাভাবের উপাসনাও যে দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়াছে, এই নূতন কথাটি তিনি একটু প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারিবেন। রাধানাম পূর্ব্বে থাকিলেও, রামানন্দ-মিলনের আগে 'রাধাভাব' লইয়া এমন প্রেমভক্তির ধর্ম্ম গড়িয়া উঠে নাই। (৯৯ পৃঃ)

রামানন্দের উপদিষ্ট এবং চৈতন্যের আচরিত এবং প্রচারিত প্রেমভক্তিধর্ম্মের নূতনত্ব আমি স্বীকার করি না, কেন না, ইহার মূল আমি ভাগবতে দেখিতে পাই। অধ্যাপক মিত্র মহাশয় আমার নামে এই অভিযোগ আনিয়াছেন। কিন্তু তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন, এই দোষে আমি একা দোষী নহি।

(১) কবিকর্ণপুর এই দোষে দোষী। উপরে যে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় হইতে সার্ব্বভৌমবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে তিনি শ্রীচৈতন্য-রামানন্দের মতকে "সর্ব্বশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য" বলিয়াছেন।

(২) কবিরাজ গোস্বামী (এবং হয় ত রামানন্দ রায়)ও এই দোষে দোষী। রামানন্দ-সংবাদে কবিরাজ গোস্বামী রামানন্দ রায়ের মুখে বলাইয়াছেন—

ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি।
যাঁহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥ (মধ্য, ৮।৭১)

এখানে সর্ব্বশাস্ত্রের কথা ত রহিলই। তার পর রাধাপ্রেম সম্বন্ধে দুইটি বচনও উদ্ধৃত হইয়াছে। একটি পদ্মপুরাণের বচন, এবং আর একটি ভাগবতের এই বচন (১০।৩০।২৮)—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥

আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রীত গোবিন্দ যাঁহাকে লইয়া নিভৃত স্থানে গমন করিলেন, তিনি নিশ্চয়ই ভগবান্ ঈশ্বর হরিকে আরাধনা করিয়াছেন।

এই শ্লোকে পণ্ডিতরা শ্রীরাধানামের বীজ পাইয়া থাকেন। কবিরাজ গোস্বামী অন্যত্র (আদি, ৪।৮৭) লিখিয়াছেন—

কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥

এবং এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে উপরি উক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(৩) স্বয়ং শ্রীচৈতন্যকেও এই দোষে দোষী করা যাইতে পারে। শ্রীচৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবনদাস বিশারদের জাঙ্গালনিবাসী ভাগবতের মহা-অধ্যাপক দেবানন্দ পণ্ডিতের প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যের ভাগবতে কিরূপ প্রগাঢ় ভক্তি ছিল তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। দেবানন্দ পণ্ডিতের ভাগবত-জ্ঞান শাস্ত্র-পাণ্ডিত্যে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তাঁহার ভক্তি ছিল না। এক দিন বিশ্বম্ভর দেবানন্দের ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনিয়া রাগ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার।
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার।
সবে পুরুষার্থ ভক্তি ভাগবতে হয়।
প্রেমরূপ ভাগবত চারিবেদে কয়।
চারিবেদ দধি, ভাগবত নবনীত।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত।"

চৈতন্যভাগবত, মধ্য, ২১।১৪-১৮।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর পুরী হইতে ফিরিয়া শ্রীচৈতন্য যখন কুলিয়া গ্রামে উপস্থিত হইলেন, তখন দেবানন্দ পণ্ডিত গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং কি প্রকারে ভাগবত ব্যাখ্যা করিবেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন—

"শুন বিপ্র ভাগবতে এই বাখানিবা।
ভক্তি বিনা আর কিছু মুখে না আনিবা॥
* * *
মোক্ষ দিয়া ভক্তি গোপ্য করে নারায়ণে।
হেন ভক্তি না জানি কৃষ্ণের কৃপা বিনে।
ভাগবতশাস্ত্রে সে ভক্তির তত্ত্ব কহে।
তেঞি ভাগবত-সম কোন শাস্ত্র নহে।
* * *
এই মত ভাগবত কারো কৃত নয়।
আবির্ভাব তিরোভাব আপনেই হয়।
ভক্তিযোগে ভাগবত ব্যাসের জিহ্বায়।
স্ফূর্ত্তি সে হইল মাত্র কৃষ্ণের কৃপায়।"

চৈতন্য-ভাগবত, অন্ত্য, ৩।৫০৫-৫১২।

(৪) বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও এই দোষে দোষী। অধ্যাপক মিত্র মহাশয় ৯৭ পৃষ্ঠায় শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মমত যে কি, তৎসম্বন্ধে বিশ্বনাথ

চক্রবর্ত্তীর একটি চমৎকার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি এই শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ মাত্র দিয়াছেন। আমি আক্ষরিক অনুবাদ দিতে চেষ্টা করিব—

"আরাধনার বস্তু ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন (গোপাল-কৃষ্ণ); তাঁহার ধাম (নিত্য বাসস্থান) বৃন্দাবন; ব্রজবধূ (গোপী) গণ যে (উপাসনা) উদ্ভাবিত করিয়াছেন, তাহাই রমণীয় উপাসনা; (এই ধর্ম্মের) বিশুদ্ধ প্রমাণের আকর শাস্ত্র ভাগবত; প্রেম মহান্ পুরুষার্থ; ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত; এই মত আমাদের পরম আদরের বস্তু।"

শ্রীচৈতন্যদেব যদি কোন পুস্তক লিখিয়া যাইতেন, তবে যাঁহাদের শাস্ত্রপাণ্ডিত্য আছে, তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারিতেন, শ্রীচৈতন্যের উদ্ভাবিত নূতন তত্ত্ব (original contribution) কি। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-চরিত্রের আমিত্বহীনতায় নূতনত্ব আছে। ধর্ম্মসংস্থাপকগণের ইতিহাসে এতদূর আমিত্বহীনতা দুর্ল্লভ। শ্রীচৈতন্যের আর এক প্রকার নূতনত্বের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। রামানন্দ রায় গজপতি-গৌড়েশ্বরের অধীনে রাজমহীন্দ্রের রাজা (viceroy) ছিলেন (অন্ত্য ৯।১২২)। শ্রীচৈতন্য বিদ্যানগরে (রাজমহীন্দ্রে) গিয়া দশরাত্রি রামানন্দ রায়ের নিকট সাধ্য-সাধনতত্ত্ব এবং রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব শুনিলেন। তার পর বিদায়কালে বলিলেন—

"বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে।
আমি তীর্থ করি তাহা আসিব অল্পকালে।
দুই জনে নীলাচলে রহিব একসঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথারঙ্গে।"

রামানন্দ তাহাই করিলেন। নীরবে উপদেশ শুনিয়া যে এমন করিয়া ধর্ম্মোপদেষ্টার মন ভিজাইয়া তাঁহাকে রাজপদ ছাড়াইতে পারে, এমন সাধুই বা আর কোথায় দেখা যায়? কবিরাজ গোস্বামীর মত অধ্যাপক মিত্র মহাশয় শ্রীচৈতন্যকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিবেন, ইহা আশা করা যায় না; কিন্তু তিনি যে শ্রীচৈতন্যের মানুষোচিত মহত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন নাই, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

কারার ডাক

কংসের কারাগারে
দেবকীমাতা　　গুমরি কাঁদিছে
বুকের পাষাণ-ভারে।
সে কথা যে আজ রহি রহি রহি
লয়ে আসে প্রাণে গুরু ব্যথা বহি,
আঁধারিয়া দেয় বৃন্দাবনের
উজল প্রেমের মেলা।
ভাল নাহি লাগে মাঠে গোচারণ,
কদমতলায় মুরলী-বাদন,
জ্বালা হয়ে উঠে সখা সখী সহ
যত মোর ব্রজ-খেলা—
যখন পড়ে গো মনে
কারাগারতলে　　মিশিছে মায়ের
অশ্রু ধরণী সনে।
কেমনে রহি গো আর
মনে প'ড়ে গেছে　　যমুনার পারে
কংসের কারাগার।
কর্ম্মের ডাকে পদতলে দলি
কেমনে বল না করি রস-কেলি,—
পুষ্পিত মধু কুঞ্জ-ভবনে
যাপি গো যামিনী মোর!
বনফুলমালা গলায় দোলায়ে,
যমুনা-পুলিনে বাঁশরী বাজায়ে,
কেমনে রহি গো রঙিন ফাগের
রঙিন নেশায় ভোর!
যখন ফুকারি কাঁদে
বন্দী মায়ের　　কাতর বেদনা
করুণ আর্ত্তনাদে।

যতেক আকর্ষণ
যমুনার জলে　　দিব ভাসাইয়া
করিব বিসর্জ্জন।
ঘাটে বাটে বাঁশী হাতে বিচরণ,
ঘরে ঘরে ক্ষীর নবনী হরণ,
যত বাজে কাজে কাটাইতে কাল
সকলি ভুলিতে হবে,
মিলনের কথা সখীরে তুল না
নীপ-শাখে আর বেঁধ না ঝুলনা,
মাধবী-লতার কুঞ্জ রচনা
ভেঙে দাও দাও সবে।
ওপার হইতে আজি
কারাগারতলে　　মায়ের রোদন
সহসা উঠেছে বাজি।
হাসি গান সব মিছে,
যমুনার পারে　　দুখ বেদনায়
জননী কাঁদিছে পিছে।
ফেলিলাম দূরে মোহন বাঁশরী
চলিলাম ছাড়ি ব্রজসুন্দরী,
তুলিব না আর হাতের পাঁচনি
মাটীতে পড়িয়া থাক।
গোচারণ মাঠে রহিল গোপাল,
রহিলে তেথায় যতেক রাখাল,
আজি তোমাদের কানায়ের বুকে
জেগেছে মায়ের ডাক।
কেমনে রহি গো আর—
যমুনার পারে　　জননি কাঁদিছে
ডাকে মোরে কারাগার।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।



আত্মদর্শন

এক

জীবনে সুখদুঃখের মধ্যে সীমা টান্‌তে গিয়ে অনেক সময় বুঝ্‌তে পারি না, কোন্‌টা প্রকৃত সুখ আর কোন্‌টা প্রকৃত দুঃখ। যাকে দুঃখ ব'লে ভাবি, সেইটাই হয় ত নিবিড় সুখ।

বিয়ে হয়েছে মাত্র এই তিন বছর, কিন্তু কোন দিন সুখের মুখ দেখেছি ব'লে মনে হয় না। ফুলশয্যার রাতটা কেমন কেটেছিল, মনে নেই ঠিক। স্বামীর গায়ে গা ঠেকিয়ে শুয়ে সে দিনের সে সুখ শিহরণ না ব্রীড়া-বিহ্বলতা? রাঙ্গা চেলীতে আপাদ-মস্তক ঘেরাটোপের মত মুড়ে যখন এ বাড়ীতে পা দিলুম, তখন সুখ পেয়েছিলুম না ছাই! মা-বাবা-ভাই-বোন এবং বন্ধুদের ছেড়ে যেতে হৃদয়ের তারগুলো সব মোচড় দিয়ে উঠছিল; নিজেকে লাগছিল সম্পূর্ণ বেসুরো, আনাড়ীর হাতের এস্রাজের মত।

"দ্যাখ্ ভাই, কিছু ভালো লাগছে না, কেমন যেন বেসুরো ঠেক্‌ছে সব,"—অনিতার কাণে কাণে বলেছিলুম খুব আন্তরিকতার সঙ্গে। কলেজের বন্ধু সে আমার, তাকে খুব ভালোবাসি কি না।

অনিতা সে দিন রঙ্গচ্ছলে আমার চিবুকে হাত দিয়ে বলেছিল, "বেসুরো ত লাগবেই ভাই, না সাধলে কি সুর এম্‌নি আসে। ছড়ের সুন্দর টান পড়্‌লেই এস্রাজ আপনি বেজে উঠ্‌বে।"

ভেবেছিলুম হয় ত তাই, কিন্তু কৈ, সুখ কোথা? অনেকে আমার স্বামি-সৌভাগ্যে হিংসে করে আমায়। আমি ত তার কোন কারণ খুঁজে পাই না। সুখ স্বামি-ঐশ্বর্য্য না তারও ঊর্দ্ধে আর কিছু?

আমার মনের মাঝারে এক বৈরাগী বাসা বেঁধেছে যেন, নইলে কিছু ভালো লাগে না কেন? দুঃখ করবার মত কিছু পাইনি ত আমি। স্বামী কলেজের প্রফেসর, নামজাদা লোক, বই লেখেন উপন্যাস, কবিতার। রূপে কিউপিড্—কন্দর্প না হোক্, তবু কিছু কুশ্রী-কদাকারও নন্। আমার প্রতি আদর-যত্নেরও ত্রুটি নেই। মাস গেলে যা মাইনে পান, তার থেকে এক্‌শো টাকা দেন আমার হাতে, বাকী তাঁর মাকে অর্থাৎ সংসার-খরচের জন্য আমার শাশুড়ীর হাতে।

কত দিন প্রতিবাদ করেছি, এ টাকা আমার কি হবে? তিনি শুধু একটু হেসে বলেন, "আচ্ছা সেকেলে ত তুমি, টাকা পেয়ে বল কি হবে, শঙ্করাচার্য্যের পর প্রথম তুমিই বোধ হয় এ কথা বল্‌লে। বি, এতে ইকনমিক্‌স্ পড়াই তোমার ইউস্‌লেস্ হয়েছে দেখছি।"

ঠিক্ ত, টাকা আবার কার না দরকার হয়? স্নো রুজ, পাউডার-পমেটম, মনের মত সাড়ী-সেমিজ, ব্লাউস-বডিস্ এ সব আস্‌বে কোত্থেকে শুনি?

ঐ ত শাশুড়ী, আধ-সেকেলে মানুষ। রাস্তার ফেরি-ওয়ালাদের কাছ থেকে চড়া দামে কিন্‌বে বিশ্রী সেকেলে সাড়ী—ডুরে, কুঞ্জদার, গঙ্গাজলী এই সব। আহা মরি! নাম শুন্‌লে রাগ হয়।

কিনে আবার রঙ্গ হবে আমার সঙ্গে। "লক্ষ্মীটি বৌমা, বিকেলে গা ধুয়েই আমার কাছে এসো, যাত-তাড়াতাড়ি কোথাও স'রে প'ড়ো না যেন!"

বিকেলে দেখে আমার গায়ে জ্বর আসে যেন; চিবুকে হাত দিয়ে আবার সোহাগ করা হচ্ছে, "কেমন বৌমা, পছন্দ হয়েছে?" আমার যেন চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে হয়, "ছাই হয়েছে পয়সার শ্রাদ্ধ ক'রে এ পিণ্ডি তোমায় কে কিন্‌তে বল্‌লে?"

উঃ, কি ভীষণ! সাড়ী না যেন একখানা পাড়। দুদিক থেকে পাড়ের অভিযান চলেছে। ড্রাগনের মত জরির জিভ বা'র ক'রে কাপড়খানাকে টেনে প্রায় গিলে এনেছে

যেন। দাম শুনে শিউরে উঠে তখনি আবার জোর ক'রে মুখে হাসি এনে বলি, "বাঃ, বেশ হয়েছে, মা।" সাড়ীখানা প'রে মার পায়ে ঠক্ ক'রে একটা প্রণাম ক'রে ফেলুলুম। মা বুকে জড়িয়ে ধ'রে চুমু খেলেন। কাকেও কষ্ট দিতে পারি না কিছুতেই, এ আমার একটা মস্ত দুর্ব্বলতা।

ব্যস! কোথায় বিকেলে একটু এদিক-ওদিক ঘুরে আস্‌বো ভেবেছিলুম, সব বন্ধ হয়ে গেল! এ প'রে কি রাস্তায় বেরোনো যায়? পাড়ের বীভৎস দৃশ্যে—সাড়ীর খস্ খস্ শব্দে রাস্তার লোক সব চেয়ে থাকবে হাঁ ক'রে, জু'তে একটা নয়া আমদানী জানোয়ার দেখার মত চোখে তাদের অপার বিস্ময়। অনিতা ত দেখে হেসেই খুন হবে। তার দাদা সুনীল ঠাট্টা ক'রে হয় ত সমুদ্দুরের একটা যাচ্ছে-তাই জন্তুর গায়ের জেল্লার সঙ্গে আমার সাড়ীর চাকচিক্যের তুলনা দেবে, একটা লুপ্ত অতিকায়ের সঙ্গে আমারই সাদৃশ্য দেখাতে পারে হয় ত। নাঃ, এ প'রে কিছুতেই পথ চলা যায় না। শোবার ঘরে এসে আল্‌মারির ডালায় লাগানো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে চেয়ে গা উঠলো ঘিন্ ঘিন্ ক'রে। জীবনের কুঁড়িত্ব অনেক কাল পেরিয়ে গেলেও এই ত সবে গেল ফাল্গুনে কুড়িতে পা দিয়েছি; কিন্তু সাড়ীখানা প'রে দেখাচ্ছে যেন চল্লিশ বছরের বুড়ীর মত। তবু বাঁচোয়া যে, সে-কালের গয়না পরায় না মা আমায়। সোণায় সোহাগা হ'তো তা হ'লে। পিঠ-ঝাঁপা, ফাঁদি নথ, জশম, সীঁতিপাটি। নাম শুনলে গা রি-রি ক'রে ওঠে!

হঠাৎ হাসি পেল এমন। হিঃ-হিঃ-হিঃ-হিঃ! মুখে রুমালটা চাপা দিলুম, তবু হাসি থামে না। কাপড়খানা প'রে দেখাচ্ছে একটা গ্যাস্‌ভরা কাগজের প্রকাণ্ড ফানুসের মত। পালঙ্কের উপর হাস্‌তে হাস্‌তে লুটিয়ে পড়লুম। কি মোটা হয়েছি আমি! সাত-আট মণ হব নিশ্চয়ই। সে দিন পৃথিবীর সকলের চেয়ে মোটা মেয়ের কথা পড়ছিলুম একখানা ম্যাগাজিনে। তার চেহারার ছবিটা ভেসে উঠলো চোখের সুমুখে। আচ্ছা, ঐ রকম যদি সত্যি হতুম! আবার হাসি—হিঃ-হিঃ-হিঃ-হিঃ!

একখানা বই হাতে উনি ঘরে ঢুক্‌লেন। পায়ের দিকের কাপড়টা গোড়ালি পর্য্যন্ত টেনে দিয়ে বল্‌লুম, "ভাখো গো ভাখো, তোমার মা আমায় কি রকম কাপড় কিনে দিয়েছেন।"

মুচকে হেসে উনি বল্‌লেন, "বাঃ, বেশ দেখতে হয়েছে! দামিনী চমকত—" আরও কি সব বলতে যাচ্ছিলেন, মুখে হাত চাপা দিয়ে থামিয়ে দিলুম আমি।

"চুপ কর, হয়েছে, কবিতা আওড়ে আর পাপ বাড়িও না। কবিতার নাম দিয়েছি কি জান, মিছে কথা, কবিতা না মিছে কথা।"

"বল কি, শুনবে, তা হ'লে?—ঝরণা, তোমার স্ফটিক জলের স্বচ্ছধারা, তাহারি মাঝারে দেখে আপনারে সূর্য্য তারা।"

থামিয়ে দিয়ে বললুম, "বাক্‌মারি বাবা তোমার সঙ্গে কথা কওয়া। আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোন না ছাই।"

"বেশ বেশ, অবহিত হয়েছি। বল এইবার, যা খুশী তোমার।"

"তোমার মা নিজের মনের মত—আমার মনের মত নয়—এই দামী সাড়ীখানা কিনে দিয়েছেন। সাড়ী বললে ভুল বলা হয়, আলখাল্লাবিশেষ। ইংলণ্ডের রাণীদের পোষাকের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এ ভার আমি বইতে পারছি না, অতএব এক জন লোক চাই—যে আমার সঙ্গে সদা-সর্ব্বদা থেকে আমার আঁচল ধরে নিয়ে বেড়াবে।"

উনি হেসে বললেন, "বেশ, মাকে বলছি মাইনে ক'রে একটা লোক রাখতে।"

"না না, দাঁড়াও বলছি, সবতাতে তোমার তামাসা। এ আমি কিছুতেই পরবো না, এখনি খুলে ফেলবো।"

উনি আমার হাতদুটো চেপে ধ'রে বললেন, "না না লক্ষ্মীটি, আমার সাম্‌নে খুলো না যেন। এই খেটেখুটে আস্‌ছি, এখুনি আবার কবিতার ভাব এলে লিখতে বস্‌তে হবে।"

পুরুষগুলো কি অসভ্য বাবা! মুখে আটকায় না কিছু। আমি তাই খুলছিলুম কি না!

দুই

মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়, কোথাও ছুটে পালিয়ে যাই। দুটো কথা কই, এমন এক জনও লোক নেই বাড়ীতে। মার সঙ্গে ও বামুন দির সঙ্গে বাজে কথা কইতে কতক্ষণ-ই বা ভালো লাগে। ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে এমন। উনি ত এক কেমন ধরণের। মন যেন সর্ব্বদাই উড়ু-উড়ু। সে দিন লুকিয়ে ওঁর কবিতার খাতার একখানা পাতা খুলতেই চোখে পড়লো—

"কিংশুকের আরক্ত অংশু, উর্বসীর রক্তরাগ ভূষা,
হরিয়া বিকচ পদ্ম উরসের নির্দোষ মঞ্জুষা,—
রচেছি প্রেমের অর্ঘ—যৌবনের উচ্ছল রক্তিমা,
হে আমার মানস-প্রতিমা।"

আর পড়তে ইচ্ছে হ'ল না। ঘরে শরীরিণী প্রতিমা থাকতে, উনি তাঁর ভালোবাসার অর্ঘ্য সাজাচ্ছেন এক অশরীরিণী মানস-প্রতিমার উদ্দেশে। কোন কথা বলতে গেলেই কি অনুনয়ের সুর! 'চুপ কর, লক্ষীটি, কথা ক'য়ে ভাবটা মাটী ক'রে দিও না, একটা কবিতা লিখছি।'

অসহ্য রাগে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। আমি ভাল-মানুষ কি না, তাই মুখ ফুটে কিছু বলতে পারি না। জ্যান্টি-পির মত জায়া হলেই ও রকম লোকের যোগ্যা হয় ঠিক।

উনি আবার কবিতার চর্চ্চা করেন। ব্রাউনিঙ প'ড়ে প্রেম-বৈদগ্ধ্যে রসিয়ে ওঠেন। কীট্‌স্‌এর কথার কীট মাথার মধ্যে ওঁর কিল্‌কিল্‌ করে। শেলী ভাবের শৈল হেনে ওঁর বুকে সুখের শিহরণ জাগায়। মরি মরি!

তবে স্বামীর আমার যা-কিছু দোষ থাক্ না কেন, তাঁর একটা মস্ত গুণকে স্বীকার না ক'রে থাকতে পারি না আমি। তাঁকে আমার যতটুকু ভালো লাগে, সে শুধু তাঁর উদারতার জন্যে। তিনি বলেন, "আমার যা ভাল লাগে, তোমার তা ভাল নাও লাগতে পারে। তোমার অনিচ্ছায় আমার ভালো-লাগার বোঝা তোমার ঘাড়ে আমি চাপাতে চাই না। সত্যি সত্যিই তুমি যা ভাল বোঝো, তাই ক'রো।" উনি যদি অত উদার না হতেন, তা' হ'লে এত দিনে আমার আত্মহত্যা করতে হ'ত, কি নিতে হ'ত ডিভোর্স আইনের সাহায্য।

বিকেলে বেড়াতে যাই অনিতাদের বাড়ী। ওখান থেকে অনিতা, তার বোন্ অমিতা ও দাদা সুনীলের সঙ্গে যাই লেকে। বাসের ওপর দু'তিন জনে হাত ধ'রে বেড়াতে বেশ আনন্দ হয়।

সাজসজ্জা শেষ ক'রে বাড়ী থেকে বেরোবার সময় কোন কোন দিন স্বামীর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে যাই, বই হাতে কলেজ থেকে ফিরছেন। সব সময়ে তাঁর হাতে একখানা ইংরেজী নভেল, নাটক কি কবিতার বই থাকেই।

দেখা হ'লে কথা নেহাৎ না কইলেই নয়, এমন ভাবে জিজ্ঞাসা করেন, "কোথা চললে?"

সংক্ষেপে 'লেকে' ব'লে এগোতে যাব কি তিনি বলেন, "সাবধানে পথ চ'লো।" ঐ সব উপদেশ শুনলে আমার হাড়-অস্থি জ্ব'লে যায়।

ঘুরে সুমুখে এসে বললুম, "তুমি কি আমায় রান্নাঘরে আর আঁচলের আড়ালে পেঁচার মত ব'সে থাকলেই ভাল দেখ? বিকেলে একটু বেড়াতে যাওয়া কি তুমি আমার পছন্দ কর না?" কথাগুলো আপনি আমার অজ্ঞাতসারেই তীব্র-ভাবে মুখ থেকে বেরিয়ে আসে যেন। কতকটা অনিচ্ছায় তাঁকে আঘাত দিয়ে ফেলি। তাঁর প্রতিকূল মত যদি তাঁরই মত ব'লে প্রচার করা যায় ত তিনি মরমে ম'রে যান।

স্বামী আমার এত কাছে স'রে এসে মুখের কাছে মুখ নিয়ে এলেন, ভাবলুম, হয় ত ক'রে ফেলবেন বিশেষ একটা লজ্জার কায। কিন্তু মোটেই তা নয়। আমার হাত দু'খানা আপন হাতের মধ্যে নিয়ে মিনতিভরা কণ্ঠস্বরে তিনি বললেন, "ভুল বুঝো না আমায়, প্রতিমা। তোমাকে এ রকম ভাবে বেড়াতে দেখলে সত্যি আমার আনন্দ হয়। শিখ-ড্রাইভারগুলো এমন অসভ্যের মত বাস্ চালায়, তাই—।"

"আচ্ছা গো আচ্ছা, আমি কচি খুকী নই," ব'লে সদর-দরজা পেরিয়ে পিচের রাস্তার ওপর এসে একটা বাসের হাতল ধ'রে উঠতে যাব, আমাদের বাড়ীর ফটকের দিকে চোখ পড়তেই দেখি, স্বামী আমার তখনও আমার দিকে নিশ্চল অপলকে তাকিয়ে।

বাসে উঠে প্রাণটা ব্যথিয়ে ওঠে নিজের রূঢ়তার জন্যে। কত দিন মাঝ-রাত পর্য্যন্ত জেগে জন্ ডনের কবিতা পড়েছি দু'জনে একসঙ্গে, নির্দ্বিধায়, বিনা লজ্জায় দুজনে আলোচনা করেছি য়ুরোপ-আমেরিকার মেয়েদের শিক্ষা, সভ্যতা ও স্বাধীনতার কথা। এই যে আমি এই রকম হট্ট-হট্ট ক'রে বেড়াই, যেখানে খুসী যাই, যা ইচ্ছে করি, শাসনের সুরে স্বামীর কর্ত্তৃত্ব নিয়ে এ সবের তিনি প্রতিবাদ করেন নি কোন দিন। সপ্তাহে তিন চার দিন ত যাই শপিং করতে হগ সাহেবের বাজারে কি কলেজ ষ্ট্রীটে। ব্লাউজের জন্যে নানা রঙের সিল্কের টুকরো কেনা আমার একটা বাই। আর আমার কাপড় ত আমি নিজেই কিনি,—রেড্ডিও, কাশ্মীরী, বোম্বাই, যে শাড়ী যে দিন পছন্দ হয়। তবু ইদানীং ওঁকে কেন ভাল লাগে না যে বুঝতে পারি না কিছু।

এই প্রায় মাস দুই হ'ল। জুতো-জোড়া ছিঁড়ে গেছলো

একটু। সকালে মখমলের স্যাণ্ডাল্ প'রে বেরিয়েছিলুম এক জোড়া নতুন কিন্‌তে। দেখে শুনে পছন্দসই গিরগিটির চামড়ার জুতো জোড়া কিনে বাড়ী ফিরতে বেলা প্রায় হয়ে গেছলো সাড়ে বারোটা। ভেবেছিলুম, উনি রাগ করবেন আর মা নিশ্চয়ই খুব বকবেন। কিন্তু কিছুই না।

স্বামী বল্লেন, "আরসিতে দেখ একবার, রোদে পুড়ে মুখখানা লোভনীয় হয়ে উঠেছে।"

তাঁর লোভকে প্রশ্রয় না দিয়ে মার কাছে যেতে তিনি পঞ্চমে স্বর তুল্লেন, "কোথা গেছলে বৌমা, পুরুষমানুষের উপর টেক্কা দিচ্ছ যে। ও মা, এ যে মেমেদের মত হিল্-তোলা জুতো! এ প'রে ডিঙ্গী মেরে মেরে কি ক'রে যে চল, ভেবে পাই না। তা বৌমা, এই কিন্‌তে কি এত বিলম্ব করতে হয়, সেই কোন্ সক্কালে বেরিয়েছিলে; আমিই বা এমন ক'রে ভাতের থালা মুখে ক'রে কতক্ষণ ব'সে থাকি।"

"তুমি খেয়ে নিলে না কেন?"

"ও মা! মেয়ের কথা শোন, উনি রোদে তেতে-পুড়ে আসবেন,আর আমি খেয়েদেয়ে আরাম করবো। ও ঠাক্রুণ—" মা বামুন-দিকে হাঁক দিলেন আমার খাবারের জন্যে।

মা এ দিকে মন্দ না, খুব ভালোবাসেন আমায়, তবু ঐ যে কেমন সেকেলেপণা গেল না। একটু বেরোবো না ত কি হেঁসেলে দিনরাত ব'সে থাকবো?

এক দিনের কথা মনে হ'লে আমার নিজেরই লজ্জা হয়। কি যে মতিচ্ছন্ন হয়েছিল আমার, তা' এখন ভাবলে নিজেকেই দুষতে ইচ্ছে হয়।

ছোট ভাইটাকে অনেক দিন দেখিনি, কোলের বোনটা চলতে পারে কি না, বাড়ীর পাশে আমার স'য়ের কি ছেলে-পুলে হ'ল,—এই রকম নানা প্রশ্ন মনে মনে তোলা-পাড়া ক'রে কাকেও কিছু না জানিয়ে বেরিয়ে পড়লুম—নারকেল-ডাঙ্গার উদ্দেশে, আমার বাপের বাড়ী, আমার জন্মস্থান, আমার সতেরো বছর পর্য্যন্ত হাসি-কান্না, খেলা-ধুলোর মুখরতা আজও রণিত হচ্ছে যার ঘরে-ঘরে। শ্যামবাজার আর নারকেলডাঙ্গা কত দূর-ই বা! আনন্দের আতিশয্যে ফিরতে ভুলে গেলুম সে দিন। সকালে ফিরে স্বামীর মুখে লক্ষ্য করলুম স্পষ্ট উৎকণ্ঠার চিহ্ন। মা ত রায় দিলেন, ঘরের বৌ যে বিনা বলা-কওয়ায় একা সারারাত বাইরে কাটিয়ে আসে, এমন অবধূত-ছিষ্টিছাড়া কাণ্ড তিনি তাঁর এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে চোখে দেখা ত চুলোয় যাক, শোনেন-ও নি কোনো দিন।

ইচ্ছে হয়েছিল ওঁর কাছে ক্ষমা চাই, কিন্তু আমার শিক্ষা আমার আত্মসম্মান জাগিয়ে দিয়ে বল্লে, "কেন, কিসের জন্যে নিজেকে ছোট করবে, কি-ই বা অপরাধ হয়েছে!"

তবে, যাই বলি না কেন, আর জন্মে অপর্ণার মত কত তপস্যা করলে তবে এমন স্বামী মেলে।

তিন

ঐ অনিরুদ্ধ, না অরবিন্দ, কি-যে-ছাই ওর নাম, তা মনেও আসে না। সুনীলের বন্ধু। উঃ, কি বেহায়া ঐ ছোঁড়াটা! বাইরে যত সুশ্রী, ভেতোরে ততোধিক কুশ্রী ও।

সকলে লেকে বেড়াতে গেছি। আমি, সুনীল, অনিতা, অমিতা আর ঐ ছেলেটা। ওখানকার ঐ দোদুল্যমান পোলটায় উঠে সকলে বেশ দোল খাচ্ছি। আকস্মিক এক সময় সুনীলের ঐ বেহায়া বন্ধুটা দু'হাত দিয়ে এমন চেপে ধরলে আমায়! ভাবলে, আমি প'ড়ে যাচ্ছি হয় ত। ভাগ্যিস্ বাইরের কোন লোক ওঠেনি তখন। লজ্জায় আমার মাটীতে মিলিয়ে যেতে ইচ্ছে কচ্ছিল। রাগের মাথায় শুনিয়েছি খুব রাস্কেলটাকে, মেয়েদের সঙ্গে ঘোরা দিয়েছি বুঝিয়ে।

সেই থেকে ছেলেগুলোকে দেখলে সন্দেহ হয় কেমন। বাসে উঠবো, সঙ্গে উঠবে গোটা দশেক ছেলে—প্রহরীর মত। কি নির্লজ্জ ওদের চাউনি! নভেলকে চায় ওরা জীবনে ফলাও করতে। মেয়েদের চোখের ওপর চোখ ফেলে ওরা নিজেদের মুখের ওপর মনোভাবের মোহর করে। ওরা কখনও হাসে, কখনও গম্ভীর হয়, কখনও বা চেষ্টা করে মুখখানাকে করুণ করবার। বহুরূপীর দেহের মত ক্ষণে ক্ষণে ওদের মনের রঙ বদলায়। ফিক্‌শনকে ওরা চায় স্যাক্‌শনে পরিণত করতে। বিলিতি রোমান্সে ওদের মন হয়ে গেছে পান্‌সে। মেয়ে দেখা ওদের কুলের আচার দেখার মত, মুখে জল আসবেই।

আর এক দিন সন্ধ্যের সময় লেকের পাশে ঘাসের ওপর ব'সে আছি। সামনে চিক্-চিক্ করছে মৃদুবাতাসে লীলায়িত লেকের জল। দূরে গাছের পাতার ভেতোরে অন্ধকার নিবিড় হয়ে আসছে ক্রমশঃ। অমিতা ও অনিতা পায়চারি করছে লাল কাঁকরের রাস্তার ওপর। সুনীল আমার পাশে এসে বসলো। জিজ্ঞেস করলে, "কি ভাবছেন?" 'কিছু

না'—ব'লে দূর পশ্চিম আকাশের গায়ে গোধূলির রক্তিমাভার শেষ আমেজটুকু মিলিয়ে যাওয়া দেখছি, ও আমার হাতের ওপর আঙ্গুলের আস্তে চাপ দিলে—"বলুন না, কি ভাবছেন?" জ্ঞাতসারে সুনীল আমার গায়ে এই প্রথম হাত দিলে। আমায় চুপ ক'রে থাকতে দেখে, ও আমার ডান হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে চেপে জিজ্ঞেস করলে, "ফরসাইট্ সাগা পড়েছেন, গলস্ ওয়ার্দীর?" আমার উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে বললে, "আপনাকে মনে হয় যেন আইরিণের মত।" পরিহাসের ছলে জিজ্ঞেস করলুম,—"আপনি কি জলিয়ন্ হ'তে—?" মুখের কথা মুখে আটকে গেল আমার। পাশের কাঁকরের রাস্তার ওপর দিয়ে যাচ্ছেন আমার স্বামী আমারই দিকে তাকিয়ে। ঘৃণায় আমার ডানহাতখানা ছিনিয়ে নিলুম সুনীলের মুঠো থেকে।

শ্যামবাজারের বাসে উঠে মনে হ'ল, সব পুরুষেরই মনের রঙ এক, বাইরের খোলস শুধু চোখের ওপর রামধনুর বৈচিত্র্য এনে ধাঁধা লাগায়।

বাড়ী ফিরে দেখি, উনি আমার আগে এসে বই নিয়ে বসেছেন। বাসে আসতে আসতে প্রতিজ্ঞা করেছি, আজ ক্ষমা চাইব ওঁর কাছে। যাঁর ঘাড়ে আমার জীবনের সমস্ত বোঝা দিয়েছি চাপিয়ে, তাঁর কাছে আবার লুকো-ছাপা লজ্জা-সঙ্কোচ কিসের? আত্মমর্য্যাদার টঙ্গে চড়িয়ে নিজেকে কার কাছে বড় করবার চেষ্টা করেছি এত দিন? যে শিক্ষায় দোষ সংশোধন না ক'রে শুধু ঢাকবার যথাসাধ্য চেষ্টায় দম্ভ বাড়ায়, সে আবার শিক্ষা কিসের?

মরীয়া হয়ে ওঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। উনি তন্ময় হয়ে বই পড়ছেন, টের পেলেন না। চেঁচিয়ে বললুম, "ঘ্যাখো, আমি যে উচ্ছন্নয় যাচ্ছি।"

অন্যমনস্কভাবে উনি বই থেকে মুখ তুলে বললেন, "ভাড়াটা বাক্স খুলে নিয়ে যাও তা হ'লে।"

অসহ্য! এ পাগলকে নিয়ে কোন্ স্ত্রীর ভাল লাগে শুনি? রাগ চ'ড়ে গেল, বললুম, "তোমায়ও সঙ্গে নিয়ে যাব।"

এতক্ষণে ওঁর টনক নড়লো, বই থেকে মুখ তুলে বললেন, "না না, আমি যাব না, কলেজ কামাই হবে।"

থাকতে না পেরে হেসে ফেললুম, "কোথায় যাবে না?"

তখন বই থেকে মুখ তুলে স্মরণ করবার বৃথা চেষ্টা ক'রে স্বামী বললেন, "ঐ যে তুমি কোথায় যাচ্ছো।"

"ওগো, তোমার মুণ্ড, চোখের মাথা ত খেয়ে ব'সে আছ, আবার কাণের মাথাও কি খেয়েছ? তুমি কি আমার দিকে একটুও নজর দেবে না, আমি যে অধঃপাতে যাচ্ছি।"

"তুমি ত কচি খুকী নও"—আমার কথাটাই স্বামী আজ ঘুরিয়ে ব'লে আমার মরমে আঘাত দিলেন।

ওঁর পা দু'খানার ওপর মাথাটা আমার চেপে ধ'রে কেঁদে ফেললুম। "ঘ্যাখো, আজ ক্ষমা কর আমায়। তোমার মত না নিয়ে আর যা খুসী তাই করবো না, কক্ষনো না। আমি তোমার উপযুক্ত নই, তুমি আমায় তোমার মনের মত ক'রে গ'ড়ে নাও।"

"ও কি হচ্ছে, কাঁদছো কেন," ব'লে উনি আমায় বুকে তুলে নিয়ে মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

ওঁর মুখের কাছে মুখ তুলে বললুম, "জানো, সব পুরুষের মনের রঙ এক, এইটা আবিষ্কার করেছি আমি!"

উনি জিজ্ঞেস করলেন, "বুঝতে পারলুম না, খুলে বল?"

"শুনলে তুমি খুব চ'টে যাবে হয় ত।"

"তবে ব'লে কাষ কি?"

ওঁর বুকের ওপর আমার মাথাটা চেপে বললুম, "আচ্ছা, বলব না: কিন্তু আর আমায় একা একা ছেড়ে দিও না কোথাও, পুরুষদের জ্বালায় গেলুম। কোথায় যে ওৎ পেতে থাকে ওরা, আর কখন্ যে কি রকম ভাবে থাবা বসায়, বোঝা দায়।"

উনি বললেন, "এক দিকে দোষ চাপিও না, প্রতিমা। দেখেছি ত তুমি যে রকম সাজে পথে বেরোও, তাতে বেড়াতে যাচ্ছ কি শিকার করতে, বোঝা কঠিন। শুধু তুমি কেন, সকলেই সমান। বিলাসিতা মেয়েদের জন্মজাত। শুধু শক্তি-সামর্থ্যে যা বাধে, নইলে তোমরা তারার মালা দোলাতে গলায়, আকাশের নীলাম্বরী ওড়াতে অঙ্গে। পুরুষদের কাছ থেকে রূপের 'বাহবা' নেওয়ার জন্যে মেয়েরা যে রকম কৃচ্ছ্র-সাধন করে, পুরুষরা তার ষোল ভাগের এক ভাগও করে কি না সন্দেহ। না, লক্ষীটি, প্রতিবাদ ক'রে কথা বাড়িও না।"

"আমার মুখ চেপে ধর, নইলে কথা বলবো।—না গো না, হাত দিয়ে নয়।" ব্ বাবাঃ, এমন বেরসিকেও আবার কবিতা লেখে!

শ্রীসূর্য্যকুমার মিত্র।

হিন্দু দণ্ডবিধি

হিন্দু-স্মৃতি হিন্দু মনীষার অনন্ত আকর। বৈদিক সাহিত্যের ভিত্তিভূমি বোধি আর স্মার্ত্ত সাহিত্যের মর্ম্মকথা বুদ্ধি। জীবনের যাহা বুদ্ধির প্রয়োজনে প্রযোজিত, স্মৃতিতে তাহার আলোচনা পাই। আইন জিনিসটা সমাজের স্থিতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। আইন না জানিলেও রক্ষা নাই—অজ্ঞতা এখানে রক্ষা করে না। পৃথিবীর চারিদিকে আজ মানুষ নূতন করিয়া মানব সভ্যতা গড়িতে চলিতেছে।

প্রাচীন সভ্যতার লক্ষ্য ছিল বিশিষ্ট একটি জাতির কল্যাণ। বর্ত্তমানের সভ্যতা সমগ্র মানবজগৎকে শান্ত ও কল্যাণপ্রসূ করিতে চলিয়াছে। হিন্দু দণ্ডবিধির আলোচনা এই বিশ্ব-প্রগতির দিক দিয়াও মূল্যবান্। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কেবল দণ্ডের তত্ত্বার্থের কথা আলোচনা করিব। সে কালের স্মৃতিকারগণ সমাজসংরক্ষক দণ্ডকে abstract principle হিসাবে দেখিতেন। তাঁহাদের চোখে দণ্ড একটি সাবয়ব শক্তি। মনু দণ্ড-প্রশংসায় বলিয়াছেন :—

"তদর্থং সর্ব্বভূতানাং গোপ্তারং ধর্ম্মমাত্মজম্।
ব্রহ্মতেজোময়ং দণ্ডমসৃজৎ পূর্ব্বমীশ্বরঃ॥
তস্য সর্ব্বাণি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
ভয়াদ্ভোগায় কল্পন্তে ধর্ম্মান্ন বিচলন্তি চ॥
স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ।
চতুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মস্য প্রতিভূঃ স্মৃতঃ।
দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্ব্বা দণ্ড এবাভিরক্ষতি।
দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি দণ্ডং ধর্ম্মং বিদুর্ব্বুধাঃ॥"

বিধাতা পূর্ব্বকালে রাজার প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য সকল প্রাণীর রক্ষক, ধর্ম্মব্যবস্থাপক, ব্রহ্মতেজোময়, আত্মজ দণ্ডকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দণ্ডের ভয়েই চরাচর সমুদয় জগৎ ভোগ করিতে সমর্থ হইতেছে এবং ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইতেছে না।

দণ্ডই রাজা, কারণ, দণ্ডই রাজশক্তি। দণ্ডই পুরুষ, কারণ, সেই অন্য সকলের রক্ষক। দণ্ডই নেতা ও শাসিতা। দণ্ডই চারি আশ্রমের ধর্ম্মের প্রতিভূ।

দণ্ড সকল প্রজাকে শাসন করে, দণ্ড সকলকে রক্ষণাবেক্ষণ করে, সকলে ঘুমাইলে দণ্ডই জাগিয়া সকলকে রক্ষা করে, এবং পণ্ডিতরা দণ্ডকেই ধর্ম্ম বলিয়াছেন।

এখনকার ভাষায় দণ্ড গভর্ণমেণ্ট। দণ্ড আছে বলিয়াই বিধি চলে, কারণ, মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক বিশুদ্ধতা নাই, দণ্ডই সমাজের স্থিতি ও ভোগ সম্পন্ন করিতেছে। দণ্ড যদি না থাকে, বলবান্ দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করে। শৃঙ্খলা ও বিধান উল্টাইয়া যায়। শান্তিপর্ব্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে দণ্ডের স্বরূপ ব্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিতেছি, ইহা হইতেই প্রাচীনরা দণ্ডকে কিরূপভাবে দেখিতেন, তাহা জানা যাইবে।

ভীষ্ম বলিলেন, "যাহাতে সমুদয় আয়ত্ত হয়, তাহাকে দণ্ড বলে। সম্যক্‌প্রকারে ধর্ম্মের প্রকাশকে ব্যবহার বলে। ব্যবহার পরস্বাপহরণাদি দোষ নিরাকৃত করে। সুপ্রণীত দণ্ডে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ সতত বিদ্যমান থাকে। দৈবদণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তাহার রূপ অগ্নির তুল্য, দণ্ডের আসুর রূপ উদ্বেগসন্তাপজনক, সুতরাং এই হেতু অগ্নিসাদৃশ্য ধারণ করে। রাজদণ্ডে ক্লেশ ও দমনোন্মাদি থাকায় মালিন্য আছে বলিয়া তাহার বাহ্য রূপ শ্যামবর্ণ। দণ্ডের চারিটি দাঁত :—কেহ মানভঙ্গ প্রযুক্ত দণ্ডার্হ, কেহ ধনহরণ নিবন্ধন দণ্ডিত হয়, কেহ অঙ্গবৈকল্য হেতু, কেহ বা প্রাণনাশ নিমিত্ত দণ্ডভাগী হয়। দণ্ডের চারিটি হাত—প্রজা হইতে অর্থ আদায় এক হাতে, সামন্ত হইতে কর অন্য হাতে, অর্থি-প্রত্যর্থী হইতে দ্বিগুণ ধন অন্য হাতে এবং কদর্য্য ব্রাহ্মণ হইতে সর্ব্বস্ব আদান চতুর্থ হাতে হইয়া থাকে। অর্থি-প্রত্যর্থিগণের আবেদন ও উত্তরদান প্রভৃতি অষ্টবিধ কারণে থাকে বলিয়া দণ্ডের আটখানি পা। রাজা অমাত্য পুরোহিত প্রভৃতি দিয়া দণ্ড দেখেন বলিয়া অনেক নয়ন, অবশ্য শ্রাব্য বলিয়া তীক্ষ্ণকর্ণ, অনেকসঙ্কেতপ্রযুক্ত জটিল বলিয়া জটা। দণ্ড সমস্ত অস্ত্রের আত্মস্বরূপ।

"দণ্ডই ভগবান্ বিষ্ণু, দণ্ডই প্রভু নারায়ণ, এই জন্য দণ্ডকে মহাপুরুষ বলে। লোকমধ্যে যদি দণ্ড না থাকে, তবে পরস্পর পরস্পরকে অত্যাচার করে, দণ্ড কর্ত্তৃক প্রজাগণ রক্ষিত হয়, তাই দণ্ড পরম আশ্রয়। দণ্ড নিয়ত অবহিত ও অমর হইয়া প্রজাগণকে রক্ষা করিয়া জাগরিত থাকেন।

"দণ্ডই রাজ্যের আদি এবং দণ্ডই রাজ্যের কারণ। দণ্ডই নৃপতিগণের পরমধর্ম্ম। দণ্ডই তাহাদের বেদ। ধর্ম্মবান্ নৃপতির নিকট কেহই অদণ্ড্য নাই।"—শান্তিপর্ব্ব, ১২১ অধ্যায়।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে দণ্ডোৎপত্তির এক ইতিহাস বলিয়াছিলেন। "পূর্ব্বকালে যখন দণ্ড না থাকায় প্রজাসঙ্কর হইতে লাগিল, তখন ভগবান্ ব্রহ্মার অনুরোধে বিষ্ণু আপনাকে দণ্ডরূপে সৃষ্টি করিলেন; এবং সরস্বতী দণ্ডনীতির উৎপাদন করিলেন। বিষ্ণু দণ্ড ঋষিগণকে দেন, মনু তাঁহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া মানবকে তাহা প্রদান করেন।

"ন্যায় অন্যায় বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মানুসারে দণ্ডবিধান কর্ত্তব্য। যদৃচ্ছা বশতঃ দণ্ড করা বিধেয় নহে। দুষ্ট ব্যক্তির নিগ্রহ করাকে দণ্ড কহে। সুবর্ণাদি দণ্ড লোকসকলের বিভীষিকা প্রদর্শনার্থ মাত্র। শরীরের অঙ্গহীনতা ও বধদণ্ড অল্প কারণে হয় না। শারীরিক দণ্ড উচ্চস্থান হইতে পাতনরূপে দেহত্যাগ এবং স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসন, ইহা বিশেষ দোষের দণ্ড। মনু প্রজারক্ষার্থ এই দণ্ড যথাক্রমে দান করিয়াছিলেন, এই দণ্ডই প্রজাগণকে পালন করিয়া জাগ্রত থাকে।"—শান্তিপর্ব্ব, ১১২ অধ্যায়।

বর্ত্তমানে মানুষ অপরাধকে সমাজ-ব্যাধি মনে করে। অপরাধী

স্বেচ্ছায় যতখানি করে, তার অনেক বেশী করে, পরিবেশের প্রভাবে। অজ্ঞান, দারিদ্র্য, কুশিক্ষা, ধন-বৈষম্য প্রভৃতিই অপরাধের কারণ। কাযেই শাস্তিদাতা আর শাস্তিকে প্রতিহিংসামূলক করিতে পারেন না।

সমাজে যাহাতে বৈষম্য দূর হয়, সমাজে যাহাতে মানুষের বিকাশের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ ও সুবিধা থাকে, বর্ত্তমানের সমাজ-বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতরা তাহার জন্ম আলোচনা করিতেছেন। কালিদাস বলিয়াছিলেন—'দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী' সে কথা সর্ব্বৈব সত্য। এখনকার মানুষ দারিদ্র্যকে কর্ম্মফল বলিয়া স্বীকার করিতে চায় না।

দারিদ্র্য সমাজব্যবস্থার কুফল। মানুষ ইচ্ছা করিলেই তাহা দূর করিতে পারে।

এই সমস্ত সাম্য ও মৈত্রীর ভাবের বন্যায় অপরাধী আর সয়তান বলিয়া গণ্য হয় না—অপরাধী এখন রোগদুষ্ট ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়—তাহার সুশিক্ষা ও সুচিকিৎসার প্রয়োজন। বর্ত্তমানের এই মনোভাব প্রাচীন দণ্ডবিধিতে দেখা যায় না।

শাস্তির স্বরূপ তাই সেখানে উগ্র—দণ্ডের মূর্ত্তি তাই রুদ্র, দণ্ড সেখানে আদিম প্রতিহিংসার আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট। সেখানে অপরাধীকে মানুষ ও সমাজ-সেবক করিয়া তুলিবার কোনও ভাবনাই দণ্ডদাতার মনকে কাতর করে নাই।

বরং দণ্ড গ্রহণ করিবার ভাব সেকালের মানুষের মনে বর্ত্তমান ছিল। সেকালের মানুষ ভাবিত—শুভাশুভ কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে। অপরাধের দণ্ড এ জগতে না হইলে পরজগতে হইবে। সুতরাং এই জগতে দণ্ড লওয়াই ভাল—তাহাতে পর-জগতে আর কোনও দুঃখ বা শাস্তির ভয় নাই। দণ্ড পাপকে ক্ষয় করে।

"রাজভির্ধৃতদণ্ডাস্তু কৃত্বা পাপানি মানবাঃ।
নির্ম্মলাঃ স্বর্গমায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনো যথা॥"

সাধু ব্যক্তি সুকৃতির দ্বারা যেমন স্বর্গে যায়, অন্যায়কারক তেমনই রাজার দ্বারা দণ্ডিত হইয়া নির্ম্মল হইয়া স্বর্গে যায়। আর দণ্ড না হইলে পরলোকে অধোগতি হইবে। নারদ বলেন :—

"গুরুভির্যে ন শাস্যন্তে রাজ্ঞা বা গূঢ়কিল্বিষাঃ।
তে নরা যমদণ্ডেন শাস্তা যান্ত্যধমাং গতিম্॥"

যাহারা গুরুজন কর্ত্তৃক শাসিত হয় না, কিংবা রাজার দ্বারা দণ্ডিত না হয়, গূঢ়পাপী তাহারা যম কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইয়া অধোগতি লাভ করে।

এই মনোভাব হইতে প্রায়শ্চিত্তের উদ্ভব হইয়াছে। পাপ হইতে আত্মক্ষালন জন্ম মানুষ তখন নানাবিধ প্রায়শ্চিত্ত করিত। স্মৃতির তিনটি মুখ্য ভাগ;—আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন :—

"প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণাঃ পাপেষু নিরতা নরাঃ।
অপশ্চাত্তাপিনঃ কষ্টান্নরকান্ যান্তি দারুণান্॥"

পাপপরায়ণ ব্যক্তিগণ অনুতাপ না করিলে এবং প্রায়শ্চিত্ত না করিলে দারুণ কষ্টকর নরকে গমন করে।

যাজ্ঞবল্ক্যের মতে অজ্ঞানকৃত পাপ প্রায়শ্চিত্তের ফলে ক্ষয় হয়। জ্ঞানকৃত পাপ প্রায়শ্চিত্তে ক্ষয় হয় না, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিলে সে সমাজে চল হইয়া থাকে।

এই আধ্যাত্মিকতার ভাব বর্ত্তমান মানুষের মন হইতে চিরদিনের জন্ম নির্ব্বাসিত হইয়াছে।

দণ্ডবিধি প্রণয়নের গুরুত্ব প্রাচীনরা জানিতেন। যে কেহ দণ্ডবিধান করিলে সমাজের ক্ষতি হইবে, তজ্জন্য মনু বলেন :—

"শুচিনা সত্যসন্ধেন যথাশাস্ত্রানুসারিণা।
দণ্ডঃ প্রণয়িতুং শক্যঃ সুসহায়েন ধীমতা॥"

আচারবান্ এবং ধনবান্, সত্যসন্ধ, শাস্ত্রজ্ঞ, সুসহায়, ধীমান্ ব্যক্তিরাই দণ্ড প্রণয়ন করিতে সমর্থ, অপরে নহে।

দণ্ডের নানাপ্রকার ভেদ ছিল। বৃহস্পতি বলেন :—

"বাগ্ দিক্ ধনং বধশ্চৈব চতুর্ধা কথিতো দমঃ।
পুরুষং বিভবং দোষং জ্ঞাত্বা তং পরিকল্পয়েৎ॥"

দোষীকে 'তুমি ভাল কায কর নাই' বলিয়া তিরস্কারকে বাগ্-দণ্ড বলে। তুমি পাপকারী, তোমাকে ধিক্, ইহাকেই ধিক্‌দণ্ড বলে। ধনদণ্ড দুই রকম ছিল ;—এক ব্যবস্থিত, অন্য অব্যবস্থিত। ব্যবস্থিত ধনদণ্ডকে অপরাধ অনুসারে প্রথম সাহস, মধ্যম সাহস ও উত্তম সাহস দণ্ড বলিত। যেখানে অপরাধ পুনরায় করিলে ধনদণ্ডের বৃদ্ধি হয়, পণ্যানুরূপ এবং মাষানুরূপ, সেই অস্থির দণ্ডকে অব্যবস্থিত ধনদণ্ড বলে। বধদণ্ড তিন প্রকার ; -পীড়ন, অঙ্গচ্ছেদ এবং হত্যা। পীড়ন চার প্রকার, কশাদি দ্বারা আঘাতকে তাড়ন বলে, কারা-বাসাদিকে অবরোধন বলে আর নিগড়াদিতে বন্ধনকে বন্ধন বলে। মুণ্ডন, গর্দ্দভারোহণ, চৌর্য্যাদি-চিহ্ন গাত্রে অঙ্কন, ঢোল সহরতে অপরাধ ঘোষণ, নগরপরিভ্রমণ প্রভৃতি নানাবিধ বিড়ম্বন ছিল।

ছেদ্য অঙ্গভেদে চৌদ্দপ্রকার অঙ্গচ্ছেদ ছিল। বৃহস্পতি বলেন—

"হস্তাঙ্ঘ্রি-লিঙ্গনয়নং জিহ্বা কর্ণৌ চ নাসিকা।
জিহ্বা পাদার্দ্ধ সংদংশ ললাটৌষ্ঠগুদং কটিঃ॥"

শরীরের এই চতুর্দ্দশ অঙ্গ—হস্ত, পদ, লিঙ্গ, চক্ষু, জিহ্বা, কর্ণ, নাসিকা, অর্দ্ধজিহ্বা, অর্দ্ধপদ, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী, ললাট, ওষ্ঠ, মলদ্বার এবং কটি। মনু দশবিধ অঙ্গচ্ছেদের কথা বলিয়াছেন :—

"উপস্থমুদরং জিহ্বা হস্তৌ পাদৌ চ পঞ্চমম্।
চক্ষুর্নাসা চ কর্ণৌ চ ধনং দেহস্তথৈব চ॥"

উপস্থ, উদর, জিহ্বা, হস্ত, পদ, চক্ষু, নাসা, কর্ণ, ধন এবং দেহ এই দশটি দণ্ডস্থান।

দেহ-দণ্ড দুই প্রকার ;—শুদ্ধ ও মিশ্র। শুদ্ধ বধদণ্ড পুনরায় দ্বিবিধ ;—বিচিত্র ও অবিচিত্র। খড়্গাঘাতাদিকৃত বধ অবিচিত্র, শূলাদিতে আরোপণ বিচিত্র বধদণ্ড, অঙ্গচ্ছেদ পূর্ব্বক পশ্চাৎ বধকে মিশ্র বধদণ্ড বলে।

মনু বলেন :—

"বাগ্দণ্ডং প্রথমং কুর্য্যাদ্ধিগ্দণ্ডং তদনন্তরম্।
তৃতীয়ং ধনদণ্ডন্তু বধদণ্ডমতঃ পরম্॥
বধেনাপি যদা ত্বেতান্নিগ্রহীতুং ন শক্নুয়াৎ।
তদৈষু সর্ব্বমপ্যেতৎ প্রযুঞ্জীত চতুষ্টয়ম্॥"

যদি অপরাধী গুণবান্ হয় এবং একবারমাত্র দোষ করিয়া থাকে, তবে 'তুমি ভাল লোক নও, ভবিষ্যতে আর এরূপ করিও না,' এই বলিয়া বাগ্ দ্বারা ভর্ৎসনা করিবেন। তাহাতেও যদি কুকর্ম্মে ক্ষান্ত না হয়, 'তবে তুমি অতিশয় ছোটলোক, তোমার মরণই শ্রেয়ঃ' বলিয়া ধিক্কার করিবেন। ইহাতেও শান্ত না হইলে ধনদণ্ড করিবেন; তাহাতেও শান্ত না হইলে অপরাধের গুরুলঘু বিবেচনামতে বধাদি দণ্ড করিবেন। যখন একটি দণ্ডে প্রশমিত না হয়, তখন চারিটি সমভাবে প্রয়োগ করিয়া দুরাত্মাকে শাসন করিবেন।

বর্ত্তমানের দণ্ডবিধির গৌরব-চূড়া তাহার নিরপেক্ষ সতর্ক দৃষ্টি। এক শত অপরাধী অব্যাহতি লাভ করুক, ক্ষতি নাই, কিন্তু একটি নির্দ্দোষ ব্যক্তিও যেন শাস্তি না পায়, এই জন্য সাক্ষ্য ও বিচারবিধির বিধানের অন্ত নাই। সন্দেহে কাহাকেও সাজা দেওয়া হইবে না। বরং শাস্তি না হউক, অনপরাধ কেহ যেন শাস্তি না পায়, ইহাই বিচারের মূলমন্ত্র। মনুতেও সদৃশ ভাবের উল্লেখ পাই;—

"অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্
অযশো মহদাপ্নোতি নরকঞ্চৈব গচ্ছতি ॥"

রাজা যদি নিরপরাধ ব্যক্তিকে দণ্ড করেন এবং দণ্ডযোগ্য ব্যক্তিকে লোকের অনুরোধে শাস্তি না দেন, তাহাতে তাঁহার অত্যন্ত অযশ হয় এবং পরলোকে নরকগমন হয়।

পূর্ব্বে যে ধনদণ্ডের কথা বলিয়াছি, তাহার পরিমাণ সম্বন্ধে কিছু জানা কর্ত্তব্য। চব্বিশ হইতে একানব্বই পণকে প্রথম সাহস বলা হইত। দুই শত হইতে পাঁচ শত পণ দণ্ডকে মধ্যম সাহস বলিত এবং পাঁচ শত হইতে এক হাজার পণ দণ্ডকে উত্তম সাহস বলিত। সে কালের অর্থ সম্বন্ধে আমাদের কোনই জ্ঞান নাই, কাজেই পণ বলিলে কি বুঝায়, তাহা বলিতেছি।

রৌদ্রকিরণে উড্ডীয়মান ধূলিকে ত্রসরেণু বলে। আট ত্রসরেণুতে এক লিক্ষা, তিন লিক্ষায় রাজসর্ষপ, চারি রাজসর্ষপে এক গৌরসর্ষপ। ছয় সর্ষপে এক যব, তিন যবে এক কৃষ্ণল, পাঁচ কৃষ্ণলে এক মাষা, এবং ষোল মাষায় এক স্বর্ণভরি হয়। চারি স্বর্ণে এক পল, এবং দশ পলে এক ধরণ হয়।

ষোল মাষার তাম্রমুদ্রাকে পণ বা কার্ষাপণ বলে। এই সমস্ত মান লইয়া স্মৃতিকারদের মধ্যে বিভিন্নতা দেখা যায়। এই বিভিন্নতা বোধ হয় বিভিন্ন দেশপ্রথার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। যেখানে মাষা আছে, সেখানে স্বর্ণমাষা দিতে হইবে বুঝিতে হইবে। মাষক বলিলে রৌপ্যমাষা এবং পণ বলিলে তাম্রকর্ষা বুঝিতে হইবে।

দণ্ডের কারণ সাধারণতঃ ষড়্বিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। নারদ বলেন:—

"মনুষ্যমারণং স্তেয়ং পরদারাভিমর্ষণম্।
দ্বে পারুষ্যে প্রকীর্ণঞ্চ দণ্ডস্থানানি ষড়্বিদুঃ ॥"

হত্যা, চৌর্য্য, ব্যভিচার, বাক্-পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য এবং প্রকীর্ণক এই ছয়টি দণ্ডের কারণ।

দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের তারতম্য ছিল। লোভ ও মোহাদি সমস্ত বিবাদের মূল। তখনকার দিনে দেওয়ানী মোকদ্দমায় মিথ্যা জবাব ইত্যাদি দিলে শাস্তি হইত, কিন্তু যে সমস্ত অপরাধ রাজার অভিযোগে হইত, তাহাদিগকেই সাধারণতঃ ফৌজদারী মোকদ্দমা বলিয়া গ্রহণ করা হইত।

দণ্ডবিধি সর্ব্বত্র প্রযোজ্য নহে। তাহার প্রতিষেধ আছে। এই সমস্ত প্রতিষেধ স্থির করিবার জন্য—

"জাতিদ্রব্যে পরিমাণং বিনিয়োগঃ পরিগ্রহঃ।
বয়ঃ শক্তিগুণৌ দেশঃ কালো দোষশ্চ হেতবঃ ॥"

জাতি, দ্রব্য, পরিমাণ, বিনিয়োগ, পরিগ্রহ, বয়স, শক্তি, গুণ, দেশ, কাল, দোষ এই এগারোটি কারণ সম্যক্ বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইত।

শূদ্রের যে দণ্ড হইবে, বৈশ্য-ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণাদির জ্ঞান-তারতম্য হেতু তাহার দ্বিগুণ দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। কাত্যায়ন বলেন:—

"যেন দোষেণ শূদ্রস্য দণ্ডো ভবতি ধর্ম্মতঃ।
তেন বিট্‌ক্ষত্রবিপ্রাণাং দ্বিগুণো দ্বিগুণো ভবেৎ ॥"

দ্রব্যতারতম্যানুসারে দণ্ডেরও তারতম্য হইত। দণ্ডবিনিয়োগ কঠিন কায,—

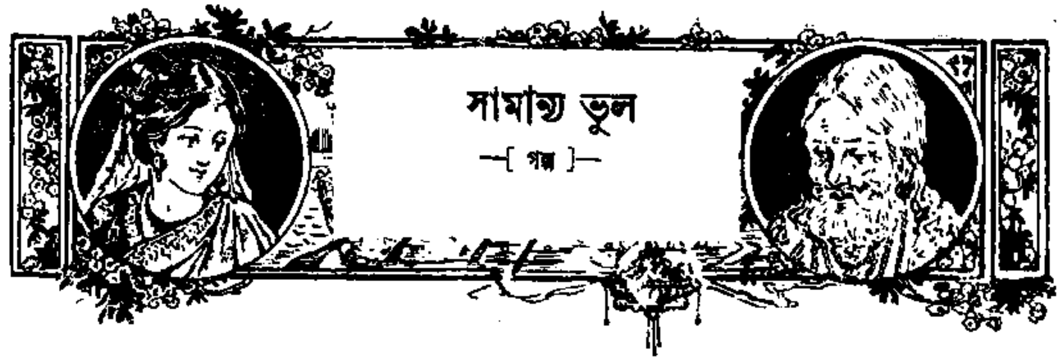
"বাধাহপকষসাম্যানামুৎকর্ষপরিনিষ্ঠয়োঃ।
ভেদেন দণ্ডভেদানাং ব্যবস্থা পঞ্চলক্ষণা ॥"

আচার্য্য, ঋত্বিক্, রাজা প্রভৃতি দণ্ড্য নহে। মোহমদাদিতে কৃত কার্য্য অদণ্ড্য, চৌর্য্যাদিতে আবর্ত্তাদি ভেদ বশতঃ দণ্ডের তারতম্য হইবে। দণ্ড অপরাধের তুল্য হওয়া উচিত। বার বার করিলে দণ্ডবৃদ্ধি হইবে এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা অনুসারে দণ্ডপ্রয়োগ করিবে।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইতেছে। যাহা আলোচনা করিলাম, তাহা হইতে বুঝি, সে কালের দণ্ডবিধির মধ্যে যুক্তি ও বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় আছে। সমাজ-স্থিতির জন্যই দণ্ড, এ কথা স্মৃতিকারেরা ভালরূপেই জানিতেন, এই জন্য সমাজ-সংস্থার সুবিধার জন্যই দণ্ড নিরূপণ করিয়াছেন।

প্রত্যেক স্মৃতিতেই দণ্ডবিধির উল্লেখ আছে। বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ের দণ্ডবিবেক একখানি সুন্দর নিবন্ধ। মিথিলার এই গ্রন্থ আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল।

শ্রীমতিলাল দাশ (এম-এ বি-এল)।



সামান্য ভুল

—[গল্প]—

কেল্লার ময়দানে সবেমাত্র তোপ পড়েছে। নূতন গদিমোড়া ফ্যান-বসানো ট্রামে চ'ড়ে সুকান্ত ধর্মতলা থেকে কলেজ-ষ্ট্রীটের দিকে আসছিল। সুকান্ত এঞ্জিনীয়র—বিলেত থেকে টাটকা পাশ ক'রে এসেছে, সুশ্রী; তার চোখে মুখে প্রতিভার দীপ্তি! হোটেল রয়ালের দোতলায় ছোট একটি ঘর—সে একার জন্য নিয়ে ক'মাস সেখানেই আছে। খুব ভোরে উঠে কাযে বেরিয়েছিল—এখন ফিরছে।

সুকান্তর ট্রামের পাশ আছে—অল-সেকসন্ এবং সে ঠিক করেছিল হ্যারিসন-রোডে চেঞ্জ নিয়ে একেবারে হোটেলের দরজায় গিয়ে নামবে। কিন্তু মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের কাছে এসেই তাকে মতপরিবর্ত্তন করতে হলো। মির্জ্জাপুরের মোড়ে ট্রামটা সবেমাত্র থেমেছে, ঠিক সেই সময় আশুতোষ বিল্ডিংসের ভিতর থেকে একটি মেয়ে একগাদা বই হাতে বেরিয়ে এল। মেয়েটিকে দেখবামাত্র সুকান্ত দ্বিধাহীনভাবে ট্রাম থেকে নেমে পড়ল। মেয়েটি ততক্ষণ তাদের বাড়ীর মোটরে চেপে বসেছে এবং সুকান্ত আর একটু এগিয়ে যেতেই শুনতে পেল, মেয়েটি সোফেয়ারকে বলছে—হোটেল রয়ালের দিকে চল।

সোফেয়ার উত্তরে বলল—আমি এইমাত্র সেখান থেকে আসছি, সুকান্ত বাবু এখনও ফেরেননি। সেই যে সাতটায় তিনি বেরিয়ে—

সোফেয়ারের কথা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই সুকান্ত পিছন থেকে এসে তন্দ্রার এলো খোঁপাটি ধ'রে একটু ঝাঁকুনি দিলে।

হাঁ, মেয়েটির নাম তন্দ্রা। তন্দ্রা ভয়ানক চমকে পিছন ফিরে তাকাতেই তার সমস্ত মুখে এক ঝলক হাসি চমকে উঠলো।

সুকান্ত গিয়ে ষ্টীয়ারিং ধরলো এবং ব্যাকসীট থেকে তন্দ্রা উঠে এসে তার পাশে বসলো। সোফেয়ার একটু হেসে পিছনের দিকে চ'লে গেল, মোটর ছুটল হোটেল রয়ালের দিকে।

প্রায় ছটো বাজে, সুকান্তর এখনও খাওয়া হয়নি। হোটেলে ঢুকেই তন্দ্রা বেয়ারাকে ডেকে অর্ডার দিল ভাত পাঠিয়ে দিতে এবং সুকান্তকেও জোর ক'রে বাথরুমের দিকে পাঠিয়ে দিল। ব'লে দিল, পাঁচ মিনিটের বেশী সময় যেন না যায়! তন্দ্রা বলল, ট্রামে ব'সে বসেই নাকি বিশ্রামের চাহিদা মিটে গেছে, সুতরাং এখন বিশ্রাম চাওয়া কুড়েমি মাত্র—এখন আহারটা প্রয়োজন—এখনই।

কয়েক মিনিট পরে ঠাকুর গরম ভাত দিয়ে গেল; তন্দ্রা নিজের হাতে টেবিলের উপর সব গুছিয়ে রাখলো। ঠাকুর চ'লে যাওয়ার সময় তন্দ্রা তাকে ব'লে দিলে, খানিকটা বরফের জন্য শীগ্‌গির যেন লোক পাঠিয়ে দেয়। ঠাকুর মাথা নেড়ে চ'লে গেল। এ-হোটেলের ঠাকুর চাকর প্রত্যেকেই জানে, সুকান্ত বাবুর হুকুমেও এক আধটুকু গাফিলি চলতে পারে, কিন্তু এই মেয়েটির আদেশ একেবারে অলঙ্ঘনীয়। তন্দ্রা সবার কাছেই পরিচিত এবং তন্দ্রাকে সকলেই মান্য ক'রে চলতে বাধ্য।

ঠাকুর চ'লে যাবার খানিক পরে সুকান্ত ফিরে এল, তখনও তার সমস্ত শরীর থেকে জল ঝ'রে ঝ'রে পড়ছে। "কি অদ্ভুত মানুষ তুমি? গা'টা ভাল ক'রে পুঁছতেও পারোনি।" বলতে বলতে তন্দ্রা নিজেই তার হাত থেকে তোয়ালেটা জোর ক'রে ছিনিয়ে নিয়ে সুকান্তর গা মুছিয়ে দিতে লাগলো।

সুকান্ত বলল—"বাঃ, তুমি যে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় দিলে, গা মোছবার সময় পেলাম কৈ?"

তন্দ্রার চোখে কিসের আলো মুহূর্ত্তের জন্য চক্‌চক্ ক'রে উঠলো। সে চোখের দক্ষিণ কোণ দিয়ে সুকান্তকে

একবার দেখে নিয়ে একটু হেসে ফেল্‌লে ; তার পর তাকে এক রকম জোর করেই চেয়ারের উপর বসিয়ে দিয়ে বলল, "হয়েছে ! হয়েছে ! খুব বাহাদুর, এবার খেতে বসো দিকি ।"

কিন্তু সুকান্তও তন্দ্রাকে না নিয়ে খাবে না। সে বলল, "তোমাকেও বস্‌তে হবে। এসো—চেয়ারটা এই দিকে টেনে নাও।"

তন্দ্রা যেন আকাশ থেকে পড়ল, এমন আশ্চর্য্য কথা সে যেন কখনও শোনেনি ! "ও মা, সে কি কথা, আমি খাব কি ! আমি ত এইমাত্র খেয়ে এলাম ।"

সুকান্ত বললে,—"এইমাত্র না আরও কিছু ! কখন্ সেই দশটায় খেয়ে বেরিয়েছো ।"

সুকান্ত বেজায় গম্ভীর হয়ে বলল—"এসো, এ দিকে এসো।"

সুকান্তর কথা শুনে একটি তন্দ্রা যেন দশটি হয়ে ছড়িয়ে পড়ল—অসম্ভব ! সে কিছুতেই খাবে না, তার একেবারে ক্ষিদে নেই। কিন্তু সুকান্তকে খেতেই হবে, বা রে, তবু খাচ্ছে না। লক্ষীটি ! সুকান্ত বড় ভাল ছেলে, তন্দ্রা সুকান্তর আর সব কথা শুনবে, কেবল একটি বাদে ; তার পেটে সত্যি যায়গা নেই। উঃ, সুকান্ত কি ভয়ানক লোক। তন্দ্রা আর কক্‌খনো এখানে আসবে না ; ভদ্দরলোকের মেয়েদের এ রকম হোটেলে ফোটেলে আসাই উচিত নয়। এতক্ষণ ধ'রে সাধাসাধি হচ্ছে, তবু সুকান্ত কিছুতে তার এই সামান্য অনুরোধটুকু রাখছে না। তা রাখবে কেন ? সুকান্ত ত তাকে দেখতে পারে না, তার কথা শুনবে কেন ? এখানে আসাই তার ভুল হয়েছে। আচ্ছা, না হয় পায়ে ধরেই সাধা হচ্ছে, খাওয়া হোক্। নাঃ, কি ভয়ানক নিষ্ঠুর লোক। বাবা, বাবা !—শেষ পর্য্যন্ত তন্দ্রা সত্যি সত্যি ঝরঝর্ ক'রে কেঁদে ফেললে, তথাপি সুকান্ত সেই যে নিজের হাত দুটি কোলে ক'রে ব'সে আছে, তার মুখের দিকে মুগ্ধ নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে, তার কিন্তু এতটুকু ব্যত্যয় হলো না। অগত্যা তন্দ্রাকে উঠতে হলো এবং সুকান্তর পাশে এসেও বসতে হ'ল।

সুকান্ত নিজের হাতে তন্দ্রার মুখে কয়েকটা ভাজা গুঁজে দিলে। তন্দ্রার ভুরু দুইটি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে এল, যেন খুব বিরক্ত হয়েছে, তেমনি একটা অস্বাভাবিক ভাবের রেখাও থালুতোভাবে ফুটে উঠলো তার মুখে,—এ দিকে অন্তরের অসহ্য আনন্দকেও তন্দ্রা সুকান্তর দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখতে পারল না। চোখের ভিতরের চক্‌চকে টুকরোগুলো আর কাণের নীচে গলার পাশের একটা টক্‌টকে লাল আভা তন্দ্রার সঙ্গে অত্যন্ত বেইমানি ক'রে বসলো।

কিছুক্ষণ পরে বরফ হাতে নিয়ে এক ছোকরা চাকর হঠাৎ ঘরে ঢুকেই দেখতে পেলো, একটি মেয়ে সুকান্ত বাবুর পিঠের দিক দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধ'রে অপর হাতে তার মুখে খাবার তুলে দিচ্ছে এবং সুকান্ত বাবু হাঁ ক'রে খাবার খাওয়ার ছলে মেয়েটির আঙুলগুলো শুদ্ধ কামড়ে ধরেছে। উঃ ক'রে হাতটা ছাড়িয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তন্দ্রার চোখ চাকরটাকে আবিষ্কার ক'রে ফেললে। তন্দ্রা একটুও অপ্রতিভ হলো না, অপ্রতিভ হওয়া কাকে বলে, তাই যেন তন্দ্রার জানা নেই, এমনি সহজ ভাবে সে চাকরটাকে বরফ দিয়ে যেতে বললে।

ইতিমধ্যে সুকান্ত ও তন্দ্রা দুজনে সন্ধি হয়ে গেছে।

খাওয়ার পর সুকান্ত মুখ-হাত ধুয়ে খাটের উপর শুয়ে পড়ল। তন্দ্রা সুকান্তর মুক্ত বক্ষের উপর ঝুঁকে খাটের উদিককার অংশে হাতের ভর রেখে সুকান্তর মুখের অতি সন্নিকটে মুখটি নিয়ে এসে গল্প করতে লাগল, এবং হোটেলের চাকরদের জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে যে, ঘরের দরজাটিও ভিতরদিক্ থেকে বন্ধ ছিল।

কিন্তু এই অল্পসময়ের মধ্যে কি ক'রে যে তিন ঘণ্টার মত অতখানি সময় ফুরিয়ে যেতে পারে, তা ওদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মত কোন তৃতীয় ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিল না বলেই সময়টাও বেশ নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব গতিতে একটির পর একটি ক'রে সেকেণ্ড কেটে কেটে বেরিয়ে এসেছে। সাড়ে পাচটার সময় টিফিন্-ছোক্‌রা টিফিন নিয়ে এসে ঘরের দরজায় টোকা মেরে ওদের প্রথম চমক্ ভাঙ্গিয়ে দিল। তন্দ্রা সোজা উঠে দাঁড়াল। নাঃ, অসম্ভব দেরী হয়ে গেছে। মা যে কত কি ভাবছেন ! ছি ছি ! তন্দ্রা একবারে চট্‌পট্ তৈরী হয়ে নিল চ'লে যাওয়ার জন্য। কিন্তু সুকান্ত অত্যন্ত নির্ব্বিকার আলস্যে গা ঝেড়ে বলল—"চল তন্দ্রা, আজ 'অলকা' দেখে আসি ; অনেক দিন পর বাঙ্গালা থিয়েটারে আবার একটা ভাল নাটক প্লে হচ্ছে।" সুকান্তর কথা শুনে তন্দ্রার বিস্ময় একেবারে সীমা ছাড়িয়ে গেল—"তুমি কি বল্‌ছো, বাড়ীতে মা তা হ'লে কি কাণ্ড ক'রে তুলবেন, তার ঠিক্ কি ! কোন্ সময় ফেরা উচিত ছিল। মা হয় ত কত

ভেবে ভেবে সারা হচ্ছেন। এর উপর বলা নেই, কওয়া নেই—সেই রাত বারোটা একটা অবধি—তার পর দুপুর রাতে মার কাছে গিয়ে দাঁড়াব কোন্ মুখে ?"

"কেন ? এই সুন্দর চাঁদমুখখানি নিয়েই দাঁড়াবে। আচ্ছা, তার জন্য ভাবনা নেই। সে ব্যবস্থা আমি করব। তুমি চল।"

"থাক্ থাক, তোমাকে আর ব্যবস্থা করতে গিয়ে উল্টে আরও বিপদ বাড়াতে হবে না। বাবা বাড়ী নেই—তাই তাঁর মোটরটা আজ পেয়েছি। কিন্তু এতক্ষণ আটকে রাখার মজা দাদা টের পাওয়াবে। তার উপর রাত দুপুরে ফিরলে আজ আর রক্ষে থাকবে না। থিয়েটার দেখা মাথায় উঠে যাবে, আমি চল্লাম।"

তন্দ্রার কথা শুনে সুকান্ত নিজের মুখখানা এমন বিশ্রী কালো ক'রে তুললে, যেন কে তাকে এইমাত্র ফাঁসির হুকুম শুনিয়ে দেছে। সুকান্ত খাটের উপর হাত-পা ছড়িয়ে অত্যন্ত অবসন্নভাবে শুয়ে পড়ল—যেন এই মুহূর্ত্তেই সুকান্তর পক্ষে ম'রে যাওয়া অসম্ভব নয়!

সুকান্তর রকম দেখে তন্দ্রা খিলখিল ক'রে হেসে উঠল, "উঃ, তুমি যে কি রকম রঙ্গ করতে পার! অদ্ভুত! আচ্ছা, নাও, হয়েছে,—চল, থিয়েটারেই চল—আমাকে সব দিক্ থেকে না ডুবিয়ে তুমি ছাড়বে না দেখছি।"

এক মুহূর্ত্তে সুকান্ত লাফিয়ে উঠল—কে বলে, সেও ম'রে যেতে পারত, তার প্রাণের পরিমাণ তখন বোধ হয় পৃথিবীটার চাইতেও বড়। সুকান্ত বল্ল—"তোমাদের গাড়ীটা বরং বাড়ী পাঠিয়ে দাও তন্দ্রা, আমরা ট্যাক্সিতে যাব।"

তন্দ্রা বল্ল—"তাতে লাভ ? দাদা এতক্ষণ নিশ্চয় ক্লাবে চ'লে গেছেন। গাড়ী ত বাড়ী গিয়ে চুপ ক'রে বসেই থাক্‌বে। তার চাইতে আমাদের সঙ্গেই থাকুক। অত রাত পর্য্যন্ত বাড়ী না ফিরলে মা যা ভাববেন, তাতে আমারই লজ্জা। তোমার কি! তোমার জন্য আমাকে যে আরও কত সইতে হবে, তার ঠিক কি ? নাও, চল, এখন বেরিয়ে পড়া যাক্—আজ বুঝি সাড়ে ছ'টায় আরম্ভ।"

পথে একটা রেস্তোঁরায় কিছু 'কোল্ড-ড্রিঙ্ক' (cold-drink) সেরে সুকান্ত এবং তন্দ্রা যখন এসে থিয়েটার-গৃহে প্রবেশ করল, তখন "অলকার" প্রথম দৃশ্য সুরু হয়ে গেছে। একবারে সামনের দিকে কয়েকটা স্থান খালি ছিল, ওরা সেখানে এসে বসল।

প্রথম অঙ্ক শেষ হবার পর 'অডিটোরিয়ামের' আলোগুলো জ্বলে উঠতে সুকান্ত এবং তন্দ্রা দেখল, তাদের থেকে দু'চারখানা সীট্ পরেই এক প্রৌঢ়-দম্পতি তাদের প্রতিবেশী আছেন। দম্পতি একটু সেকেলে ধরণের এবং বনেদি ঘরের বলেই মনে হয়। মহিলাটি তন্দ্রার দিকে বড় বড় চোখ ক'রে তাকিয়ে আছেন। তন্দ্রা একটু সঙ্কোচ বোধ করল। অনেক পুরুষ-মানুষ তন্দ্রার দিকে অনেক রকম করেই তাকায়—তন্দ্রা তা জানে এবং তাতে তন্দ্রার কোন সঙ্কোচও নেই—সম্পূর্ণ উপেক্ষা দেখিয়ে চ'লে যেতে সে অভ্যস্ত। কিন্তু আজ এই তাদেরই শ্রেণীর একটি বর্ষীয়সী মহিলার তাকানোটা তন্দ্রার ভাল লাগল না—কেমন একটা অস্বস্তি বোধ ক'রতে লাগলো। তন্দ্রা ওদিক্ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলে।

তন্দ্রা বল্ল—"বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। একটু জল পাওয়া যায় না ?"

সুকান্ত তাড়াতাড়ি বরফ দিয়ে একটা লেমনেড কিনে দিল। কিন্তু তন্দ্রার সাধ্য কি সবটা খায়, অর্দ্ধেকটা খেয়ে তন্দ্রা বল্ল—"যথেষ্ট হয়েছে। আর পারি না।"

সুকান্ত তার হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে এক চুমুকে বাকি জলটুকু নিঃশেষ ক'রে ফেল্ল। তন্দ্রার ভুক্তাবশিষ্ট পানীয়টুকু সুকান্তকে পান করতে দেখে তাদের প্রতিবেশী সেই প্রৌঢ়া রমণীর দৃষ্টি হঠাৎ তাদের দিক্ থেকে ছিট্‌কে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ফিরলো। তিনি বেশ স-শব্দ ফিস্-ফিস্ স্বরে বলতে লাগলেন—"মুয়ে আগুন অমন মা-বাপের—যারা এত বড় ধাড়ী মেয়েকে এই দুপুর রেতে এমনি বেমক্কা ছেড়ে দিতে পারে। তাদেরই বা দোষ দেব কি! মেয়েরা কি আর মা-বাপের কথা শুনবে ? হবে না, এমন ধিঙ্গী ধিঙ্গী ক'রে রেখে দেওয়া, তা আর হবে না—ভুগবেন মজা এর পরে।"

ভদ্রলোকটি একটু ব্যস্ত হয়ে ব'লে উঠলেন—"আঃ, থামো গো, শুনতে পাবে যে।"

মহিলাটি ফোঁশ ক'রে উঠলেন—"বটে ত···থাম্‌তে হবে···কেন শুনি···তোমাদের ত' লাগবেই ভাল, তোমরা এই সবই চাও···বত্ত ধেড়ে ধেড়ে মাগী ··"

তাঁর কথা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই তন্দ্রা একপ্রকার জোর ক'রে সুকান্তকে নিয়ে একেবারে ও-পাশে গিয়ে বস্‌ল।

এর মধ্যে আলো নিভে গেছে, আবার থিয়েটার সুরু হলো।

দর্শকমঞ্চ নিস্তব্ধ, অভিনয় বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। তন্দ্রার গায়ের জ্বালা কিন্তু তখনো কমে নি! দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ হওয়ার কাছাকাছি তন্দ্রা নিজেকে অনেকটা সাম্‌লে নিল। আবার যখন আলোটা জ্বলে উঠল, তন্দ্রা ততক্ষণ সব গ্লানি ঝেড়ে ফেলে সম্পূর্ণরূপেই নিজ সত্তায় ফিরে এসেছে। তার স্নিগ্ধ হাসি সুকান্তকেও আনন্দ দিল। তার পর ওরা সেই আধাবয়সী মহিলাটির মন্তব্যগুলি বেশ উপভোগ করেই আলোচনা করলে।

কথার ফাঁকে ফাঁকে সুকান্ত এদিক-ওদিক লক্ষ্য ক'রে দেখল, অনেকগুলো ছোট বড় চোখ তাদের দিকে বেশ একটু কৌতুক-মেশানো কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছে, সুকান্তদের ঠিক পিছনে ডান্‌দিকের দু'খান সীটের পরেই ফিতে-লাগানো চশমাচোখে একটি অতি আধুনিক ভদ্রলোক বসেছিলেন। সেই ভদ্রলোকটির মেয়েলী সুরের কথাগুলো সুকান্তের কাণে বেশ একটা 'ভেন্‌ট্রোলক্যুজম্‌' শোনার মত ঔৎসুক্য এনে দিচ্ছিল। সাম্‌নের দিকে আর একটি নব-পরিণীতা শিক্ষিতা বধূ তাঁর স্বামীর সঙ্গে 'স্পীচলেস—মেসেজের' কসরৎ চালাচ্ছিলেন—মাঝে মাঝে ইংরিজীতে দু'টা একটা কথাও বলছিলেন। সবটা মিলিয়ে মঞ্চের অভিনয়ের চাইতে এ বাস্তবের অভিনয় সুকান্ত এবং তন্দ্রার কাছে কম মজার লাগছিল না।

আবার তৃতীয় অঙ্ক সুরু হলো। বাতিগুলো নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'ভেন্‌ট্রোলক্যুজম্‌'এর মত একটা অতি মৃদু শব্দতরঙ্গ সুকান্ত আর তন্দ্রার মাঝ দিয়ে যেন ভেসে গেল! ফোনের অপর দিকে কোন মেয়ে আস্তে আস্তে কথা বলতে থাকলে শ্রোতার কাছে সে কথা যেমন কুণ্ঠানম্র অথচ সুস্পষ্ট বলে মনে হয়, সুকান্ত ও তন্দ্রা তেমনি একটা অতি মৃদু অথচ পরিষ্কার কথা শুনতে পেল,—"বাঃ খাসা মেয়েটি জুটিয়েছে কিন্তু! ভদ্দরলোকের ভাগ্যি ভালো!"

এবারের মন্তব্যটুকু শুনে তন্দ্রার আর রাগ হ'ল না, বরং তন্দ্রা সুকান্তের হাতের উপর একটু চাপ দিয়ে কথাটা সেও বেশ উপভোগ করছে, সুকান্তকে তা জানিয়ে দিলে।

থিয়েটারের বাকি অংশ একরকম ভালই কেটে যাচ্ছিল। একটা অঙ্ক শেষ হওয়া এবং আর একটা অঙ্ক সুরু হওয়ার মাঝের সময়টুকু দর্শকরা অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকবার সুদ চক্রবৃদ্ধি হারেই আদায় করে নিচ্ছিলেন। কেউ বা "অলকার" কোন একটি কথা বা বিশেষ ভঙ্গীর মধ্যে নিজস্ব অদ্ভুত বুদ্ধি খাটিয়ে রাজনৈতিক ইঙ্গিত আবিষ্কার ক'রে পাশের বন্ধুর কাণে চুপিচুপি বলছিল, "দেখেছিস্‌—সত্যি, এ যায়গা-টায় বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টকে কি রকম ঠুকে দিয়েছে!" কেউ বা তার গ্রাম্য প্রতিবেশী কোন প্রতিপক্ষকে কি রকম কায়দায় একটা কঠিন রকম মোকদ্দমায় জড়িয়ে ফেলবেন, তারই ব্যাখ্যা ক'রে বন্ধুকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। চারদিকে পাণ-বিড়ি, সোডা-লেমনেড, আইসক্রীম হকাররা যেন থিয়েটার গৃহটাকে চ'ষে ফেলছে। তার পর আবার আলো নিবে গেল, থিয়েটার চলতে থাকল। কিন্তু চীনেবাদামের পট্‌পট্‌ শব্দ দর্শকদের বিরক্তি জন্মাল। কেউ চেঁচিয়ে উঠল—থামুন না মশাই, বাড়ী গিয়ে খাবেন। থিয়েটার হয় ত বেশ জমে উঠেছে, এমনই সময় মহিলা-আসরে কোন্‌ দুধমেয়ের কান্না শোনা গেল। অমনি চারিদিক থেকে নানা সুরের তীব্র কটু এবং দুটো-একটা অভদ্র মন্তব্যও ছিট্‌কে বেরিয়ে এল। খানিক পরেই মহিলা-মঞ্চের তত্ত্বাবধায়িকা ঝীয়ের মুখগহ্বর থেকে "কুমারটুলীর শশী বাবু কে আছেন গো-ও-ও-ও···" সুউচ্চ কর্কশ শব্দ আরব্যোপন্যাসের দৈত্যের মতই দর্শকদের সামনে লাফিয়ে উঠে অত্যন্ত আচম্‌কা অভিনয়ের সমস্ত সৌন্দর্য্যের মাঝে তিন তিনটে মোটা মোটা পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়ে গেল। আবার হয় ত খানিক পরে চাঞ্চল্যটা একটু থিতিয়ে এল এবং পরবর্ত্তী অংশটুকু থেকে আনন্দ পাওয়া গেল।

ক্রমে চতুর্থ অঙ্ক শেষ হওয়ার পর ইণ্টারভ্যালের সময়টায় এমনি নানারূপ চাঞ্চল্যের মাঝে তন্দ্রা চুপি চুপি সুকান্তকে বলল, "দেখ, ঐ যে ও-পাশের শিক্ষিতা নববধূটি ইংরিজিতে তাঁর স্বামীর সঙ্গে মৃদুস্বরে আলাপ কচ্ছেন, তাঁদের আলাপের টার্গেট্‌ (লক্ষ্য) কি জানো, একটু কাণ দিয়ে শোন, তবেই সব বুঝতে পারবে।"

তন্দ্রার নির্দ্দেশ অনুযায়ী সুকান্ত তার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সবটুকু শক্তি একত্র ক'রে নিয়ে কাণের পাশে ঠেলে দিল। মহিলাটি তাঁর স্বামীর কাছে বিদেশী ভাষায় যা বলছিলেন, সুকান্ত অনেক চেষ্টায় তা শুনতে পেল। মহিলাটি তখন

বলছিলেন, "···আর এই জন্যেই ত আজকালকার শিক্ষিতা এবং কেতাদুরস্ত মেয়েদের উপর সকলের একটা বীতরাগ ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আমাদেরই ত দোষ, এ রকম পরিণত বয়সের অনাত্মীয় ছেলেদের সঙ্গে এমনি একা একা রাত একটা দু'টা অবধি যদি এমনি মাখামাখি ক'রে আড্ডা দিয়ে বেড়াই, তা হ'লে যাদের মুখ আছে, তারা চুপ ক'রে থাকবে কেন?—তাদের দোষ কি, তারা ত বলবেই।"

ভদ্রলোকটি কিঞ্চিৎ সঙ্কোচের সঙ্গে মৃদু আপত্তি ক'রে বলল—"কিন্তু অনাত্মীয়ই বা হবে কেন, উনি ত নিজের ভাইও হ'তে পারেন।"

কথা শুনে মহিলাটির ঠোঁট দু'টি একটি আদিরসাত্মক বক্ররেখার সৃষ্টি করল। একটু মধুর হেসে তিনি উত্তর করলেন—"হ্যাঁ, ভাই না আরও কিছু। ভাইরা কোন দিনই বোনেদের অত আদর ক'রে থিয়েটার দেখাতে নিয়ে আসে না। তাদের যত আগ্রহ কেবল পরের বোন্‌দের বেলায় উথ্‌লে ওঠে। আর ভাই-বোন হ'লে ত আরও খাসা, কেমন মাখামাখি করে—সব জানা আছে, আমাকে আর বোঝাতে হবে না।"

ভদ্রলোকটি দুষ্টামি ক'রে বললেন—"কিন্তু সে জন্য তোমার দুঃখু কেন? নিজের ভাই কটি ছাড়া আর সবার কাছে তুমিও ত একটি পরের বোন্। মাত্র নিজের ভাই কটিকে ছেড়ে দিতেও হিংসা?"

মহিলাটি ভদ্রলোকের হাতে একটি গোপন চিম্‌টি কেটে কৃত্রিম কোপের সঙ্গে ব'লে উঠলেন—"তুমি একটি ইডিয়ট্।"

তন্দ্রার কাছে কিন্তু কথাগুলি মোটেই মধুবর্ষণ করেনি। ও-পাশের সেকেলে ধরণের প্রৌঢ়া মহিলাটির সঙ্গে এ-পাশের অতি আধুনিকা শিক্ষিতা বধূটির একটা সুন্দর মিল তন্দ্রা আবিষ্কার ক'রে ফেলল, তাঁর এবং এঁর মন্তব্যগুলি একই গোত্রসম্ভূত, তফাৎ যা কিছু ভাষা ও অনুপ্রাস প্রয়োগে মাত্র। সেকেলে এবং একেলের মধ্যে প্রকৃতি এবং প্রাণ একই, প্রভেদ কেবল চাকচিক্যের তারতম্যে। এর মধ্যে নাটক কখন্ সুরু হয়ে গেছে, তন্দ্রার খেয়াল ছিল না। সে সুকান্তের কাছ থেকে একটু দূরে স'রে যাওয়ার চেষ্টা করতেই ধরা প'ড়ে গেল, সুকান্ত তন্দ্রাকে আরও নিবিড়ভাবে কাছে টেনে তার বাহুর ওপর ধীরে ধীরে হাত বুলাতে লাগল। তন্দ্রা সুকান্তকে চুপি চুপি বলল—ও-পাশ থেকে উঠে এসে এ-দিকে বসলাম, কিন্তু আমাদের ভাগ্যে হ'ল যেন 'Frying pan to Fire' এর চাইতে ও-দিকেই ছিলুম ভাল। তার পর দু'জনেই একান্ত-মনে অভিনয় দেখতে লাগল।

অভিনয়শেষে তন্দ্রা এবং সুকান্ত আবার মোটরে আশ্রয় গ্রহণ করল, সোফেয়ার ষ্টার্ট দিয়ে মোটর চালিয়ে দিল। কিন্তু গাড়ী যখন হ্যারিসন্ রোডে মোড় ভেঙ্গে হোটেল-রয়ালের নীচ দিয়েই হুস্ ক'রে বেরিয়ে গেল, থামল না, তখন সুকান্ত ভাবলো, ড্রাইভারের হয় ত ভুল হয়েছে। সুকান্ত চেঁচিয়ে উঠলো—"থাম থাম, এই বাহাদুর! আমার হোটেল ছাড়িয়ে এলে।" সুকান্তর কথাগুলো বাহাদুর শুনতে পেয়েছে ব'লে মনে হ'ল না, বরং দেখা গেল, স্পীডোমিটারের কাঁটাটা সঙ্গে সঙ্গেই আরও পাঁচটা দাগ এগিয়ে গেল এবং সুকান্ত অনুভব করলো, তার দুটো হাতই একজোড়া কোমল হাতের মধ্যে বন্দী হয়ে আছে। তার এই আকুলতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে সেই হাতদুটি আরও একটু কঠিন হয়ে উঠলো। মনটা কেমন আচ্ছন্ন হয়ে রইলো! গাড়ী ও-দিকে মোড় নিয়েছে, সুকান্ত হতাশ হয়ে দেখলো, সমস্ত সারকুলার রোডটা তখন দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে বয়ে চলেছে জলের স্রোতের মত।

তন্দ্রা যখন সুকান্তকে 'ইলোপ' ক'রে তাদের পার্ক-সার্কাসের বাড়ীর একেবারে ভিতরে গিয়ে ঢুকে পড়লো, তখন রাত প্রায় দুটো। মোটর থামতেই চাকর ছুটে এল, তন্দ্রা একলাফে মোটর থেকে নেমেই ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল, সুকান্তের জন্য তার যেন আর কোন ভাবনা থাকতে নেই, এমনি মনের ভাব।

মোটরের হর্ণ শুনে মা তাড়াতাড়ি নেমে এলেন, কিন্তু তিনি এসে দেখলেন, সুকান্ত একা মোটর থেকে নামছে—তন্দ্রা নেই। এই সময় খুট্ ক'রে তন্দ্রার ঘরের সুইচটাতে একটা শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলে উঠতে তিনি বুঝলেন, তন্দ্রা আগেই উঠে গেছে।

তখন তিনি সুকান্তর কাছেই মেয়ের নামে নালিশ জানালেন—"দেখ দেখি কি অদ্ভুত মেয়ে! আমাকে একটা খবর দিতে কি হয়েছিল! একটু খবর নেই; অথচ এত রাত অবধি বাইরে। আমি ভেবে মরছি। তোমার হোটেল নতুন চাকর চেনে না।"

দোষটা নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়ে সুকান্ত বললে,—"দোষ আমারই। হঠাৎ থিয়েটার দেখতে ইচ্ছে হলো—আগে কিছু ঠিক ছিল না। এ দিকে সময় কম থাকায় আপনাদের খপর দিতে পারিনি। তন্দ্রা যেতে চায় নি, আমি জোর ক'রে নিয়ে গেছলাম।"

সামান্য কিছু আহারের পর সুকান্ত সোজা এসে তন্দ্রার ঘরে তন্দ্রারই বিছানার উপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে মার পাশ দিয়ে তন্দ্রা এসে সেই ঘরেই ঢুকলো। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ হলো। কন্যার লজ্জারুণ মুখের দিকে তাকিয়ে স্নেহে গর্বে মা'র মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো!

হ্যাঁ, সুকান্ত বিলেত যাওয়ার আগে তন্দ্রাকে বিয়ে ক'রে গিয়েছিল। বিলেত থেকে ফিরে সে হোটেলে রয়্যালে সীট নিয়েছে। স্থায়িভাবে শ্বশুরবাড়ীতে থাকা সে পছন্দ করে না; তার চাকুরী স্থায়ী হলেই তন্দ্রাকে নিয়ে সে আলাদা বাসা করবে—তারও বড় দেরি আর নেই।

তন্দ্রাকে সে দিন অত লোকের সমালোচনার মধ্যে পড়তে হয়েছিল, তার মস্ত কারণ ছিল। তন্দ্রা সে দিন চুলে শ্যাম্পু করেছিল এবং কলেজের দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়িতে সীঁথিতে সিঁদুর দেওয়ার কথা মনে ছিল না। সীঁথিতে সিঁদুর না দেওয়ার যে সামান্য ত্রুটি, তারই ফলে সে দিন কম দুর্ভোগ ভুগতে হয়নি।

শ্রীহেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানবতা

এই যে সংসার আলোক-আঁধারে নিত্য বিরাজে মায়া—
এরি মাঝে এসে একা
প্রথম সে দিন নয়ন মেলিয়া হেরিনু লভেছি কায়া
—কি যেন ললাটে লেখা!

সেই দিন হ'তে স্বপনের ছবি ভুলালো আমার মন
সবারি অন্তরালে,
আমি যে হারায়ে ফেলেছি বন্ধু, আমার সাধন-ধন
কিসের ইন্দ্রজালে!

শান্তির বুকে আলপনা এঁকে কল্পরাণীরে রাখি
কুটীর করেছি আলা।
মিথ্যার সাথে করেছি মিতালী সত্যেরে দিয়ে ফাঁকি
বুঝিনি বিষম জ্বালা।

নর-নারায়ণে পূজিনি কখনো বিশ্ব-দেউল-দ্বারে
খুঁজিয়াছি মধুদীপ,
দেখি রূপসীর উরসেতে আভা—সঁপিনু হৃদয় তারে
এমনি অভাগা জীব!

লক্ষপ্রাণীর ক্রন্দন-ধ্বনি কাণ পেতে শুনি নাই
জানি নাকো কেন কাঁদে,
জীবের সেবায় চরম শান্তি—সে কথা ভুলিয়া যাই
পড়িয়া মোহের ফাঁদে।

রূপের নেশায় উন্মাদ আমি অরূপেরে উপহাসি
সে কথা ভাবিনি মনে,
নারী-যৌবন হেরিয়া নিয়ত তারি কেন অভিলাষী
ভাবিনি সঙ্গোপনে।

ব্যথার লহরী লীলায়িত যাহা জীবন-নদীর বুকে
কূলে কূলে দুলে ওঠে,
ঘূর্ণী-হাওয়ায় ক্ষুব্ধ হৃদয় গুমরিছে যত দুখে
পরাণে বেদনা ফোটে,

তাহাদের পানে চাহি নাই ফিরে বিরাট নিখিল মাঝে
শুধু ব'সে গান গাহি,
সে গানে আমার আত্ম-সুখের মিলন-মাধুরী আছে
মানবতা কিছু নাহি।

তাই কি বিষাণ রুদ্র বাজায় ঝঞ্ঝা-নিশান তুলি
শ্মশান-কালীর সাথে,
তাই কি হৃদয় কম্পিত হয়ে বারে বারে ওঠে দুলি
তীক্ষ্ণ অশনিপাতে!

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।



সাগরের বুকে নারী

শিক্ষা ও সভ্যতার ফলে পৃথিবীর সর্ব্ব-সমাজেই নর-নারীর মনোবৃত্তিতে বহু পরিবর্ত্তন এবং মানব-মনের বিকাশে হয়তো বহু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে! সামাজিকতার আব-হাওয়ায় মুখের হাসিতে আমরা মনের বিষ ঢাকিতে শিখিয়াছি! কাপট্যে প্রীতির পালিশ ঘষিয়া অপরের চোখে আজ ধাঁধা রচিতে জানি! এজন্য শিক্ষা-সংস্কার-মুক্ত নারী-চিত্তের স্বরূপ বুঝিতে হইলে যে-সকল সমাজে শিক্ষা-সভ্যতা আজও প্রভাব স্থাপন করিতে পারে নাই—সেই সব সমাজের আলোচনা প্রয়োজন। সে-সব সমাজে নারীর মন আজিও স্ব-ভাবে বিদ্যমান আছে; কৃত্রিম আবরণের অন্তরালে মনের স্ব-রূপ ঢাকা পড়ে নাই।

লোকালয়ের বহু দূরে অবস্থিত প্রশান্ত মহা-সাগরের বুকে যে দ্বীপ-পুঞ্জ আছে, সেই দ্বীপ-পুঞ্জে আমরা এমন নারীর দেখা পাই। দ্বীপগুলি যেন সিন্ধুর বুকে কয়েকটি বিন্দু!

পাশের মান-চিত্রে দেখিবেন, অষ্ট্রেলিয়া মহাদ্বীপের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে আকাশের বুকে অগণিত নক্ষত্রের মত ছোট ছোট অসংখ্য দ্বীপ খচিত আছে। এই বিভিন্ন দ্বীপগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলে আমরা পাই পলিনেশিয়া, মেলানেশিয়া ও মাইক্রনেশিয়া। এ সব ক্ষুদ্র দ্বীপ পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন। এগুলির কোনোটিতে অগ্নি-গিরির উদ্দাম মারণ-লীলা চলিয়াছে,—ক্ষণে ক্ষণে সম্পূর্ণ অতর্কিত-ভাবে! কোথাও ধূ-ধূ মরু! সেখানে না আছে তৃণ-শস্য, না জল! কি কষ্টে মানুষ এ সব দ্বীপে বাস করে! যখন দেখি, লোকালয়ের বহু দূরে, শিক্ষা-সভ্যতার স্পর্শ-লেশহীন এই সব দ্বীপে কাটাকাটি হানাহানি না করিয়া প্রাচীন জাতির বংশ এখনো কত কালের আচার-বিধি মানিয়া নির্ব্বিঘ্নে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, তখন আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না!

বায়োস্কোপের কল্যাণে বাঙালীর কাছে হাওয়াই দ্বীপের নাম আজ বেশ পরিচিত। শামোয়া দ্বীপ, নিউজিলান্দ, ফিজি দ্বীপের নামও নিত্য শুনি। এ সব দ্বীপকে আমরা রূপ-কথার তেপান্তর বলিয়া বুঝিলে ভুল করিব না! সুতরাং এই দ্বীপপুঞ্জের অবস্থান চোখের সামনে ধরিয়া এখানকার নারীর পরিচয়-গ্রহণে অগ্রসর হইব।

এই যে বিভিন্ন দ্বীপ—মূলে এ সব দ্বীপের নর-নারী একই গোষ্ঠী হইতে উৎপন্ন; ইহাদের ভাষা এক। ভাষার নাম ওশেনিক বা মলয়-পলিনেশিয়ান। এখানকার নর-নারীর গায়ের বর্ণ পীতাভ; কালো নয়। নাসা উন্নত। য়ুরোপীয় যে সব সভ্য জাতি পলিনেশিয়ায় ঘুরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের মতে রূপে-সেরা পৃথিবীর অন্য বহু জাতির নর-নারীর চেয়ে এ জাতির নর-নারী এতটুকু নিরেস নয়! এ মুল্লুকের নারীকে তাঁরা আদর্শ রূপসী—perfect types of beauty বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বহু কবি বিমুগ্ধ চিত্তে পলিনেশিয়ার নারীর রূপের বন্দনা-গান গাহিয়া গিয়াছেন,—পলিনেশীয় নারীর চিত্ত সরল। য়ুরোপীয় পর্য্যটকেরা বলেন, পলিনেশিয়ান নারীর মুখ-চোখ যেন শুকতারা! আঁখি-পল্লব কালো ঘন; গায়ের বর্ণে সোনা ফাটিয়া পড়িতেছে! এ মুল্লুকের নারীর প্রসঙ্গে বায়রণ বলিয়া গিয়াছেন,

...In growth a woman, tho' in years a child;
The infant of an infant world, as pure.

অর্থাৎ……

বয়সে রমণী—তবু শিশু ;
শিশু-নিখিলের শিশু—পবিত্র তেমনি !

এই দ্বীপগুলিকে শিক্ষিত সভ্য সমাজ 'সাউথ-সী দ্বীপমালা' (South Sea Island) নামে অভিহিত করেন। 'পলিনেশিয়া'র অর্থ বহু দ্বীপ ; 'মেলানেশিয়া'র অর্থ কালো দ্বীপ ; 'মাইক্রনেশিয়ার' অর্থ অগণিত ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ। ফিজি, সহজ হইবে। পলিনেশিয়ার অধিবাসী নর-নারীদের দেখিতে যেমন সুশ্রী, মেলানেশিয়ার নর-নারীরা তেমনি কদর্য্য—কালো কুৎসিত! তাদের মাথার চুল যেন ঝুল-ঝাড়া তোবড়া !

টোঙ্গা দ্বীপের নারীরা যৌবনকে বেশ বাঁধিয়া ছাঁদিয়া অটুট রাখিতে জানে। তারা যেন চির-কিশোরী ! বার্দ্ধক্য তাদের অবিদিত ! পীনোন্নত বক্ষ—সুঠাম বাহু—সুছাঁদে



সিন্ধুর বুকে বিন্দু

টোঙ্গা, শামোয়া, তাহিতি, পমেটাশ, মার্কুয়েশাস ও হাওয়াই এই কয়টি দ্বীপ 'পলিনেশিয়ার' অন্তর্গত ; নিউ গিনি, পাপুয়া, বিশমার্ক দ্বীপপুঞ্জ, শলোমান, নিউ হেব্রাইডিশ ও লয়ালটী এই কয়টি দ্বীপ 'মেলানেশিয়ার' অন্তর্গত। কারোলিন, মার্শাল ও গিলবার্ট প্রভৃতি দ্বীপ মাইক্রনেশিয়ার অন্তর্গত।

এই শ্রেণী-বিভাগ বুঝিলে আমাদের আলোচনা

গড়া চরণ-যুগ,—দেহ সরল উন্নত, কোনো দিন ধনুকের মত বাঁকিয়া মেদের ভারে পিণ্ডাকৃতি হইতে জানে না ! টোঙ্গা নারী চলে যেন বায়ু-ভরে পল্লবিনী লতার মত। য়ুরোপীয় পর্য্যটক-গণ বলেন, এ দেশের নারী নয়ন-রঞ্জিনী ; সর্ব্বদিক দিয়া দেহের এমন গঠন পৃথিবীর আর কোনো দেশের নারীর আছে কি না সন্দেহ ! শৈশব হইতেই ইহাদের চলিতে



সেন ঝুল-ঝাড়া তোবড়া



তাহিতি-রূপসী

শিখানো হয় বাঁধা-ধরা ছন্দে। এ কারণে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চারু ছাঁদে সুঠাম সুডৌল হইয়া গড়িয়া ওঠে। মেয়েদের চলিবার প্রণালীও অপূর্ব !

ছেলে-বয়স হইতে যেমন তাদের চলন-ভঙ্গী শিখানো হয়—বসিবার ভঙ্গীও তেমনি শিখানো হয়। পলিনেশিয়ান নারী বসে পদ্মাসনার ভঙ্গীতে ; পিঠ সোজা থাকে—বাঁকে না। ছেলেবেলা হইতে এই যে বসিবার ভঙ্গী শিখানো হয়, সারা জীবনে সে রীতিতে নিমেষের ত্রুটি দেখা যায় না।

পলিনেশিয়ায় রূপের আদর বড় বেশী। নারী-সমাজে রূপের সাধনা চলে পরম নিষ্ঠায়।

কি ভাবে সাজিলে, কি ভাবে দেহের ছন্দ বাঁধিলে ভালো দেখাইবে, সেদিকে তাদের লক্ষ্য অপরিসীম। স্নানে প্রগাঢ় অনুরাগ। সমুদ্রের বুকে-বাস করিলেও স্নান করে ভালো জলে। সমুদ্রের লোণা জলে স্নান করে না ; পাছে লোণা জলে দেহের বর্ণ 'জরিয়া' ঝরিয়া যায় !

পাঠিকারা মনে করিতেছেন, কাজ নাই, কর্ম্ম নাই, কেবলি ঠোঁটে রঙ মাখিতেছে ? আর রূপের সেবা চলিয়াছে ? না, তা নয়। এ দেশের নারী পুরুষদের সঙ্গে সমুদ্রে মাতন তুলিয়া সারা দিন মাছ ধরে, ঝিনুক কুড়ায় ; দিনের শেষে গৃহে ফিরিবার সময় ভালো জলে স্নান করে। এ তাদের নিত্যকার

কাজ। প্রসাধনের জন্য এ দেশের নারী গায়ে মাখে লাল মাটী; তাহাতে প্রচুর ফেনা হয়। মুখে ও সর্ব্বাঙ্গে মাখে কাঁচা কমলা লেবুর রস। দিনে দু'তিনবার স্নান করে। স্নানের পর গায়ে-মাথায় সুগন্ধি তৈল মাখে—মাথা শাম্পু করে। সারা দেহে ঘষিয়া তৈল মাখে; মাখিয়া দেহখানিকে করে সাটিনের মত চিকণ মসৃণ, মাখনের মত ললিত কোমল। ফিজি দ্বীপের নারী গায়ে তৈল মাখে না; এজন্য তাদের গায়ের চামড়া কড়া খশখশে।



টোঙ্গা নারী পদ্মাসনা

স্নানাদির পর পলিনেশিয়া-নারী সতর্কভাবে রৌদ্র-তাপ হইতে আত্মরক্ষা করে। এ কারণে য়ুরোপীয় শ্বেতাঙ্গিনী-গণের চেয়েও ইহাদের লাবণ্য ও বর্ণ হয় দীপ্ত ও উজ্জ্বল।

অঙ্গ-গঠনের জন্য নাচের রেওয়াজ আছে। চার-পাঁচ বৎসর বয়সে আমাদের দেশে যেমন ছেলেদের হাতেখড়ির ব্যবস্থা, পলিনেশিয়ার নারী-সমাজে মেয়েদের তেমনি চার-পাঁচ বৎসর বয়সে নাচে পায়ে-খড়ির ব্যবস্থা আছে। নাচে কোনো দিন ফাঁকিলি করিবার জো নাই; তাহা হইলে ভীষণ শাস্তি।

কেশ-প্রসাধন রূপ-সাধনার প্রধান অঙ্গ। সুগন্ধি তৈলে সিক্ত করিয়া পলিনেশিয়ান নারী নানা ছাঁদে কবরী বাঁধে। অবসর মিলিলেই চিরুণী দিয়া মাথা আঁচড়ানো চলিতেছে। কেশে পুষ্পভূষা না থাকিলে নয়। কি বিচিত্র ভাবেই না কবরী রচিত হয়! এক জন য়ুরোপীয় পর্য্যটক লিখিয়াছেন, সময় পাইলেই পলিনেশীয় নারী দল বন্ধ কুঞ্জে সদলে বসিয়া পরস্পরের চুল বাঁধিয়া দেয়! পাশে বহিয়া চলিয়াছে গিরি-নির্ঝরিণী—মেয়েদেরো সাধনা চলিয়াছে কেশ-দাম কুঞ্চিত করিতে; পুষ্প-ভূষণে সে কেশের বিচিত্র ভূষা-সম্পাদনে। কেশ পুষ্প-ভূষিত করার সখ এত বেশী যে, কেশ-প্রসাধনের



নৃত্যময়ী হাওয়াই-রূপসী

জন্য সে দেশে এক স্বতন্ত্র দেবতা আছে; দেবতার নাম তোতোরোপোতা। আমরা যেমন বিদ্যা-লাভের জন্য মা-সরস্বতীর পূজা করি, তারা তেমনি সুকেশিনী হইবার প্রত্যাশায় এই তোতোরোপোতা দেবতার পূজা করে। তাঁর প্রসাদ ভিন্ন সুকেশিনা হইবার আশা না কি নাই!

প্রবাল পুড়াইয়া তাহার চূর্ণ তৈয়ার করে; সেই প্রবাল-চূর্ণে কেশ-প্রসাধন করে! জলে এই চূর্ণ মিশাইয়া ফ্যাটাইয়া কাইয়ের মত করে; সেই মিশ্র মাথার কেশে মাখাইয়া

চুল শুকায়। দিনে বহুবার এ প্রক্রিয়া চলে। এ চূর্ণে মাথায় ময়লা জমে না, চুলে আটা ধরে না; কেশের বর্ণ সুরঞ্জিত থাকে। তাহাতে কেশের শোভা বাড়ে।

কবরী-সজ্জার রীতিও বহু-বিচিত্র। কেহ 'আলবার্ট' তোলে, কেহ 'পাতা' কাটে। এজন্য কেশের উপর কাঁচি চলে যেমন-খুশী; আঠা আসে; কাঁটা আসে; ফিতা আসে; ফুল আসে; পাতা আসে।

কুমারী ও বিবাহিতা—উভয় নারীর কবরী-রচনায় পার্থক্য আছে। কুমারীরা খোঁপা বাঁধে না। নিয়ম নাই। কুমারীর বেণী দোলে পিঠ বহিয়া; বিবাহের সময় অস্ত্রপাশে এ বেণী কাটা যায়। বৈধব্য ঘটিলে মাথা মুড়ানো চাই; বিধবা হইলে মাথায় দীর্ঘ কেশ রাখার বিধি নাই। ছোট করিয়া চুল ছাঁটিতে হয়।

এখানকার নারী-সমাজে কর্ণবেধের প্রথা আছে। বালিকা-বয়সে কর্ণবেধ হয়। কর্ণবেধের পর সে ছিদ্রে নিত্য বৃন্ত-সমেত নবপুষ্প গ্রথিত করার বিধি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কর্ণের ছিদ্র বড় হয়; এবং যৌবনে কর্ণের সে-রন্ধ্রে রীতিমত বড় ফুলের তোড়া গুঁজিয়া রূপশ্রী বর্দ্ধিত করিয়া তোলা হয়!

তারপর অঙ্গ।

অঙ্গে আবরণ টানিবার রীতি নাই; নগ্ন দেহে চিত্র-বিচিত্র নক্সা কাটা হয়। এ নক্সা পাকা করিবার জন্য মাছের কাঁটা দিয়া অঙ্গ বিঁধিয়া চিত্র রচনা চলে। সেই ক্ষতে একরূপ ফলের আঠা লাগানো হয়—বসন্তের টীকা দেওয়ার ধরণে। পরে অঙ্গের ক্ষত সারিলে নির্য্যাসের বর্ণ-বৈচিত্র্যে অঙ্গে নানা রকমের চিত্র ফুটিয়া ওঠে। এই সজ্জারচনায় যাতনার অন্ত থাকে না। পরো পরো মা গহনা পরো—স্তোক-বাক্যে সান্ত্বনা চলে; তবু এত যাতনা সহিয়াও অঙ্গ-শোভা-বর্দ্ধনের এ নির্ম্মম-প্রথা পরম যত্নে এখানকার নারী-সমাজে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে সেই অনাদি অনন্ত কাল হইতে।

বর্ব্বর হইলেও নগ্ন-তনু-বিলাসে পলিনেশীয় নারীর রুচি কোনো দিন ছিল না। অধঃ-অঙ্গ তারা বসনে আবৃত রাখে—ঊর্দ্ধ-অঙ্গে আবরণ নাই। সে দেশে তুলা



হাওয়াই—নাচের আসর

নাই—কাপড় বুনিবার কোনো উপাদান নাই; এজন্য তাল, নারিকেল ও খর্জ্জুরের পল্লবে কিম্বা অন্য তরু-পল্লবেও অঙ্গাবরণ রচিত হয়। রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র—সকলের এই এক বেশ! তবে বেশ-রচনায় যার হাত কুশলী, তার বেশে বৈচিত্র্যও তেমনি! বল্কলও লজ্জাবরণ-রূপে ব্যবহৃত হয়। বল্কল-আবরণ দরিদ্র পরিবারে অবিদিত। সংগ্রহের সামর্থ্য তাদের নাই।

পত্র-পল্লবে বসনাবরণ রচনা—এ শিল্প এখানকার নারী-সমাজে নারীর শ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া বিবেচিত হয়। দেশের

যিনি রাণী, বয়ন-বিদ্যায় তাঁর সব চেয়ে পারদর্শিনী হওয়া চাই। অপর নারী রাণীর চেয়ে ভালো বসনাবরণ রচনা করিয়াছে—এ সংবাদ প্রচার হইলে রাণীর লজ্জার সীমা থাকে না। 'লাজে হেঁট মুখ তাঁর' হইবে তখনি। বসনাবরণ-রচনা প্রতি পরিবারে গৃহ-কর্ম্মের মত প্রচলিত। দশ-বারো জন নারী একসঙ্গে বসিয়া এ কাজ করে। পাল-পার্ব্বণে, উৎসবে রাণীকে কেন্দ্র করিয়া নারীর দল বসন নির্ম্মাণে বসিয়া যায়।

এ বেশ পরিধানের রীতি বিচিত্র। যাদের অবস্থা ভালো, সে-সব পরিবারের মেয়েরা এক রকম গাছের ছাল পিটিয়া পিটিয়া বসন তৈয়ারী করে। সে বসনের নাম "তাপা"।

পলিনেশিয়ান নারী খুব ভূষণ-প্রিয়। পুষ্প-ভূষণ ব্যতীত

বারো-তেরো বৎসর বয়সের পূর্ব্বে মেয়েদের বিবাহ হয় না। বিবাহের জন্ম বাঁধা বয়স নাই। কুমারী মেয়ের স্বাধীনতা প্রচুর। স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে স্বামি-কুলের মন এক নিমেষ সংশয়-মুক্ত নয়। বড় ঘরে স্ত্রীদের পাহারা দিবার ব্যবস্থা আছে। দিবা-রাত্রির মধ্যে এ পাহারার বিরাম থাকে না।

বিবাহিতা নারী একা পথে বাহির হয় না; বিধি নাই; সঙ্গে পাহারা থাকে। পাহারা থাকিলে অবশ্য যথা-ইচ্ছা ঘুরিয়া এসো।

বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করে উভয় পক্ষের মা-বাপ।

দরিদ্র পরিবারে বর বিবাহের প্রস্তাব করে—সে প্রস্তাব পাকা হয় বরের কোনো বন্ধুর দূতীয়ালীতে।



শামোয়া-পানীয়-রচনা

তারা হাতে বালা পরে, গলায় নেকলেশ ঝুলায়। মেলানেশিয়ায় সেরা গহনা বন-বরাহের দাঁতে তৈয়ারী বালা; হাতে পরে; কিম্বা গলায়-দোলা লতার মালায় এক টুকরা বরাহের দাঁত যদি লকেটের মত ঝুলাইতে পারে, তাহা হইলে সমাজে ইজ্জৎ বাড়ে।

নেকলেশ তৈয়ারী হয় তিমির দাঁতে। সে নেকলেশের অনেক দাম। একটি দাঁত টুকরা-টুকরা করিয়া কাটিয়া তাহা সচ্ছিদ্র করিয়া মালা-রচনা হয়। কড়ি ঝিনুক দিয়া বালা তৈয়ার হয়। এ সব গহনা অবশ্য 'পোষাকী'; নিত্য পরিবার জন্য নহে। পালপার্ব্বণে বা পারিবারিক উৎসবে এ গহনা পরিতে হয়; নহিলে মান থাকে না।

বড় লোকের ঘরে কুমারী কন্যা নীচু ঘর হইতে পাত্র মনোনীত করিতে পারে। তবে এ ব্যাপারে তাহিতি দ্বীপে আরও মজার বিধি আছে। সেখানে স্ত্রী যদি হয় ধনীর কন্যা এবং স্বামী গরীবের ছেলে, তাহা হইলে ইচ্ছা করিলে স্ত্রী যতগুলা খুশী স্বামী (একই কালে দাম্পত্য-ধর্ম্ম পালনের জন্য) সংগ্রহ করিতে পারে। 'ফ্রী-লভ' নয়। স্বামীগুলিকে বিবাহ করিতে হয়; বিবাহ ভিন্ন মিলন দোষের—সমাজের চোখে অবশ্য!

বিবাহে ভোজ দিতে হয় বহু ব্যয়ে। এই ব্যয়ের দায়ে বহু দরিদ্র পুরুষ বিবাহ করিতে পারে না—আজীবন 'শিশুপাল' থাকিয়া যায়। বিবাহে প্রীতি-উপহার-বিতরণের

নিয়ম আছে। বন্ধু ও আত্মীয়ের দল বর-কন্যাকে উপহার দেয়,—ডোঙ্গা, শূকর-ছানা ; কিম্বা কোনোরকম পণ্য দ্রব্য, মাদুর বা পত্র-পল্লবে রচা বসনাবরণ। গহনাগাঁটী বা ফুল উপহার দিবার রীতি নাই।

দরিদ্র পুরুষের বুকে যদি বল থাকে এবং কোনো নারীকে যদি সে অন্তরের সহিত কামনা করে, তবে সে কামনার বস্তু-লাভে সনাতন বিধি আছে—None but the brave! সেই বিধির বশে সে তার কামনার বস্তু নারীকে লইয়া অনায়াসে চম্পট দিয়া বিবাহ-সাধ পূর্ণ করিতে পারে। পুরুষ যদি ধনী হয়, তাহা হইলে যত-খুশী পত্নী গ্রহণ করিতে পারে।

এই প্রসঙ্গে এক শ্বেতাঙ্গিনীর কাছে সেখানকার এক কিশোরী বলিয়াছিল— এক জন পুরুষ একটি মাত্র স্ত্রী গ্রহণ করিবে, এ রীতি খুব ভালো—যদি স্বামি-স্ত্রী পরস্পরকে ভালোবাসে। তা যদি না বাসে, তাহা হইলে 'এক স্ত্রী নিয়ে হলে কারবার' স্ত্রীকে স্বামী প্রহার করিবে, জ্বালা-যন্ত্রণা দিবে। যদি পাঁচ-সাতটা স্ত্রী থাকে, তাহা হইলে যতই বিরাগ বা বিরোধ ঘটুক, পুরুষের মেজাজ বেশী চটিবে না। একজন স্ত্রীর সঙ্গে তর্ক-বিরোধ হইল তো আর পাঁচ জন স্ত্রী আছে! তাদের কাছে গিয়া মেজাজ ঠাণ্ডা করিবে।

বিবাহ-রীতি থাকিলেও তার বাঁধন খুলিবার রীতিও এ দেশে খুব সহজ সেজন্য আইন-আদালতের প্রয়োজন নাই। বিবাহের বাঁধন কাটিতে চাহিলে স্বামী শুধু স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিবে,—তোমার সঙ্গে পোষাইতেছে না বাপু, তুমি পথ ছাখো। ব্যস্! এ কথা স্বামীর মুখে বাহির হইবামাত্র বাঁধন গেল খুলিয়া এবং স্ত্রী তখন আবার যাকে খুশী বিবাহ করিতে পারে।

স্ত্রী অবিশ্বাসিনী হইলে শামোয়া দ্বীপে স্বামীর অধিকার আছে, সে-স্ত্রীকে কাটিয়া তার রক্ত-দর্শনে। যে-পুরুষ স্ত্রীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে, শুধু তাকে নয়, তার ভাই-ভ্রাদারকে পর্য্যন্ত যদি স্বামী খুন করে, তবু সে খুন অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না—ইহাই বিধি।



শামোয়া-নারীর বেশ-ভূষা

পয়সার জন্য স্ত্রী ও কন্যাকে বেচিয়া দেওয়ার রীতি কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পলিনেশিয়ায় প্রচলিত ছিল—এখন নাই।

বিবাহ-বিধি বেশ সরল না হইলেও পলিনেশিয়ান্ নারীর নিষ্ঠা নাই, এমন ধারণা যেন কেহ মনে না পোষণ করেন। স্বামি-বিয়োগে পলিনেশিয়ান নারী বেদনা সহিতে না পারিয়া প্রাণ দিয়াছে ; পর-পুরুষের প্রলোভনে না মজিয়া স্বামীকে একান্তভাবে আশ্রয় করিয়াছে ; স্বামীর দুঃখ শিরোধার্য্য

করিয়া খুনী-মনে বাস করিতেছে,—এমন ঘটনা এ সব দ্বীপে বিরল নহে। স্বামী নাউফাতোকে বিনা-কারণে হত্যা করিয়াছিল বলিয়া নাউফাতোর পত্নী রণ-রঙ্গিণীর বেশে গিয়া খুনীকে লাঠি মারিয়া স্বামি-হত্যার প্রতিশোধ লয়। স্বামীর সমাধির উপর ছয় মাস ধরিয়া পড়িয়া কাঁদিয়াছে, এমন নারী ও-মুল্লুকে অনেক আছে।

পুরুষ মারা গেলে তার স্ত্রীকে বিবাহ করে দেবর। এ বিবাহে দেবর সম্মত না থাকিলে বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে পরের হাতে তুলিয়া দেয়। তবে পুনর্ব্বিবাহে কোনো বিধবার যদি রুচি না থাকে, জোর করিয়া তার বিবাহ দিবে, এমন বিধি নাই। যে সব বিধবা পুনর্বিবাহ করে না, তারা গিয়া পিতৃ-গৃহে বা ভ্রাতৃগৃহে আশ্রয় লয়। বাপ বা ভাই না থাকিলে পরের ঘরে দাস্য ভিন্ন উপায় থাকে না। ছেলে ডাগর হইয়া বিধবা মাকে যদি গৃহে আশ্রয় দেয়, তবেই সে-গৃহে বিধবার আশ্রয় মেলে; নচেৎ পুত্রের গৃহে আশ্রয়-লাভেও বিধবা মায়ের আইন-গত বা সমাজগত কোনো দাবী নাই।



তৌ-পন—

এক কথায় এ-মুল্লুকে নারীর সুখ-সুবিধা নির্ভর করে পুরুষের ইচ্ছার উপর। পুরুষের দেহ-মনের ক্ষুধা-পিপাসা মিটাইতেই যেন সে দেশে নারীর জন্ম হইয়াছে।

এই সব দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে শামোয়ানরা সব চেয়ে পরিচ্ছন্ন; নীতির দিক দিয়াও তারা ভালো। শামোয়ার মাটী উর্বর। অন্নের কষ্ট নাই। কাজেই শামোয়ান নর-নারীর মনে আছে স্ফূর্ত্তি, দেহে আছে প্রাণ।

গৃহ-সংসারে শামোয়া নারী তুচ্ছ বা অবহেলার পাত্রী নয়। পারিবারিক ব্যাপারে তার মতামতের মূল্য আছে। বিবাহের বাজারে শামোয়া নারী কামনার ধন; সমাজে ও শাসন-ব্যবস্থায় শামোয়া নারীর আসন আছে; সেখানে তার মতামত উপেক্ষার নয়—মানিয়া চলিতে হয়।

শামোয়ায় ধনি-দরিদ্র-নির্বিশেষে সকল নারীকে কাজ-কর্ম্ম করিতে হয়। বসন ও ভূষণ রচনা নারীর নিত্য-কর্ম্ম। এ কাজে নারী গৌরব বোধ করে—ইহাতে মানহানি হয় না। এ কাজ না জানা লজ্জার বিষয়।

প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া শামোয়া নারী ঘর-দ্বার পরিষ্কার করে—বিছানা তোলে; তার পর স্নান সারিয়া আহার্য্য প্রস্তুত ও আহার; আহারাদির পর বসনাবরণ তৈয়ারী। পাঁচ জন প্রতিবেশিনী বা আত্মীয়া মিলিয়া কাপড় বোনে। কাপড় বুনিতে বুনিতে গল্প-গুজব চলে। তার পর আছে জল তোলা, চ্যাটাই বোনা; ঋতু-ক্রমে গাছের ছাল বাহির করিয়া তাহাতে কাপড় তৈয়ারী; নয়তো সমুদ্রে ভাঁটা

পড়িলে পাড়ার মেয়েরা মিলিয়া দল বাঁধিয়া সমুদ্রে যায় মাছ ধরিতে, ঝিনুক কুড়াইতে।

পাঁচ-সাত বৎসর বয়স হইতেই মেয়েরা সংসারের কাজে মায়ের সাহায্য করে; জল বহিয়া আনে, কাপড় ও চ্যাটাই বোনে, মাছ ধরে, ঝিনুক কুড়ায়।

এ দেশে বহু প্রাচীন কাল হইতে 'গ্রামের কুমারী' নির্ব্বাচনের (Taupon or Maid of the village) প্রথা প্রচলিত আছে। বিলাতে যেমন May Queen নির্ব্বাচন হয়, এ প্রথা অনেকটা তেমনি। গ্রামের আমীর-ওমরাওদের ঘর হইতে মেয়ে বাছা হয়। বড় ঘর ছাড়া গৃহস্থ বা দরিদ্র ঘর হইতে মেয়ে বাছিবার রীতি নাই। তার পর পর্ব্বদিনে মস্ত আটচালায় বহু গ্রামের নর-নারী আসিয়া জোটে পার্ব্বণ দেখিতে। রূপে যে-মেয়ে সকলের সেরা হয়, সে মেয়ে এ গৃহে সঙ্গিনীদের সহিত রাণীর গৌরবে কিছুকাল বাস করে। সে সময় এ গৃহ ত্যাগ করিয়া কোথাও তার যাইবার উপায় নাই। এ সময়ে কোনো পুরুষ মানুষের একাকী সে গৃহে ঘেঁষিবার অধিকার নাই।

এ সময় কুমারীকে খুব শান্ত ও ভালো-মানুষ সাজিয়া থাকিতে হয়। সঙ্গিনীরা প্রত্যহ Taupon-এর বংশ-কথা, রূপের কথা গানে গাহিয়া কুমারীর পরিচয় প্রদান করে। বহু গ্রামের ওমরাও যুবকেরা আসে কুমারীকে ভেট দিতে। ভেট আনে শূকর। যে যুবক বেশী শূকর ভেট দেয়, তার সঙ্গে হয় কুমারীর বিবাহ।

যতদিন কুমারী আটচালায় থাকে, ততদিন প্রত্যহ তাকে নৃত্যকৌশল দেখাইতে হয়। নাচে কুশলী হওয়াই কুমারীর মস্ত গুণ। শামোয়া নারীর নাচ সত্যই আর্টিষ্টিক। শিব-নৃত্য নামক নাচ আছে; সে নাচ নাচিতে হয় বসিয়া বসিয়া; বসিয়া চরণে বিচিত্র গতি-ভঙ্গীর বিকাশ করিতে হয়—সঙ্গে সঙ্গে বাহুতে লীলা-ছন্দ জাগে!

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে এই যে দ্বীপমালা, এ সব দ্বীপের মধ্যমণি,—হাওয়াই দ্বীপ। এ দ্বীপে শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই; চিরবসন্ত বিরাজমান। দ্বীপটি যেন জলের বুকে পদ্ম! মাথার উপর আকাশ প্রশান্ত নীল, নির্ম্মল।



শামোয়া— মাথার টুপিতে ঝিনুকের বাহার

হাওয়াইয়ান্ জাতি খুব আমোদ-পরায়ণ। য়ুরোপীয় পর্য্যটক শ্রীমতী বিশপ এই দ্বীপের প্রসঙ্গে বলিয়া গিয়াছেন—এখানকার মেয়েরা যেন হাসির ঝিলিক! অথচ কাজে কাহারো বিরাগ নাই। কেহ রান্নাবান্না করিতেছে, কেহ কাপড় কাচিতেছে, কেহ বই

পড়িতেছে—সকলের হাসি-মুখ। কাজ করিতেছে—তাও খেলার লীলায়!

হাওয়াই দ্বীপে মেয়েদের আসন পুরুষের উপরে। এ দ্বীপে সামাজিক মান-সম্ভ্রমের অধিকারিণী নারী। যে নারী উচ্চ-বংশীয়া—তার মেয়েরা সে-বংশের সম্ভ্রম-সম্মানের অধিকারিণী হয়, ছেলেরা নয়। সম্ভ্রম চাহিলে পুরুষকে এই বংশের মেয়ে বিবাহ করিতে হয়; নচেৎ সম্ভ্রম-লাভে অন্য উপায় নাই।

তথাপি নারী বলিয়া নারীর আচরণ সম্বন্ধে এ দেশে বহু বিধি-নিষেধ প্রচলিত আছে।

তাঁরা বুঝিবেন, এই 'Tabu' হাওয়াই দ্বীপে 'নিষেধের দেবতা!' এঁর পূজার মন্ত্র—উঁহু উঁহু—নেতি, নেতি! নিষিদ্ধ কোনো বিধি পালন করিলে এই 'টাবু'-দেবতার কোপে পড়িতে হয়। সে কোপে কোনো রকমে নিস্তার মিলিবে না!

কাপিওখানি নামে এক বালিকা নাকি গোপনে (তাও ঠাকুরঘরে নয়—কদলী-কুঞ্জে!) কলা খাইয়াছিল সামাজিক বিধি লঙ্ঘন করিয়া। কথাটা কোনোমতে প্রকাশ পায়। অমনি 'টাবুর' কোপ জাগিল। সে জন্য বালিকাকে অশেষ নির্য্যাতন সহিতে হয়। ঘৃণ্য কুকুরের



হাওয়াই-দ্বীপে জলশা

মান-সম্ভ্রমে হাওয়াই দ্বীপে নারী সর্ব্বময়ী হইলেও পুরুষের সঙ্গে একত্র বসিয়া নারীর ভোজন নিষেধ। এমন কি, স্বামীর সামনে বসিয়া নারী ভোজন করিবে না। স্বামীর খাদ্য যে উনানে রান্না হইবে, সে উনানে স্ত্রীর খাদ্য রন্ধন করা চলিবে না। শূকর-মাংস, রম্ভা, নারিকেল, কচ্ছপের মাংস এবং কয়েক প্রকার মাছ মেয়েদের খাওয়া নিষেধ! যত বড় ঘরের মেয়ে তুমি হও, যতই তোমার মান-সম্ভ্রম থাকুক, এ নিষেধ টলিবার নয়।

বায়োস্কোপে যাঁরা Tabu নামে ছবি দেখিয়াছেন, মত গৃহ হইতে—সমাজ হইতে তাকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। দারিদ্র্যে অনশনে তার যাতনার অন্ত রহিল না। অবশেষে এক বালক নিজের শির বলি দিলে বালিকা আবার 'জাত' ফিরাইয়া পায়! টাবু দেবতার কোপ—অবশ্য দেবতা আসিয়া কোপ ফলায় না, এ কোপ প্রকাশ পায় পুরোহিতদের বিচারে ও ব্যবস্থায়। পুরোহিত যদি মিথ্যাচারী হয় বা ভণ্ড হয় তো সে মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে কাহারো 'টুঁ' শব্দ করিবার জো নাই! বাপ রে, 'টাবু'-দেবতার কোপে সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে! দেব-মন্দিরের কয়েক

স্থানে নারীর প্রবেশ নিষেধ; পারিবারিক ভোজন-কক্ষে ও পারিবারিক ঠাকুর-ঘরে পর্য্যন্ত নারীর প্রবেশাধিকার নাই।

হাওয়াই দ্বীপের লোকের ধারণা—দেহ স্থূল হইলে রূপশ্রী অপ্রচুর থাকিয়া যায়। তাই রূপশ্রীকে বিরাট বিশাল করিয়া তুলিতে দেহের মেদ লাগি' তারা বিপুল



শামোয়া—তরুণী-প্রেমিকা

সাধনা করে। নারীর দেহ যত স্থূল হয়, তত তাকে রূপসী বলিয়া মানা হয়।

এ দ্বীপে যারা পদার্পণ করিয়াছেন, তাঁরা সকলেই বলিয়াছেন, দ্বীপটি যেন 'নন্দন'-কানন! এখানকার জল-হাওয়া খুব ভালো—রূপে-গন্ধে ফলে-ফুলে দ্বীপ বিভূষিত! নর-নারীর সুকুমার দেহ, লাবণ্য, বেশভূষা—সমস্তই এই চির-বসন্ত, নীল সাগর ও নীল আকাশের সুষমার সহিত আশ্চর্য্য খাপ খাইয়াছে!

হাওয়াই দ্বীপে নাচ-গান-বাজনার ঢেউ ছুটিয়াছে—সর্ব্ব-সময়ে। বায়োস্কোপের কল্যাণে হাওয়াইয়ান "মিউজিকে"র মাধুর্য্য আমরাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

আলস্য এবং ইন্দ্রিয়-পরায়ণতায় তাহিতি দ্বীপের নর-নারী যেমন ওস্তাদ, এমন আর কোনো জাতে মিলিবে না! "খাও দাও আর লোটো মজা!"—এ সত্য ইহারা যেমন মর্ম্মে মর্ম্মে গ্রহণ করিয়াছে, এমন আর কোনো জাতি গ্রহণ করে নাই। এ দেশের নর-নারী বলে—গতর খাটাইয়া, কাজ করিয়া কেন মিছা মরি? আমাদের কিসের অভাব? রুটী ফল (bread fruit; দেখিতে এ দেশের কাঁঠালের মত), নারিকেল, কলা প্রচুর; অন্নকষ্ট নাই—কোনো দুশ্চিন্তা নাই। য়ুরোপীয় জাতিরা বেশভূষা চায়, জাহাজ চায়, বিলাস চায়; সে জন্য অঢেল পয়সা চাই, কাজেই তারা খাটিয়া মরে। আমাদের বেশভূষা ও জাহাজের প্রয়োজন নাই। কেন খাটিব? আমরা খাসা আছি!

তাহিতি-দ্বীপে নারী জন্মিয়াছে শুধু পুরুষের সম্ভোগ-পরিতৃপ্তির জন্য! সাজিয়া-গুজিয়া পুরুষের চোখে শুধু মোহের অঞ্জন বুলাও—রূপ-বিলাসে পুরুষের মনে ভোগের বাসনা অনির্ব্বাণ-শিখায় জ্বালাইয়া রাখো—যৌবনের লীলায় মাতিয়া থাকো! পুষ্পময়ী, লীলাময়ী, রূপময়ী নারী, তোমাকে মাথায় তুলিয়া বুকে ধরিয়া বিহ্বল পুরুষ আলসে-আবেশে জীবনের দিনগুলা আরামে-আনন্দে কাটাইয়া দিক! চির-বসন্তের দেশ—নারীর চিরযৌবনের মাধুরী-সুরা-পানে বিভোর-বিমুগ্ধ পুরুষ সেখানে বিলাস ছাড়া আর কিছু জানে না! সেখানে আছে শুধু 'মধুর আলস, মধুর আবেশ—মধুর মুখের হাসি!'

এতখানি ইন্দ্রিয়-বিলাসের ফল ফলিতে সুরু হইয়াছে! নারীর যৌবন-বন্ধ শিথিল হইতেছে—রূপ-লাবণ্যের অমল-পুষ্পে নানা ব্যাধির দুরন্ত কীট আসিয়া বাসা বাঁধিতেছে! নারী বন্ধ্যা হইয়া জাতির জীবনে প্রলয় সূচিত করিয়াছে! মায়া-পুরীর কুহক-মায়া বুঝি অচিরে স্বপ্নে মিলায়!



ঘরের বউ

পঞ্চম পর্ব্ব

বড় একটা ঝোঁকের মুখে অতি সামান্য পুঁজি লইয়াই কিরণ এখানে আসিয়াছিল। আসিয়া যখন বাস্তব এই জীবনের সম্মুখীন হইল, তখন সেটা যে তাহার অতি প্রীতিকর কি চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল, এমন কথা ঠিক বলা যায় না। সুখকর একটা স্থিতিলাভ করিয়া বৈষয়িক উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে হইলে বহুদিন কিরূপ কঠোর একটা সংগ্রাম যে তাহাকে করিতে হইবে, তাহাও সে বেশ উপলব্ধি করিত। এখনও সময় আছে, এলাহাবাদের সেই কাযে ফিরিয়া গেলে কর্ত্তারা আনন্দে তাহাকে আবার গ্রহণ করিবেন। অন্য কোথাও ঐরূপ কোনও কাযের চেষ্টা করিলে সহজেই সে পাইতে পারে। কিন্তু বরুণার সঙ্গে সংসার-জীবনের সেই বিভীষিকার কথা স্মরণ করিতেই সে শিহরিয়া উঠিত। তাহার তুলনায় মনে হইত, এখানকার এই নীরস কঠোর জীবন—জীবনের অতি কঠোর যে অবশ্যম্ভাবী সংগ্রাম তাহাও বুঝি অনেক বরণীয় তাহার হইবে। এখানে ঠিক না আসুক, কি আসিয়াও থাকিতে না পারুক, ঐরূপ কোনও আয়বহুল বড় কায সে আবার পাইলে বরুণা নিশ্চয়ই আসিবে, আবার তাহার জীবনকে অতি তিক্ত—একবারে বিষদিগ্ধ করিয়া তুলিবে।

না, আর তা সে পারে না। যে সুখের অট্টালিকা সে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিল, তুলিয়াছেই ভাবিয়াছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এখন একটু শান্তি—তাহারই সন্ধানে না এখানে সে আসিয়াছে! কিন্তু সেই শান্তিই কি সত্য এখানে সে পাইবে? একা এই সংগ্রামে পাইতে পারে, হয় ত পাইত—যদি—যদি সুরবালা আসিয়া এই সংগ্রামে তাহার সঙ্গিনী হইয়া দাঁড়াইত। হয় ত—হয় ত—নূতন এই স্থানের নূতন জীবনে নূতন আর একটা সুখের অট্টালিকাই তাহার গড়িয়া উঠিত। কিন্তু সুরবালা কি আসিবে? সেই কি তাহাকে এখন আনাইতে পারে? কে জানে—বরুণা যদি আসে? সত্যই আসে?

প্রথম কত দিন এইরূপ নানা কথা কিরণের মনে উঠিত, চিত্তকেও সময়ে সময়ে বড় বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিত। স্থায়ী ভাবে এইরূপ কাযে এখানে বসবাস সম্ভব হইবে কি না, তাহাও সে ঠিক বুঝিতে পারিত না।

কিন্তু সুখময়বাবুর সঙ্গে আলাপে ক্রমে সে বুঝিতে পারিল, তাহার নিজের সুখ-দুঃখের সম্ভাবনা এখানে যাহাই থাক, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ সব কৃষি-উপনিবেশ স্থাপনার বড় একটা সার্থকতা আছে; আর সে যদি এখানে থাকিয়া একটি এমন উপনিবেশ স্থাপনার পক্ষে কিছু সহায়তা করিতে পারে, সে প্রতিভা তাহার আছে, যে বিদ্যা যে শক্তি সে অর্জ্জন করিয়াছে, তাহার বেশ একটা সার্থকতা হইতে পারে বটে। ভাল, নিজের কথা কেবল না ভাবিয়া সেইরূপ চেষ্টাই সে এখানে থাকিয়া করুক না? তার পর তাহার সাংসারিক জীবন, যেভাবে যেরূপে যাহার সহযোগিতায়ই গড়িয়া উঠে, উঠুক। তাহার জন্য অত বেশী ভাবিবার, ব্যাকুল হইবার প্রয়োজনই বা কি! আর ভাবিয়াই বা সে কি করিতে পারে?

মনের ঠিক এই অবস্থায় সুখময়বাবুর সঙ্গে সেদিনকার কথাবার্ত্তা তাহার হইতেছিল। আলাপে ক্রমে তাহার সঙ্কল্পও স্থির হইয়া আসিতেছিল। ঠিক এই সন্ধিক্ষণে বিমলাংশু ও সুপ্রকাশ আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্কল্প তাহার অটল দৃঢ়-ভিত্তিতে স্থির হইয়াই দাঁড়াইল। হাঁ, ইহাদের লইয়াই কায সে আরম্ভ করিবে। এইখানে থাকিয়া সমগ্র শক্তি এই কাযে নিয়োগ করিবে। ফলাফল—যিনি এইখানে তাহাকে টানিয়া আনিয়াছেন, লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, আর সুসময়ে এই যোগ ঘটাইলেন, তিনিই জানেন। প্রথম বয়সে এক পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে সে গীতা পড়িত, ভালও তখন লাগিত। কিন্তু কলিকাতার আধুনিক কলেজ-জীবনের আবহাওয়ার মধ্যে পড়িয়া সব সে একবারে ভুলিয়াই গিয়াছিল। কিন্তু আজ তাহার মনে পড়িল, মহাগ্রন্থের সেই অমূল্যবাণী—'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।'

সঙ্কল্প যখন স্থির হইল, বিমলাংশু আর সুপ্রকাশকে লইয়া মহা উৎসাহে অবিলম্বে কিরণ কায আরম্ভ করিয়া দিল। জমি লইয়াছিল কিরণ দুই শত বিঘা, কিন্তু সম্বল ছিল মাত্র দুই হাজার টাকা। কিন্তু তাহারও ৬।৭ শত টাকা প্রায় খরচ হইয়া গিয়াছে বা যাইবে থাকিবার যায়গাটি প্রস্তুত করিয়া লইতে। বাকী তের চৌদ্দ শত টাকায় এত জমির চাষ একসঙ্গে আরম্ভ করা যায় না। তাহারা তিন জন এবং কাযের জন্য লোকও রাখিয়াছিল তিন জন। এই ছয়টি লোকের খোরাকীর টাকাও কিছুকালের জন্য হাতে রাখিতে হইবে। মাত্র পঞ্চাশ বিঘা জমিতে কিরণ হাত

দিল। লোক যে তিনটি রাখিয়াছিল, কেবল তাহাদের শ্রমে এই জমিরও সব কায ভাল চলে না। নিজেরাও তিন জনে মাল-কোঁচা আঁটিয়া কোমরে গামছা বাঁধিয়া কাযে লাগিয়া গেল। মহা উল্লাসে কায করিতে লাগিল।

এক দিন—তখন বেলা পড়িয়া গিয়াছে,ক্ষেতে কিরণ কায করিতে-ছিল। ক্লান্ত হইয়া একটি গাছের ছায়ায় আসিয়া বসিল। নিকটেই বিস্তৃত নদী, নদীর উপর দিয়া ঝির ঝির করিয়া মিঠা হাওয়া আসিতেছিল। ক্লান্ত দেহে সেই হাওয়ার স্পর্শ বড় মিঠাই লাগিল। কিরণের মনে হইল, সেই গাছের ছায়ায় ঘাসের উপরেই অমনই শুইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। একটি লোক তখন তামাক সাজিয়া হুঁকাটি লইয়া কাছে আসিল। এরূপ ক্লান্তির সময়ে সেটাও বেশ লোভনীয় বটে। হাত বাড়াইয়া কিরণ হুঁকাটি লইয়া তামাকু সেবনেই মন দিল। বিমলাংশু ও সুপ্রকাশও কিছুদূরে কায করিতেছিল। ক্লান্ত তাহারাও হইয়াছিল। দেখাদেখি আসিয়া কাছেই ঘাসের উপরে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল। হাওয়াটা বহিতে-ছিল বড়ই মিঠা। হুঁকা টানিতে টানিতে কিরণের চক্ষু দুইটা বুজিয়া আসিল। বিমলাংশু ও সুপ্রকাশও চক্ষু বুজিয়া যেন ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

"আরে, বাঃ বাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ!" চমকিয়া কিরণ চাহিল; দেখিল, সম্মুখে সতীশ দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।

"কে রে সতীশ! তুই হঠাৎ—কি রে, আকাশে উড়ে এসে নামলি না কি?"

"আকাশে উড়ে এসে নামব—কেন, উড়োযানগুলো কি আমাদের গরুর গাড়ী ডিঙ্গি ডোঙ্গার মত এমনই চলতি হয়ে উঠেছে দেশে?"

হাসিয়া কিরণ কহিল, "গরুর গাড়ীও জলে চলে না, আর ডিঙ্গি-ডোঙ্গা করেও এত বড় নদী পার হয়ে কেউ আসতে পারে না।"

"নদী! এও আবার নদী! একেবারে সাগর পাড়ি বল্! বাবা! ত্রাহি ত্রাহি ক'রে কোনও মতে পার হয়ে এসেছি।"

"তা বোস্, বোস্; ওরে হাক, একটা চৌকি কি মাদুর-টাদুর কিছু নিয়ে আয় রে।"

কথার সাড়ায় বিমলাংশু ও সুপ্রকাশের ঘুম ভাঙ্গিল। ধড়-ফড়িয়া দুই জনে উঠিয়া বসিয়া চক্ষু রগড়াইতে লাগিল। সতীশ কহিল, "আরে না না, ওসব কিছু চাই না। গাছের ছায়ায় খাসা ঘাস। তোরা এত খাঁটি আবাদে ব'সে শুইয়ে থাকতে পারছিস, আমি পারব না?"

বলিয়া সতীশ বসিল। হুঁকাটা কিরণ সতীশের হাতে দিল। দুই একটা টান দিয়া সতীশ কহিল, "ত সত্যিই যে একদম খাঁটি চাষা হয়ে বসেছিস? খালি পা, খালি গা, মালকোঁচার ওপরে কোমরে গামছা বাঁধা, হাতে ধুলো-মাটী, আর গাছতলায় ব'সে ডাবা হুঁকোর তামাক টানছিস্—একদম অতি কড়া দা-কাটা—থক্ থক্—"

হাসিয়া কিরণ কহিল, "তোরা এখনও বাবু, গলায় লাগছে। আর আমরা চাষা—নকল নয়, সত্যিই একদম খাঁটি চাষা হয়ে দাঁড়িয়েছি। কড়া ঐ দা-কাটা ছাড়া আর পোষায় না।"

"তাই ত, সেই সব দামী দামী চুরুট সিগারেট—"

"দামী সে অবস্থাটা যে আর নেই, সতীশ। কড়া ঐ দা-কাটা আর ডাবাই—চাষা বলিস কি ভদ্দর বলিস—এ দেশের গেরস্তদের চিরকালের সম্বল।"

"কেন অম্বুরী—"

"সেটা সহরে বড় বড় বাবুদের বিলাস। আর মেলেও সহরে। গাঁয়ে যাদের হেঁটে খেটে কায ক'রে খেতে হয়, হাম্বরাণীর পর অম্বুরীর মিঠে ধোঁয়া—সেটা কি জানিস—ঐ বড় ক্ষিদের পাতে দুটিখানি মিহি দাদখানি চালের ভাতের মত। আর চুরুট সিগারেট—খেতেও এর কাছে এমন কিছু নয়—আর যা খরচ! কি ক'রে যে গরীব বাঙ্গালীর পোষায়, তাই ভেবে পাই নে। আর এই হুঁকো কলকের তামাক দুটো পয়সা হ'লে ৫।৭ জন লোকের দিন চলে যায়। দেশটা মরেছে কি এক রকমে?"

হাসিয়া বিমলাংশু বলিয়া উঠিল, "আমরাও কি মরেছি ওতে কম, দাদা? বাবার খরচে মেসে থেকে পড়তাম সিগারেট লাগত রোজ তিন প্যাকেটের কম নয়, খরচ হ'ত কম করেও পাঁচ ছ আনা রোজ। এক একবার এখন ভাবি, সেই কবছর মাসে মাসে এই টাকাগুলোও যদি বাঁচত, বেশ কিছু মূলধন জমত। তা তখন ত বুঝিনি। ভেবেছি—"

"পাশ ক'রে বেরোতে পারলেই একটা ডেপুটি কি মুনসেফ হব, আর না হয়ে উকিল হয়ে ব'সে ব'সে মক্কেলের টাকা রোজ লুঠব—ভাবনা কি? এখন তিনটে ক'রে প্যাকেট পোড়াচ্ছি—তখন দশটা ক'রে পোড়াব। হাঃ হাঃ হাঃ!"

সতীশ কহিল, "তা তুই কতগুলো ক'রে পুড়িয়েছিস রোজ?"

"সে ঢের দাদা। আর প্যাকেটগুলোও ছিল ফাষ্টক্লাস। মাসে—হাঁ নিজের মুখে আর বন্ধু-বান্ধবদের মুখে যা পুড়িয়েছি, ঠিক হিসেব নেই, তা চল্লিশ পঞ্চাশ টাকার কম ত হবে না।"

অতি বিস্ময়ে বিমলাংশু ও সুপ্রকাশ চাহিয়া রহিল।

"৪০।৫০ টাকার চুরুট সিগারেট মাসে! বলেন কি দাদা? কি চাকরী আপনি করতেন?"

"নেহাৎ মন্দও কিছু করতাম না। শুনবে পরে। তা তোমরা বাপ-খুড়োর খরচায় মেসে থেকে কলেজে প'ড়ে যদি মাসে দশ বারো টাকা ক'রে পুড়িয়েছ, আর আমি—চাকরীটা নেহাৎ ছোটও করতাম না—৪০।৫০ টাকাও পোড়াব না? হিসেব ক'রে দেখ, তুলনায় অনেক কমই পুড়িয়েছি। আর এখন তোমরাও নলচে আড়াল ক'রে খাও, আর আমি ত খাই-ই। আবার হাক-টাকরাও তিন চারটে লোক আছে। কটা পয়সা রোজ খরচ হয়?"

"দু তিন পয়সার বেশী ত হবেই না।"

"তবেই দেখ দেখি, দা-কাটা আর হুঁকো-কলকে ছেড়ে—আর বিদেশের আমদানী ঐ চুরুট সিগারেটগুলো ধ'রে কি সর্ব্বনাশটাই আমরা করছি!"

"চুরুট সিগারেট দিশীও ত মেলে এখন।"

"মিলতে পারে। কিন্তু ঐ চালটা হচ্ছে বিদেশী আমদানী, আর গরীব দেশের পক্ষে বড় বেশী উঁচু বাবুয়ানা চাল। বিদেশী জিনিষ-গুলোর চাইতেও চালগুলো অনেক বেশী ভয়ঙ্কর। জিনিষগুলো হয় ত ছাড়া যায়, কিন্তু ঐ চালগুলো একবার পেয়ে বসলে ঝেড়ে ফেলা বড় শক্ত। আরও দুর্ভাগ্য এই হয়েছে; বাবু-ভায়াদের দেখা দেখি চাষা-মজুররাও হুঁকোটা ছাড়ছে। তবে তারা খায় দেশী বিড়ী; সেটা তবু অনেক সস্তা। কিন্তু দা-কাটার চাইতে সস্তা নয়। আবার দেশলাই কাঠিও লাগে কম নয়। আর কলকের তামাকটা

উনুনের কয়লা আগুন মালসায় তুলে রাখলেই দিনভর রাতভর খাসা চ'লে যায়। ঘরে তুষ থাকলে ত কথাই নাই।"

যুবক দুইটির দিকে চাহিয়া চাহিয়া সতীশ জিজ্ঞাসিল "এঁরা কারা, কিরণ?"

"দুটি সাথী পেয়েছি, ভাই। আপন দুটি ভেয়ের মত। এঁদের নিয়েই নতুন একটি সংসার এখানে আমার গ'ড়ে উঠেছে।"

"হুঁ—সংসার—তা কেমন ভাই নিয়েই কি সেটা গড়ে কিরণ?" বলিয়া সতীশ মুচকি একটু হাসিল।

"হুঁ—বলবে, 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে'। তা সে ভাগ্যি ত আমার ঘটছে না, সতীশ। দুটি—তা—দুটি ভাই—এদের নিয়েই সংসারটা আমার খাসা চলছে, চলবেও। এখানকার এই সংসারে এরাই আমাকে পাকা বাঁধনে বেঁধে ফেলেছে, ছিঁড়ে আর বেরোবারই যো নেই।"

"বটে!—তা হ'লে সত্যিই এখানে পাকাপাকি ভাবেই থেকে যাবি স্থির করেছিস?—"

"হাঁ! এর চাইতে ভাল কিছু—বড় কিছু—বেশী সুখের কিছু—করবার, আর কিছুই আমি দেখতে পাচ্ছিনি সতীশ। তা তুই হঠাৎ—"

"এলাম একটিবার দেখতে, সত্যি তুই কি করছিস্, কেমন আছিস্—"

"হাঁ, জিজ্ঞাসা করাই হয়নি। তা ভাল আছিস্ ত? হাঁ, তা আছিস, বই কি? নইলে দুস্তর এই লোণা জল পার হয়ে এখানে আস্‌তে পার্‌তিস্ নি। তা বাড়ীতে—খবর সব ভাল ত?"

"হাঁ, ভালই আছেন।"

"খুব খুসী বোধ হয় তাঁরা হননি?"

"না। তবে কাকীমা—"

"কি?"

"এর ভেতরও সুখের একটা আশা যে কিছু না দেখছেন, তা নয়।"

গভীর একটি নিশ্বাস কিরণ ছাড়িল। মুখে ম্লান মৃদু একটু হাসির রেখাও ফুটিয়া উঠিল। কহিল, "আশা—মিছে আশা, সতীশ। আমার হাত-পা বাঁধা।"

"বাঁধনটা যদি খুলেই যায়—"

"যাবে কি না, জানি না। না, সে রকম কোনও ইচ্ছাও মনে মনে পোষণ করা বোধ হয় আমার উচিত হবে না, সতীশ।"

"ইচ্ছা—তা সেটা উচিত অনুচিতের হিসেব ক'রে কারও মনে দেখা দেয় না, কিরণ। আর দিলে সে হিসেব ক'রে চেপেও কেউ দিতে পারে না।"

হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ চমকাইল, গুড় গুড় মেঘ ডাকিয়া উঠিল। চকিত দৃষ্টিতে সকলে চাহিয়া দেখিল, বায়ুকোণে কাল মেঘ উঠিয়াছে, বাতাসও স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। কথায় কথায় এ দিকে খেয়ালই কাহারও ছিল না। কিরণ কহিল, "ঝড় উঠবে এখনি। চল্, ঘরে গিয়ে বসা যাক্।"

অতি সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া সতীশ কহিল, "ঝড় উঠবে? তাই ত! কি সর্বনাশ। নৌকোয়—নৌকোয়—"

"নৌকোয়—কি? ও—তোর জিনিসপত্তরগুলো রয়েছে! তুলে আনেনি কেন এখনও? যাও ত বিমল, মাঝিদের নৌকো সামলাতে হবে—ডাকটাকদের কাউকে নিয়ে ছুটে যাও ত ... ওর জিনিস-পত্তরগুলো তুলে আন—"

"জিনিসপত্তর চুলোয় যাক্! নৌকায় যে কাকীমা রয়েছেন—"

"কাকীমা?"

"হাঁ, কাকীমা, বৌ, সতু, ইন্দু—"

বলিয়াই সতীশ নদীর দিকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। সঙ্গে সঙ্গে কিরণ, বিমল ও সুপ্রকাশও ছুটিয়া গেল।

২

বড় একটা ঝড় উঠিয়া ভোর এক পশলা জল হইয়া গেল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে দমকা হাওয়ার সঙ্গে পিটির পিটির বৃষ্টি তখনও হইতেছে। রান্নাঘরটিতে সরবালা বসিয়া রান্না করিতেছে। একটি ঘরে সতু ও ইন্দুকে লইয়া বিমল ও সুপ্রকাশ গিয়া বসিয়াছে, সরস গল্পে মধ্যে মধ্যে বেশ হাসির রোল উঠিতেছে। আর একটি ঘরে সতীশ ও কিরণ বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছে। পিছনে ঘেরা একটা বারান্দা ছিল, সৌদামিনী সেখানে বসিয়া সায়ং-সন্ধ্যা সারিয়া এখন মালা জপ করিতেছেন। মুখে জপের মন্ত্র আবৃত্ত হইতেছে, হাতও মালার সঙ্গে চলিতেছে। কিন্তু কাণ ও মন রহিয়াছে, ঘরে উহারা কি কথা বলিতেছে, সেই দিকে। মাঝে একটি দরজার ফাঁক দিয়া উহাদের দেখাও যাইতেছিল।

কিরণ বলিতেছিল, "হাঁ, টাকাগুলো যেন—ঠিক সময়মত যেন দেবতার বরের মতই এটা এসেছে, সতীশ। ভাবছিলাম, একটা ব্যাঙ্ক কি ক'রে করি। নইলে দু'তিনটি লোক কেবল গায়ে খেটে কাযের মত কায কিছুই ক'রে তুলতে পারে না। নিঃসম্বল একটা লোক আমি—বাদায় এসে প'ড়ে আছি। এই মূলধনটা পাওয়া গেল, এখন একবার কলকেতা গিয়ে এই জমিদারী কোম্পানীর বাবুদের সঙ্গে দেখা করি। জোড়-জোড় ক'রে কাযটা সুরু করেই দেওয়া যাক্। শুনেছি, তাঁরাও এটা দরকার ব'লে মনে করছেন। তবে টাকা নিজেদের নেই, শেয়ার ক'রে তুলবেন, সেটাও ভরসা পাচ্ছেন না। এখন যদি ছ'সাত হাজার টাকা নিয়ে আমি দেখাতে পারি, আর—আর নিজের পরিচয়টা দিই, উৎসাহে তাঁরা কাযে যোগ দেবেন, আমার সহায়তা করবেন।"

সতীশ কি ভাবিতে ভাবিতে কহিল, "কিন্তু টাকা ত তুমি পুরো দশ হাজারই পাচ্ছ—"

"না, সবটা দেব না। হাজার তিনেক অন্ততঃ ওঁদের হাতে থাক্। বাকীটা দিয়ে ওঁদের নামেই ব্যাঙ্কের শেয়ার কিনব।"

সৌদামিনী বলিয়া উঠিলেন, "সে শেয়ার-টেয়ার তুই যার নামে খুসী কিন্ গে। তোর নামে হ'লেও তোর, আমাদের নামে হ'লেও তোর। তোকে দুঃখু দিয়ে কি কোনও অসুবিধেয় ফেলে কি নিশ্চিন্তি আরামে ঘরে ব'সে ঐ টাকা ভেঙ্গে আমরা খাব? দরকার যদি হয়, কাযের সুবিধে বেশী হয়, সবই কেন নে না?"

কিরণ উত্তর করিল, "না না, হাতে কিছু থাকা ভাল। কে জানে যদি—অবিশ্যি আমি মনে করি না নষ্ট কিছু হবে—তবু সাবধানের মার নেই। হাতে ওটা তোমাদের থাক্।"

"থাকে থাক্। তোরই থাকবে, দরকার যখন হয় নিবি।"

সতীশ কহিল, "তা হ'লে এইখানেই এই কাযে থাকবে, এটা একেবারে ঠিক ক'রেই ফেলেছ, কিরণ?"

"হাঁ, তাতে আর এদিক্ ওদিক্ কিছু নেই। সঙ্কল্প আমার স্থির, অটল। হাঁ, কতকটা দোনামনা—সপন আসি—ছিল। আস্বার পরেও কিছু দিন ছিল। গোড়াতে খুব ভালও লাগত না। মনে হ'ত, যেন নিরুপায় হয়ে এই বিজনভূমিতে নিজেকে নির্ব্বাসিত কর্তে বাধ্য হয়েছি,—নির্ব্বাসিত যেন জোর ক'রেই কেউ আমাকে করেছে। কিন্তু এখন সব কেটে গেছে। নূতন একটা আশার আলোক যা পেয়েছি—মনে হচ্ছে, না, নির্ব্বাসনে আসিনি। নির্ব্বাসনে ছিলাম, মুক্তি পেয়ে নিজের দেশে নিজের ভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছি। এই ভূমিতেই সোণা ফলাতে পারব, আর তাতেই আমার জীবন সার্থক হবে। কি করেছি, এত দিন, সতীশ? হাঁ, টাকা ঢের রোজগার করেছি। আর—হাঁ—কাযও একটা হচ্ছিল বটে। কিন্তু সে কাযের কথাটা ত কখনও ভাবিনি। ভেবেছি কেবল নিজের রোজগারের কথা। আর সে রোজগারের পয়সা নিজের সখেই সব উড়িয়েছি। সুখও তাতে এমন কিছু পাইনি।"

"সবাই ত পায়। কিন্তু তুমি যে পাওনি, তার কারণ—"

"কারণ যাই হ'ক, পাইনি। আর সবাই—না, ঠিক সুখ যাকে বলে, তা বোধ হয় পায় না। কেবল নিজের ভোগে যে সুখ—না, মনে হয়, তাও শেষে তেতো হয়ে ওঠে। তার চাইতে এই যে সুখের আভাস একটা পাচ্ছি—তাও বুঝি অনেক বড়।"

"কিন্তু আভাস মাত্র। হাজার হ'ক, ভাবছ না কিরণ, অনিশ্চিত একটা ভবিষ্যৎ ভাগ্যের পেছনে—"

"ভাগ্য যার পেছনে লোকে ছোটে, সেটা ভবিষ্যতেরই বটে, আর ভবিষ্যৎটা অনিশ্চিত। পিছু ছুটছি, ছুটব, ছুটতেই আমাকে হবে। এই অনিশ্চিতকেই নিশ্চিত ক'রে আমাকে তুলতে হবে। সেইটেই ত পুরুষের পৌরুষ। আর সেই পৌরুষের সিদ্ধিই আমাকে লাভ করতে হবে। সকল প্রাণ মন আমার অদম্য আবেগে এই দিকে একান্তভাবে উন্মুখ হয়ে ছুটেছে, ফেরাতে কি নামাতে আমি আর পারিনে।"

"কিন্তু সম্ভব অসম্ভব ব'লেও ত একটা কথা আছে।"

"আছে। কেবল কল্পনা-বিলাসী হয়ে অসম্ভব একটা কিছুর দিকে ছোটাও দারুণ মূর্খতা—আকাশের চাঁদ ধরতে ঠিক উদ্বাহু বামনের মত বৃথা চেষ্টা। কিন্তু আমার এ সাধনার লক্ষ্য, দূর হ'ক, দুঃসাধ্য হ'ক, অসম্ভব ত কিছু নয়।"

"না, অসম্ভবও ঠিক বলতে পারিনে। তবে যা বল্লে, দূর বটে, দুঃসাধ্যও বটে। দেখ, যদি পার—"

"পারব। পারতেই আমাকে হবে। পারা যে চাই-ই, সতীশ। নইলে—যতই চ্যাঁচামেচি তোমরা কর, কি দেশের মাতব্বরা করুন—দেশকে বাঁচাতে হ'লে এইটেই আগে ক'রে তুলতে হবে।"

"কিন্তু যেটা তুমি করছিলে, সেও ত এই রকম একটা কাযের পথ বটে—"

"কাযের পথ বটে, কিন্তু ঠিক এ রকম নয়। হাজার হ'লেও সেটা ভিন একটা আবহাওয়ায় ভিনদেশী কায। আর এটা আমার বাঙ্গালার আবহাওয়ার মত ঠিক বাঙ্গালার কায। বাঙ্গালীকে বাঁচতে হ'লে এই পথে এই রকম কাযেই হবে। কারখানার সহর কটা এই বাঙ্গালায় কবে ছিল? জমিতে সোণা ফল্ত, গ্রামে গ্রামে জমির সেই সোণাতেই বাঙ্গালা ছিল সোণার বাঙ্গালা। গ্রাম ছেড়ে জমি ছেড়ে সহরে গিয়ে আস্তানা করেই বাঙ্গালী মরতে বসেছে। বাঁচতে হ'লে আবার তাকে গ্রামে সেই জমিতেই ফিরতে হবে। যে ধারায় একটা জাত বরাবর চ'লে এসেছে, সেই তার জীবনের ঠিক ধারা। ছেড়েই মরছে। ফিরতে পারলেই আবার বাঁচবে। সুতরাং ফেরাতেই তাদের হবে।"

"যা বলছিস্ ঠিকই বটে, কিরণ। পারিস যদি কাযের মত কাযই একটা হয় বটে।"

"যদি-টদির কথা আর তুলিসনি, সতীশ। পারবই, পারতেই আমাকে হবে।"

"হুঁ—! খুব মেতে উঠেছিস্ বটে। তা পারবি। ভুটিকে ত মাতিয়ে টেনে এনে ফেলেছিস্। তবে কেবল কথায় হবে না। টাকাও ঢালতে হবে। তবে হাজার সাতেক—ও পুরো দশ হাজারই বল—তাতে ত এল। ঐ টাকায় আরও টাকা টেনে আন্বে।"

"নিশ্চয়ই আনবে।"

"হুঁ—বলিয়া সতীশ একটু হাসিল; হাসিয়া কহিল, "দেখছি মরাগাঙ্গেও বান ডেকে আসছে। আমারও কি মনে হচ্ছে জানিস, কিরণ? কিই বা ছাই চাকরী করি। ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে—"

"চলে আয় না এখানে।"

"উঁহুঁ! দেশেও ত জমিজমা কিছু আছে। যাদের আছে, তাদেরও যে ছেড়ে ছুড়ে এই বাদা বনেই ছুটে আসতে হবে, এমন কোনও কথা হ'তে পারে না।"

"না, তা অবিশ্যি পারে না। পুরাণো গ্রামগুলো যে একেবারে বাদা করেই ফেলতে হবে, আর সারাটা বাঙ্গালাকে এই বাদা বনের নতুন আবাদে এনে ফেলতে হবে, এমন কোনও কথা সত্যিই হ'তে পারে না। জমি যার যেখানে আছে, কি যেখানে জোটাতে পারে, সেই খেনেই সে ফিরে বসুক, কাযে লাগুক। মরা বাঙ্গালা তাতেই আবার জ্যান্ত হয়ে উঠবে।"

"কিন্তু এত ফসল খাবে কে?"

"নিজেরা খাবে—ছেলেপিলে হবে, তারা খাবে। আর সবাই ত গিয়ে কেবল চাষবাসই করবে না? এখানে ওখানে আরও লোক ঢের রকম কায করবে, আর সেটা করাও চাই। তাদেরও ত মুখের খাবারটা জোগাতে হবে। আর চাষের কাযে কেবল খাবারটাই হয় না, কাপড়টাও তা থেকে আসে। ঘর-দরজার মাল-মসলাগুলোও অনেকটা তা থেকেই আসে। ভাত আর কাপড়, আর যেমন হ'ক আরামে থাকবার একটু ঠাঁই যদি গাঁয়ে গাঁয়ে সবার হয়, আর কিছুর জন্যে বড় মরতে হয় না। যা দরকার, আপনিই সব আসে, জুটিয়ে নিতেও মানুষ পারে, যদি মানুষই সত্যি তারা হয়।"

একটু ভাবিয়া সতীশ কহিল, "দেখি, দেশে ফিরে গিয়ে যদি কিছু করতে পারি। তবে পুঁজিপাটা কিছু নেই। কাচ্চা বাচ্চাও কটি এসে পয়দা হয়েছে। ঘাড়ে আবার-বুড়ো বাপ মা—"

"কিছু ভাবিসনি। পুঁজি—সে হ'ক আমার ব্যাঙ্কটা—তা থেকেই ব্যবস্থা একটা ক'রে দেওয়া যাবে।"

সতীশ কহিল, "তোর ব্যাঙ্ক ত হবে বাদার ব্যাঙ্ক।"

"না, সারাটি বাঙ্গালার ব্যাঙ্ক। বাঙ্গালার সব জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায়—বড় বড় সব গ্রামে ছড়িয়ে পড়বে তার

শাখা-প্রশাখা! যেখানে জমি পাওয়া যায়, ভদ্র কি চাষী যারা সেখানে কায করবে, তাদেরই সময়মত টাকা যোগাবে। ব্যাঙ্ক সব হবে তাদেরই ব্যাঙ্ক। এই সব ব্যাঙ্কেরই কাম হবে কত ছেলেদের জীবিকার উপায়। আর ব্যাঙ্ক কেবল কৃষি ব্যাঙ্কই বা থাকবে কেন? —গ্রাম অঞ্চলে, ছোট ছোট সব সহরে, ছোট ছোট শিল্প-বাণিজ্য—যত রকম ব্যবসায়—সব কিছুই সাহায্য করবে—এই সব ব্যাঙ্ক বা এই রকম অন্য সব ব্যাঙ্ক। কাযের মত কায একবার সুরু যদি হয়, হু হু ক'রে বেড়ে উঠবে। টাকায় টাকা টেনে আনবে, কায কাযের পথ খুলে দেবে। যদি হয় সতীশ—যদি পারি—তখন—তখন বাঙ্গালায় আর বেকার কোথাও কেউ থাকবে? আর আমি—আমি—হাঃ হাঃ! হাঃ! একেবারে আকাশকুসুমের স্বপ্ন দেখছি—গাছে না উঠতেই দশ কাঁদি—হা, হা, হাঃ হাঃ!"

"ছিঃ ছিঃ ছিঃ! তা মনে মনে চিঁড়ে খাবি, দুধ দিয়ে না খেয়ে জল দিয়ে খাবি কেন?—"

মালাটি গুটাইয়া রাখিয়া হাসিতে হাসিতে সৌদামিনী তখন গৃহের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"তা বল্—বল্—মনের খেয়াল ত? ছুটিয়ে দিয়েছিস হাউই বাজির মত। দেখি কদ্দূর যায়! ফুলকিগুলোই বা কদ্দূর ছড়ায়।"

হাসিয়া কিরণ উত্তর করিল, "যাবার যদ্দূর তা গেছে, ফুলকি-গুলোও সারা বাঙ্গালার আকাশ ভরেই ছড়িয়ে পড়েছে।"

"কতক্ষণ আর থাকবে?"

"যতক্ষণই থাক্, দেখে ত চোখ বেঁধে গেল। আর তার যে মাতলামো সুখটুকু—তার মূল্যই বা কম কি? সুখ—যখন যাতে যেটুকু পাওয়া যায়, সেইটেই লাভ। যাক—নিভেই গেল! তবে চোখে তার রেশটুকু এখনও মিলিয়ে যায়নি।"

রান্নাঘর নিকটেই ছিল; কথাগুলি সুরবালার কাণে যাইতে-ছিল। কড়াটা উনানের উপর হইতে নামাইয়া রাখিয়া সেও আসিয়া পাশের দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়াছিল। শুনিতে শুনিতে ভক্তি হইয়া প্রণাম করিল,—মনে মনে কহিল, "রেশটুকু চোখেই থাক্, তা' থেকেই সত্যিকার অম্নি আলোকে দেশের আকাশ ভ'রে উঠুক। হে ঠাকুর! দয়া কর! যদি তা দেখতে পাই—যেখানেই থাকি, এই নারী-জীবন আমার কৃতকৃতার্থ হবে! আর কিছু চাইনি, ঠাকুর। শুধু—শুধু এইটিই আমি দেখতে চাই।"

বলিয়া উঠিয়া আবার রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল।

সৌদামিনী কহিলেন, "তা যতই যা ভাবছিস, সত্যি কি তুই এইখেনে এই হালে থাকতে পারবি, কিরণ?"

"আছি ত? পারব বলেই ত ভরসা করি,—এখন তোমার আশীর্ব্বাদ।"

"ছেলের ভাল হ'ক্, মায়ের মনে মুখে এ আশীর্ব্বাদ সর্ব্বদাই উঠছে। কিন্তু ফলে তার কটা?"

একটা নিশ্বাস সৌদামিনী ছাড়িলেন।

কিরণ কহিল, "তেমন মনে যদি আশীর্ব্বাদ মায়েরা করতে পারে, আর ছেলেরাও যদি সত্যি তা মাথায় তুলে নিতে পারে, ফলে বই কি, অনেক ফলে।"

"হতেও পারে। জানিনে বাবা। তবে—"

"ও সব তবে টবে ছেড়ে দেও, মা। —আশীর্ব্বাদ তুমি কর। আমি আমি—হাঁ, মাথা তুলেই নেব। এদ্দিন পারিনি। কিন্তু আজ পারব।"

"পারিস ভাল। আশীর্ব্বাদও আমি করছি। তবে তেমন মনে কি না, বলতে পারি নে। সব দেবতার হাতে। তিনি তোর ভাল করুন। কিন্তু একটা কথা ভাবছি কি, কিরণ—"

"কি মা?"

"তুই হয় ত এখানে থাকতে পারবি। আর একটা চেষ্টা চরিত্তিরও এ দিকে কিছু করতে পারবি। কিন্তু আমি যে একা তোকে এই বাদায় ফেলে রেখে ঘরে ফিরে যেতে পারব না, বাবা?"

"বাদা কোথায় মা? বাদাটা যে সাদা আবাদে হয়েই উঠেছে।"

"ছাই হয়েছে। জন-মানিষ্যি কোথাও নেই। এই ত রাত হয়েছে—আকাশে মেঘ বৃষ্টি থম্থমে আঁধার—চাইলে প্রাণ আঁতকে ওঠে! কি করে একলা তোকে এখানে ফেলে ঘরে ফিরে গে সোয়াস্তি হয়ে থাকব, বাবা?"

"একা কোথায়, মা? ঐ যে আর দুটি ছেলে তোমার রয়েছে।"

"কিন্তু দেখে শোনে তোদের কে? ক্ষিদের সময় কে দুটি ভাত রেঁধে তোদের দেয়? হয়রানী হয়ে যখন ফিরিস, কে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল এনেই বা তোদের হাতে দেয়?"

"কিছুই আটকাচ্ছে না তাতে।"

"এসেই ত পড়েছি, তা আমরা কি এখানে থাকতে পারিনে, বাবা।"

মাথায় হাত দিয়া মুখখানি কিরণ নত করিল। একটু ভাবিয়া শেষে কহিল, "কি ক'রে যে পার, সেইটেই যে ভেবে পাচ্ছিনে, মা। যাক্, দেখি কি করা যায়। রাত ঢের হয়েছে যে, মা। ক্ষিদেও বড্ড পেয়েছে। দেখ দিকি রান্না হ'ল কি না?"

"যাই দেখি ও বউমা!" বলিয়া সৌদামিনী রান্নাঘরের দিকে গেলেন।

আহারাদি হইল। একটি ঘরে বিমল ও সুপ্রকাশের সঙ্গে কিরণ ও সতীশ গিয়া শুইল। অপর ঘরটিতে বধূ ও পুত্রকন্যা-সহ সৌদামিনী শয়ন করিলেন।

বিমল ও সুপ্রকাশ যার-পর-নাই বিস্মিত হইল। তাই ত, কত দিন পরে বৌদি আসিলেন। অথচ দাদা আসিয়া তাহাদের সঙ্গেই শুইয়া পড়িলেন! স্থানাভাব? কিন্তু তাহার কি একটা ব্যবস্থা কিছু হইত না? হাতেবা না হয় কাছারীবাড়ীতেই গিয়া শুইত।

পরদিন দুপুরে আহার-বিশ্রামাদির পর খালি একটি ঘরে স্বামি-স্ত্রীতে একবার সাক্ষাৎ হইল।

কিরণ বলিয়া উঠিল, "যদি—যদি এসেছ, থাকবে, সুরবালা?"

বলিয়াই খপ করিয়া সুরবালার হাতখানি ধরিয়া ফেলিল। মুখখানি সুরবালা ফিরাইয়া লইল। হাতেও একটু টান দিল। কিন্তু বড় জোরেই কিরণ চাপিয়া ধরিয়াছিল, ছাড়াইয়া লইতে পারিল না। তেমন জোরে টান দিতেও বুঝি পারিল না। কিরণ কহিল, "বল—বল থাকবে! যদি এসেছ আনতে ত আমি ভরসা পাই নি—আসবে, তাও ভাবিনি—কিন্তু তবু যদি এসেছ—"

অতি আয়াসে আত্ম-সম্বরণ করিয়া রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে সুরবালা কহিল, "আসতে আমি চাইনি—"

"চাওনি? চাওনি? সত্যি চাওনি? একটিবার কি ইচ্ছেও হয়নি, আমাকে এসে দেখে যাও? আমি ভাবিনি—তার মানে ভাবতে চাইনি তুমি আসবে। কিন্তু তবু—তবু এই আশাটা মনে এক একবার ঠেলে উঠেছে—হয় ত—হয় ত—তুমি আসবে—তোমাকে একটিবার দেখতে পাব। কিন্তু তুমি কি সত্যি চাওনি? সত্যি কি অমনি এক একবার তোমার মনেও ওঠেনি—এখন অন্ততঃ একটিবার এখানে এসে আমায় দেখে যাও?"

সুরবালা নীরব। মুখখানি ফিরানই ছিল। চক্ষু দুটি ভরিয়া অশ্রুর উচ্ছ্বাস উঠিতেছিল। দাঁতে দুটি ঠোঁট চাপিয়া কোনও মতে উদ্বেলিত রোদনাবেগ সংবরণ করিবার চেষ্টা করিল। কিরণ কহিল—"আসতে চাওনি? সত্যি চাওনি? কখনও চাওনি? কখনও আসতে একটু—একটুখানি ইচ্ছেও হয়নি? বল—বল সুরবালা, সত্যি হয়নি?"

ফুকরাইয়া সুরবালা কাঁদিয়া উঠিল। টানিয়া কিরণ তাহাকে কাছে আনিল, দুই হাতে বকে জড়াইয়া ধরিল। স্বামীর বুকে মুখখানি রাখিয়া সুরবালা কতক্ষণ কাঁদিল। কিরণও তাহার অশ্রুসিক্ত মুখখানি বক্ষোলগ্না সুরবালার মাথার উপরে রাখিল। ধীরে ধীরে শেষে সুরবালা স্বামীর বাহুপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া চৌকিখানির এক প্রান্তে একটু দূরে সরিয়া বসিল। কিরণও ছাড়িয়া দিল। কিন্তু বুকভরা অসহ্য একটা উত্তেজনা—অদম্য আকুল একটা আগ্রহ—চাপিয়া রাখা তাহার পক্ষে প্রায় অসাধ্য হইয়া উঠিতেছিল। মুখ কাটিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছিল; চক্ষু দুইটি আরক্ত; দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া কিরণ বসিয়া রহিল। ধীরে ধীরে শেষে কহিল, "আসতে চাও নি—সত্যিই যদি চাওনি—তবে কেন এসেছ?"

ঈষৎ কম্পিতস্বরে কেমন একটা অভিমানের সুরও যেন ধ্বনিত হইয়া উঠিল। মৃদু চাপা স্বরে সুরবালা উত্তর করিল, "মা ছাড়লেন না, জোর করেই নিয়েই এলেন।"

"হুঁ—"

"যে কাযের জন্য আসা—বলেছিলাম, আমি নিজে না এলেও চলবে।"

"কায! কি, ঐ টাকাগুলো আমার হাতে এনে ফিরিয়ে দেওয়া? তা—সেটা ত দুজনে দুটো সই দিয়ে সতীশের হাতে পাঠালেও চল্‌ত। তিনিই বা তার জন্যে ছুটে এতদূর এলেন কেন?"

"বলছিলেন, তোমায় একটিবার এসে না দেখে থাকতে পারবেন না।"

"আর তুমি—তুমি—বেশ পারতে। হাঁ, তিনি মা। কিন্তু তুমি কি আমার কেউ নও, সুরবালা?"

গলাটি ভার—চক্ষু দুইটিও সজল হইয়া উঠিল। উঠিয়া কিরণ গৃহমধ্যে একটুকাল পায়চারী করিয়া দরজাটি খুলিয়া বাহিরের দিকে কিছুকাল চাহিয়া রহিল। চক্ষু দুটি মুছিয়া ধীরে ধীরে দরজাটি বন্ধ করিয়া দিয়া আবার ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "কাল বিকেলে গাছতলায় যখন বসেছিলাম, সতীশ এল, মনেও করতে পারিনি, সঙ্গে তোমরাও এসেছ। হঠাৎ ঝড়ের মেঘ ডেকে উঠল—বিদ্যুৎ চমকাল—শুনলাম, তোমরা এসেছ। ভয় হ'ল—শুধুই ভয়—ছুটে গেলাম নৌকো থেকে তোমাদের তুলে আনতে। তুলে যখন তোমাদের এই ঘরে নিয়ে এলাম—তখন—তখন—মনে হ'ল, পথের কাঙ্গাল যেন আমি হঠাৎ রাজার ঐশ্বর্য্য একটা হাতে পেলাম! আর আজ—আজ—সব তা সত্যি ভুয়োবাজি হয়ে গেল! যে পথের কাঙ্গাল—সত্যি সেই পথের কাঙ্গালই আমি? না, তবু সেই পথের কাঙ্গাল পথেই খাড়া ছিলাম আমি। আর আজ—হাত-পা ভেঙ্গে একেবারে ধূলোয় লোটাতে হচ্ছে আমাকে!"

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সুরবালা কাঁদিতে লাগিল। কিরণ কহিল, "কেন এলে? থাকতেই যদি পারবে না, তবে কেন এলে? দেখছি—দেখছি—না আসাই তোমাদের ভাল ছিল।"

"হাঁ।"

কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া অধীর আগ্রহে কিরণ আবার জিজ্ঞাসা করিল, "থাকতে কি সত্যিই পারবে না, সুরবালা?"

"না।"

"বেশ, তবে যাও! ফিরেই চ'লে যাও? তোমাদের ঐ টাকা-কড়ি—সব নিয়ে যাও। কিছু—একটি পয়সাও আমি নেব না, নিতে পারব না।"

"টাকা যে তোমার।"

"না, ছিল আমার। দিয়ে দিইছি—এখন তোমার। তোমার টাকা কেন নেব? কে তুমি আমার, সুরবালা?"

"কেউ না হ'লে অতগুলো টাকা দিয়েছিলেই বা কেন আমাকে?"

মুখ তুলিয়া সুরবালা চাহিল। সাশ্রুমুখে একটু হাসিও ফুটিল। অস্থিরভাবে কিরণ বলিয়া উঠিল, "না না, আর জ্বালিও না, সুরবালা! কাটা ঘায়ে আর নুণের ছিটে দিও না। দিয়েছিলাম, যা ভেবেই দিয়েই থাকি—আজ—আজ—"

আবার তেমনই একটু হাসিয়া সুরবালা কহিল, "তা সেই ভাবটা যদি ভুলই হয়ে থাকে—অনায়াসে টাকাগুলো ফিরিয়ে নিতেও ত পার। আর টাকা ত সব আমাকেই দিয়ে ফেলনি, তোমার মাও অর্দ্ধেক ভাগী। এ কথা ত বলতে পার না, তিনিও কেউ নন তোমার।"

"না, কেউ—কেউ—আর আমার কেউ নয়। আমি একা একা—একেবারে নিঃস্ব—পথের কাঙ্গাল!"

"তা পথের কাঙ্গালকেও ত পথে লড়াই ক'রে চলতে হয়—"

"পারি চলব। কাঙ্গালের মতই চলব। উঠতে পারি, কাঙ্গালের মতই লড়াই করে উঠব। তার জন্যে অতগুলো টাকা কারও দয়ার দান ব'লে হাতে তুলে নেব না।"

সুরবালা তখন কহিল, "ছি! কেন পাগলের মত ওসব কথা বলছ? কত বড় একটা কাযের সঙ্কল্প করেছ—"

"চুলোয় যাক্ কায। নিজের জীবনটাই যদি এমনি ক'রে পুড়ে গেল—"

"ছি ছি!—কি বলছ? কাল যে সব কথা বলছিলে, সব ভুলে গেলে? নিজের সুখটাই এত বড় ক'রে আজ দেখছ?"

"সন্ন্যাসী আমি নই—নিজের সুখটা চাই—খুব বেশীই চাই। হাঁ, ছেলেবেলায় গীতা পড়তাম—কর্ম্মসন্ন্যাসের কথাও পড়েছি। পণ্ডিত মশাই বোঝাতেন—পড়তে, শুনতে, ভালও বেশ লাগত। কিন্তু সে সাধনা আমার নেই। অত বড় সন্ন্যাসের অধিকারীও আমি নই। কায যাই কেন করি না, সুখটাও চাই। কেন চাইব

না? কাষ যাই কেন করি না, নিজের সুখের বড় একটা অবসর কি তার মধ্যেও থাকে না?"

"থাকতে হয় ত পারে। কিন্তু সকলের ভাগ্যে ত সেটা ঘটে না। তখন ঐ কাযে—তাতেও ত সুখ বড় একটা আছে—"

"আছে। অস্বীকার করছি না। কিন্তু কেবল তাতেই জীবনটা আমার ভ'রে থাকবে—না, তা থাকবে না, সুরবালা! সন্ন্যাস ত সে সাধনা আমার নেই—কখনও করিনি। তার বাইরেও যে সুখটা আমি চাই—যার আকাঙ্ক্ষা প্রাণ ভ'রে আমার উথলে ওঠে—সেটা—সেটা এখন তুমিই আমাকে দিতে পার! আর ঐ কায—সে কাযেরও এক জন দোসর চাই, সে দোসর তুমিই হ'তে পার।"

মুখখানি সুরবালা ফিরাইয়া লইল।

কিরণ কহিল, "থাকতে কি তবে সত্যিই পার না, সুরবালা? আমার হয়ে আমার কাছে—এই কাযে আমার সহায় হয়ে—সহযোগিনী হয়ে—সত্যিই থাকতে পার না?"

চক্ষু মুদিয়া সুরবালা কহিল, "পারি কি?—তুমি—তুমি কি বলতেই পার।"

"পারি, পারব—পারতেই আমাকে হবে। নইলে—নইলে কোনই কিছু করতে পারব না। বাঁচবই না—পাগল হয়ে যাব।"

সুরবালা কহিল, "কাল যখন ঐ কথাগুলি বলছিলে—আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি শুনছিলাম। মনে হচ্ছিল এই পৃথিবীর মাটী ছেড়ে অনেক ওপরে তুমি উঠে গেছ। জানি না কিন্তু তখন কি ভেবেছিলে—মনেও এ কথাটা কখনও উঠেছিল—আমি তোমার সঙ্গিনী হয়ে এখানে থাকব, আর কেবল সেই বলেই তুমি এতবড় একটা কাযে হাত দিতে প্রস্তুত হয়েছ?"

নীরবে নতশিরে কিরণ দাঁড়াইয়া রহিল। সুরবালা কহিল, "আর ঐ কল্পনা কেবল যে কালই আমরা আসবার পর তোমার মাথায় এসেছিল—তাও ত মনে হ'ল না। আগে থেকেই—এইখেনে আসবার পর থেকেই বোধ হয় এমনি একটা কথা তুমি ভাবছিলে।"

কিরণ উত্তর করিল, "হাঁ, তাই ভাবছিলাম বটে। আর কাল—না, ঠিক তোমার কথাটা ঠিক ও ভাবেও ভাবিনি। কিন্তু কাল আর আজ—"

"তফাৎটা কিসে হ'ল?"

"পাষাণী তুমি বুঝবে না। কাল তোমাকে ভাল ক'রে একটিবার দেখিনিও চোখে, কাছেও নিরালা পাইনি। কিন্তু আজ—না, আজ আর পারছিনে। সত্যিই পারছিনে! বল—বল সুরবালা, থাকবে আমার—আমার হয়ে আমার কাছে—আমার এই কুঁড়েখানি আলো ক'রে থাকবে! যদি থাক—সব আমি পারব। নইলে—নইলে—শক্তি যা ছিল—কল্পনা যা গ'ড়ে উঠছিল—সব বুঝি ভেঙ্গে পড়বে। বল—বল সুরবালা, থাকবে!"

বলিতে বলিতে কিরণ কাছে গিয়া আবার সুরবালার হাতখানি চাপিয়া ধরিল। বুকের কাছে তাহাকে টানিয়া আনিল। অতি আবেগভরে বুকে সুরবালাকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "না, যেতে আমি তোমায় দেব না, সুরবালা! এমনি—এমনি ক'রে আমার এই বুকে চিরকাল তোমাকে ধ'রে রাখব! যেতে তুমি পারবে না—যেতে দেব না আমি!"

৪

বাহিরে সুপ্রকাশ আসিয়া ডাকিল, "ডাকপিওন এসেছে, দাদা। রেজেষ্টি চিঠি আছে।"

কিরণ তখন সরিয়া আসিয়া দরজাটি খুলিয়া বাহির হইল। সুপ্রকাশ কহিল, "দুখানা চিঠি এসেছে। একখানা রেজেষ্টী।"

সই দিয়া কিরণ রেজেষ্টী চিঠির রসিদখানি সুপ্রকাশের হাতে দিল। সিল দেখিল, রেজেষ্টী চিঠিখানি আসিয়াছে কলিকাতা হইতে। কিন্তু প্রেরকের নাম নাই। হাতের লেখাটাও কিরণ চিনিতে পারিল না। অন্য চিঠিখানি আসিয়াছে এলাহাবাদ হইতে। মনে হইল, তাহার সেই কারখানার আফিসের চিঠি। ঘরে আসিয়া কিরণ চিঠিখানি খুলিল। বড় ম্যানেজার লিখিয়াছেন, কিরণের মত পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা আছে এবং সে ফিরিয়া আসিতে পারে, এইরূপ তিনি বুঝিয়াছেন। আসিলে আনন্দে তাঁহারা আবার তাহাকে সেই কাযে গ্রহণ করিবেন। তাহার জন্য কিছুকাল অপেক্ষা করিতেও প্রস্তুত আছেন। ইত্যাদি। তার পর রেজেষ্টী চিঠিখানি খুলিল। পড়িতে পড়িতে মুখখানি একবারে পাংশু হইয়া গেল। কম্পিতহস্ত হইতে চিঠিখানি চৌকীর নীচে পড়িয়া গেল।

সুরবালা জিজ্ঞাসিল, "কার চিঠি?"

কিরণ উত্তর দিল, "একখানি এসেছে, যেখানে চাকরী করতাম, সেই আফিস থেকে।"

"কি লিখেছেন?"

"লিখেছেন, চাকরীতে যদি ফিরে যাই, আমাকে আবার নিতে পারেন। কি ক'রে তাঁরা জানতে পেরেছেন, যেতেও আমি পারি।"

"যাবে?"

"না।"

"কিন্তু যেতেও ত পার।"

"পারি, কিন্তু যাব না।"

"আর ওটা?"

"ওটা লিখেছেন নীলাম্বর বাবু আমার সেই শ্বশুর। চিঠিটা তাঁর—তবে ঠিকানাটা তাঁর হাতের লেখা নয়।"

বলিয়া খামখানি আবার তুলিয়া দেখিল।

"কি লিখেছেন?"

"লিখেছেন—লিখেছেন কলকেতায় তাঁরা এসে পৌঁছেছেন। এখানে আসছেন—"

একটুকাল চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে সুরবালা কহিল "আসছেন তাঁরা কে কে?"

দরজাটি খোলাই ছিল। কেমন একটা শূন্য উদাসভাবে কিরণ বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল,—সেই ভাবে চাহিয়া থাকিয়াই উত্তর করিল, "তিনি—আমার শাশুড়ী—আর—আর বরুণা—"

স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সুরবালা হাসিয়া কহিল, "তা—তুমি ত—হয়েছে—লিখে দিয়েই এসেছিলে, ইচ্ছে হ'লে এখানে তিনি এসে থাকতে পারেন।"

"হাঁ।"

সুরবালা কহিল, "আমিও জানতাম, তিনি আসবেন।"

"জানতে? কিসে জানতে?" বলিয়া কিরণ ফিরিল।

চকিত দৃষ্টিতে চাহিল। আনত মুখে ধীরে ধীরে সুরবালা কহিল,—"না এসে কি পারেন ? তাই ত বলছিলাম, থাকতে আমি পারিনে। তুমিও রাখতে পার না।"

একটু উত্তেজিতভাবেই কিরণ তখন বলিয়া উঠিল, "কেন পারব না ? তুমিই বা কেন পারবে না ? তারা আসছে আসুক। তাতে তোমারই বা থাকতে বাধা কি ?"

"ছি ! তাও কি হয় ?"

একটু ভ্রুকুটি সহ দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া কিরণ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। শেষে কহিল, "তারা আসছে—থাকতে আসছে না। আসছে আমাকে ফিরিয়ে নিতে। নইলে দলবলে আসত না। আর আফিসের ঐ চিঠিটা—তাও নীলাম্বর বাবুর তদ্বিরের ফল।"

সুরবালা কহিল,—"ফিরিয়ে নিতে—হাঁ, চেষ্টা ত একটা করবেনই। তবে তুমি যদি নাই যাও, তবে—তবে—উনি কি সত্যিই এসে তোমায় ফেলে আবার চ'লে যেতে পারবেন ?"

"থাকতেও পারবে না। থাকতে সে এখানে এ অবস্থায় পারে না। আরও—আরও শরীরটাও ভেঙ্গে পড়েছে—" একটি নিশ্বাস উঠিতে উঠিতে কিরণ চাপিয়া লইল।

সুরবালা কহিল, "সেটাও ত তোমার দেখা উচিত।"

"দেখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারলাম না, দেখতে দিলে না। অযথা নিজের মনের আগুনে—"

"অযথা—ঠিক অযথাই কি বলতে পার ? তোমার নিজের মনটা—"

"মনটা যাই হয়ে থাক্, সব চেপে তাকে সুখী করতেই চেষ্টা করেছিলাম, বাড়ী থেকে ফিরে গিয়ে। কিন্তু পারলাম না।"

"পারতে, যদি যদি—"

"হাঁ, যদি আগের মত তোমাদের একদম ভুলে থাকতেই পারতাম, খরচ-পত্তর কিছু না পাঠাতাম।"

"সে যাই হ'ক, এখন আসছেন—"

"তখন কি ? কি বলতে চাও ?" বলিয়া কিরণ দীপ্ত চক্ষু দুটি তুলিয়া চাহিল। আনত মুখে সুরবালা উত্তর করিল, "ফিরে যেতে পারবেন না। শরীর ভাল নয়, তাতে কি এমন হয়েছে ? থাকলেই শেষে ভাল হয়ে যাবে।"

"খায় ভাল কথা। থাকেই যদি থাক্। কিন্তু তাই ব'লে তুমিই বা থাকতে পারবে না কেন ? তুমিও স্ত্রী, তোমাকেও ত বিবাহ করেছিলাম। দাবী-দাওয়া তোমারই কি একটা নেই ?"

"না, এখন আর কিছুই নেই।"

কিরণ কহিল,—"দুইটি স্ত্রীকে যদি বিবাহই করেছি—"

"সংসার করতে দুটিকে নিয়ে পার না।"

"একেবারে ত্যাগই বা কি বলে তোমাকে করব, সুরবালা ?" স্বর কিরণের কম্পিত হইয়া উঠিল। মুখখানি সুরবালা ফিরাইয়া লইল। শেষে ধীরে ধীরে কহিল, "সে কথাটা এখন আর ভাববার সময় নেই। ত্যাগ—তা মনে ত আমায় ত্যাগ করনি।"

"না, তা করিনি। করিনি—করতে পারব না। সেটা—সেটা তুমি হয় ত বড় একটা ভাগ্য বলেই মনে করতে পার, কিন্তু আমি দগ্ধে দগ্ধে ওতে মরব। আমি যেমন মনে, তেমনি বাইরেও যে একান্তভাবে তোমাকে পেতে চাই।"

"কিন্তু—তা যে পার না।"

"যদি—যদি পারি, কোনও মতে সম্ভব হয়, তোমার কি আপত্তি আছে, সুরবালা ?"

"আমার ? আমার—কেন ও কথা জিজ্ঞাসা করছ ?"

"তবু—বল, বল ? একটিবার আমি শুনতে চাই। বল—তোমার কি আপত্তি আছে ?" উচ্ছ্বাসের ভরে কিরণ প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল।

অতি কুণ্ঠিতভাবে সুরবালা উত্তর করিল, "বলা মিছে ? সম্ভব তা কখনও হ'তে পারে না।"

"তবু—তবু—বল ! একটিবার বল !"

"তিনি যদি রাখেন, দাসী হয়েও আমি থাকতে পারতাম—"

সুরবালা চক্ষু মুছিল। কিরণও কাঁদিয়া ফেলিল,—একটু সামলাইয়া শেষে বলিল, "না, সে রাখবে না—রাখতে পারে না—যদিও সে রাখা না রাখার অধিকার তার কিছু নাই। সে অধিকার বরং তোমারই আছে। কারণ, তুমি বড়, আগে বিবাহ তোমাকেই করেছিলাম।"

সুরবালা কহিল, "কবে ওরা আসছেন ?"

"কাল বিকেলে। ষ্টেশনে লোক রাখতে লিখেছেন।"

"লোক যারা যাবে, তাদের সঙ্গে কাল সকালেই আমাদের পাঠিয়ে দেও।"

"না ! কক্ষণো না ! আসছে তারা আসুক। থাকে, থাক্। তাই ব'লে তোমরা এসেছ—ভয়ে ভয়ে আগে থেকে সরিয়ে দেব ? না, প্রাণ থাকতে তা পারব না, সুরবালা !"

বলিয়াই কিরণ বাহির হইয়া গেল। দরজার কাছে ফিরিয়া আবার কহিল, "হাঁ, মাকে আগেই কিছু ব'লো না যেন। যা বলতে হয়, আমিই কাল বুঝিয়ে বলব।"

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ।

বরষা

বরষ পরে বরষা এলো হরষ জাগে সবার বুকে,
রং-হারা এই ধরার পরে ঝরায় ধারা অসীম সুখে

বনের মাঝে বীণার সুর বাজায় ওই বরষা-ধারা,
পাতার কোলে, সকল ভুলে জলের কণা নাচিয়া সারা।
দূরের ওই বনের শেষে, আকাশ যেথা নামিয়া আসে
কাজল-কালো মেঘেরা সেথা ছুটিয়া চলে কি উল্লাসে।

ধূসর ধরা শ্যামল হ'লো—পুলকে তনু উঠিল ভরি—
ঘুচিয়া গেছে দুঃখ তার—মর্ম্ম-দাহ মিলায়ে সরি।
বাদল-বেলা বসিয়া আছি—ব্যাকুল চোখে নেহারি আমি
ধরার পরে বরষ ঘুরে বরষা আজি এলো রে নামি !

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।



স্বাধীনতা ও যুদ্ধবৃত্তি

পরাধীন জাতি স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য যুদ্ধ করে, এরূপ ঘটনা বিরল ; কারণ, জগতে স্বাধীন জাতির সংখ্যা পরাধীন জাতির অপেক্ষা অনেক অধিক। আর সে প্রকার যুদ্ধ এক প্রকার বিপ্লব। সাধারণতঃ স্বাধীন জাতিরাই যুদ্ধে লিপ্ত হয়। চিরকালই এরূপ হইয়া আসিতেছে। আমাদের যে যুগভেদ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাতে সত্যযুগে যুদ্ধ হইবার কথা নয়, কিন্তু সত্যযুগের এক কাল্পনিক অনুমিতি ছাড়া আর কিছু পুরাবৃত্ত বা অন্য রকম সাহিত্য নাই। ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই তিন যুগেই যুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। জগতের সাহিত্যে কয়েকটি মহাকাব্যের যুদ্ধ-বিগ্রহই প্রধান উপকরণ। রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডই প্রধান ঘটনা, রাম রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য লঙ্কায় সৈন্য অভিযান করেন। সে ত্রেতাযুগের কথা। দ্বাপরে মহাভারত। ঘরে ঘরে বিবাদ হইয়া কুরুক্ষেত্র মহাসমরে অগণিত সৈন্য, রথী, মহারথ, রাজন্যবর্গ নিহত হয়। তাহার পরে আত্মদ্রোহিতায় যদুবংশ ধ্বংস হয়। হোমরের মহাকাব্য ইলিয়ড ট্রোজান যুদ্ধ লইয়া বিরচিত। আবার মানুষের এমন উৎকট স্বভাব যে, যুদ্ধকাহিনী শুনিতে অত্যন্ত প্রিয় মনে হয়। বীর কে ? না, যে যুদ্ধে জয়ী হয় অথবা যুদ্ধে অসীম পরাক্রম প্রকাশ করিয়া নিহত হয়। যে রাজা যুদ্ধে অপর জাতিকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের স্বাধীনতা বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া তাহাদের দেশ নিজের রাজ্যভুক্ত করিতে পারে, সে সম্রাট্ হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা অত্যাচারের একশেষ, কিন্তু যাহারা এইরূপে রাজ্য জয় করিতে পারে, তাহারা গ্রেট, অথবা মহৎ উপাধি প্রাপ্ত হয়। চক্রবর্ত্তী সম্রাটেরও তাহাই অর্থ।

অসভ্য জাতিরা সর্ব্বদাই যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমা লঙ্ঘন করিলেই বহুসংখ্যক পাঠান জাতির বাস। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন খেল অথবা দলে বিভক্ত। ইহারা নিরন্তর পরস্পরে বিবাদ ও যুদ্ধ করে। সময়ে সময়ে নিজেদের ভূমি-সীমা অতিক্রম করিয়া ইংরাজ রাজ্য আক্রমণ করিয়া লুঠপাট করে। তখন গবর্মেণ্ট সৈন্য প্রেরণ করিয়া ইহাদিগকে পরাস্ত করিয়া শাসন করেন। দক্ষিণ-আফ্রিকায় অসভ্য জাতিরা কিছুদিন পূর্ব্বে অনবরত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিত। জুলু জাতি অত্যন্ত সাহসী ও যুদ্ধপ্রিয়। কেটিওয়েও নামক তাহাদের রাজা অপর অনেক জাতিকে দমন করিয়া স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিত। সময়ে সময়ে কোন জাতিকে একেবারে নির্ম্মূল করিত। জুলু পল্টনের নাম ইম্পি। তাহাদের অস্ত্র আসেগাই—একপ্রকার বর্শা। সেই সকল বর্শা নিক্ষেপ করিয়া তাহারা শত্রুদিগকে নিহত করিত, তাহার পর হাতাহাতি যুদ্ধে তাহাদিগকে নিঃশেষ করিয়া, তাহাদের গ্রামে গিয়া গ্রাম জ্বালাইয়া দিত, আবালবৃদ্ধবনিতা কেহ রক্ষা পাইত না, সকলকে ধ্বংস করিত। উত্তর-আমেরিকায় লাল ইণ্ডিয়ান নামক তাম্রবর্ণ অনেক অসভ্য জাতি বাস করিত। ইহারাও পরস্পরে সর্ব্বদা যুদ্ধ করিত। তীর-ধনুক ছাড়া ইহারা টোমাহক নামক একপ্রকার কুঠার ব্যবহার করিত, পরাজিত অথবা নিহত শত্রুর কেশ চামড়ার সহিত কাটিয়া লইয়া কটিদেশে ঝুলাইয়া রাখিত। আমেরিকায় য়ুরোপীয়ানদের আবির্ভাব হইলে ইহাদের সহিত যুদ্ধ হয়। তাহাতে ইহারা নিঃশেষ হয় নাই, অবশেষে যখন য়ুরোপীয়রা সুরা পান করিতে শিখিল, তাহার অল্পদিন পরেই ইহারা প্রায় নিঃশেষ হইয়া গেল। অষ্ট্রেলিয়াতে মাওরি নামক বলবান্ অসভ্য জাতি ছিল। প্রথমে কয়েকবার যুদ্ধে ইহারা ইংরাজ সৈন্যদিগকে পরাভব করে, ইংরাজী ইতিহাসেই তাহা বর্ণিত আছে। সন্ধি হইলে পর ইহারাও ব্রাণ্ডি প্রভৃতি প্রচণ্ড মদিরা সেবন করিতে আরম্ভ করে। এখন মাওরিরাও প্রায় নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে।

যুদ্ধ রহিত হইয়া যে জগতে সর্ব্বত্র স্থায়ী শান্তি স্থাপিত

হইবে, ইহা দুরাশা ; কিন্তু যুদ্ধেরও একটা কালাকাল আছে। প্রধানতঃ ক্ষমতাশালী ব্যক্তিবিশেষের দুর্দমনীয় জিগীষাই যুদ্ধের মূল কারণ। সীজর, আটিলা, তৈমুর, জঙ্গীস খাঁ, নাদীর শাহ, আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ন—সকলেই এক শ্রেণীভুক্ত। বলপূর্ব্বক অথবা ছলের দ্বারা স্থাপিত সাম্রাজ্য কখনও দীর্ঘস্থায়ী হয় না, কিন্তু সে কথা কে স্মরণ রাখে? গ্রীসে মাসিডন অতি ক্ষুদ্র প্রদেশ। সেখানকার যুবক রাজা আলেকজাণ্ডার দিগ্বিজয়ী গ্রীক সৈন্য লইয়া পশ্চিম-এসিয়া-খণ্ড জয় করিয়া, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অংশ পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়া সেখানকার রাজাকে পরাজয় করেন। কিন্তু মাসিডনের সাম্রাজ্য কয় দিন ছিল? কালস্রোতে এই সকল সাম্রাজ্য জলবুদ্বুদ মাত্র, একবার উঠিয়া, সূর্য্যালোকে চাকচিক্যবিশিষ্ট হইয়া আবার জলে মিশিয়া যায়। জুলিয়স সীজর ইংলণ্ডের কিয়দংশ জয় করিয়া সেখানে রোমান রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার বহু পূর্ব্বে ইরান দেশীয় পারসীক জাতি ইজিপ্ট হইতে আফগানিস্থান পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। ভারতের আর্য্যাবর্ত্তের আর্য্যগণ ও প্রাচীন ইরাণীরা একই জাতি ও বংশ হইতে সম্ভূত। এককালে এই দুই বিভাগের ভাষাও এক ছিল। চক্রবর্ত্তী সম্রাট্ কুরুশ (সাইরস), দরায়স (ডেরিয়স), নওশেরওয়ান (খুসরু) সকলেই জরথুস্ত্রকে ধর্ম্মগুরু বলিয়া মানিতেন, সকলেই অগ্নি- [illegible] পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। নক্শ-ই-রুস্তম নামক স্থানে দরায়সের কীর্ত্তিশিলায় ক্ষোদিত আছে—"আমি দরায়স, মহারাজা, রাজাধিরাজ, আকিমিনিড বিস্তাস্পের পুত্র। আমি পারসীক, পারসীকের পুত্র, আর্য্য-বংশসম্ভূত আর্য্য।" কোথায় সেই মহা পরাক্রমশালী, মহা সমৃদ্ধিশালী আর্য্য পারসীক জাতি? আরব দেশ হইতে ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারিত হইলে অপর সকল জাতির পূর্ব্ব-গৌরব বিলুপ্ত হইল, জরথুস্ত্র সম্প্রদায়ের অধিক লোকেরাই নূতন ধর্ম্ম অবলম্বন করিল, কেবল অল্পসংখ্যক লোক প্রাচীন ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়া, উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। সে ত তের শত বৎসরের কথা। এখন পার্শীদের সংখ্যা এক লক্ষের কিছু উপর।

সভ্যতা হিসাবে য়ুরোপ এখন জগতের শীর্ষস্থানীয়। বিজ্ঞানের উন্নতি এরূপ কোন কালে হয় নাই। প্রভূত সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্যের সকল প্রকার সরঞ্জাম। ছোট, বড়, য়ুরোপের সকল জাতিই স্বাধীন। কিন্তু কোন জাতি নিজের দেশ লইয়া সন্তুষ্ট নয়, য়ুরোপের বাহিরে সকল দেশের উপর লুব্ধ দৃষ্টি আছে, অনেক প্রদেশ য়ুরোপীয় জাতিরা অধিকার করিয়াছে। ইংলণ্ডের ত কথাই নাই, হলাণ্ড, বেলজিয়মের ন্যায় ছোট দেশেরও উপনিবেশ আছে। লোভের ও পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবের ইহাই প্রধান কারণ। সভ্যশ্রেষ্ঠ হইলে কি হয়, য়ুরোপে যে সকল ভীষণ রক্তকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, জগতে কুত্রাপি সেরূপ হয় নাই। এসিয়াকে য়ুরোপ কতকটা অবজ্ঞা ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে, কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের ন্যায় ব্যাপার এসিয়ায় কোন কালে শুনিতে পাওয়া যায় নাই। শোণিত-লিপ্সা যেন কিছুতেই মিটিতেছিল না। মোলক নামক দেবতাকে প্রাচীন ফিনিশিয়ান জাতি বহুসংখ্যক নরবলি দিত, কিন্তু স্বাধীনতার নামে এরূপ নরহত্যা কোন কালে কোথাও হয় নাই। ফ্রান্সের সর্ব্বত্র গিলোটিনে সহস্র সহস্র মুণ্ড কাটা পড়িতেছিল, যাহারা সর্ব্বময় কর্ত্তা, অবশেষে তাহাদেরও মুণ্ডচ্ছেদন হইল। বিপ্লবের অবসান হইলেই কি ফ্রান্স শান্তিলাভ করিতে পারিয়াছিল? বিপ্লবের শেষের সঙ্গে সঙ্গে নেপোলিয়ানের অভ্যুদয়। সেই ক্ষুদ্রকায় পুরুষ য়ুরোপকে মন্থন করিয়াছিলেন। তাঁহার নামে য়ুরোপ কম্পিত হইত। ইংলণ্ডে তাঁহার নাম করিয়া, ভয় দেখাইয়া মাতারা দুরন্ত ছেলেদের ঘুম পাড়াইত। একবার নেপোলিয়ন রাশিয়ার সম্রাট্ আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা দুই জনে মিলিয়া সমস্ত পৃথিবীর সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া লইবেন। নেপোলিয়নের কালে যে কত লোক মরিয়াছিল, তাহা কি সংখ্যা করা যায়? অবশেষে তাঁহারও দিন ফুরাইল। বন্দী হইয়া সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে তাঁহাকে জীবনের শেষ কয় বৎসর অতিবাহিত করিতে হইল।

য়ুরোপে যুদ্ধের নিবৃত্তি নাই। এ দিকে সভ্যতার উচ্চতম সোপানে অধিষ্ঠিত, ও-দিকে কেবল সাজ সাজ রব, ক্রমাগত সৈন্যসংখ্যা বাড়িতেছে, যুদ্ধের জন্য এরোপ্লেন নির্ম্মিত হইতেছে, রণতরীর সজ্জা হইতেছে। য়ুরোপ জুড়িয়া অস্ত্র ঝনঝনা শব্দ। এখনও আঠারো বৎসর হয় নাই, য়ুরোপে সর্ব্বলোকক্ষয়কর যুদ্ধ হইয়াছিল, সমস্ত জগৎ তাহাতে জড়াইয়া পড়িয়াছিল, আবার ইহারই মধ্যে যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম

ফ্রান্স, ইংলণ্ড, ইটালী বদ্ধপরিকর হইয়া আবার জার্ম্মাণীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। সে আশঙ্কা আপাততঃ রহিত হইয়াছে, সহজে যে কোন জাতি জার্ম্মাণীকে আক্রমণ করিবে, তাহাও মনে হয় না ; কিন্তু দীর্ঘকাল যে শান্তি রক্ষিত হইবে, এরূপ আশাও করিতে পারা যায় না। এসিয়া, আমেরিকা, আফ্রিকাতেও বিস্তর জাতি বাস করে, সকল জাতি য়ুরোপের তুল্য সভ্য না হইতে পারে, কিন্তু আর কোথাও ত নিত্য শঙ্কাতঙ্ক হয় না ? চীন ও জাপানে অনেককাল বিবাদ চলিতেছে,—তাহার কারণ, চীনে এখন পর্য্যন্ত স্থায়ী শাসন-ব্যবস্থা হয় নাই। জাপান য়ুরোপের দেখাদেখি যুদ্ধপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু চীন একবার উঠিয়া দাঁড়াইলে জাপান থামিয়া যাইবে।

যদি বুঝিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে য়ুরোপে নিরন্তর যুদ্ধ হইবার কোন কারণ নাই। যে জাতি যত বলবানই হউক, য়ুরোপের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দেশের স্বাধীনতা হরণ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। এত বার এত ভীষণ যুদ্ধ হইল, কিন্তু সুইটজরলণ্ড, হলাণ্ড, বেলজিয়মের স্বাধীনতা যেমন ছিল, সেইরূপ আছে। ইংলণ্ডের ত এত বড় জগদ্ব্যাপী সাম্রাজ্য, কিন্তু সাধ্য কি যে য়ুরোপের সূচ্যগ্রভূমি অধিকার করে। যদি দেশ জয়ই না করিতে পারিবে, তাহা হইলে যুদ্ধ করিয়া কি ফল ? জার্ম্মাণীতে আজ রাজা নাই, কাল রাজা হইলে কে নিষেধ করিতে পারে ? জেকোশ্লাভিয়াতেও সেইরূপ। যুদ্ধের কারণ কিছুই নাই, অথচ য়ুরোপের শান্তিরক্ষা হওয়া অসম্ভব। স্বাধীনতার কি ইহাই পরিণাম ? যদি য়ুরোপের দেশের লোকরা যুদ্ধ করিতে অসম্মত হয়, তাহা হইলে কে তাহাদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিতে পারে ? কিন্তু শত্রুভয় হইলে কে যুদ্ধ নিবারণ করিবে ? জার্ম্মাণী হইতে ফ্রান্সের ভয়, অতএব যুদ্ধের আয়োজন কর। ইংলণ্ড একা য়ুরোপের কোন প্রধান জাতির সহিত যুদ্ধ করিবে না, কিন্তু অপরের সঙ্গে অবিলম্বে যোগ দিবে। রাজা না থাকিলে রাজ্যলোভ থাকিবার কথা নহে, কিন্তু তথাপি য়ুরোপে শান্তিরক্ষা করা অসম্ভব। যে যুদ্ধ অকারণে হয়, সেই যুদ্ধ সকলের অপেক্ষা ভয়ঙ্কর, এবং অকারণ যুদ্ধে য়ুরোপের আত্মবিনাশ হওয়াতে কিছুই বিচিত্র নাই। যাহাকে মারে হরি, তাহাকে রাখে কে ?

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

দারিদ্র্য

বিকট করাল শীর্ণ কঙ্কালের প্রায়
মূর্ত্তি তব হেরি চিত্ত কাঁপে যে শঙ্কায়।
তুমি দাও ভালে যার তব জয়টীকা,
ম্লান হয়ে যায় তার প্রতিভার শিখা।

গুণহীন হয় সে যে হয়ে গুণবান্
বুদ্ধিহারা হয়ে যায় মহাবুদ্ধিমান্ ;
মানী হয়ে সহে সে যে সদা অপমান,
রসাতলে যায় তার আত্ম-অভিমান।

তেজস্বী সে কাপুরুষে হয় পরিণত,
অন্নদায়ে হীন-পাশে শির করে নত।
উচ্চ-চিন্তা যায় তার—জঠর-জ্বালায়,
ধরার আনন্দ তার মরীচিকা প্রায়।

রুধিরাক্ত হৃদি তার দুঃখের কাঁটায়
ক্ষয় হয় পলে পলে যক্ষ্মারোগী প্রায়,
বন্ধুসম মৃত্যু আসি ত্বরিত চরণে,
সর্ব্বদুঃখ দূর তার করে সযতনে।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্যে হাস্যরস

৫

বঙ্গভাষায় অতি প্রাচীন রূপ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা এখন ব্রতকথা, রূপকথা এবং ডাক ও খনার বচনে বেশী দেখিতে পাই। যদিও পরবর্ত্তী যুগে তাহাতে ভাষান্তর, কথান্তর হইয়াছে এবং নূতন বিষয় হয় ত অনেক প্রবেশ করিয়াছে, তবু তাহা হইতে আমরা পুরাতন বঙ্গভাষার এবং তৎকালীন রসবোধের পরিচয় পাই। ময়নামতীর গান এবং গোরক্ষবিজয়-গাথা এখন অনেকটা উদ্ধার করিয়া সংগ্রহ করা হইয়াছে। তাহার ঐতিহাসিক গবেষণা করিয়া হয় ত আমরা ধরিতে পারি না—তাহা কত প্রাচীন এবং হয় ত অনেকে সে যুক্তিতর্কপূর্ণ গবেষণাতে সন্দেহজনক অনেক জিনিষ দেখিতে পান। রসবোধ দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যেমন, বার বৎসর সন্ন্যাসের পর রাজা গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার স্ত্রী অদুনার যৌবনশ্রী দেখিতে পাইবেন না, সে কথা বুঝাইতে অদুনা বলিয়াছিলেন—(যৌবনরূপ)

ধান চাল নহে যে গোলা বান্ধি থুমু।
রাজার রাজ্যায় যুদ্ধ নহে মাল যোগাইমু।
দালমাই যাচক নহে মোহর মারিমু।
মালী-ঘরের পুষ্প নহে বসিয়া গাঁথিমু।
তেলী-ঘরের তেল নহে বাজারে বেচিমু।
সুতার কাপড় নহে কাড়া বদলাইমু।
দর্মঘটি যৌবন মুই কিরূপে রাখিমু।

একটি রূপকথার মধ্যে যৌবন সম্বন্ধে এরূপ উক্তি পাই—

এ'ত সোনার জিনিষ নহে
যে গোলা ছাঁদিয়া রাখিব।
বাণিয়ার সিন্দুর নহে
যে কৌটা ভরে থুব।

আধুনিক যুগে এই একই পরিকল্পনা এখন বিভিন্ন আকারে দেখা দিয়াছে। ভাষার দিক হইতে বলা যায়—

"বসন্ত নিশীথে বঁধু, লহ গন্ধ লহ মধু,
শুধু মোর সরমখানি রাখিও।"

এরূপ ভাব ও ভাষা বোধ হয় পুরাকালের প্রচলিত সাহিত্যে আমরা পাইব না। পৌরাণিক যুগের সাহিত্যের মত, গান, গাথা ও রূপকথার মধ্যে আমরা রূপবর্ণনার বাহুল্য পাই না। আধুনিক যুগের সাহিত্যের মত প্রেমের কথাও তেমন শুনিতে পাই না। অথচ সরল সাহিত্যিক লিপিকুশলতা এই সব গল্পের মধ্যে আমরা পাই। একটি পাঠশালার বর্ণনা শুনিতে পাই, যথা—

"পণ্ডিত কত পড়ুয়া পড়ায়, কুঁজো আছে, ন্যাজো আছে, পেঁজো আছে, ছুট ঠ্যাং ল্যাংরা আছে, রাজার রাজপুত্র আছে, দিনরাত ছিনি মিনি, কিলি বিলি, কাকহাটি না বকহাটি।"

আর একটি ছড়া এখন সর্ব্বত্র প্রচলিত (পাঠশালা)

"একে মিন্ মিন্ দুইয়ে পাঠ
তিনএ গোলমাল চারএ হাট"

রূপকথা কোন্ সময় প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু তাহাকে Lullaby literature যদি বলা যায়, তবে মনে হয়, আদিমকাল হইতে "ছেলেকে ঘুমপাড়ান" মাতৃদের যে জন্মগত ও স্বভাবগত বৃত্তি (Instinct) আছে, ইহা তাহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে ধরা যাইতে পারে। সঙ্গীতের সুরে কতকগুলি অর্থহীন শব্দ যোজনা করার মধ্যে, হয় ত ভাব, ভাষা অথবা কল্পনার বৈচিত্র্য কিছুই নাই। কিন্তু তাহা শিশুকে ভুলাইবার জন্য এক অমোঘ উপায় ছিল, তাহা আজ পর্য্যন্ত বোধ হয় সব সমাজে সর্ব্বত্র আদর পাইয়া আসিতেছে। মানুষ বড় হইলে এবং বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেও কতকগুলি শিশুস্বভাব সে ত্যাগ করিতে পারে না এবং সেজন্য Lullaby literature এখনও অনেকের কাছে প্রিয়ভাবে প্রচলিত আছে। "খোকা ঘুমুল পাড়া জুড়াল বর্গী এলো দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে।" এরূপ ছড়া বোধ হয় বর্গীর হাঙ্গামার পর, কৃষক-পরিবারের দুঃখের আভাস। কিন্তু "রুইমাছ পালঙের শাক, ভারে ভারে আসে" দেশের সমৃদ্ধি-পরিচায়ক ইতিহাস যেন বলা যায়। ঘুমপাড়ান ছড়ার মধ্যে সাময়িক কিম্বদন্তী স্বভাবতঃই প্রবেশ করিয়াছে। বিভিন্ন পুরাণ, ইতিহাস ও কিম্বদন্তী হইতে আমরা রূপকথা এবং Folk tales-এর উৎপত্তি কল্পনা করিতে পারি। বালকদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে গেলে আমরা বুঝিতে পারি যে, অস্বাভাবিক, আকস্মিক, পারলৌকিক, অনৈসর্গিক কিছু না থাকিলে গল্প তাহাদের বিশেষ প্রিয় হয় না। এরূপ একটা বিস্ময়ের ভাব, হাস্যরসের সঙ্গে বিজড়িত আছে, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। পৌরাণিক কথা ও কাহিনী এবং রূপকথা সেজন্য সময়বিশেষে ও অবস্থাবিশেষে সকলের কাছেই প্রিয়।

ডাক ও খনার-বচন এবং অনেক প্রকার ছড়া, বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রের উপদেশমূলক প্রবাদবাক্য (Witty cryptic Sayings of Practical Experience)। তাহার মধ্যে ডাক ছিলেন এক জন সামাজিক উপদেষ্টা (Social Instructor) এবং খনা ছিলেন দেশের আবহাওয়া ও কৃষিকার্য্যের বিধানদাত্রী (Meteorological and Agricultural Director), ডাক কে ছিলেন ও কবে তিনি উপদেশ বিতরণ করিয়াছেন, তাহা জানা যায় না। তবে কিম্বদন্তী ধরিলে জানা যায়, খনা ("প্রতিভাসুন্দরী") কালিদাসের যুগে জ্যোতিষী বরাহের পুত্র মিহিরের স্ত্রীভাবে পরিচিত ছিলেন। লোকসমাজে তাঁহাদের উপদেশগুলি শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁহারা যে বচন (গাথা ও ছড়া) বলিয়াছিলেন, তাহাতে প্রচলিত সাধারণ গ্রাম্য ভাষায় হাস্যরসাত্মক "পদ্যের বাঁধুনী" (Witty Poetic diction) বেশী ছিল। সুদীর্ঘ যুগযুগান্ত পরেও

তাঁহাদের কথার ব্যতিক্রম ও প্রতিপ্রসব (Exception) খুব কমই দৃষ্ট হয়। আধুনিক যুগেও তাহা কৃষকদের সামাজিক জীবনে ও কর্মক্ষেত্রে সমান প্রয়োগ করা যাইতে পারে। হয় ত কালক্রমে ইহাদের ভাষা সহজ হইয়া গিয়াছে এবং অনেক গ্রাম্য প্রবাদ ইহাতে প্রবেশলাভ করিয়াছে। তবু ইহাদের witty pithy sayings অনেক স্থানে প্রচলিত আছে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি বচন নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

ডাকের বচন –

যে দেয় ভাত শালা পানী শালী
সে না যায় যমের বাড়ী।
ধর্ম-ভূমি কন্যাদান,
বলে ডাক স্বর্গে স্থান॥

কিম্বা

দধি দুগ্ধ করিয়া ভোগ
ঔষধ দিয়া খণ্ডাব রোগ।
বলে ডাক এই সংসার
আপনা নইলে কিসের আর॥

অথবা—

ভোগা বোল পাতে লেখি।
বাটোহন বোল পড়ি সাখি॥
মধ্যাহ্ন যবে সমাবে স্নায়
বলে ডাক বড় সুখ পায়।
অনাহ্নে যবে ভোজন বুঝে
বলে ডাক নরকে পচে॥

পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে ডাকের উক্তি—

ঘরে আখা বাইরে রাঁধে
অল্প কেশ ফুলাইয়া বাঁধে।
ঘন ঘন চায় উলটি ঘাড়
ডাক বলে এ নারী ঘর উজাড়॥

কিম্বা—

কাকে কলসী পানীকে যায়
হেটমুণ্ডে কাহাকো না চায়।
যেন যায় তেন আসে
বলে ডাক গৃহিণী সেই সে॥

"পাতে লেখা" এবং "পানী" শব্দ প্রয়োগে মনে হয়, ডাক যেন মাণিকপীরের মত এক জন পীর (মুসলমান সাধক) ছিলেন। অনেকে অবশ্য তাহা স্বীকার করেন না।

খনার বচন অধিকাংশ এখন পঞ্জিকাতে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা হয়। বিশদভাবে এখানে উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। নীচে কয়েকটি সাধারণ অভিজ্ঞতা (wit এবং proverb) দেওয়া হইল। আধুনিক সময়ে তাহার প্রয়োগ সকলেই মনে করিবেন।

(১) খাটে খাটায় লাভের গাঁতি
তার অর্দ্ধেক মাথায় ছাতি।
ঘরে ব'সে পুছে বাত
তার ভাগ্যে হাভাত, হাভাত।

(২) কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা
মন্দ মন্দ দিচ্ছে বা'।
কৃষককে বল বাঁধতে আল
আজ না হয় হবে কাল॥

(৩) নারিকেল অম্বর গজেন্দ্র ছাই
কলা রুয়ে খেয়ো ভাই।
ফাল্গুনে এঁটে পোত কেটে
বেঁধে বাবে কড়কী ঝাড়
কলা বইতে ভাঙবে ঘাড়॥
সাত হাত তিন বিঘতে
কলা রুইবে মায়ে পুতে।
কলা লাগিয়ে না কাটে পাত
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।

মাণিকপীরের গান এখন বঙ্গদেশে সব স্থানে বিশেষ প্রচলিত নাই। যদিও কিছু থাকে, তাহা গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকদের বাৎসরিক বারওয়ারি উৎসব প্রভৃতিতে (পশ্চিমবঙ্গের জারী গান) কখনও কখনও শুনিতে পাওয়া যায়। বঙ্গেশ্বর দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় তাহার একটি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। ইহা হাস্যরসাত্মক country Ballads বলিয়া প্রসিদ্ধ :—

"মাণিকপীর— ভবপারে যাবার না
জয়নাল ফকির ছেলে, ফৌজ পাইলে না।
মাণিকপীর–

আল্লা আল্লা বল রে ভাই নবি কর সার
মাজা দুলিয়ে চ'লে যাবা ভবনদী পার।
মাণিকপীর

শুন রে ভাই বিবরণ সংসারে আছে জীবন
কখন্ সে পালাইবে বলিতে নাহি পারি।
কোরাণেতে বলেছে আছে দুনিয়াটা ক্যাবল মিছে
খোদার নাম বিনা জানবে সকলি ফকুমারি॥
বিহানে বিকালে দুপহরে ভক্ত ছাবাল সাথে করে
নমাজ পড়লে মনটা রবে স্থির।
মানী লোকের রাখবা মান গরীব লোককে করবা দান
দরগায় গিয়া ফয়তা দিবে ক্ষীর॥
আপন গণ্ডা বুঝে নেবা পরের গণ্ডা পরকে দিবা
মড়গোলা কোজিয়ে করে কাহাকো হব রাগী।
পীর পয়গম্বর মাথায় ধরা, অন্ধকারে দেখে তারা
হুসিয়ারছে কাম করনা ছোড়কে সয়তানী॥
বড় বাহসে না দেনা দেশ, সত্য হে বানারা একেলা
ভক্তিভাবে পূজা কর যে বাপ-মার চরণ।
গোনা বরাবর নাইক বিষ ভণে দ্বিজ গোলাম নাবিস্
এই তো ধরম শাস্ত্রের লেখন॥

মাণিকপীর—

সুবুদ্ধি গোয়ালায় মেয়ে কুবুদ্ধি ধরিল
মেসালির মধ্যে দুগ্ধ রেখে পীরকে ফাঁকি দিল।
মাণিকপীর –

কত কীর্ত্তি আছে রে ভাই কওয়া নাইক যায়
দেখ বাদির সনে দোলা বিবি ভুলি চেপে যায়।
মাণিকপীর—

ওরে কছু কুমড়া রাধলে ফেলে তুস্ছু নেরেল খাল
আজগুবি দুনিয়ার খেলা সরিষার মধ্যে ত্যাল
মাণিকপীর—

মুসলমানের মোল্লারে ভাই হাড়ের মধ্যে সাধু
কছু কুমড়া ছেড়ে দিয়ে আকির মধ্যে মধু।
মাণিকপীর।

আসমানেতে ম্যাঘের খেলা করে সিংহনাদ
আর দিনের বেলায় সুর্য্যি ওঠে রাত্তির বেলায় চাঁদ।
পাহাড়ের প্রকাণ্ড হাতী শিকলি বাঁধা পায়
আর ঘরজামায়ে শশুরবাড়ী মেগের লাথি খায়।
কত কেরামত জান রে বান্দা কত কেরামৎ জান
মাঝ দরিয়ায় ফেলে জাল, ডাঙ্গায় বসে টান।
দুর্গার ছাওয়াল কার্ত্তিক রে ভাই মোরগ চেপে যায়
আর পূজো পালি বাঁজা বিবির ছাওয়াল করে দেয়।

• • • •

ষাঁড়ের মাথায় শিং দিয়েছে মানুষির মাথায় কেশ
আল্লা আল্লা বল রে ভাই পালা করলাম শেষ।

প্রাচীন সাহিত্যে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিখ্যাত পুস্তকাবলীর মধ্যে হাস্যরস-বিশিষ্ট বাক্যলহরী উদ্ধার করিতে যাওয়া একটা "হাস্যকর" ব্যাপার। হয় ত প্রবাদ প্রমোদ প্রবচন কিছু আছে, তাহা আলাদা ও পৃথক্ ভাবে উদ্ধৃত করিতে গেলে রসলোপ হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, মনসার ভাসান, বিভিন্ন পাঁচালী ও ব্রতকথা প্রভৃতি অসংখ্য খণ্ডকাব্য দৃষ্ট হয়। পুরাণোক্ত গল্প ও কাহিনীর মত তাহা লোকশিক্ষা ও ধর্ম্মজ্ঞান, উপদেশ দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। মনোরঞ্জন করার জন্য যেটুকু হাস্যরসের আশ্রয় লওয়া প্রয়োজন তাহাতে তাহাই ছিল। বৌদ্ধযুগ ও ধর্ম্মকলহের সময় যে হাস্যরসসৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার পর হইতে বঙ্গভাষা ক্রমশঃ সমৃদ্ধিশালিনী হইয়া ওঠে এবং মুসলমান রাজত্বকালে গৌড়ীয় যুগে যে বঙ্গভাষার প্রথম "সাহিত্য" রচনা আরম্ভ হয়, তাহা বোধ হয় এখন সর্ব্ববাদি-সম্মত। রাজ-আশ্রয় ও রাজ-অনুগ্রহ ভিন্ন সাহিত্য শিল্পকলা প্রভৃতির উন্নতি-বিধান হয় না। মুসলমান রাজত্বের সময় দেশে বিভিন্ন বিষয়ে কত রকম উন্নতি হইয়াছিল, তাহা এখন ইতিহাসের কথা। এই যুগের সাহিত্য উল্লেখ করায় পূর্ব্বে বিদেশী সাহিত্য আলোচনা করা যাউক।

ইংরাজী সাহিত্যে কবি চসারকে (Chaucer) আদি জন্মদাতা বলিয়া ধরা হয়। যদিও তাঁহাকে মধ্যযুগের (১৪শ শতাব্দীর) লোক বলিয়া ধরা হয়, তবু তাঁহার পদ্যের (তদানীন্তন কালের Archaic শব্দ বাদ দিলে) মধ্যে আধুনিক পদ্যের ভাব ও ছন্দোবদ্ধ বাক্য-সমষ্টিপূর্ণ উচ্ছ্বাস উপভোগ করা যায়। তাঁহার পদ্যে Ovid, Virgil, Dante, Boccaccio প্রভৃতি লেখকগণের কল্পনার ছায়া আছে, তাহা অনেকে বলিয়া থাকেন। তাঁহার পদ্যে কথা ব্যবহারের যেটুকু স্বাধীন ভাব দেখা যায়, তাহা হয় ত আধুনিক পাঠকগণ বিশেষ প্রীতিকর মনে করেন না। তাঁহার Cock and fox এবং Nun's Priest's Tale এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য মনে হয়। তাঁহাতে গম্ভীরভাবে পশুপক্ষীদের মুখে প্রচলিত ভাষা ও রহস্যালাপ মনোজ্ঞভাবে আরোপ করা হইয়াছে এবং তাহা পুরাকালের (Humour) একটি প্রধান দৃষ্টান্ত বলা যায়। তাঁহার

"Womenne's counsels be full often cold
Womenn's counsels brought us first to woe
And made Adam from Paradise to go."

এখনও অনেক প্রকার গল্পে ও কবিতাতে প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। কবি চসারের অনুকরণ করিয়া তখন অনেক কবি যশঃপ্রার্থী হইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে John Skelton-এর নাম এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। নিজের পদ্য সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন—

Though my rhyme be ragged
Tattered and gagged
Rudely rain beaten
Rusty and moth eaten
If ye take well there with
It hath in it some pith.

তাহা বোধ হয় এখনও প্রত্যেক কবি ও লেখক মনে মনে অনুভব করেন। উপরি-উক্ত দুই প্রসিদ্ধ কবির কবিতা ও গল্প প্রচলিত হওয়ার পর বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকমের হাসিঠাট্টা রহস্যালাপ বেশী আরম্ভ হয়। Skelton রাজসভার কবি ছিলেন। তিনি ক্রমশঃ বয়স্য অথবা ভাঁড়ের পদ গ্রহণ করেন (Court jester)। তিনি মারা যাওয়ার পর Merry tales of Skelton নামে একখানি পুস্তক ছাপান হয়। (বলা বাহুল্য, এই সময় মুদ্রা-যন্ত্রের প্রথম প্রচলন হয়) তাহা অনুকরণ করিয়া আরও অনেক প্রকার ভাঁড়ের গল্প (Jest books) লিখিত ও প্রকাশিত হয়। এই সব পুস্তকের লিখিত ছোট গল্প বিভিন্ন আকৃতিতে এখনও অনেক স্থানে প্রচলিত আছে। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উদ্ধৃত করা হইল।

রাজার কাছে একচেটিয়া ব্যবসা (monopoly) করার হুকুম পাওয়ার জন্য জনৈক ওয়েলস্‌বাসী রাজার কবি ও বয়স্য Skelton-এর নিকট উপস্থিত হয় ও তাঁহাকে একখানি দরখাস্ত লিখিয়া দিতে বলে। কবি বয়স্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি লিখিতে হবে বল।" ওয়েলসবাসী বলিল, "সব রকম পানীয় মদ"; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পর," সে বলিল, "আরও বেশী মদ।" Skelton পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পর? আরও কিছু?" সে বলিল, "লিখে দেন; কিছু রুটীর টুকরা ও আরও কিছু মদ।" লেখা শেষ হইলে Skelton পড়িলেন, "সব রকম পানীয় মদ, আরও বেশী মদ, কিছু রুটীর টুকরা ও আরও কিছু মদ।" ওয়েলস-বাসী বলিল, "এইবার ঠিক হয়েছে, রাজার সহি করিয়া আনুন।" Skelton গম্ভীরভাবে বলিলেন, "দেখ, মদের ব্যবসাটা তোমার থাক, রুটীর ব্যবসাটা আমাকে দেও, রাজার সহি হ'লে তুমি মদের ব্যবসা করিও, আমি রুটীর ব্যবসা করিব— তাহাতে দুজনার ব্যবসায় চলিবে।" ওয়েলসবাসী অবাক্ হইয়া তাকাইয়া রহিল ও শেষে বলিল, "আচ্ছা, তাই হবে, তবে তোমার কাছে কি কেহ রুটী কিনিবে?"

উপরি-উক্ত গল্পটি অন্যভাবে এখন বলা হয়, যেমন, যুদ্ধে কোন এক অসমসাহসিক কার্য করার জন্য একটি সৈনিককে রাজা বলিলেন, "তুমি যাহা প্রার্থনা কর, তাহাই দিব। কিন্তু তিনবারের বেশী চাহিতে পারিবে না।" সৈনিক বলিল, "আমি একটু তামাক চাই (some tobacco)।" রাজা বলিলেন, তথাস্তু (granted)। সৈনিক কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "খুব বেশী ক'রে অনেকখানি তামাক চাই (a great deal of tobacoo)"। রাজা বলিলেন, "তথাস্তু (granted)" সৈনিক এবার মহা দুর্ভাবনায় পড়িল। তৃতীয়বার সে কি চাইতে পারে, তাহার আকাঙ্ক্ষা ত তামাকের বেশী নয়। মনে মনে অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর সে বলিল, "আর একটু তামাক, a little more tobacco," রাজা হাসিয়া উঠিলেন ও বলিলেন—"তথাস্তু"।

(হঠাৎ যদি কোন দেবতা ৩টি বর দিতে আবির্ভূত হন, তবে পাঠকদের মধ্যে কে কি বর প্রার্থনা করিবেন, মনে মনে আলোচনা করিলে দেখিবেন, অনেকেরই এই সৈনিক অথবা ওয়েলম্যানের মত অবস্থা হইবে। যমরাজের কাছে সাবিত্রী যে "বর" চাহিয়াছিলেন, তাহা নারীর পরিমার্জ্জিত শিক্ষা ও উন্নত সভ্যতা এবং মহান্ আদর্শের দৃষ্টান্ত। হাস্যরসের সামগ্রী নহে।)

Skeltonএর আর একটি গল্প এইরূপ—

রাজবাড়ীতে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত ভূরিভোজন করিয়া এক দিন Skelton গভীর রাত্রিতে নিজের সাময়িক আবাসে ফিরিয়া আসেন। অল্প তন্দ্রার পর তাঁহার অত্যন্ত পিপাসা পায়। সমস্ত ঘর খুঁজিয়া এক বিন্দু জল পান না। গৃহস্বামী ও তাঁহার স্ত্রীকে ডাক দেন। ঘুম ভাঙ্গিলেও তাঁহারা শয্যা ত্যাগ করেন না। চাকরদের ঘরে যাইয়া ডাকাডাকি করেন। তাহারাও উঠিতে চায় না। তিনি হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসেন। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি জলের জন্য অস্থির হইয়া উঠেন। অনন্যোপায় হইয়া তিনি চীৎকার করেন, "আগুন, আগুন, আগুন।" বস্তীশুদ্ধ লোক ধড়ফড় করিয়া বিছানা ত্যাগ করিয়া দৌড়াইয়া আসে ও জিজ্ঞাসা করে, "কোথায় আগুন?" Skelton শেষে সকলকে তাঁহার মুখ অঙ্গুলী দিয়া দেখান। তখন জল আসে ও তাহা খাইয়া তিনি নিশ্চিন্ত হন।

উপরি-উক্ত গল্পটি এখন একটু অন্যভাবে প্রচলিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় তাহার অনুকরণ এবং adaptation হইয়াছে বলা যায়। যথা (আধুনিক হাস্যরসের নমুনা।)

সদ্য: বিবাহিত বর ফুলশয্যার রাত্রিতে অনেক চেষ্টা করিয়াও নববধূর লজ্জা দূর করিতে ও ঘোমটা উন্মোচন করিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ হতাশভাবে শুইয়া থাকিয়া বর হঠাৎ চীৎকার করিলেন, "আগুন, আগুন, আগুন।" কপটনিদ্রাতুরা লজ্জাবনতা বধূ তাহা শুনিয়া ধড়ফড় করিয়া উঠিল ও ত্রস্তবসনা ও বিস্্রস্ত-কেশা হইয়া বসিল ও জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায়? কোথায়? আগুন?" বর গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিল, "এই যে আমার বুকে।" বধূ হাসিয়া বুকে লুটাইয়া পড়িল ও আগুন নিভাইল (Break the Ice)।

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তখন ইংরাজী সাহিত্যে সব রকম গল্পের পুস্তকে কয়েকটি সাধারণ গল্প বেশী প্রচলিত ছিল। এখনও তাহার প্রতিধ্বনি কিছু কিছু বিভিন্ন সমাজে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে কয়েকটি দেওয়া হইল।

নদীতে স্নান করিতে ও জল আনিতে যাওয়ার পর এক জন স্ত্রীলোককে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাহার স্বামীর কাছে সংবাদ দেওয়া হয়। সে আসিয়া নদীর স্রোতের বিপরীত দিকে উজানে স্ত্রীর সন্ধান করিতে থাকে। সকলে জিজ্ঞাসা করে—"ভাঁটার দিকে স্রোতের মুখে খোঁজ না ক'রে উল্টাদিকে খোঁজ কর কেন?" সে গম্ভীরভাবে উত্তর দেয়, "জীবনে সে কোন কাযই সোজাভাবে করে নাই। কথাবার্ত্তা, চালচলন, হাবভাব সবই উল্টা—মরিলেও সে যে উল্টা যাবে, তাহাতে আর বিচিত্র অবিশ্বাস্য কি আছে?" গৃহে ফিরিয়া স্ত্রীকে সশরীর দেখিলে, তাহাদের স্বামি-স্ত্রীর প্রেমালাপ কেমন হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে।

(আধুনিক সময়ে কবি রজনীকান্তের "বুড়া বুড়ীর" কাহিনী উপরি-উক্ত স্বামি-স্ত্রীর প্রেমালাপের একটি মনোজ্ঞ বিবরণ বলা যাইতে পারে)

একটি স্ত্রীলোকের পর পর ৪টি স্বামী মারা যায়। ৪র্থ স্বামী মারা যাওয়ার পর সে কবরের নিকটে আসিয়া অত্যধিক কান্নাকাটি করিতে থাকে। সকলেই সমবেদনা জানাইতে আসে এবং তাহার মধ্যে এক জন বলে, "এত কেঁদ না—তাহাতে তোমার শরীর নষ্ট হবে ও বুকের অসুখ হবে।" তাহা শুনিয়া সদ্য: বিধবা উত্তর করে, "আমি কাঁদাবো না, বল কি? আগে আগে যখন স্বামী মরেছিল, তখন মনে সান্ত্বনা ছিল যে, আর একটি স্বামী পাব। এখন কি আমায় আর কেহ বিবাহ করিবে না আমার বয়স আছে?" সকলে তাহা শুনিয়া বলিল, "হাঁ, তা ত বটেই, ঠিক কথা।"

কোন একটি গ্রাম্য অশিক্ষিত লোক তাহার ছেলেকে কলেজে উচ্চ শিক্ষা করিতে পাঠাইয়াছিল। পুত্র গৃহে ফিরিয়া আসিয়া সকলের সঙ্গেই তর্ক করিত ও বুঝাইতে চেষ্টা করিত, সে কত বড় বিদ্বান্। এক দিন ঘরের সম্মুখে ২টি মুরগী দেখিয়া সে তাহার বাপ-মাকে বলিল, "আমি প্রমাণ করিব, ৩টা মুর্গী আছে"—তাহার পিতা বলিল, "সে কি রকম?" পুত্র বলিল, "এই ধরুন, প্রথম ১টা মুর্গী, তারপর দ্বিতীয় ২টা মুর্গী—তারপর ২ আর ১এ যোগ করিলে ৩ হ'লো না?" মা ছেলের বিদ্যা শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন, পিতা বলিলেন, "আচ্ছা বাবা, প্রথম মুর্গীটা আমি খাব, ২য় মুর্গীটা তোমার মা খাবে আর তৃতীয় মুর্গীটা তুমিই খেয়ো।" বলা বাহুল্য, বিদ্যা জাহির করিতে যাইয়া বিদ্বান্ ছেলের আর সে রাত্রিতে খাওয়া হইল না—তর্কের স্পৃহা কিছু কমিল।

Taylor নামক কবির John Garret's ghost নামে কতকগুলি হাস্য-রসাত্মক গল্প প্রকাশিত হয়, তাহাকেও উপরিউক্ত ও অন্যান্য গল্পের পুনরাবৃত্তি বলা যায়। তিনি পুস্তকের ভূমিকাতে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ ছিল—

"আমার আত্মীয়-বন্ধুদের মুখে ও কিম্বদন্তী শুনিয়া এই সব গল্প সংগ্রহ করিয়াছি। হয় ত অনেকগুলি গল্প ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, আমি তাহা জানি না।"

Taylor তাঁহার পুস্তকের ভূমিকাতে বলিয়াছিলেন যে, তিনি হাস্যরস-সম্বলিত গল্পগুলি মদের দোকান, সরাইখানা, কাফিখানা, খেলার মাঠ, জল লওয়ার স্থান, রাস্তায় ও গাড়ীতে যাতায়াত করিতে এবং বিভিন্ন নিমন্ত্রণের আসর ও মজলিশ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। Campden এবং Bacon এরূপ ছোট ছোট গল্প প্রকাশিত

করিয়াছিলেন। তাহার অধিকাংশই শুধু ছোট "চুটকী" গল্প এবং বাক্যপ্রয়োগের ও অর্থের বিলাস। উদাহরণস্বরূপ একটি গল্প উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এক জন ধনী উত্তমর্ণ এক পায়ে ব্যথা অনুভব করেন এবং অনেক অনিচ্ছাসত্ত্বে ডাক্তার ডাকিতে বাধ্য হন। ডাক্তার মহাশয় পরীক্ষা করিয়া আশ্বাস দিয়া বলেন, "রোগ বিশেষ কিছুই নাই, শুধু বার্দ্ধক্যের জন্ম একটু পেশীর দুর্ব্বলতা হয়েছে।" তাহা শুনিয়া রোগী উত্তর করিলেন, "তা' যেন হ'লো বুঝলাম। কিন্তু অন্ত পায়ের বয়স ত সমানই, তবে সেটা ভাল আছে কেন?" ডাক্তার কি উত্তর দিবেন, খুঁজিয়া পাইলেন না।

অন্ত একটি গল্প এইরূপ ছিল—

বিলাতে অনেক স্থানে শূকরকে বধ করা একটা আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির উৎসব ছিল। এক জন একটি শূকরের গলায় ছুরী বসাইতেছে, তাহা দেখিয়া তাহার ছোট মেয়ে কাঁদিয়া উঠে ও বলে, "বাবা কি নিষ্ঠুর! শূকরের যে কষ্ট হচ্ছে, তা তার মনেও লাগে না" —মেয়েটির পিতা বলিয়া উঠিল, "শূকরদের ছুরীর আঘাত পাওয়া অভ্যাস আছে, রোজই এমন ক'রে আসছি, তাতে কষ্ট না হয়।"

(আধুনিক সময়ে উপরি-উক্ত উপমা ডাক্তার ও পুলিশ কর্ম্মচারী-দের সম্বন্ধে অনেকে ব্যবহার করিয়া থাকেন, শুনিতে পাওয়া যায়।)

সাহিত্যে হাস্যরসের কথা সময় অনুসারে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা কঠিন। অনেকে বলিয়া থাকেন, খৃষ্টাব্দ ১৬শ শতাব্দী হইতে প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যে হাস্যরসের মূর্ত্তিময় কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। মুদ্রাযন্ত্র প্রচলন হওয়াতে তখন পুস্তকাদি প্রকাশ করা আরম্ভ হয় এবং "লোক-রহস্য" হিসাবে হাস্যরস বেশী প্রচলিত হইতে আরম্ভ করে। বঙ্গে যেমন গৌড়ীয় যুগ হইতে আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকাশ ও বিকাশ আরম্ভ বলি অথবা বিবেচনা করি, যুরোপে সেরূপ ১৬শ শতাব্দী হইতে সাহিত্যের প্রচলন বেশী আরম্ভ হয়। এ সম্বন্ধে দুইটি প্রদেশে কিছু প্রভেদ দেখা যায়।

ভারতবর্ষে ১৬শ শতাব্দী পূর্ব্বে যে সাহিত্য ছিল (পূর্ব্বে যে সব বচন, প্রবাদ ও গান ও গাথার কথা বলা হইয়াছে), তাহা অধিকাংশ সামাজিক ও মানবধর্ম্মের সরল উপদেশাত্মক বাক্যবিলাসে সীমাবদ্ধ ছিল। সব রকম দেশে ও সব সময়ের সাহিত্যে, অনুকরণ এবং adaptation বেশী হয়, ইহা ঠিক চুরি করা অথবা Plagiarism বলা যায় না। মূল ও আদিম রামায়ণ ও মহাভারত হইতে কালিদাসের রঘুবংশ অথবা কৃত্তিবাসের রামায়ণ কিম্বা কাশীদাসের মহাভারত এরূপ অনুকরণ এবং adaptation এর প্রধান দৃষ্টান্ত বলা যায়। তবু তাহারা রামায়ণ ও মহাভারত হইতে কত মনোরম ও পৃথক্ জিনিষ, তাহাকে আমরা অনুকরণ বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নহি। কবি কালিদাস অবশ্য ১৬শ শতাব্দীর বহু পূর্ব্বেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ যেন চির-নূতন এবং সব সময়ে তাহার রসমাধুর্য্য সমান উপভোগ্য। ১৬শ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে কৃত্তিবাস, কাশীরাম প্রভৃতি লৌকিক সাহিত্য-সৃষ্টি-কর্ত্তারা বঙ্গে প্রথম সাহিত্য প্রচার করেন এবং তাহা বহুদিন পর্য্যন্ত প্রত্যেক গৃহে, দোকানে, মজলিশে, বারয়ারীতে ও বিভিন্ন উৎসবে এখনও সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। হাস্যরসের উদাহরণস্বরূপ রামায়ণ হইতে একটি খণ্ড অধ্যায় উদ্ধৃত করিতেছি।

"অঙ্গদ রায়বার"

অঙ্গদকে দেখে রাবণ ছলে মায়া পাতে।
শত শত রাবণ হয়ে বসিল সভাতে।
যে দিকে অঙ্গদ চাহে সে দিকে রাবণ।
দশ মুণ্ড কুড়ি বাহু বিংশতি লোচন।
সবাই রাবণ ভেদ নাই একজনে।
অঙ্গদ বলে কথা কব কোন্ রাবণের সনে।
সবে মাত্র ইন্দ্রজিৎ ছিল আপন সাজে।
পুত্র হয়ে পিতার মূর্ত্তি ধরিবে কোন্ লাজে।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করে রাবণের বেটা।
কপালে দেখিল তার যজ্ঞশেষ ফোঁটা।

* * * *

অঙ্গদ বলে সত্য করে কও রে ইন্দ্রজিতা।
এ সবাকার মধ্যে কেবা হয় রে তোর পিতা।
কোন্ রাবণ গেছিল দিগ্বিজয়ে কোথাকে।
কোন্ রাবণ গেছিল কোথা পরিচয় দে মোকে।
চেড়ীর উচ্ছিষ্ট খেল কোন্ রাবণ পাতালে।
কোন্ রাবণ বান্ধা ছিল অর্জ্জুনের অশ্বশালে।
কোন্ রাবণ যম জিনিতে গেছিল দক্ষিণ।
কোন্ রাবণ মান্ধাতার বাণে দন্তে করিল তৃণ।
কোন্ রাবণ সুরাপানে সদা থাকে মত্ত।
কোন্ রাবণের ভগিনী হ'রেছিল মধু দৈত্য।
একে একে কয়ে দিলাম সব রাবণের কথা।
এ সবাতে কাজ নাইক, যোগী রাবণটি কোথা।

* * * *

সহিতে না পারে রাবণ অঙ্গদের কথা
লজ্জা পেয়ে রাবণ হেঁট করিল মাথা।
দুঃখিত হইয়া রাবণ মায়া করিল ভঙ্গ
দুই জনে বেধে গেল বাক্যের তরঙ্গ।

* * * *

অঙ্গদ বলে, তোর্ ভয়েতে থরথরাতে কাঁপি
এখন এমন ধর্ম্মকথা, মরবে বেটা পাপী।

* * * *

পড়ে কিনা পড়ে মনে হৈল অনেক দিন
হাত বুলিয়ে দেখ গলে আছে লেজের চিন্।

* * * *

সর্ব্বশাস্ত্র পড়ে বেটা হলি হস্তীমূর্খ।
বল্লে কথা বুঝিস্ না'ক এই বড় দুঃখ।

* * * *

আপ্ত ছিদ্র না জানিস্ পরকে দিস্ খোঁটা
বারে বারে কথা কহিস্ মর রে অধম পাঠা।

অথবা অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি যথা—

শমন-দমন রাবণ রাজা রাবণ দমন রাম।
শমনভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম।

মহাভারত ও অন্যান্য গ্রন্থ হইতে এরূপ অনেক অংশ উদ্ধৃত করা যায়। একটি বিষয় সহজেই সকলের লক্ষ্য করার জিনিষ দেখা

যাইবে। ভারতবর্ষে যখন ধর্ম্মপ্রাণ লোকেরা ধর্ম্মের কাহিনী ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া সাহিত্য প্রকাশ ও সৃষ্টি করিতেছিলেন, লোক-শিক্ষা সামাজিক রীতি-নীতি ও উচ্চ ধর্ম্মভাব লইয়া বিশেষ মুক্ত ছিলেন—সে সময় য়ুরোপে ছোট ছোট গল্প ও চুট্‌কী সাহিত্যের প্রচলন বেশী হইতেছিল। সামাজিক ও জাতীয় জীবন ভারতবর্ষে ও য়ুরোপে বিভিন্ন ছিল। মাদকদ্রব্যাদি ব্যবহার করার ফলাফল য়ুরোপে সাধারণ সমাজ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিল —কিন্তু ভারতবর্ষে উচ্চ ধনী, বাদশাহদের সমাজেই যেন তাহা সীমাবদ্ধ ছিল। উপরে পরস্পর যে দুই প্রকার হাস্যরসের উচ্ছ্বাস দুই প্রদেশ লক্ষ্য করিয়া উদাহরণ দিয়াছি, তাহাতে মাদক দ্রব্যের প্রভাব কিছু বুঝিতে পারা যাইবে। কৃত্তিবাসের শ্লেষ ব্যঙ্গপূর্ণ কথোপকথন কতটা সরল নির্ম্মল পরিমার্জ্জিত ও বেন ইতরামিবর্জ্জিত, কিন্তু Skelton, Taylor প্রভৃতি প্রকাশিত গল্প যেন সে অনুপাতে একটু "খাদ মিশান" (Dross, Vulgar) মনে হয়, এ সম্বন্ধে মতদ্বৈত থাকা বিশেষ অস্বাভাবিক নহে। সাহিত্যে তদানীন্তন সমাজের ও সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিবিম্ব যে লাগিয়া থাকে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

১৬শ শতাব্দী হইতে সাহিত্যে অনেক জিনিষ প্রবেশ করে এবং অনেক দিকে তাহার প্রতিভা ও বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সে সময়ে প্রকাশিত Thomas Moore প্রণীত Utopia এবং Nichalas Uda'এর প্রণীত, Ralph Royster Doyster প্রচলিত সমাজের ব্যঙ্গপূর্ণ Satire আজ পর্য্যন্ত আদর পাইতেছে। Ibsenএর Doll's houseও উল্লেখযোগ্য। Columbus এর আমেরিকা আবিষ্কারের অভিযান সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে, Robinson Crusoe ও Gulliver's Travels পুস্তকে তাহার একটি মনোরম Satire প্রকাশিত হয় এবং তাহা হইতে আবার অর্থনীতি শাস্ত্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিকল্পনাও উদ্ভব হয়। এইরূপে দেখা যাইবে, বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন সমাজে তখন স্বাধীন-ভাবে হাস্যরসের প্রভাব বিস্তার করে। ইংলণ্ডে Shakespeare, ফরাসী দেশে, Rabelais স্পেনে Cervantes সমসাময়িক কালে ৩টি বিভিন্ন রাজ্যে প্রধান রস সৃষ্টিকর্ত্তা আবির্ভূত হন। ফরাসী দেশের Moliereএর নামও এই প্রসঙ্গে কম প্রণিধান-যোগ্য নয়। ঐতিহাসিক কাল হিসাবে ধরিতে গেলে সাহিত্যের ধারা এ সময় অনুমান করা কিছু কঠিন হয়। ভারতবর্ষের কথা উল্লেখ করার পূর্ব্বে সেজন্য বিদেশী সাহিত্যের ক্রমবিকাশ আলোচনা করিতেছি। প্রথমেই ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবি Shakespeareএর কথা মনে পড়িবে। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন, হাস্যরস সম্বন্ধে বোধ হয় Moliere তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তবে Shakespeareএর পদ্য এত উঁচু দরের যে, তাঁহার পদ্যে ও নাটকে হাস্যরসকে যেন দ্বিতীয় স্থান দেওয়া যায়। কিন্তু Moliereএর পদ্য ও নাটক, হাস্যরসের প্রথম ও প্রধান স্থান বলা যায়। Shakespeareএর বিয়োগান্ত নাটক (Tragedies) অপেক্ষা মিলনান্ত নাটক (comedies) অনেকের মতে শ্রেষ্ঠ। প্রকৃতপক্ষে Shakespeare এত বড় কবি যে, তাঁহাকে হাস্যরসস্রষ্টা বলিতে অনেকেই কুণ্ঠিত হইবেন। বোধ হয়, Falstaffএর চরিত্রই তাঁহার হাস্যরসের প্রধান বিকাশ। Falstaff যেন তাহার বিশাল শরীর লইয়া হাস্যরসে হাবুডুবু খাইতেছে। তাহার ঠাট্টা-বিদ্রূপে কোনরূপ কুৎসিত মনোবৃত্তির আঘাত নাই। সে নিজেই যেন একটা মূর্ত্তিমান্ হাসি যে, তাহার মধ্যে অসম্ভব ও মনোরম জিনিষ আমরা যেন লক্ষ্য করি না। (সম্প্রতি আমেরিকাতে হাস্যরসচর্চ্চার জন্য Falstaff club নামে একটি বড় সমিতি গঠিত হইয়াছে) Shakespeareএর গ্রন্থাবলীতে বিভিন্ন স্থানে এত রকম হাস্যরসের উচ্ছ্বাস দেখা যায় যে, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখান যেন দুরূহ ব্যাপার মনে হয়। কবি যেন সামান্য নিকৃষ্ট দ্রব্যকেও কোমল হাতের স্পর্শে ধরিয়াছেন যেন একটি ক্ষুদ্র মশা ও মাছির গায়েও আঘাত না লাগে, অথচ তাহার মধ্যেই নিজের কত কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার কাব্যে যে মানবতা (humanity) ও বিশ্বজোড়া ভাব (universality) আছে, তাহাতে "one touch of Nature makes the whole world kin" এই প্রবাদবাক্য আমরা বেশী দেখিতে পাই। তাঁহার হাস্যরসের বিশেষত্ব এই যে, শুধু যে পাঠক তাহাতে হাসেন, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে মনে একটা ভাবনা-চিন্তার বিষয়ও পাইয়া থাকেন। "Hath not a jew eyes" অবস্থাবিশেষে প্রশ্নটি শুনিয়া হয় ত আমরা হাসি—কিন্তু সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইহা যে কত বড় একটা মারাত্মক প্রশ্ন, তাহার মীমাংসা আমরা খুঁজিয়া পাই না। হাস্যরসের মধ্যে যেটুকু বাহ্য অসামঞ্জস্য (absurdity) এবং বিদ্রূপ ঘৃণাব্যঞ্জক (Ridiculous এবং contemptible) জিনিষ থাকে, Shakespeareএর কাব্যে যেন তাহা নাই, বরং তাহাতে মনোরম আনন্দপূর্ণ যে সব কথাসমষ্টি আছে, তাহা যেন সরল মানবপ্রীতি এবং মহানুভবতার বহিঃ-প্রকাশ। Shakespeareএর এই বিশেষত্ব কবি কালিদাসের কাব্যেও প্রকাশিত দেখা যায় এবং বোধ হয়, অন্যান্য রসস্রষ্টা কবি ও লেখক অপেক্ষা এই দুই মহাকবির উপরি-উক্ত উৎকৃষ্ট গরিমা চিরকাল যেন অক্ষুণ্ণ থাকিবেই। অনুবাদ করিতে গেলে আভ্যন্তরীণ রসমাধুর্য্য ও ভাষার কমনীয়তা সব সময় রক্ষা করা যায় না। (সেজন্য নীচে কয়েকটি বিষয় অনুবাদ করিয়া দেখাইতে গিয়া নিজের যে অক্ষমতা বুঝিতেছি, তজ্জন্য পাঠকগণের নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। রসজ্ঞ ও রসলিপ্সু পাঠক মূলগ্রন্থ পড়িবেন, তাহাই আশা করি)

ফলষ্টাফ এবং রাজপুত্র হেনরীর কথোপকথন

ফলষ্টাফ—বৎস, শুন, এখন সময় কত বলতে পার ?

রাজপুত্র হেন্‌রী—ব'সে ব'সে মদ খেয়ে, খাওয়ার পর অনবরত কাপড় শিথিল ক'রে ও বেঞ্চের ওপর প'ড়ে প'ড়ে শুধু ঘুমিয়ে, তোমার বুদ্ধি এত মোটা হয়েছে যে, যে জিনিষটা প্রকৃত তোমার জানা উচিত ছিল, সেই কথাটাই ভাল ক'রে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছ। বলতে পার, তোমার মত লোকের সময় দিয়ে কি দরকার ? যদি সময়ের ঘণ্টাগুলি মদে ভরা পেয়ালা হ'তো, মিনিটগুলি মোরগ হ'তো এবং সূর্য্য যদি আগুনের বস্ত্র-পরিহিতা কোপনস্বভাবা পরনারী হতেন, তবুও মনে হয় না, এখন সময় কত জিজ্ঞাসা করার তোমার কোন কারণ আছে ?

ফলষ্টাফ—হাঁ, অনেকটা ধরেছ বটে, আমরা যা'রা টাকা-পয়সা রোজগার করি, আমাদের কারবার চন্দ্র ও সাতটি তারার সঙ্গে। সূর্য্যের সঙ্গে বড় একটা সম্বন্ধ আমাদের কম। তবে কি না বৎস, তুমি যখন রাজা হবে, ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন (এখন

থেকেই ধর্ম্মাবতার বলা উচিত—যদিও মঙ্গল তোমার কি হবে জানি না)

হেনরী—কি ? আমার মঙ্গলও হবে না ?

ফলষ্টাফ—আমি কি তাই বলছি—তবু এতটা হবে না—যাহাতে একটু ডিম ও মাখনও ভাগ্যে জুটিবে কি না সন্দেহ।

হেনরী—তবে কি বলছো ? সোজা কথাই বল না।

ফলষ্টাফ—তবে বলি শুন,—যখন তুমি রাজা হবে, আমরা যারা চন্দ্রের দেহরক্ষী ও পূজারী, তাদের যেন অপবাদ হয় না যে, দিনের সৌন্দর্য্য চুরি করেছি। আমরা যেন চন্দ্রের সেবক, বনদেবীর অধ্যক্ষ ও অন্ধকারের লোক হয়েই থাকি। লোকরা যেন বলে, আমরা সুখের রাজত্বে বাস করি - ধর যেমন সমুদ্র চন্দ্রের অধীনে থাকে, সেই চন্দ্রের শুভ্র আলোক আমরা যেন পবিত্র মনে করি, চুরি ক'রে উপভোগ করি।

হেনরী—হাঁ, কথাটা বলেছ মন্দ নয়। আমাদের অদৃষ্ট চন্দ্রের মতই বাড়ে ও কমে, তাহার আধিপত্যে যে জোয়ার-ভাটা হয়, আমাদের ভাগ্যেও তাই। এই ধর না, সোমবারে হয় ত টাকার তোড়া জোর ক'রে পেলে, মঙ্গলবারে সেটাকে যা ইচ্ছা তাই খরচ করলে—তার পর মহা প্রতিজ্ঞা করলে, টাকা নিশ্চয় জমাব। খরচ করার সময় কাঁদলে ও ভাবলে, আরও আসবে, এক কথায় মইয়ের শেষ ধাপে আসার পরেই ফাঁসী কাঠের উপরে।

ফলষ্টাফ—সেটা সত্য কথা – তবে কি বলতে চাও, আমার নৈশ আসরের রক্ষয়িত্রী কি ভাল মেয়ে নয় ? * * * *

Much ado about nothing পুস্তকে নিম্নলিখিত কথাগুলি পাওয়া যায়।

Conrade—দূর হও—তুমি একটা গাধা, আস্ত গাধা।

Dogberry—কি ? আমি গাধা ? আমার পদমর্য্যাদা ও বয়সের মর্য্যাদারও সন্দেহ কর ? আচ্ছা প্রভু, যদিও কপালে লেখা নাই আমি গাধা, তবু ভুল করো না যে আমি গাধা—কিন্তু হতভাগা মূর্খ আমি সাক্ষী দিয়ে, প্রমাণ করবো যে, এটা তোমার অনুগ্রহ। আমি এক জন বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ লোক, তার উপর এক জন সরকারী কর্ম্মচারী, তার উপর আমি এক জন গৃহস্থ, তা বাদেও আমার শরীরে এত সুন্দর মাংসপূর্ণ অবয়ব আছে—যাহা এ দেশে কাহারও পাওয়া যায় না। ছেড়ে দিলাম যে আমি আইন ভাল জানি – বাদ দিলাম যে আমার যথেষ্ট টাকা-পয়সা আছে, সময় সময় লোকশানও দিয়ে থাকি—আমারও দুইটি ভাল পোষাক আছে - দেখতে আমিও সুন্দর কম নহি। এ সব কি গর্ব্বের মধ্যে নয় ? শেষকালে আমি হলাম কি না গাধা ?

(এই প্রসঙ্গে তুলনা করার জন্য রসিকশেখর দীনবন্ধু মিত্রের রচিত রামমাণিক্যের "বাঙ্গাল" অপবাদের অনুশোচনার কথা মনে পড়িবে)

"Merchant of Venice" হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করা অসঙ্গত হইবে না।

Lancelot—আমার বিবেক কিন্তু নিশ্চয় বলছে, তোমার ইহুদী প্রভুর ভাল কাষ করিও— তবে সয়তান আমার কাণের কাছে এসে মন্ত্রণা দিচ্ছে, "লোবো ভাল মানুষ, লোবো, লনসলট লোবো, উৎকৃষ্ট লোবো তোমার পা ব্যবহার করো, দৌড়ে পালাও।" বিবেক বলছে, "শুন, লোবে, আমার শুন, পালিও না, দৌড়ে যাওয়াটা ঘৃণা করো।" আবার শয়তান জোর ক'রে বলছে,"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, শীঘ্র স্থান ত্যাগ করো।" আচ্ছা, বিবেক যেন বুকের কাছে মনের সম্মুখে বলছে "ভাল মানুষ লোবো, যে লোকের ছেলে তুমি অথবা যে মায়ের ছেলে তুমি—বাপ হয় ত কিছু একটা খারাপ কাষ করেছেন—তাঁর যেমন পছন্দ ছিল, যা খুশী হয় ত করেছেন— মায়ের ত সে দোষ নাই, তুমি যে মায়ের ছেলে— কখনও নড়চড় হয়ো না।" সয়তান বলছে, "তুমি শীঘ্র চ'লে যাও—পালাও পালাও।" বিবেকের শাসন শুনলে আমাকে থাকতেই হয় আর সয়তানের মন্ত্রণাতে আমাকে চ'লে যেতে হয়; কিন্তু আমার যে প্রভু ভগবান্ রক্ষা করুন— তিনি এক জন আস্ত সয়তান—তাঁর সেবা করা আর সয়তানের সেবা করা সমান—যদি একটু শ্রদ্ধা তাঁকে না করতাম, তবে বলতাম, ভিতরে বাহিরে সয়তানই আমার প্রভু—আমার বিবেকটা বড় কঠিন—সয়তান ইহুদী প্রভুর ভৃত্য হয়ে থাকতে বলে। সয়তান যে মন্ত্রণা দেয়, সেইটা দেখছি ভাল ও সদুপদেশ। আমি সে জন্য মনে করি—প্রভুকে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়াই ভাল— সয়তান, আমার পা দুখানা তোমার আদেশে ব্যাপৃত কচ্ছি, চল, যে দিকে নিয়ে যাবে যাও"।

নিম্নলিখিত প্রবচন বোধ হয় অনেকের নিকট পরিচিত :—

"Stone walls donot prison make
Nor Iron bars a Cage"
"Phoebus car shall shine from far
Both make or mar the foolish fate."

Hamlet পুস্তকের অনেক রসমধুর স্থান এরূপ উদ্ধৃত করিয়া দেখান যায়, বাহুল্যভয়ে তাহা আর এখানে উল্লেখ করিলাম না।

Shakespeare এর অন্যান্য নাটকে এরূপ Glorified হাস্য-রসের ভুরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। সহৃদয় পাঠক তাঁহার মূল পুস্তক পড়িয়া বিশেষ উপভোগ করিবেন। সকৌতুক প্রেমালাপের যে সব বিবরণ আছে, তাহা সাহিত্যে চিরকাল একটি অতুল সম্পত্তি হইয়া রহিয়াছে।

Fracies, Lord Bacon, যিনি Shakespeare ছিলেন কি না, তাহা লইয়া যথেষ্ট বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়া থাকে, তিনি অনেক জ্ঞানপূর্ণ প্রবাদবাক্য লিখিয়া গিয়াছেন। তাহাদিগকে Epigrammic শ্রেণীতে ধরা যায়। যেমন—

"অন্ধকারে সব রঙই সমান"
(অথবা, অন্ধকারে সকলেই সুন্দরী)

"বুড়া লোকেরা আপত্তি করে বেশী, ভাবে বেশী, কাযে কম এবং শীঘ্রই অনুতপ্ত হয়।"

"যাহারা খেলা দেখে, তাহারা খেলোয়াড়দের অপেক্ষা বেশী বুঝে। কয়েক জন বন্ধুর উপদেশ নিয়ে কায করাই শ্রেয়ঃ।"

"পড়াশুনা করিলে মানুষ সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে, সভা আলোচনাতে মানুষ তাড়াতাড়ি কাষ করিতে পারে, যিনি লেখা অভ্যাস করেন, তিনি প্রকৃত মানুষ হইতে পারেন।"

Sir John Harrington কতকগুলি হাস্যরসাত্মক পদ্য লিখিয়া (A Precise Tailor, A certain man) সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। Satire সম্বন্ধে বলিতে গেলে এই সময়ে Ben Johnsonএর নাম বাদ দেওয়া যায় না। বোধ হয়,

Shakespeareএর পরেই নাট্যকার হিসাবে তাঁহার নাম উল্লেখ করা যায়। গল্প আছে যে, এক জন মত্তব্যবসায়ীর কাছে তাঁহার কিছু ধার ছিল। সে টাকার তাগাদা করে, কিন্তু Ben Johnson দিতে পারেন না। তিনি কবি ছিলেন বলিয়া মত্তব্যবসায়ী তাঁহাকে বলে যে,যদি তিনি ৪টি প্রশ্নের উত্তর তখন তখন পত্তে দিতে পারেন, তবে সে আর টাকা চাহিবে না। Ben Johnson তাহার প্রশ্ন শুনিয়া উত্তর দিলেন—

God is best pleased, when men forsake their sin,
The Devil's best pleased, when they persist there in,
The world is best pleased, when thou dost sell
good wine
And you're best pleased, when I do pay for mine.

বুড়া-বুড়ীর ঝগড়া ও প্রেমালাপের পত্ত Ben Johnsonএর Gibes and Joanএর কাহিনীতে বোধ হয় প্রথম পাওয়া যায়। ধর্মপ্রচারক John Donne তাঁহার witty পত্তের জন্ত বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার "The wil" নামক পত্ত এখন অনেক পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়া দেখান হয়। কয়েকটি লাইন নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

Before I sigh my last gasp, let me breath
Great love, some legacies : Here I bequeathe
Mine eyes to Argus, if mine eyes can see,
If they be blind, love, I give them thee ;
My tongue to fame, to ambassador mine ears :
To woman or the Sea, my tears.
Thou, love, hast taught me here to fore
By making me serve her who had twenty more
That I should give to none but such as
had too much before.

এই সময়ের Thomas Dekker (যিনি Bachelors Banquet লিখিয়াছিলেন), John Fletcher (Beaumont and Fletcher) প্রভৃতি লেখকদের হাস্যরস বিশেষ প্রচলিত ছিল। তাহা অন্যান্য লেখকদের তুলনায় যেন একটু নিম্নস্তরের ছিল বলা যায়। Bishop Corbet তখন অর্থশূন্য কথার ঝঙ্কার ও মূর্চ্ছনার জন্ত বিশেষ পরিচিত হইয়াছিলেন। যথা—

Like to the Thundering Tone of unspoke speeches
Or like a lobster clad in logic Breeches
Or like the grey fur of a crimson cat
Or like the moon calf in a Shipshod hat.
E'en Such is he who never was begotten
Until his children were dead and rotten

অথবা

Some men there were that did suppose the sky
Was made of carbonado'd Antidotes
But my opinion is a what's left eye
Need not be coined all king Harry Groates.

Beaumont (পূর্ব্বে Fletcherএর নাম করা হইয়াছে, তাঁহার বন্ধু) মরিয়া যাওয়াতে Bishop Corbet লিখিয়াছিলেন—

"Beaumont is dead, by whose sole death appears
Wit's a disease consumes men in few years."

রাণী Elizabethএর সময় ইংলণ্ডে সাহিত্যে এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে অনেক প্রকার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। Sir Walter Raleigh (তিনি তামাক খাইয়া ধূম উদ্গিরণ করাতে তাঁহার মাথায় আগুন লাগিয়াছে মনে করিয়া তাঁহার ভৃত্য গায়ে বালতি বালতি জল ঢালিয়াছিল) সে সময়ের মিথ্যা প্রবঞ্চনা সম্বন্ধে একটি পত্ত লেখেন, তাহা হাস্যরস হিসাবে আজও প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। Sir John Davies প্রভৃতি অনেক লেখক রাণীর নামের অক্ষরগুলি প্রথম অক্ষর ধরিয়া অনেক রকম পত্ত লেখেন। এমন কি, গৃহ নির্ম্মাণ করিতেও আদ্য অক্ষর "E" আকারে ঘরের ভিত্তি করা হইত গৃহ নির্ম্মিত হইত। ইহা তদানীন্তন Architectureএর বিশেষত্ব আজ পর্য্যন্ত প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। Daviesএর একটি পত্তকে বাঙ্গালাতে বলা যায়—"দিল্লীকা লাড্ডু, যো খায়া ওভি পস্তায়া, যো না খায়া ওভি পস্তায়া" যথা—

Wedlock, indeed, hath oft compared been
To public Feasts, where meet a public rout
Where they that are without would fain go in
And that are within would fain go out.

১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে একখানি পুস্তক, নাম Miscllany, বিশেষ খ্যাতি লাভ করে এবং ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে Paradise of Dainty Devises নামক একখানি পুস্তকের অনেক সংস্করণ বাহির হয়। তাহার পর অনেকগুলি হাস্যরসাত্মক গল্প ও কাহিনীর পুস্তক দেখা দেয়। কিন্তু তাহাদের নামে যেরূপ রসমাধুর্য্য প্রকাশ করার চেষ্টা হইত, বিষয়বস্তু সে রকম ছিল বলিয়া মনে হয় না (A gorgeous gallery of gallant inventions) বিভিন্ন সাহিত্য হইতে অনুবাদ করিয়া হাস্যরসাত্মক পুস্তকাদি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়।

ইংলণ্ডে ষোড়শ শতাব্দীতে হাস্যরস সাহিত্যের যেরূপ ক্রমবিকাশ হয়, তাহা উপরে কিছু দেখাইয়াছি। বঙ্গদেশে সে সময় হইতে বিভিন্ন প্রকার ধর্মকলহ ও সামাজিক বিপ্লব আরম্ভ হয় এবং প্রকৃতপক্ষে বঙ্গসাহিত্যে যেন ক্রমশঃ রসসৃষ্টি আলোচনা বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। পুরাতন বচন, গান, ব্রতকথা প্রভৃতিতে যাহা সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা গ্রামে গ্রামে অল্প অল্প প্রচলিত ছিল। দেশে শান্তি না থাকিলে প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের উন্নতি হওয়া যেন অসম্ভব মনে হয়। [ক্রমশঃ।

শ্রীকালিদাস বাগচী (এম, এস, সি)।



সহজ উপায়ে গ্যাসপূর্ণ ভারী ট্যাঙ্ক বহন

অক্সিজেন, এসিটিলিন বা অন্যবিধ গ্যাসপূর্ণ বৃহৎ ট্যাঙ্ক দুই জন লোক যাহাতে সহজে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। ধাতুনির্ম্মিত একপ্রকার বন্ধনীর দুই পার্শ্বে দুইটি কাঠের হাতল থাকে। এই বন্ধনীটা গোলাকার। হাতল দুইটি একটু

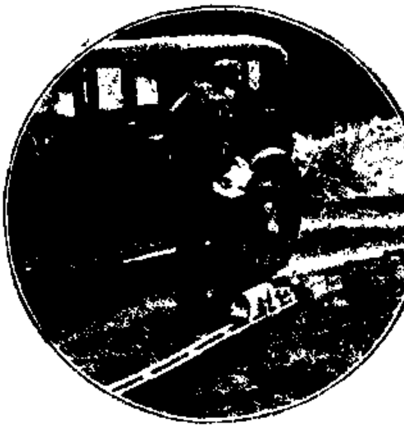


সহজ উপায়ে ভারী গ্যাস ট্যাঙ্ক বহন

নীচু করিয়া লইলেই বন্ধনীর মুখ ফাঁক হয়। তখন অনায়াসে উক্ত গ্যাসট্যাঙ্কের মাথা গলাইয়া যথাস্থানে বিন্যস্ত করা যায়। তার পর হাতল দুইটিকে সোজা করিয়া ধরিলেই বন্ধনী গ্যাসট্যাঙ্কে এরূপ-ভাবে আবদ্ধ হইবে যে, ট্যাঙ্ক কোনও মতেই আর খসিয়া পড়িতে পারিবে না। তখন উহাকে সোজাভাবে যেখানে ইচ্ছা বহন করিয়া লইয়া যাওয়া যায়।

ডাক চিঠিবাহী খেলার ট্রেণ

আমেরিকার পশ্চিমভাগস্থ এক জন কৃষিজীবী একটি ছোট ট্রেণ তৈয়ার করিয়াছেন। রাজপথের যেখানে ডাকের চিঠিপত্রাদি বিলি হয়, সে স্থান হইতে ঐ কৃষিজীবীর বাড়ী অনেক দূরে অবস্থিত। তাঁহার গৃহ হইতে রাজপথের যে স্থানে ডাক বিলি হয়, ততদূর পর্য্যন্ত তিনি একটি ছোট রেলপথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ছোট একটি খেলার এঞ্জিন সংগ্রহ করিয়া তিনি উহার সহিত একটি চিঠিপত্র বহন করিবার উপযোগী বাক্স সংলগ্ন করিয়া দিয়াছেন। উহা যেন তাঁহার ডাক-বহনকারী গাড়ী। ডাক লইয়া যে সময়ে ডাকবাহীর আসিবার কথা, তাহার কিছু পূর্ব্বে ঐ ট্রেণখানি গৃহ হইতে যাত্রা করে। রাজপথে আসিলেই ক্ষুদ্র রেলপথের সংলগ্ন একটা লিভার ট্রেণের গতি রোধ করিয়া দেয়। তার পর ডাকওয়ালা চিঠিপত্রাদি ঐ ট্রেণসংলগ্ন ক্ষুদ্র বাক্সে রাখিয়া দেয়। তার পর একটা সুইচ টানিয়া

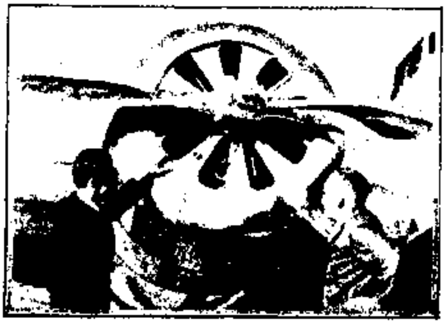


ডাকচিঠিবাহী খেলার ট্রেণ

দিলেই ট্রেণখানি পাছু হটিয়া বাড়ীর দিকে যায়। ট্রেণ-এঞ্জিনের মধ্যে অনেকগুলি তাড়িতোৎপাদক ব্যাটারী আছে।

তুষার-রাজ্যের উপযোগী বিমান

আলাস্কার জন্য "প্যাসেফিক্ আলাস্কা এয়ারওয়েস" কোম্পানী একখানি বিমান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তুষার-রাজ্যের মধ্য দিয়া



তুষার-রাজ্যের উপযোগী বিমান

যাতায়াতের জন্যই এই বিমানের প্রয়োজন। বিমান-চালকের কক্ষ হইতে এমন ভাবে বিমানে বায়ু প্রবেশের পথ বন্ধ করিবার ব্যবস্থা আছে যে, শীতল বাতাস বিমানের মধ্যে কোনও মতে

প্রবেশ করিতে পারিবে না। কাজেই তুষার-রাজ্যের মধ্য দিয়া বিমান অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারিবে। বিমানের চালন-চক্রযুগল আবর্ত্তনকালে যে তুষার বা বরফ বিমানের নানা স্থানে প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহার ধাতব পদার্থকে এমনভাবে বর্ম্মাচ্ছন্ন করা হইয়াছে যে, কোনও স্থানে তুষার সঞ্চিত হইবার অবকাশ পায় না।

চায়ের চামচে শাবকসহ পাখী

একটি চায়ের চামচের অপরিসর স্থানে গোষ্ঠীশুদ্ধ পাখী (হমিং পাখী) বসিয়া আছে, এ দৃশ্য কল্পনা করিতেও আয়াস স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে এত ক্ষুদ্রাকার হমিং বার্ড বা গুঞ্জনকারী পাখী



চায়ের চামচে সগোষ্ঠী পক্ষিণী

বস্তুতান্ত্রিক জগতেও দেখা গিয়াছে। শুধু পক্ষিণী নহে, তাহার শাবকগুলিকে লইয়া মাতা ঐ চামচের মত অপরিসর স্থানে পরম আরামে বসিয়া রহিয়াছে। এ দৃশ্য একেস্ চিড়িয়াখানার ডাঃ সি, ডবলু, লিষ্টার এবং কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ এ, এ, এলেন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাঁহারাই সগোষ্ঠী পক্ষিণীর আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

বন্ধনীযুক্ত টুপী যে কোনও মাথায় বসিবে

সামরিক শিরস্ত্রাণের আকারবিশিষ্ট এক প্রকার টুপী বাজারে বাহির হইয়াছে। উহা বন্ধনীযুক্ত। সুতরাং ছোট, বড়, মাঝারি সকল



সকল মাথার উপযোগী বন্ধনীযুক্ত টুপী

রকম মাথায় উহা ঠিক বসিবে। টুপীটি এমন ভাবে নির্ম্মিত যে, টুপীধারীর মাথায় বাতাস লাগিবার ব্যবস্থা আছে। জলে টুপী যাহাতে না ভিজিতে পারে, এমন বস্তুও উহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। ময়লা হইলে সাবান-জলে উহা ধুইয়া ফেলা যায়।

আলোকোৎপাদক জীবনরক্ষক কোমরবন্ধ

রাত্রিকালে সমুদ্রজলে নানাপ্রকারে মনুষ্যজীবন বিপন্ন হইয়া পড়ে। এজন্য জীবনরক্ষক জ্যাকেট এবং কোমরবন্ধ ধারণ করিয়া রাত্রিকালে রক্ষিগণ পোতারোহণে সমুদ্রবক্ষে প্রেরিত হইয়া থাকে। জলের সংস্পর্শে আসিবামাত্র উক্ত জীবনরক্ষক কোমরবন্ধ ও জ্যাকেট



আলোকোৎপাদক জীবনরক্ষক কোমরবন্ধ

হইতে অত্যুজ্জ্বল আলোকধারা নির্গত হইতে থাকে। তাহার সাহায্যে জলমজ্জমান ব্যক্তিগণকে দেখিতে পাইয়া রক্ষীরা তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। উল্লিখিত দ্রব্যগুলির মধ্যে বিদ্যুতালোক উৎপাদনের উপযোগী বস্তু এমনভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে যে, জলের সংস্পর্শে আসিবামাত্র তাহা আলোকোৎপাদন করিয়া থাকে। বোয়া এবং নৌকায় বড় বড় এবং মানুষের দেহে ছোট ছোট কোমরবন্ধ সংশ্লিষ্ট থাকে।

সামুদ্রিক শঙ্খাদিজাত শিল্পসম্ভার

ইদানীং সামুদ্রিক জীবদিগের অস্থি, খোলা হইতে নানাবিধ শিল্প সম্ভার রচিত হইতেছে। প্রশান্তমহাসাগর-তীরবর্ত্তী কোন স্থানের জনৈক শিল্পী কাঁকড়ার খোলা, মোচা চিঙ্গড়ীর খোসা, সামুদ্রিক

শামুক, শঙ্খ, শুক্তি প্রভৃতি হইতে রচিত শিল্পসম্ভার বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। সৌখীন নর-নারীরা উহা ক্রয় করিবার জন্য ব্যগ্র। নক্ষত্র বা তারা মাছকে শিল্পী মাজিয়া

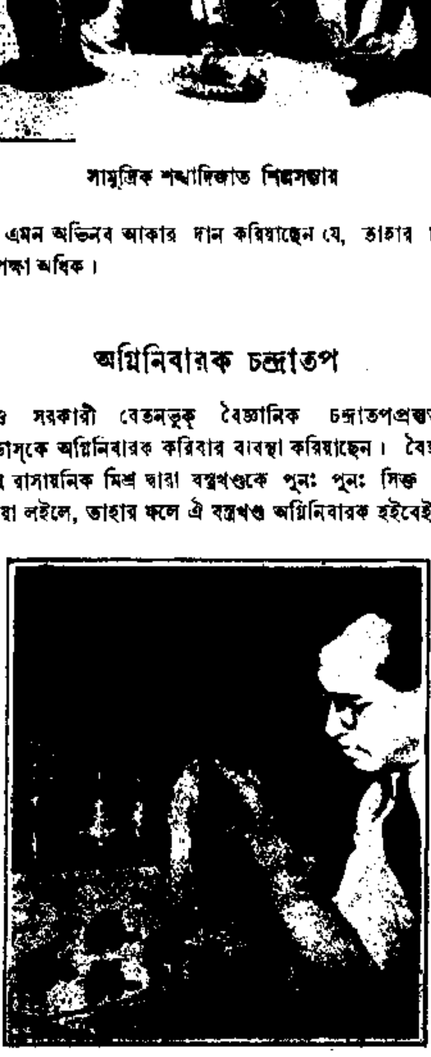


সামুদ্রিক শঙ্খাদিজাত শিল্পসম্ভার

ঘষিয়া এমন অভিনব আকার দান করিয়াছেন যে, তাহার চাহিদা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

অগ্নিনিবারক চন্দ্রাতপ

কোনও সরকারী বেতনভুক্ বৈজ্ঞানিক চন্দ্রাতপপ্রস্তুতকারী ক্যান্‌ভাস্‌কে অগ্নিনিবারক করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে রাসায়নিক মিশ্র দ্বারা বস্ত্রখণ্ডকে পুনঃ পুনঃ সিক্ত করিয়া শুকাইয়া লইলে, তাহার ফলে ঐ বস্ত্রখণ্ড অগ্নিনিবারক হইবেই।



অগ্নিনিবারক চন্দ্রাতপপ্রস্তুতকারী বস্ত্রখণ্ড

মোটর ও চাকাযুক্ত কেদারা

সল্টলেক সিটির এক ব্যক্তি চলচ্ছক্তিহীনতা নিবন্ধন চাকাযুক্ত



মোটর ও চাকাযুক্ত কেদারা

চেয়ার-গাড়ীতে মোটর সন্নিবেশ করিয়া, তাহাতে চড়িয়া নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয় করে। ইহাতেই তাহার জীবিকার্জ্জনের অর্থ সে সংগ্রহ করিয়া থাকে। হাসপাতালের চেয়ার, দ্বিচক্রযানের চাকা এবং গ্যাসোলিন মোটর প্রভৃতির যোগে এই বিচিত্র যানটি নির্ম্মিত হইয়াছে। চেয়ারের দোলনে উহা চলিতে আরম্ভ করে। উহাতে দুইটি লিভার আছে। একটির কায নিয়ন্ত্রণ, অপরটির কার্য্য গতিবেগবৃদ্ধি এবং গাড়ী থামান। ঘণ্টায় ৭ মাইল বেগে উহা ধাবিত হয়। দুই হাজার মাইল পথ এই গাড়ী গতায়াত করিয়াছে।

মোটর-সাইকেল দৌড়ে মুখোস

মোটরবাস ও মোটর-সাইকেল যোগে যাঁহারা প্রতিযোগিতা করেন, বাতাস তাঁহাদের মুখে-চোখে লাগিয়া বিষম অসুবিধার সৃষ্টি করিয়া



মোটরগাড়ী ও মোটর-সাইকেল দৌড়ে মুখোস

থাকে। এজন্য সমগ্র মুখমণ্ডলকে আচ্ছাদিত করিবার জন্য এক-প্রকার মুখোস বাজারে বাহির হইয়াছে। ইহাতে বগ্‌লস্ ধারণেরও প্রয়োজনীয়তা থাকে না। এই মুখোস ধারণ করিলে শ্বাসপ্রশ্বাস সম্বন্ধেও কোনপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত মুখোসে আছে।

আধ মিনিটে সম্পূর্ণ আলোকচিত্র

এক প্রকার স্বয়ংচালিত যন্ত্রের সাহায্যে ৩০ সেকেণ্ডের মধ্যে আলোকচিত্র তুলিয়া, ছাপিয়া, ফ্রেমে বাঁধাইয়া বিক্রয় করা হয়। যাঁহার ফটো তুলিবার ইচ্ছা, তিনি যন্ত্রের কাছে বসিয়া ছিদ্রপথে



আধ মিনিটে বাঁধান আলোকচিত্র

একটি নির্দ্দিষ্ট মূল্যের মুদ্রা নিক্ষেপ করিবেন এবং লিভার চাপিয়া ধরিবেন। অমনই মোটরযুক্ত ক্যামেরা তাহার কায সম্পন্ন করিয়া অর্দ্ধ-মিনিটের মধ্যে একটি গোলাকার ফ্রেমে বাঁধান ফটো বাহির করিয়া দিবে।

মৃত্তিকাহীন কৃত্রিম উদ্যানের গাছপালা

কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ আর এ, ডেভিস্, তাঁহার গবেষণাগারে একটি কৃত্রিম উদ্যান রচনা করিয়াছেন। উহা কাচের ঘরে প্রতিষ্ঠিত। উদ্যানে মৃত্তিকা নাই। কৃত্রিম উপায়ে বৈজ্ঞানিক এমন ভাবে তাপ, বাতাস ও সূর্য্যালোক উৎপাদন করেন, যাহার ফলে বৃক্ষলতা আপনি বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইয়া থাকে। একটি জলপূর্ণ আধারে গাছগুলি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। প্রয়োজনীয় দ্রাবক লবণ এমন ভাবে তিনি জলে প্রয়োগ করেন, আলোকাধার হইতে এমন ভাবে সূর্য্যালোকের মত রশ্মিজাল বর্ষণ করিতে



মৃত্তিকাহীন উদ্যানের গাছপালা

থাকেন, তাহার ফলে গাছগুলি পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। প্রয়োজনমত অক্সিজেন প্রয়োগে ও বিয়োগে বাতাস পরিপুষ্টির সহায়তা করে।

অভিনব বেহালা

কালিফোর্ণিয়ার এক জন শিল্পী একপ্রকার বেহালা-জাতীয় বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার বৈশিষ্ট্য কোণ হিসাবে, বক্রতায় নহে। এই যন্ত্রের নাম তিনি দিয়াছেন—"ভায়োলেওল"।



অভিনব বেহালা

এই যন্ত্র হইতে যে সুর নির্গত হয়, তাহা প্রাচীন যুগের সন্ন্যাসী-দিগের রচিত বাদ্যযন্ত্র-নির্গত সুরের অনুরূপ। সাধারণ বেহালা যন্ত্রে যে শব্দ-তরঙ্গ উত্থিত হয়, তদপেক্ষা উচ্চতর স্বরতরঙ্গ এই যন্ত্র হইতে বহির্গত হইয়া থাকে—অনেকটা বংশীধ্বনির ন্যায় মধুর ও সুস্পষ্ট। পিয়ানোর শেষ তানের সহিত এই যন্ত্রের শেষ তানের সাদৃশ্য চমৎকার। কোণ-বিশিষ্ট যন্ত্রের তীক্ষ্ণ সূচ্যগ্র মুখগুলির জন্য তার চড়া সুরে বাঁধা থাকে এবং অধিক চাপ দিবার প্রয়োজন হয় না।

কাকাদি বিতাড়নে কাগজের মার্জ্জার-মূর্ত্তি

কাকাদিকে ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য দক্ষিণ-স্কটল্যাণ্ডের কোনও কৃষিক্ষেত্রের মালিক কতকগুলি কার্ডবোর্ড হইতে কালো



কাকাদি বিতাড়নে কাগজের মার্জ্জার-মূর্ত্তি

বিড়ালের মূর্ত্তি তৈয়ার করিয়া ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে রাখিয়া দিয়াছেন। এই মার্জ্জারমূর্ত্তিগুলির এক দিক শাদা, অপর দিক কালো। এই মূর্ত্তি দেখিয়া বায়সকুল এবং মূষিকদল ভয়ে ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া থাকে।

আগাছা-ধ্বংসকারী বিদ্যুতের পিস্তল

বিদ্যুতের গুলীর সাহায্যে ক্ষেত্রের আগাছা মারিয়া ফেলিবার জন্য একপ্রকার পিস্তল নির্ম্মিত হইয়াছে। গাছের মধ্যে এক ইঞ্চি পরিমাণ পিস্তলের নল প্রথমতঃ প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে হইবে। তার পর পিস্তলের ঘোড়া বা সুইচ টিপিলেই ৫ শত ডিগ্রী উত্তাপ জন্মিবে। অমনই তাহার প্রভাবে গাছ মরিয়া যাইবে। যন্ত্রটির হাতলটি পিস্তলের ন্যায় আকারবিশিষ্ট। একটি মোটা তার যতদূর ইচ্ছা হইতে বিদ্যুৎ-প্রবাহ আনয়ন করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। উত্তাপ নির্দ্দিষ্ট স্থানেই কাষ করে। কাযেই পাশের তৃণাদির কোন ক্ষতি হয় না।



আগাছাধ্বংসে বিদ্যুতের পিস্তল

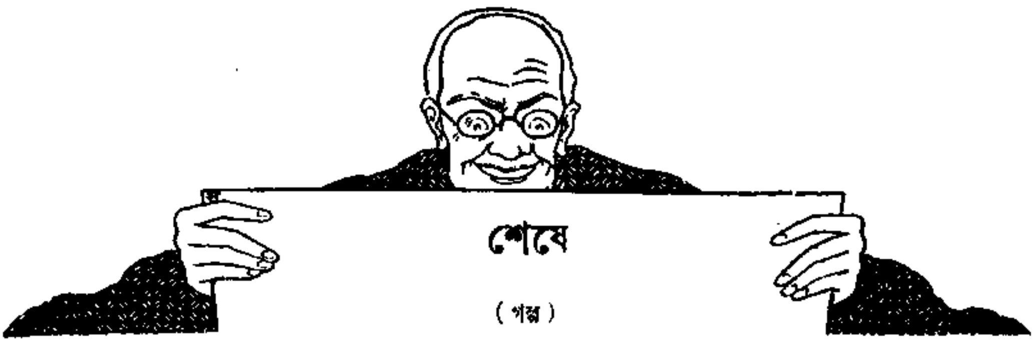
আলোকদীপ্ত ক্ষুর

নূতন ধরণের ক্ষুরের সাহায্যে ক্ষৌরকার্য্য করিবার সময় সমগ্র মুখমণ্ডল আলোকিত হইয়া উঠে। এই ক্ষুর ফাউণ্টেন পেনের



আলোকদীপ্ত ক্ষুর

আকারবিশিষ্ট। উহার সহিত আলোক-সন্নিবেশের ব্যবস্থা এমন-ভাবে আছে যে, অন্ধকার গৃহে ক্ষৌরকার্য্য আরম্ভ করিবামাত্র আলোক-প্রবাহ নির্গত হইয়া মুখমণ্ডলকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবে। প্রয়োজন হইলে আলোকাধারটি খুলিয়া ফেলা যায়।



শেষে

(গল্প)

১

মধু-পিয়াসীর দলে মিশিয়া দমদমার বাগানে আমোদ-প্রমোদে নিশি যাপন করিয়া প্রভাস গৃহে ফিরিল বেলা প্রায় আটটায়।

ফটকের পাশে একটি স্ত্রীলোক বসিয়াছিল। প্রভাসকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; উঠিয়া নম্র-বচনে কহিল—তোমার কাছে এসেছি, বাবা।

বিস্ময়ে প্রভাস কহিল,—আমার কাছে!…কোথেকে আসচো?

স্ত্রীলোকটি কহিল—বীণা পাঠিয়েচে।

বীণা!

প্রভাস ক্ষণেকের জন্য বুকের মঞ্চের পানে চাহিয়া দেখিল,—বীণা, চারু, সুশীলা, মণিমালা…কত নারী আসিয়া বুকের মঞ্চে কত অভিনয় করিয়া গিয়াছে; তাদের মধ্যে…বীণা!

ঠিক!

ভোরের দিকে মেজাজ কেমন বিগড়াইয়া গিয়াছিল। নিত্য সেই এক ধারায় আমোদ…মধু-সেবায় সেই এক ভঙ্গী! অত্যন্ত বিরস বোধ হইতেছিল! সে বিরসতার মধ্যে…বীণা!

বুকখানা দুলিল। চকিতে কি খেয়াল জাগিল! প্রভাস কহিল—কিছু বলেচে?

স্ত্রীলোকটি কহিল—কি বলবে? তার শেষ দশা! আর বাঁচবে না। ক'দিন থেকে কাঁদচে। পায়ে ধরে সাধচে। একবার তোমায় দেখতে চায়।

দেখিতে চায়!…বীণা!

যবনিকা তুলিয়া অতীতের দৃশ্য চোখের সামনে জাগিল…

তখন থাকে ঝামাপুকুরের বাড়ীতে। পাশে একতলা বাড়ী। স্বামী কোন্ অফিসে কাজ করে—সন্ধ্যার পর মদ গিলিয়া ঘরে ফিরিয়া কচি বৌকে প্রহার করে। নির্দ্দয় প্রহার! বৌটি নীরবে সয়। স্বামীর হুঙ্কারে পাড়া কাঁপিতে থাকে। প্রভাসের বুক জর্জ্জরিত হইয়া উঠিত। তখন তার কতই বয়স! প্রথম যৌবন! আকাশে সোনার রঙ—সে রঙে সারা মন সোনায় সোনা হইয়া আছে!

একদিন দিনের বেলায় বৌটি উঠানে বসিয়া বড়ি দিতেছিল। এত অত্যাচার সহিয়া পড়িয়া আছে, তবু বিধাতা রূপ আর লাবণ্য যেন তার গায়ে ঢালিয়া দিয়াছেন—দুনিয়ার যেখানে যত রূপ, যত লাবণ্য ছিল, বুঝি সবটুকু! হয়তো নয়! প্রভাসের তরুণ নয়ন-মন তখন এমনি বুঝিয়াছিল।

একটু দরদ—দুটা 'আহা'! বৌটি একেবারে পায়ে আসিয়া লুটাইল! তার পর জানালার এ ধারে একজন, ওধারে সে…দু'জনে কত কথা হইত! গোপনে কত স্বপ্ন রচনা করিত! এই কঠিন পৃথিবীর বাহিরে আছে স্বপ্নের রাজ্য আগাগোড়া কুহক-মায়ায় রচা…সে রাজ্যে যদি ছুটিতে গিয়া দাঁড়াইতে পারে…

ঘটিল তাই। তরুণ মনে দুর্ব্বার লোভ! রাত্রি ন'টায় পশ্চিমে যাইবে বলিয়া প্রভাস লগেজ লইয়া গেল ষ্টেশনে। ট্রেনে চড়িল না; লগেজগুলা ষ্টেশনে কার জিম্মায় রাখিয়া গভীর রাত্রে সে ফিরিল বাড়ীর পাশে। দ্বারে মৃদু আঘাত! বৌ জাগিয়া বসিয়াছিল—মাতাল স্বামী দাওয়ায় চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে…বৌ আসিয়া একেবারে বাহিরে দাঁড়াইল। অদূরে ছিল ট্যাক্সি…সেই ট্যাক্সিতে চড়িয়া দুজনে…

বুক কাঁপিতেছিল। ভয়…লজ্জা…কি যে নয়! পাতাল ফাঁশাইয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল যেন সেই ছেলেবেলায় রূপ-কথায়-শোনা বিরাট দৈত্যের মত। ভদ্র ঘরের বৌ—হোক্ গরীব…তাকে লইয়া কোথায় সে চলিয়াছে।

ট্যাক্সি আসিয়া ষ্টেশনে দাঁড়াইল। সে ট্যাক্সি ছাড়িয়া

লগেজ লইয়া আর একখানা ট্যাক্সি ধরিয়া যায় ফরাশ-ডাঙ্গায়; দু'চার দিন সেখানে থাকিয়া শেষে পশ্চিমে। এক মাস বাহিরে কাটাইয়া চুপি চুপি কলিকাতায় ফিরিয়া আসে। নন্দন হোটেলে একখানা ঘর লইয়া সেখানে রাখে বৌকে···সে-বৌ এই বীণা।

তার পর আরো ছ' মাস। শেষে কোথায় সরিয়া গেল মানসীর দেহ-মনের সে স্বপ্ন, সে মায়া, সে কুহক! মায়ার আবরণ খশিয়া ঝরিয়া শুষ্ক ফুলের মত বীণা যেদিন নিত্যকার মামুলি নারীর রূপে সামনে দাঁড়াইল, সেদিন প্রভাসের মোহ গেল ঘুচিয়া; সারা মন ঘৃণায় রী-রী করিয়া উঠিল! এই তুচ্ছ নারীর জন্য সে কি করিয়াছে···ছি!

প্রভাস থাকিতে পারিল না; সরিয়া পড়িল। যে-বীণা তাকে অবলম্বন—পৃথিবীর একমাত্র আশ্রয় পায়ের ঠোক্করে চূর্ণ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে—ফিরিয়া গিয়া দাঁড়াইবে, এমন ঠাঁই এত বড় পৃথিবীর কোথাও নাই—কিন্তু সে-কথা প্রভাসের মনে জাগিল না!

সেই দিন হইতে রূপের পণ্যশালায় সে হইয়াছে নিত্যকার খরিদ্দার। বীণার সঙ্গে আর দেখা হয় নাই। মাঝে মাঝে তার কথা মনে পড়িয়াছে···এই বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দিয়াছে, ঘর ছাড়িয়া পথের মায়ায় যে মজিয়াছে, পথকে আশ্রয় করিয়া সে বেশ থাকিতে পারিবে।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা!···

পাঁচ বৎসর পরে সেই বীণা তাকে ডাকিয়াছে!

খেয়াল! গেলে ক্ষতি কি!

সে কহিল,—যাবো। ঠিকানা?

স্ত্রীলোকটি ঠিকানা দিল। প্রভাস বলিল—বিকেলে যাবো'খন।

স্ত্রীলোকটি কহিল,—যেয়ো ঠিক। সে খালি কাঁদচে··· শেষ সাধ! আহা!

দুপুর বেলায় প্রভাস ঘুমাইল। বৈকালে ঘুম ভাঙ্গিলে ভাবিল—বীণার কাছে যাইবে। কাল রাত্রে পারুল বড় অপমান করিয়াছে···সে-অপমানের শোধ হইবে এই সঙ্গে। পারুল ভাবিয়াছে, এবেলায় গিয়া আবার তার প্রসাদ-প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইবে! দেখুক একবার মজা!···পারুল জব্দ হোক!

২

ঠিকানা খুঁজিয়া প্রভাস আসিল। নোংরা বস্তি—এ-বেলাতেও পাঁকের বিশ্রী দুর্গন্ধ। এখানে মধু-পিয়াসী আসিবে মধুর সন্ধানে! হায়রে!

জীর্ণ এক-তলা বাড়ী। দ্বারে করাঘাত করিতে সেই স্ত্রীলোকটি আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল; কহিল,—এসো বাবা। আমি ওকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে ঠাঁই দিয়েচি। গিয়েছিলুম গঙ্গাস্নানে। ঘাটের ধারে পড়ে ছিল। মাসখানেকও হয় নি। সবাই বলে, হাসপাতালের গাড়ী ডেকে সেখানে পাঠাও। মেয়েটি কাঁদছিল। কেমন মায়া হলো! রিকশা-গাড়ীতে তুলে এখানে নিয়ে এনু। বড্ড ভালো গো বাবু··· কেন যে এ মতি হয়েছিল···

বকিতে বকিতে একটা ঘরের সামনে আসিয়া স্ত্রীলোকটি কহিল,—ঐ ঘরে আছে। নড়তে পারে না তো। বিছানায় পড়ে আছে যেন সোনার পাত!

প্রভাসের বুকখানা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। এমন দেখিবে, সে মনে করে নাই। ঐ যে, সত্যই একটি রেখার মত পড়িয়া আছে!

স্ত্রীলোকটির পানে চাহিয়া প্রভাস প্রশ্ন করিল—সত্যি, বাঁচবে না?

স্ত্রীলোকটি কহিল,—লক্ষণ দেখচি নে। পাড়ায় আছেন ঐ মিত্তিরদের ছেলে—ডাক্তারী পড়চেন। দয়া করে এসে দেখেন।—তিনি বলচেন—বাঁচবার আশা নেই, হারার মা। রোগটা বিশ্রী না, বাবা—যক্ষ্মা। যাও না, যাও ঘরের মধ্যে। তোমায় দেখলে খুশী হবে।···লোকজন চিনতে পারে। জ্ঞান বেশ আছে।

প্রভাস ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। রোগ ও অভাবের বাষ্প-বাসে ঘর ভরিয়া আছে। মেঝের বিছানা পাতা—ঘরের চেয়েও জীর্ণ মলিন বিছানা। রোগী চক্ষু মুদিয়া বিছানায় পড়িয়া আছে।

প্রভাস ডাকিল,—বীণা···

বীণা চোখ মেলিয়া চাহিল। একটা নিশ্বাস! কোন্ পাতালের রন্ধ্রমুখে যেন পাথর চাপানো ছিল···পাথরখানা সরাইয়া লইতে কত যুগের সঞ্চিত একটু ক্ষীণ বায়ু ছাড়া পাইয়া বাহিরে আসিল! বীণার চোখে পলক পড়িতে চায় না!

প্রভাসের মুখে কথা নাই। সেই বীণা!···স্বামীর অত প্রহারেও এমন মলিন, এমন প্রাণহীন কখনো হয় নাই! কি করিয়া এমন দশা ঘটিল!

বীণা কথা কহিল, বলিল—তুমি এসেচো! সত্যি! আমি ভাবিনি, আসবে।

প্রভাস কহিল—অনেক দিন ধরে ভুগচো! দেখবার কেউ ছিল না?

বীণা হাসিল—অতি ক্ষীণ মলিন হাসি।

প্রভাস কহিল—আমি এখনি ডাক্তার আনাচ্ছি। আর এ-ঘরে···

ঘরের চারিদিকে প্রভাস দৃষ্টি ফিরাইল।—তারপর নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—ভালো বাড়ী দেখে তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবো···আজই।

বীণা কহিল—কি হবে? দরকার নেই।

প্রভাসের বুকে সেই পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেকার প্রভাস যেন আবার জাগিয়া উঠিল! এ পাঁচ বৎসরের কালি-ঝুলি মন হইতে মুছিয়া সরিয়া কোথায় মিলাইয়া গেল! প্রভাস বসিল বীণার শিয়রে।

বীণার জীর্ণ বিবর্ণ হাত পড়িয়া আছে···এই হাত প্রভাস একদিন কণ্ঠে ধরিয়াছে তাজা ফুলের মালার মত! আজ সে হাত···

বীণার হাত নিজের হাতে চাপিয়া ধরিয়া প্রভাস কহিল—বড় অত্যাচার করেছি আমি তোমার উপর···না বীণা? আরো আগে কেন আমায় ডেকে পাঠাওনি? ডাকলে বোধ হয় আসতুম। তোমার কথা কত বার মনে জেগেছে। কোথায় আছো, জানতুম না···

বীণা কহিল,—যদ্দিন আমায় ভালো লেগেছিল। যেদিন ভালো লাগেনি, চলে গেলে! আমি বুঝেছিলুম। তোমার উপর তো জোর ছিল না! কেন তুমি থাকবে চিরদিন আমার কাছে! আমি কে? প্রথমে বড্ড কষ্ট হয়েছিল··· তারপরে ভাবলুম, সত্যি—এ অভিমান মিছে! আমার জন্য কেন সব ত্যাগ করবে!

বীণার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। প্রভাস কোনো কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। দুই চোখের দৃষ্টি স্থির অবিচল··· বীণার মুখে নিবদ্ধ।

নিশ্বাস ফেলিয়া বীণা কহিল—বুঝলুম, আমি কুল ত্যাগ করে এসেচি। দুনিয়ার আবর্জ্জনা!···মনে হলেও তোমায় কোনো খপর দিতে পারিনি। ডাকবো কি? কোন্ অধিকারে তোমায় ডাকবো? পাপের পথে এসেচি···যেটুকু তোমায় পেয়েছিলুম, তার স্মৃতি বুকে ধরে দিন কাটিয়েছি। বরাত! আমার তো সুখে থাকবার কথা নয়! কিন্তু···

একটা বড় নিশ্বাসে বীণার কথা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল।···

হাতখানি তখনো প্রভাসের হাতের মধ্যে! প্রভাসের মুখে কোনো কথা নাই। মনে জাগিতেছিল যৌবনের সেই বন্যাস্রোত—সে স্রোতে গা ঢালিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে বীণা আর সে! মাথার উপর আকাশ নীল, নির্ম্মল—জ্যোৎস্নায় ভরা। নীচে পৃথিবীর বুকেও জ্যোৎস্নার বন্যা!

বীণা কহিল—কতবার মনে হয়েচে, এর চেয়ে স্বামীর মার খেতে খেতে যদি মরতুম—আশে পাশে পাঁচজনকে তবু পেতুম! দরদ করতো। সুখ আমার পাবার নয়। সুখের লোভ কেন করেছিলুম।···তাইতো আজ এমন একা, নিঃসঙ্গ পড়ে আছি। কারো মুখের পানে চেয়ে দয়া ভিক্ষা করবো—সে মুখ রাখিনি, পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছি!···তবু···সত্যি, আমি মন্দ নই। নিজেকে নষ্ট করিনি।···

বীণা চুপ করিল। তার দুই চোখের কোলে দু'ফোঁটা জল···মুক্তার মত টল্-টল্ করিতেছে।

প্রভাসের বুকখানা ধ্বক করিয়া উঠিল। কম্পিত স্বরে সে কহিল—আমায় ক্ষমা করো, বীণা। সত্যি, আমি···

ম্লান মৃদু হাস্যে বীণা কহিল—তোমার উপর রাগ করিনি আমি।···আমি তোমায় সত্যি সত্যি ভালোবাসি। তোমার জীবনে আমি কি···তাও ভেবেচি! মানুষ কত খেলনা নিয়ে খেলা করে। আমি একটা খেলনা বৈ আর কিছু নই! কিন্তু আমার কাছে তুমি···

অশ্রুর বেগে কথা বাধিয়া গেল। নিশ্বাস ফেলিয়া বীণা কহিল,—স্বামীকে ভালবাসবো ভেবেছিলুম···পারিনি। তার অবসর মেলেনি। কেবলি ভয় হতো। প্রথম দিন থেকেই গালাগাল আর মার···দুনিয়া কি, আমি কি—সব ভুলে গিয়েছিলুম।···তার পর সেদিন···যেদিন সেই বড়ি দিচ্ছিলুম বাড়ীর উঠোনে বসে, তুমি ডেকে কথা কইলে·····সেদিন পৃথিবীকে আমি প্রথম দেখলুম···যে

পৃথিবীর স্বপ্ন দেখতুম জ্ঞান হয়ে অবধি !···পড়ে পড়ে এখন ভাবি, সব বাঁধন কেটে কি করে চলে এলুম ! ভালোবাসার এমন সমুদ্র কোথা থেকে আমার সামনে তুমি ধরে দিয়েছিলে···সে সমুদ্রের ঢেউয়ে মা-বাপ, ভাই, বোন···তাদের নাম অবধি ভাসিয়ে দিতে বাধলো না !··· কারো কথা সেদিন ভাবিনি বলেই ভগবান বুঝি শেষে এমন শাস্তি দিলেন ! আজ আর আমার কোথাও কেউ নেই !

বীণার চোখে দর-বিগলিত ধারা ! প্রভাস বলিল—কারো সঙ্গে দেখা হয়নি এ পাঁচ বৎসরে ?

—না। যখন তোমার আশ্রয়ে ছিলুম, তখন লুকিয়ে ছ'খানা চিঠি লিখেছিলুম মাকে। মা সে চিঠির জবাব দেয়নি। তোমায় সে কথা বলিনি, পাছে তুমি রাগ করো। অত সুখের মধ্যে কেবল মনে হয়েছিল,—মা আমার দুঃখ দেখেছে, যাতনা দেখেছে, সুখের কথা মাকে জানাবো না ? তাই চিঠি লিখেছিলুম। তোমার পাশে থেকে এক মুহূর্ত ভাবিনি, আমার সে সুখ চুরি-করে-পাওয়া—সে সুখে আমার কোন অধিকার নেই—সে সুখের গর্ব্ব মেয়ে-মানুষের সাজে না। তার পর তুমি চলে গেলে···পৃথিবী পায়ের তলা থেকে সরে গেল—সামনে দেখলুম পাতালের গহ্বর ! ভয় হলো, ভাবলুম, কেউ নেই···কাকে বলবো এ দুঃখের কথা ? মার কথা মনে জেগেছিল। চিঠি লিখবো, ভেবেছিলুম। লিখতে পারিনি। মা চিঠির জবাব দেয়নি। ফেরার পথও আমি রেখে আসিনি · আমার জন্য তারা মাটিতে মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছে হয়তো ! তাদের কাছে আমি তো আর বেঁচে নেই—মরে গেছি।

একটা তীব্র কাশি। বীণার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সে কাশিতে কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল...অসহ্য যাতনা ! মাথা হেলিয়া পড়িল।

প্রভাস সস্নেহে তার মাথা তুলিয়া বালিশে রাখিল। বীণা কহিল—মরবো ভেবেছিলুম···মরা হলো না। পথে এসে দাঁড়ালুম। কেন মলুম না—জানি না।···মরতে পারিনি। পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়িয়েছি। ভাবতুম, একদিন পথে তোমায় দেখবো ; তোমার সামনে হাত পেতে দাঁড়াবো। ভিক্ষা চাইবো···তুমি দেখবে—বেশ হবে। তোমার কাছে হাত পাতবার পরে মরবো—এই কথা মনে করে বেঁচে রইলুম !···আশ্চর্য্য খেয়াল···নয় ? পথের লোক দয়ায় গলে পড়তো···ভিক্ষা দিতে এসে কেউ বা হাত চেপে ধরতো ! আমি শিউরে উঠতুম···জলে উঠতুম ! কত লোকে কত কথা বলতো, এসো গো, মাথায় তুলে রাখবো, বুকে বসিয়ে রাখবো। তাদের মারতুম—গাল দিতুম। লোকে বলতো, পাগল ! কিন্তু একদিনের জন্য পাগল হইনি।···এমনি করে কত দিন কত মাস কাটলো···শেষে এক দিন ঘুরতে ঘুরতে কি একটা যোগ ছিল, গিয়েছিলুম নদীর ঘাটে। মাটী যেন দুলে উঠলো ! দাঁড়াতে পারলুম না। পড়ে গেলুম। চারিদিক কেমন অন্ধকারে ঢেকে গেল। আলোয় চোখ মেলে দেখি, এখানে রয়েছি।···এ দুর্দ্দিনে এত দয়া কে করে ? কোনো আশা নেই···লাভ নেই—রোগীর যত দায় ঘাড়ে নিয়ে রয়েচে।···সামান্য দাসীর কাজ করে, বড্ড ভালোবাসে। আহা, ওর একটি মেয়ে ছিল··· মেয়েটির বিয়ে দিয়েছিল। স্বামী ছিল কাঠগোঁয়ার—শাশুড়ীও তেমনি। তাদের মার খেয়ে মেয়ে বাঁচলো না ; গলায় আঁচলের ফাঁশ টেনে একদিন মলো !···কজন বাঙালীর সংসারে স্ত্রীর দিন সুখে কাটে ! বরাত। এর উপর তো মানুষের হাত নেই !

বীণা চুপ করিল। কথাগুলা প্রভাস শুনিল—গভীর মনোযোগে।

বীণা আবার কথা কহিল, বলিল—তোমায় খপর দেবো না ভেবেছিলুম। কদিন এমন হলো···এ নিঃসঙ্গতা আর সইতে পারি না ! কেমন আছো, জানবার জন্য মন আকুল হয়ে উঠলো। তুমি বলেছিলে ঝামাপুকুরের বাড়ী ছেড়ে তোমরা গেছ নতুন বাড়ীতে···সিমলেয়। সেই নন্দন হোটেলে থাকতেই বলেছিলে। তাই কাল থেকে হারার মাকে মিনতি করছিলুম—একবার যাবে, মাসিমা ?···তোমায় কত কষ্ট দিলুম। বোধ হয় তুমি রাগ করেচো··· ?

করুণ নয়নে বীণা চাহিল প্রভাসের মুখের পানে। প্রভাস কহিল—এ কথা থাক, বীণা। তুমি সেরে উঠবে। আমি ডাক্তার আনবো···যত্ন করবো। এভাবে তোমার মরা হবে না—হতে পারে না।

বীণা কহিল,—বাঁচতে সাধ নেই। বেঁচে কি হবে ?··· কি নিয়ে বাঁচবো ?

প্রভাস তার মুখের পানে চাহিয়াছিল। একটা কথা ঠোঁটের ডগায়···

বীণা বুঝিল। তার প্রাণে এক ঝলক ফাগুন বাতাস বহিয়া গেল! সে কহিল—এ জীবনে আর কোনো লোভ নেই। তেমনি করে আবার যদি তুমি কাছে থাকো··· তবু না। এখন জেনেচি, মানুষের যাতে অধিকার নেই, যা তার পাবার নয়, সে-বস্তুর লোভ করলে কখনো ভালো হয় না!

প্রভাস কহিল—কোনো সাধ মনে নেই, বীণা? সত্যি বলচো? তোমার মা? বাবা?

বীণা কোনো কথা কহিল না। দুই চোখে আগ্রহ ভরিয়া প্রভাস চাহিয়া রহিল বীণার মুখের পানে।

বাহিরে পথে একটা ফিরিওয়ালা তুমুল কলরব জুড়িয়া দিয়াছিল—কে তার জিনিষ লইয়া দাম দিয়াছে কম—তাই।

নিশ্বাস ফেলিয়া বীণা কহিল,—হারার মাকে একদিন পাঠিয়েছিলুম। যে-বাড়ীতে বাবা ছিল···সে বাড়ী ছেড়ে ওরা চলে গেছে অনেক দিন। মেয়েমানুষ—কোথায় ও খোঁজ করবে!

প্রভাস কহিল—আমি তাঁদের আনবো খোঁজ করে?

—তুমি!

এই ছোট কথাটুকু প্রভাসের বুকে তীরের মত বিঁধিল। সে কহিল—পরিচয় দেবো না। বলবো, পাড়ায় থাকি। আমায় দিয়ে খপর পাঠিয়েচো।

বীণা হাসিল—মলিন হাসি!···

প্রভাস কহিল,—তুমি একটু চুপ করে থাকো। অনেক কথা কয়েচো···

বীণা কহিল—কত কথা কইতে যে ইচ্ছা করচে। পাঁচ বৎসর ধরে জমানো কত কথা!...রোগা হয়ে গেছ তুমি। শরীরে খুব অত্যাচার করচো—নিশ্চয়?

প্রভাস কহিল—কাল রাত্রে ঘুমোতে পারিনি।

—কেন?

এ প্রশ্নের জবাব প্রভাস দিতে পারিল না। শুধু কহিল—তুমি ঘুমোও। আমি তো চলে যাচ্ছি না। এর পরে কথা কয়ো···যত খুশী···

পাখা পড়িয়াছিল। বীণার মুখে ঘাম···প্রভাস পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। কপালে হাত বুলাইয়া দিল। একগোছা চুল কপালের উপর আঁটিয়া গিয়াছে ঘামে—রেশমের মত নরম সেই চুল!

বীণা ঘুমাইল। প্রভাস উঠিয়া হারার মাকে বলিল, সে যেন বীণার কাছে থাকে; প্রভাস একবার বাহিরে যাইতে চায়। ভালো একজন ডাক্তার যদি পায়···

হারার মা কহিল—স্তাখো বাবা, যদি বাঁচাতে পারো। বড় দুঃখ পেয়েছে···

প্রভাস চলিয়া গেল।···ফিরিল ক্ষণেক পরে বেদানা-আঙুর লইয়া; সঙ্গে একজন ডাক্তার।

বীণা ঘুমাইতেছে···ম্লান পুষ্প-লতা! গৃহাঙ্গনে কি পুষ্প-ভূষার সম্ভাবনা লইয়া এ লতা বাতাসে দুলিয়া বাড়িয়া উঠিতেছিল। মরীচিকার আশা জাগাইয়া সে লতাটিকে গৃহাঙ্গন হইতে তুলিয়া আনিয়া শেষে পথে ফেলিয়া তাকে দুই পায়ে মাড়াইয়া···

তোর পাপেই এ পুষ্প-লতা আজ শুকাইয়া মলিন··· মরিতে বসিয়াছে!···

বীণা ডাকিল,—মা···

সে-স্বরে প্রভাস চমকিয়া উঠিল।···

বীণার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে চোখ মেলিয়া চাহিল। চাহিবামাত্র সাম্‌নে দেখিল, ডাক্তারের অপরিচিত মুখ! সভয়ে সে কহিল,—কে?

প্রভাস কহিল,—ইনি ডাক্তার। আমি এঁকে এনেচি।

বীণা পাশ ফিরিয়া শুইল, ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল,—কে বলেছিল আনতে? এনে কি হবে?···

রোগীকে দেখিয়া ডাক্তার যে-কথা বলিলেন, তাহাতে প্রভাস বুঝিল, দীপে তৈল নাই! কি করিয়া জ্বলিতেছে, আশ্চর্য্য! যে কোনো ক্ষণে এ-দীপ নিবিতে পারে!··· চিকিৎসার প্রয়াস মিথ্যা। শুধু মনকে ফাঁকি দেওয়া!

প্রভাস স্থির করিল—বীণার মা-বাপকে খবর দিবে। নাম-ঠিকানা সে জানে; বীণার কাছে শুনিয়াছিল। কিন্তু এখন তাঁরা সেখানে নাই! বাঁচিয়া আছেন তো?

সেই রাত্রেই সে গেল পুরানো ঠিকানায়। বীণার বাপের নাম জগদীশ বাবু। সে বাসায় তিনি নাই; উঠিয়া গিয়াছেন বেণেটোলায়।

প্রভাস বেণেটোলায় গেল। গিয়া শুনিল, সেখান হইতে পাঁচ মাস পূর্ব্বে উঠিয়া জগদীশ বাবু সপরিবারে গিয়াছেন লেকের দিকে। নূতন বাড়ী তৈয়ার করিয়াছেন, সেই বাড়ীতে। সেখানকার ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া ট্যাক্সি লইয়া সে ছুটিল লেকের দিকে।

বাড়ী মিলিল। তখন রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। জগদীশ বাবুর সঙ্গে দেখা হইল। সংবাদ শুনিয়া রুক্ষ স্বরে তিনি কহিলেন,—সে মেয়ে মরে গেছে অনেক দিন আগে। তার সঙ্গে আজ আবার দেখা করবো কি! না! আমাকে সমাজে বাস করতে হয়। আরো পাঁচটা ছেলে-মেয়ে আছে, জ্ঞাত-কুটুম আছে, বন্ধু-বান্ধব আছে। না।

প্রভাস কাকুতি করিল, মিনতি করিল। জগদীশ বাবুর এক জবাব। অবিচল স্বরে তিনি শুধু কহিলেন,—না।

প্রভাসের রাগ হইল। কিন্তু রাগ করিয়া লাভ নাই। তাছাড়া এ দায় তার।

প্রভাস চলিয়া আসিতেছিল।

ট্যাক্সির কল বিগড়াইয়াছে; কোনোমতে ষ্টার্ট হয় না। প্রভাস কহিল,—তোর ভাড়া নে। আমি অন্য ট্যাক্সি ডাকি।

তাকে ভাড়া চুকাইয়া প্রভাস দ্বিতীয় ট্যাক্সির সন্ধানে অগ্রসর হইবে, একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল,—মা-ঠাকরুণ একবার আপনাকে ডাকচেন।

প্রভাস ফিরিল। মা ঠাকুরাণী সত্যই ডাকিতেছিলেন।

তিনি প্রশ্ন করিলেন,—বেঁচে আছে?

প্রভাস কহিল,—আছে। তবে কতক্ষণ আর থাকবে, বলা যায় না। ডাক্তাররা কোনো আশা দেয় না। মরবার সময় আপনাদের একবার দেখতে চায়।...

মা নিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন,—একবার মৃত্যু-শোক দিয়ে তো চলে গেছে—আবার নতুন করে সে শোক... না বাবা, আমি যেতে পারবো না। এইখান থেকে আশীর্ব্বাদ করচি—তাকে বলো—আমি মা...এ-জন্মের পাপ যেন এই যাতনা-ভোগেই তার মুছে যায়!

প্রভাস কহিল,—একবারটি যদি যেতে পারতেন! যত দোষ করে থাকুক—তবু আপনি মা...

মায়ের চোখে জল দেখা দিল। মা বলিলেন—না বাবা। সে মুখ আজ আর আমি দেখতে পারবো না। জানি, বদ্ স্বামী...তবু স্বামী। জ্বালা যদি এমন অসহ হয়েছিল, আমার কোল ছিল, বুক ছিল, সেখানে ফিরে আসতে পারতো! এ সে কি করলে! এমন শিক্ষা তো তাকে কোনোদিন দিইনি বাবা। তুমি সব জানো না, বাবা...কি আদরের মেয়ে সে ছিল...কি গুণ তার ছিল ..

মায়ের চোখে অশ্রুর বন্যা বহিল।

প্রভাস কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এত বড় ট্রাজেডির মূল সে...সে...সে! যৌবনের একটা তুচ্ছ খেয়াল মিটাইতে বীণাকে কি-শিকড় ছিঁড়িয়া কোথায় সে টানিয়া আনিয়াছে। কি দিবে বলিয়া আনিয়াছিল? কি দিয়াছে? দুদিন শুধু দুটা প্রণয়-বচন... দুটা চুমু... বুক-ভরা আলিঙ্গন! মানুষের জীবনে সেইটাই সব-চেয়ে বড় পাওয়া? তাও যা দিয়াছিল—কতটুকু! কি মনে করিয়া দিয়াছিল? যা দিয়াছিল, এ কি তার তৃপ্তির জন্য? না, তাহাতে নিজেই সম্ভোগ-তৃপ্তিতে মাতিয়া মশগুল হইয়াছে! এ তো তাকে দয়া নয়, করুণা নয়, ভালোবাসা নয়; এ যে তার কিছু-না-জানা সরল মনের উপর দাঁড়াইয়া শুধু পিশাচের মত নৃত্য! তার এ দুর্বৃত্ততার কি ক্ষমা আছে!

সহসা পাশের ঘর হইতে কে ডাকিল—মা...

মা বলিলেন—সুধা...

অন্তরাল-বর্ত্তিনী কহিল—বাবা বলচে, তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি যেতে পারো মেজদিকে দেখতে। বাবা যাবে না।...

প্রভাস কহিল—দয়া করে চলুন, মা। আপনার পায়ে পড়ি...

মা বলিলেন—যাবো। আমার প্রাণ মানচে না। চলো বাবা, আমাকে নিয়ে।

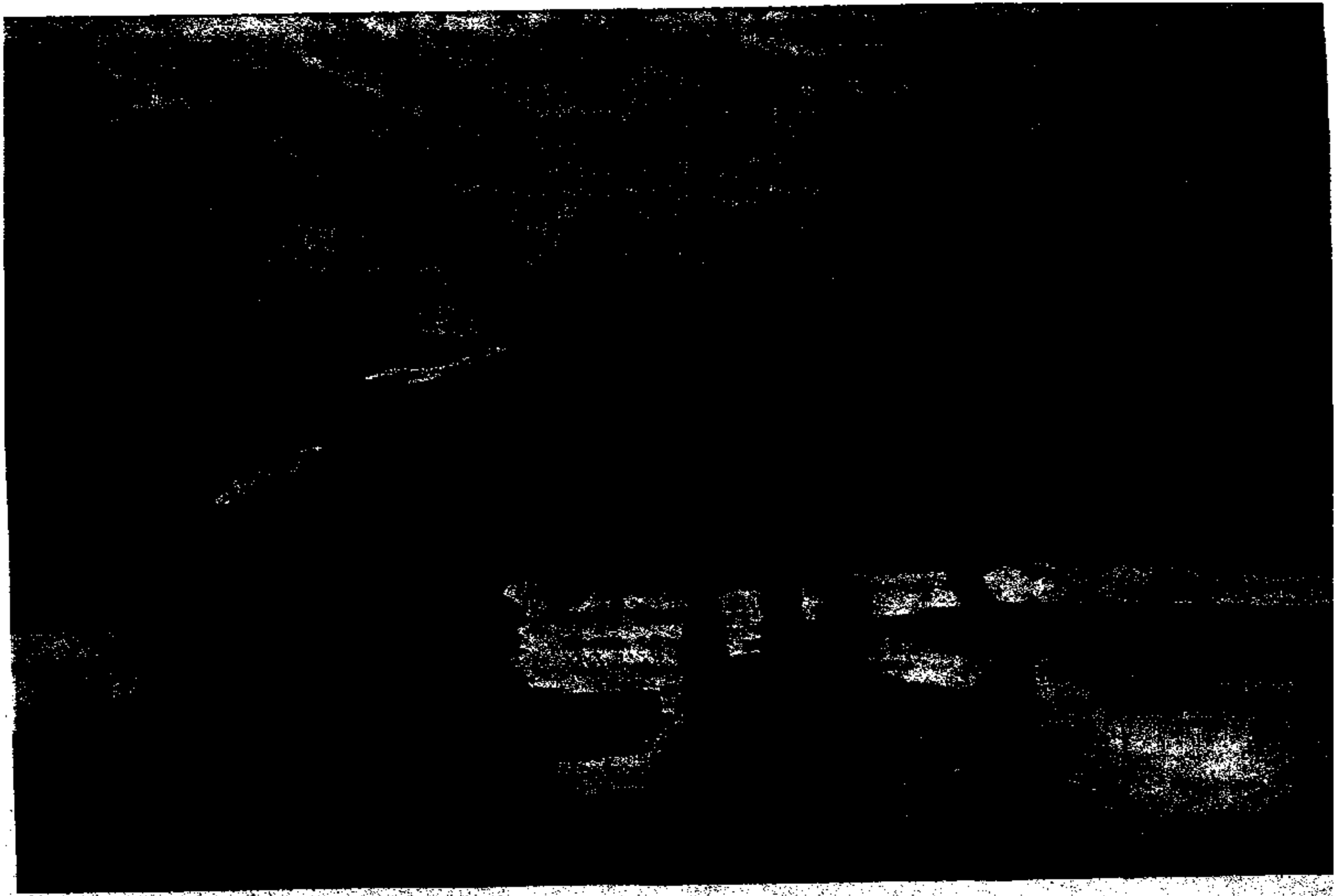
১৪

ট্যাক্সি আসিল। মা চলিলেন। মায়ের সঙ্গে চলিল সুধা; নিষেধ মানিল না। মেজদি, তার মেজদি!...

সুধা কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল।

সেই বস্তী। পাশের বাড়ীর ঘড়িতে ঢং-ঢং করিয়া এগারোটা বাজিল।

প্রভাস কহিল—এই বাড়ী।



বসুমতী-চিত্র-বিভাগ] খেলার সাথী [শিল্পী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মা চমকিয়া উঠিলেন। এ কি বাড়ী!

বীণা ঘুমাইতেছিল; পাশে বসিয়া হারার মা পাখার বাতাস করিতেছে।

প্রভাস আসিয়া কহিল—তুমি যাও। আমার হাতে পাখা দাও। ওঁর মা এসেচেন, বোন এসেচেন।

হারার মার হাত হইতে পাখা লইয়া প্রভাস ডাকিল,—বীণা···

শিহরিয়া বীণা কহিল,—উঁ···

প্রভাস কহিল,—মা এসেচেন।

বীণার চোখে আকুল দৃষ্টি! ক্ষীণ স্বরে বীণা ডাকিল,—মা···

মা আসিয়া শিয়রে বসিলেন; বীণার মাথা নিজের কোলে তুলিয়া লইলেন। সুধা আসিয়া কাঁদিয়া ডাকিল,—মেজদি···

—সুধা! আয় ভাই···

সুধা আসিয়া পাশে বসিল। বীণা হাত তুলিতে গেল, পারিল না; সুধা মেজদির হাত দু'হাতে চাপিয়া ধরিল। তার দুই চোখে অশ্রুর ঝর্ণা!

কাহারো মুখে কথা নাই। মা ও সুধার চোখে জলের ধারা ফুরাইতে চায় না।

বাহিরে পথে একখানা ছ্যাকড়া গাড়ী ছড়-ছড় শব্দে ছুটিয়া গেল···তার পর একখানা ট্যাক্সি তীব্রবেগে ভেঁপু বাজাইয়া।

ঘরের দেওয়ালে পিঠ ঠেশিয়া বসিয়া হারার মা বেদানা ভাঙ্গিতেছে; সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রভাস একগাদা বেদানা, আঙুর কিনিয়া দিয়া গিয়াছে।

প্রভাসের হাতে পাখা···পাখা নাড়িয়া সে বাতাস করিতেছিল।

প্রভাস ডাকিল,—বীণা···

বীণা তার পানে চাহিল।

প্রভাস কহিল,—মা এসেচেন। তোমার বোন এসেচেন। দেখেচো?

বীণা মাথা নাড়িয়া জানাইল, দেখিয়াছে।

বীণার কথা কহিবার শক্তি তখন লোপ পাইয়াছে প্রভাস বুঝিল। ডাক্তার এমনি কথাই বলিয়া গিয়াছেন। সহসা···তবে কি এ দীপ···

বাষ্পাদ্র কণ্ঠে প্রভাস কহিল—আমায় তুমি মাপ করেচো, বীণা? বলো। এমন হবে, আমি সত্যি বুঝিনি···

বীণা জবাব দিল না···

মায়ের চোখে জল সহসা স্তম্ভিত হইল। মা চাহিলেন প্রভাসের পানে; কহিলেন,—তুমি!···তুমিই সে!···যাও, যাও, এখনি বেরিয়ে যাও এ-ঘর থেকে। এ সময়ে ওর পাশে থেকে ওর পর-কালটা আর নষ্ট করো না। যাও···

আদেশ। রূঢ় স্বর। প্রভাসের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। ভয়ে বুক কাঁপিল। পাখাখানা তার হাত হইতে সবলে ছিনাইয়া মা কহিলেন—খবদ্দার, ওর বিছানা ছুঁয়ে থেকো না—ওকে ছুঁয়ে থেকো না। এ ঘরে নয়···এখনি তুমি চলে যাও। এ সময়ে ওকে ওর মায়ের কোলে থাকতে দাও···যে কোলে এসেছিল নিষ্পাপ নির্ম্মল। যাও, বলচি।

নিঃশব্দে বেত্রাহতের মত প্রভাস সে ঘর হইতে বাহিরে আসিল।

তারপর বীণার সহিত জীবনে তার আর দেখা হয় নাই।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।





প্রাচীন ভারতের প্রসাধন দ্রব্যাদি

সভ্যতার আদিম যুগ হইতে দেখা যায় যে, সর্ব্বদেশে ও সকল সময়ে রমণীগণ সাধারণ বেশ-ভূষা ব্যতীত অন্যান্য উপায়েও দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া পুরুষের চিত্তাকর্ষণের চেষ্টা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ শরীরের চর্ম্ম, মুখ, কেশ, চক্ষু, অধর, করতল, নখ, স্তন, পদ প্রভৃতি প্রত্যঙ্গের সৌকুমার্য্য-সাধনার্থ নানা দেশে নানা প্রকার প্রসাধন-ক্রিয়ার প্রচলন রহিয়াছে। এইরূপ কার্য্যের জন্য উদ্ভিজ্জ, প্রাণিজ, খনিজ—সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভারত ব্যতীত প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস, রোমক সাম্রাজ্য প্রভৃতিতেও বর্ত্তমান সময়াপেক্ষা প্রসাধনের বাহুল্য কিছু কম ছিল না। প্রাচীন ও আধুনিক কালের প্রসাধন-দ্রব্যাদির মধ্যে মূল প্রভেদ এই যে, সে কালে অনেক দ্রব্যই কাচা অবস্থায় (Raw products) প্রয়োগ করা হইত; এখন তাহার পরিবর্ত্তে উক্ত দ্রব্যাদির নূতন নূতন প্রয়োগরূপ (preparations) অবলম্বিত হইয়াছে। প্রসাধনের কতকগুলি দিক কেবল বহু দেশের মধ্যে সাধারণ এবং স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত আজ কাঠ, ফুল, নির্য্যাস ইত্যাদি হইতে গন্ধদ্রব্যের সার নিষ্কাশন করার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে; এবং প্রসাধনদ্রব্য-প্রস্তুতকারিগণ তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া, উক্তরূপ গন্ধসারকে ভিত্তি করিয়া নানা প্রকার মনোমুগ্ধকর প্রসাধন-সামগ্রী সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন।

প্রসাধন-দ্রব্যাদির প্রয়োগরূপ

প্রাচীন ভারতে নানাবিধ দ্রব্যই প্রসাধনকার্য্যে ব্যবহৃত হইত; তাহার মধ্যে অনেকগুলি আবার দেবপূজারও উপকরণ ছিল। কালক্রমে সামাজিক অবস্থা ও রুচির পরিবর্ত্তনের সহিত কতকগুলি দ্রব্য প্রসাধনকার্য্যে আর তেমন বহু বিস্তৃতভাবে ব্যবহৃত হয় না বটে, কিন্তু সেইরূপ দ্রব্যের মধ্যে কতিপয় দেব-পূজার অঙ্গরূপে থাকিয়া গিয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত কতিপয় দ্রব্য, যৎসমুদয় প্রসাধন ক্ষেত্র হইতে অদৃশ্য হইয়াছে, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, মধ্য-ভারত, গুজরাট প্রভৃতি দেশের প্রসিদ্ধ দেব-মন্দির-সমূহে তাহাদিগের সন্ধান এখনও পাওয়া যায়; সেগুলি এখনও দেব-দেবীগণের পূজা, অর্চ্চনা, আরতি ইত্যাদির সামগ্রীরূপে বিরাজমান।

পূর্ব্বে প্রসাধন-দ্রব্যাদি কিরূপভাবে ব্যবহৃত হইত, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে প্রথমে দৃষ্ট হয় যে, ইহাদিগকে কয়েকটি বিশিষ্ট রূপে প্রস্তুত করিয়া কার্য্যে প্রয়োগ করা হইত। যথা—

১। চূর্ণ।—আজ-কাল মুখমণ্ডল ও গ্রীবাদেশের শোভা সম্পাদনের জন্য শ্বেত (Face powder) অথবা ঈষৎ রঙ্গীন (Rouge) চূর্ণ ব্যবহৃত হয়। ভারতে গন্ধদ্রব্য-চূর্ণের ব্যবহার আরও বিস্তৃত ছিল। বস্ত্রাদি সুগন্ধকরণ, কেশ প্রক্ষালন, গাত্র-পরিষ্করণ ও আলপনা অঙ্কন প্রভৃতি কার্য্যে বিবিধ প্রকার চূর্ণ আবশ্যক হইত। পূজায় পঞ্চগুঁড়ি ও দোলে আবীর এখনও সেই পুরাতন প্রথা স্মরণ করাইয়া দেয়। গন্ধ, বর্ণ ও উপকরণের তারতম্যে কয়েক প্রকার নিম্ন ও উচ্চ শ্রেণীর চূর্ণ এখনও পর্য্যাপ্ত প্রচলিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে দু'একটি প্রসিদ্ধ চূর্ণের নাম ও উপকরণাদি এ স্থলে উল্লিখিত হইল। বলা আবশ্যক যে, বর্ত্তমান সময়ের চূর্ণ প্রস্তুত প্রথার সহিত পুরাকালের প্রথার বিশেষ প্রভেদ নাই। এখন Steatite অথবা অন্য কোন দ্রব্যের লঘু ও সূক্ষ্ম চূর্ণকে জমি করিয়া উহার সহিত নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ সুগন্ধ বায়ী তৈল মিশাইয়া, উহাকে বারংবার ছাঁকিয়া মুখশোভন চূর্ণ (Face powder) প্রস্তুত হয়, সে সময়ে বায়ী তৈল-নিষ্কাশন প্রথা অপরিজ্ঞাত থাকায়, অথবা উহা সাধারণের পক্ষে জটিল প্রতিপন্ন হওয়ায় গন্ধদ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ ঐ কোনপ্রকার গুঁড়ির সহিত মিশ্রিত করা হইত। এইরূপ চূর্ণের উদাহরণ—

(১) শ্বেত চূর্ণ—উহাতে খস্‌খস, কর্পূর-কাচ্‌রী এবং চন্দনকাষ্ঠ-চূর্ণ, তিক্ষুর অথবা জোয়ারগুঁড়ির সহিত মিশা-

থাকে। (২) উত্তর-ভারতের ঘিসিচূর্ণ—উপরি-উক্ত গন্ধ-দ্রব্যাদি ব্যতিরেকে ইহাতে আয়ুক্কল, দোনা, দেবদারুকাষ্ঠ, লবঙ্গ ও এলাচিচূর্ণ আছে ; এই সমুদয় চূর্ণ শঠীর গুঁড়ির সহিত মিশ্রিত। (৩) দাক্ষিণাত্যে বুক্কনামক চূর্ণে ঘিসিচূর্ণের উপাদান-সমূহের সহিত অগুরু, কুড়, জটামাংসী ও শিলারসও যোগ করা হয়। জৈন সম্প্রদায় পূজাদি উপলক্ষে যে (৪) বাসক্ষেপ নামক চূর্ণ ব্যবহার করেন, তাহার উপাদান চন্দন, কুঙ্কুম, মৃগনাভি ও ভীমসেনী কর্পূর। উত্তর-ভারতের উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া উপলক্ষে অঙ্গরাগ অথবা চূর্ণসংমিশ্রণ দ্বারা শরীরের শোভা-বর্দ্ধনের প্রথা আছে। মূল্যবান্ বস্ত্রাদি সদ্গন্ধযুক্ত ও কীটাক্রমণ নিবারণ করিবার জন্য স্বকীয় রুচি অনুসারে কয়েকটি গন্ধদ্রব্যের প্রয়োগ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে সাধারণ।

২। লেপন :—লেপন প্রথাতেও পূর্ব্বে অনেক প্রসাধন-দ্রব্য ব্যবহৃত হইত ; তাহাদের মধ্যে অনেকগুলির নাম অতীতের অন্ধকারে বিলীন হইয়াছে। কিন্তু এখনও দেব-দেবীর পূজায় সর্ব্বৌষধিবর্গীয় যে সমস্ত গন্ধদ্রব্যের প্রচলন আছে, সেইগুলি পূর্ব্বকালে গাত্র-সুরভিত ও সম্মার্জ্জিত করিবার জন্য যে যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োগ করা হইত, তাহা সহজে অনুমান করিতে পারা যায়। জটামাংসী, বচ, কুড়, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, চম্পক ও মুথা এইরূপ দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম। এইগুলি উত্তমরূপে বাটিয়া গায়ে মাখাইয়া কিছুক্ষণের জন্য রাখা হইত ; পরে মুছিয়া ফেলিয়া আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা পরিষ্কার করিয়া লইলে বর্ণের উজ্জ্বলতা, চর্ম্মের মসৃণতা ও দেহের সদ্গন্ধ সমস্তই একাধারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত। সাবান ও ক্রীমে যে কার্য্য সাধিত হয়, তদপেক্ষা উত্তমরূপ লেপ দ্বারা যে কম ফল পাওয়া যাইত, তাহা বোধ হয় না। এখন কেবল বিবাহ উপলক্ষে গাত্রহরিদ্রার চলন আছে। সে কালে গায়ে হরিদ্রালেপ প্রায়ই দেওয়া হইত এবং সন্ধ্যাগমে হরিদ্রা-জল দ্বারা মুখ মুছিয়া ফেলার রীতিও ছিল ; সেই জন্য হরিদ্রার অন্য নাম নিশা, রজনী। রমণীগণের বক্ষে কুঙ্কুম ও চন্দনের পত্রলেখা রচনা এবং পুরুষের ভালে চন্দন-লেপন তখন প্রসাধনের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল।

৩। তৈল :—তিলই ভারতের সর্ব্বপ্রাচীন তৈল-উপাদান, ইহাকে বিবিধ গন্ধদ্রব্য সাহায্যে সুবাসিত করিয়া পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত। কিরূপ প্রথায় এইরূপ সুবাসিত তৈল প্রস্তুত হইত, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ আছে। এখনও পর্য্যন্ত কতকগুলি মসলা তৈলে ভিজাইয়া সুগন্ধযুক্ত তৈল প্রস্তুতের চলন উঠিয়া যায় নাই। মাথা ঘষার মশলা তাহার একটি দৃষ্টান্ত। দেশভেদে উক্ত মশলার উপকরণ-সমূহ বিভিন্নরূপ, কিন্তু সাধারণতঃ প্রায় সকলেই নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে—আয়ুক্কল, একাঙ্গী বা চন্দ্রমূল, খস্‌খস্, জটামাংসী, কুড়, নাগরমুথা ও দোনা। এইরূপ তৈলকে পূর্ব্বে রতনজোত মূল দ্বারা লাল রং করা হইত। আয়ুর্ব্বেদে অনেক-গুলি তৈলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ; তাহার মধ্যে কেবলমাত্র একটি কেশতৈল বলিয়া গণ্য হইতে পারে, উহা ভৃঙ্গরাজ তৈল। ভৃঙ্গরাজ অথবা কেশরাজ নামে দেশভেদে দুইটি উদ্ভিদ ব্যবহৃত হয়। প্রকৃত কেশরাজ আমাদের সাধারণ বন্য উদ্ভিদ—কেসুত্তে (Eclipta Alba) উল্‌কি তোলাতেই ইহার ব্যবহার ছিল অধিক। ভাঙ্গড়া অথবা ভৃঙ্গরাজের (Wedelia caledulacea) কেশতৈলের মশলারূপে বঙ্গদেশে বরাবরই খ্যাতি আছে। ইহার দ্বারা চুলের অকাল-পক্কতা নিবারিত হয়, চুল বৃদ্ধি পায় এবং কেশের বর্ণও ঘন কৃষ্ণ হইয়া থাকে।

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে কতকগুলি গন্ধদ্রব্যের তৈলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ; এইগুলি কি প্রথায় প্রস্তুত হইত, তাহা সঠিক বলা দুরূহ। মাথা-ঘষার ন্যায় গন্ধদ্রব্য তৈলে কিছুদিনের জন্য ভিজাইয়া রাখিলে উহার গন্ধ তৈলে প্রবেশ করিয়া তৈলকে সুরভিত করিয়া তুলে। ইহাকে নিমজ্জন (Maceration) প্রথা বলিতে পারা যায়। কনৌজ গন্ধ-সারাদি প্রস্তুতের একটি প্রাচীন কেন্দ্র ; এ স্থলে চামেলি-তৈল, বেলা-তৈল প্রভৃতি প্রস্তুতের সাধারণ নিয়ম এই যে, এক স্তর গোটা অথবা কুট্টিত তিলের উপর ফুল বিছাইয়া দেওয়া হয় ; এক স্তর পুষ্পের গন্ধ শোষিত হইয়া গেলে তাহা ফেলিয়া দিয়া আবার এক স্তর ফুল দেওয়া হইয়া থাকে। এইরূপে বারম্বার ফুলের গন্ধ শোষণ করিয়া তিল যখন খুব সুরভিত হইয়া উঠে, তখন উহার তৈল ঘানির দ্বারা নিষ্কাশন করিয়া লওয়া হয়। ইহা শোষণপ্রথাবিশেষ। বর্ত্তমান সময়ে Enfluerage প্রথাও সমশ্রেণীয় ; কেবলমাত্র ইহাতে তৈল-বীজের পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ মোম ব্যবহৃত হয়। পরে উহা হইতে গন্ধ পৃথক্ করিয়া লওয়া হইয়া থাকে।

এই উভয় প্রথাতেই পূর্ব্বে যে অনেক সুগন্ধ তৈল প্রস্তুত,

হইত, তাহা সহজে অনুমান করা যায়। গন্ধদ্রব্য চুয়াইয়া তৈল নিষ্কাশনের প্রথা (Distillation) প্রাচীনরা বোধ হয় জানিতেন না, কিম্বা জানিলেও উক্তরূপ জ্ঞান মধ্যে কয়েক শতাব্দীর জন্য লোপ পাইয়াছিল। আরবগণ উহার পুনরুদ্ধার করেন। Volatile Oils নামক প্রামাণিক গ্রন্থপ্রণেতাদ্বয়ও (Gildemeister and Hoffmann) এইরূপ মত পরিপোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন—"Although in all probability the Indians, the Babylonians and especially the Egyptians were acquainted with the art of distiliation also with volatile oils, a sharp distinction between true distilled oils and aromatised fatty oils does not seem to have existed at the beginning of the Christian era"—অর্থাৎ, যদিও ইহা খুব সম্ভবপর যে, ভারত, ব্যাবিলন ও মিশরবাসিগণ পরিস্রুতকরণ-প্রণালী ও বাষ্পী তৈল-সমূহের সহিত পরিচিত ছিলেন, তথাপি খৃষ্টীয় যুগের প্রারম্ভে পরিস্রুত ও সুগন্ধীকৃত বসাযুক্ত তৈলের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ ধরা হইত বলিয়া বোধ হয় না। বস্তুতঃ আরব গ্রন্থকার-গণের পূর্ব্বে কোন গন্ধদ্রব্য পরিস্রুতকরণপ্রণালীর বিশেষ বিবরণ কোন জাতির সাহিত্য অথবা বিজ্ঞান-গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত হইতে দেখা যায় না। তৈল প্রসঙ্গে ইহা বলা দরকার যে, পূর্ব্বে Pomade, Brilliantine প্রভৃতি না থাকিলেও সুন্দরীগণ মোম দিয়া চুলের পাটি পাড়ার কার্য্য সম্পাদন করিতেন। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেও এই কার্য্যের উপযোগী মোমের বাতি বাজারে পাওয়া যাইত।

৪। ধূমপ্রয়োগঃ—নানাবিধ গন্ধদ্রব্য হইতে প্রস্তুত ধূপ জ্বালাইয়া কিম্বা অগ্নিপাত্রে চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া সুগন্ধ উৎপাদন বহুকাল হইতে এবং বহু জাতির মধ্যে দেবদেবী-পূজার একটি বিশেষ অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। প্রসাধন-কার্য্যে এই প্রথার সুযোগ গ্রহণ করিতে প্রাচীনরাও ছাড়েন নাই। তখনকার দিনে রূপসীরা ধারাযন্ত্রে (Shower Bath বিশেষ) স্নানের পর কেশপাশে ধূপের ধূম প্রয়োগ করিয়া সুবাসিত করিতেন বলিয়া নানা সাহিত্য গ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন বস্ত্রাদিও গন্ধদ্রব্যের ধূম দ্বারা সুবাসিত হইত। এখনকার সময় নাট্যশালা, সভাগৃহ ইত্যাদি জনসমাগমস্থলে যে বিশেষ বিশেষ চূর্ণ অথবা গন্ধসারের ধূম প্রয়োগ করিয়া বায়ুমণ্ডল বিশুদ্ধ ও মনোরম গন্ধযুক্ত করা হয়, তাহা পুরাতন ধূমপ্রয়োগ প্রথার রূপান্তর মাত্র। সাধারণ উচ্চশ্রেণীর ধূপের উপাদানের মধ্যে অগুরু, চন্দন ও গুগ্‌গুল অন্যতম। কুড়ও এক সময়ে ধূপে যথেষ্ট ব্যবহৃত হইত; মহার্ঘ পদার্থ বলিয়া এখন আর উহার এতদ্দেশে তত ব্যবহার নাই; কিন্তু চীনদেশে বৌদ্ধ মন্দিরসমূহ সুরভিত করিবার জন্য ইহা বহুল পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে।

প্রসাধনে রঞ্জন-প্রথা

রূপচ্ছটা পূর্ণমাত্রায় বিকসিত করিবার জন্য প্রত্যঙ্গবিশেষ রঞ্জন করার প্রথা চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন হিন্দু সমাজে এই শ্রেণীর দ্রব্যের মধ্যে লাক্ষা ও কজ্জল অথবা অঞ্জনের যথেষ্ট চলন ছিল। লাক্ষা-রং অথবা অলক্তকের দ্বারা চরণ রাঙ্গাইবার প্রথা বহু পুরাতন। এখন আর দেশীয় আলতার তত কাটতি নাই। তাহার স্থান বিলাতী কৃত্রিম রং মিশ্রণে প্রস্তুত "তরল আলতা" দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। হিন্দুগণের কজ্জল কিম্বা অঞ্জন এবং মুসলমানগণের সুর্ম্মার মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। চক্ষুর কজ্জলের জন্য স্রোতাঞ্জন অর্থাৎ Antimony sulphide অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু এখন বাজারে তৎপরিবর্ত্তে Lead sulphideই বেশী দেখা যায়। দুই এক প্রকার উদ্ভিদের মূল হইতে (Geranium, Coptis ইত্যাদি) উজ্জ্বল পীতবর্ণ পাওয়া যায়, এইগুলি অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করা হয়; কিন্তু ইহাদের ব্যবহার মুসলমানগণের মধ্যেই অধিক। সীমন্তে সিন্দূরবিন্দুও প্রকৃতপ্রস্তাবে রঞ্জক পদার্থের দ্বারা শোভাবর্দ্ধনের প্রয়াস—যদিও ইহা সামান্য মাত্রাতেই ব্যবহৃত হয়। কোন্ সময় হইতে কপালে সিন্দূরবিন্দু যে হিন্দু সধবা স্ত্রীলোকগণের লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা বলা যায় না; তবে বহুদিন হইতে ইহা যে ভারতের নানা স্থানে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। পাণ, সুপারি, চূণ ও খদিরের অবশ্য নানাবিধ গুণ আছে, কিন্তু ইহা খুব সম্ভবপর যে, অধর উজ্জ্বল রক্তরাগে রঞ্জিত করিয়া মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য পাণের ব্যবহার প্রথমতঃ আরম্ভ হয়। সুশ্রুত সংহিতায় পাণের উল্লেখ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীতেও পাণ ভারতে

বিশেষ পরিচিত ছিল; সুপারিও তদ্রূপ পুরাতন; ইহা ভারত হইতেই চীনে প্রবর্ত্তিত হয়। পান ও সুপারি উভয়ই মুখের দুর্গন্ধ-নাশক ও অল্পবিস্তর কামোদ্দীপক। সুপারি ও খদিরের দাঁতের মাড়ি দৃঢ় করিবার ক্ষমতাও আছে। ফলতঃ হালফ্যাসনের বিলাসিনীগণের মধ্যে কেহ কেহ পানের পক্ষপাতী না হইলেও পুরাকালের রূপসী মহলে তাম্বুল-রাগ-রঞ্জিত অধর ব্যতীত প্রসাধন-ক্রিয়া কখনই সম্পূর্ণতা লাভ করিত না।

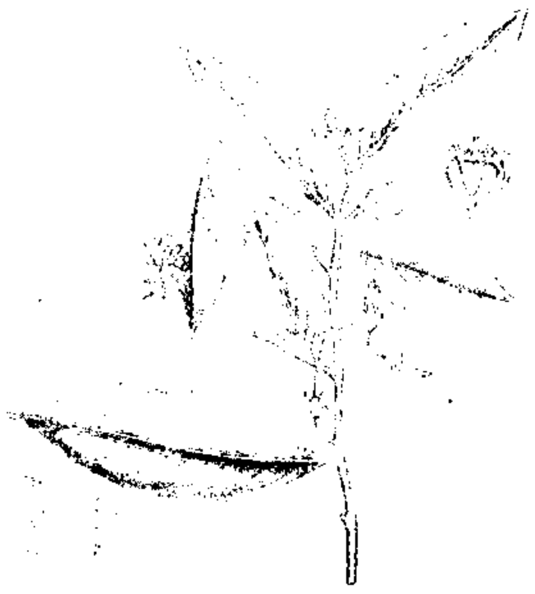
সাবান পরিবর্ত্ত

পূর্ব্বকালে অবশ্য সাবান ছিল না,—কিন্তু তাহা বলিয়া যে গাত্র অপরিষ্কৃত থাকিত, তাহা বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। হরিদ্রাবাটা, কয়েক প্রকারের ডাল-চূর্ণ, ক্ষার, তৈল, দুই এক রকমের ফেনিল মৃত্তিকা ইত্যাদি এখনও ভারতের স্থানে স্থানে সাবানের পরিবর্ত্তরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ-গুলির ব্যবহার পূর্ব্বে অনেক বেশী ছিল। এই প্রসঙ্গে আর একটি দ্রব্যের উল্লেখ করিতে পারা যায়। উহা বেলের শাঁস। একটি পক্ব বেলকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়; উহা ফাটিয়া গেলে ভিতর হইতে শাঁস বাহির করিয়া, বীজ ও আঁশ প্রভৃতি ছাঁকিয়া ফেলিয়া দিয়া, গাত্রে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া স্নান করা হইয়া থাকে। তাহার ফলে চর্ম্ম মসৃণ ও স্নিগ্ধ হয়। বেলের পিচ্ছিল আঠাবৎ পদার্থ ই (mucilage) চর্ম্ম-পরিষ্কারকরূপে কার্য্য করে। মাদ্রাজে মদুরা অঞ্চলে বোরা সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রথার চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

গন্ধদ্রব্যাদির পরিচয়

পুরাকালে কিরূপ প্রণালীতে প্রসাধনের জন্য নানাবিধ দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হইত, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইল। এক্ষণে পাঠকবর্গের অবগতির জন্য দ্রব্যগুলির কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। প্রসাধন উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত দ্রব্যাদিকে স্থূলতঃ দুইটি ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। কতকগুলির ব্যবহার খুবই প্রাচীন এবং ভারত হইতে এইগুলি অতীত-কালে নানা দূরদেশে যাইত; এই প্রকার দ্রব্যাদিকে মুখ্য গন্ধদ্রব্য বলিয়া অভিহিত করা যায়; অন্যগুলির ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম—ইহারা গৌণ গন্ধদ্রব্য বিভাগের অন্তর্গত; নিম্নে উভয় বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হইতেছে:—

অগুরু—অগুরু, কালাগুরু, বংশিকা—**Aquillaria agallocha**; বঙ্গের পূর্ব্ব-সীমান্তে, আসাম ও ব্রহ্মদেশের স্থানে স্থানে ইহা জন্মায়। কাণ্ড ও শাখার মধ্যে রজন-সদৃশ, কৃষ্ণবর্ণ, গুরুগন্ধ পদার্থ সঞ্চিত হয়; উহাই প্রকৃত অগুরু (কালাগুরু); আর এক প্রকার লঘু অগুরু আছে।



অগুরু বৃক্ষ

ধূপে, তৈলে এবং চূর্ণ ও চূর্ণরূপে ইহা ব্যবহৃত হইত; শ্রীহট্টের অগুরুই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

কর্পূর কাচরী,—কর্পূর কচ্চালী—Hedychium spicatum। ইহা হরিদ্রাবর্গীয় গাছ; পূর্ব্ব-হিমালয়ের নিম্নাংশে আর্দ্র অঞ্চলে সুলভ। মূল হইতে সমধিক মাত্রায় সুগন্ধযুক্ত শ্বেতসার পাওয়া যায়; উহা সুবাসিত চূর্ণের প্রধান উপাদান। চীনদেশ হইতেও এক প্রকার কর্পূর কাচরী আইসে।

কুঙ্কুম, কেশর, জাফ্রান—Croccus sativus—ভারতের মধ্যে ইহার কেবলমাত্র উৎপাদনকেন্দ্র কাশ্মীরে শ্রীনগরের নিকটবর্ত্তী পাম্পুর নামক স্থান। পূর্ব্বে ইহা পারস্য দেশ হইতে আসিত এবং এখন প্রধানতঃ স্পেন হইতে

আসে। সংস্কৃত সাহিত্যে বহুস্থানে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। গাত্র সুরভিত ও উজ্জ্বল করিবার জন্য ইহার লেপের ব্যবহার ছিল অধিক।



কুঙ্কুম গাছ

কুড়—Saussurea Lappa—কুঙ্কুমের ন্যায় ইহাও একমাত্র কাশ্মীরে জন্মিয়া থাকে। ইহা ভারতের একটি সর্ব্বপ্রাচীন গন্ধদ্রব্য। কেশ ধৌত ও সুগন্ধ করার চূর্ণে ও ধূপে ইহার প্রয়োগ অধিক। ইহার জীবাণুনাশক ক্ষমতাও আছে।

খস্‌খস্। উশীর—Vetiveria Zizanoides—বৈদিক যুগেও ইহা বিশেষ পরিচিত ছিল, এবং পরে ইহার ব্যবসায়িক প্রাধান্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, ইহার মূল রপ্তানীর উপর শুল্ক আদায় হইত; এখনও ইহার রপ্তানী কম নয়; স্নিগ্ধকারক লেপে ও তৈলেই ইহার ব্যবহার বেশী।



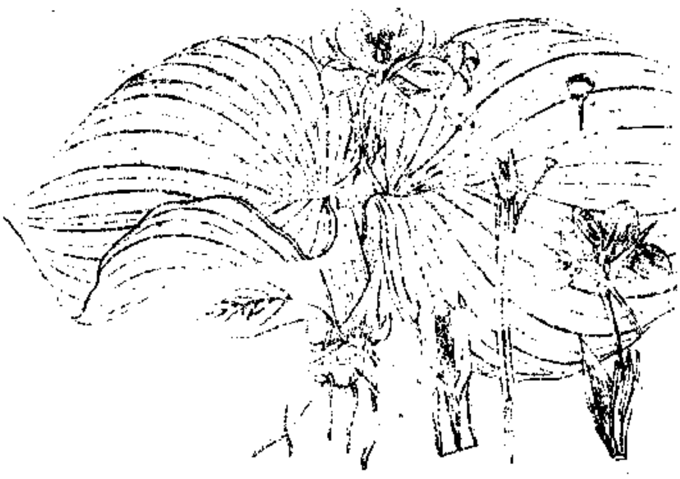
খস্‌খস্ তৃণ

চন্দন, মলয়জ—Santalum album—অথর্ববেদে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। চূর্ণ, লেপ ও সুগন্ধ তৈলের মশলা-রূপে ইহার ব্যবহারের প্রমাণ অধিক পাওয়া যায়।

চন্দ্রমূল—Kaemferia galanga—ইহা ভূমিচম্পক-বর্গীয় গাছ; ভারতের নানা স্থানে পাওয়া যায় এবং



[illegible]



চন্দমূল

চাষও হয়। ইহার কাটতি প্রায় পূর্ব্বের ন্যায়ই আছে; কেশতৈলের ইহা অন্যতম উপাদান।

জটামাংসী, ভূতকেশী—Nardostachys jatamansi—ইহা ভারতের একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গন্ধদ্রব্য। পূর্বে অন্যান্য জাতির মধ্যে ইহা spikenard নামে পরিচিত ছিল। কেশ তৈলে ইহার সমধিক ব্যবহার হইত।

বচ,—ঘোড়বচ, উগ্রগন্ধ—Acorus calamus—ইহার পত্র ও মূল, উভয় হইতেই সুগন্ধযুক্ত বায়ী তৈল পাওয়া যায়: হিমালয়ের পাদদেশে আর্দ্রস্থানে ইহা সচরাচর দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে ইহা প্রধানতঃ চূর্ণ ও লেপরূপেই ব্যবহৃত হইত।

মৃগনাভি—কস্তুরী মৃগের নাভির পশ্চাৎস্থিত গ্রন্থি মধ্যে ইহা জন্মে। একটি পূর্ণবয়স্ক পুং-মৃগের গ্রন্থিস্থলীতে ১ শত হইতে ২ শত গ্রেণ মৃগনাভি থাকে। বহু প্রাচীন কাল হইতে ইহা ভারতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কাশ্মীর, তিব্বত, ভুটান, নেপাল প্রভৃতি উচ্চ পার্ব্বত্য অঞ্চলে প্রাচীনকাল হইতে ইহা সংগৃহীত হইতেছে। চূর্ণে, কেশতৈলে ও পানের মসলারূপে পূর্ব্বে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইত।

গৌণ গন্ধ দ্রব্যগুলির নাম ও উহাদের প্রয়োগরূপ নিম্নে উল্লিখিত হইল—

দোনা—চূর্ণ, কেশতৈল
দেবদারু কাষ্ঠ—চূর্ণ
গুগ্‌গুল—ধূপ
তিক্ষুর—চূর্ণের জমি (base)
হরিদ্রা—লেপ
শঠী—চূর্ণ
মুথা—লেপ
ভীমসেনী কর্পূর—চূর্ণ
লবঙ্গ—চূর্ণ
ছোট এলাচ—চূর্ণ
শিলারস—চূর্ণ
চম্পক—লেপ
আয়ুব্বল—চূর্ণ, কেশতৈল
ভৃঙ্গরাজ—কেশতৈল।

বলা বাহুল্য যে, উপরি-উক্ত গন্ধ-দ্রব্যাদির মধ্যে অধিকাংশই এখনও পর্য্যন্ত দেশমধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে, যদিও কোন কোনটির প্রসাধনের উপকরণরূপে প্রাধান্য হ্রাস পাইয়াছে। মুসলমান আমল পর্য্যন্তও দেশীয় গন্ধদ্রব্যাদির অনেকটা সদ্ব্যবহার হইত; কিন্তু তৎপরে অযত্নে ও অবহেলায় কতকগুলি

বিশিষ্ট গন্ধদ্রব্যের ব্যবহার ও ব্যবসায় সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইয়াছে।

পুষ্পাভরণ

সর্ব্বশেষে আমরা কয়েকটি স্বভাবজ দ্রব্য দ্বারা শরীর অলঙ্কৃত করার প্রথার বিষয় উল্লেখ করিব। সকল দেশেই গন্ধ ও বর্ণবিশিষ্ট ফুলপল্লবাদি দ্বারা রমণীগণ দেহের শোভাবৰ্দ্ধন করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য দেশেও এই প্রকার প্রাচীন ও আধুনিক দৃষ্টান্ত অনেক আছে। ভারতের রূপসীগণ পূর্ব্বকালে বেশভূষার উপর কুসুম-সাজ করিয়া লোকের চিত্ত বিমোহন করিতেন। এখন ইহার শেষ নিদর্শন রহিয়াছে—বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া উপলক্ষে ব্যবহৃত ফুলের মালায়। সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে যে সমুদয় প্রসাধনের পুষ্পাদির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্যতম :—

কুরুবক—ইহা বকফুল কি ঝাঁটিফুল, তৎসম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। বকের ফুল বড় ও সুদৃশ্য; ইহা হওয়াই সম্ভব। চূড়ায় পরিহিত হইত।

পদ্ম, লীলাপদ্ম—বৃন্ত সমেত ফুল হাতে থাকিত; প্রকৃত পদ্ম ও শালুক উভয়কেই ব্যাপক ভাবে পদ্ম বলা হইত।

কুন্দ—প্রস্ফুটিত ফুল অলক ও কলি কর্ণমূল শোভিত করিত।

শিরীষ—দুই জাতীয় শিরীষ ফুলের মধ্যে একটির গন্ধ কিছু অধিক; শিরীষ-ফুল কর্ণের অলঙ্কার ছিল।

নীপ—সাধারণ কদম্ব এবং কেলি অথবা ধারা-কদম্ব, উভয়ই এই নামভুক্ত। সীমন্তে একক ফুল, মেখলায় নীপের মালা এবং শয্যায় কদম্বরেণু বিছাইয়া দেওয়ার কথা অনেক স্থলে দেখা যায়।

বকুল—ইহার মালা চূড়াতে জড়ান হইত; তূলার পরিবর্ত্তে অথবা সামান্য পরিমাণ তূলার সহিত শুষ্ক বকুলফুল মিশ্রিত করিয়া বালিশ প্রস্তুত হইত।

লোধ্র—পার্ব্বত্য অঞ্চল ও সমতল দেশভেদে দুই জাতীয় লোধ দেখিতে পাওয়া যায়। যে স্থানে যে জাতি সুলভ, সে স্থানে তাহার শুভ্ররেণু মুখে মাখিয়া সুন্দরীগণ কান্তি বৰ্দ্ধন করিতেন

কাননারণ্য পার্ব্বত্য অঞ্চলের অনেক জাতি আজও পর্য্যন্ত পুষ্পাভরণের অনুরাগী। বর্ষা উৎসব অথবা কাজরীর সময় ইহা আরও প্রকৃষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। অনার্য্যগণের অনুকরণে আর্য্যগণ প্রথমতঃ কুসুমালঙ্কারে অনুরত হইয়াছিলেন কি না, তাহা বলা যায় না; কিন্তু ইহা ঠিক যে, এক সময়ে সদ্যঃ-প্রস্ফুটিত পুষ্পাদি প্রসাধনের প্রিয় সামগ্রী ছিল।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

মেঘদূত

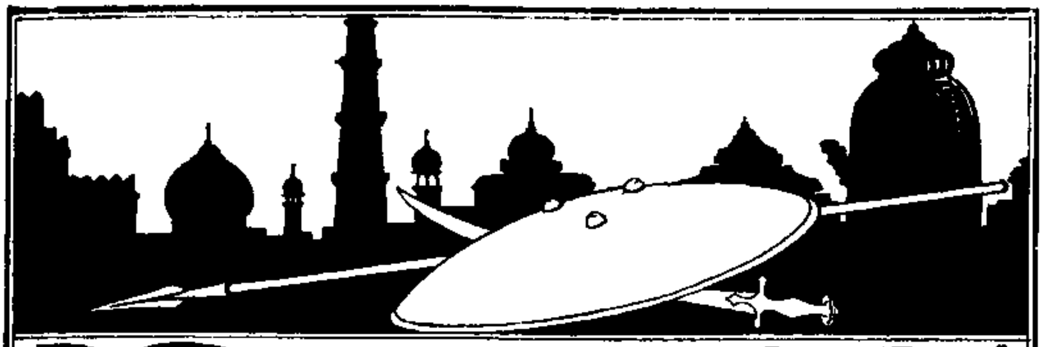
বিরহের বাণী, এনেছ বহিয়া,
কত যুগ যুগ ধরি,
আজও প্রবাসীর, বক্ষে আঁখিনীর,
যক্ষ-প্রিয়ারে স্মরি।

সজল নয়নে ঘন বরষায়,
মেঘে দূত করি পাঠাইতে চায়—
বেদনার গান, বিরহীর প্রাণ,
আঁখি ওঠে জলে ভরি॥

নব বরষায়, কার আঁখিজল,
আজি থেকে থেকে ঝরে,
বিরহী কবির, দু'নয়নে নীর,
বুঝি বঁধুয়ার তরে।

আষাঢ়ের সেই প্রথম দিবসে,
ব্যথার স্নিগ্ধ সজল পরশে—
বাজে হৃদিবীণ, আজি নিশিদিন,
বঁধুয়ারে মনে পড়ে॥

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মৌলিক এম-এ, বি-এল



ইতিহাসের অনুসরণ

পৃথিবীর প্রাচীনতম সাম্রাজ্য

২

৩। আশীরিয় সাম্রাজ্য

টাইগ্রিস নদীর বহু দূরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কোমল মৃত্তিকার সন্ধান পাইয়া এক স্বতন্ত্র জাতি সেখানে আস্তানা পাতিয়া বাস করিতেছিল। এ জাতির নাম আশীরিয়। আশীরিয় জাতি সেমিটিক-বংশীয়। সেমিটিক জাতির হাতে সুমেরাইনদের পরাভবের বহু পূর্ব্বকাল হইতে আশীরিয় জাতি এ উপনিবেশটুকুকে দৃঢ় ও নিরাপদ করিয়া তুলিয়াছিল। আশীরিয়গণ বহু গ্রাম-নগর নির্ম্মাণ করে; তন্মধ্যে অসসুর এবং নিনেভা প্রধান।

এই আশীরিয় জাতির গঠনে ছিল বৈচিত্র্য। তাদের নাসা দীর্ঘ, ওষ্ঠ স্থূল,—অবিকল এ যুগের পোলিশ-ইহুদী জাতির মতন। তাহারা দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখিত; মাথার কেশ ছিল দীর্ঘ। মাথার কেশে জট বাঁধিয়া কুণ্ডলাকৃতি করিত; মাথায় দীর্ঘাকৃতি টুপি পরিত; পোষাক ছিল সুদীর্ঘ আজানুলম্বিত। ইহাদের কাজ ছিল হিটাইট জাতির সহিত মিলিয়া পশ্চিম-দিকদেশগুলিতে প্রবেশ করিয়া পীড়ন ও অত্যাচার। সেমিটিক-অধিনায়ক শারগনের হাতে তাহারা পরাজিত হয়; কিন্তু কিছুকাল পরে সে অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া আবার তাহারা শক্তিমান স্বাধীন হইয়া ওঠে। উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত মিতানী প্রদেশের রাজা তুষরাত্তা এই আশীরিয়দিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের রাজধানী নিনেভা অবরোধ করেন। আশীরিয় জাতি দীর্ঘকাল ধরিয়া রাজা তুষরাত্তার অধীন ছিল। অবশেষে মিশরের সহিত বাবিলন-রাজ্যের বিরোধ ঘটিলে মিশরের বেতন খাইয়া আশীরিয় জাতি মিশরের পক্ষ অবলম্বন করে এবং মিশরী শক্তিকে দুর্দ্ধর্ষ অপরাজেয় করিয়া তোলে।

সমর-কৌশলে এমনিভাবে আশীরিয় জাতি খুব বেশী পারদর্শী হয় এবং নিকটবর্ত্তী চারিদিককার বহু প্রদেশে হানা দিয়া নিত্য লুঠপাট করিয়া রীতিমত বিভীষিকা জাগাইয়া তোলে; কয়েক বৎসর পরে অশ্ব ও রথের প্রবর্ত্তন করিয়া সমরক্ষেত্রে তারা দুর্দ্ধর্ষ হইয়া ওঠে। দ্বন্দ্ব প্রথমে চলে হিটাইট জাতির সঙ্গে; তার পর আশীরিয় বীর তিগলাথ পিলেশারের অধ্যক্ষতায় ১১০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে বাবিলন অধিকার করে। ওদিকে শক্তি বিস্তারিত হইলেও নিম্ন অধিত্যকাভূমি-সমূহে তাহাদের শক্তি নিরাপদ ও সুদৃঢ় ছিল না। বাবিলনে আধিপত্য স্থাপন করিলেও বহু শতাব্দী ধরিয়া আশীরিয় শক্তি তাহাদের প্রাচীন রাজ্য নিনেভায় পুঞ্জিত এবং বাবিলন ও নিনেভার বিরোধ কোনো দিন বন্ধ ছিল না; তাহার ফলে নিনেভায় ও বাবিলনে কখনো বাবিলনিয়ান রাজা সর্ব্বময় হয়, কখনো বা আশীরিয় রাজা হয় সর্ব্বময়।

চারি শতাব্দীকাল যাবৎ বহু চেষ্টা করিয়াও আশীরিয় জাতি মিশরে সূচ্যগ্র-পরিমাণ ভূমি-লাভে সক্ষম হয় নাই। তাদের এ চেষ্টা ব্যর্থ হইত আর-একদল প্রতিবেশী সেমিটিক

জাতির আক্রমণে। এ জাতির নাম আরামিয়ান। আরামিয়ানদের রাজধানী ছিল দামাস্কাস্। এই প্রাচীন আরামিয়ান জাতির বংশধর আজ এ যুগে সিরিয়ান জাতি নামে পরিচিত। আশীরিয়ান ও সিরিয়ান—দুই নামে সমতা থাকিলেও দুই জাতি সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কিত।

এই সিরিয়ান জাতির সঙ্গে আশীরিয়ান জাতির যুদ্ধ-বিগ্রহের অন্ত ছিল না। বাইবেল গ্রন্থে যে তিগলাথ পিলেশারের নামোল্লেখ দেখি,—সেই তিগলাথ পিলেশারের (তৃতীয় পিলেশার) অভ্যুদয় ঘটে খৃঃ পূঃ ৭৪৫ অব্দে। তিনি ইশ্রেলাইটদিগকে মিডিয়া প্রদেশে আনিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না: বাবিলন জয় করেন ও সেখানে শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন। তিনি ঐতিহাসিক নব-আশীরিয়ান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

তাঁহার পুত্র রাজা চতুর্থ শালমানেশার সামারিকয়া-অবরোধ-কালে পরলোকগমন করেন। তাঁহার পরে এক রাজ্যাপহারী দুর্বৃত্ত বাবিলনের রাজাসন অধিকার করে। আশীরিয় সৈন্যগণকে তিনিই প্রথম লৌহাস্ত্রে ভূষিত করেন। সিংহাসনে বসিয়া তিনি রাজা দ্বিতীয় শারগন নাম গ্রহণ করেন।

একটা জাতিকে তার নিজের দেশে করায়ত্ত করিতে না পারিয়া অন্য এক নূতন প্রদেশে আনিয়া সম্পূর্ণ বশীভূত করা—ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত বোধ হয় আর কুত্রাপি নাই! নব আশীরিয় সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার এ কাহিনী তাই পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে আজিও স্বর্ণাক্ষরে দীপ্যমান

রাজা দ্বিতীয় শারগনের পুত্র সেনাসেরিব আশীরিয় রাজ্যকে মিশর-পর্য্যন্ত বিস্তারিত করেন। মিশর-আক্রমণের উদ্যোগ করিলে মহামারীর গ্রাসে পড়িয়া তাঁর বিপুল সেনা মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং রাজা নিজে কোনমতে রাজধানী নিনেভায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেখানে বাস করেন। পুত্র-হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সেনাসেরিবের পৌত্র রাজা অসুরবানিপাল (গ্রীক ইতিহাসে ইনি সার্ডানাপালাশ নামে পরিচিত) মিশরের নিম্ন প্রদেশগুলি জয় করেন; এবং সে প্রদেশে তাঁহার শাসন দীর্ঘকাল অব্যাহত থাকে।

৪। শালদিয়ান সাম্রাজ্য

রাজা দ্বিতীয় শারগনের মৃত্যুর পর আশীরিয় সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব দেড় শত বৎসর মাত্র বিদ্যমান ছিল। তাহার পর দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক-ভাগ হইতে সেমিটিক-বংশীয় এক নূতন যায়াবর জাতি আসিয়া আশীরিয় জাতিকে বিধ্বস্ত করে। এই নূতন জাতির নাম শালদিয়ান। মেডিস ও পারসীক জাতি এই শালদিয়ান জাতির সহিত এ যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল। এই তিন জাতির সমবেত চেষ্টায় ৬০৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে নিনেভা শালদিয়ান-শক্তির অধীন হয়।

শালদিয়ান জাতি আর্য্যজাতি-সম্ভূত। সুতরাং এ-জাতির প্রাধান্য-লাভ আর্য্য-জাতির প্রথম বিজয়!

আর্য্য-জাতি আসিয়া উপস্থিত হয় উত্তরে এবং উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত উপত্যকা ও বনভূমি হইতে। এক দল আসে ভারতবর্ষে; ইহাদিগের ভাষা পরে সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত হয়; আরো বহু দল য়ুরোপের নানা প্রদেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে।

এ পর্য্যন্ত যে সকল যাযাবর জাতি গৃহ-বাস ও রাজ্য স্থাপন করিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতেছিল, তাহারা শুধু কৃষিকর্ম লইয়া ব্যস্ত ছিল; এখন হইতে আর্য্য-জাতির প্রাধান্য দিকে দিকে বিস্তার লাভ করিতে থাকে। আর্য্যজাতির অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এলামাইট জাতির নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

শালদিয়ান সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল বাবিলন। রাজা নেবুশাডনেজ্জারের রাজত্ব-কালে শালদিয়ান-শক্তি প্রদীপ্ত তেজে ভাস্বর হইয়া উঠে। নেবুশাডনেজ্জারের মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরেরা ৫৩৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত কোনমতে টিঁকিয়া ছিলেন; পরে পারস্য-শক্তির সংঘর্ষে সাইরাসের পতনের সঙ্গে সঙ্গে শালদিয়ান সাম্রাজ্য চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া লোপ পায়।

৩৩০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে গ্রীক-বীর আলেকজান্দারের হাতে পারস্য সাম্রাজ্যের ধ্বংস সম্পূর্ণ হয়।

পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত হইতে আমরা দেখিতেছি, টাইগ্রিশ ও ইউফ্রেটিশ—এই দুই নদের তীরে সভ্যতার প্রথম বিকাশ ঘটে; তারপর এই দুই নদের তীরে কি যুদ্ধ-বিগ্রহই না

সংঘটিত হয়! এক জাতির কঙ্কালের উপর অপর জাতি আসিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে! সুমেরিয়ান ও এলামাইট জাতির মত পরাক্রান্ত দুর্দ্ধর্ষ জাতির সমূলে বিলোপ ঘটিয়াছে—তাদের ভাষা পর্য্যন্ত পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন মুছিয়া গিয়াছে! সে জাতির শ্মশানে দেখি কালডিয়ান, এশিরিয়ান ও হিত্তাইত্ জাতি আসিয়া বিজলীর চকিত-চমক হানিয়া আবার কোন্ অন্তরীক্ষে মিলাইয়াছে! সেমিটিক জাতির পরে আসিয়াছে সুমেরিয়ান জাতি; তারপর উত্তরাঞ্চল হইতে আর্য্য-জাতির প্রথম আবির্ভাব ঘটে। মিডিস ও পারসীক জাতি আসিয়া এই জনপদে দেখা দিয়াছে; তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছে বিভিন্ন ভাষা; অবশেষে বালকার গায়ে হস্তরেখার মত সে সব মুছিয়া এই তট-ভূমে আসিয়া দাঁড়াইল আর্য্য গ্রীক জাতি।

এত যুদ্ধ-বিগ্রহ, এত ভাঙ্গা-গড়ার মধ্যেও কৃষির কাজ অব্যাহতভাবে চলিয়াছে—বণিক বাণিজ্য করিয়াছে—গৃহী গৃহ-নির্ম্মাণ করিয়াছে। লেখার বিজ্ঞান নর-সমাজে বিস্তার লাভ করিয়াছে; বাহন-কল্পে অশ্ব-রথ—নর সমাজে আসিয়া জুটিয়াছে; সমুদ্র ও মরুপথ বহিয়া পণ্যসম্ভার চলিয়াছে এক দেশ হইতে অপর দেশে—মানুষের জ্ঞান বাড়িয়াছে—বুদ্ধি-শক্তি বাড়িয়াছে—কল্পনা নব নব বৈচিত্র্যে উন্মেষিত হইয়াছে।

এই দুই নদের তীরে সভ্যতার যে অঙ্কুর দেখা দেয়, চারি সহস্র বৎসরের সুদীর্ঘ বিরোধ-বিপ্লব যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্য দিয়া সে অঙ্কুর ছায়া-ঘন বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়। বিপদ ও বিঘ্ন আসিয়া পদে পদে হানা দিয়াছে; রোগ, শোক, বন্যা, ঝড়—তাহার ফলে উত্তরের লোক গিয়াছে দক্ষিণে, দক্ষিণের লোক আসিয়াছে পশ্চিমে; ভাষায় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—আচারে ভেদ বাধিয়াছে; তথাপি যে সভ্যতার পত্তন হইয়াছে, সে সভ্যতা এই লক্ষ বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া লক্ষ্যহারা হয় নাই, আপনাকে প্রসারিত করিয়া চলিয়াছে চিরদিন। সে সভ্যতা কোনদিন পিছন-পানে ফিরিয়া তাকায় নাই—'আগে চলো আগে চলো' মন্ত্র শিরোধার্য্য করিয়া জগতের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে—চলিয়াছে।

এই সুদীর্ঘ কালের কাহিনী-আলোচনায় আরো দেখি, ৩৩০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে লৌহ, অশ্ব, মুদ্রার উপকারিতা মানুষ বুঝিয়াছে; বুঝিয়া সে সব কাজে লাগাইয়াছে। তার উপর মানুষ বিবিধ খাদ্য বাছিয়া লইয়াছে; রন্ধন বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছে; আর শিখিয়াছে তন্তু-শিল্প; মানুষের চিন্তাশক্তি ও কর্ম্মানুরাগও দিনে দিনে বাড়িয়া চলিয়াছে।

৫। মিশর সাম্রাজ্য

সুমেরিয়ায় যেমন সভ্যতা বিকশিত হইতেছিল, মিশরেও তেমনি আমরা এ সময়ে সভ্যতার বিকাশ দেখিতে পাই। উভয় সভ্যতার মধ্যে কোন্‌টি প্রাচীনতর, তাহা নির্ণয় করিয়া বলা কঠিন।

আলেকজান্দারের দিগ্বিজয়ের সময় পর্য্যন্ত মিশরের প্রাচীন ইতিহাস ছিল বাবিলনের ইতিহাসের প্রায় সমতুল্য; শুধু প্রভেদ ছিল এইটুকু,—বাবিলনের উপর শত্রুর শ্যেন-দৃষ্টির নিমেষ বিরাম ছিল না—যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিয়াছে অবিচ্ছেদে। পশ্চিমে ভীষণ মরু, পূর্ব্বে মরু ও উত্তাল সাগর, দক্ষিণে নিগ্রোর বাস, এ কারণে শত্রুর আক্রমণ হইতে মিশর ছিল নিরাপদ। কাজেই খৃষ্ট জন্মের আটশত বৎসর পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত মিশরে কোনো উৎপাত-উপদ্রব দেখা দেয় নাই। এই অষ্টম শতাব্দীতে (খৃঃ পূর্ব্বাব্দ) এশিয়া হইতে এথিয়োপিয়ান জাতি আসিয়া সর্ব্বপ্রথম মিশরের দ্বারে হানা দেয়। তারা আসে সুয়েজ যোজকের পথে এবং মিশর এই জাতির অধীনতা স্বীকার করে।

মিশরে প্রস্তর-যুগের (Stone Age) কাল-নিরূপণ অসম্ভব। এখানকার আদিম কৃষিজীবী জাতি প্রাচীন নিওলিথিক জাতির বংশধর কি না, সে তথ্য আজিও অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে। মিশরীরা মৃত্তিকা-গর্ভে মৃতদেহ সমাহিত করিত। মৃত আত্মীয়জনের প্রতি শ্রদ্ধা-বশতঃ তাহারা সে-দেহ-রক্ষায় যত্নপর ছিল; তবে দেহ সমাহিত করিবার পূর্ব্বে শবের দেহাংশ কাটিয়া সেই মাংস তাহারা ভোজন করিত। আত্মীয়-জনের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতিবশতঃ তারা এই মাংস ভোজন করিত। ঐতিহাসিক স্যর ফ্লিণ্ডার্শ পেট্রি বলেন—the dead were eaten with honour, জীবিত আত্মীয়গণ ভাবিত, এ মাংস-ভোজনে মৃতের সাহস, বীর্য্য ও গুণাবলীর অধিকারী হইবে!

পশ্চিম-য়ুরোপে আর্য্য-জাতির আগমনের পূর্ব্বে এক দল

বর্ব্বর জাতি ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্নভাবে তথায় বাস করিত; শবের মাংস-ভোজনের এই অমানুষিক প্রথা ইহাদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। আর্য্য-প্রাধান্য-কালে এই জাতি মিশরের ও-দিকে গিয়া বাস করে এবং নিগ্রো জাতির সঙ্গে মিশিয়া অভিন্ন হইয়া যায়।

মিশরে প্রকৃত মিশরীয় জাতির দেখা মিলে খৃঃ ৫০০০ পূর্ব্বাব্দে। এই পুরাতন জাতি শুধু কুটীর-নির্ম্মাণেই পারদর্শী ছিল: তাদের আচার-রীতি ছিল নিওলিথিক জাতির তুল্য। নবাগত মিশরী জাতি তাহাদের চেয়ে সভ্য ছিল। নব জাতি কাষ্ঠ ও ইষ্টকের গৃহ-নির্ম্মাণে এবং পাথরে কারুশিল্প-রচনায় পটু ছিল। এ জাতির মধ্যে চিত্র-লিপির প্রচলন দেখিতে পাই। দক্ষিণ-আরব হইতে এ জাতি এডেনের পথে উত্তর-মিশরে আসিয়া প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে বলিয়া মনে হয়। ক্রমে নীল-নদের তীর ব্যাপিয়া সমগ্র প্রদেশে ইহারা আস্তানা পাতিয়া বসে। প্রাচীন সুমেরিয়া জাতির দেব-দেবী ও আচার-প্রথার সঙ্গে এ জাতির দেবদেবী ও আচার-প্রথার কোন সম্পর্ক ছিল না। এই নবাগত মিশরীয় জাতির (৫০০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ) দেব-দেবীর মধ্যে সিদ্ধঘোটকী দেবীর ধ্বংসাবশেষ আজিও বিদ্যমান আছে। এ দেবতাকে আফ্রিকার কাফ্রীজাতির দেব-মণ্ডলীর মধ্যে দেখা যায় না।

সুমেরিয়ার মাটীর মত নীল নদের মাটী তেমন কোমল ছিল না—এ জন্য মিশরী জাতি মাটীর গায়ে কোনো কিছু লিখিয়া যায় নাই। 'পেপাইরস' বৃক্ষের ত্বক্ গুচ্ছাকারে বাঁধিয়া তাহাতেই তারা লেখার কাজ করিত। মিশরীয় জাতির লেখনী ছিল না—লেখনীর পরিবর্ত্তে 'ব্রাশ' ব্যবহার করিত। এই 'পেপাইরাস' হইতেই লেখার আধার কাগজের নাম হইয়াছে Paper।

প্রাচীন মিশরের শাসন-প্রথায় বৈশিষ্ট্য ছিল। বিভিন্ন-যুগের শাসকগণকে বিভিন্ন বংশ বা Dynasties নামে অভিহিত করা হয়। মিশরের ইতিহাসে সাল-তারিখ উল্লেখ করিবার সময় বিভিন্ন শাসকগণের বংশের নাম উল্লেখ করা হয়—প্রথম বা তৃতীয় বা চতুর্দ্দশ বংশীয় শাসকের শাসন—(First or Third or Fourteenth Dynasties) এমনিভাবে। পারস্য জাতি আসিয়া প্রথমে মিশরীয় জাতিকে পরাভূত করে। তার পর ৩৩২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে গ্রীক সম্রাট আলেকজান্দার আসিয়া মিশর জয় করেন। এ সময়ে মিশরে একত্রিংশতম বংশ রাজ্য করিতেছিল।

এই সুদীর্ঘ ৪০০০ বৎসরের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখি, মিশরের চতুর্থ রাজ-বংশ প্রচুর সমৃদ্ধির অধিকারী ছিলেন; এই বংশের রাজারা প্রস্তর-স্তম্ভাদি রচনায় অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন এবং বহু শিলা-মন্দির নির্ম্মাণ করান। ৩১০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে শেরপস, শেফরেণ ও মাইশরনিয়াস (The Fourth Dynasties) বহু পিরামিড তৈয়ার করান। গ্রেট পিরামিড (৪৫০ ফুট; পার্শ্বস্থ শিখর ৭৫০ ফুট) আগাগোড়া পাথরে প্রস্তুত; তাহাও নির্ম্মিত হয় এই সময়ে। বড় বড় পাথরের উপর পাথর চাপাইয়া কি করিয়া এ পিরামিড নির্ম্মিত হইল—বিস্ময়ের বিষয়! এ পিরামিডের ওজন প্রায় আটচল্লিশ লক্ষ তিরাশি হাজার টন্!

চতুর্থ ও পঞ্চদশ বংশীয় রাজগণের রাজত্ব-কাল ব্যাপিয়া এই সুদীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন শাসকগণের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে অবিরাম; বিভিন্ন মতামতের সংঘর্ষও ছিল অপরিসীম। অন্ত-র্বিপ্লবের ফলে কখনো এ-বংশ সিংহাসন অধিকার করিয়াছে —কখনো অপর বংশ সে বংশকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছে। ফ্যারাও দ্বিতীয় পোপ শুধু নিরাপদে ৯০ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। তিনি বহু শিলা-মন্দির নির্ম্মাণ করান। ইহার পরে বিদেশী শক্তির কাছে মিশর পরাভূত হয়।

দীর্ঘকাল তাহাদের অধীনতা-পাশে বদ্ধ থাকিবার পর ১৬০০ খৃষ্টাব্দে মিশরীয় জাতি সেই দাসত্ব-পাশ ছিন্ন করিতে সমর্থ হয় এবং তখন রূপোজ্জ্বল সমৃদ্ধিতে মিশর আবার ঐশ্বর্য্যময় হইয়া ওঠে। এ-সময়ে মিশরীরা সামরিক বিদ্যায় অসাধারণ পটুতা লাভ করে এবং ইউফ্রেটিশ নদের তীর-ভূমি পর্য্যন্ত মিশরীয় বিজয়-ডঙ্কা নিনাদিত হয়। তার পর সটে বাবিলনিয়ান-আশীরিয়ান-শক্তির সহিত মিশরী-শক্তির প্রচণ্ড সংঘর্ষ। এক্ষণে পথ সুগম থাকায় সৈন্য-চালনার কাজ রীতিমত সহজ হইয়াছিল।

মিশরের ভাগ্য-গগনে তখন একাদশ বৃহস্পতির উদয়! মিশরের প্রাচীন নৃপতিগণের মধ্যে তৃতীয় থট্‌মেশ ও তৃতীয় আমেনোফিশের (অষ্টাদশ বংশ) রাজ্য ইথিওপিয়া হইতে ইউফ্রেটিশ নদের তট-সীমা পর্য্যন্ত বিস্তারিত ছিল। গৃহাদি ও পিরামিড নির্ম্মাণে তাঁহাদের অনুরাগের সীমা ছিল না।

রাজা তৃতীয় আমেনোফিশ লাক্সর প্রদেশ প্রতিষ্ঠা করেন। তল-এল-আমর্ণায় বহু প্রাচীন লিপি পাওয়া গিয়াছে; সে লিপি-পাঠে জানা যায়—রাজা চতুর্থ আমেনোফিশের রাণী হাতাশু ছিলেন যেমন বিদ্যাবতী, তেমনি বীর। তাঁহার যে প্রস্তর-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে রাণী হাতাশুর বেশভূষা পুরুষের ও চিবুক শ্মশ্রুযুক্ত দেখা যায়। ইহার অর্থ, বিদ্যায় ও বুদ্ধিবৃত্তিতে তিনি ছিলেন পুরুষের সমতুল্য।

১২১৭-১২৫০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ—এ সময় মিশর কিছুকাল সিরিয়ানদিগের অধীনে ছিল; তার পর সিরিয়ানদের হয় উচ্ছেদ। এবং বহু রাজ-বংশের পরিবর্ত্তন ঘটিলে দ্বিতীয় রামেশাস অবশেষে সিংহাসন অধিকার করেন। ইনি ৬৭ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব-কালে বহু পিরামিড ও মন্দির-হর্ম্ম্য রচিত হয়। এই দ্বিতীয় রামেশাস মোজেশের ফ্যারাও (Pharaoh of the Moses) নামে পরিচিত। দ্বাবিংশ-রাজ শিশক সলোমানের মন্দির ধ্বংস করেন। ৬৭০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে পঞ্চবিংশতিতম রাজার রাজত্ব-কালে একজন দিগ্বিজয়ী এথিয়োপীয়ান বীর আসিয়া মিশর আক্রমণ করেন এবং মিশর তাঁহার করতলগত হয়। ইহার কয়েক বৎসর পরে মিশর বাবিলনের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

এ সময়ে ক্রমে ক্রমে বহিঃসাম্রাজ্যগুলি মিশরের অধিকার-চ্যুত হইতে থাকে; এবং শালদিয়ান-রাজ দ্বিতীয় নেবুশাডনেজার অমিত বিক্রমে মিশরে শালডিয়ান-শক্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। মিশরবাসী যত ইহুদীদের বন্দী করিয়া তিনি বাবিলনে আনেন।

খৃঃ পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে শালদিয়ান ও মিশর—উভয় সাম্রাজ্য পারস্যের কর-কবলিত হয়। কিছুকাল পরে মিশরে বিদ্রোহ ঘটে; এবং মিশরীরা পারস্য-শাসন উন্মূলিত করিয়া পুনরায় নিজ-শাসন স্থাপনা করে। ষাট বৎসর নিরুপদ্রবে অধিকার-ভোগের পর ৩৩২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে বিজয়ী গ্রীক সম্রাট আলেকজান্দারের চরণে মিশর আত্ম-সমর্পণ করে। এই সময় হইতে মিশরে কখনো চলে গ্রীক, কখনো রোমক-শাসন; তার পর আরব, তুর্কি ও ব্রিটিশ জাতি আসিয়া মিশরে আধিপত্য লাভ করে। ব্রিটিশ শাসন-কালে মিশর সম্প্রতি অন্তঃ-শাসনে স্বাধীনতা (quasi-independence) লাভ করিয়াছে।

[ক্রমশঃ

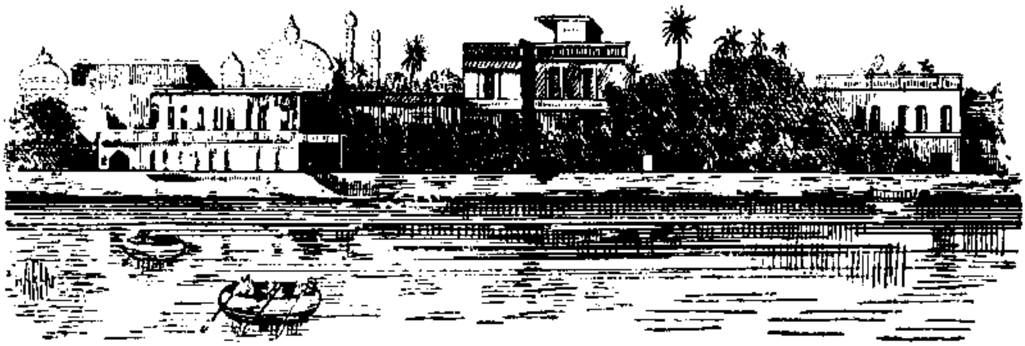
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

উচ্ছ্বাস

শ্যামল শোভায় মনের কোণে রচিয়া শোভা
নন্দনের
দোয়েল পিকের কণ্ঠমুখর, গন্ধে আকুল
চন্দনের।
কুল-কুমারীর সদ্য সিনান শিশির-কণার
বর্ষণে
ঘোমটা খুলি রঙীন হাসে চপল উষার
দর্শনে।
কল্প লোকের সেই যে স্বরগ, যে ঠাঁই মোদের
বাঞ্ছিত,
শ্বেত-বরণীর চরণ-কমল স্পর্শে যে ঠাঁই

কমল বনের কল্প-সরিৎ আনবো লুঠি
রঙ্গেতে,
হংস সহিত শ্বেতবরণী, বাঁধবো তাঁরে
সঙ্গেতে।
কহিব, "মাতা বাজাও বীণা বিশ্বে উঠুক
ঝঙ্কারি
জাগুক প্রাণে উদ্দীপনা, ভয় করি না
শঙ্কারি।
সাধক মোরা তরুণ মোরা, প্রাণের গোপন
কল্পনা—
তোমার কনক-দুর্গ-চূড়ায় আঁকবো যশের
আল্পনা।

শ্রীঅমিয়া সেন



হঙ্গেরীর মেজোকোভেজড্ সহর

সহরের জীবন-ধারা অল্পাধিক পরিমাণে প্রায় সর্ব্বত্রই সমান; কিন্তু গ্রাম্যজীবন-ধারায় জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য বিশেষরূপে পাওয়া যায়। হঙ্গেরীর মেজোকোভেজড সহরটিতে পল্লী-জীবনের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি প্রকট বলিয়া কোনও মার্কিণ পর্য্যটক উহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। আমেরিকার শ্রীমতী মার্জ্জারী রে মেজোকোভেজড্ সহরের বৈচিত্র্যের কথা শুনিয়া উহা দেখিতে গিয়াছিলেন। পত্রান্তরে তিনি লিখিয়াছেন যে, হঙ্গেরীর গ্রামসমূহের মধ্যে মেজোকোভেজড আদর্শস্থানীয়। এখানে আসিলে পল্লীর কৃষকজীবনের পরিচয় ভাল করিয়াই জানিতে পারা যায়। উক্ত সহরের জন-সাধারণের সংখ্যা ২০ হাজার। বুডাপেষ্ট নগরের পূর্ব্বভাগে মেজোকোভেজড্ সহর অবস্থিত। ট্রেণে চাপিয়া বুডাপেষ্ট হইতে যাত্রা করিলে ৩ ঘণ্টায় ঐ স্থানে পৌছান যায়। দিনের মধ্যে দুইবার ট্রেণ ছাড়ে।



পুলিস-কর্ম্মচারী ঢাক বাজাইয়া যাবতীয় সংবাদ প্রচার করিতেছে



বালিশের উপর শায়িত শিশু

রবিবার ছুটীর দিন। সে দিন গ্রামবাসীরা উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে দেহ সুশোভিত করিয়া পথে পথে শ্রেণীবদ্ধভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাদের পরিচ্ছদ বহুবর্ণরঞ্জিত এবং সুদৃশ্য। রবিবার সকালে সহরবাসীরা ধর্ম্মমন্দিরের দিকে ভিড় করিয়া অগ্রসর হয়। গির্জ্জার প্রবেশদ্বারে অনুক্ষণই ভিড় লাগিয়া থাকে।

হঙ্গেরীর সহরগুলিতে যদি উন্নতশীর্ষ গির্জ্জা না থাকিত, তাহা হইলে সহরের মধ্যে পথ হারাইয়া যাইবার বিশেষ



মাতৃ-রক্ষিতা মনোহারিণী তরুণী



সুবেশধারী গ্রাম্য যুবকগণ

সম্ভাবনা। ইহার প্রধান কারণ এই যে, প্রত্যেক বাড়ী মৃত্তিকা-নির্ম্মিত এবং বাহিরে চূণকাম করা। বাড়ীগুলি উচ্চ নহে। কাজেই সহরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে গির্জ্জার চূড়া দেখা না গেলে, দিক্ নিরূপণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। প্রত্যেক সহরের ধর্ম্মমন্দিরগুলি সহরের মাঝখানেই অবস্থিত। গির্জ্জার মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিবার স্থানই থাকে না। নর-নারীতে উহা পরিপূর্ণ থাকে। শালের দ্বারা দেহ আবৃত করিয়া নারীরা উপাসনা করিতে থাকে। পুরুষেরা মালা জপ করিতে থাকে।

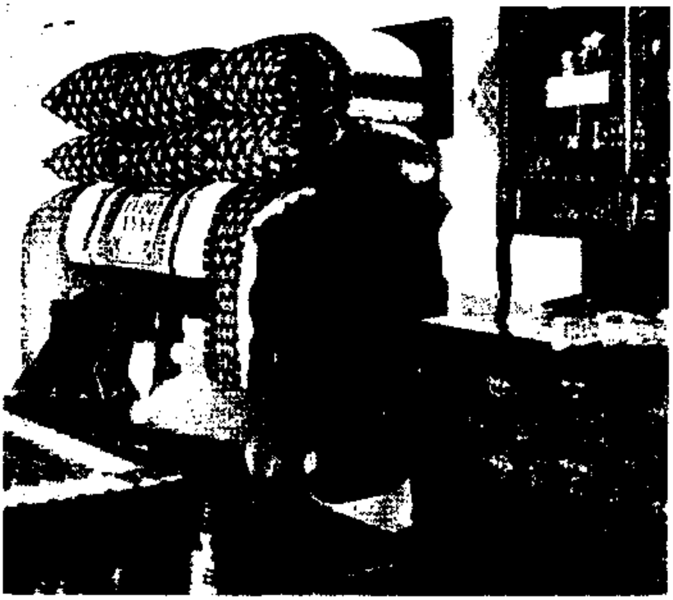
যথাসময়ে ঘণ্টাধ্বনি হইলেই গির্জ্জার কার্য্য বন্ধ হয়। অমনই কৃষ্ণ-পরিচ্ছদধারী ভূষিত নর-নারীর দল দ্রুতপদে ভিড় করিয়া বাহির হইয়া পড়ে। গির্জ্জার সম্মুখস্থ প্রশস্ত স্থানে দুই জন পুলিসপ্রহরী দাঁড়াইয়া ঢাক পিটিতে থাকে। ঐ ধ্বনি শুনিয়া জনতা পুলিসপ্রহরীদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া পড়ে। প্রহরীরা তখন কাগজ বাহির করিয়া পড়িতে থাকে।

মেজোকোভেজড্ সহরে সংবাদ কিরূপে প্রচারিত হইয়া পড়ে, তাহা এই ব্যবস্থা দেখিয়া বুঝা যায়। একটা সংবাদ এইরূপ :—"মঙ্গলবার একটা গাভী হারাইয়া গিয়াছে। যদি কেহ এই গাভী পাইয়া থাকে, তাহা হইলে সে যেন এখনই সদর আপিসে সংবাদ দেয়।"

শুধু ইহাই নহে। কতগুলি গোলাবাড়ী ভাড়া পাওয়া যাইতে পারে বা বিক্রয় হইবে, কতগুলি লাঙ্গল ভাড়ায়

পাওয়া যাইবে, কতগুলি চাকর কত মাহিনায় প্রাপ্তব্য, এ সকল বিষয়ের তালিকাও পঠিত হইয়া থাকে। এই সহরের ভৃত্যের মাসিক বেতন তিন চারি পেন্সের অধিক নহে (এক পেন্স আমাদের দেশের পনের আনা)। ইহা ছাড়া পরিধেয় বস্ত্র তাহারা পাইয়া থাকে।

জাতীয় কোনও বিশিষ্ট ঘটনাও এইরূপে অধিবাসিবর্গকে বিজ্ঞাপিত করা হইয়া থাকে। নূতন কোনও আইন হইলে তাহাও এইরূপে জানাইয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। সংবাদপত্রের কায এই-ভাবে এই সহরে সম্পাদিত হইয়া থাকে।



বাগ্‌দত্তা তরুণীর নামাঙ্কিত শয্যাদ্রব্য

ঘোষণা-প্রচারকার্য্য সম্পন্ন হইলে, কৃষককুল যে যাহার বাড়ীর দিকে চলিয়া যায়। তখন সহর অন্যান্য দিনের ন্যায় আবার নীরবতার মধ্যে ডুবিয়া যায়। সপ্তাহের অন্যান্য দিন সহরের যাবতীয় তরুণ-তরুণী কৃষিক্ষেত্রে চলিয়া যায়। শুধু যাহারা অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং শিশু, তাহারাই গৃহে থাকে।

রবিবারে পল্লীবাসীরা কি ভোজন করে, তাহা বিদেশীর পক্ষে জানিবার কোনও সুবিধা নাই। এই সহরের একটি মাত্র স্থানে অর্থ দিয়া আহার্য্য ক্রয় করা যায় বটে, কিন্তু অম্‌লেট, পনীর, ঝোল এবং সুরা ব্যতীত অপর কোনও বস্তু পাওয়া যায় না। দর্শনার্থীর সংখ্যা অত্যল্প বলিয়া এখানে রেস্তোরাঁ বা হোটেল বলিয়া কিছু নাই। কোনও বিদেশীকে পথে দেখিলে সহরবাসীরা হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে। তিনি কোথায় আহারাদি করিবেন, তাহা তাহারা ভাবিয়া পায় না।

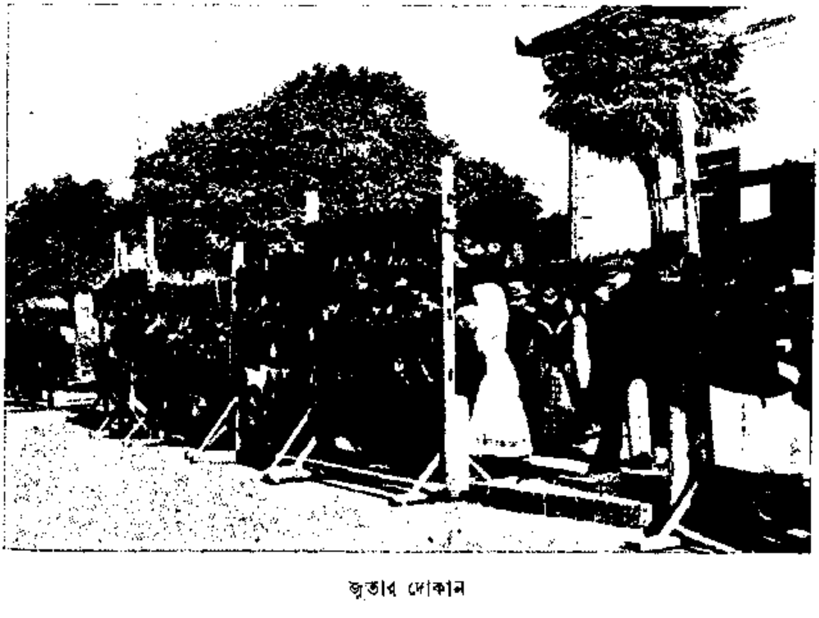


মেজোকোভেজড্ তরুণীর দল

অপরাহ্নকালে সহরবাসীরা বিচিত্র ও বহু বর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া দলে দলে পথে বাহির হইয়া পড়ে। দেখিলেই



কৃষিযন্ত্র হস্তে কৃষক পুরুষ ও নারী



জুতার দোকান

মনে হইবে, বাগানে যেন নানা বর্ণের ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে। বসনাদিতে নক্সার কায হঙ্গেরীতে নূতন ধরণের হইয়া থাকে। পুরুষ এবং নারী উভয় সম্প্রদায়ই বিশেষ মূল্যবান্ জাঁকজমক-পূর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া থাকে। পুরুষদিগের পোষাক মখমল-নির্ম্মিত, তাহাতে কায করা। কোন কোন পুরুষ নারীদিগের ন্যায় 'এপ্রণ' পরিধান করিয়া থাকে। তাহাতে সূক্ষ্ম কায দেখিতে পাওয়া যাইবে। হয় মাতার হাতের ফুলতোলা, নয় ত প্রণয়িনী লতাপাতা কাটিয়া সে পোষাক নয়নরঞ্জক করিয়াছে। সকলেই সবুজ টুপী পরিধান করিয়া থাকে।

রবিবার দিবসে কোনও যুবক কোনও যুবতীর সহিত প্রেমালাপ করে না। পুরুষরা স্বতন্ত্র থাকে, নারীরাও স্বতন্ত্র থাকে। মেজোকোভেজড্ সহরে এমন প্রথা নাই যে, স্ত্রী-পুরুষে জোড়া জোড়া হইয়া পথে বেড়াইবে। এমন কি, বিবাহিত দম্পতির পক্ষে, এমনভাবে রাজপথে পরিভ্রমণ নিষিদ্ধ।

ছোট ছোট ছেলেরা রবিবার দিবস বেশ মজা করিয়া বেড়ায়। তাহারা নারীদিগকে দেখিয়া তাহাদের নাম ধরিয়া আহ্বান করে, তাহাদের পরিচ্ছদপ্রান্ত ধারণ করিয়া বিরক্ত করে, কিংবা চুল ধরিয়া টানে। সুন্দরীদিগের মুখ তাহাতে আরক্ত হইয়া উঠে—বালিকারা খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠে। বোধ হয়, তাহারা ভাবে, এমন মজা আর হয় না। যে সকল যুবতীর বিবাহ হয় নাই, তাহারা অনাবৃত মস্তকে থাকে। এমন কি, শীতকালেও তাহারা মাথা আবৃত করে না। বিবাহের পর যুবতীরা বেণী বাঁধিয়া

মাথায় টুপী পরিধান করিতে পারে। সে টুপীর আকারও স্বতন্ত্র।

বিবাহ হইলে যুবতীর ফিতা ব্যবহারের প্রয়োজন আর থাকে না। তখন খোপা বাঁধা আরম্ভ হয়। কোণাকৃতি টুপী তখন মাথায় চড়িয়া বসে। তাহার উপর শাল জড়াইয়া প্রকাশ করা হয় যে, বিবাহিতা নারী প্রৌঢ়া নহে, তরুণী বা কিশোরী।



কৃষক যুবকরা অশ্বপ্রিয়

নব-বিবাহিতা তরুণীদিগকে দেখিলেই চেনা যায়। তাহারা একসঙ্গে বেড়ায়। ১৮ বৎসরের অধিক বয়স্কার সংখ্যা খুবই অল্প। কোনও কোনও বিবাহিতা কিশোরীর বয়স আরও কম। কিশোর স্বামীর পাশ দিয়া যাইবার সময় তাহারা খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠে। তাহারা নূতন স্বামীর সম্বন্ধে যেন বিশেষ গর্বিতা।



গির্জ্জার বাহিরে বৃদ্ধাদের আলাপ আলোচনা

প্রণয়াকাঙ্ক্ষী পুরুষ ও নারীর মধ্যে রবিবাসরের বলনৃত্যে দেখা-শুনা, আলাপ-আলোচনা হয়; গৃহেও উহা ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সকল সময়েই মা কন্যার পাশে থাকেন। সুতরাং সে সময়ে আনন্দ অপেক্ষা অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মত ব্যাপারই ঘটে।

রবিবার সন্ধ্যার পর প্রায়ই নৃত্য-উৎসব ঘটিয়া থাকে। এই সময় যুবক-যুবতীদিগের মধ্যে পরিচয় এবং হয় ত বা প্রেমে পড়াও ঘটিয়া যায়। কাযেই রবিবাসরীয় বলনৃত্যটি যুবক-যুবতীদিগের কাছে বিশেষ মনোরম।

যখন কোনও যুবক তাহার মনোনীত পত্নী আবিষ্কার



বিবাহিতাদিগের মাথার বিচিত্র টুপী



মেজোকোভেজডের বালক-বালিকা

করে, এবং যুবতীও যুবকের প্রতি অনুরাগী হয়, তখন যুবক কন্যার পিতার কাছে পাণিপ্রার্থনা করিয়া থাকে। পিতাও যদি যুবকটিকে সুপাত্র বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে পরিণয়েচ্ছু যুবক দুই জন বন্ধুকে প্রকাশ্যভাবে বিবাহের প্রস্তাব করিবার জন্য প্রেরণ করে। এই ব্যাপার হইতেই পাকা-পাকি বিবাহ-প্রস্তাব স্থির হয়।

তার পর এক দিন রবিবাসরীয় প্রভাতে বাগ্‌দত্ত যুবক-যুবতীর পরিণয়-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। নূতন গৃহে কন্যার বস্ত্রাদি এবং ব্যবহার্য্য নানাবিধ দ্রব্য সজ্জিত রাখা হয়। যৌতুকস্বরূপ কন্যা কিছু অর্থ বা গাভী স্বামিগৃহে লইয়া যায়। কন্যা যে বাড়ীতে স্বামীর সহিত বাস করিবে, তাহার একটি বা দুইটি ঘর থাকে। উহা সজ্জা-প্রচুর হয়, নানাবিধ তৈজস পত্রে। বাল্যকাল হইতে কন্যা স্বহস্তে যে সকল বসন তৈয়ার করিয়াছে —কারুকার্য্য-খোদিত সেই সকল পরিধেয় সে সঙ্গে লইয়া আইসে।

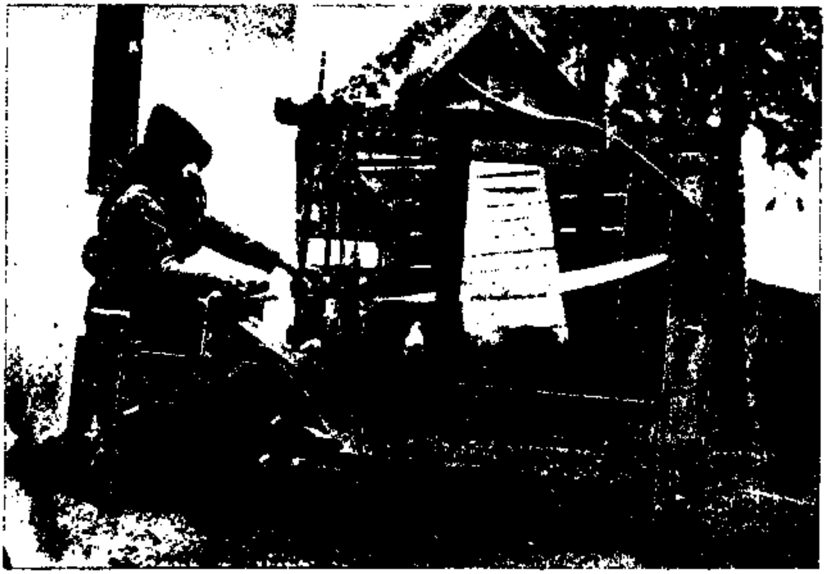
শ্রীমতী মার্জ্জারি রে কোনও দম্পতির গৃহে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। এই পরিবারের বেশ সচ্ছল অবস্থা। স্বামী যিনি, তিনি দেখিতে দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ এবং প্রিয়দর্শন। তাঁহার মুখ হাস্যপ্রফুল্ল। পত্নীর চেহারা সুন্দর। মনোহারিণী এই যুবতী কিন্তু স্বভাব-গম্ভীরা। পত্নী তাঁহার চারিটি সন্তানকে শ্রীমতী মার্জ্জারি রেকে দেখাইয়াছিলেন।

ছোট দুইটি মেয়ের দেহে কাযকরা পোষাক ছিল। বালক দুইটির অঙ্গে কোটপ্যান্ট। শ্রীমতী রের সঙ্গে যে দ্বিভাষিণী গিয়াছিলেন, তিনি সম্পর্কে এই যুবতীর ভগিনী। এই যুবতী পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে বিবাহিতা হন। এখন তাঁহার বয়স ২৬ বৎসর।



বিবাহসভায় সঙ্গীত

এই দম্পতির বাড়ীটি অপেক্ষাকৃত বড়। তিনটি কক্ষ আছে। হুঙ্গেরীয় গৃহগুলির নির্ম্মাণ-পদ্ধতি স্বতন্ত্র প্রকারের। বড় উনানকে কেন্দ্র করিয়া ঘরগুলি নির্ম্মিত হয়। তাহার ফলে প্রত্যেক কক্ষেই সমানভাবে তাপ বিতরিত হইয়া থাকে। উনানটি মৃত্তিকানির্ম্মিত এবং উপরে চূণকাম করা। উনানের নিম্নভাগে বসিবার ব্যবস্থা আছে।



বস্ত্রবয়ন

একখানি আরাম-কেদারায়,উনানের কাছে, অন্ধ এবং বর্ষীয়সী পিতামহী বসিয়া আছেন। তিনি শুষ্ক কুমড়ার বীজ চর্ব্বণ করিতেছিলেন। ঘরের মধ্যভাগ সুপরিচ্ছন্ন, যেন এইমাত্র চূণকাম করা হইয়াছে। বালকবালিকারা উনানের চারিপার্শে খেলা করিতেছিল।

গৃহের এক কোণে একখানি ছোট খাট পাতা, অতি পুরাতন যুগের খাট। তাহার উপর অনেকগুলি বালিশ সাজান। এই শয্যাই বাগ্‌দানের সময় প্রদত্ত হয়। প্রত্যেক গৃহেই এইরূপ খাট ও শয্যাদি দেখিতে পাওয়া যাইবে। উনান যেমন মেজোকোভেজড্‌বাসীদিগের জীবনে অপরিহার্য্য, খাট ও শয্যাদিও তদ্রূপ।

রন্ধনাগারে গেলেই পেয়ালা, পিরিচ ও অন্যান্য তৈজস দেখিতে পাওয়া যাইবে। প্রত্যেকটি জিনিষ পরিমার্জ্জিত ও পরিচ্ছন্ন। আহার্য্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার সময় গৃহের কেন্দ্রস্থিত এই উনানটি ব্যবহৃত হয়। রন্ধনাগারে একটি-



মাটীর শাদা উনান

মাত্র বাতায়ন দেখিতে পাওয়া যাইবে। উহা ব্যতীত বায়ু-চলাচলের জন্য সমগ্র বাড়ীতে আর কোনও বাতায়ন নাই।

উল্লিখিত দম্পতির গৃহ হইতে নির্গত হইয়া শ্রীমতী মার্জ্জারি রে পথে বাহির হইলেন। পথ সরু—গলিমাত্র। প্রধান রাজপথ ব্যতীত প্রশস্ত পথ এই সহরের কুত্রাপি নাই—শুধু ছোট ছোট গলি। তাহার উভয় পার্শ্বে তুষার-ধবল কুটীরশ্রেণী।

তিনটি হাস্যমুখরা কিশোরী তাঁহাদের পশ্চাতে আসিতেছিল। শ্রীমতী রে তাহাদের আলোকচিত্র গ্রহণ করিলেন। তিনি জানিতে পারিলেন যে, গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাহাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আগামী মাসে তাহারা স্ব স্ব স্বামীর সহিত মাঠে কাজ করিতে যাইবে।

পথে চলিতে চলিতে শ্রীমতী রের সহিত একটি বৃদ্ধার সাক্ষাৎ হইয়া গেল। সে আমেরিকাপ্রবাসী তাহার স্বামীর সংবাদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তাহার স্বামী আমেরিকায় গিয়াছে। যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছে, শীঘ্রই সে তাহার পত্নীকে তথায় লইয়া যাইবে। মহাসমরের পরে বৃদ্ধার স্বামী না কি আমেরিকায় আবার বিবাহ করিয়াছে বলিয়া সে জনরব শুনিয়াছে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সে স্বামীর নিকট হইতে পত্র পাইয়াছিল। তখন তাহার স্বামী ওহিও অঞ্চলের কলম্বস সহরে অবস্থান করিতেছিল। হতভাগিনী এই মেজোকোভেজড সহরে এখন ভিক্ষা করিয়া জীবন যাপন করিতেছে।

পথে আর এক জন পুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। লোকটি পূর্ব্বে আমেরিকায় ছিল। এখন স্থানীয় কোন স্কুলের দ্বারবান্। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে সে দেশে বেড়াইতে আসিয়াছিল। তদবধি সে আর আমেরিকায় ফিরিয়া যাইতে পারে নাই। টাকার অভাবেই তাহার এই দুর্দ্দশা। শ্রীমতী রে দ্বিভাষিণী গিন্নির সহিত আর একটি ভবনে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সে বাড়ীতে একটি স্ত্রীলোককে তিনি দেখিতে পান। স্ত্রীলোকটি শ্রীমতী রের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। গিন্নি উত্তরে বলে, শ্রীমতী রের বয়স ২৪ বৎসর। ইহা শুনিয়াই ঝড় উঠিল। এখনও পর্য্যন্ত শ্রীমতী রে বিবাহ করেন নাই শুনিয়া তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল



মাতা ও পুত্র



মেজোকোভেজডের যুবক-যুবতী



[illegible]বেশে সজ্জিত হুঙ্গেরীয় তরুণ-তরুণী



বিবাহ-পরিচ্ছদে দম্পতি



মাতার তিরস্কার



সুদৃশ্য পরিচ্ছদে মাতা, পুত্র ও শিশু

না। সে প্রশ্ন করিল, "ওঁর মা কি সে জন্য অসুখী নন? মা এখনও কি ক'রে মাথা উঁচু ক'রে বেড়ান? অন্ততঃ ২০ বছরের মধ্যে আমার মেয়ের বিয়ে না হ'লে আমি আত্মহত্যা করতুম্। ওঁর মা-বাপ কি রকম লোক, এতবড় মেয়েকে একা ছেড়ে দিয়েছেন দেশ-বিদেশে বেড়াবার জন্য? কি ভয়ানক কথা!"

উক্ত আধাবয়সী স্ত্রীলোকটির খুড়ীমা, শ্রীমতী রের পোষাক দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, "মার্কিণ মেয়েরা কি পশু-লোমের পোষাক পরে না কি?"

হঙ্গেরীতে পুরুষরাই পশু-লোমজাত পোষাক পরিধান করিয়া থাকে। ধনী এবং বয়স্ক লোকরা শাদা পশু-লোম-জাত পোষাক পরিধান করিয়া থাকেন। নারীরা কি শীত, কি গ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই সূচিশিল্প-শোভিত কালো জ্যাকেট

uj *w* OTWT* i srtJfal w f t ^ftiri «r*i *fot<r 322>
f*HfiwtFt w r s ^1 *nw i <<j^ ftf-^tcfr COT
csftcs *^*OT« «mre i ^nr 4^ (2itc5 *t*i3t trfan



ft^w « ^ ^

fa*M fortes i faft ftfaftap, [a](?^ fira *w*tts
^ m i <3&*[s w w fafan ^tf^rt^ i "tww <?rfa

fwl itTOTSstc** • -prwt* ifoii cnwfotari SPPI i

"^ c-rr^wsiH ftctf ^ta 4^f5 w ye* r&tc<r
•rf^*i i qtsffa cnro? *r%i <w «rc srrft <wft

^ *tt*rtra TOTO: 4^iS sj w r e fas* ?V5FF? ft»i i
"flirts ^1 *tfaff5ft»r i i w i % 1 <rfwP%Gr
fa*Tft* <2tT^rrt crw ffat* *2r wr w\ ^$m

*rf*f<& 4**rfa c*sw i ^N % « ^prrf^

<3^t? $f*r ^ erf? yi ^c^ ^*R ^;
f^j «T5 ^m <^ttn ^^c? it«i V K ^ [i

ttftf* ^w a w w mc^l TtOTe d5w ^ « ^ ^Pi»



চতুর্থ পাক

ফাঁদে নূতন শিকার

মিঃ ব্লীডের স্নায়ুগুচ্ছ কুলিশ-কঠোর-অচিন্ত্যপূর্ব্ব বিপজ্জালে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাহা বিচলিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই চাঞ্চল্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। নিশীথকালে উৎকট দুঃস্বপ্নের ন্যায় সেই ভীষণ সঙ্কটরাশি তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া কিছুকালের জন্য অভিভূত করিয়াছিল। তিনি যে গৃহকক্ষে উপবেশন করিয়া সেই গভীর নিশীথে তাঁহার সমব্যবসায়ীর সহিত বৈষয়িক আলোচনা করিতেছিলেন, সহসা সেই কক্ষের মেঝে কাত হইয়া নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল, এবং চক্ষুর নিমেষে একটি অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন গহ্বর মুখব্যাদান করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিল। তিনি ধরাতল হইতে প্রায় পঞ্চাশ ফুট নিম্নস্থিত ভূ-বিবরে নিক্ষিপ্ত হইয়া নিবিড় অন্ধকারে দূরাগত জলকল্লোলবৎ যে অশ্রান্ত ধ্বনি শ্রবণ করিলেন, প্রথমে তাহার কারণ-নির্ণয়ে অসমর্থ হইলেও দীপশলাকার ক্ষণস্থায়ী আলোকে অদূরে যে ভীষণ দৃশ্য নিরীক্ষণ করিলেন, তাহা যে কোন সাহসী ব্যক্তিকে আতঙ্কে বিহ্বল করিয়া তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত করিতে পারিত; কিন্তু সেই উন্নতফণা বিশালদেহ বিষধরকে তাঁহার মুখের অদূরে মস্তক আন্দোলিত করিতে দেখিয়া তিনি মুহূর্ত্তের জন্য আতঙ্কবিমূঢ় হইলেও আত্মসংবরণে সমর্থ হইলেন এবং অতঃপর কি কর্ত্তব্য, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

প্রজ্বলিত দীপশলাকাটি তাঁহার কম্পিত অঙ্গুলী হইতে স্খলিত হইবার পূর্ব্বে তিনি একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সেই বিষধর সর্প দীপালোকের সম্মুখে সম্পূর্ণ অবিচলিত ছিল। সাপটার ভাবভঙ্গী দেখিয়া মিঃ ব্লীডের ধারণা হইল, সে অন্ধ। এই জন্য সে তাঁহাকে দেখিতে না পাইলেও ঘ্রাণ ও শ্রবণশক্তির সাহায্যে তিনি কোথায় ছিলেন, তাহা অনুভব করিয়া, তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়াছিল।

অন্ধ সর্পকে প্রতারিত করা কঠিন হইবে না মনে করিয়া মিঃ ব্লীড পশ্চাতে পলায়নের চেষ্টা না করিয়া সাপের পাশ দিয়া সম্মুখে ধাবিত হইলেন। কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াও তিনি পশ্চাতে সাপের ফোঁসফোঁসানি শুনিতে পাইয়া বুঝিতে পারিলেন, সাপ সেই দিকে ফিরিয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়াছে। তখন তিনি তাহার কবল হইতে উদ্ধারলাভের আশায় আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলেন বটে, কিন্তু আর অধিক দূর গমন করা তাঁহার অসাধ্য হইল। কারণ, একটি পাষাণ-প্রাচীরে তাঁহার গতিরোধ হইল।

তখন তিনি অগত্যা অন্য দিকে ফিরিতে বাধ্য হইলেন। অন্ধকারেও তিনি সাপটার ঘাড়ে না পড়িয়া তাহার পাশ দিয়া দৌড়াইলেন; কিন্তু সেই সময় সাপটা তাঁহার এতই নিকটে ছিল যে, তিনি তাঁহার দেহে তাহার নিশ্বাসবায়ু অনুভব করিলেন। সাপটা পুনর্ব্বার তাঁহার অনুসরণ করিলে, তিনি কিরূপে তাহার গতিরোধ করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি পকেট হইতে কিছু কাগজ বাহির করিলেন এবং দিয়াশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালিয়া সেই জ্বলন্ত কাঠি হাতের কাগজগুলিতে ধরাইয়া দিলেন। কাগজগুলি দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলে তিনি তাহা পশ্চাতে নিক্ষেপ করিয়া, যে দিকে যাইতেছিলেন, সেই দিকে চলিতে লাগিলেন।

কয়েক গজ দূরে গিয়া মিঃ ব্লীড জ্বলন্ত কাগজগুলির দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। সাপটা যে দৃষ্টিশক্তিরহিত, এ বিষয়ে আর তাঁহার সন্দেহের অবকাশমাত্র রহিল না, কারণ, তিনি দেখিলেন, সাপটা তাহার সম্মুখস্থ অগ্নিজিহ্বা গ্রাহ্য না করিয়া জ্বলন্ত কাগজগুলির পাশ দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইল। সে ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে তাঁহার সান্নিধ্য বুঝিতে পারিয়া লেজের উপর ভর দিয়া তাঁহার মস্তকের ঊর্দ্ধে মুখ তুলিল এবং উদ্ঘাটিত মুখবিবর ঘন ঘন আকুঞ্চিত ও প্রসারিত করিতে লাগিল। সেই সময় তাহার শুভ্র মসৃণ বক্ষঃস্থল ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল! মিঃ ব্লীড্ সেই

বিশালকায় অজগরের ফোঁস-ফোঁস্ গর্জ্জনের সহিত তাহার বক্ষঃস্থলের তরঙ্গভঙ্গ নিরীক্ষণ করিলেন।

মিঃ ব্লেক যে কাগজগুলিতে অগ্নি সংযোগ করিয়াছিলেন, তাহা কোনও মামলার কতকগুলি সাক্ষীর জবানবন্দীর নকল। আদালতের নকল-সেরেস্তায় ব্যবহৃত এই সকল কাগজ পুরু ও শক্ত; অগ্নি-সংযোগে তাহা পাতলা কাগজের মত চক্ষুর নিমেষে পুড়িয়া যায় না। এই জন্য মিঃ ব্লেকের আশা হইল, তাহা পুড়িয়া ভস্মীভূত হইতে দুই মিনিট সময় লাগিতে পারে। তিনি বুঝিতে পারিলেন, এই সময়ের মধ্যেই তাঁহাকে কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে। তাঁহার পকেটে ঐরূপ কাগজ আর একখানিও ছিল না; সুতরাং কাগজের আগুন নিবিলে অন্ধকারে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা তাঁহার অসাধ্য হইবে, এরূপ সুযোগ আর হইবে না, ইহাও তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

তাঁহার হাতে যে ছাতা ছিল, তাহা সাধারণ ছাতা নহে; তাহার লোহার দাণ্ডিটি একখানি তীক্ষ্ণাগ্র গুপ্তি, দাণ্ডি ধরিয়া আকর্ষণ করিলেই সেই গুপ্তি বাহির হইয়া আসিত।



গুপ্তিহস্তে মিঃ ব্লেক ও দংশনোন্মুখ অজগর

মিঃ ব্লেক চক্ষুর নিমেষে সেই গুপ্তি নিষ্কাশিত করিয়া বাম হস্তে তাহার অগ্রভাগের ধার পরীক্ষা করিলেন।

গুপ্তির অগ্রভাগের তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিতে করিতে মিঃ ব্লেক দেখিলেন, সাপটা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়াছে। মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ এক পাশে লাফাইয়া পড়িলেন এবং সাপটা তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য আবার মুখব্যাদান করিবামাত্র তিনি গুপ্তির অগ্রভাগ সবেগে তাহার মুখের ভিতর চালাইয়া দিলেন।

সেই আঘাতে সাপটা এরূপ বেগে মাথা টানিয়া লইল যে, গুপ্তিখানা তাঁহার হস্তচ্যুত হইবার উপক্রম হইল; তিনি দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার হাতল চাপিয়া ধরিয়া, সাপের মুখ-বিবর হইতে তাহা টানিয়া লইলেন। তখন সাপটার মুখ হইতে প্রবলবেগে রক্ত ঝরিতে লাগিল; কিন্তু তাঁহার অস্ত্রাঘাতে সে কাতর না হইয়া, গভীর গর্জ্জন করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল।

মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন, যদি তিনি সাপটাকে হত্যা করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাহার দংশনে তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য্য। সেই স্বল্পপরিসর স্থানে তিনি পলায়ন করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবেন না, এবং কাগজগুলি ভস্মীভূত হইলে তিনি আলোকের অভাবে তাহাকে আক্রমণেরও সুযোগ পাইবেন না।

অতঃপর তিনি সতর্কভাবে এক পাশে সরিয়া গিয়া সাপের মুখে ও মাথায় পাঁচ ছয়বার গুপ্তির আঘাত করিলেন। পুনঃ পুনঃ অস্ত্রাহত হইয়া সাপটা ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে মিঃ ব্লেককে আক্রমণের চেষ্টায় একবার ছোবল মারিয়া মেঝের উপর মস্তক নত করিল, আর সে মাথা তুলিতে পারিল না; তাহার পর সে নির্জীব দেহে ছিন্নমূল বংশের ন্যায় পড়িয়া রহিল। তাহার মাথা, মুখ ও গলা হইতে রক্ত ঝরিতে লাগিল। কিন্তু তখনও সে মধ্যে মধ্যে লাঙ্গুল আন্দোলিত করিয়া, মৃত্যুর সহিত অন্তিম সংগ্রামের পরিচয় দিল। সহসা সেই সময় সাপটা এরূপ বেগে লাঙ্গুল আস্ফালন করিল যে, তাহার আঘাতে মিঃ ব্লেক সেই অন্ধকূপের পাষাণ-প্রাচীরে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তখন কাগজগুলি ভস্মীভূত হওয়ায় অগ্নিশিখা দপ্ করিয়া নিবিয়া গেল। মিঃ ব্লেক সেই ভূবিবরস্থ নিবিড় অন্ধকারে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিলেন। অন্ধকারে তিনি কিছুই দেখিতে বা কোন শব্দ শুনিতে পাইলেন না। সাপটারও কোন রকম সাড়া পাইলেন না। সর্পের লাঙ্গুলাঘাতে মিঃ ব্লেকের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল।

কয়েক মিনিট পরে তিনি সেই দেওয়ালে ভর দিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি কয়েক স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, পকেট হাতড়াইয়া ম্যাচ-বাক্স বাহির করিলেন এবং তাহার একটা কাঠী জ্বালিয়া তাহার মৃদু আলোকে অদূরবর্ত্তী সাপটার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন

তাহার অসাড় দেহ পরীক্ষা করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার মহাশত্রু নিহত হইয়াছে।

অতঃপর তিনি সাপটার কুণ্ডলীকৃত অসাড় দেহ উল্লঙ্ঘন করিয়া সেই গহ্বরের অন্য ধারে উপস্থিত হইলেন এবং ছাতাটা তুলিয়া লইয়া গুপ্তিখানি তাহার খাপের ভিতর গুঁজিয়া দিলেন। ছাতার সেই দাণ্ডি দেখিয়া তাহা গুপ্তি বলিয়া আর চিনিবার উপায় রহিল না।

এইবার তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া পূর্ব্বকথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্মরণ হইল, তিনি মিঃ লিসেষ্টার স্প্রিংএর আফিস-কক্ষে একখানি চেয়ারে বসিয়াছিলেন। সেই চেয়ারখানি যে স্থানে সংস্থাপিত ছিল, কোন গুপ্ত কৌশলে সেই স্থানের মেঝে হঠাৎ ফাঁক হইয়া যাওয়ায় যে গভীর গহ্বরের সৃষ্টি হইয়াছিল, তিনি চেয়ার হইতে উল্টাইয়া পড়িয়া সেই গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল কথা মুহূর্ত্তমধ্যে স্মরণ হওয়ায় তিনি ভাবিলেন, মিঃ লিসেষ্টার স্প্রিং তাঁহারই ন্যায় হাইকোর্টের সলিসিটর, সরকারের অনুমোদিত আইন-সমিতির সদস্য, তাঁহার সহকর্ম্মী, তিনি কি উদ্দেশ্যে তাঁহার সহিত এরূপ ব্যবহার করিলেন? অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে মৃত্যুকবলে নিক্ষেপ করিবার জন্য এই যে কল্পনাতীত ভীষণ ফাঁদ পাতিয়া রাখা হইয়াছে, এবং এই ফাঁদে নিক্ষেপ করিয়া হয় ত আরও কত লোককে সেই ভীষণদর্শন সাপটার ক্ষুধানলে আহুতি দেওয়া হইয়াছে—এই প্রকার লোমহর্ষণ ফাঁদ পাতিয়া রাখিবারই বা কারণ কি? ইহাতে কাহার কি গুপ্ত সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়?

মিঃ ব্লীডের ধারণা হইল, কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই এই পৈশাচিক ফাঁদ পাতিয়া রাখা হইয়াছে। সাপটা সম্ভবতঃ অনেক দিন হইতেই সেই ভূগর্ভস্থ অন্ধকূপে প্রতিপালিত হইতেছিল এবং তাহার জীবনধারণের জন্য যথানিয়মে তাহাকে আহার যোগাইতে হইত। কিন্তু সাপটা কিরূপ আহার পাইত? মনুষ্য? তাঁহাকে যে কৌশলে তাহার সম্মুখে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল, এইভাবে আরও কত হতভাগ্য সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন সর্প-বিবরে নিক্ষিপ্ত হইয়া সর্পের ক্ষুধানিবৃত্তি করিয়াছে, আরও কত লোক এই প্রকার সম্পূর্ণ অতর্কিত-ভাবে ইহলোক হইতে অদৃশ্য হইয়াছে—কে তাহাদের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিবে? এই প্রকার নরহত্যার সম্ভাবনার কথা মনে উদিত হওয়ায় মিঃ ব্লীডের সর্ব্বাঙ্গ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। তাঁহার প্রতীতি হইল—লিসেষ্টার স্প্রিং ব্যবহারা-জীবের ছদ্মবেশে মনুষ্যচর্ম্মাবৃত পিশাচ, নরশোণিত লোলুপ উন্মত্ত! তাহাকে নররাক্ষস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লণ্ডনের ন্যায় জনবহুল মহানগরীর কেন্দ্রস্থলে এই পাষাণ-প্রাচীর-বেষ্টিত সুগভীর অন্ধকূপ, সেখানে এক ভীষণদর্শন সর্প প্রতিপালিত হইতেছিল এবং তাহার ক্ষুন্নিবারণের জন্য জীবিত মনুষ্য তাহার কবলে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল! ইহা কি বিশ্বাস করিবার বিষয়?

মিঃ ব্লীড ভাবিলেন, নর-হত্যার অধিকতর নিখুঁত পন্থা কখন আবিষ্কৃত হইতে পারিত কি? নর-হত্যা করিয়া তাহার সকল চিহ্ন বিলুপ্ত করিবার জন্য যে উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহার কোন ত্রুটি ছিল না। তিনি যে সময় বিপন্ন হইয়া সাপের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই সময়েও একটি স্থূল লৌহদণ্ড তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই, সাপটা মনুষ্য-দেহ গ্রাস করিয়া, সেই লৌহদণ্ড অবলম্বন করিয়া বিশ্রাম করিত, এইরূপই তাঁহার ধারণা হইল। তাহার উদরে মানুষের মাংস, অস্থি, অধিক কি, পরিচ্ছদও পরিপাক হইত!

কিন্তু এইভাবে নরহত্যার কারণ কি?

মিঃ ব্লীড কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া সেই অন্ধকারে দাঁড়াইয়া কত কথাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। সহসা লিসেষ্টার স্প্রিংএর মুখ তাঁহার মনে পড়িল। তাহার মুখে ধূর্ত্ততা প্রতিফলিত হইতেছিল বটে, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া তাঁহার এরূপ ধারণা হয় নাই যে, সে নর-হত্যার জন্য এরূপ ভীষণ ফাঁদ পাতিতে পারে। তবে কি সে কাহারও হস্তের ক্রীড়া-পুত্তলিকা? সম্ভবতঃ এই অনুমান সত্য। সে স্বহস্তে তাঁহাকে সেই অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল; কিন্তু এই কার্য্য কি সে স্বেচ্ছায় করিয়াছিল? কোন ফন্দীবাজ পিশাচের ইঙ্গিতে সে নিশ্চিতই পরিচালিত হইতেছিল।

কিন্তু মিঃ ব্লীড আর একটি কথাও বুঝিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, যে হতভাগ্য সংসর্গ-দোষে নানা কুকর্ম্মে জড়িত থাকায় দুর্নামগ্রস্ত হইয়া, ফ্লোরিজেন হোটেলের হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী বলিয়া বিচারালয়ে অভিযুক্ত হইয়াছে, এবং ব্রিক্টনের কারাগারে আবদ্ধ আছে, তাহার সহিত তাঁহার এই সকল দুর্ঘটনার কি সম্বন্ধ? সম্বন্ধ যাহাই হউক, ডান কার্থ তাহার মামলার উপসংহারকালে

তাহার সলিসিটরের নিয়োগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে—এই সংবাদে লিসেষ্টার স্প্রিং অথবা যে নরপিশাচ তাহার আড়ালে থাকিয়া তাহাকে পরিচালিত করিতেছে, সে যে কোন কারণে আতঙ্কাভিভূত হইয়া ড্যান কার্থুর সঙ্কল্প বিফল করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, মিঃ ব্লীড এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলেন। তিনি যাহাতে আদালতে তাহার পক্ষসমর্থন করিতে না পারেন, এই উদ্দেশ্যে লিসেষ্টার স্প্রিং তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, ইহাও তিনি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন।

এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ একটা কথা স্মরণ হওয়ায় মিঃ ব্লীড শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার স্মরণ হইল, মিঃ লিসেষ্টার স্প্রিংএর সহিত ড্যান কার্থুর মামলার আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি স্প্রিংএর নিকট মিস্ এঞ্জেলা হালামের নাম ও ঠিকানা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ড্যান কার্থু মিস হালামকেই অনুরোধ করিয়াছিল—তিনি যেন তাহার সলিসিটর পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করেন। লিসেষ্টার স্প্রিং এ সকল কথা জানিতে পারিয়াছে। ইহার ফল কিরূপ শোচনীয় হইতে পারে, মিস্ হালামের জীবনও যে বিপন্ন হইবে, ইহা তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি ড্যান কার্থুর হিতসাধনের চেষ্টায় আসিয়া এই দুর্বৃত্ত কর্ত্তৃক মৃত্যুকবলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন; মিস্ হালামও তাহার হিতৈষিণী, এ অবস্থায় তাঁহাকেও যে ঐরূপ বিপদে পড়িতে হইবে, এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ রহিল না। যদি তাঁহাকে শীঘ্র সতর্ক করা না হয়, তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য্য—ইহা বুঝিতে পারিয়া মিঃ ব্লীড অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন।

অতঃপর মিঃ ব্লীড সকল চিন্তা ত্যাগ করিয়া, কিরূপে সেই পাষাণ-প্রাচীর-পরিবেষ্টিত কারা-গহ্বর হইতে মুক্তিলাভ করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া একটি কুকর দেখিতে পাইলেন। সেই কুকর দিয়া তিনি সেই গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা ব্যতীত কোনও দিকে পথ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না। সেই গুহার সকল দিকেই নীরন্ধ্র পাষাণ-প্রাচীর। তিনি দিয়াশলাইয়ের দুইটি কাঠী জ্বালিয়া প্রাচীরের চতুর্দ্দিক্ পরীক্ষার পর এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলেন। কিন্তু জল-প্রবাহের অস্ফুট কলধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হওয়ায় সেই শব্দ কোন্ দিক্ হইতে আসিতেছিল, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য তিনি রুদ্ধনিশ্বাসে উদ্যতকর্ণে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই শব্দটা গহ্বরের এক প্রান্ত হইতে শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল—ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন এবং উভয় জানু ও উভয় করতলে ভর দিয়া গুঁড়ি মারিয়া ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। এইভাবে চলিতে চলিতে কিছু দূরে একটা কঠিন লৌহাবরণে তাঁহার হাত পড়িল। তিনি তাহার উপর হাত বুলাইয়া বুঝিতে পারিলেন, সেই গোলাকার লৌহাবরণের উপর একটা আংটা রহিয়াছে। তিনি দুই হাতে সেই আংটা ধরিয়া সবলে ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করিলেন। তিনি সেই আবরণ টানিয়া তুলিয়া, পুনর্ব্বার দিয়াশলাই জ্বালিয়া তাহার নিম্নভাগ পরীক্ষা করিলেন এবং সেখানে লৌহ-নির্ম্মিত মরিচাধরা সোপানশ্রেণী দেখিতে পাইলেন।

মিঃ ব্লীড সেই সোপানশ্রেণীর নিম্নতম প্রান্তে নামিয়া বুঝিতে পারিলেন, তিনি একটি সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিয়াছেন। সেই সুড়ঙ্গটি ভূ-বিবরস্থ নর্দ্দামা বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। সেই নর্দ্দামায় যে জলস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাতে তাঁহার জানু পর্য্যন্ত ডুবিয়া গেল। তিনি দিয়াশলাই জ্বালিয়া সেই আলোকের সাহায্যে স্রোতের অনুকূলে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আশা হইল, সেই দিকে চলিতে চলিতে তিনি সুড়ঙ্গের বাহিরে যাইবার কোনও পথ দেখিতে পাইবেন।

মিঃ ব্লীড উভয় বাহু প্রসারিত করিয়া চলিতে চলিতে প্রায় পঞ্চাশ গজ অগ্রসর হইবার পর আর একটি কঠিন পদার্থ স্পর্শ করিলেন। দীপ-শলাকার আলোকের সাহায্যে তিনি দেখিলেন, উহা আর একটি সোপান, তাহাও লৌহ-নির্ম্মিত। মিঃ ব্লীড সেই সোপান-শ্রেণী অবলম্বন করিয়া কিছু দূর ঊর্দ্ধে উঠিতেই একটি গোলাকার লৌহাবরণে তাঁহার মস্তক স্পর্শ হইল। তিনি দুই হাত ও মাথা দিয়া সবলে তাহা ঊর্দ্ধে ঠেলিতেই লৌহনির্ম্মিত গোলাকার চাক্তিখানি উদ্ঘাটিত হইয়া এক পার্শ্বে সরিয়া গেল। তিনি ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া তারকারাজি-খচিত নৈশাকাশের কিয়দংশ দেখিতে পাইলেন, এতদ্ভিন্ন একটি উচ্চ অট্টালিকার এক দিকের প্রাচীরের কিয়দংশও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল।

মিঃ ব্লীড উভয় বাহুতে ভর দিয়া সেই সুড়ঙ্গ হইতে বাহির হইলেন। তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই কিছু

দূরে একটি মোটর-এঞ্জিনের খস্-খস্ শব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি সেই স্থানটি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাহা কোন কারখানার আঙ্গিনা। সেই আঙ্গিনার এক প্রান্তে একটি গলির মোড় ছিল, তাহাও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। মিঃ ব্লেক ধীরে ধীরে সেই গলির দিকে অগ্রসর হইতেই একখানি বৃহৎ মোটর-লরীর পশ্চাতের লোহিত আলোক দেখিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি লরীর নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাহা চলিতে আরম্ভ করিল, এবং তাহার পশ্চাৎস্থিত সেই লোহিত আলোক অদূরবর্ত্তী অট্টালিকার আড়ালে পড়ায় তিনি আর তাহা দেখিতে পাইলেন না। মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন, সেই লরী সঙ্কীর্ণ গলি অতিক্রম করিয়া দূরে চলিয়া গিয়াছে।

লরীখানি এইভাবে অদৃশ্য হওয়ায় লরীর চালককে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবার আশা রহিল না। মিঃ ব্লেক অন্ধকারাচ্ছন্ন গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া চারিদিক্ দেখিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার বামপার্শ্বে একটি উচ্চ অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন; কিন্তু নৈশ অন্ধকারে সেই অট্টালিকার সকল অংশ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না। তবে সেই অট্টালিকার কোন কোন বাতায়ন বায়ুবেগে এক একবার খুলিতেছিল, আবার সবেগে বন্ধ হইতেছিল, সেই শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। সেই সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল এবং মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতেছিল। মিঃ ব্লেক সেই অট্টালিকার ছাদের দিকে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিতেই বিদ্যুতের ক্ষণস্থায়ী চঞ্চল প্রভায় অট্টালিকা-শিরে মোটামোটা সোনালী অক্ষরে সেই অট্টালিকার নাম ক্ষোদিত দেখিলেন। তাহা দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, তিনি লিসেষ্টার স্প্রিংএর আফিস-কক্ষের বাতায়ন হইতে এই অক্ষরগুলিই দেখিতে পাইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে তখন হ্যাম্বলডন হোটেলের পশ্চাদ্বর্ত্তী আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়াছিলেন, এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ রহিল না। লিসেষ্টার স্প্রিংএর যে আফিসে তিনি বৈষয়িক কার্য্যের অনুরোধে কিছুকাল পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই স্থান হইতে সেই আফিসের দূরত্ব যে এক শত গজের অধিক নহে, ইহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন।

অতঃপর তিনি কি করিবেন, কোন্ দিকে যাইবেন, ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই সময় সেই আঙ্গিনার এক দিকের কোণ হইতে কাহারও অস্ফুট আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। সেই শব্দ শুনিয়া তিনি সতর্কভাবে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। গোঙ্গানী শব্দটা থামিয়া থামিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। তিনি শব্দ লক্ষ্য করিয়া কয়েক গজ অগ্রসর হইতেই পথের আবর্জ্জনা সংরক্ষণের গোলাকার একটা আধারের অন্তরালে এক জন পুলিসম্যানকে পড়িয়া থাকিতে দেখিলেন। তাহার হাত-পা দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ এবং সে যাহাতে চীৎকার করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে তাহার মুখও রুমাল দ্বারা আবৃত ছিল। এই জন্য সে পথিকদের সাহায্য-প্রার্থনায় চীৎকার করিতে না পারায় অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিতেছিল। মিঃ ব্লেক তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার ধরাশায়ী দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন এবং পকেট হইতে ছুরী বাহির করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে তাহার দেহের বন্ধন অপসারিত করিলেন; পরে তাহার মুখের বন্ধনও খুলিয়া দিয়া, হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিলেন। সে তখন কথা কহিতে পারিবে—ইহা বুঝিতে পারিয়া মিঃ ব্লেক তাহাকে তাহার সেইরূপ দুর্দ্দশার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

পুলিসম্যান কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া আড়ষ্টস্বরে বলিল, "জুরী! ড্যান কার্থুর মামলার জুরীদের পাহারায় নিযুক্ত ছিলাম, তাহার এই ফল!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই মামলার জুরীরা কোথায়? তাঁহাদের পাহারা দিতে আসিয়া তোমার এরূপ দুর্দ্দশার কারণ কি? এ কাহার কীর্ত্তি?"

পাহারাওয়ালা যাহা দেখিয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে মিঃ ব্লেকের নিকট প্রকাশ করিল। সে অধিক কিছু জানিত না, কিন্তু মিঃ ব্লেক তাহার নিকট যে লোমহর্ষণ কাহিনী শ্রবণ করিলেন, তাহাই যথেষ্ট। তিনি তাহা শুনিয়াই বুঝিতে পারিলেন, যে ভীষণ ষড়যন্ত্রে তাঁহার জীবন বিপন্ন হইয়াছিল, সেই ষড়যন্ত্রে পড়িয়া জুরীরাও সদলে অদৃশ্য হইয়াছেন! তিনি সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারিলেন, ড্যান কার্থুর মামলার সহিত প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে যাঁহাদের কোন সংশ্রব আছে, তাঁহাদের বিরুদ্ধে একটা ভীষণ ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এই ষড়যন্ত্রের মূল কোথায়, এবং প্রধান চক্রী কে, তাহা অনুমান করা তাঁহার অসাধ্য হইলেও তিনি একটি বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলেন; এই ষড়যন্ত্রের প্রধান নায়ককে যাহারা নানাভাবে সাহায্য করিয়া ষড়যন্ত্র সফল করিবার চেষ্টা করিতেছিল, ড্যান কার্থুর

সলিসিটর মিঃ লিসেষ্টার স্প্রিং তাহাদের অন্যতম। তাহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াই ড্যান কার্থু আত্মরক্ষার আশায় শেষ মুহূর্ত্তে লিসেষ্টার স্প্রিংকে তাহার মামলার সংস্রব হইতে অপসারিত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। যে কেহ ড্যান কার্থুর সমর্থন করিবে, চক্রীর দল তাহার জীবন বিপন্ন করিবার জন্য ষড়যন্ত্রজাল প্রসারিত করিবে। মিস্ হালাম যে কারণেই হউক, ড্যান কার্থুর হিতৈষিণী, তিনি তাহাকে সাহায্য করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, সুতরাং কুচক্রীরা তাঁহারও সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিবে—মিঃ ব্লীড এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলেন। তাহাদের অন্যতম সহযোগী লিসেষ্টার স্প্রিং তাঁহার নিকট মিস্ হালামের নাম ও ঠিকানা জানিতে পারিয়াছে, সুতরাং তাঁহারও বিপদ অনিবার্য্য, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ায় মিঃ ব্লীড মিস হালামকে সতর্ক করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন। এই চেষ্টায় মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করা উচিত নহে বুঝিয়া তিনি সেই পুলিসম্যানের হুইস্‌টা চাহিয়া লইলেন ও তাহাতে কয়েকটা ফুৎকার প্রদান করিলেন। সেই গভীর রাত্রিতে পুনঃ পুনঃ হুইস্‌ধ্বনি হওয়ায় সেই শব্দ সেই অঞ্চলের মত পুলিসম্যানের কর্ণগোচর হইল, তাহারা সকলেই স্ব স্ব ঘাঁটি ত্যাগ করিয়া সেই সকল হুইস্‌-ধ্বনির অনুসরণে হ্যাম্বলডন হোটেলের আঙ্গিনায় উপস্থিত হইল। তিনি তাঁহার পরিচয়সূচক নামের কার্ড দেখাইয়া রজ্জুবদ্ধ কন্‌ষ্টেবলটিকে কি ভাবে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা তাহাদের গোচর করিলেন এবং তাহাদিগকে এ কথাও জানাইলেন যে, প্রয়োজন হইলে তিনি আদালতে সাক্ষ্যদানেও প্রস্তুত।

অতঃপর বিভিন্ন বীটের কন্‌ষ্টেবলগুলি তাহাদের বিপন্ন সহযোগীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া কৌতূহলভরে জেরা আরম্ভ করিলে, মিঃ ব্লীড তাহাদের অলক্ষ্যে নিঃশব্দে অদৃশ্য হইলেন। তিনি নির্জ্জন পথে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে তিনি লিসেষ্টার স্প্রিংএর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া পথের যে অংশে ট্যাক্সি হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন, প্রায় সেই স্থানেই আসিয়া পড়িয়াছেন! এই অল্পসময়ের মধ্যে স্বপ্নের মত কত লোমহর্ষণ ঘটনা ঘটিয়া গেল, মৃত্যুর সহিত তাঁহাকে কি ভাবে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন এবং পরমেশ্বরের অনুগ্রহে মৃত্যুকবল হইতে রক্ষা পাইয়াছেন বুঝিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

মিঃ ব্লীড পথে আর বিলম্ব না করিয়া তাঁহার ছাতাটি বগলে লইয়া হ্যাম্বলডন কোর্টের ভিতর দিয়া লিসেষ্টার স্প্রিংএর আফিসের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি ৬৩এ নং অট্টালিকার দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বার রুদ্ধ দেখিলেন। কিন্তু দ্বার রুদ্ধ থাকিলেও লিসেষ্টার স্প্রিং যে সে সময় তাহার গৃহে উপস্থিত নাই, ইহা তাঁহার মনে হইল না। কিন্তু আর তাহার প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শনের জন্য তাঁহার আগ্রহ হইল না। তিনি দ্বারপ্রান্তে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া কি চিন্তা করিলেন, তাহার পর কোন রকম সাড়া না দিয়া পকেট হইতে একটি সূক্ষ্মাগ্র লৌহশলাকা বাহির করিলেন; তাহা তিনি দরজার কলের ভিতর প্রবিষ্ট করাইয়া দুই একবার ঘুরাইতেই কলের দাঁত সরিয়া গেল। তিনি দ্বার খুলিয়া সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ন্যায় সম্ভ্রান্ত সলিসিটরকে সেই উপায়ে পরের গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিলে অনেকেই বিস্মিত হইত, কিন্তু সেই গভীর রাত্রিতে কেহই তাঁহাকে সেই গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিতে পাইল না। তিনি লিসেষ্টার স্প্রিংএর আফিস-কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দ্বারে ঘসা কাচের কপাট ছিল। সেই কপাটের দিকে চাহিয়া মিঃ ব্লীড বুঝিতে পারিলেন, সেই কক্ষে তখনও বাতি জ্বলিতেছিল। তাহার প্রভা কপাটের কাচে প্রতিফলিত হইতেছিল।

মিঃ ব্লীড সন্দিগ্ধচিত্তে দ্বার খুলিয়া পরবর্ত্তী কক্ষে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু সেই কক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া তাঁহার পদদ্বয় আর অগ্রসর হইল না, সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন, তাঁহার শ্বাস-রোধের উপক্রম হইল! তিনি সেই কক্ষে মিঃ লিসেষ্টার স্প্রিংকে দেখিবার আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে মিস্ এঞ্জেলা হালামের হাস্যপ্রফুল্ল মুখ দেখিতে পাইলেন! মিস্ হালাম সেই গভীর রাত্রিতে প্রফুল্লচিত্তে মৃত্যুগহ্বর-দ্বারে উপবিষ্টা!

মিস্ হালাম মুখ তুলিয়া চাহিতেই মিঃ ব্লীডকে দেখিতে পাইলেন, তাঁহাকে উৎসাহভরে বলিলেন, "এই যে মিঃ ব্লীড আসিয়াছেন দেখিতেছি! ভাবিতেছিলাম, কখন্ আপনি আসিবেন? মিঃ স্প্রিংএর সঙ্গে আপনার দেখা হয় নাই? তিনি যে আপনারই সন্ধানে গিয়াছেন!"

মিঃ ব্লীড মিস্ হালামকে কি বলিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। মানুষ সম্মুখে ভূত দেখিলে যে ভাবে সে

দিকে চাহিয়া থাকে, মিঃ ব্লীড মিস্ হ্যালামের মুখের দিকে ঠিক সেইরূপ আতঙ্কবিহ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। মিস্ হ্যালাম কিরূপ সাংঘাতিক ফাঁদে পদবিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা বুঝিয়াই তাঁহার এই আতঙ্ক। নিজের বিপদের কথা তখন তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

মিঃ ব্লীড দেখিলেন, তিনি পূর্ব্বোক্ত ভূবিবরে ভীষণদর্শন অজগরের সম্মুখে নিক্ষিপ্ত হইবার পূর্ব্বে যে চেয়ারে বসিয়াছিলেন, মিস্ হ্যালামকে সেই চেয়ারেই স্থাপিত করা হইয়াছে! সুতরাং মুহূর্ত্ত পরে মিস্ হ্যালামের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইবে, ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার যেন মূর্চ্ছার উপক্রম হইল। তিনি কোন কথা না বলিয়া, হাতের ছাতাটি এক পাশে ফেলিয়া রাখিয়াই ক্ষিপ্তের ন্যায় মিস্ হ্যালামের চেয়ারের সম্মুখে লাফাইয়া পড়িলেন; বোধ হয়, মিস্ হ্যালামকে সেই চেয়ার হইতে অপসারিত করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। মিস্ হ্যালাম তাঁহাকে ঐরূপ বিহ্বলভাবে লাফাইয়া পড়িতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার এইপ্রকার ব্যবহারের কারণ বুঝিতে না পারিয়া ব্যগ্রভাবে চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইতেই ঘুরিয়া পড়িলেন! কারণ, সেই মুহূর্ত্তে চেয়ারখানি যেখানে স্থাপিত ছিল, সেই স্থানের মেঝের এক অংশ ঊর্দ্ধে উঠিয়া, চেয়ারের সম্মুখের অংশটা ঢালু হইয়া যেন নীচের দিকে নামিয়া গেল! সেই সঙ্গে চেয়ারখানাও সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িল। মুহূর্ত্ত পরে মেঝের সেই অংশ যেন মুখ-ব্যাদান করিয়া মিস্ হ্যালামকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। মিস্ হ্যালাম দুই হাতে চেয়ারের হাতা চাপিয়া ধরিয়া ঝোঁক সামলাইবার চেষ্টা করিলেন। আকস্মিক-ভয়ে তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইল, দুই চক্ষু কপালে উঠিল, তিনি অচিন্ত্যপূর্ব্ব বিপদের আশঙ্কায় হাঁপাইতে লাগিলেন; কিন্তু তখন আর তাঁহার আত্মরক্ষার কোন উপায় ছিল না। তাঁহাকে ঊর্দ্ধপদে হেটমুণ্ডে সেই চেয়ার হইতে স্খলিত হইয়া অন্ধকারসমাচ্ছন্ন ভূবিবরে নিক্ষিপ্ত হইতে দেখিয়া মিঃ ব্লীড ব্যগ্রভাবে উভয় বাহু প্রসারিত করিয়া তাঁহার ঘাড় চাপিয়া ধরিলেন এবং অতি কষ্টে তাঁহাকে সেই গুহামুখ হইতে নিরাপদ স্থানে অপসারিত করিলেন। মিঃ ব্লীডের বাহুদ্বয়ের সাহায্যেই তিনি সেই সাংঘাতিক ফাঁদ হইতে উদ্ধার লাভ করিলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

আকাশ-রাণী

আকুল নয়নে চেয়ে থাকি
অই দূর আকাশের পানে,—
ঘন-নীল স্রোতোজল সেথা
ভরা যেন কুলকুল গানে।

পরাণ প্লাবিত সুর তারি—
ভূতলে এসেছে এই নামি,
ধরণীর বাতায়নে বসে
দেখি তায় মুগ্ধ একা আমি।

দূর হ'তে ধেয়ে আসা সেই
হৃদয়ে বাঁধিছে মোর বাসা,
আকাশ-অবনী ছু'য়ে মিলে
আজি যেন কত ভালবাসা!

বিরহ-বেদনা নাই কারো
মিলনের ডোরে বাঁধা সব,—
তৃণ-তরু-মাঝেতেও শুনি
সে-মধুর প্রীতি-কলরব।

আকুল যমুনাধারা এই
ভাসাইল সব কূল পার,
কি গভীর ছুটিয়াছে স্রোত
বাঁধ যেন ভাঙিয়াছে কার।

নেমে এল কোন্ তীর হ'তে
কল-কল কার মহাবাণী,
মনে হয়, আসিয়াছে বুঝি
আজি মোর আকাশের রাণী।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল (এম, এ)



পৃথিবীব্যাপী শান্তির পরিচয়

(১৯১৯—১৯৩৫)

জার্ম্মাণ মহাযুদ্ধের অবসানে সমরক্লান্ত য়ুরোপীয় জাতিসমূহ ধনজনে বঞ্চিত, বিপুল ঋণভারে কুব্জ, এবং পরস্পরের অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া শ্মশান-বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেন। সকলে তিন হাত মাটী মাপিয়া নাকে খত দিয়া ও নিজের নিজের কাণ মলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর তাঁহারা এ রকম কুকর্ম্ম করিবেন না। অর্দ্ধভূমণ্ডলব্যাপী রুসিয়ার জারের সুদৃঢ় সিংহাসন চূর্ণ হইয়া ধূলায় মিশিয়া গেল, প্রবলপ্রতাপ জার ও তাঁহার পরিজনবর্গের মস্তক লইয়া রুস-রাজধানীর পথে পথে ফুটবল খেলা চলিয়াছিল। মহাবীর নেপোলিয়ানের ন্যায় অদ্ভুতকর্ম্মা, মহাপরাক্রান্ত বীরকেশরী কৈসার শেষ তাল সামলাইতে না পারিয়া ক্ষোভে—দুঃখে—মনস্তাপে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন, জার্ম্মাণী দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া, নতজানু হইয়া মিত্রশক্তিপুঞ্জের নিকট হীনতা স্বীকার করিলেন। মুসলমান ধর্ম্ম-জগতের শিরোমণি তুরস্কের খলিফা আবদুল হামিদ ফকিরী লইয়া চক্স যাত্রা করিলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। সকলেই তোবা করিয়া বলিলেন, খুব শিক্ষা হইয়াছে, আর নয়, যুদ্ধের নামও মুখে উচ্চারণ করা হইবে না। এবার শান্তি, পৃথিবীব্যাপী বিরাট শান্তি প্রতিষ্ঠিত হউক। স্বর্গরাজ্য ধরাতলে নামিয়া আসুক। গীর্জ্জায় গীর্জ্জায় পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করা হইল, ধর্ম্মগুরু পোপ তাঁহার ধর্ম্মশালায় বসিয়া প্রভুর আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া জলদগম্ভীর স্বরে শান্তি ঘোষণা করিলেন। —আমেন!

কিন্তু য়ুরোপের ক্ষাত্রশক্তি শ্মশান-বৈরাগ্য অবলম্বন করিবার পর পৃথিবী জুড়িয়া শান্তির পতাকা কি ভাবে উড়িতে লাগিল, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে এ সময় তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর এ পর্য্যন্ত একটি বৎসরও অতিবাহিত হয় নাই, যে সময় পৃথিবীর কোন না কোন দেশে অশান্তির অনল প্রজ্বলিত হইয়া, সেই দেশের সুখ ও শান্তি বিধ্বস্ত না করিয়াছে। প্রকাশ্যভাবে কোথাও কোন মহাযুদ্ধ বিঘোষিত হয় নাই বটে, কিন্তু অগ্নিরাশি স্থায়িভাবে নির্ব্বাপিত হয় নাই; রণদামামাধ্বনির বিরাম হয় নাই। এই উক্তি কতদূর সত্য, দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করা যাউক।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভার্সেলী সন্ধির খসড়া প্রস্তুতের সময় হইতেই সোভিয়েট রুসিয়া তাহার অধিকাংশ প্রতিবেশীর সহিত যুদ্ধ করিতেছিল। এই সময় পুলিস-বাহিনী রুসিয়ার সর্ব্বপ্রধান ও প্রবল শত্রু ছিল; ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তাহারা রুসিয়ার প্রতিকূলে অস্ত্র-ধারণ করিয়া সাফল্য লাভ করিয়াছিল। অতঃপর রাওলীর বিরুদ্ধে পরিচালিত রুসিয়ার খ-পোত-বাহিনী খ-পোতের একটি প্রধান আড্ডায় অগ্নিসংযোগ করিয়াছিল।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে 'লীগ অফ নেসন্স' প্রকাশ্যভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার গণ্ডীর বাহিরে ব্যাভেরিয়ায়, কোরিয়ায়, মিসরে, হঙ্গেরী ও পারস্যে বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময় পঞ্জাবের অমৃতসরে বহু হিন্দু নিহত হইয়াছিল, এবং হঙ্গেরীতে ইহুদী ও সোসিয়ালিষ্টদের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ-অভিযান চলিতেছিল

অতঃপর ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তুরস্ক তাহার অপহৃত রাজ্য উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। তাহার সেই রাজ্যখণ্ড মিত্রশক্তি মহাযুদ্ধের পর গ্রীসকে বক্‌শিস দিয়াছিলেন। ইহার ফলে তুর্কীরা-গ্রীক সৈন্যদল বিধ্বস্ত করিয়া, তাহাদের বিজয়ী বাহিনীর অভিযান পথে যে সকল জনবহুল সমৃদ্ধ নগরী ছিল, অগ্নিসংযোগে তাহা ভস্মীভূত করিয়াছিল, এবং প্রায় দশ লক্ষ অধিবাসীকে গৃহহীন করিয়া গ্রীসের অধিকৃত স্মার্ণায় প্রবেশ করিয়াছিল। স্মার্ণায় তুর্কী-দুর্গের বাহিরে যে গ্রীক শিবির ছিল, গ্রীকসৈন্যরা সেখানে আশ্রয় গ্রহণের পূর্ব্বেই কামাল পাশা-পরিচালিত তুর্কীরা তাহা অধিকার করিয়াছিল।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে আইরিস ফ্রি ষ্টেট প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে আয়ার্লাণ্ডে যে সকল যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতেও বহু রক্তপাত হইয়াছিল। ১৯১৯ হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এংলো আইরিস যুদ্ধেও প্রচুর জনক্ষয় হইয়াছিল, এবং বহু ধনজনপূর্ণ কর্ক নগরের কিয়দংশ ভস্মীভূত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন উত্তর ও দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ডে রাজনীতিক ও ধর্ম্মনীতিক শত্রুতা অতি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল। ডবলিন নগরের শুল্ক-ভবন (the Customs

House) সুদৃশ্য ও প্রসিদ্ধ হর্ম্ম্য-শ্রেণীর অন্যতম ছিল ; কিন্তু এই সময় সিন্-ফিন সম্প্রদায়ভুক্ত আততায়ীরা অগ্নিসংযোগে তাহা ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়াছিল। ইহার কয়েক বৎসর পর পর্য্যন্ত ফ্যাসিষ্ট সম্প্রদায় ইটালীতে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের কর্ম্মশীলতায় ইটালীর শান্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল, এবং সেই সময় মরক্কোতে, চীনে, এমন কি, ভারতেও অশান্তির দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। ব্যাভেরিয়ার, বুলগেরিয়ার, ব্রেজিলে, মেক্সিকো ও স্পেনেও যে অন্তর্বিপ্লব-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহা সহজে নির্ব্বাপিত হয় নাই।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে গ্রীকো-আলাবানিয়ান সীমান্তে জানিনার সন্নিকটে জেনারেল টেলানী ও চারিজন সামরিক কর্ম্মচারী (Army Officers) শোচনীয়রূপে নিহত হইয়াছিলেন। অবশেষে করফু নগর বোমায় চূর্ণ ও অধিকার করিয়া ইটালীয় সরকার তাহার চরম দাবী (ultimatum) গ্রীসের নিকট বিঘোষিত করিয়াছিল।

সেই বৎসরেই রুড়ের অধিকার লইয়া জার্ম্মাণীর সহনশীলতার পরীক্ষা হইয়াছিল। সামরিক শক্তির প্রতিকূলে তাহার এই কঠোর পরীক্ষার পরিচয় পাইয়া বিশ্ববাসীকে বিস্ময়াকুল হইতে হইয়াছিল। জার্ম্মাণী চুক্তির টাকা প্রদানে অসমর্থ হওয়ায় ফরাসী ও বেলজিয়ান বাহিনী রুড়ের গিরি-উপত্যকা অধিকার উপলক্ষে শান্তির প্রতি যে অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় শোণিতের অক্ষরে লিখিত থাকিবে, ইহাও পৃথিবীব্যাপী শান্তির অন্যতম নিদর্শন! ১৯২৫ ও ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে সিরিয়ার অন্তর্ব্বর্ত্তী ড্রুসেসের বিপ্লব-বহ্নি নির্ব্বাপিত করিবার জন্য ফরাসী সরকার যে সকল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারা মহা উৎসাহে অবশেষে প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রস্থল দামাস্কস নগর পর্য্যন্ত বোমা মারিয়া চূর্ণ করিয়াছিল। ইহাও ফরাসীজাতির শান্তিপ্রিয়তার একটি অকাট্য প্রমাণ বটে! ঐ সময়েই অর্থাৎ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে মরক্কোনিবাসী রিফিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত আরবগণের দলপতি আবদুল করিম স্পেনের রাজশক্তির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়া একটি আশ্রিত রাজ্য (a protectorate) স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং এই উদ্দেশ্যে পরবর্ত্তী বৎসর অর্থাৎ ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে স্পেনের মিত্রশক্তি ফ্রান্সকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। আবদুল করিমের সেই চেষ্টা সফল হইলে সেই অঞ্চলের ইতিহাস অন্য আকার ধারণ করিত। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল না হইলেও উত্তর-আফ্রিকার যে সকল দেশীয় সৈন্য স্পেনের অনুকূলে সমর-ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিল, তাহাদের পরাজয় ও জনক্ষয়ের কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্মরণীয় হইয়া বিরাজ করিবে।

আমেরিকান নৌবাহিনী নিকারাগুয়া ত্যাগের দুই বৎসর পরে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে পুনর্ব্বার সেখানে ফিরিয়া আসিয়া ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তথায় ছিল। তাহারা সেখানে বিদ্রোহ-দমনের ভার পাইয়াছিল।

অতঃপর চীনদেশে, গ্রীসে, স্পেনে এবং পর্টুগালে অন্তর্ব্বিপ্লবের পুনরবতারণা হইয়াছিল, এবং তাহার অব্যবহিত পরে বৃটিশকে আরবদের বিরুদ্ধে সৈন্যদল প্রেরণ করিতে হইয়াছিল। ত্রিপোলির বিদ্রোহীদের সহিত ইটালিয়ানদের যুদ্ধ হইয়াছিল, এবং বলিভিয়ায়, প্যানামায়, চিলী, প্যারাগুয়ে ও সালভেডারে বিপ্লবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। ইহাও য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপী শান্তির নিদর্শন!

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে মেক্সিকোর ওব্রিগনে নির্ব্বাচিত প্রেসিডেন্টের হত্যাকাণ্ডের পর ভেরাক্রুজে ও উত্তরস্থিত রাজ্যসমূহে দূরব্যাপী বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল। অনেক খণ্ডযুদ্ধের পর বহু চেষ্টায় বিপ্লবী দল জিমাইনস ও সা বিনস্মার যুদ্ধে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইলেও বহুদিন যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদল পরিচালিত করিয়াছিল।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী সমুদ্রের জল হইতে লবণ প্রস্তুত করিয়া আইন লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, তাহার পর আইন অমান্য আন্দোলন ভারতের চতুর্দ্দিকে সম্প্রসারিত হইয়াছিল। বৃটিশ সৈন্যদল খাইবার গিরিপথ অবরুদ্ধ করিয়াছিল। ওদিকে বলিভিয়ার বিদ্রোহীরা প্রেসিডেন্ট সাইলসের শাসনপ্রথার উচ্ছেদসাধন করিয়া রাজ্যে সামরিক শাসন-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ফরাসী সৈন্যরা যৎকালে রাইনল্যাণ্ড হইতে প্রস্থান করিতেছিল, সেই সময় পেরুর প্রেসিডেন্ট লিগুইয়া পদত্যাগ করিলে, সেই দেশে সামরিক আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সামরিক আইন যখনই যে দেশে প্রবর্ত্তিত হউক, তাহা সেই দেশের আভ্যন্তরীণ অশান্তিরই নিদর্শন এবং তাহা কোন দেশের পক্ষে গৌরবজনক বা কল্যাণপ্রদ নহে।

ইহার পর সার প্রদেশ হইতে জার্ম্মাণ সৈন্যদল অপসারিত হইয়াছিল। ব্রেজিলের বিদ্রোহীদের প্রতিষ্ঠিত শাসন-পরিষদের আদেশে রাষ্ট্রনেতা ওয়াসিংটন লুইস কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের অবসানকালে স্পেনের জাকাতে প্রজাপুঞ্জ বিদ্রোহী হইয়াছিল!

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে জাপান রাজনীতিক কৌশলাবলম্বনে মাঞ্চুরিয়া গ্রাস করিয়াছিল এবং তাহার অর্ণবপোত-বাহিনী চীনা সৈন্যদের বোমা মারিয়া আহত ও নিহত করিয়াছিল। জাপানীরা লীগের ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিয়া সাংহাইএ চীনের অধিকৃত চাপেয়াই আক্রমণ করিয়াছিল। জাপানীদের বোমাবৃষ্টিতে য়ুনিয়ন ষ্টেশন ভস্মীভূত হইলে আমেরিকা ও বৃটিশ পক্ষ হইতে প্রতিবাদ হইয়াছিল, কিন্তু তাহা অরণ্যে রোদনবৎ বিফল হইয়াছিল।

য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর বিশ্বে শান্তি স্থাপিত হইবে, ইহা মহা আড়ম্বরে ঘোষণা করা হইয়াছিল ; কিন্তু সকলেই মৌখিক বৈরাগ্য প্রকাশ করিয়া গোপনে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। শান্তির অভয়-বাণী প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পৃথিবীতে অশান্তির দাবানল কি ভাবে প্রধূমিত হইতেছিল, গত ষোড়শ বর্ষের ইতিহাস হইতেই তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

ফ্রান্সে ফাসিজ্‌ম্

বিগত ফরাসী বিপ্লবের পর হইতেই ফ্রান্স সাম্যবাদের এবং গণতন্ত্রের নিকেতন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে যে প্রবল রাজনীতিক বিপ্লব ঘটিয়াছিল, তাহার ফলে তথাকার প্রাচীন রাজতন্ত্র খসিয়া পড়িয়াছিল এবং সেই বিপ্লব হইতে যে স্বাধীনতা, সাম্য এবং মৈত্রীর রব উত্থিত হইয়াছিল, তাহাই এখন পৃথিবীর জনসাধারণের চিন্তাক্ষেত্রকে এবং রাজনীতিক ভাব-রাজ্যকে শাসন করিতেছে। ইতিহাসে অভিজ্ঞ পাঠকগণই এক-বাক্যে স্বীকার করিবেন যে, ফরাসী বিপ্লবই বর্ত্তমান যুগের গণতন্ত্র-বাদের এবং জাতীয়তা-সম্পর্কিত ধারণার জনক। ফ্রান্সই ডেমক্রেসী-(Democracy) এবং জাতীয়তাবাদের সূতিকাগৃহ। সেই ফ্রান্সে

আজকাল ফাসিজ্‌ম্ নামক মতবাদের প্রসারলাভ হইতেছে, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। ফাসিজম্ সর্ব্বস্বত্ববাদের প্রতিকূল মত। ইহা সাম্যবাদের অনুকূল নহে। ইটালীতে এই মতবাদের জন্ম হইয়াছে। ইহার জন্ম ইটালীতে সেনর মুসোলিনীর শক্তি পাকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ ফ্রান্সের যুবজনগণ সেই ফাসিজম্ মতের দিকে ঢলিয়া পড়িতেছেন। ফাসিজম্ এক জন সর্ব্বশক্তিমান্ ব্যক্তিকে নেতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে। আজ ফ্রান্সে সেই মত বিস্তার লাভ করিতেছে বলিয়া বহুলোক বিস্মিত।

ইহার কারণ কি? কেন আজ ফ্রান্সে গণতন্ত্রবাদ উদীয়মান যুবকসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে? ইহার কারণ, ফ্রান্সের পদস্থ রাষ্ট্রনেতাদিগের মধ্যে অনেকে নীতিভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছেন, এই অভিযোগ অনেক বিশিষ্ট রাজনীতিকদিগের মুখে শুনা যাইতেছে। ফরাসীদিগের মনেও এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহারা মনে করিতেছে যে, ফরাসী গণতন্ত্রের রাজপুরুষদিগের মধ্যে অনেকে অতিশয় কলুষিতচরিত্র এবং ঘুষখোর। তথাকার রাজ-পুরুষগণ বরাবরই ঘুষখোর এবং কার্য্যক্ষেত্রে নীতিজ্ঞানবর্জ্জিত। ফরাসীরা জানে যে, তথাকার ডেপুটীগণ ও মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্যগণ, পুলিস, সংবাদপত্রের পরিচালকবর্গ এবং বিচারকগণকে উৎকোচ প্রদানে বশীভূত করা যায়। এই অবস্থা তথায় বহুদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। লোক ইহা সহিয়া যাইতেছে। কিন্তু ইদানীং এই ব্যাপার এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, ইহা তথাকার জনসাধারণের সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রান্ত করিয়া যাইতেছে। সেই হেতু লোক চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এক জন বিশিষ্ট লেখক লিখিয়াছেন যে, বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে ফ্রান্সের যে সকল অঞ্চল বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল, সেই সকল অঞ্চল পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী রাজপুরুষ বা শাসনকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের উৎকোচগ্রাহিতা বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐ সকল স্থানকে পুনর্গঠিত করিবার সময় অনেক টাকা লোকজনকে দিতে এবং ব্যয় করিতে হইয়াছিল। সেইজন্য অনেক প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তির দুর্ব্বল নৈতিক বুদ্ধি একেবারে খসিয়া পড়িতেছে। যখন এই সকল বিধ্বস্ত অঞ্চল পুনর্গঠন করিবার জন্য প্রভূত অর্থ প্রদত্ত হইতে থাকিল, তখন চেম্বার অফ ডেপুটীর সদস্যগণ আপনাদের নির্ব্বাচকমণ্ডলীর জন্য অধিক অর্থ গ্রহণ করিবার উদ্দেশে কৌশলজাল বিস্তৃত করিতে থাকিলেন এবং সহজপ্রাপ্য অর্থের কিয়দংশ স্বয়ং রাখিতেও কুণ্ঠাবোধ করিলেন না। যত দিন বেশ দু'পয়সা আসিতেছিল, তত দিন কোন আপত্তি শুনা যায় নাই। কিন্তু যেমন অর্থ-প্রদান শেষ হইয়া গেল, অর্থ-স্রোত বিপরীতমুখগামী হইল, এবং ফরাসী রাজ্যে বেকার এবং দরিদ্র লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অমনই লোকের মনে ডেপুটী প্রভৃতিদিগের উপর ক্রোধের সঞ্চার হইতে থাকিল। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত এলেকজাণ্ডার ষ্টাভিস্কির আত্মহত্যার পর লোকের মনে এই ভাব অতি প্রবল হইয়া উঠে। ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রীর শ্যালক দুই জন মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্য এবং প্যারিসে পুলিশের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা পর্য্যন্ত সেই কলঙ্কর কাণ্ডে জড়িত হইয়া পড়িলেন। এই ব্যাপারের তদন্তকালে আপীল আদালতের এক জন বিচারপতিও নিহত হইলেন। ইহার পর আরও কতকগুলি অপযশজনক মামলা জনসাধারণকে অধিক মাত্রায় উত্তেজিত করিয়া তুলিল। ক্রুদ্ধ জনসাধারণ তখন মনে করিতে লাগিল যাহাতে এই ব্যাপারের প্রতিকার হয়, তাহা করিতেই হইবে। কিন্তু কি উপায়ে তাহা করা সম্ভব, তাহাই হইল তখন চিন্তনীয়। তখন অধিকাংশ লোক, বিশেষতঃ যুবক-সম্প্রদায় মনে করিলেন যে, এইরূপ অবস্থায় এক জন জবরদস্ত লোককে শাসন-তরণীর কাণ্ডারীপদে প্রতিষ্ঠিত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তেমন জবরদস্ত লোক খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সেই জন্য সকলে কর্ত্তকর্টা জবরদস্ত গ্যাষ্টন ডুমার্গকে শাসন-তরণীর কাণ্ডারীপদ দিয়াছিলেন।

ডুমার্গ মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই খুব দৃঢ়হস্তে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে, যদি ঠিকমত কার্য্য করা যায়, তাহা হইলে ইহা প্রতিপন্ন করা সম্ভব হইবে যে, গণতন্ত্র লোকের কল্যাণকরভাবে এবং সাধুপথে পরিচালিত করিতে পারা যায়। লোকের মনে যে ধারণা জন্মিয়াছে যে, গণতন্ত্র দ্বারা লোকের কল্যাণ সাধিত হয় না, অথবা উহা সাধু পথে পরিচালিত করা সম্ভবে না—এ ধারণা সত্য নহে, ইহা কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রতিপন্ন করিতেই হইবে। সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য গ্যাষ্টন ডুমার্গ দুইটি কার্য্যধারা ধরিয়া তাঁহার নীতি পরিচালিত করিতে থাকেন। তিনি মুদ্রায় সুবর্ণমান বর্জ্জন করিতে সম্মত হন নাই। তিনি কৃত্রিম উপায়ে মুদ্রার স্থিতিসাধনের পক্ষপাতী ছিলেন না। সুতরাং তিনি খরচা কমাইবার দিকে অবহিত হয়েন। মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই ডুমার্গ বিগত যুদ্ধের সামরিকদিগের পেন্সন, রাজপুরুষদিগের বেতন ও রেলওয়েগুলিকে অর্থপ্রদানের পরিমাণ হ্রাস করিয়া দিবার ব্যবস্থা করেন এবং সরকারী কর্ম্মচারীদিগের সংখ্যা হ্রাস করিয়া দেন। শাসন বিভাগের প্রায় আট লক্ষ কর্ম্ম-চারীর মধ্যে তিনি ৮৫ হাজার কর্ম্মচারীকে জবাব দিতে চাহেন। ইহার ফলে সরকারী তহবিলে প্রায় সাড়ে ২৬ কোটি ডলার বাঁচিয়া যায়। ডলারের বিনিময়মূল্য স্থির না থাকাতে এ স্থলে টাকায় ঐ মুদ্রার পরিমাণ প্রদত্ত হইল না। তবে মোটের উপর বলা যায় যে, ১ ডলার প্রায় ৩ টাকার কাছাকাছি। ডুমার্গ আরও বলেন যে, যদি এই কাষ পূর্ণ মাত্রায় করিতে হয়, তাহা হইলে সমস্ত শাসন-পদ্ধতিকে একবারে উল্টাইয়া ফেলিতে হইবে এবং উহার যেখানে যে ত্রুটি বা দোষ আছে, তাহার সংস্কারসাধন করিতে হইবে।

ডুমার্গ এই ধুয়া ধরিলেন যে, যদি স্বৈরশাসন পরিহার করিতে হয়, বিদেশীর আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইতে হয়, অথবা আবার একটি ব্যাপক যুদ্ধকে এড়াইতে হয়, তাহা হইলে শাসন-যন্ত্রের সংস্কার-সাধনের একান্তই প্রয়োজন। তাঁহার কথা তিনি রেডিও দ্বারা দেশ-ময় প্রচার করিয়াছিলেন। ডুমার্গ কি প্রকারে শাসন-যন্ত্রের সংস্কার-সাধন করিতে চাহেন, তাহা ডুমার্গের পতন-সংবাদে মাসিক বসুমতীতে বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং তাহা বলা অনাবশ্যক। তিনি বলেন, তিনি যাহা করিতে চাহেন, তাহা করিতে না দিলে তিনি পদত্যাগ করিবেন। করিয়াছেনও তাহাই। কিন্তু কেবল রাজনীতিক-দিগের দোষেই যে ফ্রান্সের এত হাঙ্গামা ও গোলযোগ ঘটিয়াছে, এ কথা বলা সঙ্গত নহে। আর্থিক বিভ্রাটও ফ্রান্সের দুর্য্যোগের বিশিষ্ট কারণরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। ঐ দেশে বেকার লোকের সংখ্যা হু হু বাড়িয়া যাইতেছে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ঐ রাজ্যে ২৫ হাজার নাম লেখান (Registered) বেকার ছিল। তাহার পর হইতে বেকারসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়িয়া যাইতে

থাকে। ক্রমে গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে নাম লেখান বেকার-সংখ্যা ৫ লক্ষে উন্নীত হয়। বলা বাহুল্য, ইহা সরকারী খাতায় যাহাদের নাম লেখান আছে, তাহাদেরই সংখ্যা। ইহা ভিন্ন যাহাদের নাম সরকারী খাতায় লেখান নাই, তাহাদের সংখ্যা যে কত, তাহা বুঝা কঠিন। অনেকে অনুমান করেন, মোট বেকার-সংখ্যা উহার চারি গুণ। যুদ্ধের পর হইতে এ পর্য্যন্ত প্রায় ২০ লক্ষ বিদেশী ফ্রান্সে আসিয়াছে। আরও অনেক বিদেশী লোক তথায় আসিবার সম্ভাবনা আছে। ইহাতে ফরাসী জনসাধারণের মনের ভাব কিরূপ হইতে পারে, তাহাও চিন্তনীয়।

ডুমার্গের পর ফ্লাণ্ডিন ফ্রান্সের রাজনীতিক তরণীর কর্ণধার হইয়াছিলেন। এখন তথাকার সংবাদপত্রগুলি ফ্লাণ্ডিনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন। কেহ কেহ বা বলিতেছেন যে, ইহার মূলে টাকার খেলা আছে। কিন্তু এই প্রশংসার বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া করিবে না। এ দিকে ফ্রান্সে যাঁহারা বাড়ীভাড়া বা খাজনা আদায় করিয়া দিন গুজরান করেন এবং যাঁহারা সরকারী কাগজে টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছেন, তাঁহারা মুদ্রামূল্য কমিয়া যাইবার ভয়ে শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছেন। ফরাসী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ইঁহাদের প্রভাব নিতান্ত অল্প নহে। সে জন্য ইঁহাদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিতেছে।

তাহার পর সংগ্রামের সম্ভাবনাতেও ফরাসীদিগের মন অল্প চঞ্চল হয় নাই। জার্ম্মাণী তাহার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য যতই চেষ্টা করিতেছে, ফরাসীদিগের শঙ্কিত মন ততই চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। তাহারা বলিতেছে যে, ফরাসী সরকারের এই অবস্থা সঙ্ঘটিত হইতে দেওয়া উচিত হয় নাই। এই সকল কারণে ফরাসীদিগের যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে এখন ফ্রান্সের রাজনীতিক তরণীর কাণ্ডারী পদে এক জন জবরদস্ত শাসনকর্ত্তা বসাইতে চাহিতেছেন। ইঁহাদের সহিত যোগ দিয়াছেন ফ্রান্সের বিকলাঙ্গ সৈনিকগণ। তাঁহাদের পেন্সন কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া গত বৎসর তাঁহারা অনেক হাঙ্গামা বাধাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়া আমরা এই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী মন্ত্রের জন্মভূমি ফ্রান্সে আজ ফাসিজম্ মত প্রবল হইতেছে, ইহা প্রকৃতই বিস্ময়ের বিষয়। আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া যে ডেমক্রেসী ডেমক্রেসী রব উঠিয়াছে, তাহার আদিস্থান এই ফ্রান্স। তথাকার শ্রমিকরা অবশ্য উহার বিরোধী। ইটালীতে এবং জার্ম্মাণীতে স্বৈর-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির প্রভাব দেখিয়া ফ্রান্সের এই ভাবান্তর ঘটিয়াছে কি না, কে বলিতে পারে?



ডুমার্গ



ফ্লাণ্ডিন

সাধারণ ফরাসীরা মনে করেন না। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে এবং দাঁড়াইতেছে, তাহাতে ফ্লাণ্ডিনের শাসন-ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত হইবে কি না, সেই প্রশ্নই অনেকের মনে উদিত হইতেছিল। ফ্রান্সের সরকারী আয়-ব্যয়ের খাতায় সামরিক ব্যয়ের বরাদ্দ বাড়িয়া যাইতেছিল। লোকের উপর বাধ্য করভার বৃদ্ধি পাইতেছে। কেবল গমের এবং মদের মূল্য ধার্য্য করিয়া দিলেই ত লোকের সুবিধা হইবে না। লোক শঙ্কা করিতেছে যে, ইহার ফলে এমন এক দিন আসিবে, যে দিন ফ্রান্সের এই গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্রীয় কাঠামোখানি প্রবল প্রভঞ্জনপ্রহত কদলীকাননের ন্যায় একবারে ধরাশায়ী হইয়া পড়িবে।

ফ্রান্সের প্রচলিত মুদ্রা-সম্পর্কিত সমস্যাও নিতান্ত সামান্য নহে। ফ্লাণ্ডিন বলিয়াছিলেন, তিনি ফরাসীদিগের জাতীয় মুদ্রাকে কখনই স্বর্ণ-মান হইতে বিচ্যুত করিবেন না। কিন্তু ইতোমধ্যেই গুঞ্জন-ধ্বনি শুনা যাইতেছে যে, তিনি এমন কোন কথা কস্মিন্‌কালেও বলেন নাই যে, ফ্রান্স কস্মিন্‌কালেও মুদ্রামূল্যে স্বর্ণ-মান ত্যাগ

তুরস্কের নৌবাহিনী-সজ্জা

আজ য়ুরোপের সকল রাজ্যই নৌবাহিনী বৃদ্ধি করিতেছে। কেহই যেন পূর্ব্বতন রণতরী-সজ্জা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া,—অনর্থক অর্থব্যয় করিয়া রণতরী-সজ্জা বৃদ্ধি না করিয়া—নিঃশঙ্কভাবে কালযাপন করিতে পারিতেছেন না। "প্রতিবেশী রাজ্য রণতরীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে,—অতএব তাহারা যদি আমাদের রাজ্য আক্রমণ করে, তাহা হইলে আমাদের উপায় কি হইবে," এই চিন্তাতে সকলেই যেন আকুল হইয়া পড়িয়াছেন। তুরস্ক ও য়ুরোপীয় রাষ্ট্রপতিদিগের এই ব্যবহারে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের সেই উদ্বেগ অধুনা তাঁহাদের রণতরীবৃদ্ধিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। বিগত মার্চ্চ মাসে তথাকার গ্রাণ্ড ন্যাশানাল এসেমব্লি যে বজেট পাশ করিয়াছেন, তাহাতে জাতীয় আত্মরক্ষার ব্যয় বাবদ অনেক টাকা অধিক মঞ্জুর করা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত তুরস্কের সামরিক ব্যয় বাৎসরিক ৪ কোটি পাউণ্ডে (তুরস্কের পাউণ্ড) নিবদ্ধ ছিল। বহু বৎসর

উহার হ্রাসবৃদ্ধি করা হয় নাই। কিন্তু ইটালীর রাষ্ট্রনিয়ন্তা সেনর মুসোলিনী গত বৎসর বলিয়াছিলেন যে, ইটালী এসিয়া খণ্ডে তাঁহার স্বার্থের বিস্তারসাধন করিবেই করিবে। এই কথায় তুরস্কবাসীদিগের মনে শঙ্কার সঞ্চার স্বাভাবিক। তাই গত মার্চ মাসে তুরস্ক সরকার যে বজেট করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা সৈনিক, নাবিক এবং বৈমানিক শক্তিবৃদ্ধির জন্য ৬ কোটি ৬৯ লক্ষ ৪৭ হাজার ৬২ তুর্কী পাউণ্ড ব্যয় করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সামরিক ব্যয় বাবদ তুরস্ক এত অধিক টাকা ১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দের পর আর কখনই বরাদ্দ করেন নাই। সমরসজ্জা কমাইবার জন্য রাষ্ট্রপতিদিগের কামনার গতি কোন্ দিকে, তাহা এই ব্যাপার হইতেই বুঝা যায়।

এ দিকে তুর্কী সরকার আদেশ করিয়াছেন যে, খৃষ্টান পাদ্রী এবং অন্যান্য ধর্ম্মযাজকগণ তাঁহাদের ভজনালয়ের বাহিরে যাইবার সময় আর তাঁহাদের পাদ্রীর পোষাক পরিধান করিতে পারিবেন না। তাঁহাদিগকে সাধারণ ভদ্রলোকের বেশ ধারণ করিয়া বাহির হইতে হইবে। অর্থাৎ ধর্ম্মযাজকের বিশিষ্ট পরিচ্ছদ পরিয়া কেহ ধর্ম্মায়তন হইতে বাহিরে আসিতে পারিবেন না। এ আদেশ বা আইন কিছুদিন পূর্ব্বে জারি হইয়াছে। ইস্তাম্বুলে গ্রীক ধর্ম্মসমাজভুক্ত কতকগুলি খৃষ্টান আছেন। সমস্ত তুরস্কে লক্ষাধিক খৃষ্টান বিদ্যমান। ইঁহাদের প্রধান ধর্ম্মযাজক গ্রীক সনাতন গোষ্ঠীপতি কোটিও ইস্তাম্বুলে তাঁহার প্রাসাদে বাস করেন। এই আদেশ জারি হইবার পর তিনি এবং তাঁহার অধীনস্থ ধর্ম্মযাজকগণ বাটীর বাহির হইবেন না বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন। অবশ্য যদি তুর্কী সরকার এই নিয়ম বা আইন উঠাইয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদের পোষাক পরিয়াই বাহিরে আসিবেন। আর যদি তুর্কী সরকার এই আইন উঠাইয়া না দেন, তাহা হইলে কোটিও তাঁহার বাসভবন প্রভৃতি সমস্তই গ্রীসের মালোনিকায় উঠাইয়া লইয়া যাইবেন এবং তথায় তাঁহাদের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন গ্রীক শাসনের অধীনে থাকিবেন। এখন ঐ প্রধান ধর্ম্মযাজক লক্ষাধিক খৃষ্টান যজমানের মায়া ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারিতেছেন না। কিন্তু কামালপাশা এই আদেশ প্রত্যাহার করিয়া লইবেন কি না, বুঝা যাইতেছে না।

এসিয়া-মাইনরের দক্ষিণ অঞ্চলে কফির চাষ করিয়া তুর্কীরা সাফল্যলাভ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা তথাকার চাষীদিগকে কফি চাষ করিবার জন্য উৎসাহ দিতেছেন। এখন তাঁহারা ব্রেজিল দেশ হইতে অন্য প্রণ্যের বিনিময়ে কফি আমদানী করেন। তাঁহারা আশা করেন যে, শীঘ্রই তাঁহারা তাঁহাদের রাজ্যে তাঁহাদের আবশ্যক কফি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবেন। ইহা হইলে তুরস্কের বিশেষ লাভ হইবে। কেবল সামরিক দিক দিয়াই তুরস্ক সরকার রাজ্যের উন্নতিসাধন করিতেছেন না, আর্থিক দিক দিয়াও তাঁহারা উহার উন্নতিসাধনে অবহিত হইতেছেন।

আবিসিনিয়া ও ইটালী

আবিসিনিয়ার উপর সমরশঙ্কার যে করাল ছায়াপাত হইয়াছে, তাহা এখনও অপসারিত হয় নাই। মধ্যে শুনা গিয়াছিল যে, ইটালী আবিসিনিয়ার সহিত বিবাদের মীমাংসা করিয়া লইতে সম্মত হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া পৃথিবীর লোক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছিল। কিন্তু এখন আবার অন্যরূপ সংবাদ আসিতেছে। ইটালীর ভাগ্যনিয়ন্তা সেনর মুসোলিনীর লোলদৃষ্টি যখন কৃষ্ণকায় মানবদিগের বাসভূমি আবিসিনিয়ার উপর পড়িয়াছে, তখন ঐ ক্ষুদ্র দেশ যে সহজে অব্যাহতি পাইবে, তাহা মনে হয় না। সম্প্রতি জেনিভা হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, আবিসিনিয়ার সরকার জাতিসঙ্ঘের নিকট আবেদন করিবার পর হইতে অবস্থার গতি মন্দ হইতে মন্দতর হইয়াই পড়িয়াছে। ইথিওপিয়ার অর্থাৎ আবিসিনিয়ার সরকার তাঁহাদের প্যারিসস্থিত মন্ত্রীর মারফতে জাতিসঙ্ঘকে জানাইয়াছেন যে, অতি শীঘ্রই ইথিওপিয়ার স্বাধীনতা এবং অখণ্ডতাকে নষ্ট করিবার জন্য এই রাজ্যের উপর আক্রমণ হইবার সম্ভাবনা জন্মিয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, ইটালীয় সৈন্য এখন আবিসিনিয়া আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। আর বিলম্ব নাই। সেই জন্য আবিসিনিয়ার রাজা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এই বিষয়ে দোষ কাহার, তাহা জাতিসঙ্ঘ বিচার করিয়া দেখুন। তিনি এই মর্ম্মে এক আবেদন করিয়াছেন যে, জাতিসঙ্ঘের পরিষদ কতকগুলি নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে লইয়া একটি কমিশন গঠিত করুন। সেই কমিশন ইথিওপিয়া এবং ইটালীর অধিকৃত সোমালিল্যাণ্ডের প্রান্তসীমায় থাকিয়া, নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করিয়া এই ব্যাপার সম্বন্ধে কোন পক্ষের দোষ, তাহা জাতিসঙ্ঘের নিকট সরাসরিভাবে লিখিয়া পাঠাইবেন। ইথিওপিয়ারাজ হাইলাস সিলাসির এই প্রস্তাব সর্ব্বসাধারণের নিকট সঙ্গত বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু রোম হইতে গত ২০শে জুন (৫ই আষাঢ় তারিখে) যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে মনে হইতেছে যে, ইটালী যেন "জোর যার মুলুক তার" এই নীতির বশবর্ত্তী হইয়াই কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে যে, আবিসিনিয়া যে আবেদন করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে সুচিন্তিত কোন অভিমত এখনও জানিতে পারা যায় নাই। কিন্তু ইটালীর সংবাদপত্রগুলি তাহাদের সেই পুরাতন কথারই পুনরাবৃত্তি করিতেছে। তাহারা বলিতেছে যে, জাতিসঙ্ঘ যদি স্বাধীন কার্য্য করিতে একটুও ত্রুটি করেন বা ন্যায়পথ হইতে বেথামাত্র বিচ্যুত হন, তাহা হইলে বড় গুরুতর কাণ্ড ঘটিবে,—ইটালী জাতিসঙ্ঘ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন। ইহার ভিতর যে একটা দর্প বা অহঙ্কার প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। জাতিসঙ্ঘ যদি নিরপেক্ষ ব্যক্তিদিগের দ্বারা এই বিষয়ের তদন্ত করান, তাহা হইলে তাঁহারা যে ন্যায়পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া কার্য্য করিবেন, এরূপ আশঙ্কা ইটালীর সংবাদপত্রসেবীদিগের মনে উদিত হয় কেন? প্রবলের আক্রমণ হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করাই যদি জাতিসঙ্ঘের কার্য্য হয়, যদি উহাকে প্রকৃতই সালিসী সভা বলিয়া মানিতে হয়, তাহা হইলে ইহার কৃত মীমাংসাও মানিয়া লইতে হইবে। নতুবা এ সভা রাখিবারই কোন প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। এখন ইটালীর রাজপুরুষগণ বিবেচনা পূর্ব্বক কি সিদ্ধান্ত করেন, তাহা জানিবার জন্য আমরা উদ্গ্রীব রহিলাম।

তবে এ কথা সত্য যে, য়ুরোপীয় জাতিগুলির আফ্রিকার উপর লোভপূর্ণ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে চীনের উপর য়ুরোপীয় জাতির লোলুপ দৃষ্টি পড়িয়াছিল। কিন্তু এখন জাপানের অভ্যুদয়ে এবং এসিয়াস্থিত জাতিদিগের জাতীয় বুদ্ধি জাগ্রত হওয়াতে অনেক য়ুরোপীয় জাতি

মনে করিতেছেন যে, এসিয়াখণ্ডে তাঁহাদের আর অধিক দিন সুবিধা হইবে না। এখন আফ্রিকাখণ্ডে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। ফ্রান্স এই ব্যাপারে ইটালীর সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিতেছেন। বহু য়ুরোপীয় জাতিই এখন আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ জাতির উপনিবেশ স্থাপন করিবার বাসনা করিতেছেন। তথায় তাঁহারা য়ুরোপীয় বণিকদিগের উপনিবেশ বসাইয়া কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন। ফরাসী এবং ইটালীয়ান জাতিরা আবিসিনিয়া রাজ্যটিকে আপনাদের অধিকারভুক্ত অথবা বশীভূত করিতে চাহেন। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে এই ব্যাপার মধ্যস্থ দ্বারা মিটান সম্ভব হইবে না। এখন কি দাঁড়ায়, তাহা দেখিবার জন্য অনেকে উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন।

এখানেও দেখা যাইতেছে যে, পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। জাপানে লোকের আধিক্য হেতু চারি বৎসর পূর্ব্বে জাপান মাঞ্চুরিয়ার খানিকটা গ্রাস করিতে চায়। জাপান য়ুরোপকে বলে, "তোমরা তফাৎ যাও।" বৃটেন, ফ্রান্স এবং ইটালী সরিয়া দাঁড়াইলেন। এই ব্যাপারে তখন অনেকে ঠিক করিয়াছিলেন যে, একটা প্রলয়-কাণ্ড ঘটিবে। জাপান জাতিসঙ্ঘ হইতে নাম কাটাইবার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিলেন। জাপান মাঞ্চুরিয়ার কিয়দংশ গ্রাস করিলেন। এবার দক্ষিণ-আফ্রিকার এই শেষ স্বাধীন রাজ্যের স্বাধীনতার দীপ নির্ব্বাণ করিবার সময় ঠিক তাহাই ঘটিতেছে। ইটালী জাতিসঙ্ঘ হইতে নাম কাটাইবেন বলিতেছেন। কোথাকার ব্যাপার কত দূর পর্য্যন্ত গড়ায়, তাহা দেখিবার জন্য সমস্ত সভ্য জগৎ উদ্‌গ্রীব। হাইল সিলাসীর এক কোটি হাবসী প্রজা আজই বিস্তীর্ণ আফ্রিকা-ভূমিতে স্বাধীন জাতি বলিয়া বুক ফুলাইয়া বেড়াইতেছে। এখন তাহাদের স্বাধীনতার দীপ নির্ব্বাপিত হইবে কি না, মানবের ভাগ্যবিধাতাই তাহা বলিতে পারেন। য়ুরোপের এবং আমেরিকার কতকগুলি সংবাদপত্রলেখক বলিতেছেন,—"এই ব্যাপারের চাবিকাঠিটি গ্রেট বৃটেন এবং ফ্রান্সের হাতে রহিয়াছে। ইটালীর সৈন্যদল যখন সুদূর আফ্রিকার মরুকান্তারে হাবসী-সংগ্রামে লিপ্ত হইবে, সেই অবসরে হিটলার অষ্ট্রীয়াকে গ্রাস করিয়া ফেলুক, ইহা তাঁহারা চাহেন না। লুই ভাইসের কুরিয়ার জার্ণাল লিখিয়াছেন যে, মুসোলিনী যদি ক্ষিপ্ত হইয়া আফ্রিকার দিকে ছুটিয়া যান, তাহা হইলে গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স এবং ইটালী সম্মিলিতভাবে জার্ম্মাণীর ঐ কার্য্যে বাধা প্রদানে অশক্ত হইবে। আর ইটালী যখন দক্ষিণ-আফ্রিকার এক জন রাজার রাজত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার সন্ধিসর্ত্ত ভঙ্গ করিবেন, তখন আর তাঁহাদের জার্ম্মাণী ভার্সাইলের সন্ধিসর্ত্ত রক্ষা করিয়া চলুন, এ কথা বলা সাজিবে না।" আর একখানা সংবাদপত্র বলিতেছেন যে, "যখন ইটালী উষ্ণকোটিবন্ধের জঙ্গলে রণতাণ্ডবে মাতিয়া থাকিবে, তখন হিটলার অষ্ট্রীয়াকে বুঝাইয়া বলিবে যে, জার্ম্মাণীই ভালভাবে তাহাদের স্বার্থরক্ষা করিবে।" ফ্রান্সের দৃঢ় বিশ্বাস যে, হার হিটলার এমন সুযোগ সহজে ছাড়িবে না। কিন্তু রোমের লা ট্রিবিউনা বলিতেছেন যে, ইটালীর পক্ষে পূর্ব্ব-আফ্রিকায় শক্তিশালী হইয়া উঠা অবশ্য-কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উহারা ইংরাজ এবং ফরাসীর নিষেধকে উপহাস করিতেছে। যখন এই কয় ছত্র লেখা হইয়াছে, তখনও যুদ্ধ বাধিবার সংবাদ এ দেশে আসে নাই। তবে যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্যামরাজ্যে গোলযোগ

ভারতের পূর্ব্বস্থিত শ্যামরাজ্যে আবার একটা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। পাঠক জানেন, এখন শ্যামরাজ্যের রাজা নাবালক। তাঁহার খুল্লতাত প্রজাধিপক সিংহাসন পরিত্যাগ করাতে তিনি সেই সিংহাসন লাভ করিয়াছেন। এখন একটি পরিচালক-সমিতি ঐ দেশের রাজকার্য্য চালাইতেছেন। শ্যামের রাজধানী ব্যাঙ্কক সহরে বিদেশীরা যে অঞ্চলে বসবাস করিতেছেন, সে অঞ্চলে একটা অতি প্রবল গুজব রটিয়াছে যে, শ্যামরাজ্য এখন কার্য্যতঃ জাপানীদের একটা থানায় পরিণত হইয়াছে। তাহার লক্ষণ তাঁহারা এই বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন যে, এখন শ্যামবাসীরা বাণিজ্যবিষয়েও ব্যবসায়ের দিক দিয়া জাপানীদের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা করিতেছেন। জাপান হইতে ইহার পূর্ব্বে যে পরিমাণ পণ্য শ্যামরাজ্যে আমদানী হইত, গত বৎসর তাহার পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা বড় সামান্য কথা নহে। কিন্তু শ্যামরাজ্যের রাজপুরুষগণ সে কথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলিতেছেন, শ্যামরাজ্য জাপানের সহিত বিশেষ মেলামেশা করিতেছেন না। পক্ষান্তরে, ব্যাঙ্ককস্থিত জনৈক সংবাদদাতা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, সাধারণ শ্যামবাসীরা জাপানীদিগকে তাঁহাদের খুব অনুকূল জাতি বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ব্যাঙ্ককস্থিত বৃটিশ দূত সার জোসিয়া ক্রসবিকেও শ্যামের শাসনকর্ত্তৃপক্ষ বিশেষভাবে বলিয়াছেন যে, দেশের ভৌগোলিক সংস্থান হিসাবে জাপানের সহিত শ্যামের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া শ্যামের অধিবাসীরা জাপানীদিগকে বিশেষ কোন রাজনৈতিক অধিকার দিতে সম্মত নহেন। বিদেশীরা শ্যামরাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যেরূপ ব্যগ্র, শ্যামদেশের অধিবাসীরা শ্যামরাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাহা অপেক্ষা অল্প ব্যস্ত নহেন। অর্থাৎ তাঁহারা কোনমতেই শ্যামরাজ্যকে পরাধীন রাজ্যে পরিণত হইতে দিবেন না। শ্যামরাজ্য স্বাধীন হইয়া থাকুক, ইহাও গ্রেট বৃটেনের ইচ্ছা। পরোপকার করিবার জন্য ব্যস্ত য়ুরোপীয় জাতিনিচয়ের প্রভাবাধীনে থাকিয়া শ্যামবাসীরা আপনাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখুন, ইহাই বৃটিশ সাম্রাজ্যের পরিচালকবর্গের একান্ত কামনা। যদি জাপানীরা এই দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করেন, তাহা হইলে এ পর্য্যন্ত বৃটিশ জাতি শ্যামরাজ্য সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন, সেই নীতির বিপর্য্যয়সাধন করিতে হইবে। সুতরাং সংবাদ বড় শান্তিজনক নহে।

এ দিকে শুনা যাইতেছে যে, শ্যামের ভূতপূর্ব্ব রাজা প্রজাধিপককে এখনও শ্যামরাজ্যে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু সে চেষ্টা কতদূর সফল হইবে, তাহা বলা যায় না। ফলে শ্যাম-আকাশে একটু মেঘের সঞ্চার হইতেছে বলিয়া সন্দেহ হয়। এ দিকে আব্রহ্ম ভারতের পূর্ব্বদিকে জাপানের প্রভাব বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, বৃটিশ জাতি তাহা কখনই সহ্য করিবেন না। এই বিষম সঙ্কটকালে শ্যামরাজ্যের অধিবাসীরা এবং বিশিষ্ট রাজপুরুষরা রাজা প্রজাধিপকের সহিত মনোমালিন্য উপস্থিত করিয়া ভাল কায করেন নাই। ক্রমশঃই তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিবেন।

বিলাতী মন্ত্রিমণ্ডলীর পরিবর্ত্তন

সম্প্রতি বিলাতী মন্ত্রিমণ্ডলীর পরিবর্ত্তন হইল। এখন বিলাতের শাসন-তরণীর পরিচালনা করিবার ভার নাকি কোন বিশেষ দলের হাতে নাই, সব দলই একত্র হইয়া এই শাসন-যন্ত্র পরিচালিত করিতেছেন। বিগত নির্ব্বাচনের পর হইতে এই ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। ইহাকে বিলাতের লোক জাতীয় সরকার এবং এই মন্ত্রিমণ্ডলীকে বিলাতের লোক জাতীয় মন্ত্রিমণ্ডল নাম দিয়াছেন। শ্রমিক সরকারের আমলে যিনি প্রধান সচিব ছিলেন, সেই র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড এই জাতীয় মন্ত্রিমণ্ডলীতেও প্রধান মন্ত্রিরূপে বিরাজ করিতেছিলেন। তিনি সমাজ-তন্ত্রবাদী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার লিখিত কয়েকখানি গ্রন্থেও সমাজতন্ত্রবাদ মত পরিস্ফুট আছে। কিন্তু এবারকার এই জাতীয় দলের মধ্যে পড়িয়া তাঁহার বদলাইয়া যাইল মতটা, তিনি ছাড়িয়া দিলেন পথটা। গত নির্ব্বাচনে কমন্স সভায় যে সকল সদস্য বিলাতী জনসাধারণের ভোটের জোরে সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অত্যন্ত অধিকসংখ্যক সদস্যই



মিষ্টার বলডুইন



মিষ্টার এন্টনি ইডেন



মিষ্টার ম্যালকলম্‌ ম্যাকডোনাল্ড



লর্ড জেটল্যাণ্ড

রক্ষণশীল। এরূপ অবস্থায় রক্ষণশীল দল রক্ষণশীল সরকার গঠন না করিয়া জাতীয় সরকার গঠন করিতে গেলেন কেন, তাহাও এক বিষম সমস্যা। শুনা গিয়াছিল যে, বিলাতে বেকার-সমস্যার সমাধান করিবার এবং অন্যান্য আর্থিক সমস্যার নিষ্পত্তি করিবার জন্য তখন সকলে মিলিয়া কার্য্য করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। এই কৈফিয়ৎটা তখন খুব সন্তোষজনক মনে হয় নাই। ইহার ভিতরে অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল কি না, তাহা সে সময় বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু এই জাতীয় সরকারের কার্য্যগুলি ঠিক রক্ষণশীল সরকারের কার্য্যাবলির ন্যায়ই হইয়া আসিয়াছে। মিষ্টার ম্যাকডোনাল্ড শাসনপদ্ধতি পরিচালিত করিতেছিলেন বলিয়া উহার কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। মন্ত্রিমণ্ডলীর ছোট বড় পদে উদারনীতিক এবং শ্রমিক দলের যে কয় জন সদস্য ছিলেন, তাঁহারা যেন সিন্ধুতে বিন্দুর ন্যায় ভলাইয়া গেলেন। কার্য্যটা সম্পূর্ণ রক্ষণশীল মতানুযায়ী হইয়া আসিতেছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে বর্ত্তমান বৎসর পর্য্যন্ত এই ভাবে কার্য্য পরিচালিত হইয়া আসিতেছিল। স্বদলে এবং অন্যদলে ম্যাকডোনাল্ড ইতোমধ্যে সম্মান হারাইয়া বসিয়াছেন। তিনি কমন্স সভায় প্রবেশ করিলে আর কেহ কোনরূপ জয়ধ্বনি করে না, বরং অনেকে তাঁহাকে অনেক কটূক্তি করিয়াছে। তাঁহার শরীর নাকি খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। ৭০ বৎসর বয়সে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়া বিচিত্র নহে। যাহা হউক, তিনি হঠাৎ প্রধান মন্ত্রিপদ ত্যাগ করিয়াছেন। এখন মিষ্টার বলডুইনই প্রধান মন্ত্রী হইলেন। ম্যাকডোনাল্ড এখন লর্ড প্রেসিডেণ্ট। তিনি যে মন্ত্রিমণ্ডলীতে থাকিয়া কি বিশেষ কায করিবেন, তাহা ত বুঝা যাইতেছে না। শ্রমিকদিগের মধ্য হইতে ম্যাকডোনাল্ডের মত আর এক জন লোক খুঁজিয়া



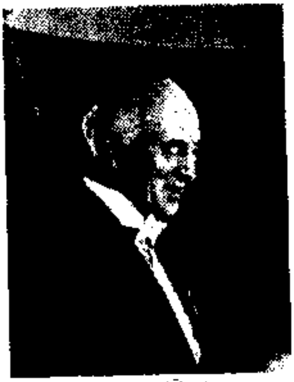
লর্ড হেলশ্যাম



লর্ড লণ্ডনডেরী



লর্ড হ্যালিফ্যাক্স



স্যর জন সাইমন



মিষ্টার নেভিল চেম্বারলেন

পাওয়া গেল না বলিয়াই তিনি কি মন্ত্রী সাজিয়া মন্ত্রমণ্ডলীতে বসিয়া রহিলেন ?

মন্ত্রিমণ্ডলীর ভিতর অনেক পরিবর্ত্তনসাধন করা হইয়াছে। স্যর জন সাইমন কিছু দিন পূর্ব্বে পররাষ্ট্র-সচিবের কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি এখন স্বরাষ্ট্র-সচিবের পদ পাইলেন। কেন ? পররাষ্ট্র-বিভাগে কার্য্য করিতে কি তিনি আবশ্যক যোগ্যতা প্রকটিত করিতে পারেন নাই ? এখন এই পররাষ্ট্র-বিভাগের ভার পাইলেন স্যর স্যামুয়েল হোর—যিনি এত দিন ভারত-সচিব হইয়াছিলেন। তাঁহার কূটনীতির বহর দেখিয়াই সম্ভবতঃ তাঁহাকে এই অধিক দায়িত্বপূর্ণ পদ প্রদত্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান ইণ্ডিয়া বিল খানি কমন্স সভায় পাশ করাইয়া দিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাঁহার এই পদোন্নতি করিয়া দেওয়া হইল, ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, টোরী দলের প্রকৃত নেতা মিষ্টার বলডুইন তাঁহার বিশিষ্ট বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে ঐ পদ দিয়াছেন। বিশেষভাবে যিনি কূটরাজনীতিক বুদ্ধিসম্পন্ন, তিনিই এই পদের সম্পূর্ণ যোগ্য। লর্ড কর্জ্জন শেষকালে এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। লর্ড হ্যালিফ্যাক্স (আমাদের দেশের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড আরউইন) হইয়াছেন—সমর-সচিব। গান্ধী-সমরে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই কি ইনি সমর-বিভাগের এই শ্রেষ্ঠ পদ পাইলেন ? গান্ধী-আরউইন চুক্তির দ্বারা ইনি যে মহাত্মাজীকে বিলাতে পাঠাইতে পারিয়াছিলেন, তাহাই হইয়াছিল মহাত্মাজীর অসাফল্য লাভের কারণ। সুতরাং সামরিক ব্যাপারে ইনি বেশ কূটবুদ্ধি প্রকাশ করিতে সমর্থ। এখন ভারত-সচিব হইলেন লর্ড জেটল্যাণ্ড। ইনি কিছু দিন পূর্ব্বে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইঁহার নাম ছিল তখন লর্ড রোনাল্ডসে। ভারত সম্বন্ধে ইঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। ইনি সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের প্রতিকূলে আন্দোলন করিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালার হিন্দুদিগের বিশেষতঃ উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগের প্রতি ঘোর অবিচার

করা হইতেছে। কিন্তু ইহার প্রস্তাব ভোটে টিকে নাই। ইহা ভিন্ন Heart of Aryabarta নামক একখানি পুস্তক লিখিয়া ইনি প্রাচীন ভারতীয় কৃষ্টির ও সভ্যতার প্রশংসা করিয়াছেন। ইঁহাকে এই পদ দিবার প্রধান কারণ এই অনুমিত হয় যে, ইনি লর্ড-সভায় ইণ্ডিয়া বিলখানির বিশেষভাবে সমর্থন করিতে পারিবেন। কমন্স সভায় সার স্যামুয়েল হোর যেরূপ দক্ষতার সহিত ইণ্ডিয়া বিলখানি পাশ করাইয়া লইয়াছেন, লর্ড জেটল্যাণ্ড ভিন্ন অন্ত কেহ সেরূপ দক্ষতার সহিত উহা লর্ড-সভায় পাশ করাইয়া লইতে পারিবেন না মনে করিয়াই তাঁহাকে ঐ পদ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করিতেছেন। আবার কেহ কেহ বলিতেছেন যে, তিনি ভারতবাসীর সহিত সহানুভূতি-সম্পন্ন বলিয়া পরিজ্ঞাত। সুতরাং তিনি যদি ঐ বিলের সমর্থন করেন, তাহা হইলে বিলাতের লোক মনে করিবে যে, উহাতে ভারতবাসীর উপর কোন অবিচার করা হয় নাই। আবার বহু লোক এমন কথাও বলিতেছেন যে, ভারতশাসন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ লর্ড জেটল্যাণ্ড যদি লর্ড-সভায় বিলখানির বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন, তাহা হইলে বড়ই অসুবিধা হইবে। সুতরাং ভারত-সচিবের পদ প্রদান করিয়া তাঁহার মুখ বন্ধ করা ভাল। প্রথম এবং শেষ কারণ বিশেষ বলবান্ বলিয়াই মনে হয়। লর্ড প্রিভী-সীল মিষ্টার এন্টনী ইডেন নূতন মন্ত্রিসভাতে দপ্তরহীন মন্ত্রী এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইলেন। এবার মিষ্টার নেভিল চেম্বারলেন হইয়াছেন বিলাতের রাজস্ব-সচিব। ডোমিনিয়ন মন্ত্রী হইয়াছেন মিষ্টার টমাস, আর উপনিবেশ মন্ত্রী হইয়াছেন মিষ্টার ম্যালকলম ম্যাকডোনাল্ড। লর্ড প্রীভিসীল এবং লর্ড হাই চান্সলার হইলেন যথাক্রমে লর্ড লণ্ডনডেরী এবং লর্ড হেলস্যাম। এইরূপ অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মন্ত্রিসভার যে পরিবর্ত্তন হইল, তাহাতে ভারতবাসীদিগের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। কারণ, এই মন্ত্রিপরিবর্ত্তনের ফলে বর্ত্তমান শাসননীতির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইবে না। কারণ, কার্য্যক্ষেত্রে মন্ত্রীরা কেহ স্বতন্ত্র হইয়া কোন কায করিতে পারেন না। সকলেই শাসন-পদ্ধতির ধারা রক্ষা করিয়া চলেন ও চলিবেন। সুতরাং আমাদের এই ব্যাপারে বিশেষ কিছু ইষ্টানিষ্ট নাই। তবে লর্ড জেটল্যাণ্ড ভারত-সচিব হওয়াতে ভারতে তাঁহার প্রভাব কিরূপ হইবে, সে কথা সাময়িক প্রসঙ্গে আলোচিত হইল। কেন না, উহা সম্পূর্ণ ভারতীয় ব্যাপার। অন্য দেশের ব্যাপারের সহিত উহার সম্বন্ধ নাই।

— —

আন্তর্জ্জাতিক গ্রন্থাগার ও গ্রন্থপঞ্জী কংগ্রেস

সম্প্রতি স্পেনদেশে আন্তর্জ্জাতিক গ্রন্থাগার ও গ্রন্থপঞ্জী কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন শেষ হইয়াছে। মাদ্রিদ, সালোমানকা, সেভিল ও বার্সিলোনা সহরে মোট ১২ দিন কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল। পৃথিবীর নানা স্থান হইতে ৩৩টি দেশের ৫ শত ১০ জন প্রতিনিধি



ন্যাশনাল বিল্ডোখেকার কুমার মুনীন্দ্রদেব রায়

কংগ্রেসে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৬০ জন বিভিন্ন রাজ্যের সরকারী প্রতিনিধি। ভারতের প্রতিনিধিরূপে কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় উক্ত অধিবেশনে যোগদান করেন। গ্রন্থাগারের উন্নতিবিষয়ক নানা প্রকার আলোচনা কংগ্রেসে হইয়াছিল। প্রথম দিনেই ভারতীয় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় বক্তৃতা করেন। ইহাতে কংগ্রেসের দৃষ্টি এ বিষয়ে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। যে সকল স্থানে কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল, সর্ব্বত্রই কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় বিশেষরূপে অভ্যর্থিত হন। বিলাতেও তিনি নানা স্থানে সম্বর্দ্ধনা লাভ করিয়াছিলেন। কংগ্রেস অধিবেশনের পর তিনি ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশে গিয়াছিলেন। সে সব দেশের "ন্যাশনাল বিবলোথেকা"গুলি তাঁহার সম্বর্দ্ধনার বিশেষ আয়োজন করেন এবং ক্যাথলিক ধর্ম্মজগতের গুরু পোপ স্বীয় প্রাসাদে তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা বিষয়ক আলোচনা করেন। এক জন বাঙ্গালী প্রতীচ্যদেশে এরূপ সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা লাভ করিয়াছেন, এ জন্য বাঙ্গালাদেশ বিশেষ আনন্দিত হইবে।

চীন ও জাপান

জাপানী সরকার চীনের উত্তর অঞ্চলে আপনাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন বলিয়াই মনে হইতেছে। যুরোপীয় জাতিরা জাপানকে যেরূপ ঈর্ষ্যালু দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, তাহাতে এই সংবাদের কতটা সত্য, কতটা মিথ্যা, তাহা বুঝিয়া উঠা অত্যন্ত কঠিন। প্রকাশ—গত মে মাসের শেষভাগে অথবা জুন মাসের প্রথমেই জাপান আচম্বিতে চীনের কর্ত্তৃপক্ষকে অত্যন্ত জবরদস্তিপূর্ণ এক পত্র দিয়াছেন, সেই পত্রে তাঁহারা চৌদ্দ দফা দাবী করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, চীনের কর্ত্তৃপক্ষ যদি ঐ ১৪ দফা দাবীতে সম্মত না হন, তাহা হইলে তাহার ফল অতি ভীষণ হইবে। সেই দাবীর মধ্যে একটি বড় রকমের দাবী এই যে, চীনকে তাহার হিলী অঞ্চল হইতে সমস্ত সরকারী সৈন্য অপসারিত করিয়া লইতে হইবে। উত্তর-চীনে কুয়োমিণ্টাংএর শাখাগুলি সমস্ত বন্ধ করিয়া দিতে হইবে এবং শাসনকর্ত্তা যু স্যুয়ে চাংকে তাঁহার গদী হইতে সরাইয়া দিতে হইবে। আদেশটা খুব লম্বা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেবল তাহাই নহে, চীনের যে অংশকে এখন সামরিক শক্তিশূন্য করা হইয়াছে, সেই অঞ্চলের শান্তিরক্ষার সমস্ত ভার জাপানের হাতে থাকিবে। ইহা ভিন্ন উহাতে এমন কথাও ছিল যে, চীনের মহা প্রাচীরের মধ্যেও নিরস্ত্রীকৃত অঞ্চলের বিস্তার বৃদ্ধি করিতে হইবে। যে দিন এই দাবী উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহার পরদিনই দুই শত জাপানী সৈনিক সাঁজোয়া গাড়ী এবং একখানি ট্রেঞ্চ মটার লইয়া গবর্ণরের আফিসের বাহিরে জাপানের সামরিক শক্তি প্রকটন করিয়াছিল; কারণ, ঐ অঞ্চলের শাসনকর্ত্তা জাপানের উপর বিদ্বিষ্ট এক জন ম্যাজিষ্ট্রেটকে পদচ্যুত করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। এমন কথাও শুনা গিয়াছে যে, মটারখানি হইতে কয়েকটি ফাঁকা আওয়াজও করা হইয়াছে। চীনারা এই ব্যাপারে শঙ্কিত হইয়া পড়ে। কারণ, তাহারা দেখিয়াছে যে, দুর্ব্বলের আক্রমণ হইতে প্রবলকে রক্ষা করিবার আর কোন শক্তি বা মানবীয় প্রতিষ্ঠান ইহজগতে নাই। চীনারা জাপানীদিগের দাবী অনুযায়ী কার্য্য করিবে কি না, তাহা লইয়া প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিয়াছিল, কিন্তু পরে তাহারা সেই দাবী পূর্ণ করিতে সম্পূর্ণ সম্মত হইয়াছিল। চীনা সৈন্য পেইপিং অঞ্চল এবং টিয়েনসিয়েন অঞ্চল ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। যখন তাহারা ঐ অঞ্চল ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তখন পথের উভয় পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জনতা তাহা দেখিয়াছিল। কেবল তাহাই নহে, চীনা সরকার জাপানী সরকারকে তুষ্ট করিবার জন্য জাপানী পণ্য-বর্জ্জন আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন যে, যাহাতে বিদেশীরা ক্রুদ্ধ হয় অথবা অসন্তুষ্ট হয়, এরূপ কার্য্য যেন কোন চীনবাসী না করেন। কারণ, চীনবাসীদিগের বিদেশীদিগের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলা উচিত। জাপানের দাবী অনেক অধিক। তাহার সকলগুলির বিষয় এখনও জানিতে পারা যায় নাই। জাপান চাহার অঞ্চলের শাসনকর্ত্তাকে পদচ্যুত করিবার জন্য চীনা সরকারকে এক পত্র দিয়াছিলেন। জাপানী সমর-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ বলেন যে, ঐ দিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের মধ্যে ঐ পত্রের জবাব দিতে হইবে। চীনা সরকার ঐ সময়মধ্যে জবাব দেন নাই,—জাপানও তাহার পর আর কিছুই করেন নাই। শুনা যাইতেছে, তাঁহারা পরে নাকি বলিয়াছেন যে, উহা চরমপত্র নহে। চীনের সমর-সচিব হো ইন চিন ঐ পত্রের জবাবে বলিয়াছিলেন যে, রাত্রি দ্বিপ্রহরের মধ্যে ঐ পত্রের উত্তর দেওয়া অসম্ভব। তাহার পর জাপান আর কিছুই করে নাই।

এই ব্যাপারে চীনের লোক অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছেন যে, যদি জাপান চীনকে দুর্ব্বল দেখিয়া এই ভাবে চীনাদের উপর জোর-জুলুম করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে সর্ব্বস্বত্ববাদীদিগকে দমন করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাদের সাহায্যে জাপানের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া দেওয়া উচিত। এখন সমস্যা দিন দিন কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে। জাপান কি অভিপ্রায়ে যে তাহার প্রতিবেশীদিগের উপর এইরূপ জোর-জুলুম প্রকাশ করিতেছে, তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না। জাপানীদিগের সহিত চীনাদিগের কৃষ্টিগত সম্বন্ধ যে কিছু আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। জাপানীরা চীনাদিগের নিকট হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। জাপানীরা মিশ্র জাতি। কোন্ কোন্ জাতির সংমিশ্রণে এই জাতির উদ্ভব হইয়াছে, সে সম্বন্ধে মতভেদ বিদ্যমান। যাহা হউক, চীনের সহিত জাপানের সম্মিলিত হওয়া অসম্ভব নহে। যদি উভয় জাতি সম্মিলিত হইতে পারেন, তাহা হইলে কালে তাঁহারা এসিয়া খণ্ডে একটি দুর্দ্ধর্ষ শক্তি আনয়ন করিতে সমর্থ হইবেন। চীন অতিকায় হইলেও দুর্ব্বল। সান ইয়েৎসেন ইহাকে সবল করিবার চেষ্টা করিলেও সেই চেষ্টায় তাদৃশ সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। জাপানও তাহা পারিবেন কি না সন্দেহ আছে। যাহা হউক, আপাততঃ ব্যাপার দেখিয়া অনুমান হইতেছে যে, জাপান উত্তর-চীনের এবং ভিতর-মঙ্গোলিয়ার কিয়দংশ গ্রাস করিয়া তাঁহাদের সৃষ্ট মাঞ্চুকুয়ো রাজ্যটির পুষ্টিসাধন করিবেন। উহা কালে জাপানের উপনিবেশ হইবে। সেই জন্যই জাপান এইরূপ চেষ্টা করিতেছে। পূর্ব্ব-এসিয়া যাহাতে য়ুরোপীয়দিগের প্রভাবমুক্ত হয়, সে দিকেও জাপানের দৃষ্টি আছে।

যাহা হউক, শেষকালে সংবাদ আসিয়াছে যে, চীন-সরকার উত্তর অঞ্চল হইতে সৈন্যদিগকে সরাইয়া আনিয়াছেন এবং জাপানের প্রায় সকল দাবীই পূর্ণ করিতেছেন। জাপানী

ও ভাবধারার সহিত বিরোধ উপস্থিত করে নাই। পাশ্চাত্য ভাবধারা ও যান্ত্রিকতা বিদেশী বলিয়াই জাপানী জীবনের বৈঠক-খানাতেই অভ্যর্থিত হইয়া স্থান পাইয়াছে, উহা অন্দরে যাইবার অধিকার পায় নাই। পক্ষান্তরে, ভারতীয় জীবনে পাশ্চাত্য কৃষ্টি একবারে অন্দরমহল দখল করিয়া বসিয়াছে এবং ভারতীয় জীবনকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে। ভারতের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের জীবনে পৈতৃক অবদানের যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা যেন বহিরঙ্গনে কোনরূপে একটু স্থান পাইয়া বর্ত্তাইয়া গিয়াছে। জাপানের যাহাতে ভারতবাসীর দশা না ঘটে, জাপান যাহাতে চিরাগত ভাবধারা ছাড়িয়া অকূলে ভাসিয়া না যায়, সেই জন্য তথায় কোডো (Kodo) আন্দোলন উপস্থিত করা হইয়াছে। এই আন্দোলন তথাকার দেশের লোককে তাহাদের পৈতৃক ভাব-ধারায় প্রতিষ্ঠিত করিতে আহ্বান করিতেছে। ইটালীতে ফাসিষ্ট আন্দোলন এবং জার্ম্মাণীতে নাজি আন্দোলন ত কতকটা তাহা করিতে চেষ্টা করিয়াছে ও করিতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখানে এই কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বর্ত্তমান সময়ে জাপানের রাজপুরুষগণ তথাকার প্রকৃতিপুঞ্জকে শিন্টো মন্দিরগুলিতে এবং তীর্থস্থানে যাইবার জন্য দেশের লোককে নানা প্রকারে উৎসাহ দিতেছে। গত দুই বৎসর এই প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র অনুযায়ী তীর্থযাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শিন্টো ধর্ম্মমত পুনঃস্থাপনা উপলক্ষে বৌদ্ধধর্ম্মও তথায় পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে চয়ন করিয়া কতকগুলি ধর্ম্মমত শিন্টোধর্ম্মের ত্রুটি পূরণ করিবার জন্য গৃহীত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের একটা বিশিষ্ট গুণ এই আছে যে, উহাকে অন্য ধর্ম্মের সহিত সমগুণীভূত করিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বিগত শতাব্দীর একবারে শেষাংশে জাপানীরা বুঝিতে পারে যে, অবিচারিতভাবে পাশ্চাত্য ধর্ম্মমত এবং পাশ্চাত্য কৃষ্টি গ্রহণ করিলে, তাহাতে সুফল ফলিবার কোন সম্ভাবনাই জন্মিতে পারে না। তাহার ফলে জাতীয় চরিত্র বিকৃত হয় এবং জাতীয় অবনতি ঘটে, সেই জন্য তাহারা জাতীয় আত্মা অবিকৃত রাখিবার জন্য শিন্টোধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব তাহাদের শিক্ষার জীবনে বৰ্দ্ধিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। সে চেষ্টা বিশেষভাবে সফলও হইতেছে। জাপানে যাহাতে রাজনীতিক্ষেত্রে উদারনীতিকতা এবং সর্ব্বস্বত্ববাদের সহজাত দোষ পরিহার করিয়া উহার গুণগুলি জাতীয় জীবনে জাতীয়ভাবে পরিপাক করিয়া গ্রহণ করিতে পারে, তাহার জন্যও তথায় সুধী সমাজে আলোচনা এবং গবেষণা চলিতেছে। ইহা একটা নূতন ব্যাপার বটে।

গগনে ঘনঘটা

য়ুরোপের রাজনীতিক গগনে আবার নিবিড় মেঘমালার সঞ্চার লক্ষিত হইতেছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, তথাকার বর্ত্তমান অবস্থার সহিত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে তথাকার আকাশে যেরূপ জলদজাল দেখা গিয়াছিল, এবারও সেইরূপ শঙ্কাজনক ঘনঘটা দেখা দিতেছে। ইঁহারা মার্শেলিসের হত্যাকাণ্ডের সহিত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে সারাজেভোর হত্যাকাণ্ডের তুলনা করিতেছেন। এবার ঐ ব্যাপারে তৎক্ষণাৎ যে একটা সংগ্রাম বাধিয়া উঠে নাই,—তাহার কারণ, বিগত মহাযুদ্ধের ফলাফল দর্শনে এবার বিজ্ঞতর য়ুরোপীয় রাজনীতিকরা জনসাধারণকে অতিকষ্টে সংযত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া লোকের ভিতরের ভাবটা ভাল ছিল না। যাহা হউক, সার জন সাইমনের, মিষ্টার এন্থনি এডেনের, লাভালের এবং টিটুলেস্কুর ছুটাছুটি যে একবারে নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে, তাহা কোনমতেই বলা যায় না। মুসোলিনী ত কথায় কথায় কঠোর নীতির সমর্থন করেন, হিটলারের নাছোড়বান্দা ভাব, লিটভিনফের অদৃষ্টবাদীদিগের ন্যায় প্রশান্তি প্রভৃতি দেখিয়া সাধারণ লোক তাঁহাদের অন্তর্নিহিত ভীতির কথা বাহিরে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। তাহার পর, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী জাতি গ্রেট বৃটেন যে একটা সমর উপস্থিত হইলে কি করিবেন, তাহার কোন স্থিরতা নাই। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দেও গ্রেট বৃটেনের এই অসাব্যস্ত ভাব জার্ম্মাণীর পরাজয়ের অনেকটা প্রবল কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। জার্ম্মাণী যখন বেলজিয়াম আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন জার্ম্মাণী মনে করিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বদিকে রুসিয়াকে ছাড়িয়া গুপে তাঁহারা প্যারিস দখল করিবেন। গ্রেট বৃটেন যদি ঐ যুদ্ধে যোগদান করিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প প্রথমেই প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে জার্ম্মাণী হয় ত অন্যরূপ উপায় অবলম্বন করিতে পারিতেন। কিন্তু কয়েক দিন কিছুই করেন নাই। শেষকালে বৃটিশ পররাষ্ট্র বিভাগের রাজপুরুষগণ, বৃটিশ চার-বিভাগের কর্ম্মচারীরা এবং বৃটিশ ব্যাঙ্কার, শ্রমিক ও পোতাধ্যক্ষগণ জার্ম্মাণীকে ভীতিপ্রদ জাতি বলিয়া মনে করেন এবং সেই জন্য গ্রেট বৃটেন কয়েক দিন পরে মিত্র শক্তিবর্গের দলে যোগ দিয়াছিলেন।

কিন্তু এবার গ্রেট বৃটেন কিসের ভয়ে ভীত? বলা বড় কঠিন। এই ব্যাপারটা বুঝিতে হইলে কেবল বৃটিশ পররাষ্ট্রনীতির কথা বুঝিলে চলিবে না,—বর্ত্তমান য়ুরোপের ভিতরকার অবস্থা কি, তাহা বুঝিতে হইবে। জার্ম্মাণী নাৎসিভাবে প্রভাবিত হয়, গ্রেট বৃটেন উহা চাহেন না। নাৎসি-শাসিত জার্ম্মাণীকে ইংরাজ শত্রু মনে করেন। যুদ্ধ বাধিলে যদি ইংরাজ জার্ম্মাণীর বিরোধী দলে যোগ দেয়, তাহা হইলে আবার আকাশ হইতে বৃটিশ দ্বীপের স্থানে স্থানে বোমা বর্ষণ হইবে। তদ্ভিন্ন সুদূর-ভবিষ্যতে হয় ত য়ুরোপে নাৎসি মত প্রবল হইয়া উঠিবে, আর সঙ্গে সঙ্গে নানা সামাজিক বিপ্লব দেখা দিবে। ইহাও বিশেষ ভাবনার কথা। সেই জন্য গ্রেট বৃটেন যুদ্ধ-সঙ্ঘটনের ঘোর বিরোধী। সম্প্রতি তথ্য সংগ্রহের দ্বারা জানিতে পারা গিয়াছে যে, ইংলণ্ডের প্রায় শতকরা ৯৩ জন লোক সমর সঙ্কোচ করিবার, শতকরা ৮৬ জন জাতীয় সামরিক বিভাগের এবং নৌবিমান-বাহিনীর সঙ্কোচ-সাধনের পক্ষপাতী। অবশ্য সকল জাতিকে সম্মত করিয়া তাঁহারা এই কার্য্য সাধন করিতে বলিতেছেন। তদ্ভিন্ন ইংলণ্ডের শতকরা ৯৭ জন ইংলণ্ডকে জাতিসঙ্ঘে যোগ দিয়া থাকিতে বলেন। গ্রেট বৃটেনের জনসাধারণের এই মত যে, যতদূর সম্ভব যুদ্ধকে পরিহার করিয়া চলা যাইতে পারে, তাহা করা উচিত। সে জন্য গ্রেট বৃটেন সহজে সংগ্রামে লিপ্ত হইতে চাহিবেন না। সেই হেতুই কেহ কেহ মনে করিতেছেন যে, সার জন সাইমন হিটলারের সম্মুখে খুব চড়া সুরে কথা বলেন নাই। ইংরাজ অবশ্য ইচ্ছা করিলে ভবিষ্যৎ যুদ্ধে যোগ না দিতেও পারেন। কিন্তু তাহা হইলেও ত

য়ুরোপে নাৎসিদিগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ইহাও হইতেছে বিষম চিন্তার কথা।

ভিতরকার অবস্থাতে নানা গোলযোগ বিদ্যমান। সব কথা এখানে আলোচনা করা যায় না। মধ্য-য়ুরোপে একটা ব্যাপক চাঞ্চল্য রহিয়াছে। হঠাৎ অর্থাৎ দৈবযোগে হয় ত একটা যুদ্ধ ত বাধিয়া যাইতে পারে। যেখানে কেবল স্বার্থ লইয়া কাড়াকাড়ি, সেখানে এইরূপ দৈবযোগে যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক। গ্রেট বৃটেনের রক্ষণশীল দল, বিশেষতঃ বড় বড় ধনীরা সোভিয়েট সরকারকে বিব্রত দেখিলে সন্তুষ্ট। কিন্তু উহা হওয়াও অসম্ভব নহে। জাপান যদি সাইবেরিয়ার দিকে রুসিয়াকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে জার্ম্মাণী হয় ত পশ্চিমদিকে, বিশেষতঃ ইউক্রেনের দিকে রুসিয়াকে আক্রমণ করিতে পারে। তাহা হইলে একটা বিষম ব্যাপার ঘটিবে। কত দিক দিয়া কত রাষ্ট্র যে সেই ব্যাপারে জড়িত হইয়া পড়িবে, তাহা মানবজাতির ভাগ্যবিধাতাই বলিতে পারেন। বিলাতের 'নিউ ষ্টেটসম্যান এণ্ড নেশন' বলিয়াছেন যে, যখন জাপান সাইবেরিয়ার দিকে বলসেভিক সৈন্যদিগের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইবে, তখনই জার্ম্মাণীর রুসিয়া আক্রমণ করিবার সুবিধা উপস্থিত হইবে। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, জার্ম্মাণী এবং জাপান সুবিধা বুঝিলেই সোভিয়েট সরকারের সহিত সহসা সংগ্রাম করিবার জন্য রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতে পারেন। ইহা অবশ্য অনেক বিশেষজ্ঞেরই মত। সাম্রাজ্যবাদী জার্ম্মাণীর সহিত রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য শক্তিবর্গকে দশ বৎসর ধরিয়া প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল। এখন সোভিয়েট সরকারের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ভিতরে ভিতরে যে কেহ কেহ প্রস্তুত হইতেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সময় হইলে এবং সুবিধা পাইলেই একটা ছুতা ধরিয়া সংগ্রাম বাধাইতে কতক্ষণ? রাজনীতিক্ষেত্রে সুবিধাবাদটাই ত বড় ব্যাপার, কাজেই আচম্বিতে যুদ্ধ বাধা অসম্ভব নহে। সুদূর প্রাচীতে জাপান যে চেষ্টায় ফিরিতেছেন, তাহার মূল লক্ষ্য কি, তাহা বলা সহজ নহে। ফলে য়ুরোপের রাজনীতিক আকাশ মেঘশূন্য নহে। উহা হইতে আচম্বিতে অশনিপতনও বিস্ময়ের বিষয় নহে।

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোকে



সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণী—আর ডিগনাম কোম্পানীর অন্যতম অংশীদার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৩ই আষাঢ় ৫২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। দুর্গাচরণ বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন কৃতী ছাত্র ছিলেন। বি, এ, ও এম, এ, পরীক্ষায় ইতিহাস ও অর্থনীতিতে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি আইনের দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ব্যবহারাজীবিরূপে তাঁহার বেশ সুনাম ছিল। তিনি নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন যৌথকারবারের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়াও দেশ-হিতৈষণার জন্য জনপ্রিয় হইয়াছিলেন।



(উপন্যাস

ত্রয়োস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ঝড়-জল

রাগে রাধাবিনোদের মাথা দপ-দপ করিয়া উঠিল। বাড়ীতে সে নাই—গভীর রাত্রি! অজিত যত বড় বন্ধু হোক্, তবু বাহিরের লোক! তাকে লইয়া লীনার এই অন্তরঙ্গতা!

কিন্তু রুক্ষ মেজাজ ভালো দেখাইবে না। তাই স্বর সহজ করিয়া সে কহিল—কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ লীনা, অজিতের ঘর-বাড়ী আছে। এত রাত্তির পর্য্যন্ত বাড়ীতে না ফিরলে সেখানে ওর জন্য দুশ্চিন্তার সীমা থাকবে না!

লীনা কহিল,—তাই না কি অজিত বাবু? আপনাকে আটকে রেখে তাহলে ভারী অসুবিধায় ফেলেচি বলতে হয়।

অজিত কহিল—না। রাত হলে ভাববে না। বাড়ীতে জানে, আমি এখানে এসেছি।

লীনা কহিল—বাঁচলুম! রাধদা যে-রকম চিন্তিত হয়েছে,…তা ভয় নেই, বেশীক্ষণ আপনাকে আর আটকে রাখবো না। মাথাটা ছাড়চে! আপনি রগের উপর সেই রকম আর-একটু বেশ চেপে আঙুল ঘষে-ঘষে দিন তো…

কথাটা বলিয়া বক্র দৃষ্টিতে লীনা একবার রাধাবিনোদের পানে চাহিল, তার পর চক্ষু মুদিল। এ কথার পর রাধাবিনোদের আর দাঁড়াইয়া থাকিবার উপায় ছিল না। ধীরে ধীরে সেখান হইতে সে চলিয়া আসিল।

আসিল সোজা একেবারে নিজের ঘরে। অন্ধকার ঘর। রাধাবিনোদ আসিয়া খাটে বিছানার উপর বসিল। বসিয়া গুম্ হইয়া রহিল। মাথার মধ্যে রক্তস্রোত ঝাঁজিয়া গরম হইয়া যেন কুণ্ডলী রচনা করিতেছে!

সে কিছু বোঝে না, বটে? তাকেও একদিন মৃগয়াহত করিতে লীনা বহু শরক্ষেপের উদ্যোগ করিয়াছিল! সে বলিয়াই…

এ ব্যাপারে তার মনে আতঙ্ক জাগে। বাহিরে একদিন যত কালি সে মাখিয়া বেড়াক, মনের কালি লইয়া কোনো সংসারকে কালো করিয়া তুলিবার কল্পনা তার মনে কখনো উদয় হয় নাই। সে কল্পনায় সে শিহরিয়া ওঠে! কিন্তু মূঢ় বেচারা অজিত…

তার সারা অঙ্গ ঝাঁজিয়া উঠিল। কিন্তু কি করিবে? স্পষ্ট কোনো অভিযোগ কোন্ মুখে আনিবে? অজিত একদিন ডাক্তারী পড়িয়াছিল, সত্য। লীনার যদি সত্যি অসুখ করিয়া থাকে? এবং এ পরিচর্য্যায়…? হয়তো ইহার অন্তরালে কোনো কুটিল অভিসন্ধি নাই! হয়তো…

বুকে কাঁটা আরো বেশী করিয়া বিঁধিতে লাগিল। অস্বস্তিরও তাই অন্ত রহিল না। সুস্পষ্ট কিছু জানিতে পারিলে হেস্তনেস্ত করা চলে! কিন্তু…

রাধাবিনোদ কাঠ হইয়া বিছানায় বসিয়া রহিল—মনে-প্রাণে নেপথ্যের পানে লক্ষ্য রাখিয়া! পাশের ছাদে প্রেমাভিনয়ের কোনো সুর কোনো ক্ষণে উচ্ছুসিত হইয়া ওঠে কি না—তাহারি আভাস যদি জাগিয়া ওঠে!

ওদিকে কাহারো মুখে কথা নাই…দূরে বড় রাস্তায় দু'চারিখানা ট্যাক্সি ভেঁপু বাজাইয়া সদর্পে ছুটিয়া চলিয়াছে! সেই শব্দ-টুকুই মাঝে মাঝে আসিয়া কাণে আঘাত করিতেছে। এ শব্দ ছাড়া দুনিয়ায় অন্য শব্দ নাই! থাকিলেও রাধাবিনোদের চেতনলোকের সীমা তারা স্পর্শ করিতে পারে না!

কতক্ষণ সে এমনি বসিয়া আছে, হুঁশ নাই। গৌতমের শাপে অহল্যা যেমন পাষাণে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল—সেও যেন তেমনি পাষাণ বনিয়া গিয়াছে! কোনো গৌতম তাকে অভিশাপ করে নাই; নিজের মনের ঝাঁজে সে এমনি শিলা-মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে!

সহসা চেতনা ফিরিল অজিতের কথায়। অজিত কহিল,—বসে আছ রাধু! এখনো শোওনি? আশ্চর্য্য!

কথার সঙ্গে সঙ্গে সুইচ টিপিয়া অজিত আলো জ্বালিল। অজিতের চোখে তার চোখের দৃষ্টি মিলিল। সে একটু অপ্রতিভ হইল। এমন ভাবে স্পাইয়ের মত! লীনার কথা মনে পড়িল। সে ছিল বাহিরে! সে যে বলিয়াছিল, স্পাই! সত্যই সে তাই?

রাধাবিনোদের মুখে কথা সরিল না।

অজিত কহিল,—আমার চাদরখানা আছে তোমার ঘরের আল্‌নায়। বাড়ী যাচ্ছি। রাত প্রায় ত্রুটো।

রাধাবিনোদ নিশ্বাস ফেলিল। বাহির হইতে লীনা কথা কহিল; বলিল,—কার সঙ্গে কথা কইচেন অজিত বাবু?

অজিত কহিল,—রাধুর সঙ্গে।

—রাধদা ঘুমোয় নি?

—না।

অজিত আল্‌না হইতে শিল্কের চাদর টানিয়া লইল। লীনা ঘরে ঢুকিল; ঢুকিয়া রাধাবিনোদের পানে চাহিয়া যেন শিহরিয়া উঠিল! ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মানুষের মুখের ভাব এমন বদলাইয়া যায়! রাধাবিনোদের মুখে কে যেন কালি লেপিয়া দিয়াছে!

লীনা কহিল,—অসুখ করেনি তো রাধদা? কতকগুলো মাছটাছ খুব গোঁয়ার্ত্তমি করে খেয়েচো বোধ হয়? না—তুমি জ্বালালে, দেখচি। একে আমার শরীর খারাপ··· বৌ নেই এখানে, দেখুন তো অজিত বাবু, আপনার পরিশ্রম বেড়ে গেল না তো? রাধদা কেমন আছে—একবার দেখুন, সত্যি···

মৃদু হাস্যে অজিত চাহিল রাধাবিনোদের পানে, কহিল,—সত্যি অসুখ বোধ করচো রাধু?

রাধাবিনোদ কহিল,—না।

ছোট কথা! সে-কথা বাহির হইল যেন পাতালের কোন্ রন্ধ্র ভেদ করিয়া!

লীনার পানে চাহিয়া অজিত কহিল,—আপনি শুয়ে পড়ুন গে···মাথা আর ধরবে না! ঘুমোলেই আরাম বোধ করবেন। কাল সকালে খপর নেবো'খন!

মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া লীনা আসিয়া দাঁড়াইল রাধাবিনোদের কাছে। অজিত চলিয়া গেল।

ঘরের মধ্যে দুজনে নির্ব্বাক্। বাহিরে ওদিকে সদর ফটকে চাবি খোলার শব্দ শুনা গেল। সে ফটক আবার বন্ধ হইল।

চারিদিক নিস্তব্ধ। লীনা চাহিয়াছিল রাধাবিনোদের পানে। রাধাবিনোদ একটা নিশ্বাস ফেলিল, ফেলিয়া কহিল,—শোওগে যাও···তোমার ডাক্তারের হুকুম।

লীনা কহিল,—জানো তো, কারো হুকুম কোনো দিন আমি মেনে চলতে পারি না।

রাধাবিনোদ কহিল,—ইনি মস্ত ডাক্তার। তোমার জন্য এমন দরদ!

—রাধদা···

লীনা যেন গর্জ্জন তুলিল। রাধাবিনোদ চুপ!

লীনা কহিল,—কি ভেবেচো তুমি যে এমন ব্যঙ্গ-পরিহাস করো!

রাধাবিনোদ যথাসাধ্য সহজ শান্ত স্বরে কহিল,—ব্যঙ্গ!

—তাই। ব্যঙ্গ বোঝবার মত বুদ্ধি আমার আছে।

রাধাবিনোদ কোনো কথা কহিল না। লীনা কহিল,—কাঁটা কোথায় বিঁধেচে—কেন বিঁধেচে—বুঝি।

রাধাবিনোদ কহিল,—কাঁটা!

—তাই। অজিতবাবু সেবা করছিলেন, তাতে তোমার এতখানি চোখ টাটালো কেন—তার কোনো কারণ খুঁজে পাই না। দুনিয়ায় বাস করতে হলে পরস্পরকে দেখতে হয়। মানুষ ম্যাখে। সকলেই আত্মসর্ব্বস্ব নয়!

যে কথাগুলা ছায়ার মত মনের আশে-পাশে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল···লীনার এ কথায় সে কথাগুলা ছায়ার আবরণ ঠেলিয়া সুস্পষ্ট মূর্ত্তি ধরিয়া জাগিয়া উঠিল!

রাধাবিনোদ কহিল,—কাঁটা-টাঁটা আমি বুঝি না। তবে কতকগুলো বিধি-নিষেধের সামঞ্জস্য আমি মানি। ঐ অজিত···এ বাড়ীর সঙ্গে তার এমন সম্পর্ক নেই···

বাধা দিয়া লীনা কহিল,— সম্পর্ক নেই ? তোমার বন্ধু ! বন্ধুর সঙ্গে কারবার মানুষ বাইরে ঘরেই করে থাকে। সে বন্ধু দুপুর-রাত্রে বাড়ীর মধ্যে···

লীনা ফোঁশ্ করিয়া উঠিল, কহিল,—তুমিই তাঁকে ডেকে এনে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেছ !

—দিয়েছি, মানি। তা বলে···

লীনা কহিল,—উনি এখানে খাবেন, এ খপর তোমার অজানা ছিল না। তাই এসেছিলেন।

রাধাবিনোদ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল ; দুই চোখের দৃষ্টি লীনার মুখে নিবদ্ধ—স্থির, অবিচল !

লীনার কথায় কি তেজ ! মানুষের মনে ছাই-পাঁশ থাকিলে মুখের কথায় কি এতখানি আগুন জ্বলে ? না, জ্বলিতে পারে ?

লীনা কহিল,—অসুখ করেছিল—দেখবার কেউ নেই—দরদ করে উনি যদি দেখে থাকেন, তাতে কি এমন দোষ হয়েছে—বুঝতে পারি না। তোমার মন ছোট, তাই···

লীনা চুপ করিল। সে যেন ফুঁশিতে লাগিল। তাহারি কথায় প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিল, হয়তো তার মন ছোট ! তবু···

লীনা কহিল,—তুমি কেন শোওনি, তার মানে আমি খুব বুঝি। গোয়েন্দাগিরি ? স্পাইইং ? অজিত বাবুর সঙ্গে আমি প্রণয়াভিনয় করি কি না, তাই লক্ষ্য করছিলে !

এ কথার আঘাতে রাধাবিনোদ মাথা নামাইল।

লীনা কহিল,—এ স্পাইগিরি সাজে শুধু স্বামীর। তোমার সাজে না।

রাধাবিনোদের মনে এবারে দৈত্য জাগিল। সে কহিল,—জানি। সে উপদেশ তোমায় দিতে হবে না।··· কাল সকালে প্রতাপ বাবুর কাছে আমি যাবো—গিয়ে এ কথা তাঁকে বলবো। উদাসীন থেকে এ-দায়িত্ব আমার মাথায় চাপাবার তাঁর কোনো অধিকার নেই। তাঁর স্ত্রীর তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা যেন তিনি করেন···

এক-নিশ্বাসে এই অবধি বলিয়া রাধাবিনোদ ক্ষণেকের জন্য চুপ করিল ; তার পর কহিল,—অজিতকেও বলে দেবো, যে-অবধি তার অধিকার, সেই গণ্ডীটুকুর মধ্যেই যেন থাকে।

—তার মানে ?

রাধাবিনোদ কহিল,—বন্ধু আসবে বন্ধুর কাছে সদরে ; বন্ধুর অগোচরে তার অন্দরে প্রবেশ করা ভদ্রতা নয়।

লীনা একটা নিশ্বাস ফেলিল ; ফেলিয়া বলিল,—তোমার বাড়ী—তাই তুমি এ কথা বলতে পারলে। বেশ, এ নিয়ে বাইরের কাকেও কর্ত্তব্য শেখাবার আগে তোমার বাড়ীতে বসে যারা তোমার বাড়ীর অমর্য্যাদা করে, তাদের ব্যবস্থা আগে করো। নিজে না পারো—আমি করবো। ভয় নেই। কাল আর এ-বাড়ীতে আমি থাকবো না। থাকা চলে না ! থাকা উচিত নয়।

রাগে দুঃখে লীনার দুই চোখে জল আসিল।

রাধাবিনোদ তাহা লক্ষ্য করিল। তার বুকখানা দুলিয়া উঠিল। সত্যই এ কু-কথায় সে লীনার অপমান করিয়াছে ! যত হাসি-পরিহাস করুক, লীনার আচরণে এ পর্য্যন্ত···

লীনা কহিল,—আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা কত হীন, তা আমি বুঝি। আগে ভাবতুম, বুঝি তামাসা। আজ বুঝলুম, এ ধারণা সত্যি। কিন্তু রাধদা···আমায় যা ভাবচো, তা নই। স্বামীর মন পাইনি—দুর্ভাগিনী বলতে পারো ! কিন্তু দুশ্চারিণী নই !

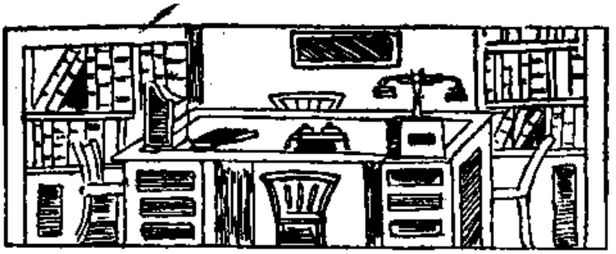
তার চোখে জল—অধরে মলিন মৃদু হাসি। নিশ্বাস ফেলিয়া লীনা ফিরিয়া আবার ছাদে গেল, গিয়া রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আকাশে দু'এক খানা ধূসর মেঘ ছুটিয়া চলিয়াছে। নীচে গলির মুখ পর্য্যন্ত গ্যাসের বাতিগুলা জ্বলিতেছে—দুঃখ-মলিন চোখের ঘোলাটে দৃষ্টির মত ! চুপ করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল···অনেক ক্ষণ।

সহসা অঙ্গে স্পর্শ অনুভব করিয়া সে চাহিল। দেখে, রাধাবিনোদ। রাধাবিনোদ তার পিঠে হাত দিয়া ডাকিতেছে—লীনা···

লীনা নীরবে চাহিয়া রহিল। রাধাবিনোদ কহিল,—আমার অপরাধ হয়েছে—মস্ত অপরাধ। আমায় তুমি ক্ষমা করো।

[ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সাময়িক  প্রসঙ্গ

জনমত উপেক্ষা

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার স্থিতিকাল আবার এক বৎসরকাল বাড়াইয়া দেওয়া হইল। যেখানে কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম, সেখানে নাড়া-বনে কীর্ত্তন হইলেও তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু নাই। ইহাতে যে এ দেশে নির্ব্বাচনমূলক শাসন-ব্যবস্থার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করা হইল, কর্ত্তৃপক্ষ সে জন্ম একটুও চিন্তিত নহেন। তাঁহারা একটা ছুতা এই ধরিবেন যে, এখন যাঁহারা ব্যবস্থাপক সভার সদস্য আছেন, তাঁহারাও জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু নির্ব্বাচনেও ত ভুলভ্রান্তি আছে, যোগাড়ের জয় আছে, ইহা বিদিত ভুবনে। লর্ড উইলিংডন ও সার জন এণ্ডার্স'ন অবশ্য তাহা বেশ জানেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বিলাতে উৎকোচ-গ্রহণাদি কলুষিত কার্য্য-নিবারক আইনের কার্য্যাদি নিবারণের জন্ম কমন্স সভার যে কমিটী বসিয়াছিল, তাহাতে সাক্ষ্যদানকালে অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি নির্ব্বাচনের ব্যাপারে যে সমস্ত নীতিহীন উপায় আছে বা তখন ইংলণ্ডে ছিল, তাহা বিবৃত করিয়াছিলেন। এ স্থলে তাহা বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বিলাতের ভোটদাতাদিগের যেরূপ বিবেচনা, বুদ্ধি এবং ভোটদান-ব্যাপারে যেরূপ নীতিজ্ঞান ছিল, বর্ত্তমান সময়ে এই দারিদ্র্যপীড়িত এবং শিক্ষাহীন বঙ্গীয় জনসাধারণের, তথা ভোটদাতাদিগের পার্থিব বিষয়ে নীতিজ্ঞান যে তাহা অপেক্ষা উন্নত, তাহা মনে করা যাইতে পারে না। সেই জন্ম তিন বৎসরের অধিককাল কোন ব্যবস্থাপক সভাকে জীয়াইয়া রাখা উচিত নহে। বিলাতের বিখ্যাত রাজনীতিবিশারদ জন ষ্টুয়ার্ট মিল সেই জন্ম বলিয়া গিয়াছেন যে, Even three years, in such circumstances are almost too long a period, and any longer term is absolutely inadmissible. অর্থাৎ এইরূপ অবস্থায় তিন বৎসরই অত্যন্ত দীর্ঘ সময় এবং ইহার অপেক্ষা অধিক সময় কোন-মতেই গ্রহণীয় হইতে পারে না। কোন্ কোন্ অবস্থায় ব্যবস্থাপক সভার স্থায়িত্বকাল দীর্ঘ করা উচিত নহে, জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাহা তাঁহার Representative Government নামক গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। সত্য বটে, Henry Sidgwick প্রভৃতি কোন কোন রাজনীতিক লেখক পার্লামেণ্টের স্থিতিকাল পাঁচ, ছয়, এমন কি, সাত বৎসর পর্য্যন্ত করিবার কথা বলিয়াছেন,—কিন্তু সে কেবল বর্ত্তমান য়ুরোপ সম্বন্ধে,—যে য়ুরোপে এখন জনসাধারণের রাজনীতিক জ্ঞান বিশেষভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। তথায় সকলে অল্পবিস্তর লেখাপড়া শিখে, সকলেই,—এমন কি, জুতা-শিলাইকারক হইতে চণ্ডীপাঠক পর্য্যন্ত—অহরহ রাজনীতির চর্চ্চা করে,—সেই য়ুরোপের পক্ষে প্রযোজ্য। তথাকার কোন ভোটদাতাই এমন কথা বলে না যে, "সরকার যাহা করিবেন মনে করেন, তাহা ত করিবেনই,—কেহ তাহাতে বাধা দিতে পারিবে না, অতএব আমি কেন ব্যক্তিবিশেষকে ভোট দিয়া বাধিত করিবার সুযোগ ছাড়িব?" এ ধারণা তথাকার কোন ভোটারের মনে উদিতই হয়,—এমন কথা তথাকার কোন বক্তাই—কোন ভোটারই তাঁহার মুখ হইতে বাহির করিতে সাহসী হইবেন না। এই ভাবের কথা বক্তার দায়িত্বজ্ঞানের একান্ত অভাবের পরিচয় প্রদান করে। বিলাতে অতি বড় লজ্জাহীন ব্যক্তিও এমন কথা বলে না। বিশেষতঃ এ দেশের জন কয়েক শিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিই বিশেষভাবে রাজনীতির আলোচনা করিয়া থাকেন। সাধারণ লোক সময়ে সময়ে রাজনীতিক বিষয় লইয়া আলোচনা করে। এখানকার জনসাধারণ, এমন কি, যাঁহারা সদস্য নির্ব্বাচিত হন,—তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই রাজনীতিক জ্ঞানে বিশেষ উন্নত নহেন। এরূপ অবস্থায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার স্থিতিকাল বর্দ্ধিত করিয়া দিয়া সরকার বিশেষ ভুল করিয়াছেন। এ ধারণা অনেকের মনেই উদিত হইতেছে যে, বর্ত্তমান বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সদস্যগণ দীর্ঘকাল পূর্ব্বে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া, নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর কথা ভুলিয়া গিয়াছেন অথবা নির্ব্বাচকদিগের সম্বন্ধে তাঁহাদের যে কোন দায়িত্ব আছে, সে জ্ঞানের অনুভূতি কস্মিন্‌-কালেও তাঁহাদের মনে জাগে নাই,—তাই তাঁহারা "ভোট-দরিয়া" পার হইয়া এখন খেয়ার মাঝিদিগকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইতেছেন। তাই তাঁহাদের সহায়তায় সরকার বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভায় অনেক জনমতের বিরোধী আইন পাশ করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহাতে কতকগুলি মন্ত্রীর এবং সদস্যের সুবিধা হইল, কিন্তু সাধারণের যে বিশেষ ক্ষতি হইল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভারত-সচিবের পদে লর্ড জেটল্যাণ্ড

লর্ড জেটল্যাণ্ড ভারত-সচিবের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, এ কথা শুনিয়া এ দেশের লোক যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। তিনি লর্ড কর্জ্জনের এক জন বিশিষ্ট চেলা। তিনি বাঙ্গালাদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া কিছু দিন এই দেশ শাসন করিয়া গিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি জয়েণ্ট কমিটীতে বাঙ্গালার উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদিগের উপর যে ঘোর অবিচার করা হইয়াছে, এ কথা স্পষ্টই বলিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মর্লি-মিণ্টো শাসনসংস্কারে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদিগের স্বার্থরক্ষার্থ স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছিল। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা এবং পাঞ্জাব প্রদেশে মুসলমানদিগের জন্ম অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে কতকগুলি অধিক সদস্যের আসন নির্দ্দিষ্ট করাতে ঐ প্রদেশ দুইটির উপর অবিচার করা হইয়াছে। পুণার চুক্তির উপরও তিনি তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কথাগুলি আমরা এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। সেই কথাগুলি এই—We do not think that those who were parties to it

(i.e. the Poona pact) can be said to have been accredited representatives of the caste Hindus or to have possessed any mandate to effect a settlement. অর্থাৎ "যাঁহারা পুণা চুক্তিতে পক্ষভুক্ত ছিলেন, তাঁহারা উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগের মানিত প্রতিনিধি ছিলেন না অথবা আপোষ করিবার জন্ম কোনরূপ ক্ষমতাও পান নাই।" অতএব গোড়ায় অবনমিত হিন্দুদিগের জন্ম যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল,—সে ব্যবস্থা বরং ভাল ছিল। অবশ্য লর্ড জেটল্যাণ্ডের প্রস্তাব ভোটে টিকে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি যে ভারতীয়, বিশেষতঃ উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগের যে ধন্তবাদার্হ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে ভারত-সচিবের আসনে বসিয়াছেন, সেজন্ম আমরা সন্তুষ্ট, এ কথা বলিতে পারি না। নীতির ধারাবাহিকতার দোহাই দিয়া পদস্থ রাজপুরুষদিগকে অনেক অসঙ্গত ব্যবস্থাকেও বাহাল রাখিতে হয়, তাহা আমরা জানি। লর্ড মর্লিও এক জন উদারমনা এবং দৃঢ়চরিত্র ব্যক্তি ছিলেন, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহারই আমলে এবং তাঁহার কতকটা অমতে ত এই ভারতে এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষজনক স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল—ইহা সকলেই জানেন। আজকালকার শাসকবর্গ যুক্তিসঙ্গতভাবে শাসন-



সার স্যামুয়েল হোর

নীতির ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করিবার হেতুপ্রদর্শন পূর্ব্বক অনেক অসঙ্গত ব্যবস্থাও প্রবর্ত্তিত রাখিতে চাহেন। লর্ড জেটল্যাণ্ড সেই অজুহত দেখাইতেও ত্রুটি করেন নাই। তিনি ভারত-সচিবের গদী পাইয়াই বলিয়াছেন যে, শাসন-সংস্কার আইনখানি রচনার জন্ম তিনি সুখ্যাতির দাবী করেন না,—সে সুখ্যাতি সার স্যামুয়েল হোরেরই প্রাপ্য। সোজা কথায় তিনি উহার দায়িত্ব লইতে চাহেন না। তবে এখন তাঁহার কার্য্য হইতেছে যে, বিলখানি লর্ড-সভায় পাশ করা এবং ঐ বিলখানি কার্য্যক্ষেত্রে চালাইয়া দেওয়া। ঐ বিলখানি রচনার জন্ম ভারতবাসীরা সার স্যামুয়েল হোরকে সুখ্যাতি করিতেছে কি অখ্যাতি করিতেছে, তাহা সর্ব্বজনে জানে। তবে বিলাতের সাম্রাজ্যবাদীরা অবশ্য তাঁহাকে এই জন্ম সুখ্যাতি করিতেছেন। সাম্রাজ্যবাদীদিগের তাঁহাকে সুখ্যাতি করিবারই কথা। যাহা হউক, শাসননীতির এই ধারাবাহিকতার মর্ম্ম আমরা বুঝি না। পুণার সরকারী কারাগারে থাকিয়া মহাত্মাজী সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ নিবারণের জন্ম প্রায়োপবেশন করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য যে অতি মহৎ ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি ভুল করিয়াছিলেন। ভুল মহাত্মাদিগেরও হয়। রামচন্দ্র, পরশুরাম প্রভৃতিও ভুল করিয়াছিলেন। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সে ভুল স্বীকার করিয়াছেন। মহাত্মাজী তাহা এখনও করেন নাই। এখন দেখা যাইতেছে যে, পুণা প্যাক্টেরই ব্যবস্থা-ফলে উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগের সহিত নিম্নবর্ণের হিন্দুদিগের মধ্যে বেশ একটু রেষারেষীর সঞ্চার হইয়াছে। সম্প্রতি নিখিল বঙ্গীয় অবনমিত সম্প্রদায়ের সঙ্ঘ ঝিনাইদহের কনফারেন্সে কি বলিয়াছেন,—তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। রাজনীতিক চালবাজীর ঘোর-প্যাঁচ যাঁহারা না বুঝেন, তাঁহাদের রাজনীতিক ক্ষেত্রে না যাওয়াই উচিত। বিলাতী রাজনীতিকদিগের এই শাসননীতিক ক্রমিক পারম্পর্য্যরক্ষার ভিতরও একটা চালবাজী নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে? লর্ড জেটল্যাণ্ড যখন সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনব্যবস্থা অসঙ্গত মনে করেন, তখন উহার সমর্থন করেন কি হেতু?

পার্লামেণ্টে ইণ্ডিয়া বিল

বিলাতী পার্লামেণ্টে কিছু দিন ধরিয়া ইণ্ডিয়া বিলের আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তাহার পর লর্ড-সভাতেও ঐ বিলের আলোচনা হইয়াছে। আমাদের ভাগ্য-বিধাতারা যখন বিদেশী, তখন বিদেশে ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের কথা আলোচিত হইবে,—ইহা স্বাভাবিক। ঐ সম্পর্কে পার্লামেণ্টের উভয় সভায় যে কত বক্তৃতা হইয়াছে,—তাহার আর ইয়ত্তা নাই। বক্তৃতাগুলির সমস্ত এ দেশে আসে না। এ দেশে আসে তাহার সংক্ষিপ্ত সার। উহাতে বক্তার অনেক কথা বাদ দেওয়া হয়। তাহা হইলেও আমাদের ঐ সকল বক্তৃতা পড়িতে পড়িতে মনে হয়, পার্লামেণ্টের সদস্যরা এই সকল বক্তৃতা কেন করেন? উহা না করিয়া সকলে যদি বার কয়েক মাথা নাড়িয়া এবং দাড়ি ফুলাইয়া বলেন যে, গ্রেট বৃটেনের সুবিধা করাই যখন আমাদের উদ্দেশ্য, তখন বিনা কৈফিয়তে আমাদের ইণ্ডিয়া বিলখানি পাশ করিতেই হইবে। অতএব এই বিলখানি পাশ করা হইল। তাহা করিলে কাহারও কোন কথা বলিবার বা বিরুদ্ধ-মন্তব্য প্রকাশ করিবার অবকাশ থাকিত না। আমাদের এক জন বিজ্ঞ এবং প্রবীণ সহযোগী বলিয়াছেন যে,—"ঐ বক্তৃতাগুলার মধ্যে যে সমস্ত মিথ্যা কথা আছে, বৃটিশ জাতির ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে অজ্ঞতার পরিচয় আছে, তাহা দেখাইয়া দেওয়া উচিত বটে; কিন্তু কাহাকে দেখান হইবে?" উহা দেখাইয়া দিয়াই বা লাভ কি? এক জন বিশিষ্ট ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন, "যে গাভী আপনার বাছুরের ডাকে সাড়া দেয় না,—সে কখনও কি ভেড়ার ডাকে সাড়া দিবে?" কখনই না। বিধাতা যে জাতির হাতে ৩৫ কোটি মানবের ভাগ্য সঁপিয়া দিয়াছেন, সে জাতির প্রতিনিধিরা যদি কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে ভারতের প্রকৃত তথ্য না জানিতে চাহেন, তাহা হইলে আমাদের কথায় কি তাঁহাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি গজাইয়া উঠিবে? এরূপ আশা বাতুলেও করে না।

কমন্স সভায় এক জন নারী-সদস্য বলিয়াছিলেন, ভারতে সুদখোরের কাযটা হিন্দুরা করিয়া থাকে। জিজ্ঞাসা করি, কাবুল হইতে যে সকল লোক আসিয়া দরিদ্র ভারতবাসীকে টাকা ধার দিয়া চড়া হারে সুদ আদায় করে, তাহারা কি হিন্দু? সুতরাং ও-সব কথা লইয়া আলোচনা না করাই ভাল। অনর্থক কাগজ-কালি খরচ করিয়া লাভ নাই। আমরা এই জন্য এই সম্বন্ধে অধিক কথা বলিব না।

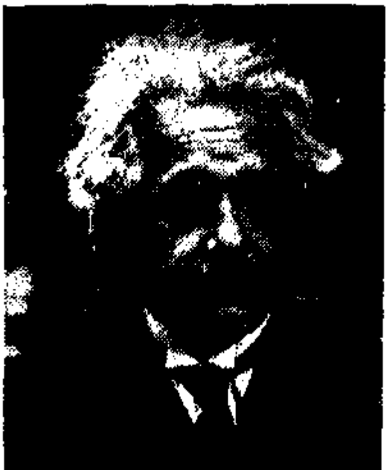
লর্ড-সভায় ইণ্ডিয়া বিল

লর্ড-সভায় ইণ্ডিয়া বিল সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এখানে ভারত সম্বন্ধে অভিজ্ঞ জনকয়েক লোক আছেন। এই সভায় লর্ড জু প্রথমে বক্তৃতা করেন। ইনি কিছু কাল ধরিয়া ভারত-সচিবের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেজন্য তিনি ভারত সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতার দাবী করিতে পারেন। তিনি বলেন, Dominion Status শব্দটা শুনিয়া তাঁহার কাণ ঝালাপালা হইয়া উঠিল। ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের মূলনীতিও অবলম্বিত হইয়াছে। জেনিভায় ভারতের অবস্থা প্রভৃতি দেখিলেই ত তাহা বুঝা যায়। তিনি বলেন, অবস্থার সহিত কার্য্যের গোলযোগ করাতে যত হাঙ্গামা ঘটিয়াছে। তবে এক্সটারের বিশপ বা ধর্ম্মযাজক এই প্রসঙ্গে ডেমোক্রেশীর খুবই নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহার কথায় নূতনত্ব আছে। তিনি বলিয়াছেন যে, ডেমোক্রেশী দারিদ্র্যের মূল এবং সিকাগোতে গুণ্ডামির নিদান। তিনি বলেন, ইহার ফলে ভারতীয় সভ্যতা বিধ্বস্ত হইয়া যাইতে পারে। পাদ্রী মহাশয়ের জানা উচিত যে, এই ভারতে প্রাচীনকালে গণতন্ত্র ছিল এবং তাহার ফলও ভাল হইয়াছিল। তবে প্রাচীন ভারতের গণতন্ত্রের সহিত বর্ত্তমান পাশ্চাত্য খণ্ডের গণতন্ত্রের মূর্ত্তিগত কিছু পার্থক্য আছে। পাশ্চাত্য খণ্ডের গণতন্ত্র এখন স্থানে স্থানে বিকৃত হইয়া ইতরতন্ত্রে (Mobocracy) পরিণত হইতেছে। তাই গণতন্ত্রের উপর তথাকার লোক বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। এই দুনিয়ায় সকল বিষয়ের একটা সীমা আছে। সীমা ছাড়াইয়া গেলেই বিপদ। যাহারা নকলনবীশ, তাহারা সব দিকে বুদ্ধি চালনা করিতে পারে না বলিয়া লঘুচিত্তে সীমা ছাড়াইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিপদকে ডাকিয়া আনে। মার্কিণে তাহাই হইয়াছে। ধর্ম্মযাজক মহাশয় লেনিনের কথা উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, স্বয়ং লেনিনই বলিয়াছেন যে, ডেমোক্রেশী স্থায়ী হইতে পারে না। কারণ, ইহার ঝোঁক দরিদ্র-পীড়নের দিকে। তাঁহার বক্তৃতা সম্পূর্ণ না পাইলে তাঁহার উক্তির সম্পূর্ণ মর্ম্ম আমরা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। কিছু কাল পূর্ব্বে বিখ্যাত মার্কিণী লেখক ওয়াসিংটন আর্ভিং গণতন্ত্র যাহাতে ইতরতন্ত্রে (Mobocracy) অবনমিত না হয়, সে জন্য তিনি তাঁহার দেশবাসীদিগকে বিশেষ সাবধান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দেশবাসীরা আপাতরম্য মতবাদে ভুলিয়া সে সুহৃদ্‌বাক্য শুনে নাই; তাই তাহাদের এই দশা। Mobocracy শব্দটা সম্ভবতঃ আর্ভিংএরই গঠিত। লর্ড ষ্ট্যাবল্‌গি বিশপ এক্সটারের কথার সমর্থন করিয়াছিলেন। কথাগুলি উড়াইয়া দেওয়া উচিত নহে। লর্ড ষ্ট্যাবল্‌গি বলেন, ভারতের সমস্যা রাজনৈতিক নহে,—উহা আর্থিক। তাঁহার এ কথা আমরা সমর্থন করিতে পারিলাম না। ভারতে উভয় সমস্যাই বিদ্যমান। এ কথা অবশ্য সত্য যে, ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা ঢালিয়া সাজা আবশ্যক। কিন্তু তাই বলিয়া উহার রাজনীতিক অবস্থা যে ভাল, ইহা স্বীকার করা যায় না। লর্ড ষ্ট্যাবল্‌গি সম্প্রদায়বিশেষকে বিশেষ অধিকার দানের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং বিলখানির বিশেষ নিন্দা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিন্দা নিরর্থক নহে। লর্ড ফিলামোর ফেডারেশন বা মেলনতন্ত্রের নিন্দা করিয়াছেন; তবে লর্ড ম্যান্সফিল্ড যে কথা বলিয়াছিলেন, সেটা খুব কাযের কথা। তিনি বলিয়াছিলেন যে, অতীতের সহিত সঙ্গতি এবং অতীতের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া যে শাসন-সংস্কারের পরিকল্পনা করা হইয়াছে, ইহা এই বিলখানির বিশেষ দোষ। আজকাল শিক্ষার দোষে কথাটা বুঝিবার মত বুদ্ধি আমাদের দেশের অনেকের নাই। মানুষ তাহার অতীতের সহিত সর্ব্বসম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া চলিতে পারে না। রৌদ্রে দাঁড়াইলে যেমন দেহ ছায়াকে ছাড়িয়া চলিতে পারে না,—তেমনই জীবনপ্রবাহে আবির্ভূত হইলে মানুষ অতীতকে ছাড়িয়া চলিতে পারে না। কারণ, অতীতই স্থানীয় আবেষ্টনের সাহায্যে ও দৈবিক শক্তির প্রভাবে মানুষের প্রকৃতিকে গড়িয়া তুলিয়াছে। তাহা এড়াইবার সাধ্য কাহারও নাই। তবে তাই বলিয়া কালের পরিবর্ত্তনসাধিনী শক্তিকেও উপেক্ষা করা চলে না। কাল কাহাকেও স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেয় না। গ্রহগণ যেমন অনন্ত অম্বরে কেন্দ্রাতিগ এবং কেন্দ্রানুগ শক্তির সঙ্ঘাতে স্বীয় কক্ষপথে চলিতে নিয়ন্ত্রিত হয়, জীবনপ্রবাহও সেইরূপ কালের দুইটি আপাততঃ বিরুদ্ধ শক্তি বলিয়া বিবেচিত শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতে বিকাশ-পথে ধাবিত হয়। উহার কোনটিকেই উপেক্ষা করা চলে না। লর্ড কাল্বিংডন কংগ্রেসকর্ম্মীদিগের ঐকান্তিকতার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। কমন্সসভায় কয়েক দিন ধরিয়া অনেক কথা বলা হইয়াছে। সকল কথার আলোচনা এ স্থানে সম্ভব নহে।

বিজ্ঞান ও মহাশক্তি

আইয়েনষ্টীন বর্ত্তমান সময়ে এই পৃথিবীর এক জন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। তিনি পদার্থ-বিজ্ঞান লইয়াই বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া থাকেন। সম্প্রতি তিনি তাঁহার বন্ধু মিষ্টার জেরী ভি রকের সহিত আলোচনা-প্রসঙ্গে যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, দেখা যাইতেছে যে, ভারতের বৈদান্তিক মতের সহিত তাঁহার সেই বৈজ্ঞানিক মতের হুবহু মিল রহিয়াছে। পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান ক্রমশঃ ভারতীয় আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের নিকট নুতি স্বীকার করিতেছে। কিছু দিন পূর্ব্বে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ষ্টিয়মিজ বলিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে আধ্যাত্মিক আবিষ্কারই জগতের শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কার হইবে। সে কথা তুলিয়া মিষ্টার রক বলেন যে, সে কথা দেখিতেছি সত্য হইতে চলিল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আমাদের এ পর্য্যন্ত যে মত ছিল, তাহা একে একে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। আইয়েনষ্টীন সে কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে মহাশক্তিরই লীলা, এই মত নূতন নহে। এই মত সনাতন। সর্ব্বযুগে এবং সর্ব্বকালে বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা বলিয়া গিয়াছেন যে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সৃষ্টির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে উহার অন্তরালে যে আদ্যাশক্তির (First cause) পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা অনির্ব্বচনীয় বটে, কিন্তু তাহা হইলেও তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ করিতে পারেন না। তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়। সকলেই সকল যুগে ইহার জয়গান করিয়া

আসিতেছেন। এ মহাশক্তির নিয়ম অলঙ্ঘ্য। কেহ ইহা লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নহেন। ইনিই অবাঙ্মনসগোচর মহাশক্তি,—ইনিই বিশ্বপ্রকৃতি। ইহাকে বিধাতা বলিয়া মানিয়া লইতেই হইবে। ইনি অনন্তসত্তা। সৃষ্টিতত্ত্বে ইহার কার্য্য পরিস্ফুট।" আইয়েনষ্টীনের এই কথায় ব্রাহ্মণগণ কেন বৈদিক যুগ হইতে এ পর্য্যন্ত সন্ধ্যাবন্দনায় সৃষ্টিতত্ত্বের কথা স্মরণ করেন, তাহা বেশ বুঝা যায়। মাইকেল ফ্যারাডে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই কথা বিশ্বের বৈজ্ঞানিক সমাজে বলিয়া গিয়াছেন যে, এই বিশ্বের যত শক্তি, সমস্তই এক; এই অখণ্ড বিশ্ব মহাশক্তিরই বহিঃপ্রকাশ। নিউটন তাঁহার "অপটিক্‌স্" নামক গ্রন্থে ভগবানের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—তিনি সর্ব্বব্যাপিনী বিদেহ এক চিৎশক্তি। ডক্টর ডবলিউ আর হুইটলে একবার বলিয়াছিলেন যে, ভগবৎলীলার (will) অপর নাম হইল ভগবানের বিধি। উহা আমরা আবিষ্কার



আইয়েনষ্টীন

করিতে পারিলেও বুঝিতে পারি না বা বুঝাইতে পারি না। উহা অনির্ব্বচনীয়। লীলাই উহার চরম কথা। আইয়েনষ্টীনের উক্তিতে বুঝা যাইতেছে যে, তিনি এই বিশ্বের অন্তরালে যে মহাশক্তি ক্রীড়া করিতেছে, তাহাকেই ভগবান্ বলিতেছেন। সেই শক্তির বিধিনিয়মে এই বিশ্ব চালিত হইতেছে,—সেই জন্য তিনিই ভগবান,—তিনিই ঈশ্বর। বিখ্যাত জড়বিজ্ঞানবিৎ আইয়েনষ্টীনের মতে এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমস্ত শক্তিময়, সর্ব্বত্রই শক্তির খেলা চলিতেছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চারিদিকে যে ব্যাপ্তি, তাহাই "ব্যোম" নামে অভিহিত। ব্যোম বলিতে আমরা বুঝি বিভিন্ন গ্রহের মধ্যবর্ত্তী স্থান। মনে হয়, এই স্থানে প্রোটোন, ইলেকট্রোন, এবং অযুক্ত অণুপরমাণু-সমূহ অতি দ্রুতগতিতে ছুটাছুটি করিতেছে। সাধারণতঃ শূন্যমণ্ডল বলিতে আমরা বায়ুমণ্ডলের কথাই ভাবি। কিন্তু এই মণ্ডল বা স্থান প্রকৃতপক্ষে শূন্য নহে,—ইহা পৃথিবীরই অংশ। জ্যোতিষশাস্ত্র এবং পদার্থবিজ্ঞান ব্যোমকে শূন্য বলিয়া বুঝে না। এই ব্যোম শক্তিময়। সর্ব্বত্রই শক্তির লীলা চলিতেছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞান আমাদিগকে অজ্ঞাত এবং অপরিচিত সিন্ধুসৈকতে লইয়া যাইতেছে। আমাদিগকে ক্রমশঃ উচ্চতর শক্তির কথা মানিয়া লইতে হইতেছে। শক্তি সকল জিনিষকে পূর্ণত্বের দিকে লইয়া যাইতেছে। ইত্যাদি।

ইহা উপনিষদের কথা নহে কি? বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ীর প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশ (২।৪।১১) এবং গার্গীর সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের বিচারে যে সকল কথা হইয়াছিল, এই উক্তি যেন অনেকটা তাহারই প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হয়। সুতরাং য়ুরোপের আর এক জন প্রসিদ্ধ জড়বিজ্ঞানবিৎ এখন ক্রমে হিন্দুর সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইলেন। বিজ্ঞান উপনিষদের ব্রহ্মবাদের কথাই সমর্থন করিতে চলিয়াছেন। ভারতের এই সিদ্ধান্ত কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বকার, তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

মিলনের চেষ্টা

বাঙ্গালা কংগ্রেসের ভিতর দুইটি বড় বড় দল আছে। আবার সেই বড় দলের মধ্যে যে উপদলও একেবারে নাই,—এমন কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু যাঁহারা দলাদলি পাকাইবার গুরুমহাশয়, তাঁহারা দলাদলির দোষ যত কীর্ত্তন করেন, এমন আর কেহই করেন না। এরূপ সাফাই গাহিয়া যদি জনসাধারণের প্রশংসাটা 'ফাউ' হিসাবে পাওয়া যায়, তাহা হইলে মন্দ কি হয়? আর দুইটা কথা বলিয়া যেটা 'ফাউ' হিসাবে পাওয়া যাইতে পারে, সেটা ত্যাগ করা ত মহামূর্খের লক্ষণ। সুতরাং বাঙ্গালায় ঐ প্রকার মিলনের কথার অপ্রতুল নাই। সম্প্রতি বাঙ্গালা প্রদেশের কংগ্রেস কমিটীর সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন মৈত্র য়ুনাইটেড প্রেসের মারফতে একখানি বিজ্ঞপ্তি-পত্র প্রচার করিয়া বাঙ্গালার দুইটি ভাঙ্গা কংগ্রেসী দলকে সম্মিলিত হইবার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। সুভাষ বাবু এখন বিদেশে, কাযেই সুরেন্দ্র বাবুকেই ঐ মিলনের জন্য চেষ্টা করিতে হয়। তাঁহার সেই অবশ্য কর্ত্তব্যবুদ্ধির উন্মেষ জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। শান্তিসংস্থাপকদিগের উপর ভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং মৈত্র মহাশয়ের চেষ্টা যদি ঐকান্তিক হয়, তাহা হইলে তিনি যে ভগবানের আশিস লাভ করিবেন, ইহা সত্য। কিন্তু ভাবের ঘরে চুরি করিলে কিছুই লাভ হইবে না, বরং ফল বিপরীত হইবে। আমরা দেখিতে পাই যে, ভারতবাসীর মধ্যে—বিশেষতঃ বাঙ্গালী জাতির মধ্যে দল পাকাইবার প্রয়াসটা বড়ই অধিক। ইহা যদি দেশের ইতর লোকের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে কথা ছিল না। কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তি-দিগের মধ্যে যদি এ ভাব প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সত্য সত্যই দেশের ভবিষ্যৎসম্বন্ধে নিরাশ হইতে হয়। অবশ্য যদি মূলনীতি লইয়া মতভেদ হয়, তাহা হইলে তাহা বিশেষ দোষের হয় না। কিন্তু যদি উহা সামান্য খুঁটিনাটি লইয়া, অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থ লইয়া দেখা দেয়, তাহা হইলে তাহা দেখিয়া দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাবৃত বলিয়া ধারণা জন্মে। যদি কেহ প্রকৃত দোষীকে ধরাইয়া দিতে যায়, তাহা হইলে তাহাকেই বিপদে পড়িতে হয়। সত্য কথা বলিলে আহাম্মুকই বাজার হইয়া উঠে। নতুবা এত চেষ্টা করিয়াই বা মিলন হইতেছে না কেন? সুভাষ বাবুর ন্যায় লোক মিলনের জন্য এত চেষ্টা করিলেন,—সেনগুপ্তও ঐ বিষয়ে

চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, তবে এই দলাদলি কংগ্রেসের বক্ষে নিয়ত প্রজ্বলিত রাবণের চিতার ন্যায় জ্বলিতেছে কেন? কতকগুলি লোকের ইচ্ছা যে, তাঁহারাই নৈবেদ্যের শীর্ষশোভী চূড়াতোলা মোণ্ডার মত দলের উপর কর্ত্তা সাজিয়া বসিয়া থাকিবেন এবং সেই সুবিধা গ্রহণ করিয়া চতুর্ব্বর্গের মাঝখানের দুইটি বর্গ লাভ করিবেন। কাযেই তাঁহারাই মিলনের প্রতি বড় অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইতেছেন। এই অবস্থার যদি পরিবর্ত্তন না ঘটে, তাহা হইলে কস্মিন্‌কালেও মিলন ঘটিবে না; ভগবানের আশীর্ব্বাদও এই অধঃপতিত জাতির উপর বর্ষিত হইবে না; ইহা ধ্রুব সত্য।

—

ভারতের নূতন বড়লাট

ভারতের নূতন বড়লাট কে হইবেন, তাহা লইয়া নানা দিকে নানা জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। লর্ড উইলিংডনের কার্য্যকাল শীঘ্রই ফুরাইবে। সুতরাং তাঁহার স্থানে কে ভারতশাসকের গদী পাইবেন, তাহা জানিবার জন্য অনেকে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে যে, পার্লামেন্টের বর্ত্তমান অধিবেশন শেষ না হইলে কাহারও সম্বন্ধে পাকাপাকি কথা হইবে না। বর্ত্তমান টোরী সরকার খুব এক জন জবরদস্ত টোরীকেই ভারতের প্রধান শাসকের পদে নিযুক্ত করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখন এই পদ দুই জনকে দিবার গুজব উঠিয়াছে;—প্রথম লর্ড লিংলিথগো, দ্বিতীয় লর্ড লণ্ডনডেরী। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে কেহ যে নিশ্চিতই ভারতের বড় লাটের গদী পাইবেন, তাহা এখনও বলা যায় না। আচম্বিতে অন্য লোকও মনোনীত হইতে পারেন। কেহ কেহ মনে করিতেছেন যে, আগামী অক্টোবর মাসে বিলাতে পার্লামেন্টের সদস্য-নির্ব্বাচন পর্ব্ব আরম্ভ হইবে। তাহার পূর্ব্বে লোক ঠিক করিতেই হইবে। কারণ, টোরী বা রক্ষণশীলদিগের ইচ্ছা এই যে, অতঃপর ভারতের শাসন-সংস্কারবিধি অনুসারে ভারতবাসীদিগকে কায করাইতে পারেন, এমন এক জন লোক ঐ পদের জন্য চাই। আসল কথা, ভারতের ভাগ্য এখন রক্ষণশীলদিগের হস্তে ন্যস্ত। রক্ষণশীলরা যাহা করিয়া যাইবেন, শাসননীতির ধারাবাহিকতার দোহাই দিয়া শ্রমিক দলও সেই কর্ম্মব্যবস্থারই অনুসরণ করিবেন। সুতরাং এখন বাজে গুজব লইয়া মন্তব্য প্রকাশে লাভ নাই। তবে মোটের উপর এ কথা সত্য যে, রক্ষণশীলই হউন আর শ্রমিকই হউন, যে দলই আগামী নির্ব্বাচনে বিলাতে জয়লাভ করুনই না কেন,—তাহার ফলে ভারতীয় শাসননীতির বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। ভারতবাসী লর্ড মর্লির ন্যায় উদারমনা উদারনীতিককে ভারত-সচিবের পদে বসিতে দেখিয়াছেন, আবার সার জায়ুয়েল হোরকেও ঐ পদে বসিতে দেখিলেন, কিন্তু পার্থক্য কিছু বুঝিলেন কি? লর্ড মর্লি যখন ভারত-সচিব, তখনই এই ভারতে যোগাড়যন্ত্র করিয়া সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-ব্যবস্থা চাপাইয়া দেওয়া হয়। লর্ড মর্লি বড় জোর তদানীন্তন বড়লাট লর্ড মিণ্টোকে বলিয়াছিলেন,—"আপনি এ করিলেন কি? এতে যে সাম্প্রদায়িক বিবাদ বেধে যাবে।" ঐ পর্য্যন্ত। ভারতে সেই সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন চলিয়াছে,—কাল সহকারে সেই সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের সহজ ফল,—সাম্প্রদায়িক বিবাদ ভারতের রাজনীতিক আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে বাধা ঘটে নাই। বরং পরচিত্তৈষণার দোহাই দিয়া সমাজ-তন্ত্রবাদী ম্যাকডোনাল্ড সেই সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-ব্যবস্থা হিন্দু-সমাজের ভিতর ঢুকাইয়া দিলেন আর বিশ্বপ্রেম-প্রকটন দ্বারা একতা-সংস্থাপনপ্রয়াসী মহাত্মা গান্ধী ডাক্তার আম্বেদকরকে তুষ্ট করিবার জন্যই নিজ জীবনকে বিপন্ন করিয়া বাঙ্গালার এবং পঞ্চনদের সর্ব্বনাশসাধনের ব্যবস্থা করিলেন। সুতরাং এবার কে বড়লাট হইবেন, কে কোন্ প্রদেশের লাট হইবেন, তাহা ভাবিয়া মাথা-ব্যথা করিয়া লাভ কি? মোটের উপর জানিয়া রাখা আবশ্যক, যিনি যে বনেই থাকুন না কেন, সকল শিয়ালের একই রব। অতএব "রহু ধৈর্য্যম্।"



লর্ড উইলিংডন



লর্ড লিংলিথগো

—

ভূমিকম্পে শিক্ষা

ইদানীং ভূমিকম্পের কথা প্রায়ই শুনা যাইতেছে। বিহার এবং কোয়েটায় ভূমিকম্প আমাদের দেশে হইয়াছে বটে,—কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে জাপানে, কিউবায়, উত্তর-পারস্যে, ফর্ম্মোজায় এবং আরও বহু স্থানে প্রবল ভূমিকম্প, উৎকট জলপ্লাবন প্রভৃতি দৈব-দুর্য্যোগে একসঙ্গে জীবনের সকল লীলাখেলা শেষ করিল, তাহা দেখিলে ত কথাই নাই, ভাবিলেও হৃদয়ে নানা বিষাদময়ী চিন্তা উপস্থিত হইবে। অনেক ইংরাজও এই দৈবযোগে মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতেছেন। তবে এ কথা সত্য,—এই ধরণীর বক্ষে আচম্বিতে কে কখন্ মরে, কাহার আশা আচম্বিতে সমাধি-প্রাপ্ত হয়,

তাহার ঠিক নাই। আর্য্যাবর্ত্তে এবং আসামে ভূমিকম্প হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। বালক হউন, যুবক হউন, বৃদ্ধ হউন, সকলেই সমভাবে মরণের অধীন। এক কথায় জীবন এবং মরণের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্প। অতএব মানবীয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শক্তিতে অতিমাত্র বিশ্বাসী হইয়া ভগবানকে ভুলিবেন না,—মৃত্যুর কথা এবং মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থার চিন্তা মন হইতে মুছিয়া ফেলিবেন না। এই ব্যাপারে আর একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার এই আছে যে, কত লোক জীবনরক্ষা করিতে যাইয়াও অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে মরিয়াছে, কত লোক সে চেষ্টা করিবার অবসর না পাইলেও বাঁচিয়া গিয়াছে। কত লোক এবং কত জীব ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বহুদিন প্রোথিত থাকিয়াও বাঁচিয়া গিয়াছে,—ইহাতে বুঝা যায় যে, মানুষের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণে নিয়তির প্রভাব নিতান্ত অল্প নহে। মানুষ ধর্ম্মহীন হইয়া পড়িতেছে বলিয়া ইহা বিধাতার কশাঘাত কি না, কে বলিতে পারে? সম্প্রতি দার্জ্জিলিঙের ঐ দিকে আবার ভূমিকম্প হইয়াছে।

বাঁটোয়ারা ব্যবস্থা অনড়

ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় বুঝিয়াছেন, অথবা তাঁহাদিগকে কেহ বুঝাইয়া দিয়াছে যে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ব্যবস্থা তাঁহাদের আত্মরক্ষার ও প্রতিষ্ঠালাভের অমোঘ কবচ, সেই জন্য উহাতে সামান্যমাত্র আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা জন্মিলে তাঁহারা ঘোর বিচলিত হইয়া উঠেন। ইণ্ডিয়া বিলের ২৯৯ ধারার বিষয় লইয়া সেই জন্য সাম্প্রদায়িক ভাবের ভাবুক মুসলমানগণ অত্যন্ত আতঙ্কিত হইয়া উঠেন। নয়া দিল্লীতে মুসলিম লীগ কাউন্সিলের এক অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে এই সম্পর্কে যে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছিল, তাহাতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার পর নিখিল ভারতীয় মুসলিম কনফারেন্সের সভাপতি মৌলভী সফি দাউদী এবং সহকারী সভাপতি আবদুল্লা হারুণ যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা ঐ ধারা পরিবর্ত্তন করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে আসমুদ্র হিমাচল ভারতে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিতে মুসলমান সমাজকে অনুরোধ করেন। গত ৫ই জুলাই শুক্রবার জুম্মার নমাজের পর অপরাহ্নে ঐ প্রতিবাদ-সভাধিবেশনের সময় ধার্য্য হয়। ঐ ধারাটিতে বলা হইয়াছে যে, শাসন-সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর কেন্দ্রী অথবা প্রাদেশিক আইন সভার অধিকাংশ সদস্যের ভোটে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে অথবা ব্যবস্থাপক সভাগুলির সহিত পরামর্শের পর সপরিষদ বড়লাট যদি সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন বর্জ্জন করিবার হুকুম দেন, তাহা হইলে সেই হুকুম অনুসারে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচননীতি নাকচ হইতে পারিবে। উনজন সম্প্রদায়ের মত না লইয়া আইন-সভায় তাঁহাদের সদস্যের আসনের অনুপাতের অথবা সাম্প্রদায়িক নীতির কোনরূপ পরিবর্ত্তন করা হইবে না,—এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। এই ধারা সেই ব্যবস্থা বদলাইয়া দিতেছে। এই মনে করিয়াই মুসলমান সমাজ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন। শুনিতেছি, তাঁহারা প্রথমে ব্যাপারটা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। বিলাত হইতে এক ব্যক্তি উহার প্রতি মুসলমান সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কাজেই এই ব্যাপার লইয়া একটা হৈ-চৈ উপস্থিত করিবার সম্ভাবনা জন্মিয়াছে। এখন ভারত সরকার গত ২রা জুলাই সোমবার এক ইস্তাহার জারী করিয়া বিক্ষুব্ধ মুসলমান সমাজকে বিশেষ আশ্বাস দিয়াছেন। তাহাতে তাঁহারা বলিয়াছেন,—ভয় নাই। দশ বৎসরের মধ্যে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের কোন অদল-বদল করা হইবে না। উহা করিতে হইলে পার্লামেণ্টের কমন্স সভা এবং লর্ড-সভা এই উভয় সভারই সম্মতি লইতে হইবে। শত মণ তেলও পুড়িবে না, রাধাও নাচিবে না। অতএব মুসলমান সমাজ আশ্বস্ত হউন। এই ইস্তাহারে তাঁহারা কতদূর আশ্বস্ত হইবেন, তাহা বুঝা যাইতেছে না। ব্যাপার কতদূর গড়ায়, তাহাই এখন দেখিবার বিষয়। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, এই সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনব্যবস্থা সরকার সাধ্যপক্ষে পরিবর্ত্তন করিবেন না। সুতরাং ভারতীয় মুসলমান সমাজের অত উতলা হইবার কারণ কিছুই নাই।

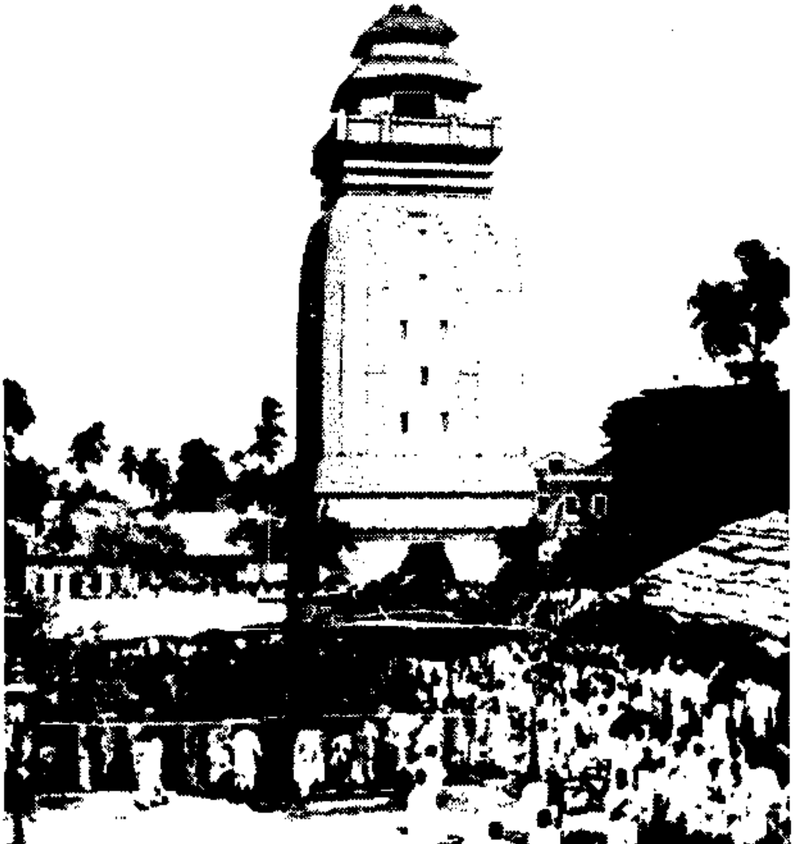
দেশবন্ধু স্মৃতি-মন্দির

গত ১লা আষাঢ় কলিকাতা কালীঘাট কেওড়াতলায় গঙ্গাতীরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের স্মৃতি-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য্য হইয়া গিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী এই উপলক্ষে যে বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের এই উপলক্ষে স্মরণ রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি বলিয়াছেন,"দেশবন্ধুর জীবনে আমরা যে সকল গুণের পরিচয় পাইয়াছি, সেই সকল গুণ যদি আমরা আমাদের জীবনে বরণ করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের দ্বারা তাঁহার প্রকৃত স্মৃতিসৌধ নির্ম্মিত হইল।" শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু ভিয়েনা হইতে তারযোগে যে বার্ত্তা পাঠাইয়াছিলেন, তাহার সার কথা এই যে, "স্মৃতিসৌধ-প্রতিষ্ঠার দ্বারা দেশবন্ধু যেন আমাদের হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হন।" কথাগুলি শুনিবার, ভাবিবার এবং বুঝিবার উপযুক্ত। আজ কেওড়াতলায় জাহ্নবী-পুলিনে দেশবন্ধুর যে স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক ইষ্টক এবং প্রত্যেক বালুকাকণা তাঁহার প্রতি দেশবাসীর ঐকান্তিক শ্রদ্ধা বিজ্ঞাপিত করিতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, দেশবাসীর প্রদত্ত অর্থেই এই সুমহৎ স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই স্মৃতিমন্দির যে সেই মহানুভব মানবের প্রতি তাঁহার দরিদ্র দেশবাসীর শ্রদ্ধাপ্রীতির মূর্ত্তিমান নিদর্শন, তাহা অস্বীকার করা যায়



দেশবন্ধু

না। এই স্মৃতিমন্দির যতই দৃঢ়ভাবে এবং সুন্দর পরিকল্পনার সহিত রচিত হউক, ইহা কখনই কালজয়ী হইতে পারিবে না। কিন্তু দেশবন্ধু দেশমাতৃকার পূজারীরূপে যে পুণ্য আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, যে ঐকান্তিকতা, সাহসিকতা,—আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত



দেশবন্ধু স্মৃতি-মন্দির

তাঁহার কর্ম্মজীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন, এবং কার্য্যক্ষেত্রে যে সকল অতুল গুণ প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার কথা যদি বাঙ্গালার জনসাধারণ নির্জ্জনে নিরন্তর চিন্তা করিয়া সেই সমস্ত গুণ আপনাতে বিকশিত করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে বঙ্গবাসীর এই সমুন্নত স্মৃতি-মন্দিররচনাকার্য্য সম্পূর্ণ সার্থক হইবে। ইহাতে আর কোন ত্রুটি থাকিবে না। এই কর্ম্মভূমিতে আসিয়া দেশবন্ধু অনেক কায করিয়া গিয়াছেন। তিনি ছিলেন একাধারে ব্যারিষ্টার, কবি, সাহিত্যিক, প্রেমিক, দাতা এবং পরদুঃখকাতর, কিন্তু সর্ব্বোপরি তিনি ছিলেন বঙ্গজননীর একনিষ্ঠ ভক্ত সাধক। দেশসেবা কি করিয়া করিতে হয়, তাহার পথনির্দ্দেশ করিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন। এখন বাঙ্গালী যদি সেই পথ ধরিয়া চলিতে পারে, আত্মজীবনে সেই সকল অমূল্য গুণের মধ্যে—অন্ততঃ কতকগুলি গুণও বিকশিত করিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, দেশ-জননীর কুন্তলশিখিনীর এই নিবিড় তিমিরজাল অপসৃত হইবার আর বিলম্ব নাই। এই স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ করিতে ৪৫ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। তিনি ৫৫ বৎসর এই ধরাধামে ছিলেন বলিয়া ইহার মধ্যের চূড়াটি ৫৫ হাত উচ্চ করা হইয়াছে। মন্দিরের বহির্ভাগ সমস্তই পাথরের। উপরে একটি কৃষক-কুটীরের চিত্র দেওয়া হইয়াছে। দেশবন্ধু পল্লীগ্রামের উন্নতিসাধন করিতে একান্ত ইচ্ছুক ছিলেন, সেই জন্ম এই চিত্র তথায় সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। আজ দশ বৎসর হইল, তিনি ইহধামের কার্য্য শেষ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তিরোধানে বাঙ্গালার যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা এখন সকলেই মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছেন। তিনি খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালার আকাশ-বাতাস তাঁহার হৃদয়ে পুলকের সঞ্চার করিয়া দিত। বাঙ্গালী-চরিত্র যে স্বদেশপ্রেমে কতটা উন্নত হইতে পারে, তাহা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। সেই জন্ম তিনি আমাদের চিরশ্রদ্ধাস্পদ।

নারী-বিদ্রোহ

পাশ্চাত্যখণ্ডের কতকগুলি প্রগতি-শীল অথবা উচ্ছৃঙ্খল নারীর দেখাদেখি এ দেশের এক শ্রেণীর তথাকথিত শিক্ষিত মহিলা যে স্বেচ্ছাচারিতার পথে ধাবিতা হইবার জন্ম লালায়িত হইয়াছেন,—তাহা তাঁহাদের কথাবার্ত্তা এবং ধরণ-ধারণ হইতেই বেশ বুঝা যায়। স্বাধীনতার নামে এখন উচ্ছৃঙ্খলতা যে কত প্রকারে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না। অধীনতার লেশ-মাত্রশূন্য কোন বস্তুই জগতে নাই। গগন-চারী চূর্ণ মেঘমালাও স্বাধীন নহে, তাহারাও বায়ুর গতি অনুসারে চালিত হয়, তাহারাও মাধ্যাকর্ষণশক্তি, আলোক এবং উত্তাপের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া

একটুও চলিতে পারে না। কিন্তু এই শ্রেণীর প্রগতিশীলা নারীরা স্নেহ, মমতা, ভালবাসা কিছুরই বশীভূত হইবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বসিয়াছেন। ভাল জিনিষ কলুষিত হইলে তাহা অতি মন্দ হইয়া পড়ে। ঘৃত বিকৃত হইলে যত খারাপ হয়, ঘোল বিকৃত হইলে তত খারাপ হয় না। নারী-হৃদয় পুরুষের হৃদয় অপেক্ষা অনেক মহৎ, অনেক উচ্চ। কিন্তু সেই নারী-হৃদয় যদি কুশিক্ষাপ্রভাবে কলুষিত হয়, তাহা হইলে নারী যেমন সহজে ভীষণা পূতনা রাক্ষসীতে পরিণত হয়, পুরুষ বিকৃতশিক্ষার প্রভাবে কখনই তত ভীষণ নর-রাক্ষসে পরিণত হয় না। আজকাল নারীরা পুরুষের সহিত সমান অধিকার চাহিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, অন্ত বিষয়ে তাঁহারা ত নরের সহিত সমান অধিকার চাহেনই,—যৌন ব্যাপারেও তাঁহারা পুরুষের সহিত সমান অধিকার চাহিতেছেন। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, সে অধিকার তাঁহাদিগকে কোন পুরুষের দিবার ক্ষমতা নাই,—প্রকৃতি সে ভার স্বহস্তে রাখিয়াছেন। এক জন বহু-বিবাহকারী পুরুষ এক বৎসরে তাঁহার চারি পত্নীর গর্ভে চারিটি সন্তান উৎপাদন করিতে পারেন, কিন্তু একটি বহু-বিবাহকারিণী নারী যতগুলি পতিই গ্রহণ করুন না কেন, তিনি বৎসরে একটির বা বড় জোর দুইটি সন্তানের জননী হইতে পারেন, আর পারেন না। নর শত সন্তানের জনক হইলেও তাহার কিছুই হয় না,—নারী কুড়িটি সন্তান প্রসব করিলে আর দেহের বল রক্ষা করিতে পারেন না। পুরুষের প্রজনন-শক্তি নারীর প্রজনন-শক্তি অপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। এরূপ অবস্থায় যৌন ব্যাপারে নারী পুরুষের সহিত তুল্যাধিকার লাভ করেন কি প্রকারে? আমরা এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতাম না, প্রগতিশীলাদের কথা বাচালতা বলিয়াই উড়াইয়া দিতাম, কিন্তু দেখিতেছি যে, ব্যাপার ক্রমশঃ বড় বেশী দূর গড়াইতেছে। সে দিন কলিকাতা সমবায় ম্যান্সনে মিলনী ক্লাবে এই বিষয়টি আলোচনার জন্য একটি সভা হইয়াছিল। অনেক ডিগ্রীধারিণী নারী সেই সভার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। এক জন এম এ উপাধিধারিণী মহিলা বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা সন্তানের জননী হইতে বিশেষ আপত্তি করেন না বটে, কিন্তু পতির গৃহিণী হইতে কিছুতেই সম্মতা নহেন! পরের হাত-তোলায় থাকিয়া মন যোগান,—সে আর এ কালে নহি—নহি—নহি!

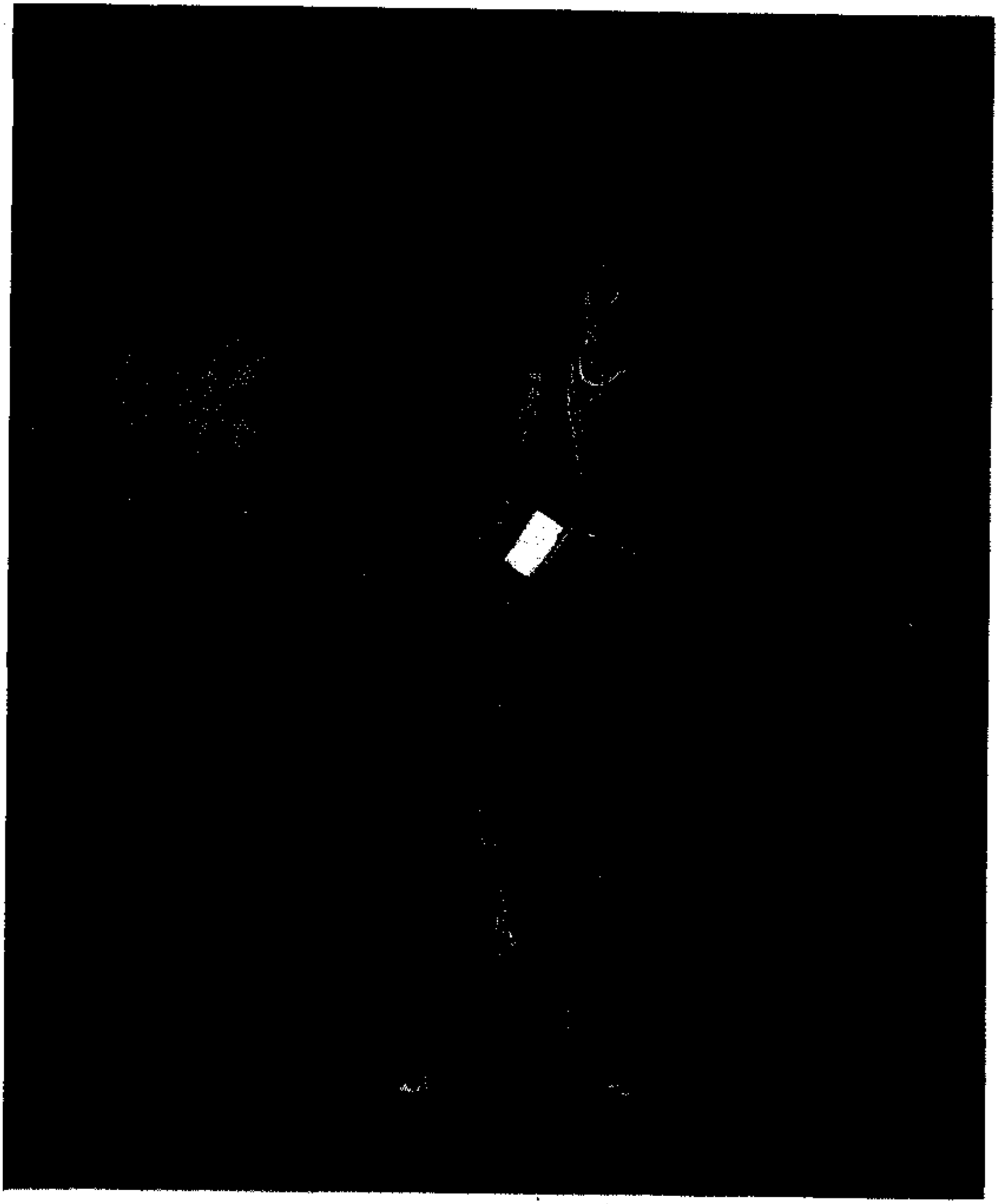
কিন্তু আমরা এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, প্রগতিশীলা বিস্তার অহঙ্কারে আত্মহারা নারীরা যাহাই বলুন না কেন, বিশ্বপ্রকৃতি প্রকৃতি যে নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহা লঙ্ঘন করিয়া সমগ্র নারী-সমাজ যে উচ্ছৃঙ্খলতার পথে উধাও হইয়া ছুটিবেন, এরূপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। নারী-হৃদয় ভাব-প্রবণ। সেই ভাবাধিক্য নিসর্গজ। সেই জন্য দেখিতে পাই, যাহারা সমাজের গণ্ডী কাটিয়া গিয়াছে, তাহারাও শেষকালে একনিষ্ঠ পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম অবলম্বন না করিতে পারুক, এক জন পুরুষের সেবায় রত হইয়াছে। ঐ সভায় শ্রীযুত অনাথগোপাল সেন স্ত্রীলোকদিগকে বিবাহ করিতে সম্মত করিবার জন্য যে এত সাধাসাধি করিয়াছিলেন, তাহা নিরর্থক হইয়াছিল। সভাপতি শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন যে, "যাঁহারা ঘরকন্না করিতে পারেন নাই, তাঁহারাই নারীর অধিকার এবং স্বাধীনতাপ্রাপ্তির জন্য কোলাহল করিতেছেন।" যাঁহাদের সামর্থ্য আছে, তাঁহারা তাঁহাদের স্বভাবদত্ত স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসার প্রভাবে নিজ সংসারে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া থাকেন। তাঁহার সংসারে তিনিই সাম্রাজ্ঞী। তাঁহাকে কাহারও হাততোলায় থাকিতে হয় না,—মন যোগাইতেও হয় না। ভগবদ্দত্ত অস্ত্রের দ্বারা দেবীর সিংহাসন দখল করিয়া তিনি পরিবারস্থ সকলকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন। সেই শ্লাঘ্য সিংহাসন ছাড়িয়া যাঁহাদের স্বাধীনতার ডঙ্কা বাজাইবার বাসনা,—তাঁহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করাই বিড়ম্বনা।

ঝরিয়া খনিতে দুর্ঘটনা

বেহার ঝরিয়া'র বাগদীঘি কয়লার খনিতে অকস্মাৎ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হওয়াতে কতকগুলি লোক হতাহত হইয়াছে। প্রকাশ—ঐ খনির এক দিকে পাঁচ বৎসর ধরিয়া আগুন জ্বলিতেছিল। সেই আগুন হইতে খনিটিকে রক্ষা করিবার জন্য একটি প্রাচীর গাঁথা হইয়াছিল। সেই প্রাচীরটি ধ্বসিয়া পড়াতে এই বিপত্তি ঘটিয়াছে। রাত্রি সাড়ে আটটার সময় এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে, তখন প্রায় দেড় শত লোক ঐ খনিতে কায করিতেছিল। তাহাদের পরিদর্শক মজুর একটা কিছু গোল হইয়াছে অনুমান করিয়া মজুরদিগকে চলিয়া যাইতে বলে। পরে সে সেই খনির সহকারী ম্যানেজার হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়কে সে কথা বলে। তখনও খনির ভিতর দুই জন মজুর জল তুলিবার কলে কায করিতেছিল, তাহাদের সঙ্গে দুই জন খালাসীও ছিল। খনির সহকারী ম্যানেজার হরিসাধন বাবু এবং সেই শ্রমিক সর্দ্দার, ব্যাপার কি হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য খনিতে গিয়াছিলেন। সেই সময় খনির ভিতর অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল এবং হরিসাধন বাবুর দেহ খনির মুখগহ্বর হইতে তিন শত ফুট বাহিরে ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল। অধিকাংশ শ্রমিক বাহিরে আসিতে সমর্থ হইয়াছিল। যে সকল শ্রমিক খনির বাহিরে আসিয়া জটলা করিতেছিল,—খনি হইতে অগ্নি বাহির হইয়া আসায় তাহারা দগ্ধ হইয়া যায়। তাহাদের মধ্যে ১৮ জন মরিয়া যায় এবং ৯ জন দগ্ধ হয়। এখন ঐ অঞ্চলে রেলগাড়ী ও পথঘাট বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই খনিটি মেসার্স এণ্ডারসন রাইট এণ্ড কোম্পানীর। অনেক দিন হইতে এই খনিতে আগুন ছিল শুনা যাইতেছে, যদি তাহা হয়, তাহা হইলে এত দিন সাবধান হওয়া হইল না কেন? খনির ভিতর এখনও আগুন আছে। এখনও কোন বিপদের আশঙ্কা আছে কি না বলা যায় না।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

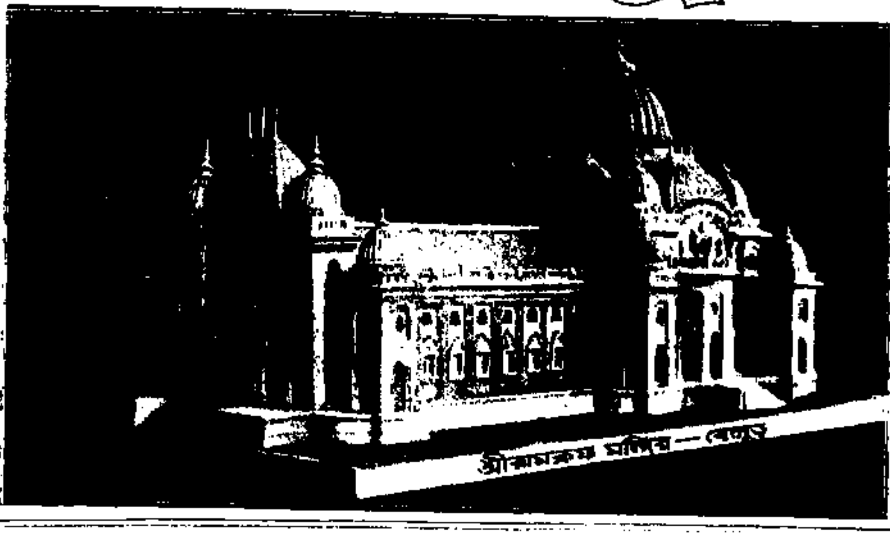
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বসুমতী রোটারী মেসিনে শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



হাসিয়েছিল কোন্ কথাতে
হাসছি মনে ক'রে।—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বসুমতী-চিত্র-বিভাগ] [শিল্পী—মিষ্টার টমাস

সচিত্র মাসিক বসুমতী



১৪শ বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩৪২ [৪র্থ সংখ্যা

ব্রহ্মসূত্র

১৪

২য় অধ্যায়, ১ম পাদ

স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ ন, অন্যস্মৃত্য-
নবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ২।১।১

স্মৃতির অনবকাশ হয় (সার্থকতা থাকে না), ইতি চেৎ (কেহ যদি এই আপত্তি করেন,—তাহার উত্তর এই), ন (তোমার যুক্তি ঠিক নহে), অন্য স্মৃতির অনবকাশদোষ উপস্থিত হয় (যদি তোমার মত গ্রহণ করা যায়)।

(শঙ্কর) ঋষিপ্রণীত গ্রন্থের নাম স্মৃতি বা তন্ত্র। মহর্ষি কপিলের সাংখ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষ এক নহে, বহু (জীবগণ বিভিন্ন পুরুষ), এবং জগৎ স্বতন্ত্র প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। "ঈশ্বর হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রহ্মই একমাত্র পুরুষ" যদি এই মত গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে কপিলের সাংখ্যদর্শন ভ্রান্ত অতএব নিরর্থক হয়। সুতরাং ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে এবং ঈশ্বর সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান, এই মত গ্রহণ করা ঠিক হইবে না। কেহ যদি এ কথা বলেন, তাহার উত্তর এই যে, পুরাণ, মনুসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং ঈশ্বর সর্ব্বভূতে বিদ্যমান আছেন, সুতরাং কপিল-প্রণীত স্মৃতির মত গ্রহণ করিলে মনু ও বেদব্যাস-প্রণীত স্মৃতি অগ্রাহ্য করিতে হয়। স্মৃতিসকল যখন কোনও কোনও বিষয়ে পরস্পর বিরোধী, তখন কোনও কোনও স্মৃতির কিয়দংশ অগ্রাহ্য করা ব্যতীত উপায় নাই। এ অবস্থায় যে স্মৃতি বেদের অনুসারিণী, সেই স্মৃতিই গ্রহণ করা উচিত, যাহা বেদবিরোধী, তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। জৈমিনি তাঁহার পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনেও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন,—শ্রুতির সহিত বিরোধ হইলে স্মৃতি পরিত্যাগ করিতে হইবে, বিরোধ না হইলে তাহা প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, বেদ অভ্রান্ত এবং অতীন্দ্রিয় ও অলৌকিক বিষয়ে বেদই একমাত্র প্রমাণ।

রামানুজও এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মধ্ব বলিয়াছেন, মহাদেব-প্রণীত কয়েকটি স্মৃতির সহিত বেদের বিরোধ হওয়াতে বেদবাক্যে অনাস্থা হইতে পারে। কিন্তু বিষ্ণু-প্রণীত স্মৃতিগ্রন্থে বেদকে সমর্থন করা হইয়াছে, এজন্য বেদবাক্যের প্রামাণিকতা স্বীকার করিতে হইবে।

ইতরেষাং চ অনুপলব্ধেঃ ২।১।২

(শঙ্কর) ইতরেষাং (অপর দ্রব্যগুলির) অনুপলব্ধেঃ (উপলব্ধি হয় না বলিয়া)।

সাংখ্যদর্শনে প্রধান ব্যতীত মহৎ প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যের উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি দ্রব্যের উল্লেখ বেদে নাই, অনুভবও হয় না, এজন্য সেগুলির অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। * অতএব সাংখ্য-দর্শনের ন্যায় স্মৃতির সহিত বিরোধ হওয়া কোনও দোষের বিষয় নহে।

রামানুজ বলিয়াছেন, "ইতরেষাং" শব্দের অর্থ মনু প্রভৃতি অপর স্মৃতিগ্রন্থপ্রণেতার। মনু যোগপ্রভাবে ব্রহ্মদর্শন করিয়াছিলেন এবং জগতের সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন। বেদেও উক্ত হইয়াছে, "যৎ বৈ কিঞ্চন মনুঃ অবদৎ তৎ ভেষজম্" -মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা ঔষধের ন্যায় হিতকারী। কপিল সাংখ্য-দর্শনে যে সকল তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন, মনু যখন সে সকল উপলব্ধি করেন নাই, তখন কপিলের সাংখ্যদর্শনকেই ভ্রান্তিমূলক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে কপিলের মতের সহিত বিরোধ হইতেছে বলিয়া বেদান্ত-বাক্যের কোনও অর্থ পরিত্যাগ করিবার কারণ নাই।

মধ্ব বলিয়াছেন যে, বেদ-বিরোধী স্মৃতিতে যে কর্ম্মের যে ফল উক্ত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া উপলব্ধি হয় না। এজন্য সে সকল স্মৃতি অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ (২।১।৩)

এই ভাবে যোগদর্শনের মতও খণ্ডিত হইল। যোগদর্শনেও সাংখ্যের ন্যায় স্বতন্ত্র প্রধান এবং মহৎ প্রভৃতির কল্পনা আছে। ইহা বেদবিরুদ্ধ, অতএব অগ্রাহ্য। সাংখ্যদর্শন খণ্ডন করিয়াও পুনরায় যোগদর্শন খণ্ডন করিবার কারণ এই যে, কতকগুলি বেদবাক্যে যোগদর্শনের সমর্থন করা হইয়াছে, এইরূপ প্রতীতি হয়। যথা বৃহদারণ্যকে—"শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ শ্রবণ করিতে হইবে, বিচার করিতে হইবে, ধ্যান করিতে হইবে। এই "ধ্যান" যোগের অঙ্গ বলিয়া যোগদর্শনে বিহিত আছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—"ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং" বক্ষ, গ্রীবা এবং মস্তক, এই তিনটি অবয়ব উন্নত এবং সমানভাবে স্থাপন করিয়া। ইহা যোগবিহিত আসনের অনুরূপ। কঠোপনিষদে আছে—"তাং যোগম্ ইতি মন্যন্তে স্থিরাং ইন্দ্রিয়ধারণাং" -সেই স্থির ইন্দ্রিয়ধারণাকে যোগ বলা হয়। সাংখ্য এবং যোগের যে অংশ বেদবিরোধী নহে, সে অংশ গ্রহণ করিতে আপত্তি নাই (যথা সাংখ্যোক্ত পুরুষের নির্গুণত্ব, এবং যোগোক্ত যম-নিয়ম-আসন-ধ্যান প্রভৃতি), যে অংশে বিরোধ আছে, সে অংশ পরিত্যাজ্য।

এই প্রসঙ্গে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, বেদান্তবাক্য ভিন্ন অন্য উপায়ে তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে না। তৈত্তিরীয়ক ব্রাহ্মণে আছে —"ন অবেদবিদ মনুতে তং বৃহন্তং" যিনি বেদজ্ঞ নহেন, তিনি সেই বৃহৎ পুরুষকে জানিতে পারেন না।

রামানুজ বলিয়াছেন যে, সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর, কিন্তু যোগদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন, এজন্য যোগদর্শনের উপর অধিক শ্রদ্ধা হইতে পারে। কিন্তু যোগদর্শনে ঈশ্বরকে জগতের নিমিত্তকারণমাত্র বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, উপাদানকারণ বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। অন্য কয়েকটি বেদবিরোধী সিদ্ধান্ত আছে। এজন্য যোগদর্শন সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না।

ন বিলক্ষণত্বাৎ অস্য তথাত্বং চ শব্দাৎ (২।১।৪)

ন (ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ হইতে পারেন না), বিলক্ষণত্বাৎ (ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে বিলক্ষণত্ব আছে), তথাত্বং (এই বিলক্ষণত্ব), শব্দাৎ (শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়)।

এই সূত্রে পূর্ব্বপক্ষের (প্রতিপক্ষের) মত দেওয়া হইয়াছে। প্রতিপক্ষ আপত্তি করিতে পারেন, "জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না, কারণ, ব্রহ্মের স্বভাব এবং জগতের স্বভাব বিলক্ষণ। ব্রহ্ম চেতন, জগৎ অচেতন;

* 'মহৎ' তত্ত্বের অনুরূপ বুদ্ধিতত্ত্ব বেদান্তে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্যে যে প্রকার 'মহৎ' প্রতিপাদন করা হইয়াছে, ঠিক সেই বস্তুটি স্বীকার করা হয় নাই।

ব্রহ্ম শুদ্ধ, জগৎ অশুদ্ধ ; ব্রহ্ম নিত্যানন্দ, জগৎ সুখ-দুঃখময়। একটি বস্তু হইতে আর একটি বস্তু উৎপন্ন হইলে উভয়ের স্বভাব একরূপ হয়। মৃন্ময় ঘটের স্বভাব মৃত্তিকার অনুরূপ হয়, সুবর্ণের মত হয় না। জগৎ ও ব্রহ্মের স্বভাব যে বিভিন্ন, ইহা শ্রুতিতেই উক্ত হইয়াছে, যথা—"বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ",—এখানে ব্রহ্মকে বিজ্ঞান বলা হইয়াছে, জগৎকে অবিজ্ঞান বলা হইয়াছে, এবং উহাদের স্বভাব যে বিভিন্ন, তাহাও বলা হইয়াছে।"

রামানুজও এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মধ্ব বলিয়াছেন, শ্রুতি ও শ্রুত্যনুযায়ী স্মৃতিতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার উপলব্ধি হয় না বলিয়া—"বিলক্ষণত্বাৎ"—অপ্রামাণ্য হয় না। কারণ, শ্রুতি নিত্য এবং স্বতঃই প্রামাণ্য। অন্যথা অনবস্থা-দোষ হয়—বুদ্ধি দ্বারা যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করা যায়, তাহা তর্ক দ্বারা খণ্ডন করা যায়। বেদ যে নিত্য, তাহা বেদেই বলা হইয়াছে (শব্দাৎ)।

অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্ (২।১।৫)

(শঙ্কর) বেদে আছে, "মৃৎ অব্রবীৎ" মৃত্তিকা বলিল ; "আপো অব্রুবন্"—জল বলিলেন ; "তৎ তেজ ঐক্ষত"—অগ্নি আলোচনা করিলেন। এ জন্য মনে হইতে পারে যে, মৃত্তিকা, জল, অগ্নি প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু চৈতন্যযুক্ত ; সুতরাং ব্রহ্ম চেতন, জগৎ অচেতন বলিয়া জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না,—এই যে আপত্তি হইয়াছিল, তাহা যথার্থ নহে। ইহার উত্তরে এই সূত্রে বলা হইয়াছে,—"অভিমানিব্যপদেশস্তু"—মৃত্তিকা প্রভৃতি বস্তুকে নিজ দেহ বলিয়া যে সকল দেবতা অভিমান করেন, তাঁহাদের ব্যপদেশ অর্থাৎ উল্লেখ আছে। "বিশেষানুগতিভ্যাং"—"বিশেষ" এবং "অনুগতি" হেতু এইরূপ বুঝিতে হইবে। "বিশেষ" অর্থাৎ প্রভেদ,—জগতে চেতন ও অচেতনের প্রভেদ আছে, শ্রুতিতেই তাহা উল্লেখ আছে, সুতরাং জগতের যাবতীয় বস্তু চেতন হইতে পারে না। "অনুগতি" অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে বিভিন্ন দেবতা অনুগত হইয়া থাকেন—ইহা বেদ, ইতিহাস, পুরাণ সর্ব্বত্র উক্ত হইয়াছে। এই সূত্রেও প্রতিপক্ষের মত দেওয়া হইয়াছে। পরবর্ত্তী সূত্রে এই মত খণ্ডিত হইয়াছে।

রামানুজও অনেকটা এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি "বিশেষ" শব্দের অর্থে বলিয়াছেন যে, "মৃৎ অব্রবীৎ" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে যাহাদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহাদিগকে অন্যত্র দেবতা শব্দ দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে। "অনুগতি" অর্থাৎ অনুপ্রবেশ,—বেদে উল্লেখ করা হইয়াছে, "অগ্নিঃ বাক্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ"—অগ্নি (দেবতা) বাক্ইন্দ্রিয় হইয়া মুখের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, ইত্যাদি।

মধ্ব এই সূত্রটির এই প্রকার ভাষ্য করিয়াছেন। বেদে আছে—'মৃৎ অব্রবীৎ' 'আপোঽব্রুবন্' এ জন্য কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, বেদের কোনও কোনও বাক্য যুক্তি-বিরুদ্ধ। তাহার উত্তর এই সূত্রে দেওয়া হইয়াছে,—মৃত্তিকা, জল প্রভৃতি অভিমানী দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া এই সকল কথা বলা হইয়াছে। এই সকল দেবতার বিশিষ্ট সামর্থ্য এবং সর্ব্বত্র অনুগতি আছে। মহাপুরুষগণ তাহা দর্শন করিয়াছেন এবং পুরাণেও তাহা কথিত হইয়াছে।

দৃশ্যতে তু (২।১।৬)

এই সূত্রে পূর্ব্বের যুক্তি খণ্ডন করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে। দৃশ্যতে অর্থাৎ ইহা দেখা যায় যে, একটি বস্তু অপর একটি বস্তু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু উভয়ের স্বভাব বিভিন্ন। যেমন চেতন পুরুষ হইতে অচেতন কেশ-লোমাদির উৎপত্তি হয় ; অচেতন গোময় হইতে চেতন বৃশ্চিকাদির উৎপত্তি হয়। কার্য্য ও কারণের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকে, কিছু পার্থক্য থাকে। যদি একেবারে কিছুই পার্থক্য না থাকে, তাহা হইলে একটিকে কার্য্য, একটিকে কারণ বলা যাইবে না কিরূপে? ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যেও কিছু সাদৃশ্য আছে, কিছু প্রভেদ আছে। ব্রহ্মের অস্তিত্ব আছে, জগতেরও অস্তিত্ব আছে। কিন্তু প্রভেদ এই যে, ব্রহ্ম চেতন, জগৎ অচেতন। এ ক্ষেত্রে ব্রহ্মকে কারণ ও জগৎকে কার্য্য বলিলে কোনও দোষ হয় না। অধিকন্তু ব্রহ্ম জগতের কারণ হইতে পারেন কি না, এ বিষয়ে বেদই প্রমাণ। ব্রহ্মের রূপ নাই যে প্রত্যক্ষ হইবেন ; তাঁহার কোনও লক্ষণ নাই যে অনুমানের বিষয় হইবেন। অতএব ব্রহ্ম-বিষয়ে তর্কের অবসর নাই, বেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রুতির প্রকৃত অর্থ কি—এই বিষয়ে তর্ক চলিতে পারে ; কিন্তু শ্রুতি সত্য অথবা মিথ্যা,—এ বিষয়ে তর্ক চলিতে পারে না।

রামানুজও এই ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি মধু হইতে কৃমির উৎপত্তিও উল্লেখ করিয়াছেন। মধ্ব ইহার

ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, শাস্ত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে, অধিকারী ব্যক্তি তাহা দর্শন করিতে পারে। ভবিষ্যপুরাণ হইতে তিনি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব, রামায়ণ মহাভারত পঞ্চরাত্র, ইহাদের নাম বেদ ; এবং এই সকল বেদ ও বৈষ্ণব পুরাণগুলি স্বতঃ প্রামাণ্য—অবশ্য স্বীকার্য্য।

অসৎ ইতি চেৎ ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ (২।১।৭)

(শঙ্কর) "যদি বলা যায় অসৎ, তাহা প্রতিষেধমাত্র।" যদি ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলা যায়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ 'অসৎ' ছিল, অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব ছিল না। কারণ, জগৎ অশুদ্ধ ও অচেতন; শুদ্ধ ও চেতন ব্রহ্মে তাহা সৃষ্টির পূর্ব্বে কিরূপে থাকিতে পারে ? কিন্তু বেদান্তের মত এই যে, কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্য কারণের মধ্যে বিদ্যমান থাকে ('সৎকার্য্যবাদ'), সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বেও জগতের ব্রহ্মের মধ্যে অস্তিত্ব থাকা উচিত। ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, ইহা প্রতিষেধমাত্র, অর্থাৎ ইহাতে প্রকৃতপক্ষে কিছু প্রতিষিদ্ধ হইল না। সৃষ্টির পরেও জগতের যা-কিছু অস্তিত্ব, তাহা ব্রহ্মের অস্তিত্ব ব্যতীত আর কিছু নহে, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র কোনও অস্তিত্ব নাই। সৃষ্টির পূর্ব্বেও জগতের সেই ব্রহ্মাত্মক অস্তিত্ব থাকে। অর্থাৎ অশুদ্ধ অচেতন জগৎ মিথ্যা, সৃষ্টির পরেও আমরা তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করি না, সুতরাং ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলিলে সৎকার্য্যবাদরূপ মতের সহিত বিরোধ হয় না।

কিন্তু রামানুজ এই ভাবে জগৎকে মিথ্যা বলেন নাই। তাই তিনি এই সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ব-সূত্রে কেবল ইহাই প্রতিষেধ করা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম ও জগতের লক্ষণ একরূপ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু লক্ষণ ভিন্ন হইলেও ব্রহ্ম ও জগৎ যে একই দ্রব্য, ইহা প্রতিষেধ করা হয় নাই। রামানুজের সিদ্ধান্ত এই যে, সৃষ্টির পর জগতের বিভিন্ন লক্ষণ দেখা যায় বটে, কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন সেই সকল বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দেয় নাই, তখন এই জগৎ ব্রহ্মের মধ্যে ছিল, ইহা স্বীকার করিতে কোনও আপত্তি নাই।

অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাৎ অসমঞ্জসম্ (২।১।৮)

"অপীতৌ" অর্থাৎ প্রলয়ের সময়ে, "তদ্বৎ" অর্থাৎ সেইরূপ, "প্রসঙ্গাৎ" জগতের দোষ ব্রহ্মে সঞ্চারিত হইতে পারে বলিয়া, "অসমঞ্জসম্" (ব্রহ্ম জগতের উৎপত্তিস্থল, এই মতটি যুক্তিবিরুদ্ধ)।

(শঙ্কর) জগৎ যদি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে প্রলয়ের সময় জগৎ ব্রহ্মে বিলীন হইবে। কারণ, যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, ধ্বংসের সময় তাহাতেই মিলাইয়া যায়। জগতে দুঃখ, অপবিত্রতা প্রভৃতি কতকগুলি দোষ আছে, সুতরাং প্রলয়ের সময় জগৎ যদি ব্রহ্মে বিলীন হয়, তাহা হইলে জগতের এই সকল দোষ ব্রহ্মে সঞ্চারিত হইয়া যাইবে। কিন্তু ব্রহ্মে কোনও দোষ থাকিতে পারে না। সুতরাং জগৎ কখনও ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না।—এই প্রকার যুক্তি বিপক্ষ প্রয়োগ করিতে পারেন।

রামানুজও এই ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয় ছিল, এবং ব্রহ্মে কোনওরূপ দোষ থাকিতে পারে না।

ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ (২।১।৯)

পূর্ব্ব-সূত্রে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা যথার্থ নহে। কারণ, এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

(শঙ্কর) মাটী হইতে ঘট, সরা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা হয়। যখন ঘট ধ্বংস হইয়া মাটীর সহিত মিশিয়া যায়, তখন ঘটের সকল গুণ মাটীতে সংক্রামিত হয় না। যথা ঘটের বর্ত্তুলাকার, ক্ষুদ্রতা বা বৃহত্ত্ব এই সকল গুণ মাটীতে সংক্রামিত হয় না। ঘট ধ্বংস হইয়া মাটীর সহিত মিশিবার পরও যদি ঘটের সকল গুণ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে ঘটের ধ্বংস হইয়াছে, এ কথাই বলা যায় না।

রামানুজও এই ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম হইতেছেন আত্মা, জীব ও জগৎ হইতেছে তাঁহার শরীর ; শরীরের অবয়বসকল সঙ্কুচিত ও বিস্তৃত হইলেও উভয় অবস্থাতে এক শরীরই বিদ্যমান থাকে, সেই প্রকার প্রলয় ও সৃষ্টির সময় জীব ও জগৎ বিভিন্ন অবস্থাতে বিদ্যমান থাকিলেও উভয় অবস্থায় একই বস্তু থাকে, শরীরের দোষগুণ যেমন আত্মাকে স্পর্শ করে না, সেইরূপ জীব ও জগতের দোষগুণ ব্রহ্মকে স্পর্শ করে না,—সৃষ্টির সময়ও করে না, প্রলয়ের সময়ও করে না।

স্বপক্ষদোষাচ্চ (২।১।১০)

নিজের পক্ষেও এই সকল দোষ আছে, সুতরাং পর-পক্ষের বিরুদ্ধে এই সকল দোষ প্রয়োগ করা যায় না।

(শঙ্কর) সাংখ্যবাদী বেদান্তবাদীর বিরুদ্ধে দুইটি দোষ দিয়াছিলেন—(১) জগতের লক্ষণ ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে ভিন্ন, এ জন্য জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না, (২) প্রলয়ের সময় জগতের দোষগুলি ব্রহ্মতে সঞ্চারিত হওয়া উচিত, কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কিন্তু এই দুইটি যুক্তিই সাংখ্যদর্শনের বিরুদ্ধেও প্রয়োগ করা যায়। সাংখ্যমতে প্রকৃতি হইতে জগৎ উৎপন্ন হয়, কিন্তু প্রকৃতির লক্ষণ এবং জগতের লক্ষণ বিভিন্ন; প্রকৃতির শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি গুণ নাই; জগতের আছে। সাংখ্যবাদীও স্বীকার করেন যে, জগতের যখন প্রলয় হয়, তখন জগৎ প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়। সুতরাং তাঁহাকে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রলয়ের সময় জগতের শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি গুণ প্রকৃতিতে সঞ্চারিত হইয়া যায়; কিন্তু তিনি তাহা স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ, তাঁহার মতে প্রকৃতির শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি গুণ নাই।

রামানুজ সূত্রটি অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রগুলিতে দেখান হইল যে, উপনিষদের মত নির্দোষ; এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, সাংখ্যের মত দোষযুক্ত। সাংখ্যদর্শনে জগতের সৃষ্টি যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা অসম্ভব। সাংখ্যদর্শনে বলা হইয়াছে যে, পুরুষ নির্গুণ, কিন্তু গুণময়ী প্রকৃতি নিকটে থাকে বলিয়া প্রকৃতির গুণগুলি পুরুষে আরোপ করা হয়, ইহাই সৃষ্টির কারণ। এই আরোপ বা অধ্যাস কি ভাবে সিদ্ধ হইতে পারে? ইহা বলা যায় না যে, পুরুষের বিকার হয় বলিয়া এই অধ্যাস হয়,—কারণ, পুরুষ নির্ব্বিকার। ইহাও বলা যায় না যে, প্রকৃতির বিকার হেতু অধ্যাস হয়। কারণ, সাংখ্যবাদীরা বলেন যে, অধ্যাস হেতু বিকার হয়। তাঁহারা যদি একবার বলেন যে বিকার-হেতু অধ্যাস হয়, আবার যদি বলেন যে অধ্যাস-হেতু বিকার হয়, তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ হয়। যদি তাঁহারা বলেন যে, প্রকৃতি আছেন বলিয়াই অধ্যাস হয়, তাহা হইলে মুক্ত পুরুষেও অধ্যাস হইতে পারে স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং সৃষ্টি সম্বন্ধে সাংখ্যের মত দোষযুক্ত।

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি অন্যথানুমেয়মিতি চেৎ, এবম্ অপি অবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ (২।১।১১)

'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ অপি',—তর্ক দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় করা যায় না, (অতএব বেদবাক্য দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় করা উচিত) 'অন্যথা অনুমেয়ম্ ইতি চেৎ'—যদি কেহ বলেন, তর্কের প্রয়োজনীয়তা আছে, 'এবম্ অপি অবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ'—তথাপি তর্কের দোষ নিরস্ত হয় না।

(শঙ্কর) এক ব্যক্তি তর্কের দ্বারা যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবেন, তাঁহার অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সে তর্কের দোষ দেখাইবেন। সুতরাং প্রকৃত সত্য কি, তাহা তর্ক দ্বারা জানা যায় না, অপৌরুষেয় বেদবাক্য হইতেই জানা যায়। কেহ যদি বলেন যে, তর্ক না করিলে যে যাহা বলিবে, তাহাই শুনিতে হয়, ভ্রান্তমত গ্রহণ করিতে হয় এবং তাহাতে নানাবিধ অনিষ্ট হয়। ইহার উত্তর এই যে, জগতের সাধারণ বিষয়-সমূহে তর্কের উপযোগিতা থাকিতে পারে, কিন্তু অবাঙ্‌মনসগোচর ব্রহ্ম সম্বন্ধে বেদের উপযোগিতাই অধিক; সে সম্বন্ধে তর্কের কেবল এইমাত্র উপযোগিতা আছে যে, তর্ক দ্বারা বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়। বেদ সত্য কি না, এ বিষয়ে তর্কের কোনও অবসর নাই।

(রামানুজ) 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' বেদ ব্যতীত অপর যে সকল ধর্ম্মমত আছে (যথা বৌদ্ধ, সাংখ্য, যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক), তাহাদের দ্বারা কোনও নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্ত করা যায় না। কারণ, ইহাদের মধ্যে এক একটি মত অপর সকল মত খণ্ডন করিয়াছে। 'অন্যথানুমেয়ম্ ইতি চেৎ' যদি বলা যায় যে, এই সকল মত ব্যতীত একটি নূতন মত স্থাপন করা যায়, যাহাতে এই সকল দর্শনে উল্লিখিত দোষগুলি থাকিবে না। 'এবম্ অপি অবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ' অর্থাৎ এই ভাবেও সত্য-লাভ হইবে না। কারণ, পরবর্ত্তী কালের কোনও অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই নূতন মতেরও দোষ বাহির করিতে পারিবেন।

পাশ্চাত্য জগতে যে নিত্য নূতন দার্শনিক মত প্রচারিত হইতেছে, ইহারা কেবল তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সকল মতের ব্যর্থতা আমাদের আচার্য্যগণ পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ (২।১।১২)

(শঙ্কর) "শিষ্টাপরিগ্রহা অপি" অর্থাৎ যে সকল মত মনু, ব্যাস প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গ্রহণ করেন নাই, সেই সকল মতও, "এতেন ব্যাখ্যাতাঃ" এইভাবে ব্যাখ্যাত হইল।

(শঙ্কর) সাংখ্যদর্শনের কোনও কোনও অংশ বৈদিক ঋষিগণ গ্রহণ করিয়াছেন। এ জন্য আশঙ্কা হইতে পারে যে, সাংখ্যের সকল মতই গ্রহণীয়। এই আশঙ্কা পূর্ব্বে নিরস্ত হইয়াছে। কণাদের বৈশেষিক দর্শনে উক্ত হইয়াছে যে, পরমাণুই জগতের আদি কারণ। মনু, ব্যাস প্রভৃতি মনস্বিগণ এই পরমাণুকারণবাদ গ্রহণ করেন নাই। এ জন্য পরমাণু-কারণবাদ খণ্ডন করিবার জন্য বিস্তারিত যুক্তি প্রয়োগ করা হইল না—যে যুক্তিপ্রণালী অবলম্বন করিয়া সাংখ্যের প্রধান-কারণবাদ খণ্ডন করা হইয়াছে, সেই প্রণালীতে পরমাণু-কারণবাদও খণ্ডন করা যায়।

রামানুজ বলেন, শিষ্ট অর্থাৎ অবশিষ্ট এবং অপরিগ্রহ অর্থাৎ যাঁহারা বেদমত গ্রহণ করেন নাই। যথা—কণাদ, গৌতম, বৌদ্ধ, জৈন। ইঁহাদের মতও পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে খণ্ডন করা যায়।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (এম এ)।

বিদেশী নায়ে

বাদল বাতাসে উড়ে এসে ফুল পড়িল আকুল গায়ে,—
সোনার প্রতিমা সমুখে ভাসিছে ময়ূর-পঙ্খী নায়ে!
হাল্লা করিয়া মাঝি-মাল্লারা সরিয়া যাইতে বলে—
ধীর জলে তীর ঘেঁসিয়া তরণী ঝিরু ঝিরু বেয়ে চলে!

ঢেউয়েরা চরণে চরণ মিলায়ে ছন্দ রচিতে চায়—
রূপসীরে বুকে রাখিয়া তরণী কবিতা লিখিয়া যায়!
চপলা খেলিছে চপল দু'চোখে,—অধরে বসোরা গুল্!
কুন্তলে নাম-না-জানা-কুসুম, ভঙ্গিটি মঞ্জুল!
যাহ্বা, বলী-দ্বীপ, কিউবা, হাওয়াই, সামোয়া, সুমাত্রায়—
কোথা হ'তে এই রূপসী রমণী এসেছে বিদেশী নায়?

নীল সাগরের উপকূলে দোলে 'পাম্'-নারিকেল-শাখা,
নীল গগনের চাঁদোয়ার কোলে চাঁদের ছবিটি আঁকা!
এলা-লবঙ্গ সুরভি বহিছে মাতাল গন্ধ-বহ
সেই যাহ্বা-বলী-দ্বীপ-নিবাসিনী রমণী কি তুমি, কহ!

অথবা যেথায় মণি-মুকুতায় মানুষে মাতাল করে—
সিন্ধুর তলে ডুবুরী ডুবায়ে সদাগর ডিঙ্গা ভরে—
ভারতের মহা-সাগরের সেই সিংহল দ্বীপ বেয়ে
হাস্তে মুকুতা ঝরায়ে, এসেছ, অয়ি সুহাসিনী মেয়ে!

অথবা এসেছ হনলুলু হ'তে, হাওয়াইয়ের উপকূলে,—
'হুলা-'হুলা' নাচে যাত্রীরা আছে বিশ্ব-ভুবন ভুলে!
কুসুমের বাসে যৌবন হাসে, হাসে রবি, রাতে শশী,—
সেই দেশ হ'তে এদেশের পানে তাকাও নায়েতে বসি'!
আয়ত, অগাধ, রহস্য-ভরা দুইটি নয়ন দিয়া
আকাশে বাতাসে মাধুরী যা আছে সকলি নিতেছ পিয়া!

কিউবা হইতে কিম্বা এসেছ, 'রাম্বা' নৃত্য ছাড়ি'—
বাগিচার মাঝে অপেখিয়া আছে তরুলতা-ঘেরা বাড়ী।
দুটি খরগোস্ চোখ তুলে চায় খাবার দেবার বেলা,
পরিচিত মুখ না দেখিয়া তা'রা করে নাকো আর খেলা;
"হায়-রাম্বার" তাল কেটে যায়, বিলাপের ধ্বনি ওঠে
কিউবার সেই ছবি বুঝি তব মানস-নয়নে ফোটে!

যেখানে হতেই আসো নাকো তুমি এসেছ আমার দেশে,
ও-সোনামুখের হাসিটুকু দেখে নদীও উঠেছে হেসে!
দেখ এ দেশের শ্যামল-মূরতি তরঙ্গিনীর কূলে,
আঁচল বিছায়ে শীতল বাতাসে প্রকৃতি পড়েছে ঢুলে!
দেখ এ দেশের মধুরা মূরতি, প্রবাস-বিধুরা মেয়ে!
জানি নাকো ভালো লাগিবে কি না এ তোমার দেশের চেয়ে—
যাহ্বা-বলী-দ্বীপ, কিউবা, হাওয়াই, সামোয়া, সুমাত্রায়
বল ত এমন নয়ন-জুড়ানো শ্যামলিমা পাওয়া যায়?

সাগরের হাওয়া, সে কি এত মিঠে, দখিণা পবন সম?
এলা-লবঙ্গ হ'তে বেলা-যূথি সৌরভে মনোরম!
গাঙ্-চিলেদের গান শুনে, এলে শামা-দোয়েলের দেশে—
তরণী তোমার বাঁধো এইবার যাত্রার অবশেষে!

রূপকথা দিয়া রূপসী রচিয়া এ দেশে ভুলায় ছেলে—
পক্ষিরাজেরা তারি খোঁজে ধায় বিমানে পক্ষ মেলে!
মণি-মুকুতার পালঙ্কে ঘুমায় পাতালপুরীর মেয়ে—
সোনার কাঠিটি ছোঁয়ালে শিয়রে, তবে সে দেখিবে চেয়ে—
কান্নাতে তার মুকুতা ঝরে গো, হাসিলে মাণিকরাশি!
এই রূপকথা উপকথা যা'র, মোরা সেই দেশ-বাসী!

ওগো বিদেশিনী রূপসী রমণী, ময়ূর-পঙ্খী নায়ে—
বাদল বাতাসে কবরীর ফুল লাগিল আকুল গায়ে:
সমুখে চাহিয়া দেখিনু হাসিছ সোনার প্রতিমা সম!
তুমি ত নহ গো পাতালপুরীর রাজকন্যাটি মম?

শ্রীরাধেন্দু দত্ত।



দান-প্রতিদান

[উপন্যাস]



[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

৫০

সুরভির বাবা, মা তাঁহাদের দেশের বাড়ীতে আসিয়া মেয়ের বিবাহ দিতেছিলেন। ভূষণডাঙ্গা হইতে সুরভিদের গ্রাম বেশী দূরে নহে; জল-পথেই যাতায়াতের সুবিধা।

বিবাহের দিন দ্বিপ্রহরে বজরা সাজাইয়া আত্মীয়-বন্ধু-পরিবেষ্টিত হইয়া বিকাশ বিবাহ করিতে যাত্রা করিল। বসন্ত ও হিরণকে বরযাত্রী হইতে হইল।

পরদিন সন্ধ্যার উজ্জ্বল আলো ও উচ্চ বাদ্যধ্বনির মধ্যে নববধূ লইয়া বিকাশ গৃহে ফিরিয়া আসিল। প্রশস্ত প্রাঙ্গণে বরণের আয়োজন হইয়াছিল; বিবাহে সমাগতা রমণীগণ বসনে-ভূষণে সজ্জিত হইয়া বর-বধূকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠারা পায়ে ধান-দূর্ব্বা রাখিয়া প্রণাম করিল।

নব-বধূ নির্জ্জনে আসিয়া কুহুকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া চুপে চুপে বলিল, "এতক্ষণে বাঁচলাম দিদি, তোমাকে পেয়ে অকূলে কূল পেলাম। অচেনাদের মধ্যে এসে বড্ড ভয় করছিল, চেনা যখন পেলাম, তখন আর তোমায় ছাড়ছিনে, ভাই।"

"ছাড়তে কে বল্‌ছে, সুরভি? কিন্তু আমার চেয়েও যে বেশী চেনা, তোমার মনের মানুষটি কাছে কাছেই রয়েছে।" বলিয়া কুহু আদর করিয়া নব-বধূর গাল টিপিয়া দিল।

বধূ মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে জবাব করিল, "তুমিই সকলের চেয়ে বেশী চেনা, দিদি! তোমার মত অন্যে নয়।"

ফলে সে রাত্রি কুহুকে সুরভির নিকটেই থাকিতে হইল, পরদিন বৌ-ভাত; বিরাজমোহিনী লোকজন খাওয়াইতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। বিকাশ তাঁহার একমাত্র সন্তান; ছেলের বিবাহ-ব্যাপার এই প্রথম, এই শেষ। তিনি গ্রামের ইতর-ভদ্র সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নের ভোজ হইলেও খাইতে খাইতে অপরাহ্ণ গড়াইয়া গেল।

নিমন্ত্রিত মহিলাদের আসিবার পূর্ব্বেই বিরাজমোহিনী কুহুকে ডাকিয়া কহিলেন, "এখুনি গাঁয়ের মেয়েরা এসে পড়বে; এইবার তুমি ভাল একখানা শাড়ী, গয়না প'রে নাও, মা। অনেকেই তোমায় দেখেনি, আজ প্রথম দেখবে, এমন সাদা-সিদে বেশে তাদের সাম্‌নে তোমায় আমি বার কর্‌তে পারব না।"

কুহু সহাস্যে কহিল, "আমি ত নতুন বৌ নই, কাকীমা। আমার সাজ করতে হবে কেন?"

কাকীমা কহিলেন, "সুরভির মত নতুন না হলেও তুমি ত পুরাণো নও, মা। রাজার রাণী হয়েছ, সেই বেশেই থাক্‌তে হয়।"

অগত্যা বাসনাকে পাঠাইয়া বাড়ী হইতে একখানি রেশমী শাড়ী ও সাধারণ গুটি কয়েক গহনা আনিয়া কুহুকে সাজিতে হইল। তাহার নিজের প্রয়োজনে না হউক, রাণীত্ব বজায় রাখিতে অনেক কিছুই যে করিতে হয়। কিন্তু নারীর প্রসাধন কাহার নিমিত্ত? কে ইহাতে প্রসন্ন হইবে?

সন্ধ্যার প্রাক্কালে মাধুরী ও বাবলিকে লইয়া কান্তমণি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন। আজ বাবলির বেশভূষা

অভিনব। কপালে খয়েরের টীপ, চোখে কাজল, গায়ে লাল সিল্কের নূতন জামা, গলায় ছোট্ট একটি সরু হার, হাতে প্লেন বালা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। মাধুরীর অঙ্গে একখানি খয়েরি রংএর ঢাকাই শাড়ী উঠিলেও গহনার মধ্যে সেই দুটি কাণের ফুল, দুইখানি তামা-বাঁধানো চুড়ি।

কুহু মাধুরীকে পাইয়া উৎফুল্ল হইল। তাহার হাত ধরিয়া কাপড় ছাড়ার ছোট ঘরটিতে লইয়া গিয়া বসাইয়া বলিল, "তুমি এতক্ষণে এলে, মাধুরী? আমি দুপুর থেকে তোমার পথের দিকে চেয়ে রয়েছি। আজ ত তোমার চুল বাঁধা ভাল হয়নি, এত টেনে বেঁধেছ কেন?"

"মা বেঁধে দিয়েছেন, দিদি, অন্যদিন আমি নিজে বাঁধলে চলে, কোথাও আস্‌তে গেলে হ'লেই মা বেঁধে দেন। মা'র বিশ্বাস, দশ গুছির বিনুনি ক'রে খোঁপা না বাঁধলে আমাকে ভাল দেখায় না। খোঁপা যে কাপড়ে ঢাকা থাকে, সেটা মা বুঝতে চান না। বাবলিকে দুধ খাইয়ে ঘরের কায সেরে, চুল-বাঁধা পর্ব্ব শেষ ক'রে আসতে আমার দেরী হ'ল। বাবলির হার, বালা দেখলে? বিয়ে-বাড়ীতে আসতে হবে ব'লে সেক্‌রাকে না দিয়ে ঢাকা থেকে তৈরি জিনিষই এনে দিয়েছেন। খুব সুন্দর হয়েছে, তোমার টাকাতেই হার, বালা, জামা হয়ে আরো দু'টাকা বেঁচে গেছে।"

"সে টাকায় বাবলিকে দুধ কিনে খেতে দিও। নতুন গয়না প'রে ওকে আজ বড়ই মানিয়েছে, তোমায় কিন্তু মানায় নি, মাধুরী! আমার ইচ্ছা করছে, তোমার চুল খুলে আবার বেঁধে দিই। মাসীমার বেঁধে দেওয়া চুল খুল্লে তিনি ত রাগ করবেন না?"

"রাগ আবার কিসের দিদি? মা কিছু বলবেন না। ইচ্ছে করছে, তুমি খুলে নতুন ক'রে বেঁধে দাও না, তুমি কষ্ট ক'রে বেঁধে দেবে, তাতে আপত্তি কিসের?"

কুহু নিঃশব্দে মাধুরীর চুল খুলিয়া নূতন করিয়া খোঁপা বাঁধিয়া দিয়া কপালে একটি সিন্দূরের টীপ পরাইয়া দিল। সিন্দুর পরাইয়া মুখখানি এদিকে ওদিকে ঘুরাইয়া পলকহারা নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। একটি সিন্দুরের টীপ, কপালের উপর চুল নামাইয়া দেওয়াতেই যাহাকে এত সুন্দর দেখা যায়, একখানি ভাল শাড়ী, খানকয়েক গহনা হইলে তাহাকে না জানি কতই মানাইত! কুহুর কত শাড়ী, গহনা নিরর্থক আলমারীতে পচিতেছে, অথচ হাতের কাছে কিছুই নাই।

কুহু মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া চক্ষুর পলকে তাহার হাতের ভাটিয়া প্যাটার্ণের বারোগাছি চুড়ির ছয়গাছা খুলিয়া মাধুরীর বাহুমূলে পরাইয়া দিল। বিস্মিতা মাধুরী বাধা দিতে না দিতেই কুহুর গলার একনর গোট-হারছড়াও মাধুরীর কণ্ঠে দোলায়মান হইল।

মাধুরীকে গহনা পরাইয়া কুহু উল্লসিত হইয়া বলিল, "এইবার একটু মানাল, মাধুরী, এই শরীরের জন্যেই গয়নার সৃষ্টি, এখানে কিছু না দিলে সৃষ্টির সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যায়।"

মাধুরী নিরুত্তরে নত মুখখানি আরও একটু নত করিল। সে রাগ করিয়াছে অনুমান করিয়া কুহু পুনশ্চ বলিতে লাগিল, "চুপ ক'রে রইলে কেন? দিদির অনেক থাকলে ছোট বোনকে কিছু দেওয়া কি দোষের? না কেউ দেয় না?"

ইহাতেও মাধুরী কিছু বলিল না দেখিয়া কুহু তাহার মুখখানি দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া অবাক্ হইয়া গেল। মাধুরীর দুই চোখের কোল বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। এ অপ্রত্যাশিত অশ্রুধারার নিমিত্ত কুহু প্রস্তুত ছিল না। এক জনকে ভালবাসিয়া স্নেহ করিয়া কিছু দিলে তাহাতে কান্নার কি থাকিতে পারে? ভালবাসার কি মূল্য নাই? হৃদয়ের গভীর স্নেহ বাক্যে ব্যবহারে প্রকাশ করাটাই কি অপরাধের? যেখানে রক্তের সম্বন্ধ নাই, সেখানে প্রাণের টান কি থাকিতে পারে না?

ব্যথিতা কুহু মাধুরীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁদছ কেন, মাধুরী? আমায় বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে আমার ছোট বোনের মতনই ভালবেসেছি। সেই ভালবাসার দাবীতে আমার সামান্য চিহ্ন কটি তোমার কাছে রাখতে দিলাম। তোমার নেই ব'লে—গরীব ব'লে তোমায় আমি দান করিনি। তোমার স্বামী এদের কায করেন ব'লে তোমায় আমি বকশিষ দিই নাই। যা দিলাম, তা আমার স্নেহের চিহ্ন। অন্য কিছু নয়।"

মাধুরী হাতের উল্টা পিঠে চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "আমি অন্য কিছু ভাবিনি, দিদি। ভাবলে তোমায় দিদি ব'লে এত কাছে আসতে পারতাম না। তোমার স্নেহ আমি কি জানি না? জানি বলেই কষ্ট হয়। আমাদের যে অশেষ ঋণে জড়াচ্ছ তুমি, কত জন্মভোর তোমার ঋণ

শোধ দেব? তুমি যে ভালবাস, তোমারই গুণে; আমরা তার যোগ্য নই।"

"কিসে যোগ্য নও, মাধুরী? মাপ-কাঠিতে মানুষের আগাগোড়া মেপে তার পর কি ভালবাসতে হয়? আমিও মানুষ, তোমরাও মানুষ, আমাদের চেয়ে তোমরাই বর্ণে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। বলবে—'তোমাদের পয়সা আছে,' কিন্তু যাদের পয়সা থাকবে, তারা কি যাদের পয়সা নেই, তাদের ভালবাসতে পারবে না? তোমার কোথায় লাগে, তা আমি জানি, মাধুরী। পরাণ বাবু এখন কাষ ছেড়ে দিলে তখন তোমার মনে কোন খেদ থাকবে না। আর কটা দিন অপেক্ষা কর, শীগ্‌গিরই আমার ভাসুর আসবেন; তিনি এলে তোমার যোগ্য অযোগ্য দেখে নেব।"

কুহু ক্ষণকাল চুপ করিয়া পুনরপি বলিতে লাগিল, "আমি তোমাদের এমন কি করলাম, মাধুরী—যাতে তোমরা আমার কাছে ঋণে আবদ্ধ হয়ে রইলে? স্নেহের কাছে ঋণ কথাটা দাঁড়াতে পারে না। সত্যি সত্যিই আমি যদি তোমাকে কষ্ট দিয়ে থাকি, তা হ'লে কষ্টের জিনিষ তোমাকে রাখতে হবে না, আমাকে না হয় ফিরিয়ে দাও।"

"না, দিদি, তোমার স্নেহের দান আমি মাথায় ক'রে রাখব, ফিরিয়ে দেব না। আমার চোখে জল এসেছিল তোমার ভালবাসায়. তুমি আমাদের এত ভালবাসলে কি ক'রে? তোমার ভেতর এত ভালবাসা কোথায় থাকে?"

"কোথায় যে থাকে, তা ত জানি না, মাধুরী।" বলিতে বলিতে কুহু মাধুরীকে বুকের কাছে টানিয়া লইল।

কুহুর বুকে মাথা রাখিয়া, হাতে হাত জড়াইয়া মাধুরী নীরবে পড়িয়া রহিল। এ নিবিড় স্পর্শের মধ্য দিয়া তাহাদের কত যুগের কত অব্যক্ত ভাষা হৃদয়ের তারে তারে ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল। আর ব্যবধান নাই, দূরত্ব নাই, ভেদাভেদ নাই, দুই ব্যগ্র ব্যাকুল হৃদয় পরস্পরকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া সহসা কাছে আসিয়া পড়িয়াছে!

কুহুর অনুসন্ধানে সুরভি কক্ষে প্রবেশ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। জলপদ্ম জল হইতে স্থলে আসিয়া স্থলপদ্মকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়াছে! গগনের চাঁদ ধরায় নামিয়া আর একটি চাঁদের সৃষ্টি করিয়াছে।

সুরভি মাধুরীকে জানিত না, সে সসঙ্কোচে কুহুর নিকটস্থ হইতেই কুহু মুখ তুলিয়া ডাকিল, "এস সুরভি, এস; এখানে বোসো! মাধুরী, তুমি বোধ হয় নতুন বৌ দেখনি? এই নতুন বৌ, সুরভি।"

মাধুরী স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় ব্যস্তসমস্তভাবে কুহুর আলিঙ্গনপাশ হইতে মুক্ত হইয়া হাসিয়া কহিল, "আলুসের গঙ্গা নিকটেই মেলে। আমার এখনও ওঁকে দেখাই হয় নি। বাঃ, দিব্যি বৌ হয়েছে; শুনেছি, উনি নাকি ভাল গান গাহিতে পারেন? এক দিন কিন্তু গান শোনাতে হ'বে, দিদি?"

কুহু কহিল, "হ্যাঁ, সুরভি সুন্দর গাহিতে পারে, ভারী মিষ্টি গলা। গান শোনাবে বৈ কি, কবে শোনাবে, সুরভি?"

সুরভি সলজ্জ হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে কুহুর দিকে তাকাইল। কুহু কহিল, "এ কে জিজ্ঞাসা করছ? এর পরিচয় তোমায় দেওয়াই হয় নি। এ আমার ছোট বোন, আমার ছোট বোনের কথা জানতে না? জানবে কি ক'রে? আমি নিজেই যে জানতাম না। এখানে এসে বোনটিকে পেয়েছি, এর নাম মাধুরী।" এ পরিচয়ে মাধুরীর চক্ষু অশ্রু-সিক্ত হইল।

৩১

বিবাহের উৎসব মিটিতে বিলম্ব হইল না। স্বজন-সমাগমে বিকাশের গৃহ যেমন মুখরিত হইয়াছিল, কয়েক দিনের মধ্যেই তাহা নীরব হইল। নববধূ পিত্রালয়ে ফিরিয়া গেল।

বিদায়কালে সুরভি কুহুকে বলিল, "আজকের মত চল্লেম, ভাই, মা বল্লেন, পৌষ মাসটা ওখানে রেখে মাঘ মাসের প্রথমেই আমাকে এখানে আনবেন। আমি ফিরে এসে তোমাকে যেন পাই, দিদি। তুমি কল্‌কাতায় পালিও না।"

কুহু বলিল, "না সুরভি, পালাবো না। আমি গাঁয়ের মেয়ে, গাঁয়েই থাকবো, ভাই, তুমি আমায় এখানে রেখে বাপের বাড়ী বেশী দিন মজা ক'রো না। শীগ্‌গির ফিরে এস।"

সুরভি চলিয়া গেলে কুহু আপনার নিভৃত কক্ষে ফিরিয়া আসিল। এ কয়েক দিন এক অদম্য উদ্দীপনার আনন্দে কুহুর দিনগুলি মন্দ কাটে নাই। আজ নির্জ্জনে আসিতেই নৈরাশ্য, অবসাদ তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। এখানে সঙ্গী নাই, সাথী নাই, করিবার কিছুই নাই। এ কয় দিনে অবস্থা আরও

দূরে সরিয়া গিয়াছে, হাত বাড়াইয়া তাহার নাগাল পাওয়া কঠিন। বিরাগে বিতৃষ্ণায় কুহু হৃদয় হইতে যতই তাহাকে দূরে ঠেলিয়া দিতে চাহে, সে যেন ততই নিকটে সরিয়া আসে।

শীতের অলস মধ্যাহ্নে কুহু কিছুতেই জয়ন্তর আশা ত্যাগ করিতে পারিল না। স্বামীর পরিত্যক্ত শয্যা ঝাড়িয়া, ঘর সাজাইয়া কুহু অন্যমনস্কভাবে জয়ন্তর বিছানায় শুইয়া পড়িল। এ বিছানা কেবল জয়ন্তর নহে, তাহারও, কিন্তু এখানে আসিয়া উহার অধিকারে সে বঞ্চিত হইয়াছে বলিয়াই জয়ন্তর শয্যা তাহাকে টানিয়া আনিয়াছিল। যে জিনিষ অধিকারে আসিয়াও আসে না, তাহার প্রতি লোভের অন্ত থাকে না।

উপধানে মস্তক রক্ষা করিয়া কুহু স্বামীর অঙ্গ-সৌরভ অনুভব করিতে লাগিল। জয়ন্ত যেন নিকটে রহিয়াছে! বিছানায় তাহার গায়ের গন্ধ, দেহের স্পর্শ নিহিত হইয়া কুহুকে মুগ্ধ পুলকিত করিয়া তুলিয়াছে! কুহু চক্ষু মুদিয়া মনে মনে ডাকিতে লাগিল, "তুমি এস, এস, একটিবার আমার কাছে এস, ক'দিন তোমায় দেখি না, কাছে পাই না। তুমি আপনি একবার এসে আমার কাছে বোসো।"

কেহই আসিল না। দ্বিপ্রহরের মৃদু বায়ু-হিল্লোলে গবাক্ষ-নিম্নের শুষ্ক পাতা সর-সর করিতে লাগিল। অদূরের বাঁশবন হইতে মর্ম্মর-ধ্বনি ভাসিয়া আসিল। নদীর তীর-স্থিত বটবৃক্ষের শাখান্তরাল হইতে একটি চাতক পক্ষী হঠাৎ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল,—"ফটিক জল, ফটিক জল।" সম্মুখেই স্ফটিকস্বচ্ছ তটিনীর বিপুল সলিলধারা তর-তর বেগে বহিয়া যাইতেছে, এত জলেও ক্ষুদ্র বিহঙ্গের পিপাসার নিবৃত্তি হয় না। মানব-হৃদয় ভোগের সহস্র উপাদান সম্মুখে রাখিয়া সুখের অসংখ্য উপকরণ নিকটে পাইয়াও নিরাশার আগুনে পুড়িয়া মরে, ইহাও বিধাতার অভিনব খেলা।

কুহু একবার মনে করিল, নিস্তারকে পাঠাইয়া জয়ন্তকে ডাকিয়া আনাইবে। এখন কেহ কোথাও নাই, জয়ন্ত হয় ত তাহারই মত একাকী বিছানায় লুটাইয়া সংবাদপত্র পড়িতেছে। সে যে কখনও তাহাকে ডাকে নাই। কত দিন ডাকিবার সাধ হইলেও হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত ভাবকে দমন করিয়া রাখিয়াছে। স্ত্রী স্বামীকে ডাকিবে, ইহা নূতন নহে, অন্যায় নহে, কিন্তু কুহু নিস্তারকে কিরূপে বলিবে? নিস্তার ভাবিবে কি? কুহুর আহ্বানে তিনি যদি বিরক্ত হন, না আসেন? তাহা হইলে নিস্তারের নিকটে কুহুর লজ্জা রাখিবার ঠাঁই থাকিবে না।

সংশয়ে সন্দেহে কুহুর নিস্তারকে ডাকা হইল না। কুহু তেমনই পড়িয়া রহিল। দীপ্ত মধ্যাহ্ন ধীরে ধীরে অপরাহ্নের কোলে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল। স্তব্ধ জগৎ আবার কর্ম্ম-কোলাহলে জাগ্রত হইল। তৃষিত চাতক ডাকিয়া ডাকিয়া সহসা থামিয়া গেল।

কিয়ৎকাল পর সিঁড়িতে জুতার শব্দের সহিত কুহুর হৃদয় তালে তালে নাচিয়া উঠিতে লাগিল। ঐ পদধ্বনি কুহুর অজানা নহে, সে ভাল করিয়াই জানে, কিন্তু জানিলেও আজিকার মত এমন ভাবে সে যেন উহা অনুভব করিতে পারে নাই। পদধ্বনির যে একটা মাধুর্য্য আছে, কুহু আজ প্রথম তাহা উপলব্ধি করিতে পারিল। তাহার কেবলই সাধ হইতেছিল—গত দিনের অনাদর অবহেলা ভুলিয়া সে ছুটিয়া গিয়া স্বামীর বাহু ধারণ করিয়া ভ্রমর-গুঞ্জনের ন্যায় তাহার কাণে কাণে কহে—'এতক্ষণ আমি তোমাকে চাহিয়াছিলাম, তাই আমার গায়ের বাতাস তোমাকে আমার কাছে ডাকিয়া আনিয়াছে।'

সাধ হইলেও কুহু উঠিল না; ঘুমের ভাণ করিয়া শুইয়া রহিল। আশা, স্বামী আসিয়া অভিনব উপায়ে তাহার কৃত্রিম নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দিবেন। ইহা তাহার কল্পনা নহে। বজরায় এক দুর্য্যোগ রজনীর মত্ততার মধ্যে জয়ন্ত অজস্র চুম্বনে কুহুর নিদ্রার জড়তা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। দুটি চক্ষু-পল্লবে সে চুম্বনবৃষ্টি এখনও যেন লাগিয়া রহিয়াছে। সে দিনের মধুর স্মৃতি এখনও মলিন হয় নাই।

সিঁড়ির পদশব্দ দ্বারপ্রান্তে আসিতেই কুহু ঈষৎ চক্ষু মেলিয়া দেখিল, সত্যই জয়ন্ত আসিয়াছে। সে গৃহে প্রবেশ করিল না, কুহুর প্রতি নেত্রপাত করিয়া লঘুপদক্ষেপে অন্য দিকে চলিয়া গেল।

ক্ষণেক পর শিসের গানে কুহু চমকিত হইয়া বিছানা ছাড়িয়া বারান্দায় উপনীত হইল।

দালানের উন্মুক্ত বাতায়নে লোহার গরাদে বাহু হেলাইয়া জয়ন্ত শিসে গান গাহিতেছে। তাহার চক্ষুর্দ্বয় মাধুরীর কুটীরের প্রতি নিবদ্ধ।

কুহু অগ্রসর হইয়া কঠোর স্বরে কহিল, "তুমি এখানে?" পত্নীর অপ্রত্যাশিত আগমনে জয়ন্ত কিছুমাত্রও অপ্রতিভ না

হইয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া উত্তর করিল, "তোমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না কি ? আমার ইচ্ছা।"

কুহু নিজেকে আর সংযত করিতে পারিল না। উত্তেজনায় তাহার মুখ আবিরের মত লাল হইয়া গেল। তীব্রস্বরে কুহু চীৎকার করিয়া উঠিল, "তুমি এখানে কেন ? এক সতী-সাধ্বীর দিকে অমন ক'রে আমি তোমাকে চাইতে দেব না। যাও, এখান থেকে এখুনি চ'লে যাও।"

"তোমার হুকুমে যাব ? তোমার মত সতী-সাধ্বী ঢের আমার দেখা আছে। কেন ওদিকে চাই, জানতে চাও ? তুমি যেমন হিরণের সঙ্গে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ, আমার যদি সেই ইচ্ছে হয়, তাতে দোষ কি ?"

কুহুর পায়ের নীচের মেঝে অকস্মাৎ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মাথার ভিতর দপ্ দপ্ করিয়া উঠিল। সে দুই হাতে মুখ ঢাকিল। তাহার আর্তকণ্ঠ হইতে বাহির হইল—"ভগবান্ তোমাকে মাপ করবেন।"

"যাকে মানি না, যে নেই, তার মাপের জন্যে আমি ব্যস্ত নই।" বলিয়া জয়ন্ত সবেগে প্রস্থান করিল।

কুহু বিমূঢ়ার মত কিয়ৎকাল সেইখানে দাঁড়াইয়া নীচে নামিয়া গেল। সে যে কি উদ্দেশে কোথায় যাইবে, তাহা হৃদয়ঙ্গম না করিয়াই মাধুরীর কুটীরাভিমুখে ধাবিত হইল।

রান্নাবাড়ীর রোয়াকে পাণের সরঞ্জাম সম্মুখে লইয়া নিস্তার নফরা চাকরের সহিত কিসের তর্ক করিতেছিল, হঠাৎ বৌরাণীকে পরাণ চক্রবর্তীর বাড়ীর দিকে যাইতে দেখিয়া সে ব্যস্তভাবে উঠিয়া প্রশ্ন করিল, "কোথায় যাচ্ছেন, বৌরাণি ?"

কুহু তাহার প্রশ্নে কর্ণপাত না করিয়া, যেমন যাইতেছিল, তেমনই চলিতে লাগিল। অগত্যা নিস্তারকেও তাহার অনুসরণ করিতে হইল।

মাধুরীর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া, মাধুরীর শয়ন-কুটীরের একটি দৃশ্য নিরীক্ষণ করিয়া কুহুর পদদ্বয় আপনা-আপনিই থামিয়া গেল। লুপ্তপ্রায় চেতনা সজাগ হইল।

চৌকীর উপর বাবলি ঘুমাইতেছে, তাহারই পার্শ্বে বালিসে হেলিয়া পরাণ অর্দ্ধ-শায়িত। স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া, মুখের পানে তাকাইয়া মাধুরী হাসিতেছে। উভয়ের বাহুতে বাহু বদ্ধ, নিমীলিত চারি নয়নপাতা।

কুহু সরিতে চেষ্টা করিয়াও সরিতে পারিল না, চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। যাহার আকণ্ঠ শুষ্ক, সে অপরের জলপান দেখিলেও তৃপ্ত হয়; মুহূর্তের জন্য নিজের প্রাণান্ত পিপাসার তীব্রতা ভুলিয়া যায়। যে উদার, মহান্, তাহার বিড়ম্বিত জীবনের অপূর্ণতা অন্যের মধ্যে পূর্ণ বিকাশ দেখিলে পরিতৃপ্ত হয়।

৩২

"বাবলির মা, কোথা গো ?" নিস্তারের কলকণ্ঠে পরাণ ও মাধুরী বাহিরে আসিয়া বিস্মিত হইল।

পরাণ পলকের জন্য কুহুর প্রতি চোখ তুলিয়া সসম্মানে সরিয়া গেল। আনন্দে বিগলিত হইয়া মাধুরী দুই হাতে কুহুকে বেষ্টন করিয়া কহিল, "দিদি, তুমি এসেছ; আমার উঠানে তোমার পায়ের ধুলো, আমার কি ভাগ্যি ? চল দিদি, ঘরে চল।"

কুহুকে ঘরে লইয়া গিয়া আসনে বসাইয়া মাধুরী তাহার কাছে বসিল।

নফরার সম্মুখে নূতন জর্দ্দার কৌটা খুলিয়া রাখিয়া আসিয়াছে মনে পড়ায় নিস্তার আর দেরী করিতে পারিল না। "আমি এখন যাচ্ছি, বৌরাণি, আবার আসবো'খন।" বলিয়াই উর্দ্ধশ্বাসে সে প্রস্থান করিল

মাধুরী কুহুর ডান হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "সত্যি দিদি, তুমি যে আমার এখানে আসতে পার, তা আমি এক দিনও ভাবিনি। আজ সকালে আমি যেন কার মুখ দেখে উঠেছিলাম! মা ও-ঘরে ঘুমুচ্ছেন, মাকে ডেকে আনি, তোমায় দেখলে কত খুসী হবেন।"

কুহু নীরবে ঘাড় নাড়িয়া মাধুরীকে নিষেধ করিল।

এতক্ষণ মাধুরী কুহুর মুখের ভাব তেমন লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই; এখন মুখের দিকে চাহিয়া উদ্বেলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি অসুখ করেছে, দিদি ? এমন দেখাচ্ছে কেন ? শরীর খারাপ নিয়ে কি বেরুতে হয় ? আমাকে ডেকে পাঠালে আমিই যেতাম। এসেছ বেশ করেছ, তোমার আর ব'সে থেকে কায নেই, আমার বিছানায় শোবে চল, সে ছিরির বিছানা, শুতে কষ্ট হবে। একটা ধোয়া চাদর বিছিয়ে দিচ্ছি।"

কুহু কোনরূপে তাহার রুদ্ধ কণ্ঠস্বরকে পরিষ্কার করিয়া কহিল, "না, অসুখ হয় নি, শুতে হবে না ; তুমি ব'স, মাধুরী।"

কুহু নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই চমকিত হইল। সাময়িক উত্তেজনায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া সে কেন মাধুরীর নিকটে ছুটিয়া আসিয়াছে ? মাধুরীকে সে কি বলিবে ? কি বলিতে পারে ? ক্ষণকাল পূর্ব্বে তাহাদের স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে যে ইতরোচিত বচসা হইয়া গিয়াছে, জগতে কাহারও কাছে তাহা প্রকাশ করিবার নহে। কর্ণান্তরে যাইবার আশঙ্কায় কুহুর হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কুহু স্বামীকে ভালবাসে, আজ তাহার প্রথম উপলব্ধি হইল—স্বামী অপেক্ষা স্বামীর সুনামকে সে আরও বেশী ভালবাসে। সেই সুনাম রক্ষা করিবার আশায় মাধুরীকে সাবধান করিবার সংকল্পে কুহু আজ ঘরের বাহির হইয়াছে। কিন্তু এখন ভাবিয়া দেখিল, দুইটার একটাও তাহার দ্বারা সাধিত হইবে না। স্বামীর অবগু চরিত্রের ইঙ্গিত করিয়া মাধুরীকে সতর্ক করিতে গেলেই জলের নিম্নের পাঁক গুলিয়া সমস্তটা জল ঘোলা হইয়া যাইবে, মাধুরীকে মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না।

শীতের অপরাহ্নেও কুহুর ললাট ঘর্ম্মসিক্ত হইতে লাগিল। কিছু একটা যে ঘটিয়াছে, তাহা বুঝিতে মাধুরীর বিলম্ব হইল না। কিন্তু সেটা যে কি, তাহা অনুমান করিতে না পারিয়া মাধুরী উদ্‌গ্রীব হইয়া পুনশ্চ কহিল, "তুমি বারণ কর্‌ছ, কিন্তু তোমার শরীর যে বড্ড খারাপ হয়ে গেছে, দিদি। সেটা আমি ভাল করেই বুঝ্‌তে পারছি। আমি তোমার ছোট বোন, আমায় পর ভেব না। কি হয়েছে, আমায় তা বল্‌বে না ? অসুখ কর্‌লে—মন খারাপ হ'লে তা চেপে রাখতে গেলে আরও যে কষ্ট হয় !"

কুহু ধরা গলায় কহিল, "না মাধুরী, অসুখ হয়নি, আমার মনও খারাপ হয়নি। বাবুল কতক্ষণ হল ঘুমিয়েছে ? এখন উঠ্‌বে না ?"

"এই খানিক আগে ঘুমিয়েছে, ওকে তুলে আনি।" বলিতে বলিতেই মাধুরী উঠিয়া গিয়া বাবলির হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল।

কাঁচা ঘুম ভাঙ্গাতে বাব্‌লি খুসী হইল না, বার দুই হাই তুলিয়া ক্রন্দনের উপক্রম করিতেই মাধুরী বেড়ার গায়ে ঝুলানো তক্তার উপর হইতে একটি বিস্কুটের টিন খুলিয়া একখানা বড় বাতাসা মেয়ের হাতে দিতেই বাবলি চুপ করিয়া চারিদিকে মিটি মিটি চাহিতে লাগিল।

কুহু টলিতে টলিতে বাবলির পরিত্যক্ত শয্যায় তাহারই ছোট বালিসটা মাথায় দিয়া হঠাৎ শুইয়া পড়িল।

মাধুরী বাবলিকে কুহুর কোলের কাছে বসাইয়া দিয়া নিজের বালিসটিতে একটা ধোয়া তোয়ালে মুড়িয়া কুহুর মাথার নীচে গুঁজিয়া দিতে দিতে বলিল, "তুমি যে ব'সে থাক্‌তে পারছিলে না দিদি, তা তোমায় দেখামাত্র আমি বুঝতে পেরেছি। ধোয়া চাদর পেতে ভাল ক'রে বিছানাটা ক'রে দিতে পার্‌লাম না। এ পা-পোঁছা ন্যাকড়ার ভেতর কি তোমাদের মত মানুষ শুতে পারে ? মাথা কি বড্ড ধরেছে, দিদি ? একটু জল দিয়ে হাওয়া ক'রে দেই ? বিয়ের গোলমালে ক'রাত তোমার ঘুম হয়নি, বিশ্রাম হয়নি, আমার মনে হয়, তাতেই অসুখ করেছে। উনি ত বাড়ীতেই রয়েছেন। তোমাদের ডাক্তার বাবুকে কি খবর দেব ? না রাজাবাবুকে ডেকে পাঠাব ?"

কুহু সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, "না, না, কাউকে তোমার ডাকাতে হবে না, মাধুরী। আমার কিছু অসুখ হয়নি। তোমায় ব্যস্ত হ'তে হবে না। তুমি শুধু আমার কাছে ব'সে থাক।"

বলিয়াই বাবলিকে বুকের ভিতর নিবিড় করিয়া চাপিয়া ধরিয়া চুম্বনে চুম্বনে কুহু তাহার বাতাসা-রসপরিষিক্ত অধর দুইটি ভরিয়া দিতে লাগিল।

উগ্র আদরের আতিশয্যে বাবলি ভীত হইয়া মায়ের দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া কুহুর বুকের ভিতর ছটফট করিতে লাগিল।

মাধুরী সস্নেহে মেয়ের পিঠ চাপড়াইয়া কহিল, "মাসীর কাছে থাক বাবুল, দুষ্টামি ক'রো না। লক্ষ্মী হয়ে থাক্‌লে নাড়ু দেব, কুল দেব্‌, ঐ শালিক পাখী আসছে, মেনি বেড়াল এখুনি দুধ খেতে আসবে।"

এ সান্ত্বনায় বাবলি শান্ত হইতে পারিল না। বার কয়েক ঠোঁট ফুলাইয়া তারস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

কুহু ক্লান্তে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়ামাত্র সে মায়ের কোলে গিয়া বসিল।

একটি শিশুর ক্ষণিকের স্পর্শে কুহুর বেদনার পাহাড় গলিয়া দুই চোখে ধারা বহিতে লাগিল। কত দিনের কত

পুঞ্জীভূত অব্যক্ত যন্ত্রণা যে সে অশ্রুধারার মধ্যে নিহিত ছিল, তাহার সন্ধান কেহ রাখিত না।

মাধুরী চকিতে দৃষ্টিপাত করিয়া তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া কুন্তর ভিজা চুলে আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে লাগিল। কুন্ত কেন কাঁদে? তাহার কিসের দুঃখ, মাধুরী তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। যাহার দুঃখ, সে প্রকাশ না করিলে দুঃখের কাহিনী জোর করিয়া টানিয়া বাহির করা যে অন্যায়, সেটা সরলা মাধুরীর অজানা ছিল না। কুন্তর অযাচিত দানে কৃতজ্ঞ হইয়া, তাহার সুমিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া মাধুরী কুন্তকে ভালবাসে নাই। ভাল লাগিয়াছে বলিয়াই ভালবাসিয়াছে। প্রথম দর্শনে উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। একের এতটুকু বেদনা অপরে সহিতে পারে না।

কুন্তর অশ্রুতে মাধুরীরও চক্ষু সজল হইল; কিন্তু সে কুন্তকে জানিতে দিল না। কুন্ত তাহার নিকটে যাহা লুকাইয়া রাখিল, মাধুরী তাহা জানিতে না চাহিলেও কুন্তর ব্যথায় ব্যথিত হইল।

বাবলি মার কোলে আসিয়াই শান্ত হইয়া বাতাসা খাইতেছিল। মেয়েকে হাঁটুর উপর বসাইয়া কুন্তর চুল চিরিয়া দিতে দিতে মাধুরী সম্মুখের খোলা জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিল। শীতের অল্পায়ু বেলা কখন্ অপরাহ্নের দিকে গড়াইয়া পড়িয়াছে। নদীর পরপারে ঘনমসীবর্ণের বৃক্ষান্তরালে সূর্য্য বিদায়োন্মুখ। আকাশের খানিকটা গাঢ় রক্তবর্ণে অনুরঞ্জিত। সেই রঙের সমুদ্রে পাখা মেলিয়া বলাকা উড়িয়া যাইতেছে। বাতায়নের নিম্নেই একসারি গাঁদা গাছে অসংখ্য গাঁদা-ফুল ফুটিয়াছে। তাহাদের গাঢ় হরিদ্রা-বর্ণের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া অদূরের খর্ব্বাকৃতি খেজুর গাছটিতে দুই কাঁদি হলুদ রংএর খেজুর ফলিয়াছে। গাঁদাগুলি এখনও যেমন পূর্ণ বিকশিত হয় নাই, খেজুর-কাঁদির তেমনই সুপক্ক হইবার বিলম্ব আছে।

অশ্রুধারায় উপধান সিক্ত করিয়া কুন্ত শান্ত হইল। প্রচুর বারিবর্ষণে তাহার হৃদয়াকাশের ঘন মেঘরাশি অনেকটা লঘু হইয়া আসিল। নিজের ক্ষণিকের দুর্ব্বলতায় কুন্ত নিরতিশয় লজ্জিত হইয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া হাত বাড়াইয়া বাবলিকে আদর করিতে লাগিল।

বাবলির ঘুমের ঘোর কাটিয়া গিয়াছিল, সে কুন্তর আদরে সন্তোষের হাসি হাসিল। এমন সময় ক্ষান্তমণি হাঁকিলেন, "ও মাধু, আজ কি তোরা উঠবি নে? বেলা যে একেবারে গেল, বাবুলকে দুধ খাওয়াবি কখন্?"

মাধুরী ডাকিল, "এস মা, দেখে যাও কে এসেছে।"

ক্ষান্তমণি ঘরে ঢুকিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার নাতনীর ছেঁড়া-কাঁথার বিছানায় জমিদার-পত্নী স্বয়ং বিরাজমান। তাঁহার কন্যার ভবিষ্যৎ আকাশে সৌভাগ্যের দীপ্ত সূর্য্য উদয় হইবার আর বিলম্ব নাই। আনন্দে তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল হইল। তিনি গদগদ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "কি আশ্চর্য্যি, আমার মেয়ে এসেছেন। মাধুরী, তোর আক্কেল-খানা কি, তা বল্ ত? একটা পরিষ্কার বিছানা ক'রে দিতে পারিস নি? আমায় ডাকিস নি? বিদুরের কুঁড়েয় নারায়ণ এলে কি তাঁকে হেনেস্তা করতে হয়? নিজেদের খুদ কুঁড় যা থাকে, তাই দিয়ে সেবা করতে হয়, সেটাও এত বড় মেয়ে জানে না?"

কুন্ত বিছানায় বসিয়া ম্লান হাসির সহিত কহিল, "আপনি মাধুরীকে অত বলবেন না, মাসীমা, আমি এতক্ষণ খুব আরামে শুয়েছিলাম। বাবলির বিছানাটা যেমন নরম, তেমনই মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ। আমি নারায়ণও নই, বিদুরের কুঁড়েয়ও আসি নি। ছোট বোনের বাড়ী এসে বোনঝির বিছানায় শুয়েছি। আপনি বসুন, মাসীমা।"

ক্ষান্তমণি সন্তর্পণে চৌকীর কোণে বসিয়া প্রসন্ন-মুখে বলিলেন, "তুমি ভালবেসে যে এসেছ মা, তা কি আমি জানি না? তবু মাধুর ত একটু যত্ন-আত্তি করতে হয়। ওর বুদ্ধিটাই ভারী কম, আমার এত বকুনিতেও মেয়ের বুদ্ধি হ'ল না। ছেলের মা হ'ল, বয়েস হ'ল, তবু যেন কেমন হ্যাকা-হ্যাকা!"

"দিদির কাছে তুমি প্রাণ খুলে আমার নিন্দা কর মা, আমি ততক্ষণ বাবলির দুধ গরম ক'রে আনি।" বলিয়া মাধুরী বাবলিকে কুন্তর দিকে ঠেলিয়া দিয়া দুধ আনিতে চলিয়া গেল।

কুন্ত সস্নেহে বাবলিকে কোলে তুলিয়া দোলা দিতে দিতে বলিল, "মাসীমার বাতের ব্যথা এখন কেমন?"

আপনার রোগের ব্যাখ্যা করিতে ক্ষান্তমণি অতিশয় ভালবাসিতেন, পরনিন্দার চেয়েও সেটা তাঁহার বেশী মুখ-রোচক হইয়া উঠিয়াছিল।

ক্ষান্তমণির পীড়ার বর্ণনা শুনিতে শুনিতেই কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইল। ইহারই ভিতর মাধুরী বাবলিকে দুধ খাওয়াইয়া গা মুছিয়া দিয়া কুন্তুর চুলের গোছা লইয়া বসিল। কুন্তু আপত্তি করিল না। বিনা প্রতিবাদে তাহার এলো খোঁপা বাঁধা হইল। কুন্তুকে সিন্দুর পরাইয়া দিয়া মাধুরী কহিল, "চল দিদি, হাত-মুখ ধুয়ে আসবে। বাড়ী যেয়ে ধোবে? না, তা হবে না। এখানে মুখ ধুয়ে তোমায় একটু বাতাসা মুখে দিয়ে জল খেতে হবে। আজ যখন প্রথম এ বাড়ীতে তোমার পায়ের ধূলো পড়েছে, শুধু মুখে তোমায় আমি যেতে দেব না।"

কন্যার উপস্থিত বুদ্ধিতে ক্ষান্তমণি খুসী হইয়া বলিলেন, "ওঠো মা, মুখ ধুয়ে মুখে কিছু দাও। তোমাকে দেবার মত মাধুর কিই বা আছে? তবু আকিঞ্চন। তুমি যেমন ওকে ভালবাসো, ও তেমনই দিদি বলতে অজ্ঞান। গরীবের ভালবাসা মনের ভেতরেই থাকে, তা দেখাবার সাধ্যি হয় না।"

"আমি কিছু খেলে আপনারা যদি খুসী হন মাসীমা, তা হ'লে আমি খাব না কেন? এখন খাওয়া আমার অভ্যাস নেই বলেই আপত্তি করেছিলাম। কি দেবেন, নিয়ে আসুন, আমি এখুনি খাচ্ছি।"

খাবার আনিতে বিলম্ব হইল না। একটু দুধের সর, ক'খানি বাতাসা, চারটি নারিকেল নাড়ু। সামান্য উপকরণ, কিন্তু আন্তরিকতায় ভরা।

খাদ্যের সম্মুখে বসিতেই প্রভাতের শিশিরসিক্ত ফুলের মত কুন্তুর চক্ষু দুটি অশ্রু-সমাকুল হইল। মনে পড়িল—ক্ষীরপুর, মা'র স্নেহ, বাবার ভালবাসা, দিদি-অন্ত-প্রাণ তপুকে! শীতের বাতাস মাধুরীর মধ্য দিয়াই যেন তাহাদের স্পর্শ কুন্তুর প্রাণে জাগাইয়া তুলিতেছে।

৫৩

সন্ধ্যার সময় নিস্তার কুন্তুকে লইতে আসিল। কুন্তুর আজ ঘরে ফিরিবার মন ছিল না, ত্বরা ছিল না। বাহিরে এবং বাহিরের লোকের সহিত মিশিয়া থাকিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু সন্ধ্যার পর আর বাহিরে থাকা চলে না। তাহার বধূত্বের সম্মান বজায় রাখিবার নিমিত্ত অবাধ্য পা দুটিকে টানিয়া লইয়া যাইতেই হইবে। সে বদ্ধ কারাগারে হৃদয় যে যাইতে চাহে না। বিবাহের পবিত্র মন্ত্রের প্রভাবে পরস্পর দুইটি প্রাণ অনন্ত-মিলন-সূত্রে গ্রথিত হইয়া যে নীড়টিকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিবার কথা, কুন্তুর ভাগ্যে তাহার সার্থকতা কোথায়? সে নিরর্থক লৌহবলয় ধারণ করিয়াছিল, লোহা লোহা হইয়াই রহিল, স্বামীর প্রেমশৃঙ্খল হইতে পারিল না। অন্তরে যাহাই থাকুক, তবু বাহিরে সে স্বামীর স্ত্রী।

কুন্তুকে আগাইয়া দিতে আসিয়া মাধুরী কহিল, "আবার এস দিদি, কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখান ভাল নয়। কাল দুপুরে আমি তোমার কাছে যাব—নেমন্তন্ন দিয়ে রাখলাম। রাজাবাবু—না, আর রাজাবাবু নয়, দিদির বরকে এবার থেকে দাদাবাবু বলতে হবে। তিনি ক'টা অবধি ওপরে থাকেন? নীচে নামবার সময় তোমার দালানের জানলায় নিত্যি এসে দাঁড়ান। তাই দেখে তোমার ভগ্নীপতি আমায় যা তা ব'লে ঠাট্টা করেন। বলেন, 'রাজাবাবুর সঙ্গে মিষ্টি সম্বন্ধ পাতিয়ে এখন স'রে থাকলে চলবে না।' উনি বাইরে যাবার সময় তোমায় ডেকে ব'লে যাচ্ছেন—'তোমার দিদি একলা রইলেন, এখন দিদির কাছে এস'।"

বলিয়া মাধুরী মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

এ তরল উপহাসে কুন্তুর হাসির ধারা সহসা শুকাইয়া কঠিন হইয়া উঠিল। কুন্তু মাধুরীর কথায় যোগ না দিয়া দ্রুতপদক্ষেপে একবারে রাস্তায় আসিয়া পড়িল।

নিস্তার পশ্চাৎ হইতে বলিতে লাগিল, "খিড়কির পথে না গিয়ে এ-যে নদীর পথে চল্লে, বৌরাণি? তা চলুন, এ সময় এ দিকে কেউ থাকে না। বড় রাজাবাবু কি সোন্দর ঘাট বানিয়ে দেছেন, সৃষ্টির লোক দেখে তারিপ ক'রে যায়। আজ আপনাকে ঘাট দেখিয়ে নে যাই।"

কুন্তু নিরুত্তরে পাকা সড়কটুকু অতিক্রম করিয়া ঘাটের সম্মুখে আসিয়া থামিল।

জমিদার-বাড়ীর দেউড়ীর নীচেই শুভ্র পাথরে বাঁধান প্রশস্ত ঘাট। সোপানের পর সারি সারি সোপান নদীগর্ভে নামিয়া গিয়াছে। চত্বরের দুই পার্শ্বে একাধিক লোকের বসিবার বেদী। নিম্নে বারিসংলগ্ন দুইটি চত্বর। একখানিতে শঙ্খ বাজাইয়া ভগীরথ অগ্রসর হইতেছেন। মর্ম্মর জটাজালে তরুণ তাপসের কমনীয় সৌম্য বদনের কিয়দংশ আবৃত। শান্ত আঁখিদ্বয় সফলতার আনন্দে

উদ্ভাসিত। সুচিক্কণ ওষ্ঠে পরিতৃপ্তির প্রসন্ন হাসি বিশ্বে বিকীর্ণ হইতেছে। অপর চত্বরে মকরবাহিনী গঙ্গা-মূর্ত্তি। করুণায়, মহিমায়, দেবত্বে ঝলমল করিতেছে। দূর হইতে সন্ধ্যার ম্লান আলোকে ভাস্করের নৈপুণ্য জীবন্তরূপে প্রতিভাত হইতেছে।

স্থান নির্জ্জন, ঘাট জলপূর্ণ। সন্ধ্যার স্নিগ্ধচ্ছায়া চতুর্দ্দিকে ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে। পরপারে দেবদারু-বনের শিখরদেশে কৃষ্ণপক্ষের জীর্ণপ্রান্ত চাঁদ উদিত হইয়াছেন। পাখীর বাসায় ডানা ঝাড়িবার শব্দ থামিয়া গিয়াছে। কেবল নদীর কল-কল ছল-ছল শব্দের সহিত তীরস্থ বৃক্ষ সর্-সর্ শব্দে বাতাসে কাঁপিতেছে।

কুহু কয়েকটা সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া গঙ্গা-মূর্ত্তির সম্মুখে আসিল, কিন্তু ভালরূপে নিরীক্ষণ করিবার পূর্ব্বেই দাঁড়ের শব্দে সচকিত হইয়া ঘাড় ফিরাইতেই তাহার চোখে পড়িল—জয়ন্তর বোটখানা তটের হাত দশেক দূর দিয়া তীরবেগে ছুটিয়া যাইতেছে। বোটের উন্মুক্ত জানালার পার্শ্বে সেজ জ্বলিতেছে। জয়ন্ত বিছানায় বসিয়া; তাহার ক্রোড়ে ঈষৎ হেলিয়া এক তরুণী। দেখিতে না দেখিতে দাঁড়ের টানে বোট সরিয়া গেল। কিন্তু সেই নিমেষের দেখা তরুণীর হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি কুহুর পরিচিত বলিয়া মনে হইল। কবে কোথায় যে উহাকে দেখিয়াছে, সেটা স্মরণ হইল না।

কুহু অপলক-নেত্রে সেই ভাসমান বোটের প্রতি চক্ষু মেলিয়া মূর্চ্ছাতুরার ন্যায় সোপানে বসিয়া পড়িল। মুহূর্ত্তে তাহার অন্তর-বাহির নিশীথিনীর নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। নদীগর্ভে আজ যেন তাহার জীবনের আশা, আনন্দ, আলো একসাথে বিসর্জ্জন হইয়া গেল। যাহার সম্ভাবনায়, যাহা ভুলিবার নিমিত্ত সে বাহিরে আসিয়াছিল, তাহার অকরুণ ভাগ্যবিধাতা রহস্যের মর্ম্মান্তিক দৃশ্যময় যবনিকাটি তাহার দৃষ্টিপথে খুলিয়া ধরিলেন। সন্দেহ নহে, সংশয় নহে, একবারে বাস্তব; যে সত্য আজ তাহার নেত্রপথে প্রতিভাত হইল, কুহু তাহা অস্বীকার করিবে কি করিয়া? মনের মধ্য হইতে মুছিয়া ফেলিবেই বা কি প্রকারে? মুছিতে চাহিলেই যে মোছা যায় না।

নিস্তার জলে নামিয়া, মুখ ধুইয়া, এক অঞ্জলি জল মাথায় ছিটাইয়া দিয়া কহিল, "বৌরাণি, চল, বাড়ী যাই, রাত হয়েছে, কোনখেন থেকে কেউ দেখলে বলবে, 'নিস্তার বৌরাণীকে নদীর ধারে হাওয়া খাওয়াতে নে গেছে'।"

কুহু পঞ্জরভেদী একটি নিশ্বাস মোচন করিয়া অনেকক্ষণ পর কহিল, "একটু পরে যাব, পুঁটুর মা; তুমি ব'সো।"

নিস্তার অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল, বড়লোকের সবই আশ্চর্য্য! স্ফূর্ত্তি করিয়া জলের ধারে আসিয়া হঠাৎ গলায় শোকের সিন্ধু উছলিয়া উঠে কেন? ঘরের বৌ কাছারীর ঘাটে আসিয়া যাইবার নাম নাই। যাইতে চাহিবেই বা কিসের লজ্জায়? এক বৌ বিলাতে বেড়াইতে গেলেন, ইনিও দিন কতক ভিজা বিড়াল সাজিয়া ক্রমে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিতেছেন। এখন মেয়ে একটা সাহেব বিয়ে করলেই ষোল কলা পূর্ণ হয়। নিস্তার মনে মনে গজর-গজর করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার একবারও স্মরণ হইল না যে, সে-ই কুহুকে ঘাটে টানিয়া আনিয়াছে।

উদ্বেলিত হৃদয় শান্ত করিয়া কুহুর ফিরিতে রাত্রি হইল, অনুযোগ অভিযোগ করিবার কেহ না থাকিলেও বাসনা অভিমান করিয়া কহিল, "আমি এখানে থাকবো না বৌদি, আমায় দাদামণির কাছে পাঠিয়ে দাও। আমার ভাল লাগছে না, লেখা-পড়াও হচ্ছে না। তোমরা যে যার বেড়িয়ে বেড়াবে, আমায় কেউ সঙ্গে নেবে না, আমি এখানে থাক্‌তে চাই নে।"

এখানে আসিবার পর এই প্রথম কুহু বাসনার লেখা-পড়ার কথা শুনিল, ভাল না-লাগার কথা শুনিল। বিবাহের গোলমাল মিটিয়া গিয়াছে, বাসনার নূতন সঙ্গী-সাথীর দল প্রস্থান করিয়াছে। এখন নূতন আনন্দে, নূতন খেলায় বালিকার চিত্ত বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। কুহু সেটা ভুলিয়া নিজের দুঃখ-বেদনার ভারে নিপীড়িত হইয়া সমস্ত বেলা ও সন্ধ্যাটা অন্যত্র অতিবাহিত করিয়া আসিল, এই লজ্জাটুকু কুহুকে বিঁধিল। সে সস্নেহে বাসনাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "আমি ত তোমায় রেখে কোথাও যাই না, বাসনা। আজ একবার বাবলিদের ওখানে গিয়েছিলাম, তাইতে রাগ হয়েছে? আচ্ছা, এর পর যেখানেই যাই, তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাব। তুমি কোথায় যাবে? দাদামণি ত এক যায়গায় থাক্‌ছেন না, দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ক'দিন পরেই ত তিনি

ফিরে আসবেন। এসে তোমার পড়াশোনার ব্যবস্থা করতে চেয়েছেন। তুমি এতক্ষণ খালি বাড়ীতেই বা ছিলে কেন? তোমার দাদাদের সঙ্গে বোটে বেড়াতে গেলেই পারতে?"

"বেড়াতে নিয়ে গেলে ত যাব? দাদা দুদিন আমায় নিয়ে গিয়েছিল, তার পর আর নেয় না। কাকীমার বাড়ী থেকে এসে দেখি, তুমি নাই, দাদা বেরিয়ে গেছে। আমি বাগানে চুপটি ক'রে ব'সেছিলাম, তাই দেখে হিরণদা নদীর ধারে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল। আমি কাল দাদামণিকে আসতে লিখে দেব। নিত্যি নিত্যি আসবো ব'লে আর আসা হয় না। ভারী আহ্লাদ হয়েছে।"

বাসনার দুই চক্ষু ছাপাইয়া অভিমানের অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ছলছুতায় অভিমানের বন্যায় ভাসা বাসনার নূতন নহে। তবু পিতৃমাতৃহারা বালিকার দুঃখটুকু আজ কুন্তর মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিল। সত্যই ত বাসনার কষ্ট হইবারই কথা, এই বয়সেই বেচারা পিতার স্নেহ জানে না, মা তার ভালবাসা জানে না। যিনি স্নেহে মমতায় পিতা-মাতার স্থান অধিকার করিয়াছেন, তিনিও দূরে। যিনি নিকটে আছেন, তিনি ভগিনীর প্রতি উদাসীন, বালিকার সঙ্গহীন দিন কাটে কি প্রকারে?

বাসনার পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কুন্ত কহিল, "দাদামণিকে শীগগির ক'রে আসতে কাল আমরা দুজনেই লিখবো। যাতে চিঠি পেয়েই চ'লে আসেন, তেমনি ক'রেই লিখতে হবে। যে কদিন দাদামণি না আসবেন, সে ক'দিন আমি তোমার সঙ্গে খুব গল্প করবো, 'ক্যারম' খেলবো, ছাদে বেড়াবো, বাগানে ফুল তুলতে যাব। আর যদি কেউ তোমায় বোটে ক'রে বেড়াতে না নিয়ে যায়, তুমি হিরণদা'র সাথেই বেড়াতে পারবে। আজ তোমরা কত দূর থেকে বেড়িয়ে এলে? চাঁদের আলোয় জলের ধারে বেড়াতে বেশ মজা।"

বাসনা প্রীত হইয়া জবাব করিল, "সত্যি বৌদি, ভারি মজা; তোমাকে এক দিন নিয়ে যাব, ভাই। আজ আমরা সর্দ্দার-পাড়ার দিকে গিয়েছিলাম। ফিরে আসবার সময় দেখি, আমাদের বোট সর্দ্দার-বাড়ীর ঘাটে লাগানো। কে যেন বোটে এসে উঠলো; অমনি বোট ছেড়ে দিলে।"

কুন্তর বুক দুলিয়া উঠিল। সে অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে উঠলো বোটে?"

"কি জানি বৌদি, একটা মেয়ের মত মনে হ'ল। সন্ধ্যে হয়েছিল, দূর থেকে বুঝতেই পারলাম না। দাদা বড্ড দুষ্টু হয়েছে, একলা একলা বেড়াবে, আমাদের নেবে না। হিরণদাকেও না। হিরণদা খুব রেগে গেছে, আমায় বলছিল, 'আমি দু-একদিনের মধ্যেই পিসীমার কাছে চ'লে যাব।' হিরণদা যদি সত্যিই চ'লে যায়, তা হ'লে কে নদীর ধারে বেড়াতে নিয়ে যাবে?"

"হিরণদা রেগে বলেছেন। যাবেন না। তোমার ভয় নেই।" বলিয়া কুন্ত বাসনাকে সান্ত্বনা দিলেও নিজে তেমন শান্ত হইতে পারিল না। হিরণ কি সত্যই চলিয়া যাইবে? তাহার চলিয়া যাওয়ার ভিতরে জয়ন্তর কি ইঙ্গিত আছে? যে বিষদিগ্ধ বাণ স্বামী আজ তাহার অন্তঃকরণে বিদ্ধ করিয়া দিয়াছে, হিরণ কি তাহার সন্ধান পাইয়াছে? সেই হীন উক্তি ঘুণাক্ষরে হিরণের কর্ণগোচর হইলে কুন্ত কিরূপে হিরণকে মুখ দেখাইবে? একান্ত বিশ্বাসে দাদা বলিয়া ডাকিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইবে? আহা, হিরণের যে কেহ নাই, কিছু নাই। পরকে ভালবাসিয়া পরের আশ্রয়ে বিড়ম্বিত জীবন-যাপন কত মর্ম্মান্তিক—কত পরিতাপের!

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী।



একটি ভুল

নকুলবাগান নারী-সঙ্ঘের কার্য্যকরী সমিতির আজ বাৎসরিক অধিবেশন। সদস্যারা প্রায় সকলেই সভাভঙ্গের পর চলিয়া গিয়াছেন, কেবল সেক্রেটারী মিস্ মিনতি দত্ত তখনও সমিতির খাতাপত্রে নিবিষ্টচিত্তে নিমগ্ন। বিজলী-পাখার ঝাড়ো হাওয়া তাহার কপোলে চূর্ণকুন্তলগুলির অলকা-তিলকা আঁকিয়া দিতেছিল, তাহার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বিজলী-বাতির আলোয় আরও উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। দূরে দ্বার-সান্নিধ্যে তিনটি তরুণী গভীর তর্ক-বিতর্ক ও হাস্য-পরিহাসে মসগুল হইয়াছিল। সেক্রেটারী মিনতি তাহাদের সকলেরই অপেক্ষা যে বয়োজ্যেষ্ঠা, তাহা তাহার মুখমণ্ডলই বলিয়া দিতেছিল।

তরুণী তিনটির মধ্যে তর্ক বাধিয়াছিল—পুরুষ জাতির ঘোর স্বার্থপরতা সম্পর্কে। একটি মেয়ে সঙ্গিনীর হাতে টান দিয়া বলিল, "আয় সুধী, যাই আমরা। ঢের বকাবকি হয়েছে, খিদে লেগে গেছে। অঞ্জি যাবে না ত মিনতি দিদিকে না নিয়ে।"

দ্বিতীয়া বলিল, "খিদে লেগেছে বলে! নাড়ী জ্বলে যাচ্ছে, ভাই। অঞ্জির কি বল না, ওদের রয়েছে মোটর, ভোঁ ক'রে চলে যাবে'খন।" কথাটা বলিয়া সে অঞ্জি অর্থাৎ অঞ্জলির খোঁপায় একটা টান দিয়া সোপানের দিকে সঙ্গিনীর সহিত অগ্রসর হইল।

অঞ্জলি নামে সম্বোধিতা তরুণী হাসিয়া বলিল, "আবার আমায় নিয়ে পড়লি কেন?"

অপর্ণা যাইতে যাইতে পশ্চাতে ফিরিয়া হাসিয়া বলিল, "তোকে নিয়ে না পড়লে ভাত হজম হয় না যে আমাদের, পোড়ারমুখী! তুই যাই বল্ অঞ্জি, সুধী যা বলেছে, তা ঠিক—পুরুষ জাতটা বড্ডো গুমুরে, ওরা ভাবে, জগতের মালিকই যেন ওরা, আর আমরা ওদের দাসী-বাঁদী!"

হাসিতে হাসিতে সুধীরা ও অপর্ণা চলিয়া গেল, রহিল কেবল অঞ্জলি ও মিনতি। অঞ্জলি একটি ছুট দিয়া মিনতির পাশে হাজির হইল এবং টান মারিয়া তাহার খাতাপত্র কাড়িয়া লইয়া হাসির তরঙ্গ তুলিয়া বলিল, "নে, নে, ভারী সেক্রেটারীগিরি করছে! আটটা বাজে, খিদে পায় না যেন কারও, ওঠ বলছি।"

অঞ্জলির হেঁচকা টানে সেক্রেটারী ভূশয্যা গ্রহণ করিবার উপক্রম করিল।

যৌবন-লাবণ্যোদ্দীপ্তা অঞ্জলির সুস্থ সবল প্রফুল্ল মুখখানি দেখিয়া মিনতির নয়নে রুদ্ধ ক্রুর আগুন জ্বলিয়া উঠিল,—তাহার মুখখানা রুদ্ধ রোষ ও হিংসায় যেন মুহূর্ত্তকাল কালো আঁধার হইয়া আসিল।

অঞ্জলি সহচরীর এ ভাবান্তর মোটেই লক্ষ্য করিল কি না, বুঝিতে পারা গেল না, সে তখন সখীকে খাতাপত্র গুছাইতে সাহায্য করিতেছিল। নিমিষে মিনতি আপনাকে সামলাইয়া লইয়া জোর করিয়া অধরপ্রান্তে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল,—"যাচ্ছি লো যাচ্ছি, আমার কি সাধ রাত ভোর খাতা নিয়ে থাকি? তোর কি বল না ভাই, বাড়ীতে সাতটা দাসী-বামনী, তৈরী পোলাও-কালিয়া! আমার মত ত আর এই রাত আটটায় গিয়ে হাঁড়ী ঠেল্‌তে হবে না!"

কথাটার মধ্যে যে হিংসা ও ঈর্ষার কুটিল সুর মূর্ত্ত হইয়া উঠিল, তাহা অঞ্জলি বুঝিল কি? সে কিন্তু পূর্ব্বেরই মত হাসিয়া বলিল, "সে জন্যে আর দুঃখু কেন? এইবার ত নরেশ'দার চাকরী হ'ল, তোরা ত কাশী চল্‌লি আস্‌ছে মাসে। ভাবছি, ক্লাবের কি হবে—"

মিনতি সুর করিয়া বলিল, "এক রাজা যাবে, পুন অন্য রাজা হবে,—এর আর ভাবনা কি? আয় যাই।"

দুই বন্ধু সোপান অবতরণ করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল,

মধু চাপরাশী তাহাদের অ্যাটাচি কেস দুটা গাড়ীতে তুলিয়া দিল।

মোটর চলিতে আরম্ভ করিলে মিনতি মৃদুস্বরে বলিল, "সুধী কি বল্‌ছিল রে পুরুষদের সম্বন্ধে?"

অঞ্জলি বলিল, "তুইও যেমন, ওটা পাগল! বল্‌ছিল কি জানিস, ওরা নাকি গুমুরে জাত, আমাদের ভাবে দাসী-বাঁদী।"

মিনতি বলিল, "তা মিথ্যে কি বলেছে? শুধু গুমুরে নয়, তার উপর মিটমিটে শয়তান, যেন ভিজে বেরালটি!"

অঞ্জলি বলিল, "বা রে, তা কেন হ'তে যাবে ওরা? তার চেয়ে বরং বল্ যে, ওরা পেটডগটি, ডাকলেই তু ব'লে দৌড়ে আসে। দেখ না, অমলির মুখের কথাটি খসলেই হ'ল, দাদা অমনি সুড় সুড় ক'রে হুকুম তামিল করতে ছোটে।" অঞ্জলি হাসিয়া উঠিল।

মিনতি বলিল, "অমন কথা বলিস্ নি—গিরিন'দার মত মানুষ ক'টা জন্মায় রে এ কালে? যে অত্যাচারটা তাঁর উপর কর তুমি বাবা, অন্য কেউ হ'লে—"

অঞ্জলির উচ্চ হাস্যধ্বনিতে বাকী কথাটা ডুবিয়া গেল। সে বলিল, "অন্য কেউ হ'লে কি করতো, বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিত? দেখ্, মিথ্যে বলিস নি মিনি, ওদের জাতের ভেতর যেমনি দুষ্টু আছে, আমাদের ভেতরেও কি তেমনি নেই? এই ধর না আমাকে,—তোরাই ত বলিস, আমার মত দুষ্টু ভূ-ভারতে নেই।"

মিনতি বলিল, "তা ত নেই, কিন্তু তোর দুষ্টুমি এক রকম, আর ওদের দুষ্টুমি অন্য রকমের।"

অঞ্জলি বলিল, "হ্যাঁ, দুষ্টুমির না কি আবার রকম-ফের আছে? জ্যেঠামণির মত ভাল মানুষ কটা আছে বল দিকি?"

মিনতি বলিল, "আমি ত বলছি, ওদের মধ্যে দুচারটে ভাল। বাবার কথা বললি, ওটা মানি, আর আমিই ত গিরিনদার মত মানুষ দেখতেই পাইনে, তা ছাড়া—"

অঞ্জলি বাধা দিয়া বলিল, "বা রে! আর—আর নরেশদা?"

মিনতি বিরক্তিভরে বলিল, "তোমার নরেশদাকে নিয়ে তুমি থাকো, ভাই। তোমায় ত তাকে নিয়ে ঘর করতে হয় না। তবে তারও আর দেরী নেই বড়—তখন বোলো দিকি।"

অঞ্জলি বিস্মিত হইল, কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধও যে হইল না, তাহা নহে। মুহূর্ত্তেই কিন্তু হো হো হাসিয়া বলিল, "ওঃ, সে দিন বিমল বটব্যালের সঙ্গে 'ভাই-ভা-ভিল্লা' দেখতে গিয়ে রাত বারোটায় বাড়ী ফিরেছিলি ব'লে নরেশদা বকেছিল বুঝি খুব? সেই রাতে আমাদের ওখানে খুঁজতে এসেছিল তোকে। ওঃ, বিমল বটব্যালের সঙ্গে গিয়েছিলি শুনে নরেশদার কি রাগ!"

মিনতি অবজ্ঞাসূচক সুরে বলিল, "শুধু রাগ? গুণের ত আর ঘাট নেই কিছু! বাইরে চকচকে চুণকাম, ভেতরটা যে গ'লে খ'সে পড়ছে, তা ত কেউ জানে না!"

অঞ্জলির বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্ষণকাল নীরব থাকিবার পর সে বলিল, "কার কথা বলছিস, মিনি? তোর কথা শুনে মনে হ'তে পারেও ত, নরেশদাও ঐ দলের ভেতর পড়েছে।"

অঞ্জলি অন্যমনস্কভাবে অন্য কিছু চিন্তা করিতেছিল, তাহার দৃষ্টি মিনতির দিকে ছিল না। অন্যথা সে যদি সে সময়ে একবার তাহার সঙ্গিনীর মুখের দিকে তাকাইত, তাহা হইলে সে সেখানে যে দুর্জ্জয় ক্রোধ ও ক্রূর হিংসার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতে দেখিত, তাহার তুলনা বোধ হয় সে কোথাও খুঁজিয়া পাইত না। তবে সেই হিংসার ঝাঁজটা একেবারে বৃথা গেল না, মিনতির কথার মধ্য দিয়াই তাহা কথঞ্চিৎ আত্মপ্রকাশ করিল। মিনতি বলিল, "বলতে পারিস বটে তুই এ কথা, তোদের বিয়ের আগের পূর্ব্বরাগ চলেছে কি না! কিন্তু তা ব'লে ত বাইরের জগৎ অন্ধ থাকতে পারে না।"

অঞ্জলি বলিল, "তার মানে? তুই কি বলতে চাস, নরেশদা—"

মিনতি বাধা দিয়া বলিল, "আমি কিছুই বলতে চাই না। ত্যাখ, তুই একটা আস্ত পাগল—তোকে কতটা রাগান যায়, তাই দেখছিলুম নরেশদার নিন্দে ক'রে—অমনি ফোঁস ক'রে উঠেছিস। কিন্তু ঠিক ক'রে বল দিকি, ওদের জেতের যদি এদিক ওদিক হয়, তা হ'লে ওদের কেউ দোষ ধরে কি? ওদের সাত খুন মাপ। আর আমাদের? সুধী যা বলছিল, তার একটি বর্ণও মিথ্যে নয়।"

অঞ্জলির সমস্ত মনের অস্বস্তি অল্পক্ষণেই অন্তর্হিত হইয়াছিল, তাহার মুখখানি মেঘমুক্ত শশধরের মত আবার হাসিয়া উঠিল। সে হাসিয়া বলিল, "মুখী তার মুণ্ডু বলেছে! আয়, নামি আয় মিনি।"

মিনতি বিস্মিত হইয়া বলিল, "তুইও নামবি না কি আমাদের এখানে? বাড়ী যাবি-নি? এই যে বলছিলি ক্ষিদে পেয়েছে?"

অঞ্জলি হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা ত পেয়েছেই। তা তোদের এখানে কিছু খেতেও দিবি নি না কি?" পরমুহূর্ত্তেই কিন্তু মিনতির অপ্রতিভ হইবার ভাব দেখিয়া তাহাকে বাহুপাশে জড়াইয়া ধরিয়া গৃহপ্রবেশকালে বলিল, "দূর বাঁদরী, একবার জ্যেঠামণিকে দেখে যাব, কেমন আছেন।"

মিনতি বলিল, "আর ঐ সঙ্গে?"

অঞ্জলি বাহিরে অপ্রতিভ না হইলেও তাহার দুগ্ধ-গৌর সুন্দর গণ্ডদ্বয়ে যুগল কমল ফুটিয়া উঠিল।

২

অঞ্জলির মুখ ভার, এ যেন মস্ত বড় একটা অভাবনীয় ঘটনা! বাড়ীর সকলেরই আজ বিস্ময়ের সীমা নাই। সাত চড়েও যে অপমান বোধ করে না, বরং বদলে একুশ চড় বসাইয়া দিতে ছাড়ে না, অপমানকে যে অপমান বলিয়া গ্রাহ্য করে না, তিরস্কারের জবাবে যে মানুষের বুকে বিষ-বাক্যের শেল বিঁধিতে দ্বিধা বোধ করে না, নিন্দাস্তুতিতে যে ভ্রূক্ষেপও করে না,—হঠাৎ তাহার এ ভাবান্তর কেন, তাহার অতি আপনার জনও তাহা বুঝিতে পারিতেছে না।

"কি গো, তোতা পাখী আজ ভোঁতা কেন গো আমাদের"—ছেলে কাঁকে করিয়া কথাটা বলিতে বলিতে ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়া অমলা থমকিয়া দাঁড়াইল। অঞ্জলির চোখে জল?—টেবলের উপর মুখ গুঁজিয়া অঞ্জলি ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে! এ কি দৃষ্টিভ্রম?

তাড়াতাড়ি পুত্রকে নামাইয়া অমলা দ্রুতপদে অগ্রসর হইল, দুই হাতে অঞ্জলির গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া স্নেহকরুণা-ভরা কণ্ঠে বলিল, "কি হয়েছে ভাই, কাঁদছিস কেন?"

তীরের মত আসন ছাড়িয়া উঠিয়া কোন জবাব না দিয়া অঞ্জলি বিদ্যুৎঝলকের মত কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল। অমলা বিস্মিত উদ্বিগ্ন হইয়া তাহার গমনপথের দিকে তাকাইয়া রহিল। আদরের ছেলে অঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করিয়া, মায়ের সাড়া না পাইয়া ক্ষুণ্ণমনে চলিয়া গেল, সে দিকেও অমলার দৃষ্টি রহিল না,—সে তখন আকাশপাতাল কত কি ভাবিতেছিল!

লক্ষ্মী মেয়ে নামটি বিবাহযোগ্যা কন্যার সঙ্গে যোড়া থাকিলে ভাল ঘরে বরে মেয়ের বিবাহ দিতে বেগ পাইতে হয় না—বিশেষতঃ যদি সে মেয়েটির রূপ থাকে, বিদ্যা থাকে, আর থাকে তার উপর বাপের ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের নগদ কিছু মায় সোনাদানা বিবাহের ফন্দে থাকিবার সম্ভাবনা। কুমারী অঞ্জলি মিত্রের এ সবের কোনটিরই অভাব ছিল না। বিবাহের সম্বন্ধও বাপের জীবদ্দশা হইতেই ঠিক হইয়াছিল। তবে এ সব সত্ত্বেও তার যে লক্ষ্মী মেয়ে বলিয়া একটা বড় রকমের খ্যাতি ছিল, এমন কথা তাহার অতি বড় শত্রুও বলিতে পারিত না। বরং 'দুষ্টু মেয়ের' মধ্যে যতগুলি দুষ্টামীর লক্ষণ ফুটিয়া উঠিতে পারে, অঞ্জলির মধ্যে তাহার কোনটিরই যে অভাব ছিল না, এ কথা ওল্ড বালিগঞ্জ পল্লীর ভদ্রগৃহস্থমাত্রেই মুক্তকণ্ঠে না হইলেও চুপি চুপি, কাণাঘুষা করিত।

ধনবান্ পিতার মাতৃহারা সন্তান, বাল্যে ও কৈশোরে সে-ই ছিল পিতার সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। সুতরাং তাহার পক্ষে যতদূর নিরঙ্কুশপরায়ণা, স্বেচ্ছাচারিণী, অপ্রিয়-সত্যবাদিনী হওয়া সম্ভব, সে তাহা হইয়াছিল, এবং সে হওয়ায় কাহারও বিস্ময়ের কোন কারণ ছিল না। অনিচ্ছায় ও অজ্ঞাতসারে পরের মনে ব্যথার আঘাত দিতে সে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিত না এবং সে জন্য তাহার স্নেহময় ভ্রাতাকে অনুক্ষণ আতঙ্কে কালহরণ করিতে হইত। কৈশোরে পিতৃহীন হইবার পর সে পরম স্নেহময় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সংসারেও কর্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল, ভ্রাতৃজায়ার শাসন সত্ত্বেও সে সংসারে তাহার শাসনই ছিল অবিসংবাদী। ভৃত্যপরিজনের বরং কর্ত্তা-গৃহিণীর হুকুম পালন না করিয়াও পার ছিল, কিন্তু 'দিদিমণির' হুকুম অমান্য করিবে, এ সাহস কাহারও ছিল না।

এ হেন অঞ্জলির চোখে জল?—অমলা জীবনে কখনও এমন বিস্মিত স্তম্ভিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। তাহার উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাও কম হইল না। তরঙ্গলেশহীন শান্ত স্থির

নদীবক্ষে নির্ব্বিঘ্নে পাড়ি দিয়া আসিয়া মধ্যপথে আকাশে ঘনঘটা—অমলার সহজ সরল জীবনযাত্রার পথে হঠাৎ এ বাধা; উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করিবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই ছিল না।

"এই যে তুমি এখানে। অঞ্জলি ছিল না এ ঘরে?" গৃহস্বামী গিরীন্দ্রনাথের এ প্রশ্ন ঈষৎ বিরক্তি ও ক্রোধ-মিশ্রিত। অমলা স্বামীর মুখ-চক্ষুর ভাব দেখিয়া ভীত হইল; বলিল, "হাঁ ছিল। কেন, কি হয়েছে গা?"

গিরীন বলিল, "চল ঘরেই যাই, সব বলছি।"

উভয়ে শয়নকক্ষে উপস্থিত হইলে গিরীন্দ্রনাথ আসন গ্রহণ করিয়া শুষ্কমুখে বিষণ্ণ স্বরে বলিল, "দেখ, কিছু বুঝতে পারছি না। ক'দিন থেকে অঞ্জলি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, তার মুখে হাসি দেখছি না। বিশেষ, আজ যা নরেশের কাছে শুনে এলুম, তাতে ত পেটের ভিতর হাত-পা সেঁধিয়ে গেছে।"

অমলা অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, হাস্যময়ী প্রফুল্লাননা সে, সংসারের ঝড়ঝঞ্ঝা কাহাকে বলে, এ পর্য্যন্ত তাহা কখনও জানিতে পারে নাই। দুই হাতে স্বামীর হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া মুখের উপর উদ্বিগ্ন বেদনাকাতর দৃষ্টি রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে বল না—আমার যে বড্ডো ভয় করছে গা! নরেশ বাবু এখানে এসেছেন না কি?"

গিরীন বলিল, "বলছি। জান ত নরেশ কাশীর মাড়োয়ারী হাঁসপাতালের চার্জ্জ নেবার পর মিনতিদের সেখানে নিয়ে গিয়েছে?"

"হাঁ, তা ত জানি। তিন মাস ত চাকরী, তার পর ফিরে এসে অঞ্জলির সঙ্গে ওর বিয়ে—"

গিরীন গম্ভীরস্বরে বলিল, "হুঁ, বিয়েই বটে! যাক্, নরেশ হঠাৎ এখান থেকে অঞ্জলির চিঠি পেয়ে আজ চ'লে এসেছে দিন চারেকের ছুটী নিয়ে। বুঝি সব কেঁচে যায়।"

কথাটা বলিয়া গিরীন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

অমলা উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, কেঁচে যাবে কেন? বাবা এ সম্বন্ধ ঠিক ক'রে গেলেন, আশু বাবুও এ বিয়েতে খুব রাজী, ওদের দুজনেরও পরস্পর খুব টান—"

গিরীন অধীরভাবে বলিল, "হাঁ, টান না মাথা! তা হ'লে কি এ সর্ব্বনাশ হয়? বাবা বিয়ে ঠিক ক'রে গেলেন কেবল ছেলেটি দেখে, আমারও নরেশকে যে পছন্দ, তেমন আর কাউকে নয়।"

অমলা বলিল, "আমারও তাই। আহা, ছেলে বয়েসে বাপ-মা মরা, ভাগ্যে আশু বাবু ছিলেন বাপের বন্ধু, তাই মানুষ করলেন এদ্দিন। একটি মেয়ে ঐ মিনতি, তা তার সঙ্গে কখনও দুই দুই করেন নি।"

গিরীন বলিল, "আর নরেশ? আশু বাবুর এপোপ্লেক্সি হলো, বুড়ো বয়সে চাকরীটিও গেল, তার পর কয়লার সেয়ারও ডুবলো, এখন নরেশই ত ছেলের মত সমস্ত ভার নিয়েছে। এমন ছেলে হাজারে একটা মেলে?"

অমলা বলিল, "তা সত্যি, রূপে গুণে ছেলের মত ছেলে। অঞ্জলির ভাগ্যি ভাল, তাই এ সম্বন্ধ জুটেছে। তা কেঁচে গেল কেন?"

গিরীন পুনরপি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "কেঁচে যাচ্ছে তোমার ননদের খামখেয়ালিতে! এই প'ড়ে দেখ না চিঠিখানা, অঞ্জলি লিখেছে নরেশকে। সে ত চিঠি প'ড়ে একেবারে হতভম্ব। প'ড়ে শুনে আমায় দিয়েছে পড়তে। কেন এ চিঠি তাকে লিখেছে, তা সে হাজার ভেবে চিন্তেও ঠিক করতে পারছে না।"

অমলা ততক্ষণ পত্রপাঠেই মন দিয়াছিল—লেখা বেশী নয়, মাত্র দুই চারি ছত্র। অঞ্জলি অতঃপর নরেশের সহিত কোন সংস্রব রাখিতে চাহে না, নরেশ দেখা করিতে চাহিলেও তাহার দেখা পাইবে না, কোন পত্র দিলেও পত্র না খুলিয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিবে। কেন, কি বৃত্তান্ত, তাহা পত্রে লেখা নাই।

অমলা পাঠ সাঙ্গ করিয়া হাসিয়া ফেলিল, "পোড়ারমুখী! তবুও এখন বিয়ে হয়নি! ঐ জন্যে টেবিলে মুখ গুঁজে কাঁদছিল বুঝি? দেখাচ্ছি বাঁদরীকে—"

গিরীন্দ্রনাথ তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "না, না, যতটা সহজ মনে করছ, ততটা না, একটা কিছু নিশ্চয়ই হয়েছে। নইলে বুঝছো না, যে কিছুতে কাঁদে না, সে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদবে কেন? আমার সঙ্গে ঝগড়া না করলে, আমার কাছে আব্দার না করলে, আমার কাছে দিনের মধ্যে পাঁচশো বার না এলে যার পেটের ভাত হজম হয় না,—সে কখনও আমায় এড়িয়ে চলে? না, না, একটা কিছু কাণ্ড হয়েছে নিশ্চয়।"

অমলা বলিল, "কি আবার হবে ? তুমিও যেমন—ও হচ্ছে ওদের ভিতর মান-অভিমানের পাল্লাপাল্লি। নইলে বিয়ের সব ঠিকঠাক, অমনি মুখদর্শন করবে না—ডাইভোর্স ?"

প্রাণসমা পত্নীর আশ্বাসবাক্যে গিরীন্দ্রনাথের বক্ষ-স্পন্দন সংযত হইল, আশার ক্ষীণ আলোকে মুখ ক্ষণ-কালের জন্য হাসিয়া উঠিল। আগ্রহভরে সে বলিল, "আহা, তাই হোক, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। যে জেদ-পাকড়া মেয়ে, একবার বেঁকে দাঁড়ালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও তাকে টলাতে পারবে না।"

অমলা বলিল, "তুমি এইখেনেই থেকো, আমি ধ'রে নিয়ে আসছি বাঁদরীকে।" অমলা চলিয়া গেল।

একলা বসিয়া থাকিয়া গিরীন্দ্রনাথের মন আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে কত কি অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের আশঙ্কা করিতে লাগিল। গিরীন নরেশের চেয়ে বছর চারেকের বড় হইলেও উভয়ের মধ্যে খুবই মিলা-মিশা ও সদ্ভাব-সম্প্রীতি ছিল। একই পল্লীতে বাড়ী, প্রায়ই দুই পরিবারের মধ্যে যাওয়া-আসা খাওয়া-দাওয়া ওঠা-বসা ছিল। নরেশ মিনতিকে পড়াইবার সময় অঞ্জলি-কেও পড়াইত, মিনতি অঞ্জলির সতীর্থ। আর নরেশের লেখাপড়ার কোন কিছু আটকাইলে এটর্ণীর আর্টিকল্‌ড ক্লার্ক গিরীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হইত। গিরীন্দ্রনাথের পিতার সহিত আশু বাবুরও ঘনিষ্ঠতা ছিল। এই সূত্রেই ধনবান্‌ পিতার আদরিণী কন্যা অঞ্জলির সহিত দরিদ্র অনাথ অথচ গুণবান্‌ ও রূপবান্‌ নরেশচন্দ্রের বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়া যায়। অঞ্জলির মত দুরন্ত অবাধ্য স্বেচ্ছাচারিণী কন্যা নিজেকে কোন কিছুতে ধরা-ছোঁয়া না দিলেও লোকের বুঝিতে বাকী ছিল না যে, সেও এ বিবাহে সন্তুষ্ট ছিল। অহরহঃ নরেশের সহিত বাগ্‌যুদ্ধ ও তর্ক-বিতর্ক চলিলেও সে যে মনে মনে নরেশকে ভালবাসিত, এ কথা গিরীন্দ্রনাথ ও অমলা বুঝিত এবং গিরীন্দ্রনাথ ইহাও বুঝিত যে, নরেশচন্দ্র এ বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া যাওয়ায় আপনাকে ভাগ্যবান্‌ ও ঈশ্বরানুগৃহীত বলিয়া মনে করিত।

সুতরাং অকস্মাৎ এই মনোমালিন্যের সংবাদ তাহার নিকট বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতই অনুমিত হইল। এত সাধের সংসার গড়ার কল্পনা কি শেষে আকাশ-কুসুমেই পর্য্যবসিত হইবে ?

৩

নরেশচন্দ্র অঞ্জলিকে শেষ একবার কাকুতি-মিনতি করিতে গিয়া অপমানিত ও প্রত্যাখ্যাত হইল। সে দিন সে সত্যই ক্ষুব্ধ, বিষণ্ণ ও ক্রুদ্ধ হইয়া কাশী ফিরিয়া গেল। আর সে দিন সত্য সত্যই অঞ্জলির স্নেহময় ভ্রাতার অসাধারণ ধৈর্য্যের আসনও টলিয়া গেল। এ কি অন্যায় জিদ ! ঝড় নাই, বৃষ্টি নাই, আকাশে এ বজ্র-বিদ্যুৎস্ফুরণ কেন ? ইহার কি কোন কৈফিয়ৎ নাই ?

পাড়ায় আর কাণ পাতা যায় না। কাহার দোষে বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল, তাহা জানিতে আর কাহারও বাকি নাই। অঞ্জলির নিন্দা শতমুখে। ভ্রাতা এটর্ণী, বড় লোক, প্রকাশ্যে না হইলেও আড়ালে লোকে কাণাঘুষা করিতে লাগিল। অঞ্জলি বড়লোকের ভগিনী, অহঙ্কারে তাহার মাটীতে পা পড়ে না, আবদারে আদরে উৎসন্ন গিয়াছে সে একেবারে, নতুবা সর্ব্বগুণাধার পাত্রকে প্রত্যাখ্যান করে ? ভদ্র সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ের এই ব্যবহার ? ছিঃ ছিঃ ! অভিভাবকের কোন শাসন নাই ? বাঙ্গালীর ঘরে এ সব হইতে চলিল কি ? কি অপরূপ শিক্ষা ও প্রগতির আমদানী হইতেছে দেশে !

সকল কথা না হইলেও ইহার কিছু কিছু যে গিরীন্দ্রনাথের কাণে উঠে নাই, তাহা নহে। কথা কাণে তুলিবার লোকেরও অভাব ছিল না। উকিল হরিহর বাবু পাড়ার এক জন মুরুব্বী। তিনি এক দিন গিরীন্দ্রনাথকে গোটাকয়েক কড়া কথা শুনাইয়া দিলেন। গিরীন্দ্রনাথ স্বয়ং যেন কত অপরাধ করিয়াছে, এইভাবে কাঁচুমাচু-মুখে বলিল, "দেখুন, ছেলে-মানুষ,—এ বয়সে ওরা একটু হেসেখেলে জেদ-জবরদস্তি ক'রে না বেড়ালে—"

উকিল বাবু পিতৃবন্ধু, সেই দাবীতে ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন, "ছেলেমানুষ ? আঠারো বছরের ধেড়ে মেয়ে, বিয়ে হ'লে এদ্দিন"—

গিরীন্দ্রনাথ বাধা দিয়া বিনীত-স্বরে বলিল, "বিয়ে ত হয় নি এখনও। দেখুন, আঠারো বছরেই কি একেবারে গিন্নীবান্নী হয়ে যাবে ?"

হরিহর বাবু বলিলেন, "ওঃ, কচি খুকী আর কি ! তোমরা বড়লোক ব'লে লোকে ভয়ে কিছু বলে না, জান ?"

গিরীন ঈষৎ রুষ্টস্বরে বলিল, "কসুরই বা কি করলেন বলতে? আপনারাই না বলেন—মেয়েদের হাই এডুকেশন দিতে?"

উকিল বাবু বলিলেন, "তা ত বলিই। তা ব'লে মেয়ে-ছেলেরা হাই এডুকেশন পেয়ে অমনি খিল্লিলাফ পেড়ে বেড়াবে, গেরোস্ত ঘরের ঝি-বউএর মত হবে না? তুমি ত ওর গুরুজন হে! বলি, তোমায় অগ্রাহ্য ক'রে কি চলাচলিটাই না করছে!"

গিরীন উত্তেজিত স্বরে বলিল, "চলাচলি? তার মানে?"

হরিহর বাবু বলিলেন, "তা না ত কি? বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক ক'রে গেল বাপ, ভাইও তাই চায়, আমাদের মত পাঁচ জন পাড়াপড়শী যারা ওর ভালই চায়, তারাও এতে কত আনন্দ পাবে,—এখন কি না বেঁকে দাঁড়াল বিয়ে করবে না! ছেলেটা হীরের টুকরো, কত হাটাহাঁটি, কত সাধাসাধি,—মেয়ের একবারে ধনুকভাঙ্গা পণ! কি অলক্ষুণে জেদ রে বাপু! তোমায় ব'লে রাখছি গিরীন, এ বিয়ে যদি না করে ও, তা হ'লে ওর কক্‌খোনো ভাল হবে না।"

উকিল বাবু সত্যই রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার উকিলি মুখে কথার প্রপাত নায়েগ্রার মত অবিশ্রান্ত বহিয়া চলিল। তিনি যখন সোপান বাহিয়া নীচে নামিতেছেন, তখনও তাঁহার উচ্চ কণ্ঠস্বর গিরীন্দ্রনাথের বৈঠকখানায় ভাসিয়া আসিতেছিল।

গিরীন্দ্রনাথ মর্ম্মাহত হইল। শুধু মর্ম্মাহত নহে, নিতান্ত অপমানিতও বোধ করিল। ধৈর্য্য ছিল তাহার অসীম, তাহার উপর কনিষ্ঠা ভগিনীর উপর স্নেহও ছিল অফুরন্ত। কিন্তু সে মানুষ—রক্তমাংসের শরীরের মানুষ। অঞ্জলি কেবল তাহাকে তুচ্ছতাচ্ছীল্য করে নাই, পরের কাছে তাহাকে ও তাহার স্নেহময়ী ভ্রাতৃজায়াকেও অপমানিত করিয়াছে। এমন মেয়ের শাসনের সত্যই একটু প্রয়োজন আছে।

হৃদয়ে দুর্জ্জয় ক্রোধ ও অভিমান পুষিয়া গিরীন্দ্রনাথ যখন এ বিষয়ে ভগিনীর সহিত একটা বোঝাপড়া করিতে গেল, তখন আবেগভরে তাহার মুখে অনেকগুলা কটু কথা বাহির হইয়া গেল—সে স্বপ্নেও যাহা অঞ্জলিকে বলিবে বলিয়া মনে করে নাই, তাহাই একনিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল।

আপনার ব্যবহারে অঞ্জলি যে এতগুলি লোকের বিরাগ-ভাজন হইয়াছে—বিশেষতঃ তাহার সকল আবদার অভি-মানের কেন্দ্রস্থল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কোমল অন্তরে সে যে দারুণ আঘাত দিয়াছে,—এমন কোন চিন্তা বা ব্যথা-বেদনার আভাস তাহার মুখে-চোখে মোটেই ছিল না, কেবল তাহার প্রফুল্লনলিনীর মত হাস্তানন বিষাদরেখাঙ্কিত বলিয়া বোধ হইতেছিল। কিন্তু ভ্রাতার ভর্ৎসনায় নিমিষে সেই ভাব অন্তর্হিত হইল, দলিতা ভুজঙ্গীর ন্যায় ফণা উদ্যত করিয়া ক্রোধ-কম্পিতকণ্ঠে সে বলিল, "ভুলে যাচ্ছো বোধ হয়, এটা মান্ধাতার যুগ নয়! বেত নিয়ে গুরুমহাশয়ের মত এসেছ শাসন করতে আমাকে? আমার যা খুশী, তাই কোরবো। অমলির মুখে ঝাল খেয়ে কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে এসেছো বুঝি আমার সঙ্গে?"

গিরীন্দ্রনাথ এতটুকু হইয়া গেল। তাহার মুখের উপর এই কথা? বিশেষতঃ যে ভ্রাতৃজায়া তাহাকে সহোদরার অপেক্ষাও অধিক ভালবাসে, তাহার সম্বন্ধে এমন কুৎসিৎ ইঙ্গিত? সেও ক্রোধে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বলিল, "বটে? তাই না কি? তুমি মস্ত মুরুব্বী হয়ে পড়েছো, না? আজ থেকে তোমার বাড়ীর চৌকাঠের বাইরে পা দেওয়া বারণ—বিশেষ তোমার ঐ হতচ্ছাড়া ফেমিনিষ্ট ক্লাবে যাওয়া বারণ, বুঝলে?"

অঞ্জলি বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া গিয়াছিল, নতুবা এতটা বাক্যস্রোত সহ্য করিবে, সে ধাতুতে সে গঠিত ছিল না। তাহার নিপাট ভালমানুষ দাদা—তাহার মুখে এ সব কথা? এ যে স্বপ্নেরও অগোচর। ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া সে চীৎকার করিয়া বলিল, "থাক্, হয়েছে, আমি যাদের সঙ্গে মিশি আর যা-ই করি, তা নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। এখন কি করতে হবে আমায় শুনি? প্রথম দফা চৌকাঠের বাইরে পা দেব না, তার পর অসভ্য ফিমেল ক্লাবে মিশবো না,—আর কি কি হুকুম আছে, ব'লে যাও।"

ক্রোধে তাহার নাসারন্ধ্র স্ফীত হইতেছিল। গিরীন্দ্র-নাথ ভীত হইল, অনুনয় করিয়া বলিল, "অঞ্জলি, ভেবে দেখ, আমি যা বলছি, তোর ভালর জন্যেই বলছি। লেখাপড়া শিখেছ, সে ত খুব ভাল কথা। তোমাদের পোষা পাখীর মত পিঁজরেয় পুরে রাখতে হবে, এ কথা আমি কখনও বলি

নি। কিন্তু তা ব'লে আমাদের বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ঘরে যা' রয়-সয়, সেইটেই ভাল নয়? দেখদিকি, তোমরা যে আজকাল পাবলিকে পয়সা নিয়ে চ্যারিটি পারফরম্যান্স করছ, এটা কি ভাল? ট্রামে, বাসে তোমাদের কলেজের মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে যে ব্যবহার করছে—"

গম্ভীরকণ্ঠে অঞ্জলি বলিল, "কি ব্যবহার করছে তারা?"

গিরীন্দ্রনাথ বলিল, "এই সে দিন শুনলুম, একটি ছেলে বাসে উঠতে গিয়ে গাড়ীর দোলানে টাল সামলাতে না পেরে একটি মেয়ের হাঁটুর উপর হাতের ভর রাখতে বাধ্য হয়েছিল, তাতেই মেয়েটি পায়ের স্যাণ্ডাল খুলে তাকে ঘা দুই তিন বসিয়ে দিলে—এটা কি ভাল হয়েছিল?"

অঞ্জলি বলিল, "সবাই কি তাই?"

গিরীন্দ্রনাথ বলিল, "না, তা বলছি না। কিন্তু এ রকম বাড়াবাড়ি প্রায়ই হচ্ছে। আদালতে মেয়েছেলেরা কি না বলছে? ঘর ছেড়ে পরের সঙ্গে বার হয়ে যাচ্ছে, আবার আদালতে হাজার লোকের সামনে তার বড়াই করছে। ছিঃ ছিঃ! আমাদের দেশে চিরকাল বড়রা ঘর-বর দেখে মেয়ের বিয়ে দিয়ে আসছেন। বাবা যা ঠিক ক'রে গিয়েছেন, তুমি তা মানতে চাও না, এ কি রকম কথা? আমার যে আর কারুর কাছে মুখ দেখাবার যো নেই!"

অঞ্জলি বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলিল, "কারুর কাছে মানে ত বৌদির কাছে? তুমি ত গ্রামোফোন! ও হিংসেয় জ্বলে যায়, যা বলছে, তুমি তাই শুনে বলছো।"

গিরীন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া বলিল, "হিংসেয়? তার মানে?"

অঞ্জলি বলিল, "হিংসে নয়? ছেলেপুলে নিয়ে ঘর-সংসার দেখতেই ওর দিন কেটে যায়, খাঁচার বাইরে ত এক দণ্ড বেরুতে পায় না। তা ব'লে আমরা কেন ঘরের কোণে রাতদিন মুখ গুঁজে প'ড়ে থাকবো?"

গিরীন এইবার হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "এই কথা? পাগলী কোথাকারের! তোকে ঘরের কোণে থাকতে হবে না, যত ইচ্ছে বাইরে থাকিস। কিন্তু লক্ষ্মী বোনটি আমার, পাগলামি করিস্ নি, এ বিয়েতে অমত করিস্ নি। বল্, নরেশকে চিঠি লিখে দিই—কি বলিস?"

আগুনে যেন ঘৃতাহুতি পড়িল,—অঞ্জলি চীৎকার করিয়া বলিল, "না, কখ্খোনো না, তোমার কোন অধিকার নেই আমায় এমনি ক'রে বেচা-কেনা করবার। আমি ঘটি-বাটি নই, গরু-বাছুর নই—আমি মানুষ। আমি কারুর কথা শুনবো না। আমি আমি—"

অঞ্জলি হাঁপাইতে লাগিল। ভ্রাতা ও ভগিনীর উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিয়া অমলা ছুটিয়া আসিয়াছিল। তাড়াতাড়ি ক্রুদ্ধা ব্যাঘ্রীকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া স্বামীকে অনুযোগের স্বরে বলিল, "কি এ সব? পোড়ারমুখী, রেগেই মলেন! তুমিও ওর সঙ্গে ছেলেমানুষ হয়েছ?"

গিরীন্দ্রনাথ এতক্ষণ ক্রোধে—ক্ষোভে—অভিমানে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠ হইয়াছিল, এইবার বলিল, "না, না, ছেড়ে দাও ওকে। আমরা না কি ওর কেউ নই, ওর উপর আমাদের কোন অধিকার নেই, কিছু বলবার দাবী নেই! আর শুনেছ, তুমিই না কি ওকে হিংসে ক'রে ঘটি-বাটির মত বিলিয়ে দেবার জন্যে আমার কাণে মন্তর দিয়েছ। ছেড়ে দাও ওকে বলছি, ওর যা খুসী করুক গিয়ে! উঃ, বাবা দুধ-কলা দিয়ে কালসাপ পুষেছিলেন।"

অমলা ধমক দিয়া বলিল, "আঃ, চুপ কর দিকি তুমি—"

অঞ্জলি বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "চুপ করবার দরকার নেই কিছু। তোমারও যা বলবার আছে, ব'লে নাও। এতই যদি আপদবালাই হয়ে থাকি তোমাদের, না হয় চলেই যাচ্ছি আজই"—

ক্ষোভে, অভিমানে, রোষে এবং চোখের জলে প্রায় অন্ধ হইয়া অঞ্জলি অমলার বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য বলপ্রকাশ করিতে লাগিল।

গিরীন্দ্রনাথ দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "যাবি কোথায়? গেলেই হ'ল বুঝি অমনি? মাথাটা ঠিক ক'রে ভেবে দেখ দিকি দোষটা কার! বিয়ে নাই করলি, কিন্তু কেন করবি নি, সেটা নরেশকে জানিয়ে দিবি নি? এ কি রকম কথা?"

অঞ্জলি তখন প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া প্রথমটা অভিভূত হইয়া পড়িলেও পরে আপনাকে সামলাইয়া লইতে সমর্থ হইয়াছে। শ্লেষের সুরে বলিল, "তোমরা যে আমার জন্যে এতটা ইন্‌টারেষ্ট নিচ্ছ, এর জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু দুঃখু এই, তোমাদের এই মহৎ কাযটা নিতান্তই মাঠে মারা যাচ্ছে।

আমি বিয়েও করবো না, আর কেন করবো না, তাও বল্‌বো না। কেমন হ'ল ত?"

গিরীন্দ্রনাথ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বলিল, "না, হয় নি। বলবো না বল্‌লেই দায়ে খালাস হ'লে, এটা মনে করো না তুমি। দেখ, অমলারাও লেখাপড়া শিখেছে, কলেজে পড়েছে, গান-বাজনাও করেছে, পাঁচ জনের সঙ্গে মিলেছে-মিশেছে। তা ব'লে তারা পাবলিকে তার পরিচয় দিতে যায় নি, কাগজে নাম ছাপাতেও দৌড়োয় নি। আর তোমাদের সমিতির মেয়েরা কি করছে? রাত-বিরেত নেই, একলা বাসে-ট্রামে যাওয়া আসা করছে, মাঠে-ঘাটে লেকে-পার্কে একলা ও হাওয়া-খেতে বেরুচ্ছে, যাদের সঙ্গে তাদের সংসারের কোন পরিচয় নেই, তাদের সঙ্গে বেশী রকমের মেশামিশি করছে, থিয়েটার করছে, ট্যাবলোতে সাজছে, আবার কেউ কেউ নাকি সিনেমা টকিতে এমেচর সাজছে। এ সব দলে তোমার না মেশাই ভাল। ঐ কম্প্যানীটাই ভাল না— ওদের সঙ্গে মেশো বলেই তোমার আইডিয়াগুলোও হয়ে দাঁড়াচ্ছে বেয়াড়া রকমের। নইলে নরেশের মত ছেলে—"

অমলা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, "আঃ, থামো দিকি, ঢের লেকচার দেওয়া হয়েছে। আয় অঞ্জলি, চুলটা বেঁধে দিই গিয়ে।"

অমলা আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইল না, অঞ্জলিকে একরূপ জোর করিয়া টানিয়া লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল। গিরীন্দ্রনাথ নীরবে ক্ষুণ্ণমনে সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিল, কাযটা কি ভাল হইল? বড় অভিমানিনী অঞ্জলি। কিন্তু নিশ্চিন্ত নির্ঝঞ্ঝাট আরামের জীবনযাত্রার শান্ত ধারায় এমন ঝড়ঝঞ্ঝা উঠে কেন?

৪

কোথা দিয়া কেমন করিয়া যে এমন অঘটন ঘটিয়া গেল, তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না। অঞ্জলি অতি বড় অভিমানিনী ও স্বেচ্ছাচারপরায়ণা হইলেও যে এমন করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া যাইবে, গিরীন্দ্রনাথ তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই।

কলেজ হোষ্টেলে অঞ্জলির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া গিরীন্দ্রনাথ বার বার ব্যর্থকাম হইয়া হতাশমনে ফিরিয়া আসিল। অমলা প্রথমটা খুব কান্নাকাটি করিল, সে যথার্থই অঞ্জলিকে সহোদরার মত ভালবাসিত। কিন্তু স্বামীর শত অনুরোধ, উপরোধ ও কাকুতি-মিনতিতেও সে যখন ফিরিয়া আসিল না, তখন অমলা ক্রোধে অভিমানে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। এতই কি তেজ অঞ্জলির? তাহাদের এত আদর, এত যত্ন, এত প্রাণঢালা ভালবাসা,—এ সব কিছুই নয়, জিদটাই হইল বড়? দোষও করিবে, আবার চোখও রাঙ্গাইবে? ব্যবহার করিতেছে এমনি—যেন সে কোন অপরাধই করে নাই, অপরাধী বাকী জগতের লোক! অমলা উঠিয়া পড়িয়া সংসার ও পুত্র-কন্যার সেবায় লাগিয়া গেল। কিন্তু তাহার সকল সঙ্কল্প ব্যর্থ করিয়া তাহার মনের মধ্যে যে আগুন মাঝে মাঝে জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল, তাহার হাত হইতে সে ত নিস্তার পাইল না।

ইহার উপর আরও সুখবর—নরেশের সহিত মিনতির বিবাহের কথা স্থির হইয়া গিয়াছে। কাশী হইতে আশু বাবুর নিমন্ত্রণপত্র আসিয়াছে। আগামী মাসের ১১ই তারিখে শুভকার্য্য সম্পন্ন হইবে, গিরীন্দ্রনাথ যেন সপরিবারে কাশীর বাসাবাটীতে উপস্থিত থাকিয়া শুভকার্য্য সম্পন্ন করে। এ নিমন্ত্রণ ছাড়া মিনতির পক্ষ হইতে সখী অঞ্জলির প্রতি বিশেষ অনুরোধ জানাইয়া পত্র আসিয়াছে, যেন সে তাহার বিবাহে আসিতে ভুল না করে, করিলে মিনতি মনে বড় ব্যথা পাইবে।

চিঠি পাইয়া স্বামী স্ত্রী ক্ষোভে বিষাদে স্তব্ধ হইয়া রহিল। শেষ আশাটুকুও অন্তর্হিত হইল—কি সর্ব্বনাশা জিদ অঞ্জলির! গিরীন্দ্রনাথ অতীতের অনাবিল স্নেহ-ভালবাসার কথা জানাইয়া, অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া শেষ একখানি পত্র অঞ্জলিকে পাঠাইয়া দিল; আশা,—যদি এখনও তাহার মন ফিরে, এখনও যদি সে একখানি পত্র নরেশকে লিখে! তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, নরেশ তাহার ভগিনীকে মনে প্রাণে ভালবাসে, কেবল ক্রোধে ও অভিমানভরে সে মিনতিকে বিবাহ করিতেছে।

ভ্রাতার অকৃত্রিম অনাবিল স্নেহসম্ভাষণের উত্তরে অঞ্জলি ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞার কঠোর গরল ঢালিয়া দিল, লিখিল,—তাহার জন্য দরদ দেখাইবার কাহারও দরকার নাই, সে নিজের ভার নিজে লইতে সম্পূর্ণ সমর্থ।

পত্র পাইয়া গিরীন্দ্রনাথ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। প্রথমে ভাবিল, আর তাহার সহিত কোন সংস্রব রাখিবে না।

তাহার পর কি ভাবিয়া ঘরে ফিরিবার জন্য অনুরোধ না জানাইয়া লিখিল,—"তুমি এখন মাইনর নও, কাজেই তোমার যা খুসী করতে পার। তবে তোমার সিনেমায় ঢুকে নিজে রোজগার করবার দরকার নেই। বাবা তোমায় একখানা বাড়ী আর নগদ এক লক্ষ টাকা দিয়ে গিয়েছেন তোমার বিয়ের যৌতুক ব'লে। তুমি যে দিন চাইবে, দিয়ে দেব।"

বেয়াড়া অঞ্জলি ইহার জবাবে জানাইল, সে বিবাহের যৌতুকের টাকা স্পর্শও করিবে না, বাড়ীও ব্যবহার করিবে না। পিতা যাহার সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত সে যখন স্বেচ্ছায় বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিতেছে, তখন যৌতুকের টাকায় তাহার কোন অধিকার নাই, সে টাকা ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ নরেশ বাবুর প্রাপ্য।

এত তেজ, এত অহঙ্কার? গিরীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে খুব কড়া করিয়াই লিখিল, তাহাই হইবে, টাকা নরেশের বিবাহে যৌতুক দেওয়া হইবে, আর বাড়ীখানাও মিনতির নামে লিখিয়া দেওয়া হইবে। সে যদি পরে ঐ টাকার জন্য দাবী করে, তবে আদালতে গিয়া নালিশ করিয়া তাহাকে টাকা আদায় করিতে হইবে। রাগের মাথায় গিরীন্দ্রনাথ এ কথা লিখিল বটে, কিন্তু সে জানিত, যখন পিতার দানপত্র বা উইল কিছুই নাই, কেবল মুখের আদেশ, তখন আদালতে টাকা বা বাড়ীর জন্য নালিশের কথা উঠিতেই পারে না।

যথাসময়ে বিবাহ হইয়া গেল। ওল্ড বালিগঞ্জের কেহই যাইতে পারিল না, সময়ের অভাব ও কাযের ঝঞ্ঝাট সকলেরই আছে। এ শুভ সংবাদ অঞ্জলির কাছে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না।

গিরীন্দ্রনাথ শুনিল, অঞ্জলি দ্বিগুণ উৎসাহে চাকুরীর চেষ্টায় একাধিক সিনেমা কোম্পানীতে পরীক্ষা দিয়া বেড়াইতেছে। লজ্জায় ঘৃণায় গিরীন্দ্রনাথ কোথাও বাহির হয় না, কাহারও সহিত দেখা করে না, যেটুকু না হইলে নয়, সেই আফিসের কাযেই ডুবিয়া থাকে। তথাপি কাণাঘুষায় তাহার কর্ণে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না যে, পাড়াপড়সী ও আত্মীয়-স্বজন তাহার ও তাহার ভগিনীর বিপক্ষে অনেক কথা বলিতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে মিনতি ও অঞ্জলির তুলনা করিয়া স্বর্গনরকের সাদৃশ্য আনিয়া ফেলিতেছে। রুদ্ধবীর্য্য সর্পের ন্যায় গিরীন্দ্রনাথ অন্তরে গুমরিতে লাগিল। আর বেচারী অমলা? বাঙ্গালীর ঘর যতই আলোকপ্রাপ্ত হউক, তবুও তাহার সদর অন্দর এখনও আছে। গিরীন্দ্রনাথ সদরে থাকিত মোসাহেব ও চাটুকার-দলবেষ্টিত হইয়া, সুতরাং পল্লীপ্রতিবেশী কথা শুনাইতে আসিলেই ইচ্ছাপূর্ব্বক কাযে ব্যস্ত থাকিত। অন্দরে অমলার সে সুযোগ ছিল না, তাহাকে মুখ বুজিয়া পাড়ার বাক্য-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত। মেয়ে-মজলিসের বাক্যবাণে ক্ষতবিক্ষত হইয়া এক এক সময় তাহার মনে হইত, অমন মেয়েকে (অঞ্জলিকে) ছেলেবেলায় নুণ খাওয়াইয়া মারা হয় নাই কেন?

মাস দুই পরে মিনতিরা একটা ছুটী উপলক্ষে বালিগঞ্জে আসিয়া ঘটা করিয়া পাড়াপড়শীদের ভূরিভোজ দিয়া গেল। তাহার আদর-আপ্যায়নে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। আর অঞ্জলি? সে কথা না বলাই ভাল! পৃথিবীর যত 'অলক্ষণে মেয়ে' আছে, তাহাদের সমস্ত বজ্জাতি যোগ দিলেও অঞ্জলির সমান হইবে না!

নরেশ কলিকাতায় আসিয়া প্রথমেই তাহার খোঁজ করিয়াছিল। নিজের প্রবল আগ্রহ ত ছিলই, তাহার উপর মিনতির পীড়াপীড়ি। নরেশ সহর ও সহরতলীর সমস্ত ষ্টুডিওগুলা ঘাঁটিয়া ফেলিল। হোষ্টেলে সাক্ষাতের অনুমতি নাই, ষ্টুডিওতেও প্রায় তাই। সম্প্রতি অঞ্জলির চাকুরী হইয়াছে। কিন্তু সে চাকুরীর সর্ত্ত এই যে, চাকুরীর ডিউটির সময় ছাড়া সে কোন পুরুষ বা নারী সহকর্ম্মীর সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে বাধ্য থাকিবে না, আর বাহিরের যে কোনও লোকের সহিত তাহার দেখা-সাক্ষাৎ একেবারেই নিষিদ্ধ থাকিবে।

নরেশের হইল দুর্জ্জয় ক্রোধ। কি কারণে সে এই অল্প-বয়সে আত্মীয়-স্বজনের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিয়া হিন্দু-গৃহস্থকন্যার অবাঞ্ছিত বিপৎসঙ্কুল পথে অসহায় অবস্থায় বিচরণ করিতেছে, তাহাও জানিবার অধিকার কি তাহাদের নাই? সে-ও প্রতিজ্ঞা করিল, জোর-জবরদস্তি করিয়াই হউক অথবা যেরূপেই হউক, তাহার সহিত সে সাক্ষাৎ করিবেই এবং তাহাকে এই ঘৃণিত পথ হইতে ঘরে ফিরাইয়া আনিবেই।

কিন্তু জোর-জবরদস্তির প্রয়োজন হইল না, এক দিন হঠাৎ সাক্ষাতের সুযোগ হইয়া গেল। কলেজ-হোষ্টেলে খবর

লইয়া জানিল, অঞ্জলিকে স্থানান্তরিত হইবার জন্ম এক মাসের নোটিশ দেওয়া হইয়াছে, সিনেমায় চাকুরী গ্রহণই না কি ইহার কারণ। এবার হোষ্টেলের লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সকাশে সাক্ষাতের অনুমতি চাহিতেই তিনি তৎক্ষণাৎ সে সুবিধা দান করিলেন। সম্রান্ত ভদ্রঘরের মেয়ে হোষ্টেল হইতে বিতাড়িত হইয়া কোথায় কোন্ ষ্টুডিওর দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে স্থান লইবে, এই দুর্ভাবনায় তিনি সত্যই ভাবনাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং যখন তিনি দেখিলেন যে, মেয়েটার নিকট-আত্মীয় আসিয়া যদি তাহাকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া ঘরে লইয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে শেষ মুহূর্তে মেয়েটার একটা সদগতি হয়, তখন তিনি সানন্দে সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন। আরও সুবিধা এই যে, সে দিন অঞ্জলিও সাক্ষাতের জন্ম স্বয়ং প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহার নিজস্ব সংসারের সহিত সকল বন্ধন ছেদন করিয়া ভিন্ন জগতে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে সে-ও একবার বোধ হয় নরেশের সহিত বোঝাপড়া করিয়া লইতে ইচ্ছুক হইয়াছিল।

নরেশ ঘরে ঢুকিয়াই পরুষকণ্ঠে বলিল, "বেশ।"

অঞ্জলি টেবল-আয়নার দিকে মুখ করিয়া পিছন ফিরিয়া কেতাবগুলা গুছাইয়া রাখিতেছিল। না ফিরিয়াই বলিল, "কি বেশ?"

নরেশ বলিল, "কি বেশ, তা কি তুমি জান না? না, জেনেশুনেও না জানবার ভাণ করছ? সকলের মুখে চূণ-কালি দিয়েছ, লজ্জা করে না তোমার মুখ নেড়ে কথা কইতে? বরাত ভাল যে, শিবতুল্য দাদা পেয়েছ, নইলে—"

অঞ্জলি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "নইলে কি করতে তোমরা? ধ'রে ফাঁসী দিতে, না দ্বীপান্তরে পাঠাতে?"

নরেশ বলিল, "তোমার মত মেয়ের তাই হওয়াই ভাল। যাক্, এখন বাড়ী ফিরবে কি না বল।"

অঞ্জলি বলিল, "বাড়ী? বাড়ী ত আমার নেই—"

নরেশ অধীর হইয়া বলিল, "ও সব ন্যাকামি শুনতে চাই নি। এখনই যেতে হবে তোমায় আমার সঙ্গে বাড়ী ফিরে। নাও, গুছিয়ে নাও সব।"

প্রশান্তমুখে ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া অঞ্জলি বলিল, "তাই না কি? তা, বললুম ত দাদার ওখানে আমার স্থান নেই। তবে কি তোমার ওখানে গিয়েই উঠতে হবে, নরেশদা? ও, মিসির এক জন কম্প্যানিয়নের দরকার হ'তে পারে বটে!"

নরেশের মুখখানা এতটুকু হইয়া গেল। ক্ষুব্ধ ব্যথিত স্বরে সে বলিল, "ছিঃ, ছিঃ, এত ছোট মন তোমার? দেখ, মনের অজানা পাপ নেই। সত্যি বল দিকি, তোমায় আমায় যে ভালবাসা ছিল, কিসের জন্যে তা পায়ে দ'লে বিয়ের কথা ভেঙ্গে দিলে?"

এত দিন অঞ্জলি জগতের কাহাকেও—আপনার অতি-প্রিয় জনকেও—এ কথার জবাব দেয় নাই। আজ কিন্তু সে নরেশের মুখের উপর আয়ত নয়নের উজ্জ্বল দৃষ্টি রক্ষা করিয়া শ্লেষের স্বরে বলিল, "কিসের জন্যে, তা কি তুমি জান না, নরেশদা? একবার নিজের বুকে হাত দিয়ে বল দিকি, তুমি কিছু জান না। ছিঃ, ছিঃ, তুমি এত বড় নীচ, এত বড় কপট!"

অঞ্জলির চোখ দুটি জল-জল করিতে লাগিল, সে হাঁপাইতে লাগিল।

নরেশচন্দ্র বিস্মিত হইল, এ বিষম অনুযোগের সে ত কোন কারণই খুঁজিয়া পাইল না! অস্ফুটস্বরে বলিল, "আমি নীচ? আমি কপট? কি করেছি আমি, কিছুই ত বুঝতে পারছি না।"

ক্রোধকম্পিত উত্তেজিত কণ্ঠে অঞ্জলি বলিল, "না, তা পারবে না। যাক্, দোষ আমারই, নরেশদা। আমি ত চিরদিনই দুষ্টু। আমায় তোমরা নিশ্চিন্তে আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও, এই ভিক্ষা চাইছি তোমাদের কাছে, নরেশদা।"

আশ্চর্য্য এই অঞ্জলি! এই তেজ, অহঙ্কার, আবার পর-মুহূর্ত্তেই কম্পিতকণ্ঠ, চোখে জল! আবেগভরে অঞ্জলির একখানা হাত ধরিয়া নরেশ বলিল, "দেখা করতে এলেও তাড়িয়ে দিয়েছ কুকুরের মত বার বার, তবেই না বাধ্য হয়ে মিনতিকে—"

অঞ্জলি মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, "বিয়ে করেছ? সে ত ভালই করেছ। তার জন্যে আবার কৈফিয়তের দরকার কি?"

নরেশ কোমল অনুনয়ের স্বরে বলিল, "কৈফিয়ৎ নয় অঞ্জলি, তোমায় বোঝাতে এসেছি। না হয় আমাদের বিবাহ নাই হয়েছে, কিন্তু তা ব'লে তুমি এমনি ক'রে জীবনটাকে ব্যর্থ ক'রে দেবে কেন? চল ঘরে ফিরে, এমন হাজার হাজার উমেদার রয়েছে—"

অঞ্জলি এতক্ষণ নীরবে নতমস্তকে কথা শুনিয়া যাইতেছিল, এইবার তীরের মত দাঁড়াইয়া উঠিয়া চোখ-মুখ আগুন করিয়া বলিল, "সে লেকচার দেবার জন্যে ত তোমায় ডাকা হয়নি এখানে। আমার যা খুশী করবো। আমায় এসেছ গার্জ্জেনের মত বেত নিয়ে শাসন করতে? তুমি যাও—যাও বলছি এখান থেকে চ'লে!"

নরেশ সে কথায় কাণ না দিয়া সমান ওজনে বলিল, "না, যাব না, কখখোনো যাব না তোমায় না নিয়ে, অঞ্জলি। তবে সত্যি বলি, তোমায় আমি এক দিনের তরেও ভুলতে পারিনি—এখনও না—"

অঞ্জলি বাধা দিয়া কঠোর শ্লেষের সুরে বলিল, "ওঃ, ভুলতে পারনি? আমিও সিনেমায় অভিনয় করি, নরেশবাবু! ভুলতে পারনি? তাই বুঝি—তাই বুঝি—ছ-মাসের তর সইলো না?—যাও, যাও, তুমি চ'লে যাও নরেশদা, আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাইনে।"

জবাবের প্রতীক্ষা না করিয়া অঞ্জলি ঝড়ের বেগে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

৫

চার বৎসর পরের কথা। নরেশ সপরিবারে গিরীন্দ্রনাথের পিতার দত্ত বাড়ীতে আসিয়া উঠিয়াছে। সে এখন লক্ষ টাকার মালিক। একখানা মোটর গাড়ী ও ডিস্পেন্সারী পাড়ায় ত আছেই, পরন্তু লিণ্ডসে ষ্ট্রীটে একটি চেম্বারও করিয়াছে, পশারও বেশ জমিয়াছে। ফল কথা, সে এখন বালিগঞ্জ অঞ্চলের এক জন নামজাদা ডাক্তার।

মিনতির সুখের সীমা নাই। দুই বৎসর হইল, আশু বাবু রোগের যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। তাঁহার দেহরক্ষার পর হইতে মিনতিই নরেশ ডাক্তারের গৃহস্থালীর সর্ব্বময়ী গৃহিণী। এখন সে সন্তানজননী, বড়টি কন্যা, ছোটটি পুত্র। নরেশচন্দ্র কন্যার নাম রাখিয়াছে অঞ্জলি।

অঞ্জলি? এ নামটা ওল্ড বালিগঞ্জ পল্লীতে বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না, এখন বোধ হয়, অনেকেই ভুলিয়া গিয়াছে। মিনতির নাম এখন ঘরে ঘরে, তাহারই কল্যাণে পাড়ার ঘরে ঘরে বিনা ভিজিটের ডাক্তার। তা ছাড়া তাহার মত গোছানে লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে যে ঘরের ঘরণী, সে ঘরের যে নিত্য বাড়বাড়ন্ত দেখা দিবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নাই। ডাক্তারের গৃহে পাড়াপড়শীর প্রায়ই ভোজটা [illegible] আছেই—মিনতির মিষ্টমুখ তাহার উপর সকলেরই [illegible] করিয়াছিল। এ সুনামের সঙ্গে আর এক জনের [illegible] যে প্রথম প্রথম নিন্দার ওজনে ঘরে ঘরে আলোচিত হইত, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। অঞ্জলি যে কাষ করিয়াছে, কোন ভদ্র বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে তাহা কখনও করিতে পারে না। এখনকার কালে আদালতে বাঙ্গালীর মেয়েকে বাপ-ভায়ের মুখের উপর বলিতে শোনা যাইতেছে বটে যে, তাহার বয়স হইয়াছে, সে যেখানে খুসি—যাহার সঙ্গে খুসি চলিয়া যাইবে, কিন্তু অঞ্জলি তাহার উপরে গিয়াছে,—সে কোন অভিভাবকের তোয়াক্কা না রাখিয়া একাকিনী এমন জগতে চলিয়া গিয়াছে, যাহার সহিত বাঙ্গালী ভদ্র পরিবারের কোন সংস্রব নাই।

আর তাহার ভাই? এমন যে শিবতুল্য মানুষ—সে আর এখন মানুষই নাই। কোথাও যাওয়া আসা নাই, কাহারও সহিত মিলামিশা নাই, অন্দরে প্রায় বন্দীর মত থাকে। যাহার জন্য এই আনন্দকোলাহলমুখর চিরহাস্যপ্রফুল্ল সোণার সংসারে এই বিষাদান্ধকারের গাঢ় মসীলেপ, সে আজ কোথায় কোন্ জগতে? দুই বৎসর কলিকাতার সিনেমা-ষ্টুডিওর চাকুরী করিবার পর সে যে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহা কেহ জানে না।

এমনই করিয়া দিন কাটিতেছিল। সংসার ওলট-পালোট হইয়া গেলেও মানুষের দিন কাটে। পুত্রশোকাতুরা জননীও এক দিন পুত্রশোক ভুলিয়া গা ঝাড়িয়া উঠিয়া সংসারধর্ম্মে মন দেয়। ক্রমে এমন হইল যে, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়া ছাড়া অঞ্জলিকে বালিগঞ্জের সবাই ভুলিল, সে জন্য সংসারের ব্যবস্থার এক বিন্দুও ওলট-পালোট হইল না। মিনতির সুখের সংসার—সেই অমৃতসাগরে ডুবিয়া একখানি দুঃখবিষাদভরা মুখ মাঝে মাঝে তাহার মনে পড়িত কি?

এক দিন কিন্তু এই সুখের নীড়ে দুঃখ-ভাবনার কালপেচক বাসা বাঁধিতে আসিল। এক দিন গিরীন্দ্রনাথ শুষ্কমুখে একখানা 'তার' লইয়া তাহাদের বাসায় উপস্থিত—সে 'তার' আসিতেছে বোম্বাই সহরের সার জামশেঠজী জিজিভাই হাসপাতাল হইতে, সেখানে তাহার ভগিনী সাংঘাতিক রোগগ্রস্তা হইয়া জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে অবস্থান করিতেছে। হাসপাতালের বাঙ্গালী ডাক্তার বহু কষ্টে রোগিণীর একখানা

কেতাব হইতে তাহার কলিকাতার ঠিকানা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পেশোয়া ফিল্মস লিমিটেডের কাছে এবং জনসাধারণের কাছে অঞ্জলির ফিল্ম-নাম ছিল রুক্মাবাই।

নরেশ বন্ধুর চেহারা দেখিয়া ভীত হইল,—রুক্ষ কেশ, রক্ত চক্ষু, শুষ্ক মুখ, যেন কত দিন আহার-নিদ্রা নাই! কি অমঙ্গল ঘটিয়াছে? নরেশ ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "ভয় কি গিরীনদা, রোগ কি কারও হয় না? চল, আজই বোম্বাই যাই দু'জনে।"

এত দুঃখেও গিরীন্দ্রনাথের মুখ হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিল, আনন্দে নরেশের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "যাবে তুমি? তোমায় তা হ'লে যা ভেবেছিলুম, তাই আছ, ভাই। কিন্তু সত্যিই সে মুখ ত রাখিনি আমরা তোমার কাছে। অমলা ঠিক বলেছিল, তুমি ত ভুলতে পার নি। উঃ, এক মুহূর্ত্তের ভুলে কোথা হ'তে কি হয়ে গেল!"

গিরীন্দ্রনাথ কাঁদিয়া ফেলিল। নরেশ তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, "কি সব বলছ গিরীনদা পাগলের মত? আমি কি তোমাদের পর? চল, যাবার ঠিক করি গিয়ে—সময়ও ত নেই বেশী, তিন ঘণ্টা পরে গাড়ী, তুমি বাড়ী গিয়ে তৈরী হয়ে নাও গিয়ে।"

গিরীন্দ্রনাথ বলিল, "তা হবে না, তোমায় ওখানে যেতেই হবে। তার কাপড়-চোপড় আর দরকারী জিনিস-পত্তোর তোমাকেই গুছিয়ে নিতে হবে ভাই, আমাদের হাত-পা আসবে না।"

নরেশ বলিল, "আচ্ছা, তাই হবে। ওখান থেকেই হাওড়ায় যাওয়া যাবে, অমলার সঙ্গে দেখাটাও ক'রে যেতে পারবো। যাও, দেরী কোরো না গিরীনদা, যাও।"

গিরীন্দ্রনাথ হঠাৎ নরেশের কাঁধের উপর দুই হাত রাখিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমার বোন্ হাসপাতালে? বাবার বড় আদরের মেয়ে—"

আর কথা সরিল না, গিরীন্দ্রনাথ বালকের মত ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নরেশ তাহার মুখ চাপা দিয়া বলিল, "পাগল, কর কি? ছিঃ ছিঃ, তুমি না পুরুষমানুষ? মিনতি শুনতে পেলে বোম্বাই যাবার জন্যে কুরুক্ষেত্র বাধাবে। যাও, বাড়ী যাও, আমি তাকে বাইরের কল এয়েছে, দু'চার দিন দেরী হবে ফিরতে ব'লে বুঝিয়ে যাচ্ছি পরে। যাও।"

গিরীন্দ্রনাথ চলিয়া গেলে নরেশচন্দ্র অতীত জীবনের এক অধ্যায়ের কথা তোলাপাড়া করিতে লাগিল। সত্যই ত—এক মুহূর্ত্তের ভুল! এক মুহূর্ত্তের ক্রোধ ও অভিমানে কি সর্ব্বনাশই না করিয়াছে সে! একটি ভুল—অন্তর্য্যামী ভগবান্, বলিয়া দাও, কি করিলে আবার যাহা ছিল, তাহা ফিরিয়া আসে!

* * * *

বোম্বাই মেল রজনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া হু হু শব্দে ছুটিয়াছে। গিরীন্দ্রনাথ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "অমন ক'রে রয়েছ কেন নরেশ, কি হয়েছে? আমার ওখান থেকে বেরুবার পর থেকেই অমন গুম হয়ে রয়েছ কেন? অমলা বুঝি কিছু শুনিয়েছে কথা?—ওর ঐ রকম, তুমি কিছু মনে কোরো না, ভাই। অঞ্জলির অবস্থার জন্যে আমরা সবাই দায়ী, এ ভুল ধারণা ওর কিছুতেই যাবে না।"

নরেশ বলিল, "না, না, ও সব কিছু না, তুমি একটু ঘুমোও দিকি, গিরীনদা, আমি আলোটা ঢেকে দিচ্ছি।"

নরেশের স্নেহযত্নে অল্পক্ষণের মধ্যে গিরীন্দ্রনাথ ঘুমাইয়া পড়িল। নরেশ তথাপি আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিল, তাহার পর অতি সন্তর্পণে পকেট হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। এই চিঠি সে পূর্ব্বে একবার পড়িয়াছে, অঞ্জলির জিনিষ-পত্র সুটকেশে গোছাইবার সময় অঞ্জলিরই দেরাজের টানার মধ্যে পাইয়াছিল। চিঠি অনেক দিনের, প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের, তাহার বিবাহেরও পূর্ব্বের। চিঠিখানি লিখিতেছে মিনতি অঞ্জলিকে কাশী হইতে। পত্রখানি এই:—

"হরিশবাবুর বাড়ী, মিছরিপোখরা,
বেনারস সিটি।

ভাই অঞ্জি, তোর চিঠি পেয়ে, তোরা ভাল আছিস জেনে খুসী হলুম। আমার আর ভাই বোধ হয় পড়া হবে না, কলকাতায় ফিরে যাই কি না, তারই ঠিক নেই। কলেজের শান্তি দিদিমণির কাছ থেকে আমার লিওপোল্ডের এডিশনের সেক্সপিয়রখানা আর বিদ্যাসাগরের এডিশনের শকুন্তলাখানা চেয়ে নিস, ও-দু'খানা তোর কাছেই রাখিস। আমি শান্তি দিদিমণিকেও আলাদা চিঠি দিলুম।

ভাই, বলতে ভয় করছে একটা কথা, কিন্তু না বললেও নয়। তোর মত বন্ধুর কাছে মনের দোর খুলতে না পারলে

গুমরেই ম'রে যাবো। তা ছাড়া এ বিষম বিপদ থেকে কেবল তুই-ই আমার উদ্ধার করতে পারিস্।

এই পুরুষ জাতটা কি ধাতু দিয়ে গড়া বলতে পারিস্? ওদের ধর্ম্মো-অধর্ম্মো নেই, কাণ্ড-অকাণ্ড নেই, কেবল নিজের সুখ, নিজের তৃপ্তি হলেই ওরা খুশী!

বড্ডো ভাল না আমাদের নরেশদা? তোর সঙ্গে বিয়ের ঠিকঠাক হচ্ছিল শুনেছি! তবে কেন সে আমার সর্ব্বনাশ করলে?

হেসে হেসে কথা কইতো, আদর ক'রে বুকে টেনে নিয়ে চুমু খেতো,—আমি রাগ করতুম—বলতো, এতে দোষ নেই, ওদের দেশে নভেলে ভাই-বোনে ওসব হয়ে থাকে। বাবা শয্যাগত রুগী, কিছু দেখতেন না, জানতেন না, কেউ ছিল না মাথার উপরে, নরেশদাই ছিল সব। তার পেটে যে বিষের ছুরি ছিল, তা কে জানতো ভাই?

এক দিন কি দুর্য্যোগ! সন্ধ্যের আগে থেকে উঠলো ঝড়। উঃ, পাথরের বাড়ীগুলোই যেন উপড়ে ফেলে আর কি! তার পর নামলো মুষলধারে বিষ্টি আর কড়কড় বজ্রাপাত। চোখে কাণে দেখতে দেয় না কিছু—এমনি সে বিষ্টির শিল-নোড়ার মত ফোঁটা!

সেই দুর্য্যোগে রাত বারোটার সময় বাইরের কল থেকে ফিরে এলো নরেশদা। একেবারে নেয়ে চাপুরচুপুর! তাড়াতাড়ি ভিজে কাপড়-চোপড় ছাড়িয়ে ষ্টোভ জেলে গরম জল ক'রে দিই সেঁক।

সেই কাল রাত—কি কুক্ষণেই অভাগীর জন্যে এসেছিল ভাই! কেউ নেই জেগে, কেবল আমরা দুটি প্রাণী এক ঘরে একই বিছানায়। ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি পড়ছে, গুম্‌গুম্ আকাশ ডাকছে, কড়কড় বাজ পড়ছে! একটা ভীষণ আওয়াজে যেন কাণ ফেটে গেল, চমকে উঠে ভয়ে নরেশদাকে জড়িয়ে ধরলুম। তার পর? উঃ, আমার মরণ হোলো না কেন!

এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় সব হারালুম! মাথায় কি জানি কি কুক্ষণে শয়তান চেপেছিল। সামনেও শয়তান। উঃ, মানুষ এত নীচ, এত কপট, এত ভণ্ড! বাবা মানুষ করেছিলেন দুধ-কলা দিয়ে, কালসাপ হয়ে তাঁকেই দংশন করলে আমায় দিয়ে? উঃ, তখনই বিষ খেয়ে মরতে যাচ্ছিলুম, আমায় বাধা দিলে, হাতে পায়ে ধ'রে বোঝালে, এতে দোষ নেই, কেউ জানতে পারবে না! রাগে গা জলে গেল, যা মুখে এলো, তাই ব'লে গাল দিলুম, সবাইকে জানিয়ে দিয়ে মরবো ব'লে ভয় দেখালুম। তখন বললে, দুজনের যদি বিয়ে হয়, তা হ'লে সব দোষ ঢেকে যাবে।

আবার বাঁচবার সাধ হ'লো। ভেবে দেখলুম, ঐ এক উপায় আছে বাঁচবার। এখন তুমি যদি দয়া কর, তবেই মুখ রক্ষা হয়, নইলে সত্যি বলছি, বিষ খেয়ে মরবো। আর, আর, সত্যি কথা বলি, রাগ করিসনি ভাই, ও তোকে মোটেই ভালবাসে না, কেবল তোর বাপের টাকার লোভে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। ওর স্বভাব-চরিত্তির ভাল নয়। আমায় বলেছে, কলেজে পড়বার সময়েই অনেক কীর্ত্তি করেছে। তোর ভাই যে রূপ, তার উপর অগাধ টাকা, অমন হাজার হাজার ছেলে তোর পায়ে এসে লুটিয়ে পড়বে। কিন্তু আমার যে আর গতি নেই ভাই!

যা ঠিক করিস, আমায় জানাস্। কিন্তু আমার মাথা খাস, এ কথা কাউকে বলিস নি—অমলিকেও না—নইলে লজ্জায় ম'রে যাবো, আত্মহত্যা করবো। আমার মরণ-বাঁচন তোর উপরেই রইলো।

তোকে যে যা বলে বলুক, আমি ত তোকে জানি—তোর মত মেয়ে কটা হয় আমাদের ঘরে? তোর এতে কোন ক্ষতি হবে না—অমন ঢের সম্বন্ধ জুটবে। পরের দয়ায় যার বিদ্যে শিক্ষা, যার স্বভাব এমন কদর্য্য, তার চেয়ে ঢের ভাল ছেলে জুটবে তোর। আমার কি না উপায় নেই তাই! তুই দয়া না করলে ভাই আমি মারা যাবো,—এই কথাটা ভেবে যা হয় ঠিক করিস। তোর চিঠির আশায় বেঁচে রইলুম, চিঠি পেয়েই জবাব দিস। ইতি

তোর মিনি।"

চিঠিখানা মুঠার মধ্যে পিষিয়া গুঁড়া করিবার মত করিয়া নরেশচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অস্থিরভাবে কামরার মধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিল। প্রথম শ্রেণীর রিজার্ভ কামরা, তাহারা দুই জন ব্যতীত অন্য যাত্রী নাই। দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া অন্তরের রুদ্ধ সপ্ত সমুদ্রের ক্রন্দনকে বুঝি আর সে ধরিয়া রাখিতে পারে না!

একবার গবাক্ষের বাহিরে মুখ রাখিয়া সে জোর করিয়া শ্বাস টানিয়া লইল, মাথাটা বাড়াইয়া রাত্রির শীতল নির্ম্মল বায়ুতে স্নিগ্ধ করিয়া লইল। তবুও ত মাথার অসহ্য জ্বালা

যায় না! বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে আপন মনে বলিল, "এত লোককে নিচ্ছ ভগবান্, আমায় নিতে পার না? এ হতভাগা লক্ষ্মী-ছাড়ার বেঁচে সুখ কি?"

তখন আকাশে জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। নীল নক্ষত্রখচিত নির্ম্মল আকাশ, তন্নিম্নে প্রকৃতি নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছে; কেবল অভাগা নরেশের চক্ষুতে ঘুম নাই!

* * * *

জুহুর শান্ত-শীতল সমুদ্রসৈকতে বসিয়া বাঙ্গালী তরুণ-তরুণী। সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও ঘনাইয়া আসে নাই—গোধূলির আলো-অন্ধকার অস্তমিতপ্রায় রক্ত-তপনের রাঙা আভা অঙ্গে ধরিয়া সমুদ্রতরঙ্গে ঝিকিমিকি খেলিতেছে—তরঙ্গের উপর তরঙ্গের আঘাতে সহস্র স্বর্ণচূর্ণ ছড়াইয়া পড়িতেছে।

অনন্তবিস্তার মহাসমুদ্রের অনন্ত বীচিবিক্ষোভের দিকে তাহারা তন্ময় হইয়া চাহিয়াছিল। সৈকতের পশ্চাতে উচ্চ তটভূমিতে জুহু এরোড্রোম ক্লাবের সাহেব-বিবিরা সারি সারি বেত্রাসনে বসিয়া চা-পান ও গল্প-গুজব করিতেছিল। আশে পাশে মারাঠী, গুজরাটী ও পার্শী পুরুষ ও মহিলারা বিশুদ্ধ সমুদ্র-বায়ু সেবনের জন্য পাদচারণা করিয়া বেড়াইতেছিল। দুই একখানা এরোপ্লেন তখনও আকাশে 'এ্যাঙ্গল' খেলা দেখাইতেছিল।

"সন্ধ্যে হোলো অঞ্জলি, চল ফিরে যাই।" নরেশের কণ্ঠ করুণা ও স্নেহমমতায় ভরা—সদ্যোরোগোত্থিতা অঞ্জলিকে লইয়া সে আজ জুহুর পরম-রমণীয় স্বাস্থ্যপ্রদ সমুদ্রতটে বায়ু-সেবন করিতে আসিয়াছে, গিরীন্দ্রনাথ অদূরে স্বাস্থ্যনিবাসে এক মাড়োয়ারী মক্কেলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছে। কথা আছে, প্রত্যাবর্ত্তনকালে নরেশ তাহাকে তথা হইতে তুলিয়া লইয়া যাইবে।

নরেশের কথা অঞ্জলির কর্ণে পশিয়াছিল কি না সন্দেহ, সে তখন উপকূলের সঙ্গে মহাসমুদ্রের অবিশ্রান্ত সংগ্রামের অভিনয়ে তন্ময় হইয়াছিল। তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া নরেশের প্রাণটা ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন! অঞ্জলিকে আর চিনিতে পারা যায় না। রোগ-দীর্ণ অস্থিচর্ম্মাবৃত দেহ, কোটরগত চক্ষু, বিশীর্ণ মুখমণ্ডল,—কেবল তাহার মধ্য হইতে দীর্ঘ আয়ত কৃষ্ণতার নয়নযুগলের অস্বাভাবিক উজ্জ্বল জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতেছিল। সে নয়নে কিন্তু কোন চাঞ্চল্য নাই, এ কয় বৎসরে সংসারের সহিত অবিরাম সংগ্রামে তাহার স্বভাবসিদ্ধ চাঞ্চল্য ও অধুর হাসি শুকাইয়া গিয়াছে!

নরেশ আবার সস্নেহে বলিল, "চল অঞ্জলি, ঘরে যাই, গিরীনদা হয় ত দেরী দেখে ভাবছে।"

অঞ্জলি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "ঘরে যাবো, কোথা ঘর?" মুহূর্ত্ত পরেই আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "না, না, নরেশদা,—চল, ঘরেই যাই।"

চন্দ্রালোকে উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া সৈকতের সুকোমল বালুকাস্তরণের উপর দিয়াই চলিল। অঞ্জলি প্রায় তাহার দেহের সমস্ত ভারটাই নরেশের উপর অর্পণ করিয়াছিল। যাইতে যাইতে নরেশ দূরে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ বাংলোটা দেখছো, ঐ গাছপালার আড়ালে? ওটা এখন লোকে বোম্বাই এলেই দেখতে আসে, ঐখানেই মহাত্মাজী থাকতেন।"

অঞ্জলির মুখখানি আনন্দের উচ্ছ্বাসে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হঠাৎ উৎসাহভরে সে বলিয়া উঠিল, "তাই নাকি? চল না দেখে আসি, নরেশদা।"

নরেশ বলিল, "পারবে যেতে হেঁটে অতটা? সমুদ্রের ধার দিয়ে গেলেও যে অনেকটা। তার চেয়ে চল মোটরেই যাই।"

অঞ্জলি আবদারের সুরে বলিল, "না নরেশদা, হেঁটে যাই চল। এই ত এইটুকু, কতটা আর?"

নরেশ বলিল, "না, আমাদের কাছে বেশী না বটে, কিন্তু তোমার পক্ষে—"

অঞ্জলি হাসিয়া বলিল, "বা রে, আমি বুঝি পারবো না? কেন, আমি ত সেরে উঠেছি। এস ত আমার সঙ্গে কত হাঁটতে পার দেখি।"

কত দিন—কত দিন পরে এই অঞ্জলিতে আবার আগেকার অঞ্জলি ফিরিয়া আসিল! অলক্ষ্যে নরেশের নয়নে এক ফোঁটা আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

দুই চারি পদ অগ্রসর হইবার পর নরেশচন্দ্র কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "একটা কথা বোলবো, অঞ্জলি? এদ্দিন জিজ্ঞাসা করি নি কেবল তোমার অসুখের জন্যে।"

অঞ্জলি চকিতনয়নে চাহিয়া বলিল, "কি?"

নরেশ গদ্‌গদকণ্ঠে বলিল, "তুমি ত আমায় জানতে অঞ্জলি, জেনে শুনেও তবে তুমি মিনতির চিঠির কথায় বিশ্বাস করলে কেন?"

অঞ্জলি ভীত-চকিত স্বরে বলিল, "আবার ও কথা কেন? ও ত চুকেই গিয়েছে। মিনতির চিঠির কথা জানলে কি ক'রে তুমি?"

নরেশ বলিল, "আসবার সময় তোমার দেরাজের টানা থেকে পেয়েছি চিঠি। যাক্, সে নিজের স্বার্থের জন্যে যাই লিখুক, তুমি ত আমায় জানতে, তুমি কি ক'রে ওর কথায় বিশ্বাস করলে?"

অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যে অঞ্জলির আয়ত নয়ন দুইটি উদ্ভাসিত হইল। সে নয়ন দুইটি আরও বিস্ফারিত করিয়া কম্পিত বিচলিত কণ্ঠে বলিল, "তা হ'লে—তা হ'লে—মিনতি যা লিখেছিল, তা সত্যি নয়?"

কথাটা বলিতে বলিতে অঞ্জলির ক্ষীণ অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, সে সৈকতের উপর বসিয়া পড়িল, নরেশচন্দ্রও সস্নেহে তাহাকে ধরিয়া বসাইয়া দিয়া নিজেও পার্শ্বে বালুকাস্তরণের উপর আসন গ্রহণ করিল, আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলিল, "তুমি কি বিশ্বাস কর অঞ্জলি, আমি এত নীচ, এত কপট, এত বিশ্বাসঘাতক? বেশী কিছু বলতে চাইনি, জগতে যার চেয়ে আমার ভালবাসার জিনিষ নেই, সেই তোমায় ছুঁয়ে শপথ ক'রে বলছি—"

অঞ্জলি বাধা দিয়া বলিল, "থাক্, আর বলতে হবে না, সব বুঝতে পারছি এখন।" অঞ্জলির মর্ম্ম ভেদ করিয়া নিশ্বাস নির্গত হইল।

নরেশ অধীর হইয়া বলিল, "না, তোমায় সব শুনতে হবে, তোমায় না শোনালে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। আমায় তুমি বার বার অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছ, কিন্তু আমি তোমায় এক দিনও ভুলতে পারি নি। মিনতিকে আমি ছেলেবেলা থেকে মা'র পেটের বোনের মত দেখে এসেছি। কিন্তু যখন তুমি কোন কথা শুনলে না, একবার দেখা করতেও দিলে না, তখন ভেবেছিলুম, তোমরা বড়লোক, গরীব ব'লে আমায় নিয়ে এদ্দিন খেলা করছিলে—"

অসম্ভব উজ্জ্বল আভায় অঞ্জলির মুখ-চক্ষু হাসিয়া উঠিল—এত আনন্দের উচ্ছ্বাস যেন তাহার ক্ষীণ দুর্ব্বল দেহে স্থান পাইতেছিল না। দুই হাতে নরেশের হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তাই বুঝি অভিমান ক'রে চ'লে গিয়েছিলে?"

নরেশের কোলের উপর মাথা গুঁজিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া অঞ্জলি খব খানিক কাঁদিল। বহুকালের রুদ্ধ জলস্রোত বাঁধমুক্ত হইয়া মত্তমাতঙ্গকেও ভাসাইয়া লইয়া চলিল!

নরেশের মনের মধ্যে তখন সপ্ত সমুদ্রের তুফান বহিতেছিল। সে অঞ্জলির কালো মেঘের মত কেশরাশির উপর সস্নেহে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে বলিল, "অঞ্জলি, আমার অজ্ঞানকৃত এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও। এক জনের পাপে ত আমাদের জীবন ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে না।"

অঞ্জলি মাথা তুলিয়া বলিল, "কি করতে বল?"

নরেশ বলিল, "সবই ত জান। তোমায় আমায় মিলন ভগবান্ দিয়েছেন, এ ত কিছুতেই ভাঙ্গবার নয়। চল, সমাজ যদি আমাদের না চায়, সমাজ থেকে দূরে গিয়ে আমরা নতুন ক'রে সংসার পাতি।"

অঞ্জলি ঘন ঘন শ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল, তাহার বক্ষের স্পন্দনশব্দ বোধ হয় বাহিরেও শোনা যাইতেছিল! মুহূর্ত্ত পরেই কিন্তু সে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "তা হয় না নরেশদা, তোমার স্ত্রী—"

উত্তেজিত ক্রুদ্ধস্বরে নরেশ বলিল, "কিসের স্ত্রী? শয়তানী—"

অঞ্জলি বাধা দিয়া বলিল, "তবুও তোমার স্ত্রী, তোমার ঘরের লক্ষ্মী, আগুন সাক্ষী রেখে বিয়ে করেছ তাকে।"

নরেশ বলিল, "তা হোক, তবু সে কালসাপ, তোমায় আমায় মিথ্যে ব'লে ভুলিয়েছে, তার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই।" ক্রোধে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল।

এবার অঞ্জলি দাঁড়াইয়া উঠিয়া তটের দিকে অগ্রসর হইল। ধীর অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিল, "তবুও তোমার স্ত্রী—এ সম্বন্ধ ঘোচবার নয়। এস, ফিরে যাই।"

নরেশ ক্ষুব্ধ আহত স্বরে শেষ একবার বলিল, "তা হোক—দেহ এ সম্বন্ধ মানলেও মন যখন মানবে না, তখন এ সম্বন্ধ কিছুই না। অঞ্জলি, দয়া কর, ক্ষমা কর, তোমার আমার যদি মনের মিল থাকে, তা হ'লে জগতে তা কোন বাধাই মানবে না, অঞ্জলি!"

অঞ্জলি বিষণ্ণস্বরে বলিল, "তা হয় না নরেশদা। ভুলে যাচ্ছ কি, সে তোমার ছেলে-মেয়ের মা?"

নরেশ এতটুকু হইয়া গেল, সে নীরবে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। অটে উঠিয়া বলিল, "তার পর, তোমার কথাটা কিছু ভেবেছো কি?"

অঞ্জলি বলিল, "আমার কথা? ভাববার ত নেই এতে কিছু!"

নরেশ বলিল, "আছে বৈ কি! এমনি ক'রে সিনেমায় অভিনয় ক'রে ত আর জীবনটা কাটবে না—আর ওটা তোমায় করতেও দেওয়া হবে না। বিয়ে-থা, ঘর-সংসার তোমায় করতেই হবে ত?"

অঞ্জলির অধরকোণে পূর্ব্বের মত দুষ্ট হাসি দেখা দিল, বলিল, "বিয়ে ছাড়া মানুষের জীবনে অন্য কিছু কায নেই বুঝি, নরেশদা? ঢের আছে। এই হাসপাতালে নার্শদের কায দেখলে কি চোখ জুড়িয়ে যায় না? কত রাত হলো,—দাদা হয় ত বিরক্ত হচ্ছে দেরী দেখে।"

অঞ্জলি আর দাঁড়াইল না, একটু দ্রুতপদে মোটরের দিকে অগ্রসর হইল। নরেশ নীরবে আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে তাহার অনুসরণ করিল। এ কি অদৃষ্টের পরিহাস? একটি ভুলে ব্যর্থ জীবনের অন্ধকারময় ভবিষ্যতের কথাই কি তখন সে মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতেছিল?

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

চিরদিনের আড়ি

যারে তোরা খুঁজে বেড়াস, নাই রে—সে আর নাই,
নাইক সেই দুষ্টু-শিরোমণি।
সবাই আছে—তারেই শুধু দেখতে নাহি পাই,
ছেড়ে গেছে আপদ-বালাই, শনি।

দুষ্টুমীতে সর্ব্বজয়ী সে ছিল এই ঘরে,
হট্টগোলে ফাটাত এই বাড়ী,
কণ্ঠ তাহার থেমে গেছে চিরদিনের তরে,
ক'রে গেছে মস্ত বড় আড়ি।

নেইক সে তাই এমনধারা সাজান এই ঘর,
যেথার জিনিষ সেথায় ঠিকই রয়,
কেউ করে না ওলোট্-পালট্ কিছুই অতঃপর,
নাইক আর ভাঙ্গা-ভাঙ্গির ভয়।

কল্কেটা ঠিক দেখি এখন থাকে হুঁকার মাথায়,
কেউ করে না কোন বেঠিক তা'র।
লাঠিগাছটা ঠিকই থাকে নিত্য রাখি যেথায়,
কেউ করে না স্থানচ্যুত আর।

বাক্স-তোরং খুলতে গেলে—খোলে পরিপাটী,
সহজেতেই চাবিটা তা'র লাগে।
গোপনেতে ছিদ্রে তাহার দিয়াসালাইয়ের কাঠি
ব'সে ব'সে কেউ গোঁজে না আগে

গাড়ুর ভিতর কাঁকর-মাটী কেউ ভরিবার নাই,
বাধে না জল নলের মুখে আর।
জুতার পাটি পাশা-পাশি থাকে একই ঠাঁই,
কেউ করে না কোনও অত্যাচার।

গলা জড়িয়ে ধরত এসে, যেতে বল্‌তুম যত;
সর্ব্বদা সে ঘুরত পাছে পাছে।
ডেকে এখন পাই না সাড়া; লক্ষ্মী ছেলের মত
জানি না কোথা মুখটি বুজে আছে!

তাহার লাগি বৃথাই যেত কতই সময় মোর,—
তবুও কোন কায না প'ড়ে থাকত।
এখন আমার প্রচুর সময় সারাটা দিন ভোর,
সকল কাযই কিন্তু অসমাপ্ত।

সব চেয়ে সে ছোট হয়ে, সবার শেষে এসে
মাতিয়েছিল সব চেয়ে এই বাড়ী।
সবার আগেই চ'লে গেছে হঠাৎ নীরব হেসে
জানিয়ে গেছে চিরদিনের আড়ি।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

বৈষ্ণব মত-বিবেক

৮

শ্রীনিম্বার্ক-মতবাদ—দ্বৈতাদ্বৈতবাদ

ভক্তিসিদ্ধান্তপ্রধান বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রদায়ভেদে ভক্তির মূলভাব অব্যাহত রাখিয়া মতভেদ বিদ্যমান। সুপ্রাচীন নিম্বার্ক-সম্প্রদায়েও এইরূপ দার্শনিক মতের বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীমদাচার্য্য নিম্বার্কের পূর্ব্বে এই সম্প্রদায়ের আর প্রাচীন গ্রন্থাদি পাওয়া যায় না বলিয়া শ্রীমদাচার্য্য নিম্বার্কের ব্রহ্মসূত্রভাষ্য—'বেদান্তপারিজাত-সৌরভে'র বিবৃত মতই এই সম্প্রদায়ের প্রাচীনতম মত বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে।

স্বসম্প্রদায়ে এই মত "দ্বৈতাদ্বৈতমীমাংসা" নামে আখ্যাত এবং এই সম্প্রদায়ের মতে ঐ দ্বৈতাদ্বৈতমতই ব্রহ্মসূত্রকারের অভিপ্রেত। এই মতে ব্রহ্মের অদ্বৈতভাব ও দ্বৈতভাব উভয়ই যুগপৎ বাস্তব এবং ব্রহ্মের অবিতর্ক্যশক্তিবশতঃ আপাততঃ বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তাহা সত্য। ফলতঃ যে ব্রহ্মের সম্বন্ধে উপনিষদই বলিয়াছেন—

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"

অর্থাৎ "ইন্দ্রিয় ও জ্ঞানের অন্তরালে অবস্থিত ব্রহ্মের যে ভাব, তাহাও পূর্ণ আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত ভাবও পূর্ণ, তাঁহার সকলই পূর্ণ এবং পূর্ণ হইতে পূর্ণগ্রহণ করিলে পূর্ণ-ই অবশিষ্ট থাকে।"

সুতরাং প্রাকৃতভাবের দ্বারা ব্রহ্মের ধারণা কিছুতেই সিদ্ধ হইতে পারে না; এবং এই জন্যই তাহাতে যুগপৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অস্তিত্বও সম্পূর্ণ সম্ভবপর। এই জন্যই আচার্য্য নিম্বার্কের মতে ব্রহ্ম জীব ও জড় অথবা চেতন ও অচেতন হইতে যুগপৎ অপৃথক্ ও অত্যন্ত পৃথক্। অর্থাৎ ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ। তিনিই জগতের স্রষ্টা ও লয়কর্ত্তা, তিনি জগতের অতীত বলিয়া জগতে ও ব্রহ্মে ভেদ আছে, অথচ জগৎ তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র নহে। যেহেতু জগৎ ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত। বেদে ও উপনিষদের অধিকাংশ স্থানে সাকার ও সগুণ শ্রুতি বর্ত্তমান, পক্ষান্তরে, উপনিষদে ব্রহ্মের নিরাকারত্ব ও নির্গুণত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতিরও অসদ্ভাব নাই, এরূপ অবস্থায় ব্রহ্ম মাত্র সাকার ও সগুণ এ ভাব প্রতিপন্ন করিতে গেলে, হয় নির্গুণাত্মক শ্রুতিগুলির লক্ষণাশক্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে হয়, না হয় নির্গুণাত্মক শ্রুতিগুলিকে একেবারে নিরর্থক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অন্যদিকে ব্রহ্ম নিরাকার ও নির্গুণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে উপনিষদাদির সগুণ ও সাকার প্রতিপাদক শ্রুতিগুলিকে হয় লক্ষণা সাহায্যে ব্যাখ্যা করিতে হয় অথবা ব্রহ্মের সাকার ভাব একেবারে নিরর্থক বলিয়া প্রতিপাদন করিতে হয়। শঙ্করাচার্য্য নির্গুণ শ্রুতিগুলিকে বলবৎ করিয়া—সগুণ শ্রুতিগুলিকে লক্ষণার দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া ব্রহ্মের নির্গুণ ও নিরাকার ভাবকেই পারমার্থিকরূপে স্থাপন করিয়াছেন এবং সগুণ শ্রুতিপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মের সগুণভাবকে ব্যবহারিক বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রমুখ বৈষ্ণব ভাষ্যকারগণ শঙ্করাচার্য্যের এইরূপ সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীমন্নিম্বার্কাচার্য্য ব্রহ্মের সাকার ও নিরাকার—সগুণ ও নির্গুণ—সবিশেষ ও নির্বিশেষ—দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয় ভাবকেই সত্য ও পারমার্থিক বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন।

ব্যবহারিক বুদ্ধিতে একই বস্তু যুগপৎ সাকার ও নিরাকার, সবিশেষ ও নির্বিশেষ, সগুণ ও নির্গুণ হইতে পারে, ইহা ধারণা করা একরূপ অসম্ভব। কিন্তু সকলপ্রমাণশিরোমণি শ্রুতি যখন ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব উভয় রূপের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন সগুণের ও নির্গুণের মধ্যে আত্যন্তিক বিরোধ থাকা সম্ভবপর নহে। ফলতঃ সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব এই উভয়ে যে বিরোধ আছে বলিয়া আপাততঃ মনে হয়, উহা বাক্যবিরোধ, প্রকৃত বিরোধ নহে। কারণ, কোনও বস্তুর ধর্ম্ম সম্বন্ধেই বলা যাইতে পারে যে, দুই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের যুগপৎ একাধারে অবস্থিতি সম্ভবপর হইতে পারে না, কিন্তু গুণ ও গুণী এতদুভয়ের সম্বন্ধে এইরূপ বিরোধ কল্পনা করা যায় না। কারণ, গুণী বলিলেই তাহা স্বরূপতঃ গুণাতীত হইয়াও গুণযুক্ত বলিয়া ধারণা হয়, ইহাতে বিরোধের সম্ভাবনা উদ্ভব হয় না। অতএব স্বরূপতঃ গুণ ও গুণী বলিয়া ব্রহ্মে কোনও ভেদ নাই। গুণী বলিলেই গুণ হইতে গুণীর পৃথক্ সত্তার কল্পনায় ইচ্ছা হয় বলিয়া কেবল তদবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হইয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্মে বৈজ্ঞানিক গুণের নিষেধ করিবার জন্যই ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হইয়াছে। কিন্তু এই নির্গুণার্থে গুণ-স্পর্শশূন্য নহে, কারণ, তিনি স্বরূপতই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্, সৃষ্টি, স্থিতি, ও লয়রূপ কার্য্য নিত্যই তাঁহাতে বর্ত্তমান। অতএব সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সৃষ্টিস্থিতিলয়কার্য্যযুক্ত ব্রহ্ম অবশ্যই সগুণও হইয়া পড়েন। এইরূপে ব্রহ্মে যুগপৎ নিত্য নির্গুণত্ব ও সগুণত্ব বর্ত্তমান। কিন্তু ব্রহ্মের এই দ্বিরূপত্ব একমাত্র শ্রুতিপ্রমাণগম্য; অনুমান ও প্রত্যক্ষাদির দ্বারা ইহা সিদ্ধ হয় না।

আচার্য্য শঙ্করও ব্রহ্মের এই দ্বিরূপতা স্বীকার করিয়াছেন। যথা "দ্বিরূপং হি ব্রহ্মাবগম্যতে; নামরূপবিকারভেদোপাধিবিশিষ্টং, তদ্বিপরীতঞ্চ সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিতম্।" (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ১।১।১১ সূত্র) কিন্তু শঙ্করাচার্য্য এ সম্বন্ধে নির্গুণ ও সগুণ শ্রুতিবাক্য উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন—"ইতি চৈবং সহস্রশো বিদ্যাবিদ্যাবিষয়ভেদেন ব্রহ্মণো দ্বিরূপতাং দর্শয়ন্তি বাক্যানি" অর্থাৎ "শ্রুতিতে দ্বিবিধ ব্রহ্ম অভিহিত হইতে দেখা যায়; এক সগুণ ও অপর নির্গুণ। যাহা নাম-রূপাত্মক বিকারবিশেষে উপহিত, তাহা সগুণ আর যাহা তাহার বিপরীত অর্থাৎ উপাধি বা উপাধিসম্বন্ধরহিত, তাহা নির্গুণ।" এই বলিয়া সগুণ ও নির্গুণ বহু শ্রুতিবাক্য উদ্ধার করিয়া শঙ্করা-চার্য্য সিদ্ধান্ত করিতেছেন—"এই সকল শ্রুতি ও এইরূপ অন্যান্য

শ্রুতিও বিদ্যা ও অবিদ্যানামক বিষয়দ্বৈবিধ্য অনুসারে পরব্রহ্মের দ্বিরূপতা প্রদর্শন করিতেছে।" পরে আচার্য্য বলিতেছেন---

"তত্রাবিদ্যাবস্থায়াং ব্রহ্মণ উপাস্যোপাসকাদিলক্ষণঃ সর্ব্বো ব্যবহারঃ।"

অর্থাৎ "তন্মধ্যে অবিদ্যাবস্থাতেই উপাস্য-উপাসকাদি ব্যবহার নির্ব্বাহিত হয়।" অতএব ইহা দ্বারা সোপাধিক বা সগুণ ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তা আচার্য্য শঙ্কর নিষেধ করিতেছেন। কিন্তু তাহা হইলে শ্রুতির এক পক্ষকে বলবৎ করিবার জন্য অন্য পক্ষকে মিথ্যা বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়। আচার্য্য নিম্বার্ক প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে—বিশেষতঃ আচার্য্য নিম্বার্কের মতে শ্রুতিবাক্য সর্ব্বত্রই তুল্যরূপে বলবান্; লক্ষণার দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া ইহার একাংশকে অপরাংশের অধীন করিতে গেলে শ্রুতিকেই দুর্ব্বল করিয়া ফেলা হয় এবং তাহাতে শ্রুতির স্বতঃপ্রমাণতার হানি হয়। এই জন্য এই স্থানে সগুণ ও নির্গুণ উভয়কেই একই বস্তুর দুইটি দিক বলিয়া গ্রহণ করিয়া, উভয়কেই একই সমগ্রের অংশ বলিয়া মানিয়া লইয়া উভয়কেই পারমার্থিকভাবে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য উভয়কেই এইভাবে গ্রহণ করিয়া দ্বৈতাদ্বৈতমতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন।

বস্তুতঃ শ্রুতিতে ব্রহ্মকে যে জগতের উপাদান এবং নিমিত্ত উভয় কারণরূপে দেখা যায়, প্রাকৃত জ্ঞানের দ্বারা তাহার সামঞ্জস্য হয় না। কারণ, ব্যবহারিক জগতে কুম্ভকার নিজ শরীর হইতে ঘট নির্ম্মাণ করে না এবং শিল্পীও নিজ শরীর হইতে অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করে না, কিন্তু এই ব্যবহারিক ভাবের নিরসন করিয়াই ব্রহ্মসূত্রের ১।৪।২৩ সূত্রে ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণরূপে বর্ণিত করা হইয়াছে এবং অদ্বৈতবাদী আচার্য্য শঙ্কর ও অন্যান্য সমস্ত ভাষ্যকারই তাহা স্বীকার করিয়া ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। নিম্বার্কাচার্য্যের মতে ব্রহ্মকে জগতের উপাদান ও নিমিত্ত এই উভয়বিধ কারণরূপে নির্দ্দেশ করিতে গেলে ব্রহ্মের এই দ্বিরূপতা স্বীকার করিতেই হইবে।

অনেকে মনে করেন যে, আচার্য্য নিম্বার্কের মত ভেদাভেদবাদী ভাস্করাচার্য্যের মতের অনুরূপ। কোনও কোনও পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি এই হেতুবাদ প্রদর্শন করিয়া আচার্য্য নিম্বার্কের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পর্য্যন্ত মানিতে চাহেন না, পরন্তু নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য ভাস্করেরই নামান্তর কল্পনা করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা ভাস্করাচার্য্যের মতবাদ সুস্পষ্টরূপে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা ভাস্করের সহিত বহু স্থলেই নিম্বার্কমতবাদের পার্থক্য দেখিতে পাইবেন। বহু স্থলে যেমন পার্থক্য আছে, তেমন আবার বহু স্থলে উভয় মতের সাদৃশ্যও বিদ্যমান। এই হেতুবাদে এবং উভয়ের স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব থাকায় উভয়কে কিছুতেই এক ব্যক্তি বলিয়া কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই স্বীকার করিতে পারিবেন না।

শ্রীভাস্করাচার্য্যের মত 'ঔপচারিক ভেদাভেদবাদ' নামে অভিহিত হইলেই ইহার অর্থানুরূপ সংজ্ঞা হয়। পরন্তু আচার্য্য নিম্বার্কের মত 'বাস্তব ভেদাভেদবাদ'। আচার্য্য ভাস্করের মতে সংসার-অবস্থায় জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন, কিন্তু সংসার-নিবৃত্তিতে যে অভিন্নতা-বোধ, তাহাই পরমার্থ। ব্রহ্ম কার্য্যরূপে বা সংসার-প্রপঞ্চরূপে ভিন্ন, কিন্তু সংসারনিবৃত্তিতে কারণরূপে এক ও অভিন্ন। শঙ্করাচার্য্য এই কার্য্যজ্ঞানকে মায়াবিলাস বলিয়াছেন, ভাস্কর কার্য্যেরও সত্যতা অঙ্গীকার করিয়াছেন। কিন্তু আচার্য্য ভাস্কর শঙ্করের প্রতিপাদিত মুক্তি বা মোক্ষকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"নিঃসম্বন্ধ-নিরাস্বাদ-ত্বৎপক্ষে মোক্ষঃ স্যাৎ, চৈতন্যমাত্রাবশেষাৎ। বদন্তি কেচিৎ শৃগালত্বং বনে বরমিতি।" অর্থাৎ "শঙ্করাচার্য্যের মতে মোক্ষ চৈতন্য-মাত্রাবশেষ হওয়ায় তাহা নিরাস্বাদ ও নিঃসম্বন্ধ, অতএব সেরূপ মোক্ষের অপেক্ষা বনমধ্যে শৃগাল হইয়া অবস্থান করাও শ্রেয়স্কর।" এই জন্য নিরতিশয় আনন্দপ্রাপ্তি ও সর্ব্বশক্তিমত্তাই মুক্তির লক্ষণ ও তাহাই জীবের প্রয়োজন। ভাস্করাচার্য্যের মতে নিরাকাররূপই ব্রহ্মের কারণরূপ, কিন্তু সগুণ ও সবিশেষ ভাব কার্য্যরূপ। কিন্তু আচার্য্য নিম্বার্কের মতে ব্রহ্মের উভয় রূপের মধ্যে কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ নাই, উভয় রূপই সত্য ও পারমার্থিক। আচার্য্য ভাস্করের মতে জীব ব্রহ্মের শক্তি, অতএব অংশ। আচার্য্য নিম্বার্কের মতেও জীব ব্রহ্মের অংশ এবং অংশীর সহিত অংশের ভেদ ও অভেদ উভয়রূপ সম্বন্ধই বিদ্যমান। ভাস্করের মতে মাত্র জ্ঞানের ফলে মুক্তি হয় না, উপাসনার ফলেই মুক্তি হইয়া থাকে। আচার্য্য নিম্বার্কের মতেও উপাসনার ফলে জীবের মুক্তি হইয়া থাকে। আচার্য্য ভাস্করের মতে মুক্তাবস্থায় জীব ব্রহ্মতুল্য সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা লাভ করে এবং ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া ব্রহ্মতা প্রাপ্ত হইয়া—পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আচার্য্য নিম্বার্কের মতে মুক্তাবস্থায়ও জীব অণুই থাকিয়া যায়, তবে মুক্তাবস্থায় জীব আপনার ও জগতের ব্রহ্ম হইতে অভিন্নত্ব বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

পূর্ব্ব-মীমাংসার সহিত উত্তর-মীমাংসার সম্বন্ধ

আচার্য্য নিম্বার্ক "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্রে "অথ" শব্দের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—"অথাধীতষড়ঙ্গবেদেন কর্ম্মফলক্ষয়াক্ষয়ত্ববিষয়ক-বিবেকপ্রকারকবাক্যার্থজন্যসংশয়াবিষ্টেন অতএব জিজ্ঞাসিত-ধর্ম্মমীমাংসাশাস্ত্রেণ তন্নিশ্চিতকর্ম্ম-তৎপ্রকার-তৎফল-বিষয়ক-জ্ঞান-বতা কর্ম্মব্রহ্ম-ফল-সান্তত্ব-সাতিশয়ত্ব নিরতিশয়ত্ব-বিষয়ক-ব্যবসায়জাতনির্ব্বেদেন ভগবৎপ্রসাদেপ্সনা তদ্দর্শনেচ্ছালম্পটেনা-চার্য্যৈকদেবেন শ্রীগুরুভক্ত্যেকহার্দ্দেন মুমুক্ষুণাহনন্তাচিন্ত্য-স্বাভাবিক-স্বরূপ-গুণশক্ত্যাদিভির্বৃহত্তমো যো রমাকান্তঃ পুরুষোত্তমো ব্রহ্মশব্দাভিধেয়স্তদ্বিষয়িকা জিজ্ঞাসা সততং সম্পাদনীয়েত্যুপক্রম-বাক্যার্থঃ।" অর্থাৎ—"ষড়ঙ্গবেদাধ্যয়নের পর কর্ম্মফলের ক্ষয়াক্ষয়ত্ব-বিষয়ক বিভিন্ন বেদবাক্যার্থ চিন্তা করিয়া কর্ম্মফলের ক্ষয়াক্ষয়ত্ব-বিষয়ে বিচার উপস্থিত হইয়া তৎপ্রতি সংশয় জন্মিলে, ধর্ম্মের (বৈদিক ধর্ম্মের) স্বরূপ অবগত হইবার জন্য ইচ্ছার উদ্রেক হয়, তদনুসারে ধর্ম্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু পুরুষের পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন পাঠে ধর্ম্মের স্বরূপ ও প্রকারভেদ ও তৎফলের জ্ঞান উপজাত হয়। অতঃপর কর্ম্মফলের সান্তত্ব, সাতিশয়ত্ব ও নিরতিশয়ত্ব-বিষয়ক বিচার দ্বারা ইহার পরিচ্ছিন্নতা বিষয়ে নিশ্চিতজ্ঞান উপজাত হইলে, তৎপ্রতি অনাস্থা উৎপন্ন হয়; এই প্রকারে কর্ম্মফলে অনাদরবিশিষ্ট মুমুক্ষু পুরুষ শ্রীভগবানের গুণগ্রাম শ্রবণে তৎপ্রতি আকৃষ্টচিত্ত হইয়া ভগবৎ-প্রসন্নতা ও ভগবদ্দর্শনলাভেচ্ছা বশতঃ প্রীতিপূর্ব্বক সদ্গুরুর অনুগত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার নিকট স্বভাবতঃ অনন্ত অচিন্ত্য স্বরূপ, গুণ ও শক্তি প্রভৃতি দ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্ববিধ বিভূতির আশ্রয়, ব্রহ্মশব্দবাচ্য, পুরুষোত্তমের বিষয় অবগত

হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।" (শ্রীযুক্ত তারাকিশোর শর্ম্মা চৌধুরী মহাশয়ের অনুবাদ)

এ স্থলে শ্রীল রামানুজ প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সকলেরই অভিমত এই যে, বেদ অধ্যয়নের পর পূর্ব্বমীমাংসা-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মকাণ্ডে জ্ঞানলাভের পরই ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে। ইহাই সাধারণ নিয়ম। এই সাধারণ নিয়মের বিশেষ কারণে কুত্রাপি ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হইলেও তাহাতে সাধারণ নিয়মেরই দৃঢ়তা স্থাপিত হয়। অতএব কর্ম্মমীমাংসার বা পূর্ব্বমীমাংসার সহিত উত্তর-মীমাংসার বা ব্রহ্মমীমাংসার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে। এই দুইটি মিলিত হইয়াই একটি শাস্ত্র, এই জন্য একটির নাম পূর্ব্বমীমাংসা, অপরটির নাম উত্তর-মীমাংসা। শ্রীমদাচার্য্য নিম্বার্কও এই মতের সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিয়াছেন।

ফলতঃ বিহিত কর্ম্মের আচরণের দ্বারা কর্ম্মফলের অনিত্যত্ব-জ্ঞান না জন্মিলে এবং ঐহিক বা পারত্রিক ইন্দ্রিয়ভোগের নশ্বরত্বের জ্ঞান না জন্মিলে শ্রীভগবৎজিজ্ঞাসার উদয় হওয়া কোনও প্রকারে সম্ভবপর হয় না। বিহিত কর্ম্মের আচরণের দ্বারা ও শ্রুতির অধ্যয়নের দ্বারাই এই জ্ঞানের অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হইয়া থাকে। এই জন্যই জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসাকেই ব্রহ্মসূত্রের অধিকাংশ আচার্য্যই ব্রহ্মসূত্রের পূর্ব্ববৃত্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

ব্রহ্মের স্বরূপ

আচার্য্য নিম্বার্কের মতে ব্রহ্মশব্দে "রমাকান্ত পুরুষোত্তম" অর্থাৎ লক্ষ্মীকান্ত নারায়ণ। "অচিন্ত্যরূপস্য বিশ্বস্য সৃষ্টিস্থিতিলয়া যস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞাদনন্তগুণাশ্রয়াদ্‌ব্রহ্মেশকালাদিনিয়ন্তুর্ভগবতো ভবতি, তদেব পূর্ব্বোক্তনির্ব্বচনবিষয়ং ব্রহ্মেতি লক্ষণবাক্যার্থঃ।" (নিম্বার্ক ভাষ্য ১।১।২) অর্থাৎ অবিচিন্ত্যরূপে প্রকাশিত এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় যাঁহা দ্বারা সাধিত হয়, সুতরাং যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও অনন্ত গুণের আশ্রয়, যিনি ব্রহ্মা, মহেশ্বর এবং কালাদিরও নিয়ন্তা, তিনিই সেই জিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম। জিজ্ঞাসিত ব্রহ্মের লক্ষণ এইরূপে এই সূত্রের দ্বারা অবধারিত হইল।" সমস্ত জীব ও জগতের স্রষ্টা ও অনন্ত গুণের আশ্রয় হইয়াও ব্রহ্ম জীব ও জড় হইতে অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার চেতন ও অচেতন পদার্থের অতীত; অথচ সমস্ত জগতের তিনিই উপাদানকারণ বলিয়া তিনি জীব ও জগৎ হইতে অপৃথক্। তিনি জীব ও জগতের অতীত হইলেও জীব ও জগৎ তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত। জগৎ গুণাত্মক এবং ব্রহ্ম গুণী। অথচ গুণী হইতে গুণের অথবা শক্তিমান হইতে শক্তির পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, কিন্তু শক্তিমান শক্তির অতীত। এই হিসাবে গুণ ও গুণীর বা শক্তিমান ও শক্তির সম্বন্ধ ভেদাভেদসম্বন্ধ। যখন তিনি শক্তির অতীত, তখন তিনি নির্গুণ এবং শক্তি যখন তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হয়, তখন তিনি সগুণ, সুতরাং ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই। এই নির্গুণত্বে ও সগুণত্বে মাত্র বাক্য-বিরোধ, কিন্তু প্রকৃত বিরোধ নাই। ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞস্বভাব। জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞস্বভাব হওয়ায় সমস্ত জাগতিক বস্তু ব্রহ্মে অভিন্নভাবে নিত্য অবস্থিত। জগদ্ব্যাপারের নিয়ত পরিবর্ত্তনের দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় নিত্য চলিতেছে বলিয়া ব্রহ্ম-স্বরূপে কোনও বিকারের সম্ভাবনা নাই। কালশক্তিও ব্রহ্মের অনন্ত শক্তির অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং কালবশেও ব্রহ্মস্বভাবের পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না, অথচ জগদতীত যে ব্রহ্মভাব, তাহাতে জ্ঞান, জ্ঞেয়, ও জ্ঞাতা এই ভেদ নাই। এই জন্যই ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়।

নিম্বার্ক-সম্প্রদায় তাঁহাদের ভেদাভেদবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য জ্ঞাপন করিবার জন্য শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদের এই শ্রুতিবাক্যগুলির উদ্ধার করিয়া থাকেন, যথা—

"উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাঽক্ষরঞ্চ।
অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ॥
সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ জ্ঞাত্বাদেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥"

অর্থাৎ "এই ব্রহ্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব বলিয়া বেদে কথিত হইয়াছেন, তাঁহাতেই অর্থাৎ এই ব্রহ্মেই তিনটি তত্ত্ব (ঈশ্বরত্ব, জীবত্ব এবং দৃশ্যজগদ্রূপত্ব) সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন এবং এই ব্রহ্মই অক্ষর বা অপরিবর্ত্তনীয়। ব্রহ্মবিদ এই অভেদ ব্রহ্মেই ঐ সকলের ভেদ, ইহা জানিতে পারিয়া সৃষ্টিপ্রবাহ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ঐ ব্রহ্মেই লীন হইয়া থাকেন।

"এই ক্ষর অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত তিনটি তত্ত্ব (ঈশ্বর, জীব ও জগৎ) এবং অক্ষর বা অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য ব্রহ্মতত্ত্ব একত্র সংযুক্ত, অর্থাৎ ভেদাভেদ তত্ত্বরূপে অবস্থিত, তন্মধ্যে তিনি ঈশ্বরভাবে এই ব্যক্ত এবং অব্যক্ত অর্থাৎ কার্য্য ও কারণরূপ বিশ্বের পোষণ করিতেছেন এবং জীবরূপী অস্বতন্ত্র আত্মা ভোক্তাভাবে অর্থাৎ আপনাকে ভোক্তা ও দৃশ্যমান বস্তুকে ভোগ্য বুদ্ধি করিয়া আবদ্ধ হইয়া পড়েন; পরে তিনি পূর্ব্বোক্ত স্বপ্রকাশস্বভাব ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইয়া সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।"

এই শ্রুতিবাক্যে দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত অতি সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে, পক্ষান্তরে, উহা যে শ্রুতিসিদ্ধ, তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, নিম্বার্ক ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ উভয় ভাবই স্বীকার করিলেও কার্য্যতঃ নিম্বার্কভাষ্যে ব্রহ্মের সগুণভাবই বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। আচার্য্য নিম্বার্ক যখন শঙ্করের ন্যায় সগুণ ও নির্গুণের দুইটি পৃথক্ সত্তা স্বীকার করেন নাই, পরন্তু উহা যখন একই সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তখন আচার্য্য নিম্বার্ক যদি নির্গুণভাব পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা না করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে কিছুই বিস্ময়ের বিষয় হয় নাই। পরন্তু যাঁহারা আচার্য্য নিম্বার্কের প্রদর্শিত সাধন-প্রণালীর আলোচনা করিবেন, তাঁহারা জানেন যে, পরম ভক্ত আচার্য্য নিম্বার্ক ব্রহ্মের পুরুষোত্তম-ভাবেরই উপাসক। ঋষিগণ-প্রদর্শিত এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াই তিনি জগতের মঙ্গলের জন্য সেই সাধনপথই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার অসাধারণ আর্জ্জবগুণের এবং লোকহিতচিকীর্ষারই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। স্বয়ং-ভগবানের লীলাতেই সগুণ ও নির্গুণের অলৌকিক সামঞ্জস্য সাধিত হইয়া থাকে; এই জন্য রসিক ভক্তগণ এই লীলামৃত-সমুদ্রেই সমস্ত সিদ্ধান্তের সার লাভ করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন। নিম্বার্কের প্রতিপাদিত ব্রহ্ম বা ভগবান পরমানন্দময়। জগতের লীলা-কৈবল্যের মধ্যেও তাঁহার আনন্দ-ময়ী শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ। এই আনন্দময় সত্তার সহিত চিরানন্দভোগই আচার্য্য নিম্বার্কের সাধনার চরম লক্ষ্য। তবে এই আনন্দ ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থ নহে, জীবের আত্মার সহিত

সেই চিরবাঞ্ছিত পরমাত্মার মিলনেই এই আনন্দের প্রকাশ। ব্রহ্মের মাধুর্য্যময় যে সত্তার ইঙ্গিত উপনিষদে প্রদত্ত হইয়াছে, নিখিল রসকদম্বমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তিতেই তাহার পরিপূর্ণ বিকাশ মনে করিয়া নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের একটি প্রধান সংখ্যাধিক বিভাগ সেই শ্রীকৃষ্ণেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। ইহাদের মতে শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণব্রহ্ম—রমাকান্ত পুরুষোত্তম এবং এই শ্রীকৃষ্ণেই ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ এই উভয়বিধ ভাবের সামঞ্জস্য-বিধান হইয়াছে।

আচার্য্য নিম্বার্কের মতে জগৎ ও জীব ব্রহ্মের শক্তি, শক্তি কখনও শক্তিমানকে ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারে না, এই জন্য জীব ব্রহ্মের সহিত অস্বতন্ত্র। ব্রহ্মের শক্তি স্বাভাবিক, এই শক্তিপ্রভাবেই সর্ব্বজ্ঞ, স্বরাট্, পরিপূর্ণ-স্বরূপ আপনা হইতে পৃথক্‌রূপে প্রকাশিত করেন এবং এই শক্তিবলেই তিনি স্বীয় স্বরূপান্তর্গত জগৎকে পৃথক্‌রূপে দর্শন করেন। যে শক্তির দ্বারা তিনি আপনাকে পৃথক্‌ভাবে দর্শন করেন, সেই শক্তিই জীবশক্তি, অতএব জীবেরও ব্রহ্মের সহিত ভেদাভেদ-সম্বন্ধ। জীব ও ব্রহ্মের সহিত যে অভেদ সম্বন্ধ, তাহা "তত্ত্বমসি" বাক্যের দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। জীব ও ব্রহ্মচৈতন্যের অংশ হইলেও চৈতন্যাংশে ব্রহ্মের সহিত জীব অভিন্ন। এই জন্য সাদৃশ্যার্থেই "তত্ত্বমসি" বাক্যের প্রয়োগ হইয়াছে। আচার্য্য নিম্বার্ক ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বলিতেছেন—"জীবস্য পরমাত্মকার্য্যতয়া পরমাত্মানন্যত্বাৎ" (১।৪।২০) অর্থাৎ "জীব পরমাত্মার কার্য্য হওয়ায় পরমাত্মা হইতে জীব অভিন্ন। কারণ হইতে কার্য্যের অভিন্নত্ব হেতু এখানে জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। কিন্তু এই অভিন্নত্ব একত্ব নহে; এই জন্য আচার্য্য নিম্বার্ক বলিয়াছেন—"ভূবিকারবজ্রবৈদূর্য্যাদিবৎ ব্রহ্মাভিন্নোঽপি ক্ষেত্রজ্ঞঃ স্বস্বরূপতো ভিন্ন এবাতঃ পরোক্তস্যানুপপত্তিঃ।" (ব্র সূ ২।১।২২) অর্থাৎ "বজ্রবৈদূর্য্যাদি যেমন পৃথিবীরই বিকার অথচ পৃথিবী হইতে অভিন্ন হইয়াও বিকারবশে ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ জীবও ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট্যাদির বিকারবশে পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও বস্তুতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন।"

অপর পক্ষে ব্রহ্ম হইতে জীবের বৈশিষ্ট্য নিরূপণের জন্য নিম্বার্ক বলিয়াছেন—"জীবোঽণুঃ"; "অনেন প্রদ্যোতনেন এষ আত্মা নিষ্ক্রামতি চক্ষুষো বা মূর্দ্ধ্নো বা অন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ," "যে বৈ কেচনাস্মাল্লোকাৎ প্রয়ন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি," "তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যাঽস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে" ইত্যুৎক্রান্তি-গত্যাগতীনাং শ্রবণাৎ।" অর্থাৎ "এই আত্মা অণুপরিমাণ কদাচ বিভুস্বভাব নহেন, কারণ, শ্রুতিবাক্যের দ্বারা জানা যাইতেছে যে, এই আত্মা হৃদয়স্থ নাড়ীমুখ দীপ্তিমান হইয়া প্রকাশিত হইলে, তাহা দ্বারা প্রবিষ্ট হইয়া চক্ষুঃ, মূর্দ্ধা অথবা শরীরের অন্যদেশ দ্বারা উৎক্রান্ত হন।" "এই লোক হইতে যাঁহারা উৎক্রান্ত হন, তাঁহারা সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করেন।" "সেই লোক হইতে পুনরায় এই কর্ম্মভূমিতে কর্ম্ম করিবার জন্য আগমন করেন।" অতঃপর ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদের দ্বিচত্বারিংশ সূত্রের ভাষ্যে আচার্য্য নিম্বার্ক—জীব ও পরমাত্মার অংশাংশিভাব স্থাপন করিয়াছেন। অতএব আচার্য্য নিম্বার্কের মতে জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বটে, আবার ভিন্নও বটে, ব্রহ্ম বিভুস্বভাব, জীব অণু এবং ব্রহ্মের অংশ। ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, জীব অল্পজ্ঞ। জীব মুক্তাবস্থায়ও জীব, জীবের নিত্যত্ব চিরস্থিত, মুক্তাবস্থায়ও জীব অণু, জীব এক নহে, জীব বহু; যদি জীব এক হইত, তাহা হইলে একের কর্ম্ম অন্যে সংক্রামিত হইত; একের মুক্তিতে অন্য মুক্ত হইত। আচার্য্য নিম্বার্ক এই জন্য জীবের সর্ব্বগতত্ব ও একত্ব স্বীকার করেন নাই।

ব্রহ্ম ও জগৎ

আচার্য্য নিম্বার্কের মতে জগৎ ব্রহ্মেরই পরিণাম। ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ। তিনিই জগতের স্রষ্টা ও তিনিই জগতের দ্রষ্টা, এই জন্য জগতের সহিত তাঁহার ভেদাভেদ-সম্বন্ধ। তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিবলেই তিনি নিজে জগৎরূপে পরিণত হইয়াও অবিকৃত আছেন এবং প্রলয়ে জগৎ তাঁহাতে লীন হইয়া গেলেও তিনি অবিকৃত থাকেন। দুগ্ধ যেমন বিকৃত হইয়া দধিতে পরিণত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হন, কিন্তু দুগ্ধ দধিতে পরিণত হইলে সেই দুগ্ধের দধি ভিন্ন আর স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না, আচার্য্য নিম্বার্কের মতে ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হইলেও তাঁহার পরিপূর্ণ সত্তার বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় না। তিনি সম্পূর্ণভাবে অবিকৃত থাকিয়াও স্বীয় অবিচিন্ত্য শক্তিবলে জগদ্রূপে পরিণত হন। এই তথ্য আচার্য্য নিম্বার্ক ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের ২৬ সূত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন। ঐ সূত্রটি এই—"আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" ঐ সূত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য্য নিম্বার্ক বলিতেছেন—"ব্রহ্মৈব নিমিত্ত-মুপাদানং চ। কুতঃ। "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" ইত্যাত্মকৃতেঃ। ননু কর্ত্তুঃ কুতঃ কৃতিবিষয়ত্বম্! পরিণামাৎ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম স্বশক্তিবিক্ষেপেণ স্বাত্মানং পরিণম্য অব্যাকৃতেন স্বরূপেণ শক্তিমত্তা কৃতিমত্তা পরিণতমেব ভবতি।" অর্থাৎ—"ব্রহ্মই এই জগতের উপাদান এবং নিমিত্তকারণ, কেন না, শ্রুতিতে আছে যে, তিনি নিজেই নিজকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই জন্যই তাঁহাকে 'আত্মকৃতি' বলা হইয়াছে। কিন্তু ব্যবহারিক জগতে কোথাও ত কর্ত্তাই আপনাকে কর্ত্তৃত্বের বিষয়ে উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ ত দেখা যায় না; পরন্তু কর্ত্তা কুম্ভকার মৃত্তিকারূপ স্বতন্ত্র উপাদানের দ্বারা কুম্ভ এবং স্বর্ণকার স্বর্ণরূপ স্বতন্ত্র উপাদানের দ্বারা কুণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।" আচার্য্য নিম্বার্ক বলিতেছেন যে, সূত্রে পরিণামাৎ শব্দ দ্বারা এই আপত্তির নিরসন করা হইয়াছে। সেই সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম নিজের সেই অপূর্ব্বশক্তির বিক্ষেপের দ্বারা আপনাকে পরিণমিত করিয়াও নিজের অভূতপূর্ব্ব বা অলৌকিক শক্তির ও কৃতিত্বের দ্বারা পরিণত হইয়াও স্বীয় অবিকৃত স্বরূপে অবস্থিতি করিয়া থাকেন—ইহাই তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বের ও সর্ব্বশক্তিমত্তার পরিচায়ক। একমাত্র আচার্য্য শঙ্কর ব্যতীত ব্রহ্ম সূত্রের সকল ভাষ্যকারই পরিণামবাদ স্বীকার করিয়াছেন এবং এই পরিণামের দ্বারা ব্রহ্মে যে কোনও বিকার উৎপন্ন হয় না, তাহাও বলিয়াছেন। ফলতঃ এই পরিণামবাদ স্বীকার করিলে ব্যবহারিক-ভাবে ব্রহ্মে বিকারসম্ভাবনা হয় বলিয়া আচার্য্য শঙ্করকে বাধ্য হইয়া বিবর্ত্তবাদ স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা পরিণামবাদ স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা ব্রহ্মের অচিন্ত্য ও অলৌকিক শক্তির দ্বারা যে এই পরিণাম হইয়া থাকে, তাহা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে স্বীকার করিয়াছেন। এই পরিণামবাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্রীজীব গোস্বামী চিন্তামণি নামক মণির দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, চিন্তামণি নামক মণি যেমন নিজের অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা নানা বস্তু প্রসব করিয়াও স্বয়ং অবিকৃত

থাকে, ব্রহ্মও সেইরূপ নিজের অচিন্ত্যশক্তির দ্বারা জীব ও জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও অবিকৃত থাকেন।* বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই পরিণামবাদ সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া এই সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্কের সমস্ত সম্ভাবনা নিরাকৃত করিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালীর গৌরব মহাপ্রতিভাশালী শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী অতি সংক্ষেপে অথচ সুস্পষ্টভাবে এই পরিণামবাদ সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, আমাদের মনে হয়, তাহাই ইহার সম্বন্ধে চূড়ান্ত কথা। যথা—

"পরিণামবাদ" ব্যাসসূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্যশক্ত্যে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত ॥
মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর—তবু অবিকার ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য।৬)

ব্রহ্মসূত্রের ২।১।২৩ সূত্রের ভাষ্যে আচার্য্য নিম্বার্কও পরিণামবাদের সমর্থনে এই "অচিন্ত্যশক্তিকে" অসাধারণ শক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

"ক্ষীরবৎ কার্য্যাকারেণ ব্রহ্ম পরিণমতে স্বকীয়াসাধারণশক্তিমত্ত্বাৎ।" অর্থাৎ "ক্ষীর যেমন দধিরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম স্বীয় অসাধারণ শক্তিমত্ত্ব হেতু অবিকৃত থাকিয়াও জগদ্রূপে পরিণত হন।"

অতএব জগতের জড়ত্ব প্রতীয়মান হইলেও বাস্তবিক জগৎ চিদ্বস্তুপ্রবিষ্ট। সুতরাং জগতের সহিতও ব্রহ্মের ভেদাভেদসম্বন্ধ। ব্রহ্ম অচিন্ত্যশক্তিবলে বা অসাধারণ শক্তিবলে সৃষ্টিকালে যেমন জগদ্রূপে পরিণত হন, সেইরূপ তাঁহার অসাধারণ শক্তিবলে প্রলয়কালে এই জগৎ তাঁহাতেই লীন হয়, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ শক্তিমত্তা হেতু এই সৃষ্টি বা প্রলয়ে তাঁহার বিকার বা বিক্ষোভ হয় না।

তত্ত্বনির্ণয়ের উপায়

আচার্য্য নিম্বার্কের মতে শাস্ত্রই ব্রহ্মতত্ত্ব-নির্ণয়ের একমাত্র উপায়। "জিজ্ঞাস্যং ব্রহ্ম শাস্ত্রপ্রমাণকমেব, নান্যপ্রমাণকম্। সমস্তশ্রুতীনাং সাক্ষাৎপরম্পরয়া বা তত্রৈব সমন্বয়াৎ।" অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ক একমাত্র প্রমাণই শাস্ত্র, অন্য কিছুই ব্রহ্মের প্রমাণ নহে ; এবং সমস্ত শ্রুতিবাক্য-সমূহের সাক্ষাৎ ও পরম্পরাক্রমে একমাত্র ব্রহ্মেই সমন্বয় হইতে পারে।" প্রত্যক্ষ অনুমানাদি প্রমাণের দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় না, কারণ, তিনি বুদ্ধির এবং যুক্তির অতিগ। মনোধর্ম্মে ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া অসম্ভব। একমাত্র অপৌরুষেয় শ্রুতি ভিন্ন অন্য কোনও পদার্থ ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ে কোনও সন্ধান দিতে পারে না। বেদ ও বেদানুকূল শাস্ত্র-সমূহই নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মতে প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম বেদপ্রমাণগম্য, এই সম্বন্ধে দুইটি আপত্তি উঠিয়া থাকে। প্রথমাপত্তিকারক—মীমাংসক-সম্প্রদায়। ইঁহারা বলেন যে, সকল বেদবাক্যই যজ্ঞাদি বিষয়ে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ বিষয়ে উপদেশ করিতেছেন, অতএব যজ্ঞই বেদের মুখ্য প্রতিপাদ্য, ব্রহ্ম নহেন। এই আপত্তির উত্তরে আচার্য্য নিম্বার্ক বলিতেছেন যে, যজ্ঞাদিকর্ম্ম ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উৎপাদনের জন্যই বিহিত হইয়াছে। "প্রত্যুত কর্ম্মণ এব বিবিদিষোৎপাদনেন পরম্পরয়া তৎপ্রাপ্তিসাধনীভূতজ্ঞানোৎপত্ত্যুপকারকত্বেন সমন্বয় ইতি নিশ্চীয়তে বিবিদিষাশ্রুতেঃ।" (নিম্বার্ক ভাষ্য ১।১।৪) অর্থাৎ শ্রুতির মধ্যে বিবিদিষাশ্রুতি নামক এই শ্রুতির দ্বারা (তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন) ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণগণ এই আত্মাকে অর্থাৎ ব্রহ্মকে বেদান্তবাক্যের দ্বারা, যজ্ঞের দ্বারা, দানের দ্বারা, তপস্যাদির দ্বারা জানিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন ; সুতরাং ব্রহ্মসম্বন্ধীয় বিবিদিষা (জানিবার ইচ্ছা) উৎপাদন করিয়া তাঁহার প্রাপ্তির সাধনীভূত জ্ঞানের উৎপত্তি যে বিষয়ে পরম্পরাক্রমে উপযোগী হয় বলিয়াই কর্ম্মের সার্থকতা, অতএব ব্রহ্মপ্রাপ্তিই সমস্ত বেদের একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, আচার্য্য শঙ্কর বলেন, বেদবাক্যসমূহ সাক্ষাৎসম্বন্ধে সেই অবাঙ্মনসোগোচর অর্থাৎ বাক্য ও মনের অগোচর তত্ত্বের বাচক হইতে পারে না, তাহারা নিষেধমুখেই ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করে। আচার্য্য নিম্বার্ক তাহা স্বীকার করেন না, তাঁহার মতে বেদবাক্য-সমূহ অন্বয় ও ব্যতিরেক-মুখে ব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করিয়া থাকেন ; অতএব সমস্তশ্রুতি-বাক্য সাক্ষাৎ বা পরম্পরাক্রমে ব্রহ্মেরই সাধক এবং তাহাতেই তাহাদের সার্থকতা।

তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ

আচার্য্য নিম্বার্কের মতে 'তৎ' শব্দের অর্থে জীব ও জগতের সহিত ভেদাভেদ-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট চেতনাচেতন পদার্থের আত্মা সর্ব্বজ্ঞাদি-অনন্তগুণ-সম্পন্ন ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। ত্বং পদার্থের দ্বারা দেহেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রাণ হইতে পৃথক্ জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞাতা, অংশস্বরূপ পরমেশ্বরের অধীন, অণুপরিমাণ অনন্তরূপে প্রতি শরীরে ভিন্ন বন্ধ ও মোক্ষের যোগ্য চেতন পদার্থ বুঝাইতেছে। এইরূপে 'তত্ত্বমসি' বাক্য সাদৃশ্যার্থে ব্রহ্ম ও জীবের অভিন্নতা-জ্ঞাপক, কিন্তু সামান্যজ্ঞাপক নহে। এইরূপে ব্রহ্ম চেতনাচেতন-বিলক্ষণ অথচ চিদচিদের আত্মস্বরূপ পদার্থ।

পদার্থভেদ

আচার্য্য নিম্বার্কের মতে ব্রহ্ম চেতনাচেতন-বিলক্ষণ পদার্থ। জীব নিত্য চেতন পদার্থ এবং এতদ্ব্যতীত অচেতন পদার্থ তিন প্রকারে বিভক্ত যথা—প্রাকৃত, অপ্রাকৃত ও কাল। যাহা গুণত্রয়ের আশ্রয়ভূত পদার্থ—তাহা প্রাকৃত, ইহা নিত্য ও পরিণামাদি বিকারী। গুণ সত্ত্ব, রজ ও তম। এই গুণাবলী জগতের কারণীভূত, কিন্তু গুণের কার্য্য অনিত্য। অপ্রাকৃত পদার্থ ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি ও কাল হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। কালের ও দেশের অতীত নিত্যবস্তুর পরমপদই অপ্রাকৃত, এই অপ্রাকৃত পদার্থ অচেতন। তবে এই অপ্রাকৃত পদার্থ অচেতন হইলেও শুদ্ধচৈতন্যগুণোপেত ব্রহ্মপদার্থের দ্বারা অনুস্যূত। কাল প্রকৃত ও অপ্রাকৃত হইতে ভিন্ন। অচেতন পদার্থ কাল অনিত্য হইলেও বিভু, যেহেতু সমস্ত প্রাকৃত বস্তুই কালপরতন্ত্র। ব্রহ্মের লীলা-বিভূতিতে তিনি কালের অনুসরণ করিয়া লীলা করিয়া থাকেন, এই জন্য তাঁহার লীলাতে বহু সময়ে মনুষ্যের প্রাকৃত বলিয়া

* "বেদাবিরোধিচিন্ত্যশক্ত্যা বিকাররহিতস্যৈব পরিণামঃ। অসিদ্ধিশ্চ লোকশাস্ত্রয়োঃ চিন্তামণিঃ স্বয়মবিকৃতনানাদ্রব্যাণি প্রসূতে ইতি—"
(সর্ব্বসম্বাদিনী—১৪২ পৃঃ সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ)

ভ্রম ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ব্রহ্মের নিত্য বিভূতিতে কালের বিন্দুমাত্র প্রভাব নাই।

চতুর্ব্ব্যূহবাদ

অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ন্যায় আচার্য্য নিম্বার্ক—চতুর্ব্ব্যূহবাদ স্বীকার করিয়াছেন, অতএব প্রাচীন পাঞ্চরাত্র মতবাদও এই সম্প্রদায়ের স্বীকৃত। ফলতঃ যাঁহারা সপরিবারে শক্তি সহিত শ্রীভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পাঞ্চরাত্র-মতবাদে শ্রীভগবানের চতুর্ব্ব্যূহ স্বীকারে কোনও আপত্তির কারণ দেখা যায় না।

আচার্য্য নিম্বার্ক তাঁহার কৃত দশশ্লোকীতে তাঁহার উপাস্য দেবতার বর্ণনায় বলিয়াছেন -

"স্বভাবতঃ অপাস্তসমস্তদোষম্ অশেষ কল্যাণগুণৈকরাশিম্।
ব্যূহাঙ্গিনম্ ব্রহ্মপরং বরেণ্যংধ্যায়েম কৃষ্ণং কমলেক্ষণং হরিম্ ॥"

অর্থাৎ "যিনি স্বভাবতঃই সমস্ত প্রকার দোষবর্জ্জিত, যিনি অনন্ত কল্যাণ-গুণের আধার, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারিব্যূহ যাহার অঙ্গ, সেই সর্ব্বজীবের বরণীয় পরব্রহ্ম কমল-নেত্র শ্রীকৃষ্ণ হরিকে ধ্যান করি।"

এই স্তোত্রে কোন কোন আচার্য্য ব্যূহ শব্দে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও কারণাতীত এই চতুর্ব্বিধরূপে প্রকাশিত, এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেও সে ব্যাখ্যা গ্রহণ না করিয়া সম্প্রদায়ের বহুজন-গৃহীত-ব্যূহ শব্দের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধই বুঝাইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের উপাসনা ও পূজাদিতে চতুর্ব্ব্যূহবাদ গৃহীত হইয়াছে। শ্রীভগবান্‌কে ইঁহারা প্রামাণিক শাস্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে বিশেষরূপে গৃহীত চতুর্ব্ব্যূহবাদ ইঁহারাও যে গ্রহণ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ৪২ সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী ৪৫ সূত্র পর্য্যন্ত চারিটি সূত্রে আচার্য্য শঙ্কর পাঞ্চরাত্র মতবাদ ও চতুর্ব্ব্যূহবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু আচার্য্য নিম্বার্ক ঐ চারিটি সূত্রে জগতের কেবল শক্তি-কারণবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। অতএব চতুর্ব্ব্যূহবাদ ও তদঙ্গী পাঞ্চরাত্র মতবাদ যে আচার্য্য নিম্বার্কের সম্মত, এতদ্দ্বারাও তাহা প্রতীয়মান হয়।

উপাসনা ও উপাস্যতত্ত্ব

কেবল বাক্যার্থ জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি এবং মোক্ষলাভ হয় না; শাস্ত্রবচনের দ্বারা যাঁহার উদ্দেশে দান করা হইয়াছে, ধ্যানাদি উপাসনার দ্বারা তাঁহার সাক্ষাৎকারের দ্বারাই জীবের মোক্ষলাভ ঘটিয়া থাকে। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে এই জন্য ভক্তিমূলক উপাসনা-বিধি প্রবর্ত্তিত আছে। অন্তরঙ্গভাবে ভক্তিভরে সেই পরমপুরুষ বা পুরুষোত্তমের উপাসনার দ্বারাই তাঁহার সাক্ষাৎকার হয় এবং তাহা দ্বারাই জীব তাঁহার সাক্ষাৎ-ভাবে সেবা করিয়া কৃতার্থ হয়। অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণও আচার্য্যের ন্যায় উপাসনা বা সাধনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য্য নিম্বার্কের মতে পরব্রহ্ম, শ্রীকৃষ্ণ বা রমাকান্ত পুরুষোত্তম একার্থবাচক—নারায়ণ বা কৃষ্ণে কোনও ভেদ নাই। ব্রহ্মের নির্গুণ ভাব ও নির্গুণ উপাসনা স্বীকার করিলেও আচার্য্য নিম্বার্ক সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা-প্রণালীই স্বসম্প্রদায়ে প্রচার করিয়াছেন। আচার্য্য নিম্বার্কের শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য, এই শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য বিশ্বাচার্য্য এবং বিশ্বাচার্য্যের শিষ্য পুরুষোত্তমাচার্য্য। ইনি আচার্য্য নিম্বার্কের দশশ্লোকীর উপর বেদান্তরত্নমঞ্জুষা নামে যে বিবরণ-গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে—

"ব্রজস্ত্রীশব্দবাচ্যায়াঃ গোপীপ্রধানভূতায়াঃ শ্রীবৃষভানুজায়া শ্রীকৃষ্ণেন সহ নিত্যযোগং বিধত্তে"—অর্থাৎ 'ব্রজস্ত্রী-পরিবৃত শ্রীকৃষ্ণ' এই স্থলে ব্রজস্ত্রী শব্দের দ্বারা গোপীপ্রধানা শ্রীশ্রীবৃষভানুতনয়া শ্রীরাধিকার নিত্যযোগ বুঝাইতেছে। অতএব শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা—ইহাই শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য। আচার্য্য নিম্বার্কও বলিয়াছেন—

"অঙ্গে তু বামে বৃষভানুজাং মুদা বিরাজমানামনুরূপসৌভগাম্।
সখীসহস্রৈঃ পরিসেবিতাং সদা স্মরাম দেবীং সকলেষ্টকামদাম্ ॥"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বামভাগে বিরাজমানা যথোপযুক্ত সৌভাগ্যশালিনী সহস্র সহস্র সখীর দ্বারা পরিসেবিতা সকল মনোহভিলাষের পূরণকর্ত্রী শ্রীশ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকাদেবীকে পরমানন্দে স্মরণ করিতেছি।

শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণই যে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের অভীষ্ট দেবতা, তাহা পদ্যাবলীতে ধৃত শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্যের অন্য একটি শ্লোকেও পাওয়া যায়। যথা—

পুরতঃ স্ফুরতু বিমুক্তিশ্চিরমিহ বাজাং করোতু বৈ রাজ্যম্।
পশুপাল-বালকপতেঃ সেবামেবাভিবাঞ্ছামি ॥"

পদ্যাবলী ৮৪ শ্লোক ॥"

অর্থাৎ আমার সম্মুখে বিমুক্তিই স্ফুরিত হউক বা চিরকাল ধরিয়া ব্রহ্মপদ বিরাজ করুক, তাহাতে আমার কোনও আকাঙ্ক্ষা নাই, আমি গোপবালকপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবারই অভিলাষ করি। এই সকল প্রমাণ দ্বারা জানা যায় যে—চতুঃসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রীরাধিকা সহকারে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মধ্যেই সর্ব্বপ্রথমে প্রচলিত হয়, তবে শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মধ্যে রসবৈচিত্র্যময়ী মধুর রসের উপাসনার ক্রমানুসারে অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সম্প্রদায়ে শ্রীকৃষ্ণ পরতত্ত্ব বলিয়া বিবেচিত হইলেও ঐশ্বর্য্যপ্রধান শ্রীশ্রীনারায়ণের সহিত তাঁহার কোনও পার্থক্য নাই, অথবা শ্রীনারায়ণ হইতে তাঁহার কোনও বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন ইঁহারা করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ কি চতুর্ভুজ, তৎসম্বন্ধে কোনও বিচার করেন নাই। যথা -

"দ্বিভুজশ্চ চতুর্ভুজশ্চ স্বপ্রীত্যনুরূপেণ উভয়বিধত্বাৎ তস্য নাত্র তারতম্যভাবঃ।" (বেদান্তরত্নমঞ্জুষা) শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ দ্বিভুজ, কি চতুর্ভুজ, ইহার বিচার না করিয়াই উপাসক নিজের যে বিগ্রহে প্রীতি, সেই বিগ্রহেরই ভজনা করিবেন; কারণ, শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ এই উভয় প্রকার রূপই হইতে পারে এবং এই উভয়বিধ রূপের মধ্যে কোন তারতম্য নাই। ইহার ফলে পুরুষোত্তমাচার্য্য পুরলীলাকেও ব্রজলীলার সমান মর্য্যাদা দান করিতে বাধ্য হইয়াছেন, যথা—"তথাচ-রুক্মিণী-সত্যভামা ব্রজস্ত্রীবিশিষ্টঃ শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমঃ সাম্প্রদায়িভির্বৈষ্ণবৈঃ সদা উপাসনীয়ঃ।" (বেদান্তরত্নমঞ্জুষা)

অর্থাৎ "সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ রুক্মিণী, সত্যভামা ও শ্রীরাধিকা-বিশিষ্ট শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিবেন।"

যেখানে দ্বারকায় পুরলীলা, সে স্থলে শ্রীবৃন্দাবনের গোপবালাগণের কি প্রকারে সন্ধান থাকিতে পারে? এইজন্যই পরবর্ত্তী কালে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের এক শাখা শ্রীরুক্মিণী ও শ্রীসত্যভামা-সমন্বিত চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। পরবর্ত্তী কালে পুরলীলার উপাসকগণকেও ব্রজলীলার মহামাধুর্য্যে নিমজ্জিত করিবার জন্য মহাপ্রতিভাশালী রসিকচূড়ামণি শ্রীরূপ গোস্বামী "শ্রীশ্রীললিত মাধব" নাটক রচনা করিয়া চিরকালের জন্য ব্রজলীলার ও পুরলীলার উপাসকগণের বিরোধভঞ্জন করিয়া দেন। সৌভাগ্য ঘটিলে আমরা যথাসময়ে তদ্বিষয়ের আলোচনা করিয়া এই রস-পরিপাটীর রহস্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিবার চেষ্টা করিব।

যাহা হউক, নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই শ্রীবৃন্দাবনস্থিত শ্রীরাধাসহিত দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপ আলোচনা করিতে গেলে তাঁহাদের সেই ধ্যানটির আলোচনা করিতে হয়। ঐ ধ্যানটি এই—

"সংপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।
দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্।
গোপীগোপগবাবীতং সুরদ্রুমতলাশ্রয়ম্।
দিব্যালঙ্কারণোপেতং রত্নপঙ্কজমধ্যগম্॥
কালিন্দীজলকল্লোলসঙ্গিমারুতসেবিতম্।
চিন্তয়ন্মনসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংসৃতেঃ॥"

অর্থাৎ অতি মনোহর পদ্মদলের ন্যায় নয়নসমন্বিত, নবনীরদের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন, বিদ্যুতের ন্যায় পীতবসনধারী দ্বিভুজ জ্ঞানমুদ্রাবলম্বী, বনমালাধারী ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনপুলিনস্থ কল্পবৃক্ষের তলস্থিত গো, গোপ ও গোপীগণ-পরিবেষ্টিত, দিব্যালঙ্কার-ভূষিত, রত্নপদ্মের মধ্যস্থলে অবস্থিত, যমুনা-জলকল্লোলস্নিগ্ধ শীতল সমীরণের দ্বারা সেবিত অবস্থায় ধ্যান করিবে; এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিলে জন্মমরণবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

এই ধ্যান অনুসারেই নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের অধিকাংশ বৈষ্ণব শ্রীবৃন্দাবনের যোগপীঠস্থ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিয়া থাকেন। যাঁহারা রুক্মিণীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করেন, তাঁহারা শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে উল্লিখিত—

"শ্রীবৎসলাঞ্ছনং হৃৎকৌস্তুভপ্রভয়া যুতম্।
চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রশার্ঙ্গপদ্মগদান্বিতম্।"

শ্রীবৎসলাঞ্ছিত হৃদয়ে কৌস্তুভধারী চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র ধনু গদা পদ্ম শোভিত কর—শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিয়া থাকেন।

শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের অধিকাংশ বৈষ্ণব শ্রীবৃন্দাবনস্থিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসক হইলেও ইঁহাদের শ্রীরাধিকা শ্রীলক্ষ্মীরই মূর্ত্তিভেদ, রমাকান্ত ও রাধাকান্ত ইঁহাদের মতে এক, সুতরাং ইঁহাদের রমায় ও রাধায় ভেদ নাই। ইঁহাদের সম্প্রদায়ের কোনও গ্রন্থাদিতে শ্রীরাধিকাকে 'পরকীয়া' রূপে বর্ণনা করা হয় নাই। স্বকীয়া ভাবসমন্বিতা ব্রজলীলাই এই সম্প্রদায়ের ধ্যেয়।

সাধনা ও প্রাপ্তি

প্রপত্তিলক্ষণা যে ভক্তি, শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ে স্বীকৃত, তাহাই ভক্তির প্রথমভূমি। শ্রীভগবানের শরণাগত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার কৃপার অপেক্ষাই ভক্তিপথের সকল সাধকগণেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ও এই প্রপত্তিলক্ষণা ভক্তিকেই সাধনার প্রথম অবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আচার্য্য নিম্বার্ক দশশ্লোকীতে বলিয়াছেন—

"নান্যা গতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দাৎ সংদৃশ্যতে ব্রহ্মশিবাদিবন্দিতাৎ।
ভক্তেচ্ছয়োপাত্তসুচিন্ত্যবিগ্রহাৎ অচিন্ত্যশক্তেরবিচিন্ত্যশাসনাৎ॥"

অর্থাৎ "ভক্তের মনোঽভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য যিনি সুখে ধ্যানযোগ্য বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন, এবং যাঁহার অলৌকিক শক্তির প্রভাব অচিন্তনীয় এবং যাঁহার শাসনের শক্তিও চিন্তার দ্বারা পার পাওয়া যায় না, সেই শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মশিবাদিবন্দিত পাদপদ্ম ভিন্ন আর গতি দেখা যায় না।"

এইরূপে অনন্যগতি হইয়া সেই সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বশক্তিময় শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করার নামই শরণাগতি বা প্রপত্তি। এই শরণাগতি ভিন্ন আর উপায় নাই—জীবের যখন এই বোধ জন্মে, তখনই সে ভক্তিপথে যাত্রা করিবার অধিকারী হয়। শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের অন্যতম আচার্য্য শ্রীল কেশব কাশ্মীরী "দৈন্য" শব্দে এই শরণাগতি বা প্রপত্তিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার মতে—

"আদৌ দৈন্যং তি সন্তোষঃ পরিচর্য্যা ততঃ পরম্।
ততঃ কৃপা চ সৎসঙ্গেঽসদ্ধর্ম্মে চারুচিস্ততঃ।
কৃষ্ণে রতিস্ততো ভক্তির্যা প্রোক্তা প্রেমলক্ষণা।
প্রাদুর্ভাবো ভবেদস্যাঃ সাধকানাময়ং ক্রমঃ॥"

অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথমে (১) দৈন্য অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ, তৎপরে (২) সন্তোষ—অর্থাৎ তাঁহার প্রদত্ত সকল অবস্থারই শান্তিবোধ। অতঃপর (৩) পরিচর্য্যা কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুদেব, শ্রীবিগ্রহ ও সাধুগণের সেবা, তৎপরে (৪) কৃপা—অভক্তজনের প্রতি বা পতিত জনের প্রতি স্বাভাবিক হৃদয়োত্থ করুণা, তৎপরে (৫) সৎসঙ্গ—সাধুসঙ্গে ঐকান্তিক অনুরক্তি, তদনন্তর (৬) অসদ্ধর্ম্মে অরুচি—সৎসঙ্গের ফলে স্বভাবতঃ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথে আসক্তি অতঃপর (৭) কৃষ্ণে রতি—কৃষ্ণকথায়, কৃষ্ণলীলায় কৃষ্ণনামাদি শ্রবণে আনন্দের উদয়, অতঃপর (৮) শ্রীকৃষ্ণেপ্রেমলক্ষণা ভক্তিলাভ আচার্য্য নিম্বার্কের মতে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি বা ভগবৎভাবপ্রাপ্তিই জীবের মোক্ষলাভ। এই মোক্ষে ভগবদ্ধামের সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষপ্রাপ্ত জীব ভগবৎশক্তিরূপে তাঁহার সহিত ভেদাভেদসম্বন্ধযুক্ত হইয়া তদ্ধামে বাস করিয়া থাকে, এই ভগবদ্ধাম কিরূপ, তৎসম্বন্ধে আচার্য্য বলিয়াছেন যে, ঐ ধাম বিরজানদীর পরপারে অবস্থিত। ঐ ধাম নিত্যচিদ্ঘন এবং মায়াস্পর্শরহিত। মুক্ত জীব দিব্যদেহ ধারণ করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া এই ধামে অনন্তকাল বাস করিয়া থাকেন।

এই সম্প্রদায়ে মুক্ত জীবের নিষ্ক্রমণ সম্বন্ধে অতি প্রাচীনকাল হইতে ১৩টি শ্লোক বিদ্যমান। তাহাতে মুক্তপুরুষের দেহান্তে অর্চিরাদিমার্গ দ্বারা যে গতিলাভ হইয়া থাকে, তাহা বর্ণিত আছে। এই শ্লোক অনুসারে—"ব্রহ্মবিৎ পুরুষ, সূক্ষ্মদেহ অবলম্বন করিয়া—স্থূলদেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সূর্য্যরশ্মিতে আরোহণ করত সর্ব্বপ্রথমে বহ্নি বা অগ্নিদেবতাকে প্রাপ্ত হন, তাহার পর যথাক্রমে দিনাভিমানী দেবতা, শুক্লপক্ষাভিমানী দেবতা, উত্তরায়ণ, ষণ্মাসাভিমানী দেবতা, সম্বৎসরাভিমানী দেবতা, আদিত্যাভিমানী দেবতা, চন্দ্রাভিমানী দেবতা, এবং বিদ্যুৎ-অভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন।

অতঃপর তিনি বরুণলোক, ইন্দ্রলোক ও প্রজাপতিলোক অতিক্রম করিয়া বিরজার তীরে উপনীত হন এবং তথায় সূক্ষ্মশরীর পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত দিব্যদেহ ধারণ করত ভগবৎভূষণতুল্য ভূষণে ভূষিত হইয়া ইচ্ছামাত্র সেই বিরজানদীকে অতিক্রম করিয়া ভগবদ্ধামে উপনীত হন। তথায় দ্বারপালগণের সহিত সেই ধাম দর্শন করিতে করিতে মহারত্নময় দিব্য মণি-মণ্ডপে সিংহাসনস্থ পুরুষোত্তম শ্রীহরিকে দর্শন করেন। তিনি লক্ষ্মী আদি শক্তিসমূহযুক্ত, এবং পার্ষদগণ দ্বারা অভিবন্দিত। তিনি সহস্র সূর্য্য হইতেও জ্যোতির্ম্ময় কিরীটাদি ভূষণে ভূষিতাঙ্গ, বেদান্তবেদ্য এবং ব্রহ্মাদিরও বন্দনীয়। তিনি মুক্তগণের প্রাপ্য, মুমুক্ষুগণের অন্বেষণীয় বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ এবং স্বভাবতঃ সমস্ত হেয়গুণবর্জ্জিত। সেই সমস্ত কল্যাণগুণ-কর—আদি-পুরুষ ভগবান মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণকে পরধামে অবস্থিত দর্শন করিয়া সেই মুক্ত পুরুষ দূর হইতে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের উদ্দেশ্যে বারম্বার প্রণাম করেন। অতঃপর তিনি শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সম্ভাবিত হইয়া ভগবৎভাব প্রাপ্ত হইয়া মায়াবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।" নিম্বার্ক সম্প্রদায় এই গতিকে অর্চ্চিরাদি পদ্ধতি নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অষ্টম অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকে এই গতির কথাই উপদিষ্ট হইয়াছে, যথা—

"অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ।"

অর্থাৎ "ব্রহ্মবিদ্‌ব্যক্তি, অগ্নি অভিমানিনী দেবতা, জ্যোতিরভিমানিনী দেবতা, দিনাভিমানিনী দেবতা, শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতা, উত্তরায়ণ অভিমানিনী দেবতা আদি ক্রমে গমন করিয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।" আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, শ্রীসম্প্রদায়ে এইরূপে ভগবদ্ধামের বর্ণনা আছে।

আমরা নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের যে গুরুপ্রণালী প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে দেখা যাইবে যে, ৩৩ সংখ্যায় কেশবকাশ্মীরীর নাম আছে। এই কেশবকাশ্মীরী মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সমসাময়িক। এই কেশবকাশ্মীরীর শিষ্য শ্রীভট্ট এবং তাঁহার শিষ্য শ্রীহরিব্যাসদেব যখন শ্রীবৃন্দাবনে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় পার্ষদ শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসিদ্ধান্তগ্রন্থ, স্মৃতিগ্রন্থ ও লীলাগ্রন্থাদি প্রকাশ ও শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থাদি প্রকাশ করিতে থাকেন, তখন এবং তাহার কিঞ্চিৎ পরে শ্রীহরিব্যাসদেব শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া হিন্দী পয়ারে, "মহাবাণী" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই 'মহাবাণী' গ্রন্থে সখীভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবার পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। সখীর অনুগতা হইয়া শ্রীরাধিকা সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেবাপদ্ধতি শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশেষত্ব। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যে এই ভাবের প্রবর্ত্তক ও প্রচারক, ইহা শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতের গ্রন্থকার শ্রীলপ্রবোধানন্দ স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীরাধার সহিত রস-লীলাসমন্বিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাপদ্ধতি পূর্ব্বে প্রচলিত থাকিলেও শ্রীচৈতন্যদেব যে ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তদনুগামী শ্রীবৃন্দারণ্যবাসী শ্রীরূপসনাতন প্রমুখ আচার্য্যগণ এই রসের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের সমকালে বা কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী কালে আবির্ভূত শ্রীল হরিদেব ব্যাসজী ইঁহাদের ভাবের দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবিত হইবেন, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। অতএব আমাদের মনে হয়, শ্রীল হরিদেব ব্যাসজী সখীগণের অনুগত হইয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলের উপাসনার পদ্ধতি ইঁহাদের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়া তাহা "মহাবাণী" গ্রন্থে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং তদবধি নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের হরিব্যাসী শাখায় ঐ প্রকারের উপাসনা-পদ্ধতিই প্রচলিত হইয়া থাকিবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এই প্রকার উপাসনার জন্য বাসনাময়ী সখীর দেহ বা সিদ্ধদেহ নির্ম্মাণ করিয়া লইতে হয়। উহার জন্য গুরুপ্রণালীর এক বিশেষ প্রকার বা সিদ্ধপ্রণালী বর্ত্তমান আছে, ঐ সিদ্ধপ্রণালীর পরিচয় জ্ঞাত না থাকিলে কোনও গৌড়ীয় বৈষ্ণবই এই প্রকারের ভজনের অধিকারী হইতে পারেন না। শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের হরিব্যাসী শাখায় এই প্রকার সিদ্ধপ্রণালী প্রচলিত আছে কি না, আমরা তাহা জানিতে পারি নাই। যদি তাহা থাকে, তবে এই পদ্ধতি যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহা একরূপ নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যাইতে পারে। ফলতঃ শ্রীল হরিব্যাসজীর আবির্ভাব-সময় যদি বিচার করিয়া আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, অধিকতর অনুসন্ধানের ফলেও তাহা সমর্থিত হইতে পারিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।* আমরা বল্লভ সম্প্রদায়ের পুষ্টিমার্গের ইতিহাস আলোচনা করিবার সময় ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের উপাসনার কথার আলোচনা করিয়াছি ও কি প্রকারে বল্লভ সম্প্রদায়ে ঐরূপ উপাসনা-পদ্ধতির প্রাদুর্ভাব ঘটিল, তাহাও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের এই সখীভাবের উপাসনাও যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতে গৃহীত, ইহাও আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস।

অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ন্যায় শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ও তিলক-ধারণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের তিলক ললাটের দুই পার্শ্বে দুইটি রেখা এবং ভ্রূমধ্যে একটি বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত। ইঁহারা কণ্ঠে তুলসীমালা ধারণ করেন এবং জপের জন্য তুলসীমালা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রাচীন ঐতিহ্য ও দর্শনমূলক বহু গ্রন্থ লোপ পাইয়াছে বলিয়া এই সম্প্রদায়ের বিশ্বাস। বস্তুতঃ মাধ্ব সম্প্রদায় ও রামানুজ সম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলীর তুলনায় এই সম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প। যাহা হউক, আধুনিক আচার্য্যগণ ঐ অভাব দূরীকরণের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম, এ, বি, এল)।

---

* আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত রাসেশচরণ দাস কয়েক মাস পূর্ব্বে—শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীযুক্ত হংসদাস বাবাজীর প্রকাশিত নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ দেখাইয়াছিলেন; তাহা শ্রীরূপ গোস্বামীর লিখিত "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" গ্রন্থের ন্যায়। তাহাতে সখীভাবসম্বলিত রসের বিচারও পরিদৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া আমার মনে পড়িতেছে। ঐ গ্রন্থখানির ইতিহাস আলোচনা করিলে শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সহিত শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ নির্দ্ধারণের সহায়তা হইবে। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আলোচনার সময় উহার স্বরূপ-নির্দ্দেশের চেষ্টা করা যাইবে।



[উপন্যাস]

১২

ছায়া ফিরিয়া আসিবার কিছু দিন পরে শিরী ও লুণা পর্ব্বতে উঠিবার চেষ্টা করিয়া বিফলপ্রযত্ন হইল। ছায়ার বৃত্তান্ত তাহারা অবগত ছিল না।

প্রধানাদের শাসনে শিরী ও লুণা ভয় পায় নাই, কিন্তু তাহারা জানিত, আবার পলায়নের চেষ্টা করিয়া ধরা পড়িলে তাহারা জন্মের মত কোথাও নির্ব্বাসিত হইবে। নির্ব্বাসনের স্থান কোথায়, তাহা কেহ জানিত না। দুই সখী জানিত, এক বৎসর তাহারা পর্ব্বতে প্রেরিত হইবে না, অথচ পর্ব্বতে যাহা দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহাতে তাহাদের কৌতূহল এবং ঔৎসুক্য অত্যন্ত বাড়িয়াছিল। এক বৎসর নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা কিছুতেই তাহাদের মনঃপূত হইতেছিল না। যখন তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিবে, তখনই বা তাহারা কি দেখিবে? প্রতি বৎসরই ত কেহ কেহ যায়, তাহারাই বা কি দেখিয়া আসে? যাহাও বা দেখিয়া আসে, তাহার কিছুই প্রকাশ করে না কেন? দুই জনে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, প্রকাশ করিলে আশঙ্কা আছে, ভয়ে কেহ কিছু বলে না। প্রধানাদিগকে দেখিলে ভয় হইবারই কথা। তাহারা যেন সাক্ষাৎ বিভীষিকা। শীর্ণ, শুষ্ক, কঠোর, নির্ম্মম মূর্ত্তি, দৃষ্টিতে দয়া কি মমতার লেশ নাই, কণ্ঠ নীরস, আচরণ নিষ্ঠুর। যে দেবতার আদেশে প্রধানারা শাসন করে, লুণা ও শিরী সে মূর্ত্তি দেখে নাই, কিন্তু শুনিয়াছিল ভীষণ মূর্ত্তি, দেখিলে আতঙ্ক হয়।

তাহারা দেখিত মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস, মুক্তবেণী স্রোতস্বিনী মুক্তকণ্ঠে কল-কল নাদে বহিয়া যাইতেছে, সর্ব্বত্র-ব্যাপিনী মুক্তির মধ্যে তাহারা পর্ব্বতপ্রাচীরবেষ্টিত কারাগারের মধ্যে বন্দিনী। বাহির হইতে কোন সংবাদ তাহাদের শ্রবণে প্রবেশ করে না, বজ্রকঠিন ব্যূহের ন্যায় দুর্ভেদ্য রহস্য তাহাদিগকে ঘিরিয়া আছে। এ প্রাচীর বল পূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া ফেলা যায় না, এ রহস্য কোনমতে ভেদ করিতে পারা যায় না। আর যাহারা আছে, তাহারাই বা কিছু করে না কেন, কোন উপায় অন্বেষণ করে না কেন?

এক দিন অপরাহ্ণের সময় দুই নগরের পরীরা নগর হইতে কিছু দূরে একটা বাগানে মেলা দেখিতে গিয়াছিল। নগর প্রায় শূন্য, আকাশে কেহ বিচরণ করিতেছিল না, নদীর ধারে কেহ ছিল না, নৌকায় কেহ ভ্রমণ করিতেছিল না। কেবল শিরী ও লুণা যায় নাই। উৎসব আমোদ তাহাদের ভাল লাগিত না। লুণার বাড়ীর সম্মুখে নদীর ধারে একখান নৌকায় বসিয়া দুই জনে কথোপকথন করিতেছিল।

দেখিতে দেখিতে সূর্য্য অস্তমিত হইল। আকাশের পশ্চিম প্রান্তে গোধূলির রাগ, অপর সকল দিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইতে আরম্ভ হইল। সহসা আকাশে গম্ভীর গুঞ্জন-শব্দ শ্রুত হইল। সেরূপ শব্দ শিরী ও লুণা পূর্ব্বে কখন শোনে নাই। তাহারা আকাশে চাহিয়া দেখিল, অতি বৃহদাকার পক্ষীর ন্যায় কি একটা উড়িয়া আসিতেছে। অকস্মাৎ শব্দ বন্ধ হইয়া গেল। যাহা হইতে শব্দ নির্গত হইতেছিল,

তাহা অতিশয় বেগে নৌকা হইতে অল্প দূরে জলে পতিত হইল।

শিরী বলিল, এ কি রকম পাখী? এত বড় পাখী ত কখন দেখিনি। আর কি রকম ডাক শুনলে?

লুণা বলিল, চল, ওটা কি দেখে আসি।

শিরী বলিল, আবার যদি উড়ে যায়? কাছে গেলে কোন ভয় নেই ত?

লুণা বলিল, উড়ে যায় যাবে, তার আর কি করা যাবে? পাখীকে আবার ভয় কি?

দুই জনে নৌকায় দাঁড় টানিয়া নিকটে গেল। কাছে গিয়া দেখিয়া লুণা কহিল, এটা পাখী নয়, আর কিছু হবে। দেখ, এ ধার দিয়ে ওঠা যায়। তুমি উঠে ভিতরে একবার উঁকি মেরে দেখ ত।

শিরী ভয়ে ভয়ে পাশ দিয়া উঠিয়া উঁকি দিয়া ভিতরে দেখিল। উঠিয়াই অস্ফুট ভীতিশব্দ করিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিল। বলিল, ওর ভিতর কি একটা রয়েছে!

লুণা বিদ্রূপ করিয়া কহিল, যত ভয় তোমার! ওর ভিতর কি আছে? বাঘ-ভাল্লুক কি আকাশে উড়ে বেড়ায় না কি?

শিরী বলিল, না, সে রকম নয়। কে এক জন ব'সে রয়েছে। চোখ দুটো মস্ত গোল, আর রং যেন কি রকম!

—কি রকম দেখতে?

শিরী চুপি চুপি লুণার কাণে কাণে বলিল, পাহাড়ে আমরা যে প্রহরী দেখেছিলাম, দেখতে কতকটা সেই রকম।

—মুখে চুল আছে?

—তা ত কৈ দেখতে পাই নি।

—রসো, আমি দেখছি, বলিয়া লুণা শিরীর মত পাশ দিয়া উঠিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল।

ভিতরে কে এক জন বসিয়া আছে। সর্বাঙ্গে এক রকম মোটা পোষাক আঁটা, মাথায় চাপা টুপী, চক্ষু গোলাকার, বৃহৎ, কিন্তু চক্ষুর তারা নাই। মস্তক বক্ষের উপর নমিত হইয়া পড়িয়াছে, হস্ত-পদ স্থির। লুণা ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইল। সে মাথা তুলিল না, যেমন স্থির ছিল, সেইরূপ রহিল। লুণার আশঙ্কা হইল, হয় ত তাহার মৃত্যু হইয়াছে। লুণা তাহার পাশে বসিয়া ভাল করিয়া দেখিল। যাহা চক্ষু মনে হইতেছিল, তাহা চক্ষু নহে, চক্ষুর আবরণ। লুণা সাহস করিয়া কম্পিত-হস্তে সেটা খুলিয়া ফেলিল; মাথার টুপী খুলিয়া ফেলিল। দেখিল, দেবদুর্লভ, নয়নমোহন দিব্য-মূর্ত্তি, ওষ্ঠ-চিবুক লোমশূন্য। মূর্চ্ছিত, সংজ্ঞাশূন্য। লুণা অঙ্গে হস্ত দিয়া দেখিল, উত্তম চর্ম্মনির্ম্মিত বস্ত্র।

লুণা উঠিয়া গেল, যাইবার সময় সেই মূর্চ্ছিত মূর্ত্তি মুখ ফিরাইয়া কয়েকবার দেখিল। শিরীকে বলিল, তুমি যে চোখ দেখেছিলে, সেটা চোখ নয়, চোখের ঢাকা। পাহাড়ে যাকে আমরা দেখেছিলাম, ঠিক সে রকম দেখতে নয়। অজ্ঞান হয়েছে। শীঘ্র ওকে আমাদের বাড়ী নিয়ে চল।

নৌকার সঙ্গে সেই যন্ত্র বাঁধিয়া দুই জনে তীরে লইয়া গেল। তীরে খুঁটি ছিল, তাহাতে সেই যন্ত্র বাঁধিল। দুই জনে ধরাধরি করিয়া মূর্চ্ছিত ব্যক্তিকে গৃহে লইয়া গিয়া একটা নিভৃত কক্ষে শয্যায় শয়ন করাইল। লুণা বলিল, যা কিছু জিনিষ-পত্র আছে, সব নিয়ে আসতে হবে, কিছু রাখা হবে না, তা হ'লে কেউ কিছু দেখতে পেলে কিছু সন্দেহ করবে। আমরা শুধু বলব, ঐ জিনিষটা আমরা জলে পেয়েছিলাম, ওর ভিতর যে কেউ ছিল, তা কোনমতে বলা হবে না।

শিরী বলিল, তুমি পাগল হয়েছ, তা হ'লে কি আর রক্ষে থাকবে? হয় ত ওকে মেরে ফেলবে, আমাদের কি করবে, তাই বা কে জানে? ওটাও বোধ হয় এক রকম নৌকা, আকাশে ওড়ে।

—তাই হবে, কিন্তু শব্দ কিসের?

—তা বলতে পারি নে।

দুই জনে যন্ত্রের ভিতর গিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিল। দুইটা মাঝারি আকারের চামড়ার বাক্স ছিল, কয়েকটা ছোট ছোট থলি, আরও ছোট ছোট কতকগুলা জিনিষ। দুই জনে সমস্ত আনিয়া, যে ঘরে সে লোকটিকে শয়ন করাইয়াছিল, সেইখানে রাখিল। সে ব্যক্তি তখনও অচৈতন্য।

লুণা বাহিরের দরজা, ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া আলোক জ্বালিল। বলিল, অনেকক্ষণ অজ্ঞান হয়ে রয়েছে, সে ত ভাল নয়।

সে ব্যক্তির বক্ষে বোতাম আঁটা ছিল, লুণা খুলিতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ মূর্চ্ছিত ব্যক্তির চিবুকে তাহার হাত ঠেকিল।

হাত ঠেকিতেই বলিয়া উঠিল, এ কি? আমার হাতে কি করকরে ঠেকল? আলোটা ধর দেখি।

শিরী এক হাতে আলোক ধরিয়া অপর হস্ত অচৈতন্য ব্যক্তির মুখে বুলাইয়া কহিল, তাই ত, আমারও হাত কর-কর করছে। এই দেখ, এর মুখেও ছোট ছোট চুল রয়েছে।

লুণা মূর্চ্ছিত ব্যক্তির বুকের বোতাম খুলিয়া ফেলিল। উভয়ে বিস্মিত হইয়া দেখিল, বক্ষঃস্থল প্রশস্ত, মসৃণ, তাহাতে কঠিন মাংসপেশী। লুণা শিরীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, দেখেছ, ওর বুক দেখতে আর এক রকম।

লুণা উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিজের একটি পক্ষ অল্প প্রসারিত করিয়া, মূর্চ্ছিত ব্যক্তির মুখে, অঙ্গে বাতাস করিতে লাগিল। শিরী জল দিয়া তাহার মুখ মুছাইয়া দিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সে ব্যক্তির মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চক্ষু উন্মীলন করিল। চক্ষু আয়ত, উজ্জ্বল, নীলতার। লুণা বীজন বন্ধ করিল।

শয্যার এক পাশে দাঁড়াইয়া লুণা, অপর পার্শ্বে শিরী। তাহাদিগকে দেখিয়া সে ব্যক্তির চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইল, দৃষ্টি স্থির হইল। একবার শিরীকে দেখে, আবার লুণাকে দেখে। লুণার পক্ষ দেখিয়া আরও বিস্মিত হইল, সুপ্তোত্থিতের ন্যায় কয়েকবার চক্ষু মার্জ্জন করিল। দ্বিধাপূর্ণ মৃদুস্বরে কহিল, আমি কি স্বপ্ন দেখছি? কোথায় এসেছি?

শিরী ও লুণা তাহার কথা বুঝিতে পারিল না। দুই জনে পরস্পরের প্রতি চাহিয়া দেখিল।

সে ব্যক্তি শয্যায় উঠিয়া বসিল। বুক খোলা দেখিয়া বুকের বোতাম আঁটিল। ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার জিনিষ-পত্র সজ্জিত রহিয়াছে। তখন সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

লুণা এবং শিরী দেখিল, এ ব্যক্তি প্রহরীর অপেক্ষাও দীর্ঘাকৃতি, বিশালবক্ষ, উন্নতস্কন্ধ, ক্ষীণকটি। পরীরা এক প্রহরী ব্যতীত অপর পুরুষ কখন দেখে নাই, নহিলে বুঝিতে পারিত, এই কুঞ্চিতকেশ, দৃপ্ত মূর্ত্তি পুরুষসিংহ।

সে বলিল, আমার জিনিষ ত সব রয়েছে দেখছি, আমার যন্ত্র কোথায়? লুণা ও শিরী মাথা নাড়িয়া বুঝাইল, তাহার কথা তাহারা বুঝিতে পারে না।

সাঙ্কেতিক ভাষা আরম্ভ হইল। সে ব্যক্তি অঙ্গুলী দ্বারা নিজের সামগ্রী দেখাইয়া, দুই হস্ত বিস্তারিত করিয়া, উড়িবার ভঙ্গী করিয়া, হস্ত ও মস্তক দ্বারা জিজ্ঞাসা করিল, যন্ত্র কোথায়?

দুই সখী হস্ত দ্বারা তাহাকে আশ্বস্ত করিল। লুণা একটা গবাক্ষ খুলিয়া তাহাকে দেখিতে ইঙ্গিত করিল। সে গবাক্ষ দিয়া জ্যোৎস্নালোকে দেখিল, বাড়ীর নীচেই নদী, নদীর ধারে তাহার গগনচারী যন্ত্র বাঁধা রহিয়াছে।

সে ঘরের বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল। অমনি লুণা ও শিরী তাহার পথরোধ করিয়া মুখ এবং অঙ্গভঙ্গী দ্বারা অত্যন্ত আশঙ্কার অভিনয় করিল। বুঝিতে পারিয়া পুরুষ নিরস্ত হইল।

ঘরে বসিবার স্থান ছিল, পুরুষ লুণা ও শিরীকে বসিতে সঙ্কেত করিয়া, তাহারা উপবিষ্ট হইলে স্বয়ং আসন গ্রহণ করিল। লুণার পাখার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া সঙ্কেতে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি উড়তে পার?

লুণা পক্ষ প্রসারিত করিয়া দেখাইল। পক্ষ অল্প সঞ্চালন করিয়া আকাশের দিকে দেখাইল। তাহার পর পূর্ব্বের ন্যায় পক্ষ সঙ্কুচিত করিল।

পুরুষ নিজের মনে বলিল, রূপকথায় যে পরীর কথা বলে, দেখছি তা সত্যি।

শিরীকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার পাখা নেই কেন? শিরী বুঝাইয়া দিল, তাহাদের সকলের পাখা হয় না। কতক লুণার মত, কতক তাহার মত।

পুরুষ চুপ করিয়া একটু ভাবিল, তাহার পর নিজের বক্ষে হস্ত দিয়া সঙ্কেতে জিজ্ঞাসা করিল, আমার মত কেহ নাই?

লুণা ও শিরী মাথা নাড়িয়া, একটি অঙ্গুলী দেখাইয়া বুঝাইল, এক জনও নাই।

পুরুষ অবাক্, কিছুই বুঝিতে পারিল না।

অনেকক্ষণ সে আহার করে নাই, ক্ষুধাতৃষ্ণায় তাহার শরীর অবসন্ন হইতেছিল। তাহার সামগ্রীর মধ্যে একটি ছোট পেটিকা ছিল, তাহা খুলিয়া কয়েকটি ফল ও কিছু খাদ্যসামগ্রী লইয়া খাইতে বসিল।

শিরী চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, আহা, ওর অনেক-ক্ষণ খাওয়া হয় নি, কিছু খেতে দাও।

লুণা লজ্জিত, ত্রস্ত হইয়া চলিয়া গেল। শিরী এবং পুরুষের চক্ষু একবার মিলিল, তখনই আবার উভয়ে চক্ষু অবনত করিল।

লুণা পাত্রে অনেক রকম খাবার সাজাইয়া আনিল। তাহার পর উত্তম পানীয় আনয়ন করিল। পুরুষ ছুইটি ফল বাহির করিয়া দুই জনের হাতে দিল। শিরী ও লুণা খাইয়া দেখিল, উত্তম স্বাদু মিষ্ট ফল।

পুরুষের আহার হইলে লুণা পাত্র লইয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে শয়ন করিতে সঙ্কেত করিল।

লুণা ও শিরী ঘরের বাহিরে আসিল। লুণা বাহির হইতে ঘরে চাবি দিল।

শিরী বলিল, রাত্রিতে আমি এখানে থাকব?

লুণা বলিল, আজ ত কোনমতে নয়, কে কি সন্দেহ করবে। কাল সকালবেলা এস, যেন ঐ যন্ত্রটা দেখতে এসেছ। ওটা যে আমরা দুজনে পেয়েছি, তা বলা হবে না। আমি বলব, ওটা ভেসে যাচ্ছিল, দেখতে পেয়ে আমি নিয়ে এসেছি। ওটা আমার। আর ঐ লোকটার বিষয় পরামর্শ ক'রে একটা কিছু ঠিক করতে হবে।

শিরী কিন্তু অনিচ্ছা পূর্ব্বক গেল। সে ও লুণা দুই জনেই যন্ত্র দেখিয়াছিল। দুই জনেই সে ব্যক্তিকে লইয়া গিয়া তাহার চৈতন্য উৎপাদন করিয়াছিল। এখন সমস্ত ভার লুণা একা গ্রহণ করিতে চায় কেন? লুণার হাতে সমস্ত ভার অর্পণ করিতে শিরীর মন সরিতেছিল না।

পথে যাইতে যাইতে পুরুষের সঙ্গে চক্ষুমিলন শিরীর স্মরণ হইল। তাহার কপোল লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল।

১৩

পরদিবস অতি প্রত্যূষে শিরী লুণার গৃহে উপস্থিত হইল। লুণা বাড়ীর প্রবেশদ্বারে দাঁড়াইয়াছিল। শিরীকে দেখিয়া স্মিতমুখে বলিল, আজ যে বড় ভোরে উঠেছ?

শিরীও হাস্যমুখে বলিল, তোমার কি উঠতে বেলা হয়েছে? তোমার অতিথি কি ঘুমুচ্ছে না কি?

—তা বলতে পারিনে, আমি সে ঘরে যাইনি। দেখবে চল।

লুণা ঘরের চাবি খুলিয়া দিয়াছিল। শিরীর সঙ্গে গিয়া দ্বারে মৃদু মৃদু করাঘাত করিল।

দরজা খুলিয়া পুরুষ তাহাদিগকে ভিতরে ডাকিল। লুণা ও শিরী ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা ভেজাইয়া দিল। মস্তক নত করিয়া তাহাদিগকে অভিবাদন করিয়া পুরুষ সঙ্কেতে উভয়কে বসিতে বলিল।

লুণা ও শিরী দেখিল, সে ব্যক্তি বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছে। পরিধানে শুভ্র আঁটা পোষাক, মার্জ্জিত কেশ, মুখে যে অল্প কেশ দেখা যাইতেছিল, তাহা নাই। পুরুষ যে নিত্য শ্মশ্রু মুণ্ডন করে, তাহা শিরী ও লুণা কেমন করিয়া জানিবে? তাহারা তাহার ওষ্ঠে ও চিবুকে নীল আভা লক্ষ্য করিল।

লুণা শিরীকে বলিল, তুমি একটু বসো, আমি ওর জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসি।

লুণা চলিয়া গেল। পুরুষ আসিয়া শিরীর পাশে দাঁড়াইল। সাঙ্কেতিক ভাষার অপেক্ষা চক্ষুর ভাষায় অনেক কথা কহিতে পারা যায়, কিন্তু সে ভাষা শিরীর অধিক জানা ছিল না। যে দেশে রমণী ব্যতীত পুরুষের বাস নাই, সেখানে কে কাহাকে চক্ষুর ভাষা শিখাইবে?

শিরী সরল দৃষ্টিতে যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া, শয্যা দেখাইয়া সঙ্কেতে জিজ্ঞাসা করিল, রাত্রিতে উত্তম নিদ্রা হইয়াছিল?

যুবক মৃদু হাস্য করিয়া, মস্তক হেলাইয়া বুঝাইয়া দিল, রাত্রিতে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই।

সে সরিয়া গিয়া স্বতন্ত্র আসনে উপবেশন করিল। লুণা একটা পাত্রে গরম দুধ ও আর এক হাতে কিছু খাবার লইয়া আসিল। যুবক তাহা গ্রহণ করিয়া, পাশে রাখিয়া, লুণাকে সঙ্কেতে জানাইল, তোমরা খাও, নহিলে আমি খাইব না।

লুণা হাসিয়া শিরী ও নিজের জন্য খাবার লইয়া আসিল। আহার সমাপ্ত হইলে যুবক নিজের বক্ষে অঙ্গুলী দিয়া দুই তিনবার বলিল, তমন, তমন! তাহার পর লুণা ও শিরীর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া সঙ্কেতে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের কি নাম?

পরী দুই জন বুঝিতে পারিল। লুণা নিজেকে দেখাইয়া বলিল, লুণা। শিরীও নিজের নাম বলিল। পুরুষ উঠিয়া লুণার হাত ধরিয়া কয়েকবার নাড়িল, তাহার পর শিরীর হস্ত ধারণ করিয়া সেইরূপ করিল। তখন তিন জনই হাসিতে লাগিল।

লুণা শিরীকে বলিল, এইবার আমাদের নদীর ধারে যেতে হবে। এখনি সকলে ও জিনিষটা দেখতে আসবে।

লুণা সঙ্কেত পূর্ব্বক তমনকে বাহিরে যাইতে নিষেধ করিল। যে গবাক্ষে পূর্ব্ব-রাত্রিতে দাঁড়াইয়াছিল, তাহা

একটু খুলিয়া তমনকে তাহার পাশে দাঁড়াইতে ইঙ্গিত করিল। তমন নদীর কূল ও যন্ত্র দেখিতে পাইল, বাহির হইতে তাহাকে দেখা যায় না।

লূণা বাহির হইতে দরজায় চাবি দিয়া শিরীর সঙ্গে নদীর ধারে গেল। দুই চারি জন পরী জড় হইয়াছে, দেখিতে দেখিতে অনেকে আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কি এটা? কোথেকে এল?

লূণা অম্লান-বদনে বলিল, কাল সন্ধ্যার পর ওটা এইখান দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল দেখে আমি বেঁধে রেখেছি। ওটা আমার।

সকলে এদিক ওদিক দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল। এক জন সাহস করিয়া বলিল, আমি উপরে উঠে দেখব, ওর ভিতর যদি কিছু থাকে?

লূণা বলিল, তা দেখ না, কিন্তু ওর ভিতর যদি কিছু থাকে, কিংবা তোমার কিছু হয়, তা হ'লে আমি কিছু জানিনে।

সে অমনি পিছাইল। কয়েক জন প্রতিহারিণী আসিল, তাহারাও বাহির হইতে দেখিল। এক জন একবার উঠিয়া আবার তখনই নামিয়া আসিল, কহিল, ভিতরে কিছু নেই, এটা বোধ হয় এক রকম নৌকা।

আর এক জন রক্ষিকা বলিল, কাদের নৌকা, এখানে কেমন ক'রে এল?

—তা কি ক'রে বলব? আমরা কি সব দেশের খবর রাখি?

গবাক্ষের আড়ালে দাঁড়াইয়া তমন সমস্ত দেখিতেছিল। সে দেখিল, সকলেই স্ত্রীলোক;—কতক পক্ষবিশিষ্ট, কতক পক্ষশূন্য। যাহাদের পাখা নাই, তাহারা নদীর অপর পার হইতে নৌকা করিয়া আসিতেছে; যাহাদের পাখা আছে, তাহারা এই পারেই থাকে, উড়িয়া কিংবা হাঁটিয়া আসিতেছে। যাহাদের হাতে সোনালি ও রূপালি যষ্টি, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া দেখিল। পুরুষ এক জনও নাই।

লোকের ভিড় ভাঙ্গিলে শিরী ও লূণা ফিরিয়া আসিল। তমন সঙ্কেতে তাহাদের ভাষা শিখিতে চাহিল। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখাইয়া—ঘরের সামগ্রী দেখাইয়া নাম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

সেই দিন হইতে তমনের পরীদের ভাষা শিক্ষা আরম্ভ হইল।

১৪

ছায়ার প্রকৃতি কোমল, তাহার স্বভাব ভীরু, কিন্তু পর্ব্বত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। প্রকাশ্যে সে কাহাকেও কিছু বলিত না, কাহারও সাক্ষাতে শোক প্রকাশ করিত না, কোন কথা ভাঙ্গিত না। হৃদয়ে তাহার নিরন্তর হুতাশন জ্বলিত, সেই অগ্নিতে তাহার পূর্ব্ব-প্রকৃতি দগ্ধভস্ম হইয়া গেল। প্রতিদিন তাহার মনে সঙ্কল্প দৃঢ় হইতে লাগিল—যেমন করিয়াই হউক, আবার পর্ব্বতে ফিরিয়া যাইবে, আবার সুনন্দের সহিত মিলিত হইবে। কুবলয়কে আবার বক্ষে তুলিয়া লইবে।

যদি চিরকাল পতির সহিত সহবাস করিতেই না পাইবে, তাহা হইলে তাহাকে পর্ব্বতে পাঠাইবার কি প্রয়োজন ছিল? ছায়া কিছু জানিত না, তাহার কোন আকাঙ্ক্ষা, কোন অতৃপ্তি ছিল না, কেন তাহাকে পর্ব্বতে লইয়া গেল, কেন তাহার হৃদয়ে প্রেম ও স্নেহের কল্পতরু রোপণ করিয়া সেই তরু পল্লবিত পুষ্পিত হইতেই তাহাকে সমূলে উৎপাটিত করিল? ইহা কোন্ পিশাচের বিধান? স্বামি-পুত্র লইয়া ছায়া বাস করিলে কাহার কি ক্ষতি? দিবানিশি সুনন্দের আগ্রহপূর্ণ সতৃষ্ণ দৃষ্টি তাহার স্মরণ হইত, রাত্রিতে স্বপ্নোত্থিত হইয়া আকুল হস্তে শয্যা অন্বেষণ করিত, কুবলয় কোথায় গেল? তখন তপ্ত অশ্রুতে তাহার মুখ, বুক ভাসিয়া যাইত।

ছায়া প্রায় সর্ব্বদাই একা থাকিত, একা নির্জ্জনে ঘুরিয়া বেড়াইত, আকাশে একা বিচরণ করিত। দৃষ্টি সকল সময় পর্ব্বতের অভিমুখে, যেখানে তাহার প্রাণ পড়িয়া আছে, প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়তর স্বামি-পুত্র আছে, চক্ষু সেই দিকেই নিবিষ্ট থাকিত।

অলকার বাড়ী ছায়ার বাড়ীর নিকটে। মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ হইত। অলকা বুঝিতে পারিল, ছায়ার মনে বল আছে, সে আত্মদমন করিতে পারে। শিরী ও লূণার সাক্ষাতে অলকা কোন কথা প্রকাশ করে নাই, তাহার প্রধান কারণ, উহাদের দুই জনের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, তাহার উপর দুঃসাহসের কর্ম্মের জন্য তাহাদের শাস্তি হইয়াছিল। কিন্তু ছায়া ও অলকার একই অবস্থা। ছায়ার কাছে কোন কথা প্রকাশ করিলে কোন আশঙ্কা নাই।

এক দিন ছায়া একা আছে জানিয়া অলকা তাহার পাশে গিয়া বসিল। ছায়া বলিল, তুমিও ত পাহাড়ে গিয়েছিলে, কি দেখে এলে?

অলকা কোন উত্তর না দিয়া রোদন করিতে লাগিল। ছায়ার দৃষ্টি কঠোর হইল, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল, কঠিন স্বরে কহিল, আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিলে। তার পর আমার স্বামী ছেলে কেড়ে নিয়ে, আমাকে অজ্ঞান ক'রে তাড়িয়ে দিলে।

অলকার দুই চক্ষু অশ্রুধারায় ভাসিয়া গেল, বলিল, আমারও ঐ দশা।

ছায়ার চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হইতে লাগিল। কহিল, তুমি কেঁদে যদি দুটি চক্ষু অন্ধ কর, তা হ'লে কি স্বামিপুত্র ফিরে পাবে?

অলকা চক্ষু মুছিল, বলিল, কান্না ছাড়া আমাদের আর কি উপায় আছে? আমরা কি করতে পারি?

ছায়া বলিল, মোরিয়া হ'লে সব পারা যায়। আমাদের কিসের ভয়? শাস্তির কি বাকি আছে? আমি ত এখনই পাহাড়ে যেতে পারি, কিন্তু তাতে ত কোন ফল হবে না। হয় আমাকে মেরে ফেলবে, না হয় কোথাও বন্ধ ক'রে রাখবে। তা হ'লে আর কি হ'ল? এরা নিষ্ঠুর পিশাচ, এদের প্রাণে দয়ামায়া নেই, এক কৌশল ছাড়া এদের সঙ্গে পেরে ওঠবার কোন উপায় নেই।

—কি কৌশল করবে?

—তাই কেবল ভাবি। হয় ত কেউ আমাদের সাহায্য করবে। তুমি কি আমার সঙ্গে যোগ দেবে?

অলকা বলিল, আমাকে যা বলবে, তাই করব, কিন্তু আমি নিজে কিছুই ভেবে পাই নে।

ছায়া বলিল, ভাবব আমি। কিছু করতে হ'লে এক জনের চেয়ে দু'জন ভাল।

এই সময় দুই নগরে রাষ্ট্র হইল, লুণা নদীতে একটা নূতন রকম নৌকা পাইয়াছে। অপর সকলের সঙ্গে ছায়া এবং অলকাও গেল। ছায়া উপরে, নীচে, এ-দিক ও-দিক অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিল। ভিতরেও যতটা দেখা যায় দেখিল।

ফিরিবার সময় অলকা বলিল, এ কি রকম নৌকা? দাঁড়-পাল কিছুই নেই, তবে চালায় কেমন ক'রে? আর অমনি ভেসে এল, ওতে কেউ নেই কেন? ও-রকম নৌকা ত কেউ কখনও দেখে নি।

ছায়া বলিল, আমি তাই ভাবছি।

বাড়ীতে ফিরিয়া ছায়া ভাবিতে লাগিল। মেলার দিন সেও কোথাও যায় নাই, ঘরের ভিতর বসিয়াছিল। আকাশে শব্দ সেও শুনিতে পাইয়াছিল, বাহিরে আসিতে কিছু বিলম্ব হইল, আকাশে কিছু দেখিতে পায় নাই। লুণাদের বাড়ী হইতে তাহাদের বাড়ী অনেকটা দূরে।

সেই শব্দের সহিত নৌকার যে কোন সম্বন্ধ আছে, ছায়ার তাহা মনে হইল না, কিন্তু আর কয়েকটা সংশয় তাহার মনে উদয় হইল। নদীর উপর এ রকম নৌকা কেহ কখন দেখে নি। আর কোথাও কি কোন স্থান আছে, যেখানে এরূপ নৌকা প্রস্তুত করে? যাহার নৌকা, সে কোথায় গেল? সে কি ডুবিয়া গিয়াছে? নৌকা দেখিলে ত ডুবিবার আশঙ্কা মনে হয় না। ছায়া অনেক কথা ভাবিতে লাগিল।

ভাবিয়া-চিন্তিয়া কয়েক দিবস পরে ছায়া অলকাকে বলিল, তুমি একবার লুণার সঙ্গে দেখা করতে পার?

অলকা বলিল, কেন পারব না? সে আর কি এমন বড় কথা?

—নৌকার কথা জিজ্ঞাসা কোরো। কোন যায়গা থেকে কেউ নৌকার খোঁজ করতে এসেছিল কি না জেনো। আমার কথাও পেড়ো, বলো, আমি স্থির করেছি, যেমন ক'রে পারি, আবার পাহাড়ে যাব।

এক দিন মধ্যাহ্নের সময় অলকা লুণার বাড়ী গেল। বাড়ীর সদর দরজা বন্ধ, অলকা দ্বারে আঘাত করাতে লুণা খানিকক্ষণ পরে দ্বার খুলিল। লুণার পিছনে দাঁড়াইয়া শিরী।

লুণা বলিল, এই যে, অলকা! এমন সময় যে বড় এসেছ?

প্রবেশপথে লুণা দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া অলকা বলিল, এইখানে দাঁড়িয়ে কথা হবে? ভিতরে চল, বলছি।

অলকা লক্ষ্য করিল, লুণা কিছু অনিচ্ছাপূর্ব্বক তাহাকে ভিতরে লইয়া গেল। শিরী দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

অলকাকে নীচের কোন ঘরে না বসাইয়া লুণা তাহাকে ডাকিয়া উপরের একটা পাশের ঘরে লইয়া গেল। শিরীর আসিতে কিছু বিলম্ব হইল।

অলকা বলিল, তুমি যে নৌকাটা পেয়েছ, ও রকম ত কেউ কখনও দেখে নি। ওটা কোন্ দেশের নৌকা?

লুণা বলিল, তা কেমন ক'রে জানব? ভেসে যাচ্ছিল দেখে আমি বেঁধে রেখেছি।

—নৌকাতে কেউ ছিল না? যার নৌকা, সে খোঁজ করতে আসে নি?

লুণা বলিল, নৌকাতে কেউ থাকলে আমি কেন বেঁধে রাখব? যার নৌকা, সে যদি খোঁজ করতে আসে, তা হ'লে নিয়ে যাবে।

অলকা অন্য কথা পাড়িল, বলিল, ছায়াকে জান ত? সে সম্প্রতি পাহাড় থেকে ফিরে এসেছে। সে বলে, যেমন ক'রে হোক আবার পাহাড়ে যাবে।

শিরী বলিল, যেতে দিলে ত! তা হ'লে আমরাও যাই।

অলকা বলিল, ঐ নৌকাতে গেলে কেমন হয়?

লুণা কহিল, তা হতেই পারে না। ও নৌকা চালাতে আমরা কেউ জানি নে।

অলকা উঠিল, বলিল, ছায়া নিজে তোমাকে সব কথা বলবে।

—বেশ ত, বলিয়া লুণা অলকার সঙ্গে নামিয়া গেল, শিরী তাহাদের পশ্চাতে।

যাইবার সময় অলকা অলক্ষ্যে অপাঙ্গে এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল, কোথাও কিছু দেখিতে পাইল না।

অলকা চলিয়া যাইলে লুণা দরজা বন্ধ করিল। শিরীকে জিজ্ঞাসা করিল, কিছু মনে ক'রে এসেছিল না কি?

শিরী বলিল, কি আর মনে করবে? যদি কিছু জানতে পারে, এই ভেবে এসেছিল। আসল কথা কি ক'রে জানবে? কিছু না দেখতে পেলে কি বুঝবে?

লুণা কিছু চিন্তিতভাবে কহিল, ওর ভাবটা যেন কিছু সন্দিগ্ধ রকম। আড়চোখে এদিক ওদিক দেখছিল।

—তা দেখুক গে, তাতে আর কি এসে যায়? ছায়ার কথাটা তোমার কেমন লাগল?

লুণা তাচ্ছীল্যভাবে কহিল, ছায়াকে কি তুমি চেন না? ওর কাণাকড়ার সাহস নেই, ওকে দিয়ে আবার কি হবে?

দুই জনে তমনের ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

রজনীকান্ত *

ছিন্নকণ্ঠ বিহঙ্গ কে গো, মরণছন্দে গাহি',
কহিছ—ব্যাধের করুণা অপার, কৃপার অন্ত নাহি!
যে-নিঠুর তব 'যশঃ ও অর্থ'
হরিল অতুল 'মান ও স্বাস্থ্য'
'কাঙ্গাল করিল সকল রকমে',
তাহারি চরণ চাহি'
পূজার অর্ঘ্য সাজায়ে আনিলে
প্রেমনীরে অবগাহি'!

কোথা পেলে হেন বিশ্বাস, কবি, দ্বিধাহীন নির্ভর!
পাষাণের হিয়া গলায়ে বহালে করুণার নির্ঝর!
কোন্ ডোরে গেঁথে সুখ-দুখ যত
কণ্ঠে দোলালে মুকুতার মত,
এক হয়ে গেল আলোক-আঁধার
জীবন-মরণ সবি।
মধু আর বিষে সমান দৃষ্টি
কোথা হ'তে পেলে কবি?

পঙ্কিল ধরা পাপে-তাপে ভরা, শান্তি সেথায় নাই;
তুমি জান কবি, এর পরপারে জুড়াবার আছে ঠাঁই।
জান তুমি, যবে খেলা হবে শেষ,
অঙ্গ অবশ,—বিমলিন বেশ,—
সঙ্গীরা সবে ছেড়ে চ'লে যাবে,
সন্ধ্যা আসিবে ঘিরে,
শান্তি-সুপ্তি মিলিবে তখন
মায়ের বক্ষ-নীড়ে।

তাই কবি, তব নির্ভীক প্রাণ দুঃখে মানে না ডর;
তাই গাহ গান, অশনি যখন হানিছে মাথার পর'!
ধূপসম দহি' করিয়াছ নতি,
দীপসম জ্বলি' করেছ আরতি,
বেদনার ফুলে বিরচি' মাল্য
পরায়ে দিয়েছ গলে,
পাইয়াছ ঠাঁই, ওগো কবি তাই
অভয়-চরণতলে।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায় (এম-এ, বি-এল)।

* পাবনা রজনীকান্ত-স্মৃতিসভায় পঠিত।

হিমালয়ে পাঁচ ধাম

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

দারুণ দুর্য্যোগে জঙ্গলাকীর্ণ নির্জ্জন পাহাড়ের উপরে এই বৃক্ষলতা-গুল্মাচ্ছাদিত শতচ্ছিদ্রময় আচ্ছাদন-নিম্নে বসিয়া বসিয়া সকলের রাত্রি-জাগরণ—তীর্থযাত্রা-পথে সেও এক আমাদের বিশেষভাবে স্মরণীয় দিন। জীমূতের ঘন-গর্জ্জন, বিদ্যুতের তীব্র চাহনি, অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত ও অজস্র শিলাবর্ষণের চট-পট্ শব্দ—একাধারে বহির্জগতের এই সমস্ত বিপ্লবই যেন একত্র হইয়া সে রাত্রিতে আমাদিগকে গ্রাস করিতেই উদ্যত হইয়াছিল। বৃষ্টির জলে বিছানাপত্র আসবাবাদি বিলক্ষণ ভিজিয়া গেল। চটীর মধ্যে এমন কোন স্থান শুষ্ক পাইলাম না, যেখানে এই পাঁচ ছয় জন যাত্রীর এক রাত্রি বিশ্রাম করা চলে। কোন প্রকারে মাথা বাঁচাইয়া সকলেই নিঃশব্দে বসিয়া রহিলাম। ভোরের দিকে আকাশ পরিষ্কার হইল। আজিকার দিনে অতিরিক্ত শীতে আমাদের বৃদ্ধা দিদি নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়েন। "সুবো" চাকরের অবস্থাও তদপেক্ষা শোচনীয়। পদব্রজে আসিয়া তাহার উরুদেশে "কুচকির" মত হইয়াছে। অগত্যা এইখানে আমরা ইহাদের উভয়েরই জন্য দুই জন কাণ্ডিবাহক স্থির করিয়া লইলাম। প্রত্যেকের মজুরী স্থির হইল—প্রতিদিন এক টাকা চারি আনা। এইভাবে আমরা ব্যবস্থা করিয়া প্রত্যুষেই কুলীর পৃষ্ঠে বোঝা চাপাইয়া সকলেই এখান হইতে আগে রওনা হইলাম। আজিকার চড়াই পথের দৃশ্য-গুলি যেন একবারেই নূতন! সারারাত্রির বর্ষিত অজস্র করকারাশি উজ্জ্বল মুক্তার মতই চারিদিকে শোভা পাইতেছিল। যতই উপরে উঠিতে লাগিলাম, দেখিলাম পুঞ্জীভূত তুষাররাশি যেন জমিয়া জমিয়া সমগ্র পাহাড় ছাইয়া ফেলিয়াছে! এ দৃশ্য ত আর কখনও দেখি নাই। তবে কি আমরা মাটীর ধরা পশ্চাতে রাখিলাম? এইরূপ নব নব দৃশ্যের বৈচিত্র্যের মাঝখানেই ত তীর্থপথের যাত্রীরা সহজেই আকৃষ্ট হইয়া যাত্রার অসীম ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া থাকে। এক স্থানে জনৈক পাহাড়ী মেষপালক উপর হইতে এই তুষাররাশির মধ্য দিয়া অগণিত মেষের দল তাড়াইয়া আনিতেছিল। মেষগুলির গায়ে কালো লোমের উপরে কেবলই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তুষারকণা ঝক্-ঝক্ করিতেছে। এইরূপে তিন মাইল পথ ঠেলিয়া আমরা "দোকন্দ" চটীর সম্মুখে আসিলাম। চটীর আশপাশ চতুর্দ্দিকেই কেবল তুষারের উজ্জ্বল বিস্তৃতি ভিন্ন দেখিবার কিছুই ছিল না। ডাণ্ডিওয়ালা ফতেসিং প্রমাদ গণিয়া জানাইল; "পওয়ালীর রাস্তা গত রাত্রির দুর্য্যোগে একবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।" অগত্যা সওয়ার নামাইয়া তাঁহাদের হাত ধরিয়া এখানে পদব্রজে যাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। পায়ের তলায় যেন নিরন্তর লবণেরই পাহাড়! ঠেলিয়া চলিতে সকলেই বিশেষ বেগ পাইতে লাগিলেন। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে যতই এই তুষার-সৌন্দর্য্যের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আমরা ততই যেন আপনাদিগকে অধিকতর বিপদের সম্মুখীন মনে করিতে লাগিলাম। চতুর্দ্দিকেই শ্বেতশুভ্র তুষার-কিরীট। উজ্জ্বল পাহাড়ের মাঝখানে এক স্থানে কতক নিম্নভূমিতে



পাইন ও চীর বৃক্ষ

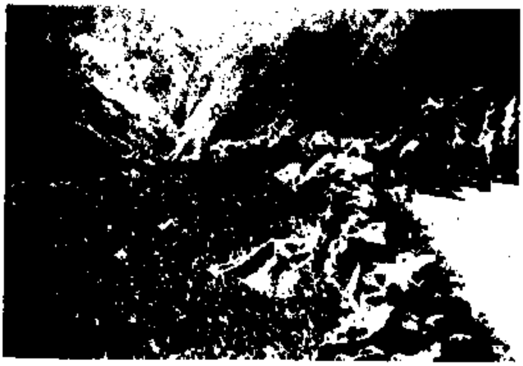
(উপত্যকার মত) কিছু কিছু শ্যাম-শষ্প তুষারে মিশিয়া কেমন নবরূপ ধারণ করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে কদাচিৎ দু একটি দেবদারু বৃক্ষ এই স্থানে শ্বেতবর্ণের মাঝখানে কালবর্ণের অস্তিত্ব জাগাইয়া রাখিয়াছে মাত্র। প্রকৃতির রাজ্যে এ কি এ বিরাট তুষারের সৃষ্টি! কালো পাহাড় ক্রমশঃই যেন ছায়াবাজীর মত অকস্মাৎ এক দিনে সাদা হইয়া গিয়াছে। উপত্যকার আশপাশ নিম্নদিকে যতদূর চক্ষু

বায়, পাহাড়ের সর্ব্ব অবয়ব ঠিক যেন একখানি 'ধোপা ধুতি'—শুভ্র বস্ত্রে একবারেই ঢাকা। এক দিকে তুষারের এই উঁচু-নীচু চমৎকার দৃশ্য, অন্যদিকে পূর্ব্বদিক্ বেড়িয়া উত্তরভাগ পর্য্যন্ত অভ্রভেদী তুষার-শৃঙ্গের দিকে চক্ষু ফিরাইলে স্বর্গের সম্পদ-সুষমাই যেন জাগ্রত-বিকাশে প্রত্যেককেই মুগ্ধ করিয়া দিতেছে! উজ্জ্বল দৃশ্যে চারিদিক বেড়িয়া যে এতদূর মনোহারিতা সুস্পষ্ট হইতে পারে, তাহাই আজ আমরা যেন প্রথম প্রত্যক্ষ করিলাম! স্বপ্ন ও জাগ্রত সাধনার একত্র সমাবেশ! প্রকৃতির আপাত-মনোহর উজ্জ্বলতার মাঝখানে আমাদের অপলক উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি সত্যই আজ আপনাকে হারাইয়া বসিল! পথ বা মনুষ্যের পদচিহ্ন ধরিয়া যে আগে যাইব, তাহাও শেষ তুষারের অমল ধবল বিস্তৃতির মধ্যে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। দোকন্দ চটী হইতে আরও তিন মাইল পথ এইরূপ তুষার-সমুদ্র মন্থন করিতে করিতে বেলা দশটা আন্দাজ সময়ে "পওয়ালী" পৌঁছিলাম।

এখানে লম্বা লম্বা ছপ্পরযুক্ত ঘর, ঘরগুলি আবার দ্বিতল। সর্ব্বসমেত ৬।৭ খানি হইবে! ছোট ছোট সরু দরজার মধ্য দিয়া একটি ঘরে আজ আমরা আশ্রয় লইলাম। ঘরের



দোকন্দচটীর পথে এক স্থান



তুষারের পথে ছাগদল



পওয়ালীর পথে

মধ্যে মেঝেতে 'তক্তা' বিছাইয়া তাহার উপরে খড় দিয়া ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে। তাহার উপর আবার লম্বা লম্বা 'চটাই' বিস্তৃত ছিল। আজ সমস্ত দিন বরফের দৃশ্যে পথিপ্রদর্শক ভগবান্ সিংএর আনন্দটা যেন অতিরিক্ত। পওয়ালী পৌঁছিয়াই সে গান ধরিয়াছে,—

"সাধু চলে নঙ্গা পড়াঙ্গা চিম্‌টা বজায়কে,
শেঠ চলে হাথী ঘোড়া পাল্কী মঙ্গায়কে,
বদরী-নারায়ন্‌কে রাস্তে মে নহী করনা রোষ গোমান্,
আগে চলে বুড্‌ঢা আদ্‌মী, পাছে চলে জোয়ান্।"

বাহিরের এই গানের সহিত মনে মনে আজ তাহার একটু দুঃখও বোধ হয় জন্মিয়াছিল। কারণ, ঝুলি সমেত সে আজ বরফের মধ্যে দুইবার আছাড় খায়;—যাহার ফলে সেই ঝুলির মধ্যগত গঙ্গোত্রীর জলভরা বোতলটি অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া একবারে চুরমার হইয়া গিয়াছে! এখানে প্রতি টাকায় চিনি মাত্র এক সের, লাল চাউল দুই সের, আটা তিন সের, ঘৃত ৮ ছটাক মাত্র! তরকারীর মধ্যে কিছুই নাই। আজ তিন দিন আলু মিলিতেছে না, বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা কম দুঃখের কথা নহে। সঙ্গে আনীত পোস্ত বা বেসন সংযোগে বড়ীভাজা বা বড়ীর ঝোলই একমাত্র অবলম্বন। ইতিপূর্ব্বে কোন কোন স্থানে "আলু-শাক" "গিমে-শাক" বা "বেথিয়া-শাক" পাইয়া লক্ষ মনে করিয়াছিলাম। "আমসত্ত্ব", "কুলটোপা" নেবুর আচার প্রভৃতি সঙ্গে ছিল, তাহাই এ খাবার রুচি-পরিবর্ত্তনের সুযোগ দিতেছে।

চটীতে পৌঁছিয়াই এ স্থানে কঠিন শীত অনুভব হইল। আহারান্তে এখানে আবার আকাশে ঘন মেঘের সঞ্চার ও বর্ষণ সুরু হইয়াছিল। সুখের বিষয়, পূর্ব্ব তিন দিনের মত এখানে অসম্ভব মাছির উপদ্রব না থাকায় শত দুঃখের মাঝখানেও আমরা যেন স্বস্তি অনুভব করিয়াছিলাম। এখানে কালী কমলীওয়ালার একটি ধর্ম্মশালা ও সেখানে "সদাব্রতের" ব্যবস্থা আছে দেখিলাম।

সারারাত্রি বিশ্রামের পরে পরদিন প্রত্যুষে আবার যাত্রার পালা সুরু হইল। অদ্য ৯ মাইল দূরে "মঙ্গু" পৌঁছিতে পারিলেই পওয়ালীর কঠিন চড়াই ও তুষার-বিস্তৃত বিপজ্জনক পথের একবারেই অবসান হয়। এই দুর্গম পথটুকু না জানি কেমন! সকলেই দ্বিগুণ উৎসাহে উপরে উঠিতে লাগিলাম। প্রথমে কিছুক্ষণ লতা-পাদপ-পরিপূর্ণ সাধারণ পার্ব্বত্য চড়াই-পথ অতিক্রম করিয়া, ক্রমশঃই

উপত্যকা * মধ্যে আবার আসিয়া পড়িলাম। উপত্যকাগুলির স্থানে স্থানে গুচ্ছ গুচ্ছ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাসগুচ্ছের শ্রেণী এবং কোথাও বা "সিনেরিয়া" ফুলের মত গুচ্ছ গুচ্ছ পীত বর্ণের পুষ্প পাহাড়টি আলোকিত করিয়াছে। কোথায়ও পাহাড়ের একটা দিক্ উজ্জ্বল শ্বেতাভ—চাদরের মত বরাবর নিম্নতলভূমি পর্য্যন্ত কেমন বিস্তৃত দেখা যাইতেছে! উপত্যকার শৃঙ্গদেশ ধরিয়া কখনও চড়াইপথে কতক উপরে উঠিয়া, আবার নীচে নামিতে বাধ্য হইলাম। সে সব স্থানের পথগুলি কোথায়ও দেড়হাত মাত্র



পওয়ালী হইতে কিছু আগেকার পথে

পরিসর, হয় ত কখনও বা এই সংকীর্ণতম পথের উপরে কিছু দূর পর্য্যন্ত লম্বা তুষার জমিয়া থাকায়, পিচ্ছিলতা নিবন্ধন আগে অগ্রসর হইতে বিলক্ষণ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইল। সুখের বিষয়, দারুণ রৌদ্রে আজ অনেক স্থানের বরফ গলিয়া গিয়াছিল। কেবল পূর্ব্বদিক বেড়িয়া উত্তরভাগ বিস্তৃত গগনস্পর্শী—বিরাটকায় পাহাড়গুলি একবারেই তুষারমণ্ডিত থাকায়, রৌদ্রকিরণে সর্ব্বদাই যেন চোখের সম্মুখে হীরকের মত ঝলমল করিতেছে। সে দৃশ্যের উজ্জ্বলতা কতই সুন্দর! রজত-মন্দিরের পর পর উচ্চতম শৃঙ্গগুলি আকাশে ঠেকিয়া আলোছায়ার সংমিশ্রণে কি অপূর্ব্ব মাধুরীই না ফুটাইয়া তুলিয়াছে! এইরূপ অপরূপ বিচিত্র দৃশ্যের মধ্য দিয়া প্রায় সাড়ে তিন মাইল পথ চলিয়া আসিয়া উতরাই পথে নামিতে সুরু করিলাম এবং অর্দ্ধমাইল আন্দাজ বরফ-পরিপূর্ণ উপত্যকার মধ্যে নামিয়া আসিয়া একটি চটী (নাম শুনিলাম "তালি" চটী) দেখিতে পাইলাম। চটীতে একটিমাত্র লোক গরম "পুরী" লইয়া বসিয়া আছে। এত দিন পরে এই বরফ-প্রদেশে গরম পুরীর আবির্ভাব দেখিয়া সুরো চাকরের আনন্দের সীমা ছিল না। দুঃখের বিষয়, তরকারী নাই। তথাপি এ অঞ্চলে এই নূতন বস্তু এই প্রথম দেখিয়া, তাহার জন্য এক পোয়া খরিদ করা হইল। চটীওয়ালা ৵১০ দাম চাহিয়াছিল। আহারান্তে জল পাইল না, কাজেই পাহাড়ের স্তূপীকৃত তুষার খুঁড়িয়া তাহার দ্বারাই তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া লইল। তখন বেলা ৯টা আন্দাজ হইবে। আমরা সরবতের জন্য চিনি আছে কি না জিজ্ঞাসা করিয়া হতাশ হইলাম। শুনিলাম, এই তালি চটীতে যাত্রীদের তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য মাসিক ১৪৲ টাকা মাহিনা স্বীকারে, কালী কমলীওয়ালার তরফ হইতে এই লোক * নিযুক্ত আছে, অথচ জল বা সরবতের কোন ব্যবস্থাই তখন ছিল না! আগাগোড়া এ পথের সর্ব্বত্রই যখন বরফ জমিয়া রহিয়াছে, তখন জলের জন্য কালী কমলীওয়ালার এই লোকনিয়োগ অনর্থক অপব্যয় বলিয়াই সকলের ধারণা জন্মিল। এই উপত্যকা হইতে গন্তব্য স্থান "মঙ্গু" পৌঁছিতে প্রায় পাঁচ মাইল পথ এখনও বাকী ছিল, সুতরাং সকলেই দ্রুতগতি সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম।

তালি চটী হইতে আগেকার রাস্তা যে ভীষণ হইতে ভীষণতম হইয়া উঠিবে, এ ধারণা কাহারও মনে হয় নাই! কিছুক্ষণ উপত্যকার পাশে পাশে অগ্রসর হইতেই আবার সেই বিরাট ফেনায়িত তুষারপুঞ্জ সম্মুখে পড়িল। যে দিকে চাই, পাহাড়ের বিরাট কলেবরে শুধুই উজ্জ্বল রজতাভরণ ভিন্ন কোন স্থানে এতটুকু কালো চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না! ডাণ্ডি, কাণ্ডি সমস্তই সওয়ার নামাইয়া খালি চলিল। দীর্ঘ-পথব্যাপী বরফের বহর দেখিয়া এবারে জ্ঞাতি-পত্নীর উৎসাহ-দীপ্ত মুখখানি একবারেই শুকাইয়া গেল! তিনি ভাবিয়াছিলেন, যাহা কিছু তুষারের পথ ইতিপূর্ব্বে অতিক্রম করা হইয়াছে, তালি চটী পৌঁছিয়াই তাহার অন্ত হইয়াছে। বৃদ্ধা দিদির হাল্কা শরীরে (জ্বরভাব থাকিলেও) শক্তি কত দূর, তাহা আমরা সকলেই সে দিন প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইলাম। কাণ্ডিওয়ালার হাত ধরিয়া তিনি সকলের অগ্রেই এই তুষারবিস্তৃত পথে বিনা বাক্যব্যয়েই অগ্রসর হইলেন। দীর্ঘযষ্টি হস্তে প্রতি পদক্ষেপেই তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য্য ও সাহসের পরিচয় প্রকাশ পাইল। কোথায় পাহাড়ের এতটুকু সংকীর্ণ শৃঙ্গদেশ—



তুষারের উতরাই পথ

যেখানে একটু অসাবধানে পা বাড়াইলে তুষারপিচ্ছিল পথে একবারেই নীচে গড়াইয়া পড়িবার পূর্ণ আশঙ্কা, সেখানেই তিনি অতি সন্তর্পণেই অনায়াস-সাধ্য বীরের মত সকলের অগ্রেই পার হইয়াছেন, তবে কাণ্ডিবাহক অবশ্য হাত ধরিয়াছিল। বঙ্গদেশবাসী জনৈক বৃদ্ধার পক্ষে ইহাও বড় কম সাহসের পরিচয় নহে। তাঁহার এই অগ্রগমনে, দেখাদেখি সকলেই সে সব স্থল অতিক্রম করিয়া চলিলেন। এইরূপে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে এক তুষার-প্রচ্ছন্ন অমল ধবল অপেক্ষাকৃত নিম্ন উপত্যকামধ্যে উপস্থিত

* চতুর্দ্দিকেই গগনস্পর্শী পর্ব্বতমালার মধ্যস্থলে অপেক্ষাকৃত নিম্ন পাহাড়কে উপত্যকা বলা হইয়াছে।

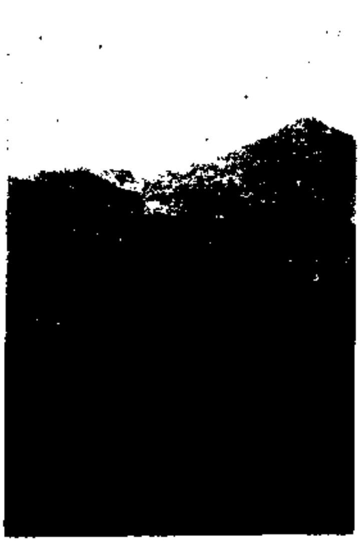
* লোকটির নাম ছিল "রতন সিং।"

হইয়া, ক্ষণেকের জন্ত সকলেরই যেন হঠাৎ গতি রুদ্ধ হইল। চতুর্দ্দিকেই চিত্র-বিচিত্র ঝলমল সৌন্দর্য্য-বেষ্টিত গগনস্পর্শী বিশাল পাহাড়—সমস্তই তুষারের আবরণ, কত অগণিত শুভ্রোজ্জল তাহার শৃঙ্গ—তাহারই মধ্যস্থলে এই নাতি-বিস্তৃত উপত্যকা (তাহারও অঙ্গে রজতের উজ্জ্বল আভরণ) কোথাও কতক উচ্চ, কোথায়ও কিছু দূর সমতল, কোথায়ও বা আঁকা-বাঁকা উঠিয়া নামিয়া ঐ দিগন্ত-প্রসারী সুবিশাল রজত-পাহাড়ের কোলে অগ্রসর হইয়া কেমন মিশাইয়া রহিয়াছে! চোখের সম্মুখে এ যেন একটি আকাশ-ভরা বিরাট সৌন্দর্য্যের প্রকাণ্ড শ্বেত-শতদল! দিগম্বরের চির-প্রশান্ত শুভ্র অট্টহাস্তের মত পাহাড়-প্রকৃতির এই অপরূপ রূপ-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া, আমাদের প্রত্যেকেরই মুগ্ধ চিত্ত যেন আপনার অলক্ষ্যে আপনিই বলিয়া উঠিল, কোথায় সেই ধূলি-ধূসরিত শ্যামল মাটীর ধরা! দেশভরা আত্মীয়-স্বজন, সংসার, মায়া-মোহ-বাসনা-ক্লিষ্ট নিরন্তর কর্ম্মকোলাহল-ভূমি! এখানে তাহার কোন চিহ্নই নাই! শুধু এই বিরাট সৌন্দর্য্য-সৌধের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া মুক্তিতীর্থ-দর্শন-প্রয়াসী আমরা কয়জন মাত্র যাত্রী! জীবনকে তুচ্ছ করিয়াই যেন কাহার অস্পষ্ট ইঙ্গিতে স্বপ্নের মত হঠাৎ চলিয়া আসিলাম! এ জীবন্ত শরীরে স্বর্গীয় জ্যোতির এই অপরূপ চির-সুন্দর সুষমাদর্শন যেন জন্মজন্মান্তরের শত সাধনার ফল! রৌদ্র, মেঘ ও ছায়ার তুলিকাস্পর্শে তখন পাহাড়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে কোথাও সোনালী, কোথাও রূপালী, আবার কোথাও বা ইন্দ্রধনুর মত নানা বর্ণে পাহাড়টি রঞ্জিত হইয়া চোখের সম্মুখে কুহকজাল বিস্তার করিতেছিল, ঠিক যেন একখানি জাগ্রত চলচ্চিত্রের মত! এ দৃশ্য মনুষ্য-চক্ষু কতক্ষণ উপভোগ করিতে সমর্থ হয়! যেখানে বিপদ, সেইখানেই বুঝি ভগবানের অতুলনীয় শোভা-সম্পদ এইভাবে চিত্র-বিচিত্ররূপে চিরদিন প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপ নানা চিন্তায় অন্তমনস্ক হইয়া আবার আগে চলিলাম।

এই তুষার-বেষ্টিত হিমগিরির তুষারের পথ অতিক্রমকালে এক নূতন বিপদের সম্মুখীন হইলাম। অকস্মাৎ প্রহেলিকার মত যেন কোন্ অদৃশ্য-পুরুষের কঠিন ইঙ্গিতে, পলক না ফেলিতেই চারিদিক অন্ধকারে ভরিয়া গেল। একবারেই পট-পরিবর্ত্তন; কোথায় ডুবিয়া গেল সেই শোভা, পাহাড়ের সেই রজত-ঝল্মল্ আপাত-মনোহর দৃশ্য! ফতেসিং ও ভগবানের চীৎকারমত আমরা যে যেখানে ছিলাম, মাথার ছাতা নীচু করিয়া ধরিয়া তুষারের মধ্যে একবারে বসিয়া পড়িলাম। বলিতে কি, সে অন্ধকারে পনেরো মিনিট কাল কেহ কাহারও অস্তিত্ব পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম না। প্রকৃতির সে কি এক কঠিন ও অদ্ভুত বিপর্য্যয়! 'চটপট' শিলা-বর্ষণ ও সঙ্গে সঙ্গে অজস্র বৃষ্টিপাতে সকলেই তখন বিলক্ষণ কম্পান্বিত-কলেবর! বৃদ্ধা দিদির হস্তের ছাতা ও যষ্টি শিথিল হইয়া পড়িল, নিরুপায় বুঝিয়া কাণ্ডিবাহক কাণ্ডির মধ্যগত কম্বলখানি (যাহার উপর সওয়ার বসিয়া যায়) তাঁহার সর্ব্বশরীরের আচ্ছাদনস্বরূপ ঢাকিয়া দিল। বৌদিদির অবস্থাও তদ্রূপ! শীতে ও শিলা-পতনে তাঁহার দুই হাতই যে সমান অসাড়! এই বিপত্তিতে তীক্ষ্ণবুদ্ধি অগ্রজ মহাশয় দৃঢ়হস্তে বৌদিদির দুই হস্তই একভাবে কিছুক্ষণ ঘর্ষণ করত গরম করিয়া দিলেন। ততক্ষণে আকাশ কিছু পরিষ্কার হইয়া আসিল। জমিদার-পত্নী মনের আবেগে এইবার কিন্তু বালকের মতই ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সকলেরই দৃষ্টি তাঁহার উপর ধাবিত হইল। আতঙ্কে তাঁহার মুখ যেন সাদা হইয়া গিয়াছে! বলিলেন, "কলিকাতায় থাকি, মাসের মধ্যে চারিবার কালীঘাটে কালী-মায়ীর দর্শন করিয়া স্বচ্ছন্দে বাটী ফিরিয়া আসি।" (ইঁহার স্বামী আলীপুরের এক জন ব্যবহারাজীব) "আমি কেন মরিতে এই সৃষ্টিছাড়া যমের বাড়ীর পথে আসিয়া পড়িলাম"! বড় দুঃখেই এ কথা তাঁহার মুখ দিয়া সে সময়ে বাহির হইয়াছিল! আমার কিন্তু এ কথায় দুঃখের মাঝেও হাসি ফুটিয়া উঠিল। এতক্ষণ বৃদ্ধা দিদি "কম্বল-মুড়ি" দিয়া তুষারমধ্যে নীরবে (বোধ হয় সমাধিস্থ হইতেছিলেন) বসিয়াছিলেন। আমার হাসির শব্দে তিনি 'গা-ঝাড়া' দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া এ জন্ত আমাকেই যেন তিরস্কার-সুরে বলিয়া উঠিলেন, "যত দোষ 'সুশীলে'রই (আমার!) যত কিছু সৃষ্টি-ছাড়া দুর্গম তীর্থ অভিযানে চিরদিনই তাহার সমান রুচি! কোথায় কৈলাস, মানস-সরোবর, কোথায় যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী যত দুরূহ কঠিন তীর্থই হউক না কেন, যাওয়া চাই-ই। বলিয়াছিলাম, শুধু বদরী-কেদার দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিব, (যাহা সকলেই করিতে চায়) তা নয়! একসঙ্গে একবারে পাঁচ ধাম!" এ তিরস্কার নীরবে মাথা পাতিয়া লইলাম। এইবার বৌদিদি মুখ ফুটাইলেন। বৎসরের মধ্যে অর্দ্ধেক সময় তিনি দার্জ্জিলিংএ থাকিতেন (ইঁহার স্বামী অর্থাৎ অগ্রজ মহাশয় বাঙ্গালার 'সেক্রেটারিয়েট' P. W. D. অফিসের প্রধান কর্ম্মচারী—সুতরাং লাট সাহেবের দপ্তরের সহিত ইঁহাকেও প্রতি বৎসর দার্জ্জিলিং যাইতে হইত) "টাইগার হিল, ঘুম পাহাড়" প্রভৃতি কত উচ্চস্থান তিনি পদব্রজে সখ করিয়া ঘুরিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এমন বিপৎ-সঙ্কুল বরফের মাঝখানে কখনও তাঁহাকে পা বাড়াইতে হয় নাই, এ কথা তিনি স্পর্দ্ধার সহিতই বলিতে পারেন। কেবল বন্ধু-পত্নী অর্থাৎ আমাদের জমিদার-গৃহিণী কিন্তু এ সকল কথায় আদৌ সায় দিলেন না। মুখে তাঁহার এই বিপদের সময়েও অটুট ধৈর্য্য ও সাহসের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল। কাশীপুরের রাজপ্রাসাদ তুল্য বাগান-বাড়ীতে বিদ্যুৎ-পাখার নিম্নে বসিয়া যিনি নিয়তই অসংখ্য দাসদাসীর পরিচর্য্যা লইয়া বাস করেন, এই কঠিন প্রকৃতি-বিপর্য্যয়ে তুষারের মধ্যে পড়িয়া তিনি আজ এতটুকুও বিচলিত হইলেন না। অমানুষিক সহিষ্ণুতার মূর্ত্তি লইয়া তিনি কেবল বিনা বাক্যব্যয়ে সকলকেই আগে যাইতে উৎসাহ দিলেন। কোথায় মন্দু, এ তুষারের শেষ কোথায়, কতক্ষণে পৌঁছিব, আবার যদি অন্ধকার ঘনাইয়া আসে! এইরূপ নানা চিন্তায় সদাই অন্তমনস্ক হইতেছিলাম। মন বাহিরে প্রকাশ না করিলেও, অন্তরে অন্তরে বেশ বিদ্রোহ তুলিয়াছিল, "এইরূপ কঠিন তুষার-সমাচ্ছন্ন দুর্গম পথে স্ত্রীলোক-যাত্রী আনিয়া কোনমতেই ভাল করি নাই।"

মানুষ মানুষের মুখ চাহিয়াই ত আশা-উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়, এই জন-বিরল কঠিন তীর্থপথে একান্ত অসহায় ও মুমূর্ষুর মতই এক্ষণে আবার আমরা তুষাররাশি মন্থন করিতে পা বাড়াইলাম। চারিদিকেই স্বর্গীয় শোভা আবার ফুটিয়া উঠিল। এবার কিন্তু সকলেরই ব্যাকুল দৃষ্টি সেই মন্দুর দিকে! এক স্থানে অগ্রজ মহাশয় হঠাৎ পা পিছলাইয়া সাত আট হাত নীচে বরফের উপর দিয়া পড়িয়া গেলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার লম্বা যষ্টির অগ্রভাগ বরফের মধ্যে একদম বসিয়া গিয়াছিল এবং যষ্টিটি

তিনি দৃঢ়হস্তে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। তৎক্ষণাৎ কুলীরা গিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া ফেলে। এ পথে যষ্টি যে তৃতীয় পায়ের মত কার্য্য করে, ইহাই তাহার জাজ্বল্য প্রমাণ। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধা-তৃষ্ণাও বাড়িয়া চলিয়াছে। এক একবার মুষ্টি ভরিয়া সকলেই বরফ তুলিয়া মুখে দিলেও তৃষ্ণা কিন্তু শান্ত হইতেছিল না। বেলা তুইটা আন্দাজ সময়ে দূরে সম্মুখভাগে বরফের গায়ে মঙ্গুর শ্বেতবর্ণ চটী দেখিতে পাইয়া,--আশায় বুক বাঁধিয়া সকলেই দ্রুতগতি অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য, তুষার-পিচ্ছিল উতরাই-পথে দ্রুত চলা কোনমতেই সহজ-সাধ্য নহে। জ্ঞাতি-পত্নীর দুর্দ্দশা অসীম। তাঁহার সর্ব্বশরীর একবারেই অবশপ্রায়। তুই জন ডাণ্ডিওয়ালা তুই দিকে তাঁহার তুই হাত (স্কন্ধের নিকটে) দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া বরফের মধ্য দিয়া ঠিক যেন টানিয়া লইয়াই যাইতেছে। তিনি নিজে যেন পায়ে ভর দিয়া চলিতে একবারেই অশক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যতে সিং, ডাণ্ডিওয়ালা কুলীগণ, ভগবান্ সিং সকলেই আগে যাইবার কালে জুতায় গোড়ালী দিয়া



তুষারের উপত্যকা



ত্রিযুগীনারায়ণ

বরফের মধ্যে একটু গর্ত্ত-মত করিয়া দিলে, আমরা আর আর সকলেই সেই গর্ত্তে পা দিয়া অতি সন্তর্পণে আগে চলিতেছি। এক স্থানে নীচু পথে নামিবার উপায় নাই দেখিয়া যতে সিং প্রভৃতি কুলীগণ কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিল। শেষ সারি সারি সিঙ্‌র-বৃক্ষ * দেখিয়া তাহারই শাখা-প্রশাখা ধরিয়া নীচে নামিবার সিদ্ধান্ত হইল। এই সকল বৃক্ষের মূলদেশ কোমর পর্য্যন্ত সে সময়ে বরফে আবৃত। কেবল পাতা-হীন শাখা-প্রশাখার অগ্রভাগ উপরিভাগে দেখা যাইতেছিল। তাহারই মধ্য দিয়া ক্ষতবিক্ষতশরীরে কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ সকলেই একে একে শাখা ধরিয়া নীচের দিকে ঝুইয়া পড়িয়াছি। কুলীগণ সে স্থলে অমানুষিক পরিশ্রমে নিজেদের জীবন তুচ্ছ করিয়াও যাত্রীর প্রাণ বাঁচাইতে এতটুকু কৃপণতা করে নাই।

এই সিঙ্‌র গাছ ধরিয়া নীচে নামিবার কালে যতে সিং উপর-দিকে এক সাধুকে অদ্ভুতভাবে নীচে নামিতে দেখিয়া, আমাদিগকে সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে বলিলে, আমরা সকলেই সে দৃশ্যে, সে কঠিন সময়েও হাস্য সম্বরণ করিতে অক্ষম হইলাম। সাধুটির দুর্জ্জয় সাহস ও উপস্থিত-বুদ্ধি এই অমানুষিক উপায়ে নীচে নামিতে উৎসাহ দিয়াছে, সন্দেহ নাই। কম্বলে সমস্ত দেহ আবৃত রাখিয়া তিনি স্বচ্ছন্দে পিচ্ছিল বরফের মধ্যে বসিয়া বসিয়া উপর হইতে নীচে গড়াইয়া পড়িতেছেন। অবশ্য নীচে নামিবার পথ না পাইয়াই এই উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বেলা পাচটা আন্দাজ সময়ে আমরা সকলেই প্রাণ লইয়া যখন মঙ্গুর চটীতে উপস্থিত হইলাম, তখন ডাণ্ডিওয়ালা প্রভৃতি কুলীগণ সকলেই সমস্বরে আনন্দের সহিত "বুড়টী মায়ী কী জয়" রবে চীৎকার করিয়া উঠিল। দুঃখের কথা বলিতে কি, ঠিক সেই সময়ে "বুড়টী মায়ী" অর্থাৎ আমাদের বৃদ্ধা দিদি অকস্মাৎ হস্তপদ শিথিলাবস্থায় অত্যধিক পরিশ্রম-হেতু অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। ধর্ম্মশালা হইতে কাষ্ঠাদি আনিয়া অগ্নিসেক দিলে প্রায় পনেরো মিনিটকাল বাদে তবে তাঁহার পুনরায় জ্ঞানসঞ্চার হইল।

সমস্ত দিন প্রাণান্ত পরিশ্রমের পর রাত্রিতে যখন গরম লুচি পাতে পড়িল, অগ্রজ মহাশয় তখন যেন আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। আলোচনা আর কিছুই নহে, শুধু পওয়ালী-পথে নিজেদেরই দুর্দ্দশার কাহিনী। তাঁহার আঘাত কিছু গুরুতর হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সপ্রতিভভাবেই বলিয়া উঠিলেন, "পওয়ালী ত আর সে পৃথিবী নহে, যে পৃথিবীর মানুষ আমরা। ইহা হইল দেব-দানব-গন্ধর্ব্বের রাজ্য। তাঁদের রাজ্যের শোভা-সম্পদ আমরা যে চর্ম্মচক্ষুতে দেখিয়া লইলাম, ইহা তাঁহারা কিরূপে সহ্য করিবেন? সেই জন্যই ত এত বিপদ, কষ্ট সকলকেই ভুগিতে হইল। গরম লুচি খাইয়া ত আর দেব-দানব-গন্ধর্ব্ব হইতে পারিলাম না যে, যখনই ইচ্ছা এই স্বর্গের শোভা বিনা বাধায় দেখিয়া লইবার সুযোগ বা সৌভাগ্য লাভ করি!"

কালী কমলীওয়ালার এখানকার ধর্ম্মশালাটি পাকা ও দ্বিতল, উপর নীচে তুইখানি করিয়া সর্ব্বসমেত চারিখানি ঘর ও তৎসংলগ্ন বারান্দা। রাত্রিতে উপরের একখানি ঘরে বেশ আরামেই সকলে ঘুমাইতে পারিয়াছিলাম। একখানি মাত্র দোকান, তবে দোকানে চাউল, আটা, চিনি হইতে পেঁড়া প্রভৃতি সকল দ্রব্যই—এমন কি, আলু পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছিল। কষ্টের মধ্যে জল-কষ্টই বেশী অনুভব করিলাম। সর্ব্বত্রই বরফ। বৈকালে এই বরফই একটু একটু গলিয়া ঝির্-ঝির্ রবে এক স্থানে জল দিতেছিল। তাহাই

* এই গাছ ছোট ছোট পলাশ বৃক্ষের মত।

সকল যাত্রীর তৃষ্ণা-নিবারণের উপায়। আমরা এখানে পৌছিবার অগ্রে ও পশ্চাতে যে কয়জন যাত্রী সে দিন আসিয়াছিলেন, সকলেই এই পওয়ালী পথের অসীম দুর্দ্দশার কাহিনী শতমুখে ব্যক্ত করিয়া, টিহিরী রাজ্যের স্বাধীন রাজার এ দিকে যে আদৌ দৃষ্টি নাই, এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

পাঠক-পাঠিকাগণকে এ স্থলে একটি প্রয়োজনীয় কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি। সাধারণতঃ এক যাত্রায় পাঁচ-ধাম-গমনেচ্ছু যাত্রিগণকেই এই পওয়ালীর বিপজ্জনক পথ ধরিয়াই অতিরিক্ত কষ্ট ভোগ করিতে হয়। বিশেষতঃ যে বৎসর তুষারের আধিক্য থাকে, * সে বৎসর এ পথের যাত্রীকে প্রতি



ত্রিযুগীনারায়ণ হইতে উত্তরের তুষার-পাহাড়

পদক্ষেপে প্রাণ হাতে লইয়াই (যেমন আমাদের দুর্দ্দশাভোগ হইয়াছে) যাইতে বাধ্য হইতে হইবে। এমত অবস্থায় এক দফায় মাত্র যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রী দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিলে যাত্রীর এই বিপজ্জনক পথ অতিক্রমের আবশ্যক হয় না। না হয়, পরের দফায় বদরী-কেদার দর্শন করিতে গেলে আর একবার তীর্থযাত্রা-পর্ব্বের উদ্যোগ চলিবে, কিন্তু তাহা করিলে শুধু সময়ের অল্পতা নহে, এই পওয়ালীর পথ হইতে নিষ্কৃতিলাভ—সেও সমতল-দেশবাসী যাত্রীর পক্ষে বড় কম সুবিধার কারণ হইবে না।

এই মরুতে পরদিন প্রাতঃকালে জলের অভাবে সমস্ত যাত্রীই বিলক্ষণ অসুবিধা ভোগ করিল। আশে-পাশে সর্ব্বত্রই তুষার জমাট বাঁধিয়া আছে, একটু বেলা না হইলে জল পাওয়া দায়! অগত্যা কুলীর মাথায় বোঝা চাপাইয়া প্রায় অর্দ্ধ-মাইল নীচে আসিয়া, একটি ঝরণার ধারে সকলেই আমরা হাত-মুখ ধুইয়া লইলাম। তার পর নানাজাতীয় লতা-পাদপ-পরিপূর্ণ জঙ্গলের মধ্য দিয়া কেবল উত্তরাই পথ, সে পথে কোথায়ও এতটুকু বরফ ছিল না। কাল প্রচণ্ড শীতে বরফের মধ্যে প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলাম, আর আজ কয়েক মাইল মাত্র ব্যবধানে নামিয়া আসিতেই সে পুঞ্জীভূত তুষারের একবারেই অন্তর্দ্ধান—সমস্তই যেন বিচিত্র মায়ার মত প্রহেলিকা মনে হইল! বেলা আটটার মধ্যে আমরা এ ছায়া-শীতল পথে পাঁচ মাইল আন্দাজ নামিয়াই এইবার নিরন্তর লোক-সমাগম-পূর্ণ প্রাচীন পবিত্র তীর্থ "ত্রিযুগীনারায়ণে" আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

স্থানটি বেশ বড়, প্রায় পঞ্চাশ ঘর ব্রাহ্মণের এখানে বসবাস আছে। দোকান-পসার, যাত্রিসংখ্যাও যথেষ্ট। যাঁহারা সাধারণতঃ বদরী-কেদার-দর্শনেচ্ছু, তাঁহারাও এখানে যাতায়াত করিয়া থাকেন। সুতরাং এইবার এত দিনে সহজ সুগম পথে প্রবিষ্ট হইয়াছি জানিয়া সকলেই যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এত দিন ছিলাম টিহিরী রাজ্যের গণ্ডীর মধ্যে, কেবলই জঙ্গল ও নিরালা ভিন্ন সেখানে কিছুই ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এইবার লোকালয়ের মধ্যে পড়িয়াছি, অন্য দিকে সুবিধা থাকিলেও জিনিষপত্র যে এখন হইতে অতিরিক্ত মহার্ঘ হইবে, তাহা দোকানের দর জানিয়াই হাড়ে হাড়ে অনুভব করিলাম। ঘৃত তিন টাকা সের, চাউল আট আনা, মিছরী এক টাকা, আলুও সের পিছু চারি আনা। অথচ চারিদিকে এখানে বিলক্ষণ আলুর ক্ষেত দৃষ্ট হইতেছে। কেরোসিন তৈল প্রতি বোতল ।০ আনা মাত্র! "কালী কম্লীওয়ালার পাকা দ্বিতল ধর্ম্মশালা, ছাদে টিন ও সম্মুখে বারান্দাযুক্ত। উপরে ও নীচে ৭।৮ খানি ঘর, কিন্তু সেখানে সাধুদের অতিরিক্ত ভিড়, সুতরাং প্রত্যহই সেখানে যাত্রীরা স্থানাভাব মনে করিয়া থাকেন।" পাণ্ডাদের এই উক্তিতে আমরা শেষ এক দোকানদারের লম্বা চটীতে (তাহাতে দুইখানি ঘর) আশ্রয় লইলাম। চটীর একটু দূরেই পাইপ সংযোগে ঝরণার জল-ব্যবহারের সুযোগ থাকায়, এখানে জলকষ্ট নাই মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। শীতও এখানে অনেকাংশে কম, কেবল একমাত্র উত্তরদিকেই তুষারমণ্ডিত পর্ব্বত দেখা যাইতেছিল। আর আর সকল দিকেই বৃক্ষ-পরিপূর্ণ ধূম্র পাহাড়।

বেলা দশটার মধ্যেই আমরা একে একে সকলেই এখানে উপস্থিত হইতে পারিয়াছি। আমাদের পাঁচ ধাম যাত্রার ইহাই



তুষারের পথে যাত্রী

হইতেছে তৃতীয় ধাম। ফতেসিং, ডাণ্ডিওয়ালা ও বোঝাওয়ালা কুলীগণ সকলেই এ স্থানের অতিরিক্ত ইনাম, খিচুড়ী প্রভৃতি বাবদ প্রাপ্য গণ্ডা আদায় করিয়া লইল, অধিকন্তু পওয়ালীর পথে স্ত্রীলোকগণকে যেভাবে যত্ন করিয়া লইয়া আসিয়াছে, তাহার জন্যও স্বতন্ত্রভাবে কিছু বখশিস্ সংগ্রহ করিতে ভুলিল না।

আসবাবাদি যথাস্থানে রাখিবার পরে স্নান ও দর্শনার্থী হইয়া সকলেই মন্দিরসমক্ষে উপস্থিত হইলাম। কাশীর মত এ স্থানে যাত্রীর পশ্চাতে পশ্চাতে পাণ্ডাদিগের বিলক্ষণ উৎপাত লাগিয়া

* সকল বৎসর সমান তুষার থাকে না।

আছে। মন্দিরের উত্তরদিকে "ব্রহ্মকুণ্ড" ও "রুদ্রকুণ্ডে" সঙ্কল্প করিয়া স্নানান্তে মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলাম। মন্দিরে নারায়ণের প্রস্তর-মূর্ত্তির সম্মুখে অষ্টধাতু-নির্ম্মিত সুন্দর চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি ও তৎপার্শ্বে রৌপ্য-নির্ম্মিত লক্ষ্মীদেবী ও সরস্বতীর প্রস্তর-প্রতিমা শোভা পাইতেছিল। পশ্চাদ্ভাগে ধাতুনির্ম্মিত "কালভৈরব"-মূর্ত্তিও বিরাজমান আছেন। শুনিলাম, সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিন যুগব্যাপী এই স্থানে ইঁহাদের মূর্ত্তি স্বপ্রকাশ, এজন্য "ত্রিযুগী-নারায়ণ" নামে এই প্রসিদ্ধি চলিয়া আসিতেছে। আরও শুনিলাম, হর-পার্ব্বতীর শুভবিবাহকালে স্বয়ং নারায়ণ এ স্থানে যে যজ্ঞ ও হোম ইত্যাদি করিয়াছিলেন, সে সময়কার পবিত্র অগ্নিকে এখনও পর্য্যন্ত জীয়াইয়া রাখিবার জন্য চিরদিন একভাবে সেই স্থানে 'ধুনী' জ্বালাইয়া রাখা হইয়াছে। যে ভাবেই অগ্নি জ্বালাইয়া রাখা হউক না কেন, এই পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে প্রত্যেক যাত্রীই যে ক্ষণেকের জন্য আনন্দাপ্লুত-হৃদয়ে পূজারীগণের নিকটে অগ্নি জ্বালাইবার কাষ্ঠ ও হোমের জন্য এখনও পর্য্যন্ত সাধ্যমত অর্থ দিয়া আসিতেছেন, তাহা আমরা সে স্থানে প্রত্যক্ষই করিলাম। মন্দিরের পশ্চিম দিকে পাণ্ডাগণ হরপার্ব্বতীর বিবাহ-কালীন "ছাউনি তলা" দেখাইয়া সেই পবিত্র শিলাভূমিতে গো-দান, অন্নজল-বস্ত্রাদি উৎসর্গের জন্য প্রত্যেক যাত্রীকেই পীড়াপীড়ি করিয়া থাকেন। ভক্তগণ উচ্ছ্বসিত আবেগে সেই বিশ্বাসেই এখনও যে সেখানে দান উৎসর্গাদি করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়া থাকেন, হিন্দুর দৃষ্টিতে সে দৃশ্যও যে আজ কত মধুর ও পবিত্র! ছাউনিতলার পার্শ্বেই আবার দুইটি কুণ্ড; একটির নাম বিষ্ণুকুণ্ড এখানে চরণামৃত পান করিবার বিধি ও অপরটি সরস্বতীকুণ্ড, যেখানে পিতৃ-পুরুষগণের তর্পণের বিধি আছে!

দর্শন-পূজাদি শেষ করিতে এ দিন আমাদের প্রায় আড়াইটা বাজিয়া গিয়াছিল। বুড়ো চাকর আজ বহুদিনের পর দোকান হইতে মেঠাই, শাকভাজা, আলুর "পকৌড়ী" প্রভৃতি কিনিতে পাইয়া প্রাণ ভরিয়া যেন পরিতৃপ্ত হইল! দুঃখের বিষয়, বুড়া কেদারের মত এ স্থানেও অসম্ভব মাছির উৎপাতে আমরা উত্ত্যক্ত হইলাম। আহারাদি কোন প্রকারে শেষ করিয়া লইয়া সন্ধ্যাকালে আবার সে দিন আরতি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। আরতি-অন্তে এ দিনে নির্জ্জন পাইয়া পূজারী মহাশয় আমাদিগকে মন্দির-দ্বার হইতে কিছুক্ষণ নীরবে কাণ পাতিয়া থাকিবার কথা বলিলেন, এবং সে সময়ে কিছু শুনিতে পাওয়া গেল কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। কাণ পাতিয়া আমরা কেবল চতুর্ভুজ-মূর্ত্তির ঠিক পার্শ্বদেশে "টপ টপ" শব্দে বিন্দু বিন্দু জল-পতনের শব্দ শুনিতে পাইয়া, জিজ্ঞাসায় জানিলাম, "এই ধারা শ্রীহরির নাভিকমল হইতে চিরদিন একভাবে এই স্থানে অল্প অল্প পড়িয়া থাকে।" পূজারীর মুখে এ কথা আশ্চর্য্যজনক মনে হইলেও, হিমগিরির এই চিরপবিত্র ত্রিযুগীনারায়ণের পুণ্য পাদপীঠে, "ভগবানের নাভি-কমল হইতে জল-পতন" এরূপ শব্দ ভক্তের কর্ণে মধুবর্ষণের মতই মধুর মনে হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। পরদিন প্রত্যুষে ত্রিযুগীনারায়ণ হইতে আবার জাঁপে রওনা হইলাম। [ক্রমশঃ।

শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

"ছিন্ন-কোরক"

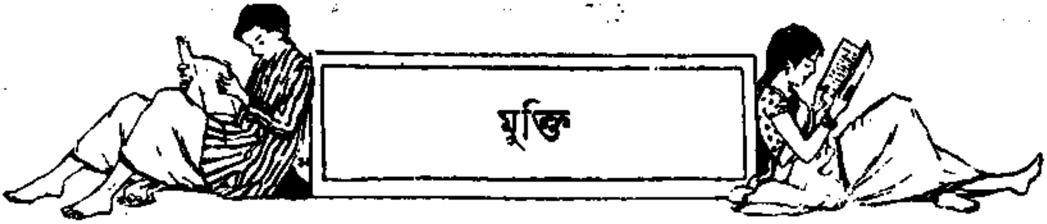
সইল না তার ধরার হাওয়া, সইল না তার সইল না—
ধরার হাওয়া তাহার বুকে, জীবন হয়ে বইল না।
হঠাৎ এসে দেখা দিয়ে, চাইল মেলি চক্ষু দু'টি—
এখনও তা' কাল-নিকষে, স্বর্ণরেখায় আছে ফুটি।

ঘুম-ভাঙ্গানো সাড়া দিয়ে, এসেছিল একটুখানি
এক নিমেষের জাগরণে, হেনে গেছে বজ্র বাণই।
ক্ষুদ্র দুটি মুষ্টি ভরি' এনেছিল বিত্ত কত——
কৃতজ্ঞতায় হয়েছিল পুলকিত চিত্ত নত।

ফিরিয়ে নিয়ে গেল সখি, দেশান্তরের অতিথি সে—
আগন্তুক সে দু'টি দিনের—অজানাতে গেছে মিশে।
নিয়ে গেছে হরণ ক'রে চোখের আলো মুখের ভাষা
অন্ধকারে মাণিক জ্বলে নিভে গেল সকল আশা।

গেছে তবু আছে বুকে চিরজীবীর আয়ু লয়ে
চিরনূতন কালজয়ী, থাকবে বুকের স্বপ্নালয়ে।

শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্ত্তী



মুক্তি

[বড় গল্প]

পুলিস-সমাগমে লেকের এই পরিত্যক্ত নির্জ্জন অংশটুকু ক্ষণকালের মধ্যেই জনাকীর্ণ হইয়া গেল। জনতার তখন কৌতূহলের অন্ত নাই। লেকের এক প্রান্তে বালিয়াড়ির আড়ালে এভাবে তোড়-জোড় পাতিয়া ফটো তোলার ব্যাপারে পুলিস কোনও নূতন রকম শিকারের সন্ধান পাইয়াছে ভাবিয়া, বহুসংখ্যক চক্ষুই সচকিত হইয়া উঠিয়াছিল,—না জানি, কি চমকপ্রদ রহস্যই এই মুহূর্ত্তে প্রকাশ পাইবে !

কাহারও মুখে কথা নাই,—মেয়েটির মুখেই প্রথম কথা শোনা গেল ; নরনারায়ণের দিকে চাহিয়া বিরক্তির সুরে সে কহিল,—গুটিয়ে ফেলুন সব,—কাযের দফা হ'ল গয়া ! পরক্ষণে আঁচলটি মাথার উপর তুলিয়া দিয়া অবগুণ্ঠনবতী হইয়া সে তাহার নির্দ্দিষ্ট বেতের চেয়ারটির উপর চাপিয়া বসিল। স্ক্রীনের ভিতরে প্রসাধন-পর্ব্ব সারিয়া সে যখন বাহিরে আসে, মাথার গেরুয়া-রঙের পাগড়িটি খুলিয়া ভাঁজ করিয়া আসনের মত বেতের চেয়ারখানির বসিবার স্থানে আস্তৃত করিয়াছিল,—নরনারায়ণ তাহার এ কার্য্যটুকু লক্ষ্য করে নাই,—সে তখন অভিভূত ছিল এই তরুণীর চিন্তায়।

শ্রীমতী মুক্তি অবগুণ্ঠনবতী হইয়া আসন গ্রহণ করিতেই পুলিস অফিসরটি আস্তে আস্তে তাহার পাশ কাটাইয়া স্ক্রীন্‌খানি তুলিয়া ভিতরে ঢুকিলেন। নরনারায়ণের বুকের ভিতর টিপ্-টিপ্ করিয়া উঠিল, অর্থপূর্ণদৃষ্টিতে সে মুক্তির মুখের দিকে চাহিল ; মুক্তির উজ্জ্বল দুই চক্ষু অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়া নরনারায়ণের মুখটির উপরই পড়িয়াছিল, তাহাতে আতঙ্কের চিহ্নমাত্র নাই !

বাহির হইয়া আসিয়াই পুলিস অফিসর নরনারায়ণের দিকে চাহিয়া ভদ্রভাবে কহিলেন,—কিছু মনে করবেন না, একটা তদন্তব্যাপারে আপনার কাযে একটু বিঘ্ন ঘটিয়ে গেলুম।

কম্পিতকণ্ঠে নরনারায়ণ উত্তর দিল,—ধন্যবাদ !

মুক্তি এই অবসরে তাহার অবগুণ্ঠন একটু খাটো করিয়া কহিল,—আপনার চেয়ে বেশী অসুবিধা আমাদের ঘটাচ্ছেন ওঁরাই !

সেই মুহূর্ত্তে পুলিস অফিসর জনতার উদ্দেশে রূঢ়স্বরে হাঁকিলেন,—কি দেখছ তোমরা এখানে ? যাও এখান থেকে সকলে ! ননসেন্স !

জনতা সঙ্গে সঙ্গে অপসৃত হইয়া গেল,—জনতার ভিতর হইতে একটা ডেঁপো ছেলের ব্যঙ্গস্বর শোনা গেল,—আমরা ত খেলছিলুম ও-ধারে, আপনারাই ত আন্‌লেন টেনে !

মুক্তি হাসিয়া প্রশ্ন করিল,—আপনি বুঝি মনে মনে ঠিক দিয়ে রেখেছিলেন, ছাড়া পোষাক-পাগড়ী আমি ও-খানে ফেলে রেখে এসেছি ?

—সেগুলো কোথায় লুকুলেন আপনি ?

—সে-পোষাক বুঝি ছেড়েছি মনে করেছেন ! তারা যথাযথ ভাবেই আছে যথাস্থানে, সে-গুলোর ওপরেই আপনার শাড়ী-ব্লাউস চড়িয়েছি,—আর গেরুয়া-রংয়ের পাগড়ীটি পাট ক'রে এখানে কেমন পেতে বসেছি দেখুন না ! ভয় ছিল আমার এইটেকে নিয়েই ; কেন না,—ওরা খুঁজছে গেরুয়া-রঙের কাপড়পরা একটা গেঁয়ো মেয়েকে !

—আমি কিন্তু এখনো অন্ধকারে রয়েছি, প্রকৃত ঘটনা শুনতে আমার কৌতূহলের অন্ত নেই।

—আমারও মনে শান্তি নেই—আপনাকে আমার সমস্ত কাহিনী না শুনিয়ে। এখানেই শুনবেন ?

—ক্ষতি কি ! কাছে কাউকেই দেখছি না, এ দিকটা নির্জ্জন আর নোংরা ব'লে কেউ বড় একটা আসে না ; পুলিস দেখে যারা এসেছিল, আপনি বুদ্ধি ক'রে পুলিস দিয়েই তাদের তাড়িয়েছেন। আরম্ভ করুন আপনার কাহিনী।

—তবে শুনুন।—

*　　*　　*　　*

মুক্তি বেশ গুছাইয়া সংক্ষেপে তাহার যে বৈচিত্র্যময় কাহিনী শুনাইয়া দিল, নরনারায়ণের মনে হইল, এইমাত্র সে যেন একখানি ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ চমকপ্রদ উপন্যাসের পাঠ সমাপ্ত করিল,—তাহার মানসপটে এই ভাগ্যবিড়ম্বিতা তেজস্বিনী মেয়েটির আশৈশব বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন আলেখ্য অপরূপ রক্ত-তুলিকায় যেন অঙ্কিত হইয়া গেল।

তখনও তাহার ঠিক জ্ঞানের সঞ্চার হয় নাই,—পাঁচ পূর্ণ হইয়াছে কিম্বা ছয়ে পড়িয়াছে,—সেই সময়কার এই স্মৃতিটুকু এখনও তাহার চিত্তে সংশয়ের রেখাপাত করে—সে যেন এক ঐশ্বর্য্যময় সুখের সংসার আশ্রয় করিয়াছিল, যাহাদের কোলে কোলে সে ফিরিত, তাহারা কত সুন্দর, তাহাদের মুখের হাসি এখনও যেন তাহার চক্ষুর উপর ভাসিয়া বেড়ায়।

ইহার পরেই হয় তাহার জীবন-নাটকের অঙ্ক-পরিবর্ত্তন,—যে অঙ্কের বিভিন্ন দৃশ্য সে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং এ পর্য্যন্ত বরাবর তাহাকে অভিনয় করিতে হইয়াছে। ইহার সূচনা হয় বৃন্দাবনের এক বৈষ্ণব আখড়ায়। এই আখড়ায় অনেকগুলি বালিকার মধ্যে তাহার জ্ঞানের উদ্রেক হয়। জ্ঞান ও বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝিতে পারে, সে ইহাদেরই এক জন; সংসারে তাহার আপনার বলিতে কেহ নাই, আশ্রমস্বামীই তাহার পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিপালক—একাধারে সব। এখানে তাহাদিগকে এমন বিধিবদ্ধভাবে থাকিতে হইত যে, একটু এদিক ওদিক হইবার উপায় ছিল না। বাঙ্গালা, ইংরাজী, হিন্দী, উর্দ্দু মোটামুটি সকলকেই শিখিতে হইত, স্বাস্থ্য ও শক্তির জন্য দুই বেলা নিয়মিত ব্যায়ামের ব্যবস্থা ছিল, সন্ধ্যার পর গানের আসর বসিত, লেখাপড়া ও ব্যায়ামের মত গান-বাজনারও রীতিমত চর্চ্চা হইত। লেখাপড়ার সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধেও উপদেশ দেওয়া হইত, বড় বড় শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া প্রত্যহ এই শিক্ষা দেওয়া হইত যে তাহারা ভারতের বিশাল আর্য্যজাতির অঙ্গস্বরূপ—প্রত্যেকেই তাহারা আর্য্যধর্ম্মী, আর্য্যকন্যা, সকলেই একজাতি, তাহাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। প্রত্যহ প্রত্যূষে ভগবানের উপাসনার পর তাহাদিগকে তাঁহার নাম লইয়া শপথ করিতে হইত যে,—আশ্রমস্বামীর কোনও আদেশ কেহ কোন দিন অবহেলা করিবে না—নত-মস্তকে পালন করিতে বাধ্য থাকিবে।

আশ্রম-বালিকাদের মধ্যে মুক্তির প্রকৃতিই ছিল অনন্য-সাধারণ। তাহার শৈশব অবস্থাতেই আশ্রমস্বামীর স্নেহটুকু সে পূর্ণমাত্রায় পাইয়াছিল। মুক্তির প্রতি স্বামীজীর এই পক্ষপাতিতায় অন্যান্য মেয়েরা মনে মনে ঈর্ষা পোষণ করিত, কিন্তু মুক্তি তাহা গ্রাহ্যের মধ্যে আনিত না। যদিও অন্যান্য মেয়েদের সহিত মিশিয়া সে লেখাপড়া, ব্যায়াম, গান-বাজনা প্রভৃতি করিত, কিন্তু তাহার পর বরাবর তাহাকে স্বামীজীর কাছেই থাকিতে হইত। স্বামীজীর ভোজনের পর তাঁহার পাতেই সে প্রসাদ পাইত,—তাঁহার ছোটখাটো কায-কর্ম্ম ও সেবা-শুশ্রূষা মুক্তিকে করিতে হইত; নিত্যকার ডাকে যে সকল খবরের কাগজ ও কেতাবপত্র আসিত, মুক্তি সেগুলি গুছাইয়া স্বামীজীর পড়িবার ঘরে রাখিয়া দিত। স্বামীজী কাগজ পড়িয়া মুক্তিকে দুনিয়ার খবর শুনাইতেন,—এই সূত্রেই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাময়িক পত্রিকাসমূহ ও কেতাবাদি নিয়মিতরূপে পাঠ করা মুক্তির একটা নেশার মত হইয়া দাঁড়ায় এবং বৃন্দাবনের এক আশ্রম-কক্ষে আবদ্ধা থাকিয়াও সে বহির্জ্জগতের সহিত পরিচিতা হইবার অবকাশ পায়। যদিও কয়েকটি কক্ষে মেয়েরা একত্র শয়ন করিত, কিন্তু শৈশব হইতেই মুক্তির রাত্রিবাসের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইয়াছিল—স্বামীজীর পড়িবার ঘরে,—যাহা স্বামীজীর ঘরটির সহিত সংলগ্ন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি সবিস্ময়ে দেখিত, আশ্রমের বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়েদের কে বা কাহারা আসিয়া হঠাৎ কোথায় লইয়া যায়,—আর তাহাদের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। মেয়েমহলে এ সম্বন্ধে এই কথাই রাষ্ট্র হয় যে,—বিয়ের ফুল ফুটিলে আর এখানে থাকবার উপায় থাকে না—বর এসে নিয়ে যায়! মুক্তি মেয়েদের মনোভাব পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারে—অধিকাংশ মেয়েই সাগ্রহ প্রতীক্ষা করে—কবে তাহাদেরও বিয়ের ফুল ফুটবে, বর এসে নিয়ে যাবে! কিন্তু কোনও দিনই মুক্তি এই আশ্রমে বিবাহের কোনও অনুষ্ঠান দেখে নাই।

অন্যান্য মেয়েরা কথাটা তলাইয়া বুঝিবার কোনও চেষ্টা কোন দিন করিত না, কিন্তু মুক্তি সংবাদপত্রের নিয়মিত

পাঠিকা, দৈনিক বসুমতীর বারোখানি পাতাই গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত সে নিত্য পাঠ করে,—কি উদ্দেশে ছোট ছোট হারানো মেয়েদের এই আশ্রমে সযত্নে প্রতিপালন করা হয় এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কোথায় তাহাদিগকে রপ্তানী করা হয়,—মুক্তির ন্যায় নিয়মিত সংবাদপত্র-পাঠিকার নিকট তাহার প্রকৃত রহস্য প্রচ্ছন্ন থাকিবার কথা নয়। মুক্তি বরাবর লক্ষ্য করে, আশ্রম দেখিবার উদ্দেশ্যে যখনই পাঞ্জাব অঞ্চল হইতে ধনী ব্যক্তিদের শুভাগমন হয়, তাহার পরই বয়ঃপ্রাপ্তা আশ্রম-কুমারীদের বিবাহের মুকুল বিকশিত হইবার কথা প্রকাশ পায়, এবং সযত্ন-প্রতিপালিতা কন্যা-স্থানীয়া কুমারীদের বিদায় দিয়াও স্বামীজী ও তাঁহার সহকারিগণকে বিশেষ হর্ষোৎফুল্ল হইতে দেখা যায়।

মুক্তি সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত,—কবে তাহারও এইভাবে ডাক পড়ে। কথায় কথায় এক দিন সে স্বামীজীর নিকট কথাটা পাড়িয়া ফেলে; গাঢ়স্বরে প্রশ্ন করে,—আমাকেও ত এক দিন এমনি ক'রে বিদেয় দেবেন, বাবা?

স্বামীজী হাসিয়া উত্তর দেন,—দূর পাগলী! তোকে পাঠাব হটমালার দেশে—ওদের মতন? সেই জন্যেই বুঝি তোকে দিন-রাত চোখে চোখে রাখছি?

কথায় কথায় এক দিন মুক্তি স্বামীজীকে প্রশ্ন করে,—আমার কি আপনার বলতে সংসারে কেউ নেই, বাবা?

স্বামীজী বলেন,—কেন, আমি কি তোর আপনার কেউ নই?

—আপনি ত আমার বাপ, মা, প্রতিপালক—সব, জ্ঞান পেয়ে অবধিই ত আপনাকে জানি; কিন্তু কোথায় জন্মেছি, কার পেটে হয়েছি, জন্মদাতা কে—সে সব খবর ত কিছু জানি না, বাবা! এখন বড় হয়েছি, জানতে ইচ্ছা করে না?

—সে সব জানবার ত কোনও উপায় নেই, মা! তুমি তোমার বাপ-মার হারানো মেয়ে; তোমার বয়স তখন পাঁচ কি ছয় বছর, প্রয়াগে সেবার কুম্ভ-মেলার মহাঘটা, ভীড়ে তুমি হারিয়ে যাও, লোকের চাপে কচি দেহটি তোমার থেঁতো হয়ে গিয়েছিল, বাঁচবার আশাই ছিল না; আমার লোকরা তোমাকে তুলে আনে। তিনটি মাস তুমি কথা কইতে পারনি, ছ'টি মাস উঠে দাঁড়াবার শক্তি ছিল না। যখন সেরে ওঠ, বাপ-মা, দেশ-তুমি কোন কিছুরই উল্লেখ করতে পারনি। তবে এইটুকু জানতে পেরেছিলাম যে, তুমি বাঙ্গালীর মেয়ে, আর কোনও বিশিষ্ট ঘরেই তোমার জন্ম। সেই জন্যই তোমার সম্বন্ধে সব দিকেই আমাকে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করতে হয়।

স্বামীজীর সঙ্গে যখন মুক্তির এইরূপ কথাবার্ত্তা হয়, তখন তাহার বয়ঃক্রম পনেরো কি ষোলো বৎসর। কিন্তু মুক্তির দুর্ভাগ্যক্রমে এই ঘটনার পর মাস কতকের মধ্যেই হঠাৎ সন্ন্যাস-রোগে স্বামীজীর মৃত্যু হয় এবং তাহার পরেই সমস্ত ওলটপালট হইয়া যায়। যে পাকা মাথাটির কূটবুদ্ধি স্বার্থময় অভিসন্ধির মধ্য দিয়া এই আশ্রমটিকে চালিত করিতেছিল—কাহাকেও কোনও ঝঞ্ঝাট ভোগ করিতে দেয় নাই,—তাহার অভাবে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আশ্রম-পরিচালকদের দুরভিসন্ধি প্রচার হইয়া পড়ে। আশ্রমের সঞ্চিত টাকা মথুরায় একটি গদীতে আমানত রাখা ছিল, মাসে মাসে সেখান হইতে টাকার সুদ আসিত। সহসা সে গদী লালবাতি জ্বালাইয়া দেউলিয়া খাতায় নাম লেখায়; কর্ত্তারা তখন মাথায় হাত দিয়া পড়ে। রাতারাতি আশ্রম ভাঙ্গিয়া যায় এবং জীবিত ও নির্জ্জীব তাবৎ সম্পত্তি কর্ত্তারা ভাগ করিয়া লয়। আশ্রমে তখনও পনেরোটি মেয়ে ছিল। মুক্তির দিকেই প্রত্যেক ভাগীদারের বিশেষ লক্ষ্য,—শেষে নাকি অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়া জনৈক বুদ্ধিমান্ ভাগীদার মুক্তিকে তাহার ভাগের সামগ্রীসমূহের সামিল করিতে সমর্থ হয়।

ভাগীদারটি ভাবিয়াছিল, মুক্তিকে সিন্ধুদেশের কোনও ধনাঢ্য বণিকের হাতে বিক্রয় করিয়া সমস্ত ক্ষতিপূরণ করিয়া লইবে। কিন্তু মুক্তি কাণাঘুষায় তাহার উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া বিদ্রোহিণী হইয়া উঠে। সে দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করে যে, নারীত্বের অবমাননা সে কিছুতেই সহ্য করিবে না, এ চেষ্টা হইলেই সে বিষ খাইয়া মরিবে; সব আশা তাহাদের ঘুচাইয়া দিবে।

আশ্রমে মুক্তি যাহার কাছে হিন্দী ও উর্দ্দু শিখিত, সেই শিক্ষাদাতা বর্ষীয়ান্ লালাজীই শেষে মুক্তির ভাগ্যবিধাতা হয় এবং ছোরা-লাঠি-খেলা হইতে চুরি-বাটপাড়ী প্রভৃতি ভাল-মন্দ কাযগুলিও আশ্রমবালিকাদিগকে পর্য্যায়ক্রমে যে তিন বুদ্ধিমান্, শিক্ষা দিত, তাহারাও এই সঙ্গে ছিল। মুক্তি ছাড়া আরও তিনটি মেয়ে ইহাদের ভাগে পড়িয়াছিল। নানা দোষের মধ্যে একটা গুণ ইহাদের চরিত্রে মুক্তি বরাবর

দেখিয়া আসিয়াছে—আশ্রমের প্রত্যেক বালিকাকে তাহারা প্রত্যেকে মেয়ের মত দেখিয়াছে—কলুষিত দৃষ্টিতে কোনও দিন কাহারও দিকে তাকায় নাই!

মুক্তির প্রতিবাদে ইহারা একবারে মুসড়াইয়া পড়ে। তখন তাহারা বিভিন্ন নামে তীর্থযাত্রী হিসাবে দেশপর্য্যটন করিতেছিল এবং লুণ্ঠন ও অপহরণের সহায়তায় তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহ হইতেছিল। যে তিনটি মেয়েকে ইহারা ভাগে পাইয়াছিল, তাহারা চুরি-বাটপাড়ী ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত! স্বামীজী মুক্তিকে লাঠি ও ছোরা-খেলায় অনুমতি দিয়াছিলেন, কিন্তু চুরি-বাটপাড়ী বিভাগে কোনও দিন তাহাকে শিক্ষাধীনা থাকিতে বাধ্য করেন নাই,—যদিও মুক্তি কৌতূহলবশে নিজে ইচ্ছা করিয়া ইহার শিক্ষাপ্রণালী দেখিত এবং শিখিবার চেষ্টাও করিত!—মুক্তির মালিকরা জাতিতে ছিল লালা, মুক্তিকে তাহারা তাহার শৈশব অবস্থা হইতে দেখিয়া আসিতেছে, তাহার প্রকৃতি তাহাদের নিকট অবিদিত ছিল না; বয়োবৃদ্ধ লালা সাহেব—মুক্তির ছিল যে হিন্দী ও উর্দ্দু-শিক্ষক—সে কাঁদিয়া বলে—তা হ'লে আমরা তোমাকে নিয়ে কি করব, মা? তুমি ত জান, শুধু তোমাকে আমাদের ভাগে নেবার জন্য কতগুলো মেয়েকে আমরা ছেড়েছি।

মুক্তি তৎক্ষণাৎ তাহার মুখের উপর জবাব দেয়,—তা ব'লে ভিন্ দেশের লোকের কাছে আমি বাঁদীর মত বিকুতে পারব না, ওস্তাদজী! তার চেয়ে হুকুম করুন—চুরি-ডাকাতী ক'রে দেদার টাকা আমি তোমাদের লুঠে এনে দিই!

শেষে তাহাই সাব্যস্ত হয়। সিন্দুক-বাক্স ভাঙ্গিবার আধুনিক কৌশলগুলি মুক্তি অল্লায়াসেই শিখিয়া লয় এবং চুরির একটা নূতন পন্থাও সে আবিষ্কার করিয়া ফেলে। সাময়িক পত্রের ধারাবাহিক প্রবন্ধ পড়িয়া তাহার মনে এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, বাঙ্গালাদেশের মেয়েরা অপহৃতা হইয়া, আরব্য উপন্যাসের বাঁদীর মত সিন্ধু ও পঞ্জাব প্রদেশের এক শ্রেণীর লম্পটদের নিকট বিক্রীত হয় এবং সেখানে তাহাদের লাঞ্ছনার সীমা থাকে না। বৃন্দাবনের আশ্রমে প্রতিপালিত হইয়া সে এই সত্যই উপলব্ধি করিয়াছে, আশ্রম-পরিচালকরা উচ্চমূল্যে তাহাদের আশ্রম হইতে ঐ সকল লম্পটের উপকরণ যোগাইয়াছে। স্বামীজীর প্রতি তাহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার এই ইতর অভিসন্ধির জন্য সে তাঁহাকে মার্জ্জনা করিতে পারে নাই। পাছে সেও এক দিন বাঁদীর মত বিদেশীর নিকট বিক্রীতা হয়, এই আশঙ্কায় সে ঘৃণিত চৌর্য্যবৃত্তিকেও বরণ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে নাই। মনের মধ্যে এই সঙ্কল্পকেই সে দৃঢ় করিয়া লয় যে, এই পথে বাহির হইয়া সে যদি প্রচুর অর্থ আহরণ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহার মালিকগণ তাহাকে বাঁদীর মত বিক্রয় করিবার অভিসন্ধি সত্য সত্যই পরিত্যাগ করিবে।

বেশপরিবর্ত্তন বা ছদ্মবেশধারণে মুক্তির দক্ষতা ছিল যেমন অসাধারণ, উপস্থিত-বুদ্ধিও তেমনই তাহার আশ্চর্য্যরূপ প্রখর ছিল। হঠাৎ কোনও বিপদ উপস্থিত হইলে এই উপস্থিতবুদ্ধিটুকু যেন সহজাত-সংস্কারের মত প্রকট হইয়া তাহাকে মুক্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিত। সুতরাং ছদ্মবেশ, সাহস, সুকণ্ঠ, ক্ষিপ্রতা ও উপস্থিতবুদ্ধি—এই পঞ্চ ব্রহ্মাস্ত্রের সহায়তায় মুক্তি তাহার সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে সহজেই সমর্থ হয়। এ পথে মুক্তির বুদ্ধি-নৈপুণ্যে প্রচুর অর্থাগম দেখিয়া মালিকগণ মুক্তির ইচ্ছানুসারে তাহাদের কাজ চালাইতে উদ্গ্রীব হইয়া উঠে এবং মুক্তির অনুরোধে দলের আর তিনটি মেয়েকেও দলভুক্ত করিয়া রাখিতে সম্মত হয়।

যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের বড় বড় সমস্ত সহরেই এই দল অর্থলুণ্ঠনপারিপাট্যে তুমুল আন্দোলন ও আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া তুলে, কিন্তু একটি দিনের জন্যও ইহারা কোনও প্রকারে বিব্রত হয় নাই বা ইহাদের সুনিয়ন্ত্রিত গতিবিধি পুলিস কিম্বা জনসাধারণের চিত্তে সন্দেহ উপস্থিত করিবার অবকাশ পায় নাই।

এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই দল কলিকাতায় আগমন করে এবং আজ এইখানেই তাহারা প্রথম বিপদাপন্ন হয়,—যে বিপদ একবারে সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়ায় তাহাদের পক্ষে। কালীঘাটে একখানা বাড়ী ভাড়া লইয়া ইহারা বাসা পাতে এবং বাড়ীটিকে তাহাদের হেড কোয়ার্টার করিয়া তাহারা শিকার-সন্ধানে বাহির হয়। কয় দিনের মধ্যেই নির্ব্বিঘ্নে তাহারা তিন স্থান হইতে প্রচুর অর্থ ও অলঙ্কার লুণ্ঠন করিতে সমর্থ হয়। ইহাতে সাহস ও দুরাকাঙ্ক্ষা ইহাদের উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। আনন্দের আতিশয্যে তাহারা সহসা এমন আশ্বাসও দিয়া ফেলে যে, মা-কালীর কৃপায় কলিকাতায় যদি এ-ভাবে আর গোটা পঁচিশ দফা রোজগার হয়, তাহা হইলে

তাহারা তাহাদের পুঁজি-পাটা লইয়া দেশে ফিরিবে, এবং মুক্তি ও তাহার তিনটি সঙ্গিনীকে বেকসুর খালাস দিয়া যাইবে। মুক্তি তাহাদিগকে লইয়া স্বাধীনভাবে দল চালাইতে পারিবে, অথবা ইচ্ছা করিলে সাদি করিয়া ঘর-সংসার পাতিতে পারিবে। কিছু কিছু টাকাও তাহাদিগকে দেওয়া হইবে—যাহাতে তাহাদের কোনও অসুবিধা না হয়।

আজই মধ্যাহ্নে তাহারা বালিগঞ্জের এক বড়লোকের বাড়ীতে প্রবেশ করে। তাহারা ব্রজবাসী বৈষ্ণবী, কলিকাতায় আসিয়াছে, বড়লোকের বাড়ীতে ব্রজের আসল কীর্ত্তন গান করিয়া মেয়েদের আনন্দ দেয়!—এই ছিল তাহাদের পরিচয়। দলের পুরুষরা বাহিরে থাকে, মেয়েরা অবাধে ভিতরে প্রবেশ করে। ব্রজবাসিনীর মুখে পরিষ্কার বাঙ্গালা শুনিয়া মেয়েরা মুগ্ধ হইয়া যায়; দ্বিতলে সুসজ্জিত হল-ঘরে তাহাদের বৈঠক বসে। নীচের বৈঠকখানায় ব্রজবাসিগণ বাড়ীর ভৃত্য ও দ্বারবানদিগকে আলাপে অভিভূত করিয়া রাখিবে এবং উপরে মেয়েরা কীর্ত্তনানন্দের মধ্যে কৌশলে কায উদ্ধার করিবে, এ দিনের এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এ অঞ্চলের সহরতলীতে উপর্য্যুপরি তিনটি চুরি হওয়ায় পুলিসের টনক নড়িয়া যায় এবং পুলিসের এক জন স্পেশ্যাল অফিসর কতিপয় পুলিস প্রহরীর সহিত খুবই সন্তর্পণে এই আশ্চর্য্য ধরণের দিনে ডাকাতির রহস্যানুসন্ধানে অবহিত থাকেন।

পূর্ব্ব হইতে বিশেষভাবে সন্ধান লইয়া এই দল এমন বাড়ী নির্ব্বাচন করিত, যেখানে দিবাভাগে বাড়ীর পুরুষরা কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে থাকেন, ভৃত্য, পাচক, দ্বারবান্ প্রভৃতিকে তাহারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনিত না, দলের পুরুষরা তাহাদের সহিত আলাপ জমাইয়া তীব্র মাদকমিশ্রিত পান বা খৈনি খাওয়াইয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। উপরে দলের মেয়েরা অহিংস কীর্ত্তনভজনের মধ্যে সহসা হিংস্র মূর্ত্তি ধরিয়া বাড়ীর মেয়েদের অভিভূত করিয়া যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। অবস্থা অনুসারে উপস্থিতবুদ্ধি খাটাইয়া মুক্তি তাহাদিগকে কোনও একটা কক্ষমধ্যে এমনভাবে আটকাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকিত যে, তাহাদের আর্ত্তনাদ সহজে বাহিরে আসিত না, অথবা আর্ত্তনাদ তুলিবার সামর্থ্যটুকু পর্য্যন্ত তাহারা হারাইয়া ফেলিত। এইভাবে লুণ্ঠন ও নির্য্যাতন যে পর্য্যন্ত চলিত, মেয়েদের সমবেত কণ্ঠের কীর্ত্তন ততক্ষণ অধিকতর উচ্চগ্রামে উঠিত।

ভজন চলিতেছে, কি মধুর কীর্ত্তন, কি মনোমুগ্ধকর স্বর! শ্রোত্রী—প্রৌঢ়া গৃহস্বামিনী, তাঁহার দুই কন্যা ও এক বর্ষীয়সী পরিচারিকা। সহসা মুক্তি হাতের খঞ্জনী তাহার এক সঙ্গিনীর ঝুলির মধ্যে ফেলিয়া দিয়া তাহার ভিতর হইতে একটা চকচকে পিস্তল তুলিয়া ধরিল। সঙ্গিনীদের ভ্রূক্ষেপ নাই, বরং তাহারা ঠিক এই সময় আন্তরিক স্বরে কীর্ত্তনাঙ্গের আখরটির উপর আরও মনোযোগ দিল।

মুক্তি তাহার হাতের সেলোগরের চকচকে আগ্নেয় পিস্তলটি গৃহস্বামিনীর দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—মুখ বুজিয়ে গায়ের গয়নাগুলো সব খুলে দিন এদের ঝুলিতে, কথা কয়েছেন কি পিস্তলের গুলী বুকে পড়েছে!

সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তনরতা সঙ্গিনীরা যথাক্রমে মাতা ও দুই কন্যার সম্মুখে ঝুলি পাতিয়া ধরিল। বজ্রসম্পাতের আতঙ্কের মত এক মুহূর্ত্তে সকলেই স্তব্ধ, স্তম্ভিত। পরিচারিকাটি কক্ষতলে আস্তৃত কার্পেটের উপর বসিয়াছিল, হঠাৎ সে বড়মড় করিয়া উঠিতেছে, মুক্তি হাঁকিল,—খবরদার! কথা কয়েছ কি মরেছ, অমনি—গুড়ুম্!

গায়ের সমস্ত অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া ঝুলির মধ্যে ফেলিতে পাঁচটি মিনিটের অধিক বিলম্ব হইল না,—ঝিয়ের হাতে ছিল সোনার তাগা, গলায় সরু একছড়া হার। সেও খুলিতে উদ্যত হইয়াছে, কিন্তু মুক্তি কহিল,—থাক্, তুমি গরীব বেচারা, তোমাকে রেহাই দেওয়া গেল। কিন্তু হুঁসিয়ার, মুখটি বুজে থাকা চাই।

পরক্ষণে গৃহিণীর দিকে চাহিয়া কহিল,—যে ঘরে টাকা আছে, গয়নার বাক্স আছে, সেই ঘরে চলুন! যদি অরাজী হন কিম্বা চেঁচান, তা হলেই—

আর বলিতে হইল না, গৃহিণী খেলার পুতুলের মত ফিরিলেন পার্শ্বের ঘরটির দিকে। মেয়ে দুটি ও পরিচারিকার কাতর দৃষ্টি তাহার দিকে পড়িয়া যেন প্রশ্ন করিতেছিল,—কি আদেশ আমাদের প্রতি!

হাতের পিস্তলটি তাহাদের দিকে লক্ষ্য করিয়া মুক্তি কহিল,—চল সকলে মার পিছু পিছু, একটু এদিক ওদিক হলেই গুড়ুম্!

গৃহের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া মুক্তি কহিল,—একটি ঘণ্টা চুপচাপ থাকুন এই ঘরে। আমি দরজা বন্ধ ক'রে পাহারায় রইলুম;—যদি কেউ মুখ থেকে একটি কিছু কথা খসান—অমনি জানালা দিয়ে তখনই করব তাঁকে গুলী।

সঙ্গিনীদের নামিয়া যাইতে বলিয়া মুক্তি তাহাদের কণ্ঠের তান নিজের কণ্ঠে টানিয়া লইল। মুক্তির গানের স্বর রোদনের সুরে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল;—

ঐ যায় পদ রহিয়া রহিয়া রহিয়া গো!
উহার মা ডাকে ঘর পানে
রাখাল ডাকে মাঠ পানে
গোপী সব ডাকে নয়নে নয়নে নয়নে গো!

মুক্তি মনে করিয়াছিল, সে যে ভাবে তাহার কায গুছাইয়াছে, মালিকরাও তেমনই তাহাদের যথাযথ কায করিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু হলের বাহিরে আসিতেই সে একটা গোলমাল ও সেই সঙ্গে তীব্র স্বর শুনিল,—পাকড়ো, পাকড়ো! মুহূর্ত্তের জন্য সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, তাহার পর ক্ষিপ্রহস্তে দোতলায় উঠিবার দরজাটি বন্ধ করিয়া দিয়া সে বারান্দার দিকে ছুটিল। নিম্নে তখন রীতিমত হাঙ্গামা ও হুটাপুটি বাধিয়াছে, তাহা সে স্পষ্টই বুঝিল। বারান্দার সুশ্রী রেলিংয়ের ভিতর দিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যে দৃশ্য সে দেখিল, তাহাতে সেই মুহূর্ত্তেই বুঝিয়া লইল যে, মালিকরা আর নিজের পথ পরিষ্কার করিতে পারে নাই, দরোয়ানদের সহিত হাতাহাতি হইতেই পুলিস আসিয়া পড়িয়াছে ও বমালসহ সকলেই ধরা পড়িয়াছে, এইবার তাহার পালা।

কিন্তু এ ভাবে পুলিসের হাতে ধরা দিবার ইচ্ছা তাহার মোটেই ছিল না, বরং এই অতর্কিত বিপদের মধ্যে সে মুক্তির পথ খুঁজিয়া লইতে ব্যস্ত হইল। উত্তেজনায় তাহার দুই চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সারা দেহ-মন ভরিয়া গেল। লেকসমুখের বারান্দা ঘুরিয়া সে পিছনের দিকে ছুটিল; দেখিল, সেই অংশে বৃক্ষবহুল উদ্যান, প্রকাণ্ড একটি কৃষ্ণচূড়ার শাখা ছাদের আলিসার উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। আলিসার উপরে উঠিয়া, শাখা অবলম্বন করিয়া, অনায়াসেই সে বাগানের ভিতর নামিয়া পড়িল। সেইখানেই সে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া লইল,—পরিধেয় গেরুয়া রঙের শাড়ীখানি খুলিয়া পাগড়ীর আকারে মাথায় বাঁধিল, বাগানের প্রাচীর অনুচ্চই ছিল, সুতরাং তাহা পার হইয়া আর একটি নির্জ্জন রাস্তায় পড়িতে তাহার কিছুমাত্র বিলম্ব হয় নাই।

অতি সন্তর্পণে এই অঞ্চল অতিক্রম করিয়া আপন মনে সে লেকের দিকে পদচালনা করিয়াছিল। যদিও সে মনে মনে বুঝিয়াছিল, পুলিস উপরের দরজা ভাঙ্গিয়া বাড়ীর গৃহিণীর নিকট যে তথ্য পাইবে, তাহাতে তাহারও অন্বেষণের জন্য তাহাদের চেষ্টার অবধি থাকিবে না, তথাপি সে বেশ স্বচ্ছন্দভাবেই ঘটনাস্থল হইতে লেকের মাঠে উপস্থিত হয়। তাহার মনে একটা দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল যে, সারা জীবনই ত সে কারাবাস করিয়াছে, এত দিনে সে পাইয়াছে মুক্তি, ভগবান্ তাহাকে পথ দেখাইয়াছেন, কাহার সাধ্য তাহাকে ধরে!

* * * *

অবশ্য, মুক্তিকে ধরা পুলিসের পক্ষে আর সম্ভবপর হয় নাই, কিন্তু যাহার নিকট সে অকপটে তাহার জীবনকথা ব্যক্ত করিয়াছিল, তাহার সঙ্গ ত্যাগ করাও এ ক্ষেত্রে তাহার পক্ষে ঘটিয়া উঠে নাই। অগত্যা নরনারায়ণ সেই রাত্রিতেই তাহাকে তাহার বাসায় আনিয়া তুলিল এবং এ বাড়ীর সহিত তাহার সম্বন্ধ ও সেই সম্পর্কে তাহার নিজের ও পারিপার্শ্বিক কাহিনীটুকুও সমস্তই তাহাকে শুনাইয়া দিল।

কোনও কথাই বাদ পড়িল না, কথার মধ্যে প্রশ্ন তুলিয়া মুক্তি তাহার এই নূতন আশ্রয়দাতাটির সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য সমস্তই জানিয়া লইল, এমন কি, শাড়ী-ব্লাউজ লইয়া শিল্পিপ্রবর লেকে কাহার প্রতীক্ষায় ছিলেন এবং কি উদ্দেশ্যে এত সাধ্যসাধনা—এ সব তথ্যও বাদ পড়িল না। প্রথম দর্শনেই মুক্তি নরনারায়ণকে বিশ্বাস করিয়াছিল, ক্রমশঃ এই সরল মুক্তপ্রাণ উদার মানুষটির আচরণ তাহার ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ বৈচিত্র্যময় চিত্তেও গভীর শ্রদ্ধার সঞ্চার করিয়া দিল।

যে রেশমী শাড়ী ও ব্লাউজ পরিয়া মুক্তি ফটো তুলাইয়াছিল এবং তাহার শাড়ীর নিম্নে যে পরিচ্ছদ ছিল, সে সব ছাড়িয়া পাড়ওয়ালা শাড়ী ও সেমিজ পরিয়া নরনারায়ণের নীচের ঘরে বসিয়া সে এতক্ষণ কথা কহিতেছিল। নরনারায়ণই আসিবার সময় মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় কয়েকখানি শাড়ী, সেমিজ, তোয়ালে প্রভৃতি কিনিয়া আনিয়াছিল।



বসুমতী চিত্র-বিভাগ]

ওঁ সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী

[শিল্পী—শ্রীঅম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তী

কিছুক্ষণ মনে মনে চিন্তা করিয়া মুক্তি কহিল,—আপনার কথায় বুঝতে পারছি, অন্তের অনুগ্রহের উপর নির্ভর ক'রে আপনি এখানে রয়েছেন; এর উপর আপনি আমাকে আশ্রয় দিতে চাইছেন কোন্ ভরসায় বলুন ত?

নরনারায়ণ অবিচলিতভাবেই উত্তর দিল,—মানুষের জীবনে কচিৎ কখনও এমন একটা ক্ষণ আসে, যে সময় কোনও ভাবনা-চিন্তার পরোয়া সে রাখে না, অন্তের চোখ-রাঙ্গানীর ভয়ে কর্ত্তব্যকে ঠেলতে পারে না।

মুক্তি কহিল,—আপনার অবস্থার পরিচয় পেয়ে আমিই বা কোন্ মুখে আপনার গলগ্রহ হই বলুন?

নরনারায়ণ চট করিয়া কথাটার উত্তর দিতে পারিল না, একটু ভাবিয়া কহিল,—কিন্তু উপস্থিত আপনার যে অবস্থা, এই বাসায় থাকা ভিন্ন অন্য উপায় ত দেখছি না।

—এখানে থাকবার একটা উপায় কিন্তু আছে।

—সেটি কি?

—ওপরে দুখানা খালি ঘর আছে বললেন না,—একখানায় আপনি ছবি আঁকেন, আর একখানা আছে খালি; ধরুন, আমি যেন সেখানা আজ থেকে ভাড়া নিচ্ছি।

উৎফুল্ল হইয়া নরনারায়ণ কহিল,—সত্যই বুদ্ধিতে আমি আপনার চেয়ে অনেক নীচু। এ কথাটা আমার মনেই ওঠেনি এতক্ষণ!

হাসিমুখে মুক্তি কহিল,—থাকবার উপায় যেন হ'ল, কিন্তু মাস মাস ভাড়া যোগাবার উপায়টাও—

বাধা দিয়া নরনারায়ণ কহিল,—সে চিন্তা পরে।—নিশায় পাইলে রক্ষা বধিব প্রভাতে!—

—এ কথা আপনাদের পক্ষেই খাটে, আমাদের কাছে কিন্তু প্রভাতের চিন্তাই আগে।

—তা হ'লে কি করতে চান?

—নিজের ভার নিজেই গ্রহণ করতে চাই, অবশ্য অভিভাবকস্বরূপ আপনি মাথার ওপর থাকবেন।

—নিজের ভার নিজেই গ্রহণ করবেন কি উপায়ে? পুনরায় কি শিকার-সন্ধানে অভিযান করবেন?

—তা হ'লে আপনাকে অভিভাবক করব কেন?—মুক্তি পেয়েছি আপনার সংস্পর্শে ও অনুগ্রহে, আবার বন্ধন পরব কোন্ দুঃখে?

—অভিপ্রায়টি স্পষ্ট করেই বলুন।

—শুনেছি, মেয়ে স্কুলে আজকাল লাঠি-খেলা, ছোরা-খেলা, আরও কত সব কসরৎ শেখান হয়,—বড়লোকের বাড়ীতেও মেয়েদের গান শেখাবার ফ্যাশান হয়েছে আজকাল। আমি দুটো কাযই বেশ চালাতে পারি,—ঐ রকম কায আমি যোগাড় ক'রে নিতে চাই।

—আচ্ছা, এ সম্বন্ধে কাল আলোচনা করা যাবে। এখন চলুন, আপনার ঘরখানা আপনাকে দেখিয়ে দিই, আপনি আগে ত সেখানে অধিষ্ঠিতা হোন!

যে ঘরে নরনারায়ণ তৈল-চিত্রাঙ্কনের জোড়জাড় পাতিয়াছিল, তাহার পার্শ্বের ঘরখানিতে মুক্তি আশ্রয় লইল। নরনারায়ণ নীচের ঘরেই বরাবর শয়ন করিত, তাহার বিছানার অর্দ্ধাংশ উপরে মুক্তির ঘরে নিজেই বহিয়া আনিল—মুক্তির প্রবল আপত্তি এ ক্ষেত্রে সে গ্রাহ্যও করিল না।

* * * *

পরদিন প্রাতে নরনারায়ণ প্রশ্ন তুলিল,—খাবার কি ব্যবস্থা করা যায়?—আমার ইচ্ছা, এ ব্যাপারটা একসঙ্গেই সম্পন্ন হয়,—অবশ্য, আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে।

মুক্তি কহিল,—সর্ব্বতোভাবেই আমি যখন আপনার আশ্রিতা, আমার তখন কোন আপত্তিই থাকতে পারে না।

—আপনার এ কথায় আমি অত্যন্ত ব্যথা পাচ্ছি; আপনি নিজেকে আশ্রিতা না মনে ক'রে আমার সম্মাননীয়া অতিথি মনে করলেই খুসী হই।

—আচ্ছা তাই, যে পর্য্যন্ত আমি নিজের ভার নেবার যোগ্যতা না পাই, নিজেকে অতিথিই মনে করব।

—ধন্যবাদ! আচ্ছা, আপনি কুকার ব্যবহার করতে জানেন?

—প্রয়োজন হ'লে যখন ছোরা-ছুরি ব্যবহার করতে জানি, ওটা আর কি এমন কঠিন কায! কিন্তু কুকারের কথা কেন?

—খাবারের ব্যবস্থা যদি করতে হয়, উনিই আমাদের অগতির গতি যে।

—আপনাদের মত আনাড়ীরা আমাদের এলাকায় অনধিকারপ্রবেশ করাতেই ঐ যন্ত্র-দানবটির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আমাদের কাছে ওর কোনও মূল্য বা মর্য্যাদা নেই।

—বলেন কি!

—যার দাঁত থাকে, সে পাণ থেঁতো ক'রে খায় না,

দাঁতে চিবিয়ে খায় ; বেঁচে থাক আমাদের হাত, হাতা-বেড়ী, হাঁড়ী আর উনুন,—আমরা কলের তোয়াক্কা রাখি না! একবার যদি বিগড়ুলো, লঙ্ঘনের ব্যবস্থা!

—আপনি রাঁধতেও জানেন নাকি ?

—মেয়ে হয়ে জন্মালেই যে এ বিদ্যাটি জানতে হয়! এতে আশ্চর্য্য হবার ত কিছুই নেই।

নরনারায়ণ অবাক্ হইয়া ভাবিল, সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে, সভ্যতার সহিত আবাল্যপরিচিতা মালতী মেয়েদের এই সহজাত বিদ্যাটির সম্বন্ধে কি ভাবে ঘৃণায় নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়াছিল, আর তাহারই সমবয়স্কা—আশৈশব পরান্নে প্রতিপালিতা, সমাজনিন্দিত হীনবৃত্তিপরায়ণা এই তেজস্বিনী মেয়েটির রন্ধনের স্বপক্ষে কি গভীর সহানুভূতি!

বসবাসের উপযোগী সমস্ত ব্যবস্থাই দোতলায় ছিল,—রান্নাঘর, বাথরুম, জলের কল, যাহা কিছু প্রয়োজনীয়। হাতে পয়সা থাকায় পূর্ব্বদিনই নরনারায়ণ এক সপ্তাহের মত জিনিষপত্র কিনিয়া ফেলিয়াছিল—প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় যাহা কিছু তাহার দুই চক্ষুর উপর পড়িয়াছিল!

সমস্ত গুছাইয়া লইয়া, মুক্তি নীচে নামিয়া গিয়া রুদ্ধ-দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নরনারায়ণের উদ্দেশে কহিল,—একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই।

নরনারায়ণ তখন তাহার ঘরের দরজাটি ভেজাইয়া দিয়া পূর্ব্বদিনের তোলা ফটোখানি ডেভেলপ করিতে ব্যস্ত ছিল ; মুক্তির কথা কর্ণগোচর হইতেই কহিল,—বলুন!

—রান্নার যোগাড় ত এতক্ষণ ধ'রে করলুম, কিন্তু আমার হাতের রান্না আপনি খাবেন কি না, সে কথা ত জিজ্ঞাসা করা হয় নি।

—আপনার উচিত ছিল, রান্নাবান্না শেষ ক'রে ভাত বেড়ে দিয়ে এ কথা জিজ্ঞাসা করা।

—তা হ'লে কি করতেন ?

—দেখতে পেতেন, কোনও প্রত্যুত্তর না দিয়েই গো-গ্রাসে সমস্ত নিঃশেষ ক'রে ফেলতুম। মুখের কথার চেয়ে হাতের কাযে মনোভাব ব্যক্ত করাই হচ্ছে আমার স্বভাব।

—ভাল, স্বভাবটি জানা রইল ; ভুল আর হবে না।

নরনারায়ণ তাহার হাতের কাযে গভীর মনোনিবেশ করিল ; সঙ্গে সঙ্গে উপরের রন্ধনশালাও গুলজার হইয়া উঠিল।

ডেভেলপের পর নেগেটিভে ছবির অবস্থা দেখিয়া নরনারায়ণের মন খুসীতে ভরিয়া গেল, নিজের মনেই সে কহিল,—বাঃ! চমৎকার হয়েছে।

পরবর্ত্তী কাযগুলি তাড়াতাড়ি শেষ করিবার জন্য আজ তাহার উৎসাহের অন্ত নাই। কায করিতে করিতে হঠাৎ মালতীর কথাটা তাহার মনে পড়িয়া গেল ; কাল ঠিক এই সময়টিতে আসিয়া সে যে সব কথা কহিয়াছিল—সেই সূত্রে নরনারায়ণ তাহার উপর নির্ভর করিয়া কতকটা অগ্রসর হইয়াছিল, মনে উঠিতেই তাহার সরল চিত্ত বিরূপ হইয়া উঠিল। আজ যদি মালতী আসে ? তাহা হইলে সে কি চুপ করিয়া থাকিবে ? না, কখনই নয় ; সে আজ সদর্পে তাহাকে জানাইয়া দিবে, সে কথা রক্ষা করে নাই বলিয়া, তাহার কায আটক থাকে নাই, বরং তাহার চেয়ে অনেক—সহসা নরনারায়ণ চমকিয়া উঠিল ; না, না, সে কি ভাবিতেছে! সত্যই মালতী যদি এখানে আসিয়া পড়ে, মুক্তিকে দেখে, তাহার পরিচয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করে,—তখন ? কি উত্তর সে দিবে ? চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে জ্বালা ধরিয়া গেল। ঠিক এই সময় বাহির হইতে মুক্তির তাড়া আসিল,—রান্নাবান্না সব তৈরী, শীগ্‌গীর নেয়ে নিন।

চিন্তার সূত্র তৎক্ষণাৎ ছিঁড়িয়া গেল, হাতের কাযগুলি গুছাইতে নরনারায়ণের ঔৎসুক্য দেখা গেল।

এনামেল, এলুমিনিয়ম ও পোরসিলিনের যে কয়খানি তৈজস-পত্র নরনারায়ণের ছিল, সে-গুলির সহায়তায় কি পরিপাটীরূপেই মুক্তি অন্ন-ব্যঞ্জন সাজাইয়া দিয়াছে! কোথা হইতে একখানি সতরঞ্চির আসনও সে সংগ্রহ করিয়া পাতিয়াছে, কাচের গ্লাসে পানীয় জল, এনামেলের থালায় পরিষ্কার ঝরঝরে অন্ন, আলুভাতে, ভাজা, ডিম ও বাটিতে ভরা ডাল ও দুই তিন প্রকার ব্যঞ্জন। এমন সযত্ন আয়োজন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা তাহার অদৃষ্টে বুঝি এই প্রথম।

অবাক হইয়া নরনারায়ণ কহিল,—এ সব করেছেন কি ?

মুক্তি মুখখানি অন্যদিকে ফিরাইয়া কহিল,—গৃহস্বামীর রুচি অনুসারে যথাকর্ত্তব্যই আমাকে করতে হয়েছে।

—খেতে ব'সে এতগুলো 'আইটেম' অনেক দিন চোখেও দেখিনি।

—কিন্তু সবে আনাজ-পত্রে যে 'আইটেম'গুলো পেয়েছি, তাতে ত কসুর কিছুই পাইনি।

মনে মনে নরনারায়ণ ভাবিল, ভাগ্যিস্ কাল বাজারগুলো

এনে ফেলেছিলুম। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ আহার চালাইয়াই সহসা সে কহিল,—এ কি রেঁধেছেন আপনি, একেবারে অমৃত যে। এমন রান্না আপনি কোথায় শিখলেন?

মুক্তি কহিল,—বৃন্দাবনের আশ্রমে স্বামীজীর রান্না আমাকে নিজের হাতে করতে হ'ত। প্রথম প্রথম বাঙ্গালা দেশের এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীই রাঁধতেন, রান্না শিখেছিলুম তাঁরই কাছে।

নিঃশব্দে আরও কিছুক্ষণ ভোজন-কার্য্য চলিল, তাহার পর পুনরায় প্রশ্ন হইল,—আচ্ছা, দোতলার ঘরখানা আপনি না হয় ভাড়াই নিয়েছেন, এতে সন্দেহের কোনও কথা নেই। কিন্তু এক হেঁসেলেই এবং একত্রই আমাদের রান্নাবান্না চলেছে—এটা যখন জানাজানি হবে? কি জবাব সে সময় দেওয়া যায় বলুন ত?

মুচকি হাসিয়া মুক্তি কহিল,—আপনার ভয় ত শুধু মালতীকে,—পাছে সে এসে জানতে চায়, আমি কে, কেন এসেছি, কি সম্বন্ধ আপনার সঙ্গে—এই ত?

হাতের গ্রাস মুখে না তুলিয়া নির্ব্বাক বিস্ময়ে নরনারায়ণ মুক্তির দিকে চাহিয়া রহিল। উত্তর না পাইয়া মুক্তিই সমস্যা ভঞ্জন করিয়া দিল,—উত্তর ত আপনার কাছেই রয়েছে, আর তা মিথ্যেও নয়। আপনি তাকে জানিয়ে দেবেন,—তোমার সৌজন্যেই একে পেয়েছি। তুমি ত সে দিন টাকা নিয়ে ডুব মারলে, আর ইনিই আমার মুখরক্ষা করলেন। গরীবের মেয়ে, কায খুঁজছিলেন, আমি এঁকে কাযে বাহাল করেছি।

নরনারায়ণের চক্ষু দুটি বিস্ফারিত হইয়া উঠিল; ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সে কহিল,—দেখুন, প্রতিবারই আপনি আমাকে পথ দেখাচ্ছেন। আপনি নিজেই কাল রাত্রে চাকরী করবার কথা পেড়েছিলেন। কিন্তু আপনার এই কথা থেকেই আমার মনে হচ্ছে, চাকরী করবার কোনও প্রয়োজন আপনার হবে না, যদি আপনি আমাকে সত্যি-সত্যই বিশ্বাস করতে পারেন, তা হ'লে আমি বলছি, বন্ধুভাবে আমরা দু'জনে মিলে যদি কায করি, আপনার সাহায্য পাই, আমাদের কোনও অভাব হবে না, নিজেরা আলাদা বাড়ী ভাড়া নিয়ে আমরা স্বচ্ছন্দে সচ্ছলভাবে থাকতে পারব।

—আমি আপনার কোন্ কাযে আসব?

—যে কাযটুকু কাল থেকে ক'রে দিয়েছেন—সত্য-সত্যই আমার মুখ রক্ষা করেছেন!

—ছবিখানা ভাল উৎরেছে নাকি?

—ফিনিস্ করি আগে, তখন নিজেই দেখবেন। এমন নিখুঁত ছবি আমার হাত দিয়ে বোধ হয় এই প্রথম বেরুবে। এখন আমার সাহস ক্রমেই বেড়ে চলেছে,—আপনি যদি প্রত্যহ কিছুক্ষণ সিটিং দেন, আমি অসাধ্য সাধন করতে পারি।

—বলেন কি! তা হ'লে মালতীর কাছে জবাবদিহির ভাবনা ত আপনার কেটেই গেল!

নরনারায়ণের কোমল কণ্ঠ কঠিন হইয়া বাজিল,—না, না—কিছুতেই না,—আপনার এ পরিচয় আমি কিছুতেই তাকে দেব না। আমার চক্ষুতে তার তুলনায় আপনি যেমন অনেক উঁচুতে, আপনার মর্য্যাদা তেমনই উঁচু করেই আমি আপনার পরিচয় দিতে চাই।

আয়ত উজ্জ্বল দুই চক্ষু তুলিয়া মুক্তি জিজ্ঞাসা করিল,—আমি যদি সেই পরিচয়টুকু জানতে চাই—সেটা কি দোষের হবে?

হঠাৎ এ কথার কি উত্তর দিবে, নরনারায়ণ ভাবিয়া পাইল না। মুক্তি বক্রদৃষ্টিতে তাহার অবস্থা বুঝিয়া হাসিয়া কহিল,—এখনও বুঝি ভেবে ঠিক করতে পারেন নি, আমার অমর্য্যাদা কল্পনা করেই একবারে জ্ব'লে উঠেছিলেন! ও সব কথা এখন থাক, এখন এ নিয়ে ব্যস্ত হবার কি দরকার? মালতী এসে যখন আপনার কাছে জানতে চাইবে, তাকে দেবেন আমার কাছে পাঠিয়ে; আমার সম্বন্ধে আপনি নিজে তাকে কোন কথা নাই বা কইলেন।

এতক্ষণে নরনারায়ণের চিন্তার বোঝা যেন হাল্কা হইয়া গেল, আশ্বস্ত হইয়া সে কহিল,—এই কথাই ভাল, যা বলবার আপনিই বলবেন, এখন থেকে আমি দরজায় খিল এঁটে কায করব।

মুক্তি কহিল,—তাই করবেন, কিন্তু উপস্থিত যে কাযে বসেছেন, শেষ ক'রে ফেলুন ত! পাতে কিছু ফেলে রাখা চলবে না, আর কি দেব বলুন!

* * * * *

ইহার পর সপ্তাহ অতীত হইয়াছে। কিন্তু যে উপদ্রবটি সহ্য করিবার জন্য তাহারা সর্ব্বদাই সচেতন ছিল, এ পর্য্যন্ত তাহার কোনও সাড়া পাওয়া যায় নাই। তবে, এই সপ্তাহের মধ্যে নরনারায়ণের হাতের অনেকগুলি কায সারা হইয়াছে,

উপরের ক্ষুদ্র গৃহস্থালীটি মুক্তির নিপুণ হস্তে বেশ গুছাইয়া উঠিয়াছে। যদিও সেই স্তরে উভয়ের ঘনিষ্ঠতা সঙ্কোচের আবরণমুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি কেহ কাহারও কথায় বা আচরণে শালীনতার অভাব দেখিয়া আতঙ্কিত হইবার অবকাশ পায় নাই।

মুক্তির মস্ত উদ্বেগ ও আতঙ্ক ছিল তাহার তিনটি সঙ্গিনীর শোচনীয় পরিণাম স্মরণ করিয়া। কিন্তু কয়েক দিন হইল, নরনারায়ণ দৈনিক বসুমতীতে প্রকাশিত ঐ ঘটনার বিবরণ তাহাকে পড়াইয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত করিয়াছে। সংবাদের শেষাংশ এইরূপ—"দিনদুপুরে এই ভাবে ডাকাতি, কলিকাতায় এই প্রথম! কিন্তু স্থানীয় সুদক্ষ ইন্‌সপেক্টর ভাদুড়ী সাহেবের সতর্কতামূলক চেষ্টায় অপরাধীরা হাতে-নাতে ধরা পড়ায় এই বিভীষিকার উপসংহার হইয়াছে। বালিগঞ্জের রায় বাহাদুরের বাড়ীর মেয়েদের মুখে প্রকাশ পায়, যে মেয়েটি পিস্তল দেখাইয়া তাঁহাদিগকে স্তব্ধ করিয়া দেয়, সে ধৃতা মেয়েদের মধ্যে নাই; বিপদ বুঝিয়াই সে দ্বিতলে উঠিবার দ্বার রুদ্ধ করিয়া ছাদ-সংলগ্ন বৃক্ষ-শাখা অবলম্বনে বাগানে অবতরণ করে ও প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া অন্তর্হিত হয়। পুলিস বাগানে তাহার পদচিহ্ন দেখিতে পায় ও বালিগঞ্জ অঞ্চলের চতুর্দ্দিকে তাহার অনুসন্ধানের ব্যবস্থা হয়। সাব ইন্‌সপেক্টর চৌধুরী কতিপয় পুলিসপ্রহরী-সহ বালিগঞ্জ ষ্টেশনের নিকট তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। মেয়েটি তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া রেল-লাইন ধরিয়া ছুটিতে থাকে। এই সময় বজবজ হইতে একখানা ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেণ আসিতেছিল। মেয়েটি নিষ্কৃতির আর কোনও উপায় না দেখিয়া সেই চলন্ত ট্রেণের এঞ্জিনের ঠিক সামনেই লাফাইয়া পড়ে। ট্রেণ থামাইবার পূর্ব্বেই সমস্ত গাড়ী তাহার উপর দিয়া চলিয়া যায় ও হতভাগিনীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। যদিও তাহার শতচ্ছিন্ন বিচূর্ণ দেহ সনাক্ত করিবার উপায় ছিল না, তথাপি সেই দেহাংশ ও কয়েকটুকরা গেরুয়া রঙ্গের কাপড় দেখিয়া ধৃত আসামীরা স্বীকার করিয়াছে যে, মেয়েটি তাহাদেরই দলভুক্তা। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, যে তিনটি যুবতী ধরা পড়িয়াছে, তাহারা প্রত্যেকেই সরকারী সাক্ষী হইয়া এই দল সম্বন্ধে এমন সব রোমাঞ্চকর তথ্য প্রকাশ করিয়াছে—যাহা উপন্যাসের ন্যায় কৌতূহলোদ্দীপক কর্তৃপক্ষ যুবতীদিগকে সরকারী সাক্ষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাদের বর্ণনা অনুসারে বিশেষভাবে তদন্তে অবহিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের বিশ্বাস, অচিরেই তাঁহারা সম্ভবতঃ এমন একটি দলের সন্ধান পাইবেন, যাহারা ব্যাপকভাবে যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের নানা স্থানে লুণ্ঠন ও দুর্নীতিমূলক অসংখ্য অপরাধ দীর্ঘকাল ধরিয়া সম্পাদন করিয়া আসিতেছে।"

এই অপ্রত্যাশিত সংবাদটুকু পাঠ করিয়া মুক্তির মুখখানি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল; কাগজখানি নরনারায়ণকে ফিরাইয়া দিয়া কহিল,—আচ্ছা, সরকারী সাক্ষী হ'লে তাদের মার্জ্জনা করা হয়, এ কথা কি সত্য?

নরনারায়ণ উত্তর দিল,—হাঁ, রাজার সাক্ষী হ'তে পারলে সাত খুন মাপ! অবশ্য, তাদের এজাহার যদি ঠিকঠাক মিলে যায়।

—তার মানে?

—যে সব কথা তারা বলবে, যাদের যাদের নাম করবে, সরকার থেকে তদন্ত ক'রে যদি সে সব সত্য ব'লে সাব্যস্ত হয়।

—নিশ্চয়ই সাব্যস্ত হবে, ওরা তিন জনে দলের সব ব্যাপার জানে, ওদের কথা বেঠিক হবে না।

—তা হ'লে ওদের জেল খাটতে হবে না, মুক্তি ওরা পাবেই।

—মুক্তি পাবে! আঃ! ওদের জন্য এ ক'দিন কত বড় দুশ্চিন্তা যে মনের ভেতর পুষছি, কি বলব! আজ যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হলুম।

—শুধু তাই নয়, নিজের দিক দিয়েও আপনি একবারে নিশ্চিন্ত, যাকে বলে—বেকসুর খালাস!

—কেন বলুন ত?

—ওদের মুক্তির আনন্দে নিজের মুক্তির কথা ভাবতে ভুলে গিয়েছেন! গেরুয়া কাপড় পরা আর একটি মেয়ে হঠাৎ এঞ্জিনের সামনে লাফিয়ে পড়ে—

—মনে পড়েছে; কোন্ হতভাগী আত্মঘাতিনী হয়ে আমার তদন্ত থেকে পুলিসকে রেহাই দিয়ে আমাকেও নিষ্কৃতি দিয়েছে,—এই ত আপনার কথা? কিন্তু ওদের মুক্তির কথা ভেবে নিজের কথাটা হারিয়ে ফেলেছিলুম।

—আমি কিন্তু মধ্যে মধ্যে লক্ষ্য করতুম, একটা দুশ্চিন্তাকে আপনি দাবিয়ে রাখতে চান, অথচ এমন কঠিন

আপনার ধৈর্য্য, বাইরে সেটাকে প্রকাশ করতে একবারে নারাজ !

—আপনি কল্পনা করতেও পারবেন না, কি রকম ভয়াবহ আবেষ্টনের ভিতর দিয়ে আমার জীবনের এতগুলো দিন কেটে গেছে ! এ কদিনই আপনার সংস্পর্শে আমি যেন একটা নতুন জন্ম গ্রহণ করেছি। আগেকার কথা মনে হ'লে দেহ-মন বিষিয়ে ওঠে, সে সময় আপনার সামনে দাঁড়িয়ে কথা কইতে নিজেকে এত ছোট মনে হয় যে, আমি যেন মাটীর সঙ্গে মিশে যাই।

—সময় সময় আমি যে আপনার এ ভাবটুকু লক্ষ্য না করেছি, তা নয় ; কিন্তু নিজেকে সহসা ছোট মনে ক'রে ও রকম সঙ্কোচ আনা ত ঠিক নয়।

—ঠিক নয় ! আপনি খুব মহৎ, আপনার মনে কোনও দাগ নেই, তাই আপনি এ কথা বলছেন, আমাকে আপনারই সারে তুলে নিয়েছেন ! কিন্তু, আমি কি ভাবুন ত ! কি আমার পরিচয়, সমাজের কোন্ অংশে আমার স্থান ! বংশ জানি না, পিতা-মাতার স্থিরতা নাই, যে সংসর্গের মধ্যে থেকে শিক্ষা-দীক্ষা যেটুকু পেয়েছি, তার কি মূল্য আছে বলুন ? তার পর এত দিন ধ'রে যে সব অপরাধ করেছি, সেগুলো যে শুধু নিজের নারীমর্য্যাদাকে রক্ষা করবার জন্য—এমন অসম্ভব কথা এক-গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আপনি এমনই আশ্চর্য্য মানুষ যে, এ পর্য্যন্ত আমার কোন কথাই অবিশ্বাস করেন নি, সবই সত্য ব'লে মেনে নিয়েছেন ; আমার পেছনে পুলিস ছুটেছে জেনেও বিনা দ্বিধায় আশ্রয় দিয়েছেন ; আমি জানি, সভ্য সমাজের আঁস্তাকুড় পার হয়ে দাঁড়াবার কোন যোগ্যতা আমার নেই, অথচ আপনি সদ্বংশজাত, নামকরা শিল্পী হয়েও কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে আমার হাতের রান্না পর্য্যন্ত—

মুক্তির স্বর এখানে আর্দ্র হইয়া সহসা থামিয়া গেল। এ পর্য্যন্ত কোন দিন সে নরনারায়ণের সম্মুখে এভাবে তাহার চিররুদ্ধ হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটিত করে নাই। নরনারায়ণ তাহার এই উচ্ছ্বাসে শুধু যে চমকিত ও চমৎকৃত হইল, তাহা নয়, সঙ্গে সঙ্গে অনেকখানি লজ্জাও তাহার তরুণ মুখখানিকে আরক্ত করিয়া তুলিল। সকল সঙ্কোচ কাটাইয়া সে কহিল, —আমাকে আপনি অনর্থক বাড়িয়ে লজ্জা দিচ্ছেন, এতে আমার কোনও মহত্বই নেই ; আপনার পিতা-মাতা বা বংশের সহিত পরিচয় নেই, এই জন্য আপনার যথেষ্ট কুণ্ঠা ; কিন্তু পিতা-মাতা আপনার অবশ্যই ছিলেন, হয় ত বা এখনও আছেন, এমন হওয়াও আশ্চর্য্য নয়, এক দিন হয় ত এ অভিযোগ আপনাকে তুলে নিতে হবে। আমার কথা যদি ধরেন, আমি অস্বীকার করতে পারি না, আমার বংশ ছিল, এখনও আছে, পিতা ছিলেন, মাতা ছিলেন, আত্মীয়ও অনেক ছিলেন, কিন্তু সংসারক্ষেত্রে চলার পথে আমিও আজ আপনারই মত একা, পেছনে চাইতে কেউ নেই, সহানুভূতি দেখাতে কেউ দেখা দেন না,—সভ্য সমাজের উচ্চস্তরে আমার মত নির্ধনও আজ আপনারই মত অপাংক্তেয় ! যার কেউ নেই, যে সর্ব্বহারা,—তার ভয়-ভাবনা কি বলুন ! কথায় বলে,—ন্যাঙটার নেই বাটপাড়ের ভয় !—কাযেই আপনার হাতে ভাত খেয়ে আমি উঁচু রকমের কোন বীরত্বই প্রকাশ করিনি, আর যদি এর জন্য জাত আমার যায়,—তার জন্য কোনও পরোয়াই নেই।

শাড়ীর আঁচলখানি তখন গলায় দিয়া মুক্তি কহিল,—আজ আপনার সত্যকার পরিচয় পেলাম, দেবতা ! তাই আমি আজ এই প্রথম হেঁট হয়ে গড় করছি আপনাকে, পায়ের ধূলো দিন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্যে হাস্যরস

৬

বৈদেশিক সাহিত্যের কথা বলিতে গেলে, বোধ হয় ইংরাজী ভাষার পরেই ফরাসী ভাষা উল্লেখযোগ্য। ১৬শ শতাব্দীতে ইংরাজী সাহিত্যের **Renaisance period**এর উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তাহাতেও হাস্যরসের ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত বিকাশ আমরা দেখিতে পাইয়াছি। ১৩শ শতাব্দীর পূর্ব্বে ফরাসী সাহিত্যে হাস্যরসের পরিচয় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। তাহার পরবর্ত্তী সময়ে ঐতিহাসিক হিসাবে যাহা পাওয়া যায়, তাহা ভ্রাম্যমাণ গায়কদলের রচিত ও প্রচলিত গান এবং সঙ্গীতের মধ্যে বেশী সীমাবদ্ধ ছিল। **Rutehoeuf** নামক এক জন কবি ১৩শ শতাব্দীতে তাঁহার হাসির গানের জন্য কিছু প্রসিদ্ধি লাভ করেন। গানের মধ্যে অনেক অবান্তর কথা সন্নিবিষ্ট ছিল বটে, তবু আখ্যানবস্তুতে এক রকম বিশেষ শ্লেষ ও বিদ্রূপ (satire) ছিল—যাহা আধুনিক সময়েও উল্লেখযোগ্য ও উপভোগ্য মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ একটি গানের আখ্যান-গল্প নিম্নে সংক্ষেপে দেওয়া হইল।

"এক জন ধর্ম্মযাজক পুরোহিত বিশেষ লোভী ছিলেন। তিনি ধর্ম্ম উপদেশ দানে বিশেষ দক্ষ ছিলেন; কিন্তু কিসে তাঁহার দু'পয়সা বেশী হয়, কাপড়-চোপড় পোষাক-পরিচ্ছদ আসবাব ধন-দৌলত বেশী হয়, তাহাই লক্ষ্য ছিল। তাঁহার গৃহ এই সব জিনিষে পরিপূর্ণ ছিল—তবু তাঁহার আশা মিটিত না। তাঁহার একটি প্রিয় গাধা ছিল। সে তাঁহার জন্য প্রত্যহ ভার বহন করিতে যথেষ্ট পরিশ্রম করিত। বৃদ্ধবয়স পাইয়া সে গাধাটি এক দিন হঠাৎ মরিয়া যায়। ধর্ম্মযাজক তাহার জন্য অনেক শোক প্রকাশ করেন এবং গির্জ্জার সন্নিহিত কবরখানাতে তাহাকে গোরস্থ করেন।

উপরি-উক্ত গির্জ্জার ধর্ম্মযাজক অন্য এক জন বিশপের অধীনে কায করিতেন। বিশপ খুব খরচপত্র করিতেন, সব সময় বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ মজলিস করিতেন এবং প্রায়ই দেনাগ্রস্ত হইয়া পড়িতেন। এক দিন বন্ধুদের কাছে পুরোহিতদের ধনদৌলতের কথা আলোচনা হইতে থাকে। তাহাতে এক জন বন্ধু বিশপকে বলে যে, উপরি-উক্ত গির্জ্জার পুরোহিত তাহার সরকারী কবরখানাতে গাধাকে গোর দিয়া বিশেষ অধার্ম্মিক কায করিয়াছে। তাহার অবস্থা খুবই ভাল। যদি তাহাকে শাস্তি দেওয়া হয়, তবে তাহার জরিমানা ও বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি পাইলে বিশপ তাঁহার দেনা শোধ করিতে পারেন। বিশপ এই উত্তম যুক্তি পাইয়া সেই ধর্ম্মযাজককে তলব করেন এবং তাহার কৈফিয়ৎ চান।

ধর্ম্মযাজক উপস্থিত হইলে বলেন, "তুমি এমন একটা বিশেষ গর্হিত ও খারাপ কায করিয়াছ—যাহার জন্য তোমাকে বিশেষ শাস্তি পাইতে হইবে। তুমি কি বলিতে চাও, ভাল খৃষ্টান্ ও গাধা দুজনে মহাপবিত্র স্থানে একত্র বসবাস করিবে?" ধর্ম্মযাজক জানে যে, জীবনে তাহার এক জন প্রধান সহায় ও বন্ধু আছে, (তাহার টাকার থলী) সে তাহাকে সব বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছে ও করিবে। সে বলিল, "আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ হইয়াছে, তাহা শুনিলাম, উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য আমি কিছু সময় চাই।" কিছু দিন পর ধর্ম্মযাজক তাহার কোমরে ঝকমকে টাকার থলী লইয়া উপস্থিত হইল ও বিশপকে বলিল, "হুজুর, আমার অপরাধ আমি স্বীকার করি, তবে যাহা জবাব দেওয়ার আছে, তাহা শুধু আপনারই কাছে গোপনে আমি বলিব।" বিশপ তাহাকে অন্যঘরে লইয়া গেলে, ধর্ম্মযাজক গোপনে তাহাকে বলিল, "আমার প্রিয় গাধাটি ২০ বৎসর বিশ্বস্তভাবে আমার কায করিয়াছে। বৎসরে তাহার ২০৲ কুড়ি টাকা করিয়া মাহিয়ানা ছিল, সে তাহা জমাইয়া মরার পূর্ব্বে আমাকে ৪০০৲ চারি শত টাকা দিয়া যায় ও বলে যে, আপনার দ্বারা আমি যেন এই অর্থে তাহার পারলৌকিক ক্রিয়া করি—যাহাতে সে যেন স্বচ্ছন্দে স্বর্গে যাইতে পারে। আমি আপনার কাছে সে অর্থ লইয়া আসিয়াছি, তাহার আত্মার কল্যাণের জন্য আপনি যাহা বিহিত হয় করুন।" বিশপ বলিলেন, "এ অতি সাধু প্রস্তাব, তোমার ইহাতে কোন দোষ নাই, তোমাকে বেকসুর খালাস দিলাম। আমি এখনই গাধার আত্মার সদ্‌গতি করিতেছি।"

গল্পের শেষ অংশ এখন সকলেই অনুমান করিতে পারিবেন। ইহার মধ্যে যে শ্লেষ-বিদ্রূপ আছে, তাহা তদানীন্তন ধর্ম্মসমাজ লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। এখন অবশ্য সে সমাজে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

Olivier Basselin নামক এক জন "ধোবা" (রজক) কবি ১৫শ শতাব্দীতে বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার ছদ্মনাম ছিল **Le Pere Joyeux du Vaudeville**। তিনি নানারকম হাসির গান তৈয়ারী করেন এবং তাঁহার এই ছদ্ম নাম হইতে আধুনিক সময়ে **Vaudeville** নামক হাস্যরসবহুল **variety** আমোদপ্রমোদবিশিষ্ট থিয়েটারের নাম পরিচিত হইয়াছে। অনেকে বলেন, রজক কবির জন্মস্থান ছিল **Vire** নামক উপনগর এবং তাহার চতুর্দ্দিকে পাহাড়ের উপত্যকা (**valley**) ছিল। তাহাকে **Vaux de Vire** হইতে **Vaudeville** কথার সৃষ্টি হইয়াছে। (**Chamber's Dictionery** দ্রষ্টব্য)। তাঁহার রচিত দুইটি গান বহুদিন পর্য্যন্ত বিশেষ সমাদৃত হইত। একটির নাম "**To my nose**" অর্থাৎ মদ খাইয়া নাক যখন লাল হইয়া ওঠে, সেরূপ নাকের প্রতি অভিনন্দন, আর একটির নাম "**Apology for cider**" অর্থাৎ আপেল ফল হইতে প্রস্তুত মদ **cider** অনবরত খাইতেছি অথচ পিপাসা-নিবৃত্তি হইতেছে না এবং নেশাও জমিতেছে না, সে মদের উদ্দেশ্যে লেখা। (ফরাসী ভাষাতে যেটুকু কথার লালিত্য ও ভাষার ও শব্দার্থের হাস্যরসপ্রধান উচ্ছ্বাস আছে, তাহা বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া বলা যায় না)। এখানে বলা আবশ্যক যে, **cider** নামক মদ ফরাসীদেশে ও হল্যাণ্ড **Belgium**এ একটা সাধারণ পানীয়, জলের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় (পানভোজনের

সময়)। Basselinএর এরূপ পদ্য ও গান লিখিতে আরম্ভ করেন আধুনিক সময়েও ইংরাজী ভাষায় Rudyard Kiplingএর ও Swinhuoর অনেকগুলি পদ্য এই রকমের (To my Dhobi, To my Pyjama ইত্যাদি)

France's Villon নামক এক জন কবি ছোট ছোট গাথা অথবা গল্প-সমন্বিত গান প্রস্তুত করার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ঐতিহাসিক মৃত সুন্দরীদের জন্য আক্ষেপ ও সমসাময়িক সমাজে বিভিন্ন দেশের সুন্দরীদের বর্ণনা তখন তাঁহার গানে বিশেষ "মুখ-রোচক" হইয়াছিল। ১৬শ শতাব্দীতে আর এক জন কবি Clunent Marot এরূপ আদিরসাশ্রিত হাস্যরসপূর্ণ পদ্য লেখার জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। "কিশোরীর হাসি" সম্বন্ধে তিনি যে পদ্য লিখিয়াছেন, তাহার রসমাধুর্য্য অনেককে এখনও মুগ্ধ করিবে। এই সময়ের ফরাসী সাহিত্যের ধারা এরূপ আদিরসপূর্ণ ছিল বলিয়া মনে হয় এবং সমসাময়িক কালে Boccaccioর Decameronএর অনুরূপ Heptameron নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। শুনিতে পাওয়া যায়, রাণী Margaret of Navarre এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহার গল্পগুলি সংক্ষেপে এখানে উদ্ধৃত করা অসম্ভব।

Francois Rabelais নামক ধর্ম্মযাজক, ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিক তদানীন্তন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় রীতিনীতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া (Satire) Gargantua and Pantagruel নামক রস-পূর্ণ কাহিনী প্রকাশ করেন। তাঁহার স্বাধীন মত প্রকাশ, হাস্যকর কল্পনা ও সত্য অথচ আপাততঃ অসম্ভব ঘটনা বর্ণনা, সাহিত্যে এক নূতন যুগ সৃষ্টি করে। আধুনিক সময়ে তাঁহার লেখা অনেকগুলি জিনিষ বিশেষ নিকৃষ্ট ও "বাজে" বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু সাহিত্যিক সমালোচকগণ বলিয়া থাকেন যে, Rabelaisএর রচিত পন্থার অনুসরণ করিয়া Swift, Sterne, Jean Paul প্রভৃতি লেখকগণ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং ইংরাজী সাহিত্যে Rabelaisএর প্রভাব বিশেষ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার লিখিত "বর্ষফল-গণনা" এখনও অনেক লেখক অনুকরণ করিয়া থাকেন। নিম্নে তাহার একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইল।

"আগামী বৎসরে ৩৬৫ দিন থাকিবে—২।৪ ঘণ্টা বাড়তি কমতি হইলেও হইতে পারে, আমরা তাহা বুঝিতে পারিব না। এতগুলি চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণ হইবে যে, আমাদের পকেটগুলিতে "গ্রহণ" করার কিছু থাকিবে না, "সম্পূর্ণ" "খালি" হইলেও হইতে পারে ও আমাদের চিন্তার স্রোত লোকশান করিবে। শনি (শত্রু) পশ্চাদ্গামী হইবেন, শুক্র (Venus দ্ব্যর্থবোধক) সম্মুখে অগ্রসর হইবেন এবং বুধ (Mercury) অবোধ্য হইবেন। অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহগণ আপনাদের ইচ্ছামত চলিতে নারাজ হইবেন। তাহার ফল এই হইবে যে, কাঁকড়া মাছ ও বাদুড় সোজা চলিতে পারিবে না। যাহারা দড়ি তৈয়ারী করে, তাহারা পিছু হাঁটিবে। গ্রহ-নক্ষত্রের সমাবেশে এইবার পৃথিবীতে এমন একটা ব্যাধি দেখা দিবে যে, তাহা ভীষণ ভয়াবহ প্রাণান্তকর, ছোঁয়াচে ও সংক্রামক এবং হঠাৎ মানুষকে ম্রিয়মাণ ও উৎক্ষিপ্ত করিবে এবং তাহার জন্য অনেকে পাগল হইয়া উঠিবে; তাহারা বুঝিতে পারিবে না, কিসে দুপয়সা বেশী রোজগার করিতে পারা যায়, কিসে দেনার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় এবং উদর-সংস্থানের আয়োজন করা যায়। অর্দ্ধেক পৃথিবী বাকি অর্দ্ধেককে তাড়া করিবে ও বিপর্য্যস্ত করিতে চেষ্টা করিবে। এই বৎসর যতগুলি শূকর আছে, তাহা অপেক্ষা বেশী মাংস পাওয়া যাইবে না। ভগবান্ যদি আমাদের সহায় না হন, তবে আমাদের হাত ও মনের অবস্থা কি হইবে, তাহা মনে করিতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।"

Rabelaisএর লিখিত বর্ণনার মধ্যে তাহার একটি বিশেষত্ব ছিল যে, একই অবস্থা অথবা কৃত কার্য্যকে একত্র বিভিন্ন কথায় প্রকাশ করিতেন। Macedonএর রাজা Philip যখন Corinth নগর আক্রমণ করেন, তখন নগরবাসী প্রত্যেকেই যুদ্ধের আয়োজন ও সরঞ্জামের জন্য বিশেষ ব্যস্ত ও উৎসুক হইয়া উঠিল। Diogenes দেখিলেন, এই মহা ব্যস্ততার মধ্যে তিনি একা নিষ্কর্ম্মা হইয়া আছেন। অনেক চিন্তা করিয়া ও নিরাশক্ত অবস্থায় রাত্রি কাটাইয়া তিনি স্থির করিলেন এবং একটি প্রকাণ্ড জলাধার টব মাথায় করিয়া পাহাড়ের উপরে গেলেন। সেখানে যাইয়া সমস্ত দিন ধরিয়া সে টবকে আছড়াইলেন, ভাঙ্গিলেন, হাতুড়ী-পেটা করিলেন, ফেলিয়া দিলেন, কুড়াইয়া আনিলেন, সরাইয়া রাখিলেন, পুনরায় তাহাকে লইয়া আছড়াইলেন, ভাঙ্গিলেন ও অশেষ কর্ম্ম-ব্যস্ততা দেখাইলেন। এই অবস্থা বর্ণনা করিতে Rabelais লিখিতেছেন—

"In a great vehemence of spirit, he (Diogenes) did he turn it (Tub), veer it, wheel it, frisk it, jumble it, shuffle it, hurdle it, bundle it, tumble it, hurry it, bury it, jolt it, jostle it, cover it, evert it, invert it, subvert it, overturn it, beat it, thwack it, bump it, batter it, knock it, thrust it, push it, jerk it, shake it, toss it, throw it, overthrow it upside down, top syturvy, tread it, trample it, tap it, ring it, rinse it, tingle it, reserved it, stop it and unstapple it. And then in a mighty bustle he bandied it, shubbered it, packed it, hurled it, rolled it, swinged it, brangled it, totterd it, etc. etc. etc.

অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এত কায করিতেছেন দেখাইলেন—যাহা ভাষার বাগাড়ম্বরীতেই প্রকাশ করা হইয়াছে। এক জন বন্ধু আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পাগলের মত সে এ কি কায করিতেছে? তাহার উত্তরে Diogenes বলিলেন,"গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কোন কায দেয় নাই। পাছে কেহ বলে, তিনি অতি বাজে নগণ্য কর্ম্মবিমুখ অলস লোক, তাই তিনি তাঁহার টবের উপর আক্রমণ করিয়া দেখাইতেছেন—তিনি কতখানি কর্ম্মঠ ও উদ্যোগী পুরুষ। তিনি সকলকে দেখাইতে চান সকলের মত—

'ভয় মোর নাই বটে, ভাবনা আছে কিন্তু'।"

বাস্তব জীবনে এরূপ কর্ম্মব্যস্ত লোকের দৃষ্টান্ত প্রায় পাওয়া যায় এবং সার্কাসে clown যেরূপ কাযে ব্যস্ততা দেখায়, তাহা দেখিয়া অনেকেই হাসিয়া থাকি। Rabelaisএর উল্লিখিত পদ্ধতি এখনও অনেকে জ্ঞান অথবা অজ্ঞানতা বশতঃ অনুকরণ করিয়া থাকেন। ব্যাধিকল্পনা অথবা কপট ব্যাধির অভিনয় করিতে করিতে কিরূপে শেষে ব্যাধি প্রকৃতই দেখা দেয়, সে সম্বন্ধে Rabelais কয়েকটি কাহিনী লেখেন। মানব-চরিত্রে এই দুর্ব্বলতা

(বাস্তব অথবা রূপক ভাবে বলিতে গেলে) তিনি বোধ হয় প্রথম বর্ণনা করেন—তাহা দার্শনিক তত্ত্ববহুল হইলেও তাহার বর্ণনাতেও রসের ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায়।

ইংলণ্ডের মত ফরাসী দেশেও ১৬শ শতাব্দীতে হাসি-ঠাট্টার পুস্তকাদি প্রণয়ন করা হইত (Jest Books)। বঙ্গদেশে এরূপ সঙ্কলন করার প্রথা তখন বিশেষ কিছু ছিল না। বিভিন্ন লেখকদের গ্রন্থাবলীতে (অধিকাংশ সংস্কৃত ও পারসী ভাষায়) তাহা ছড়ান থাকিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুটকী গল্প ফরাসী দেশে যে সব প্রচলিত ছিল, তাহার কয়েককটি দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া হইল।

"এক জন বড় লোক ঔষধপত্র-চিকিৎসাতে বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার অসুখ হওয়াতে তাঁহার বন্ধুরা এক জন চিকিৎসক ডাকিয়া আনে। চিকিৎসক আসিয়াছে শুনিয়া তিনি বলিয়া উঠেন, 'তাঁহাকে অন্য সময় আসিতে বলিও, এখন আমি অসুস্থ, দেখা করিতে পারিব না' (বলা বাহুল্য, তিনি পাওনাদার ও অনেক লোককে উপরি উক্ত কথা বলিতেই অভ্যস্ত ছিলেন)

এক জন বড়লোক তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে যথেষ্ট আবর্জ্জনা জড় হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার চাকরদিগকে ভর্ৎসনা করেন। চাকর বলে, "গাড়ী পাওয়া যায় না, কোথায় সরাইব ?" বড়লোক বলেন, "আরে গাধারা, গর্ত্ত ক'রে পুঁতে ফেলিলেও ত চলিত।" চাকর বলে, "হুজুর, গর্ত্তের মাটী কোথায় সরাইব ?" বড়লোক রাগিয়া বলেন, "তোরা সব হতভাগা, পাজী, বেকুব। এত বড় গর্ত্ত করিবি যে, আবর্জ্জনা ও মাটী একত্রই ভরা যায়।"

Rabelais যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন তাঁহার পায়ে তেল মালিশ করা হইতেছিল। এক জন বন্ধু বলেন, "পরলোকের যাত্রায় প্রস্তুত হও।" তিনি বলিয়া উঠেন, "হাঁ, দেখছ না, আমি ত প্রস্তুত হচ্ছি, হাঁটিতে পারিব বলেই ত তাহারা পায়ে তেল মালিশ কর্চ্ছে।"

১৭শ শতাব্দীর লেখকগণের মধ্যে প্রথমে Cyrano de Bergeracএর নাম আমরা পাই। তাঁহার লিখিত "সূর্য্য ও চন্দ্রের" জীবনকাহিনী ইংরাজী সাহিত্যের Gulliver's Travelsএর মত বোধ হয়। তাঁহার লিখিত বাঁধা কফির আত্মা সম্বন্ধে যে বর্ণনা আছে, তাহা দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা সম্বন্ধে একটি Satire বলা যায়। তাহাতে তর্কের বিষয় এই—ভগবান্ মানুষ ও বাঁধা কফিকে সৃষ্টি করিয়াছেন, ভগবানের চেহারা মানুষের মত নয়, কারণ, বাঁধা কফির মত যে নয়, তাহার প্রমাণ নাই। মানুষের প্রাণে অনুভবশক্তি আছে—বাঁধাকফির কি তাহা নাই ? মানুষকে আঘাত করিলে ও কাটিলে সে যন্ত্রণা পায়, বাঁধা কফিকে কাটিলে ও আঘাত করিলে কি সে তাহা পায় না ?…

Cyranoর পরে Antonie Gerardএর নাম উল্লেখ পাই। তাঁহার লিখিত কবিতা অধিকাংশই হাস্যরসমধুর ছিল। তাঁহার বিশেষত্ব এখন তেমন মনোরম বোধ হয় না। ১৭শ শতাব্দীতে ফরাসী লেখকদের মধ্যে একমাত্র Moleireকে "হাস্যরসার্ণব" বলা যায়। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল—Jean Baptiste Poquelin। তিনি প্রায় ৪০ খানা প্রহসন-নাট্য লিখিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থাবলী অনেক ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে। বঙ্গভাষাতেও কয়েকটি প্রহসন-নাট্য তাঁহার লেখার অনুকরণ করিয়া লেখা হইয়াছে ও নাট্যমঞ্চে তাহা সমাদৃত হইয়াছে। তাঁহার লিখিত "স্বামিস্ত্রীর দ্বন্দ্ব" "জোর করিয়া বিবাহ দেওয়া" ইত্যাদি উপাখ্যান অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন—পড়িয়াও না হাসিয়া থাকা যায় না। এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখান অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ সামান্য কয়েকটি ছোট অংশ তাঁহার নাট্যাবলী হইতে উদ্ধৃত করা হইল।

দুইটি শিক্ষিতা সম্ভ্রান্ত "কবিনী" আলাপ করিতেছেন (বঙ্গভাষায় যথাসম্ভব রসমাধুর্য্য রক্ষা করার চেষ্টা করা হইল, তবু তাহা অসম্পূর্ণ মনে হইবে)

প্রথমা—তুমি যে পদ্য লেখ, তাহা এত মধুর ও সুন্দর যে, উপমা দেওয়া যায় না।

দ্বিতীয়া কিন্তু তোমার পদ্যে অমৃতময়ী দেবতা (muses) ও তাঁহার সুন্দরী সহচরীগণ রাজত্ব করেন।

প্রথমা—তোমার কথাগুলির বাঁধুনি কেমন চমৎকার এবং কবিতার ঝঙ্কার অতি মনোরম।

দ্বিতীয়া—তোমার পদ্যে যে মধুর ও করুণ রস থাকে, তাহা অতি মনোরম ও উপাদেয়।

প্রথমা—যদি দেশের লোক তোমার কবিতা বুঝিত, তবে আজ তুমি অট্টালিকায় বাস করিতে ও সোণার গাড়ীতে চড়িয়া বেড়াইতে।

দ্বিতীয়া দেশের লোক যদি তোমার যথার্থ মর্য্যাদা জানিত, তবে এত দিনে তোমার মর্ম্মরপ্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপনা করিত ও তোমার নামে "জয়ন্তীর" আয়োজন হইত।

প্রথমা—রাণী Uranaর জন্ম সম্বন্ধে যে একটা নূতন চতুর্দ্দশপদী কবিতা বেরিয়েছে, সেটা পড়েছ ?

দ্বিতীয়া—হাঁ, আর এক জন পড়ছিল, তাই শুনেছি।

প্রথমা—কে লিখেছে জান ?

দ্বিতীয়া—না, জানি না। তবে সত্যকথা বলিতে কি, এমন জঘন্য নিকৃষ্ট কবিতা আর দুটি পাই নাই।

প্রথমা—তুমি তাহা মনে করিতে পার, কিন্তু অনেকে তাহার প্রশংসা করেন।

দ্বিতীয়া—তা হ'লেই যে কবিতা নিকৃষ্ট হ'তে পারে না, তাহা নহে। তুমি যদি পড়, তুমিও তাই মনে করিবে।

প্রথমা—আমার সঙ্গে তোমার মত মিলিবে না। এমন সুন্দর কবিতা আর কেহ কোন দিন লিখে নাই।

দ্বিতীয়া—ভগবান্ রক্ষা করুন, আমার হাতে যেন এমন কবিতা না বেরোয়।

প্রথমা—আমার বিশ্বাস, এমন সুন্দর কবিতা আর হয় না কেন না, আমিই সেটা লিখেছি।

দ্বিতীয়া—তুমি ?

প্রথমা—হাঁ, আমি।

দ্বিতীয়া—আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, তুমি কেমন ক'রে এই কবিতা লিখলে ?

প্রথমা—আমার দুর্ভাগ্য যে, তোমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারি নাই।

দ্বিতীয়া—বোধ হয়, শুনিতে শুনিতে আমি অন্যমনস্ক ছিলাম নয় যে পড়িতেছিল, সে ভাল পড়িতে পারে নাই। আচ্ছা যাক্ সে কথা বাদ দেও—আমার সেই গানটা তোমার কেমন লেগেছে ?

প্রথমা—তোমার গান যেন নীরস—এ সময়ে তাহা আর চলে না—মনে হয়, যেন পুরাকালের বাক্সে কোন মৃত কবির লেখা।

দ্বিতীয়া—কিন্তু অনেকেই তাহা এখন প্রশংসা করেন।

প্রথমা—তার জন্য সেটাকে ভাল বলা যায় না।

দ্বিতীয়া—শিক্ষিত সমাজে তাহার প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা ও আদর পেয়েছে।

প্রথমা—আমার অন্য মত হইতে তাহাতে বাধা নাই।

দ্বিতীয়া—তাই ত দেখছি তোমার মনে ভাল লাগে নাই।

প্রথমা—তুমি বোকার মত নিজের মতামত অন্যের ঘাড়ে চাপিয়েছ।

দ্বিতীয়া—তুমিই নিজের অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য দিয়ে আমাকে বিচার কর্চ্ছো।

প্রথমা—ভারী ত লেখক, কলমপেশা কেরাণী কোথাকার।

দ্বিতীয়া—ঢের হয়েছে, তোমার মত লেখক সাহিত্য-সমাজের কলঙ্ক।

প্রথমা—কি বল্‌ছিস্, চুরি ক'রে নকল ক'রে বই লেখেন, আবার আমায় বল্‌তে এসেছেন—তো—রী—ত।

দ্বিতীয়া—বটে, বটে, লেখার অহঙ্কার দেখে আর বাঁচি না—'বটতলার' ভূত কোথাকার!

প্রথমা—সাহিত্য-সমাজে আমার আসন আজ অচল অটল। আমি যে কেমন লোক, তাহা আমার লেখাতেই প্রমাণ।

দ্বিতীয়া—হাঁ, আমার লেখা তোমাকে শিখিয়ে দিলে তোমার গুরু কে?

প্রথমা—প্রকাশকের দোকানে ত দেখা হবে, তখনই বুঝা যাবে, কে কাহার গুরু—

(আধুনিক সাহিত্য-সমাজে যেরূপ সার্টিফিকেট দেওয়ার ধূম পড়িয়াছে এবং self admiration societyর কথোপকথন হইয়া থাকে, তাহার অনেকগুলি দ্ব্যর্থবোধক কথা উপরিউক্ত আলাপে কিছু পাওয়া যাইবে)

Molireএর গ্রন্থ হইতে আর একটি বাক্যালাপ উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

এক জন অশিক্ষিত লোক, দার্শনিক পণ্ডিতের কাছে গিয়া অনুরোধ করিয়াছিল, তাহার প্রণয়িনীর কাছে একটা প্রেমপত্র লিখিয়া দিতে হইবে, সে সময় তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কথাবার্ত্তা হয়।

অশিক্ষিত লোক—আমি আপনাকে অতি গোপনে একটা কথা বল্‌ছি। একটি সম্ভ্রান্তবংশীয়া মেয়েকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি, তাহাকে একখানা চিঠি লিখিতে চাই। চিঠিখানা সুবিধামত তাহার পায়ের কাছে ফেলে দিব। তাহাতে প্রেম জানান হবে না?

পণ্ডিত—নিশ্চয়, এই ত উপায়! তবে চিঠিখানা পদ্যে হবে না গদ্যে হবে?

অশিক্ষিত—না, না, পদ্যে নয়।

পণ্ডিত—তবে কি গদ্যে?

অশিক্ষিত—না, না, গদ্যেও নয়। পদ্য গদ্য কিছুতেই না।

পণ্ডিত—না, তা কেমন ক'রে হবে? লিখতে গেলেই একটা না একটা করতেই হবে।

অশিক্ষিত—গদ্য আর পদ্য ভিন্ন আর কিছুই নাই?

পণ্ডিত—না, যেটা পদ্য নয়, সেটা গদ্য আর যেটা গদ্য নয়, সেটা পদ্য।

অশিক্ষিত—তবে আমরা কথা বলি পদ্যে না গদ্যে? এই ধরুন, আমি যদি বলি, "ওরে, নিয়ে আয় কল্‌কেটা সেজে," কিম্বা, "নিমাই, বাড়ী গিয়ে কাজ নাই, টুপীটা আন, দিই মাথায়," তবে সেটা গদ্য হ'বে না পদ্য হবে?

পণ্ডিত—এটা গদ্য আমরা কথাবার্ত্তায় যাহা বলি, সেটা গদ্য, যদিও শেষ কথায় মিল তাহাতেও থাকিতে পারে।

অশিক্ষিত—হায়, হায়, তাই ত, আমি এই ৩০ বৎসর গদ্যেই কথাবার্ত্তা বলছি কিন্তু ঘুণাক্ষরেও তা জানতে পারি নাই। তবে এক কায করুন, গদ্যের মত পদ্য কিম্বা পদ্যের মত গদ্যে লিখে দিন—তাহ'ই হবে—আর গোল থাকবে না।

পণ্ডিত—কি ব'লে আরম্ভ করিব?

অশিক্ষিত—এই ধরুন, "সুন্দরী, কন্যা ধনী, আঁখিটি তোমার ভালবাসায় আমায় মেরেছে"—এই রকম একটা কিছু।

পণ্ডিত—বরঞ্চ লেখা যাক্, "আগুন তব আঁখির পরশে, হৃদয় মোর ছাই হয়েছে, দিনরাত্রি তার জ্বলুনিতে"……

অশিক্ষিত—না, না, খবরদার—ও-সব কথা কি কখনও লিখতে আছে? আমি সোজাসুজি বল্‌তে চাই "সুন্দরী ধনীর কন্যা, তোমার নয়নবাণে আমি প্রেমে পাগল হয়েছি।"

পণ্ডিত—হাঁ, কথাটা তাই বটে, তবে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে ত লিখতে হবে?

অশিক্ষিত—আচ্ছা, এই কথারই সাজান-গোছান রূপ কেমন হ'তে পারে? আমি বাজে বক্তৃতা শুন্‌তে চাই না।

পণ্ডিত—এই যে, তুমি যে দু'রকম ভাবে বলিলে? আরও অনেক ভাবে বলা যায়, যেমন "ধনিকন্যা সুন্দরী, মেরেছে আমাকে ভালবাসা, তোমার" কিম্বা, কন্যা ধনী সুন্দরী, আমায় মেরেছে তোমার ভালবাসা অথবা, "ধনী সুন্দরী কন্যা, তোমার মেরেছে আমায় ভালবাসা" আবার অন্য ভাবেও বলা যায় "ভালবাসা মেরেছে ধনী, আমায় তোমার কন্যা সুন্দরী," কিম্বা মেরেছে আমায় সুন্দরী তোমার ভালবাসা, কন্যা ধনী," অথবা "আমায় কন্যা ধনী, মেরেছে সুন্দরী মোরে তব ভালবাসা"।

অশিক্ষিত—তা'ত বুঝলাম—কিন্তু এর মধ্যে কোন্‌টা সব চেয়ে ভাল হবে?

পণ্ডিত—এর মধ্যে তুমি যেটা প্রথম বলেছ, তাহাই ভাল।

অশিক্ষিত—সেটা ত প্রথম আলোচনাতেই আমি বলেছি। তবে আপনার আর কৃতিত্ব কোথায়? তবে আমি আরও ভেবে দেখি—কাল সকালে আমি আস্‌বো রাত্রিটা ভাবি—বোধ হয় আরও কিছু রচনা করিতে পারিব।

পণ্ডিত—আচ্ছা, তাই হবে, আমি তোমাকে হতাশ করিব না।

Molerieএর পরবর্ত্তী লেখকগণ অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহারই রচনা অনুকরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জন নিজের কৃতিত্ব ও বিশেষত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। Paul Scarron নামক কবিকে লোকে তখন "আনন্দ-কবি" (Poet of pleasure) বলিত। তিনি তাঁহার সময়ের প্যারী (Paris) নগরীর বর্ণনা পদ্যে লিখিয়াছিলেন,

তাহাতে তাঁহার মনের স্ফূর্ত্তি ও আনন্দের আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার "হতাশ প্রেম" ভারতবর্ষের পক্ষে উপযোগী মনে হয় না। Lord Baconএর মত Francois Rochefoucauld নামক বিখ্যাত নীতিবিশারদ—তাঁহার প্রবাদ বাক্যে বিশেষ অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন।

"পুরুষ ও স্ত্রীলোকের প্রথম ভালবাসা চিরজীবন মনে লাগিয়াই থাকে—দ্বিতীয়বার ভালবাসা যে হয় না, তাহা নহে।"

"নিজেদের যদি দোষ না থাকিত, তবে অন্তের দোষ দেখিয়া আমরা এত উল্লসিত হইতাম না।"

"বৃদ্ধ লোকেরা যে খারাপ দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারে না, সেজন্তই তাহারা উপদেশ দিতে এত ব্যস্ত হয়।"

"যদি পরস্পর পরস্পরকে প্রবঞ্চনা না করিত, তবে মানুষ এত দিন বোধ হয় সমাজে একত্র থাকিতে পারিত না।"

"আমাদের প্রিয় বন্ধুর দুঃখে আমরা এমন একটা কিছু অনুভব করি, যেটা আমাদের কাছে বিশেষ অপ্রীতিকর মনে হয় না।"

অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ মহামতি Pascal তদানীন্তন Jesuit সম্প্রদায়কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহা বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ছিল। সাধারণ লোকরা তাহার আভ্যন্তরীণ হাস্তরস অনুধাবন করিতে পারিত না। বিদ্বৎসমাজে অবশ্য তাহার আদর এখনও আছে। Jean de la Fontain তাঁহার কথা ও কাহিনী (পদ্যে) লিখিয়া বিশেষ পরিচিত হইয়াছিলেন। অধিকাংশ পদ্য Aesop's Fablesএর গল্প অনুসরণ করিয়া লেখা। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নীতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য হাস্তরসমধুর পদ্যাবলী লিখিয়া ফরাসী সাহিত্যে বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার "It is doubly sweet, deceiver to deceive"কথার সার্থকতা অনেকেই অনুভব করিবেন। Boileau নামক এক জন প্রসিদ্ধ কবি, ফরাসী পদ্য ধারার অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার satireগুলি বিশেষ তীক্ষ্ণ ছিল। Alan Rene la Sage নামক প্রসিদ্ধ উপন্যাস-প্রণেতার Gil Blas নামক গল্প অনেকেই পড়িয়াছেন। তাহার হাস্তরসমাধুর্য্য গল্পের মধ্যে প্রকাশিত। উদ্ধৃত করিয়া দেখান বিশেষ দুরূহ। Jean de la Bruyere নামক লেখক সমসাময়িক স্ত্রীপুরুষের স্বভাব ও ব্যবহার সম্বন্ধে The character নামে একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন—তাহার অনেকগুলি ব্যঙ্গোক্তি এখনও প্রয়োগ করা চলে। তাঁহার লিখিত "চিন্তাবলী" (Thoughts) যেন একটু অন্য ধরণের লেখা, যথা—

"লেখক যদি সমালোচকদের উপদেশমত ও আদেশনির্দ্দেশমত লিখিতে বসেন (এক টেবলে অথবা একই ঘরে), তাহা হইলে কোন লেখাই হবে না। মহাকবি অথবা প্রসিদ্ধ লেখকদের লেখা যদি সমালোচকদের মত অনুসারে কাটছাঁট অথবা পরিবর্ত্তন করা যায়, তবে সে লেখাতেও কিছুই থাকিবে না।

পৃথিবীতে বড় হওয়ার দুইটি উপায় আছে—এক নিজের চেষ্টায় আর দ্বিতীয় অন্যের দুর্ব্বলতার সাহায্যে।

যদি জীবনটা শুধু কষ্টেরই হইত, তবে লোক বাঁচিয়া থাকিতে উদ্ব্যস্ত হইত, আর যদি সুখেরই হইত, তবে মরা অত্যন্ত ভয়াবহ হইত—দুই-ই সমান বলা যায়।

আমরা জরা ও বৃদ্ধত্ব ভয় করি, কিন্তু বৃদ্ধবয়স পাওয়া পর্য্যন্ত তাহা ভয় করি না।

জন্ম, জীবন ও মৃত্যু—এই তিনটাই প্রত্যেকের পক্ষে প্রধানতম ঘটনা। আমরা জন্ম সম্বন্ধে কিছু জানি না, কষ্ট পাইয়া ভুগিয়া মরি আর জীবনে যে বাঁচিয়া আছি, তাহা অহরহ ভুলিয়া যাই।

স্ত্রীলোকেরা যে অসতী ও বিশ্বাসঘাতিনী হইতে পারে, তাহা ভাবিলে আমাদের মনে আর হিংসা (jealousy) থাকে না।

Giles Meirage—ভাষাতত্ত্ববিদ্ যে সব পদ্য লিখিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে ইংরাজ কবি Goldsmithএর তুলনা করা যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পর ফরাসী সাহিত্যে এত অধিকসংখ্যক লেখক-লেখিকা বিখ্যাত হইয়াছেন যে, তাঁহাদের প্রচারিত সাহিত্য-সমুদ্রে মণিমুক্তা আহরণ করিতে যাওয়ার কল্পনা করা যেন অসম্ভব মনে হয়। Madame Beauvert, Balzac, Guy the Maupassant, Paulode Cork, Emile Zola প্রভৃতি কয়েকটি লেখকের নাম শুধু উল্লেখ করিলেই অনেকে তাহা বুঝিতে পারিবেন। প্রসিদ্ধ লেখক Victor Hugoকে এর মধ্যে হাস্তরস-স্রষ্টা বলা অন্যায় হইবে—কারণ, তাঁহার লিখিত পুস্তকাবলীতে যে উৎকৃষ্ট গৌরবময় কল্পনা আছে (grandeur and nobility of thoughts and ideas), তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিষ। Alexandar Dumas রোমাঞ্চকর কাহিনীর জন্য যত বিখ্যাত, হাস্তরসের জন্য তত্টা নহেন।

ফরাসী দেশের পর বোধ হয় জার্ম্মাণ সাহিত্য উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৫শ শতাব্দীর পূর্ব্বে জার্ম্মাণ সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কারণ, তখন অনুবাদ করার প্রথা তত্টা ছিল না, মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনও ছিল না। জার্ম্মাণীর ব্যবসা বাণিজ্য ও আর্থিক ধনসম্পৎ একটা ছিল না—যাহাতে অন্যান্য দেশের সঙ্গে আদান-প্রদান আলাপ-পরিচয়ে তাহাদের পুরাতন সাহিত্য কিছু লোকমুখে প্রচারিত হইতে পারিত। আমরা যৎসামান্য যাহা কিছু এখন জানিতে পারিতেছি, তাহা শুধু অনুবাদের সাহায্যে ও মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবেই। ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে একটি পদ্য জার্ম্মাণ সমাজে বেশী প্রচলিত হইয়াছিল—তাহার নাম ছিল the ship of fools (বোকার জাহাজ)। তাহার দেখাদেখি আর একখানি বই প্রচলিত হয়, তাহার নাম ছিল the boats of foolish women. (নির্ব্বোধ স্ত্রীলোক-বোঝাই নৌকা)। উপরি উক্ত বই দুইখানি তদানীন্তন সমাজের একটি satire চিত্র ছিল—এখন তাহা বিশেষ হাস্তরসাত্মক মনে হয় না। এক জন ডচ (Dutch) ছাত্র ও লেখক একখানি পুস্তক লেখেন, তাহার নাম ছিল Praise of Folly (বোকামীর প্রশংসা)। ইহাই বোধ হয় সাহিত্যিক হাস্তরস সম্বন্ধে প্রথম পুস্তক। তাহার ভূমিকাতে লেখা ছিল—

"আমার এই ব্যঙ্গে ও হাল্কা এবং গবেষণাপূর্ণ কাজলামী শুনিয়া যিনি বিরক্ত হইবেন, তাঁহাকে অনুরোধ করি, তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, আমি যে প্রথম এই ক্ষেত্রে নামিয়াছি, তাহা নহে। বহু যুগযুগান্ত হইতে অনেক অনেক খ্যাতনামা লেখক হাস্তরসের চর্চ্চা করিয়াছেন। হোমার (Homer) ব্যাঙ ও ইন্দুর সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাহিনী লিখিয়াছেন, ভার্জিল (Virgil) মশা ও পিষ্টক সম্বন্ধে গল্প করিয়াছেন এবং Ovid (ওভিড) বাদাম সম্বন্ধে পদ্য

লিখিয়াছেন"। অন্যান্য লেখকদের বিশেষত্ব উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—

"আমি এই পুস্তকে বোকামী ও নির্ব্বুদ্ধিতাকে একটা প্রশংসা করিয়াছি ও উচ্চস্থান দিয়াছি যে, যদি কেহ মনে করেন যে, তাহা আমারই জ্ঞান-বুদ্ধি-শিক্ষারই ফল, শুধু বোকামী ও নির্ব্বুদ্ধিতা, তবে যে বিশেষ অন্যায় হইবে, তাহা আমি মনে করি না।" সে পুস্তকে এক স্থানে লিখিত ছিল—

"নির্ব্বোধ অশিক্ষিত বোকাদের প্রশংসা করার একটা বিষয় আছে যে, তাহারা সব সময় সত্য কথা বলে এবং তাহা হইতে জীবনে উৎকৃষ্ট ও বীরোচিত জিনিষ আর কিছু নাই। বোকার মনে যাহা হয়, তাহা তাহার মুখে ও কথায় প্রকাশ পায়, বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ বিজ্ঞ লোকেরা দুইটি জিহ্বা রক্ষা করেন—একটিতে যাহা বলেন, তাহা যেন বলার উপযুক্তই, আর একটিতে মনে মনে ভাবেন, যাহা বলা উচিত কিম্বা উচিত নয়। তাঁহারা এত অল্পসময়ের মধ্যে বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত করিতে পারেন যে, যাহাকে আমি বলিতেছি কালো, তাহাকে তাঁহারা প্রমাণ করিবেন শাদা, শীত ও উষ্ণ নিশ্বাস একসঙ্গে বাহির করিতে পারেন এবং তাঁহাদের মনে ও বুকে এক জিনিষ থাকিলেও ঠোঁটে অন্য জিনিষ দেখাইতে পারেন। কিন্তু সরল নির্ব্বোধ বোকারা তাহা পারে না।"

অন্যান্য দেশের সাহিত্যে যেমন রূপকথা, উপকথা প্রভৃতি ছিল, জার্ম্মাণ সাহিত্যেও সেইরূপ ২।৪ জন বীরকে (Hero) নায়ক করিয়া অনেক রকম রূপকথা ও উপকথার সৃষ্টি হইয়াছিল। (Brother Rush এবং Eulenspiege'এর নাম সেখানে এখনও পরিচিত আছে) একটি ছোট গল্প এখানে উল্লেখযোগ্য মনে হয়।

একটি সরাইখানাতে Eulen উপস্থিত হন। খাবার প্রস্তুত হইতে দেরী আছে দেখিয়া তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠেন। সরাইরক্ষক বলেন, "যাঁহারা খাবার তৈয়ারী হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিবেন না, তাঁহারা যাহা ইচ্ছা এখন খাইতে পারেন।" Eulen একখানা শক্ত রুটী লইয়া এক ধারে বসিয়া খাইলেন ও যেখানে মাংস রান্না হইতেছিল, সেখানে আসিয়া বসিলেন। মাংস প্রস্তুত হওয়ার পর অন্যান্য সকলে খাইয়া গেল, কিন্তু তিনি সেখানে বসিয়াই রহিলেন। সরাইরক্ষক তাঁহার কাছে আসিয়া খাবার মূল্য চাহিল। তিনি দাম দিতে অস্বীকার করিলেন, কেন না, তিনি কিছু খান নাই। সরাইরক্ষক বলিল, 'আগুনের কাছে থেকে মাংসের যে গন্ধ পেয়েছিল, তাতেই অর্দ্ধভোজন কেন, পূর্ণ ভোজনই হয়েছে। দাম দিবেন না কেন? Euleu পকেট হইতে একটা মুদ্রা বাহির করিয়া তাহা ছুড়িয়া ফেলিলেন ও পুনরায় তাহা কুড়াইয়া পকেটে রাখিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঝনাৎ ক'রে যে টাকা শব্দ করিল, তাহা শুনেছ?" সরাইরক্ষক বলিল, "নিশ্চয়—সবাই শুনেছে"। Eulen বলিয়া উঠিলেন, "মাংসের গন্ধে আমার পেটের ক্ষুধা যতখানি দূর হয়েছে, টাকার ঝনাৎ শব্দেই তাহার মূল্য দেওয়া হয়েছে।"

জার্ম্মাণ ভাষাতেও Noodles সাহিত্য যথেষ্ট লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা যেন তদানীন্তন স্থানীয় সমাজের ক্রিয়া-কলাপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াই বেশী ছিল। সে সব কাহিনীতে ছেলে-মানুষীভাব ও নির্ব্বুদ্ধিতার আখ্যান যাহা ছিল, তাহা এখন যেন অসম্ভব মনে হয়।

জার্ম্মাণীর পরে ইতালীর নাম সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনুবাদকগণ গম্ভীর ও গবেষণা-পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিষয় লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। সে জন্য হাস্যরসকে তাঁহারা তেমন আগ্রহের সহিত বিবেচনা করেন নাই। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে যে Giovani Boccaccio নামক লেখক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার Decameronএ (শতগল্প) তদানীন্তন সমাজের আদি ও শৃঙ্গাররসের যেরূপ চর্চ্চা হইত, তাহাকেই হাস্যরসপূর্ণ উপায়ে ও ভাষাতে বর্ণনা করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে পরিমার্জ্জিত হাস্যরসের বিকাশ ও উচ্ছ্বাস কিছু কম ছিল এবং কথাবার্ত্তার মধ্যে যেটুকু ছিল, তাহাকেও উন্নত ও উঁচু স্তরের বলা যায় না। অন্যান্য কারণে পুস্তকখানি এখনও সাহিত্যে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

Boccaccioর সমসাময়িক সময়ে Filipho নামক এক জন কবির উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার কয়েকটি পদ্যে হাস্যরসের একটু আভাস ইঙ্গিত ছিল। আধুনিক সময়ে তাহা কাহাকেও হাসাইতে পারিবে কি না সন্দেহ। Salerno নামক এক জন লেখক কতকগুলি গল্প লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার একটিতে বর্ণনা করা ছিল,—বড় লোকের ছেলে পিতার পুস্তকালয় বিক্রয় করিয়া কি ভাবে কাঠের পুস্তকাকার জিনিষ করিয়া তাহার library পরিবর্ত্তন করিয়াছিল ও পিতার ত্যক্ত ধনসম্পত্তি কি ভাবে খরচ করিত, তাহার একটি মনোরম কাহিনী ছিল। বোধ হয়, বড় লোকেরা তখন শিক্ষিত লোকদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহার একটি Satire ছিল। Barni নামক এক জন কবি "বিছানায় শুয়ে থাকা" (Lying in Bed) নামে কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাহাকে হাস্যরসমধুর বলা চলে। তাহাতে আলস্য-পরায়ণ "গোঁফখেজুরে" অথবা "পাঁপু পীঁড়"র একটা সুন্দর বর্ণনা ছিল। Francho Saccheti অনেকগুলি উপন্যাস ও পদ্য লিখিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। [ফরাসী sachet কথা তাঁহার নাম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে কি না কেহ বলিতে পারে না] তাঁহার লেখাকে অনেকে Bag of perfumes (সুগন্ধ দ্রব্যের থলী) বলিত।

তিনটি তরুণী একটি বাগানে ফুল সংগ্রহ করিতেছিল ও নিজেদের মধ্যে তরুণীসুলভ রহস্যালাপ করিতেছিল। হঠাৎ বৃষ্টি আসিয়া পড়ে ও তাহারা ছুটাছুটি লুটাপুটি করিয়া দৌড়াইতে থাকে, আছাড় খায় ও একে অন্যের গায়ে (ঢলিয়া) পড়িয়া যায়। সংগৃহীত ফুলসমেত তাহাদের শরীর কর্দ্দমে অঙ্কিত হইয়া যায়। কবি নির্লিপ্তচিত্তে ও হতাশমনে এই দৃশ্যের বর্ণনা করিয়াছেন এবং শেষে লিখিয়াছেন যে, তিনি যে ইতিমধ্যে আপাদমস্তক ভিজিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার আদৌ হুঁস ছিল না। এরূপ "বেহুঁস" অবস্থায় যাহা উপভোগ করা যায়, তাহা আধুনিক সময়ের কাব্যের ও পদ্যের অনেক "খোরাক" যোগাইয়া থাকে। Sachhettiর গল্পের ও পদ্যের এই বিশেষত্ব বোধ হয় উল্লেখযোগ্য।

Benvenetu Cellinir নাম হয় ত সাহিত্যরসিক অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। তিনি একখানি "আত্মজীবনী" (Biography) লিখিয়াছিলেন। তাহাতে নিজের জীবনের বিস্ময়কর কাহিনী কতখানি ছিল, তাহা বলা কঠিন। অনেক প্রকার বিচিত্র চরিত্রের বিচিত্র কাহিনী তিনি নিজের বলিয়া চালাইয়াছেন। একটি কাহিনী এখানে সংক্ষেপে উল্লেখযোগ্য মনে হয়। Hercules নামক যোদ্ধার মর্ম্মর-প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—

"যদি তাঁহার মাথার কেশ ক্ষুর দ্বারা কামাইয়া দেওয়া হইত, তবুও তাঁহার মাথার মধ্যে এত হাড় থাকিত—যাহাতে তাঁহার মগজ স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিত। তাঁহার মুখের চেহারা দেখিয়া মনে হয় না, তাহা মানুষের চেহারা কিম্বা ষাঁড় ও সিংহের মাঝামাঝি কোন জন্তুর চেহারা। মাথা ঘাড়ের উপর এমনভাবে বসান আছে যে, মনে হয় না, তিনি কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারেন এবং বোধ হয়, একটু ধাক্কা লাগিলেই তাহা পড়িয়া যাইবে। ঘাড় দু'টি দেখিয়া মনে হয়, যেন গাধার পৃষ্ঠে বোঝা চাপান হইয়াছে। তাঁহার বুক ও মাংসপেশী দেখিয়া মনে হয়, যেন একছালা তরমুজ কেহ বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়াছে। পা দুইটি যেন দেহের সঙ্গে এমনভাবে সংলগ্ন আছে, যাহাতে বুঝিতে পারা যায় না, কোন্ পায়ের উপর ভর দিয়া কি ভাবে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন। হাত ও আঙ্গুলগুলি এমন বিশ্রী অসংলগ্ন ও অসামঞ্জস্যভাবে আছে, তাহাতে মনে হয়, যেন ভাস্কর কোন দিন কোন সুপুরুষের নগ্ন মূর্ত্তি দেখেন নাই। আরও মনে হয়, এক পা যেন মাটিতে পুতিয়া যাইতেছে আর এক পা যেন জ্বলন্ত কয়লার উপর রাখা হইয়াছে।"

ভারতীয় চিত্রকলা-প্রদর্শনীতে এক জন শিক্ষিত বিশেষজ্ঞ সমালোচক, উপরের লিখিত বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা, একখানি চিত্র দেখিয়া করিয়াছিলেন, লেখকের তাহা আজও মনে পড়িতেছে।

ইতালীর হাস্যরস-সাহিত্য সম্বন্ধে বিখ্যাত বিশেষ কিছু বিশেষত্ব আর দেখা যায় না। Boccaccioর পর অনেকে Droll stories লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা অশ্লীলতা-দোষে দুষ্ট ছিল বলিয়া গোপনে প্রচলিত হইত, প্রকাশ্য সাহিত্যে বেশী দিন তাহা স্থান পায় নাই।

স্পেন দেশের সাহিত্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বে Nobel Prizeএ সম্মানিত হইয়াছিল। সে জন্য বিশেষ বেশী উন্নত না হইলেও হাস্যরস সম্পর্কে তাহা বাদ দেওয়া যায় না। হাস্যরসের সামগ্রী যে বেশী তাহাতে আছে ও ছিল, তাহা বলা যায় না।

পুরাকালে Mendoza এবং Lopede Vega নামক দুই জন প্রসিদ্ধ লেখকের নাম পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে Lopede Vega এত অধিকসংখ্যক পুস্তক লিখিয়াছিলেন যে, এক জীবনে কেহ এত বই লিখিতে পারেন, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। সংখ্যায় অধিক হইলেও তাঁহার নাট্যাবলীতে মনোরম অনেক জিনিসই ছিল। গল্পগুলির মধ্যে কোন একটি এখানে উদ্ধৃত করা দুরূহ মনে হয়। ১৬শ শতাব্দীর Baltazor নামক এক জন কবি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার "নিদ্রা" (sleep) সম্বন্ধে একটি কবিতা কবি Wordsworthএর "নিদ্রার চেষ্টার" কথা মনে করাইয়া দেয়। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে Cerventesএর Don Quixote dela Mancha নামক বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহা অল্পসময়ে সমস্ত য়ুরোপে এত বিস্তার লাভ করে, বোধ হয়, অন্য কোন পুস্তক ততটা কোন দিন করে নাই। এখন তাহা সমস্ত পৃথিবীময় যেন আদর পাইয়াছে। এরূপ একখানি হাস্যরসমধুর satire বোধ হয় অন্য কোন সাহিত্যে আছে কি না সন্দেহ। Dickensএর Pickwick papersএর সঙ্গে অনেকে তুলনা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের বই এবং বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন রকম হাস্যকর প্রতিচ্ছবি। উভয় পুস্তকই সামাজিক satire এবং অবস্থা ও ঘটনার বৈচিত্র্য উভয়েই এমন আছে—যাহাতে স্বভাবতই মনে মনে হাসি আসে। সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, নৈতিক, শিক্ষাবিষয়ক, আইন-সংক্রান্ত, বিবাহ-বিধি-সম্পর্কিত অনেক প্রকার বিষয়ই এমন ভাবে উল্লেখ করা আছে—যাহা অন্য কোন ভাবে ও ভাষায় বলিতে গেলে তাহার অভ্যন্তরীণ হাস্যরস নষ্ট হইয়া যায়। Don Quixote বইখানি এত বড় গল্প যে, তাহা হইতে অংশ উদ্ধৃত করা যেন অসম্ভব মনে হয়। বইখানার নামই এখন ব্যক্তিবিশেষের স্বভাবচরিত্র বর্ণনা করিতে সাহিত্যে ব্যবহার হয় Quixotic। Sancho Panza একটি অদ্ভুত কল্পনা—বাস্তব জীবনে যাহার অনুরূপ প্রতিচ্ছবি প্রায়ই দেখা যায়। Cerventesএর পর যে সব লেখক স্পেন দেশের সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, সাহিত্যে হাস্যরস সম্পর্কে তাঁহাদের নাম উল্লেখযোগ্য নয়।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ১৭শ শতাব্দী হইতে য়ুরোপে সাহিত্যে হাস্যরস প্রচুর দেখা দেয় এবং ক্রমশঃ তাহা হইতে এক শ্রেণীর লোকপ্রিয় সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। এত লেখক বিভিন্ন স্থানে নিজের কৃতিত্ব দেখান যে, তাঁহাদের নাম ও কথাবলী ধারাবাহিকভাবে বলা অত্যন্ত সুকঠিন। এমন কি, যাঁহারা গম্ভীরভাবে কোন জটিল বিষয়ের আলোচনা করিতেন, তাঁহাদের লেখার মধ্যেও হাস্যরস-মধুর কথা পাওয়া যাইত, অন্ততঃ ভাষা ও লেখার দিক হইতে এ কথা বলা অন্যায় হইবে না। সেজন্য হাস্যরসের কোনরূপ ধারাবাহিক ইতিহাস বলিতে গেলে শতধা বিভক্ত শ্রেণীর মধ্যে সূত্র হারাইয়া যায়। এত দিন পরে তাহা, "দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী ধারানিবদ্ধেব কলঙ্ক-রেখার" মতই যেন দৃশ্যমান হয়। প্রসিদ্ধ কয়েক জনের নাম উল্লেখ করিয়া এ বিষয় শেষ করা ভিন্ন উপায় নাই। Thomas Hobbes হাস্যরসের যে ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন, তাহাই যেন ক্রমশঃ সাহিত্যে এই রসের আদর্শ হইয়া উঠে।

"There is a passion that hath no name, but the sign of it is that distortion of the face which we call laughter. Men laugh at mischances and indecencies wherein lies no wit nor jest at all, whatever it be that moves laughter, it must be new and unexpected. Its repetition may be stale. The passion of laughter proceeds from the sudden conception of our eminence or some absurdity of another. It is but sudden glory arising from a sudden conception of some eminence in comparison with an infirmity."

১৭শ শতাব্দীতে য়ুরোপে হাস্যরস-সাহিত্যে প্রথমে "কথা ও কাহিনী" (Ballads)এর প্রচলন যেন বেশী হইয়াছিল। বঙ্গদেশের "বচন ও গান" যেমন ধর্ম্মমূলক ও করুণরসপ্রধান ছিল, য়ুরোপে আবার তাহা আদি ও শৃঙ্গাররসের আভাস বেশী জানাইত। "চুম্বন" "আলিঙ্গন" প্রভৃতি কথা বঙ্গ-সাহিত্যে প্রকাশ করা তখন নীতিবিরুদ্ধ ছিল, কিন্তু য়ুরোপে Robert Herrlock Martial প্রভৃতি লেখকদের মধুর গানে তাহার ব্যাখ্যা ও বর্ণনা বেশী ছিল। অনেকে তাহা অশ্লীল মনে করিবেন বলিয়া এখানে তাহা বর্ণনা করিলাম না। য়ুরোপের সামাজিক রীতিনীতি বঙ্গদেশের লৌকিক প্রথা হইতে বিভিন্ন ছিল ও এখনও আছে।

ইংরাজী সাহিত্যে মহাকবি সেক্সপীয়রের পর কবি মিল্টনের নাম উল্লেখ না করা অন্যায় হইবে। অনেক পণ্ডিতগণের মত যে, মিল্টন মহাকাব্য লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু খুব কম মহাকবিই তাঁহার মত হাস্যরসবিহীন এবং ভালবাসা ও প্রেমের কথা-বর্জ্জিত সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন, এ কথা সমর্থনযোগ্য কি না সন্দেহ মনে হয়। তাঁহার প্রণীত "Paradise lost" এবং "Paradise regained"এর মধ্যে satire শ্রেণীর জিনিস আছে কি না, তাহা গবেষণার বিষয় এবং তাঁহার L' Allegro কবিতার মধ্যে মধুর হাস্যরসের আবাহন অনেকে কল্পনা করিতে পারেন। "Mirth, with thee I mean to live" কথাতে মনে হয়, তিনি হাস্যরসবিমুখ ছিলেন না। তাঁহার Epitaphএর মধ্যেও ইহার আভাস যথেষ্ট পাওয়া যায়। অনুসন্ধিৎসু পাঠককে মূলগ্রন্থ পড়িতে অনুরোধ করি। কারণ, বড় বড় অংশ উদ্ধৃত করিতে যাওয়া এখানে অন্যায় হইবে এবং তাহার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করাও সুকঠিন।

Samuel Butler-এর Hudibras নামক পুস্তকে আমরা তদানীন্তন নীতিবাগীশদের বিরুদ্ধে ঠাট্টা-শ্লেষ-বিদ্রূপপূর্ণ আলোচনা পাই। তাহা সাহিত্যে আজও একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। "কবি" সম্বন্ধে তাঁহার যে পদ্য "Epigramme" আছে, তাহার কয়েকটি লাইন নীচে উদ্ধৃত করিলাম।

It is not poetry that makes men poor
For few do write that were not so before
And those that have writ best, had they been rich,
Had ne'er been clapped with poetic itch
Had loved their ease too well to take the pains
To undergo the drudgery of the brains
But, being for all others trades unfit,
Only to avoid being idle, set up wit.

Samuel Pepys তাঁহার Diaryতে যে সব বিবরণ ও কাহিনী লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তদানীন্তন সামাজিক রীতি-নীতির বর্ণনা পাওয়া যায়। যদিও নিজের সম্বন্ধে বেশী কথাই লেখা আছে—তবু তাঁহার মতামত ও পরিবর্ত্তিত মনোবৃত্তিগুলির পরিচয় সময় সময় হাস্যরসাত্মক মনে হয়। তাঁহার স্ত্রীর সঙ্গে মান-অভিমানের পালা যেন একটা চিরন্তন জিনিস। Lords' dayতে গির্জ্জার মধ্যে যাইয়া প্রার্থনার পরিবর্ত্তে স্ত্রীলোকবিশেষের সঙ্গে আলাপ করা ও তাকাইয়া থাকার বর্ণনা স্বভাবতঃই মনে হাসি আনাইয়া দেয়।

John Dryden তাঁহার পদ্য ও নাটকের জন্য বিখ্যাত ছিলেন (এবং এখনও আছেন সন্দেহ নাই)। তাঁহার satire একটু বিশেষ রকম শ্লেষপূর্ণ ছিল। Duke of Buckingham সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"A man so various that he seemed to be
Not one, but all mankind's Epitome
Stiffin opinions, always in the wrong
Was everything by starts and nothing long
But in the course of one revolving moon
Was chemist, fiddler, Statesman and buffoon
Then for all women, painting, rhyming, drinking
Besides ten thousand freaks that died in thinking.

কবি Milton সম্বন্ধে তিনি একটি Epigramme লিখিয়াছিলেন—

Three Poets, in three distant ages born
Greece, Italy and England did adorn
The first in loftiness of thought surpassed
The next in majesty, in both the last,
The force of nature could no further go
To make the third, she joined the other two.

(এ সম্বন্ধে আর একটি পদ্য অন্য লেখকের এইরূপ ছিল—
Greece boast, to her Homer, Rome her Virgil's name
But Englands Milton vies with both in fame)

Milton সম্বন্ধে কবি Cowper-এর একটি অনুরূপ পদ্য আছে।

Daniel Defoe তাঁহার Robinson Crusoe লিখিয়া অমর হইয়াছেন—তাহাতে যে সব কাহিনী আছে, তাহার মধ্যে হাস্যরসের প্রাচুর্য্য পাওয়া যায়। (cf. Fridays conflict with the Bear) পুস্তকখানি ছেলেমেয়েদের পাঠ্য হইলেও তাহাতে যে সব তথ্যের আভাস আছে, তাহা অর্থশাস্ত্রে এবং রাষ্ট্রনীতির অনেক পরিবর্তন করাইয়াছে। সে জন্য তাহাকে একটি প্রধান satire বলা যায়।

Mathew Prior নামক এক জন কবির পদ্যাবলী Thackeray এবং Cowper যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। বৃদ্ধবয়স হইলেও Paint, powder, Rouge প্রভৃতি দ্বারা স্ত্রীলোকদের নিজের যৌবন রাখিবার চেষ্টা তিনি পদ্যে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত "Simile" এবং "Phillis Age উল্লেখযোগ্য।"

Jonathan Swift যে Gulliver's Travels লিখিয়াছিলেন, তাহা এখন অনেক ভাষাতেই অনুবাদ করা হইয়াছে। তাহা একটি বিখ্যাত satire এবং অনেকেই তাহা আদ্যোপান্ত পড়িয়াছেন।

Swift অনেক বই ও পদ্য লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে শ্লেষ, বিদ্রূপ ও হাসি-ঠাট্টার অনেক জিনিস ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, "পৃথিবী হইতে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম লোপ" সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন :—

"খৃষ্টীয় ধর্ম্ম না থাকিলে প্রধান সুবিধা এই হইবে যে, সপ্তাহের মধ্যে এক দিন আমরা বেশী পাইব—সে দিনটি আমরা এখন নষ্ট করিয়া থাকি। যে সব মনোরম অট্টালিকা প্রার্থনার জন্য আছে, তাহা ক্রীড়া করার গৃহে পরিণত করা যাইবে এবং পৃথিবীর সাত ভাগের এক ভাগ ব্যবসা-বাণিজ্য, উদ্যম, খেলাধূলা যাহা আমরা এখন পাই না, তখন তাহা পাইব।"

তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন :—

"আমি অবশ্য এ কথা মানি যে, একটা বড় অধিনায়ক শক্তির কল্পনা করা সাধারণ লোক ও ছেলেমেয়েদের পক্ষে বেশী উপযোগী। তাহাতে অবসরসময়ে তাহা লইয়া গল্প করা চলে এবং ছেলেমেয়েরা খারাপ ও দুষ্ট হইলে তাহা উল্লেখ করিয়া ভয় দেখান সহজ হয়।

স্ত্রীলোকদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে যে পদ্য লিখিয়াছিলেন, তাহা অনেক কবি ও লেখক এখন ব্যবহার করিয়া থাকেন। অন্যান্য বিষয় এখানে আলোচনা করা অবান্তর হইবে।

আলেকজান্দার পোপের নাম সকলের কাছেই পরিচিত। তাঁহার লেখার মধ্যে যে অনুপ্রাস ও শব্দ এবং কাব্য-ঝঙ্কার আছে, তাহা সকলের কাছেই প্রশংসনীয়। অনেকেই বলেন যে, তাঁহার লেখার মধ্যে হাস্যরসপূর্ণ জিনিসের বিশেষ অভাব আছে। কিন্তু তাঁহার Melody resigns to fate এবং Epigrammeগুলিতে যে সব glorified imagination আছে, তাহাকে হাস্যরসের এক বিশেষ ধারা বলা যায়।

Joseph Addison তাঁহার Tatler এবং Spectator পত্রিকাতে যে সব কথা ও কাহিনী লিখিয়াছেন, প্রবাদ আছে, তাহা তদানীন্তন সমাজের অনেক রীতিনীতি দুর্নীতি পরিবর্তন করিয়া দিয়াছিল। তাহার কতক অংশ এখন স্কুল ও কলেজের পাঠ্য হইয়াছে। একখানি willএর (দানপত্রের) নক্সা এখন অনেকে আলোচনা করিয়া থাকেন।

John Philipsএর Splendid shilling একটি মনোরম পদ্য। মিলটনের ভাষার অনুরূপ করিয়া parody লেখা—

"Sing Heavenly muse
Things unattempted in Prose or Rhyme
A shilling, breeches and chimeras dire."

Lord Chesterfield তাঁহার পুত্রকে যে সব পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা এখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে (letters to his son)। তাহাতে জীবনে নানারকম অভিজ্ঞতার কথা লেখা আছে ও উপদেশ দেওয়া আছে। অনেকগুলি কথা এখন সাধারণ প্রবাদের মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

"মনে মনে সুখী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা সকলেরই আছে, অন্যকে সুখী করার ইচ্ছাও সেরূপ হওয়া উচিত। কৃপণ লোকদের আমরা কৃপণতার জন্য গালাগালি করি না, যতটা তাহার মজুত অর্থের জন্য আমরা তাহাকে হিংসা করি।"

"জীবনে পোষাক-পরিচ্ছদ যেমন, কপটতা ব্যবসা-বাণিজ্যে তেমনই দরকার হয়। নগ্নদেহ সকলকে দেখাইতে যেমন লজ্জা হয়, নিজের মনকে উন্মুক্ত ও নগ্ন করাইয়া যে দেখায়, সেও অবিবেচনার কাযই করে।"

"স্ত্রীলোক যাহাকে ভালবাসে, তাহার শাসন আধিপত্য সে সর্ব্বদাই মানিতে প্রস্তুত থাকে; কিন্তু যাহাকে সে শুধু ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, তাহার আজ্ঞা শুনিতে রাজী হয় না। প্রথমটি তাহার স্বভাবগত মনোবৃত্তির ফল, দ্বিতীয়টি তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা বিচারের চেষ্টা। "স্ত্রী অপেক্ষা প্রণয়িনীই সেজন্য বেশী প্রিয় হয়।"

ইহার পর Fielding, Sterne, Garrick, Smollett প্রভৃতি লেখকদের কথা উল্লেখযোগ্য। Fiedlingএর Tom Jones নামক উপন্যাসে "Knocking at the door" সম্বন্ধে যে গবেষণা আছে, তাহা হাস্যরস-মধুর বলা যায়। উপরিউক্ত লেখকদের লেখা হইতে বড় বড় অংশ উদ্ধৃত করা অনেকের নিকটই অসহ্য বোধ হইবে। কারণ, এ সময়ের যে হাস্যরস ছিল, তাহাকে কিছু মোটা নীরস ধরণের বলা যায়। অবশ্য অন্যান্য কারণে তাঁহাদের লেখার মনোহারিত্ব এখনও সাহিত্য-সমাজে পরিচিত করিয়া রাখিয়াছে।

এই সময় ইংলণ্ডের সাহিত্যাকাশে দুইটি উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা দেয়, যাহাদের কল্পনা, ভাব ও ভাষা লোককে বিমুগ্ধ করিয়া থাকে। এক জন Dr. Johnson এবং দ্বিতীয় Goldsmith। দুই জন পরস্পর প্রিয় বন্ধু ছিলেন। কিন্তু প্রত্যেকের লেখাই বিভিন্ন ধরণের। ডক্টর জনসনের চেহারা যেমন বিশাল ছিল, তাঁহার লেখাও তেমনই বিশাল ও বিরাট কল্পনা-প্রসূত ছিল। গোল্ডস্মিথ কৃশদেহে থাকিলেও প্রাঞ্জল ভাষা ও হাসি-ফূর্ত্তির যুগাবতার ছিলেন। উভয়েই সাহিত্যে অনেক অতুল সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। ডাঃ জনসনের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ লেখার মধ্যে পরিমার্জ্জিত হাস্যরসের "চাটনী" অনেক পাওয়া যায়। গোল্ডস্মিথ চেষ্টা করিয়া যেখানে গম্ভীর হইতে গিয়াছেন, সেখানেও নির্ম্মল হাস্যরস আপনিই যেন নির্ঝরের মত বাহির হইয়াছে। ডাঃ জনসন কোন জিনিস ব্যাখ্যা করিতে এমন অভিনিবেশ সহকারে সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন—যাহাকে হাস্যরসধারার মত Glorified imagination নিঃসন্দেহ বলা যায়। তিনি সংবাদপত্রসেবীদের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে ইহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়।

"As an ambassador is said to be a man of virtue sent abroad to tell lies for the benifit of the country. So a news writer is a man without virtue who writes at home for his own benifit."

এরূপ ব্যাখ্যা অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। তিনি মিল্টনের একটি পদ্য পড়িয়া বলিয়াছিলেন—"যেখানে বাস্তবিক শোক বেশী হয়, সেখানে পদ্য লেখাই অসম্ভব এবং পদ্য লিখিয়া শোক প্রকাশ করার অর্থই এই যে, শোক তেমন গভীর নয়।" তাহাতে বিদ্বৎসমাজ তাঁহার উপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন; কিন্তু তাঁহার এ উক্তির বোধ হয় প্রতিবাদ করিতে কেহ সাহস করেন নাই। তিনি Rasselas পুস্তকে আকাশে উড়িতে চেষ্টা করার যে অদ্ভুত কাহিনী লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে এখন আকাশভ্রমণ "Aeroplane" সৃষ্টি হইয়াছে অনেক ঐতিহাসিক পণ্ডিত সে কথা বলিয়া থাকেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি বড় বড় কথা ব্যবহার করিতে ভালবাসিতেন (যেমন Net—জাল, কথা বুঝাইতে শুনা যায়, তিনি বলিয়াছিলেন reticulated fibre dessicated at reguler intervals) কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভাব ও ভাষার মনোহারিত্ব ও কল্পনার বিশেষত্ব যেন বেশীই প্রকাশ পাইয়াছে।

গোল্ডস্মিথের লেখার দৃষ্টান্ত দিতে যাওয়া এক দুরূহ ব্যাপার। কারণ, তাঁহার প্রত্যেক পুস্তকে প্রত্যেক পদেই হাস্যরসের মাধুর্য্য এত পাওয়া যায় যে, সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী না পড়িলে সামান্য কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখান বৃথা মনে হয়। তাঁহার Village schoolmasterএর বর্ণনা (passing rich with forty pounds a year) পাঠ্যপুস্তকে উদ্ধৃত করা হয়। তাঁহার "She stoops to conquer" পুস্তক যখন বাহির হয়, তাহার পর রঙ্গমঞ্চে বহুদিন তাহা অভিনীত হইয়াছিল। Vicar of Wakefieldএ অর্থবিহীন কথাসমষ্টির উল্লাস প্রকৃতই হাস্যকর মনে হইবে। তাঁহার Chinese letterএ যে সব কাহিনী দেওয়া আছে, তাহাতে না হাসিয়া থাকা যায় না। তাঁহার Elegy (Mad dog, Madame Blaize, Parson Gray প্রভৃতি)তে অনুপ্রাসবহুল সাধারণ উক্তি ও কল্পনা অনেক লেখক অনুকরণ করিয়াছেন। তাঁহার Traveller ও Deserted village যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার পরিমার্জ্জিত হাস্যরস উপভোগ করিয়াছেন। গোল্ডস্মিথের

জীবনীতেও অনেক হাস্যরসের কাহিনী পাওয়া যায়। (Lord Macaulayর লিখিত জীবনী দ্রষ্টব্য)

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, সভ্যসমাজে মনোভাব গোপন করার জন্যই ভাষা পরিমার্জ্জিতভাবে ব্যবহার হয়। কোন স্থানে চা'য়ের নিমন্ত্রণে গেলে, নিকৃষ্ট চা' খাইয়াও বলিতেই হইবে—"এমন চা আমি জীবনে কোন দিন খাই নাই"। বয়স্থা বুড়ীকে দেখিয়াও বলিতেই হইবে, "আপনার চেহারা ও স্বাস্থ্য বেশ সুন্দর ভালই আছে দেখছি"—এইরূপ ভাষা ব্যবহার এখন সভ্য সমাজের নিয়ম হইয়াছে। মনোভাব ও মনোবৃত্তি প্রকাশ করা ভিন্নও ভাষা ব্যবহারে আর একটি বিষয় আছে—যাহা নাটকে অভিনয়ে ও ঘটনাবিশেষে কার্য্যকরী বলিয়া বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। তাহাকে ইংরাজী ভাষাতে Tact নাম দেওয়া হয় অর্থাৎ অবস্থাবিশেষ ঘটনাবিশেষকে অন্যরূপ অর্থ দেখাইয়া তাহার প্রকৃত স্বরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া—বিপদ হইতে বেন সহজে উদ্ধার পাওয়া। অনেকে ইহাকে Ready wit নাম দিয়া থাকেন (উপস্থিত বুদ্ধি অথবা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলা যায়)। সামাজিক আলাপ-পরিচয় ও ব্যবহারে সময় সময় এই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব যে কতখানি কি ভাবে কার্য্যকর হয়, তাহা বোধ হয় ডাঃ জন্সন এবং গোল্ডস্মিথের সময় হইতে আলাপে, ব্যবহারে ও সাহিত্যে বেশী প্রকাশিত হইতে থাকে। কথিত আছে, ডাঃ জন্সন এক স্থানে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া গরম আলুসিদ্ধ মুখে দিয়াই তাহা ফেলিয়া দিতে বাধ্য হন। ইহাতে উপস্থিত নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলা সকলেই বিরক্ত ও বিস্মিত হন, কারণ, তাহা অভদ্রতা ও "চাষাড়ে" বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ডাঃ জন্সন তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "অতি নির্ব্বোধ—বোকাও এই আলু গিলিয়া খাইতে পারে না।" সকলে এই কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল ও তাঁহার অভদ্রতা কেহই মনে করিতে পারিল না। নাট্যাভিনয়ে এরূপ Ready witএর দৃষ্টান্ত থাকে বলিয়াই তাহা এত মনোরম হয়—কি ভাবে কথাবার্ত্তার উত্তর-প্রত্যুত্তরে ঘটনাপরম্পরা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। Ready witএর অভাবে অনেক সময় বিপদ আসিয়া থাকে, সে দৃষ্টান্তও কম নহে। (পরে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইবে) গোল্ডস্মিথ নিজে কিছু "ডাক্তারী" করিতেন। তাঁহার একবার অসুখ হয়, ডাঃ জন্সন আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন। তিনি উত্তর করেন, "ওষুধ আমি নিজেই খাচ্ছি, অন্য ডাক্তারের আর দরকার নাই।" ডাঃ জন্সন তাঁহাকে বলেন, "তোমার ঔষধ ও চিকিৎসা তোমার নিন্দুক ও শত্রুদের জন্যই রাখিও।" এই, দুই বন্ধুর সময় হইতে হাস্যরসধারাতে একটা বিশেষ উন্নতি ও পরিবর্ত্তন দেখা যায়—এতাবৎ আমরা যাহার ফল ভোগ করিয়া নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। [ক্রমশঃ।

শ্রীকালিদাস বাগচী।

আত্মীয়া

ধরণীর পথপ্রান্তে অতি সঙ্গোপনে হে সুন্দরি! এলে যবে কাছে,
স্পর্শে তব মুঞ্জরিল জীর্ণপুষ্পদল অন্তরের মৌনবীথি-মাঝে,
পুলকের অলক্তকে প্রেমের প্রাঙ্গণ দীপ্যমান, হাসে দূর্ব্বাদলে—
উষসীর ছন্দোবদ্ধ নূপুর-নিক্কণে রাত্রি শেষ হ'ল পূর্ব্বাচলে।
নিরন্তর যুগান্তের যত মর্ম্মবাণী অনাসম্ন রহে অন্তরালে
কল্পনার সিন্ধুপারে স্বপ্নময়ী সদা, জাগে তারা তব নৃত্যতালে
আলো করি ভুবনের দিক্‌চক্রবাল। বাসনার শতদল ফুটে,
বসন্তের সমীরণে ভ্রমর-গুঞ্জনে কামনার স্রোতস্বিনী ছুটে।

রূপালোকে উচ্ছ্বলিয়া আত্মার আত্মীয়া! মাল্য দিলে পরম কৌতুকে,
প্রণয়ের সত্য-প্রীতি পুষ্পসম ফোটে সুরভিত এই দীর্ণ বুকে।
সৃজনের বীজ-নিদ্রা অলক্ষ্যেতে ভাঙি হৃদয়ের আরক্তিম রাগে,
নূতনের অভ্যুদয় নিভৃত-সাধনে আনিয়াছ তীব্র অনুরাগে।
জীবনের তীর্থপথে নীরব-মন্দিরে তুমি ক'র শিব আবাহন,
মাঙ্গল্যের দীপশিখা ধরিয়া অন্তরে আমি শুনি তব আরাধন।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।



ভানুমতী

ইন্দ্রজাল



আমাদের বাঙ্গালা দেশের পল্লী অঞ্চলে যাহারা ভেল্‌কী দেখায়, তাহারা আসর গরম করিবার জন্য বলে, 'লাগ ভেল্‌কী লাগ, ভানুমতীর দোহাই!' কেবল বঙ্গদেশে নহে, দক্ষিণ-ভারতেও ভানুমতীর নাম সুবিদিত এবং সেই অঞ্চলে 'ভানুমতী' শব্দের অর্থই ইন্দ্রজাল এবং ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া।

মিঃ টি, ডবলিউ লা' টৌস সেকেন্দরাবাদ-প্রবাসী ইংরাজ। তিনি লণ্ডনের কোন বিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় দক্ষিণাপথের কোন কোন স্থানে ভানুমতীর প্রত্যক্ষ প্রমাণের দৃষ্টান্ত প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, যদি কেহ সাহস করিয়া এ কথা বলে যে, সে প্রকৃতই এরূপ এক জন ভারতীয় যোগী দেখিয়াছে যিনি শ্রবণ-বিবরে কোন গাছের পাতা গুঁজিয়া অদৃশ্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলে লোক তাঁহার কথা অবজ্ঞাভরে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। কিন্তু যদি অন্য কেহ জোর গলায় বলে যে, এক জন বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক কোনও গুপ্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় (secret chemical process) অদৃশ্য হইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার এই উক্তি সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইতেও পারে। কারণ, আমাদের অনেকেরই বিশ্বাস, বিজ্ঞান অনেক অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন করিতে পারে।

প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে হায়দরাবাদ রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষ বিদর নগরের কতকগুলি সম্ভ্রান্ত অধিবাসীর নিকট হইতে একখানি আবেদন-পত্র পাইয়াছিলেন, এই আবেদনপত্রে তাঁহারা এই মর্ম্মে অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, এক দল চতুর অপরাধী 'ভানুমতী' নামক ইন্দ্রজালের সাহায্যে তাঁহাদের মধ্যে ভীষণ আতঙ্ক সঞ্চার করিয়াছে।

সমাজের সকল স্তরের লোক 'ভানুমতী' দলভুক্ত গুণীনদের দ্বারা উৎপীড়িত হইতেছিল, আবেদনপত্রে বিভিন্ন প্রকার উৎপীড়নের প্রণালী বর্ণিত হইয়াছিল। তাহাদের উৎপীড়ন অসহ্য হওয়ায় অবশেষে এই সকল ব্যক্তি সরকারের সহায়তা প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহারা আশা করিয়াছিল, সরকার তাহাদের অভিযোগের কারণ অনুসন্ধান করিয়া ঐ শ্রেণীর অত্যাচারীদের কবল হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন।

'ভানুমতী' নামক দলভুক্ত গুণীনদের অতিপ্রকৃত শক্তির অস্তিত্ব সরকারী ভাবে স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই প্রকার গুরু অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অভিযোগ অগ্রাহ্য করিবার উপায় ছিল না। এই জন্য হায়দরাবাদের দরবার ভারতীয় পুলিস সার্ভিসের এক জন উচ্চপদস্থ বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে এই দেশব্যাপী ও আতঙ্কজনক অভিযোগের কারণ অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত তথ্য নিরূপণের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। এই ইংরাজ পুলিসকর্ম্মচারীর নাম মিঃ এল্‌, বি, গোড।

পৃথিবীর সকল দেশের পুলিস-কর্ম্মচারীরা নিতান্ত গদ্য-প্রকৃতির লোক, তাহারা কোন কাল্পনিক বা অপ্রত্যক্ষ ব্যাপার বিশ্বাস করে না, যাহা তাহারা চক্ষুর সম্মুখে ঘটিতে দেখে, তাহাই তাহারা বিশ্বাসযোগ্য মনে করে। মিঃ গোডও এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। ভানুমতী সম্প্রদায় কোন অলৌকিক শক্তির অধিকারী, এ বিশ্বাস তাঁহার মনে স্থান পাইল না। এ সকল ব্যাপার আগাগোড়া প্রতারণাপূর্ণ, এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি তদন্ত আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু তদন্তে প্রবৃত্ত হইয়া যখন তিনি কতকগুলি অলৌকিক ঘটনার প্রমাণ সংগ্রহ করিলেন এবং ভানুমতী সম্প্রদায়ের অচিন্তপূর্ব্ব প্রভাবে অভিভূত কতকগুলি লোকের দুরবস্থা ও ভীষণ যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করিলেন, অথচ তাহার কোন সঙ্গত কারণ নির্ণয়ে অসমর্থ হইলেন, তখন ইহা যে প্রতারণা-পূর্ণ ও ভণ্ডামী মাত্র, এরূপ ধারণা তিনি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, এবং তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার মন ঘৃণায় ও আতঙ্কে পূর্ণ হইল। অবশেষে যখন তাঁহার তদন্ত শেষ হইল, তখন তিনি বিশ্বাস করিলেন যে, ভানুমতী সম্প্রদায় প্রকৃতই অলৌকিক শক্তির অধিকারী, এবং এই শক্তির পরিচালনায় বাধা দান করিতে হইলে আইনের সাহায্যে বিশেষ ব্যবস্থা-প্রণয়ন অবশ্য কর্ত্তব্য।

মিঃ গোড হায়দরাবাদ রাজ্যের সকল অংশেই তদন্ত শেষ করিয়া তাঁহার মনিব-সরকারে যে সুবিস্তৃত রিপোর্ট দাখিল করেন, তাহাতে বহু বিস্ময়াবহ বিচিত্র ঘটনার বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। এই রিপোর্টে তিনি স্বীয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই, অন্যান্য স্থান হইতে যে সকল বিশ্বাসযোগ্য অদ্ভুত ঘটনার বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাও তাহাতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ভানুমতী সম্প্রদায়-ভুক্ত গুণীনরা তাহাদের দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যে সকল মন্ত্রাদি ব্যবহার করে, ইন্দ্রজাল-বিদ্যা প্রয়োগের জন্য যে সকল দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হয়, তাহাও তাঁহার রিপোর্টে বর্ণিত হইয়াছে; এবং তিনি সুরঞ্জিত চিত্র (coloured drawings) দ্বারা তাঁহার বর্ণিত বিষয় পরিস্ফুট করিয়াছেন।

নানা কারণে এই রিপোর্ট গোপনীয় দলীলরূপে সংরক্ষিত হইয়াছে। যাঁহাদিগকে এই অনিষ্টকর প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে, তাঁহাদের নিকট এই রিপোর্ট-সংগৃহীত বিবরণগুলি অত্যন্ত মূল্যবান্‌।

এই রিপোর্টে প্রকাশ,—ভানুমতী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা এক জন ঋষি, তাঁহার নাম গোরক্ষনাথ। সম্প্রদায়ভুক্ত যে সকল লোক তাহাদের দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করে, সেই সকল মন্ত্রের অধিকাংশেই গোরক্ষনাথের ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, গোরক্ষনাথ মনুষ্য-সমাজের কল্যাণকামনায় এই বিদ্যা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু অনেক উৎকৃষ্ট বিষয় যেমন কালে বিকৃত হওয়ায় তাহা হইতে মন্দ ফল উৎপন্ন হয়, এই বিদ্যার পরিণামও এখন সেইরূপ হইয়াছে।

এখন লোকে ইতর মনোবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য, (to gratify baser human passions) শত্রুদের অনিষ্টসাধনের উদ্দেশ্যে বা অর্থ-সংগ্রহের অভিপ্রায়ে ভানুমতীর সহায়তা গ্রহণ করে। এই উদ্দেশ্যে ইহাদের ওস্তাদেরা যে সকল ঘৃণিত অনুষ্ঠান ও জঘন্য প্রক্রিয়ার সাহায্য গ্রহণ করে, তাহা এরূপ বীভৎস যে, যাঁহার

বিন্দুমাত্র আত্মসম্মানজ্ঞান আছে, তিনি এই ইতর সম্প্রদায়ে যোগদানে কুণ্ঠা অনুভব করিবেন।

যে সকল হতভাগ্য ব্যক্তি ভানুমতী সম্প্রদায়ের কবলে পতিত হয়, তাহাদিগকে অসহ্য যন্ত্রণাভোগ করিতে হয়, এবং তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিলে দুঃখ হয়। গুণীনদের ইচ্ছার উপর তাহাদের যন্ত্রণার স্থায়িত্ব নির্ভর করে। গুণীনদের প্রক্রিয়ার ফলে আক্রান্ত ব্যক্তির পরিহিত বস্ত্রে আগুন লাগে, তাহার খাদ্যদ্রব্য ঘৃণাজনক দ্রব্যে পরিণত হয়, সময়ে সময়ে তাহার চতুর্দ্দিকে শিলাখণ্ড বর্ষিত হয়; কিন্তু কোথা হইতে তাহা বর্ষিত হয়, তাহা জানিতে পারা যায় না! এতদ্ভিন্ন, আরও একরূপ বিরক্তিজনক ভয়াবহ ব্যাপার সংঘটিত হইতে দেখা যায়,—যাহার কারণ আবিষ্কার করা অসাধ্য। কিন্তু এই প্রকার উৎপীড়নের কোন কারণ স্থির করিতে না পারিয়া, আক্রান্ত ব্যক্তি আত্মরক্ষায় হতাশ হইয়া, অবশেষে কোন উপরওয়ালার (রোজার) শরণ গ্রহণ করে। এই রোজা সাধারণতঃ ওস্তাদের সহযোগে কার্য্য করে, এবং আক্রান্ত ব্যক্তিকে যন্ত্রণামুক্ত করিয়া যে দক্ষিণা আদায় করে, তাহা তাহার সেই সহযোগীর সহিত বখরা করিয়া লয়।

বস্তুতঃ, যখন এই সম্প্রদায়ের ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান কেবল অর্থলাভের উদ্দেশ্যেই নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন ওস্তাদ কোন রোজার সহযোগে কার্য্য করিয়া থাকে। এই মাণিকযোড় তখন এরূপ কৌশলে লোকের নিকট টাকা আদায় করে যে, ফৌজদারী আইনের কোন ধারায় তাহাদিগকে অভিযুক্ত করিতে পারা যায় না।

সুপ্রমাণিত ঘটনাবলী দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, কোন জাতি, কোন সম্প্রদায়, সমাজের কোন স্তরের লোক এই সকল ওস্তাদের অনিষ্টকর প্রভাব হইতে আপনাকে দূরে রাখিতে পারে না। যে সকল লোক সম্মোহন শক্তির অধিকারী, তাহারা যাহাদিগকে সম্মোহিত করে, তাহাদিগকে সম্মুখে রাখিয়া তাহাদের শক্তির পরিচয় প্রদান করে, কিন্তু যে সকল গুণীন ভানুমতী সম্প্রদায়ভুক্ত, তাহারা দূরে থাকিয়াই তাহাদের শক্তি প্রয়োগ করে। কিন্তু ইহাও দেখা গিয়াছে যে, পুলিস এই দলের কোন ওস্তাদকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে আবদ্ধ করিলে, সেই সময়ের জন্য সে শক্তিহীন হইয়া পড়ে (he is tempor ri y render d powerless)।

ভারতের পল্লী অঞ্চলে ইহাদের ইন্দ্রজাল-সংক্রান্ত অনেক অদ্ভুত ঘটনার বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়। কোন কোন গ্রামের সমস্ত লোক ইহাদের অত্যাচারে এরূপ ভীত ও নিরুপায় হইয়া পড়ে যে, তাহারা এই সকল গুণীনদের প্রতি দণ্ডবিধানের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করে, এবং যাহাদিগকে ঐন্দ্রজালিক বলিয়া সন্দেহ করে, তাহাদের প্রতি এরূপ ভীষণ অত্যাচার করে যে, তাহাতেই ভানুমতী দলের প্রতি তাহাদের ক্রোধ ও ঘৃণা পরিব্যক্ত হয়। এই প্রসঙ্গে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, মালাবার উপকূলে যে শ্রেণীর ইন্দ্রজালবিদ্যা প্রচলিত আছে, দাক্ষিণাপথের ভানুমতীর সহিত তাহার যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। 'মাদ্রাজ গবর্মেণ্ট মিউজিয়ম বুলেটিন' নামক পত্রিকায় একটি বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠে জানিতে পারা যায়, উক্ত অঞ্চলের 'ওদিয়ান' নামধারী ডাইনগুলি এরূপ শক্তি সঞ্চয় করে যে, সেই শক্তির সাহায্যে তাহারা ইচ্ছানুযায়ী অদৃশ্য হইতে পারে, এমন কি, আফ্রিকায় যেমন মানুষ বাঘের গল্প শুনিতে পাওয়া যায়, তাহারাও সেই ভাবে ব্যাঘ্রদেহ ধারণ করে।

যাহা হউক, দাক্ষিণাপথে ভানুমতীর প্রভাব কিরূপ ভীষণ, আদালতের একটি মামলার বিবরণ হইতে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল,

বাপু হনুমন্ত, মিত্র বানজী, বাপু রামজী এবং চীনা, এই চারি জন লোক অজ্ঞ গ্রামবাসীদের ভয়প্রদর্শন করিয়া টাকা আদায়ের অভিযোগে বিদরের ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে প্রেরিত হইয়াছিল। তাহাদের বিরুদ্ধে এই অপরাধের আরোপ করা হইয়াছিল যে, তাহারা ভানুমতীর সাহায্যে জনসাধারণের উপর ভয়ঙ্কর জুলুম করিয়াছিল।

অভিযোগে প্রকাশ, এই চারি জন লোক হামিদ আলি নামক এক ব্যক্তির স্ত্রীর প্রতি তাহাদের ঐন্দ্রজালিক শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল; তাহার ফলে সেই স্ত্রীলোকটি অসহ্য যন্ত্রণায় ধড়ফড় করিতেছিল। হামিদ আলি তাহার স্ত্রীর যন্ত্রণা দর্শনে ব্যাকুল হইয়া, তাহার যন্ত্রণাপ্রশমনের আশায় কোন ফকিরের শরণাপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু ফকির তাহার স্ত্রীর চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবার পর দেখিতে পাওয়া গেল, হামিদ আলির স্ত্রীর ন্যায় তাহাকেও



ফকিরও যন্ত্রণায় বে-এক্তার হইয়া পড়িয়াছে!

যন্ত্রণায় বে-এক্তার হইয়া পড়িতে হইয়াছে! কিছুকাল পরে ফকির সাহেব যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল, এবং সেই অবস্থায় তাহার মুখবিবর হইতে 'ভিলবান' নামক এক প্রকার তিক্ত ফলের বীজ (ভেলাবীজ) ও কণ্টক তরুর কাঁটা বাহির হইতে লাগিল।

আদালতে যে সকল সাক্ষী উপস্থিত ছিল, তাহাদের জেরায় প্রতিপন্ন হইল, আসামীরা হামিদ আলির নিকট এক জন কারপরদাজ পাঠাইয়া তাহাকে জানাইয়াছিল, ভানুমতীর ভেল্‌কী বড় শক্ত ভেল্‌কী, কোন ফকির সে যতই নিষ্পাপ হউক—ভানুমতীর ভেল্‌কী ছাড়াইতে পারে না। কেবল তাহারাই হামিদ আলির আউরৎকে সুস্থ করিতে পারে, এবং তাহার যন্ত্রণা দূর করিতে রাজী আছে—যদি হামিদ আলি তাহাদিগকে এক শত টাকা সেলামী প্রদান করে। তাহাদের ঐ প্রকার শক্তি আছে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য এক জন আসামী হামিদ আলির স্ত্রীর হাতে একটি

মন্ত্রপূত লেবু দিয়াছিল। আদালতে প্রতিপন্ন হইয়াছিল যে, হামিদ আলির স্ত্রী সেই লেবু স্পর্শ করিয়া পাঁচ দিনের জন্য সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিল।

যাহা হউক, হামিদ আলি ইচ্ছা করিয়াই হউক আর অর্থাভাবেই হউক, সেই 'রাস্কেল'গুলাকে টাকা প্রদান করে নাই। (No money was paid to the rascals) ইহাতে তাহারা সেই স্ত্রীলোকটিকে পুনর্ব্বার যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিল। নিদারুণ যন্ত্রণায় সেই অভাগিনী দিবা-রাত্রি আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তাহার আঙ্গুলে সর্ব্বদা ছুঁচ ফুটিতে লাগিল, কিন্তু সেই সকল ছুঁচ কোথা হইতে আসিত, তাহা কেহ দেখিতে পাইত না। অদৃশ্য হস্ত তাহার মস্তকের কেশগুচ্ছ ধরিয়া টানিয়া ছিঁড়িত। তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাল কাল দাগে ভরিয়া গেল।—নিশাদলে সুপারির কস মিশাইলে যেরূপ দাগ হয়, সেইরূপ দাগ।

সাক্ষীর জবানবন্দী হইতে ইহাও প্রতিপন্ন হইল যে, আসামী-দের এক জন অন্য জনের নিকট একটি হাণ্ডা গচ্ছিত রাখিয়াছিল, সেই হাঁড়ীর ভিতর অদ্ভুতাকৃতি কয়েকটি পুতুল, কাঁটাগাছের কতক-গুলি কাঁটা, এবং গাধার কাণ, খুর ও লেজ সংরক্ষিত ছিল।



হাণ্ডাটির ভিতর হইতে অদ্ভুতাকৃতি পুতুলাদি বাহির হইতেছে।

পুলিস এই সকল দ্রব্য-পূর্ণ হাণ্ডাটি সাক্ষীদের সাক্ষাতে সংগ্রহ করিয়া আদালতে দাখিল করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন অপরাধীদের ঘর হইতে পুলিস আরও অনেক অদ্ভুত পদার্থ ক্রোক করিয়া আনিয়া-ছিল।

অতঃপর আদালত ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষীদের জবানবন্দী হইতে সন্তোষজনকরূপে প্রতিপন্ন করিলেন যে, কাটরাস্থিত আসামীরা ভানুমতীর সাহায্যে জনসাধারণকে উৎপীড়িত করিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিবার জন্য অর্থের দাবী করিত। এই অপরাধে ম্যাজিষ্ট্রেট প্রত্যেক আসামীর প্রতি এক বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান করিলেন।

ভানুমতী-সংক্রান্ত আর একটি চাঞ্চল্যজনক মামলার বিচার-কল হইতে জানিতে পারা গিয়াছে ;—এক জন উকিলকে শোচনীয়-রূপে নিগৃহীত হইতে হইয়াছিল। প্রকাশ্য আদালতে সেই উকিল যখন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট মামলা করিতেছিলেন, সেই সময় উকিলকে বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। সেই সময় যে সকল লোক এজলাসে উপস্থিত ছিল, তাহারা সকলেই সেই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। সেই অদ্ভুত ঘটনাটি এই,—

বাপুজী নামক এক জন লোক এবং তাহার কয়েক জন বন্ধু বিদরের আদালতে বাপুজী ও তাহার কয়েক জন সহকর্ম্মীর বিরুদ্ধে একটা মামলা রুজু করিলে, মহম্মদ মুলতানী সাহেব নামক কোন উকিল ফরিয়াদী পক্ষে মামলা চালাইবার ভার গ্রহণ করেন।

বাপুজী ও তাহার দলের লোক ফৌজদারী সোপরদ্দ হওয়ায় ফরিয়াদী পক্ষের উকিল মুলতানী সাহেবকে এই বলিয়া ভয়প্রদর্শন করে যে, তিনি তাহাদের প্রতিকূলে মামলা চালাইলে তাঁহার দুর্গতির সীমা থাকিবে না। মুলতানী সাহেব তাহাদের এই স্পর্দ্ধায় বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাহাদিগকে বলেন, তিনি মামলা চালাইবেন, তাহারা তাহাদের যাহা সাধ্য করিতে পারে। তাঁহার উত্তর শুনিয়া আসামীরা তাঁহাকে সতর্ক করিবার জন্য পুনর্ব্বার বলে, যদি তিনি গো না ছাড়েন, তাহা হইলে তাঁহার অদৃষ্টে বিস্তর দুঃখ আছে। কিন্তু মুলতানী সাহেব ইহাতেও দমিলেন না। তাঁহার সঙ্কল্প অটল রহিল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে মামলার শুনানী আরম্ভ হইল। অবশেষে মুলতানী সাহেব বাপুজীকে জেরা করিতে উঠিয়া দেখিলেন, তিনি সম্মুখবর্ত্তী দেওয়ালকে জেরা করিতেছেন! বাপুজী তখন তাহার কাটরা হইতে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়াছিল। উকিল সাহেব আর সকলকেই দেখিতে পাইলেন, কিন্তু বাপুজীর টিকিও দেখিতে পাইলেন না! উকিল সাহেব মুখ চূণ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে দর-দর ধারায় ঘাম ছুটিতে লাগিল, এবং তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। ম্যাজিষ্ট্রেট এবং এজলাসের সকল লোক বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন ম্যাজিষ্ট্রেটকে নিরুপায় হইয়া সে দিনের মত মামলা মুলতুবি রাখিতে হইল।

মামলা মুলতুবি হইলে মুলতানী সাহেব আদালত হইতে বাড়ী ফিরিলেন। বাড়ীতে আসিতেই তাঁহার দুর্গতি আরম্ভ হইল। তিনি রাত্রিতে শয্যায় শয়ন করিলেন, কিন্তু ঘুমাইতে পারিলেন না, শয্যায় পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিলেন! তিনি সেই অস্থিরতার কারণ বুঝিতে পারিলেন না। কয়েকবার তন্দ্রার আবির্ভাব হইল, কিন্তু চক্ষু মেলিয়াই শিহরিয়া উঠিলেন, শয়নকক্ষের মৃদু দীপালোকে ঘরের দেওয়ালের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, উঃ, কি ভীষণ! দেওয়ালে একটা বিষধর সর্প যেন আঁকিয়া-বাঁকিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল!—'সসর্পে চ গৃহে বাসঃ' তিনি চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিলেন, কিন্তু দেওয়ালের নিকটে গিয়া সর্পের সাক্ষাৎ পাইলেন না; সর্পের ছায়াদেহ তাঁহার আতঙ্ক বৃদ্ধি করিল।

পরদিন প্রভাতে তিনি ঘরের বাহিরে যাইতেছিলেন, তাঁহার কন্যা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "বাপজান,

তোমার নাক যে কালো হইয়া গিয়াছে!" উকিল সাহেব আয়নায় মুখ দেখিলেন, সত্য, কেহ যেন তাঁহার নাসিকায় এক পোঁচ কালী মাখাইয়া দিয়াছে। তিনি রুমালে নাক ডলিলেন, সাবান দিয়া—জল দিয়া নাক ঘষিলেন, কিন্তু নাকের সে কালী মুছিল না।

সেই দিন মুলতানী সাহেব সভয়ে দেখিলেন, তাঁহার গলায় কাঁধে—বুকে ভেলার কষ দিয়া সর্প ও মনুষ্যদেহের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে! এই প্রকার শোচনীয় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তিনি আতঙ্কে বিহ্বল হইলেন, এবং পুলিসে ও ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এই অদ্ভুত ব্যাপার সম্বন্ধে এজাহার করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রথমে তাঁহার কথা বিশ্বাস করিতে না পারিলেও তাঁহার দেহে সেই সকল অদ্ভুত চিত্র দেখিয়া তাঁহার আতঙ্কের কারণ বুঝিতে পারিলেন।

অতঃপর মুলতানী সাহেবকে এই ভাবে ভয়-প্রদর্শনের জন্য বাপুজী ও তাহার সহযোগিগণকে ফৌজদারীতে অভিযুক্ত করা হইলে, তাহারা যে তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্য ভানুমতী-বিদ্যার সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিল, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রচুর প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদের অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া তাঁহার রায়ে এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, আসামীরাই এই কার্য্য করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের কার্য্য-প্রণালী যেরূপ অদ্ভুত, সেইরূপ দুর্ব্বোধ।

যে সময় এই প্রবন্ধ রচিত হইতেছিল, সেই সময় বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত সোলাপুরের টেলিগ্রাফ বিভাগের কর্ম্মচারী মিঃ ও ম্যাকম্যানস্ নিম্নলিখিত বিবরণটি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

"১৯৩২ খৃষ্টাব্দে এক দিন প্রাতঃকালে আমি আফিসে উপস্থিত হইয়া আফিসের পিয়নকে সেখানে দেখিতে পাইলাম না। পিয়ন কিঞ্চিৎ বিলম্বে আফিসে প্রবেশ করিলে দেখিলাম, সে তাহার মাথার পাগ্ড়ী এ ভাবে বাঁধিয়াছিল যে, তাহার কপাল পর্য্যন্ত ঢাকিয়া গিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তাহার ব্যবহারেও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম। আমি তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সন্তোষজনক উত্তর পাইলাম না। কিন্তু সে আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইবার সময় আমি তাহার কপালে তিনটি কৃষ্ণবর্ণ রেখা চিহ্ন (× × ×) দেখিতে পাইলাম। অন্য কোন ব্যক্তির ললাটে ঐরূপ চিহ্ন পূর্ব্বে কোনও দিন লক্ষ্য করি নাই, এজন্য উহার কারণ জানিতে কৌতূহল হওয়ায় আমি পিয়নকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার কপালের ঐ চিহ্নগুলির অর্থ কি?'

পিয়ন আমার প্রশ্নে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া বলিল, 'আমার কোন দুষমন ঐ চিহ্নগুলির জন্য দায়ী, সাহেব! সে হিংসার বশে এক জন গুণীন্‌কে ধরিয়া আমার উপর ভেল্‌কী খাটাইয়াছে। কাল রাত্রিতে আমি অন্যান্য দিনের মত বিছানায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়ি, কিন্তু হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; মনে হইল, আমার কপালে আগুনের 'ছ্যাঁকা' লাগিয়াছে! আমি তাহার কারণ জানিবার জন্য চেষ্টা করিলাম না। আজ সকালে জাগিয়া কপালের এই দাগগুলি দেখিতে পাইলাম। আমি কাপড় দিয়া ঘষিয়া, জল দিয়া ধুইয়া, ঐ সকল দাগ তুলিয়া ফেলিতে পারি নাই।'

কথাগুলি পিয়ন এ ভাবে বলিল যে, তাহা অবিশ্বাস করা যায় না; তথাপি আমার মনে হইল, সে সত্য কথা গোপন করিল। অতঃপর এই ব্যাপার লইয়া আমার সহকর্ম্মীদের মধ্যে আন্দোলন আলোচনা আরম্ভ হইল; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যে সকল দেশীয় লোক আমাদের আফিসে চাকরী করেন, তাঁহারা এই ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না। তাঁহারা অবিচলিত-ভাবে বলিলেন, 'কোনও গুণীন্ উহাকে 'গুণ' করিয়াছে! উহার কোন শত্রু কোন গুণীনের কাছে গিয়াছিল, সে তাহাকে কিছু প্রণামী দিয়া বশীভূত করায়, সেই গুণীন গুপ্ত প্রক্রিয়ার সাহায্যে উহাকে ঐ ভাবে দাগিয়া দিয়াছে। যদি ঐ পিয়ন এমন কোন ওস্তাদ গুণীনকে অর্থে বশীভূত করিয়া তাহার সাহায্য গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে ঐ কালো দাগগুলি ধীরে ধীরে অপসারিত করিতে পারে, উহার দেহে নূতন দাগ বসিবার আশঙ্কাও দূর হইতে পারে।'

এই সকল উক্তি অর্থহীন প্রলাপ বলিয়াই আমার ধারণা হইল। মনে হইল, এ দেশে সকল শ্রেণীর দেশীয় লোকের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলিত হইলেও এখনও ইহারা কুসংস্কারের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিল না! ইহা অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় নহে কি?

পূর্ব্বোক্ত পিয়ন পরদিন আফিসে আসিলে তাহার দুই গালে ও চিবুকের নীচে নূতন তিনটি রেখা চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। এই সকল চিহ্ন সে কোথায় পাইল, এ কথা জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, তাহার কোন অজ্ঞাত শত্রু গুণজ্ঞানের সাহায্যে এই ভাবে তাহাকে জ্বালাতন করিতেছে। তাহার এই অভিযোগ পূর্ব্ববৎ অবিশ্বাস করিয়া বলিলাম, 'তুমি এ অতি অসম্ভব কথা বলিতেছ। কোন লোক তোমার শরীর ঐ ভাবে দাগিয়া দিতেছে; তুমি ঘুমাইয়া থাক, এজন্য কিছুই জানিতে পার না। আমার উপদেশ শোন। রাত্রিতে শুইবার পূর্ব্বে তোমার ঘরের দ্বার-জানালা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিবে।'

সে আমার এই আদেশ পালন করিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিল। সে রাত্রিকালে আমার উপদেশ পালনও করিয়াছিল; কিন্তু তাহার সতর্কতা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়াছিল। কারণ, পরদিন আরও তিনটি নূতন রেখা চিহ্ন তাহার গলায় অঙ্কিত দেখিলাম সেই চিহ্নগুলি তিলচিহ্নের ন্যায় ত্বকের অংশ বলিয়া মনে হইল। তাহাতে সাবান দিয়া, জল ঢালিয়া, কিম্বা তাহা ঘষিয়া-মাজিয়া তাহার বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হইল না।

দেখিলাম, পিয়নটার দেহের বিভিন্ন অংশে প্রতিদিনই নূতন নূতন রেখা চিহ্নের আবির্ভাব হইতেছে, ইহাতে বেচারা ভয়ে ও দুশ্চিন্তায় অভিভূত হইল; ইহাতে আমারও জিদ বাড়িয়া গেল। আমি ভাবিলাম, এই ব্যাপারে কি গভীর রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে—আমাকে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেই হইবে। যদি পিয়নটাই কোন গুপ্ত কারণে আমার সঙ্গে চালাকী করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার ধাপ্পাবাজি ধরিয়া ফেলিব।

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া সেই রাত্রিতে আমি তাহাকে আফিসে শুইয়া থাকিতে আদেশ করিলাম। তাহাকে ইহাও জানাইলাম যে, সে আফিসে রাত্রিযাপন করিলে শত্রু-কবল হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিব। পিয়ন আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলে, আমি আমার বন্ধু মিঃ কামিয়ানোর সহিত পরামর্শ করিয়া রাত্রি জাগিয়া পিয়নকে পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করিলাম। এই ব্যবস্থায় প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিব বলিয়াই আমার প্রতীতি হইল।

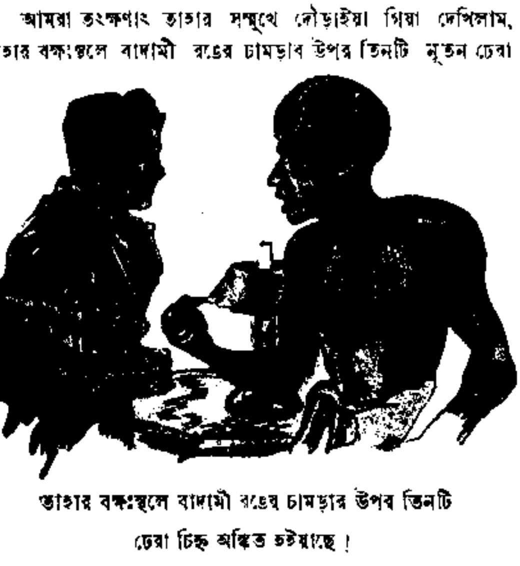
রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় পিয়ন আফিসে আসিলে তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য পুনর্ব্বার বলিলাম; কে তাহাকে রাত্রিকালে দাগিয়া যায়, তাহা আমরা পরীক্ষা করিব। সে ঘুমাইয়া পড়িলে আমরা অদূরে বসিয়া সারা রাত্রি তাহার পাহারা দিব। পিয়ন আমার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিল না বটে, কিন্তু তাহার হতাশ ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, আমরা যে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিব, এ কথা সে বিশ্বাস করে নাই।

তাহাকে শয়ন করাইবার পূর্ব্বে আমরা তাহার গাত্রবস্ত্র অপসারিত করিয়া তাহার নগ্ন দেহ পরীক্ষা করিলাম। দেখিলাম, পূর্ব্বে তাহার দেহে যে সকল কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন অঙ্কিত ছিল, তাহার অতিরিক্ত কোন নূতন চিহ্ন সে দিন তাহার দেহে অঙ্কিত হয় নাই। আমরা তাহাকে সেই কক্ষের মধ্যস্থলে শয়ন করাইয়া ঘরের সকল দ্বার-জানালা সতর্কভাবে রুদ্ধ করিলাম। দারুণ গ্রীষ্মে রুদ্ধ গৃহে রাত্রিযাপন করিতে আমাদের কষ্ট হইবে, তাহা বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু উপায় কি? কোন দিকে কোন ফাঁক রাখিলাম না। অবশেষে আমরা বাতির আলো কমাইয়া দিয়া মৃদু দীপালোকিত কক্ষের এক কোণে দুই বন্ধু পাহারা দিতে বসিলাম। সেই স্থানে বসিয়া পিয়নের সর্ব্বাঙ্গে দৃষ্টিপাতের কোন অসুবিধা হইল না।

পিয়ন আধ ঘণ্টার মধ্যে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল। কিন্তু আমাদের সময় যেন আর কাটে না। রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটার সময় আমার অত্যন্ত ঢুলুনি আসিল। বন্ধুটিরও প্রায় সেই অবস্থা দেখিয়া আমি উৎসাহভরে মৃদুস্বরে বলিলাম, 'যদি কোন অদ্ভুত ঘটনা ঘটে, তাহা হইলে তাহার আর অধিক বিলম্ব নাই।'

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আমার এই কথা বলিবার পর পাঁচ মিনিট অতীত না হইতেই পিয়নটা হঠাৎ জাগিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, 'সাহেব, সাহেব, আমাকে দাগিয়া দিয়াছে!'

আমরা তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখে দৌড়াইয়া গিয়া দেখিলাম, তাহার বক্ষঃস্থলে বাদামী রঙের চামড়ার উপর তিনটি নূতন ঢেরা



তাহার বক্ষঃস্থলে বাদামী রঙের চামড়ার উপর তিনটি ঢেরা চিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে!

চিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে। ঢেরাগুলি যেন তাহার বুকের মাংস কাটিয়া বসিয়াছিল!

সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে আমরা স্তম্ভিত হইলাম, এ কথায় আমাদের ঠিক মনের ভাব পরিস্ফুট হইবে না। আমরা হতবুদ্ধি হইলাম, আমাদের মুখে কথা সরিল না। আমি থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, সেই কক্ষে জনপ্রাণী প্রবেশ করে নাই; পিয়নও নিদ্রাঘোরে নড়ে নাই। দ্বার-জানালাগুলি পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ ছিল। তথাপি তাহার বুকে সেই তিনটি নূতন ঢেরার দাগ যেন তাহার বুকের মাংস কাটিয়া বসিয়াছিল! ইহা কি বিশ্বাস করিবার কথা?

পরদিন পিয়ন ছুটী লইয়া তাহার পল্লীগ্রামের বাড়ীতে চলিয়া গেল। কয়েক দিন পরে সে আফিসে ফিরিয়া আমাকে জানাইল—সে তাহার বাসগ্রামের এক জন গুণীনকে তাহার বিপৎসংক্রান্ত সকল কথা বলিয়া তাহার সহায়তা প্রার্থনা করিলে, সেই গুণীন্ যাগযজ্ঞ করিয়া তাহার দেহ মন্ত্রপূত করিয়া দিয়াছে। সেই গুণীন তাহাকে বলিয়াছে, ভবিষ্যতে আর তাহাকে কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সেই দিন হইতে পিয়নের দেহে আর কোন নূতন ঢেরা চিহ্ন অঙ্কিত হয় নাই, এবং পূর্ব্বের দাগগুলিও ধীরে ধীরে তাহার দেহের ত্বকে মিলাইয়া যাইতে লাগিল।

অতঃপর মিঃ লা টোস লিখিয়াছেন,—"প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে আমেদনগর হইতে ভানুমতীর অত্যাচার-সংক্রান্ত একটি ঘটনার বিবরণ কোনও দেশীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক জন উকিল ও এক জন সম্রান্ত জমিদার এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

মুক্তানল হরি দুবে কৃষক। এক পুত্র, পুত্রবধূ এবং তিনটি পৌত্র ও পৌত্রী লইয়া তাহার সংসার। গত দুই বৎসর হইতে তাহার পুত্রবধূ কোন অদৃশ্য শক্তি দ্বারা নানাভাবে উৎপীড়িত হইতেছে। কখন কখন অদৃশ্য হস্ত রজ্জু দ্বারা তাহার গলায় ফাঁস দিয়া শ্বাস রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করে। তাহার উপর তাহার সর্ব্বাঙ্গে ভেলার কাল রসের ঢেরা ও দাঁড়ির চিহ্ন।



অদৃশ্য হস্তের উৎপীড়নে যন্ত্রণাভোগ করিতেছে!

গ্রামের সকল লোকের ধারণা, এই নারী কাহারও নিদারুণ অভিসম্পাতে এই প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল। কিন্তু কেহই এ পর্য্যন্ত ইহার কারণ নির্ণয় করিতে পারে নাই। পূর্ব্বোক্ত উকিল

বলেন, তিনি স্ত্রীলোকটির দুঃসহ যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা কোন মনুষ্যের কার্য নহে, এ কথা তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন, তাহার কেশরাশি অদৃশ্য হস্তে তাহার মস্তক হইতে উৎপাটিত হইয়াছে, এবং সে ভেলা-ফলের বীজ উদ্গিরণ করিয়াছে। কিন্তু এই অত্যাচারের সময় স্ত্রীলোকটির জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হয় না। অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় এই প্রকার পীড়নের পরিচয় পাওয়া যায়। যখন তাহার কণ্ঠে অদৃশ্য হস্তে রজ্জুর ফাঁস দেওয়া হয়, তখন যাহাতে শ্বাস-রোধে তাহার মৃত্যু না হয়, এ বিষয়ে লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন হয়। তাহার স্বামী ও পুত্রকন্যাদের দেহেও কখন কখন ভেলার কষের কাল দাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

মিঃ গোড এইরূপ বহু প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি যে সকল অত্যাচারের প্রত্যক্ষদর্শীর নাম প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এক জন রোমান ক্যাথলিক পাদরী ও সরকারের এক জন পদস্থ কর্ম্মচারীরও নাম আছে।

গত ২৮এ জানুয়ারী (১৯৩৫) মাদ্রাজের বিখ্যাত দৈনিক 'হিন্দু'তে এই প্রকার অলৌকিক উৎপীড়ন প্রসঙ্গে তাঁহাদের কুডাপার সংবাদ-দাতা যে অদ্ভুত সংবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

"কুডাপা, ২৭এ জানুয়ারী।

স্থানীয় উকিল মিঃ পি, সুব্বা রাও৷র গৃহে যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, তাহার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। এক এক সময় জলপ্রবাহ উৎসারিত হইয়া সুব্বা রাওর বৃদ্ধ পিতার সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত করে, কিন্তু সেই জলরাশি কোথা হইতে কিরূপে আসে, তাহা কেহ জানিতে পারে না। এক এক সময় কোন অদৃশ্য হস্ত গৃহমধ্যস্থ দ্রব্যাদির উপর লোষ্ট্র বর্ষণ করে, এবং তৈজসপত্রাদি বহন করিয়া কূপে নিক্ষেপ করে। কখন কখন তাঁহার গৃহে বিনা কারণে আগুন জ্বলিয়া উঠে এবং বিভিন্ন দ্রব্য সেই অগ্নিতে দগ্ধ হয়। সুব্বা রাওর কতকগুলি নথিপত্র একটি আলমারিতে আবদ্ধ ছিল, গতকল্য হঠাৎ আলমারির ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিয়া সেগুলি ভস্মীভূত করিয়াছে। ঘরে একখানি ধুতি ঝুলিতেছিল, তাহাতেও আগুন লাগিয়াছিল।

আজ প্রভাতে কালেক্টর মিঃ নরসিংহম পান্তালু, আপনাদের সংবাদ-দাতা এবং অন্যান্য ব্যক্তি সেই গৃহে গমন করিয়া উক্ত ভস্মীভূত নথিপত্রগুলি, কাপড়খানি এবং প্রস্তরখণ্ডগুলি দেখিয়া আসিয়াছেন। একখানি প্রস্তর ঘড়ির উপর নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাও বুঝিতে পারা গেল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যে কক্ষে গৃহবিগ্রহ ও পূজার পাত্রাদি সংরক্ষিত হইয়াছে, সেই কক্ষে কোন দিন কোন প্রকার অত্যাচার হয় নাই।

এই সকল অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হইবার কোন সময় নির্দ্দিষ্ট নাই। গৃহবাসীরা দারুণ আশঙ্কায় ও উৎকণ্ঠায় কাল যাপন করিতেছেন, কাহার কখন্ কি বিপদ ঘটে, তাহা অনুমান করা অসাধ্য। এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার জন্য পুরুষ ও নারীরা দলে দলে সর্ব্বদাই ঘটনাস্থলে সমবেত হইতেছেন।

কয়েক দিন পূর্ব্বে এক জন ভিক্ষুক মিঃ সুব্বা রাওর বাড়ীতে ভিক্ষা লইতে আসিলে, সুব্বা রাওর বৃদ্ধ পিতা তাহাকে দুর্ব্বাক্য বলিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। ঠিক সেই দিন হইতে তাঁহার বাড়ীতে এই সকল ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। সেই ভিক্ষুককে বিতাড়িত করিবার সহিত এই সকল ব্যাপারের কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা অনুমান করা অসাধ্য। কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণের ধারণা, এই বাড়ীতে অপদেবতার ভর হইয়াছে।"

কিন্তু ইহাও কি ভানুমতীর প্রভাবের ফল ?

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় ;

প্রার্থনা

ভোরের পাখী গাইবে যখন তরুর শাখে,
ভোরের রবি ভাস্‌বে যখন আমার আঁখে ;
তখন যেন তোমার ছবি আমার মনে
বাজায় বীণা মোহন সুরে ফুলের বনে।

সূর্য্য যখন মাঝ গগনে উঠবে জ্ব'লে,
নদী যখন বইবে মাণিক জেলে জলে
আমার এ-মন ছন্দে-গানে পাগল হয়ে
তোমায় বরণ করে তখন সকল স'য়ে।

সাঁঝের ছায়ায় নিখিল যখন উঠবে কেঁদে,
শেষের ক্ষণে বিদায়-লিপি বক্ষে বেঁধে,
তখন যেন তোমার পানে দু'হাত তুলি'
তোমারে পাই বুকের মাঝে, সকল ভুলি।

শ্রীহলধর মুখোপাধ্যায়।



ভালবাসা ?

[গল্প]

ঘুমটা হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল।

"ভালবাস ?"

"ভালবাসি।"

অল্প একটু অলঙ্কার-শিঞ্জিনী মৃদু কণ্ঠের ঐ দুটি কথা ও নিস্তব্ধ রাত্রির নিশ্চল বাতাসের গায়ে সামান্য পুষ্পসার-সৌরভ —ঘুমের রাজত্ব হইতে আমাকে বাস্তবের ভূমিতে টানিয়া আনিল।

গলির ও-পারেই ছোট ঘরখানি স্যাঁতসেঁতে ও অন্ধকারময়। বাতাস কখনও এই অন্ধকারের বুকে আশার হিল্লোল তোলে না; অন্ধকার আলোককে জানালার প্রান্তে নির্ব্বাসিত করিয়া সগর্ব্বে সমস্ত ঘরখানিতে ঘুরিয়া বেড়ায়। এত দিন অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল; সম্প্রতি এ-বাড়ীর এক কন্যার বিবাহে স্থান-সঙ্কুলান না হওয়ায় সকলে গৃহ-জামাতার জন্য এই একান্ত নির্জ্জন কক্ষটি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। শালী-সম্পর্কীয়ারা আড়ি পাতিতে পারেন না,—এক পাতে ত পথচারী পথিক। তায় গভীর রাত্রিতে দরিদ্র অর্দ্ধভুক্ত বস্তীবাসীদের সে উৎসাহটুকুর একান্ত অভাব। সুতরাং নিরুদ্বেগে ও নিঃশঙ্ক চিত্তে নূতন দম্পতির আলাপ-প্রলাপ চলিতে থাকে।

গলির এ-পারে আমার ঘর, কিন্তু নির্ভীক দম্পতি লজ্জা-কুণ্ঠাশূন্য হইয়া স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠেই আলাপ করে। তাহাদের আলাপ শুনিবার মত উৎসুক কর্ণের একান্ত অভাবই তাহাদের সাহসকে বাড়াইয়া দিয়াছে। যাহা হউক, আলাপ চলিতেছিল—

"ভালবাস ?"

"ভালবাসি।"

"সত্যি ?"

"সত্যি। সত্যি। সত্যি।"

সত্য ও ভালবাসার কয়েকটি কঠিন ও নির্ম্মম শপথ হইয়া গেল। তার পর আর কিছু শোনা গেল না। মনে মনে হাসিলাম। ভালবাসা ? প্রথম দর্শনে অজ্ঞাত অপরিচিত দুটি হৃদয় পরস্পরের সন্নিকটে আসিয়া পরিচিত হইতে সে-টুকু সময় লাগে, তাহারই মধ্যে ভালবাসার বন্ধনী দিয়া উহারা ঐ পরিচয়টুকু নিবিড় করিয়া লইতে চাহে!

পার্শ্বে চাহিয়া দেখিলাম, ভালবাসিবার সামগ্রী রহিয়াছে। কিন্তু দীর্ঘদিন চলিয়া গিয়াছে—ও-পারের ঘরখানিতে যে উচ্ছ্বাস ভরিয়া উঠিয়াছে, এ পারে তা আবেগহীন—শান্ত। ওখানে উঠিয়াছে তরঙ্গ-তুফান, এখানে পড়িয়া আছে স্থির-শান্ত নদী। ও-পারের বৃক্ষ নব-বসন্ত-সমাগমে শ্যামপত্র-সমারোহে উন্মদ-সৌন্দর্য্যকে দিকে দিকে ছড়াইয়া দিয়াছে, এ-পারের বৃক্ষের অবনত শাখা ফলের ভারে সমৃদ্ধ—ফুলের বিকাশে আপনাতে আপনি সৌন্দর্য্যময়।

একদিন ছিল—ভালবাসার শপথ করিতে যখন কণ্ঠ কম্পিত হইত না, উল্লসিত দুটি ওষ্ঠপুট ক্লান্তিহীন আবেগে উঠা-নামা করিত—চক্ষুর দৃষ্টি ছিল মুগ্ধ, অপলক।

এই নিশীথ রাত্রির পারে বহুদিবসের বিস্মৃত রাত্রি ও দিনগুলি ভাসিয়া আসিল এবং পরস্পর গ্রন্থিবদ্ধ হইতে লাগিল। সে এক কাহিনী।...

বয়স তখন আমার বাইশ-তেইশ। ভালবাসা না বুঝিয়া তখনই ভালবাসিবার শপথ করা যায়,—ভালবাসা চিনিবার সময় নহে।

তেমনই দিনে লীলার সঙ্গে আমার আলাপ হয়।

গ্রীষ্মের ছুটীতে বহুদূরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। হরিদ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া মনে হইল—এই দারুণ গ্রীষ্মে মুসৌরী চলিয়া যাই—সময়টা কাটিবে ভাল। বাঙ্গালার পল্লীপ্রান্তে গিয়া কেন আর গ্রীষ্মে কষ্টটুকু ভোগ করি ? যদিও সেখানে মা

আছেন, ভাই-বোনেরা আছে, স্নেহ আছে—আদর-সোহাগ আছে······

যাহা হউক, মুসৌরী পর্য্যন্ত আর যাওয়া হইল না, দেরাডুনের একটা হোটেলে আশ্রয় লইলাম এবং কয়েক দিন হোটেল বাসের পর যেখানে আশ্রয় মিলিল—সেখানে গৃহের স্নেহ-যত্ন যেন নূতন করিয়া উপভোগ করিতে লাগিলাম।

হরিদ্বার হইতে দেরাডুন আসিতে ট্রেণের সঙ্গী ছিলেন এক প্রৌঢ় বাঙ্গালী। কলিকাতার কোন উপকণ্ঠস্থিত ট্রেণের কামরায় হইলে দু'জনের সম্মুখে কাগজের, বইয়ের কিম্বা মৌনতার পর্দ্দা শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকিত। কিন্তু বিদেশ—বাঙ্গালীর সঙ্গ—একটি মুহূর্ত্তের তরেও সে-আবরণ ছিল না।

ইনি অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। গ্রীষ্মের কয়েক মাস প্রতি বৎসরই এখানে আসিয়া থাকেন।

আলাপে প্রকাশ পাইল, আমাদেরই গ্রামের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে ইঁহার বাসস্থান ও বাবার এক জন—বিশিষ্ট না হউন—বন্ধু বটে। বাবার মৃত্যু-সংবাদে দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং সব দুঃখের সান্ত্বনাস্বরূপ আমার উপর অতিরিক্ত স্নেহ দেখাইয়া তাঁহার ভবনে থাকিবার অনুরোধ করিলেন। সবিনয়ে সে-অনুরোধ কাটাইয়া দিলাম।

আমাকে নূতন জানিয়া এই ঘণ্টা কয়েকের পথে—যত কিছু দ্রষ্টব্য স্থানের বিবরণ শোনাইয়া দিলেন এবং সেগুলি ভাল করিয়া দেখিতে অন্ততঃ মাসখানেক সময় লাগিবে, তাহাও জানাইলেন। তাঁহার বর্ণনীয় বিষয়ে কবিত্ব ছিল অল্প; কিন্তু আমার মনে হইল, রুক্ষ পাহাড়ের বুকে নীলিমার আলিঙ্গনটুকু—সন্ধ্যার অন্ধকারে আনত-আঁখি তারা-বধূর চুপি চুপি কথা কহার মধ্যে রহস্য কিছু আছেই এবং সে-রহস্য কবিত্ব-মণ্ডিত।

যাহা হউক, হোটেলে উঠিলাম।

আমার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া বিশ্রামান্তে তাঁহার বাসায় যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ তিনি অনুরোধ করিলেন এবং তাহাতে আমার পথ-ভ্রান্তির কোনরূপ সুযোগ উপস্থিত না হয়, তাহার জন্য গন্তব্য স্থানের সহজ নিদর্শন জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদেশে এমন সহায় পাইয়া মনটা বেশ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

কিন্তু ক্লান্তি বশতঃ সে-দিন আর হোটেল ত্যাগ করিলাম না। পরদিন প্রাতঃকালে চায়ের হাঙ্গামা চুকাইয়া তাঁহার বাসায় উপস্থিত হইলাম। সেখানে তখন চায়ের আয়োজন-পর্ব্ব চলিতেছিল। খালি চেয়ারটা দেখাইয়া তিনি বসিতে বলিলেন। বসিলাম।

চায়ের টেবল ঘেরিয়া যে বসিয়া ছিল—সেটি তরুণী। কিন্তু আমি অকুণ্ঠিত-চিত্তে বলিতে পারি, তাহার মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু দেখি নাই বা সেখানে রোমান্সের নাম-গন্ধও ছিল না। নিতান্ত সাদা-সিধা ধরণের মেয়েটি, রং ময়লা, গড়ন ছিপ ছিপে, গতি মৃদু—আসন্ন সন্ধ্যার মত একটি স্নিগ্ধ-শান্ত শ্রী তাহার চারিদিকে নিবিড় হইয়া ফুটিয়াছে। শুধু দুটি আয়ত কৃষ্ণতার পক্ষ্মাবৃত উজ্জ্বল নয়ন দেখিয়া ক্ষণিকের তরে সে-দিকে চাহিতে ইচ্ছা হয়।

নামটি শুনিলাম—লীলা। তাঁহার একমাত্র কন্যা। লীলাকে দেখিয়া মনে হইল—যে-সব শিক্ষিতা মহিলার অকুণ্ঠিত চাঞ্চল্যের কাহিনী বন্ধুবর্গের মুখে শুনিয়াছি, এ যেন সেই হিসাবে একটু অতিরিক্ত লজ্জাশীলা। কথা বেশী কহে না, তর্কও করে না—শুধু নীরবে সমস্ত শুনিয়া যায় ও কোন বিষয়ে মত প্রকাশ করিতে হইলে ধীরে সংক্ষেপে আপনার মত ব্যক্ত করে। কেহ মতের বিরুদ্ধে তর্ক তুলিলে হয়তো একটু হাসে, কিন্তু প্রতিবাদ করে না। অগত্যা প্রতিপক্ষকে থামিতে হয়।···

তিনটি দিন পরে এক দিন লীলা আমাকে বলিল, "আর ত হোটেলে থাকা আপনার ভাল দেখায় না। বাবা কাল কত দুঃখ করছিলেন।"

কি বলিতে যাইতেছিলাম—মৃদু হাসিয়া লীলা বলিল, "আপত্তি করবেন না। আজই আসুন।"

বলা বাহুল্য, আমার যত কিছু আপত্তি লীলার মৃদু হাসির বক্ষে ঠেকিয়া অগ্রাহ্য হইয়া গেল। তল্পীতল্পা গুটাইয়া সেই দিন অপরাহ্ণে ও-বাড়ীতে আসিয়া উঠিলাম।

এইবার আপনারা হয়তো ভাবিবেন,—তাহার পর লীলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া চলিল। তাহার কালো রূপে মনের অন্ধকার-কানন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, কুঞ্চিত কেশ বহিয়া অলকার মাধুর্য্যভরা মেঘরাশি নামিতে লাগিল এবং দীর্ঘ কৃষ্ণতার নয়নে মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুদ্বহ্নি চমকিতে লাগিল।

কিন্তু এই পাহাড়ের দেশে আকাশ ও মেঘ যেখানে

মুখোমুখী হইয়া প্রতিদিনকার সুখ-দুঃখের কাহিনী আলোচনা করে, বাতাস উত্তর-মেরু হইতে প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হয়, মলয়ের কোন পরিচয়ই রাখে না, উর্দ্ধশীর্ষ দেবদারু ধ্যানমগ্ন ঋষির মত স্তব্ধ মৌন, পাহাড়ের বুকে সন্ধ্যায় আলোর কমল ফুটিয়া ওঠে, তারার হাসি সে আলোর দীপ্তিতে ম্লান হইয়া গেলেও নীলের সৌন্দর্য্যটুকু নূতন করিয়া ফুটিয়া ওঠে, সেখানে কাব্যের অনেক উপাদান থাকিলেও বাস্তবকে কল্পনা করিতে ইচ্ছা করে না। হাতের কাছে পাওয়া জিনিষকে মর্য্যাদা না দিয়া দূরের দুর্গম বস্তুকে সবটুকু আগ্রহ ঢালিয়া দিতে মন চায়। বাগানে ত প্রতিদিন অবহেলায় কতই না গন্ধ-ভরা রক্ত গোলাপ ফুটিয়া থাকে—তবু বিশেষ দৃষ্টি পড়ে তোড়া-বাঁধা সযত্ন-রক্ষিত গোলাপটির উপর। শুধু রূপ থাকিলে কি হইবে—সাজাইতে জানা চাই।

তা বলিয়া বিদেশের এই অকৃত্রিম স্নেহ-ভালোবাসা উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত যে হই নাই, এ কথা বলা চলে না।

প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর এবং অপরাহ্ণ হইতে রাত্রির প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত লীলার সঙ্গ আমার বড়ই মধুর লাগিত। তাহাতে উন্মাদনা ছিল না, আবেগ ছিল না—অবসাদ বা ক্লান্তিও অনুভব করি নাই।

সে দিন বিকালবেলা 'ক্যামেল্‌স্ ব্যাক' হইতে ফিরিতেছিলাম—লীলাও সঙ্গে ছিল। উঁচু-নীচু পথে চলিতে চলিতে উভয়েই পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম। ইচ্ছা, একটু বিশ্রাম করি, কিন্তু সূর্য্য পাহাড়ের অন্তরালে অদৃশ্য হইতেছেন বলিয়া শ্রান্তপদের গতি বাড়াইয়া দিলাম।

লীলা হাঁপাইতে হাঁপাইতে একখানা পাথরের উপর বসিয়া বলিল, "বসুন। একটু না জিরিয়ে নিয়ে চলতে পারবো না।"

তাহার সম্মুখে একখানা পাথরে বসিয়া বলিলাম, "এ দিকে যে সন্ধ্যে হয়ে এলো—লীলা।"

লীলা অল্প একটু হাসিয়া উত্তর দিল, "তা হোক, এ পথে ভয়ের কোন কারণ নেই। আর জ্যোৎস্না-রাত আছে, পথ চিনে যেতে কষ্ট হবে না।"

চারিদিক প্লাবিত করিয়া জ্যোৎস্নার বান ডাকিল। পাহাড়, গাছপালা, আকাশের ছোট বড় নক্ষত্র—সেই আলোক-প্রবাহে মায়াময় হইয়া উঠিল। শুধু বিজলী-আলোর রেখা এই মায়া-সুন্দরীর গলায় মালার মত জ্বলিয়া জ্বলিতেছিল।

পাহাড়ের যে অনুচ্চ প্রস্তরখণ্ডের উপর আমরা বসিয়াছিলাম, তাহার চারিদিক ঘিরিয়া শুভ্র জ্যোৎস্না কুয়াশা রচিত হইয়া মেঘের এক অলকাপুরীতে আমাদের দুটিকে মাটীর জগৎ হইতে চুপি চুপি আনিয়া কে যেন বসাইয়া দিয়া গিয়াছে!

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া লীলা আনন্দে মাথা দোলাইয়া বলিল, "এ বেশ ভাল লাগছে, নয়? আমার আর উঠতে ইচ্ছে করছে না।"

লীলার কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হইলাম। আবেগ-বিহ্বল এই স্বর কোন দিন ত তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হয় নাই। একটু ব্যস্ত হইয়া বলিলাম, "চল, উঠি।"

লীলা ক্ষুদ্র বালিকার মত আমার হাত ধরিয়া উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলিল, "না, না, আর একটু বসি। কেমন সুন্দর পাহাড়—কি সুন্দর জ্যোৎস্না! আচ্ছা মোহন বাবু—চিরকাল এই জ্যোৎস্নার মধ্যে ডুবে থাকা যায় না? তা হলে কিন্তু বেশ হয়।"

ডুবিয়া থাকা যে যায় না, তাহা উভয়েই জানি। কিন্তু মায়া-বিহ্বলতায় এমন ইচ্ছা কি মাঝে মাঝে জাগে না?

বসিয়া বলিলাম, "এই ব'সে ব'সে স্বপ্ন দেখা কি বিলাস নয়, লীলা?"

লীলা বলিল, "কেন? এও ত জীবনের একটা পরিপূর্ণতা!"

হাসিয়া বলিলাম, "খাওয়া-শোওয়ার মত ওরও একটা ধর্ম্ম আছে বুঝি?"

লীলা বলিল, "আছে। মনের ধর্ম্ম গণ্ডীতে বাঁধা নয়, উদার মুক্তির কোলে সে ধর্ম্মের জন্ম। আমার মন—আমার চোখ যদি এই সন্ধ্যার মায়ায় মোহমুগ্ধ হতে চায় ত তাকে জোর ক'রে ফেরাবার কি প্রয়োজন?"

বলিলাম, "তা হ'লে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি নিয়ে তর্ক করতে হয় এবং প্রবৃত্তিকে যদি বাধাশূন্য উদ্দাম—"

লীলা হাসিয়া উঠিল, বলিল, "উচ্ছৃঙ্খল,—বলুন—বলুন, বিশেষণ প্রয়োগে কুণ্ঠিত হবেন না। আমি অভয় দিচ্ছি আপনাকে—যা সুন্দর—যা মনোহর, তার মধ্যে ও সব

থাকতেই পারে না। পূজার একাগ্রতা যদি অসংযম হয়, ধ্যানের মন্ত্র যদি মন-ভুলানো হয়, ত্যাগের তপস্যা যদি মানব-মনের বিকার হয় ত এই সন্ধ্যার মায়াও না হয় মায়াই রইল। তাতে কি এলো গেল বলুন ত সংসারের ?" একটু থামিয়া বলিল, "কিন্তু তপস্যার—ত্যাগের—ধ্যানের যেমন সার্থক মূল্য আছে, এই মায়ার মধ্যেও একটুখানি সত্য লুকোনো নেই কি ? নৈলে সুন্দরকে ভালবাসতে আমাদের মন চায় কেন ?"

এ তর্কের অন্ত একটা দিক। নিষ্পত্তির এবং তর্কের অনিচ্ছা ত যুক্তির মধ্যে নিহিত। সুতরাং এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া বলিলাম, "আর ভাল লাগছে না, এখানে প্রায় মাসখানেক হলো এসেছি—"

লীলা বলিল, "ভাল লাগছে না ? তা এত দিন বলেন নি কেন ?"

কেমন একটু কৌতুক করিবার ইচ্ছা হইল। বলিলাম, "বললে কি করতে ?"

লীলা বলিল, "দেশে যাওয়ার উদ্যোগ ক'রে দিতাম। জানেন মোহন বাবু, আমার বাবা বলেন—দেহমন্দিরে মন হচ্ছেন দেবতা। তাকে অসন্তুষ্ট করলে ধর্ম্মহানি হয়।"

বলিলাম, "তবে ত আমার এই দণ্ডেই দেরাদুন ত্যাগ করা উচিত। কিন্তু আমি গেলে তোমার একটুও কষ্ট হবে না কি ?"

লীলা সহজ কণ্ঠে বলিল, "হবে। কিন্তু উপায় কি ?"

কেমন একটা আঘাত আসিয়া লাগিয়া মনে আনন্দও হইল; আনন্দের সঙ্গে আগ্রহও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। বুঝিলাম, এই কৌতুক নিষ্ঠুর, কিন্তু দমন করিতে পারিলাম না। বলিলাম, "আমার জন্যে তোমার কষ্ট হবে কেন লীলা ? আমি ত তোমার কেউ নই।"

লীলা বারেক আমার পানে চাহিয়া চক্ষু নত করিল। জ্যোৎস্নার মৃদু আলোকে তাহার মুখের আরক্তিম ভাব দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু কণ্ঠে কম্পন ফুটিয়া উঠিল।

লীলা বলিল, "আপন-পর কেউ ত আঁচড় কেটে লিখে দেয় না, যাকে ভাল লাগে, সেই আপন। আত্মীয়তার বাইরে এ জিনিষ।"

মনটা মুহূর্ত্তে দুলিয়া উঠিল। তরুণী—তা সে না হউক সুন্দরী, নাই থাকুক তাহার অসীম আকর্ষণী শক্তি, কণ্ঠের ঐ মৃদুল ঝঙ্কারটুকু এই জ্যোৎস্না-পুলকিত নির্জ্জন পাষাণ-প্রাচীর-ঘেরা মায়াপুরীর সুরম্য উপত্যকায় বড় মধুর হইয়াই মনের অনাহত তারগুলি ছুঁইয়া গেল। আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে কহিলাম, "লীলা, তুমি আমায় সত্যই ভালবাস ?"

স্বর কাঁপিয়া উঠিয়া—নির্জ্জন পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হইয়া আমারই অন্তরে আসিয়া বাজিল। অমনই মোহ টুটিয়া গেল। ছি! যাহাকে কোন দিন হৃদয়ের এক প্রান্তে এতটুকু স্থান দিই নাই, আজ মুহূর্ত্তের মোহ-বশে তাহার সঙ্গে এ কি প্রতারণা করিতেছি ?

কিন্তু ভাবিবার সময় আর ছিল না। লীলা আমার হাতখানি ধীরে ধীরে তাহার হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া কোমল কণ্ঠে বলিল, "ভালবাসি।"

একখণ্ড কালো মেঘ সেই মুহূর্ত্তে চন্দ্রকে ঢাকিয়া ফেলিল, পাতলা অন্ধকারের যবনিকায় গিরিপ্রান্তর ঢাকিয়া দিল। আমি চঞ্চল হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বলিলাম, "চল, বাসায় ফেরা যাক।"

লীলা এক মুহূর্ত্ত থামিয়া আমার কথার অসঙ্গতিজনিত আঘাত সামলাইয়া লইল, পরে সহজ কণ্ঠে বলিল, "চলুন।"

বাসায় আসিতেই এক তরুণী ছুটিয়া আসিয়া লীলার কণ্ঠলগ্না হইল। আমি যে লীলার পিছনে দাঁড়াইয়া আছি, বহুদিন অদর্শনজনিত উৎকণ্ঠার বশে তাহা যেন সে দেখিতেই পাইল না। কলকণ্ঠে হাসিয়া লীলার বাহু জড়াইয়া তেমনই ত্বরিতে সে গৃহান্তরে চলিয়া গেল।

তরুণী সুন্দরী; বর্ষামেঘমণ্ডিত, মুহূর্ত্ত-বিভাসিত বিদ্যুৎ-লেখার মত দৃষ্টিদাহকরী। সারা অঙ্গে চাঞ্চল্য আবেগে উছলিয়া পড়িতেছে। তনুদেহ ঘিরিয়া যে সুন্দর আশমানী শাড়ীর প্রান্তখানি ঈষৎ স্থানভ্রষ্ট হইয়া উড়িতেছিল, তাহারও শ্রীটুকু উপভোগ করা যায়।

তৎক্ষণাৎ লীলার সঙ্গে সে ফিরিয়া আসিল ও একটি ক্ষুদ্র নমস্কার করিয়া কহিল, "কিছু মনে করবেন না, মোহন বাবু। অনেক দিন পরে ছোট বোনটিকে দেখে আনন্দে দিশাহারা হয়ে গেছলুম—আপনাকে লক্ষ্যই করিনি। আমি লীলার দিদি—বোধ হয়, বুঝতেই পারছেন ?"

আমি এই অপ্রত্যাশিত আলাপে মুগ্ধ হইয়া কোন উত্তর দিতে পারিলাম না।

লীলা বলিল, "ওকেও আপনি চপলা ব'লে ডাকবেন।"

চপলা হাসিয়া বলিল, "যদিও আমি লীলার দিদি, তবু সে মর্য্যাদা আমায় কেউ দেয় না।"

লীলা বলিল, "ক'দিনের বড় ?"

চপলা বলিল, "দিনের নয়, মাসের। তোর চেয়ে আমি মাসখানেকের বড় হব। কি, ঘাড় নাড়ছিস্ যে? নয়? আচ্ছা, কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করছি—চ।" বলিয়া লীলার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া চলিল।

স্বীকার করিতে দোষ নাই—মেয়েটিকে আমার ভালই লাগিল। কেমন অকুণ্ঠিত—হাস্যময়ী সদালাপী। সংসার-উপবনে চপলা যেন একটি সদ্যঃ-প্রস্ফুটিত অনাঘ্রাত গন্ধরাজ। আজ এইমাত্র মন্ত্রমুগ্ধ জ্যোৎস্নাজড়িত নীল আকাশকে সাক্ষ্য রাখিয়া যে ভালোবাসার অভিনয় করিয়া আসিলাম, মনে হইল, লীলা না হইয়া চপলা যদি সেই নির্জ্জন গিরি-উপত্যকায় অমনই করিয়া আমার একান্ত সন্নিকটে বসিয়া কম্পিত কণ্ঠে ঐ কথাটি উচ্চারণ করিত ত আমার অন্তরে বেদনার বিনিময়ে তীব্র আনন্দেরই সঞ্চার হইত!

দেরাদুনের শোভা আবার নূতন করিয়া বিকশিত হইয়া উঠিল। আকাশে, বাতাসে, পাহাড়ে, প্রান্তরে যে বিরসতা ফুটিয়া উঠিতেছিল—তাহা অন্তর্হিত হইয়া গেল। আমি সংকল্প করিলাম, গ্রীষ্মের শেষ পর্য্যন্ত এইখানেই কাটাইব।

দিন দুই পরে লীলা বলিল, "মোহন বাবু, সে দিন বলছিলেন—এখানে ভাল লাগছে না, চ'লে যাবেন, এখনও কি সে মত বদলান নি ?"

লীলার পানে লজ্জায় মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিলাম না। মনে হইল, পরিহাসের কথা লইয়া সে আমায় শাসন করিতে আসিয়াছে!

কিন্তু আমার এই অনুমান ভুল। লীলা একটু হাসিয়া স্নিগ্ধ স্বরে বলিল, "চপলার ইচ্ছা, আরও দিন কতক এখানে আপনি থাকুন। ওরও কলেজ সেই সময়ে খুলবে—এক-সঙ্গে যাবেন।"

সঙ্কোচ কাটাইয়া বলিলাম, "বেশ, তাই হবে।" স্বরে বোধ হয় আগ্রহই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। লীলা অল্প একটু হাসিয়া চলিয়া গেল।

আর একটি দিন। এ দিন চপলাকে লইয়া—'ক্যামেল্‌স্ ব্যাক্' হইতে ফিরিতেছিলাম। সময় অপরাহ্ণ। ক্লান্তিবশতঃ না হউক, সেই প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া চপলাকে বসিতে বলিলাম।

চপলা বলিল, "বা রে, এইমাত্র ত্রিশ হাত উপরে ত জিরিয়ে এলুম! আবার এখানে ?"—বলিয়া বসিল।

বসিয়া নিম্নের পানে চাহিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিল, "বাঃ—কি সুন্দর! দেরাদুন এখান থেকে যেন একখানা ছবির মত দেখাচ্ছে! যেন খেলাঘরের জিনিষ-পত্তর! এতটুকু গাছ—এই একরত্তি বাড়ী-ঘর—ওর মধ্যে মানুষ কতটুকু জীব, মোহন বাবু ?" বলিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল।

বলিলাম, "সত্যই সুন্দর। কিন্তু চপলা—" বলিয়া থামিলাম।

কৌতুকোৎফুল্ল চক্ষুদুটি নাচাইয়া চপলা বলিল, "কিন্তু কি? কোন নীরস তত্ত্বকথা মনে হয়ে থাকে ত কথাটি কবেন না। এমন সময় কথা ক'য়ে নষ্ট করার চেয়ে—চুপ ক'রে ব'সে ব'সে বেশ উপভোগ করা যায়।"

সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সকল নারীর রুচিই দেখিতেছি অভিন্ন। তাহারা মনের মধ্যে উৎসারিত আনন্দের সন্ধান না রাখিয়াই প্রকৃতিকে প্রাধান্য দেয়।

বলিলাম, "তবে খানিক বসা যাক। চাঁদ উঠলে ফেরা যাবে।"

সে দিন কিন্তু পথশ্রান্তা লীলার কথায় বিপরীত উত্তর দিয়াছিলাম।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল। তিথিটা কি ছিল, জানা নাই, অন্ধকার গাঢ় হইয়া পাহাড় প্রান্তর ঢাকিয়া ফেলিল, চাঁদ উঠিল না। তা না উঠুক—মন্দ লাগিতেছিল না। চারিদিকে অন্ধকার—জগৎ হারাইয়া গিয়াছে—শুধু নক্ষত্রখচিত নীল চন্দ্রাতপতলে বসিয়া আছি আমরা দুটি প্রাণী। আর যে জগৎ আমাদের অন্তরে বর্ণ-বিকাশে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা বিচিত্র অনুপম; তাহার প্রকাশ অন্ধকারেই মানায় ভাল। পায়ের তলায় পুরাতন জগৎ অন্ধকারে ঊর্দ্ধমুখে আমাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছে।

মনের মধ্যে অকারণ একটা পুলক-প্রবাহ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। আবেগকম্পিতকণ্ঠে বলিলাম, "চপলা!"

সে চমকিত হইয়া কহিল, "কি ?"

বলিলাম, "জগতের মধ্যে বাস ক'রে কোলাহলে যে

জিনিষ পেয়েও বুঝতে পারিনে—পেয়েছি কি না। নির্জ্জনে মনে হয়—সে জিনিষ আছে এবং আমারই নিজস্ব।"

চপলা বলিল, "ও হেঁয়ালী আর কবিত্ব এখন থাক, মোহন বাবু, চাঁদ বোধ হয় আজ উঠবে না—চলুন ফেরা যাক।"

আমি বাধা দিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলাম, "নাই বা উঠলো চাঁদ—এমন সুন্দর মুহূর্ত্ত জীবনে দুবার আসে না।"

চপলা সে-কথায় হাসিয়া উঠিল। আমি অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিলাম।

সহসা চপলা অন্য প্রসঙ্গ পাড়িল, "আচ্ছা মোহন বাবু, আপনার জমিদারীর আয় কত?"

মর্ম্মাহত হইয়া বলিলাম, "ও কথা কেন চপলা?"

চপলা সহজ স্বরে বলিল, "এমনি জিজ্ঞাসা করছি। থাক ও সব কথা—চলুন।" বলিয়া উঠিল।

আমি অধীর হইয়া বলিলাম, "কিন্তু আমার কিছু বলবার আছে যে চপলা।"

—"বাসায় গিয়ে বলবেন।"

—"না, না, সে কথা আলোর পরশ পেলে প্রকাশের ক্ষমতা হারাবে। এই অন্ধকারে—নির্জ্জন পাহাড়ে—শুধু তুমি আর আমি—আর কেউ শুনবে না।"

চপলা পুনরায় বলিল, বেশ একটু গম্ভীর স্বরে বলিল, "বলুন। কিন্তু কবিত্বটুকু যথাসম্ভব বাদ দেবেন।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিলাম; কিন্তু অন্ধকারে বোঝা গেল না—ওষ্ঠে পরিহাসের কৌতুক-হাস্য পরিলিপ্ত কি না?

বলিলাম, "তোমায় আমি ভালবাসি, চপলা।"

চপলা সহজকণ্ঠেই বলিল, "এ ত ভাল কথা। মানুষ-মাত্রেরই পরস্পরের উপর এই ভালবাসাটুকু থাকা উচিত।"

বলিলাম, "কিন্তু আমার ভালবাসা—"

হাসিয়া চপলা বলিল, "একটু বিশেষ রকম? তা ভাল, এতে আমি সুখী বৈ দুঃখিত নই।"

—"কিন্তু তুমিও কি আমায়—"

—"ভালবাসি? তা বাসি বৈ কি। আপনি হচ্ছেন আমার এখানকার দুটি চক্ষু অর্থাৎ দেখবার শোনবার যত কিছু নির্ভর আপনার উপরই করতে হয়; সুতরাং ভাল না বাসা অকৃতজ্ঞতার পরিচয়।"

বিষণ্ণ মুখে বলিলাম, "শুধু কৃতজ্ঞতা?"

চপলা হাসিয়া বলিল, "আপনি নিতান্ত ছেলেমানুষ। একেই অন্যের উৎপত্তি। পড়েননি নাটকে—কাব্যে—উপন্যাসে?"

আমি উৎফুল্ল কণ্ঠে বলিলাম, "তোমার অমত নেই বুঝলুম।"

চপলা তেমনই হাসিমুখে বলিল, "কিন্তু মতের কথাও ত বলিনি।"

মুহূর্ত্তে আমার বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল, মুখের হাসি নিভিয়া গেল। শুষ্ক কণ্ঠে বলিলাম, "তবে

চপলা বলিল, "আমার মতামতের উপর নির্ভর ক'রে এ কাষ হবে না। জানেন বোধ হয়, বাড়ীতে বাবা আছেন—মা আছেন—তাঁদেরও একটা মত আছে।"

কল্পনায় কিন্তু ও-সব বিভ্রাট ছিল না। সেখানে অভি-ভাবকের রক্তচক্ষু বা কর্কশ কণ্ঠের কর্তৃত্ব ছিল না—ছিল আমাদের দুজনের ভালবাসার কথা।

বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

চপলা উঠিয়া দাঁড়াইল, নিকটে আসিয়া আমার হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিল, "ভাবতে হয় বাসায় গিয়ে ভাববেন, এখন না উঠলে ফিরতে রাত হবে।"

যন্ত্রচালিতের মত উঠিলাম। কিছু দূর আসিয়া সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, "কিন্তু চপলা, তুমি ত কোন উত্তর দিলে না! আমায় ভালবাস কি না,—ঠাট্টা নয়, সত্যি ক'রে বল।"

চপলা বলিল, "আবার কবিত্ব সুরু করলেন? নাঃ, কাকাবাবুদের না ভাবিয়ে ছাড়বেন না দেখছি।"

কেমন যেন মোরিয়া হইয়া উঠিয়াছিলাম। দৃঢ়স্বরে বলিলাম, "না, তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই। বাজে কথায় আমায় ভুলিও না, সত্য বল।"

চপলা আমার পানে ফিরিয়া হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু হাসি ফুটিল না। একটু গম্ভীর স্বরেই বলিল, "এ কি জোর ক'রে আদায় করবার জিনিষ, মোহন বাবু, না, হৃদয়ের অনুভূতিতে একে ধরা-ছোঁয়া যায়? আপনি কি মনে করেন জানি না, কিন্তু আমি একে কবিত্ব ছাড়া আর কিছু বলতে পারি না।"

বার বার পরিহাসের কশাঘাত! উষ্ণ হইয়া উঠিলাম।

লীলা হইলে এই উষ্ণতাটুকু প্রকাশ পাইতে বিলম্ব হইত না, চপলা বলিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। বুকের মধ্যে একটা প্রচণ্ড আঘাতকে দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে অতি কষ্টে মিশাইয়া দিলাম। চপলা সে নিশ্বাসের মর্ম্মটুকু হয় ত বুঝিল। কেন না, সে স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "তরুণ মনের এই উচ্ছ্বাসটুকু সত্যই উপভোগের জিনিষ। আমার বড্ড ভাল লাগে কিন্তু!"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া নীরবে পথ চলিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, চপলা যদি লীলা হইত! লীলার ব্রীড়া-সঙ্কুচিত সলজ্জ গতি ইহার অতি চঞ্চল পদক্ষেপ হইতে মিষ্ট বলিয়া বোধ হইল। সেই কোমল কণ্ঠের উচ্ছ্বাস-আবেগহীন স্বর সে দিন বাতাসে যে মোহময় ঝঙ্কার তুলিয়াছিল, আজিকার কলকণ্ঠে তাহার বিন্দুমাত্রও ছিল না। তবু রূপের বহ্নি জ্বালিয়া চপলা লীলার শ্যামলতাটুকু নিঃশেষে পুড়াইয়া দিয়াছিল। আমার সারা অন্তর স্পর্শ করিয়া সেই বহ্নিশিখা অহরহ জ্বলিতেছিল। আমার সমস্ত জগৎ বহ্নির পদপ্রান্তে আপনাকে আহুতি দিয়াছিল।…

সে দিনের পর আর এমন নির্জ্জন মুহূর্ত্ত আসিল না যে, চপলার মুখ হইতে ঐ দুটি পরমপ্রার্থিত কথা শুনিয়া জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করি।

আমি চাহিতাম তাহার সঙ্গ; সে সৃষ্টি করিত লীলাকে লইয়া একটি অবসরহীন আনন্দের জগৎ।

ক্রমে বিদায়-দিন সন্নিকটবর্ত্তী হইল। কথা ছিল, চপলাও আমার সঙ্গে ফিরিবে, কিন্তু বিদায়-দিনে সহসা সে অসুস্থ হইয়া পড়িল। আমার মনে হইল, এই অসুস্থতা তার ইচ্ছাকৃত।

বিদায় লইতে গিয়া বলিলাম, "চপলা, আমি যাচ্ছি। হয় ত আর কোন দিন আসবো না—তোমার সঙ্গে দেখাও হবে না; কিন্তু একটি মধুর দুঃখময় স্মৃতি নিয়ে চললুম।"

চপলা উপধান হইতে মাথা তুলিয়া বলিল,—"পৃথিবীতে চলতে গেলে চোখের সামনে অনেক কিছুই আসে যায়—সে সমস্তকে নিয়ে স্মৃতি রচনা করলে ছোট্ট-মনের কোণটুকু ভারগ্রস্ত হয়ে পড়ে, মোহন বাবু!"

বেদনাবিহ্বল কণ্ঠে বলিলাম, "তুমি নিষ্ঠুর চপলা। মনের উপর রেখাপাত করে যে জিনিষ, তাই স্মৃতি হয়ে মনে জড়িয়ে যায়, এ কথা হয়তো তুমি জান, কিন্তু—"

চপলা নিরীহ শান্ত মেয়েটির মত হাতদুটি কপালে ঠেকাইয়া সহজ স্বরে বলিল, "তাকে আমি শ্রদ্ধা করি—ভক্তি করি। কিন্তু বড়ই কষ্ট হচ্ছে আমার কথা কইতে—মাপ করুন।" বলিয়া শ্রান্তিভরে সে চক্ষু মুদিল।

লীলা দ্বারপ্রান্ত হইতে ডাকিল, "আসুন।" চপলার মুখের পানে চাহিয়া দ্রুতপদে আমি কক্ষত্যাগ করিলাম।

ট্রেণে বসিয়া লীলার পানে চাহিতে পারিলাম না। লীলার পিতা পরমাত্মীয়ের বিদায়-ব্যপারে মিয়মাণ হইয়া স্নেহ-সতর্ক উপদেশ দিতেছিলেন—কোথাকার খাবার ভাল, কোথায় গাড়ী আধঘণ্টা থামে, ষ্টেশনের কলে মাথা ধুইয়া একটু সরবত খাইলে শরীরের গ্লানি থাকিবে না ইত্যাদি···

লীলা অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে আমার পানে চাহিয়া চুপি চুপি বলিল, "মোহন বাবু, আমি জানি, আপনি কি ব্যথা নিয়ে চলেছেন। কিন্তু আপনি পুরুষ—দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেবেন কেন?"

বলিলাম, "লীলা, তুমি জান না, এমন একটি দুর্ব্বলতা আছে—যাকে সুখ বা দুঃখের মধ্যে আশ্রয় দেওয়াই মনের ধর্ম্ম। তাকে এড়ানো যায় না।"

লীলা হাসিয়া বলিল, "সেন্টিমেন্টালিটির ভাল মন্দ দুই-ই আছে তাকে ত্যাগ করাই যুক্তি।"

একটু থামিয়া বলিল, "আমাদের এখানে এসে শুধু দুঃখই নিয়ে গেলেন—এই আক্ষেপ রইল।"

বলিলাম, "তোমার স্নেহের যে অপরূপতা আমি উপভোগ করেছি, তাই আমার সান্ত্বনা। লীলা, আমায় ক্ষমা করো—সে দিনের কথা ভুলে যেও।"

লীলা হাসিয়া বলিল, "কোন দিনের কোন কথাই ক্ষমা করা যায় না; ভোলবারও দরকার দেখিনে। আপনি যা পারেন না, তাই কি সকলে পারে, আশা করেন?"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ব্যথিতা লীলার পানে চাহিলাম; কিন্তু সে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল। হায় সরলা লীলা!

তার পর যে কাহিনী বলিব—দেরাদুনের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধই নাই।

সেই ভোরের শুকতারার স্মৃতি বা সন্ধ্যাতারার সৌন্দর্য্য কিছুই আর চিত্তকে বিচলিত করিতে পারে না। কুয়াশার ওপারের রাজত্ব—কুয়াশার ওপারেই মিলাইয়া গিয়াছে। এই আকাশে যে তারাটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা নিতান্ত

সাধারণ—ক্ষীণজ্যোতি ও মলিন। কিন্তু ক্ষুদ্র জীবনাকাশ ভরিয়া তাহারই কোমল কিরণটুকু ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আবেগ নাই—উচ্ছ্বাস নাই—যেন এক শান্ত সমাহিত তরঙ্গ-শূন্য নদী—রুক্ষ প্রান্তরের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

বিবাহ করিয়াছি। লীলা আসে নাই, চপলাও আসে নাই—আসিয়াছে তৃতীয় এক অপরিচিত প্রাণী। ফুলশয্যার রাত্রিতে চপলার স্মৃতির দুঃসহ ভারে মন পীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল, ভাল করিয়া আলাপ করি নাই এবং তাহার পরেও কত দিন এমনই উপেক্ষা-নীরব অন্ধকার বা জ্যোৎস্না-রাত্রি কাটিয়া গিয়াছে—নবাগতার পানে বিশেষ দৃষ্টি লইয়া ফিরিয়া চাহি নাই। তাহার হৃদয়খানি নির্ঝরের মত নিষ্পেষিত করিতে আমার এতটুকু বাধিত না। বুঝি নাই কি তাহার অপরাধ—কেন চপলাকে না পাওয়ার অন্তরায় বলিয়া মনে করিতাম! অবশেষে ভুল ভাঙ্গিল।

একখানি রঙীন চিঠি চপলার শুভ বিবাহের সংবাদ বহিয়া আনিয়া আমার সযত্ন-রক্ষিত স্মৃতির সৌধ ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া গেল।

মমতা-ভরা হৃদয় লইয়া সেই দিন আশার পানে ফিরিয়া চাহিলাম এবং বলিতে লজ্জা নাই, বেশ একটু মুগ্ধ হইলাম।

আশা চিঠিখানি পড়িয়া যে সান্ত্বনার কথা আমায় বলিয়াছিল, তাহা উচ্চারণ করিয়া আজ আর অকারণ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিব না। তাহা বাঙ্গালার জল-বায়ু দিয়া গড়া; ক্ষমাময়ী মাধবীরাই উচ্চারণ করিতে পারেন।

আপনারা হয় ত হাসিবেন। বলিবেন, শৈলশিখরে বসিয়া একদা যে ভালবাসার স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, তাহা অন্য এক জগতের। তাহার মধ্যে যৌবনের আবেগ ছিল প্রচুরতর এবং ভালবাসার গন্ধও ছিল না এতটুকু। তাহা কল্পনাপ্রয়াসী মনের নৈসর্গিক পীড়া মাত্র!

অথবা বলিবেন, পুরুষের ভালবাসা এমনই চঞ্চল! যৌবনের দীপ্ত আলোকে যাহা কিছু চোখের সম্মুখে সুন্দর হইয়া ভাসিয়া ওঠে, তাহাকেই ভালবাসা বলিয়া ভুল করে। হয়তো ভালও বাসে; কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনে সেই আলোক ধীরে ধীরে নিবিয়া যায় ও উজ্জ্বলতর অন্য কিছুকে কামনা করে।

সে যাহা হউক, চপলার স্মৃতির নাগপাশ আমাকে মুক্তি দিয়াছে বটে, কিন্তু লীলার কথা ভুলিতে পারি নাই। শুনিয়াছি, লীলা আজও বিবাহ করে নাই। পরহিত-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে।

আর কেহ না জানুক, আমি জানি, আমার মুহূর্ত্তের সঙ্গ—এক দণ্ডের ভালবাসা—শৈল-শিখরের সেই স্বপ্নময় স্মৃতিই লীলার আত্ম-পরিবেষণের মূলে প্রেরণা দিয়াছে।

আজ নিশীথ রাত্রিতে ও-পারের ঘরে যে তরঙ্গ উঠিয়াছে, উহার মধ্যে কতটুকু ভালবাসা আছে, সে বিচার আমি করিব না। হয়তো এই ফেনায়িত তরঙ্গের তলে এক দিন তাহার সঞ্চিত রত্নটুকু দেখা গেলেও যাইতে পারে, হয়তো অশ্রান্ত গর্জ্জনের সঙ্গে উন্মত্ত বায়ুর সংঘর্ষে তাহা শূন্যময় বুদ্বুদের মত মিলাইয়াও যাইতে পারে; কিন্তু প্রথম আবেগটুকু হইতে সত্যাসত্য বিচার করা বড় সহজ নহে। কিছুদিন পরে এ আবেগের স্মৃতিও হয়তো থাকিবে না, কিন্তু এই মুহূর্ত্তকে বিচার-বিতর্কে বাহুল্য প্রতিপন্ন করিয়াই বা লাভ কি?

নিদ্রিতা পত্নীর সুপ্তিভরা মুখের পানে চাহিয়া ভাবিলাম, নারিকেলে জল-সঞ্চারের মতই ইহা একদা অতি নিঃশব্দে আবির্ভূত হয় এবং মুখের ভাষা যেখানে হারাইয়া যায়, মনের সঞ্চয় সেইখানেই এই অমূল্য পণটুকু লিখিয়া রাখে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়।



সেকালের জবাব

বাদী যখন নালিশ করিত, তখন প্রথমে তাহার আরজি লেখা হইত। আরজিকে সংস্কৃতে ভাষা, প্রতিজ্ঞা বা পক্ষ বলা হইত। পক্ষ লিখিবার পর প্রতিবাদীকে তাহার জবাব দিবার জন্য আদেশ হইত। চতুষ্পাৎ ব্যবহারের দ্বিতীয় পাদ উত্তরপাদ। জবাবকে সংস্কৃতে উত্তর বলা হইত।

উত্তর কেমন করিয়া লওয়া হইবে, তাহাতে কি কি থাকিবে, উত্তরের ভেদ কি কি, তাহার দোষ কি কি, সে বিষয়ে সংস্কৃত স্মৃতি-নিবন্ধে সুন্দর পর্য্যালোচনা আছে। স্মৃতির এই ব্যবস্থা আলোচনা করিলে আমরা যুগপৎ আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করিব।

বৃহস্পতি বলেন :—

"বিনিশ্চিতে পূর্ব্বপক্ষে গ্রাহ্যাগ্রাহ্যবিশোধিতে।
প্রতিজ্ঞার্থে স্থিরীভূতে লেখয়েদুত্তরং ততঃ॥"

বাদী নিশ্চিত করিয়া পক্ষ বলিলে এবং বিচারক তাহা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য, তাহা বিবেচনা করিলে পর স্থিরীভূত প্রতিজ্ঞার বিপক্ষে প্রতিবাদীর উত্তর যথাযথ লিখিবে।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, বাদীর স্থাপিত আরজি প্রতিপক্ষকে পড়িয়া শোনাইবে, তার পর বাদীর সম্মুখে প্রতিবাদীর উত্তর লিখিয়া লইবে। যদি ব্যাপার অতি প্রয়োজনীয় হইত কিম্বা সামাজিক-বিষয়ক হইত, তবে তৎক্ষণাৎ উত্তর লেখা হইত। অন্যত্র বিচারকের বা পক্ষের সুবিধার জন্য সময় দেওয়া হইত।

হারীত বলেন :—

"স্বল্পবর্ণোঽর্থবহুলঃ প্রতিজ্ঞাদোষবর্জ্জিতঃ।
সাক্ষিমান্ কারণোপেতো নিরবদ্যঃ সুনিশ্চিতঃ॥
ঈদৃশঃ পূর্ব্বপক্ষস্তু লিখিতো যত্র বাদিনা।
দদ্যাৎ তৎপক্ষসম্বন্ধং প্রতিবাদী তদোত্তরম্॥"

বাদী যখন অল্প কথায় ভাবগর্ভ, দোষহীন, সাক্ষিমান্, অনিন্দ্য, কারণযুক্ত, সুনিশ্চিত পক্ষ দিবে, তখন প্রতিবাদী তৎসম্পর্কীয় বিষয়ে তাহার যাহা বক্তব্য, তাহা বলিবে।

পক্ষাভাস দোষ থাকিলে জবাব দিতে হইত না। যদি কেহ একক সাধারণী ভূমি চাহিত কিম্বা গণের দ্রব্য চাহিত, তাহা হইলে উত্তর দেওয়ার দরকার ছিল না।

কোন কোন ক্ষেত্রে সদ্য উত্তর লওয়া হইত, তৎসম্বন্ধে নারদ বলেন :—

"গোভূহিরণ্যস্ত্রীস্তেয়-পারুষ্যাত্যয়িকেষু চ।
সাহসেষ্বভিশাপে চ সদ্য এব বিবাদয়েৎ॥"

যেখানে বিবদমান বিষয়, গরু, ভূমি, সোনা, স্ত্রী, চৌর্য্য, মারামারি, সাহস, অভিশাপ ও আত্যয়িক বিষয় হইত, তখন কালহরণ করিবে না।

কাত্যায়ন আত্যয়িকের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"বাধৈপৈতি গৌরবং যত্র বিনাশস্ত্যাগ এব বা।
কালং তত্র ন কুর্বীত কার্য্যমাত্যয়িকং হি তৎ॥"

গুরুতর ফৌজদারি মোকদ্দমায়, কিম্বা হত্যা বা ত্যাগে কাল নষ্ট করিবে না—এইগুলি অত্যন্ত জরুরী কাষ।

কাত্যায়ন বলেন, গরু, বৃষ, ক্ষেত্র, স্ত্রী, প্রজনন, ন্যাস, যাচিতক, দান, ক্রয়, বিক্রয়, কন্যাদূষণ, স্তেয়, কলহ, সাহস, উপনিধি, জুয়াচুরি এবং মিথ্যাসাক্ষ্য সদ্য সদ্য বিচার করিবে।

কোন্ কোন্ বিবাদে সময় দেওয়া যাইবে, তৎসম্বন্ধে নারদ বলেন :—

"গহনত্বাদ্বিবাদানামসামর্থ্যাৎ স্মৃতেরপি।
ঋণাদিষু হরেৎ কালং কামং তত্ত্ববুভুৎসয়া॥"

যেখানে মামলা জটিল, বিবাদী অসমর্থ, বিষয় অস্মরণ হইয়াছে, সেখানে ঋণাদি বিষয়ে তত্ত্ব জানিবার জন্য সময় দিবে।

পিতামহ বলেন—

"ঋণোপনিধি-নিক্ষেপ-দান-সম্ভূয়-কর্ম্মণাম্।
সময়ে দায়ভাগে চ কালঃ কার্য্যঃ প্রযত্নতঃ॥"

ঋণ, গচ্ছিত বিষয়, দান, যৌথকারবার, গণের স্থাপিত নিয়মাদি লইয়া কিংবা ভাগ লইয়া যেখানে বিবাদ, সেখানে সময় দিবে।

কাত্যায়ন সময় দেওয়ার হেতু বলিয়াছেন। বিবাদী যদি বাদীর আরজি বা অভিযোগ শুনিয়া কারণ বশতঃ উত্তর দিবার সময় চাহে, তখন তাহাকে সময় দিবে। সদ্যঃকৃত কার্য্য সদ্যই বিচার করিবে, কিন্তু অতীতকালে সংঘটিত বিষয়ে সময় দেওয়ার কোনই বাধা নাই।

কত দিন সময় দিবে, তৎসম্বন্ধে নারদ বলেন—মামলার গুরুত্ব অনুসারে এক, তিন, পাঁচ, সাত দিন, পক্ষ, মাস বা দেড়মাস সময় দিবে। স্থল-বিশেষে এক বৎসরও অবকাশ দিবার ব্যবস্থা ছিল। কাত্যায়ন বলেন :—

"কালং শক্তিং বিদিত্বা তু কার্য্যাণাং চ বলাবলম্।
অল্পং বা বহু বা কালং দদ্যাৎ প্রত্যর্থিনে প্রভুঃ॥"

অল্প বা বহু সময় দিবার জন্য কাল, বিবাদীর শক্তি, কার্য্যের গুরুত্ব প্রভৃতি বিবেচনা করিয়াই বিচারক সময় দিবেন।

এ বিষয়ে সে-কালের বিচারকগণকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া ছিল। অধীন, জড়, উন্মত্ত, অমনস্ক, ব্যাধিপীড়িত বা অপ্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যর্থীকে সংবৎসর পর্য্যন্ত অবকাশ দেওয়া হইত। সাক্ষী বা পক্ষের কেহ বিদেশগত হইলে, তাহার ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত সময় দেওয়া হইত।

কার্য্যের গুরুলাঘব জ্ঞান করিয়া, পক্ষগণের সুবিধা বা অসুবিধা বিবেচনা করিয়া সময় দিতে সে কালের বিচারক কুণ্ঠিত হইতেন না, কারণ, সত্য নির্ণয়ের দিকে তাঁহাদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল।

উত্তর লক্ষণ সম্বন্ধে প্রজাপতি বলেন :—

"পক্ষস্য ব্যাপকং সারমসন্দিগ্ধমনাকুলম্।
অব্যাখ্যাগম্যমিত্যেতদুত্তরং তদ্বিদো বিদুঃ॥"

পক্ষকে আচ্ছাদন করিয়া উত্তর দিবে। পূর্ব্বকৃত অভিযোগের উত্তর প্রদানে সমর্থ, সংশয়হীন, অন্বিতার্থযুক্ত সুবোধ্য করিয়াই উত্তর লিখিবে।

হারীতে পাই :—

"পূর্ব্বপক্ষার্থসম্বদ্ধমনেকার্থমনাকুলম্।
অনল্পমবাস্তপদং তথা বৈ নাতিভূরি চ॥
সারভূতমসন্দিগ্ধমপক্ষৈকাংশসম্ভবম্।
অধিশ্রবমগূঢ়ার্থং দেয়মুত্তরমীদৃশম্॥"

অভিযোগানুগত, সুবিদিতার্থ ও অসংশয়িত উত্তর দিবে। তাহা যেন খুব ছোটও না হয়, খুব বড়ও না হয়। তাহা যেন নিশ্চিত প্রতিজ্ঞাসূচক ও ব্যাপক হয়। তাহা যেন সারবান্, অসন্দিগ্ধ ও সম্পূর্ণ হয়। তাহাতে যেন পক্ষের একাংশের মাত্র উত্তর না দেওয়া হয়। বাদী যাহা বলিয়াছে, তাহারই যেন উত্তর হয়, এবং তাহাতে যেন অর্থবোধের কোনও বাধা না হয়।

আরজি যেমন চারি প্রকার ছিল—উত্তরও তেমনই চারি প্রকার ছিল।

নারদ বলেন :—

"মিথ্যা সম্প্রতিপত্ত্যা বা প্রত্যবস্কন্দনেন বা।
প্রাঙ্ন্যায়বিধিসিদ্ধ্যা বাহপ্যুত্তরং স্যাচ্চতুর্বিধম্॥"

মিথ্যা, সম্প্রতিপত্তি, প্রত্যবস্কন্দন এবং প্রাঙ্ন্যায় জবাব এই চারি রকম। কথাগুলি সবই পারিভাষিক। কাত্যায়ন ইহাদের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। যখন অভিযুক্ত অভিযোগকে অস্বীকার করিয়া জবাব দেয়, তাহাকে মিথ্যা উত্তর বলে। সাধ্য সত্য, ইহা স্বীকারকে সম্প্রতিপত্তি বলে। যেমন বাদী বলিল—বিবাদী এক শত টাকা ধারে, বিবাদী বলিল, হাঁ, সত্যই টাকা ধারি। যদি অর্থীর লিখিত সাধ্য স্বীকার করিয়া বিবাদী মোকদ্দমা না চলিবার অন্য কারণ দেখায়, তখন তাহাকে প্রত্যবস্কন্দন বলা হয়। যেমন ধার করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা দিয়া দিয়াছি। যখন বিবাদী বলে, পূর্ব্বে অনুরূপ মোকদ্দমা করিয়াছিল, কিন্তু তখন বিচার হইয়া আমিই জিতিয়াছি, অতএব স্থাপিত ব্যবহার অচল, তখন সেই উত্তরকে প্রাঙ্ন্যায় বলা হইত। মিথ্যা উত্তর আবার চারি প্রকার ছিল। কাত্যায়নে পাই :—

"মিথ্যৈতন্নাভিজানামি তদা তত্র ন সন্নিধিঃ।
অজাতশ্চাস্মি তৎকাল ইতি মিথ্যা চতুর্বিধা॥"

(১) অভিযোগ মিথ্যা, আমি ইহার নিকট কিছুই ধারি না,
(২) আমি আরজির কিছুই জানি না বা কিছুই স্মরণ নাই,
(৩) আমি বাদীর কথিত স্থানে, কথিত কালে উপস্থিত ছিলাম না,
(৪) আমি বাদি-কথিত সময়ে জন্মগ্রহণই করি নাই।

প্রাঙ্ন্যায় ছিল তিন রকম। কাত্যায়নে পাই :—

বিভাবয়ামি কুলিকৈঃ সাক্ষিভির্লিখিতেন বা।
জিতশ্চৈব ময়াহয়ং প্রাক্ প্রাঙ্ন্যায়স্ত্রিপ্রকারকঃ॥"

প্রকৃত ব্যবহার দ্রষ্টার দ্বারা, সাক্ষীর দ্বারা, কিম্বা জয়পত্রের দ্বারা দেখাইব যে, এই বিবাদে আমিই পূর্ব্বে জয়লাভ করিয়াছি—এইরূপভাবে তিন রকম প্রাঙ্ন্যায়ের আপত্তি উত্থাপন করা যাইত।

আরজির মতই দোষযুক্ত উত্তর অগ্রাহ্য হইত। কোন্ কোন্ জবাব নিন্দনীয়, তৎসম্বন্ধে বৃহস্পতি বলেন :—

"প্রস্তুতাদন্যদন্যস্থং ন্যূনাধিকমসঙ্গতম্।
অব্যাপ্যসারং সন্দিগ্ধং প্রতিপক্ষং ন লেখয়েৎ॥"

যে জবাব অভিলিখিত অভিযোগের অপহারক না হয়, যাহা প্রতিপক্ষভাব-রহিত ও অভিযোগের অনুগত নহে, যাহা বিবদমান বিষয়কে ব্যাপ্ত না করে, যাহা সংশয়জনক, সেইরূপ প্রতিপক্ষকে অগ্রাহ্য করিবে।

কাত্যায়ন বলেন :—

"অপ্রসিদ্ধং বিরুদ্ধং যদত্যল্পমতিভূরি চ।
সন্দিগ্ধাসম্ভবাব্যক্তমন্যার্থং চাতিদোষবৎ॥
অব্যাপকং ব্যস্তপদং নিগূঢ়ার্থং তথাকুলম্।
ব্যাখ্যাগম্যমসারং চ নোত্তরং শস্যতে বুধৈঃ॥"

যাহা অবোধ্য, তাহাকে অপ্রসিদ্ধ বলে। যেমন যখন বিবাদী বাদীর কথিত বস্তুর প্রকৃতি, অবয়ব, সংস্থান, সংখ্যা, সময় না জানিয়া কিম্বা বিচারালয়ে অন্য দেশীয় ভাষায় যে উত্তর দেওয়া হইত, তাহাকে অপ্রসিদ্ধ বলিয়া ত্যাগ করা হইত। যখন উত্তরের মধ্যেই পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তি থাকে, তাহাকে বিরুদ্ধ উত্তর বলে—যেমন বাক্যে সমস্ত দেনা শোধ করিয়াছিলাম বলিয়া পুনরায় শেষে বলা হয়, আমি দেনা শোধ করি নাই। যেখানে উত্তর অতি সংক্ষিপ্ত, তখন তাহাকে অত্যল্প উত্তর বলে। যেমন পূর্ব্বে আমি এই ব্যবহার জিতিয়াছি বলিতে গিয়া 'আমি পূর্ব্বে এই ব্যবহার' পর্য্যন্ত যদি বলি, তাহা ন্যূন উত্তর হয়।

ধার লইয়াছি, এইমাত্র না বলিয়া, ধার লইয়া কি করা হইয়াছে, তাহার বিশদ ব্যাখ্যা দিলে তাহাকে অতিভূরি বলা হয়। যে উত্তর দ্ব্যর্থ, তাহাকে সন্দিগ্ধ বলে। যথা দেয়ম্ কথায় সংস্কৃতে দুই অর্থ হয় আমি ধারি এবং আমি ধারি না—এরূপ স্থলে উত্তর সংশয়জাত হয়। যদি পুত্রহীন কেহ বলে, ইহা আমার পুত্র শোধ করিয়াছে, তখন সেই উত্তর অসম্ভব উত্তর বলিয়া ধরা হয়। যাহা সুখবোধ্য নয়, তাহাকে অব্যক্ত বলে—স্বর্ণের উত্তর না দিয়া যদি বিবাদী বলে, বাদী আমাকে মারিয়াছে, তখন তাহাকে অন্যার্থ দোষ বলে। যখন বাদী এক শত টাকার দাবী করে, তখন দুই শত দিতে স্বীকার করিলে অতিদোষবৎ উত্তর হয়। বাদী আমাকে হাজার টাকা দিয়াছিল—তাহার অর্দ্ধেক শোধ করিয়াছি বলিলে উত্তর অব্যাপক হয়। আমি এক শত স্বর্ণ লইয়াছিলাম—আমি কিছু ধারি না, এইরূপ উত্তরকে ব্যস্তপদ বলে। এ কি পদ্মফুল যে না লইয়াই দিব—এইরূপ জবাবকে নিগূঢ়ার্থ বলে। সে কি সকল সময় ধার দিবে, আর আমি সর্ব্বদা ধার শোধ দিব, এইরূপ উত্তরকে আকুল বলে। ব্যাখ্যা না করিলে যাহার অর্থসঙ্গতি করা যায় না, তাহাকে ব্যাখ্যাগম্য বলে এবং কাকের দাঁত আছে কি নাই ইত্যাদি বিতর্ক যেমন অসার, তেমন নিষ্প্রয়োজন উত্তরকে অসার বলে।

সঙ্কর উত্তরও অগ্রাহ্য। তাহার সংজ্ঞায় কাত্যায়ন বলেন :—

"পক্ষৈকদেশে যৎ সত্যমেকদেশে চ কারণম্।
মিথ্যা চৈবৈকদেশে চ সঙ্করাত্তদনুত্তরম্॥"

পক্ষের একাংশ সত্য, একাংশ কারণ, একাংশ মিথ্যা, এইরূপ মিশ্রিত উত্তরকে সঙ্কর উত্তর বলে। সঙ্কর উত্তর গ্রহণে প্রমাণ সাঙ্কর্য্য হওয়ার সম্ভবনাহেতু তাহা অগ্রাহ্য হইত।

কাত্যায়নই বলেন :—

"ন চৈকস্মিন্ বিবাদে তু ক্রিয়া স্যাদ্বাদিনোর্দ্বয়োঃ।
ন চার্থসিদ্ধিরুভয়োর্ন চৈকত্র ক্রিয়াদ্বয়ম্।"

একই বিবাদে বাদীর দুইটি ক্রিয়া হইবে না—উভয়ের অর্থসিদ্ধি হইবে না কিম্বা দুই ক্রিয়ার যুগপৎ সমাবেশ হইবে না।

সঙ্কর উত্তর গ্রহণ না করিবার কারণ—সত্যনির্ণয়ের পন্থাকে জটিল না করা। উত্তর যদি মিথ্যা অর্থাৎ অস্বীকার হয়, তবে বাদীকে ক্রিয়া প্রমাণ করিতে হইত। প্রত্যবস্কন্দন এবং প্রাঙ্ন্যায় হইলে বিবাদীকে করিতে হইত। সত্য স্বীকার করিলে প্রমাণ লাগিত না। স্বীকারোক্তি বাদে অন্য তিন প্রকারের জবাব যদি সঙ্কর হয়, তবে বাদীকে এক বিষয় প্রমাণ করিতে হয়, বিবাদীকে দুই বিষয় প্রমাণ করিতে হয়। যদি জবাব কেবল প্রত্যবস্কন্দন ও প্রাঙ্ন্যায় হয়, বিবাদীকে দুইটিই প্রমাণ করিতে হয়। যদি জবাব মিথ্যা ও প্রত্যবস্কন্দন কিম্বা মিথ্যা ও প্রাঙ্ন্যায় হয়, তাহা হইলে বাদীকে একটি প্রমাণ করিতে হয়—বিবাদীকে অপরটি প্রমাণ করিতে হয়। সাধ্য সিদ্ধির জন্যই প্রমাণ। একটি ব্যবহারে একটিমাত্র সাধ্য এবং বাদীর প্রার্থিত সাধ্যই সাধ্য। অতএব প্রমাণের সাঙ্কর্য্য হইতে দিলে অন্যায় হয়। অতএব সকল বিবাদেরই পক্ষব্যাপক উত্তর গ্রহণ করিবে। কিন্তু যেখানে উত্তর পৃথকভাবে গ্রহণ করা যাইত, সেখানে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বিচার হইত।

রাম অভিযোগ করিল, যদু এক শত মোহর, এক শত টাকা ও বস্ত্র লইয়াছে। যদু মোহর লওয়া অস্বীকার করিল, এক শত টাকা লওয়া স্বীকার করিল এবং বলিল, বস্ত্র ফিরাইয়া দিয়াছে। এখানে পর পর বিচার করিলে সঙ্কর দোষ হইবে না।

যেখানে উত্তর দু'তিন প্রকারের মিশ্রণে দেওয়া, সেখানে প্রথমে কি গ্রহণ ক[illegible]তে হইবে, তাহার উত্তরে হারীত বলেন :—

"মিথ্যোত্তরং কারণং চ স্যাতামেকত্র চেদুভে।
সত্যং বাপি সহান্যেন তত্র গ্রাহ্যং কিমুত্তরম্।
যৎ প্রভূতার্থবিষয়ং যত্র বা স্যাৎ ক্রিয়াফলম্।
উত্তরং তত্র তৎ জ্ঞেয়মসঙ্কীর্ণমতোঽন্যথা।"

মিথ্যা প্রত্যবস্কন্দন কিম্বা সত্য অন্য প্রকারের সহিত একত্র হইয়া থাকিলে কোন্ উত্তর গ্রহণ করিবে? দুইটি উত্তরের মধ্যে যাহার দাবী অধিক, সেই প্রভূতার্থবিষয়, জবাব পূর্ব্বে গ্রহণ করিবে। যদি একটি স্বীকার, অন্যটি অস্বীকার হয়, তবে অস্বীকার জবাব পূর্ব্বে গ্রহণ করিবে, কারণ, তাহাতেই ক্রিয়ার প্রয়োজন। ইহা করিলে সঙ্কর দোষ হইবে না, অন্যথা হইবে।

"মিথ্যাকরণয়োর্বাপি গ্রাহ্যং কারণমুত্তরম্।"

মিথ্যা ও প্রত্যবস্কন্দন থাকিলে প্রত্যবস্কন্দনই আগে গ্রহণ করিবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সঙ্কর দোষে কে প্রমাণ দিবে, তাহা লইয়া গণ্ডগোল হয়। আজকাল যাহাকে onus বলে, বিমিশ্রিত উত্তরে সেই onus লইয়া অব্যবস্থা হইতে পারে বলিয়াই শাস্ত্রকারগণ সঙ্কর দোষের জন্য এতখানি মাথা ঘামাইয়াছেন।

যদি বিবাদী উত্তর না দেয়, তবে সামাদি দ্বারা তাহাকে দমন করিবে।

নারদ বলেন :—

"যথার্থমুত্তরং দদ্যাদদদদ্দাপয়েন্নৃপঃ।
সামভেদাদিভির্যোগৈর্যাবৎ সোঽর্থঃ সমুদ্ধৃতঃ।"

যথার্থ উত্তর দিবে। যদি না দেয়, তবে রাজা সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড দ্বারা অর্থের উদ্ধার করিবেন।

হারীত সামদানাদির ব্যাখ্যা দিয়াছেন :—

"প্রিয়পূর্ব্বং বচঃ সাম ভেদস্তু ভয়দর্শনম্।
অর্থাপকর্ষণং দানং দণ্ডস্তাড়নবন্ধনম্।"

প্রিয়-বচনকে সাম বলে, ভয়দর্শনকে ভেদ, অর্থগ্রহণকে দান এবং তাড়ন ও বন্ধনাদিকে দণ্ড বলে।

বিবাদী উত্তর না দিলে বশিষ্ঠ সাতটি উপায় গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন :—

"কৌটিল্যং সামভেদৌ চ দণ্ডশ্চেতি চতুষ্টয়ম্।
মায়োপেক্ষেন্দ্রজালানি সপ্তোপায়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

উত্তর বাহির করিবার সাতটি উপায়—কুটিলতা, সাম, ভেদ, দণ্ড, মায়া, উপেক্ষা ও ইন্দ্রজাল।

যদি ইহাতেও প্রতিবাদী উত্তর না দেয়, তবে সাত দিন চলিয়া গেলে বাদী একতরফা ডিক্রী পাইবে। মনু বলেন, বিবাদীকে উত্তর দিবার জন্য দেড় মাস সময় দিবে, তাহার মধ্যে উত্তর না দিলে বাদী মোকদ্দমায় একতরফা জয়লাভ করিবে। অভিযোগ নির্ণয় না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাদী প্রত্যভিযোগ করিতে পারিত না, কিন্তু কলহ বা সাহসে অভিযোগের সমকালীন প্রত্যভিযোগ গৃহীত হইত।

আহ্বানের পর বিবাদী যদি না আসিত, তাহা হইলে সেই অনুপস্থিত বিবাদী পরাজয় লাভ করিত। কিম্বা আসিয়াও যদি নিরুত্তর থাকিত, তাহা হইলেও পরাজয় হইত। যদি ছল করিয়া কালহরণ করিত, তাহা হইলেও বিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রী হইত। আর আহ্বান শুনিয়া যে বিবাদী পলায়ন করিত, তাহাকেও ঋণী বা দোষী স্থির করা হইত।

দেখিতেছি, সে-কালের মানুষও বেশ চালাক ছিলেন। মানুষের দোষ-ত্রুটিগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহারা যে সমস্ত বিধান করিয়াছিলেন, তাহাকে আমরা কোনও প্রকারেই উপেক্ষা করিতে পারি না।

শ্রীমতিলাল দাশ (এম-এ, বি-এল)।



পরদেশী গল্প

(ফরাসী-গল্প)



১। কুড়ানো ঘড়ি

বন্ধু ব্রের্লোকে সে-দিন চলন্ত ট্রাম হইতে লাফাইয়া পথে নামিয়া যে ভাবে মোড় পার হইতে দেখিলাম, মনে কেমন আতঙ্ক জাগিল-- নিশ্চয় ভারী রকমের কিছু একটা ঘটিয়াছে! আমি ছিলাম একটা দোকানে বসিয়া; ছুটিয়া তার সামনে গিয়া প্রশ্ন করিলাম,—ব্যাপার কি? তোমার মুখ দেখচি কালি হয়ে গেছে।

বন্ধু কহিল,—আর বলো না ভাই, জেলে যেতে-যেতে রয়ে গেছি!

জেল!

ব্রের্লো শেষে অফিসের টাকা ভাঙ্গিয়া বসিল না কি! আমার বুকখানা ছঁ্যাৎ করিয়া উঠিল। ব্রের্লো চোর!

ব্রের্লো কহিল—সব কথা খুলে বলচি।··

তার পর বলিল,—একটা লক্ষীছাড়া ঘড়ির জন্য যে বিপদে পড়েছিলেম! ওঃ!

কহিলাম—ইলেকট্রিক ঘড়ি?

ব্রের্লো কহিল—না হে, এমনি সাধারণ ওয়াচ-ঘড়ি। কাল রাত্রে পথে কুড়িয়ে পাই বুলেভার্দের কাছে। কার ঘড়ি জানি না—সেটি নিয়ে গিয়েছিলেম আমাদের মহল্লার থানায় জমা দিতে! তুমি অবাক হচ্ছো! আছে হে, কাহিনী আছে—রীতিমত প্রাণ-কাঁপানো কাহিনী!···

ব্রের্লো বলিতে লাগিল—

আজ এই বেলা নটায় থানায় গিয়েছিলেম সেই ঘড়ি নিয়ে। ঘড়ির ডালা সোনার, তাতে প্লাটিনামের একটা হরফ শুধু ক্ষোদা আছে। থানায় গিয়ে দেখলেম, এক ভদ্রলোক বসে কোকো খাচ্ছেন। আমায় দেখে বললেন,—কি চাই?

সত্য কথা বলতে কি, থানার অফিস-ঘরে ঢুকে আমার গা কেমন ছমছম্ করে উঠলো—দেওয়ালে টাঙানো একটা মস্ত ফ্রেম—তাতে ঝুলচে রাশীকৃত লোহার হাত-কড়া!

একটা ঢোঁক গিলে বললেম—আপনি ইন্‌স্পেক্টর সাহেব?

তিনি বললেন—হ্যাঁ। কি চাই?

বললেম,—কাল রাত্রে পথে এই ঘড়িটি কুড়িয়ে পেয়েছি। তাই আপনার কাছে জমা দিতে এসেছি। মানে, যার ঘড়ি······

কথা শেষ হলো না! ভদ্রলোক কোকোর পেয়ালা নামিয়ে টেবলে রেখে দুই চোখ কপালে তুলে বললেন—ঘড়ি?

পাশের ঘরে কটা জমাদার বসে দাবা খেলছিল! ভদ্রলোক ডাকলেন—হাবিলদার—·

—হুজুর!

—এ দিককার জানালা-দরজাগুলো বন্ধ করে দাও। বাতাসে ভারী ধুলো উড়চে।

তারপর আমার পানে চেয়ে বললেন,—দেখি, কি ঘড়ি।

ঘড়িটি তাঁর হাতে দিলেম। তিনি ঘড়িটি ধরলেন কাণের উপর—তার পর নেড়ে-চেড়ে দেখলেন দু'চারবার; অবশেষে ডালা খুলে কি পরীক্ষা করলেন; তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন—হাঁ, ঘড়ি বটে! তাতে ভুল নেই।

ঘড়িটি হাতে নিয়ে তিনি থানার সিন্দুক খুললেন, খুলে তার মধ্যে ঘড়ি রেখে সিন্দুকে চাবি এঁটে আমার কাছে এলেন; চেয়ারে বসে বললেন—দামী ঘড়ি। কোথায় পেলে?

—আজ্ঞে, ঐ রুয়ে মঁগ প্রিন্সের কোণে, বুলেভার্দের সামনে।

—হুঁ। রাস্তায়? না ফুটপাথে?

—ফুটপাথে।

—হুঁ!···ফুটপাথ হলো ঘড়ি রাখবার জায়গা,—না?

আমি বললেম—আগে শুনুন···

ভুরু কুঁচকে ভদ্রলোক বললেন,—আর শুনে কাজ নেই। তাঁর মুখ আরো গম্ভীর হলো। বললেন—তোমার নাম?

নাম বললেম।

—কোথায় থাকো?

—আমি থাকি প্লা ব্ল্যাশে। ২৩ নম্বর বাড়ী। দোতলার ফ্ল্যাটে।

—কি কাজ করো?

তাঁকে বললেম,—আমার বার্ষিক আয় বারো হাজার ফ্রাঁ।

—এ ঘড়ি কখন্ কুড়িয়ে পেলে?

—আজ্ঞে, রাত তখন তিনটে।

—আরো পরে নয়?

—আজ্ঞে না।

ভদ্রলোক বললেন,—বাহাদুর ছোকরা! পুলিশ একটু আগে ও পথে রোঁদে গেছে। সে ঘড়ি দেখতে পেলে না?

রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠলো। এত বড় ইতর-ইঙ্গিত!

ইন্‌স্পেক্টর বললেন,—অত রাত্রে ও-পথে কি মহাকার্য্য ছিল, বাপু? থাকো বলচো, প্লা ব্লাশে—ওখান থেকে বহুৎ দূরে।

রুক্ষ স্বরে বললেম তার মানে?

—সহজ কথা। এর আবার মানে খুঁজচো কি!

—যা বলবার, আমি বলেছি।

—হুঁ!···কিন্তু আমার কথা এখনো শেষ হয়নি, বাপু। বলো, বাড়ী-ঘর ছেড়ে অত রাত্রে ও-পথে কি করছিলে?

বললেম—আমার এক মহিলা বান্ধবীর বাড়ী থেকে ফিরছিলেম।

—বান্ধবীটির বিয়ে হয়েছে? না, কুমারী?

—বিয়ে হয়েছে।

—কার সঙ্গে ?

—একজন ডাক্তারের সঙ্গে।

—তাঁর নাম ?

—তাঁর নামে কি দরকার, মশায় ?

ভদ্রলোক চোখ রাঙিয়ে বজ্র-গর্জ্জনে বললেন,—কি! এমন স্পর্দ্ধা! নাম বলবে না ?

—না। আমি তাঁর নাম বলবো না।

ইন্‌স্‌পেক্টরের মুখ রাগে রাঙা হলো। তিনি বললেন,—ও সুরে সুবিধা হবে না বাপু! তাছাড়া তোমার মুখখানি চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।

—অসম্ভব! মশায়ের সঙ্গে জন্মে কখনো আমার দেখা-সাক্ষাৎ ঘটেনি।

—ও সব উড়োধাপ্পা চল্‌বে না বাপু। এটা হচ্ছে বাঘের বাসা।

রাগে আমার মুখে কথা সরলো না। ভদ্রলোক বললেন,— ক'বার জেল খেটেছ ?

অসহ্য! বললেম,—তুমি ক'বার খেটেছ ?

—কি! পাজি! শয়তান!

—তুমি শয়তান।

বেশ বুঝলেম, বাঘের বাসায় ঢুকে বাঘের সঙ্গে বিরোধ করছি! আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছিল।

ইন্‌স্পেক্টর উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—কি বললে ?

কথাটা আবার বলতে যাচ্ছিলেম—বলবার সুযোগ মিললো না। জুতোর একটি ঠোক্করে আমায় ধূলিসাৎ করে তিনি গর্জ্জন তুললেন—জেলের পথ বানিয়ে দিচ্ছি—এখনি। দাঁড়াও! মরবার পাখা উঠেচে ? দাগী পাকা চোর—সাধু সেজে থানায় এসেচেন! আমার সঙ্গে তামাসা! শ্বশুর-বাড়ী পেয়েছ এটা! না ? খাওয়াচ্ছি জামাই-ভোগ হালুয়া…

ভদ্রলোক একখানা মোটা খাতা টেনে তার পাতা খুলে খ্যাস খ্যাস করে কি সব লিখলেন, লিখতে লিখতে বললেন—নাম ক্রেলেঁা…থাকো মহল্লা ব্রঁাশে…রুয়ে প্রিন্সের সামনে কুড়িয়ে পেয়েছ দামী ঘড়ি…হুঁ…বাধিক আর বারো হাজার ফ্রাঁ!…

তারপর আমার পানে চেয়ে বললেন,—এ কথা আমায় বিশ্বাস করতে হবে ? বটে!…আচ্ছা, দেখাও, তোমার বারো হাজার ফ্রাঁ কোথায় ? বার করো বারো হাজার ফ্রাঁ।

আমি অবাক! ভয়ে বিস্ময়ে!

তিনি বললেন—আমার কাছে ধাপ্পা চলবে না বাপু। আমি হলেম অনেকদিনকার পাকা ঝুনো অফিসার!…এ ঘড়ি তুমি চুরি করেছ! তুমি পাকা চোর…দাগী।

—আমি চুরি করেছি ?

—নিশ্চয়! তুমি পাকা চোর!

ভদ্রলোকের গলার স্বর বেশ চড়ে চড়ে উঠলো—পাশের ঘরের জমাদারগুলো দাবার ছক ফেলে এসে দাঁড়ালো অফিস-কামরার সামনে। ভদ্রলোক তাদের পানে চেয়ে বললেন—তালাশী নাও…

চকিতে অমনি দু'চারজন এসে ঝাপিয়ে পড়লো আমার উপর। তালাশী চললো বেশ জবরদস্তভাবে—যার আমার পায়ের মোজা জোড়া খুলে উল্টেপাল্টে তারা দেখতে ছাড়লো না।

ইন্‌স্‌পেক্টর বললেন—ভারী চালাক!…হাত দুটো তুলে ছাখো—বগল-দাবায় আর কোনো চোরাই-মাল পাও কি না!…

ক্রেলেঁার কথায় আমার হাসি চাপিয়া রাখা দায় হইল! কহিলাম,—বলো কি হে! তুমি এমন নিরেট!

ক্রেলেঁা কহিল—সত্যি বলচি, এবারে পথে-ঘাটে কোনো জিনিষ দেখলে স্রেফ সে জিনিষ পকেটে পুরবো—থানায় জমা দিতে যাবার দুর্ব্বুদ্ধি হবে না! এ একেবারে পণ করেছি! সত্যি…

২। চাকরির বাজার

খনিজ-বিজ্ঞানটা মাশগ্রেভিয়াস-বংশের কেমন একচেটিয়া বিদ্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাঁর দৌলতে এ বংশের খ্যাতি, সেই জর্জ্জেস মাশগ্রেভিয়াস আজ ত্রিশ বৎসর ফ্রেঞ্চ-আকাডেমিতে খনিজ-বিজ্ঞানে গদি দখল করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁর বড় ছেলে জীন—এখানকার মিউজিয়মে খনিজ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক; মেজো ছেলে অঁারি নর্ম্যাল স্কুলে খনিজ-বিজ্ঞানের মাষ্টার। বড় জামাই পীয়ের দোলেঁা শরবোঁ কলেজে খনিজ-বিদ্যার অধ্যাপক; মেজো জামাই চার্লস তুলেঁা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের এম-এ; কিন্তু সে পড়ায় খনিজ-বিজ্ঞান—তা'ও তুলেঁার একটা ছোট স্কুলে।

মেজো মেয়ে দূরে সেই অজ পাড়াগাঁয়ে পড়িয়া আছে—মায়ের প্রাণে এ দুঃখ বিঁধিয়া আছে কাঁটার মত। অন্য ছেলেমেয়েরা কাছে থাকে; এই মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয় শুধু জামাইয়ের স্কুলে লম্বা-ছুটী হইলে।

শরবোঁর কলেজে খনিজ বিজ্ঞানের জন্য আর একজন প্রফেসর দরকার। এ সংবাদ রাষ্ট্র হইবামাত্র গৃহিণী কর্ত্তাকে ধরিলেন—ওগো, মেজো জামাইকে এবারে যেমন করিয়া পারো, এ চাকরীতে বাহাল করিয়া দাও। নহিলে আমি মাথা খুঁড়িয়া অনর্থপাত করিব।

নিত্য এক কথা! অবশেষে প্রাণরক্ষার জন্য আচার্য্য মাশগ্রেভিয়াসকে একদিন দামী পোষাক গায়ে অঁাটিয়া ছুটিতে হইল মন্ত্রী-বাহাদুরের কাছে মেজো জামাইয়ের জন্য সুপারিশ ধরিতে। চাকরী দেওয়ার মালিক মন্ত্রী-বাহাদুর।

মন্ত্রী-বাহাদুর কয়দিন ধরিয়া ভাবিতেছিলেন, মাশগ্রেভিয়াস নিশ্চয় আসিয়া মুরুব্বি ধরিবে! এবং আসিলে এই প্রবীণ আচার্য্যকে কি কথা বলিবেন, তাহাও তিনি ভাবিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। মন্ত্রী-বাহাদুরের নিজের জানা একটি উমেদার ছিল—এ চাকরীর জন্য। এবং মাশগ্রেভিয়াসদের এ-চাকরীতে একচেটিয়া অধিকার ভাবিয়া তিনি তাঁর উমেদারটিকে যেমন করিয়া পারেন, এ চাকরীতে বসাইবেন—এমনি সঙ্কল্প করিয়াছেন।

মাশগ্রেভিয়াস আসিয়া দ্বারে হানা দিলে মন্ত্রী-বাহাদুর প্রথমে একটু চমকিত হইলেন। কিন্তু তিনি পাকা লোক! নহিলে আর ফরাসী মুলুকে মন্ত্রিত্ব পান! মাশগ্রেভিয়াসকে দেখিয়া মনোভাব মনে চাপিয়া তিনি বলিলেন—আসুন। নিশ্চয় কোনো কাজ আছে—নাহলে আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলা পড়বে কেন!

আচার্য্য মাশগ্রেভিয়াস কহিলেন—ঠিক ধরেচেন। কাজেই এসেছি। জরুরি কাজ। শুনচি, শারবোঁ কলেজে একটি খনিজ বিজ্ঞানের প্রফেসর নেবেন।

—হাঁ। তাই স্থির হয়েছে! কথা পাকা! কলেজ-কমিটি

বহুদিন থেকে তাগিদ দিচ্ছে—আমাদের কৌন্সিলও এ চাকরি মঞ্জুর করেছে। কাজেই গড়িমাসির কি দরকার! আর একজন প্রফেসর নিতে হবে।

—কোনো লোক স্থির করেচেন?

—এখনো স্থির করিনি। তবে দু'চারজন এসে দেখাশুনা করচে। কিন্তু এদিককার খপর আপনার মত কে আর রাখে বলুন? তা আছে আপনার জানা কোনো লোক? এ কাজে সবচেয়ে যে যোগ্য হবে?

—আছে। লোকটি আমার খুব জানা। ঐ চার্লশ…

—চার্লশ! সে আপনার জামাই না?

—আজ্ঞে হাঁ। আমার জামাই।

—শুনুন, তবে আসল কথা বলি। এ ছোকরাটির সুখ্যাতি আমি শুনেছি—কিন্তু তাকে এ কলেজে চাকরি দেওয়া অসম্ভব।

—অসম্ভব কেন? তার নামে মিছে করে কেউ কিছু লাগিয়েছে বুঝি? তাই আপনার কাণ ভারী হয়েছে তার সম্বন্ধে?

—না, না। তার নামে কেউ কিছু লাগায় নি।

মাশগ্রেভিয়াস কহিলেন—তার মত পণ্ডিত দেশে আর কে এখন আছে? আগ্নেয়গিরির মাটীর সম্বন্ধে সে কি রকম গবেষণা করেছে, জানেন? বিজ্ঞান-পরিষদ তার কত তারিফ করেছে।

—তাঁর পাণ্ডিত্য বা শক্তি আমি অস্বীকার করছি না, প্রফেসর।

—তবে কি এমন হলো?

—এ-কথা আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আপনার সে অধিকার আছে। কি জানেন, শরবোঁর কলেজে তাঁকে যে নেবো না—তার কারণ আছে।

—কি কারণ, জানতে পারি?

—সে আপনার জামাই! তাই তাকে নেওয়া হবে না।

—আমার জামাই হয়ে সে এত বড় অপরাধ করেছে যে…

—তাই। আপনি, আপনার ছেলেরা, আপনার জামাইরা—সমস্ত কলেজে খনিজ-বিজ্ঞানের চাকরি একচেটে করে রেখেচেন। এ যেন ঠিক আপনার বংশ এ-দিকটায় রাজ্য করছে!

মাশগ্রেভিয়াস কহিলেন—এমন দৃষ্টান্ত আরো আছে মন্ত্রীমশায়।

—থাকতে পারে! আমার তা জানবার প্রয়োজন নেই। এই একচেটে ব্যাপার আমার দু'চোখের বিষ! আমি মন্ত্রীর আসনে থাকতে কোনো বংশকে এভাবে কোনো কিছুতে একচেটে থাকতে দেবো না।

আচার্য্য বলিলেন,—এ সঙ্কল্প ভালো—খুব ভালো। কিন্তু এতে বিশেষজ্ঞদের উপর আপনি মস্ত অবিচার করবেন। এর ফলে অযোগ্য লোককে চাকরি দেবেন।

—কি জানেন, তবে সত্য কথাই বলি। জানেন, দেশশুদ্ধ লোক বিরক্ত হয়ে বলছে এই খনিজ-বিজ্ঞানের বিদ্যা সপরিবারে আপনি দখল করে রেখেছেন। যেন, এ বিদ্যা আপনার পরিবারের গণ্ডীর মধ্যেই আছে বদ্ধ!

—এমন দাবী আমি করি না। আমার জামাই হবার আগে এই ছেলেটি ছিল আমার ছাত্র।

—তা সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। যে ছেলেটিকে এ চাকরিতে আমি বাহাল করবো, স্থির করেছি সে ছেলেটিও আপনার ছাত্র। কথার জাল-বিস্তারে প্রয়োজন কি? তার নাম আপনাকে বলতে আমার কোনো আপত্তি নেই। তার নাম পল গ্রাজেঁ—পাশ করে নর্ম্মাল স্কুলে সে মাষ্টারী করছে।

—পল গ্রাজেঁ?

—হাঁ। সে একটি চমৎকার থীশিস লিখেচে। নয়?

—সত্য।

—তার সম্বন্ধে ভালো রিপোর্ট আমি পেয়েছি। চমৎকার ছেলে।

—নেহাৎ এখনো বাচ্চা।

—সে তো ভালো কথা। এই বয়স থেকেই এ সাবজেক্টে গভীর মনোযোগী হবে—অন্য পাঁচ ব্যাপারে মন দিতে পারবে না। কেমন, এ-কথা আপনি স্বীকার করবেন নিশ্চয় যে আপনার জামাই এ চাকরি না পেলেও অযোগ্য লোককে এ চাকরিতে আমি বাহাল করচি না?

—হাঁ। কিন্তু আমার স্ত্রী মনে ভারী আঘাত পাবেন।

—সেজন্য আমি সত্যই দুঃখিত। কিন্তু এ কথাও স্বীকার করবেন, মাদাম মাশগ্রেভিয়াসকে খুশী করবার জন্য তাঁর ইচ্ছামত চাকরির ব্যবস্থা আমি করতে পারি না।

—কিন্তু আমি ভাবছিলেম এই লেকচারের কথা। চার্লশের এ চাকরিতে দাবী ছিল। তবে আপনি যখন বলচেন, অসম্ভব। …তা…এজন্য আমরা খেসারৎ দাবী করতে পারি না?

—অবশ্য। চার্লশ আকাডেমির সভ্য?

—তুলোঁর চাকরিতে সে আজ ছ'বৎসর মুখ জুবড়ে পড়ে আছে। 'ডক্টর' ডিগ্রী পেয়েছে। বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসর। এখনো সে সামান্য স্কুল-মাষ্টার রয়ে গেল, এতখানি পাণ্ডিত্য নিয়ে! তুলোঁয় খনিজ-বিজ্ঞানের কোনো 'চেয়ার' নেই। একটা চেয়ারের ব্যবস্থা না হয় সেখানে করুন। নাহলে কোন্ মুখে আমি ফিরে যাবো? গিয়ে গৃহিণীকে বলবো—ওগো, কিছু হলো না—তোমার মেয়ে-জামাই তুলোঁতেই পড়ে থাকবে? বড্ড বিশ্রী হবে মন্ত্রী-মশায়।

—হুঁ। বেশ, আমি কথা দিচ্ছি, চেষ্টা করবো—যাতে আপনার জামাইয়ের সুবিধা করতে পারি।

—আপনি মনে করলে কি না হতে পারে, বলুন!

—সভার সঙ্গে আগে পরামর্শ করি…

—বেশ!

—আমি কথা দিচ্ছি—আমি চেষ্টা করবো।

—তাহলে আমার স্ত্রীকে আমি ভরসা দিতে পারি? মানে, নিশ্চিত ভরসা?

—পারেন। আমার উপর নির্ভর রাখুন। চার্লশকে আমি প্রফেসর করে দেবো।

মন্ত্রী উঠিলেন—কাজ আছে। প্রফেসরকে নিরস্ত করিতে পারিয়াছেন এত অল্প কথায়—ইহাতে মনে মনে খুশী হইলেন।

কর-কম্পনের জন্য তিনি হাত বাড়াইলেন, কহিলেন,—আপনি রাগ করেন নি প্রফেসর মাশগ্রেভিয়াস?

—না, না। রাগ কি! আপনি যোগ্য লোককে চাকরিতে বাহাল করচেন। আমার স্ত্রী এ কথা শুনে খুব খুশী হবেন। কারণ, ঐ পল্ গ্রাজেঁর সঙ্গে আমার সেজ-মেয়ের বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে।

শ্রীবৈকুণ্ঠ শর্ম্মা।



বৌদ্ধধর্ম্ম ও রবীন্দ্রনাথ

আষাঢ়ের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কবি-জনোচিত উচ্ছ্বসিত ভাষায় বুদ্ধদেবের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে বেশী কিছু বলা হয় নাই। শুধু ইহা বলা হইয়াছে যে, তাঁহার ধর্ম্ম ছিল 'অহিংস্রধর্ম্ম' 'অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে জয় করা' 'সাধু কর্ম্মের মধ্যে আত্মত্যাগ' 'সর্ব্বজীবের প্রতি অপরিসীম মৈত্রীসাধনা।' কিন্তু ধর্ম্মের প্রধান বস্তু ঈশ্বর। ঈশ্বর সম্বন্ধে বুদ্ধদেব কি বলিয়াছেন, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নীরব। বুদ্ধদেব কোথাও কি বলিয়াছেন যে, এক সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ও পালন করিতেছেন? এ কথা বুদ্ধদেব কোথাও বলেন নাই। শুধু তাই নয়, তিনি ইহাও বলেন নাই যে, ঈশ্বর আছেন। সুতরাং তাঁহার ধর্ম্ম হইতে ঈশ্বরকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ঈশ্বরকে বাদ দিয়া ধর্ম্ম, আত্মাকে বাদ দিয়া দেহের ন্যায়, বিড়ম্বনা মাত্র। বৌদ্ধধর্ম্মে ঈশ্বরের কোনও উল্লেখ নাই, ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের গুরুতর ত্রুটি বলিয়া আমাদের মনে হয়। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কি মত, তাহা জানিতে কৌতূহল হয়।

তাহার পর অহিংসার কথা। হিন্দুরা যজ্ঞে পশু বধ করিত। বুদ্ধদেব বলিলেন, ইহা বড় নিষ্ঠুর। কিন্তু তিনি ত ইহা বলিলেন না যে, পশুর মাংস ভোজন করা পাপ। আমাদের বৃদ্ধ মনু বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি পশু-মাংস ভোজন করে, সে-ও পশুবধজনিত পাপের ভাগী হয়। সহজ বুদ্ধিতে এ-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এই সহজ সত্য বুদ্ধদেবের চক্ষুতে পড়িল না, ইহা কি আশ্চর্য্য নহে? তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম যাহারা গ্রহণ করিল, তাহারা পশু-মাংস ভোজন করিত। ফলে যে সকল দেশে বুদ্ধদেবের বাণী প্রচারিত হইল, সে সকল দেশে অহিংসার বহর দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। চীন জাপান তিব্বত ব্রহ্মদেশে বুদ্ধদেবের অনুচরদের রসনা-তৃপ্তির জন্য নিত্য লক্ষ লক্ষ জীব হত্যা হইতেছে, যাহারা এই সব প্রাণীর মাংস ভোজন করিতেছে, তাহারা যে কিছু পাপ করিতেছে, ইহা মনে করে না; কারণ, তাহারা ত প্রাণিহত্যা করে নাই! আর ভারতবর্ষের হিন্দুরা যাহারা বুদ্ধের ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, মা-কালীর নিকট পাঁঠা বলি দেয়—তাহাদের মধ্যেই মাংস-ভোজনের জন্য জীবহত্যা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কম হয়। বুদ্ধদেব বুঝেন নাই, রবীন্দ্রনাথও বুঝিলেন না যে, যজ্ঞে পশুবলির ব্যবস্থার কারণ এই যে, হিংসা করা যাহাদের স্বভাব, তাহাদিগকে ক্রমশঃ অহিংসার পথে লইয়া যাওয়া। তাহাদিগকে বলা হইল যে, যজ্ঞ ভিন্ন অন্যত্র পশু-বধ পাপ; তাহারা ইহা বিশ্বাস করিয়া যজ্ঞ ভিন্ন অন্যত্র পশু-বধে বিরত হইল। ফলে মোট পশু-বধের সংখ্যা কমিয়া গেল।

এই প্রবন্ধে বুদ্ধদেবকে প্রশংসা করিবার উপলক্ষ করিয়া হিন্দুধর্ম্মকে নিন্দা করিবার সুযোগ রবীন্দ্রনাথ উপেক্ষা করেন নাই। হিন্দু ধর্ম্মে 'মানুষে মানুষে বেড়া তুলে দেওয়া' হইয়াছে—ইহাই না কি ভারতের অধঃপতনের কারণ? না হয় মানিলাম যে, জাতিভেদ ছিল বলিয়াই হিন্দুর পতন হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মে ত জাতিভেদ নাই, তথাপি পতন হইল কেন? ভারতে বৌদ্ধ নৃপতিরা বিস্তীর্ণ রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'সত্যের বন্যায় বর্ণের বেড়া দিলে ভাসিয়ে'—তথাপি ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম বহিষ্কৃত হইল কেন? বৌদ্ধ ব্রহ্মদেশ পরপদানত হইল কেন? বৌদ্ধ তিব্বত, বৌদ্ধ চীন লাঞ্ছিত হইল কেন? জাপান কি জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল বুদ্ধদেবের অহিংসা মন্ত্র জপ করিয়া? জাপান কি এক্ষণে চীনের প্রতি অহরহ

'অপরিমেয় মৈত্রীসাধনায়' নিরত আছে? এই সব আলোচনা করিলে কি ইহা প্রতীতি হয় না যে, উত্থান-পতন সংসারের নিয়ম; জগতে পশুবল অনেক সময় জয় লাভ করে; দুর্বৃত্ত অধার্ম্মিকও মধ্যে মধ্যে নিরীহ ধার্ম্মিকের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে?

'মানুষে মানুষে বেড়া' তুলে দেওয়াকে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু সভ্যতার সূত্রপাত হইতে 'মানুষে মানুষে বেড়া' তুলিয়া দেওয়া হইতেছে—এই প্রথা সকল সভ্য দেশেই প্রচলিত। যখন মানুষের ঘর-দ্বার ছিল না, অরণ্যে ঘুরিয়া বেড়াইত—তখনই কোনও বেড়া ছিল না। এখন সর্ব্বত্রই বেড়া আছে। প্রত্যেক গৃহস্থ তাহার পরিবারবর্গকে রক্ষা করিবার জন্য বেড়া তুলিয়া থাকে। বেড়া ভাঙ্গিয়া দিলে সব সময় সুফল হইবে না; কারণ, অনেক ক্ষেত্রে মনুষ্যদেহের মধ্যেই কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি ভীষণ পশু বাস করে, সেই সকল পশুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বেড়া দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। সবরমতী আশ্রমে বেড়া আলগা করা হইয়াছিল, এজন্য নীলা নাগিনীর বিষে অনেক আশ্রমবাসী জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যদি সকল স্থানে বেড়া ভাঙ্গিয়া দিতে বলেন, তাহা হইলে কোনও সভ্য সমাজই তাঁহার মত গ্রহণ করিবে না। হিন্দুর বর্ণাশ্রমধর্ম্মে যে বেড়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার উপরেই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের সমধিক আক্রোশ। কিন্তু হিন্দুর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ঋষিদের সত্যদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা। ইহা সমাজে ভেদের সৃষ্টি করে না; ইহা ঐক্যেরই সৃষ্টি করে। 'সব মানুষের সমান অধিকার হওয়া উচিত,' পাশ্চাত্য সভ্যতার এই ভ্রান্ত উক্তির ফলে আমরা ইহা বুঝিতে পারি না। বাস্তবিকপক্ষে সব মানুষের সমান অধিকার হওয়া উচিত নহে, সম্ভব নয়। পাশ্চাত্য সমাজেও নাই। পাশ্চাত্য সমাজে মুখে বলা হয় যে, সমান অধিকার হওয়া উচিত, কিন্তু কাযে সমান অধিকার দেওয়া হয় না, এজন্য সেখানে Sufragette movement, strike প্রভৃতি স্ত্রীপুরুষে দ্বন্দ্ব, ধনিকে শ্রমিকে দ্বন্দ্ব নিত্যই লাগিয়া আছে। বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে স্বাভাবিক অসমতা উপলব্ধি করিয়া ঋষিগণ প্রত্যেকের যে ন্যায্য অধিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহারই নাম বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। ইহার প্রভাবে হিন্দু সমাজে চিরকাল আভ্যন্তরিক শান্তি বিরাজিত ছিল।

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে উপনিষদ্-বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। অন্যান্য প্রবন্ধেও তিনি উপনিষদের ঋষিদের জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কি ইহা লক্ষ্য করেন নাই যে, উপনিষদের ঋষিগণ বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থাকে ঈশ্বরকৃত কল্যাণকর ব্যবস্থা বলিয়া সর্ব্বত্র মান্য করিয়াছেন? বেদ, উপনিষদ্, রামায়ণ,মহাভারত,—প্রত্যেক গ্রন্থেই কি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে সমর্থন করা হয় নাই? হিন্দুর অতীত ইতিহাসে যাহা কিছু গৌরবের বস্তু, সকলের সহিত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত আছে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যদি এতই অনিষ্টকর হয়, তাহা হইলে হিন্দু তাহার ধর্ম্ম, দর্শন, কাব্য, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, গণিত, শিল্প, ভাস্কর্য্য—সকল বিষয়ে এত অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল কিরূপে? তাহা হইলে ব্যাস-বাল্মীকি হইতে শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য পর্য্যন্ত সকল সাধু মহাপুরুষ ইহার সমর্থন করেন কেন?

রবীন্দ্রনাথ বরাবর বলিয়া আসিয়াছেন যে, মন্দিরে গিয়া মূর্ত্তিপূজা করিলে চিত্তের অবনতি হয়। অতএব কেহ যদি মূর্ত্তিপূজা করিবার সুযোগ না পায়, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের আনন্দিত হওয়া উচিত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মন্দির-প্রবেশ আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর রবীন্দ্রনাথ বহুস্থলে বলিয়াছেন যে, সকল হিন্দুকে মন্দিরে গিয়া পূজা করিবার অধিকার দেওয়া উচিত। তিনি হয় ত বলিবেন, যাহারা মূর্ত্তিপূজায় বিশ্বাস করে, তাহাদিগকে মন্দিরে ঢুকিতে দেওয়া হয় না কেন? এখন দেখিতে হয়, মূর্ত্তি-পূজায় বিশ্বাস কোন্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত? শাস্ত্রে আছে, এইরূপ মূর্ত্তি এই ভাবে পূজা করিলে কল্যাণ হয়। যে ব্যক্তি শাস্ত্রে বিশ্বাস করে, মূর্ত্তিপূজায় তাহার বিশ্বাস হয়। যে ব্যক্তি শাস্ত্রে বিশ্বাস করে না, তাহার মূর্ত্তিপূজায় প্রকৃত বিশ্বাস হইতে পারে না। যে-শাস্ত্রে মূর্ত্তিপূজার ব্যবস্থা আছে, তাহাতেই বলা হইয়াছে—বিশেষ পাপ করিলে বিশেষ কোনও জাতিতে জন্ম হয়, সে জন্মে দেহ অপবিত্র থাকে, এজন্য মন্দির-প্রবেশ নিষেধ। তাহার সাধনার উপায়,—নাম-সঙ্কীর্ত্তন এবং সাধু কর্ম্ম। যে ব্যক্তি শাস্ত্রে বিশ্বাস করে, সে এই নিষেধ মানিয়া চলিবে। যে বিশ্বাস করে না, হিন্দুর দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া পূজা

করিবার অধিকার তাহার নাই, যেমন মুসলমান ও খৃষ্টানের অধিকার নাই। রবীন্দ্রনাথ হিন্দুধর্ম্ম মানেন না, পূর্ব্বজন্ম ও কর্ম্মফল কিছুই স্বীকার করেন না, এ অবস্থায় হিন্দুর পূজা-পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁহার মতের কোনও মূল্য নাই। তাঁহার এই প্রকার বিরুদ্ধ সমালোচনার ফলে কতকগুলি হিন্দু নিজ ধর্ম্মে আস্থা হারাইতেছেন। ইহাতে তাঁহাদের মঙ্গল-সাধন করা হইতেছে অথবা অনিষ্টসাধন করা হইতেছে, তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন।

ইহা সুবিদিত যে, বুদ্ধদেব প্রচার করিয়াছিলেন যে, সংসার দুঃখময়; চিত্ত হইতে সকল প্রকার কামনা বিসর্জ্জন করিতে পারিলে এই সংসার-দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি হয়। ইহা বৈরাগ্যের কথা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্যের বিরোধী—"বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে নহে আমার।" এ জন্য রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের বৈরাগ্য-বাণী সম্বন্ধে নীরব। কেবলমাত্র নীরব নহেন—তিনি প্রকারান্তরে ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বুদ্ধদেব বৈরাগ্যের কথা বলেন নাই। কারণ, রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "বুদ্ধদেব সেই মুক্তির কথা বলিয়াছেন, যাহা রাগ-দ্বেষ-বর্জ্জনে নয়, সর্ব্বজীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীসাধনায়।" কথাটি বড়ই অদ্ভুত। রাগ বা আসক্তি বর্জ্জন করা না হয় অন্যায় হইল, কিন্তু দ্বেষ বর্জ্জন করাও কি অন্যায়? দ্বেষ বর্জ্জন না করিলে "সর্ব্বজীবের প্রতি মৈত্রীসাধনা" হয় কিরূপে? সকলেই জানেন যে, বুদ্ধদেব কামনা ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। কামনা হইতেই রাগ ও দ্বেষের উৎপত্তি হয়। যে বস্তুর জন্য কামনা থাকে, তাহার প্রতি রাগ বা আসক্তি হয়, তাহার বিপরীত বস্তুর প্রতি দ্বেষ হয়। সুতরাং কামনা ত্যাগ করিলে রাগ-দ্বেষ বর্জ্জন করিতে হয়। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কি করিয়া বলিলেন যে, বুদ্ধদেব রাগ-দ্বেষ বর্জ্জন করিতে বলেন না? আষাঢ়ের 'প্রবাসীতেই' "তথাগতের সাধনার একটি দিক" নামক প্রবন্ধে শ্রীনিরঞ্জন নিয়োগী বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অংশ কোনও প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন:—"সমস্ত সংসারকে বন্ধনাগার সদৃশ মনে করিয়া—সমস্ত সংসার ত্যাগ করিতে উৎকণ্ঠিত হইয়া এবং ত্যাগকামী হইয়া নিষ্ক্রমণ-প্রয়াসী হইতে হইবে।" বুদ্ধধর্ম্মের প্রসিদ্ধ দশপারমিতার মধ্যে "নিষ্ক্রমণ" নামক পারমিতার ইহাই তাৎপর্য্য। সংসারের প্রতি আসক্তি ত্যাগ না করিলে সংসার ত্যাগ করিতে উৎকণ্ঠিত হওয়া যায় না। কিন্তু সংসারের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করা রবীন্দ্রনাথের মতের বিরোধী। সুন্দর জগৎকে ভোগ করিতে হইবে—ইহাই রবীন্দ্রনাথের মত। এ জন্য রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের বৈরাগ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উপদেশের কোনও উল্লেখ না করিয়া বলিয়াছেন যে, বুদ্ধদেব রাগ-দ্বেষ বর্জ্জন করিতে বলেন নাই। কিন্তু ইহা কি সত্য? রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে যথার্থই বলিয়াছেন যে, "আজকাল মানুষের মধ্যে সত্যের বিকাশ বড় অল্প।"

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (এম এ)।

লোকারণ্যে

তোমারে লভিতে হরি, যদি যেতে হয়—
পর্ব্বত-কন্দর-মাঝে ত্যজি লোকালয়;

ত্যজি প্রিয়জন-স্নেহ প্রীতি প্রেমরাশি
হয় যদি মোরে প্রভু সাজিতে সন্ন্যাসী;
অথবা বিগ্রহ তব সর্ব্বকর্ম্ম ভুলে—
পূজিতে রহিতে যদি হয় গো দেউলে
চাহি না চাহি না তবে হে জীবন-স্বামী,
এ জীবনে সঙ্গ তব লভিবারে আমি।

আমি চাই কর্ম্ম-মাঝে তোমারে শ্রীহরি,
দেখিতে আনন্দরূপে এ জীবন ভরি।
লোকারণ্য-মাঝে তব বাঁশরীর তান
শ্রবণ করিতে চাহি পূর্ণ করি প্রাণ।
প্রিয়-জন-প্রেমে তব প্রেম সুগভীর—
লভিয়া মরিতে চাহি আনন্দে অধীর।

শ্রীব্রজেশ্বর রায়।



আধুনিকতম দ্বিচক্রযান

সিকাগোর ক্লিফ হিউসেঙ্গ নূতন ধরণের এই দ্বিচক্রযান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। নূতন দ্বিচক্রযানের বৈশিষ্ট্য, ইহার গীয়ার বা চেন নাই।



আধুনিকতম দ্বিচক্রযান

আরোহীর দেহের প্রতিঘাতের বেগ ইহাকে চালাইয়া লইয়া যায়।

বোমা-বর্ষণের জন্য বিমান

মৌখিক শান্তিবাদী য়ুরোপের নানা স্থানে আজ সংগ্রামের পূর্ব্বাভাস মিলিতেছে। প্রকাশ্যে এবং গোপনে নানা স্থানে সমরায়োজন চলিয়াছে। ফ্রান্সও পিছাইয়া নাই। বিগত মহাযুদ্ধে বোমাবর্ষণে ফ্রান্সকে বিপর্য্যস্ত হইতে হইয়াছিল; বোধ করি, তাহারই প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ফ্রান্স এবার নূতন ধরণের কতকগুলি বিমান নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই বিমানগুলি দেখিতে প্রায় ডাক বা যাত্রিবাহী বিমানের মত। বোমা-বর্ষণের জন্যই এইগুলি ব্যবহার করা হইবে বটে, কিন্তু বহুসংখ্যক সৈন্যের স্থান-সঙ্কুলানের ব্যবস্থাও ইহার মধ্যে আছে। ইহার দুই পাশ বর্ম্মাবৃত। আলো আসিবার জন্য মধ্যে মধ্যে যে সব কাচ বসান হইয়াছে, বন্দুকের গুলীতে সেগুলি ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি কলের কামান চালাইবে, তাহার স্থান সম্মুখ-ভাগে, স্বতন্ত্র একটি কক্ষে। ফলে সম্মুখে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে তাহার কোন অসুবিধা হইবার কথা নহে। কলের কামানটি নানাভাবে ঘুরাইবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।



বোমা-বর্ষণের জন্য বিমান

পক্ষিপালনের অভিনব ব্যবস্থা

যাঁহারা পাখী পোষেন, বাড়ী হইতে বাহির হইলেও তাঁহাদের মন পড়িয়া থাকে খাঁচার পাখী-গুলির দিকে। সময়মত পাখীগুলি একটু জল ও খাবার পাইবে কি না, এই ভাবনায় তাঁহাদিগকে অস্থির হইয়া থাকিতে হয়। এই অসুবিধার প্রতীকারের জন্য নূতন ধরণের এক প্রকার খাঁচা তৈয়ারী হইতেছে। এই খাঁচাগুলিতে জলের পাত্র এবং খাদ্যদ্রব্যের পাত্র আপনা হইতে পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা আছে। লৌহ-নির্ম্মিত খাঁচার পাত্রেই জল সরবরাহের জন্য 'ঝর্ণা' সংলগ্ন আছে, পাত্র শূন্য হইলেই তাহা স্বতঃই জলে পূর্ণ হয়। খাবারের পাত্র পূর্ণ



পক্ষিপালনের অভিনব ব্যবস্থা

করিবার জন্য একই প্রকার কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছে।

বালকের যুদ্ধজাহাজের নমুনা নির্ম্মাণ

কালিফের অদূরে সমুদ্রবক্ষে যখন রণতরী-বহর নোঙ্গর করিয়াছিল, জ্যাক্ বিটমিয়ার নামক একটি উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ের ছাত্র তখন রণপোতগুলির এক একটি নক্সা গ্রহণ করে। ইহা তাহার খেয়াল-মাত্র। সে তার পর জাহাজগুলির নমুনা তৈয়ার করিতে থাকে। ৫০ ফুট এক ইঞ্চির মধ্যে নক্সার আনিয়া, কাঠ কাটিয়া সে যুদ্ধ-জাহাজগুলিকে মডেলস্বরূপ লইয়া তদনুরূপ ক্ষুদ্রজাহাজ নির্ম্মাণ করিতে থাকে। দুই তিন সপ্তাহ ধরিয়া অবসরকালে সে এক

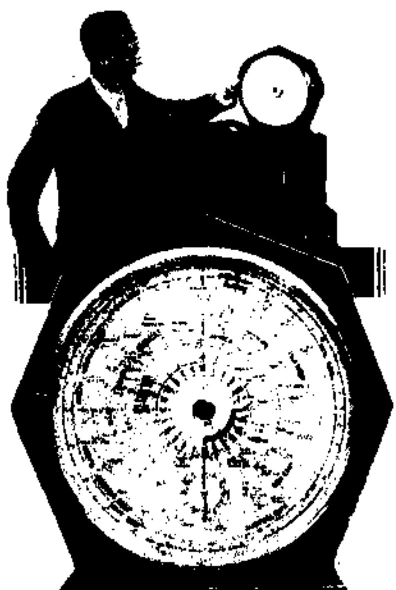


বালকনির্ম্মিত যুদ্ধজাহাজের নমুনা

একখানি যুদ্ধজাহাজের নমুনা তৈয়ার করে। এইভাবে সে ১৫খানি জাহাজের নমুনা রচনা করিয়াছিল। নৌবিভাগের কর্তৃপক্ষ এই বালকের প্রচেষ্টার কথা জানিতে পারিয়া তাহার নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজগুলি পর্য্যবেক্ষণ করেন। তাহার প্রতিভা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হন। এখন বালকটি এইভাবে জাহাজ ও নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া বাজারে বেশ নাম করিয়াছে এবং অর্থোপার্জ্জনও করিতেছে। নরম দেবদারু কাঠ ও ছুরীর সাহায্যেই সে নমুনা-জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।

পৃথিবীর সময়-নির্দ্দেশ

ইংলণ্ডে এক প্রকার নূতন ঘড়ির প্রচলন হইয়াছে। ঘড়ির মূল্যও অধিক নহে, অথচ পৃথিবীর সকল প্রান্তের সংবাদও ইহার সাহায্যে একই সময়ে অবগত হওয়া যায়। ইহাতে সাধারণ ঘড়ির ন্যায় বড় কাঁটা নাই, ইহার 'ডায়াল'ই আবর্ত্তিত হয়। ডায়ালের উপর পাঁচ মিনিট হিসাবে ঘর কাটা আছে এবং উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই পৃথিবীর নানা স্থানের সময় অবগত হওয়া যায়। ক্ষুদ্র একটি ডায়ালে ছোট কাঁটার সাহায্যে মিনিটেরও সঠিক হিসাব করিবার ব্যবস্থা আছে। বিমানে বা জাহাজেও ইহা অনায়াসে ব্যবহার করা চলে, কোনরূপ অসুবিধা হয় না। যাঁহারা বেতারযন্ত্র রাখেন, তাঁহাদেরও ইহাতে বিশেষ সুবিধা হইবার কথা। পৃথিবীর কোন্ প্রান্তে ঠিক কয় ঘটিকায় কি অভিনয় বা সঙ্গীত হইবে, তাহাও ইহা ঘরে থাকিলে অনায়াসেই বুঝিয়া লওয়া চলে। নরওয়ের জন উইলম এই ঘড়ি নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

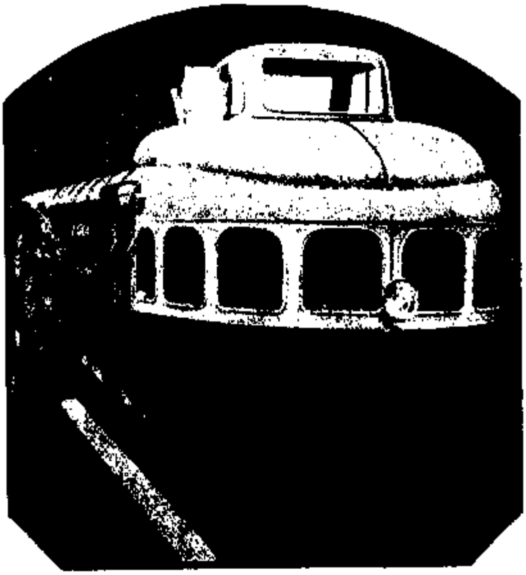


পৃথিবীর সময়-নির্দ্দেশ

নূতন ধরণের গাড়ী

ফ্রান্সে নূতন ধরণের এক প্রকার গাড়ী বাহির হইয়াছে। ইহাকে ট্রামও বলিতে পারেন, মোটরও বলিতে পারেন, আবার উভয়ের সংমিশ্রণও বলিতে পারেন। নিউম্যাটিক টায়ার-যুক্ত ষোলটি চাকার সাহায্যে এই ধরণের গাড়ীগুলি এত নিঃশব্দে যাতায়াত করে যে, অনেক সময়ে কিছু বুঝাই যায় না। এই গাড়ীর উপরের দিকে ছোট একটি ঘরের মত স্থান, উহা ড্রাইভারের বসিবার জন্য

নির্দ্দিষ্ট। উপরের দিকে তাহার জন্য আসনের ব্যবস্থা। হওয়ায় পথঘাট দেখিয়া গাড়ী চালনা ড্রাইভারের পক্ষে সহজ হয়। গ্যাসোলিন-এঞ্জিন-চালিত এই গাড়ীগুলি ঘণ্টায় ৭০ মাইল বেগে যাইতে পারে। ফ্রান্সে এই ধরণের গাড়ীর প্রচলন প্রথম দেখা গেলেও, ইংলণ্ডের নানা সহরের মধ্যেও এই ধরণের গাড়ীর



নূতন ধরণের গাড়ী

প্রচলনের চেষ্টা চলিতেছে। অল্পব্যয়ে নানা স্থানে যাতায়াতের জন্য সমগ্র য়ুরোপে আজ যে প্রতিযোগিতা সুরু হইয়াছে, ইহাকে তাহারই পরিণতি বলা চলে।

ভূপ্রদক্ষিণে অতিকায় বিমান

দিন দিন বিজ্ঞানের যেরূপ উন্নতি হইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে স্থলপথ ত্যাগ করিয়া মানুষ ব্যোমপথেই পৃথিবী পর্য্যটন করিতে থাকিবে। বহু মোটরযুক্ত অতিকায় বিমান নির্ম্মাণে যুক্তরাষ্ট্র,



ভূপ্রদক্ষিণে অতিকায় বিমান

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী এবং রুসিয়া অবহিত হইয়াছেন। এখন দেখা যাইতেছে যে, অতঃপর দশ দিনে ব্যোমপথে মানুষ পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া আসিতে পারিবে। জুল্‌স্ ভার্ণি যে ভবিষ্যবাণী করিয়াছিলেন, তাহার আট ভাগের এক ভাগ সময়ে এই কার্য্য সংসাধিত হওয়া সম্ভবপর। এই চিত্রে যে বিমানখানি দেখা যাইতেছে, উহা মার্কিণ পোত। বহু যাত্রী এই পোতে আরোহণ করিতে পারিবে। ডাক বিভাগ উক্ত পোতখানির গতিবেগ দেখিয়া স্থির করিয়াছেন যে, সাংহাই হইতে নিউইয়র্ক পর্য্যন্ত ডাক ৩ দিনে বিলি করা চলিবে।

বিচিত্র জীব

গৃহপালিত মেষ ও পার্ব্বত্য হরিণের শোণিত-সংমিশ্রণের ফলে এক বিচিত্র জাতিসঙ্কর জীবের জন্ম হইয়াছে। এই জীবটিকে অৰ্দ্ধমেষ,

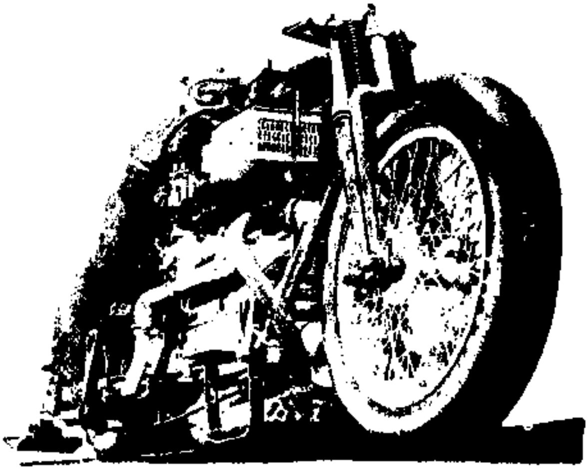


বিচিত্র জীব

অৰ্দ্ধমৃগ অনায়াসেই বলা চলে। কারণ, পার্ব্বত্য হরিণের বহু বৈশিষ্ট্য যেমন ইহার অঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে, মেষসুলভ লক্ষণেরও তেমনই অভাব নাই। জীবটি চঞ্চল মৃগের মত ছুটিয়া বেড়ায়, লাফ দিয়া অনতি-উচ্চ স্থানগুলির উপরেও অনায়াসেই উঠিতে পারে। ইহার ছয় ইঞ্চি করিয়া দুইটি শিং আছে। ইহার অৰ্দ্ধেক দেহ কোমল লোমাবৃত, অপরার্দ্ধ সাধারণ চুলে আচ্ছাদিত।

মোটর-চালিত দ্বিচক্রযানের গতি

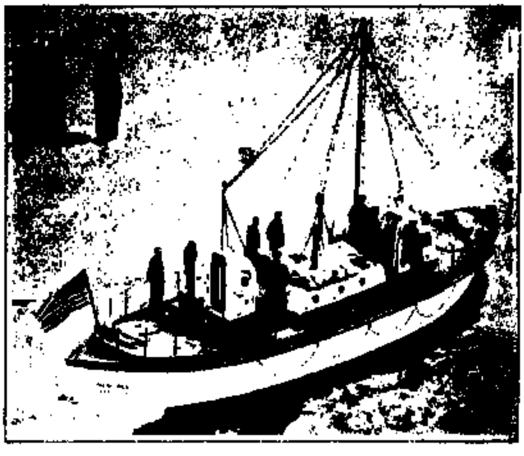
পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে আজ গতির প্রতিযোগিতা চলিয়াছে। মোটর-সাইকল বা মোটর-চালিত দ্বিচক্রযানও এই দিক দিয়া তাহার কৃতিত্বের পরিচয় দিতে উদ্যত হইয়াছে। যাহাতে প্রতি ঘণ্টায় তিন শত মাইলের উপর পথ অতিক্রম করা যায়, সেজন্য নূতন ধরণের এক প্রকার মোটর সাইকেল বাহির হইয়াছে। ওজনে এই মোটর সাইকেলগুলির প্রত্যেকটি দেড় হাজার পাউণ্ড। ছয়-সিলিণ্ডার প্লাইমাউথ এঞ্জিনের দ্বারা এইগুলি চালিত হয়। 'কারবুরেটারের' বিশেষ ব্যবস্থার ফলে ইহা প্রতি মিনিটে চারি হাজার এক শতবার আবর্ত্তিত হয়।



মোটর-চালিত দ্বিচক্রযানের গতি

নূতন জীবনরক্ষক তরণী

সমুদ্রের বিপজ্জনক স্থানে যখন জাহাজ-ডুবী হয়, তখন জীবনরক্ষক তরীগুলি লইয়াও সময় সময় বিশেষ আশঙ্কার কারণ ঘটে। এই

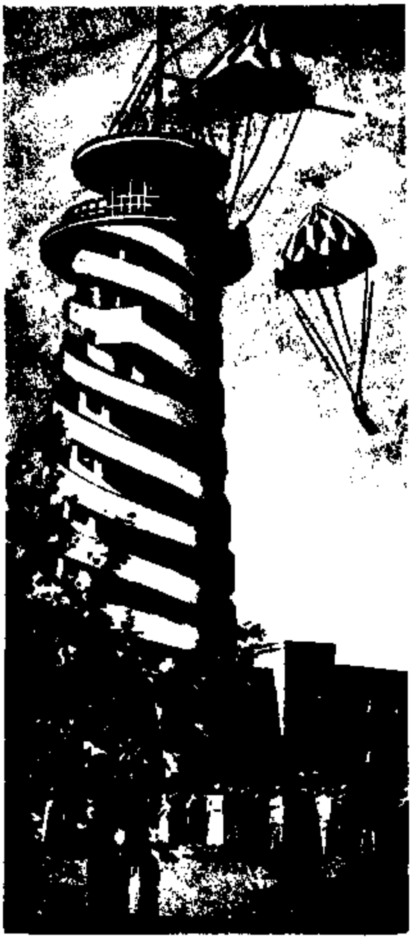


নূতন জীবনরক্ষক তরণী

অসুবিধার প্রতীকারের চেষ্টা বহুদিন হইতে চলিতেছিল। সম্প্রতি এমন এক প্রকার তরী নির্ম্মিত হইয়াছে যে, তাহার নাকি ডুবিবার ভয় নাই। নিউ জার্সিতে রক্ষিদল ইহা ব্যবহার করিবে। এই নিউ জার্সির উপকূলেই 'মোরোকাসল' এবং 'মো-হক্' বহু যাত্রী সহ নিমজ্জিত হইয়াছিল।

প্যারাসুট ব্যবহারে সুবিধা

মস্কোর একটি পার্কে শিক্ষা-নবীশদের জন্য প্যারাসুট হইতে লম্ফ প্রদানের জন্য বিশেষ সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

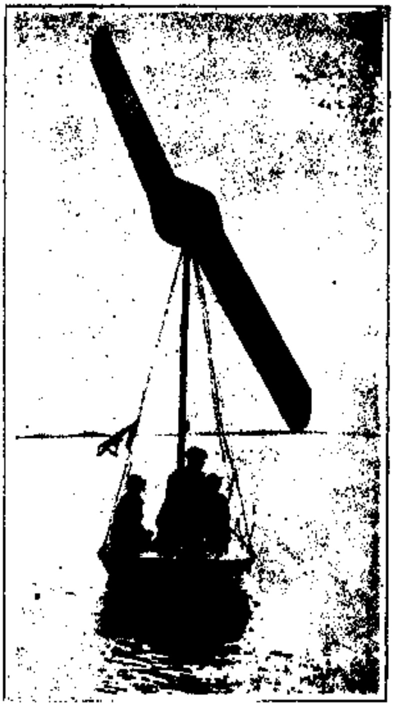


প্যারাসুট ব্যবহারে সুবিধা

প্যারাসুটগুলি একটি উচ্চ স্তম্ভের উপর রক্ষিত থাকে। শিক্ষার্থী-দিগকে উপরে উঠিয়া, প্যারাসুট আঁটিয়া লাফাইয়া পড়িতে হয়। প্যারাসুট খুলিবার জন্য অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন হয় না; সেইগুলি এমন ভাবে নির্ম্মিত যে, লাফাইবার সঙ্গে সঙ্গেই খুলিয়া যায়। ইহাতে শিক্ষার্থীদের ভয়ও অনেকটা কমিয়া যায়।

নৌকার আধুনিকতম পাল

বার্ক উইলফোর্ড নৌকার জন্ত নূতন ধরণের পালের ব্যবস্থা উদ্ভাবন করিয়াছেন। মাস্তুলের উপর পাল না টাঙ্গাইয়া তিনি ঘূর্ণায়মান দুইটি পাখার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাতাসের গতি অনুযায়ী এই পাখা দুইটির বেগে নৌকা স্বচ্ছন্দে জলপথে অগ্রসর হইতে পারে,



নৌকার আধুনিকতম পাল

বাতাস যে মুখেই বহুক না কেন, তাহাতে কোন অসুবিধা হয় না। ইহার জন্য মোটর-এঞ্জিন ব্যবহার করিবার আবশ্যকতা নাই। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে বার্ক উইলফোর্ডের ব্যবস্থা অনুযায়ী কাষ ভাল ভাবেই চলিতে পারে।

সন্তরণ-শিক্ষার সহজ উপায়

সন্তরণ, জল-ক্রীড়া প্রভৃতিতে বালক-বালিকাদিগকে সুদক্ষ করিয়া তুলিবার জন্য বিলাতে এক প্রকার সহজ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। একখানি হালকা কাঠের তক্তা এমন ভাবে নির্ম্মাণ করা হইতেছে যে, তাহার উপর ভর দিয়া অনায়াসেই বহুদূর পর্য্যন্ত ভাসিয়া যাওয়া যায়। নিস্তরঙ্গ জলে এবং প্রবল স্রোতের মুখে ইহা সমান ভাবে কাষ দেয়। ইহা হাতে করিয়া লইয়া বেড়ান অত্যন্ত সহজ, কেন না, ওজন মাত্র ১৫ পাউণ্ড, উপরন্তু ডুবিবার কোন ভয়



সন্তরণ-শিক্ষার সহজ উপায়

নাই। তিন শত পাউণ্ড ওজনের লোক পর্য্যন্ত ইহার সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন।

নূতন ধরণের দ্বিচক্রযান

ডেনমার্কে নূতন ধরণের এক প্রকার দ্বিচক্রযান নির্ম্মিত হইয়াছে, উহা দেখিয়া কোনও দর্শকের পক্ষে বলা অসম্ভব, আরোহী আসিতেছে কি চলিয়া যাইতেছে। এই যানের সম্মুখের চাকা ছোট এবং



নূতন ধরণের দ্বিচক্রযান

চাকা সাধারণ দ্বিচক্রযানের চাকার মত। গাড়ীটি দেখিতে ত্রিচক্র যানের অনুরূপ—শুধু একখানি চাকা বাদ। আরোহী গাড়ীর দিকে পশ্চাৎ করিয়া উপবিষ্ট। একটি হাতল দ্বারা যানের নিয়ন্ত্রণকার্য্য চলে অর্থাৎ ছোট চাকাটিকে এই হাতল ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেয়।

মোমবাতির ঘড়ি

রাজা আর্থারের সময় মোমবাতির সাহায্যে সময় নিরূপণের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সম্প্রতি আমেরিকাতেও এই ব্যবস্থা দেখা গিয়াছে। কতকগুলি মোমের টুকরা একসঙ্গে সংযুক্ত করিয়া এই মোমবাতিটি তৈয়ারী করা হইয়াছিল। প্রত্যেকটি মোমের টুকরা



মোমবাতির ঘড়ি

যাহাতে পনের মিনিটের মধ্যে পুড়িয়া যায়, সেইরূপ ব্যবস্থা ছিল। এক একটি টুকরা পুড়িয়া যাইবার পরেই বাতির শিখা কাঁপিয়া উঠিত এবং তাহাতেই বুঝা যাইত যে, পনের মিনিট অতিবাহিত হইয়াছে।

লতাগুল্মের উচ্ছেদ

বাড়ীর প্রাচীর ও প্রাঙ্গণ প্রায়ই লতাগুল্মে ভরিয়া যায়, ইহা আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। ইহাতে নানা প্রকার অসুবিধা ঘটে। সম্প্রতি ইহার প্রতীকারের জন্ম আমেরিকায় এক অভিনব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। নব-আবিষ্কৃত একটি যন্ত্রের সাহায্যে এই ব্যবস্থা করা হয়। যন্ত্রটি হাতে করিয়া যে কোন স্থানে লইয়া যাওয়া যায়। ইহার সহিত সংলগ্ন তৈলাধারে প্রায় দেড় ঘণ্টা কায চালাইবার উপযোগী তৈল রাখিবার ব্যবস্থা আছে।



লতাগুল্মের উচ্ছেদ

এই যন্ত্রের মুখ দিয়া যে অগ্নিশিখা বাহির হয়, তাহার দ্বারা অনায়াসে লতাগুল্মের উচ্ছেদসাধন সম্ভব।

ছবির কৌশল

এক জন ফটোগ্রাফার 'ট্রান্সকন্টিনেন্টাল এণ্ড ওয়েষ্টার্ন এয়ার' সার্ভিসের একটি বিমানের কতকগুলি ছবি তুলিতেছিলেন। শ্রমিকরা তখন বিমানের নানা স্থানে কায করিতেছিল। কিন্তু তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে, ইহার মধ্যে একটি ছবির দিকে চাহিলে মনে হইতে পারে যে, বিকটাকার কোন জীব



ছবির কৌশল

যেন একটি মানুষকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু 'নেগেটিভ'-গুলি ডেভেলপ করিবার পর দেখা গেল, ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। এই ছবিখানি যদি আপনি উল্টাইয়া দেখেন, তাহা হইলে আপনারও ঠিক সেই কথাই মনে হইবে।



ঘাতিনী

(গল্প)

ফাঁসি !

ফাঁসির হুকুম শুনিতে কি রকম ? কেহ কখন শুনিয়াছ ? আদালতে দাঁড়াইয়া শুনিলে, এক জনের ফাঁসির হুকুম হইল। কি রকম মনে হয় ? আর যাহার ফাঁসির হুকুম হয়, তাহার কি রকম হয় ? আমি আমার নিজের ফাঁসির হুকুম শুনিলাম।

আদালতে মঞ্চের উপর উপবিষ্ট জজকে দেখিতেছিলাম। শীর্ণ, ক্ষীণ, বৃদ্ধ ব্যক্তি, চোখে চশমা, মাথায় কালো টুপী। তাহার মনে কি হইতেছিল ? এক জন আর এক জনকে প্রাণদণ্ড দিবার সময় কিছু মনে করে না ? ফাঁসির আদেশ দিবার সময় জজ আমার দিকে চাহিয়াছিল। চশমার ভিতর চক্ষু উজ্জ্বল, কণ্ঠস্বর ধীর, স্পষ্ট। একেবারে নির্ব্বিকার। ফাঁসির হুকুম দিয়া জজ ধীরে ধীরে উঠিয়া নিজের বসিবার ঘরে গেল।

কি রকম মনে হয় ? আমাকে দেখিতে খুনীর মত মনে হয় ? চক্ষু রক্তবর্ণ, বিকট মুখশ্রী দেখিলে ভয় হয় ? দেখ একবার আমাকে দাঁড়াইয়া। আদালত শুদ্ধ লোক অবাক্ হইয়া আমাকে দেখিত। খবরের কাগজে আমার ছবি দেখ নাই ? আমি স্ত্রীলোক, আমি যুবতী, আমি অপূর্ব্ব সুন্দরী, আমি ধনীর কন্যা, আমি ধনীর পত্নী, আমি শিক্ষিতা।

আমি হত্যা অপরাধে অভিযুক্ত। আমি অপরাধ স্বীকার করিয়াছি। আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

বিচার-গৃহ লোকে পরিপূর্ণ ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন শব্দ হইতেছিল না। স্তব্ধ লোকমণ্ডলী ! কেবল জজের কণ্ঠস্বর শ্রুত হইতেছিল—নির্জ্জন স্থানে আকাশবাণীর ন্যায়, মুক্ত, ধীর, প্রত্যেক কথার অক্ষর স্পষ্ট, মমতা-নির্ম্মলতা-শূন্য। জজ উঠিয়া যাইতেই সেই জনতা হইতে দীর্ঘ নিশ্বাস প্রবাহিত হইল, অনেকের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল, কেহ কেহ কাতরোক্তি করিয়া উঠিল। এই বেদনা কাহার জন্য ? অপরাধ-স্বীকৃতা হত্যাকারিণীর জন্য, না রূপসী যুবতীর প্রাণদণ্ডের আদেশের জন্য ?

বিচারের কয়েক দিন আমার কোন প্রকার আশঙ্কা কিংবা চিত্তবিকার হয় নাই। আমার পক্ষে বড় বড় কৌঁসিলী ছিল, অন্যমনস্ক হইয়া তাহাদের কথা শুনিতাম, সাক্ষীদের জেরা শুনিতাম। জজের আদেশে কাঠঘেরার ভিতর আমাকে চেয়ারে বসিতে দিয়াছিল, সুতরাং সারা দিন দাঁড়াইয়া শ্রান্তি অনুভব করিতে হইত না। আমিও যেন দর্শকদের মধ্যে এক জন, যেন আর কাহার বিচার হইতেছে।

হঠাৎ জজের কথা মনে হইল, মনে হইল, কে যেন আমার গলায় দড়ী দিয়া সজোরে টানিতেছে, আমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া গেল, মুখ রক্তবর্ণ হইল, দুই চক্ষু ঠিকরিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইল। আমি চেয়ার হইতে পড়িয়া যাই দেখিয়া জেলের স্ত্রী-লোক রক্ষিকা আমাকে ধরিল। সে আমার পাশে দাঁড়াইয়াছিল। আমি তখনই সামলাইলাম। হা-হুতাশ করা কিম্বা মূর্চ্ছা যাওয়া, কিংবা কান্নাকাটির পাট আমার ছিল না।

রক্ষিকা আমার হাত ধরিয়া আমাকে লইয়া গেল। দর্শকদিগের মর্ম্মব্যথার অস্ফুট ধ্বনি আমার কর্ণকুহরে লাগিয়া রহিল।

আমার এই অপরাধ সম্বন্ধে নানা রকম কথা রাষ্ট্র হইয়াছিল। তাহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই। আগাগোড়া প্রকৃত ঘটনা আমি ছাড়া আর কেহই জানিত না, কিন্তু সে কারণে কাহারও মুখ বন্ধ হয় না, সংবাদপত্র-লেখকদের লেখনীও বন্ধ হয় না। কতক সত্য, কতক মিথ্যা, কতক বাস্তব, কতক

কল্পিত, অনেক রকম বৃত্তান্ত প্রচারিত হইয়াছিল। সেই কারণে আমি আনুপূর্ব্বিক সকল কথা বলিতেছি। পাপ করিলেই যে মিথ্যা বলিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। বিচারালয়ে আমি মিথ্যা কথা বলি নাই, এখন আমার মৃত্যু উপস্থিত। পরকালের ভয় না থাকিলেও অসত্য কথা বলিবার কোন প্রয়োজন নাই।

মা-বাপ আদর করিয়া আমার নাম চিত্রা রাখিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদের একমাত্র কন্যা। আমার দুই ভাই, তাহারা আমার অপেক্ষা বড়। আমার পিতার বিপুল সম্পত্তি, আমি ধনীর কন্যার ন্যায় পালিতা হইয়াছিলাম। যাহা চাহিতাম, তাহাই পাইতাম ; যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতাম।

আমার মনে পড়ে, ছেলেবেলা হইতে একটা কথাই সকলের মুখে শুনিতাম যে, আমার তুল্য আর সুন্দরী নাই। একটু বড় হইলে এ কথার মর্ম্ম বুঝিতে শিখিলাম। লেখা-পড়াতে আমার অনুরাগ-বিরাগ বিশেষ কিছু ছিল না। পড়িতে হয়, পড়িতাম। স্কুলে লেখাপড়া মোটের উপর ভালই করিতাম। বাড়ীতে ইংরাজী পড়াইবার জন্য মেম, গান শিখাইবার জন্য ওস্তাদ নিযুক্ত ছিল। ইংরাজী যেমন শীঘ্র সড়গড় হইয়া গেল, সঙ্গীতশাস্ত্র তেমন আয়ত্ত হইল না। সুন্দরী হইলে কি হয়, আমার গলা ছিল না। গানের সুর কিছুতেই আসিত না, গলাও তেমন মিষ্ট ছিল না। শিক্ষক তাহা বুঝিতে পারিত, কিন্তু সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারিত না। সে মাসে পঞ্চাশ টাকা বেতন পাইত, আমাকে সে কিছু বলিতে যাইবে কেন ? এক এক দিন বাবা দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ শুনিতেন, বোধ হয়, তিনিও কিছু নিরাশ হইতেন। ওস্তাদকে বলিতেন, ওস্তাদজী, এত দিনে চিত্রার ভাল গান করিবার কথা!

ওস্তাদ তাড়াতাড়ি বলিত, বাবুসাহেব, আহিস্তা আহিস্তা হো জায়গা।

বাজনা বাজাইতে শিখিয়াছিলাম মন্দ নয়। হার-মোনিয়ম ত গর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়, আমি পিয়ানো বাজাইতাম, এস্রাজও বাজাইতে শিখিয়াছিলাম। কিন্তু গান-বাজনায় আমার তেমন মন লাগিত না। কি একঘেয়ে চীৎকার করা আর যন্ত্র হইতে কতকগুলা শব্দ বাহির করা! আমার নিজের যে গলা বেসুরা আর বিশেষ কলাজ্ঞান ছিল না, সে কথা কোনমতে ভাবিতাম না।

স্কুলের মেয়েদের অনুরোধে এক দিন স্কুলে গান করিয়া-ছিলাম। আমার গলা শুনিয়া দুই এক জন হাসিয়াছিল। বাড়ীতে আসিয়া মাকে বলিলাম, আমি আর গান শিখব না।

মা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, কেন, কি হয়েছে ?

আমি বলিলাম, কিছু হয়নি, গান গাইতে আমার ভাল লাগে না।

বাবা আমাকে কত বুঝাইলেন, আমি কিছুতেই শুনিলাম না। মা বলিলেন, মেয়ে বড় একজিদ্দী!

আদুরে মেয়ের জিদ হইবে না ত কাহার হইবে ?

আমি আর গান শিখিব না জানিয়া ওস্তাদের মুখ শুকাইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, মেরা কুছ কসুর হুয়া ?

বাবা বলিলেন, না, না, তোমার কি দোষ ? এই চিত্রা জেদ ধরেছে যে, আর গান শিখবে না।

ওস্তাদ বলিল, এক মাস পরে তাহার কন্যার বিবাহ, এ সময় তাহার কর্ম্ম যাইলে তাহাকে বড় মুস্কিলে পড়িতে হইবে।

বাবা তাহাকে ভরসা দিলেন, বলিলেন, তাহার কন্যার বিবাহে তিনি সাহায্য করিবেন।

আমি বলিলাম, আচ্ছা, আমি আর তিন মাস গান শিখব, কিন্তু তার পর আর নয়।

ওস্তাদ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সেই দিন হইতে আমি ওস্তাদের সঙ্গে প্রায় গল্প করিয়াই সময় কাটাইতাম, গান বড় একটা গাহিতাম না। তার মেয়ে কেমন দেখিতে, কোথায় বিবাহ হইবে, ছেলে কি করে, এই সব কথা।

হঠাৎ এক দিন বলিলাম, ওস্তাদজী, তোমার মেয়েকে এক দিন নিয়ে এস ত, আমি দেখব। তাকে আনবার জন্য আমার মোটর পাঠিয়ে দেব।

ওস্তাদ তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইল।

৩

আমার দশ বৎসর বয়স হইতেই রূপের গর্ব্ব আরম্ভ হইয়াছিল। যে যেখানে আছে, আমাকে এত সুন্দরী বলে, সকলে কি আর মিথ্যা বলে ? আমার আলাদা সাজানো ঘর ছিল, তাহাতে বড় বড় আরসী। বাড়ী থাকিতে আমার অর্দ্ধেক সময় আরসীর সম্মুখে দাঁড়াইয়াই কাটিত। রূপ ? রূপ বলিতে হয় ত এই রূপ বটে। তের

বৎসর বয়সে কৈশোর অবস্থায় আমার যৌবনের উন্মেষ আরম্ভ হইল। প্রতি অঙ্গের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। ছিলাম শীর্ণ বালিকা, দেহযষ্টি বলয়িত হইবার লক্ষণসমূহ দেখা দিল। মাথায় আমি ছেলেবেলা হইতেই ডাগর, এখন বেশ বাড়িয়া উঠিলাম। অঙ্গের লাবণ্য ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তন্বী, তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা, ঘন-কুঞ্চিত-কেশশোভিনী, ললাট চূর্ণকুন্তলে আবৃত, বিশাল-চঞ্চল-তরল-নয়না, লোহিত ওষ্ঠপুট, হাসিলে কপোলে টোল পড়ে। বক্ষঃস্থল উন্নত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। আমি ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া নিজের সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিতাম। আরসীর সম্মুখে দাড়াইয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া, দুই বাহু প্রসারিত করিয়া, দীর্ঘ পক্ষরাজিশোভিত অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে আপাদমস্তক অঙ্গের লাবণ্যতরঙ্গ দেখিতাম। দুই হস্তে কটিদেশ ধারণ করিয়া কটির ক্ষীণতা অনুভব করিতাম, শ্রোণীর গুরুত্বের সঞ্চার বুঝিতে পারিতাম। কত রকম অঙ্গভঙ্গী করিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া, পদন্যাস করিয়া নিজের রূপ দেখিতাম। অবশেষে আরসীর প্রতিমূর্ত্তিকে মুখ ভেঙ্গচাইয়া বলিতাম, কি লো রূপসি! তোর রূপ নিয়ে ধুয়ে খাবি?

মানুষ যদি নিজের দোষ বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে জগতে কত দুষ্কর্ম্মই নিবারিত হইত! বিনয়ের ভাণ করে অনেকে, যথার্থ বিনয়ী কয় জন দেখিতে পাওয়া যায়? আমার স্বার্থ ছাড়া আর কিছু ছিল না। নিজে খাইব, পরিব, সাজগোজ করিব, সকল বিষয়ে আত্মতৃপ্তি চরিতার্থ করিব। যদি কেবল মুকুরে রূপ না দেখিয়া আমার প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখিতাম, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতাম যে, আমার গুণের লেশমাত্র নাই। দয়া, দাক্ষিণ্য, স্নেহ, মমতা, হৃদয়ের কোমলতা, পরদুঃখে কাতরতা কিছুমাত্র ছিল না। আমার প্রকৃতিতে এক প্রকার মজ্জাগত নিষ্ঠুরতা ছিল, তাহা কেহ কেহ বুঝিতে পারিত, কেহ কেহ পারিত না। প্রত্যক্ষ আচরণে সর্ব্বদা নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পাইত না, কারণ, আমি কথা অল্প কহিতাম, কিন্তু কাহারও কোন রকম বিপদ-আপদ হইলে আমি তাহার প্রতি দৃক্‌পাতও করিতাম না। একবার আমাদের বাড়ীর একটা বিড়ালকে কুকুরে কামড়াইয়াছিল, সকলে বিড়ালটার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল, আমি সে দিকও মাড়াইলাম না। বাড়ীতে কাহারও অসুখ-বিসুখ হইলে সেবা-শুশ্রূষা আমাকে দিয়া হইয়া উঠিত না। সময়ে সময়ে বারান্দা হইতে চড়াই পাখীর ছানা কাকে ধরিয়া লইয়া যাইত, পাখীটা চিঁ-চিঁ করিত, ছেলেরা তাহাকে ছাড়াইবার জন্য কাককে তাড়া করিত, আমি দাঁড়াইয়া মজা দেখিতাম।

রূপ? কেন রূপ রূপ করিয়া সকলে আকুল হয়? কেন রূপের মোহে বহ্নিবিবিক্ষু পতঙ্গের ন্যায় পুরুষ আকৃষ্ট হয়? এক রূপের উন্মাদনায় জগতে কত ভীষণ কাণ্ডই না হইয়া গিয়াছে! রূপসী ছিলেন সীতা, রাবণ তাঁহাকে হরণ করিয়া সবংশে মরিল। রূপসী ছিল হেলেন, তাহার জন্য ট্রয় ছারখার হইয়া গেল। এ পোড়া রূপের সৃষ্টি কেন হইয়াছিল?

২

ষোল বৎসর বয়সে আমি ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষায় পাশ হইলাম। পাশ হইয়া আমি নিজেই কতক আশ্চর্য্য হইলাম। এক নিজের রূপ ও অঙ্গপ্রসাধন ছাড়া অন্য কোন বিষয়েই আমার বিশেষ অনুরাগ ছিল না। পড়িতে হয় বলিয়া পড়িতাম। গান-বাজনার পাট তুলিয়া দিয়াছিলাম। ওস্তাদের কন্যাকে আনাইয়া দেখিয়াছিলাম, সেও সুন্দরী বটে, কিন্তু আমার সঙ্গে তুলনাই হয় না। কিসে আর কিসে! সে বড় লজ্জাশীলা, হয় ত কতক লোকের দৃষ্টিতে সে রকম স্বভাব ভাল লাগিতে পারে। সে আমার সঙ্গে অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। যাইবার সময় তাহাকে একখানা দামী শাড়ী দিলাম। দিতে হয় বলিয়া দিলাম, নতুবা দান-ধ্যানের অভ্যাস বড় একটা আমার ছিল না। যাহার আকাঙ্ক্ষা অনন্ত, বাসনার তৃপ্তি নাই, সে দানের আনন্দের মর্ম্ম কি জানিবে?

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেই আমার মা আমার বিবাহের জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। বাবাকে বলিলেন, মেয়ে এত বড় হ'ল, আর কি ওকে আইবুড়ো রাখা চলে? পাশ হয়েছে বেশ হয়েছে, এইবার ওর বিয়ে দাও। কত যায়গা থেকে কত ভাল ভাল সম্বন্ধ আসছে জান ত?

পীড়াপীড়ি হইতে লাগিল বলিয়াই আমি বাঁকিয়া বসিলাম। স্কুল ত শেষ হইল, একবার কলেজের মূর্ত্তি দেখিবার সাধ ছিল। মেয়েদের কলেজ নয়, যে কলেজে ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পড়ে, সেই কলেজ। একবার ষোড়শীর

রূপ দেখিয়া নব্য যুবকের দল চক্ষু সার্থক করুক। বিকশিত কমলিনীর শ্রবণে একবার ভ্রমরগুঞ্জন ঝঙ্কৃত হউক!

মাতার কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, এখন ও সব কথায় কাষ নেই,—দিন কতক আমি কলেজে পড়ি, তার পর তোমাদের যা ইচ্ছে হয় করো।

শেষে আমারই জেদ বজায় রহিল। আমি সব চেয়ে বড় কলেজে ভর্ত্তি হইলাম।

৩

কলেজে শাসন বড় কঠিন। ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পড়িত, এই মাত্র; মিশিবার আদেশ একেবারেই ছিল না। ক্লাশে মেয়েদের বসিবার স্থান স্বতন্ত্র, তাহাদের সঙ্গে ছেলেরা বসিতে পাইত না। ক্লাশ না থাকিলে মেয়েদের বসিবার ঘর আলাদা, সে ঘরে ছেলেরা প্রবেশ করিতে পাইত না। হয় কোন শিক্ষক কিংবা কলেজের অন্য কোন লোক সর্ব্বদা নজর রাখিত—যাহাতে মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে অধিক কথাবার্ত্তা কহিতে না পারে। ছেলেমেয়েতে দেখা হইলে অমনি একবার নমস্কার, না হয় দুইটা সাধারণ কথা হইত, অধিকক্ষণ বাক্যালাপের, হাস্যকৌতুকের অথবা মর্ম্মকথার কখন অবকাশ হইত না।

হাজার সতর্ক হইলেও চক্ষুর ভাষা কে নিবারণ করিতে পারে? কটাক্ষের ক্ষণিক ইঙ্গিত কেমন করিয়া রোধ করিতে পারা যায়? স্মিতহাস্যের সম্ভাষণ কিরূপে বারণ করা যাইতে পারে?

কলেজের ছেলেরা নির্নিমেষনয়নে আমাকে দেখিত, সুযোগ পাইলেই আমার সঙ্গে দুই চারিটা কথা কহিত। অপরের অলক্ষ্যে কেহ আমাকে চকোলেট দিত। কাহারও ইচ্ছা, আমার জন্য ফুল লইয়া আসে, কিন্তু ও প্রকার উপহার একেবারেই নিষিদ্ধ, আমাকে কোন ছেলে ফুল দিলে রসাতল-ব্যাপার হইত। আমি নিরপেক্ষভাবে হাসিরাশি বিলাইতাম; কটাক্ষ একটা প্রধান অস্ত্র, তাহা সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া তাহাতে শাণ দিতাম। ভ্রমরগুঞ্জন শ্রবণমূলে না হউক, কাছাকাছি শুনিতে পাইতাম। তাহাতে আমার আত্মপ্রসাদ হইত। কোন তরুণ অথবা কিশোরবয়স্ক ছাত্রের প্রতি আমার বিশেষ অনুরাগ হইত না। আমার হৃদয় আমার নিজের মূর্ত্তিতেই পরিপূর্ণ, সেখানে আর কাহারও স্থান কুলাইত না। রূপ আমার রথ, সেই রথে আরোহণ করিয়া ঘর্ঘর রবে রথ চালনা করিব, রথচক্রে কত বন্দী বদ্ধ হইবে; তাহাই দেখিব। যদি কোন হতভাগ্য চক্রতলে পিষ্ট হইয়া যায় ত আমার কি দোষ? রূপের যিনি সৃষ্টি করেন, অপরাধ তাঁহার। লোলায়মান দীপশিখায় পতঙ্গ পুড়িয়া মরে, সে কি প্রজ্বলিত শিখার দোষ? অগ্নি দাহ করে; রূপ মুগ্ধ করে, ইহাই তাহাদের প্রকৃতি।

চন্দ্রনাথ নামে একটি ছাত্র কিছু বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল। সে দেখিতে মন্দ নয়, শান্তশিষ্ট স্বভাব, মেয়েদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের বিশেষ চেষ্টা করিত না; কিন্তু আমাকে দেখিয়া পর্য্যন্ত তাহার আত্মসংযম রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল। মোটরে করিয়া আমি কলেজে যাইতাম, সে আমাকে দেখিবার জন্য ফটকের বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিত। কলেজের ছুটী হইয়া গেলে সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় দেখিতাম, চন্দ্রনাথ সিঁড়ির এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে। কাঙ্গালকে গৃহস্থ যেমন ভিক্ষা দেয়, সেই রকম তাহাকে আমি এক মুষ্টি হাসি ও এক কণা কটাক্ষ দান করিতাম। এক দিন বাড়ী ফিরিবার সময় দেখি, গাড়ীর ভিতর একটা ফুলের তোড়া। মুখ ফিরাইয়া দেখি, চন্দ্রনাথ কিছু দূরে দাঁড়াইয়া সতৃষ্ণ-নয়নে আমাকে দেখিতেছে। আমি ফুলের বিনিময়ে তাহাকে লোচনার্দ্ধে কটাক্ষ ও অধরপ্রান্তে স্মিতহাস্য উপহার দিলাম।

তাহার সাহস বাড়িতে লাগিল। এক দিন সিঁড়িতে আমার হস্ত স্পর্শ করিল। আমি যেন কিছুই অনুভব করি নাই, এইভাবে চলিয়া গেলাম। আর এক দিন তৃতীয় ব্যক্তি নাই দেখিয়া চন্দ্রনাথ আমার হাত ধরিল। এবার আর তাহার হাস্যলাভ হইল না। আমি হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিলাম, দেখ চন্দ্রনাথ, এখানে আমরা পড়াশুনা করতে আসি, কোর্টসিপের জন্য নয়। আবার যদি এ রকম কর, তা হ'লে আমি ব'লে দেব, তোমাকে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেবে, হয় ত আর কোন কলেজেই ভর্ত্তি হ'তে পাবে না।

চন্দ্রনাথ মুখ চুণ করিয়া বলিল, আমার অপরাধ হয়েছে, আর কখন করব না।

সেবার প্রেমের অভিনয় সেই পর্য্যন্ত রহিল। আই এ পরীক্ষায় ফেল হইয়া আমি কলেজ ছাড়িয়া দিলাম।

৬

এবার ত আর নিস্তার নাই! এত দিন ত মুক্ত জীবন কাটিল; এইবার উদ্বাহের উদ্বন্ধন গলায় পড়িবে; সর্ব্বত্র বিহারিণী সুন্দরী বন্দিনী হইবে। আমার আর কোন আপত্তি করিবার অবকাশ রহিল না। সত্য কথা বলিতে হইলে আমার কোন আপত্তি ছিলও না। আমাদের সমাজে যখন কুমারী থাকিবার প্রথাই নাই, এমন অবস্থায় আমি বিবাহ করিতে কেমন করিয়া অস্বীকার করিব? রূপের যে কেবল মোহ আছে, তাহা নয়, রূপের জন্য গঞ্জনাও শুনিতে হয়। অবশেষে কি লোকে বলিবে, অতি বড় রূপসী না পান ঘর, অতি বড় সুন্দরী না পান বর? বিবাহের ইষ্টাপত্তি সকলেরই ঘটে, আমারই বা বাদ যাইবে কেন? আমার এক অদ্ভুত রকম স্বভাব। বিবাহ হইবে জানিয়া আনন্দ কি নিরানন্দ কিছুই হইত না। ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহা কখন ভাবিতাম না। এখন নিজের ইচ্ছামত কর্ম্ম করি, ইহার পরও তাহাই করিব, কোন বাধা অথবা শাসন মানিব না। সুতরাং বিবাহের কথা শুনিয়া আমার কোন প্রকার চঞ্চলতা হইল না।

বিবাহের সম্বন্ধ যে কত আসিতে আরম্ভ হইল, তাহার ঠিকানা নাই। আমি ত আর ছোট মেয়েটি নই যে, বিবাহের কথা শুনিয়া লজ্জায় পলায়ন করিব? আমি সকল কথাই শুনিতাম। একে কন্যা সুন্দরী, তাহাতে তাহার পিতা ধনী। নানা স্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। দেনা-পাওনার কথা হইলে আমি মাকে বলিলাম, দেখ, যারা টাকার বেশী কামড় করে, এমন যায়গা চেষ্টা করো না। অর্থ-পিশাচের ঘরে আমি বিয়ে করব না।

মা বলিলেন, এই জন্য এত বড় মেয়ে ঘরে রাখতে নেই। আমরা দেখে শুনে ভাল ঘরেই ত বিয়ে দেব, তোর এ রকম কথা শুনলে লোকে বলবে কি?

—যা খুসী বলুক গে। আমি কিন্তু স্পষ্ট কথা ব'লে রাখলাম। দেনা-পাওনার কথা বড় একটা উঠিতও না। আমি বাপের এক মেয়ে, বাপ বড় মানুষ, মুক্তহস্ত, কে না জানে যে, তিনি আমার বিবাহে যথেষ্ট ব্যয় করিবেন? একবার এক সম্বন্ধে পাত্রের পক্ষ হইতে পাওনার কথা পাড়িয়াছিল। বাবা সে সম্বন্ধ তখনই ভাঙ্গিয়া দিলেন। তাহাদের মুখের উপর স্পষ্ট বলিলেন, দর ক'রে আমি কুটুম্বিতা করব না। আমার মেয়ে-জামাইকে যা দেবার, আমি স্বেচ্ছায় দেব, পীড়াপীড়িতে নয়। কুটুম্বিতা আহ্লাদের জিনিষ, হাটে ব'সে দর-দস্তুর করা নয়।

কন্যা না দেখিয়া ত বিবাহ হয় না, কাযেই আমাকে অনেকে দেখিতে আসিত। আমার বিবাহ ত আর গৌরী-দান নয় যে, নয় বৎসরের মেয়ে মাথা হেঁট করিয়া জড়সড় হইয়া বসিয়া থাকিবে? একটা পাশ করা, কলেজে পড়া, পূর্ণাঙ্গী যুবতী, সে আবার কাহাকে ভয় করিবে? আমাকে যখন দেখিতে আসিত, আমি নিজে কাপড় পরিয়া, দু এক-খানি অলঙ্কার অঙ্গে দিয়া উপস্থিত হইতাম। যাহারা আমাকে দেখিতে আসিত, তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া অসঙ্কোচে কথা কহিতাম। মনে মনে বলিতাম, আমাকে দেখতে এসেছ, তা দেখ। দেখে চক্ষু সার্থক কর!

আমাকে দেখিয়া কোন কোন ব্যক্তি মোসাহেবী ধরণে বাবাকে বলিত, এমন মেয়েকে আবার দেখবার কি আছে? রূপে লক্ষ্মী, বিদ্যায় সরস্বতী, রূপে, গুণে, বিদ্যাবুদ্ধিতে সমান। এমন কন্যা ভাগ্যবানের ঘরে যায়।

বিবাহে যেমন নিয়ম আছে—লক্ষ কথার পর আমার বিবাহ স্থির হইল। আমি গোড়া হইতেই বলিয়া রাখিয়া-ছিলাম, কন্যা দেখিবার যেমন নিয়ম আছে, পাত্রকেও সেই-রূপ দেখা আবশ্যক। বিবাহ আমার, আমি যুবতী, যাহার সহিত বিবাহ হইবে, তাহাকে না দেখিয়া বিবাহ করিব না। এ কথায় কেহ আপত্তি করিতে পারিল না। অবশেষে এক জন বড় জমিদারের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হইল। যুবা পুরুষ, আর এক জেলায় বাস, কিন্তু সহরেও বাড়ী আছে। বাপ নাই, সম্পত্তি সে নিজেই দেখে। মা আছেন।

সে আমাকে নিজে দেখিতে আসিল। দিব্য সুপুরুষ, বেশের বিশেষ আড়ম্বর নাই। আমার সঙ্গে কয়েকটা কথা কহিল। কথা কহিবার ধরণ ভাল। তাহার সঙ্গে তাহার দূর-সম্পর্কে এক বড় ভাই আসিয়াছিল। উঠিয়া গিয়া পাশের ঘরে বাবার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইল, আমি শুনিতে পাইতেছিলাম।

পাত্রের ভাই বলিল, আমাদের পক্ষ থেকে আমরা এখনই পাকা কথা দিতে প্রস্তুত, আপনাদের যা মত হয় জানাবেন। দেনা-পাওনার কোন কথা নেই। আপনার কন্যা, আপনার জামাই, তাদের কিছু দেওয়া না দেওয়া আপনার অভিরুচি,

আমরা কিছু জানিনে, কিছু বলবও না। বধূ আমাদের, বধূকে যথাসাধ্য তার শাশুড়ী দেখেন। আর ঘরের বউ ত ঘরের লক্ষী।

বাবা বলিলেন, আপনারা বসুন, আমি একবার বাড়ীর ভিতর হয়ে আসি। হয় ত এখনই কিছু একটা নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।

বাবা আসিয়া আমাকে চুপি চুপি বলিলেন, কি রে, কি বলিস?

আমি নিতান্ত ভাল মানুষের মত মাথা হেঁট করিয়া বলিলাম, তোমরা যা ভাল বোঝ, তাই কর। আমার কোন আপত্তি নেই।

বাবা বুঝিতে পারিলেন। ফিরিয়া গিয়া পাত্রের ভাইকে বলিলেন, বিয়ে স্থির। দুই পক্ষে আশীর্ব্বাদ হয়ে গেলে এই মাসেই দিন স্থির করা যাবে।

৭

আমার বিবাহ হইয়া গেল। ধনবানের কন্যার বিবাহে যেরূপ সমারোহ হইয়া থাকে, সেই রকম ঘটা হইল। বিবাহের পর শ্বশুর-বাড়ীতে উপস্থিত হইলে এক খুড়শাশুড়ী আমাকে বরণ করিয়া ঘরে লইলেন। শাশুড়ী বিধবা, তাঁহার বরণ করিবার অধিকার নাই। বনিয়াদী ধনীর বাড়ীতে যেমন সুব্যবস্থা থাকে, আমার শ্বশুরবাড়ীতেও সেইরূপ দেখিলাম।

শাশুড়ী প্রৌঢ়া, দেখিতে জগদ্ধাত্রী ঠাকুরাণীর ন্যায়। মাথার চুল দুই চারি গাছি পাকিয়াছে, দেখিলেই বোধ হয়, বুদ্ধিমতী গম্ভীরপ্রকৃতি রমণী। আমাকে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত অহ্লাদ প্রকাশ করিলেন, পূর্ব্বকথা এবং নিজের বৈধব্য স্মরণ করিয়া দুই একবার চক্ষু মুছিলেন। চার পাঁচ দিনেই আমার ধারণা হইল যে, শাশুড়ীর সহিত আমার বিশেষ বনিবনাও হইবে না। তিনি বুদ্ধিমতী হইলেও সেকালের ধরণের মানুষ, নববধূ লজ্জাশীলা হইবে, ঘাড় হেঁট করিয়া থাকিবে, অধিক কথা কহিবে না, এইরূপ তাঁহার মনের ভাব। তাহা হইলে সেই রকম দেখিয়া একটি ছোট পাড়াগেঁয়ে মেয়ে ঘরে আনিলেন না কেন? আমি কনে-বউ নই, কলাবউও নই, স্কুল-কলেজে পড়া পাশ করা যুবতী, আমাকে দিয়া এক গলা ঘোমটা আর মুখ বুজিয়া থাকা চলিবে না, তাহাতে শাশুড়ী যাহা ইচ্ছা হয় মনে করুন। বিশেষ, আমার স্বভাব পরিবর্ত্তন করিব কেমন করিয়া? আমি বরাবর নিজের ইচ্ছামত কায করিয়া আসিয়াছি, এখন কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতে পারিব না। শাশুড়ী অবশ্য মুখে কিছুই বলিতেন না, আমি ত এই সবে তাঁহার পুত্রবধূ হইয়াছি, কি বলিয়া আমাকে শাসন করিবেন? কিন্তু স্ত্রীলোকের মনের ভাব বুঝিতে স্ত্রীলোকের কতক্ষণ লাগে? পুরুষরা স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে অনেক মিথ্যা কথা রটাইয়াছে, অথচ সেই স্ত্রীজাতির পদানত হইয়া থাকে। পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোক যে অপরের মন সহজে বুঝিতে পারে, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

প্রথামত কয়েক দিন পরে পিত্রালয়ে আমাকে লইয়া যাইবার জন্য লোক আসিল। লোক না পাঠাইয়া বাবা নিজে আসিলেন। আমার শাশুড়ী বৈবাহিকের সঙ্গে কথা কহিতেন না, কহিবার কোন সম্ভাবনাও ছিল না। আমাদের বাড়ী হইতে আমার সঙ্গে যে ঝি আসিয়াছিল, তাহাকে বলিলেন, বউ-মা ত আর ছোট্ট মেয়েটি নয় যে, এখনই আবার বাপের বাড়ী যেতে হবে? তবে বেহাই মশায় যখন নিজে এসেছেন, এমন অবস্থায় তাঁকে ফিরিয়ে দেব না। তোমাদের মেয়ে এখন নিয়ে যাও, কিন্তু আবার খুব শীগ্‌গির পাঠিয়ে দিতে হবে, আমি নিয়ে আসব।

বাবার সঙ্গে বাড়ী আসিলে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি রে, শ্বশুরবাড়ী কেমন? শাশুড়ী কেমন?

আমি বলিলাম, তোমরা দেখে শুনে বিয়ে দিয়েছ, আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন? শ্বশুরবাড়ী ভাল, শাশুড়ীও ভাল।

পরের ঘরে গিয়া কি দুদিন পরেই তাহাদের নিন্দা করিতে হইবে? সে রকম হাল্কা প্রকৃতিই আমার নয়। আমি নিজের গরবেই থাকিতাম, পরচর্চ্চা আমার ভাল লাগিত না।

মঙ্গলা ঝিকে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁরে, বেহান দেখতে কেমন? তাঁকে কেমন মানুষ দেখলি?

মঙ্গলা বলিল, বেহান তোমার যেন জগদ্ধাত্রী ঠাকরুণ, রূপে বাড়ী আলো ক'রে আছে। বয়সও বেশী দেখায় না। মানুষও বেশ, তবে রাশভারি।

মা বলিলেন, তা আর হবে না, কত বড় ঘরের গিন্নী।

আমার দিকে চাহিয়া, মুখ টিপিয়া বলিলেন, কে সুন্দরী, শাশুড়ী না বউ?

আমি কপট কোপ করিয়া বলিলাম, যাও, তোমার যেমন কথা ! তোমার মত সুন্দরী কেউ নেই ।

মা হাসিতে লাগিলেন ।

আমি বাপের বাড়ী থাকিতেই জামাইষষ্ঠী পড়িল। তত্ত্ব পাঠাইয়া জামাইকে নিমন্ত্রণ করা হইল। তাহার কয়েক দিবস পরেই আমাকে আবার শ্বশুরবাড়ী লইয়া গেল।

৮

শাশুড়ীর সঙ্গে ঘর করা বেশী দিন আমার ঘটিয়া উঠিল না। মুখোমুখী কোন কথা হইল না, বিবাদ-বিসম্বাদ কিছুই না। শাশুড়ী বুঝিতে পারিলেন যে, কাহারও মন রাখা আমাকে দিয়া হইবে না, আর আমি লজ্জাবতী ললনা হইয়া থাকিব না। শাশুড়ীর এমন স্বভাব নয় যে, তিনি প্রকাশ্যে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিবেন, অথবা আমাকে কিংবা তাঁহার পুত্রকে কিছু বলিবেন। শ্বশুরবাড়ী গিয়া মাস দুই পরে আমরা সকলে গ্রামের বনিয়াদী ভিটা-বাড়ীতে গেলাম। একটা পাড়া জুড়িয়া বাড়ী, পুরুষানুক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে।

সহরের বাড়ীও নিজের, বেশ বড় ; কিন্তু এ বাড়ীর তুলনায় কিছুই নয়। বাড়ীতে বিস্তর পরিবার, দূর-সম্পর্কের আত্মীয়-কুটুম্ব। শাশুড়ী সকলকে প্রতিপালন করেন। আমি যাওয়াতে বাড়ীতে, পাড়ায় একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল। নূতন বউকে সকলে দেখিতে আসিত। বউ দেখিয়া সকলে অবাক্। বউ যে পরমা সুন্দরী, সে বিষয়ে কোন কথাই নাই, কিন্তু আজকাল সহরে কি এই রকম বউ হয় ? মাথায় ঘোমটা নাই, লজ্জাসরমের বিশেষ বালাই নাই, মাথা হেঁট করা অভ্যাস নাই। এ বউ দিব্য সপ্রতিভ-ভাবে সকলকে চাহিয়া দেখে, অবাধে কথাবার্ত্তা কয়, যেন কত কাল শ্বশুরঘর করিতেছে। যাহারা আমাকে দেখিতে আসিত, তাহারাই পিছাইত, আমি অসঙ্কোচে সকলের সহিত কথা কহিতাম।

পনের দিন পরে শাশুড়ী তাঁহার পুত্রকে বলিলেন, সূর্য্যি, বউমাকে নিয়ে তুমি কলকেতায় যাও, আমি এখন এইখানেই রইলাম। এখানেও অনেক কাযকর্ম্ম আছে।

আমার স্বামীর নাম সূর্য্যকুমার। স্বামীর নাম করিতে আমার কখনই কোন বাধা মনে হইত না, আর সেটা যে মহা লজ্জার কথা, তাহাও ভাবিতাম না। কোন কালে স্বামীকে আর্য্যপুত্র বলিয়া সম্বোধন করিত। শুনিতে মন্দ নয়, কিন্তু কোথায় বা আর্য্য, আর কোথায় সে আর্য্যশাসন !

মাতার কথায় আমার স্বামীর মনে কোন প্রকার সংশয় উপস্থিত হইল না। সহরে ফিরিয়া আমি নিজের ঘরের গৃহিণী হইলাম। আর কাহারও শাসনে অধিক দিন থাকা আমার সহিত না।

ঘরের ঘরণী ত হইলাম, যখন যাহা মনে হইত, তাহাই করিতাম ; কিন্তু তাহাতে তৃপ্তি হইল না কেন ? কিসের যেন একটা অভাব অনুভব করিতাম, হৃদয়ের একটা কক্ষ যেন শূন্য থাকিত। এই নূতন সংসার, অট্টালিকায় বাস, স্বামী অনুগত, প্রচুর অর্থ, তথাপি কিসের অতৃপ্তি ? আমি নিজের মোটর করিয়াছিলাম। প্রথমে আমার স্বামী অল্প আপত্তি করিয়াছিল, বলিয়াছিল, আমাদের বাড়ীতে একটু আক্র বেশী, আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক কি না। যদি মা কিছু মনে করেন ?

আমি কিছু ঝাঁজালো স্বরে বলিলাম, কি আবার বলবেন ? তিনি ত জেনে শুনেই আমাকে এনেছেন। আমি মেম সাহেব হ'তে চাইনে, কিন্তু খাঁচায় পোরা থাকলে হাঁপিয়ে মরব।

আমার স্বামী আর কিছু বলিল না। লোকটা নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। যদি একটু শক্ত-প্রকৃতি হইত, তাহা হইলে হয় ত—

কিসে কি হইত, ভাবিয়া কি হইবে ? যাহা হইয়াছে, সেই কথা বলিতে বসিয়াছি।

কিছুদিন পরে বুঝিতে পারিলাম, আমার স্বামীই আমার অতৃপ্তির কারণ। কোন রকম অযত্ন কিংবা তাচ্ছীল্যভাবের অভিযোগ আমি করি না। লোকটার বাতিক ছিল পশুপক্ষী পালন করা। একপাল কুকুর বাড়ীময় ঘুরিয়া বেড়াইত। কত রকম যে পাখী, তাহা বলা যায় না। মোটরকার হইয়া গাড়ী-ঘোড়ার পাট এক রকম উঠিয়াই গিয়াছে, কিন্তু আমার স্বামীর পাঁচ ছয়টা ঘোড়া, দু চার ঘণ্টা প্রতিদিন আস্তাবলেই কাটিত। রেস খেলিত না, ঘোড়ায় চড়িবার সখ।

কুকুর, বিড়াল, পাখী আমার দুই চক্ষুর বিষ। নিজের ভাবে আমার মন ভরা, আর কিছুর ঠাঁই ছিল না। ঘরের ভিতর কুকুর দেখিলে আমি তাড়াইয়া দিতাম। স্বামীকে

এক দিন বলিলাম, তোমার বাড়ী যেন চিড়িয়াখানা। এই ত আলিপুরে অত বড় জু রয়েছে, দেখতে গেলেই হ'ল। বাড়ীতে মানুষ থাকবে না জানোয়ারে চারিদিক পোরা!

আমার স্বামী বিষণ্ণ হইল, আমি বুঝিতে পারিলাম। বলিল, ওরা ত কোন ক্ষতি করে না। আমি ওদের ভালবাসি।

আমি কিছু শ্লেষভাবে বলিলাম, তা ত দেখতেই পাচ্ছি। মানুষকে ভালবেসে কি মানুষের মন ওঠে না?

আমার স্বামী ব্যথিতভাবে কহিল, এ সে রকম ভালবাসা নয়।

এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। সেই দিন হইতে দেখিলাম, কুকুর সব বাঁধা, আর ঘরে আসিতে পায় না। আমার স্বামীরও ঘরে থাকা কমিয়া গেল, অনেক সময় কুকুর, ঘোড়া, পাখী এই সব দেখিত।

৯

মোটর কিনিয়াই যে আমি স্বাধীন জেনানা হইলাম, তাহা নয়। যাইবার মধ্যে এক বাপের বাড়ী, আর কোথাও যাইতাম না। মোটর হইতে নামিয়া কদাচ কখন ইডেন বাগানে বেড়াইতাম, কিন্তু তাহাও বাড়ীতে না বলিয়া। সোফরের প্রতি আদেশ ছিল যে, ভিড়ের যায়গায় আমাকে লইয়া যাইবে না। দেখিবার মধ্যে চিড়িয়াখানা, সেখানে একবার গিয়া আর যাইতাম না। চিড়িয়াখানা ত বাড়ীতেই রহিয়াছে। মিউজিয়ামে যত পাড়াগাঁয়ের লোক, সেখানে গিয়া কি হইবে?

একটা কেমন কিসের অভাব অনুভব করিতে আরম্ভ করিলাম। সংসারের কাযকর্ম্ম করা অভ্যাস ছিল না যে, তাহাতে খানিক সময় কাটিবে। আরসীতে নিজের মুখ দেখিয়া, সাজগোজ করিয়াই বা কি তৃপ্তি? আমার স্বামী পশুপক্ষী লইয়াই ব্যস্ত, আমি কি পরি, কি রকম সাজ করি, সে দিকে তাহার বড় একটা দৃষ্টি ছিল না। একা বসিয়া কিংবা মোটর-গাড়ীতে বেড়াইবার সময় আমার মনে নানা প্রকার ভাব উপস্থিত হইত। কলেজে সেই যে চন্দ্রনাথ আমার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিত, সে কথা মনে পড়িত। আমার হাত ধরিয়াছিল, সে স্পর্শস্মৃতি স্মরণ হইত। তাড়াতাড়ি আমার হাত ছাড়াইয়া লইয়া তাহাকে ভয় দেখাইবার কি প্রয়োজন ছিল? না হয় দুইটা আদরের কথা বলিত কিংবা আমার রূপের প্রশংসা করিত।

এত বড় রূপসী আমি, রূপ লইয়া আমার কি হইল? আমাকে দেখিয়া কে মুগ্ধ হইল, কে শয়নে স্বপনে জাগরণে আমার রূপ ধ্যান করিত? প্রেমের তীব্র মদিরার পানপাত্র আমার ওষ্ঠে কখন স্পর্শ করাইবার সুযোগ হয় নাই। পোষমানা প্রাণে যাহার তৃপ্তি হয় হউক, আমার মন কিছুতেই শান্ত হইত না। কি ছার রূপের গর্ব্ব—যদি যৌবনের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতায় বঞ্চিত হইলাম! বনের পাখী যেমন পক্ষপুট দ্বারা পিঞ্জরের বন্ধন আঘাত করে, সেইরূপ আমার চিত্ত বন্ধনমুক্ত হইবার নিমিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল।

যে সময় মনে এইরূপ অতৃপ্তি, হৃদয়ে দারুণ বিদ্রোহিতা, সেই সময় আমার স্বামীর কাছে একটি নূতন লোক আসিতে আরম্ভ করিল। বৈঠকখানায় আমি যাইতাম না, অপর কোন পুরুষের সাক্ষাতে বাড়ীতে বাহির হইতাম না। কিন্তু দোতলার ঘরের জানালার পাখী খুলিয়া কে আসিত যাইত দেখিতে পাইতাম। এ ব্যক্তি ধনী। খুব বড় জমকাল মোটর, পরিচ্ছদের যথেষ্ট পারিপাট্য। বিশেষ সুপুরুষ না হইলেও দেখিতে বেশ, আয়ত চক্ষু, নিবিড় ভ্রূ। আকৃতি দেখিলে মনে হয়, অত্যন্ত বলবান। যুবা পুরুষ।

আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে, মোটর হইতে নামিবার সময় ও মোটরে উঠিবার সময় সে ব্যক্তি উপর দিকে চাহিয়া দেখিত। কেন? উপরে জানালার কাছে কেহ দাঁড়াইয়া আছে কি না দেখিবার জন্য। আমার স্বামী তাহার সহিত কখন বাহিরে আসিত না। আমি স্থির করিলাম, সে ব্যক্তির কৌতূহল সফল করিব। এক দিন সে যে সময় মোটরে উঠিবে, ঠিক সেই সময় আমি জানালা অল্প খুলিয়া, জানালার ভিতর হইতে তাহার দিকে চাহিলাম। সে মুখ তুলিতেই আমাকে দেখিতে পাইল। সে বিস্মিত হইয়া নির্নিমেষ নয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমি ঈষৎ হাসিয়া, চঞ্চল কটাক্ষপাত করিয়া, ধীরে জানালা বন্ধ করিলাম।

সেই দিন হইতে এক নূতন অভিনয় আরম্ভ হইল। সেই লোকটি আমাকে যে জানালায় দেখিতে পাইয়াছিল, যাইবার আসিবার সময় একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া থাকিত। কিন্তু আমি সর্ব্বদা সেখানে দাঁড়াইতাম না,

তাহাতে আশঙ্কা ছিল। বাড়ীতে লোকজন চাকর-বাকর আছে, কে কোন্ দিন দেখিয়া ফেলিবে। আর কিছু মনে না করুক, বাড়ীর বউ আর এক জন পুরুষের দিকে চাহিয়া আছে, সেটা তাহার চক্ষুতে ভাল ঠেকিবে না। কেবল এক দিন আমি একবার মাথা নাড়িয়া পিছনের দিকে চাহিয়া গবাক্ষ রুদ্ধ করিলাম।

আমাদের বাড়ীর পিছনে একটা সরু বদ্ধ গলি ছিল। সে দিকে লোকজনের বড় চলাচল ছিল না। সে দিকের কয়েকটা ঘরও সর্ব্বদা ব্যবহার হইত না।

পরদিবস সেই দিকের একটা জানালা খুলিয়া দেখিলাম, সে ব্যক্তি উর্দ্ধমুখ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে দেখিয়া হাসিয়া জানালার অভিমুখে কি নিক্ষেপ করিল। সেটা ঘরের ভিতর পড়িল, তুলিয়া দেখিলাম, কাগজে জড়ানো একটি ছোট রবরের বল। কাগজে লেখা আছে—দর্শন-সৌভাগ্য ত হয়েছে, কথা কইবার সুযোগ হবে না?

আমি একটা পেন্সিল লইয়া সেই কাগজেই লিখিলাম, আজ সন্ধ্যার সময় ইডেন বাগানে। কাগজখানা পূর্ব্বের মত জড়াইয়া ফেলিয়া দিলাম। তাহার পর হাসিয়া, হাত তুলিয়া, নাড়িয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিলাম।

১০

সেই দিন কি একটা জমিদারী কাজের উপলক্ষে আমার স্বামী দেশে গেল। ফিরিতে দিন দুই তিন লাগিবে

সারা দিনমান চিত্তের দারুণ চঞ্চলতায় কাটিল। কয়েকবার মনে হইল, কাযটা ভাল হইতেছে না, কোথাকার কে এক জন অপরিচিত লোক, তাহার সহিত কি এরূপ গোপনে সাক্ষাৎ করা উচিত? হাজার হউক, আমি সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পত্নী, এ রকম আচরণ কি আমার পক্ষে ভাল? আর অন্যায় ব্যবহার কখন কি গোপন থাকে? নানা রকম সংশয়-সঙ্কোচ মনে উদয় হইল। একবার ভাবিলাম, সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে যাইব না। আবার মনে হইল, কিসের এত ভয়? একটা লোকের সহিত গোটা-কতক কথা কহিতে দোষ কি? সংযম আমার প্রকৃতিতে ছিল না, মনের প্রবৃত্তি শাসন করিতে আমি শিখি নাই। সমাজ কি সংসারকে ভয় করিবার লোক আমি নই

অন্য দিন বৈকালে যে সময় বেড়াইতে যাইতাম, আজ তাহার অপেক্ষা কিছু বিলম্বে বাহির হইলাম। বাগানে উপস্থিত হইতে অন্ধকার হইয়া আসিল, আকাশে তারা ফুটিল। আমি বাগানের পশ্চাদ্দিকে মোটর রাখিয়া বাগানে প্রবেশ করিলাম। সে দিকে বেশী লোকজন ছিল না। দেখিতে পাইলাম, সেই ব্যক্তি কিছু দূরে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার নাম ত্রিপুরাচরণ জানিতে পারিয়াছিলাম। যে দিকে গাছ-পালা ঘন-বিন্যস্ত, কোন লোক নাই, আমি সেই দিকে অগ্রসর হইলাম। ত্রিপুরাচরণ ধীরে ধীরে আমার পশ্চাতে আসিল। সেখানে গাছতলায় অন্ধকার,—নির্জ্জন স্থান, সেইখানে ত্রিপুরাচরণ আসিয়া আমাকে চাপিয়া ধরিল। আমি ছাড়াইবার চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না। বলিলাম, কর কি? আমাকে ছেড়ে দাও, নইলে আর কখন আসব না।

সে আমাকে ছাড়িয়া দিল, কিন্তু আমার হাত ধরিয়া রহিল। বলিল, যদি আমার দোষ হয়ে থাকে ত' ক্ষমা কর। আবার আসবে না, ও কথা বলো না।

অধিকক্ষণ আমি দাঁড়াইলাম না, কিন্তু সেই অল্পসময়ের মধ্যে কিসের একটা বন্যা যেন আমাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। ত্রিপুরাচরণের আবেগপূর্ণ কথায় আমার বক্ষ চঞ্চল হইল, নিশ্বাস খর বহিল। সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইল। আসিবার সময় সে যখন আমাকে আবার দৃঢ় আলিঙ্গন করিল, আমার মুখ হইতে আর নিষেধবাক্য বাহির হইল না।

দুই তিন দিন এইরূপ গেল। তাহার পর ত্রিপুরাচরণের উত্তেজনায় ও আমার নিজের চিত্তের উন্মাদনায় আমি গৃহ ত্যাগ করিয়া তাহার সহিত চলিয়া গেলাম।

১১

সহর হইতে অনেক দূরে ত্রিপুরাচরণের একটা বাগান-বাড়ী ছিল। আমাকে সেইখানে লইয়া গেল। কিছু দিন সে বড় ভয়ে ভয়ে থাকিত, কেবল বলিত, শ্বশুর নালিশ-ফরিয়াদ করবে না ত?

আমি বলিলাম, কেউ কিছু করবে না। আমি কালামুখী ব'লে আর কেউ নিজের মুখে চূণকালি মাখবে না।

হইলও তাহাই। আমার শ্বশুরবাড়ী কিংবা বাপের বাড়ী হইতে কেহ কোন সন্ধান করিল না। সংবাদপত্রে

পর্য্যন্ত কোন কথা প্রকাশ হইল না। ত্রিপুরাচরণ এক মাস আমাকে বাগানে রাখিল, তাঁহার পর আশ্বস্ত হইয়া বলিল, আর কত দিন এখানে থাকব? চল, সহরে ফিরে যাই।

আমি কোন আপত্তি করিলাম না। ত্রিপুরাচরণ একটা বাড়ী ভাড়া করিল, আমাকে সেইখানে রাখিল। সে বাড়ীতে সে আসা-যাওয়া করিত, সর্ব্বদা থাকিত না। তাহার সুরাপানের অভ্যাস ছিল। আমার বাপের বাড়ী কিংবা শ্বশুরবাড়ীতে কাহাকেও মদ খাইতে দেখি নাই। প্রথম কিছু দিন ত্রিপুরাচরণ সাবধানে মদ্য পান করিত, তাহার পর বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল। কোন কোন দিন রাত্রিতে আসিত না। নেশার মুখে কটুকাটব্যও বলিত।

বুঝিতে পারিলাম, নরক অধিক দূরে নয়, পরকালের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না। আমার হৃদয়ে অহোরাত্র নরকাগ্নি জ্বলিতে লাগিল। এই দুর্ব্বৃত্ত, লম্পট, নরাধমের জন্য সোণার সংসার বিসর্জ্জন দিলাম, কুলকলঙ্কিনী হইলাম, সুখ-শান্তির আশা হইতে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হইলাম! আরসীর সমুখে দাঁড়াইয়া নিজের গালে ঠাস-ঠাস করিয়া চড়াইয়া বলিলাম, পোড়াকপালী! রূপের দেমাকে যে মাটীতে পা পড়ত না, এখন তোর সে জাঁক কোথায় গেল? এ পোড়া মুখ আর কখনও কাউকে দেখাতে পারবি?

কাঁদিয়া কি করিব? দোষ দিব কাহার? কপালের দোহাই দিবারও উপায় ছিল না, আমি ত জানিয়া শুনিয়া আপন হাতে কপাল ভাঙ্গিয়াছি, কাহাকে কি বলিব?

যেমন যেমন আমার অন্তর্দাহ বাড়িতে লাগিল, সেইরূপ আমার লাঞ্ছনাও বাড়িতে লাগিল। খরচপত্রের টানাটানি আরম্ভ হইল, অথচ প্রমোদ ও বিলাসিতায় ত্রিপুরা অনেক খরচ করিত। এক এক দিন রাগিয়া বলিত, কত কাল তোর জন্য এত খরচ করব? তোর মত মেয়েমানুষ কি চিরকাল এক জনের সঙ্গে থাকে?

এক এক সময় আমার মনে হইত, পাগল হইয়া যাইব, আবার ভাবিতাম, আত্মহত্যা করিলেই নিষ্কৃতি পাইব। আত্মহত্যা? যে দিন বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি, সেই দিনই ত নিজেকে বধ করিয়াছি! মরণ ত হয় একবার, এ যে নিত্য মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতেছি!

এক রাত্রিতে মদ খাইয়া টলিতে টলিতে ত্রিপুরা একটা স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া আসিল। জড়িতকণ্ঠে আমাকে বলিল, এর সঙ্গে আলাপ কর।

স্ত্রীলোকটা দেখিতে কুৎসিত, আমাকে দেখিয়া একটু জড়সড় হইল। আমি নিজের ঘরে গিয়া খিল দিলাম।

১২

সমস্ত রাত্রি আমার সর্ব্বাঙ্গে চিতাগ্নি জ্বলিতে লাগিল। চক্ষুতে জল আসিল না। কয়েকবার মনে হইল আত্মহত্যা করি, আবার ভাবিলাম, আমি মরিলে কাহার কি আসিয়া যাইবে? শেষ রাত্রিতে নিদ্রা আসিল।

উঠিতে বেলা হইল। দরজা খুলিয়া দেখি, রৌদ্র উঠিয়াছে। আমার মনের অস্থিরতা দূর হইয়াছিল। কি করিব, তাহা স্থির করিয়াছিলাম।

সে স্ত্রীলোকটা চলিয়া গিয়াছিল। ত্রিপুরা কিছু কুণ্ঠিত, কিছু লজ্জিত। আমি কোন রকম কোপ অথবা অভিমান প্রকাশ করিলাম না। ত্রিপুরার সহিত পূর্ব্বে যেমন কথা কহিতাম, সেইরূপ কহিলাম। তাহাতে সে আশ্বস্ত হইল।

অস্ত্র সংগ্রহ করা ত্রিপুরার সখ ছিল। একটা ঘরে দেয়ালে কয়েকটা অস্ত্র রাখা ছিল। তাহার মধ্যে হাতী-দাঁতের বাঁট দেওয়া একখানা তীক্ষ্ণধার ছুরি ছিল। আমি সেটা বস্ত্রের মধ্যে গোপন করিলাম।

ত্রিপুরার সঙ্গে এমন ভাবে কথা কহিতে লাগিলাম, যেন কিছুই হয় নাই, আমার মনে কোন প্রকার ক্ষোভ বা বিকার নাই। রূপের মোহ বিস্তার করিলাম, মধুর আলাপে ত্রিপুরাকে প্রতারিত করিলাম।

সে রাত্রিতে সে কোথাও গেল না। সন্ধ্যার পর আমি স্বহস্তে তাহাকে মদ আনিয়া দিলাম। সে পান করিয়া আমাকে আদর করিয়া বলিল, তুমি একটু খাও না কেন?

আমি বলিলাম, আমি কখন খাই নি, এখন পারব না। তুমি খাও।

সে আবার সুরা পান করিল। ব্যাঘ্রী অলক্ষ্যে যেমন বধ্য পশুকে নিরীক্ষণ করে, আমি ত্রিপুরাকে সেই ভাবে দেখিতেছিলাম।

অল্পক্ষণেই তাহার নেশা হইল, তখন সে দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইল। আমি চকিতের ন্যায় ছুরি বাহির করিয়া, আমূল তাহার

বক্ষে বিদ্ধ করিলাম। ত্রিপুরা যেন বিস্মিত হইয়া একবার আমার মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর পড়িয়া গেল। একটি কথাও কহিতে পারিল না।

তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইল।

১৩

কারাগারে একটি ছোট কুঠরীতে আমি মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এক জন প্রহরী সর্ব্বদা ঘরের বাহিরে পাইচারি করিত। ঘরে একটা ছোট ঘুলঘুলি ছিল। প্রহরীর প্রতি আদেশ ছিল, প্রত্যেক ঘণ্টায় সেই ঘুলঘুলি দিয়া দেখিবে—আমি কি করিতেছি। তাহার অর্থ—যাহাতে আমি আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা না করি। সে কথা আমার মনে হইত না। আত্মহত্যা করিবার কোন উপায়ও ছিল না। ফাঁসির আদেশ হইয়াছে, ফাঁসিই যাইব।

কেমন করিয়া আমার সময় কাটিত? কেহ আমার সহিত একটা কথাও কহিত না। বসিয়া বসিয়া জীবনের আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা আমার স্মরণ হইত। কিসের আমার অভাব ছিল, কি দুঃখ ছিল? একমাত্র রূপ আমার কাল হইল। না থাকিত রূপ, না থাকিত রূপের দর্প, তাহা হইলে এই নব-যৌবনে হত্যা অপরাধে আমার প্রাণদণ্ড হইত না। আমার বাপ মা স্বামীর মনে কি হইতেছে? তাঁহারা কেহ আমাকে দেখিতে আসেন নাই, কিন্তু বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া উকিল-ব্যারিষ্টার তাঁহারাই নিযুক্ত করিয়া থাকিবেন।

রূপ? রূপ লইয়া শেষে কি এই দশা হয়? সত্য সত্যই এবার রূপের গলায় দড়ী পড়িবে। কোথায় রহিল আমার রূপের গর্ব্ব? কলঙ্কিনী, হত্যাকারিণী, রাজদণ্ডে আমার বধের আদেশ হইয়াছে। রূপের গৌরব এইবার পূর্ণ হইল।

মৃত্যু উপস্থিত জানিয়া কি আমার মনে অনুতাপ হইত? ত্রিপুরাকে হত্যা করিয়াছি বলিয়া আমার কিছুমাত্র অনুতাপ হইত না। আমি পাষাণের ন্যায় কঠিন হইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

ললাটের লিখনে সে সময় মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট ছিল না। মৃত্যুর পরিবর্ত্তে আমার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হইল। যত দিন বাঁচিব, কারাবাস করিব? তাহা নয়। পনর বৎসর পরে আমার মুক্তি হইবে, তখন সংসারে ফিরিয়া যাইতে পারিব।

কিসের সংসার, কাহার সংসার? পিত্রালয়ে, শ্বশুরালয়ে আমার স্থান নাই, কোথায় যাইব? সে পরের কথা, এখন এই দীর্ঘকাল কেমন করিয়া কাটিবে? পঞ্চদশ বৎসর বন্দিনী অবস্থায় যাপন করিতে হইবে। এই দীর্ঘকালে কোথায় রহিবে এই রূপ, কোথায় রহিবে হতভাগিনীর দর্প? সংসারে স্থান নাই, পথের ভিখারিণী হইয়া বাহির হইব।

এই দগ্ধ তপ্ত কলুষিত হৃদয়ে কি কখন শান্তি পাইব? শান্তিদাতা কেহ আছেন কি? থাকিলেও তাঁহার চরণে আমার স্থান নাই।

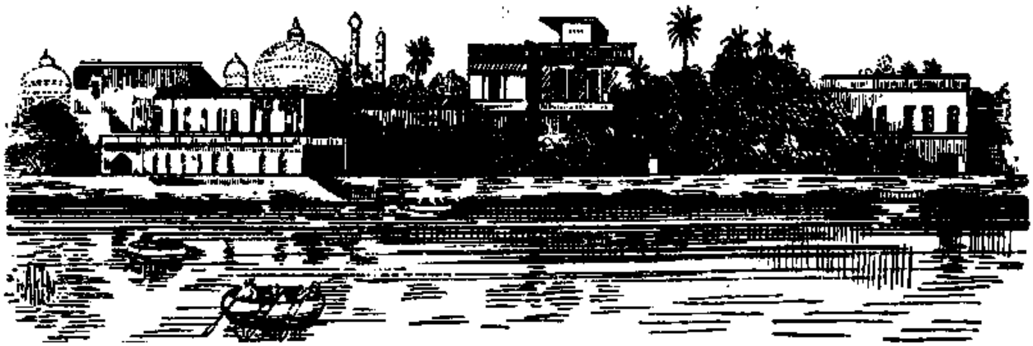
শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

"সৃষ্টি"

সৃষ্টির সে-প্রথম উচ্ছ্বাসে
ধরণী জাগিল হাসি গভীর আশ্বাসে
সে দিন প্রভাতে,
ল'য়ে সাথে—
প্রথম যৌবন;
অকস্মাৎ অঙ্কুরিয়া উঠিল অজানা,
সৃষ্টির সে আদি বীজকণা

সেই হ'তে লক্ষ স্রোতে লক্ষ পথে
লভিছে জনম এই তরুলতা কীট পশু পাখী;
সেই হ'তে তারা এই উঠিতেছে ডাকি
প্রাণের আনন্দ নিবেদিয়া;
কহিয়া কহিয়া—
পুত্র মোরা আজি সব ঘরে
আদি ধরণীর আদি জননীর

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল (এম, এ)



আফ্রিকার অজ্ঞাত অঞ্চলে

অসভ্য আফ্রিকার অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আজও ফ্রান্সের আধিপত্য চলিতেছে। ফরাসী-অধিকৃত পশ্চিম-আফ্রিকায় বিদেশী সভ্যতার আমদানী হইয়াছে আজ বহুদিন ; ফেডারল সরকারের কৃপায় আধুনিক শাসনব্যবস্থাও নানা স্থানে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু আজও ইহার বহু অঞ্চলে বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা, সভ্য পৃথিবীর আচার-ব্যবহার বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। শুধু আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই নহে, ফরাসী-অধিকৃত গিনিতে মাইলের পর মাইল জুড়িয়া এমন বহু স্থান পড়িয়া আছে— যেখানে জনমানবের বসতি নাই ; ধূসর ও উষর এই বিস্তৃত অঞ্চল দিনের পর দিন শুধু খরসূর্য্যালোকে পুড়িয়া যাইতেছে।



ফরাসী-অধিকৃত গিনির যান-বাহনের ব্যবস্থা



মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর মানুষের বসতিহীন বনপথে যাত্রার উদ্যোগ

এ-কথা আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা-প্রসূত নহে। শ্রীমতী এলিনর ডি চিতেলাৎ তাঁহার ভূতত্ত্ববিদ্ স্বামীর সহিত ফরাসী-অধিকৃত পশ্চিম-আফ্রিকায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সরকারী কার্য্যে শ্রীমতীর স্বামীকে প্রায়

ছয় মাস এই অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। শ্রীমতীও স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন। প্রথমে অবশ্য 'পথি নারী বিবর্জ্জিতা' এই নীতি অনুসরণ করিয়া, তাঁহার ভূতত্ত্ববিদ্ স্বামীটি একাই যাত্রা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীমতী যখন ধরিয়া বসিলেন যে,আফ্রিকা যত বড় বিপজ্জনক স্থানই হউক না কেন, তিনি সেখানে যাইবেনই, স্বামী বেচারীর তখন আর উপায় রহিল না। সরকারী কর্ম্মচারীরাও আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের বুঝাইয়া দেওয়া হইল যে, এ যাত্রার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁহাদের। সুতরাং এক দিন উদ্যোগ-আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া তাঁহারা বাহির হইয়া পড়িলেন। ভ্রমণান্তে শ্রীমতী এলিনর সম্প্রতি উহার কৌতূহল-উদ্দীপক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ তাঁহারই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী।



তোমিনি নদীতে দেশীয় নৌকা

আফ্রিকায় গিয়া সর্ব্বপ্রথম তাঁহারা ছাউনী ফেলিলেন 'পিটায়'। পিটায় তবু শ্বেতজাতির কয়েক জন লোক খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু পিটার প্রান্ত হইতেই মাইলের পর মাইল জুড়িয়া এমন বিস্তৃত ভূভাগ পড়িয়া আছে—যেখানে পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া ছাড়া উপায় নাই; যাহারা এই দীর্ঘপথ পদব্রজে অতিক্রম করিতে অসমর্থ, মানুষের মাথায় আরোহণ করা ভিন্ন তাহাদের উপায় থাকে না। কথাটা পরিহাস নহে। প্রথম চিত্রটি লক্ষ্য করিলেই পাঠকগণ ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিবেন।

পিটায় দিনগুলি তাঁহাদের লঘুপক্ষ মেঘের মত অনায়াস স্বচ্ছন্দগতিতে কাটিয়াছিল। কিন্তু সে কথা বলিবার পূর্ব্বে এই অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। পিটায় দুই জন শাসনকর্ত্তা আছেন। কিন্তু শাসনব্যাপারের সহিত তাঁহাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নাই বলিলেই হয়। এক এক জন গ্রাম্য সর্দ্দারের উপর এক একটি গ্রামের ভার দেওয়া আছে, কয়েকখানি গ্রাম লইয়া আবার এক জন করিয়া উপরওয়ালা আছে—তাহারাও সেই দেশের লোক। ফরাসী শাসনকর্ত্তাদের সম্বন্ধ এই লোকগুলির সহিতই অধিক। এই অঞ্চলের অধিবাসিগণ সাধারণতঃ 'ফুলাহ' নামে পরিচিত, তাহারা নানা প্রকার কারু-শিল্পে অভিজ্ঞ—রঙীন ঝুড়ি, মাদুর প্রভৃতি বুনিতে সিদ্ধহস্ত, ফরাসীদের



পথাতিবাহন

সম্পর্কে আসিয়া টেবলের ঢাকনী প্রভৃতি দুই চারিটি সৌখীন জিনিষও তাহারা করিতে শিখিয়াছে। পূর্ব্বে তাহারা নানা প্রকার মনোহর নক্সা কাটিয়া মৃৎপাত্র তৈয়ারী করিত, এখন সে সব চর্চ্চা তাহাদের নাই। মৃৎপাত্রের পরিবর্ত্তে কেরোসিনের টিন ব্যবহার করা এখন ঢের বেশী গৌরবজনক, সিরিয়ার চতুর ব্যবসায়ীরা তাহাদের মনে এই ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছে। বলা বাহুল্য, তাহারাই শূন্য কেরোসিনের টিনগুলি যথেচ্ছমূল্যে তাহাদের কাছে বেচিয়া যায়।



সর্দ্দার মামাদু আলফা এবং তাহার তিনটি স্ত্রী

এইবার শ্রীমতী এলিনরের দিনযাপনের কথা বলি। ১১ই নভেম্বর তারিখে তাঁহারা এই অঞ্চলেই ছিলেন। যুদ্ধবিরতির উৎসব উপলক্ষে এই দিন সবাই ছুটী পায়। পিটার শাসনকর্ত্তা এই দিন সকলকে উৎসবে যোগদান করিতে বলিয়াছিলেন। বেলা এগারটার সময় গ্রাম্য সর্দ্দারেরা আসিয়া জড় হইল। সরকারী কর্ম্মচারীদের সহিত



অবিবাহিতদের বাসগৃহ



রমণীদের রূপসজ্জা

করমর্দ্দন করিয়া তাহারা খাইতে বসিয়া গেল। কিন্তু কাচের পাত্রে রঙীন পানীয় দেখিয়াই তাহাদের মুখে সন্দেহের ছায়া পড়িল। কিছুতেই সেগুলি আর তাহারা স্পর্শ করিবে না। অবশেষে নিমন্ত্রণকর্ত্তা তাহাদের বুঝাইয়া দিলেন যে, উহা মদ নহে, কমলালেবুর নির্য্যাস; পান করিলে তাহাদের ধর্ম্মভাব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইবে না। তখন তাহারা এক নিশ্বাসে পানপাত্রগুলি নিঃশেষ করিয়া ফেলিল। বলিতে ভুলিয়াছি, জাতিতে ইহারা মুসলমান। অপরাহ্ণে সৌন্দর্য্য-প্রতিযোগিতা সুরু হইল। বলা বাহুল্য, প্রতিযোগিতা রমণীদের লইয়া। বিচারক হইলেন চারি জন য়ুরোপীয়ান। সৌন্দর্য্য-প্রতিযোগিতার জয়মাল্য মিলিল দুইটি ফুলাহ-তরুণীর। মাথায় প্রকাণ্ড চূড়া খোঁপা বাঁধিয়া, কাণে বড় বড় রূপার



ফুতা জ্যালন মালভূমির পরপারে টারমেদী স্ত্রীলোকদিগের পোষাক-পরিচ্ছদ



কোনিয়াগুইদের বাসগৃহ—মধ্যস্থলের ঘরটি অবস্থান বলিয়া গণ্য





কুলাহ রমণীদের গৃহকার্য্য—শস্য ঝাড়িয়া বাছাই করা হইতেছে

পল্লীমধ্যে মণ্ডলের ব্যবস্থা



Y.Wi'l :-ii>i|?.^M' ^\i ^<H i:s-l Wi'£:^| *!-'!



•'.>lt*(%l (/Wli£ ^-H-iT^i



C^l'^tl*' WH •'.4*l'--i>T!'i*! —"!>!!'i':*;<i ^Vi'-Mci^f

মাকড়ী ঝুলাইয়া তাহারা প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে আসিয়াছিল। সৌন্দর্য্য-প্রতিযোগিতার পর দেশীয় নৃত্য-গীত সুরু হইল। শ্রীমতী এলিনরের মতে উহাকে বীভৎসতার সাধনা ছাড়া অন্য কিছুই বলা চলে না, জীবনে এইরূপ বিরক্তি-কর ব্যাপার তিনি দেখেন নাই।



ফুলাহ রমণীদের বিচিত্র কেশপ্রসাধন

ঘোড়া এই অঞ্চলের বিস্ময়কর জীব। সচরাচর এই অঞ্চলে ঘোড়া দেখিতে পাওয়া যায় না। এই কারণে দৈবাৎ একটি ঘোড়া চোখে পড়িলে অধিবাসীরা আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়ে। পিটায় শ্রীমতী এলিনর বহুকষ্টে একটি ঘোড়া যোগাড় করিয়াছিলেন। তিনি যখন ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইতেন, গ্রামগুলি যেন আনন্দ-কলরবে মুখর হইয়া উঠিত। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ঘোড়ার সহিত পাল্লা দিয়া উর্দ্ধ-শ্বাসে ছুটিতে আরম্ভ করিত, ঘোড়াটি যদি বিশ্রাম লইবার জন্য এক মুহূর্ত্ত কোথাও দাঁড়াইত, তখনই তাহার চারি পাশে বাল-বৃদ্ধ নর-নারীর ভিড় জমিয়া যাইত—কি যেন এক পরম বিস্ময়কর জীব তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। রূপ-কথার পক্ষিরাজও বোধ করি এতখানি বিস্ময়কর নহে। এক দিন প্রাতঃকালে শ্রীমতী ঘোড়ায় চড়িয়া খানিকটা দূরে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, হঠাৎ দেখা গেল, ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ ছোট ছোট একদল ছেলে বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে ঘোড়ার পশ্চাতে ছুটিয়া আসিতেছে। শ্রীমতী ঘোড়া ছুটাইয়া দ্রুত চলিলেন, তাহারাও উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। না থামিল তাহারা নিজে, না থামাইল বাঁশী। বাঁশীর উৎকট আওয়াজ শুনিতে-শুনিতে শ্রীমতীর কাণে তালা ধরিবার উপক্রম! উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি ঘোড়া থামাইলেন। ছেলের দল ঘোড়াটিকে ঘিরিয়া তারস্বরে বাঁশী বাজাইতে লাগিল। বাঁশীর সুরের মাধুর্য্য তিনি ঠিক উপলব্ধি



ফুলাহ-নৃত্যে বিকট মুখভঙ্গী



তীর ও ধনুর্ধারী কোনগাই যুবক দল

করিতে পারেন নাই, তবে সুরটা যে খুব শ্রদ্ধাসূচক নহে, এইটুকু তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই অবস্থায় কি করা যায়, সে সম্বন্ধে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শ্রীমতী এলিনর সিগারেট-কেস খুলিয়া ছেলেদের একটি করিয়া সিগারেট উপহার দিলেন, আশ্চর্য্যের কথা এই যে, সিগারেট পাইয়া তাহারা বেশ গৌরবান্বিত বোধ করিল, এমন কি, বাঁশী বাজাইতেও ভুলিয়া গেল। আর এক দিন অশ্বারোহণে বাহির হইয়া শ্রীমতী বিপদে পড়িয়াছিলেন। অপরিচিত দেশ, পথঘাট জানা নাই, ঘুরিতে ঘুরিতে বহু দূরে গিয়া পড়িয়াছিলেন। ফিরিবার সময় পথ ভুল হইয়া গেল। আসিতে আসিতে সম্মুখে পড়িল সঙ্কীর্ণ একটি নদী। মরুভূমির দেশের শীর্ণ নদীতে জল আর কত বেশী হইবে মনে করিয়া শ্রীমতী ঘোড়ায় চড়িয়া জলে নামিলেন। কিন্তু অল্প দূর অগ্রসর হইতেই দেখা গেল, জল বাড়িতেছে। ঘোড়া আর অগ্রসর হইতে চায় না। শ্রীমতী এলিনর প্রমাদ গণিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ সেই সময় স্থানীয় একটি লোক আসিয়া পড়িল এবং ঘোড়াটির নাকে দড়ি বাঁধিয়া সে জলের মধ্য দিয়া টানিয়া লইয়া গেল, শ্রীমতী ঘোড়ার পৃষ্ঠে বসিয়া রহিলেন লোকটি সন্তরণ-পটু এবং নদীর জল কোথায় কম বা বেশী, তাহাও সে ভাল করিয়াই জানিত। নদী-তীরের বালুকায় অনেকগুলি হাঙ্গর চক্ষু মুদিয়া রৌদ্র সেবন করিতেছিল, শ্রীমতী প্রতি মুহূর্ত্তে আশঙ্কা করিতেছিলেন, এইবার হয় ত তাহারা তাড়া করিবে। সৌভাগ্যের বিষয়, তাহারা রৌদ্রের মধুর স্পর্শ ছাড়িয়া তাঁহার ঘোড়ার পিছু পিছু ছুটিবার উৎসাহ বোধ করে নাই। এই অঞ্চলে সিংহও যখন-তখন



লোগদের মোরগ-নৃত্য—কাপড় দিয়া মুখোস তৈয়ারী করা হইয়াছে

যেখানে সেখানে শ্রীমতীর চোখে পড়িয়াছে, তাহারাও কোন দিন বিশেষ উৎপাত করে নাই। এক দিন অন্ধকার রাত্রিতে তাঁহার ঘোড়াটি আসিয়া পড়িল এক হায়েনার সম্মুখে। শ্রীমতীর সর্ব্বশরীর ভয়ে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, তাঁহার সঙ্গের লোকজন এক মুঠি খড় দিয়া হিংস্র হায়েনাটিকে অনায়াসে বশ করিয়া ফেলিল।

পিটায় কয়েক দিন অবস্থানের পর তাঁহারা বুসৌরা যাত্রা করিলেন। সঙ্গে রহিল, দুই জন অস্ত্রধারী রক্ষী, রাঁধুনী, দো-ভাষী, পথিপ্রদর্শক, ভারবাহীর দল—সর্ব্বসমেত প্রায় এক শত জন। এ দেশের প্রত্যেক লোক ষাট-সত্তর পাউণ্ড ওজনের জিনিষ লইয়া অনায়াসে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে পারে, অনেকে এক শত পাউণ্ডের ভারও অনায়াসে বহন করিতে সমর্থ। খররৌদ্রে অসমতল ছায়াহীন পথ অতিক্রম করিতে সূর্য্যাস্তের সময় তাঁহারা 'তুবায়' আসিয়া পৌঁছিলেন। এই স্থানের অধিবাসীরা 'মালিঙ্কে' নামে পরিচিত। তাঁহাদের আসিবার সংবাদ তুবায় প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মালিঙ্কে ছেলেমেয়েরা আসিয়া তাঁহাদিগকে ঘেরিয়া ফেলিল, নানাপ্রকার উৎকট বাদ্যধ্বনি করিয়া তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনারও ত্রুটি রাখিল না। গ্রাম্য সর্দ্দার তাঁহাদের জন্য একটি পরিচ্ছন্ন কুটীরে বাসের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিল, সেইখানেই অবস্থান করা স্থির হইল। সর্দ্দার তাঁহাদের জন্য কয়েকটি মুরগী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল; সেগুলি তাঁহাদের হাতে দিয়া ভয়ে ভয়ে জানিতে চাহিল, আরও কিছু তাঁহাদের চাই কি না। তাহাদের দেশে যে অভাব কিছুরই নাই, বোধ করি, ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য সে বেচারী একরাশি কমলালেবু, কলা এবং পেঁপে পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল।



আফ্রিকার অনতিগভীর জলাশয়

রাত্রিতে সর্দ্দার তাঁহাদের জন্য একটি ভেড়া পাঠাইয়া দিল, ভেড়ার মাংস য়ুরোপীয়ানদের প্রিয়, এই খবরটুকুও সে সংগ্রহ করিয়াছিল। ভেড়াটির মূল্যস্বরূপ সর্দ্দার মাত্র বারোটি ফ্রাঙ্ক দাবী করিয়াছিল। কিন্তু রন্ধনের উদ্যোগ-আয়োজন সুরু হইবার পূর্ব্বেই সর্দ্দারের লোক আসিয়া বলিয়া গেল, ভেড়ার মাংসের যে অংশটুকু অতিথিদের প্রিয়,

তাহার পর যে অংশটা ভাল, তাহা সর্দারকে দিতে হইবে, তার পর যেটুকু ভাল জিনিষ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা সর্দারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভাগে পড়িবে। অবশিষ্টাংশ যে ভাবেই বিতরণ করা হউক, সর্দার তাহাতে আপত্তি করিবেন না। ইহাই এখানকার সামাজিক রীতি। সর্দারের অতিথিরা ইহাতে আপত্তি করেন নাই, কারণ, খুব বেশী মাংসের প্রয়োজন তাঁহাদের ছিল না। খোলা যায়গায় মাংস রান্না শুরু হইল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, মাংসের সুগন্ধে প্রলুব্ধ গ্রামবাসীরা দলে দলে সেই স্থানে আসিয়া জড় হইতেছে এবং তাহাদের কলরবে নিস্তব্ধ রাত্রি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সে রাত্রিতে শ্রীমতী এলিনরের স্বামী সশস্ত্র রক্ষীদের দ্বারা ভয় দেখাইয়া লোভাতুর গ্রামবাসীদিগকে শান্ত করিয়াছিলেন।

বুসৌরায় অবস্থানকালে শ্রীমতী এলিনরকে সকলে চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শিনী বলিয়া স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল। স্থানীয় ডাক্তারদের সংখ্যা অবশ্য সেখানে অল্প নয়, কিন্তু



ডিয়াকাদেরদিগের কামারশালা

কেন যে তাহারা শ্রীমতীকে ডাক্তার বলিয়া সন্দেহ করিয়া ফেলিল, তাহা বলা কঠিন। কাহারও হয় ত পা কাটিয়া গেল, কাহারও হয় ত পেট কাঁপিয়া উঠিয়াছে, সবাই ছুটিয়া আসিত শ্রীমতী এলিনরের পরামর্শের জন্য। তিনি আয়োডিন ও সোডা বাইকার্বোনেট দিয়া তাহাদিগকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। অধিকাংশ লোকই এই অঞ্চলে ক্রিমিরোগে ভুগিতেছে। অনেক সময় জোলাপ লইয়া তাহারা উপকার পাইত। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্ফীতি রোগটা তাহাদের মধ্যে একটু বেশী প্রবল। শ্রীমতী এলিনর সত্যই চিকিৎসক নন যে, তিনি সকল রোগের ঔষধ অবগত থাকিবেন, তিনি তাহাদিগকে ফিরাইতে বাধ্য হইলেন, তিনি এই রোগের প্রতীকারের উপায় অবগত নহেন জানিয়া সকলে হতাশ হইল। কুইনাইন ব্যবহারের ফলে যে উপকার পাওয়া যায়, সে বিষয় ইহাদের কিছু কিছু জ্ঞান আছে দেখা গেল। তাহারা প্রায় আসিয়া শ্রীমতী এলিনরের নিকট কুইনাইন চাহিত। কিন্তু তাঁহাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণ কুইনাইন না থাকায় তিনি সকল সময়ে তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। স্থুলাহদের মধ্যে অনেকেই ক্ষয়রোগে ভুগিতেছে দেখিয়া শ্রীমতী এলিনর বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। নগ্নদেহ বামারি বা কোনিয়াগুইদের মধ্যে এই ব্যাধির আক্রমণের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। সুস্থ



ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে খরিদ-করা পোষাক পরিহিত রমণী



ভোজনরত কুকী-রমণীগণ ও পুরুষ



অর্দ্ধনগ্ন বাগারী যুবকদের তালপত্রের ভেঁপু বাজাইয়া উদ্দাম নৃত্য-গীত



বাসারী পুরুষদের ক্ষৌরকর্ম্ম



বাসারীয় যুবকগণের নাসিকা এবং দন্ত-পাঁতির শোভা



বাসারীদের অলঙ্কার-বৈচিত্র্য

সুগঠিত দেহ লইয়া কি কারণে তাহারা এই কাল-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, তাহা ভাবিবার কথা।

এক দিন বহুদূর হইতে এক বৃদ্ধ চারি মাসের একটি শিশুকে লইয়া শ্রীমতী এলিনরের নিকট উপস্থিত হইল। তাহার উদর অস্বাভাবিকভাবে ফুলিয়া গিয়াছে—শ্রীমতীকে দয়া করিয়া ছেলেটিকে বাঁচাইয়া দিতে হইবে। ছেলেটির অবস্থা দেখিয়া শ্রীমতীর দয়া হইল, কিন্তু কি উৎকট ব্যাধিতে যে সে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। এ দিকে অধীর পিতা-মাতা ছেলেটিকে নীরোগ করিয়া তুলিবার জন্য ব্যাকুল। তাহাদিগকে শান্ত করিবার জন্য শ্রীমতী এলিনর ছেলেটিকে একটু ফলের রস খাইতে দিয়াছিলেন এবং তাহাতেই তাহারা শ্রীমতীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছিল। ছেলেটি বাঁচিয়াছে কি মরিয়াছে, ভগবান জানেন।



স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে ভূতত্ত্ববিদ্ মিঃ এনজ্বো এবং ফরাসী পদাতিক-বাহিনীর লেফটেনান্ট

তাহার পর এক দিন প্রভাতে পুনরায় যাত্রা সুরু হইল। আবার সেই বন্ধুর, বিবর্ণ পথে বৈচিত্র্যহীন যাত্রা! ক্রোশের পর ক্রোশ মানববসতিহীন মাঠ ও পাহাড় অতিক্রম করিয়া আসিবার পর এই যাত্রিদলের সহিত বাসারীদের প্রথম পরিচয় হইল। এই বাসারীরা ধর্ম্মে মুসলমান নয়, কিন্তু অসভ্য, বর্ব্বর জাতির সর্ব্বপ্রকার লক্ষণই ইহাদের মধ্যে বিদ্যমান। ইহাদের সুগঠিত ঘন-কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয়, কালো ব্রোঞ্জ হইতে কে যেন ইহাদিগকে ক্ষোদাই করিয়া বাহির করিয়াছে। বিরাট ধনু ও শাণিত তীরের গুচ্ছ হাতে লইয়া তাহারা এই অঞ্চলে যথা তথা ঘুরিয়া বেড়ায়। সভ্যতার প্রথম চিহ্ন পরিচ্ছদকে পর্য্যন্ত ইহারা স্বীকার করে নাই, সম্পূর্ণ নগ্ন শরীর লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে ইহাদের বাধে না। ফরাসীদের সম্ভাষণের 'মঁসিয়ে' কথাটা কোথায় হয় ত ইহারা শুনিয়া থাকিবে, যাত্রিদলকে যাইতে দেখিয়া তাহারা বলিয়া উঠিল, 'বনজুর, মঁসিয়ে!'

তাহাদের মধ্যে এক জনের অঙ্গে পরিচ্ছদ ছিল, ফুলাহ-গণ যে জাতীয় পোষাক ব্যবহার করে, ইহাও সেই জাতীয়। লোকটির চেহারা দেখিয়া মনে হইল, দেহে শক্তি তাহার অসীম এবং কথায় কথায় জানা গেল যে, ফুলাহদেরই এক জন তাহাকে এই পোষাক উপহার দিয়াছে। কিন্তু তাহার কথাটা সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া দুষ্কর। কারণ, ফুলাহ এবং বাসারীদের মধ্যে বিরোধ ও শত্রুতা চলিয়া

আসিতেছে পুরুষানুক্রমে। তাহাদেরই কেহ এই বাসারি যুবকটিকে পরিচ্ছদ উপহার দিবে, ইহা সত্য হইলেও অস্বাভাবিক। সে যাহাই হউক, এই যুবকটিকে তাঁহারা ভার-বহনের জন্য নিযুক্ত করিলেন। কাচের জিনিষপত্র বোঝাই একটা বাক্স মাথায় লইয়া সেও তাঁহাদের সহিত চলিল। কিন্তু কয়েক মিনিট না কাটিতেই দেখা গেল, মাথা হইতে বাক্সটি মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে এবং কাচের বাসনগুলি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়াছে। শ্রীমতী এলিনর প্রথমটা খুব রাগিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু পরে যখন শুনিলেন যে, ফুলাহদের দেওয়া সেই পোষাক পরিয়া চলিতে গিয়া, অনভ্যাসচর্চ্চার ফলেই সে বেচারী পথের উপর টাল খাইয়া পড়িয়াছে, তখন হাস্য সংবরণ করা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িল।

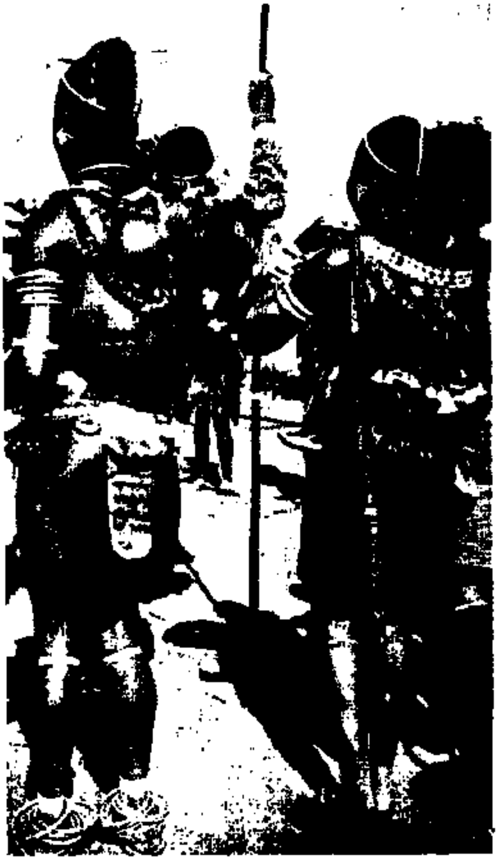
এ দিকে বেলা বাড়িতেছিল। শীর্ণকায়া এক স্রোতস্বিনীর নিকট পৌঁছিয়া যাত্রা স্থগিত রাখা হইল। নদীর উভয় পার্শ্বে বড় বড় গাছের দীর্ঘ ছায়া, সমস্ত মিলিয়া যেন মরূদ্যানের মত। স্থির হইল, এইখানেই স্নানাহার সারা হইবে। ভারবাহী লোকগুলিও তখন নদীর তীরে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছে। শ্রীমতী এলিনরের স্বামী স্নান সারিয়া আসিলে তিনিও স্নানে নামিলেন। কিন্তু স্নানের পোষাক পরিয়া যেই তিনি ডুব দিবার উদ্যোগ করিয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তে দেখা গেল, লোকগুলি ছুটিয়া গিয়া বনের মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছে। বলা বাহুল্য, শ্রীমতীর স্নানের পোষাক দেখিয়াই তাহারা লজ্জায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু যাহারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ মূর্ত্তি লইয়া পথে প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহারা হঠাৎ সে দৃশ্য দেখিয়া লজ্জাবোধ করিল কেন, কে জানে? কে তাহাদের মনে অকস্মাৎ এই শালীনতা-জ্ঞান সঞ্চারিত করিল, তাহা কে বলিবে? বাসারিতে ইঁহারা প্রায় দুই মাস ছিলেন। এই অঞ্চলে মামাডু আলকার অখণ্ড আধিপত্য। মামাডু ফুলাহ-জাতীয় লোক, কিন্তু ফরাসী সরকারের অনুমতি লইয়া সে ফুলাহ এবং বাসারিদের উপর সমানভাবে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। কিন্তু অতিথিদের সেবা ও সম্বর্দ্ধনায় মামাডু যত্নের ত্রুটি করে নাই। এমন কি, নিজের তিনটি স্ত্রীকেও সে শ্রীমতী এলিনরের সেবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিল। আসিবার সময় শ্রীমতী এলিনর মামাডুকে এক বোতল লেবুর



সদ্যোজাত গেজেল—শ্রীমতী এলিনর ইহাকে পালন করিয়াছিলেন, কিন্তু দুই সপ্তাহের অধিক বাঁচে নাই

সিরাপ উপহার দিয়াছিলেন, তাহাতেই মামাতুর আনন্দের অন্ত ছিল না।

এক দিন রাত্রিতে সেই স্থানে একটা ভয়াবহ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। শ্রীমতীর স্বামী সে দিন সরকারী কার্য্যে ছাউনী হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছেন, এলিনর তখন একা। খানসামাকে ডাকিয়া তিনি মুরগী বানাইতে বলিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে খানসামা আবদুল আসিয়া বলিল, আজ আর রন্ধনের কোন সম্ভাবনা নাই, কুকারের মধ্যে একটা সাপ ঢুকিয়া বসিয়া আছে। ভয়ে সকলেই অস্থির হইয়া পড়িলেন, শেষ পর্য্যন্ত মামাতুর লোকজন আসিয়া সাপটিকে মারিয়া ফেলিল। সাপটি দীর্ঘ কেউটে—কিন্তু মামাতুর লোকজনের কাছে যেন খেলার জিনিষ, অনায়াসে সেটাকে তাহারা বধ করিল।



মল পায়ে দিয়া বাসারী রমণীগণ

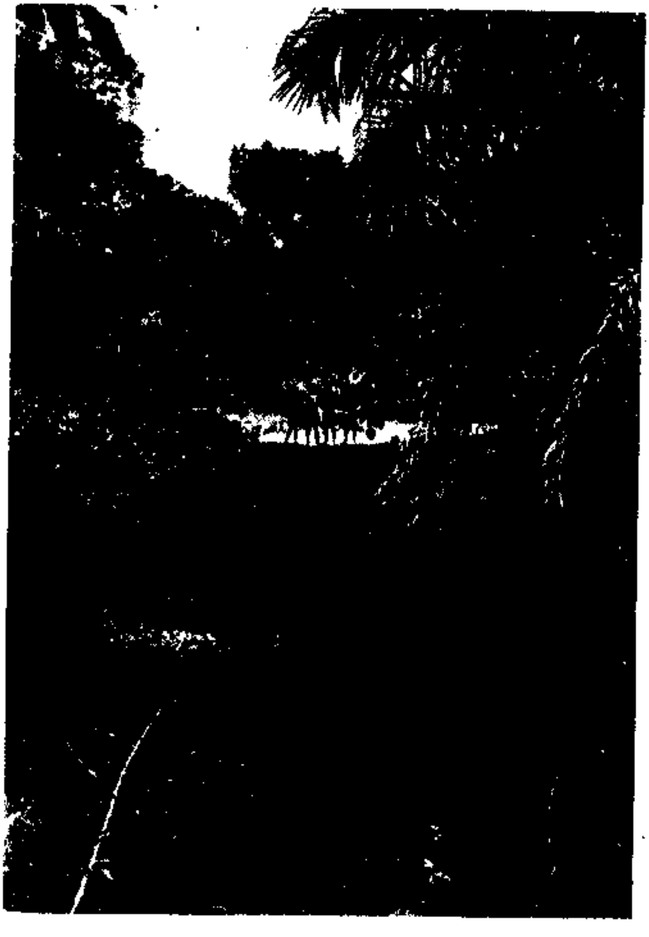
এখানে মামাতুর পুত্র সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। কয়েক দিন অবস্থানের পর শ্রীমতী এলিনর বুঝিতে পারিলেন যে, লোকটি যেমনই ভাব-প্রবণ, তেমনই প্রেম-পাগল। পিটার অন্তঃপাতী কোন গ্রামে তাহার একটি পত্নীকে সে রাখিয়া আসিয়াছে, আবার এখানে আসিয়াও বিবাহ করিয়াছে একাধিকবার। কিন্তু ইহাতে মামাতুপুত্রের প্রেম-পিপাসা মিটে নাই। সম্প্রতি সে এক তন্বী বাসারি-তরুণীর প্রেমে পড়িয়াছে। কিন্তু পড়িলে কি হয়, মেয়েটির আত্মীয়-স্বজন কেহই সেখানে নাই যে, মামাতু দরদস্তুর করিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া ফেলিবে। শ্রীমতী এলিনরকে সে ধরিয়া বসিল, বাবাকে বুঝাইয়া তিনি যেন তাহাদের বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া দেন, নহিলে জীবন-ভার বহন করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে।



সাত ফুট দীর্ঘ একটি ঈগল পাখী সহ বাসারী যুবক

কিন্তু সর্দার মামাহুকে সম্মত করান গেল না। সর্দার বলিল, এত বড় দায়িত্ব সে গ্রহণ করিতে পারে না। তখন মামাহুর ছেলেটি শ্রীমতী এলিনরকে, সেই বাসারী তরুণীর একটি ফটো তুলিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিল। সেই ছবি বুকে করিয়াই সে বিরহ ভুলিবার চেষ্টা করিবে। শ্রীমতী এলিনর এই প্রণয়ী যুবকের অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন।

এক দিন সন্ধ্যার অন্ধকারে একা একা বসিয়া



গাম্বিয়া নদীর নিকট মনোহর মরুদ্যান

থাকিতে শ্রীমতী এলিনরের ভাল লাগিতেছিল না। অবসর-যাপনের জন্য গ্রামোফোন বাহির করিয়া তিনি বাজাইতে লাগিলেন। কিন্তু দশ মিনিট না কাটিতেই দেখা গেল, গ্রামের চারিদিক হইতে লোকজন আসিয়া তাঁবুর নিকট জড় হইতেছে। দেখিতে দেখিতে প্রায় ষাট সত্তর জন জমায়েত হইল। একটা যন্ত্রের মধ্য দিয়া মানুষের কণ্ঠস্বর বাহির হইতেছে শুনিয়া তাহাদের আনন্দ দেখে কে! ছেলে বুড়া সবাই মিলিয়া গ্রামোফোন রেকর্ডের সহিত নাচিতে সুরু করিয়া দিল। ইহার পর যে কয় দিন তাঁহারা এখানে ছিলেন, প্রতিদিন সন্ধ্যায় গ্রামোফোন শুনিবার আশায় তাহারা তাঁবুর নিকটে আসিয়া বসিয়া থাকিত। এক দিন গ্রামোফোন রেকর্ডের তালে তালে নাচ চলিতেছে, যাত্রিদলের রক্ষী মাঙ্গালাই পর্য্যন্ত আনন্দে উৎফুল্ল



বাসারী রমণীর মাথায় পর পর অনেকগুলি জিনিষ

হইয়া উঠিল। মহাযুদ্ধের সময় লড়াইয়ে যাইবার সৌভাগ্য তাহার হইয়াছিল, সভ্য সৈনিকদের সাহচর্য্যে ফক্স-ট্রট নাচ সম্বন্ধেও একটু আধটু ধারণা তাহার জন্মিয়াছিল। সমবেত নরনারী যখন নৃত্যে মাতিয়া উঠিয়াছে, মাঙ্গালাই হঠাৎ উঠিয়া গিয়া একটি তরুণীর কটিদেশ বেষ্টন করিয়া ফেলিল। ইচ্ছা—সাহেব লোক কেমন করিয়া নাচে, তাহাই সে এই

আয়নাটি বড় নয়, মাত্র এক ফুট চওড়া। আড়াল হইতে শ্রীমতী এলিনর দেখিলেন, জল দিয়া ফিরিবার সময় প্রত্যেক রমণীই একবার করিয়া সেই আয়নার সম্মুখে বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে দাঁড়াইয়া যাইতেছে এবং দর্পণে নিজ নিজ মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইতেই আনন্দের আতিশয্যে কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিতেছে! শ্রীমতী এলিনর তাহাদের কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই ভয়ে তাহারা কাঠ হইয়া গেল! কিন্তু এলিনর তাহাদিগকে বলিলেন, ভয় নাই, তোমরা গ্রাম শুদ্ধ সকলকে আনিয়া আয়নায় মুখ দেখিয়া যাইতে পার।



সাঙ্গালন অঞ্চলের রমণীদের শিরোভূষণ



'আলোকপ্রাপ্ত' কোনিয়াগুই যুবক



ডাউলাবায়ার রোজা



গিনির বন্য-মোরগ—এইগুলি বাড়িতে গাছে বসিয়া থাকে

ইউকুনকুনের ছোট ছোট ছেলেরা তীরধনু লইয়া তাহাদের ধনুর্বিদ্যার পরিচয় দিতে আসিত। সন্ধ্যার পর সুরু হইত তাহাদের প্রতিযোগিতা এবং একবাক্স করিয়া দিয়াশলাই পাইলেই তাহারা সন্তুষ্টচিত্তে বাড়ী ফিরিয়া যাইত।

ইউকুনকুনের কোনিয়াগুইরা চাষবাস করে, কিন্তু ফলের গাছ রোপণ করে না কোন দিন। ফলমূল সংগ্রহের জন্য তাহাদিগকে দূরান্তরে লোকজন পাঠাইতে হইত। দুই মাস অন্তর শ্বেতজাতির উপনিবেশে লোকজন ছুটিত ফলমূল সংগ্রহ করিতে। বহুপূর্ব্ব হইতেই



কোনিয়াগুই তরুণী



ডিয়াকাকে তরুণী

এই জন্য তালিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইত। কারণ, তাহাদের ফিরিয়া আসিতে সময় লাগিত প্রায় তিন সপ্তাহ।

ইউকুনকুনে নানা প্রকার শাকসবজী পাওয়া যাইত, কিন্তু অন্যত্র তাহা পাওয়া যায় না। শ্রীমতী এলিনর নিজে কোন দিন বাজারে যাইতেন না, স্থানীয় লোকজনই সেইগুলি আনিয়া দিত। কোনিয়াগুই সর্দ্দারের তরুণ ভ্রাতুষ্পুত্র



তুরা এবং কুম্বিয়ার মধ্যে নদীর উপর নির্ম্মিত সেতু

ফোটা এই বিষয়ে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিত। শ্রীমতীর মনোরঞ্জনের জন্য সে চেষ্টার ত্রুটি করিত না। যখনই ভাল আনাজপত্র মিলিত, তাহাই সে আনিয়া শ্রীমতীকে উপঢৌকন দিত। কোন দিন বা একরাশ ডিম, কোন দিন বা কতকগুলি বড় বড় মোরগ আনিয়া হাজির করিত। ছেলেটি কুলাহদের ভাষায় তাঁহাকে কি যে বলিত, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন না। কারণ,বাসারি বা কুলাহ কোন ভাষাই তাঁহার জানা ছিল না। কিন্তু না জানিলেও এটুকু বুঝিতে পারিতেন যে, এই সরলচিত্ত ছেলেটি তাঁহার মুখের সামান্য প্রশংসা শুনিবার জন্য লালায়িত। এক দিন শ্রীমতী এলিনর ফোটাকে বলিলেন, বড় বড় মোরগ তিনি পছন্দ করেন না, সেগুলি ছোট ছোট হইলেই ভাল হয়। পরদিন প্রাতঃ-



মালীর অধিবাসিনী কুলাহ-তরুণী

কালেই দেখা গেল, কয়েকখানি গ্রাম উজাড় করিয়া সে অসংখ্য মুরগীর ছানা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে।

তাহার এই অহেতুক আত্মীয়তায় তিনি মধ্যে মধ্যে লজ্জা বোধ করিতেন।

একবার ইউকুনকুন হইতে তাঁহারা জিনিষপত্র খরিদের

জন্য বৃটিশ গাম্বিয়ায় লোক পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা ফিরিয়া আসিবার সময় পনের দিন পূর্ব্বের একখানি সংবাদ-পত্র সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। শ্রীমতী বলিয়াছেন, বহুকাল পরে কোন প্রিয় পরিচিত ব্যক্তির সহিত হঠাৎ সাক্ষাৎ হইয়া গেলে হৃদয় যেমন আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠে, এই সংবাদ-পত্রখানি চোখে পড়িতেও তাঁহার সমস্ত মন তেমনই আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছিল। এখানে বেতারে যেটুকু সরকারী খবর



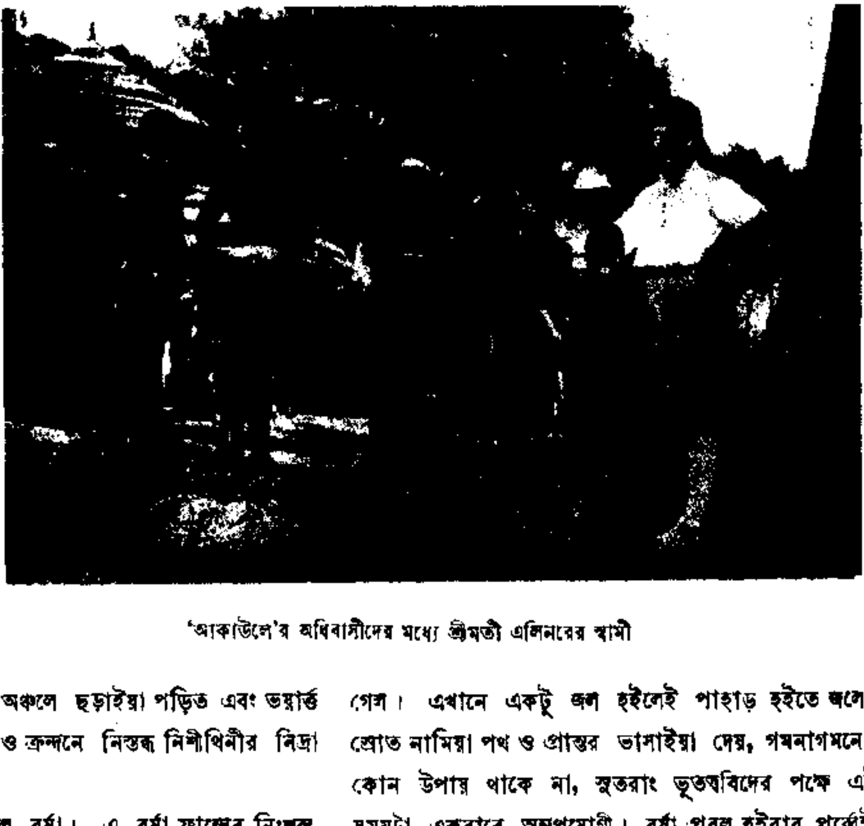
গাছের গুঁড়ির গহ্বরের মধ্যে পাঁচ জনের স্থান সঙ্কুলান

আদানপ্রদান হয়, তাহাতেই সকলকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়, সুতরাং সভ্য মানুষের পক্ষে একখানি সংবাদপত্রের মূল্য যে কতখানি, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। সভ্যজগতে এক দিন পূর্ব্বের সংবাদপত্রের কোন মূল্য নাই, কিন্তু এখানে এক মাস পূর্ব্বের সংবাদপত্র পাইলেই লোকে আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করে।

এইবার কোনিয়াগুইদের জীবনযাত্রার প্রণালী সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলি। শ্রীমতী এলিনর এই অঞ্চলে অবস্থানকালে এই সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। ইহাদের ধর্ম্ম রাজনীতি ও সমাজ-জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং তাহা আনুষ্ঠানিক আড়ম্বর ও দুর্জ্ঞেয় রহস্যে সমাচ্ছন্ন। ইহাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যাহারা প্রচলিত প্রথার খাতিরে নরমাংস গলাধঃকরণ করিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নহে। এই দেশের স্ত্রীলোকরা শ্রমশীল, দীর্ঘদেহা এবং স্বাধীন। গৃহধর্ম্মে নারীর স্থান কোথায়, ইহারাই পুরুষদের তাহা শিখাইয়া দেয়। কিন্তু স্ত্রীলোক যতক্ষণ একটি সন্তান প্রসব করিয়া প্রমাণ না করিতেছে যে, বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা তাহার আছে, ততক্ষণ বিবাহ করিবার অধিকার তাহার নাই। সন্তান-জন্মের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বহুচারিতা ইহাদের মধ্যে অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না, কিন্তু বিবাহের পর ইহা ঘোরতর অপরাধ। এই কারণে কোনিয়াগুইদের মধ্যে বিবাহ একটু বেশী বয়সে প্রচলিত।

গ্রীষ্মের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই অঞ্চলে বাস করা সাধারণ মানুষের পক্ষে কঠিন নয়। শ্রীমতী এলিনর যখন এই দেশে প্রথম পদার্পণ করেন, আকাশ তখন ঘননীল এবং বাতাসের অত্যাচারও কম কিন্তু গ্রীষ্মের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ধূলিজঞ্জাল উড়াইয়া প্রবল বায়ু বহিতে লাগিল, তরুপত্র ও

তৃণদল বিবর্ণ হইয়া গেল এবং জলাশয়গুলিতে কর্দ্দমাক্ত ঘোলা জল ব্যতীত আর কিছুই রহিল না। গায়ের চামড়া ফাটিতে লাগিল, ভেসলিন্ এবং গ্লিসারিণ লেপন করিয়াও বিশেষ কোন ফল হইল না। তাহার পর বাতাসের বেগ থামিল ত যেখানে সেখানে অগ্নিকাণ্ড ঘটিতে লাগিল। দিনমানে রখর-রৌদ্রে গাছপালা, বনজঙ্গল উত্তপ্ত হইয়া থাকিত; রাত্রিতে ধূ ধূ করিয়া সেইগুলি জ্বলিয়া উঠিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় লোকরাই চাষের উপযোগী জমি বাহির করিবার জন্য আগুন লাগাইয়া দিত। রাত্রির নিবিড় অন্ধকারকে উদ্ভাসিত করিয়া, বাতাসের বেগে আগুন কখনও নিকটবর্ত্তী পল্লী অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িত এবং ভয়ার্ত্ত গ্রামবাসীদের চীৎকার ও ক্রন্দনে নিস্তব্ধ নিশীথিনীর নিদ্রা টুটিয়া যাইত!



'আকাউলে'র অধিবাসীদের মধ্যে শ্রীমতী এলিনরের স্বামী

তাহার পর নামিল বর্ষা। এ বর্ষা ফ্রান্সের নিঃশব্দ, ভীরু বর্ষণ নহে; মেঘমৃদঙ্গের ধ্বনির সহিত এই বর্ষা বিজয়ী রাজার মত এই মরুপ্রদেশে প্রবেশ করিল। তীব্র, তীক্ষ্ণ বিদ্যুতের বেগে আকাশ খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল, পর্ব্বত ও প্রান্তর ভাসাইয়া নামিল বন্যার স্রোত। প্রতি মুহূর্ত্তে বজ্রের ধ্বনি জনবিরল বনভূমি সচকিত করিয়া তুলিতে লাগিল। বর্ষণের অপেক্ষা গর্জ্জন এখানে বেশী। ক্রমান্বয়ে মেঘ ও বজ্রের ধ্বনি শুনিতে শুনিতে পশু ও মানুষ যেন ক্ষেপিয়া গেল। এখানে একটু জল হইলেই পাহাড় হইতে জলের স্রোত নামিয়া পথ ও প্রান্তর ভাসাইয়া দেয়, গমনাগমনের কোন উপায় থাকে না, সুতরাং ভূতত্ত্ববিদের পক্ষে এই সময়টা একবারে অনুপযোগী। বর্ষা প্রবল হইবার পূর্ব্বেই মে মাসের শেষে তাঁহারা আবার সভ্য পৃথিবীর পথে যাত্রা করিলেন।

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়।

অপূর্ব্ব সঞ্জীবনী

কনফুসিয়াস্ তাঁহার শিষ্যদের বলিয়াছিলেন, "তৃষ্ণার্ত্ত পথিক যদি তোমার দ্বারে আসে, তাকে একপাত্র চা দিও বিনামূল্যে।" চা-পান ইদানীং সামাজিকতার মধুর অঙ্গ-স্বরূপ। শরীর যখন ক্লান্ত, মন বিচলিত, তখন এক পেয়ালা চা খাওয়া প্রয়োজন। কি গভীর আরাম যে তাহাতে পাওয়া যায়, তাহা বর্ণনা করা সম্ভব নহে! চা-কে নেশা হিসাবে গণ্য করা অত্যন্ত ভুল।

চা নেশা ত নয়ই, বরং অন্যান্য মাদক দ্রব্যের অস্বাস্থ্যকর পিপাসা-জয়ে চা সাহায্য করিয়া থাকে। ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষকদের ভিতর চা-পানের অভ্যাস ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তাড়ি-সেবকের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। চা একমাত্র ভারতবর্ষেই উৎপন্ন ও প্রস্তুত হয়। ভারতীয় চা হইতে আমরা অপকারহীন, হিতকর একটি পানীয় পাই।



পঞ্চত্রিংশ পাক

সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র

মিঃ ব্লীড্ মিস এঞ্জেলা হ্যালাম্‌কে ভূবিবরে পতনোন্মুখ দেখিয়া, তাহাকে মৃত্যুকবল হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টায় সবল বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া তাহার উভয় স্কন্ধ দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিতেই, দু'জনেই উদ্ঘাটিত গহ্বরদ্বারের অদূরে মেঝের উপর নিক্ষিপ্ত হইলেন। মিস্ হ্যালাম্ চিৎ হইয়া পড়িল, মিঃ ব্লীড্ ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া তাহার বুকে ঢলিয়া পড়িলেন। মিঃ ব্লীড্ আপনাকে সংবরণ করিতে না পারায় অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়াই সেই লজ্জাজনক অবস্থা হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর মিস্ হ্যালামের হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিলেন। খ-পোত-চালনে অসাধারণ সাহস ও দক্ষতার পরিচয় দিতে গিয়া মিস্ হ্যালাম অনেকবার জীবন বিপন্ন করিয়াছিল, তাহার কাতরতা কেহ কোন দিন লক্ষ্য করে নাই; কিন্তু মিঃ ব্লীড্ তাহাকে টানিয়া তুলিবার সময়, সে মুখ তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলে, তিনি দেখিলেন, আতঙ্কে তাহার চক্ষু বিস্ফারিত, এবং প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় মুখকান্তি ব্লটিং কাগজের মত সাদা হইয়া গিয়াছে। নারীর এরূপ আতঙ্কবিহ্বল মুখচ্ছবি আর কখনও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

মিস্ হ্যালাম্ উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্খলিতস্বরে বলিল, "এ—এ—কি ব্যাপার?"

পর-মুহূর্ত্তেই সে মিঃ ব্লীডের হাত ধরিয়া, যে চেয়ার হইতে উল্টাইয়া পড়িয়া হেটমুণ্ডে ভূ-বিবরে পড়িতে পড়িতে মিঃ ব্লীডের ক্ষিপ্রতায় অল্পের জন্য বাঁচিয়া গিয়াছিল, বিহ্বল-দৃষ্টিতে সেই চেয়ারের দিকে চাহিয়া রহিল। চেয়ারখানি তখন কোনও গুপ্ত স্প্রিংএর আকর্ষণে একবার আবর্ত্তিত হইবার পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছিল। সেই সময় 'খট' করিয়া একটা শব্দ হইতেই, মেঝের যে গহ্বর-মুখ উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, এবং যাহার অভ্যন্তরস্থ গুপ্ত রহস্য মিঃ ব্লীডের সুপরিজ্ঞাত হইয়াছিল, সেই গহ্বর-মুখ অদৃশ্য হইল। মেঝেতে যে ঐরূপ কোন কৌশল ছিল, তাহা তখন আর বুঝিবার উপায় রহিল না। সেই কক্ষের মেঝে তখন যে কোন অট্টালিকার সাধারণ মেঝের মতই প্রতীয়মান হইল।

মিঃ ব্লীড মিস্ হ্যালামের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া, ওষ্ঠে তর্জ্জনী স্থাপন করিয়া তাহাকে নিস্তব্ধ থাকিতে ইঙ্গিত করিলেন। তাহার পর তিনি তাড়াতাড়ি বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল, লিসেষ্টার স্প্রিং, অথবা সে যাহার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়া নরহত্যার ব্যবসায়ে দক্ষতার পরিচয় দিতেছিল, মনুষ্যচর্ম্মাবৃত সেই পিশাচ হঠাৎ সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে পারে। মিঃ ব্লীড তখন নিজের বিপদের কথা বিস্মৃত হইয়া মিস্ হ্যালাম্‌কে কি উপায়ে রক্ষা করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে-ছিলেন। মিস্ হ্যালামের কোন বিপদ ঘটিলে তিনিই যে সে জন্য দায়ী, ইহা তিনি মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিতে পারিলেন না। তাঁহার মুহূর্ত্তকালের অসতর্কতার জন্য মিস্ হ্যালাম্‌কে ঐ ভাবে বিপন্ন হইতে হইয়াছে, ইহা উপলব্ধি করিয়া মিঃ ব্লীড নিজের মূঢ়তা অমার্জ্জনীয় মনে করিলেন। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, সেই দুর্ব্বৃত্তদের ষড়যন্ত্রে মিস্ হ্যালামকে আর কোনও নূতন বিপদে পড়িতে না হয়, সেজন্য যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করিবেন।

মিঃ ব্লীড মিস্ হ্যালামের কাণে কাণে বলিলেন, "আপনি নির্ব্বাক্‌ভাবে আমার অনুসরণ করুন।"—লিসেষ্টার স্প্রিং তাহাকে সেই কক্ষে বসাইয়া রাখিয়া পূর্ব্বে যে কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, মিঃ ব্লীড সেই কক্ষের অভিমুখে অগ্রসর হইলে মিস্ হ্যালাম্ নিঃশব্দে তাঁহার অনুসরণ করিল।

সেই কক্ষটি তখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিলেও, মিঃ ব্লীড সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া রাখায়, বাহিরের আফিসের আলোক সেই কক্ষে প্রতিফলিত হইল। সেই আলোকের সাহায্যে মিঃ ব্লীড সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারিলেন—লিসেষ্টার

স্প্রিং যে কক্ষে বসিয়া তাহার মক্কেলদের সঙ্গে বৈষয়িক প্রসঙ্গের আলোচনা করিত, উহা সেই কক্ষই বটে। এই কক্ষে একখানি সুপ্রশস্ত মেহগনী ডেস্ক এবং একখানি চেয়ার সংস্থাপিত ছিল। তাহার দেয়ালগুলি ঘেঁসিয়া মক্কেলদের মামলা ও বিষয়কর্ম্ম-সংক্রান্ত দলীলপূর্ণ কতকগুলি টিনের বাক্স থরে থরে সজ্জিত ছিল। মিঃ ব্লীড অসঙ্কোচে সেই ডেস্কের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তাহার উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়া, ডেস্কের প্রত্যেক দেরাজ খুলিয়া তাহার মধ্যস্থিত জিনিষপত্রগুলি তাড়াতাড়ি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই সময় তিনি মুখ তুলিয়া মিস্ হ্যালামকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মিস্ হ্যালাম্, আপনি দয়া করিয়া ঐ দ্বারের চৌকাঠের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলে আমি বাধিত হইব। আপনি ঐ ভাবে দাঁড়াইলে, বাহিরের দরজার কাচের ভিতর দিয়া যদি কেহ চাহিয়া দেখে, তাহা হইলে আপনি তাহার নজরে পড়িবেন না। ঐ স্থান হইতে কাহারও কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় কি না, তাহাও লক্ষ্য করিবেন। যদি কোন আগন্তুকের পদশব্দ শুনিতে পান, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ দ্বারটি বন্ধ করিবেন।"

সেই সঙ্কটজনক অবস্থায় এই কথাগুলি বলিলেও মিঃ ব্লীডের কণ্ঠস্বরে বিন্দুমাত্র জড়তা ছিল না, তিনি সুস্পষ্ট স্বরেই এ সকল কথা বলিলেন। বাহিরের কক্ষে যে ভীতিসঙ্কুল রহস্যের অস্তিত্ব বর্ত্তমান ছিল, এবং তিনি যে গোপনে এক জন সমব্যবসায়ীর কক্ষস্থিত ডেস্কের দেরাজ খুলিয়া কাগজপত্রাদি পরীক্ষা করিতেছিলেন, এ কথা চিন্তা করিয়া তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তাঁহার অচঞ্চল স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর শুনিয়া সেই যুবতীর মনেও সাহসের সঞ্চার হইল; তাহার চিত্তের দৃঢ়তা অবিচলিত রহিল। মিস্ হ্যালাম্ তাঁহার উপদেশ অনুসারে তাড়াতাড়ি সেই কক্ষের দ্বারের নিকট সরিয়া গিয়া চৌকাঠের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং অদূরে কোন শব্দ হইলে তাহা শুনিবার আশায় কাণ পাতিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

অতঃপর মিঃ ব্লীড তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া, কতকটা নিশ্চিন্ত-চিত্তে তাড়াতাড়ি সেই ডেস্কের দেরাজগুলির জিনিষপত্র পরীক্ষায় পুনঃপ্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে তিনি মেঝের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, ডেস্কের দক্ষিণ পার্শ্বের দেরাজগুলির নিম্নতমটি টানিয়া বাহির করিলেন। সেই দেরাজের 'খোপে'র ভিতর তাঁহার দৃষ্টি পড়িতেই তিনি উভয় জানু ও করতলে ভর দিয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িলেন। তিনি সেখানে ইস্পাত-নির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র দণ্ড (লিভার) দেখিতে পাইলেন; যে কোনও ব্যক্তি লিসেষ্টার স্প্রিংএর চেয়ারে বসিয়া পায়ের অঙ্গুলীর সাহায্যে সেই দণ্ডটি পরিচালিত করিতে পারিত। মিঃ ব্লীড কৌতূহলভরে সেই দণ্ডে ধাক্কা দিতেই অস্ফুট শব্দ-কল্লোল শুনিতে পাইলেন। তখন তিনি জানুর উপর ভর দিয়া নত-মস্তকে গুঁড়ি মারিয়া সেই ডেস্কের নীচে উপস্থিত হইলেন, তাহার পর তিনি মুক্তদ্বার-পথে পরবর্ত্তী কক্ষটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি তাঁহার বাম হস্তের মণিবন্ধে আবদ্ধ ঘড়ির দিকে চাহিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ঠিক তিন মিনিট অতীত হইলে, খট্ করিয়া একটা শব্দ হইল। সেই শব্দটি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই চেয়ারখানি ঘুরিতে আরম্ভ করিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দ্বারের নিকট হইতে একটি অস্ফুট কণ্ঠধ্বনি উত্থিত হইল। মিঃ ব্লীড তৎক্ষণাৎ গুঁড়ি মারিয়া ডেস্কের তলার অন্য প্রান্তে উপস্থিত হইয়া, সহাস্যে মিস্ হ্যালামকে আশ্বস্ত হইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন।

চেয়ারখানি কি কৌশলে ইচ্ছানুযায়ী উন্টাইয়া ফেলিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারা যায়, তাহা তিনি এইরূপে আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি বুঝিলেন, ইস্পাত-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র দণ্ডটিতে যৎসামান্য চাপ দিলেই চেয়ারখানি উন্টাইয়া পড়ে, সেই সঙ্গে চেয়ার-সন্নিহিত মেঝের কিয়দংশ নিম্নে ঝুলিয়া পড়িয়া যে গহ্বর-মুখ উদ্ঘাটিত করে, চেয়ারে উপবিষ্ট হতভাগ্য ব্যক্তি সতর্কতাবলম্বনের বিন্দুমাত্র সুযোগ না পাওয়ায় নিরুপায়ভাবে নিম্নস্থিত গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই গহ্বরে যে ভীষণদর্শন অজগর আবদ্ধ ছিল, তাহারই কবলে পড়িয়া সেই হতভাগ্যকে ইহলোক হইতে অপসৃত হইতে হইত। মিঃ ব্লীড সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন, নরপিশাচ লিসেষ্টার স্প্রিং মিস্ হ্যালামকে সেই চেয়ারে বসাইয়া, ইস্পাতনির্ম্মিত দণ্ডটিতে চাপ দিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়াছিল; তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল, সে মিঃ ব্লীডের সন্ধানে চলিল; সে জানিত, তিন মিনিটের পর চেয়ার উন্টাইয়া পড়িবে, সঙ্গে সঙ্গে মিস্ হ্যালাম্ সেই কক্ষ হইতে অদৃশ্য হইবে, তাহার পর পৃথিবী হইতে তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে!

এই ফাঁদের সাহায্যে কি কৌশলে নির্ব্বিঘ্নে নরহত্যা করা হয়, মিঃ গ্রীড তাহা আবিষ্কার করিতে পারিলেন বটে, কিন্তু এই প্রকার পৈশাচিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কি, কি জটিল রহস্য এই নিষ্ঠুর পাশবিক কার্য্যপদ্ধতির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহাদিগকে নরনারী হত্যায় বাধ্য করিত, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না; বিশেষতঃ, ড্যান কার্থু নর-হত্যার অভিযোগে দায়রা-সোপর্দ্দ হইয়া, কোন কারণে তাহার সলিসিটর লিসেষ্টার স্প্রিংকে ত্যাগ করিয়া অন্য সলিসিটর নিযুক্ত করায়, সেই নবনিযুক্ত সলিসিটরকে, এবং আসামী ড্যান কার্থু তাহার যে হিতৈষিণী মহিলাকে তাহার সলিসিটর পরিবর্ত্তনের ভার অর্পণ করিয়াছিল, তাহাকেও হত্যা করিবার কি প্রয়োজন, তাহাও অনুমান করা মিঃ গ্রীডের অসাধ্য হইল। তাঁহার মনে হইল, দৈবানুগ্রহেই তিনি মৃত্যুকবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া মিস্ হ্যালামেরও প্রাণরক্ষায় সমর্থ হইয়াছেন; নতুবা সেই এক রাত্রিতেই একটি পুরুষ ও একটি মহিলাকে পৃথিবী হইতে অদৃশ্য হইতে হইত। এইভাবে কত লোককে যে অকালে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছে, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

মিঃ গ্রীড এই হত্যা-রহস্যের কারণ নির্ণয় করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু তিনি এই রহস্যের কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। জ্ঞানবিজ্ঞানের নিকেতন, সভ্যতালোক-সমুদ্ভাসিত, জনধনপূর্ণ লণ্ডনের কেন্দ্রস্থলে এই প্রকার সম্ভ্রান্ত পল্লীতে তিনি যে নরকের মৃত্যু-গহ্বর উদ্ঘাটিত দেখিবেন, ইহা যে-কোনও লণ্ডনবাসীর স্বপ্নেরও অতীত বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল। মৃত্যুর এই কৌশলপূর্ণ ফাঁদটি যাহার রচিত—সে মনুষ্য-মূর্ত্তিতে শয়তান, এবং যে রহস্যময় শক্তি ইহা পরিচালিত করিতেছিল, সেই শক্তির মূলে সহানুভূতি, দয়া, করুণা, মনুষ্যত্ব—মানব-হৃদয়ের কোনও সুকোমল বৃত্তির অস্তিত্ব বর্ত্তমান ছিল না। কিন্তু কোন্ লোভে, কোন্ স্বার্থের কুহকে মানুষ এরূপ পিশাচে পরিণত হইতে পারে—যাহার নিকট মনুষ্যজীবন কীট-পতঙ্গের প্রাণ অপেক্ষাও তুচ্ছ? অবজ্ঞার বস্তু? তিনি বুঝিতে পারিলেন, এই বিশাল ধ্বংস-শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়-মান হইয়া, তাহার স্রোত তাঁহাকে প্রতিহত করিতে হইবে। তিনি এই গভীর রাত্রিতে যে শোচনীয় অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন, তাহার তুলনায় তিনি কিরূপ অসহায় ও নিরুপায়, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার হৃদয় আতঙ্ক-বিহ্বল হইল।

কিন্তু এই ঘটনায় মিঃ গ্রীডের হৃদয় দারুণ দুশ্চিন্তায় পূর্ণ হইলেও তাঁহার বাহ্য ভাবান্তর লক্ষিত হইল না বা বিপদের ভীষণতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবেন, এরূপ ভীরুতাও তাঁহার মনে স্থান পাইল না। তিনি সঙ্কল্প করিলেন—এই রহস্য-ভেদ করিবেনই।

মিঃ গ্রীড ডেস্কের তলায় বসিয়া এই সকল কথা চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময় মিস্ হ্যালামের দীর্ঘ দেহ হঠাৎ দ্বারের চৌকাঠের উপর হইতে দ্বারের অন্তরালে অপসারিত হইতে দেখিয়া তাঁহার চিন্তাস্রোত অবরুদ্ধ হইল। পর-মুহূর্ত্তেই সেই দ্বার রুদ্ধ হইল। তাহা লক্ষ্য করিয়া মিঃ গ্রীড ডেস্কের তলা হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া মিস্ হ্যালামকে দ্বারপ্রান্ত হইতে টানিয়া আনিলেন।

মিস্ হ্যালাম্ মৃদুস্বরে বলিলেন, "হঠাৎ আমি একটা শব্দ শুনিলাম! কি শব্দ, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না; তবে আমার মনে হইল, কেহ ঐ দিকের আঙ্গিনার দরজাটা খুলিয়া ফেলিয়াছে।"

সেই কক্ষ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। সেই অন্ধকারে মিস্ হ্যালামের মুখের দিকে চাহিয়া মিঃ গ্রীডের মনে হইল, সেই যুবতীর মুখমণ্ডল যেন ধূসর মুখোসে আচ্ছাদিত হইয়াছে! তিনি নিঃশব্দে মিস্ হ্যালামের নিকট হইতে সরিয়া গিয়া রুদ্ধ দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং দ্বারের চাবীর ছিদ্রের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহাতে কর্ণ স্থাপন করিলেন। তিনি কিছু দূরে একটা ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ শুনিতে পাইলেন; শব্দটা থামিল না, বরং অধিকতর সুস্পষ্ট হইল। তিনি রুদ্ধনিশ্বাসে নৈশ অন্ধকারের দিকে চাহিয়া, কোন্ স্থান হইতে সেই শব্দ আসিতেছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিলেন। তাহার পর অন্ধকারে বাহু প্রসারিত না করিয়া পূর্ব্বোক্ত ডেস্কের নিকট ফিরিয়া আসিলেন।

শব্দটা এবার অধিকতর সুস্পষ্ট, এবং অধিকতর নিকট-বর্ত্তী বলিয়াই তাঁহার মনে হইল। তিনি হঠাৎ হাত বাড়াই-তেই একটি 'র‍্যাকে' তাঁহার হাত ঠেকিল; তাহা সাধারণ কাগজের 'র‍্যাক' বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া হাত টানিয়া লইতেই পুনর্ব্বার সেই শব্দ শুনিতে পাইলেন। এবার তাঁহার মনে হইল, উহা কোনও

দ্বার খুলিবার শব্দ। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই 'র‍্যাকে'র নিকট অগ্রসর হইয়া অন্ধকারেই 'র‍্যাক'টা উঁচু করিয়া ধরিলেন।

কাগজ রাখিবার সেই কাষ্ঠ-নির্ম্মিত 'র‍্যাকে' একটি 'মাইক্রোফোন' যন্ত্র সংস্থাপিত ছিল। বাহিরের আফিসের প্রত্যেক শব্দ তাহাতে ধ্বনিত হইতেছিল। মিঃ ব্লেড তখন কৌতূহলভরে ডেস্কের উপর উঠিয়া বসিয়া, সেই 'র‍্যাক'টি কর্ণমূলে চাপিয়া ধরিলেন।

তিনি বাহিরের আফিসের দ্বার খুলিবার শব্দ শুনিতে পাইলেন। তাহার কাঠের 'পাল্লা' খুলিবার শব্দ হইল। অনন্তর মেঝের উপর দিয়া চলিয়া যাইবার পদশব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। ক্ষণকাল পরে মনুষ্য-কণ্ঠের যে খন্‌-খনে আওয়াজ তিনি শুনিতে পাইলেন, তাহা শুনিয়া তাঁহার দেহের রক্ত যেন জল হইয়া গেল!

তিনি শুনিলেন, "ভূগর্ভে আমাদের যে সরীসৃপ বন্ধুটি বাস করিতেছে, রকমারি খাদ্যদ্রব্যে আজ সে তৃপ্তিলাভ করিবে। প্রথমেই সে হাইকোর্টের একটি মাংসল সলিসিটরকে ভোজন করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়াছে; তাহার পর একটি নারীর কোমল মাংস তাহার অত্যন্ত মুখরোচক হইয়াছে, আর এই নারী যে সে রমণী নহে; সে বহুজন-প্রশংসিতা, বিখ্যাত খ-পোতচালিকা। এখন তুমি দরজার চাবী বন্ধ করিতে পার, প্রিং! আজ রাত্রির মত আমাদের ফাঁদের কায শেষ হইয়াছে; এখন আমাকে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতে হইবে।"

মিঃ ব্লেড তখনও সেই মাইক্রোফোনে কর্ণ সংলগ্ন করিয়া, ছাতার বাঁট খুলিয়া তাঁহার গুপ্তিখানি বাহির করিয়া লইলেন। তিনি সেই মাইক্রোফোনের সাহায্যে যে কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন, তাহা এরূপ সুস্পষ্ট যে, তাঁহার মনে হইল, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই তাহা উচ্চারিত হইয়াছিল। তিনি বক্তার সেই স্বীকারোক্তি শুনিয়াই বুঝিতে পারিলেন—সেই পৈশাচিক ফাঁদ তাহার স্বরচিত, এবং তাহারই নারকীয় উদ্দেশ্য-সাধনে নিয়োজিত। সেই ভীষণ-প্রকৃতি নর-পিশাচ ও তাঁহার ব্যবধানে একটি দ্বারমাত্র অবস্থিত! তাহাকে চূর্ণ করিতে পারিলে সভ্যজগতের মহোপকার সাধিত হইবে, বহু ব্যক্তির জীবনের ভয় বিলুপ্ত হইবে, এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ রহিল না। কিন্তু মিস্ হালামের কথা স্মরণ হওয়ায় তিনি পরবর্ত্তী কক্ষে সেই নর-প্রেতকে আক্রমণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করিলেন। অতঃপর তিনি কি করিবেন—তাহা চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময় সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহাতে চাবী লাগাইবার শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল।

মিঃ ব্লেড বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার সুযোগ নষ্ট হইয়াছে; তিনি রহস্যভেদের যে উৎকৃষ্ট অবসর পাইয়াছিলেন, দ্বিধায় পড়িয়া তাহা তিনি হারাইয়াছেন। উহারা যতক্ষণ সেই স্থান ত্যাগ না করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করা ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন উপায় নাই। তিনি সেই আপিসে আছেন, এ সন্দেহ যদি তাহাদের মনে স্থান পায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে পলায়ন করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে। লিসেষ্টার প্রিংকে ধরিয়া বিচারালয়ে অর্পণ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন না হইতে পারে; কিন্তু যে নরপিশাচ সকল কু-কর্ম্মের নায়ক—পালের গোদা, লিসেষ্টার প্রিং তাহার হাতের পুতুলমাত্র! সেই পালের গোদাটাকে পাকড়াইতে না পারিলে তাঁহার কর্ত্তব্যকর্ম্ম অসম্পন্ন থাকিয়া যাইবে।

'মাইক্রোফোন'-নিঃসারিত কণ্ঠস্বর পুনর্ব্বার তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি আগ্রহভরে শুনিতে লাগিলেন,—পালের গোদা বলিল, "যাহা করিবার, কাল করা যাইবে, প্রিং! কিন্তু ভুল-ভ্রান্তি হইলে চলিবে না, এ কথা যেন স্মরণ থাকে। আজ রাত্রিতে আমি এখানে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, ইহা তোমার সৌভাগ্য বলিয়াই মনে করিবে। আমি না আসিলে তোমাকে হাবুডুবু খাইতে হইত। যদি তুমি সেই লোকটার হাতে তোমার কাযের ভার ছাড়িয়া দিতে, তাহা হইলে ড্যান্‌কে মুঠায় পুরিয়া কার্য্যোদ্ধার করা তোমার পক্ষে—"

হঠাৎ সে নীরব হইল, যেন অসির আস্ফালন মধ্যপথে থামিয়া গেল।

কিন্তু সেই শয়তান মুহূর্ত্ত পরেই আরম্ভ করিল, "কাল তাহা শেষ করাই স্থির; আমার কথা বুঝিলে? উহারা নূতন একদল জুরী খাড়া করিবে। হাঁ, মামলা আবার নূতন করিয়া (de novo) আরম্ভ হইবে। তখন ড্যান্‌কে সাক্ষীর কাঠরায় তুলিয়া, তাহার জবানবন্দী দিতে দেওয়া হইবে। সে কাযটা হয় ত প্রথমেই হইবে। তুমি তাহাকে কোনও কারণে ব্রিক্সটন ত্যাগ করিতে দিবে না।"

মিঃ ব্লেড এইবার সর্ব্বপ্রথম লিসেষ্টার প্রিংএর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। তাহার কণ্ঠস্বর মৃদু-কম্পিত, তাহাতে উত্তেজনার আভাস ছিল।

সে বলিল, "আপনি কি লণ্ডনে থাকিবেন, সর্দ্দার! এখন লণ্ডনে থাকিলেই ভাল হয় না কি?"

তীব্রস্বরে উত্তর হইল, "আমি কোথায় থাকি না থাকি, তাহাতে তোমার কি দরকার? তোমার চেষ্টা বিফল হইলে, সেই ধাক্কা সাম্‌লাইবার জন্ম আমাকে সর্ব্বদাই নিকটে থাকিতে হয়; সেজন্ম তোমার দুশ্চিন্তার কারণ নাই।"

লিসেষ্টার প্রিং নরম স্বরে বলিল, "সাধ্যানুসারে আমি চেষ্টা মাত্র করিতে পারি। কি রকম ঝুঁকি ঘাড়ে লইয়া আমাকে কায করিতে হয়, তাহা আপনি জানেন। তাহারা এক জন সলিসিটরের উপর মক্কেলের কাযের ভার দিয়া রাখে বটে, দেখায় যেন তাহারই উপর নির্ভর করিতেছে; কিন্তু সর্ব্বদাই তাহার কাযের উপর লক্ষ্য রাখে। যদি কোন মুস্কিলের সম্ভাবনা বুঝিতে পারি, তাহা হইলে সে কথা আপনাকে জানাইতে চাই; ইহা কি ঠিক নয়?"

মিঃ ব্লেড অতঃপর মেঝের উপর ধীরে ধীরে পদচালনার শব্দ শুনিতে পাইলেন; যেন একটা বাঘ তাহার খাঁচার ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল! ব্লেড ভাবিলেন, লোকটার চেহারা কিরূপ?

মিঃ ব্লেড পুনর্ব্বার দলপতির কথা শুনিতে পাইলেন। সে বলিল, "তুমি আমাকে ৩৭ নং হ্যাটনে টেলিফোন করিতে পার। যদি কার্য্যোদ্ধার হয়, বলিবে, 'হাঁ', না হইলে বলিবে 'না।' একটির বেশী দু'টি কথা বলিবে না। তবে আমি হইলে কখনই 'না' বলিতাম না, বুঝিয়াছ, প্রিং!"

বাহিরের দ্বার ধীরে ধীরে বন্ধ করিয়া তাহারা উভয়েই প্রস্থান করিল। মাইক্রোফোনের সাহায্যে মিঃ ব্লেড তাহাদের আর কোন সাড়া পাইলেন না।

মিঃ ব্লেড কাগজের 'র‍্যাক্' যথাস্থানে সংস্থাপিত করিয়া ধীরে ধীরে এঞ্জেলা হ্যালামের নিকট ফিরিয়া আসিলেন।

তিনি মিস্ হ্যালাম্‌কে বলিলেন, "আমরা কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিরাপদে বাহিরে যাইতে পারিব, মিস্ হ্যালাম্! বিপদ বোধ হয় কাটিয়া গিয়াছে।"

মিস্ হ্যালাম্ বলিল, "কিন্তু উহারা আমাদিগকে ঘরের ভিতর আবদ্ধ করিয়া দ্বারে চাবী দিয়া গিয়াছে যে! আমি বাহিরে যাইতে চাই। পূর্ব্বে আমার ধারণা ছিল, আমি কখন ভয় পাই না। যে দুই জন লোক আলাপ করিতেছিল—উহারা কাহারা? উহাদের কথা আমি শুনিতে পাই নাই বটে, কিন্তু আমার ধারণা, প্রিং ভিন্ন আরও এক জন লোক সেখানে ছিল।—কে সে?"

মিঃ ব্লেড বলিলেন, "তাহাই আমাকে সন্ধান লইয়া জানিতে হইবে। কিন্তু প্রথমে আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, মিস্ হ্যালাম্! এখানে আপনি কিরূপে আসিলেন?"

মিস্ হ্যালাম্ বলিল, "আজ রাত্রি ন'টার কয়েক মিনিট পরে এক জন লোক আমার বাসায় গিয়া বলিল, আপনি মিঃ প্রিংএর আফিসে আছেন, সেখানে আমাকে যাইতে বলিয়াছেন। সেই কথা শুনিয়া আমি তৎক্ষণাৎ এখানে চলিয়া আসিলাম। এখানে আসিলে প্রিংএর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল। সে বলিল, আপনি মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে কোনও কাযে বাহিরে গিয়াছেন। সে আমাকে বসাইয়া দুই একটি কথার পর বলিল, 'তাই ত, ক্রমেই বিলম্ব হইতেছে, আপনি বসুন; মিঃ ব্লেড কোথায় গিয়াছেন দেখি।'—সে আপনার সন্ধানে যাইবার দুই তিন মিনিটের মধ্যেই আপনি আমার নিকট উপস্থিত হইলেন, তাহার পর—"

কিন্তু মিস্ হ্যালাম্ কথাটা শেষ না করিয়াই মিঃ ব্লেডের হাত ধরিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিল, "এই ভয়ঙ্কর স্থান হইতে আমাকে বাহিরে লইয়া চলুন, মিঃ ব্লেড!"

মিঃ ব্লেড কোন কথা না বলিয়া দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং পকেট হইতে তাঁহার যন্ত্রটি বাহির করিয়া তাহার সূচল অগ্রভাগ সেই দ্বারের তালার ছিদ্রপথে প্রবেশ করাইয়া কয়েকবার ধীরে ধীরে তাহা ঘুরাইলেন। তাহার পর কপাট ঠেলিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। এক মিনিট পরেই তাঁহারা উভয়ে হাম্বলডন কোর্টের বাহিরে আসিলেন। অতঃপর প্রশস্ত রাজপথে প্রবেশ করিতে তাঁহাদের বিলম্ব হইল না।

মিঃ ব্লেড পূর্ব্বে যখন সেই পথ দেখিয়াছিলেন, তখন পথে নৈশ নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল। সেই পথের দূরে দূরে দুই এক জন পথিক মাত্র বিচরণ করিতেছিল। তাঁহারা কিছু দূর অগ্রসর হইয়া, হাম্বলডন হোটেলের আঙ্গিনার দিকে প্রসারিত গলির মোড়ে প্রকাণ্ড জনতা দেখিতে পাইলেন। প্রত্যেকেই তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গলির ভিতর চাহিয়া কি দেখিতেছিল। মিঃ ব্লেড সেই গলির মোড় হইতে কিছু দূরে দাঁড়াইয়া এক জন পথিককে বলিলেন, "এই গভীর রাত্রিতে এখানে এরূপ জনসমাবেশের কারণ কি?"

পথিক বলিল, "সে কথা শুনেন নাই বুঝি? অতি অদ্ভুত ব্যাপার মহাশয়! হোটেল ফ্লোরিজেনে এক ভদ্রলোক খুন হইলে, ড্যান্ কার্থু—একটা পাকা বদমায়েস অভিযুক্ত হইয়া দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছিল। তাহার বিচারের জন্য যে সকল জুরী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা হাম্বলডন হোটেলে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু মামলার বিচার শেষ হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা ঐ হোটেলের কামরা হইতে সকলেই অদৃশ্য হইয়াছেন, এক জনেরও সন্ধান নাই! এক জন পুলিসম্যান সেই কামরার বাহিরে, আর এক জন হোটেলের আঙ্গিনায় পাহারায় ছিল; কিন্তু তাহারাও ফেরার! কেহ কেহ বলিতেছেন, তাঁহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছে। সে কথা সত্য কি না বলা কঠিন; তবে তাঁহারা যে সকলেই ফেরার, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। লণ্ডনের বুকের উপর এই রকম প্রসিদ্ধ হোটেল হইতে পাহারা-ওয়ালা সমেত এক ঝাঁক জুরীকে—"

মিঃ ব্লীড আর সেখানে না দাঁড়াইয়া, মিস্ হ্যালামের হাত ধরিয়া তাঁহার গন্তব্যপথে অগ্রসর হইলেন। চলিতে চলিতে তিনি তাঁহার সঙ্গিনীকে বলিলেন, "মনে করিয়াছিলাম—এখান হইতে সোজা ব্রিক্সটনে যাইব, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম, এখন সেখানে তাড়াতাড়ি না যাওয়াই ভাল, কাল সকালে সেখানে যাইলে একটু অসুবিধার আশঙ্কা আছে; কিন্তু সে ঝুঁকিটুকু ঘাড়ে লইতেই হইবে। এখন আমাকে অন্য কার্য্যে যাইতে হইবে। কি ঘটিয়াছে, তাহা আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন কি, মিস্ হ্যালাম্?"

মিস্ হ্যালাম্ বলিল, "ঐ লোকটা জুরীদের অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে আপনাকে যে কথা বলিল, তাহা শুনিয়াছি; ইহার অধিক আর কিছুই জানি না।"

মিঃ ব্লীড বলিলেন, "কাল দায়রা আদালতে ড্যান্ কার্থুর জবানবন্দী দেওয়ার কথা আছে। আজ শেষ কাছারীতে সে যাহা বলিয়াছিল, তাহা হইতে বুঝিতে পারা গিয়াছিল, যে ব্যক্তি প্রকৃত হত্যাকারী, তাহার নাম সে জানে, এবং সেই নাম সে আদালতে প্রকাশ করিবে। কিন্তু হত্যাকারীর সঙ্কল্প, ড্যান্ কার্থু যাহাতে আদালতে তাহার নাম প্রকাশ করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবেই। তাহার মুখ বন্ধ করিবার জন্য বিচারের কল বিকল করিবার প্রয়োজন হইয়াছে!"

মিঃ ব্লীড যুবতীর বিস্ময়-ব্যাকুল মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এই উদ্দেশ্যে জুরীদের সকলকেই চুরি করিয়া লইয়া গিয়া লুকাইয়া রাখা হইয়াছে, মিস্ হ্যালাম্। তাহার অর্থ, আদালতে এই মামলার বিচার নূতন করিয়া আরম্ভ করিতে হইবে। প্রকৃত অপরাধী এই উপায়ে কিছু সময় পাইবার সুবিধা করিয়া লইয়াছে; এই অবসরে সে ড্যান্ কার্থুর কণ্ঠ চিরনীরব করিবার উপায় অবলম্বন করিবে।"

মিস্ হ্যালাম্ এবার আতঙ্ক-বিহ্বল-মুখে মিঃ ব্লীডের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মিঃ ব্লীড বলিলেন, "লিসেষ্টার স্প্রিংকেই এই কার্য্যটি করিতে হইবে। আপনি স্মরণ রাখিবেন, ড্যান্ কার্থুর নূতন সলিসিটর আমি—যাহাকে লিসেষ্টার স্প্রিংএর পরিবর্ত্তে নিযুক্ত করা হইয়াছে, এবং আপনি—যিনি ড্যান্ কার্থুর জন্য নূতন সলিসিটর সংগ্রহ করিয়াছেন, আমরা উভয়েই নিহত হইয়াছি—ইহাই সেই প্রধান চক্রীর ধারণা হইয়াছে। লিসেষ্টার স্প্রিং আগামী কল্য প্রভাতে ব্রিক্সটনের কারাগারে প্রবেশ করিবে, এবং তাহাকে যে আসামীর সঙ্গে দেখা করিতে দেওয়া হইবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।"

মিস্ হ্যালাম্ তাঁহার হাত ধরিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিল, "না, মিঃ ব্লীড! এই বদ্ লোকটা যাহাতে হতভাগ্য ড্যানের কোন অনিষ্ট করিতে না পারে, আপনাকে তাহার উপায় করিতেই হইবে। সেরূপ কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে নিজেকে আমি কখনও ক্ষমা করিতে পারিব না। আপনি এখনই ড্যানের সঙ্গে দেখা করিতে যান। যাইবেন না?"

মিঃ ব্লীড মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, এখন তাহার সঙ্গে দেখা করা অসম্ভব। যে লোক সকল অনিষ্টের মূল—প্রধান চক্রী, যে আড়ালে থাকিয়া ব'ড়ে টিপিতেছে, তাহাকে যদি ধরাশায়ী করিতে পারি, তাহা হইলেই ড্যান্ কার্থুর প্রকৃত উপকার করা হইবে। কিন্তু এ বিষয়ে আপনিই আমাকে সাহায্য করিতে পারেন। আপনার নিজের একখানি এরোপ্লেন আছে শুনিয়াছি।"

মিস্ হ্যালাম আড়ষ্টস্বরে বলিলেন, "হাঁ আছে। একখান ডি হ্যাভিল্যাণ্ড মথ।"

মিঃ ব্লীড বলিলেন, "আপনি আমাকে সেই এরোপ্লেনে হ্যাটন নামক স্থানে লইয়া চলুন, অবিলম্বে—এই মুহূর্ত্তে।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।



দ্বীপবাসিনী

১। নিউ-জীলান্দ

পলিনেশিয়ার নারীর সঙ্গে প্রতিবেশিনী নিউ-জীলান্দ দ্বীপ-বাসিনীর বেশ-ভূষায় ও আচারে মিল থাকিলেও আকারে বহু পার্থক্য। নিউ-জীলান্দের আদিম অধিবাসী—মাওরি জাতি। মাওরিদের মেয়েদের মাথার কেশ ঘন কুঞ্চিত—অঙ্গ সুদৃঢ় পেশী-বহুল। এ দ্বীপের অধিবাসীদের গৃহও সুদৃঢ়। চাষ-বাসের কাজে মাওরি জাতির বিপুল অধ্যবসায়। তার উপর এ জাতি বীর, সমর-কুশল। সম্ভ্রান্ত সমাজে বংশ-গৌরব আছে খুব; এবং চরিত্র-গৌরবে সম্ভ্রান্ত মাওরি সমাজ কোনো সুসভ্য জাতির নর-নারীর চেয়ে নিরেস নয়।



নিউজীলান্দে নারী-নৃত্য

মাওরি-সমাজে নারীর মর্য্যাদা আছে, মান আছে। গৃহ-সংসারের সকল কাজে নারী সর্ব্বময়ী কর্ত্রী! এমন কি, যুদ্ধাদি ব্যাপারেও মাওরি-নারী মাওরি-পুরুষের সঙ্গিনী সহকর্ম্মিণী। যুদ্ধ-বিগ্রহ উপস্থিত হইলে মেয়েদের মতামত সাদরে গ্রহণ করা হয়।

সংসারে মাওরি-নারী স্নেহময়ী প্রীতিময়ী—তবে রাগিলে রক্ষা নাই। স্বামীর উপর রাগ করিয়া নিজের হাতে সন্তান হত্যা করিতে মাওরি-নারীর প্রাণে বাধা বাজে না!

বাল্যকালে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে খেলাধুলা করে। সম্ভ্রান্ত পরিবারে মেয়েদের অঙ্গে নক্সা কাটার রেওয়াজ আছে। এই নক্সা কাটার ব্যাপারে রীতিমত উৎসব হয়—আমাদের দেশে অন্নপ্রাশন ও উপনয়নে যেমন, তেমনি। নক্সা-কাটায় যাতনা যা চলে, বিলক্ষণ! অস্থি দিয়া গা চিরিয়া সেই ক্ষতে নানা রকমের চূর্ণ ও প্রলেপ লাগানো হয়। এ-নক্সা শুধু হাতে-পায়ে বুকে-পিঠেই আঁকা হয় না; চিবুকে এবং নিম্ন ওষ্ঠেও নক্সা কাটা হয়! কর্ণ-ভেদ-প্রথা এ সমাজে প্রচলিত আছে।

মাওরি-নারীর অঙ্গাবরণ—চ্যাটাই। সে চ্যাটাই তারা

কোমরে জড়ায়; আর-এক অংশ গলায় আঁটিয়া জামার মত অঙ্গে ঝুলাইয়া দেয়। আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মাওরি ছেলেমেয়েরা নগ্ন দেহে থাকে—এ বয়সে আবরণের কোন বালাই নাই।

মাওরিদের মধ্যে পার্ব্বণ-উৎসবাদিতে নৃত্য ও অভিনয়ের ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে সেই সনাতন যুগ হইতে।



ফিজি দ্বীপ—জেলের মেয়ে

অভিনয়ে নর-নারী দু' দলই যোগ দেয়। নৃত্যে পালা-অভিনয় চলে। অভিনয়ে গৃহ-জীবনের নানা দশা ব্যঞ্জিত হয়। যেমন ধরুন, স্বামী চলিয়াছে ডিঙ্গিতে চড়িয়া বিদেশে; ঢেউয়ের দোলায় ডিঙ্গি দুলিতেছে—তীরে বন-জঙ্গল; নায়ক বিরহ বেদনা ভোগ করিতেছে; ও-দিকে গৃহে নায়িকার বিরহ-বেদনা! নাচে বিবিধ ভঙ্গীতে এই সব ভাব জাগাইয়া তোলা হয়। নাচের সঙ্গে গান চলে; গানের মাঝে মাঝে কথা-চ্ছলে যাত্রী নায়ক বা গৃহবাসিনী নায়িকার দশার আভাস দেওয়া হয়।

এককালে মাওরিরা নর-মাংস ভোজন করিত। পশু-পক্ষীর মাংস এ দ্বীপে ছিল দুর্লভ। কাজেই মাংস ভোজনে সাধ হইলে নর-মাংসের ব্যবস্থা! নর-মাংস ভোজনের দ্বিতীয় কারণ—মাওরি জাতির ধারণা শত্রুকে ভোজন



ফিজি-কুমারী—বেশ-বন্ধনে বৈচিত্র্য

করিতে পারিলে তার শত্রুতার চূড়ান্ত শাস্তি দেওয়া হইবে! তবে মেয়েরা কখনো নর-মাংস ভোজন করিত না; নরমাংস-ভোজনে নারীর নিষেধ আছে। শুধু সর্দ্দারণী নারীর সম্বন্ধে এ নিষেধ খাটে না। নর-মাংস-ভোজনে সর্দ্দারণী নারীর গৌরব বাড়ে।

যুদ্ধ-বিগ্রহ-কালে মাওরি নারী পুরুষের সঙ্গিনী, সহকর্ম্মিণী হইলেও নারী কখনো যুদ্ধ করে না; পুরুষের সঙ্গে রণক্ষেত্রে যায় রসদ বহিয়া; এবং গৃহ-দুর্গাদিতে শত্রুরা পাছে অগ্নি সংযোগ করে, সে আপদ হইতে

মেয়েরা গৃহ-দুর্গাদি রক্ষা করে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুদ্ধ-বিগ্রহ উপস্থিত হইলে সম্ভব-পক্ষে নারীদের কোনো নিরাপদ স্থানে রাখিয়া পুরুষের দল যুদ্ধে যায়। যুদ্ধে কোনো নারীর আত্মীয় মারা গেলে শত্রু-বন্দীদের মধ্য হইতে যে কোনো ব্যক্তিকে সেই নারীর সম্মুখে



নকালাকা নাচ—বাহুর হিন্দোলা

আনা হয়; এবং বন্দীদের সম্বন্ধে নারী ইচ্ছানুরূপ শাস্তির ব্যবস্থা করে।

মাওরি জাতির বিবাহে পুরোহিতের সম্পর্ক নাই; বিবাহ-রীতি অনেকটা একালের civil বিবাহের অনুরূপ। বিবাহের পূর্ব্বে যথেচ্ছ প্রণয়-চর্চ্চায় কিশোরী কুমারীর অধিকার আছে; কুমারী-কালে যৌবন-মধু-বিতরণে কোনো দোষ নাই; এবং তাহাতে নিন্দা রটে না। তবে বিবাহ হইলে একমাত্র স্বামীকেই ভজনা করিতে হয়! তখন পতি হয় পরম গুরু—দেহ-মনের একমাত্র মালিক।

সর্দার সমাজে পুরুষ বহুবিবাহ করে। যার বহু ক্ষেত-খামার আছে, সে বিবাহ করে অগণ্য—অর্থাৎ স্ত্রীগুলার খোরাক ঠিকমত জোগাইতে পারিলে বহু-বিবাহে বাধা নাই।

মাওরি পরিবারে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী থাকে; বংশানুক্রমে তারা গৃহস্বামীর সম্পত্তি। দাসের সহিত কুমারী-কালে গৃহস্বামীর কন্যা বা ভগ্নী প্রণয়াভিসারে মত্ত হইতে পারে; কিন্তু দাসকে বিবাহ করিলে লজ্জা-অপমানের সীমা থাকে না।

স্বজাতির মধ্যেই বিবাহ-সীমা আবদ্ধ। এক জাতি অন্য জাতিতে বিবাহ করিতে চাহিলে পঞ্চায়েৎ বসে; উভয় জাতির প্রতিনিধি মিলিয়া পঞ্চায়েৎ বসায়। উভয় জাতির অভিমত মিলিলে তবেই বিভিন্ন জাতির নর-নারীর বিবাহ সম্ভব; নচেৎ সে বিবাহকে বিবাহ বলিয়া গণ্য করা

হয় না। কন্যার বিবাহে কন্যার ভ্রাতার মত সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিতে হয়, পিতা-মাতা বর্ত্তমান থাকিলেও। বিবাহের পূর্ব্বে পাত্রকে আনিয়া কন্যার সঙ্গে বাস করিতে দেওয়া হয়; সে সময় পাত্র যদি গর-হাজির হয়, তবে বিবাহ-সম্বন্ধ নাকচ হইয়া যায় এবং কন্যাকে অপর পাত্রে অর্পণ করিতে তখন আর বাধা থাকে না।

মাওরিদের মধ্যে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও তাহার সংখ্যা অল্প; যৌবন-বিবাহই বেশী।

নিষ্ঠা-সম্বন্ধে মাওরি-নারীর দাম্পত্য-জীবন কালিমাহীন, এ-কথা অসঙ্কোচে বলা চলে।

২। মেলানেশিয়া

নিউ গিনি, ফিজি, আডমিরালটি, বিশমার্ক, সলোমন্, শান্তা ক্রুজ, ব্যাঙ্কস ও টরেস, নিউ ক্যালেডোনিয়া ও লয়ালটি —এই কয়টি দ্বীপ মেলানেশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। (আষাঢ়-সংখ্যা মাসিক বসুমতী ৪৩৭ পৃষ্ঠায় মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। এই বিভিন্ন দ্বীপের নর-নারীর মধ্যে আচার-রীতিতে বহু সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান বলিয়া ইহাদিগকে এক গ্রুপের অধিবাসী বলিয়া অনেকে মনে করেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহারা 'সগোত্র' নয়।

মেলানেশিয়ার অন্তর্ভুক্ত দ্বীপগুলিতে নর-নারীর মাথার গড়ন ভিন্ন ধরণের। সাগরের বুকে পাশাপাশি বাস, তবু গঠনের এ পার্থক্য সত্যই ভারী বিস্ময়ের বিষয়! এ অঞ্চলের নর-নারীর মাথা সরু ও লম্বা প্যাটার্ণের; নাক লম্বা, থ্যাবড়ানো গোছ, ডগা উপর-দিকে উল্টানো; গায়ের বর্ণ বিচিত্র—গোলাপী বর্ণ আছে, আবার লোহার মত বর্ণও আছে। মাথার কেশ কালো—আঁট-সাঁট, পশমের মত কোঁকড়ানো। কেশ বেশী দীর্ঘ হয় না, খাটো; অনেকটা কাফ্রীদের মাথার চুলের মত।

পাশাপাশি দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ-কলহ নিত্য লাগিয়া আছে। ইহাদের প্রকৃতি অলস; মনে আশা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই! পুরুষের মন সদা-সন্দিগ্ধ; মেয়েরা লাজুক। বিদেশী কেহ দেশে আসিয়া দেখা দিলে মেয়েরা লজ্জায় ভয়ে ঝোপের আড়ালে গিয়া লুকায়—সামনে আসে না। তবে বিদেশীরা দু'চারদিন থাকিয়া গেলে যদি বোঝে, হাঁ, ইহারা মানুষ, কোনো হাঙ্গামা বাধাইবে না—তখন গোপন অন্তরাল হইতে মেয়েরা বাহিরে আসে; তাদের সঙ্গে দেখা করে, আলাপ করে।

সলোমন দ্বীপটি যেন নারী-রাজ্য। অর্থাৎ বিদেশী কেহ এ দ্বীপে আসিলে শুধু মেয়েদের দেখা পাইবে; পুরুষদের দেখা চট্ করিয়া মিলিবে না। তার কারণ, পুরুষেরা



আডমিরালটি দ্বীপের কিশোরী—কৌপীনে কড়ি-ঝিনুকের বাহার

সারাদিন সমুদ্রে ভেলা ভাসাইয়া মাছ ধরিয়া বেড়ায়—মেয়েরা থাকে ঘরে-বাটে।

মেলানেশিয়ার দু-একটি দ্বীপে বসনের রেওয়াজ আদৌ নাই। সেখানকার মেয়েরা অঙ্গে চিত্র-বিচিত্র নক্সা কাটে। এ চিত্র-বিচিত্র করায় রকম-ফের আছে।

১। গা চিরিয়া খুঁড়িয়া সেই কাটা ঘায়ে রঙীন উজ্জ্বল রঙ ঢালিয়া দেওয়া হয়;

২। অঙ্গে ছ্যাঁকা দিয়া ফোস্কা তুলিয়া সজ্জা হয়;

৩। গাছ-গাছড়ার রস বা আঠা গায়ে লাগাইয়া দগদগে ক্ষত করে।

ফিজি দ্বীপে হেভিশ জাতির ঘরে যে-সব মেয়ে গায়ে নক্সা কাটে না, নক্সা-কাটা মেয়ের দল তাদের তাড়া করিয়া মারিয়া ফেলিতে দ্বিধা করে না; মারিয়া দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে তাদের উৎসর্গ করে।

যে-সব নর-নারী কাপড়-চোপড় পরে না, তারা কড়ি, নুড়ি প্রভৃতির ভূষণ রচনা করিয়া সেগুলা দিয়া যথাসম্ভব নগ্ন তনু আবৃত রাখে। নাক-কাণ ফুঁড়িয়া গহনা পরার রেওয়াজ যা আছে, তা একেবারে ভীষণ রকমের। অনেক



ফিজি-কুমারীর অলক —বিবাহ হইলে এ অলক কাটা যায়

সময় শিশুদের নাক-কাণ ফুঁড়িয়া দেওয়া হয় সূতিকা-গৃহে; ফুঁড়িয়া সেই রন্ধ্রে তৃণ বা মাছের কাঁটা গুঁজিয়া রাখা হয়। মেয়েদের নাক-কাণ না ফুঁড়িয়া পথে বাহির করিলে ভূতে পাইবে, ইহাই কিন্তু তাদের বিশ্বাস।

নিউ ক্যালেডোনিয়ায় এক পৈশাচিক প্রথা আছে! শৈশবে ছেলেমেয়েদের কচি মাথা আঙুলে টিপিয়া টিপিয়া সঙ্কুচিত করা হয়; তারপর মাথায় কষিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া রাখে। এ ব্যাণ্ডেজ বারো-তেরো বৎসর বয়স পর্য্যন্ত খুলিবার নিয়ম নাই! এ জন্য অনেক ছেলেমেয়ে মাথার রোগে মারা যায়! যে মেয়ের মাথা যত ছোট, তার সৌন্দর্য্যের তত সুখ্যাতি! যে মেয়ের মাথা ছোট নয়, বড় ঘরে সে মেয়ের বিবাহ হয় না।

বিশমার্ক ও সলোমন দ্বীপপুঞ্জে পশ্চিমাঞ্চলে নারীর বসনের কোন বালাই নাই। সৌন্দর্য্যের নগ্ন আবরণই এখানকার রীতি। তবে পত্র-পল্লবে বা দড়ি-দড়া দিয়া তাহাতে ঝিনুক প্রভৃতি বাঁধিয়া ভূষণ রচিয়া মেয়েরা লজ্জা ঢাকে; কাজেই উদ্দাম নগ্নতার বীভৎসতায় বিরাম ঘটে। নিউ ক্যালেডোনিয়ার মেয়েরা কোমরে ঘুনশী বাঁধে; সেই ঘুনশীর দড়িতে খুব ছোট ন্যাকড়া বাঁধিয়া কোনোমতে কৌপীন আঁটে। এরোমাভ ও সিতেন্দি দ্বীপে—কোমর হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত পেটিকোটের ধরণে পত্র-পল্লবের ঘাগরা আঁটার রীতি দেখা যায়। বহু ক্ষেত্রে মাদুর বা চ্যাটাই দিয়া অঙ্গাবরণের কাজ সারা হয়।

গৃহস্থ-সংসারে মেয়েদের আদর কম। এজন্য যে-পরিবারে বেশী মেয়ে জন্মায়, আমাদের মত 'আন্নাকালী' বা 'ক্ষান্ত' নামের মোহে দেবতা ভুলাইবার প্রয়াস না পাইয়া সেখানকার মা-বাপ মেয়েগুলার গলা টিপিয়া কিম্বা সমুদ্র-জলে চুবাইয়া তাদের মারিয়া ফেলে।

শান্তা ক্রুজ দ্বীপটি ছোট। এখানে কোনো পরিবারে দুটির বেশী তিনটি ছেলে জন্মিলে গলা টিপিয়া সে-ছেলেকে মারিয়া ফেলা হয়।

ছোট দ্বীপে লোক বাড়িতে দেওয়া উচিত হইবে না—এই উদ্দেশ্যেই মারিয়া ফেলে। মেয়ে মারিবার রীতি নাই। এজন্য এ দ্বীপে মেয়ের সংখ্যা পুরুষের চেয়ে তিন গুণ বেশী।

ব্যাঙ্কস্ দ্বীপেও এই ব্যবস্থা। এ দ্বীপে মেয়েদের লইয়াই উত্তরাধিকারের বিধি। সম্পত্তির মালিক নারী; এবং এ সম্পত্তি কন্যা-দৌহিত্রীক্রমে উত্তর পুরুষে বর্ত্তাইয়া থাকে। এজন্য মেয়ের আদর এ দ্বীপে খুব বেশী। বারো-তেরো বৎসর বয়সে মেয়েদের বিবাহ হয়। বিবাহের পূর্ব্বে মেয়েদের অঙ্গে নক্সা কাটা চাই। যে মেয়ের অঙ্গে নক্সা নাই, সে মেয়ের বিবাহ হয় না।

নিউ হিব্রাইডিস দ্বীপে বিবাহের বয়স হইলে মেয়েদের সামনের দুটা দাঁত নোড়া দিয়া ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। এ বিধি

না মানিলে মেয়েদের বিবাহ হয় না। অতএব দাঁত ভাঙ্গা চাই-ই। বিবাহে কন্যা কিনিতে হয়—মূল্য দশ-বিশটা শূকর-ছানা। রূপ বা মাধুর্য্যের চেয়ে গতর বুঝিয়া মেয়েদের মূল্য নির্ণীত হয়। তবে উত্তর-পশ্চিম কোণে ভেউ নামক অঞ্চলে মানুষের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান আছে। যদি সেখানে রূপসী কন্যার মূল্য হয় দশটা শূকর ছানা, তাহা হইলে কুরূপার মূল্য হইবে দুটা ছানা। মালোকুল দ্বীপে শূকর বেশী নাই; সেখানে একটা দুটা শূকরের বিনিময়ে রূপসী



মিগিয়েলের সেরা সুন্দরী

বধূ কিনিতে পাওয়া যায়। টানা দ্বীপে শূকরের সংখ্যা অনেক; তথাপি সে দেশে একটা শূকরের বিনিময়ে 'ভালো' বধূ কিনিতে পারা যায়!

লয়ালটি দ্বীপের লোকজন পরিশ্রমী। তারা নৌকা-জাহাজ তৈয়ার করিতে পটু। লয়ালটি দ্বীপে কাঠ অপ্রচুর —তারা কাঠ আনে নিউ ক্যালেডোনিয়া হইতে। নিউ ক্যালেডোনিয়ায় লয়ালটি দ্বীপের মেয়েদের ভারী আদর। তারা রূপসী। এজন্য লয়ালটি দ্বীপের মেয়ের বাপেরা নিউ ক্যালেডোনিয়ায় যায় কন্যা লইয়া এবং এক-নৌকা কাঠের বিনিময়ে পাত্রের হাতে কন্যা দান করিয়া আসে। মেয়ের দর সম্বন্ধে এমন বাঁধাবাঁধি ব্যবস্থা আছে বলিয়া গৃহস্থ গরীবেরা একটির বেশী দুটি বিবাহ করিতে পারে না। যারা ধনী, তারা অবশ্য যতগুলা খুশী পাত্রী গ্রহণ করিতে পারে। বহু-পত্নীত্বে ঐশ্বর্য্যের পরিচয়।

নিউ হিব্রাইডিস্ দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত আওবা অঞ্চলে এক মজার বিধি আছে। গৃহে রূপসী তরুণী স্ত্রী থাকিলে দেখিয়া-শুনিয়া অনেকে মধ্যবয়সী কোনো বিধবা নারীকে দ্বিতীয় পত্নীত্বে বরণ করিয়া ঘরে আনে। এই মধ্যবয়সী স্ত্রীর কাজ, তরুণী সুওরাণীকে দেখাশুনা করিবে। বিবাহিত পুরুষের মৃত্যু ঘটিলে তার বিধবা স্ত্রী সে-পরিবারের সম্পত্তির সামিল বলিয়া ভ্রাতা বা ভ্রাতুষ্পুত্র ওয়ারিশনদের

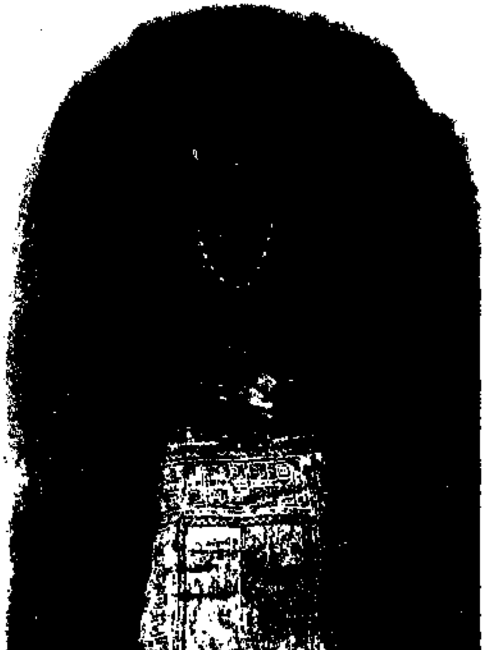


মিগিয়েল-তরুণীর পাতার ঘাগরা

হাতে আসিয়া বর্ত্তায়। কাজেই কোনো কোনো সংসারে দেখা যায়, তরুণ গৃহস্বামী চন্দ্রের মত বিরাজমান, আর তাকে ঘিরিয়া নক্ষত্ররাজির মত দাদা, কাকা, মামা, জ্যাঠার বিধবারা বিরাজ করিতেছে!—অর্থাৎ সে একেবারে এক-গোয়াল বিধবা স্ত্রীর স্বামী হইয়া দাঁড়ায়! তবে ইহারা শুধু নামেই স্ত্রী—আসল স্ত্রী থাকে দুটি তিনটি মাত্র। বয়সে এই আসল স্ত্রীরা স্বামীর চেয়ে ছোট—সন্ধান করিয়া ইহাদের পত্নীত্বে বরণ করিতে হইয়াছে; "দায়ে পড়িয়া দারগ্রহের" ফলে গৃহিণী হয় নাই!

অনেকের ধারণা, মেলানেশিয়ার নর-নারী বর্ব্বর—তাই সেখানে দুর্নীতির প্রসারও বুঝি অবাধ! কিন্তু এ

ধারণা ভ্রান্ত। এ দ্বীপে সতীত্ব নারীর পরম নিধি বলিয়া গণ্য হয়। বিবাহের পূর্ব্বে বিপুল যত্নে মেয়েদের দেহের শুচিতা রক্ষা করা হয়। কুমারী-গমনে দুর্বৃত্ত পুরুষকে ইহারা প্রাণে মারিয়া ফেলে। যে মেয়ে পুরুষের দলে মিশিয়া খেলাধূলা করিয়া বেড়ায়, তার বিবাহে বিষম গোল বাধে। তবে



মার্শালস দ্বীপের বনেদী-ঘরের মেয়ে—চ্যাটাই-বসনে নক্সার কারিগরি

সলোমন দ্বীপে যে-কন্যা কৌমার দশায় বহুজনকে দেহ-দানে তৃপ্ত করিয়া বেড়ায়, সে কন্যার চিত্ত-রঞ্জনী বিদ্যার সুখ্যাতিতে দেশ ভরিয়া যায়; তার বিবাহে গণ্যমান্য পাত্র আসিয়া দেখা দেয়। তবে এ কৃপা-বিতরণের অধিকার শুধু কৌমার্য্যেই—বিবাহের পর স্বামীকে ছাড়িয়া দ্বিতীয় পুরুষে লোভ করিলে ভীষণ শাস্তির ব্যবস্থা হয়।

নিউ বৃটেনেও ঠিক এমনি ব্যবস্থা। অসতী নারীকে সে দেশে বর্শায় বিঁধিয়া মারিয়া ফেলা হয়। আর যে-পুরুষ নারীর উপর অত্যাচার করে, মহল্লার লোক মিলিয়া তার গলায় মোচড় দিয়া কসিয়া তাকে গাছে বাঁধিয়া রাখে; সেই বাঁধনেই দেহ-পিঞ্জরে তার প্রাণ-পাখী হাঁফাইয়া মরে।

মেলানেশিয়ার ব্যবস্থা, 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'। স্বামী মরিল তো সে-বেচারী হইল ভাশুর-দ্যাওরের সম্পত্তি! তাহাকে লইয়া তারা যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে! ঘরে রাখিতে পারে, বিলাইয়া দিতে পারে—বিধবার তাহাতে কোনো আপত্তি চলে না। এ বিলানোর অর্থ দাস্য নয়—পত্নীত্ব-স্বীকার। কাজেই বৈধব্য ঘটিলে নারীকে সে-মুল্লুকে বৈধব্য পালন করিতে হয় না।

নিউ হিব্রাইডিসে বিধবাকে গোঁচাইয়া মারা হয়; বিধবা অলক্ষণা—তাই। স্বামীর সঙ্গে বাঁধিয়া 'এক কবরে' মাটী চাপা দেওয়ার বিধিও কয়েকটি দ্বীপে প্রচলিত আছে। বৈধব্য ঘটিলে ইচ্ছা থাকিলেও বাঁচিবার উপায় নাই। বিধবা যদি বাঁচিতে চায় তো লোকালয়ে তার নিন্দার আর সীমা থাকে না! সকলে বলে, স্বভাব নিশ্চয় খারাপ! এ কথা সহিয়া বাঁচিয়া থাকা—হোক বর্ব্বর, এ কলঙ্কে মেলানেশিয়ান্ বিধবা নারীর বড় ভয়!

কয়টি দ্বীপের মধ্যে ফিজি দ্বীপের অবস্থা একটু ভালো। ফিজির জল-বাতাস ভালো, স্বাস্থ্য ভালো,—ভূমি উর্ব্বর। এক কথায় ফিজি-দ্বীপ সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা। অধিবাসীরা দো-আঁশলা; মেলানেশিয়ান ও পলিনেশিয়ানের "মিকশ্চার"! দুই শত বৎসর পূর্ব্বে টোঙ্গা ও শামোয়া হইতে বহু নর-নারী আসিয়া এই দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপনা করে; ফিজির নর-নারীর সঙ্গে তাহাদের বিবাহাদি চলে। তাহার ফলে এই নব ফিজিয়ান জাতির উদ্ভব।

ফিজিতে নারীকে পুরুষ সম্মানের চোখে দেখে। পুরুষ ও নারী উভয়ের সামাজিক অবস্থান সমান। নাচ-গান আমোদ-আহ্লাদে ফিজিয়ানদের প্রগাঢ় রুচি। নাচে ফিজির কলা-জ্ঞানের পরিচয় পাই। বিশেষ করিয়া ফিজিয়ানদের 'লকালাকা' নাচ! সে নাচ নাকি অপূর্ব্ব!

ফিজি-নারীর নৃত্যানুরাগ প্রবল হইলেও তারা অলস নয়। ছেলে-মেয়ে মানুষ করা এবং গৃহ-সংসারকে সুশৃঙ্খল রাখা—সে দিকে তাদের এতটুকু শৈথিল্য নাই।

৩। মাইক্রনেশিয়া

এ দ্বীপে আছে কেরোলিন, মার্শাল, গিলবার্ট, কিংসমিল, এলিশ প্রভৃতি দ্বীপ।

মাইক্রনেশিয়ানের সহিত পলিনেশিয়ানদের বহু সাদৃশ্য আছে। প্রভেদ শুধু এই,—মাইক্রনেশিয়ানদের মাথার কেশ ঘন, কুঞ্চিত, কালো; মাথা দীর্ঘ। মেয়েদের গড়ন খাটো (small in form) কিন্তু তারা রূপসী। চোখ ভাবময়, কোমল, লালিত্য-পূর্ণ। অঙ্গ সুচারু ছাঁদে গঠিত—হাতগুলি ছোট, পায়ের গড়ন নিটোল, সুডৌল। দাঁত কুন্দ-কলির মত—শুভ্র, পরিপাটী; প্রকৃতি লজ্জাশীল। মুখে-চোখে প্রদীপ্ত সরম-রাগ; চরণের গতি সলীল ছন্দোময়। দুনিয়ার



"ঢেকে দিবে সব লাজ সুনীল জলে"

রূপসীদের পাশে দাঁড় করাইলে মাইক্রনেশিয়ান নারীর মাথা লজ্জায় হেঁট হইবে না, এ কথা বহু য়ুরোপীয় পর্য্যটক উচ্ছ্বসিত ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন।

মাইক্রনেশিয়ান্ নারী মাথার দীর্ঘ কেশ বিলম্বিত রাখে—কখনো পরিপাটী ছাঁদে খোপা বাঁধে। সে কেশ-প্রসাধনে বহু ফ্যাশন দেখা যায়। মাইক্রনেশিয়ার 'মিগিয়েল' অঞ্চলের একটি কিশোরীকে দেখিয়া ডক্টর কার্ণেশ নামক একজন ইংরেজ পর্য্যটক লিখিয়াছেন—**She is nice, modest, gentle girl and famous for her singing.**

এ দ্বীপে নারীর বেশে প্রচুর বৈচিত্র্য। পিলু দ্বীপের উত্তরাঞ্চলে নারীর সাজ প্রায়-বিবসনা। গিলবার্ট দ্বীপে নারিকেল-পাতার সূক্ষ্ম ঝালর দিয়া পেটিকোটের ধরণে ঘাগরা রচিয়া কোমরে তারা বিলগ্ন রাখে। কেরোলাইন দ্বীপে কদলীপত্র নারীর লজ্জাবস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। পত্রে ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্র-মুখে কড়ি ঝিনুক দুলাইয়া দেয়—তাহাতে বসনে বেশ বাহার খোলে।

মার্শালস্ দ্বীপে বন্ধলের চ্যাটাই বসনের কাজ করে;



মাউর দ্বীপ—মা ও ছেলে

এ বসন কোমর হইতে পদতল পর্য্যন্ত বিলম্বিত থাকে। এ চ্যাটাই বোনায় নক্সার খুব কারিগরি দেখা যায়। এ বসন দেখিতে অনেকটা আমাদের দেশের শীতল-পাটির মত।

অঙ্গে নক্সা কাটার রেওয়াজ এ দ্বীপেও আছে। নক্সার উপরেই সামাজিক মর্য্যাদা নির্ভর করে। এ নক্সা শুধু হাতে বুকে পিঠে কাটা হয় না—গালেও নক্সা কাটিতে হয়।

এই নক্সা কাটা উপলক্ষে রীতিমত উৎসবের আয়োজন হয়।

কেরোলাইন দ্বীপের হুকেরি প্রদেশে এই নক্সা-উৎসবের তিন মাস পূর্ব্ব হইতে কিশোরী কুমারীকে গৃহের বাহিরে একটি স্বতন্ত্র ঘরে রাখা হয়। সে ঘরের নাম 'পুণ্য-কক্ষ'। এই "পুণ্য-কক্ষে" আলাদা বাস ও মন্ত্রাদি পড়িয়া নিত্য তাকে সমুদ্রে স্নান করিতে হয়; তার পর মহা ধুমধামে নৃত্যগীত-বাদ্যসহ একদা নক্সা-উৎসব সম্পন্ন হয়।

নাক-কাণ ফোঁড়ার রেওয়াজ অন্য দ্বীপের মত এ দ্বীপেও



শলোমন দ্বীপ-বিলাসিনী

আছে। কাণে মাকড়ি নয়—রীতিমত মোটা জাহাজ-বাঁধা শিকল ঝুলানো (বৈশাখের মাসিক বসুমতীতে এ-মাকড়ির ছবি দেখিবেন) হয়।

এ দ্বীপে বিবাহ-প্রথা বড় কৌতুককর; এবং দেশভেদে বিবাহ-বিধিতে পার্থক্য আছে।

গিলবার্ট দ্বীপে কন্যাকে বসাইয়া দেওয়া হয় বাড়ীর নীচের তলার একটি ঘরে; উপর-তলায় বসে এক দল পাণিপ্রার্থী যুবা। উপর তলার মেঝে ফুঁড়িয়া সেই রন্ধ্রপথ দিয়া পাত্রের দল নীচের তলার ঘরে নারিকেল-পাতা ঝুলাইয়া দেয়। কন্যা সেই পাতা টানিয়া প্রশ্ন করে—কার পাতা? যে যুবার পাতা, সে নিজের নাম বলে; পাত্রী যদি তাকে পছন্দ না করে, তবে পাতা ছাড়িয়া দেয়। ছাড়িয়া দিলে অন্য যুবা পাতা ঝুলায়। যাহার নাম শুনিয়া পাত্রী পাতা ছাড়িয়া দেয় না, সেই পাত্র তার মনোনীত বুঝিতে হইবে। সেই পাত্রের সঙ্গে হয় কন্যার বিবাহ।



মাউর-যুবতী

মাইক্রনেশিয়ায় বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা প্রচলিত আছে সে প্রথায় কোনো সমারোহ নাই, আইন-কানুনও নাই। বধূ যদি পতি-গৃহ ত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে আসে, এবং

তিন দিনের মধ্যে পতিগৃহে ফিরিয়া না যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, বিবাহের বাঁধন কাটিল!

মার্শোলস্ দ্বীপে এক তরুণকে পর-পর এগারোটি স্ত্রী ত্যাগ করিয়া যায়। শাশুড়ীর জ্বালা-যাতনার বিষে বহু বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হয়। স্বামীর দৌরাত্ম্য-হেতু বাঁধন কাটার সংখ্যা খুব অল্প।

ইহাদের দাম্পত্য জীবন সাধারণতঃ শান্তিময়। স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা সকল সংসারেই দেখিতে পাওয়া যায়। ধনীরা বহু পত্নী গ্রহণ করে; সেজন্য পত্নীরা একটুও হা-হুতাশ করে না।

এ সম্বন্ধে একটি সত্য কাহিনী বলিলে মাইক্রনেশিয়ান্ নারীর অন্তরের পরিচয় পাইব। জেলিক নামে এক তরুণ মাইক্রনেশিয়ান এক জার্ম্মাণ বণিকের কাছে চাকরি করিত। তার গৃহে ছিল দুটি স্ত্রী। জার্ম্মাণ বণিকের কাছে এক ষোড়শী মাইক্রনেশিয়ান কাজ করিত। জেলিক তাকে কেমন প্রীতির চোখে দেখিয়াছিল। বাজারে তখন নূতন সেলাইয়ের কল দেখা দিয়াছে। একটি কল কিনিয়া জেলিক ষোড়শীর হাতে উপহার দিল; সেই সঙ্গে দিল এক টিন বিলাতী মাছ। ষোড়শী সেলাইয়ের কলটি বাজারে বেচিয়া সেই অর্থে কিনিল চুরুট ও চাকু ছুরি; কিনিয়া সে তাহা প্রত্যুপহার দিল জেলিককে। তার প্রীতি-উপহার বেচিয়া দিয়াছে দেখিয়া জেলিকের রাগ হইল না। ষোড়শী তাকে ভালোবাসিয়া উপহার দিতেছে—এ আনন্দে মশগুল হইয়া সে ষোড়শীকে বলিল—তোমাকে বিবাহ করিব। তুমি আমার প্রেয়সী হইবে। ঘরে যে দুটি স্ত্রী আছে, তাদের দূর করিয়া তাড়াইয়া দিব। চল তুমি আমার ঘরে।

ষোড়শী বলিল—না। তাদের তাড়াইয়া আমাকে ঘরে লইলে আমি যাইব না।

ষোড়শী বলিল, সে জেলিককে ভালোবাসে; সে তাকে বিবাহ করিবে। কিন্তু সপত্নীদের দুর্দ্দশা ঘটাইয়া সে সুখী হইবে না। বিবাহ করিতে চাহিলে সপত্নী দুটিকেও গৃহে রাখিয়া ভালোবাসিতে হইবে।

তাহাই হইল। সপত্নী-সাহচর্য্যে ষোড়শী আসিল জেলিকের গৃহে সংসারে করিতে।

স্বামীর বহু-বিবাহে স্ত্রীর বিরাগ না থাকিবার একটি কারণ, এ দ্বীপের পুরুষ নারীকে ভালোবাসে, সম্মান করে। এদেশে স্ত্রীকে প্রহার করার অর্থ—দারুণ বর্ব্বরতা! স্ত্রীকে কেহ প্রহার করিলে সমাজে তার নিন্দা-অপমানের আর সীমা থাকে না।

আসিলে যদি জাগালে না কেন

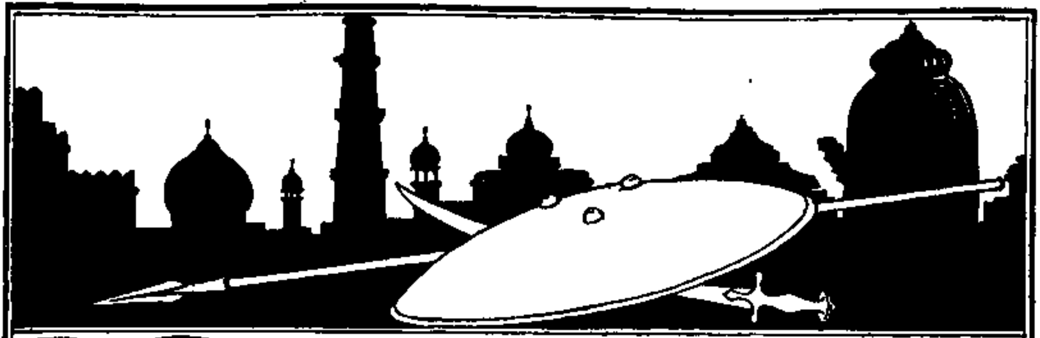
প্রদীপ ছিল জাগিয়া মোর ঘরে
শ্রান্ত দু'টি আঁখির পানে চেয়ে।
ফুটিয়াছিল সুদূর নীলাম্বরে
তারার হাসি যেন বা কারে পেয়ে!

ক্লান্ত পাখা পাপড়ি 'পরে রাখি
ভ্রমর ছিল গোলাপ-বনে জাগি,
বুঝি বা কোনো গোপন ধন মাগি
নিশীথ রাতে প্রিয়ার কাছে তার।
বিরহী কোন্ বাজায়ে বাঁশী দূরে
তুলিতেছিল করুণ হাহাকার!

ব্যর্থ আশা আনিল ঘুম-ঘোর
রজনী-শেষে সিক্ত আঁখিপাতে,
জানি না কিছু তুমি যে এলে প্রিয়,
তাহার মাঝে কখন্ মালা হাতে।

কি নাম ধ'রে ডাকিয়া গেছ চ'লে
কেহ তো তাহা দেয়নি মোরে ব'লে,—
জাগিনু যবে পাখীর কলরোলে
হেরিনু শুধু মালাটি প'ড়ে পাশে।
আসিলে যদি জাগালে না গো কেন
যাবার আগে সুদূর পরবাসে?

শ্রীপ্রতিভা ঘোষ



ইতিহাসের অনুসরণ

পৃথিবীর প্রাচীনতম সাম্রাজ্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৪। ভারত সাম্রাজ্য

ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে ঘটনার ঘনঘটা নাই, জটিলতাও নাই। ওদিকে মিশরী এবং সুমেরিয়ান শক্তি ও সভ্যতা যেমন প্রসারিত হইতেছিল, ভারতে গঙ্গার উপকূল প্রদেশে তেমনি দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা ও কৃষ্টিও অবাধে উৎকর্ষ লাভ করিতেছিল। প্রাচীন সুমেরের বহু মুদ্রা ও শিলা-লিপির মত উত্তর-ভারতেও প্রাচীন মুদ্রা ও শিলা-লিপি প্রভৃতি পাওয়া যাইতেছে। সেগুলি দেখিয়া বুঝা যায়, মিশরী ও সুমেরিয়ান জাতির সভ্যতা যতখানি উন্নত হইয়াছিল, ভারতের বিভিন্ন জাতির সভ্যতা তেমন উৎকর্ষ-লাভে সমর্থ হয় নাই। অতি প্রাচীন যুগের ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির বিশেষ নিদর্শন এ-পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে সেমিটিক জাতি যে কখনো ভারতবর্ষে বিজয়-অভিযান করিয়াছিল, এমন প্রমাণ মিলে না।

হামুরাবির অভ্যুত্থান-কালে আর্য্য-ভাষী একদল যাযাবর জাতি উত্তর-পারস্যে ও আফগানিস্থানে বাস করিতেছিলেন; তাঁহারা ক্রমে ভারতের পশ্চিম প্রদেশে আসিয়া বসতি স্থাপনা করেন। প্রাচীন মীড ও পারসীক জাতির সহিত ইঁহাদের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই যাযাবর জাতিই ক্রমে উত্তর ভারতের অনার্য্য বা কৃষ্ণবর্ণ আদিম অধিবাসীদের পরাভূত ও বিধ্বস্ত এবং ভারতের সমগ্র প্রদেশ অধিকার করেন।

এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কিন্তু কোনোদিন প্রীতি বা ঐক্য স্থাপিত হয় নাই। বিভিন্ন নৃপতিগণের যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী ভিন্ন এ-যুগের ইতিহাসে তাঁহাদের সম্বন্ধে আর কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

বাবিলন-অধিকারের পর হইতে পারস্য-সাম্রাজ্য দিকে দিকে প্রসারিত হইয়া ভারতের প্রান্তে সিন্ধু নদের উপকূল পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছায়। পরে আলেকজান্দার এই পথে মরু পার হইয়া সিন্ধু-নদ-কূলে আসিয়া আপনার বিজয়-পতাকা উড্ডীন করেন। ভারতবর্ষের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র এস্থলে দেওয়া হইল। ভারতে প্রাচীন আর্য্য-সভ্যতার বিপুল কাহিনীর বিশদ বিবরণ স্বতন্ত্র সন্দর্ভে আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব।

৫। চীন সাম্রাজ্য

ভারতবর্ষ, এশিয়া, আফ্রিকা এবং য়ুরোপের সঙ্গম-ভূমে এই গৌরবর্ণ আর্য্যজাতির সভ্যতা ও কৃষ্টি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর তারিমের শুষ্ক উষর বক্ষ বহিয়া কিউয়েন-লন গিরিবর্ত্ম-পথে সে কৃষ্টি ও সভ্যতা গিয়া ইয়াং-শি-কিয়াং নদীর কূল-অভিমুখে অগ্রসর হয়।

প্রাচীন চীনের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সঠিক বিবরণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। চীনের মৃত্তিকা-গর্ভ হইতে প্রাচীন যুগের যে-সব শিলা-নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র ও তৈজস-পত্রাদি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে হোনান ও মাঞ্চুরিয়া প্রদেশের প্রাচীন রীতি-নীতি এবং সভ্যতার কতক পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তর চীনে এখন যে সব চীনা নর-নারীর

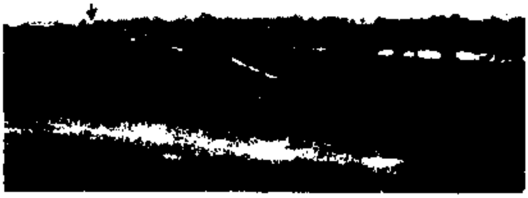
বাস, আদিম চীনা জাতির 'বিশুদ্ধ' বংশধর না হইলেও প্রাচীন যুগের চীনাদের সঙ্গে আচারে-ব্যবহারে তাহাদের বড় বেশী পার্থক্য ছিল না। প্রাচীন চীনারা গ্রামে বাস করিত এবং গৃহে শূকর পালন করিত। অস্ত্রশস্ত্র হিসাবে কুঠার, শিলা-নির্ম্মিত ছুরিকা, শ্লেট-পাথরের তৈয়ারী ফলা ব্যবহার করিত; অস্থি ও প্রস্তরখণ্ড সমূহ লোষ্ট্রবৎ শত্রু-লক্ষ্যে নিক্ষেপ করিত। তন্তু-শিল্পে এবং মাটীর তৈজসাদি রচনায় তাহারা বিশেষ পটু ছিল।



চীনের প্রাচীর (গ্রেট ওয়াল)

তবে এই সকল নিদর্শনকেই একমাত্র প্রমাণ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া ঐতিহাসিকগণ প্রাচীন চীনের সভ্যতার সম্বন্ধে কোনোরূপ অভিমত দিতে প্রস্তুত নন; সে সভ্যতার পরিচয় আমরা পাই প্রাচীন চীনা সাহিত্যে।

চীনা ও মোঙ্গোলীয় সভ্যতা অভিন্ন। আলেকজান্দারের অভিযানের পরে আর্য্য বা সেমিটিক সভ্যতার সংস্পর্শে বহু প্রাচীন জাতি সভ্য ও শিক্ষিত হইয়া ওঠে; কিন্তু বহু গিরি, নদ, নদী মরুভূমির অন্তরালে বহুদূরে অবস্থিত চীন প্রদেশে সে সভ্যতার সংস্পর্শ ঘটে নাই। হোনানের প্রাচীন মৃৎপাত্রাদির গায়ে বিচিত্র নক্সা দেখিয়া এবং প্রাচীন সুমের

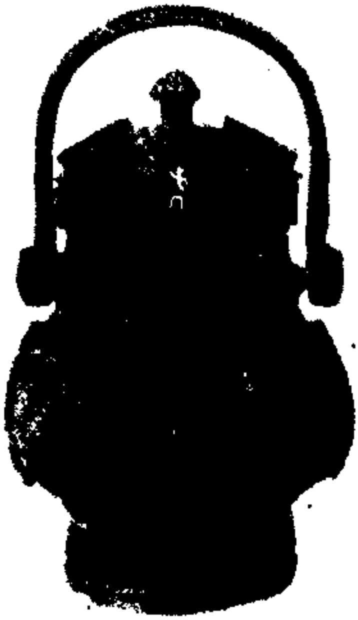


চীন—হুয়ান নদীর তীরে
(এই জায়গা হইতে প্রাচীন স্তূপাদি পাওয়া গিয়াছে)

জাতির সহিত ঘনিষ্ঠতা ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন, প্রাচীন চীনের সভ্যতা ও কৃষ্টি আর্য্য সভ্যতা হইতে উদ্ভূত, কিন্তু এ অনুমানের কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। বহু দুর্গম গিরি-কান্তার-নদী-মরুভূমির অন্তরালে দূরাবস্থিত চীনে প্রাচীন কোনো জাতি কোনো কালে উপনিবেশ স্থাপনার উদ্যোগ করে নাই।

উত্তর চীনের সভ্যতা ও কৃষ্টি—চীনা জাতির সম্পূর্ণ নিজস্ব; অপর জাতির সভ্যতার সহিত তাহার কোনো সম্পর্ক নাই। দক্ষিণ চীনের নর-নারীর সহিত নানা কারণে শ্যাম ও ব্রহ্মবাসী এবং দ্রাবিড়ীয় জাতির মেলামেশা ছিল; সুতরাং দক্ষিণ চীনের সভ্যতাকে মৌলিক বলা চলে না।

খৃষ্ট-জন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে চীনের যে ঐতিহাসিক বিবরণ আমরা পাই, তাহাতে দেখি, উত্তর ও দক্ষিণ চীনের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ আর কলহ চলিয়াছে। দক্ষিণ চীনে সে সময়ে কৃষির প্রচলন ছিল; এবং তাহার বিধি ছিল বেশ সুশৃঙ্খল। মঠ ও মন্দির-নির্ম্মাণে দক্ষিণ-চীনাজাতির শক্তি বেশ বিকাশ লাভ করিয়াছিল।



প্রাচীন চীনের পিতলের সুরা-পাত্র



প্রাচীন চীনের সুরা-পাত্র

যে সব বিদেশীয় জাতি আসিয়া চীনে বাসের আস্তানা পাতে, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে আসে নাগরিক আলৃতিক Rural-Altic জাতি। এ জাতি আসে চীনের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত হইতে। এ জাতির পরে আসে হুন জাতি। হুন জাতির সঙ্গে প্রাচীন চীনা জাতির বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়।



প্রাচীন চীনের ছোরা

খৃঃ পূর্ব্ব ২৭০০ হইতে ২৪০০ অব্দ—এই তিন শত বৎসরে সুশাসন-গুণে পাঁচ জন মাত্র চীনা সম্রাটের নাম ইতিহাসে উল্লিখিত দেখি।

এ সময়ে বিরাট চীন কয়েকটি খণ্ড প্রদেশে বিভক্ত ছিল; সেগুলি বিভিন্ন রাজার শাসনাধীন ছিল। এই রাজাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের অন্ত ছিল না। এই বিভিন্ন খণ্ডরাজ্যগুলি ১৭৫০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে শাংবংশীয় একজন সার্ব্বভৌম সম্রাটের অধিকারভুক্ত হইয়া অভিন্ন সাম্রাজ্যে পরিণত হয় এবং ১১২৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ-কাল পর্য্যন্ত সমগ্র চীনে এই শাং-বংশীয় নৃপতিগণের শাসন অপ্রতিহতভাবে বিদ্যমান থাকে। ১১২৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে চৌ-বংশের অভ্যুত্থানে শাং-বংশের শাসন বিলুপ্ত হয় এবং ২৫০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ-কাল পর্য্যন্ত চৌ-বংশীয় নৃপতিগণ চীন সাম্রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করেন। চৌ-বংশীয় নৃপতিগণের রাজত্ব-কালে শিল্পকলায় প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হয়। সম্প্রতি মৃত্তিকা-গর্ভ হইতে নানা রীতির যে সব পিতলের তৈজসাদি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির অঙ্গে বিচিত্র কারুকার্য্য দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইতে হয়।

শাং-বংশীয় নৃপতিগণের শাসন-কালে সমগ্র চীনা জাতির ভাষা ছিল এক ও অভিন্ন; বহিঃশত্রু ছিল একমাত্র ঐ হুন-জাতি।

শাং-বংশের শেষ রাজা ছিলেন দারুণ নিষ্ঠুর ও বুদ্ধিহীন। চৌ-বংশের রাজা উ-ওয়াংয়ের কাছে ১১২৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তিনি যুদ্ধে পরাজিত হন; পরাজয়ের কলঙ্ক সহিতে না পারিয়া জীবন্ত চিতানলে প্রবেশ করেন। তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের চীনাদের সহায়তায় চৌ-বংশীয় উ-ওয়াং সিংহাসন অধিকার করেন।

চৌ-বংশের শাসন চীনে তেমন শিকড় গাড়িয়া বসিতে পারে নাই। তবে এই বংশের রাজাদের সমগ্র চীনা জাতি 'ধর্ম্ম-গুরু' বলিয়া স্বীকার করে। চীনা শিক্ষা ও সভ্যতা গ্রহণ করিলেও হুন জাতি চীনা জাতির সহিত মিলিয়া এক হয় নাই।

প্রসিদ্ধ চীনা ঐতিহাসিক লিয়াং চি চাও বলেন, খৃঃ-পূর্ব্ব অষ্টম হইতে চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে সার্ব্বভৌমত্ব ঘুচিয়া চীনে আবার পাঁচ হাজার খণ্ড রাজ্যের সৃষ্টি হয়। এই সকল খণ্ড রাজ্যের চৌহদ্দি ছিল—একদিকে হোয়াংহো, অপরদিকে ইয়াংশীকিয়াং নদী। খণ্ডরাজ্যের সংখ্যা পাঁচ-ছ হাজার হইলেও দশ বারোজন মাত্র বিভিন্ন নৃপতি এগুলির অধীশ্বর ছিলেন। রাজায় রাজায় যুদ্ধ-বিগ্রহ নিত্য লাগিয়া থাকিত; দেশে শান্তি ছিল না। চীনা ইতিহাসে এ যুগকে Age of Confusion বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

খৃঃ পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনে শি ও শিন্ নামে দুই রাজ্যে বিরোধ-দ্বন্দ্ব একেবারে সাংঘাতিক হইয়া ওঠে; ওদিকে তখন ইয়াংশি নদীর কূলে চু-রাজ্য প্রবল শক্তিমান হইয়া উঠিয়াছে। চু-শক্তিকে দমন করা একান্ত প্রয়োজন বুঝিয়া শি ও শিন্ উভয় পক্ষ নিজেদের বিরোধ-কলহ 'চাপা' দিয়া ঐক্যবদ্ধ হয়; চু-শক্তির বিরুদ্ধে উভয় রাজ্যের মিলিত অভিযান চলে; এবং ফলে এ দুই রাজ্য

একশত বৎসরকাল নিরুপদ্রব থাকে। পরে চু-শক্তির সহিত সন্ধি হয়।

প্রাচীন চীনে লৌহের ব্যবহার প্রচলিত ছিল; তবে সে কতকাল পূর্ব্ব হইতে, সে সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। আসীরিয়া, মিশর ও য়ুরোপে লৌহের ব্যবহার প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে ৫০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে চীনা জাতি লৌহ-নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিত। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন, হুন জাতিই চীনে সর্ব্বপ্রথম লৌহ-ধাতুর প্রবর্ত্তন করে।



প্রাচীন চীনের রণ-কুঠার (পিতল-নির্ম্মিত)

চৌ-বংশের শেষ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া শিন-বংশীয় রাজারা চীনে ক্রমে দুর্দ্ধর্ষ শক্তিমান হইয়া ওঠে।

এই শিন-বংশীয় নৃপতি শি-হোয়াং-তি (Universal Emporor—সমগ্র জাতির অধীশ্বর) শক্তি-প্রভাবে চীনের সমুদয় খণ্ড রাজ্যগুলিকে এক বিরাট সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া একচ্ছত্র সম্রাট উপাধিতে নিজেকে বিভূষিত করেন। হুন-আক্রমণ-প্রতিরোধ-কল্পে সম্রাট শি-হোয়াং-তিই চীনের 'বিপুল দেউল' (Great Wall) রচনায় উদ্যোগী হন। তাঁহার মৃত্যুর পরে হুন শক্তি আবার সবল হইয়া চীন সাম্রাজ্য আক্রমণ করে; এবং বিজয় লাভ করিয়া চীনে হুন শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

হুন-শাসন-কালে চীন সাম্রাজ্য বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে। আদিম চীনা নর-নারীরা এশিয়ার পশ্চিম দিক-প্রান্তে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হইয়া সরিয়া যায়। এইখানে আসিয়া তারা অপর বহু জাতির সভ্যতা ও কৃষ্টির পরিচয় পায়।



প্রাচীন চীনের অস্ত্র

১০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে চীনা শক্তি তিব্বতের সীমান্তদেশ এবং পশ্চিমে তুর্কিস্থান পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে। উষ্ট্রকে বাহন করিয়া তাহারি সাহায্যে পারস্য এবং পাশ্চাত্য বহু রাজ্যের সহিত চীনা জাতির বাণিজ্য-সম্পর্ক সংস্থাপিত হয়। চীনের প্রাচীন ইতিহাসের ইহাই সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

৬। সভ্যতার অরুণোদয়ে

এই যে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া বর্ব্বরতার অন্ধ পাতালরন্ধ্র হইতে কৃষ্টি ও সভ্যতার আলোক-রাজ্যের পথে মানুষ ধীর-চরণে অগ্রসর হইতেছিল, এ সময়ে এত-বড় পৃথিবীর অপর প্রদেশ-গুলির অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার বাসনা মনে স্বতঃই উদয় হয়। এই দীর্ঘ-কালের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখি, উত্তরে রাইন নদীর তীর হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের কূল পর্য্যন্ত সমগ্র ভূ-ভাগে যাযাবর মোঙ্গোলীয়গণের গতি তখনো থামিয়া গৃহাশ্রয়ী হয় নাই। মোঙ্গোলীয়গণ এ সময়ে ধাতুর ব্যবহার শিখিয়াছে—তারপর যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করিয়া তারা নিরাপদ গৃহবাসের ব্যবস্থা করে। এই সহস্র বৎসরে গৌরবর্ণ

আর্য্যজাতি ক্রমে ভূমধ্যসাগর উপকূল হইতে মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকার পথে অগ্রসর হয়। এই আর্য্যজাতির সহিত পরিচয় ও সংস্রবের ফলে আফ্রিকার আদিম নিগ্রো জাতি বিবিধ ধাতু ব্যবহার করিতে শিখে।

আর্য্যজাতি আফ্রিকায় দুই বিভিন্ন পথে আসিয়া উপস্থিত হয়। এক পথ ছিল—সাহারা মরুভূমির উপর দিয়া পশ্চিমে; অন্য পথ—নীল নদের তীর বহিয়া। প্রথম পথে আসে বর্ব্বর ও তুয়ারেগ জাতি; নিগ্রো জাতির সঙ্গে এ দুই জাতির সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ হইয়া ওঠে এবং এই তিন জাতির মিশ্রণে (inter-mixture) এক স্বতন্ত্র জাতির উদ্ভব ঘটে। সে নব জাতির নাম ফুলা (Fulla)।

নীল নদের তীরে যে দ্বিতীয় পথ, সে পথে আসে আর একদল আর্য্য-জাতি; সে জাতি উগাণ্ডায় আসিয়া উপস্থিত হয়। এ জাতির সহিত নিগ্রো জাতির মিশ্রণের ফলে যে নব জাতির উদ্ভব ঘটে, সে জাতির নাম 'বাগাণ্ডা'। এ সময়ে আফ্রিকার বন-জঙ্গল ছিল একেবারে দুর্ভেদ্য এবং তাহার বিস্তার ছিল নীল নদের উত্তর হইতে পূর্ব্ব সীমা পর্য্যন্ত।

তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইষ্ট-ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে পেলিও-লিথিক অষ্ট্রালয়েড জাতি বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্নভাবে বাস করিত। ওশানিয়া দ্বীপপুঞ্জে মানবের বসতির চিহ্নমাত্র ছিল না। ভেলায় চড়িয়া পেলিওলিথিক জাতির নর-নারী আসিয়া ক্রমে প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে অবস্থিত বিবিধ দ্বীপে বসতি স্থাপনা করে (১০০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ); আরো পরে তারা মাডাগাস্কার দ্বীপের সন্ধান পায় এবং কয়েক দল নর-নারী সেখানে গিয়া আস্তানা পাতে। নিউ-জীলান্দেও এ সময়ে লোকের বাস ছিল না। জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে সে দ্বীপে বাস করিত অষ্ট্রিচ ও মোয়া (এখন নিশ্চিহ্ন) নামক দুই অজগর পক্ষীর বংশ এবং কিউই নামে এক অতি ক্ষুদ্রকায় পক্ষীর বংশ।

উত্তর আমেরিকায় একদল মোঙ্গোলীয় জাতির বাস ছিল। প্রাচ্য ভূখণ্ডের সহিত তাহাদের কোনো সম্পর্ক বা সংস্রব ছিল না। বংশ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই জাতি ক্রমে দক্ষিণ দিক-ভাগে অগ্রসর হইতে থাকে। ভুট্টা চাষের সম্বন্ধে এ জাতির তখন কোনো জ্ঞান ছিল না। এ জাতি ক্রমে দক্ষিণ আমেরিকায় আসিয়া সেখানকার লামা পশুকে পোষ মানাইয়া বাহনরূপে কাজে নিযুক্ত করে। পরে মেক্সিকো, যুকাটান ও পেরু প্রদেশে এ জাতির সভ্যতা নানা বেশে নানা রূপে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। এ জাতি প্রথম যখন দক্ষিণ আমেরিকায় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সেখানে মেগাথেরিয়াস ও গ্রীপতোদোন নামক অতিকায় পশুজাতি বিরাট শক্তিতে রাজত্ব করিতেছিল।

মানব-সভ্যতা-বিকাশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিতে হইলে আমেরিকার এই আদিম বৃত্তান্ত মনে রাখা প্রয়োজন। য়ুরোপীয় জাতি আমেরিকা আবিষ্কার করে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে। তাহার পূর্ব্বে এখানকার আদিম অধিবাসীরা বিবিধ ধাতুর গুণাগুণ জানিয়া তাহার ব্যবহারে পটুতা লাভ করিয়াছে, দেখিতে পাই। দেশের মাটী হইতে তাহারা তামা সোনা প্রভৃতি ধাতু সংগ্রহ করিত। কৃষি বিদ্যায় তাহারা ছিল অভিজ্ঞ—ফশল বোনার সময় মহাসমারোহে উৎসব করিত; সে উৎসবে নরবলি হইত। এ জাতির প্রধান দেবতা ছিল সর্প। সমগ্র জাতির উপর পুরোহিতদের প্রভাব অমোঘ প্রচণ্ড ছিল। পুরোহিতের তর্জ্জনীর ইঙ্গিতে সমগ্র জাতি উঠিত বসিত।

এই পুরোহিতের দল জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল। বাবিলনিয়ান জাতির পুরোহিতদের চেয়ে এ জাতির পুরোহিতদের জ্যোতিষ্বিদ্যায় জ্ঞান ছিল অনেক বেশী।

প্রাচীন যুকাটান জাতির মধ্যে এ সময়ে লিখন-রীতির প্রচলন ছিল; তাহারা পঞ্জিকা-রচনা করিত। পেরুর মৃত্তিকা-গর্ভে যে সকল প্রাচীন শিলামূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির সঙ্গে সুমেরিয়ান মূর্ত্তি সমূহের আকারগত বহু সাদৃশ্য দেখা যায়। এ সাদৃশ্য দেখিয়া সুমেরিয়ান সভ্যতার সঙ্গে আমেরিকার প্রাচীন সভ্যতার সম্পর্ক ছিল, এমন ধারণা যেন কেহ না করেন। প্রাচীন আমেরিকার সভ্যতার সহিত অপর কোনো জাতির সভ্যতার কোনো সম্পর্ক ছিল না। দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন শিলামূর্ত্তি সমূহের সঙ্গে এ সব প্রাচীন মূর্ত্তির সাদৃশ্য খুব বেশী।

মেক্সিকোর প্রাচীন সভ্যতার সহিত নরবলির নিষ্ঠুর কাহিনী বিজড়িত আছে; পূজা-পার্ব্বণে পুরোহিতেরা নৃশংস চিত্তে নরবলি দিত। অতখানি পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও এ নৃশংস

আচরণ কি বলিয়া প্রচলিত ছিল, ভাবিলে আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না!

মেক্সিকো ও পেরু প্রদেশে মৃত্তিকা-গর্ভ হইতে সম্প্রতি বহু শিলামূর্ত্তি ও তৈজসাদির উদ্ধার সাধন হইয়াছে। শিলালিপি হইতে রাজা-শাসনের বহু শৃঙ্খলিত বিধির পরিচয় পাওয়া যায়—মৃত্তিকা-গর্ভ হইতে কয়েকখানি প্রাচীন মানচিত্রও পাওয়া গিয়াছে।

স্প্যানিশ জাতি যখন আমেরিকায় প্রথম পদার্পণ করে, তখনো পর্য্যন্ত আমেরিকার বিভিন্ন জাতিসমূহ প্রতিবেশী জাতিদের নাম জানিত না। পেরুভিয়ানরা জানিত না পাশেই মেক্সিকো নামে অন্য প্রদেশ ও সেখানে মেক্সিকান জাতির বাস আছে; এবং মেক্সিকানরা জানিত না পেরু বলিয়া দেশ ও পেরুভিয়ান নামে জাতি তাহাদের পাশে এই ধরণী-পৃষ্ঠে বাস করে! পেরুভিয়ান জাতির প্রধান খাদ্য ছিল আলু; অথচ প্রতিবেশী মেক্সিকান জাতি সে আলু চোখে দেখা দূরের কথা, আলুর নাম কখনো কাণে শোনে নাই!

খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দে সুমেরিয়ান ও মিশরী জাতিও পরস্পরের কোনো সংবাদ জানিত না।

কৃষ্টি ও সভ্যতায় আমেরিকা তখন য়ুরোপ ও এশিয়া হইতে প্রায় ছয় হাজার বৎসর পিছনে পড়িয়া ছিল।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বিস্মৃত

আজ আমি নহি আর তোমাদের কেহ
মোরে কারো নাহি প্রয়োজন;
মোর স্মৃতি, মোর গীতি, ভালবাসা, স্নেহ
আজি হোলো বিস্মৃত স্বপন!

আজো তোমাদের গৃহ আগেকারি মত
মুখরিত হাস্য-কলরবে,
পরিপূর্ণ দিনগুলি চলিছে সতত
শত কণ্ঠে আমোদে উৎসবে।

সে হাসি-আনন্দ-মাঝে মোর কণ্ঠস্বর
নীরব হয়েছে চিরতরে,
তোমাদের মাঝে মোর আজন্মের ঘর
ভেঙ্গে গেছে বিস্মৃতির ঝড়ে!

তবু ছিনু এক দিন তোমাদেরি মাঝে
সংসারের শত দুঃখে সুখে,
সে কথা স্মরণ করি আজো সন্ধ্যাকাযে
উদাসীন—অশ্রু আসে চোখে!

শ্রীরসময় দাশ।



বিলাতের নূতন মন্ত্রিমণ্ডল

বিলাতের মন্ত্রিমণ্ডলীর যে পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তাহার কথা আমরা পূর্ব্ব মাসে বলিয়াছি। আমরা গতবারে বলিয়াছিলাম যে, মন্ত্রিসভার যে পরিবর্ত্তন হইল, তাহাতে ভারতবাসীর কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। কারণ, এই পরিবর্ত্তনের ফলে বর্ত্তমান শাসননীতির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। গত দশ বৎসর ধরিয়া যাঁহারা বিলাতী রাজনীতিক তরণীর কাণ্ডারীগিরি করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারাই এখন সেই পদে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। বিলাতের স্বরাষ্ট্র ক্ষেত্রে তাঁহারা এমন কিছুই করিতে পারেন নাই—যাহার জন্য তাঁহারা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে পারেন। দেশের বেকার-সমস্যার হ্রাস করাই সরকারের একটা বড় কায। সে দিকে যে ইঁহারা বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিয়াছেন, এমন কথা এ পর্য্যন্ত কেহই বলিয়া উঠিতে পারেন নাই। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিলাতে বেকার-সংখ্যা এত ছিল যে, শত চেষ্টা করিলেও ঐ সংখ্যা ১০ লক্ষের কম করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু তাহার পর হইতে অবস্থা আরও মন্দ হইয়া পড়ে; এখন সেই বেকার-সংখ্যা প্রায় উহার দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং এই মন্ত্রিমণ্ডলীর কেরামতি কতখানি, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

জাতীয় সরকার এখন কেবল বলিতেছেন যে, দেশের নির্ব্বিঘ্নতা-রক্ষাই সরকারের এখন প্রধান কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সেই নির্ব্বিঘ্নতা তাঁহারা কিরূপ ভাবে রক্ষা করিতেছেন, তাহাও বিচার্য্য বিষয়। কারণ, মন্ত্রিমণ্ডলীর পরিবর্ত্তন যাহা হইয়াছে, তাহা নামতঃ—কার্য্যতঃ বড় কিছুই হয় নাই। সেই খাড়া বড়ি থোড়ের স্থানে থোড় বড়ি খাড়াই রহিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে মন্ত্রিমণ্ডলীতে বিশ জন মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে চৌদ্দ জন ছিলেন রক্ষণশীল। আর বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত মন্ত্রিমণ্ডলে বাইশ জন মন্ত্রী বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে পনর জন মন্ত্রী রক্ষণশীল। সুতরাং আসলে বদল বিশেষ হয় নাই। তাহার উপর আর একটা ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার আছে। মন্ত্রীদিগের মধ্যে যাঁহাদের কায বিশেষ গুরুদায়িত্বপূর্ণ এবং যাঁহাদের কার্য্যের উপর নীতিপরিচালন বিশেষভাবে নির্ভর করে, সেই তিন জন মন্ত্রীই এবার হইয়াছেন রক্ষণশীল দলভুক্ত। যথা (১) প্রধান মন্ত্রী, (২) চান্সেলার অব দি এক্সচেকার অর্থাৎ রাজস্ব-সচিব এবং (৩) পররাষ্ট্র সচিব। এই তিন জনই এখন রক্ষণশীলদলের এক এক জন দিক্‌পাল। সুতরাং শাসননীতির তরণী যে রক্ষণশীলদিগের খাতে ধরিয়া পরিচালিত হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

এ দেশের কেহ হয় ত মনে করিতে পারেন যে, ভিন্নমতাবলম্বী সম্প্রদায়ের কোন কোন লোক যদি মন্ত্রিমণ্ডলীতে স্থান পান, তাহা হইলে তাঁহারা শাসনতরণী পরিচালনের নীতির উপর কতকটা প্রভাব বিস্তৃত করিতে পারেন। অর্থাৎ তাঁহারা অন্য মন্ত্রীদিগকে বলিয়া কহিয়া তাঁহাদের নীতি কতকটা নরম করিয়া দিতে সমর্থ হন। সে ধারণাটি যে সর্ব্বৈব ভুল, তাহা গত বার সম্পূর্ণ সপ্রমাণ হইয়াছে। নীতি দেখিয়াই তাহা ধরা যায়। জাতীয় মন্ত্রিমণ্ডলী যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন, তাহা কোন রক্ষণশীল রাজনীতিকের অপছন্দ হয় নাই। অতি জবরদস্ত রক্ষণশীল মন্ত্রিমণ্ডলী যদি তখন প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহারাও ঐরূপ নীতিই অবলম্বন করিতেন। তাহার বিশেষ কিছু ইতরবিশেষ হইত না। তবে অন্য রাজনীতিকদলের লোক মন্ত্রিমণ্ডলীতে ছিলেন বলিয়া রক্ষণশীলদিগের বিশেষ লাভ হইয়াছে। কারণ, উঁহারা মন্ত্রিমণ্ডলীতে ছিলেন বলিয়া আগামী নির্ব্বাচনে রক্ষণশীলদল হয় ত অধিক সংখ্যায় সদস্য নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন। কারণ, অন্য দলের কৃতিত্ব কতখানি, তাহা তাঁহাদের এই জাতীয় মন্ত্রিমণ্ডলীতে অবস্থান দ্বারাই বুঝা গিয়াছে। সার জন সাইমনের স্থানে সার স্যামুয়েল হোর পররাষ্ট্রসচিব হইয়াছেন। এখন তাঁহার যশোভাতি শেষটা সার জন সাইমনের ন্যায় পরিম্লান হইয়া পড়ে কি না, তাহাই দ্রষ্টব্য। এ কথা খুবই সত্য যে, গত চারি বৎসর য়ুরোপ এবং এসিয়ার রাজনীতিক আকাশ নিবিড় মেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে। এরূপ অবস্থায় সহসা কিছু করাও সহজ নহে। পররাষ্ট্রসচিব স্বয়ং কোন নীতির প্রবর্ত্তন করেন না। মন্ত্রিমণ্ডলী সমবেতভাবে যে নীতি নির্দ্দিষ্ট করেন, তিনি কার্য্যক্ষেত্রে সেই নীতিরই বিনিয়োগমাত্র করেন। মন্ত্রিমণ্ডলীও ঠিক তাঁহাদের বিচারবুদ্ধি অনুসারে কায করেন না। তাঁহারা কমন্সসভার অধিকাংশ সদস্যের মুখ চাহিয়া তাঁহাদের নীতি নির্দ্দেশ করেন।

আর কমন্স সভায় দেশের লোকের মত প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া গণ্য করা হয়। স্যার জন সাইমন যে পররাষ্ট্রসচিবের কার্য্য ত্যাগ করিলেন, সে জন্ত তাঁহার দেশে কেহই বিশেষ দুঃখ বা ক্ষতি অনুভব করেন নাই। স্যার জন সাইমন তাঁহার কোন কার্য্যেই উদারনীতির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া মনে হইল না।

আর কি আসিবে ফিরে ?

য়ুরোপের সকল বাণিজ্যব্যবসায়ী জাতি এখন মনে মনে চিন্তা করিতেছেন,—তাঁহাদের সে সুখের দিন কি আবার ফিরিয়া আসিবে ? আজ প্রায় পৌনে ছয় বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর সকল শিল্প-বাণিজ্যপ্রধান দেশে শ্রমশিল্পজ পণ্য প্রস্তুত যন্ত্রের যে চক্র দ্রুতবেগে ঘুরিতেছিল এবং আগ্নেয়গিরির মুখনিঃসৃত ধূমরাশির ন্যায় যে যন্ত্রের মুখ হইতে ব্যবহারোপযোগী পণ্য অনর্গল বাহির হইতেছিল, অকস্মাৎ সেই যন্ত্রের গতি মন্থর হইয়া ক্রমশঃ ধীরে, অতি ধীরে চলিয়া অবশেষে প্রায় স্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে। এঞ্জিনের গর্জ্জন এখন বেদনা-বিধুর বিধবার গভীর-নিশ্বাস-স্বননের মত শুনাইতেছে। গঞ্জে আর সে লোক-কোলাহল নাই,—শ্রমিকের আর কাষের সে হুড়াহুড়ি নাই, সবই আচম্বিতে কি যেন এক যাদুমন্ত্রের বলে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সেই হইতে আজ পৌনে ছয় বৎসর শ্রমশিল্পের এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের দশা মন্দ হইয়া পড়িয়াছে। কি করিয়া উহার পূর্ব্বাবস্থা ফিরাইয়া আনিতে পারা যায়, সেই চিন্তায় আকুল অর্থনীতিবিশারদগণ, বণিকগণ, এবং শ্রমিককুল চক্ষবন্ধ হইয়া-গালে হাত দিয়া চিন্তা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা উপায় কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছেন না। বিলাতেও বাণিজ্যের অবস্থা পূর্ব্ব হইতেই অতিশয় মন্দ হইয়া পড়িতে থাকে। রক্ষণশীলদল জাতীয় সরকার বলিয়া যে মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত করেন, তাহাতে তাঁহারা ব্যবস্থাপূর্ব্বক বাণিজ্যের অবস্থা ভাল করিবেন বলিয়া আশা দিয়াছিলেন। সেই আশার বাণী তাঁহারা সার্থক করিতে পারেন নাই। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বিলাতের বাণিজ্যের অবস্থা যাহা ছিল, এখন তাহাও নাই। বিলাত হইতে এখন লৌহ এবং ইস্পাত আর অধিক পরিমাণে বিদেশে চালান যাইতেছে না। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বিলাত হইতে যে পরিমাণ লৌহ এবং ইস্পাতের পণ্য বিদেশে চালান গিয়াছিল, এখন তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ ঐ পণ্য বিদেশে চালান যাইতেছে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দকে নিরিখ ধরিলে দেখা যায় যে, সেই বৎসরে যত পরিমাণ কয়লা ইংলণ্ড বিদেশে চালান দিয়াছিল, তাহার মাত্র বারো আনা কয়লা এখন বিদেশে চালান যাইতেছে। কার্পাসজাত পণ্য ঐ বৎসরের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায়, এখন উহা বিলাত হইতে অর্দ্ধেকেরও কম এবং পশমজাত পণ্য অর্দ্ধেকের কিছু অধিক বিদেশে প্রেরিত হইতেছে। এমন কি, কলকজা, বৈদ্যুতিক যন্ত্র, গাড়ী এবং লৌহ ভিন্ন অন্য ধাতুজ পণ্যের রপ্তানী ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের রপ্তানীর অঙ্ক হইতে কম হইতেছে। এখন সকলেই ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের বাণিজ্য ভাল হইয়াছিল মনে করিতেছেন,—কিন্তু তখন তাহা কেহ মনে করেন নাই। জাতীয় সরকার এই সমস্যার কোন সমাধানই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সেই জন্ম বিলাতের জনসাধারণ জাতীয় সরকার নামধারী রক্ষণশীল সরকারের উপর যে কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে যখন ইণ্ডিয়া বিলখানি লর্ডসভার কমিটীতে আলোচিত হইতেছিল, তখন আর্ল অব ম্যান্সফিল্ড এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন যে, ইণ্ডিয়াবিলে এই মর্ম্মে একটি নূতন ধারা সংযোগ করিয়া দেওয়া হউক, "ভারতে কোন আমদানী পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য্য করিবার এবং বাড়াইয়া দিবার প্রস্তাবযুক্ত কোন আইনের পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থা-পরিষদে পেশ করিতে হইলে, সেই পাণ্ডুলিপিখানিতে যদি অন্যান্য আমদানী পণ্য অপেক্ষা বৃটিশ পণ্যের উপর বিশেষ অল্প হারে শুল্ক ধার্য্য করিবার ব্যবস্থা না থাকে, তাহা হইলে বড়লাট বাহাদুর শাসনসংস্কার আইনের ৩৭ ধারা অনুসারে ঐ পাণ্ডুলিপিখানি পেশ করিবার অনুমতি দিবেন না।" ধৃষ্টতার সীমা ইহা অপেক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে কি না সন্দেহ। কেবলমাত্র এই প্রস্তাবটি বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, কতকগুলি ইংরাজ বাণিজ্য-বিস্তারের জন্য অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা বৃটেনবাসীদিগের স্বার্থসিদ্ধির কথা চিন্তা করিবার সময় ভারতবাসীদিগের আর্থিক বিষয়ে যে একটা স্বার্থ আছে, সে কথা ভাবিতে ভুলিয়া যান। নূতন ভারত-সচিব লর্ড জেটলাণ্ড আর্ল ম্যান্সফিল্ডকে সে কথা সমঝাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, লর্ড ম্যান্সফিল্ডের ঐ প্রস্তাব নিতান্ত অবিবেকিতাপূর্ণ, তবে আপাতদৃষ্টিতে অনেকটা মনোজ্ঞ বটে। তিনি আরও বলেন যে, বৃটিশজাতি ভারতে বাণিজ্যবিষয়ে অনেক আপেক্ষিক সুবিধা ভোগ করিতেছে; ইহা ভিন্ন ভারতবাসীর মনে যদি এইরূপ ধারণা জন্মিয়া যায় যে, বৃটিশজাতি ভারতবাসীর স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া বৃটিশ জাতির স্বার্থসাধনকল্পে ভারতের আর্থিক নীতি পরিচালিত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, তাহা হইলে তাহার ফলে ভারতে বৃটিশ বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইবে, ইহাই ভারত-সচিবের বিশ্বাস। ঐরূপ ধারণা যে ভারতবাসীদিগের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং তাহার ফলে যে গ্রেটবৃটেনের ক্ষতি হইতেছে, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। ভারতবাসীরা নামে আর্থিক স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে,—কিন্তু কাযে বিন্দুমাত্রও সে সুবিধা ভোগ করিতেছে না। যদি আর্থিক বিষয়ে ভারত-বাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণ করিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে ভারত-বাসীদিগের প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও অটোয়া-চুক্তি হইত না, বৃটিশ ভারতীয় বাণিজ্য সর্ত্তও হইত না আর জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটীর সুপারিশ গ্রাহ্য হইত না। অটোয়াচুক্তির ব্যাপারে অষ্ট্রেলিয়া, কানেডা প্রভৃতি ইংরাজদিগের উপনিবেশ যাহা করিতেছে,— ভারত-বাসীরা কি তাহা করিতে পারিতেছে ? ঐ সকল উপনিবেশবাসীরা যখন বৃটিশজাতির জ্ঞাতি, তখন তাহাদের কার্য্য বৃটিশ বিদ্বেষজনিত বলা যাইতে পারে না। কিন্তু ভারতবাসী পরাধীন বলিয়া তাহাদের সামান্য আর্থিক স্বার্থরক্ষাকর কার্য্য বা মন্তব্য সময়ে সময়ে নিতান্ত কূটতর্ক দ্বারা বৃটিশবিদ্বেষ বিজৃম্ভিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হয়। ইহাতে ভারতবাসীদিগের মন অত্যন্ত অধিক বিগড়াইয়া যায়, ইহা বৃটিশ রাজনীতিকরা কেন বুঝেন না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

ফ্রান্সে গোলযোগ

ফ্রান্সে বড় বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। তথায় ফ্লাণ্ডিন যেরূপ অবস্থায় মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা গত মাসের বৈদেশিক প্রসঙ্গে আমরা বিবৃত করিয়াছি। তাহার পর মঁসিয়ে ফার্ণাণ্ড সুয়ের্স ৪ দিন মাত্র মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া উহা ছাড়িয়া দিয়াছেন। এখন গত জুন মাসে আবার মঁসিয়ে লাভাল ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি ফ্রান্সের মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সে সময়ে ফ্রান্সের অবস্থা খুব ভাল ছিল। ঐ দেশের শক্তিও হইয়াছিল অত্যন্ত অধিক। তখন প্রচুর সুবর্ণ ফ্রান্সের ব্যাঙ্কে জলস্রোতের ন্যায় আসিয়া পড়িতেছিল বলিয়া সমস্ত য়ুরোপ ফরাসীদিগের হাতের মুঠার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। সুবর্ণের এমনই গুণ। ফ্রান্স তখন ক্ষুদ্র আঁতাতে এবং পোলাণ্ডের যেন ঘাড় চাপিয়া বসিয়াছিল। জেচো-শ্লোভেকিয়া, জুগোশ্লেভিয়া এবং রুমেনিয়া ১৯২১ খৃষ্টাব্দে সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হন, সেই জন্য এই রাষ্ট্রত্রয় ক্ষুদ্র আঁতাত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কূট-বুদ্ধি জার্ম্মাণ পররাষ্ট্রসচিব ডাক্তার কার্টিয়াসের সমস্ত কৌশল ব্যর্থ করিয়া ফ্রান্স জার্ম্মাণ অষ্ট্রীয়ান জাতির মধ্যে শুল্ক-সম্মেলন বিধ্বস্ত করিয়া দেন। ফরাসী রাজনীতিকদিগের কৌশলেই হাঙ্গেরী ইটালীর প্রভাবমুক্ত হইয়াছেন। এই সময়ে ফ্রান্সের প্রভাব এতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, ফ্রান্স য়ুরোপের রাষ্ট্রসমূহের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। গ্রেট বৃটেন য়ুরোপে ফরাসী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ইহা দেখিয়া বিশেষ স্বস্তিবোধ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহাদের কিছু করিবার ক্ষমতাও ছিল না। ফ্রান্সের অবস্থা তখন সর্ব্বজন-স্পৃহণীয় ছিল। য়ুরোপের মহাদেশমধ্যে ফ্রান্সের সমকক্ষ কেহই ছিল না।



মঁসিয়ে ফ্লাণ্ডিন



মঁসিয়ে লাভাল

ইহার পরই ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থায় ভাটা পড়িতে আরম্ভ হয়। বাহিরে ফ্রান্সের অবস্থা ভাল বলিয়া বোধ হইলেও ভিতরে এই মন্দার বাজার তাহার জীবনীশক্তিকে ক্ষীণ করিয়া ফেলিতেছিল। গত মাসে আমরা "মার্কিণ ও ফ্রান্স" শীর্ষক প্রবন্ধে ফ্রান্সের এই অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছি। এই সময়ে ফ্রান্সের ব্যাঙ্কগুলির রিপোর্ট হইতে বুঝা যায় যে, ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থা ভিতরে ভিতরে মন্দ হইয়া পড়িতেছে। তাহার অনেক মূলধন ব্যবহৃত না হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, আর্থিক ক্ষেত্রে উহার বিনিয়োগ হইতেছে না। গত ফেব্রুয়ারী মাসে তথাকার ব্যাঙ্ক হইতে ৩ কোটি ২০ লক্ষ ফ্রাঙ্ক ব্যবহারার্থে প্রার্থীদিগকে প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে গড়ে প্রতি মাসে ১৮২ কোটি ৩০ লক্ষ ফ্রাঙ্ক ঐরূপ ভাবে প্রার্থী-দিগকে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন ফরাসী ব্যাঙ্কারগণ অল্প সুদে অল্পদিনের জন্য টাকা ধার দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার ফলে ব্যাঙ্কের লাভ হইতেছে না। যাহারা টাকা ধার লইতেছে, তাহারা নূতন যন্ত্রপাতি বসাইবার বা নূতন কারবার খুলিবার জন্য টাকা লইতেছে না। ইহাতে ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থার শোচনীয়তা প্রতিবিম্বিত হইতেছে। এই ক্ষতির বা মন্দার লক্ষণ কেবল এক দিক দিয়া প্রকাশ পায় নাই, নানা দিক দিয়া উহা প্রকাশ পাইয়াছে। সে সব হিসাব দিয়া বিশেষ কোন লাভ নাই।

এই অবস্থায় কেহ আর ফ্রান্সের রাজনীতিকতরণীর কাণ্ডারী হইতে চাহেন না। মঁসিয়ে ডুমার্গ এবং মঁসিয়ে ফ্লাণ্ডিনের পর মঁসিয়ে পিয়েটো এবং মঁসিয়ে বয়সোঁ কয়েক দিন মাত্র চেষ্টা করিয়া তথাকার রাজনীতিক তরণী পরিচালিত করিতে অসমর্থ হন। শেষে মঁসিয়ে লাভালকে ঐ পদ দেওয়া হইয়াছে। তিনি প্রথমে এই পদ গ্রহণ করেন নাই। যখন আর কোন উপায় নাই, তখনই মঁসিয়ে লাভাল এই পদ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সাফল্যের পথ এখন কুসুমাস্তৃত নহে।

ফ্রান্সের ঘরে বাহিরে দুই দিকেই অশান্তি। মুদ্রার মূল্যে সুবর্ণমান ত্যাগ করা উচিত কি না, তাহা লইয়া ঘরে নানা গোল। নানা মুনির নানা মত যেন ফরাসীদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। তথাকার মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনেও দেখা যায় যে, যাঁহারা অত্যন্ত প্রতিবাদী, তাঁহারাই নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে জয়লাভ করিতেছেন। এই ত গেল ভিতরের কথা। বাহিরের ব্যাপারও অল্প উদ্বেগজনক নহে। ফরাসীরা সমস্ত য়ুরোপে আপনাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন এবং সেই প্রয়াসে বিশেষ সাফল্যলাভে সমর্থও হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন যেন ফরাসী রাজনীতিকদিগের হাতে

পাশা উল্টাইয়া পড়িতেছে। হাঙ্গেরী এবং পোলাণ্ড এখন আর ফরাসীদিগকে বন্ধু বলিয়া মনে করিতেছে না। যুগোশ্লেভিয়া এবং রুমেনিয়া কি ভাব ধারণ করে, তাহা ফরাসীরা যেন ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। উহাদের মনের মধ্যে কেমন যেন একটা সন্দেহের বিষ প্রবেশ করিয়াছে। তাহার পর ফ্রান্সের মনে ইদানীং এই সন্দেহ জাগিয়া উঠিতেছে যে, গ্রেট বৃটেন তাঁহাদিগকে অবিচলিত-ভাবে সাহায্য করিবে না। সেই সন্দেহ আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে জার্ম্মাণীর সহিত গ্রেট বৃটেনের রণতরী-সম্পর্কিত চুক্তির দ্বারা। অবশ্য সম্প্রতি ফ্রান্সের নূতন মিত্র জুটিয়াছেন—সোভিয়েট রুসিয়া। কিন্তু তাহাতেও নানা আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে। ফ্রান্সের ভদ্র-সম্প্রদায় এই ব্যাপারে সশঙ্ক হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের শঙ্কার কারণ এই যে, সোভিয়েট-শাসিত রুসিয়ার সহিত নিবিড় সহযোগিতার এবং সখ্যের ফলে ফ্রান্সের ভদ্র-সম্প্রদায়-প্রধান প্রজাতন্ত্রের বিপদ ঘটিবে। সে জন্য সকলের মনে বেশ একটু চাঞ্চল্য দেখা দিতেছে। এখন উপায় কি? নূতন মন্ত্রী মঁসিয়ে লাভালের পক্ষে এখন উভয়-সঙ্কট উপস্থিত। তাঁহার পক্ষে ফ্রান্সের প্রচলিত মুদ্রা ফ্রাঙ্কের মূল্য হ্রাস না করিয়া আর কোন কিছুই করিবার উপায় আছে বলিয়া মনে হইতেছে না। বৃটিশ জাতির এই উপায় দ্বারা বিশেষ সুবিধা হইয়াছে বলিয়া কতকগুলি ফরাসী অর্থনীতিবিশারদ এই উপায় অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য মনে করিতেছেন।

গ্রেট বৃটেন ও জার্ম্মাণী

গত জুন মাসে গ্রেট বৃটেনের সহিত জার্ম্মাণীর নৌবহর সম্বন্ধে এক চুক্তি হইয়া গিয়াছে। এই চুক্তির সর্ত্ত দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছেন। কেহ কেহ সে জন্য জার্ম্মাণীর চরিষ্ণু রাজনীতিক হার রিবেনট্রপের কৃতিত্ব বিশেষভাবে দেখিতে পাইতেছেন। এই চুক্তির দ্বারা গ্রেট বৃটেন জার্ম্মাণীকে গ্রেট বৃটেনের সমস্ত নৌবলের শতকরা ৩৫ ভাগ তরণী-নির্ম্মাণের অধিকার দান করিতে সম্মত হইয়াছেন। আর সাধারণভাবে জার্ম্মাণী গ্রেট বৃটেনের শতকরা ৪৫ ভাগ সবম্যারিণ বা ডুবো জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন। সঙ্গে সঙ্গে এমন সর্ত্তও করা হইয়াছে যে, যদি অবস্থার চাপে পড়িয়া প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে জার্ম্মাণী বৃটিশ সবম্যারিণের তুল্যমূল্য সবম্যারিণ প্রস্তুত করিতে পারিবেন। এই শেষোক্ত সর্ত্তটি দেখিয়া সকলে বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন। যে জার্ম্মাণীর ডুবো জাহাজ বিগত যুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ নৌবাহিনীকে বিশেষভাবে শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল—প্রয়োজন হইলে জার্ম্মাণী সেই গ্রেট বৃটেনের তুল্যমূল্য ডুবো জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে, এরূপ অধিকার প্রদানে সম্মতি বৃটেনের পক্ষে বিশেষ উদারতার পরিচায়ক হইয়াছে,—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

গ্রেট বৃটেন যে জার্ম্মাণীর সহিত এইরূপ সর্ত্ত করিবেন, এ কথা কেহ মনেই করেন নাই। ভার্সাইল সন্ধিপত্রে নৌবাহিনী সম্বন্ধে যে ধারা আছে, এই সন্ধির দ্বারা তাহা খণ্ডিত করা হইয়াছে। ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের রাজনীতিকরা বলিতেছেন যে, গ্রেট বৃটেন সন্ধিভঙ্গকারীদিগের পক্ষেই যোগ দিলেন। ইহাতে ষ্ট্রেসা সমিতির পর যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার অপহ্নব করা হইয়াছে বলিয়া রব উঠিয়াছে। ইহার দ্বারা ওয়াশিংটনের এবং লণ্ডনের নৌ-চুক্তির প্রতিকূলতা করা হইয়াছে। সকলের সমবেতভাবে আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা সমাধান করিবার মত মনোবৃত্তি লইয়া এই কায করা হয় নাই।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, এই চুক্তির ফল কি হইবে? অবশ্য অতঃপর উত্তর সাগরে এবং বাল্‌টিক সাগরে আবার জার্ম্মাণ রণতরী দেখা দিবে। এই রণতরীবহর পরিমাণে গ্রেট বৃটেনের রণতরীর তিন ভাগের এক ভাগ এবং ফরাসীদিগের রণতরীর তিন ভাগের দুই ভাগ হইবে। বৃটেনের রণতরী পৃথিবীর সপ্তবারিধিবক্ষে



হার রিবেনট্রপ

বিক্ষিপ্তভাবে রক্ষিত, ফ্রান্সের রণতরীর অবস্থাও প্রায় সেইরূপ। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, স্বদেশের সন্নিহিত জলনিধিবক্ষে জার্ম্মাণ রণতরী অনেকটা ফ্রান্সের এবং বৃটেনের রণতরীর তুল্য-মূল্য হইবে। সুতরাং বাল্‌টিক সাগরে জার্ম্মাণ রণতরী বড় সামান্য ব্যাপার হইবে না। আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে গ্রেট বৃটেনের এই প্রকার উদারতা-প্রদর্শন আগামী নৌ-সমিতিতে নৌ-সঙ্কোচ প্রস্তাব করিবার পক্ষে অনুকূল হইবে না। ফ্রান্স ইতোমধ্যেই বলিয়া উঠিয়াছেন যে, তাঁহারা দ্রুতবেগে তাঁহাদের রণতরী বর্দ্ধিত করিতে থাকিবেন। আসল কথা, রণতরী-সঙ্কোচনের প্রস্তাবটা এইবার বোধ হয় মাঠে মারা যাইবে। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, গ্রেট বৃটেনের এই কায করা ঠিক হয় নাই। আমরা এই যুক্তির মর্ম্ম বুঝি না। বিগত মহাসমরে জার্ম্মাণী পরাজিত হইয়াছিল বলিয়া যে, ঐ প্রতিভা-শালী জাতিকে চিরকাল দমিত করিয়া রাখা সম্ভব হইবে, ইহা মনে করাই ভুল। বিজয়ী মিত্রশক্তিবর্গ জার্ম্মাণীকে চিরতরে পঙ্গু করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা তাহা পারিলেন কি? আজ জার্ম্মাণীতে কৈশর নাই, কিন্তু হার হিটলারের হুঙ্কারে যুরোপ সন্ত্রস্ত। এরূপ অবস্থায় বৃটেন জার্ম্মাণীর সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া বা উদারতা দেখাইয়া যদি জার্ম্মাণীর মনে শুভেচ্ছা জাগাইতে পারেন ত তাহার ফল ভালই হইবে মনে হয়।

চাকো সংগ্রাম

এত দিনে দক্ষিণ-আমেরিকার প্যারাগুয়া এবং বোলিভিয়া সংগ্রামের অবসান হইল। গত ১৫ই জুন তারিখে উভয় যুযুধান জাতির পক্ষ হইতে সেনাপতিগণ ভেরীধ্বনি করিয়া নিজ নিজ দলের সৈনিকদিগকে জ্ঞাপন করিয়াছেন,—"ক্ষান্ত হও যোদ্ধগণ, কর অস্ত্র সম্বরণ।" সুদীর্ঘ চারি বৎসর পরে এই সমর-নিবৃত্তির সংবাদ যে সৈনিকদিগের নিকট কি মধুর মনে হইয়াছিল, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। ভীষণ কান্তারে যাহাদের ৫০ হাজার জুড়িদার অনন্ত শয়নে শয়ন করিয়াছে, ৮০ হাজার জুড়িদার বিকলাঙ্গ হইয়া অতিকষ্টে জীবনযাপন করিতেছে, তাহাদের পক্ষে এই সংগ্রাম-নিবৃত্তির সংবাদ বড়ই মনোরম হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গত ১২ই জুন আর্জেন্টিনার রাজধানী বুনোসআয়ার্স সহরে উভয় পক্ষের প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়া সন্ধির চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছেন। লক্ষ বর্গমাইল বিস্তীর্ণ স্থানের সম্মুখে সাড়ে পাঁচ শত মাইল বিস্তীর্ণ রণক্ষেত্রে ১৫ই জুন অগ্নিবর্ষণ ক্ষান্ত হইয়াছে।

য়ুরোপীয়দিগের মন্তব্য পড়িয়া এ দেশের অনেকের মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, ঐ দুইটি বিবদমান জাতি অকারণ এই চারি বৎসর ধরিয়া সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। এ ধারণা একবারেই ভুল। অকারণে কেহই ধন-জন ক্ষয় করিয়া যুদ্ধ করে না। সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ বুঝে। চাকো স্থানটি একবারে জঙ্গলাকীর্ণ কান্তার নহে। বিবাদের বিষয়ীভূত এই স্থানটি প্যারাগুয়ার উত্তরে এবং বোলিভিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত। উহার দক্ষিণাংশ প্যারাগুয়ার এবং উত্তর অংশ বোলিভিয়ার অধীন ছিল। যে অংশ প্যারাগুয়ার অধীন ছিল, তাহাতে লক্ষাধিক প্যারাগুয়াবাসীর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় হয়। তদ্ভিন্ন তথায় পনর লক্ষ গৃহপালিত পশু আহার্য্যাদি পায়। এই অঞ্চলের জন্য আর্জেন্টিনা রাজ্যও পশুপালনকার্য্য সহজে নির্ব্বাহ করে। প্যারাগুয়া আর্জেন্টিনার গোচরভূমির একটা অংশ বলিলেও বেশী বলা হয় না। তদ্ভিন্ন এই চাকো অঞ্চলে প্যারাগুয়ার অনেক পরিমাণে ট্যানিন্ উৎপন্ন হয়। পৃথিবীতে যত ট্যানিন (Tannin) উৎপন্ন হয়, তাহার তিন ভাগের এক ভাগ প্যারাগুয়ার চাকোস্থিত অঞ্চলের কারখানাতে জন্মে। প্যারাগুয়ার রেলপথের অর্দ্ধেক রহিয়াছে চাকো অঞ্চলে। তথায় কলকারখানার সংখ্যাও অনেক। সেই সকল কলকারখানায় প্যারাগুয়ানদের লক্ষ লক্ষ টাকা খাটিতেছে। তথায় অনেকগুলি সহরও আছে; সেই সহরে পোষ্ট আফিস, টেলিগ্রাফ, এমন কি, টেলিফোনও রহিয়াছে। সুতরাং প্যারাগুয়ানদের ঐ অঞ্চলের উপর মমতাবুদ্ধি থাকা অস্বাভাবিক নহে। চাকো অঞ্চলই প্যারাগুয়াবাসীদের সমৃদ্ধির মূল।

বোলিভিয়ারও এই অঞ্চলটি দখল করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। সকল রাজ্যেরই বহির্বাণিজ্য-বিস্তারের জন্য বারিধির বেলাভূমিতে অধিকার থাকা আবশ্যক। বোলিভিয়ার তাহা ছিল। কিন্তু চিলি তাহা ইদানীং বোলিভিয়ার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছে। চিলি এখন প্রবল রাজ্য। সুতরাং বোলিভিয়ার পক্ষে চিলির নিকট হইতে তাহার উদ্ধারসাধন অসম্ভব। অগত্যা বোলিভিয়াবাসীরা পূর্ব্বদিক দিয়া সাগর-বক্ষে যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। দক্ষিণ-আমেরিকার সমস্ত ভূমিই পূর্ব্বদিকে আনত। পশ্চিমদিকে আণ্ডিস পর্ব্বত মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান। ঐ দিক দিয়া যাইতে পারিলে প্রশান্ত মহাবারিধি নিকটবর্ত্তী হয় সত্য, —কিন্তু আণ্ডিস লঙ্ঘন করিয়া যাওয়া যেমন কঠিন, তেমনই ব্যয়সাধ্য। সুতরাং পূর্ব্বদিকের আনত ভূমিতে প্রবাহিত নদী বহিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরে যাইবার চেষ্টা স্বাভাবিক। সেই জন্য বোলিভিয়াবাসীরা পিলকোমিয়ো নদী বহিয়া পূর্ব্বদিকে অবস্থিত আটলাণ্টিক মহাসাগরাভিমুখে যাইবার প্রয়াস পাইয়াছিল। সুতরাং বোলিভিয়ার প্রয়োজনও নিতান্ত সামান্য ছিল না। অবশ্য তাহার পক্ষে মাডেইরা উপনদী বাহিয়া আমাজন নদ ধরিয়া আটলাণ্টিকে যাইবার পথ আছে। কিন্তু প্রবল বিদেশী রাজ্যের ভিতর দিয়া যাইতে হয় বলিয়া সে পথ বিঘ্নসঙ্কুল। সুতরাং বোলিভিয়া তাহার দুর্ব্বল এবং বিরলবসতি প্রতিবেশী প্যারাগুয়ার দিকে অধিকার-বিস্তারের চেষ্টা করে।

বোলিভিয়া অনেক দিন হইতে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছিল। ঐ দেশের রাজনীতিকরা জার্ম্মাণী হইতে সেনাপতি কুণ্ড (Kundt) এবং কাপ্তেন রোহম (Roehm)কে আনিয়া তথাকার আদিম অধিবাসীদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। সুতরাং যে সময়ে যুদ্ধ বাধিয়া উঠিয়াছিল, সে সময়ে বোলিভিয়ার সৈন্য-সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ৮০ হাজার। ইহা অগ্রাহ্য করিবার মত ছিল না।



কাপ্তেন রোহম

প্যারাগুয়ার বোলিভিয়ার ন্যায় সম্পদ নাই। তাহারা বোলিভিয়ার ন্যায় সমরসজ্জায় সজ্জিত হইতে পারে নাই। তবে বোলিভিয়া যেমন যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার জন্য জার্ম্মাণীর শরণ লইয়াছিল, প্যারাগুয়াবাসীরা তেমনই যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার জন্য ফ্রান্সের দ্বারস্থ হইয়াছিল। প্যারাগুয়া সৈন্যের প্রধান সেনাপতি কর্ণেল এষ্টিগেরিবিয়া ফ্রান্সের সামরিক বিদ্যালয়ে সমরবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য গিয়াছিলেন। প্যারাগুয়ার সৈনিকগণ ফরাসী সৈনিকদিগের আদর্শে গঠিত।

যখন উভয় পক্ষই বিবাদ বাধাইবার জন্য ব্যাকুল হয়, তখন বিবাদের অছিলার আর অভাব হয় না। তবে এ কথা সত্য যে, গোড়ায় বোলিভিয়াই যুদ্ধ বাধায়। চাকোর সেই জলজঙ্গলাকীর্ণ পতিত ভূমিতে উভয়পক্ষের সৈনিকগণ সমাবিষ্ট হইল। প্রথমে কোন পক্ষেরই জয়-পরাজয় ঘটে নাই। ক্রমে রণচণ্ডিকা প্যারাগুয়ার দিকে অনুকম্পাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। প্যারাগুয়ান্ সৈনিকগণ জয়যুক্ত হইতে থাকিল। তাহার কারণ, বর্ত্তমান যুগে যুদ্ধের একটা বড় ব্যাপার এই যে, যাহারা আত্মরক্ষা করে, তাহারা অনেকটা

সুবিধা পায়,—আর যাহারা ত্বরিতগতিতে আবশ্যক জিনিসের যোগান পায়, তাহারাই জয়যুক্ত হয়। প্রথম কয়েক মাস প্যারাগুয়ান সৈন্য কেবল আত্মরক্ষা করিয়াই যায়, কাযেই বোলিভিয়ানদিগেরই সৈন্যক্ষয় অধিক হইতে থাকে। যে স্থানে যুদ্ধ হইতেছিল, সে স্থান প্যারাগুয়ানদিগের বিশেষ পরিচিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ প্রকৃত যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্যারাগুয়ানদিগের দ্রব্যাদি যোগাইবার মূল স্কন্ধাবার দূরে ছিল না। রণস্থলে রসদাদি লইয়া যাইবার জন্য রসদ-বোঝাই ট্রেণগুলিকে অধিক দূর যাইতে হইত না। অধিকন্তু বোলিভিয়ার সাধারণ সৈনিকদিগের মনে দেশাত্মবোধ খুব প্রবল ছিল না। প্যারাগুয়ান সৈনিকদিগের তাহা ছিল। প্যারাগুয়ান সৈনিকরা যোত-জমার মালিক; বোলিভিয়ার সৈনিকগণ সকলেই ঋণগ্রস্ত দিনমজুর। কাযেই প্যারাগুয়ার দিকে সুবিধা অধিক ছিল। বিজয়ী প্যারাগুয়ান সৈন্য প্রথমে জয়ী হইয়া উল্লাসের সহিত অগ্রসর হইতে থাকিল। কিন্তু অগ্রগতির সহিত প্যারাগুয়ান সৈন্যদিগের একটা অসুবিধা ঘটিতে থাকিল। তাহারা ক্রমশঃ তাহাদের রসদাদি যোগাইবার মূল স্কন্ধাবার হইতে দূরে যাইয়া পড়িতে থাকিল। গোড়ায় বোলিভিয়ান সৈনিকদিগকে যে অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল, পরে প্যারাগুয়ার সৈনিকদিগের ক্রমশঃ সেই অসুবিধা দেখা দিতে থাকিল। কাযেই তাহাদের আক্রমণের প্রচণ্ডতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকিল। শেষে যখন তাহারা পর্ব্বতের পাদমূলে আসিয়া উপনীত হইল, তখন নৈরাশ্য আসিয়া তাহাদের হৃদয় অধিকার করিল। তাহারা কোন কোন যুদ্ধে পরাজিত হইতে থাকিল। যে সময়ে প্যারাগুয়ান সৈন্য ভীমবিক্রমে অগ্রসর হইতেছিল, সে সময়ে বোলিভিয়ার রাজধানী লাপাজে একটা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার ফলে বোলিভিয়ার প্রেসিডেন্টের এবং প্রধান সেনাপতির পরিবর্ত্তন ঘটে। লোক রণশ্রান্ত হইয়া উঠে। যুদ্ধে ক্ষান্ত দিবার জন্য জনতা হাঙ্গামা করিতে থাকে। ফলে উভয় পক্ষের রণশ্রান্তিই এই যুদ্ধবিরতির প্রধান কারণ।

এই ব্যাপারে লীগ অফ নেশন্স অর্থাৎ জাতিসঙ্ঘের বিফলতা বিকট মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। অতবড় হোমরাচোমরা জাতি কর্ত্তৃক গঠিত প্রতিষ্ঠান যে দুইটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জাতির বিরোধ থামাইতে পারিলেন না,—ইহা সত্য সত্যই বিস্ময়ের বিষয়। ইহাতে সন্দেহ হয় যে, শান্তিপ্রতিষ্ঠাই জাতিসঙ্ঘের লক্ষ্য নহে। যত দিন পর্য্যন্ত যুযুধান জাতিদ্বয় রণশ্রান্তিতে একবারে অবসন্ন হইয়া না পড়িয়াছিল, তত দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিতে দেওয়াই জাতিসঙ্ঘের ঘোর অকর্ম্মণ্যতাই প্রকটিত করিয়াছে।

—

ইটালী এবং ইথিওপিয়া

ইটালী এবং ইথিওপিয়া বিবাদের এ পর্য্যন্ত কোন কিছুই মীমাংসা হইল না। ইটালীয় সৈন্য এবং রণবিমান ক্রমাগতই আবিসিনিয়া অভিমুখে ছুটিতেছে, এইরূপ সংবাদ ক্রমশঃই পাওয়া যাইতেছে। মধ্যে সংবাদ আসিয়াছিল যে, ইটালী হইতে শতাধিক রণবিমান আবিসিনিয়া অভিমুখে ছুটিয়াছে। ইটালীর প্রধান মন্ত্রী বেনিটো মুসোলিনী ইটালীতে যে সকল রৌপ্য-মুদ্রা বাজারে চলিতেছিল, তাহা সমস্তই প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন এবং তাহার পরিবর্ত্তে কাগজের নোট ইটালীতে চালাইতেছেন। মুসোলিনীর এইরূপ করিবার হেতু আছে। আফ্রিকার প্রায় সকল দেশেই রৌপ্য-মুদ্রা চলিত রহিয়াছে। সুতরাং যুদ্ধের সময় ঐ অঞ্চলে খরচ করিতে হইলে রৌপ্য-মুদ্রারই প্রয়োজন। সুতরাং ইটালী হইতে রজত মুদ্রা আহরণ করিয়া তাহা হইতে মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া তাহা পূর্ব্ব-আফ্রিকায় প্রেরণ করা হইতেছে। সে দেশের লোক নোট লইতে চাহে না। এ দিকে মার্কিণ এখন অনেক রূপা খরিদ করিতেছেন, সে জন্য রূপার দরও চড়িতেছে। ইটালীতে সেই জন্য রজতের মূল্য অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। তাই ইটালীর কর্ণধার তাঁহার দেশে মুদ্রারূপে যে রূপা বিরাজ করিতেছিল, তাহাই আহরণ করিয়া উপস্থিত সময় কাজ চালাইবেন, স্থির করিয়াছেন। ৫ লিরা, ১০ লিরা এবং ২০ লিরা মূল্যের মুদ্রা সমস্তই প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহাতে মুসোলিনী যুদ্ধের জন্য কিরূপ প্রস্তুত হইয়াছেন এবং হইতেছেন, তাহা বুঝা যাইতেছে। ইহা ভিন্ন ইতোমধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার ইটালীয় সৈন্য সুয়েজখাল পার হইয়া গিয়াছে এবং ইটালীয় সৈনিকদিগের জন্য ১৩ হাজার টন খাদ্য-শস্য ক্রয় করা হইয়াছে। তিনি এরূপ ভাবে প্রস্তুত হইয়াছেন যে, মীমাংসার কথা শেষ হইলেই যদি যুদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে একবারে পূর্ণবলে যাহাতে হাবসী রাজ্যকে আক্রমণ করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেছেন।

এ দিকে আবিসিনিয়ার নৃপতি হাইলাস সিলাসী ইটালীর এই উদ্যোগপর্ব্বে ভীত হইতেছেন না। বিংশ শতাব্দীর প্রথমেই হাবসী নৃপতি মেনেলেক বলিয়াছিলেন যে, সর্ব্বশক্তিমান ভগবান ইথিওপিয়াকে এ পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, আমার বিশ্বাস, তিনি অতঃপরও এই দেশকে রক্ষা করিতে থাকিবেন। মেনেলেক যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আজ সম্রাট হাইলাস সিলাসীর মুখেও সেই কথা। বিলাতের লোকরা হাইলাস সিলাসীকে রাস তাফারী নামে ডাকে। তিনি হারার নামক আবিসিনিয়ার এক অঞ্চলের শাসনকর্ত্তার পুত্র। হারারের ফরাসী মঠের সন্ন্যাসীদিগের নিকট তিনি বাল্যে শিক্ষালাভ করিয়াছেন এবং ফরাসী ভাষা অনর্গল বলিতে পারেন। তিনি রীতিমত সুশিক্ষিত। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং তাহা ছাপাইয়াছেন। ইনি ইথিওপিয়ার ভূতপূর্ব্ব নৃপতি মেনেলেকের ভ্রাতুষ্পুত্র। মেনেলেকের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী রাণী জৌডিটু বা জুডিথ ইথিওপিয়ার সিংহাসন প্রাপ্ত হন। সেই সময় হাইলাস সিলাসী তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতপত্নীর প্রতিনিধি রাজা-রূপে রাজকার্য্য পরিচালিত করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠতাতপত্নীর মৃত্যুর পর তিনিই ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ইথিওপিয়ার সিংহাসন লাভ করিয়াছেন। ইনি বিশেষ বিবেচক ব্যক্তি। রাজনীতিক বিষয়ে ইহার জ্ঞান অনন্যসাধারণ। ইথিওপিয়া দেশটি যেন প্রকৃতি কর্ত্তৃক সুরক্ষিত। ইহার চারিদিকে যে মরুকান্তার আছে, তাহা পার হইয়া যাওয়াই য়ুরোপীয় সৈনিকদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। তদ্ভিন্ন এই আগষ্ট মাসের শেষ পর্য্যন্ত তথায় বর্ষা থাকিবে। এই সময়ে তথাকার স্বাস্থ্য অতিশয় মন্দ হয়। বর্ষায় তথায় মড়ক দেখা দেয়। মড়কে য়ুরোপীয়গণ যত সহজে আক্রান্ত হয়, দেশীয়গণ তত অধিক মরে না। তাহার উপর এই বন্ধুর দেশে সামরিক পদ্ধতিতে ব্যূহ রচনা করিয়া য়ুরোপীয় যোদ্ধাদিগের অগ্রসর হওয়াই কঠিন হইবে। পার্ব্বত্য অরণ্যানীর মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে যাইয়া অনেক ইটালীয় সৈন্য মারা পড়িবার সম্ভাবনা। সুতরাং যুদ্ধ বাধিলে

ইটালীর অসুবিধাও যথেষ্ট ঘটিবে। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হয় আশ্বিন-কার্ত্তিকমাসের পূর্ব্বে যুদ্ধ বাধিবে না। য়ুরোপীয়রা আবিসিনিয়ায় অস্ত্র-শস্ত্র রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু মার্কিণ, জাপান, আয়র্লণ্ড প্রভৃতি ইহাদিগকে অস্ত্র যোগাইবেন কি না, কে বলিতে পারে? শুনা যায়, অনেক আইরিশ নাকি বিনা পারিশ্রমিকে হাবসীদিগকে সাহায্য করিতে চাহিতেছেন। জাপানও হাবসীদিগের পক্ষ অবলম্বন করিবেন শুনা যাইতেছে। জার্ম্মাণরা কি করিবেন, তাহা অবশ্য ঠিক বুঝিয়া উঠা যাইতেছে না।

জাতিসঙ্ঘ এই ব্যাপারে বড় একটা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। হাবসী নৃপতি রাস তাফারি বহুদিন ধরিয়া এই বিবাদ মিটাইয়া দিবার জন্য জাতিসঙ্ঘকে ধরিয়া বসিয়াছেন। কিন্তু ইটালী কিছুতেই যেন সম্মত হইতেছেন না। মুসোলিনীর মনের বাসনা এই যে, এই ইথিওপিয়া যেমন এক সময়ে ইটালীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিল, সেইরূপ এবার তিনি ইটালীর সেই জাতীয় অবমাননার প্রতিশোধ লইবেন, তিনি ইটালীয়ান জাতিকে কিরূপ পরাক্রমশালী করিয়াছেন, তাহা দেখাইবেন। তাঁহার একটা বড় ভরসা আছে যে, হাবসী জাতি যতই দুর্দ্ধর্ষ হউক,—আকাশ হইতে বোমা বর্ষণ করিয়া উহাদিগকে পরাজিত করা সহজ হইবে। আকাশপথে অতি ঊর্দ্ধে রণবিমান চলিলে ধরাচারীর পক্ষে তাহা দেখিতে পাওয়া কঠিন। অনেক সময় শব্দ কাণে আসিয়া পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই বোমা আসিয়া পড়ে,—এবং ধরণীবক্ষে বিচরণকারী শুধু ব্যাপার কি তাহা বুঝিবার পূর্ব্বেই উহা বিদীর্ণ হইয়া শত শত যোদ্ধার দেহ ধূলায় লুটাইয়া দেয়। ইটালী মনে ভাবিতেছেন যে, ঐ রণবিমানের সাহায্যেই তিনি হাবসী যোদ্ধাদিগকে শিক্ষা দিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু উহা যে নিশ্চিত সফল হইবে, সেরূপ সম্ভাবনা নাই। কারণ, এই উচ্চাবচ-গিরিপর্ব্বতসমাকীর্ণ এবং মধ্যে মধ্যে ঘন বনানীসমাকুল দেশে বোমাবর্ষণে যে বিশেষ কোন ফল ফলিবে, তাহা মনে হইতেছে না। কারণ, গিরিকন্দরে, ঘন-বনমধ্যে কোথাও কোন সৈনিকের গুপ্ত শিবির আছে কি না, তাহা অত ঊর্দ্ধ হইতে সহজে লক্ষিত হইবে না, বরং গিরিশিখরস্থিত সৈনিকের গুলীতে বিমানসহ বিমানচারীদিগকে ভূপাতিত করা সহজ হইতে পারে।

চীন ও জাপান

গত মাসের বৈদেশিক সন্দর্ভে আমরা "চীন ও জাপান" সম্বন্ধে একটি সন্দর্ভ লিখিয়া, মহাচীনে জাপান কিরূপ আপনাদের অধিকার বিস্তৃত করিতেছে ও করিয়াছে, তাহার আভাস প্রদান করিয়াছি। যে সময়ে সার জন সাইমন পররাষ্ট্র বিভাগে প্রবেশ করেন, সেই সময় সুদূর-প্রাচীতে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিয়াছিল। আবার বর্ত্তমান সময়ে সার স্যামুয়েল হোর যে সময়ে বিলাতী পররাষ্ট্র বিভাগে কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন, ঠিক সেই সময়েই আবার ঐ দিকে ঐরূপ একটা হাঙ্গামা ঘটিয়া গেল। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, জাপান এখন হোয়াংহো নদের উত্তর হইতে মাঞ্চুকুয়ো পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ অধিকৃত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। এই স্থানেই চীনের পুরাতন রাজধানী পিকিং সহর এবং টিয়েনসিং সহর অবস্থিত। এক টিয়েনসিং সহরেই প্রায় দশ লক্ষ লোকের বাস। এই বিস্তীর্ণ স্থান চীনের প্রাচীন প্রাচীরের ভিতরে অবস্থিত। অতএব জাপান যদি সত্য সত্যই এই অঞ্চলটি অধিকার করিয়া লয়, তাহা হইলে চীনের প্রাচীন প্রাচীরই যে তাহার রাজ্যের সীমা, এ কথা আর বলিবার উপায় থাকিবে না। এই স্থানের সহিত মহাচীনের অনেক ঐতিহাসিক অবদান জড়িত রহিয়াছে। অবশ্য এ কথা সত্য যে, জাপান এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই যে, তাঁহারা এ দেশটি সম্পূর্ণরূপে দখল করিয়া লইলেন। তাঁহারা এখানে ঠিক কি করিবেন, তাহা আর কিছুদিন অতিবাহিত হইয়া না গেলে বুঝা যাইতেছে না। জাপান কেবল ঐ অঞ্চলটি তাঁহাদের প্রতিকূল পক্ষের প্রভাব হইতে মুক্ত করিতে চাহেন, কি উহাকে একবারে আপনাদের খাসদখলে আনিতে চাহেন, তাহাই দ্রষ্টব্য। কিন্তু এই ব্যাপারটার ভিতর আর একটা বড় ব্যাপার রহিয়াছে। ইহার ৩ শত মাইল দূরে ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরস্থ ভূমিতে ইংরাজ এবং মার্কিণের স্বার্থ আছে। কাযেই এই ব্যাপারে তাঁহাদের উদ্বেগের হেতু উপস্থিত হইয়াছে। চীনের জাতীয় সরকার এই ব্যাপারে বিশেষ কোন আপত্তি করিলেন না কেন, তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না। চীনের সমর-সচিব যো হিং চিন এই ব্যাপারে পদত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, এই ব্যাপারে চীনকে হতমান এবং অপদস্থ হইতে হইয়াছে।

মাঞ্চুরিয়াতে ভূমিজ তৈলের খনি আছে। সেই অঞ্চলে সকল জাতি অবাধে বাণিজ্য-ব্যবসায় চালাইতে পারিবেন, কথা ছিল। কিন্তু মাঞ্চুকুয়ো সরকারের কর্ত্তৃপক্ষ এখন নাকি তাহাতে বাধা ঘটাইতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে, তাঁহারা তৈলের ব্যবসায় একচেটিয়া রাখিবেন। ইংলণ্ড এবং মার্কিণ তাহাতে আপত্তি করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে, মাঞ্চুকুয়ো রাজ্যটি স্বতন্ত্র রাজ্য নহে, উহা জাপানেরই বেনামী রাজ্য। জাপানীরা বলিতেছেন যে, মাঞ্চুকুয়ো রাজ্যটি স্বতন্ত্র রাজ্য। ঐ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় জাপানীরা হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। ইহা লইয়া একটা বিবাদের উদ্ভব হওয়া অসম্ভব নহে। জাপান বলিতেছেন, অন্য রাষ্ট্রনায়কগণ মাঞ্চুকুয়োকে স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন। কিন্তু য়ুরোপীয়রা তাহা স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। এখন এই ব্যাপার লইয়া কোথাকার জল কোথায় যাইয়া দাঁড়ায়, তাহা বুঝা যাইতেছে না। ফলে পূর্ব্ব-এসিয়াতে একটা প্রবল ঝটিকা-কেন্দ্রের উদ্ভব হইতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। গত ২৯শে এপ্রিল সার জন সাইমন বিলাতের কমন্সসভায় যে মন্তব্য পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বৃটিশ জাতির পক্ষ হইয়া জাপানকে তাহার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন। মার্কিণের সংবাদপত্রেও ঐরূপ ভাবের অভিযোগ অনেক শুনা যাইতেছে। তাই মনে হইতেছে যে, প্রাচ্যখণ্ডে চীন ও জাপান যেন অগ্নিগর্ভ গিরির ন্যায় বিরাজ করিতেছে। য়ুরোপে জার্ম্মাণীকে লইয়াও একটা উদ্বেগজনক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। সেই জন্য কোন জাতিই আর সহসা সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতে সাহসী হইতেছেন না বা ইচ্ছা করিতেছেন না। এখন কেবল অজাযুদ্ধের অথবা প্রভাতে মেঘাড়ম্বরের ন্যায় তাল-ঠোকাঠুকি ও গর্জ্জনের বাহুল্যই দেখা যাইতেছে। ইহা যে বিশেষ উদ্বেগের সৃষ্টি করিতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।



ইটালী এবং আবিসিনিয়া

ইটালী এবং আবিসিনিয়ায় যুদ্ধ অনিবার্য্য কি না, তাহা বলিতে পারা যায় না। সিনিয়োর মসোলিনী ইটালীর সর্ব্বেসর্ব্বা এবং তিনি যুদ্ধের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আবিসিনিয়ার নিকটে ইটালীর এরিট্রিয়া নামক উপনিবেশে সৈন্য ও যুদ্ধের এরোপ্লেন প্রেরিত হইতেছে। ইটালীতে সৈন্য সংগ্রহ হইতেছে, ইটালীনিবাসীরা যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত হইতেছে। কিন্তু এই যুদ্ধে য়ুরোপীয় আর কোন জাতির মত নাই। লীগ অব নেসনের পক্ষ হইতে চেষ্টা হইতেছে—যাহাতে সালিসী করিয়া বিবাদ মিটিয়া যায়, যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত না হয়। ইংলণ্ড বিশেষরূপে এই চেষ্টা করিতেছেন, ফ্রান্সও এ বিষয়ে ইংলণ্ডের সহযোগী। ইটালী ও আবিসিনিয়া উভয়ে লীগের সভ্য, লীগের প্রধান উদ্দেশ্য—যাহাতে কোন দুই জাতির মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত না হয়, কোনরূপ মতভেদ অথবা বিবাদ হইলে লীগ মধ্যস্থ হইয়া মিটাইয়া দিবেন।

ইটালীর ইতিহাস সকলেই জানেন, কিন্তু আবিসিনিয়ার বৃত্তান্ত অনেকের জানা নাই। প্রাচীন ইতিবৃত্তে ইথিওপিয়া নামক যে প্রসিদ্ধ সাম্রাজ্য ছিল, তাহাই আবিসিনিয়া। আফ্রিকায় এই শেষ সাম্রাজ্য। দক্ষিণ-আফ্রিকায় কেটিওয়েও নামক জুলু সম্রাটের সাম্রাজ্য এখন ইংরাজের অধীন, আফ্রিকায় এক আবিসিনিয়া ব্যতীত আর কোন স্বাধীন সাম্রাজ্য নাই। বাইবেলে কথিত আছে, সোবার রাণী জেরুজেলমে ইহুদীদিগের জগদ্বিখ্যাত রাজা সলোমনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। লিখিত আছে, সোবার রাণীর সহিত বিস্তর অনুচর, বহুসংখ্যক উষ্ট্র, রাশি রাশি সুবর্ণ, প্রচুর হীরক ও নানাবিধ রত্ন, এবং নানাবিধ সুগন্ধ মসলা ছিল। তিনি সেই সমস্ত সামগ্রী সলোমনকে উপঢৌকন দেন। প্রবাদ আছে যে, তাঁহাদের উভয়ের প্রণয়-সঞ্চার হয়। অবশেষে রাণী স্বদেশে ফিরিয়া যান। আবিসিনিয়ার বর্ত্তমান সম্রাটের নাম হেলি সেলাসী; কিন্তু তিনি সাধারণতঃ রাস তফারী নামে পরিচিত। ইনি নিজেকে সোবার রাণীর বংশধর বলেন। রাস তফারী খর্ব্বা পুরুষ, আকৃতি দীর্ঘ না হইলেও দেখিতে অত্যন্ত সুপুরুষ, হাবসী জাতির মত নয়। সম্রাট খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী, সুশিক্ষিত, ইংরাজী ও অপর য়ুরোপীয় ভাষা উত্তমরূপে বলিতে পারেন, কর্ম্মদক্ষ, সুচতুর। ইঁহাকে শ্যামবর্ণ নেপোলিয়ন বলে।

যথার্থ পক্ষে আবিসিনিয়ার সহিত ইটালীর বিবাদের কোন কারণ নাই। মেষশাবকের সঙ্গে নেকড়ে বাঘের বিবাদের যে কারণ, ইহাও তাহাই। য়ুরোপীয় জাতিরা সমস্ত পৃথিবী অধিকার করিতে চাহেন, নিজের নিজের দেশে তাঁহাদের কখন মনস্তুষ্টি হয় না, পরস্পরে সদ্ভাবও অধিক দিন থাকে না। সমগ্র আমেরিকাখণ্ড য়ুরোপীয় জাতিরা অধিকার করিয়াছেন। অষ্ট্রেলেশিয়াও তাঁহাদের করকবলিত। এই সকল দেশের আদিম নিবাসীরা হয় লুপ্ত হইয়াছে অথবা লোপ পাইতেছে। এসিয়ার অনেকটা অংশ তাঁহারা অধিকার করিয়াছেন। প্রশান্ত মহাসাগরে অনেক দ্বীপ য়ুরোপীয় জাতিদিগের অধীন। আফ্রিকার সমুদ্রতটস্থ প্রায় সকল দেশই তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে অনেক দেশ ইংরাজের অধীনে। পশ্চিমে ফরাসী জাতি বৃহৎ ভূমিখণ্ড অধিকার করিয়াছেন। দক্ষিণ-পূর্ব্বে পোর্টুগালের রাজ্য। আবিসিনিয়ার পার্শ্বে, সমুদ্রের তীরে ইটালীর অধিকৃত এরিট্রিয়া ও সোমালীদেশ, এবং এই দুই স্থানের মধ্যে ইংরাজের সোমালী-দেশ। আবিসিনিয়া হইতে আরব্য সাগরের কূলে যাইতে হইলে এই দেশের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। আবিসিনিয়ার সম্রাটের একান্ত অভিলাষ যে, সমুদ্রতীরে যাইবার পথ তাঁহাকে দেওয়া হয়। এ জন্য তিনি বিবাদ করিতে চাহেন

না, ভূমি-বিনিময় করিতে স্বীকৃত আছেন। সম্প্রতি এই বিবাদ উপস্থিত হইলে ইংলণ্ড আবিসিনিয়াকে পথ দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে অনেক ইংরাজ আপত্তি করেন।

আবিসিনিয়ার সংলগ্ন ইংলণ্ড ও ইটালীর রাজ্য আছে। ইংলণ্ডের সহিত আবিসিনিয়ার কোন বিবাদ নাই, ইটালীর সহিতই বা হয় কেন? এই কথা বুঝিয়া দেখিতে হইবে। ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য এবং উপনিবেশ-সমূহ এত বিস্তৃত যে, ইংরাজরা অপর নূতন দেশ অধিকার করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টিত নহেন। আফ্রিকার কিয়দংশ অনুর্ব্বর মরুভূমি



সিনিয়োর মুসোলিনী



আবিসিনিয়ার সম্রাট রাস তফারী

ব্যতীত ইটালীর আর কোন রাজ্য অথবা উপনিবেশ নাই, এ কারণে ইটালীর পক্ষে নূতন ভূমিখণ্ড অধিকার করিবার লালসা হওয়া বিচিত্র নহে। বিশেষ মুসোলিনী প্রাচীন রোমের গৌরব ও সাম্রাজ্য পুনরায় স্থাপন করিতে চাহেন। তিনি ফাসিষ্ট দলের নেতা, ইটালীর সৈন্যসংখ্যা অনেক বাড়াইয়াছেন। দেশের লোককে সর্ব্বদাই উত্তেজিত করিয়া থাকেন।

ইটালী এবং আবিসিনিয়ায় একবার সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। আবিসিনিয়ার সম্রাট মেনেলিকের কালে ইটালী ও আবিসিনিয়ায় উক্কিয়ালী নামক স্থানে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে সন্ধি স্থাপিত হয়। তাহার পরেই আবিসিনিয়ায় প্রভুত্ব স্থাপন করিবার জন্য ইটালীয় সৈন্য প্রেরিত হয়। আডোয়া নামক স্থানে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইটালীয়ানরা কেবল পরাজিত হয় নাই, তাহাদের অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য রক্ষা পায়। তখন যুদ্ধের এয়রোপ্লেনের সৃষ্টি হয় নাই, আকাশ হইতে বোমা নিক্ষেপ করিবার উপায় ছিল না। সেই পরাজয়ের পর অনেক দিন ইটালী আর কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই, কিন্তু সে অপমান ত বিস্মৃত হইবার নয়।

আবিসিনিয়া পার্ব্বত্য দেশ রাজধানী আদ্দিস আবাবা ৮০০০ ফুট উচ্চ। নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী নহে। মাটীর বাড়ী, টিনের ছাদ। আকাশ হইতে আক্রমণের আশঙ্কা হইলে তিন চার ঘণ্টায় সহর শূন্য হইতে পারে। চারিদিকে পর্ব্বত-গহ্বরে আশ্রয় লইবার যথেষ্ট স্থান আছে। রাজধানীতে সকল জাতির প্রতিনিধি আছে। ইটালী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, তুরস্ক, মিশর, জাপান, আমেরিকা সকল দেশেরই প্রতিনিধি দেখিতে পাওয়া যায়। আমেরিকা বলিয়াছেন—তাঁহাদের প্রতি-নিধি রাজধানী পরিত্যাগ করি-বেন না। যদি বাড়ীর উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইলে সে দায় ইটালীর। সম্রাট রাস তফারী বলিয়াছেন, বিদেশী-দিগকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা তিনি করিবেন।

জাপানে তুমুল আন্দোলন হইতেছে—যাহাতে ইটালী যুদ্ধসঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। সংবাদপত্রে, সভায় ও জনতা করিয়া জাপানীরা আবিসিনিয়ার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে ও ইটালীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছে। তাহার কারণ, আবিসিনিয়ার সহিত জাপানের বিস্তর ব্যবসা-বাণিজ্য আছে, যুদ্ধ বাধিলে তাহা একবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে আবিসিনিয়ায় অনেক বস্ত্র চালান হয়, সে ব্যবসা বন্ধ হইবে; সুতরাং ইংলণ্ড যে আবিসিনিয়ার পৃষ্ঠ-পোষকতা করিতেছেন, ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স, ইংলণ্ড এবং ইটালীতে এক সন্ধি

স্বাক্ষরিত হয়। তাহাতে লেখা আছে যে, আবিসিনিয়ার অনুমতিতে যদি ইটালী আবিসিনিয়া দেশে রেলপথ নির্ম্মাণ করেন, তাহা হইলে কোন আপত্তি নাই। আবিসিনিয়ার সম্রাট ইহার কিছুই জানেন না। তিনি ইটালী অথবা অপর কোন জাতিকে তাঁহার দেশে রেলওয়ে প্রস্তুত করিতে দিবেন না। পেশওয়ার হইতে কাবুলে রেলওয়ে করিবার প্রস্তাব অনেকবার হইয়াছে, কিন্তু কোন আমীর তাহাতে সম্মত হন নাই। ইটালী স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, মিশর দেশে ইংরাজরা যেমন প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছেন, ইটালীও আবিসিনিয়ায় সেইরূপ করিবেন। রাস তফারী বলিয়াছেন, আবিসিনিয়ানিবাসীরা প্রাণ থাকিতে ইটালীকে তাহাদের দেশে প্রবেশ করিতে দিবে না।

য়ুরোপের কোন না কোন জাতির সহিত যে বিবাদ হইবার সম্ভাবনা, রাস তফারী তাহা বহু কাল হইতে জানেন। —এক নিবিড় অরণ্যবেষ্টিত মধ্য-আফ্রিকা ব্যতীত য়ুরোপীয় জাতিরা সমস্ত আফ্রিকা গ্রাস করিতে উদ্যত, আবিসিনিয়া কত কাল রক্ষা পাইবে? সম্রাট যথাসাধ্য আয়োজন করিয়াছেন। বেলজিয়মের শিক্ষকগণ সৈন্যদিগকে অস্ত্র-শিক্ষা দিতেছেন ও যুদ্ধকৌশল শিখাইতেছেন। কতক নূতন অস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু ইটালীর তুলনায় আবিসিনিয়ার কিছুই নাই। যুদ্ধের এয়রোপ্লেন নাই, তেমন উৎকৃষ্ট তোপ নাই। তাহা হইলেও আবিসিনিয়া সহজে পরাজিত হইবে না। ফরাসী সৈন্যগণ রিফদিগকে দমন করিতে অনেক বেগ পাইয়াছিল, আবিসিনিয়াবাসীরা রিফদিগের অপেক্ষা আরও সাহসী ও বলবান্। সম্মুখ-যুদ্ধ ও সমান অস্ত্র হইলে কোন কথাই থাকিত না। আডোয়ার ব্যাপার পুনরায় অভিনীত হইত। ইটালীর এত লম্ফঝম্প অস্ত্র ও এয়রোপ্লেনের বলে। এ দিকে এরিটিয়ায় গ্রীষ্মের আতিশয্যে ইটালীয়ান সৈন্য ও অনুচরবর্গ দলে দলে পীড়িত হইয়া দেশে ফিরিয়া যাইতেছে।

এই বিবাদে ইটালীর পক্ষে কেহ নাই, কিন্তু ইটালীকে যে কোন জাতি নিবৃত্ত করিবে, তাহারও বিশেষ আশা নাই। কোন দিন আফ্রিকা লইয়া য়ুরোপে যুদ্ধ বাধিবে, কিন্তু তত দিন আবিসিনিয়া রক্ষা পাইবে কি? লীগ অব নেশন এ বিবাদ মিটাইতে না পারিলে তাহার অস্তিত্ব বৃথা।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরলোকে

আমরা অত্যন্ত গভীর শোকসন্তপ্ত-চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গীতাচার্য্য দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর ইহজগতে নাই। তিনি স্বনামধন্য দার্শনিক স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র এবং বিশ্বভারতীর সঙ্গীতাধ্যাপক ছিলেন। কণ্ঠসঙ্গীত—যন্ত্রসঙ্গীতের উৎকর্ষ-বিধান তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তিনি চিরজীবন একনিষ্ঠভাবে সেই ব্রতের সাধনা করিয়া গিয়াছেন। কবীন্দ্র ডক্টর শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহু গানে তিনি সুর সংযোগ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত তাঁহার সুরসাধনানৈপুণ্যে সর্ব্বজন-সমাদৃত হইয়াছিল। সেতার, এসরাজ প্রভৃতি তারের যন্ত্রে তিনি যে সুর-তরঙ্গ তুলিতেন, তাহা অতুলনীয়। তাঁহার সঙ্গীত-সাধনা-প্রভাবে ঠাকুর-বাড়ীর অভিনয়—সঙ্গীত-জলসায় সুরলহরী-প্রবাহে পুলক তরঙ্গায়িত হইত। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলিতেন যে, দিনেন্দ্রনাথ তাঁহার গানের কাণ্ডারী এবং ভাণ্ডারী। স্বদেশী আন্দোলনের সময় দিনেন্দ্রনাথ সঙ্গীতের উদ্দীপন ঝঙ্কারে স্বদেশী মন্ত্রের প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি কেবলমাত্র ভারতীয় সঙ্গীতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন না, পাশ্চাত্য সঙ্গীতবিদ্যায় তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৫৩ বৎসর হইয়াছিল। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। তাঁহার বিয়োগে সঙ্গীত-বিজ্ঞানের যে ক্ষতি হইল, তাহা অচির-ভবিষ্যতে পূর্ণ হইবার আশা নাই।



দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাময়িক প্রসঙ্গ



শরৎচন্দ্রের মুক্তিলাভ

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, কলিকাতার স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুকে সরকার গত ২৬শে জুলাই ১০ই শ্রাবণ শুক্রবার বেলা দ্বিপ্রহরের সময় বিনা সর্ত্তে মুক্তি দিয়াছেন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে সরকার বসু মহাশয়কে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩ রেগুলেশন অনুসারে ঝরিয়ায় গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অপরাধের কোন বিচার না করিয়া এই সুদীর্ঘকাল তাঁহাকে আটক করিয়া রাখিয়াছিলেন। শরৎ বাবুকে কি জন্য



শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু

এইরূপ অবিচারে আটক করা হইয়াছিল, তাহা দেশের লোক জানিতে পারে নাই। তাঁহাকে মুক্তি দিবার জন্য দেশের লোক সরকারকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন। জনসভা এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, হয় আদালতে প্রকাশ্যভাবে তাঁহার অপরাধের বিচার করা হউক, না হয়, তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হউক। শরৎ বাবু স্বয়ং সরকারকে পত্র দ্বারা জানাইয়াছিলেন যে, তিন জন আইন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা গঠিত আদালতে তাঁহার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অপরাধের বিচার করা হউক। তিনি যদি সেই আদালতের সম্মুখে তাঁহার নিরপরাধত্বের প্রমাণ দিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি হৃষ্টচিত্তে দণ্ড গ্রহণ করিবেন। বলা বাহুল্য, সরকার সে কথায় তখন কর্ণপাতও করেন নাই। তিনি কতকগুলি লোকের উপর গুরু অভিযোগ করিয়াছিলেন। তাহারও কোন তদন্ত হয় নাই। সরকারপক্ষ হইতে কেবল বলা হইয়াছিল যে, তিনি এক জন বিপজ্জনক ব্যক্তি। কি জন্য তিনি "বিপজ্জনক" বলিয়া বিবেচিত, তাহার কারণ কেহই নির্দ্দেশ করেন নাই। এরূপ ব্যবস্থা কেবল এ দেশের শাসকদিগের পক্ষেই সম্ভবে। যেরূপ সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপ ব্যাপারের মতামত গঠন করিয়া থাকেন, তাহার একটি প্রকট দৃষ্টান্ত সম্প্রতি মেদিনীপুরে পাওয়া গিয়াছে। যাহা হউক, সরকার যে শেষকালে শরৎ বাবুর সম্বন্ধে সুবিচার করিলেন, ইহা দেখিয়া আমরা আনন্দিত। যত দিন সার শ্যামুয়েল হোর ভারত-সচিবের পদে বসিয়াছিলেন, তত দিন শরৎ বাবুকে মুক্তি দেওয়া হয় নাই, ইহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। যাহা হউক, এখনও আরও অনেক গরীবের ছেলে যে এইরূপ বিনা বিচারে সরকার কর্ত্তৃক আটক হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে শীঘ্র মুক্তি পাইতে দেখিলে আমরা সুখী হইব।

—

পাকিস্থান

বিলাতে এক অদ্ভুত আন্দোলন উপস্থিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। তথায় পাকিস্থান আন্দোলন বলিয়া এক আন্দোলন উপস্থিত করা হইয়াছে। এই পাকিস্থান জাতীয় আন্দোলন করিবার জন্য নাকি এক সভা স্থাপিত হইয়াছে। সে সভা কোথায় আছে, তাহা কেহ জানে না,—সম্ভবতঃ উহার অবস্থান চন্দ্রলোকে! কিছুদিন পূর্ব্বে এই পাকিস্থান আন্দোলনের কথা শুনা গিয়াছিল। এই পাকিস্থানের অস্তিত্বের কথা তাহার পূর্ব্বে নরলোকে কেহ শুনিয়াছেন কি না, জানি না। এখন শুনা যাইতেছে যে, ঐ নামটি কয়েকটি স্থানের আদ্যাক্ষর হইতে গঠিত হইয়াছে; যথা—পাঞ্জাবের পি, আফগানিস্থানের এ, কাশ্মীরের কে। এই কয় স্থানের আদ্যক্ষর যোগ করিলে হয় "পাক"। ই অক্ষরটি নাকি ইরাণ হইতে গৃহীত। অতএব বুঝা গেল যে, পাকিস্থান আন্দোলনকারীরা প্রথমে পাঞ্জাব, আফগান রাজ্য, কাশ্মীর এবং ইরাণ রাজ্য লইয়া একটি স্বতন্ত্র এবং সম্ভবতঃ স্বাধীন রাজ্য গঠিত করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। পরে শাসকরা উহা পছন্দ করেন না বলিয়া আফগানিস্থান এবং ইরাণকে বাদ দিয়া তৎপরিবর্ত্তে সিন্ধু এবং বেলুচিস্থানকে উহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই পাকিস্থান নাম কোন দেশের কোন কালে ছিল কি না, তাহা আমরা জানিও না, শুনিও নাই। অন্ততঃ খাইবার এবং বোলান গিরিসঙ্কটের পূর্ব্বধারে ঐ নামের কোন দেশ ছিল না,—ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে।

যাহা হউক, এই সম্বন্ধে পাকাপাকিভাবে আন্দোলন সম্প্রতি উপস্থিত করা হইয়াছে। পাকিস্তান জাতীয় আন্দোলনের সভাপতি বলিয়া আত্মপরিচয়দাতা আলি নামধেয় এক ব্যক্তি সম্প্রতি বিলাতে এক ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন। ঐ ইস্তাহার ঐ অঞ্চলের সংবাদপত্রে প্রচার করা হইয়াছে এবং পার্লামেন্টের সদস্যদিগের নিকট বিলি করা হইয়াছে। বিলাতের লোক এ দেশের সম্বন্ধে কোন কথাই জানেন না, সেই জন্য ঐ ইস্তাহারে অনেক অদ্ভুত কথা বলা হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, ভারত-শাসন বিলে যে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহাতে পাকিস্থানের জাতীয় ভাবকে বিড়ম্বিত করা হইতেছে। এখন ঐ স্থানের জাতীয় ভাবের সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে। পাকিস্থানের এবং হিন্দুস্থানের মধ্যে যে অবস্থাগত পার্থক্য বিদ্যমান, তাহা গ্রেট বৃটেনের সদস্যদিগকে জানাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে পাকিস্থানের কৃষ্টিগত, ধর্ম্মগত এবং ঐতিহাসিক অবদান হইতে আসল হিন্দুস্থানের যে পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা বুঝা যাইবে না। পাকিস্থানে হিন্দুস্থানের লোকরা বাস করে না। ইহা চিরকালই জাতীয়তার দিক হইতে এবং ইতিহাসের দিক হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ইতিহাসের প্রথম আমল হইতেই উহা আমাদের (মুসলমানদিগের) বাসস্থান। প্রাচীনকাল হইতে এখানে আমাদের সভ্যতা বিস্তার লাভ করিয়াছে। হিন্দুরা হিন্দুস্থানকে যে কারণে তাহাদের জন্মভূমি বলিয়া দাবী করে, আমরাও পাকিস্থানকে সেই কারণে আমাদের পিতৃভূমি বলিয়া দাবী করি। হিন্দুরা যদি হিন্দুস্থানের চারি ভাগের তিন ভাগ লোক বলিয়া হিন্দুস্থানকে তাহাদের মাতৃভূমি বলিয়া দাবী করিতে পারে, তাহা হইলে আমরাই বা পাকিস্থানের পাঁচ ভাগের চারি ভাগ লোক হিসাবে ঐ স্থানকে আমাদের পিতৃভূমি বলিয়া দাবী করিতে না পারিব কেন? ইত্যাদি। উপসংহারে ঐ ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, "গোল টেবিল বৈঠকে যে সমস্ত আত্ম-মনোনীত মুসলমান ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনায় সম্মতি দিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের উপর আমাদের আস্থা নাই। তাঁহারা আমাদের জাতীয় স্বার্থকে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছেন।" এরূপ অদ্ভুত আব্দার কাহারা করিতে পারে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। এই ব্যক্তি কোথায় থাকেন, কি করেন, তাহা আমরা জানি না। ইঁহার কোন্ কথাটি সত্য, তাহাও আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। বর্ত্তমান যুগে যে এই ভাবে পুকুরকে পুকুর চুরি করা যায়, তাহা আমাদের জ্ঞান ছিল না। পঞ্চনদের নদীগুলি যথা—সিন্ধু, ইরাবতী, বিতস্তা, বিপাশা প্রভৃতি এখনও হিন্দুদিগের প্রদত্ত নামই বহন করিয়া আসিতেছে। বিপাশা নদীতে পড়িয়া ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ পাশমুক্ত হইয়াছিলেন,—সেই জন্য ঐ নদী তাঁহার নামে আজিও সেই প্রাচীন যুগের স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছে। মুসলমানগণ যদি বলেন যে, পরে তাঁহারা ঐ দেশ জয় করিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া ঐ দেশ তাঁহাদের হইয়াছে, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে, শিখরা পঞ্চনদ দেশ মুসলমানদিগের নিকট হইতে জয় করিয়া লইয়াছেন, অতএব ঐ দেশ তাঁহাদের। কাশ্মীর সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যায়। এক দিন যাঁহারা ইরাণ-তুরাণের দিকে মুখ ফিরাইয়া-ছিলেন, তাঁহারা হঠাৎ পাকিস্থানরূপ একটা কাল্পনিক রাজ্যের এত ভক্ত হইয়া দাঁড়াইলেন, ইহার কারণ কি? ইহার ভিতর কাহাদের গুপ্ত চাল আছে, তাহা বুঝা কঠিন।

মন্ত্রিত্ব-গ্রহণ

কংগ্রেসের সদস্যগণ বৃটিশ রাজসরকারের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবেন কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর এক বৈঠক বসিয়াছিল। ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর এই অধিবেশন করিবার উদ্দেশ্য, সম্ভবতঃ কংগ্রেস-কর্ত্তারা ঐ স্থানে থাকিলে ঐ সম্বন্ধে তাঁহারা মহাত্মাজীর পরামর্শ অনুসারে চালিত হইতে পারিবেন। ফলে মহাত্মাজী কংগ্রেসকে ছাড়িলেও কংগ্রেস মহাত্মাজীর আশ্রয় ছাড়িয়া চলিতে সমর্থ নহেন। এ সম্বন্ধে মহাত্মাজী কোন পরামর্শ দিয়াছেন কি না, তাহা অবশ্য প্রকাশ নাই। যাহা হউক, ওয়ার্দ্ধাগঞ্জে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যগণ এক বিশাল বটবৃক্ষসমারূঢ় নানা পক্ষীর ন্যায় নানা কলরব তুলিয়া শেষটা সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, এ সম্বন্ধে এখন কোন পাকাপাকি সিদ্ধান্ত করিবার সময় আইসে নাই। কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের জন্য ঐ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হইল। সুতরাং সকল পথ দৌড়াদৌড়ি করিয়া শেষটা খেয়াঘাটে যাইয়া গড়াগড়ি দেওয়াই সাব্যস্ত হইল। সত্যমূর্ত্তি, শামমূর্ত্তি প্রভৃতি নানামূর্ত্তি এক সুরে ধুয়া ধরিয়াছেন যে, এইরূপ একটা গুরুবিষয়ের মীমাংসা তাড়াতাড়ি করা সঙ্গত নহে। আমরা এই বিষয়টিকে বিশেষ গুরুতর বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। এখন কংগ্রেসের নীতি কি হইবে, তাহাই সর্ব্বাগ্রে সাব্যস্ত করা উচিত। কংগ্রেস অসহযোগ এবং আইন অমান্য নীতি বর্জ্জন করিয়াছেন। মহাপ্রলয়কালে পরব্রহ্ম যেমন সমস্ত সৃষ্টিকে আপনার মধ্যে সংহৃত করিয়া লয়েন, সেইরূপ মহাত্মাজীও আইন অমান্য আন্দোলন আপনাতেই সংহরণ করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং বাহ্যজগতে আর তাহার অস্তিত্ব নাই। ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রবেশ করিয়া কংগ্রেস অসহযোগিতার পিণ্ডদান করিয়াছেন। অথচ তাঁহারা বলিতেছেন যে, কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া নূতন শাসনব্যবস্থার বিরোধিতা করিবার সুবিধা হইবে। কিন্তু তাহার ফল যে কি দাঁড়াইবে, তাহা এই কয় বৎসরের অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝা গিয়াছে। তাই জিজ্ঞাসা করি—এখন কংগ্রেস কি করিবেন? যদি পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রাখিয়া কার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে যাঁহারা সাইমন কমিশন হইতে এই শাসন-সংস্কার-সম্পর্কিত সকল ব্যাপারকে বর্জ্জন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের কোনমতেই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা উচিত নহে। তা তাঁহারা নরমপন্থীই হউন আর গরমপন্থীই হউন। আর তোমরা মন্ত্রিত্ব লইয়াই বা কি করিবে? কোনও ব্যবস্থাপক সভাতে ত তোমাদের দল ভারি হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে এত গুরু চিন্তার হেতু কি? শাসন-সংস্কার আমলে আসিবার এখনও বিলম্ব আছে। সুতরাং ধৈর্য্য ধর।

সাম্প্রদায়িক পুরস্কার

অমৃতবাজার পত্রিকা একটি অতি মজার সংবাদ দিয়াছেন। সংবাদটি সত্য কি না, ঠিক বুঝিতে পারা যাইতেছে না। তবে সংবাদটি কয়েক দিন পূর্ব্বে প্রকাশিত হইলেও এই মন্তব্য লিখিবার সময় পর্য্যন্ত ইহার কেহ কোন প্রতিবাদ করিল না, সেই জন্য উহা যে একবারেই মিথ্যা, ইহা মনে হইতেছে না। সংবাদটি

অদ্ভুত। প্রকৃত ব্যাপার কি দাঁড়ায়, তাহা না জানিলে কোন কথাই বলা যাইতেছে না। অমৃতবাজারের প্রদত্ত সংবাদটি এই :—আগামী শাসন-সংস্কার যন্ত্র যখন প্রবর্ত্তিত হইবে, তখন এই বাঙ্গালাদেশের শাসন-পরিষদে আট জন মন্ত্রী হইবেন। ঐ আট জন মন্ত্রীর মধ্যে ৫ জন হইবেন মুসলমান, এক জন হইবেন য়ুরোপীয়, এক জন মহাত্মাজীর হরিজন আর বাকি এক জন ছাই ফেলিতে কুলোর ন্যায় থাকিবেন "কাষ্ঠ হিন্দু।" যদি ঠিক এই ব্যবস্থাই হয়, তাহা হইলে সেই শেষোক্ত মন্ত্রীর পদ লাভের জন্য "কাষ্ঠ হিন্দু" উমেদারের হুড়াহুড়ি অল্প হইবে না। বেতনটা যে মোটা, আত্মসম্মানবোধ লইয়া কি তাহারা ধুইয়া খাইবে? ব্যবস্থাটা ঠিক এইরূপ হইলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়, তাহা দেখিবার জন্য অনেকে বিশেষ কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছেন।

অসবর্ণ বিবাহ বিল

এ দেশে এক শ্রেণীর লোক হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান পরিস্থিতি নষ্ট করিয়া দিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ইঁহারা আইন দ্বারা বাধ্য করিয়া লোককে তাহাদের বর্ত্তমান সামাজিক এবং পিতৃপুরুষের ব্যবস্থার বিরোধী করিতে চাহেন। বোধ হয়, অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, পরলোকগত বিঠল-ভাই প্যাটেল ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে অসবর্ণ-বিবাহ-আইন সিদ্ধ করিবার জন্য সেই সময়কার ব্যবস্থা পরিষদে আইনের একটি খসড়া



ডাক্তার ভগবানদাস

উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দুসমাজ ঐ বিলের বিরোধী হওয়াতে বিলখানি তখন প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু যাঁহারা হিন্দু সমাজের আক্রান্ত করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়া আছেন, তাঁহারা সহজে ক্ষান্ত হইবার পাত্র নহেন। তাই সম্প্রতি বর্ত্তমান ব্যবস্থা পরিষদের অন্যতম সদস্য ডাঃ ভগবানদাস বিঠলভাই প্যাটেলের সেই প্রত্যাহৃত বিলখানিকে ব্যবস্থা পরিষদে পুনরায় দাখিল করিবার নোটিশ দিয়াছেন এবং সে জন্য বড়লাটের অনুমতিও চাহিয়াছেন। বিলখানির মর্ম্ম এই যে, "প্রচলিত প্রথা এবং বর্ত্তমান আইনের বিধান যাহাই হউক না কেন, বর ও কন্যা ভিন্ন-জাতীয় হইলেও তাহাদের বিবাহ হিন্দু সমাজে অবৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে না।" এই শ্রীভগবানদাস সংবাদপত্রের মারফতে এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। সে বিবৃতির স্থূল মর্ম্ম আমরা এ স্থলে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। উহা দীর্ঘ। তবে তাঁহার একটা কথা এই যে, "যেহেতু বিঠলভাই প্যাটেলের ন্যায় এক জন দূরদর্শী এবং স্বদেশপ্রেমিক নেতা যখন এই বিলখানি উপস্থিত করিয়াছিলেন, তখন হিন্দুদিগের এই বিলখানির সমর্থন করা উচিত।" কি চমৎকার যুক্তি! এইরূপ যুক্তি দেখাইয়া হয় ত কেহ বলিবেন যে, অমুক স্বদেশপ্রেমিক নেতা গোবধের সমর্থন করিয়াছেন, অতএব সকল হিন্দুরই গোহত্যার সমর্থন করা উচিত। ইনি আরও বলিয়াছেন যে, এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কাহাকেও অসবর্ণ-বিবাহে বাধ্য করা এই প্রস্তাবিত আইনের উদ্দেশ্য নহে। বরং যাঁহারা অসবর্ণ-বিবাহ করিবেন, তাঁহাদের হিন্দুসুলভ অধিকার এবং মর্য্যাদা রক্ষা করা এবং তাঁহারা যাহাতে হিন্দু সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন না হন, তাহার ব্যবস্থা করাই এই পাণ্ডুলিপির উদ্দেশ্য। এক কথায় জোর করিয়া এই আইনবলে সরাসরি কাহাকেও অসবর্ণ-বিবাহ করিতে বাধ্য করা হইবে না সত্য, কিন্তু জোর করিয়া যাহারা হিন্দু সমাজের পক্ষে অবশ্য পরিত্যাজ্য, তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে হিন্দু সমাজকে আইনবলে বাধ্য করা হইবে এবং পরোক্ষ ভাবে হিন্দু সমাজের চিরাগত কৃষ্টির বিরোধী ব্যবস্থা সমাজমধ্যে চালাইবার ব্যবস্থা করা হইবে। অসবর্ণ বিবাহ যদি সত্য সত্যই হিন্দুশাস্ত্রসম্মত এবং সুধীজনসম্মত হইবে, তাহা হইলে ভারতের কুত্রাপি কোন হিন্দু সমাজে উহা চলিত নাই কেন? আর পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্র-সমরের পূর্ব্বে অর্জ্জুনই বা শ্রীকৃষ্ণকে এ কথা কেন বলিয়াছিলেন যে—

"সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥"

ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সে কথার একটুও প্রতিবাদ করেন নাই। অর্জ্জুন ভুল কথা বলিলে ভগবান্ নিশ্চয়ই তাহার প্রতিবাদ করিতেন। লর্ড রোনাল্ডসে (তখনও বোধ হয় তিনি লর্ড জেটলাণ্ড হন নাই) একবার ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনে দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে, তিনি যদি এত কালের পুরাতন পৈতৃক অবদানের অধিকারী হইতেন, তাহা হইলে তিনি কখনই উহা পরিত্যাগ করিতেন না। এই কালজয়ী ব্যবস্থাকে বিসর্জ্জন করা বিধেয় নহে। আশা করি, লর্ড উইলিংডন ঐ বিলখানি পুনরুত্থাপিত করিবার অনুমতি দিয়া অকারণ হিন্দু সমাজের বিক্ষোভ বৃদ্ধি করিবেন না।

যৌবন-বিবাহের পরিণাম

যৌবন বিবাহের পরিণাম কি হয়, তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সম্প্রতি কলিকাতার সন্নিহিত ঢাকুরিয়া লেকে পাওয়া গিয়াছে। ঐ জলাশয়ে গত ২৭শে জুলাই শনিবার একটি যুবক ও একটি যুবতী আলিঙ্গনাবস্থায় ডুবিয়া মরে। যুবকটির নাম সুশীলকুমার আর যুবতীটির নাম গৌরী বা আভা। গৌরীর বয়স ১৮ বৎসর,

সুশীলের বয়স ২০ বৎসর। ইহাদের উভয়ের নিবাস কলিকাতা বাহির মির্জ্জাপুর রোডে। তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতিবেশী। উভারা দুই পরিবারভুক্ত। পরিবারদ্বয়ের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। সুতরাং সুশীল গৌরীর সহিত অবাধে মিশিত। এ দিকে উভয়েরই যৌবনোদ্‌গম হয়। কালের যাহা ধর্ম্ম, তাহা হইবেই। বিশেষতঃ যাহারা জীবনে সংযমের শিক্ষা পায় নাই, ধর্ম্মের বার্ত্তা জানে না, পরকাল মানে না, তাহারা যে প্রবৃত্তির তরঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া দিবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? ফলে তাহাদের উভয়ের প্রতি উভয়ের আসক্তি জন্মে। কিন্তু সে আসক্তি চরিতার্থ করিবার তাহাদের কোন সুযোগ হয় ত ঘটে নাই। যাহা হউক, মাস দুই পূর্ব্বে অষ্টাদশী গৌরীর সহিত পাটনার এক ডাক্তারের বিবাহ হয়। গৌরী স্বামি-গৃহে কয়েক দিন থাকিয়া পিতৃগৃহে আসে। আবার উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাতে মনের আগুন দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠে। তাহার পর গত ১১ই শ্রাবণ শনিবার সুশীল তাহার বন্ধুর একখানি মোটর আনিয়া আভার সহিত সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হয়। তাহারা গঙ্গাতীরে ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে কিছুক্ষণ অনির্দ্দিষ্টভাবে ভ্রমণ করিয়া রাত্রি প্রায় ১১টার সময় ঢাকুরিয়া লেকে গমন করে। তথায় নিবিড় নিশীথিনীতে তাহারা সেই হ্রদের তীরে যাইবার সময় সুশীল তাহার কোটটি মোটর গাড়ীতে রাখিয়া যায়। তাহাদের ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব দেখিয়া মোটরচালক তাহাদের খোঁজ করিতে ঐ দিকে যায়। সে জলের ধারে দুই জোড়া জুতা দেখিতে পায়। দেখিয়াই তাহার মনে শঙ্কা জন্মে; সুতরাং সে সাহায্যের জন্ম চীৎকার করে। নিকটস্থ মসজেদ হইতে কয়েক জন লোক তথায় আসে এবং সেই নিরুদ্দিষ্ট যুবক-যুবতীর সন্ধান করিতে থাকে। এক জন বলে যে, কিছু পূর্ব্বে জলের মধ্যে কোন ভারী জিনিস পতনের শব্দের মত শব্দ শুনিয়াছে। তখন তাহারা পুলিসে সংবাদ দেয়। পুলিস আসিয়া যুবকটির কোটের পকেটে একখানা পত্র পায়। প্রকাশ—পত্রে লেখা ছিল, তাহারা উভয়ে স্বেচ্ছায় মরণকে বরণ করিতে যাইতেছে। ডুবুরীর সাহায্যে মৃতদেহ দুইটি আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় উদ্ধৃত হয়। যথাবিহিত অনুসন্ধানের পর পুলিস মৃতদেহ দুইটি তাহাদের আত্মীয়দিগের হস্তে অর্পণ করিয়াছিল।

ব্যাপার ত এই। এই ব্যাপারে যে একটা ঘোর সামাজিক বিপ্লব আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। যে ভারতে বহু সহস্র বৎসর বাল্যবিবাহ প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে, সেই ভারতে আচম্বিতে যৌবন-বিবাহ প্রবর্ত্তিত করিলে যে এইরূপ শোচনীয় ব্যাপার ঘটিবে, ইহা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। সেই জন্যই আমরা যে সময়ে সর্দ্দা আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, সেই সময়ে উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। মহাত্মাজী সেই সময়ে টেলিগ্রাফ করিয়া জানাইয়াছিলেন যে, নারীদিগের বিবাহের বয়স ১৮ বৎসরের কম হওয়া উচিত নহে। এখন তিনি কি বলেন? অবিবাহিত অবস্থায় এইরূপ অবাধ-মিলনের ইহাই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম! এরূপ ঘটনা বিরল নহে। এরূপ যৌবন-বিবাহের কুফল অনেক ঘটিতেছে, তবে সকলে মরণকে বরণ করে না, সকল সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশ পায় না। প্রাচীনপন্থীদিগের অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করা উচিত নহে। যে পরিবারে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, আমরা তাঁহাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। ইহার পূর্ব্বে নাগপুর হইতে ঠিক এইরূপ একটি সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। গত বৈশাখ মাসের মাসিক বসুমতীতে আমরা তাহার বিবরণ দিয়াছিলাম। সর্দ্দা আইনের সমর্থক অমৃতবাজার পত্রিকা স্বীকার করিয়াছেন যে, পূর্ব্বাপেক্ষা এখন এইরূপ আত্মহত্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। তবে সহযোগী ইহা যে বিলম্বে বিবাহের ফল, যেন স্পষ্ট স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। যদি এই সামাজিক ব্যাধির প্রতীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ইহার মূল কারণ স্বীকার করিতে কুণ্ঠাবোধ করা উচিত নহে। ধর্ম্মহীনতার সহিত যৌবন-বিবাহই ইহার কারণ।

ভারতের ভাবী বড় লাট

ভারতের বর্ত্তমান বড় লাট লর্ড উইলিংডনের কার্য্যকাল আগামী এপ্রিল মাসে শেষ হইবে। তাহার পর কে তাঁহার স্থানে ভারতের বড় লাট হইবেন, তাহা লইয়া বহু-দিন হইতেই নানা জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল। সম্প্রতি বিলাত হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, লর্ড লিংলিথগো লর্ড উইলিংডনের পর ভারতের বড় লাট হইবেন। ইনি ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে রয়্যাল কৃষিকমিশনের কর্ত্তা (চেয়ারম্যান) হইয়াই ভারতে আসিয়াছিলেন।



ভারতের ভাবী বড় লাট লিংলিথগো

সুতরাং ভারতের সহিত ইঁহার কিছু পরিচয় আছে। ভারতের শাসন-সংস্কার আইনের জন্য যে জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিল, মার্কুইস অব লিংলিথগো তাহার চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন। কৃষিবিদ্যায় ইনি বিশেষ পারদর্শী। ইনি এডিনবরা ইষ্ট অব স্কটল্যাণ্ড কৃষি-কলেজের প্রেসিডেণ্ট বা সভাপতি এবং এডিনবরা রয়্যাল সোসাইটীর সদস্য। ইনি অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। ইনি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার প্রকৃত নাম ভিক্টর আলেকজাণ্ডার জন হোপ। ইনি বিলাতের ইটন কলেজে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ইনি পিতৃপদবী লাভ করিয়াছেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইনি সার একমিলনায়ের দ্বিতীয়া কন্যা ডোরীণ মডকে বিবাহ করেন। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে ইনি অনেক বিশিষ্ট কায করিয়াছিলেন। মিষ্টার

বলডুইনের ইনি এক জন বিশিষ্ট এবং বিশ্বস্ত বন্ধু। ইনি এক জন পাকা রক্ষণশীল মতাবলম্বী। অনেকটা লর্ড আরউইনের (অধুনা লর্ড হ্যালিফ্যাক্স) মতাবলম্বী অর্থাৎ উভয়ে যেন অনেকটা একমত। ইঁহার বয়স এখনও ৪৭ বৎসর পূর্ণ হয় নাই; এই সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ণ হইবে। ইঁহার দুই পুত্র এবং তিন কন্যা। মধ্যে শুনা গিয়াছিল যে, লেডী লিংলিথগোর স্বাস্থ্য অত্যন্ত মন্দ, সেই জন্য তিনি ভারতে আসিতে পারিবেন না। এখন সম্ভবতঃ তিনি আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। অনেকে বলিতেছেন যে, তিনি খুব ভাল লোক হইবেন। আমরা কিন্তু তাঁহার কার্য্য না দেখিয়া কোন কথা বলা যুক্তিসিদ্ধ মনে করি না। সম্রাট নিয়োগ মঞ্জুর করিয়াছেন। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, ইঁহার শাসনকাল যেন ভারতের পক্ষে শান্তিপূর্ণ হয়। এক বৎসর পূর্ব্বে অমৃতবাজার ইঁহার এই পদে নিয়োগের আভাস দিয়াছিলেন। উপর্য্যুপরি কয়েকবার কৃষিবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তিকে বিলাতী সরকার ভারতের ভাগ্যবিধাতৃপদে নিয়োগ করিতেছেন, ইহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

—

সাহীদগঞ্জের হাঙ্গামা

লাহোরের যে পল্লীতে ধর্ম্মগতপ্রাণ ভাই তরুসিং নবাবের দয়া উপেক্ষা করিয়া স্বীয় মস্তক দান করিয়াছিলেন, সেই স্থান, তাঁহার সেই স্মৃতি মানবজাতির মনে জাগাইয়া রাখিবার জন্য সাহীদগঞ্জ নামে অভিহিত হইয়াছে। ধর্ম্মের জন্য যাঁহারা প্রাণ দান করেন, তাঁহারাই সাহীদ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। সেই সাহীদগঞ্জে একটি মসজেদ আজ প্রায় পৌনে দুই শত বৎসর শিখদিগের অধিকারে রহিয়াছে। ঐ স্থানে শিখদিগের যে সাধন-মন্দির (গুরুদ্বারা) আছে, তাহার সহিত সেই সাবেক মসজেদটি সংশ্লিষ্ট হইয়া আছে। আজ প্রায় পৌনে দুই শত বৎসর কাল ঐ মসজেদটি মুসলমানগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এবং শিখগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া যথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। মুসলমানরা ঐ মসজেদটি অধিকৃত করিবার জন্য বৃটিশের আদালতে বিচারপ্রার্থী হন। বৃটিশ সরকারের হাইকোর্ট উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক শুনিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শিখরাই মায় ইমারৎ ঐ স্থানটির ন্যায্য অধিকারী। সম্প্রতি শিখরা তাঁহাদের সাহীদগঞ্জ গুরুদ্বারার এক অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। যে সময় তাঁহারা উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করেন, সেই সময় মুসলমানরা জোর করিয়া শিখদিগের সেই সঙ্কল্পে বাধা দিবার চেষ্টা করেন। শিখরাও কৃপাণ লইয়া এবং শিখরমণীরা তরবারি লইয়া ঐ স্থানে পাহারা দিতে থাকেন। উভয় পক্ষের সঙ্ঘর্ষের ফলে কয়েক জন হতাহতও হয়। শেষটা সরকার সশস্ত্র গোরা ও সিপাহী সৈন্য আমদানী করিয়া ঐ স্থানের শান্তিরক্ষা করেন। এই উপলক্ষে পাঞ্জাব সরকার একটি বড় অদ্ভুত কথা বলিয়াছেন। এরূপ কথা যে তাঁহারা কি করিয়া বলেন, তাহা সাধারণের বুদ্ধির বাহিরে। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, এ কথা খুবই সত্য যে, আইন অনুসারে সাহীদগঞ্জের গুরুদ্বারার সমস্ত ইমারতের উপরই শিখদিগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাই বলিয়া উহার এক অংশ শিখরা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেওয়াতে মুসলমানদিগের ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত করা হইয়াছে, অতএব তাহার ফলে যদি ভবিষ্যতে কোন কুফল ফলে, তাহা হইলে তাহার নৈতিক দায়িত্ব হইবে শিখদিগের। মানবজাতির ইতিহাসে এরূপ অদ্ভুত বা কিম্ভূত যুক্তি কেহই প্রয়োগ করিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। যাহাতে আইন অনুসারে কাহারও অধিকার আছে,—সে যদি সেই অধিকৃত বস্তুর বা বিষয়ের যদৃচ্ছ ব্যবহার করে, এবং সে উহা ব্যবহার করিলে যদি তাহার কোন প্রতিবেশী এই বলিয়া অভিযোগ করে যে, ঐ বস্তুর বা বিষয়ের যদি সে যদৃচ্ছ ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহার মনে বেদনা লাগিবে, তাহা হইলে তাহার ঐ অদ্ভুত আব্দারের জন্য সেই বস্তুর বা বিষয়ের মালিকের কি নৈতিক দায়িত্ব হইবে? কাশীর সাবেক বিশ্বেশ্বরের মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া ঔরঙ্গজেব বাদশাহ তাহারই অঙ্গে ও অঙ্গনে মসজেদ বানাইয়া গিয়াছেন।

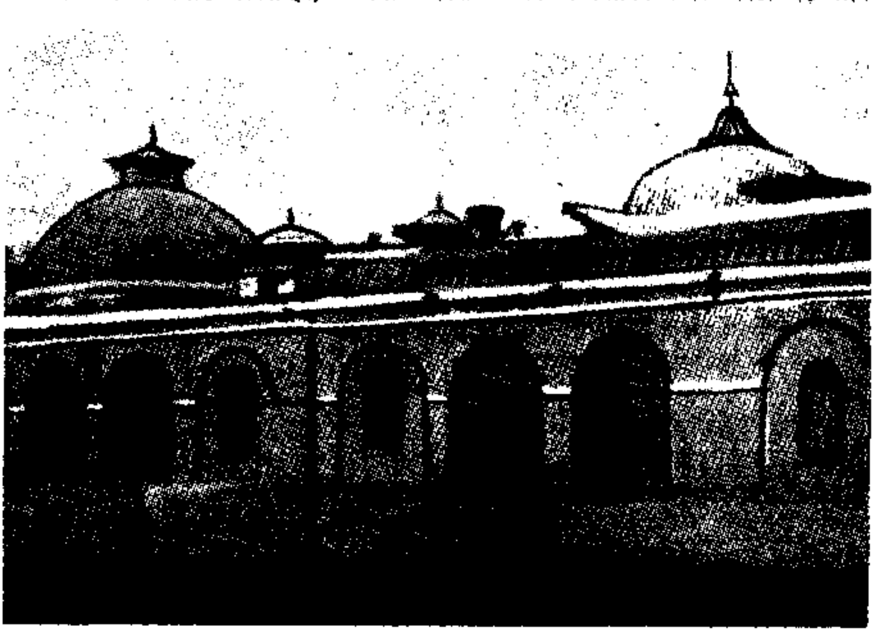


লাহোরের সাহীদগঞ্জ মসজেদ—এই মসজেদটি অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত

তাহা দেখিলে অনেক হিন্দুর প্রাণে বেদনা লাগে। কিন্তু তাই বলিয়া যদি আজ আড়াই শত বৎসর পরে কোন হিন্দু উহার মুসলমান অধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে যায়, তাহা হইলে কি তাহার নৈতিক দায়িত্ব মুসলমানদিগের হইবে? কখনই না। সুতরাং ঐ ব্যাপারে শিখদিগের নৈতিক দায়িত্বের কথা নিতান্তই বাজে। সরকার ঐ কথা বলিয়া মুসলমান সম্প্রদায়কে তুষ্ট করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কেবল তাহাই নহে, সরকার একটি মসজেদও মুসলমানদিগকে তাহাদের সংযমশীলতার পুরস্কার-স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন।

কিন্তু এততেও সরকার ঐ শান্তিপ্রিয় মুসলমানদিগের মন পান নাই। তাঁহারা সরকারের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছেন, এবং সরকারের লোক-জনের উপর লাঠি চালাইয়াছেন। সরকারের ইস্তাহারেই প্রকাশ—"শুক্রবারে নামাজ উপলক্ষে বাদশাহী মসজেদে উত্তেজনাজনক বক্তৃতা করা হইয়াছিল। ইহার পর কতকগুলি দায়িত্বজ্ঞানবর্জ্জিত মুসলমান সরকারের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া শোভাযাত্রা করিয়া যায় এবং তাহারা সহরের বিভিন্ন রাস্তা ধরিয়া মার্চ্চ করিয়া সাহীদগঞ্জের গুরুদ্বারে যাইবার সঙ্কল্প করে। পুলিস ৩৬ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল এবং যখন আরও কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টায় ছিল, তখন কতকগুলি অশান্ত মুসলমান জমায়েৎবদ্ধ হইয়া পুলিসদলকে আটক করিয়া ফেলে। সেই অবরুদ্ধ পুলিস-বাহিনীকে উদ্ধার করিবার জন্য অকুস্থলে রিজার্ভ পুলিস আনাইতে এবং মুসলমান জনতার উপর তিনবার মৃদুমন্দ লাঠি চালনা করিতে হয়।

ইহার পর মুসলমান-জনতার জনকতক গুণ্ডা পুলিসের কয়েকখানা ভ্যান আক্রমণ করে। তথাপি পুলিস সংযত হইয়া কার্য্য করিতে থাকে। কিন্তু অদূরদর্শী জনতা পুলিসের সহিষ্ণুতা দেখিয়া উৎসাহিত এবং উত্তেজিত হইয়া উঠে। তাহারা পশ্চাদ্দিক হইতে পুলিস বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের উপর ইষ্টক প্রভৃতি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করে। শেষকালে বেগতিক দেখিয়া পুলিস সাহীদগঞ্জ গুরুদ্বার হইতে অর্দ্ধ পোয়া দূরে (২ ফার্লং) অবস্থিত দিল্লী গেটের নিকটে সেই মুসলমান-জনতার উপর গুলী চালায়। প্রকাশ—ঐ গুলীচালনার ফলে ৫ জন মুসলমান নিহত ও কয়েক জন মুসলমান আহত হইয়াছিল। সরকারের ভাবগতিক দেখিয়া লাহোরের মুসলমানগণের আশা এবং আশঙ্কা বাড়িয়া গিয়াছিল। তাই তাঁহারা একটি মসজেদ উপহার পাইয়াও পরিতুষ্ট হইতে পারেন নাই। যদি কোন শক্তিশালী ব্যক্তি বা পক্ষ অন্যায় নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার আশ্রিত দুর্ব্বল পক্ষকে বা সম্প্রদায়কে সহায়তা করেন, তাহা হইলে সেই দুর্ব্বল পক্ষের আব্দারের আর সীমা থাকে না। আবার সেই আশ্রিত দুর্ব্বল পক্ষ যদি নির্ব্বোধ হন, তাহা হইলে তাঁহারা সত্য সত্যই মনে করেন যে, তাঁহাদের আব্দার যতই অন্যায় হউক না কেন, আশ্রয়দাতা প্রবল পক্ষের তাহা পূর্ণ না করিলে চলিবে না। কাজেই তাঁহারা দিদিমার আদুরে নাতির মত আব্দারে হইয়া উঠেন। ভেদনীতির ইহাই একটা বড় দোষ।



লাহোরে চিরাগ শাহ মসজেদ—সরকার এই মসজেদ মুসলমানদিগের হস্তে প্রদান করিয়াছেন।

আমাদের মনে হয়, সরকারের নিরপেক্ষ হইয়াই কার্য্য করা উচিত। এখন ব্যাপারটা কোথায় যাইয়া দাঁড়ায়, তাহাই দ্রষ্টব্য।

যাহা হউক, শেষকালে পাঞ্জাবী মুসলমানদিগের অহ্‌রার দল এবং আরও কোন কোন মুসলমান-নেতা বলেন যে, জোর করিয়া গুরুদ্বার মসজেদ দখল করিতে যাওয়া মুসলমানদিগের পক্ষে অন্যায় এবং অসঙ্গত হইয়াছে। যখন বৃটিশ রাজ্য পাঞ্জাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই এ স্থান শিখদিগের অধিকারে রহিয়াছে, এবং শিখরাই উহার আইনসঙ্গত অধিকারী বলিয়া হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন, তখন ঐ বিষয় লইয়া আর হাঙ্গামা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। ফলে ব্যাপারটা এইখানে মিটিয়া গিয়াছে। পুলিস যে সকল মুসলমানকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে।

ঊষারাণী হরণের মামলা

পুলিস কোর্টে মামলা চলিতেছিল—ঊষারাণী ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে। বিবাহ হইয়াছে পল্লীগ্রামে। স্বামীর নাম পাঁচকড়ি চক্রবর্ত্তী। হুগলী জেলার কোথায় স্বামীর সামান্ত চাষবাস আছে। ঊষারাণীর পিত্রালয় কলিকাতায় সম্ভ্রান্ত পল্লীতে এবং ঊষারাণী যুবতী। সেই পল্লীতেই বাস করিত তরুণ যুবক তারক। তারক ধনী বংশের ছেলে—বিলাসে লালিত। ঊষার ও তারকের এক পাড়ায় বাস। হু'জনে কি করিয়া চোখে চোখে কথা হইল—সে সংবাদ জানা নাই। তবে সহসা এক দিন প্রাতে দেখা গেল, ঊষারাণী গৃহে নাই! চারিদিকে সন্ধান চলিল। সন্ধানে জানা গেল, তারকও গৃহে নাই। শেষে সংবাদ মিলিল। তদারক তদন্ত করিয়া পুলিস তারককে পুলিস কোর্টে চালান দিল—ভারতীয় পেনাল কোডের ৩৭৩ ধারায়। দীর্ঘকাল ধরিয়া শুনানীর পর প্রবীণ অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট রায় ডাক্তার শ্রীযুত সত্যপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর গত ৮ই আগষ্ট আসামী তারককে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে এক দিনের কারাবাস ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। সুদীর্ঘ রায়ে ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন, সাক্ষ্য-প্রমাণে দেখিতেছি, ঊষার বিবাহ হইয়াছে; তার স্বামী সরল নিরীহ পল্লীবাসী, তার আয় সামান্ত,—কায চাষবাস। আসামী তারক সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে—ধনী; হু'জনে পাশাপাশি বাড়ীতে থাকে। পরস্পরে খুব প্রীতি এবং ঊষার উপর তারকের নজর ছিল বহুকাল ধরিয়া। তারক শুধু সুযোগ খুঁজিতেছিল এবং সে সুযোগ মিলিবার পক্ষে বাধা ছিল না। এক দিকে পল্লীর চাষবাসে নিযুক্ত সরল গ্রাম্য ব্যক্তি—আর এক দিকে ধনবল-সমন্বিত নাগরিক তরুণ তারক! বাছিয়া লও, বালা, কাহাকে চাও! কিশোর বয়সে মনের মোহ! এত বড় প্রলোভন ঊষারাণী সম্বরণ করিতে পারিল না। সে তারককে আশ্রয় করিয়া গৃহত্যাগিনী হইল। তারকের উপর এমন তার মোহ যে, প্রকাশ্য আদালত-গৃহে—নিজের বাপ, ভাই এবং প্রকাণ্ড জনতার সম্মুখে ঊষা স্পষ্ট ভাষায় বলিল, দেহে-মনে সে তারককেই স্বামী বলিয়া জানে। এ কথা বলিতে তার দ্বিধা হইল না! লজ্জা হইল না!

এই দ্বিধা বা লজ্জা না হইবার কারণ, ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর বলিতেছেন, তার তরুণ মনে তারকের অসাধারণ প্রভাব! তারক তার জীবনে ধ্রুবতারা! এই অবৈধ অভিসারে তারকের আহ্বানে অম্লানবদনে সে বাহির হইয়া আসিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিতেছেন, আসামী পক্ষ বলিয়াছে, ঊষা স্বেচ্ছায় তারকের সঙ্গে আসিয়াছে—তাকে কেহ ফুসলাইয়া কুলের বাহিরে আনে নাই। কথা হয় ত সত্য, কিন্তু ঊষাকে তারক এমন মোহাচ্ছন্ন করিয়াছিল যে, সে ব্রাহ্মণের ঘরের বিবাহিতা যুবতী—গঙ্গাস্নান করে, ঠাকুর-ঘরে পূজার নৈবেদ্য সাজায়—সে এই কায়স্থ যুবকের আহ্বানে জাতি-মান-কুল, নিজের প্রাণের প্রিয় আত্মীয়বন্ধু, মা, বাপ, স্বামী সকলের মায়া ত্যাগ করিয়া অনায়াসে গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া আসিল। এ যেন ইন্দ্রজাল এবং এ ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিয়াছে আসামী তারক।

তাঁর রায়ে আরও অনেক যুক্তি, অনেক কথার আলোচনা আছে। তাঁর বিচার-নৈপুণ্য প্রশংসনীয়।

বাঙ্গালা দেশে বহু গৃহ—বহু সংসার নানা বিপ্লবে বিপন্ন বিনষ্ট হইতেছে, জানি, এবং সে বিপত্তি নিবারণের সামর্থ্য আমাদের নাই, এ কথাও ভালো করিয়া জানি। কিন্তু আজ যখন নানা বিপত্তির মধ্যে দেখি, যে-ছেলেমেয়েদের সরল বিশ্বাসে, একান্ত স্নেহে বুকে রাখিয়া আমরা পালন করিতেছি, যাহাদের মঙ্গলের জন্য মা-বাপ নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভুলিয়া যান, সেই ছেলেমেয়েরা কিসের বলে এমন করিয়া মা-বাপের মুখে কালিমা লেপিয়া এবং আপনাদিকে এতখানি লজ্জাহীন দুর্নীতি ও কলঙ্কের পঙ্কে নিক্ষেপ করিতে ছোটে! সংসারে যৌনবৃত্তি চরিতার্থ করাটাই কি সব চেয়ে বড় কায? প্রণয়ি-প্রণয়িনী সাজিয়া জ্যোৎস্নালোকে বিচরণ এবং চুম্বন ও আলিঙ্গন—তাহা হইলেই জীবনে চরমপ্রাপ্তি ঘটিয়া গেল? এমনি অভিসার-যাত্রার কাহিনীগুলির আদ্যোপান্ত সন্ধান লইলে আমরা দেখিব, প্রণয়ি পুরুষ—যাহাকে অবলম্বন করিয়া বিমুগ্ধা নায়িকা স্বামী পুত্র, পিতা, ভ্রাতা, গৃহ, সব ছাড়িয়া পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত ছুটিতে উদ্যত, ধন চাহে না, অলঙ্কার চাহে না, গৃহ চাহে না, কিছু চাহে না—চাহে শুধু প্রেম আর প্রেম। সেই প্রণয়ী-পুরুষ হু'দিন পরে পিপাসা মিটিবামাত্র বিমুগ্ধা নায়িকাকে পঙ্কে নিমজ্জিত রাখিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, সন্ধান নাই। তখন বিমুগ্ধা নায়িকা চেতনা-ভঙ্গে দেখিয়াছে গৃহহীন, বন্ধুহীন, সহায়হীন, স্নেহ-হীন, মর্য্যাদাহীন প্রান্তর-পথে সে পরিত্যক্তা অভাগিনী, একাকিনী! আশ্রয় কোথাও মিলিবে না। গৃহ-সংসার তাকে দেখিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দেয়,—না, পথ ভাখো—এখানে প্রবেশ নিষেধ। সহায় যদি এ অবস্থায় মেলে তো সে সহায়দাতারা চায় ত তার দেহ-যৌবন! শেষে বিমুগ্ধা নায়িকা নিজের দেহ-মনকে ছেঁচিয়া পিষিয়া দুর্ভাগ্যের রসাতলে গড়াইয়া যায়! যে সুখ চাহিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিল, কোথায় থাকে তখন সে সুখ! সে মদিরার নেশা!

এমন অনাচার পূর্ব্বে ছিল না, এমন কথা বলি না। তবে এ অনাচারকে মানুষ চরিত্রের দুর্ব্বলতা বুঝিয়া লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া থাকিত। এখন এ অনাচার যেন গর্ব্বের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। এই সে দিন লেকে যে ব্যাপার হইয়া গেল, সে ব্যাপার লইয়া অনেকে জয়ধ্বনি তুলিতেও দ্বিধা করেন নাই। পাপ ও অনাচার চিরদিন আছে; তাহা লইয়া আমাদের আশঙ্কা তত নয়—যত আশঙ্কা অনাচারের এই নির্লজ্জ গর্ব্বে—মত্ত আস্ফালনে!

ঊষারাণী-হরণ-মামলার রায়ে ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন, ঊষার পক্ষে প্রথম প্রলোভন এক দিকে চাষবাসের কাযে নিযুক্ত গেঁয়ো স্বামী, অন্য দিকে সহরের ধনীর পুত্র তারক! আমরা ভাবিতেছি, এ প্রলোভন কিসের? কেন এ প্রলোভন জাগে?

বড় যখন ছোটকে দরদ করিতে আসে, ছোট তখন গলিয়া যায় কেন? তখন তার এ কথা কেন মনে হয় না যে, বড়র কোন স্বার্থ আছে, তাই এ দরদ! বড়র পীরিতি বালির বাঁধ—এ কথার দাম লক্ষ টাকা! বড় নিজের ঐশ্বর্য্যমদে মাতিয়া প্রেম বল, বসন বল, ভূষণ বল দিতে আসে; ভাবে, উহারই জোরে তোমায় করিব ক্রীতদাসী! তারকের মত যুবা যখন ঊষারাণীর মত মেয়েকে প্রেমের লোভ দেখায়, তখন ঊষারাণীর দল এ কথা কেন ভাবে না—কেন তোমার এ দরদ? তারকের মত যুবারা পরস্ত্রী জানিয়া প্রেমচর্চ্চা করিতে আসে, তখন ঊষারাণীদের মনে সন্দেহ জাগা উচিত—ভাবা উচিত, বড়লোকের ছেলে—দু'দিন পুতুল খেলার

সাধ হইয়াছে! অজানায় মোহ-বৈচিত্র্য—নূতনত্বের নেশা—সে নূতনত্ব কাটিলে, সে মোহ ভাঙ্গিলে পুরানো জুতার মত চরণচ্যুত হইয়া নর্দ্দামায় গড়াইতে হইবে। যৌবনে মোহ তীব্র হয়। মোহের সে তীব্রতায় চোখ ঝাপসা হয়—অন্ধ হয়; তাই বলিয়া নিজের অপমান, অমর্য্যাদা করিয়া এমন ভাবে নারীত্বকে পিষিয়া মারিবে—তুমি নারী!

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন,—এ ইন্দ্রজাল। আমরাও বলি, তাই। এ ইন্দ্রজাল পাশ্চাত্য সভ্যতার চটকের! এ ইন্দ্রজাল অভিভাবকদের দৃষ্টি-শৈথিল্যের! এ ইন্দ্রজাল বিলাতী সিনেমার! এ ইন্দ্রজাল বিলাসের মোটরে চড়িয়া জলি ড্রাইভের। এ ইন্দ্রজাল গরীবের ঘোড়া রোগের! আর এ ইন্দ্রজাল হালের আমদানী নির্লজ্জ যৌন-সাহিত্যের!

এই বিভ্রম, এই মোহ-সৃষ্টির মূলে আছে যৌন-সাহিত্য।—যে সাহিত্য মুক্তির নামে নির্লজ্জ অভিসারের জয়গান রচিয়া বেড়ায়।

যে সব লোক সাহিত্য-সৃষ্টির নামে যৌন-বাসনায় মানুষকে উন্মত্ত করিয়া বেড়ায়—দুনিয়ার নারীকে পুরুষের কাম-সাগরের ভেলা ভাবিয়া ভাবের তরঙ্গ তোলে,—সে সব লোককে লেখক ত বলিবই না—ভদ্র বলিতেও বাধে। আজ বাঙ্গালী নারীকে শুধু বলিতে চাই, যে সব পুরুষ তোমাদিগকে ভোগ্যা বলিয়া জানে, ভোগ্যা বলিয়া চিত্রিত করে—তাহাদের বিষ-বচন কাণে শুনিয়ো না। তোমাদের এ ভাবে অপমান করিতে যাদের বাধে না, তাহাদের শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা তোমরা কর।

মিস মেয়ো, রেডিও, ফিল্মস কোম্পানী আজ ভারতবাসীদের কালো ছবি দেখাইয়া অপমান করিতেছে বলিয়া আমরা মিটিং ডাকিতেছি, চীৎকার করিতেছি, কিন্তু যারা আমাদের দেশের লোক—দেশের আলো-বাতাসে পুষ্ট হইয়া দেশের মাতৃজাতিকে এমনই অপমানে কলুষিত করিতেছে, এ অনাচারের জন্ম, এ অসংযমের জন্ম, এই গৃহ-সংসার ভাঙ্গার জন্ম তারা সব চেয়ে বেশী দায়ী। তাহাদের শায়েস্তা করার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিবে?

উষারাণীর মোকদ্দমায় আমাদের মনে হইতেছে—এ মোহ-বিভ্রমের ফল গড়ায় আদালতে এবং প্রেমে যত মধুই থাকুক, মামলায় প্রচুর হলাহল উঠে। নিজেদের দাবী অপরে ছাড়িবে কেন? অবৈধ অভিসার সাহিত্যের ছোট গণ্ডীর মধ্যে কোথাও যদি চলে, সত্যকার জগতে তাহা অচল এবং বেচারী উষারাণীর মত মোহ-বিভ্রমে মজিয়া বাঙ্গালীর কত কন্যা, পত্নী, ভগিনী আজ কুৎসিত পল্লীর আবর্জ্জনার সামিল হইয়া পড়িয়া আছেন, সে কথাটা যেন তাঁহারা ভাবিবার অবসর পান।

সরকারের দান

থুথু দিয়া ছাতু গোলা যায় না; আর এক কোটি টাকা খরচ করিয়া ভারতবর্ষের গ্রামগুলির সংস্কার করাও চলে না। কিন্তু তবুও ভারত সরকার গ্রামগুলির উন্নতির জন্য সকল প্রদেশে ঐ টাকাটা বণ্টন করিয়া দিয়াছেন। লোকে বলে, মহাত্মা গান্ধীর গ্রাম-সংস্কারের চেষ্টার ফলে পাছে গ্রামবাসীরা মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের ভক্ত হইয়া পড়ে, সেই ভয়ে সরকারের প্রাণ গ্রামবাসীর জন্য কাঁদিয়া উঠিয়াছে। যাহারা নিরন্ন, তাহাদের পক্ষে দাতার চরিত্র বা অভিসন্ধি লইয়া গবেষণা করা নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং সরকারের এই সহৃদয়তার মূলে আর কোনও মনোভাব প্রচ্ছন্ন আছে কি না, তাহা জানিবার চেষ্টা করা নিরর্থক।

এই এক কোটি টাকার মধ্যে বাঙ্গালা সরকার পাইয়াছেন মাত্র ষোল লক্ষ টাকা। বাঙ্গালার গ্রামগুলির অভাবের তুলনায় এই ষোল লক্ষ টাকা যে সমুদ্রে শিশিরবিন্দুবৎ, তাহা বোধ হয় সরকারও স্বীকার করিবেন। বাঙ্গালীর পেটে অন্ন নাই, দেহে স্বাস্থ্য নাই, মনে শিক্ষা নাই। পাটের দর পড়িয়া যাওয়ার ফলে কৃষকরা মরিতে বসিয়াছে এবং মরিবার সময় তাহারা সঙ্গে সঙ্গে জমিদার, মহাজন, উকিল, ব্যবসাদার—সকলকেই মরণের পথে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। উপর্য্যুপরি দুই বৎসর অনাবৃষ্টির ফলে মাঠ ফাটিতেছে। গরু-বাছুর অনাহারে মরিতেছে; আর কৃষকরা স্ত্রী-পুত্র লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া ভিক্ষার জন্য সহরে আসিয়া পড়িতেছে লোকের পেটে অন্ন নাই, জলাশয়ে বিশুদ্ধ পানীয় নাই, সুতরাং নানাবিধ রোগের আক্রমণও যে প্রবল হইবে, ইহা জানা কথা। ম্যালেরিয়ায় গ্রাম উজাড় হইয়া যাইতেছে—সরকার বাহাদুর সস্তাদরে কুইনাইন খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াই নিশ্চিন্ত। রেলওয়ে-বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গেই যে নদীগুলি মজিতেছে ও ম্যালেরিয়া বাড়িতেছে, এ কথা তাঁহারা শুনিয়াও শুনেন না।

যাহা হউক, এই অনন্ত অভাব-অভিযোগের প্রতীকারকল্পে ষোল লক্ষ টাকার কিরূপে সদ্ব্যয় করা যাইতে পারে, বাঙ্গালা সরকার তাহার একটি হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, প্রত্যেক অভাবের প্রতীকারের জন্য যদি বহু ষোল লক্ষ টাকা বহু বৎসর ধরিয়া ব্যয় করা যায়, তাহা হইলে হয় ত দুঃখের কতকটা নিবৃত্তি হইতে পারে। কিন্তু মোটে যখন ষোল লক্ষ টাকা বরাদ্দ, তখন ক্ষতভরা সর্ব্বাঙ্গে একটু একটু প্রলেপ লাগাইবার চেষ্টা না করিয়া একটা ক্ষত সারাইবার চেষ্টা করিলেই সম্যক্ ফল পাওয়া যাইত। কিন্তু বাঙ্গালা সরকার সে চেষ্টা করেন নাই। ছোট বড় অনেক বিষয়ে তাঁহারা এরূপভাবে হাত লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, ষোল লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াও কোন অভাব দূর হইবে না। প্রতি বৎসর ভারত সরকারের নিকট হইতে যদি এইরূপ সাহায্য পাইবার পাকাপোকি বন্দোবস্ত থাকিত, তাহা হইলে একসঙ্গে অনেক কাযে হাত দিলে হয় ত বিশেষ ক্ষতি হইত না; কিন্তু সেরূপ বন্দোবস্ত যখন নাই, তখন একসঙ্গে অনেক কায আরম্ভ করা আর টাকাটা জলে ফেলিয়া দেওয়া প্রায় সমান কথা। বিশেষতঃ, বাঙ্গালা সরকার এমন অনেক কাযে টাকাটা ব্যয় করিতে চাহিয়াছেন, যাহার সহিত গ্রামের প্রকৃত উন্নতির বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। উদাহরণস্বরূপ দেখান যাইতে পারে যে, বয়স্কাউট ও ব্রতাচারীদিগের জন্য তাঁহারা বিশ হাজার টাকা দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গ্রামে প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্যও বিশ হাজার টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। লোকে যখন উদরান্নের জন্য লালায়িত, বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে তাহারা যখন রোগে মরিতেছে, তখন ব্রতাচারীদিগের জন্য বিশ হাজার ও প্রচারকার্য্যের জন্য বিশ হাজার খরচ করা নিতান্তই অপব্যয় বলিয়া মনে হয়। এই চল্লিশ হাজার টাকায় বহু গ্রামে বহু জলাশয় খনন করান যাইতে পারিত এবং অজন্মার দরুণ যে সমস্ত গ্রাম্য কুলীমজুর বেকার হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদিগকেও অর্দ্ধা-ভাবে মরিতে হইত না। পশ্চিম-বঙ্গে সরস্বতী নদী মজিয়া যাওয়ায়

অনেকগুলি জেলা ম্যালেরিয়ায় একবারে আবাসের অযোগ্য হইয়া পড়িতেছে। সরকার যদি ঐ ষোল লক্ষ টাকার সমস্তটা ব্যয় করিয়া সরস্বতীর পঙ্কোদ্ধার করিতেন, তাহা হইলে পশ্চিম-বঙ্গের চেহারা ফিরিয়া যাইত এবং সরকারকে কুইনাইন বিলাইয়া ম্যালেরিয়া-নাশের স্বপ্ন দেখিবার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু সরকার সে রাস্তা মাড়ান নাই। তাঁহারা বিরাশী হাজার টাকা খরচ করিয়া মেদিনীপুরের গ্রামে গ্রামে রেডিও কেন্দ্র খুলিবার সংকল্প করিয়াছেন। রেডিওর গান শুনিয়া মেদিনীপুরের তাপিত প্রাণ শীতল হইবে কি না, তাহা ভগবান্ই জানেন; কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, হুগলী, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলার ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হইতে যে সমস্ত অর্দ্ধমৃত বুভুক্ষুর দল গৃহ ছাড়িয়া সহরের দিকে ছুটিয়াছে, তাহাদিগকে কোনরূপ জনহিতকর কাযে লাগাইয়া তাহাদের জন্য এই বিরাশী হাজার টাকা ব্যয় করিতে পারিলে এই টাকার প্রকৃত সদ্ব্যয় হইত। ব্রতাচারীর নৃত্য দেখিয়া এই বুভুক্ষুদলের পেট ভরিবে কি?

জনশিক্ষা বিস্তারের পথরোধ

সরকারী ডাকঘরের ক্রমবর্দ্ধমান ডাকমাশুলের হার জনসাধারণের সহ্যের সীমা অতিক্রম করিতে চলিল। ডাকঘরের কর্ম্মচারিগণের সময়ানুযায়ী বর্দ্ধনশীল বেতনবৃদ্ধির ফলে—ডাক বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ত্তৃপক্ষের বেতনাধিক্যের প্রভাবে—ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য পোষ্টাল সার্টিফিকেটের সুদের প্রাচুর্য্যে—বিবিধ ব্যয়াধিক্যের পরিণামে, জনসাধারণ ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় অতিষ্ঠ হইতেছেন। পোষ্টকার্ড ও খামের মাশুল প্রায় তিন গুণ বর্দ্ধিত করিয়াও সে বিপুল ব্যয় নির্ব্বাহ করা সম্ভব হয় নাই! সেই বিপুল ডাকমাশুলের পাষাণ-চাপে ভিঃ পিঃর ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ হইয়াছে। ডাকমাশুলের বিপুল বহরে সুলভে সংসাহিত্য প্রচারের পথ সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হইয়া দেশে সংশিক্ষার—জ্ঞানবিস্তারের আশা লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও সরকারী ডাকঘরের বিশাল ব্যয় নির্ব্বাহ হইতেছে না। বুকপোষ্টের মাশুল তিন গুণ বৃদ্ধি করিয়াও নিস্তার নাই!

সম্প্রতি ডাকঘরের কর্ত্তৃপক্ষ প্রতি ডাকঘরে সারকুলার জারি করিয়াছেন যে, বুকপোষ্টের ভিতর যদি কেহ একখানি ছোট চিরকুট দিয়া চিঠি লিখিবার সুযোগ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ডাকঘরের সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভাবনা! অতএব প্রত্যেক বুকপোষ্ট খুলিয়া দেখিতে হইবে। বুকপোষ্টের ভিতর এরূপ চিঠি সংগুপ্ত থাকিলে ডাকঘরের বিধানে বেয়ারিং করিলেও কথা ছিল না, কিন্তু বুকপোষ্ট খুলিতে যদি পোষ্টমাষ্টার মহাশয়ের কোনরূপ অসুবিধা হয়, তাহা হইলে সেই অজুহাতেই বুকপোষ্টটি যথাযথ টিকিটযুক্ত হইলেও বেয়ারিং করিয়া ফাইন আদায় করা হইবে। এ দিকে রাজভক্তির নিদর্শন দেখাইবার জন্য ডাকঘর লম্বা বড় জুবিলি টিকিটের বাহার দিয়াছেন, সেই টিকিট যদি কোন ছোট বুকপোষ্টের ব্যাপারের বাহিরে গিয়া বুকপোষ্টের সহিত লাগিয়া যায়, তাহা হইলেই একদফা বেয়ারিং মাশুল দিতে হইতেছে।

কাহারও পত্রের যদি একটি ছত্র পোষ্টকার্ডের ঠিকানা-অংশে ভ্রমক্রমে বা প্রয়োজন অনুসারে আসিয়া পড়ে, তবেই বেয়ারিং মাশুলে ফাইন দিতে হয়। কিন্তু এই পোষ্টকার্ডখানি বহন করিতে কি পোষ্ট আফিসের বেশী ব্যয় পড়ে?

যে দেশের সরকার আজও বিনাব্যয়ে জনসাধারণের ভিতর প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে পারেন নাই—যে দেশের সরকার আজও ৮ তোলার বেশী ওজনের সুলভ সংবাদপত্র এক পয়সা মাশুলে ডাকে বিলি করিবার সুবিধা করিয়া দিয়া জনশিক্ষাবিস্তারের পথ সুগম করা আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই, সুলভ সাহিত্যের উপর অসম্ভব হারে ডিউটী চাপাইয়া শিক্ষাবিস্তারের পথে পর্ব্বতসম বাধা সৃষ্টি করা তাঁহাদের পক্ষেই সম্ভব ও সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

অসম্ভব ডাকমাশুল বৃদ্ধির জন্য ডাকঘরের কার্য্য যতই কমিয়া যাউক, সরকার যখন ডাকঘরের বিপুল ব্যয় কোনমতেই লাঘব করিতে পারিবেন না—অচির-ভবিষ্যতে সরকারী ডাকঘরের প্রতি বর্ষের বাজেটের নিয়মিত ঘাট্তি-পূরণের কোন সম্ভাবনাই যখন নাই, তখন সরকার না হয় পোষ্ট আফিসের কার্য্যভার দেশের লোকের হাতে বিশ্বাস করিয়া ছাড়িয়া দিন না। ইহাও কি স্বরাজ—প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের মত অসম্ভব ব্যাপার?

বর্ত্তমান সময়ে দেশে অসংখ্য শিক্ষিত সুযোগ্য যুবক বেকার; তাঁহারা ডাকবিভাগের বর্ত্তমান কর্ম্মচারিগণের অপেক্ষা কম বেতনে যোগ্যতার সহিত পিয়নগিরি হইতে পোষ্টমাষ্টার—পরিদর্শকের কার্য্য করিতে সানন্দে প্রস্তুত আছেন। অল্প বেতনে তাঁহাদিগকে নিয়োগ করিলে অন্যদিকে উচ্চ বেতনের অর্থ সংকুলানের দায় হইতে সরকারও বাঁচিবেন, জনসাধারণ এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ও এমন ভাবে পিষ্ট হইবেন না।

ডাকমাশুলের হার অসম্ভব বৃদ্ধি করিয়া হয় ত' সরকার ডাকঘরের আয়ের অঙ্কের কতকটা সমতা রাখিতে পারিয়াছেন, কিন্তু ভিঃ পিঃ ও বুকপোষ্টের সংখ্যা অসম্ভব কমিয়া যাওয়ায় ডাকঘরের কার্য্য কত কমিয়া গিয়াছে, তাহার রিপোর্ট কি সরকারী দপ্তরে থাকে না? কার্য্যহ্রাসের জন্য কি ডাকঘরের উচ্চপদস্থ কর্ত্তৃপক্ষের সংখ্যা ও বেতন হ্রাস হওয়ার প্রয়োজন সরকার কি অনুভব করেন না? ডিরেক্টার প্রভৃতি পদের জন্য উচ্চ বেতনে শ্বেতাঙ্গ-প্রীতির পরিচয় না দিয়া কি সরকার অনেক কম বেতনে যোগ্যতর ভারতীয় কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া ব্যয় লাঘব করিয়া, ডাকমাশুল হ্রাস করিতে পারেন না?

সরকার বাঙ্গালায় পল্লীর উন্নতির অভিনয় দেখাইবার জন্য ত সবলগ্ন ১৬ লক্ষ টাকা দান করিয়া রেডিও বাজাইয়া প্রচারকার্য্য চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু সংবাদপত্র ও সুলভ সংসাহিত্যের সাহায্যে পল্লীবাসীর যে পারিবারিক শিক্ষা অনায়াসে সুসম্পন্ন হইতেছিল—আইনের নাগপাশে জাতীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিয়া—ডাকঘরের বাজেটের নিয়মিত ঘাটতি-পূরণের অজুহাতে তাহার প্রচার-সঙ্কোচের জন্য সরকারের চেষ্টার ত' অন্ত নাই। রেডিওর ক্ষণস্থায়ী শব্দ-ঝন্ঝনার সাহায্যে শিক্ষা-প্রচার অপেক্ষা সুলভ সংবাদপত্র—জাতীয় গৌরব সাহিত্যের দ্বারা যে অনায়াসে স্থায়িভাবে শিক্ষা-বিস্তার—পারিবারিক শিক্ষা সুসম্পন্ন হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার মত অবসর বোধ হয় সরকারের নাই।

সরকার যদি যথার্থই পল্লীমঙ্গলসাধনে উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে অসম্ভব ডাকমাশুল ও কাগজের উপর উচ্চহারে ডিউটি হ্রাস করিয়া সংসাহিত্য—সংবাদপত্র—সাময়িক পত্র প্রচারে শিক্ষাবিস্তারের পথ প্রশস্ত করিবার সুযোগ দান করুন।

পরলোকে ক্ষীরোদগোপাল মিত্র

কলিকাতা আহিরীটোলা স্ট্রীটের সুপ্রসিদ্ধ মিত্র-বংশের গৌরব—স্বনামধন্য ব্যবসায়ী ক্ষীরোদগোপাল মিত্র মহাশয় গত ৭ই শ্রাবণ ৯০ বৎসর বয়সে, লোকান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি প্রতিভাবলে বিভিন্ন ব্যবসায়ে যেমন অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তেমনই বহু সদনুষ্ঠানে দান ও বহু দুঃস্থ পরিবারের বিধবাকে নিয়মিত ভাবে সাহায্য করিতেন। সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনে তিনি কলিকাতা ও হাওড়ায় বহু প্রতিষ্ঠানের উন্নতিবিধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি পিতার পুণ্য-স্মৃতি পূজার মানসে বহু অর্থব্যয়ে সালকিয়ায় তাঁহার পিতার নামে রাজেন্দ্রেশ্বর মহাদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া—নিত্য সদাব্রতের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কালীঘাটে আদি গঙ্গার স্নানের ঘাট ও গঙ্গাযাত্রি-নিবাস নির্ম্মাণ তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি। অক্লান্তকর্ম্মী ক্ষীরোদ বাবু সুদীর্ঘ জীবন ব্যাপিয়া কেবল অর্থসাধনা করেন নাই—সেই উপার্জ্জিত অর্থরাশি জনহিতকর কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাধনা সার্থক। যৌবন-সূচনা হইতে বার্দ্ধক্যসীমায় শরীর কিরূপ বিবর্ত্তিত হয়, ক্ষীরোদ বাবুর তিনখানি চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

ক্ষীরোদ বাবুর সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুত কুমারকৃষ্ণ মিত্র য়ুরোপ ও আমেরিকায় অভ্র-ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর গৌরব



ক্ষীরোদ বাবু—কর্ম্মজীবনে



ক্ষীরোদ বাবু—১৮ বৎসর বয়সে



ক্ষীরোদ বাবু—৮১ বৎসর বয়সে

বৰ্দ্ধিত করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি কলিকাতার করদাতৃগণের প্রকৃত বন্ধুরূপে কলিকাতা কর্পোরেশনের বহু অনাচারের প্রতীকার-কল্পে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। তাঁহার মত কর্ম্মবীরের উদ্যম—প্রযত্ন সফল হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি। তিনি করদাতৃগণের উপকার করিয়া ধন্যবাদভাজন হউন।

পরলোকে নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত

স্বদেশী এবং অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম জননায়ক নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে ইহলোক হইতে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি মহাত্মাজীর এক জন অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। বঙ্গদেশের এবং বঙ্গবাসীর উপর তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল।



নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত

তিনি সরকারের শিক্ষা-বিভাগে অনেক দিন কায করিয়াছিলেন। শিক্ষাদানকার্য্যে তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। তিনি সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন এবং কয়েকবার কারাদণ্ডেও দণ্ডিত হইয়াছিলেন। দেশের জন্য তিনি যে বিশেষ ত্যাগস্বীকার করিয়া গিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তদ্ভিন্ন তিনি ছোটনাগপুরের অসভ্যদিগের সামাজিক উন্নতিসাধনের এবং তাহাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার পরলোকপ্রস্থিত আত্মার শান্তি কামনা করি। তাঁহার মত স্বদেশ-সেবক নেতার অভাব দেশবাসী বহুদিন অনুভব করিবেন।

সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু

সাহিত্যজগতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ—'সাহিত্যের সরোজ' মাসিক বসুমতীর সর্ব্বজন-সুপরিচিত সুলেখক শ্রীযুত সরোজনাথ ঘোষের জামাতা—আমাদের পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসুর অতর্কিত পরলোক-গমনে আমরা প্রিয়জন-বিয়োগবেদনায় মর্ম্মাহত হইয়াছি। সত্যেন্দ্রপ্রসাদ স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে শিক্ষালাভের পর কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য বোলপুর শান্তিনিকেতনে কিছুদিন ছিলেন। তিনি ইংরাজী বসুমতী, ফরোয়ার্ড, ইংলিশম্যান ও লিবার্টি পত্রের সহযোগী সম্পাদকরূপে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। পরে ফ্রী প্রেসের, তৎপরে ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধিরূপে সংবাদ সঙ্কলন—সম্পাদনের কার্য্যে যশ অর্জ্জন করেন। ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলার সংবাদে বিচলিত হইয়া তিনি কোয়েটা গমন করেন। কোয়েটার ধ্বংসস্তূপ



সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু

আলোড়নের যে সকল মর্ম্মন্তুদ সংবাদ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অসংখ্য সংবাদপত্র-পাঠকের চিত্তে বেদনার শিহরণ তুলিয়াছিল—করুণায় বিবশ করিয়াছিল—তাহা সত্যেন্দ্রপ্রসাদের সাংবাদিক প্রতিভার—অদম্য উৎসাহের ফল। কিন্তু তাহার বিনিময়ে উদীয়মান সাহিত্যিক—প্রকৃত সাংবাদিক—প্রিয়দর্শন তরুণ বাঙ্গালীকে অকালে আত্মাহুতি দিতে হইয়াছে। জাতীয় সংবাদপত্রের সেবায় নিয়োজিত সাংবাদিকগণ এ ব্যথা বহুদিন অনুভব করিবেন। মাত্র ৩৫ বৎসর জীবনসীমার ভিতর সত্যেন্দ্রপ্রসাদ কেবল সাংবাদিকরূপে নহে—সমালোচক—সাহিত্যিকরূপেও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইংরাজী এবং বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। আমরা তাঁহার বিয়োগবিধুর আত্মীয়স্বজনকে কি বলিয়া যে প্রবোধ দিব, তাহার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। শ্রীভগবান্ তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি প্রদান করুন।



মিশ্র মেঘ—তেতালা

আইল শাওয়ন ঋতুরাজ! বরষণ শেষে আইল
শাওয়ন আজ ॥
চল চল মেঘদল, চঞ্চল অলিকুল, ফুটিল কমল দল
পরাতে ঋতুরে রাজ-সাজ ॥

বিজুরী চমকে থমকে থমকে, রহিয়া রহিয়া বিদারি
গগন হিয়া গরজে বাজ;
সরস ধরাতল, মানব শতদল আজি যে আকুল হোল,
আজি যে শাওয়ন এল, দেখ ফেলে জীবনের কাজ ॥

কথা ও স্বরলিপি—শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সুর—শ্রীহংসেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

স্থায়ী—

০ ১ + ৩
{ রে গা মা পা মা রে | সা নি রে সা | রে গা মা পা মা পা | মা রে রে }
{ আ ০ ০ ০ ই ল | শা ০ ওয় ন | ঋ ০ ০ ০ ০ তু | রা ০ জ }

০ ১ + ৩
রে গা মা পা মা রে | সা নি রে সা | নি পা নি সা | মা পা নি সা রে সা |
আ ০ ০ ০ ই ল | শা ০ ওয় ন | ব র ষ ণ | শে ০ ০ ০ ০ ষে |

০ ১ + ৩
রে গা মা পা মা পা | মা গা মা রে সা | নি সা রে গা রে গা মা পা | মা পা গা মা রে সা নি সা ||
আ ০ ০ ০ ই ল | শা ০ ০ ওয় ন | আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ | জ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ||

অন্তরা—

+ ৩ ০ ১
{ মা পা নি পা | নি নি নি নি | সা সা রে | নি নি সা সা }
{ চ ল চ ল | মে ঘ দ ল | চ ঞ্চ ল | অ লি কু ল }

+ ৩ ০ ১
পা রে সা রে | নি সা নি পা | মা পা নি পা | মা পা মা রে |
ফু টি ল ক | ম ল দ ল | প রা তে ঋ | তু রে রা জ |

+ ৩
সা রে মা পা নি পা মা পা | রে গা মা পা গা মা রে সা ||
সা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ | জ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ||

সঞ্চারী ও আভোগ—

```
 +              ৩        ০              ১                +
{ নি র্মা পা নি | সা সা | রে রে সা সা | রে রে নি সা }| মা মা রে পা |
{ বি ছু রী চ   | ম কে  | থ ম কে থ    | ম ০ ০ কে   }| র হি য়া র   |

 ৩          ০              ১              +              ৩
মা রে রে | সা রে মা পা | নি মা পা পা | সা সা নি সা | নি পা মা রে ||
হি ০ য়া  | বি দা রি গ  | গ ন হি য়া   | প র ০ জে   | বা ০ ০ জ

 ০             ১           +              ৩              ০
{ নি পা নি নি | সা সা সা | সা রে মা রে | সা নি সা সা }| পা সা নি রে |
{ স র স ধ    | রা ত ল   | মা ০ ন ব    | শ ত দ ল    }| আ জি যে আ   |

 ১             +                    ৩                    ০
নি সা নি পা | রে গা মা পা গা মা | রে সা নি রে সা | সা রে মা রে |
ফু ল হো ল   | আ ০ ০ ০ জি শা    | ওম ন ০ এ ল     | দে খ ফে লে  |

 ১             +                          ৩
মা পা নি সা | পা নি সা রে সা নি পা মা | রে গা মা পা গা মা রে সা ||
জী ব নে র   | কা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০         | জ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
```

পরলোকে সার দেবপ্রসাদ

বাঙ্গালার আর একটি ইন্দ্রপাত হইয়া গেল। ২৫শে শ্রাবণ শনিবার রাত্রি ২টা ৫৫ মিনিটের সময় সাহিত্যরসিক, দেশভক্তপ্রাণ, কর্ম্মবীর সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী পরলোক-প্রয়াণ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার প্রায় ৭৫ বৎসর বয়স হইয়াছিল। বহু দিন হইতে তিনি রক্তের চাপবৃদ্ধি ও বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন সত্য; কিন্তু তথাপি তাঁহার অসাধারণ কর্ম্মশক্তি ছিল। গত কয়েক মাস যাবৎ শয্যাশায়ী না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি বহু প্রতিষ্ঠানের কার্য্যে নিয়মিতভাবে যোগদান করিয়া আসিতেছিলেন। সার দেবপ্রসাদ কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ এটর্ণী ছিলেন। বহুসংখ্যক শিক্ষামূলক এবং জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন। এক সময়ে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত

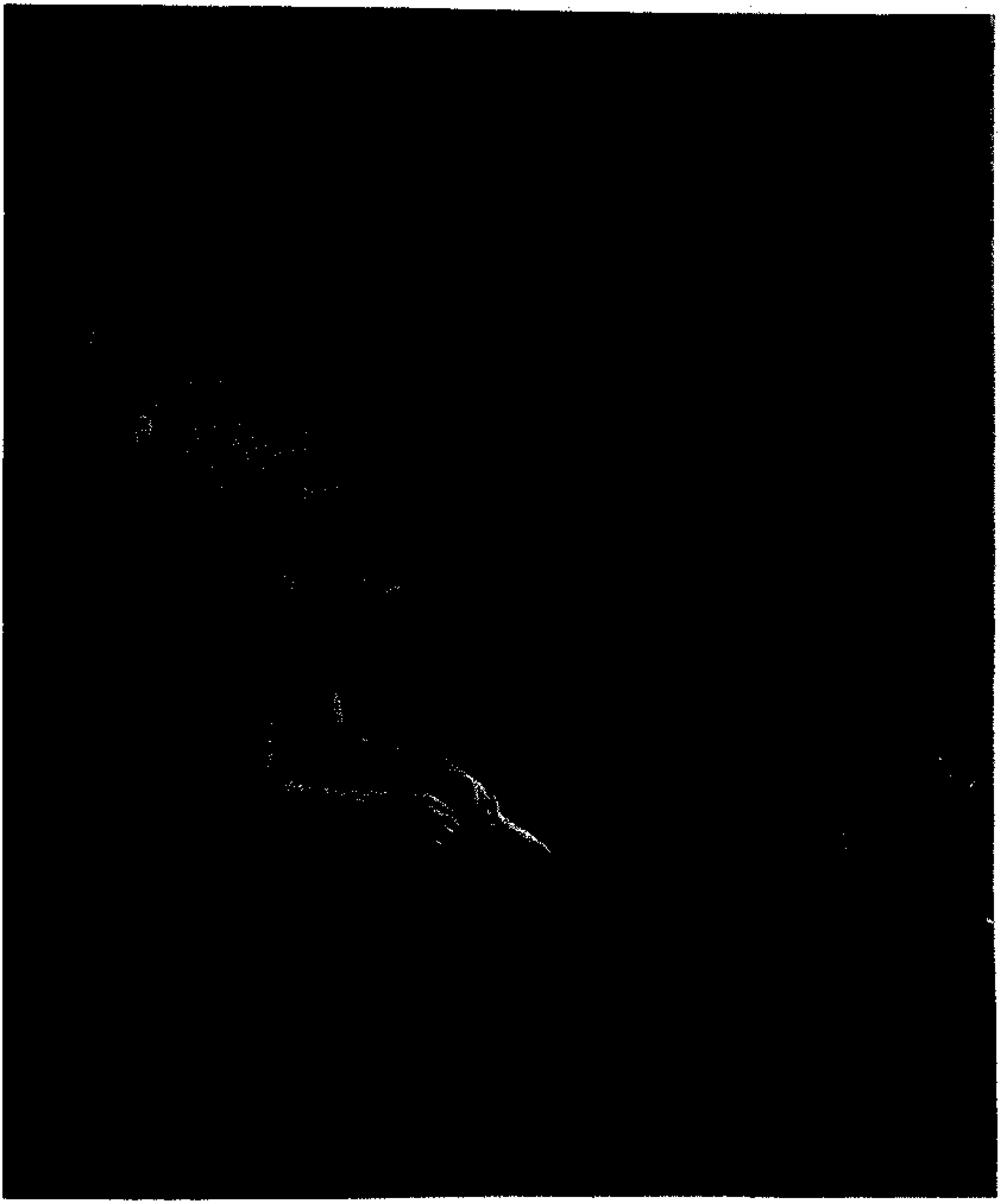


সার দেবপ্রসাদ

তিনি সুদীর্ঘকাল, এমন কি, মৃত্যুসময় পর্য্যন্ত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে সার দেবপ্রসাদ দুইবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিলেন। শিক্ষাজীবনে তিনি যেমন সর্ব্বোচ্চ সম্মান পাইয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, কর্ম্মজীবনেও তেমনই দৃঢ়তা, নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। "বসুমতীর" সহিত তাঁহার সাহিত্যজীবনের বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তাঁহার ন্যায় নীতিপরায়ণ, ধর্ম্মবিশ্বাসী, সাধুচরিত্র বাঙ্গালী কর্ম্মবীরের সংখ্যা ইদানীং বিরল। বাঙ্গালা মায়ের কোল শূন্য করিয়া সার দেবপ্রসাদ পরিণতবয়সে দেহত্যাগ করিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার শূন্যস্থান শীঘ্র পূর্ণ হইবার নহে। তাঁহার শোক-কাতরা বিধবা সহধর্ম্মিণী ও পিতৃহীন পুত্র-কন্যাগণের শোকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট, বসুমতী রোটারী মেসিনে শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

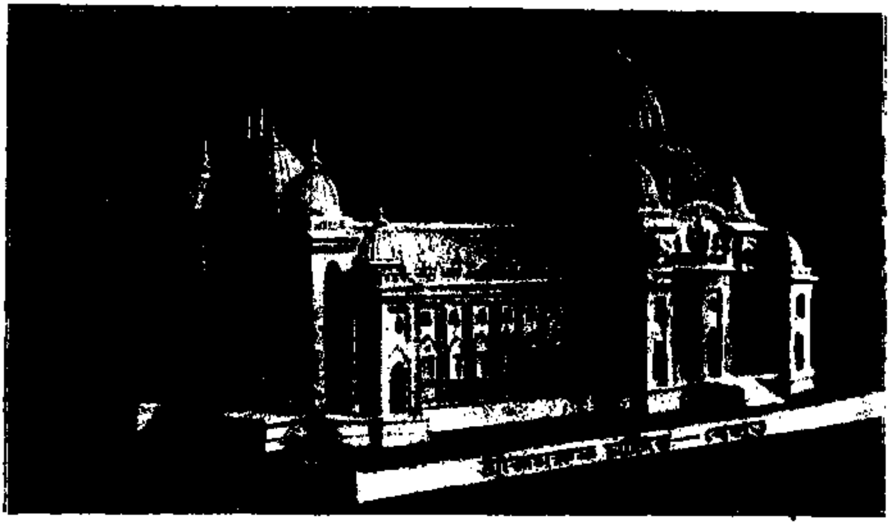


পদ-পঙ্কজ·············
কণ্টকে জর-জর ভেল !—গোবিন্দদাস

বসুমতী-চিত্র-বিভাগ

শিল্পী—মিষ্টার টমাস।

সচিত্র
মাসিক বসুমতী



১৪শ বর্ষ] ভাদ্র, ১৩৪২ [৫ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেব

"নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং
ভক্তানুকম্পাধৃতবিগ্রহং বৈ।
ঈশাবতারং পরমেশমীড্যং
তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ॥"

বাল্য ও কৈশোর

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী—বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান জেলার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত কামারপুকুর গ্রামে এক পরম নিষ্ঠাবান্ সদ্ব্রাহ্মণবংশে, ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়াতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম হয়।

ঠাকুরের জন্মবর্ষ সম্বন্ধে ৩টি মত প্রচলিত আছে। ১২৮৩ সালে ৩রা কার্ত্তিক শ্রীঠাকুরের অসুখের সময় অম্বিকা আচার্য্য তাঁহার এক কোষ্ঠী প্রণয়ন করেন। তাহাতে লেখা আছে—১০ই ফাল্গুন ১২৪১ সাল, বুধবার, পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্র। কিন্তু তিথি, বার প্রভৃতি পাঁজীর সঙ্গে মিলে না। ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য নামে অন্য এক জ্যোতিষী আর এক কোষ্ঠী গণনা করেন। তাহাতে হয় ১২৩৯ সাল ১০ই ফাল্গুন, বুধবার, শুক্লা দ্বিতীয়া, "লগ্নে রবি-বুধ-চন্দ্রের" যোগ, কুম্ভ রাশি। "লগ্নে রবি-বুধ-চন্দ্র" এগুলি ঠাকুরের নিজ মুখের কথা। এই তারিখ গ্রহণ করিলে কিন্তু ঠাকুরের জীবনের ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার সময়ে তাঁহার বয়সের অঙ্ক তাঁহার নিজমুখে কথিত বয়স হইতে বেশী হইয়া যায়। এই জন্য পুনরায় বেলুড় মঠ হইতে তাঁহার আর একখানি কোষ্ঠী প্রস্তুত করান হয়—জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণের দ্বারা। এই কোষ্ঠী অনুসারে ঠাকুরের জন্ম-সন তারিখ হইতেছে—১২৪২ সাল, ৬ই ফাল্গুন, বুধবার ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ। এই মতে ঠাকুরের জন্ম শেষ রাত্রে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে, রাত্রি ৪টায়। এক্ষণে এই

কোষ্ঠীমত তারিখই শ্রীঠাকুরের জন্মতারিখ বলিয়া সকলে গ্রহণ করিয়াছেন।

কামারপুকুর গ্রাম বর্দ্ধমান সহর হইতে কমবেশ ৩০ মাইল দক্ষিণ, তারকেশ্বর হইতে প্রায় ১৮ মাইল পূর্ব্বে এবং জাহানাবাদ (আরামবাগ) হইতে ৭৮ মাইল পশ্চিম। বর্দ্ধমান হইতে যে পাকা রাস্তা বরাবর পুরীধাম পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে, কামারপুকুর গ্রামটি ঠিক সেই রাস্তার উপর



নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ

অবস্থিত। ঘাটাল ও বনবিষ্ণুপুর হইতেও কামারপুকুরে আসিবার রাস্তা আছে।

ঠাকুরের পিতার নাম ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ও মাতার নাম চন্দ্রমণি দেবী। কামারপুকুরে বাসের পূর্ব্বে ক্ষুদিরাম ৩ মাইল দূরবর্ত্তী দেরে নামক অন্য এক গ্রামে বাস করিতেন। ক্ষুদিরামের পিতার নাম মাণিকরাম। তাঁহার কিছু জমিজমা ছিল, অবস্থাও ছিল চলনসই। বংশটি ছিল রামভক্ত। মাণিকরামের ৩ পুত্র ও ১ কন্যা; ক্ষুদিরাম জ্যেষ্ঠ পুত্র ও কানাইরাম সর্ব্বকনিষ্ঠ। ক্ষুদিরামের ভগিনী রামশীলার রামচাঁদ নামে এক পুত্র ও হেমাঙ্গিনী নামে কন্যা হয়। কনিষ্ঠ ভ্রাতা কানাইরামের পুত্রের নাম রামতারক বা হলধারী। দেরে গ্রামে বাসকালীন ক্ষুদিরাম প্রথমে এক বিবাহ করেন, কিন্তু সে স্ত্রী বিবাহের পর অল্পকালমধ্যেই ইহলোক ত্যাগ করেন। পরে ক্ষুদিরাম আনুমানিক ২৫ বৎসর বয়সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলেন—স্ত্রী চন্দ্রমণি, শ্বশুরালয় সারাইঘাটা মায়াপুর। এই দেরে গ্রামের জমিদারের পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দেন নাই বলিয়া তাঁহার চক্রান্তে তাঁহার বিষয় আশয় সব গেল ও ক্ষুদিরামকে দেরে ত্যাগ করিতে হইল এবং কামারপুকুর গ্রামে তদীয় বন্ধু সুখলাল গোস্বামীর প্রদত্ত জমিতে আসিয়া তিনি বাস করিতে লাগিলেন। ক্ষুদিরামের বংশ রামভক্ত; ক্ষুদিরাম নিজেও অতিশয় নিষ্ঠাবান্ ও সত্যবাদী ছিলেন। লোকেও তাঁহাকে সিদ্ধবাক্ বলিয়া জানিতেন। তিনি কখনও শূদ্রদত্ত দান গ্রহণ করেন নাই। সময়ে সময়ে তিনি গেরুয়া বসনও পরিধান করিতেন এবং যখন খড়ম পায় দিয়া রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেন, তখন রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থ দোকানের দোকানদারেরা উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাতযোড় করিয়া প্রণাম ও কুশলপ্রশ্ন করিতে থাকিত। কামারপুকুর গ্রামে হালদারপুকুর নামে একটি দীঘি আছে। সেইখানে ক্ষুদিরাম নিজে স্নান করিতেন। কিন্তু তিনি স্নান না করিয়া গেলে গ্রামের লোক সে পুকুরে স্নান করিতে নামিতে সাহস করিত না। এ দিকে তিনি কিন্তু অতিশয় সরল ও মিষ্টভাষী ছিলেন। বাড়ীতে চেতনশিলা রঘুবীরের ও শীতলা মাতার সেবা ছিল, এই নিমিত্ত নিজে প্রাতে স্বহস্তে পুষ্প চয়ন করিতেন ও ঠাকুরদের পূজা করিবার কালে তন্ময় হইয়া যাইতেন। গ্রামের সকল লোক এই উভয় দেবতাকে জাগ্রত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন, মা শীতলা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেন।

ক্ষুদিরামের ৩ পুত্র ও ২ কন্যা। প্রথম পুত্র রামকুমার, তৎপরে কন্যা কাত্যায়নী, তৎপরে পুত্র রামেশ্বর। রামেশ্বরের পর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন ও সর্ব্বশেষ ক্ষুদিরামের কন্যা সর্ব্বমঙ্গলার জন্ম হয়। কামারপুকুর হইতে প্রায় ১ ক্রোশ দূরবর্ত্তী আনুড় গ্রামের কেনারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত কাত্যায়নীর বিবাহ হয় এবং কেনারামের ভগিনীর সহিত রামকুমারের পাল্টি বিবাহ হয়। রামকুমারের অক্ষয় নামে এক পুত্র হইয়াছিল এবং পুত্রটি প্রসূত

হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ ঘটিয়াছিল। রামেশ্বরেরও ২ পুত্র—রামলাল ও শিবরাম এবং ১ কন্যা লক্ষ্মীমণি।

চন্দ্রমণি দেবী সরলতার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। তিনি এতদূর দয়াশীলা ছিলেন যে, যে কোন ক্ষুধার্ত্ত তাঁহার গৃহে আসিলে গৃহে যাহা থাকিত, তাহা দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তবে নিশ্চিন্ত ও সুখী হইতেন।

ক্ষুদিরামের কনিষ্ঠ কানাইরামও অতিশয় ভক্তিমান, ভাবপ্রবণ ও শ্রীরামভক্ত ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ বিশ্বাস ছিল। একদা যখন মেয়ের বাড়ীতে গমন করিতেছিলেন, তখন যাইবার পথে এক স্থানে দেখিলেন যে, সেখানে চমৎকার বেলফুল ও সুন্দর বেলপাতা রহিয়াছে। এইরূপ ফুল ও পাতায় পরমপরিতোষে ঠাকুরসেবা হইবে, এই ভাবিয়া সেইগুলি সংগ্রহ করিলেন এবং মেয়ের বাড়ী গমন না করিয়া ২।৩ ক্রোশ ফিরিয়া আসিয়া দেবসেবায় মন দিলেন। আর একবার এক স্থানে রামযাত্রা হইতেছিল। উত্তম অভিনয় চলিতেছে, কৈকেয়ী শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাসে যাইতে বলিলেন। ভাবপ্রবণ কানাইরামের ইহা সহ্য হইল না; সভা হইতে উঠিয়া, একটি জ্বলন্ত প্রদীপ লইয়া, যে কৈকেয়ী সাজিয়াছিল, তাহার নিকট গিয়া সক্রোধে বলিলেন —"পামরি! এই দেউটি দিয়ে তোমার মুখ পুড়িয়ে দেব।" কানাইরাম যখন আবক্ষ জলে দাঁড়াইয়া স্তবপাঠ করিতে করিতে ধ্যান করিতেন, তখন তাঁহার চক্ষু হইতে অজস্র জলধারা নিপতিত হইত এবং বক্ষ লাল হইয়া যাইত।

একদা ক্ষুদিরাম গয়াতীর্থে শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের জন্য গমন করিয়াছিলেন। সেখানে এক দিন রাত্রিতে নিদ্রাবশে স্বপ্ন দর্শন করেন যে, যেন গদাধর (মতান্তরে রঘুবীর) তাঁহাকে বলিতেছেন যে, তিনি ক্ষুদিরামের গৃহে তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। ইহাতে ব্রাহ্মণ অতিমাত্র চিন্তিত হইয়া প্রথমধ্যেই কহিলেন, 'ঠাকুর, আমি অতি গরীব ব্রাহ্মণ, কেমন করিয়া তোমার উপযুক্ত সেবা করিব?' ঠাকুর হাসিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, 'সে সব ঠিক হয়ে যাবে।' এই কথা বলিয়া মূর্ত্তি অন্তর্দ্ধান হইল। ক্ষুদিরামেরও নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গে তিনি স্বপ্ন সম্বন্ধে নানা বিচার-বিতর্ক করিলেন ও ভাবিতেও লাগিলেন। গয়াকৃত্য সমাপনান্তে তিনি কামারপুকুরে আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এ দিকে কামারপুকুরে চন্দ্রমণি দেবী এক দিন যখন ২ জন প্রতিবেশিনীর সঙ্গে বাটীর অদূরবর্ত্তী যুগীদের শিবমন্দিরের নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন তাঁহার এক অতি অদ্ভুত অনুভব ঘটিল। তাঁহার মনে হইল, যেন শিবমন্দির হইতে জ্যোতিঃপুঞ্জ তাঁহার উদরে প্রবেশ করিতেছে। এই কথা তিনি প্রতিবেশিনীদিগের নিকট বলিলেন; কিন্তু তাঁহারা কথাটা ঠিক



যুগীদের শিবমন্দির

বিশ্বাস না করিয়া নিজ নিজ বুদ্ধিমত মতামত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই দুই জনের মধ্যে এক জন বালবিধবা ধনী কামারণী। অপরটি প্রসন্নময়ী, ধর্ম্মদাস লাহার কন্যা। যাহা হউক, সেই দিন হইতে চন্দ্রমণি বোধ করিতে লাগিলেন, যেন তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে। ইতিমধ্যে ক্ষুদিরাম গয়া হইতে আসিয়া সমস্তই শুনিলেন; কিন্তু নিজের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া 'হাঁ না' কিছুই বলিলেন না। চন্দ্রমণির ঠাকুরকে গর্ভে ধারণের সঙ্গে মেরীর যীশুকে গর্ভে ধারণের অনেকটা সৌসাদৃশ্য যেন আমরা দেখিতে পাইতেছি। যোশেফের সঙ্গে তিনি সঙ্গতা হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার গর্ভ হইয়াছে, এইরূপ

মেরী বিশ্বাস করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে কুমারী (Virgin) মেরী মাতা বলা হয়। এ দিকে চন্দ্রমণি-দেবীর দৈহিক রূপ-লাবণ্য দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল এবং তাঁহার স্বভাব অনেকটা পরিবর্ত্তিত হওয়ায় তিনি যেন পাগলিনীর মত হইয়া গেলেন। তিনি এই গর্ভাবস্থায় নানাবিধ অপূর্ব্ব রূপ দর্শন, বাদ্যগীত শ্রবণ ও স্বর্গীয় গন্ধ আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন এবং রাত্রিতে শয়নঘরে অস্বাভাবিক আলোকচ্ছটাও দর্শন করিতে লাগিলেন। পাড়ার লোকে অবশ্য এই সব কথা শুনিয়া, তাঁহার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়াছে, তাহাদের এই অনুমানই যথার্থ মনে করিতে লাগিল। কিন্তু ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে নির্জ্জনে বলিতেন,—'এ সব কথা ঐহিক লোকদের নিকট প্রকাশ করিও না। তোমার গর্ভে যিনি আসিতেছেন, তাঁহারই আগমনে এরূপ ঘটনা ঘটিতেছে এবং পরে আরও কত আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতে দেখিতে পাইবে।' ক্রমে শুভ শুক্লা দ্বিতীয়াতে, ফাল্গুন মাসে ঠাকুরের অবতরণের দিন উপস্থিত হইল। যে চালাতে ঢেঁকি ছিল, সেই স্থানেই প্রসবস্থান নির্দ্দিষ্ট করা হইল; কারণ, অন্য কোন স্বতন্ত্র ঘর আঁতুড় হইবার মত ছিল না। শেষরাত্রিতে ধনী কামারণীর সম্মুখে প্রভু ভূমিষ্ঠ হইলেন। সদ্যপ্রসূত বালক দীর্ঘকায়, যেন ছয় মাসের শিশুর মত অবয়ববিশিষ্ট, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, 'চন্দ্রকিরণ অঙ্গে', অপূর্ব্ব দর্শন! আনন্দের সীমা নাই, সমস্ত গ্রামের লোক নবজাত শিশুকে দেখিতে আসিতে লাগিল এবং তাহার নানা প্রকার সুখ্যাতি করিতে লাগিল। ক্ষুদিরাম শিশুর নাম রাখিলেন গদাধর, ভাল নাম থাকিল রামকৃষ্ণ। আদর করিয়া পিতামাতা ও গ্রামের লোকে তাঁহাকে গদাই বলিয়া ডাকিত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ক্ষুদিরাম অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। তাঁহার বন্ধু সুখলাল গোস্বামী তাঁহাকে থাকিতে ভদ্রাসনের একাংশ দান করিয়াছিলেন এবং রঘুবীরের নিত্যসেবা আছে জানিয়া লক্ষ্মীজোলা নামক স্থানে কমবেশ ১ বিঘা জমি নিঃস্বত্বে দান করিয়াছিলেন। এইটুকু সম্পত্তির মালিক ক্ষুদিরাম। বর্ষার তিনি স্বহস্তে তিন গোছা ধানের চারা জমির ঈশানকোণে 'জয় রঘুবীর' বলিয়া পুঁতিয়া দিতেন। বলা বাহুল্য, এইরূপে যে অতি সামান্য আয়ই হইত, তাহাতে বৎসরের ব্যয় সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব ছিল। তবে সৌভাগ্যক্রমে এই সময় ক্ষুদিরামের ভগিনী রামশীলার পুত্র রামচাঁদ মেদিনীপুরে মোক্তারী করিয়া বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতেছিলেন। তিনি মাতুলের অবস্থা জানিয়া সাহায্যকল্পে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মাসিক অর্থ-সাহায্য করিতে লাগিলেন। তাহাতে ক্ষুদিরামের সংসারযাত্রা বহুল পরিমাণে সহজ হইয়া আসিল। পুরী যাইবার হাঁটা পথের ধারে তাঁহার বাড়ী, সুতরাং অতিথি নিত্যই আসিত এবং তাহার ব্যবস্থা এই গৃহস্থকে করিতে হইত। এমন কি, মধ্যে মধ্যে এমন ঘটিত যে, গৃহে অন্ন প্রায় নিঃশেষিত, এমন সময় হয় ত দশ জন অতিথি সমাগত। এক দিন এইরূপ ঘটিলে চন্দ্রমণি দেবী যখন অতিথি বিমুখ হইয়া যাইবে ভাবিয়া রন্ধনশালায় ক্রন্দন করিতেছিলেন, তখন তিনি যেন দেখিলেন যে, একটি নবমবর্ষীয়া বালিকা তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িতেছেন ও তাহাতে অন্নব্যঞ্জন সহসা বৃদ্ধি পাইতেছে। কি আশ্চর্য্য, সেই অবধি যতক্ষণ না চন্দ্রমণি দেবী আহার করিতেন, ততক্ষণ ভোজ্যদ্রব্য ফুরাইত না।

এ স্থলে ঠাকুরের জাগ্রত গৃহদেবতা রঘুবীরপ্রাপ্তির সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। একদা ক্ষুদিরাম মেদিনীপুরে তাঁহার ভাগিনেয় রামচাঁদের নিকট গমন করিতেছিলেন। গমন করিতে করিতে ক্লান্তিবোধ হওয়ায় তিনি এক বৃক্ষতলে শয়ন করিলেন। যেমন শয়ন, অতিরিক্ত ক্লান্তির জন্য অমনই নিদ্রার আবেশ হইল। স্বপ্নে দেখিলেন, এক নবদূর্ব্বাদলশ্যামবর্ণ বালক, কুমার বয়স, হাতে ধনু, পৃষ্ঠে বাণের তূণীর—তিনি ক্ষুদিরামকে কহিতে লাগিলেন, 'দেখ, আমি এক সাধু কর্ত্তৃক এইখানে পরিত্যক্ত হইয়া রহিয়াছি। দিনান্তে দু'টি খেতে পাই না। তুমি আমাকে লইয়া তোমার বাড়ীতে চল। আমি এই ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে প্রোথিত অবস্থায় রহিয়াছি। তোমার বাড়ীতে যাইতে আমার ভারি ইচ্ছা।' নিদ্রিত ব্রাহ্মণ স্বপ্নের মধ্যে বলিলেন—'দেখ ঠাকুর, আমি বড় দরিদ্র; তোমাকে নিত্য সেবা করিবার মত দ্রব্য যোগাইতে পারিব কোথা হইতে?' সুকুমার মূর্ত্তি কহিলেন, 'বেশী কিছু চাই না, যদি প্রত্যহ দুটি দুটি অন্ন পাই, তবেই আমার যথেষ্ট।' নিদ্রাভঙ্গে ব্রাহ্মণ বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং সমস্ত ক্ষেত্র খুঁজিয়া দেখিলেন; কিন্তু কোথাও ঠাকুরের সন্ধান মিলিল না। ক্ষোভে, বিস্ময়ে ও হতাশহৃদয়ে ব্রাহ্মণ আবার শয়ন করিলেন।

পুনরায় নিদ্রাবেশে আবার সেই স্বপ্ন। এবারে স্বপ্নে ব্রাহ্মণ রঘুবীর যে স্থানে রহিয়াছেন, সেই স্থান জানিতে পারিলেন। নিদ্রাভঙ্গে সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিয়া ক্ষুদিরাম দেখিলেন যে, সত্য সত্যই গর্ত্তমুখে এক শিলা রহিয়াছে, এক বিষধর সর্প ফণা বিস্তার করিয়া শিলাটিকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। স্বপ্নকথা স্মরণ করিয়া ব্রাহ্মণ নির্ভয়ে যেমন শিলা গ্রহণ করিতে হস্ত প্রসারিত করিলেন, অমনি সেই ফণী অন্তর্হিত হইয়া গেল। পরম হৃষ্টমনে ব্রাহ্মণ সেই শিলা লইয়া গৃহে প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইনিই ঠাকুরের গৃহে নিত্য আরাধিত চেতন শালগ্রাম রঘুবীর। কোন কোন ভক্ত এরূপও অনুমান করিয়াছেন যে, ইনিই শ্রীচৈতন্যদেবের বাটীতে নিত্য-পূজিত "রঘুনাথ" শিলা। কোনরূপে নবদ্বীপ হইতে হুগলীতে আসিয়া পড়িয়া পরিত্যক্তভাবে থাকিতে থাকিতে ব্রাহ্মণ ক্ষুদিরামের গৃহে শুভাগমন করিয়াছেন।

শিশু গদাধর নাকি নানা লীলা দেখাইতেন। কখন তিনি এত গুরুভার হইতেন যে, মাতা চন্দ্রমণি তাঁহাকে তুলিতেই পারিতেন না। কখন কখন তিনি শিবনেত্র হইতেন ও জননীকে অতিশয় ভীত করিতেন। কেহ কেহ ইহাকে শিবের আবেশ বলিয়াও মনে করিতেন। কখন কখন তাঁহার আকৃতির ও দৈর্ঘ্যের তারতম্য ঘটিত। পাঁচ মাস বয়সে এক দিন চন্দ্রমণি তাঁহাকে ঘরে শোয়াইয়া কার্য্যান্তরে গমন করেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, শিশু নাই, তৎস্থানে শয্যাপ্রমাণ এক দীর্ঘকায় পুরুষ শয়ন করিয়া আছেন। তখন তিনি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণ সে চীৎকার শ্রবণে আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু শিশু যেমনি শুইয়াছিলেন, তেমনি দেখিতে পাইলেন। তখন চন্দ্রমণিকে তিনি বলিলেন, 'তুমি যাহা দেখিয়াছিলে, তাহা সত্য। যিনি তোমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ, তিনি সবই হইতে ও করিতে পারেন। এখন কত কি দেখিবে, তবে এ সব কথা যার তার কাছে বলিও না বা এই সমস্ত দেখিয়া এত বিচলিত হইও না।' এইরূপে শিশু ষষ্ঠ মাসে উপনীত হইলে যথারীতি তাঁহার শুভ অন্নপ্রাশন সম্পন্ন হইল এবং তদুপলক্ষে ভদ্র ও ভদ্রেতর কামারপুকুরগ্রামবাসী সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া আহারে পরিতৃপ্ত হইলেন।

ইতিমধ্যে ঠাকুরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ ও সাহিত্যপাঠে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন; এখন তিনি স্মৃতিও সমাপ্ত করিলেন। তিনি এখন উপার্জ্জনক্ষমও হইয়াছিলেন; সুতরাং সাংসারিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়াছিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও পিতামাতার আদরে পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রমে পদার্পণ করিলেন। এখন শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যারম্ভের সময় উপস্থিত হইল। লাহা বাবুরা গ্রামের একঘর বড় ধনাঢ্য তামলী-বংশ ছিলেন। এই বংশের কর্ত্তা ধর্ম্মদাস লাহা ক্ষুদিরামের বন্ধু ছিলেন তিনি কারবারে বিস্তর ধনার্জ্জন করিয়াছিলেন। উভয় পরিবারের মধ্যে প্রীতি ছিল এবং তাঁহাদের পরস্পর পরস্পরের বাড়ীতে যাতায়াত ছিল। তাঁহারা ঠাকুরকে বড়ই ভালবাসিতেন। গৃহজাত নানাবিধ মিষ্টান্ন তাঁহার গৃহিণী বালক গদাধরকে খাওয়াইয়া বিশেষ তৃপ্তি ও আনন্দ অনুভব করিতেন। ধর্ম্মদাসের পুত্র গয়াবিষ্ণু গদাধরের সমবয়স্ক ছিলেন এবং উভয়ে পরস্পরের সহিত "সেঙ্গাৎ" পাতাইয়াছিলেন। ধর্ম্মদাসের কন্যা প্রসন্নময়ীও গদাধরকে খুব ভালবাসিতেন। এই লাহাদের বাড়ীতে পাঠশালা ছিল। বালক গদাধর সেই পাঠশালায় পাঠাভ্যাসের জন্য গমন করিলেন। গুরুমহাশয়ের নাম যদুনাথ সরকার। লেখাপড়া শেখায় গদাধর কিন্তু বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না। তিনি অবসর পাইলেই সঙ্গীদিগকে লইয়া খেলাধূলা করিতেন। এই খেলার আড্ডা ছিল বাড়ীর অনতিদূরে মাণিক বাড়ুয্যের বাগান। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ভুরসুবো গ্রামের জমিদার ছিলেন, লোকে তাই তাঁহাকে মাণিক রাজাও বলিত। মাণিক রাজার বাড়ীতে গদাধরের যাতায়াত ছিল;—এই সুন্দর বালকের পৃষ্ঠে তখন লম্বমান বেণী ছিল; কোমরে গোট ও দুই হাতে বালা ছিল। কথা কহিবার সময় একটু একটু বাধিত। এই বালককে দেখিলে মাণিক-গৃহিণী ও অন্যান্য অন্তঃপুরিকারা বিশেষ প্রীতি লাভ করিতেন। বালক সেখানে গেলে তাঁহাকে আদর ও যত্ন করিতেন এবং তাঁহাকে আহার্য্য মিষ্টান্নে পরিতুষ্ট করিতেন। একদা তাঁহারা একপ্রস্থ সোনার গহনা গড়াইয়া বালক গদাধরকে সাজাইয়া দিয়াছিলেন। যদি গদাধর বেশী দিন তাঁহাদের বাড়ী না যাইতেন, তবে লোক পাঠাইয়া তাঁহারা তাঁহার সংবাদ লইতেন।

বালক গদাধর লেখাপড়ায় বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না বটে, কিন্তু অসাধারণ মেধাশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি অতিশয় সুকণ্ঠ ছিলেন। যে সকল পরিণতবয়স্ক ব্যক্তি

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গান শুনিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার কণ্ঠের সুমিষ্টতা সম্বন্ধে একমত ছিলেন। বালক গদাধর অসাধারণ স্মরণশক্তির সাহায্যে যাত্রার পালা আগাগোড়া মুখস্থ বলিতে পারিতেন এবং শুধুই তাহা নহে, প্রত্যেক নটের হাবভাবও হুবহু নকল করিতে সমর্থ হইতেন। সর্ব্বোপরি ছিল তাঁহার ভাবপ্রবণতা। এমন প্রায়ই ঘটিত যে, যাত্রা নকল করিয়া সঙ্গী বালকগণকে শুনাইতে শুনাইতে এবং গান গাইতে গাইতে ভাবাধিক্যে তিনি বাহ্যজ্ঞান প্রায় হারাইয়া ফেলিতেন; কখনও এমন ক্রন্দন করিতেন যে, তাঁহাকে থামান মুস্কিল হইত। সঙ্গী বালকগণ তাঁহার ভাবান্তর দেখিয়া অনেক সময় ভীত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যাইত।

অমনোযোগিতা নিবন্ধন গদাধরের বিদ্যা পাঠশালার 'কাঠাকে'র ওপারে আর যায় নাই। তাহার উপর "শুভঙ্করী ধাঁধা লাগতো"। তবে তাঁহার হাতের লেখা কয়েকখানি পুঁথি আছে, উহাতে দেখা যায়, তাঁহার বাঙ্গালা হস্তাক্ষর নিতান্ত মন্দ ছিল না। তা ছাড়া তিনি ছেলেবেলায় ভাল চিত্র আঁকিতে পারিতেন ও ছোট ছোট ঠাকুর বেশ গড়িতে পারিতেন। এ বিষয়ে তিনি অনেক দক্ষ কারিকরকেও হারাইয়া দিতে পারিতেন। তিনি পাঠশালে যে প্রহ্লাদচরিত্র পুঁথি পড়িতেন, তাহা আবার পাঠশালার ছুটীর পর, সন্ধ্যার সময়, মধু যুগী নামক এক তাঁতির বাড়ীতে এমন সুরলয়-সহযোগে পাঠ করিতেন যে, গদাধরের পাঠ শুনিবার জন্য চারিদিকে নানা বয়সের লোকের ভীড় জমিয়া যাইত। আমরা শুনিয়াছি, এই পাঠকালে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিত। নিকটবর্ত্তী আমগাছ হইতে কখন কখন একটি হনুমান পাঠের স্থলে আসিয়া স্থির হইয়া অন্যান্য শ্রোতাদের ন্যায় বসিয়া থাকিত, কখনও বা বালক গদাধরের পদধারণ করিয়া বসিয়া থাকিত। পাঠান্তে ঠাকুর যখন হনুর মস্তকে বই ছোঁয়াইয়া দিতেন, তখন হনু আবার গাছে গিয়া উঠিত।

লাহা বাবুদের বাড়ীতে সাধু-সন্ন্যাসিগণের সর্ব্বদা যাতায়াত ছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কামারপুকুর গ্রামটি পুরী যাইবার পথের উপর অবস্থিত। সুতরাং ধনী অতিথিসেবক লাহাদের গৃহে যে সাধু-ফকির আসিয়া ভিক্ষা ও আতিথ্য গ্রহণ করিবেন, তাহা অতি স্বাভাবিক। বালক গদাধর এই সব সাধুর সঙ্গ করিতে ভালবাসিতেন এবং তাঁহারা যখন পুস্তক, পুঁথি বা পুরাণাদি পাঠ করিতেন, তখন তিনি নিবিষ্টমনে ঐ সকল শ্রবণ করিতেন। এতদ্ভিন্ন গ্রামে কোথাও পুরাণ-ভাগবত-সম্বন্ধীয় কথকতা, পাঠ বা গান হইলে সে স্থানে প্রায়ই ঠাকুর হাজির থাকিতেন এবং নিবিষ্টমনে কথা শ্রবণ করিতেন; অধিকন্তু কথিত বিষয় স্মরণ করিয়া রাখিতেন। এইরূপে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি পুস্তকের ভিতরকার মোটামুটি আখ্যানভাগ বাল্যকালেই তিনি জানিয়া লইয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে গদাধর সাধুদের সাজপোষাক নকল করিয়া নিজের বস্ত্র ছিঁড়িয়া ডোর-কৌপীন প্রভৃতিও পরিধান করিতেন। তিনি সাধুদের দত্ত প্রসাদাদি আনন্দে গ্রহণ ও ভোজন করিতেন। ঠাকুর গদাধর এইরূপে সাধুসঙ্গের ফলে অতি অল্পবয়স হইতেই ধ্যান করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন—যে ধ্যান পরিণতি লাভ করিয়াছিল নির্ব্বিকল্প-সমাধিতে। সাধারণের দৃষ্টিতে প্রায় অশিক্ষিত ও বালক মাত্র থাকিলেও গদাধর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার ও বিচারশক্তির পরিচয় দিতেন। এ বিষয়ে আমরা বালক গদাধরের সম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকার বর্ণনা করিতেছি।

গ্রামের জমিদার লাহা বাবুদের বাড়ীতে একদা শ্রাদ্ধ উপলক্ষে গ্রামস্থ ও আশপাশের গ্রামের সমস্ত টোলে নিমন্ত্রণ করা হয়। এতদুপলক্ষে বহু পণ্ডিত একত্র সমবেত হইয়াছিলেন। ক্রমে পণ্ডিতগণের মধ্যে শাস্ত্রালাপ আরম্ভ হইল এবং তাহা হইতে মতভেদ হইয়া বিষম তর্ক উপস্থিত হইল। তর্কের কোলাহলে চারিদিক হইতে লোক আসিয়া পড়িল এবং সঙ্গিগণসহ ঠাকুর গদাধরও তথায় গমন করিলেন। তিনি পণ্ডিতগণের মধ্যে এক একটি কথা বলিতে আরম্ভ করায় পণ্ডিতগণ তাঁহাকে বালক বলিয়া ভুলিয়া গেলেন এবং তাঁহাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ঠাকুর যে সব উত্তর দিতে লাগিলেন, তাহাতে মতভেদের সরল মীমাংসা ও তৎসহ শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহের ব্যাখ্যাও আপনি হইয়া যাইতে লাগিল। পণ্ডিতগণ আশ্চর্য্য ও নির্ব্বাক্ হইয়া গেলেন এই ভাবিয়া যে, এই ক্ষুদ্র বালক এ সব গূঢ় শাস্ত্রীয় তত্ত্বের শব্দার্থ ও মর্ম্মার্থ কিরূপে অবগত হইল? তাঁহারা শিশুর পরিচয় জানিয়া ভাবিতে লাগিলেন, নিশ্চয় এই বালক দৈবশক্তির অধিকারী, নচেৎ এমন বয়সে এরূপ গভীর শাস্ত্রজ্ঞান কখনই সম্ভব

হইতে পারে না। পণ্ডিতগণের সকল বিতর্কের মীমাংসা করিতে এই ক্ষুদ্র বালককে সমর্থ দেখিয়া তাঁহারা পরম প্রীত হইয়া বালক গদাধরের দীর্ঘজীবন ও ভবিষ্যৎ জীবনের শুভেচ্ছা কামনা করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ঠিক অনুরূপ ঘটনার বিবরণ বালক ঈশার জীবনে ঘটিয়াছিল, আমরা ইহা বাইবেলে (New Testamentএ) দেখিতে পাই। দ্বাদশ বর্ষবয়স্ক বালক ঈশা জেরুসালেমের মন্দিরে পণ্ডিতগণকে বিবিধ প্রশ্ন করিয়া এবং তাঁহাদের প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তর দান করিয়া এইরূপ তাঁহাদিগকে মুগ্ধ ও বিস্ময়ান্বিত করিয়াছিলেন।

এখানে এ কথা বলা প্রয়োজন যে, পণ্ডিত মোক্ষমূলর যিনি শ্রীরামকৃষ্ণজীবনচরিত আলোচনা করিয়া একখানি বই লিখেন, তিনি যীশুর জীবনের এই ঘটনার সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্য-জীবনের এই ঘটনাকে শিষ্যগণের কল্পনা-প্রসূত interpolation বা প্রক্ষেপ বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। অবশ্য এ মতামতের জন্য মোক্ষমূলরই দায়ী, কিন্তু ঘটনাটি যে যথার্থ, তাহা অনুসন্ধানে ও তৎকালীন ঠাকুরের সমবয়স্ক ও বয়োজ্যেষ্ঠদিগের নিকট হইতে শুনিতে পাওয়া গিয়াছে, শুধু কল্পনা অবলম্বনে রচিত হয় নাই।

ঠাকুরের পিতা সরল উদার নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ক্ষুদিরাম এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন। বয়স প্রায় ৬৮ হইবে। এই নিঃস্ব দুঃখী ব্রাহ্মণের কিন্তু শারীরিক ও মানসিক বলের অভাব কোন দিনই ছিল না। ঠাকুরের জন্মের পূর্ব্বে ইনি পদব্রজে সেতুবন্ধ রামেশ্বর তীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন। সেতুবন্ধ এ দেশ হইতে যাতায়াতে প্রায় তিন হাজার মাইল। দীর্ঘ ১ বৎসর-কাল ভ্রমণ দ্বারা এই কার্য্য তিনি করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, যেখানে ভগবান্ অবতীর্ণ হন, সেইখানেই অবতারের পিতামাতা মূর্ত্তিমান সরলতারূপে আবির্ভূত হন। নন্দ গোপের মত সরল মহাপ্রাণ ব্যক্তির দ্বিতীয় উদাহরণ কোথায়? ক্ষুদিরামও নন্দ ঘোষের ন্যায় সরলতার মূর্ত্তি ছিলেন। আর চন্দ্রমণি দেবীর মত সরলহৃদয়া অশেষস্নেহভালবাসার আগার নারীর দ্বিতীয় উদাহরণ আমরা কোথায় পাইব? তাই শ্রীঠাকুর চন্দ্রমণি দেবীর দেহত্যাগকালে দক্ষিণেশ্বরের বকুলতলার ঘাটে এই বলিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন—"মা, তুমি কে গো মা, যে আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলে?"

পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে, ক্ষুদিরামের ভাগিনেয় রামচাঁদ মেদিনীপুরে মোক্তারী করিয়া বেশ সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার বাড়ী ছিল সেলামপুরে। এই সময়ে একবার তিনি তাঁহার বাড়ীতে খুব ঘটা করিয়া দুর্গোৎসব করিলেন। মাতুল ক্ষুদিরাম পূজা দেখিতে আমন্ত্রিত হইয়া গমন করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি আর কামারপুকুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিলেন না। রামচাঁদের বাড়ীতে তিনি বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইলেন এবং সজ্ঞানে রঘুবীরের নাম লইতে লইতে বিজয়া-দশমীর দিন দেহত্যাগ করিলেন। কামারপুকুরে চাটুয্যে-পরিবারে বিষম শোকের ঝড় উঠিল। কিন্তু রামকুমার এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই বাধ্য হইয়া এই সংসারের ভার গ্রহণ করিতে সাহস করিলেন এবং যথাসম্ভব পরিবার-বর্গকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। ক্রমে অবস্থানুরূপ ব্যয় সহকারে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন হইয়া গেল।

গদাধরের বয়সও এখন আট বৎসর হইতে চলিল। তাঁহাকে উপনীত করা এখন প্রয়োজন। তাহারই চেষ্টা ও আয়োজন হইতে লাগিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কামারপুকুরের ধনী কামারণী ঠাকুরের ধাইমাতা ছিলেন। ইনি অপুত্রকা হওয়ায় গদাধরকে অতিশয় ভালবাসিতেন এবং কোন ভাল খাদ্যদ্রব্য পাইলে গদাধরকে না খাওয়াইতে পারিলে সুখী হইতেন না। ঠাকুর নিজ মুখে বলিয়াছেন যে, অতিশয় ভক্তিপ্রবণতার জন্য তিনি ধনীর রাঁধা ডালও খাইয়াছিলেন, তবে তাতে কেমন একটা 'কামারে', 'কামারে' গন্ধও নাকি অনুভব করিয়াছিলেন।

এহেন ধনী কামারণীর মনে সাধ ছিল, ঠাকুরের উপনয়ন-কালে তিনি ভিক্ষামাতা হইবেন ও ঠাকুর তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিবেন। কিন্তু অশূদ্রগ্রাহী ব্রাহ্মণের বংশে এ অনিয়ম সহজে হওয়া ত সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠ রামকুমার পণ্ডিত ও বিধিজ্ঞ। গদাধর যখন দেখিলেন যে, তিনি নিজে ধনীর ভিক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেও বাড়ীর কাহারও তাহাতে মত নাই, তখন তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া রহিলেন—কাহারও অনুরোধে দ্বার খুলিলেন না। কথাটা ক্রমে গ্রামে প্রচার লাভ করিল। শেষে যখন কিছুতেই ঠাকুর দ্বারোদ্ঘাটন করেন না, তখন

লাহাদের বাড়ীর কর্ত্তা—ধর্ম্মদাস আসিয়া জ্যেষ্ঠ রামকুমারকে অনেক বুঝাইলেন এবং তাঁহাকে গদাধরের মতে মত দিতে রাজী করিলেন। যখন এই সংবাদ ঠাকুরকে দেওয়া হইল, তখন তিনি গৃহদ্বার উন্মোচন করিলেন ও ক্রমে যথারীতি উপনয়নকার্য্য সুসম্পন্ন হইল। তবে ধনীর ভিক্ষাই গদাধর প্রথম গ্রহণ করিয়া তাহাকে ভিক্ষামাতারূপে স্বীকার করিলেন এবং ধনীর বহুদিনের গুপ্ত মনোভিলাষ এইরূপে বালক গদাধর পূর্ণ করিলেন।

পূর্ব্বে ঠাকুরের সাঙ্গাৎ গয়াবিষ্ণুর কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। আরও দুই এক জন বাল্যসখার কথা আমরা এখানে বলিব। ইঁহাদের এক জন চিনু শাঁখারী। ইনি গদাধরের সমবয়স্ক ছিলেন না। ঠাকুরের অপেক্ষা অনেক বয়োবৃদ্ধ ছিলেন—ঠাকুর তাঁহাকে দাদা বলিতেন। চিনু গদাধরকে বড়ই ভালবাসিতেন এবং গদাধর তাঁহার দোকানে আসিলে খরিদ্দারগণকে উপেক্ষা করিয়াও তাঁহার সহিত আলাপ করিতেন ও তাঁহাকে ভালমন্দ জিনিষ সযত্নে খাইতে দিতেন। চিনু ভাগবত ভালরূপে জানিতেন এবং কীর্ত্তনানন্দে গদাধরকে স্কন্ধে তুলিয়া মধ্যে মধ্যে ভাবাবেশে নৃত্যও করিতেন। সাধন-ভজনের সময় ও পরে ঠাকুর যখন দেশে আসিতেন, তখন তিনি কখনও ভক্ত বালক বা ভক্ত লোক পাইলে তাহাদের মুখে মিষ্টান্ন তুলিয়া দিতেন। চিনুকে এরূপে তিনি কৃপা করেন নাই বলিয়া চিনু দুঃখ করিত। কিন্তু ঠাকুর এরূপ না করার কারণ পরে ভক্তদের নিকট বলিয়াছিলেন। এই সব লোকের বাহিরে ভক্তির ভাব থাকিলেও নৈতিক চরিত্র ভাল ছিল না এবং সেই জন্যই তাঁহার হাত, ইচ্ছা থাকিলেও এ কার্য্যে উঠিত না।

দ্বিতীয় বাল্যসখার নাম শ্রীরাম মল্লিক। ইঁহার শিওড়ে বাড়ী এবং মল্লিকদের অবস্থাও ভাল ছিল। গদাধর ও শ্রীরামের মধ্যে বিশেষ প্রণয় ছিল। রাতদিন একসঙ্গে শোয়া-বসা। উভয়ের বয়স তখন ষোল সতর হইবে। এত ভাব দুজনে যে, গ্রামের লোকে বলিত—"এদের ভিতর এক জন মেয়েমানুষ হ'লে দু'জনের বিয়ে হ'ত।"

এগার বৎসর বয়সে ঠাকুর গদাধরের প্রথম ভাব-সমাধি হয়। তিনি একদা কামারপুকুরের নিকটবর্ত্তী আনুড় গ্রামে বিশালাক্ষীদেবীর মন্দির দর্শনে গ্রামস্থ সঙ্গিসঙ্গিনীসহ যাইতেছিলেন। হঠাৎ পথের মধ্যে মূর্চ্ছা গেলেন। তিনি নিজ মুখে বলিয়াছেন যে, তিনি তখন অদ্ভুত জ্যোতিঃ দর্শন করেন এবং তাহাতেই বাহ্যজ্ঞানশূন্য হন। কেহ কেহ তাঁহার তৎকালীন অবস্থা দেখিয়া অনুমান করিলেন যে, তাঁহার উপর বিশালাক্ষী দেবীর "ভর" হইয়াছে। যাহা হউক, তাঁহাকে দেবীর নাম বারবার কর্ণে শুনাইবার পর আবার সহজ অবস্থা ফিরিয়া আসিল। এই সময় হইতে কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাঁহার ভাবাবেশ হইতে লাগিল। ঠাকুর বলিয়াছেন, সেই দিন হইতে তিনি আর এক রকম মানুষ হইয়া গেলেন এবং নিজের ভিতর আর এক জনকে দেখিতে লাগিলেন।

পরের ঘটনাটি গদাধরের যখন ১২ বৎসর বয়স, তখন ঘটে। কামারপুকুরে সীতানাথ পাইন নামক এক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি বাস করিতেন। অবস্থা ভাল; তাঁহার বাড়ীতে শিব-রাত্রি উপলক্ষে একবার গ্রামের সখের যাত্রার অভিনয়ের আয়োজন হয়। বেশকারী স্বয়ং ঠাকুরের সাঙ্গাৎ গয়াবিষ্ণু। যাহার শিব সাজিবার কথা, তিনি কোন কারণে উপস্থিত না থাকায় অবশেষে ঠাকুর গদাধরকে শিব সাজাইয়া আসরে নামান হইল। কিন্তু আসরে নামিয়াই ঠাকুর গদাধরের শিবের আবেশ হইল। চোখ দুটি ঢুলু ঢুলু, তাহা হইতে অবিরাম জল ঝরিতে লাগিল। তাঁহাকে তৎকালে দেখিয়া সাক্ষাৎ শিব বলিয়াই ভ্রম হইতে লাগিল। শুনা গিয়াছে যে, এই শিবের আবেশ তাঁহার শরীরে তিন দিন ছিল।

এখন গদাধর আর পাঠশালে গমন করেন না। বাড়ীতে কখন হাতে পুঁথি লিখেন, কখন গৃহ-দেবতা রঘুবীরকে স্বহস্তে মনোমত সাজাইয়া পূজা করেন, কখনও বা মাণিক রাজার বাগানে গিয়া সমবয়স্কগণ সঙ্গে নানাবিধ গান গাহেন বা দেবদেবীর মূর্ত্তি স্বহস্তে গড়িয়া পূজা করেন। তা ছাড়া তাঁহার মুখে সুমিষ্ট গান শুনিতে গ্রামের ও গ্রামান্তরের লোক তাঁহাকে নিজ নিজ বাড়ীতে আহ্বান করিয়া লইয়া যাইত। প্রসন্নময়ীও তাঁহার প্রতি গোপালভাব পোষণ করিত। এই সময় তাঁহার শিওড় গ্রামে যাতায়াত হইতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ক্ষুদিরামের ভগিনী রামশিলার হেমাঙ্গিনী নামে এক কন্যা হয়। হেমাঙ্গিনীর শিওড় গ্রামে বিবাহ হয়। হৃদয়রাম তাঁহার তৃতীয় পুত্র। কাযেই হৃদয় ঠাকুর গদাধরের ভাগিনেয় ছিলেন। হৃদয়ের সহিত তাঁহার আবাল্য ভালবাসাও ছিল।

গদাধরের কথা মিষ্ট ও সরস, গঠনভঙ্গীও সুন্দর; সুতরাং

কিশোর গদাধর যদি স্ত্রীবেশ পরিধান করিতেন, অনেক সময়ে সে বেশ ভেদ করিয়া তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া চেনা কঠিন হইত। এই নারীবেশে—সখীভাবে সাধন-কথা পরে যথাস্থানে বলা হইবে। এখন কিশোর গদাধরের স্ত্রীবেশে দুই একটি কার্য্যের এখানে উল্লেখ করিব। গ্রামে সীতানাথ নামে এক স্বর্ণ-বণিক বাস করিতেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই বাড়ীতে খুড়তুতো জাঠতুতো করিয়া চৌদ্দ ভগিনী ছিলেন—যাঁহাদের জ্যেষ্ঠা রুক্মিণী। এই গৃহস্থের সকলেই, বিশেষতঃ কন্যারা গদাধরকে আপনাদের আত্মীয়ের মত ভালবাসিতেন এবং কেহই তাঁহাকে ভাল ভিন্ন মন্দ কখনও ভাবিতেন না। গদাধর অবাধে ইচ্ছামত তাঁহাদের গৃহে



আম্মুড় গ্রামে বিশালাক্ষীদেবীর মন্দির

যাতায়াত করিতেন এবং তাঁহাদিগকে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ হইতে নানা উপাখ্যান ও বিবিধ শ্যামা ও কৃষ্ণবিষয়ক গান শুনাইতেন। কিন্তু সীতানাথ পাইনের প্রতিবেশী ও আত্মীয় আর এক পাইন বড়ই কড়া লোক ছিলেন, তাঁহার বাড়ীর মেয়েদের পর্দ্দা যাহাতে নষ্ট না হয়, সে বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট চেষ্টা ছিল। তিনি গর্ব্ব করিয়া বলিতেন যে, তাঁহার অন্তঃপুরে তাঁহার বাড়ীর লোক ব্যতীত তাঁহার অজ্ঞাতে কোনই পুরুষ প্রবেশ করিতে পারে নাই এবং পারিবেও না। গদাধর ইহা শুনিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, শুধু পর্দ্দার আড়ালে রাখিলেই স্ত্রীলোক সতী থাকে না—সৎশিক্ষা দান ও তাঁহাদের মনে ধর্ম্মভাব জাগরিত করিতে পারিলে তবে নারীত্ব অটুট রাখা যায়। ঠাকুর আরও বলিলেন যে, তিনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে তাঁহাদের বাড়ীর অন্দরে প্রবেশ করতে পারেন। পাইন-কর্ত্তা বলিলেন, 'বেশ, তাই যাও না দেখা যাক।' ঠাকুর বলিলেন, 'আচ্ছা; দেখো।' কয়েক দিন পরেই অবগুণ্ঠিতা এক গরীব তাঁতিনী তাঁহাদের সদরে দেখা দিল। হাতে পইচা পরা—লাল শাড়ীতে শরীর ঢাকা। সে দিন কামারপুকুরে হাট বসিয়াছে। তাঁতিনী বলিল, তাহার বাড়ী দূর গ্রামে। সন্ধ্যা হইয়াছে হাট হইতে ফিরিতে, সুতরাং সে দিন আর বাড়ী ফিরিতে বিলম্ব হেতু সাহস হয় না। যদি তাঁহাদের বাটীতে তাহাকে একটু ঠাঁই দেওয়া হয়, তবে রাত্রিটা সেইখানেই সে কাটাইয়া যায়। কর্ত্তা সম্মত হইয়া তাহাকে অন্দরে পাঠাইলেন এবং সেখানে গিয়া তাঁতিনী মেয়েদের সঙ্গে বেশ আলাপ জমাইয়া তুলিল। কথাবার্ত্তার সময় ঠাকুর কিন্তু ঘোমটা একেবারে খুলেন নাই, আধাখোলা আধা দেওয়া অবস্থায় রাখিয়াছিলেন। তাঁহার মিষ্ট ব্যবহারে ও কথায় মেয়েরা তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিল, এমন কি, গৃহকার্য্যও ভুলিয়া গেল। এ দিকে রাত্রিও বাড়িয়া চলিতেছিল। গদাই ফিরিতেছেন না দেখিয়া রামেশ্বর সন্ধানে বাহির হইলেন এবং প্রথমে গদাধরকে সীতানাথের বাড়ীতে খোঁজ করিলেন, কিন্তু সেখানে গদাধর নাই। তার পর 'গদাই কোথায় রে' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে তিনি যেমন পাইন-কর্ত্তার বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিলেন, অমনি ঠাকুর দাদার ডাক শুনিয়া ভিতর হইতে সেই স্ত্রীবেশেই সাড়া দিলেন—"দাদা, যাচ্ছি গো!" পাইন-কর্ত্তা ব্যাপার বুঝিয়া, প্রথমে একটু বিরক্ত হইলেও শেষে গদাইএর স্ত্রীবেশে সাজার তারিফ করিয়া, তাঁহারই জয় হইয়াছে স্বীকার করিলেন। অতঃপর সীতানাথ পাইনের বাড়ীতে ঠাকুর যখন যাইতেন, বাড়ীর মেয়েরাও তখন

সেখানে আসিত এবং আর গদাধরের সঙ্গে মেলামেশায় তাহাদের কোন বাধা ছিল না। শুনা যায়, পাইনকন্যারা ঠাকুরকে একটি সোণার বাঁশী গড়াইয়া দিয়াছিল। সীতানাথও ঠাকুরকে অতি সৎ ও মহৎ বলিয়া জানিতেন এবং সেইরূপই তাঁহার সঙ্গে ব্যবহার করিতেন।

মধ্যে মধ্যে ঠাকুর স্ত্রীবেশে কলসী কক্ষে লইয়া মেয়েদের ডাকিয়া ডাকিয়া দলবদ্ধ হইয়া জল আনিতেও যাইতেন। কিন্তু এ সময়েও কয়েক জন বিশেষজ্ঞ ছাড়া সাধারণে তাঁহাকে নারী বলিয়াই ঠিক্‌ঠাক্ ধারণা করিয়া লইত। ঠাকুর বলিয়াছেন, 'এ সময় কিন্তু আমি সুখের পায়রা ছিলুম, বেশ ভাল সংসার দেখলে আনাগোনা করতুম।' যেখানে যত্ন নাই বা দারিদ্র্যের উত্তাপ, গদাধর সেখানে যাইতেন না।

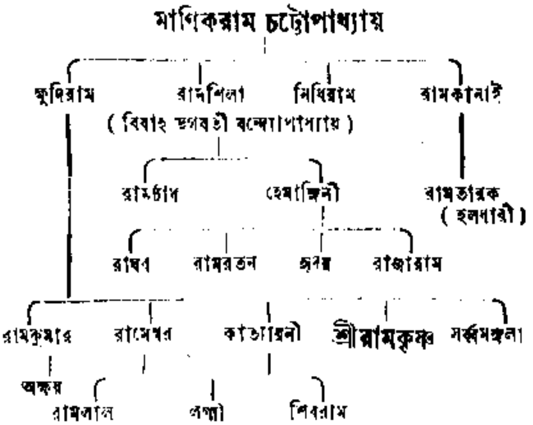
পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অপ্রতিগ্রাহী ও অশূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ ছিলেন, কাহারও দানগ্রহণ, বিশেষতঃ শূদ্রের দান তিনি কখনও গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু গদাধর সে আচারের প্রথম ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছেন ধনী কামারণীকে ভিক্ষামাতারূপে গ্রহণ করিয়া। গদাধর আরও কিছু কিছু ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছিলেন। তিনি ধনীর দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি চিনু শাঁখারীর দ্রব্য আহার করিতেন; সীতানাথের বাড়ীতে মেয়েদের উপহৃত খাদ্যও গ্রহণ করিতেন। খেতীর মা নাম্নী তাঁহার গ্রামবাসিনী এক তাঁতিনী ছিলেন। তাঁহারও বড় সাধ গদাধরকে কিছু খাওয়ান, তিনি নিজে এ কথা কিন্তু গদাধরকে বলিতে সাহস করিলেন না। ধনীর এক ভগিনী ছিলেন, তাঁহার নাম শঙ্করী। তাঁহাকে মনোভাব জানাইলে তিনি গদাধরকে এই কথা বলিবামাত্র গদাধর খেতীর মার বাড়ীতে গিয়া তদ্দত্ত খাদ্য গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন এবং এক দিন এই ভক্ত-নিবেদিত খাদ্য গ্রহণ করিলেন। গ্রামে বৃন্দার মা নাম্নী আর একটি গরীব ব্রাহ্মণকন্যা ছিলেন, ঠাকুর তাঁহারও গৃহে অন্নভোজন করিতেন।

এইরূপে গদাধর কৈশোর বয়স অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। এ সময়ে তিনি বিশেষ ভাবপ্রবণতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে বা শুনিতে শুনিতে প্রায় ভাবসমাধিতে নিমগ্ন হইতেন। একবার এই সময়ে ভাবে তিনি চিনু শাঁখারীর ও অন্যান্য সঙ্গিগণের পায় ধরিতে গিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে হরিবোল বলিতে কাতরভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন। চিনু এই শুনিয়া জবাব দিয়াছিল, "ভাই, তোমার এখন প্রথম অনুরাগ, তাই সব সমান বোধ হচ্ছে। প্রথম ঝড় যখন উঠে, তখন আমগাছ, তেঁতুলগাছ এক বলেই বোধ হয়। ভাই, তোমার এ ঝড় দেখে বোধ হচ্ছে, তুমি হয় ত এইবার নিজের নির্দ্দিষ্ট লীলাস্থলেই চ'লে যাবে, আর আমাদের পরিত্যাগ করবে।" চিনুর ভবিষ্যৎদৃষ্টি ছিল। বাস্তবিকই উহার কিছু পরে ঠাকুর দেশ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন করিলেন। রামকুমার ইতিপূর্ব্বেই অর্থাভাব-নিবন্ধন কলিকাতায় আসিয়া ঝামাপুকুরে এক টোল খুলিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহাকে অধিক উপার্জ্জনের জন্য নানা ভাবে পরিশ্রম করিতে হইত। তিনি দেশে আসিয়া দেখিলেন যে, গদাধর লেখা-পড়া ছাড়িয়া দিয়া বাড়ীতে একরকম নিষ্কর্ম্মা হইয়াই বসিয়া আছে। সেই জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় নিজের কাছে লইতে মনস্থ করিলেন। গদাধরও ইহাতে রাজী হইলেন এবং শুভদিনে এক দিন ঠাকুর গদাধর তাঁহার বাল্যের লীলাভূমি কামারপুকুর হইতে বিদায় লইয়া ১৬।১৭ বৎসর বয়সে কলিকাতার অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

একটা প্রবাদবাক্য আছে যে, মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের ছায়া বাল্যজীবনেই বেশ প্রতিবিম্বিত হয়। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের সম্বন্ধে তাহার কতক আভাস তাঁহার বাল্যজীবন আলোচনা করিয়া দেখিতে পাইতেছি। সরলতা, সত্যনিষ্ঠা, সকলের প্রতি দয়া ও আত্মীয়ভাব, উচ্চনীচে সমান ভালবাসা, ভক্তি ও ভক্তের নিকট আত্মসমর্পণ, এই সকল গুণ বাল্যে ঠাকুরের জীবনে বেশ প্রকাশিত হইয়াছে। অসাধারণ স্মৃতি ও সুমিষ্ট কণ্ঠ, স্ত্রীপুরুষ-বালক-বৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে সকলের সঙ্গে মিশিবার শক্তি ও সকলকে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত করিবার সামর্থ্য আমরা বালক ও কিশোর গদাধরের জীবনে সুস্পষ্টই দেখিতে পাই। সর্ব্বোপরি দেখিতেছি তাঁহার অসামান্য ভাবপ্রবণতা। ১১ বৎসর বয়সে তাঁহার ভাবসমাধির কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। কত স্বচ্ছ সরল পবিত্র ভাবপ্রবণ মন হইলে তবে এত অল্পবয়সে তাহা ঈশ্বরীয় ভাবে ডুবিয়া যাইতে সমর্থ হয়, তাহা সাধারণ ব্যক্তি

বোধাতীত। উত্তর-জীবনে যে মন অহর্নিশি চিদানন্দরসে, ভাবরসে ডুবিয়া থাকিবে, ইহা সেই মনেরই পূর্ব্বাভাস বা নমুনা। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি, গদাধর সাধারণের মত দেখিতে হইলে কি হইবে, ইনি অসাধারণ ব্যক্তি। ইনি এমন এক জন মানুষ জন্মিয়াছেন—যিনি রসে ভাসিবেন, প্রেমে ডুবিবেন ও উজানপথে আনাগোনা করিতে থাকিবেন। গদাধর ঠাকুর অল্পবয়সেই অসাধারণ মেধাশক্তির প্রভাবে—শাস্ত্রপাঠ, কথকতা প্রভৃতির শ্রবণ দ্বারা শাস্ত্রাদির মধ্যের আখ্যানভাগ জানিয়া লইয়াছিলেন, এ কথা বলা হইয়াছে। তাঁহার অমৃতময়ী কথার মধ্যে আমরাও রামায়ণ, মহাভারত, দেবীভাগবত, অধ্যাত্মরামায়ণ, চণ্ডী প্রভৃতির ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাই। তিনি নিজ মুখেই বলিয়াছিলেন—"ওগো, আমি অনেক পড়িনি বটে, কিন্তু শুনেছি কত?" পাঠক চলুন, আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখা যাক, এই জীবন এখন আবার কোন্ পথে চলিতে থাকে, কি কায করিতে পারে ও কি ভাষা বলিতে পারে।

পাঠকগণের বোধসৌকর্য্যার্থ আমরা ঠাকুরের বংশ-লতাটি নিয়ে দিলাম।



প্রেমের সংজ্ঞা

প্রেম সে কি শুধু মুখের আলাপ?
কাব্যে কবির প্রলাপ শুধু?
তা নয় তা নয়, হৃদয় গুহায়
চির-সঞ্চিত প্রেমের মধু।

প্রাণে প্রেমের প্রকাশ সত্য
মিথ্যা নয় তা শুচি-স্মিতা,
স্পর্শমণি সে পরশ অভাবে
তা ব'লে কখনো হয় না মৃতা।

জগতে যা কিছু সুন্দর আছে
প্রেম বিরাজিত তাহার মাঝে,
রূপ নাই তার অরূপ রতন
চিত্তজয়ী সে চিত্তে রাজে।

প্রেমিক দেবতা প্রেমের জগতে
মানবের বুকে দিয়াছে এঁকে
চির-সুন্দর প্রেমের চিত্র
মনোদর্পণে সে ছবি দেখে।

প্রেম-পিপাসায় উন্মাদ হয়
যৌবনাগমে মানব তাই,
পেলেও পাগল না পেলে পাগল
প্রেমের নেশায় বিরতি নাই।

প্রেম সে কি শুধু কামনা-বিলাস?
নাগালের আগে জাগিয়া থাকে?
দেখিতে না পেলে না পেলে স্পর্শ
প্রিয়তমে যায় ভুলিয়া লোকে?

তাই যদি হয় ভোলে দুদিনেই
পার্থিব সেই ক্ষুদ্র প্রেমে,
সত্য প্রেমের পুণ্য স্পর্শে
স্বর্গ হইতে আসে সে নেমে,

দয়িত তাহার দয়িতার বুকে,
স্মৃতির আলোকে বাঁচিয়া রয়,
আপনার মাঝে আপনি পূর্ণ
প্রেম চিরদিন মহিমাময়।

প্রেম যে 'অমর' মরিলে প্রেমিক
তথাপি তাহার নাহিক লয়,
জীবন মরণ অতীত যে 'প্রেম'
নিজ মহিমায় সে বেঁচে রয়।

শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ।

ভোক্ত্রাপত্তেঃ অবিভাগঃ চেৎ স্যাৎ লোকবৎ (২।১।১৩)

(শঙ্কর) ভোক্তৃবিষয়ে আপত্তি হয়,—ভোক্তা ও ভোগ্য এই বিভাগ সিদ্ধ হয় না,—যদি এইরূপ আপত্তি হয়, তাহার উত্তর এই যে, ভোক্তা ও ভোগ্য এই বিভাগ হইতে পারে, জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। সাংখ্যবাদী আপত্তি করিতে পারেন যে, ব্রহ্ম হইতেই যদি জগৎ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে জগতের সকলই ব্রহ্মময় হইবে,—ভোক্তা ও ভোগ্য এই বিভাগ জগতে থাকিতে পারিবে না। ইহার উত্তর এই যে, যদিও জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, তথাপি ভোক্তা ও ভোগ্য এই বিভাগ হইতে কোনও বাধা হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত,—সমুদ্রের জল হইতেই ফেন, তরঙ্গ, বুদ্‌বুদ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, তথাপি তাহাদের বিভিন্ন স্বভাব দেখা যায়, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জীব ও জগতের মধ্যে ভোগ্য ও ভোক্তা এইরূপ বিভাগ হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ নহে।

(রামানুজ) পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, জীব ও জগৎ ব্রহ্মের শরীর, ব্রহ্ম ইহাদের আত্মা। এ ক্ষেত্রে আপত্তি হইতে পারে যে, জীবের শরীর আছে, সে সুখ-দুঃখ ভোগ করে; ব্রহ্মেরও যদি শরীর থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকেও জীবের ন্যায় সুখদুঃখভোগী বলিতে হয়। ইহার উত্তর এই যে, শরীর থাকিলেই যে সুখদুঃখ ভোগ করিতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। সুখ-দুঃখ-ভোগের কারণ কর্ম্মফল। জীবকে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়, এ জন্য তাহার সুখ ও দুঃখ হইয়া থাকে। ঈশ্বরকে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না, এ জন্য তাঁহার সুখদুঃখসংস্পর্শও নাই।

তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ (২।১।১৪)

তদনন্যত্বং (তাহা হইতে অভেদ) আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ (আরম্ভণ প্রভৃতি শব্দ হইতে—জানা যায়)

(শঙ্কর) ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে,—যথা সোম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং ভবতি, বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যং,—"হে সৌম্য, একটি মৃৎপিণ্ডকে জানিলে যেমন সকল মৃণ্ময় বস্তুকে জানা যায়,—যাহাকে মৃত্তিকার বিকার বলা যায়, তাহা "বাচারম্ভণ"মাত্র অর্থাৎ কেবলমাত্র বাক্য দ্বারাই তাহার আরম্ভ অথবা সৃষ্টি হয়,—বিকারগুলি কেবল নাম মাত্র, তাহারা মৃত্তিকা, ইহাই সত্য—"। ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি বুঝাইবার জন্য এই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। মৃত্তিকা নির্ম্মিত ঘট, কলস প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্য যেমন বাস্তবিক মৃত্তিকা ব্যতীত আর কিছুই নহে, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জগতের যাবতীয় দ্রব্য বাস্তবিক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। ব্রহ্ম ব্যতীত জগতের সত্তা নাই। ব্রহ্মই সত্য—জগৎ মিথ্যা। সূত্রের "আদি" শব্দটি এই জাতীয় অপর শ্রুতিবাক্য সকলকে লক্ষ্য করিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে। যথা,—"ঐতদাত্ম্যম্ ইদং সর্ব্বং, তৎ সত্যং,স আত্মা, তৎ ত্বম্ অসি"—অর্থাৎ এই সকলেরই ব্রহ্মই আত্মা, তাহা (ব্রহ্ম) সত্য, তাহাই আত্মা, তুমি তাহাই; "ইদং সর্ব্বং যদ্ অয়ম্ আত্মা" অর্থাৎ এই সকলেই সেই আত্মা; "ব্রহ্ম এব ইদং সর্ব্বং"—এই সকলই ব্রহ্ম; "আত্মা এব ইদং সর্ব্বং"—এই সকলই আত্মা; "নেহ নানা অস্তি কিঞ্চন"—এই জগতে নানাবিধ বস্তু নাই। আপত্তি হইতে পারে যে, জগৎ যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে লৌকিক ব্যবহার সিদ্ধ হইবে না, এবং শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ ব্যর্থ হইবে। ইহার উত্তরে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান না হয়, ততক্ষণ জগৎ সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়, এই জন্য লৌকিক ব্যবহার এবং শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ সার্থক হয়। মৃত্তিকার দৃষ্টান্ত দেখিয়া মনে করা উচিত নহে যে, জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম; কারণ, শ্রুতি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম নির্ব্বিকার, তাঁহার পরিণাম হইতে পারে না। অবিদ্যারূপ উপাধির সাহায্যেই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি সিদ্ধ হয়, উপাধিহীন ব্রহ্মের এ সকল গুণ নাই। পূর্ব্ব-সূত্রের "স্যাৎ লোকবৎ" ইহা ব্যাবহারিক জগতের কথা; বর্ত্তমান সূত্রের "তদনন্যত্বং" ইহাই পারমার্থিক সিদ্ধান্ত।

রামানুজের মতে এই সূত্রে বলা হইতেছে যে, জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে; জগৎকে মিথ্যা বলা এই সূত্রের অভিপ্রায় নহে।

ভাবে চ উপলব্ধিঃ (২।১।১৫)

ভাবে (অস্তিত্ব থাকিলে) উপলব্ধিঃ (উপলব্ধি হয় বলিয়া)।

(শঙ্কর) কারণের অস্তিত্ব থাকিলে কার্য্যের উপলব্ধি হয়, নচেৎ উপলব্ধি হয় না। মৃত্তিকা না থাকিলে ঘটের উপলব্ধি হয় না, তন্তু (সূতা) না থাকিলে পটের (বস্ত্র) উপলব্ধি হয় না। অতএব কার্য্য ও কারণ এক বস্তু। যদি ভিন্ন বস্তু হইত, তাহা হইলে একের অস্তিত্বের উপর অপরের অস্তিত্ব নির্ভর করিত না। গো ও অশ্ব ভিন্ন বস্তু, তাই গো না থাকিলেও অশ্ব থাকিতে পারে।

(রামানুজ) কার্য্য থাকিলেই (ভাবে) কারণের উপলব্ধি হয়। মৃণ্ময় ঘট থাকিলে, মৃত্তিকার উপলব্ধি হয় ; সুবর্ণের বলয়ে সুবর্ণের উপলব্ধি হয়। অতএব কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে।

সত্ত্বাৎ চ অবরস্য (২।১।১৬)

সত্ত্বাৎ চ (অস্তিত্ব হেতু) অবরস্য (পশ্চাৎকালীন দ্রব্যের অর্থাৎ কার্য্যের)।

(শঙ্কর) সৃষ্টির পূর্ব্বেও জগৎ ব্রহ্মের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, ইহা শ্রুতি বলিয়াছেন ; অতএব জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। শ্রুতি বলিয়াছেন, "সৎ এব সোম্য ইদম্ অগ্র আসীৎ"—হে সোম্য, ইহা পূর্ব্বে "সৎ"ই ছিল। এখানে "ইদম্" শব্দে জগৎকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, "অগ্রে" অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ; জগতের কারণ ব্রহ্মকে সৎ শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ; সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলা হইয়াছে,—অতএব জগৎ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তু নহে।

(রামানুজ) বেদে বলা হইয়াছে যে, জগৎ পূর্ব্বে ব্রহ্মই ছিল ; সাধারণতঃ এরূপ কথাও শোনা যায় যে, ঘট প্রভৃতি মৃণ্ময় দ্রব্য পূর্ব্বে মৃত্তিকাই ছিল। সুতরাং কার্য্যই কারণ-ভাবে অবস্থান করে, ইহা লৌকিক এবং বৈদিক উভয়রূপ ব্যবহার হইতেই সিদ্ধান্ত করা যায়।

অসদ্ব্যপদেশাৎ ন ইতি চেৎ ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ (২।১।১৭)

(শঙ্কর) 'অসদ্ব্যপদেশাৎ' অসৎ বলা হইয়াছে বলিয়া, 'ন' সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ ছিল না, 'ইতি চেৎ' যদি কেহ ইহা বলেন, 'ধর্ম্মান্তরেণ' সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতের নাম ও রূপ এই ধর্ম্ম ছিল না, অপর ধর্ম্ম ছিল, এই হেতু অসৎ বলা হইয়াছে, 'বাক্যশেষাৎ' বাক্যের শেষে যাহা আছে, তাহা হইতে ইহা বুঝা যায়।

শ্রুতি এক স্থানে বলিয়াছেন—'অসদ্ বা ইদম্ অগ্রে আসীৎ' এই জগৎ পূর্ব্বে 'অসৎ' ছিল। এ জন্য কেহ মনে করিতে পারেন যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ ছিল না। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত ভুল হইবে। কারণ, এই শ্রুতিবাক্যের পরে আছে 'তৎ সৎ আসীৎ।' এখানে 'তৎ' মানে সেই জগৎ—যাহাকে পূর্ব্ববাক্যে অসৎ শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল। সেই জগৎকে যখন সৎ বলা হইল, তখন বুঝিতে হইবে যে, জগতের অস্তিত্ব ছিল না, ইহা শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে। সাধারণতঃ বস্তুর নাম ও রূপ থাকে, কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতের নাম ও রূপ ছিল না, এজন্যই তাহাকে 'অসৎ' বলা হইয়াছে। বাস্তবিক তখন জগৎ ছিল না বলিয়া অসৎ বলা হয় নাই।

(রামানুজ) কার্য্যের যে সকল ধর্ম্ম থাকে, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য যখন কারণের মধ্যে লীন থাকে, তখন তাহার সে সকল ধর্ম্ম থাকে না, অন্য ধর্ম্ম থাকে। এই ধর্ম্মের বিভিন্নতা (অর্থাৎ "ধর্ম্মান্তর") হেতু সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎকে অসৎ বলা হইয়াছে এবং সৃষ্টির পর সৎ বলা হইয়াছে। এই শ্রুতিবাক্যের শেষে আছে যে, ঈশ্বর সৃষ্টির প্রাক্কালে 'অসৎ' মনকে সৃষ্টি করিলেন। মনকে যখন অসৎ বলা হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, 'কিছু নয়' এই অর্থে অসৎ শব্দের প্রয়োগ করা হয় নাই, নামরূপহীন এই অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ (২।১।১৮)

(শঙ্কর) "যুক্তেঃ" যুক্তির দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্য কারণের মধ্যে থাকে, এবং কার্য্য কারণ হইতে অভিন্ন। 'শব্দান্তরাৎ চ' অন্য শ্রুতি-বাক্যও আছে—যাহার দ্বারা ইহা সমর্থন করা যায়। যুক্তি-এইরূপ, যাহার দধির প্রয়োজন থাকে, সে দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে দধি প্রস্তুত করে ; যাহার ঘটের প্রয়োজন থাকে, সে মৃত্তিকা সংগ্রহ করে ; দুগ্ধের মধ্যেই দধি আছে, মৃত্তিকার মধ্যেই ঘট আছে, ইহা জানা আছে বলিয়াই লোকে এইরূপ করে ; দধির জন্য কেহ মৃত্তিকা সংগ্রহ করে না, ঘটের জন্যও দুগ্ধ সংগ্রহ করে না। যদি বল, দুগ্ধের মধ্যে দধি থাকে না, দধি উৎপাদন করিবার শক্তি থাকে মাত্র, তাহা হইলে বলিব, এই শক্তি দুগ্ধ হইতে অভিন্ন,

আবার দধিও শক্তি হইতে অভিন্ন। অধিকন্তু 'ঘট উৎপন্ন হইল' এইরূপ বলা হয়। এই 'উৎপন্ন হওয়া' ক্রিয়ার কর্তা যখন ঘট, তখন ঘট পূর্ব্বেই ছিল, নচেৎ কর্ত্তা হইবে কিরূপে? মৃত্তিকার কণাগুলি বিশেষ আকারে সজ্জিত হইলে ঘট হয়। এ ক্ষেত্রে মৃত্তিকা এবং ঘটকে দুইটি বিভিন্ন বস্তু বলা যুক্তিযুক্ত হয় না। যে ব্যক্তি হাত-পা গুটাইয়া থাকে, সে যদি পরে হাত-পা ছড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাকে কেহ ভিন্ন ব্যক্তি বলে না।

শ্রুতিবাক্য এইরূপ,—'সদেব সোম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্'—হে সোম্য, এই জগৎ পূর্ব্বে সৎই ছিল। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সৃষ্টির পূর্ব্বেও জগৎ ছিল, এবং ব্রহ্ম হইতে অভিন্নভাবে ছিল। সুতরাং কার্য্য উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেও থাকে এবং কার্য্য কারণ হইতে অভিন্ন।

(রামানুজ) ঘট নাই বলিলে ইহা বুঝিতে হইবে যে, ঘটের বিশিষ্ট আকারটিই নাই, কিন্তু ঘটে যে দ্রব্যগুলি ছিল, সেগুলি এখনও আছে, যদিও বিভিন্ন আকারে। অতএব 'অসৎ' শব্দের অর্থ গুণ বা ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন মাত্র ("ধর্ম্মান্তর")। সেইরূপ সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ 'অসৎ' ছিল, ইহার অর্থ এই যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতের অন্য প্রকার রূপ ও গুণ ছিল।

পটবচ্চ (২।১।১৯)

এক খণ্ড বস্ত্রকে যখন গুটাইয়া রাখা যায়, তখন বুঝিতে পারা যায় না, ইহা বস্ত্র অথবা অন্য দ্রব্য, বুঝিলেও ইহা কত দীর্ঘ, কত প্রস্থ, তাহা জানা যায় না। ঐ বস্ত্রখণ্ড প্রসারিত করিলে নিশ্চয় জানা যায় যে, উহা বস্ত্র, উহা কত দীর্ঘ, কত প্রস্থ। কিন্তু উভয় অবস্থায় দ্রব্য একই। পুনশ্চ,—কতকগুলি সূতাকে তাঁতের সাহায্যে বিশিষ্ট আকারে সাজাইলে তাহাকে বস্ত্র বলা হয়; সূতা ও বস্ত্র দেখিতে বিভিন্ন বোধ হইলেও বস্তুতঃ একই। এইভাবে বুঝিতে হইবে যে, কার্য্য ও কারণ একই দ্রব্য, ভিন্ন দ্রব্য নহে।

যথা চ প্রাণাদি (২।১।২০)

(শঙ্কর) আমাদের দেহে প্রাণ, অপান, ব্যান প্রভৃতি পাঁচটি বায়ু আছে। প্রাণায়ামের সময় তাহারা সংযত থাকে, স্বাভাবিক অবস্থায় ইহারা শরীরমধ্যে সঞ্চারিত হয়, উভয় অবস্থাতেই ইহারা একই বস্তু। কার্য্য ও কারণ সেইরূপ একই বস্তু, যদিও ইহাদের ক্রিয়া বিভিন্ন।

(রামানুজ) এক বায়ুই প্রাণ, অপান প্রভৃতি বিভিন্নরূপে পরিণত হইয়া বিভিন্ন ক্রিয়া সম্পাদন করে। সেইরূপ এক ব্রহ্মই জগতের বিভিন্ন পদার্থের রূপ ধারণ করিয়া বিভিন্ন কার্য্য সম্পাদন করেন।

ইতরব্যপদেশাৎ হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ (২।১।২১)

শ্রুতিতে বিভিন্ন স্থানে জীবকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। যথা 'তৎ ত্বম্ অসি'—তুমি হও সেই ব্রহ্ম; 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ'—ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়া জীবরূপে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন; 'অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি'—ব্রহ্ম ভাবিলেন, 'আমি এই জীবরূপে জগতে প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ বিভাগ করিব'। কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, 'ইতর' অর্থাৎ জীব সম্বন্ধে এইরূপ 'ব্যপদেশ' বা উল্লেখ হেতু 'হিতাকরণ' প্রভৃতি দোষ হয়। 'হিতাকরণ' অর্থাৎ 'হিত' বা মঙ্গল, 'অকরণ' না করা। তুমি বলিতেছ যে, ব্রহ্ম জগৎ রচনা করিয়াছেন। তাহা হইতে পারে না। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। অতএব তুমি যদি বল যে, ব্রহ্ম জগৎ রচনা করিয়াছেন, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, জীবই জগৎ রচনা করিয়াছে। জীব যদি জগৎ রচনা করিত, তাহা হইলে জীব কেবলমাত্র নিজের হিতই রচনা করিত,—অহিত রচনা করিত না। কিন্তু জগতে অনেক অহিত দেখিতে পাওয়া যায়,—যথা জন্ম, মৃত্যু, রোগ, জরা।

অতএব ইহা যুক্তিযুক্ত কথা নহে যে, ব্রহ্ম জগৎ রচনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহা পূর্ব্বপক্ষ, অর্থাৎ প্রতিপক্ষের উক্তি, পরে ইহা খণ্ডন করা হইবে।

অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ (২।১।২২)

(শঙ্কর) জীবের "অধিক" যে ব্রহ্ম, তিনিই জগতের স্রষ্টা, জীব স্রষ্টা নহে। "ভেদনির্দ্দেশাৎ," কারণ, শ্রুতি জীব ও ব্রহ্মের ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা, 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ'—আত্মাকে দর্শন করিতে হইবে; যে দর্শন করিবে, সে জীব, যাহাকে (আত্মাকে) দর্শন করিবে, তাহা ব্রহ্ম 'সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি' সুষুপ্তির সময় জীব সৎ (ব্রহ্মের) সহিত এক হইয়া যায়। এই দুই বাক্য হইতে বোঝা যায় যে, ব্রহ্ম জীব হইতে ভিন্ন। এই প্রকার শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম জীব অপেক্ষা অধিক

প্রশ্ন হইতে পারে;—কিন্তু এরূপ শ্রুতিবাক্যও ত আছে যে, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, যথা 'তৎ ত্বম্ অসি' তুমি হও সেই (ব্রহ্ম); জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ ও অভেদ দুই-ই কি সম্ভব হয়? ইহার উত্তর এই যে, দুই-ই সম্ভব হইতে পারে। যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশের মধ্যে ভেদ আছে, অভেদও আছে। অধিকন্তু, পরমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মই সত্য, আর সমস্তই মিথ্যা। এই দৃষ্টিতে জগৎ-ই যখন মিথ্যা, তখন ব্রহ্মকে জগতের স্রষ্টা বলা যায় না; জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন; কারণ, মন বুদ্ধি প্রভৃতি যে সকল উপাধি জীবকে পৃথক্ সত্তা দান করে, সে সকলই মিথ্যা হইয়া যায়। কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এই সকল উপাধি সত্য, ব্রহ্ম জীব অপেক্ষা অধিক, ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা, জীব নহে।

রামানুজ ব্যবহারিক দৃষ্টি ও পারমার্থিক দৃষ্টির প্রভেদ স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, ব্রহ্ম বাস্তবিক জীব অপেক্ষা বৃহৎ, 'তৎ ত্বম্ অসি' ইহার অর্থ এই যে, ব্রহ্ম জীবের আত্মা, জীব ব্রহ্মের শরীর। ব্রহ্ম আত্মারও আত্মা, এ জন্য তিনি পরমাত্মা।

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ (২।১।২৩)

(শঙ্কর) অশ্ম অর্থাৎ প্রস্তর। সকল প্রস্তরের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ ধর্ম্ম আছে, যথা—পার্থিবত্ব, কঠিনত্ব। আবার প্রভেদও আছে। কোনটি উজ্জ্বল, কোনটি মলিন। সেই প্রকার সকল আত্মার কতকগুলি সাধারণ ধর্ম্ম আছে—যথা চৈতন্য। আত্মার কতকগুলি বিশেষ ধর্ম্ম আছে,—যথা—জীবের অল্পজ্ঞত্ব, ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব।

(রামানুজ) যেরূপ প্রস্তর, তৃণ প্রভৃতি পদার্থ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইলেও মলিনত্ব, অচেতনত্ব প্রভৃতি গুণ হেতু ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলা যায় না, সেইরূপ জীবাত্মাও ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইলেও অল্পজ্ঞত্ব, দুঃখিত্ব প্রভৃতি গুণ হেতু ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলা যুক্তিযুক্ত হয় না (অনুপপত্তিঃ)।

উপসংহারদর্শনাৎ ন ইতি চেৎ ন ক্ষীরবৎ হি (২।১।২৪)

(শঙ্কর) ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা হইতে পারেন না। 'উপসংহারদর্শনাৎ'। উপসংহার অর্থাৎ উপকরণ। কুম্ভকার ঘট প্রস্তুত করিতে অনেক উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করে, যথা—মৃত্তিকা, জল, চক্র। কিন্তু (সৃষ্টির পূর্ব্বে) ব্রহ্ম একাই ছিলেন, তাঁহার কোনও উপকরণ ছিল না। সুতরাং অসহায় ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন না। 'ইতি চেৎ' যদি কেহ ইহা বলেন। ইহার উত্তর—'ক্ষীরবৎ হি'। ক্ষীর অর্থাৎ দুধ যেমন কোনও উপকরণের সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং দধিতে পরিণত হয়, ব্রহ্ম সেইরূপ কোনও উপকরণের সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং জগতে পরিণত হন। ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে, উত্তাপ ব্যতীত দুধ দধি হয় না। কিন্তু উত্তাপ দধিভাবে পরিণাম ত্বরান্বিত করে মাত্র, দুধের নিজেরই এই ভাবে পরিণত হইবার ক্ষমতা আছে, উত্তাপ সে ক্ষমতা উৎপাদন করে না। বায়ু বা আকাশে উত্তাপ দিলে তাহা দধি হয় না। কুম্ভকারের শক্তি অল্প, এ জন্য সে মৃত্তিকা প্রভৃতি উপাদান ব্যতীত ঘট প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে পারে না। কিন্তু ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান। তিনি কোনও উপকরণের অপেক্ষা করেন না।

রামানুজও এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, দুগ্ধকে দধি করিবার জন্য যে আতঞ্চন (দম্বল) দেওয়া হয়, তাহারও উদ্দেশ্য—উহাকে শীঘ্র দধিভাবে পরিণত করা, অথবা উহাকে সুস্বাদু করা।

দেবাদিবদ্ অপি লোকে (২।১।২৫)

(শঙ্কর) পুনরায় এরূপ আপত্তি করা যায় যে, দুগ্ধ অচেতন পদার্থ, তাহা উপকরণ ব্যতীত স্বয়ং দধিভাবে পরিণত হইতে পারে সত্য; সেইরূপ অচেতন জলও উপকরণ ব্যতীত তুষারে পরিণত হইতে পারে; কিন্তু কোনও চেতন পদার্থ উপকরণ ব্যতীত কিছুই প্রস্তুত করিতে পারে না। এই আপত্তির উত্তর এই যে, কোনও কোনও চেতন পদার্থও উপকরণ ব্যতীত বিবিধ বস্তু নির্ম্মাণ করিতে পারে। 'দেবাদিবৎ'—দেবগণ, মহর্ষিগণ কোনও উপকরণ ব্যতীতও প্রাসাদ, রথ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে পারেন। বেদ, ইতিহাস ও পুরাণে ইহার উল্লেখ আছে। শঙ্কর ইহার অন্য দৃষ্টান্তও দিয়াছেন। তন্তুনাভ (মাকড়সা) কোনও উপকরণ ব্যতীত (নিজ দেহ হইতে) জাল উৎপাদন করে, বলাকা শুক্র ব্যতীত গর্ভধারণ করে।

কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা (২।১।২৬)

প্রতিপক্ষ আপত্তি করিতে পারেন যে, ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন, এই সিদ্ধান্তটি ভুল। কারণ, প্রশ্ন হইবে, সমগ্র ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন, অথবা ব্রহ্মের

কিয়দংশ জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন ? যদি বল, সমগ্র ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন, "কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ"—তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রহ্ম এখন নাই, জগৎই আছে। যদি বল, ব্রহ্মের কিয়দংশ জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন, কিয়দংশ ব্রহ্মই আছেন, তাহা হইলে "নিরবয়বত্বশব্দকোপঃ" ব্রহ্ম অবয়বহীন বলিয়া যে শ্রুতিবাক্য আছে, সে শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ হইবে। শ্রুতিবাক্য এইরূপ—'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং'—ব্রহ্ম অংশহীন, ক্রিয়াহীন, শান্ত, দোষহীন, নির্লেপক। অতএব উভয় পক্ষেই দোষ হয়। সুতরাং ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হন, এই সিদ্ধান্তটিই ভুল।

শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ (২।১।২৭)

(শঙ্কর) পূর্ব্ব সূত্রে যে আপত্তি করা হইয়াছে, তাহার উত্তর এই সূত্রে দেওয়া হইয়াছে। "শ্রুতেস্তু" অর্থাৎ শ্রুতি হইতেই ব্রহ্মের স্বভাব ও স্বরূপ কি, তাহা বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে আছে যে, ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হইলেও ব্রহ্ম নির্ব্বিকারভাবেই বিরাজ করেন; সুতরাং ব্রহ্মের কৃৎস্নপ্রসক্তি হয় না। নিম্নলিখিত শ্রুতিবাক্য এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

তাবান্ অস্য মহিমা ততো জ্যায়ান্ চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদ্ অস্য অমৃতং দিবি॥

"এই জগৎ ব্রহ্মের মহিমা, ব্রহ্ম ইহা হইতেও বৃহৎ। বিশ্বের সকল প্রাণী তাঁহার এক অংশমাত্র, তাঁহার অপর তিন অংশ স্বর্গে অমৃতরূপে বিরাজ করে।"

যদি সমগ্র ব্রহ্মই জগৎরূপে পরিণত হন, তাহা হইলে ব্রহ্মকে ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলা যায় না। কিন্তু শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের অগোচর। আবার সমগ্র ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হন না বলিয়া ব্রহ্ম অবয়বযুক্ত বস্তু, এরূপ অনুমান করাও যুক্তিযুক্ত হয় না। কারণ, শ্রুতি স্পষ্টভাবে ব্রহ্মকে নিরবয়ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, ব্রহ্ম যদিও জগৎরূপে পরিণত হন, তথাপি সমগ্র ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হন না, ব্রহ্মের অংশও নাই। কারণ, 'শব্দমূলত্বাৎ'—ব্রহ্ম হইতেছেন শব্দমূল,—শব্দ অর্থাৎ শ্রুতিবাক্যই তাঁহার স্বরূপ জানিবার উপায়। তিনি কিরূপ বস্তু, যুক্তিতর্ক প্রভৃতির দ্বারা তাহা জানা যায় না। অনেক সময় দেখা যায় যে, মণি, মন্ত্র, ওষধি প্রভৃতির শক্তি তর্কের দ্বারা নির্ণয় করা যায় না। সর্ব্বাপেক্ষা অলৌকিক ব্রহ্মের স্বরূপ যে তর্কের দ্বারা নির্ণয় করা যাইবে না, সে বিষয়ে সন্দেহ কি ?

পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে যে, শ্রুতিবাক্যের বলে পরস্পর বিরোধী দুইটি গুণ কিরূপে স্বীকার করা যায় ? ব্রহ্মের কিয়দংশ জগৎরূপে পরিণত হয় নাই, সমগ্র অংশও হয় নাই, ইহা কি পরস্পর বিরুদ্ধ নহে ? ইহার উত্তর এই যে, বাস্তবিকপক্ষে ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হন নাই, জগৎ মিথ্যা; অবিদ্যা বা অজ্ঞান হেতু জগৎ আছে বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক ব্রহ্মই আছেন, আর কিছুই নাই, জগৎ ব্রহ্মের বিকার নহে, বিবর্ত্তমাত্র। একটি বস্তু যদি বাস্তবিক অন্য বস্তুতে পরিণত হয়, তাহা হইলে তাহার বিকার হয়; যেমন দুগ্ধের বিকার দধি। কিন্তু একটি বস্তুর যদি কোনও পরিবর্ত্তন না হয়, কেবল ভ্রম হেতু উহাকে অন্য বস্তু বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে বিবর্ত্ত হয়। যেমন অন্ধকারে রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। শঙ্কর বলেন, জগৎ ব্রহ্মের বিকার নহে, বিবর্ত্ত।

রামানুজ বলেন যে, নিরবয়ব ব্রহ্ম হইতেই বিচিত্র জগতের উৎপত্তি আশ্চর্য্যের বিষয় হইলেও অবিশ্বাস্য নহে, কারণ, ব্রহ্মের স্বভাব অলৌকিক, শ্রুতিবাক্যই সে বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ।

আত্মনি চ এবং বিচিত্রাশ্চ হি (২।১।২৮)

(শঙ্কর) স্বপ্নের সময় 'আত্মনি' অর্থাৎ নিজের মধ্যেই 'বিচিত্রাঃ চ' অর্থাৎ বিচিত্র রথ, পথ প্রভৃতির সৃষ্টি হয়, সেই সময় আত্মার স্বরূপ বিনষ্ট হয় না, সেই প্রকার ব্রহ্ম নিজ স্বরূপ বিনষ্ট না করিয়া বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

রামানুজ এই সূত্রের ব্যাখ্যা অন্যরূপ করিয়াছেন। জগতের বিভিন্ন দ্রব্যের বিচিত্র ধর্ম্ম দেখা যায়। জড় পদার্থের যে সকল ধর্ম্ম, চেতন আত্মার ধর্ম্ম তাহা হইতে ভিন্ন। সেই প্রকার ব্রহ্মের যে সকল শক্তি, অপর সকল দ্রব্যের সেরূপ শক্তি নাই। নিজে অবিকৃত থাকিয়া ও নানাবিধ বস্তুতে পরিণত হওয়ার শক্তি ব্রহ্মের আছে, আর কাহারও নাই।

স্বপক্ষদোষাচ্চ (২।১।২৯)

"নিজের পক্ষেও এই দোষ আছে, এ জন্য প্রতিবাদী এই দোষ অবলম্বন করিয়া আক্রমণ করিতে পারেন না।"

সাংখ্য বলেন যে, প্রধান বা প্রকৃতি হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। এই প্রধানকে তাঁহারা নিরবয়ব বলেন। সুতরাং হয় স্বীকার করিতে হইবে যে, সমস্ত প্রধানই জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াছে, নয় বলিতে হইবে যে, প্রধানের অংশ অথবা অবয়ব আছে। সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাই প্রধান, এজন্য প্রধানকে অবয়ব বলা যায় না, কারণ, সত্ত্ব, রজ ও তম ইহারা সকলে নিরবয়ব। যাঁহারা পরমাণুকে জগতের কারণ বলেন, তাঁহাদের মতেও এই দোষ আছে। তাঁহারা বলেন, দুইটি পরমাণু মিলিয়া একটি দ্ব্যণুক হয়। তাঁহাদিগকে হয় বলিতে হইবে যে, দুইটি পরমাণুর সমগ্রটিই পরস্পর মিলিত হয়, নয় বলিতে হইবে যে, একটির কিয়দংশ অপরটির কিয়দংশের সহিত মিলিত হয়। যদি সমগ্রের মিলন হয়, তাহা হইলে দ্ব্যণুকের পরিমাণ পরমাণুর পরিমাণ অপেক্ষা কিছুতেই বড় হইতে পারে না, এই ভাবে স্থূল বস্তুর উৎপত্তি সিদ্ধ হয় না। যদি কিয়দংশের মিলন হয়, তাহা হইলে পরমাণুকে অবয়বযুক্ত বলিতে হইবে; কিন্তু কণাদের মতে পরমাণুর অবয়ব নাই। সুতরাং সাংখ্য ও কণাদ উভয়ের মতেই এই দোষ আছে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (এম এ)

দুঃখিনী কৃষ্ণদাস

[সখীভাবক সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া কৃষ্ণদাস বৈষ্ণব-গ্রন্থে 'দুঃখিনী কৃষ্ণদাস' নামে পরিচিত। ইঁহার অপর নাম শ্যামানন্দ]

সে দিন বৃন্দাবনের কুঞ্জে
ছিল সংকেপরাস ;
দর্শন লাগি হৃদয়ানন্দ
সাথে গৌড়িয়া ভক্তবৃন্দ
আইলেন —পাছে প্রধান ভক্ত
দুঃখিনী কৃষ্ণদাস।
নৃত্য দেখিয়া রাধাকৃষ্ণের
সখীগণে লয়ে সাথে ;—
সবার চিত্ত হ'ল পুলকিত,
দুঃখিনী কৃষ্ণ ভূমে মূর্চ্ছিত
ক্ষণে উঠে, পড়ে, গোপীভাব করে
বসন ফেলিয়া মাথে।
কপালে তিলক রাধাপদাকৃতি
বিন্দু তাহার মাঝে ;
কৃষ্ণ-সেবায় শ্যামার আনন্দ
তাই লিখা নাম হৃদে 'শ্যামানন্দ'
ধুয়ে মুছে দিল সাধুরা সমাজে
তথাপি উঠিল না যে !
হৃদয়ানন্দের আনন্দ নাই
মনে বিস্ময় খালি ;—
আমারি কৃপায় সেবক আমার
স্বপ্নে সিদ্ধ হয়ে গেল, আর—
আমি জানি নাই ? কিছু না, এ সব
শ্রীজীবের চতুরালী।
অভিমান-ধূমে জ্বলিল হৃদয়
শ্রীগোঁসাই রাস ছাড়ি'
চলিয়া গেলেন ফিরিয়া ভবনে,
উপায়ে কুশল গৌড়িয়াগণে,
প্রেম-কুঞ্জে দুঃখিনী কৃষ্ণ
সারা রাত র'ল পড়ি'।

প্রভাতে আসিয়া গুরুদর্শনে,
দুঃখিনী প্রণাম করে ;
হৃদয়ানন্দ মহাক্রোধে কন—
"মোর সনে তোর কিবা প্রয়োজন ?
বাহ্যে গোপীর লক্ষণ তোর
গোপীভাব অন্তরে !"
মিনতি করিয়া কহে কৃষ্ণদাস -
"বুঝিতে নারিনু স্বামি !
শ্রীজীব লয়েছেন রাধার ভাবেতে,
অনুক্ষণ রাধা কৃষ্ণ সহিতে ;
রাধাকৃষ্ণে হেরি ভাব মোর চিত্তে—
কিসে অপরাধী আমি ?"
"আমার সখ্য ভাব আচরণ
করিবারে পার যবে "
শ্রীগোঁসাই কন, "আমার চরণে
স্থান হবে তোর পুনঃ সেই ক্ষণে।"
দুঃখী কৃষ্ণ কয়—"হেন মনে লয়—
সে আমার নাহি হবে।"
মহাক্রোধে জ্বলি' উঠিয়া হৃদয়
ঠাকুর আসিয়া ছুটে,
সক্রোধে দিলেন ছড়ি পরবেশ
পিঠে, হাতে, পায়ে, নাহি কৃপালেশ
রক্তারক্তি দুঃখিনী কৃষ্ণ
ভূমেতে পড়িল লুটে'।
চারিদিক হতে যত মহান্ত
ধাইয়া আসিল সবে,
হৃদয়ানন্দে কেহ বা ধরিল,
দুঃখিনী কৃষ্ণে কেহ আশ্বাসিল,
দুঃখিনী কৃষ্ণ হাসিয়া কহিল—
"এমন দিন আর হবে !—

দেহ, প্রাণ, মন সার্থক হ'ল
আজি কি আনন্দ মোর !
বুঝি শ্রীগোঁসাই এত দিন পরে
নিলেন আমারে আপনার ক'রে,
প্রহার এ নহে—প্রসাদ, প্রভুর
দয়ার নাহিক ওর।"
ভক্তে মারিয়া ঘরে স্বপন
দেখিল হৃদয়ানন্দ ;—
শিয়রে দাঁড়ায়ে প্রভু শ্রীচৈতন্য,
সোণার অঙ্গ ছিন্নভিন্ন,
রক্তে ভিজেছে উড়ানি বসন,
মলিন শ্রীমুখচন্দ্র !
বিপরীত রূপ মহাপ্রভুর
হেরিয়া গোঁসাই কাঁদি'
কহেন "এ কি এ !" মহাপ্রভু কন !
"দুঃখিনীরে তুমি করিলে তাড়ন !
সে মোর আত্মা, আমি তার দেহ,
হ'লে মহা অপরাধী।"
প্রভাতে উঠিয়া শ্রীগোঁসাই কোলে
করিলেন দুঃখিনীরে।
কহিলেন,—"তোরে করেছি প্রহার,
তুই বিনে মোর নাহি গতি আর,
আপনা উদ্ধার করিলি, এবার
গুরুর হইবে কি রে ?"
শ্রীগুরুচরণে লুটিয়া দুঃখিনী
কহিল কাতর স্বরে—
"না করিনু তব আদেশ পালন,
আমি মূর্খ ছাত্র, অতি অভাজন,
পাঁচ পুত্র তব সুতা এক জন
জানি' প্রভু ক্ষম মোরে।"

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত।



হিমালয়ে পাঁচ ধাম

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

সওয়া মাইল আন্দাজ উত্তরাই পথে নামিয়া বামভাগে "শাকম্ভরী" দেবীর দর্শন পাইলাম। দেবীর মন্দিরটি ত্রিপুরা রাজষ্টেটের কর্ণেল যাদবচন্দ্র ঠাকুর কর্তৃক প্রায় ২২ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে এ স্থানটি দুইটি রাস্তার সন্ধিস্থল (Junction) একটি উপরের রাস্তা কতকটা দক্ষিণাভিমুখী হইয়া হরিদ্বার হইতে আসিতেছে, অপরটি পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া নীচের দিকে গৌরীকুণ্ডের পথে নামিয়াছে। নীচের উত্তরাই পথেই আমরা ক্রমশঃ নামিয়া



উপর হইতে গৌরীকুণ্ড চটী ও মন্দাকিনীর দৃশ্য

চলিলাম। কিছু দূর অগ্রসর হইতেই বামভাগে উত্তরদিক হইতে আগত "বাসুকি-গঙ্গার" কলকল শব্দ শুনিতে পাইলাম। একবারে নীচে নামিয়া এইবার আমরা গভর্ণমেণ্ট-নির্ম্মিত সুন্দর প্রশস্ত সড়কে একে একে উপস্থিত হইয়া হাঁফ ছাড়িলাম। ইহাই হইল রামপুরে যাইবার রাস্তা। এখান হইতে "কেদারনাথ" মাত্র ৯৷৹ মাইল। রাস্তার অবস্থা দেখিয়া বুড়া দিদি, দাদা, বৌদিদি, বিশেষভাবে জ্যাঠিপত্নীর মুখে এইবার হাসি ফুটিল। এইখানে বাসুকি-গঙ্গার উপরে একটি সুন্দর পুল আছে। ওপারে বিশালকায় ধূম্র পাহাড়। পাহাড়ের পার্শ্ব দিয়া পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে আবার "দুধগঙ্গা"-মিশ্রিত মন্দাকিনীর শ্বেত-ধারা প্রচণ্ড নিনাদে বাসুকি-গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। দৃশ্য হিসাবে এ স্থান অতীব রমণীয় মনে হইল। ডাণ্ডিওয়ালা, বোঝাওয়ালা সকল কুলীই আজ যেন অধিকতর প্রফুল্লচিত্ত। বদরী-কেদারের সুসংস্কৃত সড়কের সহিত তাহারা চিরদিনই পরিচিত। ইচ্ছা করিলে প্রতিদিন ২০ মাইল পর্য্যন্ত পথ তাহারা এ দিকে অতিক্রম করিবার সামর্থ্য রাখিয়া থাকে। মনে পড়িল, "ছুঁনা-বেলক-পওয়ানার" গভীর জঙ্গল, "খাওয়ান কী মড়া পওয়ালীর" সৃষ্টিছাড়া তুষারের বিপজ্জনক রাস্তা! পথের যত কিছু কঠিনতা, সবই যেন এতক্ষণে অন্তর্হিত হইয়া, প্রত্যেককেই আজ আশ্বাস প্রদান করিল, "আর কোথায়ও ভয় পাইবার কিছুই নাই,



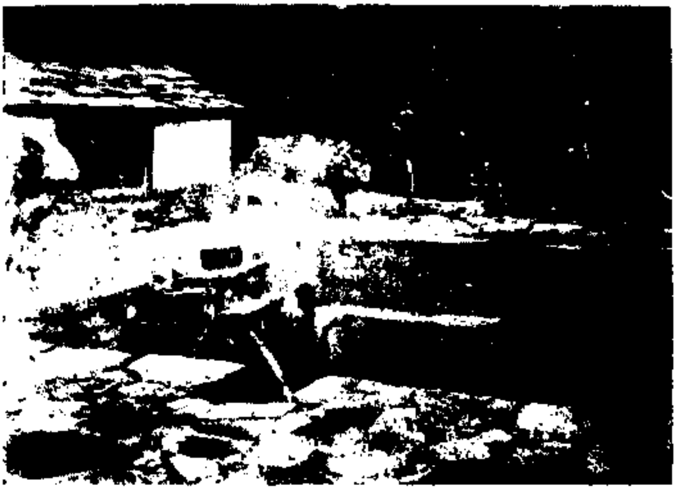
দুধগঙ্গামিশ্রিত মন্দাকিনী ধারা - বাসুকি-গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে

এইবার স্বচ্ছন্দে দুই ধাম দর্শনানন্তর বাটী ফিরিবার আশা হইয়াছে।" পুল পার হইয়া মন্দাকিনীর ধারে ধারে ক্রমাগত চড়াই পথে উঠিয়া বেলা আটটা আন্দাজ সময়ে "গৌরীকুণ্ডে" উপস্থিত হইলাম। এখানে অনেক দোকান ও চটী এবং এত দিন পরে বহু বঙ্গদেশীয় যাত্রীর সহিত সাক্ষাৎলাভ ঘটিল। উত্তরাখণ্ডে এই গৌরীকুণ্ডের মাহাত্ম্য-বর্ণনে উল্লিখিত আছে,—

"যত্র ত্বয়া মহেশানি মন্দাকিন্যাস্তটে পুরা।
ঋতুস্নানং কৃতং তদ্বৈ গৌরীতীর্থমিতি স্মৃতম্ ॥"

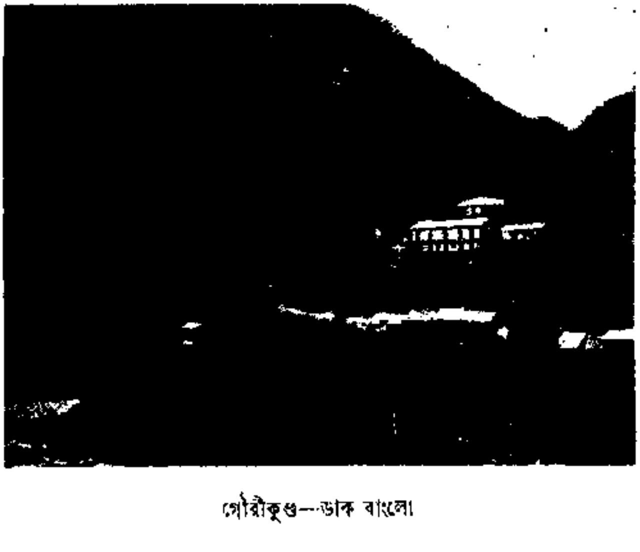
এখানে মন্দাকিনীতটে কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তিসময়ে গৌরীদেবী প্রথম ঋতুস্নান করেন।

এখানে তিনটি কুণ্ড দেখিলাম। প্রত্যেক কুণ্ডেই গোমুখ দিয়া ধারা নামিতেছে। একটির জল শীতল, সেটিই 'গৌরীকুণ্ড' আর একটি তপ্তকুণ্ড তাহাতে তপ্ত-ধারার প্রস্রবণ। সেটিকে 'মহাদেবকুণ্ড' বলা হয়। পার্শ্বেই "গোরক্ষনাথ" মহাদেব ও পার্ব্বতীদেবীর মন্দির আছে। তৃতীয় কুণ্ডটির নাম শুনিলাম "বিষ্ণুকুণ্ড"। পাণ্ডাদিগের কথামত আমরা প্রথমে গৌরীকুণ্ডে ও পরে তপ্ত ধারায় স্নান করিয়া মন্দিরে দর্শনাদি যথাসম্ভব সত্বর শেষ করিলাম। আশে-পাশে প্রায় প্রত্যেক দোকানেই "বদরীনারায়ণ," "কেদারনাথ" ও "ত্রিযুগীনারায়ণের" তাম্রমূর্ত্তি, রৌপ্য-মূর্ত্তি প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ সজ্জিত দেখিয়া আমরাও এখানে প্রত্যেকেই এই সকল মূর্ত্তির কিছু কিছু ক্রয় করিতে বিস্মৃত হইলাম না। দোকানদারেরা এই উপায়ে বিলক্ষণ রোজগার করিয়া থাকে দেখিলাম। একটি দোকানদারের উপরের ঘরে আশ্রয় লইয়াছিলাম। দ্বিপ্রহরের আহারাদি সারিয়া এখানেই অদ্য রাত্রি-যাপনের ব্যবস্থা স্থির হইল। ত্রিযুগীনারায়ণ হইতে গৌরীকুণ্ড মাত্র পাঁচ মাইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অকাল বলিয়া ১৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের পূর্ব্বে আমরা কেদারনাথ কেহই দর্শন করিব না, এই হিসাবেই এক্ষণে অল্প অল্প ব্যবধানে রাত্রিযাপনে বাধ্য হইতেছি। ইহাতে ডাণ্ডি বা বোঝাওয়ালা কুলীগণ কেহই সন্তুষ্ট নহে, কারণ, মজুরী লইয়া তাহারা যত শীঘ্র বাটী ফিরিতে পারে, তাহাদের ততই কিছু অধিক লাভ থাকে। আমরা কিন্তু এক্ষণে অল্পদূর আসিয়া আসিয়া, তাহাদের এই লাভের পথের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছি, ইহা তাহাদের পক্ষে বড় কম দুঃখের কথা নহে।



গৌরীকুণ্ড—গরমজলের প্রবাহ

যাত্রীর সুবিধার্থে সরকার বাহাদুর এই গৌরীকুণ্ডে দুই তিন স্থানে ঝরণার জল ধরিয়া রাখিয়া তাহাতে পাইপ যোজনা করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু বলিতে কি, অল্পস্থানের মধ্যে বহু যাত্রী ও দোকানের সমাবেশ থাকায়, স্থানটি সর্ব্বদাই বিলক্ষণ অপরিষ্কার হইয়া রহিয়াছে। জিনিষপত্রও বিশেষ মহার্ঘ। তদুপরি এখানেও আবার বিলক্ষণ মাছির উৎপাত। যাহা হউক, কোন প্রকারে রাত্রি-যাপন করিয়া পরদিন প্রত্যূষে আবার আগে চলিলাম। অদ্য ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, সুতরাং আজিকার দিনে এখান হইতে আর সাড়ে সাত মাইল মাত্র দূরে "কেদারনাথ" তীর্থে উপস্থিত হইতে পারিলে, পরদিন প্রাতে স্বচ্ছন্দেই কেদারনাথ দর্শন করিতে পারিব, এই আশায় প্রত্যেকেই তখন আনন্দোৎসুক-চিত্তে উপরে উঠিতেছি। দক্ষিণভাগে মন্দাকিনীর নিরন্তর কল-কল শব্দ কাণের মাঝে আশা আশ্বাস জাগাইয়া দিতেছে। দুই মাইল আগে "জঙ্গল-চটীর" লম্বা লম্বা ছপ্পর-ঘর দৃষ্ট হইল। যাত্রীর সুবিধার্থ সরকার এখানেও পাইপ-সংযোগে ঝরণার জল ধরিয়া রাখিয়াছেন। এখান হইতে দুই মাইল আগে "রামবাড়া" চটী। জঙ্গল-চটী পার হইয়া কিছু দূর আগে যাইতেই দূরে চোখের সম্মুখে আবার রজত-গিরির শ্বেত সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিল। মনে হইল, হিম-গিরির এই শুভ্র সুন্দর তুষার-রাজ্যের এইখানে আসিয়া, দেবাদিদেব স্বয়ম্ভু কেদারনাথ যোগিজন-বাঞ্ছিত আপনার যোগাসন



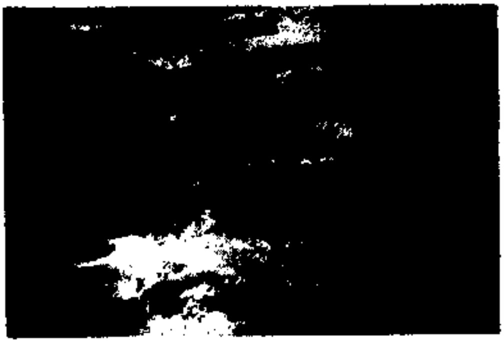
গৌরীকুণ্ড—ডাক বাংলো

স্থির রাখিয়াছেন। ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া এক নিমেষে সেথায় উপস্থিত হই। কিন্তু পাহাড়ের দুরধিগম্য পথের শেষ কৈ? হিন্দীতে একটা কথা আছে, "বিনা আপনা মরে স্বরগ নহী পঁহুচতা" অর্থাৎ নিজে না মরিলে স্বর্গে পৌঁছিবে কিরূপে? কথাটা অতি সুন্দর। সাধন-মার্গের সোপান অতিক্রম করিয়া চলা—সে কেবল সাধনা ও ধৈর্য্যের উপরেই নির্ভর করে। হঠাৎ "এরোপ্লেনে" উঠিয়া (আজকাল যে উপায় আবিষ্কৃত

হইতেছে) ঝটিতি কেদার দর্শন করিয়া বাটী ফিরিলাম—আকাশ-মার্গের এ অভিনয়ে যাত্রীর সংযম-তিতিক্ষার কতটুকু থাকিতে পারে ? মহাপ্রস্থানের পথ কি এতই সুগম ও সহজ ? মাস মাস ব্যাপী দারুণ রৌদ্র ও মাথায় বৃষ্টি লইয়া যাত্রিগণ লোকালয়হীন দুরধিগম্য পর্ব্বতের চড়াই উতরাই পথে, যে ভাবে আত্মত্যাগ ও দুঃখ বরণ করিতে বাধ্য হয়—কোথাও জঙ্গল, কোথাও নদী, কোথায় বা তুষারের চির-পিচ্ছিল পথ ! কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই, জীবনকে যেন তুচ্ছ ও একনিষ্ঠভাবে ভগবানের উপরে অর্পণ করত আত্মনির্ভরশীল চিত্তে অগ্রসর হইয়া চলে অসহায় অজানা পথিকেরই মত ! দৃষ্টি তাহার কেবল বিরাট-বিশাল নব নব প্রকৃতি-বৈচিত্র্যের



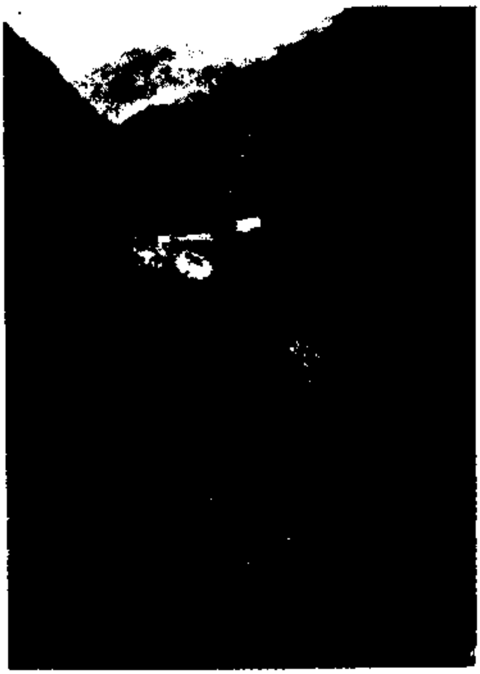
কাষ্ঠনির্ম্মিত সেতু—গৌরীকুণ্ড



বরফের মধ্যে মন্দাকিনী

মাঝখানে সেই বিচিত্র-রূপী লীলাময় ভগবানের অপরূপ রূপ-সৌন্দর্য্যে ! ধ্যান—যেন দৈনন্দিন দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ধ্যান-ধারণার পবিত্র মূর্ত্তি সেই অদৃশ্য মহাপুরুষেরই চরণতলে ! তাই বলিতে-ছিলাম, প্রতিদিনের এই নিত্য-নূতন বিচিত্র দৃশ্য-সৌন্দর্য্যের মধ্যে উপাসকের মতই যাহাদের চিত্ত সেই অনন্তরূপী বিরাট পুরুষকে খুঁজিয়া বেড়ায়, সে প্রাণপাত পরিশ্রম, জাগ্রত সাধনা যে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতেই নিরন্তর উত্থিত হইয়া থাকে, সে কেবল বুকভরা বেদনা লইয়াই যাত্রীকে আগে লইয়া যায় ! এ দৃশ্য, এ সহিষ্ণুতা উপেক্ষা করিয়া বিনা কষ্টে হঠাৎ আকাশ-মার্গে উঠিয়া কেদারদর্শন করিয়া বাটী ফিরিলাম—এ 'উড়ো' বা ফাঁকা আনন্দের সহিত ভুক্তভোগী পায়ে-চলা যাত্রীর সমকক্ষতালাভ—আকাশ-পাতাল পার্থক্য বলিলেই ঠিক হয় । "নিজে না মরিলে স্বর্গলাভ হয় না"—এ কথাটা প্রত্যেক তীর্থ-পথ-যাত্রীর বিলক্ষণ স্মরণ রাখা উচিত । পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে কেহ কোন দিনই যে উচ্চ-পদ-লাভে সমর্থ হয়েন নাই, এ দৃষ্টান্ত আদৌ বিরল নহে ।

দুই তিনটি ঝরণা পার হইবার পর পথিমধ্যে এক স্থানে পাহাড়ের গা বাহিয়া উপর হইতে বৃষ্টিধারার মত নিরন্তর ঝরিঝরা পতিত হইতেছিল । মাথায় ছাতা ধরিয়া সে স্থান সকলেই অতি সন্তর্পণে পার হইলাম । "কৈলাস-যাত্রায়" গার্ব্বিয়াং-এর পথে একবার এইরূপভাবে নিরন্তর জল-ধারা-পতনের স্থলে পিচ্ছিল সংকীর্ণ পথ হইতে, আমাদেরই এক কুলী (বেচারী !) বোঝা মস্তকে লইয়া এক দম নীচে "কালী-নদী"-গর্ভে ডুবিয়া মরিয়াছিল ।



কেদারের পথে উপত্যকা

সে কঠিন মর্ম্মঘাতী দৃশ্য আজও যেন চোখের সম্মুখে সুস্পষ্ট ভাসিয়া বেড়াইতেছে । রাস্তার উপরে আর এক স্থানে কেবল স্তূপীকৃত তুষার-রাশি দেখিলাম । তবে এ তুষার, পঁওয়ালী নহে যে, দেখিবামাত্র শিহরিয়া উঠিব ! যাত্রীর সুবিধার্থে এ তুষার কাটিয়া কাটিয়া সিঁড়ির আকারে উপরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে । যষ্টিতে নির্ভর করিয়া একটু সাবধানেই পার হওয়া চলে । বেলা আটটা আন্দাজ সময়ে আমরা "রামবাড়া" আসিয়া উপস্থিত হইলাম । কালীকমলীওয়ালার ধর্ম্ম-শালায় তখন যাত্রীর অত্যন্ত ভীড় ও ভীষণ অপরিষ্কার দেখিয়া, আমরা সকলেই এক দোকানীর লম্বা দোকান-ঘরে আশ্রয় লওয়া যুক্তি-যুক্ত মনে করিলাম এবং দ্বি-প্রহরের আহারাদি যথাসম্ভব সত্বর শেষ করিয়া লইয়া, বেলা ১২টার মধ্যেই সেখান হইতে আবার আগের পথে উঠিয়া চলিলাম ।

রামবাড়া হইতে কেদারনাথের দূরত্ব সাড়ে তিন মাইল মাত্র। সে পথ কেবলই ক্রমিক চড়াই উঠিয়া সম্মুখ-ভাগে অর্থাৎ উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। প্রায় আড়াই মাইল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতে দুই তিন স্থানে কেবল অল্প অল্প তুষার অতিক্রম করিয়াছিলাম। শেষের দিকে এই চার মাইলব্যাপী তুষার-ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলাম। পাহাড় ভরিয়া সেই শুভ্র-সুন্দর উজ্জ্বলতা! কোথাও এতটুকু মলিনতা নাই! সুখের বিষয়, এ তুষারে পওয়ালীর মত কাহাকেও ভরসা-হীন হইতে হয় নাই, কারণ, রাস্তা সুপ্রশস্ত এবং পাহাড়ের উপর হইলেও প্রায় সমতল ভূমির উপরে। সুতরাং পা পিছলাইলেও গভীর খাদে পড়িয়া প্রাণ হারাইবার মোটেই আশঙ্কা ছিল না। দক্ষিণভাগের লম্বা পাহাড়টি এখানে তুষার-মণ্ডিত, তবে তাহাতে অন্যান্য পাহাড়ের মত উঁচু-নীচু অগণিত শৃঙ্গদেশ না



জলপ্রপাত—গৌরীকুণ্ড ও কেদারের মধ্যস্থলে

থাকায়, যেন সমানভাবেই আমাদের সহিত আগে অগ্রসর হইতেছিল। এ পাহাড়ের ইহাই যেন নূতনত্ব! তার পর, দূর হইতে এইবার যখন সেই আকাশ-চুম্বী, ঝলমল সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত সুবিশাল পর্ব্বতগিরি চিত্র-বিচিত্ররূপে চোখের সমক্ষে হঠাৎ ঝলসিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে সেই অমল-ধবল সৌন্দর্য্যের মাঝখানে হিমগিরির চির-পবিত্র পাদ-পীঠে কেদারনাথের সুশোভন শুভ্র-মন্দির দৃষ্টিগোচর হইল, তখন আনন্দ-অধীর-চিত্তে সকলেই যেন দ্রুতগতি সে দিকে ধাবিত হইলাম। মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইলে চতুর্দ্দিকেই কেবল আপাদ-মনোহর উজ্জ্বলতা ও শুভ্রতায় প্রত্যেকেরই নয়ন-মন ভরিয়া উঠিল। ধরণীর ধূলি-ধূসরিত বাসনা-পঙ্কিল স্থান যেন অতিক্রম করিয়া, এইবার এতক্ষণে সেই মুনিজন-মনোহারী দেব-গন্ধর্ব্ব-বাঞ্ছিত স্বর্গের সৌন্দর্য্য-নিকেতনে উপনীত হইয়াছি! চারিদিকেই স্বর্গীয়, পবিত্র ও চিরমধুর শুচিতা-সংস্পর্শে উদ্‌ভ্রান্তের মত আমরা যখন কেদারতীর্থে উপস্থিত হইলাম, তখন বেলা আন্দাজ আড়াইটা হইবে।

এখানে আসিয়া প্রথমেই আমরা বুদ্ধা দিদি ও 'সুরো' চাকরের জন্য নিযুক্ত দুই জন কাণ্ডিবাহককে তাহাদের ৫ দিনের প্রাপ্য মজুরী সওয়া ছয় টাকা (দৈনিক ১।০ হিসাবে) চুক্তি করিয়া বিদায় দিলাম। অগ্রজ মহাশয় বৌদিদির জন্য ভাটোয়ারী হইতে এই কেদারনাথ পর্য্যন্তই ডাণ্ডিবাহকের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বৌদিদির কথামত তিনিও এখানে ডাণ্ডিওয়ালা কুলীগণকে হিসাবমত মজুরী দিয়া বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন। পুরাতন ডাণ্ডিখানা (যাহা ১৪৲ টাকা মূল্যে ক্রয় করা হয়) তাহাদিগেরই সর্দ্দারকে ৪৲ চারি টাকা মূল্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এ বোঝা কে বহিতে স্বীকার করিবে!



তুষারাদ্রিশোভিত কেদার-মন্দির—প্রাতের দৃশ্য

ভগবানসিং আনন্দে এইবার আমাদিগকে সুর করিয়া "পুরব কে লোগোঁ কা এক কিসসা" শুনাইল। কিসসাটি এই :-

"লড়কা বেটী রোয়ত ছোড়া
গো বছরি খড়ক্ ছোড় আয়া।
পাঁচ রূপেয়া মোরী গাঁঠী খরচা—
কৈসে জাঁউ "তুঙ্গনাথ" কে মুলতানি মাটি
আগে পৈর ধরো, পীছে বিছিলে
কৈসে জাঁউ বদরীনারায়ণ কী কঠিন ধাম।"

গানের অর্থের সহিত তাহার নিজের অবস্থার অনেকটা সামঞ্জস্য ছিল। কারণ, সে দেশ হইতে আসিবার কালে বাস্তবিকই তাহার লড়কা-বেটী "রোয়ত" অর্থাৎ কাঁদাইয়া এবং "গো-বছরি" অর্থাৎ গরু

বাছুর খোঁয়াড়ে রাখিয়াই এই কঠিন তীর্থ-পথের সঙ্গী হইয়াছে। খরচাও এক্ষণে "পাঁচ রুপেয়া" আন্দাজ তাহার নিকট অবশিষ্ট আছে এবং বলিতে কি, এখনও পর্য্যন্ত "তুঙ্গনাথ" বা "বদরী-



কেদারের পথে এক প্রপাত



কেদারের মন্দির—সন্ধ্যার দৃশ্য

নারায়ণের" মত কঠিন তীর্থও তাহার দর্শন বাকী। তবে তাহার আজ এক্ষণে আনন্দের কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে, সে ত "কেদারনাথ" ও "বদরীনারায়ণ" উভয় তীর্থেরই আমাদের নিযুক্ত পাণ্ডাদ্বয়ের 'ছড়িদার'বিশেষ। সুতরাং এত দিন পরে সে আজ আমাদিগকে তাহারই প্রভু এক পাণ্ডার নিকটে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছাইয়া দিতে সমর্থ হওয়ায়, তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্য গণ্ডা বুঝিয়া পাইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে, ইহা তাহার পক্ষে কম আনন্দের কারণ নহে। এখানে পৌঁছিয়াই সে তাহার মালিককে যাত্রীর নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছান সংবাদ দিয়া, তাঁহার কথামত আমাদিগকে এক সুন্দর দ্বিতল বাড়ীর উপর-ঘরে আশ্রয় দিল। প্রকাণ্ড হলঘর। মেঝেতে একখানি কার্পেটাসন বিস্তৃত, কত যত্নের যাত্রী আমরা। কিছুক্ষণ পরে পাণ্ডা মহাশয় স্বয়ং হাজির দিয়া, কুশল-প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসাবাদের পর বলিয়া উঠিলেন, "আহারাদির ব্যবস্থা যদি না হইয়া থাকে, তবে দোকান হইতে গরম পুরী ইত্যাদি আনাইয়া দিই।" বলা বাহুল্য, দোকানের পুরী আমরা খাই না, এ-কথা শুনিয়া তিনি যেন আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন! সাধারণতঃ যাত্রীরা এ-স্থানে অত্যধিক শীত-নিবন্ধন রান্না ইত্যাদির ঝঞ্ঝাটে আদৌ যাওয়া পছন্দ করেন না। শীতের দরুণ "টেম্পারেচার্" সে-দিনে ৪০° ডিগ্রী (বড় কম ঠাণ্ডা নহে!) পর্য্যন্ত নামিয়াছে শুনিলাম। বলা বাহুল্য, আমরা রামবাড়া হইতেই মধ্যাহ্নের 'পাপক্ষয়' সারিয়া আসিয়াছিলাম। এজন্য সময় নষ্ট না করিয়া সকলেই এ-স্থানের আশ-পাশ সমস্তই দেখিয়া লইবার জন্য বাহির হইলাম।

যাত্রীর জন্য বহু ধর্ম্মশালা ও "যাত্রি-নিবাস" দৃষ্ট হইল। এক কালীকম্লীওয়ালারই তিনটি—তাহা ছাড়া গোয়ালিয়র, বিকানীর, পঞ্জাব, কানপুর, ইটোয়া, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের রাজা, মহারাজা, জমিদার, শেঠগণেরও অনেকগুলি ধর্ম্মশালা বিদ্যমান। "রামপুর দরবার", সিমলা ডিষ্ট্রিক্ট বিশহর ষ্টেটের মহারাজা পদ্ম সিং সাহেব বাহাদুর সি, এস, আই, মহোদয় আজ তিন বৎসর হইল প্রায় ৩৫ হাজার টাকা ব্যয়ে যাত্রীদিগের জন্য সুন্দর বিশ্রামাগার তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালীর মধ্যে হাওড়া পঞ্চাননতলা-নিবাসী উমেশচন্দ্র দাসের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তাঁহার পুত্রগণের দ্বারা নির্ম্মিত "উমেশ-নিবাস" উল্লেখ-যোগ্য। ময়মনসিংহ মুক্তাগাছার "রাণী বিদ্যাময়ী"র কীর্ত্তিস্বরূপ চারিখানি ঘর-সংযুক্ত একটি দ্বিতল ধর্ম্মশালার সংস্কারাভাবে যেরূপ অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা দেখিলে চিত্ত স্বতঃই ব্যথিত হইয়া উঠে! কর্ত্তৃপক্ষের সে দিকে একটু দৃষ্টিপাত বাঞ্ছনীয় মনে হয়। পাকা ধর্ম্মশালা ব্যতীত ছপ্পরযুক্ত বহু ধর্ম্মশালাও দেখা গেল। পোষ্ট আফিস, তার-ঘর বিদ্যমান দেখিয়া বন্ধু-পত্নীর নিরাপদে কেদারতীর্থে উপস্থিতির সংবাদ বন্ধুমহাশয়কে জানাইয়া দিলাম।



কেদার-মন্দির, উদককুণ্ড ও আশপাশের কতক স্থান

শুনিলাম, এ তার "গুপ্তকাশী" হইয়া যথাস্থানে যাইবে। আমরাও নিজ নিজ ঘরে পত্র দিতে ভুলিলাম না।

জিনিষ-পত্রও এখানে যথেষ্ট মহার্ঘ। ঘৃত, আটা, চিনি ও আলু প্রতি সেরে যথাক্রমে তিন টাকা, ছয় আনা, এক টাকা ও আট আনা মাত্র!

এই কেদার-তীর্থের আশ-পাশ কিছু দূর ব্যাপিয়া চতুর্দ্দিকেই কেবল অগণিত তীর্থরাজি বিরাজ করিতেছে। কিন্তু তুষার না কমিলে সেগুলি দেখিবার উপায় নাই। পাণ্ডা বলিলেন, সেই শ্রাবণ মাস ভিন্ন এ তুষার কমিবে না। উত্তর-তরফ হইতে মন্দিরের পশ্চিমদিকে 'মন্দাকিনী' নদী কুলু-কুলু নিনাদে নীচের দিকে বহিয়া চলিয়াছেন। দু'ধারেই শুভ্র উজ্জ্বল স্তূপীকৃত তুষাররাশি ইঁহাকে অধিকতর মহিমামণ্ডিত রাখিয়াছে-বলিলে অত্যুক্তি হয় না।



অর্দ্ধবৃত্তাকার তুষার – কেদারের সন্নিকটে

শুনিলাম, মন্দিরের উত্তরদিকে ঐ তুষার-পর্ব্বত সাড়ে চারি মাইল আন্দাজ অতিক্রম করিতে পারিলে, পাহাড়ের উপরে এক অতি সুন্দর তাল বা সরোবর (নাম "চোরাবাড়ী তাল") দেখা যায়। সেখান হইতেই এই মন্দাকিনীর উৎপত্তি। ঐ চোরাবাড়ী তালের পূর্ব্বদিকে "ব্রহ্মগুহা" আছে। শ্রাবণ মাসে যখন ওখানে যাওয়া চলে, গুহামধ্যে গুচ্ছ-গুচ্ছ যব-গাছ দৃষ্ট হয়, তাহার শস্য অর্থাৎ যব টিপিলে উহা হইতে আবার 'বিভূতি' বাহির হইয়া থাকে।

এই উত্তরদিক্ হইতে "স্বর্গ-দ্বারী" নদী আসিয়া আবার মন্দাকিনীর সহিত সম্মিলিত। সেখানে পিতৃপুরুষগণের পিণ্ডদান-প্রথা আছে। বাল্যকালে "অমরকোষে" অভ্যাস করিতাম, "মন্দাকিনী বিয়দ্গঙ্গা স্বর্নদী সুর-দীর্ঘিকা" এই মন্দাকিনী স্বর্গেরই নদীর এক নামান্তর মাত্র। আজ এই অমল-ধবল তুষার-বেষ্টিত হিমালয়ের তুঙ্গশৃঙ্গে অবস্থিত মন্দাকিনীকে স্বর্গের ধারাই মনে করিয়া শ্রদ্ধানতচিত্তে সকলেই বার বার স্পর্শ করিয়া ধন্য হইলাম। মন্দিরের পূর্ব্বদিক হইতে আগত আবার "সরস্বতী" নদী দক্ষিণাভিমুখী হইয়া এই মন্দাকিনীর সহিত মিলিত হইয়াছে। সেখানে "হংস-কুণ্ড" নামে একটি ছোট কুণ্ড দেখা যায়। তাহাতেও পিতৃ-পুরুষগণের পিণ্ড দেওয়া হয় এবং মৃতব্যক্তির জন্ম-কুণ্ডলী ডুবাইয়া দিবার বিধি আছে।

পশ্চিমদিকের পাহাড় হইতে "দুধ-গঙ্গা" নামিয়া আসিতেছেন। শুনিলাম, ঐ পাহাড়ের দুই তিন মাইল আগে গেলে সেখানেও "বাসুকিতাল" নামক একটি তাল আছে। সেখান হইতেই এই দুধ-গঙ্গার উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বদিকে "রেতঃ-কুণ্ড" নামে আরও একটি কুণ্ড আছে শুনিয়া তদ্দিকে ধাবিত হইলাম।

কিন্তু সে দিকের পথও তখন সম্পূর্ণ তুষার-ঢাকা দেখিয়া, আমরা সকলেই কুণ্ডদর্শনে নিরস্ত হইলাম। পাণ্ডা বলিল, এ কুণ্ডের জলের নিকটে গিয়া "বম্ বম্" বলিলেই জলের মধ্যে আপনা হইতেই বুদ্‌বুদ্ উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ ইহাতে শব্দের সহিত কোন সংযোগ আছে বলিয়াই সম্ভবতঃ মনে করিতে পারেন। ইহারই দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে পাহাড়ের শৃঙ্গদেশে এক ভৈরব-মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন।

সন্ধ্যার প্রাক্‌ক্ষণে সকলেই বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। আমাদের শীত-নিবারণের জন্য পাণ্ডা মহাশয় অযাচিতভাবে সাতখানি (সাত জনের ব্যবহারের নিমিত্ত) কম্বল পাঠাইয়া দিয়া, আমাদিগের অধিকতর আরামের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, এই হিম-শীতল তুষারতীর্থে কালীকম্লীওয়ালার এই সুব্যবস্থা সকল যাত্রীকেই যেন চমক লাগাইয়া দিয়াছে!

বাসায় ফিরিয়া লক্তে সিং ডাণ্ডিওয়ালা ও কর্ণ সিং বোঝাওয়ালা কুলীগণের এই কেদার-তীর্থের পৌঁছানর দরুণ চতুর্থ ধাম হিসাবে প্রাপ্য "ইনাম" "খিচুড়ী" প্রভৃতির (পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধাম হিসাবে দেওয়ার মত) চুক্তি দেওয়া হইল। অবশ্য জিনিষ-পত্রের মহার্ঘতা নিবন্ধন খিচুড়ীতে প্রত্যেক কুলী কিছু কিছু বেশী স্বীকার করিতেই হইল।

পরদিন ১৬ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার যথাসম্ভব প্রাতঃকালে উঠিয়া, প্রথমেই মন্দাকিনীর পবিত্র শীতল ধারায় আচমন-স্পর্শাদি করিতে আমরা তীরে উপস্থিত হইলাম। সেখানেই সন্ধ্যা বন্দনাদি শেষ করিয়া লওয়া হইল। তার পর পাণ্ডা সমভিব্যাহারে এইবার কেদার-দর্শনে সকলেই একে একে মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। প্রস্তরনির্ম্মিত সুশোভন মন্দির, মন্দিরের বামদিকে হনুমানজী, দক্ষিণে পরশুরাম ও মধ্যস্থলে সম্মুখেই বিঘ্ন-বিনাশন গণেশজীর মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। ভিতরভাগে নাতি-প্রশস্ত অঙ্গন, অনেকটা নাটমন্দিরেরই মত, তাহারই বামভাগে লক্ষ্মীনারায়ণ, দক্ষিণে পার্ব্বতী, মধ্যস্থলে নন্দীগণ ও বৃষমূর্ত্তি এবং চতুর্দ্দিকেই পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর দর্শন করিতে করিতে তুষারনাথ কেদারেশ্বরের সুবৃহৎ জ্যোতির্লিঙ্গের সম্মুখে আসিয়া উপবিষ্ট হইলাম। সে স্মরণীয় শুভ-মুহূর্ত্তে, নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আমরা সকলেই যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া মনে করিলাম, এই সেই হিম-গিরিশীর্ষ-শোভী তুষার-প্রচ্ছন্ন কেদার-তীর্থে সুর-নর-মুনি-বন্দিত, জটাজুটধারী ত্র্যম্বকের অবিচল ধ্যান-মূর্ত্তি! যাঁহার দর্শনের আশায় রাজ্য, সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন তুচ্ছ করত এক দিন কোন্ অতীতযুগের সেই ধর্ম্মরাজ স্বয়ং যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি পঞ্চপাণ্ডব নিরন্তর পথশ্রান্ত, ব্যাকুল নয়নে এই চির-দুর্গম তুষার-পথের পথিক হওয়া লোভনীয় মনে করিয়াছিলেন! কৈ তবে তাঁহার সেই ত্রিনয়ন শোভিত বিশ্ব-বিমোহন সদানন্দ দিগম্বর-মূর্ত্তি! ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রশোভী, রজতগিরিনিভ,

ভস্মাচ্ছাদিত দিব্য তনু—গলে যাঁহার নিরন্তর কাল-ভুজঙ্গম-বেষ্টিত উন্নত-ফণার বিস্তৃতি, শিরোদেশে জটা-জাল-বিহারিণী মন্দাকিনীর পবিত্র ধারা! সেই ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত-কটি, বিভূতি-ভূষণ, দেবাদিদেব মহাদেবের সদা-সৌম্য মধুর মূরতি কি এই মহামহিম জ্যোতির্লিঙ্গমধ্যেই লুক্কায়িত রহিয়াছে? ধ্যানস্তিমিতনেত্রে সকল যাত্রীই এখানে যথাশক্তি পূজা করিতে ব্যস্ত। যেন কত প্রাণপাত পরিশ্রমেই এই প্রাণাধিক পূজার মূর্ত্তিকে নিকটে দেখিতে পাইয়াছে! তীর্থযাত্রার সকল সাধনাই যে এখানে সফল ও সম্পূর্ণ! যুগ-যুগান্তরব্যাপী এই মহাজন-প্রদর্শিত মুক্তি-পথের বিরাট জ্যোতি-র্ম্মূর্ত্তির অন্তরালে হিন্দু-ধর্ম্মের কতই না ভাব, ভক্তি, পূজা ও প্রেমের বিকাশ আছে, কে তাহা অন্তরের সহিত স্বীকার না করে? আস্তিক দূরের কথা, অতি বড় নাস্তিকও যেন এ স্থানের মহিমায় স্বতঃই আকৃষ্ট হইয়া উঠে। সকলেই স্ব স্ব শক্তি অনুসারে পূজার্চ্চনা শেষ করিলাম। পাণ্ডা ঠাকুর এই সুবৃহৎ জ্যোতির্লিঙ্গ সম্বন্ধে কত কথাই বর্ণন করিলেন। "শিবমূর্ত্তি না দেখিয়া এইখানে ভীম গদা মারেন," "এইখানে একটি ছিদ্র" "লিঙ্গের উত্তরদিক্ মহিষের পুচ্ছাকৃতি-বিশিষ্ট" "সম্মুখেই △ ত্রিভুজাকৃতি শক্তিযন্ত্র" "এই স্থানে পদ্ম" ইত্যাদি অনেক কিছুই 'পুরাতত্ত্ব' আবিষ্কৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ভিড়ের মধ্যে সে সকল কথায় কাণ দিবার আদৌ প্রয়োজন মনে হয় নাই। এ সম্বন্ধে একমাত্র উত্তরাখণ্ডে বর্ণিত সুবিশাল কেদার-তীর্থের মাহাত্ম্য সকলেরই দৃষ্টিতে অতুলনীয়। বাসায় ফিরিয়া আসিয়া এইবার আমরা পাণ্ডাঠাকুরকে বিদায় দিতে ব্যস্ত হইলাম।

'পূজা', 'দক্ষিণা', 'সুফল' ইত্যাদি যথাশক্তি প্রদান করিলে পাণ্ডা ঠাকুর সকলকেই সন্তুষ্টচিত্তে (?) আশীর্ব্বাদ করিলেন। তার পর তাঁহার পূর্ব্ব-নিযুক্ত 'ছড়িদার' ভগবান সিংহকে নিকটে ডাকিয়া আমাদিগের যাত্রা-পথের শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবার জন্য



দুধগঙ্গা নদীর উপরের দৃশ্য—কেদার-তীর্থ

আদেশ দিলেন। আমাদের কষ্টের লাঘবতা হেতুই অযাচিতভাবে তাঁহার এই সঙ্গে-দেওয়া লোকটিকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সঙ্গে লইতে বাধ্য হইলাম।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য।

তুমি শুধু নাই

সে-দিনও এমনি ছিল জ্যোৎস্না নিবিড়
সুনীল অম্বরে পূর্ণ-চন্দ্র রজনীর।
মধুপ-গুঞ্জন-মুগ্ধ এ গোলাপ-বনে
নিভৃত মিলনপ্রার্থী এনু দুই জনে।
বাহু-লীনা হয়ে তুমি, হে অভিসারিকা,
লুব্ধ ওষ্ঠে দিলে মম আঁকি প্রেমটীকা।

আজিও ফুটিয়া আছে এ কুঞ্জে গোলাপ
মধুপ আজিও হেথা গাহিছে প্রলাপ।
নিশীথিনী আজো পূর্ণ-চন্দ্রিকা-বিভোর—
তুমি শুধু নাই প্রিয়া বাহুপাশে মোর!

শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায়



দান-প্রতিদান

[উপন্যাস]



[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

৩৫

অনেক বেলায় কুহুর ঘুম ভাঙ্গিল। রাত্রিতে বাসনার খাটের সহিত আর একখানি ছোট খাট সংলগ্ন করিয়া কুহু শয়ন করিয়াছিল। শয়ন পর্য্যন্তই, শান্তিদায়িনী নিদ্রাদেবী তাহার প্রতি অকরুণ হইয়াছিলেন, তাই শীতের সুদীর্ঘ রজনী বিছানায় ছটফট করিয়া ভোরের দিকে কুহু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়াছিল।

এত বেলায় জাগিয়া প্রভাতের সোণার রৌদ্রটির প্রতি চাহিয়া কুহু নিতান্ত অলসের ন্যায় বিছানায় পড়িয়া রহিল। এখানে করিবার কিছুই নাই। জীবনের সমস্ত কায—সমস্ত প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়াছে। অন্তর বাহির মরুবালুকার মত ধু ধু করিতেছে। সে মরুভূমিতে আশার তৃণ নাই; বাসনার মঞ্জরী নাই। আছে কেবল মহা বৈরাগ্য। মনে মনে সে স্বামীকে মুক্তি দিয়াছে, নিজেও মুক্তি মাগিয়া লইয়াছে, তথাপি হৃদয়ে নির্ব্বিকার প্রশস্ততা আসে না। দীন আশাহত অন্তঃকরণ গুমরিয়া কাঁদিয়া মরে। এ বিশাল বিশ্বে পতিপ্রেম ভিন্ন আর যেন কিছুই থাকিতে পারে না। নারায়ণ, নারীর ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু গড়িবার সময় এত ক্ষুদ্র করিয়া গড়িয়াছিলে কেন? গড়িলে যদি, তবে তোমাকে ভুলিতে দিলে কেন? তোমার অনন্ত প্রেম-নির্ঝর দিবানিশি ঝরিয়া পড়িতেছে, ভ্রান্ত মন ত সে দিকে ফিরিয়া চাহে না।

মুখ ধুইয়া, রাত্রির কাপড়-জামা বদ্‌লাইয়া প্রভাতের তাজা ফুলটির মত বাসনা কুহুর শিয়রে আসিয়া ডাকিল, "বৌদি, আজ তোমার কি হয়েছে, ভাই? এখনও শুয়ে রয়েছ, জ্বর হয়েছে?"

কুহু মাথা নাড়িল, "না, জ্বর নয়। কাযকর্ম্ম নেই, শালগ্রামের শোয়া-বসা সমান।"

বাসনা মুচকি হাসিয়া বলিল, "কাম না থাকলে শুয়ে থাকতে হয় না কি? কৈ, এখানে এসে ত তুমি এক দিনও এমন ক'রে শুয়ে থাকনি? বালিগঞ্জে ভোরবেলা উঠে কত কায করতে, দাদামণি এলেই আবার তোমার কাযের তাড়া প'ড়ে যাবে। আজ আমরা দু'জনে দাদামণিকে চিঠি লিখবো, মনে আছে ত?"

কুহু জবাব দিবে, এমন সময় বিন্দি ঝি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বৌরাণি, এ বেলা কি রান্না হবে ব'লে দিন। ঠাকুর চান ক'রে ব'সে রয়েছে। দেওয়ান বাবু আপনাকে বলতে বল্লেন, যদি সন্দেশ-টন্দেশ তৈরী করতে চান, তা হ'লে দুধ বেশী ক'রে আনিয়ে দেবেন। ঠাকুরবাড়ীর বামুন-মা আপনাকে একবার ভোগের ঘরে যেতে বলেছেন। ঠাকুরকে আজ ক্ষীরের নাড়ু দিতে হবে।"

এ কয়েক দিন বিকাশদের গৃহে বিবাহের গোলমালে কাটিয়া গিয়াছে। সংসারের ভার লইতে—কর্ত্তৃত্বের ভার লইতে দাস-দাসীরা তাহাকে একটিবারও ডাকে নাই। সুবিজ্ঞ দেওয়ানের আদেশে আজ ঝি-চাকর তাহাদের নূতন কর্ত্রীকে খাতির করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতে আসিয়াছে।

কুহুর বিদ্রোহী মন তখনই চীৎকার করিয়া বলিতে

চাহিল—"আমাকে তোমরা ডেকো না, আমি কিছু জানি না. পারবো না।" কিন্তু এ যে সাধারণ দাসদাসীর আহ্বান নহে, যিনি যৌবনের প্রারম্ভে এ সংসারে প্রবেশ করিয়া ইহারই কল্যাণকার্য্যে আজ বার্দ্ধক্যের দ্বারে উপনীত হইয়াছেন, সেই চির-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধ দেওয়ান কাকাকে সে কি বলিয়া অপমান করিবে—অবহেলা করিবে? কুহুর উত্তপ্ত চিত্ত তখনই শান্ত হইয়া আসিল। সে ত্রস্তে উঠিয়া ঝিদিকে বলিল, "আমি এখনই যাচ্ছি, তুমি যাও।"

কিয়ৎকাল পরে স্নানান্তে বাসনাকে সঙ্গে লইয়া কুহু ভাঁড়ারে উপস্থিত হইল। ভাঁড়ারের তত্ত্বাবধান করিত প্রমদা ঠাকুরাণী। অনেক দিন পূর্ব্বে নিরাশ্রয়া ব্রাহ্মণকন্যা দেওয়ানের নিকটে কার্য্যপ্রার্থিনী হইয়া কাঁদিয়া পড়িয়াছিল। জমিদার-বাড়ীর ভাঁড়ারের দৌলতে এখন তাহার কাঁদিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। প্রমদার কর্তৃত্বে অপর দাস-দাসী সন্তুষ্ট নহে। আজ কুহুকে ঘর-কন্নার মধ্যে নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদের খুসীর অন্ত রহিল না।

প্রমদা ঠাকুরাণী মুখখানা হাঁড়িপানা করিয়া শুষ্ক মুখে বলিল, "ভাঁড়ারের জিনিষ-পাতি দেখে শুনে নিন, বৌরাণি! এইবার আপনাদের দ্রব্যজাত আপনারা তদারক ক'রে রাখুন। আমি ছুটী নিই। দিন নাই, রাত নাই, ভাঁড়ার আগ্‌লে পড়েই আছি, তবু আপনাদের মুখপোড়া ঝি-চাকরদের বিশ্বাস, সকল জিনিষ অপচয় হয়।"

কুহু মিষ্ট হাসিয়া জবাব করিল, "আপনাকে ছুটী নিয়ে যেতে হবে না, বামুন-দিদি। আপনি যেমন আছেন, তেমনই থেকে আমায় একটু কাযকর্ম্ম শিখিয়ে দেবেন।"

এ আশ্বাসেও বামুনদিদির বদন-মণ্ডল রাহুমুক্ত হইল না। কুহু নিস্তারের নিকটে কত দিন গল্পচ্ছলে শুনিয়াছে, তাহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী ঘরকন্নার কায করিতে ভালবাসিতেন। এই ঘরখানিই তাঁহার সকল ঘরের চেয়ে প্রিয় ছিল। বহু ঝি-চাকর থাকা সত্ত্বেও সকাল-সন্ধ্যা এই ঘরেই তাঁহার অতিবাহিত হইত। সেই আলমারী, সেলফ, ধামা, কাঠা, হাঁড়িকুড়ি-বোঝাই গৃহে পদার্পণ করিতেই মায়ের কল্পিত মূর্ত্তিটি কুহুর মানস-নয়নে ভাসিতে লাগিল। চওড়া লালপাড় শাড়ী-পরিহিতা, সিন্দুর ও অলক্তকরাগে রঞ্জিতা মা যেন প্রসন্ন-স্মিতমুখে কুহুকে ডাকিয়া বলিতেছেন—"এস মা, আমার ঘরের লক্ষ্মী ঘরে এস।"

কুহু শাশুড়ীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বিশৃঙ্খল গৃহ সংস্কারে মনোনিবেশ করিল।

বাসনা এ সমস্ত কাযে অভ্যস্ত নহে, তাহার ভালও লাগে না, সে অপটু হস্তে এটা সেটা নাড়িয়া দাদামণিকে চিঠি লেখার অছিলায় বাহির হইয়া গেল।

সব জিনিষপত্র ঝাড়িয়া মুছিয়া নূতন করিয়া সাজাইয়া গোছাইয়া রাখিতে কুহুর মন্দ লাগিতেছিল না। কায করিতে সে বরাবরই ভালবাসে। কাযে তাহার অবসাদ আসে না, ক্লান্তি আসে না। আজ তাহার দগ্ধ হৃদয়ের জ্বালা সে কর্ম্মপ্রবাহে জুড়াইতে আসিয়াছে—ভুলিতে আসিয়াছে। এখন কুহু কেবলই স্বামিপ্রেমে বঞ্চিতা অনাদৃতা স্ত্রী নহে, সে এত বড় সংসারের বধূ—গৃহিণী। তাহাকে আশ্রিত-পরিজনদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ্য করিতে হইবে—শৃঙ্খলা আনিতে হইবে। নিজের দুঃখ ভুলিয়া সকলের সুখ-দুঃখের সন্ধান লইতে হইবে। কুহু হৃদয় বাঁধিবার সংকল্প করিলেও কোথায় যেন বেদনার কাঁটা বিঁধিয়াই রহিল। সে ব্যথা ভুলিতে গেলে ভোলা যায় না। সে কণ্টক যেন মর্ম্মের প্রত্যেক তন্ত্রী ভেদ করিয়া অস্থিমজ্জায় টন-টন করিতে থাকে।

কুহুর আরব্ধ কায শেষ হইতে হইতে বেলা হইয়া গেল। শীতের সুমিষ্ট রৌদ্র বৃক্ষশির পরিত্যাগ করিয়া অঙ্গনে লুটাইয়া পড়িল, সে বেলার রান্না-খাওয়ার যোগাড় করিয়া দিয়া কুহু বাহিরে আসিতেই একটি অপরিচিতা মেয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। মেয়েটির বয়ঃক্রম পনের ষোলর অধিক নহে। গায়ের বর্ণ শ্যাম, কিন্তু মুখশ্রী সুন্দর। শরীরটি পরিপূর্ণ, দিব্য ফিটফাট বেশ-ভূষা। পাণ-দোক্তার রসে ঠোঁট টুকটুক করিতেছে, কপালে উল্কি। হাত অলঙ্কারশূন্য, গলায় মুড়কিমালা, কোমরে রূপার গোট, কাণে সোণার ফুল। মেয়েটির কাঁকালে শাক-সব্জীপূর্ণ একটি সাজি। কুহুর পায়ের কাছে সব্জীর ডালাটি নামাইয়া, মাটীতে মাথা ঠেকাইয়া, প্রণাম করিয়া মেয়েটি কহিল, "আমাদের ক্ষেতের মটরশাক, বরবটী, শিম, এই সব মা আপনাকে পাঠিয়ে দিলে, বৌরাণি। আপনারা সেবা করো। আমায় চিনতে পারছ না? আমি আপনাদের কালু সর্দ্দারের পুন সোহাগী। আর এক দিন শাক নিয়ে এসেছিনু। সে দিন

আপনি ছোট তরফে ছিলে।" বলিয়া সোহাগী মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

উহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই কুহু সচকিত হইয়া উঠিয়াছিল, ইহাকে কোথায় যে দেখিয়াছে, তাহা মনে পড়িতেছিল না। এই মুখ টিপিয়া বাঁকা হাসিটুকুর ভঙ্গী সোহাগীকে ধরাইয়া দিল। গত সন্ধ্যায় জয়ন্তর বোটে কুহু ইহাকেই নিরীক্ষণ করিয়াছিল। এই দুষ্ট হাসি, কাণের নূতন ফুল সেজের আলোকে ঝিকমিক করিতেছিল। উহাকে কুহু ভুল করিতে পারে না। তাহার ভাগ্যবিধাতা আগুনের রেখা টানিয়া কুহুর হৃদয়ে উহার অবয়ব যে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন!

কুহু মুখ তুলিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান মেয়েটির পানে আর চাহিতে পারিল না। সেখানে সে দাঁড়াইতে পারিল না, দ্রুতপদক্ষেপে ভাঁড়ারে ঢুকিয়া মশলা রাখিবার আলমারীর পশ্চাতে বসিয়া পড়িল। তাহার দুই চোখ বাহিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিতে লাগিল। কুহু মনে মনে বলিল,—"ঠাকুর, আমি কি তোমার পরীক্ষার যোগ্য? এত বড় জগতে আমি যে তোমার পায়ের এক বিন্দু ধূলি-কণার মতও নই। আমার সাথে এ খেলা কেন? এ ছলনা কেন? আমার কতটুকু শক্তি? আমি পারি না। তুমি অন্তর্যামী অন্তরে থাকিয়া আমার পরাভব ত দেখিতেছ? তবুও তোমার পরীক্ষা করিবার সাধ হয়?"

৩৩

দিন কুড়ি কাটিয়া গিয়াছে। ইহারই মধ্যে শীতটা বেশ ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে।

আজকাল তিতলের ছাদে পড়ন্ত রৌদ্রে মাদুর বিছাইয়া কুহুদের সভা বসিতেছে। এ সভার প্রধান সভ্য মাধুরী ও বাবলি, দুই সখীর বিশ্রম্ভালাপের ভিতর চঞ্চলা বাসনা অধিক কাল না থাকিলেও সময় সময় আসিয়া বাবলির সহিত খেলা করিয়া থাকে। কোন দিন বা কুহুর নিকটে সেলাই শিখিতে বসে। মাধুরী সেলাই জানে না, কিন্তু শিখিবার খুবই উৎসাহ। কুহু মাধুরীকে সযত্নে সেলাই শেখায়। কিন্তু সেলাইয়ের পরিবর্তে তাহাদের আলাপ-আলোচনাই জমিয়া উঠে বেশী। এই উপলক্ষে মাধুরীকে নিত্যই আসিতে হয়। মধ্যে মধ্যে উভয় পক্ষের নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণও বাদ যাইতেছে না। এক নিম্নতম কর্মচারীর পত্নীর সহিত জমিদার-গৃহিণীর এ হৃদ্যতা দাস-দাসীদের ঈর্ষার কারণ হইলেও এখন সহিয়া গিয়াছে। কাত্যমণির বাতের বেদনা বৃদ্ধি হওয়াতে তিনি বড় একটা বাড়ীর বাহির হইতে পারেন না। নিস্তারের সহিত মাধুরী যাওয়া আসা করে।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। বনের কোলে নিশার আঁধার নিবিড় হইয়া আসিতেছে। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, কিন্তু পশ্চিম-গগনপটে এখনও তাহার বিদায়চিহ্ন মিলাইয়া যায় নাই।

ক্ষণকাল পূর্ব্বে নিস্তারের সহিত মাধুরীকে বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া কুহু উদাসনয়নে রাঙ্গা রঙ্গে রঞ্জিত আকাশের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। এমন সময়ে বাসনা আসিয়া কুহুর পাশে মাদুরে শুইয়া পড়িল।

কুহু জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি বাসনা, এসেই শুয়ে পড়লে কেন? মুখ ধুয়ে কাপড় ছাড়বে কখন্? চুল বাঁধা হ'ল না। সন্ধ্যে হ'ল।"

বাসনা তাচ্ছীল্যভরে ঠোঁট উল্‌টাইয়া উত্তর করিল, "হোক গে।"

"হোক গে কেন? চল, নীচে যেয়ে আমি তোমার চুল বেঁধে দি। মুখ ধুইয়ে দি।"

"না বৌদি, আমি আজ চুল বাঁধবো না। মুখ ধোব না। কিছু করবো না।"

"মহাবৈরাগ্য দেখছি যে! কেন করবে না, শুনতে পাব কি?"

বাসনা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল, "ঘরে বোসে সাজ ক'রে কি হবে? কোথাও যাওয়া নেই, বেড়ান নেই, আমার ভাল লাগে না। আমি এখানে আর থাকতে পারবো না,—আমায় বালিগঞ্জে পাঠিয়ে দাও।"

"বালিগঞ্জে পাঠিয়ে দেব? কিন্তু সেখানে যে কেউ নেই। তুমি কার কাছে থাকবে? একা থাকতে পারবে ত?"

"একা কোথায়, বৌদি? বাড়ী ভর্ত্তি লোক রয়েছে। লীলা দিদিকে বল্লে তিনিই এসে আমার কাছে থাকবেন। আমার লীলা দিদিই ভাল, আমি আর কারুকে চাইনে। দাদামণি, দাদা, হিরণদা সব্বাইকে আমি দেখে নিয়েছি। কাউকে আমার দরকার নেই। আমি কারুর সাথে কথা

বলবো না।" বলিতে বলিতে বাসনার নয়নপথে অভিমানের অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

কুহু স্নেহে তাহার মুখখানি কোলের উপর টানিয়া লইয়া কহিল, "এত রাগ কেন, বাসনা? দাদামণি ত তোমায় ফেলে কখনও কোথাও যান না? শরীর তেমন ভাল নেই, তাই দু'দিন ঘুরে আসছেন, এতে রাগ করতে নেই। তোমার এক দাদা কাছে নেই, আর একটি রয়েছেন, তুমি তাঁর সঙ্গে বেড়াতে বেরুলেই পার? তোমার দাদা রয়েছেন, আমি রয়েছি, তবু কি ভাল লাগে না?"

বাসনা সবেগে মাথা নাড়িয়া জবাব করিল, "কে বল্লে, তোমায় ভাল লাগে না? তোমায় আমার খুব ভাল লাগে। দাদার সঙ্গে আমি বেড়াতে চাই না, ওঁর সাথে আমার 'আড়ি'। হিরণদা বেশ ছিল, তাকে কেন তুমি যেতে দিলে, বৌদি?"

"আমি যেতে না দেবার কে, বাসনা? আমি এখানে ক'দিন এসেছি? এর আগে তোমার হিরণদাকে যে ধ'রে রেখেছিল, তাকে বল গে। হিরণদাদা তাঁর পিসীমাকে দেখতে গেলেন, সেখানে আমার কি মানা করা উচিত? আর মানা করলে তিনি আমার কথা শুনবেনই বা কেন?"

বাসনা রাগতস্বরে বলিল, "শুনতো না আবার? তোমার কথা খুব শুনতো। হিরণদা সকলের চেয়ে তোমাকেই যে বেশী ভালবাসে, তা বুঝি আমি জানি না?"

এ অভিযোগে কুহু প্রতিবাদ করিল না। তাহার প্রতি হিরণের স্নেহ সকলেই জানে, সে নিজেও জানে; কিন্তু সেই স্নেহে জয়ন্ত যে দিন সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছে, সেই দিন হইতে কুহু যেন সঙ্কোচে মরিয়া রহিয়াছে। ভগিনী-স্নেহের দাবী খাটাইতে তাহার সাহস হয় না। নহিলে হিরণ কি যাইতে পারিত? আবাল্যের বন্ধুত্ব, প্রাণের টানে না ফিরিলেও কুহু তাহাকে অনায়াসেই ফিরাইয়া আনিতে পারিত। কিন্তু যে বন্ধুত্বের অপমান করিয়া, একমাত্র সুহৃদকে অবজ্ঞা-কলঙ্কের পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়াছে, তাহারই প্রতি নিদারুণ বিতৃষ্ণায় কুহু হিরণকে যাইতে বাধা দেয় নাই। কিন্তু তাহার সেই বিদায়কালের করুণ কোমল মুখচ্ছবি কুহু আজও ভুলিতে পারিতেছে না। সমস্ত সন্ধ্যাকাশ বিষণ্ণ, বিশ্বপ্রকৃতি তাহারই অব্যক্ত বেদনায় এখনও র'সে র'সে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

বিদায়-মুহূর্ত্তে হিরণ বেশী কিছু বলিতে পারে নাই, কেবল বলিয়াছিল—"পিসীমার অসুখ, আমি দেখতে যাচ্ছি।" কুহুর কাণে কাণে তাহার চোখ দুটি যেন বলিয়াছিল—"তোমাকে সুখী করিতে আনিয়া পারিলাম না। জগতের সকল আত্মীয়-বন্ধুকে পরিত্যাগ করিয়া যাহাকে একমাত্র আত্মীয়, বন্ধু, প্রিয়তম ভাবিয়াছিলাম, চোখের সম্মুখে তাহারই চরম অধঃপতনের কোন প্রতীকার করিতে না পারিয়া আমি চলিয়া যাইতেছি।" এ সব কথা বালিকা বাসনাকে বলা চলে না, তাই কুহু নীরব হইয়া রহিল।

নীরবে সন্ধ্যার ম্লান আলোক রজনীর গভীরতার মধ্যে আত্মগোপন করিতে চলিয়া গেল। নীরব আকাশে নীরব চন্দ্র উদয় হইলেন। নক্ষত্র-বধূরা আকাশের গায়ে একটির পর একটি নীরবে ফুটিয়া তারকার মালা গাঁথিতে লাগিল। সে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বাসনাই প্রথমে কথা কহিল। কহিল, "বৌদি, চুপ ক'রে রইলে যে? হিরণদা তোমাকে সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসে বলেছি ব'লে রাগ করলে? আচ্ছা বৌদি, তোমাকে কেউ বেশী ভালবাসে বল্লে রাগ হয় কেন? আমার রাগ হয় না, ভাল লাগে। হিরণদা গেছে, তা ব'লে আসতে ত মানা নেই? তুমি একটিবার তাকে আসতে লিখলে সে অমনি চ'লে আসবে। আমি তার পিসীমার বাড়ীর ঠিকানা লিখে রেখেছি। তুমি আজকেই হিরণদাকে আসতে লেখ, বৌদি।"

কুহু সনিশ্বাসে বলিল, "তুমি লিখলেই তিনি আসবেন, বাসনা, হিরণদা তোমাকেও খুব ভালবাসেন, তুমি আসতে বল্লে ঠেলতে পারবেন না। তাড়াতাড়ি করবার কিছু নেই, দাদামণি এলেই তিনি আসবেন। দাদামণি তোমার জন্যে কত দেশ থেকে কত জিনিষ আনবেন। এবার ফিরে এলে তোমায় রেখে আর কখনও কোথাও যাবেন না।"

বাসনা প্রীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দাদামণি এলেই আমরা এখান থেকে চ'লে যাব, বৌদি? অনেক দিন আমার স্কুল কামাই হ'ল, বালিগঞ্জে যেতে যেতেই মেয়েদের পরীক্ষা শেষ হবে।"

কুহু কহিল, "পরীক্ষার জন্যে ব্যস্ত কি, বাসনা? তুমি এখানকার স্কুলে পরীক্ষা দিও। তোমাদের এ স্কুল ত মন্দ নয়, ভাল ভাল লোক পড়াচ্ছেন, মেয়েও ঢের হয়েছে।"

বাসনা উত্তেজিতভাবে উঠিয়া বসিল। বসিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিতে লাগিল, "ছাই স্কুল, ছাই পড়া, এখানে আবার মেয়ে আছে, ওদের আবার পড়া-শোনা। এদের ভেতর আমার পরীক্ষা দিতে বয়ে গেছে। যত সব ছোট লোক, মূর্খ। আমি ওদের মানুষ বলেই মনে করি না।"

"মানুষ মনে না করবার কারণ কি, বাসনা? এখানকার মেয়েরা বেশী ফ্যাসান জানে না, গাড়ী চ'ড়ে স্কুলে আসে না। গরীব বাপের মেয়ে ব'লে এরা কি মানুষ নয়? কিন্তু এরাই তোমার আপনার। বিদেশে না যেয়ে নিজেদের ভিটেয় ব'সে তোমাদেরই স্কুলে যারা লেখাপড়া শিখছে, তাদের তুমি কিছুতেই ছোট মনে করতে পার না। তোমরা স্কুল তৈরী ক'রে দিয়েছ, তোমাদের খরচে তা চলছে, তোমরা যদি তাকে ভাল মনে না কর, তা হ'লে স্কুলের উন্নতি হবে কি ক'রে? আমার ইচ্ছা হয়—তোমাদের ছোট স্কুলটাকে বড় করতে; লীলাদিকে এনে স্কুলের কর্ত্রী ক'রে দিতে। সকল জাতের সকল মেয়ে স্কুলে পড়বে; ক্রমে ছেলেমেয়েদের দুটো বড় কলেজ হবে। তাতে গাঁয়ের যেমন উন্নতি হবে, লোকের উপকারও হবে তেমনি।"

কুন্থ ক্ষণেক নীরব হইয়া পুনরপি বলিতে লাগিল, "যারা নিজের জন্মভূমি—নিজের দেশকে ভালবাসতে পারে না, তারা গোটা দেশকে ভালবাসবে কি ক'রে? নিজের গ্রামের—নিজের দেশের উন্নতিতেই যে জাতির প্রকৃত উন্নতি। বাসনা, তুমি এখানে বেশী দিন থাকনি, কিন্তু আমাদের বাবা, মা যে এখানেই ছিলেন। নিস্তারের কাছে শুনেছ ত, মা এখানে থাকতে কত ভালবাস্‌তেন? অসুখের সময় পর্য্যন্ত তাঁকে এ যায়গা থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া যায় নি। তাঁরা এখন না থাকলেও তাঁদের ভালবাসা যায় নি—এখানকার মাটীতে—জলে—বাতাসে তাঁরা মিশে রয়েছেন। ভূষণডাঙ্গা আমাদের সকলেরই পবিত্র তীর্থ।"

কুন্থর ওজস্বিনী বক্তৃতায় বাসনা কিছুই বলিল না। হয় ত কথার ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। কলিকাতার ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া—সাথীদের ছাড়িয়া এখানে থাকিবার আশঙ্কায় তাহার মুখ অন্ধকার হইয়া রহিল।

[ক্রমশঃ

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী।

আকুতি

আঁধারের এই ঘোম্‌টাখানি খোলো,
আমার পানে নয়ন দুটি তোলো।
মোর পরাণের সকল আলোর ভাষা
তোমার মুখে বাঁধ্‌লো সে তার বাসা।
নয়নে মোর আননখানি তোলো,
আঁধারের এই ঘোম্‌টাখানি খোলো

মোর নয়নের সকল আলোর আশা
ঘোম্‌টা-মাঝে হারালো তার ভাষা।
আলো নিয়ে তোমার নয়ন থেকে
অরুণ-রেখা দাও না তারে এঁকে।
নয়নে মোর নয়ন দুটি তোলো,
আঁধারের এই ঘোম্‌টাখানি খোলো

শ্রীসরোজরঞ্জন চৌধুরী

নারী—পাশ্চাত্যসমাজে ও হিন্দুসমাজে

বিগত অগ্রহায়ণ মাসের 'বসুমতী'তে দেখাইয়াছি যে, পাশ্চাত্য সাম্যবাদ (doctrine of equality) ও তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত সকল লোকের সকল কর্ম্ম করিবার সমান অধিকার স্বীকার করায় ও সকল কর্ম্মে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকায় ধনিক ও ধনোপার্জ্জন ও ধনরক্ষণকুশল ব্যক্তিরাই সকল প্রধান ধনোপায় প্রায় গ্রাস করিয়াছে, তজ্জন্ত অন্ত সকলেই তাহাদিগের দাসত্বে নীত হইয়াছে, সেই জন্ত এখন পাশ্চাত্যদেশে যত অধিকসংখ্যক লোক পরের বেতনভোগী দাস হইয়াছে, পৃথিবীর ইতিহাসে কোন কালে কোন দেশে তাহা হয় নাই। যখন এইরূপ দাসত্ব জোটাও দুর্ঘট হয়, তখন এই সকল লোকে দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। আর ধনীরাই উত্তরোত্তর অধিক ধনী হয় ও তাহাদিগের বিলাসিতারও ক্রমাগত বৃদ্ধি হয়—তাহা দেখিয়া লোকের ভোগতৃষ্ণারও বৃদ্ধি হয়। এই জন্তই ধনী ও ধনিকরা লোকদিগের বিকৃত স্বদেশভক্তি উদ্দীপিত করিয়া তাহাদিগকে সৈনিক ও নাবিক জীবনে পুরাকালের ক্রীতদাসদিগের অপেক্ষাও অশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে প্ররোচিত ও বাধ্য করে। অনেক দেশ জয় করিয়া তাঁহারা তত্তৎ-দেশ হইতে নানা প্রকারে ধন দোহন করিয়া আরও অধিক ধনী হইতেছেন এবং সেই ধনের স্বল্প অংশমাত্র যে সকল লোকের জীবন ও জীবনের অশেষ কষ্টের বিনিময়ে ধনীরা অত্যধিক ধনী হইয়া বিলাসিতায় গা ভাসাইতেছেন, তাহাদিগের ভিতর বিতরিত হয়। দাসত্ব পাওয়ার অনিশ্চয়তার জন্ত—পারিশ্রমিক হারের স্বল্পতার জন্ত, সৈনিক ও নাবিক জীবনে বিবাহের অসুবিধার জন্ত, অনেক পুরুষই বহুকাল বা চিরকাল বিবাহ করিতে পারে না, সুতরাং নারীরা বহুকাল বা চিরকাল বিবাহিতা হইতে পায় না—যে মাতৃত্বের জন্ত নারীর সকল অঙ্গ গঠিত ও যাহার জন্ত তাহারা লালায়িত—যাহা তাহাদিগের জীবনের সুখের প্রধান উৎস, তাহা হইতে নারীরা বঞ্চিত হয়—যৌন ব্যাধির প্রসার হয়—নারীরা পুরুষদিগের সহিত বি-সম প্রতিযোগিতায়, অর্থোপার্জ্জনের কাড়াকাড়িতে—যাহা অধিকাংশ স্থলেই গোলামীগিরি পাইবার কাড়াকাড়ি মাত্র—নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। এখন তাঁহারা মাতৃত্বের সুখের বিনিময়ে ধনী প্রভুদিগের সকল প্রকার গোলামীগিরির সুখ অর্জ্জন করিয়াছেন—এই গোলামীগিরির অধিকার লাভ করিবার জন্ত পুরুষদিগের সহিত যুদ্ধে তাঁহারা জয়ী হইয়াছেন। পুরুষ ও নারীর সাম্য স্বীকৃত হইয়াছে, সেই বিজয়বার্ত্তা সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইয়াছে, আমাদিগের শিক্ষিতা নারীরাও সেইরূপ অশেষ সুখদায়ী গোলামীগিরির অধিকার লাভের জন্ত বদ্ধপরিকর হইতেছেন।

বহু ধনী পাশ্চাত্য দেশে সকল কর্ম্মে সকলের সমান সুযোগ ও অবাধ প্রতিযোগিতা থাকার ফলে যখন উত্তরোত্তর অধিকসংখ্যক লোকদিগের দুর্দ্দশা ভীষণ হইল—নিঃস্ব বেকারের সংখ্যা বাড়িল, ধনিকরা সকল ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি—প্রকৃষ্ট ধনোপায়গুলি গ্রাস করিয়া বসিল—অন্ত সকলে তাহাদিগের দাসত্বে নীত হইল—তখনই বোঝা উচিত যে, অবাধ প্রতিযোগিতা থাকাই বিধেয় নয়, কিন্তু পাশ্চাত্যরা সাম্যবাদের মোহে তাহা স্পষ্ট দেখিলেন না—সাম্যবাদটাই যে গোড়ার ভুল, তাহাও বুঝিলেন না, সেই গোড়ার ভুল না বুঝিয়া গরীবদিগের ও নারীদিগের দুর্দ্দশা মোচনের জন্ত নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। রোগের উৎপত্তি কোথায়, তাহা না স্থির করিয়া—সে দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া রোগের উপসর্গ নিবারণের চেষ্টায় যেমন রোগ সারে না—যদি বা কিছু দিনের জন্ত রোগের উপসর্গের আংশিক নিবৃত্তি হয়, অন্ত নানা কুফল ফলে, ঐ গোড়ার কথাটা না দেখায় পাশ্চাত্য নারীদিগের ও গরীবদিগের দুর্দ্দশা মোচনের যে সকল চেষ্টা হইতেছে—তাহার ফলও সেইরূপ হইতেছে।

গরীবদিগের দুর্দ্দশা মোচনের চেষ্টার চারিটি প্রধান উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে:—(১) শ্রমিক ও ব্যবসাসঙ্ঘ স্থাপন। ইহার সহিত আমাদিগের জাতিভেদ প্রথার কত সৌসাদৃশ্য আছে—আমাদিগের জাতিভেদ প্রথা কত শ্রেষ্ঠ, তাহা ঐ অগ্রহায়ণ মাসের প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। ইহার দ্বারা শ্রমিকদিগের—গরীবদিগের অবস্থার যে কতক উন্নতি হইয়াছে, তাহাও সকলে স্বীকার করিতে বাধ্য। ইহাতে যে ঐ সকল সঙ্ঘ দ্বারা পরিচালিত কর্ম্মেও অবাধ-প্রতিযোগিতা বন্ধ করা হয়—প্রথমে জোর করিয়া অবাধ-প্রতিযোগিতা বন্ধ করা হইয়াছিল ও তজ্জন্তই কিছু উন্নতি হইতে পাইয়াছে, তাহাও সকলের দ্রষ্টব্য ও তাহা হইতে প্রমাণ হয় যে, সমাজে প্রত্যেক আবশ্যক কর্ম্মে অবাধ-প্রতিযোগিতা বন্ধ করা গরীবদিগের দুর্দ্দশা মোচনের প্রকৃষ্ট উপায়। (২) সমবায় প্রথা। ইহাই উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্যের মহৎ দান, ইহা আমাদিগের জাতিগত ব্যবসায়ী ও শিল্পীদিগের বিশেষভাবে অবলম্বন করা বিধেয়। (৩) সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism), (৪) তুল্যাধিকারবাদ বা সঙ্ঘবাদ (Communism)। শ্রমিকরা ও গরীবরা দেখিল, প্রথমোক্ত দুই উপায়ে তাহাদিগের দুর্দ্দশা ঘোচে না—ধনিকরাও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া Trust করিয়া, তাহারা পূর্ব্বে যে ধর্ম্মঘট (strike) করিয়া তাহাদিগের অবস্থার কিছু উন্নতি করিতে পারিয়াছিল, তাহা করাও ক্রমে দুর্ঘট হয়, সুতরাং তাহারা এখন স্থির করিয়াছে যে, ধনোপায়ের প্রধান উপায়গুলি—ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প (এবং ক্রমে কৃষিও) রাষ্ট্রশক্তির কর্তৃত্বাধীনে আনা একান্ত আবশ্যক এবং সেই রাষ্ট্রশক্তি লোকসংখ্যাধিক্যের দ্বারা নির্ব্বাচিত গণতন্ত্রের হস্তে সমর্পিত হওয়া বিধেয়—তাহা হইলেই সকলের মঙ্গলবিধান হইবে—ধনিকদিগের অত্যাচার নিবারিত হইবে—গরীবদিগের দুর্দ্দশা ঘুচিবে—সাম্য সংস্থাপিত হইবে। এই মতবাদের দ্বারা সকল পাশ্চাত্য দেশই পরিচালিত হইতেছে। আমাদিগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও সেই জন্ত এ দেশে সেইরূপ প্রথা অবলম্বন করিতে চাহেন।

যদিও সমাজতন্ত্রবাদী ও সঙ্ঘবাদী উভয়েই সকল ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি রাষ্ট্রশক্তির কর্তৃত্বাধীনে আনা আবশ্যক বলেন, তথাপি কোথাও ঐ সকল ধনোপায় রাষ্ট্রশক্তির সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে আসে নাই—সমাজতন্ত্রবাদীরা এখন ঐ সকল ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প

কি নিয়মে পরিচালিত হইবে—শ্রমিকদিগের বসবাস কিরূপ হইবে—পরিশ্রমের সময় কত থাকিবে—তাহাদিগের চিকিৎসার—অপত্যদিগের শিক্ষার বিষয়ে নানা নিয়ম করিয়া শ্রমিকদিগের অবস্থার ক্রমশঃ উন্নতি করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আর ধনী ও ধনিকদিগের উপর অতি উচ্চ হারে নানা টেক্স স্থাপন করিয়া নিঃস্ব, বেকার ও অসমর্থ লোকদিগের ভিতর বিতরিত হইতেছে—চিকিৎসা ও শিক্ষার ও স্বাস্থ্যকর বসবাসের উপায় করা হইতেছে। মানুষমাত্রেরই খাইবার-পরিবার স্বত্ব আছে—সমাজ বা রাষ্ট্রশক্তি তাহা দিতে বাধ্য, এইরূপ মতবাদ প্রচারের ফলেই এইরূপ হইতে আরম্ভ হয়। শ্রমিক দল যতই সঙ্ঘবদ্ধতার বলে শক্তিশালী হইতেছে, ততই তাহাদিগের দাবী বাড়িতেছে—ততই টেক্সের বৃদ্ধি হইতেছে—ধনীদিগকেই তাহা দিতে হইতেছে। শ্রমিকদিগের বেতন বৃদ্ধি, পরিশ্রমের সময় সঙ্কোচ, তাহাদিগের সুবিধা ও মঙ্গলের জন্য যত অধিক অর্থব্যয় হইতেছে—ততই ব্যবসায়-বাণিজ্যে ও শিল্পে লাভ কমিতেছে, অনেক সময়ে লোকসানও হইতেছে—শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য বাড়িতেছে—অপর দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় সেই সকল ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প চালান অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। এইরূপ টেক্স-বৃদ্ধি ও লাভ কম হওয়ায়, শ্রমিকদিগের দাবী বাড়ায় ধনিক ও শ্রমিকবিদ্বেষ সর্ব্বত্রই হইতেছে। এ দিকে শিল্পজাত দ্রব্যের অধিক বিক্রয়াভাবে আবার বেকার-সংখ্যাও বাড়ে। তজ্জন্য টেক্সবৃদ্ধিও হইতেছে। আবার এইরূপ উচ্চহারে ভাতা পাওয়ায় আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে। এরূপ অবস্থায় যে সকল পাশ্চাত্য দেশের বিস্তৃত রাজত্ব আছে, তাহারা সেখানে বিদেশজাত শিল্পের উপর অধিক হারে শুল্ক স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগের শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের কিছু কিছু সুবিধা করিয়া লইতে পারিতেছেন। যাহাদিগের ঐরূপ বিস্তৃত রাজত্ব নাই, তাঁহাদিগের রাজত্ব বৃদ্ধি না করিলে কোন সুবিধা হইতে পারে না দেখিতেছেন, ঐরূপ রাজত্ব বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন—তজ্জন্য সৈন্য ও রণসজ্জা বৃদ্ধি করিতেছেন—অপর পক্ষও সেইরূপ করিতে বাধ্য হইতেছেন। এই সমরসজ্জার জন্যও উত্তরোত্তর অধিক ব্যয় হইতেছে—তজ্জন্য টেক্স স্থাপন ও ধার গ্রহণ চলিতেছে—অধিকাংশ রাজস্ব যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য ব্যয় হইতেছে—লোকদিগকে যুদ্ধের জন্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে—লোকরাও মরিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। বৈজ্ঞানিকরা অধিক লোক-হত্যাকারী যন্ত্র ও দ্রব্য প্রস্তুত করণে নিয়োজিত হইয়াছেন। তজ্জন্য সর্ব্বধ্বংসী সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইবার আশু সম্ভাবনা হইয়াছে—জেনিভার আন্তর্জ্জাতিক শান্তিসভা তাহা নিবারণ করিবার কোন উপায় দেখিতে পাইতেছেন না। এরূপ অবস্থায় বিবাহ করিয়া স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদি লইয়া সুখে ও শান্তিতে যাপন করিবার, ভবিষ্যৎ দেখিয়া কার্য্য করিবার প্রবৃত্তিই হয় না—একটা বে-পরওয়া ভাব আসে—আশু আমোদ ও উত্তেজনা-প্রদ কর্ম্ম ও বিষয়ই প্রিয় হয়। সেই জন্য খেলা, সবাক চলচ্চিত্র, থিয়েটার, নাচ-গান—ক্ষণিক প্রীতিপ্রদ কাম উপভোগই কাম্য হইতেছে। ভোগ-প্রবণতা বাড়িয়াছে—তজ্জন্য জীবনে ধনের প্রাধান্য অত্যধিক হইয়াছে। এক দিকে যেমন ধনি-বিদ্বেষ হইতেছে, অপর দিকে ধনীরা সেই ধনের গুপ্তবলে সমাজ রাষ্ট্রনীতি অপ্রকাশ্যে পরিচালিত করিতেছেন, সেই জন্য সঙ্ঘবাদীরা বলে, এরূপ সমাজতন্ত্রবাদ গরীব ও শ্রমিক ভুলানো ধনিকদিগের ছলনা মাত্র।

পাশ্চাত্যদেশে সর্ব্বত্রই ভোগপ্রবণতা বাড়ায়—অদূরদর্শী হওয়ায় সকল খবরের কাগজেই খেলা ও নাচ, গান, থিয়েটার, সবাক্ চলচ্চিত্রের কথা বিবৃত—তাহাতে পারদর্শী তরুণদিগের কীর্ত্তি ঘোষিত—তাহাদিগের চিত্র প্রকাশিত হইতেছে—যেন তাহারাই দেশের আদর্শ hero, heroine—নাচ ও নাচের ভঙ্গিমা কামোদ্দীপক। সংসারানভিজ্ঞ তরুণ-তরুণীদিগের তাহাতে রুচি-বিকার হইতেছে, চরিত্রহীনা নর্ত্তকী, অভিনেত্রী, অনেক সময়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে, তরুণীরা সেই পথে প্রলোভিত হইতেছে—দেশের নৈতিক অবনতি হইতেছে। গৃহ বলিতে যাহা এতকাল বুঝাইত, এখনও আমরা যাহা বুঝি—পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী, ভ্রাতা, ভগিনী আদির স্নেহ-মণ্ডিত, শৈশব-কৈশোরের সুখ-স্মৃতি-জড়িত—অপত্যদিগের কলরব-মুখরিত গৃহবাস ক্রমশঃই লুপ্ত হইতেছে—শৈশব হইতেই বোর্ডিংএ বাস—পরে নিত্য নূতন হোটেলে বা মেসে বাস—কোথাও স্থায়ী নির্ভরশীল ত্যাগধর্ম্মী ভালবাসা নাই, তজ্জন্য কাহারও জীবনে শান্তি, সন্তোষ ও তৃপ্তি নাই—আছে আলাপী (acquaintance) মাত্র,—বন্ধুর অভাবে তাহারা বন্ধু আখ্যা পাইয়াছে—আছে কেবল ক্ষণিকের আমোদ ও উত্তেজনা—আর আছে স্বল্পদিনস্থায়ী কামপ্রদত্ত মোহ—তাহাই প্রেম বলিয়া বর্ণিত। আর যাহারা কখনও প্রকৃত প্রেম উপভোগ করে নাই, কখনও দেখে নাই, তাহারাই কেবল তাহা প্রেম বলিয়া বোঝে। নারীদিগকে পুরুষদিগের সহিত বে-সম প্রতিযোগিতায় অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়—আর বৃদ্ধবয়সে ও অসুস্থ অবস্থায় সকলকেই নির্জ্জন বারাবাসের দুঃখ ভোগ করিতে হয়। বৃদ্ধবয়সেই পুত্রকন্যাদিগের যত্ন, সেবা ও সাহায্য একান্ত আবশ্যক এবং তাহা তৎকালে পাওয়াই জীবনের তৃপ্তি ও উপভোগ—তাহা প্রায় কেহই পায় না—আর পৃথিবী হইতে শেষ বিদায় লইতে হয় ভালবাসাবর্জ্জিত অবৈতনিক বা বৈতনিক সেবাসদনে—যাহাকে শেষ দেখা দেখিতে তাহার প্রাণ আকুল হয়, এমন কেহ থাকে না—তাহাকে যে ভালবাসে, এমন কোন একটি লোকও নাই—যদি কেহ থাকে, তাহারা ধন বা সম্মানের ঘানিগাছে অন্যত্র ঘূর্ণায়মান। ইহার অপেক্ষা মনুষ্য-জীবনের, বিশেষতঃ নারীজীবনের দুর্ভাগ্য কি আছে?

একে ত পূর্ব্বে বর্ণিত নানা কারণে বিবাহ করা অনেকের অসম্ভব হইতেছে, তাহার উপর আশু যুদ্ধের সম্ভাবনায় কেহ বিবাহ করিতে চাহে না। এ দেশের তরুণ-তরুণীরা পাশ্চাত্য নারীদিগের অবস্থা প্রার্থনীয় মনে করেন, কিন্তু বাস্তবিক পাশ্চাত্য নারীদিগের মত দুঃখিনী কোনও দেশে নাই। ভালবাসাই নারীর জীবন,—মাতৃত্বের জন্য তাহারা সৃষ্ট—মাতৃত্বই তাহাদিগের জীবনের সুখের প্রধান উৎস মাতৃত্বের জন্য তাহারা লালায়িত—নির্ভরযোগ্য ভালবাসার প্রার্থিনী, তাহা হইতেই পাশ্চাত্য নারীরা বঞ্চিত—সুতরাং তাহারা সর্ব্বদারা দুঃখিনী। শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়, আই, সি, এস, যাঁহার পাশ্চাত্যের মোহ আজও কাটে নাই, তিনিও সেই জন্য তাঁহার "পথে প্রবাসে" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন:—যুবতীরা জেনেছে, পুরুষসংখ্যার অল্পতাবশতঃ বিবাহ অনেকের ভাগ্যে নাই—আর্থিক অসচ্ছলতাবশতঃ মাতৃত্ব আরও অনেকের ভাগ্যে নাই। সুতরাং যতটুকু পাব হেসে নেবো তাই। ঘোরতর মোহভঙ্গের ভিতর তরুণ-তরুণীরা বাস করছে—ছেলেদের চোখে Democracyর

(গণতন্ত্রের) কাল দিকটা ধরা প'ড়ে গেছে – উনবিংশ শতাব্দীর সব আদর্শ খোলা হয়ে গেছে—জীবন নামক চিত্রিত পর্দাখানা তুলে দেখলে, এর পেছুনে লক্ষ্য ব'লে আর কিছুই নাই। শুধু বাঁচবার আনন্দে বাঁচতে হবে,—হাসবার আনন্দে হাসতে হবে। এ যুগের তরুণরা যত হাসে—তত ভাবে না। মেয়েরা বুঝতে পেরেছে, ভোট আর আর্থিক অনধীনতাই সব কথা নয়—এ সব পেয়ে যাহা বাকী থাকে, তার উপর জোর খাটে না—সেটা হচ্ছে পরের হৃদয়। এ যুগের মেয়েদের মত দুঃখিনী আর নাই। তবু তারা পণ করেছে, কিছুতেই কাঁদবে না—কিছুতেই হটবে না।" (৭ম পরিচ্ছেদ ৯০ পৃ)। পুরুষ ও নারী সাম্য স্বীকারে পাশ্চাত্য দেশের নারী-দিগের এইরূপ অশেষ দুর্গতি হইয়াছে—আর আমরা আমাদিগের নারীদিগকে সেইরূপ উন্নত করিতে চেষ্টিত! এ দেশের খবরের কাগজে পাশ্চাত্যের অনুকরণে খেলোয়াড়, অভিনেত্রী ও নর্তকী-দিগের চিত্র-সম্বলিত কীর্ত্তি-কাহিনী প্রকাশিত হইতেছে—তরুণ-তরুণীরা সেইরূপ কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতে প্ররোচিত হইতেছে—তাহাই তাহাদিগের পাঠ্য ও প্রধান আলোচনার বিষয় হইয়াছে, তাহাতেই দেশের উন্নতি হইবে বোধ হয় বুঝিতেছেন! পাশ্চাত্য দেশেই এইরূপ মনোভাব হওয়ায় দেশের নৈতিক অবনতি হইয়াছে—ধনের প্রাধান্য বাড়ায় আর কোন উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য কলাবিদ্যা দেখা যাইতেছে না, কেবল উন্মত্ত যৌন উপভোগের গল্পে উপন্যাসে দেশ প্লাবিত। এ দেশেও তাহা হইতেছে, তাহাতে আমাদিগের দুর্গতির বৃদ্ধি করা হইতেছে।

সমাজতন্ত্রবাদীরাও সঙ্ঘবাদীদিগের মত সকল ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি রাষ্ট্রশক্তির কর্ত্তৃত্বাধীনে আনা বিধেয় স্বীকার করেন বটে, কিন্তু রুসিয়া ছাড়া কোথাও একদমে তাহা করিতে প্রস্তুত নন—দেখিয়া, বুঝিয়া ক্রমে ক্রমে করাই বিধেয় মনে করেন—রাষ্ট্র-শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ করিয়া, ঐরূপ করিয়া যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিশেষ খর্ব্ব হয়, তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন মনে করেন—কিন্তু কি উপায়ে, কিরূপে রাষ্ট্রশক্তি বিকেন্দ্রীকৃত হইলে তাহা হইতে পারে—গরীবদিগের দুর্দ্দশাও মোচন হয়, পরে দেখিয়া বুঝিয়া স্থির করিবেন। সমাজতন্ত্রবাদীদিগের দেশে কোথাও গরীবদিগের দুর্দ্দশা ঘোচে নাই। গরীবদিগের দুর্দ্দশা হইলে গরীব নারীদিগের আরও অধিক দুর্দ্দশা হয়—তাহাদিগকে বেশ্যাবৃত্তি করিতে হয়—যৌন রোগেরও বৃদ্ধি হয়। তজ্জন্য উত্তরোত্তর অধিকসংখ্যক লোকদিগের বিশ্বাস হইতেছে যে, রুসিয়ার মত তুল্যাধিকারবাদী না হইলে, ধনীদিগকে সর্ব্বস্বান্ত না করিলে—সকল ধনোপায় রাষ্ট্রশক্তির কর্ত্তৃত্বাধীনে না আনিলে গরীবদিগের দুর্দ্দশা মোচন হইতে পারে না। তজ্জন্য ধনী ও ধনিক বিদ্বেষ সর্ব্বত্রই বাড়িতেছে—অন্তর্দ্রোহের সম্ভাবনা বাড়িতেছে।

তুল্যাধিকারবাদী রুসিয়া সাম্য স্থাপন করিতে গিয়া প্রথমেই ধনী বণিকদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়া তাহাদিগকে নির্ব্বংশ, নির্ব্বাসিত ও সর্ব্বস্বান্ত করিলেন—যেন ধনী ও বণিক-মাত্রেই নৃশংস নরপিশাচ। শুধু যে বড় বড় ধনী ও ধনিকদিগের উপর এইরূপ অত্যাচার করা হইল, তাহা নহে, যাহারা কায়শ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে না—সচরাচর যাহারা মধ্যবিত্ত ছিল, তাহাদিগের উপরও যথেষ্ট অত্যাচার করা হইল; তাহা-দিগেরও অধিকাংশকে নির্ব্বংশ, সর্ব্বস্বান্ত ও নির্ব্বাসিত করা হইল। যাহারা কায়শ্রমিক নয়—তাহারা যত বড় পণ্ডিত বুদ্ধিমানই হউক, তাহাদিগের ভোটাধিকার নাই, ফলতঃ যাহারা কার্ল মার্কসের অনুযায়ী রাষ্ট্রশক্তি-পরিচালকদিগের মত সঙ্ঘবাদী নয়, তাহাদিগকে সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, সকল বিরুদ্ধ মতবাদ প্রকাশের স্বাধীনতা লোপ করা হইয়াছে, এমন কি, যে ট্রট্স্কি রুসিয়ার ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া স্বীকৃত, তিনিও রুসিয়ার উন্নতিকল্পে কি করা বিধেয়, তদ্বিষয়ে ষ্টেলিনের সহিত মতদ্বৈধ হওয়ায় ও তাহার প্রচার করায় নির্ব্বাসিত হইয়া-ছেন। এই সঙ্ঘবাদীরা নিরীশ্বরবাদী, ধর্ম্ম ও পরকালে বিশ্বাস কুসংস্কার বলেন, সুতরাং সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিষয়াদি—গির্জ্জা সকল বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। আর প্রায় সকল ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা পরিচালিত করিতে চেষ্টিত। যাহারা স্বাধীনভাবে কোন ব্যবসা বা শিল্প চালায়, তাহারা সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত, সর্ব্বত্র অস্পৃশ্যদিগের মত ঘৃণিত, তাহাদিগের পুত্র-কন্যারা বিদ্যালাভের সুবিধা হইতে বঞ্চিত, তাহারা নানারূপে অত্যাচারিত। একে ত রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা সকল ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি সম্যক্ পরিচালন প্রায় সচরাচর অসম্ভব—কারণ, তাহা করিতে হইলে অত্যাচার, অন্যায়, চুরি ও ঘুষ নিবারণের জন্য নানাবিধ নিয়ম করা অত্যাবশ্যক, তজ্জন্য নানা কারণে সকল গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মেই বিলম্ব হয়; কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি সম্যক্ পরিচালন করিতে ক্ষিপ্রকারিতা অনেক সময়ে বিশেষ আবশ্যক, তাহা হইতে পায় না, তাহার উপর ঐ সকল কার্য্যদক্ষ লোককে ধনী—ধনিক ও মধ্যবিত্ত লোকরাই ঐ সকল কার্য্যদক্ষ লোক হয়,—তাহাদিগের নির্ব্বংশ বা নির্ব্বাসিত করায় ঐ সকল কার্য্য সম্যক্ পরিচালিত হইতে পারিতেছে না। ঐ সকল দক্ষ লোক বিদেশ হইতে আনয়ন করিতে হইতেছে, তাহাদিগকে অধিক হারে বেতন দিতে হইতেছে এবং ঐরূপ করিতে গিয়া পারিশ্রমিকের হারেরও তারতম্য ইতিমধ্যে করিতে হইয়াছে। যে সাম্য স্থাপন করিতে গিয়া এত নৃশংস অত্যাচার করিলেন, সেরূপ সাম্যও স্থাপন করিতে পারিলেন না ও তাহাতে ভবিষ্যতে অধিক ধনগত বৈষম্যের সূত্রপাত করাও হইল। আর ঐ সকল ধনোপায় রাষ্ট্রশক্তির কর্ত্তৃত্বাধীনে আনায় লোকদিগের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিশেষভাবে খর্ব্ব করা হইয়াছে—প্রায় সম্পূর্ণ লোপ হইয়াছে। লোকরা কি খাইবে, কোথায় বাস করিবে, কি কর্ম্ম করিবে, কি পারিশ্রমিক পাইবে, কি পড়িবে, কি দ্রব্যের বিনিময়ে কি ও কত দ্রব্য পাওয়া যাইবে, তাহাও লেলিন যেমন নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, এখনও প্রায় সেইরূপেই আছে। সাম্য স্থাপন করিতে গিয়া যখন সকল ধনী ও মধ্যবিত্তকে সর্ব্বস্বান্ত, নিহত বা নির্ব্বাসিত করিতে হইল, বিরুদ্ধমতাবলম্বীদিগের সকল স্বাধীনতা লোপ করা হইল—যাহারা স্বাধীনভাবে কোন ব্যবসা, শিল্প বা কৃষি করে, তাহাদিগকে সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইল, তাহাদিগের ভোটও নাই—স্বমতাবলম্বীদিগকে রাষ্ট্রশক্তির হুকুম অনুযায়ী সকল কার্য্য করিতে হইতেছে, স্বাধীনভাবে অতি অল্প কর্ম্মই করিতে পায়, তখন সাম্য ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যে পরস্পরবিরোধী, তাহা প্রমাণিত হয়, এই দুইটি একত্রে পাওয়া অসম্ভব। এত অত্যাচার করিয়াও রুসিয়ায় ধনগত সাম্য স্থাপন করিতে পারিলেন না, তাহা দেখিয়াছি।

রুশিয়ায় সাম্য স্বীকৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় কেবল পুরুষ ও নারীর ভিতরে। নারীরা পুরুষদিগের মত সকল কর্ম্মই করিতে পায়—আর স্বাধীনতা আছে উভয়েরই কাম উপভোগে, আর ইচ্ছা করিলেই বিবাহ-বিচ্ছেদ করিবার। ইহার ফল ১৩৪১ সালের মাঘ মাসের 'বসুমতী'তে কতক আলোচিত হইয়াছে। যখন উভয়েই যথেচ্ছা কাম উপভোগ করিতে পায়, তখন সন্তান হইলেই পিতৃ নির্দ্দেশ করা কঠিন এবং পিতাকে সন্তান পালনের ভার বহন করাইতে হইলে তাহার পিতৃত্বের প্রমাণ কঠিন হয়। অনেক তরুণ-তরুণী কিছুদিন স্বামি-স্ত্রীর মত থাকিয়া সরিয়া পড়ে—স্থায়ী দম্পতিপ্রেম থাকে না। আইন হইয়াছে পুরুষকে সন্তানপালনের জন্ম তাহার আয়ের ¼ দিতে হয়, কিন্তু যত সন্তান, যত স্ত্রী দ্বারাই উৎপন্ন হউক, তাহাকে কখনও তাহার আয়ের ⅓এর অধিক দিতে হয় না। অধিকাংশেরই আয় অতি অল্প, সুতরাং নারীদিগকে অধিকাংশ স্থলেই সন্তান-প্রতিপালনের ভার লইতে বাধ্য হইতে হয়, আবার নারীরা—যাহার আয় কিঞ্চিৎ অধিক আছে, সে মিথ্যা পিতৃ-নির্দ্দেশ করিয়া, আর্থিক সুবিধা করিবার চেষ্টাও পায়, এরূপ অনেক মোকর্দ্দমা হয়। নারীদিগকে সন্তান-পালনের ভার বহন করিতে হয়, গর্ভধারণও করিতে হয়, তাহার কষ্ট ও অক্ষমতা ভোগ করিতে হয়, সন্তানদিগকে স্তন্যপান করাইতেও হয়, রক্ষণাবেক্ষণও করিতে হয়, অর্থোপার্জ্জনও করিতে হয়—তাহার ফলে গৃহ বলিতে আর কিছু থাকে না। এত কাল গৃহই সকলের আরাম, শান্তি ও তৃপ্তির স্থান ছিল—পুরুষ ও নারীর সাম্য-স্বীকারে তাহারই প্রায় লোপ হইতেছে, সন্তানদিগকে অপরের তত্ত্বাবধারণে রাখিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়, অল্পবয়স হইতে বোর্ডিংএ পাঠাইতে হয়, সন্তানরা মাতারও ঐকান্তিক যত্ন-সাহায্য হইতে বঞ্চিত হয়, পিতার যত্ন, সাহায্য ও ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হয়। পিতামাতা উভয়েই সন্তানের সান্নিধ্য হইতে বঞ্চিত হয়। যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহাকে নিকটে না পাইলে ভালবাসারই বিকাশ হয় না, ক্রমে কমিয়া আসে। এই কারণে সন্তানদিগের পিতৃমাতৃভক্তি থাকে না, পিতামাতারও সন্তান-বাৎসল্যও ক্ষীণ হয়, দাম্পত্য-প্রেমও ক্ষণভঙ্গুর। ভালবাসার পূর্ণ বিকাশ হয়—মাতার স্নেহে, দাম্পত্য-প্রেমে, পিতৃমাতৃ-ভক্তিতে পিতার ভালবাসায়—এই সকল ভালবাসাই সঙ্কুচিত হয়—শ্রেষ্ঠ ত্যাগধর্ম্মী ভালবাসা, যাহা মনুষ্য জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপভোগ্য, যাহাতে তৃপ্তি, সে ভালবাসাই অতীব অল্প লোকেই পাইতে পারে, অধিকাংশই বঞ্চিত হয়। ইহা অপেক্ষা অধিক দুর্ভাগ্য মানুষের, বিশেষতঃ ভালবাসাপ্রবণ নারী-দিগের কি হইতে পারে? শৈশবে পিতৃমাতৃ স্নেহ অল্পই পায়, যৌবনে ক্ষণভঙ্গুর দাম্পত্য-প্রেম পায়, বার্দ্ধক্যে অপত্যদিগের পিতৃমাতৃভক্তি, যত্ন ও সেবা হইতে বঞ্চিত।

নারীদিগকে এইরূপ সন্তান-প্রতিপালনের ভার বহিতে হওয়ায় ও সন্তানদিগের কোন যত্ন সেবা সাহায্য পাওয়ার আশা না থাকায় অধিকাংশ নারীকে ভ্রূণ-হত্যা করিতে হয়। একা মস্কো সহরে তজ্জন্ত ১৫টি হাঁসপাতাল আছে, সেখানে সরকারী ডাক্তাররা তৎকার্য্যে সহায়তা করে, যত জীবিত সন্তান জন্মে, তদপেক্ষা অধিক ভ্রূণ-হত্যা হয়। ইহাই পুরুষ ও নারীর সাম্য-স্বীকারের অবশ্যম্ভাবী ফল। এই সাম্য পাইবার জন্য, জীবন স্থায়ী শ্রেষ্ঠ ভালবাসা-বর্জ্জিত—ব্যক্তিগত স্বাধীনতাও বর্জ্জিত। আমরা ত জানি "সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্" সকল পরবশ্যতাই দুঃখ। রাষ্ট্র-শক্তির হস্তে সকল স্বাধীনতা তুলিয়া দিলে—যাহা না দিলে কি তুল্যাধিকারবাদী, কি সমাজতন্ত্রবাদী সকলেই বলিতেছেন যে, গরীবদিগের ও নারীদিগের দুর্গতি মোচন হইতে পারে না—সকলকে সেই পরবশ্যতার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হয়—তাহা অনিবার্য্য।

মানুষে মানুষে যেখানে কোন বিষয়েই সাম্য নাই—পুরুষ ও স্ত্রীর শরীর-গঠনে ও শরীরের অঙ্গের ক্রিয়ারও অনেক পার্থক্য আছে, সেখানে সাম্যস্থাপন চেষ্টায় এইরূপ নানা বিষময় ফল অনিবার্য্য, তাহা পাশ্চাত্যরা এখনও স্পষ্ট দেখিতেছেন না। আমরা সেই ভুল সাম্যবাদের শ্রেষ্ঠত্বের ডঙ্কা ধ্বনিতে প্রতারিত হইতেছি। এই সাম্যস্থাপন প্রয়াসে প্রকৃষ্ট ভালবাসা হইতে অধিকাংশ লোককে বঞ্চিত করা হইল—লোকদিগের সকল স্বাধীনতা লোপ করা হইল—বিরুদ্ধমতাবলম্বী সকলের উপর অশেষ অত্যাচার করা হইল—কায়শ্রমিক সঙ্ঘবাদী ভিন্ন সকল লোককে সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইল; তথাপি সেই কায়শ্রমিক সঙ্ঘবাদীরাই বা পাইয়াছেন কি? সামান্য গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র কিছু লেখাপড়া শিখিতে পাওয়া হাঁসপাতালে চিকিৎসা পাওয়া—যাহা সকল কয়েদী অধিক জেলখানায় পায় তাহার উর্দ্ধে বড় বেশী কিছু নয়। আর পাইয়াছেন নব্যতন্ত্রীদের সকল দুঃখহরা ভোট মাত্র। ইহা পাইবার জন্ম এক দল নব্যতন্ত্রীরা তরুণ-তরুণীদিগকে প্রোৎসাহিত করিতে-ছেন—পুরুষ ও নারীর সাম্য স্থাপনের জন্ম অস্থির হইয়াছেন আর তজ্জন্য তরুণীদিগকে পাশ্চাত্য নারীদিগের অপেক্ষা অশেষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করাইতে উদ্যত হইয়াছেন। কারণ, এখানে সেরূপ হাঁসপাতালও নাই—পেটের দায় হইতে মুক্তি পাওয়ার উপায়ও নাই। যৌবন কাটিয়া গেলে দুর্গতির সীমা থাকিবে না—একাই দাসীগিরি ও বেশ্যাবৃত্তি করিয়া জারজ সন্তান পালন করিতে হইবে—অন্য উপায় নাই বলিলেই হয়। নারীদিগের দুর্গতি-মোচনের কোন ক্ষমতা নাই—নিকট-ভবিষ্যতে তাহা পাইবার কোন সম্ভাবনাও নাই।

নব্যতন্ত্রীরা প্রায় সকলেই পাশ্চাত্যদিগের ন্যায় সমাজতন্ত্রবাদী বা তুল্যাধিকারবাদী হইয়াছেন। পাশ্চাত্যে ঐ সকল মতবাদ অনুযায়ী যেরূপ আইন-কানুন হইতেছে, তাঁহারাও এখানে সেইরূপ করিতে চাহিতেছেন—সুতরাং রাষ্ট্রশক্তির হস্তে সকল ক্ষমতা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তুলিয়া দিতে প্রস্তুত—তাহা স্বীকার করিতেছেন; সুতরাং সেই পুরাণ স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃভাব মতবাদ অচল, তাহা স্বীকার করিতেছেন। তথাপি তাঁহারা সেই পরিত্যক্ত স্বাধী-নতা, সাম্য ও ভ্রাতৃভাবের বুলি আওড়াইয়া আমাদিগের জাতিভেদ প্রথা ও জাতিগত ব্যবসা প্রথা ব্রাহ্মণদিগের নিম্ন জাতিদের প্রতি অত্যাচার বলেন। ব্যবসা, বাণিজ্য শিল্প, কৃষিই ধনোপার্জ্জনের প্রকৃষ্ট উপায়—তাহাই যখন ব্রাহ্মণরা বৈশ্য-শূদ্রের জন্ম, নিম্নজাতি-দিগের জন্ম নির্দ্দিষ্ট করিলেন। নিজেদের প্রকৃত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নিজেদের জীবিকা পরের শ্রদ্ধার দান স্থির করিলেন, তখন তজ্জন্ম তাঁহাদিগকে অত্যাচারী বলা কত সঙ্গত, তাহা একবার ভাবিলেন না। এরূপ নিজেদের জীবিকা নির্দ্দেশ যে গ্যারিবল্ডি বা ওয়াসিংটনের ত্যাগস্বীকার অপেক্ষাও মহত্তর (কারণ ইহা বংশানুক্রমিক দৈন্যবরণ), তাহা বুঝিবারও শক্তি নাই।

আমরা পাশ্চাত্যদিগের পোষাপাখী মাত্র হইয়াছি, সেই জন্ম যখন প্রথমে স্বাধীনতা সাম্য ও ভ্রাতৃভাব বুলি বলাইতে শিখাইল; আমরা সেই বুলি বলিতে শিখিলাম। আমাদিগের বুদ্ধিতে যাহা কিছু হিন্দু সমাজে তাহার বিরোধী বোধ হইল, তাহা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিরোধী বলিয়া দোষাবহ বলিলাম, তাহা না মানিয়া তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া সংস্কারক সাজিলাম, আবার যখন তাহারা সমাজতন্ত্রবাদী বা সঙ্ঘবাদী হইল, সকল ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রাষ্ট্রশক্তির হস্তে তুলিয়া দেওয়া বিধেয় বলিল, আমরা এখন তাহাই বলিতেছি। কংগ্রেসে এক বড় দল সমাজতন্ত্রবাদী হইয়াছে, অনেকে সঙ্ঘবাদীও হইয়াছে; সুতরাং তাহারা রাষ্ট্রশক্তির হস্তে (তাহা যে ইংরাজ-কবলে, সে কথা স্মরণ থাকে না) সকল ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি তুলিয়া দিতেও প্রস্তুত, তাহা স্বীকার করিতেছেন। অথচ এখনও সেই পরিত্যক্ত 'স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃভাব' বুলির দোহাই দিয়া এ দেশের জাতিভেদ ও জাতিগত ব্যবসা-প্রথা—নারী ও পুরুষের ভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্র ও অধিকার—পিতৃমাতৃ-আজ্ঞা নির্ব্বিচারে পালন বিধি ও নানা বিধিনিষেধ করিবার হিন্দু সমাজের অধিকার অস্বীকার করিতেছি। এরূপ করার যে বলা হইতেছে যে, অন্য সকল সমাজের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব্ব করিবার অধিকার আছে—যে যত অধিক অত্যাচারই হউক না কেন—কিন্তু সামান্যভাবেও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব্ব করিবার অধিকার নাই কেবল হিন্দু সমাজের—তাহা দেখি না; এবং সেই অধিকার হিন্দু সমাজের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া রাষ্ট্রশক্তির—যাহা ইংরাজ-কবলে—হস্তে তুলিয়া দিতেছেন—সেই জন্য সর্দ্দা আইন পাশ হইয়াছে—মন্দিরে প্রবেশাধিকার ও ঐরূপ অন্যান্য বিলও হইতেছে।

হিন্দু সমাজ জাতিভেদ প্রথার দ্বারা প্রত্যেক জাতির জন্য সমাজের আবশ্যক একটিমাত্র কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছিল—অন্য কোনরূপ কর্ম্ম করিতে দেওয়া হইত না। এরূপ হইয়াছিল বলিয়া অল্পসংখ্যক ধনোপার্জ্জনকুশল ব্যক্তি সকল ধনোপার্জ্জনের প্রকৃষ্ট উপায়গুলি গ্রাস করিতে পায় নাই (যাহা পাশ্চাত্যে করিয়াছে) এবং একই জাতিভুক্তদিগের ভিতর বিবাহ নিবদ্ধ থাকায় সেই ব্যবসায় বা শিল্পে কুশল ব্যক্তির ধন সেই জাতিভুক্তদিগের ভিতরই বিতরিত হইত। ইহার উদ্দেশ্য ও ফল পরে আলোচিত হইবে। মান্দ্রাজের কোন কোন স্থানে অতি অসভ্য অপরিষ্কার আদিম বা নিম্নজাতিদিগকে কোন কোন রাস্তায় যাইতে দেয় না—কোন কোন কূপ হইতে জল উত্তোলন করিতে দেয় না—অন্য জাতিদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেয় না। এই জন্য ব্রাহ্মণদিগকে ঘোর অত্যাচারী বলিয়া নব্যতন্ত্রী শিক্ষিত সম্প্রদায় চীৎকার করিয়া গলা ফাটাইয়া ফেলিলেন—কেহ বা এই জাতিভেদ প্রথাকে আমাদিগের জাতীয় রাজনৈতিক পরাধীনতার মূল কারণও বলেন। মহাত্মা গান্ধী ভূমিকম্প, ঝড় ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্ঘটনাকে—তাহা ভারতের যে প্রদেশে হউক না কেন—ঐরূপ নিম্নজাতিদিগের প্রতি অত্যাচাররূপ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তও বলেন। মান্দ্রাজের এই নিম্নজাতিদিগের প্রতি অত্যাচারের সহিত তুল্যাধিকারবাদী রুশিয়ার ভিন্নমতাবলম্বীদিগের উপর—ধনী ও মধ্যবিত্তদিগের উপর—যাহারা কারশ্রমিক নয়—যাহারা নিজের লাভের জন্য কোন ব্যবসা-শিল্প বা কৃষি করে, তাঁহাদিগের উপর—তাহারা ব্যক্তিগত ভাবে যত উন্নত হউক না কেন—যত পরোপকারী হউক না কেন; তাহাদিগের উপর অত্যাচারের তুলনা করিতে বলি। সম্প্রতি জার্ম্মাণীতে ইহুদীদিগের উপর—যাহারা বিগত যুদ্ধে জার্ম্মাণদিগের সহিত যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল—সকল কষ্ট সহিয়াছিল—অত্যাচারের তুলনা করিতে বলি। এই সকল নিম্নজাতিভুক্ত লোক সভ্যতার নিম্নতম স্তরের, অতিশয় অপরিষ্কার—তাহাদিগের আচার, আহার-ব্যবহারে আর্য্যদিগের সহিত বহু পার্থক্য—ভিন্ন জাতিভুক্ত (race)। আর্য্য ব্রাহ্মণরা উদার উন্নত সাম্যবাদী পাশ্চাত্যদিগের মত তাহাদিগকে নির্ব্বংশ করিয়া—স্বর্গবাসী করিয়া উন্নত করে নাই। কি আমেরিকায়, কি অষ্ট্রেলিয়ায়, কি আফ্রিকায় যেখানে স্বাধীনতা সাম্য ও ভ্রাতৃভাবধ্বজী—উদার পাশ্চাত্যরা নিম্ন ও ভিন্ন সভ্যতার লোকদিগের সহিত একত্রে বাস করে—যেখানে ধর্ম্ম-বিশ্বাস ভিন্ন (রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট) সেখানে স্বজাতি হইলেও কি ভয়ানক অত্যাচার হইয়াছে, তাহা একবার ইতিহাস খুলিয়া দেখিতে বলি ও তাহার সহিত হিন্দুদিগের এই সকল নিম্নজাতির প্রতি ব্যবহারের তুলনা করিতে বলি। ব্রাহ্মণদিগের এই অত্যাচার বড় জোর আংশিক পৃথক্‌করণ (partial segregation) মাত্র। স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃভাবধ্বজী আমেরিকানরা এখনও নিগ্রোদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করে—রেড ইণ্ডিয়ানদিগের প্রতি কিরূপ অত্যাচার করিত জন্তু শিকারের মত সখ করিয়া হত্যা করিয়া গৌরব করিত—তাহা দেখিতে বলি। তাহারা নির্ব্বংশ হয় দেখিয়া, তাহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য দয়াপরবশ হইয়া, তাহাদিগের বসবাসের জন্য পৃথক্ প্রদেশ নির্দ্দিষ্ট করিতে বাধ্য হইলেন অর্থাৎ সম্পূর্ণ পৃথক্‌করণ করা হইল (segregate); তাহাই উহাদিগকে বাঁচাইবার একমাত্র উপায় বলিয়া বুঝিলেন—অন্য কোন উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না। হিন্দুরা তাহার পরিবর্তে এই সকল নিম্ন জাতির জীবিকার জন্য সমাজের একটি আবশ্যক কার্য্য—যাহা তাহাদিগের সাধ্য, নির্দ্দিষ্ট করিলেন। সেই কর্ম্মে উচ্চ জাতিদিগের প্রতিযোগিতা বন্ধ করা হইল—গ্রামের ভিন্ন অংশে তাহাদিগকে বসবাস করিতে দেওয়া হইল—তদ্দ্বারা সংঘর্ষ নিবারিত হইল। হিন্দুরা চিরকালই বিভিন্ন জাতিদিগের জন্য (caste) পৃথক্ বসবাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছে—সকল গ্রামেই ব্রাহ্মণপাড়া, গোয়ালাপাড়া, বৈদ্যপাড়া, ডোমপাড়া আছে—তাহাই এ দেশের সাধারণ নিয়ম, এমনও আছে বলা যাইতে পারে। বিভিন্ন আচার, আহার-ব্যবহার পূজাপদ্ধতির দ্বারা লোকরা যত অধিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসে, ততই বিরোধ ও সংঘর্ষ অধিক হয়—তাহা নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যই এইরূপ আংশিক পৃথক্‌করণ—পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মক্ষেত্র ও বসবাসস্থান নির্দ্দেশ হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা নানা বিভিন্ন জাতীয় বিভিন্ন প্রকার আহার আচার ব্যবহারী লোকদিগের ভিতর সংঘর্ষ ও বিরোধ নিবারিত হইয়াছে। এখনও মুসলমান-পাড়ায় বাস করিতে গেলে আমাদিগের কিরূপ দুর্গতি হয়, তাহা দেখিতে বলি। এখন বিভিন্ন প্রদেশবাসী হিন্দুদিগের ভিতর একই প্রকার কর্ম্মে, বিশেষতঃ রাজকর্ম্মে—অবাধ প্রতিযোগিতা থাকায় উত্তরোত্তর প্রাদেশিক বিদ্বেষ বাড়িতেছে।

সম্পূর্ণ পৃথক্‌করণ অপেক্ষা ঐরূপ আংশিক পৃথক্‌করণ নিম্ন জাতিদিগের পক্ষে অধিক মঙ্গলজনক। তাহারা উন্নত জাতির সহিত নানা সম্পর্কে আসে, তাহাতে নানা বিষয় দেখিয়া শিখিবার

আত্মোন্নতি করিবার সুবিধা পায়। যে সম্পূর্ণ পৃথক্করণ, দয়াপরবশ আমেরিকানরা এই সকল নিম্ন জাতিকে বাঁচাইবার একমাত্র উপায় বলিয়া বুঝিলেন, এই "ভীষণ অত্যাচারী" ব্রাহ্মণরা তদপেক্ষা মঙ্গলজনক উপায়—এই জাতিভেদ ও জাতিগত ব্যবসা প্রথার উদ্ভাবন করিয়াছিলেন ও তদ্দ্বারা তাহাদিগকে হিন্দু সভ্যতা ও সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই তাহারা এত সহস্র বৎসর স্ত্রীপুত্র-কন্যা লইয়া স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া আছে—শরীরের যে স্বাস্থ্য আছে, তাহাদিগের জীবনে যে আনন্দ আছে, তাহা হয় ত অনেকেরই লোভনীয়—পাশ্চাত্য দেশের স্বজাতীয় গরীবরাও সে স্বচ্ছন্দতা উপভোগ করে না—তাহাদিগকে নির্ব্বংশ করিয়া উন্নত করেন।

সকলের সকল কর্ম্ম করিবার সমান অধিকার থাকিলে—অবাধ-প্রতিযোগিতা থাকিলে ধনোপার্জ্জনে ও ধনরক্ষণে অকুশল ব্যক্তিদিগের—তাহারা যত বুদ্ধিমান্ই হউক, যত পণ্ডিতই হউক না কেন, ভীষণ দুর্গতি হয়, তাহারা ক্রমে নির্ব্বংশ হয়; তখন ভারতে নব্যতন্ত্রীদিগের অভীপ্সিত সকল কর্ম্মে অবাধ-প্রতিযোগিতা থাকিলে এই সকল সভ্যতার নিম্নতমস্তরের জাতিরা—যাহাদিগের বুদ্ধি ও কর্ম্মক্ষমতা অতি অল্প—তাহারা যে ঐ সকল উচ্চজাতির সহিত প্রতিযোগিতায় বাঁচিতে পারে না, তাহা তাঁহারা ভুল সাম্যবাদের মোহে দেখেন না। এইরূপ অবাধ-প্রতিযোগিতায় আসিলে তাহাদিগের অসভ্যতাসুলভ ব্যবহারে অন্য জাতিদিগের সহিত বিরোধ ও সংঘর্ষ অনিবার্য্য হয় এবং তাহাতেও প্রতিযোগিতায় অপারগ হওয়ায় তাহাদিগের ধ্বংসসাধন হয়। এইরূপ আংশিক পৃথক্করণ তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবার শ্রেষ্ঠ উপায় এবং তাহাকেই আমরা ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচার বলিতেছি। অস্পৃশ্যতাও অনেক সময়ে তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে—তাহা না থাকিলে তাহাদিগের নারীরা পেটের দায়ে অন্য জাতিভুক্তদিগের কাম চরিতার্থ করিতে বাধ্য হইত—যৌনরোগ বহু বিস্তার লাভ করিত—সিমলা দার্জ্জিলিঙ শিলঙে পাহাড়ী জাতিদিগের এখন এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। সচরাচর অস্পৃশ্যতা আমি সমর্থন করিতেছি না। কিন্তু যাহারা সচরাচর অতিশয় অপরিষ্কার, তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে কেহ চাহে না—স্পর্শ করাও বাঞ্ছনীয় নয়—তাহাতে অনেক ব্যাধির প্রসার হয়। যাহারা সচরাচর অতিশয় অপরিষ্কার—পরিষ্কার থাকাও যাহাদিগের পক্ষে সচরাচর সম্ভব নয়, তাহাদিগকে অস্পৃশ্য বলা একটা সাধারণ নিয়ম মাত্র (General rule)—সকল বিষয়েই ঐরূপ সাধারণ নিয়ম সর্ব্বত্রই করিতে হয়—ব্যক্তিগতভাবে তাহাতে অন্যায়ও করিতে হয়, তাহা স্বীকার্য্য। বিভিন্ন প্রকার আচার আহার-ব্যবহারী বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী লোক একত্রে বাস করিলেই যাহারা নিজেদের উন্নত মনে করে, তাহাদিগের ক্ষমতা থাকিলেই অনুন্নত শক্তিহীন জাতিদিগের প্রতি অবজ্ঞা-ভাব ও কতকটা অত্যাচার অনিবার্য্য। যত দিন পৃথিবী স্বর্গে পরিণত না হয়, তত দিন কোথাও তাহা নিবারিত হয় নাই—হইতেও পারে না। হিন্দুভারতে এই অত্যাচার যত অল্প হইয়াছে, কোন দেশে কোন কালে অত অল্প অত্যাচার হয় নাই।

জাতিভেদ প্রথার দ্বারা 'ভীষণ অত্যাচারী ব্রাহ্মণরা' এইরূপ আংশিক পৃথক্করণ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই এই সকল বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রকার আহার আচারব্যবহারী, বিভিন্ন প্রকার পূজাপদ্ধতির লোকদিগের ভিতর সংঘর্ষ, বিরোধ, বিদ্বেষ, পরস্পর ধ্বংসকারী যুদ্ধ নিবারিত হইয়াছিল—এই সকল অসভ্য জাতি এখনও বাঁচিয়া আছে—তাহাদিগকে হিন্দুসভ্যতা ও সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হইয়াছে। রামায়ণাদি গ্রন্থে আর্য্য ও অনার্য্য জাতিদিগের ভিতর যে সর্ব্বদা সংঘর্ষ ও যুদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই জাতিভেদপ্রথার দ্বারাই নিবারিত হইয়াছিল—হিন্দুরা সভ্যতার উচ্চতম শিখরে উঠিতে পারিয়াছিলেন এবং বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া সভ্যতার শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন—ভারতীয় সভ্যতার যে অতুলনীয় সঞ্জীবনী শক্তি আছে, তাহা সঞ্চারিত হইয়াছিল। ভারতের সভ্যতা অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী চিত্রকরের উজ্জ্বল স্থায়ী বহু বর্ণে রঞ্জিত অতুলনীয় চিত্র—তাহার তুলনায় অন্য সকল সভ্যতা অল্পদিনস্থায়ী এক রঙ্গের চিত্র। চিত্রবিদ্যাশিক্ষার্থীরা এখন এক এক তুলি ও এক এক বিলাতী রঙ্গের টেবলেট লইয়া সেই চিত্রসংস্কারকার্য্যে লাগিয়া গিয়াছেন, নব্যতন্ত্রী নেতারা তাহা দেখিয়া বাহবা দিতেছেন, আর অন্তরীক্ষে অসুর পরাজিত ভারতশুভানুধ্যায়ী দেবতাদিগের নয়নে শোণিতাশ্রু ঝরিতেছে!

দুঃসময়ে আত্মীয়রাও পর হইয়া যায়—সকল বিষয়ে তাহার দোষ দেখে—গুণ কেহ দেখে না। হিন্দুদিগের এখন অত্যন্ত দুঃসময়—সেই জন্যই আমরা আমাদিগের দোষ দেখিতে সহস্রলোচন—তিল-প্রমাণ দোষকে তাল কেন, পর্ব্বতপ্রমাণ দোষ বলিয়া প্রচারিত হইতেছে—গুণ দেখিতে অন্ধ—গুণের কথা শুনিতেও বধির। সেই জন্যই এখন এত হিন্দুদ্রোহী হিন্দু,—হিন্দু নেতাও হইয়াছে—এত কালাপাহাড়ী সংস্কারকের দল বাহির হইয়াছে—আমাদিগের গুণও দোষ বলিয়া প্রচারিত হইতেছে—হিন্দুর সকল প্রতিষ্ঠানের নিন্দা করাই এ দেশের অদ্ভুত স্বদেশভক্তির নিদর্শন হইয়াছে। এই জাতিভেদ-প্রথাই সভ্যতার নিম্নস্তরের নানা জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিবার শ্রেষ্ঠ উপায়—তাহাকেই আমরা ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচার বলিতে সকলকে শিখাইতেছি—তজ্জন্য সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণ ও উচ্চ জাতি-বিদ্বেষ উদ্দীপিত হইতেছে—অন্তর্দ্রোহ সৃষ্ট হইতেছে এবং তৎসঙ্গে হিন্দুর শাস্ত্র—যাহাতে আমাদিগের সুদীর্ঘ জাতীয় জীবনের অভিজ্ঞতা সন্নিবিষ্ট আছে—তাহার প্রতি বিদ্বেষ এত প্রবল হইয়াছে যে, নব্যতন্ত্রীরা শাস্ত্রের নাম শুনিলেই ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠেন। এইরূপ আমাদিগের বহু সহস্র বৎসরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা বর্জ্জন-ফলে—পৈতৃক বিষয় উড়াইয়া দিলে যেরূপ পরের গোলামী করিতে হয়—সকল বিষয়েই পরের দ্বারস্থ হইতে হয়—আমরা এখন সকল বিষয়েই পাশ্চাত্যের দ্বারস্থ হইতেছি—পাশ্চাত্যের সখের গোলাম হইয়া গৌরবান্বিত হইতেছি।

ইতিহাস খুলিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব যে, একা হিন্দুরা ভিন্ন কোন জাতি কোন কালে কোন দেশে সভ্যতার বিভিন্ন স্তরের—নানা ভাষাভাষী নানা প্রকার আহার আচারব্যবহারী, বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মবিশ্বাসী—বিভিন্ন জাতি (race)ভুক্ত লোকদিগকে এক সভ্যতার ও সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারে নাই—হয় একটি প্রবল জাতি অন্য জাতিকে নির্ব্বংশ করিয়াছে—না হয়, তাহারা মিলিয়া মিশিয়া এক মিশ্রজাতি হইয়াছে। (মুসলমানরা অনেক বিভিন্ন জাতিভুক্তদিগকে তাহাদিগের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে বটে, কিন্তু

তাহাও তাহাদিগের বৈশিষ্ট্য লোপ করিয়া)। সেখানে এরূপ মিশ্র-জাতি হইয়াছে, সেখানে তাহারা প্রায় সভ্যতার এক স্তরের—অধিকাংশই এক জাতিভুক্ত (race)। ভারতে এত বিভিন্ন জাতি, এত বিভিন্ন ভাষা আছে, সভ্যতার স্তরগত এত বিভিন্নতা আছে—আহার আচারব্যবহারে এত বিভিন্নতা আছে যে, ভারতে এক মিশ্রজাতি হওয়া অসম্ভব। ভারতে যদি তাহা সম্ভব হয়, তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবীতে তাহা হওয়া সম্ভব। কারণ, পৃথিবীর প্রায় সকল বিভিন্ন জাতির সমাবেশ এই ভারতেই আছে—পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই বিভিন্ন প্রকার জল, হাওয়া (climate) সমাবেশও এখানে আছে। নব্যতন্ত্রী শিক্ষিত সম্প্রদায় যেরূপ একীভূত ভারতের স্বপ্ন দেখেন, তাহা বাস্তবে পরিণত হওয়ার বহু পূর্ব্বে য়ুরোপ একীভূত হইয়া যাইতে পারে। ভারতে জাতিগত, ভাষাগত সভ্যতার স্তরগত, ধর্ম্ম ও পূজাপদ্ধতিগত আহার আচার ব্যবহারগত, যত অধিক পার্থক্য আছে—য়ুরোপে তাহার স্বল্পাংশও নাই। সেখানে ত বহু শতাব্দী ধরিয়া আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ আছে—অস্পৃশ্যতাও নাই—একত্র আহার করিবার কোন বাধাও নাই—তবে কেন জেনিভার আন্তর্জ্জাতিক শান্তি-সভায় য়ুরোপ যে পরস্পর-ধ্বংসী সমরানল প্রজ্বলিত হইবার আশু সম্ভাবনা হইয়াছে, তাহা নির্ব্বাপিত করিবার কোন উপায়ই দেখিতে পাইতেছেন না? নব্যতন্ত্রী শিক্ষিত সম্প্রদায় যে সকল সাবালক-সাবালিকাকে ভোট দিয়া, ভারতে গণতন্ত্র স্থাপন করিয়া, ভারতের একতা ও উন্নতি করিবার চেষ্টা করিতেছেন, য়ুরোপীয় কোন পণ্ডিত—কোন অভিজ্ঞ রাজনৈতিক সেইরূপ গণতন্ত্র য়ুরোপে স্থাপন করিবার কথাও কেহ তুলিল না কেন? য়ুরোপে তাহা হওয়া যত সহজ, ভারতে তদপেক্ষা ঐরূপ করা বহু কঠিন। এক প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর বহু পার্থক্যের জন্য—জল-হাওয়ার পার্থক্যের জন্য—যদি ভারতে কেবল এক জাতিরই বাস হইত, তথাপি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের এই জাতি-ভুক্ত লোকদেরই ভিতর আহারে, আচারে-ব্যবহারে, জীবন-যাপন-প্রণালীতে, ধর্ম্ম-বিশ্বাসে ও অল্পদিনেই বহু পার্থক্য উপস্থিত হইত, সেই জন্য একীভূত হওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়—তাহার উপর জাতিগত, ভাষাগত, সভ্যতার স্তরগত, এত অধিক পার্থক্য রহিয়াছে যে, যাহারা কোদাল-কুড়ুল সাহায্যে হিমালয়াদি পর্ব্বতমালা কাটিয়া সমগ্র ভারতকে এক সমতল-ক্ষেত্রে পরিণত করিবার আশা পোষণ করিতে পারে—হিমালয়ের বরফ কাটিয়া মাদ্রাজে ও রাজপুতানায় বিছাইয়া দিয়া সর্ব্বত্র শীত-গ্রীষ্ম সমান করাইয়া দিবার আশা করিতে পারে, তাহারাই কেবল অসবর্ণ বা আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ-প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া, সকলকে সকল মন্দিরে প্রবেশাধিকার দিয়া, সকলকে প্রাথমিক শিক্ষা দিয়া, সকলকে ভোট দিয়া এক গণতন্ত্র স্থাপন করিয়া ভারতের একতা ও উন্নতি করিবার আশা পোষণ করিতে পারে। জাতিগত, ভাষাগত, ধর্ম্ম-বিশ্বাসগত ভারতের তুলনায় অতি সামান্য পার্থক্য থাকায় য়ুরোপীয় রাজনৈতিকগণ য়ুরোপে এইরূপ গণতন্ত্র স্থাপন করা এত অসম্ভব—এরূপ করিবার প্রস্তাবই হাস্যাস্পদ, মনে করেন যে, কেহ সে কথা তুলিল না।* আমাদিগের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাহীন পুঁথিগতবিদ্যা, 'স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃভাব' বুলির জয়ডঙ্কা শ্রবণে প্রতারিত, বিভিন্ন পাশ্চাত্য দেশে—যেখানে কেবল এক ধাঁচের (homogenous) লোকের বাস,—আবদ্ধ চক্ষু-কর্ণ, দেশের অবস্থার দিকে দৃষ্টিহীন, দেশের অভিজ্ঞতার কথা শুনিতে কর্ণহীন, নব্যতন্ত্রী শিক্ষিত সম্প্রদায়ই কেবল ঐরূপ গণতন্ত্র স্থাপন করিয়া দেশের সুশাসন ও উন্নতি করিবার আশা পোষণ করিতেছেন ও সেইরূপ করিতে গিয়া দেশের দুর্গতি বৃদ্ধি করিতেছেন—বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতির ভিতর নির্ব্বাপিত বিরোধ পুনঃ প্রজ্বলিত করিয়া দেশের একতা ও উন্নতি করিতেছেন।

জাতিভেদ-প্রথা তুলিয়া দেওয়ায়—সকল জাতির ভিতর বিবাহপ্রচলন করায় যে ভারতে কোন প্রকার উন্নতির আশা নাই, তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ এই ভারতেই রহিয়াছে। মুসলমানরা বহু শতাব্দী ধরিয়া দেশের রাজা ছিল, সুতরাং তাহাদের ধনী হইবার সুবিধা ছিল, বহু ধনীও ছিল। তাহাদিগের ভিতর জাতিভেদ-প্রথা নাই—অসবর্ণ ও আন্তর্জ্জাতিক বিবাহও আছে, তাহারা সকলে একত্র আহারও করিয়া থাকে, তাহাদিগের ভিতর বহু জাতিসঙ্করও আছে, নারীরা পৈতৃক বিষয়ের অংশও পায়, বিধবা-বিবাহও আছে, তবে এই বিগত ১৫০।১৬০ বৎসরের ভিতর তাহারা কি অর্থে, কি বিদ্যায়, কি বুদ্ধিতে, কি ব্যবসায়, কি শিল্পে, সকল বিষয়ে এই জাতিভেদ স্বীকারী হিন্দুদিগের সহিত অবাধপ্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিতেছে না কেন? সকল ক্ষেত্রেই তাহাদিগের জন্য বিশেষ সুবিধা চাহিতেছে কেন? ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সেনসাস রিপোর্টে (Vol v Part I. P. 586) লেখা আছে যে, সমগ্র বাঙ্গালায় যত মুসলমান ইন্‌কাম্ টেক্স দিয়াছে, তাহার মোট সংখ্যা মাত্র ৩১২৮—আর একা কায়স্থদিগের ভিতর, যাহাদের মোট সংখ্যা ১১ বা ১২ লক্ষ মাত্র, ৩০৪১ জন ঐ টেক্স দিয়াছে। জাতিভেদ-প্রথা তুলিয়া দেওয়ায় আমাদিগের আর্থিক বা অন্য কোনরূপ উন্নতির আশা নাই, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, তাহাতে দুর্গতির বৃদ্ধি হইবে বুঝা যাইতেছে। দেশের অবস্থার দিকে দৃষ্টিহীন বলিয়াই নব্যতন্ত্রীরা তাহা দেখেন না, জাতিভেদ-প্রথা ভাঙ্গিয়া সংস্কারক সাজেন।

এ দেশে এককালে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রভাবে জাতিভেদ-প্রথা প্রায় উঠিয়া গিয়াছিল। উহা যদি নিম্নজাতিদিগের প্রতি অত্যাচারই হইত, তাহা হইলে তাহারা বৌদ্ধ না হইয়া বা না থাকিয়া হিন্দু থাকিল বা হইল কেন? এই জাতিভেদ-প্রথার অত্যাচার বরণ করিয়া লইল কেন? এখনও নিম্নতম জাতিরা তাহাদিগের জাতীয় বৃত্তিতেই জীবিকা অর্জ্জন করে, অন্য জাতির বৃত্তি অবলম্বন করে না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার ধাঙ্গড়রা ধর্ম্মঘট করে, বেতন বৃদ্ধি করিতে চায়, তাহাদিগের প্রতি যে অন্যায়াচরণ হইত, তাহার নিবৃত্তি চাহে। ইহার নিমিত্ত অনেক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। তখন মেথর-মুদ্দফরাসরা কেহই অর্থের প্রলোভনেও ধাঙ্গড়দিগের কর্ম্ম করিতে চাহে নাই। তাহাদিগের বহু কালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতায় একটা

* বিভিন্ন আচার-ব্যবহারী, বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকদিগকে এক গণতন্ত্রাধীন করিলে, যাহাদিগের সংখ্যাধিক্য আছে, তাহারা সকল ক্ষমতাই গ্রাস করিতে পারে, অথচ যাহারা সংখ্যায় অল্প, তাহাদিগকে সংখ্যার অধিক রাজনৈতিক সভার প্রতিনিধি দিতে হয়, তাহাদিগের কতক বিশেষ অধিকার দিতে হয়—যেখানে বহু অধিকসংখ্যক বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে, সেখানে কতক সংখ্যালঘু জাতিদিগের জন্য ঐরূপ বিশেষ অধিকার দিতে হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিদিগের প্রতিনিধিসংখ্যা অত্যন্ত অল্প হইয়া যায়—গণতন্ত্র মূল সূত্র সংখ্যাধিক্যের মতে রাজ্য-শাসনই থাকে না।

অস্পষ্ট ধারণা আছে যে, অপর জাতির বৃত্তিতে হস্তক্ষেপ করিলে তাহারা তাহাদিগের বৃত্তি অবলম্বন করিবে, তাহাদিগের দুর্দশা হইবে, সেই জন্যই ধাঙ্গড়দিগের কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইল না। দুই চারি দিনেই কলিকাতায় আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত হইল। লাট সাহেব সিমলা হইতে প্রত্যহই তার করিয়া মিটমাট করিতে বলেন, মিউনিসিপালিটীও তাহাদিগের প্রায় সকল দাবীই মঞ্জুর করিতে বাধ্য হয়। যে সকল ধাঙ্গড় আদালতে কারাদণ্ডিত হইয়াছিল, তাহাদিগকেও গভর্ণমেণ্ট তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। কিন্তু এবারে যখন তাহারা নব্যতন্ত্রী বন্ধুদিগের প্ররোচনায় পুনরায় ধর্ম্মঘট করে, তখন জাতিভেদ ও জাতিগত ব্যবসার বিরোধী নিম্নজাতিদিগের উন্নতিকামী নব্যতন্ত্রী বন্ধুরাই আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিতে লাগিয়া গেলেন ও অবৈতনিক ধাঙ্গড় পাওয়ায় ধাঙ্গড়দিগের ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিয়া গেল। ধাঙ্গড়দিগের কোন দাবীই মঞ্জুর হইল না। জাতিভেদ-প্রথা ও জাতিগত বৃত্তি অক্ষুণ্ণ থাকিলে সকল জাতিরই কত ক্ষমতা থাকে—সুতরাং প্রজাদিগের হস্তে কত ক্ষমতা থাকে, তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করা রাষ্ট্রশক্তির কত দুঃসাধ্য হয়, এই ধাঙ্গড়ের ধর্ম্মঘটই তাহার প্রমাণ। নব্যতন্ত্রীরা জাতিভেদ-প্রথার উদ্দেশ্য ও সুফল না বোঝার নিমিত্তই জাতিভেদ-প্রথা ও জাতিগত বৃত্তি অক্ষুণ্ণ থাকিলে, তাহা সম্যক্ পরিচালিত হইলে, কোন রাষ্ট্রশক্তির—তাহা স্বদেশী হউক আর বিদেশী হউক—প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করা প্রায় অসম্ভব হয়, তাহা আমাদিগের পাশ্চাত্ত্য সাম্যবাদ-মোহগ্রস্ত রাজনৈতিকগণ দেখেন না। মহাত্মা গান্ধী যে অসহযোগ প্রথা অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, জাতিভেদ-প্রথা অক্ষুণ্ণ থাকিলে তাহা কত সহজে সম্পূর্ণ সফল হইতে পারে, তাহা ঈষৎ চিন্তা করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়, অথচ অসহযোগ-প্রথা সমর্থনকারী নব্যতন্ত্রী হিন্দুনেতারাই জাতিভেদ-প্রথার বিরোধী। তাঁহারাই একই মুখে Dignity of honest labour বলেন আর সভ্যতার নিম্নতম শ্রেণীর সাধ্য নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মকে হিন্দুদিগের অত্যাচার বলেন।

পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, ভারতের সমস্যা বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সমস্যা অপেক্ষা বহু জটিল। পাশ্চাত্যরা তাহাদিগের নিজেদের অপেক্ষাকৃত সহজ সমস্যাই পূরণ করিতে অপারগ। প্রত্যেক পাশ্চাত্য দেশেই প্রায় এক ধাঁচের (homogenous) লোকের বসতি। সেখানে তাহারা কোথায় কি করে, তাহা এই বহু জাতি-সমাবিষ্ট ভারতে প্রযোজ্য নয়। সুতরাং তাহাদিগের অনুকরণে এখানে কোন উন্নতি হইতে পারে না। সে জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পাশ্চাত্যদেশে নিবদ্ধ চক্ষু-কর্ণ দেশের দিকে ও দেশের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার দিকে ফিরাইতে বলি।

[ক্রমশঃ

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র (এটর্ণি)।

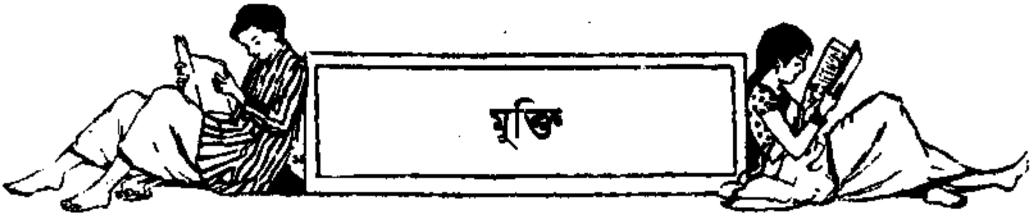
উদ্দেশে

এসেছিলে এই ধরণীর মাঝে, বেসেছিলে তারে ভাল ;
জ্বেলেছিল তাই তার হাসিখেলা নয়নে প্রেমের আলো।

মরুভূমি, নদী, গিরি-কন্দর, শ্যাম ধরা, বীথি, বন,
তন্বী ও তরুলতার বাঁধনে বাঁধা পড়েছিল মন।
বরষে বরষে ঋতুবালাদের বারে বারে অভিসার
আনিত না কভু বিষাদ নয়নে, হারার্ত্ত না মায়া তার।
আজিকে তোমারে শুধাই বন্ধু! কবর-শয্যালীন,—
এখনও কি বোঝ কখন্ আসিছে রাত্রির পর দিন?
তোমারে হারায়ে মাতা বসুমতী নীরব গহীন রাতে—
বেদনা জানায় স্মরিয়া তোমারে অশ্রু শিশির পাতে।
কঠিন মাটীর বক্ষ ভেদিয়া সেই ঝরা আঁখিনীর
জানাতে পারে কি কতখানি ব্যথা বুকে বাজে জননীর?
শ্রান্ত দুপুরে স্মরিয়া তোমারে ঘুঘু যবে ওঠে ডাকি—
ঘুমের মাঝারে তুমি কি তখন চমকাও থাকি থাকি?
কবর-পাশের ফুলগাছ যবে ফুয়ে প'ড়ে তোমা ডাকে—
তখন তুমি কি ফিরে পেতে চাও যে গেছে হারায়ে তাকে?

সাগর যখন তীরে আছাড়িয়া কেঁদে মরে তোমা' তরে—
সে বিষাদ-সুর বাজে কি তখন তব হৃদি-বীণা-তারে?
জোনাকিরা যবে কবরে তোমার সন্ধ্যায় জ্বালে বাতি,—
শেফালিকা ঢালে অর্ঘ্য প্রাণের শেষ হয়ে এলে রাতি,
পাখীরা যখন ভোর হ'লে ধরে ঘুম-ভাঙানিয়া গান
তুমি কি সে সব পার বুঝিবারে? দুলে ওঠে তব প্রাণ?
ভালবেসেছিলে জীবনে যাদের, টেনে নিয়েছিলে বুকে,
বিরহে তাদের হৃদয় তোমার গুমরে এখনও দুখে?
এখনও কি আছে সাগরের বুকে রতনের মত জমা,
অথবা সে সব মুছে গেছে যেই নেমেছে জীবনে অমা?
শুধু এইটুকু শুধাই বন্ধু! জীবনে যাদের সাথে
ভালবাসা দিয়ে বেঁধেছিলে তুমি নিজেরে আপন হাতে,
সে ভালবাসার সুবাস তোমায় আজও কি পাগল করে,
অথবা তোমার বিদায়ের সাথে সেও গেছে দুখে ঝ'রে?

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়।



মুক্তি

[বড় গল্প]

৩

প্রথম সাক্ষাতে নরনারায়ণ মুক্তির যে ফটো তুলিয়াছিল, তাহাকে 'সবজেক্ট' করিয়া যে ছবি সে আঁকিয়াছে, তাহা দেখিয়া নিজেই বিভোর হইয়া গিয়াছে! এবার মুক্তিকে সম্মুখে রাখিয়া আধুনিক ধরণের আর একখানি ছবি সে আঁকিয়াছে,—মুক্তকুন্তলা নিরাভরণা মুক্তি বৃহৎ আকৃতির দুইটি সূর্য্যমুখী ফুল লইয়া দাঁড়াইয়া আছে,—স্বাভাবিক হাসিটুকু তাহার সুন্দর মুখখানিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে; পশ্চাতে ধূসর বর্ণের ব্যাক গ্রাউণ্ড! নরনারায়ণের মতে ছবিতে মুখের স্বাভাবিক হাসিটুকু যে ভাবে ফুটিয়াছে, তাহার মূল্য নাই! অনেক স্থলে শিল্পীরা আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া তাহার মুখে হাসি ফুটাইবার জন্য নানাবিধ কার্টুন বা রঙ্গচিত্র সম্মুখে প্রদর্শন করে, তাহা দেখিতে দেখিতে মুখে হাসিটুকু ফুটিবামাত্র শিল্পী সেটুকু তাহার আলেখ্যে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পায়। কিন্তু মুক্তির মুখে হাসি ফুটাইবার জন্য নরনারায়ণকে কোনওরূপ কৃত্রিম পন্থা অবলম্বন করিতে হয় নাই।

ছবি দুইখানি শেষ করিয়া নরনারায়ণ প্রত্যূষেই তাহার মুরুব্বী অধ্যাপকের নিকট লইয়া গিয়াছে। মুক্তি বাড়ীতে একা। সহসা নীচের দালানে মালতীদের ব্লকের দিকের দরজার কড়ানাড়াটি সশব্দে বাজিয়া উঠিল।

দ্বারটির ওপারে মালতীদের মহল। দরজা খুলিতেই মুক্তি দেখিল, সম্মুখে তাহারই সমবয়সী সুসজ্জিতা এক তরুণী দাঁড়াইয়া;—পরনে তাহার সোণালী রঙের রেশমী শাড়ী, পায়ে লাল রঙের নাগরা, মাথায় কাপড় নাই, আঁচলখানি যেন ইচ্ছা করিয়াই পিঠের পাশ দিয়া লুটাইয়া দিয়াছে!

মালতী ভাবিয়াছিল, কড়ানাড়ার সাড়া পাইয়াই নরনারায়ণ তুলি হাতে করিয়াই শশব্যস্তে ছুটিয়া আসিয়াছে, দ্বার খুলিতে কিন্তু তাহার স্থলে যে মূর্ত্তি দেখিল, তাহাতে তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না!—দুই চক্ষু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল করিয়া সে দেখিল, চওড়া লালপাড়ের বাহার দেওয়া সাদা ধবধবে শাড়ীপরা এক নিখুঁত সুন্দরী মেয়ে ঠিক তাহার সামনাসামনি দাঁড়াইয়াছে, মুখখানি হাসি হাসি হইলেও, কৌতুক যেন তাহার সহিত মিশিয়া ঝলমল করিতেছে; একরাশ কালো চুল সমস্ত পিঠ ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, হাতে তাহার মোটা দাঁড়ার একখানি দেশী চিরুণী,—দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায় যে, কড়ার আওয়াজ পাইয়া মেয়েটি চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে ছুটিয়া আসিয়াছে দরজাটি খুলিয়া দিতে।

বিস্মিতা মালতীকে অধিকতর বিস্ময়ান্বিতা করিয়া মুক্তিই প্রথমে কথা কহিল,—আপনার নাম বোধ হয় শ্রীমতী ,—নয় কি?

মুক্তির মুখের দিকে পরিপূর্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া কঠিনস্বরে মালতী প্রশ্ন করিল,—আপনার সঙ্গে কোন পরিচয় আমার নেই, নাম জানলেন কি ক'রে?

মুক্তি মুচকি হাসিয়া কহিল,—এটা কি খুবই আশ্চর্য্যজনক মনে করেন? একই ছাদের তলায় সবাইকে যখন মাথা গুঁজতে হয়, নাম-পরিচয় না জানাই বরং আশ্চর্য্যের কথা।

—এ বাড়ীর সঙ্গে আপনার কি সম্বন্ধ, জিজ্ঞাসা করতে পারি?

—নিশ্চয় পারেন, আর সেই সঙ্গে স্বাভাবিক বুদ্ধিতে এটুকুও আপনি বুঝতে পারেন যে, সম্বন্ধ ভিন্ন কেউ কারুর বাড়ীতে মাথা গলায় না; সুতরাং ঐ বাড়ীর সঙ্গে আপনার যে সম্বন্ধ, এই বাড়ীর সঙ্গে ঠিক সেই সম্বন্ধই আমার।

—ভাড়া নিয়েছেন না কি এ বাড়ী?

—ঐ রকম কিছু নেওয়া হয়েছে বই কি, নইলে মাথা এখানে গলিয়েছি কোন্ ভরসায় বলুন! আচ্ছা, এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কি এই ভাবে আমাদের আলাপ-পরিচয় হবে? বসবেন না?

—বসবার আমার অবসর নেই, এসেছি একটু কাযে এখানে ; এ বাড়ীতে এক জন আর্টিষ্ট ছিলেন—

—এখনও থাকেন, নরনারায়ণ বাবুর কথা বলছেন ত ?

—তাঁর সঙ্গেও ফ্যামিলিয়ারিটি আছে তা হ'লে !

—সেটুকু হয়েছে আপনারই সৌজন্যে !

—কি মিন্ ক'রে এ কথা আপনি বললেন ?

—আপনি মিছে রাগ করছেন, অন্যায় কিছু আমি বলিনি ; ওঁর সঙ্গে লেকে আপনার যে এনগেজমেণ্ট ছিল, তা আপনি ব্রেক করাতেই না আমি এই চান্সটুকু পেয়েছি।

—আপনার পক্ষে এটা চান্স হ'তে পারে, কিন্তু আমার কাছে অপমান।

—কেন বলুন ত ?

—একটা 'লোফারের' সামনে দাঁড়িয়ে ছবি দেওয়া আমি ডিসগ্রেস্ মনে করি।

—বলেন কি ! কিন্তু সেই লোফারের কাছ থেকে ঠিক এই উদ্দেশ্যেই যখন পাঁচটি টাকা হাত পেতে নিয়েছিলেন, তখনও কি আপনার মনে এই বিরাগটুকু ছিল ?

মুক্তির কথাগুলি ধনুকের জ্যামুক্ত তীরের মত মালতীর মনে ব্যথার ঠিক স্থানটির উপরই বিদ্ধ হইল, সুন্দর মুখখানি তাহার মুহূর্ত্তে কালো হইয়া গেল।

ঠিক এই সময় বাহিরের দরজায় কড়ার ঘা পড়িল আঁচলটি মাথায় টানিয়া দিয়া মুক্তি দরজা খুলিয়া দিল। প্রবেশ করিল হর্ষোৎফুল্ল-মুখে নরনারায়ণ !

কিন্তু মালতীকে দেখিয়াই মুখের হাসি তাহার মিলাইয়া গেল, অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া কহিল,—আপনি যে হঠাৎ ?

মুক্তির মুখের কথায় যে আঘাত বুকে পাইয়াছিল, পরমুহূর্ত্তেই তাহা ভুলিয়া গিয়া মালতী কথার সুরটুকু পরিবর্ত্তন করিয়া কহিল,—ভেরী স্যরি নরনারায়ণ বাবু, সেদিনের এনগেজমেণ্ট ফেল্ করেছিলুম প্রিভিয়াস্ এক রাশ এ্যাপয়েন্টমেন্টের ঠেলায় ! বলেন কেন, সেই থেকে নিশ্বেস ফেলবারও ফুরসদ পাচ্ছি না ; এর ওপর আবার মিষ্টার সরকার একবারে নাছোড়বান্দা,—তাঁর কারনিভ্যালের এ্যামিউসমেণ্টের সব ভার চাপিয়েছেন আমার ওপর, বেলা চারটে থেকে রাত এগারোটা পর্য্যন্ত ডীপলি এনগেজড হয়ে থাকতে হয় সেখানে !

মুক্তি হাসিয়া কহিল,—ভারি আশ্চর্য্য ত, এত সব রসালো খবর আপনি পেটের ভেতর লুকিয়ে রেখেছিলেন, বিন্দু বিসর্গও হয়নি আমার অদৃষ্টে, ভাগ্যিস নরনারায়ণ বাবু এসে পড়লেন !

নরনারায়ণ ঈষৎ শ্লেষের সুরে কহিল, দেখুন, কাযের মত কাযে জড়িয়ে পড়াটা হয় ত ভালই ; কিন্তু আপনার মত ভদ্রমহিলার পক্ষে কারনিভ্যালের এ্যামিউসমেণ্টে ডীপলি এনগেজড হওয়াটা ত গৌরবের কথা নয়।

মালতী ব্যগ্রভাবে উত্তর দিল, না, না, ওটাকে আপনি ব্যাড সেন্সে নেবেন না ! আমার ও কথা বলবার অর্থ এই যে, মিঃ সরকার সম্প্রতি জন কয়েক য়ুরোপীয়ান লেডীস্ আনিয়েছেন, তাঁরা প্রাচ্য সঙ্গীত শিখতে চান্, আমাকে সে ভার নিতে হয়েছে। তা ছাড়া এঁদের আর কলকেতার বড়ঘরের মেয়েদের কো-অপারেসনে এম্পায়ারে একটা পারফরমান্সের আয়োজন হচ্ছে, তার ভারও পড়েছে আমার ওপর। হাঁ, ভাল কথা, আপনার জন্য আমি কতকগুলো কায ঠিক করেছি, আর্টিষ্টদের ফটো তুলতে হবে, তা থেকে ব্লক তৈরী করিয়ে পিক্টোরিয়েল পামফ্লেট্ বেরুবে। এই জন্যেই আমি এসেছিলুম আপনার কাছে, আজ রাত ঠিক আটটায় কারনিভালের আফিসে আপনার যাওয়া চাই, কথাবার্ত্তা সব পাকা হবে, অ্যাডভান্সও কিছু টাকা আপনাকে পাইয়ে দেব, আর আমার কাছে যে পাঁচ টাকা জমা আছে, সেটাও ঐ সঙ্গে দিয়ে দেব। যাচ্ছেন ত ?

নরনারায়ণ কহিল,—আমার জন্য আপনি যে এত যত্ন নিয়েছেন, তাতে আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এইটুকু যে, এ সময় আমার হাতে এমন কতকগুলো কায জ'মে গেছে যে, নতুন কায হাতে নেবার কোনও উপায় নেই। আমাকে এ জন্য আপনি ক্ষমা করবেন।

মালতী বিস্ময়ের সুরে কহিল,—বলেন কি ! দুর্ভাগ্যক্রমে আপনিও এ সময় এনগেজড্ হয়ে পড়লেন ! অতগুলো টাকার কায ! তা হ'লে আপনার সে কটা টাকার—

মালতীর কথায় বাধা দিয়া নরনারায়ণ কহিল,—তার জন্য আপনার কোন চিন্তা নেই, আপনার কাছেই জমা থাক।

মালতী হাসিল, সঙ্গে সঙ্গে বক্রদৃষ্টিতে মুক্তির দিকে

চাহিয়া কহিল,—জমা রাখতে আর ভরসা হয় না, হিসেব নেবার লোক এসেছে!

নরনারায়ণের মুখে কথা নাই, কিন্তু মুক্তি কথাটার উত্তর না দিয়া পারিল না, কহিল,—ঠিকে ভুল ধরা পড়লেই হিসাবের হয় ওলপ, দেনা-পাওনাও অমনি গোল বাধায়।

মালতী এ কথা গায়ে না মাখিয়া হঠাৎ কহিয়া উঠিল,—হাঁ, আসল কথাটাই বলা হয়নি এখনও, বলছিলুম কি—দাদামশাই কলকেতা ত্যাগ করতে না করতেই আপনি এখানে মজা জমিয়ে ফেলেছেন ভাল!

কথাটা সে এমন সুরে কহিল যে, মুক্তি মুখখানি তাহার ফিরাইয়া লইল; নরনারায়ণ অসহিষ্ণু স্বরে প্রশ্ন করিল,—এ কথার মানে?

মুক্তির দিকে কটাক্ষ করিয়া বিদ্রূপের সুরে মালতী উত্তর দিল,—মানে না হয় আর এক দিন এসেই বুঝিয়ে দেওয়া যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে দরজাটি সশব্দে রুদ্ধ করিয়া সে অদৃশ্য হইল।

তাহার কথাটির মানে আর কেহ না বুঝুক, সে যাহা বুঝিয়াছিল, তাহাই বিস্তারিতভাবে বিবৃত করিয়া সেই দিনই দাদামহাশয়ের উদ্দেশে সপ্তপৃষ্ঠাব্যাপী এক পত্র লিখিয়া ডাকে পাঠাইল।

* * * *

পিকচার একজিবিসনের ছবিগুলি দাখিল করিয়া নরনারায়ণ দাদামহাশয়ের দেওয়া অয়েল পেইন্টিংগুলি লইয়া পড়িয়াছে। দোতলার ঘরখানির ভিতর সে দাদামহাশয়ের ছবি কয়খানির কায ব্যতীত নিজের অন্ত কোনও কায করিত না বা তাহার ব্যবসায়-সংসৃষ্ট কোনও চিত্র বা অন্ত কিছু এ ঘরে রাখিত না। ভিতর হইতে দ্বারটি বন্ধ করিয়া কায করিত এবং বাহির হইবার সময় দরজায় তালা লাগাইয়া নীচে নামিত। এই ঘরখানির দিকে তাহার ন্যায় অসতর্ক মানুষটির এই সতর্কতা দেখিয়া মুক্তি মনে মনে হাসিত; কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন সে কোন দিন করে নাই বা নরনারায়ণ যখন এই ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া কায করিত, একান্ত প্রয়োজন উপস্থিত হইলেও সে তাহার কাযে ব্যাঘাত দিতে চাহিত না।

নিবিষ্টমনে শিল্পী তাহার সদ্যঃসমাপ্ত ছবিখানির উপর ফিনিসিং টাচ দিতেছিল। পুরোজন অস্পষ্ট আলেখ্য দৃষ্টে তৈলচিত্রখানি সে নিখুঁত করিয়াই আঁকিয়াছে—এই চিত্রাঙ্কন আরম্ভ করিবার সময় মালতীর অনধিকারচর্চ্চায় ব্যথা পাইয়া সে অহঙ্কার করিয়া যাহা বলিয়াছিল, তাহা যে সার্থক করিতে পারিয়াছে—ইহাতেই তাহার অপরিসীম তৃপ্তি। সত্যই, সহসা এই ঘরখানির মধ্যে যে কেহ প্রবেশ করিবে, তাহার চক্ষু সর্ব্বাগ্রে এই মনোরম চিত্রখানির উপর আকৃষ্ট হইয়া পলক হারাইবে এবং চক্ষুর অধিকারীকে স্বীকার করিতে হইবে যে, ছয় বৎসরের এক অপূর্ব্বসুন্দরী বালিকা যেন জীবন্ত হইয়া তাহার আকর্ণবিস্তৃত দুইটি চমৎকার চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া আছে!

ছবিখানি পরিপাটীরূপে শেষ করার দিকেই এত দিন শিল্পীর যে মনটুকু পড়িয়াছিল, শেষ হইবার পরেই তাহার সেই মনের উপর সংশয়ের একটা গভীর রেখা পড়িয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে!

এ কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য এই মেয়েটির মুখের দিকে—মুক্তির সঙ্গে? অবশ্য, ছয় বছরের মেয়ের মুখের সঙ্গে আঠারো বৎসরের মেয়ের মুখের আকৃতিগত সাদৃশ্য-পরিকল্পনা সম্ভবপর নয়, কিন্তু এমন কয়েকটি সহজাত চিহ্ন দুইখানি মুখের একই বৈশিষ্ট্যবর্দ্ধন করিয়াছে, যাহা সত্যই বিস্ময়বর্দ্ধক!

মনের ভিতর সন্দেহের এই দাগটুকু পড়িতেই নরনারায়ণ নীচের ঘর হইতে মুক্তির ফটো আনিয়া বালিকার তৈল-চিত্রটির পার্শ্বেই রাখিয়াছে; দুইখানি ছবির মুখ মিলাইয়া বিশেষ করিয়া সে এইটুকু লক্ষ্য করিয়াছে যে, দুইখানি মুখেই চিবুকের ঠিক কোণেই জোড়া-তিল টিপ্‌টির মত ফুটিয়া রহিয়াছে ও সুন্দর মুখের সৌন্দর্য্য যেন তাহাতে আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে! উভয় চিত্রেই চোখের বৈশিষ্ট্য অনন্য-সাধারণ, চোখের তারাগুলি যেমন ডাগর, ভাসাভাসা ও প্রতিভাব্যঞ্জক, চোখের উপরে তেমনই টানা জোড়া-ভ্রূ—ঠিক যেমন প্রতিমার চোখের পাতাগুলি তুলি দিয়া আঁকা দেখা যায়।

নরনারায়ণের মনে আতঙ্ক হইল, মুক্তির ছবি লইয়া গভীর মনোনিবেশের জন্য তাহার অজ্ঞাতে এই মেয়েটির চিত্রাঙ্কনের সময় তিল ও ভ্রূ সম্বন্ধে এই ভুল হইয়া যায় নাই ত? কিন্তু বালিকার আসল ফটোখানি বাহির করিয়া মিলাইতেই স্পষ্ট দেখিতে পাইল—তাহাতে চিবুকের কোণে

জোড়া-ভিল ও ভ্রূর বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে,—কোনও ভুল সে করে নাই।

এক দিন নয়, দুই দিন নয়, ছবি শেষ করিয়া আরও নয়টি দিন সে এই সাদৃশ্য লইয়া চিন্তা করিয়াছে, গবেষণা করিয়াছে, তাহার বিদ্যাবুদ্ধিতে যতটা সম্ভব, তাহা খাটাইয়া স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পথ খুঁজিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সে কিছুই সাব্যস্ত করিতে পারে নাই।

আলেখ্য দেখিয়া সে বালিকাকে বুঝিবার চেষ্টা করে, আর মুক্তির জীবন্ত মূর্ত্তি তাহার চোখের উপরেই সদাসর্ব্বদা পড়ে; মুক্তির সৌন্দর্য্যের আরও একটা নিদর্শন সে দেখিতে পায়,—হাসিলেই তাহার গোলাপনিভ গাল দুটিতে টোল খায়! বালিকার ছবি দেখিয়া এ সাদৃশ্যটুকু নির্ণয় করা অবশ্য সম্ভবপর নয়, তবে যাঁহার কন্যা, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে হয় ত এ তথ্যও—

কিন্তু পরক্ষণে তাহার মনে পড়িয়া যায় মালতীর কথা! শৈশবেই অসামান্য রূপের এই আলেখ্যটুকু রাখিয়াই বৃদ্ধের এই কনিষ্ঠা কন্যাটি ইহলোক ছাড়িয়া গিয়াছে অনেক দিন। সুতরাং কি প্রয়োজন এই অপ্রীতিকর আলোচনায়?

সে দিন উপরের ঘরে কায করিতে করিতে কি একটা প্রয়োজনে নরনারায়ণ নীচের ঘরে আসিয়াছে, সেই সময় বাহিরের দরজার সম্মুখে একখানা প্রাইভেট কার আসিয়া দাঁড়াইল।

—নরনারায়ণ বাবু আছেন?

দ্বার খুলিতেই নরনারায়ণ সবিস্ময়ে দেখিল, তাহার মুরুব্বী অধ্যাপক মোটরে বসিয়া আছেন, তাঁহারই সোফার তাহাকে ডাকিয়াছে।

শশব্যস্তে নরনারায়ণ কহিল,—এ কি, স্যর, আপনি!

স্যর তাহাকে অধিকতর বিস্ময়বিহ্বল করিয়া কহিলেন,—জামাটা গায়ে দিয়ে চট ক'রে বেরিয়ে এসো, জরুরী কায আছে।

তাড়াতাড়ি একটা সার্ট গায়ে দিয়া, অর্দ্ধমলিন চাদরখানা কাঁধে ফেলিয়া, স্যাণ্ডেল-জোড়ায় পা-দুখানি গলাইয়া বাহিরে আসিতে তাহার পাঁচ মিনিটও লাগিল না।

গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিয়া অধ্যাপক মহাশয় ডাকিলেন,—উঠে পড় শীগ্‌গীর, পনেরো মিনিটের মধ্যে পৌঁছনো চাই।

অধ্যাপকের বিষম তাড়া দেখিয়া নরনারায়ণ ভিতরে সংবাদ দিবারও অবকাশটুকু পায় নাই; মুক্তি তখন রন্ধন-কার্য্যে ব্যস্ত, ষ্টোভের অবিরাম গর্জ্জনে মোটরের তর্জ্জন তাহার শ্রুতিস্পর্শ করে নাই, বাহিরে দরজা খোলাই রহিয়া গেল।

* * * *

মুক্তি প্রত্যহই খুব প্রত্যূষে উঠিত, প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া, স্নান করিয়া তাহাদের দুই জনের এই ছোট সংসারটির কায-কর্ম্ম লইয়া পড়িত। বারোটার পূর্ব্বে কোন দিনই নরনারায়ণের স্নানাহার হইয়া উঠিত না, সেই জন্য একটু বেলা করিয়াই তাহাকে রান্না চড়াইতে হইত এবং ঠিক সাড়ে এগারোটার সময় সে নরনারায়ণকে স্নানের জন্য তাড়া দিত। আজও যথাসময়ে উপর হইতে তাড়া দিতে সে ভুলে নাই। কিন্তু নরনারায়ণ যে ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে অধ্যাপকের মোটরে বাহিরে গিয়াছে ও বাহিরের দরজা খোলা পড়িয়া আছে, সে তাহা কি করিয়া জানিবে?

কিছুক্ষণ পরে নরনারায়ণকে পুনরায় তাড়া দিবার জন্য সিঁড়ির দিকে যাইতে পার্শ্বের ঘরখানির দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল; বিস্মিত হইয়া দেখিল, ঘরের দরজাটি বাতাসে খুলিয়া গিয়াছে ও সদ্যঃসম্পন্ন অপরূপ তৈলচিত্রখানির ঔজ্জ্বল্যে সমস্ত ঘরটি যেন হাসিতেছে!

এ ঘরখানি সে কোন দিন এ ভাবে উন্মুক্ত দেখে নাই, নরনারায়ণ যে গৃহস্বামীর পরিজনদের তৈলচিত্রাঙ্কনের জন্যই এই ঘরখানি অতি সন্তর্পণে ব্যবহার করে, ইহা তাহার জানা থাকিলেও, একটিবারও এ ঘরের কোনও চিত্র সে দেখে নাই বা নরনারায়ণ তাহাকে কোন দিন এই ঘরটির মধ্যে কখনও আহ্বান করে নাই। আজ মুক্ত দ্বারপথে অতর্কিত-ভাবে কক্ষের সেই অপূর্ব্ব চিত্রখানির উপর তাহার চক্ষু পড়িতে, কাছটিতে গিয়া ভাল করিয়া ছবিখানি দেখিবার প্রলোভন সে সংবরণ করিতে পারিল না। মুক্তির মনে হইল, ছবির মেয়েটি যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, তাহার ভাসা ভাসা মোহময় চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া তাহাকে আহ্বান করিতেছে! অভিভূতার মত মুক্তি ছবিখানির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, অপূর্ব্ব ছবির অপূর্ব্ব চক্ষুর সহিত তাহারও অপূর্ব্বতাময় দুই চক্ষুর যেন অপূর্ব্ব সংযোগ ঘটিয়াছে; মুক্তির দুই চক্ষু নিষ্পলক, মুখে কথা নাই!

ছবির বালিকাকে দেখিয়া মুক্তি এতই তন্ময় যে, বাহিরে

একাধিক ট্যাক্সীর উপস্থিতি, লটবহর সহ আরোহীদের অবতরণ, মুক্ত দ্বারপথে তাহাদের সোপানশ্রেণী অতিক্রম পূর্ব্বক উপরে আবির্ভাব—কিছুই তাহার শ্রুতিগোচর হয় নাই! সে বুঝি এতক্ষণ ছবিখানির দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টি রাখিয়া অতীতের কোন্ স্বপ্নময় জগতে বিচরণ করিতেছিল! স্বপ্নজাল তাহার অকস্মাৎ ছিন্ন হইয়া গেল মালতীর শ্লেষ বিজড়িত রূঢ় কথায়,—এই যে, বিদ্যাধরী এখানে গো!

স্তব্ধবিস্ময়ে মুক্তি দেখিল, মালতী রণরঙ্গিণী-মূর্ত্তিতে দরজার উপর দাঁড়াইয়া; লাল নাগরামণ্ডিত একখানি পা পড়িয়াছে ঘরের ভিতর, আর একখানি পা ঠিক চৌকাঠটির উপর; তাহার পশ্চাতে কিছু দূরে শুভ্র-পরিচ্ছদধারী এক বর্ষীয়ান্ পুরুষ এবং আরও দুইটি মহিলার সমাবেশ। সবের ভিতরে প্রত্যেকেরই উৎসুক দৃষ্টি!

মুক্তির আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল, এই নিষিদ্ধ ঘরটির ভিতর প্রবেশ করিয়া কত বড় অন্যায়ই সে আজ করিয়া বসিয়াছে, এ ঘরের গুপ্ত চিত্রগুলি আজ বাহিরের দশ জনে আসিয়া দেখিয়া যাইবে! উনিই বা ইহাদের উপরে পাঠাইলেন কেন?

ভাবিবার অবসরই বা কোথায়, সহজাত উপস্থিতবুদ্ধি তাহার মাথায় খেলিয়া গেল—মালতীর রূঢ় উক্তির সঙ্গে সঙ্গে সেও রূঢ়ভাবে দরজার সম্মুখে আসিয়া দুই হাতে সবলে মালতীর কাঁধটি ধরিয়া পুতুলটির মত ঘুরাইয়া দরজার বাহিরে দাঁড় করাইয়া দিল, পরক্ষণে দরজা সশব্দে বন্ধ করিয়া শিকলটি আঁটিয়া দিল।

এমন যে হইবে, মালতী তাহা কল্পনাও করে নাই! যে মেয়েটিকে পথে দাঁড় করাইবার জন্য সে আটঘাট বাঁধিয়া বিজয়িনীর মত সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার এমন স্পর্দ্ধা! অকুতোভয়ে তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া দরজা বন্ধ করে! দুই চক্ষু পাকাইয়া মারমুখী হইয়া মালতী তর্জ্জন করিল,—আমাকে তুমি ছুঁতে সাহস কর—এত তোমার তেজ!

মাথায় আঁচলখানি তুলিয়া দিয়া মুক্তি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মালতীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—ও তিরস্কার আপনারই প্রাপ্য, কেন না, দোষ আপনার।

—আমার দোষ? মুখ সামলে কথা কও বলছি।

—আমি ত অন্যায় কিছু বলিনি, আপনি মিছে রাগ করছেন। জুতো পায়ে দিয়ে আপনি ওপরে উঠে এসেছেন, শুধু তাই নয়—ঘরের ভেতর জুতোশুদ্ধ-পায়ে ঢুকেছিলেন।

—বেশ করেছিলুম, কি তাতে হয়েছে?

—আপনার হয় ত কিছু না হ'তে পারে, কিন্তু ঐ ঘরটির ভেতর ব'সে যিনি মা সরস্বতীর সাধনা করেন, তাঁকে অপমান করা হয়েছে।

মালতীর মা সকলের পিছনে পড়িয়াছিলেন, কন্যার লাঞ্ছনায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন, ওরে আমার ভাটপাড়ার ঠাকরুণ রে! ঝেঁটিয়ে তোমার সতীপনা ঘুচুচ্ছি—দাঁড়াও—

পাশ কাটাইয়া তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া বর্ষীয়ান্ আগন্তুকটি বাধা দিয়া কহিলেন,—থাম মালতীর মা, তুমি কেন ছুটছ ওদের মধ্যে! মেয়েটির কথাগুলো আমার ভা'র মিষ্টি লাগছে!

মালতী ফোঁস্ করিয়া উঠিল, বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া ঝঙ্কার দিয়া কহিল,—তা ত লাগবেই মিষ্টি, তা হ'লে দাঁড়িয়ে কেন, কোলে বসিয়ে মিষ্টিমুখ করান!

আগন্তুকদের দলে বৃদ্ধের গৃহিণীও ছিলেন। যদিও শান্তমণির বয়ঃক্রম তিনি বহুকাল পূর্ব্বেই অতিক্রম করিয়াছেন, কিন্তু নারীর সহজাত লজ্জা-সঙ্কোচের মোহটুকু এখনও কাটাইতে পারেন নাই। মালতীর কথাটা তাঁহার কাণে বাজিয়াছিল, মাথার কাপড় একটু সরাইয়া তিনি চাপাস্বরে কহিলেন, তোর মেয়ের মুখ ভারী আল্গা হয়েছে শান্ত, লঘুগুরু জ্ঞান নেই মেয়ের! ছি!

মুক্তি এই সময় তাহার প্রশান্ত দৃষ্টিতে বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া কহিল,—দেখুন, আপনাকে দেখে শ্রদ্ধা হচ্ছে বলেই ভদ্রভাবেই জিজ্ঞাসা করছি, দয়া ক'রে আমাকে বলবেন—কি অভিপ্রায়ে আপনারা ওপরে উঠে এসেছেন,—কারুর অনুমতি পেয়েছেন?

বৃদ্ধ কহিলেন,—কার অনুমতি নিতে বল তুমি?

মুক্তি কহিল,—যাঁর জিম্মায় এ বাড়ী, তিনি নীচে আছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি?

বৃদ্ধ কহিলেন,—না।

—কে আপনাদের দরজা খুলে দিলে?

—দরজা খোলাই ছিল।

মালতী বিদ্রূপের স্বরে কহিল,—খাঁচা খুলে পাখী গেছে

উড়ে—বোধ হয় সাড়া পেয়েছিল আগে,—বামাল ফেলেই ফেরার! এখন বিদ্যেধরীর কাছে কৈফিয়ৎ দিন দাদামশাই—কি অভিপ্রায়ে আপনার বাড়ীতে আপনার এই অনধিকারপ্রবেশ?

মুক্তির চক্ষু দুটি তখন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, সুন্দর মুখে উত্তেজনার চিহ্ন; ক্ষণকাল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া, সহসা বৃদ্ধের দিকে মুখখানি ফিরাইয়া নম্রভাবে কহিল,—আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি কে! আগে থাকতে পরিচয় না পেয়ে, আর কতকটা ওঁরই ব্যবহারে হয় ত আমাকে কঠিন হ'তে হয়েছিল, তার জন্য ক্ষমা চাইছি আমি।

দাদামহাশয় মুগ্ধভাবে মুক্তির দিকে চাহিয়াছিলেন, দৃষ্টিটুকু তাহার মুখে আবদ্ধ করিয়া কহিলেন,—তা হ'লে আমিও নিষ্কৃতি পেলুম, মালতী বলছিল তোমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে, সেটার আর প্রয়োজন নেই দেখছি। কিন্তু নরু কেন ফেরার হ'ল?

শান্তমণি জবাব দিলেন—সে কথা ভাটপাড়ার ঐ ঠাকরুণটিকেই জিজ্ঞেসা কর না কাকা, ওই বলবে—ফেরার হ'ল কেন?

মুক্তি এবার কঠিন হইয়া কঠোর স্বরে কহিল,—সে লোক এখানে উপস্থিত নেই, তার উদ্দেশে কেন এমন ইতরের মত আঘাত করছেন বলুন ত? কার ভয়ে তিনি ফেরার হবেন শুনি? খুন করেছেন না চুরী করেছেন, না আর কোনও গর্হিত কায করেছেন তিনি—যে, অত তদ্বি ক'রে মেজাজ দেখাচ্ছেন?

শান্তমণি এবার অগ্নিমুখী হইয়া চীৎকার তুলিল,—করব না তম্বি? করেনি সে কি? তুই কালামুখী আবার মেজাজ দেখাস্ কাকে? তোকে ত বার ক'রে এনে এই ভদ্দর লোকের বাড়ীতে তুলে ঘরকন্না পেতেছে,—গাতে দড়ি দেবার মতলব, তা কি আর বুঝিনি? সাধে কি কাকাকে বোম্বাই থেকে ছুটে আসতে হয়েছে এখানে বাড়ী থেকে তোদের দুটোকে ঝেঁটিয়ে বার করবে ব'লে? কোথায় লুকুলো সে হতচ্ছাড়া!

দাদামহাশয় বোধ হয় এতটা প্রত্যাশা করেন নাই, অসহিষ্ণুভাবে বাধা দিলেন,—শান্ত, তুই থাম্ থাম্—চেঁচাস্‌নি অমন ক'রে।

মুখ বাঁকাইয়া শান্তমণি ঝঙ্কার দিল,—সাধে কি চেঁচাচ্ছি? বাইরে অত রোক্ দেখালে, ঘাড় ধ'রে রাস্তায় বার ক'রে দেবে, কেটে রক্তারক্তি করবে,—ওপরে উঠে—ঐ কালামুখীকে দেখে একেবারে ঠুঁটো জগন্নাথ! যাদু জানে, যাদু জানে! ওর ওষুধ হচ্ছে—আধোয়া ঝাঁটা!

শান্তমণির আস্ফালনে দাদামহাশয়ের স্নীর শান্ত চিত্তটিও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, অনুযোগের স্বরে কহিলেন,—মেয়ের মা হয়ে অমন কথা মুখে আনতে নেই শান্ত, মা লক্ষ্মী তাতে ভয় পান!

কিন্তু তাহার কথার উত্তরে শান্তমণির কণ্ঠ কাঁসরের মত বাজিয়া উঠিল,—কিন্তু ও যে লক্ষ্মীর পীঠের এটুলি কাকা, ঝাঁটা ছাড়া উঠবে না।

পরিপূর্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টিতে দাদামহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দৃপ্ত স্বরে মুক্তি জিজ্ঞাসা করিল,—আপনারও কি এই কথা?—এই সাধু উদ্দেশ্যটুকু নিয়েই কি আপনি বোম্বাই থেকে হন্তদন্ত হ'য়ে এ বাড়ীতে এসেছেন?

মুখখানি গম্ভীর করিয়া দাদামহাশয় কহিলেন,—যদি বলি—হাঁ, এ কথা মিছে নয়?

—তা হ'লে আমার ইচ্ছাকেও এখনই জোর ক'রে মোড় ফেরাতে হবে।

—তার মানে?

—ইচ্ছা ছিল, গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজো করব; কিন্তু মা গঙ্গা যখন নিজেই ক্রমাগত ময়লা তুলছেন, তখন তাঁকে এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় কি?—তা হ'লে আমার কথা শুনুন, উনি নীচেই ছিলেন বরাবর, বোধ হয়, কোনও দরকারে কাছেই কোথাও গিয়ে থাকবেন, ওঁর না ফেরা পর্য্যন্ত আপনাকে মনে করতে হবে—এ বাড়ীর আমিও এক জন ভাড়াটে, এখানে থাকবার অধিকার আমার আছে। আপনি আপনার ভাগে দেওয়া সব দুখানা খুলে যা অভিরুচি তয় করুন, আমাকে বৃথা ঘাঁটাবেন না।

কথাগুলি বলিয়াই সে নিজের ঘরখানির দিকে বেগে অগ্রসর হইল।

শান্তমণি সেই সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল,—ঝাঁটাগাছটা নিয়ে আয় ত, মালা—

গমনগতি রুদ্ধ করিয়া, দরজার নিকট হইতে মুখখানি ফিরাইয়া মুক্তি শান্তমণির কথার উত্তর দিল,—আপনার ঘরের জঞ্জাল আগে সাফ করুন, তার পর ঝাঁটা নিয়ে

আসবেন আমার ঘরে! মনে রাখবেন, এটা ভদ্রমহিলার আস্তানা, কার্ণিভালের আড্ডা নয়!

কথাগুলি কহিয়াই সে ঘরে ঢুকিতেছিল, কিন্তু দাদামহাশয় তৎক্ষণাৎ হাতটি তুলিয়া কহিলেন,—একটু দাঁড়াও ত মা, একটা কথা আমি শুধু তোমাকে জিজ্ঞাসা করব,—নরুর সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ?

সিঁড়ির দিক হইতে উত্তর আসিল,—নরুকেই জিজ্ঞাসা করুন দাদামশাই, উত্তর তার কাছেই পাবেন।

চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া সিঁড়ির উপর দণ্ডায়মান নরনারায়ণের কৌতুকোদ্ভাসিত সপ্রতিভ মুখটির দিকে চাহিয়া দাদামহাশয় কহিলেন,—এই যে, নরু! তোমার চেহারা যে মাস দুয়ের মধ্যেই বেশ খোলতাই হয়েছে দেখছি! গায়েব হয়েছিলে এতক্ষণ কোথায়?

মালতী কহিল,—ঠিক গায়েব হননি, তবে লুকুচুরি খেলছিলেন বোধ হয়!

নরনারায়ণ কহিল,—ভারী একটা জরুরী কাযে বেরিয়েছিলুম দাদামশাই, মিনিট পনেরো হ'ল ফিরেছি!

—আমাদের কথাবার্ত্তা তা হ'লে আড়াল থেকে সবই শুনছ?

—নিশ্চয়; গড় ক'রে পায়ের ধুলো পর্য্যন্ত নেবার প্রলোভন জোর ক'রে চেপে ছিলুম! এবার সে ত্রুটিটুকু সেরে নিই, দাদামশাই—

—থাক্ থাক্, আমি ওর জন্য ব্যস্ত নই!

—যে জন্য আপনি ব্যস্ত, সে সমস্তই আমি শুনেছি। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, দাদামশাই, আমি আপনার কোন ক্ষতিই করিনি; পরের মিছে কথা শুনে বৃথা আপনি ছুটে এসেছেন কোনও খবর আমাকে না দিয়ে!

দাদামহাশয় সহসা উত্তেজিত হইয়া কহিলেন,—আমি তোমার কোন বাজে কথা শুনতে চাই না, আমার প্রশ্ন আগেই করেছি, ওপরপড়া হয়ে তুমি যখন উত্তর দিতে চেয়েছ, উত্তর দাও—কি সম্বন্ধ ঐ মেয়েটির সঙ্গে তোমার?

নরনারায়ণ সহজ স্বরে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল,—উনি যে আমার সহধর্ম্মিণী, দাদামশাই! আপনি বুঝতে পারেননি, এইটুকুই আশ্চর্য্য।

আশ্চর্য্য হইল প্রত্যেকেই—যে যে সেই দালানটির উপর দাঁড়াইয়াছিল; কিছুক্ষণ কাহারও মুখে কোনও কথা নাই! মুক্তি তাড়াতাড়ি তাহার ঘরখানির ভিতর প্রবেশ করিল।

বিস্ময়ের স্বরে দাদামহাশয় কহিলেন,—সহধর্ম্মিণী! বিয়ে করেছ তুমি? নিজের নেই চালচুলোর ঠিকানা, এর ওপর ঘাড়ে বোঝা নিয়েছ? এ যে তোমার সেই অবস্থা হে,—আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে!

নরনারায়ণ হাসিয়া উত্তর দিল,—মানুষের দিন কি বরাবর একই রকম থাকে, দাদামশাই? দুর্দ্দিনের মেঘ এক দিন কাটেই। ওঁরই আয়-পয়ে আমারও দিন ফিরে গেছে—

দুই চক্ষু উজ্জ্বল করিয়া দাদামহাশয় কহিলেন,—কি রকম?—কি রকম? দাও-টাও কিছু মেরেছ না কি হে?

নরনারায়ণ পকেটের ভিতর হইতে একখানা লেফাফা বাহির করিয়া কহিল,—দুখানা ছবি দিয়েছিলুম একটা বড় একজিবিসনে; আপনি শুনে সুখী হবেন, হাজার তিনেক ছবির ভেতর আমার ছবি দুখানাই ফার্ষ্ট হয়েছে!

—বল কি?

—আমার কোনও পৃষ্ঠপোষক অধ্যাপকের মারফতেই ছবিদুখানা পাঠিয়েছিলুম। ঘণ্টা তিনেক আগে তিনি নিজেই আসেন সুখবরটুকু নিয়ে, নীচে থেকেই তখনই তাঁরই মোটরে বেরিয়ে পড়েছিলুম; তাই এসেই আমাকে দেখতে পাননি।

—ছবি না হয় তোমার ফার্ষ্ট হ'ল, কিন্তু মজুরী কিছু মিলল?

নরনারায়ণ লেফাফার ভিতর হইতে চেকখানা বাহির করিয়া দাদামহাশয়ের হাতে দিয়া কহিল,—এক জন মার্কিণ মিলিওনিয়র ছবিদুখানা কিনে নিয়েছেন দশ হাজার টাকায়—তারই চেক!

দাদামহাশয় পড়িয়া দেখিলেন, সত্যই দশ হাজার টাকার এক কেতা চেক—ইম্পীরিয়েল ব্যাঙ্কের ওপর, নরনারায়ণের নামে!—যাহাকে বরাবর তিনি অপদার্থ সাব্যস্ত করিয়া আসিয়াছেন, একটু পূর্ব্বেও আপনার অন্নসংস্থানে অক্ষম বলিয়া উপহাস করিয়াছেন! তাঁহার মুখ হইতে সহসা বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

আর মালতী?—কে যেন তাহার পিঠের উপর সজোরে হাণ্টার হাঁকাইয়া সে দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দিল—ছবি বিক্রীর সব টাকাই আপনি বুঝে নেবেন!

নরনারায়ণের সৌভাগ্যের ইতিবৃত্তটুকু তখনও সমাপ্ত হয় নাই, বিস্মিত দাদামহাশয়কে চমৎকৃত করিয়া সে কহিল,—জানেন ত আপনি দাদামশাই, ভগবান্ যখন সদয় হন, ছপ্পর ফুঁড়েই দেন সব দিক্ দিয়ে! এত দিনে তিনি বোধ হয় এ গরীবের দিকে চক্ষু তাঁর মেলেছেন। এই সূত্রে বড় পায়ার একটা চাকরীও পেয়েছি, দাদামশাই!

—চাকরী! কি রকম চাকরী? ছবি তোলবার না কি? কত মাইনে হ'ল?

—মাইনে আপাততঃ পাঁচশো, এর ওপর ভাতা আছে। আপনার বোম্বায়ের কাছাকাছি—পুনায়।

হর্ষোৎফুল্লমুখে দাদামহাশয় কহিলেন,—বেশ, বেশ, শুনে ভারি খুসী হলুম, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরসুখী হও।—কথার সঙ্গে সঙ্গে চেকখানি নরনারায়ণের হাতে ফিরাইয়া দিতে উদ্যত হইতেই সে সসম্ভ্রমে কহিল,—আপনার কাছেই ওখানা এখন থাক, দাদামশাই ও ব্যাঙ্কে আপনার একাউন্ট ত আছে, আপনিই ভাঙ্গিয়ে আজ পর্য্যন্ত আপনার যা পাওনা আমার কাছে, সমস্ত কেটে নিয়ে আমাকে বাকিটা ফিরিয়ে দেবেন।

দাদামহাশয় দৃষ্টি কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন, আমার দেনা তা হ'লে টাকা দিয়েই তুমি শোধ করতে চাও নরু···আমার দেওয়া ছবিগুলোর গতিমুক্তি তা হ'লে কিছুই করনি এখনও?

নরনারায়ণ মিনতির সুরে কহিল,—অমন কথা বলবেন না, দাদামহাশয়। আপনার ঋণ আমি সারা জীবনেও শুধ্‌তে পারব না, আপনার আশ্রয়ে এসেই না আমার এই উন্নতি! আপনার ছবিগুলো আমি সব শেষ ক'রে দেব, তবে তার জন্য মজুরী কিছু নিতে পারব না, এ বিষয়ে আমাকে মাপ করতে হবে। হাঁ,—তবে আমি একবারে নিশ্চিন্ত হয়েও ব'সে নেই, শুধু যে নিজের কাযই গুছিয়েছি, তা নয়, আপনার কাযও কিছু করেছি, অন্ততঃ এমন একখানা এঁকে ফেলেছি, আপনাকে দেখিয়ে হয় ত আনন্দ দিতে পারব। মালতী দেবী! আপনাকেও সে ছবিখানা দেখতে হবে, কেন না, আমি আপনার সামনে জোর ক'রে তার সম্বন্ধে কথা কয়েছিলুম

দ্বারটি খুলিতেই সদ্যঃসম্পন্ন তৈলচিত্রখানি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এ চিত্রখানি দেখিয়া আনন্দে বিস্ময়ে অতীতের স্মৃতির আকর্ষণে দাদামহাশয় অভিভূত, তাঁহার মুখে কথা নাই, দুই চক্ষুর পল্লব যেন পড়িতে চায় না! প্রায় পাঁচটি মিনিট ছবিখানির দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি কহিলেন,—আমার মনে হচ্ছে, নরু, তুমি যেন আমার হারানিধিকে ফিরিয়ে দিলে এই ছবির ভেতরে। এখন তোমাকে বলছি শোন, এটি আমার মেয়ে, ছোট মেয়ে, বারো বছর হ'ল তাকে হারিয়েছি, কিন্তু সেই থেকে এমন একটি দিন নেই—আমরা স্বামি-স্ত্রী তার কথা না ভেবেছি।

দাদামহাশয়ের স্ত্রীও ছবিখানি দেখিতে স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া আর্ত্তস্বরে তিনি কহিলেন,—মা আমার থাকলে অত বড়টিই হতেন, আর ঠিক—

স্ত্রীর কথার মর্ম্ম বুঝিলেন দাদামহাশয় একা। কাহার মত সে বড়টি হইত—বাঁচিয়া থাকিলে, আকৃতিও ঠিক কাহার মত দেখাইত! নরনারায়ণের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—তোমার কাছে কিছুই লুকাবো না নরু, আমার প্রকৃতি ত তুমি জানই। একটু কিছু অন্যায় বুঝলেই ক্ষেপে উঠি। মালতীর চিঠিতে এখানকার ব্যাপার জেনে তোমার দিদিমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। মেয়ে-জামাইরাও সেখান থেকে রওয়ানা হবে আজ। আমার আর তর সইল না। আমার তার পেয়ে মালতীর মা মালতীকে নিয়ে ষ্টেশনে গিয়েছিল। সারা পথ আমি বলতে বলতে এসেছি, যাচ্ছেতাই অপমান ক'রে তোমাদের বাড়ী থেকে বার ক'রে দেব,—আরও কত কদর্য্য কল্পনাই মনে উঁকি দিয়েছিল। কিন্তু ওপরে এসে মেয়েটিকে দেখেই আমার সে তেজ, অত গায়ের জালা, রাগ-আক্রোশ সব যেন এক মুহূর্ত্তে জল হয়ে গেল! কেন জান? এই ঢল-ঢলে ভাসা ভাসা চোখ, এই টানা জোড়া-ভ্রূ, মুখের এই ছাঁদ—বারো বছর ধ'রে যা চোখের ওপর ভাসছে—ঐ মেয়েটির মুখে যেন তারই ছাপ দেখলুম! তার পর, কি মিষ্ট কথা, অথচ তাতে কি তেজ মাখা! মুগ্ধ হয়ে গেলুম!

নরনারায়ণ দাদামহাশয়ের কথাগুলি শুনিয়া উল্লাসে গাঢ়স্বরে কহিল,—এই ছবিখানি শেষ ক'রে, এঁদের দুজনের মধ্যে কতকগুলো সাদৃশ্য আমিও লক্ষ্য করেছি, দাদামশাই! আপনি শুধু চোখ আর ভ্রূ দেখছেন, ছবিতে ওঁর চিবুকটির

কোলে জোড়া তিলটি যেমন দেখছেন, ঠিক ঐ রকম তিল ওঁরও মুখে ঠিক ঐখানটিতে আছে। এমন সাদৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না। তবে এঁর মুখের আর একটু বিশেষত্ব আছে; আপনি বোধ হয় সেটুকু লক্ষ্য করবার অবকাশ এখনও পাননি,—হাসলেই গাল দুটিতে টোল খায়——

দাদামহাশয়ের স্ত্রী কহিলেন,—আমার মীনাও হাসলে মুক্তা ঝরত নরু, দুটি গালে টোল খেয়ে যেত! পাথুরী মেয়েগুলো পর্য্যন্ত অবাক্ হয়ে মার দিকে চেয়ে থাকত!

দাদামহাশয় সহসা গম্ভীর হইয়া প্রশ্ন করিলেন, তোমার স্ত্রীর জন্মস্থান কোথায়, নরু?

—পশ্চিমের কোনও একটা প্রসিদ্ধ সহরে তিনি প্রতিপালিতা হয়েছিলেন।

—ওঁর পিতৃকুলের পরিচয়?

—এখনও পর্য্যন্ত অজ্ঞাত, দাদামশাই!

শান্তমণির কণ্ঠ আবার ঝঙ্কার দিয়া উঠিল,—শোনো কাকা, শোনো! বিশ্বাস এখন হ'ল ত!

দাদামহাশয় তাহার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই কহিলেন, —তবে কোন্ সাহসে তুমি ওঁকে বিবাহ করেছ, নরু?

নরনারায়ণের কণ্ঠ এবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, কহিল, —মায়মুখী হয়ে এখানে এসে যার মুখ দেখেই আপনার কঠোর মন গ'লে যায়—বংশপরিচয় না পেয়েও তাকে গ্রহণ করা আমার পক্ষে কি অস্বাভাবিক হয়েছে, দাদামশাই? সংসারে আগে পেছনে চাইতে যার কেউ নেই?

—বংশপরিচয় ছাড়া ওঁর প্রকৃতির আর কি পরিচয় তুমি পেয়েছ, নরু?

—প্রচুর দাদামশাই, প্রচুর! মুখে ব'লে শেষ করা যায় না; বিদ্যা, বুদ্ধি, সাহস, আত্মসম্মানবোধ, সন্ন্যাসিনীর মত নির্ম্মল চরিত্র,—সে সব উপন্যাসের মত রোমাঞ্চকর! কিন্তু এই পর্য্যন্ত দাদামশাই,—এর বেশী কিছু বলতে পারব না, আপনিও জানতে চাইবেন না—এই প্রার্থনা।

—আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, নরু,—বড় কৌতূহল হচ্ছে, শুধু একটি কথা জানবার জন্য!

—বেশ, আজ্ঞা করুন।

—শৈশবের কোনও কথাই কি ওঁর স্মরণ নেই? ঠিক জান?

—খুব শৈশবেই উনি হারিয়ে যান।

—হারিয়ে যান! উনি বলেছেন? সত্যই হারিয়ে গিয়েছিলেন? কোথায়—তা কিছু বলেছেন? বল, বল,—নরু, বল!

—পরে শুনেছিলেন—প্রয়াগে, কুম্ভমেলায়।

—কুম্ভমেলায়! মীনাকেও যে আমরা ঐ মেলায় হারিয়েছিলুম—বারো বছর আগে! ওঃ! হোঃ! দাদামহাশয় সদ্য শোকাতুরের মত আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন! তাঁহার পত্নীর দুই চক্ষুও অতীতের সেই ভয়াবহ দিনটির কথায় অশ্রুময় হইয়া উঠিল। নরনারায়ণের উদ্বেলিত চিত্তে মুক্তির সে দিনের কথাগুলি জীবন্ত চিত্রের মত যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল!

হঠাৎ নরনারায়ণের হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া দাদামহাশয় ব্যগ্রভাবে কহিলেন,—আর একটি কথা জানতে চাই, নরু—শুধু একটি কথা,—ওঁর কাঁধের নীচে আশ্চর্য্য রকম কোনও চিহ্ন তুমি লক্ষ্য করেছ?

মুখখানি নীচু করিয়া নরনারায়ণ উত্তর দিল,—সে সৌভাগ্য আমার এখনও হয়নি, দাদামশাই!

দাদামহাশয়ের মুখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল, কহিলেন,—এ কথার অর্থ কি, নরু? তুমি ওঁকে বিবাহ করেছ বললে না?

নরনারায়ণ নম্র সুরে উত্তর দিল,—আমি ওঁকে গ্রহণ করেছি, রক্ষার ভার নিয়েছি, উনিও সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণীরূপে এই অকর্ম্মার ভারটুকু গ্রহণ করেছেন,—কিন্তু লৌকিক বন্ধন ত এখনও পড়েনি, দাদামশাই! মাথার ওপর আপনি রয়েছেন—আপনাকে ছেড়ে কি সে শুভকর্ম্ম হ'তে পারে?

দাদামহাশয় যেন আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন,—তোমার মুখে এ কথা শুনে সত্যই খুসী হলুম, নরু।

স্বামীর উক্তির সমর্থন করিয়া গৃহিণী কহিলেন,—সেই জন্যই মেয়েটির সীঁথেয় সিঁদুর দেখিনি বটে! বিয়ে তা হ'লে এখনও হয়নি!

দাদামহাশয় গৃহিণীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—একবার ও ঘরে এসো ত গিন্নি! শুধু তুমি, আর—আমি।

* * * *

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে মুক্তির হাত দুইখানি ধরিয়া দুই জনে ছবিঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই মুখের ভাবটুকু তাঁহাদের আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত

হইয়াছে, তৃপ্তির আনন্দে তিনখানি মুখ ঝলমল করিতেছিল !

দাদামহাশয় কহিলেন,—মীনার বাঁ কাঁধের নীচে লাল রঙের আশ্চর্য্য রকমের একটা জড়ুল ছিল ; ঠিক সেই জড়ুল দেখেছি এরও কাঁধে—ঠিক সেই যায়গায় । এখন তোমার কি মনে হয়, নরু ?

নরু নিরুত্তরে নীচু মুখখানি উঁচু করিয়া মুক্তির মুখের দিকে চাহিল,—উভয়ের চোখোচোখির ভাষা মনে মনে উভয়েই পাঠ করিল কি ?

গৃহিণী আনন্দাতিশয্যে আবেগের সুরে কহিয়া উঠিলেন,—ওরে শান্ত ! হারাধন আমরা ফিরে পেয়েছি ; এ যে—মীনা, আমাদের—মীনা, সেই—মীনা !

সঙ্গে সঙ্গে দুই হাতে মুক্তিকে তিনি বুকে জড়াইয়া ধরিলেন ।

দাদামহাশয় ভাবোদ্বেলিত-হৃদয়ে নরনারায়ণকে আলিঙ্গন করিয়া গাঢ়স্বরে কহিলেন,—মীনাকে তুমিই মুক্ত করেছ ; ছবির মীনাও তোমার, জীবন্ত মুক্তিও তোমার ।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ।

শিব-তাণ্ডব

রুদ্র শ্মশান ! ক্রুদ্ধ ঈশান ধ্বংস-বিষাণ করে
তাতা-থৈ থৈ নাচিতেছে ঐ—কাঁপে ধরা পদ-ভরে !
ভয়ে থর-থর কাঁপে রবি-শশী !
পথ-হারা গ্রহ-তারা পড়ে খসি !
কাঁদে দশদিক—এ কি ঘন মসী ছাইল রে চরাচরে !
রুদ্র শ্মশান ! ক্রুদ্ধ ঈশান ধ্বংস-বিষাণ করে
তাতা-থৈ থৈ নাচিতেছে ঐ—কাঁপে ধরা পদভরে !

ব্যোম্—হর হর গরজে সাগর কোটি অজগর-রবে,
ভাঙ্গি জন-পদ ছোটে নদী-নদ গণিছে বিপদ সবে ।
কাঁপে ভিখারিণী পর্ণ-আসনে,
কাঁপে রাজ-রাণী স্বর্ণ-ভূষণে,
কুসুম-কাননে কাঁপিছে কামিনী দয়িতের বাহু'পরে !
রুদ্র শ্মশান ! ক্রুদ্ধ ঈশান ধ্বংস-বিষাণ করে
তাতা-থৈ থৈ নাচিতেছে ঐ—কাঁপে ধরা পদ-ভরে !

ভস্ম ভূষিত বিশ্ব-শ্মশানে দাউ দাউ চিতা জ্বলে,
ব্যাবিলন-ক্রীট মিশর-মহিমা লুকায় তাহার তলে ।
কত কার্থেজ-ফিনিশিয়া ট্রয়
মরণ-সাগরে লভিতেছে লয়,
কত মহাতেজা সম্রাট-রাজা পর্ণের প্রায় ঝরে !
রুদ্র শ্মশান ! ক্রুদ্ধ ঈশান ধ্বংস-বিষাণ করে
তাতা-থৈ থৈ নাচিতেছে ঐ—কাঁপে ধরা পদ-ভরে !

ক্রুদ্ধ কালের রুদ্র রোষেতে ঝঞ্ঝা বহিছে বেগে,
লক্ষ-লক্ষ সুপ্ত রক্ষ উঠিল যেন রে জেগে !
প্রতি পরমাণু পাগলের পারা !
জীবন জুড়িয়া ধ্বংসের ধারা !
দেবতা-দানব স্তম্ভিত সব—মুখে নাহি কথা সরে !
রুদ্র শ্মশান ! ক্রুদ্ধ ঈশান ধ্বংস-বিষাণ করে
তাতা-থৈ থৈ নাচিতেছে ঐ—ধরা কাঁপে পদ-ভরে !

বিশ্ব-প্রকৃতি টলমল করে চণ্ড-চরণ-চাপে,
তল-রসাতল পাতাল-বিতল ভূলোক-দ্যুলোক কাঁপে !
দেখি রুদ্রের তাণ্ডব নাচ
নাচে কবন্ধ—প্রমথ-পিশাচ !
ভূকম্প সনে মহামারী নাচে অযুত বজ্র স্বরে !
রুদ্র শ্মশান ! ক্রুদ্ধ ঈশান ধ্বংস-বিষাণ করে
তাতা-থৈ থৈ নাচিতেছে ঐ—ধরা কাঁপে পদ-ভরে !

দীর্ঘ দিবস ব্যথিতা বসুধা যাদের অত্যাচারে,
দম্ভ-দৃপ্ত দানবের দল কম্পিত ভীতি-ভারে ।
অরণ্য-হিয়া উঠিছে কাঁপিয়া,
মহা-মহীরুহ পড়ে উপাড়িয়া,
"সম্বর হর—দীনে দয়া কর" উঠে ধ্বনি ঘরে-ঘরে !
রুদ্র শ্মশান ! ক্রুদ্ধ ঈশান ধ্বংস-বিষাণ করে
তাতা-থৈ-থৈ নাচিতেছে ঐ—কাঁপে ধরা পদ-ভরে !

মহা-আকাশের বক্ষ ব্যাপিয়া কাঁপে হর-জটাজুট !
জড়ায়ে জটায় গরজে ভুজগ উগারিয়া কালকূট !
বব-ব্যোম-ব্যোম ধ্বনি উঠে গালে !
ধ্বক্-ধ্বক্ জ্বলে ক্রোধানল ভালে !
ত্রিলোক দলিতে ত্রিনেত্র হ'তে প্রচণ্ড প্রভা ক্ষরে !
রুদ্র শ্মশান ! ক্রুদ্ধ ঈশান ধ্বংস-বিষাণ করে
তাতা-থৈ-থৈ নাচিতেছে ঐ—কাঁপে ধরা পদ-ভরে !

কে ডাকিল ঐ—মা ভৈঃ মা ভৈঃ ! দেখ জ্ঞান-আঁখি খুলে,
জন্ম-মৃত্যু সৃষ্টি-প্রলয় একই তত্ত্ব মূলে ।
ধাইছে ধ্বংস এক পদ-পাতে,
জাগিছে জীবন অন্তের সাথে,
অপূর্ব্ব লীলা ! ভাঙ্গি এক হাতে—অপর হস্তে গড়ে !
রুদ্র শ্মশান ! ক্রুদ্ধ ঈশান ধ্বংস-বিষাণ করে
তাতা-থৈ-থৈ নাচিতেছে ঐ—কাঁপে ধরা পদ-ভরে !

শ্রীসুরেশচন্দ্র কবিরত্ন সাহিত্য-বিশারদ ।



(উপন্যাস)

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

নীপু

লীনা কোন কথা বলিল না। রাধাবিনোদ কহিল—ক্ষমা করবে না ?

উদ্ভ্রান্ত একটা নিশ্বাস চাপিয়া লীনা কহিল—কি অপরাধ তুমি করেচো যার জন্ত এমন করে আমার ক্ষমা চাইছো !

রাধাবিনোদ কহিল—কু-কথা বলে তোমায় অপমান—সে যদি অপরাধ না হয় তো সে কি, লীনা ?

লীনা কহিল—কু-কথা বলোনি, রাধদা। তুমি সত্য কথাই বলেচো ! তোমার বাড়ীতে বাইরের একজন পুরুষ-মানুষের সঙ্গে গভীর রাত্রে বসে আমার মত বয়সের মেয়ে কথা কইলে সে কথাকে ভাগবত-কথা হচ্ছে বলে কেউ মনে করবে না ! সে কথা যে প্রেমের কথা—তাতে কারো সন্দেহ করবার কারণ নেই ! কাজেই তুমি কু-কথা বলোনি। কুণ্ঠিত হয়ে ক্ষমা চাইবার মত কোন অপরাধ তুমি করোনি। অন্যায় আমার ; আমি ক্ষমা চাইছি !

কথাটা বলিয়া মৃদু হাস্য করিয়া লীনা সেখান হইতে চলিয়া গেল। রাধাবিনোদ মূঢ়ের মত ক্ষণেক নির্ব্বাক্ দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর আসিল নিজের ঘরে। ভাবিল, এত কিসের রাগ ! ক্ষমা চাহিলাম, তবু অমন ব্যঙ্গের বাণে বিদ্ধ করিয়া···

ভাবিতে ভাবিতে তার সারা মন রাগে তাতিয়া উঠিল। না, সে কোনো অপরাধ করে নাই। কথায় হয়তো কোনো দোষ সত্যই ছিল না। তবে লীনা এমন অবুঝ—আর-পাঁচজনে হয়তো যা-তা ভাবিয়া মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করিতে পারে ! সে অপবাদ বাঁচাইয়া মেয়েদের এদেশে কত সাবধানে চলিতে হয়, বোঝে না ? বুঝিয়া চলার প্রয়োজন আছে !

কিন্তু লীনা তো বুঝিবে না, তার ভালোর জন্যই রাধাবিনোদ এ-কথা বলিয়াছে !

বলিবার তার কি অধিকার ? অধিকার আছে বৈ কি ! তাকে তো লীনা দাদা বলিয়া ডাকে ! সত্য-সম্পর্কে বোন না হইলেও লীনাকে রাধাবিনোদ সত্যকার বোন হইতে তফাৎ করিয়া দেখে নাই কোনোদিন ! সে জানে, লীনার মনে রোমান্সের ঝড় বহিতেছে ! সে-ঝড়ের ঝাপটা রাধাবিনোদকে আঘাত করে নাই, এমন নয়। সে বলিয়াই সে ঝাপটা ঠেলিয়া দিয়াছে—উভয়ের মঙ্গলের জন্য ! অপর-লোক যদি অত খানি বুঝিয়া নিজেকে সম্বরণ করিতে না পারে ! তাহা হইলে কত বড় বিপত্তি ঘটিয়া যাইবে ? শুধু কি লীনাই···

লীনা বলিল,— এ গৃহ হইতে কাল চলিয়া যাইবে ! কোথায় যাইবে ? প্রতাপের কাছে যদি যায়, ভালো ! কিন্তু তা কি যাইবে ? প্রতাপের সঙ্গে লীনার যা সম্পর্ক···

মনে হইল, কণিকা থাকিলে ভালো হইত ! সে স্ত্রীলোক—কথাটা লীনাকে ভালো করিয়া বুঝাইতে পারিত ! তার সঙ্গে কণিকার অন্তরঙ্গতা না থাকিলেও কণিকার বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে, সে-পরিচয় রাধাবিনোদ পাইয়াছে।

কি কথা বলিয়া লীনাকে বুঝাইতে হইবে—কণিকা

তাহা না বুঝিলেও রাধাবিনোদ কণিকার মারফৎ সে বিষয়ে প্রচুর উপদেশ দিতে পারিত!

এখন সে কি করিবে? চেঁচামেচি করিয়া লাভ নাই। পাঁচজনকে লইয়া এ-বিষয়ে আলোচনা-পরামর্শ করাও চলে না!

অজিতকে স্পষ্ট বলিবে? না। বলা যায় না। সে যদি এমন ইঙ্গিত করিয়া বসে সে লীনা তাকে···

রাধাবিনোদ শিহরিয়া উঠিল। সর্ব্বনাশ! তাও কি হয়! অসম্ভব!

এমনি পাঁচরকম চিন্তার মধ্যে ঘুম আসিয়া দুচোখে কখন্ চাপিয়া বসিল, রাধাবিনোদ জানিতে পারিল না।

সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে প্রথম চিন্তা জাগিল, লীনা! সে কি করিতেছে? রাত্রিতে ঘুমাইয়াছে তো?

মুখ-হাত ধুইয়া সে ছুটিল লীনার সন্ধানে। একটা বড় দালান ঘুরিয়া ও-দিককার বারান্দার ধারের ঘরে লীনা শোয়। সে ঘরের সামনে গিয়া দেখে,—দ্বার খোলা।

বাহির হইতে ডাকিল,—লীনা···

লীনা কহিল,—রাধদা! এসো···

লীনার স্বর সহজ।

রাধাবিনোদ ঘরে ঢুকিল। লীনার স্নান হইয়া গিয়াছে—বড় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া সরু চিরুনীর ডগায় সিঁদুর তুলিয়া সীমন্তের উপর লীনা সযত্নে রেখা টানিতেছে!

রাধাবিনোদের পানে ফিরিয়া লীনা কহিল,—কোনো কাজ আছে?

রাধাবিনোদ কহিল,—একটু গল্প করতে এলুম। বসবো?

হাসিয়া লীনা কহিল,—নিশ্চয়। অতিথি তুমি, তোমায় ফেরাবো কি বলে?

—ও!

রাধাবিনোদ খাটের উপর বসিল। ঘরের চারিদিকে চাহিল; দেওয়ালের গায়ে প্রতাপের একখানি ফটো ফ্রেমে আঁটা। মনে মনে ভাবিল, লীনার নিষ্ঠা আছে!

সীমন্তের প্রসাধন শেষ হইলে লীনা চিরুণী রাখিয়া ফিরিল, কহিল,—কি কথা? বলো।

রাধাবিনোদ কহিল,—আজ এ ভোরের আলোটুকু বড় ভালো লাগচে!

লীনা কহিল,—বটে! ছাখো, পৃথিবীতে বুঝি নূতন সূর্য্যোদয় হলো!

—তার মানে?

—মানে তুমি জানো! আমার কাছে এ আলো নিত্য দিনের মতই সাধারণ মনে হচ্ছে। কোনো রকম অসাধারণত্ব দেখচি না।

রাধাবিনোদ কহিল,—প্রতাপ বাবুর এ ছবি এখানে টাঙালো কে?

লীনা কহিল,—আমি।

—আগে দেখিনি।

লীনা কহিল,—টাঙানো ছিল না; ছিল আমার বাক্সে। কাল রাত্রে বাক্স থেকে বার করে দেওয়ালে টাঙিয়েচি—মাথার সামনে। একটু কাব্য বলে মনে হচ্ছে—না?

কথাটা বলিয়া লীনা হাসিল।

অপ্রতিভের মত রাধাবিনোদ চুপ করিয়া রহিল; কোনো কথা বলিতে পারিল না। মনে হইল, লীনা সারা জীবন এমনি হেঁয়ালি রহিয়া গেল! সাধারণ মানুষের মত সাদা কথা কখনো বলিবে না!

লীনা কহিল,—চুপ করে রইলে যে!

রাধাবিনোদ কহিল,—কি কথা কইবো—বলো।

লীনা কহিল,—তুমিই জানো। বললে, এসেচো গল্প করতে আমার সঙ্গে।

রাধাবিনোদ কহিল,—তুমি গল্প বলো। আমি শুনি।

লীনা কহিল,—ও! তা আমি খুব ভালো গল্প জানি। লীনা রাধাবিনোদের পানে চাহিয়া রহিল।

রাধাবিনোদ কহিল,—বলো।

লীনা কহিল,—চা খেয়েচো?

—না।

—তবে একটু বসো—তোমার চায়ের ব্যবস্থা করি।

রাধাবিনোদ কহিল,—সে ব্যবস্থা চাকররা করবে'খন। নাই বা তুমি ব্যস্ত হলে!

লীনা কহিল,—তারা তো জানে না, তুমি এখানে আমার ঘরে আছো। তাদের খপর দি···

—দাও।···

লীনা বাহিরে গেল; ফিরিল তখনি। ফিরিয়া কহিল,—বলে এসেচি। চা এই ঘরে নিয়ে আসবে।

রাধাবিনোদ কহিল,—তুমি চা খাবে না?

লীনা কহিল,—না! ছেড়ে দিয়েছি। বদ নেশা!

রাধাবিনোদ হাসিল, হাসিয়া কহিল,—ভালো! তা, এবারে তোমার কি গল্প আছে, বলো…

লীনা কহিল,—বলচি। কিন্তু মনে করো না, এ গল্প আমি তৈরী করেছি। বইয়ে পড়া গল্প। এর মধ্যে গভীর অর্থ খুঁজো না। গল্পকে গল্প বলেই জেনো—বুঝলে!

রাধাবিনোদ কহিল—ভূমিকা রেখে গল্প বলো।

লীনা কহিল—শোনো…

—মস্ত পুরী। পুরীতে রাজা আছেন, রাণী আছেন, দাস-দাসী আছে, শান্ত্রী-পাহারা আছে। ঐশ্বর্য্য প্রচুর। পুরীর এক কোণে পড়ে থাকে এক অন্ধ বালিকা। দু'চোখের দৃষ্টি বন্ধ। কিছু দেখে না; তবে কাণে শোনে পুরীর যত প্রাণীর হাসি গল্প কথা গান। এ হাসি-গান-গল্পের স্পর্শে মনে মনে সে কত রঙের ছবি আঁকে। সাধ হয়, ওদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সেও ওদের সঙ্গে কথা কয়, গান গায়। কিন্তু সে অন্ধ—সকলে তাকে ভিন্ন জগতের জীব বলে মনে করে। তাকে দয়া করে, মমতা করে—কিন্তু কাছে ডেকে তার সঙ্গে কথা কয় না, গানও শোনায় না! তার সাধ হয়, সকলের সঙ্গে মেশে। কিন্তু এ সাধ মনে জেগে মনেই মিলিয়ে যায়! একদিন আকাশে মেঘের পর মেঘ জমে প্রচণ্ড ঝড় উঠলো…

সহসা ওদিকে বাহিরে সদরে জাগিল নীপুর কণ্ঠস্বর—রাধদা…

চমকিয়া রাধাবিনোদ কহিল,—নীপু এলো না কি!

উচ্ছ্বাস-ভরে লীনা কহিল,—তাহলে বৌও এসেচে। আঃ, বাঁচলুম!

লীনা আর এক মুহূর্ত্ত বসিল না; তখনি বাহিরে চলিয়া গেল। রাধাবিনোদ গুম হইয়া বসিয়া রহিল—নড়িল না।

সাধু চায়ের পেয়ালা লইয়া প্রবেশ করিল। রাধাবিনোদ কহিল—তোর নীপুদা এলো না কি?

সাধু বলিল, সে জানে না। সে ছিল অন্দরে…

পেয়ালা রাখিয়া সাধু চলিয়া গেল। রাধাবিনোদ চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া সদর বাড়ীর বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল; নীচে নীপু তখন সতেজে হাঁকিতেছে,—ট্যাক্সির ভাড়াটা রাখো—স'তিন টাকা! জিনিষপত্র দেখে-শুনে নামিয়ে নাও। বৌঠাকরুণের জিনিষপত্র যাবে তাঁর ঘরে; আমার স্যুটকেশটা আমার ঘরে রাখবে!

আদেশ দিয়া নীপু দোতলায় উঠিয়া আসিল। রাধাবিনোদ কহিল,—এসো। মোটা হওনি তো! যেমন তেমনি আছো! পশ্চিমী হাওয়ায় কিছু হলো না।

নীপু কহিল—না। হাওয়া আর খেলুম কোথায়, বলো! যে যুদ্ধ সেখানে চলেছিল! তোমার শ্বশুর মশায়কে আঁকড়ে কোনোমতে ইহলোকে টেনে রেখেছি!…যে-মূর্ত্তিতে তিনি দেশে ফিরেচেন, দেখলে শিউরে উঠবে!

রাধাবিনোদ কহিল—এখানে এসেচেন?

নীপু কহিল—না। অনেক বলেছিলুম, এলেন না। তাঁকে তাঁর বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে আসচি। বৌঠাকরুণও সেখানে নেমেচেন। তাই কি তোমার শ্বশুরমশায় সেখানে তাঁকে নামতে দ্যান! বলেন, না, নিজের সংসারে ফিরে যাও। শেষে সর্ত্ত হলো, বেশ, এখন তিনি সেখানে নামবেন,—তারপর স্নানাহার সেরে সেখানে সব গোছগাছ করে বৌঠাকরুণকে এখানে তাঁর নিজের গৃহে আসতে হবে। তাঁর লগেজ-পত্তর সে বাড়ীতে নামবার অধিকার পায়নি—শ্বশুরমশায়ের হুকুম ভারী কড়া!

রাধাবিনোদ কহিল—এর মানে?

নীপু কহিল—মানে খুব আছে এবং সে-মানে তুমি জানো। তাঁর জীবনে তোমার এ ঔদাস্য কাঁটার মত বিঁধে আছে। সত্যি, তোমার পাওনাদারদের তুমি যে চোখে দ্যাখো, সে চোখেও শ্বশুরমশায়কে দেখতে নারাজ—এতে…আমায় মাপ করো, দাদা হলেও একটি বিশেষণে তোমাকে শুধু ভূষিত করতে পারি। সে বিশেষণ—cru…! সত্যি, যদি মঙ্গল চাও, তাঁকে বোঝবার চেষ্টা করো, রাধদা! The old man's heart is full of you.

মৃদু-হাস্যে রাধাবিনোদ কহিল—মুখ-হাত ধোও। ধুয়ে চা খাও। তারপর উপদেশের ঝুলি খুলো।

দুজনে ঘরে প্রবেশ করিতেছিল, লীনা আসিয়া কহিল,—এই যে নীপু! ভালো আছ? ওখানকার খপর ভালো?

নীপু সংক্ষেপে জবাব দিল।

লীনা কহিল,—বৌ কোথায় গেল? নীচে তাকে দেখতে পেলুম না। ভাবলুম, যদি সোজা এখানে এসে থাকে…

নীপু কহিল—না। তাঁকে নামিয়ে দিয়ে আসচি তাঁর পিত্রালয়ে। মঙ্গলময় বাবুকেও নিয়ে এলুম কি না। তাঁর শরীর যা হয়েছে, একলা রেখে আসা চললো না। থাকতুম আরো কিছু দিন! তাঁর তাড়া—না, না, নিজের ঘর-সংসার ফেলে আমায় নিয়ে পড়ে থাকতে হবে না! শেষে বলা হলো, বেশ, তাই হবে, আপনাকেও তাহলে কলকাতায় যেতে হবে।

লীনা কহিল—বৌ তাহলে এখানে আসেনি?

নীপু কহিল,—না। ও-বেলায় আসবেন।…ভালো কথা, প্রতাপবাবু সেরেচেন? তিনি কোথায়? আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি। তিনি কোথায়—বলো তো লীনাদি…

লীনা কহিল—তিনি এখানে নেই।

নীপুর দুই চোখে বিস্ময়! সে কহিল—কলেজ জয়েন করেচেন! নাঃ! এই জন্মেই তো শরীর সারে না। ছেলেঠ্যাঙানি ছেড়ে দুদিন একটু আরাম করো! তা নয়। এই যে আমি! কি মজায় আছি! প্রফেসর হলেই কি সহজ বুদ্ধি লোপ পায়।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রতাপ এখানে নাই; লীনার কথায় অভিমান করিয়া চলিয়া গিয়াছে।—শুনিয়া নীপু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল না; চা পান করিয়া তখনি ছুটিল প্রতাপের সন্ধানে।

চাকর-বাকরদের মধ্যে সাধু জানিত প্রতাপের ঠিকানা। সেদিন সে আসিয়াছিল কি একটা জিনিষের জন্য—লীনা ও রাধাবিনোদ বায়োস্কোপে যাইতেছিল; তারা চলিয়া গেলে সাধুর উপর সে-জিনিষ পৌছাইয়া দিবার ভার দিয়া যায়—সাধু গিয়া পৌছাইয়া দিয়া আসে।

ঠিকানা জানিয়া তার বাসায় গিয়া নীপু শুনিল, কালিকার আসাম মেলে প্রতাপ সীলেট চলিয়া গিয়াছে। নীপুর বুকের উপর কে যেন সবলে মুগুর মারিল।

রাগ ধরিল লীনার উপর। অত-বড় মনটার কোনো দাম তুমি বুঝিলে না! তুমি স্ত্রী—এত দিন একসঙ্গে বাস করিয়াও দরদ-ভরে কোনো দিন তার মুখের পানে চাহিয়া দেখিলে না! কেন? না, আজিকার চিত্তহীন অসার কতক-গুলা আমোদ-প্রমোদ হাসি-গান লইয়া এ লোকটি মাতিয়া থাকে না তাই? কিন্তু তোমাকে সে কি স্বাধীনতা দিয়াছে! এই যে তুমি যা খুশী, যেমন তোমার খেয়াল, তাহাই করিতেছ—কোনো দিন তাহাতে একটা নিষেধ-বাণী উচ্চারণ করে না—হাসি-মুখে তোমার সকল স্বেচ্ছাচার মাথায় বহিয়া আসিতেছে! আজ যে এই চলিয়া গিয়াছে, ইহার পিছনে কত বড় অভিমান,—তা যদি বুঝিতে তো কাচের পুতুল সাজিয়া পরের গৃহে ঐশ্বর্য্যের আসনে বসিয়া থাকিতে তোমার ঘৃণা ধরিত!

মনে প্রচণ্ড ঝাঁজ লইয়া সে গৃহে ফিরিল—উপরে উঠিতে দেখা হইল রাধাবিনোদের সঙ্গে। রাধাবিনোদ খবরের কাগজে চোখ দিয়া বসিয়াছিল, নীপুকে দেখিয়া সাগ্রহে প্রশ্ন করিল—প্রতাপবাবুকে আনতে পারলে?

নীপু গায়ের জামা খুলিয়া চেয়ারের উপর ফেলিয়া কহিল—এখানে থাকলে তো আনবো।

রাধাবিনোদ কহিল—তার মানে?

নীপু কহিল—কালকের আসাম মেলে তিনি সীলেট চলে গেছেন।

রাধাবিনোদ এ কথায় ক্ষণেকের জন্য হতভম্ব হইয়া রহিল; পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—কাকেও না বলে?

নীপু কহিল—কাকে বলবেন? কে এখানে তাঁর এমন লোক আছে—যে তত্ত্ব নেবে! তিনি জানেন, তুমি বড় লোকের অকালকুষ্মাণ্ড ছেলে—ইয়ার্কি দিয়ে বিষয় ফুঁকে এখন মস্ত তেজ দেখাচ্ছো—স্ত্রীর বাপের পয়সায় নবাবী করবে না! অথচ কোনো দিকে সাধ-আহ্লাদের কমতি নেই! হাজার হোক, প্রফেসর মানুষ—সহজ বুদ্ধি না থাকুক, বই তো একগাদা পড়েচেন।

রাধাবিনোদ মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিল; ফেলিয়া বলিল—আমায় তুমি এ সব কথা বলতে পারো, নীপু। কথাটা সত্যি! আমার উচিত ছিল, তাঁকে ধরে এখানে ফিরিয়ে আনা। আমার বাড়ীতেই তিনি অতিথি হয়ে এসেছিলেন!

নীপু কহিল—চোর পালালে কারো কারো বুদ্ধি বাড়ে, জানি। কিন্তু সত্যি রাধদা, এ্যাদ্দিন তুমি এখানে করছিলে কি! স্ত্রীর বাপ হলেও শ্বশুর একজন ভদ্রলোক তো বটে—তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ও আছে। তাঁর অত-বড় অসুখে

একখানা চিঠি লিখে কখনো খোঁজ নাওনি। সম্পর্ক না স্বীকার করো, ভদ্রতার খাতিরেও অন্ততঃ খপর নেওয়া উচিত ছিল। ছি ছি, পয়সাই তুমি ওড়াওনি শুধু, সেই সঙ্গে ভদ্রতা উড়িয়ে একেবারে অধম নিঃস্ব হয়ে বসে আছো সকল দিকে! আমার ভালো লাগেনি বৌঠাকরুণের সঙ্গে তোমার ছাড়-ছাড় ভাব! সে বেচারী যেন মস্ত অপরাধ করেছে তোমার মত মহাপুরুষের গলায় মালা দিয়ে! তোমার এ সামান্য সৌজন্য ভদ্রতায় এমন পরিবর্ত্তন ঘটলো কি করে, ভেবে আমি সত্যি আশ্চর্য্য হই, রাধদা!···

এই পর্য্যন্ত বলিয়া নীপু বাক্যের স্রোত বন্ধ করিয়া রাধাবিনোদের পানে চাহিয়া তাকে লক্ষ্য করিল। দেখিল, রাধাবিনোদের মুখ মলিন!

রোষের দাহ নিবাইয়া শান্ত স্বরে সে তখন কহিল,—ভদ্রতা-রক্ষার উপায় এখন শুধু একটি আছে। মানে, এখনি যাও তোমার শ্বশুর মশায়কে দেখতে। পারো, বৌ-ঠাকরুণকে অমনি ফেরবার মুখে তুমি সঙ্গে করে নিয়ে এসো। তিনি আর ক'দিন! বড় আশায় তোমার হাতে একমাত্র কন্যাকে দান করেছেন। শেষের কটা দিন যেন একটু শান্তি পান—এটুকু করা এমনি কঠিন?

রাধাবিনোদ কোনো কথা কহিল না; শুধু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া নীপু কহিল,—কি বলো—যাবে?

রাধাবিনোদ এ প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না।

নীপু বিস্মিত হইল; এবং তার সে বিস্ময়ের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল লীনা।

নীপুকে দেখিয়া লীনা কহিল,—তুমি না বেরিয়েছিলে?

নীপু একটু কঠিন স্বরে জবাব দিল,—বেরিয়েছিনুম এবং ফিরে এসেচি···

লীনার পানে চাহিয়াই সে এ-কথা বলিল। লীনা কহিল,—তা তো দেখতে পাচ্ছি।

নীপু কহিল,—একা ফিরেচি—এতে বোধ হয় আশ্চর্য্য হচ্ছো!

লীনার বুকখানা একটু দুলিল। এ লোকটির সে সহজ প্রফুল্ল মেজাজ আজ কোথায় গেল! আসিয়া পর্য্যন্ত বকাবকি করিতেছে! তবু পাছে নীপু আঘাত দেয়! সে আঘাত মর্ম্মান্তিক বাজিবে! ইহা মনে করিয়া সে কহিল,—আমি জানতুম, শুধু হাতেই তুমি ফিরে আসবে।

নীপু কহিল,—বুঝেছিলে যদি তো বারণ করোনি কেন?

লীনা কহিল,—আমার দরকার?

স্থির অবিচল দৃষ্টি লীনার মুখে ক্ষণেক নিবদ্ধ রাখিয়া নীপু কহিল,—তা বটে। ওঁর স্বামী অভিমান করে চলে গেলেন—ওঁর কি দরকার সে স্বামীকে ফিরিয়ে আনবার! এঁর স্ত্রী মলিন মুখে থাকেন—এঁর কি দরকার তার সন্ধান রাখবার! তাই ভাবি লীনাদি, এমন রাজযোটক মিল পাশাপাশি থাকতে দু'জায়গা থেকে দুজন অপরিচিত ব্যক্তিকে এনে এ-দুর্গতি কেন ভোগ করালে!

লীনার সারা অঙ্গ ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠিল। সবলে অধরে হাসি আনিয়া লীনা কহিল,—মিছে তোমার উপদেশ দেওয়া, ভাই!

নীপু কহিল,—জগতে মিছে কিছু নেই লীনাদি—সব সত্য! এত বুদ্ধি নিয়ে এটুকু কেন বোঝো না, তাই ভাবি।

লীনা কহিল,—যাক, ও নিয়ে তর্ক করে কোনো ফল যখন হবে না, তখন কেন আর বকে কষ্ট পাও! তুমি এসেচো—আমি ঠাকুরকে বলি। কখানা লুচি ভেজে দিক! কখন সেই খেয়েচো···

নীপু কহিল,—না, এখন কিছু খাবো না। খাবার যত্ন ছেড়ে যা বলি, শোনো। প্রতাপ বাবুকে যে আনতে পারলুম না, তার কারণ, তিনি এখানে নেই। কাল তিনি সীলেট চলে গেছেন!

এ-কথাটা ভারী পাথরের মত লীনার বুকে আসিয়া লাগিল। এমন নিঃশব্দে চলিয়া গিয়াছে! তাকে এখানে এই সব লোকের সামনে এমন অপদস্থ করিয়া···এতখানি ছোট করিয়া! ইহারা ভাবিতেছে, ভারী তেজ দেখাইয়া ছিলে! এখন তাঁর তেজ ছাখো!

এমন তো কখনো হয় নাই। চিরদিন লীনা রাগ করিয়াছে, তর্ক করিয়াছে—প্রতাপ সে রাগ মুছিয়া দিয়াছে, সে তর্ক নিঃশব্দে গায়ে মাখিয়াছে! আর আজ?

বর্ষার জলে ফুলের পাপড়ির বাঁধন যেমন শিথিল হইয়া

যায়, গাছ নাড়া দিলে সে পাপড়ি ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়ে—লীনার মনের মধ্যে যা-কিছু ছিল, সেগুলাও তেমনি ঝরিয়া খশিয়া পড়িতে লাগিল!

কোনোমতে নিশ্বাস চাপিয়া এ নিঃস্বতা গোপন করিবার অভিপ্রায়ে সে কহিল,—বৌ আসবে ওবেলায়—না? তুমি গিয়ে নিয়ে আসবে? না, ওখান থেকে কারো সঙ্গে আসবে?

নীপু কহিল,—রাধদা স্নানাহার সেরে সেখানে যাবে ওর শ্বশুর মশায়কে দেখতে···ফেরবার সময় বৌঠাকরুণকে অমনি নিয়ে আসবে।· তারপর রাধাবিনোদের পানে চাহিয়া কহিল,—কেমন রাধদা, এই কথাই ঠিক তো?

রাধাবিনোদ কোনো কথা বলিল না।

লীনা কহিল,—যখন যাবে,···আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেয়ো। বৌয়ের বাপের অমন অসুখ—আমি একবার দেখতে যাবো।

নীপু কহিল,—তাহলে আমিও যাবো। তুমি আর আমি আলাদা আসবো লীনাদি—রাধদার সঙ্গে বৌঠাকরুণ আসবেন। এ খুব ভালো ব্যবস্থা হবে!

[ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

পুরাতন বন্ধু

গায়ে কতগুলা পশম কি তুলা—খাড়া হয়েছিল রোঁয়া,
নাড়া দিলে খালি ঝরে ধূলাবালি—বরাতে পড়েনি ধোয়া;
এ-পিঠে ও-পিঠে ধরিয়াছে চিটে তেলে ও বর্ম্মে জমি'—
বয়সে প্রাচীন ক্ষয়ে তনু ক্ষীণ—ওজনে হয়নি কমি।
বাপ, খুড়ো কিম্বা দাদামশায়ের আমলে হয়েছে কেনা—
নাই সে ঠিকানা কম্বলখানা তবু সকলের চেনা।

ইতালি অথবা বিলাতী অথবা অমৃত-সরী 'ধোসা'—
আঁচে গরমিল চেনা মুস্কিল—এত বড় দুর্দ্দশা!
পরিচয় তাই কভু খুঁজি নাই শুধু এইটুকু জানি
কত প্রয়োজনে লাগিতেছে মোর বুড়া কম্বলখানি।
অজ্ঞেয় যেন ভগবান—যার ইতিহাসে নাহি জানা—
ঠেকা-বেঠেকায় কাযে লেগে যায় নামের দোহাইখানা।

গোটা হিমটাই ঝিম্ মেরে থাকি কম্বলে দিয়ে মুড়ি,
শীতে কেঁপে মরে প্রতিবেশী ঘরে আর যত বুড়া-বুড়ী;
গরমের দিনে ফেলিতে পারিনে শয্যাতে চলে পাতা,—
কপালে যখন জোটে না কখনো 'চাটায়ের পরে কাঁথা।
খেতে বসি কভু আসন পাতিয়া পেতে বসি বৈঠকে;—
পর্দ্দা করিয়া বেঁধেছি কখনো "ফটো" তুলিবার সখে।

সব চেয়ে বড় দুর্দ্দিনে ওযে-সেদিনে করেছে ত্রাণ;
নতুবা কপালে ছিল বুড়োকালে নির্ঘাত অপমান!
ছিল না রক্ষে তৃতীয়-পক্ষে চেয়েছিল কিনে চুড়ি,—
কত বুঝাইয়া নিষ্কৃতি নাই—দু'টি পায়ে মাথা খুঁড়ি'।—
কম্বল কাঁধে মুখে 'জয় রাধে' হাতে নিতে হলো লোটা,
'আঁটি কৌপীন—বৈরাগ্য-চিন্ কপালে কাটিনু ফোঁটা';—
বলা বাহুল্য ক্রোধের মূল্য-বোধে দরদিনী প্রিয়া—
ট্রেণ থেকে শেষে টেনে নামিয়েছে মাথার দিব্যি দিয়া।

শ্রীঅদ্বৈতকুমার সরকার (বি, এল)



নারিকেলের ব্যবসায়িক প্রাধান্য

নারিকেলের ন্যায় উপকারী বৃক্ষ প্রায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার প্রত্যেক অংশ কোন না কোনরূপে মানবের ব্যবহারে আসে; আবার পৃথিবীর মধ্যে এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে নারিকেলই লোকের প্রধান সম্পদ। ইহাই তাহাদিগকে গৃহনির্ম্মাণের উপাদান, আহার্য্য এবং এমন কি, পরিধেয় যোগায়; ইহার বিনিময়েই তাহারা লবণ, বস্ত্র ইত্যাদি অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে। নারিকেলের উৎপত্তি সর্ব্বপ্রথমে কোন্ দেশে হইয়াছিল, তাহা সঠিক নির্ণয় করা যায় না: তবে ইহা নিশ্চয় যে, ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলস্থ কোন দেশে অথবা উক্ত দুই সাগরের বক্ষঃস্থিত দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে কোনটিতে ইহার প্রথম উদ্ভব হইয়াছিল; পরে ইহা গ্রীষ্মমণ্ডলস্থ প্রায় সকল উপকূল-প্রদেশে প্রসার লাভ করিয়াছে। ভারতে নারিকেল প্রাগৈতিহাসিক সময় হইতে রহিয়াছে।

ধর্ম্ম ও লৌকিক কার্য্যে নারিকেল

অনেক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেই নারিকেলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। দেবপূজায় ও শুভ কার্য্যাদিতে মঙ্গলঘট স্থাপন করিতে নারিকেলের প্রয়োজন; পক্ক ও অপক্ক উভয় প্রকার নারিকেলই নৈবেদ্যে দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন ভারতের নানা স্থানে নারিকেল কয়েকটি লৌকিক ব্যাপারের সহিত বিজড়িত, তন্মধ্যে দুই চারিটি উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম উপকূলে শ্রাবণী পূর্ণিমায় একটি নারিকেল-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়; উক্ত দিনে সমুদ্রে নারিকেল নিক্ষেপ করা হইয়া থাকে; এক সময়ে বোম্বাইয়ের লাট সাহেব সমারোহের সহিত এই উৎসবে যোগদান করিতেন এবং একটি সোণার নারিকেল জলধিগর্ভে নিক্ষেপ করিতেন। পূর্ব্বোক্ত প্রদেশেই আবার যদি কোন ব্যক্তির গৃহ-প্রাচীরে নারিকেল ফাটান হয়, তাহা হইলে তাহার সহিত শত্রুতা ঘোষণা করা হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়। ভারত-উপকূলের অনেক স্থানেই বিবাহ, দ্বিরাগমন ও গর্ভাধান উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজন ও আগন্তুকবর্গকে অকাতরে নারিকেল ও বাতাসা বিতরণ একটি চলিত প্রথা। বস্তুতঃ এতগুলি মাঙ্গলিক কার্য্য ও লৌকিক আচারের সহিত নারিকেলের সম্বন্ধ রহিয়াছে যে, ইহা ভারতের একটি প্রাচীনতম ব্যবহারিক বৃক্ষ বলিয়া সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়।

নারিকেল-বৃক্ষের প্রসার

নারিকেলের উৎপত্তিস্থানের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে জগতের গ্রীষ্মমণ্ডলের প্রায় সকল স্থানেই নারিকেল দৃষ্ট হয়। অবশ্য ইহা বলা আবশ্যক যে, নারিকেল সমুদ্র-উপকূলেরই গাছ এবং সমুদ্রতীর হইতে ১ শত মাইলের মধ্যে ইহা উত্তমরূপে জন্মিয়া থাকে। বারিধি-বারি-প্রবাহই ইহার নানা দেশে বিস্তৃতিলাভের সহায়তা করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। নারিকেল তালের ন্যায় বন্য বৃক্ষ নহে, তবুও উপকূল-প্রদেশে ইহা সঙ্ঘবদ্ধভাবে জন্মিয়া থাকে। সৈকত-রেখা হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে যে সমুদয় নারিকেল-গাছ দেখা যায়, সেগুলি রোপিত। সমুদ্র-জলপ্রবাহ ও মানব দ্বারা স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইয়া নারিকেল এতদূর প্রসার লাভ করিয়াছে যে, ইহা এখন এসিয়া, আফ্রিকা ও ও আমেরিকা—এই তিন মহাদেশেই জন্মিতেছে। জগতের মোট নারিকেল-ফসলের সহিত বিভিন্ন অঞ্চলোৎপন্ন ফসলের শতকরা অনুপাত কিরূপ, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ ও উপদ্বীপপুঞ্জ ..	১০ ভাগ
ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিজ ··· ··· ···	১৬ "
ফিলিপাইন··· ··· ··· ···	১৫ "
সিংহল ও এসিয়ার অন্যান্য স্থান··· ···	৫৫ "
আফ্রিকা··· ··· ···	২ "
গ্রীষ্মমণ্ডলস্থ আমেরিকা··· ··· ···	২ "
	১০০

ভারতে নারিকেল উৎপাদনের কয়েকটি প্রধান কেন্দ্র রহিয়াছে, যথা—বোম্বাই প্রদেশে কাথিয়াবাড় ; উত্তর-কানাড়া ও রত্নগিরি ; মাদ্রাজ প্রদেশে মালাবার ও গোদাবরীর ব-দ্বীপ ; গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও ইরাবতী নদীর মোহানা-সন্নিহিত প্রদেশ ; মহীশূর এবং ভারতসাগরস্থিত নিকোবার ও অন্যান্য দ্বীপ-সমূহ। সমুদ্রকূল ছাড়াইয়া দেশমধ্যে ২ শত মাইল গমন করিলে নারিকেল-গাছ কচিৎ দৃষ্ট হয়। ভারতীয় কেন্দ্র-সমূহের মধ্যে মালাবারই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। নারিকেলের আর দ্বিতীয় জাতি নাই ; কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বহুকাল ধরিয়া চাষের ফলে কয়েকটি বিশিষ্ট উপজাতির উদ্ভব হইয়াছে। ভারতে উক্তরূপ উপজাতির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান—(১) করমণ্ডল অথবা বামুণ, বর্ণ—পীতাভ-রক্ত, জল উৎকৃষ্ট, কিন্তু শাঁস ও ছোবড়া কম। (২) কানাড়া, ফল শক্ত, ডিম্বাকার। (৩) মালাবার। (৪) মালদ্বীপ, ফল ছোট, বৃত্তাকার। (৫) আন্দেম, ফল ছোট, ডিম্বাকার। (৬) নিকোবার, ফল সূচ্যগ্র, সর্ব্ববৃহৎ। (৭) সিংহল, বৃক্ষ ২০ ফুটের বড় হয় না, ফল সুবর্ণাভ।

এতদ্দেশে অন্যান্য দেশের ন্যায় সুবৃহৎ বাগিচা নাই ; অধিকাংশ স্থানেই ছোট ছোট বাগানে নারিকেল উৎপাদিত হইয়া থাকে। চাষও বৈজ্ঞানিক প্রথায় হয় না। বঙ্গদেশে কেবলমাত্র বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালি জেলাতেই নারিকেল-চাষ অধিক এবং এই দুইটি স্থানেই চাষের জন্য কিছু যত্ন করিতে দেখা যায়। ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিজে গাছে প্রতি বৎসরে ৮০।৯০টি ফল হয় ; সেই স্থলে ভারতে ফলনের হার ৪০ হইতে ৭৫টি ফলের অধিক নহে। মালাবার অঞ্চলে এক একর জমিতে প্রায় ৫ হাজার ফল হয় এবং তাহা হইতে ১ টন শাঁস পাওয়া যায় ; ইহাও অন্যান্য দেশের তুলনায় কম।

নারিকেল-বৃক্ষের ব্যবহার

নারিকেল-গাছ যে কত রকমে মানুষের উপকারে আসে, তাহা বলা যায় না। লণ্ডনের Indian and Colonial প্রদর্শনীতে বোম্বাইয়ের সরকারী ঔষধ-ভাণ্ডারের পেরিরা সাহেব নারিকেলজাত ৮৩ প্রকার দ্রব্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নারিকেল-গাছের বিভিন্ন অংশ কোন্ কোন্ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, নিয়ে তাহার উল্লেখ করা হইল :—

বৃক্ষের সমস্ত অংশ	জ্বালানি
কাণ্ড	গৃহ, সেতু, ডোঙ্গা ইত্যাদি নির্ম্মাণ
কাণ্ডমধ্যস্থ তন্তু	মোটা ব্রুশ
পত্র	গৃহাচ্ছাদন, জ্বালানি
পত্রভস্ম	পটাশ-প্রধান সার
পত্রের মধ্য-পর্শুকা	গৃহ-নির্ম্মাণ
পত্রের পার্শ্বস্থ পর্শুকা	সম্মার্জ্জনী
পর্শুকা-বিহীন পত্রাংশ	মাদুর, থলে
বৃক্ষের রস	শর্করা, সুরা, তাড়ী
ফলের বহিস্ত্বক	ছোবড়া
খোলা	হুঁকা
খোলার কয়লা	বাষ্প-শোষক
শাঁস	খাদ্য, তৈল
জল	পানীয়
শিকড়	স্যালিসাইলিক অম্ল

বিগত মহাযুদ্ধের সময় দেখা গিয়াছিল যে, নারিকেল-খোলার কয়লার বিলক্ষণ বাষ্পশোষক গুণ রহিয়াছে ; সেই জন্য বিষাক্ত বাষ্প শোষণ করিয়া লইবার জন্য ইহা প্রয়োগ করা হইত। নারিকেল-বৃক্ষের বিভিন্ন অংশের ভেষজ গুণের বিষয় আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে। ডাবের জল স্নিগ্ধকারক ও শৈত্য-উৎপাদক ; পিপাসা, জ্বর ও মূত্ররোগাদিতে ইহা ব্যবহৃত হয় ; তরুণ শাঁস পুষ্টিকর, স্নিগ্ধকারক ও মূত্রকারক। নারিকেলখণ্ড একটি প্রসিদ্ধ কবিরাজী ঔষধ ; অজীর্ণ রোগে ইহা বিশেষ ফলদায়ক এবং ক্ষয়রোগেও ইহা উপকার প্রদান করে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। নারিকেল-খোলা প্রজ্বালিত করিয়া উহার উপর একটি পাথরবাটি চাপা দিলে উহা হইতে ঘাম নির্গত হয় ; এই ঘাম এসেটিক অম্ল, ইহার দ্বারা দদ্রু ভাল হয়। প্রসঙ্গক্রমে এ স্থলে নারিকেলজাত আর একটি কৌতূহলোদ্দীপক দ্রব্যের উল্লেখ করিতে পারা যায়—উহা নারিকেল-মুক্তা। কচিৎ কখনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, শাঁসের পরিবর্ত্তে নারিকেলজলে বড় মটর কিম্বা সুপারির আকারের একটি নীলাভ শ্বেতবর্ণের দ্রব্য ভাসমান রহিয়াছে ; অথবা শাঁস জল সমস্ত গিয়া উক্তরূপ পদার্থ খোলার অন্তর্দ্দিকে সংলগ্ন রহিয়াছে ; ইহাই নারিকেল-মুক্তা। মালয় উপদ্বীপের

সেলিবিজ দ্বীপেই প্রধানতঃ এইরূপ মুক্তা সময় সময় পাওয়া যায়। সাধারণ লোকে ইহা বহুমূল্য দ্রব্য বলিয়া মনে করে এবং তাহাদিগের বিশ্বাস এই যে, ইহা ধারণ করিলে রোগ ও বিপদ নিবারিত হয়।

নারিকেলের খাদ্যমূল্য

কিছু দিবস পূর্ব্বে Conquest নামক বিলাতী পত্রিকায় Englehardt নামধেয় জনৈক অষ্ট্রিয়াবাসীর বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইনি এক জন নারিকেলতত্ত্ববিৎ। যৌবনে কোনরূপ অবিমৃষ্যকারিতার জন্য দেশ হইতে পলায়ন করিয়া দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে গমন করেন এবং তথায় একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ ক্রয় করিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। তিনি নারিকেলের এতদূর পক্ষপাতী যে, বিগত ১৫ বৎসর যাবৎ নারিকেলজল ও শাঁস খাইয়াই জীবন ধারণ করিয়া আছেন। কোন বিশেষ ব্যক্তির পক্ষে ইহা সম্ভবপর বলিয়া ধরিয়া লইলেও সকলের পক্ষে ইহা সম্ভবপর কি না, তাহা পরীক্ষা-সাপেক্ষ। ইঙ্গলহার্ট একটি বিরল দৃষ্টান্ত, তথাপি ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, যদি কোন ফল মানবের ক্ষুধা-তৃষ্ণা অন্ততঃ কিছু দিবসের জন্যও মোচন করিতে পারে, তাহা হইলে সে ফল নারিকেল। কোন মুসলমান আমীরও বলিয়াছিলেন যে, নারিকেল সৃষ্টি করিয়া খোদা একাধারে রুটী ও জলের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ডাবের জলের ন্যায় এমন স্নিগ্ধকর পানীয় আর নাই এবং শাঁস সকল অবস্থাতেই পুষ্টিকর আহার্য্য। নারিকেল যেমন লোকে কাঁচা খায়, তেমনই নানাবিধ তরকারি ও মিষ্টান্নের উপাদানরূপে ব্যবহার করে। ভারতের যে সকল স্থানে নারিকেল দুষ্প্রাপ্য, সে সকল স্থানেও শুষ্ক নারিকেলের শাঁস (খোপা) বিক্রয় হইয়া থাকে। য়ুরোপ ও আমেরিকায় খাদ্য হিসাবে নারিকেলের চাহিদা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। নারিকেল-মাখম, নারিকেলের শুষ্কীকৃত পাতলা টুকরা, নারিকেল হইতে প্রস্তুত খাদ্য এই সমুদয় পাশ্চাত্যে উত্তরোত্তর অধিক প্রসার লাভ করিতেছে।

একটি মধ্যমাকৃতি ডাবে গড়ে প্রায় ১ পোয়া জল থাকে। ফলের বয়োবৃদ্ধির সহিত জলের মাত্রা কম ও শাঁসের মাত্রা অধিক হয়। বীজ অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বে জল একবারেই অদৃশ্য হয় এবং সেই সময়ে ফোঁপল অথবা অঙ্কুর দেখা দেয়; ফোঁপলও সুখাদ্য, কিন্তু নারিকেলের ন্যায় উপকারী বৃক্ষের অঙ্কুর নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নহে। একটি সুপক্ব নারিকেলে ছোবড়ার অংশ ৫৮'২৮ ভাগ, খোলা ১১'৫ ভাগ, শাঁস ১৮'৫৪ ভাগ, এবং জল ১২'৫৮ ভাগ। নারিকেলের শাঁস ও জল যে কিরূপ পুষ্টিকর খাদ্য, তাহা উহাদের প্রধান উপাদানগুলির শতকরা অনুপাত দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে: ঐগুলি নিম্নরূপ:—

উপাদান	শাঁস	জল
জলীয়াংশ	৪৬'৬৪	৯১'৫০
সোরাজানঘটিত পদার্থ	৫'৪৯	'৪৬
বসা	৩৫'৯৩	০'০৭
সোরাজানবিহীন পদার্থ	৮'০৬	৬'৭৮
ভস্ম	৩'৮৮	১'১৯

নারিকেলজাত প্রধান দ্রব্যাদি

নারিকেল ও তদুৎপন্ন যে সমস্ত দ্রব্য লইয়া বড় বড় ব্যবসায় চলে, তন্মধ্যে পাঁচটি প্রধান—(১) কোপ্রা অথবা শাঁস; (২) তৈল, (৩) খৈল, (৪) ছোবড়া এবং (৫) ডাব ও নারিকেল। নিম্নে এইগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল:—

(১) কোপ্রা:—ইহাই নারিকেলজাত দ্রব্যাদির মধ্যে অন্যতম। মালাবারের কোপ্রা ব্যবসায়জগতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হয়। ইহা সূর্য্যপক্ব বলিয়া বর্ণ খারাপ হয় না এবং ইহাতে তৈলের মাত্রাও অধিক। পক্ষান্তরে, অন্য দেশের কোপ্রা পীতাভ ও কলে শুষ্ক করার জন্য কম তৈলযুক্ত। জার্ম্মাণী ও ফ্রান্সে প্রতি বৎসর বহুল পরিমাণে কোপ্রা রপ্তানী হয়; শ্যামবর্গের তৈলকলসমূহ নারিকেল-তৈল নিষ্কাশনের প্রধান কেন্দ্র। রপ্তানীর অবশিষ্ট কোপ্রা হইতে মালাবারেই তৈল নিষ্কাশিত হইয়া থাকে, ভারতের অন্য প্রদেশে চালান যায় না।

(২) তৈল:—নারিকেলের শাঁস হইতে শতকরা ৩০ হইতে ৫০ ভাগ মাত্রায় তৈল পাওয়া যায়। আহার্য্য তৈলসমূহের মধ্যে ইহা প্রায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কৃত্রিম মাখম, চর্ব্বি ও স্নেহযুক্ত খাদ্য প্রস্তুতে সেই জন্য ইহার চাহিদা যথেষ্ট আছে। এতদ্ভিন্ন ইহা সাবান, বাতি ও গ্লিসরিন্ প্রস্তুতের পক্ষেও বিশেষ উপযোগী। নারিকেল-সাবান জলে ডুবে না এবং কড়া জলেও ইহার বেশ ফেনা হয়। সমুদ্রজলে ব্যবহারের জন্য নারিকেল-সাবানের সমধিক কাটতি হয়।

দেশীয় প্রথায় নারিকেল-তৈল দুই প্রকারে প্রস্তুত হয় ;—হয় শাঁস ঘানিতে পিষিয়া, নতুবা জলে ফুটাইয়া। উভয় প্রথাতেই ১০০টি মধ্যমাকারের নারিকেল হইতে প্রায় ৭½ সের তৈল পাওয়া যায়। কোচিন তৈলের খ্যাতিই সর্বাপেক্ষা অধিক ; অন্য স্থানের তৈলের তুলনায় ইহার মূল্য শতকরা ১৫ হইতে ২০ ভাগ অধিক। আজকাল দক্ষিণ-ভারতে নারিকেল-তৈল-কলের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। বলা দরকার যে, কোচিন তৈল দেশী ঘানিতে (চক্কু) প্রস্তুত হয়।

(৩) **খৈল** ঃ—নারিকেল-তৈল নিষ্কাশনের পর শাঁসের অবশিষ্টাংশের সহিত সামান্য পরিমাণ গঁদ মিশ্রিত করিয়া খৈল প্রস্তুত হয়, মাদ্রাজে ইহার স্থানীয় নাম—পুনাক। পূর্ব্বে এই খৈল প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হইত। ইহা পুষ্টিকর পশুখাদ্য এবং উৎকৃষ্ট সার। এরূপ দ্রব্যের দেশমধ্যে ব্যবহার হওয়াই বাঞ্ছনীয় ; সুখের বিষয় যে, পুনাক রপ্তানী ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে।

(৪) **ছোবড়া** ঃ—বঙ্গদেশে নারিকেল-ছোবড়ার সামান্যই সদ্ব্যবহার হয় ; কিন্তু অন্য স্থানে ইহাকে নানা প্রকার কার্য্যে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, যথা—দড়ি-দড়া, পা-পোষ, মেঝের মাদুর, ব্রুশ, সম্মার্জ্জনী, মোটা কার্পেট ও থলে প্রস্তুতে এবং গদী, তাকিয়া ও ঘোড়ার জীনের ভিতর দেওয়ার জন্য। কোচিনে ছোবড়া তৈয়ারী কুটীরশিল্পরূপে পরিচালিত হয় এবং মালাবারই ইহা হইতে হাতে সূতা প্রস্তুতের প্রধান কেন্দ্র ; ত্রিবাঙ্কুরে এইরূপ সূতা চরকায় তৈয়ারী হয়। ছোবড়ার সূতার কতিপয় শ্রেণী রহিয়াছে ; তন্মধ্যে মালাবারের হস্ত-প্রস্তুত 'আলাপাত' শ্রেণীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ছোবড়ার সূতার অধিকাংশই কোচিন, ক্যালিকট্ ও আলেপ্পী বন্দর দিয়া বিদেশে চালান যায়। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় ছোবড়া হইতে এক প্রকার পর্দ্দা প্রস্তুত হইত ; উহা সৈন্য-সমাবেশ লুক্কায়িত রাখার পক্ষে বিশেষ উপযোগী ছিল।

(৫) **ডাব ও নারিকেল** ঃ—পক্ব ও অপক্ব অবস্থায় বহুসংখ্যক নারিকেল দেশমধ্যে খাদ্যার্থ ব্যবহৃত হয়। ডাবের কাটতি বঙ্গদেশে যে কিরূপ, তাহা অনেকে জানেন ; নারিকেলের কাটতি তদপেক্ষা কম নহে। বস্তুতঃ, বঙ্গ, বোম্বাই ও করমণ্ডল উপকূলে যে নারিকেল জন্মে, তাহার প্রায় সমস্তই দেশমধ্যে আহার্য্য উদ্দেশ্যে কাটিয়া যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, দেশমধ্যে খাদ্যার্থ ব্যবহৃত নারিকেলের সংখ্যা ৪০ কোটির কম হইবে না।

নারিকেল-ব্যবসায়

নারিকেল উৎপাদন ও তজ্জাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতের কলকব্জার জন্য পৃথিবীর নানা স্থানে বহু অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে। মার্কিণের Drug and Chemical Market নামক প্রসিদ্ধ পত্রিকা অনুমান করেন যে, এতদর্থে যে ধন নিয়োগ করা হইয়াছে, তাহা প্রায় ২ শত কোটি টাকা হইবে। অন্য দিকে যে নারিকেল ও নারিকেলজাত দ্রব্যাদি প্রতি বৎসর জগতের বাজারে আসে, তাহার মূল্য প্রায় ১০৫ কোটি টাকা হইবে।

নানা দেশ হইতে যে পরিমাণ কোপ্রা রপ্তানী হয়, তাহার পরিমাণ ৫ লক্ষ ৪০ হাজার টন ; ইহার মধ্যে মাত্র একসপ্তমাংশ ভারত হইতে চালান যায়। ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়াই কোপ্রা রপ্তানীর প্রধান কেন্দ্র ; উক্ত স্থান হইতে বৎসরে গড়ে ২ লক্ষ টন কোপ্রা চালান যায় ; উহা প্রস্তুত করিতে ১১০ কোটি নারিকেল আবশ্যক হয়। জগতের নারিকেল-বাজারে ভারতের অংশ কিরূপ এবং কত মূল্যের কি কি দ্রব্য এতদ্দেশ হইতে বিদেশে চালান যায়, তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে প্রতীয়মান হইবে।

বিবরণ	মূল্য
নারিকেল	১৭৩৫৫
ছোবড়া	১৭১৭৩৫
ছোবড়াজাত দ্রব্যাদি	৮৮৯১১১৫
দড়ি-দড়া	১০৫২৮২৫
খৈল	৪০৪৪৭৫৲
কোপ্রা	১৫৫৯৭৩৯০৲
তৈল	২৩২৬০০৫৲

মোট—২ কোটি ৮৪ লক্ষ ৬০ হাজার ৯ শত

যে সময়ে নারিকেল ও নারিকেলজাত দ্রব্যাদির বাজার বেশ স্বচ্ছল ছিল, সেই সময়ের অঙ্কাদি হইতে উক্ত তালিকা

সঙ্কলিত হইয়াছে। অবশ্য প্রতি বৎসর উক্ত দ্রব্যাদির পরিমাণ ও মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ভারতে নারিকেল-শিল্পের ভবিষ্যৎ

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে প্রতিপন্ন হইবে যে, ভারতে এখনও নারিকেল চাষ ও শিল্পের পরিসর-বৃদ্ধির অনেক অবসর রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এতদ্দেশে এখন পর্য্যন্ত নারিকেল-চাষ-বিস্তারের কোন ধারাবাহিক চেষ্টা হয় নাই; বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরিচালিত নারিকেল-বাগিচাও দেশমধ্যে নাই। চাষের উপর লক্ষ্য রাখিলে নারিকেল উৎপাদন যে কি পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে পারা যায়, ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিজের সুপরিচালিত বাগিচা-সমূহ তাহার দৃষ্টান্তস্থল। ইহাও দুঃখের বিষয় যে, যে-পরিমাণ নারিকেল বর্ত্তমান সময়ে উৎপাদিত হইতেছে, তাহারও পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয় না। উদাহরণ-স্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, শাঁসকে সূক্ষ্ম ফালিরূপে কাটিয়া, শুষ্ক করিয়া বিদেশে চালান দেওয়া হয়; ইহাকে desiccated cocoanut বলে; সিংহল এই ব্যবসায়ে অনেক প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে, কিন্তু ভারতে এই বিষয়ে কিছুই করা হয় নাই। নারিকেল হইতে মাখম ব্যতীত আরও নানা প্রকার পুষ্টিকর খাদ্য জার্ম্মাণীতে প্রস্তুত হইতেছে। আমাদিগের দেশে সেরূপ হওয়া দূরে থাকুক, বরং নারিকেল-লাড়ু প্রভৃতি যে সকল সাধারণ খাদ্য ছিল, সেগুলিও ক্রমশঃ অদৃশ্য হইতেছে। এ সম্বন্ধে একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা—কোচিন-রাজ্যের রাজধানী এর্ণাকুলম সহরে টাটা কোম্পানীর কোকোটিন অথবা আহার্য্য নারিকেল-তৈলের কারখানা। বহুল পরিমাণ ছোবড়া ও কোপ্রা দেশমধ্যে সদ্ব্যবহৃত না হইয়া বিদেশে চালান যায়, তাহাও বাঞ্ছনীয় নহে। ফলতঃ নারিকেল-শিল্পের উন্নতির চেষ্টা না করিয়া আমরা ধনাগমের একটি প্রকৃষ্ট পন্থা অবহেলায় হারাইয়া ফেলিতেছি।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

বিদায়

আজ কে তুমি যেয়ো নাকো—একটু থাক পাশে,
কঠিন এ প্রাণ ছিল শুধু তোমায় দেখার আশে!
এবার আমি যাবো সুখে—নাইকো কোন ব্যথা,—
বল্‌তে তোমায় বাকী কেবল আছে দু'টি কথা।
নিজের হাতে দিও সিঁদুর আমার সীঁথের ভরি,—
যেতে যেন পারি—তোমার চরণ পরশ করি!

এর বাড়া নেই ভাগ্য নারীর,—তপস্যা সে করে,—
আল্‌তা পায়ে, গলায় মালা,—যাত্রা দিগন্তরে!
সবাই তারে হিংসা করে—করে নমস্কার!
এর বাড়া নেই সাধ্বী-সতীর পরম পুরস্কার!

বল্‌তে কথা ডাক্তারেতে নিষেধ করে,—জানি,—
পদে পদে শাসন-বিধি আর কত কাল মানি?
মানুষ আমি রক্তে গড়া—নয় তো মাটীর দেহ,
ছেড়ে যখন যেতেই হবে এমন সোণার গেহ!—
তবে কেন মানবো আজ আর বাধার কঠিন ডোর,—
ক্ষণেক পরেই হবে যখন জীবন-নিশির ভোর!

* * *

ম'রে গেলেও আমায় তুমি এমনি রেখো মনে,—
এমনি যেন ফুটে থাকি তোমার মনের বনে!
হাসিমুখে দাও গো বিদায়,—এবার আমি যাই,—
ফিরে যদি আসি আবার—তোমায় যেন পাই!

শ্রীহলধর মুখোপাধ্যায়।



ঘরের বউ

(ষষ্ঠ পর্ব)

জমিদার কোম্পানীর একখানি মোটর লঞ্চ ছিল। বাবুরা মধ্যে মধ্যে আসিতেন, ঘুরিয়া ফিরিয়াও দেখিতেন। লঞ্চখানি সাধারণতঃ ওপারে মাতলারই থাকিত। কিরণ গিয়া সকল কথা সুখময় বাবুকে খুলিয়া বলিল এবং দুই তিন দিনের জন্য লঞ্চখানা চাহিল। উঁহারা আসিবেন এবং দুই তিন দিন যদি থাকেন, লঞ্চেই রাখিতে পারিলে সুবিধা হয়। তার পর বরুণা যদি থাকেই—তখন সে যাহা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাইবে। সুখময় বাবু কহিলেন, লঞ্চ কিরণ তাহার ব্যবহারে যে কয় দিনের জন্য দরকার অনায়াসে পাইতে পারে, এবং একখানি পত্রও লিখিয়া কিরণের হাতে দিলেন।

বাড়ীতে ফিরিয়া বিমল ও সুপ্রকাশকে বাহিরে ডাকিয়া আনিয়া সব কথা তাহাদেরও কিরণ খুলিয়া বলিল। তার পর উঁহাদের আহারাদির কিরূপ ব্যবস্থা করিয়া কি ভাবে লইয়া আসিবে, তাহার সম্বন্ধে যথাপ্রয়োজন উপদেশ দিয়া—একটা নৌকা ঠিক করিয়া রাত্রিতেই তাহাদের পাঠাইয়া দিল। সতীশকে কি তাহার মাতাকে তখন আর কিছু বলিল না।

পরদিন বৈকালে ষ্টেশনে গাড়ী আসিয়া যখন পৌঁছিল, বিমল ও সুপ্রকাশ গিয়া পরিচয় দিয়া নীলাম্বর বাবুকে সম্বর্দ্ধনা করিল। ইঁহাদের সঙ্গে সপরিবারে নীলাম্বর বাবু আসিয়া লঞ্চে উঠিলেন; দেখিলেন, সুসজ্জিত কেবিনটির ভিতরে চা, রুটী, মাখন, কলা, দুধ প্রভৃতি খাবার কেবল নহে, তাঁহার জন্য সিগারেট দেশলাইও ছোট দুইটি টেবলের উপরে বেশ পরিপাটীভাবে সাজান রহিয়াছে! নীচে এক ধারে কয়েকটি ডাবও রাখা হইয়াছে, যদি এই গ্রীষ্মের অপরাহ্নে চায়ের পরিবর্ত্তে তাহাই তাঁহাদের অধিকতর উপভোগ্য হয়। জগে ও কুঁজোয় জল, একখানি র‍্যাকের উপরে দু' তিন-খানা তোয়ালে, কিছুরই অভাব নাই। আবার ঐ ছেলে দুইটি যে আসিয়াছে, খাসা চটপটে, গ্রাম্য জড়তার লেশমাত্রও তাহাদের ব্যবহারে কিছু নাই। নীলাম্বর বাবু ও তিলোত্তমা অতি আনন্দিত ও আশ্বস্ত হইলেন। বরুণাও একটি স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

একখানি মোটর লঞ্চ তাঁহাদের জন্য পাঠাইয়াছে, অমন খাসা দুইটি ছেলে তাহার সহকারী, এমন সব বন্দোবস্ত তাঁহাদের পরিতৃপ্তির জন্য করিয়া রাখিয়াছে। তবে ঠিক গ্রাম্য চাষীর মত হীন অবস্থায় সে থাকে না। যাহাই করুক, উঁচুদরের কায কিছু উঁচু চালেই করে, আর থাকেও বেশ একটু উঁচু চালে। হয় ত খাসা একটা বাঙলো-টাঙলো আছে; লোকজনও রাখিয়াছে। তা ভদ্রলোকের ছেলেদের যদি ফার্ম্মিংএর কায করিতেই হয়, এই ভাবেই ত করিতে হইবে। একবারে সেই আদিম গ্রাম্য চাষীদের মত নেংটি পরিয়া কুঁড়ে ঘরে থাকিবে, আর হাতে লাঙ্গল ঠেলিবে—ইহা কি সত্য আর এ যুগে সম্ভব হয়? তা দেখা যাক্, কাযকর্ম্মের কিরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছে। চাকরীতে যদি ফিরিয়া নাই যায়, এখানেই পরিমার্জ্জিত আরামে বরুণা কিছুকাল অন্ততঃ থাকিতে পারে, এমন বন্দোবস্ত অবশ্যই আছে।

বিমল কহিল, "আপনারা হাত-মুখটা ধুয়ে নিন।—পেছনে ঐ যে বাথরুম রয়েছে, ওঁরা ওখানেই যেতে পারেন। জল, সাবান, তোয়ালে সব ঠিক আছে। ছোট্ট খোকাটি যদি দুধ খায়—ঢেলে দেব এক কাপ?"

তিলোত্তমা কহিলেন, "হাঁ, দেও, দেও,—ভাল দুধ ত? বেশ ফোটান হয়েছে ত? হাঁ, দেও, ওদের দুজনকেই দু' কাপ দুধ তবে দেও। টমকে একটা কলা আর দু'খানা রুটীও দেও। ঐ লখিয়ার হাতে দেও, ও-ই খাইয়ে দেবে'খন ওদের।"

সুপ্রকাশ দুই কাপ দুধ ঢালিয়া দিল; একখানি প্লেটে দু'খানা রুটী ও একটি কলা লইয়া বিমল টমকে কহিল, "এস কাকু! আমি কাকাবাবু, এস, খাবে এস।" বলিয়া কোলের কাছে তাহাকে টানিয়া আনিল।

হাসিমুখে বিমলের দিকে চাহিয়া টম কহিল, "কাকাবাবু? কাকাবাবু কাকে বলে, কাকাবাবু?"

"কাকাবাবু বলে বাবার ভাইকে—ঐ যে জিম তোমার ভাই না?"

"জিম ত এই এতটুকু!"

"বড় হবে—তুমিও বড় হবে—তখন জিম হবে কাকাবাবু?"

"কার কাকাবাবু! আমার?"

"না না, তোমার কেন? নতুন সব খোকা আসবে, তাদের।"

"নতুন খোকা আসবে? কবে আসবে?"

"আসবে, যখন বড় হবে—ঠিক তোমার বাবার মত।"

"বাবা কোথায়, কাকাবাবু?"

"ঐ যে নদীর ওপারে আছেন। তোমাদের নিয়ে যাবার জন্যে খাসা কলের নৌকো পাঠিয়েছেন—এই ত এখুনি যাবে। গিয়ে তাঁকে দেখবে, তাঁর কোলে উঠবে!"

"বাবা ভালবাসবে?"

"হাঁ, খুব ভালবাসবে!"

বালক চুপ করিয়া কি ভাবিল। শেষে আবার কহিল, "ভালবাসবে?"

"হাঁ, খুব বাসবে, কোলে করবে, কত চুমো খাবে।"

"ভাল ত বাসত না, কোলে করত না, চুমো খেত না। না, আগে খুব ভালবাসত, কোলে করত, চুমো খেত—"

"আবার ভালবাসবে, যখন যাবে বাবার কাছে। ভালবাসবে, কোলে করবে, চুমো খাবে—"

বরুণার চোখে জল আসিল,—মুখ ফিরাইয়া অলক্ষ্যে মুছিয়া ফেলিল। তিলোত্তমা তখন বাথরুম হইতে ফিরিয়া কহিলেন, "খা ভাত-মুখ ধুয়ে আয় গে। আর ছেলের যেমন কথা! বাসবে —বাসবে!—কেন বাসবে না? এদ্দিন পরে যাচ্ছিস্—এই তোদের নিতে কেমন কলের নৌকা পাঠিয়েছে—কত খাবার পাঠিয়েছে—খুব ভালবাসবে, কোলে করবে, চুমো খাবে। আবার কত খোলা ময়দান আছে—বাবার সঙ্গে কাকাবাবুদের সঙ্গে ছুটোছুটি খেলা করবি।—খা, খা, এখন খেয়ে ফেল্।"

"হাঁ, এই ত খাচ্ছি। খাসা কলা,—তোমাদের বাড়ীতে ত এমন কলা খাইনি। হাঁ, বাবা সত্যিই ভালবাসে! কেমন বড় বড় কলা কিনে পাঠিয়েছে—না, ও রুটী খাব না, দিদিবাবু, আর একটা কলা খাব।—হাঁ, মেলাই কলা আছে ওখানে? বাবা কিনে দেবে?"

"দেবে। যতটা খেতে পার—"

"জুতো কিনে দেবে? জামা কিনে দেবে?—বাটবল—ঘোড়া—কুকুর—সব কিনে দেবে?"

"হাঁ, দেবে—যা ওখানে পাওয়া যায়।"

সুপ্রকাশ রুটীতে মাখন মাখাইয়া, কয়েকটি কলা ছুলিয়া তিনখানি প্লেটে সাজাইয়া রাখিল। তার পর কহিল,—"গরম জল তৈরী আছে—চা খাবেন এখন? আনব?"

"হাঁ, আন, খাওয়া যাক্।"

বলিয়া টেবলটির পাশে তিলোত্তমা বসিলেন। নীলাম্বর বাবুও মুখের দগ্ধশেষ সিগারেটটি জানালার ফাঁকে নদীতে ফেলিয়া দিয়া সরিয়া আসিয়া বসিলেন। বরুণা মৃদুস্বরে মাকে কহিল, "আমি চা-টা কিছু খাব না, মা। এক গ্লাস জল শুধু—"

"জল? শুধু জল? কেন, আর কিছু না খাস্, এক গ্লাস ডাবের জল বরং খা। ঐ যে খাসা ডাব রয়েছে—হাঁ বাবা, অমন খাসা সব ডাব কোথায় পেলে? এখানে বুঝি অমনি ডাব খুব পাওয়া যায়?"

সুপ্রকাশ উত্তর করিল, "হাঁ মা, খুব পাওয়া যায়।—দেদার নারকেল হয় এ দেশে—"

"বটে! এ দেশের লোক ত তা হ'লে জল না খেয়ে তেষ্টায় কেবল ডাব খেয়েই থাকতে পারে? অম্বল-টম্বল তাতে কিছু হয় না, লিভারও শুনেছি ওতে ভাল থাকে। তা দেও বাবা, একটা ডাব ওকে কেটে দেও।"

সুপ্রকাশ চায়ের জল ছাঁকিতেছিল। বিমল তাড়াতাড়ি উঠিয়া একটা ডাবের মুখ কাটিতে গেল। বরুণা তেমনই মৃদুস্বরে মাকে কহিল, "না মা, ডাব থাক, এক গ্লাস জলই শুধু দিতে বল। বুকটার ভেতর বড় কাঁপছে, খেয়ে একটু শুই—" বলিয়া একধারে জানালার পাশে বাক্সখানির দিকে চাহিল। কুঁজোয় জল ছিল। বিমল এক গ্লাস জল গড়াইয়া আনিয়া টেবলের উপরে রাখিল। ক্ষিপ্রহস্তে একটি বিছানা খুলিয়া বাক্সের উপরে পাড়িয়া দিল। চায়ের-পাত্র দুধ চিনি সব একখানি ট্রের উপরে তখন সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। টমকে লইয়া বিমল ও সুপ্রকাশ বাহিরে কেবিনের ছাদে গিয়া বসিল। ঢক ঢক করিয়া ভরা গ্লাস জল খাইয়া বরুণা গিয়া শুইয়া পড়িল।

চা তৈয়ারী করিতে করিতে তিলোত্তমা কহিলেন, "শরীর কি খুব অসুস্থ বোধ হচ্ছে, বরুণ?"

"না, এমন কিছু নয়। কেবল বুকটা কেমন ধুবধাব করছে। কতক্ষণে গিয়ে পৌছব, মা?"

"কতক্ষণ আর হবে?—এই ঘণ্টা ছুইটুই—কি বল?"

নীলাম্বর বাবু উত্তর করিলেন, "জানিনে ত। ঐ রকমই বোধ হয় হবে!—লঞ্চটাও ছেড়ে দিলে—এখানে যদি ডাক্তার কাউকে পাওয়া যেত—হাঁ, থামিয়ে একবার খোঁজ করতে বলব?"

বরুণা বলিয়া উঠিল, "না, না, ডাক্তার লাগবে না। মিছে ঘণ্টাখানেক আরও দেরী হবে। জলটা খেয়ে শুয়ে এখন একটু ভাল বোধই বরং করছি। খাসা হাওয়াও আসছে।"

চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়া তিলোত্তমা কহিলেন, "এক কাপ চা বরং শুয়ে শুয়েই খা। শরীর আরও ভাল বোধ করবি। দেব?"

"না না, চা খাব না। আর এক গ্লাস জল বরং—"

তিলোত্তমা উঠিয়া এক গ্লাস জল আনিয়া দিলেন। কতখানি খাইয়া বরুণা পাশ ফিরিয়া চক্ষু বুজিল।

একখণ্ড রুটী চায়ে ভিজাইয়া মুখে দিয়া তিলোত্তমা কহিলেন, "তা বন্দোবস্ত ত সব খাসা ক'রে পাঠিয়েছে—ঠিক যেমনটি হ'তে হয়! আমার ত ভয়ই হচ্ছিল—এই ত নদী—পচা পুরোনো নোকা কি একটা দিশী নৌকো পাঠাবে—গুটিসুটি মেরে পাঁচ ছ ঘণ্টা ব'সে থাকতে হবে—এক কাপ চাও মিলবে না—"

নীলাম্বর বাবু কহিলেন, "হাঁ, বন্দোবস্ত সব খাসাই ক'রে পাঠিয়েছে বটে। যায়গাটা কেমন—নিজে ঠিক কি ভাবে আছে—কায কি ধরণের করছে জানিনে, তবে—"

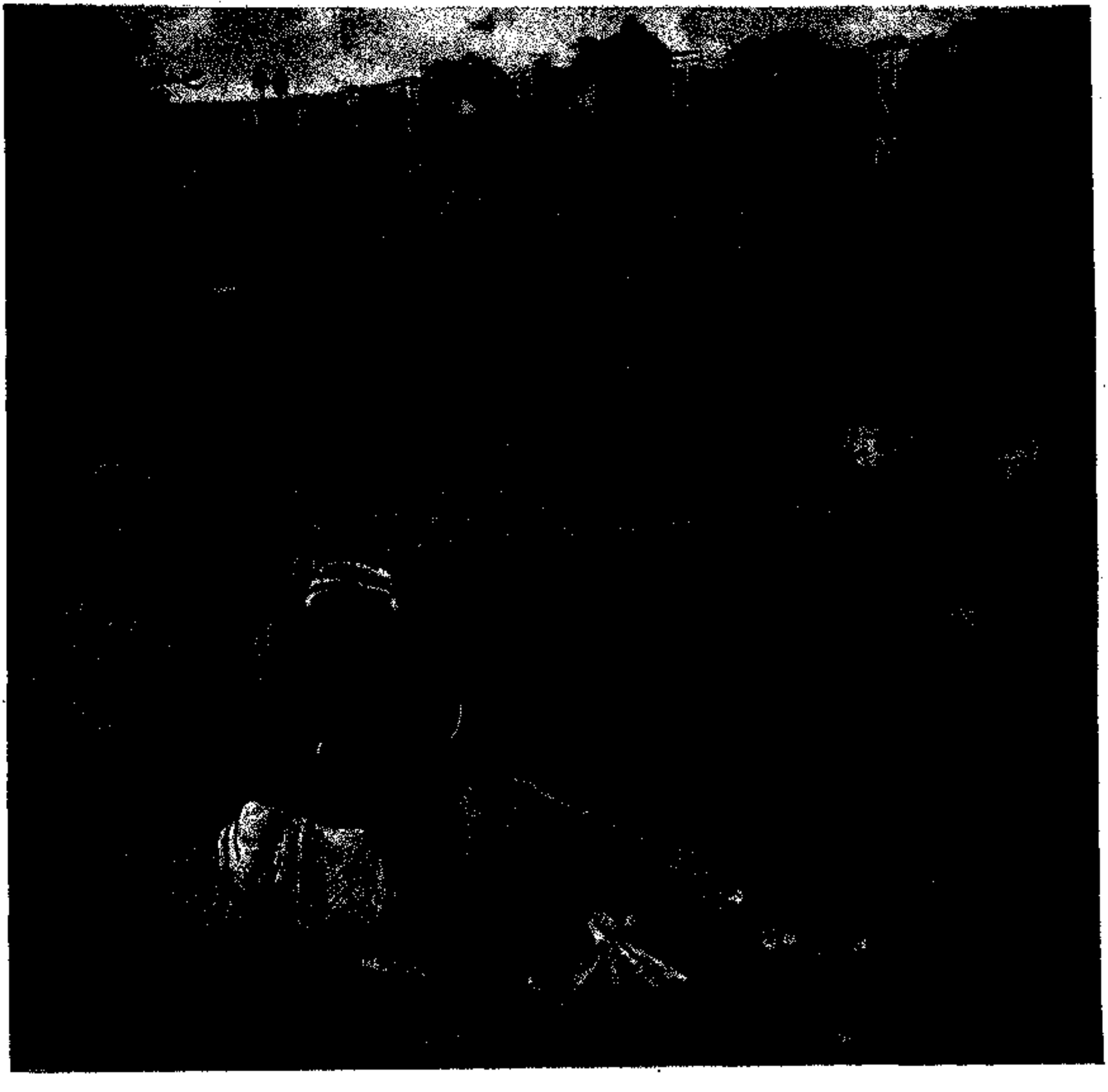
"না, নেহাৎ গরীবানাভাবে ঠিক গেঁয়ো গেরস্তর মতও থাকে না, কাযকর্ম্মও সে রকম ছোট কিছু করে না। কল্‌কেতায় খোঁজখবর নিয়েও ত সব জান্‌লে? যায়গাটা হচ্ছে বড় একটা কোম্পানীর। হয় ত বড় একটা কোম্পানী ক'রে কল-টল বসিয়েই কাযকর্ম্ম হচ্ছে, আর তার ম্যানেজারটারই কেউ হয়ে এসে সে বসেছে।"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া মাথা নাড়িয়া নীলাম্বর বাবু কহিলেন, "না, না, অতটা কিছু এখনও হয়নি। তবে আফিসের লোকরা ব'ল্লে—বড় দরের কে এক জন লোক ওখানে গেছে। একটা ব্যাঙ্ক খুলে ভাল বন্দোবস্ত ক'রে কাযকর্ম্মের কি প্লান সে করছে—"

"সে ঐ বিরূণ, আর কেউ নয়। তা কাযকর্ম্ম ঐ রকমই ঠিক সুরু না হ'ক, শীগ্‌গিরই হবে। আবার ঐ ছেলে দুটি যে এসেছে দেখলে না? শিক্ষিত ছেলে—আদব-কায়দায় খাসা দোরস্ত—একেবারে আনকোরা কল্‌কেতা থেকেই যেন এল! আমাদের যা খাবার-টাবার সব গুছিয়ে দিলে—যেন ভাল খাস হোটেল রেস্তরাঁয় সর্ব্বদা যাওয়া-আসা করে। ওরা ত সঙ্গে থাকে—"

"হাঁ, বল্লে ত সঙ্গেই কাযকর্ম্ম করছে—"

"তবে? নেহাৎ ছোট কায হ'লে এমন দুটি ছেলে গিয়ে সঙ্গে ওখানে জুটত না। বলিনি তখন? সব ওর চাল।



বসুমতী-চিত্র-বিভাগ]

রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হলো সারা··· রবীন্দ্রনাথ

[শিল্পী—শ্রীইন্দুভূষণ সেন ।

কায-কর্ম্ম ছোট রকম কিছু ও কর্‌বে না। তেমন ছোট হয়েও কোথাও গিয়ে থাক্‌বে না। ঐ সব লিখেছিল—ভেবেছিল, ভয় পেয়ে বরুণা আর আস্‌বে না, তখন মা মাসীকে আর গাঁয়ের সেই বৌটোকে নিয়ে আস্‌বে।"

বরুণা একটু ধড়ফড় করিয়া উঠিল। বালিসটা একটু ঘুরাইয়া এক প্রান্ত বুকে চাপিয়া অপর প্রান্তে মুখ গুঁজিয়া উবুড় হইয়া শুইল।

নীলাম্বর বাবু কহিলেন, "কিন্তু টাকা ত কুল্লে ঐ ছুটি হাজার নিয়ে এসেছিল। কোম্পানী থেকেও টাকাকড়ির বন্দোবস্ত এখনও কিছু হয়নি। কাযের কি একটা প্লানের কথাই নাকি কেবল হয়েছে।"

তিলোত্তমা উত্তর করিলেন, "টাকা—নিজের হাতে আরও কত ছিল কে জানে?"

"কোত্থেকে থাক্‌বে? পঁচিশ হাজার টাকা ত বরুণাকেই দিয়েছে। আরও দশ হাজার বাড়ীতে পরিবারের জন্যে পাঠিয়েছে। এই ক'বছর চাকরীতে কত টাকাই আর জমিয়েছিল? খরচও ত ঢের কর্‌ত।"

"কিন্তু কুল্লে ছুটি হাজার টাকা—জমি কিনেছে, ঘরদোর করেছে, আবার ঐ ছেলে ছুটিকে এনে রেখেছে। তার পর ধর, এই একটা লঞ্চ পাঠিয়েছে—'

"হাঁ, মনে ত হয়, বেস্ত কিছু আছে। কিন্তু কোথায় পেলে?"

একটু নড়িয়া চড়িয়া বরুণা তখন উঠিয়া বসিল। মাতা কহিলেন, "কি লো? উঠলি কেন আবার? শুয়েই থাক্ না? একটু ঘুমোবার চেষ্টা বরং দেখ।"

"ঘুম পাচ্ছে না।"

"তা কি মনে করিস্ তুই? এই যে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা—তা ছাড়া—"

"না, হাতে আর বেশী কিছু ছিল না—ঐ দু'হাজার ছাড়া। কোত্থেকে থাক্‌বে? আর থাক্‌লে ফাঁকি একটা হিসেব দিত না, খুলেই সব লিখত। তবে টাকা যদি হাতে কিছু এসেই থাকে, ঐ দশ হাজার টাকা—দেশে যা পাঠিয়েছিল—তাই তারা ফিরিয়ে দিয়েছে। সেটা তারা পারে। কিন্তু আমি হতভাগী পার্‌লাম না। একটিবার ভাবলামও না—"

হাঁটুর উপরে মুখখানি রাখিয়া বরুণা কাঁদিয়া উঠিল।

একটু কি ভাবিয়া তিলোত্তমা কহিলেন, "হাঁ, সেটা—হ'তে পারে বটে।—তা যদি দিয়েই থাকে দিয়েছে। তুইও গিয়ে তোর টাকাগুলোও না হয় দিবি। তারা দিয়েছে দশ হাজার, আর তুই দিতে পার্‌বি পঁচিশ হাজার!"

"সে দেওয়ার আর মূল্য কি এখন, মা? ঐ টাকা দিয়ে তারা যে আগেই কিনে রেখেছে।"

চা-পান শেষ করিয়া নীলাম্বর বাবু একটি সিগারেট তখন ধরাইয়াছিলেন; একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া বাহিরে গেলেন। তিলোত্তমা কহিলেন, "তা রাখুক। তুই গিয়ে একবার দাঁড়ালে ঠেলে তোকে ফেল্‌তে পারে?"

"মন থেকে ত ঠেলে অনেক আগেই ফেলেছে, মা।"

"ও সব কথা রেখে দে, বাছা। পুরুষমানুষের মন—অত সব ভাবলে আর চলে না। আসলে দেখতে হবে ঘরে মান রাখে কি না। তা যদি রাখল, তবে মনে যাই ভাবুক গে—কি বাইরে যাই করুক—এসে যায় না বড় কিছু। অত সব খুঁটিনাটি দেখতে গেলে, কি তাই নিয়ে অহরহ গোলমাল কর্‌লে, সংসার কেউ কর্‌তে পারে ওদের নিয়ে?"

বরুণা কোনও উত্তর করিল না। একটি নিশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে মুখখানি ফিরাইয়া লইল।

তিলোত্তমা কহিলেন, "যাচ্ছি—যাই ত দেখি। চাকরীতে ফিরিয়ে আন্‌বার চেষ্টা না হয় নাই করা যাবে। টাকা যদি মেলাই হাতে আসে, আর কাযকর্ম্ম সত্যিই যদি তেমন ভাল কিছু কর্‌তে পারে, মন্দ কি? অনেক সাহেবও ত মেমটেমদের নিয়ে এই সব মফঃস্বল যায়গায় থাকে। কল্‌কেতাও ত এমন দূর নয়—মাঝে মাঝে ইচ্ছে যখন হয়, সেখানে গিয়েও ত থাক্‌তে পার্‌বি? তার পর এমন একটা লঞ্চ রয়েছে—কোম্পানীরই বোধ হয় হবে—তা ও যদি কর্ত্তাই হয়, ওর হাতেই ত থাক্‌বে, যখন খুশী তোদের নিয়ে বেড়াতেও পারবে।"

বড় একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া বরুণা কহিল, "যা হারিয়েছি, তা হারিয়েছি। ফিরে আর পাব না, মা। টাকা?—টাকা সে নিক। কি করব আমি টাকা দিয়ে? ইচ্ছে হচ্ছে মা, এই জলে ঝাঁপ দিয়ে এখুনি ডুবে মরি!"

তিলোত্তমা শিহরিয়া উঠিলেন! খোলা জানালাটির কাছে বসিয়া রহিয়াছে, কে জানে, সত্যই যদি জলে একটা ঝাঁপ-টাপ দিয়া ফেলে? তাড়াতাড়ি উঠিয়া তিনি কাছে আসিয়া বসিলেন। কন্যাকে ধরিয়া গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া কহিলেন, "ও সব পাগলামো কথা আর বলিসনি, মা! শুনতে ভয় করে। কি এমন হয়েছে? মনের একটু টান ওদিকে—তা হয়ে পড়েছে—কি আর হবে? একটু বুঝে শুনে চল্‌বি, সব ঠিক হয়ে যাবে। নে, আর কাঁদিস্ নি বাছা, এখন শুয়ে পড়। শুয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা দেখ। জেগেই দেখবি গিয়ে পৌঁছেছিস, নদীর ধারে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখন শো—শুয়ে থাক্ বাছা।" বলিয়া কন্যাকে ধীরে ধীরে শোয়াইয়া দিয়া কাছেই বসিয়া রহিলেন।

২

সন্ধ্যা ঘোর হইয়া আসিল। লঞ্চের অপেক্ষায় নদীতীরেই কিরণ দাঁড়াইয়াছিল। দাঁড়াইয়া আনমনাভাবে কি ভাবিতেছিল। দূরে একটা ফুঁ শোনা গেল। কিরণ ছটফট করিয়া উঠিল। সতীশ আসিয়া তখন পাশে দাঁড়াইল। কহিল, "ওঁরা ত এখুনি এসে পৌঁছবেন!"

"হুঁ।"

"কি করবে এখন, ঠাউরেছ কিছু?"

"আজ রাতটা ওঁরা ঐ লঞ্চেই থাক্‌বেন।"

"তার পর কাল?"

"কাল—সে কাল দেখা যাবে। আজ আর ভেবে কি হবে?"

"ভাবতে আজই হয়। সেইটেই বুদ্ধিমানের লক্ষণ।"

"বুদ্ধিমান্ আমি কস্মিন্‌কালেও নই, সতীশ।"

"অন্যের কাছেও বুদ্ধি একটু নিতে কখনও চাও নি। তা—আজ একটু নেবে? এখনও হয় ত সময় আছে। আমরা পালালে ভাল হ'ত না?"

"আপাততঃ ঘরে গিয়ে পালাতে পার। আর যদি মুখে না সরে, হারুকে গিয়ে বল, একটা আলো নিয়ে চ'লে আসুক।"

সতীশ কহিল, "তাই করা যাক্। আর আমার এমন ভয়ই বা কি? ধ'রে কেউ আমাকে মারবে না। আজও না, কালও না।"

"না, তা কেউ মারবে না। আরও আমার মার খাওয়াটা দেখে হেসে বেশ একটু মজা লুটতেই বরং পারবে।"

"তা পারব বই কি? এতবড় একটা ট্র্যাজিক কমেডী বা কমিক ট্র্যাজেডী—জীবনে কখনও দেখিও নি, দেখবও না।"

"মা কি করছেন?"

"থ' হয়ে ব'সে আছেন। কি আর করবেন?"

"সুরবালা?"

"মেজাই কুটনো কুটে নিয়ে রান্নাঘরে গে' ঢুকল দেখলাম।"

"হুঁ!"

"আর হারুকে সুধোচ্ছিল—ঘি ময়দা ঘরে কোথাও ত নেই, যোগাড় ক'রে দিতে পারে কি না।"

"হুঁ! —তা গিয়ে ব'লো, ভাবনার কোনও কারণ তার নেই। ঘি ময়দা টয়দা সব বিমল ওরাই যোগাড় ক'রে আনছে। অতিথি-সৎকারটা ভালই আজ রাত্তিরে সে করতে পারবে, কাল তার ভাগ্যে যাই থাক।"

"সেটা তুমি যত পার ভাব। সে কিছু ভাবছে ব'লেই ত মনে হচ্ছে না।"

"না!"

"আচ্ছা, পালাই তবে। হারুকেও পাঠিয়ে দিচ্ছি। ঐ যে—আলো নিয়ে হারু আসছে। খাসা তৈরী চাকর বটে! আচ্ছা, পালাই তবে। 'যঃ পলায়তি স জীবতি!'"

বলিয়াই সতীশ ফিরিল।—আলো দেখিয়া লঞ্চ আসিয়া নিকটেই তীরে ভিড়িল। টমকে লইয়া বিমল ও সুপ্রকাশ তখনও বাহিরে বসিয়াছিল।

"ঐ যে বাবা—বাবা আসছে—"

কেমন যেন একটু সঙ্কুচিতভাবে চাপাস্বরে এই বলিয়াই টম মুখ ফিরাইয়া বিমলের গলাটি জড়াইয়া ধরিল। কিরণ তখন সিঁড়ি বাহিয়া লঞ্চের উপর গিয়া উঠিল।

"যাও, বাবার কোলে যাও টম্।" ফিরিয়া একবার একটু চাহিয়াই আবার ঘুরিয়া টম্ আরও শক্ত করিয়া বিমলের গলাটি জড়াইয়া ধরিল। একটি নিশ্বাস চাপিয়া কিরণ হাতদুটি বাড়াইয়া কহিল, "এস টম্।"

টম্ তাড়াতাড়ি বিমলের গলাটি ছাড়িয়া দিয়া ছুটিয়া ভিতরে ঢুকিয়া একবারে মায়ের গা ঘেঁসিয়া গিয়া বসিল।

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কিরণ কহিল, "আচ্ছা, তোমরা এখন বাড়ীতে যাও, বাজার যা এনেছ নিয়ে। হারুকে একটু বাদে পাঠিয়ে দিও। যা দরকার, আমি ব'লে পাঠাব।"

বলিয়া কিরণ ভিতরে গিয়া শ্বশুর-শাশুড়ীকে প্রণাম করিল। সাড়া পাইয়া বরুণা মুখ ফিরাইয়া একটি জানালার কাছে বসিয়াছিল, সেই ভাবেই বসিয়া রহিল—চক্ষুদুটি ভরিয়া টস্ টস্ করিয়া তখন জল পড়িতেছিল।

"এস বাবা, এস! ব'স, ভালো আছ ত?" বলিয়া নীলাম্বর বাবু জামাতাকে সম্ভাষণ করিলেন।

"হাঁ, আছি ভালই। তা—পথে আপনাদের অসুবিধে কিছু হয়নি ত?"

"অসুবিধে! না, অসুবিধে কি হবে? খাসা সব বন্দোবস্ত ক'রে পাঠিয়েছ। আর ছেলে দুটিও দেখলাম খাসা ছোকরা—একেবারে up-to-date. কিছু অসুবিধে হয়নি। যা দরকার, সব না চাইতেই পেয়েছি। বেশ আরামেই এয়েছি। তবে বরুণের শরীরটা ত তেমন ভাল নয়। কেমন নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। চা-টাও কিছু খেলে না—শুয়েই প্রায় সারাটা পথ ছিল। এই কেবল উঠে বসেছে। কেমন, এখন একটু ভাল বোধ করছিস ত, বরুণ?"

বরুণা কোনও সাড়া দিল না। অতি আয়াসে বুকভাঙ্গা একটা রোদনের উচ্ছ্বাস সম্বরণ করিল। নীলাম্বর বাবু একটুকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "কি মা? শরীরটা কি আবার খুব খারাপ বোধ করছ?"

একটু ভ্রুকুটি করিয়া তিলোত্তমা কহিলেন, "আঃ! কেন ওকে মিছে বিরক্ত করছ? আছে চুপ ক'রে থাক্। শরীর—ভাল ত নয়ই। আরও এখন—বেশী একটু নার্ভাস হয়ে ত পড়বেই।"

বলিয়া উঠিয়া গিয়া কন্যার কাছে বসিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া নীলাম্বর বাবু জামাতার দিকে চাহিলেন। কহিলেন, "তা হ'লে—এখন ত আমাদের উঠতে হবে?—তা বাড়ীটা কদ্দূর? বরুণা হেঁটে যেতে পারবে ত? শরীরটা ভালো নয়। নার্ভাস হয়েও পড়েছে বড়। তা conveyance ত এখানে বোধ হয় কিছু নেই—"

একটু বিদ্রূপের হাসি-রেখা তিলোত্তমার মুখে ফুটিয়া উঠিল। কহিলেন, "তোমার যেমন কথা! লোকজনের সাড়াশব্দ নেই; একটি আলো পথে কি বাড়ীতে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। গাড়ীটাড়ী কোত্থেকে এখানে আসবে? এক যদি পাল্কী-ডুলী দুই একখানা মেলে—"

কিরণ কহিল, "বাড়ী কাছেই। ও-সব দরকারই কিছু হবে না। পাওয়াও যায় না কিছু—খোলা দুই একখানা গরুর গাড়ী ছাড়া। তা এই রাত্তিরটা আপনারা এই লঞ্চেই বরং থাকুন—"

মোটর লঞ্চ, কামরাটিতেও তাড়িতালোক জ্বলিতেছিল, আরামে রাত্রিযাপনের বন্দোবস্তও সব বেশ ছিল। চাহিয়া দেখিয়া নীলাম্বর বাবু কহিলেন, "তা—রাত্তিরটা বেশ এখানে থাকা যেতে পারে বটে। তবে একটি মোটে কেবিন—তা এক কাষ করা যাক্ না? আমরা উঠি, তুমি বরং বরুণকে নিয়ে এই লঞ্চেই আজ থাক—"

বলিয়া নীলাম্বর বাবু কিরণের মুখপানে চাহিলেন।—একটু মাথা চুলকাইয়া কিরণ কহিল, "সেটা—সুবিধে হবে না। আপনারা থাকতেই গিয়ে পারবেন না ওখানে,—আরও এই রাত্তির বেলায়—"

"কেন পারব না? যায়গা নিরেলা হ'ক্, ভালো বাংলো ঘর ত? ভাল আলোটালোও অবিশ্যি আছে। আর বাথরুমটুম—"

একটু হাসি চাপিয়া কিরণ কহিল, "কিছুই ও-সব নেই। বাংলো ঘরই নয়। দু তিনখানা কুঁড়ে ঘর মাত্র—এই সব যায়গায় যেমন হয়। গোলপাতার চাল—হোগলার বেড়া—কাঁচা ভিত—"

"বল কি! তা হ'লে" কেমন একটা বিস্মিত শঙ্কিত দৃষ্টিতে নীলাম্বর বাবু চাহিলেন।

কিরণ কহিল, "আজ্ঞে, আপনারা যে আসবেন, এটা ভাবতেও কখনও পারিনি। জানতেও আগে পারিনি। আর জানতে পারলেই বা কি? সে-রকম কোনও ব্যবস্থা এখানে সম্ভবই হ'ত না। তাই এই লঞ্চটার বন্দোবস্ত করেছি—দু তিন দিন যা থাকেন, এখানেই বেশ থাকতে পারবেন।"

"আমরা—হাঁ, দু'তিন দিন যা থাকতে হয়, লঞ্চেই বেশ থাকতে পারব বটে। কিন্তু বরুণকে যদি কিছুদিন থাকতে এখানে হয়—"

"আমার ঐ কুঁড়ে ঘরেই থাকতে হবে।"

"কিন্তু শরীরটা ত ওর ভাল নয়—"

"কি করব? অন্য রকম কোনও ব্যবস্থা করা সম্ভব এখানে হ'তে পারে না, আর সাধ্যায়ত্তও আমার নয়।"

"শুনলাম, ফিরে গেলে ঐ চাকরীতে এখুনি আবার তোমাকে তাঁরা নিতে পারেন—"

"হাঁ। কাল একটা চিঠিও পেয়েছি।"

"তা হ'লে—"

"ফিরে যাবার ইচ্ছে আমার নাই। এখানে কাযকর্ম্ম একটা আরম্ভ ক'রে দিয়েছি। দেখতে চাই কি ক'রে উঠতে পারি।"

নীলাম্বর বাবু কহিলেন, "হাঁ, তেমন খরচপত্তর ক'রে বেশ একটু higher styleএ—এই যেমন ওদের সব plantation থাকে—তেমনি ধারা কাযের একটা বন্দোবস্ত ক'রে নিতে যদি পার—আর থাকবার যায়গাটাও—"

"ও সব বড় দরের সাহেবী plantation এখানে কিছু হ'তে পারে না। ছোট ছোট ফার্মে বাঙ্গালী গেরস্তর মতই থাকতে হবে। চেষ্টাও আমি সেই রকমই করছি—"

"হুঁ—! কিন্তু বরুণ—"

কিরণ কহিল, "খুলেই ত আমি লিখেছিলাম, কি রকম কাযকর্ম্ম আমি করব, কি ভাবে থাকব—"

একটু কি ভাবিতে ভাবিতে নীলাম্বর বাবু কহিলেন, "কিন্তু এটাও ত তোমাকে ভাবতে হয়, বিবাহ ওকে করেছ—cultured refined familyর মেয়ে—delicately brought up—আর সেই ভাবেই পাঁচ ছ'বছর ওকে রেখেছ। এখন হঠাৎ তাকে এই অবস্থার মধ্যে যদি এনে ফেল—"

"অবস্থা এ রকম হ'লে আর উপায় কি? স্বামীর অবস্থা যখন যেমন হবে, তার সঙ্গে মানিয়েই ত স্ত্রীকে চলতে হবে।"

তিলোত্তমা বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু অবস্থাটা এ রকম কেন হ'ল? ভাল চাকরী-বাকরী করতে, অত বড় মান-মর্য্যাদায় ছিলে, হঠাৎ ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে এই বাদার যে চাষ করতে চ'লে এলে—কেন? সত্যি ত একটা বিপদে প'ড়ে এখানে এসে তোমাকে আশ্রয় নিতে হয়নি? তা হ'লে সে কথা ছিল আলাদা। আপত্তি ওর কিছু হ'তেই পারত না। মরুক বাঁচুক, এইখেনে তোমার কাছে এসে থাকতেই হ'ত।"

"তাই যদি পারত, এখনই বা কেন পারবে না? আমার কাযের কর্ত্তা আমি। একটা কায ছেড়ে নতুন ধরণের আর একটা কাযে যদি আমি যাই—"

"না, স্বেচ্ছায় তা তুমি যেতে পার না। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার রয়েছে, তাদের কথাটাও ভাবতে হয়। যখন যেখানে খুসী—যে কোনও দুঃখক্লেশে তাদের টেনে নিয়ে ফেলবে, পুরুষমানুষ ব'লে কি কাযের কর্ত্তা ব'লে এ অধিকারও সত্যি কারও থাকতে পারে না।"

কিরণ উত্তর করিল, "স্ত্রীপুত্র-পরিবার আছে ব'লে যে কোনও একটা যায়গায়, বিশেষ একটা অবস্থায়, চিরকাল কাউকে বাঁধা থাকতেই হবে—ভাল লাগুক কি না লাগুক—এমন কথাও হ'তে পারে না। তার নিজেরও সুখ-দুঃখের বিবেচনা একটা আছে।"

"আছে। কিন্তু কি এমন দুঃখে সেখানে ছিলে? হাঁ, ও যায়গা ভাল না লাগত, অন্য কোথাও ঐ রকম—কি না হয় ওরা সুখে থাকতে পারে, এই রকম আর কোনও কাযে তুমি যেতে। কিন্তু এ তুমি কি একটা যায়গায় কি কাযে এসেছ? আর এসেছ ত রাগ ক'রে কেবল ওকে জব্দ করবে ব'লে?"

"কেন এসেছি, সব ত জানেন।"

"জানি। না হয় একটা ভুল-ত্রুটি ওর হয়েছিলই। তা বিয়ে করেছিলে, একটা অপরাধ কি ওর ক্ষমা করতে নেই? একেবারে এত বড় একটা শাস্তিই তার জন্যে ওকে দিতে হয়? আমরাও ত ছিলাম, মীমাংসা একটা কিছু কি ক'রে দিতে পারতাম না? তা কাউকে কিছু না ব'লে, মীমাংসা একটা কিছু হ'তে পারে না পারে, কিছু না দেখে, অমনি সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে তুমি চ'লে এলে এমন একটা যায়গায় যে, ও এসে তোমার এই সংসারে দুটি দিন না থাকতে পারে। যেন একদম ত্যাগই ওকে করতে চাও। আর সেই মতলব ক'রেই চ'লে এসেছ।"

কিরণ নীরব। তিলোত্তমা কহিলেন, "আর সেই ত্যাগ যে করবে, কাকে করবে? হাঁ, ও পরের মেয়ে—কাল বিয়ে করেছিলে, আজ যদি দরদটা এমন গিয়েই থাকে—তবু দুটি ছেলে ত ওর পেটে হয়েছে? দরদটা কাটিয়ে তাদের ত্যাগ করতে পার?"

ধীর স্বরে কিরণ উত্তর করিল, "ত্যাগ ত আমি কাউকে করতে চাইনি।"

"না, স্পষ্ট ঠিক ও কথাটা বলনি। কিন্তু এখানে এই বাদা-বনে এসে কুঁড়ে ঘরে থাকতে যে বলছ, এটা জেনেই ত বলছ, ও তা পারবে না। তবু যদি, উনি যা বলছিলেন, বড় রকমের একটা কিছু করতে, আর লোকজন নিয়ে বাংলো-টাংলো একটা ক'রে থাকতে—আশা ত করেছিলাম, তেমনিই বুঝি একটা কিছু করেছ।"

"সেটা এখানে সম্ভবই হ'তে পারে না। আর অত বড় একটা আশা করতে পারেন, এমন কোনও আভাসও বোধ হয় আমার চিঠিতে পাননি।"

"কিন্তু—শরীরটা ওর এই রকম, সেটাও ত তোমাকে ভাবতে হয়। সত্যি কি আস্ত ধ'রে গলা টিপে ওকে মেরে ফেলতে চাও?"

"আপাততঃ—শরীর যদ্দিন ভাল না হয়—কলকেতায় বরং থাকতে পারে। মাঝে মাঝে আমি গিয়ে দেখে আসব।"

মুখ ফিরাইয়া আরক্ত চক্ষু দুটি তুলিয়া বরুণা তখন কহিল, "না, আমি এইখেনেই থাকব। মরতেই যদি হয়, এইখেনেই মরব, আর কোথাও যাব না!"

একটি নিশ্বাস চাপিয়া দাঁতে দুটি ঠোঁট কামড়াইয়া কিরণ মুখখানা অন্য দিকে ফিরাইয়া লইল। বরুণা সেটা লক্ষ্যও করিল।

হারু তখন আলোটি হাতে করিয়া উপরে নদীর পাড়ে আসিয়া দাঁড়াইল। শাশুড়ীর দিকে চাহিয়া কিরণ কহিল, "রাত্তিরে আপনাদের জন্তে লুচি ক'রে পাঠাতে বলব ?"

চক্ষু মুছিয়া তিলোত্তমা কহিলেন, "তা বল্‌তে পার। কিন্তু অত হাঙ্গামা কে করবে ?"

কিরণ কহিল, "লোক আছে। অসুবিধে কিছু হবে না।"

বরুণা কেমন একটা তীব্রদৃষ্টিতে চাহিল। নীলাম্বর বাবু কহিলেন, "হাঁ, ঐ ছেলে দুটি আছে—দেখলাম, কাযকর্ম্মে বেশ চটপটে বটে! তা ওরা খাবার-টাবারও তৈরী করতে পারে ?"

"পারে।"

উঠিয়া কিরণ একটি জানালার কাছে গিয়া কি করিতে হইবে হারুকে বলিয়া দিল।

একটু চাপা স্বরে বরুণা মাকে কহিল, "গোটা কত কথা আমি বলব। তোমরা একটু বাইরে গিয়ে ব'স না, মা ?"

তিলোত্তমা ও নীলাম্বর বাবু উঠিয়া বাহিরে গিয়া বসিলেন। লখিয়াও জিমকে কোলে লইয়া উঠিয়া বাহিরে গেল। টমও উঠিয়া দাঁড়াইল; এদিক ওদিক একবার চাহিয়া ছুটিয়া বাহিরে গেল।

বরুণা কহিল, "তুমি লিখেছিলে, ইচ্ছে হ'লে এইখেনে এসে আমি থাকতে পারি—"

"হাঁ।"

"কেন, কি মনে ক'রে লিখেছিলে, তুমিই জান। হয় ত ভেবেছিলে, ঐ রকম কিছু একটা লেখা তোমার উচিত—"

"হাঁ, উচিত ত দু'পোবার।"

"শুধুই উচিত! কিন্তু মনে মনে এটা বোধ হয় চাওনি যে, এখানে এসে আমি থাকি। আর এটাও বোধ হয় ভাবনি যে, সত্যি আমি আসব ?"

"এ কথা কেন বল্‌ছ ? আমি ত—"

"না, মুখে স্পষ্ট ক'রে সে কথাটা বল্‌ছ না। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি, আমি যে এসেছি—এটা—এটা"—দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বরুণা কাঁদিয়া উঠিল।

কিরণের বড় দুঃখ হইল। কাছে গিয়া বরুণার পিঠে হাতখানি রাখিল। স্বামীর বুকে মুখখানি রাখিয়া বরুণা কতক্ষণ কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতে শেষে কহিল, "কেন, কেন এত বড় শাস্তি আমাকে দিলে ? নিজেকেও এমন ক'রে ডোবালে ? অন্যায় একটা করেছিলাম,—হাঁ, খুবই অন্যায়। কিন্তু আমি মেয়েমানুষ—মনের জ্বালায় পাগল হয়ে যা-ই ক'রে থাকি—ক্ষমা কি করতে পারতে না ? তেমন ক'রে একটু বোঝালে কি সত্যিই আমি বুঝতাম না ? চ'লে এলে যেন জন্মের মত আমার খোরপোষটা সব বুঝিয়ে দিয়ে—"

কিরণ কহিল, "সেটাও ত আমাকে করতে হয়, বরুণ, যদি না আমার নতুন এই অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে আমার কাছে এসে থাকতে তুমি পার!"

"এই অবস্থাটা ত নিজেই সৃষ্টি ক'রে নিলে—যেন—যেন এত বড় একটা শাস্তি আমাকে দেবে তাই।"

"তোমাকে শাস্তি দেবার জন্তে নয় বরুণ, নিজের গরজেই চ'লে আসতে হ'ল।"

"নিজের গরজ—সেও ত—সেও ত—আমি অত বড় একটা অশান্তি তোমার ঘটাচ্ছিলাম—সত্যি একেবারে অতিষ্ঠ করেই তোমাকে তুলেছিলাম—তাই—"

"থাক্ ও কথা, বরুণ। যা হবার হয়ে গেছে। এখন আর—"

"কিন্তু ফিরে কি সত্যিই যাবে না ? যেতে চাওই না ? না, ফিরে চল,—সব অপরাধ আমার ক্ষমা কর। তোমার রোজগারের টাকা যা খুসী তোমার ক'রো—যাকে যা খুসী দিও। কথাটিও আমি কব না। যে ভাবে থাকতে বল, তাই থাকব—কোনও অশান্তি তোমার কখনও ঘটাব না। বল—বল—যাবে ?"

বুকে অশ্রুসিক্ত মুখখানি রাখিয়া স্বামীর গলাটি বরুণা জড়াইয়া ধরিল। কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "এত বড় একটা শাস্তি—না, শাস্তি কেবল আমার নয়—অপরাধ করেছি—শাস্তি আমি মাথায় তুলে নিতাম—সইতে না পারতাম—মরেই বরং পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতাম! কিন্তু তোমার এই শাস্তি, আর তার কারণ হলাম আমি—"

"না, না বরুণ, ও ভেবে দুঃখু পেও না কিছু। শাস্তি হ'লে যা হবার তোমারই হয়েছে—আমার কিছুই হয় নি। বরং এখনকার নতুন এই জীবনটাকে ভগবানের বড় আশীর্ব্বাদ বলেই মনে করছি।"

"আশীর্ব্বাদ! আশী—র্ব্বাদ ? কেন ? কিসে এটা একটা আশীর্ব্বাদই বা তোমার হ'ল ?"

চক্ষু মুছিয়া বরুণা কেমন একটা বিস্মিত চকিত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখপানে চাহিল।

কিরণ কহিল, "যদি থাকতেই পার, আর সত্যি মনটা তোমার ফেরে, বুঝতে পারবে, কেন এটাকে আশীর্ব্বাদ বলছি।"

"বুঝতে পারছিনি। তবে থাকতেই আমাকে হবে, ফিরে যদি তুমি না-ই যাও।"

"ফিরে আমি যেতে পারব না, বরুণ।"

"জানতাম—যখন এসেছিলাম,—ওঁরা যা-ই বলুন—আমি জানতাম, ফেরাতে তোমাকে পারব না। পাষাণ তুমি, আর কারও কোনও দুঃখ বুঝবে না। থাকব ব'লে প্রস্তুত হয়েই এসেছিলাম—"

"বেশ, তবে থাক।"

"থাক—কিন্তু কথাটা যেন মনে-প্রাণে বলছ না। যেন—যেন—"

"আর কিছু নয়, বরুণ! তবে—তবে—আশঙ্কা হচ্ছে—বড্ড অসুবিধে তোমার হবে—ক্লেশও অনেক পাবে। অভ্যেস ত এ রকম কিছু নেই। আরও শরীরটা ভাল নয়—"

"তবু ত ফিরে যেতে তুমি চাইছ না ? বাধ্য ক'রে এইখেনেই রাখতে আমাকে চাইছ!"

"বাধ্য ক'রেও তোমাকে রাখতে চাইছি নি, বরুণ। তবে আমাকে যদি চাও, থাকতে তোমাকে এইখেনেই হবে, এই অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলতেও হবে। কারণ, যে কায সুরু করেছি, তা ছেড়ে আমি এখন কোথাও আর যেতে পারি নে। তাই বলছিলাম, শরীরটা তোমার যদ্দিন ভাল না হয়, কলকেতায় গিয়ে থাক, ডাক্তার-কবরেজ দেখাও—"

"না, না, কোথাও যাব না আমি,—যেতে পারবই না। কেন আমাকে ফিরিয়ে পাঠাতে চাচ্ছ ? তোমার অসুবিধে হবে ?"

"না—না, আমার কি আর অসুবিধে হবে ? অসুবিধে যা হবে তোমার। কারণ, যেমনটা হ'লে ভাল হ'ত, তেমন কোনও আরামে তোমাকে রাখতে পারব, তার কোনও সম্ভাবনাই দেখতে পাচ্ছিনি।"

"সম্ভাবনা না থাকে, নাই হবে। যে ভাবে রাখবে, তাই থাকব। না থেকে উপায় কি ? যেতে ত পারছিনি ! আরামের জন্ম ভাবছিনি—তবে—তবে ভাবছি, শরীরটা যদি একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে—তা পড়ে পড়ুক, মরণ হ'লেও এখন বাঁচতাম ! তোমারও নিষ্কৃতি হ'ত !"

"ছি ! ও কথা কেন বলছ, বরুণ ?" বলিয়া বরুণার পিঠে কিরণ হাতখানি রাখিল। হাত সরাইয়া দিয়া বরুণা একটু সরিয়া বসিল। নীরবে একটুকাল কি ভাবিয়া শেষে কহিল, "টাকা কি সত্যিই সবে ঐ দুই হাজার তোমার সম্বল ?"

"তাই ত ছিল। কিন্তু এখন—"

"কি, আরও পেয়েছ ? হাঁ, আমারও সেটা মনে হচ্ছিল—"

"মনে হচ্ছিল ? কিসে—কিসে মনে হচ্ছিল ?"

"যাতেই হোক, হচ্ছিল। তা টাকা কোথায় পেলে ?"

একটু কাল নীরব থাকিয়া কিরণ শেষে কহিল, "দেশে ওদের জন্যে যেটা পাঠিয়েছিলাম—"

"হাঁ, জানি, সেইটে আবার ফেরত নিয়েছ। আর আমি—আমি—আমাকে এতগুলো টাকা দিয়েছিলে—সেটা তোমার পরের টাকা ?"

"ফেরত আমি নিজে নিইনি বরুণ, যেচে তারাই দিয়ে দিয়েছে।"

বরুণা কহিল, "আমার টাকাও আমি যেচে দিচ্ছি। নেও ; ওটা ফেরত নেও।"

"তোমার ত প্রয়োজন হ'তে পারে।"

"কিসে হবে ? কেন হবে ? আমি ত এইখেনেই থাকব ? আলাদা অতগুলো টাকা কিসে আমার লাগবে ? দরকার বরং তাদেরই হ'তে পারে যদি আমি থাকি, আর আমাকে রাখ। বল, ফেরত নেবে ?"

"বেশ, তাই দেওয়া যাবে।" একটি নিশ্বাস কিরণ ছাড়িল। কহিল, "আচ্ছা, তা হ'লে এখন উঠি, বরুণ। ওঁরাও বাইরে ব'সে রয়েছেন। যাই, গিয়ে তোমাদের খাবারটা এখন পাঠিয়ে দিই।" বলিয়া কিরণ উঠিল।

"না, বসো একটু। খাবারের জন্যে এমন তাড়া কিছু নেই—" হাত ধরিয়া টানিয়া বরুণা কিরণকে বসাইল। কহিল, "রাত্তিরে এই লঞ্চেই আমাদের থাকতে হবে ?"

"হাঁ, সেইটেই সুবিধে হবে।"

"কেন বাড়ীতে—ঠিক কদ্দূর হবে বাড়ীটা ?"

"এই কাছেই। রাত পোয়ালে বেশ দেখতেই পাবে এখান থেকে।"

"তা হ'লে নিয়েই কেন যাও না আমাদের।"

"এই রাত্তিরে—না না, রাত্তিরটা আজ থাক বরুণ, কাল দিনের বেলায় যাবে। অমন ধারা ঘর-দোরে কখনও ত থাকনি, হঠাৎ এই রাত্তিরে গিয়ে বড্ড বিশ্রী লাগবে।"

"লাগবে লাগুক, থাকতে ত ঐখেনেই হবে। একটা রাত্তিরের এইটুকু আরামে কি আর এমন রাজা হব ? না, নিয়েই যাও আমাদের।"

"ওঁরা রয়েছেন। গিয়ে থাকতেই পারবেন না।"

"ওঁরা বরং ছেলেদের নিয়ে এইখেনেই থাকুন। আমাকে নিয়ে যাও।"

বলিয়া হাতখানি বড় জোরে চাপিয়া ধরিল। কাঁধের উপরে মাথাটি রাখিল।

পিঠে হাত বুলাইয়া, একটু আমতা আমতা করিয়া কিরণ কহিল, "সে ভাবে ত প্রস্তুত ক'রে কিছু রাখিনি—সব আলুথালু—না, আজ এইখেনেই থাক বরুণ—কাল সকালেই—"

"প্রস্তুত—তা এই রাত্তিরের ভেতর কি আর এমন প্রস্তুত ক'রে ফেলবে ? না না, সে সব কিছু দরকার হবে না আমার। তুমি ত থাকবে, আমিও থাকতে পারব—প্রস্তুত যা দরকার হয়, সকালে নিজেই বরং ক'রে নেব। না, নিয়েই যাও আমাকে। হেঁটে বেশ যেতে পারব। শরীরটা একটু খারাপ বোধ হচ্ছিল—এখন বেশ ভালই লাগছে। চল, এখুনি যাব।"

বলিয়াই বরুণা উঠিল। টানিয়া বরুণাকে বসাইয়া কিরণ কহিল, "না না, এত ব্যস্ত কেন হচ্ছ, বরুণ ? এই রাত্তিরে—সুবিধে হবে না—"

"অসুবিধেই বা কি এমন হবে ? হয় হবে। এই এদ্দিন পরে তোমাকে পেলাম—ছেড়ে যে থাকতে পারছিনি—"

কাঁদিয়া বরুণা স্বামীর বুকে মাথাটি রাখিয়া গলাটি দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল।—কিরণ যার-পর-নাই বিপন্ন হইয়া পড়িল। দুঃখও বড় হইল। ধীরে ধীরে বরুণার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "কি করব—লক্ষ্মীটি আমার, আজকার এই রাতটা একটু ধৈর্য্য ধ'রে থাক। কাল সকালেই নিয়ে যাব। যাওয়াটি সে আজ হবে না। লোকজন কটি আছে—"

"লোকজন ! কে—কারা আছে ?"

কেমন চমকিয়া মুখ তুলিয়া বরুণা চাহিল।

ঢোক গিলিয়া কিরণ কহিল, "ঐ ত বিমল আর সুপ্রকাশ রয়েছে—আরও কয়টি লোক এসেছে এই জমি দেখতে—তা কাল সকালেই তাদের কাছারী-বাড়ীতে পাঠিয়ে দেব। আজ এই রাত্তির বেলায় হঠাৎ এখন গিয়ে ত তাদের বলতে পারিনে যে, না, এখুনি তোমাদের বেরুতে হবে—"

গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া বরুণা চুপ করিয়া রহিল। কিরণও কিছুকাল মৌন থাকিয়া শেষে কহিল, "তা হ'লে এখন আসি, বরুণা।"

"এস !" বলিয়া বরুণা মুখ ফিরাইল। কিরণ ধীরে ধীরে উঠিয়া বাহির হইয়া গেল।

৩

বড় মন-মরা হইয়াই কিরণ বাড়ীতে ফিরিল। বরুণার জন্যও বড় দুঃখ হইতেছিল। আবার এই সঙ্কটে এখন কি সে করিতে পারে, ভাবিয়া তাহারও কোনও কূল-কিনারা পাইতেছিল না। ঘরে গিয়া উঠিতেই সৌদামিনী কহিলেন, "কি, কি হ'ল ? কি বন্দোবস্ত ক'রে এলি ?"

"আজ রাত্তিরটা ত ওঁরা ঐখেনেই থাকবেন।"

"কিন্তু রাত্তির ত পোয়াবে। তখন ?"

"তখন—ওঁরা দুই এক দিন যা থাকেন, লঞ্চেই থাকতে পারবেন।—তবে—"

"বৌকে আনতে হবে। তা হ'লে থাকতে এখানে সে রাজি হয়েছে ?"

"হাঁ।" মুখখানি কিরণ অন্য দিকে ফিরাইয়া লইল। গভীর একটি নিশ্বাস সৌদামিনী ত্যাগ করিলেন। একটু কি ভাবিয়া শেষে কহিলেন, "থাকতে এখানে সে পারবে ?"

"থাকতে যদি চায়, পারতেই হবে।"

"সকালেই তবে ওদের তুলে আনতে হবে ?"

"সম্ভব।"

"তার পর ? আমরা তখন কি করব ?"

"তাই ভাবছি —"

"ভাবছিস্ ? ভেবে কি করবি এখন ? কাল বিকেলে খবর পেয়েছিস্—বিকেল গেল, রাত গেল, সারাটি দিনও আজ গেল, ভাবলি নি। এত ক'রে বলা হ'ল, কাণেও কোনও কথা তুল্লি নি। এখন তুই ভাবছিস্! চিরকালই তুই এই ভুল করলি, কিরণ। সময় থাকতে ভালমন্দ কিছু ভাবলি নি—কেবল খেয়ালেই চল্লি।—আর তাই চ'লে চ'লে এমন সব জট এখন পাকিয়ে ফেলেছিস্ যে, একটু ফাঁস আর কোনও দিকে চোখে দেখতে পাস্ নি ?"

"না !"

"তা হ'লে কি করবি এখন ?—এই ত রাত্তিরটুকু সময়। কোথায় নিয়ে আমাদের লুকোবি ?—সকালেই যদি ওরা এসে উঠে, আর এসে আমাদের দেখে—না, মা, সে হ'তেই পারে না, কিরণ। হাঁ, একা আমি থাকতাম, কোনও কথা ছিল না। কিন্তু ঐ আবাগী রয়েছে—এসে দেখেই ত আগুন হয়ে যাবে। ধ'রে তা'কে চুলে ধরেই টেনে ওকে হয় ত বের ক'রে দেবে—"

"পাগল হয়েছ, মা! তাও কি হয় কখনও ? আমার সামনে—"

"কি তুই করবি ? করতে পারবি কি ? করতেই যদি কিছু পারবি, তা হ'লে তোরই আজ এই দশা হয়, না ওরই এই দশা হয় ?"

একটু আড়ঘোমটা টানিয়া পাশের দরজার কাছে সুরবালা আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চাপা স্বরে কহিল, "এই রাত্তিরেই আমরা চ'লে যেতে পারিনে, মা ? একটা নৌকো-টৌকো যদি পাওয়া যেত—তাই এখন দেখলে হ'ত না ?"

মাথায় হাত রাখিয়া কিরণ কতক্ষণ ভাবিল।—শেষে কহিল, "দেখছি—যেতেই তোমাদের হবে, মা! কিন্তু এই রাত্তিরে—এখন নৌকোই বা কোথায় ? আর ঝড়ঝাপটা যদি আসে—"

সৌদামিনী বলিয়া উঠিলেন,—"তা হ'লে ত সোণায় সোহাগা হবে ! তখন ওদেরও এনে বাড়ীতে তুলতে হবে। বাইরের ঝড় ত ভাল। ঘরে তখন যে ঝড় উঠবে—তার তাল কে সামলাবে ?"

সুরবালা কহিল, "আর কোথাও গে আমরা থাকতে পারিনে ? শেষে দিনের বেলায় একটা নৌকো-টৌকো দেখে—"

একটু ভাবিয়া কিরণ কহিল, "থাকবার এক যায়গা হ'তে পারে, কাছারীবাড়ীতে। কিন্তু—"

সুরবালা কহিল, "ভাববার আর সময় নেই।—সেইখেনেই তবে আমরা যাই, মা।"

সৌদামিনী কহিলেন, "তাই তবে বন্দোবস্ত কর্, কিরণ। রাত্তিরেই আমরা চ'লে যাই ?"

"রাত্তিরে—এত তাড়া কি, মা ? যেতে হয়, সকালে গেলেই হবে।"

"ঝড়ঝাপটা সত্যিই যদি আসে ?—"

"আসে—তখন তার উপায় যা হয় করা যাবে। কাছারীবাড়ী উড়ে পুড়ে তার আগেই যাচ্ছে না ?—"

"আর এত বিড়ম্বনাও কপালে ছিল! কি ভাবলাম, কি হ'ল ?—তা এখন ওদের খাবার-টাবারটা কি পাঠিয়ে দেবে ?"

"দিক্।" বলিয়া কিরণ চৌকির উপরে শুইয়া পড়িল।

"তুই খাবিনি ?"

"না, বিমল আর প্রকাশকে ডাক।"

সুরবালা তাড়াতাড়ি গিয়া খাবার সব গুছাইয়া দিল। বিমল ও সুপ্রকাশ ঠাকুর সাহায্যে সব লইয়া লঞ্চে গেল। কাছে বসিয়া কতক্ষণ কি ভাবিতে ভাবিতে সৌদামিনী ডাকিলেন, "হাঁ কিরণ ?"

"কি মা ?"

"ভাবছিলাম কি—"

"কি, বল ?

"যাবার আগে খোকাদুটিকে এনে আমায় একবার দেখাতে পারিসনি ?"

কিরণ চুপ করিয়া রহিল। সৌদামিনী কহিলেন, "সেই প্রয়াগে তোর বাড়ীতে গেলাম—মন ছিল রাগে ভরা—চোখে প'ল, ফিরেও তাকালাম না। সেই থেকে পুড়ে পুড়ে মরছি ও ধন যদে আমার চোখেও কখনও দেখব না, কোলেও করব না। এত কাছে ওরা রয়েছে—আর অমনি চ'লে যাব, একটিবার দেখব না—এ যে বরদাস্ত করতেই আমি পারছিনি, বাবা। ইচ্ছে হচ্ছে, ছুটে যাই, গিয়ে তাদের বুকে জড়িয়ে ধরি। তা একটিবার সকালবেলায় যখন যাব—তখন—তখন হয় ত ঘুম তাদের ভাঙ্গবে তা একটিবারের তরে—"

সৌদামিনী কাঁদিয়া ফেলিলেন। আর্দ্র চক্ষুদুটি মুছিয়া কিরণ কহিল, "তখন না, সম্ভব হবে না, মা। তবে দেখি—কাছারী-বাড়ীতে ত তোমাদের থাকতে হবে কিছুকাল—দেখি, তখন যদি পাঠাতে পারি—"

"তুই নিজে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাস—তোর কোলে ওদের দেখে জন্মের মত আমার চক্ষুদুটি সার্থক হ'ক্।"

"দেখি।—তা অত ভাবছ কেন, মা ? থাকেই যদি ওরা এখানে, এর পরে কোনও সময় এসেও ত দেখতে পারবে ?"

"তাই কি আর আস্‌্‌তে কখনও হবে, বাবা ? তবে জানি না—মতি-গতি যদি ওদের ফেরে—তা এখন ত একটিবার দেখিয়ে দে।—এত কাছে পেয়ে চোখে একটিবার না দেখেও চ'লে যাব, সে যে ভাবতেও আমি পারছিনে, বাবা !"

গভীর একটি নিশ্বাস কিরণ ত্যাগ করিল।—উত্তর কিছু করিল না।

চক্ষু মুছিয়া সৌদামিনী কহিলেন, "তা এখন খাওয়া-দাওয়া করবিনি ? রাত হ'ল—"

"আসুক ওরা ফিরে।"

উঠিয়া সৌদামিনী দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন।

ওদিকে লঞ্চে গিয়া খাবার পৌঁছিল। প্লেটে প্লেটে টেবলে

সব পরিবেষণ করিয়া রাখা হইল। মাতার একান্ত অনুরোধে বরুণা উঠিয়া গিয়া একবার বসিল ; কিন্তু আহার কিছুই একরূপ করিতে পারিল না। শেষে এক কাপ দুধ মাত্র পান করিয়া গিয়া শুইয়া পড়িল।

নানাবিধ খাদ্য ; অতি সুস্বাদু দুগ্ধাদি গব্য ; আর পাকও হইয়াছিল অতি উত্তম। উন্মুক্ত ও বিশুদ্ধ সমীর-হিল্লোল-সেবিত বিস্তৃত নদীপথে যাত্রার পর ক্ষুধাও বেশ পাইয়াছিল। কন্যার অরুচিতে কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেও মহাপরিতোষে তিলোত্তমা ও নীলাম্বর বাবু সব উদরসাৎ করিতে লাগিলেন।

"এত সব রেঁধেছে, আর রেঁধেছেও খাসা! ভাল বামুন-টামুন আছে বুঝি?"

বলিয়া তিলোত্তমা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। বিমল ও সুপ্রকাশ কাছেই দাঁড়াইয়াছিল। সুপ্রকাশ কহিল, "আজ্ঞে না, বামুন-টামুন কেউ নেই।"

চকিতদৃষ্টিতে বরুণা চাহিল। বিমল সুপ্রকাশের কাছে ঘেঁসিয়া গায়ে একটি টিপ দিল। কিন্তু বরুণা সেটা লক্ষ্য করিল। তিলোত্তমা কহিলেন, "কে রাঁধলে তবে এত সব এমন পাকা হাতে? ও, তোমরা বুঝি? -না, তোমরাই বা এরি মধ্যে গিয়ে এত সব কি ক'রে রেঁধে আনলে?"

বিমল কহিল, "আজ্ঞে, আমাদের লোক যারা আছে, কেউ কেউ রাঁধে মন্দ নয়। -আবার কাছারীবাড়ীতে ম্যানেজার বাবুর পরিবার আছেন -দাদাকে তাঁরা খুব ভালবাসেন—খাতিরও করেন—"

"ও! তাই বল! তারাই বুঝি সব রেঁধে পাঠিয়েছে? তা বেশ রেঁধেছে। আর দুধটাও এখানকার বড় চমৎকার!"

বরুণা উঠিয়া বসিয়াছিল। একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া আবার শুইয়া পড়িল। আহারাদির পর তিলোত্তমা ও নীলাম্বর বাবু শয়ন করিলেন ; বেশ নাক ডাকাইয়াই ঘুমাইতে লাগিলেন। কিন্তু বরুণার নিদ্রা একবারেই হইল না। সমস্তটা রাত্রি শুইয়া বসিয়া ছটফট করিয়া কাটাইল। দুই একবার বাহিরে আসিয়াও দাঁড়াইল। কিছু দূরে আলো দেখা যাইতেছিল—ঐটিই তবে বাড়ী? মনে হইল, ছুটিয়া সে যায়, গিয়া দেখে, স্বামী কি করিতেছেন, আর কে ওখানে আছে, কারা আসিয়াছে।

রাত্রি-ভোরে বরুণা আর একবার বাহিরে আসিল। তখনও আলো জ্বলিতেছে। কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, সিঁড়িটা লাগানই ছিল ; ধীরে ধীরে তীরে গিয়া উঠিল। শরীর অতি দুর্ব্বল, পা কাঁপিতেছিল, মাথা ঘুরিতেছিল, বুকটার মধ্যেও যেন ঢেঁকি পড়িতেছিল। বুক চাপিয়া ধরিয়া বরুণা চরের উপরেই বসিয়া পড়িল। নদীটি রাঙ্গাইয়া পূবের আকাশে তরুণ অরুণ মাথা তুলিতেছেন, মিঠা ভোরের হাওয়াও বহিতেছিল। বরুণা একটু সুস্থ বোধ করিল ; আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘর কয়খানি কতকটা স্পষ্টভাবেই তখন দেখা যাইতেছে। একটি ঘরে আলোও জ্বলিতেছে, আর মনে হইল, সম্মুখের দরজাটিও খোলা। ধীরে ধীরে বরুণা সেই দরজা লক্ষ্য করিয়া চলিল। পা কাঁপিতেছে, বুক কাঁপিতেছে, কিন্তু তবু চলিল। তিলোত্তমার তখন ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল, কন্যাকে না দেখিয়া ধড়মড়িয়া উঠিলেন ; ব্যস্ত হইয়া জানালার কাছে আসিয়া মুখ বাহির করিলেন। দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"ও মা, একলা কোথায় যাচ্ছিস্, বরুণ! দাঁড়া, দাঁড়া আবাগী!"

বরুণা ঘুরিয়া দাঁড়াইল। তিলোত্তমা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া উপরে গিয়া উঠিলেন। কন্যার হাত ধরিয়া কহিলেন, "কোথায় যাচ্ছিস্ আবাগী এই ভোরের বেলায়?"

"মনটা বড় কেমন করছে, মা। যাই—একবার গিয়ে দেখি। ঐ দেখছ না? ঐই বুঝি বাড়ী।"

"তা হবে। তা একলা এই ভোর-বেলায় কোথায় গে উঠবি? রাতটা পোয়াক, ওরা সব উঠুক, কিরণ আসুক,—চা-টা খেয়ে একটু সুস্থ হ—"

"উঠেছে ওরা। দেখছ না, দরজা খোলা —ঘরে আলোও জ্বলছে—"

"তা হবে—হয় ত কেউ কেউ উঠেছে। হাত-মুখ ধুয়ে তৈরী হয়ে নিক। ব্যস্ত কি? কিরণ উঠে আসুক, একটু চা-টা খেয়ে সুস্থ হয়ে নে, রাত্তিরে ত কিছুই মুখে তুলিস নি, ঘুমও হয়নি বোধ হয় ভাল। চোখে মুখে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। চুলগুলো আলু-থালু -যেন সাত জন্মে চিরুণী পড়েনি। কারা নাকি এসেছে—এই ভাবে কি ক'রে গে উঠবি—ঘর ভ'রে হয় ত তারা কেউ কেউ শুয়েই প'ড়ে রয়েছে"

"কারা এসেছে?"

"সে কি আর আমি জানি, মা? তোকেই ত ব'লে গেল। তুই আয়, এখন ফিরে আয়। চোখে মুখে জল দে। কাপড়টা ছাড়; নপিয়া মাথাটা আঁচড়ে চুলগুলো ঠিক ক'রে দিক।—ওরা এসে চা ক'রে দিক, খেয়ে একটু সুস্থ হ—কিরণ নিজেই ত এসে তখন তোকে নিয়ে যাবে—"

মাথা নাড়িয়া বরুণা কহিল, "না মা, উঠে এদ্দুর এসেছি, গিয়ে একবার দেখেই না হয় আসি। তুমিও চল না?"

নিজের দেহের দিকেও চকিতে একটিবার দৃষ্টিপাত করিয়া তিলোত্তমা কহিলেন, "ও মা, ঘুম থেকে কেবল এই উঠলাম—এই ভাবে অমনি গিয়ে উঠব, বলিস কি? আবার কারা নাকি এসেছে।"

"কি হয়েছে আর এমন তাতে? আমি যদি পারি, তুমি পারবে না? না, চল যাই, দেখে একবার আসি। ঐ যে উনিও দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। চল।"

কি একটা উত্তেজনার বশে শরীরেও তখন যেন বরুণার কেমন একটা বল আসিল। মার হাত ধরিয়া এক রকম হিড় হিড় করিয়া টানিয়াই বরুণা তাঁহাকে লইয়া চলিল। কিরণ দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, নামিয়া অগ্রসর হইয়া আসিল।

"এই যে, আসুন। এই ভোরবেলায় আপনারা এই ভাবে অমনি চ'লে এসেছেন! তা এ দিকে একটু গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে দিনের বেলায় আমিই ত গিয়ে নিয়ে আসতাম—"

সৌদামিনী কহিলেন, "কি করব, বাবা? ঘুম ভেঙ্গে দেখি, বরুণ বিছানায় নেই। বাইরে চেয়ে দেখি, একাই চ'লে আসছে—কখন্ উঠে এসেছে, টেরও পাইনি। কি করব? ছুটে বেরোলাম।"

বরুণার দিকে চাহিয়া একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া কিরণ কহিল, "অত ব্যস্ত কেন হয়েছ, বরুণ? এদিকে সব ঠিক-ঠাক ক'রে আমি গিয়ে নিয়ে আসব, এইটুকু তর সইল না?"

শরীরটা তখন আবার বরুণার কাঁপিতেছিল। কাছে ঘেঁসিয়া

মাকে শক্ত করিয়া ধরিয়া অভিমানবিক্ষুব্ধ ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে উত্তর করিল, "থাক্‌তে পারলাম না। রাত্তিরেই ত আসতে চেয়েছিলাম, তুমি আন্‌লে না—রাত পোয়াল, থাক্‌তেই আর পারলাম না!"

বরুণা প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। একটা দম লইয়া কিরণ মুহূর্ত্তে দৃঢ় সংকল্পে মন বাঁধিয়া ফেলিল। চোখে মুখেও একটা দৃঢ়তার ভাব ফুটিয়া উঠিল। স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "এসেছ,—তা বেশ—এস, ঘরে এস! —মা!"

চমকিয়া বরুণা হাতখানি বাড়াইয়া মাকে জড়াইয়া ধরিল। তিলোত্তমাও একবার চমকিয়া কেমন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। মুখখানি আরক্ত হইয়া উঠিল। ঈষৎ স্ফুরিত অধরে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিলেন। সৌদামিনী বাহির হইয়া কহিলেন, "আসুন! আমি কিরণের মা। এস মা, এস, ঘরে এস!"

বলিয়া বধূর হাতখানি ধরিলেন। নিঃশব্দে তিলোত্তমা কন্যাকে লইয়া সৌদামিনীর পশ্চাতে ঘরে গিয়া উঠিলেন।

"বসুন, এই চৌকীর ওপর বসুন। ব'সো মা, ব'সো কাঁপছ—ভয় কি? ব'সো।"

হাত ধরিয়া কম্পিতা বধূকে সৌদামিনী বসাইলেন। তিলোত্তমাও বসিয়া বাহুবেষ্টনে বরুণাকে জড়াইয়া ধরিলেন। নিমীলিত নেত্রে মাথাটি বরুণা মায়ের কাঁধের উপরে রাখিল। মুখ তুলিয়া তিলোত্তমা কহিলেন, "আপনিই কিরণের মা?"

"হাঁ বোন, আমিই কিরণের মা?"

"আপনারা বুঝি এইখেনেই আছেন?"

"না। সবে এসেছি এই দু'তিন দিন হ'ল। শুন্‌লাম, চাকরী ছেড়ে কিরণ চ'লে এসেছে, একা এই বাসায় এসে রয়েছে। তাই একবার দেখতে ওকে এসেছি।"

তিলোত্তমা কহিলেন, "তা এসেছেন—ছেলের এই সংসার—ঠিক আপনাদের মতই তৈরী ক'রে রাখা হয়েছে দেখছি,—তা হ'লে থেকেই বোধ হয় যাবেন একেবারে?"

একটু ভ্রূকুটি সৌদামিনীর ললাটেও দেখা দিল। মুখখানিও কিছু কঠোর হইয়া উঠিল। কহিলেন, "তা তৈরী যেমনই ক'রে নিক, ছেলের সংসার—আমি মা—আমারই সংসার। থাক্‌তে যদি চাই-ই, বের ক'রে ত দিতে পারে না।"

"কিন্তু ছেলের একটা সংসার আগেও ত ছিল—"

"ছিল। কিন্তু যেতেও চাইনি, থাক্‌তেও গিয়ে চাইনি। যদি চাইতাম, গিয়ে উঠতাম, ঘাড়ে ধ'রে কেউ আমাকে বের ক'রে দিতে পারত?"

"ঘাড়ে ধ'রে বের ক'রে কেউ না দিক, ছেলের সংসার ব'লেই সব অবস্থায় সব রকম সেই সংসারে মায়েদের এই দাবী আছে কি না, চলে কি না, জানি না। আইন আদালতও সেটা মান্‌বে কি না সন্দেহ।"

একটু হাসিয়া সৌদামিনী উত্তর করিলেন, "আইন আদালতের ধার কিছু ধারিনি, দিদি। তবে ছেলে যদি ছেলেই হয়, মায়েদের এ দাবী সব অবস্থায় তার সব রকম সংসারেই চলে।"

"হাঁ, ছেলে এখন ছেলেই হয়েছে, আর তাই বুঝি মায়ের সেই দাবী নিয়েই এসে এখন উঠেছেন তার এই সংসারে?"

বরুণা একটু ছটফট করিয়া উঠিল। মুখ তুলিয়া মাকে কি বলিতে যাইবে, কিরণ তখন বলিয়া উঠিল, "ছেলে আমি ছেলে যদি হ'তেই পেরে থাকি, সেটা আমার গৌরবের বই অগৌরবের কথা কিছু নয়। আর ইচ্ছে হ'লে আমার মা এ সংসারে এসে থাক্‌তেও পারেন তার কর্ত্রী হয়ে।—"

কিছু রুখিয়া তিলোত্তমা উত্তর করিলেন, "না, কর্ত্রী হয়ে নয়।—কর্ত্রী এ সংসারের বরুণা, যদি সে থাকেই এখানে। আর তখন তার অনুমোদন হ'লেই উনি থাক্‌তে এসে পারেন মাঝে মাঝে—"

কিরণ একটু হাসিয়া কহিল, "সেটা ও দেশের রীতি, এ দেশের নয়। এ দেশে মা-ই সংসারের কর্ত্রী, যত দিন না স্বেচ্ছায় তিনি বউএর হাতে সংসারের ভার ছেড়ে দেন। আর দিলেও বউকে মায়ের একটা কর্ত্তৃত্ব সব বিষয়ে মেনেই চল্‌তে হয়।"

স্বর আরও চড়াইয়া তিলোত্তমা কহিলেন, "হ'তে পারে। কিন্তু বরুণাকে বিয়ে করেছিলে এ কড়ারে নয় যে শাশুড়ীর বাঁদী হয়ে এসে তোমার সংসারে সে থাকবে। এইটেই আমরা বরং জানতাম।"

কিরণ কি বলিতে যাইতেছিল,—হাত তুলিয়া ইঙ্গিতে তাহাকে নিষেধ করিয়া সৌদামিনী কহিলেন, "ও সব কথা আর কেন তুলছেন, দিদি? মিছে কেবল একটা অশান্তিরই সৃষ্টি হচ্ছে।—কোনও দাবী-দাওয়া নিয়ে থাক্‌তে আমি এখানে আসিই নি। এসেছিলাম চোখে একটিবার ওকে দেখতে, এখুনি আবার দেশে ফিরে যাচ্ছি। যাবার উদ্যোগই করছিলাম। হঠাৎ এই সকাল-বেলায় যদি আপনারা না এসে পড়তেন, আমাদের দেখতেই মোটে পেতেন না।"

"আমাদের। আমাদের মানে?"

চকিত দৃষ্টিতে বরুণাও মুখ তুলিয়া চাহিল। মুখখানি আরক্ত হইয়া উঠিতে উঠিতে হঠাৎ কেমন পাংশু হইয়া গেল। কিরণ ঠোঁটে কামড় দিয়া শক্ত হইয়া দাঁড়াইল। একটু থতমত খাইয়া সৌদামিনী কহিলেন, "ছোট দুটি ছেলে-মেয়ে আমার আছে। আর ঐ বউটি—তাকেও ত একা বাড়ীতে ফেলে আসতে পারিনে—"

"ও—তাই—তাই! সত্যিই তবে! তাই আমার মনে হচ্ছিল। তাই রাত ভ'রে ভাবছিলাম! তাই রোতে যখন আসতে চাইলাম—তখন—তখন—ওঃ! মা মা! মা গো!" বলিতে বলিতে বুকে দুটি হাত চাপা দিয়া মায়ের গায়ের উপরে বরুণা ঢলিয়া পড়িল।

"বরুণ! বরুণ! মা আমার!"

তিলোত্তমা চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কিরণ ত্রস্ত কাছে আসিয়া বরুণাকে চৌকির উপরে শোয়াইয়া দিল।—সৌদামিনী দ্রুত এক ঘটি জল লইয়া আসিয়া মাথায় চোখে মুখে ঝাপটা দিয়া হাওয়া করিতে লাগিলেন।

নীলাম্বর বাবু তখন দরজায় আসিয়া উঠিলেন। সৌদামিনী মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিয়া এক দিকে কতটুকু সরিয়া বসিয়া হাওয়া করিতে লাগিলেন। নীলাম্বর বাবু কহিলেন, "কি, কি হয়েছে? হঠাৎ না ব'লে ক'য়ে তোমরা চ'লে এলে—তা—কি—হয়েছে?—বরুণ—বরুণ! বরুণ!"

কন্যার কাছে আসিয়া নীলাম্বর বাবু বসিয়া পড়িলেন। পাশের দিকের দরজার আড়ালেই সুরবালা দাঁড়াইয়াছিল, ফাঁক করিয়া একটু চাহিয়া দেখিয়াই আবার সরিয়া গেল। তিলোত্তমার চোখে তাহা

পড়িল। অগ্নি-মূর্ত্তি হইয়া সৌদামিনীর দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "যান যান! স'রে যান স'রে যান আপনি! অত আর মায়া দেখাতে হবে না! ম'রে গেলেই ত আপনারা বাঁচেন? রাক্ষুসী মায়া—চোখের চাউনীতে, নাকের নিশ্বেসে, গায়ের আঁচেই বাছা আমার এখুনি ম'রে যাবে। যান যান! স'রে যান!"

পুত্রের হাতে পাখাখানি দিয়া সৌদামিনী উঠিয়া গিয়া ঘরের একধারে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

অতি বিস্ময়ে এদিক ওদিক একবার চাহিয়া নীলাম্বর বাবু কহিলেন, "বলি, কি হয়েছে ব্যাপারটা? এই ত ঘরদোরের অবস্থা। রাত না পোয়াতেই হঠাৎ অমনি ওকে নিয়ে এলে—মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়েছে, পড়বেই ত। তা এত রাগারাগিই বা কর্‌ছ কেন? ইনি কে?"

"জিজ্ঞাসা কর জামাইবাবুকে। আমি কিছু জানিনে।"

"এই যে জ্ঞান ফিরে আসছে? জল—জল—হাঁ করছে, দেও ত বাবা, একটু জল ওর মুখে দেও ত চামচে ক'রে—"

চামচ কাছে ছিল না। হাতে করিয়াই একটু একটু জল কিরণ বরুণার মুখে দিল।

"বরুণ! বরুণ! মা আমার!"

মাথা নাড়িয়া বরুণা একটু সাড়া দিল। মুখে কোনও শব্দ করিল না।

সৌদামিনীর দিকে একবার তাকাইয়া নীলাম্বর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ইনি, বাবা?"

"আমার মা।"

"মা! তোমার মা—ও! তা উনি—"

"এসেছেন এখানে দু'তিন দিন হ'ল।"

"ও!"

তিলোত্তমা বলিয়া উঠিলেন, "শুধু কি উনিই এসেছেন? বউটিকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসা হয়েছে। বলি সাত ডিঙ্গে সাজিয়ে সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে মেয়েকে ত নিয়ে এসেছ! এই ত জামাইয়ের ঘর-বাড়ী—তাও আবার সতীন এসে আগেই দখল ক'রে বসেছে।"

"সতীন!" হাঁ করিয়া কেমন হতভম্বের ন্যায় নীলাম্বর বাবু চাহিলেন।

"হাঁ হাঁ, সতীন! সতীন! কেন, গাঁয়ে একটা বউ ছিল, ভুলেই গেলে? সুযোগ দেখে মা-ঠাকুরুণ আগেই তাকে নিয়ে রাজপুরী দখল ক'রে বসেছেন। বলিনি তখন, এই মতলব ক'রেই চাকরী ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে পবর হয়েছে; মা-মাগীও ছিল ওৎ পেতে—ফাঁক পেয়ে অমনি উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন! দু'জনে আগে থেকে একটা যোগসাজস করেই যে এটা ঘটায় নি, তাই বা কে জানে?"

"কিরণ!"

"আজ্ঞে করুন!"

কিরণ তখন চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল; রুদ্ধক্রোধে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। অতি আয়াসে ক্রোধবেগ সংযত করিয়া এই উত্তরটুকু করিল।

"তা এই অভিপ্রায়ই যদি তোমাদের ছিল, তবে এদ্দুর থেকে অপমান করবার জন্যে আমাদের না আনাইলেই ত হ'ত?"

কিরণ উত্তর করিল, "আজ্ঞে, অভিপ্রায় আমাদের কিছুই ছিল না। অনর্থক অপমান করতেও কাউকে চাইনি। অপমান আপনারাই বরং আমার মাকে আজ যথেষ্ট করছেন—আমারই এই বাড়ীতে এসে।"

তিলোত্তমা বলিয়া উঠিলেন, "অপমান! কি অপমান তোমার বাড়ীতে এসে তোমার মাকে করেছি আমরা? কি এমন বলেছি? উনিই বলুন না, দাঁড়িয়ে রয়েছেন—বলুন না, কি অপমান ওঁকে করেছি?"

একটু চাপাস্বরে সৌদামিনী কহিলেন, "না না, অপমান আর কি হয়েছে? আপনারা এসেছেন—পরম ভাগ্যি আমার। তা মাফ করুন দিদি, ছেলেমানুষ, ওর কথা গায়ে তুলে কিছু নেবেন না।"

"অপমান! অপমান বরং তুমিই আমাদের করছ, এই কথা ব'লে!" সৌদামিনীর কথায় কর্ণপাতও না করিয়া এই বলিয়া তিলোত্তমা সরোষ-নেত্রে জামাতার দিকে চাহিলেন, বলিতে লাগিলেন, "এখানে এনে অপমান যদ্দুর করবার সে ত করেছই, তার উপরে আবার এই সব কথা! অপমান করেছি আমরা? ক'রেই যদি থাকি, বেশ করেছি! এতই যদি মান-অপমানের হিসেব ছিল, কেন ওঁদের আনিয়েছ এখানে?"

কিরণ কহিল, "আমার মা উনি, আমার বাড়ী ওঁরই বাড়ী। আনাবার না আনাবার কর্ত্তা আমি নই। যখন খুসী উনি আসতে পারেন, এসে থাকতেও পারেন।"

"উনি না হয় মা, মেনেই নিলাম, আসতেও পারেন, থাকতেও পারেন। কিন্তু ঐ সঙ্গে ক'রে যেটিকে এনেছেন?"

"সেও আমার স্ত্রী।"

"স্ত্রী?"

"হাঁ, বিবাহ করেছিলাম; স্ত্রীই বটে!"

"আর বরুণা?"

"সেও স্ত্রী; বিবাহ তাকেও করেছিলাম।"

"বলতে চাও দুইটি স্ত্রী তোমার?"

"কথাটা সত্য ত বটে, বলতেই বা হবে কেন?"

"বটে! তবে—তবে—বলতে চাও, দুই স্ত্রী নিয়েই তুমি সংসার করবে? আর বাদাবনে এই কুঁড়ে-ঘরে বরুণা এখন সতীনের বাঁদী-পণা শেসে করবে? আর তাই তুমি তাকে এখানে আনিয়েছ? হতভাগা পাজি ছোট লোকের ছেলে! কি ভেবেছ তুমি? বরুণা তোমার কেনা বাঁদী?"

ক্রোধের আবেগে অগ্নিবর্ণ মুখে তিলোত্তমা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হাত ধরিয়া টানিয়া তাঁহাকে বসাইয়া নীলাম্বর বাবু কহিলেন, "আঃ! থাম—থাম! ব'সো! একটু ঠাণ্ডা হও!"

"না! পারছি নি—পারছি নি! কিছুতেই সহ্য করতে আর পারছি নি! চল—চল! এখুনি আমাদের নিয়ে চল! সোণার প্রতিমে নিয়ে এসেছিলাম—নদীর জলে ওকে বিসর্জ্জন ক'রে যাব, তবু—তবু এই বাদাবনে সতীনের ঘরে—"

ফুকরাইয়া তিলোত্তমা কাঁদিয়া উঠিলেন। বরুণাও তখন উঠিয়া বসিয়াছিল। দুই হাতে মায়ের গলাটি জড়াইয়া ধরিল। মাঝে-মাঝে পরস্পরের গলা ধরিয়া কখনও নীরবে, কখনও বা একটু ফুকরাইয়া উঠিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

নীলাম্বর বাবু কহিলেন, "তা হ'লে কি করতে চাও, বাবা? হাঁ,

বিবাহ দুইটিকেই করেছ—উচিত কি অনুচিত যাই হয়ে থাক—করেছ এটা সত্যই বটে। তা—দুই জনকেই কি এখন স্ত্রী ব'লে স্বীকার ক'রে নিতে চাও ?"

"অস্বীকারই বা কি ক'রে করব ?"

"না, ঠিক অস্বীকার হয় ত না করতে পার। কিন্তু তাই ব'লে এটাও কি সম্ভব যে দুই জনকে এক বাড়ীতে এক সংসারে রেখে—"

"এক বাড়ীতে এক সংসারে রাখা সম্ভব না হ'ক, দুই জনকে দুই বাড়ীতে দুই সংসারে রাখতে অবশ্য পারি "

"তা হ'লে তাই তোমার মতলব ? আর মনে কর, বরুণা অমনি সেই ব্যবস্থাটা মাথা পেতে নেবে ?"

"না, তা নেবে না জানি। আর সে রকম অভিপ্রায়ও সত্যি আমার কিছু নেই।"

"তবে ?"

"তবে—কি বলতে চান ?"

"তবে—বরুণাকে যদি আসতে লিখেছিলে, ওদের আবার আনিয়েছ কেন ? অবশ্য তোমার মাকে কোনও অমর্য্যাদা আমি করতে চাইনে। কিন্তু তোমার কি ওঁদের আনা উচিত হয়েছে, বরুণা আসতে পারে এটা জেনেও ?"

"আগেই বলা হয়েছে, ওঁদের আমি আনিনি এখানে। আপনারাই এসেছেন, আর আসতেও পারেন।"

"হাঁ, উনি আসতে পারেন বই কি। কিন্তু ঐ বউটি—"

"সেও আসতে পারে, যদি ইচ্ছে হয়। বিবাহিতা স্ত্রী ত বটে।"

নীলাম্বর বাবু ভ্রূকুটি করিলেন। কহিলেন, "বেশ, এসেছে, তবে থাক্, ওরাই থাক এখানে। আমরা তবে বিদায় হই। মিছে এই ক্লেশটা না দিলেই পারতে।"

সৌদামিনী কহিলেন, "থাকব ব'লে আমরা আসিনি ! আমার সে বউমাও থাকবে না, থাকতে চায়ও না। আসতেও সে চায় নি। আমিই নিয়ে এসেছিলাম জোর ক'রে। একা বাড়ীতে কার কাছে ফেলে রেখে আসব, তাই। তা এখুনি আমরা চ'লে যাচ্ছি। যাচ্ছিলামই—এরই মধ্যে ওঁরা এসে পড়লেন—"

মুখ তুলিয়া তিলোত্তমা বলিয়া উঠিলেন, "এসেছি ত আমরা কাল। আসব, তা পরশুই ত চিঠিতে খবর এসেছিল। যাবেনই যদি, খবর পেয়ে তখনই কেন যান নি ? ওই বা কেন পাঠায় নি ? কেন আমাদের এসে দেখতে হ'ল যে, ঐ বউ নিয়ে আপনি এসে রয়েছেন ?—মুখের ভালমানুষী ! আসলে মতলব ত এই যে, আমরা এসে দেখি, আর অমনি চ'টে ম'টে পথ খোলসা ক'রে দিয়ে চ'লে যাই ?"

"না দিদি, সে রকম মতলব আমাদের কিছু ছিল না। তবে যাওয়া—ঘ'টে উঠেনি—কি করব ?"

"ঘ'টে ওঠেনি—কেন ? কেন ওঠেনি ? বেশ, না উঠে থাকে, এখুনি তবে উঠুক। যাবেন ? যাচ্ছিলেন ? বেশ, তবে যান,—এখুনি এই মুহূর্ত্তে আমাদের সামনে এই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান।"

মুখখানি সৌদামিনীর লাল হইয়া উঠিল। কিরণও কঠোর ভ্রূকুটি করিল। গম্ভীর দৃঢ়স্বরে কহিল, "আমার সামনে আমার মাকে আমার বাড়ী থেকে এইভাবে দূর ক'রে দেবেন—না, সে অধিকার আপনার নেই। না, [illegible]'লে আমিও বলছি, ওঁরা যাবেন না, যেতে আমি দেব না। যাবেন—যেতে হয়—পরে, যখন আমি পাঠাব, কি যখন ওঁদের ইচ্ছে হয়। কিন্তু আজ নয়।"

চক্ষু মুছিয়া বরুণা তখন কহিল, "মাফ কর। রাগের বশে বড় অন্যায় কথাই মা ব'লে ফেলেছেন। কিন্তু আমি—আমি জানতে চাই—সত্যি তুমি কি চাও ?—"

"কি চাই—তার মানে ?"

একটু ভ্রূকুটি বরুণার ললাটে দেখা দিল। একটু চাপিয়া থাকিয়া আনত মুখে কহিল, "চাকরী ছেড়ে কেন কি ভেবে তুমি এসেছিলে, তুমিই জান। তবে আমাকে লিখেছিলে এইখানে এসে যদি থাকতে চাই, তবে আসতে পারি—"

স্বর একটু কম্পিত হইয়া উঠিল। বলিতে বলিতে বরুণা চুপ করিল। একটি নিশ্বাস চাপিয়া কিরণ উত্তর করিল, "হাঁ, তাই লিখেছিলাম বটে।"

তীব্র একটা অভিমানের বেদনা বুক ভরিয়া উঠিতেছিল। অতি আয়াসে আপনাকে সংযত করিয়া বরুণা কহিল, "লিখেছিলে, তাই এসেছিলাম। তোমাকে ফিরিয়ে নিতে পারব, এ ভরসা আমি বড় করিনি। তবে এই ভরসা অবিশ্যি ছিল, যদি আমি আসি আর থাকতে পারি এখানে, তবে ঠাঁই আমার তোমার এ বাড়ীতে হবে।"

"নিশ্চয়ই হবে।—এসেছ,—যদি থাক, থাকতে পার, ঠাঁই আমার এ সংসারে তোমারই হবে।"

"কিন্তু—"

স্খলিত কণ্ঠে এইমাত্র বলিয়াই বাষ্পার্দ্রনেত্রে—আরক্ত মুখখানি বরুণা পাশের দিকে ফিরাইয়া লইল।—কিরণ কহিল, "সব ত শুনেছ বরুণা—তবে বিশ্বাস করবে কি না, করছ কি না, জানি না। আমি ওঁদের আনাইনি, নিজেরাই এসেছেন, থাকবেন ব'লেও আসেননি। দু'চার দিন হয় ত আরও থাকতেন। কিন্তু তোমরা এসেছ দেখে আজ এই এখুনি ফিরে চ'লে যাচ্ছিলেন। ওঁরাও জানেন, আমিও জানি, থাকতে ওঁরা পারেন না। আমিও রাখতে পারি না, যদি—যদি—তুমি থাক।"

"আর আর—যদি না থাকি—থাকতে না পারি—"

"তখন কি হবে, কি হ'তে পারে, সেটা এখনই ভাববার এমন দরকার কিছু দেখছি না। তুমি থাক—কেন পারবে না ?—থাক, যথাসম্ভব সুখে রাখতেই তোমাকে চেষ্টা করব।"

"কিন্তু—তুমি—তুমি কি মনে প্রাণে সত্যিই সেটা চাও ?"

"কেন ও কথা তুলছ ?—আমি কি চাই না চাই, তা নিয়ে কোনও কথাই হ'তে পারে না। ত্যাগ এক জনকে আমার করতেই হবে। সুরবালাকে পারলেও তোমাকে পারি না। কারণ, জানি, আমার এ সংসারের গৃহিণীত্বে তোমার দাবীই অনেক বড়।"

"দাবী—শুধুই দাবী—"

কাঁদিয়া অশ্রুভারা মুখখানি বরুণা হাঁটুর উপরে রাখিল। চাহিয়া দেখিয়া কিরণ একটি নিশ্বাস ছাড়িল। বুঝিল, বড় বেদনা বরুণা পাইয়াছে। মনে হইল, কাছে গিয়া বসিয়া বুকে তাহাকে ধরিয়া স্নেহের আদরে তাহার এই বেদনা কিছু উপশম করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ইহাদের সম্মুখে তাহা সম্ভব নয়। এক অগ্রসর হইয়া কি বলিতে যাইবে, তখন ভ্রূকুটিকুটিল আঁধা মুখে তিলোত্তমা বলিয়া উঠিলেন, "না, কায নেই। ফিরেই আম

চ'লে যাই। উনি চানই না যে বরুণ এখানে থাকে। সুখে রাখবেন? কি সুখে উনি রাখবেন? কি সুখেই বা রাখতে পারেন? দুদিনেই ম'রে যাবে, পথ খোলসা হবে। তাই না চান? না, কায নেই। চল, এখুনি আমরা চ'লে যাই। কি বলিস, বরুণা! যাবি?"

রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বরুণা কহিল, "চল।"

থ' হইয়া নীলাম্বর বাবু বসিয়াছিলেন, মুখ তুলিয়া তখন কহিলেন, "তা হ'লে কি বল, বাবা? সত্যিই আমরা ফিরে চ'লে যাব—বরুণাকে নিয়ে?"

কিরণ উত্তর করিল, "কেন যাবেন, সেইটেই আমি বুঝতে পারছিনি। বরুণাকে ত রাখতেই এখানে আমি চাইছি।"

তিলোত্তমা বলিয়া উঠিলেন, "চাইছ? ঐ কি চাওয়া? ওকে চাওয়া বলে? চাইতে যদি, তবে অমন চাকরী ছেড়ে দিয়ে এই বাদাবনে কুঁড়ে-ঘর বেঁধে এসে থাকতে না। চাইছ, কি চাইছ তুমি? নেহাৎ এড়াতে পার না, ভাল দেখায় না, আবার ছুটে এদ্দুর এসে পড়েছে—অগত্যে তাই একটা ভার বোঝার মতই ত ঘাড়ে রাখতে ওকে চাইছ। না, অমন একটা ফেলা-ফেলার মেয়ে ও আমাদের নয়। তোমার যতই ভার-বোঝা আজ ও হয়ে থাক্, আমাদের ভারবোঝা ও নয়। না, সে হবে না। এই অনাদরে—এই হেলা তাচ্ছীল্যে, আরও তোমার এই বাদাবনের কুঁড়ে-ঘরে, ওকে রেখে যেতে আমরা পারব না।"

ধীর দৃঢ়স্বরে কিরণ উত্তর করিল, "কিন্তু নিয়েও যেতে পারেন না, যদি না আমি যেতে দিই!"

"কি! কি ব'ল্লে? নিয়ে যেতে পারি না? ফাঁকি দিয়ে বিয়ে করেছিলে ব'লে সত্যিই মনে কর, ও তোমার কেনা বাঁদী—যেখানে খুসী নিয়ে রাখবে, যখন যেমন খুসী নকড়া ছকড়া ওকে নিয়ে কর্‌বে, আর ওর মা-বাপ আমরা কথাটিও বলতে পারব না, তোমার হুকুম ছাড়া বেড়ী খুলে তোমার এই কয়েদখানা থেকে মুক্ত করেও ওকে নিয়ে যেতে পারব না! বলি শুনছ, একেবারে থম দিয়ে হাঁ ক'রে ব'সে রয়েছ, কি ভাবছ? একটু কি মানুষের আত্মা নেই কো? ওঠ! এখুনি চল! চল, এখুনি মেয়ে নিয়ে আমরা চ'লে যাই। দেখি, ও কি ক'রে ওকে ধ'রে রাখে? ওঠ্, ওঠ্, বরুণা!"

বলিয়াই হাতে ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া বরুণাকে টানিয়া লইয়া তিলোত্তমা বাহির হইয়া পড়িলেন। নীলাম্বর বাবু ছুটিয়া আসিয়া অতি অবসন্না মূর্চ্ছিতাপ্রায় বরুণাকে দুই বাহুতে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। কিরণও বাহিরে আসিয়া কঠোর স্বরে কহিল, "আপনি এ করছেন কি? ক্ষেপেছেন একেবারে? না, এই অবস্থায় টেনে হিঁচড়ে বরুণাকে আমার সামনে আপনি নিয়ে যেতে পারবেন না!"

"পারব না? কে তুমি? আমার মেয়েকে এই অপমানের ঘর থেকে আমি নিয়ে যাব—কে তুমি—কোন্ অধিকারে বলছ পারব না?"

সে কে, আর কি অধিকার আছে, তাহার কোনও উল্লেখ না করিয়া কিরণ কহিল, "অত ব্যস্তই বা কেন হচ্ছেন? বেশ ত, ঘরে এখন ফিরে আসুন, একটু সুস্থ হ'ক, তার পর স্বেচ্ছায় যদি যেতে চায়, যাবে! জোর ক'রে ধ'রে আমি রাখব না।"

"না, সে হবে না! এক মুহূর্ত্তও আর এখানে থাকব না! ও পাপের ঘরে আর ওকে নিয়ে গিয়ে ঢুকব না! স্বেচ্ছা—ওর আবার স্বেচ্ছা অনিচ্ছা কি এখন থাকতে পারে? মাথা ওর ঠিক আছে, কি দাগা দিয়ে ওকে আজ কি ক'রে ফেলেছ, একটু ভাবছ না? না, সে হবে না! এক মুহূর্ত্তও আর এখানে ওকে নিয়ে থাকতে আমরা পারব না! বলি শুনছ, পাঁজা-কোলে তুলে ওকে নিয়ে চল। পুরুষমানুষ, এতটুকু বল কি গায়ে নেই?"

একবারে অসাড় হইয়া বরুণা পড়িয়াছিল। স্ত্রীর প্রচণ্ড হুকুমে অগত্যা নীলাম্বর বাবু কুঁথিয়া কোনওমতে বরুণাকে পাঁজা-কোলে তুলিয়া লইলেন।

এ-দিক ও-দিক তিলোত্তমা একবার চাহিয়া দেখিলেন। সতীশ নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "বলি হাঁগা, কে তুমি? এগিয়ে একটু এস না, বাছা! একা উনি পারবেন না, তুমিও এসে একটু ধর। ধরাধরি ক'রে দু'জনে ওকে নিয়ে চল না?"

অগত্যা সতীশ আসিয়া ধরিল, দুই জনে বরুণাকে লইয়া নদীর দিকে চলিলেন। নিরুপায় হইয়া কিরণও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। লঞ্চে গিয়া সকলে উঠিলেন, বরুণাকে সাবধানে শোয়াইয়া দেওয়া হইল। অসাড়ভাবেই সে পড়িয়া রহিল।

কিরণ কহিল, "তা হ'লে সত্যিই এইভাবে ওকে নিয়ে আপনারা চ'লে যাবেন?"

"যাব।"

"জানি না, বরুণার চেতনা কিছু এখন আছে কি না! কিন্তু এটা জানবেন, যদি যান, চেতনা যখন ফিরে আসবে—আর বুঝবে, সত্যিই আপনারা চ'লে গিয়েছেন—বরুণা সুখী হবে না।"

"হবে! হাঁফ ছেড়েই বরং বাঁচবে সে, এই নরক থেকে তাকে তুলে নিয়ে আমরা এসেছি।"

"একটু অপেক্ষা তবে বরং করুন। একটু সুস্থ হ'ক্, দুটো কথা আমি তাকে বলব।"

"না! কিছু দরকার তার নেই। এখুনি আমরা যাব! যদি পার, পাঠাবার বন্দোবস্ত আমাদের ক'রে দেও। নইলে—সত্যি বলছি, ওকে নিয়ে নদীতে আমি ঝাঁপিয়ে পড়ব!"

অগত্যা কিরণ বিমল ও সুপ্রকাশকে ডাকিয়া পাঠাইল। পথে ইঁহাদের প্রয়োজন হইতে পারে, এমন কিছু আহার-পানীয়ের বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদের সঙ্গে ইঁহাদের পাঠাইয়া দিল।

সেই দিনই দুপুরে আহারাদির পর সতীশের সঙ্গে সৌদামিনী ও সুরবালা দেশে ফিরিয়া গেলেন। কিরণ আপত্তি কিছু করিল না। সুরবালাকে ডাকিয়া দু'টি কথাও কিছু বলিল না।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ।

সে-কালের স্মৃতি

১৯

পরিচ্ছদের পারিপাট্যের প্রতি শ্রীঅরবিন্দের কোনও দিন লক্ষ্য ছিল না। পোষাক-পরিচ্ছদ দূরের কথা, নিত্য ব্যবহার্য্য জুতা জামা কাপড় সম্বন্ধে এরূপ ঔদাসীন্য বিলাত-ফেরতদের মধ্যে আর কাহারও কখন দেখি নাই; তবে মহাত্মা গান্ধীর কথা স্বতন্ত্র। যাঁহারা কোনও সুযোগে একবার বিলাতের মাটী স্পর্শ করেন, তাঁহাদের অনেকেরই বাহ্যাড়ম্বরের চটকে চক্ষু ধাঁধিয়া যায়! অরবিন্দ বাল্যকাল হইতে বিলাতফেরত পিতামাতার গৃহে প্রতিপালিত; যৌবনকাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে ইংরাজ সমাজের আবেষ্টনের মধ্যে বর্দ্ধিত ও শিক্ষিত হইয়াও, হিন্দুর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ও কৃষ্টি ত্যাগ করেন নাই! ইহা মানব-চরিত্রের দুর্জ্ঞেয় রহস্য বলিয়াই মনে হইত। অরবিন্দ স্বদেশীয় মিলের সাধারণ মোটা ধুতিই ব্যবহার করিতেন। জামাও সেইরূপ। তাঁহাকে কোন দিন শিমলা-ফরাসডাঙ্গার সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহার করিতে দেখি নাই। যে শয্যায় তিনি শয়ন করিতেন, তাহা সর্ব্বপ্রকার বাহুল্যবর্জ্জিত, নিতান্ত সাধারণ শয্যা, লৌহ-খট্টাও তদ্রূপ। বরোদায় যাত্রা করিবার সময় তাঁহার সঙ্গে নিত্য-ব্যবহার্য্য সাধারণ ধুতি-জামা ভিন্ন অন্য পরিচ্ছদ ছিল না। সঙ্গে যে কয়েকটি ট্রাঙ্ক ছিল, তাহা নানা ভাষার পুস্তকে পূর্ণ। তাঁহার লট-বহর দেখিয়া মনে হইল, কোনও আত্মসমাহিত ব্রহ্মচারী পারমার্থিক ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যাত্রা করিয়াছেন! এই সকল মালপত্রসহ এক দিন প্রভাতে তিনি বোম্বের ভিক্টোরিয়া টারমিনস ষ্টেশনে অবতরণ করিলেন। আমার সঙ্গে যে সামান্য বিছানা-পত্র ও পোর্টম্যাণ্টো ছিল, তাহা লইয়া তাঁহার সঙ্গেই বোম্বের একটি বৃহৎ সাহেবী হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সেই হোটেলের একটি কক্ষে আমরা উভয়ে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলাম, সন্ধ্যার পর আমরা বোম্বের কোলাবা ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া, বোম্বে বরোদা সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া (বি, বি, সি, আই, আর) রেল-পথের একটি ট্রেণে আরোহণ করিলাম। সেই ট্রেণে আমরা বরোদার টিকিট গ্রহণ করিয়াছিলাম। রাত্রি প্রায় দশটার সময় সেই ট্রেণ কোলাবা ষ্টেশন ত্যাগ করিল। পরদিন অতি প্রত্যূষে তাহা বরোদা ষ্টেশনে পে

বার কথা। মনে হইল, আমরা শিয়ালদহ ষ্টেশনে ঢাকা মেলে উঠিয়া গোয়ালন্দ যাত্রা করিলাম। ঢাকা মেলও পরদিন অতি প্রত্যূষে গোয়ালন্দের ষ্টীমার-ঘাটে পৌছাইয়া দেয়। কিন্তু কলিকাতা হইতে গোয়ালন্দের দূরত্ব অপেক্ষা বোম্বে হইতে বরোদার দূরত্ব অনেক অধিক; তথাপি আমাদের ডাক-গাড়ী সারারাত্রি চলিয়া যখন বরোদা ষ্টেশনে আমাদিগকে পৌছাইয়া দিল, তখন উষালোকে চতুর্দ্দিক উদ্‌ভাসিত হইয়াছিল মাত্র; সূর্য্যোদয়ের তখনও অনেক বিলম্ব ছিল।

প্রত্যূষে বরোদা ষ্টেশনে নামিয়া প্ল্যাটফর্ম্মের বাহিরে আসিতেই এক অভিনব দৃশ্য আমার বিস্ময়াকুল নেত্রে প্রতিফলিত হইল। চতুর্দ্দিকের অট্টালিকাগুলির অধিকাংশই লোহিতাভ, তাহাদের ঢালু ছাদ লোহিতবর্ণ টালি দ্বারা আচ্ছাদিত। পথে নানা প্রকার শকট, কিন্তু অধিকাংশই গো-যান। ঘোড়ার গাড়ীর চাকার মত চাকাগুলি স্প্রিংএর উপর সংরক্ষিত। অধিকাংশ গাড়ী পাল্কী-গাড়ীর মত আচ্ছাদিত, পশ্চাৎস্থিত দ্বার দিয়া গাড়ীতে প্রবেশ করিতে হয়; কিন্তু গাড়ীর বলদগুলি যেন ঐরাবতের এক একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। তাহাদের বিশাল শৃঙ্গগুলির অধিকাংশই রৌপ্য ও পিত্তলাদি ধাতুর পাত দ্বারা মণ্ডিত। শ্রেণীবদ্ধ পিত্তলের ঘণ্টা দ্বারা তাহাদের কণ্ঠ পরিবেষ্টিত।



শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

আমরা প্ল্যাটফর্ম্মের বাহিরে আসিতেই এক জন রাজকর্ম্মচারী আমাদের নাম-ধাম, বরোদার ঠিকানা ইত্যাদি লিখিয়া লইলেন। মিঃ ঘোষ গায়কবাড় সরকারের পদস্থ কর্ম্মচারী, কে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবে? তাঁহার বন্ধু লেফটেনাণ্ট মাধব রাও যাদব ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন, তিনি ঘোষকে সঙ্গে লইয়া নগরে চলিলেন; আমি অন্য গাড়ীতে তাঁহাদের অনুসরণ করিলাম।

মস্তকে প্রকাণ্ড রঙ্গীন পাগড়ী ও কর্ণে কুণ্ডলধারী মারাঠা শকটচালক ফতুয়ায় দেহ আবৃত করিয়া বৃহৎ বলীবর্দ্দ-যুগল-বাহিত শকট চালাইয়া, বরোদা নগরের সুপ্রশস্ত রাজপথ দিয়া গন্তব্য স্থলে অগ্রসর হইল। পথিমধ্যে দেখিলাম, কোথাও সুরঞ্জিত বস্ত্র-পরিহিতা যুবতী বালিকা মহারাষ্ট্রীয়া মহিলা শ্রেণীবদ্ধভাবে, সুললিত-ভঙ্গীতে পথ অতিক্রম করিতেছিলেন; কাছা থাকায় আমার অনভ্যস্ত চক্ষুতে তাঁহাদিগকে পুরুষভাবাপন্ন দেখাইতেছিল। সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী রবিবর্ম্মার অঙ্কিত উর্ব্বশী, মেনকা, দ্রৌপদী, সুদেষ্ণা ও শকুন্তলার সুরঞ্জিত চিত্রগুলি মানসনেত্রে ভাসিয়া উঠিল। কোনও স্থানে সুরঞ্জিত ঘাগরা-ধারিণী স্থূলাঙ্গী গুর্জ্জরীদের দলবদ্ধভাবে জটলা করিতে দেখিলাম। পশ্চিম-ভারতের মহিলা-সমাজের অবগুণ্ঠন-বর্জ্জিত বদনমণ্ডল, আত্মমর্য্যাদা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হইয়া অসঙ্কোচে পাদচারণ বাঙ্গালী যুবকের চক্ষুতে বিস্ময় ও কৌতূহলের সঞ্চার করিল। দেখিয়া মনে হইল, বাল্যকাল হইতে তাঁহারা এই স্বাধীনতার সম্মান রক্ষায় অভ্যস্ত হইয়াছেন। প্রকাশ্যপথে তাঁহাদের ব্যবহারে জড়তার চিহ্নমাত্র নাই।

শ্রীঅরবিন্দের বন্ধু খাসে রাও যাদবের বাসভবন নগরের প্রকাশ্য স্থলে অবস্থিত। লোহিতবর্ণ প্রাসাদোপম অট্টালিকা 'ঘোষ সাহেবের' বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আমি তাঁহার অতিথি, সুতরাং আমাকেও সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। অন্য লোক হইলে দুই চারি দিন পরে আমাকে হয় ত' দেখিয়া-শুনিয়া একটা বাসা ঠিক করিয়া লইতে বলিতেন; কিন্তু সহৃদয় ও মানব-হৃদয়জ্ঞ অরবিন্দ আমার অসুবিধা এবং নবীন প্রবাসীর মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আমি মারাঠী, গুজরাটী ভাষায় অনভিজ্ঞ; বাঙ্গালীবর্জ্জিত সেই সুদূর প্রবাসে আমি কাহাকেও চিনি না; কোথায় বাসা পাইব, কি খাইব, সাংসারিক কার্য্যে কাহার সাহায্য গ্রহণ করিব, কিরূপে কাহার নিকট মনের ভাব প্রকাশ করিব, কিছুই জানি না। এই সকল কারণে অরবিন্দ আমাকে ত্যাগ করিলেন না। সেই অট্টালিকায় আমার জন্য স্বতন্ত্র একটি কক্ষ নির্দ্দিষ্ট হইল। অরবিন্দ তাঁহার সোদর তুল্য স্নেহভাজন বন্ধুর গৃহে বাস করিবেন, হয় ত' তাঁহার সে জন্য কুণ্ঠিত হইবার প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু আমার অবস্থা স্বতন্ত্র। আমি কোন্ অধিকারে তাঁহার বন্ধুর গৃহে বাস করিব, তাঁহাদের অন্ন গ্রহণ করিব? কিন্তু আমার সঙ্কোচ, কুণ্ঠা নিষ্ফল হইল; আমি তখন সম্পূর্ণ নিরুপায়। দেখিলাম, এই সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারে কোনও প্রকার অনুদারতা ও সঙ্কীর্ণতার স্থান ছিল না। কোন উচ্চশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও উদার বাঙ্গালী-পরিবারে ও এই মারাঠা-পরিবারে কোনও পার্থক্য দেখিতে পাইলাম না। তাঁহাদের অমায়িক ব্যবহারে প্রবাসের বেদনা স্থায়ী হইল না।

সমগ্র বরোদা রাজ্যে এই যাদব-পরিবারের ন্যায় গায়কবাড় মহারাজার হিতৈষী সুহৃদ আর কেহ ছিলেন বলিয়া শুনিতে পাই নাই। শুনিয়াছিলাম, মহারাজ আবাল্য নানা বিপদে সঙ্কটে ইঁহাদের প্রাণপণ সেবায় ও সাহায্যে উপকৃত হইয়াছিলেন। সুতরাং ইঁহাদের রাজভক্তি পরীক্ষিত, অথচ তাহা মো-সাহেবী নহে। ইঁহারা মহারাজের প্রিয়জন হইলেও তাঁহার প্রসাদলোলুপ ছিলেন না; মানসিক তেজ, স্বাধীনতা ও বিবেকের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আত্মমর্য্যাদার সহিত রাজকার্য্য পরিচালিত করিতেন। ইঁহারা তিন সহোদর ছিলেন। জ্যেষ্ঠ সহোদরকে আমি কোন দিন বরোদায় দেখিতে পাই নাই; শুনিয়াছিলাম, রাজ্যের কোন 'প্রান্তে' তিনি পুলিসের অধ্যক্ষ ছিলেন। দ্বিতীয় খাসে রাও যাদব মহারাজের প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। তিনি বিলাতের কৃষি-কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, আমাদের দেশের সেকালের 'কালা সিভিলিয়ান' স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ সেন প্রভৃতির ন্যায় বরোদা রাজ্যের 'সিভিল সার্ব্বিসে' প্রবেশ করেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় তিনি বরোদা রাজ্যের আমরেলী অথবা কাড়ি 'প্রান্তের' সুবা অর্থাৎ কালেক্টরের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আমাদের দেশে জেলা বলিতে যাহা বুঝায়, বরোদা রাজ্যে 'প্রান্ত' বলিতে তাহাই বুঝায়। কিছু দিন পরে আমি বরোদায় থাকিতে থাকিতেই তিনি বরোদায় বদলী হইয়া আসিয়াছিলেন, এবং 'সার সুবা' অর্থাৎ 'রেভিনিউ কমিশনরের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাধব রাও যাদব বিলাতের সামরিক কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বরোদা রাজ্যের সেনা-বিভাগে চাকরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে সময় তিনি লেফটেনাণ্টের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি অরবিন্দের সমবয়স্ক, এবং তাঁহার পরম বন্ধু ছিলেন। অরবিন্দ অত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ; কিন্তু লেফটেনাণ্ট মাধব রাওর সহিত যখন তাঁহার গল্প চলিত, তখন সেই গাম্ভীর্য্য সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইত। দুই জনেরই হাসির গর্‌রা উঠিত। অরবিন্দের সেই পরিহাস-রসিকতা, মজলিসী গল্প করিবার অদ্ভুত কৌশল, বাহিরের কোনও লোক কল্পনাও করিতে পারিতেন না; যেন বাহ্য কঠোরতার অন্তরালে রসের ফল্গু প্রবাহিত হইত! তাহা নির্ম্মল, স্বচ্ছ, উপভোগ্য। আমি যে সময় প্রথম বরোদায় যাই, সে সময় মহারাজের পরলোকগতা প্রথমা



বরোদার মহারাজা সয়াজী রাও গায়কবাড়

মহিষীর পুত্র প্রিন্স ফতে সিং রাও গায়কবাড় ইংলণ্ডের সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতেছিলেন। তিনিই মহারাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং পৈতৃক গদীর উত্তরাধিকারী ছিলেন; কিন্তু সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়া নবযৌবনেই তাঁহাকে পরলোকে প্রস্থান করিতে হইয়াছিল। সে কালে এরূপ রূপবান্, গুণবান্ রাজপুত্র ভারতের সামন্ত রাজবংশে দুর্ল্লভ ছিল। কিন্তু মহারাজকেও যৌবনে পুত্রশোক পাইতে হইয়াছিল। 'নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে!' —প্রাচীন বয়সেও মহারাজকে অন্য এক পুত্রের অকাল-বিয়োগে শোক পাইতে হইয়াছিল। মহারাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র জীবিত থাকিলে এত দিন প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করিতেন। বরোদার মহারাজ সার সয়াজি রাও গায়কবাড় ভারতীয় সামন্ত নরপতি-মণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাচীন। সংপ্রতি তাঁহার ষাট বৎসর রাজত্ব-কাল পূর্ণ হওয়ায়, মহারাজের রাজত্বকালের 'হীরক জুবিলী' উৎসবের আয়োজন চলিতেছে। বর্ত্তমান বৎসরের শেষে এই

উৎসব সুসম্পন্ন হইবে। লর্ড নর্থব্রুক যখন ভারতের বড় লাট, সেই সময় মল্হর রাও গায়কবাড় সিংহাসনচ্যুত হইলে বর্ত্তমান মহারাজ বরোদার রাজগদীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বরোদা রাজ্যে যে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে বরোদারাজ্য নবভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। বরোদা সামন্ত-নরপতিগণের শাসিত রাজ্যসমূহের আদর্শ-স্থানীয়। প্রাচীন মারাঠা যুগের ইতিহাস পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বরোদায় বৃটিশ শাসনতন্ত্রের আদর্শ গৃহীত হইয়াছে। ইহা মহারাজের চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায়ের ফল।



সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



লালমোহন ঘোষ

বরোদায় উপস্থিত হইয়া এক জন সঙ্গী সহ নগরদর্শনে বাহির হইয়াছিলাম। যেমন ধূলা, তেমনই মাছি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথগুলি সঙ্কীর্ণ, ধূলিবহুল ও অপরিচ্ছন্ন। দরিদ্র গুজরাটী পরিবারগুলি অত্যন্ত নোংরা। শুনিলাম, অনেকের পরিহিত বস্ত্রাদি ধৌত করিবার অভ্যাস নাই। পল্লীর বহু গৃহ পরিত্যক্ত দেখিলাম; নির্জ্জন, দরজা তালাবদ্ধ। শুনিলাম, প্লেগের ভয়ে পল্লীবাসীরা গ্রামান্তরে পলায়ন করিয়াছে। সেবার প্লেগ সংক্রামক মূর্ত্তিতে বোম্বে প্রদেশে জনক্ষয় আরম্ভ করিয়াছিল। কোনও পরিবারে প্লেগ দেখা দিলে, রোগীকে 'সিগ্রিগেসন্-ক্যাম্পে' লইয়া যাওয়া হইতেছিল। মাতৃক্রোড় হইতে পুত্র, স্ত্রীর ক্রোড় হইতে রুগ্ন স্বামী বিচ্ছিন্ন হইতেছিল; তাহার পর সব শেষ! এই ব্যবস্থার ফলে বোম্বে প্রদেশে অশান্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাহার পরই র্যাণ্ড ও লেফটেনাণ্ট আয়ার্ষ্টের হত্যা-কাণ্ড। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দামোদর ও হরি চাপেকার নামক দুই জন ব্রাহ্মণ যুবক প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। দক্ষিণী ব্রাহ্মণ-সমাজকে বোম্বে সরকারের প্রসন্নতায় বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল।



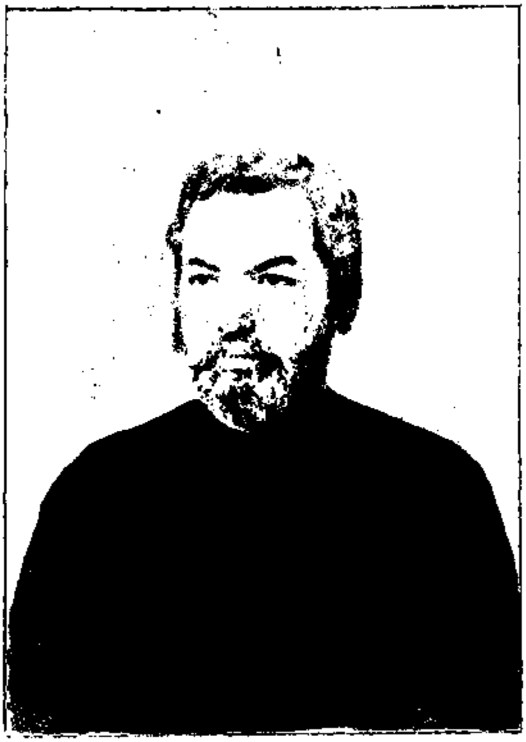
মনোমোহন ঘোষ



আনন্দমোহন বসু

এ সময় কংগ্রেসের শৈশবাবস্থা। কংগ্রেস তখন বাঙ্গালার সূতিকাগার হইতে বাহির হইয়া জীবনশক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। বাঙ্গালার সুরেন্দ্রনাথ, মনোমোহন, লালমোহন, আনন্দমোহন, কালী বন্দ্যো, উমেশচন্দ্র, যাত্রামোহন প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের সেবায় তাহার দেহে শক্তি সঞ্চার করিতেছিলেন। একালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের যে সকল নেতা কংগ্রেসের মোড়লী-ভার গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালীকে কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত করিবার নানা ভাবে চেষ্টা করিতেছেন, তখন তাঁহাদের অস্তিত্বও ছিল না।

অন্যের কথা দূরে থাক, মহাত্মা গান্ধীর সহিতও তখন কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ কোন সম্বন্ধ ছিল না; তিনি তখন সবেমাত্র দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে ভারতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন; তখনও তিনি 'মহাত্মা' হইতে পারেন নাই, এবং বাঙ্গালার সহিত ঘনিষ্ঠভাবেও পরিচিত ছিলেন না। ইহার কয়েক বৎসর পরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া স্বর্গীয় দেশনায়ক ভূপেন্দ্রনাথ বসুর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া কলিকাতা-সমাজে পরিচিত হইয়াছিলেন। তখন তিনি যুবক ব্যারিষ্টার। কংগ্রেসের দেহে পরবর্ত্তী যুগে যিনি নবপ্রাণের সঞ্চার করিয়াছিলেন, সেই দেশবন্ধু মহাপ্রাণ চিত্তরঞ্জন তখন হাই-কোর্টের ব্যারিষ্টারী-ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ



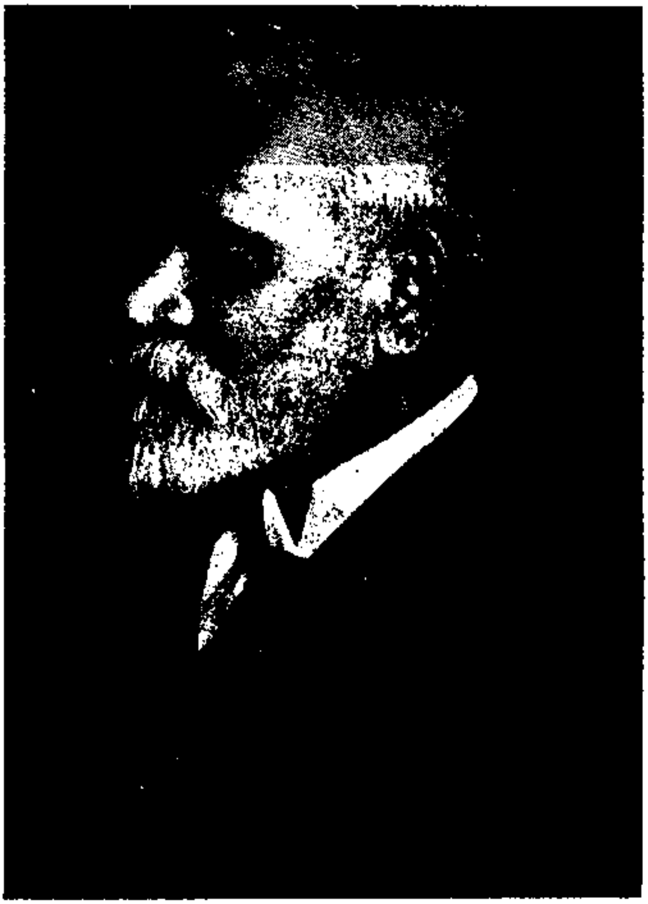
কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

করিতেছিলেন, এবং ব্যারিষ্টারী অপেক্ষা সাহিত্য-সমাজে তাঁহার কবিত্বেরই খ্যাতি প্রচারিত হইতেছিল। চিত্তরঞ্জন তখন 'মালঞ্চের' কবি।

আনন্দ চালু প্রভৃতি কয়েক জন স্বদেশপ্রেমিক মাদ্রাজী তখন কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু তখন কবিযশঃপ্রার্থিনী, রাজনীতির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল না। পঞ্জাব তখনও নিদ্রাগত—লালা লাজপত রায়ের ভেরীমন্দ্র তখন পঞ্চনদের কূলে কূলে ধ্বনিত হইয়া, পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের মাতৃভূমিতে দেশাত্মবোধ উদ্দীপ্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। যুক্তপ্রদেশে পণ্ডিত বিশ্বম্ভর নাথ ও মদনমোহন মালব্য তাঁহাদের অপূর্ব্ব বাগ্মিতায় স্বদেশবাসীর নিদ্রালস নেত্র হইতে তন্দ্রাঘোর অপসারিত করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, এবং সুদূর বোম্বের সমুদ্রতটে বৃদ্ধ দাদাভাই নৌরোজী যে স্বদেশী মন্ত্র প্রচারিত করিতেছিলেন, সার ফিরোজ শা মেটা, মহাপ্রাণ গোখলে প্রভৃতি কয়েক জন মনস্বী তাঁহারই কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া, স্বরাজ-সাধনায় বৃদ্ধ দাদাভাইকে সাহায্য করিতেছিলেন, এবং তাঁহারা সকলেই কংগ্রেসকে জাতীয় জীবন-প্রতিষ্ঠার একমাত্র প্রতিষ্ঠান বলিয়া, তাহাতে শক্তিসঞ্চারের জন্য আকুলকণ্ঠে স্বদেশবাসীদিগকে আহ্বান করিতেছিলেন। মুসলমান-সমাজের অলঙ্কার বদরুদ্দীন তায়েবজি তখনও হাইকোর্টের বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই। বিচারপতি রাণাডের অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যে, সুগভীর শাস্ত্রজ্ঞানে এবং গভীর নিষ্ঠার সহিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় বোম্বেপ্রদেশের হিন্দু-সমাজ গভীর নিশীথিনীর অবসানে যেন নবজীবনের অরুণালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল; এবং সকলের উর্দ্ধে দক্ষিণ-ভারতের মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডস্বরূপ বালগঙ্গাধর তিলক সমগ্র মহারাষ্ট্র খণ্ডে জাতীয় দেহে প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সুবিস্তীর্ণ মহারাষ্ট্রভূমে ছত্রপতি শিবাজীর অনুসৃত জাতীয়তার অমরবাণী বিঘোষিত করিতেছিল। বস্তুতঃ মহাপ্রাণ বালগঙ্গাধর তিলকই তখন দক্ষিণ-ভারতের অদ্বিতীয় নেতা। দক্ষিণ-ভারতে মহাত্মা গান্ধীর নামও তখন প্রচারিত হয় নাই। তাঁহার পরম মিত্র মুসলমান-সমাজের অলঙ্কার আব্বাস তায়েবজি এখন কংগ্রেস-সেবক বলিয়া অসাধারণ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তিনি সুবিখ্যাত বিচারপতি বদরুদ্দীন তায়েবজির ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা, তিনি সেই সময় বরোদার 'বরিষ্ঠ আদালতের' (হাইকোর্টের) অন্যতম বিচারকপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তখন তিনি যুবক; কংগ্রেসের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল কি না, কেহ জানিতেন না; বিশেষতঃ দেশীয় রাজ্যে কংগ্রেস কোন দিন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই।



উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়



ভূপেন্দ্রনাথ বসু



দাদাভাই নৌরোজী



বদরুদ্দীন তায়েবজী



ফিরোজ সা মেটা

এই সময় তিলকই সমগ্র দক্ষিণ-ভারতের নেতৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচালিত 'কেশরী' তখন দক্ষিণ-ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশীয় পত্রিকা। দক্ষিণ-ভারতের ঘরে ঘরে 'কেশরীর' আদর ছিল। ইহা এক দিকে যেমন স্বদেশী মন্ত্র প্রচারিত করিতেছিল, অন্য দিকে সেইরূপ সনাতন ধর্ম্মের প্রতি হিন্দু-সমাজের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়া সমগ্র হিন্দু-জাতিকে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সেই সময় তিলকের ইঙ্গিতে



বালগঙ্গাধর তিলক

হিন্দুসমাজ পরিচালিত হইত; এজন্য দক্ষিণ-ভারতে তিলকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবারও লোকের অভাব ছিল না; কিন্তু তাঁহার স্বদেশসেবার গতিরোধ করা সহজ হয় নাই। এই ব্রহ্মণ্যশক্তির পুনরুত্থানে ও ব্যাপকতায় ইংলণ্ডের কোন কোন চিন্তাশীল 'ভারতহিতৈষীর' মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল; তন্মধ্যে সার ভ্যালেন্টাইন চিরলের

নাম উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ-ভারতের এই ভাবধারার পরিপুষ্টি ও পরিণতি সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য রাজনীতির ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়াছে; এখানে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

দক্ষিণ-ভারতে তিলকই কংগ্রেসের প্রধান বান্ধব ছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান এক দিন সমগ্র ভারতের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে। এজন্য তিনি সর্ব্বদা কংগ্রেসের সমর্থন করিতেন। এরূপ বিরাট প্রতিষ্ঠানের নানা দোষ-ত্রুটি এখনও আছে, সেকালেও ছিল। কিন্তু শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি সাধারণতঃ সে দিকে আকৃষ্ট হইত না; অনেকে সে সকল ত্রুটি উপেক্ষা করিতেন।

আমার বরোদাগমনের পূর্ব্বে, অরবিন্দ গায়কবাড় সরকারের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেই কংগ্রেসের কার্য্যপদ্ধতি লক্ষ্য করিতেছিলেন। কংগ্রেসের কার্য্যপ্রণালীর কতকগুলি ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বোম্বে অঞ্চলের শিক্ষিত সমাজ জানিতেন, অরবিন্দ কবি, তিনি সুনিপুণ অধ্যাপক; কিন্তু তিনি রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচনায় সিদ্ধ-হস্ত, 'ইংলিস চ্যানেলের' এধারে তাঁহার ন্যায় ইংরাজী যে অতি অল্প লোকেই লিখিতে পারে, এ সংবাদ সে কালের শিক্ষিত সমাজের অতি অল্প লোকেরই বিদিত ছিল। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে,আমি কলিকাতায় আসিয়া সাপ্তাহিক 'বসুমতীতে' যোগদানের পর, অরবিন্দ মাতৃভূমির আহ্বানে গায়কবাড় সরকারের সকল বন্ধন, বৈষয়িক উন্নতির সকল প্রলোভন ত্যাগ করিয়া 'বন্দে মাতরমে'র সম্পাদনভার গ্রহণ করিলেন। তখনই দেশের লোক ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। আমাদের দেশের এ কালের অন্যান্য বাঙ্গালী নেতার ন্যায় কংগ্রেসের বিভিন্ন কটিরও সমর্থন করিবেন, অরবিন্দের ন্যায় ন্যায়নিষ্ঠ, তেজস্বী স্বদেশসেবকের নিকট তাহা আশা করা যায় না। আমার বরোদা-গমনের পূর্ব্বেই অরবিন্দ বোম্বের তৎকাল-প্রচলিত 'ইন্দুপ্রকাশ' নামক প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রে সেই সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়া কংগ্রেসের কার্য্য-প্রণালীর কঠোর সমালোচনা করায়, চতুর্দ্দিকে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। সুপণ্ডিত তিলক পর্য্যন্ত অরবিন্দের অকাট্য যুক্তি খণ্ডন করিতে না পারিয়া, তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তিনি যেন 'ইন্দুপ্রকাশে' কংগ্রেসের প্রতিকূল আলোচনায় বিরত থাকেন; নতুবা সমগ্র ভারতের এই অদ্বিতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানের যে ক্ষতি হইবে, সেই ক্ষতি সহজে পূর্ণ হইবে না। অরবিন্দ তিলকের ভক্ত ছিলেন; তাঁহার অনুরোধে তিনি লেখনী সংবরণ করেন; কিন্তু তাহার পর যত দিন তিনি বরোদায় ছিলেন, তাঁহাকে কংগ্রেসের সমর্থন করিতে দেখি নাই, বা কংগ্রেসের কোনও অনুষ্ঠানে তিনি যোগদান করেন নাই। দেশের নেতৃত্ব করিবার উচ্চাভিলাষ কোন দিন তাঁহার ছিল বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন ও কবিতা রচনাই যেন তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি আহারাদির পর কয়েক ঘণ্টার জন্য কলেজে যাইতেন, এবং অধ্যাপনা-শেষে বাসায় ফিরিয়া টেবলের ধারে লিখিতে বসিতেন। তাঁহার অধিকাংশ কবিতাই রামায়ণ-মহাভারতের আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত হইত। বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার তেমন অধিকার না থাকিলেও, সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তির অভাব ছিল না, এবং তিনি মূল রামায়ণ-মহাভারতের ভাব ও ভাষা অবলম্বন করিয়া, ইংরাজী ভাষায় কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহাকে কোন দিন রামায়ণ-মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদের সহায়তা গ্রহণ করিতে দেখি নাই। তাঁহার বাঙ্গালা পাঠের সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল না। উপর্য্যুপরি পাঁচ সাত দিন তাঁহাকে কোন বাঙ্গালা পুস্তক স্পর্শ করিতেও দেখিতাম না; অবশেষে এক এক দিন অপরাহ্নে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাস, দীনবন্ধুর কোন নাটক, অথবা রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থ লইয়া বসিতেন। দুই এক পৃষ্ঠার পাঠ শেষ না হইতেই হয় ত' পুস্তকের সমালোচনা আরম্ভ হইত। আমি তাঁহার সাহিত্যরসজ্ঞতার এবং সাহিত্যসমালোচনায় তাঁহার সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইতাম। এই ভাবে তাঁহাকে যাহা শিখাইতাম, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক শিখিতাম। আমাদের উভয়ের কে শিক্ষক, কে ছাত্র, তাহা স্থির করিতে পারিতাম না। কখন কখন মনে হইত, আমি তাঁহাকে কি কতটুকু শিখাইতেছি? এবং যদি তাঁহাকে ঐটুকু সাহায্য না করিতাম, তাহা হইলেই বা তাঁহার কি ক্ষতি হইত? বস্তুতঃ আমি তাঁহার বাঙ্গালা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য্য ছিলাম না, এবং মাসের অধিকাংশ দিন তাঁহার জন্য আমাকে কিছুই করিতে হইত না। আমরা স্বাধীনভাবে নিজের কাজ করিতাম।

কলেজের বি, এ, পরীক্ষার্থী ছাত্ররা কোন কোন দিন অরবিন্দের কাছে পড়িতে আসিত। তাহারা বলিত, মিঃ ঘোষ সেলী, মিল্‌টন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, সেক্সপীয়র প্রভৃতি যেমন পড়াইতেন, বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কলেজের কোন ইংরাজ অধ্যাপক তেমন চমৎকার পড়াইতে পারিতেন কি না সন্দেহ। বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের অনুরূপ উক্তি, তিনি যেন নখদর্পণে দেখিতে পাইতেন। য়ুরোপের অধিকাংশ দেশের সাহিত্যে তিনি সুপণ্ডিত বলিয়া, ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনায় অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে, এবং ছাত্রগণকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেন। তাঁহার দাদা স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ অরবিন্দের এ দেশে আসিবার অনেক পরে 'ভারতীয় এডুকেশনাল সার্ভিসে' প্রবেশ করিয়া, পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠতম বিদ্যামন্দিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি অরবিন্দের ন্যায় ছাত্রসমাজের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কি না, জানি না। তবে এ কালের বিশ্বপণ্ডিতগণের মধ্যে যে সকল সাহিত্যের 'ডক্‌টর' সাহিত্যানুশীলনে নানাভাবে বিদ্যা জাহির করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিতেছেন, অরবিন্দের আজীবনের সাধনালব্ধ জ্ঞানের তুলনায়, তাঁহাদের অনেককে 'হাতুড়ে ডাক্তার' বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তাঁহাদের প্রতি অমর্য্যাদা প্রদর্শন আমার উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু গভীর জ্ঞান-সমুদ্রের তলস্পর্শ করিবার জন্য অনন্যব্রত অরবিন্দের যে কঠোর সাধনা—তাঁহার যে সাধনার পরিচয় পাইয়া রবীন্দ্রনাথ এক দিন শ্রদ্ধান্তরে লিখিয়াছিলেন, 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার'—সেই সাধনায় যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিয়াছেন, 'নামকা ওয়াস্তে' আড়ম্বরপূর্ণ পোষাকী জ্ঞানের পশরাই যাঁহাদের সম্বল, তাঁহারা বিদ্যাদানে অরবিন্দের সমকক্ষ হইবেন, এরূপ আশা করা যায় না।

কিন্তু নূতন নূতন ভাষা শিক্ষায় অরবিন্দের উৎসাহের অভাব বা ক্লান্তি ছিল না। তিনি য়ুরোপের প্রধান প্রধান ভাষায় সুপণ্ডিত হইলেও, কার্য্যোপলক্ষে গুর্জ্জরে বাস করিতেছিলেন ও তাঁহাকে মারাঠা জাতির সংস্রবে আসিতে হইয়াছিল বলিয়া মারাঠী ও গুজরাটী

ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও, তিনি 'মোরী' ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। শুনিয়াছিলাম, ঐ অঞ্চলের দলীল-পত্রাদি উক্ত ভাষায় লিখিত হইত। এই ভাষার সহিত মারাঠী ভাষার কি পার্থক্য, তাহা জানিবার জন্য কোনও দিন আমার আগ্রহ হয় নাই; কিন্তু এই ভাষার অক্ষরের সহিত দেবনাগরী অক্ষরের সাদৃশ্য ছিল না। বলা বাহুল্য, মারাঠী ভাষা সংস্কৃত ভাষার ন্যায় দেবনাগরী অক্ষরেই লিখিত হইয়া থাকে; কিন্তু 'মোরী' ভাষায় লিখিত হরফগুলি অন্যপ্রকার। গুজরাটী ভাষার হরফের সহিত তাহাদের সাদৃশ্য আছে কি না, তাহাও কোন দিন জানিবার চেষ্টা করি নাই।

অরবিন্দ যাঁহার নিকট এই শ্রুতিকঠোর, উৎকট ভাষা অসীম ধৈর্য্য সহকারে শিক্ষা করিতে লাগিলেন, তাঁহার নাম—মিঃ ফাড়্‌কে। তাঁহার পূর্ণ নামটি ভুলিয়া গিয়াছি। তাঁহার নাম এত কাল পরেও সম্ভবতঃ অরবিন্দের স্মরণ আছে। মিঃ ফাড়্‌কে দক্ষিণী ব্রাহ্মণ—যাহাকে আমরা অজ্ঞতা বশতঃ মারাঠী ব্রাহ্মণ বলি। তিনি পরম নিষ্ঠাবান্, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ; গৌরবর্ণ, খর্ব্বকায়, দোহারা গঠন। সে সময় তিনি যৌবন-সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন। দাড়িবর্জ্জিত মুখে কৃষ্ণবর্ণ নিবিড় গোঁফ, মস্তকের হ্রস্ব কেশের মধ্যে তরমুজের বোঁটা অপেক্ষা স্থূলতর সুদীর্ঘ টিকির গোছা। মুখ প্রফুল্ল, সদা হাস্যময়; প্রদীপ্ত নেত্রের দৃষ্টি সরল। সনাতন ধর্ম্মের ও স্বদেশের প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। তিনি দেওয়ানের আফিসে অর্থাৎ 'বরোদা সেক্রেটেরিয়েটের' কোন-এক বিভাগে চাকরী করিতেন। কিন্তু আমাদের দেশের কোন সরকারী আফিসের সাধারণ কেরাণী, মুহুরী অপেক্ষা তিনি উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়াই মনে হইত। মারাঠী ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সাহিত্যালোচনায় তাঁহার অবসর-কাল অতিবাহিত হইত। তিনি নিজের চেষ্টায় বাঙ্গালাভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং স্বর্গীয় ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাতের' অনুবাদ করিতেছিলেন। অনুবাদ-কার্য্য তখন বহু দূর অগ্রসর হইয়াছিল। কোন কোন স্থান বুঝিতে না পারিলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন। আমি সাধু ভাষায় বুঝাইয়া দিলে তিনি তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেন, এবং বলিতেন, সাধু ভাষায় রচিত বাঙ্গালা পদগুলি সংস্কৃতমূলক বলিয়া বিশুদ্ধ মারাঠী ভাষার সহিত তাহার সাদৃশ্য এতই অধিক যে, তাহা বুঝিতে তাঁহার কষ্ট হয় না। তিনি বলিতেন, মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাতের ন্যায় উৎকৃষ্ট উপন্যাস তিনি অল্পই পাঠ করিয়াছেন। এই উপন্যাসে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজার চরিত্রাঙ্কনে গ্রন্থকার অসাধারণ দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন। ছত্রপতি শিবাজীর চরিত্রের আদর্শ, গ্রন্থকারের মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণগুণে কোনও স্থানে ক্ষুণ্ণ হওয়া দূরের কথা, তাঁহার লেখনীর ইন্দ্রজাল-কৌশলে ছত্রপতির মহান্ চরিত্র অপূর্ব্ব বর্ণরাগে ফুটিয়া উঠিয়াছে! মিঃ ফাড়্‌কে বঙ্গসাহিত্যের এই যশস্বী লেখককে দর্শন করিয়া চক্ষু সফল করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে আমার নিকট আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। সুখের বিষয়, কিছু দিন পরে তাঁহার এই আশা পূর্ণ হইয়াছিল। পরে এই প্রসঙ্গের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

মারাঠী ভাষায়, বিশেষতঃ গুজরাটী ভাষায় অনেকগুলি উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা উপন্যাস অনুবাদিত হইয়াছিল। আমি মিঃ ফাড়্‌কেকে তাঁহার অনুবাদকার্য্যে সাহায্য করিলে, তিনি দয়া করিয়া আমাকে মারাঠী ভাষা শিখাইতে সম্মত হইলেন। মারাঠী-ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য আমারও একটু আগ্রহ হইয়াছিল। 'প্রথম শিক্ষার' কয়েক পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিলাম, বাঙ্গালার সহিত ইহার অনেক শব্দই সাদৃশ্যমূলক, কিন্তু 'মাজার' অর্থাৎ (মার্জ্জার) বিড়ালের 'সহনাপণা' অর্থাৎ 'সেয়ানাপণা' বা বুদ্ধি-প্রাখর্য্যের গল্প পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াই আমার উৎসাহস্রোতে ভাটা পড়িল। আমি 'তুত্তোর' বলিয়া মহারাষ্ট্র-ভাষা শিক্ষার কেতাব বন্ধ করিলাম; কিন্তু অরবিন্দের মকরন্দ-লোলুপ চিত্ত সেই উৎকটভাষার কণ্টকারণ্যে প্রবেশ করিয়া, দিনের পর দিন মহা উৎসাহে গুঞ্জন করিতে লাগিল। আমার মনে হইল, বাঙ্গালাদেশের সাধারণ লোক ইহাকেই বলে—"সুখে থাকৃতে ভূতে কিলোয়!"

ধর্ম্মাত্মা ফাড়কের সহিত আমার সাহিত্যালোচনা বন্ধ হইল বটে, কিন্তু সমাজনীতি, স্থানীয় রাজনীতি ও ইতিহাস প্রভৃতির আলোচনা সমান উৎসাহে চলিতে লাগিল। তাহাতে যোগদান করিবার, অরবিন্দের সেরূপ উৎসাহ বা অবসর ছিল না। আমি ফাড়্‌কেকে বলিলাম, এ দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ঘুসিতে বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, সে-কালের বর্গীরা এ কালে দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছে; নতুবা নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর আমোলে ভাস্কর পণ্ডিতের দল বাঙ্গালা লুঠ করিয়া, কত শত গ্রামে লঙ্কাকাণ্ড করিয়া আসিয়াছে। সেই অত্যাচারের কাহিনী স্মরণ করিয়া বাঙ্গালার মায়েরা ছেলে-মেয়েদের ঘুম পাড়াইবার সময় এখনও সুর করিয়া বলে, "খোকা ঘুমুলো পাড়া জুড়ুল, বর্গী এ'ল দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে?" মনে হইতেছে, ফাড়্‌কে হাসিয়া বলিয়াছিলেন, ভাস্কর পণ্ডিত চৌথ আদায় করিত, কিন্তু প্রজা নবাবকে 'দামামা' বাজাইয়া সাহায্য করিত না, এবং বুল্‌বুল্ ধান খাইয়া প্রজাকে নিঃস্ব করিত না; কারণ, বুল্‌বুল্ শুকজাতীয় পক্ষীর ন্যায় ধান্য ভক্ষণ করে না। তোমার ও-ছড়ার আগাগোড়াই অর্থহীন প্রলাপ! আমি বলিলাম, বাঙ্গালা ভাষায় তোমার চমৎকার দখল হইয়াছে! 'খাজনা' ও 'বাজনা' তোমার কাছে অভিন্ন জিনিষ! বুল্‌বুল্ ধান খায় কি না জানি না, কিন্তু বর্গীর অত্যাচারে প্রজার অসহায় অবস্থার ছবি ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে। ফাড়কে সহজে পরাজয় স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বলিলেন, তোমাদের শিশু-সাহিত্য হইতে যুবা ও বুড়ার সাহিত্যে কেবল নিদ্রা, চুম্বন, আর 'হেমকুম্ভ জিনি' পয়োধরযুগলের বর্ণনা! মা ছেলেদের ঘুম পাড়াইতেছে—ঘুম পাড়াইবার ছড়া বলিয়া, স্ত্রী স্বামীকে ঘুম পাড়াইতেছে—স্তনচ্ছায়ায় শয়ন করাইয়া, স্নেহাঞ্চলের বাতাস দিয়া, আর বুড়ো-বুড়ীর ত কথাই নাই। তোমাদের জয়দেবের 'দেহি মে পদপল্লবমুদারং' হইতে বাঙ্গালার কাব্যাকাশের নবোদিত অরুণ রবীন্দ্রনাথের, "যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ এস, মম হৃদয়-নীরে" অথবা "বাহু ঘোরে বাঞ্ছিতেরে ঘিরে, লাঞ্ছিত ভ্রমর যথা মুদিত পদ্মের কাছে"—সর্ব্বত্রই এক সুর, এক ভাব! তোমাদের প্রেমের কবি চণ্ডীদাস বা প্রতিবেশী মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির প্রেমের চল্‌চলি না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। আমি বলিলাম, "ভাল হ'তে মন্দটুকু নিয়ে, বন্ধু, তব বৃথা এ রোদন।" প্রেমের কবিতায় বাঙ্গালা সাহিত্য জগজ্জয়ী। তোমাদের মারাঠী সাহিত্য-কাব্য কোন দিন আমাদের জয়দেব,

চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, বিদ্যাপতি, রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ হইতে পারিবে, সে আশা অল্প। এ বিষয়ে বাঙ্গালা সাহিত্য পৃথিবীর সাহিত্যের সহিত প্রতিযোগিতায় যে স্থান অধিকার করিয়াছে, সেই স্থান হইতে তাহাকে অপসারিত করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। কিন্তু বাঙ্গালার সাহিত্যকুঞ্জ কেবল কি প্রেমের সুমোহন বেণুর মধুর স্বরেই প্রতিধ্বনিত? পাঞ্চজন্য-শঙ্খধ্বনি নাই?

"সপ্ত-কোটি-কণ্ঠ-কল-কল-নিনাদ-করালে,
দ্বিসপ্ত-কোটিভুজৈধৃ'ত-খর-করবালে,
কে বলে মা তুমি অবলে?"

এ সঙ্গীত বাঙ্গালীর কণ্ঠেই ধ্বনিত হইয়াছে। 'বন্দে মাতরমে'র ন্যায় জাতীয় সঙ্গীত ভারতের আর কোন্ ভাষায় ধ্বনিত হইয়াছে? পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে—'কে বলে মা তুমি অবলে?' এই ছত্রটি পরে পরিবর্ত্তিত হইয়া লিখিত হইয়াছিল, 'কেন মা অবলা এত বলে?' কিন্তু ইহাতে মূল সঙ্গীতের গৌরব-হানি হয় নাই। বাঙ্গালার কবি হেমচন্দ্র এক দিন মেঘমন্দ্র স্বরে গাহিয়াছিলেন,—

"যাও সিন্ধু-তীরে ভূধর-শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে
বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধ'রে
স্বকার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হও।"

কাড়কে আমার কথার প্রতিবাদ করিলেন না, তিনি উৎসাহভরে বলিলেন, সমগ্র ভারত আজ মহামিলন-ক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছে, অসাড় জাতীয় জীবনে প্রাণ-স্পন্দন অনুভূত হইতেছে। তিলক মহারাজা আমাদের জাতীয়তার প্রধান পুরোহিত। সমগ্র ভারত রুদ্ধ নিশ্বাসে তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত নবজীবনের বাণী শ্রবণ করিবে। নিশাবসানে সুপ্ত ভারতকে জাগাইবার জন্য তাহা বিহঙ্গ-কণ্ঠের প্রভাতী রাগিণী।

মনে হইতেছে, সে ১৩০২ সালের কথা। তাহার পর সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর অতীত হইয়াছে। সমগ্র ভারত হইতে কোটি কণ্ঠে—নরনারীকণ্ঠে জাগরণের সাড়া পাইয়াছি; কিন্তু আমরা আমাদের গন্তব্যপথে পদমাত্রও অগ্রসর হইতে পারিয়াছি কি?

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

অন্তর যদি না নোয়ায় মাথা

অন্তর যদি না নোয়ায় মাথা করিস্‌নে মাথা নত,
বিশ্ব নিখিলে ছলিতে রে তুই, নিজেরে ছলিবি কত!
মুখে ভাষা এক বুকে ভাষা আর,
খেলিস্‌নে খেলা এই ছলনার,
ক্ষণিক সুখের লাগিয়া রে তুই, করিস্‌নে বুক ক্ষত,
অন্তর যদি না নোয়ায় মাথা করিস্‌নে মাথা নত।

অশিব ছাড়িয়া ওরে ও পথিক, শিবেরে আজি নে বরি'—
আজ থেকে তুই চলা সুরু কর্ সত্যের পথ ধরি'।
বিফল হইলে শত মনোরথ,
ছাড়িস্‌নে যেন সত্যের পথ—
টলিস্‌নে যেন সে-পথ হইতে আসে যদি দুখ শত,
অন্তর যদি না নোয়ায় মাথা করিস্‌নে মাথা নত।

শ্রীদীপঙ্কর বর্ম্মা।



(উপন্যাস)

১৩

তমন বুদ্ধিমান্, মেধাবী ; নূতন ভাষা শিক্ষা করিবার তাহার অসাধারণ ক্ষমতা। তিন মাসের মধ্যে পরীদের ভাষা সে শিখিয়া ফেলিল।

লুণা ও শিরীর মুখে সে সকল কথা শুনিল। তাহারা ত বিশেষ কিছু জানিত না, পাহাড়ে পুরুষের মধ্যে এক জন প্রহরীকে দেখিয়াছিল। তাহাদের কথা শুনিয়া তমন অত্যন্ত বিস্মিত হইল, কিন্তু সকল কথা বুঝিতে পারিল না। বলিল, পাহাড়ে গিয়ে কিছুদিন ছিল, এমন কারুর সঙ্গে কথা হ'লে কিছু বুঝতে পারি।

লুণা বলিল, আর কাউকে ডাকতে সাহস হয় না। কেউ টের পেলে তোমার প্রাণের ভয়, আর আমাদের কি দশা হবে, তা জানিনে।

তমন অল্প হাসিয়া কহিল, তোমাদের কোন অনিষ্ট হয়, সেই আশঙ্কায় আমি এই রকম চোরের মত লুকিয়ে রয়েছি। নিজের জন্য কিছু ভাবিনে।

শিরী বলিল, তোমার দিদিমাকে বল না কেন? উনি সব জানেন, আর ওঁকে দিয়ে কোন কথা প্রকাশ হবে না।

লুণা বলিল, এ বেশ বুদ্ধির কথা। এত দিন ত তমন আমাদের ভাষা জানতেন না, এখন দিদিমার সঙ্গে সব কথা হবে।

তমন বলিল, তা হ'লে চল তোমার দিদিমার কাছে।

লুণা বলিল, তুমি একটু বসো, তাঁকে ব'লে তার পর তোমাকে নিয়ে যাব।

লুণা ও শিরী লুণার দিদিমার কাছে গেল। বৃদ্ধা ছাদে বসিয়াছিল, তাহার অল্প তন্দ্রা আসিয়াছিল। লুণা ও শিরীর পদশব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখিয়া সে বলিল, আজ যে বড় এমন সময়ে তোরা এসেছিস্?

লুণা বলিল, তোমার সঙ্গে একটা ভারি দরকারী কথা আছে।

বৃদ্ধা বলিল, কি কথা?

লুণা কহিল, এখানে বলা হবে না, তুমি দোতলায় নিজের ঘরে চল।

বৃদ্ধা শঙ্কিত হইল, জিজ্ঞাসা করিল, কোন বিপদ হয়নি ত?

লুণা কহিল, না, না, কোন বিপদ হয়নি, চল, তোমাকে বলছি।

বৃদ্ধা ধীরে ধীরে দোতলায় নামিয়া নিজের ঘরে গিয়া বসিল। লুণা আর শিরী দাঁড়াইয়া রহিল।

লুণা বলিল, নদীতে আমি যে নৌকা পেয়েছি দেখেছ?

বৃদ্ধা কহিল, দেখব না কেন, ছাদ থেকে রোজ দেখতে পাই।

লুণা গলা খাটো করিয়া বলিল, নৌকাতে এক জন লোক ছিল।

বৃদ্ধা অবাক্। চক্ষু ডাগর করিয়া বলিল, অ্যাঁ, বলিস্ কি?

কি রকম লোক ? দেখতে কি তোদের মত ? কোন্ দেশ থেকে এল ? কোথায় গেল ?

লুণা বলিল, আমাদের মত দেখতে নয়। কি জানি কোন্ দেশ থেকে এসেছে ! পাহাড় থেকে নয়। আগে আমাদের কথা বুঝতে পারত না, এখন কইতে পারে। আমাদের বাড়ীতেই তাকে লুকিয়ে রেখেছি। বল ত ডেকে আনি।

বৃদ্ধার চক্ষু কপালে উঠিল। বলিল, কি সর্ব্বনাশ ! কেউ টের পেলে রক্ষে থাকবে না। তাকে দেখে আমার ভয় করবে না ত ?

শিরী ও লুণা হাসিতে লাগিল। লুণা কহিল, আমাদের ভয় হয় না ত তোমার হবে কেন ?

দুই জনে গিয়া তমনকে ডাকিয়া আনিল। বৃদ্ধা তাহাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিল। তাহার পর বলিল, আমার কাছে বসো। তোমার নাম কি ?

বৃদ্ধাকে নমস্কার করিয়া তমন তাহার পাশে বসিল। কহিল, আমার নাম তমন।

অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। বৃদ্ধা তমনকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার দেশ কোথায় ? তমন কহিল, তাহাদের দেশ পাহাড় পার হইয়া অনেক দূরে, সেখানে অনেক দেশ আছে, অনেক লোকের বাস। এখানে তমন কেমন করিয়া আসিল ? ঐ নৌকায়। উহা জলে ভাসে, আকাশেও ওড়ে। পাহাড় পার হইবার সময় তমন কিছু নীচে নামিয়াছিল, সেই সময় পাহাড় হইতে কোন লোক কোন একটা অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া যন্ত্রে আঘাত করে, যন্ত্র জলে পড়িয়া যায়।

তমন জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের এই দুই সহরে কেবল স্ত্রীলোকের বাস। এক জনও পুরুষ নেই কেন ? আমাদের সকল দেশে পুরুষ স্ত্রীলোক একত্রে বাস করে।

বৃদ্ধা বলিল, পুরুষরা পূর্ব্বদিকে আর পশ্চিমের পাহাড়ের উপর থাকে। এক দলের পাখা আছে, অপর দলের নেই। তারা এখানে আসতে পায় না। এখান থেকেও কেউ পাহাড়ে যেতে পায় না। কেবল একবার নিয়ে গিয়ে সেখানে বিয়ে দেয়। যদি ছেলে হয়, তা হ'লে সেইখানে রাখে, মাকে একলা ফিরে পাঠিয়ে দেয়। মেয়ে হ'লে মার সঙ্গে পাঠিয়ে দেয়। স্বামি-স্ত্রীতে আর দেখা হয় না। এ সব কথা ভয়ে কেউ প্রকাশ করে না। শিরী আর লুণা কিছু জানে না। আমার মনে হয়, ওরা লুকিয়ে পাহাড়ে যাবার চেষ্টা করেছিল, ওদের যেতে দেয়নি আর পাহাড়ে যাওয়া এক বছর বন্ধ ক'রে দিয়েছে। তুমি বিদেশী ব'লে তোমাকে বলছি, নইলে আমি কিছু প্রকাশ করতাম না।

শিরী এবং লুণা যাহা জানিত বলিল।

তমন বলিল, এ ত বড় নিষ্ঠুর প্রথা ! এ কথা প্রকাশ করলে কি হয় ?

বৃদ্ধা বলিল, কোথায় নির্ব্বাসন ক'রে আটকে রাখে, কেউ আর দেখতে পায় না।

তমন বলিল, কার আদেশে এ সব হয় ? এ কি অরাজক দেশ, রাজা নেই ?

বৃদ্ধা কহিল, রাজা নেই, দুই বুড়ী প্রধানা আছে। তারা ম'রে গেলে আর দুজন হয়। পাহাড়েও বোধ হয় ঐ রকম কিছু আছে।

—ওদের কি সৈন্য আছে ?

—না, পাহাড়ে প্রহরী আছে, এখানে প্রতিহারিণী আছে।

একটা কথা তমনের স্মরণ হইল। জিজ্ঞাসা করিল, যাদের হাতে সোণালি ও রূপালি যষ্টি আছে, তারাই কি রক্ষিকা ?

—হাঁ, ওদের যা ইচ্ছে, তাই করে।

তমন সস্মিতমুখে কহিল, ওদের এত ভয় ?

বৃদ্ধা বলিল, ওদের সঙ্গে কে পারবে ? ওরা প্রধানাদের আজ্ঞা পালন করে, প্রধানাদের ভয়ে সকলে অস্থির। লুণা তোমাকে লুকিয়ে রেখেছে টের পেলে তোমাকে হয় ত মেরে ফেলবে আর আমাদের নির্ব্বাসন ক'রে দেবে।

তমন বলিল, এমন অবস্থায় আমার এখানে থাকা উচিত নয়। আমি আর কোথাও যাব।

বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিল, দেশে ফিরে যাবে ?

লুণা ও শিরীর মুখ শুকাইয়া গেল। লুণা বলিল, এখানে থাকলে কেউ টের পাবে না, আমরা খুব সাবধান আছি।

শিরী বলিল, তুমি আমাদের বাড়ী চল, সেখানে কেউ নেই। এ বাড়ীতে সে দিন অলকা এসেছিল, বোধ হয়, তার মনে কিছু সন্দেহ হয়ে থাকবে।

তমন বলিল, দিন কতক না হয় তোমার বাড়ী গিয়ে থাকব। কিন্তু আমার থাকবার জন্য একটা আলাদা

যায়গা দেখে নিতে হবে। যন্ত্রটার বিশেষ কোন দোষ হয়নি, তবু ওটা একবার ভাল ক'রে দেখতে হবে, অনেক কাযে আসবে। এখানে যে রকম অত্যাচার, তার একটা প্রতীকার করতে হবে।

বৃদ্ধা সন্দিগ্ধভাবে কহিল, তুমি একা কি করবে?

তমন হাসিল, কহিল, দেখি কি করতে পারি। অনেক কথা ভেবে দেখতে হবে।

তমন উঠিয়া নিজের ঘরে গেল।

তমন দিবারাত্রি ঘরের ভিতর বদ্ধ থাকিত না। রাত্রিতে আহারাদির পরে নগর নিস্তব্ধ হইলে লুণা ও শিরী তমনকে সঙ্গে করিয়া, একটা নৌকায় লইয়া যাইত। তমন কৃষ্ণবর্ণ বেশ ধারণ করিত, মাথায় কালো আঁটা টুপী পরিত, চক্ষুর ঠুলি পকেটে পুরিয়া লইত। নদীতে কখন পূর্ব্বাভিমুখে, কখন পশ্চিমদিকে যাইত। নগর উত্তীর্ণ হইয়া, নৌকা হইতে নামিয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইত। দুই সহরের বাহিরে কোথায় কি আছে, লুণা ও শিরীকে জিজ্ঞাসা করিত। ফিরিয়া আসিয়া নিজের যন্ত্র উত্তমরূপে পরীক্ষা করিত, বিদ্যুতের বাতি জ্বালিয়া সমস্ত দেখিত; যেখানে আঘাত লাগিয়াছিল, সে অংশ ভাল করিয়া মেরামত করিল।

লুণার দিদিমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইবার পর কয়েক দিন পরে তমন বলিল, এইবার আমি আর এক যায়গায় যাব।

লুণা বলিল, কেন, আমাদের কি অপরাধ হয়েছে?

শিরী বলিল, তুমি আমাদের বাড়ীতে গিয়ে থাকবে বলেছিলে, তার কি হ'ল?

—তাও থাকব। আমি ত তোমাদের দেশ ছেড়ে যাচ্ছিনে, দেখাশুনা হবেই। এই যে তোমাদের উপর এ রকম নিষ্ঠুর আচরণ করে, এর একটা কিছু বিহিত করতে হবে। তোমাদের আর কত দিন পরে পাঠিয়ে দেবে?

লুণা বলিল, ছয় মাস পরে।

—তার পর কিছুদিন পরে ফিরে আসতে হবে, জীবনের সব সুখ সেইখানে রেখে আসতে হবে।

শিরী সাগ্রহে বলিল, আমরা পাহাড়ে যেতে চাইনে। তোমার সঙ্গে আমাদের নিয়ে চল না কেন?

—তাও হ'তে পারে, কিন্তু আর যারা এখানে আছে, তাদের কি হবে? তাদের দশাও ভাবতে হয়

ইহারা রাত্রিতে ঘুরিয়া বেড়াইত, ছায়া যে অলক্ষ্যে ছায়ার মত তাহাদের অনুসরণ করিত, তাহা কেহ জানিত না। লুণার বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া অলকা যাহা বলিয়াছিল, তাহাতে ছায়ার মনে সন্দেহ হইয়াছিল—একটা কিছু রহস্য আছে। সে গোপনে লুণার বাড়ীর প্রতি দৃষ্টি রাখিতে আরম্ভ করিল। সে দেখিল, শিরী প্রতিদিন লুণার বাড়ীতে আগমন করে, বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে চারিদিকে চাহিয়া দেখে—আর কেহ কোথাও আছে কি না। একটা যেন কিসের আশঙ্কা, কি যেন গোপন করিতে চায়।

তাহার পর ছায়া তমনকে দেখিতে পাইল। দেখিয়াই চিনিল, এ ব্যক্তি পুরুষ, কারণ, পাহাড়ে গিয়া সে অনেক পুরুষ দেখিয়া আসিয়াছিল। ছায়া স্থির করিল, এই ব্যক্তি নূতন নৌকায় আসিয়াছে। পর্ব্বতবাসী নহে, কোন বিদেশী হইবে। লুণা এবং শিরী ইহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। ছায়া আরও দেখিল, ইহারা তিন জন রাত্রি-কালে নৌকা করিয়া কোথায় যায়, সে ব্যক্তি নিজের নৌকায় প্রবেশ করিয়া কি করে।

এক রাত্রিতে লুণা, শিরী ও তমন ভ্রমণ করিয়া আসিয়া লুণার গৃহে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় ছায়া ছুটিয়া আসিয়া তমনের পদপ্রান্তে পতিত হইল। তাহার চরণ জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, ওগো, তুমি কে? আমাকে রক্ষা কর!

তমন অত্যন্ত বিস্মিত, কুণ্ঠিত হইয়া তাড়াতাড়ি ছায়াকে হাত ধরিয়া তুলিল। জিজ্ঞাসা করিল, কে তুমি? লুণা ও শিরীকে জিজ্ঞাসা করিল, একে তোমরা চেন?

ঘোর শঙ্কায় লুণা ও শিরীর শরীর কণ্টকিত হইল। তাহারা চাহিয়া দেখিল, ছায়া। লুণা ভীতস্বরে কহিল, ছায়া, এমন সময় তুমি যে এখানে?

ছায়া বলিল, তোমাদের কোন ভয় নেই। আমি কাউকে কিছু বলব না। তোমাদের সব কথা বলব ব'লে এসেছি।

লুণা বলিল, এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে আর কেউ দেখতে পাবে। ভিতরে এস।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া লুণা দরজা বন্ধ করিল। তমনের ঘরের ভিতর গিয়া দরজা ভেজাইয়া দিল।

কেহ বসিল না, সকলে দাঁড়াইয়া রহিল। ছায়া আবেগের সহিত কহিল, আমি তোমাদের শত্রু নই, আমাকে তোমাদের কোন ভয় নেই। অলকাকে আমি কোন কু-অভিসন্ধিতে পাঠাইনি। আমি প্রধানাদের শত্রু, যারা পাহাড় থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাদের শত্রু।

তমনকে বলিল, তুমি ঐ নৌকা ক'রে এসেছ, আমি জানি। তুমি নৌকাতে আলো জেলে কি করতে, আমি দেখেছি। তোমরা রাত্রিকালে নৌকা ক'রে বেড়াতে যাও, তাও আমি জানি। যদি আমার কোন মন্দ অভিপ্রায় থাকত, তা হ'লে রক্ষিকাকে কি প্রধানাকে ব'লে দিতাম। তুমি শক্তিশালী, আমি তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি। আমি বড় দুঃখিনী।

তমন কোমল, দয়ার্দ্র কণ্ঠে বলিল, কি দুঃখ তোমার?

চিত্তের অধৈর্য্যে ছায়া দুই হাতে তমনের হস্ত ধারণ করিল, রুদ্ধ ভগ্ন কণ্ঠে কহিল, আমি হতভাগিনী। পাহাড়ে আমার বিয়ে হয়েছিল, আমার স্বামীর নাম সুনন্দ। আমাদের একটি ছেলে, তার নাম কুবলয়। ছেলেকে আমার বুক থেকে কেড়ে নিয়ে, আমার স্বামীকে বেঁধে রেখে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

ছায়ার তপ্ত অশ্রু প্রবাহিত হইয়া তমনের হস্ত সিক্ত করিল। তমন ছায়াকে বসাইয়া বলিল, তুমি স্থির হয়ে সব কথা বল।

সকলে বসিল। ছায়া সকল কথা বলিল। বৃদ্ধ প্রধান তাহাকে অজ্ঞান করিয়া সেই অবস্থায় নগরে পাঠাইয়া দিয়াছিল, সে কথা বলিল। বলিল, আমি আবার পাহাড়ে ফিরে যাব, তা আমার কপালে যাই থাক। তুমি যদি কিছু উপায় কর, ভাল, নইলে আমি একা যাব। দুই নগরে আমার মত কত অভাগিনী আছে।

তমন বলিল, আমি একটা মানুষ, আমাকে দিয়ে যা হ'তে পারে, আমি করব। তুমি গিয়ে কি করবে, তোমাকে ধ'রে নির্ব্বাসন করবে। তার চেয়ে বরং তোমরা সব খবর জেনে আমাকে ব'লো। তুমি এক পাহাড়ে গিয়েছিলে, লূণা আর শিরী আর এক পাহাড়ে যাবার চেষ্টা ক'রে যেতে পারেনি। সেখানকার কিছু খবর শিরী যোগাড় করবে। প্রধানারা, রক্ষিকারা কোথায় কি ভাবে থাকে, জানতে হবে। যাদের নির্ব্বাসন করে, তাদের কোথায় পাঠায়, জানবার চেষ্টা করা উচিত। ছায়া, তুমি অধীর হয়ে একটা কিছু ক'রে বসো না। আমি খুব শীঘ্র এখান থেকে যাব। দেখ, যদি আমাকে দিয়ে কিছু হয়।

ছায়া আবার তমনের পদলগ্ন হইবার চেষ্টা করিল, তমন তাহাকে নিবারণ করিল।

ছায়া চলিয়া গেল। লূণা বলিল, ও জানতে পেরেছে, তাতে কোন ভয় নেই ত?

তমন বলিল, কিছু না। ওকে দিয়ে আমাদের অনেক কায হবে। অনেকেই তোমাদের সঙ্গে যোগ দেবে, কেন না, অনেকে অত্যাচারে পীড়িত হয়েছে, অনেকের মনে রাগ-দুঃখ আছে। পাহাড়ে আর দুই সহরে বিদ্রোহীর দল কেবল বাড়বে। আর কথা লুকানো ত তোমাদের সকলেরই অভ্যাস আছে। প্রকাশ ক'রে কারুর কোন লাভ নেই, বরং ক্ষতি।

শিরী যাইবার সময় তমন তাহাকে বলিল, তুমি যদি দু'চার জন এমন বন্ধু পাও, যাদের কাছে কিছু কথা জানা যেতে পারে, তা হ'লে তোমার বাড়ী যাব।

লূণা দরজা বন্ধ করিল। তমনকে বলিল, তুমি কি এখানে আর থাকবে না?

তমন লূণার হাত ধরিল, বলিল, তুমি আমাকে আশ্রয় দিয়েছ, তা কি আমি ভুলে গিয়েছি? যে কাযে আমরা হাত দিয়েছি, তাতে আশঙ্কা আছে, বিপদ আছে, আমাদের নিজের কোন কথা ভাববার এ সময় নয়।

লূণা আর কোন কথা না বলিয়া দিদিমার ঘরের পাশের ঘরে শয়ন করিতে গেল।

১৬

শিরী তাহাদের নগরের কয়েক জন পক্ষশূন্য পরীর কাছে সাবধানে কথা পাড়িল। তাহারা সকলে পাহাড়ে গিয়াছিল, সকলের হৃদয়ে শোকদুঃখ ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় চাপা ছিল। শিরী তাহাদিগকে বুঝাইল যে, কোন অলৌকিক ক্ষমতাশালী ব্যক্তির কৃপায় তাহাদের দুঃখের অবসান হইতে পারে। সে ব্যক্তি যেরূপ আদেশ করিবে, সেইরূপ করিতে হইবে, কোন কথা প্রকাশ হইলে সকলের বিপদ।

এমন লোক কে থাকিতে পারে, কোথা হইতে আসিল? যাহারা শুনিল, তাহাদের অত্যন্ত কৌতূহল হইল, তাহারা

শপথ করিল, কোন কথা প্রকাশ করিবে না। এক রাত্রিতে শিরী তমনকে গোপনে তাহার বাড়ীতে ডাকিয়া আনিল। লুণাও আসিল। শিরী যাহাদের বলিয়া রাখিয়াছিল, একে একে তাহারাও আসিল। তাহারা বিস্মিত হইয়া তমনের তেজঃপুঞ্জ, বলিষ্ঠ, মনোমোহন মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল। কাহারও মনে শঙ্কার লেশ রহিল না, সকলের মনে আশা হইল, সকলের হৃদয়ের দ্বার অর্গলমুক্ত হইয়া গেল।

তমন জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা সকল কথা নির্ভয়ে অকপটে বলিল। পর্ব্বতের দুই দিকে একই প্রথা, বিবাহের একই পদ্ধতি। এক সন্তান হইলেই পাহাড় হইতে বিদায় করিয়া দেয়, পুত্র-সন্তান কাহাকেও আনিতে দেয় না।

তমন বলিল, তোমাদের এই দুই নগর আর পাহাড়ে যারা থাকে, তাদের ছাড়া পাহাড় পেরিয়ে আরও অনেক দেশ আছে, অনেক লোকের বাস আছে। তাদের ডানা নেই, তারা পরী নয়। এখানেও তোমাদের সকলের পাখা নেই। আমাদের পাখা নেই বটে, কিন্তু ওড়বার কল ক'রে উড়তে পারি। ঐ যে নৌকাটা দেখেছ, ঐটে চ'ড়ে আমি এখানে অনেক দূর থেকে উড়ে এসেছি। তোমাদের যাদের পাখা আছে, তারাও উড়ে পাহাড় পার হয়ে যেতে পারে না। এই পাহাড়ের গণ্ডীর ভিতর সব বাঁধা, কারুর বাইরে যাবার জো নেই। এখানে যে রকম নিষ্ঠুর প্রথা, এ রকম কোথাও শুনিনি। আর সব দেশে স্ত্রীপুরুষে একত্রে বাস করে, বিয়ের পরে স্বামি-স্ত্রীতে কখনও বিচ্ছেদ হয় না, ছেলে-মেয়ে তারা মানুষ করে, বাইরের কায পুরুষরা করে, ঘরের কায মেয়েরা করে। তোমাদের এখানে এ কি নির্ম্মম অত্যাচার! এখানে এক জনও কি সুখে আছে? যাদের বিয়ে হয়েছে, তারা কেউ স্বামীর মুখ দেখতে পায় না, পুত্রের মুখ দেখতে পায় না, মেয়ে হ'লে মেয়ে কোলে ক'রে চ'লে আসতে হয়। তোমরা যে বল, কোন অপরাধ হ'লে নির্ব্বাসন করে, কোথায় পাঠিয়ে দেয়, কেউ দেখতে পায় না, এই যে তোমাদের এখনকার অবস্থা, এর চেয়ে আর কঠিন নির্ব্বাসন কি হ'তে পারে? স্বামীর কাছ থেকে নির্ব্বাসিত, পুত্রের মুখদর্শনে বঞ্চিত। এই ছায়া, এই অলকা, তোমাদের মধ্যে এমন কত জন আছে, তোমাদের নির্ব্বাসন নয় ত কি? তোমরা কেউ মনে করলে স্বামি-পুত্রের কাছে যেতে পার? তোমরা বলবে, রক্ষিকারা তোমাদের যেতে দেবে না, জোর ক'রে আটকে রাখবে, তার পর প্রধানারা তোমাদের নির্ব্বাসন করবে, তোমরা পাহাড়ে যেতেও পাবে না, ফিরেও আসতে পাবে না। তোমরা কত জন আর রক্ষিকারা ক'জন, ভেবে দেখেছ? তোমরা সকলে মিলে একমত হয়ে রক্ষিকাদের বেঁধে ফেলতে কতক্ষণ? তার পর দুই বুড়ী প্রধানা কি করবে? দুই পাহাড়ে যে দুদল পুরুষ প্রহরী আছে, সে কথা আমি ভুলিনি। তারা এসে তোমাদের বিদ্রোহ দমন করতে পারে। কিন্তু তোমরা যেমন এখানে আছ, তেমনই পাহাড়ে অনেক পুরুষ আছে, তারা পরামর্শ ক'রে প্রহরীদের নিরস্ত্র করতে পারে।

অলকা বলিল, তাদের কে পরামর্শ দেবে? এখানে তুমি আমাদের ভরসা দিয়েছ, সেখানে তাদের কে বলবে?

তমন বলিল, সে ভার আমার। তাদের না বোঝালে শুধু তোমাদের ব'লে কি ফল হবে? আরও একটা কথা ভেবে দেখ। রক্ষিকারা তোমাদেরই মত, ওরা কি ঘর-সংসারের সুখ চায় না? পাহাড়ে যারা পাহারা দেয়, তারা কি স্ত্রী-পরিবার নিয়ে বাস করতে চায় না? আসল কথা এই যে, তোমাদের এখানে আর পাহাড়ে খোলাখুলি কথা কইতে সকলে ভুলে গেছে। কেবল ঢাক-ঢাক, কেবল চুপ-চুপ, মনের ভিতর মনের কথা গুমরিয়ে মরে। ভয়ের যে কারণ নেই, তা বলছি নে। এত শাসন, এত কড়াকড় পাহারা থাকলে ভয় হবারই কথা। কিন্তু তোমরা মনে স্থির সিদ্ধান্ত কর যে, এ শাসন নির্ম্মম, নির্দ্দয়। যারা এরূপ শাসন করে, তারাই অপরাধী, অপরাধ তোমাদের নয়। এদের শক্তি নষ্ট করা তোমাদের সকলের কর্ত্তব্য। এই সব কথা আজ যেমন তোমাদের বলছি, তেমনি পাহাড়ে বলব, প্রহরীদের বলব, প্রতিহারিণীদের বলব।

লুণা ভয় পাইয়া বলিল, ওরা জানতে পারলে তোমাকে মেরে ফেলবে।

তমন হাসিতে লাগিল। কহিল, আমি সে কথা জানি। মরণ-বাঁচন ত আছেই, তোমাদের এ অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি হ'লে সব সার্থক হবে। আমার জন্ত চিন্তার কোন কারণ নেই। আমি যা করব, সাবধানে করব। তোমরা নিজের দল বাড়াও, এতকাল ধ'রে যে ভয়ে তোমাদের কিছু

করতে সাহস হয় নাই, সে ভয় পরিত্যাগ কর। এর পর তোমাদের কি করতে হবে, আমি ব'লে দেব। কিছু দিন যদি আমাকে না দেখতে পাও, তা হ'লে তোমরা কিছু মনে কোরো না। আমাকে অনেক স্থানে যেতে হবে, অনেকের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। আমি এক দণ্ডও নিশ্চিন্ত কি নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকব না। তোমরা মনে মনে স্থিরসঙ্কল্প কর যে, এই অত্যাচারের উচ্ছেদসাধন করবে, যারা এই অত্যাচারে লিপ্ত, তাদের শাস্তিবিধান করবে। গোপনে তোমরা বিদ্রোহ প্রচার কর, তোমাদের দল যত বড় হয়, ততই মঙ্গল। প্রধানারা কোথায় থাকে, আমাকে জানতে হবে, তাদের সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হবে। রক্ষিকাদের আমাদের দলে আনতে হবে। নির্ব্বাসন ক'রে কোথায় রাখে, জেনে নির্ব্বাসিতাদের মুক্ত করতে হবে, তাদের এখানে ফিরিয়ে আনতে হবে। পাহাড়ে যারা থাকে, তাদের উত্তেজিত করতে হবে, সেখানে প্রহরীরা যাতে আমাদের বশীভূত হয় তার উপায় করতে হবে, অত্যাচারীদিগকে শাসন করতে হবে। তোমাদের সহায়তা পেলে এ সব কিছুই কঠিন নয়

তমন চলিয়া যাইবার সময় পরীরা তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। এক জন জিজ্ঞাসা করিল, তোমার বিয়ে হয়েছে? দেশে তোমার কে আছে?

হাসিমুখে তমন বলিল, না, আমার বিয়ে হয় নি। দেশে আমার বাপ-মা আছে। হয় ত এর পর তোমাদের দেশে আর আমাদের দেশে যাওয়া আসা হবে।

পরীরা করতালি-ধ্বনি করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। কহিল, এমন দিন কি আমাদের হবে? পাহাড়ের পাঁচীল কি আমরা কখন পার হ'তে পারব?

তমন তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল, তার আর অধিক বিলম্ব নেই। তোমরা মন শক্ত কর, তা হ'লে সব বিঘ্নবাধা দূর হয়ে যাবে।

দেখিতে দেখিতে দুই নগর আর এক ভাব ধারণ করিল। সে ভাবের বাহ্যবিকাশ তেমন কিছু লক্ষিত হয় না। নগর-বাসিনীরা দলে দলে লুণা, শিরী ও ছায়ার সহিত যোগদান করিল। অনেকে তমনকে দেখিল, তাহার সহিত আলাপ করিল। ভিতরে চলিতেছিল চক্রান্ত, কিন্তু বাহিরে তাহার কোন লক্ষণ দেখা দিল না। যাহারা সর্ব্বদা বিমর্ষ থাকিত, তাহাদের মুখে হাসি ফুটিল। যাহাদের চক্ষুর জ্যোতি নিষ্প্রভ হইয়াছিল, তাহাদের চক্ষু আবার উজ্জ্বল হইল। যাহারা অবনতমস্তকে স্খলিত-জড়িত-পদক্ষেপে পথে চলিত, তাহারা উন্নতমস্তকে ক্ষিপ্র-দৃঢ়গতিতে চলিতে আরম্ভ করিল। হাস্যলহরীতে আকাশ, নদীবক্ষ, পথ-ঘাট মুখরিত হইয়া উঠিল। ম্রিয়মাণ কুসুম স্নিগ্ধ বায়ুস্পর্শে যেমন পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠে, পরীরা আশার বলে সেইরূপ বলবতী হইয়া উঠিল।

এই বিচিত্র অচিন্তিতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনের কারণ কি? আর কিছু নয়, পুরুষশূন্য নগরে এক জন পুরুষের আগমন। যে দেশ পরীরা কেহ কখন দেখে নাই, সেই দেশ হইতে অলৌকিক-বলশালী এক পুরুষ তাহাদের মুক্তির নববার্ত্তা লইয়া আসিল। যাহাদের হৃদয়ে কোন আশা ছিল না, তাহাদের মনে আশার সঞ্চার হইল। ভীতকে কে যেন অভয় প্রদান করিল, দুর্ব্বলকে বল দান করিল। দুঃস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, বক্ষের উপর হইতে শিলাখণ্ড কে যেন দূরে নিক্ষেপ করিল। যে কথা কেহ মুখ ফুটিয়া বলিতে সাহস করিত না, নির্ভয়ে সকলে সেই কথা কহিতে লাগিল। যাহাদের অধর হইতে সুখের সুধাভাণ্ড তিরোহিত হইয়াছিল, তাহাদের আবার সুধাপানের আশা হইল। তৃষিত বঞ্চিত নয়ন ঈপ্সিতের দর্শনাশায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। নারীর ভীরু প্রাণে পুরুষের বল সঞ্চারিত হইল। কুহকের ইন্দ্রজাল যেন চক্ষুর সম্মুখ হইতে অপসারিত হইয়া গেল

[ক্রমশঃ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত



ন্যায়দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এ মহাবাক্য যেমন ভারতবাসী হিন্দুর কণ্ঠস্থ, শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাসও তাহাদের তেমনই হৃদ্গত। সেই বদ্ধমূল বিশ্বাসের সমর্থন বা নিরাকরণার্থে বৃথা লেখনী চালনা বর্ত্তমান লেখকের উদ্দেশ্য নহে। প্রাচীন ভারতে "প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানাম্" ইত্যাদি প্রমাণে যে ন্যায়দর্শনকে সর্ব্ববিদ্যা-প্রকাশের উজ্জ্বল আলোকরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই ন্যায়শাস্ত্রের প্রথম পাঠ্য পরিভাষাগ্রন্থ "ভাষা-পরিচ্ছেদ," উহার টীকা "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী" এবং ন্যায়ের মূল গ্রন্থ গোতমসূত্রের বৃত্তির উপক্রম ও উপসংহার শ্লোকে, তথা ন্যায়ের চরম সিদ্ধান্তগ্রন্থ ন্যায়াচার্য্য উদয়নাচার্য্য-কৃত "কুসুমাঞ্জলিতে" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সংক্ষেপে কিরূপ স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এই প্রবন্ধে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে। বলা বাহুল্য, গ্রন্থারম্ভে প্রদত্ত মঙ্গলাচরণ-শ্লোকগুলি গ্রন্থকর্ত্তার ইষ্টদেবতার নামসংকীর্ত্তনপূর্ব্বক প্রণামার্থ রচিত হইয়া থাকে। ঐরূপ মঙ্গলাচরণ গ্রন্থমধ্যে লিপিবদ্ধ করিবার মুখ্য লক্ষ্য—শিষ্যশিক্ষা ও শিষ্টাচার। এ বিষয়ে ভগবান্ মনুর উপদেশ ;—

> "মঙ্গলাচারযুক্তানাং নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনাম্।
> চত্বারি সংপ্রবর্দ্ধন্তে আয়ুর্বিদ্যাযশোবলম্॥"

অর্থাৎ মঙ্গলাচারপরায়ণ, সতত জ্ঞানবয়োজ্যেষ্ঠদিগের শুশ্রূষা-নিরত জনগণের পরমায়ু, বিদ্যা, যশ, ও বল এ চারিটি পরিবর্দ্ধিত হয়। অতএব গ্রন্থমাত্রের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে যে দেবতার নাম কীর্ত্তন ও প্রণাম করা হয়, তিনি গ্রন্থকর্ত্তার অভীষ্টদেব, ইহা সর্ব্বসম্মত। এখন পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থগুলির মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে যে পরমারাধ্য শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন ও প্রণাম করা হইয়াছে, ঐ পরতত্ত্বের বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ যথামতি বিবরণ দিতেছি।

প্রথমতঃ ভাষা-পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে ;—

> "নূতনজলধররুচয়ে গোপবধূটীদুকূলচৌরায়।
> তস্মৈ নমঃ কৃষ্ণায় সংসারমহীরুহস্য বীজায়॥"

নব-জলধরকান্তি, গোপসুন্দরীগণের বস্ত্রহরণকারী, সংসারবৃক্ষের মূলবীজ সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি। শ্লোকের স্পষ্টার্থে আপাততঃ মনে হয়, জলভরা মেঘের মত কালো, গোয়ালিনীদের কাপড় চুরি করে যে কৃষ্ণ নামে যুবা, তাকে নমস্কার। আপাত প্রতীয়মান এই অসদর্থের নিরাকরণার্থে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার শ্রীল বিশ্বনাথ ন্যায়-পঞ্চানন, স্বকৃত টীকা "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী"তে বুঝাইতেছেন,—"সংসারেতি সংসার এব মহীরুহো বৃক্ষস্তস্য বীজায়, এতেন ঈশ্বরে প্রমাণমপি দর্শিতং ভবতি, তথাহি যথা ঘটাদিকার্য্যং কর্ত্তৃজন্যং তথা ক্ষিত্যঙ্কুরাদিকমপি। ন চ তৎকর্ত্তৃত্বমস্মদাদীনাং সম্ভবতীত্যস্তা-কর্ত্তৃত্বেনেশ্বরসিদ্ধিঃ।" সংসারবৃক্ষের বীজ এই বিশেষণে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরত্বে প্রমাণ প্রদর্শিত হইল। অর্থাৎ তোমার আশঙ্কিত যে, সে কৃষ্ণনামক যুবা বুঝাইল না, কারণ, যেমন ঘট-পদাদি কার্য্য কুম্ভকারাদি কর্ত্তার দ্বারা সম্পাদিত হইতে দেখা যায়, তেমনি পৃথিবী-সৃষ্টি-কার্য্যেরও অবশ্য এক জন কর্ত্তা আছেন। এই সৃষ্টিক্রিয়া তোমার আমার দ্বারা হইতে পারে না। যিনি ইহার স্রষ্টা, তিনিই ঈশ্বর। এইরূপে অনুমেয় যে ঈশ্বর, তাঁহাকেই গ্রন্থকর্ত্তা কৃষ্ণ নামে প্রণাম করিতেছেন। এ কৃষ্ণ সাধারণ কৃষ্ণ নহেন। গ্রন্থকার স্বীয় উক্তির সমর্থনার্থে নিম্নোক্ত প্রকার শ্রুতিরও উদ্ধার করিয়াছেন,—"দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব এক আস্তে, বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা, ইত্যাদয় আগমা অপ্যনুসন্ধেয়াঃ" এক অদ্বিতীয় দেবতা অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই নিখিল বিশ্বের কর্ত্তা ও সমগ্র ভুবনের রক্ষাকর্ত্তা ইত্যাদি। শ্লোকোক্ত "নূতনজলধররুচয়ে" বিশেষণের বিশদার্থটি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলায় বড়ই সুমধুর ও সুপরিস্ফুট। নবেণ্য কবিরাজ গোস্বামীর ব্যাখ্যা—

> "কৃষ্ণ নব জলধর, জগৎশস্য উপর
> বরিষয়ে লীলামৃতধার।
> মাধুর্য্য ভগবত্তাসার ব্রজে কৈলা পরচার
> তাহে শুক ব্যাসের নন্দন॥"

"গোপবধূটীদুকূলচৌরায়" বিশেষণের বহু অর্থ ধ্বনিত হইয়া থাকে। প্রথম প্রকার অর্থে গোপীদের বস্ত্রচোর বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণের চৌর্য্যাপবাদে ক্ষুব্ধগণ ব্যাখ্যা করেন,—গো, পৃথিবী যিনি পালন করেন, তিনি গোপ কি না রাজা যুধিষ্ঠির, তাঁহার বধূটী দ্রৌপদী, তাঁহার দুকূল পট্টবস্ত্র, উহার চৌর কি না রক্ষক। "উপকৃতং বহু তত্র কিমুচ্যতে" ইত্যাদি শ্লোকে প্রদর্শিত অলঙ্কারশাস্ত্রব্যাখ্যাতে বিপরীতলক্ষণা স্থলে চৌর শব্দে রক্ষক বুঝায়। তাৎপর্য্যার্থে দুষ্ট দুঃশাসনকৃত বস্ত্রাকর্ষণসময়ে যিনি বস্ত্ররূপে রক্ষক হইয়াছিলেন। গূঢ়ার্থে চৌর্য্য অর্থটি এখানেও অনুধ্বনিত। অর্থাৎ যিনি স্বরূপ চুরি করিয়া বস্ত্ররূপ ধারণ করিয়াছিলেন। অথবা গো শব্দে ইন্দ্রিয়, উহাদের পালক জীব, তাহার বধূটী অবিদ্যা, উহার দুকূল আবরণ যিনি হরণ করিয়া থাকেন। কিংবা গোপবধূটীদিগের দুকূল কি না পতি ও পিতৃকুল, ইহলোক ও পরলোক যিনি চুরি করেন, কি না কুলাদিজনিত লজ্জাভয়াদি বিলুপ্ত করেন। কৃষ্ণতত্ত্বের গূঢ়-রহস্যবিৎ শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ তাঁহার অমিয় নাটক "ললিত-মাধবের" ১ম অঙ্কে "কুলবরতনুধর্ম্মগ্রাববৃন্দানি ভিন্দন্" ইত্যাদি ৩৪শ শ্লোকে এই কুলচৌর্য্যের কথাটি বেশ পরিস্ফুট করিয়াছেন। ঐ শ্লোকের ভাবার্থ—

"কুলবধূধর্ম্ম এ যে পাষাণ হ'তে দৃঢ়।
ছেদিতে কটাক্ষটাঙ্গী পাইয়াছে বড়॥"

ফলতঃ রাগানুগা ভক্তির ধনী মহাজন শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ এই দুই বিশেষণের যে সারার্থ প্রকটিত করিয়াছেন, সমীচীন ও প্রাসঙ্গিক বোধে ঐটি এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম :

"ব্রজে প্রসিদ্ধং নবনীতচৌরং গোপাঙ্গনানাঞ্চ দুকূলচৌরম্।
শ্রীরাধিকায়া হৃদয়স্য চৌরং, চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি॥
অনেকজন্মার্জ্জিতপাপচৌরং, নবাম্বুদশ্যামলকান্তিচৌরম্।
পদাশ্রিতানাঞ্চ সমস্তচৌরং, চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চুরির অভ্যাসটা এত দুরপনেয় হইয়াছে যে, যুগযুগান্তর পরে এই ঘোর কলিযুগেও তিনি প্রেয়সী শ্রীরাধার ভাবকান্তি চুরি করিয়া প্রচ্ছন্ন অর্থাৎ চোর সাজিয়া আসিয়া জীবের "অনেকজন্মার্জ্জিত পাপ" চুরির জন্য দ্বারে দ্বারে অঝোর-নয়নে কাঁদিয়া বেড়াইয়াছেন।

অতঃপর "তস্মৈ" এই সর্ব্বনাম—তৎশব্দে তাঁহাকে বুঝাইতেছে। যাহা সকলের নাম, তাহাই সর্ব্বনাম। এই সর্ব্বনামগুলি সাক্ষাৎ ভাবে কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তু বুঝাইতে পারে না। অতএব এ তিনি কে? উত্তরে মনে হয় যে, গ্রন্থকারের অভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণই সেই পরব্রহ্ম। তাই তিনি ব্রহ্মনিরূপক উপনিষদের ভাষায় তস্মৈ লিখিয়াছেন। আমরা কঠোপনিষদের ২য় বল্লীর ১৪শ মন্ত্রে দেখিতে পাই ;—

"তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দ্দেশ্যং পরমসুখম্।"

ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগিগণ সেই অনির্দ্দিষ্ট (undefinable) পরমানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মকে "তদেতৎ" "তাহা এই" ইত্যাকার আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ মূকের অনুভূতির ন্যায় ব্রহ্মানুভূতির প্রকার ভাষার অনায়ত্ত। শব্দশাস্ত্রের দিক্ দিয়া এই "তস্মৈ" পদের অষ্টবিধ ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। অলঙ্কারশাস্ত্রে তৎশব্দের প্রক্রান্ত (commenced), প্রসিদ্ধ (well known) ও অনুভূত (বুদ্ধিস্থ Experienced), এই তিনটি অর্থ দেখা যায়। এস্থলে ঐ তিনটি অর্থই সুসঙ্গত। যথা—জগদারম্ভক, সর্ব্বপ্রসিদ্ধ ও সর্ব্ববুদ্ধিস্থ সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ।

"কৃষ্ণায়" পদের অর্থটি ব্রহ্মসংহিতায় সুব্যাখ্যাত ও সুব্যক্ত।

যথা—"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বস্বরূপবিচারদানস্থলে স্বয়ংই ব্যক্ত করিয়াছেন ;—

"কৃষ্ণের স্বরূপবিচার শুন সনাতন।
অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥" মধ্যলীলা।

এটি নিরপেক্ষরবা শ্রুতি শ্রীমদ্ভাগবতের,—"বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।" এই তত্ত্বসিদ্ধান্তবাদের সারগর্ভ অনুবাদ। মূলতঃ "কৃষ্" ধাতুর অর্থ আকর্ষণ, তাই পূজ্য চরিতামৃতকার অন্ত্যলীলায় লিখিয়াছেন,—

"চঞ্চল স্বভাব কৃষ্ণের না রয় এক স্থানে।
দেখা দিয়া মন হরি করে অন্তর্দ্ধানে॥"

যিনি ভক্তির দ্বারা ভক্তগণকে স্বপ্রেমাভিমুখে আকর্ষণ করেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। এই আকর্ষণের মুখ্য উপায় (Instrumental) ভক্তি। আকর্ষীয়েতে (আঁকশী) যেমন সমুচ্চস্থানস্থিত ফলাদি লাভ করা যায়, সুদুর্লভ ভগবানও তদ্রূপ ভক্তি-আকর্ষীর টানে ভজনকর্ত্তার সহজলভ্য হন।

শ্রীলরূপগোস্বামিপাদ "শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে" ভক্তিকে ভগবানের আকর্ষিণীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।—"শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা"। এই আকর্ষণের ভঙ্গীটি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য-লীলায় (২৪শ পরিচ্ছেদ) অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত আছে।

"ভক্তির স্বভাব ব্রহ্ম হইতে করে আকর্ষণ।
দিব্য দেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন॥
* * * *
সর্ব্বাকর্ষক সর্ব্বাহ্লাদক মহা রসায়ন।
আপনার বলে করে সর্ব্ব আকর্ষণ॥"

সনকাদির মন সৌরভে, লীলায় শ্রীশুকদেবের, শ্রীঅঙ্গরূপে শ্রীগোপিকার, রূপ-গুণ-শ্রবণে শ্রীরুক্মিণী দেবীর, গুরুতুল্য স্ত্রীগণের বাৎসল্যভাবে, দাস্যসখ্যাদিভাবে পুরুষগণের ; এমন কি—

"পক্ষী মৃগ বৃক্ষ লতা চেতনাচেতন।
প্রেমে মত্ত করি আকর্ষয়ে কৃষ্ণগুণ॥"

শ্রীকৃষ্ণ পদের মৌলিক অর্থ আকর্ষণটি আচার্য্যপাদ শঙ্করেরও অভিমত। তিনি তাঁহার "প্রবোধ-সুধাকরে" লিখিয়াছেন ;—

"আশ্রিতমাত্রং পুরুষং স্বাভিমুখং কর্ষতি শ্রীশঃ।
লৌহমপি চুম্বকবশাৎ সাম্মুখ্যমাত্রং জড়ং সদ্যঃ॥"

আশ্রিত মানবগণ স্বাভিমুখে আকর্ষণ
নিরন্তর করেন শ্রীকৃষ্ণ।
হইলে সম্মুখাগত, জড়লৌহ আকর্ষিত,
হয় যেন চুম্বক-সদন॥

"সংসারমহীরুহস্য বীজায়" বিশেষণটি টীকার মতে পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যাটি পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মসংহিতার শ্লোকের পদার্দ্ধে "অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্" সুব্যক্ত। বিখ্যাত ন্যায়দর্শন-বৃত্তির মঙ্গলাচরণে দার্শনিক শিরোমণি ভক্তকোকিল এই বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন ;

"বপুর্লীলালক্ষ্মীজিতমদনকোটির্ব্রজবধূ-
জনানামানন্দং কমপি কমনীয়ং বিরচয়ন্।
স কোঽপি প্রেমাণং প্রথয়তু মনোমন্দিরচরং-
স্ত্রিলোকীলোকানাং সজল-জলদ-শ্যামলতনুঃ॥"

কোটি কোটি মন্মথ শরীরলাবণ্যে জিত,
ব্রজবধূস্বপ্নসিন্ধুরজনী-রঞ্জন।
ত্রিভুবন-জনমন, মন্দিরেতে বিচরণ
সজল-জলদ জিনি শ্যামল বরণ॥
অবিরত প্রেমধন করে বহু বরিষণ
করুণা-নিধান কৃষ্ণ কমললোচন॥

এই বিশ্বনাথই স্বকীয় বৃত্তির উপসংহারের মনোজ্ঞ শ্লোকে লিখিয়াছেন ;—

"এষা মুনিপ্রবরগোতমসূত্রবৃত্তিঃ
শ্রীবিশ্বনাথ-কৃতিনা সুগমাল্পবর্ণা।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চরণাম্বুজচঞ্চরীক-
শ্রীমচ্ছিরোমণি বচঃ প্রচয়ৈবকারি ।
মুনীন্দ্র গোতমকৃত ন্যায়সূত্রবৃত্তি ।
সুগম সুলঘু বর্ণে বিশ্বনাথ কৃতী ॥
শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মমধুলুব্ধমধুব্রত ।
শিরোমণি বাক্যযোগে করিল রচিত ॥

ন্যায়দর্শনকার মহর্ষি গোতমের মতে প্রমাণ-প্রমেয়াদি ষোড়শ পদার্থের জ্ঞানে মুক্তি। উঁহার বৃত্তিকার বিশ্বনাথ চান শ্রীকৃষ্ণপদে ভক্তি। এই মুক্তি ও ভক্তি মুমুক্ষু ও ভক্ত সাধকের সাধনা-কল্প-বল্লীর দুইটি পরিপক্ক সুরসাল ফল। "রসো বৈ স ভগবান্"ই উভয়ের লক্ষ্য। তাই মান্য পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন—"রসো ব্রহ্ম রসং লব্ধ্বা আনন্দীভবতি ধ্রুবম্।" কি মুক্তি কি ভক্তি উভয়েরই সার রস বা আনন্দ, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। এখন ন্যায়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রন্থ কুসুমাঞ্জলির মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের রূপটি লক্ষ্য করুন।

ঈষদীসদনপীতবিক্রয়া তাতমাতৃমুদমাবিবর্দ্ধয়ন্ ।
ক্ষেপণায় ভবজন্মকর্ম্মণাং কোঽপি গোপতনয়ো নমস্যতে ॥
অশিক্ষিত উচ্চারিত আধ আধ বাণী ।
শুনি মহা আনন্দিত জনক-জননী ॥
জন্মকর্ম্মক্ষয় হেতু নমি বার বার ।
পরিচয়াতীত সেই গোপের কুমার ॥

ভক্তবর গ্রন্থকারের নিকট কাতর প্রার্থনা, তিনি যেন আমা-দিগকেও গোপ-বালকের প্রণামের রীতিটি শিক্ষাদান করেন।

শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ (অধ্যাপক)।

হুগলী জেলার ইতিহাস

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

হুগলী ও হেষ্টিংস

হেষ্টিংস ১৭৩২ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের কয়েক দিন পরেই তাঁহার জননীর মৃত্যু হয়। তাঁহার পিতা কয়েক দিন পরেই এক কসাই-কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে চলিয়া যান, এবং সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। শিশু হেষ্টিংসের ভার গ্রহণ করিলেন তাঁহার আত্মীয়সম্পর্কীয় এক পিতামহ। বালক হেষ্টিংসকে তিনি এক গ্রাম্য দরিদ্র-পাঠশালায় শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। ৮ বৎসর পরে তাঁহার পিতৃব্য তাঁহাকে লণ্ডনের কোন স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। ১০ বৎসর বয়সে তিনি ওয়েষ্ট মিনিষ্টার স্কুলে পড়িতে যান। ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি স্কুলে পড়েন। এই সময় তাঁহার পিতৃব্যের দেহত্যাগ হয়। তাঁহারও লেখাপড়া শেষ হইল। তিনি সদাগরী আফিসে চাকরীর জন্য হিসাবের খাতাপত্র লিখন-প্রণালী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সদাগরী আফিসে বাৎসরিক ৫ পাউণ্ড (তখনকার ৫০৲ টাকা) মাহিনায় নিযুক্ত হইয়া ১৮ বৎসর বয়সে ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া ভারতে আসেন।

তিনি দুই বৎসর কলিকাতায় সেক্রেটারী আফিসে কার্য্য করিয়া পরে কাশীমবাজারে একটি সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কাপ্তেন ক্যাম্বেলের বিধবা পত্নীকে বিবাহ করেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে কাশীমবাজারে তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হয়।

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে অর্থাৎ পলাশীযুদ্ধের পর হেষ্টিংস মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন। এই সময় হইতেই তাঁহার হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমারের সহিত মনোমালিন্য আরম্ভ হয়। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি মুর্শিদাবাদে থাকিয়া ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। যাহা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, ইংলণ্ডে গিয়া অপরিমিত ব্যয় করিয়া সে সমস্তই ফুরাইয়া যায়। পুনরায় ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে চাকরী গ্রহণ করিয়া ভারতে আসেন।

তিনি যে জাহাজে আসিতেছিলেন, সেই জাহাজে ইম্পহফস (Imhoffs) নামে এক জার্ম্মাণ চিত্রকর ও তাঁহার পত্নী ছিলেন। জাহাজে হেষ্টিংস সাহেবের কঠিন পীড়া হয়। চিত্রকর-পত্নী তাঁহার সেবা করেন। ছেঁড়াকাঁথা সম্বল ইম্পহফস নিজেকে 'ব্যারণ' বলিয়া পরিচয় দিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেন। তাঁহার পত্নী বিশিষ্টা সুন্দরী ছিলেন। ঐ সেবার পুরস্কারস্বরূপ হেষ্টিংস তাঁহাকে অর্দ্ধাঙ্গিনী করিতে ইচ্ছা করিলেন। সুন্দরীও রাজী হইলেন। শেষে হেষ্টিংস সাহেব 'ব্যারণ(!!)কে' মুখ ফুটিয়া বলিলেন, 'তোমার পত্নীকে আমায় দাও—তোমার ভাল করিয়া দিব।' বেচারা করে কি? বুদ্ধিমানের মত 'অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' নীতির অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালায় আসিলেন। হেষ্টিংসও ঐ সুন্দরী লইয়া মান্দ্রাজে রহিলেন। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ব্যরণ(!!) বিবাহ-বিচ্ছেদের দরখাস্ত করিলেন—মঞ্জুরও হইয়া গেল। হেষ্টিংস হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। ঐ ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ৮ই আগষ্ট হেষ্টিংস কলিকাতায় আসিলে উভয়ের বিবাহ হইল। পাত্রীর বয়স তখন ৩০ বৎসর মাত্র। পাত্রীর নাম Elegant Marion—এখন হইলেন Mrs Hastings. তাঁহার 'বেলভেডিয়ার' প্রাসাদ ভাল লাগিত না, সেজন্য গঙ্গায় নৌকা করিয়া স্বামীর সহিত বেড়াইতেন। হেষ্টিংস সাহেবের এক অন্তরঙ্গ বন্ধু মটস (Mottes) সাহেব সস্ত্রীক হুগলীতে বাস করিতেন। সেইখানেই "হুগলী হাউসে" হেষ্টিংস-দম্পতি আসিয়া থাকিতেন। শেষে রিসড়ায় জমি ক্রয় করিয়া বাড়ী করিলেন। এই রিসড়াই তাঁহার সিমলা-শৈল ছিল। ঐ মটস সাহেব হেষ্টিংসের জন্য কলিকাতায় পুলিসের চাকরী পাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান "Mott's Lane" ঐ মটস সাহেবের স্মরণার্থে কলিকাতায় বর্ত্তমান আছে।

ফ্র্যানসিস্ ও হেষ্টিংস

ম্যাডাম লি গ্রাণ্ড ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের ২১শে নভেম্বর টানকুভারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফরাসী মহিলা—তাঁহার ফরাসী নাম Monsier Werlee. তাঁহার পিতা শৈশবে চন্দননগরে আসেন। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ১০ই জুলাই জর্জ্জ গ্রাণ্ডের সহিত ঐ মহিলার বিবাহ হয়। সার ফিলিপ ফ্রানসিসের বাড়ীতে বলনাচের মজলিসে ম্যাডাম লি গ্রাণ্ড ফিলিপ ফ্রানসিসের সহিত নাচিয়াছিলেন। ফিলিপ ফ্রানসিস সুপুরুষ ছিলেন এবং গ্রাণ্ড-মহিলাও তখনকার দিনে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। উভয়ের মন পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইল। এক দিন গ্রাণ্ড সাহেব এক নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। এই সুযোগে ফ্রানসিস দুই জন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া দড়ির মই দিয়া প্রণয়িনীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এক

দ্বারবান্ উহা দেখিয়া সর্দ্দার দ্বারবানকে জানাইল। ফ্রান্সিস ধরা পড়িলেন, কিন্তু পরে বন্ধুদ্বয়ের সাহায্যে পলাইলেন। এক জন বন্ধু ধরা পড়িলেন। এ দিকে গ্রাণ্ড সাহেবকেও খবর দেওয়া হইল। গ্রাণ্ড সাহেব, হেষ্টিংসের প্রাইভেট সেক্রেটারী পামার সাহেবকে (Prince of merchants) সঙ্গে লইয়া আসিলেন। পরদিন গ্রাণ্ড সাহেব ১৫ হাজার টাকা মাত্র খরচার নালিশ করিলেন। তখন বড় জজ সার ইলাইজা ইম্পে; চেম্বার ও হাইড সাহেব সহকারী জজ ছিলেন। এই মোকদ্দমায় মায় খরচ ৩৪৭।০ টাকার ডিক্রী হইল। গ্রাণ্ড সাহেব মিথ্যা সাক্ষ্য দেন নাই বলিয়া কিছু পুরস্কার পাইয়াছিলেন। শেষ স্থির হইল, গ্রাণ্ড সাহেব বিলাত চলিয়া যাইবেন। মিসেস্ গ্রাণ্ড ও ফ্রান্সিস একত্র থাকিবেন। ফ্র্যান্সিস সাহেবের এক জ্ঞাতি ভ্রাতা মেজর ফিলিপ বাগসের হুগলীর বাড়ীতে নব-প্রণয়িনী লইয়া ফ্রান্সিস রহিলেন। পরে বাগস সাহেব বিলাত যাইবার সময় বাড়ী বিক্রয় করিলেন। অগত্যা ফ্রান্সিস প্রণয়িনীকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। এই কলিকাতায় আসাই তাঁহার কালস্বরূপ হইল। মিসেস গ্রাণ্ড হেষ্টিংস সাহেবের নজরে পড়িলেন। তিলোত্তমাকে লইয়া যেমন সুন্দ ও উপসুন্দের লড়াই বাধিয়াছিল, এখানেও তাহাই হইল।* ফ্র্যান্সিস আহত হইলেন এবং মনের দুঃখে বিলাত গেলেন। এত কাণ্ড হইয়া গেল, কিন্তু তখনও গ্রাণ্ড সাহেবের সহিত বিবাহ-বিচ্ছেদের চুক্তিপত্র হয় নাই। মিসেস গ্রাণ্ড দুইটি পতঙ্গকে রূপ-বহ্নিতে অর্দ্ধদগ্ধ করিয়া ইংলণ্ড হইয়া ফ্রান্সে গমন করিলেন। ফ্রান্সে তখন বিদ্রোহাগ্নি জ্বলিতেছিল। সুতরাং মিসেস গ্রাণ্ডকে বন্দী করা হইল। কারণ, তিনি ইংলণ্ড হইয়া ফ্রান্সে গিয়াছিলেন। নেপোলিয়নের এক জন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী টাালেরাণ্ড (Talleyrand) ঐ রূপমোহে ভুলিলেন এবং মিসেস গ্রাণ্ডকে মুক্তি দিলেন এবং শেষ তাঁহারই অর্দ্ধাঙ্গিনী হইলেন এবং গ্রাণ্ড সাহেবের সহিত বিবাহ-চুক্তি ভগ্ন করিলেন। এই ঘটনা ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে ঐ রূপবতী মহিলা যমের হাত এড়াইতে না পারিয়া তাঁহারই অধীনে গেলেন।†

হুগলী ও ভিখারী দাস

হুগলী-বালি প্রায় ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে জঙ্গলময় ছিল। ভিখারী দাস নামে এক জন বৈষ্ণব সিদ্ধপুরুষ ঐ জঙ্গল কাটিয়া আশ্রম স্থাপন করেন। খামারপাড়ায় তাঁহার 'আখড়া' ছিল। এই সময়ে ত্রিবেণীতে এক জন ক্ষমতাবান্ মুসলমান ফকির বাস করিতেন। তাঁহার নাম ছিল দোরাফ গাজী ‡। তিনি হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। তিনি এক দিন ভিখারী দাসকে অপদস্থ করিবার জন্য এবং নিজ ক্ষমতা দেখাইবার জন্য এক বাঘে চড়িয়া ভিখারী দাসের আশ্রমে আসিলেন। ভিখারী দাস তখন ঘরের বাহিরে রকে বসিয়া হাত-মুখ ধুইতেছিলেন। গাজীর বাঘে চড়িয়া আসিবার সংবাদ পাইয়া তিনি যে রকে বসিয়াছিলেন, সেই রকের উপর দুই চাবিবার করাঘাত করিয়া রককে চলিতে বলিলেন এবং তিনি ঐ রকেই বসিয়া রহিলেন। রোয়াক সমেত ভিখারী দাস গাজীর সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। দুই জনেই নিজ নিজ বাহন হইতে নামিয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন। ভিখারী দাসের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া গাজী বলিলেন, "আমি একটা জীবকে বশীভূত করিয়া আজ্ঞাধীন করিয়াছি মাত্র, আপনি জড় পদার্থকে বশীভূত করিয়া আজ্ঞাধীন করিয়াছেন।" গাজী নিজ আস্তানা ত্যাগ করিয়া ভিখারী দাসের কাছে আসিয়া রহিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত হিন্দু দেবদেবীর স্তোত্র ছিল; কিন্তু তাহা এখন পাওয়া যায় না। তবে গঙ্গাস্তবের কিছু উদ্ধৃত করিলাম।

প্রথমাংশ—যৎ তত্তোয়ং জননীগণৈর্গতমপি ন স্পৃষ্টং স্তনস্বাঙ্কৈ-
যস্মিন্ পান্থদৃগন্তসন্নিপতিতে তৈঃ স্বর্গতে শীতলঃ।
স্বাঙ্কে ন্যস্য তদীদৃশং বপুরহো সন্নীয়তে পৌরুষঃ
ত্বং তাবৎ করুণাপরায়ণপরা মাতাসি ভাগীরথী।

শেষাংশ—সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং
স তরতি নিজপুণ্যৈস্তত্র কিন্তে মহত্ত্বম্।
যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং
তদপি চ তন্মহত্ত্বং তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বম্।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (জোড়ীগড়)।

---

* It was probably either this appointment or that of supervisors, when Hastings was rejected—according to Scrafton, because he had two many croocked lines in his head—which gave occasion to Clive's remark that he had never hard of Hastings having any abilities exeept for seducing his friends wives.

Beveridge's Nundo Kumar Page 106

† Hoogly past & present হইতে সারাংশ গৃহীত।

‡ এই নাম সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

সমালোচনা

শ্রুতিসংগ্রহ

শ্রীমৎস্বামিকমলেশ্বরানন্দ সংকলিত। মূল্য ।৵০, প্রকাশক ব্রহ্মচারী প্রীতিচৈতন্য ৮৬।এ হরিশ চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, ভবানীপুর, কলিকাতা।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, আমাদের অরণ্যবাসী অসভ্য পূর্ব্বপুরুষগণ যখন একটু সভ্য হইতেছিলেন, তখন সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, আকাশ প্রভৃতির দিকে অবাক্ হইয়া তাকাইয়া থাকিতেন, উহাদিগকে জীবন্ত দেবতা বলিয়া কল্পনা করিতেন এবং সেই সব কাল্পনিক দেবতার উদ্দেশ্যে স্তবস্তুতি রচনা করিতেন; এই ভাবেই না কি বেদের উৎপত্তি হইয়াছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আরও বলিয়া থাকেন যে, বেদের যে অংশ প্রথমে রচিত হইয়াছিল, (অর্থাৎ বেদের মন্ত্রভাগে) সর্ব্বশক্তিমান এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের কথা নাই। কারণ, যাঁহারা বেদের প্রথম অংশ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সবেমাত্র সভ্য হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, পরমেশ্বরের ধারণা করিবার মত মনের উচ্চ অবস্থা তাঁহাদের হয় নাই; বেদের শেষ অংশ অর্থাৎ উপনিষদ্ যখন রচিত হইয়াছিল, তখন বৈদিক ঋষিগণ পরমেশ্বর সম্বন্ধে ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমাদের দেশের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি এই সকল পাশ্চাত্য মত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল মত যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, বেদের

মূল মন্ত্রগুলি পড়িলেই তাহা সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। কারণ, বেদের মন্ত্রভাগের বহু স্থানে পরমেশ্বরের কথা রহিয়াছে। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিলে যে ইন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাকে অবিশ্বাস করিতে হইবে, ইহার কোনও কারণ নাই। দেশে এক জন রাজা থাকিলেও তাঁহার অধীনে অনেক রাজপুরুষ থাকিতে পারেন। সেইরূপ জগতে এক জন ঈশ্বর থাকিলেও তাঁহার অধীনে অনেক দেবতা থাকিতে পারেন। এই সহজ সত্যটি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ধরিতে পারেন নাই, এজন্য তাঁহারা নানা অলীক কল্পনা করিয়াছেন।

যাঁহাদের মূল বেদ পড়িবার সুযোগ নাই, তাঁহারা আলোচ্য "শ্রুতিসংগ্রহ" গ্রন্থখানি পাঠ করিলে বেদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেকটা সঠিক ধারণা করিতে পারিবেন। ঋগ্বেদের কতকগুলি উৎকৃষ্ট মন্ত্র এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। শব্দগুলির অর্থ দেওয়া হইয়াছে এবং মন্ত্রগুলির বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক মন্ত্রের সায়ণভাষ্য এবং ভাষ্যের বাঙ্গালা অনুবাদও দেওয়া হইয়াছে। ঋগ্বেদের প্রাচীন ঋষিগণেরও যে এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান ছিল, এই মন্ত্রগুলি পড়িলে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

শ্রুতিসংগ্রহে শতপথ ব্রাহ্মণের যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যহ বেদপাঠ ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য, নিত্য বেদপাঠ করিলে ব্রাহ্মণের অশেষ কল্যাণ হয়, না করিলে অনিষ্ট হয়। নাসদীয়সূক্তে প্রলয়ের সময় জগৎ কি ভাবে থাকে, তাহার পর ঈশ্বর কি ভাবে জগৎ সৃষ্টি করেন, তাহা সুন্দরভাবে বলা হইয়াছে। হিরণ্যগর্ভসূক্তে হিরণ্যগর্ভের জগৎকর্ত্তৃত্ব বর্ণিত হইয়াছে। পুরুষসূক্তে ঈশ্বরের সহিত জগতের সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের উৎপত্তির কথাও এই সূক্তে উল্লিখিত হইয়াছে। যাঁহারা বলেন, বেদে জাতিভেদের কথা নাই, তাঁহাদের উক্তি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, তাহাও এই সূক্ত পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়।

গ্রন্থের প্রারম্ভে স্বামী কমলেশ্বরানন্দ-লিখিত একটি উৎকৃষ্ট ভূমিকা আছে।

আমরা এই গ্রন্থের বহুলপ্রচার কামনা করি।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (এম-এ)।

এক এবং দুই

সর্ব্বতত্ত্বের সার তত্ত্ব একের স্বরূপ এবং তাহার সহিত দুইএর সম্বন্ধ-নির্ণয়। প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মবিৎ পিথাগোরাস একের মহিমায় বিভোর হইয়াছিলেন; একের স্বরূপ বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে, একের স্বরূপ একই এবং দুই তিন প্রভৃতি সংখ্যা এক প্রসূত হইলেও মূল এক হইতে ভিন্ন। একের অনন্ত বিভূতি অসংখ্য সংখ্যার দ্বারা সূচিত হইলেও, এক দুইএ নাই। এইরূপে তিনি উৎপাদক একএর সহিত উৎপন্ন এক, দুই, তিন প্রভৃতির পার্থক্য দেখাইয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অসংখ্য ভেদের ভিতর দিয়াও যে প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে পিথাগোরীয় মতের পোষণ করিতেছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। সমগ্র হিন্দু দর্শনের মূল প্রতিপাদ্যও তাহাই। সাংখ্যের প্রকৃতি এবং বেদান্তের মায়া একেরই পরিচয় দেয়। যুগান্তব্যাপিনী চিন্তার ফলে লোক যাহা জানিতে পারিয়াছে, তাহা এই যে, একমাত্র সার পদার্থ এক, এ বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান্, কি জৈন, কি বৌদ্ধ, সকলেই প্রত্যক্ষতঃ বা পরোক্ষতঃ একেরই উপাসনা করে। ভেদ কেবল দুই সম্বন্ধে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সর্ব্বদেশের সর্ব্বলোকেই একেকে ভাবিতে গিয়া দুইএর চিন্তা করে। একেকে ভাবিতে গেলে দুইএর চিন্তা আসে কেন? আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে পিথাগোরাস যাহা ভাবিয়াছিলেন, আজও আমরা তাহাই ভাবিতেছি। এ পর্য্যন্ত কেহই একেকে ভাবিতে গিয়া দুইএর হাত এড়াইতে পারেন নাই, এবং দুইএর চিন্তাতেই যত গোল বাধিয়াছে। এইখানেই যত দলাদলি, যত সাম্প্রদায়িক ভাব। কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য, কি প্রাচীন, কি আধুনিক, সকল প্রকার মতেই এক এবং দুইএর বিরোধ দেখিতে পাই, আর এই বিরোধ ভঞ্জনের কতই না চেষ্টা এবং তাহার ফলে কত মতবাদেরই না সৃষ্টি হইয়াছে। অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ; monism, deism, trithism, polytheism, pentheism, materialism, phenomenalism, spiritualism কত যে 'ism'এর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা অনেকেই জানেন। সকল 'বাদ' বা 'ism'এর উদ্দেশ্য একের সহিত দুইএর সম্বন্ধ-নির্ণয়। এক আছে—তৎ সৎ, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত; কিন্তু সোঽহম্, এই-খানেই বিরোধ।

এক কি? না, যাহা দুই নয়। একমেবাদ্বিতীয়ম্,—এই অদ্বিতীয় বস্তুকে চিনিতে হইলে দুইকেও চিনিতে হইবে। অদ্বি-তীয়কে বুঝাইবার জন্য এমন অনেক বিশেষণ প্রয়োগ করিতে হয়, যাহা দুই-এ প্রযুক্ত হয় না, যথা—অব্যক্ত, অব্যয়, অক্ষর, অনন্ত, নির্ব্বিকল্প, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন,—আরও কত কি? ভেদের ভিতর দিয়া অভেদচিন্তনই সর্ব্ব-শাস্ত্রের গোড়ার কথা। এই চিন্তনে কত সাধকের কতই না অশ্রু ঝরিয়াছে। এক যদি দুই না হয়, তবে দুইকে দেখিতে গিয়া একেকেই দেখি কেন? ইহাও যদিই বা মানিয়া লওয়া গেল, কিন্তু আসল বিবাদ বাধিল, এক কেন দুই হইল? এই প্রশ্ন লইয়া। অনেক গোঁড়া নাস্তিকও ঈশ্বর মানি না বলিয়া শেষে এমন কিছু মানিয়াছেন, যাহাতে সেই একেরই প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। চার্ব্বাক্ ঋষির 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' মত বলুন, ডিমক্রিটাসের পরমাণুতত্ত্ব অথবা কোম্তের Positivism মতই বলুন, সকল মতেই বহুর ভিতর দিয়া একের প্রতিষ্ঠাই হইয়াছে, কিন্তু এক যে কেন দুই বা বহু হইল, কোন মতেই তাহার সদুত্তর পাই না। এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া কেহ বা প্রাকৃতিক নিয়ম, কেহ কর্ম্ম, কেহ ধর্ম্ম, কেহ প্রেম, কেহ বা মায়ার অবতারণা করিয়াছেন। ঈশ্বর মানি না, কিন্তু মানি এমন একটা কিছু—যাহা কাহারই লঙ্ঘন করিবার অধিকার নাই। তাহাই যদি হয়, তবে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বই বা মানি না কেন? বিরুদ্ধবাদী বলিবেন, মানি না এই জন্য যে, মানিলে অনেক তর্ক আসে, যেমন ঈশ্বরের নিরপেক্ষতা, ক্রিয়াহীনতা ইত্যাদি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, বিশেষতঃ খৃষ্টান ভাবুক-গণ ঈশ্বরকে জগতের অতীত ভাবিতে গিয়া কতই না তর্কের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের মধ্যে কে যে কাহার নিকট প্রথম এই ভাবটি গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা বলা কঠিন, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, পিথাগোরাসের মূল এক এবং উৎপন্ন একের ধারণা

আরিষ্টটলের মতের ভিতর দিয়া যেমন সমগ্র পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়াছিল, প্রাচ্যেরও বহু মতের ভিতর ঐ একই ধারণা একই ভাবে প্রকটিত রহিয়াছে। নির্গুণ ও নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মের কল্পনা করিয়া ব্রহ্মবাদীরা সেই একই সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রহ্মের নির্গুণত্ব বা নির্ব্বিকল্পত্ব কল্পনা করিয়া পুনরায় মায়া বা ভ্রমের অবলম্বন দ্বারা জগতের মীমাংসা করায় লাভ কি? ব্রহ্ম বলিতে যে পদার্থের জ্ঞান হয়, তাহা যদি নির্গুণ, নির্ব্বিকল্প বা নির্ব্বিকার হইবে, তবে গুণ, বিকল্প বা বিকার আসে কোথা হইতে? বৈষ্ণব-ভক্তগণ এই বিরোধ মিটাইয়াছেন হ্লাদিনী শক্তির কল্পনা করিয়া। হ্লাদা বা রাধাই ক্রিয়া প্রবৃত্তি, প্রাচীন পণ্ডিতেরা যাহাকে Plastic principle বলিতেন। কিন্তু কথা এই যে, মায়া, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি বা Plastic principle যাহাই হউক, সকল মতেই আসল যায়গায় ফাঁকি। এই ফাঁকি ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে। যত কিছু যুক্তি এবং তর্ক এইখানেই অচল হইয়া যায়, আর তখনই ইহাকে এক নিগূঢ় রহস্য বলিয়া হাল ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কলা-কৌশল ও নিয়মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবুকমাত্রেই বলিতে বাধ্য হন, ভগবানের অনন্ত লীলা বোঝা ভার; তখনই বিরাট পুরুষের কল্পনা আসে। নানা জনে নানা দিক্ দিয়া এই লীলা বুঝিতে চেষ্টা পাইয়াছেন এবং পরিশেষে অনন্তের অন্ত না পাইয়া প্রেম-ভক্তিতে গদ্‌গদচিত্ত হইয়া শ্রদ্ধার অঞ্জলি দান করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, রে অবোধ, তোর সাধ্য কি যে তুই অনন্তকে ধরিবি? কেহ বা দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন, ধরিতেই যদি না পারিলাম, তবে মানব কেন হইলাম? উভয় ক্ষেত্রে ফল একই হইয়াছে। আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে এই যে ক্ষুদ্র দীপ প্রদীপ্ত রহিয়াছে, ইহা কি অনন্ত আলোকেরই এক শিখা নয়? অসীমকে কি সীমার বন্ধনে বাঁধা যায়? যায় না সত্য, কিন্তু না বাঁধিয়াও ত মানুষ থাকিতে পারে না। মানুষ যে জীবের চরম পরিণতি! আমরা যদি আধুনিক পাশ্চাত্য জাতিকে নীরেট জড়বাদী বলিয়া নাসিকা-কুঞ্চন করি, তাহা হইলেও তাঁহাদিগকে অযথা দোষ দেওয়া হয়। প্রাচ্যের তপস্যালব্ধ জ্ঞান-ভাণ্ডারকে আজ তাঁহারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে মুক্তি দান করিতেছেন। বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য মানুষকে অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন করা, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তুর সন্ধান করা, অর্থাৎ বহুর ভিতর দিয়া পুনরায় একেরই প্রতিষ্ঠা করা।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, এক ও দুই বলিয়া কিছুই নাই, কেবল একই বিদ্যমান। স্থূলজগৎ এবং সূক্ষ্মজগৎ উভয়ই এক এবং তাহা প্রমাণ করিবার জন্য ভ্রম, মায়া, দ্বিতীয় সত্তা বা তদ্রূপ অপর কিছুর প্রয়োজন নাই। সৃষ্টিশব্দেরও সার্থকতা নাই, দেশ কাল প্রভৃতির সংস্কারও ভুল, কারণ, ইহাতেও অবাধ চিন্তার বাধা হয়, বিরাটকে খর্ব্ব করা হয়। একের যদি কোন রূপ কল্পনা আবশ্যক হয়, তবে তাহাকে একমাত্র অনন্ত চিন্ময়ী সত্তা ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। তাহাকে ব্রহ্ম বলিতে হয় বল, কিন্তু নির্গুণ বা নির্ব্বিকল্প বলিও না। চিন্ময়ী সত্তার চিচ্ছক্তি অনন্তব্যাপিনী, অনন্তমুখিনী, তাহাতে স্থূল-সূক্ষ্ম-ভেদ নাই। যাহা কিছু স্থূল বা সূক্ষ্ম, তাহা একেরই প্রকাশ। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বালুকণা হইতে বিরাট বিশ্ব, স্থাবর-জঙ্গম কীট-পতঙ্গ, দেহ মন আত্মা সকলই চিতেরই বিকাশ ব্যতীত আর কিছু নয়। নামের প্রয়োজন জ্ঞানলাভের নিমিত্ত, জ্ঞানলাভ হইলে আর নামের প্রয়োজন হয় না; তখন আমি, তুমি ও সে থাকে না, তখন এক ব্যতীত দুই থাকে না; 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এক উপলব্ধি হয়।

শ্রীদিগ্বিজয় রায়চৌধুরী।

স্মৃতি

স্মৃতি কতটুকু! সন্ধ্যার মেঘে
রক্তিম আভা প্রায়
দিগন্তলোক গাঢ় আভাসিয়া
পলকে মিলায়ে যায়।
এ যেন প্রিয়ার চুম্বনটুক
ক্ষণিকের তরে বুকে রাখা বুক;
তার পরে যেন চির-বিচ্ছেদ
চিরযুগ ধরি হায়।
তার পরে কাঁদা দীর্ঘ জীবনে
ক্লান্ত গহন ছায়।

এতটুকু স্মৃতি,—বাঁশরীর ধ্বনি
ছিল গোপী-হৃদয়ের;
বেজেছিল কবে কালিন্দীর কূলে—
আজি সারা ভুবনের।
মোর সাধ নাই, আশা গেছে তল,
জীবন ব্যাপিয়া নিরাশা কেবল;
শুধু দু'টি গান বাজিয়া উঠিল
যৌবন-বীণা-তারে।
বাজিবে কি জানি কাহার বীণাতে
অসীম অন্ধকারে!

শ্রীকরুণাময় বসু



বৃহত্তর ভারতের আমোদ-প্রমোদ

অত্যন্ত আধুনিক সময়ে সুদূর প্রাচ্যে অবস্থিত বিস্মৃত-প্রায় বৃহত্তর ভারতের প্রতি এ দেশের প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত-গণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা কিন্তু গবেষণার আলোক কাম্বোডিয়া, যবদ্বীপ ও বালি প্রভৃতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানে সু-প্রাচীন হিন্দু-স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শনস্বরূপ বৌদ্ধমঠ সকলের ভগ্নাবশেষের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ভগ্নস্তূপের অভ্যন্তরে যে সত্য লোকনয়নের অন্তরালে নিহিত রহিয়াছে, তাহা আবিষ্কার করিতে হইলে বৃহত্তর ভারতের অন্তর্গত দ্বীপবিশেষে বা স্থানবিশেষে প্রত্নতাত্ত্বিককে বহু বৎসর অবস্থান করা দরকার। এই প্রকার দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণার জন্য কোনও বাঙ্গালী প্রত্নতাত্ত্বিক যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, এমন কথা আজ পর্য্যন্ত কেহ শুনে নাই। বিদেশ-ভ্রমণব্যপদেশে যতটুকু তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া সুদূর প্রাচ্যে অতীত হিন্দু-সভ্যতার ইতিহাস প্রণয়ন করাও যুক্তিযুক্ত নয়। বৃহত্তর ভারতের বর্ত্তমান জীবন্ত আলোচনা করিলে কিন্তু অনেক মূল্যবান্ ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করা যাইবে, তাহা অনুসন্ধিৎসু প্রত্নতাত্ত্বিকের কাযে লাগিতে পারে। এ স্থলে বলা দরকার যে, বালি-দ্বীপেই জীবন্ত হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় অনুভূত হয়। কাম্বোডিয়া ও যবদ্বীপে মুসলমানের সংখ্যা অত্যধিক, কিন্তু ডাচ্ অধিকৃত হিন্দুপ্রধান বালিদ্বীপের ন্যায়



যবদ্বীপ ও বালি দ্বীপের গামেলান বা ঐক্যতান বাদন

ফ্রেঞ্চ অধিকৃত কাম্বোডিয়া ও ডাচ্ অধিকৃত যবদ্বীপের মুসলমানগণের আমোদ-প্রমোদেও আমরা হিন্দু-আদর্শের সুস্পষ্ট প্রভাব উপলব্ধি করি।

বৃহত্তর ভারতের অন্তর্গত দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে ডাচ্ ভারতের (Nitherland india) অধিকারে বালিদ্বীপের হিন্দুদের দৈনন্দিন জীবনে আমোদ-প্রমোদের প্রভাব যে খুব বেশী, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। নৃত্য, গীত, বাদ্য ও নাট্যাভিনয় বালিদ্বীপের বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের সর্ব্বপ্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়। এখানকার নৃত্যশীলা হিন্দুমহিলাগণ উৎকৃষ্ট বেশ-ভূষায় ভূষিতা হইয়া সর্ব্বপ্রথমে দেব-মন্দিরে গামেলান্ (Gamolan) বা বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের ঐক্যতান-বাদনে ধাতুময় একটি যন্ত্র—যাহা হইতে জল-তরঙ্গের ন্যায় কাঠির সাহায্যে স্বর বাহির করিতে হয়—তাহার তুলনা বাদ্যযন্ত্রের জগতে বিরল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। গামেলানে সাতটির পরিবর্ত্তে পাঁচটি স্বর শুনা যায়। চারু-কলার সমঝদার পাশ্চাত্যের সমালোচকগণ আলোচ্য নৃত্য, গীত ও বাদ্যের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, এই প্রকার আমোদ-প্রমোদে আর্টের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শান্তভাব-বর্দ্ধিত এই আমোদ-প্রমোদের সূচনায় দেবতার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিবার প্রথা হইতে বুঝা যায় যে,



বালি-দ্বীপের স্ত্রীপুরুষের ভাবের অভিব্যক্তি

গমন করেন। সেখানে পুরোহিত তাঁহাদিগকে প্রসাদ বিতরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের ললাটে চন্দনবৎ দ্রব্য-বিশেষের তিলক দিবার পরে উক্ত মহিলাগণ সুবৃহৎ বট-বৃক্ষের ছায়ায় আসরের মধ্যে গমন করেন। এই প্রসর আচ্ছাদনহীন আসরে বাদ্যযন্ত্র সহকারে নৃত্য ও গীত আরম্ভ হয়। এমন মনোমুগ্ধকর নৃত্য, গীত ও বাদ্যে মুখরিত আসরের ব্যবস্থা প্রায়ই হইয়া থাকে। জন্মোৎসব, বিবাহোৎসব ও ধান্যোৎসব ব্যতীত অন্যান্য লৌকিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের সময়েও বালিদ্বীপের হিন্দু অধিবাসিগণ জাঁকজমকের সহিত উক্ত প্রকার জলসার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। বালিদ্বীপের হিন্দুদের মধ্যে আলোচ্য ধর্ম্মানুমোদিত সামাজিক ব্যাপারের উৎপত্তিস্থান দক্ষিণ-ভারত। ইতিহাসলেখক-গণের মতে দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুরা দক্ষিণ-ভারত হইতে গমন করিয়া কাম্বোডিয়া, যবদ্বীপ ও বালিদ্বীপে হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত করিয়াছিলেন। দক্ষিণ-ভারতের দেব-মন্দিরে এখন পর্য্যন্ত নৃত্যশীলা দেবদাসীগণের অস্তিত্ব লোপ পায় নাই। সুদূর প্রাচ্যেও যে দক্ষিণ-ভারতের দেবদাসী-গণের মধ্যে প্রচলিত প্রাচীনকালের হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত আমোদ-প্রমোদের প্রতিধ্বনি শুনা যায় না, তাহা কে বলিতে পারে? দেশকালপাত্রভেদে যাহা এক সময়ে দক্ষিণ-ভারতে

হিন্দু-ধর্ম্মের অঙ্গ ছিল ও এখনও আছে, তাহাই পরিবর্ত্তিত আকারে বালিদ্বীপের সামাজিক ব্যাপারে পরিণত হইয়া নূতন ধরণের লৌকিক ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছে, এই অনুমান অসঙ্গত নয়। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষে শৈবধর্ম্মের প্রাধান্য দক্ষিণ-ভারতেই অনুভূত হয়। কাম্বোডিয়া, যবদ্বীপ ও বালিদ্বীপেও আমরা অসংখ্য শিব-মন্দির দেখিতে পাই। সুদূর প্রাচ্যে হিন্দু-রাজত্বের সহিত হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুপ্রথা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু শতাব্দী পরে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে প্রত্ন-তাত্ত্বিকগণ বৌদ্ধযুগের মঠ-সমূহের স্থাপত্য-শিল্পের দিকে দৃষ্টি প্রত্নতাত্ত্বিক চেষ্টা করিলে ভারতবর্ষ ও বৃহত্তর ভারতের মধ্যে যোগসূত্রের খেই সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে।

নাট্যকলার দিক হইতে বৃহত্তর ভারতের আমোদ-প্রমোদে যে আশ্চর্য্য বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়, তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। বালিদ্বীপের হিন্দুগণ নাট্যাভিনয়ের অত্যন্ত পক্ষপাতী। তাহাদের নাট্যাভিনয় কতকটা বঙ্গদেশের যাত্রাভিনয়ের অনুরূপ। ছায়াময় সুবৃহৎ বট-বৃক্ষের পাদ-দেশে খোলা যায়গায় এই নাট্যাভিনয়ের আসর প্রস্তুত হইয়া থাকে। রামায়ণ ও মহাভারতে বিবৃত ঘটনাবলী হইতে এই শ্রেণীর নাট্যাভিনয়ের বিষয় নির্ব্বাচিত হইয়া



বালি-দ্বীপবাসীর নৃত্য

আবদ্ধ করিয়া রাখিবার ফলে বালিদ্বীপে প্রাচীনতর হিন্দুধর্ম্মের চাক্ষুষ প্রমাণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছেন। বৃহত্তর ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম লোপ পাইলেও বালিদ্বীপের জীবন্ত হিন্দুসমাজে প্রাচীনতম হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। বৌদ্ধমঠ ভগ্ন-স্তূপে পরিণত হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু হিন্দুর দেব-মন্দির সর্ব্বত্র নির্ম্মিত হইয়া স্থানীয় হিন্দুদের ধর্ম্মকে সজাগ রাখিয়াছে। বৃহত্তর ভারতের সর্ব্বত্র আমোদ-প্রমোদের ভিতর দিয়া হিন্দুধর্ম্মের এমন একটি সুর স্পষ্ট শুনা যায়—যাহা হইতে উদ্যমশীল কোনও থাকে। নায়ক-নায়িকা ও পাত্র-পাত্রীর মূল আদর্শ বাল্মীকি ও বেদব্যাসের নাট্যশালা হইতে গৃহীত। রামায়ণ ও মহাভারতের এমন কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা নাই—যাহা বৃহত্তর ভারতের অধিবাসিগণ নাট্যাভিনয়ের মারফত বুঝিবার সুবিধা পায় না। জনসাধারণের শিক্ষাকার্য্যে আলোচ্য নাট্যাভিনয় যে সহায়তা করিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। আধুনিক সময়ে পাশ্চাত্যের আদর্শে কখন কখন আমরা রঙ্গমঞ্চেও উপরি-উক্ত নাট্যাভিনয় দেখিতে পাই। বেশ-ভূষার হিসাবে আলোচ্য নাট্যাভিনয়ে

দুই শ্রেণীর অভিনেতা ও অভিনেত্রী আবির্ভূত হইয়া থাকে। প্রথম শ্রেণীর অভিনয়ে নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ আত্মগোপন না করিয়া স্ব স্ব মূর্ত্তিতে আচ্ছাদনহীন আসরে বা রঙ্গমঞ্চে দেখা দেয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিনয়ে কিন্তু তাহারা মুখোস লাগাইয়া আত্মগোপন করে। মুখোস দেখিয়া দর্শকগণ বুঝিতে পারে, কে কোন্ ভূমিকা অভিনয় করিতেছে। দেব-দেবী, স্ত্রী ও পুরুষ, রাজা ও রাণী, রাক্ষস ও নট-নটী- ঘটনাবলীর অভিনয়ে হিন্দুর ন্যায় মুসলমানগণও যোগদান করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বৃহত্তর ভারতের সকল রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাবলীর নির্ব্বাক্ অভিনয়েরও বিশেষ ব্যবস্থা আছে। দুই প্রকার নির্ব্বাক্ নাট্যাভিনয় এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। এই দুই প্রকার অভিনয়ে জীবন্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রীর পরিবর্ত্তে চর্ম্মনির্ম্মিত ও চিত্রিত পুতুলের সাহায্যে অভিনয়কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে।



ওয়াজাং

গণের মুখোস এমন হাস্যরসের অবতারণা করে—যাহা যথার্থই উপভোগ্য।

জীবন্ত নর-নারী দ্বারা অভিনীত উপরি উক্ত দুই শ্রেণীর নাট্যাভিনয়ে রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যানবিশেষের জীবন্ত চিত্রাবলী হইতে বেশ বুঝা যায় যে, বালিদ্বীপে সুপ্রাচীন হিন্দু আদর্শকে সেখানকার হিন্দু অধিবাসীরা আজ পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। শুধু হিন্দুপ্রধান বালিদ্বীপ কেন, বৃহত্তর ভারতের অন্তর্গত বৌদ্ধপ্রধান কাম্বোডিয়া এবং মুসলমানপ্রধান যবদ্বীপেও রামায়ণ ও মহাভারতে বিবৃত এমন চমৎকার পৌরাণিক ঘটনাময় দৃশ্য ভারতবর্ষে আমরা দেখিতে পাই না। রামায়ণ ও মহাভারতে উক্ত চন্দ্রবংশ ও সূর্য্যবংশের নরপতিগণ ও তাঁহাদের স্বজন-গণ যখন নাচের পুতুলরূপে অভিনয় করিতে থাকে, তখন তাহাদের বিচিত্র ও বিসদৃশ আকার দেখিয়া দর্শকগণ হাস্যরসের সহিত বিমল আনন্দ উপভোগ করে। এই প্রকার পুতুলের নাচেও আমরা বৈচিত্র্য দেখিতে পাই। এক শ্রেণীর পুতুল-নাচে আমরা পুতুলগুলিকে চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাই। অপর এক শ্রেণীর নাচের পুতুলগুলিকে আমরা দেখিতে পাই না





অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মাস্ক বা মুখোস

বটে, কিন্তু তাহাদের ছায়া একখণ্ড শুভ্র ও সূক্ষ্ম পর্দার উপর পশ্চাৎ হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া সমগ্র দৃশ্যাবলীর গতিশীল ছায়া পর্দার সম্মুখস্থ দর্শকগণের দৃষ্টিতে সুন্দরভাবে প্রতিভাত হয়। এই ছায়া-নাট্য অভিনয় জগতে এক অপূর্ব্ব জিনিষ। পুতুল-নাচ বা পুতুলের ছায়ার চিত্রে যখন পৌরাণিক ঘটনাবলী প্রকাশ পাইতে থাকে, তখন এক ব্যক্তি উক্ত ঘটনাবলীর মর্ম্ম বুঝাইয়া দিতে থাকে। তাহার নাম দালাং বা কথক। এই দালাং সহর বা গ্রামের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাঠক ও পৌরাণিক সাহিত্যে রীতিমত অভিজ্ঞ।

বৃহত্তর ভারতের, বিশেষতঃ হিন্দুপ্রধান বালিদ্বীপের আমোদ-প্রমোদের তালিকায় মোরগের লড়াই বিস্ময়কর ব্যাপার মনে হইতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। মুসলমানপ্রধান যবদ্বীপের ন্যায় বালিদ্বীপেও লড়ায়ের নিমিত্ত মোরগ সকল প্রায় প্রত্যেক হিন্দুর গৃহে রক্ষিত হয়। বালিদ্বীপের হিন্দুদের মধ্যে যেমন মোরগ পালন করা দূষণীয় নয়, যবদ্বীপের মুসলমান-সমাজেও সেইরূপ রামায়ণ ও মহাভারতের গল্পাংশের অভিনয় মুসলমান অভিনেতার পক্ষে দূষণীয় নয়। বৃহত্তর ভারতে বিশিষ্ট মুসলমানগণ পৌরাণিক হিন্দুর বেশে অভিনেতৃরূপে নাট্যাভিনয়ের আসরে বিনা বাধায় দেখা দিয়া থাকে। বৃহত্তর ভারতের আমোদ-প্রমোদে সেই জন্য ধর্ম্মবিদ্বেষের ছায়াপাত আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। যবদ্বীপের অন্তর্গত যোক্‌জা বা যোক্‌জাকর্তার সুলতান উপরি-উক্ত ওয়াজাং (wajang) বা পুতুল-নাচের এক জন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। যোক্‌জাকর্তা ও সুরকর্তার সুলতানগণের প্রাসাদে (kraton) রাজবাড়ীর মহিলাগণ, বিশেষতঃ দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশবর্ষ-বয়স্কা রাজকুমারীরা পর্ব্বাদি উপলক্ষে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সমক্ষে নৃত্য করিয়া থাকেন। রাজপরিবারের যুবকগণও নৃত্য ও নাট্যাভিনয়ে সুদক্ষ। ভারতবর্ষে যেমন গ্রীকদিগের আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত কোনও বৈদেশিক সভ্যতা হিন্দু সভ্যতাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া ফেলিতে পারে নাই, বৃহত্তর ভারতেও সেইরূপ মুসলমান ও খৃষ্টান সভ্যতা সেখানকার হিন্দু সভ্যতাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিতে যে পারে নাই, তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ আলোচ্য আমোদ-প্রমোদের



নারদ ও দেবী শিবপ্রভাব পুতুল-নাচ



জরাসন্ধের পুতুল-নাচ

জীবন্ত ইতিহাস হইতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যের প্রত্নতাত্ত্বিক-গণের মতে বৃহত্তর ভারতের আমোদ-প্রমোদের ব্যাপার সকল মুসলমান-রাজত্বের বহু পূর্ব্বকালে হিন্দুরাজাদের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। তাহা হইলেও, মালয়দ্বীপ-পুঞ্জের অন্তর্গত যে সকল দ্বীপ দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুরা জয় করিয়াছিলেন, সেই সকল দ্বীপের আদিম অধিবাসী মালয়জাতির সহিত বিজেতাদের যে কতকটা সংমিশ্রণ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় বর্ত্তমান সময়ের সেখানকার হিন্দুদের আকৃতি হইতে। যবদ্বীপ ও বালিদ্বীপের হিন্দুদের সহিত ভারতবাসী হিন্দুদের আকৃতিগত পার্থক্য লক্ষিত হইলেও বৃহত্তর ভারতের হিন্দু উপনিবেশিক-গণ যে প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম ও সভ্যতাকে আজ পর্য্যন্ত আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে ও অহিন্দু বিজেতার উপর হিন্দু সভ্যতার প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়—বৃহত্তর ভারতের আলোচ্য আমোদ-প্রমোদের জীবন্ত ইতিহাসে। আদর্শবহুল রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় অমিতশক্তিশালী সাহিত্যের ভাব-ধারা বিজয়ী অহিন্দুর হৃদয়ে আমোদ-প্রমোদের ভিতর দিয়া জাঁকিয়া বসিয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণের নিকট সেই জন্য আমাদের বিনীত অনুরোধ, যেন তাঁহারা বৃহত্তর ভারতের জীবন্ত হিন্দু সমাজের ইতিহাসকে উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র অতীতের ভস্মরাশি বিশ্লেষণে তাঁহাদের সমুদয় শক্তি নিয়োগ না করেন। বর্ত্তমানের দর্পণেই অতীতের প্রতিবিম্ব রেখায় রেখায় সমুজ্জ্বল।

বর্ত্তমান সময়ে ডাচ্ ও অন্যান্য য়ুরোপীয় বণিকগণ বৃহত্তর ভারতের বড় বড় সহরে ব্যবসার খাতিরে বারো মাস অবস্থান করিয়া থাকে। তাহারা নিজেদের জন্য নৌকা-বিহার, সন্তরণ, পোলো ও পাশ্চাত্যের অন্যান্য নানা প্রকার ক্রীড়া-কৌতুকের ব্যবস্থা করিয়াছে। তাহা হইলেও বিদেশীরা স্থানীয় অধিবাসীদের আমোদ-প্রমোদকে আদৌ উপেক্ষা করে না। সান্ধ্যভোজের পরে বিদেশীরা বালিদ্বীপের হিন্দু নর্ত্তক-নর্ত্তকীর নৃত্য দেখিবার ও গামেলানের ঐক্যতান-বাদন শুনিবার রীতিমত ব্যবস্থা করিয়া থাকে। বালি-দ্বীপের রাজধানী শিঙ্গারাজা ও প্রধান সহর দেন-পসারের অনতিদূরে কেদাতন নামে গণ্ডগ্রামে বহু পেশাদার নর্ত্তক-নর্ত্তকীর দল আছে। বালি-প্রবাসী বিদেশীরা কেদাতন

হইতে প্রায়ই একটি নাচের দলকে নিজেদের হোটেল বা বাসস্থানের প্রাঙ্গণে আমোদ-প্রমোদের খাতিরে আনয়ন করিয়া থাকে।

বালিদ্বীপের রমণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে গ্রামে



যবদ্বীপের অভিনেতা

গ্রামে, সহরে সহরে, ধূপ-ধুনার গন্ধে আমোদিত দেব-মন্দিরের সম্মুখে উন্মুক্ত স্থানে, রাস্তার ধারে নানাবিধ সুন্দর গাছে ঘেরা খোলা যায়গায়, ছায়াশীতল বট-বৃক্ষের পাদদেশে প্রায় প্রতিদিনই একটা-না-একটা উৎসব উপলক্ষে নৃত্য, গীত, বাদ্য ও নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিদেশীরা বালিদ্বীপের নাম দিয়াছে—"ভ্রমণকারীর স্বর্গরাজ্য।" আমোদ-প্রমোদে রত বালিদ্বীপের ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের হিন্দু নরনারীর সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ ও মুখশ্রী, মাংসপেশীযুক্ত সুগঠন দেহের অনাবৃত উপরার্দ্ধ, সোণালী রঙ্গে চিত্রিত পোষাক-পরিচ্ছদ যিনি দেখিয়াছেন, তাঁহার অন্তর-বাহির এক অপূর্ব্ব আনন্দে ভরিয়া গিয়াছে। বৃহত্তর ভারতের আমোদ-প্রমোদে কুরুচির লেশমাত্র কোথাও নাই। দুর্নীতির পরিচায়ক কোনও দৃশ্য সেখানকার নাট্যাভিনয়ে স্থান পায় না। আর্টের নামে অবৈধ প্রণয়কে দর্শকগণের সমক্ষে জাহির করিতে বালিদ্বীপবাসীরা শিখে নাই। বৃহত্তর ভারতের আমোদ-প্রমোদের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিলে জানা যায় যে, পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে ভারতবাসী যতটা আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছে, সুদূর প্রাচ্যে হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ সেরূপ হয় নাই। বালিদ্বীপের হিন্দু মহিলারা নৃত্য, গীত, বাদ্য ও নাট্যাদি কলাবিদ্যার রীতিমত অনুশীলন করিলেও তাহারা দেবার্চ্চনা ও গৃহকার্য্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করে না। সমাজতত্ত্বের দিক হইতেও সেই জন্য বৃহত্তর ভারতের জীবন্ত ইতিহাস সম্বন্ধে গভীরভাবে আলোচনা করা দরকার।*

স্বামী সদানন্দ।

* বাঙ্গালী পরিব্রাজক স্বামী সদানন্দ সম্প্রতি বৃহত্তর ভারতের (Greater India) অন্তর্গত প্রাচীনকালের হিন্দু নরপতিগণের অধিকৃত কাম্বোজ (Cambodia), যবদ্বীপ (Java), বালিদ্বীপ ও অন্যান্য বহুস্থান পরিদর্শন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

কামনা

হৃদয় চাহিছে, তোমার হৃদয়ে
মিশায়ে থাকিতে চাই
নয়ন কহিছে নিয়ত যেন গো
তোমার দরশ পাই !

কচি বাহুর দুটি আকুল আবেগে
বাহুর বাঁধন মাগে,
কটিদেশ যদি করের পরশ
গভীর পুলকে জাগে।

চরণ ধরিলে—সরাবে চরণ ?
রাজিবে মরণ মম—
কণ্ঠ আমার মুখরিত হবে
স্তব গানে অনুপম !

শ্রীমতী অমিয়া সেন।



অগ্নিবাণ

খবরের কাগজখানা হতাশ হস্ত-সঞ্চালনে আমার কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"নাঃ—কোথাও কিছু নেই, একেবারে ফাঁকা। এর চেয়ে কাগজওয়ালারা সাদা কাগজ বের করলেই পারে। তাতে ছাপার খরচটা অন্ততঃ বেঁচে যায়।"

আমি খোঁচা দিয়া বলিলাম—"বিজ্ঞাপনেও কিছু পেলে না? বল কি! তোমার মতে ত দুনিয়ার যত কিছু খবর সব ঐ বিজ্ঞাপন-স্তম্ভের মধ্যেই ঠাসা আছে।"

বিমর্ষ-মুখে চুরুট ধরাইয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"না, বিজ্ঞাপনেও কিছু নেই। একটা লোক বিধবা-বিয়ে করতে চায় ব'লে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। কুমারী ছেড়ে বিধবা বিয়ে করবার জন্যেই গোঁ ধরেছে কেন, ঠিক বোঝা গেল না। নিশ্চয় কোনও বদ্ মৎলব আছে।"

"তা ত বটেই। আর কিছু?"

"আর, একটা বীমা কোম্পানী মহা ঘটা ক'রে বিজ্ঞাপন দিয়েছে যে, তারা স্বামি-স্ত্রীর জীবন একসঙ্গে বীমা করবে, এবং জোড়ার মধ্যে একটাকে কোনও রকমে পটল তোলাতে পারলেই অন্য জন টাকা পাবে। এই সব বীমা কোম্পানী এমন ক'রে তুলেছে যে, মরেও সুখ নেই।"

"কেন, এর মধ্যেও বদ্ মৎলব আছে না কি?"

"বীমা কোম্পানীর নিজের স্বার্থ না থাকতে পারে, কিন্তু অন্যের মনে দুর্ব্বুদ্ধি জাগিয়ে তোলাও সৎকার্য্য নয়।"

"অর্থাৎ? মানে হ'ল কি?"

ব্যোমকেশ উত্তর দিল না, হৃদয়ভারাক্রান্ত একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া টেবলের উপর পা তুলিয়া দিল, তার পর কড়িকাঠের দিকে অনুযোগপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া নীরবে ধূম উদ্গিরণ করিতে লাগিল।

শীতকাল; বড়দিনের ছুটি চলিতেছিল। কলিকাতার লোক বাহিরে গিয়া ও বাহিরের লোক কলিকাতায় আসিয়া মহা সমারোহে ছুটি উদ্‌যাপন করিতেছিল। কয়েক বছর আগেকার কথা, তখনও ব্যোমকেশের বিবাহ হয় নাই।

আমরা দুই জনে চিরন্তন অভ্যাসমত সকালে উঠিয়া একত্র চা-পান ও সংবাদপত্রের ব্যবচ্ছেদ করিতেছিলাম। গত তিন মাস একেবারে বেকারভাবে বসিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশের ধৈর্য্যের লৌহশৃঙ্খলও বোধ করি ছিঁড়িবার উপক্রম করিয়াছিল। দিনের পর দিন সংবাদপত্রের নিষ্প্রাণ ও বৈচিত্র্যহীন পৃষ্ঠা হইতে অপদার্থ খবর সংগ্রহ করিয়া সময় আর কাটিতে চাহিতেছিল না। আমার নিজের মনের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা হইতেই বুঝিতেছিলাম, ব্যোমকেশের মস্তিষ্কের ক্ষুধা ইন্ধন অভাবে কিরূপ উগ্র ও দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তবু সমবেদনা প্রকাশ করিয়া তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করি নাই; বরঞ্চ এই অনীপ্সিত নৈষ্কর্ম্যের জন্য যেন সে-ই মূলতঃ দায়ী, এমনিভাবে তাহাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়াছি।

আজ প্রভাতে তাহার এই হতাশপূর্ণ ভাব দেখিয়া আমার একটু অনুশোচনা হইল। মস্তিষ্কের খোরাক সহসা বন্ধ হইয়া গেলে সুস্থ বলবান্ মস্তিষ্কের কিরূপ দুর্দ্দশা হয়, তাহা ত জানিই, উপরন্তু আবার বন্ধুর খোঁচা খাইতে হইলে ব্যাপারটা নিতান্তই নিষ্করুণ হইয়া পড়ে।

আমি আর তাহাকে প্রশ্ন না করিয়া অনুতপ্ত চিত্তে খবরের কাগজখানা খুলিলাম।

এই সময়ে চারিদিকে সভাসমিতি ও অধিবেশনের ধূম পড়িয়া যায়, এবারেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। সংবাদ-ব্যবসায়ীরা সরসতর সংবাদের অভাবে এই সব সভার মামুলি বিবরণ ছাপিয়া পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়াছে। তাহার ফাঁকে ফাঁকে সিনেমা ও থিয়েটার-সার্কাসের বিজ্ঞাপন সচিত্র ও

বিচিত্ররূপে আমোদ-লোলুপ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছে।

দেখিলাম, কলিকাতাতেই গোটা পাঁচেক বড় বড় সভা চলিতেছে। তা ছাড়া দিল্লীতে নিখিল ভারতীয় বিজ্ঞান-সভার অধিবেশন বসিয়াছে। ভারতের নানা দিগ্‌দেশ হইতে অনেক হোমরা-চোমরা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত একযোট হইয়াছেন এবং বাক্যধূমে বোধ করি দিল্লীর আকাশ বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। সংবাদপত্রের মারফৎ যতটুকু ধূম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহারই ঠেলায় মস্তিষ্ক-কোটরে ঝুল পড়িবার উপক্রম হইয়াছে।

আমি সময় সময় ভাবি, আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকরা কায না করিয়া এত বাগ্‌বিস্তার করেন কেন? দেখিতে পাই, যিনি যত বড় বৈজ্ঞানিক, তিনি তার চতুর্গুণ বাগ্মী। বেশী কিছু নয়, যদি ইঁহারা ষ্টীম এঞ্জিন বা এরোপ্লেনের মত একটা যন্ত্রও আবিষ্কার করিতে পারিতেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের বাচালতা ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিতাম। কিন্তু ও সব দূরে থাক, মশা মারিবার একটা বিষও তাঁহারা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। বুজরুকি আর কাহাকে বলে!

নিরুৎসুকভাবে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের বিবরণ পড়িতে পড়িতে একটা নাম দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ইনি কলিকাতার এক জন খ্যাতনামা প্রফেসার ও বিজ্ঞান-গবেষক—নাম দেবকুমার সরকার। বিজ্ঞান-সভায় ইনি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়াছেন। অবশ্য ইনি ছাড়া অন্য কোনও বাঙ্গালী যে বক্তৃতা দেন নাই, এমন নয়, অনেকেই দিয়াছেন; কিন্তু বিশেষ করিয়া দেবকুমার বাবুর নামটা চোখে পড়িবার কারণ, কলিকাতায় তিনি আমাদের প্রতিবেশী, আমাদের বাসার কয়েকখানা বাড়ীর পরে একটা গলির মুখে তাঁহার বাসা। তাঁহার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ আলাপ ছিল না, কিন্তু তাঁহার পুত্র হাবুলের সম্পর্কে আমরা তাঁহার সহিত নেপথ্য হইতেই ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিলাম।

দেবকুমার বাবুর ছেলে হাবুল কিছুদিন হইতে ব্যোমকেশের ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ছোকরার বয়স আঠারো উনিশ, কলেজের দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িত। ভালমানুষ ছেলে, আমাদের সম্মুখে বেশী কথা বলিতে পারিত না, তদ্গতভাবে ব্যোমকেশের মুখের পানে চাহিয়া থাকিত। ব্যোমকেশ মৃদু হাসিয়া এই অস্ফুটবাক্ ভক্তের পূজা গ্রহণ করিত; কখনও চা খাইবার নিমন্ত্রণ করিত। হাবুল একবারে কৃতার্থ হইয়া যাইত।

এই হাবুলের পিতা কিরূপ বক্তৃতা দিয়াছেন, জানিবার জন্য একটু কৌতূহল হইল। পড়িয়া দেখিলাম, দেশী বৈজ্ঞানিকদের অভাব-অসুবিধার সম্বন্ধে ভদ্রলোক যাহা বলিয়াছেন, তাহা নেহাৎ মিথ্যা নয়। ব্যোমকেশকে পড়িয়া শুনাইলে তাহার মনটা বিষয়ান্তরে সঞ্চারিত হইয়া হয় ত একটু প্রফুল্ল হইতে পারে, তাই বলিলাম,—"ওহে, হাবুলের বাবা দেবকুমার বাবু বক্তৃতা দিয়েছেন শোনো।"

ব্যোমকেশ কড়িকাঠ হইতে চক্ষু নামাইল না, বিশেষ ঔৎসুক্যও প্রকাশ করিল না। আমি পড়িতে আরম্ভ করিলাম—

"এ কথা সত্য যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত কোনও জাতি বড় হইতে পারে নাই। অনেকের ধারণা এইরূপ যে, ভারতবাসী বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পরাঙ্মুখ এবং তাহাদের উদ্ভাবনী শক্তি নাই,—এই জন্যই ভারত পরনির্ভর ও পরাধীন হইয়া আছে। এই ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, ভারতের গরিমাময় অতীত তাহার প্রমাণ। নব্য বিজ্ঞানের যাহা বীজমন্ত্র, তাহা যে ভারতেই প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল ও পরে কাশপুষ্পের বীজের ন্যায় বায়ুতাড়িত হইয়া দূর-দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা এই সুধীসমাজে উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র। গণিত, জ্যামিতি, নিদান, স্থাপত্য—এই চতুস্তম্ভের উপর আধুনিক বিজ্ঞান ও তৎপ্রসূত সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত, অথচ ঐ চারিটি বিজ্ঞানেরই জন্মভূমি ভারতবর্ষ।

"কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বর্ত্তমানে আমাদের এই অসামান্য উদ্ভাবনী প্রতিভা নিস্তেজ ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণ কি? আমরা কি মানসিক বলে পূর্ব্বাপেক্ষা হীন হইয়া পড়িয়াছি? না—তাহা নহে। আমাদের প্রতিভা অ-ফলপ্রসূ হইবার অন্য কারণ আছে।

"পুরাকালে আচার্য্য ও ঋষিগণ—যাঁহাদের বর্ত্তমানকালে আমরা Savant বলিয়া থাকি—রাজ-অনুগ্রহের আওতায় বসিয়া সাধনা করিতেন। অর্থচিন্তা তাঁহাদের ছিল না, অর্থের প্রয়োজন হইলে রাজা সে অর্থ যোগাইতেন; সাধনার সাফল্যের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন হইত,

রাজকোষের অসীম ঐশ্বর্য্য তৎক্ষণাৎ তাহা যোগাইয়া দিত। আচার্য্যগণ অভাবমুক্ত হইয়া কুণ্ঠাহীন-চিত্তে সাধনা করিতেন এবং অন্তিমে সিদ্ধি লাভ করিতেন।

"কিন্তু বর্ত্তমান ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের অবস্থা কিরূপ? রাজা বৈজ্ঞানিক-গবেষণার পরিপোষক নহেন—ধনী ব্যক্তিরাও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমিত আয়োজনের উপর নির্ভর করিয়া উঞ্ছবৃত্তির সাহায্যে আমাদের সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়; ফলে আমাদের সিদ্ধিও তদুপযুক্ত হইয়া থাকে। মূষিক যেমন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও হস্তীকে পৃষ্ঠে বহন করিতে পারে না, আমরাও তেমনই বড় বড় আবিক্রিয়ায় সফল হইতে পারি না; ক্ষুধাক্ষীণ মস্তিষ্ক বৃহতের ধারণা করিতে পারে না।

তবু আমি গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারি, যদি আমরা অর্থের অভাবে পীড়িত না হইয়া অকুণ্ঠ-চিত্তে সাধনা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা জগতের কোনও জাতির নিকটেই ন্যূন হইয়া থাকিতাম না। কিন্তু হায়! অর্থ নাই—কমলার কৃপার অভাবে আমাদের বাণীর সাধনা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। তবু, এই দৈন্য-নির্জ্জিত অবস্থাতেও আমরা যাহা করিয়াছি, তাহা নিন্দার বিষয় নহে—শ্লাঘার বিষয়। আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ল্যাবরেটারিতে যে সকল আবিক্রিয়া মাঝে মাঝে অতর্কিতে আবির্ভূত হইয়া আবিষ্কর্ত্তাকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে, কে তাহার সংবাদ রাখে? আবিষ্কারক নিজের গোপন আবিষ্কার সযত্নে বুকে লুকাইয়া নীরবে আরও অধিক জ্ঞানের সন্ধানে ঘুরিতেছে; কিন্তু সে একাকী, তাহাকে সাহায্য করিবার কেহ নাই; বরঞ্চ সর্ব্বদাই ভয়, অন্য কেহ তাহার আবিষ্কার-কণিকার সন্ধান পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহা আত্মসাৎ করিবে। লোলুপ পরস্বগৃধ্নু চোরের দল চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

"তাই বলিতেছি—অর্থ চাই, সহানুভূতি চাই, গবেষণা করিবার অবাধ অফুরন্ত উপকরণ চাই, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে নিষ্কণ্টক যশোলাভের নিশ্চিত সম্ভাবনা চাই। অর্থ চাই—"

"থামো।"

প্রফেসার মহাশয়ের ভাষাটি বেশ গাল-ভরা, তাই শব্দ-প্রবাহে গা ভাসাইয়া পড়িয়া চলিয়াছিলাম। হঠাৎ ব্যোমকেশ বলিয়া উঠিল—"থামো।"

"কি হ'ল?"

"চাই—চাই—চাই। আর আস্ফালন ভাল লাগে না। বিয়ের সঙ্গে খোঁজ নেই, কুলোপানা চক্কর—"

আমি বলিলাম,—"ঐ ত মজা। মানুষ নিজের অক্ষমতার একটা-না-একটা সাফাই সর্ব্বদাই তৈরী ক'রে রাখে। আমাদের দেশের আচার্য্যরাও যে তার ব্যতিক্রম নয়, দেবকুমার বাবুর লেক্‌চার পড়লেই তা বোঝা যায়।"

ব্যোমকেশের মুখের বিরক্তি ও অবসাদ ভেদ করিয়া একটা ব্যঙ্গ-বঙ্কিম হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল,—"হাবুল ছোকরা দেখতে হাবাগোবা ভালমানুষ হলেও ভেতরে ভেতরে বেশ বুদ্ধিমান। তার বাবা হয়ে দেবকুমার বাবু এমন ইয়ের মত আদি-অন্তহীন বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান কেন, এই আশ্চর্য্য।"

আমি বলিলাম,—"বুদ্ধিমান ছেলের বাবা হলেই বুদ্ধিমান হ'তে হবে, এমন কোনও কথা নেই। দেবকুমার বাবুকে তুমি দেখেছ?"

"ঠিক বলতে পারি না। তাঁকে দেখবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা কখনও প্রাণে জাগেনি। তবে শুনেছি, তিনি দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করেছেন। নির্ব্বুদ্ধিতার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি থাকতে পারে?" বলিয়া ব্যোমকেশ ক্লান্তভাবে চক্ষু মুদিল।

ঘড়ীতে সাড়ে আটটা বাজিল। বসিয়া বসিয়া আর কি করিব ভাবিয়া না পাইয়া শেষে পুঁটিরামকে আর এক দফা চা ফরমাস দিব মনে করিতেছি, এমন সময় ব্যোমকেশ হঠাৎ সোজা উঠিয়া বসিয়া বলিল, "সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।" কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া থাকিয়া আবার ঠেসান দিয়া বসিয়া বিরক্ত স্বরে বলিল,—"হাবুল। তার আবার কি হ'ল? বড্ড তাড়াতাড়ি আসছে।"

মুহূর্ত্ত পরেই হাবুল সজোরে দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। তাহার চুল উস্কোখুস্কো, চোখ দুটা যেন ভয়ে ও অভাবনীয় আকস্মিক দুর্ঘটনার আঘাতে ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। এম্‌নিতেই তাহার চেহারাখানা খুব সুদর্শন নয়, একটু মোটাসোটা ধরণের গড়ন, মুখ গোলাকার, চিবুক ও গণ্ডে নবজাত দাড়ির অন্ধকার ছায়া—তাহার উপর এই পাগলের মত আবির্ভাব; আমি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, "কি হে, হাবুল! কি হয়েছে?"

হাবুলের পাগলের মত দৃষ্টি কিন্তু ব্যোমকেশের উপর নিবদ্ধ ছিল; আমার প্রশ্ন বোধ করি সে শুনিতেই পাইল না, টলিতে টলিতে ব্যোমকেশের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—"ব্যোমকেশদা, সর্ব্বনাশ হয়েছে। আমার বোন রেখা হঠাৎ ম'রে গেছে।" বলিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

২

ব্যোমকেশ হাবুলকে হাত ধরিয়া একটা চেয়ারে বসাইয়া দিল। কিছুক্ষণ তাহাকে শান্ত করা গেল না, সে অসহায়ভাবে কাঁদিতেই লাগিল। বেচারার বয়স বেশী নয়, বালক বলিলেই হয়; তাহার উপর অকস্মাৎ এই দারুণ ঘটনায় একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল।

হাবুলের যে বোন আছে, এ খবর আমরা জানিতাম না; তাহার পারিবারিক খুঁটিনাটি জানিবার কৌতূহল কোনও দিন হয় নাই। শুধু এইটুকু শুনিয়াছিলাম যে, হাবুলের মাতার মৃত্যুর পর দেবকুমার বাবু আবার বিবাহ করিয়াছিলেন। বিমাতাটি সপত্নীপুত্রকে খুব স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন না, ইহাও আঁচে-আন্দাজে বুঝিয়াছিলাম।

মিনিট পাঁচেক পরে অপেক্ষাকৃত সুস্থির হইয়া হাবুল ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল। দেবকুমার বাবু কয়েক দিন হইল দিল্লী গিয়াছেন; বাড়ীতে হাবুল, তাহার অনূঢ়া ছোট বোন রেখা ও তাহাদের সৎ-মা আছেন। আজ সকালে উঠিয়া হাবুল যথারীতি নিজের তে-তলার নিভৃত ঘরে পড়িতে বসিয়াছিল; আটটা বাজিয়া যাইবার পর নীচে হঠাৎ সৎ-মা'র কণ্ঠে ভীষণ চীৎকার শুনিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিল; দেখিল, সৎ-মা রান্নাঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উর্দ্ধস্বরে প্রলাপ বকিতেছেন। তাঁহার প্রলাপের কোনও অর্থ বুঝিতে না পারিয়া হাবুল রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার বোন রেখা উনানের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আছে। কি হইয়াছে, জানিবার জন্য হাবুল তাহাকে প্রশ্ন করিল, কিন্তু রেখা উত্তর দিল না। তখন তাহার গায়ে হাত দিয়া নাড়া দিতেই হাবুল বুঝিল, রেখা বাঁচিয়া নাই, তাহার গা বরফের মত ঠাণ্ডা, হাত-পা ক্রমশঃ শক্ত হইয়া আসিতেছে।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া হাবুল আবার কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল,—"আমি এখন কি করব, ব্যোমকেশদা? বাবা বাড়ী নেই, তাই আপনার কাছে ছুটে এলুম। রেখা ম'রে গিয়েছে—উঃ! কি ক'রে এমন হ'ল, ব্যোমকেশদা?"

হাবুলের এই শোক-বিহ্বল ব্যাকুলতা দেখিয়া আমার চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল। ব্যোমকেশ হাবুলের পিঠে হাত দিয়া বলিল,"হাবুল, তুমি পুরুষমানুষ,বিপদে অধীর হয়ো না। কি হয়েছিল রেখার, বল দেখি—বুকের ব্যামো ছিল কি?"

"তা ত জানি না।"

"কত বয়স?"

"ষোলো বছর, আমার চেয়ে দু'বছরের ছোট।"

"সম্প্রতি কোনও অসুখ-বিসুখ হয়েছিল? বেরিবেরি বা ঐ রকম কিছু?"

"না।"

ব্যোমকেশ ক্ষণকাল চিন্তা করিল, তার পর বলিল,—"চল তোমার বাড়ীতে। নিজের চোখে না দেখলে কিছুই ধারণা করা যাচ্ছে না। তোমার বাবাকে 'তার' করা দরকার, তিনি এসে পড়ুন। কিন্তু সে দু'ঘণ্টা পরে করলেও চলবে। আপাততঃ এক জন ডাক্তার চাই। তোমার বাড়ীর কাছেই ডাক্তার রুদ্র থাকেন না? বেশ—এস অজিত।"

কয়েক মিনিট পরে দেবকুমার বাবুর বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। বাড়ীখানার সম্মুখভাগ সঙ্কীর্ণ, যেন দুই দিকের বাড়ীর চাপে চ্যাপ্টা হইয়া উর্দ্ধদিকে উঠিয়া গিয়াছে। নীচের তলায় কেবল একটি বসিবার ঘর, তা ছাড়া ভিতরদিকে কলঘর, রান্নাঘর ইত্যাদি আছে। আমরা দ্বারে উপস্থিত হইয়া দাঁড়াইতেই অন্দর হইতে একটা তীক্ষ্ণ স্ত্রীকণ্ঠের ছেদ-বিরামহীন আওয়াজ কাণে আসিল। কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ও আশঙ্কার চিহ্ন পূর্ণমাত্রায় থাকিলেও শোকের লক্ষণ বিশেষ পাওয়া গেল না। বুঝিলাম, বিমাতা বিলাপ করিতেছেন।

একটা বৃদ্ধ গোছের ভৃত্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। ব্যোমকেশ তাহাকে বলিল,—"তুমি এ বাড়ীর চাকর? যাও, ঐ বাড়ী থেকে ডাক্তার বাবুকে ডেকে নিয়ে এস।"

চাকরটা কিছু একটা করিবার সুযোগ পাইয়া 'যে আজ্ঞে' বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। তখন হাবুলকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

যাহার কণ্ঠস্বর বাহির হইতে শুনিতে পাইয়াছিলাম, তিনি উপরে উঠিবার সিঁড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া একাকী অনর্গল বকিয়া চলিয়াছিলেন, আমাদের পদশব্দে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল; তিনি উচ্চকিতভাবে আমাদের পানে চাহিলেন। দুই জন অপরিচিত লোককে হাবুলের সঙ্গে দেখিয়া তিনি মাথার উপর আঁচলটা টানিয়া দিয়া ক্ষিপ্র-পদে উপরে উঠিয়া গেলেন। আমি মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মুখখানা দেখিতে পাইয়াছিলাম। আমার মনে হইল, তাঁহার আরক্ত চোখের ভিতর একটা ত্রাস-মিশ্রিত বিরক্তির ছায়া দেখা দিয়াই অঞ্চলের আড়ালে ঢাকা পড়িয়া গেল।

হাবুল অস্ফুটস্বরে বলিল,—"আমার মা—"

ব্যোমকেশ বলিল,—"বুঝেছি। রান্নাঘর কোন্‌টা?"

হাবুল অঙ্গুলীনির্দ্দেশে দেখাইয়া দিল। অল্পপরিসর চতুষ্কোণ উঠান ঘিরিয়া ছোট ছোট কয়েকটি কক্ষ; তাহার মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত বড়, সেইটি রান্নাঘর। পাশে একটি জলের কল, তাহা হইতে ক্ষীণ ধারায় জল পড়িয়া দ্বারের সম্মুখভাগ পিচ্ছিল করিয়া রাখিয়াছে।

জুতা খুলিয়া আমরা রান্নাঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরটা প্রায় অন্ধকার, আলোক-প্রবেশের কোনও পথ নাই। হাবুল দরজার পাশে হাত বাড়াইয়া সুইচ টিপিতেই একটা ধোঁয়াটে বৈদ্যুতিক বাল্‌ব জ্বলিয়া উঠিল। তখন ঘরের অভ্যন্তরভাগ ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম।

দ্বারের অপর দিকে দেয়ালে সংলগ্ন পাশাপাশি দু'টি কয়লার উনান, তাহাতে ভাঙ্গা পাথুরে কয়লা স্তূপীকৃত রহিয়াছে; কিন্তু আগুন নাই। এই অগ্নিহীন চুল্লীর সম্মুখে নতজানু হইয়া একটি মেয়ে বসিয়া আছে—যেন বেদীপ্রান্তে উপাসনারত একটি স্ত্রীমূর্ত্তি। মেয়েটির দেহ সম্মুখদিকে ঝাঁকিয়া আছে, মাথাও বুকের উপর নামিয়া পড়িয়াছে; হাতদুটি পাশে লম্বিত—দেখিয়া মনে হয় না যে, সে মৃত। ব্যোমকেশ সন্তর্পণে গিয়া তাহার নাড়ী টিপিল।

তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিলাম, নাড়ী নাই। ব্যোমকেশ হাত ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে মেয়েটির চিবুক ধরিয়া মুখ তুলিল। প্রাণহীন দেহে মৃত্যুকাঠিন্য দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে—মুখ অল্প একটু উঠিল।

মেয়েটি বেশ সুশ্রী, হাবুলের মত নয়। রং ফর্সা, মুখের গড়ন ধারালো, নীচের ঠোঁট অভিমানিনীর মত স্বভাবতঃই ঈষৎ স্ফুরিত। ষোলো বছর বয়সের অনুযায়ী দেহ-সৌষ্ঠবও বেশ পূর্ণতা-লাভ করিয়াছে। মাথার দীর্ঘ চুলগুলি বোধ হয় স্নানের পূর্ব্বে বিনুনি খুলিয়া পিঠে ছড়াইয়া দিয়াছিল, সেই ভাবেই ছড়ানো আছে। পরিধানে একটি অর্দ্ধ-মলিন গঙ্গা-যমুনা ডুরে; অলঙ্কারের মধ্যে হাতে তিনগাছি করিয়া সোণার চুড়ি, কাণে মীনা করা হাল্কা ঝুম্‌কা, গলায় একটি সরু হার।

ব্যোমকেশ নিকট হইতে তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; তার পর দূর হইতে তাহার বসিবার ভঙ্গী ইত্যাদি সমগ্রভাবে দেখিবার জন্য কয়েক পা সরিয়া গিয়া দাঁড়াইল।

খানিকক্ষণ একাগ্র দৃষ্টিতে মেয়েটির পানে চাহিয়া থাকিয়া সে আবার নিকটে ফিরিয়া আসিল; মেয়েটির ডান হাতখানি তুলিয়া করতল পরীক্ষা করিয়া দেখিল। করতলে কয়লার কালি লাগিয়া আছে—সে নিজের হাতে উনানে কয়লা দিয়াছে, সহজেই অনুমান করা যায়। অঙ্গুলীগুলি ঈষৎ কুঞ্চিত, তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ পরস্পর সংলগ্ন হইয়া আছে। ব্যোমকেশ অঙ্গুলী দুটি সাবধানে পৃথক্ করিতেই একটি ক্ষুদ্র জিনিষ খসিয়া মাটীতে পড়িল। ব্যোমকেশ সেটি মাটী হইতে তুলিয়া নিজের করতলে রাখিয়া আলোর দিকে তুলিয়া পরীক্ষা করিল। আমিও ঝুঁকিয়া দেখিলাম—একটি দেশলাইকাঠির অতি ক্ষুদ্র দগ্ধাবশেষ, দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলিয়া জ্বলিয়া আঙ্গুল পর্য্যন্ত পৌঁছিলে যেটুকু বাকি থাকে, সেইটুকু।

গভীর মনঃসংযোগে কাঠিটা কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া ব্যোমকেশ সেটা ফেলিয়া দিল, তার পর মেয়েটির বাঁ হাত তুলিয়া দেখিল। বাঁ হাতটি মুষ্টিবদ্ধ ছিল, মুঠি খুলিতেই একটি দেশলাইয়ের বাক্স দেখা গেল। ব্যোমকেশ বাক্সটি লইয়া খুলিয়া দেখিল, কয়েকটি কাঠি রহিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে বলিল, "হুঁ। আমিও তাই প্রত্যাশা করেছিলুম। দেশলাই জ্বেলে উনুনে আগুন দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় মৃত্যু হয়েছে।"

অতঃপর ব্যোমকেশ মৃতদেহ ছাড়িয়া ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইল; মেঝের উপর সিক্ত পদচিহ্ন শুকাইয়া অস্পষ্ট দাগ হইয়াছিল, সেগুলি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল। শেষে ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"না—মৃত্যুকালে ঘরে আর কেউ ছিল

না। পরে এক জন স্ত্রীলোক ঘরে ঢুকেছিলেন, তার পর হাবুল ঢুকেছিল।"

এই সময় বাহিরে শব্দ শুনা গেল। ব্যোমকেশ বলিল,—"বোধ হয় ডাক্তার রুদ্র এলেন। হাবুল, তাঁকে নিয়ে এস।"

হাবুল বাহিরে গেল। আমি এই অবসরে ব্যোমকেশকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ব্যোমকেশ, কিছু বুঝলে?"

ব্যোমকেশ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মাথা নাড়িল,—"কিছু না। কেবল এইটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, মেয়েটি মৃত্যুর আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জান্‌ত না যে, মৃত্যু এত নিকট।"

ডাক্তার রুদ্রকে লইয়া হাবুল ফিরিয়া আসিল। ডাক্তার রুদ্র বয়স্থ লোক; কলিকাতার এক জন নামজাদা চিকিৎসক। কিন্তু অত্যন্ত রূঢ় ও কটুভাষী বলিয়া তাঁহার দুর্নাম ছিল। মেজাজ সর্ব্বদাই সপ্তমে চড়িয়া থাকিত; এমন কি, মুমূর্ষু রোগীর ঘরেও তিনি এমন ব্যবহার করিতেন যে, তিনি না হইয়া অন্য কোনও ডাক্তার হইলে তাঁহার পেশা চলা কঠিন হইয়া পড়িত। একমাত্র চিকিৎসা-শাস্ত্রে অসাধারণ প্রতিভার বলে তিনি পসার-প্রতিপত্তি বজায় রাখিয়াছিলেন; এ ছাড়া তাঁহার মধ্যে অন্য কোনও গুণ আজ পর্য্যন্ত কেহ দেখিতে পায় নাই।

ডাক্তার রুদ্রের চেহারা হইতেও তাঁহার চরিত্রের আভাস পাওয়া যাইত। নিকষ কৃষ্ণ গায়ের রং, ঘোড়ার মত লম্বা কদাকার মুখে রক্তবর্ণ দুটা চক্ষুর দৃষ্টি দুর্ব্বিনীত আত্মম্ভরিতায় যেন মানুষকে মানুষ বলিয়াই গণ্য করে না। অধরোষ্ঠের গঠনেও ঐ সার্ব্বজনীন অবজ্ঞা ফুটিয়া উঠিতেছে। তিনি যখন ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন, তখন মনে হইল, মূর্ত্তিমান দম্ভ কোট-প্যাণ্টালুন ও জুতা শুদ্ধ ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল।

হাবুল নীরবে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া ভগিনীর দেহ দেখাইয়া দিল। ডাক্তার রুদ্র স্বভাব-কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হয়েছে? মারা গেছে?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"আপনিই দেখুন।"

ডাক্তার রুদ্র ব্যোমকেশের দিকে দম্ভ-কষায় নেত্র তুলিয়া বলিলেন,—"আপনি কে?"

"আমি পারিবারিক বন্ধু।"

"ও"—ব্যোমকেশকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া ডাক্তার রুদ্র হাবুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এটি কে—দেবকুমার বাবুর মেয়ে?"

হাবুল ঘাড় নাড়িল।

ডাক্তার রুদ্রের উত্থিতভ্রূ ললাটে ঈষৎ কৌতূহল প্রকাশ পাইল। তিনি মৃতদেহের পানে তাকাইয়া বলিলেন,—"এরই নাম রেখা?"

হাবুল আবার ঘাড় নাড়িল।

"কি হয়েছিল?"

"কিছু না—হঠাৎ—"

ডাক্তার রুদ্র তখন হাঁটু গাড়িয়া রেখার পাশে বসিলেন; মুহূর্ত্তের জন্য একবার নাড়ীতে হাত দিলেন, একবার চোখের পাতা টানিয়া চক্ষু-তারকা দেখিলেন। তার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মারা গেছে। প্রায় দু'ঘণ্টা আগে মৃত্যু হয়েছে। Rigor mortis set in করেছে।" কথাগুলি তিনি এমন পরিতৃপ্তির সহিত বলিলেন—যেন অত্যন্ত সুসংবাদ, শুনিবামাত্র শ্রোতারা খুসী হইয়া উঠিবে।

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, "কিসে মৃত্যু হয়েছে, বলতে পারেন কি?"

"সেটা অটপ্সি না ক'রে বলা অসম্ভব। আমি চল্লুম—আমার ভিজিট বত্রিশ টাকা বাড়ীতে পাঠিয়ে দিও। আর, পুলিসে খবর দেওয়া দরকার, মৃত্যু সন্দেহজনক।" বলিয়া ডাক্তার রুদ্র প্রস্থান করিলেন।

৩

রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"পুলিসে খবর পাঠানোই উচিত, নইলে আরও অনেক হাঙ্গামা হ'তে পারে। আমাদের থানার দারোগা বীরেন বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ আছে, আমি তাঁকে খবর দিচ্ছি।"

এক টুকরা কাগজে তাড়াতাড়ি কয়েক ছত্র লিখিয়া ব্যোমকেশ চাকরের হাতে দিয়া থানায় পাঠাইয়া দিল। তার পর বলিল,—"মৃতদেহ এখন নাড়াচাড়া ক'রে কায নেই, পুলিস এসে যা হয় করবে।" দরজায় শিকল তুলিয়া দিয়া কহিল,—"হাবুল, একবার রেখার ঘরটা দেখতে গেলে ভাল হ'ত।"

ভারী গলায় "আসুন" বলিয়া হাবুল আমাদিগকে উপরে লইয়া চলিল। প্রথম খানিকটা কান্নাকাটি করিবার পর সে কেমন যেন আচ্ছন্নের মত হইয়া পড়িয়াছিল; যে যাহা বলিতেছিল, কলের পুতুলের মত তাহাই পালন করিতেছিল।

দ্বিতলে গোটা তিনেক ঘর, তাহার সর্ব্বশেষেরটি রেখার; বাকী দুইটি বোধ করি দেবকুমার বাবু ও তাঁহার গৃহিণীর শয়ন-কক্ষ। রেখার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ঘরটি আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও পরিপাটীভাবে গোছানো। আসবাব বেশী নাই, যে কয়টি আছে, বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এক ধারে একখানি ছোট খাটের উপর বিছানা; অপর দিকে জানালার ধারে লিখিবার টেবল। পাশে ক্ষুদ্র সেল্‌ফে দুই সারি বাঙ্গালা বই সাজানো। দেয়ালে ব্রাকেটের উপর একটি আয়না, তাহার পদমূলে চিরুণী, চুলের ফিতা, কাঁটা ইত্যাদি রহিয়াছে। ঘরটির সর্ব্বত্র গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা ও শিক্ষিতা মেয়ের হাতের চিহ্ন যেন আঁকা রহিয়াছে।

ব্যোমকেশ ঘরের এটা-ওটা নাড়িয়া একবার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইল, চুলের ফিতা ও কাঁটা লইয়া পরীক্ষা করিল; তার পর জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। জানালাটা ঠিক গলির উপরেই; গলির অপর দিকে একটু পাশে ডাক্তার রুদ্রের প্রকাণ্ড বাড়ী ও ডাক্তারখানা। বাড়ীর খোলা ছাদ জানালা দিয়া স্পষ্ট দেখা যায়। ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল; তার পর ফিরিয়া টেবলের দেরাজ ধরিয়া টানিল।

দেরাজে চাবি ছিল না, টান দিতেই খুলিয়া গেল। দেখিলাম, তাহাতে বিশেষ কিছু নাই; দু'একটা খাতা, চিঠি লেখার প্যাড, গন্ধদ্রব্যের শিশি, ছুঁচ-সুতা ইত্যাদি রহিয়াছে। একটা শিশি তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ দেখিল, ভিতরে কয়েকটা শাদা ট্যাবলয়েড রহিয়াছে। ব্যোমকেশ বলিল,—"অ্যাস্‌পিরিন্। রেখা কি অ্যাস্‌পিরিন্ খেত?"

হাবুল বলিল,—"হ্যাঁ—মাঝে মাঝে তার মাথা ধরত—"

শিশি রাখিয়া দিয়া আবার ব্যোমকেশ চিন্তিতভাবে ঘরময় পরিভ্রমণ করিল, শেষে বিছানার সম্মুখে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। বিছানায় শয়নের চিহ্ন বিদ্যমান, লেপটা এলোমেলোভাবে পায়ের দিকে পড়িয়া আছে, মাথার বালিসে মাথার চাপের দাগ। কিছুক্ষণের জন্য শ্মশান-বৈরাগ্যের মত একটা ভাব মনকে বিষণ্ণ করিয়া দিল—এই ত মানুষের জীবন,—যাহার শয়নের দাগ এখনও শয্যা হইতে মিলাইয়া যায় নাই, সে প্রভাতে উঠিয়াই কোন্ অনন্তের পথে যাত্রা করিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই।

ব্যোমকেশ অন্যমনস্কভাবে মাথার বালিসটা তুলিল; এক খণ্ড ফিকা সবুজ রঙের কাগজ বালিসের তলায় চাপা ছিল, বালিস সরাইতেই সেটা প্রকাশ হইয়া পড়িল। ব্যোমকেশ সচকিতে কাগজখানা তুলিয়া লইয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল, ভাঁজকরা চিঠির কাগজ। সে একবার একটু ইতস্ততঃ করিল, তার পর চিঠির ভাঁজ খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

আমিও গলা বাড়াইয়া চিঠিখানা পড়িলাম। মেয়েলী ছাঁদের অক্ষরে তাহাতে লেখা ছিল—

"নন্তুদা,

আমাদের বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেল। তোমার বাবা দশ হাজার টাকা চান, অত টাকা বাবা দিতে পারবেন না।

আর কাউকে আমি বিয়ে করতে পারব না, এ বোধ হয় তুমি জানো। কিন্তু এ বাড়ীতে থাকাও আর অসহ্য হয়ে উঠেছে। আমাকে একটু বিষ দিতে পার? তোমাদের ডাক্তারখানায় ত অনেক রকম বিষ পাওয়া যায়। দিও; যদি না দাও, অন্য যে কোনও উপায়ে আমি মরব। তুমি ত জানো, আমার কথার নড়চড় হয় না। ইতি

তোমার রেখা।"

চিঠিখানা পড়িয়া ব্যোমকেশ নীরবে হাবুলের হাতে দিল। হাবুল পড়িয়া আবার ঝর-ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, অশ্রু-উদ্‌গলিত কণ্ঠে বলিল,—"আমি জানতুম এই হবে, রেখা আত্মহত্যা করবে—"

"নন্তু কে?"

"নন্তুদা ডাক্তার রুদ্রর ছেলে। রেখার সঙ্গে ওর বিয়ের সম্বন্ধও হয়েছিল। নন্তুদা বড় ভাল, কিন্তু ঐ চামারটা দশ হাজার টাকা চেয়ে বাবাকে রাগিয়ে দিলে—"

ব্যোমকেশ নিজের মুখের উপর দিয়া একবার হাত চালাইয়া বলিল,—"কিন্তু—; যাক।" তার পর হাবুলের হাত ধরিয়া বিছানায় বসাইয়া স্নিগ্ধস্বরে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। হাবুল রুদ্ধস্বরে বলিল,—"ব্যোমকেশদা, নিজের বলতে আমার ঐ বোনটি ছাড়া আর কেউ ছিল না। মা নেই—বাবাও আমাদের কথা ভাববার সময় পান না—" বলিয়া সে মুখে কাপড় দিয়া ফুঁপাইতে লাগিল।

যা হোক, ব্যোমকেশের স্নিগ্ধ সান্ত্বনাবাক্যে কিছুক্ষণ পরে সে অনেকটা শান্ত হইল। তখন ব্যোমকেশ বলিল,—

"চল, এখনই পুলিস আসবে; তার আগে তোমার মাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে।"

হাবুলের বিমাতা নিজের ঘরে ছিলেন। হাবুল গিয়া ব্যোমকেশের আবেদন জানাইলে, তিনি আড়ঘোমটা টানিয়া দ্বারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে এক-নজর মাত্র দেখিয়াছিলাম, এখন আরও ভাল করিয়া দেখিলাম।

তাঁহার বয়স বোধ হয় সাতাশ-আটাশ বছর; রোগা লম্বা ধরণের চেহারা, রং বেশ ফর্সা, মুখের গড়নও সুন্দর। কিন্তু তবু তাঁহাকে দেখিয়া সুন্দরী বলা ত দূরের কথা, চলনসই বলিতেও দ্বিধা হয়। চোখের দৃষ্টিতে একটা স্থায়ী প্রখরতা ভ্রূযুগলের মধ্যে দুইটি ছেদ-রেখা টানিয়া দিয়াছে; পাৎলা সুগঠিত ঠোঁট এমনভাবে ঈষৎ বাঁকা হইয়া আছে, যেন সর্ব্বদাই অন্যের দোষ-ত্রুটি দেখিয়া শ্লেষ করিতেছে। তাঁহার অসন্তোষ-চিহ্নিত মুখ দেখিয়া আমার মনে হইল, বিবাহের পর হইতে ইনি এক দিনের জন্যও সুখী হন নাই। মানসিক উদারতার অভাবে সপত্নীসন্তানদের কখনও স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন নাই, নিজেরও সন্তান হয় নাই; তাই তাঁহার স্নেহহীন চিত্ত মরুভূমির মত ঊষর ও শুষ্ক রহিয়া গিয়াছে।

আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করিলাম,—তাঁহার বোধ হয় শুচিবাই আছে। তিনি যেরূপ ভঙ্গীতে দ্বারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাহাতে মনে হইল, তিনি নিজেকে ও নিজের ঘরটিকে সর্ব্বপ্রকার অশুদ্ধি হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। পাছে আমরা তাঁহার ঘরে পদার্পণ করিয়া ঘরের নিষ্কলুষ পবিত্রতা নষ্ট করিয়া দিই, তাই তিনি দ্বার আগুলিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

আমরা অবশ্য ঘরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলাম না, বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল,—"আজ সকালে রেখার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?"

প্রত্যুত্তরে মহিলাটি একগঙ্গা কথা বলিয়া গেলেন। দেখিলাম, অন্যান্য নারীসুলভ সদ্‌গুণের মধ্যে বাচালতাও বাদ যায় নাই—একবার কথা কহিবার অবকাশ পাইলে আর থামিতে পারেন না। ব্যোমকেশের স্বল্পাক্ষর প্রশ্নের উত্তরে তিনি তাঁহার মনের ও সংসারের অধিকাংশ কথাই বলিয়া ফেলিলেন। আজ সকালে ঝি আসে নাই দেখিয়া তিনি রেখাকে রান্নাঘর নিকাইয়া উনানে আগুন দিতে বলিয়াছিলেন। অবশ্য সপত্নী-সন্তানদের তিনি কখনও আঙুল নাড়িয়াও সংসারের কোনও কায করিতে বলেন না—নিজের গতর যত দিন আছে, নিজেই সব করেন। কিন্তু তবু সংসারের উনকুটি চৌষট্টি কায ত আর একা মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়, তাই তিনি রেখাকে উনান ধরাইতে বলিয়া স্বয়ং নিজের শয়নকক্ষের জঞ্জাল মুক্ত করিয়া স্নান করিতে গিয়াছিলেন। স্নান সারিয়া উপরে চলিয়া আসিয়াছিলেন, রান্নাঘরে কি হইতেছে না হইতেছে, দেখেন নাই। তার পর কাপড় ছাড়িয়া চুল মুছিয়া দশবার ইষ্ট-মন্ত্র জপ করিয়া নীচে গিয়া দেখেন—ঐ কাণ্ড! সপত্নী-সন্তানদের কোনও কথায় তিনি থাকেন না, অথচ এমনই তাঁহার দুর্দ্দৈব যে, যত ঝঞ্চাট তাঁহাকেই পোহাইতে হয়। এখন যে ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহাতে সকলে হয় ত তাঁহাকেই দুষিবে, বিশেষতঃ কর্ত্তা ফিরিয়া আসিয়া যে কি মহামারী কাণ্ড বাধাইবেন, তাহা কল্পনা করাও দুষ্কর। একে ত তিনি কর্ত্তার চক্ষুঃশূল, তিনি মরিলেই কর্ত্তা বাঁচেন—

বাক্যস্রোত কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল,—"আজ সকালে আপনি রেখাকে কি কোনও রূঢ় কথা বলেছিলেন?"

এবার মহিলাটি একবারে ঝাঁঝিয়া উঠিলেন,—"রূঢ় কথা আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না, তেমন ভদ্রলোকের মেয়ে আমি নই। এ বাড়ীতে ঢুকে অবধি সতীনপো সতীন-ঝি নিয়ে ঘর করছি, কিন্তু কেউ বলুক দেখি যে, একটা কড়া কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে! তবে, আজ সকালে রেখাকে উনুন ধরাতে পাঠালুম, সে রান্নাঘর থেকে ফিরে এসে বললে, 'দেশালাই খুঁজে পাচ্ছি না'—ব'লে ঘরে ঢুকে ব্রাকেটের উপর থেকে দেশালাই নিলে। আমি তখন মেঝে মুছ্‌ছিলুম, বললুম—'বাসি কাপড়ে ঘরে ঢুকলে? এতবড় মেয়ে হয়েছ, এটুকু হুঁস নেই? দেশালাইয়ের দরকার ছিল, দোকান থেকে একটা আনিয়ে নিলেই পারতে।' এইটুকু বলেছি, এ ছাড়া আর একটি কথাও আমার মুখ দিয়ে বেরোয়নি। তা এতে যদি অপরাধ হয়ে থাকে ত ঘাট মানছি।"

ব্যোমকেশ শান্তভাবে বলিল,—"অপরাধের কথা নয়;

কিন্তু দেশালাই নিতে রেখা আপনার ঘরে এল কেন? আপনার ঘরেই কি দেশালাই থাকে?”

গৃহিণী বলিলেন,—“হাঁ। রাত্তিরে আমি অন্ধকারে ঘুমতে পারি না, তেলের ল্যাম্প জ্বেলে শুই,—তাই ঘরে দেশালাই রাখতে হয়। ঐ ব্র্যাকেটের উপর ল্যাম্প আর দেশালাই থাকে। সবাই জানে, রেখাও জান্‌ত।”

ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলাম, খাটের শিয়রের দিকে দেয়ালে একটি ক্ষুদ্র কাঠের ব্র্যাকেট, তাহার উপর ছোট একটি ল্যাম্প রহিয়াছে। ঘরের অন্যান্য অংশও এই সুযোগে দেখিয়া লইলাম। পরিচ্ছন্নতার আতিশয্যে ঘরের আসবাব-পত্র যেন আড়ষ্ট হইয়া আছে। এমন কি, দেয়ালে লম্বিত মা কালীর ছবিখানিও যেন ঘরের শুচিতা-ভঙ্গের ভয়ে সন্ত্রস্তভাবে জিভ্‌ বাহির করিয়া আছেন।

চিন্তাকুঞ্চিত ললাটে ব্যোমকেশ বলিল,—“ও—তা হ'লে এই সময় রেখাকে আপনি শেষ দেখেন? তার পর আর তাকে জীবিত দেখেন নি?”

“না”—বলিয়া গৃহিণী বোধ করি আবার একপ্রস্থ বক্তৃতা সুরু করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় নীচে হইতে চাকর জানাইল যে, দারোগা বাবু আসিয়াছেন।

আমরা নীচে নামিয়া গেলাম।

দারোগা বীরেন বাবুর সহিত ব্যোমকেশের ঘনিষ্ঠতা ছিল, দু'জনেই দু'জনের কদর বুঝিতেন। বীরেন বাবু মধ্য-বয়স্ক লোক, হৃষ্টপুষ্ট মজবুত চেহারা। বিচক্ষণ ও চতুর কর্ম্মচারী বলিয়া তাঁহার সুনাম ছিল। বিশেষতঃ তাঁহার মধ্যে পুলিস-সুলভ আত্মম্ভরিতা বা অন্যের কৃতিত্ব লঘু করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি ছিল না বলিয়া ব্যোমকেশ তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিত। কয়েকটা জটিল ব্যাপারে ব্যোমকেশকে তাঁহার সাহায্য লইতেও দেখিয়াছি। সহরের নিম্নশ্রেণীর গাঁটকাটা ও গুণ্ডাদের চালচলন সম্বন্ধে তাঁহার অগাধ অভিজ্ঞতা ছিল।

ব্যোমকেশের সহিত মুখোমুখি হইতেই বীরেন বাবু বলিলেন,—“কি খবর, ব্যোমকেশ বাবু! গুরুতর কিছু না কি?”

ব্যোমকেশ বলিল,—“আপনি নিজেই তার বিচার করুন!” বলিয়া তাঁহাকে ভিতরে লইয়া চলিল।

৪

মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের জন্য রওনা করিয়া দিয়া, দেবকুমার বাবুকে তার পাঠাইয়া এই শোচনীয় ব্যাপারের যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করিতে বেলা দুটা বাজিয়া গেল। বাসায় ফিরিয়া আমরা যখন আহারাদি সম্পন্ন করিয়া উঠিলাম, তখন শীতের বেলা পড়িয়া আসিতেছে।

ব্যোমকেশ বিমনা ও নীরব হইয়া রহিল। আমিও মনের মধ্যে অনুতাপের মত একটা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে লাগিলাম। মস্তিষ্কের যে খোরাকের জন্য আমরা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলাম, তাহা এমন নির্ম্মমভাবে দেখা দিবে, কে ভাবিয়াছিল? বেচারা হাবুলের কথা বার বার মনে পড়িয়া মনটা ব্যথা-পীড়িত হইয়া উঠিতে লাগিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া গেল, ব্যোমকেশ দৃষ্টিহীন চক্ষুতে জানালার বাহিরে তাকাইয়া নীরব হইয়াই রহিল। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—“আত্মহত্যাই তা হ'লে? কি বল?”

ব্যোমকেশ চমকিয়া উঠিল,—“অ্যাঁ! ও—রেখার কথা বলছ? তোমার কি মনে হয়?”

যদিও মন সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত ছিল না, তবু বলিলাম,—“আত্মহত্যা ছাড়া আর কি হ'তে পারে? চিঠি থেকে ত ওর অভিপ্রায় বেশ বোঝাই যাচ্ছে।”

“তা যাচ্ছে। কি উপায়ে আত্মহত্যা করেছে, তুমি মনে কর?”

“বিষ খেয়ে। সে কথাও ত চিঠিতে—”

“আছে। কিন্তু বিষ পাবার আগেই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা কি ক'রে হ'তে পারে, আমি ভেবে পাচ্ছি না। চিঠিতে রেখা বিষ চেয়েছিল, কিন্তু চিঠি যখন যথাস্থানে পৌঁছায়নি, লেখিকার বালিসের তলাতেই থেকে গিয়েছিল, তখন বিষ এল কোত্থেকে?”

আমি বলিলাম,—“চিঠিতে আছে, যে বিষ না পেলে অন্য যে কোনও উপায়ে—”

“কিন্তু চিঠি পাঠাবার আগেই যে অন্য যে কোনও উপায় অবলম্বন করবে, এটা তুমি সম্ভব মনে কর?”

আমি নিরুত্তর হইলাম।

কিয়ৎকাল পরে ব্যোমকেশ বলিল,—“তা ছাড়া উনুন জ্বালতে জ্বালতে কেউ আত্মহত্যা করে না। রেখার মৃত্যু

"চল, এখনই পুলিস আসবে : তার আগে তোমার মাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে।"

হাবুলের বিমাতা নিজের ঘরে ছিলেন। হাবুল গিয়া ব্যোমকেশের আবেদন জানাইলে, তিনি আড়ঘোমটা টানিয়া দ্বারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে এক-নজর মাত্র দেখিয়াছিলাম, এখন আরও ভাল করিয়া দেখিলাম।

তাঁহার বয়স বোধ হয় সাতাশ-আটাশ বছর; রোগা লম্বা ধরণের চেহারা, রং বেশ ফর্সা, মুখের গড়নও সুন্দর। কিন্তু তবু তাঁহাকে দেখিয়া সুন্দরী বলা ত দূরের কথা, চলনসই বলিতেও দ্বিধা হয়। চোখের দৃষ্টিতে একটা স্থায়ী প্রখরতা ভ্রূযুগলের মধ্যে দুইটি ছেদ-রেখা টানিয়া দিয়াছে; পাংলা সুগঠিত ঠোঁট এমনভাবে ঈষৎ বাঁকা হইয়া আছে, যেন সর্ব্বদাই অন্যের দোষ-ত্রুটি দেখিয়া শ্লেষ করিতেছে। তাঁহার অসন্তোষ-চিহ্নিত মুখ দেখিয়া আমার মনে হইল, বিবাহের পর হইতে ইনি এক দিনের জন্যও সুখী হন নাই। মানসিক উদারতার অভাবে সপত্নীসন্তানদের কখনও স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন নাই, নিজেরও সন্তান হয় নাই; তাই তাঁহার স্নেহহীন চিত্ত মরুভূমির মত ঊষর ও শুষ্ক রহিয়া গিয়াছে।

আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করিলাম,—তাঁহার বোধ হয় শুচিবাই আছে। তিনি যেরূপ ভঙ্গীতে দ্বারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাহাতে মনে হইল, তিনি নিজেকে ও নিজের ঘরটিকে সর্ব্বপ্রকার অশুদ্ধি হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। পাছে আমরা তাঁহার ঘরে পদার্পণ করিয়া ঘরের নিষ্কলুষ পবিত্রতা নষ্ট করিয়া দিই, তাই তিনি দ্বার আগুলিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

আমরা অবশ্য ঘরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলাম না, বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল,—"আজ সকালে রেখার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?"

প্রত্যুত্তরে মহিলাটি একগঙ্গা কথা বলিয়া গেলেন। দেখিলাম, অন্যান্য নারীসুলভ সদ্গুণের মধ্যে বাচালতাও বাদ যায় নাই—একবার কথা কহিবার অবকাশ পাইলে আর থামিতে পারেন না। ব্যোমকেশের স্বল্পাক্ষর প্রশ্নের উত্তরে তিনি তাঁহার মনের ও সংসারের অধিকাংশ কথাই বলিয়া ফেলিলেন। আজ সকালে ঝি আসে নাই দেখিয়া তিনি রেখাকে রান্নাঘর নিকাইয়া উনানে আগুন দিতে বলিয়াছিলেন। অবশ্য সপত্নী-সন্তানদের তিনি কখনও আঙ্গুল নাড়িয়াও সংসারের কোনও কায করিতে বলেন না—নিজের গতর যত দিন আছে, নিজেই সব করেন। কিন্তু তবু সংসারের উনকুটি চৌষট্টি কায ত আর একা মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়, তাই তিনি রেখাকে উনান ধরাইতে বলিয়া স্বয়ং নিজের শয়নকক্ষের জঞ্জাল মুক্ত করিয়া স্নান করিতে গিয়াছিলেন। স্নান সারিয়া উপরে চলিয়া আসিয়াছিলেন, রান্নাঘরে কি হইতেছে না হইতেছে, দেখেন নাই। তার পর কাপড় ছাড়িয়া চুল মুছিয়া দশবার ইষ্ট-মন্ত্র জপ করিয়া নীচে গিয়া দেখেন—ঐ কাণ্ড! সপত্নী-সন্তানদের কোনও কথায় তিনি থাকেন না, অথচ এমনই তাঁহার দুর্দ্দৈব যে, যত ঝঞ্ঝাট তাঁহাকেই পোহাইতে হয়। এখন যে ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহাতে সকলে হয় ত তাঁহাকেই দূষিবে, বিশেষতঃ কর্ত্তা ফিরিয়া আসিয়া যে কি মহামারী কাণ্ড বাধাইবেন, তাহা কল্পনা করাও দুষ্কর। একে ত তিনি কর্ত্তার চক্ষুঃশূল, তিনি মরিলেই কর্ত্তা বাঁচেন—

বাক্যস্রোত কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল,—"আজ সকালে আপনি রেখাকে কি কোনও রূঢ় কথা বলেছিলেন?"

এবার মহিলাটি একবারে ঝাঁঝিয়া উঠিলেন,—"রূঢ় কথা আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না, তেমন ভদ্রলোকের মেয়ে আমি নই। এ বাড়ীতে ঢুকে অবধি সতীনপো সতীন-ঝি নিয়ে ঘর করছি, কিন্তু কেউ বলুক দেখি যে, একটা কড়া কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে! তবে, আজ সকালে রেখাকে উনুন ধরাতে পাঠালুম, সে রান্নাঘর থেকে ফিরে এসে বললে, 'দেশালাই খুঁজে পাচ্ছি না'—ব'লে ঘরে ঢুকে ব্রাকেটের উপর থেকে দেশালাই নিলে। আমি তখন মেঝে মুছছিলুম, বললুম—'বাসি কাপড়ে ঘরে ঢুকলে? এতবড় মেয়ে হয়েছ, এটুকু হুঁস নেই? দেশালাইয়ের দরকার ছিল, দোকান থেকে একটা আনিয়ে নিলেই পারতে।' এইটুকু বলেছি, এ ছাড়া আর একটি কথাও আমার মুখ দিয়ে বেরোয়নি। তা এতে যদি অপরাধ হয়ে থাকে ত ঘাট মানছি।"

ব্যোমকেশ শান্তভাবে বলিল,—"অপরাধের কথা নয়;

কিন্তু দেশালাই নিতে রেখা আপনার ঘরে এল কেন? আপনার ঘরেই কি দেশালাই থাকে?"

গৃহিণী বলিলেন,—"হাঁ। রাত্তিরে আমি অন্ধকারে ঘুমতে পারি না, তেলের ল্যাম্প জ্বেলে শুই,—তাই ঘরে দেশালাই রাখতে হয়। ঐ ব্র্যাকেটের উপর ল্যাম্প আর দেশালাই থাকে। সবাই জানে, রেখাও জানত।"

ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলাম, খাটের শিয়রের দিকে দেয়ালে একটি ক্ষুদ্র কাঠের ব্র্যাকেট, তাহার উপর ছোট একটি ল্যাম্প রহিয়াছে। ঘরের অন্যান্য অংশও এই সুযোগে দেখিয়া লইলাম। পরিচ্ছন্নতার আতিশয্যে ঘরের আসবাব-পত্র যেন আড়ষ্ট হইয়া আছে। এমন কি, দেয়ালে লম্বিত মা কালীর ছবিখানিও যেন ঘরের শুচিতা-ভঙ্গের ভয়ে সন্ত্রস্তভাবে জিভ্ বাহির করিয়া আছেন।

চিন্তাকুঞ্চিত ললাটে ব্যোমকেশ বলিল,—"ও—তা হ'লে এই সময় রেখাকে আপনি শেষ দেখেন? তার পর আর তাকে জীবিত দেখেন নি?"

"না"—বলিয়া গৃহিণী বোধ করি আবার একপ্রস্থ বক্তৃতা সুরু করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় নীচে হইতে চাকর জানাইল যে, দারোগা বাবু আসিয়াছেন।

আমরা নীচে নামিয়া গেলাম।

দারোগা বীরেন বাবুর সহিত ব্যোমকেশের ঘনিষ্ঠতা ছিল, দু'জনেই দু'জনের কদর বুঝিতেন। বীরেন বাবু মধ্যবয়স্ক লোক, হৃষ্টপুষ্ট মজবুত চেহারা—বিচক্ষণ ও চতুর কর্ম্মচারী বলিয়া তাঁহার সুনাম ছিল। বিশেষতঃ তাঁহার মধ্যে পুলিস-সুলভ আত্মম্ভরিতা বা অন্যের কৃতিত্ব লঘু করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি ছিল না বলিয়া ব্যোমকেশ তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিত। কয়েকটা জটিল ব্যাপারে ব্যোমকেশকে তাঁহার সাহায্য লইতেও দেখিয়াছি। সহরের নিম্নশ্রেণীর গাঁটকাটা ও গুণ্ডাদের চালচলন সম্বন্ধে তাঁহার অগাধ অভিজ্ঞতা ছিল।

ব্যোমকেশের সহিত মুখোমুখি হইতেই বীরেন বাবু বলিলেন,—"কি খবর, ব্যোমকেশ বাবু! গুরুতর কিছু না কি?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"আপনি নিজেই তার বিচার করুন!" বলিয়া তাঁহাকে ভিতরে লইয়া চলিল।

৪

মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের জন্য রওনা করিয়া দিয়া, দেবকুমার বাবুকে তার পাঠাইয়া এই শোচনীয় ব্যাপারের যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করিতে বেলা দুটা বাজিয়া গেল। বাসায় ফিরিয়া আমরা যখন আহারাদি সম্পন্ন করিয়া উঠিলাম, তখন শীতের বেলা পড়িয়া আসিতেছে।

ব্যোমকেশ বিমনা ও নীরব হইয়া রহিল। আমিও মনের মধ্যে অনুতাপের মত একটা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে লাগিলাম। মস্তিষ্কের যে খোরাকের জন্য আমরা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলাম, তাহা এমন নির্ম্মমভাবে দেখা দিবে, কে ভাবিয়াছিল? বেচারা হাবুলের কথা বার বার মনে পড়িয়া মনটা ব্যথা-পীড়িত হইয়া উঠিতে লাগিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া গেল, ব্যোমকেশ দৃষ্টিহীন চক্ষুতে জানালার বাহিরে তাকাইয়া নীরব হইয়াই রহিল। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আত্মহত্যাই তা হ'লে? কি বল?"

ব্যোমকেশ চমকিয়া উঠিল,—"অ্যাঁ! ও—রেখার কথা বলছ? তোমার কি মনে হয়?"

যদিও মন সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত ছিল না, তবু বলিলাম,—"আত্মহত্যা ছাড়া আর কি হ'তে পারে? চিঠি থেকে ত ওর অভিপ্রায় বেশ বোঝাই যাচ্ছে।"

"তা যাচ্ছে। কি উপায়ে আত্মহত্যা করেছে, তুমি মনে কর?"

"বিষ খেয়ে। সে কথাও ত চিঠিতে—"

"আছে। কিন্তু বিষ পাবার আগেই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা কি ক'রে হ'তে পারে, আমি ভেবে পাচ্ছি না। চিঠিতে রেখা বিষ চেয়েছিল, কিন্তু চিঠি যখন যথাস্থানে পৌঁছায়নি, লেখিকার বালিসের তলাতেই থেকে গিয়েছিল, তখন বিষ এল কোত্থেকে?"

আমি বলিলাম,—"চিঠিতে আছে, সে বিষ না পেলে অন্য যে কোনও উপায়ে—"

"কিন্তু চিঠি পাঠাবার আগেই সে অন্য যে কোনও উপায় অবলম্বন করবে, এটা তুমি সম্ভব মনে কর?"

আমি নিরুত্তর হইলাম।

কিয়ৎকাল পরে ব্যোমকেশ বলিল,—"তা ছাড়া উনুন জ্বালতে জ্বালতে কেউ আত্মহত্যা করে না। রেখার মৃত্যু

এসেছিল অকস্মাৎ,—নির্মেঘ আকাশ থেকে বিদ্যুতের মত। এত ক্ষিপ্র এমন অমোঘ এই মৃত্যুবাণ যে, সে একটু নড়বার অবকাশ পায়নি, দেশলাইয়ের কাঠি হাতেই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।”

“কি ক’রে এমন মৃত্যু সম্ভব হ’ল?”

“সেইটেই বুঝতে পারছি না! জানি ত, বিষের মধ্যে এক হাইড্রোসায়েনিক অ্যাসিড ছাড়া এত ভয়ঙ্কর শক্তি আর কারুর নেই। কিন্তু—” ব্যোমকেশের অসমাপ্ত কথা চিন্তার মধ্যে নির্ব্বাণ লাভ করিল।

আমি একটু সঙ্কুচিতভাবে বলিলাম,—“আমি ডাক্তারী সম্বন্ধে কিছু জানি না, কিন্তু হঠাৎ হার্টফেল্ ক’রে মৃত্যু সম্ভব নয় কি?”

ব্যোমকেশ ভাবিতে ভাবিতে বলিল,—“ঐ সম্ভাবনাটাই দেখছি ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠছে। রেখা মাথা ধরার জন্যে অ্যাস্‌পিরিন খেত, হয় ত ভেতরে ভেতরে হৃদ্‌যন্ত্র দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল;—কিন্তু না, কোথায় যেন বেধে যাচ্ছে, হার্টফেলের সম্ভাবনাটা নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করতে পারছি না,—যদিও যুক্তি-প্রমাণ সব ঐ দিকেই নির্দ্দেশ করছে।” ব্যোমকেশ অপ্রতিভভাবে হাসিল—“বুদ্ধির সঙ্গে মনের আপোষ করতে পারছি না; কেবলই মনে হচ্ছে, মৃত্যুটা সহজ নয়—সাধারণ নয়, কোথায় এর একটা মস্ত গলদ আছে। কিন্তু যাক, এখন মিথ্যে মাথা গরম ক’রে লাভ নেই। কাল ডাক্তারের রিপোর্ট পেলেই সব বোঝা যাবে।”

ঘর অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল, ব্যোমকেশ উঠিয়া আলো জ্বালিল। এই সময় বহির্দ্বারে আস্তে আস্তে টোকা মারার শব্দ হইল। সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা যায় নাই, ব্যোমকেশ বিস্মিতভাবে ভ্রূ তুলিয়া বলিল,—“কে? ভেতরে এস!”

একটি অপরিচিত যুবক নিঃশব্দে প্রবেশ করিল। স্বাস্থ্যপূর্ণ বলিষ্ঠ দেহ, সুশ্রী চেহারা—কিন্তু শুষ্ক বিবর্ণ মুখে ট্র্যাজেডির ছায়া পড়িয়াছে। পায়ে রবার-সোল জুতা ছিল বলিয়া তাহার পদধ্বনি শুনিতে পাই নাই। সে কয়েক পা অগ্রসর হইয়া অনিশ্চিতভাবে দাঁড়াইয়া বলিল,—“আমার নাম মন্মথনাথ রুদ্র—”

ব্যোমকেশ ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া বলিল,—“আপনিই নন্তু বাবু? আসুন”—বলিয়া একটা চেয়ার দেখাইয়া দিল।

চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া যুবক থামিয়া থামিয়া বলিল,—“আপনি আমাকে চেনেন?”

ব্যোমকেশ টেবলের সম্মুখে বসিয়া বলিল,—“সম্প্রতি আপনার নাম জানবার সুযোগ হয়েছে। আপনি রেখার মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু জানতে চান?”

যুবকের কণ্ঠস্বর ঈষৎ কাঁপিয়া গেল, সে বলিল,—“হ্যাঁ। কি ক’রে তার মৃত্যু হ’ল, ব্যোমকেশ বাবু?”

“তা এখনও জানা যায়নি।”

অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চক্ষু ব্যোমকেশের মুখের উপর রাখিয়া মন্মথ বলিল,—“আপনার কি সন্দেহ হয় যে, আত্মহত্যা করেছে?”

“সম্ভব নয়।”

“তবে কি কেউ তাকে—”

“এখনও জোর ক’রে কিছু বলা যায় না।”

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মন্মথ কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল, তার পর মুখ তুলিয়া অস্পষ্টস্বরে বলিল,—“আপনারা হয় ত শুনেছেন, রেখার সঙ্গে আমার—”

“শুনেছি।”

মন্মথ এতক্ষণ জোর করিয়া সংযম রক্ষা করিতেছিল, এবার ভাঙ্গিয়া পড়িল, অবরুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিল,—“ছেলেবেলা থেকে ভালবাসতুম;—যখন রেখার ছ’বছর বয়স, আমি ওদের বাড়ীতে খেলা করতে যেতুম, তখন থেকে। তার পর যখন বিয়ের সম্বন্ধ হ’ল, তখন বাবা এমন এক সর্ত্ত দিলেন যে, বিয়ে ভেঙ্গে গেল। তবু আমি ঠিক করেছিলুম, বাবার মতের বিরুদ্ধে বিয়ে করব। এই নিয়ে বাবার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হয়ে গেল। বাবা বললেন, বাড়ী থেকে দূর ক’রে দেবেন। তবু আমি—”

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—“বাবার সঙ্গে আপনার কখন্ ঝগড়া হয়েছিল?”

“কাল দুপুরবেলা। আমি বলেছিলুম, রেখাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না। তখন কে জান্‌ত যে, রেখা—কিন্তু কেন এমন হ’ল, ব্যোমকেশ বাবু? রেখাকে প্রাণে মেরে কার কি লাভ হ’ল?”

ব্যোমকেশ একটা পেন্সিল লইয়া টেবলের উপর হিজিবিজি কাটিতেছিল, মুখ না তুলিয়া বলিল,—“আপনার বাবার কিছু লাভ হ’তে পারে।”

মন্মথ চমকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল,—"বাবা! না না—এ আপনি কি বলছেন? বাবা—?"

ত্রাস-বিস্ফারিত-নেত্রে শূন্যের পানে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া, মন্মথ আর কোনও কথা না বলিয়া স্খলিতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া দেখিলাম, সে গাঢ় মনঃসংযোগে টেবলের উপর হিজিবিজি কাটিতেছে।

৩

পরদিন সকালবেলাটা ডাক্তারের রিপোর্টের প্রতীক্ষায় কাটিয়া গেল। কিন্তু রিপোর্ট আসিল না। ব্যোমকেশ ফোন করিয়া থানায় খবর লইল, কিন্তু সেখানে কোনও খবর পাওয়া গেল না।

বৈকালে বেলা আন্দাজ সাড়ে চারটার সময় দেবকুমার বাবু আসিলেন। আলাপ না থাকিলেও তাঁহার সহিত মুখচেনা ছিল; আমরা খাতির করিয়া তাঁহাকে বসাইলাম। তিনি হাবুলের টেলিগ্রাম পাইবামাত্র দিল্লী ছাড়িয়া রওনা হইয়াছিলেন, আজ দ্বিপ্রহরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

তাঁহার বয়স চল্লিশ কি একচল্লিশ বৎসর; কিন্তু চেহারা দেখিয়া আরও বর্ষীয়ান্ মনে হয়। মোটা-সোটা দেহ, মাথায় টাক, চোখে পুরু কাচের চশমা। তিনি স্বভাবতঃ একটু অন্যমনস্ক প্রকৃতির লোক বলিয়া মনে হয়,—অর্থাৎ বাহিরের জগতের চেয়ে অন্তর্লোকেই বেশী বাস করেন। তাঁহার গলাবন্ধ, কোট ও গোল চশমা-পরিহিত পেচকের ন্যায় চেহারা কলিকাতার ছাত্রমহলে কাহারও অপরিচিত ছিল না, প্রতিবেশী বলিয়া আমিও পূর্ব্বে কয়েকবার দেখিয়াছি। কিন্তু এখন দেখিলাম, তাঁহার চেহারা কেমন যেন শুকাইয়া উঠিয়াছে। চোখের কোলে গভীর কালীর দাগ, গালের মাংস চুপসিয়া গিয়াছে; পূর্ব্বের সেই পরিপুষ্ট ভাব আর নাই।

চশমার কাচের ভিতর দিয়া আমার পানে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া তিনি বলিলেন,—"আপনিই ব্যোমকেশ বাবু—"

আমি ব্যোমকেশকে দেখাইয়া দিলাম। তিনি ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"ও"—বলিয়া হাতের মোটা লাঠিটা টেবলের উপর রাখিলেন।

ব্যোমকেশ অস্ফুটস্বরে মামুলি দু'একটা সহানুভূতির কথা বলিল; দেবকুমার বাবু বোধ হয় তাহা শুনিতে পাইলেন না। তাঁহার ক্ষীণদৃষ্টি চক্ষু একবার ঘরের চারিদিক পরিভ্রমণ করিল, তার পর তিনি ক্লান্তিশিথিল স্বরে বলিলেন,—"কাল বেলা দশটায় দিল্লী থেকে বেরিয়ে আজ আড়াইটার সময় এসে পৌঁছেছি। প্রায় বত্রিশ ঘণ্টা ট্রেণে—"

আমরা চুপ করিয়া রহিলাম; দৈহিক শ্রান্তির পরিচয় তাঁহার প্রতি অঙ্গে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

দেবকুমার বাবু অতঃপর ব্যোমকেশের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া বলিলেন,—"হাবুলের মুখে আপনার কথা শুনেছি—বিপদের সময় সাহায্য করেছেন, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।"

ব্যোমকেশ বলিল,—"সে কি কথা, যদি একটু সাহায্য করতে পেরে থাকি, সে ত প্রতিবেশীর কর্ত্তব্য।"

"তা বটে; কিন্তু আপনি কাযের লোক—" তার পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হয়েছিল মেয়েটার? কিছু বুঝতে পেরেছেন কি? বাড়ীতে ভাল ক'রে কেউ কিছু বলতে পারলে না।"

ব্যোমকেশ তখন যতখানি দেখিয়াছিল ও বুঝিয়াছিল দেবকুমার বাবুকে বিবৃত করিল। শুনিতে শুনিতে দেবকুমার বাবু অন্যমনস্কভাবে পকেট হইতে সিগার বাহির করিলেন, সিগার মুখে ধরিয়া তার পর আবার কি মনে করিয়া সেটি টেবলের উপর রাখিয়া দিলেন। আমি তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়াছিলাম, দেখিলাম, ব্যোমকেশের কথা শুনিতে শুনিতে তিনি এত তন্ময় হইয়া গিয়াছেন যে, স্নায়বিক উত্তেজনার বশে তাঁহার অস্থির হাত দুটা যে কি করিতেছে, সে দিকে লক্ষ্য নাই। একবার তিনি চশমা খুলিয়া বড় বড় চোখ দুটা নিষ্পলকভাবে প্রায় দু'মিনিট আমার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন; তার পর আবার চশমা পরিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলেন।

ব্যোমকেশের বিবরণ শেষ হইলে দেবকুমার বাবু অনেকক্ষণ নীরব হইয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—"হুঁ, ঐ ডাক্তার রুদ্রটা আমার বাড়ীতে ঢুকেছিল! চামার! চণ্ডাল!—টাকার জন্য ও পারে না, এমন কায নেই। একটা জীবন্ত পিশাচ!" উত্তেজনার বশে তিনি লাঠিটা মুঠি করিয়া ধরিয়া একবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার মুখ হঠাৎ ভীষণ হিংস্রভাব ধারণ করিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই কিন্তু আবার তাঁহার মুখ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। আমাদের চোখে বিস্ময়ের চিহ্ন দেখিয়া বোধ হয় মনে মনে একটু অপ্রতিভ হইলেন। গলা ঝাড়িয়া বলিলেন,—"আমি যাই। ব্যোমকেশ বাবু, আর একবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।" বলিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন।

দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কি চিন্তা করিলেন; তার পর ফিরিয়া বলিলেন,—"আমার পয়সা থাকলে এ ব্যাপারের অনুসন্ধানে আপনাকে নিযুক্ত করতুম। কিন্তু আমি গরীব—আমার পয়সা নেই।" ব্যোমকেশ কি একটা বলিতে চাহিলে তিনি লাঠি নাড়িয়া তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন,—"বিনা পারিশ্রমিকে আমি কারুর সাহায্য গ্রহণ করতে পারব না। পুলিস অনুসন্ধান করছে, তারাই যা পারে করুক। আর, অনুসন্ধান করবার আছেই বা কি? হাজার অনুসন্ধান করলেও আমার মেয়ে ত আর আমি ফিরিয়ে পাব না।" বলিয়া কোনও প্রকার অভিবাদন না করিয়া প্রস্থান করিলেন।

এই অদ্ভুত মনুষ্যটি চলিয়া যাইবার পর দীর্ঘকাল আমরা হতবাক্ হইয়া বসিয়া রহিলাম। শেষে সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"একটা ভ্রম সংশোধন হ'ল। আমার ধারণা হয়েছিল, দেবকুমার বাবু প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়েদের ভালবাসেন না—সেটা ভুল। অন্ততঃ মেয়েকে তিনি খুব বেশী ভালবাসেন।"

সিগারটা দেবকুমার বাবু ফেলিয়া গিয়াছিলেন, সেটার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"আশ্চর্য্য অন্যমনস্ক লোক।" বলিয়া ধীরে ধীরে পায়চারি করিতে লাগিল।

আমি বলিলাম,—"ডাক্তার রুদ্রের ওপর ভয়ঙ্কর রাগ দেখলুম।"

ব্যোমকেশ উত্তর দিল না।

সন্ধ্যার পর দারোগা বীরেন বাবু স্বয়ং ডাক্তারের রিপোর্ট লইয়া আসিলেন। বলিলেন, রিপোর্ট বড় Disappointing, বারবার পরীক্ষা করিয়াও মৃত্যুর কারণ ধরিতে পারা যায় নাই।

রিপোর্ট পড়িয়া দেখিলাম, ডাক্তার লিখিয়াছেন, দেহের কোথাও ক্ষতচিহ্ন নাই; শরীরের অভ্যন্তরেও কোনও বিষ পাওয়া যায় নাই। হৃদ্‌যন্ত্র সবল ও স্বাভাবিক, সুতরাং হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার জন্য মৃত্যু হয় নাই। যতদূর বুঝিতে পারা যায়, অকস্মাৎ স্নায়ুমণ্ডলীর পক্ষাঘাত হওয়ায় মৃত্যু ঘটিয়াছে। কিন্তু কি করিয়া স্নায়ুমণ্ডলীর পক্ষাঘাত ঘটিল, তাহা বলিতে ডাক্তার অক্ষম। এরূপ অদ্ভুত লক্ষণহীন মৃত্যু তিনি পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই।

ব্যোমকেশ কাগজখানা হাতে লইয়া, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চিন্তিতমুখে বসিয়া রহিল।

বীরেন বাবু বলিলেন,—"এ কেস্ অবশ্য করোনারের কোর্টে যাবে; সেখানে 'অজ্ঞাত কারণে মৃত্যু' রায় বেরুবে। তার পর আমরা—অর্থাৎ পুলিস—ইচ্ছে করলে অনুসন্ধান চালাতে পারি, আবার না-ও চালাতে পারি। ব্যোমকেশ বাবু, আপনি কি বলেন? এই রিপোর্টের পর অনুসন্ধান করলে কোনও ফল হবে কি?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"ফল হবে কি না, বলতে পারি না; কিন্তু অনুসন্ধান চালানো উচিত।"

বীরেন বাবু উৎসুকভাবে বলিলেন,—"কেন বলুন দেখি? আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন?"

"ঠিক যে কোনও ব্যক্তিবিশেষকে সন্দেহ করি, তা নয়। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এর মধ্যে গোলমাল আছে।"

বীরেন বাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—"আমারও তাই মনে হয়। আচ্ছা, দেবকুমার বাবুর স্ত্রীকে আপনার কি রকম মনে হ'ল?"

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে বলিল,—"দেখুন, আমার মনে হয়, ও-পথে গেলে হবে না। এ মৃত্যুরহস্যের জট ছাড়াতে হ'লে সর্ব্বপ্রথম জানতে হবে—কি উপায়ে মৃত্যু হয়েছিল। এটা যতক্ষণ না জানতে পারছেন, ততক্ষণ একে ওকে সন্দেহ ক'রে কোনও ফল হবে না। অবশ্য এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, মেয়েটির মৃত্যুর সময় তার সৎ-মা আর সহোদর ভাই ছাড়া বাড়ীতে আর কেউ ছিল না। কিন্তু তাই ব'লে আসল জিনিষটিকে দৃষ্টির বাইরে যেতে দিলে চলবে না।"

"কিন্তু ডাক্তার সে-কথা বলতে পারছে না—"

"ডাক্তার কেবল শব পরীক্ষা করেছেন, আমরা শব ছাড়া আরও অনেক কিছু দেখেছি। সুতরাং ডাক্তার যা পারেন নি, আমরাও তা পারব না, এমন কোনও কথা নেই।"

দ্বিধাপূর্ণস্বরে বীরেন বাবু বলিলেন,—"তা বটে—কিন্তু—; যা হোক, আপনি ত দেবকুমার বাবুর পক্ষ থেকে গোড়া থেকেই আছেন, শেষ পর্য্যন্ত নিশ্চয় থাকবেন—দু'জনে পরামর্শ ক'রে চলা যাবে।"

মৃদু হাসিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"উঁহু। এই খানিক আগে দেবকুমার বাবু এসেছিলেন—তিনি আমাকে বরখাস্ত ক'রে গেছেন।"

বিস্মিত বীরেন বাবু বলিলেন,—"সে কি?"

"হ্যাঁ। আমার অবৈতনিক সাহায্য তিনি চান না—আর, টাকা দিয়ে আমাকে নিয়োগ করতে তিনি অক্ষম।"

"বটে! কিন্তু অক্ষম কিসে? তিনি ত মোটা মাইনের চাকরী করেন, সাত আটশ' টাকা মাইনে পান শুনেছি।"

"তা হবে।"

বীরেন বাবুর ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন,—"হুঁ, দেবকুমার বাবুর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে খোঁজ নিতে হচ্ছে। কিন্তু আপনার সাহায্য প্রত্যাখ্যান করবার কি কারণ থাকতে পারে? তিনি কাউকে আড়াল করবার চেষ্টা করছেন না ত?"

আমি হাসিয়া ফেলিলাম। দেবকুমার বাবু অপরাধীকে আড়াল করিবার জন্য কৌশলে ব্যোমকেশের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, এ কথা শুনিতে যেমন অদ্ভুত, তেমনই হাস্যকর।

বীরেন বাবু ঈষৎ তীক্ষ্ণস্বরে বলিলেন, "হাসছেন যে?"

আমি অপ্রস্তুত হইয়া বলিলাম,—"আপনি দেবকুমার বাবুকে দেখেছেন?"

"না।"

"তাঁকে দেখলেই বুঝবেন, কেন হাসছি।"

অতঃপর বীরেন বাবু উঠিলেন। বিদায়কালে ব্যোমকেশকে বলিলেন,—"আমি এ ব্যাপারের তল পর্য্যন্ত অনুসন্ধান ক'রে দেখব। যদি কিনারা করতে পারি,—আপনি কিন্তু ছাড়া পাবেন না। দেবকুমার বাবু আপনাকে বরখাস্ত করেছেন বটে, কিন্তু দরকার হ'লে আমি আপনার কাছে আসব মনে রাখবেন।"

ব্যোমকেশ খুশী হইয়া বলিল,—"সে ত খুব ভাল কথা। আমার যতদূর সাধ্য আপনাকে সাহায্য করব। হাবুলের সম্পর্কে এ ব্যাপারে আমার একটা ব্যক্তিগত আকর্ষণও রয়েছে।"

বীরেন বাবু বলিলেন,—"বেশ বেশ। আচ্ছা, উপস্থিত কোন্ পথে চললে ভাল হয়, কিছু ইঙ্গিত দিতে পারেন কি? যা হোক একটা সূত্র ধ'রে কায আরম্ভ করতে হবে ত।"

ব্যোমকেশ ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিল,—"ডাক্তার রুদ্র'র দিক থেকে কায আরম্ভ করুন; এ গোলক-ধাঁধাঁর সত্যিকার পথ হয় ত ঐ দিকেই আছে।"

বীরেন বাবু সচকিতভাবে চাহিলেন। "ও—আচ্ছা—" তিনি নতমস্তকে ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিলেন।

৬

ইহার পর পাঁচ ছয় দিন একটানা ঘটনাহীনভাবে কাটিয়া গেল। ব্যোমকেশ আবার যেন ঝিমাইয়া পড়িল। সকালে কাগজ পড়া এবং বৈকালে টেবলের উপর পা তুলিয়া দৃষ্টিহীন চক্ষু শূন্যে মেলিয়া থাকা ছাড়া তাহার আর কাম রহিল না।

বীরেন বাবুও এ কয় দিনের মধ্যে দেখা দিলেন না; তাই তাঁহার তদন্ত কতদূর অগ্রসর হইল, জানিতে পারিলাম না। আগন্তুকের মধ্যে কেবল হাবুল একবার করিয়া আসিত। সে আসিলে ব্যোমকেশ নিজের অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিয়া নানাবিধ আলোচনায় তাহাকে প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু হাবুলে যেন একটা বিমর্ষ অবসন্নতা স্থায়িভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সে নৈরাশ্যপূর্ণ দীপ্তিহীন চোখে চাহিয়া নীরবে বসিয়া থাকিত, তার পর আস্তে আস্তে উঠিয়া চলিয়া যাইত।

বাড়ীতে কি হইতেছে না হইতেছে, জিজ্ঞাসা করিলেও সে ভালরূপ জবাব দিতে পারিত না। বিমাতার রসনা নরম না হইয়া আরও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কথার ভঙ্গীতে ইহার আভাস পাইতাম। শেষদিন সে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"বাবা আজ রাত্রিতে পাটনা যাচ্ছেন; সেখানে য়ুনিভার্সিটিতে লেকচার দিতে হবে।" বুঝিলাম, শোকের উপর অহর্নিশ কথার কচকচি সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি পলায়ন করিতেছেন। এই নির্লিপ্তস্বভাব বৈজ্ঞানিকের পারিবারিক অশান্তির কথা ভাবিয়া দুঃখ হইল।

সে দিন হাবুল প্রস্থান করিবার পর বীরেন বাবু

আসিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝিলাম, বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। তবু ব্যোমকেশ তাঁহাকে সমাদর করিয়া বসাইল, পুঁটিরামকে চা আনিবার হুকুম করিল।

আমাদের বৈকালিক চায়ের সময় হইয়াছিল, অচিরাৎ চা আসিয়া পৌঁছিল। তখন ব্যোমকেশ বীরেন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তার পর—খবর কিছু আছে?"

পেয়ালায় চুমুক দিয়া বিমর্ষভাবে বীরেন বাবু বলিলেন,—"কোনও দিকেই কিছু সুবিধা হচ্ছে না। যে দিকেই হাত বাড়াচ্ছি কিছু ধরতে—ছুঁতে পারছি না, প্রমাণ পাওয়া ত দূরের কথা, একটা সন্দেহের ইসারা পর্য্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ আমার দৃঢ় ধারণা জন্মেছে যে, এর ভেতর একটা গভীর রহস্য লুকোনো রয়েছে; যতই প্রতিপদে ব্যর্থ হচ্ছি, ততই এ বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে।"

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে নূতন কিছু জানতে পেরেছেন?"

বীরেন বাবু বলিলেন,—"আমি ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিলুম। তিনি অবশ্য রিপোর্টের বাইরে যেতে রাজি নন, তবু মনে হ'ল, তাঁর একটা থিয়োরি আছে। তিনি মনে করেন, কোনও অজ্ঞাত বিষের বাষ্প নাকে যাওয়ার ফলেই মৃত্যু হয়েছে। তিনি খুব অস্পষ্ট আবছায়াভাবে কথাটা বললেন বটে, তবু মনে হ'ল, তাঁর ঐ বিশ্বাস।"

ব্যোমকেশ একটু ভাবিয়া বলিল,—"উনুন ধরাবার সময় মৃত্যু হয়েছিল, এ কথা ডাক্তারকে বলেছিলেন বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"যাক।—আর এ দিকে? ডাক্তার রুদ্র সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ। যতদূর জানতে পারলুম, লোকটা নির্জ্জলা পাষণ্ড, আর অর্থ-পিশাচ। কয়েক জন ধনুষ্টঙ্কারের রোগীর উপর নিজের আবিষ্কৃত ইন্‌জেকশান পরীক্ষা করতে গিয়ে তাদের সাবাড় করেছে, এ গুজবও শুনেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান ব্যাপারে তাকে খুনের আসামী করা যায় না। দেবকুমার বাবুর মেয়ের সঙ্গে ওর ছেলের সম্বন্ধ হয়েছিল, এ খবরও ঠিক। লোকটা দশ হাজার টাকা বরপণ দাবী করেছিল। দেবকুমার বাবুর অত টাকা দেবার ক্ষমতা নেই, কাযেই তাঁকে সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিতে হ'ল। ডাক্তার রুদ্রের ছেলেটা কিন্তু ভদ্রলোক, বাপের সঙ্গে এই নিয়ে তার ভীষণ ঝগড়া বেধে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে এ বাড়ীতে এই কাণ্ড—মেয়েটি হঠাৎ মারা গেল। তার পর ছোকরাটি শুনলুম বাড়ী ছেড়ে কোথায় চ'লে গেছে; তার বিশ্বাস, তার বাপই প্রকারান্তরে মেয়েটির মৃত্যুর কারণ।"

মন্মথ যে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, এ সংবাদ নূতন বটে, কিন্তু আর সব কথাই আমরা পূর্ব্ব হইতে জানিতাম। তাই পুরাতন কথা শুনিতে শুনিতে ব্যোমকেশ একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। বীরেন বাবু থামিলে সে প্রশ্ন করিল,—"দেবকুমার বাবুর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবেন বলেছিলেন, করেছিলেন না কি?"

"করেছিলুম। তাঁর আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। ধার-কর্জ্জ নেই বটে, কিন্তু মেয়ের বিয়েতে দশ-বারো হাজার টাকা খরচ করা তাঁর অসাধ্য। লোকটি বোধ হয় একটু বেহিসাবী, সাংসারিক বুদ্ধি কম। কলেজ থেকে বর্ত্তমানে তিনি 'আটশ' টাকা মাইনে পান, কিন্তু, শুনলে আশ্চর্য্য হবেন, এই আটশ' টাকার অধিকাংশই যায় তাঁর বীমা কোম্পানীর পেটে। পঞ্চাশ হাজার টাকার লাইফ ইন্সিওরেন্স করিয়েছেন, তাও এত বেশী বয়সে যে, প্রিমিয়াম দিয়ে হাতে বড় কিছু থাকে না।"

ব্যোমকেশ বিস্মিতভাবে বলিল,—"পঞ্চাশ হাজার টাকার লাইফ ইন্সিওরেন্স। নিজের নামে করেছেন?"

"শুধু নিজের নামে নয়—জয়েণ্ট পলিসি, নিজের আর স্ত্রীর নামে। মাত্র এক বছর হ'ল পলিসি নিয়েছেন। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—তিনি মারা গেলে পাছে বিধবাকে পথে দাঁড়াতে হয়, এই জন্যেই বোধ হয় দু'জনে একসঙ্গে বীমা করিয়েছেন। এ টাকায় উত্তরাধিকারীদের কোনও দাবী থাকবে না।"

ব্যোমকেশ বলিল,—"হুঁ। আর কিছু?"

বীরেন বাবু বলিলেন,—"আর কি? দেবকুমার বাবুর ছেলে হাবুলের পিছনেও লোক লাগিয়েছিলুম—যদি কিছু জানতে পারা যায়। সে ছোকরা কেমন যেন পাগলাটে ধরণের, কলেজে বড় একটা যায় না, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, কখনও পার্কে চুপ ক'রে ব'সে থাকে। আপনার কাছেও রোজ একবার ক'রে আসে; জানতে পেরেছি—"

এই সময় হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম, ব্যোমকেশের সে শৈথিল্য

আর নাই, সে যেন অন্তরে-বাহিরে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। অনেক দিন পরে তাহার চোখে সেই চাপা উত্তেজনার প্রখর দৃষ্টি দেখিতে পাইলাম। কিছু না বুঝিয়াও আমার রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ কিন্তু বাহিরে কোনও উত্তেজনা প্রকাশ করিল না, পূর্ব্ববৎ বিরসস্বরে বলিল,—"হাবুলকে বাদ দিতে পারেন। উঠছেন না কি? থানাতেই থাকবেন ত? আচ্ছা—যদি দরকার হয়, ফোনে খবর নেব।"

বীরেন বাবু একটু অবাক্ হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি প্রস্থান করিবার পর ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ পিছনে হাত দিয়া ঘরময় পায়চারি করিল; দেখিলাম, তাহার চোখে সেই পুরাতন আলো জ্বলিতেছে। বীরেন বাবুকে সে হঠাৎ এমন ভাবে বিদায় দিল কেন, জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছি, এমন সময় সে চেয়ারের পিঠ হইতে শালখানা তুলিয়া লইয়া বলিল,—"চল একটু বেড়িয়ে আসা যাক্। বদ্ধ ঘরে ব'সে ব'সে মাথাটা গরম বোধ হচ্ছে।"

দু'জনে বাহির হইলাম। অকারণে বাড়ীর বাহির হইতে ব্যোমকেশের একটা মজ্জাগত বিমুখতা ছিল; কায না থাকিলে সে ঘরের কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে ভালবাসিত। আমিও তাহার সঙ্গদোষে কুণো হইয়া পড়িয়াছিলাম, একাকী কোথাও যাইবার অভ্যাসও ছাড়িয়া গিয়াছিল। তাই আজ তাহার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক ফাঁকা যায়গার বিশুদ্ধ বাতাস কামনা করিতেছে দেখিয়া খুসী হইয়া উঠিলাম।

পথে চলিতে চলিতে কিন্তু খুসীর ভাব বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। জনসঙ্কুল পথে ব্যোমকেশ এমনই বাহ্যজ্ঞানহীন উদ্‌ভ্রান্তভাবে চলিতে লাগিল যে, ভয় হইল, এখনই হয় ত একটা কাণ্ড বাধিয়া যাইবে। আমি তাহাকে সামলাইয়া লইয়া চলিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে অপ্রশমিত বেগে ইহাকে উহাকে ধাক্কা দিয়া, একবার এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের পা মাড়াইয়া দিয়া, কয়েক মুহূর্ত্ত পরে পুস্তকহস্তা এক তরুণীকে ঠেলা দিয়া, কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া জগন্নাথের অপ্রতিহত রথের মত অগ্রসর হইয়া চলিল। বাস্তবিক, এতটা আত্মবিস্মৃত তাহাকে আর কখনও দেখি নাই। তাহার মন যে অকস্মাৎ শিকারের সন্ধান পাইয়া বাহ্যেন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ হারাইয়া ছুটিয়াছে, তাহা আমি বুঝিতেছিলাম বটে, কিন্তু তাহার মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন পথচারী তাহা বুঝিবে কেন?

ভৎর্সনা-ভ্রূকুটির স্রোত পিছনে ফেলিয়া কোনক্রমে কলেজ স্কোয়ার পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিলাম। হাস্য-আলাপ-রত ছাত্রদের আবর্ত্তমান জনতায় স্থানটি ঘূর্ণিচক্রের মত পাক খাইতেছে। আমি আর দ্বিধা না করিয়া ব্যোমকেশের হাত শক্ত করিয়া ধরিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। এখানে আর যাহাই হউক, বৃদ্ধ এবং তরুণীকে বিমর্দ্দিত করিবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং অশিষ্টতা যদি কিছু ঘটিয়া যায়, ফাঁড়াটা সহজেই কাটিয়া যাইবে। আমাদের দেশের ছাত্ররা স্বভাবতঃ কলহপ্রিয় নয়।

পুকুরকে কেন্দ্র করিয়া দুইটি জনপ্রবাহ বিপরীত মুখে ঘুরিতেছে; আমরা একটি প্রবাহে মিশিয়া গেলাম, সংঘাতের সম্ভাবনা অনেকটা কমিয়া গেল। ব্যোমকেশ তখনও স্থানকাল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন, তাহার ললাট একাগ্র-চিন্তার সঙ্কোচনে ভ্রূকুটিবন্ধুর; কাঁধের শাল মাঝে মাঝে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু সে দিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই।

আমি ভাবিতে লাগিলাম, বীরেন বাবুর কথার মধ্যে এমন কি ছিল, যাহা ব্যোমকেশের নিষ্ক্রিয় মনকে অকস্মাৎ পাঞ্জাব মেলের এঞ্জিনের মত সক্রিয় করিয়া তুলিয়াছে? তবে কি রেখার মৃত্যু-সমস্যার সমাধান আসন্ন?

সমাধান যে কত আসন্ন, তখনও তাহা বুঝিতে পারি নাই।

আধ ঘণ্টা এই ভাবে পরিভ্রমণ করিবার পর ব্যোমকেশের বাহ্য চেতনা ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল; সে সহজ দৃষ্টিতে আমার পানে তাকাইল। বলিল,—"আজ দেবকুমার বাবু পাটনা যাবেন—না?"

আমি ঘাড় নাড়িলাম।

"তাঁকে যেতে দেওয়া হবে না—" ব্যোমকেশ সম্মুখদিকে তাকাইয়া কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই ক্ষিপ্রচরণে অগ্রসর হইয়া গেল। দেখিলাম, এক কোণে একখানি বেঞ্চি ঘিরিয়া অনেক ছেলে জড় হইয়াছে এবং উত্তেজিতভাবে কথা বলিতেছে। ভিড়ের বাহিরে যাহারা ছিল, তাহারা গলা বাড়াইয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের ভাব দেখিয়া মনে হইল, অসাধারণ কিছু ঘটিয়াছে।

সেখানে উপস্থিত হইয়া ব্যোমকেশ একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হয়েছে ?"

ছেলেটি বলিল,—"ঠিক বুঝতে পারছি না। বোধ হয়, কেউ হঠাৎ বেঞ্চে ব'সে ব'সে মারা গেছে।"

ব্যোমকেশ ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল, আমিও তাহার পশ্চাতে রহিলাম। বেঞ্চির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একটি ছোকরা ঠেসান দিয়া বসিয়া আছে,—যেন বসিয়া বসিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মাথা বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, পা সম্মুখদিকে প্রসারিত। অধরোষ্ঠ হইতে একটি সিগারেট ঝুলিতেছে,—সিগারেটে অগ্নিসংযোগ হয় নাই। মুষ্টিবদ্ধ বাঁ হাতের মধ্যে একটি দেশালাইয়ের বাক্স।

একটি মেডিক্যাল ছাত্র নাড়ী ধরিয়া দেখিতেছিল, বলিল,—"নাড়ী নেই—মারা গেছে।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, ভিড়ের মধ্যে ভাল দেখা যাইতেছিল না। ব্যোমকেশ চিবুক ধরিয়া মৃতের আনমিত মুখ তুলিয়াই যেন বিদ্যুদাহতের মত ছাড়িয়া দিল।

আমারও বুকে হাতুড়ির মত একটা প্রবল আঘাত লাগিল, দেখিলাম—আমাদের হাবুল।

৭

পুলিস আসিয়া পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। আমরা দেবকুমার বাবুর ঠিকানা পুলিসকে জানাইয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

তখন রাস্তায় গ্যাস জ্বলিয়াছে। দ্রুতপদে বাসার দিকে ফিরিতে ফিরিতে ব্যোমকেশ কয়েকবার যেন ভয়ার্ত্ত শ্বাস-সংহত স্বরে বলিল,—"উঃ! নিয়তির কি নিদারুণ প্রতিশোধ! কি নির্ম্মম পরিহাস!"

আমার মাথার ভিতর বুদ্ধিবৃত্তি যেন স্তম্ভিত নিশ্চল হইয়া গিয়াছিল; তবু, অসীম অনুশোচনার সঙ্গে কেবল এই কথাটাই মনে হইতে লাগিল—পরলোক যদি থাকে, তবে যাহার মৃত্যুতে হাবুল এত কাতর হইয়াছিল, সেই পরম স্নেহাস্পদ ভগিনীর সহিত তাহার এতক্ষণে মিলন হইয়াছে।

বাসায় পৌঁছিয়া ব্যোমকেশ নিজের লাইব্রেরী-ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। শুনিতে পাইলাম, সে টেলিফোনে কথা বলিতেছে।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ক্লান্তস্বরে পুঁটিরাম্‌কে চা তৈয়ার করিতে বলিল, তার পর বুকে ঘাড় গুঁজিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। যে ট্রাজেডির শেষ অঙ্কে যবনিকা পড়িতে আর দেরি নাই, তাহার সম্বন্ধে বৃথা প্রশ্ন করিয়া আমি আর তাহাকে বিরক্ত করিলাম না।

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় বীরেন বাবু আসিলেন। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"ওয়ারেণ্ট এনেছেন ?"

বীরেন বাবু ঘাড় নাড়িলেন।

তখন আবার আমরা বাহির হইলাম।

দেবকুমার বাবুর বাসায় পৌঁছিতে তিন চার মিনিট লাগিল। দেখিলাম, বাড়ী নিস্তব্ধ, উপরের ঘরগুলির জানালায় আলো নাই, কেবল নীচে বসিবার ঘরে বাতি জ্বলিতেছে।

বীরেন বাবু কড়া নাড়িলেন, কিন্তু ভিতর হইতে সাড়া আসিল না। তখন তিনি দ্বার ঠেলিলেন, ভেজানো দ্বার খুলিয়া গেল। আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

বাহিরের ক্ষুদ্র ঘরটিতে তক্তপোষ পাতা, তাহার উপর দেবকুমার বাবু নিশ্চলভাবে বসিয়া আছেন। আমরা প্রবেশ করিলে তিনি রক্তবর্ণ চক্ষু তুলিয়া আমাদের পানে চাহিলেন। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর তাঁহার মুখে একটা তিক্ত হাসি দেখা দিল, তিনি মাথা নাড়িয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন—"সকলি গরল ভেল—"

বীরেন বাবু অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"দেবকুমার বাবু, আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে।"

দেবকুমার বাবুর যেন চমক ভাঙ্গিল, তিনি দারোগা বাবুর পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"আপনারা এসেছেন—ভালই হ'ল। আমি নিজেই থানায় যাচ্ছিলুম—" দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন,—"হাতকড়া লাগান্।"

বীরেন বাবু বলিলেন,—"তার দরকার নেই। কোন্ অপরাধে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হ'ল শুনুন,—" বলিয়া অভিযোগ পড়িয়া শুনাইবার উপক্রম করিলেন।

দেবকুমার বাবু কিন্তু ইতিমধ্যে আবার অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন; পকেটে হাত দিয়া যেন কি খুঁজিতে খুঁজিতে নিজমনে বলিলেন,—"নিয়তি! নইলে হাবুলও ঐ বাক্স থেকেই দেশালাইয়ের কাঠি বার করতে গেল কেন? কি ভেবেছিলুম, কি হ'ল! ভেবেছিলুম, রেখার ভাল বিয়ে দেব, নিজের একটা বড় ল্যাবরেটারী করব, হাবুলকে

বিলেত পাঠাব"—পকেট হইতে সিগার বাহির করিয়া তিনি মুখে ধরিলেন।

ব্যোমকেশ নিজের দেশালাই জালিয়া তাঁহার সিগারে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিল। তার পর বলিল,—"দেবকুমার বাবু, আপনার দেশালাইটা আমাদের দিতে হবে।"

দেবকুমার বাবুর চোখে আবার সচেতন দৃষ্টি ফিরিয়া আসিল, তিনি বলিলেন,—"ব্যোমকেশ বাবু? আপনিও এসেছেন? ভয় নেই—আমি আত্মহত্যা করব না। ছেলেকে মেরেছি—মেয়েকে মেরেছি, আমি খুনী আসামীর মত ফাঁসীকাঠে ঝুলতে চাই—"

ব্যোমকেশ বলিল,—"দেশালাইয়ের বাক্সটা তবে দিন।"

পকেট হইতে বাক্স বাহির করিয়া দেবকুমার বাবু সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন, বলিলেন,—"নিন, কিন্তু সাবধান, বড় ভয়ানক জিনিষ। প্রত্যেকটি কাঠি এক-একটি মৃত্যুবাণ। একবার জ্বাললে আর রক্ষে নেই"—ব্যোমকেশ দেশালাইয়ের বাক্সটা বীরেন বাবুর হাতে দিল, তিনি সন্তর্পণে সেটা পকেটে রাখিলেন। দেবকুমার বাবু বলিয়া চলিলেন—"কি অদ্ভুত আবিষ্কারই করেছিলুম; পলকের মধ্যে মৃত্যু হবে, কিন্তু কোথাও এতটুকু চিহ্ন থাকবে না। আধুনিক যুদ্ধ-নীতির আমূল পরিবর্ত্তন হয়ে যেত। বিষ নয়—এ মহামারী। কিন্তু সকলি গরল ভেল—" তিনি বুকভাঙ্গা গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

বীরেন বাবু মৃদুস্বরে বলিলেন,—"দেবকুমার বাবু, এবার যাবার সময় হয়েছে।"

"চলুন"—তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ব্যোমকেশ একটু কুণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনার স্ত্রী কি বাড়ীতেই আছেন?"

"স্ত্রী!"—দেবকুমার বাবুর চোখ পাগলের চোখের মত ঘোলা হইয়া গেল, তিনি হা হা করিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—"স্ত্রী!—আমার ফাঁসীর পর ইন্সিওরেন্সের সব টাকা সে-ই পাবে। প্রকৃতির পরিহাস নয়—চলুন।"

একটা ট্যাক্সি ডাকা হইল। ব্যোমকেশ হাত ধরিয়া দেবকুমার বাবুকে তাহাতে তুলিয়া দিল; বীরেন বাবু তাঁহার পাশে বসিলেন। দুই জন কনেষ্টবল ইতিমধ্যে কোথা হইতে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহারাও ট্যাক্সিতে চাপিয়া বসিল।

দেবকুমার বাবু গাড়ীর ভিতর হইতে বলিলেন,—"ব্যোমকেশ বাবু, আপনি রেখার মৃত্যুর কিনারা করতে চেয়েছিলেন—আপনাকে ধন্যবাদ—"

আমরা ফুটপাথে দাঁড়াইয়া রহিলাম, ট্যাক্সি চলিয়া গেল।

দিন দুই ব্যোমকেশ এ বিষয়ে কোনও কথা কহিল না। তাহার মনের অবস্থা বুঝিয়া আমিও করিলাম না।

তৃতীয় দিন বৈকালে সে নিজেই বলিতে আরম্ভ করিল; এলোমেলো ভাবে কতকটা যেন নিজ মনেই বলিতে লাগিল—

"ইংরাজীতে একটা কথা আছে—vengence coming home to roost, দেবকুমার বাবুর হয়েছিল তাই। নিজের স্ত্রীকে তিনি মারতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এমনই অদৃষ্টের খেলা, দু'বার তিনি তাঁর অমোঘ অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করলেন, দু'বারই সে অগ্নিবাণ লাগল গিয়ে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র-কন্যার বুকে।

"দেবকুমার বাবু অপ্রত্যাশিতভাবে এক আবিষ্কার ক'রে ফেলেছিলেন। কিন্তু টাকার অভাবে সে আবিষ্কারের সদ্ব্যবহার করতে পারছিলেন না। এ এমনই আবিষ্কার যে, তার পেটেন্ট নেওয়া চলে না। কারণ, সাধারণ ব্যবসায়-জগতে এর ব্যবহার নেই। কিন্তু ঘুণাক্ষরে এর ফরমুলা জানতে পারলে জাপান, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স প্রভৃতি যুদ্ধোন্মত্ত রাজ্যলোলুপ জাতি নিজেদের কারখানায় এই প্রাণঘাতী বিষ তৈরী করতে আরম্ভ ক'রে দেবে। আবিষ্কর্ত্তা কিছুই করতে পারবেন না, এতবড় আবিষ্কার থেকে তাঁর এক কপর্দ্দক লাভ হবে না।

"সুতরাং আবিষ্কারের কথা দেবকুমার বাবু চেপে গেলেন। প্রথমে টাকা চাই, কারণ, এ বিষ কি ক'রে ব্যবহার করা যেতে পারে, সে বিষয়ে আরও অনেক এক্সপেরিমেন্ট করা দরকার। কিন্তু টাকা কোথায়? এত বড় এক্সপেরিমেন্ট গোপনে চালাতে গেলে নিজের ল্যাবরেটারী চাই—তাতে অনেক টাকার দরকার। কিন্তু টাকা আসে কোথা থেকে?

"এ দিকে বাড়ীতে দেবকুমার বাবুর স্ত্রী তাঁর জীবন দুর্ব্বহ ক'রে তুলেছিলেন। মানসিক পরিশ্রম যারা করে, তারা চায় সাংসারিক ব্যাপারে শান্তি, অথচ তাঁর জীবনে ঐ জিনিষটির

একান্ত অভাব হয়ে উঠেছিল। এক শুচিবায়ুগ্রস্ত মুখরা স্নেহহীনা স্ত্রীর নিত্য সাহচর্য্য তাঁকে পাগলের মত ক'রে তুলেছিল। এটা অনুমানে বুঝতে পারি, দেবকুমার বাবু স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক নন, শান্তিতে নিজের বৈজ্ঞানিক চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকতে পারলে তিনি আর কিছু চান না। তাঁর মনটি যে খুব স্নেহ-প্রবণ, তাঁর ছেলে-মেয়ের প্রতি ভালবাসা দেখেই আন্দাজ করা যায়। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীও চেষ্টা করলে এই স্নেহের অংশ পেতে পারতেন; কিন্তু স্বভাবদোষে তিনি তা পেলেন না; বরঞ্চ দেবকুমার বাবু তাঁকে বিষবৎ ঘৃণা করতে আরম্ভ করলেন।

"নিজের স্ত্রীকে হত্যা করবার ইচ্ছা মানুষের স্বাভাবিক নয়; যখন এ প্রবৃত্তি তার হয়, তখন বুঝতে হবে—সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। দেবকুমার বাবুরও সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হয়েছিল। তার পর তিনি যখন এই ভয়ঙ্কর বিষ আবিষ্কার করলেন, তখন বোধ হয়, প্রথমেই তাঁর মনে হ'ল স্ত্রীর কথা। তিনি মনে মনে আগুন নিয়ে খেলা আরম্ভ করলেন।

"তার পর তাঁর সব সংশয়ের সমাধান ক'রে বীমা কোম্পানীর যুগ্ম-জীবন পলিসির বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল,—স্বামি-স্ত্রী একসঙ্গে জীবন বীমা করতে পারে, এক জন মরলে অন্য জন টাকা পাবে। এমন সুযোগ তিনি আর কোথায় পাবেন? যদি এই ভাবে জীবন বীমা ক'রে পরে তাঁর আবিষ্কৃত বিষ দিয়ে স্ত্রীকে মারতে পারেন—এক ঢিলে দুই পাখী মরবে; তিনি তাঁর বাঞ্ছিত টাকা পাবেন; স্ত্রীও মরবে এমন ভাবে যে, কেউ বুঝতে পারবে না, কি ক'রে মৃত্যু হ'ল।

"দেবকুমার বাবু একেবারে পঞ্চাশ হাজার টাকার জীবন বীমা করালেন; তার পর অসীম ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাড়াতাড়ি করলে চলবে না, বীমা কোম্পানীর সন্দেহ হ'তে পারে। এই ভাবে এক বছর কেটে গেল। তিনি মনে মনে স্থির করলেন, এই বড় দিনের ছুটীতে তাঁর মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করবেন।

"তাঁর আবিষ্কৃত বিষের প্রকৃতি অনেকটা বিস্ফোরক বারুদের মত; এম্‌নিতে সে অতি নিরীহ, কিন্তু একবার আগুনের সংস্পর্শে এলে তার ভয়ঙ্কর শক্তি বাষ্পরূপ ধ'রে বেরিয়ে আসে। সে-বাষ্প কারুর নাকে কণামাত্র গেলেও আর রক্ষে নেই, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হবে।

"দেবকুমার বাবু তাঁর স্ত্রীর উপর এই বিষপ্রয়োগ করবার এক চমৎকার উপায় বার করলেন। বৈজ্ঞানিকের মাথা ছাড়া এমন বুদ্ধি বেরোয় না। তিনি কতকগুলি দেশালাইয়ের কাঠির বারুদের সঙ্গে এই বিষ মাখিয়ে দিলেন। কি উপায়ে মাখালেন, বলতে পারি না, কিন্তু ফল দাঁড়ালো—যিনি সেই কাঠি জ্বালবেন, তাঁকেই মরতে হবে। এই ভাবে বিষাক্ত দেশালাইয়ের কাঠি তৈরী ক'রে তিনি দিল্লীতে বিজ্ঞানসভার অধিবেশনে যোগ দিবার জন্যে প্রস্তুত হ'তে লাগলেন। ক্রমে দিল্লী যাবার সময় উপস্থিত হ'ল; তখন তিনি সময় বুঝে তাঁর স্ত্রীর দেশালাইয়ের বাক্সতে একটি কাঠি রেখে দিয়ে দিল্লী যাত্রা করলেন। তিনি জানতেন, তাঁর স্ত্রী রোজ রাত্রিতে শোবার আগে ঐ দেশালাই দিয়ে ল্যাম্প জ্বালেন—এ দেশালাইয়ের বাক্স অন্যত্র ব্যবহার হয় না। আজ হোক, কাল হোক, গৃহিণী সেই কাঠিটি জ্বালবেন। দেবকুমার বাবু থাকবেন তখন ন'শ মাইল দূরে—এ যে তাঁর কায, এ কথা কেউ মনেও আনতে পারবে না।

"সবই ঠিক হয়েছিল, কিন্তু রাম উল্টো বুঝলেন। স্ত্রীর বদলে রেখা উনুন ধরাতে গিয়ে সেই কাঠিটি জ্বাললেন।

"দিল্লী থেকে দেবকুমার বাবু ফিরে এলেন। এই বিপর্য্যয়ে তাঁর মন স্ত্রীর বিরুদ্ধে আরও বিষিয়ে উঠল। তাঁর জিদ্ চ'ড়ে গেল, মেয়ে যখন গিয়েছে, তখন ওকেও তিনি শেষ ক'রে ছাড়বেন। কয়েক দিন কেটে গেল, তার পর আবার তিনি স্ত্রীর দেশালাইয়ের বাক্সে একটি কাঠি রেখে পাটনা যাবার জন্য তৈরী হলেন।

"কিন্তু এবার আর তাঁকে যেতে হ'ল না। হাবুল সিগারেট খেত; বোধ হয়, তার দেশালাইয়ের বাক্সটা খালি হয়ে গিয়েছিল, তাই সে সৎ-মার ঘরের দেশালাইয়ের বাক্স থেকে কয়েকটি কাঠি নিজের বাক্সে পুরে নিয়ে বেড়াতে চ'লে গেল। তার পর—

"কি ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশা কালকূট যে দেবকুমার বাবু বিজ্ঞান-সাগর মন্থন ক'রে তুলেছিলেন তাঁর জীবনে—সকলি গরল ভেল।"

ব্যোমকেশ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল।

কিয়ৎকাল পরে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আচ্ছা, দেবকুমার বাবু যে অপরাধী, এটা তুমি প্রথম বুঝলে কখন্?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"যে মুহূর্ত্তে শুনলুম যে, দেবকুমার বাবু পঞ্চাশ হাজার টাকার জীবন বীমা করিয়েছেন, সেই মুহূর্ত্তে। তার আগে রেখাকে হত্যা করবার একটা সন্তোষ-জনক উদ্দেশ্যই পাওয়া যাচ্ছিল না। কে তাকে মেরে লাভবান্ হ'ল, কার স্বার্থে সে ব্যাঘাত দিচ্ছিল—এ কথাটার ভাল রকম জবাব পাওয়া যাচ্ছিল না। রেখা যে হত্যাকারীর লক্ষ্য নয়, তা ত আমরা জানতুম না।

"কিন্তু আর এক দিক্ থেকে একটি ছোট্ট সূত্র হাতে এসেছিল। রেখার দেহ-পরীক্ষায় যখন বিষ পাওয়া গেল না, তখন কেবল একটা সম্ভাবনাই গ্রহণযোগ্য রইল—অর্থাৎ যে-বিষে তার মৃত্যু হয়েছে, সে-বিষ বৈজ্ঞানিকদের অপরিচিত। মানে, নূতন আবিষ্কার। মনে আছে—দিল্লীতে দেবকুমার বাবুর বক্তৃতা? আমরা তখন সেটা অক্ষমের বাস্ফোট ব'লে উড়িয়ে দিয়েছিলুম। কে জানত, তিনি সত্যিই এক অদ্ভুত আবিষ্কার ক'রে ব'সে আছেন; আর, তারই চাপা ইঙ্গিত তাঁর বক্তৃতায় ফুটে বেরুচ্ছে!

"সে যা হোক, কথা দাঁড়ালো—এই নূতন আবিষ্কার কোথা থেকে এল? দু'জন বৈজ্ঞানিক হাতের কাছে রয়েছে—এক ডাক্তার রুদ্র, দ্বিতীয় দেবকুমার বাবু। এঁদের দু'জনের মধ্যে এক জন এই অজ্ঞাত বিষের আবিষ্কর্ত্তা। কিন্তু ডাক্তার রুদ্র'র উপর সন্দেহটা বেশী হয়, কারণ, তিনি ডাক্তার, বিষ নিয়ে নাড়াচাড়া তাঁরই বেশী। তা ছাড়া দেবকুমার বাবু বিষের আবিষ্কর্ত্তা হ'লে তিনি কি নিজের মেয়ের উপর সে বিষ প্রয়োগ করবেন?

"কাজেই সব সন্দেহ পড়ল গিয়ে ডাক্তার রুদ্র'র উপর। কিন্তু তবু আমার মন খুঁতখুঁত করতে লাগ্ল। ডাক্তার রুদ্র লোকটা অতি পাজি, কিন্তু তাই ব'লে সে এত সামান্য কারণে একটি মেয়েকে খুন করবে? আর, যদিই বা সে তা করতে চায়, রেখার নাগাল পাবে কি ক'রে? কোন্ উপায়ে আর এক জনের বাড়ীতে বিষ পাঠাবে? রেখার সঙ্গে খগেনবাবুর ছাদের উপর থেকে দেখাদেখি—চিঠি-ফেলাফেলি চলত; কিন্তু ডাক্তার রুদ্র'র সঙ্গে ত সে রকম কিছু ছিল না।

"কোনও বিষাক্ত বাষ্পই যে মৃত্যুর কারণ, এ চিন্তাটা গোড়া থেকে আমার মাথায় ধোঁয়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মনে ক'রে দেখ, রেখার এক হাতে পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি, আর এক হাতে বাক্স ছিল; অর্থাৎ দেশলাই জ্বালার পরই মৃত্যু হয়েছে। সংযোগটা সম্পূর্ণ আকস্মিক হ'তে পারে, আবার কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধও থাকতে পারে। দেবকুমার বাবু কিন্তু বড় চালাকী করেছিলেন, বাক্সে একটি বৈ বিষাক্ত কাঠি দেননি—যাতে বাক্সের অন্যান্য কাঠি পরীক্ষা ক'রে কোনও হদিস পাওয়া না যায়। আমি সে বাক্সটা এনে-ছিলুম, পরীক্ষাও করেছিলুম, কিন্তু কিছু পাইনি। হাবুলের বেলাতেও বাক্সে একটি বিষাক্ত কাঠিই ছিল, কিন্তু এমনই দুর্দ্দৈব যে, সেইটেই হাবুল পকেটে ক'রে নিয়ে এল—আর প্রথমেই জ্বাললে।

"অজিত, তুমি ত লেখক, দেবকুমার বাবুর এই ব্যাপারের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড রূপক দেখতে পাচ্ছ না? মানুষ যে দিন প্রথম অন্যকে হত্যা করবার অস্ত্র আবিষ্কার করেছিল, সে দিন সে নিজেরই মৃত্যুবাণ নির্ম্মাণ করেছিল; আর আজ সারা পৃথিবী জুড়ে গোপনে গোপনে এই যে হিংসার কুটিল বিষ তৈরী হচ্ছে, এও মানুষ জাতটাকে এক দিন নিঃশেষে ধ্বংস ক'রে ফেলবে—ব্রহ্মার ধ্যান-উদ্ভূত দৈত্যের মত সে স্রষ্টাকেও রেয়াৎ করবে না। মনে হয় না কি?"

ঘর অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল, ব্যোমকেশকে ভাল দেখা যাইতেছিল না। আমার মনে হইল, তাহার শেষ কথাগুলা কেবল জল্পনা নয়—ভবিষ্যদ্বাণী।

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (বি এল)।





কাফ্রীদের মেয়ে

১। পূর্ব্ব-আফ্রিকা

কাফ্রীর দেশ আফ্রিকা—মস্ত দেশ। এ দেশে আজ য়ুরোপের নানা জাতি আসন পাতিয়া বসিয়াছে। সেই রাজনৈতিক বিভাগ-হেতু আফ্রিকার নানা প্রদেশে বেশে-ভূষায় আচারে-নীতিতে আজ বহু বিভেদ, বহু পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। এ-সব পারিপার্শ্বিক আব-হাওয়ার অন্তরালে কাফ্রী-মেয়েদের অন্তরের যে-পরিচয় আদিম ও অকৃত্রিম, আমরা তাহারি আলোচনা করিব।

প্রথমে পূর্ব্ব-আফ্রিকার কথা বলি।

কেনিয়ার একটু পশ্চিমে উগাণ্ডা। (মানচিত্র দেখুন) উগাণ্ডায় দু-শ্রেণীর লোক বাস করে। এক, আদিম সর্দ্দার বা সম্ভ্রান্ত বংশের; দুই, জন-সাধারণ। সর্দ্দারের বংশ বহু শত বর্ষ পূর্ব্বে আসে আবিশীনিয়া হইতে। ইহারা জাতে হাবশী। এই হাবশী-বংশীয়েরা উগাণ্ডার বনিয়াদী বা সম্ভ্রান্ত বংশীয় বলিয়া মান-মর্য্যাদা পাইয়া আসিতেছে দীর্ঘকাল ধরিয়া। এ জাতের নাম 'ওয়াহুমা'।

সাধারণ কাফ্রী-ঘরের মেয়েদের মধ্য হইতে ওয়াহুমা জাতের মেয়েদের চিনিয়া বাছিয়া লইতে কষ্ট হয় না। হাবশী-ওয়াহুমা-ঘরের মেয়েরা মাথায় খুব লম্বা; মুখে-চোখে দম্ভের ছাপ লাগিয়া আছে; তাদের চলা-ফেরার রীতিই স্বতন্ত্র। উগাণ্ডার সাধারণ মেয়েদের গায়ের রঙ তামাটে-গোছ; চোখের তারা বাদামী-রঙের; সুছন্দে গঠিত দেহে প্রচুর শক্তি। যৌবনে সত্যই দেখিতে ভালো। গায়ে ইহারা নক্সা কাটে না। সকলেই সুদশনা—দাঁতগুলি মানানসই এবং কুন্দ-শুভ্র। এরা নানা ছাঁদে বেণী বাঁধে, গল্প বলিতে নিপুণ। অনেক ঘরে দেখা যায়, মেয়েরা মাথায় চুল রাখে না, মাথা কামায়; এবং নিজেদের স্তন-দুগ্ধ গায়ে মাখে। ইহাদের কাণ ছোট; কাণে ছিদ্র করিয়া মাকড়ি বা লোঙর ঝুলানোর রেওয়াজ নাই! গায়ের চামড়া বেশ মসৃণ, কোমল; কণ্ঠের স্বর মিষ্ট মধুর।

পথে বাহির হইবার সময় উগাণ্ডার সাধারণ ঘরের মেয়েরা অঙ্গ আবৃত রাখে। নগ্ন তনু-বিলাসের চেষ্টা করিলে শুধু নিন্দা রটে না; সামাজিক শাস্তি গ্রহণ করিতে হয়। বসন তৈয়ার হয় 'ফিগ'-গাছের ছালে। প্রথমে শেমিজের মত একখণ্ড বাকল কোমরে জড়ায়; তার উপর পরে লুঙ্গি বা শাড়ীর ধরণে আর-একখানি বাকল। সেখানি দেহে জড়ায়; বুক ঢাকিয়া বগলের নীচে পর্য্যন্ত এই দ্বিতীয় আবরণ টানা থাকে। উগাণ্ডার রাজা মেশার রাজত্ব-কালে মেয়েদের বক্ষ-বাস মুক্ত থাকিলে (পথে বাহির হইবার সময়) কঠিন শাস্তি দেওয়া হইত। ঘরে অবশ্য কাফ্রী-যুবতীরা গায়ে আবরণ রাখে না, লজ্জা ঢাকে শুধু কৌপীনে তবলকির ঝালর ঝুলাইয়া। মেয়েদের অঙ্গে যেন গহনার মিউজিয়ম খোলা হয়! তারা গলায় ঝুলায় অসংখ্য নেকলেশ; হাতে আঁটে বালা, ব্রেশলেট, চুড়ি; কোমরে পরে চন্দ্রহার। এ চন্দ্রহার সোনায় রচা নয়, তবলকি বা কাচে-রচা। তবলকির বর্ণ বিচিত্র; বাহার খোলে চমৎকার—রুচির তারিফ করিতে হয়! কাঠের টুকরা কাটিয়া তাহা কুঁদিয়া মালা ও চন্দ্রহার তৈয়ার হয়! স্যাকরা ডাকিয়া গহনা গড়ানো হয় না; কাফ্রী-মেয়েরা ঘরে বসিয়া এ-সব গহনা তৈয়ার করে। আমাদের দেশে সেকালে মেয়েদের মধ্যে যেমন কাঁথা-শিল্পে কারিগরি খেলাইবার সখ ছিল, এখানকার মেয়েরা তেমনি এই গহনা-রচনার ব্যাপারে গুণপনা দেখাইতে ব্যগ্র।



এখানকার মেয়ে-পুরুষে ধূমপান করে। পাণ খায় না। সারাক্ষণ কপির পাতা মুখে চিবায়।

উগাণ্ডা-প্রদেশটি যেন সুরম্য উপবন। সম্ভ্রান্ত সর্দার বংশীয়দিগের গৃহ অবশ্য খড়ে ছাওয়া, তাহা হইলেও প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড আছে। কম্পাউণ্ডে ফল-ফুলের বাগান অন্দর-বাড়ী আলাদা বেড়ায় ঘেরা। সেখানে সকলে প্রবেশ করিতে পারে না।

এ-দেশে বিবাহের রীতি সনাতন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে সেই এক ধারায়। কন্যা কিনিতে হয়। সাধারণ গৃহস্থ-ঘরে বিবাহের পূর্বে কন্যা লইয়া দর-কষাকষি চলে, তিন-চারিটা বলদের বিনিময়ে গৃহস্থ-ঘরে বিবাহ-যোগ্য কন্যা মিলে, দর ঠিক হইয়া গেলে বরকে স্বতন্ত্র কুটীর নির্মাণ করিতে হয়। কুটীর তৈয়ার হইলে বিবাহ করিয়া কন্যাকে লইয়া বর সেই কুটীরে গিয়া ওঠে এবং সেখানে দুজনে বাস করে। যাদের অবস্থা একটু ভালো, বিবাহ-উপলক্ষে তাদের ঘরে নাচ-গানের সমারোহ চলে। কন্যার পিতাকে ভোজের

ব্যবস্থা করিতে হয়। বিবাহের পর নব-নির্ম্মিত গৃহে বর ও বধূ রাত্রি যাপন করে। প্রাতে উভয় পক্ষের আত্মীয়-বন্ধুরা আসিয়া তাদের অভ্যর্থনা করিয়া ঘরের বাহিরে আনে এবং নাচ গান ভোজ চলে খুব সমারোহে। এখানে যে সব গান হয়, সে গানে সংসার-পরিচালনা সম্বন্ধে নানা উপদেশ ছন্দে ভাষায় গাঁথা থাকে।

উগাণ্ডার উত্তরাঞ্চলে এক মজার বিধি আছে। বিবাহের পর স্বামীর সাধনা চলে— স্ত্রীকে খুব 'হৃষ্টপুষ্ট' করিয়া তুলিতে। দেহের স্থূলত্বই এ মুল্লুকে সৌন্দর্য্যের আদর্শ! কাযেই এই আদর্শ-সৌন্দর্য্য-লাভের জন্য মেয়েদের কশরতির অন্ত থাকে না। তাদের দুগ্ধ পান করানো হয় পেট ঠাশিয়া এবং অনেকের দেহ এমন মোটা হয় যে তারা হাঁটিতে কষ্ট বোধ করে—হামা দিয়া চলাফেরা করিতে হয়। হাঁটা বন্ধ করিয়া মেয়েরা যখন হামা দিয়া চলে, তখন তাদের সুন্দরী-কুলে অগ্রগণ্যা বলিয়া স্বীকার করা হয়। এ জাতের নাম ওয়ানিয়োরো। ওয়ানিয়োরো জাতের নর-নারী খুব অলস—তবে বুদ্ধি তীক্ষ্ণ।

ওয়ানিয়োরো-সর্দ্দারের অন্দরে সর্দ্দারণীর হাট লাগিয়া আছে। সর্দ্দারেরা যত খুশী বিবাহ করে। এত সর্দ্দারণী গৃহে থাকিলে সকলের উপর নেক-নজর রাখা কঠিন হয়; কাযেই সর্দ্দারের রুচি বিগড়াইলে অন্দরের বহু সর্দ্দারণী বাহিরে গিয়া যার-তার কাছে যৌবন-মধু বিতরণ করিয়া বেড়ায়; তাহাতে লজ্জা বা নিন্দা বা কলঙ্কের আঁচ গায়ে লাগে না। বাহিরের কোন পুরুষকে যদি খুব ভালো লাগে, তবে তার সঙ্গে গিয়া দু-চারি মাস



লাগু-সুলতানেব পত্নীদল



উগাণ্ডা-যুবতী

গায়ে নক্সা—মাথা কামানো



উগাণ্ডা-নারীর কর্ণভূষণ

বাস করে—ক্ষতি নাই! কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে সব পুরুষকে সর্দ্দার-গৃহের রমণী-উপভোগ করার মূল্য-স্বরূপ একটা ট্যাক্স দিতে হয়!

এখানে নরমাংস-ভোজনের রীতি একেবারে উঠিয়া যায় নাই; তবে যে পরিবারের লোক নর-মাংস খায়, 'অখাদ্য' খাওয়ার কলঙ্কে সে-গৃহ-পরিবার কলঙ্কিত হয়; এবং সে ঘরের মেয়েদের বিবাহে বড় গোলযোগ ওঠে। অখাদ্য-ভোজী পরিবার হইতে কন্যা গ্রহণ করিলে সমাজে নিন্দা রটে। সে ঘরে বিবাহ করিলে বরকে অনেক সময় একঘরে হইয়া থাকিতে হয়।



কিকুয়ু নারী গম ভাঙ্গিতেছে

এ মুলুকের মেয়েরা পুরুষের মোহ-বিভ্রম জাগাইবার বাসনায় নয়নে কাজলরেখা আঁকে। পাতার রস দিয়া এ কাজল রচিতে হয়! এ কাজলে নাকি বিপুল নেশা হয়! এবং এ কাজলের অঙ্গপাশে আহত পুরুষ কাজল-কাটা রমণীর পিছনে ল্যাংবোটের মত ঘুরিয়া মরে!

ওয়ানিয়োরো-জাতের বিশ্বাস, শিম্পাঞ্জি, বনমানুষ ও হাতী এক কালে মানুষ ছিল; গুরুজনের কোপে ভাষাহারা পশু বনিয়া গিয়াছে! কুকুরও নাকি এককালে কথা বলিতে পারিত,—তার ভাগ্যও দেবতার অভিশাপে বিড়ম্বিত হইয়াছে।

এ সম্বন্ধে ওয়ানিয়োরোয় এক প্রাচীন গল্প আছে—গল্পটি ভারী কৌতুককর। এক ধার্ম্মিকের ছিল একটি মেয়ে। প্রতিবেশী এক ভদ্রলোক তার ছেলের সঙ্গে এই মেয়ের বিবাহ দিতে চায়। বিবাহ হয়; এবং বর ও বধূ এক সঙ্গে কিছুকাল মনের সুখে বাস করে। মেয়েটি কিন্তু যখন তখন বাপের বাড়ী যাইত; এ জন্য স্বামী একদিন স্ত্রীকে দারুণ ভর্ৎসনা করে। বলে—তুমি পর-পুরুষকে ভজিতে যাও! মেয়েটি তবু বাপের বাড়ী যাওয়া ছাড়িল না। স্বামীর বাক্যবাণ শেষে পীড়নে প্রহারে গিয়া দাঁড়ায়। মেয়ে আসিয়া বাপের কাছে নালিশ করিল। মেয়ের অপবাদ শুনিয়া বাপ করিল আত্মহত্যা—জামাতা খবর শুনিয়া মৃত শ্বশুরকে দেখিতে আসিল; শ্বশুরের প্রেতাত্মা তখন অত্যাচারী জামাতাকে নিমেষে 'শিম্পাঞ্জি' করিয়া দিল।

স্ত্রী মনের দুঃখে শিম্পাঞ্জি স্বামীর সঙ্গে বনে গেল; এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততি পুরুষানুক্রমে বনের বনমানুষ হইয়া আজ বনে বংশ বিস্তার করিয়া বসিয়াছে!

আমাদের গঙ্গা নদীর যেমন অনেক নাম আছে—কোথাও নীলধারা, কোথাও গঙ্গা, কোথাও বা হুগলী, ভাগীরথী; আফ্রিকার নীল-নদেরও তেমনি দেশভেদে নামের ইতর-বিশেষ ঘটিয়াছে। একাংশের নাম শ্বেত নীল (White Nile)। এই শ্বেত-নীলের পূর্ব্ব উপকূলে মাদি-জাতির বাস। মাদি-জাতির নানা শ্রেণী আছে—শিলুক, জুর, বোঙ্গো, গুলি, গোলো, লুরি, উমিরো, ডিঙ্কা, মাক্রাকা। এই মাক্রাকা-সম্প্রদায় এখনো নর-মাংস ভোজন করে।

মাদি (কখনো বা মোরু নামে অভিহিত) জাতের মেয়েরা মাথায় খুব লম্বা নয়, বেঁটেও নয়। ইহাদের স্বাস্থ্য ভালো, গড়ন নিটোল। ইহারা গায়ে নক্সা কাটে না, চুলে রঙ মাখে না। মাথায় প্রচুর কেশ। প্রায় আট ইঞ্চি দীর্ঘ হয়; তখন ছাঁটিয়া বর্ত্তুলাকারে কুঞ্চিত করে। মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের চুল ছাঁটে; নাপিত ডাকে না। আর একটি প্রথা আছে—চারিটা incision দাঁত তুলিয়া ফেলে; এ জন্য মুখের কথা অস্পষ্ট থাকিয়া যায়। কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মাদি-জাতের মেয়েরা বসন পরিত না—কোমরে ঘুন্সী বাঁধিয়া তাহাতে কড়ি ও ঝিনুক বা কাচের মালা গাঁথিয়া ঝুলাইয়া দিত; কখনো বা তরু-পত্র ঝুলাইত।

এ জাতির মেয়ে-পুরুষ সুরা পান করে; তবে সে পান-কার্য্য বাস-গৃহে চলে না। প্রতি গৃহে একখানি করিয়া স্বতন্ত্র ঘর থাকে—ঘর অবশ্য পাতায় ছাওয়া; সেই ঘরে ভিন্ন অন্য ঘরে সুরাপান নিষেধ। এ সুরা বাড়ীর মেয়েরা চোলাই করে।

মাদিদের মেয়েরা বৈদ্যগিরিতে ওস্তাদ। পুরুষরা চিকিৎসা করে কাটাছেঁড়ার ও সর্প-দংশনের। মেয়েরা বৈদ্যগিরি করিয়া 'ভিজিট' পায়—গরু, ভেড়া কিম্বা এক-গোছা তীর। ঔষধ বড় নাই—ঝাঁড়ফুঁক ও মন্ত্রাদিতে চিকিৎসা-কার্য্য চলিয়া আসিতেছে সেই মান্ধাতার আমল হইতে।

এ জাতের মধ্যে কাহারও উন্মাদরোগ হইলে তাকে পথে প্রান্তরে আনিয়া পাখীদের দিয়া পরখ করায়। পাখীরা যদি ঠোকর দিয়া তার মাংস ভোজন করে, তবে উন্মাদরোগ সম্বন্ধে কোনো সংশয় থাকে না! পাখী তার মাংস ভোজন না করিলে রোগীর পাগলামি লক্ষণ যতই প্রকাশ পাক, তাকে কেহ পাগল বলিয়া স্বীকার করিবে না।

এ দেশের মেয়েরা দ্বন্দ্বযুদ্ধ (duels) করে। যুদ্ধের সময় হাতে পরে লোহার বালা; অস্ত্র লয়—শাণিত বর্শা। এ যুদ্ধ এমন প্রবল হয় যে উভয় পক্ষে রক্তাক্ত মূর্চ্ছাগত না হইলে যুদ্ধের বিরাম ঘটে না।

মাদি-জাতের মেয়েদের বসন অল্প হইলেও নিষ্ঠা অসাধারণ। অসতীত্বের অপবাদ মাদি-জাতের মেয়েদের বড়



কিসুম-সর্দ্দারের কন্যাগণ

কেহ দিতে পারিবে না। উগাণ্ডা ও ওয়ানিরো জাতের মেয়েরা বসনরাশিতে আবরু রক্ষা করিলেও দেহ-দানে তাদের কৃপণতা নাই!

ডিঙ্কা জাতের মেয়েরা কোমরে ঘুন্সী বাঁধিয়া সেই ঘুন্সীতে ঘাঘরা আঁটে। গায়ে একেবারে গহনার বাজার বসায়। মাথার চুল রাখে না; মাথা কামায়। কাণে আঁটে ইয়ারিং।

এ জাতের পুরুষ বহুবিবাহ করে—পত্নীর দাম গরু বাছুর। যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিলে গো-দানে খেসারতীর ব্যবস্থা

আছে। পত্নী ও কন্যাদান করিয়াও খেশারৎ দিবার প্রথা প্রচলিত আছে। পত্নী—পরিবারের সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হয়।

উগাণ্ডা ও ভারত-সাগর-উপকূল-মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে কিকুয়ু জাতির বাস। পাহাড়ের বুকে কুটীর বাঁধিয়া সেই



মাশাই-কুমারী—কাণে প্লাগ.!

কুটীরে তারা বাস করে। শত্রু আসিয়া হানা দিবার প্রয়াস পাইলে পাহাড়ে বসিয়া পূর্ব্বাহ্নেই গতিরোধে উদ্যত হয়।

কিকুয়ু জাতের প্রধান কায চাষ-বাস। মেয়েরা ক্ষেতে কাজ করে; পুরুষরা কাপড় বোনে। এ জাতের মেয়ে-পুরুষ গায়ে নক্সা কাটে।

আকাম্বা জাতের মেয়েরা এ তল্লাটে উহারি মধ্যে একটু 'সুন্দরী'! কিন্তু মেয়ে জাতের ঘাড়ে কাজের এমন ভার চাপানো আছে যে, সেই কাজের ভারে রূপ-যৌবন অকালে ঝরিয়া তাদের কদর্য্য কুৎসিত করিয়া তোলে।

মাশাই জাতের মেয়েরা কাণে প্রশস্ত ছিদ্র করে; সে ছিদ্রে তারা ঢেঁড়ি ঝুমকা ঝুলায়, লোহার শিকল, ঢাকের মত বড় আরো কত জিনিস আঁটে—তার আর সীমা নাই!

মাশাই জাতের পুরুষ একটি স্ত্রী লইয়া কারবার করে না। দু'টা স্ত্রী তো তুচ্ছ কথা! এক এক স্বামীর আছে চার-



মাশাই-নারী—কাণের দশা দেখুন!

চার স্ত্রী। মেয়েদের গহনার অন্ত নাই। আমাদের দেশে সেকালে মেয়েরা যেমন 'পাঁয়জোর' পরিত, এদেশের মেয়েরা পায়ে তেমনি চরণপদ্মের ভঙ্গীতে বেড়ি পরে। হাঁটুর নীচে হইতে উরুর খানিকটা পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফের তার জড়ায় নানা ফেরতায়! এই বেড়ি ও তারের বাঁধনের জন্য অতি ধীরে চলিতে হয়। চট্ করিয়া বসিবে, দাঁড়াইবে, তার উপায় থাকে না। হাতেও এমনি তারের বালা, বাজুবন্ধ, তাবিজ এবং গলায় তারের হার বহু ফালিতে জড়ানো থাকে, বুকেও দোলে। গহনাগুলি এক সঙ্গে অঙ্গে আঁটা হয় নব-যৌবনের উন্মেষ ঘটিবামাত্র; তার পর যৌবনের স্রোত অঙ্গে অঙ্গে ভরিয়া ওঠে, তখনো হাতে পায়ে সেই গহনা! তাদের চাপে

দেহ যদি কাটিয়া যায়, টুটিয়া যায়, গহনা নিগড় হইয়া চাপিয়া ধরে, তবু তাহা খুলিবার উপায় নাই! সমাজে ইজ্জতের ওজন বুঝিয়া গহনার ওজনে কম-বেশী হয়। এক একটি রমণীর অঙ্গে পনেরো সের, আধ মণ ওজনের লোহার তার, সেই সঙ্গে কাচের মালা, হাড়ের মালা আকণ্ঠ আঁটা থাকে!

এ জাতের পুরুষের দল যেথায় সেথায় হল্লা করিয়া বেড়ায়। মারপিঠ, লুঠপাট লইয়া সারাক্ষণ ব্যস্ত, অথচ মেয়েরা ঘরে বসিয়া নিষ্ঠা-ভরে সতীধর্ম্ম পালন করে কি করিয়া, তাহা দেখিয়া পাশ্চাত্য পর্য্যটকদের বিস্ময়ের আর সীমা নাই!

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এ জাতের মেয়েরা মাথা কামায়; কিন্তু বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইবামাত্র মাথার চুল রাখিতে সুরু করে। তখন মাথায় আঁটে কড়ির ব্যাণ্ডেজ। তাহাতে ঝোলে বধূর ঘোমটা (voil)। বিবাহ হইলে মেয়েদের কাণ হইতে লোহার তারের ইয়ারিং খশিয়া যায়—তখন কাণে ওঠে তামার তারের ইয়ারিং। বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে বধূর গায়ে সত্যকার বসন চড়ে। বিবাহের পূর্ব্বে বধূর গায়ে যে বসন থাকে, বিবাহের পরে একমাস-কাল বরকে সেই বসন পরিতে হয়।

২। কঙ্গো

টাঙ্গানিকার পশ্চিমে কঙ্গো প্রদেশ। এখানে নানা জাতির বাস। তাদের আচার-নীতিতে বহু পার্থক্য। চেহারা ধরিয়া অধিবাসীদের দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণী খাঁটী নিগ্রো; অপরটির শিরায় আছে হেমেটিক রক্ত।

প্রিয়জনের চোখে মোহ-বিভ্রম জাগাইতে কঙ্গোর মেয়েরা সর্ব্বদা উন্মুখ থাকে। এজন্য কাটা-কোঁড়া করিয়া গায়ে ক্ষতরেখা আঁকে। এ ক্ষত চট্ করিয়া যাহাতে না সারে, সেজন্য তাদের কশরতির সীমা থাকে না। এই কশরতির ফলে কাহারো কাহারো অঙ্গের ক্ষত আজীবন সারে না। 'টুকুল' গাছের রস গাঢ় লাল রঙের; সেই রঙ তারা গায়ে মাখে। উবাঙ্গি জাতের মেয়েরা মুখে ভুষা মাখিয়া মুখের রঙ কালো করে; চাম্বালা জাতের মেয়েরা মুখে মাখে বাদামী রঙ।

কঙ্গোর বুজা, বাপোতো এবং আরো কয়েকটি জাতের ঘরে মেয়েদের বসন পরার রেওয়াজ নাই। অঙ্গে তারা নক্সা কাটে—কোমরে দড়ি বাঁধিয়া সেই দড়িতে কড়ি বা তবলকির ঝালর ঝুলাইয়া দেয়। বাঙ্গা জাতের মেয়েরা কোমরে পাতা ও ঘাসের ঝালর-রচা ঘাগরা আঁটে। যে মেয়ে দেখিতে যত ভালো, তার ঘাগরা হয় তত ছোট।

কঙ্গোর পুরুষরা বহু বিবাহ করে; শুধু বাঙ্গা জাতের



পিগ্‌মী-জাতের মেয়ে

মধ্যে এক-পত্নীত্বের প্রথা বিদ্যমান। এজন্য দাম্পত্য-নিষ্ঠায় তাদের গর্ব্বেরও সীমা নাই।

আজান্দে জাতের মধ্যে বিবাহ-প্রথায় বেশ একটু বৈচিত্র্য আছে। সর্দ্দাররা পাত্রী-নির্ণয় করে। পাত্র-পাত্রীর রুচি বা ইচ্ছার কোন তত্ত্ব না লইয়া নিজের খেয়ালমত সাধারণের পাত্র-পাত্রী নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়। সে পাত্র-পাত্রীর বিবাহ দিতেই হইবে। তবে যার ভাগ্যে যেমন জুটুক, সেই বর-বধূ লইয়াই তারা সংসার করে—মনে কোনো খুঁৎখুঁতুনি রাখে না। মেয়েরা খুব পতিব্রতা—সতীত্বের মর্য্যাদা-রক্ষায় তৎপর। স্বামীর দলও সাধারণতঃ পত্নীপরায়ণ

হয়। বিদেশী বা অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের আলাপ করিবার রীতি নাই ; তাদের সামনে বাহির হওয়াও সমাজে নিষেধ। এ কারণে আজান্দে জাতের মেয়েরা ভারী লজ্জাশীলা।

আজান্দেদের প্রতিবেশী মাঙ্গবেতু জাতের ঘরে স্ত্রীরা হয় দুর্জ্জয়ময়ী প্রভু। স্বামীর দল স্ত্রীর কথায় ওঠে-বসে। বিষয়-সম্পত্তি দেখা বলো, সাংসারিক বা সামাজিক সমস্যা সমাধান

কঙ্গোয় দাম্পত্য সম্পর্কে কলুষ ঘটিলে শাস্তির ব্যবস্থা আছে। যে পুরুষ পরনারী ভজনা করে, ধরা পড়িলে সে পুরুষকে পরনারীর স্বামীর কাছে 'হেটমুণ্ডে' দাস্য করিতে হয় এবং কুলটা নারীকে এ জাত প্রহারে রীতিমত জর্জ্জরিত করে। বান্দালা জাতের ঘরে কুলটা নারীর দুই কাণ কাটিয়া, হাতে তপ্ত লৌহ-শলাকা বিঁধিয়া দেওয়া হয়। আজান্দে জাত কুলটা স্ত্রীকে মারিয়া ফেলে এবং ব্যভিচারী



কঙ্গো—শাকারা-জাতের মেয়ে

বলো—সকল কাজে নারী এ মুলুকে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। বিচার-সালিশী করিতে হইলে নারী তাহা করে—এবং সে বিচার-কার্য্যে বিভ্রাট ঘটে না।

শেমকু জাতের ঘরে চাষবাস করে পুরুষ। জঙ্গল কাটা, ফশল বোনা, ঘর ছাওয়া বা মেরামত করা, রান্নাবান্না, ছেলেমেয়ে দেখা—সব কাজ পুরুষকে করিতে হয়। এ জাতের মেয়ে-পুরুষে দারুণ সাম্য—একত্র ভোজন, একত্র বিচরণ করে। অর্থাৎ পুরুষরা মেয়েদের এতটুকু তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করে না। আশ-পাশের জাত এজন্য শেমকু জাতের পুরুষদের 'স্ত্রৈণ' বলিয়া অবজ্ঞা করে।

পুরুষের হাত ও কাণ কাটিয়া ছাড়িয়া দেয়। উবাঙ্গি জাতি কুলটা পত্নীকে মারিয়া ফেলে।

বাওতান্দা জাতের মধ্যে বাঁধা-টাইমের বিবাহ-রীতি (marriage for a limited time) প্রচলিত আছে। এদেশে, কন্যাকে হরণ করিয়া বর বনমধ্যে গোপনে তাহাকে রক্ষা করে ; তার পর সে কন্যার গর্ভে সন্তান জন্মিলে মহা সমারোহে বর-বধূ শিশুসহ গৃহে ফিরিয়া আসে। সেই সঙ্গে রোমান্সের অবসান হয়। শিশু স্তন্যদুগ্ধ ত্যাগ করিলে সে রহিয়া যায় বাপের কাছে এবং স্ত্রী চলিয়া যায় তার পিতার গৃহে। সেখানে ফিরিলে আবার সে স্বাধীন।

তখন তাকে লইয়া আবার যে-কোন পুরুষ পূর্ব্বেকার মত হরণ-বৃত্তিবশে বনে লইয়া যাইতে পারে—তার সঙ্গে আবার হয় মিলন।

যোগওয়ান্দি জাতের ঘরে মেয়ের সংখ্যা অল্প। এজন্য এখানে যে ভাগ্যবান পুরুষ পত্নী-সংগ্রহে সক্ষম হয়, সে দশ মাসের জন্য নিজের স্ত্রীকে অপর পুরুষের হাতে 'ভাড়া' খাটাইতে পারে—ঠিক যেন বাড়ী লীজ দেওয়া! এই দশ মাসের মধ্যে স্ত্রী অন্তঃস্বত্বা হইলে সে সন্তানে অধিকার জন্মায় ভাড়াটিয়ার! দশ মাসের 'লীজ' আবার নূতন কাল-সর্ত্তে অতিরিক্ত ভাড়ায় বাড়ানো (prolonged) চলে।

কঙ্গোর শাকারা জাতের মধ্যে কবর-প্রথা অমানুষিক! পুরুষ মরিলে মস্ত কবর খোঁড়া হয়। জীবিতা স্ত্রীর বুকে মৃত স্বামীর বক্ষ লগ্ন থাকে—এবং সেই অবস্থায় মৃত স্বামিসহ সতী স্ত্রী কবরে গিয়া বসে। মৃতের কয়েকটি দাস-দাসীকেও মারিয়া কবরের মধ্যে মৃতের সহিত 'মাটীচাপা' দেওয়া হয়। দাস-দাসী মারিয়া কবরে দিবার উদ্দেশ্য—মৃতের আত্মা তাহাদের মাংস খাইবে; পরলোকে অন্ন-কষ্ট পাইবে না!

বারুয়া জাতের মধ্যেও সংকারের প্রথা এমনি; বারুয়া জাতে পুরুষ বহু বিবাহ করে; কাজেই সে মারা গেলে সবকটি স্ত্রীকে তার সঙ্গে এক কবরে প্রবেশ করিতে হয়। কোনো স্ত্রী হয় স্বামীর মাথার বালিশ, কোনো স্ত্রী লেপ-তোষক, কেহ পাশ-বালিশ, কেহ বা পা রাখিবার পাদানি (foot-stool)। জীবন্ত সব কয়টি স্ত্রীকে এক কবরে 'গাড়া' হয়।



বাঙ্গালা-দম্পতি

বেনা কানিয়োকা জাতের স্ত্রীর দল এভাবে সহমরণে যাইতে রাজী না হইলে তাদের একখানা হাত বা পা কাটিয়া লইয়া সেই হাত-পা মৃত স্বামীর সঙ্গে এক কবরে মাটী চাপা দেওয়া হয়।

কঙ্গোর বহু জাতির মধ্যে নরমাংস-ভোজনের রীতি



শাঙ্গো-নারীর বিচিত্র কেশদাম

এখনো বিদ্যমান আছে। তবে মেয়েরা নর-মাংস খায় না—নরমাংস তাদের কাছে নিষিদ্ধ খাদ্য। বাঙ্গালা ও বাঙ্গোতো জাতের মধ্যে নারীমাংস-ভোজন নিষিদ্ধ; তারা নারীমাংস খায় না—খায় শুধু নর-মাংস! বাঙ্গালা জাতের পুরুষ নরমাংস-গ্রহণে শিশু বা নারী লইয়া বাছ-বিচার করে না—সর্ব্বশ্রেণীর নর-মাংসে তাদের সমান রুচি।

মেয়েরা রন্ধনে পটুতা লাভ করে। রন্ধনাদি কার্য্যে পরিচ্ছন্নতার দিকে তাদের লক্ষ্য খুব গভীর। প্রধান খাদ্য পিঠা। গরম জলে ময়দা সিদ্ধ করিয়া তাহা দিয়া 'পিঠা' তৈয়ার করে।

বাঙ্গালা জাতের ঘরে মেয়েদের ছাগমাংস বা মৃগয়ালব্ধ পশু-মাংস খাওয়া নিষেধ; বাইয়কতা জাতের মেয়েরা ডিম বা মুর্গীর মাংস খায় না। এগুলা মেয়েদের পক্ষে অখাদ্য। খাইলে মাথা গরম হইয়া পাগল হইয়া যাইবে! বাঙ্গয়ানা জাতের মেয়েরা ব্যাঙ খায়—পুরুষ ব্যাঙ খায় না!

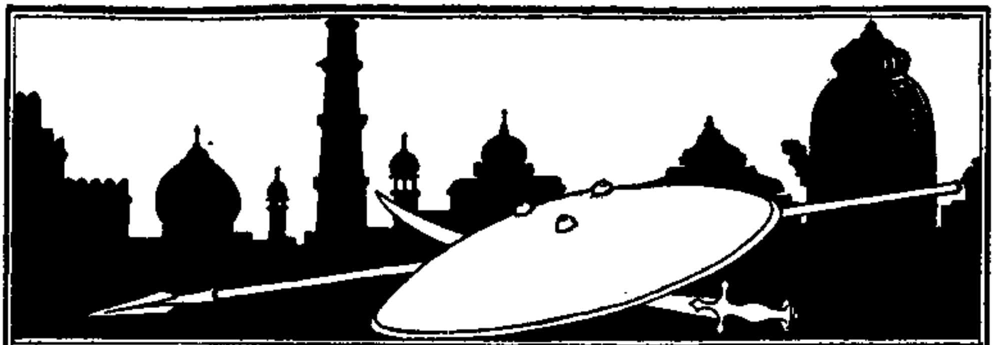
কঙ্গোর নর-নারীর ঠাকুর-দেবতা নাই। দু'চারিটা বিগ্রহ আছে। সে বিগ্রহের তারা পূজা করে না। তবে এ বিগ্রহ ঘরে থাকিলে ভূত-প্রেতের নজর লাগে না—ইহাই তাদের বিশ্বাস। বিগ্রহ থাকা সত্বে গৃহে যদি কোনো অমঙ্গল ঘটে, তাহা হইলে বিগ্রহকে পেরেকে বিঁধিয়া কিম্বা ছুরি দিয়া সে-বিগ্রহের অঙ্গ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া তারা বিগ্রহের বিগ্রহ-লীলার অন্ত করিতে এতটুকু দ্বিধা রাখে না!

পরিক্রমা

আমার জগত-কেন্দ্রে তুমি আছ সখি,
তোমারে ঘেরিয়া মোর নিত্য পরিক্রমা,—

এ হৃদয় সিন্ধু মম তোমারে নিরখি'
উদ্বেলিয়া ওঠে মুহু; সুস্নিগ্ধ চন্দ্রমা
অপার রহস্য-ভরা স্বপ্ন সুধাময়ী
তুমি মোর। তুমি মোর প্রস্ফুট কমল
অপূর্ব্ব মাধুর্য্য-ভরা,—রূপমুগ্ধ, অয়ি,
আমার মানসভৃঙ্গ তব ঢল-ঢল
রূপের বন্দনা-গীতি গাহে মঞ্জু-স্বরে;
ঈশানের স্বপ্নভরা তুমি মেঘমায়া
কেতকীর কুঞ্জ আমি শ্যামা ধরণীতে;—
দরশে তোমার ফুটে হৃদয়ের পুরে—
বাসনা কেতকী শত; তব স্নিগ্ধ ছায়া
আনে স্বপ্ন—আনে মোহ মোর মুগ্ধ-চিতে।

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার নাগ (বি, এ)।



ইতিহাসের অনুসরণ

সভ্যতার পতন

য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পৃথিবীতে সভ্যতার প্রথম পতন হয় প্রায় বারো হাজার বৎসর পূর্ব্বে—নিওলিথিক যুগে। এই নিওলিথিক জাতি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্বাঞ্চল হইতে য়ুরোপে আসিয়া আস্তানা পাতে।

এ যুগের ইতিহাস-আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই,—

(১) এ জাতি শিলা-প্রস্তরে অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ করে, সেগুলিতে পালিশ আছে; কুঠারে কাঠের বাঁট জুড়িতে শিখিয়াছে। সুতরাং কাঠ কাটিয়া সে কাঠ জ্বালানি ও অন্য কাজেও ব্যবহার করে; তীর-ধনু লইয়া মৃগয়া ও যুদ্ধাদি করে।

(২) এ জাতি চাষ-বাস করিতেছে; গাছপালার বীজ পুঁতিয়া সে গাছপালা জল-সেকে লালন করে; তাহা সত্বেও মৃগয়ার পাট বন্ধ করে নাই; পুরুষেরা মৃগয়ায় বাহির হয়; মেয়েরা চাষ-বাস করে, ঘরকন্না দেখে।

(৩) এ জাতি খাদ্যাদি পাক করে; পাকের জন্য মাটীর হাঁড়ি তৈয়ার করে। পূর্ব্বে মানুষ অশ্ব-মাংস ভোজন করিত, এ যুগে অশ্ব-মাংস-ভোজন নিষিদ্ধ কোঠায় গিয়া উঠিয়াছে।

(৪) গৃহে পশু-পালন হয়। প্রথমে কুকুর; পরে গরু, ছাগল, ভেড়া ও শূকর পালন করিতে প্রবৃত্ত হয়।

(৫) ধাতুপাত্র তৈয়ার করিতে ও কাপড় বুনিতে শিখিয়াছে।

নিওলিথিক জাতি যাযাবর-বৃত্তিচারী ছিল না। এ জাতির বহু আচার আজ পর্য্যন্ত বহু য়ুরোপীয় জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে।

নিওলিথিক জাতির মধ্যে পরস্পরে যুদ্ধ-বিগ্রহ, জয়-পরাজয়, উত্থান-পতনের বিরাম ছিল না। এ জাতির বর্ণ ছিল শ্বেত। এই জাতিই আধুনিক য়ুরোপীয় জাতির পূর্ব্বপুরুষ।

এ জাতির নারী অস্থি-কঙ্কালে ভূষণ রচিয়া অঙ্গে পরিত। তারপর মিলিল স্বর্ণ ধাতু। মাত্র ছয়-সাত হাজার বৎসর পূর্ব্বে তাম্রের প্রচলন হইয়াছে। গলাইয়া ছাঁচে ফেলিয়া এই তাম্রে তাহারা ভাঁটা বা লোষ্ট্র গড়িত। সে লোষ্ট্র ব্যবহার করিত যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়। তামার গুলি নিক্ষেপ করিত গুলতির সাহায্যে। সে তামা ছিল কোমল; তামায় টিন মিশাইয়া তাকে কঠিন করা যায়, সে বিদ্যা তখন তাদের অবিদিত ছিল।

কয়েক শত বৎসর পরে সে বিদ্যা আয়ত্ত হয়। চীন, কর্ণওয়াল এবং অন্যান্য বহু প্রদেশে তামা ও টিনের খনি ছিল পাশাপাশি; তামা গলাইতে গিয়া কি করিয়া টিনের খনিতে অগ্নি-সংযোগ ঘটে; টিন ও তামা এক সঙ্গে মিশিয়া যে-ধাতুর সৃষ্টি হয়, তাহা কঠিন, দৃঢ়। এমনি করিয়াই এই নূতন তামার প্রচলন ও আদর ঘটিল।

হাঙ্গারিতে যে তামা মিলিত, সে তামার সহিত অ্যাণ্টিমনি মিশানো ছিল; এই তামার ময়লা সাফ করিতে গিয়া প্রাচীন যুগের নর-নারী আধুনিক তাম্রধাতুর দর্শন পায়। সে সময় হইতে ব্রঞ্জের প্রচলন হয়। প্রাচীন মিশরে এবং সুইজারল্যাণ্ডে প্রচুর টিন মিলিত; কাজেই টিনের ব্যবহার প্রচলিত হইতে বিলম্ব ঘটিল না। দস্তা ও তামা মিলিত প্রচুর। পিতলের আবিষ্কার পরে হয়।

বহু প্রাচীন যুগ হইতেই এই কয়টি ধাতু—নর-সমাজে প্রচলিত আছে।

তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে য়ুরোপে সর্ব্বপ্রথম লৌহের আবিষ্কার ঘটে। এশিয়া মাইনরে আরো পূর্ব্বে লৌহ পাওয়া যায়। এই লৌহ প্রথমে পাওয়া যায় উল্কাখণ্ডের আকারে (meteor stones)। তবে লৌহ গলাইবার কৌশল জানা ছিল না; সে কৌশল দৈবাৎ আয়ত্ত হয়। এবং একবার লৌহ গলাইবার হদিশ পাইবামাত্র নর-সমাজে লৌহের নানা উপযোগিতা-হেতু তার আদরও অপরিসীম বাড়িয়া ওঠে।

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে, এই নিওলিথিক যুগের সভ্যতা কোথা হইতে এবং কেমন করিয়া আসিল?

নিওলিথিক জাতি য়ুরোপে আসিয়া বিস্তীর্ণভাবে আস্তানা পাতিবার পূর্ব্বে কোথায় ছিল, তাহার সঠিক কোনো বিবরণ আজ অবধি পাওয়া যায় নাই। কেহ বলেন, পূর্ব্বে এ জাতির বাস ছিল এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে; কেহ বলেন, ভূমধ্য-সাগরের তীরে (এখন সে স্থান সাগর-গর্ভে বিলীন হইয়াছে); কেহ বলেন, ভারত মহাসাগরের উপকূলে। এ কথা অনুমান মাত্র, এবং এ অনুমানের ঐতিহাসিক ভিত্তি পাওয়া যায় না।

তা না পাই, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়, নিওলিথিক জাতি নানা শাখা-প্রশাখায় বহুব্যাপী হইয়া ওঠে—য়ুরোপে, উত্তর-আফ্রিকায় ও এশিয়ায়। শিক্ষায় সভ্যতায় এ জাতি প্রাচীন যুগের সকল জাতির অগ্রণী।

ইতিহাসে এ জাতির জীবন-ধারার যে পরিচয় পাই, তাহা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। অপ্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য এ জাতি বাসস্থান হইতে বহুদূরে নিক্ষেপ করিত। যেখানে নিক্ষেপ করিত, সেখানে একেবারে আবর্জ্জনায় পাহাড় জমিয়া উঠিত। ইহারা মৃতের দেহ ভূগর্ভে সমাহিত করিত। সেই সমাধি বা কবরের উপর মাটীর প্রকাণ্ড স্তূপ গড়িয়া তুলিত। যাহারা পারিত, মৃতের কবরের উপর তাহারা শিলা-স্তূপ রচনা করিত। কয়েক পরিবারে মিলিয়া স্বতন্ত্র গ্রাম রচনা করিত; সে গ্রামের চতুর্দ্দিকে মাটী দিয়া বা পাথর সাজাইয়া পরিখা গড়িত।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে সুইজারলাণ্ডে একবার প্রচণ্ড বন্যা নামে। সে বন্যায় মাটীর বহু প্রাচীর ও স্তূপ ভাঙ্গিয়া ধ্বসিয়া গলিয়া অদৃশ্য হয়; এবং বন্যার জল বাহির হইয়া গেলে প্রাচীন যুগের বহু গ্রামের চিহ্ন জাগিয়া ওঠে। এ গ্রামগুলিতে ছিল বহু কুটীর; কুটীরের দ্বার কাঠ দিয়া তৈয়ারী; সে কাঠের গায়ে নক্সা কাটা—চিত্র-বিচিত্র নক্সা। কুটীরের মধ্যে কাঠের অনেক ভারী সিন্দুক মেলে; সিন্দুকে মাটীর তৈজসপত্র, হাড়ের গহনা, মাছ ধরিবার জাল ও পোষাক-পরিচ্ছদ পাওয়া যায়। সেগুলি পরীক্ষা করিয়া বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সেগুলি তৈয়ারী হইয়াছে। মাটীর যে সব কুঁজা ও পাত্র পাওয়া গিয়াছে, সেগুলার অঙ্গেও বিচিত্র নক্সা। কারিগরির পাকা নিদর্শন!

স্কটলাণ্ড, আয়ার্লাণ্ড এবং অন্যান্য বহু প্রদেশে হ্রদ-তীরে বহুকালের প্রাচীন কুটীরাদির জীর্ণ ধ্বংসপ্রায় মূর্ত্তি বাহির হইয়াছে। বিশেষ করিয়া গ্লাষ্টনবেরিতে; সেগুলি রচিত হইয়াছিল প্রায় দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে। এ সব কুটীর দেখিয়া একালের বিশেষজ্ঞেরা বলিতেছেন—স্রোতস্বিনীর বুকে তক্তা পাতিয়া তাহার উপর সে যুগে কুটীর নির্ম্মাণের ব্যবস্থা খুবই প্রচলিত ছিল। এ ভাবে কুটীর-নির্ম্মাণে এঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যায় কতখানি নিপুণতা প্রকাশ পায়, তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়! জলের বুকে কুটীর করিয়া তাহাতে বাসের উদ্দেশ্য,—স্বাস্থ্য-সুখটুকু পূর্ণভাবে উপভোগ করা; কোনো রোগের বিষ সহজে তাহা হইলে আক্রমণ করিতে পারিবে না।

তবে এমন কুটীরের সংখ্যা খুব বেশী নয়। এ সব কুটীরে বাস করিত সে যুগের সম্ভ্রান্ত সৌখীন পরিবারবর্গ। সম্প্রতি বহু কুটীর ও গ্রাম ভূগর্ভ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছে; সে সব কুটীর দেখিলে বুঝা যায়, এক এক পরিবারে অসংখ্য লোক বাস করিত। তখনকার দিনে patriarchical families—অর্থাৎ কর্ত্তৃপ্রধান পরিবারের রেওয়াজ ছিল; এই সকল বৃহৎ গোষ্ঠী একান্নবর্ত্তীভাবে বাস করিত।

বিশেষজ্ঞেরা এই সব কুটীরের নির্ম্মাণ-কাল অনুমান করিয়াছেন,—খৃষ্টজন্মের পাঁচ হাজার বা চারি হাজার পূর্ব্বাব্দে। এ সময়ে গৃহে কুকুর ছাড়া অপর পশু মানুষ পালন করিত না। ইহাদের কুঠারে কাঠের বাঁট ছিল না।

ইহার প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে মানুষ গাভী পালন

করিতে শিখে। গাভীর সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করে ছাগল। উদ্দেশ্য—দুগ্ধলাভ! সুইজারলাণ্ডে গাভী-পালনে খুব বেশী সমারোহ ছিল। ইহার কারণ, সুইজারলাণ্ডে প্রচুর গাভী মিলিত; এবং গাভীগুলি ছিল দুগ্ধবতী।

দুগ্ধ পান করিয়া পূর্ণ-বয়স্ক নর-নারী জীবন ধারণ করিতে পারে না। দুগ্ধ প্রচুর মিলিত। মানুষ কত পান করিবে? ক্রমে এই দুগ্ধ হইতে ছানা ননী মাখন এবং আরো বহু বিচিত্র খাদ্য মানুষ তৈয়ার করিতে শিখিল।

দুগ্ধ যে মানবের পক্ষে উপাদেয় 'খাদ্য', এ সত্য প্রথম আবিষ্কার করে এই নিওলিথিক জাতি—এবং সে প্রায় ৬হাজার বৎসর পূর্ব্বে।

এ সময়েও আমরা দেখি, মৃগয়ালব্ধ পশু ছিল প্রধান খাদ্য। পুরুষের দল প্রাতে গৃহত্যাগ করিয়া শীকারের সন্ধানে বাহির হইত—বরাহ, মৃগ ও বাইসন শীকার করিত; শৃগাল শীকার করিত। শৃগালের মাংস অতি প্রিয় খাদ্য ছিল। শশক প্রচুর মিলিলেও শশক-মাংসে সে-যুগে কাহারো রুচি ছিল না। তাহারা ভাবিত, শশক অতি ভীরু পশু; তাহার মাংস-ভোজনে ছোঁয়াচ লাগিয়া বলবীর্য্য উবিয়া যাইবে!

সে যুগে চাষ-বাসের অবস্থা কেমন ছিল, তাহার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না। এ পর্য্যন্ত সে যুগের লাঙলের কোনো চিহ্ন দেখা যায় নাই। হয়তো লাঙল ছিল; কাঠের তৈয়ারী বলিয়া সর্ব্বধ্বংসী কালের আক্রমণ সহিয়া আজিও টিঁকিয়া থাকিতে পারে নাই। গম, বার্লি, যব, ছোলা ভোজ্যার্থে ব্যবহৃত হইত—তাহাতে সংশয় নাই। পাথরে গম ভাঙ্গিয়া আটা-ময়দা বাহির করিত; এবং সে আটা-ময়দা জলে মাখিয়া চটকাইয়া আগুনে তাতাইয়া তাহা খাদ্যরূপে ব্যবহার করিত।

গম ছোলা বার্লির চাষ চলিত। চাষের কাজ ছিল মেয়েদের হাতে। আমেরিকায় অতি প্রাচীন যুগে গম ছোলা প্রভৃতির চাষ ছিল না; সেখানকার লোকে ভুট্টার চাষ করিত এবং ভুট্টাই ছিল প্রধান খাদ্য।

নিওলিথিক নর-নারী প্রথমে বসন পরিত। সে-বসন চামড়ার তৈয়ারী। শণের পাতা ছিঁড়িয়া তাহা দিয়াও অঙ্গাবরণ রচনা হইত। সে যুগের শণের বসন—ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। ব্রঞ্জ ধাতু আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে অলঙ্কারের রেওয়াজ দেখা দেয়। নর-নারীর মাথায় কেশ সুদীর্ঘ হইত: সে কেশের ভার সম্বদ্ধ করিতে পূর্ব্বে ব্যবহার করিত হাড়ের কাঁটা; পরে হাড়ের পরিবর্ত্তে তামা, ব্রঞ্জ প্রভৃতি ধাতুর কাঁটা। প্রাচীন যুগের যে-সব শিলা-স্তূপ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে যে নারী-চিত্র অঙ্কিত আছে—সেই ছবির নারীর মাথায় দেখা যায় দীর্ঘ কেশভার এবং ব্রঞ্জ প্রভৃতি ধাতুর কাঁটা দিয়া তাহা সম্বদ্ধ।

ব্রঞ্জ-ধাতু আবিষ্কারের পূর্ব্বে টেবল বা অন্য আসবাবের অভাব ছিল। বসা শোওয়া—এ সব কাজ মেঝেয় চলিত।

সে-যুগে বিড়াল ও ইন্দুর ছিল না; মুর্গী ছিল বলিয়া কোনো প্রমাণ মিলে না। হাঁস মুর্গী প্রভৃতি গৃহে প্রবেশ করিয়াছে বহু আধুনিক যুগে। ওল্ড টেষ্টামেণ্ট বা হোমারের কাব্যে মুর্গীর কোনো উল্লেখ নাই। ১৪০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ কাল পর্য্যন্ত মুর্গীকে দেখি ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ায়। হাঁস মুর্গীর আদি বাস ছিল ব্রহ্মদেশে। গ্রীসে সেখান হইতে মুর্গী ও হাঁস চীনে চালান যায় ১১০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে। সক্রেটিশের যুগে চীন হইতে পারস্য ঘুরিয়া মুর্গী প্রবেশ করে গ্রীসে। 'মুর্গীর ডাকের' প্রথম উল্লেখ আমরা দেখি নিউ টেষ্টামেণ্টে।

নিওলিথিক জাতির অস্ত্র প্রথমে ছিল শুধু কুঠার—পরে আসে তীর-ধনু। তীরের ফলা তারা পাথর দিয়া তৈয়ার করিত; ছিপ-বঁড়শী লইয়া মাছ ধরিত।

কুটীরের দেওয়াল ও মেঝে মেয়েরা প্রত্যহ মাটী বা গোময় দিয়া নিকাইত; সংসারের সম্পত্তির মধ্যে ছিল ধামা চুবড়ি (বাঁশ বা বেত দিয়া বোনা), হাঁড়ি কলসী প্রভৃতি। দেওয়ালে বাঁখারি বা গাছের ডাল পুঁতিয়া তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া সেই দড়িতে হাঁড়ী কলসী ঝুলাইয়া রাখিত। ছেলেমেয়েরা গরু-ছাগলগুলাকে লইয়া মাঠে বাহির হইত চরাইবার জন্য এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে গৃহে ফিরিত। সন্ধ্যার পরে গৃহের বাহিরে থাকা নিরাপদ ছিল না—নেকড়ে বাঘ ও ভল্লুক বাহির হইত।

এমনি ভাবে নিওলিথিক জাতির ঘর-সংসার চলিত। খৃঃ ১০০০ পূর্ব্বাব্দে দেখি, এ জাতি কাঠের গোলকের দুই প্রান্তে ছিদ্র করিয়া সে দুই প্রান্তে পশু-চর্ম্ম আটকাইয়া ঢোলক-বাদ্যের সৃষ্টি করে; হাড়ের বাঁশী তৈয়ার করিয়া বাজাইত; কণ্ঠ ছাড়িয়া সুর বাহির করিত; অগ্নি জ্বালিত দুখানা পাথর (চকমকি ঠুকিয়া। অগ্নি জ্বালিতে

বহু শ্রম হইত, এ জন্য অগ্নি জ্বালিয়া দীর্ঘকাল তাহা প্রজ্বালিত রাখিত। এই অগ্নি জ্বালিয়া রাখার ফলে কত কুটীর এবং সেই সঙ্গে কত লোক ধ্বংস পাইয়াছে, তার সংখ্যা নাই।

এই কাহিনীর আদ্যন্ত আলোচনা করিয়া আমরা দেখিতেছি,—আদিম মানব প্রাণরক্ষার জন্য ইতস্ততঃ খাদ্য সংগ্রহ করিয়া বেড়াইত; গৃহ রচিয়া সেখানে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিবার তার উপায় ছিল না, এবং তাহার উপর ছিল, শীত-গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতুর পীড়ন। প্রধানতঃ এ দুই কারণে ঘুরিতে ঘুরিতে নির্দ্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করিয়া আদিম মানব যাযাবর-বৃত্তিতে ভর করিয়া কোথায় দূরে কত সাগর-গিরি-বন পার হইয়া দুস্তর দুর্গম রাজ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়। তাহার জায়গায় আসিল নব জাতি' এ জাতি ক্রমে চাষবাসের মর্ম্ম বুঝিল; বুঝিয়া গৃহ বাঁধিল; সে গৃহ সাজাইতে শিখিল; এবং এই গৃহকে নানা দিক দিয়া নিরাপদ ও উপভোগ্য করিয়া তুলিতে অস্ত্রশস্ত্র রচনা করিল, শিল্প শিখিল, পশু-পালনে মনোযোগী হইল; এবং তাহারি অন্তরালে দেহ ছাড়িয়া মনের দিকে তার নজর পড়িল। মনের দিকে নজর পড়িবামাত্র সে চিন্তা করিতে শিখিল এবং চিন্তার ফলে দিকে দিকে তার কাজে বৈচিত্র্য দেখা দিল;—সে কাজে সে পাইল আরাম ও আনন্দ।

মানুষের এই কর্ম্ম-বৈচিত্র্যের মধ্যেই আমরা ব্যবসায়-বাণিজ্যের অঙ্কুর নিহিত দেখি। নানা প্রদেশের কোথাও মেলে রত্ন, কোথাও তামা, কোথাও বা গম, যব, বার্লি, ছোলা প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী। যে বলিষ্ঠ, সে নির্ব্বিবাদে প্রচুর পশু শীকার করে; যে শীকারে বাহির হয় না, পশু বা পশু-চর্ম্মের প্রয়োজন ঘটিলে তাহার দ্বারে গিয়া দাঁড়ায়—রত্ন বা যব-গমের বিনিময়ে পশু-চর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া আনে। সমুদ্রতীরে যাহাদের বাস, তারা লবণ সংগ্রহ করে; দূরবর্ত্তী প্রদেশে যাহাদের বাস, লবণের জন্য তাহারা আসিয়া সমুদ্রতীর-বাসীদের শরণ লয়—তারা লবণ দেয়, দিয়া তার পরিবর্ত্তে অন্য সামগ্রী লয়। এমনি করিয়া মানব-সমাজে ব্যবসায়ের সূত্রপাত ঘটে। এই পরিবর্ত্ত বা বিনিময়-প্রথায় যার যা প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহ করিতে কোথাও কোনো বাধা বা অসুবিধা রহিল না।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

স্মৃতির মোহ

দিন গেল চ'লে হীন কোলাহলে, ক্ষীণ হ'ল আলো আঁধারে;
পথ হ'ল হারা কণ্টক ভরা দুর্গম বন মাঝারে।
পাথেয় বলিতে সঞ্চয় নাহি কিছু গো,
বিভীষিকা শত সবেগে নিয়েছে পিছু গো;
তবু তার মাঝে রাজে অমলিন, গত স্বপনের মাধুরী;
এমনি মায়াতে গড়া সংসার;—ধন্য সৃজন-চাতুরী!

ভুল ব'লে যত ফেলে দিতে চাই, ফুল হয়ে উঠে ফুটিয়া,
অন্তর মম মন্থন করে সব জ্ঞান লয় লুটিয়া;
বর্ত্তমানের হতাশতা যত ভুলে যাই,
ভবিষ্যতের ভীষণতা নাহি লভে ঠাঁই;
ডুবে যায় মোর পিপাসিত মন অতীত কালের খাতাতে;
বিবিধ বর্ণ সম্পদে তার চিত্রিত প্রতি পাতাতে।

হাসি গান নিয়ে এসেছিল যারা জীবনের মধু বাসরে;
বিবিধ রঙ্গে তুলি তরঙ্গ ভিড় করেছিল আসরে।
আঁখি সম্মুখে নন্দন করি রচনা,
অমরার সুধা ঢেলেছিল প্রাণে কত না!
অন্তর মাঝে উথলিয়া ছিল কি অসীম আশা-পারাবার!
—ভুবন-ভুলানো উৎসব শোভা, ভগবান্, সে কি ভুলিবার!

একে একে তারা চ'লে গেছে রাঙা দাগ রেখে ভাঙা পাঁজরে;
আজো মনে পড়ে মুখছবিগুলি ঢল'-ঢল' কালো কাজরে!
—জানি আমি মাথা কাটালেও আর পাবনা,
তবু কেঁদে মরি,—তবু করি সেই ভাবনা,
মনে প্রাণে বুঝি সব-ই মায়া, তবু ভুলে আছি তার-ই ছলাতে;
ভিতরের আলো ঢাকা থেকে গেল মায়াচিন্তার মলাতে।

পথের ধূলাতে মাণিক হারায়ে কাঙাল সেজেছি স্বদোষে
নিরুপায় তাই, কেঁদে মরি হায়, 'হৃত'-জীবনের প্রদোষে!
পারিনাক' যেতে কোনমতে মায়া কাটায়ে,
মরিব কি ওগো, পাষাণেই মাথা ফাটায়ে!
একবার নেমে এস প্রাণে মোর, একবার এসো, হে দয়াল!
রুদ্রের বলে কণা কণা ক'রে ছিঁড়ে দাও এই মায়া জাল।

শ্রীকমলাকান্ত কাব্যতীর্থ।



জাপান এবং কোরিয়া

আজ প্রায় পঁচিশ বৎসর হইল, জাপান কোরিয়া দেশটি কুক্ষিগত করিয়াছেন। এই পঁচিশ বৎসরই এই দেশটি জাপানের অধিকারে রহিয়াছে। এই পাদ-শতাব্দীমধ্যে জাপানের নেতৃত্বাধীনে কোরিয়ার অবস্থা কিরূপ হইতে কিরূপে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, য়ুরোপীয়গণ তাহার আলোচনা করিতেছেন। এ কথা সত্য যে, এই সময়মধ্যে কোরিয়ার জনসংখ্যা শতকরা ৫৬ জন বাড়িয়াছে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে জাপান যখন কোরিয়া অধিকার করিয়াছিল, তখন কোরিয়ার অধিবাসিসংখ্যা ছিল ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ১৩ হাজার ১৭ জন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ঐ দেশের অধিবাসিসংখ্যা ২ কোটি ৭ লক্ষ ৯১ হাজার ৩ শত ২১ জন হইয়া দাঁড়ায়। ইহার মধ্যে ৫২ লক্ষ ৩৩ হাজার ৬ শত ৯৭ জন অর্থাৎ ৮ লক্ষ ৭১ হাজার ২ শত ২৫ ঘর গৃহস্থ কেবল কৃষিকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া, কর্ষণযোগ্য জমিতে ভাগ বসাইয়া কৃষীবলের স্বল্পায়তন জমির পরিমাণকে ক্ষুদ্র করিয়া দিতেছে। জাপানের চেষ্টায় প্রায় ২৪ হইতে ২৫ লক্ষ বিঘা পতিত এবং বন্ধভূমি আবাদী জমিতে পরিণত করা হইয়াছে। পর্ব্বতের পাদমূলে যে সকল বনাচ্ছাদিত ভূমি ছিল এবং সমুদ্রের তীরস্থ যে সকল যায়গা অনাবাদী ছিল, তাহাতে হলকর্ষণ-কার্য্য চলিতেছে। কোরিয়াতে যখন জাপানের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন তথায় প্রতি বৎসর ৫ কোটি ১০ লক্ষ বুশেল চাউল জন্মিত ; এখন তথায় অন্ততঃ ৯ কোটি বুশেল চাউল জন্মিতেছে। (বুশেল পাশ্চাত্য খণ্ডের এক প্রকার মাপের পাত্র বা ষেরা। উহার খোলে ৮০ পাউণ্ড বা ৩৯ সের জল ধরে) চাউলের উৎপত্তি কিছু কম দ্বিগুণ হইয়াছে। সুতরাং বাহ্য দৃষ্টিতে যে কোরিয়ার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু ইহাতে কোরিয়ার প্রকৃত অধিবাসীদিগের অবস্থা যে বিশেষ ভাল হইয়াছে, তাহা নহে। কোরিয়ার মধ্যে যাহারা চাষ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে, তাহাদের মধ্যে শতকরা ৫৩ জন চাষী প্রজা অর্থাৎ তাহারা অন্যের জমিতে চাষ করে। তথাকার সরকারী হিসাবেই প্রকাশ যে, গড়ে তথাকার চাষী প্রজার যোতে ৯ বিঘার অধিক জমি নাই। সেই জমির উৎপন্ন ফসলের ভাগ ভূস্বামীদিগকে দিয়া প্রত্যেক চাষীর থাকে বৎসরে গড়ে কিছু কম ৫৩ ইয়েন। এই টাকায় তাহাদের পক্ষে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা সম্ভব হয় না। তাহাদের প্রতি বৎসর ১৭ ইয়েনের কিছু অধিক কম পড়ে। যে পরিবারে ৫ জন লোক আছে, সেই পরিবারে ৫ বুশেল চাউল এবং দেড় বুশেল জোয়ারের অকুলান ঘটে। এই পরিমাণ খাদ্যের জন্য তাহাকে হয় ঋণ করিতে হয়, না হয় অল্প খাইয়া দিন কাটাইতে হয়। অধিকাংশ চাষী পরিবারকে সেই জন্য অর্দ্ধাশনে থাকিতে হয়। ঋণ করিতে হইলে হয় তাহাদিগকে তাহাদের গ্রাম্য মহাজনের নিকট যাইতে হয়, অথবা পল্লী ঋণদান-সমিতির শরণ লইতে হয়। যাহারা পল্লী ঋণদান-সমিতির নিকট ঋণপ্রার্থী হইয়া ঋণ পায়, তাহারা আপনাদিগকে অনেকটা ভাগ্যবান্ মনে করে ; কারণ, তথায় সুদের হার অল্প। ইহারা প্রায়ই অনাহারে দিন কাটায়। কারণ, তথাকার প্রত্যেক চাষী প্রজার গড়ে ঋণের পরিমাণ ৪৯ ইয়েন। ইহা ভিন্ন কোরিয়ার চাষীদিগের মধ্যে শতকরা ২৫ জন কতক অংশে প্রজা এবং কতক অংশে ভূস্বামী অর্থাৎ ইহাদের যোতের কিয়দংশ জমি উহাদের নিজ সম্পত্তি আর কতক জমিও ইহারা প্রজা হিসাবে চাষ করে। ইহাদের যোতে জমির পরিমাণ কিছু অধিক এবং ইহাদের আয়ও অনেক অধিক। ইহাদের প্রত্যেকের গড়ে বাৎসরিক আয় অপেক্ষা ব্যয় প্রায় ২৩ ইয়েন অধিক হয় এবং প্রত্যেকের ঋণের পরিমাণ গড়ে ১ শত ৩০ ইয়েন।

এ দেশে টাকা কর্জ্জ লইলে সুদ দিতে হয় শতকরা ৬০ ইয়েন পর্য্যন্ত। শতকরা ৩০ ইয়েন সুদের হার ত প্রায়ই দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় চাষী প্রজাদিগের পক্ষে জমির ফসল বিক্রয় করিয়া দেনা শোধ করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং যাহাদের মালেকান স্বত্বযুক্ত জমি আছে, তাহাদিগকে ঋণদায় হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে নিজ জমির কিয়দংশ বেচিয়া ঋণদায় হইতে মুক্তিলাভ করিতে হয়। এই জন্য কোরিয়াতে কৃষকদিগের নিজ জমি কমিয়া যাইতেছে এবং ভূস্বামীর অধীনে চাষী প্রজার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। এ দেশে জমির খাজনা অত্যন্ত অধিক। ফসলের অর্দ্ধেক চাষীরা পায় আর অর্দ্ধেক লয়েন জমিদার তাঁহার খাজনা বাবদ। কোন কোন অঞ্চলে জমিদার খাজনা হিসাবে ফসলের শতকরা ৮০ ভাগও গ্রহণ করিয়া থাকেন। অনেক স্থলে, বিশেষতঃ দক্ষিণ

যখন মাঠে শস্য হইতেছে, তখন জমিদার তাঁহারই আন্দাজমত জমির খাজনা কত হইবে, তাহা ধার্য্য করিয়া দিয়া থাকেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, প্রজাই শ্রমিকের ব্যয় বহে, চাষের বলদ ও লোক দেয়, বীজ দিয়া থাকে, জমিতে সার দেয় এবং সেচের জন্য অর্দ্ধেক খরচা যোগায়। ইহা ভিন্ন জমির খাজনা প্রজাকেই দিতে হয়। জায়গীরদারী আমল হইতে জমিদার প্রজাদিগকে বেগার ধরে, সেজন্য কোন প্রকার পারিশ্রমিক সে প্রজাকে দেয় না। আর পার্ব্বণ উপলক্ষে প্রজা জমিদারদিগকে ভেট দিয়া থাকে। ইহা ভিন্ন কোরিয়ার প্রজাদিগকে জমিদারের নায়েব ও তহশীলদারদিগকে তাহাদের বেতনের অর্দ্ধেক দিতে বাধ্য হইতে হয়। ঐ সকল নায়েব বা তহশীলদারকে কোরিয়ান ভাষায় 'সাহুতম' বলে। প্রজারা যখন ফসল মাপিয়া দেয়, তখন তাহারা মাপের পাত্রটিতে শস্য রাশীকৃত করিয়া মাপে। নায়েব সেই শস্য একটি গোল ছড়ি দিয়া পালির সহিত সমান করিয়া দেয়। যাহা পালির বাহিরে পড়ে, তাহা নায়েবের প্রাপ্য হইয়া থাকে।

এত করিয়াও কোরিয়ার প্রজারা জমিদারদিগের মন পায় না। ফসল কাটা হইলে পর জমিদার প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে পারেন। এখানকার প্রজারা প্রায় উটবন্দী প্রজা। সুতরাং প্রজারা জমি অনেক সময় খারাপ করিয়া ফেলে। কারণ, এরূপ অবস্থায় তাহাদের জমির উপর কোনরূপ দরদ থাকিবার কথা নহে। ইহাতে কোরিয়ার বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। এরূপ অবস্থায় কোরিয়ার প্রজাদিগের মধ্যে অসন্তোষের উদ্ভব স্বাভাবিক। গত দশ বৎসরের মধ্যে কোরিয়ার অসন্তুষ্ট প্রজারা অনেক হাঙ্গামা উপস্থিত করিয়াছে। সময়ে সময়ে সমগ্র গ্রামের প্রজারা হাঙ্গামা বাধাইয়াছে। জাপানী সরকার প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে, কোরিয়ার লোক সর্ব্বস্বত্ববাদীদিগের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ঐ হাঙ্গামা উপস্থিত করিতেছিল। সেই জন্য তাঁহারা জবরদস্তির সহিত ঐ সকল হাঙ্গামা দমন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে ঐ সকল হাঙ্গামার অবসান হয় নাই। শেষে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে জাপানী সরকার এই ব্যাপারের রীতিমত অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন। কমিশনের হস্তে এই ব্যাপারের তদন্তভার অর্পিত হইয়াছিল, তাঁহারা একটি আইনের খসড়াও রচিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর আরও একটি আইন রচিত হইয়াছে। এখন তথাকার শাসনকর্ত্তা এই জমিদার-প্রজার বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিবার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ইহারা বেসরকারী ভাবে জমিদার-প্রজার বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়াছেন। ইহাতে প্রজাদিগের কষ্টের কিঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু ইহাতে জমির খাজনার একটা নির্দ্দিষ্ট বাঁধিয়া দেওয়া হয় নাই,—সেই জন্য ইহা এই হাঙ্গামার মূল উচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না।

কোরিয়ার জমিদারদিগের মধ্যে অনেক জাপানী আছেন। আর কতকগুলি কোরিয়াবাসী জমিদারও আছেন। বিশ বৎসর পূর্ব্বে কোরিয়ার কৃষীবল আপনাদের জন্যই কেবল শস্য উৎপন্ন করিত। এখন তাহারা বিদেশে চালান দিবার মত শস্যও উৎপন্ন করিতেছে।

শ্যামরাজ্যে জাতীয়তাবাদ

পূর্ব্ব-উপদ্বীপে শ্যামরাজ্য। ঐ রাজ্যে যে রাজনীতিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। এখন শ্যামের সিংহাসনে আনন্দমহীদল বসিয়াছেন। তিনি এখন বালক। তাঁহার এখন পঠদ্দশা। এখন তাঁহার হইয়া কয়েক জন অভিভাবক ঐ রাজ্য শাসন করিতেছেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকের ন্যায় শ্যামরাজ্যের জনগণের মধ্যে কিছু দিন হইতে জাতীয়ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইদানীং সেই জাতীয়ভাব তথায় অতি দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। এই জাতীয়ভাবের প্রসার হইতেছে বলিয়া শ্যামের ভূতপূর্ব্ব রাজা প্রজাধিপক রাজ্য ত্যাগ করিয়া বিদেশে প্রবাসীর ন্যায় জীবন যাপন করিতেছেন। জাতীয় আন্দোলনকারীরা শান্তিপূর্ণভাবে রাজনীতিক্ষেত্রে এক বিষম বিপ্লব উপস্থিত করে, সেই আন্দোলনের ফলে শ্যামরাজ প্রজাধিপক প্রজার হস্তে ক্রমশঃ অধিকতর অধিকার ছাড়িয়া দিতে সম্মত হয়েন। তাহার ফলে রাজার ক্ষমতা অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। রাজা প্রজাধিপককে দেশের লোক খুব শ্রদ্ধা এবং ভক্তি করিয়া থাকে। কিন্তু তিনি যখন দেখিলেন যে, তাঁহার প্রজারা তাঁহাকে "ঠুঁটো জগন্নাথে"র ন্যায় সিংহাসনে বসাইয়া রাখিতে চাহে, তখন তিনি আর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিতে সম্মত হইলেন না। অবশ্য রাজা প্রজাধিপক যেরূপ জনপ্রিয় নৃপতি ছিলেন, তাহাতে তিনি যদি জাতীয়দলের সহিত বিবাদ-বিসম্বাদ করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চিতই শ্যামভূমি নরশোণিতে প্লাবিত হইয়া যাইত, এবং প্রবল বিদেশীরা হয় ত সেই সুযোগে শ্যামের কিয়দংশ অধিকার করিয়া লইবার সুযোগ পাইতেন। অবশ্য এ কথা সত্য যে, ঐ রাজ্যের সামরিক বিভাগের পদস্থ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে অনেক লোক এই জাতীয়তা-বাদী বিপ্লবীদিগের নেতা। কিন্তু তাহা হইলেও সাধারণ সৈনিক-দিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকই রাজা প্রজাধিপকের পক্ষপাতী। শ্যামরাজ্যের সামরিক বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের হস্তে প্রভূত ক্ষমতা ন্যস্ত। তাঁহারা যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। এরূপ অবস্থায় প্রজাধিপক যদি জাতীয়দলের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে কি হইত, তাহা বলা যায় না। তবে তাহার ফলে দেশের যে ঘোর অনিষ্ট হইত, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। রাজা প্রজাধিপক সমস্ত বিশেষ অধিকার প্রজার হস্তে ছাড়িয়া দিয়া একটিমাত্র অধিকার সঙ্কুচিত করিতে সম্মত হন নাই। সেই জন্য তিনি অধিক জিদ না করিয়া সিংহাসন ত্যাগ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই আচরণ দর্শনে য়ুরোপের অনেকেই অতিশয় বিস্ময় মানিয়াছিলেন।

শ্যামের জাতীয়তাবাদী দল সম্পূর্ণভাবে খাঁটি গণতন্ত্রের সমর্থন করেন না। বরং তাঁহারা গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধবাদী। তাঁহাদের মত এই যে, রাজ্যের পরিচালকবর্গ যাহাতে বিদেশীদিগের প্রভাবে পতিত না হইয়া এবং পাশ্চাত্যভাবে প্রভাবিত না হইয়া পড়েন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেই জন্য রাজ্যের সরকার বা শাসনযন্ত্রের পরিচালকবর্গ যাহাতে পূর্ণমাত্রায় জাতীয় ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে চাহেন। শ্যামরাজ্যটির উপর অনেক বিদেশী রাজ্যের লোলুপ দৃষ্টি আছে। শ্যামের জাতীয়দল বলেন যে, বিদেশীরা শ্যামরাজ্যের অঙ্গীভূত কতকগুলি অঞ্চল পূর্ব্বে কাড়িয়া

লইয়াছে, সুতরাং শ্যাম সরকার আর তাহাদের পররাষ্ট্র নীতিতে বিদেশীদিগের মন যোগাইয়া, অথবা তাহাদের স্বার্থের দিকে তাকাইয়া কোন কায করিবেন না। তাঁহারা স্বীয় জাতীয় স্বার্থরক্ষা করিয়াই চলিবেন। শ্যামরাজ্য জাতিসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাহা হইলেও জাতিসঙ্ঘের প্রস্তাবের প্রতিকূলে শ্যামের প্রতিনিধি মত প্রদানে পশ্চাৎপদ হন নাই। জাপান যখন মাঞ্চুরিয়ায় হাঙ্গামা করিয়াছিল, তখন শ্যাম জাপানের অনুকূলে এবং জাতিসঙ্ঘের মতের প্রতিকূলে মত প্রকাশে দ্বিধা করে নাই। ইহাতেই বুঝা গিয়াছিল যে, শ্যাম নিজত্ব বজায় রাখিবার জন্য দৃঢ়ভাবে কার্য্য করিতে চাহে। শ্যামের সাধারণতন্ত্রবিরোধী জাতীয়দলের নায়কগণ জাপানের সহযোগিতায় আপনাদের সরকারকে দৃঢ় এবং বলশালী করিতে চাহেন। কিন্তু এই মত তথাকার সকলে সমর্থন করিতেছেন না। ইহার বিরুদ্ধবাদীরা বলেন যে, জাপানীদিগের সহিত সহযোগিতা করিলে গ্রেট বৃটেন, ইটালী এবং ফ্রান্স শ্যামরাজ্যের বিরোধী হইবেন। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় শ্যামের উহা করা যুক্তিযুক্ত নহে। শ্যামের সরকারী পক্ষ বলেন যে, শ্যামরাজ্য এখনও দুর্ব্বল। উহার অবস্থা এখন পরিবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু এখনও যখন ঐ রাজ্যের দুর্ব্বলতা ঘুচে নাই, তখন বিদেশীদিগের সহযোগে এবং ভরসায় উহাদের উন্নতিসাধন করিতে হইবে। নতুবা শ্যাম ক্রমশঃ বলশালী হইয়া উঠিতে পারিবে না। এ কথাগুলি যে একবারে মিথ্যা, তাহাও মনে হয় না। এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, শ্যামরাজ্যে এখনও দুইটা প্রবল দল আছে। অচির-ভবিষ্যতে হয় ত দুই দলে যুদ্ধ উপস্থিত হইতে পারে। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে জাপানের সাহায্যে শ্যামের বর্ত্তমান নীতি-পরিচালকদল তাঁহাদের প্রতিপক্ষদলের নায়কদিগকে কঠোর হস্তে শাস্তি দিতে পারিবেন। এ কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, শ্যামের ভূতপূর্ব্ব রাজা প্রজাধিপক অনেকটা জাপানের সহিত প্রীতি রাখিয়া চলিতেন। সেই জন্য তিনি পদত্যাগ করিলে জাপান হুঙ্কার দিয়া উঠিয়াছিল শুনা গিয়াছিল। তাহার পর সম্ভবতঃ শ্যামের শাসনতরণীর বর্ত্তমান কাণ্ডারীগণ জাপানের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিতে চাহেন বলিয়া, জাপান তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও শ্যামের অবস্থা যে সম্পূর্ণ নির্ব্বিঘ্ন, তাহা মনে করিতে পারা যাইতেছে না। য়ুরোপীয় কয়েকটি জাতি, বিশেষতঃ ফ্রান্স এই ব্যাপার দেখিয়া যে নিশ্চিন্ত আছেন, তাহা মনে হয় না। যদি সত্য সত্যই শ্যামরাজ্যে একটা অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ফ্রান্স প্রভৃতি যে অপর পক্ষ অবলম্বন করিবেন না, তাহাই বা নিশ্চিতভাবে কে বলিতে পারে? তবে গতিক দেখিয়া মনে হয় যে, সহসা তাঁহারা তাহা করিবেন না। কারণ, তাহা হইলে একটা আন্তর্জ্জাতিক হাঙ্গামা উপস্থিত হইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে য়ুরোপে যেরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইয়েছে, তাহাতে এত দূরদেশে আসিয়া য়ুরোপীয়রা কেহই সংগ্রাম বা বিবাদে লিপ্ত হইবেন না। ইটালী ত এখন আবিসিনিয়ার হাঙ্গামায় পড়িয়াছেন। তিনি এখন এত দূরে আসিয়া কাহাকে ত' সাহায্য করিতে চাহিবেন না,—পারিবেনও না। ফ্রান্স জার্ম্মাণীকে লইয়াই বিব্রত। তিনি এরূপ অবস্থায় যে আপাততঃ এই অঞ্চলে কোনরূপ কলহে লিপ্ত হইবেন, এরূপ শঙ্কা করিবার বিশেষ হেতু নাই। কাযেই শ্যাম এই অবসরে একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হইতে পারিলেও পারিতে পারে। জাপান যদি এই বিষয়ে শ্যামের সহিত সহযোগিতা করেন, এবং সে সহযোগিতা যদি আন্তরিক হয়, তাহা হইলে তাহা হওয়া অসম্ভব নহে। ফলে শ্যামরাজ্যের রাজনীতিক জীবনে একটা সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে। এখন তাহার ফল কি দাঁড়ায়, তাহা অনুমান করা বড়ই কঠিন। শ্যামের অপর দলও যে হঠকারিতার সহিত একটা ভীষণ গণ্ডগোল বাধাইবেন, এরূপ নির্ব্বুদ্ধিতা বোধ হয় তাঁহারা প্রকাশ করিবেন না।

আরবদিগের জাতীয় আন্দোলন

এসিয়ার পশ্চিম অংশে আরবদিগের এক জাতীয় আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। প্রায় ৩৫ লক্ষ বর্গ-মাইল ব্যাপিয়া এই জাতীয় আন্দোলনের প্রসার বিস্তৃত। মিশরই এই আন্দোলনের কেন্দ্র-স্থল। তদ্ভিন্ন সিরিয়া, লেবানিজ প্রজাতন্ত্র, প্যালেষ্টাইন, ট্রান্সজর্ডান, ইরাক, ইয়ামেন এবং সাউদী আরব রাজ্যেও এই আন্দোলন অল্প নহে; প্রত্যুত অত্যন্ত অধিক। ইহা ভিন্ন ইহার তরঙ্গ-তাড়নাও বহু দূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। উত্তর-আফ্রিকার লিবিয়া, টিউনিসিয়া, আলজিরিয়া এবং মরক্কো পর্য্যন্ত এই আন্দোলনের শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। আরবদেশের দক্ষিণে এবং পূর্ব্ব দিকে যে সমস্ত বৃটিশ রক্ষিত রাজ্য আছে, তাহাতেও এই আন্দোলনের গুঞ্জনধ্বনি শুনা যাইতেছে। এক কালে আতলান্তিক মহাসাগরের বেলাভূমি হইতে আরব-সাগরের তীরস্থ স্থান পর্য্যন্ত আরবদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। যে সময়ে উইলিয়ম দি কনকারার ইংলণ্ড জয় করিয়াছিলেন, সেই সময়ে এবং তাহার পর দুই শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে আরবদিগের সভ্যতা সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য খণ্ডের জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোক এই অঞ্চল হইতে বিকীর্ণ হয়। এই স্থানেই পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের অনুসন্ধানকার্য্য বিশেষ-ভাবে চলিতে থাকে, এবং জ্যোতিষ, গণিত ও ভৈষজ্যশাস্ত্র এই বিস্তীর্ণ স্থানে আলোচিত এবং বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এ দেশে সাহিত্যের এবং দর্শনের আলোচনাও অল্প হয় নাই। এক কথায় ইহা পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের জন্মভূমি না হইলেও বিকাশভূমি, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

ইহার পর খৃষ্টীয় ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে অটোম্যান তুর্কগণ এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ আক্রমণ করিয়া ইহা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়। সেই সময় হইতে ইহার অধঃপতন ঘটিতে থাকে। শেষকালে য়ুরোপের কতকগুলি রাজ্য এই বিস্তীর্ণ ভূভাগটি নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া ইহা দখল করিয়া লইয়াছে। কোথাও কোথাও উহারা এই সকল দেশে উপনিবেশও স্থাপন করিয়াছে। ফলে এই প্রকারে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া সে কালের সেই বিস্তীর্ণ আরব সাম্রাজ্যের মধ্যে পূর্ব্বকার সেই ঐক্য এবং সম্মেলন-শক্তি প্রায় নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু তাহা একবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যায় নাই। এই বিস্তীর্ণ দেশের জনগণ একধর্ম্মাবলম্বী, এক-ভাষাভাষী। তাহাদের পুরুষপরম্পরাগত একই অবদান এবং কতকটা জাতিত্বের অনুভূতি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহাই অবলম্বন করিয়া আরব আন্দোলন এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। এখন এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে আপনাদের

সংস্কৃতি এবং আপনাদের অখণ্ড স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্ম আরব-জাতি প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। ঐ সকল রাজ্যে যে সকল বিদেশী আপনাদের অধিকার বিস্তৃত করিয়াছেন, তাঁহারা এই ব্যাপারে চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। এই আন্দোলন সফল হইবার পক্ষে কতকটা বাধাও রহিয়াছে।

পূর্ব্বে যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অন্তঃপাতী উত্তর-আফ্রিকার মরক্কো, আলজিয়ার্স, টিউনিস, মিশর প্রভৃতি দেশ স্পেন, ফ্রান্স, ইটালী এবং ইংরাজ জাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত। ঐ সকল রাজ্যের কর্তৃপক্ষ যে সহজে তাঁহাদের অধিকার ত্যাগ করিতে সম্মত হইবেন, ইহা কোন-ক্রমেই মনে করা যাইতে পারে না। আরব দেশের সাগর-প্রান্তস্থিত যে সকল স্থানে ইংরাজ অধিকার আছে,—ইংরাজ জাতি যে সেই সকল স্থানের অধিকার সহজে ছাড়িয়া দিবেন, তাহা মনে করা বিষম ভ্রম।

মিশরের সহিত ইংরাজের যে চুক্তি হইয়াছিল, মিশর এখন সেই চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে কার্য্য করিতে সম্মত নহেন; সুতরাং ইংরাজ যে সহজে মিশর ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইবেন, তাহা মনে হয় না। কিন্তু আরব জাতীয় দল এই সকল বাধার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিতেছেন না। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা চরমপন্থী, তাঁহারা বলিতেছেন যে, আরব জাতির সৌভাগ্যসূর্য্য যখন মাধ্যন্দিন গগনে বিরাজ করিতেছিল, তখন যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ আরব সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত ছিল, সেই বিস্তীর্ণ ভূভাগে আরব জাতির সভ্যতা-জনিত সংস্কৃতির (culture) পুনরুজ্জীবন, রাজনীতিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা, আরব জাতির প্রাচীন সাহিত্য দর্শন প্রভৃতির পঠন-পাঠন এবং বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ প্রয়োজন, সেইরূপ ভাবে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আরব সংস্কৃতির সহিত সমঞ্জসীভূত করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এই আন্দোলন উপস্থিতির তিনটি কারণ আছে বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রথম আরব জাতির পুরুষপরম্পরাগত অবদান, বিদেশীদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত ধারণা এবং বিদেশীদিগের প্রভুত্বের প্রতিক্রিয়া। এই আন্দোলনের ফলে যে সকল য়ুরোপীয় জাতির স্বার্থে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা, তাঁহারা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন।

ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স

জার্ম্মাণীর সহিত গ্রেট বৃটেন যে নৌবাহিনীর চুক্তি করিয়াছেন, তাহা লইয়া য়ুরোপে এবং মার্কিণে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। বিলাতের বর্ত্তমান পররাষ্ট্রসচিব সার স্যামুয়েল হোর গত জুলাই মাসে বিলাতের পররাষ্ট্র-নীতির আভাস দিয়া যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া এই সকল মন্তব্য প্রকাশিত হইতেছে। এই সন্ধির ফলে ফরাসী রাজনীতিকদিগের মনে বিষম বিস্ময়জড়িত আতঙ্কের উদ্ভব হইয়াছে। গ্রেট বৃটেন বলিতেছেন যে, প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া গ্রেট বৃটেন এবং ফ্রান্স একযোগে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। গ্রেট বৃটেন কখনই পুরাতন বন্ধুদিগকে ত্যাগ করিয়া নূতন জাতির বা পক্ষের সহিত বন্ধুতা করেন নাই। সোভিয়েট সরকারের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, শান্তি অবিভাজ্য, সমবেদনার সহিত এই ব্যাপারটা বুঝিয়া কার্য্যক্ষেত্রে উহার বিনিয়োগ করা কর্ত্তব্য। গ্রেট বৃটেন পূর্ব্ব-য়ুরোপে কোনরূপ নূতন বন্দোবস্ত করিতে চাহেন না সত্য, কিন্তু ঐ অঞ্চলে তাঁহারা যাহাতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা দেখিতে চাহেন। সার স্যামুয়েল হোর বলেন যে, পাশ্চাত্য য়ুরোপে বিমান বিষয়ে যে সন্ধি হইয়াছে, তাহাতে ক্ষতি অধিক হইবে না,—মঙ্গলই অধিক হইবে। ফরাসীরা এই বক্তৃতার কতক অংশের সমর্থন করিয়াছেন, আবার কতক অংশে আপত্তিও করিয়াছেন। ইংরাজরা জার্ম্মাণীর সহিত যে নৌবাহিনী সম্বন্ধে চুক্তি করিয়াছেন, তাহার সমর্থনে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, ফরাসীদিগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আপত্তি সেই সম্বন্ধে। ফরাসী রাজনীতিকদিগের প্রধান কথা এই যে, রুস সরকারের সহিত ফ্রান্সের যে চুক্তি হইয়াছে



সার স্যামুয়েল হোর

এবং জেকোশ্লোভেকিয়ার সহিত রুসিয়ার যে চুক্তি হইয়া গিয়াছে, তাহা ঠিক জার্ম্মাণ-বৃটিশ নৌ-চুক্তির অনুরূপ নহে। শেষোক্ত দুইটি চুক্তিই ভার্সাইল সন্ধি-সর্ত্তের সহিত অবিরোধী। অর্থাৎ ভার্সাইল সন্ধি-সর্ত্তের সহিত মূল তত্ত্বের এবং শেষোক্ত দুইটি চুক্তির পরস্পরের মধ্যে বিরোধ বা অসঙ্গতি নাই। কিন্তু বৃটেনের সহিত জার্ম্মাণীর যে সন্ধি হইয়াছে, তাহার সহিত ভার্সাইল সন্ধির কোন প্রকার সঙ্গতি দেখা যায় না। বৃটিশ রাজ-নীতিকগণ ফরাসীদিগের ঐ মন্তব্য যে বিশেষ যুক্তিসিদ্ধ, তাহা মনে করেন না। জার্ম্মাণীর মন্তব্য ইহার ঠিক বিপরীত। জার্ম্মাণী নৌচুক্তি খুব আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু অন্য প্রসঙ্গে খুব চাপা সুরে অথবা অত্যন্ত ঔদাসীন্যের সহিত মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। সার স্যামুয়েল হোর বলিয়াছিলেন যে, জার্ম্মাণীর ডানিউব অঞ্চলের এবং প্রাচ্য য়ুরোপ সম্বন্ধে পরবর্ত্তী ব্যবস্থা করিতে অবহিত হওয়া উচিত, কিন্তু সে প্রস্তাব জার্ম্মাণী আমলে আনিবেন না; আমলে আনিতেছেন না। অষ্ট্রীয়ায় পুরাতন রাজবংশীয়দিগের বিরোধী আইনগুলি প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া জার্ম্মাণী ডানিউব নদের তীরভুক্ত অঞ্চলের ব্যবস্থা সম্বন্ধে একবারে নাছোড়বান্দা হইয়া উঠিয়াছেন। হার হিটলারকে আর এই ব্যাপারে নরম করা যাইতেছে না। অষ্ট্রীয়ার ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকার অর্থে ফরাসী এবং ইটালীয়গণ যাহা বুঝেন এবং বুঝাইতে চাহেন, হার হিটলার এখন তাহা বুঝিতে চাহিতেছেন না। তিনি বলেন যে, জার্ম্মাণীর পূর্ব্বসীমার দিকে এমন কিছু ঘটে নাই—যাহার জন্য তাঁহাকে

বর্ত্তমান রুস সরকারের উপর তাঁহার চির-পোষিত ভাবের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

ইটালী স্যার স্যামুয়েল হোরের বক্তৃতা সম্বন্ধে মিশ্রভাবেরই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইটালীর রাজ্যবিস্তার করিবার অধিকার আছে, গ্রেট বৃটেন এ কথা স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া ইটালী খুসী আছেন। কিন্তু যুদ্ধ দ্বারা আবিসিনিয়া সমস্যায় সমাধান করা হইতে পারিবে না, শুনিয়া সে আনন্দ যেন লোপ পাইয়াছে। এখন ইটালীর রাজনীতিপরিচালকবর্গের মুখে কেবল "মার মার" শব্দ। সেনর মুসোলিনী ত মুষল ধরিয়াই আছেন। ইটালীর উপনিবেশ-বিভাগের আণ্ডার সেক্রেটারী সেনর লেস্যোনা, এবং ইটালীর হাঙ্গামা বাধাইতে দল্ তৎপর গেব্রিয়েল ডি, অন্নুজিয়ো একবারে বেপরোয়া হইয়া সকলকে অস্ত্র ধারণ করিয়া আত্তোয়ার কলঙ্ক স্খালন করিবার জন্য ক্রমাগতই উদ্দীপ্ত করিতেছেন। পাঠক জানেন যে, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইথিওপিয়ার তদানীন্তন সম্রাট মেনেলিকের সহিত সংগ্রামে ইটালীর সৈন্য আকাশ যুদ্ধে সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত হইয়াছিল। কৃষ্ণকায় মানবের নিকট শ্বেতকায় মানবের এই পরাজয় ইটালীর লোকের মনে বড় ব্যথা দিয়াছিল। তাই আজ প্রায় ৪০ বৎসর পরে ইটালীর সেই অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্য এই দুরন্ত চেষ্টা। কেবল তাহাই নহে, ইটালী পূর্ব্ব-আফ্রিকার একটা অতি প্রবল শক্তিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। গেব্রিয়েল ডি, অন্নুজিয়ো কেবল বলিতেছেন, "ওগো! আমি সেই আত্তোয়া যুগের লোক। সে অপমানের স্মৃতি আমার মন হইতে কিছুতেই মুছিয়া যাইতেছে না। অতএব হে ইটালীর যুবকবৃন্দ! তোমরা কাহারও কথা শুনিও না, আত্তোয়ার কলঙ্ক অপনোদনের জন্য তৎপর হও।"



ষ্টালিন

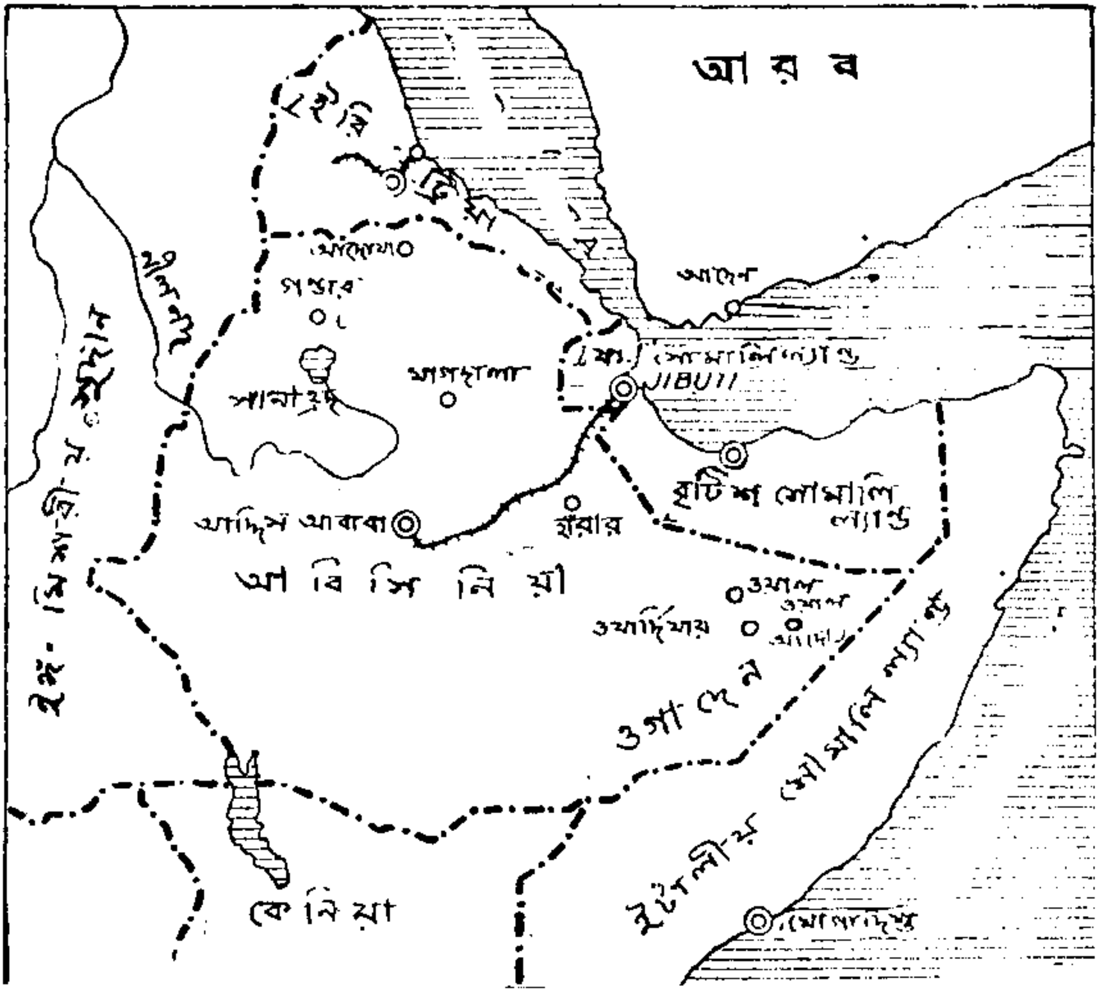
ইটালীর আবিসিনিয়া অভিযান লইয়া সোভিয়েট-শাসিত রুসিয়া বিশেষ মাথাব্যথা করিতেছেন না। কারণ, উহাতে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন স্বার্থ নাই। জাপান যে দুর্ব্বারভাবে মহাচীনের ভিতর প্রবেশ করিতেছে, সেই চিন্তায় রুসিয়ার সোভিয়েট সরকারের বিশেষ উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াছে। রুসিয়ার ষ্ট্যালিন সম্প্রতি মার্কিণের সহিত বাণিজ্য বিষয়ে এক চুক্তি করিয়া বসিয়াছেন। সেই চুক্তি অনুসারে এখন রুসিয়া মার্কিণের নিকট হইতে যে পরিমাণ মাল ক্রয় করিতেছেন, তাহার প্রায় দ্বিগুণ মার্কিণী মাল খরিদ করিবেন বলিয়া এক সর্ত্ত করিয়াছেন। কিন্তু রুসিয়া মার্কিণের নিকট হইতে যে কোনরূপ সুবিধা পাইবেন, এরূপ কোন সর্ত্ত করেন নাই। এই প্রকার নিঃস্বার্থ পরোপকারের জন্য সোভিয়েট সরকারের প্রাণ এত কাঁদিয়া উঠিল কেন,—তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না। শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পন্থা শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্। সবুরে সকল ব্যাপারই বুঝা যাইবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মার্কিণের সহিত রুসিয়ার যে পরিমাণ পণ্যের আদান-প্রদান হইত, এই নূতন চুক্তি অনুসারে তত পণ্যের আমদানী-রপ্তানী হইবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ বিদ্যমান। কিন্তু মার্কিণের নিকট রুসিয়ার দেনার টাকাটার কথা এখন কিছু উঠিতেছে না। এইটিই বড় ব্যাপার। ইহা লইয়া ভবিষ্যতে গোল বাধিতে যে না পারে, এমন কথা বলা যায় না। মোটামুটি য়ুরোপের রাজনীতিক এবং আর্থিক অবস্থার ইহাই আভাস।

ইটালী ও আবিসিনিয়া

ইটালীর সহিত আবিসিনিয়ার সংগ্রাম উপস্থিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা জন্মিয়াছে। ইটালীয় সৈন্য আর জাতিসঙ্ঘের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা না করিয়া পূর্ব্ব-আফ্রিকা অভিমুখে দলে দলে ধাবিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত কত ইটালীয় সৈন্য যে পূর্ব্ব-আফ্রিকায় ইরিট্রিয়ায় উপনীত হইয়াছে, তাহার হিসাব পাওয়া যায় নাই। তবে ইহা জানা গিয়াছে যে, আবিসিনিয়ার ন্যায় একটি দেশকে জয় করিবার জন্য যত সৈন্য আবশ্যক, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক সৈন্য তথায় উপনীত করা হইয়াছে। ইটালী এই ব্যাপারে এখন আর ক্ষান্ত হইতে চাহে না। তাহারা কাহারও বাধা মানিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে ইটালী এবং আবিসিনিয়ার এই বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিবার জন্য প্যারিসে গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স এবং ইটালীর প্রতিনিধিদিগের এক সভা বসিয়াছিল। কিন্তু ঐ সভা বসিবার অল্পক্ষণ পরেই সভা ভাঙ্গিয়া যায়। গত ১৮ই আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ সাড়ে ৩টার সময় এই পরামর্শ-বৈঠক বসে। কেবলমাত্র দেড় ঘণ্টাকাল এই সম্বন্ধে প্রতিনিধিদিগের মধ্যে কথা হয়, তাহার পর অপরাহ্ণ ৫টার সময় সভা ভাঙ্গিয়া যায়। ঐ ত্রিশক্তির সদস্যগণ ইহার পরে যে ইস্তাহার প্রচার করেন, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, আপাততঃ এই বৈঠকের আলোচনা স্থগিত রাখা হইল।

এই ত্রিশক্তির প্রতিনিধিরূপে যে তিন ব্যক্তি উক্ত পরামর্শ-বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের নাম যথাক্রমে এই ;—ফ্রান্সের পক্ষে ছিলেন মঁসিয়ে লাভাল, বৃটিশদিগের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন মিষ্টার এণ্টনি এডেন আর ইটালীর প্রতিনিধিরূপে ছিলেন ব্যারণ এলয়সি। আলোচনা বন্ধ হইলেই ইটালীর প্রতিনিধি এলয়সি এবং বৃটেনের প্রতিনিধি মিষ্টার এণ্টনি এডেন উভয়ে ফ্রান্স পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যাহাতে এই সমস্যার সমাধান হয়, তাহারই একটা উপায় খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য এই পরামর্শ-সভা বসান হইয়াছিল। শুনা যাইতেছে যে, তিনটি সর্ত্তে ইটালীকে আবিসিনিয়ায় আর্থিক সুবিধাদানের কথা উঠিয়াছিল। সে তিনটি সর্ত্ত এই :—(১) আবিসিনিয়ায়

রাজনীতিক স্বাধীনতা এবং ঐ রাজ্যের সীমানা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। (২) আর্থিক কর্তৃত্ব সম্বন্ধে আবিসিনিয়ার কর্তৃপক্ষের সম্মতি লইতে হইবে, এবং (৩) যে চুক্তি হইবে, তাহা জাতিসঙ্ঘের অনুমোদিত করিয়া লইতে হইবে। তাহার পর প্রকাশ পায় যে, এই সর্ত্ত সম্বন্ধে সেনর মুসোলিনী যে জবাব দিয়াছিলেন, তাহাতে এ বিষয়ে আর আলোচনা চলে নাই। সুতরাং উহা স্থগিত রাখিতে হইয়াছে। একলটি সম্মিলিত করিয়া আপনার এক বিস্তীর্ণ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তাহা হইলে লোহিত সাগরের তীরেও ইটালীর বিশাল রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। ফলে লোহিত সাগরেও ইটালীর বিশেষ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে। ইংরাজের পক্ষে ভারত অভিমুখে যাইবার পথে হয় ত ভবিষ্যতে বাধাও পড়িতে পারে। ভবিষ্যতের সেই ভয় যে ইংরাজ করিতেছেন না, তাহা মনে হয় না।



আবিসিনিয়ার মানচিত্র

ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, সেনর মুসোলিনী আবিসিনিয়া-রাজ্যটি রাজনীতিক ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে আপনার করতলগত করিতে চাহেন। নতুবা তিনি কিছুতেই ক্ষান্ত হইবেন না। কিন্তু গ্রেট বৃটেন তাহাতে বিশেষ আপত্তি করিয়াছেন। গ্রেট বৃটেনের ইহাতে আপত্তি করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। ভূমধ্যসাগরে ইটালীর অনেকটা সুবিধা আছে। ঐ মহাসাগরে ইটালী সহজেই ক্ষমতা বিস্তার করিতে পারে। তাহার উপর পূর্ব্ব-আফ্রিকায় যদি ইটালী ইরিত্রিয়া, ইটালী-অধিকৃত সোমালিল্যাণ্ডের সহিত ইথিওপিয়া যাহা হউক, ফ্রান্সের প্রতিনিধি মঁসিয়ে লাভাল সকল পক্ষেরই সুবিধাজনকভাবে এই সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টার কোন ফলই ফলে নাই। ইটালী যদি কাহারও কোন কথা না শুনেন, তাহা হইলে কে কি করিতে পারে? আপাততঃ প্রকাশ—লাভাল না কি বলিয়াছেন যে, ৪ঠা সেপ্টেম্বর জাতিসঙ্ঘে যখন এই বিষয়টি উঠিবে, তখন যাহাতে মীমাংসার চেষ্টা পণ্ড না হয়, তাহার জন্য তিনি বিশেষভাবে চেষ্টা করিবেন। তাঁহার এখনও বিশ্বাস এই

যে, তিনি সেই চেষ্টায় সাফল্যলাভে সমর্থ হইবেন। কিন্তু ইংরাজ পক্ষের প্রতিনিধি মিষ্টার এডেন সেরূপ কোন আশা মনে মনে পোষণ করেন না। তিনি এ কথা স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ইটালী যদি তাঁহার দাবী কতকটা না কমাইতে চাহেন, তাহা হইলে কোনরূপ মীমাংসাই হইতে পারে না। কিন্তু সেই সভায় ইটালীর প্রতিনিধিগণ যেরূপ মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং তাহার পর মুসোলিনী, লেসোনা, অন্ন-নজিও যেরূপ কথা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন, তাহাতে বিনা যুদ্ধে এই ব্যাপারের যে মীমাংসা হইবে, তাহা কোনমতেই আশা করা যাইতে পারে না। এই ব্যাপারে জাতিসঙ্ঘেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইবে বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন। আবিসিনিয়া এবং ইটালী উভয় রাজ্যই জাতিসঙ্ঘের অধীন। এই উভয় পক্ষের বিবাদ যদি জাতিসঙ্ঘ মিটাইয়া দিতে এরূপ ভাবে অসমর্থ হন, তাহা হইলে উহার প্রয়োজনীয়তা কি আছে, তাহা বুঝা যাইতেছে না। জাতিসঙ্ঘের সম্মান সেই জন্য জগৎসমক্ষে অত্যন্ত হ্রাস পাইবে।



ম°সিয়ে লাভাল



ব্যারন এলয়সি

ইটালী এখন যুদ্ধ করিতেই দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছেন। ইটালীর মনের কথা বোধ হয় এই যে, ফ্রান্স উত্তর-আফ্রিকার অনেকটা বিস্তীর্ণ রাজ্য অধিকার করিয়া আছেন, ইটালীর ঐ দিকে বিশেষ কোন অধিকার নাই। একমাত্র লিবিয়াতে ইটালীর অধিকার আছে। ইটালী তাহাতে সন্তুষ্ট নহে। তাই গত শতাব্দীর শেষভাগে যখন ইংরাজ, ফরাসী এবং ইটালী আফ্রিকার পূর্ব্ব-উপকূল বিভাগ করিয়া লইতে আসিয়াছিলেন, তখন ইংরাজই লোহিত সাগরের তীরস্থ ইরিট্রিয়ায় এবং ভারত সাগরের পশ্চিমদিকে ইটালীর সোমালিল্যাণ্ড ইটালীকে অধিকার করিতে দিয়াছিলেন। তখন ইংরাজ, ফরাসী এবং ইটালীয়ান এই তিন জাতিরই আবিসিনিয়া রাজ্যটি অধিকার করিয়া লইবার অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু নানা কারণে তখন তাহা হইয়া উঠে নাই। তখন ফ্রান্সের সঙ্গে ইংরাজদিগের উপনিবেশ সম্বন্ধে কোন বন্দোবস্তই হয় নাই। ইটালীও তখন এখনকার মত এত শক্তিশালী হইয়া উঠে নাই। ইটালী এখন তাঁহার রাজ্যে কার্পাসের কল প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, তাঁহার তূলার প্রয়োজন আছে। তিনি আবিসিনিয়ায় সম্ভবতঃ তূলার চাষ করিতে চাহেন। কাযেই ইটালী কাহারও কথা শুনিতে চাহিতেছেন না। ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ইটালীর আবিসিনিয়ার সহিত কোনরূপ আপোষ করিবার ইচ্ছা নাই। সেই জন্য প্যারিসের আপোষ-মীমাংসার সভা ভাঙ্গিয়া যাইলেও ইটালী বিন্দুমাত্রও দুঃখিত হয় নাই। বরং খুব উৎসাহ সহকারে পূর্ব্ব-আফ্রিকায় সৈন্য এবং রণতরী পাঠাইতেছে।



সেনর মুসোলিনী

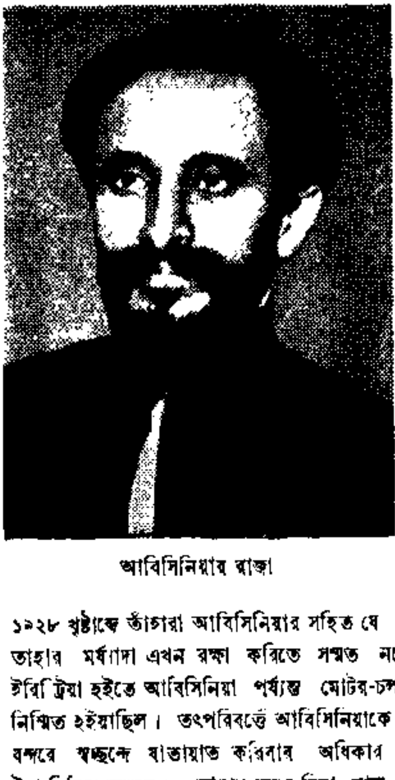


মিষ্টার এণ্টনি এডেন

ফলে এখন একরূপ ঠিকই হইয়া গিয়াছে যে, আগামী অক্টোবর

মাসে ইটালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করিবে। আপোষ যে হইবে না, তাহা প্রায় সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। তাই ইংরাজ এবং ফরাসী তাঁহাদের ভূমধ্য সাগরের রণতরীবহর সাজাইয়া গুছাইয়া লইতেছেন। ইটালী এখন যেন বুঝিতে পারিয়াছেন যে, গ্রেট বৃটেন যুদ্ধ বন্ধ করিবার পক্ষপাতী। জাতিসঙ্ঘেও সম্ভবতঃ ইটালীর প্রতিকূলে অধিক ভোট হইবে। তাই ইটালী বলিতেছেন যে, তিনি জাতিসঙ্ঘ হইতে নাম কাটাইয়া লইবেন। যাহার এতদূর আব্দার এবং এতটা জিদ, তাহাকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করা অত্যন্ত কঠিন। অসম্ভব বলিলেও বেশী বলা হয় না। ইটালী বলিতেছেন যে, আতোয়ার পরাজয়ে পূর্ব্ব-আফ্রিকায় তাঁহার যশ-মান হত হইয়াছে, অতএব তাঁহাকে তাহার প্রতিশোধ লইতেই হইবে। ইটালীর সেনর মুসোলিনী প্রভৃতি এতদূর আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন যে, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা আবিসিনিয়ার সহিত যে সন্ধি করিয়াছিলেন, তাহার মর্য্যাদা এখন রক্ষা করিতে সম্মত নহেন। সে সময়ে ইরিট্রিয়া হইতে আবিসিনিয়া পর্য্যন্ত মোটর-চলাচলের একটি পথ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তৎপরিবর্ত্তে আবিসিনিয়াকে ইরিট্রিয়ার আসাদ বন্দরে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, ইহা বিদিত ভুবনে। আসাদ বন্দর দিয়া মাল আমদানী-রপ্তানীর সুবিধা হওয়াতে আবিসিনিয়াবাসীদিগকে ফরাসীদিগের জিবটি বন্দরের উপর একমাত্র নির্ভর করিতে হইতেছে না। ইহা ভিন্ন সেই সন্ধিতে এরূপ সর্ত্ত করা হইয়াছিল যে, ইটালীর সহিত আবিসিনিয়ার যে বিষয় লইয়া গোলযোগ বা বিবাদ উপস্থিত হউক না কেন, সেই বিবাদের মীমাংসা তাঁহারা উভয়ে পরস্পর আপোষে কথাবার্ত্তা কহিয়া মিটাইয়া লইবেন। তাহাতেও যদি বিবাদের নিষ্পত্তি না হয়, তাহা হইলে মধ্যস্থ দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে রাজী করিয়া বা নিষ্পত্তি করাইয়া লইতে হইবে। যুদ্ধ করা কিছুতেই হইতে পারিবে না। এখন ইটালী নিতান্ত হঠকারিতার সহিত সন্ধির সেই সর্ত্ত লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

ওয়াল ওয়ালের হাঙ্গামা লইয়াই এই বিবাদের উদ্ভব, এ কথা প্রকাশ করা হইতেছে। এই ওয়াল ওয়ালের ব্যাপার হইতে ইটালীর গায়ে পড়িয়া ঝগড়া বাধাইবার প্রবৃত্তির বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যত মানচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কোন খানিতেই ওয়াল ওয়াল যে ইটালীর অধিকার-মধ্যে অবস্থিত, এরূপভাবে চিহ্নিত নাই। বরং ঐখানে যাইতে হইলে আবিসিনিয়া এবং ইটালী-অধিকৃত সোমালিল্যাণ্ডের সীমান্ত পার হইয়া আবিসিনিয়ার ভিতর কয়েক মাইল অগ্রসর হইলে তবে ঐ স্থান পাওয়া যায়। সুতরাং ঐ ক্ষেত্রে ইটালী যে গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করিতে গিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইটালী সম্মুখ-সংগ্রামে এই কালা আদমী হাবসী জাতিকে পরাজিত করিতে অসমর্থ হইয়া, রণবিমানের সাহায্যে অন্তরীক্ষ হইতে বোমা নিক্ষিপ্ত করিয়া, তাহাদের সর্ব্বনাশ করিয়া জয়লাভ করিবার আশায় প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তাই ইটালী সদম্ভে বলিতেছে যে, হাবসীরাজ ইটালীর চরণে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করুক, তাহা হইলে সে ছাড়িবে। এ বড় দম্ভসূচক বাক্য। কেবল তাহাই নহে, মুসোলিনী সদম্ভে বলিতেছেন যে, জাতিসঙ্ঘের সভায় ইটালীকে একঘরে করিবার প্রস্তাব যদি গৃহীত হয়, তাহা হইলে ইটালী অবিলম্বে জাতিসঙ্ঘ ত্যাগ করিবে। যে সমস্ত শক্তি ইটালীকে একঘরে করিবার প্রস্তাব সমর্থন করিবেন, ইটালী সেই সমস্ত রাজ্যের সহিত যুদ্ধ করিবে। আফ্রিকায় উপনিবেশবিস্তার সম্পর্কে ইটালী যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে, জাতিসঙ্ঘ তাহা একটি য়ুরোপীয় যুদ্ধে পরিণত করিতে চাহিলে, সমস্ত অসন্তুষ্ট রাজ্যই সেই সুযোগে নিজ নিজ অভীষ্ট-সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে, ইহার ফলে সমস্ত য়ুরোপ, সম্ভবতঃ সমস্ত পৃথিবী সেই যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়িবে, এবং অন্যূন এক কোটি সৈনিক তাহাতে জীবন বিসর্জ্জন করিবে। জাতিসঙ্ঘ য়ুরোপে এই যুদ্ধের সূচনা করিলে তাহার জন্য জাতিসঙ্ঘই দায়ী হইবে। ইটালীর এই প্রকার দম্ভপূর্ণ উক্তিতে জাতিসঙ্ঘ বিচলিত হইবেন কি না, বলা যায় না। তবে এই আন্তর্জ্জাতিক সভা এ পর্য্যন্ত যেরূপ দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের পক্ষে এই হুমকিতে বিচলিত হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে। ৪ঠা সেপ্টেম্বর (১৮ই ভাদ্র) জাতিসঙ্ঘের অধিবেশন। তথায় ইটালীর অভাব অভিযোগ পেশ করিবার জন্য ইটালীর পক্ষ হইতে এক প্রতিনিধি প্রেরিত হইতেছেন। ইটালী বলিতেছেন যে, ফটোগ্রাফ এবং দলিলের সাহায্যে তাঁহারা তাঁহাদের দাবী সপ্রমাণ করিবেন।



আবিসিনিয়ার রাজা



আবিসিনিয়ার রাণী

এ দিকে আবিসিনিয়ার রাজ্ঞী ১৬ দিন উপবাস করিয়া ভগবানের নিকট তাঁহার কাতর নিবেদন জানাইয়াছেন। তিনি বিশ্বের

নারীজাতিকে শান্তির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনায়, তাঁহার সহিত যোগদান করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। পঞ্চকাল উপবাসের ফলে আবিসিনিয়ার অধীশ্বরী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি শান্তিস্থাপনের জন্য আরও প্রার্থনা করিবেন। কিন্তু তাহাতেও শান্তি না হইলে তিনি অবশেষে তাঁহার দেশবাসী সমস্ত লোককে আক্রমণকারীদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে উত্তেজিত করিবেন। এখন 'ভবিতব্যং ভবত্যেব যদ্বিধেম্মনসি স্থিতম্।' বিধাতার মনে যাহা আছে, তাহাই হইবে। মুসোলিনী প্রমুখ ইটালীর রাজনীতিকগণ যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন সত্য, কিন্তু ইটালী ধনাঢ্য দেশ নহে। তাহার রাজকোষে অর্থাভাব। ইটালীর রাজস্বসচিব পায়েলো মেরণ ডি-রেভেল তথাকার সেনেটকে বলিয়াছিলেন যে, আবিসিনিয়ার সামরিক বজেট স্বতন্ত্রভাবে দেখান হইবে। সাধারণ বজেটে ত দেখা যায়, ইটালীর আয় অপেক্ষা ব্যয় ১ শত ৭০ কোটি ২০ লক্ষ লায়ার অধিক। ইটালীর বৈদেশিক বাণিজ্য ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ অপেক্ষা ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে শতকরা ৪ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। ইটালীর লোকসংখ্যা ৪ কোটি সাড়ে ২১ লক্ষের কিছু অধিক। বাঙ্গালার লোকসংখ্যা অপেক্ষা কিছু বেশী।

এখন কিছু দিন ধরিয়া ইটালী হইতে প্রতিদিন দুই জাহাজ করিয়া সৈন্য, মজুর প্রভৃতি ইরিট্রিয়ার রাজধানী আস্মারায় প্রেরিত হইতেছে। ইতোমধ্যে শুনা গিয়াছে যে, ইটালীর বহু সৈনিক পূর্ব্ব-আফ্রিকা হইতে পীড়িত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। এ দিকে আবিসিনিয়ায় যাহাতে ইটালীর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত না হয়, গ্রেট বৃটেনের তাহা করিবার বিশেষ কারণ আছে। গ্রেট বৃটেন মিশরের রক্ষক এবং সুদানের অন্যতর শাসক। ঐ দুই দেশের সমৃদ্ধি এবং জীবনীশক্তি নীল নদের জলের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। এই নীল নদের মূল দুইটি;—একটি শ্বেত নীল (White Nile), আর একটি নীল নীল (Blue Nile) ইহার মধ্যে নীল নীলেরই গুরুত্ব অধিক। ইহা ইথিওপিয়ার মালভূমিস্থিত সানা (Tsana) হ্রদ হইতে বাহির হইয়া খার্ত্তুমে শ্বেত নীলের সহিত মিলিত হইয়াছে। শ্বেত নদে যখন জলসম্পদ কম হয়, তখন নীল নদের জলের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতে হয়। নীল নীল নদের খাত বহিয়া তখন প্রচুর জল নামিয়া আসে। এখন যদি অন্য কোন প্রবলপরাক্রান্ত জাতি আবিসিনিয়া দখল করে, তাহা হইলে গ্রেট বৃটেনের শঙ্কার কারণ আছে। নীল নীল নদের মূলপ্রদেশে যদি নদের গতি কোন উপায়ে ভিন্ন পথে প্রবাহিত করা যায়, তাহা হইলে সুদান এবং মিশরের সর্ব্বনাশ হইবে। ইহাও ইটালী কর্ত্তৃক ইথিওপিয়া অধিকারে বৃটিশ জাতির আপত্তির অন্যতম কারণ। সেই জন্য পশ্চিম-ইথিওপিয়ায় বৃটিশ জাতি স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র। সুতরাং এই ব্যাপারের সহিত অনেক জটিল সমস্যা জড়িত রহিয়াছে। তবে এ কথা সত্য যে, ইটালী অকস্মাৎ গ্রেট বৃটেনের স্বার্থে হাত দিবে না। গত ২৫শে জুন তারিখের নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত হয় যে, মুসোলিনী এডেনকে বলিয়াছেন যে, ইটালী সমস্ত ইথিওপিয়া অধিকার করিতে চাহে না। যে অঞ্চলে বৃটিশ জাতির স্বার্থ আছে,—ইটালী তাহার সম্মান করিবে। তবে ইটালীর একটি বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রেরও প্রয়োজন, সুতরাং ইটালী কেবল রেলপথ নির্ম্মাণের অধিকার পাইলেই ক্ষান্ত হইবে না। অতএব যতই কথা কাটাকাটি হউক, যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। আগামী অক্টোবর মাসে যুদ্ধ হইবে।

ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ড

ইংলণ্ড এবং আয়র্লণ্ডের মধ্যে একটা চরম মীমাংসার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। বিগত ৬ই জুন প্রিভি কাউন্সিল আইরিশ ফ্রী ষ্টেট সম্বন্ধে যে রায় দিয়াছেন, তাহাতে আয়র্লণ্ডের অনেক উগ্রপন্থী পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। প্রিভি কাউন্সিল যে রুলিং বা সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, ফ্রী ষ্টেটের পার্লামেণ্ট ১৯২১ খৃষ্টাব্দের এঙ্গলো আইরিশ সন্ধিপত্রখানি সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে বাতিল করিয়া দিতে পারেন। কারণ, সেই সন্ধির সর্ত্তগুলি কেবল বৃটিশ জাতির প্রণীত আইনমাত্র। প্রেসিডেণ্ট ডি ভ্যালেরা



ডি ভ্যালেরা

এবং তাঁহার সরকার কিছুদিন ধরিয়া এই প্রকার ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই চলিতেছিলেন। যাহা হউক, এখন যখন সরকারী ভাবে এই ব্যাপারের মীমাংসা হইয়া গেল, তখন এই পুরাতন সন্ধির পরিবর্ত্তে আবার উভয় পক্ষের সন্তোষজনকভাবে একটা নূতন চুক্তি হইবার পথ খোলসা হইল।

ইদানীং যতদূর বুঝা গিয়াছে এবং আষাঢ় মাসের শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপার দেখিয়া মনে হইয়াছে যে, শীঘ্রই আয়র্লণ্ডের সহিত ইংরাজদিগের সন্তোষজনক সর্ত্তের সহিত একটা চুক্তি হইয়া যাইবে। উভয় পক্ষের মনোভাব দর্শনে ঐরূপ ধারণা সকলের মনেই উপস্থিত হইয়াছে। বিগত ২৮শে মে তারিখে আয়র্লণ্ডের প্রতিনিধি সভায় ডি ভ্যালেরা বলিয়াছিলেন যে, তিনি আয়র্লণ্ডের গভর্ণর জেনারলের পদ উঠাইয়া দিতে চাহেন, কারণ, তিনি বৃটিশ রাজশক্তির এক জন সরকারী প্রতিভূকে স্বাধীন আয়র্লণ্ডের শাসনযন্ত্রে স্থান দিতে ইচ্ছা করেন না। দ্বিতীয়তঃ ঐ পদ উঠাইয়া দিলেই আয়র্লণ্ড প্রকৃতপক্ষে একটি প্রজাতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হইতে পারিবে। কিন্তু ঠিক তাহার পরদিনই সেই ডি ভ্যালেরা সেই ডেল এইরিয়ানে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন যে, গ্রেট বৃটেনের

সহিত কথাবার্ত্তা না কহিয়া এই বিষয়ে কোন চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে না। তাহার পর সেই ডি ভ্যালেরাই বলিয়াছিলেন যে, "তবে আমি এ কথা নিশ্চয়ভাবে বলিতে পারি যে,



ইওইন ওডাফি

বর্ত্তমান আইরিশ সরকার অথবা অন্য কোন আইরিশ সরকার চিরকালই এই মতের সমর্থন করিবেন যে, আয়ার্লণ্ডকে কখনই কেহ গ্রেট বৃটেন আক্রমণের ভিত্তিভূমিরূপে ব্যবহার করিতে পারিবেন না।" তাহার পর আবার ২২শে তারিখে ডবলিন সহর হইতে এইরূপ একটা সংবাদ প্রকাশ পায় যে, আইরিশ ফ্রী ষ্টেট সভা সম্প্রতি ঐরূপ কতকগুলি সর্ত্তে একটি নূতন চুক্তির খসড়া প্রস্তুত করিতেছেন। এরূপ কথাও শুনা গিয়াছে যে, আয়ার্লণ্ডের সর্ব্বজনের ভোট না লইয়া তথায় পাকাপাকিভাবে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারিবে না। যদি অন্য কোন শক্তি গ্রেট বৃটেনকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে আয়ার্লণ্ড সর্ব্বদাই গ্রেট বৃটেনকে সাহায্য করিবে। পক্ষান্তরে কখনই আয়ার্লণ্ডকে গ্রেট বৃটেনের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার ভিত্তি-ভূমিরূপে ব্যবহার করিতে পারিবে না। গ্রেট বৃটেনকেও তাঁহাদের দেশের সর্ব্বসাধারণের ভোট লইয়া স্থির করিতে হইবে যে, কবে তাঁহারা আয়ার্লণ্ডের গভর্ণর জেনারেলের পদ উঠাইয়া দিতে পারিবেন। ইহা ভাল কথা সন্দেহ নাই।

সেনাপতি ইওইন ওডাফি এখনও আয়ার্লণ্ডের ব্লু শার্ট দলের বা চরমপন্থী দলের নেতৃত্বের দাবী করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে, আগামী নির্ব্বাচনকালে তিনি সরকারী দলের সহিত প্রতিযোগিতা করিবেন। যদি তিনি জয়লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি সমস্ত আয়ার্লণ্ডে। এমন কি, আলষ্টার অঞ্চল সহ সমস্ত আয়ার্লণ্ডের) ইটালীর সম্মিলিত রাজ্যগুলির আদর্শে একটি প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিবেন। যাহা হউক, যে ডি, ভ্যালেরা এক সময়ে বৃটিশ জাতির ঘোর বিরোধী ছিলেন, তিনি এখন বৃটিশ সরকারের সহিত বন্ধুত্ব রাখিয়া চলিতে ইচ্ছুক। তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে জয়যুক্ত হইবেন বলিয়া আশা করা যায়। তাঁহার প্রতিপক্ষ ওডাফির তিনি মুখ বন্ধ করিয়া দিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া মনে করা অসঙ্গত নহে।

বিদায়

যাবে যদি চ'লে, যাও তবে যাও, কেন এ দেরী,
মিছে কেন থেমে ক্রন্দন আর আমারে ঘেরি'?
সজল নয়নে আর কেন হাসা,
মৌন বচনে এত ভালবাসা,
চলিবার পথে থামিয়া দাঁড়াও আমারে হেরি'?

আলু থালু বেশে পশ্চাতে ফিরে ডেকো না আর,
বসনে ও-মুখ ঢেকে বাড়া'ও না বেদনা-ভার;
সিন্ধুর তীরে আমি প'ড়ে রব,
লহরীর পরে লহরী গণিব,
বসি'-বসি' হেথা বহিব নীরবে জীবন-ভার।

ব্যথা-ভরা প্রাণে, বেদনা ত আজ নূতন নহে,
আসা ও যাওয়ার বিচ্ছেদ মম গিয়েছে সহে।
বহু এসেছিল, বহু গেছে চ'লে,
বহু আরও যাবে, বহু কথা ব'লে,
ছন্দে ছন্দে, সঙ্গীতে, গানে, জীবন দহে।

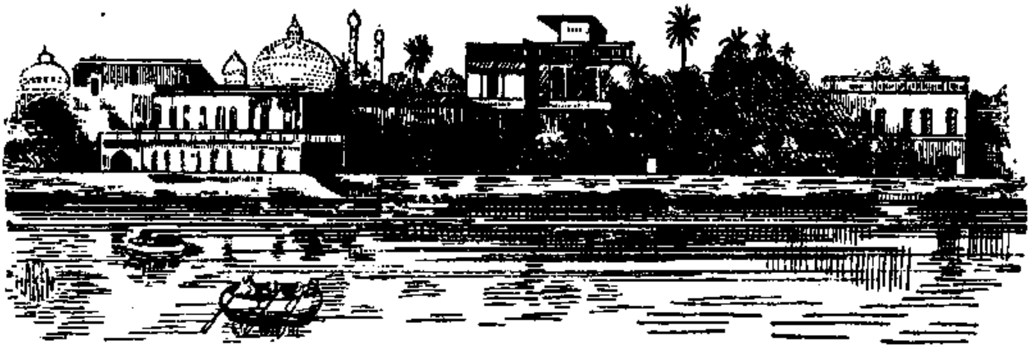
যা'রা এসেছিল দু'বাহু বাড়ায়ে গিয়েছে ভুলি,'
রংগুলি মোর গিয়েছে হারায়ে রয়েছে তুলি;
কাঁটার মুকুট পরাইয়া শিরে,
রাখিয়া গিয়েছে নির্জ্জন তীরে,
নৃপতি করিয়া স্কন্ধে দিয়েছে ভিক্ষা-ঝুলি।

স্বপনের মত এসেছিলে তুমি নীরব রাতে,
শোক-তাপ ভুলি খেলিনু দু'দিন তোমার সাথে।
পারিনি ভাবিতে তুমি চ'লে যাবে,
আকাশের চাঁদ আকাশে মিলাবে,
পাব না কুড়াতে ঝরা ফুলগুলি আঁচল পাতে।

করুণার স্বরে নিও নাকো আর আপন করি,'
নিজ হাতে দিব সাগরে ভাসায়ে আমার তরী।
মুছে ফেল লোর বিদায়ের বেলা,
ভুলে যাও প্রিয় দু'দিনের খেলা,
রহিবারে দাও যেমনি আছিনু জীবন ভরি'।

আঁখি-জল মোর ছুটিলে যে কভু বাধা না মানে,
ব্যথিতের ব্যথা আমারো বক্ষে আঘাত হানে,
দয়া ক'রে তুমি কাঁদিও না আর,
এত কাঁদি তবু সাধ কাঁদাবার?
হরষে বিষাদ আনিও না মোর কঠোর প্রাণে,
চলিতে চলিতে দেখো না ফিরিয়া আমার পানে।

কুমার ভূপেন্দ্রনাথ দাস।



পেনসিলভানিয়া

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম পেনসিলভানিয়া উইলিয়ম্ পেনের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। পেনসিলভানিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে জগতের দরবারে গরীয়ান্ করিয়া তুলিবার জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়াছিল। যখন জাহাজ পাল তুলিয়া সমুদ্রবক্ষে যাত্রী ও মাল বহন করিত, তখন সমুদ্র-পথে বাণিজ্যের প্রগতি এত বৃদ্ধি পায় নাই। পেনসিলভানিয়ার এক জন অধিবাসী রবার্ট ফুল্‌টন্ বাষ্পীয়পোত-পরিচালনার উপায় উদ্ভাবন করিয়া জগৎকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন।

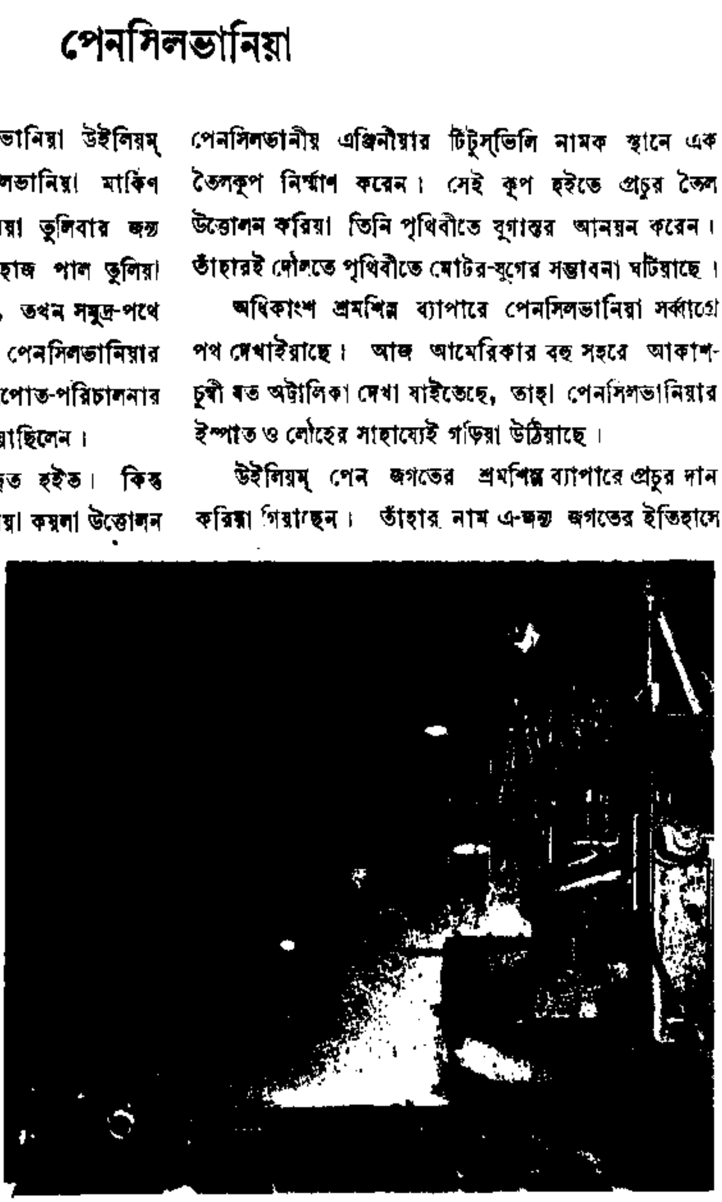
পূর্ব্বে বাষ্পীয় পোতে কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইত। কিন্তু অপর্য্যাপ্ত কাষ্ঠ দুর্লভ হওয়ায় পেন্‌সিলভানিয়া কয়লা উত্তোলন করিয়া তাহার সাহায্যে বাষ্পীয় পোত-পরিচালনার উপায় নির্দ্দেশ করে।

ষ্টেট্‌সবার্গের স্কচ আইরিশ কারখানা লৌহ-শিল্পের প্রতিষ্ঠা করে। পেনসিলভানিয়া সে কার্য্যে লৌহ সরবরাহ করিবার ভার লয়। তাহারই ফলে রেলপথ নির্ম্মাণের উপযোগী যাবতীয় দ্রব্যের উদ্ভব ঘটে।

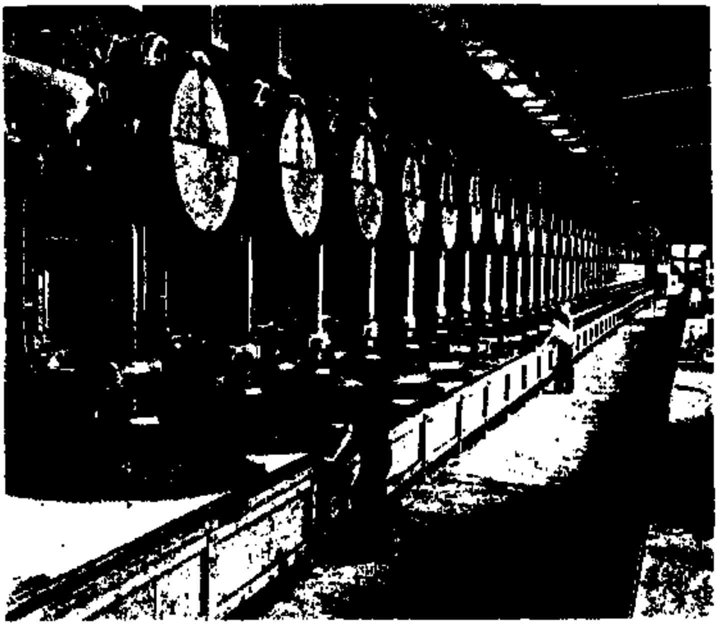
পূর্ব্বে তিমি মৎস্যের এবং অন্যান্য জন্তুর চর্ব্বি হইতে তৈল উৎপাদিত হইত। সেই তৈলের দ্বারা জ্বালানি কার্য্য এবং যন্ত্র-সমূহকে তৈলসিক্ত করিবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তাহা পর্য্যাপ্ত বিবেচিত না হওয়ায় কর্ণেল ই, এল ড্রেক নামক জনৈক পেনসিলভানীয় এঞ্জিনীয়ার টিটুস্‌ভিলি নামক স্থানে এক তৈলকূপ নির্ম্মাণ করেন। সেই কূপ হইতে প্রচুর তৈল উত্তোলন করিয়া তিনি পৃথিবীতে যুগান্তর আনয়ন করেন। তাঁহারই দৌলতে পৃথিবীতে মোটর-যুগের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে।

অধিকাংশ শ্রমশিল্প ব্যাপারে পেনসিলভানিয়া সর্ব্বাগ্রে পথ দেখাইয়াছে। আজ আমেরিকার বহু সহরে আকাশ-চুম্বী যত অট্টালিকা দেখা যাইতেছে, তাহা পেনসিলভানিয়ার ইস্পাত ও লৌহের সাহায্যেই গড়িয়া উঠিয়াছে।

উইলিয়ম্ পেন জগতের শ্রমশিল্প ব্যাপারে প্রচুর দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম এ-জন্য জগতের ইতিহাসে



এটনার টিউব মিল—নল যুড়িবার সময় বৈদ্যুতিক দৃশ্য



কাচ-পালিসের কারখানা



শিকারী-কুকুর ও শিকারী

এখান হইতেই সরবরাহ হইয়া থাকে। পৃথিবীতে যত চিনি বিশুদ্ধ অবস্থায় সরবরাহ হইয়া থাকে, তাহার এক-ষষ্ঠাংশ পেনসিল-ভানিয়ায় হয়। ইস্পাতের পরিমাণও ঐ প্রকার।

আমেরিকায় ৫১টি প্রধান প্রধান শ্রমশিল্প আছে। তন্মধ্যে পেনসিল-ভানিয়া ১৭টিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে এবং বাকিগুলির মধ্যে তৃতীয় স্থান এই অঞ্চলের অধিকৃত।

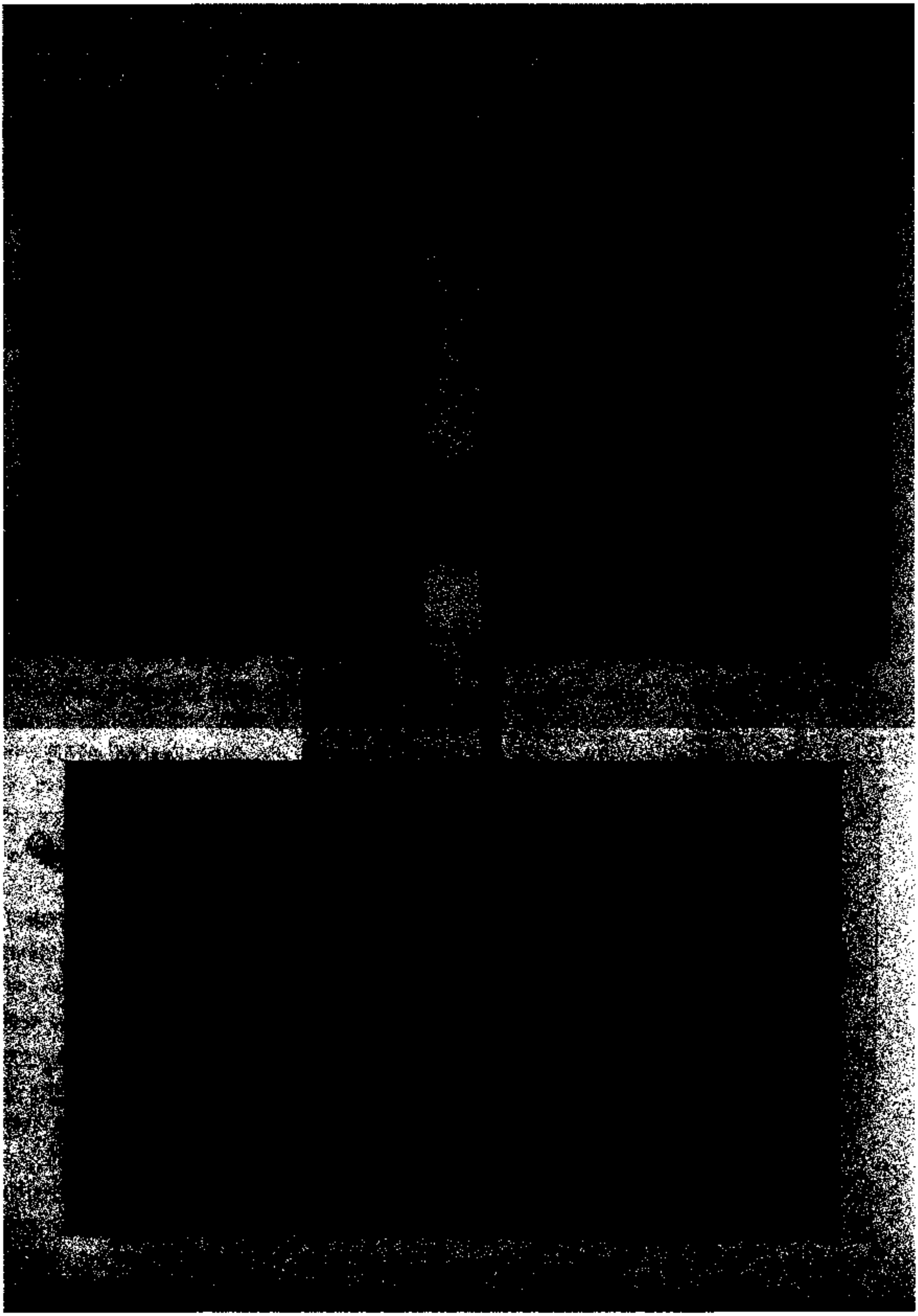
পেনসিলভানিয়ার ইতিহাস গৌরবময় কাহিনীতে পূর্ণ। ইহার আরণ্য-জীবনও যেমন বিস্ময়কর, শ্রম-শিল্প-জীবনও তেমনই বিচিত্র। বহু ধর্ম্ম-সম্প্রদায় পেনসিলভানিয়ার উদারতার মোহে আকৃষ্ট হইয়া এই অঞ্চলে স্বস্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া উন্নতি-সাধন করিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একমাত্র পেন-সিলভানিয়ার সীমান্তপ্রদেশে বহু লোক দেশীয় শ্বেতকায় হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এরূপ ব্যাপার যুক্তরাষ্ট্রের কুত্রাপি দৃষ্ট হইবে না।

নূতন দেশে পেনসিলভানিয়ার অধিবাসীরা যত অধিক পরিমাণে বসবাস করিতে যায়, এত আর কোথাও নাই। প্রায় দেড় শতাব্দী ধরিয়া পেনসিলভানিয়ার চঞ্চল অধিবাসীরা পুত্রকন্যা পরিজন সহ ভিন্ন ভিন্ন সীমান্তদেশে গিয়া বসবাস করিয়াছে।

অমর হইয়া থাকিবে। পেনসিলভানিয়া হইতে বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি এত অধিক পরিমাণে নির্ম্মিত হইয়া থাকে যে, জগতের সর্ব্বত্র ঐ জাতীয় দ্রব্যের সমগ্র পরিমাণের একপঞ্চমাংশ

মিসিসিপি উপত্যকাভূমিতে পেনসিলভানিয়াবাসীরা কি করিয়া ভিড় জমাইয়া তুলিয়াছিল, সে সম্বন্ধে ভবিষ্যতে হয় ত কোনও লেখক ইতিহাস রচনা করিবেন।

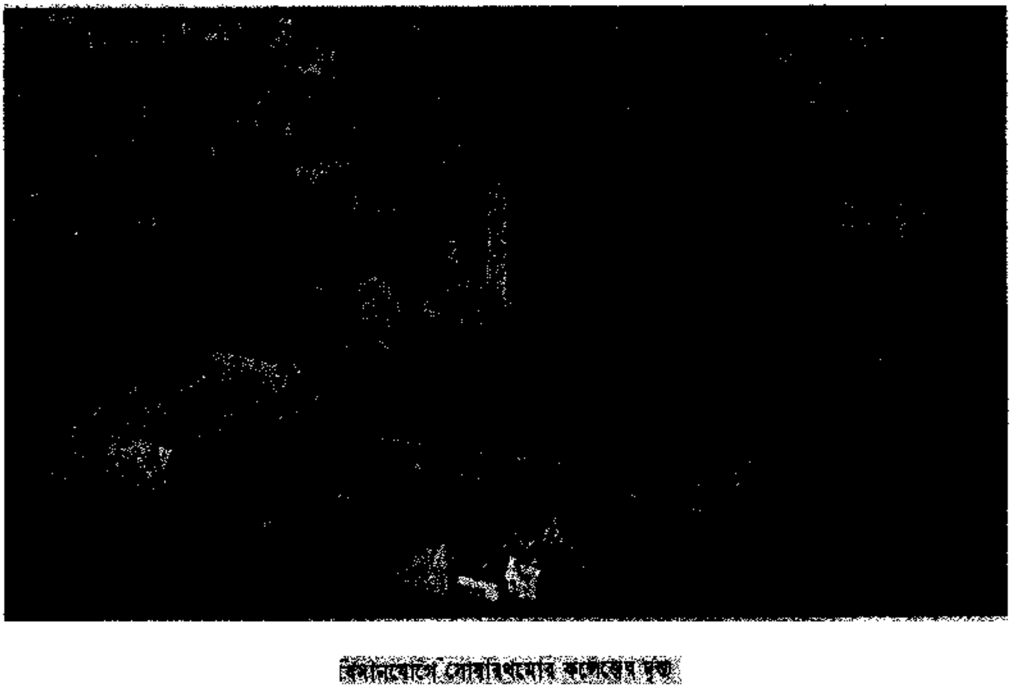




মনুষ্যরচিত ৪৩ ফুট দীর্ঘ বৈদ্যুতিক আলোকসম্পাত



টিটুসভিলির তৈল-কূপ



বিমানযোগে ব্রীনমোর কলেজের দৃশ্য

পেনসিলভানিয়া-বাসীরা এইভাবে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া না পড়িলে আমেরিকার দ্রুত উন্নতি সম্ভবপর হইত না।

উইলিয়ম্ পেন যখন আমেরিকায় আগমন করেন, তখন তিনি ২ কোটি ৮০ লক্ষ একর-পরিমিত ভূমির স্বত্ব লাভ করেন। তন্মধ্যে পাহাড়, উপত্যকা এবং অরণ্যও ছিল। বহুকাল পর্য্যন্ত অরণ্য হইতে শুধু কাঠই পাওয়া যাইত। যে সকল জমির আবাদ হইত, তাহাতে শস্য উৎপাদিত হইত। তার পর ক্রমে বড় বড় সহর গড়িয়া উঠিল, তখন মহাজনী কাঠের আদর বাড়িল।

এক উইলিয়ম্‌স্পোর্টএই ৩৩টি বড় বড় কাঠ চেরাই করিবার মিল দেখা দিল। এই কাষ্ঠ-ব্যবসায়ে অনেকেই লক্ষপতি হইয়া উঠিলেন, বহু ব্যাঙ্কও সেই টাকায় প্রতিষ্ঠিত হইল।

এই ভাবে কাষ্ঠ-ব্যবসায় চলিবার পর দেখা গেল যে, ২০ হাজার-পরিমিত অরণ্যে শাল ও সেগুন কাঠ আছে, আর সকল স্থানের বড় বড় গাছই নির্ম্মূল হইয়া পড়িয়াছে। বনে আগুন লাগিয়া বহু বৃক্ষও অবশেষে ধ্বংস হইয়া গেল।



কুক্‌সবার্গ পার্কের পাইন বৃক্ষশ্রেণী

ক্রমে উপর্য্যুপরি বন্যা আসিতে লাগিল। তৃণশূন্য ভূমিতে বন্যার জল স্থিতিলাভ করে না। গ্রীষ্মকালে নদীতেও জলাভাব হইতে লাগিল। ইহার জন্য মাছের মড়ক আরম্ভ হইয়া গেল।

পেনসিলভানিয়ার অধিবাসীরা এইরূপ সর্ব্বনাশকর অবস্থা দেখিয়া প্রতীকারের উপায় উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা করিতে লাগিল। সরকার পক্ষের সহিত বেসরকারী লোকরাও পুনরায় অরণ্যের সৃষ্টির জন্য মনোনিবেশ



উইলিয়ম্ পেন প্রতিষ্ঠিত রেডিং সহরের মোজার কারখানা



হ্যামিলটনের ঘড়ীর কারখানায় নারী-শিল্পীর কাষ

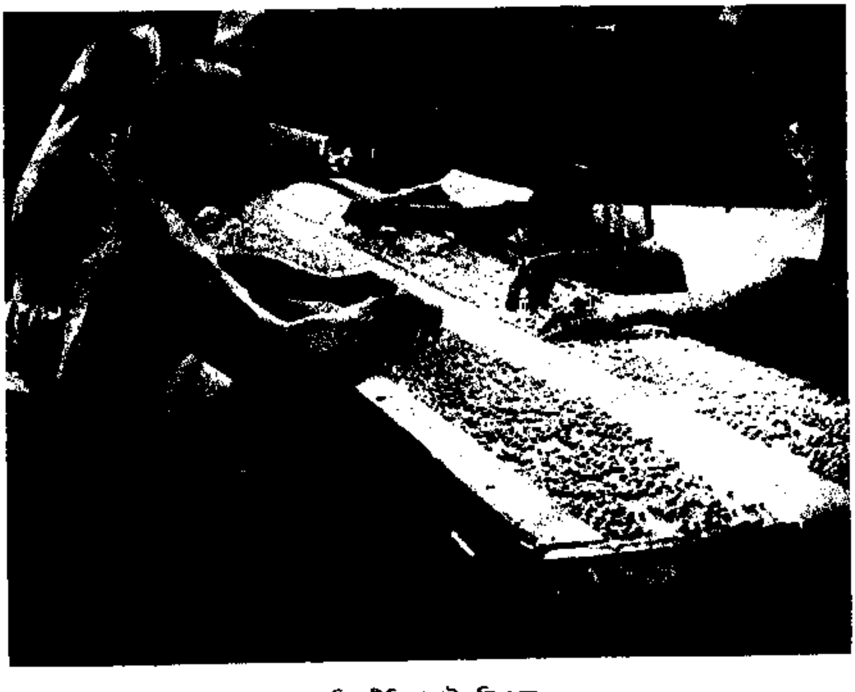
করিলেন। বনে যাহাতে আগুন লাগিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইল।

এখন শুধু কিষ্টোন ষ্টেটেই ১ কোটি ৩০ লক্ষ একর-পরিমিত ভূমি অরণ্যভূমি বলিয়া পরিগণিত। অবশ্য ইহার অধিকাংশ স্থানেই চারাগাছ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

পুনরায় অরণ্যের আবাদ হওয়ায় সে অঞ্চলে বন্যা হ্রাস পাইয়াছে এবং যদিও বা বন্যা হয়, তাহাতে ধ্বংসজনিত ব্যাপার ঘটে না। কারণ, বন্যার জল ভূমি শোষণ করে, উহা নদীর দিকে প্রবল উচ্ছ্বাসে ধাবিত হয় না। নদীর স্রোত ধীরগতি হওয়ায় মৎস্যকুলও ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। অবশ্য নবজাত অরণ্যে এখন সে যুগের ন্যায় বড় বড় মৃগ বা ৪০ পাউণ্ড ওজনের এক একটা বন্য মোরগ দেখা যাইবে না, কিন্তু এখন ষ্ট্রৌডসবার্গ অঞ্চলের অরণ্যে প্রবেশ করিলে সন্ধ্যাকালে তৃণচর্ব্বণরত বহু হরিণের দেখা মিলিবে।

পেনসিলভানিয়ায় শিকার সম্বন্ধে সংরক্ষণ-রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। প্রত্যেক শিকারী উপযুক্ত টাকা জমা দিয়া নির্দ্দিষ্ট জন্তু বা পক্ষী শিকার করিতে পারেন। এ জন্য প্রচুর অর্থাগমও হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রতি বৎসর এই বাবদে ৪ লক্ষ ডলার মুদ্রা সঞ্চিত হয়।

দেশের সরকার মৎস্যরক্ষা সম্বন্ধেও আইন-কানুন রচনা করিয়াছেন। ইহাতে প্রত্যেক নদীতে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য উৎপাদিত ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সরকারী ব্যবস্থায় মাছ ধরিবার বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ছিপের সাহায্যে মাছ ধরিতে হয়, পুরুষরা কত বড় মাছ ধরিয়া রাখিতে পারিবে এবং নারীদিগের পক্ষে কত বড়



শিম-বীচি বাছাই চলিতেছে

মাছ ধরা বিধিসঙ্গত, তাহারও বন্দোবস্ত আছে। পেনের দেশ বা পেনসিলভানিয়া ৬৭টি পরগণায় গঠিত। ইহাকে "পেন অরণ্য" বলিয়া অভিহিত করা হয়। পর্ব্বত, উপত্যকাভূমি ও অরণ্য-সমাকুল, উৎকৃষ্ট রাজপথ-সমন্বিত পেনসিলভানিয়া ভ্রমণ করিয়া কবি কিপলিং একটি কবিতা রচনা করেন।

উইলিয়ম্ পেন যেখানে বাস করিতেন, সেখানে ফিলাডেলফিয়ার ব্যবসায় আজ জগৎজোড়া নাম করিয়াছে। এইখানে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন্ দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা করেন, স্বাধীনতার বাণী এইখানেই জন্মগ্রহণ করে, সংহিত রাষ্ট্রতন্ত্রেরও উদ্ভব এইখানে।

ব্রাডক্ যেখানে যুদ্ধ করিয়া সাংঘাতিকরূপে আহত হয়েন, আজ সেখানে অজস্র নাগরিক বাস করিতেছে। উহারই সান্নিধ্যে পৃথিবীর কতিপয় শ্রেষ্ঠ শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হইয়াছে। এডগার টমসন ইস্পাত মিল, ওয়েষ্টিং হাউস বৈদ্যুতিক কারখানা প্রভৃতি সেই স্মরণীয় যুদ্ধক্ষেত্রের অদূরেই প্রতিষ্ঠিত। ইংরাজ সৈন্যকে বর্ব্বরগণ যে স্থান হইতে যুদ্ধে বিতাড়িত করে, তাহার দ্বাদশ মাইলের মধ্যে, কয়লা, ইস্পাত, লৌহ,রেলযোগে এখন এই সমস্ত দ্রব্যের গতায়াত হইয়া থাকে।

একনমি ও বেডেনের মাঝামাঝি ওহিও নদের উপর ৪ নং ড্যাম্ প্রসারিত। উহারই উপর বায়ারস্ কোম্পানীর লৌহ গলাইবার বিরাট কারখানা। সেতুর পরপারে রাজপথের অদূরে একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। এইখানে জেনারেল এন্থনি ওয়েন শিবির স্থাপন করিয়া ইণ্ডিয়ানদিগের বিরুদ্ধে সমরাভিযান করিয়াছিলেন।



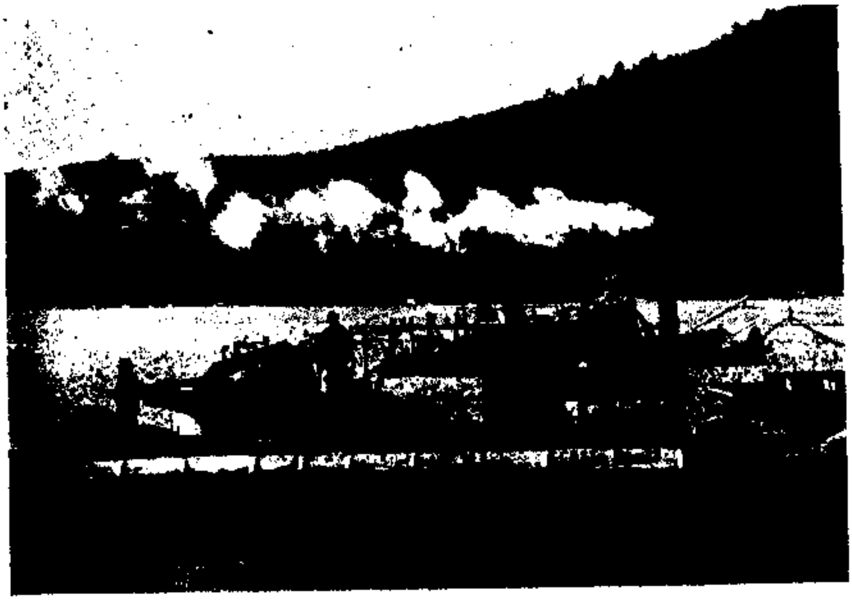
মোজার কারখানায় নারীরা মোজার অন্য অংশ তৈয়ার করিতেছে



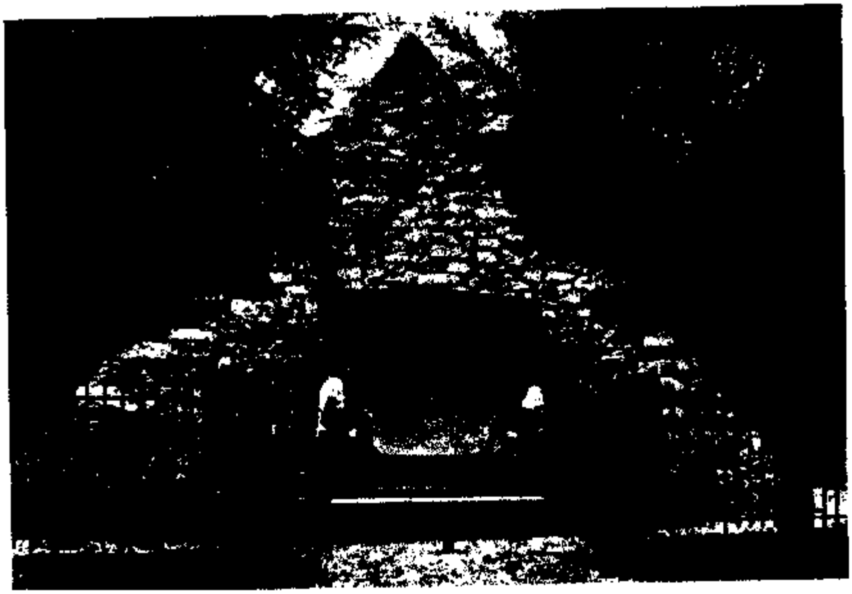
পাহাড়ের মধ্যে লুক্কায়িত কয়লা আবিষ্কারের ব্যবস্থা

অনেকেই গেটিস্বার্গ এবং ভ্যালি ফোর্জ্জএর গল্প জানিতে পারে ; কিন্তু ওল্ বুল ও তাঁহার অরণ্যমধ্যস্থিত দুর্গের বিবরণ

কয় জন জানেন ? ওল্ বুলের দুর্ভাগ্যের কাহিনীপূর্ণ ঘটনা "বিগ্ উড্" নামক অরণ্য-মধ্যে ঘটিয়াছিল।



জলমগ্ন কয়লা তুলিবার ব্যবস্থা



প্রেসিডেন্ট বুকানের পাথরের পিরামিড

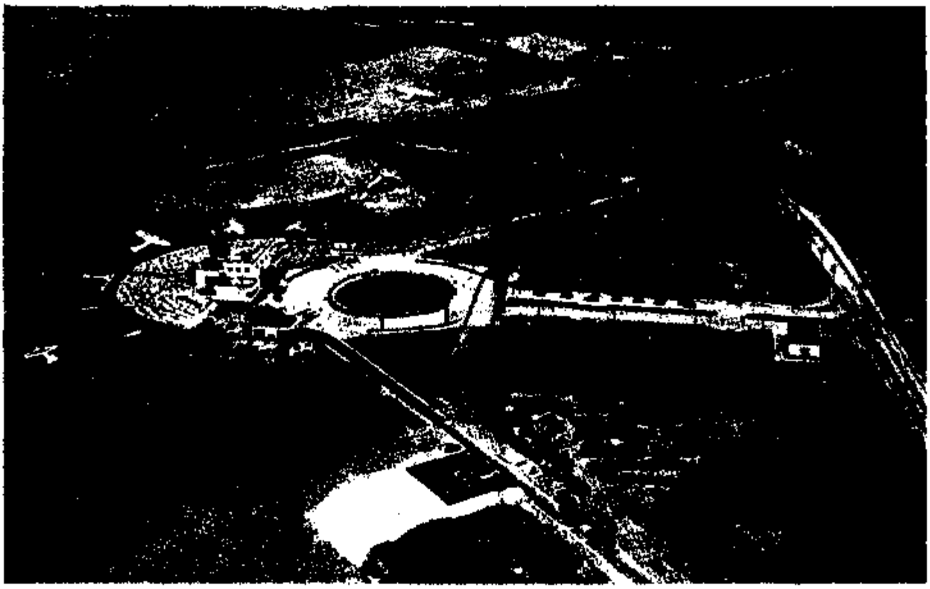
ওল্ বুল দক্ষিণ-দিকে ভ্রমণকালে তাঁহার স্বদেশ নরওয়ের অনেক লোকের সাক্ষাৎ পান। তাহারা এ দেশে আসিয়া নানা দুঃখ পাইতেছিল, অনশনে মরিতে বসিয়াছিল। তাহাদের আবেদন শুনিয়া ওল্ বুলের হৃদয় বিচলিত হয়। পরবর্ত্তী কালে পেনসিলভানিয়ার উত্তর-ভাগে পর্য্যটনকালে তিনি পটার অঞ্চলে একটি বিস্তৃত স্থান দেখিতে পান। উহা ক্রয় করিয়া তিনি তথায় নূতন নরওয়ে নির্ম্মাণ করিতে থাকেন।

পর্ব্বতমালা-পূর্ণ অঞ্চলে তাঁহার ৮ শত স্বদেশবাসী আসিয়া সমবেত হয়। তাহাদের বাসের জন্য তিন শত বাড়ী, একটি গির্জ্জা ও একটি গুদাম-ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। কেটেল ক্রিকের অদূরে, পাহাড়ের উপর ওল্ বুল নিজের বাসের জন্য প্রস্তররচিত একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন।

বেহালার বাদ্য শুনাইবার জন্য তিনি মাঝে মাঝে চারিদিকে ভ্রমণ করিতেন; যখন সে কার্য্য করিতেন না, তখন তিনি স্বদেশবাসী-দিগের কাছে ফিরিয়া আসিতেন। দুর্গ-প্রাকারে বসিয়া তিনি সেই সময় বেহালা বাজাইতে থাকিতেন।

এখনও পর্য্যটকগণ যখন মোটরযোগে ওলিওনা গ্রামের পাশ দিয়া গমন করেন, তাঁহারা ৮০ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত ওল্ বুলের দুর্গ দেখিতে পান। কাহারও কাহারও এমন মনে হয়, তাঁহারা যেন সেই বৃদ্ধ বেহালা-বাদকের সঙ্গীত শুনিতে পাইতেছেন।

এই নবগঠিত নরওয়ে বেশ ভালভাবেই চলিতেছিল। এক দিন রাত্রিকালে ওল্ বুল তাঁহার কতিপয় বন্ধুকে বেহালা বাজাইয়া শুনাইতেছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি অশ্বারোহণে আসিয়া তাঁহাকে নোটীশ দিয়া গেল যে, যে সম্পত্তি তিনি ক্রয় করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কোন



পিটসবার্গের বিমানবন্দর

অধিকার নাই। কারণ, যে ব্যক্তি তাঁহাকে বিক্রয় করিয়াছে, সম্পত্তিতে তাহার নিজেরই কোনও অধিকার ছিল না। সম্পত্তির প্রকৃত মালিক তাই তাঁহাকে নোটীশ দিয়াছেন। প্রকৃত মালিক ফিলাডেলফিয়ার এক জন বণিক।

পাঁচ বৎসর ধরিয়া ওল্ বুল্ আদালতে মামলা চালাইলেন, কিন্তু তিনি জয়লাভ করিতে পারিলেন না। বেহালার বাজনা শুনাইয়া তিনি যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তাহারই দ্বারা তিনি আদালতে মামলা চালাইতেন। অবশেষে সামান্য-মাত্র মূল্য পাইয়া তাঁহাকে সম্পত্তি ছাড়িয়া দিতে হইল। এ-দিকে নব প্রতিষ্ঠিত উপনিবেশ ধ্বংসে পরিণত হইয়া গেল। এখন ধ্বংসাবশেষ পুরাতন দুর্গটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। তাহাই ষ্টেটের একমাত্র সম্পদ।

উইল্কিস্-বারে হইতে টাওয়ানডা পর্য্যন্ত সাস্কুয়েহামা নদের যে শাখা উত্তরদিকে প্রবাহিত, তাহা যেখানে রুমারফিল্ড ক্রিকের মোহানায় আসিয়া থামিয়াছে, তাহার কাছে একটি স্থান আছে। ঐ স্থানটিতে ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের সময় বহু পলাতক বিদ্রোহী আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। এইখানে আসিয়া তাহারা একটা সহর গড়িয়া তুলে এবং আপনাদের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস পায়। এই নবগঠিত উপনিবেশের নাম হয় আনাইনম্। ফ্রান্সের পরবর্ত্তী রাজা লুই ফিলিফি ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ডিউক অব অরলিয়ানস্ নামে এখানে আগমন করেন। টেলেরাণ্ডও পলাতকদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিবার জন্য এখানে আসিয়াছিলেন।

জন নিকলসন ও রবার্ট মরিসের নিকট হইতে তাঁহারা এই স্থানটি সংগ্রহ করেন। সেখানে একটি বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়। মেরী এণ্টনেটী এখানে আসিয়া আশ্রয় লইবেন, এইরূপ স্থির হইয়াছিল। কিন্তু ফ্রান্স হইতে পলায়ন করিবার পূর্ব্বেই তিনি বিপ্লববাদীদিগের হস্তে ধৃত হন। তাহারা তাঁহাকে গিলোটিনে হত্যা করে। এখনও

এই সহরে ফরাসীবিপ্লবের বহু ঘটনার কথা আলোচিত হইয়া থাকে।

এলিঘেনি পর্ব্বতমালার বক্ষোদেশে, জন্‌সটাউন এবং আলটুনার উপরিভাগে এক স্থানে জনৈক রুসীয় রাজপুত্রের



সামরিক শিক্ষালয়ের ছাত্রগণ ভারসাম্য-রক্ষা শিখিতেছে

স্মৃতিবিজড়িত কতিপয় প্রতিষ্ঠান আছে। ইনি পর্ব্বতবাসী দরিদ্রদিগের উপকারের জন্য দারিদ্র্য বরণ করিয়াছিলেন। এই রাজপুত্রের নাম প্রিন্স ডিমিট্রিয়স আগষ্টিন্ গ্যালেজিন্। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ইনি হল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা হল্যাণ্ডের রুসীয় দূত ছিলেন। তাঁহার মাতা ফ্রেডারিক দি গ্রেটের ফিল্ড মার্শালের কন্যা। সপ্তদশবর্ষ বয়সে তিনি গ্রন্থাগার হইতে একখানি বাইবেল লইয়া পড়িতে আরম্ভ করেন। পড়িতে পড়িতে তিনি খৃষ্টধর্ম্মের একান্ত অনুরাগী হইয়া পড়েন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে দেশ-ভ্রমণের জন্য আমেরিকায় প্রেরণ করেন। বালটিমোরে তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা করিতে থাকেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ধর্ম্মযাজকত্ব গ্রহণ করিয়া দেশ-বিদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য বাহির হন। এলিঘেনি পর্ব্বতমালার পশ্চিমভাগে তিনি একটি দারুনির্ম্মিত ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বহুদেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। যখন তিনি দেশে যাইতেন, ভূমিতলে শয়ন করিতেন। আহারাদি সম্বন্ধেও তাঁহার বিন্দুমাত্র বিলাসিতা ছিল না—অতি সামান্য খাদ্য গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন।

প্রিন্স গ্যালিজিন সর্ব্বস্ব হারাইলেন। তাঁহার পিতা তাঁহার যাবতীয় ধনসম্পদ তাঁহার কন্যাকে দান করিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার মাতা যে অর্থ পুত্রকে পাঠাইতেন, প্রিন্স গ্যালিজিন তাহা পার্ব্বত্য ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে ব্যয় করিতেন। তিনি ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার স্মৃতি পেনসিলভানিয়ায় সমাদৃত ও পূজিত হইয়া থাকে।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইউটোপিয়ায় হোরাস্ গ্রিলে নামক প্রসিদ্ধ সম্রাটকে সর্ব্বস্বত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য কতকগুলি কল প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। কিন্তু তাঁহার সাধু সঙ্কল্প সাফল্যলাভ করে নাই। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ভীষণ তুষারপাত হওয়ায় সহরটি ধ্বংস হইয়া যায়। ইহার দুই দিন পরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া সকলেই পলায়ন করে।

পেনসিলভানিয়ার প্রচুর কাচ তৈয়ার হইয়া থাকে। গলিত দ্রব্যসমূহ যখন বড় বড় কাচখণ্ডরূপে আত্মপ্রকাশ করে, তখন সে দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। এলিঘেনি নদীর ধারে পিটস্‌বার্গ সহর। তাহার সন্নিহিত ক্রেটন নামক গ্রামে বিরাট কাচশিল্পের প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। কাছেই কয়লার খনি আছে। এই কয়লা কাচ নির্ম্মাণের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক একটি বড় কটাহে ১২ শত টন গলিত পদার্থ ধরিতে পারে। উহা পরে কাচরূপে পরিণত হয়। ২ হাজার ৭ শত ডিগ্রি ফারনাহিট উত্তাপে বালুকা, চূণ, পাথর প্রভৃতি দ্রবীভূত হয়। ২১ দিন ধরিয়া উত্তাপ-বৃদ্ধির পর তবে এই কার্য্য সমাধা হয়।



রবার্ট ফুলটনের জন্মস্থান



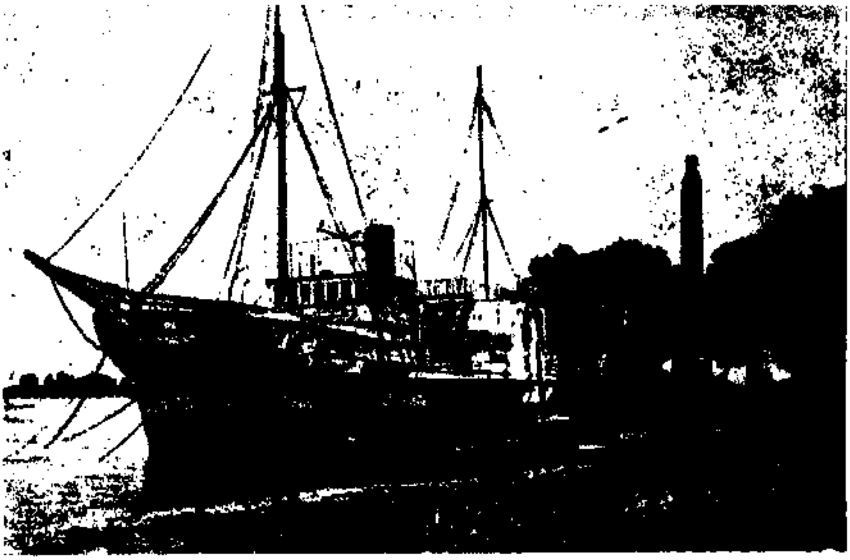
নরওয়ের বেহালাবাদক ওল্ বুলের প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতাগার

উইলিয়ম পেন ও বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের চেষ্টায় পেনসিলভানিয়ায় লোকহিতব্রত উচ্চাঙ্গের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। হতভাগ্যদিগের দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য এই দুই মহাপ্রাণ ব্যক্তি নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত করেন। তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত লোকহিতব্রত এখন পেনসিলভানিয়ার গৌরবস্বরূপ। ডফিন্ জেলায় হারসে নামক সৌভ্রাতৃত্ব-প্রতিষ্ঠার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। ষ্টিফেন জিরার্ড কলেজ তাহারই অনুরূপ প্রতিষ্ঠান। মিল্টন স্নাভেলি হারসে কোনও দরিদ্র ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। বালক হারসে লেখাপড়া শেষ করিবার পর কোন

ছাপাখানায় কায আরম্ভ করেন। ১৯ বৎসর বয়সে তিনি মিছরি তৈয়ার করিবার কার্য্য শিক্ষা করেন। একগাড়ী বোঝাই মাল লইয়া ফিলাডেলফিয়ায় যাইবার সময় একটি গাড়ীর সহিত ধাক্কা লাগায় মাল-বোঝাই গাড়ী উল্টাইয়া যায়। সুতরাং আর এ ব্যবসায়ে তাঁহার সুবিধা হইল না।



২১ সেকেণ্ডে করাতে কাঠ কাটা



যুক্তরাজ্যের প্রথম লৌহ-জাহাজ—"উলভারিন"

তাঁহার কোনও খুল্লতাতপত্নী তাঁহাকে কিছু অর্থ দান করেন। সেই অর্থ লইয়া হারসে নিউইয়র্ক গমন করেন। কিন্তু এখানেও তাঁহার সুবিধা হইল না। তিনি সকলবিষয়েই ব্যর্থকাম হইতে লাগিলেন, তিনি দেউলিয়া হইয়া গেলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বজনগণের কাছে ফিরিয়া গিয়া ল্যাঙ্কাষ্টারে শর্করা-ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন।

১৫ বৎসর পরে ৪৩ বৎসর বয়সে তিনি ১০ লক্ষ ডলার মুদ্রার মাল বিক্রয় করেন। তিনি তখন কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া দেশভ্রমণে বহির্গত হন। সঙ্গে তাঁহার পত্নী ছিলেন। মেক্সিকো পর্য্যন্ত গিয়া তিনি আবার ক্লান্তি অনুভব করিতে থাকেন—পুনরায় ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইবার আগ্রহ জন্মে।

নিজের জন্মস্থানে ফিরিয়া আসিয়া তিনি একটি কারখানা স্থাপন করেন। দুগ্ধ ও শর্করা প্রভৃতি সংযোগে তিনি চকোলেট প্রস্তুত করিতে থাকেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। তাঁহার পুত্র-কন্যা নাই। পেনসিলভানিয়ার

পিতৃ-মাতৃহীন বালক-বালিকাদিগের কল্যাণ-কল্পে তিনি সমস্ত অর্থের নিয়োগ করিবার কল্পনা করেন।

তাহারই ফলে হারসে শ্রমশিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির মূল্য ৬ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার। হারসে বিদ্যালয় ৯ হাজার একর ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। ৪০টি বিভিন্ন বাড়ীতে ৮শত বালক বাস করে। প্রত্যেক কুটীরে ৩০টি বালক থাকে। এইরূপ ১০টি কুটীর আছে। তিন জন বর্ষীয়সী মহিলা তাহাদের তত্ত্বাবধান করেন। বাকি ৩০টি বাড়ীতে দ্বাদশ বৎসরের অধিকবয়স্ক বালক অবস্থান করে। এগুলি গোলাবাড়ী। প্রত্যেক বাড়ীতে এক জন করিয়া চাষী সস্ত্রীক বাস করিয়া থাকে। বালকগণের তত্ত্বাবধানের জন্য তাহারা নিযুক্ত। বিদ্যালয়ের যখন ছুটী থাকে, তখন কৃষক-দম্পতি তাহাদিগকে কৃষিকার্য্য শিক্ষা দেয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণ কলেজে পড়িবে, বা কোনও ব্যবসায় অবলম্বন করিবে, সেজন্য তাহাদিগকে স্বাধীন ইচ্ছা ব্যক্ত করিবার অবকাশ দেওয়া হইয়া থাকে অধিকাংশই ব্যবসায় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে।



পেন্‌সিলভাসিয়ার অব্যর্থলক্ষ্য পিস্তলধারী পুলিসদল



মার্টিনডেল মেনোনাইট গির্জ্জা—এখানে মোটরগাড়ী বর্জ্জিত

১৮ বৎসর বয়স হইলে প্রত্যেক বালককে ১ শত ডলার ও পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রদান করা হয়। তাহাতে তাহাদের এক বৎসর বেশ চলিয়া যায়।

হ্যামিলটনের ঘড়ীর কারখানা ৬০ বৎসর ধরিয়া ঘড়ী নির্ম্মাণ করিতেছে। আমেরিকায় হ্যামিলটনের ঘড়ীর বিশেষ সুনাম আছে। এই ঘড়ী খুব ভাল ভাবেই সময় রাখে। কোনও ঘড়ী নিয়মিত সময় রাখিয়া চলিতেছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য এই কোম্পানী "টাইম-মাইক্রোসকোপ" নামক এক প্রকার যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছেন।



পেনসিলভানিয়ার ট্রেণ

এলিঘেনি নদীর উত্তরদিকে, পিটাসবার্গ সহরে সুপ্রসিদ্ধ হেন্‌জের কারখানা বিরাজিত। কাঁচা-শাকসব্জী, ফল ও মাংস এই কারখানায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে টিনে ভরিয়া দেশ-দেশান্তরে প্রেরিত হইয়া থাকে। ৫৭ প্রকার দ্রব্য এখানে নবকলেবর ধারণ করিয়া বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়।

২ শত ২২ একর-পরিমিত ভূমির উপর এই কারখানা প্রতিষ্ঠিত। ১২ হাজার কর্ম্মচারী এখানে কায করিয়া থাকে। ২ লক্ষ একর-পরিমিত ভূমিজাত শাকসব্জী ও ফলাদি এই কারখানার জন্য প্রয়োজন হইয়া থাকে। সে জন্য ২ লক্ষ লোক শস্যাদি সংগ্রহ করিয়া থাকে।

ওয়েষ্টিং হাউস বৈদ্যুতিক কারখানা পেনসিলভানিয়ার অন্যতম গৌরব। এই কারখানার যন্ত্রাদি দিবারাত্রি চলিয়া থাকে।

শ্রমশিল্পব্যাপারে পেনসিলভানিয়া অসাধ্যসাধন করিয়াছে; এলুমিনম প্রস্তুতের কারখানায় অতি চমৎকার জাতীয় দ্রব্যাদি নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

শিক্ষাব্যাপারে পেনসিলভানিয়া কাহারও পশ্চাতে পড়িয়া নাই। উপযুক্ত শিক্ষক তৈয়ার করিবার জন্য ট্রেণিং বিদ্যালয় আছে। ১৬টি সরকারী এবং মিউনিসিপ্যাল ট্রেণিং স্কুল ও কলেজ আছে। শিক্ষকগণ এই সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করিয়া ছাত্রগণকে শিক্ষাদানকার্য্যে অগ্রসর হন। ২০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী সাধারণ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া থাকে।

চিত্র-শিল্প-বিদ্যাতেও পেনসিলভানিয়া অগ্রগণ্য। মেরী ক্যাসাট্, সিসিলিয়া বিউ এবং ভায়লেট্ ওক্‌লে চিত্রবিদ্যায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। পেনসিলভানিয়া সর্ব্বতোভাবে জগতের বরেণ্য হইবার মত সর্ব্ববিষয়েই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

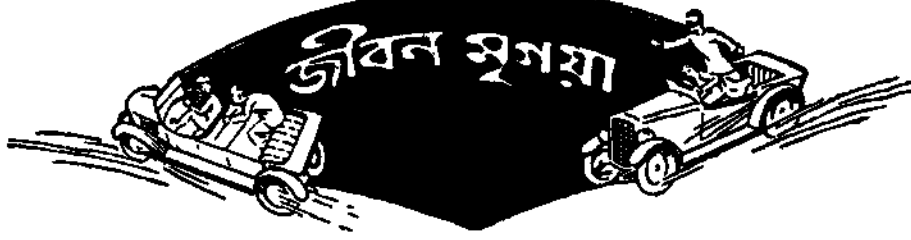
শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

শরৎ-বিদায়

বন্ধু গো যাই চ'লে যাই নতুন দেশে
যাবো পুবালী সমীরে চলি নিরুদ্দেশে,
পিছু হ'তে ডাকে মোরে তরু-বীথিকা
আঁকা হয়ে রলো হেথা চরণ-লিখা।
চড়ি মেঘের ভেলায় যাবো আঁখির শেষে।
বন্ধু গো যাই তবে আজ নতুন দেশে।

ফুল ঝ'রে যায় পাতা খসে বিরহে মম
যাবো সাথে নিয়ে সোণালি দিন প্রিয়তম।
কাঁদিবে নভতল শিশির ধারায়
ধরণী নাহিক মোরে ছেড়ে দিতে চায়
যাই, তবু চাই—কাঁদে ধরা মলিন বেশে।
যাবো হিমেলা বাতাসে চলি নিরুদ্দেশে।

বন্দেআলী মিয়া।



ষষ্ঠ পাক

জীবিত কঙ্কাল

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার প্রায় পনের মিনিট পরে মিঃ গ্রীড তাঁহার উপবেশনকক্ষে বসিয়া টেলিফোনের রিসিভার কাণের কাছে তুলিয়া ধরিলেন। সেই সময় মিস্ হ্যালাম সিঁড়ির অন্য ধারের একটি কক্ষে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতেছিল। মিঃ গ্রীডের মন তখন নানা চিন্তায় আলোড়িত হইতেছিল।

তাঁহার মনে হইল, নিয়তির অখণ্ডনীয় বিধানে তিনি যে ভীষণপ্রকৃতি অপরিচিত নরপিশাচের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, সেই সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইলে তাঁহাকে সুদক্ষ সেনাপতির ন্যায় সকল বাধা অতিক্রম করিতে হইবে, শত্রুর আক্রমণের সকল পথ রুদ্ধ করিতে হইবে। হ্যাম্বলডন কোর্টে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া যুদ্ধের জন্য তিনি উত্তেজিত হইয়াছিলেন। ড্যান কার্থ, লিসেষ্টার স্প্রিং, তাঁহার সাহায্যে বন্ধনমুক্ত পুলিস-প্রহরী, শৃঙ্খলিত জুরীর দল, বিড়ম্বিত বিচার-মহিমা, একে একে তাঁহার মানসপটে প্রতিফলিত হইয়া সেই অপরিচিত শত্রুর বিরুদ্ধে শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইবার জন্য তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিল।

অন্য কোন ব্যক্তি এই অবস্থায় পুলিসের নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করিত; পুলিস দ্বারা অন্ধভাবে পরিচালিত হইত! কিন্তু মিঃ গ্রীড সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না; তিনি আইন-ব্যবসায়ী, সুতরাং আইনের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকিলেও তিনি জানিতেন, আইনের সাহায্যে সকল সময় আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। আইনের যাতা অতি ধীরে চূর্ণ করে, এবং যাহা চূর্ণ করে, তাহার পরিমাণও অত্যন্ত পরিমিত। তাঁহার মনে হইল, তিনি সাহায্য-প্রার্থনায় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত হইয়া এজাহার করিলে, তাঁহার দুই তিন ঘণ্টা সময় নষ্ট হইবে; কিন্তু সেই সময়টুকু তাঁহার নিকট অসাধারণ মূল্যবান্। তিনি সেই নরপিশাচের টেলিফোনের নম্বর জানিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং অকারণ সময় নষ্ট না করিয়া, সেই সময়ের মধ্যেই তিনি স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে যে প্রথম খোঁচা দিতে পারিবেন—অন্যের সাহায্যে তাহা সেরূপ তীক্ষ্ণ হইবে না বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল।

হঠাৎ টেলিফোনের আওয়াজে তাঁহার চিন্তাস্রোত রুদ্ধ হইল। তাঁহার কাণে প্রবেশ করিল, "হ্যাটন এক্সচেঞ্জ কথা বলিতেছে। সাড়া দিলেন কে?"

মিঃ গ্রীড নারীকণ্ঠের মিহি আওয়াজে উহা শুনিতে পাইলেন।

মিঃ গ্রীড কোমল স্বরে বলিলেন, "আপনাকে একটু কষ্ট দিতে হইল, সে জন্য আমি দুঃখিত। আপনি দয়া করিয়া আমাকে একটা সংবাদ জানাইবেন কি? একটি বন্ধু আমাকে হ্যাটনের একটি টেলিফোনের নম্বর বলিয়াছে; কিন্তু নম্বরটা ঠিক শুনিয়াছি কি না, এ বিষয়ে আমি অনিশ্চিত। তবে আমার মনে হইতেছে—সে যে নম্বরটি দিয়াছে, তাহা ৩৭।"

উত্তর হইল, "কি নামের আপনার প্রয়োজন? ৩৭ ত ব্ল্যাক্ মুর গ্রেঞ্জের নম্বর।"

মিঃ গ্রীড তাঁহার বন্ধুর নাম বলিলেন, কিন্তু সেই নামটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলিয়া হ্যাটন একস্চেঞ্জের অধিকৃত এলাকার মধ্যে সেই নামের সন্ধান মিলিল না। তিনি রিসিভার ঝুলাইয়া রাখিয়া টেবলের উপর প্রসারিত মানচিত্রে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। তিনি হ্যাটনের পাশে সমারসেট ও ডিভনের সীমাপ্রান্তে কোন গ্রামের নিদর্শনসূচক একটি মসীবিন্দু দেখিতে পাইলেন। তাহার প্রায় দুই মাইল দূরে ব্ল্যাক্ মুর চিহ্নিত ছিল। মিঃ গ্রীড্ তাহাই পরীক্ষা করিতেছিলেন; সেই সময় মিস্ হ্যালাম সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। খ-পোত-চালিকার পরিচ্ছদে তাহার রূপ যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। তিনি তাহাকে মানচিত্রে সেই স্থানটি দেখাইয়া তাহা পরীক্ষা করিতে দিলেন। তাহার পর উঠিয়া গিয়া বিমান-ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

তাঁহারা যখন সেই অট্টালিকা ত্যাগ করিয়া ট্যাক্সিতে প্রবেশ করিলেন, তখন রাত্রি সাড়ে দশটা। এগারটা বাজিবার কয়েক মিনিট বিলম্ব থাকিতেই তাঁহারা মিস্ হালামের খ-পোতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আকাশে উড়িলেন। মিস্ হালামের মথ দক্ষিণপশ্চিমদিকে ঝটিকাবেগে উড়িয়া চলিল। মিঃ ব্লেক যখন লিসেষ্টার স্প্রিংএর আফিসে প্রথম প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহার ঠিক দুই ঘণ্টা পরে তাঁহারা এই ভাবে উড়িয়া চলিলেন।

জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি। চন্দ্রালোকে সমগ্র প্রকৃতি যেন হাসিতেছিল। সেই আলোকে পৃথিবীর সকল দৃশ্যই সুস্পষ্ট-রূপে দৃষ্টিগোচর হইল। মিঃ ব্লেক দেখিলেন, তাঁহার সঙ্গিনী রেল-লাইনের অনুসরণ করিয়া দক্ষতার সহিত খ-পোত পরিচালিত করিতে লাগিল। অবশেষে তাঁহারা ডিভনের সীমা-প্রান্তে উপস্থিত হইলে তাহা উত্তরাভিমুখে চলিল। রাত্রি প্রায় সাড়ে বারোটার সময় খ-পোত উর্দ্ধাকাশ হইতে বহু নিম্নে অবতরণ করিয়া, কয়েক মিনিট নিম্নভূমির চারিদিকে ঘুরিয়া স্থানটি পরীক্ষার পর পুনর্ব্বার উর্দ্ধে উঠিল। তাহার পর চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে একটি প্রশস্ত প্রান্তর-বক্ষে অবতরণ করিল।

এঞ্জিন নীরব হইলে মিস্ হালাম বলিল, "আপনার আদেশে নির্দ্দিষ্ট স্থানের যত নিকটে অবতরণ করিবার সুযোগ পাইলাম, সেই স্থানেই নামিলাম।"

মিঃ ব্লেক 'ককপিট্' হইতে নামিয়া চতুর্দ্দিকে প্রাকৃতিক দৃশ্য একবার দেখিয়া লইলেন। তাঁহারা যেখানে খ-পোত সহ নামিয়াছিলেন, সেই স্থান হইতে প্রায় আধ মাইল পশ্চিমে জলাভূমির একটি উচ্চ আইল নৈশ আকাশের প্রান্তে মসীলেখাবৎ প্রতীয়মান হইল। তাঁহারা যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহার প্রায় এক শত গজ দূরে বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে এলিজাবেথীয় যুগের একটি প্রাচীন অট্টালিকার গম্বুজ তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। উহাই ব্ল্যাক মুর গ্রেঞ্জ কি না, মিঃ ব্লেক তাহা বুঝিতে না পারিলেও তিনি তাড়াতাড়ি সেই অট্টালিকাটি পরীক্ষা করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। কারণ, তিনি স্প্রিংএর আফিস হইতে শুনিয়াছিলেন, লণ্ডন হইতে সেই রাত্রিতেই তাঁহার অপরিচিত শত্রু সেখানে উপস্থিত হইবে, এই জন্য তিনি তাহার আগমনের পূর্ব্বেই সেই স্থানে গমনের সঙ্কল্প করিলেন। মিঃ ব্লেক তাঁহার ছাতা এবং খানিক দড়ি সংগ্রহ করিয়া মিস্ হালামকে বলিলেন, "মিস্ হালাম, আপনাকে এখানে রাখিয়া যাইতে আমার দুঃখ হইতেছে, কিন্তু আপনার সম্বন্ধে অন্য কোন ব্যবস্থা করিবার উপায় নাই। আমি যতক্ষণ ফিরিতে না পারি, ততক্ষণ আপনি দয়া করিয়া এখানে অপেক্ষা করিবেন। যদি প্রত্যূষেও আমি এখানে ফিরিতে না পারি, তাহা হইলে আপনি লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিবেন এবং তৎক্ষণাৎ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গমন করিয়া আমাদের আবিষ্কৃত রহস্য সম্বন্ধে যাহা কিছু জানেন, সমস্তই তাহাদের বলিবেন।"

মিস্ হালাম মিঃ ব্লেকের এই প্রস্তাব শুনিয়া ক্ষুব্ধ হইল। মিঃ ব্লেকের সঙ্গে যাইবার জন্য তাহার আগ্রহ হইল; কিন্তু ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সে বলিল, "এই রাত্রিকালে আমাকে এখানে একা থাকিতে হইবে? তা আপনি প্রভাতের পূর্ব্বেই এখানে ফিরিবেন ত?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেইরূপই আশা করি, কিন্তু হঠাৎ কোন বিপদ ঘটিবে কি না, তাহা ত বলা যায় না। তবে একটা বিষয় আমি আপনার উপর নির্ভর করিতেছি। কাল ব্রিক্সটনের কারাগারে যে সলিসিটরই ড্যান কার্থ্যর সহিত সাক্ষাৎ করুক, সে যেন লিসেষ্টার স্প্রিং না হয়।"

মিঃ ব্লেক মিস্ হালামের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সেই প্রান্তরের প্রান্তস্থিত বেড়ার ধারে উপস্থিত হইলেন, এবং বেড়ার ভিতর দিয়া অন্য একটি মাঠে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তিনি আরও একটি মাঠ অতিক্রম করিয়া একটি গলিপথ পাইলেন। সেই গলি দিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলে একটি উচ্চ পাষাণ-প্রাচীর তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি সেই প্রাচীরের উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একখানি কাষ্ঠফলক দেখিতে পাইলেন, তাহাতে মোটা মোটা হরফে অঙ্কিত ছিল,—'ব্ল্যাক মুর গ্রেঞ্জ এষ্টেট্'।—তাহার ঠিক নীচেই লিখিত ছিল, 'এতদ্দ্বারা অনধিকারপ্রবেশকারীদের সতর্ক করা যাইতেছে—যাহারা ইহার সীমার মধ্যে প্রবেশ করিবে, তাহাদের বিপদের আশঙ্কা আছে।'

মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন, তিনি সেখানে প্রবেশ করিলে নিয়তি তাঁহাকে লইয়া পুনর্ব্বার কোন প্রকার নিষ্ঠুর খেলা খেলিবেন। কিন্তু ইহাই যে ব্ল্যাক মুর গ্রেঞ্জ, এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারায় তিনি খুসীই হইলেন।

মিঃ ব্লেক সেই গলির কিছু দূরে প্রাচীর-সন্নিকটে একটি

উচ্চ বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই গভীর রাত্রিতে কোন দিকে জনমানবের সমাগম না দেখিয়া সেই বৃক্ষে আরোহণ করিলেন এবং তাহার একটি শাখার সাহায্যে প্রাচীরের মাথায় নামিয়া সেই প্রাচীর হইতে ভিতরের দিকে লাফাইয়া পড়িলেন। সেই স্থানে কতকগুলি গুল্ম ছিল। তিনি সেই গুল্মরাশি ভেদ করিয়া প্রায় দশ মিনিট চলিবার পর একটি লোহার রেলিং দেখিতে পাইলেন। সেই রেলিংএর অপর ধারে গাড়ী চলিবার একটি শুভ্র পথ চন্দ্রালোকে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল।

মিঃ ব্লীড রেলিংএর উপর দিয়া সেই পথের ধারে লাফাইয়া পড়িলেন, এবং সেই স্থানে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি কিছু দূরে সেই অট্টালিকাখানি দেখিতে পাইলেন। তিনি সেখানে গমনের আর কোন বাধা দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু তথাপি সেই দিকে অগ্রসর হইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কি একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাঁহার বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল।

তিনি একবার পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার মনে হইল, যে অরণ্য তিনি অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা যেন হঠাৎ তাঁহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়া তাঁহাকে চাপিয়া ধরিতে উদ্যত হইয়াছিল! পথের অন্য ধারে শ্যামল শষ্পরাশি-সমাচ্ছাদিত সমতল ক্ষেত্র। চতুর্দিক নিস্তব্ধ, কোন বৃক্ষের একটি পত্রও কম্পিত হইতেছিল না। যেন সেখানে শ্মশানের গাম্ভীর্য্য বিরাজিত।

তিনি যে লৌহনির্ম্মিত রেলিং লাফাইয়া পার হইয়াছিলেন, সেই দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। স্থানটি অত্যন্ত নির্জ্জন হইলেও সেই পথে যে অনেকের গতিবিধি আছে, এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ রহিল না। অথচ এখানে পথিকগণের প্রবেশ নিষেধ এবং প্রবেশ করিলে বিপদের আশঙ্কা আছে বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল!

অজ্ঞাত ভয়ে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হওয়ায় তিনি কয়েক মিনিট স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জনপ্রাণীও দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু তাঁহার অমূলক আশঙ্কা দূর হইল না। তিনি ধীরে ধীরে তাঁহার ছাতা হইতে গুপ্তিখান খুলিয়া লইলেন। সেই সময় তিনি বহু দূরে কোন এরোপ্লেনের এঞ্জিনের শব্দ শুনিতে পাইলেন। সেই শব্দ ক্রমশঃ সুস্পষ্টতর হওয়ায় তিনি বুঝিতে পারিলেন, এরোপ্লেনখানি দূর হইতে সেই অট্টালিকার অভিমুখেই আসিতেছিল। অবশেষে তিনি ঊর্দ্ধাকাশে বিশালকায় নিশাচর পক্ষীর ন্যায় পক্ষ বিস্তার করিয়া এরোপ্লেনখানিকে উড়িতে দেখিলেন। তাহার গতি লক্ষ্য করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, পূর্ব্বোক্ত পথের অন্যধারে তৃণপূর্ণ যে প্রশস্ত সমতল ক্ষেত্র ছিল, সেই স্থানে তাহা অবতরণের চেষ্টা করিতেছিল। সেই নিস্তব্ধ নিশীথে চন্দ্রালোকিত আকাশতলে ঘুরিতে ঘুরিতে যে স্থানে সে নামিবার চেষ্টা করিল, মিঃ ব্লীডের অনুমান হইল, তিনি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই স্থান হইতে তাহার দূরত্ব চারি শত গজের অধিক নহে। এরোপ্লেনখানি ধীরে ধীরে প্রান্তরের সেই স্থানে অবতরণ করিল।

মিঃ ব্লীডের মনে হইল, কোনও ব্যক্তি তাড়াতাড়ি ব্ল্যাক মুর গ্রেঞ্জের দিকে আসিতেছিল। তিনি আর সেখানে অপেক্ষা না করিয়া গন্তব্য স্থানে অগ্রসর হওয়াই সঙ্গত মনে করিলেন। তিনি তাঁহার গুপ্তির অগ্রভাগ দ্বারা তাঁহার সম্মুখস্থিত মৃত্তিকা বিদ্ধ করিলেন। গুপ্তির অগ্রভাগের আঘাতে সেই স্থানে ঠং করিয়া শব্দ হইল; কোনও ধাতব পদার্থে কঠিন দ্রব্যের খোঁচা লাগিলে যেরূপ শব্দ হয়, সেইরূপ শব্দ। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তিনটি ছায়াবৎ মূর্ত্তি যেন বায়ু-স্রোতে ভাসিয়া আসিয়া তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। সেই মূর্ত্তিত্রয় পূর্ব্বোক্ত প্রান্তর অতিক্রম করিয়া, এরোপ্লেনখানি যে স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, সেই স্থানে দ্রুতবেগে ধাবিত হইল।

মিঃ ব্লীড সেই সময় তাঁহার সম্মুখস্থ মৃত্তিকার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, তাঁহার গুপ্তির আঘাতে সেই স্থানে ঐ প্রকার শব্দের কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করিলেন। তিনি চন্দ্রালোকে সেই স্থানে একটি বৃহৎ ফাঁদের ইস্পাতনির্ম্মিত দন্তশ্রেণী দেখিতে পাইলেন। উজ্জ্বল চন্দ্রালোক তাহাতে প্রতিফলিত হওয়ায় সেগুলি ঝকমক্ করিতেছিল। তিনি তাহা দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন, যদি তিনি তাহার উপর পদনিক্ষেপ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পা সেই ফাঁদে আবদ্ধ হইত, এবং ইঁদুর ধরিবার জাঁতিকলের দাঁতের মত সেই ফাঁদের দাঁতগুলি তাঁহার পা এভাবে কামড়াইয়া ধরিত যে, তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও সেই ফাঁদ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিতেন না। তাঁহাকে বন্দী হইতে হইত।

তিনি সেই পথের অন্য ধারে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। তাহার পর মাটীর উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া বুকে ভর দিয়া অদূরবর্ত্তী গুল্মান্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিতে চলিলেন। তিনি এরোপ্লেনখানির দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন, পূর্ব্বোক্ত তিন মূর্ত্তি সেই এরোপ্লেনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার 'ককপিটে'র নিকট একত্র জটলা করিতেছিল। সেই সময় আর একটি দীর্ঘ মূর্ত্তি এরোপ্লেন হইতে নামিয়া আসিল। সেই লোকটি পূর্ব্বোক্ত তিন জন লোককে লক্ষ্য করিয়া কথা বলিলে, তাহার খন্‌খনে নীরস কণ্ঠস্বর শুনিয়া ব্রীড চমকিয়া উঠিলেন। সেই কণ্ঠধ্বনি তিনি কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে লিসেষ্টার স্প্রিংএর আফিসে পুস্তকপূর্ণ সেলফের নিকট দাঁড়াইয়া শুনিতে পাইয়াছিলেন।

আগন্তুক বলিল, "অরণ্যের অপর পার্শ্বে যে প্রকাণ্ড ময়দান আছে, সেই ময়দানে একখান এরোপ্লেন দেখিলাম; কোন বিদেশগামী এরোপ্লেন কোন কারণে সেখানে নামিতে বাধ্য হইয়াছে কি না, বুঝিতে পারি নাই। তোমরা সেখানে যাও, কি উদ্দেশ্যে সেখানে তাহা নামিয়াছে, পরীক্ষা কর। যদি সন্দেহের কোন কারণ থাকে, তাহা হইলে তাহার চালককে এখানে ধরিয়া আনো।"

দলপতির আদেশ শুনিয়া মিঃ ব্রীড মিস্ হালামের বিপদের আশঙ্কায় ব্যাকুল হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, অবিলম্বে তাহার রক্ষার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে তাহার জীবন বিপন্ন হইবে। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, যে উপায়েই হউক, এই তিন জন লোক যাহাতে মিস্ হালামের নিকট যাইতে না পারে, তিনি তাহার উপায় উদ্ভাবন করিবেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, তিনি আগন্তুকের অনুসরণ করিয়া তাহাকে বন্দী করিবেন; কিন্তু তাঁহাকে সেই চেষ্টায় বিরত হইতে হইল।

অতঃপর তিনি সেই স্থানেই থাকিবেন কি মিস্ হালামের নিকট প্রত্যাগমন করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সেই সময় পূর্ব্বোক্ত তিন মূর্ত্তির এক জন আগন্তুককে বলিল, "আজ আমাদের বখরা ভাগের জন্য একটা বৈঠক বসিবে না, কর্ত্তা?"

মিঃ ব্রীড দেখিলেন, সেই দীর্ঘদেহ কর্ত্তাটি এই প্রশ্ন শুনিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইয়া কঠোর স্বরে বলিল, "ওরে কুকুর, তুই আমার সঙ্গে তর্ক করিতে সাহস করিতেছিস্? আজ দলের সাধারণ সভায় বখরা ভাগ হইবে, বখরাদার এক জন কম আছে, এ জন্য বখরা মোটাই হইবে, তবে কেন তোরা ব্যস্ত হইয়াছিস?"

ইহার পর আর কি কথা হইল, মিঃ ব্রীড তাহা শুনিবার জন্য সেখানে অপেক্ষা না করিয়া, বুকে ভর দিয়া পুনর্ব্বার অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। দুই এক মিনিট পরে তিনি পদশব্দে বুঝিতে পারিলেন, সেই তিন জন লোক পূর্ব্বোক্ত রেলিং পার হইয়া আসিল। তিনি একটি বৃক্ষের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহাদের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহারা শ্রেণীবদ্ধভাবে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। তাহারা দ্রুতবেগে তাঁহার পাশ দিয়া চলিয়া যায় দেখিয়া তিনি সকলের পশ্চাদ্বর্ত্তী লোকটির জানুর বিপরীত দিকে সবেগে তাঁহার গুপ্তি বিদ্ধ করিলেন।

গুপ্তির তীক্ষ্ণাগ্র মাংসের ভিতর এক ইঞ্চি প্রবেশ করিয়াছিল। মিঃ ব্রীড চক্ষুর নিমিষে গুপ্তিখানি টানিয়া লইতেই লোকটা উপুড় হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। সে যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

তাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া অগ্রগামী সঙ্গিদ্বয় তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল; তাহারা সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইল, বিল? মাটীতে পড়িয়া চাৎকার করিতেছ কেন?"

বিল বলিল, "আমার পা জখম হইয়াছে। আধ হাত ফুটো হইয়া গিয়াছে! রক্তের স্রোত বহিতেছে। সাপে কামড়াইলে কি পায়ে আধ হাত গর্ত্ত হয়? না, সাপের ছোবল নয়; কিন্তু এ কি ব্যাপার, ঠাহর করিতে পারিতেছি না! তোমরা একবার দেখ, মনে হইতেছে, হাঁটুর হাড় পর্য্যন্ত ফুটো হইয়া গিয়াছে।"

বিল আহত পায়ের ট্রাউজার হাঁটুর উর্দ্ধে টানিয়া তুলিল, তাহার সঙ্গিদ্বয় জ্যোৎস্নালোকে তাহার আহত অঙ্গ পরীক্ষা করিতে লাগিল। তাহাদের উভয়কে বিলের হাঁটুর উপর ঝুঁকিয়া পড়িতে দেখিয়া মিঃ ব্রীড নিঃশব্দে তাহাদের পশ্চাতে আসিয়া কঠোর স্বরে বলিলেন, "শীঘ্র দুই হাত মাথার উপর উঁচু কর—তোমরা দু'জনেই।"

এই আদেশ বজ্রনাদের ন্যায় তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। তাহারা চক্ষুর নিমিষে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া

উভয় হস্ত মাথার উপর তুলিল। যে ব্যক্তি আহত হইয়া মাটীতে পড়িয়াছিল, সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

মিঃ প্রীড বলিলেন, "তোমাদের তিন জনেরই প্রাণ আমার দয়ার উপর নির্ভর করিতেছে। যদি প্রাণের মায়া থাকে, তাহা হইলে তোমাদের পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া ঐ ঝোপের ভিতর ফেলিয়া দাও।"

সেই মুহূর্ত্তে তিন জনেরই পিস্তল অদূরবর্ত্তী গুল্মের ভিতর নিক্ষিপ্ত হইল।

মিঃ প্রীড এবার অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ, আমাকে তাড়াতাড়ি অন্য কার্য্যে যাইতে হইবে, এ জন্য আমি তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। তোমরা দুজনে তোমাদের ঐ আহত সঙ্গীটিকে দড়ি দিয়া ঐ গাছের গুঁড়ির সঙ্গে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখ।"

বিলের সঙ্গিদ্বয় তাঁহার আদেশ-পালনে সম্মত না হইয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহা দেখিয়া মিঃ প্রীড তাহাদের উভয়ের পাঁজরে গুপ্তির এক এক গোঁচা দিলেন, সেই গোঁচা খাইয়া কাপুরুষদ্বয় কাতরস্বরে বলিল, "কি দিয়া বাঁধি? দড়ি কোথায়?"

মিঃ প্রীড পকেট হইতে রেশমের দড়ি বাহির করিয়া দিলে আহত বিলকে তাহার সঙ্গিদ্বয় পার্শ্বস্থ গাছের গুঁড়ির সঙ্গে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিল। অনন্তর দ্বিতীয় ব্যক্তিও তাহার সঙ্গী দ্বারা সেইভাবে আবদ্ধ হইল। মিঃ প্রীড স্বয়ং তৃতীয় ব্যক্তিকে আর একটা গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলিলেন। বন্ধন সুদৃঢ় হইয়াছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া মিঃ প্রীড পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত অট্টালিকার সন্নিহিত পথে ধাবিত হইলেন।

তিনি এরোপ্লেনখানি সেই প্রান্তরেই সংরক্ষিত দেখিলেন, কিন্তু তাহার চালককে সেখানে দেখিতে পাইলেন না। তিনি বুঝিতে পারিলেন, দলপতি অপহৃত জুরীদের লুকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়াছে। সেখানে তাহার দলের লোকের বৈঠক বসিবার কথাও তিনি পূর্ব্বে শুনিতে পাইয়াছিলেন। দলপতি সেখানে সেই বৈঠকের ব্যবস্থা করিবে, এ বিষয়েও তাঁহার সন্দেহ রহিল না।

মিঃ প্রীড লরেল তরুর কয়েকটা গুল্ম অতিক্রম করিয়া লোহিত বর্ণ ইষ্টক-নির্ম্মিত প্রাচীন অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই অট্টালিকার দক্ষিণপার্শ্বস্থ একটি কক্ষ দীপালোকে উদ্ভাসিত দেখিলেন; ক্ষণকাল পরে দীর্ঘকায় একটি লোক সেই কক্ষের এক প্রান্ত হইতে অন্য দিকে চলিয়া গেল, খড়খড়ির ভিতর দিয়া তিনি তাহাকে দেখিতে পাইলেন। মিঃ প্রীড সেই বাতায়নের ধারীর উপর উঠিয়া বাতায়নে কাণ পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার আশা হইল, সেই আলোকিত কক্ষে কথোপকথন হইলে, তাহা তিনি শুনিতে পাইবেন। তিনি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া কক্ষমধ্যে কাহারও পদশব্দ শুনিতে পাইলেন বটে, কিন্তু কাহারও কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণগোচর হইল না। মুহূর্ত্ত পরে তিনি দিয়াশলাইয়ের কাঠী জ্বালিবার শব্দ শুনিলেন, এবং তাহার পর খট করিয়া একটা শব্দ হইল; সঙ্গে সঙ্গে সেই কক্ষ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। তাহার পর ভিতরের আর একটি দ্বার খুলিবার এবং মুহূর্ত্ত পরে তাহা বন্ধ হইবার শব্দও তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল।

মিঃ প্রীড বুঝিতে পারিলেন, সেই স্থানে আর অধিক কাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া সময় নষ্ট করা সঙ্গত হইবে না, অথচ তিনি কি উপায়ে সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিবেন, তাহাও বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার আশঙ্কা হইল, অন্যান্য গুণ্ডারা যে কোনও মুহূর্ত্তে সেখানে আসিয়া পড়িতে পারে; কিন্তু তাহাদের আগমনের পূর্ব্বেই তিনি সেই দলপতিকে তাঁহার মুঠায় পুরিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। তিনি তাঁহার গুপ্তির অগ্রভাগ দ্বারা বাতায়নের শার্শিতে গোঁচা দিয়া তাহার কাচ ফাটাইয়া ফেলিলেন; তাহার পর তাহাতে কাঁধের ধাক্কা দিতেই কাচগুলি ভাঙ্গিয়া নীচে পড়িল। শার্শি এইভাবে ভাঙ্গিয়া পড়ায় যে ফুকর হইল, সেই ফুকরের ভিতর দিয়া তিনি অট্টালিকার সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

পরবর্ত্তী কক্ষের দ্বার ঈষৎ উদ্ঘাটিত ছিল, সেই ফাঁকের ভিতর দিয়া উজ্জ্বল দীপালোক দেখিতে পাওয়ায়, মিঃ প্রীড সেই দ্বারে কাণ পাতিয়া কয়েক মিনিট দাঁড়াইয়া রহিলেন; কিন্তু কাহারও সাড়া পাইলেন না। সেই নিস্তব্ধ কক্ষে তখন কেহ ছিল বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল না। তিনি তখন ধীরে ধীরে সেই দ্বার খুলিয়া, যে কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তাহা একটি প্রশস্ত হল-ঘর। সেই ঘরের এক প্রান্তে আর একটি দ্বার উদ্ঘাটিত দেখিয়া মিঃ প্রীড সেই দ্বার পার হইয়া যে অংশে উপস্থিত হইলেন, সেই দিকে পরিচারকবর্গ বাস করিত।

মিঃ ব্লীড এই অংশে প্রবেশ করিয়া একটি কক্ষে সোপান-শ্রেণী দেখিতে পাইলেন। সেই সোপানশ্রেণী অট্টালিকার খিলানের নিম্নস্থিত গুদাম পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। তিনি সিঁড়ির আলোর সুইচ টিপিয়া, ভূগর্ভস্থ গুদামে অবতরণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। কারণ, তিনি অট্টালিকার নিম্নে অনেকগুলি গুদাম দেখিতে পাইলেন। বিভিন্ন গুদাম আলোকিত করিয়া, কোন কোন গুদামে তিনি রাশি রাশি বোতল দেখিতে পাইলেন, কতকগুলা গুদাম খালি পড়িয়াছিল; তাহার কোণে কোণে মাকড়সার জালের স্তূপ। তিনি এই প্রকার কয়েকটি গুদাম ঘুরিয়া অবশেষে একটি দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; সেই দ্বারটি লোহার চাদর দ্বারা আবৃত। কিন্তু দ্বারটি ঈষৎ উদ্ঘাটিত ছিল।

মিঃ ব্লীড সেই দ্বারের নিকট রুদ্ধ-নিশ্বাসে দাঁড়াইয়া মৃদু শব্দ শুনিতে পাইলেন; দ্বারের অপর প্রান্তে কক্ষমধ্যে কেহ লঘুপদবিক্ষেপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহারই পদশব্দ বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল। ক্ষণকাল পরে তিনি হাতের ধাক্কায় সেই দ্বার সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করিলেন।

সেই কক্ষের সকল অংশ এবার তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। উহা আফিস-কক্ষের ন্যায় সুসজ্জিত, তাহাতে মূল্যবান্ আসবাব-পত্রের অভাব ছিল না। একখানি মূল্যবান্ গালিচায় কক্ষের মেঝে সম্পূর্ণরূপে আবৃত। তাহার এক প্রান্তে আর একটি কক্ষ; সেই কক্ষের উজ্জ্বল আলোক মিঃ ব্লীডের দৃষ্টিগোচর হইল। সেই আলোকে তিনি একখানি ডেস্ক দেখিতে পাইলেন। সেই ডেস্কের পাশে একটি ক্ষুদ্র টেবলে একটি রেকর্ডিং মেসিন ও মোমের চোঙ (wax cylinder) সংরক্ষিত ছিল।

কিন্তু এই সকল আসবাব-পত্রের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল না, মুহূর্ত্ত পরে সেই কক্ষের অন্য প্রান্তে স্থাপিত একখানি চেয়ার তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। সেই চেয়ারের দিকে চাহিয়া তাঁহার যেন মূর্চ্ছার উপক্রম হইল!

তিনি সেই চেয়ারে কঙ্কালবৎ একটি মনুষ্যদেহ উপবিষ্ট দেখিলেন। দেহটি চেয়ারের সঙ্গে এরূপ সুদৃঢ়ভাবে রজ্জু-বদ্ধ যে, তাহার বাম বাহুর নিম্নভাগ ভিন্ন দেহের কোন অংশ সরাইবার উপায় ছিল না। বস্ত্র দ্বারা দেহটি এ-ভাবে আবৃত যে, তাহা দেখিয়া বস্তাবন্দী বলিয়াই মনে হইল। তাহার গালের চর্ম্ম এরূপ শুষ্ক যে, গালের অস্থির উপর তাহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারা কঠিন। তাহার উদ্ঘাটিত মুখ-বিবরে বস্ত্রখণ্ডের একটি দলা সংস্থাপিত। মিঃ ব্লীডের মনে হইল—উহা মৃত দেহ, যেন কোন বহু প্রাচীন সমাধি-শয্যায় সংরক্ষিত মমি-সমূহের ভিতর হইতে সেই দেহটি সংগৃহীত করিয়া সেই চেয়ারের উপর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে! কিন্তু ঐ প্রকার নরকঙ্কাল সংগ্রহ করিয়া চেয়ারের সহিত রজ্জুবদ্ধ করিবার কি প্রয়োজন, মিঃ ব্লীড তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

সহসা সেই নরকঙ্কালের উভয় চক্ষুতে মিঃ ব্লীডের দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট হইল। তিনি দেখিলেন, চক্ষুযুগল ঈষৎ স্পন্দিত হইতেছিল। নরকঙ্কাল জীবিত! মিঃ ব্লীডের মাথা ঘুরিয়া উঠিল। তিনি চক্ষু মুদিত করিলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

আঁধারে

কাল রাতে বাতি নিভিয়া গিয়াছে, মিনতি—জ্বেলো না তায়!
ফিরে যেতে বলো আজ রজনীতে সুন্দরী জ্যোছনায়।
দূর গগনের নীলিমার সাথে
করেছে মিতালী আঁখি আজি রাতে,
বিরহ-কাতর অন্তরে মোর ব্যর্থতা গুমরায়!

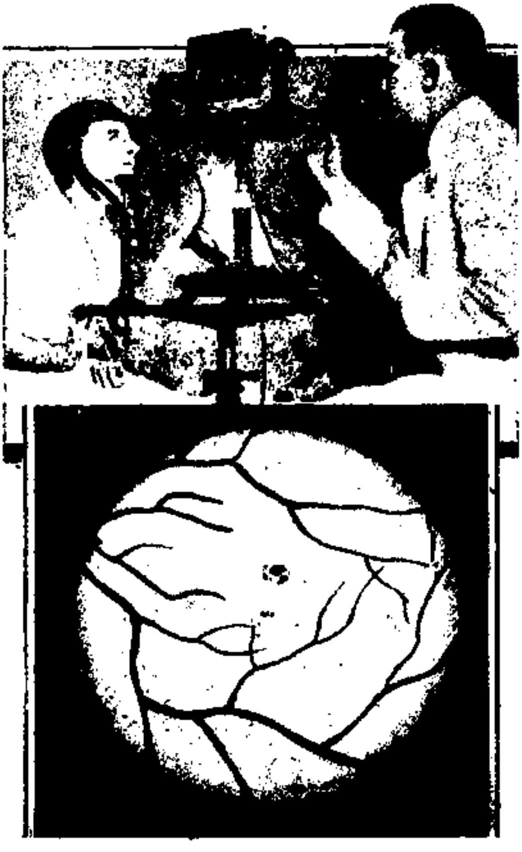
ছিঁড়েছে যে মালা কোলে লয়ে তারে কেঁদে সখি কিবা ফল?
খুলে দাও মোর ফুল-আভরণ, কদমের কুণ্ডল।
'বৌ কথা কও' লাজহীন পাখী
অকারণে কেন করে ডাকাডাকি
অশ্রুর ঢেউ উদ্বেলি' তোলে অন্তর-যমুনায়!

শ্রীমতী প্রতিভা ঘোষ।



ক্যামেরার সাহায্যে চক্ষুর ভিতরের দৃশ্য

ক্যামেরার সাহায্যে চক্ষুর ভিতরের অংশের ফটোগ্রাফ লইবার ব্যবস্থা ষ্ট্যাণ্ডার্ড য়ুনিভারসিটি স্কুলে হইয়াছে। ইহাতে চিকিৎসকদিগের চক্ষুচিকিৎসা করিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। নানাবিধ রোগের



উপরে আলোকচিত্র গ্রহণের দৃশ্য ; নীচে রেটিনাস্থিত সূক্ষ্মতম উপশিরার দৃশ্য

চিকিৎসাও ইহাতে সম্ভবপর। এই ক্যামেরা অভিনব পদ্ধতিতে নির্ম্মিত। ফটোগ্রাফ লইবার পর 'রেটিনা'স্থিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিরা উপশিরাগুলি আলোকচিত্রের সাহায্যে নির্দ্দেশ করা যায়। ক্যামেরা-সংশ্লিষ্ট যে আলোক মুহূর্ত্তের জন্য চক্ষুর উপর পতিত হয়, তাহাতে চক্ষুর কোন ক্ষতি হয় না।

জলে ভাসিয়া মৎস্য শিকার

এক প্রকার কোমরবন্ধ নির্ম্মিত হইয়াছে, উহার সাহায্যে মৎস্য-শিকারী জলে ভাসিয়া মাছ ধরিতে পারে। এই কোমরবন্ধের ওজন ১০ পাউণ্ডের অধিক নহে। মৎস্য-শিকারীর গায়ে রবার-নির্ম্মিত



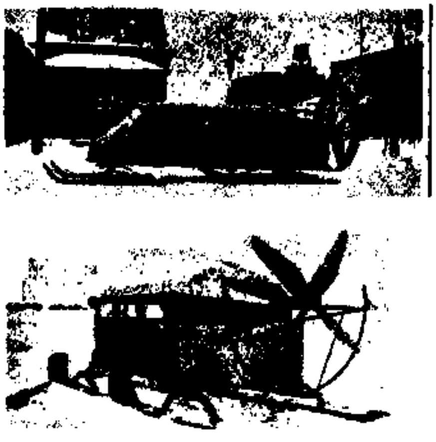
উপরের চিত্রে কোমরবন্ধ বায়ুপূর্ণ করা হইয়াছে ; নিম্নের চিত্রে শিকারী মাছ ধরিতেছেন

পরিচ্ছদ থাকে। মৎস্যশিকারীর বুট জুতার সংলগ্ন যে ফ্লাপ আছে, তাহার সাহায্যে তিনি জলের মধ্যে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে পারেন। এই কোমরবন্ধটির বায়ু বাহির করিয়া দিয়া উহাকে অনায়াসে ভাঁজ করিয়া রাখা চলে। বহুক্ষণ জলের মধ্যে থাকিয়াও শিকারী বিন্দুমাত্র অসুবিধা বোধ করেন না।

স্বয়ংচালিত তুষার-পোত

উত্তর-কানাডায় মোটর-গাড়ীর ন্যায় তুষারপোত-সমূহ ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা যেমন দ্রুতগামী, তেমনই ইহাতে চড়িয়া আরাম

পাওয়া যায়। এই গাড়ীগুলির চারিদিক আবৃত, তিন জন হইতে ৬ জনের বসিবার আসন ইহাতে আছে। কাচ-বাতায়ন দ্বারা গাড়ী সুশোভিত। গাড়ীর মধ্যে ব্রেক করিবার যন্ত্র, আলোক এবং উত্তাপ প্রদানের ব্যবস্থা আছে। ইস্পাত ও এলুমিনিয়ম ধাতু দিয়া গাড়ীগুলি নির্ম্মিত। ফোর্ড গাড়ীর এঞ্জিন উহাতে সন্নিবিষ্ট হয়।

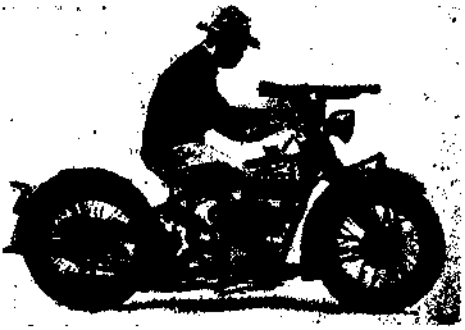


দুই শ্রেণীর তুষার-যান

যে স্থান তুষার দ্বারা আচ্ছন্ন, সেখানে তুষারবাস চলিবে। তুষারাচ্ছন্ন পাহাড়ের উপর উঠিয়া যাইবে। ভাল রাস্তা পাইলে ঘণ্টায় ৫০ মাইল বেগে উহা চলিবে। ১৪ মাইলে এক গ্যালন গ্যাসোলিনের প্রয়োজন হয়।

মোটর-দ্বিচক্রযান-সংলগ্ন কলের বন্দুক

আমেরিকা ইদানীং মোটর-দ্বিচক্রযানের সহিত কলের বন্দুক সংলগ্ন করিয়া সেনাদলের ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থা করিতেছে। হাতলের



মোটর-দ্বিচক্রযান-সংলগ্ন কলের বন্দুক

উপর এই কলের বন্দুক সংস্থাপিত হয়। এই উপায়ে সেনাদল সজ্জিত হইলে তাহারা দুর্জ্জয় হইয়া উঠিবে। কারণ, একে ত মোটর-দ্বিচক্রযান দ্রুতগামী, তাহার উপর লঘুভার কলের বন্দুক থাকায় দ্রুতগতিতে আক্রমণকার্য্য নিষ্পন্ন হইবে। রাইফেলের তুলনায়, কলের বন্দুক আরও অব্যর্থ-লক্ষ্য।

ধূলা-নিরোধকারী মুখোস

যখন ধূলিঝটিকা প্রবাহিত হয়, তখন নাসিকা ও মুখের মধ্যে ধূলা প্রবেশ করিয়া মানুষকে অত্যন্ত কষ্ট দেয়। এ জন্য আমেরিকার



ধূলা-নিরোধকারী মুখোস

পশ্চিমদিকের অঞ্চলে এক প্রকার মুখোস নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা ধারণ করিলে নাসাপথে আর ধূলি প্রবেশ করিতে পারে না। উহা নাসিকা ও মুখবিবরকে আবৃত রাখে। উক্ত অঞ্চলে ধূলি-ঝটিকার প্রভাবে বহু ব্যক্তি ব্যাধিনিপীড়িত হইয়া থাকে, এ জন্য এই প্রতিকারব্যবস্থা।

গাড়ীর বসিবার আসন শয্যায় পরিণত

সেডান্ মোটর-গাড়ীর বসিবার আসনকে মুহূর্ত্তমধ্যে শয্যায় পরিণত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে ভ্রমণকারী, শিকারী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকের বিশেষ সুবিধা। বসিবার আসন এমন



মোটর-গাড়ীর বসিবার আসন শয্যায় পরিণত

ভাবে মোটর-গাড়ীতে কব্জার দ্বারা আবদ্ধ থাকে যে, উহা নামাইয়া দিলে বিস্তৃত ও দীর্ঘ শয্যা প্রস্তুত হয়। কব্জাগুলি তখন অদৃশ্য হইয়া যায়। দেহের ভারে শয্যাও ঝুলিয়া পড়ে না। চিত্র দেখিলেই বুঝা যাইবে, গাড়ীর মধ্যে আরোহীরা শয্যায় কেমন আরামে নিদ্রা যাইতেছে।

অভিনব উপধান

সকল ঋতুতে ব্যবহারের উপযোগী এক প্রকার কোমল, লঘুভার উপধান বাজারে বাহির হইয়াছে, এই উপধান কোনমতেই আর্দ্র



অভিনব উপধান

হয় না, পোকা-মাকড়ের উৎপাতের আশঙ্কাও ইহা ব্যবহারে থাকে না। ইহা এমন-ভাবে নির্ম্মিত যে, স্বেদধারা আপনা হইতেই উবিয়া যায়। উপধানের সহিত চন্দ্রাতপ সংলগ্ন থাকে। বৃষ্টি বা তুষারপাত হইলে চন্দ্রাতপের নিম্নে শায়িত ব্যক্তির তাহাতে কোনও ক্ষতি হয় না। মশারির ব্যবস্থাও আছে, গ্রীষ্মকালে তাহার প্রয়োজন হয়।

বিজ্ঞাপনের কৌশল

বার্লিনের ব্যবসায়ীরা বিজ্ঞাপন দিবার নূতন কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন। কোনও পরিচ্ছদবিক্রেতা একখানি মোটর-গাড়ীর

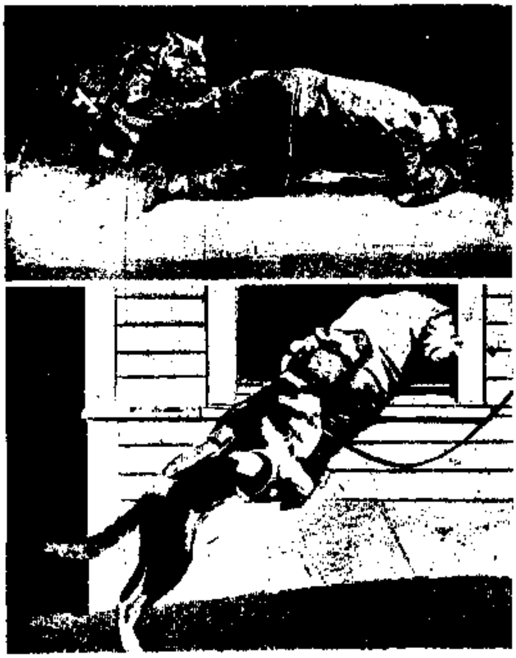


বিজ্ঞাপনের নূতন কৌশল

পশ্চাদ্দিকে একটি কাচের সো-কেস রাখিয়া, তন্মধ্যে নানাবিধ পরিধেয় দ্রব্য সাজাইয়া রাখেন। চারিদিকে কাচের আবরণ থাকায় উহাতে ধূলা লাগিতে পারে না। এই ভাবে রাজপথে গাড়ী চলিতে থাকে। সকলেই জিনিষগুলি দেখিতে পায়। ইহাতে বিজ্ঞাপনের কায ভালই হইয়া থাকে।

শিক্ষিত কুকুরের অপরাধী গ্রেপ্তার

নিউইয়র্কের পুলিস বিভাগের কুকুরগুলি এমন শিক্ষালাভ করিয়াছে যে, তাহারা মানুষের ন্যায় পলাতক আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া থাকে। শিক্ষাপ্রদানকালে এক জন মানুষকে পলাতক আসামী



অপরাধী গ্রেপ্তারে শিক্ষিত কুকুর

সাজাইয়া তাহাকে ধরিবার জন্য কুকুর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। শিক্ষিত কুকুর তাহার সম্মুখের দুইখানি পায়ের সাহায্যে মানুষের ন্যায় অপরাধীকে আঁকড়াইয়া ধরে। কখনও কখনও পা ও সমস্ত দেহ দ্বারাও অপরাধীকে জাপটাইয়া ধরে। কোনও অপরাধী বাতায়ন-পথে গৃহ প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া তাহাকেও সাপটাইয়া ধরিয়া রাখে। উপরে ও নিম্নের চিত্র দেখিলেই ব্যাপারটা সুস্পষ্ট হইবে।

যোদ্ধার মুখোস

মুষ্টিযোদ্ধাদিগের জন্য এক প্রকার তুলা-নির্ম্মিত মুখোস বাজারে বাহির হইয়াছে। ইহা ধারণ করিলে নাসিকা, কর্ণ, ওষ্ঠ, গণ্ড

প্রভৃতি মুষ্ট্যাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইবে না। মুষ্টিযোদ্ধাদিগের মুখ-মণ্ডল প্রায়ই মুষ্ট্যাঘাতে বিকৃত রূপ ধারণ করিয়া থাকে। এই মুখোস ধারণ করিলে সে আশঙ্কা থাকিবে না। একটা হাতুড়ীর দ্বারা আঘাত করিলেও এই মুখোস অনায়াসে তাহার আঘাত



মুষ্টিযোদ্ধার মুখোস

প্রতিরোধ করিতে সমর্থ। এই মুখোস ধারণে দৃষ্টিশক্তির কোনও প্রকার ব্যাঘাত ঘটে না

দুই চাকার মধ্যবর্ত্তী মোটর-গাড়ী

মোটর-গাড়ীর চাকা দুইটি অতিকায়, উহার মধ্যে মোটর-গাড়ী। দুই জনের বসিবার স্থান। তন্মধ্যে এক জন পরিচালক। এই



দ্রুতগামী অভিনব মোটর-গাড়ী

গাড়ীর নাম "সাইবাউটো।" চাকাগুলি রবারের। গাড়ী উল্টাইয়া যাইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

ডিমভাঙ্গা যন্ত্র

ডিম ভাঙ্গিয়া সাদা ও পীত পদার্থকে স্বতন্ত্রভাবে সংগ্রহ করিবার জন্ম অধুনা এক প্রকার স্বয়ং-চালিত যন্ত্রের উদ্ভাবন হইয়াছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে ঘণ্টায় ৫ হাজার ৮ শত ডিম ভাঙ্গিতে পারা যায়।

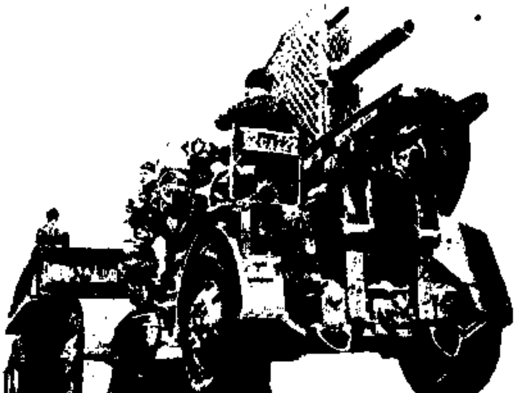


ডিম ভাঙ্গিবার কলের যন্ত্র

হাতে ঐ সময়ের মধ্যে সাড়ে ছয় শত ডিমের অধিক ভাঙ্গিতে পারা যায় না। এই নবোদ্ভাবিত যন্ত্রে যখন এক একটি ডিম ভগ্ন হয়, মুহূর্ত্তের জন্ম যন্ত্র থামিয়া পড়ে। সেই সময়ের মধ্যে ডিম্বস্থিত তরল পদার্থ অন্য পাত্রে সঞ্চিত হয়।

বিমানধ্বংসকারী কলের কামান

বিমান ধ্বংস করিবার জন্ম আমেরিকায় তিন ইঞ্চ আধুনিক কামান নির্ম্মিত হইয়াছে। সমুদ্রতীররক্ষী গোলন্দাজ সেনাবিভাগের জন্মই এই কামানের উদ্ভব। কামানটি রবারের চাকাযুক্ত আধারের

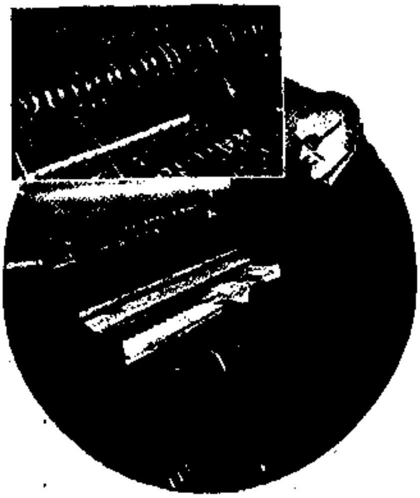


বিমানধ্বংসকারী নূতন কলের কামান

উপর বসান হয়, মনে হয়, যেন একটা ইস্পাতের দুর্গ। আকার বৃহৎ এবং ভারী হইলেও ভাল পথ পাইলে এই কামান দ্রুতগতিতে স্থানান্তরিত করা যায়।

পিয়ানোয় তারযন্ত্রের শব্দ

ওকলার টুলসাস্থিত এক জন বাদক পিয়ানো যন্ত্রে বেহালা, সেলো প্রভৃতি তারের যন্ত্রের সুর বাহির করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।



পিয়ানোয় তারযন্ত্রের সুর

একটি ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক মোটর পিয়ানোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে। সুতার দ্বারা তারের যন্ত্রের সহিত পিয়ানোর চাবির সংযোগ ঘটাইয়া বাদক যখন চাবি টিপেন, তখন তারের যন্ত্রের সুর বাজিতে থাকে।

কৃত্রিম রেশমজাত কাচ

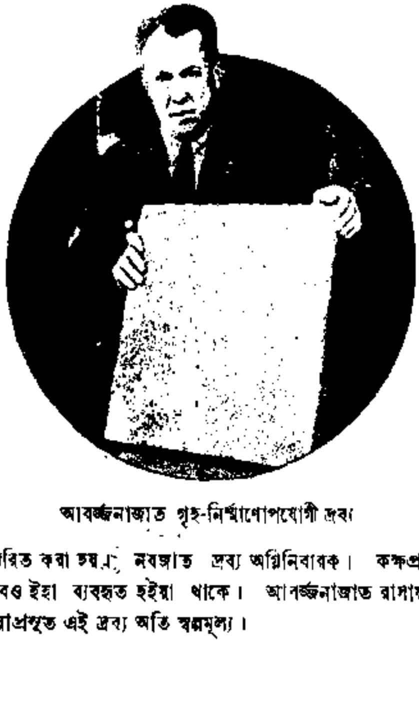
কৃত্রিম রেশমজাত কাচ কোনমতেই ভাঙ্গিবে না। জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক বহু গবেষণার পর এই কাচ উদ্ভাবিত করিয়াছেন। এই কাচ আগুনেও পুড়িবে না। এই প্রকার কাচ রোমক সম্রাট নিরোর সময়ে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। কি কি উপাদানে উহা কি ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা লোক ভুলিয়া গিয়াছিল। জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক আবার তাহা উদ্ভাবিত করিয়াছেন।



রেশমজাত কাচ

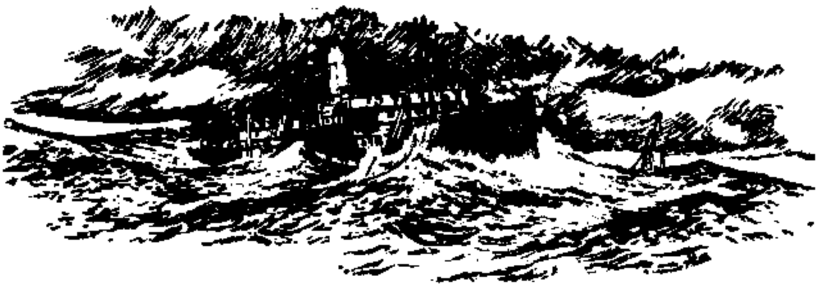
আবর্জ্জনা হইতে গৃহ-নির্ম্মাণের দ্রব্য প্রস্তুত করা

জার্ম্মাণীতে আবর্জ্জনা হইতে গৃহ নির্ম্মাণের উপযোগী দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। আবর্জ্জনাকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে এইভাবে



আবর্জ্জনাজাত গৃহ-নির্ম্মাণোপযোগী দ্রব্য

রূপান্তরিত করা হয়। নবজাত দ্রব্য অগ্নিনিবারক। কক্ষপ্রাচীর হিসাবেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আবর্জ্জনাজাত রাসায়নিক প্রক্রিয়াপ্রসূত এই দ্রব্য অতি স্বল্পমূল্য।



দামোদর-বন্যা

ঝুলন পার্ব্বণ বর্দ্ধমানের এক বিশিষ্ট উৎসব। ২৭শে শ্রাবণ, ইংরাজী ১২ই আগষ্ট চতুর্দ্দশী তিথি। বর্দ্ধমানবাসী ঝুলন উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা। যাত্রা হইবে, কীর্ত্তন হইবে, দেবতাকে অনুপম সজ্জায় সজ্জিত করা হইবে। প্রতি বৎসরই এমনি হয়। আকাশে তেমন মেঘ নাই, জল নাই, সন্ধ্যার পর সকলেই দেবতা দর্শন করিতে যাইবে। কেহ কেহ পথে বাহির হইয়াছে, কোনও কোনও দেবমন্দিরে যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। বালক, বৃদ্ধ, যুবা উৎসবানন্দে প্রফুল্ল। এমন সময় রাত্রি ৮ ঘটিকাকালে সহরে ঢ্যাঁড়া দিয়া জানানো হইল- দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে, আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই বান আসিবে।

বার্ত্তা শুনিয়াই সহরবাসী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। গায়কের মুখের গান অর্দ্ধপথে থামিয়া গেল। নরনারী দেবমন্দির অভিমুখে যাইতে



দামোদর-বন্যায় বিধ্বস্ত দক্ষিণ-বর্দ্ধমানের একটি গ্রাম

যাইতে ছুটিতে ছুটিতে ঘরের দিকে ফিরিয়া গেল। বণিক দোকান বন্ধ করিল। দেবদ্বার রুদ্ধ হইল। নিমেষমধ্যে এক আতঙ্কের বিভীষিকা সমগ্র সহরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

সেই রাত্রি সমগ্র সহরবাসীর বিনিদ্রভাবে কাটিল। যে যেমন ভাবে পারিল, গৃহের দ্রব্যাদি গুছাইতে লাগিল। যাহারা পর্ণকুটীরে অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্ত্তী স্থানে বাস করে, তাহারা তাহাদের গরু-বাছুর এবং যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল, তাহা লইয়া সহরের ভিতরস্থ অপেক্ষাকৃত উচ্চবর্ত্তী স্থানে আশ্রয় লইল। বর্দ্ধমান সহরে কৃষ্ণসায়র, শ্যামসায়র এবং রাণীসায়র নামক তিনটি সুবৃহৎ পুষ্করিণীর পাড়ে অনেক লোক আশ্রয় লইল। এমনি করিয়া উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় সারা রাত্রি কাটিয়া গেল।

পরদিন ২৮শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার। প্রত্যুষ হইতেই নানা

লোক নানা দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। মুখে একমাত্র শব্দ—বান, বান, বান! যাহারা পারিল, সাইকেলে কোথায় বান আসিল বা আসিতেছে, দেখিতে ছুটিতে লাগিল।

বর্দ্ধমানের রাজকীয় পশুশালা গোলাপবাগের পশ্চিম-উত্তর দিকে একটি দীর্ঘ জলাশয় আছে, লোক ঐ দিকেই ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কারণ, তখন জনরব, বন্যা ঐ পথেই ছুটিয়া আসিতেছে। মঙ্গলবার প্রত্যূষ, সূর্য্য উদয় হইয়াছে, ৬টা বাজিয়া গিয়াছে, এমন সময় সহস্র সহস্র নরনারীর আতঙ্ক ও কৌতূহলের বিষয় বন্যা তাহার রক্তপ্রবাহ লইয়া পূর্ব্বোক্ত লহর নামক পুষ্করিণীতে হু হু করিয়া পড়িতে লাগিল। নিমেষমধ্যে সেই সুবৃহৎ খাত বন্যা-জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।



মদনপুর গ্রামের এই দালান ব্যতীত একখানি বাড়ীও অবশিষ্ট নাই

বন্যার অন্য একটি ধারা বাঁধ ভাঙ্গিয়া গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডকে প্লাবিত করিয়া বর্দ্ধমান ষ্টেশনের অভিমুখে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। সেই প্রবাহের অন্য একটি ধারা বর্দ্ধমান জেলখানার পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া বর্দ্ধমানের বৈদ্যুতিক পাওয়ার হাউস এবং মেডিক্যাল স্কুলের সুবৃহৎ ছাত্রাবাসকে নিমেষে জলপ্লাবিত করিয়া ফেলিল। বেলা ৯টা ৩ মিনিটের সময় বন্যা বেশ রীতিমত ভাবে সহরকে আক্রমণ করিয়াছিল। যখন বেলা ১২টা, তখন বর্দ্ধমান রেল-ষ্টেশনের পশ্চিম-দক্ষিণ এবং পূর্ব্বদিক জলে জলময় এবং সেই জলের বেগ দুর্ব্বার।

গত ১৩২০ সালে দামোদরে বাঁধ যেখানে ভাঙ্গিয়াছিল, এবার তাহা হইতে কিছু পশ্চিমে দাদপুর এবং সেঁদা প্রভৃতি গ্রামের নিকট বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বর্দ্ধমান সহরের মধ্যস্থল জলপ্লাবিত হইতে পারে নাই। বন্যা উত্তর-বর্দ্ধমানকে ডুবাইতে ডুবাইতে ছুটিয়া যায়। বর্দ্ধমান ষ্টেশনের অব্যবহিত উত্তরে বাজেপ্রতাপপুর পল্লীখানির অবস্থা এই বন্যামুখে পড়িয়া নিমেষমধ্যে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। ঐ স্থানের ব্যবসায়িগণের লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

এবার বন্যার আক্রমণ এমন আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত হইয়াছিল যে, লোকে পূর্ব্বাহ্ণ হইতে সাবধান হইবার অবকাশ পায় নাই। কারণ, এবার পশ্চিম-বঙ্গে তেমন বৃষ্টিপাত হয় নাই, বরং অল্প বর্ষার জন্য কৃষিকার্য্যের অসুবিধা ঘটায় দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা হইয়াছিল। কাযেই বন্যার কথা এক দিন আগে জানিতে পারিলেও বিশেষ করিয়া দামোদরের উত্তরতীরবাসিগণ সাবধান হয় নাই। মেঘে বিন্দু বারি নাই। কে বিশ্বাস করিবে বন্যা হইবে? কাযেই যতটুকু সাবধান হইতে পারিলে ধনপ্রাণ কতকটা রক্ষা করা সম্ভব হইত, তাহাও হইয়া উঠে নাই।

গত ১৩২০ সালে বন্যা আসিয়াছিল রাত্রিতে। সেই জন্য মৃত্যু-সংখ্যা সে-বার অত্যধিক হইয়াছিল। এবার দামোদর নদের উত্তর-তীরে দিনমানে বন্যার আক্রমণ হওয়ায় লোকের তেমন জীবনহানি না হইলেও সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছিল প্রচুর। কাহারও কাহারও মতে বিশ সালের অপেক্ষা জল এবার বেশী হইয়াছিল। এবার বন্যা-বারি সহরে প্রবেশ করিয়া নিমেষে বিজলী আলোক-গৃহটির যন্ত্রাদি নষ্ট করিয়া দিয়া গেল। ফলে বন্যার দিন রাত্রিতে সহরে আলো ... না। এক দিকে বন্যার ভয়, অন্য দিকে সহর অন্ধকার।

দামোদর-বাঁধ ভাঙ্গিয়া বন্যার প্রবাহ দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে

সহরের উত্তরদিকে প্রবেশ করিয়া বিজলী-ঘর, মেডিকেল ছাত্রাবাস এবং মোহনি বাগান ও বাজেপ্রতাপপুরকে ডুবাইয়া দিল। ও-দিকে দক্ষিণদিকে বৰ্দ্ধমানের অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী বাঁকা নদী দামোদরের জলে স্ফীত হইয়া সহরের দক্ষিণদিকস্থ কতকাংশকে জলপ্লাবিত করিতে লাগিল। বাঁকার জল রেল-ষ্টেশনের উত্তরাভি-মুখে উচ্ছ্বসিত আবেগে বহিয়া গিয়া অনেকগুলি গ্রামকেও ডুবাইয়া দিল। এমনি করিয়া চারিদিক দিয়াই বন্যা-প্রবাহ সহর-খানিকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিল।

দামোদরের বন্যা-প্রবাহে স্থানীয় জলকলকেও বিকল করিয়া তুলিয়াছিল। পাওয়ার হাউসের মত উহাও ৮।১০ দিন কার্য্যকর হয় নাই।

বন্যার প্রথম দিন কাটিয়া গেল। দ্বিতীয় দিনেও সহরের পাকাস রোড প্রভৃতি অঞ্চলে বন্যা-স্রোত বহিতেছে। ষ্টেশনের কাছে অপেক্ষাকৃত জল কম হইলেও রেলের লোকো কোয়ার্টার, বাজেপ্রতাপপুর, গোদা প্রভৃতি পল্লীতে পূর্ণ বন্যার আক্রমণ। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে যে সকল লোক দুধ লইয়া, শাক-সব্জী লইয়া



অণ্ডালের নিকটবর্ত্তী মদনপুর গ্রামের বন্যায় গৃহহীন অধিবাসিগণ

১৩ই মঙ্গলবার যে দিন বৰ্দ্ধমান সহরে বান আসিল, সে-দিন সহরবাসীর এমন অবস্থা রহিল না যে,—বন্যা-প্রবাহে তাহার কোন্ স্থানের বিশেষ কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহার কোনও সন্ধান লয়। আর লইবার উপায়ও ছিল না। কোথাও এমন একখানি নৌকা ছিল না, যাহা লইয়া লোকে জলরাশি ভেদ করিয়া বন্যার সমগ্র-আক্রমণটা দেখিয়া আসে। আর দামোদরের অবস্থাও তখন দুর্ব্বার। সেই উন্মাদ আবর্ত্তিত তরঙ্গরাশি অতিক্রম করিয়া কোথাও যাইবার উপায় নাই। বন্যার প্রথম আক্রমণের দিন সহরের লোক শুধু আতঙ্ক, ক্ষতি এবং আলোক ও জলহীন অবস্থায় কাটাইতে লাগিল। জলহীন বলিলাম এই জন্য যে, সহরে আসিত, তাহারা কেহই আসিতে পারিল না। কারণ, এক দিকে বন্যার উচ্ছ্বসিত জল, অন্য দিকে তাহাদেরও অনেকে বন্যার উপদ্রবে গৃহহীন, সম্পত্তিহীন হইয়াছে। ঐ দিন বৃষ্টির বেগ পূর্ব্বদিন অপেক্ষা অধিক থাকায় লোকের অসুবিধা অত্যন্ত বাড়িয়াছিল। বন্যাবিপন্নগণ নীচে জল উপরে জল লইয়া কোনও প্রকারে কাল কাটাইতেছিল।

এইভাবে দুই দিন কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিনেও দামোদরের দক্ষিণ তীরের বিশেষ কোনই সংবাদ পাওয়া গেল না। তবে, আভাসে অনুমানে বুঝিতে পারা গেল যে, দামোদরের দক্ষিণ-তীরবর্ত্তী গ্রামগুলিতে এক ভয়াবহ সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। কোনওরূপে

যে দুই এক জন লোক দক্ষিণ দিক হইতে ২।৩ দিন পরে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদেরই মুখে বিপদের কতকটা আভাস মাত্র পাওয়া গিয়াছিল।

বর্দ্ধমানে যে দিন প্রথম বন্যা আসিয়াছিল, সে দিন মঙ্গলবার। তাহার পূর্ব্বদিন অর্থাৎ সোমবার বেলা ৭টার মধ্যে দক্ষিণ তীরে বন্যার আক্রমণ হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা ঐ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, সোমবার সকাল বেলা দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল যে, দামোদরের তীরভূমি ব্যাপিয়া যেন কতকগুলি গাভী ছুটিয়া আসিতেছে। উহা প্রকৃতপ্রস্তাবে বন্যার জলপ্রবাহ। দেখিতে দেখিতে বন্যার জল গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছুটিয়া চলিল। তাহার গর্জ্জনে ধর্ষণে নিমেষমধ্যে সহস্র সহস্র গ্রাম জলপ্লাবিত হইয়া গেল। কৃষক মাঠে চাষ করিতেছিল, গৃহে ফিরিয়া পুত্রকন্যা, ধনজন রক্ষা করিবার অবকাশ পাইল না, কোনওরূপে গাছে উঠিয়া প্রাণ বাঁচাইল। কতগুলি গাভী যে বন্যামুখে পড়িয়া ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা করিতে পারা যায় নাই।

দক্ষিণ-বর্দ্ধমানে এবার বন্যার জল গত ১৩২০ সালের বন্যা-বারি অপেক্ষা ২ ফুট অধিক হইয়াছিল। আবার, বি, ডি রেল-পথের নিকট বৌয়াইচণ্ডীর দক্ষিণ দিকে দেবখাল নামক একটি খাতমুখে দ্বারকেশ্বর নদের জল প্রবেশ করিয়া দামোদরের বন্যার সহিত মিশিয়া যাওয়াতে ঐ অঞ্চলের দুর্দ্দশা সমধিক হইয়াছিল। দামোদরের দক্ষিণে খণ্ডকোষ একখানি গ্রাম। ঐ গ্রামখানির মধ্যে জল অন্ততঃ ৮ ফুট পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। বন্যাপ্রবাহে দক্ষিণ-বর্দ্ধমানের খণ্ডকোষ, ওয়াড়ী প্রভৃতি গ্রামের বর্ণনাতীত ক্ষতি হইয়াছে; যে গ্রামে দেড় হাজার গৃহ ছিল, সেখানে মাত্র তিনখানি গৃহ বর্ত্তমান। কোনও কোনও গ্রামের চিহ্ন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান নাই। এমন কি, যেখানে ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ ছিল, সেখানে উহার ভিত্তি পর্য্যন্ত নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

বন্যায় আর এক বিপদ হইয়াছে; ধান্যক্ষেত্রগুলি একবারে বালুকাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। কোনও কোনও গ্রামে কর্ষণযোগ্য জমির উপর ২।৩ ফুট পর্য্যন্ত বালুরাশি পড়িয়া আছে। আবার বন্যা-প্রবাহ কোনও কোনও গ্রামের চিহ্ন পর্য্যন্ত রাখে নাই, ঐখানে এক একটা খাতসৃষ্টি হইয়াছে।

বন্যা-প্রবাহ দক্ষিণ-বর্দ্ধমানে এমন আকস্মিকভাবে আসিয়াছিল যে, লোক সাবধানতা অবলম্বন করিবার অবকাশ পায় নাই। গাভীগুলির গলরজ্জু কাটিয়া দিলে হয় ত তাহারা বাঁচিতে পারিত, কিন্তু সে অবসরও লোকে পায় নাই। ফলে, গোয়ালে গাভীগুলি একান্ত অসহায়ভাবে মরিয়া গিয়াছে। বন্যার বেগ এমনই তীব্র হইয়াছিল যে, বড় বড় ট্রাঙ্কগুলি পর্য্যন্ত সেই বন্যা-বেগে



বর্দ্ধমানের সর্ব্বমঙ্গলার বন্যা-বিপন্ন একটি পরিবার

ভাসিয়া গিয়াছে। ই, আই, আর-এর পানাগড় ষ্টেশনের জল-সংগ্রহের পাম্পিং যন্ত্রটি যে স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহা হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া বন্যা-বেগে দামোদরের গর্ভে পতিত হইয়াছে। এমনই কত কি যে ধ্বংস হইয়াছে, এখনও তাহা গণনার মধ্যে আসে নাই।

দামোদর নদ এবার যে যে স্থানে ভাঙ্গিয়াছে, তাহার পরিচয় দিতেছি। দামোদর বাঁধটি নদের উত্তর তীরে অবস্থিত। উহা বৰ্দ্ধমান সহরের নিকট দিয়াই গিয়াছে। ই, আই, রেলপথকে রক্ষা করিতে ঐ বাঁধ দেওয়া হয়। পূর্ব্বে নদের দুই দিকেই বাঁধ ছিল। কিন্তু তাহাতে উত্তরতীর সবিশেষ নিরাপদ না হওয়ায় দক্ষিণ-তীরের বাঁধটি কাটিয়া দেওয়া হয়। তাহা হইলেও দামোদর-বাঁধ রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। বর্ত্তমান বর্ষের পূর্ব্বে ১৩২০ সালে বাঁধটি বৰ্দ্ধমানের ঠিক দক্ষিণ দিকে ভাঙ্গিয়াছিল। তাহার পূর্ব্বেও দুইবার বাঁধ ভাঙ্গার ইতিহাস জানিতে পারা যায়।

বাঁধ বর্ত্তমান বর্ষে যেখানে ভাঙ্গিয়াছে, তাহা সহর হইতে কিছু দূরে রাঘবপুরের নিকট এবং ১১ মাইল দূরবর্ত্তী দাদপুরের নিকট ১২৫ ফুট ও ৬০০ ফুট। সোঁদা গ্রামে দুইটি যায়গায় বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে। উহার পরিমাণ ১৭০ ও ১৫০ ফুট। সহর হইতে ৭ মাইল দূরে আর একটি ভয়ঙ্কর ভাঙ্গন ১৫০০ ফুট। সীমার নিকট বাঁধ ভাঙ্গে নাই। বাঁধ ছাপাইয়া ঐ স্থান হইতে জল উপচাইয়া পড়িয়াছিল।

বাঁধ যেখানে যেখানে ভাঙ্গিয়াছে, তাহার নিকট সোঁদা, রাঘবপুর, ভানাপুর, দাদপুর প্রভৃতি গ্রামের ভিতর ঘর-বাড়ী যে ছিল, তাহার কোনই পরিচয় নাই। এই সকল গ্রামের গরুগুলি সবই ভাসিয়া গিয়াছে। এই সকল গ্রামের দুরবস্থা এমনই চরম হইয়াছিল যে, ৭।৮ দিন বালক-বালিকা, বৃদ্ধ-রুগ্ন পর্য্যন্ত খাইতে পায় নাই। লোকজন ঘরের চালে বন্যার জল খাইয়া কোনও প্রকারে দিন কাটাইতেছিল।

পশ্চিম-বঙ্গে এবার অজয়েও বন্যা হইয়াছিল। অজয়ের জল কুন্নুর নদীর সহিত মিশিয়া অনেক গ্রামের ধনজনের সর্ব্বনাশ করিয়া দিয়াছে। অজয়ের বন্যায় লুপলাইনের নিকটবর্ত্তী অনেক পল্লী একবারে জলমগ্ন হইয়াছিল।

সংবাদপত্রে বন্যার সংবাদ পাইবামাত্র বাঙ্গালার অনেক মহাপ্রাণ ব্যক্তি এবং সেবাসঙ্ঘ সাহায্যের জন্য খাদ্যসম্ভার লইয়া বন্যা-বিপন্ন অঞ্চলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। "বসুমতী"র কয়েক জন কর্ম্মীও সাহায্য লইয়া বন্যাবিধ্বস্ত গ্রামে গ্রামে সাহায্য বিতরণ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু বিপন্ন অঞ্চলের সর্ব্বনাশের পরিমাণ এমন ভয়ানক যে, সাময়িক সাহায্যে প্রকৃতভাবে উপকারের আশা করিতে পারা যায় না। বন্যার দ্বিতীয় সপ্তাহেও এমন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, বন্যাবিপন্ন অনেক গ্রামে তখন পর্য্যন্ত সাহায্য পৌঁছায় নাই। তাহা হইলেও বন্যা-বিপন্নগণকে সাহায্য করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ত্যাগী কর্ম্মিবৃন্দ, সঙ্কটত্রাণ সমিতি ও মাড়োয়ারী ধনী সম্প্রদায় যে ভাবে আন্তরিক



গোমতী-প্লাবনে একটি গৃহস্থবাড়ীর অবস্থা

অনুকম্পা দেখাইয়াছেন,—তাহার জন্য অন্তরের কৃতজ্ঞ। উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

এইবার আমরা দামোদর-বন্যার সম্বন্ধে একটু ইতিহাস-কথা কহিব। দামোদর নদ ছোটনাগপুর প্রদেশে উৎপন্ন হইয়াছে উহা বহুদিন হইতেই রাঢ়ের বক্ষ ভেদ করিয়া প্রবাহিত। দামোদরের উৎপত্তিস্থানে যখন প্রবল বৃষ্টিপাত হইত, সেই জলরাশি দামোদরের খাতমুখে প্রবাহিত হইয়া আসিয়া উহার দক্ষিণ ও উত্তরতীরস্থ ভূমিখণ্ডকে বন্যায় প্লাবিত করিত। জলের উচ্চতা কিন্তু কখনও পাঁচ ছয় ইঞ্চির অধিক হইত না। ফলে বন্যাজল কৃষিক্ষেত্রের উপর পলি ফেলিয়া উহাকে উর্ব্বর করিত এবং দেশের ময়লা ধুইয়া লইয়া দেশকে স্বাস্থ্যসম্পন্ন করিত। আমরা দামোদর-বন্যার যতদূর প্রাচীন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাতে জানিতে পারি যে, উত্তর-বর্দ্ধমানে বন্যার জলরাশি অনেক গ্রামকে সামান্যভাবে জলপ্লাবিত করিতে করিতে গঙ্গার মুখে গিয়া পড়িত। কিন্তু দামোদরের উত্তর-তীরে বাঁধ দিবার পর নদের জলরাশির স্বচ্ছন্দ গতি প্রতিহত হইল।

এমনই ভাবে দামোদরের জলধারাকে রুদ্ধ করা হইল বটে, কিন্তু উহাতে আর এক ভয়াবহ বিপদ উপস্থিত হইল। দামোদর-বাঁধ বাঁধিবার পরে বিখ্যাত বর্দ্ধমান ম্যালেরিয়া বাঢের লক্ষ লক্ষ প্রাণকে কবলিত করিতে লাগিলেন। ইহার সহিত অন্য বিপদও দেখা দিল। নদপ্রবাহের স্বাভাবিক গতি বাঁধের দ্বারা প্রতিহত হওয়ায় গর্ভস্থ বালুকারাশি স্তরের উপর স্তর পড়িয়া উচ্চ হইতে লাগিল। বর্ত্তমানে নদের খাতবক্ষ স্থানে স্থানে ৮।১০ ফুট হইতে কোথাও কোথাও ১৩।১৪ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়াছে। এখন বাঁধ দিলেও বন্যার আক্রমণ কিছুতেই প্রতিরোধ করিতে পারা যাইবে না। বরং বন্যার বিপদকেই বাড়াইয়া তোলা হইবে। বিশেষতঃ, দামোদরের উত্তর-তীরে বাঁধ থাকিলে দক্ষিণ-বর্দ্ধমানের সহস্র সহস্র বর্গ-পরিমিত স্থান কৃষিকার্য্যের একবারেই অনুপযুক্ত হইয়া পড়িবে। ইতিপূর্ব্বে কতক কতক স্থানের এরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে।

দামোদর-বাঁধ ভাঙ্গিলে উত্তর-বর্দ্ধমানের যে ক্ষতি হয়, তাহা অপরিমেয় হইলেও সাময়িক। কিন্তু দক্ষিণ-বর্দ্ধমানের উহাতে স্থায়ী অনিষ্ট হইতেছে। বন্যামুখে যে বালুকারাশি ভাসিয়া আসিয়া কৃষিক্ষেত্রগুলিকে চাষের অনুপযুক্ত করে, তাহা বলিয়াছি; দ্বিতীয়



বন্যায় একটি গৃহের ধ্বংস দৃশ্য



বন্যার দৃশ্য

ক্ষতিটি তদপেক্ষা ভয়াবহ। দামোদরের জলপ্রবাহ উত্তরদিকে বাধা পাইয়া দক্ষিণদিকেই বিক্রম প্রকাশ করিতে করিতে ছুটিয়া চলে। তাহাতে কতকগুলি হানার সৃষ্টি হইয়াছে। কুমীরখোলা, বেগুয়া, শ্রীকৃষ্ণপুর, কাঁটানকুমি প্রভৃতির হানা বিখ্যাত দামোদর-হানা।

হানা হইতেছে দামোদরের জলপ্রবাহের এক একটা খাতমুখ।

জলপ্রবাহ উদ্দাম আবেগে আপনার পথ করিয়া লইবার জন্য কতকটা ভূমিখণ্ডকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে। উহাতে এক একটা পল্লী একেবারে নদগর্ভে চলিয়া গিয়াছে। বেগুয়ার নিকট দামোদরের যে হানা পড়িয়াছে, উহাতে দামোদর তাহার



বিধ্বস্ত ঘরের চালে বিপন্নগণ

পূর্ব্ব-প্রবাহপ্রণালী ছাড়িয়া ঐ খাতমুখে বহিয়া যাইতে চাহিতেছে। ইহার ফলে কর্ষণোপযোগী ক্ষেত্রগুলিই শুধু নষ্ট হয় নাই, অনেক ধন-জন-সমৃদ্ধ গ্রামও নদগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত, অদূর ভবিষ্যতে দামোদরের এমন অবস্থাও ঘটিতে পারে যে, উহা তাহার প্রাচীন প্রবাহপ্রণালী ছাড়িয়া যে কোনও একটা হানা-মুখে বহিয়া যাইতে পারে। তাহাতে হয় ত সহস্র সহস্র বর্গ পরিমিত জন-অধ্যুষিত স্থান দামোদরের জলগর্ভে চির বিশ্রান্তি লাভ করিবে। বেগুয়ার হানা, কুমীরখোলা এবং জাহানাবাদের হানায় এই অবস্থার কতকটা আভাস পাওয়া যাইতেছে। দক্ষিণ বৰ্দ্ধমানে খণ্ডঘোষ ও শাঁকারীর যে বিল বহিয়াছে, পূর্ব্বে উহা জলাশয় ছিল না, শ্যামশস্য-সমন্বিত কৃষিক্ষেত্র ছিল।

এমনই ভাবে দামোদরের বাঁধ দুই ভাবে দুই দিকের অনিষ্ট করিতেছে। দক্ষিণ-বৰ্দ্ধমানের বিপৎপাতের আর একটু কথা বলিয়া উত্তরদিকে বাঁধের দ্বারা যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহা বিবৃত করিতেছি। দামোদরে জলবৃদ্ধি হইলে সেই জল যখন বন্যার সৃষ্টি করিয়া উত্তর-বৰ্দ্ধমানের নিকটে উপস্থিত হয়, তখন তাহা সহসা সহরে বা গ্রামে প্রবেশ করিতে পারে না, বাঁধে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া উত্তরতীরের অধিবাসিগণকে কতকটা সাবধান হইবার অবকাশ দেয়। কিন্তু দক্ষিণদিকে বাঁধ না থাকায় এরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই প্রদেশে বান আসিলে অকস্মাৎ অতর্কিত ভাবে আসিয়া সর্ব্বনাশ করিয়া দেয়।

বর্ত্তমান বৎসরে ঠিক এমনই হইয়াছিল। লোকে চাষ-বাস করিতেছে, রাখাল গরু চরাইতেছে, গো-গাড়ীর গাড়োয়ান নদী পার হইবার আশায় গরু ও গাড়ী লইয়া তীরে বসিয়া আছে, পাটনী পারাপার করিতেছে, কুলনারী গৃহকর্ম্ম করিতেছে, কোথাও কিছু নাই, হু হু করিয়া বান আসিয়া সব কিছু ভাসাইয়া লইয়া গেল। ধন-সম্পত্তি রক্ষা ত দূরের কথা, পিতা-মাতা তাহাদের হৃদয়ানন্দ পুত্রকন্যাকে রক্ষা করিবার অবকাশ পাইলেন না।

যে সব কাহিনী এতদিন প্রবাদরূপে চলিয়া আসিয়াছে, এবারের বন্যায় উহা সত্য হইতে দেখা গিয়াছে। গৃহের চাল ভাসিয়া যাইতেছে, তাহার উপর পাশাপাশি শৃগাল ও হাঁস। বন্যার তৃতীয় দিনে একটি লোক ১০।১২ মাইল পশ্চিমদিক হইতে বাঁকা নদীতে ভাসিয়া আসিয়াছিল। সে একটি বৃক্ষ আশ্রয় করিয়াছিল, উহাতে বিষধর সর্পও আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আবার এমন অবস্থাও দেখা গিয়াছে—গৃহস্বামী তাহার দুগ্ধবতী গাভীটিকে জড়াইয়া ধরিয়া মৃতাবস্থায় ভাসিয়া আসিয়াছে।

বাঙ্গালার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ শতবর্ষ পূর্ব্বেও এমন কি, ৭০।৭৫ বৎসর আগেও স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছিল। অনেকে বৰ্দ্ধমানে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য আসিতেন। ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথ এবং তাহাকে রক্ষা করিতে দামোদরের উত্তর



বন্যায় কেশবগঞ্জের চটির দুর্দ্দশা

বাঁধ নির্ম্মিত হইবার পর পশ্চিম রাঢ় ম্যালেরিয়ার আবাসস্থল হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন যে, বর্দ্ধমান-ম্যালেরিয়ায় যত লোক প্রাণ হারাইয়াছে এবং মরিতেছে, বিগত মহা সমরেও তত লোক মরে নাই বা মরিতে পারে না। স্বাস্থ্যহীন পশ্চিমবঙ্গ এইরূপ ভাবে দামোদর বাঁধের কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছে।

বাঁধে যে পশ্চিমবঙ্গের সমূহ অনিষ্ট হইতেছে, ইহা বহু পূর্ব্বেই অনুভূত হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরে বন্যা হইবার পর উহার অনিষ্টকারিতার কথা সকলেই বিশেষভাবে অনুভব করিতেছেন। ইতিমধ্যেই বাঁধটি উঠাইয়া দিবার জন্য বর্দ্ধমান জেলায় একটি আন্দোলনের উদ্ভব হইয়াছে। উক্ত বাঁধের জন্য বর্দ্ধমান-রাজকে প্রতি বৎসর বাঁধবন্দী খাজনা নামে (Embankment tax) একটি কর দিতে হয়; উহার পরিমাণ বার্ষিক ষাট হাজার টাকা। ট্যাক্সটি অনর্থকই দেওয়া হইয়া থাকে। কারণ, বাঁধ দিয়াও দামোদর-বন্যাকে রোধ করা যায় না। ১৩২০ সালের বন্যা এবং বর্ত্তমান বৎসরের বন্যায় উহা বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। এবার বন্যার কথা ১০।১২ ঘণ্টা পূর্ব্বেই জানিতে পারা গিয়াছিল। এতখানি সময় থাকিতে চেষ্টা করিয়াও কিন্তু বন্যার আঘাত হইতে বাঁধরক্ষা করা সম্ভব হইল না। বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়া বর্দ্ধমানবাসীর সর্ব্বনাশ করিয়া দিল।

এমন অবস্থায় প্রতি বৎসর ষাট হাজার টাকা ট্যাক্স দিয়া এক দিকে ম্যালেরিয়া ও মৃত্যু, অন্য দিকে মরুবায়ু ও সর্ব্বনাশ পুষিয়া বাঁধরক্ষার কোনই উপযোগিতা থাকিতে পারে না। বন্যার আক্রমণে যে ক্ষতি হইয়া গিয়াছে বা হইতেছে, তাহার পরিমাণ কয়েক কোটিরও অধিক হইতে পারে। তাহার উপর আছে জীবনহানি! বর্ত্তমান বৎসরে বন্যা উৎপাদনে ক্ষতির পরিমাণ উত্তর ও দক্ষিণ-বর্দ্ধমানে সর্ব্বসমেত ৫।৬ কোটি টাকা হওয়া আশ্চর্য্য নহে; কারণ, কোথাও লক্ষ লক্ষ টাকার বাণিজ্য বন্ধ গিয়াছে, কোথায় গিয়াছে সঞ্চিত ধান-চাউল, গৃহের বাসন-কোসণ, বহুমূল্য বস্ত্র অলঙ্কার এবং গৃহও গিয়াছে! তাহার উপর গিয়াছে সহস্র সহস্র বিঘা কৃষিক্ষেত্র! এই সকলের যথার্থ মূল্য ধরিলে যে কয়েক কোটি হইতে পারে, তাহা আদৌ অত্যুক্তি নহে।

বন্যায় বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। এখন উপায়? উপায়ের মধ্যে সহজেই এবং সতসাই মনে পড়ে—ভগবান্! বিপত্তৌ মধুসূদনঃ—বিপদে মধুসূদন! কিন্তু মানুষেরও একটু কায রহিয়াছে। প্রাথমিক কায—আর্ত্তের সেবা! রামকৃষ্ণ মিশন, আর্ত্তোদ্ধার সমিতি, আর্ত্তত্রাণ সমিতি, কংগ্রেস, বসুমতী কর্ম্মিদল এবং অন্যান্য অনেকে করিয়াছেন ও করিতেছেন; বাঙ্গালার বহু গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কলিকাতায় সভা করিয়া বন্যা সাহায্যে ব্রতী হইয়াছেন। সরকারের ইহাতে মাত্র দশ হাজার টাকা সাহায্যের কথা শুনা গিয়াছে।

নদী-নালা, খাল-বিলের জলবৃদ্ধি পাইলে কিম্বা অতিবৃষ্টি হইলে যে প্রকার বন্যা হয়, দামোদর-বন্যা সেই প্রকার স্বাভাবিক



প্লাবনবিপন্ন বৰ্দ্ধমানের একটি গ্রাম

জলোচ্ছ্বাস নহে, দামোদরের-বন্যার যে আক্রমণ ও তাহার ভয়াবহতা, তাহা ঐ কৃত্রিম বাঁধের জন্য। বন্যা-বিপন্ন অঞ্চলকে সত্য করিয়া রক্ষা করিতে হইলে যাঁহারা সেই রক্ষাকার্য্যে অগ্রসর হইবেন, তাঁহাদের দামোদর বাঁধের অবসান ঘটাইবার চেষ্টা করা উচিত। আর, সাময়িকভাবে সাহায্যের সহিত এই বন্যার আক্রমণ-বৎসরে রাজস্ব হইতে বন্যাপীড়িতগণকে মুক্তি দেওয়াও একান্ত কর্ত্তব্য। প্রতি বৎসর বৰ্দ্ধমান হইতে ত্রিশ লক্ষ টাকা যাহা রাজস্ব লওয়া হয়, এই বৎসরের মত তাহা হইতে মুক্তিদান করিলে সত্য করিয়াই বন্যায় বিপর্য্যস্তদিগকে বাঁচিবার অবকাশ দেওয়া হইবে। রাষ্ট্রকর্ত্তব্যের মধ্যে এই অতি প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্যটির দিকে সরকারপক্ষের অচিরে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

প্রাকৃতিক উপদ্রবে যে বন্যা হয়, তাহার প্রতীকার করা মানবের পক্ষে সম্ভব নহে, উহার জন্য ভগবানের আশ্রয় লইতে হয়। কিন্তু যে বাঁধটির জন্য দামোদরের জলপ্রবাহ এমন উগ্র উন্মাদ হইয়া নানাভাবে উত্তর ও দক্ষিণ-বৰ্দ্ধমানের সর্ব্বনাশ-সাধন করিতেছে, অচিরে সেই বাঁধের বন্ধন কাটিয়া দিয়া, কৃত্রিমতার জন্য প্রাকৃতিক রোষের পরিনির্ব্বাণ করাই সরকারের একান্ত কর্ত্তব্য। বন্যাশান্তির অন্যবিধ পন্থা নাই।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিলেই বন্যা-সম্বন্ধীয় সকল কথা বলা শেষ হইয়া যায়। সরকার রেডিও প্রভৃতি বসাইয়া পল্লী-উন্নতিতে মনোনিবেশ করিয়াছেন। যদি দামোদরের বাঁধটি তাঁহারা কাটিয়া দেন, তবে দামোদরের স্বাভাবিক জলপ্রবাহ রাঢ়ের ভূমিখণ্ডকে উর্ব্বর করিয়া তুলিবে, তাহার বিগত স্বাস্থ্যকে ফিরাইয়া আনিবে। ফলে রাঢ়ের অপচীত পল্লী-শ্রী পুনরায় শরৎশোভায় প্রফুটিত হইবে। দামোদরও নির্ব্বিবাদে সমুদ্রকে আত্মসমর্পণ করিবার অবকাশ পাইয়া শান্ত ও সংযত হইবে। তাহার বক্রিম রোষ-বিরঞ্জিত ধ্বংসতাণ্ডব আনন্দ প্রবাহে রূপান্তরিত হইবে।

তারকেশ্বর-বন্যার সূচনা

২৮শে শ্রাবণ রাত্রি হইতে তারকেশ্বর অঞ্চলে দামোদরের জল অপ্রত্যাশিতরূপে বাড়িতে আরম্ভ করে। বিশেষজ্ঞগণ জলের গতি দেখিয়া তখনই শঙ্কিত হইয়া উঠেন। তারকেশ্বরের পুলিস-ষ্টেশন যে স্থানে অবস্থিত, তাহার উত্তর-পশ্চিম অংশে প্রায় সাড়ে তিন মাইল তফাতে নিশ্চিন্তপুর গ্রাম। এই গ্রামের কিনারা দিয়া দামোদরের বাঁধ চলিয়াছে। ২৯শে শ্রাবণ পূর্ব্বাহ্নে এই অঞ্চলেই বাঁধের তিনটি স্থান দামোদরের উদ্দামশক্তিতে ভাঙ্গিয়া যায় এবং সেই ভগ্নবাঁধ ছাপাইয়া দুর্ব্বার জলস্রোত তারকেশ্বর অঞ্চল প্লাবিত করে।

প্রতিকার-ব্যবস্থা

দামোদরের বন্যার সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র শ্রীরামপুরের সবডিভিসনাল অফিসার তারযোগে দামোদর ডিভিসনের প্রত্যেক সার্কেল অফিসারকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। ২৭শে শ্রাবণ শ্রীরামপুরের সবডিভিসনাল অফিসার মিঃ বার্থওয়েল বন্যার সম্ভাবনায় তারকেশ্বর পরিদর্শনও করিয়াছিলেন। তিনি চাপাডাঙ্গা, কুমরুল, সিমবেড়িয়া

প্রভৃতি অঞ্চলের ভিতর দিয়া বেগুয়ার থানা পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়া—বাঁধ ও নদীর অবস্থা দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াই তাঁহারা মহকুমায় ফিরিয়া গিয়াছিলেন। তখনও দামোদর ছিলেন শান্ত, বিরাট উদর তাহার অসামান্য স্ফীত হইয়া উঠে নাই। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটও বুঝিতে পারেন নাই যে, এক দিন পরেই এই অঞ্চল বন্যার জলে প্লাবিত হইয়া যাইবে। ইহার পরদিনই হঠাৎ দামোদর প্রলয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরিয়া তারকেশ্বরবাসীকে ত্রস্ত-বিব্রত করিয়া তুলে।

চারিদিকে সংবাদ প্রেরণ

নিশ্চিন্তপুরের বাঁধে হানা পড়িতেই সিমবেড়িয়ার সতর্ক সারকেল অফিসার তৎক্ষণাৎ তারযোগে হুগলীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও শ্রীরামপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটকে এই ভয়াবহ বিপত্তির সংবাদ জ্ঞাপন করেন। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তৎক্ষণাৎ প্রতিকারে অবহিত হন, অনতিবিলম্বে তিনি অকুস্থলে উপনীত হইয়া তারকেশ্বর থানায় দারোগা শ্রীযুত গিরীন্দ্রনাথ সিংহ ও প্রজ্ঞাসমিতির বহু স্বেচ্ছাসেবক সহ নিশ্চিন্তপুরের ভগ্ন বাঁধের দিকে অগ্রসর হন। ইতিমধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে ঢোল-সহরতে পল্লীবাসিগণকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়,—বন্যা আসিতেছে, সাবধান!

অগ্রগামীদের প্রত্যাবর্ত্তন

মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট সদলবলে কিছুদূর অগ্রসর হইতেই দেখিতে পাইলেন, বন্যার জলে রেলপথের পূর্ব্বাংশ প্লাবিত হইয়া গিয়াছে, চতুর্দ্দিকে জলস্রোত ছুটিয়াছে, নিশ্চিন্তপুর অঞ্চলে যাইবার উপায় নাই। তখন তাঁহারা ষ্টেশনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন।

বিপন্ন উদ্ধারে নৌকা সংগ্রহ

মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ও শ্রীরামপুরের এসিষ্ট্যাণ্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ খোন্দকার তখন এই যুক্তি স্থির করেন যে, প্লাবনবিধ্বস্ত অঞ্চলের অধিবাসিগণের উদ্ধারের জন্য অবিলম্বে বহুসংখ্যক নৌকার প্রয়োজন। কিন্তু তারকেশ্বরে সে সময় একখানিও নৌকা ছিল না। ইতিমধ্যে হুগলীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় শ্রীযুত এম সি ঘোষ বাহাদুরও ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হন। ঐ দিনই স্পেশাল ট্রেণে শ্রীরামপুর ও শেওড়াফুলি হইতে ৩০খানি নৌকা তারকেশ্বরে আনাইবার ব্যবস্থা হয়। রাত্রি ২টার সময় নৌকাগুলি তারকেশ্বর ষ্টেশনে আনীত হইলে তখন আর্ত্তত্রাণের আয়োজন চলিতে থাকে।

তারকনাথের মন্দিরমধ্যে

বন্যার জল প্রবেশ করিয়াছিল এবং বাবার সম্পূর্ণ মূর্ত্তি অহোরাত্র জলে নিমজ্জিত ছিল। সেই অবস্থাতেই নানা অসুবিধাসত্ত্বেও বাবার পূজা ও ভোগরাগাদির কোনও ব্যবস্থার ত্রুটি হয় নাই। পুরোহিত সেই জলে দাঁড়াইয়া অন্যের হাতে পূজার উপচারাদি রাখিয়া তাহাদের সহায়তায় অর্চ্চনা করিয়াছিলেন।

তারকেশ্বর অঞ্চলের ক্ষতি

দামোদর বন্যায় তারকেশ্বর অঞ্চলে প্রায় ৫০ হাজার লোক



বন্যায় তারকনাথের মন্দির ও মুকুন্দ ঘোষের সমাধির দৃশ্য

গৃহহীন হইয়াছে এবং ক্ষতির পরিমাণ পাঁচ লক্ষ টাকারও অধিক।

বাঁকুড়া

তারকেশ্বরের পরেই বাঁকুড়ার প্লাবন-বিবরণও মর্ম্মন্তুদ। বাঁকুড়ার সংবাদে প্রকাশ, এই জেলার বহু গ্রাম প্লাবিত, অসংখ্য গৃহ বিধ্বস্ত, প্রচুর শস্য ও শত শত গো-মহিষ বন্যার প্লাবনে ভাসিয়া গিয়াছে। মেজিয়া বড়জোড়া, সোনামুখী, পাত্রসায়ের, ইন্দাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ থানার এলাকাধীন সুবিস্তৃত অঞ্চল সর্ব্বগ্রাসী দামোদরের প্রকোপে ভীষণভাবে বিপন্ন হইয়াছে। সাহসপুর ও বোয়াইচণ্ডী ষ্টেশন দুইটির মধ্যবর্ত্তী রেল-লাইন বিধ্বস্ত হওয়ায় ট্রেণ চলাচলে বিঘ্ন উপস্থিত করিয়াছিল।

রাণীগঞ্জ ও অণ্ডাল

এই দুইটি প্রসিদ্ধ অঞ্চলেও দামোদর তাহার প্রভাব বিস্তারের ত্রুটি করে নাই। রাণীগঞ্জ পেপার মিলের অধিকাংশ ডুবিয়া যায়।



বন্যায় বর্দ্ধমানের অপর দৃশ্য



বর্দ্ধমান জিলার বন্যাপ্লাবিত একটি গ্রাম



দামোদর বন্যা—গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর জলস্রোত

খণ্ডাল ষ্টেসনের সন্নিহিত মদনপুর, পুবড়া, সুপুর প্রভৃতি পল্লীগুলি জলমগ্ন হয়। প্রবল স্রোতে গৃহস্থদের সঞ্চিত শস্য, পুত্রকন্যা, গৃহপালিত গরু, ছাগল, মহিষ প্রভৃতি ভাসিয়া গিয়াছে, এরূপ সংবাদও যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে। পুবড়া গ্রামে এক গৃহস্থের ঘরে বন্যার স্রোত প্রবেশ করে, সমর্থগণ যখন তাহাদের দ্রব্যজাত রক্ষণাবেক্ষণে ব্যস্ত ছিল, সেই সময় তাহাদের এক শিশুকন্যা স্রোতোবেগে ভাসিয়া যায়। বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত দামোদরতীরবর্ত্তী এই দুই অঞ্চলের বহু গ্রামেরই অবস্থা এইরূপ।

অন্যান্য নদ-নদীরও চাঞ্চল্য

দামোদরের প্রচণ্ড তাণ্ডবের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের অন্যান্য অংশের নদনদীগুলিও বিক্ষুব্ধ হইয়া বহু জেলাকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে।

বিভিন্ন স্থানে বন্যা

পদ্মা ও যমুনায় বন্যা হওয়ায় বহু স্থান প্লাবিত হইয়াছে। যমুনার জলে ময়মনসিংহের পিংনা অঞ্চলের কতকাংশ ডুবিয়া গিয়াছিল।

কালীগঙ্গা ও পদ্মার আবর্ত্তে কুষ্টিয়া মহকুমার প্রায় ৫০ খানি গ্রাম জলপ্লাবিত, দশ হাজার বিঘা জমীর ধান নষ্ট হইয়াছে।

গোমতীর প্লাবনে কুমিল্লা অঞ্চলের বহু পল্লী নিমজ্জিত, প্রায় ১২ বর্গ মাইল-পরিমিত ভূভাগ জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। ডাকাতিয়া নদী ডাকাতের মত রাতারাতি ত্রিপুরার অন্তর্গত ৩০ খানি গ্রাম ডুবাইয়া দিয়াছে।

বিদ্যাধরী ভয়ঙ্করী হইয়া ২৪ পরগণার ক্যানিং ও ভাঙ্গড় অঞ্চলের প্রায় ৩০ মাইল স্থান গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। ১০০ খানিরও অধিক পল্লী জলমগ্ন, ৫০ হাজার অধিবাসী নিরাশ্রয়।

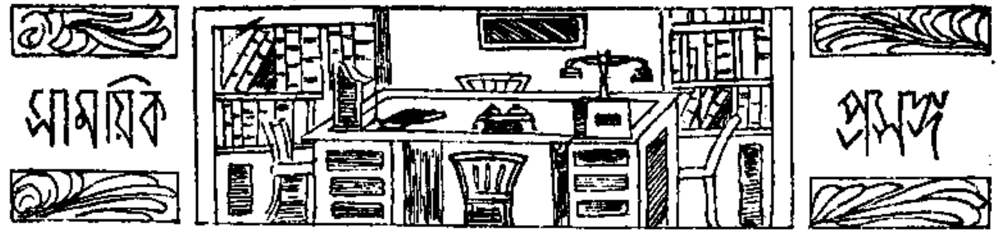
ব্রহ্মপুত্রের আবর্ত্তে ডিব্রুগড় অঞ্চলের পল্লী সমূহ জলময়, বহু গৃহ পড়িয়াছে, ক্ষতির পরিমাণও অল্প নয়।

মহানন্দার বক্ষও উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্ণিয়ার নানা স্থান ও কিষণগঞ্জ মহকুমার বহু অঞ্চল ডুবিয়াছিল। দার্জ্জিলিং রোডের একটা অংশ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে।

গোমতীও প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধরিয়াছিল। দামোদরের মত ত্রিপুরা বিভাগের বিশাল বাঁধের পাঁচটি স্থানে হানা দিয়া প্রায় ৮০ বর্গ-মাইল স্থান প্লাবিত করিয়াছিল। কুচবিহার ও আলিপুর ডুয়ার্সের মধ্যবর্ত্তী রেলপথ তাহার প্লাবনে মগ্ন হইয়াছিল।

গিরিনদী পঞ্চসই, বুড়ীবালারুণ, মহানদ ও তিস্তা একসঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া সেভোক ও ডুয়ার্সের পথে সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল।

এই সঙ্গে বিহার প্রদেশের গণ্ডক, শোণ, বাগমতী, শেয়াই, ধবলী, লক্ষণডেরী প্রভৃতি নদ-নদীগুলির নর্ত্তনও একান্ত উপেক্ষণীয় নয়। বস্তুত, একসঙ্গে বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন নদ-নদীগুলির এরূপ উন্মাদনাময় ভয়াবহ অভিযান নদী-মাতৃক বঙ্গভূমির ইতিহাসে বোধ হয় এই প্রথম।



শিক্ষার সঙ্কোচ

সরকার বঙ্গদেশের শিক্ষার সঙ্কোচসাধনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা বাঙ্গালার পাঠশালাগুলির সংখ্যা হ্রাস করিয়া দিবার জন্য এক নূতন ব্যবস্থা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা দেশে চৌষট্টি হাজার পাঠশালা আছে। সরকার এই পাঠশালার সংখ্যা হ্রাস করিয়া ১৬ হাজারে দাঁড় করাইতে চাহেন। ইহাতে বাঙ্গালার বহু লোক অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন। সেই অসন্তোষ জ্ঞাপন করিবার জন্য গত ৮ই ভাদ্র রবিবারে কলিকাতার আলবার্ট হলে কলিকাতার শিক্ষিত বাঙ্গালীরা এক সভা করিয়া সরকারের ঐ প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। সেই সভার সভাপতি হইয়াছিলেন সার পি সি রায় ও সার নীলরতন সরকার। উভয়েই বিশিষ্ট ব্যক্তি। ইহারা যে না বুঝিয়া সরকারের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবেন, ইহা বোধ হয় কোন সরকারী পুরুষই মনে করিতে পারেন না। এই সভায় যে সকল মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, সরকার প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা-সংস্কারকল্পে যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে এ দেশের শিক্ষাকে পিছাইয়া দেওয়া এবং বিপন্ন করা হইবে। একেই ত এ দেশে শিক্ষার বিস্তার অধিক হয় নাই। তাহার উপর যদি বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা হ্রাস করিয়া প্রত্যক্ষভাবে লোকের ছেলেমেয়েকে পড়াইবার সুবিধার সঙ্কোচসাধন করা হয়, তাহা হইলে যে এ দেশ অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অবশ্য বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিকে সকলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া মনে করেন না। ঐ শিক্ষা-পদ্ধতির দ্বারা বিদ্যার্থীদিগের বুদ্ধি স্বাভাবিকভাবে বিকাশ লাভ করে না। টেক্সট বুক কমিটী, তথা বিদ্যালয়ের পরিচালক-বর্গ ছোট ছোট বালকদিগকে অতি অল্পবয়সে এত অধিক বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন করিতে চাহেন যে, সেই বিদ্যার চাপে তাহাদের বুদ্ধি হাঁপাইয়া উঠে। তাহারা পাঠশালাকে এবং গুরুমহাশয়দিগকে যেন বাঘের মত ভয় করে। তাহাদিগকে ভূবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, স্বাস্থ্যবিদ্যা প্রভৃতি অশেষ বিদ্যায় ধনুর্দ্ধর করিবার চেষ্টা হয়,—কিন্তু সাধারণ বালকদিগের তত বিদ্যা মগজে স্থান দিবার মত যায়গা নাই। কাযেই অনেক ছাত্র পাঠশালার পাঠে আর অগ্রসর হইতে পারে না। সেই জন্য অনেক পাঠশালার ছাত্র বিদ্যাশিক্ষা বিভীষিকাময় মনে করিয়া পাঠশালা ত্যাগ করে। সে দোষ ছাত্রের না শিক্ষা পদ্ধতির? কিন্তু বণিকবেশেই হউক, আর রাজবেশেই হউক, ইংরাজ যখন এ দেশে শুভ পদার্পণ করেন, তখন এই বাঙ্গালাদেশে অন্ততঃ লক্ষাধিক বিদ্যালয় ছিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এই বঙ্গদেশে এক লক্ষ বিদ্যালয় ছিল, ইহা মিষ্টার এডাম অনুমান করিয়া গিয়াছেন। মিষ্টার হাউয়েল (H wel) সে কথা তাঁহার মন্তব্যে উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। (In Bengal alone in 1835 Mr. Adam estimated their number to be 100,000.) ইহাই মিষ্টার হাউয়েলের ভাষা। উইলিয়াম ওয়ার্ড বলিয়াছেন যে, তখন মনে করা হইত যে, বাঙ্গালার এক-পঞ্চমাংশ পুরুষ লিখিতে পড়িতে পারিত। (Leitner's History of Indigenous Education in the Punjab P 169) এখন তাহা পারে না। কোন কোন বিশেষজ্ঞ অনুমান করেন যে, বাঙ্গালায় ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বে ৮০ হাজার পাঠশালা ছিল। ইহাতে সাধারণ সকল শ্রেণীর বালকরাই বিদ্যাশিক্ষা করিত। রেভারেণ্ড F. E. Keays লিখিয়াছেন যে, Side by side, however with these, there grew up at sometime and in most parts of India, a popular system of elementary education which was open generally to all comers. অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ এবং মুসলমান শিক্ষা-পদ্ধতির পার্শ্বেই এক সময়ে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই জনসাধারণের জন্য এক প্রকার প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতি উদ্ভূত হইয়াছিল। সেই প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে আসিত, সেই ভর্ত্তি হইতে পারিত। দেশের ব্যবসায়ী এবং কৃষক সম্প্রদায় ঐ সকল পাঠশালায় লিখিতে পড়িতে এবং অঙ্ক কষিতে শিক্ষালাভ করিত। সেইরূপ পাঠশালা কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও বাঙ্গালায় ছিল। উহাতে লিখন, পঠন এবং গণিত ব্যতীত একটু ধর্ম্মশিক্ষাও প্রদত্ত হইত। তাহার দ্বারা ছাত্রগণ উত্তরকালে তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রানির্ব্বাহের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহা শিক্ষা করিতে পারিত বটে, কিন্তু উত্তরকালে বিস্মৃতিদেবীকে নিবেদন করিয়া দিবার জন্য অনর্থক পরিশ্রম করিয়া কিছুই শিখিতে বাধ্য হইত না। ইহা ভিন্ন যাহা প্রয়োজন, তাহা তাহারা উত্তরকালে কার্য্যক্ষেত্রে



সার পি সি রায়

প্রবেশ করিয়া শিক্ষালাভ করিত। উহাতে তাহাদের যথেষ্ট উপকার হইত। এখনকার পাঠশালাগুলি সেরূপ নহে। যাহা হউক, তাই বলিয়া এই সময়ে পাঠশালাগুলি উঠাইয়া দেওয়া উচিত নহে।

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা সাম্প্রদায়িকভাবে দেওয়াও উচিত নহে। বরং যাহাতে সাম্প্রদায়িক ভাব নষ্ট হয়, সেইরূপ শিক্ষা দিবার জন্ম চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু উপস্থিত কর্ত্তৃপক্ষের যেরূপ মনোভাব দেখা যাইতেছে, তাহাতে তাঁহারা সে বিষয়ে অবহিত হইবেন বলিয়া কিছুতেই মনে হইতেছে না। সাম্প্রদায়িকভাবে শিক্ষাদান করা যে ঘোর অন্যায় এবং জাতীয়তার হস্তারক, তাহা আমাদের শাসকগণ যে বুঝেন না, তাহা মনে করা যাইতে পারে না। গোড়া হইতে সাম্প্রদায়িকতার বনিয়াদ গাঁথিয়া তুলিলে সেই বনিয়াদ যে খুব পাকা হয়, তাহা যে বৃটিশ জাতি বুঝেন না, তাহা মনে হয় না। আকবর বিশেষ দূরদর্শিতা প্রকাশ পূর্ব্বক এই সাম্প্রদায়িকতার মূলোচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সেই চেষ্টায় তিনি অনেকটা সফলমনোরথ হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, সরকার যে ৬৪ হাজার পাঠশালার স্থানে ১৬ হাজার পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং সাম্প্রদায়িকভাবে শিক্ষা দিবার যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহার সমর্থন এ দেশবাসী কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিই করিতে পারেন না। ঐ পরিকল্পনা সহজ বুদ্ধির বিরোধী। অবশ্য সরকার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, এ বিষয়ে তাঁহারা চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। চার পাঁচ বর্গমাইলের ভিতর একটি করিয়া পাঠশালা থাকিলেই বা কি লাভ, তাহা ত আমরা বুঝি না। আর এক শত বর্গমাইলের ভিতর একটি করিয়া মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয় রাখাও যা, আর সমস্ত দেশকে অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাখাও তা। সরকার কি উদ্দেশ্যে এই কায করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী নাই। তবে আমরা এ কথা জানিতে চাহি যে, দেশের লোককে অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিলে দেশের লোকের রাজনৈতিক অনুভূতি বা অসন্তোষ কমে কি? ইতিহাস এ সম্বন্ধে কি সাক্ষ্য দেয়? সরকারের এবং এ দেশের রাজপুরুষদিগের ধারণা এই যে, শিক্ষা-বিস্তারের জন্ম এ দেশে বিপ্লববাদ প্রভৃতি আত্মপ্রকাশ করিতেছে। তাঁহাদের সে ধারণা ভুল। সুশিক্ষার ফলে কখনই বিপ্লববাদ বা ঘোর উগ্রপন্থী রাজনীতিকের আবির্ভাব হয় না। উহা অত্যন্ত বিকৃত শিক্ষার ফল। সুতরাং শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার করিতে হইবে। অযথাভাবে শিক্ষার সঙ্কোচ করিলে সুফল ফলিবে না। বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস পাইলে সরকার যে আনন্দিত হয়েন, ইদানীং তাহার নমুনা পাওয়া গিয়াছে। এ স্থলে আমরা সে কথার আলোচনা করিলাম না।

সরকারী দানের অপব্যয়

ভারত সরকার ভারতের পল্লী অঞ্চলের উন্নতিসাধনের জন্ম ১ কোটি টাকা দান করিয়াছেন। এই এক কোটি টাকার মধ্যে বাঙ্গালার সরকার পাইয়াছেন ১৬ লক্ষ টাকা। বাঙ্গালার যেরূপ অভাব, তাহাতে এই অর্থ-দান প্রজ্বলিত পর্ণ-কুটীরের অগ্নিনির্ব্বাণ কার্য্যে কুশাগ্রে জলনিক্ষেপের ন্যায় হাস্যজনক। উহাতে বাঙ্গালার জন প্রতি দুইটি মাত্র পয়সা ভাগে পড়িবে। অভাবের তুলনায় ইহা কিছুই নহে। বাহ্য দৃষ্টিতে এ দান উপহাস মাত্র বোধ হইতে পারে। তবে ভারত সরকার কস্মিন্‌কালেও এই বাবদ কিছু দেন নাই, তাহার পর এত বড় বিস্তীর্ণ ব্যাধিবিড়ম্বিত এবং দরিদ্র দেশের অভাবমোচনের অনুরূপ দান করিবার সঙ্গতি সরকারের নাই। ইহা মনে করিয়াই বঙ্গবাসী হাসি-মুখে এই সামান্য টাকা লইয়াছিল। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে, এই বাঙ্গালা প্রদেশে ঐ ১৬ লক্ষ টাকার অধিকাংশই দেশবাসীর অভাব-অভিযোগ দূর করিবার জন্ম ব্যয় করা হইবে না। গত ১৫ই আগষ্ট তারিখে এই টাকাটা সরকার কোন্ কোন্ কার্য্যে ব্যয় করিবেন, তাহার একটা পরিকল্পনা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিয়াছিলেন। পরিকল্পনাটা কিছু দিন পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল,—তবে শেষটা মামুলী রীতি রক্ষার মত যেন উহা জনমতের সমর্থন করাইয়া লইবার জন্ম ব্যবস্থাপক সভায় একবার পেশ করা হয়। বলা বাহুল্য, এই ব্যবস্থা পরিষদে যাঁহারা জনমত ব্যক্ত করিবার সাহস রাখেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই সেই সরকারী পরিকল্পনার সমর্থন করেন নাই। গত ২২শে আগষ্ট বা ৫ই ভাদ্র ব্যবস্থাপক সভায় উহার আলোচনা অভিনয়ের শেষ হয়। সরকার পক্ষ ঐ ১৬ লক্ষ টাকা ১৩ দফা কার্য্যে ব্যয় করিবেন বলেন। দেশের লোকের যাঁহারা প্রকৃত প্রতিনিধি, তাঁহারা বলেন যে, অত অধিক দফায় ঐ সামান্য টাকা ব্যয় করা সঙ্গত হইবে না। যদি উহা পল্লীর উন্নতি-সাধক কার্য্যের জন্ম দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে সত্য সত্যই যাহাতে পল্লীগ্রামবাসীদিগের উপকার হয়, কেবলমাত্র সেই সকল বাবদ ঐ টাকা ব্যয় করা কর্ত্তব্য। ইহা যে ন্যায্য কথা, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীযুত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, ঐ ১৬ লক্ষ টাকা বাঙ্গালার ২৮টি জেলায় ভাগ করিয়া দেওয়া হউক। তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া হউক যে, প্রত্যেক জেলার পল্লীবাসীদিগের পক্ষে যে সকল কার্য্য অত্যন্ত অধিক প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইবে, কেবল সেইরূপ একটি বা দুইটি মাত্র কাযে এই টাকাটা ব্যয় করিতে হইবে। অবশ্য প্রত্যেক জেলার আয়তন ও লোকসংখ্যা হিসাবে টাকা বরাদ্দের কিছু তারতম্য করা যাইতে পারিবে। তাহা হইলে প্রত্যেক জেলায় অন্ততঃ অর্দ্ধ লক্ষ টাকা করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। মিষ্টার টি সি চট্টোপাধ্যায় বলেন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবের সহিত এই কথাটা যোগ করিয়া দিতে হইবে যে, সর্ব্বত্রই পানীয় জল সরবরাহের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এ প্রস্তাব যে খুব সঙ্গত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাঙ্গালার এই বশবর্ত্তী ব্যবস্থাপক সভাতে বন্দ্যোপাধ্যায় ও চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষে হইয়াছিল ২৯টি ভোট আর সরকার পক্ষে হইয়াছিল ৫৬টি ভোট। অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ। যাঁহারা দেশের জনসাধারণের ভোটে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যের পদ পাইয়াছেন, তাঁহারা কি বুঝিয়া এই সরকারী পরিকল্পনার সমর্থন করিলেন, তাহা আমাদের ধারণার অতীত। মেদিনীপুর অঞ্চলে রেডিও বাজাইবার কি প্রয়োজন আছে? উহাতে কি ঐ জেলার লোকের পেট ভরিবে, না রেডিওর গান শুনিয়া রোগ-বালাই ঐ অঞ্চল ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবে? ব্রতচারীর নাচ, বয়েজ স্কাউট, গার্লস গাইড প্রভৃতির দ্বারাই বা কি উপকার

হইবে ? ব্যবস্থাপক সভার স্বনামধন্য সদস্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু দেশের লোকের পক্ষ হইয়া যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন,—সকলেই তাহার সমর্থন করিবেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, ভারত সরকারের অর্থ-সচিব বলিয়াছিলেন যে, পল্লী অঞ্চলের উন্নতিসাধনকল্পে ঐ ১ কোটি টাকা প্রদত্ত হইল। সেই সময় তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, পল্লী অঞ্চলের দাবীই সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবে। পল্লী অঞ্চলের আর্থিক উন্নতির জন্য ঐ অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। পাছে কেহ ভুল বুঝেন, সেই জন্য তিনি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন যে, প্রাদেশিক মন্ত্রীরা যে সকল বিভাগ পরিচালিত করিতেছেন, তাহার উন্নতিসাধনের জন্য এই অর্থ ব্যয় করা যাইবে। ঐ সর্ত্তেই বাঙ্গালা দেশ ১৬ লক্ষ টাকা পাইয়াছে। সেই জন্য সকলে আশা করিয়াছিলেন যে, মন্ত্রীদিগের পরিচালনাধীন বিভাগের জন্য ঐ টাকাটা ব্যয় করা হইবে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, সরকার মেদিনীপুরে রেডিও দ্বারা প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্য যে টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে রাজনীতিক উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য। চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অঞ্চলের উন্নতির জন্য যাহা বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাহা কি রাজস্ব বিভাগের জন্য নহে ? সরকার ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, ২ লক্ষ ১৭ হাজার ৮ শত টাকা কমিশনার এবং ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের হস্তে তাঁহাদিগকে নিজ নিজ বিবেচনা অনুসারে ব্যয় করিবার জন্য দেওয়া হইবে। নরেন্দ্র বাবু বলেন যে, ঐ টাকাটার কিয়দংশ সম্ভবতঃ হিংসাপন্থী বিপ্লববাদীদিগের জন্য গোয়েন্দা বিভাগে ব্যয় করা হইবে। ফলে এই অর্থ দ্বারা পল্লীবাসীর কোনরূপ উন্নতিসাধক কার্য্য হইবে না। তাঁহার একটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধান করা আবশ্যক। পল্লীবাসীরা যাহাতে বাঁচে, অগ্রে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহার পর তাহাদিগকে হাত ধরিয়া তুলিতে হইবে। যে সকল ব্যাধির প্রতিষেধ হইতে পারে, সেই সকল ব্যাধির আক্রমণ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। বাঁচিতে হইলে তাহাদিগের পক্ষে নির্ম্মল পানীয় জলের প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এ কথাগুলি সমস্ত বঙ্গবাসীর মর্ম্মকথা। আমরা চাই অন্ন, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা ; গ্রামবাসীমাত্রের ইহা মর্ম্মকথা। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, বঙ্গীয় সরকার যে ভাবে এই ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন স্থির করিয়াছেন, তাহা গ্রামবাসীদিগের মতে অপব্যয়ই হইবে। সার জন এণ্ডার্সন যে কি ভাবিয়া এইরূপ ভাবে ব্যয়ের পরিকল্পনা করিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এ পরিকল্পনা ভাল হয় নাই।

সাধারণের নির্ব্বিঘ্নতা-সাধক আইন

বঙ্গদেশে সাধারণের নির্ব্বিঘ্নতা-সাধক এক আইন অমান্য আন্দোলনের পর বিধিবদ্ধ হইয়াছে। যখন এই আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, তখন বাঙ্গালাদেশের লোক বলিয়াছিল যে, ঐ আইন প্রণয়ন করিবার কোন প্রয়োজনই নাই। কিন্তু সরকার বিবেচনা করেন যে, ঐ আইন বিধিবদ্ধ না হইলে বাঙ্গালার জনসাধারণ নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে পারিবে না। ঐ আইন তখন কেবল তিন বৎসরের জন্য প্রণীত হইয়াছিল। ঐ সময় কথা ছিল যে, যখন আইন অমান্য আন্দোলন নিবৃত্তি পাইবে, তখন যদি বাঙ্গালার লোকের নির্ব্বিঘ্নে বাস করিবার মত অবস্থা হয়, তাহা হইলে আর এই আইন বহাল রাখা হইবে না। বর্ত্তমান বৎসরের শেষে এই আইনের মেয়াদ ফুরাইবার সময়। এ দিকে আইন অমান্য আন্দোলনও চিরতরে নির্ব্বাণলাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও ক্ষমতাপিপাসী ব্যুরোক্রেশী এই আইন বিহনে দেশটাকে নির্ব্বিঘ্ন রাখিতে পারিবেন না বলিয়া ঐ আইনটি আরও তিন বৎসরের জন্য বহাল রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, আইন অমান্য আন্দোলন যখন লোপ পাইয়াছে, তখন এই আইন আবার তিন বৎসরের জন্য জিয়াইয়া রাখা অবিবেচনা-মূলক, অবিচারসূচক এবং অন্যায়। শ্যামাপ্রসাদ বাবুর যুক্তি-যুক্ত



শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কথা শুনিয়াও ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদিগের মধ্যে কাহারও মন টলে নাই। কারণ, এই আইনটি আবার বহাল রাখিবার পক্ষে ৫৮ জন এবং বিপক্ষে অর্থাৎ শ্যামাপ্রসাদ বাবুর যুক্তির পক্ষে ১৭ জন মাত্র ভোট দিয়াছিলেন। ইহাতেই বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের মাহাত্ম্য বুঝা যায়। যখন আইন অমান্য আন্দোলন পূর্ণ-তেজে চলিতেছিল, তখন সরকার তিন বৎসরের জন্য এই আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এবার আইন অমান্য আন্দোলন নিবৃত্তি পাইলেও সরকার আবার উহা তিন বৎসরের জন্য বিধিবদ্ধ করিলেন। এই আইনটি জিয়াইয়া তুলিবার হেতু সম্বন্ধে মাননীয় মিষ্টার আর এন রীড কোন যুক্তি-যুক্ত হেতু দর্শাইতে পারেন নাই। ভারতে যে নূতন সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেই সরকারের নির্ব্বিঘ্নতাসাধনের জন্য নাকি এই আইনটি জিয়াইয়া তোলা আবশ্যক। চমৎকার যুক্তি! যে দেশে আমলা-তন্ত্রের আমলারা সর্ব্বে-সর্ব্বা, সে দেশে তাহারা যে কোন ক্ষমতা হাতে পাইলে তাহা ছাড়িবে, তাহা মনে করাই ভুল। ওয়াণ্টার বেজহট যথার্থই বলিয়াছেন,—A bureaucracy is sure to think that its duty is to augment official power,

official business or officid numbers rather than leave free the energies of mankind; it overdoes the quantity of government, as well as impairs its quality. ইহার অর্থ, "আমলাতন্ত্রের আমলারা এ কথা নিশ্চয়ই মনে করিয়া থাকে যে, রাজপুরুষদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, রাজপুরুষদিগের কার্য্য এবং সংখ্যা বৃদ্ধি করাই তাহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য,—মানুষের শক্তিকে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে দেওয়াটা তাহারা তত্তটা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে না। ইহারা শাসন-কার্য্যের পরিমাণের দিকটা খুব বেশীভাবে করিয়া থাকে, এবং শাসনকার্য্যের উৎকর্ষের দিকটা ক্ষুণ্ণ করিয়া ফেলে।" স্বাধীন দেশের রাজপুরুষদিগের যখন ইহাই স্বভাব, তখন যে দেশ পরাধীন, যে দেশের লোকের সহিত শাসক জাতির শোণিতসম্বন্ধ নাই, এবং যে দেশের আমলাতন্ত্রের আমলাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবার কেহ নাই,—সে দেশের আমলাতন্ত্রের আমলারা কি করিবেন, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। সুতরাং ও কথা বলিয়া লাভ কি?

বাঙ্গালার বিকাশসাধিনী ব্যবস্থা

বেঙ্গল ডেভেলপমেণ্ট এক্ট অর্থাৎ বাঙ্গালার বিকাশসাধিকা ব্যবস্থা বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সরকার বলিতেছেন, তাঁহারা বঙ্গদেশের অধিবাসীদিগের হিতের জন্য বা কল্যাণসাধনের কামনায় এই ব্যবস্থা বা আইনটি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সরকার যাহাদের কল্যাণ-সাধনের জন্য এই আইনটি বিধিবদ্ধ করিলেন,—এ সম্বন্ধে আইন করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা এ দেশের সেই জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করিবার জন্য কোন চেষ্টাই করেন নাই। বরং এ সম্বন্ধে তাঁহা-দিগকে জনসাধারণের মতামত জানিবার জন্য অনুরোধ করিলেও তাঁহারা সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। যাঁহাদের হিতার্থ এই আইনটি বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাঁহাদের মতামত গ্রহণে সরকারের এরূপ অরুচি জন্মিল কেন, তাহাও আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। তাহারা কি এতই নির্ব্বোধ যে, তাহাদের আত্মস্বার্থ বিষয়ে বুঝিবার মত জ্ঞান নাই? আমরা দেখিতেছি যে, কি ব্যবস্থাপক সভার ভিতরে, কি ব্যবস্থাপক সভার বাহিরে, যাঁহারা জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয়, তাঁহারা সকলেই এই আইনের প্রতিকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহারা যে কেহই দেশের কিসে হিত হয়, কিসে অহিত হয়, তাহা বুঝেন না, এ কথা বাতুল ভিন্ন অন্য কেহ মনে করিতে পারে না।

এই আইনের সম্বন্ধে একটি প্রধান আপত্তি এই যে, ইহাতে সরকারী প্রাপ্যগুলা অত্যন্ত অধিক হারে ধরা হইয়াছে। দামোদর এবং বক্রেশ্বর খাল কাটিয়া সরকার অর্থের যে ব্যয় বা অপব্যয় করিয়াছেন, সেই খরচা সরকার এখন প্রজাদিগের নিকট হইতে গত কয়েক বৎসরের পূর্ব্বের পাওনা হিসাবে আদায় করিবেন। আইন হইল এখন, কিন্তু তাহার ফল ফলাইবার ব্যবস্থা হইল কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে! এরূপ যুক্তিহীন ব্যবস্থা সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা সমর্থন করিতে পারে না। তাহার পর এই আইনে ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, সরকারী উন্নতিসাধক কার্য্যের ফলে চাষী প্রজাদিগের যে লাভ হইবে, তাহার অর্দ্ধেক সরকার লইবেন। মৌলবী তামিজ উদ্দীন খাঁ প্রস্তাব করেন যে, উন্নতিসাধনের খরচা বাবদ সরকার প্রজার নিকট তাঁহাদের খাঁটি লাভের বড় জোর এক-তৃতীয়াংশ লইতে পারিবেন। এই ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাবটিও সরকারপক্ষ গ্রাহ্য করেন নাই। ইহাতেই সরকারের মনোভাব বেশ বুঝা যায়। আর এক কথা এই যে, জমির লভ্যাংশ কত বৃদ্ধি পাইল, তাহার হিসাব হইবে কিরূপে? এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, সকল বার সকল ক্ষেতে সমান ফসল ফলে না। যে জমিতে প্রায় বিঘা করা ৮ মণ ধান জন্মে, অনেক বৎসর সেই জমিতে বিঘা করা ৬ মণ ধানও জন্মে না। এইরূপ ফসলের অল্পতা ক্রমাগত কয়েক বৎসর ধরিয়াও হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় সরকারের উন্নতিসাধক কার্য্যের ফলে প্রজার প্রকৃতপক্ষে কত লাভ হইল, তাহা কি প্রকারে সাব্যস্ত হইবে? আর এক কথা, যদি কোন বৎসরে প্রজার আর্থিক কিছু ক্ষতি হয়, তাহা হইলে সরকার কি প্রজার সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেন? "লাভের অংশ যে লইবে, ক্ষতির অংশও সে বহিবে," ইহাই ত সাধারণ নিয়ম। সরকারের পক্ষে সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে কেন? সরকার দেশের ক্ষয়িষ্ণু অঞ্চলকে বর্দ্ধিষ্ণু করিবার জন্য যে অর্থ ব্যয় করিবেন, তাহা তাঁহারা মায় সুদ প্রজার নিকট হইতে ৫০ কিম্বা ৪০ বৎসরে আদায় করিয়া লইতে পারেন, তাহা না করিয়া তাঁহারা যাবৎ জগতে শশি-দিবাকর বিরাজ করিবেন, তাবৎকাল প্রজার নিকট হইতে আয়ের অর্দ্ধাংশ আদায় করিয়া লইবেন, ইহা কিরূপ নীতির অনুমোদিত? প্রজাদিগের হিতার্থ সরকারের কার্য্য যে ব্যবসাদারী বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়, ইহা কোন দেশের প্রজাই ইচ্ছা করে না। এবার বাঁধ ভাঙ্গিয়া যে পশ্চিম বঙ্গের এতটা ক্ষতি হইল, তাহার জন্য সরকারের কি কোনরূপ দায়িত্ব নাই? সরকার ত দামোদরের বাঁধ রক্ষার্থ বর্দ্ধমান রাজ-সরকারের নিকট হইতে বৎসর বৎসর ৬০ হাজার টাকা করিয়া লইতেছেন। কিন্তু তাঁহারা সেই বাঁধ রক্ষা করিতে পারিবেন না বলিয়া, ঐ বন্যা-পীড়িত কৃষকদিগের যে ক্ষতি হইল, তাহা পূরণ করা কি নৈতিক হিসাবে সরকারের কর্ত্তব্য নহে? এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া আমরা সরকারের প্রণীত এই আইনের সমর্থন করিয়া উঠিতে পারিলাম না। এ আইন করা নিতান্তই অসঙ্গত হইয়াছে।

সাংবাদিক সম্মেলন

সম্প্রতি কলিকাতা টাউনহলে নিখিল ভারতীয় সাংবাদিক সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে একটি সংবাদ-পত্রের প্রদর্শনীও হইয়াছিল। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু এই প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করিয়াছিলেন। প্রবীণ সম্পাদক শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শারীরিক এবং মানসিক অসুস্থতা সত্ত্বেও সম্মেলনে উপস্থিত হইয়া এই প্রদর্শনীর কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীযুত চিরভূরি যজ্ঞেশ্বর চিন্তামণি এই সভার সভাপতি এবং শ্রীযুত মৃণালকান্তি বসু অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। উভয়ের বক্তৃতাতেই ভারতের সংবাদপত্র-সেবীদিগকে কত অসুবিধার ভিতর থাকিয়া সংবাদপত্রের সেবা করিতে হয়, তাহার কথা বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছিল। এ কথা সত্য যে, স্বেচ্ছাতান্ত্রিক শাসকদিগের দ্বারা যে কোন দেশ শাসিত হইয়া থাকে, সে দেশে স্বাধীন সংবাদ-পত্র কখনই থাকিতে পারে না। ইতিহাসে দেখা যায় যে, যাহারা

স্বৈরশাসক, তাহারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সহ্য করিতে পারে না। শুনা যায়, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট একবার বলিয়াছিলেন যে, তিনি দশ হাজার অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত লোকের সম্মুখীন হইতে সম্মত আছেন, কিন্তু চারিখানি প্রতিকূল সংবাদপত্রের সম্মুখীন হইতে ইচ্ছা করেন না। বিসমার্কের যখন ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক ছিল, তখন তিনি বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন যে, তিনি সংবাদপত্রগুলিকে কেবল কালি-মাখান কাগজ বলিয়া মনে করেন। জার্ম্মাণীর হার হিটলার এবং ইটালীর মুসোলিনী সংবাদপত্রে তাঁহাদের কার্য্যের স্বাধীন সমালোচনা সহ্য করিতে পারেন না। সংবাদপত্র প্রকৃত কথা প্রকাশ করিয়া দেয় বলিয়া স্বৈরশাসকগণ উহা সহিতে পারেন না। যে জানে যে, সে ন্যায়ধর্ম্ম অনুসারে কাষ করিতেছে না, সে কখনই স্বাধীন সমালোচনা সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। জেরেমী বেস্থাম বলিয়া গিয়াছেন যে, Publicity is the very soul of Justice. অর্থাৎ জনসমাজে প্রচারকার্য্যটাই ন্যায়বিচারের আত্মা। সুতরাং দেখা যায়, যেখানে ন্যায়বিচারের অভাব, সেইখানেই জুগোপিষা বা গোপন করিবার ইচ্ছা থাকিবেই থাকিবে। কাজেই স্বৈরশাসকের দেশে স্বাধীন সংবাদপত্র থাকিতে পারে না। ইহা হইল সাধারণ নিয়ম। যে কোন দেশের সংবাদপত্রের সুর দেখিলেই বুঝা যায় যে, সে দেশে কিরূপ শাসনকার্য্য চলিতেছে।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত মৃণালকান্তি বসু যে দীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা এ ক্ষেত্রে সম্ভব নহে। আমরা কেবল তাঁহার কয়েকটি কথার উল্লেখ করিব। তিনি বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালার সংবাদপত্রের প্রচারকার্য্য নিরুদ্ধ করিবার জন্য দমনমূলক আইনের অরণ্যানী সৃষ্টি করা হইয়াছে। যথা (১) ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় সংবাদপত্রের মুখরোধক আইন। ১৯৩১ এবং ৩৪ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় ফৌজদারী আইনের সংশোধক বিধি। (২) ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের রাজন্য-রাজ্যরক্ষা-সম্পর্কিত আইন (States Protection Bill)। (৩) ১৯২২ খৃষ্টাব্দে প্রণীত রাজন্য-রক্ষাবিষয়ক আইন (Princes Protection Bill)। (৪) পর-রাষ্ট্রের সহিত সম্বন্ধ-সম্পর্কিত আইন (Foreign Relation Act), এই আইন ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে প্রণীত। মৃণালকান্তি বাবু এই আইনগুলির বিধিবিধান কিরূপ ব্যাপক, তাহা তাঁহার অভিভাষণে আলোচনা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বিধিবিধানের বেড়া জাল উত্তীর্ণ হইয়া চলাই কঠিন। মুদ্রাযন্ত্র-সম্পর্কিত আইন এক বৎসরের জন্য বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু তাহাই আবার ফৌজদারী আইনের সংশোধক বিধি হিসাবে তিন বৎসরের জন্য জারি করা হইয়াছে। এই সকল সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধক আইনের মধ্যে যে সকল অপরাধ অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সাধারণ আদালতে ঐ সকল অপরাধের বিচার হইতে পারে। কিন্তু শাসকদিগের মন তাহাতে পরিতৃপ্ত নহে। তাঁহারা সাধারণ বিচারালয়ে সংবাদপত্রগুলির ঐরূপ অপরাধের বিচার করাইতে চাহেন না। বঙ্গীয় সরকার সংবাদপত্রের নিয়ামক রাজপুরুষদিগের দ্বারা কিরূপ ভাবে সংবাদপত্রগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তাহাও মৃণালকান্তি বাবু বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছিলেন। ইহা অনেকেই অবগত আছেন, সুতরাং এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই।

শ্রীযুত চিন্তামণি মহাশয় সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাও অতিশয় সুন্দর হইয়াছিল। তিনি বলেন যে, এ দেশের বৃটিশ সাংবাদিকগণ, দেশের যাহারা স্থায়ী অধিবাসী, তাহাদিগের স্বার্থ দেখেন না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। তাঁহারা কেবল বৃটিশ জাতির সাময়িক স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই দোষ নূতন নহে। ত্রিপাদ শতাব্দী-কাল ধরিয়া এই দোষ চলিয়া আসিতেছে। সার জন লরেন্স (পরে লর্ড লরেন্স) বলিয়া গিয়াছেন যে, ভারত সরকারের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা এই যে, যদি দেশীয়দিগের জন্য কিছু করা বা করিবার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে বিলাতে সে জন্য ঘোর কলরব উঠে এবং বিলাতের লোকও সেই কলরবের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ এবং তাহার সমর্থন করে। সকল লোকই বিষয়ব্যবচ্ছিন্ন-ভাবে (in the abstract) ন্যায়বিচার, সংযম ও প্রশান্তভাব প্রভৃতি গুণাবলীর প্রশংসা করিয়া থাকেন, কিন্তু উহা কার্য্যক্ষেত্রে



শ্রীযুত চিন্তামণি

বিনিয়োগ করিতে যাইলে যদি কাহারও স্বার্থে আঘাত লাগে, তাহা হইলে তাঁহার সে মত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজ-সম্পাদিত সংবাদপত্রগুলি যে সাধারণতঃ ভারতীয় সংবাদপত্রের সহিত বিভিন্ন ভাবে মতামত প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির স্বার্থ-রক্ষার জন্য ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিরই চেষ্টা করিতে হইবে। বৃটিশ সংবাদপত্রগুলির নিকট হইতে ঐ বিষয়ে সাহায্য পাওয়া যাইবে না। ইহা পরাধীনতার দোষ।

এবার শ্রীযুত চিন্তামণির সকল কথা আলোচনা করিবার স্থান আমাদের নাই। তবে তিনি বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে ভারতের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে যে ভারতীয় সংবাদপত্র স্বরাজের পক্ষসমর্থন করে না, সেই সংবাদপত্রের থাকিবার কোন

নৈতিক অধিকার নাই। এ সম্বন্ধে সকলেই যে একমত হইবেন, তাহা মনে হয় না। সকল জীবই স্বাধীনতা চাহে। বিশেষতঃ নিজেদের ব্যবস্থা নিজে করিবার স্পৃহা মানুষমাত্রেরই স্বাভাবিক। সেই জন্য মনে হয় যে, যাঁহারা স্বরাজ চাহেন না বলেন, তাঁহারা যে বাস্তবিকই স্বরাজ পাইবার কামনা করেন না,—ইহা মনে হয় না। তবে তাঁহারা কোন গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে কথা মুখে প্রকাশ করেন না। অতএব তাঁহাদের কথা লইয়া আলোচনা অনাবশ্যক। তবে বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে ঔপনিবেশিক স্বরাজ চাহি, তাহা অনেকেই বলিয়া থাকেন।

সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে ভারতবর্ষীয় ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৮ ধারাটির বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার আসল কথা এই যে, যখন ঐ ধারাটি আইন-পুস্তকে রহিয়াছে, তখন আবার বিশেষ দমননীতিমূলক আইন বিধিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন কি? তিনি স্বয়ং ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই,—অন্য কেহই তাঁহার ঐ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই। আসল কথা এই যে, ভারত সরকার স্বৈরশাসনে অভ্যস্ত বলিয়া তাঁহারা স্বাধীন বিচারালয়ের সমক্ষে তাঁহাদের কার্য্যের বিচার করাইতে চাহেন না। ইহার উপর মন্তব্য প্রকাশ অনাবশ্যক। তবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের সভায় সাংবাদিকগণের ব্যক্তিগত অসুবিধার কথা আলোচনা না করিলেই শোভন ও সঙ্গত হইত।



পণ্ডিত জহরলাল নেহরু



শ্রীমতী কমলা নেহরু

কারামুক্ত পণ্ডিত জহরলাল নেহরু

গত ৩রা সেপ্টেম্বর সপরিষদ বড়লাট পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে আলমোড়া কারাগার হইতে মুক্তি দিয়াছেন। তাঁহার পত্নী শ্রীমতী কমলা নেহরু বেডেন ওয়েবারে কঠিন ব্যাধিতে শয্যাশায়িনী। ভিয়েনার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন। পণ্ডিতজীকে সরকার সম্পূর্ণভাবে মুক্তি দেন নাই। ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৪১০ ধারা অনুসারে পণ্ডিতজীর দণ্ডভোগ স্থগিত রাখিয়া তাঁহাকে পীড়িতা পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ দানের সুযোগ দিয়াছেন। পণ্ডিত জহরলালকে মুক্তি দিবার পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধীর সহিত বড়লাটের কথাবার্ত্তা চলিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। মুক্তি পাইয়াই পণ্ডিত জহরলাল নেহরু উড়ো জাহাজে য়ুরোপ যাত্রা করিয়াছেন। যাত্রার পূর্ব্বে করাচিতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হইয়াছিল। তিনি রাজনীতি-সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করিতে সম্মত হন নাই। কায়রোয় উপনীত হইয়া জহরলালজী সংবাদ পান যে, তাঁহার পত্নীর সামান্য উন্নতিলাভ ঘটিয়াছে। তিনি শীঘ্রই পত্নীর সহিত মিলিত হইবেন। ভগবানের আশীর্ব্বাদে শ্রীমতী কমলা নেহরু রোগমুক্ত হইয়া স্বামী ও দেশবাসীর আনন্দবর্দ্ধন করুন। দেশসেবা-ব্রত গ্রহণ করিয়া পণ্ডিত জহরলাল পুনঃ পুনঃ কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন। দেশসেবকগণের ইহা নিয়তি। "মাসিক বসুমতী" ছাপিবার সময় পর্য্যন্ত আর কোনও নূতন সংবাদ আসে নাই। তবে এ ক্ষেত্রে একটা কথা দেশবাসী বলিতে পারে, সরকার যখন পণ্ডিতজীকে সেই মুক্তি দিলেন, তবে আরও কিছুদিন পূর্ব্বে সে কার্য্য করিলে অধিকতর শোভন হইত। তিনি আরও পূর্ব্বে পত্নীর সহিত মিলিত হইতে পারিতেন।

কৃষি-ক্ষেত্রে মসজেদ নির্ম্মাণ

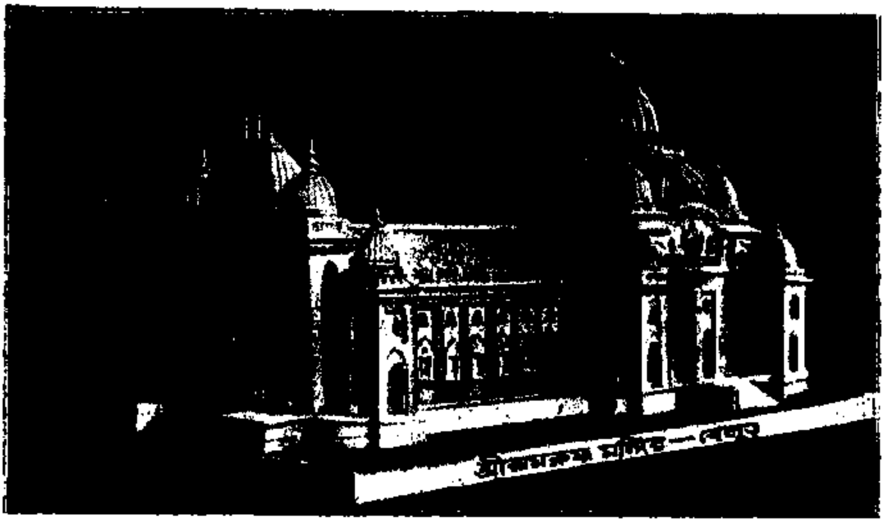
কতকগুলি মুসলমান কৃষিক্ষেত্রে মসজেদ নির্ম্মাণের অধিকার পাইবার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় আইনের এক খসড়া দাখিল করিতে চাহিতেছেন। মসজেদ নির্ম্মিত হইলেই সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানরা সেই মসজেদে 'গো'-হত্যা করিবেন এবং তাহার সন্নিহিত পথ দিয়া অন্য সম্প্রদায়ের শোভাযাত্রা লইয়া যাইবার এবং বাদ্যভাণ্ড করার সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। সুতরাং তাঁহাদের এ পর্য্যন্ত যে অধিকার ছিল না,—বিবাদ-বিসম্বাদ বাধাইবার জন্য তাঁহাদিগকে সেই অধিকার দেওয়া কোনমতেই সঙ্গত হইতে পারে না। এখন কর্ত্তাদের ইচ্ছায় কর্ম্ম হইবে, ইহা খুবই সত্য। তবে এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলিয়া কোন লাভ নাই।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বসুমতী রোটারী মেসিনে শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



[বসুমতী-চিত্র-বিভাগ] আনন্দময়ীর আগমনে [শিল্পী—শ্রীইন্দুভূষণ সেন ।

সচিত্র
মাসিক বসুমতী



শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির — বেলুড়

১৪শ বর্ষ] আশ্বিন, ১৩৪২ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

শরতে

কদম কামিনী বিদায় নিয়েছে
এলো শেফালির দিন,
গিয়াছে পাথার ঘাটে ঘাটে আজ
নির্ভয়ে খেলে মীন।
বিদায় নিয়েছে মীনকেতু লাজে
স্থলে জলে, হরডম্বরু বাজে,
ইন্দ্রাণী-রতি কমলার ভাতি
মহাশ্বেতায় লীন।
থেমেছে গগনে চপলালাস্য
থেমেছে মুরজ, চপল হাস্য,
কমল সুরভি মন্দিরে, কবি
বাজাও তোমার বীণ।

শ্রীকালিদাস রায়।

বিশ্বজননী দুর্গা

প্রত্যেক বাঙ্গালী হিন্দুসন্তান প্রভাতে দুর্গানাম স্মরণ করিয়া শয্যা ত্যাগ করেন। বাড়ী হইতে কোথাও দুরদেশে যাইতে হইলে দুর্গা, দুর্গা বলিয়া যাত্রা করেন,—ভয়ে, বিপদে মা দুর্গাকে ডাকেন।

দুর্গাপূজা বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসব। ভারতের যেখানে যেখানে দেবীর মন্দির বা শক্তি-উপাসক আছে, সেখানে সেখানে দুর্গাপূজার সময় দেবীর পূজা, চণ্ডী-পাঠ প্রভৃতি হয়। তাহাকে বলে নবরাত্রি বা দশেরা। কিন্তু বাঙ্গালাদেশের মত এত ব্যাপকভাবে পূজা ও উৎসব আর কোথাও দেখা যায় না।

আমাদের বেদে ও পুরাণগুলিতে দুর্গা সম্বন্ধে নানা কাহিনী আছে। তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

সামবেদীয় তলবকারোপনিষদে আমরা হৈমবতী উমার প্রথম সাক্ষাৎকার পাই। এক সময় অসুরগণ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মের কৃপায় তাহাদিগকে পরাজিত করেন। দেবতাদের মনে তখন অত্যন্ত অহঙ্কারের উদয় হইল। তাঁহারা ভাবিলেন,—এ জয়ে তাঁহাদেরই কৃতিত্ব। ব্রহ্ম তাঁহাদের মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাদের সম্মুখে জ্যোতীরূপে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার সেই অপরূপ রূপ দেখিয়া সকল দেবতাই আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। তাঁহাদের মনে একটু ভয়ও হইল। তখন দেবতারা সকলে যুক্তি করিয়া অগ্নিকে পাঠাইলেন। অগ্নি গিয়া জানিয়া আসিবেন, এ অপরূপ মূর্ত্তি কে?

অগ্নি তাঁহার সম্মুখে গিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তখন ব্রহ্ম অগ্নিকে প্রশ্ন করিলেন,—"তুমি কে?"

"আমি জাতবেদা বা অগ্নি।"

"তোমার শক্তি কি?"

"পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই আমি দহন করিতে পারি।"

তখন ব্রহ্ম অগ্নিকে একগাছি তৃণ দিয়া বলিলেন,—"তুমি ইহা আমার সম্মুখে দগ্ধ কর।" অগ্নি তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও তাহা দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তখন লজ্জিত ও দুঃখিত অন্তরে ফিরিয়া গিয়া দেবগণকে কহিলেন,—"উনি যে কে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না।"

দেবতারা সকলে আবার পরামর্শ করিয়া বায়ুকে পাঠাইলেন। বায়ু যাইতেই প্রশ্ন হইল,—"তুমি কে?"

"আমি মাতরিশ্বা বায়ু।"

"তোমার শক্তি কি?"

"পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই আমি গ্রহণ করিতে পারি।"

"এ তৃণটি গ্রহণ কর।"

বায়ু তাঁহার সমস্ত শক্তি দ্বারা চেষ্টা করিল; কিন্তু তৃণটি তিনি কিছুতেই নাড়িতে পারিলেন না। তখন লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া গেলেন ও দেবগণকে বলিলেন,—"আমিও ইহাকে চিনিতে পারিলাম না।"

সকল দেবতা তখন ইন্দ্রকে পাঠাইলেন। ইন্দ্র ব্রহ্মের নিকটে যাইবামাত্র ব্রহ্মের জ্যোতীরূপ অন্তর্হিত হইল এবং অন্তরীক্ষে হৈমবতী উমা আবির্ভূতা হইলেন। ইন্দ্রের প্রশ্নে দেবী তাঁহাকে ব্রহ্ম-বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন; তাহাতেই দেবতারা ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন এবং নিজেদের অহঙ্কার অভিমান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে পাওয়া যায়,—"কাত্যায়নায় বিদ্মহে, কন্যাকুমারীং ধীমহি, তন্নো দুর্গে প্রচোদয়াৎ।" সায়নাচার্য্যের মতে ইহাই বেদোক্ত দুর্গাগায়ত্রী। নারায়ণোপনিষদে দুর্গা-গায়ত্রী এইরূপ আছে,—"কাত্যায়নায়ৈ বিদ্মহে, কন্যাকুমারীং ধীমহি, তন্নো দুর্গা প্রচোদয়াৎ।"

দেব্যুপনিষদে মহাদেবীর সম্বন্ধে এই বিবরণ পাওয়া যায়,—সকল দেবতা দেবীর চারিপাশে বসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"মহাদেবি! আপনি কে?" দেবী উত্তর করিয়াছিলেন,—"আমি ব্রহ্মরূপিণী, প্রকৃতি-পুরুষাত্মক জগৎ আমা হইতে উদ্ভূত। আমি শূন্য, আমি অশূন্য; আমি আনন্দ, আমি অনানন্দ; আমি ব্রহ্মা, আমি অব্রহ্মা; * * * * * পরে দেবগণ বলিলেন,—"ইনিই আত্মশক্তি,

বিশ্ববিমোহিনী, পাশাঙ্কুশ ও ধনুর্ব্বাণ-ধারিণী, ইনিই শ্রীমহাবিদ্যা, যে ইঁহাকে জানে, সে শোক হইতে নিস্তার পায়।"

কালিকাপুরাণে মহামায়ার আবির্ভাব বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্মের অংশস্বরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আবির্ভূত হইলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু জগৎ-রক্ষার জন্য নিজ নিজ শক্তি গ্রহণ করিলেন; কিন্তু মহাদেব তাহা করিলেন না। তিনি যোগে তন্ময় হইয়া রহিলেন। ব্রহ্মা নিজ সৃষ্ট সন্ধ্যার প্রতি অনুরক্ত হইলেন। ইহাতে মহাদেব তাঁহাকে যথেষ্ট উপহাস করিতে ছাড়িলেন না। লজ্জিত হইয়া ব্রহ্মা ভাবিতে লাগিলেন,—কি ভাবে মহাদেবকেও শক্তি গ্রহণ করান যায়। এ দিকে জগৎ-রক্ষার জন্য শিবের শক্তি গ্রহণ করা দরকার। অথচ শিবের উপযুক্ত কোনও দেবীও পাওয়া যাইতেছে না। ব্রহ্মা বিষ্ণু ভাবিয়া আকুল।

অনেক চিন্তার পর ব্রহ্মা স্বীয় পুত্র দক্ষকে ডাকিয়া বলিলেন—"বিষ্ণুমায়া ব্যতীত শিবকে ভুলাইতে পারেন, এমন নারী কেহ নাই। আমি তাঁহার স্তব করিতেছি, তিনিই শিবকে মোহিত করিবেন। দক্ষ, তুমিও দেবীর আরাধনা কর, তিনি যেন তোমার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং শিবকে স্বামিত্বে বরণ করেন।" পিতার আদেশে দক্ষ বহু বৎসর কঠোর তপস্যা করিলেন। দেবী তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন। দক্ষ তাঁহার মনোবাসনা তাঁহাকে জানাইলেন। তিনি উত্তর করিলেন,—"আমি তোমার কন্যারূপে শীঘ্রই জন্মগ্রহণ করিব। কিন্তু যখনই তুমি আমাকে অনাদর করিবে, তখনই আমি দেহ ত্যাগ করিব।"

দক্ষপত্নী বীরিণীর গর্ভে দেবী জন্মগ্রহণ করিলেন। দক্ষ নাম রাখিলেন—সতী। সতী যৌবনে পদার্পণ করিয়া মায়ের আদেশে একমনে শিবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। সতীর তপস্যায় ও রূপে শিব মোহিত হইলেন। তাঁহাকে তিনি দেখা দিলেন। সতী বলিলেন,—"আপনি আমার পিতাকে জানাইয়া, আমাকে গ্রহণ করুন।" সতী মায়ের কাছে চলিয়া গেলেন। মহাদেবও কৈলাসে ফিরিয়া আসিলেন। কৈলাসে গিয়া তিনি সতীর কথা ভুলিতে পারিলেন না। ব্রহ্মাকে ডাকিয়া সকল কথা বলিলেন। ব্রহ্মার ইচ্ছা এত দিনে পূর্ণ হইল। তিনি দক্ষকে গিয়া শিবের কথা জানাইলেন। দক্ষও মহানন্দে সতীকে শিবের হাতে সম্প্রদান করিলেন। কিছুদিন পরে দক্ষ এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। সকল দেবতাই তাহাতে নিমন্ত্রিত হইলেন। শিব কপালী, এই জন্য দক্ষ তাঁহার নিমন্ত্রণ করা আবশ্যক মনে করিলেন না। কপালীর স্ত্রী বলিয়া দক্ষ সতীকেও ডাকিলেন না। সতী যখন পিতার এই অনাদরের কথা শুনিতে পাইলেন, তখন মহাদুঃখে যোগবলে দেহত্যাগ করিলেন। শিব তখন ঘরে ছিলেন না। ফিরিয়া আসিয়া বিজয়ার মুখে সতীর দেহত্যাগের কারণ জানিতে পারিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। সতীর শবদেহের পার্শ্বে বসিয়া শিব শোক করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নজলে বৈতরণী নদীর উৎপত্তি হইল। সতীর দেহ স্কন্ধে লইয়া মহাদেব বিলাপ করিতে করিতে পূর্ব্বাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শনি তখন সতীর দেহে প্রবেশ করিয়া, তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। যেখানে যেখানে সতীর অঙ্গ পতিত হইল, সেখানে সেখানেই পুণ্যতীর্থ মহাপীঠ হইল। শিব আবার পরব্রহ্মের ধ্যানে তন্ময় হইয়া গেলেন।

এ দিকে হিমালয়মহিষী মেনকা, মহামায়াকে কন্যারূপে পাইবার জন্য বহুকাল হইতে তপস্যা করিতেছিলেন। মহাদেবী তাঁহাকে দর্শন দিয়া তাঁহার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন। যথাসময়ে গিরিরাজের ঘরে দেবী জন্মগ্রহণ করিলেন। বাবা নাম রাখিলেন কালী। আত্মীয়বন্ধুগণ নাম রাখিলেন পার্ব্বতী। দেবীর শরীর তখন কালো বর্ণ ছিল। দেখিতে দেখিতে পার্ব্বতীর বয়স হইল। শিবকে পতিরূপে পাইবার জন্য তিনি প্রত্যহ শিবের নিকট গিয়া অতিশয় ভক্তি সহকারে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। শিব ধ্যানে এমন তন্ময় হইয়া রহিলেন যে, পার্ব্বতীর সেবা তাঁহার মনকে কিছুতেই নীচে নামাইতে পারিল না।

এ দিকে স্বর্গরাজ্যে মহা গোল। তারকাসুর প্রবল হইয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়াছে। দেবতারা ভাবিয়া অস্থির। শেষকালে ব্রহ্মা বলিলেন,—"শিবের যদি পুত্র হয়, তাহা হইলে একমাত্র সেই তারকাসুরকে বধ করিতে পারিবে।" কিন্তু সমস্যা,—শিবের পুত্র হয় কিরূপে? মহাদেব যে পর্ব্বতের মত অচল—ধ্যানে নিমগ্ন। শেষকালে সকলে যুক্তি করিয়া, মদনকে রতি ও বসন্তের সহিত শিবের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। পার্ব্বতী তখন শিবের সেবা

করিতেছেন। তাঁহার রূপে কৈলাসপুরী আলো হইয়া গিয়াছে। বসন্ত ও রতিকে সঙ্গে লইয়া মদন ঠিক সেই সময় কৈলাসে উপস্থিত হইল। উপযুক্ত সময় বুঝিয়া মদন শিবের উপর কুসুম-বাণ সন্ধান করিল। এক মুহূর্ত্তের জন্য শিবের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। চাঞ্চল্যের কারণ দেখিবার জন্য শিব চোখ চাহিতেই মদনকে দেখিলেন। অমনি শিবের রোষাগ্নিতে মদন ভস্ম হইয়া গেল। শিব আবার ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। দেবী তখন আরও কঠোর তপস্যায় মন দিলেন। পঞ্চতপা করিয়া তিনি ক্ষীণ ও মলিন হইয়া গেলেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া, মা মেনকার মনে বড় দুঃখ হইল। তিনি বলিলেন,—"উ মা।" (অর্থাৎ আর তপস্যা করিও না।) তাহা হইতেই দেবীর নাম উমা হইল।

দেবীর কঠোর তপস্যায় আশুতোষের মন টলিল। তিনি দর্শন দিয়া দেবীকে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। যথাসময়ে গিরিরাজ শিবের হাতে কালীকে সমর্পণ করিলেন। কালী কৈলাসে গিয়া শিবসঙ্গে মহানন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন। কালীর গায়ের বর্ণ কালো বলিয়া এক দিন মহাদেব তাঁহাকে ঠাট্টা করেন। তাহাতে কালী মহাকৌশী-প্রপাতে গিয়া বহুকাল কঠোর তপস্যা করেন। তপস্যার পর তিনি নিজের অন্তর-বাহির শিবময় দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহের কালো-বর্ণ চলিয়া গিয়া বিদ্যুৎসদৃশ গৌর-বর্ণ হইল। সেই দিন হইতে তাঁহাকে গৌরী বলা হয়। কার্ত্তিক গণেশ ইঁহার পুত্র। ইনি মহিষাসুরকে বধ করেন।

এক দিন রাত্রিতে মহিষাসুর স্বপ্নে দেখিল,—মহামায়া ভদ্রকালী তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া রক্তপান করিতেছেন। ইহাতে মহিষাসুর অত্যন্ত ভয় পাইল। সে তাহার অনুচরবর্গের সহিত দেবীর পূজা করিতে লাগিল। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া দেবী ষোড়শ-ভুজা ভদ্রকালীরূপে তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। দেবীকে প্রণাম করিয়া অসুর বলিল,—"মহা-দেবি, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি,—আপনি আমাকে বধ করিয়া আমার রুধির পান করিতেছেন। তাহাতে বুঝিয়াছি, আপনি সত্যই আমার রক্তপান করিবেন। আমার পিতা আপনার ও মহাদেবের আরাধনা করিয়া আমাকে লাভ করেন। আমি ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, আমি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য নির্ব্বিবাদে ভোগ করিয়াছি। এখন আমার বাঞ্ছনীয় কিছুই নাই। কেবল আপনি আমাকে এই বর প্রদান করুন, নিখিল যজ্ঞে যেন আমি পূজিত হই।" মহাদেবী উত্তর করিলেন,—"যজ্ঞের এমন আর কোনও ভাগ নাই, যাহা আমি তোমাকে দান করিতে পারি। তবে আমার দ্বারা নিহত হইয়াও তুমি আমার পদত্যাগ করিবে না। যেখানে আমার পূজা হইবে, সেখানে তোমারও পূজা হইবে।" তখন মহিষাসুর দেবীকে নমস্কার করিয়া কহিল,—"যজ্ঞে আপনার কোন্ কোন্ মূর্ত্তির সহিত পূজিত হইব?" দেবী বলিলেন,—"উগ্রচণ্ডা, ভদ্রকালী ও দুর্গা, এই তিন মূর্ত্তিতে তুমি সর্ব্বদা আমার পাদলগ্ন হইয়া মনুষ্যদের ও রাক্ষসগণের পূজ্য হইবে।" * * * *

দেবীভাগবতে আছে,—এক কালে দেবগণ মহিষাসুর কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা শিবকে ও দেবতাগণকে সঙ্গে লইয়া বিষ্ণুর কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে বিষ্ণুকে বলিলেন,—"ব্রহ্মার বরে মহিষাসুর পুরুষের অবধ্য হইয়াছে। অথচ দেবগণের মধ্যে এমন রমণীও কেহ দেখা যাইতেছে না, যিনি মহিষাসুরকে বধ করিতে পারেন। মহিষাসুরের অত্যাচার এ দিকে চরমে উঠিয়াছে।" বিষ্ণু সকল কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন,—"যদি সেই অসুরকে বধ করিতে চাও, তাহা হইলে তোমরা আপন আপন শক্তির সহিত মিলিত হইয়া, স্ব স্ব তেজের নিকট প্রার্থনা কর, যেন উৎপন্ন তেজোরাশি সমবেত হইয়া এক নারীরূপে আবির্ভূত হয়। সেই নারীকে আমরা নানা দিব্য অস্ত্রে ভূষিত করিব। তিনিই মহিষাসুরকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন।"

ব্রহ্মার মুখ হইতে রক্তবর্ণ তেজ, শিবের মুখ হইতে শ্বেতবর্ণ তেজ, বিষ্ণুর শরীর হইতে নীলবর্ণ তেজ বাহির হইতে লাগিল। তার পর ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের, যম, অনল এবং অন্যান্য দেবগণের শরীর হইতে তেজ বাহির হইয়া, সেই তেজঃপুঞ্জ হইতে এক অদ্ভুত নারীমূর্ত্তি আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার রূপ ও তেজ দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তাঁহার নাম মহালক্ষ্মী। তাঁহার বাহু অষ্টাদশ। তাঁহার মুখমণ্ডল শ্বেতবর্ণ, নয়ন কৃষ্ণবর্ণ, অধর রক্তবর্ণ, করতল তাম্রবর্ণ। তিনি দিব্যভূষণে ভূষিতা এবং কমনীয় কান্তিধারিণী। তাঁহার সহস্রবাহু হইলেও অসুরগণের বিনাশের নিমিত্ত তিনি অষ্টাদশভুজা।

কাহার তেজ হইতে তাঁহার শরীরের কোন্ কোন্ অঙ্গ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা বিস্তারিতভাবে দেবী-ভাগবতে বর্ণিত আছে। শঙ্করের তেজ হইতে তাঁহার মনোহর শ্বেতবর্ণ মুখমণ্ডল, যমের তেজ হইতে কৃষ্ণবর্ণ আজানুলম্বিত কেশদাম, অগ্নির তেজ হইতে ত্রিনয়ন ইত্যাদি। সেই মহাদেবীকে দেবগণ স্ব স্ব অস্ত্র দান করিয়াছিলেন। বিষ্ণু দিলেন চক্র, শঙ্কর—শূল, অরুণ—শঙ্খ ইত্যাদি। এইরূপে দেবী অস্ত্র-শস্ত্রে ভূষিত হইলেন এবং সিংহের উপর আরোহণ করিয়া অসুরবিনাশে অগ্রসর হইলেন। ঘোর যুদ্ধের পর দেবীর হস্তে মহিষাসুর পরাজিত ও নিহত হইল।

দুর্গার আবির্ভাব সম্বন্ধে কাশীখণ্ডে এইরূপ আছে ;—পুরাকালে রুরুর পুত্র মহাদৈত্য দুর্গ তপস্যার বলে ত্রিলোক জয় করিয়াছিল। সে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, সকলের পদই কাড়িয়া লইল। তাহার ভয়ে ঋষিগণের তপস্যা এবং ব্রাহ্মণের বেদপাঠ বন্ধ হইল। মহা বিপদে পড়িয়া দেবগণ মহেশ্বরের শরণাগত হইলেন। মহেশ্বর দেবীকে পাঠাইলেন। দেবতাগণকে অভয় দিয়া দেবী যুদ্ধে গমন করিলেন। * * * অগণিত সৈন্য লইয়া দুর্গ যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাদেবীর শরীর হইতেও শক্তিগণ আবির্ভূত হইয়া দৈত্য-সেনা ধ্বংস করিতে লাগিলেন। দুর্গ তখন গজ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। দেবী অস্ত্রের দ্বারা তাহার শুণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহিষরূপ ধারণ করিয়া দুর্গ দেবীকে আক্রমণ করিল। ত্রিশূলাঘাতে দেবী তাহাকে ধরাশায়ী করিলেন। তৎক্ষণাৎ দুর্গ সহস্রবাহু পুরুষমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেবীকে আক্রমণ করিল। দেবীও দিব্য অস্ত্রে তাহাকে নিপাত করিলেন। স্বর্গে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। দেবতাগণ দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। দুর্গকে নিধন করিয়া, সেই দিন হইতে দেবী দুর্গা নামে অভিহিত হইলেন।

সপ্তশতী চণ্ডীতে দেবী সম্বন্ধে তিনটি উপাখ্যান আছে। প্রলয়ের কালে জগৎ কারণসাগরে নিমজ্জিত ছিল। সেই সময় ভগবান্ বিষ্ণু অনন্ত-শয্যায় যোগনিদ্রায় শায়িত ছিলেন। বিষ্ণুর নাভিদেশ হইতে একটি পদ্ম উঠিয়াছিল। ব্রহ্মা তাহাতে বসিয়াছিলেন। বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে মধু ও কৈটভ নামে দুইটি অসুর উৎপন্ন হইল। ব্রহ্মা বসিয়া আছেন দেখিয়া তাহারা ব্রহ্মাকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিল। বিষ্ণু তখন যোগমায়ার প্রভাবে নিদ্রামগ্ন। ব্রহ্মা অত্যন্ত ভয় পাইয়া এবং নিরুপায় হইয়া যোগমায়ারূপিণী দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার স্তবে দেবীর কৃপা হইল। তিনি বিষ্ণুকে জাগাইয়া দিলেন। বিষ্ণু মধু ও কৈটভকে বিনাশ করিলেন।

পুরাকালে মহিষাসুর অত্যন্ত প্রতাপশালী হইয়া স্বর্গ-রাজ্য জয় করিয়াছিল। তাহার প্রতাপে দেবতারা স্বর্গ ছাড়িয়া মর্ত্ত্যে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সকল দেবতার তেজ হইতে মহাদেবী আবির্ভূত হইয়া, সকল দেবতাদের অস্ত্র-শস্ত্রে ভূষিত হইয়া মহিষাসুরকে যুদ্ধে নিপাতিত করিয়াছিলেন। সপ্তশতীর এই আখ্যানটি পূর্ব্ববর্ণিত দেবীর মহিষাসুরবধের মত। অবশ্য কোনও কোনও স্থানে ঘটনাভেদ আছে। বাহুল্যভয়ে তাহা বর্ণনা করিলাম না।

তৃতীয় কাহিনীটি শুম্ভ ও নিশুম্ভ-বধের। অতি সংক্ষেপে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি। এক সময়ে শুম্ভ ও নিশুম্ভ মহাপরাক্রান্ত হইয়া ত্রিলোক জয় করিয়াছিল। দেবগণ পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। দেবী তাঁহাদিগকে দর্শন দিয়া অভয় দান করিলেন। তার পর দেবী হিমালয়ে গমন করিলেন। সেখানে শুম্ভের অনুচর চণ্ড ও মুণ্ড তাঁহাকে দর্শন করিয়া শুম্ভের নিকট গিয়া বলিল,—"দৈত্যরাজ, ত্রিলোকে যাহা কিছু ভাল আছে, আপনি সকলেরই অধিকারী। পর্ব্বতে একটি মেয়ে দেখিলাম, এমন সুন্দরী নারী আর কোথাও নাই, আপনি তাহাকে গ্রহণ করুন।" শুম্ভ তাহার দূত সুগ্রীবকে তৎক্ষণাৎ দেবীর নিকট পাঠাইয়া দিল। দূত দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া শুম্ভ ও নিশুম্ভের অনেক গুণগান করিয়া তাহাদের যে কোনও এক জনকে পতিত্বে বরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিল। শুম্ভ ও নিশুম্ভ দুই ভাই। দেবী সুগ্রীবকে রহস্য করিয়া উত্তর দিলেন,—"আমি দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ একটা প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিয়াছি, যে আমাকে সংগ্রামে জয় করিতে পারিবে, সেই আমার স্বামী হইবে।" দূত তাঁহাকে কত বুঝাইল,—ত্রিলোকে কোনও বীরই শুম্ভ-নিশুম্ভকে পরাস্ত করিতে পারিল না; আর দেবী একা স্ত্রীলোক, তিনি কি করিতে পারেন? তিনি যদি নিজে ইচ্ছা করিয়া না যান, তবে তাঁহাকে চুলে ধরিয়া জোর করিয়া

লইয়া যাওয়া হইবে। দেবী গেলেন না। সুতরাং শুম্ভ-নিশুম্ভের সঙ্গে দেবীর যুদ্ধ বাধিল। বহু সৈন্য-পরিবৃত হইয়া দৈত্যসেনাপতি ধূম্রলোচন আসিল। দেবী সমস্ত সৈন্যসহ ধূম্রলোচনকে বধ করিলেন। ধূম্রলোচনের পর আসিল চণ্ড ও মুণ্ড। তাহারাও দেবীর হাতে জীবন দিল। তার পর আসিল রক্তবীজ। ইহাকে লইয়া দেবী একটু বিপদে পড়িলেন। দেবীর আঘাতে রক্তবীজের শরীর হইতে যে রক্তপাত হইতেছিল, সেই রক্ত হইতে সহস্র সহস্র রক্তবীজ আবির্ভূত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। তখন দেবী তাহাদের একটি একটি করিয়া কাটিতে লাগিলেন ও রক্তপান করিতে লাগিলেন। ইহাতে রক্তবীজবংশ বিনষ্ট হইল। দেবী শিবকে দূতরূপে শুম্ভ-নিশুম্ভের, নিকট পাঠাইলেন। যদি অসুরগণ বাঁচিতে চায়, তবে যেন যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইয়া সকলে পাতালে প্রবেশ করে। ইন্দ্র ত্রিলোক-আধিপত্য করুন, দেবগণ তাঁহাদের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করুন। দেবীর কথায় অসুরগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিল। দেবী প্রথম নিশুম্ভকে, তার পর সকল অসুরসহ শুম্ভকে নিপাতিত করিলেন। দেবতারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

সপ্তশতী মতে স্বারোচিষ মন্বন্তরে সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য দেবীর পূজা করেন। দেবীভাগবতের মতে ভারতে সর্ব্বপ্রথম সুরথ রাজাই দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। দেবীভাগবত, মহাভাগবত, কালিকাপুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বর-পুরাণ ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক দেবীর অকালে পূজার কথা বর্ণিত আছে। ইহাই শারদীয়া পূজা। কাহারও মতে রাবণ বসন্তকালে দেবীর পূজা করেন এবং তাহাতেই তাহা বাসন্তী পূজা নামে অভিহিত।

স্বামী প্রেমঘনানন্দ।

আবাহন

উদ্ভাসিয়া বসুন্ধরা আলো তুমি দিকে দিকে আলো
দেখা দাও দেখা দাও হে আলোক, হে আমার আলো।
অন্ধকার আজি অন্ধকার
খোল খোল দ্বার খোল দ্বার
উষার আশিস্ আন' দীপ্ত কর যত দ্বিধা কালো
হে আলোক হে আমার আলো।

তিমির নয়নে মম জ্যোতি তব বুলাইয়া দাও,
আমার ললাটে তব স্পর্শখানি ছুলাইয়া যাও,
সাজাইয়া আলোক সিন্দুরে
ডেকে দাও আমার বন্ধুরে
জ্যোতির্ম্ময় দেখা দাও, এসো শুভ্র এসো নিত্য ভালো
হে আলোক হে আমার আলো।

শ্রীসুবোধ দাশগুপ্ত।



দান-প্রতিদান

[উপন্যাস]



[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

৩৬

পরদিন রত্নপুকুর গ্রাম হইতে কুহুর নামে একখানি চিঠি আসিল। চিঠি লিখিয়াছে কুহুর দিদি সুলোচনা। ভূষণডাঙ্গা হইতে রত্নপুকুর বেশী দূর নহে। সুলোচনা লিখিয়াছে—

"কুহু ছোট বোনটি আমার,

তুই রাজরাণী হইয়া গরীব দিদিকে কি একবারেই ভুলিয়া গিয়াছিস্? মার পত্রে জানিয়াছি, তোরা ভূষণডাঙ্গায় আসিয়াছিস্। আশা করিয়াছিলাম, এতটুকু পথের কষ্ট সহ্য করিয়া, তোরা এক দিন দিদিকে দেখা দিতে আসিবি। কিন্তু সে আশা আমার আশা পর্য্যন্ত। আগে তবু তুই একখানা পত্রে দিদির খোজখবর লইতেছিলি, কাছাকাছি আসিয়া তাহাও বন্ধ। মনে ভাবিয়াছিলাম, আমিও তোরই মত চুপ করিয়া থাকিব, কিন্তু পারিলাম কৈ? তোদের নিকটে আমি নিজেই যাইতাম, হঠাৎ জ্বরে পড়িয়া তাহা হইল না। শরীরটা কিছুতেই ভাল হইতেছে না। দুই এক দিন অন্তরই জ্বর হইতেছে। ডাক্তার বলেন, ম্যালেরিয়া। তোর জামাই বাবুর কাণ্ডকারখানায় পাগল হইয়া উঠিয়াছি। বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে দিবেন না। রাত্রিতে শিয়রে বসিয়া থাকিবেন। এমন বৌ-পাগলা মানুষ পৃথিবীতে দুইটি নাই। ঘরে কেহ নাই বলিয়াই এত বাড়াবাড়ি; থাকিলে চক্ষুলজ্জাতেও বাধিত।

তোর পত্রেই জয়ন্তকে অনুরোধ করিতেছি, তোরা দুটিতে এক দিন অবশ্য অবশ্য আসিবি। বড়ই দেখিতে ইচ্ছা হয়। দিদির অনুরোধ রাখিস। অসিত ভাল আছে। তোরা কেমন আছিস? পত্রোত্তরের পরিবর্ত্তে তোদের সশরীরে দেখিতে চাই।"

চিঠিখানা পড়া শেষ করিয়া কুহু অক্ষরগুলির পানে তাকাইয়া রহিল। সত্যই সে সকলকে ভুলিয়াছে, কিন্তু রাজরাণী হইয়া নহে। সে কারণে তাহার অস্তিত্ব সকলের মন হইতে সে মুছিয়া ফেলিতে ব্যগ্র, তাহা কাহারও নিকটে ব্যক্ত করিবার নহে। কিন্তু ভুলিতে চাহিলেই কি সহজে ভোলা যায়? যেমনই দিদির আহ্বান আসিল, অমনই তাহার উন্মুখ হৃদয়-মন দিদির অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। দিদির সুন্দর হাসিভরা মুখ নেত্রপথে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। বাল্যের ও কৈশোরের কত তুচ্ছ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনী হৃদয়দ্বারে আঘাত করিয়া তাহাকে উন্মনা করিয়া তুলিতেছে। এ রাজ-ঐশ্বর্য্য স্বর্ণ-মুকুট ধূলায় ফেলিয়া দিয়া সেই সহজ অনাবিল আনন্দের রাজ্যে একবারও কি ফিরিয়া যাওয়া যায় না? এ জীবন জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের ন্যায় দূরে পরিহার করিয়া সেই শান্তজীবন কত আনন্দের!

দিদির অসুখ, তিনি ডাকিয়াছেন, কুহু না যাইয়া পারে না। তাহাকে যাইতেই হইবে। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে স্বামীর অনুমতি লওয়া প্রয়োজন। স্বামিসম্ভাষণের সম্ভাবনায় কুহু সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। কিন্তু না যাইয়া পারিল না।

জয়ন্ত কি জানি কিসের প্রয়োজনে নিজের ঘরে আসিয়াছিল। কুহু স্বামীর পশ্চাতে উপনীত হইয়া আস্তে আস্তে কহিল, "তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা ছিল, আমাকে

একবার রত্নপুকুরে যেতে হবে। দিদির অসুখ, তিনি আমাদের দুজনকেই একটিবার যেতে লিখেছেন। এই তাঁর চিঠি প'ড়ে দেখ।"

জয়ন্ত চিঠিও লইল না, মুখও তুলিল না। খোলা আলমারীর ভিতর কি যেন খুঁজিতে খুঁজিতে প্রত্যুত্তর করিল, "যেতে ইচ্ছা হয়, কাকাকে ব'লে যাবার বন্দোবস্ত ক'রে নাও। আমি যেতে পারব না। আমার সময় হবে না।"

একটা কঠিন উত্তর কুহুর কণ্ঠ অবধি ঠেলিয়া উঠিলেও সে তাহা বাহির হইতে দিল না; নিজেকে জোর করিয়া সেইখানেই ধরিয়া রাখিল। জয়ন্ত তখনই আলমারী বন্ধ করিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

কুহুর কিন্তু বাহিরে আসিতে সময় লাগিল। স্বামীর প্রতি সে শ্রদ্ধা-ভক্তি হারাইলেও তাহাকে অন্তরের বাহির করিতে পারে নাই। কুহুর বিক্ষিপ্ত হৃদয় তাহার অজ্ঞাতসারে ভিতরে ভিতরে সন্ধির আশা করিতেছিল; কোন একটা ছল-ছুতা খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। মর্ম্মান্তিক দুঃখের মধ্যেও জয়ন্তর ভাল হইবার, সৎ হইবার আশাটুকু কুহু পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। অভিমানে বিতৃষ্ণায় সরিয়া থাকিলেও হৃদয় তাহার সরিয়া থাকিতে প্রস্তুত ছিল না। অবাধ্য মনের এ হীন আচরণ কুহু ভালরূপে জানিতেও পারে নাই।

হঠাৎ উপরদিকে মুখ তুলিতেই তাহার নেত্রপথে পড়িল আলমারীর ডালার স্ফটিকস্বচ্ছ বৃহৎ দর্পণ। তাহার নিত্য-নিয়মিত কেশ-বেশের পরিবর্ত্তনটুকু লক্ষ্য করিয়া সে যেন মরমে মরিয়া গেল। প্রতিদিনের মত তাহার বিশেষ ভঙ্গীতে চুল বাঁধিবার, শাড়ী পরিবার ভিতর আজ একটু বিশেষত্ব যেন ছিল। ইহা কি এক জনকে দেখাইবার, মুগ্ধ করিবার স্পৃহা নহে? নারী-চরিত্রের এ রহস্যময় ছলনাটুকু মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া কুহুর লজ্জার অবধি রহিল না। সে তখনই নীচে নামিয়া দেওয়ানকে ডাকিয়া রত্নপুকুরে যাইবার প্রস্তাব করিয়া বসিল।

বৃদ্ধ দেওয়ান এই বধূটিকে নিরতিশয় স্নেহ করিতেন। নানা লোকের সংসর্গে আসিয়া তাঁহার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট হইয়াছিল; লোক চিনিবার শক্তিও জন্মিয়াছিল। জয়ন্তর ধাপে ধাপে নামিবার ব্যাপার তাঁহার অগোচর ছিল না। তিনি কি করিবেন? শাসন করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই তিনি এ সংসারের যতই উন্নতি কামনা করুন, মঙ্গল কামনা করুন, তথাপি বেতনভোগী ভৃত্য!

সে কালে কর্ত্তার আমলে প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ মধুর ছিল, অনুযোগ-অভিযোগ অক্লেশে চলিতে পারিত। প্রভুর নিকটে ভৃত্যের দাবী ছিল, মান ছিল, অধিকার ছিল। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনে সে যুগ উল্টাইয়া গিয়াছে। যে শিশুকে বুকে করিয়া লালন-পালন করিয়া বড় করা হইয়াছে, তাহাকেও কিছু বলা চলে না। তিনি নীরবে জ্যোতির্ম্ময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। জ্যোতির্ম্ময়কে সম্মুখে রাখিয়া এ অনাচার বন্ধ করিবার সংকল্প করিতেছিলেন। যে স্থলে অন্যায়ের প্রতীকার করিবার উপায় থাকে না, যাহার প্রতি অন্যায় হইতেছে, সাধারণতঃ সেই দিকেই চিত্ত নিতান্ত কোমল হইয়া থাকে।

কুহু দেওয়ানকে ডাকিয়া রত্নপুকুরে যাইবার অনুমতি চাহিতেই বৃদ্ধ স্নেহে করুণায় দ্রবীভূত হইয়া বলিলেন, "দিদির অসুখ, যেতে ইচ্ছে হয়েছে, যাবে বৈ কি, মা? সে কালে এ বাড়ীর মেয়েদের বাড়ীর বার হবার প্রথা ছিল না। বৌ-ঠাকরুণের অনুরোধে দাদা সে প্রথা ভাঙ্গতে বাধ্য হয়েছিলেন। এখন সে সব কিছু নেই। তা তুমি কবে যেতে চাও বল, সেই ব্যবস্থা করছি?"

কুহু নম্রস্বরে বলিল, "আপনি যে দিন পাঠাবেন, কাকা, আমি সেই দিনই যাব।"

"আমি যে দিন পাঠাব, তুমি সেই দিনই যাবে? এদিকে যে তোমার মন ছুটে যেতে ছটফট করছে, তা আমি বুঝতে পারছি। আজ ত যাওয়া হ'তে পারে না; কাল তোমাকে পাঠিয়ে দেব।"

কুহু প্রীত হইয়া বলিল, "আমার যাওয়া নিয়ে বাদল হয় ত গোলমাল করবে। হিরণদা চ'লে যাবার পর ওকে কেউ বেড়াতে নিয়ে যায় না ব'লে একেই ওর মন খারাপ, তারপর আমি যাব শুনলে রাগ করবে। ছেলেমানুষ, একলা থাকতেও কষ্ট হবে।"

"কষ্ট কিসের? ওকে আমি ঠিক ক'রে নেব, মা। তোমার চিন্তা নেই। তুমি না আসা অবধি ছোট তরফের বৌ-ঠাকরুণের কাছে ওকে রেখে দেব। রোজ দু'বেলা আমি ওকে সাথে ক'রে বেড়িয়ে আনবো, এতে বাদলার

আপত্তি হবে না। তা তুমি কদিন সেখানে থাকতে চাও, মা? কুটুম-বাড়ীতে বেশী দিন থাকা ভাল নয়।"

কুহু কহিল, "বেশী দিন থাকবো না, কাকা। দিদির অসুখ, যেয়েই ত আসা চলবে না? দু'এক দিন তাঁর কাছে থাকতে হবে। আপনি যে দিন আমায় আনতে পাঠাবেন, আমি সেই দিনই আসবো। কাল কখন্ আমাকে যেতে হবে?"

দেওয়ান কহিলেন, "সকাল সকাল দুটো খেয়ে নিয়েই বেরুবে, দশ মাইল রাস্তা, সকালে রওনা হলেও দুপুর হয়ে যাবে। সে সময় কি না খেয়ে কারুর বাড়ী যাওয়া চলে? রাস্তা ভাল নয়, তোমাকে পাল্কীতেই যেতে হবে। তোমার সঙ্গে যাবে নিস্তার, আর তেওয়ারী। পাল্কী-বেহারা বাড়ীতেই রয়েছে। নিস্তারের জন্যে একটা গোরুর গাড়ী ঠিক করতে হবে। অতটা রাস্তা হেঁটে যেতে পারবে না। যে ক'দিন তুমি দিদির কাছে থাকবে, সে ক'দিন নিস্তার ওর নিজের বাড়ী যেয়ে থাকবে। রক্তপুকুরের কাছেই নিস্তারদের গাঁ, ও কদিনের ছুটীও চেয়েছিল। এই সুযোগে সেটা হয়ে যাবে। আবার যে দিন তুমি ফিরবে, সে দিন নিস্তার তোমার সঙ্গেই আসবে। আগে তুমি সেখানে যাও মা, তার পর দিদি কি বলেন, কোন্ দিন আসতে পারবে, ঠিক ক'রে তেওয়ারীকে ব'লে দিও। আমি আনতে পাঠাব।"

দেওয়ানের সুব্যবস্থায় কুহু আনন্দিত হইল। বাসনা নিত্য দুই বেলা কাকার সহিত নৌকায় বেড়াইতে পাইবে জানিয়া কুহুর যাওয়া লইয়া বিশেষ আপত্তি করিল না।

হঠাৎ চলিয়া যাওয়ার ব্যাপারে ক্ষুব্ধ ও ম্রিয়মাণ হইল মাধুরী। কুহুর নিকটে না আসিলে তাহার একটি দিনও এখন কাটিতে চাহিত না। কেবল মাধুরীরই আসা নহে, তাহার ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো যখন তখন ছড়াইয়া পড়িত। সে আলোটুকু অন্তর্হিত হইলে কি লইয়া মাধুরীর দিন কাটিবে?

পরদিন বিদায়কালে কলার পাতায় জড়ানো কয়েকটা পাণের খিলি কুহুর হাতে গুঁজিয়া দিয়া মাধুরী কহিল, "দুপুরে রোদে বেরুলে, দিদি, পিপাসা পেলে পাণ ক'টা খেও। আর শীগ্‌গির ফিরে এস; দিদিকে পেয়ে বোনটিকে ভুলে থেকো না। মনে রেখো। আমি নিত্যি তোমার পথের পানে চেয়ে থাকবো।"

কুহু তাহার হাত দুইটি চাপিয়া ধরিয়া মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মনে পড়িল—ক্ষীরপুর হইতে সেই বিদায়-মুহূর্ত। যার অশ্রুসিক্ত ম্লান মুখচ্ছবি; সে মুখের সাদৃশ্য এ মুখেও মেলে। সেই স্নেহভারাকুল মমতাময় হৃদয় ঐ হৃদয়ের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে। নারীপ্রকৃতি সবই কি এক?

৩৭

কুহুদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইল। নদী-বিবর্জ্জিত গ্রামের চতুর্দ্দিকে অনেক পুষ্করিণী থাকায় গ্রামের নাম বোধ হয় রক্তপুকুর হইয়াছিল। গ্রামের দক্ষিণে সুবৃহৎ মাণিকদহের বিল, বিলের অনতিদূরে স্কুলবাড়ী। সারি সারি কয়েকটি টীনের ঘর, চারিদিকে বাঁধানো একটি ইন্দারা। তাহারই সন্নিকটে তিমিরবরণের ক্ষুদ্র গৃহ। খড়ে ছাওয়া বাহিরের বসিবার ঘর, অন্দরে দুইটি শয়ন-কুটীর। একটি রন্ধনের চালা। বাড়ীখানি রাংচিতার বেড়ায় ঘেরা। বেড়ার গায়ে ঝুমকা-লতায় ফুল ফুটিয়াছে। আম, জাম, কাঁটাল বৃক্ষে বাড়ীটি ছায়াময়। দূর হইতে তপোবন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কোথাও নেড়া খেজুরগাছে হাঁড়ি বাঁধা, কোথাও বা সজনেডালে অসংখ্য ডাঁটা ঝুলিতেছে। প্রাঙ্গণের এক দিকে শাকক্ষেত্র, মটরফুলের বিচিত্র বাহার খুলিয়াছে। দুই একটা গাঁদা গাছ আপাদমস্তক পুষ্প-সজ্জায় সাজিয়া বাতাসে আন্দোলিত হইতেছে।

সে দিনটা ছুটীর দিন ছিল, তিমিরবরণ বাড়ীতেই ছিলেন। তিনিই প্রথমে কুহুকে অভ্যর্থনা করিলেন,—"এস, এস, মহারাণি, গরীবের কুঁড়েয় লক্ষ্মীর পায়ের চিহ্ন পড়ুক।"

আনন্দোজ্জ্বল-মুখে সুলোচনা ছুটিয়া আসিয়া কুহুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "কুহু, এসেছিস, কার সঙ্গে এলি? জয়ন্ত আসেনি?"

কুহু নিরুত্তরে রহিল। তিমিরবরণ উত্তর দিলেন, "জয়ন্ত লুকিয়ে রাখবার জিনিস নয় গো, এলে দেখ্‌তেই পেতে? তুমি মুহুর্মুহুঃ কুহু কুহু ক'রে উতলা হয়েছিলে, এখন জয়ন্তর জন্যে উহু উহু না ক'রে যা পেলে, সেইটিকে নিয়েই সন্তুষ্ট হও; বেশী লোভ ভাল নয়, জানো না, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।"

সুলোচনা ম্লান হইয়া কহিল, "আমার যে দুজনকে এক-সঙ্গে দেখ্‌তে সাধ হয়েছিল। সেই বিয়ের দিন একটুখানি

দেখেছিলাম, আর দেখি নি। হ্যাঁ রে কুহু, জয়ন্ত ভূষণ-ডাঙ্গাতেই আছে ত? তার শরীর ভাল আছে? নিজে এলো না, তবু তোকে যে পাঠিয়েছে, এই আমার ভাগ্যি। তোকে কার সাথে পাঠিয়েছে রে?”

কুহু নত-নেত্রে উত্তর দিল, “আমার সঙ্গে তেওয়ারী আর ঝি এসেছে, ওরা এখুনি ফিরে যাবে। ওদের কাছে ব’লে দিতে হবে, কবে আবার পাল্কী আসবে। তুমি এখন কেমন আছ দিদি? অসিতকে দেখছি না কেন?”

দিদি বলিলেন, “মূর্ত্তিমান এখানেই ত ছিল, ঐ যে ধূলো মেখে ভুত হয়ে আসছেন। আমি ভালই আছি। ক’দিন জ্বর হয় না। কত কাল পর তোকে দেখলাম কুহু; মাটীতে পা না দিয়েই যাবার কথা? আমাদের জোরের কিছু নেই, আজ রবিবার গেল, আসছে রবিবারে যদি তোকে পাঠাই, তাতে জয়ন্ত রাগ করবে না ত? সে তোকে কোন্ দিন ফিরতে বলেছে, কুহু?”

এ প্রশ্নের নিমিত্ত কুহু প্রস্তত হইয়াই ছিল। চুপে চুপে বলিল, “তা কিছু বলেন নি, দিদি।”

তিমিরবরণ পরিহাস করিয়া কহিলেন, “ফেরার দিন জয়ন্ত ঠিক করবে কি ক’রে? সে কি জানে না, কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম। তোমাদের মত রত্ন যে ভাগ্যবানদের করতল-গত হয়েছে, তারা সেই দিন থেকে নিজেদের মতামত বানের জলে ভাসিয়ে দিয়েছে।”

সুলোচনা তিমিরবরণকে একটি কটাক্ষের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া জবাব করিল, “তা নয় ত কি? আপনা জাহিরের আর দরকার নেই। তবু জয়ন্তকে ভাল বলতে হয়, নিজে না এসেও কুহুকে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমরা যে ক’দিন রেখে খুসী হব, তাতেও আপত্তি করেনি। আর তুমি কি করেছ—”

তিমিরবরণ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, “কায কি ও সব আলোচনায়? জয়ন্ত রাজা, তার অনেক রাজ-ঐশ্বর্য্য আছে। আমি গরীব, একটি বৈ জানি না; কাযেই হারানোর ভয় রাখি। তুমি সকলকে ডেকে এনে ভেতরে বসাও। আমি তিনু ময়রার দোকান থেকে সের কত রসগোল্লা আনি। ওদের জল খাইয়ে দিতে হবে।” বলিতে বলিতে তিমিরবরণ বাহির হইয়া গেলেন।

কুহু অসিতকে কোলে লইয়া তাহার সহিত নূতন করিয়া পরিচয় করিতে লাগিল।

জলযোগ করাইয়া, সকলকে বিদায় দিয়া, সুলোচনা কুহুকে লইয়া বসিল। আপনার অসুখের কথা, দিবাকরের গল্প শেষ হইবার পর সুলোচনা জয়ন্তর কথা পাড়িল। এই স্থানেই কুহুর ভয় ছিল। সে স্বামী সম্বন্ধে দিদিকে কি বলিবে? বলিবার আছে কি? যে অব্যক্ত যন্ত্রণা তাহার বুক গুমরিয়া গুমরিয়া সমস্ত হৃদয়-মন বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে, তাহা যে কাহারও নিকটে বলিবার নহে! দিদি পর নহে, তাহাকে বলিতে পারিলে কুহুর মন হয় ত হাল্কা হইতে পারিত; কিন্তু বলিয়া লাভ কি? সে ভাল আছে, সুখে আছে জানিয়া যাহারা পরিতৃপ্ত, তাহাদের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া কি হইবে? কেবলই ব্যথা দেওয়া, কুহু কাহাকেও ব্যথা দিতে চাহে না, তাহার ভাগ্য-বিধাতা তাহাকে ব্যথা দিতেছেন, সে একাই তাহা সহিবে। কিন্তু মিথ্যাই বা বলিবে কিরূপে?

ভগিনীর ছাড়া ছাড়া “হাঁ না” উত্তরে সুলোচনা তেমন সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। সুলোচনা অবাক্ হইয়া কুহুর পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে লাগিল। বাল্যকাল হইতেই কুহু ধীর, শান্ত; কিন্তু এমন গম্ভীর ছিল না। জয়ন্ত হয় ত গম্ভীর-প্রকৃতি, তাহারই কাছে থাকিতে থাকিতে কুহুও ধীরে ধীরে গম্ভীর হইয়া যাইতেছে।

সুলোচনা বেশী লোকের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পায় নাই। বাল্যে পিতা, মাতা, ভ্রাতার স্নেহ-আদরে বর্দ্ধিত হইয়া বিবাহের পর স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছিল। সংসারে তিমিরবরণের আপনার জন কেহই ছিল না। থাকিবার মধ্যে ছিল তাহার নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল চরিত্র। পত্নীর প্রতি প্রগাঢ় একনিষ্ঠ প্রেম, সেই প্রেমশিখা দরিদ্র কুটীরের সমস্ত দীনতা বিদূরিত করিয়া সুলোচনাকে দীপ্ত-জ্যোতির্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিল।

মানুষের এক দিকের সহিতই সুলোচনার নিবিড় পরিচয়. দেবত্বের অপর অংশে যে দানব থাকিতে পারে, সুলোচনার সেটা ধারণার বাহিরে। তাহার পিতা, ভ্রাতা, স্বামীর পুণ্য-পূত চরিত্রের উপাদানেই যেন সমগ্র পুরুষজাতি গঠিত। শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সমাজে হীন অসংযমী লোক যে থাকিতে পারে, সুলোচনা তাহা বিশ্বাস করিত না। তাই সে কুহুর গোপন বেদনাসূত্র ধরি ধরি করিয়াও ধরিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “জয়ন্তর কথা ভাল ক’রে বলছিস না কেন?

আমার কাছেও লজ্জা? তোদের দুটিকে একসাথে দেখিনি বলেই আমার বেশী বেশী জানতে ইচ্ছে হয়।"

কুহুর এ সমস্যার উত্তর তিমিরবরণই দিলেন। তিনি কোথা হইতে ঘুরিয়া আসিয়া দুই ভগিনীর অধিকৃত মাদুরের এক প্রান্ত অধিকার করিয়া বলিলেন, "জয়ন্তর সব খবর জানতে চাওয়া তোমার স্বাভাবিক, কারণ, মিলিয়ে দেখতে হবে কি না? তা জেনে লাভ নেই, জিৎ কুহুরই হয়েছে। কুহু রাজরাণী, তুমি মেথরাণী। বদলিয়ে নেবার সুযোগ নেই, কেবলই মনের কষ্ট।"

সুলোচনা ভ্রূভঙ্গে স্বামীকে শাসন করিয়া কৃত্রিম কলহের স্বরে উত্তর করিল, "তোমায় কে জিজ্ঞেস করছে? উনি মধ্যস্থ হয়ে ফোড়ন দিতে এলেন! দিন দিন বয়েস কমছে না বাড়ছে? রাতদিন ঠাট্টা। আমি আসলে মেথরাণী নই, তবে মেথরের হাতে প'ড়ে হ'তে হয়েছে। হিন্দুর মেয়ে কোন কালে স্বামী বদলিয়ে নেয় না, তোমার আক্ষেপ থাক্‌লে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পার। আমার সর্ত্ত আমি এই দণ্ডে ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছি।"

তিমিরবরণ গম্ভীরভাবে মাথা দুলাইয়া জবাব দিলেন, "না, সেটা আর এখন হয় না, দেরী হয়ে গেছে। আমি এখন অনেকখানি ক্ষয় হয়ে গেছি, এ মেকি মালের আর কাণাকড়িও দাম নেই। কেউ নেবে না, নেবার লোকও তৈরী হয়নি। কি বল কুহু, বিকানোর সময় আর আমার নেই;—সর্ত্ত ত্যাগ করলেও না, সর্ত্ত রাখলেও না।"

কুহু প্রত্যুত্তরস্বরূপ একটুখানি সুমিষ্ট হাসি হাসিল মাত্র। ফলতঃ ইঁহাদের কৃত্রিম কলহ, সরল পরিহাস কুহুর নিকটে এক নূতন রাজ্যের বার্ত্তা প্রচার করিতেছিল। কুহু পূর্ব্বে তিমিরবরণকে অনেকবার দেখিয়াছে, তাঁহার শিশুর ন্যায় সরল চপল প্রকৃতিটিকেও বিলক্ষণরূপে জানে, তবু যেন উঁহার সহিত কুহুর আজ নূতন পরিচয় হইল। এ মানুষটি কেবল নিজেই হাসিতে জানে না। উঁহার হাসির আলো চতুর্দ্দিকে ঠিকরাইয়া পড়ে। তাহারই আভায় সুলোচনার বদনমণ্ডল সমুজ্জ্বল। চিত্তের প্রসন্নতায় ইঁহাদের অভাব অনাটন শান্তিময় আনন্দময় হইয়া উঠিয়াছে।

উভয়ের তুচ্ছ কলহ-বাদানুবাদের মধ্য দিয়া সন্ধ্যার তিমিরতা দিকে দিকে আচ্ছন্ন করিল। খেলা ভুলিয়া অসিত মায়ের কোলে আশ্রয় লইল। তিমিরবরণ ক্ষিপ্র হস্তে সন্ধ্যা-বাতি জ্বালাইয়া দড়ির আলনা হইতে একখানি মোটা খদ্দরের চাদর আনিয়া সুলোচনার গায়ে ঢাকিয়া দিতে দিতে কহিলেন, "তুমি অসিতকে নিয়ে এইবার লেপের তলায় যাও দেখি। উত্তরের হাওয়া বইছে, ঠাণ্ডা পড়েছে খুব। যে শরীরের অবস্থা, ঠাণ্ডা লাগলে আর রক্ষা নাই। কুহু তোমার কাছে বোসে গল্প করুক, আমি রান্না চড়াচ্ছি। এ বেলা কি রান্না হবে, বল না গো?"

অসিতকে দোলাইতে দোলাইতে সুলোচনা বলিল, "যা রাঁধতে হয়, আমিই রাঁধবো। তোমার এ বেলা হেঁসেলে ঢুকতে হবে না। কোন্ কালে একটু জ্বর হয়েছিল, এখন সেরে গেছে, তবু এই ছুতোয় দু-সন্ধ্যা হাঁড়ি ঠেলা।"

"সেরে গেছে কোথায়? শরীর তোমার এখনও সারেনি, মোটে তিন দিন ভাত খেয়েছ। এখুনি তোমায় আমি আগুনের তাতে যেতে দেব না। আমাদের রান্নার নামে তোমরা এত আঁতকে ওঠো কেন বল ত? আজ তোমার ঘরে আমি নতুন রাঁধুনী নই। পুরাকালে বড় বড় বীরদেরও ঐটি শিখতে হ'ত। জান না, নলরাজার রান্না খেয়ে দময়ন্তী তাঁকে চিনতে পেরেছিল? তোমাদের দ্রৌপদীর রান্নার এত নাম কার দৌলতে? ভীমের দৌলতে, ভীম না শেখালে দ্রৌপদী আবার রাঁধুনী?"

কুহু কহিল, "আজ ভীম দ্রৌপদী দুজনাই থাকুন, আমিই এ বেলা রাঁধবো। অসিকে ঘুম পাড়িয়ে দিদি একটিবার রান্নাঘরে যেয়ে আমায় দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে।"

তিমিরবরণ সত্রাসে বলিয়া উঠিলেন, "সর্ব্বনাশ, এ কি শুনি আজ সখী মন্থরার মুখে? রাজরাণী যাবেন রন্ধন-শালায়? এ খবর পেলে জয়ন্ত আমার গর্দ্দানা নেবে। না কুহু, আর যা কর, অবশেষে গরীবের শিরশ্ছেদ ক'রে তোমার দিদিকে বিধবা করো না।"

সুলোচনা গর্জ্জিয়া উঠিল, "সন্ধ্যেবেলা যা তা বকো না, বারণ করছি। কথার ছিরি শুনে গা জ্বালা করে।"

কুহু উঁহাদের বাদানুবাদে যোগ না দিয়া কহিল, "আমি কি এখন আপনাদের এতই পর হয়ে গেছি, জামাই বাবু? দুটো রান্না ক'রে দেবারও অধিকার নেই? এসেছি অবধি এক কথাই একশবার শোনাচ্ছেন। আমাকে রাজরাণী না ভেবে আপনাদের কুহু ভাবতে কি খুব অসুবিধা হচ্ছে?

রাণী শব্দটার উপর আমার ঘেন্না ধ'রে গেছে, শুনতে ইচ্ছে হয় না, ভাল লাগে না।"

তিমিরবরণ অপ্রস্তুত হইলেন। তাঁহার স্বচ্ছ সরল পরিহাসে কেহ যে আঘাত পাইতে পারে, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। যাহাদের রাজার ঐশ্বর্য্য, রাণীর সম্পদ, তাহারা যে রাণী বলিলে দুঃখিত হয়, মুখ ম্লান করে, এটা তাঁহার জানা ছিল না। কিন্তু কেন এই মেয়েটির রাণীত্বের উপর এত অবজ্ঞা, রাণী বলিলে কেন ইহার আয়ত চক্ষু অশ্রুভারে ছলছল করে, তাহা তিনি ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম না করিতে পারিয়া কুহুর মাথায় হাত দিয়া সস্নেহে বলিলেন, "তুই যে আমাদের সেই কুহু, তা কি আমরা জানি না, দিদি? তোর যতই টাকাকড়ি থাকুক্ না কেন, তুই রাজরাণী কেন, সাম্রাজ্ঞী হোস্ না কেন, তবু তোকে আমরা আমাদের সেই ছোট্ট কুহু ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারবো না। তবে একটু আবোল-তাবোল বকা—ওটা আমার বদ্ অভ্যাস দিদি, ওতে কেউ কোন দিন রাগ করেনি, তুইও করিস্‌নে। বুড়ো বয়েসে এ স্বভাব আর বদ্‌লাবে না। লোকে কথায় বলে, 'স্বভাব যায় না ম'লে আর ইল্লং যায় না ধুলে।' আমারও তাই হয়েছে। চিরটা কাল একভাবেই কাটলো, আর উন্নতির আশা নেই। হ্যাঁ, আমার এতখানি বয়েসে বার দুই মোটে স্কন্ধে পেঁচা ভর করেছিলেন। একবার যখন বাবা মা পরামর্শ ক'রে দুই দিন আগে পিছে কলেরায় মারা পড়্‌লেন, সেই সময় আমি দিনরাত খুব গম্ভীর হয়ে ছিলাম। আর একবার অল্প একটু হয়েছিলাম বি এ পরীক্ষার ফল বেরুলে—মাত্র এক নম্বরের জন্ত সেকেণ্ড ক্লাশ পেয়ে একটু দুঃখ হয়েছিল, তবে তা বেশী দিন থাকেনি। তখনই লক্ষ্মী এলেন, এসেই সকলের আগে তাঁর বাহন পেঁচাটিকে তাড়িয়ে দিলেন। কই, এর ভেতর আর কোন দিন ত আমায় 'গম্ভীরা' রোগ ধরেনি।"

সুলোচনা টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল এবং কুহুও না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী।

ভ্রমর

হায় রে আকুল মন ভ্রমরা,
আর মধুর লোভে হ'সনে হত,
দিনে দিনে এগুচ্ছে দিন
শেষের দিন যে সমাগত।
গুঞ্জরিয়া বুলে বুলে
মধুর লোভে ফুলে ফুলে
সব হারালি লাভে মূলে,—
ওরে পাগল ও জ্ঞান-হত,
পরিপূর্ণ মধু-থালি
নিত্য নব রূপের ডালি
মৃণাল, চাঁপা, শিউলি, বকুল
কদম, কেতক, মনের মত;

অপরাজিতা মায়াবিনী—
এগিয়ে, নীলের রাজরাথোনি
নীলে-নীলে সকল নিলে,
বল্‌তে তোমার নাই কিছু ত;
গুন্‌গুনানির জাল বুনিয়ে
বেড়াস ফুলের মন ভুলিয়ে
আপনারে যা'স ভুলিয়ে
বধুর হাসি মধুর এত।
সম্মুখে তোর রূপের ধাঁধা,
চোখ দুটো তাও নয়ক আঁধা,
ঐ আস্‌ছে ঘেরে নিশার আঁধার
তবু, হয় না চেতন ক্ষেপা সে ত।

অপ্রকাশিত কবিতা]

স্বর্গীয়া গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী



বিষকন্যা

[বড় গল্প]

যে কালের উপর চিরবিস্মরণের পর্দ্দা পড়িয়া গিয়াছে, সে কালে মিলনোৎকণ্ঠিতা নবযৌবনা নাগরী যখন সন্ধ্যাসমাগমে ভবনশীর্ষে উঠিয়া কেশপ্রসাধনে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন তাঁহার স্বর্ণমুকুরে যে উৎফুল্ল উৎসুকস্মিত-সলজ্জ মুখের প্রতিবিম্ব পড়িত, তাহা এ কালেও আমরা সহজে অনুমান করিতে পারি। চিরন্তনী নারীর ঐ মূর্ত্তিটিই শুধু শাশ্বত—যুগে যুগান্তরে অচপল হইয়া আছে। কেবলমাত্র ঐ নিদর্শন দ্বারাই তাঁহাকে সেই নারী বলিয়া চিনিয়া লইতে পারি।

কিন্তু অন্য বিষয়ে—?

সে যাক। প্রসাধনরতা সুন্দরীর দ্রুত অধীর হস্তে গজদন্ত-কঙ্কতিকা কেশ কর্ষণ করিয়া চলিতে থাকে। ক্রমে দুটি একটি উন্মূলিত কেশ কঙ্কতিকায় জড়াইয়া যায়।—প্রসাধনশেষে সুন্দরী কঙ্কতিকা হইতে বিচ্ছিন্ন কেশগুচ্ছ মুক্ত করিয়া অন্যমনে দুই চম্পক-অঙ্গুলীর দ্বারা গ্রন্থি পাকাইয়া দূরে নিক্ষেপ করেন। ক্ষুদ্র কেশগ্রন্থি অবহেলায় লক্ষ্যহীন বায়ুভরে উড়িয়া কোন্ বিস্মৃতির উপকূলে বিলীন হইয়া যায়, কে তাহার সন্ধান রাখে?

তেমনই, বহু বহু শতাব্দী পূর্ব্বে একদা কয়েকটি মানুষের জীবন-সূত্র যে ভাবে গ্রন্থি পাকাইয়া গিয়াছিল, ইতিহাস তাহার সন্ধান রাখে না। মহাকালভুজঙ্গের যে বক্রচিহ্ন এক দিন ধরিত্রীর উপর অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে। মৃন্ময়ী চিরনবীনা, বৃদ্ধ অতীতের ভোগ-লাঞ্ছন সে চিরদিন বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিতে ভালবাসে না। নিত্য নব নব নাগরের গৃহে তাহার অভিসার। হায় বহুভর্তৃকা, তোমার প্রেম এত চপল বলিয়াই কি তুমি চিরযৌবনময়ী?

দুই সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল হইল, যে কয়টি স্বল্পায়ু নর-নারীর জীবনসূত্র সুন্দরীর কুটিল কেশকুণ্ডলীর মত জড়াইয়া গিয়াছিল, তাহাদের কাহিনী লিখিতে বসিয়াছি। লিখিতে বসিয়া একটা বড় বিস্ময় জাগিতেছে। জন্মজন্মান্তরের জীবন ত আমার নখদর্পণে, সহস্র জন্মের ব্যথা-বেদনা আনন্দের ইতিহাস ত এই জাতিস্মরের মস্তিষ্কের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, তবু যতই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমার বিগত জীবনের আলোচনা করি না কেন, দেখিতে পাই, কোনও না কোনও নারীকে কেন্দ্র করিয়া আমার জীবন আবর্ত্তিত হইয়াছে; জীবনে যখনই কোনও বৃহৎ ঘটনা ঘটিয়াছে, তখনই তাহা এক নারীর জীবনের সঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছে। নারীদ্বেষক হইয়া জন্মিয়াছি, কিন্তু তবু নারীকে এড়াইতে পারি নাই। বিস্ময়ের সহিত মনে প্রশ্ন জাগিতেছে—পৃথিবীর শত কোটি মানুষের জীবন কি আমারই মত? ইহাই কি জীবনের অমোঘ অলঙ্ঘনীয় রীতি? কিম্বা—আমি একটা সৃষ্টিছাড়া ব্যতিক্রম?

* * * *

ন্যূনাধিক চব্বিশ শতাব্দী পূর্ব্বের কথা। বুদ্ধ তথাগত প্রায় শতাধিক বর্ষ হইল নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। উত্তর-ভারতে চারিটি রাজ্য;—কাশী, কোশল, লিচ্ছবি ও মগধ। চারিটি রাজ্যের মধ্যে বংশানুক্রমে অহি-নকুলের সম্বন্ধ স্থায়িভাব ধারণ করিয়াছে। পাটলিপুত্রের সিংহাসনে শিশুনাগবংশীয় এক অশ্রুতকীর্ত্তি রাজা অধিরূঢ়।

শিশুনাগবংশের ইতিকথা পুরাণে আদ্যন্ত ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ হইতে পায় নাই, অজাতশত্রুর পর হইতে কেমন যেন এলোমেলো হইয়া গিয়াছে। তাহার কারণ, অমিতবিক্রম অজাতশত্রুর পর হইতে মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত মগধে একপ্রকার রাষ্ট্রীয় বিপ্লব চলিয়াছিল।

পিতাকে হত্যা করিয়া রাজ্য অধিকার করা শিশুনাগ-রাজবংশের একটা বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, বিপুল রাজপরিবারের মধ্যে সিংহাসনের জন্য হানাহানি অন্তর্বিবাদ সহজ ও প্রকৃতিসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। বংশের এক জন শক্তিশালী ব্যক্তি রাজাকে বিতাড়িত করিয়া নিজে সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন, ইহার কিছুকাল পরে পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা শক্তি সংগ্রহ করিয়া আবার সিংহাসন পুনরুদ্ধার করিলেন—এইভাবে ধারাবাহিক শাসনপারম্পর্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বলা বাহুল্য, প্রজারাও সুখে ছিল না। তাহারা মাঝে মাঝে মাৎস্যন্যায় করিয়া রাজাকে মারিয়া আর এক জনকে তাহার স্থানে বসাইয়া দিত। সে কালে প্রকৃতিপুঞ্জের সহিষ্ণুতা আধুনিক কালের মত এমন সর্ব্বংসহা হইয়া উঠিতে পারে নাই, প্রয়োজন হইলে ধৈর্য্যের শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া যাইত। তখন শ্রীমন্মহারাজের শোণিতে পথের ধূলি নিবারিত হইত,—তাঁহার জঠর-নিষ্কাশিত অন্ত্র দ্বারা রাজপুরী পরিবেষ্টিত করিয়া জিঘাংসু বিদ্রোহীর দল প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিত।

সে যাক। পুরাণে শিশুনাগবংশীয় মহারাজ চণ্ডের নাম পাওয়া যায় না। চণ্ডের প্রকৃত নাম কি ছিল, তাহাও লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। মহিষের মত আকৃতির মধ্যে রাক্ষসের মত প্রকৃতি লইয়া ইনি কয়েক বৎসর মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তার পর—কিন্তু সে পরের কথা।

রাজ-অবরোধে এক দাসী একটি কন্যা প্রসব করিয়াছিল। অবশ্য মহারাজ চণ্ডই কন্যার পিতা; সুতরাং সভাপণ্ডিত নবজাত। কন্যার কোষ্ঠী তৈয়ার করিলেন।

কোষ্ঠী পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিত বলিলেন,—"শ্রীমন্, এই কন্যা অতিশয় কুলক্ষণা, প্রিয়জনের অনিষ্টকারিণী—সাক্ষাৎ বিষকন্যা, ইহাকে বর্জ্জন করুন।"

সিংহাসনে আসীন মহারাজের বন্ধুর ললাটে ভীষণ ভ্রূকুটি দেখা দিল; পণ্ডিত অন্তরে কম্পিত হইলেন। স্পষ্ট কথা মহারাজ ভালবাসেন না; স্পষ্ট কথা বলিয়া অল্পই সচিব শিবমিশ্রের যে দশা হইয়াছে, তাহা সকলেই জানে। পণ্ডিত স্খলিত বচনে বলিলেন,—"মহারাজ, আপনার কল্যাণের জন্যই বলিতেছি, এ কন্যা বর্জ্জনীয়া।"

কিন্তু মহারাজের ভ্রূকুটি শিথিল হইল না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন্ প্রিয়জনের অধিক অনিষ্ট হওয়া সম্ভব?"

পণ্ডিত পুনরায় কোষ্ঠী দেখিলেন, তার পর ভয়ে ভয়ে বলিলেন,—"উপস্থিত পিতা মাতা সকলেরই অনিষ্ট-সম্ভাবনা রহিয়াছে। মঙ্গল সপ্তমে ও শনি অষ্টমে থাকিয়া পিতৃস্থানে পূর্ণদৃষ্টি করিতেছে।"

কে কোথায় দৃষ্টি করিতেছে, তাহা জানিবার কৌতূহল মহারাজের ছিল না। তাঁহার মুখে স্ফুরিত-বিদ্যুৎ বৈশাখী মেঘ ঘনাইয়া আসিল মহারাজের সাম্যদৃষ্টির সম্মুখে অপরাধী ও নিরপরাধের প্রভেদ নাই—অশুভ বা অপ্রীতিকর কথা যে উচ্চারণ করে, সেই দণ্ডার্হ। এ ক্ষেত্রে শনি-মঙ্গলের পাপদৃষ্টির ফল যে জ্যোতিষাচার্য্যের শিরে বর্ষিত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? পণ্ডিত প্রমাদ গণিলেন।

সভা-বিদূষক বটুক ভট্ট সিংহাসনের পাশে বসিয়াছিল। সে খর্ব্বকায় বামন, মস্তকটি বৃহদাকার, কণ্ঠস্বর এরূপ তীক্ষ্ণ যে, মনে হয়, কর্ণের পটহ ভেদ করিয়া যাইবে। পণ্ডিতের দুরবস্থা দেখিয়া সে সূচ্যগ্রসূক্ষ্ম কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, বলিল,—"বিষকন্যা! তবে ত ভালই হইয়াছে, মহারাজ! এই দাসীপুত্রীকে সযত্নে পালন করুন। কালে যৌবনবতী হইলে ইহাকে নগর-নটীর পদে অভিষিক্ত করিবেন। আপনার দুষ্ট প্রজারা অচিরাৎ যম-মন্দিরে প্রস্থান করিবে।"

বটুক ভট্টকে রাজ-পার্ষদ সকলেই ভালবাসিত, শুধু তাহার বিদূষণ-চাতুর্য্যের জন্য নয়, বহুবার বহু বিপন্ন সভাসদ্‌কে সে রাজরোষ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল।

তাহার কথায় মহারাজের ভ্রূগ্রন্থি ঈষৎ উন্মোচিত হইল, তিনি বামহস্তে বটুকের কেশমুষ্টি ধরিয়া তাহাকে শূন্যে তুলিয়া ধরিলেন। সূত্রাগ্রে ব্যাদিতমুখ মৎস্যের ন্যায় বটুক ঝুলিতে লাগিল।

রাজা বলিলেন,—"বটুক, তোর জিহ্বা উৎপাটিত করিব।"

বটুক তৎক্ষণাৎ দীর্ঘ জিহ্বা বাহির করিয়া দিল। রাজা হাস্য করিয়া তাহাকে মাটিতে নামাইলেন। পণ্ডিতের ফাঁড়া কাটিয়া গেল।

ভৃঙ্গারে মাধ্বী ছিল। রাজার কটাক্ষমাত্রে কিঙ্করী চষক ভরিয়া তাঁহার হস্তে দিল। চষক নিঃশেষ করিয়া রাজা বলিলেন,—"এখন এই বিষকন্যাটাকে লইয়া কি করা যায়?"

গণদেব নামক এক জন চাটুকার পার্ষদ বলিল,—"মহারাজ, উহাকেও শিবমিশ্রের পথে প্রেরণ করুন—রাজ্যের সমস্ত অনিষ্ট দূর হোক।"

মহারাজ চণ্ডের রক্ত-নেত্রে একটা ক্রূর-কৌতুক নৃত্য করিয়া উঠিল, তিনি স্বভাবস্ফীত অধর প্রসারিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাসচিব শিবমিশ্র মহাশয় এখন কি করিতেছেন, কেহ বলিতে পার ?"

গণদেব মুণ্ড আন্দোলিত করিয়া মুখভঙ্গী সহকারে বলিল, —"এইমাত্র দেখিয়া আসিতেছি, তিনি শ্মশানভূমিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া শ্মশান-শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন। ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইব বলিয়া কিছু মোদক লইয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিলাম, ব্রাহ্মণের মিষ্টান্নে রুচি নাই।" বলিয়া নিজ রসিকতায় অতিশয় উৎফুল্ল হইয়া চারিদিকে তাকাইল।

মহারাজ অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "ভাল। অদ্য নিশাকালে শিবাদল আসিয়া শিবমিশ্রের মুণ্ড ভক্ষণ করিবে।" তার পর ভীষণ দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শিবমিশ্র আমার আজ্ঞার প্রতিবাদ করিয়াছিল, তাই আজ তাহাকে শৃগালে ছিঁড়িয়া খাইবে।—তোমরা এ কথা স্মরণ রাখিও।"

সভা স্তব্ধ হইয়া রহিল, কেহ বাক্য উচ্চারণ করিতে সাহসী হইল না।

রাজা তখন সভা-জ্যোতিষীকে বলিলেন,—"পণ্ডিতরাজ, আপনার অভিমত রাজ্যের কল্যাণে এ কন্যা বর্জ্জিত হোক। ভাল, তাহাই হইবে। কন্যা ও কন্যার মাতা উভয়েই অদ্য রাত্রিতে শ্মশানে প্রেরিত হইবে। সেখানে কন্যার মাতা স্বহস্তে কন্যাকে শ্মশানে প্রোথিত করিবে। তাহা হইলে দৈব আপদ দূর হইবে ত ?"

পণ্ডিত শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"মহারাজ, এরূপ কঠোরতা নিষ্প্রয়োজন। কন্যাকে ভাগীরথীর জলে বিসর্জ্জন করুন, কিন্তু কন্যার মাতা নিরপরাধিনী,—তাহাকে—"

রাজা গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"নিরপরাধিনী ! সে এরূপ কন্যা প্রসব করে কেন ?—যাক, আপনার বাগ্‌বিস্তারে প্রয়োজন নাই, যাহা করিবার, আমি স্বহস্তে করিব।" বলিয়া মহারাজ সিংহাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

যাহার দুর্দ্দম দানবপ্রকৃতি মর্ত্যলোকে কোনও বস্তুকে ভয় করিত না, দৈব আপদের আশঙ্কা তাহাকে এমনই অমানুষিক নিষ্ঠুরতায় জ্ঞানশূন্য করিয়া তুলিয়াছিল যে, নিজ ঔরসজাত কন্যার প্রতি তাহার চিত্তে তিলমাত্র মমতার অবকাশ ছিল না।

পাটলিপুত্র নগরের চৌষট্টি দ্বার, তন্মধ্যে দশটি প্রধান ও প্রকাশ্য। বাকীগুলি অধিকাংশই গুপ্তপথ।

এই গুপ্তপথের একটি রাজপ্রাসাদসংলগ্ন; রাজা বা রাজপরিবারস্থ যে কেহ ইচ্ছা করিলে এই দ্বারপথে নগর-প্রাকারের বাহিরে যাইতে পারিতেন। তাল-কাণ্ডের একটি শীর্ণ সেতু ছিল, তাহার সাহায্যে পরিখা পার হইতে হইত। এই স্থানে গঙ্গাপ্রবাহের সহিত খনিত পরিখা মিলিত হইয়াছিল।

পরিখার পরপারে কিছুদূর যাইবার পর গঙ্গাতটে পাটলি-পুত্রের মহাশ্মশান আরম্ভ হইয়াছে;—যত দূর দৃষ্টি যায়, তরু-গুল্মহীন ধূ ধূ বালুকা। বালুকার উপর অগণিত লৌহশূল প্রোথিত রহিয়াছে; শূলগাত্রে কোথাও অর্দ্ধপথে বীভৎস উলঙ্গ মনুষ্যদেহ বিদ্ধ হইয়া আছে, কোথাও শুষ্ক নরকঙ্কাল শূলমুখে পুঞ্জীভূত হইয়াছে। চারিদিকে শত শত নরকপাল বিক্ষিপ্ত। দিবাভাগেই এই মহাশ্মশানের দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর; অপিচ, রাত্রিকালে নগরীর দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেলে এই মনুষ্যহীন মৃত্যুবাসরে যে পিশাচ-পিশাচীর নৃত্য আরম্ভ হয়, তাহা কল্পনা করিয়াই পাটলিপুত্রের নাগরিকরা শিহরিয়া উঠিত। দণ্ডিত অপরাধী ভিন্ন রাত্রিকালে মহাশ্মশানে অন্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল—চণ্ডালরাও মহাশ্মশানের অনির্ব্বাণ চুল্লীতে কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়া সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রতিগমন করিত।

সে রাত্রিতে আকাশে সপ্তমীর খণ্ড চন্দ্র উদিত হইয়াছিল। অপরিস্ফুট আলোক শ্মশানের বিস্তীর্ণ বালুকারাশির উপর যেন একটা শ্বেতাভ কুজ্ঝটিকা প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল। তটলেহী গঙ্গার ধূসর প্রবাহ চন্দ্রালোকে কৃষ্ণবর্ণ প্রতিভাত হইতেছিল। শ্মশান ও নদীর সন্ধিরেখার উপর দূরে অনির্ব্বাণ চুল্লীর আরক্ত অঙ্গার জ্বলিতেছিল।

প্রথম প্রহর রাত্রি—প্রাকাররুদ্ধ পাটলিপুত্রে এখনও নগরগুঞ্জন শান্ত হয় নাই; কিন্তু শ্মশানে ইহারই মধ্যে যেন প্রেতলোকের অশরীরী উৎসব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। চক্ষুতে কিছু দেখা যায় না, তবু মনে হয়, সূক্ষ্মদেহ পিশাচী-ডাকিনীরা চক্ষু-খদ্যোত জ্বালিয়া লুব্ধ লালায়িত রসনায় গলিত শবমাংস অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে। আকাশে নিশাচর পক্ষীর পক্ষশব্দ যেন তাহাদেরই আগমনবার্তা ঘোষণা করিতেছে।

এই সময়, যে দিকে রাজপ্রাসাদের গুপ্তদ্বার, সেই দিক

হইতে এক নারী ধীরে ধীরে শ্মশানের দিকে যাইতেছিল। রমণীর এক হস্তে একটি লৌহখনিত্র, অন্য হস্তে বক্ষের কাছে একটি ক্ষুদ্র বস্ত্রপিণ্ড ধরিয়া আছে। ক্ষীণ চন্দ্রের অস্পষ্ট আলোকে রমণীর আকৃতি ভাল দেখা যায় না; সে যে যুবতী ও এক সময় সুন্দরী ছিল, তাহা তাহার রক্তহীন মুখ ও শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ দেখিয়া অনুমান করাও দুরূহ। অতি কষ্টে দুর্ভর দেহ ও লৌহখনিত্র বহন করিয়া জরাজীর্ণ বৃদ্ধার মত সে চলিয়াছে। রুক্ষ কেশজাল মুখে, বক্ষে ও পৃষ্ঠে বিপর্য্যস্তভাবে পড়িয়া আছে। রমণী মাঝে মাঝে দাঁড়াইতেছে, ত্রাস-বিমূঢ় চক্ষুতে পিছু ফিরিয়া চাহিতেছে, আবার চলিতেছে।

শ্মশানের সীমান্তে পৌছিয়া সে জানু ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। তাহার কণ্ঠ হইতে একটি কাতর আর্ত্তস্বর বাহির হইল; সেই সঙ্গে বক্ষের বস্ত্রপিণ্ডের ভিতর হইতেও ক্ষীণ ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইল।

কিছুক্ষণ পড়িয়া থাকিবার পর রমণী আবার উঠিয়া চলিতে লাগিল। ক্রমে সে শ্মশানের বীভৎস দৃশ্যাবলীর মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

একবার সে চক্ষু তুলিয়া দেখিল,—সম্মুখে দীর্ঘ শূল প্রোথিত রহিয়াছে; শূলশীর্ষে বিকট ভঙ্গিমায় এক নরমূর্ত্তি বিদ্ধ হইয়া আছে, শূল-নিম্নে দুইটা শৃগাল উর্দ্ধমুখ হইয়া সেই দুষ্প্রাপ্য ভক্ষ্যের দিকে তাকাইয়া আছে। চন্দ্রালোকে তাহাদের চক্ষু জ্বলিতেছে।

রমণী চীৎকার করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অধিক দূর যাইতে পারিল না, কয়েক পদ গিয়া আবার বালুর উপর পড়িয়া গেল।

এবার দীর্ঘকাল পরে রমণী উঠিয়া বসিল। বোধ হয়, সংজ্ঞা হারাইয়াছিল, উঠিয়া বসিয়া ভয়ার্ত্ত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল। বক্ষের বস্ত্রপিণ্ড ভূমিতে পড়িয়া গিয়াছিল, সে দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে উন্মত্তের মত উঠিয়া খনিত্র দিয়া বালু খনন করিতে আরম্ভ করিল।

অল্পকালমধ্যে একটি নাতিগভীর গর্ত্ত হইল। তখন রমণী সেই বস্ত্রপিণ্ড তুলিয়া লইয়া গর্ত্তে নিক্ষেপ করিল—অমনই ক্ষীণ নির্জ্জীব ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। রমণী দুই হাতে কাণ চাপিয়া কিয়ৎকাল বসিয়া রহিল, তার পর বালু দিয়া গর্ত্ত পূরণ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পারিল না। সহসা দুই বাহু বাড়াইয়া বস্ত্র-কুণ্ডলী গর্ত্ত হইতে তুলিয়া লইয়া সজোরে নিজ বক্ষে চাপিয়া ধরিল। একটা ধাবমান শৃগাল তাহার অতি নিকট দিয়া তাহার দিকে গ্রীবা বাঁকাইয়া চাহিতে চাহিতে ছুটিয়া গেল, বাহ্য-চেতনাহীন রমণী তাহা লক্ষ্য করিল না।

অতঃপর মৃগতৃষ্ণিকাভ্রান্ত মৃগীর মত নারী আবার এক দিকে ছুটিতে লাগিল। তখন তাহার আর ইষ্টানিষ্ট-জ্ঞান নাই—কোন্ দিকে ছুটিয়াছে, তাহাও জানে না; শুধু পূর্ব্ববৎ এক হস্তে খনিত্র ধরিয়া আছে, আর অপর হস্তে সেই বস্ত্রাবৃত জীবনকণিকাটুকু বক্ষে আঁকড়িয়া আছে।

কিছু দূর গিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, সম্মুখে দূরে গঙ্গার শ্যামরেখা বোধ করি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কয়েক মুহূর্ত্ত বিহ্বল-বিস্ফারিত-নেত্রে সেই দিকে তাকাইয়া থাকিয়া, যেন সহসা উদ্ধারের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে, এমনই ভাবে সে হাসিয়া উঠিল। তার পর অসীমবলে অবসন্ন দেহ সেই দিকে টানিয়া লইয়া চলিল।

মানব-মানবীর জীবনে এরূপ অবস্থা কখনও কখনও আসে—যখন তাহারা মৃত্যুকে বরণ করিবার জন্য হাহাকার করিয়া ছুটিয়া যায়।

জাহ্নবীর শীতল বক্ষে পৌছিতে আর বিলম্ব নাই, মধ্যে মাত্র ছয় সাত দণ্ড বালুভূমির ব্যবধান, এরূপ সময় রমণীর মুহ্যমান চেতনা পার্শ্বের দিকে এক প্রকার শব্দ শুনিয়া আকৃষ্ট হইল। শব্দটা যেন মনুষ্যের কণ্ঠস্বর—অর্দ্ধব্যক্ত তর্জ্জনের মত শুনাইল। রমণীর গতি এই শব্দে আপনিই রুদ্ধ হইয়া গেল। সে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, চন্দ্রালোকে শুভ্র বালুকার উপর একপাল শৃগাল কোনও অদৃশ্য কেন্দ্রের চারিধারে ব্যূহ রচনা করিয়া রহিয়াছে। তাহাদের লাঙ্গুল বহির্দ্দিকে প্রসারিত। ঐ শৃগালচক্রের মধ্য হইতে মনুষ্যকণ্ঠের তর্জ্জন মাঝে মাঝে ফুঁসিয়া উঠিতেছে; অমনি শৃগালের দল পিছু হটিয়া যাইতেছে। আবার ধীরে ধীরে অলক্ষিতে তাহাদের চক্র সঙ্কুচিত হইতেছে।

রমণী যন্ত্রচালিতের মত কয়েক পদ সেই দিকে অগ্রসর হইল। শৃগালরা একজন জীবন্ত মনুষ্যকে আসিতে দেখিয়া দংষ্ট্রাবিকাশ করিয়া দূরে সরিয়া গেল। তখন মধ্যস্থিত বস্তুটি দৃষ্টিগোচর হইল।

মাটীর উপর কেবল একটি দেহহীন মুণ্ড রহিয়াছে।

মুণ্ডের দুই বিক্ষত গণ্ড হইতে রক্ত ঝরিতেছে, চক্ষুতে উন্মত্ত দৃষ্টি। মুণ্ড রমণীর দিকেই তাকাইয়া আছে।

রমণী এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া অস্ফুট চীৎকার করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

মুণ্ড তখন বিকৃত স্বরে বলিল,—"তুমি প্রেত, পিশাচ, নিশাচর যে হও, আমাকে উদ্ধার কর!"

মানুষের কণ্ঠস্বরে রমণীর সাহস ফিরিয়া আসিল—সে আরও কয়েক পদ নিকটে আসিল; রুদ্ধ শুষ্ক কণ্ঠ হইতে অতি কষ্টে শব্দ বাহির করিল—"কে তুমি?"

মুণ্ড বলিল,—"আমি মানুষ, ভয় নাই। আমার দেহ মাটিতে প্রোথিত আছে—উদ্ধার কর।"

রমণী তখন কাছে আসিয়া ভাল করিয়া তাহার মুখ দেখিল, দেখিয়া সংহত অস্ফুট স্বরে বলিল,—"মন্ত্রী শিবমিশ্র!"—তার পর খনিত্র দিয়া প্রাণপণে মাটী খুঁড়িতে আরম্ভ করিল।

মৃত্তিকাগর্ভ হইতে বাহিরে আসিয়া শিবমিশ্র কিয়ৎকাল মৃতবৎ মাটীতে শুইয়া রহিলেন। তার পর ধীরে ধীরে দুই হস্তে ভর দিয়া উঠিয়া বসিলেন। রমণীর ক্ষীণ অবসন্ন দেহ তখন ভূমিশয্যায় লুটাইয়া পড়িয়াছে।

শিবমিশ্রের শৃগালদষ্ট গণ্ড হইতে রক্ত ঝরিতেছিল, তিনি সন্তর্পণে তাহা মুছিলেন। রমণীর রক্তলেশহীন পাণ্ডু মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দুর্ভাগিনি, তুমি কোন্ অপরাধে রাত্রিকালে মহাশ্মশানে আসিয়াছ?"

রমণী নীরবে পার্শ্বস্থ বস্ত্রপিণ্ড দেখাইয়া দিল, শিবমিশ্র দেখিলেন,—একটি শিশু। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার পরিচয় কি? তুমি আমার প্রাণদাত্রী, তোমার নাম স্মরণ করিয়া রাখিতে চাহি।"

রমণী নির্জীব কণ্ঠে বলিল,—"আমার নাম মোরিকা—আমি রাজপুরীর দাসী।"

শিবমিশ্র সচকিত হইলেন, বলিলেন,—"বুঝিয়াছি। তুমি কবে এই সন্তান প্রসব করিলে?"

"আজ প্রভাতে।"

শিবমিশ্র কিছুক্ষণ স্তব্ধ রহিলেন।

"হতভাগিনি! কিন্তু তুমি শ্মশানে প্রেরিত হইলে কেন? পরম ভট্টারকের সন্তান গর্ভে ধারণ করা কি এতই অপরাধ?"

মোরিকা বলিল, "সভাপণ্ডিত গণনা করিয়া বলিয়াছেন, আমার কন্যা রাজ্যের অনিষ্টকারিণী বিষকন্যা—তাই—"

"বিষকন্যা!" শিবমিশ্রের চক্ষু সহসা জ্বলিয়া উঠিল—"বিষকন্যা! দেখি।"

শিবমিশ্র বামহস্তে শিশুকে তুলিয়া লইলেন। তখন চন্দ্র অস্ত যাইতেছে, ভাল দেখিতে পাইলেন না। তিনি শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া দূরে চুল্লীর দিকে দ্রুতপদে চলিলেন।

চুল্লীর অঙ্গারের উপর ভস্মের প্রচ্ছদ পড়িয়াছে। শিবমিশ্র একখণ্ড অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠ তাহাতে নিক্ষেপ করিলেন—অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল।

তখন সেই শ্মশান-চুল্লীর আলোকে শিবমিশ্র নবজাত কন্যার দেহলক্ষণ পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষা করিতে করিতে তাঁহার রক্তলিপ্ত মুখে এক পৈশাচিক হাস্য দেখা দিল।

তিনি মোরিকার নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিলেন,—"হ্যাঁ, বিষকন্যা বটে।"

মোরিকা পূর্ব্ববৎ ভূশয্যায় পড়িয়া ছিল, প্রত্যুত্তরে একবার গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

শিবমিশ্র আগ্রহকম্পিত স্বরে বলিলেন,—"বৎসে, তুমি তোমার কন্যা আমাকে দান কর, আমি উহাকে পালন করি। কেহ জানিবে না।"

মোরিকা পুনরায় অতি গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

শিবমিশ্র বলিলেন,—"তুমি ফিরিয়া গিয়া বলিও, কন্যাকে বিনষ্ট করিয়াছ। আমি অদ্যই উহাকে লইয়া গঙ্গার পরপারে লিচ্ছবিদেশে পলায়ন করিব। তার পর—"

মোরিকা উত্তর দিল না। তখন শিবমিশ্র নতজানু হইয়া তাহার মুখ দেখিলেন। তার পর করাগ্রে শীর্ণ মণিবন্ধ ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিলেন।

ক্ষণেক পরে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দুই হস্তে শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া উদ্দীপ্ত চোখে দূরে অর্দ্ধদৃষ্ট রাজপ্রাসাদশীর্ষের দিকে চাহিলেন। কহিলেন,—"এই ভাল।"

এই সময় আকাশের নিকটে অগ্নির রেখা টানিয়া রক্তবর্ণ উল্কা রাজপুরীর ঊর্দ্ধে পিণ্ডাকারে জ্বলিয়া উঠিল,—তার পর ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

সেই আলোকে শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া শিবমিশ্র বলিলেন,—"এ নিয়তির ইঙ্গিত। তোমার নাম রাখিলাম—উল্কা!"

তার পর মগচন্দ্র রাত্রির অন্ধকারে জাহ্নবীর তীররেখা ধরিয়া শিবমিশ্র পাটলিপুত্রের বিপরীত মুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

মোরিকার প্রাণহীন শব মহাশ্মশানে পড়িয়া রহিল। যে শিবাকুল তাহার আগমনে সরিয়া গিয়াছিল, তাহারা আবার চারিদিক হইতে ফিরিয়া আসিল।

২

অতঃপর ষোল বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

কালপুরুষের পলকপাতে শতাব্দী অতীত হয়; কিন্তু ক্ষুদ্রায়ু মানুষের জীবনে ষোল বৎসর অকিঞ্চিৎকর নয়।

মগধে এই সময়ের মধ্যে বহু পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বাধ্যায়-বর্ণিত ঘটনার পর পাটলিপুত্রের নাগরিকবৃন্দ ত্রয়োদশ বর্ষ মহারাজ চণ্ডের দোর্দ্দণ্ড শাসন সহ্য করিয়াছিল; তার পর এক দিন তাহারা সদলবলে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। জনগণ যখন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে, তখন তাহারা বিবেচনা করিয়া কায করে না—এ ক্ষেত্রেও তাহারা বিবেচনা করিল না। ক্রোধান্ধ মৌমাছির পাল যদি একটা মহিষকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে দৃশ্যটা যেরূপ হয়, এই মাৎস্যন্যায়ের ব্যাপারটাও প্রায় তদ্রূপ হইল।

গর্জ্জমান চণ্ডকে সিংহাসন হইতে টানিয়া নামাইয়া বিদ্রোহ-নায়কেরা প্রথমে তাহার মণিবন্ধ পর্য্যন্ত হস্ত কাটিয়া ফেলিল। মহারাজ চণ্ডকে এক কোপে শেষ করিয়া ফেলিলে চলিবে না,—অন্য বিবেচনা না থাকিলেও এ বিবেচনা বিদ্রোহীদের ছিল। মহারাজ এত দিন ধরিয়া যাহা অগণিত প্রজাপুঞ্জকে দুই হস্তে বিতরণ করিয়াছেন, তাহাই তাহারা প্রত্যর্পণ করিতে আসিয়াছে। এই প্রত্যর্পণক্রিয়া এক মুহূর্ত্তে হয় না।

অতঃপর চণ্ডের পদদ্বয় জঙ্ঘাগ্রন্থি হইতে কাটিয়া লওয়া হইল। কিন্তু তাহাতেও প্রতিহিংসাপিপাসু জনতার তৃপ্তি হইল না। এ ভাবে চলিলে বড় শীঘ্র মৃত্যু উপস্থিত হইবে—তাহা বাঞ্ছনীয় নয়। মৃত্যু ত নিষ্কৃতি! সুতরাং জননায়করা মহারাজের বিখণ্ডিত রক্তাপ্লুত দেহ ঘিরিয়া মন্ত্রণা করিতে বসিল। হিংসা-পরিচালিত জনতা চিরদিনই নিষ্ঠুর, সে কালে বুঝি তাহাদের নিষ্ঠুরতার অন্ত ছিল না।

এক জন নাসিকাহীন শৌণ্ডিক উত্তম পরামর্শ দিল। চণ্ডকে হত্যা করিয়া কায নাই, বরঞ্চ তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টাই করা হউক। তার পর এই অবস্থায় তাহাকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া প্রকাশ্য সর্ব্বজনগম্য স্থানে বাঁধিয়া রাখা হউক। নাগরিকরা প্রত্যহ ইহাকে দেখিবে, ইহার গায়ে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে। চণ্ডের এই জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া ভবিষ্যৎ রাজারাও যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে।

সকলে মহোল্লাসে এই প্রস্তাব সমর্থন করিল। প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতেও বিলম্ব হইল না।

তার পর মগধবাসীর রক্ত কথঞ্চিৎ কবোষ্ণ হইলে তাহারা নূতন রাজা নির্ব্বাচন করিতে বসিল। শিশুনাগবংশের দূর-সম্পর্কিত সৌম্যকান্তি এক যুবা—নাম সেনজিৎ—মৃগয়া, পক্ষিপালন ও সুরা আস্বাদন করিয়া সুখে ও তৃপ্তিতে কাল যাপন করিতেছিল, রাজা হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা তাহার ছিল না,—সকলে তাহাকে ধরিয়া সিংহাসনে বসাইয়া দিল। সেনজিৎ অতিশয় নিরহঙ্কার, সরলচিত্ত ও ক্রীড়াকৌতুকপ্রিয় যুবা; নারীজাতি ভিন্ন জগতে তাহার শত্রু ছিল না; তাই নাগরিকগণ সকলেই তাহাকে ভালবাসিত। সেনজিৎ প্রথমটা রাজা হইতে আপত্তি করিল; কিন্তু তাহার বন্ধুমণ্ডলীকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া সে দীর্ঘশ্বাস মোচন পূর্ব্বক সিংহাসনে গিয়া বসিল। এক জন ভীমকান্তি কৃষ্ণকায় নাগরিক স্বহস্তে নিজ অঙ্গুলী কাটিয়া তাহার ললাটে রক্ত-তিলক পরাইয়া দিল।

সেনজিৎ করুণবচনে বলিল,—"যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিব, কিন্তু আমাকে রাজ্য শাসন বা বংশরক্ষা করিতে বলিও না।"

তাহাই হইল। কয়েক জন বিচক্ষণ মন্ত্রী রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন; মহারাজ সেনজিৎ পূর্ব্ববৎ মৃগয়াদির চর্চ্চা করিয়া ও বটুকভট্টের সহিত রসালাপ করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। নানা কারণে কাশী, কোশল, লিচ্ছবি তখন যুদ্ধ করিতে উৎসুক ছিল না; ভিতরে যাহাই থাকুক, বাহিরে একটা মৌখিক মৈত্রী দেখা যাইতেছিল,—তাই মহারাজকে বর্ম্ম-চর্ম্ম পরিধান করিয়া শৌর্য্য প্রদর্শন করিতে হইল না। ও দিকে রাজ-অবরোধও শূন্য পড়িয়া রহিল। কঞ্চুকী মহাশয় ছাড়া রাজ্যে আর কাহারও মনে খেদ রহিল না।

মগধের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন লিচ্ছবি রাজ্যের রাজধানী বৈশালীতেও ভিতরে ভিতরে অনেক কিছু

ঘটিতেছিল। মহামনীষী কৌটিল্য তখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই, কিন্তু তাই বলিয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কূটনীতির অভাব ছিল না। বৈশালীতে বাহ্য মিত্রতার অন্তরালে গোপনে গোপনে মগধের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল।

শিবমিশ্র বৈশালীতে সাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন। লিচ্ছবিদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত—রাজা নাই। রাজার পরিবর্ত্তে নির্ব্বাচিত নায়কগণ রাজ্য শাসন করেন। শিবমিশ্রের কাহিনী শুনিয়া তাঁহারা তাঁহাকে সসম্মানে মন্ত্রণাদাতা সচিবের পদ প্রদান করিলেন।

কেবল শিবমিশ্রের নামটি ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তাঁহার গণ্ডের শৃগালদংশনক্ষত শুকাইয়াছিল বটে, কিন্তু ক্ষত শুকাইলেও দাগ থাকিয়া যায়। তাঁহার মুখখানা শৃগালের মত হইয়া গিয়াছিল। জনসাধারণ তাঁহাকে শিবামিশ্র বলিয়া ডাকিতে লাগিল। শিবমিশ্র তিক্ত হাসিলেন, কিন্তু আপত্তি করিলেন না। শৃগালের সহিত তুলনায় যে ধূর্ত্ততার ইঙ্গিত আছে, তাহা তাঁহার অরুচিকর হইল না। ঐ নামই প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।

দিনে দিনে বৈশালীতে শিবামিশ্রের প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। ও দিকে তাঁহার গৃহে সেই শ্মশানলব্ধ অগ্নিকণা সাগ্নিকের যত্নে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

চণ্ড ও মোরিকার কন্যা উল্কাকে একমাত্র অগ্নির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যতই তাহার বয়স বাড়িতে লাগিল, জ্বলন্ত বহ্নির মত রূপের সঙ্গে সঙ্গে ততই তাহার দুর্জ্জয় দুর্দ্দম প্রকৃতি পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ করিল, শিবামিশ্র তাহাকে নানা বিদ্যা শিক্ষা দিলেন, কিন্তু তাহার প্রকৃতির উগ্রতা প্রশমিত করিবার চেষ্টা করিলেন না। মনে মনে বলিলেন—'শিশুনাগবংশের এই বিষকণ্টক দিয়াই শিশুনাগবংশের উচ্ছেদ করিব।'

তীক্ষ্ণমেধাবিনী উল্কা চতুঃষষ্টি কলা হইতে আরম্ভ করিয়া নৃত্যবিদ্যা, অসিবিদ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত অবলীলাক্রমে শিখিয়া ফেলিল। কেবল নিজ উদ্দাম প্রকৃতি সংযত করিতে শিখিল না।

মগধের প্রজা-বিদ্রোহের সংবাদ যে দিন বৈশালীতে পৌঁছিল, সে দিন শিবামিশ্র গূঢ় হাস্য করিলেন। এই বিদ্রোহে তাঁহার কতখানি হাত ছিল, কেহ জানিত না। কিন্তু কিছু দিন পরে যখন আবার সংবাদ আসিল যে, শিশুনাগবংশেরই আর এক জন যুবা রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছে, তখন তাঁহার মুখ অন্ধকার হইল। এই শিশুনাগবংশ যেন সর্পবংশেরই মত—কিছুতেই নিঃশেষ হইতে চায় না।

তার পর আরও কয়েক বৎসর কাটিল; শিবামিশ্র উল্কার দিকে চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

যে দিন উল্কার বয়স ষোড়শ বৎসর পূর্ণ হইল, সেই দিন শিবামিশ্র তাহাকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন,—"বৎসে, তুমি আমার কন্যা নহ। তোমার জীবন-বৃত্তান্ত বলিতে চাহি, উপবেশন কর।"

ভাবলেশহীন কণ্ঠে শিবামিশ্র বলিতে লাগিলেন, উল্কা করলগ্ন-কপোলে বসিয়া সম্পূর্ণ কাহিনী শুনিল; তাহার স্থির চক্ষু নিমেষের জন্য শিবামিশ্রের মুখ হইতে নড়িল না। কাহিনী সমাপ্ত করিয়া শিবামিশ্র বলিলেন,—"প্রতিহিংসা সাধনের জন্য তোমায় ষোড়শ বর্ষ পালন করিয়াছি। চণ্ড নাই, কিন্তু শিশুনাগবংশ অদ্যাপি মগধে সদর্পে বিরাজ করিতেছে। সময় উপস্থিত—তোমার মাতা মোরিকা ও পালক পিতা শিবমিশ্রের প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ কর।"

"কি করিতে হইবে?"

"শিশুনাগবংশকে উচ্ছেদ করিতে হইবে।"

"পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিন।"

"শুন, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তুমি বিষকন্যা; তোমার উগ্র অলোকসামান্য রূপ তাহার নিদর্শন। পুরুষ তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইবে—পতঙ্গ যেমন অগ্নিশিখার দিকে আকৃষ্ট হয়। তুমি যে পুরুষের কণ্ঠলগ্ন হইবে, তাহাকেই মরিতে হইবে। এখন তোমার কর্ত্তব্য বুঝিয়াছ? মগধের সহিত বর্ত্তমানে লিচ্ছবিদেশের মিত্রভাব চলিতেছে, এ সময়ে অকারণে যুদ্ধ-ঘোষণা করিলে রাষ্ট্রীয় ধনক্ষয় ও জনক্ষয় হইবে, বিশেষতঃ যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত। মগধবাসীরা নূতন রাজার শাসনে সুখে সচ্ছন্দভাবে আছে—রাজ্যে অসন্তোষ নাই। এরূপ সময় রাজ্যে রাজ্যে যুদ্ধ বাধানো সমীচীন নয়। কিন্তু শিশুনাগবংশকে মগধ হইতে মুছিয়া ফেলিতে হইবে, তাই এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছি। বর্ত্তমান রাজা সেনজিৎ ব্যসনপ্রিয় যুবা, শুনিয়াছি, রাজকার্য্যে তাহার মতি নাই;—সর্ব্বপ্রথম তাহাকে অপসারিত করিতে হইবে।—পারিবে?"

উল্কা হাসিল। যাবক-রক্ত অধরে দশনদ্যুতি সৌদামিনীর

মত ঝলসিয়া উঠিল। তাহার সেই হাসি দেখিয়া শিবামিশ্রের মনে আর কোনও সংশয় রহিল না।

তিনি বলিলেন,—"এখন সভায় কি স্থির হইয়াছে, বলিতেছি। মগধে কিছু দিন যাবৎ বৈশালীর প্রতিভূ কেহ নাই, কিন্তু মিত্ররাজ্যে প্রতিনিধি থাকাই বিধি, না থাকিলে সৌহার্দ্দের অভাব সূচনা করে। এ জন্য সঙ্কল্প হইয়াছে, তুমি লিচ্ছবি রাষ্ট্রের প্রতিভূস্বরূপ পাটলিপুত্রে গিয়া বাস করিবে। প্রতিভূকে সর্ব্বদা রাজ-সন্নিধানে যাইতে হয়, সুতরাং রাজার সহিত দেখা-সাক্ষাতে কোনও বাধা থাকিবে না। অতঃপর তোমার সুযোগ।"

উল্কা উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—"ভাল। কিন্তু আমি নারী, এজন্য কোনও বাধা হইবে না?"

শিবামিশ্র বলিলেন,—"বৃজির গণরাজ্যে নারী পুরুষে প্রভেদ নাই, সকলের কথা সমান।"

"কবে যাইতে হইবে?"

"আগামী কল্য তোমার যাত্রার ব্যবস্থা হইয়াছে। তোমার সঙ্গে দশ জন পুরুষ পার্শ্বচর থাকিবে, এতদ্ব্যতীত সখী, পরিচারিকা তোমার অভিরুচিমত লইতে পার।"

উল্কা শিবামিশ্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, অকম্পিত স্বরে বলিল,—"পিতা, আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিব। যে চুর্প্তের অভিসম্পাত লইয়া আমি জন্মিয়াছি, তাহা আমার জননীর নিষ্ঠুর হত্যার প্রতিশোধ লইয়া সার্থক হইবে। আপনি যে আমাকে কন্যার ন্যায় পালন করিয়াছেন, সে ঋণও এই অভিশপ্ত দেহ দিয়া পরিশোধ করিব।"

শিবামিশ্রের কণ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইল, তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"কন্যা, আশীর্ব্বাদ করিতেছি, লব্ধকামা হইয়া আমার ক্রোড়ে প্রত্যাগমন কর। দধীচির মত তোমার কীর্ত্তি পুরাণে অবিনশ্বর হইয়া থাকিবে।"

* * * *

পাটলিপুত্রের উপকণ্ঠে রাজার মৃগয়া-কানন। উল্কা ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া, এই বহু যোজনব্যাপী অটবীর ভিতর দিয়া অশ্বারোহণে চলিয়াছিল। তাহার সঙ্গী কেহ ছিল না, সঙ্গী সহচরদিগকে সে রাজপথ দিয়া প্রেরণ করিয়া দিয়া একাকী বনপথ অবলম্বন করিয়াছিল। পুরুষ রক্ষীরা ইহাতে সসম্ভ্রমে ঈষৎ আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু উল্কা তীব্র অধীর স্বরে নিজ আদেশ জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছিল,—"আমি আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ। তোমরা নগরতোরণে পৌঁছিয়া আমার জন্য প্রতীক্ষা করিবে। আমি একাকী চিন্তা করিতে চাই।"

স্থির অচপল দৃষ্টি সম্মুখে রাখিয়া উল্কা অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়াছিল, অশ্বও তাড়নার অভাবে মন্থরসঞ্চারী গতিতে চলিয়াছিল। পাছে আরোহিণীর চিন্তাজাল ছিন্ন হইয়া যায়, এই ভয়ে যেন গতিচ্ছন্দ অটুট রাখিয়া চলিতেছিল। শষ্পের উপর অশ্বের খুর ধ্বনিও অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

ছায়া-চিত্রিত বনের ভিতর দিয়া কৃষ্ণ বাহনের পৃষ্ঠে যেন সঞ্চারিণী আলোকলতা চলিয়াছে—বনের ছায়ান্ধকার ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। উল্কার বক্ষে লৌহজালিক, পার্শ্বে তরবারি, কটিতে ছুরিকা, পৃষ্ঠে সংসর্পিত কৃষ্ণ বেণী, কর্ণে মাণিক্যের অবতংস অঙ্গারবৎ জ্বলিতেছে। এই অপূর্ব বেশে উল্কার রূপ যেন আরও উন্মাদকর হইয়া উঠিয়াছে।

কাননপথ অৰ্দ্ধেক অতিক্রান্ত হইবার পর সহসা পশ্চাতে দ্রুত-অস্পষ্ট অশ্বখুরধ্বনি শুনিয়া উল্কার চমক ভাঙ্গিল। সে পিছু ফিরিয়া দেখিল, এক জন শূলধারী অশ্বারোহী সবেগে অশ্ব চালাইয়া ছুটিয়া আসিতেছে; তাহার কেশের মধ্যে কঙ্কপত্র, পরিধানে শবরের বেশ। উল্কাকে ফিরিতে দেখিয়া সে ভল্ল উত্তোলন করিয়া সগর্জ্জনে হাঁকিল—"দাঁড়াও।"

উল্কা দাঁড়াইল। ক্ষণেক পরে অশ্বারোহী তাহার পার্শ্বে আসিয়া কর্কশ স্বরে বলিল,—"কে তুই?—রাজার মৃগয়া-কাননের ভিতর দিয়া বিনা অনুমতিতে চলিয়াছিস্? তোর কি প্রাণের ভয় নাই?" এই পর্য্যন্ত বলিয়া পুরুষ সবিস্ময়ে থামিয়া গিয়া বলিল,—"এ কি! এ যে নারী!"

উল্কা অধরোষ্ঠ ঈষৎ সঙ্কুচিত করিয়া বলিল,—"নারীই বটে! তুমি কে?"

পুরুষ ভল্ল নামাইল। তাহার কৃষ্ণবর্ণ মুখে ধীরে ধীরে হাসি ফুটিয়া উঠিল, চোখে লালসার তীক্ষ্ণ আলোক দেখা দিল। সে কণ্ঠস্বর মধুর করিয়া বলিল,—"আমি এই বনের রক্ষী। সুন্দরি! এই পথহীন বনে একাকিনী চলিয়াছ, তোমার কি দিগ্‌ভ্রান্ত হইবার ভয় নাই?"

উল্কা উত্তর দিল না; বল্গার ইঙ্গিতে অশ্বকে পুনর্ব্বার সম্মুখদিকে চালিত করিল।

রক্ষী লালসাদগ্ধ স্বরে বলিল,—"তুমি কি পাটলিপুত্র যাইবে? চল, আমি তোমাকে কানন পার করিয়া দিয়া আসি।" বলিয়া সে নিজ অশ্ব চালিত করিল।

উল্কা এবারও উত্তর দিল না, অবজ্ঞাস্ফুরিত-নেত্রে একবার তাহার দিকে চাহিল মাত্র। কিন্তু রক্ষী কেবল নেত্রাঘাতে প্রতিহত হইবার পাত্র নয়, সে লুব্ধ নয়নে উল্কার সর্ব্বাঙ্গ দেখিতে দেখিতে তাহার পাশে পাশে চলিল।

ক্রমে দুই অশ্বের ব্যবধান কমিয়া আসিতে লাগিল। উল্কা অপাঙ্গদৃষ্টিতে দেখিল, কিন্তু কিছু বলিল না।

রক্ষী আবার মধু-ঢালা স্বরে বলিল,—"সুন্দরি, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? তোমার এরূপ কন্দর্প-বিজয়ী বেশ কেন?"

উল্কা বিরস-স্বরে বলিল,—"সে সংবাদে তোমার প্রয়োজন নাই।"

রক্ষী অধর দংশন করিল; এ নারী যেমন রূপসী, তেমনই মদ-গর্ব্বিতা! ভাল, ইহার মদগর্ব্ব খর্ব্ব করিতে হইবে; এ বনের অধীশ্বর কে, তাহা জানাইয়া দিতে হইবে।

রক্ষী আরও নিকটে সরিয়া আসিয়া হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক উল্কার হাত ধরিল। উল্কার দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, সে হাত ছাড়াইয়া লইয়া সর্প-তর্জ্জনের মত শীৎকার করিয়া বলিল,—"আমাকে স্পর্শ করিও না—অনার্য্য!"

রক্ষীর মুখ আরও কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। সম্পূর্ণ অনার্য্য না হইলেও সে আর্য্য-অনার্য্যের মিশ্রণজাত অম্বষ্ঠ বটে, তাই এই হীনতা-জ্ঞাপক সম্বোধন তাহাকে অঙ্কুশের মত বিদ্ধ করিল। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া সে বলিল,—"অনার্য্য, ভাল, আজ এই অনার্য্যের হাত হইতে তোমাকে কে রক্ষা করে দেখি"—বলিয়া বাহু দ্বারা কটি বেষ্টন করিয়া উল্কাকে আকর্ষণ করিল।

উল্কার মুখে বিষ-তীক্ষ্ণ হাসি ক্ষণেকের জন্য দেখা দিল।

"আমি বিষকন্যা—আমাকে স্পর্শ করিলে মরিতে হয়," বলিয়া সে রক্ষীর পঞ্জরে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া দিল, তার পর উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে হাসিতে বায়ুবেগে অশ্ব ছুটাইয়া দিল।

পাটলিপুত্রের দুর্গতোরণে যখন উল্কা পৌঁছিল, তখন বেলা দ্বিপ্রহর। শান্তির সময় দিবাভাগে তোরণে প্রহরী থাকে না, নাগরিকগণও মধ্যাহ্নের খর রৌদ্রতাপে স্ব স্ব গৃহচ্ছায়া আশ্রয় করিয়াছে; তাই তোরণ জনশূন্য। কেবল উল্কার পথশ্রান্ত সহচরগণ উৎকণ্ঠিতভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে।

উল্কা উন্নত তোরণ-সম্মুখে ক্ষণেক দাঁড়াইল। একবার উত্তরে দূর-প্রসারিত শূলকণ্টকিত শ্মশানভূমির দিকে দৃষ্টি ফিরাইল, তার পর নিবদ্ধ ওষ্ঠাধরে তোরণ-প্রবেশ করিল।

কিন্তু তোরণ উত্তীর্ণ হইয়া কয়েক পদ যাইতে না যাইতে আবার তাহার গতি রুদ্ধ হইল। সহসা পার্শ্ব হইতে বিকৃত-কণ্ঠে কে চীৎকার করিয়া উঠিল—"জল! জল! জল দাও!"

রুক্ষ উগ্রকণ্ঠের এই প্রার্থনা কাণে যাইতেই উল্কা অশ্বের মুখ ফিরাইল। দেখিল, তোরণপার্শ্বস্থ প্রাচীরগাত্র হইতে লৌহবলয়-সংলগ্ন স্থূল শৃঙ্খল ঝুলিতেছে, শৃঙ্খলের প্রান্তে এক নরাকার বীভৎস মূর্ত্তির কটিতে আবদ্ধ, মূর্ত্তির করপত্র নাই, পদদ্বয়ও জঙ্ঘাসন্ধি হইতে বিচ্ছিন্ন—জটাবদ্ধ দীর্ঘ কেশে মুখ প্রায় আবৃত। সে তপ্ত পাষাণ-চত্বরের উপর কৃষ্ণকায় কুম্ভীরের মত পড়িয়া আছে এবং লেলিহ রসনায় অদূরস্থ জলকুণ্ডের দিকে তাকাইয়া মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে,—"জল! জল!" মাধ্যন্দিন সূর্য্যতাপে তাহার রোমশ দেহ হইতে স্বেদ নির্গত হইয়া চত্বর সিক্ত করিয়া দিতেছে।

উল্কা উদাসীনভাবে সেই দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার মনে করুণার উদ্রেক হইল না। শুধু সে মনে মনে ভাবিল,—এই মগধবাসীরা দেখিতেছি নিষ্ঠুরতায় অতিশয় নিপুণ।

শৃঙ্খলিত ব্যক্তি জন-সমাগম দেখিয়া, জানুতে ভর দিয়া উঠিল, রক্তিম চক্ষুতে চাহিয়া বন্য জন্তুর মত গর্জ্জন করিল—"জল! জল দাও!"

উল্কা এক জন সহচরকে ইঙ্গিত করিল; সে জলকুণ্ড হইতে জল আনিয়া তাহাকে পান করাইল। শৃঙ্খলিত ব্যক্তি উত্তপ্ত মরুভূমির মত জল শুষিয়া লইল। তার পর তৃষ্ণা নিবারিত হইলে অবশিষ্ট জল সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া লইল।

উল্কা জিজ্ঞাসা করিল,—"কোন্ অপরাধে তোমার এরূপ দণ্ড হইয়াছে?"

গত তিন বৎসর ধরিয়া বন্দী প্রতিনিয়ত বিদ্রূপকারী নাগরিকদের নিকট এই একই প্রশ্ন শুনিয়া আসিতেছে। সে উত্তর দিল না,—হিংস্রদৃষ্টিতে উল্কার দিকে তাকাইয়া পিছু ফিরিয়া বসিল।

উল্কা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"কে তোমার এরূপ অবস্থা করিয়াছে? শিশুনাগবংশের রাজা?"

শ্বাপদের মত তীক্ষ্ণ দন্ত বাহির করিয়া বন্দী ফিরিয়া চাহিল। তাহার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল, একবার মুক্তি পাইলে সে উল্কাকে দুই বাহুতে পিষিয়া মারিয়া ফেলিবে।

উল্কা যে তাহাকে এইমাত্র পিপাসার পানীয় দিয়াছে, সে জন্য তাহার কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা নাই।

সে বিকৃত মুখে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিল—পথের কুক্কুর সব, দূর হইয়া যা, লজ্জা নাই? এক দিন আমি তোদের পদতলে পিষ্ট করিয়াছি, আবার যে দিন এই শৃঙ্খল ছিঁড়িব, সে দিন আবার পদদলিত করিব। এখন পলায়ন কর্—আমার সম্মুখ হইতে দূর হ?"

উল্কার চোখের দৃষ্টি সহসা তীব্র হইয়া উঠিল; সে অশ্বপৃষ্ঠে ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কে তুমি? তোমার নাম কি?"

ক্ষিপ্তপ্রায় বন্দী তুই বাহু দ্বারা নিজ বক্ষে আঘাত করিতে করিতে বলিল,—"কে আমি? কে আমি? তুই জানিস না? মিথ্যাবাদিনি, আমাকে কে না জানে? আমি চণ্ড—আমি মহারাজ চণ্ড! তোর পিতৃ! তোর দণ্ডমুণ্ডের অধীশ্বর! বুঝলি? আমি মগধের সম্রাট অধিপতি মহারাজ চণ্ড।"

উল্কা ক্ষণকালের জন্য যেন পাষাণে পরিণত হইয়া গেল। তার পর তাহার সমস্ত দেহ কম্পিত হইতে লাগিল, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিল, নাসা স্ফারিত হইতে লাগিল। তাহার এই পরিবর্তন বন্দীরও লক্ষ্যগোচর হইল, উন্মত্ত প্রলাপ বকিতে বকিতে সে সহসা থামিয়া গিয়া নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া রহিল।

উল্কা কথঞ্চিৎ আত্মসম্বরণ করিয়া সহচরদের দিকে ফিরিল, নীরস্বরে কহিল,—"তোমরা ঐ পিপ্পলীবৃক্ষতলে গিয়া আমার প্রতীক্ষা কর, আমি এখনই যাইতেছি।"

সহচরগণ প্রস্থান করিল।

তখন উল্কা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া বন্দীর সম্মুখীন হইল। চত্বরের উপর উঠিয়া একাগ্রদৃষ্টিতে বন্দীর মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিল,—"তুমিই ভূতপূর্ব রাজা চণ্ড?"

চণ্ড সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল,—"ভূতপূর্ব নয়—আমিই রাজা। আমি যত দিন আছি, তত দিন মগধে অন্য রাজা নাই।"

"তোমাকে তবে প্রজারা হত্যা করে নাই?"

'আমাকে হত্যা করিতে পারে, এত শক্তি কাহার?'

রক্তহীন অধরে উল্কা জিজ্ঞাসা করিল,—"মহারাজ চণ্ড, মোরিক নাম্নী জনৈকা দাসীর কথা মনে পড়ে?"

চণ্ডের জীবনে বহুশত মোরিকা ক্রীড়াপুত্তলীর মত যাতায়াত করিয়াছে, দাসী মোরিকার কথা তাহার মনে পড়িল না।

উল্কা তখন জিজ্ঞাসা করিল,—"মোরিকার এক বিষকন্যা জন্মিয়াছিল, মনে পড়ে?"

এবার চণ্ডের চক্ষুতে স্মৃতির আলো ফুটিল, সে হিংস্র হাস্যে দন্ত নিষ্ক্রান্ত করিয়া বলিল,—"মনে পড়ে, সেই বিষকন্যাকে শ্মশানে প্রোথিত করাইয়াছিলাম। শিবমিশ্রকেও শ্মশানের শৃগালে ভক্ষণ করিয়াছিল।" অতীত নৃশংসতার স্মৃতির মধ্যেই এখন চণ্ডের একমাত্র আনন্দ ছিল।

উল্কা অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল,—"সে বিষকন্যা মরে নাই, শিবমিশ্রকেও শৃগালে ভক্ষণ করে নাই। মহারাজ নিজের কন্যাকে চিনিতে পারিতেছেন না?"

চণ্ড চমকিত হইয়া মুণ্ড ফিরাইল।

উল্কা তাহার কাছে গিয়া কর্ণকুহরে বলিল—"আমিই সেই বিষকন্যা। মহারাজ, শিশুনাগবংশের চিহ্ন বাঁধন আছে কি? এ বংশের রক্ত যাহার দেহে আছে, সেই পিতৃহন্তা হইবে।—তাই বহুদূর হইতে বংশের প্রথা পালন করিতে আসিয়াছি।"

চণ্ড কথা কহিবার অবকাশ পাইল না। উদ্যত ফণা সর্প যেমন বিদ্যুদ্বেগে দংশন করে, তেমনই উল্কার ছুরিকা চণ্ডের কণ্ঠে প্রবেশ করিল। সে উত্তানমুখ হইয়া পড়িয়া গেল। তাহার প্রকাণ্ড দেহ মৃত্যুযন্ত্রণায় ধড়্ফড় করিতে লাগিল। দুইবার সে বাক্যনিঃসরণে চেষ্টা করিল, কিন্তু বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না,—মুখ দিয়া গাঢ় রক্ত বিগলিত হইয়া পড়িল। শেষে কয়েকবার পদপ্রক্ষেপ করিয়া চণ্ডের দেহ স্থির হইল।

উল্কা কটিলগ্ন হস্তে দাঁড়াইয়া দেখিল। তার পর ধীর পদে গিয়া নিজ অশ্বে আরোহণ করিল, আর পিছু ফিরিয়া তাকাইল না। তাহার ছুরিকা চণ্ডের কণ্ঠে আমূল বিদ্ধ হইয়া রহিল। নির্জ্জন তোরণপার্শ্বে মধ্যাহ্ন রৌদ্রে ষোল বৎসরের পুরাতন নাট্যের শেষ অঙ্ক যে অভিনয় হইয়া গেল, জনপূর্ণ পাটলিপুত্রের কেহ তাহা দেখিল না।

এইরূপে শোণিতপঙ্কে দুই হস্ত রঞ্জিত করিয়া মগধের বিষকন্যা আবার মগধের মহাস্থানীয়ে পদার্পণ করিল।

[ক্রমশঃ

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।



[উপন্যাস]

১৭

গভীর রাত্রিতে নগর নিদ্রামগ্ন। আকাশে চন্দ্রালোক নাই, কেবল চঞ্চলরশ্মি নক্ষত্রপুঞ্জ। শব্দের মধ্যে নদীর কলধ্বনি, কচিৎ নৈশ পক্ষীর রব। পথে জনপ্রাণী নাই, চারিদিক নিস্তব্ধ।

নদীর দক্ষিণ তীরের নগরপ্রান্তে প্রধানাদ্বয়ের বাসভবন। বৃহৎ প্রাসাদ, চারিদিকে উদ্যান। সিংহদ্বার বন্ধ। সিংহদ্বার উত্তীর্ণ হইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই একটা ঘরে দুই জন রক্ষিকা শয়ন করিয়াছিল। ঘরের এক কোণে প্রদীপ জ্বলিতেছিল।

অকস্মাৎ রক্ষিকাদের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। তাহারা প্রথমে মনে করিল কুস্বপ্ন দেখিতেছে, কিন্তু সে ভ্রম তখনই ভাঙ্গিয়া গেল। যাহা দেখিল, তাহা স্বপ্ন নহে,—বাস্তব। তাহাদের শয্যাপার্শ্বে কৃষ্ণমূর্ত্তি দীর্ঘকায় কে এক জন দাঁড়াইয়া আছে! বৃহৎ গোলাকার চক্ষু, কিন্তু চক্ষুতে তারা নাই, দৃষ্টি নাই। মুখে কথা নাই, হস্তপদের সঞ্চালন নাই, নিস্পন্দ ভীম মূর্ত্তি! রক্ষিকাদের হৃৎপিণ্ড স্থির হইল, নিশ্বাস রুদ্ধ হইল, কণ্ঠতালু শুষ্ক হইল, চক্ষু কপালে উঠিল।

পুরুষ ওষ্ঠাধরে অঙ্গুলী স্পর্শ করিয়া কহিল, কোন শব্দ ক'রো না, চীৎকার ক'রো না, তা হ'লে তোমাদের কোন ভয় নেই। গোল করলে তোমাদের বিপদ্ হবে। প্রধানারা কোথায়?

এক জন রক্ষিকা অঙ্গুলী দিয়া ভিতর দিকে দেখাইয়া দিল। তাহাদের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছিল না।

যে ঘরে রক্ষিকারা শয়ন করিয়াছিল, তাহার পাশে একটি ছোট কুঠরী ছিল, তাহাতে একটি দরজা, জানালা নাই। ওমন রক্ষিকাদের সেই ঘরে প্রবেশ করিতে আদেশ করিয়া কহিল, তোমরা এই ঘরে থাক, কিন্তু কোন শব্দ ক'রো না। প্রধানাদের সঙ্গে আমার গোটা কতক কথা আছে, ফিরে এসে তোমাদের দরজা খুলে দেব।

কুঠরীতে রক্ষিকারা প্রবেশ করিলে ওমন বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া নিঃশব্দে প্রধানাদিগের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। তাহারা পাশাপাশি দুইটি স্বতন্ত্র ঘরে শয়ন করিতেন।

ঘরে আলোক জ্বলিতেছিল। ওমন নিদ্রিতা প্রধানার চক্ষুর উপর বিদ্যুতের আলোক ধরিতেই বৃদ্ধা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। ভীষণ কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি ও বৃহৎ গোলাকার চক্ষু দেখিয়া তিনি যেমন চীৎকার করিবার উপক্রম করিবেন, অমনই ওমন তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিল, গম্ভীর স্বরে কহিল, তুমি স্ত্রীলোক, বৃদ্ধা, তোমাকে আঘাত করবার আমার ইচ্ছে নেই, কিন্তু চেঁচামেচি করলে তোমাকে গলা টিপে মারব। কোন শব্দ ক'রো না, তা হ'লে তোমার কোন ভয় নেই।

বৃদ্ধা চীৎকার করিবার বা কথা কহিবার চেষ্টা করিলেন না, কম্পিত-শরীরে, ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে ওমনকে দেখিতে লাগিলেন।

ওমন বলিল, তোমরা দুজন, আর এক জন কোথায়?

বৃদ্ধা মস্তক হেলাইয়া পাশের ঘর দেখাইয়া দিলেন। তমন বলিল, ঐ ঘরে চল্।

প্রধানার হস্ত ধারণ করিয়া তমন পাশের ঘরে লইয়া গেল। পাশের ঘরে কণ্ঠশব্দ শুনিয়া দ্বিতীয় প্রধানার নিদ্রা-ভঙ্গ হইয়াছিল, অপর প্রধানাও তমনকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া শিহরিত-কণ্টকিত-শরীরে শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। তমন কহিল, কোন গোল ক'রো না, এই আর এক জন যেমন চুপ ক'রে আছে, সেই রকম চুপ ক'রে থাক।

প্রধানা দুই জনই স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তমন বলিল, তোমাদের সঙ্গে কিছু কথা আছে। আমি যা জিজ্ঞাসা করব, তার যথার্থ উত্তর দিলে তোমাদের কোন আশঙ্কা নেই।

তমন প্রথম প্রধানার হস্ত পরিত্যাগ করিয়াছিল। তিনি গিয়া দ্বিতীয় প্রধানার পাশে বসিলেন। দ্বিতীয় প্রধানা সাহস করিয়া তমনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? পাহাড় থেকে এসেছ?

তমন কহিল, পাহাড় থেকে এলে তোমাদের ভয় কি? যারা পাহাড়ে থাকে, তাদের ভরসাতেই ত এখানে এমন অত্যাচার হয়। আমি আর এক দেশ থেকে এসেছি। এখানে আর পাহাড়ে যারা নিষ্ঠুর আচরণ করে, তাদের আমি শাস্তি দেব।

ভয়ে ভয়ে দ্বিতীয় প্রধানা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সঙ্গে অন্য লোক আছে?

তমন কহিল, আমার যত লোকের আবশ্যক হয়, আমি পাব। তোমাদের আর রক্ষিকাদের আমি একাই শাসন করতে পারি। এখানে নগর-শাসনের ভার কার হাতে?

—আমরা দুই জন প্রধানা, সকল ক্ষমতা আমাদের হাতে।

—এখানে কেউ পুরুষ নেই কেন?

—পুরুষ থাকবার নিয়ম নেই।

—কার নিয়ম?

—যাঁরা পাহাড়ে শাসনকর্ত্তা, তাঁদের।

—স্বামি-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা সকলে একসঙ্গে বাস করে না কেন?

—করবার প্রথা নেই।

—এ কি রকম পৈশাচিক প্রথা? স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে সহবাস করতে পায় না, মা ছেলের মুখ দেখতে পায় না। এই দুই নগরে কত যুবতী, কত বর্ষীয়সী শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে বাস করছে। ভয়ে কেউ মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না, কারুর অনুযোগ-অভিযোগ করবার ক্ষমতা নেই। কিছু হলেই, কোন কথা প্রকাশ হলেই তোমরা নির্ব্বাসন কর। কোথায় নির্ব্বাসন কর?

এইবার প্রথম প্রধানা কথা কহিলেন, বলিলেন, তা আমরা বলব না, বলতে নিষেধ।

তমন দুই হাতে দুই প্রধানার গলা টিপিয়া ধরিল, বলিল, আমি যদি তোমাদের গলা টিপে মারি ত আমাকে নিষেধ করে কে? তোমাদের হত্যা করলে স্ত্রীহত্যা হবে না, পিশাচী-বধ করা হবে।

তমন গলা চাপিতে আরম্ভ করিল, প্রথম প্রধানা হাঁপাইয়া বলিলেন, ছাড়, ছাড়, বলছি।

তমন গলা ছাড়িয়া দিল। দন্তে দন্ত ঘর্ষিত করিয়া বিকট স্বরে কহিল, হয় বল, না হয় মর।

প্রধানা বলিলেন, উত্তরদিকে পাহাড়ের নীচে ছুটো বাড়ী আছে, নির্ব্বাসিতরা সেইখানে থাকে। বাইরে যেতে পায় না।

তমন বলিল, এইবার তোমরা নিষ্কৃতি পেলে, কিন্তু সাবধান, যেন কোন কথা প্রকাশ না হয়, তা হ'লে তোমরা রক্ষা পাবে না।

প্রধানা দুই জন সমস্বরে কহিলেন, আমরা কিছু প্রকাশ করব না। রক্ষিকারা কোথায়?

তমন বিদ্রূপ করিয়া হাসিল, কহিল, তারা আমার কি করবে? আমি তাদের বন্ধ ক'রে রেখেছি, এখন গিয়ে তাদের ছেড়ে দেব। তোমরা যেন বাইরে যাবার চেষ্টা ক'রো না, যেমন আছ, তেমনি থাক।

প্রধানারা বলিলেন, আমরা কিছু করব না।

তমন বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া, রক্ষিকা-দ্বয়কে মুক্ত করিয়া, তাহাদের নিজের ঘরে লইয়া গেল। সেখানে গিয়া চক্ষুর ঠুলি খুলিয়া ফেলিল।

রক্ষিকারা বিস্মিত হইয়া দেখিল, তাহারা যাহা চক্ষু মনে করিয়াছিল, তাহা চক্ষু নয়, চক্ষুর আবরণ। তমনের চক্ষু আয়ত, হাস্য-কৌতুকপূর্ণ। রক্ষিকাদের ভয় কতকটা ভাঙ্গিয়া গেল, এক জন জিজ্ঞাসা করিল, তোমার চোখে ও কি ও?

তমন বলিল, ওটা চোখের ঢাকা। তোমরা ভয় পেয়েছিলে ব'লে খুলে ফেলেছি। তোমরা যেন প্রধানাদের কাছে এ কথা বলো না।

—না, আমরা কিছু বলব না।

তমন রক্ষিকাদের মুখে, অঙ্গে হস্ত বুলাইয়া দিল। তাহাদের কলেবর রোমাঞ্চিত হইল, বক্ষঃস্থল চঞ্চল হইল, নিশ্বাস ঘন ঘন বহিতে লাগিল। তমন কহিল, তোমাদের কোন ভয় নেই, কিন্তু কাউকে কিছু বলো না, প্রধানারা যেন কিছু জানতে না পায়। তোমরা যাতে সুখে থাক, সে উপায় হবে। তোমরা যদি আমার কথা শোন, তা হ'লে তোমাদের মঙ্গল হবে।

এক জন রক্ষিকা তমনের হস্ত স্পর্শ করিয়া কহিল, তুমি আমাদের যা করতে বলবে, তাই করব। তুমি কে, আমাদের বল।

—আমি আর এক দেশের লোক, আমার মত সেখানে আরও অনেক আছে। তোমাদের মতও অনেক আছে। সকলে একসঙ্গে থাকে, কতক পাহাড়ে আর কতক নগরে থাকে না। এখানেও তাই হবে। প্রধানাদের ক্ষমতা বেশী দিন থাকবে না। তোমরা প্রধানাদের অজ্ঞাতে নগরবাসিনীদের সঙ্গে পরামর্শ কর। এর পর আর সোনা-রূপার যষ্টির প্রয়োজন হবে না।

ঘরের কোণে সোণালি রূপালি ছড়ি ছিল, তমন নীচে ফেলিয়া দিল। সোণা-রূপার ছড়ি মাটীতে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল।

তমন কহিল, এইবার তোমরা প্রধানাদের কাছে যাও। আমি চললাম।

রক্ষিকারা কহিল, আবার কবে আসবে?

তমন বলিল, আবার শীঘ্রই আসব, তখন তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।

তমন চলিয়া গেল, নিমেষের মধ্যে অন্ধকারে ছায়ার মত মিলাইয়া গেল।

রক্ষিকারা সতৃষ্ণ-নয়নে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, তাহার পর দুই জনে চুপি চুপি বলাবলি করিল, ওদের কিছু বলা হবে না, ওরা যত ভয় পায়, ততই ভাল।

দুই জনে দরজা খুলিয়া প্রধানাদের ঘরে প্রবেশ করিল। তাহারা ভয়ে কাঁপিতেছে, চক্ষু ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। এক জন প্রধানা বলিলেন, চ'লে গিয়েছে? তোমাদের মারধর করেনি ত?

এক জন রক্ষিকা ঢোক গিলিয়া বলিল, আমাদের মারেনি, বেঁধে রেখেছিল। এখন খুলে দিয়ে চ'লে গেল। ব'লে গেল, কোন কথা প্রকাশ করলে আবার এসে আমাদের মেরে ফেলবে।

—আমাদেরও সেই কথা ব'লে গিয়েছে। আমাদের গলা টিপে ধরেছিল, আর একটু হ'লে মেরে ফেলত।

—ওটা দৈত্য। কি ভয়ানক চোখ দুটো! মুখের অর্দ্ধেকটা যেন চোখ!

এক জন প্রধানা বলিলেন, ও কি একা এসেছে না ওর সঙ্গে আরও আছে?

—ওর সঙ্গে আরও সব নিশ্চয় আছে। ওরা কি করবে, কে জানে?

প্রধানা বলিলেন, কাল তা জানা যাবে। আমরা কাউকে কিছু বলব না, তোমরাও কোন কথা প্রকাশ ক'রো না।

রক্ষিকারা বলিল, আমাদের ত আর মরবার সাধ হয়নি যে, আমরা কিছু বলব? তা হ'লে রাত্রিবেলা এসে আমাদের মেরে রেখে যাবে।

প্রধানারা রক্ষিকাদিগকে রাত্রির ঘটনা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন। রক্ষিকা দুই জন শয়ন করিতে গেল। অনেকক্ষণ তাহাদের চক্ষুতে নিদ্রা আসিল না, দুই জনে চুপি চুপি কথা কহিতে লাগিল।

নিদ্রিত অবস্থায় দুই জন স্বপ্ন দেখিল, যেন সেই পুরুষ তাহাদের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া বলিতেছে, আমার সঙ্গে চল, তোমরা সুখে থাকবে।

পরদিবস সকলে দেখিল, লুণার বাড়ীর সম্মুখে সে নৌকা নাই। লুণা বলিল, রাত্রিতে বোধ হয় দড়ি ছিঁড়ে নৌকাটা ভেসে গিয়েছে, তার আর কি করা যাবে?

অপর পরীদের সঙ্গে সেই দুই জন রক্ষিকাও আসিয়া উপস্থিত হইল। লুণা, পিরী ও ছায়া আলাদা একটু দূরে দাঁড়াইয়াছিল। রক্ষিকারা তাহাদের নিকটে গিয়া বলিল, সে নৌকাটা ভেসে গিয়েছে না কেউ নিয়ে গিয়েছে?

লুণা বলিল, কে আবার নিয়ে যাবে? জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে।

এক জন রক্ষিকা লুণার মুখের দিকে চাহিয়া যেন অন্যমনে বলিল, আমি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলাম। কে এক জন যেন আমার পাশে দাঁড়িয়ে, চোখ দুটো মস্ত গোল গোল—

রক্ষিকা কথাটা শেষ করিল না, স্থিরদৃষ্টিতে লুণার মুখ দেখিতে লাগিল। লুণা, শিরী ও ছায়া মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিল। ছায়া বলিল, যাকে স্বপন দেখেছিলে, সে তোমাকে কিছু বলেছিল?

—হ্যাঁ, বলেছিল, সে আরও অনেককে স্বপ্নে দেখা দিয়েছে। বললে, এখানে বড় অত্যাচার হয়, তাদের দেশে হয় না। সে পাহাড়েও যাবে বললে। আরও বললে, এখানকার দুঃখ ঘুচে যাবে, সকলে সুখে থাকবে। কি মজার স্বপ্ন! তোমরা কেউ ও রকম স্বপ্ন দেখেছিলে?

—সে কি বলেছিল, যারা স্বপন দেখেছিল, তারা সকলে মিলে পরামর্শ করবে?

—বলেছিল বৈ কি!

—আমরাও ঐ রকম স্বপন দেখেছিলাম, কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে ত সে সব কথা হ'তে পারে না। সন্ধ্যার পর তোমরা একবার লুণার বাড়ীতে আসতে পার?

—পারব না কেন? আজ আমাদের প্রধানাদের বাড়ী আগলাবার পালা নয়।

সন্ধ্যার পর লুণার বাড়ীতে একে একে অনেকে আসিল। রক্ষিকা দুই জনও আসিল। অনেকক্ষণ তাহাদের গোপনে পরামর্শ হইল।

১৮

উত্তরদিকে পাহাড়ের নীচে প্রকাণ্ড অরণ্য, তাহার ভিতর প্রাচীরবেষ্টিত বড় বড় দুইটি বাড়ী। বাহির হইতে কিছু দেখা যায় না, বনে প্রবেশ করিয়াও নিকটে না আসিলে বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায় না। এই দুই বাড়ীতে নির্ব্বাসিত পরীরা থাকিত। যাহাদের পাখা আছে, তাহারা একটা বাড়ীতে, যাহাদের পাখা নাই, তাহারা দ্বিতীয় বাড়ীতে। প্রত্যেক বাড়ীতে দশ জন প্রতিহারিণী, তাহারা এক বৃদ্ধার অধীনে।

পলায়নের কোন পথ ছিল না। যাহাদের পাখা আছে, তাহাদের উড়িবার উপায় নাই, চারিদিকে বড় বড় গাছ, শাখাপত্রে চারিদিক আচ্ছন্ন। যাহাদের পাখা নাই, তাহাদের ত কথাই নাই। নির্ব্বাসিতারা অনেকেই যুবতী। তাহাদের অপরাধ, পাহাড়ে পতিপুত্র ত্যাগ করিয়া আসিয়া, শোকে অধীর হইয়া, দুঃখের কথা প্রকাশ করিয়াছিল, অথবা প্রধানাদিগকে কটুবাক্য বলিয়াছিল।

নির্ব্বাসিতাদিগের প্রতি শাসন অত্যন্ত কঠোর। সামান্য অপরাধে, অনেক সময় বিনা অপরাধে তাহাদের কঠিন শাস্তি হইত। কোন রক্ষিকা কাহারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করিলেই বৃদ্ধার আদেশে তাহাকে একটা ঘরে একা বন্ধ করিয়া রাখিত, কখন কখন সারাদিন উপবাসী থাকিতে হইত। সারাদিন বন্দিনীদিগকে কঠিন পরিশ্রম করিতে হইত। তাহারা ধান ভানিত, আটা পিষিত, গৃহ মার্জ্জনা করিত, পাক করিত, বৃদ্ধা ও রক্ষিকাদের সকল কর্ম্ম করিত। সকল সময় বৃদ্ধা তাহাদিগকে গালি দিত, অকারণে শাসাইত। তাহার ভয়ে বন্দিনীরা তটস্থ, তাহার উপর রক্ষিকাদের নির্য্যাতন। কোন কালে মুক্তির আশা ত ছিলই না, অধিকন্তু অত্যাচারে উৎপীড়নে নির্ব্বাসিতারা হতাশ্বাস হইয়াছিল। নিজেদের মধ্যেও ভয়ে তাহারা পরস্পর কিছু বলিতে সাহস করিত না, নীরবে সাশ্রুনয়নে সকল অত্যাচার সহ্য করিত। এক মরণ ছাড়া তাহাদের যন্ত্রণা শেষ হইবার অন্য উপায় ছিল না।

রাত্রিকালে বাহিরের ফটক বন্ধ করিয়া, ফটকের পাশে একটা কুঠরীতে এক জন রক্ষিকা শয়ন করিত। যে সকল ঘরে নির্ব্বাসিতারা শয়ন করিত, সেগুলার দরজা বাহির হইতে বন্ধ। রক্ষিকারা একটা বড় ঘরে দরজা ভেজাইয়া দিয়া শয়ন করিত। বৃদ্ধার স্বতন্ত্র মহল। তাহার উত্তম পালঙ্ক, তাহাতে পুরু কোমল শয্যা। ঘরের দরজার পাশে এক জন রক্ষিকা শয়ন করিয়া থাকিত। রাত্রিতে কোন রকম গোলযোগের কিছু আশঙ্কা ছিল না।

প্রাচীরের এক পাশে একটা বৃহৎ বৃক্ষের শাখা প্রাচীরের অভিমুখে নমিত হইয়াছিল। গভীর অন্ধকার রাত্রিতে তমন সেই গাছে উঠিয়া প্রাচীরে আরোহণ করিল। তাহার পর নিঃশব্দে প্রাচীরের ভিতর লাফাইয়া পড়িল। ফটকের কাছে গিয়া পাশের কুঠরী খুলিয়া দেখিল, রক্ষিকা নিদ্রিতা। তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতেই সে জাগিয়া উঠিয়া চীৎকার করিবার পূর্ব্বেই তমন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল, তাহার মুখে কাপড় দিয়া তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। বলিল, ভাল চাও ত

গোল ক'রো না। যদি প্রাণের মায়া থাকে, তা হ'লে আমি যা বলি, তাই করবে।

সেই দীর্ঘকায়, আপাদমস্তক কৃষ্ণমূর্তি ও বৃহৎ গোলাকার দৃষ্টিশূন্য চক্ষু দেখিয়া রক্ষিকা ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মুখ খুলিয়া দিলেও সে চীৎকার করিতে পারিত না। তমন বলিল, আর সব রক্ষিকারা যেখানে আছে, সেইখানে আমার সঙ্গে চল।

অপর রক্ষিকারা যে ঘরে শয়ন করিয়াছিল, বেত্রবতী তমনকে সেই ঘরে লইয়া গেল। তমন প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিল। রক্ষিকারা গোলমাল করিবার পূর্ব্বেই তাহাদের হাত, পা, মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। তাহারা আড়ষ্ট হইয়া তমনকে দেখিতে লাগিল।

যে রক্ষিকা তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহাকে বাহিরে ডাকিয়া তমন বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিল। তাহাকে বলিল, প্রধানা কোথায় থাকে, আমাকে দেখিয়ে দাও।

রক্ষিকা কলের মত তমনকে প্রধানার মহলে লইয়া গেল। সেখানে প্রধানা ও অপর রক্ষিকাকে বাঁধিয়া, ঘরে বন্ধ করিয়া, প্রথম রক্ষিকাকে সঙ্গে করিয়া বাহিরে আসিল। ফটকের কাছে গিয়া রক্ষিকাকে বলিল, দরজা খোল।

প্রাচীরের বাহিরে আসিয়া তমন রক্ষিকার মুখ খুলিয়া দিল। বলিল, অন্য বাড়ীর দ্বার-রক্ষিকাকে জাগাও, তাকে বল যে, প্রধানা তাকে ডেকেছে। আর কিছু বলো না, চীৎকার ক'রো না, তা হ'লে তখনই তোমার মৃত্যু হবে।

তমন রক্ষিকার গলায় হাত দিয়া, অল্প চাপিয়া কথাটা বুঝাইয়া দিল। রক্ষিকা অন্য গৃহের সম্মুখে গিয়া দ্বারে করাঘাত করিল। ভিতর হইতে নিদ্রাজড়িত স্বরে অপর প্রতিহারিণী জিজ্ঞাসা করিল, কে ও? এত রাত্রিতে দোর ঠেলে কে?

রক্ষিকা বলিল, আমি ও-বাড়ী থেকে এসেছি। দরজা খুলে শীঘ্র এস, প্রধানা তোমাকে ডাকছেন।

—রাত্রিতেও একটু ঘুমাবার জো নেই, বলিয়া রক্ষিকা গজ-গজ করিতে করিতে দ্বার মুক্ত করিল। তমন তৎক্ষণাৎ তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। যে রক্ষিকা তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহাকে বলিল, আর সব রক্ষিকা কোথায়?

প্রতিহারিণী পথ দেখাইয়া লইয়া গেল। তমন দ্বিতীয় রক্ষিকার হাত ধরিয়াছিল। এবারও প্রতিহারিণীগণ অনায়াসে বন্দিনী হইল। সকলের হাত, পা, মুখ বাঁধিয়া দিয়া, তমন বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিল। কেবল যে রক্ষিকা তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহাকে বাহিরে লইয়া আসিল। বলিল, তুমি যদি আমার কথা শোন, তা হ'লে তোমার কোন আশঙ্কা নেই। আর সকলের কি হবে, আমি এখনও স্থির করিনি। যারা নির্ব্বাসিত হয়েছে, তারা নগরে ফিরে যাবে, তুমি আমার আদেশ পালন করলে তুমিও যাবে।

রক্ষিকার আর এক ভয় উপস্থিত হইল। সে বলিল, সহরে যে প্রধানারা আছে!

তমন কহিল, এখানে প্রধানার যা হয়েছে, সেখানে তাদেরও তাই হবে। তোমার কোন ভয় নেই।

তমন চক্ষুর ঠুলি খুলিয়া ফেলিল। রক্ষিকা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, তোমার চোখে ও কি দিয়েছিলে?

হাসিতে হাসিতে তমন বলিল, ওটা তোমাদের ভয় দেখাবার জন্য। যারা এখানে বন্দিনী, তাদের ভয় দেখাবার আবশ্যক নেই। তারা কোথায়?

রক্ষিকা তমনকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। বন্দিনীরা জাগরিত হইয়া প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিল না। তমনকে দেখিয়া তাহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইল, প্রথমে কিছু ভয়ও পাইল। যখন শুনিল, তাহারা মুক্তিলাভ করিয়াছে এবং প্রধানা ও রক্ষিকাগণ বন্দিনী হইয়াছে, তখন তাহাদের বিশ্বাসই হইল না। তাহারা কিছু শুনিতে পায় নাই, তমনের সঙ্গে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, কেমন করিয়া এমন অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল? তমন তাহাদিগকে ডাকিয়া, যে ঘরে রক্ষিকারা হাত-পা-বাঁধা পড়িয়াছিল, সেখানে লইয়া গেল। তমন তাহাদের মুখের বাঁধন খুলিয়া দিল। নির্ব্বাসিতাদিগকে বলিল, তোমরা যদি বল, তা হ'লে এদের খুলে দেই। এদের আর ভয় করবার কোন প্রয়োজন নেই। এরা ত এই ক'জন, তোমরা সংখ্যায় অনেক বেশী। তোমাদের কথা যদি না শোনে, তা হ'লে এদের সাজা দিতে পার। তোমরা স্বচ্ছন্দে নগরে ফিরে যেতে পার।

দুই বাড়ীর নির্ব্বাসিতারা মিলিত হইয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। প্রধানা ও রক্ষিকারা অনেক অনুনয় করিয়া মুক্তি পাইল। নির্ব্বাসিতারা পরদিবস নগরে ফিরিবার সঙ্কল্প করিল।

১৯

দুই নগরে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। প্রধানাদের মনে সর্ব্বদাই ভয়, সমস্তক্ষণ আশঙ্কা। নগরবাসিনী পরীদের মনে আশা, আনন্দের পূর্ব্বাভাস। প্রধানারা ভাবিতেন, সেই ভীমদর্শন পুরুষ আবার কোন্ দিন আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন তাঁহাদের কোন একটা বিষম বিপদ ঘটিবে। তাঁহাদের শাসন স্থগিত হইল, শাস্তিবিধান রহিত হইল। দিনে অথবা রাত্রিকালে কখনও তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। দৃষ্টি সর্ব্বদা গৃহদ্বারের অভিমুখে, কখন্ সেই করালমূর্ত্তি, কঠোরকণ্ঠ পুরুষ গৃহে প্রবেশ করিবে। রক্ষিকাদিগকে সকল সময় নিকটে রাখিতেন। তাহারা যে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে, সে আশা ছিল না, তথাপি তাহারা থাকিলে তাঁহাদের কতকটা ভরসা হইত। কিন্তু বেত্রবতীরাও অনেক সময় উপস্থিত থাকিত না, তাঁহাদের অনুমতি না লইয়াই নগরে চলিয়া যাইত। তাহাদিগকে শাসন করিতে প্রধানাদের সাহস হইত না।

নগরে কিছু দিন গোপনে আন্দোলন হইতেছিল, কিন্তু প্রধানাদের শাসন যেমন শিথিল হইতে আরম্ভ হইল, গোপনে পরামর্শ করিবার প্রয়োজন সেই অনুসারে হ্রাস হইতে লাগিল। যে কারণে প্রধানাদের ভয়, সেই কারণেই নগরবাসিনীদের আশা ও উৎসাহ। লুণা, শিরী, ছায়া, অলকা নিত্য পরামর্শ করিত, তাহাদের দল প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল। রক্ষিকারাও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল। নগর পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তমন লুণা ও শিরীকে বলিয়া গিয়াছিল যে, সে প্রথমে নির্ব্বাসিতাদিগের মুক্তির উপায় করিবে, তাহাদের নগরে ফিরিয়া আসিবার ব্যবস্থা করিবে। তাহার পর পাহাড়ে যাইবে। সকলে মিলিয়া সেই কথার আলোচনা করিত। নির্ব্বাসন করিয়া কোথায় পাঠাইয়া দেয়, তাহা ত কেহ জানিত না, সুতরাং নির্ব্বাসিতারা কোন্ দিক হইতে ফিরিয়া আসিবে, তাহা কেহ বলিতে পারিত না। তমনের অসীম শক্তিতে সকলের অটল বিশ্বাস, সকলেরই দৃঢ় ধারণা যে, সে যাহা বলিয়াছে, তাহাই হইবে। সে একা প্রধানা ও রক্ষিকাদিগকে দমন করিয়াছিল, তাহার এমন প্রতাপ যে, তাহার অবর্ত্তমানেও প্রধানারা কিছু করিতে সাহস করিতেন না, রক্ষিকারা তাঁহাদের ভয়ের কথা বলিয়া উপহাস করিত। নগর আগ্রহ ও উৎসাহপূর্ণ এবং চঞ্চল হইয়া উঠিল। দুই নগর মিলিত হইয়া যেন এক হইল। পূর্ব্বের পরস্পরে বিদ্বেষভাব তিরোহিত হইল। পক্ষযুক্ত আর পক্ষশূন্য পরীদের মধ্যে কোনরূপ মনোমালিন্য রহিল না। সকলেরই বিশ্বাস, পূর্ব্বের শাসন ও অত্যাচারের অবসান হইয়াছে, সুখের নূতন দিন আসিতেছে। লুণা ও শিরী সর্ব্বদা তমনকে স্মরণ করিত। এই বিচিত্রবীর্য্য, দিব্যকান্তি পুরুষ কোথা হইতে আসিল? কেন সে তাহাদের মঙ্গলের—মুক্তির জন্য এরূপ অসাধ্যসাধন স্বীকার করিয়াছে? শিশু যেমন অবহেলা করিয়া পুতুল ভাঙ্গিয়া ফেলে, তমন সেইরূপে অবলীলাক্রমে প্রধানাদের ক্ষমতা চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। পাহাড়েও কি সে সেইরূপ সহজে সিদ্ধকাম হইবে? লুণা ও শিরী মাত্র এক জন প্রহরীকে দেখিয়াছিল। দুই দিকের পাহাড়ে ঐরূপ কত প্রহরী আছে, কে জানে? যদি তমনের কোন বিপদ হয়, যদি প্রহরীরা মিলিত হইয়া তাহাকে হত্যা করে? এ কথা মনে হইলে শিরী ও লুণার হৃদয় ভয়ে কাঁপিয়া উঠিত, আবার তমনের অলৌকিক ক্ষমতা স্মরণ করিয়া সে আশঙ্কা অপনীত হইত। তমন ত শুধু বলবান্ নয়, তাহার কৌশলের সীমা নাই। যে দুই জন রক্ষিকা রাত্রিতে প্রধানাদের গৃহে ছিল, তাহাদের মুখে শিরী ও লুণা সকল কথা শুনিয়াছিল। তমন কিরূপে অলক্ষ্যে নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা কিছু বুঝিতে পারে নাই। তাহারা অথবা প্রধানারা কেহ চীৎকার করিবার কিংবা কাহাকেও ডাকিবার অবসর পায় নাই। তমন যেমন গোপনে আসিয়াছিল, সেইরূপ অন্ধকারে নিঃশব্দে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া অবধি প্রধানাদের ভয় কিছুতেই ঘুচিতেছিল না। আবার কোন্ দিন অলক্ষ্যে সেই ভীষণদর্শন মূর্ত্তি উপস্থিত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? আবার আসিয়া কি করিবে, কে জানে?

লুণা ও শিরীর মনে তমনের পুনদর্শনলালসা সর্ব্বদা জাগরূক থাকিত। পুরুষের মধ্যে তাহারা পর্ব্বতের সেই প্রহরী এবং তমনকে দেখিয়াছিল। প্রহরীর সহিত তমনের তুলনাই হয় না। প্রহরী তাহাদের পথরোধ করিয়াছিল, তমন তাহাদের পথ মুক্ত করিবার আশ্বাস প্রদান করিয়াছিল। তমনকে তাহারা ত অন্য দেশের লোক বিবেচনা করিত না, অন্য লোকের অসামান্য ক্ষমতাশালী পুরুষ মনে করিত। তাহার পথ কেহ রোধ করিতে পারে নাই।

তাহার যেমন শক্তি, তেমনই সৌম্য মূর্ত্তি। তাহার চক্ষুর দৃষ্টি, তাহার মুখের কথা সর্ব্বদা তাহাদের স্মরণ হইত। আবার সে কবে আসিবে, কবে আবার তাহাকে দেখিয়া তাহাদের নয়ন তৃপ্ত হইবে?

ছায়া, অলকা ও আরও অনেকের মনে অনুরূপ আশার সঞ্চার হইয়াছিল। তাহারা ভাবিত, তমনের সহায়তায় তাহাদের পতিপুত্রের সহিত পুনর্ম্মিলন হইবে। ছায়ার মনে পড়িত—সুনন্দ ও শিশু কুবলয়ের কোমল মুখশ্রী। সে ভাবিত, তমন তাহাদিগকে পর্ব্বত হইতে লইয়া আসিবে, প্রহরী অথবা আর কেহ তাহাকে নিবারণ করিতে পারিবে না।

উভয় নগরে সকলের মুখে ঔৎসুক্য, নয়নে চঞ্চলতা। কে যেন আসিবে, তাহার সঙ্গে কাহারা আসিবে, সকলে যেন সেই প্রতীক্ষায় থাকিত। সকলের মুখেই যেন একটা মূক প্রশ্ন। সকলেই কাহার প্রতীক্ষায় চারিদিকে চাহিয়া দেখে। সকলেই কাণ পাতিয়া থাকে, কাহারও কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইবে। আশার আলোকে সকলের মুখ উজ্জ্বল, আনন্দের পূর্ব্বানুভূতিতে সকলের হৃদয় উৎফুল্ল। দিন কয়েক এই ভাবে কাটিল। এক দিন অপরাহ্নে নগরবাসিনীরা দেখিল, উত্তরদিকের মাঠ পার হইয়া পরীরা আসিতেছে—কতক আকাশমার্গে, কতক পদব্রজে। তৎক্ষণাৎ দুই নগরে রাষ্ট্র হইয়া গেল—নির্ব্বাসিতারা নগরে ফিরিয়া আসিতেছে। তাহাদিগকে প্রত্যুদ্গমন করিবার নিমিত্ত উভয় নগর হইতে দলে দলে পরীগণ নিষ্ক্রান্ত হইল।

পথশ্রমে নির্ব্বাসিতারা ক্লান্ত, কিন্তু তাহারা মুক্তিলাভ করিয়া নগরে ফিরিয়া আবার সকলের সহিত মিলিত হইয়াছে, এই আনন্দে তাহাদের চক্ষুতে পুলকাশ্রু প্রবাহিত হইতেছিল। নগরের পরীরা তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া গৃহে লইয়া গেল। নির্ব্বাসিতাদিগের সঙ্গে যে রক্ষিকারা আসিয়াছিল, তাহাদের মনে আশঙ্কা ছিল, হয় ত নগরবাসিনীরা তাহাদিগকে তাড়না অথবা অপমান করিবে, কিন্তু সে ভয় সত্বর অপনীত হইল। নগরের পরীরা তাহাদিগকে আশ্বাসিত করিয়া বলিল, তোমাদের কোন ভয় নেই, আমরা তোমাদের কিছু বলব না। তোমরা আমাদের মত নগরে বাস কর, আর রক্ষিকা হবার কোন আবশ্যক নেই। যাকে তোমরা দেখেছিলে, তিনি এখানেও এসেছিলেন, আবার আসবেন। প্রধানাদের আর কোন ক্ষমতা নেই।

নির্ব্বাসিতাদিগের সঙ্গে যে প্রধানা আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে কেহ সম্ভাষণ করিল না, কোন সম্মান প্রদর্শন করিল না। তিনি ভয়ে ভয়ে নগরের প্রধানাদ্বয়ের গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি যে ফিরে এলে? কি হয়েছে?

নবাগত প্রধানা বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন, কি হয়েছে, তোমরা কি জান না? নগরে গিয়ে দেখ, নির্ব্বাসিতারা সব ফিরে এসেছে। আমাকে যে মেরে ফেলেনি, এই আমার কত ভাগ্য! দেখতে যেন সাক্ষাৎ যমদূত!

—তোমাদের ওখানেও গিয়েছিল? আমাদের আর একটু হ'লে গলা টিপে মেরে ফেলত। শুনতে পাই না কি ব'লে গিয়েছে আবার আসবে।

—আমাকে আর রক্ষিকাদের সব বেঁধে রেখেছিল। তার কথায় নির্ব্বাসিতারা সব সাহস পেয়ে চ'লে এল। আমাকে কি রক্ষিকাদের আর গ্রাহ্যও করে না। পাহাড়ে খবর না গেলে ত আমাদের আর রক্ষে নেই।

—পাহাড়ে কি হচ্ছে, তাই বা কে জানে? ওর সঙ্গে, হয় ত ঐ রকম আরও অনেক আছে, তারা পাহাড়ে গিয়ে এই রকম করতে পারে। এখানে ত বেত্রবতীরাও আর আমাদের কথা শোনে না, নগরের সকলের সঙ্গে মিলে কি ষড়যন্ত্র করছে।

প্রধানাদের ত এই অবস্থা, ও দিকে দুই নগরে আনন্দের সীমা নাই। নির্ব্বাসিতাদিগের আনন্দ—তাহারা মুক্তিলাভ করিয়া নগরে ফিরিয়া আসিয়াছে। নগরবাসিনীগণের আনন্দ—প্রধানাদের শাসন রহিত হইয়াছে বলিয়া। রক্ষিকাদিগকে আর কেহ ভয় করে না, তাহারাও অপর সকলের সহিত মিলিত হইল। যাহাদের অবস্থা ছায়ার মত, তাহাদের আনন্দ আশাজনিত, তাহারা আশা করিত, বিচ্ছেদের অবসান হইবে, আবার সুখের দিন আসিবে, স্বামী ও সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া একা বাস করিতে হইবে না।

লূণার বাড়ীতে সর্ব্বদা অপর পরীদের সমাগম। লূণাই প্রথমে তমনকে দেখিয়াছিল, তাহারই গৃহে তমন গোপনে আশ্রয় লইয়াছিল। ছায়ার উৎকণ্ঠা সকলের অপেক্ষা প্রবল, সে যেন কোনমতে স্থির হইয়া থাকিতে পারিত না। সে লূণাকে বলিত, আমরা কি শুধু চুপ ক'রে ব'সে থাকব, আমাদের কিছু করবার নেই?

লুণা বলিত, আমাদের কি ক্ষমতা আছে?

—কেন, আমরা সকলে মিলে পাহাড়ে যেতে পারি, এখানে যেমন আমাদের আর কোন ভয় নেই, পাহাড়েও আমরা সকলকে সেই রকম অভয় দেব।

লুণা মৃদুমন্দ হাসিল, কহিল, তোমার এখন এত সাহস হয়েছে কিসের জন্য? শিরী আর আমি পাহাড়ে যাবার চেষ্টা করেছিলাম, আমাদের কি হয়েছিল জান ত? এত দিন কেউ নিজের ইচ্ছায় পাহাড়ে যাবার কথা পাড়ত? আমরা ত সংখ্যায় অনেক, আমরা এত কাল প্রধানাদের কিছু করতে পেরেছিলাম? যা কিছু করবার, তমন একলা করেছে। কোথায় তার দেশ, কেন সে নিজের প্রাণ তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে এত করছে, আমরা কিছুই জানিনে। আমাদের সব আশা-ভরসা তার উপর। সে ব'লে গেছে, সেই সব করবে। আমরা কেবল এখানে প্রধানাদের আর কোন রকম অত্যাচার করতে দেব না। আমাদের ক্ষমতা এই পর্য্যন্ত। তমন আমাদের পাহাড়ে যেতে বলেনি। আমরা তার পথ চেয়ে এখানেই থাকব।

ছায়া নিরুত্তর হইল।

প্রধানারা আর কোন আদেশ প্রচার করিতেন না। তাঁহারা সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাকিতেন। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, সেই ঘোরদর্শন পুরুষের আগমনে মহা অমঙ্গল ঘটিবে। তাঁহাদের ক্ষমতা অপহরণ করিয়া সে ক্ষান্ত হইবে না। নগরে, পর্ব্বতে কিরূপ বিপ্লব উপস্থিত হইবে, কে বলিতে পারে? সে আবার আসিলে কি তাঁহারা রক্ষা পাইবেন? কোন সময়ে তাঁহাদের আশা হইত যে, পাহাড়ে গিয়া সে ব্যক্তি আর ফিরিবে না। সেখানে শাসন কঠিন, প্রহরীরা মহা বলবান্, সর্ব্বদা সতর্ক, সেখানে সে কি করিতে পারিবে? তাহাকে দেখিতে পাইলেই প্রহরীরা তাহাকে হত্যা করিবে। কিন্তু এই আশার তৃপ্তি অধিকক্ষণ তাঁহাদের মনে স্থান পাইত না। প্রহরী হউক অথবা যে কেহ হউক, এমন মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই ভয়ে নিশ্চেষ্ট হইবে, আত্মরক্ষার কিংবা তাহাকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিতে পারিবে না। সর্ব্বত্র তাহার অপ্রতিহত গতি, রুদ্ধ দ্বার তাহার স্পর্শে মুক্ত হইয়া যায়, কেহ তাহার পদধ্বনি শুনিতে পায় না, সে অপচ্ছায়ার ন্যায় আগমন করে, ছায়ার ন্যায় অপসৃত হয়। কিন্তু সে অশরীরী ছায়ামূর্ত্তিও নয়, স্বপ্নদৃষ্ট অলীক আতঙ্কমূর্ত্তিও নয়। তাহার ক্ষিপ্র কার্য্যতৎপরতার পরিচয় প্রধানারা পাইয়াছিলেন—নিমেষের মধ্যে সে তাঁহাদিগকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। কণ্ঠস্পর্শে তাহার হস্তের বজ্রবল প্রধানারা অনুভব করিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে কে আঁটিয়া উঠিবে?

এক ব্যক্তির আগমনে পরীস্থানে কি বিচিত্র পরিবর্ত্তন ঘটিল! সে কে, কোথা হইতে আসিয়াছিল, কেহ জানিত না। নগরে অনেকে তাহাকে দেখিয়াছিল। লুণার গৃহে সে কিছু দিন বাস করিয়াছিল। যাহারা তাহাকে সহজ বেশে দেখিয়াছিল, তাহারা কেহ ভয় পায় নাই। লুণা ও শিরী তাহাদের মনের ভাব গোপন করিত, কিন্তু উভয়ের হৃদয়ে তমনের প্রতি অনুরাগ উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার মুখচ্ছবি—সুন্দর, তরুণ, নয়নাভিরাম—সর্ব্বদা তাহাদের স্মরণ হইত। তাহার চক্ষুর উজ্জ্বল কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টি স্মরণ করিয়া তাহাদের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিত। সেই উন্নত, ঋজু, দীর্ঘ মূর্ত্তি, ব্যূঢ়স্কন্ধ, ক্ষীণ কটি, দীর্ঘ অর্গল তুল্য কঠিন বাহু তাহাদের মানসচক্ষুর সম্মুখে বিরাজ করিত। তাহাকে মনে পড়িলে শিরীর চক্ষু কোমল হইয়া আসিত, হৃদয় চঞ্চল হইত, দীর্ঘ নিশ্বাস বহিত। লুণা সময়ে সময়ে আকাশে উড়িয়া পর্ব্বতের অভিমুখে অনেক দূর চলিয়া যাইত, চারিদিকে সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিত, যদি তমনকে কোথাও দেখিতে পায়।

প্রতিদিন লুণা ও শিরী তমনের প্রসঙ্গে নানা কথা আলোচনা করিত। সে কোথায় গিয়াছে, কি করিতেছে? নগরে সে যেমন বিনা আয়াসে সিদ্ধকাম হইয়াছে, প্রধানাদিগের ক্ষমতা চূর্ণ করিয়া দিয়াছে, রক্ষিকাদিগকে শাসন করিয়া অপর পরীদিগের দলভুক্ত করিয়াছে, পাহাড়েও কি তাহার চেষ্টা সেইরূপ সফল হইবে? কখন আশঙ্কা, কখন আশা, কিন্তু ইহাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তমন অলৌকিক বলে বলবান্, তাহার যে কোনরূপ বিপদ হইতে পারে, এ আশঙ্কাকে তাহারা অধিকক্ষণ মনে স্থান দিত না।

প্রধানারা তমনকে ছদ্মবেশে দেখিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত আকৃতি কখন দেখেন নাই। তাঁহাদের মনে ভয় ভিন্ন কিছুমাত্র ভরসা ছিল না।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।



অসিধারা

আজিকালি রস-সাহিত্য-রচনায় কতকগুলি অলিখিত বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যে সৌন্দর্য্য সংসারে সচরাচর দেখা যায় না, নায়ক-নায়িকার এমনই রূপ চাই। তার উপর চায়ের আসর, প্রেমের বাসর, সোহাগ-বিরাগ, আলাপ-প্রলাপ, মাঝে মাঝে বিলাসের অজস্র আবির্ভাব, চুম্বনের গর্ভস্রাব, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ গল্পে এ সব অভাব, কেননা, ঘটনাটি সত্য। ইহার নায়ক নীলকণ্ঠ সান্যাল আকৈশোর চাকরী-জীবী, এখন প্রৌঢ়ত্বে উপনীত। নায়িকা মাতৃত্ব-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত। নাম বিনয়িনী হইলে কি হয়! মনের ভাব যাহাই হউক, স্বভাবতঃ অতিশয় অবিনয়ী, দারিদ্র্যের পীড়নে হৃদয় নিষ্পেষিত। মুখরা—কলহে খরতরা। কণ্ঠ কর্কশ। কটু-বাক্য-প্রয়োগে রসনা নীরস। দাম্পত্য-জীবন বিষময়।

নীলকণ্ঠের সওদাগরী অফিসে কাম। বেতন যৎসামান্য। তবে কিছু উপরি পাওনা আছে, তাই কষ্টে-সৃষ্টে কোন রকমে সংসার চলে। কিন্তু এ মাসে তাও বেশী হয় নাই। কোন্ দিক কেমন করিয়া রক্ষা করিবেন, সেই দুশ্চিন্তায় মগ্ন হইয়া নীলকণ্ঠ কর্ম্মস্থল হইতে গৃহে ফিরিতেছিলেন। বাড়ী-ভাড়া দুমাসের জমিয়া গিয়াছে। উঠ্‌নোর দোকানে পাওনা। গত মাসের দুধের দাম বাকী আছে। পুত্র দেবকণ্ঠের স্কুলের মাহিনা দেওয়া হয় নাই—দুমাস, তার উপর জামা-কাপড় না কিনিলে নয়, নহিলে বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ। তার উপর বাড়তি খরচ—গৃহিণীর বাল্যসখীর কন্যার বিবাহ, লৌকিকতা করিতে হইবে। নহিলে গৃহে টেঁকে কার সাধ্য।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নীলকণ্ঠ অতি অন্যমনস্কভাবে চলিতেছিলেন। পশ্চাৎ হইতে একখানা ট্যাক্সি ধাক্কা দিবার উপক্রম করিতেই কে এক জন তাঁহাকে টানিয়া লইল। "চাপা দিলে, চাপা দিলে, যাক্, বড় বেঁচে গেছে," শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী অদৃশ্য হইয়া গেল।

যিনি রক্ষা করিলেন, তিনি এক জন সাধু। বলিলেন, "আপনার মরণ-ফাঁড়া—বড় বেঁচে গেছেন।"

নীলকণ্ঠ একটু বিষন্ন হাসি হাসিয়া কহিলেন, "তা বটে! কিন্তু ম'লে আরও বাঁচতাম।"

সা—কেন, কি দুঃখে?

নী—বেঁচে লাভ?

সা—ম'রে লাভ?

নী—ম'রে লাভালাভের হাত এড়ান।

সা—বেঁচে থেকেও সেটা হ'তে পারে।

নী—কি ক'রে?

সা—যে ধর্ম্মপথে চলে, ভগবানের উপর নির্ভর করে, তিনি তার সকল প্রয়োজন পূর্ণ করেন। তবে বিশ্বাস চাই।

নী—ধর্ম্মপথ? কেমন ক'রে তা বিশ্বাস করি? প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছি, জমীদার প্রজা পীড়ন ক'রে গদীয়ান হয়ে ব'সে রয়েছে। আর আপনি? কিছু মনে করবেন না! গেরুয়া নিয়ে মাথা মুড়িয়ে ধর্ম্মের ধ্বজা উড়িয়ে দোরে দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দুটি পেটের ভাতের জন্য! ধর্ম্ম আপনাকে কি সুখে রেখেছেন? ধর্ম্মপথ? সংসার ত দেখ্‌তে পাই সম্পূর্ণ স্বার্থ-চালিত। যে ষোল আনার যায়গায় আঠারো আনা আদায় করে, সেই ত বেশ সুখে আছে।

সা—মনের সুখে গাছতলায় পড়েও ঘুম হয়। আর এক হাত পুরু গদিতে শুয়েও অধিকাংশ গদীয়ান ঘুমের ঔষধ

না খেয়ে চোখের পাতা বুজ্‌তে পারেন না। দিনে দুশ্চিন্তা, রেতে দুঃস্বপ্ন। ক'দিনের জন্য এ দুর্ভোগ! চোখের পাতা না ফেল্‌তে ফেল্‌তে যম এসে দ্বারে ঘা দেয়। গরীব মেরে রোজগার—অর্থ উপার্জ্জন নয়, পাপসঞ্চয়।

নীলকণ্ঠ বলিলেন, "তা মশাই, পল্লীতে না শুই, স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালন ত করতে হবে? অত ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার গৃহীর চলে না, বিশেষ আমার মত গরীব গৃহস্থের।"

সা—কেন চল্‌বে না? চালালেই চলে। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যাদের জন্য দুর্ভাবনায় নিজের অমূল্য জীবন বিপন্ন করেছিলেন, তাদের কি সুখী করতে পেরেছেন? যতই করুন, যতই দিন, কাউকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন না। অন্ততঃ আমি ত পারিনি।

নীলকণ্ঠ সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, "কি রকম, কি রকম?"

"চটকলে কুলী-মজুরদের বেতন বাঁট্‌তুম আর তাদের প্রাপ্য থেকে টাকায় এক আনা দস্তুরী কাট্‌তুম। একবার ভেবে দেখ্‌তুম না, তাদের কাছে সে চার পয়সার মূল্য কত? এক দিন মনে বড় ধিক্কার হ'ল। যাদের জন্য গরীব মেরে রোজগার করছি, তাদের মুখে ত এক দিনও সন্তোষের চিহ্ন দেখ্‌তে পেলুম না। তবে এ করছি কি, ওরা ত আমার পাপের ভাগ নেবে না। তবে কেন, কার জন্য? সংসার ত্যাগ করলুম। তার পর ভাব্‌লুম, শুধু সংসার ত্যাগ করলে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। কর্ম্মে অপকর্ম্ম ক্ষয় করতে হবে।"

নী—কি ক'রে?

সা—যে গরীবদের পীড়ন ক'রে অর্থ নিয়েছি, তাদের সেবা ক'রে। তাদের সেবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করি।

নীলকণ্ঠ ভাবিতে লাগিলেন, দরিদ্রপীড়ন করিয়া আমিও ত তবে মহাপাপ সঞ্চয় করিতেছি। কিন্তু যাদের জন্যে অপকর্ম্ম করি, তারাই বিরূপ। কারণে অকারণে পরিবারের লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, দুর্ব্বাক্য আমার অঙ্গের আভরণ। কখনও কি সুখী হইয়াছি? কোন দিন কি স্ত্রীর মুখে একটা মিষ্ট সম্ভাষণ পাইয়াছি? কৈ, মনে ত পড়ে না। তবে কেন? আমাকে ধিক্! আর পাপ সঞ্চয় করিব না। কিন্তু কেবল পরপীড়ন বন্ধ করিলে হইবে না। আমারও প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন।

নীলকণ্ঠ গভীর চিন্তামগ্ন। অন্তরে আত্মগ্লানি। মুখে অনুতাপচ্ছায়া।

সাধু বলিলেন, "কি ভাবছেন?"

"আপনার দরিদ্র-সেবার জন্যে আমি যদি কিছু চাঁদা দি, গ্রহণ করবেন?"

সা—পরম আদরে।

নী—কিন্তু এ পাপের রোজগার।

সা—প্রায়শ্চিত্তে যাক।

এ মাসের সমস্ত উপ্‌রি-পাওনা সাধুকে দিয়া নীলকণ্ঠ গৃহে গমন করিলেন। ভাবিতে ভাবিতে গেলেন, আজই যদি জীবন শেষ হয়ে যেত, এতটুকু প্রায়শ্চিত্তও হ'ত না।

গৃহে প্রত্যাগত হইয়া পরিবারের হাতে মাসিক বেতন অর্পণ করিতেই সে ঝাঁঝিয়া উঠিল, "এ মাসে এত কম?"

নীলকণ্ঠ চুপ করিয়া রহিলেন।

বি—বলি, দাসী-বাঁদীর কথা গ্রাহ্য হচ্ছে না? এ মাসে এত কম কেন?

নী—তার আর তোমার কাছে কি কৈফিয়ৎ দেব?

পতির কণ্ঠে উগ্রস্বর শুনিয়া অতি বিস্ময়ে বিনোদিনী কিছুক্ষণ তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

এই সময় এক ফালি কুমড়া, এক গোছা শাক, কয়েকটি আলু-পটল, এক ফালি থোড় হস্তে একটি প্রৌঢ়া রমণী রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। ইনি নীলকণ্ঠের প্রতিবাসী, পাতানো মাসী এবং এই দরিদ্র সংসারের পরম হিতৈষী; সাধ্যমত সাহায্য করেন। মাসী আসিয়াই প্রশ্ন করিলেন, "কি হচ্ছে গো, বৌমা, এখনও রান্না চড়াওনি?"

বি—রান্না আর চড়াব না, মাসীমা।

মা—কেন গো? অসুখ করেছে?

বি—পোড়া কপাল! আমার কি তেমন ভাগ্যি যে, এক দিন অসুখ করেও দু-দণ্ড জিরুব!

মা—বালাই! কি হয়েছে, বল না?

বি—হবে আর কি, মা! মাসে মাসে যে কটি টাকা আসে, তাইতে কষ্টে স্বষ্টে আধপেটা খেয়ে সংসার চালাই। তাও তুমি নিত্যি সাহায্য কর ব'লে। এ মাসে তার আদ্ধেকও আসেনি।

মা—হ্যাঁ বোন্‌পো, এ মাসে কি উপ্‌রি পাওনি?

নী—পাব না কেন, মাসীমা, যা পেয়েছিলুম, দরিদ্র-সেবায় দান করেছি।

মা—সে কি বাছা, আপ্ত রেখে ধর্ম্ম!

নী—তা হোক, মাসী, গরিব কুলী-মজুরদের পেটে মেরে আর আমি উপ্‌রি নেব না।

বিনয়িনী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "নেবে না ত চল্‌বে কেমন ক'রে? ছ'মাসের ঘর-ভাড়া পাওনা। না দিলে তাড়িয়ে দেবে।"

নী—তাড়িয়ে দেয়—গাছতলা আছে।

বি—শুন্‌লে, মাসীমা, বে-আক্কিলে মিন্‌ষের কথা! উট্‌নোর দেনা না দিলে চাল-ডাল দেবে না।

নী—না দেয়, মুড়ি খেয়ে চল্‌বে।

মা—না, বোন্‌পো, ও কি একটা কথা! অতি বড় গরীব যে, সে-ও স্ত্রী-পুত্রকে ভাত-কাপড় দিয়ে পোষে। রোজগার না হলে চুরি-ডাকাতি করে।

নী—না, মাসী, আর ও মতলব দিও না। জন্ম-জন্মান্তরের পাপে এ জন্মে এই দুর্দ্দশা! আর নয়। কেন? কার জন্মে? পরিবার? মুখে একটা মিষ্টি কথা নেই।

বি—কি সুখেই রেখেছেন? মুখে গুড় দেবে! মধু দেবে! তোমায় বলবো কি, মাসীমা, আমার মাথা-মুড় খুঁড়ে মর্‌তে ইচ্ছে করছে। কত পাপ করেছিলুম, তাই এই হা-ঘরে হাবাতের হাতে পড়েছি! আমার মরণ হয় না!

বিনয়িনী গালে মুখে চড়াইতে লাগিল। মাসীমা হাত ধরিয়া বলিলেন, "কি কর, বৌমা!"

নী—তোমার বাপ ত গরীব দেখেই দিয়েছিলেন।

বি—ঝকমারি করেছিলেন!—আমার হেরাদ্দর পিণ্ডি চট্‌কেছিলেন!

মা—কাঁদিস্‌নি, বৌ! যে যার হাঁড়ীতে চাল দেয়, সেই তার বর।

বি—পোড়া কপাল এমন বরের! আর আমারও গলায় দড়ী! এমন সোয়ামীর ঘর করার চেয়ে ছেলের হাত ধ'রে ভিক্ষে ক'রে খাওয়া ভাল।

নী—শেষ পর্য্যন্ত তাই বরাতে আছে, মাসীমা! জান, এদের জন্মে দুশ্চিন্তায়, দুর্ভাবনায় আজ ট্যাক্সি-চাপা পড়্‌তে পড়্‌তে বেঁচে গেছি!

মা—অ্যাঁ! সর্ব্বরক্ষে!

বি—নাই হ'ত রক্ষে! যে ভাত-কাপড় দিয়ে মাগ-ছেলে পুষতে পারে না, তার থেকে লাভ?

মা—অমন কথা মুখে এনো না, বৌমা! বিধবার লাঞ্ছনা-খোয়ার জান না। পর্ব্বতের আড়ালে আছ—মাছ-ভাত খাচ্ছ।

বি—ভাত জোটে না, তার মাছ!

মা—খেতে ত পাও? বারণ ত নেই? কোন কোন সোয়ামী যে খেতেও দেয় না, তার উপর জ্বালা-যন্ত্রণা দেয়।

বি—আর জ্বালা-যন্ত্রণা কাকে বলে, মাসীমা! হাতে দু-ঘা মারলেই কি বেশী হ'ল! দুটি বেলা বাসন মেজে মেজে আঙ্গুল ক্ষয়ে গেল। আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে গা'ময় ফোস্কা। বাটনা বেটে হাতের চেটোয় কড়া পড়েছে। শতেক তালি দেওয়া কাপড় পরছি। তুমি এক যোড়া যা-ই দিয়েছিলে, তাই লজ্জা-নিবারণ হচ্ছে। কখনও এক-খানা গয়না গায় উঠেছে?

নী—তবু ত দুধ খাওয়া চলে!

বি—আমার গলায় দড়ী। সোয়ামীর মুখে খাবার খোঁটা! ধিক্ আমাকে! শোন, মাসীমা! রোজ আধ পো ক'রে দুধ কিনি। চায়ের সঙ্গে খোকা একটু খায়, আমি একটু খাই।

মা—তা বেশ কর! না খেলে অত খাটুনীতে শরীর থাক্‌বে কেন? যাও, এখন রান্না চড়াও গে যাও।

আপাততঃ এইখানে দাম্পত্য-কলহের ইতি হইল।

রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর। বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া নীলকণ্ঠ বাসায় ফিরিতেছিলেন। হঠাৎ একটা লোক তাঁহার পাশ দিয়া ছুটিয়া যাইতে গায় গায় ধাক্কা লাগিল এবং তাহার অধিকারচ্যুত হইয়া পথে একটা কি পড়িয়া গেল। তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে বিপুল শব্দ উঠিল—"চোর—চোর, পাক্‌ড়ো।"

ধরা পড়িবার ভয়ে চোর পতিত দ্রব্য কুড়াইবার প্রয়াস করিল না। পশ্চাতে যাহারা ছুটিতেছিল, তাহারাও কেহ লক্ষ্য করিল না। নীলকণ্ঠ তাহা কুড়াইয়া লইয়া গৃহে ফিরিলেন এবং কেরোসিনের ডিবার অনুজ্জ্বল আলোকে

দেখিলেন, চামড়ার বাক্সে এক যোড়া বালা। মাথার বালিসের নীচে বাক্সটা রাখিয়া নীলকণ্ঠ শয়ন করিলেন।

অনেক রাত্রিতে শয়ন করিয়াছেন। পরদিন ঘুম ভাঙ্গিতে বেলা হইল। শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়াই দেখিলেন, অতি সুন্দর গড়নের এক যোড়া সোণার বালা, ডালায় সোণার জলে অধিকারীর নাম লেখা—সুরযমল কোটারী। তার নীচে নম্বর ও ঠিকানা।

নীলকণ্ঠ নিবিষ্টমনে বালা, নাম, ঠিকানা প্রভৃতি দেখিতেছেন; বিনয়িনী আচম্বিতে ছোঁ মারিয়া তাঁহার হাত হইতে বাক্সটি কাড়িয়া লইল এবং 'মাসী-মাসী' বলিতে বলিতে ছুটিয়া গেল।

অনতিবিলম্বে মাসীর সহিত পুনরাগমন। উভয়েরই মুখ হর্ষপ্রফুল্ল!

মাসী আসিয়াই প্রশ্ন করিলেন,—"এ বালা কোন্ স্যাকরা গড়্লে, বোন-পো? কি সুন্দর গড়ন, বৌমা, দেখ্লে চক্ষু জুড়িয়ে যায়! ক'ভরি সোণা আছে, বোন-পো?"

বিনয়িনী বলিল, "আজ পাঁচ বছর ধ'রে এক যোড়া বালার জন্তে ফেকিয়ে ফেকিয়ে গলা শুকিয়ে গেছে। হাত ছ'টো ন্যাড়া ন্যাড়া দেখায়! তা' এত দিন পরে কথা কাণে উঠ্ল!"

মাসী বলিলেন, যা হোক, এখন ত মনের মত হয়েছে? এইবার বোন-পো, এক ছড়া হার গড়িয়ে দাও! এইস্ত্রী মানুষের গলা ন্যাড়া থাক্লে হাতের জল শুদ্ধ হয় না।"

বি—তোমাদের পুরুতকে দিয়ে একটা দিন দেখিয়ে দাও, মাসীমা।

মা—স্বোয়ামী নিজে হাতে পরিয়ে দিলে আর দিন দেখ্তে হয় না, বৌমা! বোন-পো, তুমি বৌ-মার হাতে পরিয়ে দাও।

বি—দাঁড়াও, মাসী-মা, আগে তুলসী-তলায় মায়ের পায় ঠেকিয়ে আনি। আজ পাঁচ বছর ধ'রে মায়ের পায় মাথা কুট্ছি। সন্ধ্যের সময় এসো, মাসীমা, হরিন্নোট দিতে হবে।

বিনয়িনী তৎক্ষণাৎ তুলসীতলায় বালা রাখিয়া প্রণাম করিল এবং বালা-যোড়াটি পুনরায় বাক্সে পূরিয়া স্বামীর হাতে দিল।

মাসী বলিলেন, "দাও বোন-পো, পরিয়ে দাও।"

নীলকণ্ঠ এতক্ষণ নীরবে উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। বধূ বালা পরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতে বলিলেন, "কার বালা কাকে পরাব, মাসী? এ কি আমি গড়িয়েছি? আমার কি সাধ্য? এ বালা আমি কুড়িয়ে পেয়েছি।"

মা—সে ত আরও ভাল। এ দেবতার দান।

নী—দেবতার দান কি, মাসী! যার বালা, তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

বি—হ্যাঁ, দিলুম ত ফিরিয়ে!

মা—বোন-পো, হাতের লক্ষ্মী পায় ঠেল না।

নী—সে হয় না, মাসী, এ বালা আমাকে ফেরাতেই হবে।

বি—এমন হাড়-হাবাতের হাতেও পড়েছিলুম! এ বালা যদি ফিরিয়ে দেওয়া হয়, আমি গলায় দড়ী দেবো।

"সে পরের কথা পরে," বলিয়া নীলকণ্ঠ দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন।

বালা পাইয়া সুরযমল কোঠারী প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কোথায় পেলেন?"

নী—কুড়িয়ে পেয়েছি।

সুরয্মলবাবু ব্যবসায়ী লোক। লোক-চরিত্রে অভিজ্ঞ। নীলকণ্ঠকে দেখিয়া বুঝিলেন, অতি দরিদ্র। ইহার পক্ষে কুড়িয়ে পাওয়া সুবর্ণ-বলয়ের লোভ সংবরণ অতি দুরূহ। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবুজীর কি করা হয়?"

নী—সামান্য চাকরী।

সু—তলব কত পান?

নীলকণ্ঠ বেতনের কথা বলিলেন।

সু—উপ্রি কিছু আছে?

নী—আছে। আমি নিই না।

সু—পরিবার ক'টি।

নী—আমি, স্ত্রী আর এক ছেলে।

সু—বাড়ীভাড়া দিতে হয়?

নী—আজ্ঞে হ্যাঁ। বাড়ী নয়, সামান্য একখানি খোলার ঘরে বাস করি।

সু—বাবুজী, আমার কাছে চাকরী করবে? যাতে তোমার স্বচ্ছন্দে চলে, সে বিষয়ে আমি লক্ষ্য রাখব।

নী—আপনি যদি দয়া করেন, করব না কেন? কবে থেকে কাযে লাগতে হবে?

সু—এক মাসের নোটিশ দিতে হবে ত? না দিলে এক মাসের মাইনে দেবে না। কিন্তু সে টাকা আমি তোমাকে দেব।

নী—আপনি কেন দেবেন?

সু—আমার গরজ।

সুরযমলবাবু নীলকণ্ঠকে ত্রিশটি টাকা দিলেন।

নী—আমি মাইনা ত এত পাই না।

সু—আচ্ছা, পুরস্কার হিসাবে নাও।

নী—আমি কর্ত্তব্য করেছি, তার আবার পুরস্কার কি?

সু—আমারও ত একটা কর্ত্তব্য আছে, ধর্ম্ম আছে। কাল এসো।

নীলকণ্ঠ প্রস্থান করিলে সুরযমলবাবু তাঁহার বাল্যবন্ধুকে বলিলেন, "পূরণচাঁদ, ব্যবসায় ঢুকে অবধি আমি এক জন বিশ্বাসী, সৎলোক তল্লাস করছি, এত দিনে বোধ হয়, সে দুর্লভ বস্তু মিল্‌লো।"

নীলকণ্ঠের উপর সুরযমল বাবুর প্রভূত বিশ্বাস। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে বিশ্বাস বাড়িতেছে। লোহার আলমারীর চাবি সুরযমল কাহাকেও দিতেন না; এমন কি, স্ত্রী-পুত্রকেও নয়। একমাত্র নীলকণ্ঠই সে বিধির ব্যতিক্রম; কিন্তু প্রভুর প্রত্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন কর্ম্মচারিগণের ঈর্ষা দিনে দিনে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল।

সংসার সম্বন্ধে নীলকণ্ঠ এক রকম নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। আর খোলার ঘরে বাস করিতে হয় না। পূর্ব্বের সে অভাব অনটন নাই। টেক্সর তাগিদ নাই। উহ্‌নোর তাগাদা নাই। বাড়ীভাড়া এখন মাসে মাসেই চোকে। দুশ্চিন্তার তাড়নায় আর গাড়ী চাপা পড়িবার ভয় থাকে না। সর্ব্বোপরি অন্নদাতা প্রভুর সর্ব্বক্ষণ প্রসন্ন বদন। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। পুত্র দেবকণ্ঠ দিনে দিনে নিরতিশয় দুর্ব্বৃত্ত হইয়া উঠিতেছে। লেখাপড়ায় মন বা মস্তিষ্ক কখনই ছিল না। এখন ত বিড়ির ধুঁয়ায় সর্ব্বদাই আচ্ছন্ন থাকে। কুসঙ্গীও যথেষ্ট জুটিয়াছে। কুপ্রবৃত্তির পরিচালনায় যে পয়সার প্রয়োজন, তাহা পুরুষকারের দ্বারা অর্জ্জন করিতে হয়, অর্থাৎ গোপনে পিতা-মাতার বাক্স হইতে।

কিন্তু পতির প্রতি বিনয়িনীর ব্যবহারের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। নিত্য সেই টক্‌ঝক্, নিত্য মুখঝাম্‌টা। তাহার অন্তরে অসন্তোষ স্থায়িভাবে বাসা বাঁধিয়াছে। কপালক্রমে যদি মনিব এমন সদয়, তবে এখনও কেন কোটা-বালাখানা উঠিতেছে না? তা হ'লে বাড়ীভাড়া বাঁচিয়া যায়, সেই টাকায় অলঙ্কার হইতে পারে। কিন্তু সুরযমল বাবু একটু কৃপণস্বভাবের লোক। কর্ম্মচারিগণের প্রয়োজন পূর্ণ করেন, ঐ পর্য্যন্ত। তাঁহার বিশ্বাস—সৎলোকও অভাবে চুরি করে, প্রাচুর্য্যে—অলস, অকর্ম্মণ্য হয়।

নীলকণ্ঠের জীবনরক্ষা করার পর সাধু বুঝিয়াছিলেন, এই গৃহস্থের সাংসারিক জীবন সুখের নয়। কথায়-বার্ত্তায় কিছুক্ষণ তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিবার নিমিত্ত সাধু প্রায়ই আসিতেন। কৃতজ্ঞ নীলকণ্ঠ যখন যেমন পারিতেন, তাঁহার দরিদ্রসেবার ভাণ্ডারে সাহায্য দান করিতেন।

কথায় কথায় এক দিন সাধু বলিলেন, "ধর্ম্মই মানুষের প্রকৃত বন্ধু।"

"বেশ। কিন্তু এই ধর্ম্ম কি বস্তু, আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন?"

"না, তা পারি না। বুঝাবার মত তর্কযুক্তি আমার আয়ত্ত নেই। তবে নিজে বুঝতে পারি, কোন্‌টা ধর্ম্ম, আর কি অধর্ম্ম।"

নী—বীরধর্ম্ম ত মানুষ মারা। তা হ'লে, খুনে, লেঠেলরা, দস্যু এরা দোষ করলে কি?

সা—খুনে, লেঠেলরা, ডাকাত, এরা কি দেশের শত্রু নিপাত করে? অন্যায়ের প্রতীকার করবার জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে ছোটে? না, তার নিজের প্রয়োজনে?

নী—স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালন ত কর্ত্তব্য?

সা—অবশ্য। ঠাকুর বলতেন—

নী—ঠাকুর কে?

সা—দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংস।

নী—কি বলতেন তিনি?

সা—বলতেন, পিতৃঋণ, মাতৃঋণ, আবার পত্নীঋণও আছে।

নী—পত্নী-ঋণ কি?

সা—স্ত্রী যদি সতী হয়, তাকে ভাত-কাপড় দিয়ে প্রতিপালন করতে হবে।

নী—আর গালমন্দ শুনতে হবে?

সা—সইবার জন্তই ত আপনার নাম নীলকণ্ঠ।

এক দিন মনিবের প্রয়োজনে নীলকণ্ঠকে অসময়ে বাহির হইতে হইয়াছিল। সেই সময় সাধু আসিলে বিনয়িনী দ্রুত তাঁহার সম্মুখীন হইয়া বলিল—

বিন—তুমি নিত্যি কি করতে এস বল ত, ঠাকুর! আমার সর্ব্বনাশ করতে?

দুঃসহ বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া সাধু বিনয়িনীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

বিনয়িনী রুক্ষস্বরে বলিল, "কাণের মাথা খেয়েছ? না গরীবের কথা গেরাহ্যি হচ্ছে না? ওখানে ত মুখে খই ফোটে! মনে করেছ, ঐ বোকাটাকে জপিয়ে-সপিয়ে কিছু গপ্পা করবে?"

সাধু বলিলেন, "কি বল্‌ছেন আপনি? গপ্পা করব কি?"

বিন। ওঃ, কচি খোকা! ভাজা মাছ উলটে খেতে জানেন না। ভিকিরি, কাঙালের নাম ক'রে নিজের পেট ভরাও।

সা—নিজের পেট ভরাই?

বিন—নাঃ! নেশাভাংও কর। গাঁজা খাও। যেখানে যাও, গেরস্তর লক্ষ্মী ছাড়ে।

সা—লক্ষ্মী ছাড়ে?

বি—নইলে হাতে মাথ্‌তে কুলয় না কেন?

সাধু মৃদুস্বরে বলিলেন,—

"দক্ষিণে কলা-গাছ উত্তরে পুঁই।
একলা কালো বেরাল কি করব মুঁই॥"

তার পর ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

৪

কোথাকার জল কোথায় মরে, তাহা মানব-বুদ্ধির অগম্য। সুরযমলের অতি প্রাচীন কর্ম্মচারী বারুই মশাই নীলকণ্ঠের উপর মনিবের পক্ষপাত দর্শনে তাহাকে জব্দ করিবার জন্য নিরন্তর সুযোগ খুঁজিতেন। এক দিন সয়তান সহায় হইল।

সকল সময় মানুষ সতর্ক থাকিতে পারে না। এমনই এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে বারুই মশাই কার্য্যসিদ্ধি করিলেন। ব্যাঙ্কের টাকা ভাঙ্গাইতে গিয়া একখানি চোরাই নোট বাহির হইতে নীলকণ্ঠ ধরা পড়িলেন। সুরযমলের জামিনে খালাস হইয়া অভিযুক্ত একেবারে কালীঘাটের মন্দিরে হাজির হইলেন। সকাতরে নিবেদন করিলেন, মা নিরপরাধকে রক্ষা কর।

বৃত্তান্ত শুনিয়া মায়ের সেবক মনে মনে বলিল, 'বেটা খুব মোটা রকম মেরেছে।' মুখে বলিল, "ভয় কি! এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দেব। মন খুলে বলি মানত করুন।"

সুরযমল সাক্ষ্য দিয়া বলিলেন, "কর্ম্মচারী আমার বিশেষ বিশ্বাসী।"

উকীল জেরা করিলেন, "কিসে আপনার এত বিশ্বাস?"

সু—আমার একযোড়া চোরাই বালা পথে কুড়িয়ে পেয়ে নীলকণ্ঠ আমায় ফিরে দিয়েছিল। আসামী অনায়াসে তা আত্মসাৎ করতে পারত। সেই সূত্রে আমি একে কর্ম্মে নিযুক্ত করি। সেই অবধি আমার কাছে আছে। কখনও কোনরূপ তঞ্চক করে নাই। আমার খাস লোহার সিন্দুকের চাবি আমি স্ত্রী-পুত্রের হাতেও দিই না; কিন্তু নীলকণ্ঠ তাহার রক্ষক। আমি পুনঃ পুনঃ পরীক্ষায় দেখেছি, লোকটি সজ্জন।

উকীল বলিলেন, "মিষ্টার সুরযমল, আপনার বয়স হয়েছে। অনেক দেখেছেন, শুনেছেন, অর্থের সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছেন। কখন কি দেখেননি, মানুষ দীর্ঘকাল সততা করে, এক সময় একটা তুচ্ছ জিনিষের লোভ সামলাতে পারে না? লাখ টাকার লোভ সাম্‌লে এক দিন একটা পাণের ডিপে চুরি ক'রে পালালো? এ আমি চোখে দেখেছি।"

সুরযমল বলিলেন, "দেখিনি যে, তা বল্‌তে পারিনি।"

উকীল—তবে? বলে—মন না মতি।

সুরয—তবু আমার বিশ্বাস—

উকীল হাসিয়া বলিলেন, "বিশ্বাসের পাত্রই বিশ্বাসভঙ্গের সুযোগ পায়। হুজুর! স্বদেশী ডাকাতি, চুরি, গুণ্ডার উৎপাত যত বাড়ছে, ততই চোরাই নোটের আমদানী হচ্ছে। এর একটা বিহিত হওয়া কর্ত্তব্য। দণ্ড না দিলে লোকের সাহস আরও বেড়ে যাবে।"

হাকিম বড় কড়া। সরাসরি (summary) বিচারে নীলকণ্ঠের প্রতি এক পক্ষ কারাবাসের আদেশ দিলেন।

৫

দুঃসংবাদ প্রাপ্তিমাত্র বিনয়িনী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। মুখ দিয়া এক ঝলক রক্ত উঠিল।

সুরথমল প্রতিনিয়ত সংবাদ লইতেন। তাঁহারই পারিবারিক চিকিৎসক চিকিৎসা করিতে লাগিল। সুরথমলের উৎকণ্ঠিত প্রশ্নে ডাক্তার উত্তর দিল, "সঙ্কটাপন্ন অবস্থা। বুকের ব্লাড্-ভেসল্ (রক্তকোষ) ছিঁড়িয়া গিয়াছে। প্রতিবাসী মাসীর প্রাণান্তিক সেবা, ঔষধ, পথ্য কিছুরই অভাব নাই। তথাপি বিনয়িনী ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

পঞ্চদশ দিবস কারাভোগের পর নীলকণ্ঠ গৃহে উপস্থিত হইলে শ্বাসকষ্টে উগ্রকণ্ঠে বিনয়িনী বলিল, "তুমি এসেছ? কাছে এস। আমার মাথায় পা দাও। সারাজীবন তোমায় যেমন জ্বালিয়েছি, কিন্তু আমিও তেমনই জ্বলেছি। তুমি হয় ত বিশ্বাস করবে না।"

বিনয়িনীর ওষ্ঠপার্শ্ব দিয়া এক ফোঁটা রক্ত পড়িল। নীলকণ্ঠ অতি যত্নে মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "করি, বিনু, করি।"

বি—কত দিন আমায় ঐ ব'লে ডাকনি। বল, আবার বল।

নী—বিনু, গয়নাপত্তর ছেড়ে দাও, ভাল ক'রে তোমায় ভাত-কাপড় দিতে পারিনি! মিষ্টি কথায় এক দিনও তোমার মুখে হাসি ফোটাতে পারিনি! দারিদ্র্যে তোমার গতর পিষে দিয়েছি। তোমায় জ্বালিয়েছি, তবে ত তুমি অমন হয়েছ।

বি—তোমার দোষ কি? বড় গরীব ব'লে তোমাকে জামাই করতে বাবার অমত ছিল। বয়স বেশী হয়েছিল ব'লে মা বল্লেন, মেয়ে ত রূপের ধুচুনি, তার ওপর বুড়ো ধাড়ী। এখনও তুমি অমত করছ? স্ত্রীভাগ্যে ধন। মেয়ের বরাতে ধন। মেয়ের বরাতে পাকে, ঐ খোলার ঘরেই কোঠা-বালাখানা হবে।

বিনয়িনীর মুখ দিয়া পুনরায় রক্ত-মোক্ষণ হইল। এবার একটু বেশী।

নীলকণ্ঠ বলিলেন, "প্রাণটা জোর ক'রে বার করছ কেন? এখন এ সব কথার কি দরকার? একটু ঘুমোও। তুমি বড় হাঁপাচ্ছ। স্থির হ'লে হাঁপটা ভাল হয়ে যাবে।"

বিনু মৃদু হাসিয়া বলিল, "শ্বাস কি ভাল হয়? যতক্ষণ আছি, তোমাকে দেখি, কথা কই। স্ত্রীভাগ্যে ধনও হ'ল না, রাজরাণীও হলুম না। নিজের ভাগ্যের ওপর যত বিরক্ত হয়েছি, ততই তোমাকে মন্দ বলেছি। তার জন্যে সারারাত চোখের জলে বালিস ভিজিয়েছি, তুলসীতলায় কত মাথা খুঁড়েছি, কিন্তু পোড়া জিভকে কিছুতেই বশে আনতে পারিনি।"

হাঁপাইতে হাঁপাইতে বিনয়িনী নির্জীব হইয়া পড়িল। নীলকণ্ঠ বলিলেন, "থাক্ না, বিনু।"

বি—তবে আর বলব কবে? একটি যদি ভিক্ষা দাও—

নী—ভিক্ষা কি, বিনু? চিরদিন যেমনি জোর ক'রে কাটিয়েছ, তেমনি জোর করবে।

বি—খোকা বদ ব'লে তুমি ওকে দেখতে পার না, কিন্তু আমি ভুলতে পারিনি, আমি মা। ও বড় অভাগা, ওকে দুটি অন্ন দিও।

খোকা পায়ের কাছে কাঁদিতেছিল। বিনয়িনী বলিল, "খোকা, কাঁদিসনি। শোধরাবার চেষ্টা কর্। মাসীমাকে টাকা দিও। তিনি রেঁধে দেবেন, আমি বলেছি। সাধুর কাছে আমি বড় অপরাধী। একবার এ সময় দেখা পেলে —মাসীমা।

মা—কেন মা!

বি—পতি-পুত্রের ভার তোমায় দিয়ে গেলুম।

এই সময় সদর হইতে কে ডাকিল, সাণ্ডেল মশাই—

নীলকণ্ঠ তাড়াতাড়ি গিয়া সাধুকে ভিতরে আনিলেন।

বিনয়িনী ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "বাবা, হাজার অপরাধ করলেও আমি জানি, মাপ করেছ। পায়ের ধুলো দাও।"

সা—সে কি, মা! মায়ের ওপর কি কেউ রাগ করে, না, মাকে পায়ের ধুলো দিতে আছে?

বিনয়িনী স্বামীকে বলিল, "তুমি এনে আমার মাথায় দাও।"

রুধিরাক্ত অধরে ঈষৎ হাসি ফুটাইয়া, নীলকণ্ঠের পানে চাহিয়া বিনয়িনী বলিল, "সেই—মনে আছে? কুশণ্ডিকার সময় নিজের হাতে সীঁতেয় সিঁদুর দিয়ে দাসী ক'রে এনেছিলে? আজ আবার তেমনি ক'রে সিঁদুর দিয়ে চেনা ক'রে দাও। তোমার কেনা দাসী যেন তোমার কাছেই ফের ফিরে আসে।"

নীলকণ্ঠ সীমন্তে সিঁদুর দিলেন। সহসা শরীর শিহরিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে শেষ শ্বাস শূন্যে মিলাইল। চরমসময়ে

অন্তর্নিহিত গভীর প্রেমের পরিচয় দিয়া সতী বাঞ্ছিত লোকে যাত্রা করিল।

দরিদ্রের শ্মশানযাত্রা। সমারোহের ঘটা নাই। যতক্ষণ চিতা জ্বলিল, নীলকণ্ঠ শুষ্কচক্ষে একদৃষ্টিতে তাহারই পানে চাহিয়া রহিলেন।

৬

বিনয়িনীর মৃত্যুর পর প্রায় এক বৎসর অতীত হইতে চলিল, সাধু নিত্য আসিয়া নীলকণ্ঠকে সঙ্গদান করেন।

এক দিন মাসীমা আসিয়া সাধুকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "বাবা, যদি বিরক্ত না হও, একটা কথা বলি।"

সা—বলুন না, মা।

মা—ভয় করে। সাধু মানুষ—পাছে ঘরসংসার বে'থার কথা কইলে কি মনে কর।

সা। সে কি মা! আমরাও ত এককালে ঘর-সংসার বে'-থা করেছি। একেবারে গেরুয়া প'রে ত পেট থেকে পড়িনি।

মা। তাই বলছিলুম বাবা, না উদাসী, না গৃহবাসী, এ কি ভাল?

সাধু বুঝিলেন, মাসীমার ভয়, পাছে তাঁহার সংস্রবে আসিয়া নীলকণ্ঠ সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করে। বলিলেন, "মা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি আপনার বোনপোকে কোন দিন গেরুয়া-মন্ত্র দিই-ও নি, দেবও না, তবে সম্প্রতি শোকটা পেয়েছেন, কথায় বার্ত্তায় যদি একটু ভুলে থাকেন।"

মা। তা জানি বাবা। বলছি কি, পরিবার না থাকলে সংসার যেন শুকনো খাদে সাঁতার। আপনি যদি বুঝিয়ে বোনপোর একটি বে' দেন।

সা। মা, জীবনে অকাম কুকাম অনেক করেছি বটে, কিন্তু ঘটকালী কখনও করেছি ব'লে ত মনে হয় না। তা আপনার জানাশোনা মেয়ে কোথাও আছে?

মা। না বাছা, আমার জানা-শোনা কেউ কোথাও নাই। তা ক'নের অভাব কি?

সা। হাঁ, তা বটে, বিশেষ বাঙ্গালা দেশে। জোর-গলায় যত বরপণের প্রতিবাদ বাড়ছে, গেরস্ত দিন দিন যত ফকির হচ্ছে, মেয়ের আমদানী ততই বাড়ছে। তা সাণ্ডেল মশাই কি বলেন?

নীলকণ্ঠ এতক্ষণ নীরবে মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন, বলিলেন, "মাসীমা, অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? আর কিছু দিন যাক, সাবালক হই, মাথায় টাক পড়ুক, চুলে আর একটু পাক ধরুক, মেড়ে দু'টো ভাল ক'রে ফাঁক হোক, বাসরে সব মেয়েদের তাক্ লাগাতে হবে, টোপর মাথায় মানাবে কেন? আর বছর পোনেরো সবুর কর। পঁয়তাল্লিশ হয়েছে, ঘেঠের কোলে ঘাটে পা দিই।"

মা। সে বাছা তুমি যাই বল, পঁয়তাল্লিশ আবার বয়েস? নবীন মুখুয্যে পঁয়ষট্টি বছর বয়েসে তেজপক্ষে বে' ক'রে আনলে। গোলোক চাটুয্যে যখন চতুর্থ পক্ষ পত্তন করলে, তখন সত্তরের পত্তর এসেছে। পুরুষ পরেশ, তার বয়েসই বা কি আর রূপই বা কি!

নী। তা হোক মাসীমা, এখন আর বাল্য-বিবাহের রেওয়াজ নেই। আগে দু'টি চক্ষে ছানি পড়ুক, কাণ দুটোর মাথা খাই; বউয়ের রূপ যখন চোখে পড়বে না, কথা কাণে উঠবে না, তখন বে'র কথা।

মা। বালাই, ষাট! কাণা কালা হ'তে যাবে কেন? তোমার এ লক্ষ্মীছাড়া দশা আর আমি দেখতে পারি না।

মাসীমার স্বর কাঁপিতে লাগিল,—"ঘরে এসো, তেষ্টায় ছাতি ফাটে, এক গ্লাস জল গড়িয়ে দেয়, এমন কেউ নেই। এক ঘটি পা ধোবার জল এগিয়ে দেবার লোকের অভাব, ঘেমে নেয়ে এসো, বাতাস—"

নীলকণ্ঠ দেখিলেন, অভাবের ফিরিস্তি ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে। বলিলেন, "মাসীমা, এ সব কি আমার বরাতে কখনও জুটেছে?"

মা। তাই ত বলছি বাছা, একটি লক্ষ্মী ঘরে আন।

নী। মাসীমা, খুঁজব লক্ষ্মী; আমার যে বরাত, পরে এসে বাসা বাঁধবেন তাঁর বাহনটি। কেন মাসীমা, তোমার কি রাঁধতে কিছু কষ্ট হচ্ছে?

মা। বোনপো, এই মহাপুরুষের পা ছুঁয়ে বলছি—

সাধু ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন,—"করেন কি মা, করেন কি? আমি যে আপনার ছেলে, পায়ে হাত দিতে আছে? আমার অকল্যাণ হবে যে!"

মাসীমা বলিলেন,—"বউ ঘরে আন, আমি যেমন তোমাকে আর নাতীকে রেঁধে দিচ্ছি, তেমনি বউকেও দেবো, তা হ'লে ত বে' করবে?"

নী। দু'জনের যায়গায় তিন জনের রাঁধবে? আমার সে লক্ষীছাড়া বরাত, দৃষ্টিতে লক্ষ্মীরও লক্ষ্মী ছেড়ে যায়। তাকে ত দেখেছ? বকুক ঝকুক, গালমন্দ করুক, অযত্ন কখনও করেনি। কিন্তু তার আমি কি করেছি? গয়না-গাটি চুলোয় যাক, কোন দিন ভাল খেতে পরতে দিয়েছি?

মা। সে বাছা তুমি কি করবে? খাওয়া-পরা, সোণা-দানা বরাত।

নীলকণ্ঠ হাসিয়া বলিলেন, "সবই ত বরাত, মাসীমা, খালি বিবাহটাই কর্ত্তব্য। সেও অবশ্য রাঁধত ভাল, কিন্তু তোমার হাতের রান্না—দেবতারাও বোধ করি এমন অমৃত খেতে পান না।"

মা। বাছা, আমি কি মান্ধাতার পেরমাই নিয়ে এসেছি?

নী। তা হোক মাসীমা, যে ক'দিন আছ, দুটো ভাত ফুটিয়ে দাও।

মা। তার পর?

নী। মনিব ত সবই দিচ্ছেন, বাসন মাজবার কেউ নেই, ঠিকে ঝির মাইনে দিচ্ছেন। তিনি কিছু না ব্যবস্থা করেন, নিজে দুটো ফুটিয়ে আধ-পোড়া আধ-সেদ্ধ ভাত খাব। কিন্তু "সুধামুখীর রান্না—আর না, আর না।"

মাসী চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেলেন। নীলকণ্ঠ সাধুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "একটা কাঁড়া গেল। তা হোক, স্ত্রীলোকের ফাঁদে আর পড়ছি না।"

সা। সে রামের ইচ্ছা।"

নী। রামের ইচ্ছাটি কি?

সা। পরমহংস বলতেন—এক গ্রামে এক তাঁতি থাকে। লোকটি বড় ধার্ম্মিক, সকলেই তাকে ভালবাসে আর ধার্ম্মিক ব'লে জানে। খরিদ্দার কাপড় কিনতে এসে দাম জিজ্ঞাসা করলে তাঁতি বলে—রামের ইচ্ছা, সুতার দাম এক টাকা, মেহনতের দাম চার আনা; রামের ইচ্ছা, মুনফা দু'আনা; সবশুদ্ধ কাপড়ের দাম, রামের ইচ্ছা, এক টাকা ছ'আনা। সবাই তাকে বিশ্বাস ক'রে তৎক্ষণাৎ দাম ফেলে দিয়ে কাপড় নিয়ে চ'লে যায়। এখন, লোকটি ভারী ভক্ত, রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়ার পর এক দিন দাওয়ায় ব'সে রাম নাম করছে। এমন সময় সেই পথ দিয়ে একদল ডাকাত যাচ্ছে। তাদের এক জন মুটের অভাব। তারা তাঁতিকে টেনে নিয়ে চলল। ডাকাতি ক'রে তাঁতির মাথায় মোট দিলে। এমন সময় ফাঁড়িদার এসে পড়ল। ডাকাতরা পালাল, তাঁতি পালাল না। ধরা প'ড়ে হাকিমকে বললে, "হুজুর, রামের ইচ্ছা, ডাকাতরা ডাকাতি ক'রে আমার মাথায় মোট চাপিয়ে দিলে। তার পর ধরা প'ড়ে হুজুরের কাছে এসেছি।"

সাধু হাসিয়া বলিলেন, "লোকটিকে সরল আর ধার্ম্মিক দেখে, রামের ইচ্ছা, হাকিম তাকে ছেড়ে দিলেন।"

সে দিন ঠিকা ঝি আসেনি। নীলকণ্ঠ কলতলায় বসিয়া বাসন মাজিতেছিলেন আর ভাবিতেছিলেন, এ কায জীবনে কখন করিনি। বীণু বকেছে-ঝকেছে, কিন্তু ম'রে-ম'রেও খেটেছে। এক দিনও রাঁধতে কি বাসন মাজতে হয়নি। বাজার করেছি, তাতেও খিটখিট—এটা মাগগি, ওটা পচা, সেটা ওজনে কম। ভর কম্‌ বাজার করা। এখন বুঝছি, সে বিরক্তি আমার উপর নয়, আমাকে বাজার করতে হয় ব'লে অদৃষ্টের উপর রাগ। চিরদিন সহ্য করেই আসছি। ছেলেবেলা বাপের তাড়না, মায়ের মিছামিছি বকুনি। তার পর বে হ'ল। ভাবলুম, একটু সুখী হব। কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রিতে সে ভুল ভাঙল। একটু আদর করতে গেলুম, ধমকে উঠল, সর সর। রাত দুপুরে এল সোহাগ করতে। আগে পরিবার পোষবার যোগ্য হও, তখন সোহাগ জানিও। হাতে পয়সা হোক, তখন সোহাগ। নির্ধন পুরুষের সোহাগ আমি চাইনি। বড় দুঃখ হ'ল। বললুম, সে তোমার বরাত। আরও ফুঁড়ে উঠে বললে, বরাত ব'লে দাসীবৃত্তি করি গে। ব্যস্‌! সব আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে স'রে শুলুম। আমার ঘুম এল না। সে কিন্তু অকাতরে ঘুমুতে লাগল। তার পর যত দিন বেঁচে ছিল, একসঙ্গে ঘর করেছি, এক শয্যায় শয়ন করেছি, তাকে চিনতে পারিনি। চিরদিন প্রখরা, মুখরারূপে আত্মপ্রকাশ ক'রে মরবার সময় ধরা দিয়ে গেল। তা আপনার মনকেই বড় চেনা যায়! তার সঙ্গে ত জন্মাবধি সম্বন্ধ। কখন্ কি ভাবে থাকে, কি কথায় বাঁকে, কি কথায় রুষ্ট, কিসে সন্তুষ্ট, কার সাধ্য বোঝে! কখন ভক্ত, কখন ভণ্ড; কখন ভাল মানুষ, সাত চড়ে কথা নেই, কখন খামকা প্রচণ্ড; এই

স্বর্গের দেবতা, এই নরকের কীট ; এই সাধু, এই চোর ; এই নির্লোভ, আবার তখনই ছেলের পাতে ভাল জিনিষ পড়লে জিভ দিয়ে লাল পড়ে। এর মতি, গতি, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি কিছুই বোঝা যায় না।

এই সময় দ্বারে এক জন ভিখারী আসিয়া গাহিল—

"মন, গরীবের কি দোষ আছে ?
বাজিকরের মেয়ে শ্যামা,
তারে যেমন নাচাও, তেমনি নাচে ॥"

গান শেষ হইলে নীলকণ্ঠ বলিলেন, "ওরে খোকা, ওকে একটা পয়সা দে ত, বালিসের নীচে আছে।"

এই সময় অতি মধুর স্বরে কে প্রশ্ন করিল, "মাসীমা হেথা এসেছেন ?"

নীলকণ্ঠ চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, প্রশ্নকর্ত্রী যুবতী। সুন্দরী নয়, কিন্তু কি অসামান্য লাবণ্যবতী। বলিলেন, "না।"

নীলকণ্ঠ পুনরায় চাহিয়া দেখিলেন, যুবতী তাঁহাকে সকৌতুকে লক্ষ্য করিতেছে। অধরে স্ফুরিত ঈষৎ হাসি।

সেই সময় দ্বার হইতে ভিখারী বলিল, "কই, বাবু, কিছু পাব না ?"

নী। কেন ? এই যে পাঠিয়ে দিলুম।

ভি। কই বাবু, আমি ত পাই নি।

নী। পাওনি কি ?

যুবতী মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনি উঠুন, এ আপনার কায নয়।" বলিয়া নীলকণ্ঠের হাত হইতে বাসন কাড়িয়া লইল।

কি সপ্রতিভ ভাব ! এ অনুরোধ নয়, আদেশ। এর কি আশ্চর্য্য স্বভাব ! নারীর সহজাত সরম আছে, সঙ্কোচ নাই। সরম-জ্ঞান আছে, কুণ্ঠা নাই ! চক্ষুতে মধ্যাহ্নের প্রখর গরিমা, অথচ পূর্ণিমার মাধুরী ! কে এ, কখনও দেখিয়াছি, কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এ রূপ লক্ষের মাঝে লক্ষ্য হয় ; একবার দেখিলে ভুলিবার নয়।

ভিখারী বলিল, "বাবু, দাঁড়াব কি ? পাঁচ দোরে যেতে হবে।"

"দাঁড়াও" বলিয়া নীলকণ্ঠ তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া ঘরে আসিয়া দেখিলেন, বালিসের নীচে পয়সা রেজকি যা কিছু ছিল, সবই অন্তর্হিত হইয়াছে ! ব্যাপার বুঝিতে তাঁহার বাকি রহিল না। ঘরের ঢেঁকি কুমীর।

বাক্স হইতে একটি আনি বাহির করিয়া ভিখারীকে দিলেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতেছে।

"জয় হোক বাবু" বলিয়া ভিখারী চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে মাসীমা আসিয়া বলিলেন, "ও মা রমা, তুই হেথায় এসেই বাসন মাজতে ব'সে গেছিস ! আজ কি ঠিকে ঝি আসেনি, বোন-পো ?"

"না, মাসী-মা। আমিই মাজছিলুম। তা উনি এসে— "

ইতিমধ্যে বাসন মাজা শেষ হইল। রমাকে লইয়া মাসীমা চলিয়া গেলেন।

৮

সে দিন পূর্ণিমা। মাথার উপর পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছে। অর্দ্ধধরা নিদ্রামগ্ন। কিন্তু নীলকণ্ঠের চক্ষুতে নিদ্রা নাই। অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিয়া ছাদে উঠিলেন। দারুণ অর্থ-চিন্তায় শয্যায় অতিষ্ঠ হইয়া এই ছাদে এমন কত পূর্ণিমা কাটিয়া গিয়াছে। ঐ চাঁদ, এই জ্যোৎস্না তখন গায় যেন বিষ ছড়াইত। আর আজ ? এত মধু কোথায় ছিল ? দারুণ গুমট সত্ত্বেও শরীর স্নিগ্ধ, শীতল !

একটা দিশাহারা বাতাস একরাশ ফুলের গন্ধ বহিয়া কোথা হইতে ছুটিয়া আসিল। মিত্রদের বাড়ীর সেই পিঞ্জরাবদ্ধ পোষা কোকিলটা সহসা ডাকিয়া উঠিল। প্রকৃতি যেন তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিলেন। তখন তর-তর, ঝর-ঝর, সর-সর, মর-মর পাতায় পাতায় কত কথা ফুটিল ! ভাষা বিভিন্ন—ভাব এক। যে বুঝিতে পারে, সে পারে ! ঐ কোকিল আকুল হইয়া যে কথা বলিতেছে, ঐ ঝিল্লীর দল ঝিম্-ঝিম্ রবে সেই ব্যথাই জানাইতেছে ! সেই ভালবাসা, সেই বিরহের গান ! আর ঐ যে গৃহছাদ হইতে উচ্চস্বরে সুধাস্বরে গাহিতেছে :—

"প্রেম ভ্রম যার লেগেছে—
সে কি সে আছে।
শোকে না হয় কাতর,
দুখে না দহে অন্তর,
মনে ভাবে নিরন্তর
সে অন্তর হয় পাছে ॥"

ঠিক ! এ ভ্রম, এ কুহক যাকে আচ্ছন্ন করেছে, এ গরল, এ সুধা যে একবার আস্বাদ করেছে, সে মজেছে ! ভালবাসা ! কে বাসে না ? কেউ অর্থ ভালবাসে, কেউ মান ; কেউ সঞ্চয়, কেউ দান ; ভাল কে বাসে না ? কেউ কেশ, বেশ, কেউ দেশ ; কেউ পত্নী, কেউ বাজারে পেত্নী ; এমন লোক নাই, ভাল যে বাসে না ! কেউ কামিনী-কাঞ্চন, কেউ করে ধর্ম্ম আকিঞ্চন। কিন্তু আমার মত প্রৌঢ় বয়সের ভালবাসা যা প্রকাশে লজ্জা বাধা দেয়, সে কেবল গুমে গুমে পোড়বার জন্য। সাধু বলেন, সব ছেড়ে যে ভগবান্‌কে ভালবাসে, সেই ধন্য। তিনি প্রেমের আকর, প্রেমের সাগর ! তা যদি হতেন, তা হ'লে কি আমায় এত দুঃখ দিতে পারতেন ? নিরপরাধে আমার জেল হ'ত ? একমাত্র পুত্র চোর, নেশাখোর !

নীলকণ্ঠ নীচে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার গুণধর পুত্রবর শয্যার শিয়রে কি হাতড়াইতেছে !

"কি রে, কি করছিস্ ? খুঁজছিস্ কি ?"

"ছারপোকা" বলিয়া খোকা সরিয়া পড়িবার পথ দেখিতে লাগিল।

নীলকণ্ঠ বলিলেন, "ইস্ ! বেজায় পিতৃভক্তি ! তা সে সব আমি বাক্সয় তুলে রেখেছি।"

"ছারপোকা বাক্সয় তুলে রেখেছ কি ? আমি ভাল করতে এলুম, মন্দ হ'ল ? দেখ্‌ছি, রাত্তিরে ঘুমুতে পার না, ছট্‌ফট্ কর।"

রমার সহিত নীলকণ্ঠের ঘনিষ্ঠতা দিনে দিনে বাড়িয়া উঠিতেছে। পূর্ব্বে মাসী নিজ বাড়ী হইতে ভাত বাড়িয়া আনিয়া দিতেন। রমা বলিল, "যে কদিন আমি তোমার কাছে থাক্‌ব, ঐ বাড়ীতেই রেঁধে দেব।"

"তা হ'লে ত ভালই হয়, বাছা ! আহা, এমন কেউ নেই যে বেচারীকে একটু আত্তিরি করে ! খেটে খুটে তেতে পুড়ে আসে, এমন কেউ নেই যে এক ঘটি জল এগিয়ে দেয়, কি একটু বাতাস করে।"

মাসীর বর্ণনা অসীম সহানুভূতিসম্পন্না, সেবাপরায়ণা রমার অন্তরে বাজিল। পরদিন হইতেই বিনদিনীর পাকশালে রমা রন্ধন করিতে বসিল।

নীলকণ্ঠ তাহার স্নানস্নিগ্ধ মূর্ত্তি, নিতম্ব-চুম্বিত এলায়িত কেশপাশ দর্শনে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিলেন। কি মোহিনী মূর্ত্তি ! অরূপে কি অপরূপ রূপের স্ফূর্ত্তি ! কিন্তু বার্দ্ধক্যের মোহ, আশ মিটাইয়া চাহিতেও লজ্জা ! ধীরে ধীরে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীলকণ্ঠ দূরে সরিয়া যান।

রন্ধনের পর ভোজনের পালা। পাখা হাতে বসিয়া রমার আহারের অনুরোধ, এটা খাও, ওটা খাও, উপরোধ, মাথার দিব্য, অভিমান ! স্নেহের অত্যাচার ! আহারান্তে হাতে আঁচাইবার জল, পাণ দিয়া রমা চলিয়া যায়। নীলকণ্ঠ একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন। মনে ভাবেন, এ স্বর্গভোগ কয় দিনের জন্য ? আবার দীর্ঘশ্বাস !

আজ সকালে মাসীকে ভাত আনিতে দেখিয়া নীলকণ্ঠ জিজ্ঞাসা করি করি করিয়াও সরমে সহসা প্রশ্ন করিতে পারিলেন না,—আজ রমা কোথা ? অন্তরের লুকান প্রেম পাছে ব্যক্ত হইয়া পড়ে ! শুধু তাই নয় ! অর্থ ব্যয় করিয়া যাহাকে অপরের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হয়, সকলের কাছেই তাহার কুণ্ঠিত ভাব। কিন্তু প্রবল কৌতূহল কোন বাধা মানিল না। নীলকণ্ঠ প্রশ্ন করিলেন, "মাসী, আজ তুমি যে, তিনি কোথা ?"

মাসী। কে, রমা ? বাপ ডেকে পাঠিয়েছে, তাই গেছে।

নীলকণ্ঠের মনে অভিমান হইল, আমাকে ঘুণাক্ষরে একটু জানাতে পারতো ! কিন্তু কেন ? আমি তার কে ? তবু এতটা দয়া যে করেছে, এটুকু সে না করলেও পারত।

মাসী বলিলেন, "তুমি কাযে বেরিয়ে যাবার পর লোক এসে নিয়ে গেল। যাবার সময় ব'লে গেছে, দাদাকে ব'লে যাওয়া হ'ল না ! ব'ল মাসীমা, যেন রাগ করেন না।"

নীলকণ্ঠ বলিলেন, "নাঃ, রাগ কি ? আচ্ছা, মাসী, মেয়েটি তোমার কে ?"

মা। আমার এক দূর-সম্পর্কের বোনঝি। বড় ভাল, না বোনপো ?

নী। এঁর কি এখনও বে' হয় নি ? না—

মা। না, বিধবা নয়।

নী। তবে ?

মা। কি, তবে ? বে হয় নি কেন ? সে বাছা, এক কাহিনী ! বাপ-মার ঐ একটি মেয়ে, আর কেউ নেই। বিষয়-আশয় কিছু আছে, কিন্তু বাধা পড়েছে—পাঁচ হাজার টাকায়। কেউ যদি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে বন্ধক খালাস

ক'রে দেয়, বাপের ইচ্ছে, মেয়েটি তাকেই দেবেন। আর বিষয়-আশয় সব মেয়ে-জামাইকে যৌতুক দিয়ে পরিবারকে নিয়ে কাশীবাসী হবেন। তা বাছা, মেয়ে যদি সাকারা সুন্দরী হ'ত, তা হলেও কথা ছিল।

নী। মেয়েটি কিছু পাস-টাস করেছে?

মা। না। বাপ শুনেছি অগাধ বিদ্বান্। মেয়েকে নিজে যত্ন ক'রে লেখাপড়া শিখিয়েছেন।

নী। কত বললে মাসী, পাঁচ হাজার?

মা। পাচ হাজার। আমার যদি ও টাকা থাকত, আমি ওর বাপকে দিয়ে, মেয়েটিকে এনে তোমার পায়ে ফেলে দিতুম। তা আমার যা কিছু আছে, কায়ক্লেশে চলে। বাপকে কত বুঝিয়েছি; কিন্তু সে ধনুক-ভাঙ্গা পণ, কার সাধ্যি ভাঙ্গে? আবার রমাও তাতে যোগ দিয়েছে।

নী। রমা? সে কি বলে?

মা। কেন মাসীমা, তুমি আমার জন্য এত ভাব? বাবা যত দিন আছেন, তাঁর বিষয় তিনি ভোগ করুন। তার পর সম্পত্তি বেচে মাকে নিয়ে কাশীবাসী হব। আমি বলেছিলুম, তা হোক বাছা, মেয়েমানুষের মাথার উপর এক জন অভিভাবক না থাকলে—

নী। তা কি বল্‌লে?

মা। মাসীমা, তোমাদের দিনকাল এখন আর নেই। এখন মেয়েরা আপনাদের বুঝেছে। তারা আর অভিভাবক চায় না। সময়ের গতি কে বাধা দেবে? এ দেশেও এমন দিন ছিল, যখন স্ত্রীলোক চিরজীবন ব্রহ্মচারিণী থাকতেন। ভগবানের দয়া হ'লে সব হয়, মাসীমা। তবে হ্যাঁ, মেয়ে-পুরুষ দু'জনকেই সংযমী হ'তে হবে।

নী। পাঁচ হাজার বুঝি, মাসীমা?

মা। হ্যাঁ, বাছা! একটু চেষ্টা দেখো না, কেউ যদি এমন থাকে।

বাচনিক আলোচনা এইখানেই শেষ হইল। কিন্তু নীলকণ্ঠের মনে কেবলই পাক খাইতে লাগিল—পাঁচ হাজার, পাঁচ হাজার, পাচ হাজারের অভাবে এ অমূল্য রত্ন হাতছাড়া হয়! দারিদ্র্য মহাপাপ।

নগরে নগরে, ঘরে ঘরে, হাটে, মাঠে, ঘাটে, বাটে, বহুরূপী সয়তান অনুক্ষণ শিকার অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। কামিনী-কাঞ্চন তাহার প্রধান অস্ত্র।

সয়তান আজ ধরমচাঁদ জহুরীর কর্ম্মচারিরূপে নীলকণ্ঠের সম্মুখে উপস্থিত হইল। প্রথম আলাপ-পরিচয় ও সামান্য গৌরচন্দ্রিকার পর কর্ম্মচারী বা সয়তান বলিল, "আমি আপনাকে পাচ হাজার টাকা পাইয়ে দিতে পারি।"

নীলকণ্ঠ চকিত হইলেন। এ কি মনের কথা টের পায় না কি? প্রশ্ন করিলেন, "কেমন ক'রে?"

কর্ম্মচারী বলিল, "ধরমচাঁদ বাবুর একখানি বন্ধকী কোবালা আপনার মনিবের সিন্দুকে আছে।"

নী। জানি। পঞ্চাশ হাজার টাকার।

ক। সেই দলিলখানি আমার চাই।

নী। চাই বল্‌লেই পাই কোথা?

ক। লোহার সিন্দুকের চাবি ত আপনারই জিম্মায়।

নী। চুরি বিশ্বাসঘাতকতা, আপনি আমার জেলের ব্যবস্থা করছেন?

ক। চুরি, বিশ্বাসঘাতকতা না করেও ত নিরপরাধে জেল পুরে এসেছেন। ভেবে দেখুন দিকি, বিশ্বাসঘাতক, চোর, জেলের ভিতরেই বা কত, আর বাইরেই বা কত আছে? ছাতি চাই।

নী। ভাল, জীবন্তে না হয় জেল এড়ালুম। তার পর?

ক। তার পর আবার কি?

নী। পাপ করলে ত নরকভোগ আছে?

ক। সে আবার কি? নরক আবার কি? কেউ দেখেছে?

নী। শাস্ত্রকার বলেন, পাপের দণ্ড আছে।

কর্ম্মচারী হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।—মশাই, ম'রে কোন্ লোকে যাব, সেখানকার আইন-কানুন কি রকম, কে বল্‌তে পারে? মশাই, কাল কি হবে, জানি না; তার আবার পরকাল! শাস্ত্রকার দুর্ব্বল, ভীরু লোকদের ভয় দেখাবার জন্য ঐ সব রচনা করেছেন।"

প্রয়োজন হইলে সয়তানের মুখেও শাস্ত্রকথা, মহাজন-বাক্যের স্রোত বয়। সয়তান বলিল, "সাক্ষাৎ নররূপী নারায়ণ দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেব বলেছেন, 'পাপ পুণ্য আছেও, আবার নেইও।' সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ কি বলেছেন—

'শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য,
মান্য করে সব খেয়ালে।'

আবার বলেছেন,—

'ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা।
তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি,
যদি না মানে বারণ তবে
জ্ঞান-খড়্গে বলি দিবি।'

ছাতি চাই, বুক চাই। সাহস চাই। তাই ভাগবত বলেছেন,—

'তেজীয়সাং ন দোষায়।'

আপনার ত জানা আছে। কত লোক নাবালকের সম্পত্তি, বিধবার গচ্ছিত ধন ফাঁকি দিয়ে গরীয়ান্ হয়ে ব'সে আছে। ছাতি চাই।"

নীলকণ্ঠ গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। সয়তান জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবছেন?"

নীলকণ্ঠ ভাবিতেছিলেন, এই ত সুযোগ, দৈব-প্রেরিত, বলিলেন, "দলিল কবে চাই আপনার?"

ক। আজ পাই ত কাল নয়।

নী। কোথায় আপনার দেখা পাব?

ক। বলেন ত এইখানেই আস্‌ব—টাকা নিয়ে।

নী। কাল নয়, পরশু। কাল সুরথমল বাবু বাড়ী থাক্‌বেন না, কাল চেষ্টা দেখব।

নীলকণ্ঠ ভাবিতে লাগিলেন, সব দিকেই দেখছি দৈবের অনুকূলতা। কাল সুরথমল বাবু বাড়ী থাকবেন না। আমাকে ব'লে গেছেন, পাশের ঘরে শুতে। দেখি ভাগ্যে কি আছে। রমাকে কি পাব?

সুরথমল কালীঘাটে গিয়াছেন, রাত্রি তিনটায় ফিরিবেন। অপকর্ম্মের পথ প্রশস্ত। কিন্তু চেষ্টা যদি সব সময় সফল হইত, পাপের পথে অগ্রসর হইলেই যদি কার্য্যসিদ্ধি হইত, তাহা হইলে সুবিধা মন্দ ছিল না।

তাঁহার প্রতি সুরথমলের পক্ষপাতের নিমিত্ত এ গৃহে সকলেই তাঁহার শত্রু। কোথায় কে আছে, কে কোথায় গোপনে তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে, এই দুশ্চিন্তায় সময় বহিতে লাগিল। পরে ঝিল্লীর সহিত ঘোর নাসিকা-ধ্বনি উত্থিত হইয়া নীলকণ্ঠকে যখন কিয়ৎপরিমাণে অভয় প্রদান করিল, তখন ঘড়ীতে দুটা বাজিতেছে। নীলকণ্ঠ নিঃশব্দে অগ্রসর হইলেন। আবার কাণ পাতিলেন। অগ্রসর হইতেছেন এবং প্রতি-পদে কাণ পাতিতেছেন। এইভাবে যে কতটা সময় কাটিয়া গেল, কে লক্ষ্য রাখে। নাঃ, এইবার সকলেই নিদ্রিত। কিন্তু চাবিহস্তে লোহার সিন্দুকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতেই কোথা হইতে কার পদধ্বনি কাণে আসিয়া পশিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কে তন্দ্রা-জড়িত স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—চোর—চোর!

ত্বরায় নীলকণ্ঠ শয্যায় আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। পরক্ষণেই দ্বারে ঘা পড়িল—বাবুজী বাবুজী! সঙ্গে সঙ্গে তিনটা বাজিল। সয়তান বলিল, আরে মশায়, ও অমন হয়। ভয়—ভয়—ভয় ছাড়া আর কিছু নয়। বুক টিপ টিপ করে, মনে হয়, কার পায়ের শব্দ। নিজের নিশ্বাসের শব্দে মনে হয়, কে কথা কইলে! আপনি আর একবার চেষ্টা দেখুন।

নীলকণ্ঠ বলিলেন, "না। আমার দ্বারা আর হবে না। রামের ইচ্ছা নয় যে এ কায হয়।"

ক—রাম আবার কে?

নী—কে, তা জানিনি। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা না হ'লে কোন কাযই হয় না। শুনেছি, তাঁর ইচ্ছা না হ'লে মানুষ আত্মহত্যাও করতে পারে না।

ক—আর একবার চেষ্টা করবেন না?

নী—কায হাসিল হ'লে ত আমারই লাভ; কিন্তু আমাকে মাপ করবেন।

কর্ম্মস্থলে বাহির হইবার পূর্ব্বে সহসা রমা আসিয়া নীলকণ্ঠের পদধূলি গ্রহণ করিল। নীলকণ্ঠ বিস্মিত হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন।

পরক্ষণেই মাসী ডাকিলেন, "বোন্‌পো, ভাত এনেছি, এস। ও মা! রমা যে, কখন্ এলি?"

রমা—এইমাত্র আসছি, মাসীমা। দাদা বেরিয়ে যাবেন ব'লে আগেই দেখা করতে এসেছি।

মা—হ্যাঁ রে, বাপ ডেকেছিল কেন?

রমা—তিনি, মাসীমা, মাকে নিয়ে তীর্থে চ'লে গেলেন। কারা সব সঙ্গী জুটেছে, এ সুযোগ ছাড়লেন না।

মা—কত দিনে ফিরবেন?

রমা—তার ঠিক নেই। আমার ভার তোমার উপর দিয়ে গেছেন।

মা। তা বেশ হয়েছে। তুই, মা, দাদাকে ব'সে খাওয়া। তার পর যাস, সব শুন্‌বো।

রমা পাখাহাতে খাওয়াইতে বসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ দাদা, অমন মুখভার ক'রে ব'সে আছ কেন? মুখে একটি কথা নাই,—একটু হাসি নেই। রাগ করেছ?"

নীলকণ্ঠ বলিলেন, "রাগ! কার ওপর?"

রমা। আমার ওপর?

নী। কেন?

রমা। না ব'লে, না দেখা ক'রে চ'লে গিয়েছিলুম ব'লে?

নী। তা গেলেই বা। বলতেই হবে, এমন কথা কি? আমার কেউ নাই, তাই দয়া ক'রে যত্ন কর। নইলে আমি তোমার কে?

রমা। কেন—দাদা।

নী। পাতান। নইলে সত্যি তুমি আমার কে?

রমা। দাদা, মুখ তুলে চাও; বল, আমি তোমার কেউ নই!

নীলকণ্ঠ নীরব।

রমা। চুপ ক'রে রইলে কেন? আমার পানে চেয়ে বল, আমি তোমার কেউ নই। দাদা, সত্যি বল, তুমি আমাকে ভালবাস কি না?

নী। বাসি। কিন্তু তুমি?

রমা। ভালবাসায় পশুপক্ষী বশ হয়—আমি ত মানুষ।

নী। না, তুমি মানুষ নও, দেবী। দেবীর ভালবাসা কি মানুষে পায়? কত আরাধনায়—কত পুণ্যে দেবী সদয় হন। তার কামনা পূর্ণ করেন। লক্ষ্মী কার ঘরে অচলা থাকেন?

রমা। কেমন ক'রে তোমায় বোঝাব?

রমার স্বর কাঁদিতে লাগিল। নীলকণ্ঠ বলিলেন, "রমা, মন যে বুঝতে চায় না। দারিদ্র্য, বয়স—"

রমা। গিরিকুমারী উমা, দক্ষ-দুহিতা সতী চির-ভিখারী মহাদেবকে মালা দিয়ে ত এ সমস্যার উত্তর দিয়েছেন। হিন্দুর মেয়ের এই আদর্শ।

নী। তাঁরা দেবতা, তাঁদের কথা আলাদা।

রমা। দাদা, ভালবাসাই যে দেবত্ব।

নী। রমা, সত্যি তুমি আমায় ভালবাস?

রমা। বাসি। কিন্তু, দাদা, তোমাকে দাদা বলেছি, এ মুখে আর কিছু বলতে পারব না। তুমি আমায় ভালবাস, আমি তোমায় ভালবাসি, আর কি চাই? পশুর পশুত্ব? সে তোমার আমার নয়। যিনি অমৃতের আকর, প্রেমের সাগর, যিনি বিষপানে সত্যই নীলকণ্ঠ, তাঁতে আত্ম-সমর্পণ ক'রে এ জীবন আমরা শুধু ভালবেসেই কাটিয়ে দেব।

নীলকণ্ঠ একটি ক্ষুদ্র শ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "রমা, সে রামের ইচ্ছা।"

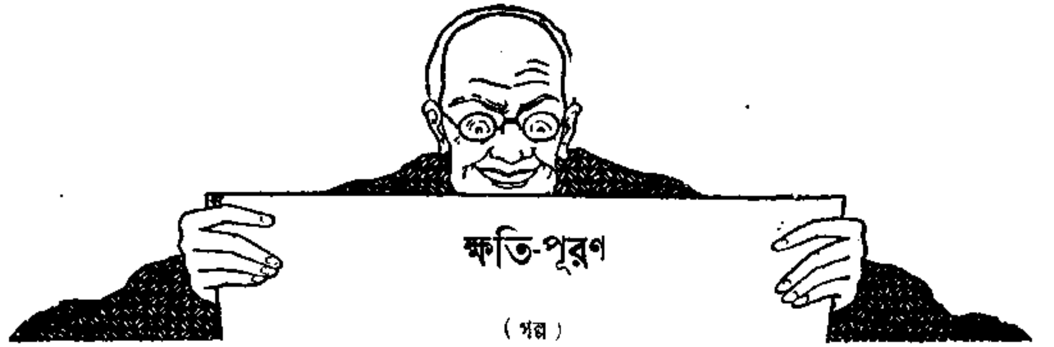
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

শেষ সম্বল

সে-দিনের কথা এরি মাঝে ভুলে গেলে
হৃদয়-বন্ধু মোর!
ভুলিবেই যদি কেন বা তখন এলে,
এ-অভাগিনীরে পরালে পুষ্প-ডোর?
ব্যাকুলতা-ভরা করুণ নির্নিমেষে
চেয়ে ছিলে তুমি মোর প্রাঙ্গণে এসে,
বরণ করিয়া লইনু তোমারে হেসে
মনোমন্দিরে মোর।
চলিয়াছ আজি কোন্ দুর্গম দেশে
মোরে দিয়ে শুধু আকুল অশ্রু-লোর॥

করেছিনু মোর মুক্ত হৃদয়-দ্বার
তব তরে ও গো প্রিয়!
পেয়েছো যে তার নিঃশেষ অধিকার,
সে কথা তোমার র'বে না কি স্মরণীয়?
আকাশের পাখী রহিবে না তুমি নীড়ে,
কি দিয়ে তোমারে রাখিব হেথায় ঘিরে
যাবে যদি যাও, আবার আসিয়ো ফিরে
হে মোর পরাণ-প্রিয়!
রহিব হেথায় বেদনা-সাগর-তীরে
বুকে ক'রে তব স্মৃতিটুকু রমণীয়॥

শ্রীসরোজরঞ্জন চৌধুরী



ক্ষতি-পূরণ

(গল্প)

অতুল খুব ত্রস্তব্যস্তভাবে আসিয়া ডাকিল, "ঠাকুরদা !"

তখন সন্ধ্যা উত্তরাইয়া গিয়াছিল। ঠাকুরদাদা আহ্নিকে বসিতেছিলেন। গ্রাম্য সম্পর্কের নাতি অতুলকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "অতুল যে, দেশে এলি কবে রে ?"

অতুল অগ্রসর হইয়া ঠাকুরদাদার পদধূলি লইয়া বলিল, "এই শেষ বেলায় এসেছি, ঠাকুরদা ! আপনার বিয়ের গল্পটা আজ আবার শুনাতে হবে।"

"বটে ! আগেই সেই গল্প !"

"হ্যাঁ ঠাকুরদা, আগেই সেই গল্প শুনবো।"

অতুলের কথার ভঙ্গিমায় গল্প শুনিবার কৌতূহলের অপেক্ষা আরও কিছু প্রকাশ পাইল। বৃদ্ধ যুবকের মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন, তাহাতে যেন চিন্তার গাম্ভীর্য্য ফুটিয়া রহিয়াছে। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "এমনি একটা গল্প ফাঁদবার আয়োজন বুঝি তোমার ঘটেছে ? তা বোস, আমি আহ্নিকটা সেরে নি। তুই ততক্ষণ ভিতর থেকে বেড়িয়ে আয় না, তোর দিদিমা বোধ হয় লুচি ভাজছেন।"

ঠাকুরদাদা আহ্নিকে বসিলেন। অতুল ভিতরে গেল না। বসিবার খাটের উপর শুইয়া পড়িল। আষাঢ়ের সন্ধ্যা, আজ মেঘ-বৃষ্টি নাই, খুবই গরম পড়িয়াছে। হেনাফুলের গন্ধ ঘরটাকে ভরপুর করিয়া দিয়াছে। পল্লীগ্রামের বাড়ী, রাস্তায় কোনও সোরগোল নাই, একটু দূরে কোনও বাড়ীতে মৃদঙ্গ বাজাইয়া হরিনাম গাহিয়া কাহারা হরির লুঠ দিতেছিল। আর ভিতর-বাড়ীতে বালক-বালিকারা মাঝে মাঝে সোরগোল করিতেছিল। অতুল কোনও দিকে মনোনিবেশ না করিয়া শুইয়া রহিল।

ঠাকুরদাদা খুব তাড়াতাড়ি আহ্নিক সারিলেন। তার পর বলিলেন, "শোন্ তবে সেই গল্প। আজ আহ্নিকে মন দিতে দিলি না তুই,—জানিস ত, ও গল্পের কথা মনে হ'লে এই চুয়াত্তর বছর বয়সেও আমি চব্বিশের মত হয়ে যাই। সত্যি, আজ ছ'মাসের ভিতর সে গল্প আমি কাকেও শুনাইনি। শুন্‌বার মত লোকই পাই না।"

চাকর তামাক দিয়া গেল; ঠাকুরদাদা নল মুখে দিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন,—"আমাদের বাড়ীতে এক বিধবা ভদ্রমহিলা একটি বালিকা কন্যাসহ বাস করতেন। ইনি আমার মামার দেশের লোক। মা তাঁকে বড় সচ্চরিত্রা ব'লে জানতেন। তাই বড় অভাবগ্রস্তা দেখে তাঁকে বাড়ীতে এনেছিলেন। তিনিও আমাদের ঘরে এসে শুধু শুধু আমাদের গলগ্রহ হয়ে থাকলেন না। রান্নাবান্না-ঘরকন্নায় মায়ের খুব সাহায্য করতে লাগলেন। তখন আমাদের মত বিশ পঞ্চাশ হাজারী জমিদার পাচক-পাচিকা রাখত না। আমার মা ঠাকুরমা পিসীমারা রান্না-বাটনা করতেন। ঐ যে আমাদের মামীমা,—আমরা তাঁকে মামীমা ব'লে ডাকতাম,—মা ডাকতেন বউ ঠাকুরাণী,—তিনি মায়ের চেয়ে কিছু বয়সে বড় ছিলেন। মামীমা বড় ভাল রাঁধতেন। তাঁর সেই গুণপণার মর্য্যাদায় তাঁকে প্রায়ই রান্নাঘরে আটকা থাকতে হতো। আমাদের পরিবার তখন ছোট ছিল না, আমরা ভাই-বোন, পিসীমা, তাঁর ছেলেমেয়েরা এসোজন-বসোজন, আমলা-গোমস্তা- নেহাৎ পক্ষে চল্লিশখানা পাতা প্রতি বেলায় পড়তো। মামীমা অম্লানবদনে তিন সন্ধ্যাই উনুনের আঁচে ব'সে থাকতেন। মা বা পিসীমা জোর-জবরদস্তি করেও তাঁর হাত থেকে হাতা-বেড়ী কেড়ে নিতে পারতেন না। ফলে আমরাও তাঁকে রান্নাঘরের মালিক ভেবে, ক্ষুধা লাগলে আর মাকে না ব'লে মামীমাকেই তাড়া করতাম। ভাল কথা, মামীমার একটি মেয়ে ছিল, তার নাম ছিল বিন্দী, অবশ্য তার মা-বাপে নাম রেখেছিল বিন্ধ্যবাসিনী বা বিন্দু-বিলাসিনী, বা বৃন্দাবন-বিহারিণী। বিন্দী চার বছর বয়সে এসেছিল আমাদের বাড়ীতে,—তিন বছর গেল, এখন হলো সাত বছরের। খুব চালাক মেয়ে। এই ক'বছরে সে আমাদের সঙ্গে বেশ জানা মিশে গিয়েছিল, মা তাকে আমার বোনদের মত কাপড়-গয়না দিয়ে সাজাতেন। সে যে গরীবের মেয়ে, আমাদের গলগ্রহ, তা সে কখনই বুঝতে পারেনি। আমার তখন বয়স তের বছর। তের বছরের জমিদারের ছেলে আমি, আমি বাবার বড় ছেলে,—প্রজারা, গোমস্তা দারোয়ানরা আমায় ডাকে বড় বাবু ব'লে। আমার মনে তখন হতেই বেশ একটু অহঙ্কার দেখা দিয়েছিল। আমি বুঝে নিয়েছিলাম, বিন্দী একটা গরীবের মেয়ে, ওর মাকে যে মামীমা ব'লে ডাকি, ওটা ত কেবল মুখ-বোলা ডাক। তিনি দায়ে প'ড়ে আমাদের পাচিকার কায ক'রে ভাত-কাপড়ে বেঁচে যাচ্ছেন, আরও মেয়ে পুষছেন। অতুল! ঘুমাচ্ছ না কি ?"

অতুল বলিল, "না দাদা মশাই! গল্প শুনতেই এসেছি, ঘুমাতে আসি নাই।"

ঠাকুরদাদা এই অবসরে গড়গড়ার নলে দু' চারিবার জোরে টান দিয়া বলিলেন, "সেই তের বছর বয়সে, এই ছোট কোঠা-বাড়ীটা, আর পিতা-মাতার আদরের জামা-জুতা-চাদরের আড়ম্বরে, মনটাকে যখন নরকের তলে ডুবিয়ে দিচ্ছি, তখন একটা কাণ্ড ঘ'টে গেল! ঐ যে দেখছ মণ্ডপ-ঘরের পিছনে ঐ বুড় আমগাছটা এখন মুড়-মাথায় খাড়া আছে, ওর ডালগুলি তখন আমাদের উঠানটা ছায়া ক'রে রাখতো। ওর নাম হচ্ছে 'গঙ্গাজ'লে', ওতে যে আম ধরতো, সে দশ হাজার কি তারও বেশী। আর অমন আম আমি ত

কোথাও দেখতে পেলাম না, ভাই। সার্থক ওর নাম গঙ্গাজ'লে। সেবারও অনেক আম ধরেছিল। জ্যৈষ্ঠ মাস, দুপুরবেলা, রোদ খাঁ খাঁ কচ্ছে! সবাই ঘরে প'ড়ে ঘুমুচ্ছে! আমি ছিলাম বাহিরে মণ্ডপ-ঘরে, সেখানে পাড়ার ছেলেরা আসতো আমার সঙ্গে খেলা করতে। সে দিন তখনও কেউ আসে নাই। এমন সময়ে টপ ক'রে একটা আম পড়লো, আমটা কুড়িয়ে আনবো, আমি ভাবছি, এর মধ্যে বিন্দী ছুঁড়ীটা তার সারা পিঠ-ঢাকা এলো চুলগুলি উড়িয়ে দৌড়িয়ে এলো সেই আমটা কুড়িয়ে নিতে। এর একটু আগে সে আমার ঘুড়িখানা ছিঁড়ে দিয়ে আমায় খুব রাগিয়ে দিয়ে গেছে। বিন্দী আমার সুমুখ দিয়ে আমটা কুড়িয়ে নিয়ে যায় দেখে, আমিও লাফ দিয়ে পড়লাম ঘর থেকে! সেই সর্ব্বনাশ হলো! বিন্দী যেই আমটা ধরতে যাবে, আমিও সেই লাফিয়ে পড়লাম আমটার উপর। আমার পায়ের চোট লেগে পোড়ারমুখী মেয়েটা প'ড়ে গেল, প'ড়ে গিয়ে যে কণ্ঠে সে ক'দে উঠল, 'ওঃ! বড়বাবু, আমায় খুন করেছ?' আজ ষাট বছরের কথা—সে কণ্ঠের কাতরতা, সে প্রাণ-ভাঙ্গা যাতনার সুর এখনও আমার বুক থেকে মিলিয়ে যায় নি। চেয়ে দেখি, বিন্দী ধূলায় গড়িয়ে আছে,—তার লাল মুখখানিতে নীল মেড়ে দিয়েছে। তথাপি আমি বল্লাম, "নে, ন্যাকামি রাখ, উঠে পড়। এমন কি লেগেছে!" বিন্দী এবার কেঁদে ফেল্লে, বল্লে, "আমি ত উঠতে পাচ্ছি না,—বড়!" সে বড় আদরের সময় আর বড় রাগের সময় আমাকে বড় বাবু না ব'লে 'বড়' ব'লে ডাকত। আমি তার হাত ধ'রে তুলতে গিয়ে দেখি, কি সর্ব্বনাশ! অভাগিনীর ডান পায়ের পা তার বৃদ্ধাঙ্গুলের উপরকার হাড়খানা ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে। সেখান থেকে রক্ত ছুটে তার আর একখানা পা রঞ্জিত ক'রে দিয়েছে। দেখে আমারও মুখ শুকিয়ে গেল, বুক কেঁপে উঠলো! 'আহা! এ কি হলো, বিন্দী! তোর পা যে ভেঙ্গে গিয়েছে! এখন উপায়?' কি সহিষ্ণুতা সেই সাত বছরের বালিকার! আমি হাত ধরলে সে উঠে বসলো। বসেই বল্লো, 'এখন কি হবে, বড় বাবু! মাকে ডাকবো?' আমি তখন তার পাখানি তুলে, ভাঙ্গা হাড়খানি ভিতরে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম। বড় ব্যথা লাগল তার, তবু সে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করলে। কিন্তু আমি সে ভাঙ্গা পা জুড়ে দিতে পারলাম না। আহা! কত ব্যথা লাগছে বেচারীর! আমার হাত কাঁপছে! আমি কেঁদে ফেল্লাম! পরক্ষণেই বিন্দী রোদে টলা লতাটির মত আমার বুকের উপর এলিয়ে পড়লো! এ কি! বালিকার যে সংজ্ঞা নাই! আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। চীৎকার শুনে ভিতর থেকে সকলে ছুটে আসলো। সে দৃশ্য দেখে সকলেই মর্ম্মাহত হ'ল। অভাগিনী দীনা জননী সংজ্ঞাহারা কন্যাকে বক্ষে আঁকড়ে ধরলেন। আমার মা আহত বালিকার চোখে মুখে জল দিতে লাগলেন। অল্প চেষ্টাতেই বালিকার চৈতন্য হ'ল। চেতনা পেয়েই বিন্দী প্রথম কথা বল্লো, "আমি প'ড়ে গিয়েছি, বড়র দোষ নেই।"

তখনই ডাক্তার ডাকা হ'ল। ডাক্তার এসে বিন্দীর ভাঙ্গা হাড় জুড়ে দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করলেন। নিয়মিত চিকিৎসা চলল। সকলে বিন্দীকে গৃহে লইয়া গেলেন। আমি কিন্তু সেই স্থানেই ব'সে রইলাম। আমগাছের ছায়া স'রে গিয়ে, জ্যৈষ্ঠের পড়ন্ত রৌদ্র আমার মাথায় পড়ল, বিন্দীর পায়ের রক্ত আমার হাতে গায়ে মাখা, আমি সেখান থেকে স'রে যেতে পারি নি। আমার উপর দৃষ্টি দেওয়ার অবকাশ তখন কারু ছিল না। অনেকক্ষণ পরে সন্ধ্যার একটু আগেই বিন্দীর মা, আমাদের মামীমা এসে আমার হাত ধ'রে বল্লেন, 'ও কি বাবা! তুমি এখনও ওখানে ব'সে আছ?' আর সাম্‌লে থাকতে পারলাম না। কেঁদে ফেল্লাম। 'মামী-মা, আমি তোমার বিন্দীর পা ভেঙ্গে দিয়েছি।' কত বড় যাতনায় যে বুক ভেঙ্গে যেতে লাগলো, তা কি আজ কাউকে বুঝাতে পারি!"

বৃদ্ধের চক্ষু দিয়া জল ঝরিল, কথায় বাধা পড়িল। অতুলের নয়নও শুষ্ক রহিল না। অতুল বলিল, "দাদা মশাই! এ বৃদ্ধ বয়সে আপনার চোখের জল কি সুন্দর!"

দাদা মহাশয় চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "বৃদ্ধ আমি, তা কিন্তু এই গল্প মনে উঠলে আমার মনে থাকে না। এই কাহিনীটার কথা উঠলে যেন আমার আঠার বছর বয়সটাকে আমি ধ'রে রেখেছি। শোন, বিন্দী বাঁচল, তার ঘা সারল, কিন্তু পা সারল না, ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগল না। বিন্দী খোঁড়া হ'য়ে গেল। বড় ডাক্তার বল্লেন, প্রথমে হাড় ফিট ক'রে ব্যাণ্ডেজ করবার সময়ে, হাড় ঠিক যায়গায় যায় নি। তাই এই খোঁড়াটুকু থেকেই যাবে। বিন্দীর মা বল্লেন, তা থাক, আর কি করা যাবে? তবে একে গরীবের মেয়ে, তায় খোঁড়া, কেউ বিয়ে করতে চাবে না।' একটা বড় দীর্ঘনিশ্বাসে মামী-মার বক্ষের পঞ্জরগুলি যেন ভেঙ্গে গেল।

"সেই দিন এ জীবন-স্রোতের গতিটা যেন বড় একটা দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়ে ঠেকে সেইখানেই আটকে দাঁড়ালো। আহা! ধনে, মানে, রূপে, স্বাস্থ্যে বড় আমি, একটা দীনা কাঙ্গালিনী মেয়েকে অঙ্গহীন ক'রে তাকে সকল রকমে সংসারের ত্যাজ্য ক'রে দিলাম! সেই দিন সকল গর্ব্ব আমার টুটে গেল। ধনবানের পুত্র, জমিদারের বংশধর, কোঠাবাড়ী, সাজ-সরঞ্জাম—সব আমার ভুল হয়ে গেল। এই ধন-দৌলতে দরিদ্রের মেয়ে বিন্দীর পাখানি ত আমি জুড়ে দিতে পারলাম না! দয়াময় দর্পহারী এই উপলক্ষে আমার সকল দর্প চূর্ণ ক'রে দিলেন।

"এর পর বিন্দীকে আর আমি কটু কথাটি বলিনি। প্রথমে তার কাছে যেতে আমার যেন ভয় হতো। পীড়িত অবস্থায় বিন্দী আমাকে কাছে ডাকতো। আমি তার কাছে যেতাম। সে বলতো আমায়, 'তোমার দোষ কি, বড়? আমার সেরে যাবে।' আমি কথা বলতাম না, চোখ ফেটে জল বেরুতো,—ছুটে সেখান থেকে চ'লে আসতাম। তার পর বিন্দী সেরে উঠে যখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে আমার কাছে আসতো, আমি অন্যত্র চ'লে যেতাম। তার খোঁড়া পার চলন আমার বুকে শেল বিঁধতো। তথাপি বিন্দী দুরন্ত মেয়ে কাযে অকাযে আমারই কাছে আসতো। তেমনি আগেকার মত আমার বই উল্টাত, আমার কাগজের উপর হিজি-বিজি লিখতো, আমার খেলার গুটিগুলি চুরি ক'রে সরিয়ে রাখতো, আমি খুঁজে খুঁজে হায়রাণ হ'লে বার ক'রে দিয়ে হেসে কুটিকুটি হতো। গঙ্গাজ'লের আম কিন্তু আমি আর কুড়াতে যাইনি। বিন্দী কুড়িয়ে এনে আমায় দিত, আমি না নিতে চাইলে রাগ করতো, কেঁদে ফেলতো। সে কত কথা, তোমাদের তা ভাল লাগবে না। সেই পাঁচ বছরে আমার মনের ঝড়-তুফান বলতে গেলে শুকদেবের মহাভারত বলা হবে।

"শোন পরের কথা।—ষোল বছর বয়সেই আমার বিয়ের কথা উঠলো। আমি জমিদারের ছেলে, বিয়েয় কত রোশনাই হবে, মা'র

কত আনন্দ! আমি দু'চারদিন ভেবে চিন্তে মাকে ব'লে ফেল্লাম, 'গরীবের মেয়ে বিন্দী, তার পা আমি খোঁড়া করেছি। তাকে কেউ বিয়ে করতে চাবে না। তা'কে ভাল বরে বিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত আমি কিছুতেই বিয়ে করবো না। এ আমার দৃঢ়পণ,—বাড়াবাড়ি কল্লে বাড়ী থেকে পালিয়ে চ'লে যাব এবং কেশব সেনের কাছে গিয়ে ব্রহ্মজ্ঞানী হব।' কথা বাবার কাণে উঠলো। বাবা কথাটা ভালভাবেই বুঝলেন। বল্লেন, 'তা বটে, ওর প্রাণে যখন এমন উচ্চ ভাবের সঞ্চার হয়েছে, আমি তার অন্যথা করবো না।' বাবা আমার বিবাহ বন্ধ রেখে বিন্দীর বিবাহের আয়োজন করতে লাগলেন। তিনিও পণ করলেন, যত টাকা লাগে, ভাল বরে বিন্দীর বিবাহ দিয়ে পরে আমার বিবাহ দিবেন। বিন্দীর তখন দশ এগারো বছর বয়স। খোঁড়া হয়ে এখন আরও তার চালাকি বেড়ে গেছে। সে এক দিন আমায় বল্লে, 'বড়, তোমার ত বড় অন্যায়।' আমি বল্লাম, 'কি?' সে মুখ ভার ক'রে বল্লে, 'তুমি আগে আমায় তাড়িয়ে পরে বউ আনবে। আমি তোমার বউয়ের সঙ্গে দুটো দিন খেলা করতেও পাব না?' আমি তার কথা শুনে হাসলাম, হেসে বল্লাম, 'আমি বিয়ে করবো বড় মানুষের মেয়ে, সে হবে কত বড় সুন্দরী, তার গা-ভরা থাকবে সোনা-মণি। তোমার খোঁড়া পা দেখে ঘেন্না করবে।' বলেই আমি চমকে উঠলাম, আমি তাকে কখনও 'খোঁড়া' কথাটি বলি না। সে সে দিক লক্ষ্য না ক'রে বল্লে, 'তা হ'লে আমি তোমার কাছে নালিস করবো।' সে বল্লে না, 'আমি বউকে ব'লে দেবো, কে আমার পা খোঁড়া করেছে।' আমার কেমন অস্বস্তি বোধ হ'ল, বল্লাম 'যা! পাগলামি করিস না।'

"বাবা বিন্দীর জন্য ভাল বর বেছে আনলেন। টাকার অভাব কিছুই নয়। তবু কিছু সময় লাগলো। আরও দু'বছর কেটে গেল। বিন্দীর বয়স তখন ১২ বছর। বড় সুন্দর চেহারাটি বিন্দীর, পিঠ-ছাওয়া চুলের বোঝা উরু ছুঁয়েছে, কুঁদে কাটা মুখখানা, চাঁপা ফুলের বর্ণ, দীর্ঘায়ত চোখ, তুলি-আঁকা ভ্রূ। কেবল যা খুঁৎ একটু খোঁড়া। তার জন্য বাবা দিচ্ছেন দু'হাজার নগদ, আর দু'হাজার টাকার সোনা। এখনকার মত তখন ত্রিশ টাকার বি, এ পাশ কেরাণী বাবুর পণ দশ হাজার টাকা হয় নাই। বিন্দীর বর যথার্থই সুপাত্র। দেখে শুনে আমার আহ্লাদ হ'ল। একটু পরে মনে একটা ভাবনা উঠলো। আজ ত বাবার মানে ও বাবার ধনে এমন সুপাত্র বিন্দীকে গ্রহণ করলে। এর পরে যদি খোঁড়া দেখে তার বিতৃষ্ণা জন্মে, যদি সেজন্য সে এমন সুন্দর সরলা মেয়ে বিন্দীকে ঘৃণা করে? বুকের ভিতর দুপ্ দুপ্ ক'রে উঠলো। তখন আমার আঠারো বছর বয়স।

"সে দিন আর আহারাদি করলাম না। সারাদিন নদীতীরে, মাঠের মধ্যে, এ রাস্তা সে রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম। রাত্রিতে ঘুম এল না। সকালে উঠে আর একবার বেড়িয়ে আসলাম। তার পর ধীরে ধীরে, ভয়ে ভয়ে, চুপে চুপে গেলাম বিন্দী তার মায়ের সাথে যে ঘরে থাকে। গিয়ে দেখলাম, বিন্দী তখনও শয্যা থেকে উঠেনি। তার মা উঠে গেছেন। আমি চুপে চুপে তার কাছে ব'সে ডাকলাম, 'বিন্দী!' তার গায়ে হাত দিতে তখন সাহস হয়নি। এ কি! আমি যেন একটা বর্ষাকালের পদ্ম নাড়া দিলাম। বিন্দী আমার মুখপানে চাহিতেই তার চোখ দিয়ে ঝরঝর পশলা বইতে লাগল। সে তা হাত দিয়ে বার বার মুছলো। তবু যে তা মুছে না। দুর ছাই! আমিও বুঝি আর তখন কিছু চোখে দেখতে পাই না। আঠারো বছরে পুরুষের চোখেও জল আসে? আমি বল্লাম, 'কাঁদছিস কেন, বিন্দী!' বিন্দী উঠে বসলো,—উঠে ব'সে আরও কাঁদতে লাগলো। 'ছি! কাঁদছিস কেন?' ব'লে আমি তার হাতখানি ধরলাম। সে জোরে আমার হাত থেকে তার হাতখানি ছিনিয়ে নিয়ে বল্লে, 'এই ত তোমরা তাড়িয়ে দিচ্ছ।'

'তোর কি যেতে ইচ্ছা হয় না?'

'না।'

'বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সুরূপ তোর বর, আমি নিজে দেখে এসেছি।'

'গরীব, খোঁড়া মেয়ে, তার এতটা কেন?'

'বিন্দী সেখান থেকে উঠে যাবার চেষ্টা কচ্ছিল। আমি তার হাত ধ'রে বাধা দিলাম। বল্লাম, 'তবে একটা কায করতে হবে, বিন্দী!'

'কি কায?'

'তোর মা ও আমার মায়ের সামনে গিয়ে তোর বলতে হবে, যে আমার পা খোঁড়া ক'রে দিয়েছে, আমি তাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবো না।'

"বিন্দী ব'সে ছিল, শুয়ে পড়ল। যেন দেহের ভার বহন করা তার পক্ষে ক্লান্তিজনক। আমি বললাম, 'পারবে ত?' বিন্দী শুইয়া—উপুড় থাকিয়াই বলিল, 'ছি! ছি! তুমি ত ভারি অসৎ।'

'সৎ অসৎ পরের কথা, যা বল্লাম, পারবে ত?'

'না, কখনই না।'

'আমার অনুরোধে।'

'না তোমার দরকার হয়, তুমি গিয়ে বল।'

'আমি দুর্ব্বল! আমি বলতে পাচ্ছি না। তুমি আমার অনুরোধে বল।'

'না, আমি পারবো না।'

'যদি না পার, ইহলোকে আমার সঙ্গে এই শেষ সাক্ষাৎ।'

'ইস্।'

'সত্য বলছি! এই পণ,—আমি চল্লাম।'

"যখন দরজা পর্য্যন্ত এসেছি, তখন বিন্দী আমায় ডাকল, 'শোন, বড়।' আমি ফিরলাম। বিন্দী অত্যন্ত কাতরভাবে বলল, 'এ তোমার বড় অন্যায়।'

'আমার অন্যায় সকলই। বিনাপরাধে তোমার পাখানি ভেঙ্গে দিয়েছি, সে কি আমার ন্যায়?'

'আমি যদি তোমার কথা না শুনি, তবে কি তুমি সত্যই ঘর-বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাবে?'

'এখনি, এই মুহূর্ত্তে! এই পণ।'

'মা, বাপ, ভাই, বোন, সব ছেড়ে যাবে?'

'যাবো, আমার ইচ্ছা।'

'তবে, তুমিই তোমার মাকে এ কথা বল না কেন?'

'আমি বলবো?—একটি খোঁড়া গরীবের মেয়েকে বিয়ে করার কথা আমি বলতে যাবো কিসের জন্য? আমি পারবো না, তুই বলবি। পারবি না? পারবি না? তবে যা, আমি যাই।'

'আমি আবার ফিরলাম। বড় অত্যাচার করলাম বালিকার উপর। সে যেন বড় একখানা পাথরের চাপে প'ড়ে পিষে যেতেছিল, তার মুখে চোখে বড় যাতনার ছায়া দেখা গেল! তবু আমার ক্ষমা

হলো না, আমার দুষ্টামি গেল না। সত্য বল্‌ছি, সেই সমস্যায় পড়া, সরম-সোহাগের তুফান খাওয়া, হাসি-কান্নার বিপ্লব-সহা, বিন্দীর মুখখানা আমি বড় সুন্দর দেখছিলাম। সে আমার অত্যাচারে যতই কাতর হচ্ছিল, আমি ততই তার উপর অত্যাচার করতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম! আমি ধূর্ত, সে সরলা! অগত্যা সে বলিল, 'আমি পার্‌বো, বড়। যা থাকে কপালে, আমি বল্‌বো'।

'তখনই আমার মা সে ঘরে প্রবেশ করলেন। এর আগে তেমন অবস্থা আমাদের কারুরই ছিল না যে, বাহিরের আর কোনও দিকে মনোযোগ রাখি। মা বুঝি আগে থেকে দ্বারে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনেছিলেন। তিনি ঘরে ঢুকেই তর্জ্জন ক'রে বল্লেন, 'কেমন মেয়ে রে বিন্দী তুই! এক প্রহর বেলা হয়, এখনও বিছানা ছাড়লি না?'

'বিন্দীর তখনও চোখ-ভরা জল। আমি ব্যাকুবটির মত স'রে আস্‌লাম। বিন্দীর পক্ষে একটু দয়া হলো বই কি? দেখি, মা না জানি তাকে কি বলেন। বাহিরে কাণ পেতে শুন্‌তে লাগলাম, মা বল্লেন, 'খোকা তোকে কি বল্‌ছিল রে?'

'বিন্দী কোনও উত্তর কল্লে না। মা খুব তর্জ্জন ক'রে অথচ হাসি-মিশান স্বর-ভঙ্গিমায় বল্লেন, 'বল্, আমি শুনেছি সব। ছেলেটি এত বড় বেয়াদব হয়েছে?'

'বিন্দী পোড়ারমুখী তখন লাজের মাথা খেয়ে ব'লে ফেল্লে, বড় বাবু আমায় বলেন যে, তুই মার কাছে বল্‌বি, আর কাউকে বিয়ে কর্‌বি না!'

'বড় বাবুকে বিয়ে কর্‌বি?'

'তিনি তাই বল্‌তে বলেন?'

"বাহিরে থেকে আমার যা রাগ হলো,—তা আর কি বল্‌বো। কাছে যেতে পার্‌লে আমি দুষ্ট মেয়েটার জিব টেনে ধর্‌তাম। যাক, আর আমি সেখানে দাঁড়ালাম না। যা হয় হোক গিয়ে।"

'দুপুরবেলায় বাবা যখন ঘুম থেকে উঠলেন, তখন মা গিয়ে বল্লেন, বিন্দী আমার ঘরের লক্ষ্মী, আমি পরকে দেবো না।'

'বাবা বল্লেন, সে কি, খোঁড়া মেয়ে!'

'যার খোঁড়া, তারই থাক্। বয়সে পঞ্চাশ পার হ'তে যায়—এতটুকু বুদ্ধি ঘটে নেই? আজ ক'দিন দেখছ—ছেলের মুখের শ্রী!'

'হ্যাঁ! বটেই ত। তবে আমায় এত ঘোরাঘুরি করালে কেন?' বলিয়া বাবা চাকরকে ডাকলেন তামাক দিতে। আমি সে দিন মামার বাড়ীতে চ'লে গেলাম।"

২

ঠিক সেই সময়ে পশ্চাতের দরজা দিয়া দিদিমা খোঁড়া পায় সত্বর গমনে আসিয়া উপস্থিত। "এখন বুড় পেয়াদার গল্প হবে! আর ছোঁড়াগুলো হয়েছে নেহাৎ গল্পখোর!" বলিয়া পঁয়ষট্টি বছরের দিদিমা নাকের ফাঁদি নথটায় খুব ঝাঁকি দিলেন। হাসির কথা নয়, দিদিমার একটি দাতও পড়ে নাই, একগাছি চুলও পাকে নাই। সে নথ নাড়াটি মোটেই বেমানান বোধ হইল না। অতুল উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। দিদিমা তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "বউ যেন পাকা চুলে সিঁদুর পরে!" অতুল হাসিয়া বলিল, "কেন দিদিমা! তোমার মত কাঁচা চুলে পরবে না? তোমাদের মত কোর্টসিপের জোগাড়ে আমিও আছি!"

দিদিমা তাঁহার লাল ঠোঁটখানায় একটু ভঙ্গিমা করিয়া বলিলেন, "ঐ গল্প বুঝি বিশ্বাস কচ্ছিস,—ও-সব মিথ্যে কথা! অমন অলঙ্কার দিয়ে গল্প করতে আর ছুটি পাবে না।"

"আচ্ছা! দিদিমা, তুমি গল্পটা খাঁটি-খাঁটি ব'লে শুনাও না। ঠাকুরদার মুখে এই তিন দিন শোনা হলো,—তোমার মুখে আজ শুনবো।" বলিয়া অতুল যোড় হাত করিল।

"আচ্ছা, শুন্‌বি পরে! আয়,—খাবার যায়গা হয়েছে! পেটে কিছু দিয়ে আগে পেট ঠাণ্ডা ক'রে নে, খালি পেটে এ গল্প শুন্‌লে এ বয়সে অরুচি দাঁড়িয়ে যাবে। চল্, ও-ঘরে!"

ঠাকুরমার পশ্চাতে ঠাকুরদাদা ও অতুল আর এক ঘরে গেলেন। সেখানে দুইখানি থালায় লুচি-তরকারী সাজান।

অতুল হাসিয়া বলিল, "এই হলো আমার আইবুড় আশীর্ব্বাদ দিদিমার! এখন বল সেই গল্প!"

দিদিমা বলিলেন, "তবে শোন। উনি কিন্তু আবার কথার ভিতর কথা কাটতে পারবেন না। আমরা বড় গরীব দেখে, পিসীমা আমার মাকে ও আমাকে নিয়ে আস্‌লেন। এখানে সবাই আমায় খুব ভালবাসতেন, কেবল ঐ এক জন আমায় কিলটা চড়টা মারতেন, মাথার খোঁপা খুলে দিয়ে চুলগুলি ছড়িয়ে দিতেন। আবার আমি না হ'লে ওঁর পা টেপা, ঘামাচি খোঁটা, চুল আঁচড়ান হতো না। তার পর এক দিন প'ড়ে গিয়ে আমার পা-খানা ভেঙ্গে গেল। উনি বাহানা ধরলেন, আমি তোর পা-খানা ভেঙ্গে দিয়েছি। পা আবার সেরে গেল,—তবু তাই নিয়ে ওঁর সঙ্গে আমার ঝগড়া। কেবলই সেই এক কথা,—আমি তোকে খোঁড়া ক'রে দিলাম, বিন্দী! আমার তাতে বড় রাগ হতো! ওঁর সঙ্গে তর্কে আঁটতে না পেরে কেঁদেছিলাম, কিল-চড়ের ভয়ে বেশী বল্‌তে সাহস হতো না।"

ঠাকুরদাদা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। বলিয়া উঠিলেন, "কি মিথ্যাবাদী! তার পর তোমার গায়ে আমি হাত তুলেছি?"

দিদিমা আঁচলখানা আর একটু কপালের দিকে টানিয়া দিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ, চিমটি কাটতে লাগ্‌লেন। সেই ত আমার দুঃখ বেধে উঠলো। কিল-চড়টা বরং মিষ্টি ছিল,—সেই যখন তখন শুধু শুধু অপরাধীর মত ভাব, কি হবে? কি কর্‌লাম? কেন এমন হলো? আর দিনে পাঁচবার আমার খোঁড়া পা-খানা টেপাটেপি—ছি ছি! আমি অতিষ্ঠ হয়ে পড়লাম। ভাবলাম, এখান থেকে স'রে পড়তে পাল্লে স্বস্তি পাই। তা যাবো কোথায়? ভাত-কাপড়ের উপায় ছিল না। আরও পিসীমা-পিসে মশাইএর আদর-যত্ন। কোথাও যাওয়া হলো না। থাক, সে কত কথা। পিসে মশাই কত চেষ্টা ক'রে, টাকা দিয়ে, আমার জন্ম বর বেছে আন্‌লেন। শুন্‌লাম, খুব ভাল বর, ভাল ঘর। বারো বছর বয়সে আমার বিয়ে। সেই আনন্দে সে দিন আমি সকাল সকাল বিছানা ছেড়ে উঠি নাই,—এমন সময়ে আঠার বছুরে মরদ, বেলজ্জ—বেহায়া,—আমায় গিয়ে বলে, আমি তোকে বিয়ে করবো। বেহায়ার কাণ্ড দেখে আমি হেসে মরি।"

ঠাকুরদাদা আবার বলিয়া উঠিলেন,—"মিথ্যা কথা, তখন কেঁদে ফেলেছিল!"

"জিভটা শুড় শুড় কচ্ছে দেখ! কেঁদেছিলাম? হাসি কান্না,—

মেয়েমানুষের মুখের, তোমরা পুরুষ জাত বোঝ কি না? তার পর আর কি হবে? বড় মানুষের আহ্লাদে ছেলে, তার আবদারে আটক থায়? মা বাপও তেমনি,—ছেলের সাধ, হোক তাই। খুঁড়ীর বিয়ে,—তার কি বাজি-বাজনার ঘটা! যা ছিল কপালে, তাই হলো আর কি, ভাই।"

অতুলের তখন খাওয়া আধা হইয়াছিল। সে কেমন গম্ভীর মুখেই হাসিয়া বলিল, "তার পর এত কাল কেমন কাটলো, দিদিমা?"

"কাটলো সুখে দুখে একরূপ! তবে একটা জ্বালায় বড় জ্বলেছি এই খোঁড়া পাখানা নিয়ে! আগাছোটা, আলুলতা, দায়মল-কাটা কত রকমের মল, গুঞ্জরি-পঞ্চম, ঘুঙ্গুর যে এই খোঁড়া পাখানায় পরতে হয়েছে,—নিত্যি নতুন,—তাতে দুই এক দিন ইচ্ছে হয়েছে, আমি আর মাটিতে পা পাতবো না। আর লজ্জার কথা—কব কি ভাই,—রোজ একবার খোঁড়া পাখানায় হাত না দিয়ে দেখলে, সর্ব্বনেশে লোকটার শান্তি হতো না!"

ঠাকুরদাদা এবার বলিলেন, "চুপ কর, বেই-মানী কোথাকার! ও ঘরে বউমারা শুনে হাসছেন, শুনতে পাচ্ছ না?"

"আ আমার কপাল! ও হাসাহাসি তুমি বাকি রেখেছ? আমার মেজো বউ-মা ঘরে থাকলেও, আবার ঘুঙ্গুর দেওয়া মল তৈরী হয়ে এসেছে। তুমি যা লজ্জা আমায় দিলে!"

৩

গল্প শুনিয়া অতুলের মনটা যেন খুব পাতলা হইয়া গেল,—বড় ভারি মনে সে আসিয়াছিল।

সে রাত্রি অতুল সেখানে কাটাইয়া পরদিন সকালে চলিয়া গেল। তার চার দিন পরে ঠাকুরদাদা মাধ্যাহ্নিক নিদ্রার পর মহাভারত পড়িতেছিলেন, ঠাকুরমা ও তাঁহার বউমারা কাছে বসিয়া শুনিতেছিলেন, এমন সময়ে অতুল আসিয়া উপস্থিত। তাহার পশ্চাতে একটি অবগুণ্ঠনবতী ষোড়শী। অতুলের মুখে সলজ্জ মৃদু হাসি। সকলেই যেন চমক খাইল। জিজ্ঞাসাবাদ করিবার আগেই ঠাকুরমা উঠিয়া সহাস্যে অবগুণ্ঠনবতীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "এটি বুঝি, নাত-বউ? এসো দিদি!" ফিরিয়া দেখিলেন, অতুল সেখানে নাই। তখন তাহাকে খুঁজিবার অবকাশ ছিল না। সকলে নববধূর অভ্যর্থনায় মনোযোগ দিলেন। আনন্দোল্লাসের তরঙ্গ প্রশমিত হইতে সময় কাটিল অনেক। পরে যখন তত্ত্বানুসন্ধানের প্রবৃত্তি আসিল,—তখন অতুলকে খুঁজিয়া আনিবার বড় প্রয়োজন হইল। "অতুল বিয়ে কল্লে কোথায়? বউ এনে এখানে উপস্থিত কল্লে কেন? বউএর চিবুকে সাদা দাগ,—এমন বউ কেন বিয়ে কল্লে?" ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধান জন্ম অতুলকে খুঁজিতে লোক পাঠাইলেন। কোথাও অতুলকে পাওয়া গেল না। লাজে মূক বধূটিও কিছু বলিল না! এ কি সমস্যা!

বউটির মুখখানা শুষ্ক, ক্ষুধা পাইয়াছিল। আগে তাহাকে কিছু খাওয়াইয়া ঠাকুরমা এক নিভৃত কক্ষে গিয়া বলিলেন, "দিদিমণি! বল ত ব্যাপার কি? আমি ঠাকুরমা, আমায় লজ্জা কি?" ঠাকুরমা যে ভাবে কথা বলিলেন, তাহাতে পাগলেরও কথা ফুটে। বউ আস্তে আস্তে বলিতে লাগিল।

"বড় গরীব আমরা। বাবা ম'রে গেলে আমাদের খাবার সংস্থান ছিল না। আমাকে ও আমার ভাইটিকে নিয়ে মা এক বছর থালা, বাসন, গয়না বেচে কাটালেন। কলকাতায় গড়পারে আমাদের একটি ছোট বাড়ী ছিল। একটি আত্মীয় জুটিয়ে দিলেন তিনটি কলেজের ছাত্রকে। তাঁরা মাকে ২০ টাকা ক'রে মাসিক দিতেন,—মা তাঁদের খেতে দিতেন, একটি কামরা তাঁদের থাকবার জন্ম দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে সেই টাকায় আমাদের খাওয়া চলতো। সেবার দীপালীর দিন সকল ছেলেরা বাজি পোড়াচ্ছিল। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। আমার ইচ্ছা কচ্ছিল, আমি তুবড়ী হাউই পেলে পোড়াতুম। এমন সময়ে উনি এসে আমায় বল্লেন, 'তুমি বাজি পোড়াবে?' আমার আঁধার মুখ দেখে তাঁর বুঝি বড় স্নেহ হলো। তিনি তখনই ছুটে গিয়ে বাজার থেকে কয়টি বাজি এনে আমায় দিলেন। আমি পেয়ে বড় খুসী। তখনই একটি তুবড়ীর মুখে দেশলাইকাঠি জ্বেলে ধরলুম।—দেশলাইটা নিবে গেল। যে আগুনের ফুলকিটুকু ছিল, তাই ফুঁ দিয়ে জ্বালাতে গেলাম। অমনি তুবড়ী ফুটে উঠলো। আমার মুখ ঝলসে গেল। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। যখন জ্ঞান হলো, তখন দেখলাম, কলেজের ছেলেরা আমার শুশ্রূষা কচ্ছেন, মা কেঁদে আকুল হচ্ছেন। যিনি আমাকে বাজি দিয়েছিলেন, আর সকলে তাঁকে বড় নিন্দা কচ্ছে। বলছে, তুমিই সকল অনর্থের মূল। তিনি অপরাধ স্বীকার ক'রে প্রাণপণে আমার শুশ্রূষা কচ্ছেন।

"অল্পদিনেই আমি সেরে উঠলাম। কিন্তু মুখে এই সাদা দাগটা রয়ে গেল। ডাক্তাররা বল্লেন, ও পোড়াদাগ সহজে মিলাবে না। মা গরীব,—আমার মুখে ঐ সাদা দাগ দেখে কেউ আমায় নিতে চায় না। দুই এক জন চেয়েছিল,—তারা বুড়ো। এ জন্ম মা বড় কাঁদতেন, আর মাঝে মাঝে বলতেন,—'ঐ বাবু ভালবেসে বাজি এনে দিয়েই আমার সর্ব্বনাশ করেছেন।' বাবু কত রকম ঔষধ এনে দিলেন, আমার সাদা দাগ মিলাল না। এক দিন নির্জ্জনে পেয়ে বাবু আমার হাতখানি ধ'রে বল্লেন, 'কি করলে এর প্রতীকার হয়, কুমু?'

"আমি শিহরে উঠলাম, বল্লাম, 'কিসের?'

"আমি তোমার যে সর্ব্বনাশ করেছি,—তার! তোমার এমন সুন্দর মুখখানি আমি বিরূপ ক'রে দিয়েছি!' কত অপরাধীর মত সে কথাগুলি! আমি লজ্জায় মরে গেলাম! বল্লাম, 'আপনার পায় পড়ি, এমন কথা আর বলবেন না। আপনার কি দোষ?'

"তিনি আমার মুখপানে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে, কত কি ভেবে আমার হাত ছেড়ে দিয়ে বল্লেন, 'আচ্ছা।' সে আজ ৭ দিনের কথা। সেই দিনই তিনি আমাদের বাড়ী থেকে চ'লে আসলেন। তার তিন দিন পরে ফিরে গিয়ে মাকে বল্লেন, 'মা! আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করবো। কালই শুভ দিন। আপনি প্রস্তুত হ'ন।' মা অবাক্ হয়ে রইলেন। তার পর আমাকে এইখানে এনেছেন।"

ঠাকুরমা পরমাহ্লাদে বলিলেন, "তা হ'লে আজ ফুলশয্যা!"

বউটি হাসিল,—কথা বলিল না।

ঠাকুরমা সে কাহিনী সকলকে শুনাইলেন।

পরদিন ঠাকুরদাদা অতুলের এক পত্র পাইলেন। যথা—"ঠাকুরদাদা! দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনাদের প্রথম

প্রণয়ের আখ্যান আমার কর্ত্তব্য পথের আলোক হইয়াছিল। কিন্তু আমি দরিদ্র পিতার সন্তান। আমি এম, এ পাশ করিয়াছি, এই গৌরবে দু'তিন জন কন্যার পিতা বাবাকে পাঁচ হাজার টাকা সহ কন্যাটিকে তাঁর পুত্রবধূ করিতে সানুনয় অনুরোধ করিতেছিলেন। আমি দরিদ্র পিতার পাঁচ হাজার টাকা নষ্ট করিয়াছি, সন্তান হইয়া পিতার মনোভঙ্গ, সুতরাং মানভঙ্গ করিয়াছি। দেনার দায়ে আমার বাবার বাস্তু বাঁধা। যাহা হউক, আমি টাকা উপার্জ্জনে মনোযোগ দিলাম। পাঁচ হাজার টাকা কখনও উপার্জ্জন করিতে পারিব কি না, বলিতে পারি না,—কিন্তু পাঁচ হাজার টাকা বাবার হাতে না দিয়া, আমি বৌএর মুখ দেখিব না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আপনার ঘরে ভাতের অভাব নাই,—নিরুপায় বালিকাটিকে দু'টি ভাত দিয়া অবশ্য পুষিবেন।"

পত্র পাইয়া ঠাকুরদাদা আগে হাসিয়া কুটপাট হইলেন। তার পর গৃহিণীকে ডাকিয়া পত্র পড়াইয়া শুনাইলেন,—বউমাদেরও শুনাইলেন, পরে বলিলেন, "অতুল ছেলেটা কতবড় ধড়িবাজ দেখেছ? আমার উপর এক চাল চেলে নিলে?"

অতঃপর তিনি অতুলের পিতাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি আসিলে, বৃদ্ধ বলিলেন, "অতুলের বিয়ে, পাঁচ হাজার টাকার কিছু কম হ'লে তোমার চলবে না?"

"তা আর চলে কি ক'রে, কাকামশাই? জানেন ত দেনায় সর্ব্বস্ব যায়।"

বৃদ্ধ বাক্স খুলিয়া হাজার টাকার পাঁচ কেতা নোট অতুলের পিতার হাতে দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এই নাও বাবাজী তোমার পাঁচ হাজার! আমার ঘরে আছেন তোমার পুত্রবধূ,—নিজের ঘরে নিয়ে বরণ করো। ছেলেকে বাড়ী আসতে লেখ।"

শ্রীবিধুভূষণ বসু।

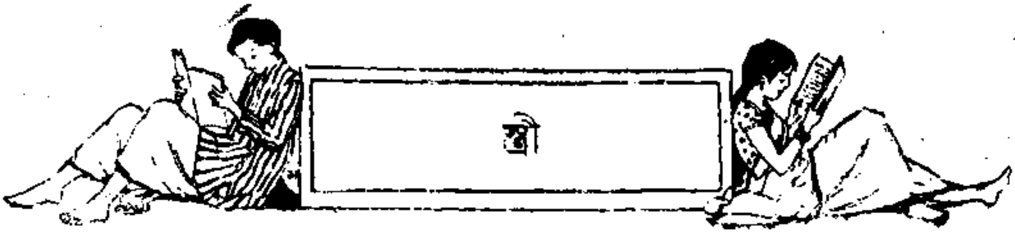
প্রবাসীর প্রিয়া

দীর্ঘ বরষ প্রবাসে কাটায়ে
আজি এই আশ্বিনে
প্রিয়তম, তুমি আসিছ ফিরিয়া
ঘরখানি তব চিনে।
দিবসের সাথে রজনী যখন
চুপি চুপি আসি করে আলাপন;
সেই সন্ধ্যায় তুমিও কখন
আসিয়া দাঁড়াবে দ্বারে।
ছুটে যেতে চাহি হেরিব সরমে
চরণ চলিতে নারে।

হয় তো বা সাঁঝে তুলসীর মূলে
পূর্ণ প্রদীপ নিয়া
প্রণমিতে যবে পড়িব লুইয়া
গলে অঞ্চল দিয়া—
বাহিরে চরণ-শব্দ তোমার
ভুলাইয়া দিবে প্রণাম আমার;
দীপ ফেলি, বহি সরমের ভার
ছুটিব ঘরের দিকে—
হয় তো বা হেরি মৃদু হেসে তুমি
চেয়ে রবে অনিমিখে।

তার পর যবে দুরু দুরু বুকে
যাইব তোমার পাশে
তোমার সোহাগ ভাবিয়া আবেশে
নয়ন মুদিয়া আসে!
দীর্ঘ দিনের বিরহের ভার
যাহা আছে হিয়া করি অধিকার
নিমেষে প্রেমের প্লাবনে তোমার
নিঃশেষে যাবে ভাসি।
শুধু রবে মিলি অধরে অধর,
নয়নের কোণে হাসি।

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়।



স্ত্রী

(গল্প)

সদ্য বিবাহ হইয়াছে, নূতন শ্বশুরবাড়ী গিয়াছি।

মধ্যাহ্নে আহারাদির পর বাহিরের একটি ঘরে বিশ্রাম করিতে ঢুকিয়াছি, বাহির হইতে কে বলিল, "পান নিয়ে এলেন না?"

ফিরিয়া দেখি নীহার—মুখে একমুখ হাসি, হাতে এক রেকাবী পান। ভিতরে ঢুকিয়াই বলিল, "বউ-মানুষ না কি, এত লজ্জা!"

মেয়েটি সম্পর্কে আমার শালী—সেই বাড়ীরই মেয়ে। তখনও বিবাহ হয় নাই, তের পার হইয়া চৌদ্দয় পড়ি-পড়ি করিতেছে। মাতাপিতার একটিমাত্র সন্তান।

খুব কম বয়সেই আমার বিবাহ হয়। প্রবাদ আছে, তখন আমি ভারি লাজুক ছিলাম। বিশেষ করিয়া, মেয়ে-মানুষ দেখিলে এতটুকু হইয়া পড়িতাম। কিন্তু এই মেয়েটির সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইবার পরই বুঝিতে পারিতাম, আমি অনেকটা যেন বিশ্ববিজয়ী। নীহারের কথাটা শেষ হইতে না হইতে বলিলাম, "তুমি কেন কষ্ট ক'রে আনলে, নীহার?"

"আপনি মুখটি রাঙা করবেন, তাই!" বলিয়াই নীহার পান কয়টি তুলিয়া লইয়া আমার হাতে গুঁজিয়া দিয়া একখানি বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িল। আমি তখন কক্ষের অপর পার্শ্বে খাটের উপর শুইয়া পড়িয়াছি।

উভয়েই চুপচাপ। কিন্তু, বোধ করি, সে দুই এক মিনিট। নীহার কি মনে করিয়া বলিয়া উঠিল, "আমাকে দেখে আপনি লজ্জা করেন, না?"

সত্য কথাই বলিলাম। কহিলাম, "লজ্জা করব কেন?"

"ভাল ক'রে কথা কন না, গল্প করেন না!"

মুস্কিলে পড়িলাম। কিছুতেই স্মরণ করিতে পারিলাম না, কোন্ দিন, কবে এই দিকটায় আমার ত্রুটি হইয়াছে। জবাব দিলাম, "সবই ত করি।" যেন আমি কত অপরাধী!

"লজ্জা করেন না আমার কাছে?"

"কেন করব?"

"আচ্ছা। একটা কথা বলবো, রাখবেন?"

"বল।"

"না, আমার গা ছুঁয়ে বলুন—রাখবেন?" বলিয়াই নীহার উঠিয়া আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

আমার মনের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল—গা ছুঁইয়া! অনূঢ়া হইলেও নীহারের বয়স হইয়াছে। বলিলাম, "বল, শুনবো। দিব্যি করবার দরকার নেই।" বুঝিতে পারিলাম, কথাটি বলিয়া নীহার আমার মনের ভাব লক্ষ্য করিয়াছে এবং লজ্জায় পড়িয়াছে। কি বলিলে কি হয়, বোধ করি, আগে সে বুঝিতে পারে নাই, এখন বুঝিয়া মুখখানা রাঙা করিয়া ফেলিল। কিন্তু, ঠকিবার পাত্রী নয়, তাই সহজ-ভাবেই বলিল, "একটি গান—"

"গান ত জানিনে! জানিনে নয়, গাইতে জানিনে।"

"না, জানেন না!" বলিয়া নীহার আর একটু কাছ ঘেঁসিয়া সরিয়া আসিল, এবং আমার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে এক মিনিট চাহিয়া থাকিয়া আবার বলিল, "গান—এই মাথার চুল টেনে দিচ্ছি!" বলিয়াই আমার পার্শ্বে বসিল এবং মুখের উপর হইতে দুই একগাছি চুল সরাইয়াই ঈষৎ শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, "ও মা! ঘেমেছেন যে!" বলিয়াই আঁচল দিয়া আমার কপাল মুছাইয়া দিতে লাগিল। আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধ।

"জামাইবাবু, ধরুন গান?"

"বললাম, জানিনে।"

"দেখুন, অত ইয়ে করবেন না," বলিয়াই যেন রাগ করিয়া ঈষৎ সরিয়া বসিল। কিন্তু চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, পরক্ষণেই আবার বলিল, "আচ্ছা, একটা লিখে দিন!"

"তা নাও—"

নীহার নিজেই একটি গান লিখিয়া লইল।

"—ঠাণ্ডা!"

"এই মরেছে রে!"—নীহার চমকিয়া উঠিল। তার পর পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরের দুয়ারটি ও একটি জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

ডাক দিল—হেমলতা, নীহারের 'ঠাণ্ডাজল।' সারাদিন উভয়ে একসঙ্গে থাকে—উভয়ের এক প্রাণ, এক তারে যেন এক সুরে বাঁধা। সে দিন হেমলতা কোথায় গিয়াছিল, দীর্ঘকাল দেখা হয় নাই, তাই বাড়ীতে পা দিয়াই ছুটিয়া আসিয়াছে। সাড়া না পাইয়া আবার সে ডাকিল—"ঠাণ্ডাজল—"

"এই রে, এই দিকেই আসছে।"—কথাগুলি গলা চাপিয়া বলিয়া নীহার বাকী জানালাগুলিও বন্ধ করিয়া দিল।

"—নীহার!"

"এই—" বলিয়া নীহার জিব কাটিয়া ফেলিল। দেখিলাম, তাহার মুখ সাদা হইয়া গিয়াছে।

"তোর জামাইবাবুকে বিরক্ত করিস্‌নে! ও বাড়ী যা—" বলিলেন নীহারের মা।

আমরা কেহই জানিতাম না, নীহারের মা নিকটেই একটা চালায় শুইয়া আছেন।

নীহার ঘর হইতে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল। হেমলতা তখন নিরাশ হইয়া চলিয়া গিয়াছে।

সেই দিন হইতে নীহার বড় একটা আমার কাছে আসিত না। চোখোচোখি হইলে, চোখ নামাইয়া চলিয়া যাইত, যেন কত অপরাধ করিয়াছে।

* * * *

অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে, এক দিন মাঠে বেড়াইতেছি, ডাক-পিয়ন আসিয়া হাতে একখানি চিঠি দিয়া গেল। দেখিলাম, লেখাটা স্ত্রীলোকের হাতের। শিরোনামায় লেখা, "পূজনীয়—।" বিস্মিত হইলাম, কেন না, আমার স্ত্রী কস্মিন্‌কালে প্রথমভাগের মুখ দেখে নাই। যাহা হউক, খুলিয়া ফেলিলাম, দেখিলাম, নীচে লেখা—'আপনারই নীহার!' পত্রে যাহা নিবেদন, তাহা আর আজ স্মরণ করিব না।

এইরূপ তিন-চারিদিন অন্তর একখানি করিয়া নীহারের পত্র আসিতে লাগিল। আমারও কেমন নেশা ধরিয়া গেল, তাহাকে পত্র লেখা। আমার চিঠি লেখার স্থান ছিল—আমাদের বাগানের একটি গাছের তলায়। ক্রমশঃ এমনি হইয়া দাঁড়াইল যে, ডাক খুলিবার সময় ডাকঘরে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতাম ও চিঠি আসিলে লইয়া আসিতাম। এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল।

অতঃপর হঠাৎ এক দিন বুঝিতে পারিলাম, নীহার বড় বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিতেছে। এক দিন মিষ্ট কথায় পত্র লিখিয়া বুঝাইয়া দিলাম—"অতটা ভাল নয়!"

এই চিঠির জবাব পাই নাই। স্ত্রীর মুখে শুনিয়াছি, এ চিঠি গিয়া পড়ে নীহারের কাকীমার হাতে; নীহার তখন বাড়ী ছিল না। সে বাড়ী আসিলে, তাহার আক্কেলের কথা লইয়া খুব খানিকটা আলোচনা চলিয়াছিল,—সে আলোচনা বাহিরে প্রকাশ পায় নাই। তবে নীহার সে দিন জলস্পর্শ করে নাই।

এই ঘটনার পর প্রায় দুই-তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। নীহারের বিবাহ হইয়াছে—বাঁকীপুরে। আমি কলিকাতায় কলেজে পড়ি, নীহার থাকে স্বামীর কাছে। তাহার সেই লাঞ্ছনার কথা ভাবিয়া-ভাবিয়া এ কয় বৎসরের মধ্যে এক দিনও মনে শান্তি পাই নাই। ভাবিতাম, তাহার মনে কতই না আঘাত দিয়াছি। সরল বিশ্বাসে মনের কপাট খুলিয়াছিল, বিশ্বাসের প্রতিবাদী হইয়া সে-ভাণ্ডার লুঠ করিবার জন্য আমি দেশের লোক জড় করিয়াছি।

এক দিন থাকিতে পারিলাম না, নীহারকে চিঠি লিখিলাম, শুধু সাদা কথায় 'কেমন আছ?'

জবাব আসিল খুব শীঘ্র—সেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা হাতের লেখা, যেন কত অমিয়া-মাখানো, স্মৃতির ব্যথা-জড়ানো! মনে হইল—জীবনের মাঝখানে বসন্ত আর আসিবে না, কোকিল আর ডাকিবে না!

নীহারের চিঠি! চোখে দুই ফোঁটা জল আসিল অনেক কষ্টে খুলিলাম—সেই চিঠি! একটি নিশ্বাস ফেলিয়া পড়িলাম—সেই লেখা!

চিঠিখানিতে দুই একটিমাত্র কথা লেখা। ইহাতে প্রেমের সে বাজার বসানো নাই, ভালোবাসার মাথার দিব্যও নাই! আছে যেন কত দিনের ব্রত-উদ্‌যাপনকারিণীর অভয়-বাণী, শ্মশান-চিতা-নির্ব্বাণান্তে তপ্ত ভস্মরাশি—যেন আর কেহ আসিবে না, আর কেহ চাহিবে না। কিন্তু সেই ত সে—সেই ত আমি! বারবার পড়িলাম তৃপ্তি মিটিল না, মনের ব্যথা কমিল না! আবার চিঠি লিখিলাম। জবাব আসিল—"আর চিঠি দেবেন না—মরিনি।"

* * * * * *

আবার একটা অতিদীর্ঘ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইতি-মধ্যে নীহারের পিত্রালয়ে এক দুর্দৈব ঘটিয়াছে—নীহারের মা মারা গিয়াছেন। মৃত্যুকালে নীহারের মা কন্যাকে দেখিবার জন্য চঞ্চল হইয়াছিলেন, কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই নীহার আসে নাই। নীহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, তথাপি তাহার স্বামী তাহাকে দেখিতে পারিত না। এমন কি, শুনিতে পাইতাম, যৎপরোনাস্তি অত্যাচারও করিত। আরও শুনিতাম, স্বামী বাহিরে নিশা-যাপন করে, বাড়ী আসে না। শুনিতাম, তাই নীহারের এই দুর্দশা।

পূজার ছুটীতে শ্বশুরালয়ে গিয়াছি, এক দিন নীহারের বৃদ্ধ পিতা অশ্রুনিরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "বাবা, তুমি যদি এক দিন বাঁকীপুর গিয়ে জামাইকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বল! তোমরা লেখাপড়া শিখেছো, এ কালের ছেলে, তোমাদের কথায় যদি তার সুমতি হয়।" নিত্যই এমনি বলিতেন। অগত্যা এক দিন বাঁকীপুর যাত্রা করিলাম। স্ত্রী শুধু একটু ঠোক্কর দিয়া বলিল, "চোর চায় ভাঙ্গা বেড়া।"

* * * * * * *

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। বাঁকীপুর পৌঁছিলাম।

নীহারদের বাড়ী ঢুকিতে হইবে—খিড়কীর পথ দিয়া, সদর দুয়ারটি গত রাত্রির ঝড়ে পড়িয়া গিয়া রাস্তা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ভিতরে প্রবেশ করিব, দেখি, সম্মুখে নীহার—সেই! কূপ হইতে জল তুলিতেছে। তখন আকাশে একরাশ জ্যোৎস্না।

ডাকিলাম—"নীহার!"

"জামাইবাবু?" নীহারের কণ্ঠস্বর, সেই সব! কিন্তু —কিন্তু এ ডাকে প্রাণ কৈ? যেন নির্জীব! এই কি সেই —নী-হা-র?

"হঠাৎ? ভাল আছেন—জামাইবাবু?"

"আছি। তুমি?"

এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে বজ্রকণ্ঠে কে ডাকিয়া উঠিল, "বউ!" আমাকে দেখিতে পাইয়া বলিল,—"ও কে?"

নীহার প্রত্যুত্তর করিল,—"আমার বাপের বাড়ীর লোক।"

অপরাধ করিয়া মানুষ যখন ধরা পড়ে ও ঠিক সে মুহূর্তে তাহার অবস্থা যেমন হয়, ভয়ে ও লজ্জায় মাটীর মধ্যে সে যেমন মিশিয়া যায়, আমার অবস্থাও ঠিক তেমনই হইল। কিন্তু কেন, খুঁজিয়া পাইলাম না। আমি ত কোন অপরাধ করি নাই। চাহিয়া দেখি—একটি তরুণী বিধবা।

তরুণী একদৃষ্টে আমার দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া নীহারকে বলিল,—"এখানে কেন? বাড়ী নিয়ে যাও!"

তাহার হাবভাবে আমার মনের ভিতর কি এক পরিচয়হীন আতঙ্ক ও বিস্ময় যুগপৎ যেন মাথা উঁচু করিয়া রুখিয়া দাঁড়াইল। নীহারকে প্রশ্ন করিলাম,—"উনি?"

নীহার জবাব দিল,—"আমার বিধবা ননদ।"

অতঃপর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিবার অবসর না দিয়াই আমাকে ইঙ্গিত করিয়া বাড়ীর ভিতর সে প্রবেশ করিল, এবং যে যবনিকা নীহার অতি যত্নে ফেলিয়া দিল, তাহাকে উঠাইবার প্রবৃত্তি আমারও হইল না।

সে রাত্রিতে নীহারের স্বামী বাড়ী আসিল না—আমার আসিবার উদ্দেশ্যটা নীহারকে খুলিয়া বলিলাম—বলিলাম, "তোমার বাবার আসবার উপায় নেই, তোমায় তিনি দেখতে চান!"

নিশ্বাস ফেলিয়া নীহার বলিল,—"বলবার কিছুই নেই, জামাইবাবু! এ মুখ আর দেখাবো না বলেই মাকে শেষ দেখা দিতে যাইনি। আমি গেলে এরা বাঁচে!"

তাহার চোখ দুটি সজল হইয়া উঠিল। অতঃপর মুখটি নীচু করিয়া সে আড়ালে চলিয়া গেল।

পরদিন বাহিরে বসিয়া আছি, দেখিলাম, নীহারের স্বামী বাড়ী আসিতেছে। তাহার চোখদুটি রক্তবর্ণ, পদক্ষেপও স্বাভাবিক নয়। বুঝিতে পারিলাম, কোন নায়িকার গৃহ হইতে সদ্য নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। আমি যথারীতি অভিবাদন করিলাম, সেও যথাযথ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল।

উভয়ে কথা কহিতে কহিতে বাড়ী ঢুকিলাম। তার পর একথা-সেকথায় আমি বলিলাম,—"নীহারের বাবা নীহারকে দেখিতে চান। নীহারকে লইয়া যদি—"

সে বলিল,—"ধান নিয়ে। আমার সময় হবে না।"

সন্ধ্যায় ট্রেন। সেই দিনই যাইব স্থির করিলাম,—কেহ আপত্তি করিল না। অপরাহ্ণে যাত্রা করিবার জন্য নীহারকে তৎপর হইতে বলিলাম। নীহারের স্বামী বাড়ীর মধ্যে ছিল, আমি ছিলাম বাহিরে। সে একটি ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র নীহারও সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিল—আমি একটু দূরে সরিয়া

আসিলাম। কেন জানি না, তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিবার জন্ম মনটা ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তাই সে দিকে কাণ পাতিয়া রহিলাম।

শুনিলাম, নীহার বলিতেছে, "কবে আবার আস্‌বে বল—বল!"—তাহার কণ্ঠস্বর ক্রমে অস্ফুট হইয়া আসিল।

এমন সময়ে বাহিরে গাড়ীর শব্দ হইল। মনে করিলাম, নীহারের স্বামী আমাদের জন্ম গাড়ী আসিতে বলিয়াছে। গাড়ীখানা দাঁড়াইবামাত্র সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, আমিও পশ্চাতে আসিলাম। কিন্তু, এ কি!—দেখিলাম, গাড়ী হইতে এক রূপসী তরুণী নামিয়া আসিয়া নীহারের স্বামীর কাণ দুটি মলিয়া দিল ও তাহার হাত ধরিয়া হাসি ছড়াইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

নীহারের ঘরে আসিলাম; দেখিলাম, সে বসিয়া রহিয়াছে—যেন মাটীর প্রতিমা। দেহে চাঞ্চল্য নাই, চোখে অশ্রু নাই, ভাবে বিপর্য্যয় নাই। ডাকিলাম, "নীহার—"

নীহার অন্যমনস্ক ভাবে সাড়া দিল।

কহিলাম, "ওঠো!"

"গাড়ী?"

"আন্‌ছি।"—একখানা গাড়ী ডাকিয়া আনিলাম।

নীহার তাহার ননদের কাছে বিদায় গ্রহণ করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

ষ্টেশনে আসিয়া দেখিলাম, ট্রেণ আসিবার আর দেরী নাই। নীহারকে স্ত্রীলোকদের বিশ্রামাগারে রাখিয়া টিকিট কিনিতে যাইতেছি, নীহার ডাকিল, বলিল, "কোথায় যাচ্ছেন?"

"টিকিট করতে।"

"কোথাকার?"

"বোলপুরের।"

"না। কাশীর টিকিট করুন।"

"কেন?"

"বাড়ী আর যাব না।"—নীহারের স্বর স্বাভাবিক। অথচ মনে হইল, তাহার অন্তরের এক নিভৃত কোণ হইতে একটু হাসির আভা বাহির হইয়া তাহার মুখটি আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে। সে-মুখে বিষাদ অথবা চাঞ্চল্যের এতটুকু ছায়া নাই—এ যেন বাল্যের সেই স্বভাব-কুমারী, সেই নীহার। বলিলাম, "বাড়ী যাবে না কেন?" তখন আর আমার বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা নাই।

নীহার জবাব দিল, "যাব না। আপনি কাশীর টিকিট করুন।"

"কি বল্‌ছ? কাশী যাবে কি জন্মে?"

"বুঝতে পারছেন না?"

"কি ক'রে বুঝবো?"

"শুনুন—"

আমি একটু সরিয়া গেলাম। নীহার নিমেষে তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্যটুকু যেন তাহার চোখের উপর ছড়াইয়া দিল এবং মুখখানি ঈষৎ একটু উঠাইয়া বলিল, "আপনি ভালো বাসেন, তাই। বাসেন না। ভালো, ঠিক তেমনিটি?"

সে চুপ করিল। পরক্ষণেই আবার বলিল, "চোখের সামনে সবই দেখলেন। জামাইবাবু, এ-সংসার আমি চাইনে! চাই আর এক সংসার, আর এক আশ্রম, আর এক তীর্থ—সেখানকার যাত্রী আপনি আর আমি।"

কি-যেন কিসের কথা, অন্তরের কি-যেন ব্যথা-জড়িত কত দিনের কাহিনী, কোন্ অতীত-বসন্তের প্রাণ-মাতানো মৃদু-সমীরণ, দীর্ঘকালের কোন্ মেঘলা-রাতের চাঁদের ছবি একে একে আমার মনের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। নীহারের মুখের পানে চাহিলাম, তাহাকে দেখিলাম—সেই লাবণ্যময়ী নীহার। চক্ষু নামাইলাম, নীচে ঘোর অন্ধকার! আবার চোখ তুলিলাম—আবার সেই চটুল, চঞ্চল, উচ্ছ্বাসময়ী বালিকা! বালিকা? না! সে এখন বালিকা নয়, অপূর্ব্ব রহস্যময়ী নয়। এখন যৌবনের প্রবল বন্যায় তাহার সারা সৌন্দর্য্য তরল হইয়া দেহের উপর উপ্‌ছিয়া পড়িতেছে। কি-এক অলস প্রশ্ন আমার বুকের মধ্যে উঁকি মারিল। কি বলিতে চাহিলাম, পারিলাম না। অবরুদ্ধকণ্ঠে শুধুই ডাকিলাম, "নীহার—"

জবাব আসিল, "কেন, জামাইবাবু?"

আর আমার কথা নাই, কাহিনী নাই—চুপ করিয়া রহিলাম।

নীহার তাড়া দিল, "করুন টিকিট!"

"টিকিট?"

"হাঁ। কাশীর।"

"আমি পারব না।"

নীহার দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "তা হ'লে আমাকেই টিকিটের জন্ত যেতে হবে।"

এমন সময়ে টিকিটের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে যেন দেখিতে পাইলাম, এক মন্দিরের পর্দা উঠিয়াছে, যাহার ভিতরকার বিগ্রহ—সমাজ! চম্‌কিয়া উঠিলাম। মুখ ফিরাইতেই চোখে পড়িল আর এক মূর্ত্তি—নীহার! তাহার নয়নে নিবেদন, মুখে বেদনা, সর্ব্বাঙ্গে মিনতি! না, না—এ ঠেলিবার নয়! না—না—না! মুহূর্ত্তে বাছিয়া লইলাম বর্ত্তমান, বাছিয়া লইলাম—নীহারের তৃপ্তি, বাছিয়া লইলাম—আমার মুক্তি। দুইখানি কাশীরই টিকিট কিনিয়া পশ্চিমের গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম।

একই কামরায় একই আসনে বসিলাম। অপরাপর যাত্রী আমাদের উভয়ের পরিচয় ও সম্পর্ক যে সহজ, হয় ত তাহাই বুঝিয়া লইয়াছিল—কাহারও মুখে সন্দেহের ছায়া নাই। পাশের বেঞ্চিতে একটি ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী ছিলেন—তিনি বসিয়াছিলেন নীহারের অপর পার্শ্বে। দেখিলাম, তাঁহাদের মধ্যে খুব খানিকটা আলাপ-পরিচয়ের জমাট বাঁধিয়া উঠিল। একথায়-সেকথায় স্ত্রীলোকটি আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া নীহারকে থাম্‌কা মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিয়া বসিল, "উনিই? তোমার—"

নীহার মুখখানি নীচু করিয়া মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিল।

একে একে অনেকে নামিয়া যাইতে লাগিল। ইঁহারাও নামিয়া গেলেন, এবং মেয়েছুটির যে পরিচয় যুগ-যুগ ধরিয়াও ভাঙ্গিবে না বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিল, তাহাও বাষ্প হইয়া উবিয়া গেল।

কাশী পৌছিতে মাত্র আর দুই একটি ষ্টেশন বাকী। তখন আমাদের গাড়ীতে বড় একটা ভিড় নাই, দূরে এক জন পশ্চিমা-বাসী নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যাইতেছিল। কাশী গিয়া কোথায় থাকিব, নীহারকে লইয়া কোথায় রাখিব, সে ভাবনা এতক্ষণ ভাবি নাই। এইবার তাহা মনে পড়িল। নীহারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় এখন থাকা যাবে?"

নীহার মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। হাসিয়া বলিল, "সে ভাবনা আগেই আমি ভেবে রেখেছি।"

"কি?"

নীহার তাহার পানের কৌটা খুলিয়া একটি পান আমার হাতে দিল, দিয়া বলিল, "কাশীতে কেন এলাম, বোধ করি, বুঝতে পারেন নি—না?"

"না।"

"এখানে আপনাদের জামাই আস্‌বেন কাল—সেই ঠাক্‌রুণকে নিয়ে!"

সে কি? তবে কি নীহারের এ সমস্তই ছল? কৌশলে আমাকে ফাঁদে ফেলিবে?—যেন একটা দম্‌কা ঝড় আমার বুকটাকে কাঁপাইয়া দিল!

নীহার আমার অবস্থা বুঝিতে পারিল, বলিল, "ভয় খাবেন না। এই স্থান—এই কাশীই আমাদের পক্ষে নিরাপদ। কেন না, এখানে থাক্‌লে কখনও তিনি সন্দেহ করবেন না, পারেন না—কেউ না!"

কথাটা বুঝিলাম। ভাবিলাম—সত্যই ত। বলিলাম, "কিন্তু, বাসা?"

"তাও ঠিক করেছি।"

"কোথায়?"

"ডাল্‌কিমণ্ডাই। আশ্চর্য্য হবেন না। ওখান ছাড়া আর কোনও যায়গায় আমাদের থাকা চলে না। ওখানে থাকলে কেউ চিন্‌বে না, কেউ সন্দেহ করবে না। পাশের বাড়ীর রূপসীরা মনে করবে—একটা নতুন ভাড়াটে এসেছে! ভাল নয়?"—নীহারের মুখে হাসি, আর হাসি!

আমার বুকের ভিতরটা আর একবার আলোড়িত হইয়া উঠিল। কেন, এ সমস্তর মূলে প্রয়োজনটা কি? আর একবার নীহারকে ভাল করিয়া দেখিলাম, মুখপানে চাহিলাম—পরিষ্কার, পবিত্র এক আলেখ্য! না, না!—ও-মুখে কলুষ নাই, কলঙ্ক নাই! শুধুই—ঝরিয়া পড়িতেছে—এক সঙ্কোচহীন, আবরণহীন, নির্ম্মুক্ত বেদনা। নিষ্পেষিত অন্তর!

আমি দ্বিরুক্তি করিলাম না। কাশী আসিয়া পৌছিলাম।

নীহারকে ট্রেণ হইতে নামাইয়া একখানা গাড়ী ভাড়া করিলাম ও কোচম্যানকে গন্তব্য স্থানে যাইতে হুকুম দিয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম।

পৌছিয়া বাড়ী খুঁজিয়া লইতে বেশী দেরি হইল না। পাড়ায় গাড়ী দাঁড়াইতেই,—ভদ্রবেশী একটি বাবু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নতুন আস্‌ছেন বুঝি?"

বলিলাম—"হ্যাঁ।"

"কার বাড়ী যাবেন ?"

"কারু বাড়ী যাব না। একটি বাড়ী আমার চাই।"

"বাড়ী ?—আচ্ছা দাঁড়ান, আমি দেখে দিচ্ছি।"

বাবুটি তৎক্ষণাৎ ছুট দিল এবং ক্ষণকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "অনেক কষ্টে, বাবু, একখানা ভাল বাড়ী পেয়েছি। ভাড়া পনের টাকা। কিন্তু, আমার চাই—এক টাকা। এর কমে হবে না, বাবু।"

তথাস্ত। আমি বলিলাম, "আচ্ছা, চল—"

বাবুটি সেই পল্লীর মাঝখানে ছোট একটি দ্বিতল বাড়ী দেখাইয়া দিল। দেখিলাম, দ্বারদেশে স্থূলকায়া বর্ষীয়সী এক স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। বাবুকে একটি টাকা দিয়া বিদায় দিলাম ও স্ত্রীলোকটি সব দেখাইয়া-শুনাইয়া চলিয়া গেল। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম, যেন আমার নব-জীবনের এক অতি বড় দায়িত্ব কাটিয়া গিয়াছে, যেন একনিষ্ঠ এক ব্রতের আজ সমাপ্তি হইয়াছে! নীহার ঘর-কন্না পাতিতে বসিল।

জিনিষপত্র কিনিতে-কাটিতে সারাটা দিন কাটিয়া গেল। নীহার একা, সাজাইতে-গোছাইতে পাছে তাহার কষ্ট হয়, এ জন্য সেই দিনই যোগাড় করিয়া একটি ঝি আনিলাম। মনে শান্তির অবধি ছিল না, তাই সন্ধ্যার পর সহরের মুক্ত হাওয়ায় বেড়াইতে বাহির হইলাম। এদিক, ওদিক বেড়াইলাম, কিন্তু বেশীক্ষণ নয়—পারিলাম না! নীহারকে একলা ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছি! বাসায় ফিরিলাম। তখন পাড়ায় পরীর বাজার বসিয়া গিয়াছে।

বাসায় ঢুকিলাম—আমাদের রচিত নিকেতন! ঝি চলিয়া গিয়াছে। উপরে উঠিয়া দেখি, বারান্দায় আলো জ্বলিতেছে। শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতে যাইব, খিল দেওয়া। ডাকিলাম—"নীহার!" জবাব নাই! আবার ডাকিলাম—"নীহার!" তবু সাড়া নাই, শব্দ নাই। মনে করিলাম, হয় ত সমস্ত দিনের পরিশ্রান্তির পর নীহার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পাশে আর একখানি ঘর ছিল, সেই ঘরে শয়ন করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলাম, কিন্তু প্রাণ বুঝিল না—কেমন করিয়াই বা নীহারের সাড়া না লইয়া থাকি? আবার ফিরিলাম, কপাটে ধাক্কা মারিলাম, আর একবার ডাকিলাম—"নীহার!" এই বিরাট নিস্তব্ধতা মূর্ত্তি ধরিয়া আমাকে ধাক্কা মারিয়া গেল। মনে মনে একটু রাগ হইল, কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই আর তাহার অস্তিত্ব রহিল না—নীহার কি স্বেচ্ছায় চুপ করিয়া থাকিতে পারে? গাঢ় নিদ্রায় নিজেকে সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। নিশ্চয় তাই! এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া পাশের ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম, দেখিলাম—বিছানা পাতা রহিয়াছে।

রাত্রিতে মনে মনে সঙ্কল্প আঁটিয়া রাখিলাম, নীহারকে বেশ একটু জব্দ করিতে হইবে। অবিশ্বাস-অনিশ্চিতের ভিতর দিয়া যে রকম করিয়াই হউক, ভোরের আলো জানালা ঠেলিয়া দেখা দিল। ঘর হইতে শুনিতে পাইলাম, নীহারের কাযকর্ম্মের ঘটা পড়িয়া গিয়াছে।

উঠিয়া পড়িলাম। কবাট খুলিয়াই দেখি, সম্মুখে—নীহার! প্রভাতে প্রথম সাক্ষাৎ! একরাত্রির অদর্শনে সে যেন আরও সুন্দরী হইয়া উঠিয়াছে! সে মুখ নামাইল। আমিও চাহিলাম না, নিজের সম্ভ্রমটুকু ষোলো আনা বজায় রাখিয়া বারান্দায় মুখে-হাতে জল দিতে লাগিলাম। তার পর ঝিকে বাজার করিতে দিয়া বাহির হইয়া যাইব, নীহার ডাকিল, "কোথায় যাচ্ছেন ?"

"পেছু ডাকলে ?"

"রাগ করলেন ?"

আমি কোন জবাব না দিয়া ফিরিয়া একবার ঘরে ঢুকিলাম। এদিক-ওদিক একটু ঘুরিয়া পুনশ্চ বাহির হইয়া সিঁড়িতে পা দিয়াছি, নীহার আবার ডাকিল, "একটু জল খেয়ে গেলে হ'ত না ?"

"না।"

"খাবার আনি—"

"ছাই খাব"—বলিয়া বাহির হইয়া গেলাম। চলিতে লাগিলাম, কোথায় যাইতেছি, ঠিকানা নাই।

বেলা হইয়া উঠিল, রাস্তায় লোক-চলাচল করিতে লাগিল, কোলাহলে সারা-সহরটি মুখরিত হইয়া উঠিল। সকলেই ছুটাছুটি করিতেছে, সকলেই এক-একটা অন্তর-ভরা আশা লইয়া কোন্ মহা-পুরস্কারের উপাসনা-মন্দিরে যত্নভরা পুষ্পপাত্র লইয়া চলিতেছে, যেন দিবসের অবসান-অন্তরালে তাহাদের জন্য কোন্ নবীন-প্রদেশ. পাথেয় বক্ষে করিয়া আদরে ধরিয়া আসিবে। আর আমি?—লক্ষ্যহীন, নির্দ্দেশহীন। এই যে এত বড় পৃথিবী—ইহার ভিতর আমি যেন

একা—কোনও আত্মীয় নাই, স্বজন নাই, মুখের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিবার কেহ নাই! আমি মানুষ—আমার আশা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, অথবা থাকিবার কথা! কিন্তু আমার কামনার সমাধিক্ষেত্রে একটি অতি-পরিচিত পল্লীর ছবিও সরিয়া আসিবে বলিয়া মনে হইতেছে না, যেন কোন্ পরিমাণ-বিহীন অন্তহীন শূন্যতার মাঝে মিশিয়া যাইতেছি!

ভাল লাগিল না। বাসায় ফিরিলাম। ভাবিলাম, হয় ত সেই ঘৃণিত পল্লীর ক্ষুদ্র অট্টালিকায় সমস্ত তৃপ্তির রহস্য-ভাণ্ডার নিহিত আছে, তা ছাড়া ইহলোকের কোনও তীর্থে আমার সুখ নাই, শান্তি নাই। এমনই মহাশান্তির মন্ত্রশক্তি, এমনই জগতের স্বার্থপরতার উজ্জ্বল অনলচ্ছবি!

উপরে উঠিয়াই দেখি, নীহার চুল খুলিয়া অন্যমনস্কভাবে বসিয়া আছে, তাহার রূপের আভায় ঘর রঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। জানালা খোলা ছিল, আলো ঢুকিবার পথ বন্ধ ছিল না, কিন্তু নীহারের ঐ রূপের কাছে তাহাকে একান্ত-ভাবেই হার মানিয়া লাঞ্ছনায় অনাদরে বাহিরে পড়িয়া থাকিতে হইয়াছিল। আমাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি সে মাথার কাপড় টানিয়া দিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এতক্ষণ কোথায় ছিলেন, ভাবছি!"

"ভাবছ? কারণ?"

আমার মুখ দিয়া জবাবটা হয় ত স্বাভাবিক! কিন্তু তাহার কাছে? সে বলিল, "খাবেন না?" তাহার কণ্ঠ-স্বর যেন স্নেহ-ভালবাসার মাঝখানে আটক পড়িয়া ছিল, এইমাত্র উপ্‌ছিয়া পড়িতেছে!

অনাসক্তকণ্ঠে জবাব দিলাম, "না। শরীরটা ভালো নেই! একটা মিষ্টি খেয়ে জল খাবো'খন!"

"তবে তাই আনতে দিই?"

"আমি দিচ্ছি—" বলিয়া ঝিকে ডাকিয়া কিছু মিষ্টান্ন কিনিতে দিয়াই পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম। তার পর খাবার আসিলে খাইয়া ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

শুইয়া-শুইয়া আকাশ-পাতাল ছাইভস্ম কত কি ভাবিতে লাগিলাম—একটা ভাবনা গড়িয়া তুলি, পরক্ষণেই আবার তাহা ভাঙ্গিয়া চুরমার হয়, এবং একটা কৌতুক মূর্ত্তি ধরিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়, তাহার পায়ে কুঠারাঘাত করিতে যাই, অস্তিত্ব পাই না—আঘাত নিজের পায়েই লাগে। এইরূপ মনের ভিতর আকাশ-পাতাল-জোড়া এক-একটা ব্রহ্মাণ্ড খণ্ড-খণ্ড করিয়া মহাপ্রলয়ের যোগাড় করিয়া তুলিতেছি, এমন সময়ে দুয়ারে কাহার করশব্দ হইল। বুঝিলাম—নীহার!

"ঘুমুলেন?"

জবাব দিলাম না।

"শুন্‌ছেন, কি অসুখ, বলুন না?"

আর থাকিতে পারিলাম না! নিমেষের ভিতর আমার কত যত্নের রাগ-অভিমান, সংযমের অসীম পরিমাণ কোথায় ভাসিয়া গেল! বিরক্তির ভাণ করিয়া কহিলাম, "কেন?"

"খুলুন। দরকার আছে।"

"কি দরকার—" বলিয়া যথাসম্ভব বিরক্তির পদশব্দ করিয়া ঝনাৎ করিয়া খিল খুলিয়া দিয়া পুনরায় শুইয়া পড়িলাম।

নীহার আস্তে-আস্তে আমার পাশে আসিয়া বিছানার একধারে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল, এবং আমার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "রাগ করেছেন? বলুন!"

"রাগ? দেখ, রাগটা অত সস্তা নয় যে, যার-তার উপর রাগ করবো। এর দাম আছে, সে দাম দিতে জানে, তোমার দিদি।"

"আমি নই?"

"তুমি? তুমি দেবে কেন? কি অধিকারে?"

"অপরাধ আমার?"

"অপরাধ? অপরাধ তুমি কি করবে, নীহার? তুমি আমার কে? আর, আমার কাছে তোমার দোষই বা সাজবে কেন, মানাবে কেন?"

নীহার হাত ছাড়িয়া দিয়া মুখটি নীচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "খুব রাগ করেছেন। ক্ষমা করুন!" বলিয়াই আমার পায়ে হাত দিল। দেখিলাম, স্বভাব-পরিমিত রঙ্গীনতা তাহার মুখের উপর হইতে গণ্ডী পার হইয়া দুটি চোখকেই বিব্রত করিয়া তুলিতেছে!

দেবতার পুষ্প পায়ে ঠেকিলে মানুষ যেমন চম্‌কিয়া উঠে, তেমনই চম্‌কিয়া পা দুটা সরাইয়া লইলাম। ভাবিলাম, আর কেন?—যথেষ্ট হইয়াছে। দালানের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, ঝি নাই—নীচে কাম করিতেছে। কেহই নাই—মাত্র দুইটি নরনারী! আমি আর সে! মুখের পানে চোখ তুলিলাম, দেখিলাম—নীহার অতি সুন্দর!

ডাকিলাম, "নীহার!"

"কেন?"

"সত্যি আমাকে—"

"ভালবাসি কি না? সে পরিচয় আজ কি নতুন ক'রে নিতে এলেন?"

একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম। সত্যই ত! আমার উপর এতটা যে নির্ভর করিয়াছে, তাহাকে আবার এই অর্থহীন প্রশ্ন কেন? সুতরাং দারুণ অভিমানের খোঁচা বারংবার খাইয়াও গতরাত্রির কৈফিয়তের দাবী করিয়া কোন কথা পাড়িলাম না। আমার দৌর্ব্বল্য ধরা পড়িবে!

চুপ করিয়া আছি, নীহার বলিয়া উঠিল, "জামাইবাবু, একটা কথা বল্‌বো, রাখবেন?—না, না! আপনার অসুখ হয়েছে!"

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, "তা হোক, কি বল?"

নীহার একটিবার আমার পানে তাকাইল, পরক্ষণেই মুখ নীচু করিয়া বলিল, "এই, আমার জন্যে যদি একটা হারমোনিয়ম কিনে দিতেন! ইচ্ছে হয়!"

"তার আর কি! এখনই ত বেড়াতে যাব, আন্‌বো কিনে।"

"আচ্ছা! কিন্তু, খেয়ে যান কিছু, ওবেলা ভাল ক'রে খাওয়া হয়নি!"

প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই নীহার উঠিয়া গেল ও একখানি থালায় নানাবিধ খাবার সাজাইয়া আনিয়া আমার সম্মুখে ধরিয়া দিল। আমিও যথারীতি সমস্তই নিঃশেষ করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে।

বেড়াইতে যাওয়াটা ভাণমাত্র। পকেটে অর্থ ছিল। সটান একটা দোকানে পৌঁছিয়া একটি হারমোনিয়ম কিনিয়া বাসায় ফিরিলাম। দেখিলাম, নীহার বসিয়া রহিয়াছে।

নীহার হাসিতে হাসিতে হারমোনিয়মটি আমার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া তাহার ঘরের জানালার কাছে রাখিয়া দিল। তার পর দুই-চারিটি কথাবার্ত্তার পর আমি আহারের ব্যাপারটা সারিয়া ফেলিলাম এবং নীহারকে তৎপর হইতে বলিলাম, কেন না, উভয়ে বসিয়া আজই আমাদের জীবনযাত্রার একটা ছক কাটিতে হইবে। নীহার বিনা বাক্য-ব্যয়ে নীচে নামিয়া গেল, আমিও সেইখানে নীহারের ঘরেই আপাততঃ শুইয়া পড়িলাম। সারাদিনের মানসিক শ্রান্তির পর সেই একান্তে আমাদের ভবিষ্য-জীবনের এক সম্ভব সঙ্গীত মনে মনে রচনা করিতে করিতে তন্দ্রার আবেশ আসিল, শত চেষ্টাতেও সামলাইতে পারিলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরে চমকিয়া উঠিয়া দেখি, আমি একাই। উঠিয়া পড়িলাম। বরাবর পাশের ঘরের কাছে আসিলাম, দেখিলাম, খিল দেওয়া! অপমান, গ্লানি, ঘৃণা ও লজ্জায় সর্ব্বাঙ্গ রিরি করিয়া উঠিল। টলিতে টলিতে ও-ঘরে আসিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিলাম। ভাবিলাম, এ চাতুরীর তাৎপর্য্য? ঘর-সংসার ত্যাগ করিল, সমাজ বিসর্জ্জন দিল, স্বামীকে পর্য্যন্ত ছাড়িয়া আসিতে পারিল, তার পর—এই ছল? কেন? এই ঘৃণিত পল্লীর মাঝখানে দারুণ প্রলোভনের মধ্যে আসিয়া এরূপ লুকোচুরির অভিনয় কেন? স্বীকার করি, সে নারী, কিন্তু আমার পরিচয় কি তাহার কাছে এতটুকুও নাই? এত দিনের এই ভালবাসা, এই স্নেহ, এতটা আত্মীয়তা,—এর মূল্য নারীর কাছে কিছুই কি নাই? নারীর কাছে পুরুষের অপর নাম কি পশু? তবে তাহাই হউক। উভয়ের ভিতর ছাড়াছাড়ির শপথ পড়ুক—বিচ্ছেদের আহুতি পড়ুক—বিস্মৃতির হোমানলে! প্রভাতেই সমাপ্তি হইবে উভয়ের প্রাপ্য উভয়ে কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লইব।

উঠিয়া পড়িলাম। তখন ঘামে আমার সর্ব্বশরীর ভিজিয়া উঠিয়াছে। জানালা খুলিয়া দিলাম। তখন বহির্জ্জগতে ভীষণ কাণ্ড—ঝম্‌-ঝম্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, মেঘের প্রচণ্ড প্রতাপ দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতেছে, সমস্ত চরাচর যেন এক মহা-প্রলয়ের আসন্ন আহ্বান শুনিয়া আতঙ্কে জড়সড় হইয়া নিস্তেজ, নিরুপায়, সম্বলহীন অবস্থায় অতিকষ্টে নিস্তব্ধে বুক পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সজোরে একটা ঝাপ্‌টা আসিল, জানালা বন্ধ করিয়া দিলাম।

সকাল হইল। এইবার নীহারের সঙ্গে চোখোচোখি হইবে। এত বড় একটা ভার—এমনিধারা এক কুৎসিত কর্ত্তব্যের বোঝা বহিয়া বেড়ানো আর ভাল নয়। উঠিয়া সশব্দে কপাট খুলিলাম। নীহার দালানে দাঁড়াইয়া—চমকিয়া উঠিল, এবং আমার মুখের দিকে একবার চাহিয়া

মুখ ফিরাইয়া লইল। আমার সর্ব্বদেহ যেন জ্বলিয়া উঠিল—কথা কহিবার প্রবৃত্তি হইল না।

মুখ ধুইতে যাইতেছি, জল দিতে আসিল। রাগে আমার চেতনা লুপ্ত হইল—জলের ঘটিটা তাহার হাত হইতে টানিয়া লইয়া দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলাম।

এই কাণ্ড দেখিয়া, নীহার আমার দিকে মুখ করিয়া এমনই এক মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইল, যেন তাহার বিস্ময়ের অবধি নাই! মৃদুকণ্ঠে কহিল, "আবার এত রাগ—কেন?"

"জান না তুমি?"

নীহার একটিবার আমার মুখের দিকে তাকাইয়াই মুখ নামাইল।

আমি আবার বলিয়া উঠিলাম, "ও চাউনি আমি চিনেছি! এতখানি বাড়াবাড়ি করা তোমার সাজে না।"

"কি করলাম?"

"কি করেছ? বাকী কি রেখেছ, নীহার? সমাজের কাছে আমার মুখ দেখাবার পথ রাখনি, বাপ-মায়ের কাছে দাঁড়াবার উপায় রাখতে দাওনি। স্ত্রীর কাছেও তাই। কি আর করনি, বলতে পার? তুমি মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের যা প্রয়োজন, তা' তোমার কাছে অপরের আশার অতিরিক্তই আছে—তোমার পথ চারিদিকে খোলা! আর আমার? আমি সমাজকে বোঝাব কেমন ক'রে, আত্মীয়কে বোঝাব কেমন ক'রে—নিজেকে বোঝাব কেমন ক'রে? স্ত্রীর কাছেই বা—?"

নীহার নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, কথা কহিল না। পুনশ্চ সুরু করিলাম, "কি করেছ, কল্পনা করতে পার? কতখানি বিশ্বাস দিয়ে ভুলিয়ে এনেছিলে, স্মরণ হয়? আর কতটা দিয়েছ, ভাবছ নীহার? যাক্, যা দিয়েছ, খুব দিয়েছ—এই-ই আমার প্রাপ্য!"

দেখিলাম, তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতেছে—টপ-টপ-টপ! কিন্তু এ নির্লজ্জ রোদন, এ সখের অভিনয় আমার ভাল লাগিল না। আবার মুখ ছুটিল, বলিলাম, "কি ঠিক করেছি জানো?—আজ একটা হেস্ত-নেস্ত করবো। ইচ্ছা হয়, এখানে থাকতে পার—আপত্তি নেই! বাঁকীপুর যেতে চাও—চল, বাবার কাছে যেতে চাও—পৌঁছে দিতে রাজি আছি। কিন্তু, আমি আর এখানে থাকতে প্রস্তুত নই! অবশ্য, তোমার পাওনা আমি দেবই, তোমার ইচ্ছার মান—আমি রাখবো! আজই যা হয় একটা ঠিক কর। কাল সকালের ট্রেণে আমি কাশী ছাড়বো—ঠিক জেনো।"

নীহার এইবার কথা কহিল। বলিল, "কেন, আপনি কি মনে করেন, আপনাকে আমি ভালবাসিনে?"

এখন পর্য্যন্ত তাহার সেই অযাচিত ভাণ পূরামাত্রায় বজায় থাকিতে দেখিয়া আমার সহ্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। বলিলাম, "বাস, না বাস—সে আমার দেখবার প্রয়োজন নেই। তোমার ভালবাসাতে আমার বড় একটা কিছু এসে যাবে না! আসল কথা—তোমার কাছে আমার সত্যিকার সম্পর্ক বিশ্লেষ করতে চাই। মনে করো না, একটা কুলটার কুহকে ঘুমিয়ে থাকব"—থামিলাম।

নীহার উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বলুন, বলুন, থামলেন কেন? এই-ই আমি আপনার কাছে শুনতে চাই,—এই আমার আপনার কাছে প্রাপ্য!"

কথাটা শুনিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। বলিলাম, "দেখ, তোমার মুখে এ কথা সাজে না। তুমি কুলবধূ নও। প্রথমতঃ স্বামীর ঘর থেকে বার হয়ে এক জন যুবকের সঙ্গে চ'লে এলে, একটা মেয়েলোকও সঙ্গে নেবার কথা বললে না—কোন্ সাহসে এসেছিলে, বলতে পার? তার পর স্বেচ্ছায় এখানে এসে এমনই এক পাড়ায় বাড়ী ভাড়া করলে—কেন বলতে পার? বেশী কি, এই রূপ-যৌবন কেনা বেচার হাটে, এই জনহীন বাড়ীতে আমার সামনে এতবড় একটা ভরা-যৌবনের দায়িত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ, কেমন ক'রে, কার জোরে বোঝাতে পার? যাক্, আজ যা-হয় একটা ঠিক ক'রে ফেল, কাল আমি কাশী ছাড়বোই ছাড়বো! যতক্ষণ আছি, আমাকে বিশ্বাস করতে পার, কেলেঙ্কারী করবার লোক আমি নই! আমি মানুষ—পুরুষমানুষ!—পশু নই! তা যদি হতাম, সে পরিচয় অনেক দিন আগেই পেতে—মনে কর তোমার বিয়ের পূর্ব্বেকার কথা!" একটু থামিলাম। একটু পরেই আবার সুরু করিলাম, "বলতে পার, তোমার সঙ্গে কেন এলাম—সে কেবল তোমার দৌড়টা দেখতে, আর তোমার চোখের উপর ধ'রে দিতে—আমার আসল পরিচয়!"

দেখিলাম, নীহারের চোখ দিয়া ঝর-ঝর করিয়া জল পড়িতেছে! আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, সে বসিয়া

পড়িল। তাহার আকাশ-ভরা মেঘের মত আকুল চুলের গোছাও যেন ফোঁপাইয়া উঠিল। আমার পা দুটা হাত বাড়াইয়া জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "যথেষ্ট হয়েছে। আমাকে ক্ষমা করুন!"

তখনও আমার রাগের নেশা লেশমাত্র কাটে নাই, সজোরে পা ছাড়াইয়া লইয়া সরিয়া দাঁড়াইলাম। বলিলাম, "ক্ষমা? ক্ষমা চেয়ো ভগবানের কাছে—আমার কাছে নয়। আমি তোমার কেউ নই।" বলিয়া সেই সহায়হীন, আশ্রয়হীন, ঘৃণিত পল্লীর সেই জনশূন্য বাড়ীতে, সেই উপেক্ষিতাকে চারিদিকে অন্ধকার দেখিবার জন্য একাকী ফেলিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

সারাদিন আর বাড়ী ঢুকিলাম না। আজ বিশ্বনাথ দর্শনে আকাঙ্ক্ষা হইল। মন্দিরে আসিলাম। দেখিলাম, শত-শত নরনারী যেন সংসারের সমস্ত ক্লেদ বিশ্বনাথের পদতলে নামাইয়া শান্ত হইতেছে। তাহাদের সে সুখশান্তি আমার সহ্য হইল না। দারুণ হিংসা যেন আমাকে সেখানে তিষ্ঠিতে দিল না। পুণ্য বারাণসী—এই ত সেই দেবাদিদেবের স্থান, এই ত সেই পুণ্যক্ষেত্র! বিশ্বনাথ স্বার্থপর নন ত, তবে কেন এই প্রাণীটিকে এতটুকু তৃপ্তি দিতে এমন কুণ্ঠিত? ভাবিতে-ভাবিতে গঙ্গার ধারে আসিলাম। ভাগীরথীর জলে হাত-মুখ ধুইয়া তীরে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—ইহা কি প্রেম, এই কি তাহার পরিণতি? ইহা কি ভালবাসা, ইহা কি তাহার সমাপ্তি? যে-কিরণ এক মহাব্রতের সমাধি-ক্ষেত্র হইতে উঠিয়া, অন্তরকে আলোকিত করিয়া, দিগন্তবিহীন পুলকে সমস্ত চরাচরের চির-অপরিচিত নিত্য-নূতন স্থানেও দিশেহারা করিবে না বলিয়া আশ্বাস দেয়, সেই-সে এত চেনাশোনার, এত পরিচয়ের মাঝে নিত্যপদাঙ্কিত স্থানেও এই অভিসম্পাত-অন্ধকারের অন্তরালে বিক্ষিপ্ত করিয়া মর্ম্মভেদী অট্টহাসি হাসিয়া চলিয়া যাইতে পারে? এই কি সংসারের রীতি-নীতি? ইহাই কি মানব-জীবনের পরম ধর্ম্মের চরম বিশেষণ?

কত ভাবিতে লাগিলাম, মনে মনে কত ভাঙ্গা-গড়া করিলাম; কিন্তু, মনকে আজ বুঝাইব কেমন করিয়া? কোন্ যুক্তির সঠিক সিদ্ধান্ত এই বিষাক্ত প্রাণে আজ শান্তি-বারি ঢালিবে?

উঠিয়া পড়িয়া বাসার দিকে ফিরিলাম, তখন রাত্রি হইয়াছে—চাঁদ উঠিয়াছে।

বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া শুনিতে পাইলাম, বাড়ীর ভিতর হইতে একখানি গান ভাসিয়া আসিতেছে। বিস্মিত হইলাম, পরক্ষণেই বুঝিতে পারিলাম—নীহারের গলা। আস্তে আস্তে আর একটু সরিয়া আসিয়া রাস্তার ধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইলাম।

নীহার হারমোনিয়মে গলা মিশাইয়া গাহিতেছিল—

"যুগ যুগ ধ'রে চেয়েছি তোমারে
তুমি দূরে চ'লে গিয়েছ,
আসিবে না যদি, বাসিবে না ভাল
মন কেন তবে নিয়েছ!
আমি বারে বারে প্রাণ সঁপিবারে
প্রাণপণ সখা করিনি আমারে
তুমি অহরহ ওগো প্রিয়তম,
মুখপানে চেয়ে হেসেছ।
অতীত বসন্ত অনন্তে লীন
চাঁদিনী যামিনী আজি জ্যোতিহীন
পড়িয়া আছে গো হৃদয়-দুয়ার
দয়া ক'রে যাহা দিয়েছ!"

সাবাস্! বলিয়া রাখি, এ পর্য্যন্ত কখনও নীহারের গান শুনি নাই। একবার ভাবিলাম, সব চেয়ে এই সকালের সেই তাহার কান্নাকাটির ভাণ। ভাবিলাম, উভয়ের অন্তরের মাঝে ব্যবধান কতখানি। এত বড় একটা কাণ্ডের পরও নীহারের এমনি ভাবে গলা ছাড়িয়া গান গাহিতে রুচি হইতেছে? নারী বলিয়া যে ছবি গৃহস্থের ঘরে ঘরে সাজানো থাকে, তাহার আসল ইতিহাস এই? এক দুর্জ্জয় ঘৃণায় আমার সারাদিনের ম্লান শান্তিটুকু পুনশ্চ লোপ পাইল, যেন এক আগুনের ঝলক আসিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ ঝলসিয়া দিয়াছে।

মনের ভিতর কত কি গড়িয়া তুলিতেছি, এমনই সময়ে আমাদের বাসার দুয়ারে একখানা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল—এ আবার কি? দেখিলাম, একটি 'বাবু' গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিতেছে—আমারই বাসায়—যে বাসা আমিই পাতিয়াছি।

ঘৃণায়, লজ্জায়, আকস্মিক যন্ত্রণায় আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল—মনে হইল, সেই গলির ভিতরকার সারি-সারি বাড়ীগুলার ইটপাথর সজীব হইয়া আমাকে তাড়াইয়া আসিতেছে, নিজেরই বাসার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি, সে-কথা কহিবার অধিকার আমার নাই। আবার মনে আঘাত পড়িল—ও কি! তবে কি এই এত বড় অভিনয়ের মূলে শুধু এক জঘন্য—ছি—ছি!

এত দূর অগ্রসর হইয়াছি, শেষ দেখিতে হইবে! পা টিপিয়া টিপিয়া বাবুটির পশ্চাদনুসরণ করিলাম। বাবুটি উপরে উঠিয়া গেল, আমিও তাহার পশ্চাতে, নিজেকে লুকাইয়া উঠিতে লাগিলাম। বাবুটি উঠিবামাত্র নীহার ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল ও ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া কপাট ভেজাইয়া দিল। তাহার মাথায় ঢেউ-খেলানো রাশীকৃত চুল এলানো, পরনে ফিরোজা-রঙের সাড়ী, মাথায় কাপড় নাই, গাত্রাবরণও সংযত নহে—সরমের লেশমাত্র নাই! সে যেন এক বিচিত্র এক অপরূপ—কালসর্পী!

বাতাসে দুয়ারটি একটু খুলিয়া গেল—সেই ফাঁক দিয়া কোনরূপে তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করা যায়। নীহার মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইতেই বাবুটি চমকিয়া উঠিল, এবং ঘন-ঘন নীহারের মুখের পানে চাহিতে লাগিল! স্পষ্ট বুঝিলাম, নীহারের মুখের উপর বেশীক্ষণ দৃষ্টি রাখিতে পারিতেছে না—পলকে পলকে পিছলাইয়া পড়িতেছে! তার পর বাবুটি মুখ খুলিয়া কি বলিতে যাইবে, গলা কাঁপিয়া উঠিল। একটু সামলাইয়া বলিয়া উঠিল, "তোমারই নাম সরলা? তুমিই এ পাড়ায় নতুন এসেছ? চিঠি পাঠিয়েছিলে তুমিই?"

"হ্যাঁ—বসুন!"

নীহার বাবুটির হাত ধরিয়া শয্যার উপর বসাইতে গেল।

বাবুটি একটু পিছাইয়া আসিয়া বলিল, "আজ অতিরিক্ত মদ খেয়েছি, ভালো ক'রে তোমাকে দেখতে পাচ্ছিনে—একবার মুখটি তোলো দিকিনি?"

নীহার মুখ উঠাইল। অতঃপর বিনা অনুরোধেই বাবুটি বিছানার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল, "একটু মদ দিতে পার?"

নীহার ঘরের এক কোণ হইতে একটা মদের বোতল বাহির করিল ও গ্লাস পূর্ণ করিয়া বাবুটির মুখের সম্মুখে ধরিল।

"দাও! ও এক গ্লাসে হবে না—গোটা বোতল চাই! দাও"—বলিয়াই বাবুটি নীহারের হাত হইতে বোতলটা ছিনাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কম্পিতপদে জানালার কাছে সরিয়া গিয়া বোতলটার পানে তাকাইয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "অনেক দিন থেকে তোমার পুজো ক'রে আসছি, এত দিনে সু-ফল দিয়েছ! আজ তোমার বিসর্জ্জনের দিন। যাও"—বলিয়াই জানালা দিয়া বোতল ও গ্লাস বাহিরে ফেলিয়া দিল। তার পর ধীরপদক্ষেপে নীহারের কাছে সরিয়া আসিয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "নী-হা-র!" যেন জন্ম-জন্মান্তরের পরিচিত সামগ্রীর সঙ্গে আজ এই প্রথম সাক্ষাৎ, এই প্রথম পরিচয়—যেন তাহার কত ত্রুটি, কত অবহেলার সূক্ষ্ম বিচারের জন্য নিজেকেই সাক্ষী মানিয়া ঐ মেয়েটির হাতে বিচার-দণ্ড তুলিয়া দিতেছে!

নীহার মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কথা কহিল না। বাবুটি আর থাকিতে পারিল না, উন্মত্তের ন্যায় নীহারের কৃশাঙ্গ দুই হাতে বেষ্টন করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "নীহার! নেশা আমার কেটে গেছে! আমি আর পশু নই—মানুষ! আমাকে ক্ষমা কর!"

"কাকে কি বলছেন? আমি সরলা!"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ! এই রকম সরলা আমারও একটি ছিল! এত দিন হারিয়ে ফেলেছিলাম। আবার ফিরে পেয়েছি—তুমি!"

"কেমন ক'রে জানলেন?"

"যেমন ক'রে জানিয়ে দিয়েছ। নীহার—" বাবুটি কি বলিতে যাইতেছিল, পারিল না—কাঁদিয়া ফেলিল।

নীহারেরও ভিতরকার অবস্থার রূপান্তর হইয়া আসিতেছিল, সেও সহসা চোখে কাপড় উঠাইয়া ফোঁপাইয়া উঠিল! যতটুকু সংযম, যতটুকু দৃঢ়তা তাহার বুকের ভিতর এতক্ষণ বাঁধা দিল, তাহা উপ্‌ছিয়া উঠিয়া বুক ঠেলিয়া চোখ দিয়া নির্গত হইতে লাগিল। ঘন-ঘন চোখ মুছিতে-মুছিতে বলিল, "তোমাকে ফিরে পাব আশা করিনি। যাদের তুমি এত দিন ভালবেসে আসছিলে, ভাবলাম, তাদের মত ফাঁদ পেতে একবার শেষ চেষ্টা করি—তাই আজ এখানে!" স্বামীর বুকের ভিতর মুখ রাখিয়া বলিল, "আশা সফল

হয়েছে। তুমি মুখ রেখেছ! নারায়ণকে ধন্যবাদ—আর এক জনকে—যার ভালবাসা ছাড়া এ-পথে কখনো আস্‌তে পারতাম না।"

নীহারের স্বামী সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "কে তিনি ?"

"জামাইবাবু,—যিনি আন্‌তে গিয়েছিলেন।"

একটা দমকা বাতাসে দুয়ার সহসা খুলিয়া গেল। ভিতরে দাঁড়াইয়া অভিশাপ-মুক্ত আলিঙ্গনাবদ্ধ দুইটি নরনারী, সম্মুখে আমি—নিবাসহীন পান্থ। পলাইবার শক্তি নাই!

আমাকে দেখিয়া নীহার তাড়াতাড়ি নিজেকে ছাড়াইয়া লইল ও দ্রুতপদে আমার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, "জামাইবাবু, আসুন!" যেন সে কতই অপ্রতিভ। আমার হাত ধরিয়া টানিয়া ঘরে লইয়া গিয়া স্বামীকে সে বলিল, "জামাইবাবু এসেছেন!"

নীহারের স্বামী শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "না! আর জামাইবাবু নন্—আমাদের গুরু! এস, প্রণাম করি।"

উভয়ে মাথা নোয়াইতে আমি একটু সরিয়া আসিলাম। জানালা দিয়া বাহিরের শ্বেতবর্ণ অর্দ্ধরাত্রির মৌন মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি মেলিয়া রাখিলাম—ওপারে কত না ছোট বড় ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে লুকোচুরি খেলিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের লজ্জা নাই, ঘৃণা নাই, সঙ্কোচ নাই!

শ্রীচরণদাস ঘোষ।

নির্ভয়

তোমার সাথে আজকে নূতন নয় কো পরিচয়
হাজার যুগের চেনা শোনা—নূতন চেনা নয়!
ওরা কি তার খবর রাখে
কুসুম কেন ফুটছে শাখে
অন্ধকারে গন্ধ সুবাস বাতাস কেন বয়?
বদ্ধ দুয়ার থাক্ না, আমার নেইক কিছু ভয়।

পূজারতির আলো আমার নিভেই যদি যায়,
বড় সাধের ফুলের মালা যদিই বা শুকায়,
নিভে নিভুক তেলের বাতি
ঘিরুক এসে আঁধার রাতি
দুঃখ-মরুর তপ্ত বায়ে পুড়ুক অবিনয়,
কাটুক আমার মনের মলা যা কিছু সংশয়।

সুখে তোমায় ভুলে না যাই তাই ত মহারাজ,
দিলে এমন দুঃখ ভীষণ, দিলে এমন লাজ;
জল ঝরে যে তোমার আঁখে
ওরা কি তার খবর রাখে?
মিছাই ওরা ভাবুক আমার ঘটলো পরাজয়।
দুঃখ যতই আসুক, আমার নেইক কিছু ভয়।

শ্রী——



ঝড়ের দোলায়

—[গল্প]—



ডাঃ মিত্রের সহিত কথা কহিতে কহিতে রোগীর ঘরে ঢুকিয়া, রোগীর মুখের দিকে চাহিয়া অনীতা হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার মনে হইতে লাগিল, মাথাটা তাহার যেন ঘুরিতেছে, চোখের দৃষ্টি যেন ঝাপসা হইয়া আসিতেছে। তাহার পা কে যেন স্ক্রু দিয়া আঁটিয়া দিয়াছে, সর্ব্বদেহ থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতেছে, গলা শুকাইয়া আসিতেছে, শুভ্র কপালের উপর বিন্দু বিন্দু ঘাম মুক্তার মত দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। এক মুহূর্ত্তে সমস্ত পৃথিবীর আলো ফুঁ দিয়া কে যেন নিবাইয়া দিল, টলিয়া পড়িয়া যাইতে যাইতে অতি কষ্টে নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া পাশের দেওয়ালটায় হেলান দিয়া সে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

হঠাৎ অনীতাকে অমনভাবে দাঁড়াইয়া পড়িতে দেখিয়া আর তাহার স্বেদসিক্ত মুখের দিকে চাহিয়া ডাঃ মিত্র তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া সস্নেহে কহিলেন—"ও কি অনীতা, অসুস্থ হয়ে পড়লে না কি, হঠাৎ এমন ভাবে দাঁড়িয়ে পড়লে যে?"

অনীতার কণ্ঠ হইতে একটিও শব্দ বাহির হইল না, শুধু তাহার পাত্লা ঠোঁটদুটি একটু কাঁপিয়া উঠিল। প্রাণপণ শক্তিতে সে তখন আত্মস্থ হইবার চেষ্টা করিতেছে। নিজের ভাব-বৈলক্ষণ্য যে এমনভাবে ধরা পড়িয়া গিয়াছে, তাহাতেও তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। কিন্তু নিরুপায় হইয়া স্থাণুর মতই সে দাঁড়াইয়া রহিল।

ডাঃ মিত্র তাহার বাহুমূল ধরিয়া ধীরে ধীরে কাছের একটা সোফায় বসাইয়া দিয়া কহিলেন—"এমন ধারা 'উইক্নেস' কত দিন থেকে হয়েছে তোমার? এ ত ভাল কথা নয়, চিকিৎসা করান দরকার। একটু সুস্থ হয়ে নাও, তার পর চল, তোমাকে বাসায় পৌছে দিয়ে আমি এখান কার জন্য অন্য নার্স ব্যবস্থা করছি। এমন দুর্ব্বলতা নিয়ে কিছুতেই তোমার কায করা চলবে না—আর উচিতও নয়।"

অনীতা নিজেকে অনেকটা সামলাইয়া লইয়া ক্ষীণ লজ্জিত কণ্ঠে কহিল—"না, এমন বিশেষ কিছু নয়; হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল, এখন সেরে গেছে, আপনাকে ব্যস্ত হ'তে হবে না, আমিই নার্স করতে পারব। আর তার জন্যই যখন এসেছি, তখন নিজের সামান্য অসুস্থতার অছিলায় ফিরে যাওয়াটাও শোভন হবে না। আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন, এখনই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

ডাঃ মিত্র বার দুই আপত্তি করিয়া শেষে বলিলেন—"ঠিক্ যদি হয়ে যায় ভালই, তবে যদি ফের কোন রকম অসুস্থতা মনে কর, তখনই আমায় জানিও, আমি মিসেস্ বাগচীকে পাঠাবার ব্যবস্থা করব। কেস্টা খুবই সিরিয়াস্, তোমার মত যত্ন নিয়ে কেউ নার্স করতে পারবে না ব'লে তোমাকেই সঙ্গে নিয়ে এসেছি। একটু এদিক্ ওদিক্ হয়ে গেলে রোগীর জীবন বাঁচান শক্ত হয়ে পড়বে। তোমার উপর আমার অগাধ বিশ্বাস, তাই তোমার অসুস্থ অবস্থা দেখেও ছুটী তোমাকে দিতে পারছি না।"

ডাঃ মিত্রের স্বরে একটু কুণ্ঠার ভাব দেখিয়া অনীতা সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, "আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার বিশ্বাসের যোগ্য যেন আমি হ'তে পারি। ভার যখন নিচ্ছি, তখন এঁকে সারিয়ে তুলে হাসি-মুখে ফিরে যেতে পারি যেন। আমার জন্য আপনি ভাববেন না, আমি বেশ সুস্থ বোধ করছি।"

ডাঃ মিত্র হাসিয়া কহিলেন—"আমি জানি মা, তোমার স্পর্শ পেলে রোগী ঠিক্ সেরে উঠ্বে। আমার ডাক্তারীর চেয়ে তোমার সেবার দাম যে কম নয়, এটা আমি বুঝি। তোমার হাতে রোগীকে ছেড়ে দিয়ে আমি যে কতটা নিশ্চিন্ত হই, তা আমি ছাড়া বোধ করি আর কেউই জানে না।"

অনীতাকে রোগীর অবস্থা, ঔষধ-পত্রের ব্যবস্থা, খাওয়ার

চার্ট ইত্যাদি বুঝাইয়া দিয়া, তাহাকে আর একবার নিজের শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার উপদেশ দিয়া ডাঃ মিত্র চলিয়া গেলেন।

অনীতা রোগীর শিয়রে গিয়া বসিল। পীড়িতের পাণ্ডুর রক্তহীন মুখের দিকে তাকাইয়া অনিমেষ দৃষ্টিতে সে বসিয়া রহিল। তাহার মনের মধ্যে একটা প্রবল ঝড় বহিতে লাগিল; অতীতের কোন একটা স্মৃতি তাহার দৃষ্টির সম্মুখে বায়স্কোপের ছবির মত একটার পর একটা ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। অশ্রুর বন্যা যেন তাহার চোখ ছাপাইয়া বাহির হইয়া আসিতে চায়। তাহার মনে হইতে লাগিল, কেন সে পূর্ব্বে ভাল করিয়া রোগীর নাম ও পরিচয় জানিয়া লয় নাই, তাহা হইলে কখনই সে এখানে আসিত না। কিন্তু এখন আর ফিরিয়া যাওয়া যায় না—এত কাছে আসিয়া, এমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিয়া কোন্ প্রাণে সে ফিরিয়া যাইবে? কিন্তু নিষ্ঠুর বিধাতা এ কি খেলা তাহাকে লইয়া খেলিতেছেন; যেখানে এক দিন তাহাকে সর্ব্বস্ব হারাইয়া একান্ত রিক্ত ও নিঃসহায় হইয়া বিদায় লইতে হইয়াছিল, আজ আবার তাহারই কাছে, তাহারই রোগ-শয্যার পাশে এমন করিয়া ভাড়া-করা সেবিকার বেশে তাহাকে টানিয়া আনিবার কি প্রয়োজন ছিল? কিন্তু না, কোন দুর্ব্বলতাকে সে প্রশ্রয় দিবে না; সেবিকার যাহা কর্ত্তব্য, সেইটুকু পালন করিয়াই সে বিদায় লইবে। সুরেশ্বরের কাছে সে ধরা দিবে না; এত কাল পরে সুরেশ্বরও বোধ করি তাহাকে আর চিনিতে পারিবে না। তাহার চেহারার যে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা ত অনেকেই বলে, নিজেও ত সুরেশ্বর আর তাহার একসঙ্গে তোলা ছবির সঙ্গে তাহার বর্ত্তমান চেহারা মিলাইয়া দেখিয়াছে—তাহাকে সেই দশ বছর পূর্ব্বেকার সবিতা বলিয়া আর চেনা যায় না। সুরেশ্বরের জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে একটু সুস্থ হইলেই সে চলিয়া যাইবে। এলাহাবাদেও আর সে থাকিবে না—সমস্ত স্মৃতি, সমস্ত পরিচয়, সমস্ত আত্মবেদনাকে ছিন্ন করিয়া দূরে নিভৃতে কোনখানে সে চলিয়া যাইবে।

সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় অনীতার মুখে একটা কঠিন ছায়া পড়িল। গভীর আত্ম-সংযমের সহিত রোগীর পরিচর্য্যায় নিজেকে সে বিলাইয়া দিল। অন্তরদ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াও সে আর নিজের কথা ভাবিবার চেষ্টা করিল না। সেবা-কোমল হস্তে রোগীকে সারাইয়া তুলিবার জন্য সে আত্ম-নিয়োগ করিল।

ডাঃ মিত্র তাহার আশ্চর্য্য সেবিকা-মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন—"এমন সেবার কাছে রোগ যে বেশী দিন টিকতে পারে না, সে ত আমি জানিই। কিন্তু ভাবছি, অনীতা, এত খাটলে তোমার নিজের শরীর না ভেঙ্গে পড়ে। আমার মনে হচ্ছে, কাল সকালের দিকে রোগীর জ্ঞান ফিরে আসবে। তার পর তিন চারটে দিন একটু সাবধানে রাখতে পারলেই বিপদ কেটে যাবে, তখন তোমার ছুটী। তোমার শরীরের দিকটাও ত আমার দেখতে হবে। তোমার সেবা না পেলে আমার চিকিৎসার যে ফল হয় না, সেটা আমি ছাড়া আর কেউই হয় ত জানে না। অন্ততঃ নিজের চিকিৎসা-খ্যাতিটা বজায় রাখবার জন্যও তোমার দিকটা আমায় দেখতে হবে।"

অনীতা মৃদু হাসিয়া কহিল—"কি যে বলেন আপনি, তার ঠিক নেই। আমি যে আপনার মেয়ে, আমাকে অত ক'রে বাড়ালে আপনি নিজেই যে নীচু হয়ে পড়বেন।"

ডাঃ মিত্র সস্নেহে তাহার মাথায় হাত রাখিয়া কহিলেন —"তোমার কাছে ত হেরেই আছি, মা। তুমি কি জান না, তোমার উপর আমি কতখানি নির্ভর করি?"

অনীতা তাড়াতাড়ি সেই প্রবীণ ডাক্তারের পায়ে হাত ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া সরিয়া গেল।

ডাক্তারও মৃদু হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

সুরেশ্বরের জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে—সমস্ত রাত্রি সুনিদ্রার পর মানুষ যেমন করিয়া জাগিয়া উঠিয়া চোখ মেলে, তেমনই করিয়াই কয় দিন পরে সুরেশ্বর আজ চোখ মেলিয়া চাহিল। চোখ মেলিয়া ধীরে ধীরে সে সমস্ত ঘরখানায় একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইল, তাহার পর অনীতার মুখের দিকে চাহিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। অনীতার শান্ত সুন্দর মুখখানির উপর তাহার দৃষ্টি যেন আলপিনের মত গাঁথিয়া গেল—তাহার মনের মধ্যে স্মৃতির যে পুরাতন পটখানা সঙ্গোপনে লুকান ছিল, তাহা বুঝি আজ সহসা দোল খাইয়া নড়িয়া উঠিল। সুরেশ্বর হয় ত ভাবিতে লাগিল, এ কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য!

সেই কোমল অন্তরদাহী দৃষ্টির সুকোমল স্পর্শে অনীতার বুকে কাঁপন ধরিয়া গেল। তাহার ভয় হইল, সুরেশ্বর বুঝি বা তাহাকে চিনিয়া ফেলে। কিন্তু তাহাকে যে কঠিন হইতেই হইবে—কিছুতেই আত্ম-বিস্মৃতি ঘটিতে দেওয়া উচিত হইবে না। এখন যে সে ভাড়াকরা সামান্য সেবিকা মাত্র—ইহার বেশী পরিচয় আজ আর তাহার কিছুই নাই।

অনীতা নিজেকে সংযত করিয়া কোমল কণ্ঠে কহিল—"আর ভয় নেই, এবার আপনি সেরে উঠবেন। আমি যাই, ডাঃ মিত্রকে খবর পাঠাই, আপনার জ্ঞান হয়েছে।"

অনীতা উঠিতে যাইতেছিল, সুরেশ্বর তাহার একখানি হাত ধরিয়া ফেলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কে?"

অনীতার বুকটা আবার দুলিয়া উঠিল—নিজেকে সংযত রাখা আর বুঝি তাহার চলে না। তাহার ইচ্ছা করিতেছিল, সুরেশ্বরের বুকের উপর মুখ রাখিয়া বলে—সে তাহারই সেই প্রত্যাখ্যাতা সবিতা, এক দিন যাহাকে সে—অনীতা চমকিয়া উঠিল, এ কি সে ভাবিতেছে, এ কি তাহার দুর্ব্বলতা!

আত্মস্থ হইতে অনীতার বেশী সময় লাগিল না। ধীর মৃদু কণ্ঠে সে উত্তর দিল—"আমি নার্স, ডাঃ মিত্র আমাকে আপনার শুশ্রূষার জন্য পাঠিয়েছেন।"

অনীতার হাতখানি তখনও সুরেশ্বরের হাতের মধ্যে ধরা রহিয়াছে, তাহার শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, বুকের মধ্যে কান্না যেন বাঁধ ভাঙ্গিয়া অশ্রু-প্রবাহে ঝরিয়া পড়িতে চাহিতেছে।

সুরেশ্বর নির্নিমেষ মুক-দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে খানিক চাহিয়া থাকিয়া নিতান্ত যেন আশাহত কণ্ঠে কহিল—"তুমি নার্স!" তাহার পর অনীতার হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে চোখ বুজিল।

অনীতাও সেই অবসরে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

সুরেশ্বরের সারিয়া উঠিতে প্রায় এক মাস লাগিয়া গেল। জ্ঞান ফিরিবার দিন সাতেক পরেই অনীতা চলিয়া যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু যাওয়া তাহার হয় নাই। আজ কাল করিয়া শেষে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং শরীরে বল না পাওয়া পর্য্যন্ত সুরেশ্বর কিছুতেই তাহাকে ছাড়িয়া দিতে রাজী হয় নাই। অনীতা যখনই যাইবার কথা তুলিয়াছে, তখনই সুরেশ্বর বলিয়াছে—"আচ্ছা অনীতা, তুমি কি চাও না আমি বেঁচে উঠি? তুমি না থাকলে যে আমি আর উঠে চ'লে ফিরে বেড়াতে পারব না, এ কি তুমি বোঝ না? কায তোমাকে যেখানে হোক করতেই হবে, তবে আমাকে এমন অসহায় অবস্থায় ফেলে কেন তুমি যেতে চাচ্ছ?"

অনীতা তাহার উত্তরে বলিয়াছে—"বাঃ, অসহায় কোথায় আপনি? এই ত বেশ সেরে উঠেছেন, আর দু'চার দিন পরেই ত আগেকার মত কায-কর্ম্ম করতে পারবেন, চ'লে ফিরে বেড়াতেও কষ্ট হবে না—শুনলেন না, ডাঃ মিত্র তাই ত ব'লে গেলেন?"

সুরেশ্বর বলিল—"বেশ, সে অবস্থা যে দিন হবে, সেই দিনই তুমি যেও। কিন্তু যে কটা দিন এমন পঙ্গু হয়ে প'ড়ে থাক্‌ব, কিছুতেই তোমার যাওয়া চল্‌বে না।"

সুরেশ্বরের সুরে যেন একটা অধিকারপূর্ণ আদেশের ভাব ফুটিয়া উঠিল।

অনীতা তাহা লক্ষ্য করিয়া মনে মনে একটু হাসিয়া বিদ্রূপ-ভরা কণ্ঠে কহিল—"এ যে দাবীর আদেশ দেখছি! কিন্তু নার্স অনীতা ত চিরদিন এমন ক'রে আপনার অধিকারভুক্ত হয়ে থাকতে পারে না। তার চাইতে এক কায করুন না কেন? আপনার স্ত্রীকে নিয়ে আসুন, যার সামগ্রী, তাঁর হাতে দিয়ে আমি বিদায় নিই—ভাড়া করা নার্সের চেয়ে তিনি আপনাকে ঢের ভাল—"

মধ্যপথে অনীতার কথা বন্ধ হইয়া গেল। সে দেখিল, সুরেশ্বরের মুখের উপর কে যেন সঙ্কর-মাছের চাবুক মারিয়া আঘাত করিল—তাহার রোগ-শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ মৃতের মুখের মত নিষ্প্রভ ও রক্তলেশহীন হইয়া উঠিয়াছে, চোখের দৃষ্টি যেন ঘোলাটে, সমস্ত শরীর যেন অবশ, অবসন্ন—যেন একটা মূর্চ্ছার ভাব সারা দেহে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

অনীতা তাড়াতাড়ি সুরেশ্বরের কাছে সরিয়া আসিয়া উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে কহিল—"কি হ'ল, অমন করছেন কেন? কিছু কষ্ট হচ্ছে না কি? কথা বলছেন না কেন? ও কি—" কোমল হাতখানি সুরেশ্বরের বুকে মাথায় বুলাইতে বুলাইতে অনীতা তাহার একান্ত সন্নিকটে সরিয়া আসিয়া ঝুঁকিয়া মুখের দিকে দেখিতে লাগিল।

সুরেশ্বর ততক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়াছে, গম্ভীর মৃদু কণ্ঠে সে কহিল—"না, কিছু হয় নি।"

"তবে অমন করছিলেন কেন?"

সুরেশ্বর তাহার উত্তর না দিয়া কহিল—"তুমি যাবে বল্‌ছিলে না? কবে যেতে চাও বল।"

এই কটি কথা বলিয়া সুরেশ্বর হাঁপাইয়া উঠিল।

অনীতা একদৃষ্টে তাহার দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া অস্পষ্ট কণ্ঠে কহিল—"কি ক'রে আর যাই বলুন? এখনও যে আপনি বেশ দুর্ব্বল—এখনই ত একটা কাণ্ড বাধিয়েছিলেন।"

সুরেশ্বর ম্লান হাসিয়া কহিল—"দুর্ব্বল—তাতে কি হয়েছে? চিরদিনই যদি এমনই দুর্ব্বল, অশক্ত থেকে যাই, তাতেই বা কি? তুমি ত আর চিরদিনই থাক্‌তে পার না—যেতেই যখন হবে, বিশেষ তোমার যখন এখানে থাক্‌বার স্পৃহা বা ইচ্ছা আর নেই, তখন দু'দিন আগে আর পরে—সুতরাং যে দিন তুমি যেতে চাও যাবে, আমার কোন অনুরোধ নেই। মৃত্যু এক দিন আছেই। তবে তুমি থাক্‌তে থাক্‌তে হ'লে একটা গতি হবে, না হ'লে ম'রে প'ড়ে থাকলেও কেউ জানতে পারবে না। স্ত্রীর কথা বলছিলে না? কিন্তু ও বিষয়ে আমার মত হতভাগা আর নেই। থাক্, ও কথার কোন প্রয়োজন নেই। যখন যে দিন ইচ্ছা তুমি যেতে পার, আমার কোন আপত্তি নেই!"

অনীতা বুঝিল, তাহার কথাটা তাহাকেই ফিরাইয়া দিয়া সুরেশ্বর তাহাকে আঘাত করিতেছে। কোন কথা আর সে কহিতে পারিল না। রুদ্ধ অশ্রুবেগকে মুক্তি দিবার জন্য সে উঠিয়া গেল।

তাহার পর আরও কয়েকটা দিন গড়াইয়া গিয়াছে। অনীতা আর যাইবার কথা তুলে নাই। বলিতে গেলেই সে দিনকার সেই দৃশ্যটি তাহার দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠে; সুরেশ্বরের অভিমানভরা কথাগুলি আবার নূতন করিয়া তাহার কাণে বাজিতে থাকে।

কিন্তু না যাইয়াও যে আর উপায় নাই। তাহার নিজের মনও যে দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, সুরেশ্বরের সঙ্গ-লোভ তাহার অন্তরে দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিতেছে। সে বুঝিতে পারিতেছে, সুরেশ্বর তাহাকে সবিতা বলিয়া চিনিতে পারে নাই; তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠে। পুরুষের এই লোভাতুরতার পরিচয় পাইয়া তাহার হৃদয় সুরেশ্বরের প্রতি কঠিন হইয়া উঠে, ঘৃণায় ও বিতৃষ্ণায় তাহার শরীর সাপের মত কুঞ্চিত হইতে থাকে। নিজের বিবাহিতা স্ত্রীকে এক দিন যে বিনা কারণে ত্যাগ করিয়াছিল, নিরপরাধ ও নিষ্কলঙ্ক জানিয়াও সমাজ ও আত্মীয়-স্বজনের ভয়ে যাহাকে আশ্রয়চ্যুতা করিয়াছিল, না চিনিতে পারিয়া আজ তাহারই সহিত—ছিঃ ছিঃ, এমনই পুরুষজাত!

অনীতার সমস্ত দেহ ও মন সুরেশ্বরের প্রতি বিমুখ হইয়া উঠিল। সে দৃঢ় সঙ্কল্প করিল, সুরেশ্বরকে কোন প্রশ্রয়ই সে আর দিবে না। সে ফিরিয়া যাইবে—তাহার সেই একান্ত নির্জ্জন, নিঃসঙ্গ জীবনপথে আবার সে নিজেকে হারাইয়া ফেলিবে।

সে দিন বিকালের দিকটায় হঠাৎ ঝড়ের মেঘ আকাশে তাহার জটা বিস্তার করিয়া সমস্ত আকাশটাকে কালো করিয়া দিল। আকাশচারী পাখীরা চীৎকার করিতে করিতে শূন্যের বুক হইতে পৃথিবীর দিকে নামিয়া আসিতেছে, গাছের মাথাগুলি দোল খাইয়া খাইয়া পরস্পরকে ছুঁইয়া যাইতেছে, পথের ধূলা পাক খাইয়া খাইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া শূন্যের ঐ লম্বমান মেঘ-জটাকে ধরিবার জন্য যেন বাহু বিস্তার করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, চারি পাশের ঘর-বাড়ী জানালা-দরজা ভীষণ শব্দ করিয়া আছাড় খাইয়া পড়িতেছে—ঝড় আসিয়া পড়িয়াছে, বাহিরে অবিশ্রান্ত শোঁ শোঁ শব্দে তাহার আগমনের তূর্য্যধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে—প্রকৃতির কোলে সুরু হইল রুদ্রের তাণ্ডব-লীলা; মেঘের জটাজাল ভেদ করিয়া বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ আলো সাপের দেহের মত শূন্য হইতে মাটীর বুকে ফণা বিস্তার করিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে। মাঝে মাঝে আকাশের বুক চিরিয়া বজ্রের বহ্নি যেন সৃষ্টিকে ধ্বংস করিতে ছুটিয়া আসিতেছে।

সুরেশ্বর তাহার ঘরের সম্মুখের খোলা ছাদটায় বসিয়া প্রকৃতির সেই প্রলয়-নৃত্য দেখিতেছিল। তাহার সমস্ত চেতনা যেন সেই নৃত্যের তালে তালে ডুবিয়া গিয়াছে! ঝড়ের দোল খাইয়া তাহার চুলগুলি এলোমেলো হইয়া মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, বৃষ্টির জলে সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইয়া গিয়াছে। কোন দিকে তাহার হুঁস নাই, একদৃষ্টে সে বাহিরের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিয়া ঝড়ের সেই অপূর্ব্ব রূপ দেখিতে দেখিতে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছে—

তাহার অ-কবি চিত্তে যেন কবিত্বের নেশা লাগিয়াছে। প্রকৃতির সেই প্রলয়ঙ্কর রূপ যেন তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে।

অনীতা সুরেশ্বরকে ঘরের ভিতর দেখিতে না পাইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে ছাদে আসিয়া তাহাকে সেইরূপ অবস্থায় দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"সুরেশ্বরবাবু, জীবনের মায়া কি আপনার এতটুকু নেই? এই যে সে-দিন অমন কঠিন রোগ থেকে সেরে উঠেছেন, আর আজ এই ঝড়ের মধ্যে ব'সে ব'সে কি ব'লে এমন ক'রে বৃষ্টিতে ভিজছেন?"

সুরেশ্বরের চেতনা তাহাতে ফিরিল না। অনীতা দ্রুত-পায়ে তাহার কাছে আসিয়া হাত ধরিয়া টানিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়া কহিল—"বুঝেছি আপনার মতলবখানা! আবার অসুখ ক'রে আমাকে না যেতে দেওয়াই যদি মতলব ক'রে থাকেন, তা' হ'লে জানবেন, আপনার সে অভিসন্ধি টিকবে না। কালই আমি চ'লে যাব স্থির করেছি, যদি দরকার হয়, অন্য নার্স আনবার ব্যবস্থা করাবেন—আমার দ্বারা আর চলবে না।"

সুরেশ্বর একটিও কথা কহিল না; স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনীতার উদ্বেগপূর্ণ ক্রুদ্ধ মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

অনীতা তাহা লক্ষ্য করিয়া আরও জ্বলিয়া উঠিয়া তিক্ত কণ্ঠে কহিল—"মেয়েমানুষের মুখের দিকে অমন ক'রে তাকাতে লজ্জা করে না আপনার? আমি লক্ষ্য ক'রে দেখেছি—"

অনীতার কথা শেষ হইল না। সুরেশ্বর তাহার হাত ছাড়াইয়া আবার ইজি চেয়ারটার উপর বসিয়া পড়িল।

অনীতা লক্ষ্য করিল, সুরেশ্বরের মুখে আবার ফুটিয়া উঠিয়াছে সে-দিনকার সেই অসহায় পাণ্ডুরতা। তাহার মনটা কোমল হইয়া উঠিল—এই অযথা কটুভাষণের জন্য কেমন যেন একটু অনুতাপ-মিশ্রিত লজ্জা তাহার মুখে চোখে ফুটিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সুরেশ্বরের নিকটে আগাইয়া আসিয়া, তাহার হাতখানি ধরিয়া, গলায় একরাশ মমতা মিশাইয়া সে কহিল—"ছিঃ, রাগ করলেন? এমনি ক'রে কি আপনার মত রোগা লোকের বৃষ্টিতে ভেজা উচিত? এমন ক'রে আমায় শাস্তি দিয়ে কি লাভ আপনার? দোহাই, আর নয়, অনেক ভিজেছেন, এবার ঘরে চলুন। ভিজে কাপড়-কামিজ ছেড়ে ফেলে ঘরের ভিতরে ব'সে ব'সে যত ইচ্ছে ঝড়-বৃষ্টি উপভোগ করুন, একটুও আপত্তি আমি করব না।"

অনীতার স্বরে কেমন যেন একটা মাধুর্য্য ঝরিয়া পড়িল। সুরেশ্বর প্রাণ ভরিয়া সেই মমতা-মাখা উদ্বেগটুকু উপভোগ করিল, তাহার পর একটি কথা না কহিয়া অনীতার হাত ধরিয়া ঘরের ভিতরে চলিয়া আসিল।

ভিজা কাপড়-জামা বদলাইয়া সুরেশ্বর খাটের উপর দেহভার ছড়াইয়া দিয়া চোখ বুজিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। অনীতাও নিজের ভিজা কাপড়-জামা বদলাইয়া এক বাটি গরম দুধ লইয়া ফিরিয়া আসিল।

সুরেশ্বর চোখ চাহিয়া দেখিল, অনীতার সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া একটা আশ্চর্য্য রূপ খেলা করিতেছে—তাহার পরনে ছিল একখানি সাগরের মত নীল রঙের সাড়ী, খোলা চুলের গুচ্ছ সাপের মত পিঠের উপর ছড়াইয়া রহিয়াছে, মাথার উপর আলতো একটুখানি কাপড়, কাণের দুল দুটি ইলেকট্রিকের আলোয় চিক্-চিক্ করিতেছে, সুন্দর ভ্রূ-লতার মধ্যে ছোট একটি সিন্দূরের টিপ প্রভাতের সূর্য্যের মত জ্বল্-জ্বল্ করিতেছে। সুরেশ্বর বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে অনীতার সেই রূপ-সুধা চক্ষু ভরিয়া পান করিতে লাগিল।

অনীতার মনটা আবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, সুরেশ্বরের সেই বিমুগ্ধ দৃষ্টি দেখিয়া কঠিন বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে সে কহিল—"ব্রাণ্ডি দেওয়া এই দুধটুকু খেয়ে নিন্, অমন হাঁ ক'রে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেই রোগ পালাবে না।"

সুরেশ্বরের উঠিবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, বরং তাহার দৃষ্টিকে যেন আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া সে অনীতার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

অধীর কণ্ঠে অনীতা কহিল—"অমন ক'রে যখন তখন আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে কি অত দেখেন বলুন ত? আপনার লজ্জা ব'লে কোন জিনিষ না থাকতে পারে, কিন্তু আমার আছে। নাঃ, আর এখানে থাকা আমার পোষাবে না; মানে মানে বিদায় হওয়াই এখন আমার উচিত। কালই যাতে যেতে পারি—"

সুরেশ্বর সহসা উঠিয়া বসিয়া অনীতার হাত দুটি ধরিয়া ফেলিয়া হাসিয়া কহিল—"আর যেতে যদি না দিই?"

অনীতা জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া কঠিনকণ্ঠে কহিল,—"ছিঃ, আপনি এই! এই জন্যই বুঝি এত দিন আমায় যেতে দেননি! এত নীচু মন যে আপনার, তা' যদি

জানতাম, তা হ'লে কখনই এখানে আসতাম না। আর এক মুহূর্ত আমি এখানে থাকতে পারব না; এখনি চল্লাম।" অনীতা দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

সুরেশ্বর খাট হইতে দ্রুত নামিয়া আসিয়া তাহার পথ-রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"সে কি, তোমার পারিশ্রমিক না নিয়েই চ'লে যাবে না কি? তা ত হ'তে পারে না, অনীতা। অনেক রাত জেগে, অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম ক'রে মরণের মুখ থেকে আমায় বাঁচিয়েছ; এত বড় অকৃতজ্ঞ আমায় ভেব না যে, তোমার পারিশ্রমিক না দিয়েই তোমায় বিদায় দেব।"

অনীতা স্বরে ক্রোধের ভাণ আনিয়া কহিল—"পথ ছাড়ুন, এ নাটক আমার ভাল লাগে না। পারিশ্রমিক আমি চাই না!"

"কিন্তু অনীতা, তা হয় না—ঋণ আমি কারুর রাখি না।"

"না রাখেন, পথের ভিখারীকে দিয়ে দেবেন। আপনার দেওয়া টাকা ছুঁতে আমি পারব না—পথ ছাড়ুন—যেতে দিন আমায়।"

সুরেশ্বর সহসা তাহার হাত দৃঢ়-মুষ্টিতে ধরিয়া কহিল,—"না, পেয়ে আবার তোমায় হারাতে পারব না। তুমি নিজেকে যতই গোপন করতে চাও, সবিতা, আজ তুমি আমার চোখে ধরা প'ড়ে গেছ—আজ তোমায় আমি চিনেছি—"

অনীতার বুকের মধ্যে অসম্ভব রকম আলোড়ন সুরু হইল। তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, তবু সে জোর করিয়া কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা আনিয়া কহিল—"এ কি অন্যায় আপনার—একলা নিজের বাড়ীতে পেয়েছেন বলেই কি এই অপমান করছেন? কে আপনার সবিতা জানিনে, কিন্তু আপনি যে লোক ভাল নন, এইটুকুই আজ আমায় বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু দোহাই আপনার, পথ ছাড়ুন, চারিদিকে চাকর-দাসীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখলে যে তারা এ দৃশ্যটা ভালভাবে নেবে না, সেটা আপনি আমার চেয়ে কম বোঝেন না।"

"জানুক তারা তুমি আমার কে—নিজেকে গোপন ক'রে রেখ না, সবিতা।"

"কিন্তু সবিতা যে আমি নই। ভুল ক'রে অনীতা নার্সকে সবিতা ব'লে চালিয়ে দেওয়া যায় না—এইটাই যে আপনি ভুলে যাচ্ছেন।"

"ভুল আমার হয়নি একটুও—অনীতাই যে সবিতা, তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। অভিজ্ঞান যে আমার কাছেই রয়েছে।"

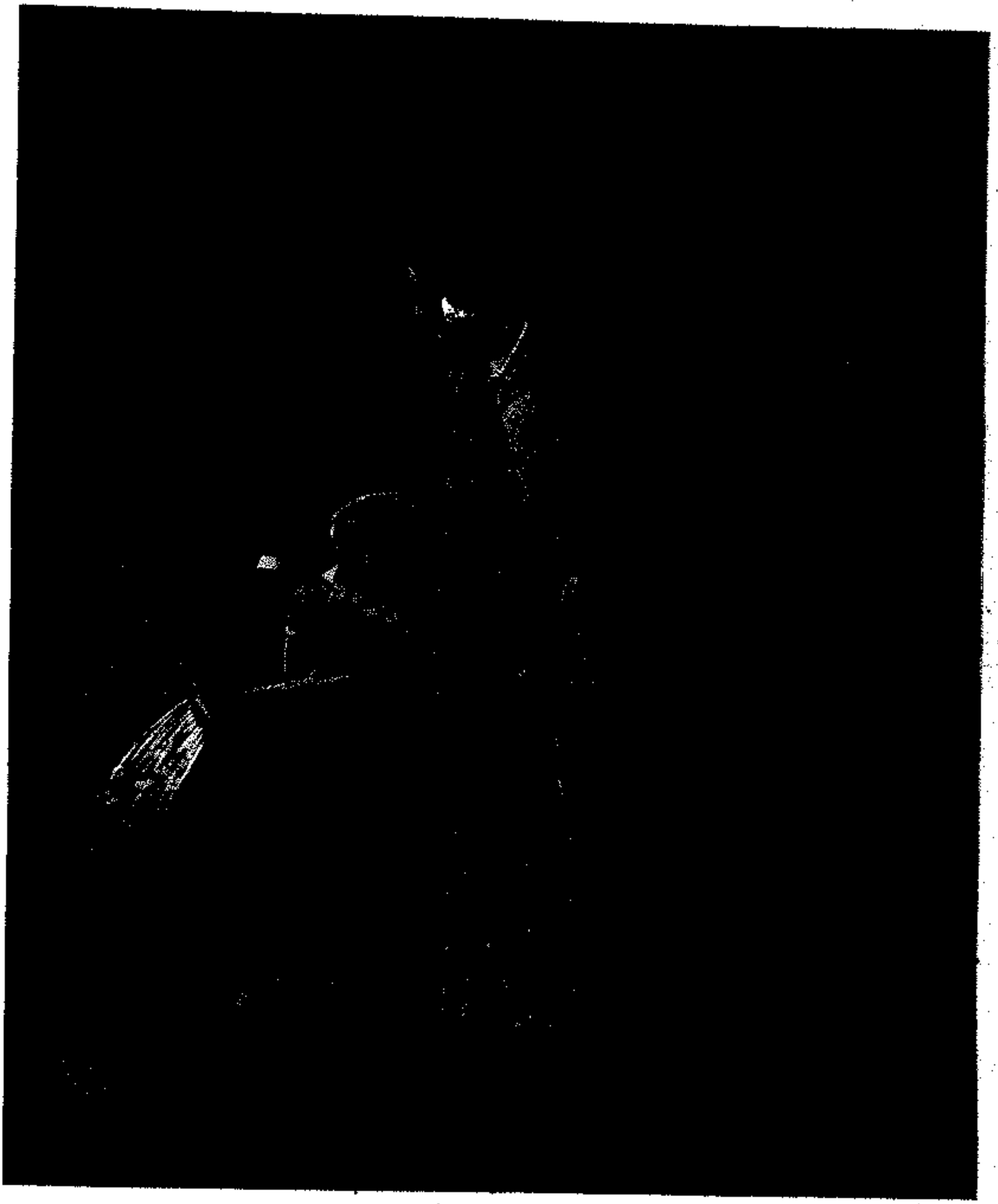
"কি সে অভিজ্ঞান?"

"দেখবে? কিন্তু তুমি যে কাঁপছ, সবিতা! এখনই হয় ত প'ড়ে যাবে।"

সুরেশ্বর সবিতার হাত ধরিয়া কাছের সোফাটার উপর বসাইয়া দিয়া, বালিসের তলা হইতে সরু একছড়া হার বাহির করিয়া, তাহার লকেটের টিপ কলটি খুলিয়া ফেলিয়া অনীতার সম্মুখে ধরিল। তাহার পর কিছুক্ষণ অনীতার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "মনে পড়ে সবিতা, সেই ফুলশয্যার রাত্রির কথা—সুরেশ্বর কার গলায় এই লকেট শুদ্ধ হার পরিয়ে দিতে বলেছিল—সবিতা, এই হ'ল আমার অভিজ্ঞান—"

অনীতার পক্ষে নিজেকে সামলাইয়া রাখা দায় হইল। তবু সে আর একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে চায়। সে হাসিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া ফাটিয়া পড়িয়া কহিল—"ওঃ, ঐ হারটা দেখে বুঝি আমাকে সবিতা ঠাউরেছেন? ভুল, ভুল হয়েছে আপনার। একটি মেয়েকে কঠিন রোগ থেকে সারিয়ে তুলেছিলাম, তাতেই সে আমাকে ওটা উপহার দিয়েছিল। তা' সেই মেয়েটিই বুঝি আপনার স্ত্রী সবিতা! কিন্তু আপনার স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হ'ল কেমন ক'রে—কই, তিনি ত আপনার এত বড় অসুখে—তবে যে সে দিন বললেন আপনার স্ত্রী নেই?......আমার ভাগ্য নেহাৎই ভাল দেখছি, স্বামী স্ত্রী দুজনেরই অসুখে সেবা করলাম—বড় গোছের কিছু একটা পুরস্কার না নিয়ে আর উপায় নেই দেখছি—কিন্তু সেটা—"

সুরেশ্বর অধীর ও উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল—"কেন এখনও এমন ক'রে নিজেকে ঢাকতে চেষ্টা করছ, সবিতা! যখন অসুখের মধ্যে প্রথম জ্ঞান ফিরে পেলাম, চোখ চেয়ে দেখলাম তোমায়। তখনই চিনেছিলাম, কিন্তু তখন তুমি ভুল বুঝিয়ে দিয়েছিলে। কিন্তু আজ আর কোন ভুল নেই সবিতা—ভোলাতেও আজ আর তুমি পারবে না। জানি, অনেক অন্যায়—অনেক অবিচার করেছি তোমার উপরে;



স্নেহ-ঝারি

বসুমতী-চিত্র-বিভাগ]

[শিল্পী—মিষ্টার টমাস।

কিন্তু তার প্রায়শ্চিত্ত যে কতখানি করেছি, তাও কি তুমি শুনবে না?"

অমীতা আর পারিল না—দেখিল, নিজেকে গোপন করা আর সম্ভব না। গম্ভীর শান্ত কণ্ঠে সে কহিল—"বেশ, স্বীকার করছি, আমিই সবিতা। কিন্তু একবার যাকে বিনা অপরাধে, নিষ্কলঙ্ক জেনেও চরণে স্থান দাওনি; আজ কি সাহসে তাকে ফিরে নিতে চাইছ? উঃ, সে-দিনের কথা আজও আমি ভুলতে পারিনি। গুণ্ডারা ধ'রে নিয়ে গেল, মাঠের মধ্যে তাড়া খেয়ে ফেলে পালাল, তার পর ঘরে ফিরে এলাম। তোমার বাপ-মা, সমাজ, সবাই বললেন—ও বউকে আর ঘরে স্থান দেওয়া চলবে না। কত মিনতি করলাম, কত কাঁদলাম তাঁদের সকলের পায়ে ধ'রে, কিন্তু কেউ এতটুকু দয়া করলেন না। তোমার কাছে গেলাম, পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়লাম,—কিন্তু পিতৃমাতৃভক্ত সন্তান তুমি—তুমি বললে—'কি করব সবিতা, বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজন, সমাজের উপর কথা বলতে পারব না আমি'—তার পর আর সহ্য করতে পারলাম না,—চ'লে এলাম সম্পূর্ণ রিক্ত, নিঃস্ব ও নিঃসম্বল হয়ে। বাপের বাড়ী গেলাম, সেখানেও স্থান পেলাম না। তাঁরা বললেন, 'যে মেয়েকে তার শ্বশুরবাড়ীতে নিলে না, তাকে আমরা স্থান দেব কেমন ক'রে? আমাদেরও ত সমাজ আছে, আত্মীয়-বন্ধু আছে'—উঃ, সে-দিন যে কত অসহায় অবস্থায় পথে বেরিয়ে পড়েছিলেম, তার স্মৃতি আজও আমি ভুলিনি!"

সুরেশ্বর বিবর্ণ পাংশু মুখে সবিতার মুখের দিকে তাকাইয়া তাহার কথা শুনিতেছিল, তাহার মুখ দিয়া একটিও কথা বাহির হইল না।

সবিতা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার কহিল—"আজ কি সাহসে তুমি আমায় ফিরে নিতে চাইছ শুনি? সে-দিন সত্যিই আমি নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র ছিলাম, তবু তুমি গ্রহণ করতে পারনি; কিন্তু আজ যে মেয়ে নার্সের কাষ ক'রে পাঁচ যায়গা থেকে অন্নসংস্থান ক'রে বেড়ায়, সে যে পবিত্র থাকতে পারে, এ কি তুমি বিশ্বাস কর? তুমি বিশ্বাস করলেও তোমার সমাজ, আত্মীয়বন্ধু, বাপ-মা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। তবে—তবে কোন্ সাহসে তাকে ফিরে গ্রহণ করতে চাইছ? যে বউকে গুণ্ডারা শুধু ধ'রে নিয়ে যাওয়াতে তাকে তোমার বাপ-মা গ্রহণ করতে পারলেন না, আজ যখন তাঁরা শুনবেন, সেই বউ—যে আজ নার্সের কাষ ক'রে পাঁচদোরে ঘুরে বেড়ায়, তাকেই তুমি গ্রহণ করতে চাইছ—"

সুরেশ্বর কাতরকণ্ঠে কহিল—"থাম সবিতা, থাম। তোমার উপর অনেক অবিচার করেছি, তার জন্ত নিজেও শাস্তি কম ভোগ করিনি। আজ আর আমি কাউকে ভয় করি না—বাবা মা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন, থাকলেও ক্ষতি ছিল না—সমাজের ভয় আজ আর আমার নেই—"

বাধা দিয়া সবিতা উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া কহিল—"ওঃ, তাই! কিন্তু তুমি ফিরে নিতে চাইলেই যে আমি ফিরে যাব, তার ত কোন নিশ্চয়তা নেই! তুমি কি জান না, নার্সরা বেশীর ভাগই কি জাতের—"

"সবিতা, আর না, চুপ কর। আমি কিছুই জানি না—জানতেও চাই না। আমি আজ শুধু চাই তোমায়। শোন তা হ'লে, সে-দিন যখন তোমায় আশ্রয় দিতে পারলাম না, নিরপরাধ, অসহায় জেনেও যখন তোমায় বিদায় দিলাম, তার পরমুহূর্ত্ত থেকেই সংসারের উপর, জগতের উপর, সব কিছুর উপর আমার আর কোন টান, কোন মায়া-মমতা, শ্রদ্ধা-ভালবাসা রইল না—এমন কি, নিজের উপরেও না। ভাবতে লাগলাম, যার নিজের স্ত্রীকে রক্ষা করবার শক্তি নেই, সেই কি না সমাজ, বাপ-মা, আত্মীয়-বন্ধুর কথায় পৌরুষের গর্ব্ব করে! নিজের উপরও ঘৃণার আর আমার অন্ত রইল না। তার পরদিনই তোমার বাপের বাড়ী গেলাম—তোমার সন্ধানে। মনে করেছিলাম, তোমায় নিয়ে সমাজের বাইরে গিয়ে সুখে থাকব।" কিন্তু তা হ'ল না। সেখানে গিয়ে শুনলাম—আমরা যাকে স্থান দিইনি, তাঁরা তাকে কেমন ক'রে গ্রহণ করবেন? তাই তুমি চ'লে গেছ—কলঙ্কিনী মেয়ের সন্ধান তাঁরা জানেন না। ভাঙ্গা বুক নিয়ে ফিরে এলাম, কত যায়গায় তোমায় খুঁজলাম, দেশে দেশে ঘুরে বেড়ালাম—তোমায় পেলাম না। এই দশটা বছর তোমার খোঁজার বিরাম আমার ছিল না। তার পর এক দিন প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হ'ল—জ্ঞান হারালাম। সেই জীবন-মরণের ঝড়ের দিনে তুমি এলে—তোমার স্পর্শে মরণ পালাল আমার দেহ ছেড়ে, তোমার অক্লান্ত সেবায় পুনর্জ্জীবন পেলাম। বেঁচে উঠে দেখলাম, তুমি এসেছ, কিন্তু নিজেকে গোপন রেখে তুমি আমায় করলে আশাহত।

মনে মনে কতবার সেই হারান মুখখানির সঙ্গে তোমার মুখ মিলিয়ে দেখলাম—সময়ের পার্থক্যে সে মুখের কোথাও এতটুকু পরিবর্ত্তন হয়নি। হৃদয়ের সিংহাসনে বসিয়ে যার মূর্ত্তি রাত্রিদিন ধ্যান করেছি, ভোলা কি তাকে যায়! যে সন্দেহের ছায়াটুকু তুমি আমার মনের মধ্যে ফেল্‌তে চেষ্টা করেছিলে—নিজকে সম্পূর্ণভাবে ঢেকে রেখে সামান্য এক জন নার্সের বেশে দাঁড়িয়ে, সে ছায়ার মেঘ কেটে গেল—আজ ঐ হারটা বাথরুম থেকে পাবার পর। ঝড়ের মধ্যে ব'সে ব'সে ভাবছিলাম—কি আনন্দ নিয়েই এই ঝড় আজ এসেছে। একটা বিশ্রী ঝড়ের মধ্যেই এক দিন তোমায় হারিয়েছিলাম, আজ আর একটা সুন্দর ঝড়ের আনন্দ-নৃত্যের মধ্যে তোমায় আবার সম্পূর্ণরূপে ফিরে পেলাম। তাই ভাবছিলাম—এ ঝড় ত ধ্বংসের নয়—এ যে আনন্দের, এ যে তোমার প্রত্যাবর্ত্তনে প্রকৃতি মায়ের আনন্দ-উচ্ছ্বাস।"

সুরেশ্বর হাঁপাইতে লাগিল। অনীতা তাহার দিকে সরিয়া আসিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্পন্দিত-দেহে সুরেশ্বর আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, "সবিতা, আমায় ক্ষমা কর—আমার সে দিনের সব দুর্ব্বলতা, অক্ষমতার ইতিহাস ভুলে যাও—আজ তুমিই আমায় গ্রহণ কর।"

সুরেশ্বর জানু পাতিয়া সবিতার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া সবিতার কোলের উপর মাথা রাখিল। সবিতার চোখ দিয়া বহুদিনের সঞ্চিত অশ্রু-প্রবাহ সহস্র ধারায় ঝরিয়া পড়িল। নত হইয়া সুরেশ্বরের কাঁধের উপর সেও মাথা রাখিল।

শ্রীমৃণাল সর্ব্বাধিকারী (এম, এ)।

চিত্ত মোর অন্তর্মুখী হ'ল আজ

চিত্ত মোর অন্তর্মুখী হ'ল আজ, নির্ব্বাপিত অজস্র উক্তির অহঙ্কার,
মর্ম্মের অদৃশ্য তারে বেজে ওঠে রাত্রদিন অমর্ত্ত্যের নিঃশব্দ ঝঙ্কার।
বাক্যের যেথায় শেষ গান সেথা পায় তার সীমাহারা উড়িবার পাখা,
আজি মোর ছায়াস্তব্ধ ধ্যান-হ্রদে কি খুঁজিছে শূন্যচারী পথিক বলাকা?
এসেছে সে যুগে যুগে নিত্যকার তুচ্ছতার শতছিন্ন শীর্ণ অবকাশে,
এনেছে নক্ষত্রদীপ দেখায়েছে পথখানি পন্থাহীন গোধূলি আকাশে।
আজ কিছু লিখিব না, কণ্ঠ হোক ভাষাহারা, কাব্য মোর অসম্পূর্ণ থাক,
কাব্যের অতীত লোকে বিস্তীর্ণ আনন্দরসে প্রাণ মোর আপনি হারাক্।

ঈর্ষ্যার সজ্ঘর্ষবেগে বিষবাষ্প হইয়াছে পৃথিবীর মর্ম্মের নিশ্বাস,
সেথায় কুণ্ঠিত কাব্য, মৃত রহে অনিবার্য্য অপর্য্যাপ্ত প্রাণের প্রকাশ।
এ পৃথিবী সত্য জানি, তার চেয়ে সত্য মানি মানবের অন্তর-দেবতা,
দেবতার ক্ষুব্ধ কান্না শোন নাই? শোন নাই জীবনের সুগম্ভীর কথা?
পৃথিবীতে শান্তি নাই, শক্তির উদ্ধত বীর্য্য আনিয়াছে অশান্ত বিপ্লব,
আত্মার বিদীর্ণ ইচ্ছা পক্ষ মেলি ঊর্দ্ধে ধায়, সেথা তার নিস্তব্ধ উৎসব।

শ্রীকরুণাময় বসু।



অভিশপ্ত

[গল্প]

পোষ্ট-মর্টেম্ কক্ষ। তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা চলিতেছে। ছাত্ররা ভীড় করিয়া টেবলের উপর শায়িত মৃত দেহটাকে নিরীক্ষণ করিতেছে।

বলিষ্ঠ সুন্দর চেহারা। হ্যাঁ, সুপুরুষ বটে। মৃত্যুর বিবর্ণতা সেই অনিন্দ্য কান্তিকে এখনও নিঃশেষ করে নাই। সৌন্দর্য্যের অবশেষ এখনও নিস্পন্দ দেহটাকে জড়াইয়া আছে।

ব্যবচ্ছেদ আরম্ভ হইল। অপ্রত্যাশিত একটা নিরুৎসাহের মেঘ ক্ষণকালের নিমিত্ত কক্ষমধ্যে ছায়াপাত করিল।

একটা শবদেহ খণ্ড-বিখণ্ড হইতেছে বলিয়া যে তরুণ মুখগুলা ম্লান হইয়া গেল, তাহা নহে। এ কাযে তাহাদের অভ্যাস আছে। প্রাণহীন দেহের মাঝ হইতে মৃত্যু-রহস্য উদ্ঘাটিত করা, প্রাণধারীদের বাঁচিয়া থাকিবার গোপন তত্ত্বটা আবিষ্কার করা তাহাদের শিক্ষার অঙ্গ। নিত্য-দৃষ্ট বস্তু চিত্তকে ব্যাকুল করে না। অনেক দুর্ভাগাই একান্ত কষ্টকর জীবনের বোঝাটা অবশেষে এই উপায়ে নামাইয়া ফেলে। আজিকার ঘটনাটা কিন্তু ঠিক তেমন নহে। একটা রাশি-পাতের ভ্রমে আগা গোড়া অঙ্কটা যেন গরমিল হইয়া গিয়াছে। কাল অবধি যাহাকে সৌভাগ্যশালীদের অন্যতম এক জন বলিয়া সকলে জানিত, আজ প্রভাতেই দুনিয়াতে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অভাগা, তাহাদেরই নামের অ-লিখিত তালিকাতে মানুষের মুখে মুখে এ নামটাও যুক্ত হইয়া গেল। আর এই ভয়ানক বিস্ময়টা তীরের তীক্ষ্ণ ফলার মত সকলের অন্তরে বিঁধিয়া তাহাদের মুখে বেদনার চিহ্ন আঁকিয়া দিল।

অমিয় কহিল,—"এত বড় লোকটা শেষে আত্মহত্যা কল্লে! না, দুনিয়াকে বিশ্বাস নেই।"

সুজিত কহিল, "আমার ভয় হচ্ছে এখন তোকে নিয়ে। তুই আবার কবে কি ক'রে ফেলিস।"

এতক্ষণ ঘরের মধ্যে যে অস্বস্তিকর গুমোট জমিয়া উঠিয়াছিল, তাহা যেন মৃত্যু-সঞ্চালিত পবন-প্রবাহে সরিয়া গেল। এই ক্ষুদ্র পরিহাস যেন সকলকে হাঁপ ছাড়িবার অবকাশ দিল।

চঞ্চল কহিল, "এই মা! একখানা উইল?"—দরজার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই চঞ্চলের কথাটা আর শেষ হইল না।

কর্ণেল চাটার্জ্জি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই স্বল্পভাষী গম্ভীরপ্রকৃতি অধ্যাপককে ছাত্ররা যতখানি শ্রদ্ধা করিত, তাহার চেয়ে অনেকখানি বেশী তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলিত। নিজ নিজ কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় সকলেই তখন মনোযোগী হইয়া পড়িল।

কর্ণেল চাটার্জ্জি ক্ষণকাল নিস্পন্দ-নেত্রে টেবলের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বোধ হয়, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া আসিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মৃতের হাতখানি ছুঁইয়া গভীর আবেগে তিনি কহিলেন, "বন্ধু, সুহৃদ্, উপকারক!"

কর্ণেল চাটার্জ্জির উচ্ছ্বাসবাণী কক্ষটাকে নিমেষে সচকিত করিয়া তুলিল। ছাত্ররা এতক্ষণ ধরিয়া যাহা কিছু পরীক্ষা করিতেছিল, সব বিস্মরণ হইয়া কর্ণেলের মুখের পানে তাকাইয়া রহিল—যেন জটিল রহস্যের সুস্পষ্ট ভাষ্য সেইখানে লিখিত আছে।

তীব্রতম বেদনা ক্ষণকালের নিমিত্ত স্থান, কাল, পাত্র, পদমর্য্যাদা বিস্মৃত করিয়া উচ্চতম আসন হইতে মানুষকে সাধারণের মাঝে নামাইয়া আনে। কর্ণেল ছেলেদের পানে চাহিয়া কহিলেন, "ইনিই বিখ্যাত মোহিত রায় সলিসিটর। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ইনি চার লাখ টাকা দান করেছিলেন। এঁর অর্থ-সাহায্যেই আমি বিলেতের লেখাপড়া শেষ করেছি।"

সুধাংশু কহিল, "স্যার, হঠাৎ এমন দুর্ব্বুদ্ধি ঘটল কেন ভদ্রলোকের?"

"কেন ঘটল? এ মস্ত কুহেলিকা। আমি নিজেও যেন হদিস পাচ্ছি না। মোহিতের নির্ম্মল চরিত্র, উদার হৃদয়, সহানুভূতিভরা বুক! কি ক'রে এ কায তার দ্বারা সম্ভব হ'ল, জানিনে।"

চঞ্চল কহিল, "হয় ত আভ্যন্তরিক এমন একটা অবস্থা এসেছিল, যা থেকে পরিত্রাণ শুধু মৃত্যু।"

নিরুদ্দিষ্ট বস্তুর সন্ধানে ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালনের মত কক্ষের চারিপাশে চাহিয়া কর্ণেল অবশেষে সেই দৃষ্টি শবদেহের উপর স্থাপিত করিয়া বলিলেন, "এটা কি হ'তে পারে? তার ব্যবসার কথা আমি বিশেষ জানি, সেখানে সব দিক দিয়েই তার উন্নতি। আর পারিবারিক যদি কিছু থাকে, বিয়ে-থা সংসারের কোন বালাই ত তার ছিল না।"

কর্ণেল থামিলেন। মনের আঁতিপাতি খুঁজিয়া বোধ করি দেখিতে চাহিলেন। অবশেষে কহিলেন, "মোহিত একটু বিশেষ রকম ভাবপ্রবণ ছিল।"

অমিয় কহিল, "স্যার, ভাবপ্রবণ মানুষগুলার মত বিপজ্জনক দুনিয়াতে কিছু নেই। গোলযোগ বাধাতে এরা সকলের আগে ও সবচেয়ে মজবুত।"

কর্ণেল মাথা নাড়িলেন। কহিলেন, "কিন্তু দুনিয়ার বড় কাযগুলা করবার ভার এদের উপরই পড়ে। সেনাপতির যুদ্ধে আদেশ দেওয়া থেকে যোগীর তপস্যা করা সবই এই প্রেরণাতে চলছে।" তার পর একটু থামিয়া কহিলেন,—"মোহিতের বুকে শূলের মত বিঁধেছিল—তার গর্ভধারিণীর মৃত্যুটা। দুনিয়াতে তার এই একমাত্র স্নেহ-ভালবাসার স্থান ছিল।"

অমিয় কহিল, "স্যার, হৃদয়বেগ দুর্দ্দমনীয় হ'লে চৈতন্যকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে! সে ত শত্রু! বাপ-মা কারুরই চিরস্থায়ী হ'তে পারে না!"

কর্ণেল কহিলেন, "জানি, মৃত্যু অনুক্ষণ আমাদের দিকে চেয়ে আছে। বিয়োগের দুঃখ সে দেবেই। কিন্তু সে অপরাধী ক'রে চ'লে যায়, বুক সে ভেঙ্গে দিয়ে যায়। মিঃ রায় তাঁর মায়ের শেষ কৃত্যটুকু করবার অবধি অধিকার হ'তে বঞ্চিত হয়েছিলেন।"

* * *

পাঁচ বছর বয়সে মোহিতের পিতৃবিয়োগ ঘটিয়াছিল এবং সেই সঙ্গে তাঁহাকে জননীর সহিত আসিয়া মাতুলালয়ে স্থিতি লইতে হইয়াছিল।

ভবনাথ মেয়ের পানে চাহিয়া এক ফোঁটা অশ্রুপাত বা একটা আক্ষেপ পর্য্যন্ত করিলেন না; কিন্তু বছরের মধ্যেই তিনি বিছানা গ্রহণ করিলেন।

রকমফের চিকিৎসা চলিতে লাগিল। পীড়া কিন্তু কাহারও বশ্যতা স্বীকার করিল না বা ভবিষ্যতে যে করিবে, এমন কোন আশাও দিল না। ভবনাথ পুত্রকে কহিলেন, "জ্যোতিষ, মোহিতকে কিছু দিলুম না, ওকে তোমাদের হাতে দিয়ে গেলুম।"

জ্যোতিষ পিতার নিকট সরিয়া আসিলেন; বিনীতকণ্ঠে কহিলেন, "আপনি দিদির নামে কি মোহিতের নামে যদি দিতে ইচ্ছে করেন, আমাদের কোন আপত্তি নেই।"

ভবনাথ কহিলেন, "সে চিন্তা আমি অনেক করেছি। কিন্তু দেখলুম, গৌরীর অদৃষ্ট বড় মন্দ, আমি দিলেও কিছু থাকবে না। যে পথে সব গেছে, সেই পথেই যাবে।"

গৌরী পিতার জন্য মকরধ্বজ মাড়িতেছিলেন, খলের দিকে মাথাটা তাঁহার ঝুলিয়া পড়িল।

পিতার প্রথম সন্তান হইয়া তিনি দুনিয়াতে আসিয়াছিলেন। আদরপ্রতিপত্তির দাবী ভাই-বোনের অপেক্ষা বাপ-মায়ের কাছে তাঁহার বেশীই ছিল, ভবনাথ অনেক অর্থব্যয় করিয়াই কন্যাকে ধনী ঘরের বধূ করিয়াছিলেন। কিন্তু সুখী করিব বলিলেই সুখী করা যায় না। জন্মান্তরের সুকৃতির সংযোগ থাকা চাই। তাই ভবনাথ যে মেয়েটিকে হীরামতিতে অঙ্গ মুড়িয়া ভাগ্যবতী করিয়া দিয়াছিলেন, জন্মকেন্দ্রস্থিত রুষ্ট গ্রহের ক্রূর দৃষ্টিপাতে, একটিমাত্র সন্তানের মা হইতেই তাঁহার সীঁথির সিঁদুর মুছিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে জানা গেল, শেয়ার মার্কেটের বাজারে তরুণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াই মরিয়াছে। পত্নী-পুত্রের একমুঠা অন্নের সংস্থান অবধি রাখিয়া যায় নাই।

মেয়ের বৈধব্যের জন্য ভবনাথ কোন ক্ষোভ করিলেন না। জামাতার প্রকৃতিকে তিনি চিনিতেন। সে যে ইজ্জতের সহিত দুনিয়া হইতে বিদায় লইয়াছে, এইটুকুর জন্য মনে মনে তিনি ভগবানকে ধন্যবাদ দিলেন। প্রাণের অপেক্ষাও প্রিয় যে মর্য্যাদা। কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা দুঃখকে দমন করিলেও দেহ তাহা সহিতে পারে না। বাঁচিবার শক্তিটা তাহার ক্ষয় হইয়া আসে।

ভবনাথ পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধ চুকাইলেন। পিতার সংসার হইতে গৌরী ভায়ের সংসারে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

জ্যোতিষের পুত্র ছিল না। কন্যাদের লইয়াই তাঁহার

সংসার। তিনি কহিতেন, "মোহিতই আমার ছেলের স্থান ভর্ত্তি ক'রে আছে।"

কথাটা নীলিমার ভাল লাগিত না। ওষ্ঠ উন্টাইয়া অবজ্ঞার কণ্ঠে তিনি বলিতেন, "যম জামাই ভাগনা, এরা মুখ-পানে চায় না।"

গৌরী মুখ বুজিয়া সব শুনিতেন। একটা নিশ্বাস তাঁহার কণ্ঠের দ্বারে ঠেলিয়া আসিত। এই গৃহ তাঁহার পিতৃ-গৃহ, জন্মভূমি, বাল্য ও শৈশবের সুখনীড়! তথাপি এখানকার তিনি আশ্রিত মাত্র। নিজের অধিকার-সীমার ভিতর মানুষ যদি অপরের আধিপত্য সহ্য না করিতে চাহে, তাহাতে অনুযোগ করিবার কি আছে?

মোহিত যখন বি, এল, পাশ করিল, জ্যোতিষ তখন ব্লাড্‌প্রেসারে ভুগিতেছেন।

মোহিতকে ডাকিয়া তিনি কহিলেন, "তুমি এটর্ণী হ'তে চাইছ। আমি বলি, ওতে দরকার নেই! তুমি বিলেত যাও।"

মোহিত চুপ করিয়া রহিল। ছাত্র-জীবনের উহা যে তাহার স্বপ্ন! কিন্তু অর্থের অস্বচ্ছলতা স্মরণ করিয়া সে সঙ্কল্প সে পরিত্যাগ করিয়াছিল।

জ্যোতিষ ক্ষণকাল ভাগিনেয়ের পানে চাহিয়া রহিলেন। শেষে একটুখানি বিষাদের হাসি হাসিয়া কহিলেন, "আমি বুঝেছি, তোমার অভিমান কোথা! কিন্তু ও সব ত মেয়েলি কথা।"

কথাটা নীলিমার কাণে উঠিল। সাপের মত তিনি ফোঁস করিয়া উঠিলেন। তিক্তকণ্ঠে কহিলেন, "না, তা হবে না। তোমার পাঁচটা দৌহিত্র আছে। আমার মণি, বিশু, রবি আছে। ওরা কি তোমার কেউ নয়?"

কথা যখন স্বার্থ ও বিদ্বেষের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন হাজার সহিষ্ণু স্নেহপ্রবণ শ্রোতার চিত্তও ঘৃণা-বিরক্তিতে রি-রি করিয়া উঠে। রুষ্ট কণ্ঠে জ্যোতিষ কহিলেন, "দেখ, মোহিতের ভার বাবা আমারই উপর দিয়ে গেছেন।"

সমান স্বরে নীলিমা উত্তর দিলেন, "তা ব'লে তিনি ত সর্ব্বস্বান্ত হ'তে বলেন নি!"

জ্যোতিষ শুইয়া ছিলেন, উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, "মোহিতকে হাজার দশ বারো টাকা দিলে আমি সর্ব্বস্বান্ত হব, এ কথা তোমায় কে বলেছে?"

নীলিমা রাগ করিয়া কহিলেন, "কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে কখন তা হ'তে দেব না।"

অবজ্ঞার হাসিতে জ্যোতিষের ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হইল, ব্যঙ্গের স্বরে তিনি কহিলেন, "কিন্তু সম্পত্তি হচ্ছে আমার।"

মানুষ রাগ সহিতে পারে, তিরস্কারবাণী সহিতে পারে, সহিতে পারে না শুধু অবজ্ঞা। বিশেষতঃ স্বামীর নিকট হইতে। সে যেন শক্তিশেলের মত বুকে আসিয়া বিদ্ধ হয়।

স্বামী যে মুখের উপর এমন করিয়া অপমান করিবেন, ইহা ছিল নীলিমার স্বপ্নের অগোচর। পুত্র না জন্মানর মনক্ষোভে নীলিমার বুকের মাঝটা শূন্য ঠেকিত, কিন্তু জ্যোতিষের যে তাহাতে এতটুকু সহানুভূতি নাই! ভাগিনেয় আছে, তাহাতেই পুত্রের অভাব পূর্ণ হইয়াছে, স্বামীর এই তৃপ্তিবোধটাই মোহিতের প্রতি নীলিমার বিদ্বেষকে যেন বাড়াইয়া তুলিত। আজ স্বামীর কথায় বর্ষার নদীর মত সেই বিদ্বেষ-প্রবাহ ফুলিয়া, ফাঁপিয়া ভয়ানক হইয়া উঠিল।

নীলিমা তীব্রকণ্ঠে কহিলেন, "তোমার বিষয়, বেশ, তুমিই ভোগ কর! আমি এখান থেকে স'রে যাচ্ছি।"

নীলিমা কাহারও নিষেধ মানিলেন না। গৌরী হাতে ধরিয়া কান্নাকাটি করিয়া কহিলেন, "বৌ, অত রাগ ক'রে যাস্ নি, যেতে নেই।"

নীলিমার মনের ভিতর তখন অগ্নিকাণ্ড চলিতেছিল। তিনি কহিলেন, "মাপ কর, ঠাকুরঝি! এ ভিটের জলটুকু অবধি আমি খাব না। কেন আমায় এত তাচ্ছীল্য? আমার ছেলে নেই ব'লে?"

গাড়ী আসিল, নীলিমা উপবাস করিয়া চলিয়া গেলেন। যাত্রাকালে স্বামীকে প্রণাম করিতে কক্ষে ঢুকিলেন। জ্যোতিষ খোলা জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন।

* * * * *

সেই সন্ধ্যায় জ্যোতিষের ব্লাড্‌প্রেসার অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন

গৌরী ভীত হইয়া পুত্রকে অন্তরালে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমার মামীমাকে আনতে লোক পাঠাও, কপালের কথা।"

"আচ্ছা" বলিয়া মোহিত চলিয়া গেল। বহির্ব্বাটীতে গিয়া সে ডাক্তারদের ফোন্ করিল। নীলিমাকে কোন সংবাদ দিল না।

সহরের বিখ্যাত চিকিৎসকে বাড়ী ভরিয়া উঠিল। আত্মীয়, অনাত্মীয় বার্ত্তা পাইতেই ছুটিয়া আসিল। জ্যোতিষের সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় সকলের মুখেই ভাবনার ছায়া পড়িল। শুধু নীলিমাই কোন সংবাদ পাইলেন না;—যাহার অদৃষ্টের সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ পীড়িতের এই মৃদু নিশ্বাসটির উপরই শুধু নির্ভর করিতেছে।

গৌরী ছেলেকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন,—"তোর মামীকে আনতে লোক গেছলো?"

দীপ্ত দীপশিখার মত গৌরীর উজ্জ্বল চোখের পানে চাহিয়া মোহিতের বুকের ভিতরটা একবার কাঁপিয়া উঠিল। জড়িত কণ্ঠে সে বলিল, "পাঠাচ্ছি"—বলিয়াই সে দ্রুতপদে মাতুলের কক্ষাভিমুখে চলিয়া গেল।

বিজাতীয় ক্রোধে মোহিতের চিত্ত নীলিমার উপর ভয়ানক কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। মাতুলানী তাহার উপর বিরূপ ছিলেন বলিয়াই যে মোহিতের মনে কোন দ্বেষ কখনও জাগিয়াছে, তাহা নহে। শুধু একান্ত স্নেহময় মাতুলের এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থাটার জন্য সে মনে মনে নীলিমাকে দায়ী করিয়া, সমগ্র অন্তর দিয়া তাহাকে ইহার উপযুক্ত শাস্তি দিবে—জব্দ করিবে বলিয়া বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। বিবেকের কোন অনুশাসনকেই মোহিত মানিবে না।

অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ যেমন বাতাসে ভর করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ছুটিয়া যায়, দুঃসংবাদও তেমনই ক্ষিপ্র গতিতে মানুষের মুখে মুখে ছুটিয়া চলে।

নীলিমা স্বামীর জীবন-মৃত্যুর এই সাংঘাতিক অবস্থার সংবাদটা পাইয়াই মেয়ে-জামাই লইয়া ছুটিয়া আসিলেন।

গৌরী কাঁদিয়া কহিলেন, "বউ, এমন ক'রে গেলে কেন?"

নীলিমা কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, "আমার অদৃষ্ট! তা না হ'লে এ দুর্ব্বুদ্ধি আমার কেন ঘটল?"

একবাড়ী লোক, সকলেই জানিতে পারিল, স্বামীর সহিত কলহ করিয়া নীলিমা মেয়ের বাড়ী গিয়াছিলেন। কলহ মোহিতকে লইয়া। সে যেমন পারিল, সে সেই ভাবেই নীলিমার উপর ক্ষোভ, দুঃখ প্রকাশ করিল, তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিল।

নীলিমা নির্ব্বাক্! নিজের অপরাধে মানুষ নিজেই যখন মর্ম্মাহত হইয়া পড়ে, অপরের তিরস্কার তখন গায়ে বাজে না।

* * * * *

শ্রাদ্ধ শেষ হইলে জ্যোতিষের উইল বাহির হইল। দেখা গেল, তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি—স্থাবর অস্থাবর বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, সমস্তই তিনি উত্তরাধিকারী হিসাবে মোহিতকে দিয়া গিয়াছেন। নীলিমার একটা মাসহারার অবধি উল্লেখ নাই।

নীলিমা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ক্ষণকাল পরে তিনি জামাতাকে কহিলেন, "তিনি ত কখন উইল করার কথা মুখে আনেন নি।"

নীরস কণ্ঠে তপন কহিল, "কিন্তু ক'রে ত গেছেন।"

নীলিমা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন, তীব্র কণ্ঠে কহিলেন, "মিছে কথা। আমার অমতে তিনি অনেক কায কল্লেও আমায় না জানিয়ে তিনি কোন কিছু করেন নি।"

মোকদ্দমা উঠিল। সকলেই একবাক্যে সাক্ষ্য দিল, উইল লইয়াই জ্যোতিষের সহিত নীলিমার কলহ বাধিয়াছিল। রাগ করিয়া তিনি মেয়ের বাড়ী চলিয়া গিয়াছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর দিন অনেক করিয়া তাঁহাকে আনা হইয়াছে।

মধ্যাহ্নের দিবালোককে রাত্রির অন্ধকার যেন অকস্মাৎ গ্রাস করিয়া ফেলিল। এত বড় মিথ্যা কথা। নীলিমার মুখ দিয়া একটা স্বর অবধি ফুটিল না।

মোহিত আপোষ করিতে চাহিয়াছিল, তপনকে কহিয়াছিল, "আপনি মামীমাকে বুঝান। আমি অর্দ্ধেক সম্পত্তি তাঁকে ছেড়ে দিতে রাজি আছি।"

উত্তম প্রস্তাব বলিয়া তপন কথাটা শাশুড়ীর নিকট পাড়িল।

অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত নীলিমা দ্বিগুণ হইয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "সেই জোচ্চোরের ব্যাটা জালিয়াৎ যে উইল করেছে, আমাকে সেই স্বত্ব মেনে নিতে হবে না কি?"

তপন কহিল, "আপনি যাই বলুন, মা, প্রমাণে কিছু টিঁকছে না।"

নীলিমা উত্তপ্ত কণ্ঠে কহিলেন, "মানুষের প্রমাণে না হোক, ভগবানের প্রমাণে টিঁকবে। ঠাকুরঝি যে সেই কাশী চ'লে গেল, এর মানে কিছু বুঝতে পার?"

বিরক্ত কণ্ঠে তপন কহিল, "আপনার কথা না হয় মেনে

নিলুম। কিন্তু সবটা হারানর চেয়ে অর্দ্ধেকটা ফিরে পাওয়া—"

বাধা দিয়া নীলিমা কহিলেন, "তপন, ও সব আমায় কিছু বোঝাতে এস না। মিথ্যাকে আমি জয়ী হ'তে দেব না।"

"কিন্তু আদালত যদি করে—"

শাণ দেওয়া ইস্পাতের মত নীলিমার দুই চোখ চক্‌চক্ করিয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "ভগবানের দণ্ড তোলা থাকবে।"

শাশুড়ী অবুঝ। বিরক্ত-চিত্তে তপন মনে মনে ভাবিল, শুধু অবুঝ নহেন, নিতান্ত নির্বোধ। তাহা না হইলে স্বামীর সম্পত্তির একটি কপর্দ্দক হইতে অবধি বঞ্চিত হইয়াছেন!

তপন চুপ করিয়া চলিয়া গেল।

নীলিমার মামাত ভাই এটর্ণী। তিনিই মোকদ্দমা চালাইতেছিলেন। তিনি আসিয়া কহিলেন, "নীলু! ওরা আজ মিট্‌মাটের কথা কইতে এসেছিল।"

ছিলা-কাটা ধনুকের মত নীলিমা সোজা হইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন, "এর ভিতর মিট্‌মাটের কি আছে? আমার স্বামীর বিষয় আমি পাব।"

সুরেশ একটুখানি হাসিলেন, কহিলেন, "আমরা ত সবাই সেইটিই ইচ্ছা করি। কিন্তু কেস্ বড় বাঁকা। জ্যোতিষবাবু যদি সব দিয়েই থাকেন।"

নীলিমা বাঘিনীর মত গর্জ্জিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "দাদা! তুমি আমায় এই বিশ্বাস করতে বল? আমার স্বামীকে আমি চিনি না? আমি নিশ্চয় বলছি, মোহিত শুধু আমায় জব্দ করবার জন্য এমন উইল সৃষ্টি করেছে।"

সুরেশ কহিলেন, "সে যাই হোক্ নীলু, ওসব কথা তুমি ভুলে যাও। যা বল্‌তে এসেছি, সেইটাই বিশেষ বিবেচনা কর।"

নির্লিপ্তকণ্ঠে নীলিমা কহিলেন, "বল।"

সুরেশ কহিলেন, "মোহিত রায় বলছে, সে বিশ হাজার টাকা শুধু দাবী করে। বাকী সব তোমার। আমিও দেখছি, খুব ভাল কথা।"

নীলিমা কহিলেন, "না, এর চেয়ে মন্দ আমার আর কিছু নেই। এর অর্থ আমাকে মোহিতের অনুগৃহীত হওয়া। সম্পত্তি হয় তার, না হয় আমার। এর মধ্যে অন্য কিছু হ'তে পারে না।"

অসহিষ্ণু কণ্ঠে সুরেশ কহিলেন, "মামলার হার-জিত না হয় ছেড়ে দিলুম। কিন্তু খরচটা একবার বুঝে দেখ—" সুরেশ থামিলেন।

নীলিমা কহিলেন, "সুরদা! তোমার ভয় নেই। আমার গহনা হ'তে তোমার বিল চুকবে। আমি ধর্ম্মের দিকে চেয়েই মোকদ্দমা করব। তা না হ'লে মোহিতের মামার বিষয় আমি মোহিতকে দিতে পারতুম। কিন্তু সে কেন আমাকে ফাঁকি দেবে?"

*　*　*　*　*

সব বছর শেষ গেছে বলিয়া মোকদ্দমারও এক দিন নিষ্পত্তি হইল। উইলখানা সত্য বলিয়া সুদীর্ঘ রায়ে বিচারক অভিমত ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু অদৃশ্য হাতে কে যেন মোহিতের মুখে কালির ছোপ মাখাইয়া দিল। দুই চোখে তাহার ফুটিয়া উঠিল—গভীর বিষণ্ণতা। এত বড় একটা জয়োল্লাসের উত্তেজনা ক্ষণিকের জন্য তাহার মুখে আনন্দের দীপ্ত রাগ ফুটাইল না। সদস্য-হারার মত একান্ত ক্লান্ত দেহ-মন লইয়া নিঃশব্দে সে গৃহে ফিরিয়া আসিল।

তপনের সহিত দেখা করিয়া মোহিত ব্যগ্র-ব্যাকুল কণ্ঠে তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "তুমি ভাই মামীমাকে বুঝাও। তাঁর স্বামি-শ্বশুরের ভিটে ফেলে তিনি কোথা যাবেন? আমি অন্যত্র স'রে যাচ্ছি।"

মোহিতের সুখ্যাতিতে দেশ ভরিয়া উঠিল। নীলিমাই শুধু সম্মতি দিলেন না; কিন্তু মেয়ের বাড়ীতেও রহিলেন না, কাশী চলিয়া গেলেন।

মোহিত ষ্টেশনে আসিয়াছিল। গভীর মিনতিতে কহিল, "মামীমা! আমি আপনার জন্য কাশীতে ভাল বাড়ীর ব্যবস্থা করেছি। লোকজনও বন্দোবস্ত করেছি। ভাড়া বা খরচার কথা কিছু ভাববেন না।"

দুঃখ যখন অন্তরের কানায় কানায় ভরিয়া উঠে, তখন অত্যন্ত সোজা কথাটাও কেমন বাঁকা বোধ হয়; সহানুভূতিটা অনেক সময় উপহাস বলিয়া ভ্রম হয়। নীলিমা মুখ ঘুরাইয়া লইয়া কহিলেন, "তিনি যখন এক কপর্দ্দকও আমায় দিয়ে যান নি, তখন আমার কিছু চাই না।"

অভিমান করিয়া মানুষ যতখানি ত্যাগ করিতে পারে, সুস্থমনে তাহার চারি ভাগের এক ভাগও পারে না।

অপরের ব্যথাটা যখন নিজের অন্তরে উপলব্ধি হয়, বিমুখ

চিত্তও তখন স্নেহ-করুণায় আর্দ্র হইয়া পড়ে। বিনীতকণ্ঠে মোহিত কহিল, "মামীমা! মামাবাবুরই ত সব।"

নীলিমা কহিলেন, "তিনি ত তোমায় দিয়ে গেছেন।"

কথাটা মোহিতকে আঘাত করিয়া তাহার সুগৌর মুখখানাকে নিমেষের জন্য বেদনায় কালো করিয়া দিল। মুহূর্ত নীরব থাকিয়া মোহিত কহিল, "কিন্তু আমি ত আপনার পুত্রস্থানীয়, আপনাদের অন্নেই পুষ্ট। আপনাদের আশ্রয়েই মানুষ।"

মোহিত মাতুলানীর পদধূলি লইল।

চিত্ত হাজার উগ্র থাকিলেও প্রণামের সম্মুখে সে একটুখানি শান্ত হয়। প্রকৃত স্নেহাস্পদ যখন চরণপ্রান্তে মাথা লুণ্ঠিত করে, তখন ক্ষণিকের জন্য সব অভিযোগ বিস্মৃত হইয়া, সব ক্ষোভ ভুলিয়া সেই মুহূর্ত্তটিতে হৃদয় কেমন আর্দ্র হইয়া পড়ে।

জ্যৈষ্ঠের জ্বালাভরা রৌদ্রের শেষে আকাশে বৃষ্টিসঞ্চারের মত নীলিমার আয়ত-নেত্রকোণে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। মোহিতের মাথায় হাত দিয়া নীলিমা কহিলেন,—"আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হও। কিন্তু আমি ভিখারী নই। স্মরণ রেখ, কার পুত্রবধূ আমি।"

তপন মোহিতের গা টিপিল।

ট্রেণ হুইসিল দিয়া ছাড়িয়া দিল। মোহিত প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে সেই গতিশীল বিপুলকায় গাড়ীখানার দিকে চাহিয়া রহিল। যেন সেই ভারী চাকার কঠোর নিষ্পেষণে তাহার জীবনের সুখ, শান্তি, আনন্দ দলিত-পিষ্ট হইয়া মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদে মৃত্যুর রাজ্যে চলিয়া গেল। অব্যক্ত যন্ত্রণামাখা দৃষ্টিতে একান্ত অসহায়ের মত নিষ্পলক-নেত্রে মোহিত শুধু চাহিয়া রহিল। বেদনার হাহাকারে অন্তর জানাইল—নিরুপায়, নিরুপায়।

একটা ঠেলা দিয়া তপন কহিল,—"চল, ফেরা যাক্।"

"চল" বলিয়া মোহিত মোটরে উঠিল।

গাড়ীতে বসিয়া তপন কহিল,—"আমার শাশুড়ী অদ্ভুত প্রকৃতির। এ রকম একগুঁয়ে আমি জীবনে দেখিনি।"

মোহিত কোন উত্তর দিল না। বুকের ভিতরে একটা উচ্ছ্বাস কান্নার আকারে বাহিরে আসিতে চাহিতেছিল, প্রাণপণ শক্তিতে উহা চাপিয়া সে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। অন্তরকে আজ তাহার এতটুকু বিশ্বাস ছিল না। কোন্ মুহূর্ত্তের ফাঁকে সে যে নিজেকে প্রকাশ করিয়া দিবে, তাহা কিছু বলা যায় না।

* * *

রায় কোম্পানী! মস্ত বড় এটর্ণীর অফিস। অনুক্ষণ টেলিফোন ঝন্-ঝন্ করিয়া বাজিতেছে। পাশের কক্ষে টাইপিষ্টদের হাতে বিরামহীন হইয়া মেসিনগুলির শুধু একটানা খট্‌খট্ শব্দ হইতেছে। কেরাণী-দলের বিশ্রাম ত দূরের কথা, একটু গল্প করিবার অবধি অবসর নাই। কর্ম্মচক্র যেন পূর্ণ উদ্যমে এই অফিসখানার ভিতর ছুটিতেছে। সকলের মুখে ব্যস্ততার চিহ্ন। মক্কেলের ভিড় লাগিয়া আছে। পাঁচ জন এটর্ণী মোহিত মাহিয়ানা দিয়া রাখিয়াছে, তথাপি নিশ্বাস ফেলিবার অবসর তাহার নাই। জটিল মামলায় জয়ী হইতে গেলে মোহিতের কূটবুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতির সাহায্য অগ্রে প্রয়োজন। মক্কেলদের এমনই বিশ্বাস। তাহারা বলিয়া বেড়ায়—মোহিত রায় সলিসিটর মোকদ্দমা কেটে জোড়া দেয়, মরা বাঁচায়, ভরা-ডুবি ওর বুদ্ধির জোরে আর জেগে ভেসে উঠে। আর আছে হ্যাঁ হাত-যশ। এইটাই মানুষ আগে খোঁজে। ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন দৃষ্টিতে মানুষের দিকে তাকায়। অনেক রুদ্ধ দুয়ার তাহার করস্পর্শে খুলিয়া যায়।

মোহিতের এতখানি পসার-প্রতিপত্তির পানে চাহিয়াও কিন্তু প্রজাপতি ঠাকুর কিছু সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। আজিও সে অবিবাহিত। বিবাহের একবার চেষ্টা যে না চলিয়াছিল, তাহা নহে। বরঞ্চ সেটা যেন দুর্ব্বিষহ হইয়া, স্থানে অস্থানে মোহিতকে আক্রমণ করিয়া, কন্যাদায়-গ্রস্তগণ কিছুদিন তাহার জীবনটাকে দুর্ভর করিয়া তুলিয়াছিল।

একটি মেয়েকে মনোনীত করিয়া মোহিত গিয়াছিল—কাশীতে জননীর সম্মতি আনিতে।

গৌরী পুত্রকে কহিলেন,—"আমায় ও-সব কিছু জিজ্ঞেস ক'র না। আমি অনেক ক'রে গণ্ডীর বাইরে এসেছি।"

মোহিত ফিরিয়া আসিল। জগতে একটিমাত্র ভক্তি ও ভালবাসার পাত্র ছিলেন গর্ভধারিণী। তিনিই যখন মোহিতের বিবাহ সম্বন্ধে নির্লিপ্ত, উদাসীন রহিলেন, তখন মোহিত সংসার করিতে চাহে না। মরুভূমির মত এমনই উত্তপ্ত বারিহারা জীবনটা অভিসম্পাতের মত কাটিয়া যাক।

মোহিত এ বিষয় লইয়া কাহার নিকট অভিযোগ করিবে? জন্মকালীন কোন রুষ্ট গ্রহ জীবনটাকে তাহার ব্যর্থ করিতে চাহিতেছে; তাহার বিরুদ্ধে অভিযান করিতে মোহিতের শক্তিও নাই, স্পৃহাও নাই।

তপন তর্ক করিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছিল যে, মোহিতের এই মনোভাবের কোনও ভিত্তি নাই। উহা তাহার ভাব-প্রবণ চিত্তের উদ্ভট খেয়াল মাত্র। কিন্তু পাথরে গাঁথুনী করা বনিয়াদের মত মোহিতের সঙ্কল্প অটল রহিল।

দুঃখ-বেদনাতে অন্তরটা যখন জর্জ্জরিত হইয়া থাকে, তখন অপরের এতটুকু ব্যথায় তাহাকে বড় কাতর করে।

সৎকাযের খাতায় মোহিতের নাম উঠিত সকলের আগে। স্নেহ, মায়া, করুণা দিয়া পরকে আপন করিতে তাহার মত কেহ পারিত না। নিজের বলিতে যাহার কেহ থাকে না, বিশ্বটাই তখন যোগসূত্রে তাহার সহিত নিবিড় হইয়া বাঁধা পড়ে।

প্রাচীনের দল অবাক্ হইয়া যাইত। বলিত,—"তরুণ রায়ের ছেলে এতবড় বুক পেলো কোথা থেকে? ওর বাপ একটা মস্ত জোচ্চোর ছিল। ম'রে গেল তাই! বেঁচে থাকলে,—না জানি শেষটা—হ্যাঁ, তবে মাথাখানা তার সাফ ছিল। কিন্তু কি জান, ধর্ম্মের গতি বড় সূক্ষ্ম। এই যে তরুণ রায় পরের সর্ব্বস্ব গ্রাস করবার ফন্দীতে অনুক্ষণ লেগে থাকত; কিন্তু রাখতে পাল্লে কি কিছু?"

কেহ বলিত,—"ওটা ওদের বংশের ধারা। তরুণ রায়ের বাপটিও বিশেষ সুবিধার ছিলেন না। বাপের ব্যাটা! তবে যত দিন বেঁচে ছিল,—হ্যাঁ, রাজ-ঐশ্বর্য্য ভোগ করেছে। নবাবী জানত বটে।"

এমনই অনেক কথার আলোচনা মোহিতের পশ্চাতে চলিত। তাহার দু'এক টুকরা যে কাণে না আসিত, তাহাও নহে। সকলেই একবাক্যে বলিত, দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ ঐ মোহিত রায়;—মামার বাড়ী মানুষ হয়েছিল ব'লে! ওর মাতামহ ভবনাথ মিত্তির! আহা, যেন দেবতা।

* * *

কাশী হইতে সংবাদ আসিল, মোহিতের জননী পীড়িত।

ট্রেণে যাত্রা করিলে যদি বিলম্ব ঘটে, তাই মোহিত মোটরে বেনারস যাত্রা করিল।

সমস্ত পথটা মোহিত যেন একটা দুর্ব্বহ ভার বহন করিয়া মাতৃ-সন্নিধানে ছুটিয়া আসিল। শৈশব হইতে জীবনের যত খুঁটিনাটি ছোট-বড় স্মৃতি এই সুদীর্ঘ পথের মাঝে তাহার দৃষ্টির সম্মুখে বার বার আসিয়া দাঁড়াইতেছিল। কত কথা মনে পড়িতেছিল,—মোহিতকে বড় করিয়া, মানুষ করিয়া, সংসারে দশ জনের মত তাহার জননী এক দিন ঘরকন্না করিবেন, কত না তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। তাঁহার হৃদয়ের সেই স্বপ্নরচনা আজ নিরর্থক। অপরূপ শ্রীর শোভায় তাহার জননীর হৃদয় সুশোভিত হইয়াছিল। যে মাধুর্য্যের সকল্পনায় তিনি এক দিন উপভোগ করিয়াছিলেন, আজ তাহা আকাশকুসুমে পরিণত নহে কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমের রোগশয্যায় মাকে দেখিয়া মোহিত কাঁদিয়া ফেলিল। উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে কহিল,—"মা, এমন কি অপরাধ করেছি যে, এমন ক'রে আমায় শাস্তি দিচ্ছ?"

গৌরীর কঠিন পীড়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলিলেও জ্ঞানের বিকৃতি ঘটায় নাই।

কক্ষের চারিপাশে একবার ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া, গৌরী দুর্ব্বল কণ্ঠে কহিলেন,—"তোমায় শাস্তি আমি দিইনি। তার হাত হ'তে রক্ষা করতে আমি নিজেই এই প্রায়শ্চিত্ত করেছি।"

আহতকণ্ঠে মোহিত কহিল,—"কেন মা তুমি এ সব কচ্ছ? আমার অন্যায়ের পাপদণ্ড আমারই হবে। কিন্তু তুমি এত দুঃখ ভোগ কচ্ছ কেন, মা? এ ত তোমার পিতৃ-সম্পত্তি।"

অস্তমিত সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুকুর মত একটা বিষাদের হাসি গৌরীর পাণ্ডুর মুখখানিতে নিমেষের জন্য ফুটিয়া উঠিল।

গৌরী কহিলেন, "ফাঁকি দিয়ে যা আসে, ফাঁকি দিয়েই তা যায়। ন্যায্য অধিকারে তারা বঞ্চিত হয়েছে। মানুষের চোখে এ অবিচার চাপা থাকলেও ভগবানের কাছে চাপা নেই। ওরে, আমি যে তোর মা, এ আমি সইব কেমন ক'রে? তাই নিজেকে আমি এমন ভিখারী ক'রে রেখেছি।"

মোহিত স্তব্ধ হইয়া গেল। একটা নিদারুণ শঙ্কা তাহার সমগ্র অন্তরকে যেন হিম করিয়া দিল। এত দিন একটা প্রচণ্ড অভিমান অন্তরটাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। নিঃশব্দে কেবলই একটা অভিযোগ উত্থিত হইত, মা সন্তানের সুখে দুঃখে উদাসীন। একটা সংশয় জাগিত, মা যে তাহাকে

ফেলিয়া দেবতাকে চাহিলেন, ইহাতে যথার্থ ধর্ম্ম হয় কি ? কর্ত্তব্যে অকর্ত্তব্য হইলে জগতে ধর্ম্মের দাম কোথায় ?

আজ মনের সমস্ত কুয়াসাজাল ভেদ করিয়া বিশ্বাসের সূর্য্য দীপ্ত কিরণে যেন জ্বলিয়া উঠিল। যে মা পুত্রকে গর্ভে ধরিয়া দুনিয়াতে আনিয়াছে, সে কখনও তাহাকে পর করিয়া দিতে পারে না। তাই ধরিত্রীর একটা নাম সর্ব্বংসহা।

গৌরী কহিলেন, "মোহিত, আমি জানি, এ স্বভাব তোমার নয়। তোমার পিতৃগোষ্ঠীর রক্তধারা হ'তে এ অন্যায় তোমাতে উদ্ভব হয়েছে। তাই যে দিন তুমি আমার কাছে বিয়ের সম্মতি চাইলে, দিতে পারলুম না।" গৌরী থামিলেন, তাঁহার কোটরগত চোখের দুই পাশ দিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল।

মোহিত সযত্নে তাহা মুছাইয়া দিল। পুত্রের হাতটা নিবিড় স্নেহে চাপিয়া ধরিয়া গভীর মিনতিতে গৌরী কহিলেন, "তোকে ছেড়ে এতগুলা বছর আমি দেবতার পায়ে প'ড়ে আছি বাবা, তবু এই শেষ সময়ে তোকে দেখবার জন্য প্রাণটা আমার ছটফট্ কচ্ছিল, মৃত্যুকে আমি ঠেকিয়ে রাখছিলুম। তোকে না দেখে মনে মনে যে শুধু অসোয়াস্তি জড়ান থাক্‌বে। কিন্তু আমার একটি প্রার্থনা বাবা"—গৌরী পুত্রের পানে চাহিলেন।

মোহিত কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "প্রার্থনা ব'ল না মা, আদেশ বল! যত দুরূহ হোক, আমি তা পালন করবো।"

গৌরী ক্ষণকাল নিস্তব্ধ রহিলেন, তার পর কহিলেন, "যে হাত দিয়ে মিথ্যে উইল সৃষ্টি করেছিলে, সে হাত দিয়ে আমার মুখে আগুন দিস্‌নি, বাবা! না মোহিত, সে আমি নিতে পারব না। দেবতা আমার পানে চেয়ে আছে।"

মোহিতের মনে হইল—দিনের উজ্জ্বল আলো হইতে কে যেন তাহাকে টানিয়া দুঃসহ অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিল। কুম্ভীপাক নরকের যন্ত্রণার কথা সে গল্পে শুনিয়াছিল, আজ যেন তাহা সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অনুভব করিল। পায়ের নীচে পৃথিবী বোধ হইল অকস্মাৎ দুলিতেছে।

* * *

মোহিত আর সহিতে পারিতেছিল না। গর্ভধারিণীর শেষ কৃত্যটুকু সে করিল না। চারিদিকে একটা ভয়ানক বিস্ময় উঠিল। কারণ জানিতে অনেকেই চাহিল, কিন্তু উত্তর না পাইয়া নিজেরাই তাহা দিল। কহিল,—তিনি যেমন শুচিবায়ুগ্রস্তা ছিলেন, নিষ্ঠাময়ী ছিলেন, এ একরকম ভালই হ'ল। মোহিত ত বে-থা করেনি। ভেতরের কথা কে জানে। হয় ত কিছু গোলযোগ আছে।

ভাল-মন্দ কোন উত্তরই মোহিত দিল না। সংশয়নিষ্পত্তি, নিন্দা, প্রশংসা কোনটাই আজ মনকে স্পর্শ করিতে পারিতেছিল না। শুধু একটা ভয়ানক ধিকার ঝড়ো হাওয়ার মত বুকের মাঝে হাহা করিতেছিল। মানুষ অনেক আশা লইয়াই পুত্রের কামনা করে। বিস্তর দুঃখ সহিয়া, অনেক কষ্টে তাহাকে বড় করে, মানুষ করে। ইহকালের সুখ, পরকালের শান্তি সবই সে সন্তানের নিকট হইতেই গ্রহণ করে। কিন্তু মোহিতের মা ?

রাবণের চিতা নিভে না। মোহিত ভাবিত, তাহা মিথ্যা নহে। একান্ত উপলব্ধির মাঝ হইতেই এ ভক্তির উদ্ভব ঘটিয়াছে। অনুতাপের তীব্র জ্বালা, অনুশোচনার মর্ম্মদাহ, গ্লানিই অনির্ব্বাণ চিতাগ্নি। মানুষের সমস্ত সুখ-শান্তি-কল্যাণকে নিঃশব্দে সে পোড়াইতে থাকে। ইহার দাহিকা শক্তি মৃত্যু ভিন্ন নির্ব্বাপিত হয় না।

দুনিয়ার উপর মোহিতের যেন বিরক্তি ধরিয়া গেল। এই যে মানুষে মানুষে অনুক্ষণ কাড়াকাড়ি মারামারি, এই জগৎ-জোড়া বিদ্বেষ-জ্বালা কিসের জন্য ? কি সার্থকতা ইহার মাঝে নিহিত আছে ? শান্তির বিন্দুকণাও কি এ কোন দিন দিতে পারিবে ?

কালকূট-বিষের মত এই বিষয়-জ্বালা বুকে পূরিয়া এক দিন মোহিত মাতুলানীকে জব্দ করিতে গিয়াছিল—প্রতিশোধ লইতে গিয়াছিল। আপনার অন্তরের বার্ত্তা সে জানে। সর্ব্বস্ব হইতে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায় তাহার ছিল না। ইচ্ছা ছিল, নীলিমাকে সে বুঝাইয়া দিবে, তাহার করুণার উপর নীলিমা নির্ভর করিতেছে। হায় রে ভবিষ্যৎ! বুকে যে এত ক্ষুধা, কে জানিত ? শত্রুপক্ষকে পরাজিত করার অর্থ যে নিজের ধ্বংসকে উজ্জীবিত করা, কে তখন এ চিন্তা করিয়াছিল ? আশার সর্ব্বনাশা মোহে সে যে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

মোহিত অনুক্ষণ ভাবিত, এই দুষ্ট কর্ম্মের প্রেরণা কোথা হইতে সে পাইয়াছিল ? যাহার চিন্তা অবধি সে কখন করে নাই, অকস্মাৎ সে কেমন করিয়া সৃষ্টি লাভ করিল ? এ কি তবে তাই ? পাঁচ জনে যাহা বলে, তাহাই কি ? না,

না, মোহিত ঊর্দ্ধতনদের বিচার করিয়া আর একটা নূতনতর অপরাধের সৃষ্টি করিতে চাহে না। কিন্তু মানুষ সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়া যে চিন্তাটাকে পরিত্যাগ করিতে চাহে, সেইটাই যেন বেশী করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়।

অনুতপ্ত মোহিতের কেবলই মনে হইত, পরকে ফাঁকি দিবার এই একান্ত স্পৃহা সংক্রামক ব্যাধির মত যথার্থই কি সে পিতৃপিতামহের নিকট হইতে পাইয়াছে? মাতুল দুঃখ করিয়া বলিতেন, "তোর বাপের বিদ্যা-বুদ্ধির অভাব ছিল না; কিন্তু জুচ্চুরী বুদ্ধিটাকে—" মোহিত কথাটা শেষ হইতে দিত না, সরিয়া যাইত।

এমনই হয়। জীবনের তৌল-দাড়ি হাতে করিয়া যে কালপুরুষ অনুক্ষণ বসিয়া আছেন, এক দিকে এতটুকু ঝুঁকি তিনি সহিতে পারেন না। তীব্র উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া এক দিন মানব যে মনোবৃত্তি সফল করিতে পাল্লার এক দিক ভারী করিয়া তোলে, তাহারই সমতা করিতে যাহা দেন, সে দিকে চাহিয়া হৃদয় যত অস্থিরই হউক, ভগবানের দেওয়া এ প্রতিশোধকে ব্যর্থ করা মানুষের সাধ্যাতীত।

পরস্বাপহারী! তস্কর! মা তাহাকে এই চোখে নিরীক্ষণ করিতেন, এই চিন্তাটাই মোহিতকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিত। মহাদেবের ত্রিশূলের মতই এই ব্যথা একান্ত ধর্ম্মপরায়ণা জননীর সেই স্নেহভরা বুকে বিদ্ধ হইয়াছিল। তাই তিনি বিশ্বনাথের চরণতলে পড়িয়াছিলেন,—বুঝি বেদনার এতটুকু উপশম-ভিক্ষায়।

থাকিয়া থাকিয়া মোহিতের মনে হইত, তবে কি সে মাতৃহন্তা? না—না, এ অসহ্য চিন্তা সে আর সহ্য করিতে পারে না। সে কি পাগল হইয়া যাইবে?

বিদ্যুৎবিকাশের মত মোহিতের মনে হইল,—সে কোন উপায়ে হউক, এই অভিশপ্ত জীবনের বোঝাটা এ জন্মের মত নামাইয়া ফেলিতে হইবে।

ব্যবসার হিসাব-নিকাশ হইতেছিল। দেখা গেল, এ বৎসর উপার্জ্জন সব বৎসর অপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু এ অর্থে তাহার কি হইবে? মা তাহার দাতব্য চিকিৎসালয়ে মারা গিয়াছেন!

মোহিত উইল লিখিল,—তাহার সমুদয় সম্পত্তি অসহায়, পিতৃমাতৃহীন, অনাথ ছাত্রছাত্রীদের জন্য।

এইবার নিষ্কৃতি! মুক্তি! সমাপ্তি! না, আর না। নিজেকে আর বিশ্বাস নাই। দুষ্ট রোগের জীবাণুর মত অর্থলিপ্সার পোকা তাহার মস্তিষ্কে আবার যদি পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে! না, না, দুনিয়াতে আর তাহার থাকা কোনমতেই চলিতে পারে না।

উৎকট বিষ যোগাড় করিতে মোহিতকে এতটুকু বেগ পাইতে হইল না। কিছুদিন হইল, একটা ডাক্তারখানার সে স্বত্বাধিকারী হইয়াছিল।

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।

শরতে

কাশের চামর কে দিল লুটায়ে মাঠের' পরে?
কেয়ার গন্ধ আনিয়া দিল কে বাতাস ভ'রে।"
শেফালী কাহার আশার চাহনি চাহিয়া লুটে?
বেলা মল্লিকা পুলকে এমন উঠিল ফুটে?

দোদুল দোলায় চম্পক দোলে গাছের শিরে,
স্থলপদ্মের পুষ্পরাশিতে কানন ঘিরে?
দীঘীর জলেতে লোহিত কমল উঠিছে ফুটি।
বাতাস তাহার গন্ধ লইয়া বেড়ায় ছুটি?

চারিদিকে কার পড়িছে ঝরিয়া উজল হাসি?
আকাশে বাতাসে রণিয়া উঠিছে কিসের বাঁশী?
ধরণী সুচারু সজ্জিতা আজ তুষিতে কারে,
দূর্ব্বাদলে কে সাজালো শিশির-মুকুতা-হারে?

কার তরে আমি সাজাই যতনে কুটীর-দ্বার?
এ দীন কুটীরে পড়িবে কি রাঙা চরণ মার?

শ্রীমতী অনিলবালা দেবী।



সুদেবদা

এক

আমরা একসঙ্গে মেডিক্যাল কলেজে পড়িতাম। সুহাস আমার অকৃত্রিম বন্ধু ছিল,—বোধ হয়, তাহাকে সহোদরের অপেক্ষাও বেশী ভালবাসিতাম। মড়াকাটা ঘরেই আমাদের প্রথম পরিচয়; সেই পরিচয় ক্রমে এমন সৌহার্দ্দ্যে পরিণত হইল যে, রোজ অন্ততঃ ঘণ্টা চারেক একসঙ্গে না কাটাইলে মনে হইত যেন দিনটা বাজেই গেল।

আমি ছাত্রাবাসেই থাকিতাম; কিন্তু প্রত্যহ বৈকালে তাহার সঙ্গে তাহাদের বাড়ীতে বসিয়া দুই এক বাটি চা না খাইলে কিছুতেই তৃপ্তি হইত না। চায়ের নেশা ঠিক কতটা ছিল, বলিতে পারি না; তবে বন্ধুত্বের নেশাটা যে আমাকে একবারেই পাইয়া বসিয়াছিল, তাহা তখন না বুঝিলেও এখন খুব স্পষ্টই অনুভব করি। অবিবাহিত জীবনে বোধ করি বন্ধুর নেশা এমনই উদ্দাম —এমনই তীব্র হয়।

* * * * * *

"সুহাস !"

"দাদা বাড়ী নেই।"

জানালার ফাঁকে একখানি কালো অথচ মিষ্ট মুখ, এক জোড়া কালো ডাগর চোখ ভাসিয়া উঠিল।

গায়ে তখনও মড়ার গন্ধ ভর-ভর করিতেছে।

"আচ্ছা, আমি সন্ধ্যের পর আস্‌বো'খন"—বলিয়া ফিরিতেই শুনিলাম, সে বলিতেছে, "না না, যাবেন না, দাদা এখনই আস্‌বেন। আপনি বৈঠকখানায় বসুন।"

হঠাৎ কেন জানি না, গতিরোধ হইয়া গেল।

ফিরিয়া দেখি, দরজার অর্গলটি খুলিয়া গেল এবং ঠিক তাহার আড়ালে মাধুরী দাঁড়াইয়া আছে। কালো রংএর মধ্যেও মুখখানি যে এমন উজ্জ্বল, পূর্ব্বে কখনও তাহা লক্ষ্য করি নাই। চোখে চোখ পড়িতেই সে মাথা নীচু করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

অগত্যা বৈঠকখানায় গিয়া বসিলাম ও একখানি খবরের কাগজ টানিয়া পড়িতে লাগিলাম।

প্রায় দশ মিনিট কাটিয়া গেল। কাগজ পড়া শেষ হইল। কিন্তু একাকী বড়ই বিশ্রী বোধ হইতেছিল।

কতকটা সুহাসের উপর রাগ হইতেছিল, কিন্তু সহসা একটা চিন্তার নূতন সূত্র মনকে কেমন এক নূতন ভাবধারায় নিবিষ্ট করিয়া ফেলিল।

মাধুরীর বয়স কত? তেরো কি চৌদ্দ হইবে। মেয়েটি কালো। কালো না হইয়া যদি সে ফর্সা হইত, তবে বোধ হয়, সে সুন্দরীই হইত। সে যাক্! তাহাকে লেখাপড়া শেখায় না কেন? রূপ না থাকিলেও গুণের কদর নিশ্চয়ই আছে। আসুক সুহাস, তাহাকে আজ নিশ্চয়ই বলিব। বর্ত্তমান যুগে—বিশেষতঃ নারীপ্রগতি যখন এমন দ্রুততালে এদেশে অগ্রসর হইতেছে, তখন সে কেন তাহার ভগিনীকে লেখাপড়া শিখাইতেছে না—কেন তাহাকে রীতিমত স্কুলে পাঠাইয়া ইংরেজী, বাঙ্গালা, সঙ্গীত, শিল্পকার্য্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতেছে না? ইহা তাহার ঘোরতর অন্যায়—

"সুদেবদা,—চা!"

চমকিয়া উঠিলাম। ঠিক আমার পশ্চাতেই মাধুরী—এক হাতে এক বাটি চা—আর এক হাতে একখানি রেকাবে কয়েকখানি গরম নিম্‌কি।

"এ কি! এর ভেতর খাবার তৈরী কল্লে কি ক'রে, মাধু?"

"দাদা ব'লে গেছেন—তোর সুদেবদাকে রোজই শুধু চা খেতে দিস্—"

মৃদুহাস্যে বালিকার মুখখানি যেন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। গরম কড়ায় নিম্‌কি ভাজিয়া তাহার সমস্ত মুখখানিতে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়া রহিয়াছে।

চায়ের বাটিটি হাত হইতে নিজের হাতে লইলাম। নিম্‌কির রেকাবখানি টেবলের উপর রাখিয়া মাধুরী মৃদুকণ্ঠে বলিল,—"একখানিও ফেললে চল্‌বে না, সুদেবদা!"

"এই যে সুহাস, কোথায় গেছলি?"

ঘরে ঢুকিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে সুহাস বলিল, "শুনলাম, বৌবাজারে হরিদ্বার থেকে কে এক জন সাধু এসেছেন,—তিনি না কি হাঁপানির জন্যে হালুয়া বিলোচ্ছেন—তাই মার জন্যে—"

"হাঁ, তিনি কেমন আছেন? অনেক দিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি।"

"বিশেষ ভাল নেই, ভাই। আজ কদিন থেকে এমন টান আরম্ভ হয়েছে যে, মায়ের মুখের দিকে আর চাওয়া যায় না"—বলিতে বলিতে সুহাসের চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল।

"হালুয়া পেলি?"

"না ভাই! সবই অদৃষ্ট। সাধু আজ দেড়টার গাড়ীতে কাশী চ'লে গেছেন।"

দুই

"না মাসীমা, তা হতেই পারে না।"

সুহাসের মাতাকে আমি মাসীমা বলিয়াই ডাকিতাম।

"আজকালকার দিনে যে মাধু এমন মূর্খ হয়ে থাক্‌বে, তা হ'তেই পারে না।"

ক্ষীণকণ্ঠে সুহাসিনী বলিলেন,—"কি কর্‌ব, বাবা। তুমি ত দেখছ সব। আমার এই শরীর, তার উপর মেয়েকে স্কুলে পড়ানো

একটা মস্ত খরচ। সামান্য যা পুঁজিপাটা আছে, তাই দিয়ে সংসার চালিয়ে নিচ্ছি—ভরসা শুধু এক সুহাস—কবে ডাক্তার হয়ে বেরোবে, তাই।"

দৃঢ়কণ্ঠে বলিলাম,—"সে এক রকম ক'রে হবে, মাসীমা; আপনারা না পারেন, আমি বাবার কাছ থেকে পড়ার খরচ বাবদ যা পাই, নিজে একটু কষ্ট ক'রে থেকে মাধুর পড়ার খরচ চালাবো।"

"কেন তুমি কষ্ট করবে, বাবা? তা ছাড়া জানই ত আমাদের বামুনের ঘর, এই তেরো চৌদ্দ বছর বয়স হ'লো আমার অসহায় বিধবা পেয়ে এর ভেতরই সবাই বলছে, ওর বিয়ের বয়েস হয়েছে; আমার তাই এরই মধ্যে পাত্রও খুঁজতে হ'চ্ছে।"

"না মাসীমা, আমি আপনার কোন কথা শুনবো না, আমি কালই মাধুকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে ব্রাহ্মবালিকা-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি ক'রে দিয়ে আসব। আর অন্ততঃ ম্যাট্রিক পাশ না করা পর্যন্ত আপনি কিছুতেই মাধুর বিয়ে দিতে পারবেন না, ব'লে দিচ্ছি।"

তর্কের শক্তি ভগবান আমার এত অধিক মাত্রায় দিয়াছেন যে, প্রৌঢ়ার প্রবল যুক্তিজাল মুহূর্ত্তে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। সজোরে মাথা নাড়িয়া মাধুরীকে বলিলাম, "মাধু, তোমার এ বিষয়ে মত আছে ত', কালই তোমায় আমি স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দেব।"

স্মিতহাস্যে মাধু মাথা নীচু করিল।

* * * * * *

সুহাসদের বাড়ীটি যেন ক্রমেই আমার নিকট একটি পরম আনন্দধাম হইয়া উঠিল। ছাত্রাবাসে শুধু নামে মাত্র থাকা। পড়াশুনা, এমন কি, প্রায় দিনই খাওয়া-দাওয়া অবধি সেখানেই চলে। মাধুরীর উপর এমনই একটা স্নেহের টান দিনের পর দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল যে, আমার মনের প্রায় সব যায়গাটুকুই সে ধীরে ধীরে জুড়িয়া বসিল।

তাহার পড়াশুনা, গান-বাজনা, কাপড়-চোপড়, শরীরের ভাল-মন্দ সবের উপরই প্রখর দৃষ্টি রাখা আমার যেন এক রকম অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইল। প্রথমে যে সঙ্কোচ আমাকে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ভাল করিয়া কথা পর্য্যন্ত কহিতে বাধা দিত, সে সঙ্কোচ ক্রমে কোথায় ভাসিয়া গেল। মাধু এত মনোযোগ দিয়া পড়াশুনা করিত যে, সে ক্লাশে প্রতি বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিতে লাগিল। বেশ মনে পড়ে, একবার সে অঙ্কে কম নম্বর পাইয়াছিল। শুনিয়া রাগে আমি তাহার মা ও দাদার সাক্ষাতেই তাহার চুলের মুঠো ধরিয়া গালাগালি দিয়াছিলাম।

* * * * *

ঠিক এমনই সময় এক দিন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল। হাসপাতালে একটি কঠিন পীড়াগ্রস্ত রোগীর সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছি, এমন সময় সুহাসের চাকর দৌড়িয়া আসিয়া আমার হাতে এক টুকরা কাগজ দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গেল। কাগজখানি খুলিতেই দেখিলাম, লেখা আছে,—

"সুদেবদা, শীঘ্র এসো, মা বোধ হয়—চললেন।

—সুহাস"

দ্রুতগতিতে হাউস সার্জ্জনের গৃহে গিয়া তাঁহার নিকট হইতে ছুটী লইলাম এবং প্রাণপণ শক্তিতে সুহাসের বাড়ীর দিকে ছুটিলাম।

ধীরপদক্ষেপে মাসীমার ঘরে প্রবেশ করিয়াই নিশ্চল পাথরের ন্যায় তাঁহার পার্শ্বেই বসিয়া পড়িলাম। মাসীমার হাতে আমার হাত রাখিতেই মাসীমা আমার হাতখানি কোলের উপর টানিয়া লইলেন আর অন্য হাতে মাধুরীর হাতখানি আমার হাতের উপর রাখিয়া নিমীলিত নেত্র-প্রান্ত হইতে ঝর-ঝর করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন।

সর্ব্বাঙ্গে তড়িৎ খেলিয়া গেল। মাধুকে স্নেহ করিয়াছি, ভালবাসিয়াছি, শাসন করিয়াছি, কিন্তু কল্পনায়ও তাহার হাতখানি ত' আমার হাতে লই নাই। কি সর্ব্বনাশ! এ কি হইল?

"মাসীমা"—বলিয়া ফিরিয়া চাহিতেই দেখিলাম, তাঁহার নিষ্প্রভ নয়নকোণে শুধু এক বিন্দু তপ্ত অশ্রু জমিয়া রহিয়াছে।

তিন

অসংখ্য প্রশ্নবাণে মস্তিষ্ক আমার ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল। কি অপরাধ আমি করিয়াছি?

মাধুরীকে আমি স্নেহ করি, ভালবাসি, আমার সহোদরাকেও বোধ হয় আমি তত ভালবাসি না। তাহার উন্নতির জন্যই আমি তাহার শিক্ষাভার এত কাল স্বয়ং বহন করিয়া আসিয়াছি এবং সে যত দিন পড়াশুনা করিবে, তত দিন এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিব।

কিন্তু মাসীমা আমায় এ কি বিপাকে ফেলিয়া গেলেন! তাঁহার এই ইঙ্গিতের অর্থ কি আমি মাধুরীকে বিবাহ করি? ছি, ছি, আমি যে চিরকাল তাহাকে সহোদরার ন্যায় স্নেহ করিয়াছি—সেও আমায় দাদার ন্যায় ভক্তি করে, ভালবাসে।

সে কালো বলিয়া আমি যে তাহাকে কখন মনে মনেও ঘৃণা করিয়াছি, এরূপ মনে পড়ে না, বরং তাহার শান্ত মুখশ্রী আমার বেশ ভালই লাগিত। যাহাতে তাহার এই কালো রং তাহার জীবন-পথে অন্তরায় না হয়, তাই আমি তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে অগ্রণী হইয়াছিলাম। তাহার এই পুরস্কার?

দারুণ বিক্ষোভে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছিল।

পিতামাতার দৃষ্টিতে আমি কত হীন হইয়া পড়িব? তাঁহারা নিশ্চয়ই মনে করিবেন, প্রেমমুগ্ধ হইয়াই আমি এত দিন এই বালিকার শিক্ষায় এত উৎসুক্য দেখাইয়াছি স্ত্রীনির্ব্বাচনে আমি তাঁহাদের একটা অনুমতিও লইলাম না।

কিন্তু আমার অপরাধ কোথায়?

বস্তুতঃ মাধুরীকে আমি কখনই আমার জীবন-সঙ্গিনী করিব বলিয়া ভাবি নাই। অলক্ষ্যেও যে তাহার উপর আমার সে রকম কোন আকর্ষণ ছিল, এমনও ত' মনে হয় না। তবে কেন এমন হইল?

স্বর্গগতা মাসীমার কাছে আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, তিনি মৃত্যুকালে আমার ললাটে এমন মর্ম্মান্তিক অভিশাপ আঁকিয়া দিলেন?

মনস্তাপের তীব্র দাবানলে মন-প্রাণ পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছিল।

ছাত্রাবাসের শয়নকক্ষে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় শূন্য আকাশের দিকে নির্নিমেষ-নেত্রে চাহিয়া শুধু এই কথাই ভাবিতেছিলাম। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার যবনিকা টানিয়া দিয়া ক্ষীণ চন্দ্রালোক আকাশের গায়ে স্বর্ণরেখা অঙ্কিত করিতেছিল। স্থিরনেত্রে সেই গরিমাময় দৃশ্যের দিকে চাহিয়া চাহিয়া নয়ন মুদিয়া আসিতেছিল।

এমন সময় সুহাসের চাকরটি গৃহে প্রবেশ করিল। পায়ের শব্দেই তন্দ্রা কাটিয়া গেল।

"বাবু একখানা চিঠি দিয়েছেন"—বলিয়া সে একখানি সাদা খাম আমার হাতে দিয়া চলিয়া গেল।

হস্তাক্ষর চিনিতে বিলম্ব হইল না।

সুহাসের ঐ এক রোগ। জরুরী কোনও কথা হইলেই সে চিঠি লিখিয়া জানাইত। কিছুতেই মুখোমুখি কোনও কথা বলিবে না।

চিঠিখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিলাম,—

"প্রিয় সুদেব,

মায়ের মৃত্যুর পর থেকে আর তুমি আমাদের এখানে তেমন আসছো না। আমি অনেক দিন থেকেই এটা লক্ষ্য করছি। কিন্তু এর যথাযথ কারণ বের করতে পারিনি। আজ মায়ের বাক্সে একখানা চিঠি পেলাম। চিঠিখানি প'ড়ে আর মায়ের মরণকালে মাধুর হাতখানি তোমার হাতের উপরে রাখার কথা স্মরণ ক'রে সবই বুঝলাম। মাধুকে যে তিনি তোমার হাতে সমর্পণ করবেন, তা আমি কল্পনায়ও ভাবিনি। তিনি আমায় এ কথা কোন দিনই বলেন নি। আমার বোধ হয়, আমাদের এখানে তোমার না আসিবার কারণও এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত। মনে হয়, এ সম্বন্ধে তোমার মনোভাব স্পষ্ট জানা দরকার। কবে তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হ'তে পারে, আমায় জানিও। আমি বাচনিক সব মীমাংসা ক'রে নিতে চাই।

শুনে সুখী হবে, মাধু এবারে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেছে। তোমার চেষ্টা সফল হয়েছে। ইতি

তোমারই সুহাস।"

চিঠিখানি বার দশেক পাঠ করিয়াও যখন শান্ত হইতে পারিলাম না, তখন অগত্যা জামাটি গায়ে দিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম।

চার

প্রায় চারি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

সুহাস ও আমি দুজনই ডাক্তার হইয়াছি। সে অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বের মাধুর্য্য কত ম্লান হইয়া গিয়াছে। যথাসম্ভব সুহাসকে এড়াইয়া চলিতেই শিখিয়াছি।

ভগিনীর বিবাহের প্রস্তাব লইয়া যে দিন সে শেষবার আমাকে বুঝাইতে আসিয়াছিল, সে দিন তাহাকে কি না অপমান করিয়াছি। সেই অপমানের তীব্র কশাঘাতে ব্যথিত হইয়া আর্দ্র-নয়নে সে যখন আমার গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল, তখন আমার বুকের ভিতরটাও যে পুড়িয়া যাইতেছিল না, এমন নহে; কিন্তু নিজের অহমিকাপূর্ণ যুক্তি-তর্ক দিয়া সে আগুন বোধ হয় একেবারে নিভাইয়া দিয়াছিলাম।

শুধু একটা চিন্তাই আমার মনে বার বার দাগ কাটিয়া বসিতেছিল—

সুহাস আমার বন্ধু হইতে পারে, তাহার মাতাকে আমি মায়ের মত ভক্তি করিতাম, মাধুরীকে আমি ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করিয়াছি; কিন্তু আমি তাহাকে বিবাহ করিব কেন? তাহাদের সহিত মেলা-মেশা করিয়াছি বলিয়া আমার পিতা-মাতার অমতে আমি তাহাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে পারি না।

সুহাসের সঙ্গে মাঝে মাঝে যে দেখা না হয়, এমন নহে; কিন্তু অভিমান ও ক্ষুব্ধতা উভয়ের মধ্যে এমন দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলিয়াছিল যে, মাত্র সামান্য দুই একটি প্রীতি-নমস্কারেই এত কালের পরিচয় ধরা পড়িত। মাধুর কথা তাহাকে কোন দিনই জিজ্ঞাসা করি নাই।

* * * *

যক্ষ্মারোগের চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ হইবার উদ্দেশ্যে জার্ম্মাণীর 'মিউনিক' বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়াছি। উদ্দাম কর্ম্মস্রোতে নিজেকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া নিত্য নব নব চিকিৎসা-প্রণালী শিক্ষা করিতেছি।

পাশ্চাত্যের কর্ম্মকোলাহলপূর্ণ জীবনের আমি চিরকালই পক্ষপাতী। স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে বস্তুতান্ত্রিক যোগ্যতা ও কর্ম্ম-কুশলতা অর্জ্জনের জন্য ইহারা কি অসম্ভব পরিশ্রম করিতে পারে! তাহাদের দেখিলে মনে হয়, জগতে ঐহিক বলই বল, মানুষ ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, মানুষ ইচ্ছা করিলে স্বীয় অদম্য কর্ম্মশক্তির বলে বোধ হয় সংসারের সকল দুঃখই দূর করিতে পারে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, যক্ষ্মাজীবাণুর ইতিবৃত্ত অনুধাবন এবং তাহার ধ্বংসের নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য গবেষণাগারে কার্য্য করিতাম। আর কোন চিন্তাই মনে স্থান পাইত না। পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগিনী প্রভৃতি অতি আপনার সকলের কথাই ভুলিতে বসিলাম।

এইরূপে দুই বৎসর কাটিয়া গেল।

'মিউনিক' বিশ্ব বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি লাভ করিয়াছি, কিন্তু জ্ঞান-পিপাসা তখনও মিটে নাই। বিভিন্ন সংবাদ-পত্রের স্তম্ভে আমার বহু প্রশংসা বিঘোষিত হইতে লাগিল। বহু ভারতীয় সংবাদপত্রেও আমার অজস্র স্তুতিবাদ হইতেছিল। সকলেরই এক কথা—ভারতীয় ছাত্রগণের মধ্যে যক্ষ্মারোগে বিশেষজ্ঞ হইবার এরূপ সুযোগ আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই।

মনে মনে ভাবিলাম, জ্ঞানের শেষ নাই, এই কৃতিত্বে আত্মহারা হইলে চলিবে না,—আরও বহু বিষয় অধিগত করিতে হইবে।

এমনই সময় এক দিন সারা দিবসের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর গৃহে ফিরিয়াই দেখিলাম, টেবলের উপর একখানি ছোট পুস্তিকার পার্শেল পড়িয়া রহিয়াছে। পার্শেলটি ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছে।

ধীরে ধীরে পার্শেলটি খুলিলাম। একখানি ক্ষুদ্র দিন-লিপির বই ও তাহার সঙ্গে আর একখানি ক্ষুদ্র চিঠি।

সুহাস লিখিতেছে,—

* * * *

"মানবদেহের চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছ, কিন্তু মানবের এই বিরাট দেহের অন্তরালে যে একটা বিরাটতত্ব অন্তর ব'লে পদার্থ রয়েছে, তার কোনও নূতন চিকিৎসা য়ুরোপে আবিষ্কৃত হয়েছে কি না, বলতে পার কি?

"মাতৃহারা ভগিনী আমার আজ তিলে তিলে মরণ-পথের যাত্রী। তার উপর কোনও অনুকম্পা করতে তোমায় অনুরোধ করি না। আমি তার মনের সব অবস্থা কখনই বুঝতে পারি না।

"সে দিন তার বাক্সে এই দিনলিপির পুস্তকখানি পেয়েছি। অবসর হয় ত একবার প'ড়ে দেখ।

"আমার শুধু এইটুকুই বক্তব্য যে, তোমায় আমি অতি আপনার বন্ধু ভেবেই আমার ভগিনীর শিক্ষার ব্যাপারে তোমায় সাহায্য করতে দিয়েছিলাম, নইলে জোর করেও নয় বা আমাদের অভাবের জন্যও নয়।

"কে জানিত যে, তোমার অনুগ্রহই আজ আমাদের বুকে এমন মর্ম্মশেল হয়ে বিঁধবে।"

* * * * *

দিনলিপির বইখানি খুলিয়া একে একে পাতার পরে পাতা পড়িয়া যাইতে লাগিলাম,—

* * * * *

"সুদেবদাকে আমার গোড়া থেকেই ভাল লাগছে। বিশেষতঃ তাঁর সরল উচ্চ হাসি আমার কাণে বড়ই মিষ্টি বোধ হয়। কিন্তু আমি যে কালো—তায় আবার লেখাপড়া জানিনে।

* * * * *

"আজ থেকে স্কুলে যাচ্ছি। সুদেবদার বড্ড ইচ্ছে যে, আমি ম্যাট্রিক পাশ করি। আমি খুব মন দিয়ে পড়াশুনা করবো—নিশ্চয়ই ভালোভাবে ম্যাট্রিক পাশ করবো।

* * * * *

"মা আমায় কেন এমন বিপদে ফেলে গেলেন? সুদেবদাকে আমি সমস্ত মন দিয়ে ভালবেসেছি সত্যি, কিন্তু সে ত' আমার আকাশ-কুসুম, স্বপ্ন। মা আমার সেই নীরব প্রাণের ভাষাকে এমন নির্ম্মমভাবে ব্যক্ত ক'রে দিলেন কেন?

* * * * *

"সুদেবদা আমায় সত্যি সত্যিই প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু এখন ত' আর কাউকে ভালবাসতে পারবো না। এখন আমি কি করি? আমার মা আমায় সুদেবদার হাতে সঁপে দিয়েছিলেন ব'লেই সুদেবদা আমায় প্রত্যাখ্যান করলেন; কিন্তু সুদেবদার মা যদি আমার তাঁর হাতে সঁপে দিতেন, তবে তিনি কিছুতেই আমায় ফেলতে পারতেন না।"

* * * * *

পড়িতে পড়িতে কখন্ যে নিদ্রার কোলে হেলিয়া পড়িয়াছি, বুঝিতেই পারি নাই। সহসা ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিতেই জাগিয়া উঠিলাম।

নৈশ আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অগত্যা অভুক্ত অবস্থাতেই বিছানায় পড়িয়া রহিলাম।

পাঁচ

ঠিক দশ বৎসর পরের কথা।

বিপুল উৎসাহে কলিকাতায় ডাক্তারী করিতেছি। যক্ষার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলিয়া দেশবিদেশে খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দুহাতে পয়সা আয় করিতেছি, আবার দুহাতেই ব্যয় করিয়া যাইতেছি। সংসারে আপনার বলিতে কেহই নাই—কাহার অভাবও বোধ করি না। অবিশ্রান্ত কর্ম্মের উন্মাদনা ও অফুরন্ত অর্থাগম অন্তরকে সর্ব্বদাই ভরপুর করিয়া রাখিয়াছে।

সুহাস বা মাধুরীর কথা একবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া একবারমাত্র তাহাদের খোঁজ লইয়াছিলাম। শুনিয়াছিলাম, সুহাস বর্ম্মায় ডাক্তারী করিতে গিয়াছে আর মাধুরীর খবর কেহই বলিতে পারে না।

সেও অনেক দিনের কথা। তার পর উদ্দাম কর্ম্মস্রোতে গা ঢালিয়া দিবার পর কাহারও চিন্তা মনে এতটুকুও স্থান পায় নাই।

নিত্য নূতন বন্ধু-বান্ধবীর সৃষ্টি হইতেছে। স্বীয় কার্য্য ব্যতিরেকে যেটুকু সময় থাকে, তাহাদের মধ্যেই কোন রকমে কাটাইয়া দিই।

* * * * *

যাদবপুর যক্ষা-হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছি। কলিকাতা হইতে একটু দূরে; স্বীয় অসংখ্য কার্য্য ফেলিয়া প্রত্যহ এখানে আসিতে পারি না। মাত্র সপ্তাহে এক দিন এখানে আসি ও রোগীদের স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে সন্ধান লই। নিতান্তই হাতের নিকট কোনও রোগী আসিলে স্বহস্তে তাহার চিকিৎসা করিয়া থাকি। যে সকল রোগী আমাকে দিয়াই তাহাদের চিকিৎসা করাইবে বলিয়া নাছোড়বান্দা হইয়া উঠে, তাহাদের চিকিৎসা আমি যথাসম্ভব স্বহস্তেই করিয়া থাকি।

মেডিকাল অফিসার আসিয়া জানাইলেন যে, আজ তিনটি রোগীর বুকে আমাকে স্বহস্তে কৃত্রিম উপায়ে বায়ু প্রবেশ করাইতে হইবে। তাহারা আজ সাত দিন যাবৎ আমার জন্যই অপেক্ষা করিতেছে।

তাহাদিগকে অস্ত্রোপচার-গৃহে আনিবার আদেশ দিয়া স্বয়ং সাজ-সরঞ্জাম ঠিক করিতে ভিন্ন প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইলাম।

* * * * *

অস্ত্রোপচার-গৃহে চার পাঁচটি ডাক্তার রহিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন নার্স, কম্পাউণ্ডার প্রভৃতিও রহিয়াছেন।

বেড নং ১৩—মিস্ চাটার্জ্জিকে অপারেশন টেবলের উপর শায়িত করা হইয়াছে। তিনি ডানদিকে ফিরিয়া শুইয়া রহিয়াছেন। অস্থিচর্ম্মসার দেহখানিকে একখানি সাদা চাদর দিয়া ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে।

ধীরে ধীরে তাঁহার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলাম—ডান পাশের পঞ্জরগুলিকে অনাবৃত করিয়া পর পর গুণিয়া যাইতে লাগিলাম। তার পর একটি উপযুক্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া আয়োডিন প্রভৃতি লাগাইবার পর একটি তীক্ষ্ণ শলাকা বুকের ভিতর ঢুকাইয়া দিলাম।

মহিলাটি একবারমাত্র "উঃ" করিয়া উঠিল; তার পরই ডান হাত দিয়া আমার হাতখানি চাপিয়া ধরিল।

"কে?"

"সুদেবদা! তোমার ঐ তীক্ষ্ণ শলাকা আরও একটু জোরে বুকের ভেতর বসিয়ে দাও, যেন ঠিক আমার বুকের মাঝখানিটিতে পৌঁছে যায়। আজ শেষদিনে এই আমার ভিক্ষা।"

উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিলাম,—"কে তুমি?"

একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, সকলের মুখেই এক দারুণ উদ্বিগ্নতা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"কেউ নই, সুদেবদা! তোমার হাসপাতালের ১৩ নং বেডের এক জন যক্ষারোগিণী।"

ক্ষিপ্রহস্তে তাহার মুখের কাপড় সরাইয়া খানিকক্ষণ মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

"কি, চিন্‌তে পাচ্ছ না, সুদেবদা ! কেমন ক'রে পারবে বল ?"

বিশীর্ণ অধরপ্রান্তে একটু ম্লান হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। শলাকাটি বাহির করিয়া লইলাম।

মস্তক আনত করিয়া মহিলাটির সেই মৃত্যুমলিন মুখখানিকে খুঁটিনাটি করিয়া দেখিতে লাগিলাম।

একটা অস্পষ্ট অথচ অতি সত্য পরিচয়ের প্রবল হিল্লোল আমার অন্তরকে ক্রমেই আলোড়িত করিয়া তুলিল। বুকের ভিতরে কে যেন সজোরে বার বার আঘাত করিতেছিল।

"এখনও চিন্‌তে পার্‌লে না, সুদেবদা ?"

"কে ?—মা—"

"তা হ'লে চিন্‌তে পেরেছ ?"

অভাগিনীর কম্পিত শীর্ণ বাহুযুগল ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইল।

মাথা ঝি-ঝি করিয়া ঘুরিতে লাগিল। পার্শ্বে, পশ্চাতে চাহিয়া দেখি, গৃহে একটি লোকও নাই।

"সুদেবদা, তোমার ঐ শলাকাটি আমার বুকের এই ঠিক মাঝখানটিতে বসিয়ে দাও—এ যে বহুদিনের যন্ত্রণা—রক্ত চাপ হয়ে জ'মে আছে—তোমার তীব্র আঘাতে সব যন্ত্রণার শেষ হয়ে যাক।"

মহিলার নয়ন-যুগল হইতে উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে অশ্রু বর্ষিত হইতেছিল।

কাণ্ডজ্ঞানহীনের ন্যায় তাহার মুখখানি বুকের উপর টানিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলাম,—"মাধু, আমায় ক্ষমা কর।"

আনন্দের আতিশয্যে মহিলার সর্ব্বাঙ্গ থর-থর কাঁপিয়া উঠিল। বিপুল আগ্রহে সে টেবলের উপর বসিবার চেষ্টা করিতেই একটা ভীষণ দমকা কাসির সঙ্গে এক চাপ রক্ত মুখ বাহিয়া আমার জামার উপর আসিয়া পড়িল।

মৃদুকণ্ঠে সে বলিল,—"এই রক্তের প্রতি কণায় কি লেখা রয়েছে জান, সুদেবদা ?"

জানি, জানি, তাহার প্রাণঢালা অকৃত্রিম ভালবাসার প্রতি আমার নির্ম্মম, নিষ্ঠুর পরিহাস !

ক্ষীণ-কণ্ঠে সে বলিল, "সুদেবদা, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আবার আমার মাথায় একটু হাত দাও।"

মাথায় হাত রাখিয়া সজোরে চীৎকার করিলাম,—"নার্স !" দ্রুতবেগে নার্স প্রবেশ করিতেই বলিলাম,—"শীঘ্র এক টুক্‌রা বরফ নিয়ে এস—আর—আর ..."

"সুদেবদা—আসি তা হ'লে—"

মহিলার দৃষ্টি স্থির হইয়া আসিল। তাহার বক্ষোদেশ মুহূর্ত্তের জন্য দ্রুততালে নৃত্য করিয়া একবারে নিশ্চল নিস্পন্দ হইয়া গেল।

"মাধু—মাধু, আমি তোমায়—"

অস্ফুটকণ্ঠে শুধু একবার উচ্চারিত হইল,—"সু—দে—ব—দা !"

* • * •

নিঃসঙ্গ জীবনের সায়াহ্নে আজ যশ, অর্থ, কৃতিত্ব প্রভৃতি সংসারের সকল আকর্ষণই স্বেচ্ছায় ধ্বংস করিয়াছি—মাধুরীর নামে বিরাট যক্ষ্মা-হাসপাতাল নির্ম্মাণ করিয়াও অন্তরের তীব্র দহনজ্বালা প্রশমিত হইল না।

মাধুর সেই শেষ আহ্বান, "সুদেবদা" যেন আজিও আমার কর্ণে প্রতিনিয়ত ঝঙ্কৃত হইতেছে। আমার চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত হইলেও তাহা শুনিতে পাইব কি না, কে জানে ?

শ্রীসুধাংশুকুমার রায় চৌধুরী।

আগমনী

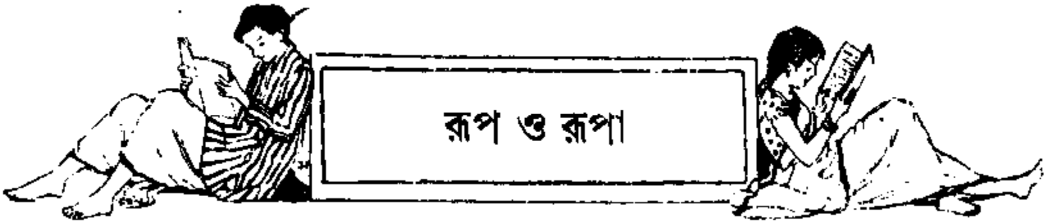
শুভ্র মেঘের কেশর-শোভিত-সিংহবাহিনী জননী,
দ্যুলোকের দেবী, এসেছেন নামি' ভূলোকে।
নির্মেঘ নভে কনক-কিরণ, হাসিতেছে যেন অবনী—
বাদল-বেদন-মুক্ত, অধীর পুলকে।

অতসী-পুষ্পে বরণ মাতার, চরণ রক্তকমলে;
অপরাজিতা ও নীলাব্জ-নীল অঞ্জনে—
স্নিগ্ধ নয়ন বিরাজে মাতার ;—করুণা-শিশির উছলে ;
নাচে খঞ্জন মৃদু-তরঙ্গ-শিঞ্জনে।

ঝরা শেফালিকা, শ্যামল দূর্ব্বা করিছে অর্ঘ্য-রচনা ;
ঢুলিছে চামর শত শ্বেত কাশ-কুসুমে।
সরোবরে সুখে মেলিছে নয়ন কুমুদী মুদিত-লোচনা ;
মাতারে প্রকৃতি পূজে প্রস্ফুট প্রসূনে।

নবীন ধান্য-মঞ্জরী আজি রচে নৈবেদ্য-থালিকা ;
জলহারা মেঘ শঙ্খ ফুকারে গগনে।
নভে বলাকার শুভ্রবিহীন দুলিছে তোরণ-মালিকা ;
জননী জগতে এসেছে শারদ লগনে॥

শ্রীযতীন্দ্র সেনগুপ্ত।



রূপ ও রূপা

(গল্প)

মিষ্টার নির্ম্মল ব্যানার্জ্জী সি-আই-ই কলিকাতার বিখ্যাত এঞ্জিনীয়ার। আচারে-বিচারে, কথায়-কায়দায় ভীষণ সাহেব। দয়া করিয়া যেন বাঙ্গালা বলেন। ছেলে-মেয়েরা বাড়ীতে হয় ইংরেজী নয় হিন্দী বলে, ক্যাষ্টি বাঙ্গালা ভাষার সেখানে প্রবেশাধিকার নাই বলিলেই হয়।

সরকারী কর্ম্মচারী হিসাবে বিশেষ নাম করিয়া মিষ্টার ব্যানার্জ্জী আপাততঃ "রিটায়ার্ড লাইফ্‌" যাপন করিতেছেন, "লীড্‌" করিতেছেন বলিলেই ভাল হয়। তাঁহার গাম্ভীর্য্যে মুখ তুলিয়া কথা বলিতে লোকের সাহস হয় না।

এ-হেন ব্যানার্জ্জী সাহেব স্ত্রীর কাছে যেন চোরটি, ছেলেরা জুজুকেও যেন তার চেয়ে কম ভয় করে।

সে দিন টি-পার্টিতে মিসেস মজুমদার জিজ্ঞাসা করিলেন—"চায়ে আপনি ক চামচ চিনি খান, মিষ্টার ব্যানার্জ্জী।"

অসহায়ের মত এদিক ওদিক চাহিয়া ব্যানার্জ্জী বলিলেন, "আমি ত জানিনে, উনি করেন।"

মিসেস্‌ ব্যানার্জ্জী কাছেই ছিলেন, বলিলেন, "চার চামচে।"

হাসিয়া মিসেস্‌ মজুমদার বলিলেন, "কি অসহায়! সব যায়গায় চায়ের সময় হয় ত মিসেস্‌ ব্যানার্জ্জী উপস্থিত না-ও থাকতে পারেন!"

ব্যানার্জ্জী বলিলেন, "উনি বরাবরই করেন, আমি ত জানিনে, জানবার চেষ্টাও করিনে—"

বাধা দিয়া মিসেস্‌ মজুমদার বলিলেন, "থাক্‌, আর কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। বুঝেছি।"

তবুও ব্যানার্জ্জী বলিতে লাগিলেন—"কিন্তু চার চামচ বড্ড বেশী, অতটা না দিলেই যেন—"

মিসেস্‌ ব্যানার্জ্জী বলিলেন, "আমি নিজে যে ছ চামচ খাই, চার চামচ আর এত কি বেশী?"

সাহেব চুপ করিলেন।

কেহ সাহায্য চাহিতে আসিয়াছে, পাঁচটা টাকা দিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন; কিন্তু টাকা গৃহিণীর ভাণ্ডারে। গিয়া বলিলেন, "আমি কথা দিয়েছি, পাঁচটা টাকা ওকে দেব, গরীব বেচারী খেতে পাচ্ছে না—"

মিসেস্‌ তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "পাঁচ টাকা হবে না, একটা টাকা দাও—"

গরীব বেচারাকে তাহাই লইতে হইল, মুখের কথা কর্ত্তার মুখেই রহিয়া গেল।

এই ভাবে আহারে-বিহারে চলনে-বলনে মিসেস্‌ ব্যানার্জ্জী, সাহেবকে যে দিকে ঘুরাইবেন, তাঁহার সে দিকে ঘোরা ছাড়া উপায় নাই।

অথচ মিসেস্‌ ব্যানার্জ্জীর মত কালো এবং শ্রীহীনা মেয়ে সারা বাঙ্গালা দেশে খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত, এমনই বিসদৃশ—এমনই কদাকার!

সেই স্ত্রীকে এমন প্রাণ ভরিয়া ভালবাসা, এমন সর্ব্ব-দেহ-মন সমর্পণ, এমন সর্ব্বস্বদান—সাধারণের চোখে যেন কেমন মনে হয়। এ ত' প্রেম নয়, ভক্তি; এ ত' প্রীতি নয়, ভক্তবৎসলের নিবিড় অনুরাগের মত।

তিনি আবার ঐ চেহারা লইয়া 'মেমসাব' হইতে চান, 'মাইজী' বলিয়া ডাকিলে ভৃত্য বরখাস্ত হয়! দশহাজার টাকা দামের হীরার নেক্‌লেস্‌ তাঁহার কণ্ঠশোভা, দু-হাজার টাকা দামের বেনারসী স্কার্টের মত করিয়া তিনি পরেন। কারবার্টসন হার্পারের একশো টাকার হিলওয়ালা জুতা তাঁহার পাদুকা।

সেবার অন্ত নাই, ভোগেরও সীমা নাই, তবু সাহেবের মনে হয়, কিছুই হইতেছে না!

লোকে মনে করে আদিখ্যেতার আধিক্য। কিন্তু তাহারা পূর্ব্বকথা জানে না।

ব্যানার্জ্জী সাহেব যৌবনে যখন শুধু নির্ম্মল—তখনকার দিনে ফিরিয়া যাই।

নির্ম্মলের চেহারাটা রাজপুত্রের মত, যেমনই গায়ের রং, তেমনই গঠন, তেমনই মুখ-চোখ। জন্মতে জন্ম, ছেলেবেলাটা কাটিয়াছে মারী, ডালহাউসি, রাণীখেত, নাইনিতালে। বাপ মিলিটারী লাইনে কায করিয়া পয়সা জমাইয়াছেন বিস্তর, ছেলে এঞ্জিনীয়ারিং পড়িয়াছে রুড়কীতে, সরকারী ভাল চাকরীও পাইয়াছে। রূপে গুণে এমন আদর্শ ছেলে কেরাণী ও বেকার-বহুল বাঙ্গালাদেশের কালোমাণিকদের মধ্যে দুর্লভ।

এই ছেলে যখন বলিল বিবাহ করিব, তখন কন্যার পিতাদের মধ্যে হুড়াহুড়ি লাগিল রীতিমত। তাহার সিডান-বডি মোটার আর প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডওয়ালা পাঁচতলা বাড়ী কাহার মেয়ে উপভোগ করিবে, এই চিন্তায় মায়েদের মধ্যে হইল প্রতিযোগিতা সুরু।

কিন্তু কালো মেয়ে সে বিবাহ করিবে না, কালো মেয়ের উপর না কি বিজাতীয় ঘৃণা! নির্ম্মল বলে, দেখিতে যাহাকে ভাল নয়, মন তাহার ভাল হইবে কি করিয়া? দেহের সঙ্গে মনের যে অত্যন্ত নিকটসম্পর্ক, এই ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত।

এ সম্বন্ধে তর্ক চলিতে পারিত, বলা যাইত, বাহিরটা যাহার কালো, তাহার ভিতর সাদা হইতে বাধা নাই, এবং বাহির সুন্দর হইলেও ভিতর যে কুৎসিত হইতে পারে না, এই বা কি কথা? ইতিহাসের নজীর এবং অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত দেওয়াও চলিত। কিন্তু নির্ম্মল কাহারও কথাই শুনিতে প্রস্তুত নহে। আসল কথা, রূপ কে না চায়? রূপ এবং রূপা দুনিয়ার চিরদিনের প্রলোভনের বস্তু।

যাহা হউক, সুন্দরী বলিয়া খ্যাতি আছে, এমন মেয়েদের অভিভাবকরা বড় আশা করিয়াই মেয়ে দেখানো সুরু করিলেন। সকলেরই বিশ্বাস, আমার মেয়েকে অপছন্দর কথা ওঠেই না। এ মেয়ে দেখিলেই ভুলিতে হইবে। এবং যে সব মেয়ে ট্রামে এবং কারে এম-এ ক্লাসে এবং চেঞ্জে গিয়া বিমুগ্ধ পথিকের লুব্ধদৃষ্টিতে পুলকিত হইয়াছে, তাহারাও মিরার্ড আলমারির সম্মুখে গোঁপা ঠিক করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল, পাত্রী দেখিতে আসিয়া আর ফিরিতে হইবে না। মেয়েরা নাম বলিল, গান গাহিল, কেহ হাসি-উচ্ছ্বসিত খানিকটা কথাও কহিল, নির্ম্মলের মন ভিজিল না। সিগারেটের লম্বা একটা টান টানিয়া বহুবিধ বিনয়াতিশয্যের মধ্যে বিদায় গ্রহণ করিয়া পরে খবর পাঠাইল—না-পছন্দর কথা। এম্‌নি করিয়া একে একে কলিকাতা ও সহরতলীর, ব্যাঙ্গালোর ও এলাহাবাদের, ঢাকা ও বর্দ্ধমানের কত মেয়েই সে দেখিল, মেয়ের বাপ-মার অতিদর্প চূর্ণ করিয়া, মেয়েদের অতি-অহঙ্কার ভাঙ্গিয়া দিয়া সে অমনোনীতার দীর্ঘ তালিকা দীর্ঘতর করিতে লাগিল।

মেয়েদের আর রাগের অবধি রহিল না, পাশ করা এবং না করার এক ভাগ্যলিপি লিখিয়া দিয়া বছর তিনেক ধরিয়া নির্ম্মলের ক'নে দেখাই চলিল।

অবশেষে বিরক্ত হইয়া ছুটী লইয়া সে চলিয়া গেল মাদ্রাজ। মেয়ে দেখিয়া দেখিয়া ক্লান্ত হইয়া মস্তিষ্কটাকে একটু ঠাণ্ডা করিবার বাসনাই শুধু ছিল।

কিন্তু কে জানিত, মাদ্রাজে গিয়া মাথা ঘুরিয়া যাইবে?

বন্ধু শিশিরের বাড়ী রয়াপুরমএ সমুদ্রতীরে—"সি ভিউ" নাম তাহার। সোজা তিনতলা উঠিয়া গিয়াছে, সদরদরজার সম্মুখ দিয়া ট্রামরাস্তা, পিছনে রেলের লাইন, পাথর বাঁধানো, তাহারই ধার হইতে সুরু হইয়াছে সমুদ্র।

তিনতলার উপরে যে ছাদ, সেইখানে বসিয়া দুই বন্ধুতে চা-পান করিতেছিল, হঠাৎ আসিল সুজাতা, শিশিরের দূর-সম্পর্কের বোন।

কলিকাতায় পড়ে, সেবারে ম্যাট্রিক দিয়াছে, তখনকার এন্‌ট্রেন্স। এখানে বেড়াইতে আসিয়াছে। বাড়ীতেই ছিল, নির্ম্মল তাহাকে সারাদিন দেখিতে পায় নাই, কিন্তু যখন দেখিল, সে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি!

ছোট প্রাচীরের ধারে সুজাতা একটু পিছনে হেলিয়া দাঁড়াইয়াছে, কোমরের কাছ হইতে ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড—মরকত-নীল সমুদ্র, প্রায় ঘাড়ের পিছন হইতে অস্তরাগরঞ্জিত সন্ধ্যার দিগন্ত, মাথার উপরে অনুজ্জ্বল পীতাভ আকাশ, মুখে ও অনাবৃত দুখানি হাতে দিনশেষের রাঙ্গা আলো, উতল সাগরবায়ু চূর্ণকুন্তলে আসিয়া পড়িতেছে, পড়িতেছে তাহার ঘন নীলবসনাঞ্চলে—যেন ভারী সুন্দর একখানা ছবি ঝলমল ঝলমল করিতেছে!

তাহার লম্বা একহারা দেহ, তাহার গভীর কালো দুটি চোখ, নির্ম্মল সঙ্কীর্ণ ললাটে লোহিত সিন্দুররেখা, পাৎলা দুখানি ঠোঁটে ম্লান মধুর হাসি—সমস্তই হয় ত ব্যর্থ হইত, দিবসশেষের এই পূর্ব্বক্ষণে পিছনে ফেনিলোজ্জ্বল বঙ্গোপ-সাগরকে রাখিয়া, অস্ত-আভার জ্যোতিঃ মুখের চারিপাশে

প্রতিফলিত করিয়া যদি না সে দেখা দিত মহিমময়ীর বেশে।

নির্ম্মলের মনে হইল, এমন সে দেখে নাই, এমনটি কখনও সে দেখে নাই।

রূপের সঙ্গে যদি কথার মাদকতার যোগ হয়, চোখে চোখ রাখিয়া, কিছু হাসিয়া, কিছু গম্ভীর হইয়া, কিছু প্রশংসা কিছু দরদে যদি আলোচনা সুরু হয়, তবে মোহের যেটুকু বা বাকী থাকে, তা সুসম্পূর্ণ হইতে আর দেরী না হইবার কথা।

নির্ম্মলেরও হইল তাই,সে দিন সাগরতটের "ওজোন"-মিশ্রিত বায়ু সেবন করিতে করিতে ছাদের চায়ের আসরে সে প্রথম অনুভব করিল জীবনটা উপভোগ্য এবং প্রেম রোমাঞ্চকর।

একটা মধুর আবেষ্টনের মধ্যে সুজাতাকে তাহার ভাল লাগিবার সময় এ কথা একবারও মনে হইল না যে, তাহার দেখা মেয়েদেরও কেহ যদি এখানে এম্‌নি করিয়া দাঁড়াইতে পারিত, তাহাকেও এমনই ভালই লাগিত।

পরীক্ষা দিতে গেলে যেমনই ভীরু মনোভাবের সঞ্চার হয়, তেমনই অবস্থায় সে দেখিয়াছে মেয়েদের। তাহাদের স্বচ্ছন্দ কথাবার্ত্তা, তাহাদের উচ্ছল কলহাসি সে শোনে নাই, তাহাদের সেবা ও প্রীতি দেখাইবার অবকাশই দেওয়া হয় নাই, অথচ হইয়াছে নামঞ্জুর।

কিন্তু সুজাতা তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়া দিল।

পরদিন মেরিনায় বেড়াইতে গিয়া টিপু সুলতানের কাচখচিত প্রাসাদের দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল, সেও এক জন সুলতান কিম্বা রাজাধিরাজ। সুজাতাকে পছন্দ করিবার পরই বিবাহে সম্মতি পাওয়া গিয়াছে।

মাদ্রাজেই বিবাহ হইয়া গেল—এগ্‌মোরে একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া। নির্ম্মলের আর দেরী সহিতেছিল না।

কলিকাতায় ফিরিবার সময় সেকেণ্ড ক্লাসের দুখানা বার্থ সে রিজার্ভ করিল। গাড়ীতে আর কেহ ওঠে নাই।

রস্তার কাছাকাছি চিল্কা হ্রদের অপরূপ শোভা দেখিতে দেখিতে তাহার মনে হইল, সুজাতা ঐ তরল রূপার অপেক্ষাও মনোরম। ট্রেণের দুটি রাত্রি এবং একটি দিন স্বর্গের পুষ্পক রথে কাটানোর মত তাহার কাটিল।

কলিকাতায় আসিয়া প্রতিটি দিন তাহার কাছে ফুলশয্যার তিথির মতই মনোরম হইয়া উঠিল।

সুজাতাকে ঘিরিয়া তাহার সমস্ত কল্পনা—সমস্ত উদগ্র চিন্তা এমন এক মায়ানীড় রচনা করিল, যেখানে বন্ধু নয়, আত্মীয় নয়, কাষ নয়, কর্ত্তব্য নয়—শুধু রোমান্সেরই প্রবেশাধিকার আছে।

আত্মীয়রা মন্তব্য করিলেন—বিবাহ যেন কেহ আর করে না, শুধু নির্ম্মলই করিয়াছে।

বন্ধুরা বলিতে লাগিল—ছোঁড়াটা কি পাগল হইয়া গেল, একেবারে বদ্ধ পাগল? ঘুরিলে বৌ লইয়া এ কি ঢলাঢলি? ছুটী লইয়া লইয়া ছুটী শেষ হইয়া গেল, শেষটা মেডিকেল গ্রাউণ্ডে এভারেজ-পে লইয়া নির্ম্মল কলিকাতা ছাড়িল, সুজাতা ধরিয়া বসিয়াছে—জয়পুর দেখাইতে হইবে।

জয়পুর—লালপাথরের প্রাসাদ-নগরী। রংএর দেশে, ময়ূরের বিচিত্র পালকে, মানুষের বিচিত্র পোষাকে শুধু রং-বেরংএর মেলা।

সেখান হইতে অম্বর। পাহাড়ের উপরে শুভ্র প্রাসাদ। অম্বর-দুর্গের রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া নির্ম্মলের মনে হইল, মানসিংহের কুলবধূরা কি সুজাতার অপেক্ষা সুন্দর ছিল? হইতে পারে না।

তার পর আগ্রা।

বাদশার হারেম্ হইতে তাজমহল দেখিতে দেখিতে নীল-রেখা যমুনার বালুকাময় তীরতট দেখিয়া মনে হইল নির্ম্মলের, সেই সব সুন্দরীরা—যাহাদের লীলায়িত নূপুরনিক্কণ এখানে ধ্বনিত হইত, বিশ্ববিখ্যাত সেই রূপসী মমতাজ—যাহার কাহিনী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্মৃতিমন্দিরে অক্ষয় অব্যাহত হইয়া আছে, কেহ কি সৌন্দর্য্যে সুজাতার অপেক্ষাও বড় ছিল? হইতে পারে না।

ইহার পর কাশী।

শত শতাব্দীর পুণ্যকথাবিজড়িত মহাতীর্থ মহানগরী, নিত্য উৎসব-মুখরিত যাহার ঘাট, নিত্যপূজা-সমারোহ-সমাকীর্ণ যাহার অসংখ্য দেবমন্দির, ফুলে গন্ধে ধূপসুরভিতে পরিপূর্ণ অনতিপরিসর পাষাণ-পথ, সেখানে সুজাতাকে শুচি-স্নাতা পুরাকালের রাজান্তঃপুরবধূ বলিয়া নির্ম্মলের মনে হইল।

সে সময় সূর্য্যগ্রহণ আসিয়াছিল, দেশবিদেশের লোক বারাণসীর পথে ঘাটে ভিড় করিয়াছে।

সুজাতা ধরিল নির্ম্মলকে—"আমি গঙ্গা নাইতে যাব, নিয়ে চল।"

নির্ম্মল বলিল, "এই দারুণ ভিড়ে তোমার কষ্ট হবে সুজাতা, বড় কষ্ট !"

"তা হোক্ কষ্ট। কাশীতে রইলুম অথচ ভিড়ের ভয়ে গ্রহণে গঙ্গাস্নান হবে না ? তুমি বল কি ? ওঠো লক্ষীটি !"

এমন অনুনয়ের ভঙ্গী করিয়া, এমন সহজ অনুশাসনের সুরে সুজাতা কথাগুলি বলিল যে, গঙ্গাস্নান ত ছোট কথা, কাশীর ড্রেণে নামিয়া ময়লা তুলিতেও নির্ম্মল রাজী হইত।

টাঙ্গা রামাপুরার কাছে থামিল, আর অগ্রসর হইবার উপায় নাই বলিয়া।

গোধূলিয়ার মোড় হইতে এমন লোকসমাগম সুরু হইয়াছে যে, যত দূর দৃষ্টি যায়, কেবলই মানুষের মাথা, আর কিছু দেখিবার যো নাই।

স্বেচ্ছাসেবকরা বলিল, "মা, আপনারা কেদারঘাটে যান, বাঙ্গালীদের জন্য ঐ দিকে ব্যবস্থা। এ দিকে আপনারা পারবেন না।"

সুজাতা তবু জিদ ধরিয়া বসিল, দশাশ্বমেধ ঘাটেই স্নান করিতে হইবে, দশাশ্বমেধযজ্ঞের পুণ্য সহজ কথা !

নির্ম্মলের হাতে টান দিয়া সে অগ্রসর হইল।

হর-হর-ব্যোম্ ব্যোম্, জয় বিশ্বনাথ, দুর্গামাঈজীকি জয় রবে গগন-পবন কম্পিত করিয়া কোলাহলমুখর জনসমুদ্র গর্জ্জন করিতে করিতে অগ্রসর হইল। অগস্ত্যকুণ্ডের গলির সম্মুখে আসিয়া ভিড় বাঁশের বেড়ায় ঠেকিয়া গেল, পুলিস রুখিয়াছে, এখন আর যাওয়া যাইবে না, ঘাটে অতিরিক্ত লোক গিয়া পড়িয়াছে।

সুজাতা বলিল, "আমাকে ঐ ফুটপাথে দাঁড় করিয়ে তুমি যাও ত একবার, সাহেবকে জিজ্ঞেস্ ক'রে এসো, কতক্ষণে ছাড়বে, এখানেই ত আধঘণ্টা হয়ে গেল। যদি দেরী থাকে, আমরা পাশের গলি দিয়ে স'রে পড়ব। গ্রহণ থাক্‌তে থাক্‌তে চান করতে হবে ত।"

নির্ম্মলের যাইতে ইচ্ছা ছিল না, বিশেষ পীড়াপীড়িতে অগত্যা সুজাতাকে ভিড় হইতে দূরে ফুটপাথের উপর রাখিয়া সে পুলিস-সাহেবের কাছে গেল।

সাহেব জানাইল, ওধারে ভিড় কমিলে সিটি দিবে, তখনই ছাড়া হইবে, পাঁচ মিনিটও হইতে পারে, বিশ মিনিটও হইতে পারে, ভিড় বলিয়া কথা ! এখন ছাড়িয়া দিলে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়া যাইবে।

কথাটা সত্য।

নির্ম্মল ফিরিয়া আসিল।

ফিরিয়া আসিয়া দেখে, যেখানে সুজাতাকে দাঁড় করাইয়া গিয়াছিল, সেখানে সে নাই। নাই ত গেল কোথায় ?

এধারে ওধারে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, অসংখ্য নরমুণ্ড, কিন্তু তাহার অতি পরিচিত সুন্দর মুখখানি নাই।

গ্রহণের স্নান নির্ম্মলের মাথায় উঠিয়া গেল।

ততক্ষণে ভিড় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহারই ধাক্কায় টলিতে টলিতে গঙ্গায় গিয়া পড়িল। পুণ্য প্রবাহিনীর কলধ্বনি, অমৃতকণ্ঠে বিজয়গান নির্ম্মলের কাণে মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদের মত লাগিল। সুজাতা কোথায় গেল ? পথ হারাইয়া এই বিরাট নগরীতে কোন্ মেয়ে ফিরিতে পারে ? পুলিসকে, ভলান্টিয়ারকে—সকলকে বলিয়া কাশীর পথে ঘাটে সারাদিন ধরিয়া পাগলের মত নির্ম্মল ঘুরিল।

সুজাতা—সুজাতা—সুজাতা, তাহার ক্রন্দনের মত বুক-ফাটা ডাকে সন্ধ্যার মণিকর্ণিকা-ঘাটের চিতা-বহ্নি যেন চমকাইয়া উঠিল, হয় ত হরিশ্চন্দ্র এমনই করিয়া এক দিন শৈব্যাকে ডাকিয়াছিল।

এক দিন দুই দিন তিন দিন—খোজার আর বিরাম নাই, তবু কোন সন্ধানই মিলিল না। কাশীর গুণ্ডার পাল্লায় পড়িলে আর কি রক্ষা আছে ?

একটা কথা নির্ম্মলের মনে হইল, গ্রহণের দিন কালী-তলার গলিতে সে সুবোধকে দেখিয়াছিল।

এক দিন সন্ধ্যার সময় কলিকাতার বাড়ীতে সুবোধ আসিয়াছিল। নির্ম্মল অফিস হইতে ফিরিয়া দেখে, তাহার সঙ্গে সুজাতা বেশ গল্প জুড়িয়া দিয়াছে। নির্ম্মলকে দেখিয়া সুজাতা বলিল, "এসো, তোমার সঙ্গে এর আলাপ করিয়ে দিই। ইনি আমার বাল্যবন্ধু সুবোধ সেনগুপ্ত। দার্জ্জিলিংএ যখন ভিক্টোরিয়ায় পড়ি, তখন থেকে আলাপ, আর ইনি that goes without saying—আমার husband, Mr. Banerjee."

তার পরও কয়েকবার সুবোধ আসিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে সুজাতার অতিরিক্ত মেলামেশা নির্ম্মলের চোখে ভাল ঠেকে নাই ; কিন্তু স্ত্রীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রীর ও ভ্রূ-ভঙ্গীর সম্মুখে সাহস করিয়া সে কথা প্রকাশ করিতে সে পারে নাই।

সুবোধের সঙ্গে আলাপে জানিয়াছিল, সে বেনারস বোর্ডিংএ আছে। তৃতীয় দিনে সেইখানে সে খোঁজ করিতে গেল।

শুনিল, সুবোধ যোগের দিনই লক্ষ্ণৌ চলিয়া গিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে একটি স্ত্রীলোকও ছিল। সে স্ত্রীলোক তাহার মা কিম্বা বোন কিম্বা হয় ত তাহারই স্ত্রীও হইতে পারে। তাহার রূপবর্ণনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে বোর্ডিংএর ম্যানেজার বলিল, "ভদ্রলোকের মেয়েছেলেদের দিকে কি আমরা চাই মশাই, যে, বলব কেমন তিনি দেখতে? আশ্চর্য্য আপনার প্রশ্ন।"

আসল কথা, তাহার ভয় হইয়াছে, যদি সাক্ষ্য দিতে হয় শেষটা, একবার কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া যে বিসদৃশ অভিজ্ঞতা হইয়াছে, জীবনে দ্বিতীয়বার তাহা ভোগ করিবার অভিলাষ নাই।

যাহা হউক, খবরটা পাইয়াই নির্ম্মল লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিল, সেখানে খোঁজ লইয়া জানিল, সুবোধ দিল্লী গিয়াছে।

দিল্লী যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় রিডাইরেক্টেড একখানি চিঠি পাইল, সেই অতি চমৎকার হাতের লেখা—সুজাতার।

লেখার বিষয়বস্তু মর্ম্মভেদী—"আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা ক'র না, তুমি আমাকে সুখী করতে পারনি, প্রয়োজন হ'লে সেই কথাটাই কোর্টে বলব।"

চিঠিতে দিল্লীর ছাপ।

পরাজয়—নিদারুণ পরাজয় নির্ম্মলের। এ অপমানের জ্বালা, এ আঘাতের প্রচণ্ডতা ভুলিবার নহে। জীবনের সমস্ত সুষমা হরণ করিয়া, অন্তরের সমস্ত বিশ্বাসকে পদদলিত করিয়া এ কি স্পর্দ্ধিত সর্ব্বনাশসাধন? আকাশের সকল নীলিমা, ধরণীর সমস্ত শ্যামলতা বিলুপ্ত হইয়া সাহারার বিস্তীর্ণ বালুকাসাগর তাহার জীবনে ঝলসিয়া উঠিল।

কলিকাতায় ফিরিয়া নির্ম্মল ঘোষণা করিল, সুজাতা এক দিনের কলেরায় কাশীতে মারা গিয়াছে। পুলিস ফৌজ করাতে আসল কথাটা কানাঘুসায় প্রচার হইয়াই গিয়াছিল, শত্রু-মিত্র মুখ টিপিয়া হাসিল মাত্র।

এই সময়ে গরীব ব্রাহ্মণের মেয়ে কালিদাসী চব্বিশ হইতে পঁচিশে পা দিল।

যেমন নাম, তেমনই রূপ, যেন মা কালী চার হাত তুলিয়া শ্মশানে নৃত্য করিতেছেন।

রূপের যতটা অভাব ছিল, ততটা রূপার দ্বারা পূরণ করিয়া দিতে হইলে যে পরিমাণ ব্যয় করিতে হয়, কালিদাসীর বিধবা মায়ের তাহার শতাংশের একাংশ সঙ্গতিও ছিল না। তাই বলিয়া মেয়ের বয়স অপেক্ষা করিল না।

কিন্তু কালিদাসী সে সম্বন্ধে মাথা খাটাইতে নারাজ, সংসারের সমস্ত কায, ভাইবোনদের সেবা আর রুগ্না মাতার শুশ্রূষা শেষ করিয়া বিবাহের চিন্তায় মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করিবার আগে তাহার শ্রান্ত নয়নে ঘুম আসিয়া যায়। তাহার ভয় নাই, ভরসা আছে। কারণ, ভাল জ্যোতিষী হাত দেখিয়া বলিয়াছে, রাজা বর আসিবে এবং আদর করিয়াই গ্রহণ করিবে।

সম্মুখের বাড়ীর মেয়ে উত্তরা যখন বলিতে আসে তাহার স্বামীর ভালবাসার কথা, তখন কাঁদিয়া কালিদাসী বলে, "ভালবাসে না ছাই, তা হ'লে আট হাজার টাকা গুণে নিত না, ঘড়ী, আংটী, খাট-বিছানা, গয়না, নগদ টাকা, তক্তাবাস—সব বাদ দিয়ে শুধু যদি তোকে নিয়ে বলত ভালবাসি, তবে মানাত।"

উত্তরা বলিল, "আমি ছাড়িনি, আমি ফুলশয্যার রাত্রেই জিজ্ঞেস্ করছিলুম, টাকা নিলে কেন? বল্লে, টাকা নেওয়া হয়েছে না কি? আমি ত কিছু জানি না, মামা জানেন।"

"ন্যাকামি দেখে আর বাঁচি না, সব জানেন, শুধু ঐটি জানেন না। শুনিস্ কেন ওদের কথা? তুই ব'লে তাই বিশ্বাস করিস্।"

উত্তরার একটু অপমান-বোধ হইয়াছিল, সে'ও আঘাত দিবার চেষ্টা করিল;—"তোর বর যদি পণ নেয়, তাকে ভালবাসবি না?"

"কক্‌খনো না! রাম বল!" মাথা নাড়িয়া কালী জবাব দিল।

"দেখব লো দেখ্‌ব!"

"দেখিস্ লো দেখিস্।"

এম্‌নি সময় ঘটক এক সম্বন্ধ আনিয়া হাজির করিল। পাত্রটি দোজ-বরে, কিন্তু বয়স কম! রূপে-গুণে, ধনে-মানে, বিদ্যায়-বুদ্ধিতে সকল দিক হইতেই বরণীয় বর। পণ করিয়া বসিয়াছে—পাত্রী চাই, শুধু কালো নয়, যত খারাপ দেখিতে হয়। পণ গ্রহণ করিবে না, কিন্তু এই পণ রাখিবে।

বান্ধবী



[গল্প]

১

"মিঃ রায়, এরই কথা বলেছিলুম। সম্পর্কে আমার বোন্। বৈষ্ণব সাহিত্যে আপনার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য শুনে আপনার কাছে ওটা পড়তে চায়।"

চঞ্চলকুমার চাহিয়া দেখিল। অষ্টাদশী তরুণী যে সুন্দরী, তাহাতে সন্দেহ নাই। লজ্জার অরুণ রাগ তরুণীর আননে লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। চঞ্চলকুমার নারী-ভক্ত নহে। তাহার ২৫ বৎসর বয়সে সে বহু সুন্দরীর সংস্রবে আসিয়াছে, কিন্তু তাহার নারীদ্বেষী হৃদয় কোনও দিন কোনও তরুণীর প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই। এজন্য য়ুরোপ ও আমেরিকায় যাপনকালে সে অক্ষত দেহ ও মন লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছিল। আজও অচঞ্চলভাবে একবার তরুণীর দিকে চাহিবার পর মধুর বিনম্র কণ্ঠে সে বলিল, "আপনি দাঁড়িয়ে রৈলেন কেন, বসুন।"

দীর্ঘায়ত কৃষ্ণতার নয়নের উজ্জ্বল দৃষ্টি মুহূর্ত্তমাত্র মিঃ রায়ের মুখের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া সুন্দরী তরুণী টেবলের অপর পার্শ্বস্থ চেয়ারে উপবেশন করিল।

অরুণচন্দ্র বলিল, "আমার এই বোনটি কোন দিন কলেজে পড়েনি, কিন্তু ইংরেজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যের পরম ভক্ত। এর বাবা যত্ন ক'রে বাড়ীতে শিক্ষক রেখে সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরেজী ভাল করেই শিখিয়েছেন। বৈষ্ণব কবিদের রচনা এর বাবারও যেমন প্রিয়, ওরও তেমনই। আপনি এ বিষয়ে বিশেষ গবেষণা করেছেন, সে কথা এ দেশে র'টে গেছে। আপনার কয়েকটা বক্তৃতা আমিও শুনেছি। অবশ্য, আপনি আমাকে বন্ধু ব'লে স্বীকার করেন, তাই আপনার কাছে সাহস ক'রে একে পড়াবার প্রস্তাব করেছি।"

চঞ্চলকুমার অচঞ্চল স্বরে বলিল, "আপনি অত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন? আমার কাছে আরও দুজন ছাত্র পড়ছেন। সময় আমার অফুরন্ত। সুতরাং ঘণ্টা দুই এসে আমি রোজ আপনার বোন্‌কে, আমার যতটুকু জ্ঞান হয়েছে, ওঁকে শেখাবার চেষ্টা করব।"

হাস্যমুখে অরুণচন্দ্র বলিল, "আপনি বড়লোক, টাকা-পয়সা যথেষ্টই আছে, সুতরাং আপনার অনুগ্রহ-লাভে আমরা ধন্য হলুম। এর মধ্যেই আপনি বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রবন্ধ লিখে যে রকম প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে আমার বিশ্বাস, সাহিত্যের যথেষ্ট সম্পদ বাড়বে।"

চঞ্চলকুমার মৃদু হাসিল। সে ধনী পিতার একমাত্র সন্তান। ১৯ বৎসর বয়সে বি, এ পাশ করিবার পর সে পিতৃহীন হয়। অক্সফোর্ডের ডিগ্রী লইবার তাহার প্রবল আগ্রহ বরাবরই ছিল। পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সে বিলাতে গিয়া পড়িতে থাকে। উচ্চ প্রশংসার সহিত ডিগ্রী লাভের পর তাহার মন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে। বিলাতে অবস্থানকালে সে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনায় গভীর মনোযোগের সহিত আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। কলিকাতায় ফিরিয়া তাহার ডিগ্রী-লুব্ধ চিত্ত কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধি লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। গত বৎসর সে দর্শন-শাস্ত্রে এম্-এ পরীক্ষায় সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রেমচাদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভের জন্য সে এ বৎসর প্রস্তুত হইয়াছে। বাঙ্গালার অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস এবং সাহিত্য

সে এমন ভাবে আয়ত্ত করিয়াছে যে, তাহার বন্ধুর দল তাহাকে এ বিষয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া ঘোষণা করিত। বৈষ্ণব রস-সাহিত্য সম্বন্ধে তাহার গবেষণা অনন্যসাধারণ। বর্ত্তমানে চণ্ডিদাস সমস্যা লইয়া কয়েক জন অধ্যাপক অনেক উদ্ভট মতবাদের প্রচার করিতেছিলেন। চঞ্চলকুমার সম্প্রতি প্রমাণ করিয়া দিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের চণ্ডিদাস ও বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য রত্ন চণ্ডিদাস-পদাবলীর রচয়িতা একই ব্যক্তি নহেন। এ বিষয়ে সে সম্প্রতি স্বতন্ত্র বিস্তৃত প্রবন্ধ রচনা করিতেছিল।

অরুণচন্দ্র কোন বেসরকারী কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপক। চঞ্চলের সহিত তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। বালিগঞ্জে চঞ্চলকুমার যে নূতন প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সেখানে অরুণচন্দ্র প্রায়ই যাইত।

চঞ্চল এতক্ষণ বাতায়নের দিকে চাহিয়াছিল। দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া সে সম্মুখে চাহিতেই একবার তাহার নূতন শিষ্যার সহিত দৃষ্টিবিনিময় হইল। সুন্দরী তরুণীর ক্ষুদ্র সপ্তমীর চাঁদের মত ললাটের মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র সিন্দুরের বিন্দু জ্বল্-জ্বল্ করিতেছিল। কুঞ্চিত, কৃষ্ণ কেশদাম-চর্চ্চিত সীমন্তে সিন্দুরের দীর্ঘ রেখা। দৃষ্টি নামাইয়া লইয়া চঞ্চল ভাবিল, তাহার ছাত্রী বিবাহিতা। তাহার মুখে ক্ষণিকের জন্য ঈষৎ হাসির আভাস দেখা গেল।

অরুণচন্দ্র বন্ধুর দিকে চাহিয়াছিল। সে গম্ভীরভাবে বলিল, "এর বিয়ে ছেলেবেলাই হয়েছিল; কিন্তু সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানিনে, বিয়ের পর ওর স্বামী নিরুদ্দেশ। তাই লেখাপড়া নিয়েই থাক্‌তে হয়। গীতা—চণ্ডিদাস ওর মনে শান্তি দিয়েছেন।"

চঞ্চলকুমার ক্ষণকালের জন্য অন্যমনস্ক হইল। তার পর বলিল, "বিয়ের আমি পক্ষপাতী নই। বিয়ে ক'রে মানুষের যে কি লাভ হয়, বুঝিনে। কিন্তু থাক্, হয় ত এ সব অনধিকারচর্চ্চা। আপনি আমায় ক্ষমা করবেন, মিসেস্—"

"ওর নাম শান্তি। এই নামেই আমরা ডেকে থাকি।"

"শান্তিদেবি, আপনি আমার বাচালতা ক্ষমা করবেন।"

এবার শান্তি কথা কহিল। কুণ্ঠিত নম্রস্বরে সে বলিল, "আমি যখন আপনার ছাত্রী, তখন আমাকে 'আপনি' না ব'লে 'তুমি' বললেই সুখী হব।"

কথাগুলি কবির অতিরঞ্জিত বীণা-ধ্বনির ন্যায় না হইলেও অত্যন্ত মিষ্ট—মধুস্রাবী, সে বিষয়ে চঞ্চলের ন্যায় নারীদ্বেষী সমালোচকও মনে মনে স্বীকার না করিয়া পারিল না।

কিন্তু ধীরকণ্ঠে সে প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "আপনাকে কেন, কাকেও আমি 'তুমি' বল্‌তে পারিনে। ওটা আমার স্বভাব। সুতরাং আমার কাছে যদি পড়তে চান, আমার এ অত্যাচার আপনাকে সহ্য করতে হবে।"

তরুণী তখন নত দৃষ্টিতে ভূমিতলে কি দেখিতেছিল। তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে কি মৃদুহাস্যের তড়িৎতরঙ্গ মুহূর্ত্তের জন্য দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল?

চঞ্চলকুমার চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আচ্ছা, কাল থেকেই আমি আপনাদের এখানে পড়াতে আসব, অরুণ বাবু? ওঁর পড়বার সুবিধা কখন্ হবে, সেটা জেনে নিতে চাই। সকাল ও দুপুরবেলা আমার সুবিধা হবে না। ওঁরও হয় ত অসুবিধা হ'তে পারে।"

অরুণচন্দ্র বলিল, "সন্ধ্যার পর ঘণ্টা দুই আপনার অবকাশ হবে ত?"

"সেই ভাল, আমি সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে নটা পর্য্যন্ত সময় দিতে পারি। তাতে আপনাদের অসুবিধা হবে না ত? সিনেমা, টকিতে যাওয়া অভ্যাস থাক্‌লে—"

বাধা দিয়া অরুণ বলিল, "আমাদের বাড়ীতে ওসব নেশা বড় কম। বিশেষতঃ শান্তি থিয়েটার-বায়স্কোপের মোটেই ভক্ত নয়। এ সব ব্যাপারে আমার বোনটি হু'শ বছর পেছিয়ে আছে।"

"বেশ, তবে সেই কথাই রইল।"

ব্যায়ামপুষ্টদেহ, দীর্ঘকায়, সুন্দর যুবক দৃঢ়-চরণে বিদায় লইল। যাইবার সময় উভয়কে দেশীয় প্রথায় নমস্কার করিতে সে ভুলিল না।

২

চঞ্চলকুমারের জীবনের একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস ছিল। তাহার ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদার পিতা গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার দেহ ও মনে বাঙ্গালীর মনোভাবের বৈশিষ্ট্য ছিল। উচ্চশিক্ষিত হইয়াও তিনি কায়মনে হিন্দুর আচার-নিয়মের পক্ষপাতী ছিলেন। একমাত্র মাতৃহীন সন্তানকে তিনি পিতা ও মাতার সমস্ত দৃষ্টির সহায়তায় সুশিক্ষা দিয়া আসিয়াছিলেন।

সপ্তদশ বর্ষ বয়সে পুত্র চঞ্চল জলপানি সহ আই, এ, পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলে, তিনি দশম-বর্ষীয়া এক সুন্দরী বালিকার সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। কন্যার পিতা রাজপুতনায় কোনও সামন্ত নরপতির দরবারে উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার জন্মভূমি পূর্ব্ববঙ্গে ময়মনসিংহ জেলায় হইলেও একপ্রকার স্থায়িভাবেই তিনি রাজপুতনায় বাস করিতেছিলেন। তিনিও সদাচারী, নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। কন্যাটিকে সুলক্ষণা ও সুন্দরী দেখিয়া চঞ্চলের পিতা রামজীবন রায় তাহাকে পুত্রবধূ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কন্যার পিতা রাসবিহারী বাবু দুই তিন বৎসর অন্তর একবার করিয়া বাঙ্গালা মায়ের ক্রোড়ে দুই এক মাসের জন্য বাস করিতে আসিতেন। কর্ম্মসূত্রে রামজীবনের সহিত রাসবিহারীর বিশেষ পরিচয় ঘটে। পুত্র চঞ্চলকুমারের " জন্মকোষ্ঠীতে শনির প্রভাব লগ্নস্থানে সিংহরাশিতে এত প্রবল ছিল যে, পুত্রের সন্ন্যাসী হইবার আশঙ্কা ছিল। এজন্য পুত্রকে তিনি জ্যোতিষীর সহিত পরামর্শ করিয়া অল্প-বয়সেই বিবাহ দিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে মঙ্গলের দশা শেষ হইলে বুধ ও বৃহস্পতি গ্রহের প্রভাবে শনিগ্রহের প্রভাব হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এ সকল ব্যাপারের কিছুই চঞ্চল জানিত না।

তখন সরদা আইন রচিত হয় নাই। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে দশ বৎসরের কন্যার সহিত সতের বৎসরের কিশোর চঞ্চলকুমারের বিবাহ হইয়া যায়। বিবাহের পর দুই বৎসরের মধ্যে রামজীবন পরপারে যাত্রা করেন। এই সময়ের মধ্যে রাসবিহারী বাবু একবার বাঙ্গালাদেশে আসিয়াছিলেন। জামাতা অত্যন্ত লাজুক-প্রকৃতি। সে শ্বশুরালয়ে যাওয়া দূরে থাকুক, সর্ব্বপ্রযত্নে শ্বশুরালয়ের সকলকেই এড়াইয়া চলিত। বিবাহের পর বালিকা স্ত্রীর সহিত দুই দিনে দুই চারি মিনিটের জন্য চঞ্চলের দেখা হইয়াছিল। শনি-মহারাজের কৃপায় চঞ্চলের মন তখন স্ত্রীলোকের সান্নিধ্যই সহ্য করিতে পারিত না। আলাপ-পরিচয় ত দূরের কথা।

তার পর দীর্ঘ প্রবাস। চঞ্চল ভুলিয়াই গিয়াছিল যে, সে বিবাহিত। স্ত্রীর প্রতি তাহার যে অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য আছে, সে কথা তাহার একবারও মনে হইত না। অধ্যয়নই তাহার একমাত্র কাম্য ছিল। কাযেই বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই দুই বৎসরের মধ্যে সে স্ত্রী বা শ্বশুরালয়ের কোন সংবাদই লয় নাই—লওয়া যে প্রয়োজনীয়, তাহাও সে মনে মনে স্বীকার করিত না।

জ্ঞানসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই সে নারীসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া চলিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। সাগরপারে গিয়াও সে সেই গ্রহ মহারাজের কৃপায় নারীসঙ্গ যথাসাধ্য এড়াইয়া চলিত। তবে য়ুরোপীয় স্বাধীন জাতিসমূহের সমাজে মাঝে মাঝে তাহাকে মিশিতে হইত। সে সকল ক্ষেত্রে তরুণী য়ুরোপীয় সুন্দরীগণের সাহচর্য্য অনেক সময় অপরিহার্য্য হইয়া উঠিত। য়ুরোপীয় বন্ধুগণের সাহচর্য্যে থাকিয়া এবং য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবে তাহার মানসিক শিক্ষা ঈষৎ রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার ধারণা হইয়াছিল, স্ত্রী বা ভার্য্যা হিসাবে নারীসঙ্গ স্পৃহণীয় না হইলেও বান্ধবী-ভাবে নারীর সহিত মেলা-মেশা চলিতে পারে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সে বান্ধবীরূপে কাহারও দেখা পায় নাই। কলিকাতার শিক্ষিত সমাজে সে অল্পদিনেই সুপরিচিত হইয়াছিল। স্বভাবতঃ লাজুক হইলেও বন্ধুসঙ্গ তাহার স্পৃহণীয় ছিল। উচ্চশিক্ষিত এবং ধনী অভিজাত বংশের সন্তান বলিয়া বহু স্থানে তাহার নিমন্ত্রণ হইত। সেখানে অনেক তরুণী—সুন্দরী, শ্যামাঙ্গী, উচ্চশিক্ষিতা, অর্দ্ধশিক্ষিতা, নানাপ্রকার যুবতী-কিশোরীর সহিত তাহার দেখা হইত, আলাপ-আলোচনাও হইত। সে যে বিবাহিত, এ কথা অনেকেই জানিত না। সুতরাং এমন একটি লোভনীয়, সুদর্শন, সুশিক্ষিত, ধনী পাত্রকে অনেকেই আয়ত্ত করিতে চাহিত। কিন্তু শনি-মহারাজের দুর্ভেদ্য বর্ম্ম এই তরুণ যুবকের মনের চারিপার্শ্বে এমন ভাবে বেড়া দিয়া রাখিয়াছিল যে, মকরকেতন তাঁহার ফুলশরের সন্ধান করিবারই সুযোগ এবং সুবিধা পাইতেন না।

বাঙ্গালাদেশে, বিশেষতঃ কলিকাতার অনর্গল সমাজে য়ুরোপীয় প্রগতিবাদ অভিনব রূপ গ্রহণ করিয়া দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছিল। য়ুরোপপ্রত্যাগত চঞ্চলকুমার দেশে ফিরিয়া তাহার বীভৎস মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিল। প্রতীচ্য শিক্ষা-দীক্ষা প্রচুর পরিমাণে পাইলেও তাহার মনটি পৈতৃক ধারা হইতে বিচ্যুত হইতে পারে নাই। স্বাধীন দেশের আবহাওয়ার মধ্যে কয়েক বৎসর যাপন করিবার পর ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বাঙ্গালায়

স্বাতন্ত্র্য বর্জ্জনের উৎকট বাসনা তাহার মনকে পীড়িত করিত। তাই সে প্রথমেই য়ুরোপীয় বেশভূষা ও খানাপিনার সাজসরঞ্জাম বর্জ্জন করিয়াছিল। নিষ্ঠাভরে সে বাঙ্গালার আভিজাত্য, বাঙ্গালার অবদান, বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহ্যকে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। আত্মবিস্মৃতি মৃত্যুরই নামান্তর, ইহা বুঝিয়া সে অতীত বাঙ্গালার রূপ, রস ও বৈশিষ্ট্যের সন্ধানে তাহার শিক্ষিত মনকে নিযুক্ত করিয়াছিল।

স্বামীজী বিবেকানন্দের বাণী অনুক্ষণ তাহার সমগ্র চিত্তকে আকৃষ্ট করিত। সে সংকল্প করিয়াছিল, দেশহিত-ব্রতে সে তাহার জীবন, কর্ম্মপ্রেরণা ও অর্থ সমস্তই নিয়োগ করিবে। কিন্তু তাহার আগে অতীত বাঙ্গালাকে সে সাধনার দ্বারা নিজের জীবনে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে চাহে।

কাযেই আট বৎসর পূর্ব্বে তাহার জীবনে কে মন্ত্রপূত হইয়া অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার কথা ভাবিবার অবকাশও তাহার হয় নাই। তাহার শ্বশুর মহাশয় রাজকার্য্যে এতই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাহার বিলাতপ্রত্যাবর্ত্তনের পর দেশে আসিবার তিনি কোনও সুযোগ করিয়া লইতে পারেন নাই। তবে জামাতাকে পত্র লিখিয়াছিলেন—তাঁহার কর্ম্মস্থানে যাইবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। উত্তরে সে জানাইয়াছিল, যত দিন রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ পরীক্ষার "থিসিস" শেষ না হয়, তত দিন তাহাকে একাগ্রচিত্তে সাধনা করিবার অবকাশ তিনি দিবেন। স্ত্রীর কথা ঘুণাক্ষরেও সে উল্লেখ করে নাই। স্ত্রীকে এ যাবৎ সে কোন পত্রও লিখে নাই। স্ত্রীর পত্র পাইবার জন্য ব্যগ্রতা তাহার ছিলই না। তাহার স্ত্রীর নিকট হইতে সে কোনও আহ্বান পায় নাই। সে জন্য তাহার মনে একবারও প্রশ্ন উঠে নাই। বরং সে দিক হইতে একখানিও পত্র না আসায় মনে মনে আরও স্বস্তি লাভ করিয়াছিল। চিরাচরিত প্রথামত স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পরিচয় ও ভালবাসার অভাব সত্ত্বেও যে মিলন হয়, চঞ্চলকুমার তাহার কোনও সার্থকতা আছে বলিয়া স্বীকার করিত না। দাম্পত্য জীবনের প্রতি আকর্ষণ ও মোহের অভাব হেতু সে মনে করিত, পিতা তাহাকে অল্পবয়সে বিবাহ দিয়া তাহার সম্বন্ধে সুবিচার করেন নাই।

নারী সম্বন্ধে তাহার যে বিচিত্র ধারণা জন্মিয়াছিল, তাহার ফলে সে যৌন সমস্যার আধুনিক তীব্রতা হাসিয়া উড়াইয়া দিত। নারীর সহিত বান্ধবতা চলিতে পারে, কিন্তু বান্ধবতা যে যৌন লিপ্সাকে উদগ্র করিয়া তুলিতে পারে, ইহা সে বিশ্বাস করিত না। দুই বিরুদ্ধ বৈদ্যুতিক শক্তি সম্মিলিত হইলেই বজ্রপাত অবশ্যম্ভাবী, ইহা প্রাকৃতিক জগতে সম্ভবপর হইলেও শিক্ষিত মানবমনের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী, ইহা সে কোনমতেই স্বীকার করিত না। বন্ধুদিগের সহিত সে এ বিষয়ে বহু তর্ক করিয়াছে ; কিন্তু তর্কে কেহই তাহাকে এই সহজ সত্যটি স্বীকার করাইতে পারে নাই। সে বলিত, মানুষ যদি অধ্যাত্ম-রসের সন্ধান পায়, তাহা হইলে বস্তুতান্ত্রিক জগতের বাহিরের রূপ ও আসঙ্গলিপ্সা তাহার মনে কোনও ছাপ দিতে পারে না। রজকিনী রামী ও চণ্ডিদাসের প্রেমসাধনার উন্নততর এবং সুপবিত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া সে প্রগতিবাদী বন্ধুদিগকে নির্ব্বাক করিয়া দিত।

নারীর সহিত বান্ধবতা পুরুষের পৌরুষ-হানির সহায়তা করে না, এ বিশ্বাস চঞ্চলকুমারের মনে দৃঢ় হইলেও, পঁচিশ বৎসর বয়সের মধ্যে সে কোনও নারীকে বান্ধবী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই। আধুনিক সমাজের বিলাসিনী তরুণীদিগকে সে লঘুচিত্ত মনে করিত বলিয়াই এ সুযোগ ঘটে নাই কি না, তাহা বলা যায় না। তবে এ কথা সত্য যে, সে কোনও তরুণীর সহিত অধিকক্ষণ আলোচনার সুযোগ পরিহার করিয়াই চলিত। নির্জ্জন আলাপের বহু সুবিধা সত্ত্বেও সে কোন দিন তেমন অবকাশ ঘটিতে দেয় নাই।

৩

অনলস অধ্যয়ন ও রচনাকার্য্যে রত থাকিয়াও চঞ্চল তাহার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে নাই। সে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর নির্দ্দিষ্ট সময়ে ছাত্রীকে পড়াইতে আসিত। শান্তি অধ্যয়নরতা ছাত্রীর ন্যায় তাহার শিক্ষকের কাছে বসিয়া একে একে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস ও সাহিত্যকে আয়ত্ত করিয়া লইতেছিল। বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, গোবিন্দদাসের পদাবলী, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহের রসাস্বাদে সে চঞ্চলকুমারের অপূর্ব্ব বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় পাইত। বাঙ্গালার রস-সাহিত্য ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনকে কেন্দ্র

করিয়া কেমন ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, বাঙ্গালার জাতীয় সম্পদ বলিতে কি বুঝায়, তাহা শান্তিদেবী অগ্রে এমন বিশদভাবে জানিতে পারে নাই। বৈষ্ণব কবিগণের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃমন্ত্রসাধক কমলাকান্ত, রামপ্রসাদ, দাশরথি প্রভৃতি কবির অনির্ব্বচনীয় কাব্য ও তত্ত্বসুধার সে রসাস্বাদ করিতে লাগিল। সে বুঝিল, য়ুরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষায় পণ্ডিত হইয়াও এই তরুণ বাঙ্গালীর প্রাণে মাতৃভূমি ও দেশবাসীর প্রতি কি বিপুল প্রেম ও ভক্তি বিদ্যমান। ধীরে ধীরে তাহার কোমল নারীচিত্ত এই প্রতিভাবান্ যুবকের প্রতিভার একান্ত ভক্ত হইয়া পড়িল।

প্রথম প্রথম অরুণচন্দ্র এক পাশে বসিয়া শিক্ষক ও ছাত্রীর পড়াশুনা শুনিত। কিন্তু কার্য্যানুরোধে প্রত্যহ তাহার সেখানে অপেক্ষা করার সুবিধা হইত না। সে-ও কাযের মানুষ।

পাঁচ ছয় মাস পড়াইবার পর চঞ্চলকুমার বুঝিল, তাহার ছাত্রী প্রখরবুদ্ধিশালিনী এবং মেধাবিনী হইলেও যৌবনের চাঞ্চল্য এবং যুগধর্ম্মের প্রগল্ভতা তাহাতে নাই। শান্তি কথা অধিক বলিত না, শুধু আয়ত কৃষ্ণতার নয়নযুগল তুলিয়া সমাহিত-চিত্তে শিক্ষকের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিত।

চঞ্চল শুনিয়াছিল, এই সুন্দরী যুবতীর স্বামী বহুদিন নিরুদ্দেশ। সে জন্য তাহার মনের এক প্রান্তে ছাত্রীর জন্য সমবেদনার রেখাপাত হইলেও, সে এক দিনও শান্তির পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রশ্ন করে নাই। শান্তির কে পিতা, মাতা আছেন কি না, শ্বশুরালয় কোথায়, স্বামীর নাম ও পরিচয় কি, এ সব বিষয়ে প্রশ্ন করিবার কৌতূহলও চঞ্চলের হইত না। সে উহা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ও অনধিকার-চর্চ্চা বলিয়া মনে করিত। এক জন নারী তাহার নিকট হইতে সাহিত্যের ও রসতত্ত্বের একটা বিশিষ্ট বিষয় শিখিতে চাহে, সে তাহার সাধ্যমত সেই বিষয়ে শিক্ষা দিয়া যাইবে, ইহাই হইতেছে শান্তির সহিত তাহার সম্বন্ধ। বিশেষতঃ জীবনে এই যুবতী যদি এই শিক্ষাব্যাপার লইয়া আনন্দ পায়, তবে সে আনন্দদান বিষয়ে কৃপণতা করা মনুষ্যত্বের বিরোধী।

সে দিন আকাশে তখনও মেঘ জমিয়াছিল। বর্ষণক্লান্ত মেঘ, স্তব্ধ আকাশ ও প্রকৃতি যেন একটা দুঃসহ বেদনাভারে মূর্চ্ছাতুর। মানুষের মন ও বাহ্য প্রকৃতির মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। তাই কি আজ শান্তির মুখে অস্বাচ্ছন্দ্যের ছায়া পড়িয়াছিল?

চণ্ডিদাসের একটি পদ ব্যাখ্যা করিতে করিতে চঞ্চলকুমার একবার নয়ন তুলিয়া ছাত্রীর দিকে চাহিল। তরুণীর স্বভাবসুন্দর কমনীয় মুখে অন্যদিন যে নীরব প্রসন্নতার মধুর শ্রী সমুজ্জ্বলভাবে দীপ্তি পায়, আজ তাহা নাই।

চঞ্চল বইখানি টেবলের উপর রাখিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার শরীরটা কি আজ ভাল নেই?"

শান্তি মুখ নত করিয়া বলিল, "আমি ত ভালই আছি।"

দুইবার প্রশ্ন করা চঞ্চলের স্বভাববিরুদ্ধ। সে আর কোনও প্রশ্ন করিল না। কিন্তু সে সহসা অনুভব করিল, তাহার ছাত্রীর জন্য অনুকম্পায় তাহার হৃদয়ের এক প্রান্ত যেন চঞ্চলতা অনুভব করিতেছে। এরূপ অনুভূতি পূর্ব্বে কোনও নারীর জন্য সে অনুভব করে নাই।

চঞ্চলকুমার বইখানি তুলিয়া লইয়া বলিল, "যদি পড়তে আজ ভাল না লাগে, তা হ'লে—"

শান্তি স্মিত হাস্য সহকারে বলিল, "না, না, ভালই লাগছে, আপনি পড়ুন, মাষ্টার মশাই।"

"মাষ্টার মশাই" !—চঞ্চলকুমার বলিল, "দেখুন, আমি আপনাকে পড়াই ব'লে আমাকে মাষ্টার মশাই ব'লে ডাকা আমি পছন্দ করিনে। শিক্ষক ও ছাত্রীর মধ্যে একটা অনবদ্য বন্ধুত্বের সম্বন্ধ আছে। আমি সেই পবিত্র বন্ধন বা সম্পর্ককে শ্রদ্ধা করি। আপনি আমাকে বন্ধুজন ব'লে মনে করতে পারেন।"

শান্তি এত দিন পাঠ্য বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে চঞ্চলকুমারের সহিত আলোচনা করে নাই। আজ সে মৃদু হাসিয়া সপ্রতিভভাবে বলিল, "নারী ও পুরুষের মধ্যে বান্ধবতা—অনবদ্য মিত্রতা হ'তে পারে ব'লে আপনি বিশ্বাস করেন, স্যার?"

বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ভাদ্রের আকাশে যে মেঘ জমিয়াছিল, তাহা গলিয়া তখন আবার বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

বাতায়নপথে বাহিরের অন্ধকারের দিকে একবার চাহিয়া চঞ্চলকুমার চেয়ারের উপর নড়িয়া চড়িয়া সোজা হইয়া বসিল। তার পর অচঞ্চল কণ্ঠে বলিল, "আমি ত খুবই সম্ভবপর ব'লে মনে করি। আপনার কি সে বিশ্বাস হয় না?"

তেমনই শান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া শান্তি বলিল, "আপনার এমন বান্ধবী ক'জন আছেন ?"

প্রশ্নের অন্তরালে কি বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন ছিল ? চঞ্চল শান্তির দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া কি দেখিল। না, এই শান্ত-প্রকৃতির মেয়েটি প্রগল্‌ভা নহে। তাহার আননে গোপন বিদ্রূপের বিন্দুমাত্রও রেখাপাত হয় নাই।

চণ্ডিদাস-পদাবলীখানা টেবলের উপর মুড়িয়া রাখিয়া চঞ্চল বলিয়া উঠিল, "আজ পর্য্যন্ত বান্ধবী ব'লে স্বীকার করবার মত অন্য কোন নারীর পরিচয় আমি পাইনি।"

শান্তির সমগ্র দেহে যেন একটা মৃদু চাঞ্চল্য-বেগ অনুভূত হইল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আজ বাদলার দিনে এক পেয়ালা চা আন্‌তে বলব কি ?"

গম্ভীরভাবে চঞ্চলকুমার বলিল, "তা বলুন। এ সময়ে গরম চা মন্দ লাগবে না। কিন্তু আপনি অত ব্যস্ত হবেন না।"

শান্তি মন্থরগতিতে অন্দরের দিকে চলিল। তাহার অঙ্গের নীলাম্বরী শাড়ীর জরীর অঞ্চলটা বিদ্যুতের আলোকে ঝলমল করিয়া উঠিল।

চঞ্চলকুমার বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। বৃষ্টির রিম্‌-ঝিম্‌ শব্দ সন্ধ্যার অন্ধকারে একটা সঙ্গীতের সুর যোজনা করিয়াছিল। সে সুরে যেন কত অব্যক্ত ভাব-তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। দর্শন শাস্ত্রের সঙ্গে চঞ্চল-কুমার মনস্তত্ত্বের বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিল। সে মানব-মনোবৃত্তির সূক্ষ্মতম জটিল সমস্যার সমাধান করিতে ভাল-বাসিত। নিজের হৃদয়কে সে বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করিল।

মিনিট দশেকের পর সে সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল। বারান্দায় দাঁড়াইয়া সে ডাকিল, "বেহারা!"

পরিচারক শম্ভু বারান্দার এক কোণে মাদুরের উপর শুইয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেছিল। চঞ্চলের ডাকে সে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাড়াতাড়ি ফাউন্টেনপেন খুলিয়া একখানি কাগজে চঞ্চল লিখিল—"আমাকে মাপ করবেন। চা-র জন্য অপেক্ষা করবার ধৈর্য্য রইল না। আমি আজ বাড়ী চললুম। কাল দেখা হবে।"

কাগজখানা শম্ভুর হাতে দিয়া সে বলিল, "দিদিমণিকে ওখানা দিও। আমি এখন বাড়ী যাচ্ছি।"

সে দাঁড়াইল না। গাড়ী-বারান্দায় তাহার মোটর অপেক্ষা করিতেছিল। তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিয়া সে সোফারকে গাড়ী চালাইতে আদেশ দিল।

আলো জ্বলিয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তে মোটর রাজপথে আসিয়া গুরু শব্দে ছুটিয়া চলিল।

৮

শান্তিকে সে বান্ধবীর আসনেই ছাড়িয়া দিয়াছিল। ইহাতে চঞ্চলকুমারের নিঃসঙ্গ অন্তর যেন প্রীতিপ্রফুল্ল হইয়া উঠিয়া-ছিল। ছাত্রীর সহিত শিক্ষকের বান্ধবতা থাকিতে কোনও দোষ আছে, ইহা সে পূর্ব্বেও স্বীকার করিত না, এখনও করিল না। পিতার সহিত পুত্রের বান্ধবতা যখন দোষাবহ নহে, তখন ছাত্রীকে বান্ধবী বলিয়া মনে করিলে মহাভারত অশুদ্ধ হইবে কেন ? অবশ্য তাহার বহু পরিচিত ও বন্ধুজনের নারী বান্ধবী আছে, কিন্তু তাহারা যে দৃষ্টিতে তাহাদের বান্ধবীদিগকে দেখে বা তাহাদের সহিত আলাপ-ব্যবহার করে, চঞ্চলকুমার শান্তিকে সে শ্রেণীর বান্ধবী বলিয়া মনে করিত না। অসঙ্কোচে পুরুষ যদি নারীর সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা করিতে না পারিল, তবে তাহার শিক্ষা ব্যর্থ। জ্ঞান মানুষকে উন্নত করে, হৃদয়কে উদার, মহৎ ও পবিত্র করিয়া তুলে। যৌন সম্পর্ককে দূরে পরিহার করিয়া পুরুষ যদি নারীর সহিত অকুণ্ঠমনে মেলা-মেশা করিতে না পারিল, তবে তাহার পৌরুষ কোথায় ? এই ভাবে নিজের মনকে গড়িয়া তুলিয়া সে শান্তির সহিত বান্ধবের ন্যায় নানা বিষয়ের আলোচনা করিত। আত্মার সহিত আত্মার উন্নততম স্তরে যে পরিচয় ঘটে, তাহাই বান্ধবতার নিদর্শন। সরল স্বচ্ছন্দভাবে সে শান্তির সহিত অধ্যাপনার অবকাশে নরনারীসম্পর্কিত উচ্চাঙ্গের বিষয় আলোচনা করিত।

প্রথমতঃ সে ইহাতে একটা তৃপ্তি ও আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। সে আধুনিক যুগের বহু মনীষী লেখকের রচনা পাঠ করিয়াছিল। বার্ণার্ড শ, ইবসেন, রোমা-রোলাঁ, ওপেনহিম প্রভৃতির রচনাবলী লইয়া শান্তির সহিত আলোচনা করিত। চণ্ডিদাসের বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিত—"সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই।" মানবতার দাবীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং তাহাই পরম সত্য।

সব কথা শান্তি বুঝিত কি না, বলা যায় না। তবে সে নিবিষ্টমনে চঞ্চলের আলোচনা শুনিয়া যাইত।

সে দিন চঞ্চলকুমার নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্ব্বেই ছাত্রীকে পড়াইতে আসিল। ভৃত্য জানাইল, সকলেই কি একটা কাযে বাহিরে গিয়াছেন, শীঘ্রই ফিরিবেন। মাষ্টার মহাশয় কি ঘরের মধ্যে বসিবেন? না, বাহিরের ছোট ফুলবাগানে একখানা চেয়ার আনিয়া দিবে?

আশ্বিনের প্রথম। আকাশে মেঘ ছিল না। পূর্ণিমার চন্দ্র পূর্ব্বাকাশে দেখা দিয়াছে। ঝির-ঝির করিয়া বাতাস বহিতেছিল। ভিতরে বিজলী-পাখার বাতাস অপেক্ষা মুক্ত আকাশতলে স্নিগ্ধ বাতাসের স্পর্শ চঞ্চলকুমারের স্পৃহণীয় বোধ হইল।

শম্ভু একখানি আরাম-কেদারা টানিয়া আনিল। চঞ্চলকুমার আরাম করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল। পল্লীতে তেমন কলরব নাই। স্নিগ্ধ বাতাস বড় মিঠা লাগিতেছিল। অধ্যয়নক্লান্ত মস্তিষ্ক শান্ত সন্ধ্যায় শীতল হইল। ধীরে ধীরে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

কতক্ষণ সে ঘুমাইয়াছিল, তাহার হিসাব ছিল না। সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইতেই সে দেখিল, জ্যোৎস্না-ধারায় বাগানটি ভরিয়া উঠিয়াছে। সোজা হইয়া বসিতেই সে দেখিল, তাহার ছাত্রী শান্তিদেবী মন্থরগতিতে তাহার দিকে আসিতেছে। জ্যোৎস্নার প্লাবন তরুণীর দেহে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল।

"খুব ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। আপনারা কখন্ ফিরলেন?"

শান্তি বলিল, "খানিক আগে। আপনি বেশ ঘুমুচ্ছেন দেখে ডাকিনি। এখন এক পেয়ালা কোকো খান না। আনতে ব'লে দিয়েছি।"

চঞ্চলকুমার আপত্তি করিল না। ভৃত্য আসিয়া একখানি টিপয় রাখিয়া গেল। একটি পাত্রে কিছু সিঙ্গাড়া ও এক পেয়ালা কোকো আসিল।

চঞ্চল বলিল, "এ সব আবার কেন?"

শান্তি মৃদুস্বরে বলিল, "শুনেছি, আপনি সিঙ্গাড়া ভালবাসেন। আজ ফিরে এসেই কখানা ভেজেছি।"

চঞ্চল কৌতুকভরে বলিল, "আমি সিঙ্গাড়া ভালবাসি, কে আপনাকে বল্লে? আপনি জানলেন কি ক'রে, শান্তি দেবি?"

তেমনই মৃদু কণ্ঠে শান্তি বলিল, "বা! আপনি আমাকে বান্ধবী বলেন। আর বান্ধবী হয়ে আপনার কি ভাল লাগে না লাগে, সেটা জানা কি এমনি অসম্ভব ব্যাপার?"

চঞ্চল কোনও উত্তর না দিয়া সিঙ্গাড়ার সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল। শম্ভু আর একখানা চেয়ার আনিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। শান্তি তাহাতে বসিল।

চর্ব্বণরত চঞ্চল বলিল, "অরুণ বাবু কোথায় গেলেন? তিনি বাড়ী ফেরেন নি?"

"আমাদের নামিয়ে দিয়ে তিনি একটা জরুরী কাযে চ'লে গেছেন। ফিরতে দেরী হ'তে পারে।"

চঞ্চল একবার দ্বিতল অট্টালিকার দিকে চাহিল। উপরে ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বলিতেছিল। বাহিরে চন্দ্রালোকের রজত-ধারা!

কোকোর পেয়ালায় চুমুক দিয়া চঞ্চল বলিল, "আজ আপনার পড়ার দেরী হয়ে গেল। বোধ হয় ৯টা বাজে।"

সঙ্গে সঙ্গে সে করপ্রকোষ্ঠের ঘড়ীর দিকে চাহিয়া বলিল, "পাঁচ মিনিট বাকি। উঃ! প্রায় ছ'ঘণ্টা ঘুমিয়েছি। ভারী অন্যায়।"

শান্তি বলিল, "আজ আর নাই বা পড়ালেন। আপনার শরীরটা বোধ হয় আজ ভাল নেই। ঘুম পেয়েছিল, ঘুমিয়েছেন। তাতে অন্যায় হবে কেন?"

কেন? প্রশ্নটা চঞ্চলের মনে হইতেই সে কোকোর পেয়ালাটি নামাইয়া রাখিল। আজ নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্বেই সে কেন এখানে আসিয়াছিল? এই কার্য্যের অন্তরালে মনের এই বাসনার স্বরূপ কি? এই বিবাহিতা সুন্দরী তরুণীকে তাহার ভাল লাগিয়াছে বলিয়াই কি সে আগ্রহভরে আসে নাই?

কিন্তু মনের মধ্যে দ্বিধা জাগিবামাত্র সে যেন শিহরিয়া উঠিল।

এই তরুণী, স্বামিসৌভাগ্যবঞ্চিতা সুন্দরীকে সে শিক্ষাদানের অবকাশে সঙ্গিনী বান্ধবী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এ স্বীকৃতি তাহার অন্তরের মধ্য হইতেই স্বেচ্ছায় আসিয়াছে। অপর পক্ষ হইতে কোনও অনুরোধের ইঙ্গিত পর্য্যন্ত ছিল না।

আজ এই জ্যোৎস্না-পুলকিত রাত্রিতে অদূরে উপবিষ্টা তরুণী বান্ধবীকে অন্তরজগতের উন্নততম স্তরে প্রতিষ্ঠিতা করিয়াও সে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছে না, এ সত্য

তাহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল। তাহার হৃদয় আরও যেন কিছু প্রত্যাশা করে।

কিন্তু সে কি প্রত্যাশা? অপরের বিবাহিতা পত্নীর নিকট হইতে সত্যনিষ্ঠ মন, মানুষের একান্ত কাম্য ধর্ম্ম, মনুষ্যত্ব কি প্রত্যাশা করিতে পারে?

আলোড়িত অন্তরে সে শান্তিদেবীর দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিল। সেই কমনীয় শান্ত আননে রূপজ্যোৎস্নার অনাবিল মাধুর্য্যের সহিত পূর্ণচন্দ্রের বিমলদীপ্তি মিশিয়া গিয়াছিল। এই নারীকে যেন তাহার পরম রহস্যময়ী বলিয়া মনে হইল। তাহার আয়ত নেত্রের অন্তরালে যেন একটা নূতন অপরিচিত জগতের আভাস রহিয়াছে।

চঞ্চলের শিক্ষিত মন যেন চাবুকের আঘাতে শিহরিয়া উঠিল। বিদ্যুৎবিকাশের মত তাহার মনে হইল, মানব-মনের চিরন্তন দুর্ব্বলতা আজ যেন তাহাকে বিমূঢ় করিয়া ফেলিয়াছে।

প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে সে মনকে তিরস্কার করিয়া উঠিল। না, ইহা অন্যায়, অসঙ্গত, অশোভন।

কেদারা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, "পড়া আজ থাক, শান্তি দেবি! সত্যই আমার শরীরটা ভাল নেই।"

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই সে তাড়াতাড়ি নিজের মোটরে গিয়া উঠিল। সেখান হইতে সে দেখিল, তাহার ছাত্রী তেমনই নিস্পন্দভাবে চেয়ারে বসিয়া রহিয়াছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস চঞ্চলের নাসারন্ধ্রপথে বাহির হইয়া গেল। তখন মোটর বাড়ীর ফটক ছাড়াইয়া গিয়াছে।

৫

রবিবারের সকালে বৈঠক বসিয়াছিল। বন্ধুর দল চা-বিস্কুটের সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনায় বৈঠকখানা-ঘরটিকে কোলাহল-মুখর করিয়া তুলিয়াছিল। অরুণচন্দ্রও সে দলে ছিল। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, কথা-সাহিত্য, কবিতা—অজস্র বিষয়ের আলোচনা চলিতে চলিতে বর্ত্তমান যুগের যৌন-সমস্যা লইয়াও বিতণ্ডা চলিতে লাগিল। পুরুষের সহিত নারীর যৌনসম্পর্ক যে অনতিক্রমণীয়, সে কথা কয়েক জন বন্ধু জোর গলায় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিল।

চঞ্চলকুমার অন্যদিন এ বিষয়ের তুমুল আলোচনায় অখণ্ড যুক্তি-প্রমাণ প্রয়োগ করিত; কিন্তু আজ সে একটি কথাও বলিল না।

অরুণচন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিল, "মিঃ রায়, আজ যে কথা কইছেন না?"

চঞ্চল গম্ভীরভাবে বলিল, "অরুণ বাবু, আপনি আমাকে মিঃ রায় ব'লে লজ্জা দেবেন না। আমার একটা নাম আছে, আপনারও তা অজানা নেই।"

"মাপ করবেন, চঞ্চল বাবু, ওটা আমার অভ্যাস-দোষ। এবার থেকে আর ভুল হবে না। কিন্তু আজ এমন মুখ-রোচক আলোচনায় আপনি যোগ দিচ্ছেন না দেখে আমার যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে!"

পরেশ বলিল, "কদিন থেকে চঞ্চলকে একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে।"

পরেশ চঞ্চলের বাল্যবন্ধু। একসঙ্গে বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। একই গ্রামে বাড়ী। সে জাপানে কয় বৎসর ছিল। মাস দশেক হইল কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু যে ব্যবসায় শিখিয়া আসিয়াছিল, তাহার জন্য মূলধনের প্রয়োজনে তাহার পাঞ্জাবস্থিত কোন আত্মীয়ের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল। এক সপ্তাহ হইল, সেখান হইতে সে ফিরিয়াছে। বন্ধুর বিবাহে সেও নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। বন্ধু-সমাজের আর কেহ চঞ্চলের বিবাহের কথা জানিত না। বন্ধুর অনুরোধে সে এ যাবৎ সে প্রসঙ্গের কথা কাহারও সহিত আলোচনা করে নাই।

পরেশের কথায় চঞ্চল একবার তাহার দিকে চাহিল।

পরেশ বন্ধুর পাশে চেয়ার টানিয়া লইয়া অন্যের অশ্রাব্য স্বরে বলিল, "এবার স্ত্রীকে এখানে আনিয়ে নেও। আর এ রকম ভাবে থাকা তোমার উচিত নয়। তোমার শ্বশুর মশাইয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, তাঁরা বোধ হয় শীঘ্র আসছেন!"

কথাটা বলিয়াই সে চঞ্চলের মুখের দিকে নিবিষ্টভাবে চাহিয়া রহিল।

চঞ্চল কি সে কথায় শিহরিয়া উঠিল? পরেশ ঠিক বুঝিতে পারিল না। সেই সময় অরুণচন্দ্রের সহিত তাহার দৃষ্টি-বিনিময় হইল।

অরুণ হাসিমুখে বলিয়া উঠিল, "কৈ চঞ্চল বাবু, আপনার কথামত—যৌন-সমস্যা, নারী-বান্ধবী সম্বন্ধে, আপনার

অভিজ্ঞতার পরিচয় পাবার জন্য সত্যি আমরা ব্যগ্র হয়ে আছি।"

চঞ্চলের মুখের গাম্ভীর্য্য পূর্ব্ববৎই অক্ষুণ্ণ রহিল। পরেশ বলিল, "সাধনমার্গে পুরুষ ও নারী যদি উন্নততর স্তরে না পৌঁছুতে পারে, তা হ'লে নারীর সঙ্গে পুরুষের যৌন-সম্পর্কের আশঙ্কাই প্রবল হয়ে পড়ে। কেমন, চঞ্চল, এতে তোমার আপত্তি আছে?"

চঞ্চলকুমার কোন উত্তর দিল না।

এমন সময় নেপালী দ্বারবান্ একখানি ডাকের চিঠি আনিয়া প্রভুর হস্তে অর্পণ করিল।

খাম খুলিয়া পড়িবার পর তাহার মুখে একটা পাণ্ডুর ভাব ফুটিয়া উঠিল। গোয়ালিয়র হইতে শ্বশুর লিখিয়াছেন, আজই তাঁহারা কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিবেন। সর্ব্বনাশ! তাহার বিবাহিতা স্ত্রীও তাহা হইলে আসিতেছে! অথচ তাহার সহিত চঞ্চলের কোনও পরিচয় নাই!

বন্ধুর দলকে বসিতে বলিয়া সে তাড়াতাড়ি তাহার পাঠ-কক্ষে প্রবেশ করিল। দ্রুতহস্তে একখানি পত্র লিখিয়া খামে আঁটিয়া সে বন্ধুদের কাছে ফিরিয়া আসিল। অরুণচন্দ্রকে এক পাশে ডাকিয়া আনিয়া সে পত্রখানি শান্তি দেবীকে দিবার জন্য অনুরোধ করিল। আজ সে পড়াইতে যাইতে পারিবে না, সে কথাটিও বলিতে ভুলিল না।

বেলা হইয়াছে দেখিয়া বন্ধুর দল অবশেষে সভা ভঙ্গ করিল।

* * * *

আজ ধোঁয়ে মেলেই সে কলিকাতা ত্যাগ করিবে। আর এখন এখানে থাকা তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে—কোন-মতেই নহে। শান্তি দেবীকে শিষ্যা হইতে বান্ধবীর আসনে বসাইয়া সে ভুলই করিয়াছে। সাধক তপস্বীরা যাহা পারেন, ভোগবিলাসের মধ্যে থাকিয়া শুধু উচ্চ মনের দোহাই দিয়া সে কার্য্য করা অসম্ভব। রজকিনী সম্বন্ধে সাধক চণ্ডিদাসের যে অনবদ্য প্রেম ভক্তির মাধুর্য্যে অপরূপ শ্রী ধারণ করিয়াছিল, তাহা সাধারণ মানুষের পক্ষে কল্পনারও অতীত। মানুষ যত জ্ঞানই অর্জ্জন করুক, যত বড় পণ্ডিতই হউক, উপযুক্ত কঠোর সাধনা ব্যতীত কখনই অন্য নারীর সহিত বান্ধবতা বজায় রাখিতে পারিবে না। কামগন্ধ অজ্ঞাতসারেই তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিবে।

সে যদি শান্তি দেবীর সান্নিধ্য ত্যাগ না করে, তাহা হইলে সেও তাহার অন্য সাধারণ বন্ধুর ন্যায় বান্ধবীর মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবে না। সুতরাং পলায়নই একমাত্র পথ। বিশেষতঃ তাহার স্ত্রী আসিতেছে। তাহাকে গ্রহণ ও বর্জ্জন উভয়ই তাহার পক্ষে সমান কঠিন কার্য্য। যাহার অন্তরের সহিত তাহার কোনও পরিচয় নাই, যে সম্পূর্ণরূপে তাহার কাছে অপরিচিত; এত শীঘ্র তাহাকে সে সহ্য করিতে পারিবে না।

বিদেশভ্রমণের উপযোগী ব্যবস্থা করিয়া অপরাহ্নে সে পরিশ্রান্ত দেহে চেয়ারে বসিয়া পড়িল। একটা সিগার ধরাইয়া লইয়া চঞ্চলকুমার নিবিষ্টমনে চিন্তা করিতে বসিল।

নিমীলিত-নেত্রে সে চিন্তা করিতেছে, এমন সময় তাহার মনে হইল, কে যেন তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। কাহার বস্ত্রের খস্-খস্ শব্দও তাহার কাণে গেল।

চকিতে চাহিয়া মুখ ফিরাইবামাত্র সে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল।

"শান্তি দেবি! আপনি এখানে—আমার—"

স্মিতমুখে হাস্যময়ী সুন্দরী বলিল, "বন্ধুর বাড়ীতে কি বান্ধবীর আস্তে নিষেধ আছে?"

এই তরুণী ত পূর্ব্বে এমন প্রগল্‌ভা ছিল না!

স্খলিত-কণ্ঠে চঞ্চল বলিল, "জানেন ত, আমার বাড়ীতে কোন স্ত্রীলোক নেই। আপনার মত—"

তেমনই সুধা-বৃষ্টি করিয়া তরুণী বলিল, "কিন্তু বান্ধবী ত সাধারণ নারী হ'তে অনেক উপরে। বাহিরের লোকাচার কি সত্যি সেখানে দরকার?"

তার পর সুটকেশ, হোল্‌ডঅল প্রভৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শান্তি বলিল, "সত্যি সত্যি কি আপনি পালাবার মতলব করেছেন না কি? কিন্তু যদি আপনাকে যেতে না দেই?"

চঞ্চল শিহরিয়া উঠিল। স্বামিবঞ্চিতা এই তরুণী এ কি কথা বলিতেছে? তাহার মনের স্পর্শ কি এই যুবতীকেও এমন অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে?

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই দ্বারপার্শ্বে দণ্ডায়মান অরুণচন্দ্র ও তাহার পশ্চাতে আর একখানি সাড়ীর অঞ্চল দেখা গেল।

"অরুণ বাবু, আপনি? এ সব—"

"উনি আমারই গৃহলক্ষ্মী, আপনারও মধুর সম্পর্কীয়া—শান্তি দেবীর ছোট বোন্। এ দিকে এস, প্রীতিলতা।"

চঞ্চলকুমার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

অরুণ বলিল, "আর কেন, দিদি। আপনি যে সুলতা, সে খবর আর চেপে রেখে ফল নেই। শ্বশুরমশাই, শাশুড়ী ঠাকরুণ নীচের ঘরেই ব'সে আছেন। পরেশ বাবুও রয়েছেন। চঞ্চলদা, আপনার নেপালী চাকর খবর দিতে আস্‌ছিল, কিন্তু বকশিসের লোভে তাকে আর উপরে আসতে হয় নি। বিশেষতঃ সে পরেশকে ও আমায় ভাল করেই আপনার বন্ধু ব'লে জানে। আমি বলেছি, তার মাঈজী ইনি।"

ধীরে ধীরে আশ্বস্ত হইয়া চঞ্চলকুমার স্খলিতকণ্ঠে বলিল, "কিছুই ত বুঝতে পারছি না। এ কি হ'ল?"

"বুঝতে পারছেন না? শান্তি দিদি ওরফে সুলতা আপনার সহধর্ম্মিণী। কিন্তু আপনার মতিগতির কথা ভাল ক'রে জানতে পেরে শ্বশুর মশাই ওঁকে আমার কাছেই পাঠিয়ে দেন। উনি আপনার ছাত্রী হলেন। সেটা অবশ্য আমারই উদ্যোগে। তার পর বান্ধবীতে প্রমোশন। শনি-মহারাজ আপনার অনুকূল দেখে, আমরা সবাই আর আপনাকে এত দিন বেশী পীড়াপীড়ি করিনি। শুধু যৌন সম্পর্ক সমস্যাটা কি রকম ব্যবস্থা করে, শনি-মহারাজের বিরূপতা সত্ত্বেও, সেটা পরখ করবার ইচ্ছে হয়েছিল। এখন সুলতা দি, আপনি বান্ধবের কাছে থাক্‌বেন, না আমাদের সঙ্গে ফিরে যাবেন?"

প্রীতিলতা আগাইয়া আসিয়া বলিল, "জামাই বাবু কি বলেন?"

চঞ্চলকুমার একবার নবাগতা তরুণীর দিকে, তার পর গভীর দৃষ্টিতে উত্তরকালের বান্ধবী শান্তি দেবীর দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি আমাকে ক্ষমা করবে কি?"

সুলতা হাসিয়া বলিল, "এখন ত বেশ তুমি বল্‌তে পারছেন! অভ্যাস বদলে গেল কি ক'রে, স্যার?"

অরুণ বলিল, "তা অমন মত বদলায়, সুলতা দি।"

"না, না, বড় অপরাধ হয়ে যাচ্ছে। বাবা মাকে আগে ডেকে নিয়ে আসি। তাঁদের কাছে অনেক অপরাধ করেছি।"

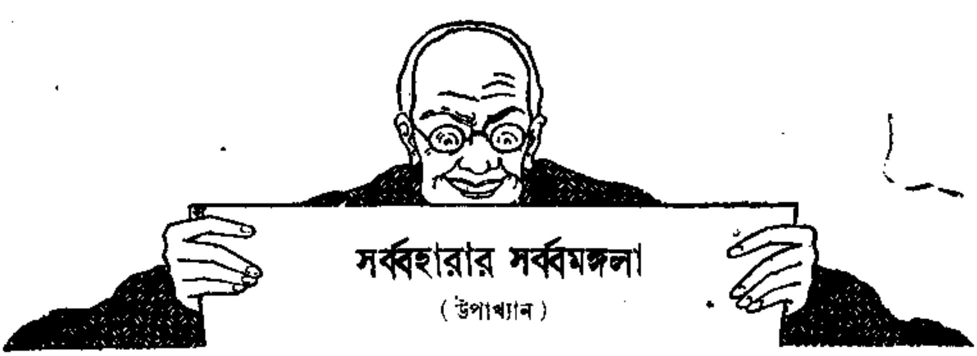
দ্রুত-লঘুচরণে চঞ্চলকুমার যেন উড়িয়া নীচে নামিয়া গেল।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

বিত্তহীন

হাতে ছিল অর্থ মোর, ভেবেছিনু
বুঝি বা "আমার",
ঘুচাইলে অহমিকা, ঘুচাইলে
মোহের বিকার!
কাড়ি লয়ে, অর্থ মোর,
নিমেষের ভুলে,
ডুবালে আমারে তুমি,
অকূলে, অতলে;
ভেঙ্গে গেল মিথ্যা অভিমান,
শুনিলাম তোমার আহ্বান,
পথের ধূলায় দীনতার মাঝে,
বিভব হারিয়ে, ভিখারীর সাজে,
আমারে সাজালে তুমি,
রাজার আসন ছাড়ি চিরতরে,
ঐশ্বর্য্য-গরিমা ফেলি দিয়া দূরে,
ধূলায় আসিনু নামি!

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।



সর্ব্বহারার সর্ব্বমঙ্গলা

(উপাখ্যান)

পশ্চিম-বঙ্গের সর্ব্বাণী গ্রামের ঘোষালদের এক সময় খুব বোল-বোলাও ছিল। সে সময় ইঁহারাই ছিলেন গ্রামের জমিদার। সর্ব্বমঙ্গলা ইঁহাদের কুলদেবী,—দেবীর রূপ ঠিক দশভুজা দুর্গার মতই। সম্বৎসর ঘটে কুলদেবীর অর্চ্চনার ব্যবস্থা, শারদীয় দেবীপক্ষে যথারীতি প্রতিমা গড়িয়া ধূমধাম করিয়া সর্ব্বমঙ্গলা-দুর্গোৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে।

কালক্রমে ঘোষাল-বংশ সরিকানি বিবাদে ছন্নছাড়া হইয়া পড়ে এবং সেই সুযোগে কোনও এক সরিকের অবস্থাপন্ন দৌহিত্র উত্তরাধিকারসূত্রে মাতামহের সম্পত্তি-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সরিকদের অংশগুলিও ক্রয় করিয়া ঘোষালবংশের জরাজীর্ণ বাস্তু-ভিটার উপর জাঁকিয়া বসেন। পুরুষানুক্রমে ঋণগ্রস্ত জমিদারির হারাহারি অংশ প্রায় প্রত্যেক সরিকই নবাগত উত্তরাধিকারীকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কেবল একমাত্র সরিক সত্যহরি ঘোষাল তাঁহার অংশটুকু কিছুতেই বিক্রয় করেন নাই। এক দিকে বারো আনা সম্পত্তির নূতন মালিক নিখিলেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা, অন্য দিকে সিকি অংশের মালিক সত্যহরির কৌলিক বৈভবের এই শেষ নিদর্শন বজায় রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা—সে অঞ্চলে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল।

সরিকদের মধ্যে সত্যহরি ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ ও একান্ত ধর্ম্ম-নিষ্ঠ, তজ্জন্য দৈনন্দিন ও বাৎসরিক কৌলিক পূজার সম্পূর্ণ ভার তাঁহার উপরেই অর্পণ করিয়া জ্ঞাতিগণ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। বিঘা দশেক ধানজমি দেবোত্তর সম্পত্তিরূপে সর্ব্বমঙ্গলার সেবার জন্য বাঁধা ছিল। ঘোষাল মহাশয় তাহার যাহা কিছু উপস্বত্ব, সমস্তই মায়ের সাম্বৎসরিক মহোৎসবে ব্যয় করিতেন এবং সারা বৎসর ধরিয়া যাহা কিছু সঞ্চয় করিতেন, সমস্তই মায়ের সেবায় নিঃশেষ করিয়া দিতেন। অজন্মা বা বন্যার বৎসরেও মায়ের পূজায় যথাযথ অনুষ্ঠানের কোনও ত্রুটি দেখা যাইত না, স্বয়ং ঋণ করিয়াও বহু ব্যয়সাধ্য এই কৌলিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া তিনি ঘোষালবংশের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিতেন।

প্রাচীন ঘোষালবংশের বিশাল প্রাসাদের পুরোভাগেই ছিল প্রতিষ্ঠাপন্ন ভূস্বামিকুলের উপযোগী সুবৃহৎ পূজার দালান। কিন্তু তাহাও কালক্রমে জীর্ণ হইয়া পড়ে এবং এক প্রচণ্ড ভূমি-কম্পে ছাদটুকুও নামিয়া যায়। বংশধরগণেরই তখন নাভিশ্বাস উপস্থিত, ছাদ তুলিবার জন্য ব্যয়ের অংশ বহনের সামর্থ্য যেমন অনেকেরই ছিল না, সে সম্বন্ধে যথাসাধ্য চেষ্টার লক্ষণও দেখা গেল না; বিগ্রহ তখন অনেকের নিকট নিগ্রহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, নিজ নিজ আস্তানা লইয়াই সকলে ব্যস্ত, বিগ্রহের আস্তানা—তাহাও আবার সাত জন সরিকের, মাথা দিবে কে? কথায় বলে—ভাগের মা গঙ্গা পান না!

সত্যহরি ঘোষাল একাই বুক দিয়া পড়িলেন, ছাদহীন দালানের উপর চালা বাঁধিয়া পূজার উৎসব চালাইয়া লইলেন। সেই ভাবেই পরবর্ত্তী কয়টি বৎসর চালার ছাউনি বাঁধা ভাঙ্গা দালানে মায়ের পূজা চলিয়া আসিতেছিল। তাহাতেও গোল বাধাইয়া বসিলেন নূতন বারো আনা সরিক নিখিলেশ্বর চক্রবর্ত্তী। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, জীর্ণ দালানটির উচ্ছেদ করিয়া হাল-ফ্যাসানের নূতন বৈঠক-খানা বানান। কিন্তু চার আনার সরিক সত্যহরি তাহাতে বাদী হইলেন। তিনি প্রবল আপত্তি তুলিয়া জানাইলেন,—দেড় শো বছর ধ'রে যেখানে সর্ব্বমঙ্গলার অধিষ্ঠান হয়ে আসছে, তার উচ্ছেদ হ'তে পারে না! সে আস্তানা বজায় রাখা চাই।

খিদিরপুরের ডকে ষ্টিভেডোরের কাযে নিখিলেশ্বর প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। টাকার গরমে তিনি তাঁহার এই বিপুল উপার্জ্জনের উপলক্ষগণ ছাড়া আর কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না। ঘোষালবংশের সকলেই তাঁহার নিকট মাথা মুড়াইয়া অনুগ্রহপ্রত্যাশী হইয়াছিলেন, একমাত্র সত্যহরি ঘোষালই যক্ষের মত তাঁহার কৌলিক প্রতিষ্ঠাটুকু আঁকড়াইয়া ছিলেন,—কিছুতেই পরিত্যাগ করেন নাই;—বৃদ্ধের এ ধৃষ্টতা বিত্তবান্ শক্তিশালী নিখিলেশ্বরের বুকে যেন সূচের মত বিঁধিতেছিল। শেষে যখন জীর্ণ দালানটির উপরও বৃদ্ধ সত্যহরির সরিকানির স্বত্বাধিকারসূত্রে রক্ষণশীলতার পরিচয় প্রকাশ পাইল, নিখিলেশ্বর তখন গর্জ্জন করিয়া সর্ব্বাণী গ্রামের সর্ব্বসাধারণকে শুনাইয়া দিলেন,—দালান আমি ভাঙ্গবই, এর জন্য লাখ টাকা তোলা রইল।

এ যুগের চতুরঙ্গবাহিনী সাজাইয়া নিখিলেশ্বর সত্যহরির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। মহকুমার ফৌজদারী আদালতে ঘোষাল মহাশয়ের বিরুদ্ধে চিটিং, ট্রেসপাশ, ডিফামেসন ও ব্রিচ অফ ট্রাষ্টের চার্জ্জ দিয়া কয়েক দফা মামলা রুজু হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ানী আদালতে স্বত্ব-সাব্যস্তের এক জটিল দরখাস্ত পড়িল।—দুর্দ্ধর্ষ নিখিলেশ্বরের তোড়জোড় দেখিয়া সর্ব্বাণী গ্রামের সর্ব্বসাধারণ চমকিয়া উঠিলেন, ঘোষালমহাশয় কিন্তু দমিলেন না; পূর্ণ উৎসাহে মামলার তদ্বিরে লাগিয়া গেলেন।

হিতৈষীরা বাড়ী বহিয়া আসিয়া পরামর্শ দিলেন,—ঘোষাল কি ক্ষেপে উঠলে, লড়ছ কার সঙ্গে? রফা কর।

ঘোষাল কিন্তু অটল, হাসিয়া উত্তর দিলেন,—মালিকের ইচ্ছা হলেই হবে।

হিতৈষী পক্ষ হইতে প্রশ্ন হইল,—সে ইচ্ছাটুকু গোড়াতেই হোক না কেন?

ঘোষাল মহাশয়ের মুখে বিকারের চিহ্নমাত্র দেখা গেল না, উত্তর আসিল,—লড়াই ত আমার মালিক বাধান নি, তিনি রক্ষা করবেন কেন ?

অপর এক বর্ষীয়ান্ একটু শ্লেষের সহিত যুক্তি প্রদর্শন করিলেন,—তা হ'লে নিজেই ঝক্কি মাথায় করছ কেন,—তোমার মালিকের ওপরই ভার দাও না।

এবার কঠিন হইয়া তীক্ষ্ণস্বরে ঘোষাল মহাশয় উত্তর দিলেন,—দুর্ব্বলের ভার তিনি সহজে নেন না। যে ভার এত দিন আমি মাথায় ক'রে এসেছি, আজ যদি একটা অবিশ্বাসী ছুঁচোর দপ-দপানিতে নামিয়ে দিয়ে মালিকের দোরে ধন্না দিয়ে পড়ি, তিনি যে আগেই আমাকে দেবেন শাস্তি ; চোখ রাঙিয়ে বলবেন দশপ্রহরণধারিণী দশভুজার পূজার উপচার এত দিন জুগিয়ে এসেছিস্ এই দুটো দুর্ব্বল হাতে !

কথাটা অতিরঞ্জিত হইয়া উঠিল নিখিলেশ্বরের কাণে। সেই দিনই তিনি তূণ হইতে আর একটি তীক্ষ্ণ বাণ বাহির করিলেন। পরদিনই সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া গেল, এ বৎসর হইতে পূজার যাবতীয় ভার আপনার হাতে লইবার জন্য নিখিলেশ্বর জজের আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন এবং তদনুসারে সত্যহরি ঘোষালের উপর জজের নোটিশ জারী হইয়াছে।

তথাপি সত্যহরি নির্ব্বিকার ও নিশ্চিন্ত। সকাল সকাল সর্ব্বমঙ্গলার পূজা সারিয়া, ভোগারতি সম্পন্ন করিয়া, দলিল-দস্তাবেজের দপ্তর-বগলে তিনি যখন আদালতের পথে পাড়ি দিতেন, সর্ব্বাণী গ্রামের আবাল-বৃদ্ধবনিতার সচকিত চক্ষুগুলি তখন এই অদ্ভুত পুরুষটির দিকে পড়িয়া রহিত, মনে বিস্ময়ের অন্ত থাকিত না। কিন্তু যাঁহাকে লইয়া গ্রামবাসী সর্ব্বসাধারণের বিস্ময়, তাঁহার সিন্ধুবৎ গভীর হৃদয়টির রহস্য কেহই নির্ণয় করিতে পারিতেন না।

ঘোষাল মহাশয় ভাবিতেন, আত্মরক্ষা যেমন জীবমাত্রের ধর্ম্ম, সম্পত্তিরক্ষাও তেমনই আত্মাভিমানীর অবশ্য কর্ম্ম। নিজের আস্তানাটুকু রক্ষা করিবার জন্য জীব-জন্তু কীট-পতঙ্গ প্রত্যেকেই সচেতন ; এই চেতনার অভাব অপমৃত্যুর পূর্ব্ব-লক্ষণ। তাঁহার দেহ, মন, পরিজন, ইহলোক, পরলোক—যথাসর্ব্বস্বের মালিক যখন সর্ব্বমঙ্গলা, সত্য ও ধর্ম্ম যখন তাঁহার অবলম্বন, তখন পরাজয় হইবে কেন ? তাই তিনি আত্মরক্ষার অদম্য উৎসাহে তাঁহার মালিকের নিকট সর্ব্বদাই প্রার্থনা করিতেন,—

দাসোঽহং শরণাগতঃ করুণয়া বিশ্বেশ্বরি ত্রাহি মাম্ !

* * * *

সত্যহরি ঘোষালের বৃহৎ পরিবার। সাধ্বী সহধর্ম্মিণী সত্যভামা, তিন পুত্র, পুত্রবধূগণ, কন্যা, দৌহিত্র, নাতি-নাতনীগণ, ঝি, চাকর প্রভৃতি পোষ্যবর্গের প্রাচুর্য্য ত আছেই, তাহার উপর অতিথি-অভ্যাগতের সমাগম প্রায়ই দেখা যায়। ঘোষাল মহাশয়ের পরিজনপূর্ণ এই সুবৃহৎ সংসারটির প্রতি সর্ব্বমঙ্গলার এমনই করুণা যে, চলার পথে তাহাতে কোনও প্রকার অশান্তি বা পারিবারিক অসদ্ভাবের ছায়াটুকুও কোনও দিন পড়িতে পায় না। বাড়ীর কর্ত্তা ও গৃহিণীর দুইটি হৃদয় যেন একই তারে গাঁথা। বাহিরের কোনও বড় কাযে হাত দিয়া কর্ত্তা যদি কখনও সে সম্বন্ধে গৃহিণীর কি মত জানিতে চাহিতেন, গৃহিণী বিস্ময়ে জড়-সড় হইয়া বলিতেন,—তুমি ভাল বুঝে যে কাযে হাত দিয়েছ, তাই-ই ভাল, এর বেশী আমি তোমাকে কি যুক্তি দিতে পারি বল ? ঘরে আছেন সর্ব্বমঙ্গলার ঘট, তোমার ঘটে তিনিই যে ভাল বুদ্ধি দিয়ে এসেছেন বরাবর। আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রে আর খোঁটা ক'র না।

আবার গৃহিণী যদি গৃহস্থালী সম্বন্ধে কোনও বিষয়ে কর্ত্তার মত জিজ্ঞাসা করিতেন, তিনিও তৎক্ষণাৎ হাসিয়া জানাইতেন,—বাইরের বিষয়সম্পত্তি নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে আমি যতটা পারি, তোমার গেরোস্থালী ব্যাপারেও ঠিক ততটা আমি আনাড়ী। আমার রাজ্যে রাজা আমি, তোমার রাজ্যেও তুমি তেমনই সর্ব্বময়ী। আমাকে জিজ্ঞাসা করা মিছে।

যে সংসারে কর্ত্তা ও গৃহিণীর মনোভাব এমনই মর্ম্মস্পর্শী, অহর্নিশ সেখানে কলহের কিচকিচি উঠিতে পারে না,—অভাব-অশান্তিও প্রভাব বিস্তার করিবার পথ পায় না। বাড়ীর অন্যান্য পরিবার ও পরিজনগণের প্রকৃতিও যথাযথভাবে আদর্শবাদের প্রেরণায় অনুরঞ্জিত।

সুতরাং সত্যহরি ঘোষাল যখন অকুতোভয়ে প্রবলপ্রতাপ নূতন লক্ষপতি ধনিক নিখিলেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সহিত মামলাযুদ্ধে অবতীর্ণ হন, তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও পরিজনবর্গের চিত্তগুলি ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় কিছুমাত্র বিক্ষুব্ধ হয় নাই,—মঙ্গলময়ী সর্ব্বমঙ্গলার ইচ্ছায় অনাগত কোনও মঙ্গলের জন্যই এই বিপত্তি উপস্থিত—গৃহস্বামী হইতে দাসদাসী পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই এই কথাটি অলঙ্ঘ্য সত্য-সাব্যস্ত করিয়া সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্বমঙ্গলার উপর নির্ভরপরায়ণ হইয়াছিল।

দীর্ঘকাল ধরিয়া মামলার পর মামলার প্রবাহ আদালতের বিভিন্ন সেরেস্তার ভিতর দিয়া উদ্দাম গতিতে গড়াইয়া চলিল। দুই ধনিকের চমকপ্রদ মোকদ্দমার বিবরণ জেলার মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল। প্রচুর পরিমাণে পয়সা ছড়াইতে পারিলে, হাকিমের বিচারে হারিয়াও অর্থহীন বিজয়ী প্রতিপক্ষকে কাবু করিতে পারা যায়। জলের মত টাকা ঢালিয়া নিখিলেশ্বর চক্রবর্ত্তী আদালতের ঘুঘুদিগকে ত মুঠার মধ্যে আনিয়াছিলেনই, উপরন্তু দেওয়াল-প্রাচীরের বুভুক্ষু কাণগুলির ভীষণ গহ্বর পর্য্যন্ত পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। ঘোষাল মহাশয়ের ভরসা মাত্র তাঁহার মালিক সর্ব্বমঙ্গলা। উৎকোচের আদান-প্রদান তাঁহার চক্ষুতে তুল্য অপরাধ, সুতরাং বাজে খরচের কিনারা দিয়াও তিনি চলিতেন না। কাযেই আদালতের ঘুঘুরা যে তাঁহার বাস্তুভিটায়ও ঘুঘু চরাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিবেন, ঘোষাল মহাশয় সে সম্বন্ধে সংশয় পোষণ না করিলেও সর্ব্বাণী গ্রামের শুভাকাঙ্ক্ষীদের তাহাতে সন্দেহের লেশমাত্র ছিল না।

ঘোষাল মহাশয়ের বিরুদ্ধে যে কয় দফা ফৌজদারী মামলা রুজু হইয়াছিল, একটি একটি করিয়া সবগুলিই ফাঁসিয়া গেল। প্রতিপক্ষ কিন্তু তাহাতে না দমিয়া চতুর্গুণ উৎসাহে উচ্চতর ও উচ্চতম আদালতে আপীল জুড়িয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ানীর চক্রব্যূহ এমন শৃঙ্খলায় রচিত হইল যে, সকলেই সাব্যস্ত করিয়া লইলেন—সত্যহরি ঘোষালের এ যাত্রা আর নিষ্কৃতি নাই।

মামলার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে অবশেষে ঘোষাল মহাশয়কে বাধ্য হইয়া কয়েক বন্দ ব্রহ্মোত্তর জমি বিক্রয় করিতে হইল। এই বিক্রয়-কোবালা রেজিষ্টারী হইবার কয়েক দিন পরেই আলিপুর

ফৌজদারী আদালত হইতে বেলিফ আসিয়া তাঁহার নামে এক সাংঘাতিক পরোয়ানা জারী করিয়া গেল। সমন পড়িয়া সত্যহরি ঘোষাল অবাক্‌। সম্প্রতি যে জমি তিনি বিক্রয় করিয়াছেন, সেই জমি নাকি সেখ আরজান নামে এক ব্যক্তিকে বিক্রয় করিবার সর্ত্তে তিনি তিন শত টাকা বায়না লইয়াছিলেন, সেই সূত্রেই এই ফৌজদারী কেস্‌!

কথাটা গ্রামময় রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না, আট মাসব্যাপী মামলা-যুদ্ধের মধ্যে নানাবিধ অস্ত্রই সত্যহরি ঘোষালের উপর প্রতিপক্ষ হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, কিন্তু এরূপ ভীতিপ্রদ শব্দভেদী বাণের সন্ধান এই প্রথম। গ্রামবাসীদের বিস্ময়ের অন্ত নাই, শুভার্থী হিতৈষীদের মুখে শুধু এই কথা,—ঘোষালের শেষে এই কুমতি হ'ল যে! ডুবে ডুবে জল খেয়ে এখন পেট একবারে ঢোল, —এখন সামলাবে কিসে, তাই বল!

চক্রবর্ত্তীর তরফ হইতে টিপ্পনী শোনা গেল,—রীতিমত চিটিং কেস, এবার চিচিং ফাঁক!

কিন্তু যাঁহাকে লইয়া এত ঘোঁট ও চর্চ্চা, তিনি এমন গভীর ব্যাপারেও নিশ্চিন্ত ও নির্ব্বিকার। সর্ব্বমঙ্গলার এজলাসে এই মিথ্যার এত্তেলা দিয়া, তিনি ভিন্ন জেলার সদরে দলিলদস্তাবেজ লইয়া যথাসময়ে এই নূতন মামলা-যুদ্ধের তদ্বির করিতে ছুটিলেন।

* * * *

তিন শো টাকার বায়না লইয়া যেখানে এই মামলা, বাদি-পক্ষ সেখানে তিন শো টাকা ফী দিয়া কলিকাতা হাইকোর্টের তিন জন নামী ব্যারিষ্টারকে আদালতের আসরে নামাইয়া সকলকেই চমৎকৃত করিয়াছিল। ঘোষাল মহাশয় বার-লাইব্রেরীর প্রত্যেক গাউনধারীকে পরখ করিয়া শেষে এক ধর্ম্মবিশ্বাসী বর্ষীয়ান্‌ মোক্তারকে দৈনিক দুই টাকা হারে দক্ষিণা দিবার সর্ত্তে নির্ব্বাচন করিয়া ফেলিলেন।

মামলা উঠিতেই বাদিপক্ষের কৌন্সলীরা ঘটা করিয়া অভি-যোগের বর্ণনাসূত্রে অসাধারণ মামলাবাজ আসামী জবরদস্ত ভূস্বামী সত্যহরি ঘোষালের ইতিহাস বিচারককে শুনাইয়া আদালত শুদ্ধ সকলকেই চমকিত করিয়া দিলেন। পক্ষান্তরে, বর্ষীয়ান্‌ মোক্তার মহাশয় হংসমধ্যে বকের মত গ্রীবা উচ্চ করিয়া তাঁহার মক্কেলের ধর্ম্মনিষ্ঠা, বয়ঃক্রম, বংশমর্য্যাদা প্রভৃতির প্রসঙ্গ তুলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইলেন যে, অভিযোগ সর্ব্বৈব মিথ্যা, প্রতিবাদীর সহিত কখনও কোনও সূত্রে তাঁহার দেখা-সাক্ষাৎ নাই, জাল বায়না-পত্র রচনা করিয়া তাঁহার নিরীহ মক্কেলকে এ ভাবে অনর্থক হায়রাণ করা হইয়াছে,—তাঁহার উপর অভিযোগের চার্জ্জ প্রযুক্ত হইতেই পারে না।

প্রতিবাদীর কৌন্সলীগণ তিন তুড়িতে বৃদ্ধ মোক্তারের আপত্তি উড়াইয়া দিলেন। তাঁহারা আসামীর সম্বন্ধে দৃঢ়তার সহিত এই কথাই কোর্টকে বুঝাইয়া দিলেন যে, সে এক জন রীতিমত মামলাবাজ, বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে এ সম্বন্ধে তাহার প্রতিষ্ঠা অসাধারণ; হুজুর যদি তদন্ত করেন, তাহা হইলে সবিস্ময়ে জানিতে পারিবেন যে, গত আট মাসের মধ্যে কতগুলি মামলার সহিত এই ভয়ঙ্কর মানুষটি ব্যাপকভাবে বিজড়িত। আসামী সত্য সত্যই এক পাকা সিভিল অ্যাণ্ড ক্রিমিন্যাল একস্‌পার্ট এবং মামলা-সমুদ্রের ভয়াবহ 'অক্টোপাস'-বিশেষ!

ভয়াবহ অক্টোপাস-জাতীয় প্রত্যক্ষ জীবটিকে আসামীর কাঠগড়ায় সশরীরে দণ্ডায়মান দেখিয়া, একান্ত কৌতূহলের সহিত সুবিজ্ঞ ডেপুটী অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার আপাদ-মস্তক দেখিয়া লইলেন।

বাদিপক্ষ কতিপয় মাতব্বর সাক্ষী আনিয়াছিল, ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদের সাক্ষ্য-প্রমাণ শেষ হইলেই বিভিন্ন সাক্ষীর সাক্ষ্যে বাদিপক্ষের আর্জ্জীর সব কয়টি প্যারার সমর্থন পাইয়া হাসিতে হাসিতে আসামীর বিরুদ্ধে চার্জ্জ বিধিবদ্ধ করিলেন এবং মামলা শুনানীর দিন ধার্য্য করিয়া আসামীর প্রতি হাজার টাকার জামিনের আদেশ দিলেন।

মোক্তার আসামীর কাছে গিয়া কহিলেন, শুনলেন ত, পারবেন জামিন দিতে?

আসামী কিন্তু এখনও অবিচলিত, তাঁহার মুখ হইতে দৃঢ় স্বরে উত্তর আসিল,—আমার জামিন সর্ব্বমঙ্গলা।

পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের এক তরুণ উকিল সাক্ষী-গোপালের মত উকিল-কৌন্সলীদের ভিতর বসিয়া আদ্যোপান্ত এই রহস্য-বিজড়িত মামলাটির বিচার দেখিতেছিল। চেহারা ও পরিচ্ছদের পারিপাট্যে এই প্রিয়দর্শন তরুণ উকিলটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেও, এ পর্য্যন্ত তাহাকে কোনও পক্ষের অনুকূলে বা প্রতি-কূলে কোনও কথা কহিতে দেখা যায় নাই। আসামীর শেষের কথাটির সঙ্গে সঙ্গে বাদিপক্ষের প্রত্যেকের মুখে যেমন ব্যঙ্গের হাসি ফুটিয়া উঠিল, সেই মুহূর্ত্তেই তাহাদের মুখের হাসি ম্লান করিয়া দিয়া সেই তরুণ উকিল সবেগে উঠিয়া গাঢ়স্বরে মোক্তারকে কহিল,—আপনি আসামীর জামিন হোন, আমি বলছি, এঁর জন্য আমি দায়ী থাকব আপনার কাছে।

এক জন আততায়ী রিভলভার উদ্যত করিয়া এজলাসের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেও বোধ হয় এজলাস শুদ্ধ সকলে ইহা অপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়স্তব্ধ হইতেন না! কিছুক্ষণ সকলেই নির্ব্বাক, আসামীর পক্ষে হাজার টাকার জামিন হইবার জন্য যে তরুণ উকিল স্বেচ্ছায় তাহার স্বাস্থ্যপুষ্ট দেহখানি উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ মোক্তারকে অনুরোধ করিল, তাহার বিরুদ্ধে কথা কহিবার মত কোনও যুক্তিই ছিল না,—আসামী না জানিলেও, বাদিপক্ষের প্রত্যেকেই জানিতেন যে, এই তরুণ উকিল কলিকাতা হাইকোর্টের এক জন বিচারপতির পুত্র এবং ধন ও প্রতিষ্ঠার খ্যাতিও তাঁহার অসাধারণ।

* * * *

ঘোষাল মহাশয়ের প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বেই সর্ব্বাণী গ্রামের সর্ব্বত্র তাঁহার নামে এই ফৌজদারী মামলা সম্পর্কে নানা কথাই প্রচারিত হইয়াছিল। প্রতিপক্ষ ব্যাপকভাবেই চিত্তাকর্ষক বহু তথ্যই সর্ব্ব-সাধারণকে শুনাইয়াছিলেন। গ্রামমধ্যে জনরব রটিয়া গিয়াছিল, এই মামলায় ঘোষালের আর নিস্কৃতি নাই, সর্ব্বমঙ্গলার সেবা ছাড়িয়া এবার জেলে গিয়া ঘানি টানাই তাঁহার শেষ জীবনের কর্ম্মফল।

ঘোষাল মহাশয়ের পরিজনদের নিকট এ সংবাদ বহন করিয়া আনিবার লোকাভাব হয় নাই। কিন্তু তাঁহারা এমন ভয়ঙ্কর সংবাদ শুনিয়াও নির্ব্বিকার, গৃহিণী হইতে প্রত্যেকের মুখে একই কথা,—যেখানে আছেন সর্ব্বমঙ্গলা, এমন অমঙ্গল সেখানে আসতে পারে না।

ইহার পরেই যখন ঘোষাল মহাশয় সশরীরে সর্ব্বাণী গ্রামে পুনরায় দেখা দিলেন, অপ্রত্যাশিত জামিনদারের কথা যখন সর্ব্বত্র রাষ্ট হইয়া পড়ে, তখন অনেকেরই সন্দিগ্ধ চিত্ত দুলিয়া উঠিয়া প্রশ্ন তুলিতে থাকে—ছেলে বুড়ো সবারই মুখে এক কথা, যেখানে সর্ব্বমঙ্গলা, অমঙ্গল সেখানে আসে না;—তবে কি এ কথা সত্য?

কার্ত্তিক মাসে বিষয় এবং সর্ব্বমঙ্গলার পূজার পালা-সংক্রান্ত যে মামলার সৃষ্টি হইয়াছিল, পর বৎসর আষাঢ় মাস শেষ হইয়া গেল, তথাপি তাহার নিষ্পত্তির কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। এ দিকে সর্ব্বমঙ্গলার সাম্বৎসরিক শারদীয়া উৎসবের উদ্যোগ-আয়োজনের সময় উপস্থিত। ঘোষাল মহাশয়কে এত দিন পরে এই সময় একটু উদ্বিগ্ন দেখা গেল। তিনি জেলা কোর্টে এই মর্ম্মে এক দরখাস্ত করিলেন যে, অন্যান্য বৎসরের ন্যায় তাঁহাকে সাম্বৎসরিক পূজা সম্পন্ন করিবার আদেশ প্রদত্ত হউক। কিন্তু তাঁহার প্রতিপক্ষ নিখিলেশ্বর চক্রবর্ত্তী তাহাতে আপত্তি তুলিয়া বলিলেন, মূল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র কোনও আদেশ কোনও পক্ষকে দেওয়া যাইতে পারে না। তজ্জন্য যদি এ বৎসর পূজা বন্ধ থাকে, তাহাতে এ পক্ষের কোনও আপত্তি নাই। কেন না, স্বত্ব-সাব্যস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কোনও পক্ষই সর্ব্বমঙ্গলার পূজা ও দেবোত্তর সম্পত্তির অধিকারী নহেন।

আদালতেও এই দিন সকলেই সত্যহরি ঘোষালকে প্রথম বিচলিত হইতে দেখিলেন। সর্ব্বমঙ্গলার পূজা বন্ধ হবে, দেড়শো বছর ধ'রে পুরুষানুক্রমে যাঁর পূজো চ'লে এসেছে বরাবর সকল বিঘ্নবাধা কাটিয়ে, আজ আদালত থেকে তা বন্ধ করবার হুকুম বেরুবে—আর সেই হুকুম চাইছে তাঁরই এক সরিক, আত্মীয়, রক্তের সঙ্গেও আছে যার সম্বন্ধ!—এজলাসের ভিতরেই ঘোষাল মহাশয় অভিভূতের মত মোহাচ্ছন্ন হইলেন!

জজ সাহেব মন্তব্য প্রকাশ করিলেন,—বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষকে দুই ঘণ্টা সময় দেওয়া যাচ্ছে, এর মধ্যে তাঁরা পরামর্শ ক'রে বার্ষিক পূজা সম্বন্ধে একটা সোলেনামা করুন, নতুবা কোর্ট থেকে রিসিভার নিযুক্ত ক'রে পূজার ব্যবস্থা করা হবে, আর যদি তাতে অসুবিধা দেখা যায়, অগত্যা এ বৎসর পূজা বন্ধ থাকবে।

ঘোষাল মহাশয় তাঁহার উকিলকে বলিলেন,—দেখুন, পূজো বন্ধ হবে না, রিসিভারের হাতেও যাবে না। পূজো আমরাই করব; বেশ, চক্রবর্ত্তীই পূজো করুক,—আমি দাবী ত্যাগ করছি।

ঘোষালের উকিল প্রতিপক্ষের নিকট এ প্রস্তাব উত্থাপন করিতেই চক্রবর্ত্তী ঘোষালের প্রকৃতি বুঝিয়াই আপত্তি জানাইলেন, আমার ইচ্ছা, পূজো এ বছর বন্ধ থাকে, যদি একান্তই হয়—রিসিভার অ্যাপয়েণ্ট করেই হোক।

চক্রবর্ত্তীর কথায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেও মনোভাব দমন করিয়া ঘোষাল জানাইলেন—পূজো বন্ধ থাকবে না। আমাদের ঘরোয়া ব্যাপারে রিসিভার অ্যাপয়েণ্ট হবে কেন? চক্রবর্ত্তী যদি পূজোর ঝঞ্ঝাট মাথায় নিতে না চায়, আমি সমস্ত ঝক্কি নিতে রাজী আছি। দেবোত্তরের জমিজমা কিছুতেই আমি হাত দেব না, আমি শুধু সর্ব্বমঙ্গলার পূজা করব, যেমন বরাবর ক'রে এসেছি।

বুদ্ধিমান্ নিখিলেশ্বর চক্রবর্ত্তী যখন বুঝিলেন, সর্ব্বমঙ্গলার পূজার জন্য সত্যহরি ঘোষালের ধনুর্ভঙ্গ পণ, তখন তিনিও উপযুক্ত সময় বুঝিয়া এক কোপে সমস্ত ঝঞ্ঝাট কাটাইতে খরধার খড়্গ তুলিলেন। তাঁহার প্রস্তাবের মর্ম্ম এই যে, ঘোষাল যদি সর্ব্বমঙ্গলা এবং তাঁর সেবার জন্য বরাদ্দ কয় বিঘা জমি লইয়া তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি, জমিদারীর সিকি অংশ, বসতবাটী, বাগান, পুকুর প্রভৃতির অংশ তাঁহাকে কায়েমী ভাবে ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে তিনি এখনই সোলেনামায় সহি দিতে পারেন, অন্যথায় নহে।

অভিভূতের মত ঘোষাল নিজেই চক্রবর্ত্তীর সম্মুখে গিয়া কহিলেন,—আমি এই সর্ত্তেই রাজী আছি নিখিল, শুধু এর ওপর এমন একটু স্থান চাই, যেখানে সর্ব্বমঙ্গলার অধিষ্ঠান হ'তে পারে, আমরাও মাথা গোঁজবার মত আস্তানা পাই।

তখন এই সাব্যস্ত হইল যে, সর্ব্বমঙ্গলার জীর্ণ পূজার দালানটুকু এবং তাহার পশ্চাতে আবর্জ্জনাপূর্ণ বিঘাপরিমিত পতিত জমি মাত্র সর্ব্বমঙ্গলার সম্পত্তিস্বরূপ ঘোষাল মহাশয় দখল করিবেন। দালানের কোলে দরদালান, দাওয়া ও তাহার কোলে সুবিস্তৃত অঙ্গন ও ভিতর-মহলের সমস্ত অংশই চক্রবর্ত্তীর আয়ত্তাধীন হইবে। দালান ও দরদালানের মধ্যস্থলে প্রাচীর তুলিয়া চক্রবর্ত্তী তাঁহার মহল স্বতন্ত্র করিয়া লইবেন।

বিনা বাক্যব্যয়ে ঘোষাল মহাশয় সোলেনামায় স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। তাঁহার উকিল ও শুভানুধ্যায়ীরা এই সর্ব্বনাশকর প্রস্তাবে নিরস্ত হইবার জন্য বহু যুক্তি দিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি ছিলেন অটল। তাঁহার মুখে একই কথা, সর্ব্বমঙ্গলার এই ইচ্ছা।

* * * *

যথাসময় গৃহিণী সত্যভামা দেবী, উপযুক্ত তিন পুত্র ও অন্যান্য পরিজনরা আদালতে মর্ম্মন্তুদ মীমাংসার কথা শুনিলেন, কিন্তু কাহারও তজ্জন্য বিচলিত বা মর্ম্মাহত হইতে দেখা গেল না। কর্ত্তার মুখের কথা তাঁহাদের প্রত্যেকেরই মুখে সর্ব্বমঙ্গলার এই ইচ্ছাই মনে ছিল; তিনি যে মঙ্গলময়ী, যা করেন সবই মঙ্গলের জন্যই।

পল্লীবাসী, প্রতিবেশী সকলেই এই অদ্ভুত পরিবারের সহন-শীলতা ও কুলদেবীর প্রতি আশ্চর্য্য নির্ভরতা দেখিয়া চমৎকৃত! জমিদারী গেল, জোৎজমা সব হাত-ছাড়া হইল, ঘর-দুয়ার ছাড়িয়া জীর্ণ পূজার দালানে আসিয়া বাঁধা চালার নীচে মাথা গুঁজিতে হইল, তাহাতেও কিছুমাত্র বিক্ষোভ নাই তাঁহাদের মনে; বরং এই আনন্দেই সকলে অভিভূত যে, সব যাক, সর্ব্বময়ী সর্ব্বমঙ্গলা ত তাঁহাদের রহিল!

তখনও আলিপুরের ফৌজদারী মামলা মাথার উপর টাঙ্গানো খাঁড়ার মত ঝুলিতেছিল। তবে আশ্বাসের বিষয় এইটুকু যে, সর্ব্বমঙ্গলার ইচ্ছাতেই সে তরুণ উকিলটি ঘোষাল মহাশয়ের জামিন হইয়াছিল, সকল কাহিনী আগাগোড়া শুনিয়া সেই-ই এ মামলার সকল ভার ইচ্ছাপূর্ব্বকই গ্রহণ করিয়াছিল। ঘোষাল মহাশয়কে এই বলিয়া সে আশ্বাস দিয়াছিল যে, প্রয়োজন হইলেই সে তাঁহাকে তারযোগে সংবাদ দিবে।

সোলেনামা হইবার পরদিনই নিখিলেশ্বর চক্রবর্ত্তী পূজার দালান ও দরদালানের মধ্যে দেওয়াল তুলিয়া নিজের দখল পাকা করিতে রাজমিস্ত্রী ও মজুর লাগাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই অংশে তাঁহার দীর্ঘ দিনের আকাঙ্ক্ষিত বৈঠকখানা নির্ম্মাণ করাইবার জন্য উদ্যোগ-আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

পাড়ার দুই এক জন স্পষ্টবক্তা তাঁহাকে গোপনে ডাকিয়া

পরামর্শ দিলেন, কাযটা কিন্তু ভাল করলে না, চক্রবর্ত্তী। আর যা'ই কর, ভিটে-ছাড়া কাউকে করতে নেই।

চক্রবর্ত্তী হাসিয়া উত্তর দিলেন—কেন, আমি ত অন্যায় কিছু করিনি, যা যা উনি চেয়েছেন সবই ত দিয়েছি; আর ন্যায্য কথা যদি বলেন, আমিই ঠকেছি; আমি নিয়েছি—জমি-জেরাৎ আর ভাঙ্গা বাড়ী; এ সব ত ভুয়ো মাল। উনি পেয়েছেন—সেরা চীজ, খাস সর্ব্বমঙ্গলা আর তাঁর তোষাখানা; ওঁর এখন ভাবনা কি?

চক্রবর্ত্তীর কথা শেষ হইতেই তাঁহার পারিষদগণ উচ্চ হাস্য করিয়া কথার পিঠে রসান দিয়া কহিল,—মিছে বলেন নি, চক্কোত্তী মশাই। পূজোর দালানের পেছনে দিকে খানেক ঐ যে পড়ো জমি দেখছেন, ইট-পাটকেল আর বনবাদাড়ে এখন ভরা, সাবেক আমোলে ঐটেই ছিল যে মায়ের তোষাখানা; সাধে কি ঘোষাল ওটা হাতিয়েছেন, ওঁর সর্ব্বমঙ্গলার দৌলত ওখানে ঘড়া ঘড়া মোহর গাড়া আছে, কিছু খরচপত্তর ক'রে তুললেই হ'ল!

কথার সঙ্গে সঙ্গে উঠিল হাসির হর্‌রা। যাঁহারা গায়ে পড়িয়া উপদেশ দিতে আসিয়াছিলেন, চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার বয়স্যদের কথায় বুঝিলেন, ঘোষালকে কৌশলে সর্ব্বহারা করিয়াও ইহাদের আশ এখনও মিটে নাই, মৃতের দেহে অস্ত্রাঘাতের মত ঘোষালের এই দারিদ্র্য-বরণকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জ্জরিত করিতেও ইহারা কুণ্ঠিত নহে।

দালানের যে অংশ ঘোষাল মহাশয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাকেই অবলম্বন করিয়া নূতন ব্যবস্থায় তাঁহাকে সংসার পাতিতে হইল। দালান-সংস্কার, পতিত ভূখণ্ড পরিষ্কার ও তাহার একাংশে চালাঘর তুলিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ প্রভৃতির কাযগুলি যেমন তাঁহার সাধ্যানুসারে ধীরে ধীরে চলিতেছিল, পক্ষান্তরে, সদর হইতে সর্ব্বাণী গ্রাম পর্য্যন্ত সমগ্র স্থানের অধিবাসিগণকে চমকিত করিয়া ঘোষাল-বংশের জীর্ণ ভিটার উপর নিখিলেশ্বর চক্রবর্ত্তীর বিশাল অট্টালিকা-নির্ম্মাণের উদ্যোগপর্ব্ব মহাসমারোহে আরম্ভ হইয়া গেল। তখন য়ুরোপের মহাযুদ্ধ বিশ্বে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, বহু দ্রব্যই দুষ্প্রাপ্য বা অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিয়াছে, ইট ও লোহার বাজারে জয়-জয়কার,—যাহাদের ঘরে মাল মজুত, তাহারা তখন সাপের সাত পা দেখিয়াছে। জাহাজের চালানী কাযে নিখিলেশ্বর সে সময় দেদার টাকা উপার্জ্জন করিতেছিলেন, উপার্জ্জিত অর্থের উপর মমতা অল্প! যে মূল্যে মাল খরিদ হয়, তাহার চতুর্গুণ মূল্যে সঙ্গে সঙ্গে সরবরাহ হইয়া যায়! মালের সন্ধান একবার মিলিলেই হইল, চিলের মত তখনই তাহার উপর অসংখ্য ক্রেতার সমাবেশ হয়।

বর্দ্ধমান, হুগলী ও তারকেশ্বর অঞ্চলের নানা স্থানে নিখিলেশ্বর বিবিধ পণ্যের দাদন দিয়া রাখিয়াছিলেন। কোনও প্রতিষ্ঠাপন্ন কোম্পানীর সহিত তাঁহার ছিল রীতিমত চুক্তি, ঐ সকল পণ্য নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে তাঁহার সরবরাহ করিবার কথা। তাঁহার লোকজন নানা স্থানে ঘুরিয়া মাল সরবরাহ করিতেছিল এবং সংগৃহীত মাল সংরক্ষণের জন্য সর্ব্বাণীগ্রামের একাংশে অনেকগুলি বড় বড় অস্থায়ী গুদাম নির্ম্মিত হইয়াছিল। সংগৃহীত পণ্যে সমস্ত গুদাম ভরিয়া গিয়াছে, এই বার মহোৎসাহে মাল-সরবরাহ কার্য্য সপ্তাহ ব্যাপিয়া চলিবে। শতাধিক গোযান নানা স্থান হইতে আমদানী করা হইয়াছে, অধিকাংশ গাড়ীতে ইমারত তৈয়ারীর মাল-মশলাও আসিয়াছে, আবার তাহারাই চালানী ব্যবসায়ের মাল-পত্র লইয়া রওনা হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। নিখিলেশ্বর চক্রবর্ত্তীর এই আড়ম্বরময় ব্যাপারে সর্ব্বত্রই একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

যাহার শ্রাবণে ঘোষাল-পরিবারের অসুবিধা ও দুর্দ্দশার একশেষ হইলেও, তাঁহারা যেন ইহা সহ্য করিবার জন্যই বুক পাতিয়াছিলেন। অভাব, অসুবিধা ও দুর্দ্দশা শত চেষ্টা করিয়াও এই নিরুদ্বেগ পরিবারটিকে ছন্নছাড়া করিতে পারে নাই, শান্তি ও তৃপ্তি যেন হাত ধরাধরি করিয়া ইহাদিগকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল।

ঠিক এই সন্ধিক্ষণে—যে সময় সর্ব্বহারা সত্যহরি ঘোষাল সপরিবার কুলদেবী সর্ব্বমঙ্গলাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহারই আস্তানায় শান্তিময় নীড় বাঁধিতে ব্যস্ত এবং অতুল ঐশ্বর্য্যশালী নিখিলেশ্বর চক্রবর্ত্তী তাহারই অপরাংশে বিপুল ব্যয় স্বীকার করিয়া প্রমোদ-ভবন রচনার আয়োজনে রত,—সেই স্মরণীয় ১৩২০ সালের প্রাবৃটের ঘনঘটাচ্ছন্ন নিশায়—সহসা দিগ্‌দিগন্তে প্রলয়কল্লোল তুলিয়া সর্ব্বগ্রাসী দামোদর লোকভয়ঙ্কর প্লাবনে তাহার দুই তীরবর্ত্তী ভূভাগের অসংখ্য পল্লী নিমজ্জিত করিয়া দিল।

দামোদরের এই দুর্ব্বার বন্যার প্রবল আবর্ত্তে পল্লীর পর পল্লী বিধ্বস্ত হইল, শত শত পল্লীবাসী—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তৃণের মত ভাসিয়া গেল, অসংখ্য ঘর-বাড়ী বিধ্বস্ত হইল, কত ধনশালী এক রাত্রির মধ্যেই সর্ব্বস্ব হারাইয়া পথের ভিখারী হইলেন, কে তাহার ইয়ত্তা করে? পণ্যব্যবসায়ীদের বিপুল পণ্যরাশি বুভুক্ষু দামোদর উদরসাৎ করিয়া সর্ব্বত্র হাহাকারের সৃষ্টি করিয়া দিল। চারিদিকে সহস্র সহস্র কণ্ঠে আর্ত্তনাদ উঠিল—বন্যা, বন্যা; সর্ব্বগ্রাসী দামোদরের সর্ব্বনাশী লীলা!

সর্ব্বাণী গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই এই প্রলয়ঙ্কর প্লাবনে সর্ব্বস্বান্ত হইল, কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ অতুলনীয় হইয়াছিল নিখিলেশ্বর চক্রবর্ত্তীর।—কর্ম্মময় সারা জীবন ধরিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় যাহা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, ব্যাঙ্কের টাকা প্রায় নিঃশেষ করিয়া যে বিপুল পণ্য সঞ্চিত হইয়া তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য-প্রতিষ্ঠার প্রতীক্ষায় ছিল, সে সমস্তই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উদ্দাম দামোদর কুক্ষিগত করিয়া কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল! শুধু কি তাহাই,—ইমারত নির্ম্মাণের জন্য বহু ব্যয়ে সংগৃহীত মূল্যবান্ দ্রব্যজাতও ভোজবাজীর মত রাতারাতি কোন্ রহস্য-লোকে অদৃশ্য হইয়া গেল!

সেই ভয়াবহ ঘটনার সময় সপরিবার ঘোষাল মহাশয় কুল-দেবী সর্ব্বমঙ্গলার মঙ্গলময় ঘটটি অবলম্বন করিয়া পারিবারিক মঙ্গলকামনায় সারারাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ঘোষাল-বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ দামোদরের প্রকোপ উপলব্ধি করিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও নিরাপদ স্থানে সর্ব্বমঙ্গলার দালান প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যদিও এই জীর্ণ দালানেরই একাংশে সারারাত্রি আবক্ষ জলে দাঁড়াইয়া দেবীর ঘট মাথায় করিয়া তাঁহাদেরই কীর্ত্তি-রক্ষাব্রত বংশধর সত্যহরি সপরিবার কাটাইয়াছিলেন, কিন্তু ইহার অধিক কোনও বিপদ তাঁহাদিগকে পিষ্ট করিতে পারে নাই।

দেবীর দালানে জলের টান খর হয় নাই এবং জলও অধিকক্ষণ স্থায়ী ছিল না। জল সরিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে ঘোষাল মহাশয় চমৎকৃত হইয়া দেখিলেন, দালানের পাদদেশে দুর্গম পতিত ভূখণ্ড বন্যার প্রবল আবর্ত্তে আশ্চর্য্যরূপে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে; যথাসাধ্য বলিয়া তিনি সাহার সংস্কারে ইতস্ততঃ

করিতেছিলেন, দামোদর যেন স্বয়ং সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এক রাত্রির মধ্যেই সমস্ত জঞ্জাল, বনবাদাড়, ইটপাথরের স্তূপ ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে! ধীরে ধীরে উদ্বেলিত চিত্তে তিনি সেই বহুবৎসরের পরিত্যক্ত পতিত ভূখণ্ডে অগ্রসর হইলেন।

সহসা দুই চক্ষু তাঁহার উজ্জ্বল ও বিস্ফারিত হইয়া উঠিল,—পতিত ভূখণ্ডে সর্ব্বমঙ্গলার পরিত্যক্ত জীর্ণ তোষাখানার—বন্যা-স্রোতের আবেগে বিপর্য্যস্ত ইষ্টকস্তূপমধ্যে দুইটি সুবৃহৎ তাম্র-কলস!

এ কি সর্ব্বমঙ্গলার পরিহাস, কিম্বা এই ঘোরতর বিপত্তির সময় কোনও গুরুতর পরীক্ষা!—ঘোষাল মহাশয় কিছুমাত্র উত্তেজিত না হইয়া, প্রাণপণ শক্তিতে সেই গুরুভার কলস দুইটি একে একে দালানের পার্শ্বস্থ কক্ষের ভিতর রাখিয়া দিলেন। বন্যার জল তখন নামিয়া গিয়াছে, জল-কর্দ্দমাক্ত কক্ষমধ্যেই তাঁহার পরিজনরা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিলেন। চণ্ডীর ঘটটি কক্ষমধ্যে একটি গবাক্ষের উপর রাখিয়া ঘোষাল মহাশয় বাহিরে গিয়াছিলেন।

তাম্রপূর্ণ কলসী দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠিলেন। সকলেরই দৃষ্টি গৃহস্বামীর মুখের দিকে! অল্প চেষ্টায় কলসীর মুখ খুলিতেই দেখা গেল, একই আকারের ছোট ছোট স্বর্ণবাটে দুইটি কলসীই পূর্ণ!

এ অবস্থায় যে আবেগময় উল্লাস উচ্ছ্বসিত হইবার কথা, তাহার কিন্তু কোনও লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। গৃহিণী শুধু অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিলেন; স্বামী গাঢ়স্বরে কহিলেন, সর্ব্বস্ব ছেড়ে সর্ব্বমঙ্গলাকে সার করেছিলুম, মা তাই তাঁর তোষাখানার দ্বার খুলে দিয়েছেন এই সর্ব্বহারার হাতে।

গৃহিণী বন্যার জলে সিক্ত আঁচলখানি অশ্রুধারায় অভিষিক্ত করিয়া গলায় দিয়া ভাবগদ্গদস্বরে কহিলেন, মা যে আমার সর্ব্বহারার সর্ব্বমঙ্গলা।

* * * *

বন্যার পরে নানা দিক দিয়া নিখিলেশ্বর চক্রবর্ত্তীর এমন ভাগ্য-বিপর্য্যয় উপস্থিত হইল যে, সর্ব্বমঙ্গলার দালান ভাঙ্গিয়া বৈঠক-খানা নির্ম্মাণের প্রচেষ্টা ত ব্যর্থ হইয়া গেলই, উপরন্তু আলিপুরের ফৌজদারীর মামলার বাদী খিদিরপুরের কনট্রাক্টর সেখ আরজান মোল্লার সহিত নিখিলেশ্বরের এমন মনোমালিন্য উপস্থিত হইল যে, আদালতে পরবর্ত্তী শুনানীর দিন সে স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি দিয়া বসিল, নিখিলেশ্বরই এই মামলার স্রষ্টা,—সত্যহরি ঘোষালকে জব্দ করিবার জন্যই তাহাকে উপলক্ষ করিয়া এই মিথ্যা মামলার সৃষ্টি হইয়াছে।

ইহার পরেই স্রোত আবার ফিরিল, চাকাও ঘুরিয়া গেল। ক্রীত সমস্ত সম্পত্তি সর্ব্বমঙ্গলার দেবোত্তরের অন্তর্গত করিয়া দিয়া, সত্যহরি ঘোষালের একান্ত অনুগ্রহেই সে যাত্রা নিখিলেশ্বর নিষ্কৃতি পাইল।

আদালতে সে দিন সর্ব্বসাধারণ সত্যহরি ঘোষালকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—সত্যই ঘোষাল মশাই, সর্ব্বমঙ্গলা আপনারই।

ঘোষাল মহাশয় উত্তর দিয়াছিলেন,—সর্ব্বহারার সর্ব্বমঙ্গলা।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঘর সাজানো

তোমাতে-আমাতে যে-ঘর বাঁধিনু প্রিয়া,
সে-ঘর বলো তো, সাজাই আজি কি দিয়া—
ঝড়ে বা রৌদ্রে, বর্ষায়, শীত-বাতে
আরামে বিরাম তিলেক না ঘটে যাতে?

খোলা ছাদে আলো ঝলমল কিবা ঝলে!
সকল শান্তি রাখিব সে ছাদ-তলে;
বসিবার ঘরে হাসি কথা প্রাণ-ঝরা;
পাকশালে রাখি মেজাজ মাধুরী-ভরা;
প্রচুর বিরাম রাখিব শয়ন-ঘরে—
শান্তির ঘুম সোনার স্বপনে ভরে!
সকল-ঘরের কোণে কোণে রাখি জমা
স্নেহ-মায়া,—জড়ো হবে না আবর্জ্জনা;

দ্বিতলে ত্রিতলে উঠিতে সোপান যত—
হাসিতে হাসিতে মুড়ে রাখি অবিরত;
দ্বারে-বাতায়নে দিব না কো আবরণ—
ঘরে ও বাহিরে দেয়া-নেয়া হবে মন;
ফুলের ছোট্ট বাগানখানিকে ঘিরি
প্রাণের পীরিতি বহাইব ধীরি ধীরি!
তৃপ্তির বাতি নিবাবো না কোনো ক্ষণে—
উজল নবীন রবে ঘর সে-কিরণে;

সারা ঘরে এসো পরাণ মেলিয়া রাখি—
স্বরগ রচিতে কিছু না রহিবে বাকি!

শ্রীবৈকুণ্ঠ শর্ম্মা



অন্ধ বালিকা

(গল্প)

১

লীলা

আমার হাতের লেখা দেখে তুই খুব আশ্চর্য্য হবি—না? অতল অন্ধকারে বসে আছি—যেন আর এক জগতে! পরলোক কি এমনি? শুধু জমাট অন্ধকার? সেই অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে মানুষ পথে চলেছে?

ভাবি, তোরা কত সুখী। তোদের চোখ আছে; সে চোখে দৃষ্টি আছে! তোরা দেখতে পাস—আকাশ কেমন নীল,—চাঁদ কত সুন্দর—আকাশে কত পাখী ওড়ে—গাছে কত ফুল ফোটে! মা-বাপ, ভাই-বোন—স্নেহে যারা তোকে ঘিরে রেখেচে, তাদের হাসিতে কত আরাম! সে সৌভাগ্য থেকে আমি বঞ্চিত—আজ দশ বৎসর!

ন'বছর, না, দশ বছর বয়স চোখে কি যে হলো—সব আলো নিভে গেল! অন্ধকারের কালো পর্দ্দা পড়ে গেল আমার চোখের সামনে!

এই দশ বৎসর অন্ধ কারাগারে আমার দিন কাটচে। আরো কতকাল এ কারাভোগ অদৃষ্টে আছে, কে জানে!

গোলাপের গন্ধ আজো পাই—তার নরম পাপড়ির পরশ পাই হাতে। শুনি, মেয়ে-মানুষের রূপের তুলনা মানুষ করে ফুলের রঙের সঙ্গে! সে তুলনা কি করে মানুষ করে, বুঝেও আমি বুঝতে পারি না। মাঝে মাঝে কত কথা মনে জাগে—বলি মায়ের কাছে, বাবার কাছে। ডাক্তাররা বলেন, চোখ সারবার আশা নেই, তা নয়!

রাত্রে রোজ ভাবি, কাল সকালে হয়তো চোখে আবার আলো জাগবে—সে-আলোয় পৃথিবী আলো হয়ে আছে! কিন্তু নিত্য নিরাশা! যে তিমিরে আমি সেই তিমিরে। কথা আছে—অন্ধ জাগো রে! না, কিবা রাত্রি কিবা দিন। আমার হয়েচে তাই!

আজ সকালে ঘরের মধ্যে হাতড়াতে হাতড়াতে হাত পড়লো কিসে—জানিস? একখানা বড় আয়নার। এ আয়নায় এক দিন নিজেকে দেখতুম! আজ আয়না আছে,—নিজেকে সে আয়নায় দেখবার আশা আর নেই!

সকলের মুখে শুনি, অন্ধ হলে কি হবে, আমার রূপ যেন ফোটা পদ্মের মত অঙ্গে অঙ্গে উপলে উঠচে! আমি ভাবি, কেমন সে রূপ! আমার রূপ সকলে দেখচে, আমিই শুধু দেখচি না! নিজের রূপের সে-স্মৃতি মনে জেগে আছে—সে যেন···

কিন্তু সে-কথা থাক্।

আচ্ছা, একটা কথা সত্য বলবি? দু-একটা কথার টুকরো কাণে আসে। শুনি, কোন্ ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় বাবার টাকা-কড়ি নাকি সব গেছে! টাকা-কড়ি গেলে মানুষ গরীব হয়। গরীব যে, তার বাড়ীর আসবাব পত্রে কোন বৈচিত্র্য থাকে না। কিন্তু হাতড়ে হাতড়ে আমি যা পাই, তা থেকে তো গরীবানার কিছু বুঝি না। আগে যা সব ছিল—এখনো তেমনি আছে। বাবা কি সত্যই গরীব হয়েচেন?

চিঠি দিস্। কি লিখবি, আমি তা পড়তে পারবো না। অপরে তোর চিঠি পড়ে শোনাবে। তবু ভাই, চিঠি লিখিস্।

চেনা গলায় তোর চিঠির কথা শুনলেও কথা গুলো তোরি শুনবো তো!

আমি অন্ধ—এ কথা ভেবে শুধু হা-হুতাশ করিস্ নে। চিঠি লিখে তোর নিজের কথা দুটো জানাস। তাহলে বুঝবো, পৃথিবীতে শুধু দুঃখ নেই—সুখও আছে।

শান্তি

২

লীলা

নতুন কথা শুনবি? আমার না কি বিয়ে হবে। অন্ধ আমি—আমাকেও জীবন-সহচরী করতে চায়—এমন মানুষ আছে!

তার কথা বলি, শোন্।

মা কাল হঠাৎ বললে—তোর সঙ্গে একজন নতুন লোক ভাব করতে চায়, শান্তি। তার সঙ্গে আলাপ কর্।

মা চলে গেল। আমি চুপ করে বসে রইলুম। অনেকক্ষণ। ভাবছিলুম, ভাব করতে চায় আমার সঙ্গে? পুরুষ? না মেয়েমানুষ?

হঠাৎ অজানা কণ্ঠে ভাষা শুনলুম—তোমার নাম শান্তি?

আমি বললুম,—হ্যাঁ।

সে বললে,—আমার নাম অলোক। তোমার বাবা আমাকে খুব ভালো রকম জানেন।

এই অবধি বলে' সে চুপ করে রইলো।

আমার সারা অঙ্গ কেমন ছম্ ছম্ করতে লাগলো। কেন, জানি না। সে বললে,—আমি কেন এসেছি,—জানো?

আমি বললুম,—আমার সঙ্গে ভাব করতে!

সে বললে—শুধু ভাব নয়। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে।

বিয়ে! আমি চমকে উঠলুম! আমি বললুম,—কিন্তু আমি তো অন্ধ। চোখে কিছু দেখি না।

সে বললে,—তা হোক!

কিন্তু কি করে তা হয়? শুনেছি, শুভদৃষ্টি না হলে বিয়ে হয় না! আমি শুভদৃষ্টি করবো কি করে?

বললুম,—আমায় বিয়ে করে কি সুখ পাবে? আমাকে চৌকি দিয়েই সারা জীবন কাটাতে হবে!

সে বললে,—চোখে তুমি নাই কিছু দেখতে পেলে! আমার চোখে আমি যা দেখবো, তোমাকে তা বলবো। আমার চোখ হবে তোমার চোখ। তুমি দেখতে পাচ্ছো না—তুমি কত সুন্দর! আমি দেখছি। আমার দেখায় তুমিও নিজেকে দেখবে পরমা সুন্দরী। তোমার পায়ের রঙে গোলাপের আভা! তোমার কোঁকড়া চুলগুলি যেন থোলো থোলো আঙুরের গোছা! তোমার গাল যেন তাজা আপেল! তোমার নিটোল দুটি হাত···

বড় লজ্জা হতে লাগলো। বললুম,—থাক, থাক,—নিজের কথা আমি শুনতে চাই না···

সে বললে,—এ বিয়েয় তোমার আপত্তি আছে?

আপত্তি!

তোর কাছে লুকোবো না, শীলা—ক'মাস থেকে কেবলি মনে হচ্ছে, এমন কাকেও যদি পাই—যার কাছে অতি তুচ্ছ মনের কথা অকপটে জানাতে পারি! আমি হবো যার সব—এই অন্ধ কারায় যে আমার পাশে বসে আমার এ দারুণ নিঃসঙ্গতা ঘোচাবে!

বাবার মুখে, মায়ের মুখে প্রায় শুনতুম—আমার বিবাহের জল্পনা! মা বলতো,—কে ওকে নেবে? বাবা বলতো,—মেয়ে আমার পরমা সুন্দরী! তা ছাড়া অজস্র টাকা যৌতুক দেবো। কেন পাবো না বর?

আমার মনে কেমন ভয় হতো। টাকা! শুনেছি, টাকার দাম পুরুষ বোঝে সব-চেয়ে বেশী! টাকার পাশে দুনিয়ার সকল বস্তু পুরুষ তুচ্ছ করে। টাকার লোভে আমায় যে বিয়ে করবে, টাকাকেই 'বড়' বলে' গ্রহণ করে আমায় যদি সে হেলায় ফেলে রাখে পায়ের তলায়!

এ-কথা মনে জাগবামাত্র মন আমার কি ব্যথায় টন্‌টন্ করে ওঠে! এমন কথা তোদের মনে জাগে? বোধ হয়, জাগে না। তোরা তো অন্ধ নোস! আমার মত অসহায়, নিরুপায় নোস!

আমি বললুম—আমায় বিয়ে করলে বাবা তোমাকে অনেক টাকা দেবে—না?

সে বললে,—টাকার লোভে আমি তোমায় গ্রহণ করতে আসিনি, শান্তি।

তবে কিসের জন্য?

করুণা! অনুকম্পা! কিন্তু সে প্রশ্ন আমার মুখে ফুটলো না।

সে বললে, পরমা সুন্দরী।

চোখে যখন দেখতে পেতুম—তখন পরমা সুন্দরী দেখেছি বটে। কিন্তু সে যে চমৎকার দেখতে! সুন্দরীর চোখের চাহনিতে রূপ শতধারে উছলে পড়ে! আমার চোখ নেই, আমি পরমা সুন্দরী হবো কিসের জোরে?

৩

শীলা।

মনে বড় কষ্ট।

বাবার ঘরে চড়া গলায় কারা কথা কইছিল! কথার ভাবে বুঝলুম—যে-বাড়ীতে বাস করছি, এ-বাড়ী না-কি

বাবার দেনার ভারে অনেক দিন আগে বিকিয়ে গেছে। এ সব আসবাব—বাবার নয়। জিনিষগুলো আগে আমাদের ছিল—এখনো আছে—তবে সেজন্য ভাড়া দিতে হয়।

তাদের নাকি অনেক টাকা জমেছে। তারা শাসিয়ে বাবাকে দুর্বাক্য বলচে; আর বাবা করুণ মিনতি-ভরা কণ্ঠে বলচে, ওগো, যা করতে হয় করো—শুধু চীৎকার করো না! আমার অন্ধ মেয়ে—তার দুঃখের সীমা নেই। তাকে এ দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা পাঁচ বৎসর জানতে দিইনি। সে যদি জানতে পারে, তার মর্ম্মান্তিক বাজবে!

কথাগুলো শুনে অবধি আমি যেন পাথর বনে গেছি!

আমার পাছে বেদনা বোধ হয়, এজন্য আমার দুঃখী বাবা এ ক'বৎসর মনে এত নির্য্যাতন সইচেন!

আরো যে-সব কথা হলো, তা থেকে বুঝলুম,—অন্ধ মেয়ে—তার কি গতি হবে? এ দুভাবনায় মা-বাবা দুজনে সারা হচ্ছে…এমন দুর্গ্রহের মধ্যে বাবার বন্ধুর ছেলে অলোক এসে তাদের সামনে দাঁড়িয়েচে সম্পদের স্বচন্না জাগিয়ে।

অলোকের অনেক টাকা। অলোক আমায় বিবাহ করবে। আমি অন্ধ, তাতে কি! অন্ধকে যদি উপেক্ষায় সরিয়ে রাখি আপন-জন হয়ে, তা হলে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না-কি বড় দারুণ!

তাই?

তাই সে সেদিন বলেছিল, বাবার টাকার লোভে আমায় বিবাহ করচে না।…করুণাই বটে!

আমার অন্ধ নয়নে জলের ধারার আর নিবৃত্তি নেই, লীলা। আমি কাঁদচি—শুধু কাঁদচি!

৪

মায়ের কাছে অভিমান-ভরে বলছিলুম,—এ দুঃখের কথা আমার কাছে গোপন রেখেছিলে কেন, মা? চোখের দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়ে যদি বেঁচে থাকতে পারি তো ধন-ঐশ্বর্য্য থেকে বঞ্চিত হয়ে নতুন দুঃখ কি বেশী পাবো! বিশেষ তোমরা যখন এত দুঃখ-যাতনা ভোগ করচো! সে দুঃখে তোমাদের মেয়ে আমি অংশ নেবো—এ কি বড় কথা!

অলোক এসেছিল।

আমি বললুম—তোমার মন এত বড়…আমি তোমার পাশে কি যোগ্যতা নিয়ে দাঁড়াবো?—সারা জীবন তুমি দুঃখ পাবে।

অলোক বললে—সুখ সকলেই চায়। আমি যদি দুঃখ চাই, আমায় নিবৃত্ত করিতে পারো?

আমার মুখে কথা নেই! কি জবাব দেবো?

সাধ করে দুর্ভাগ্যকে যে বরণ করতে চায়, তাকে কি ভাষায় মানুষ নিবৃত্ত করবে!

সে বললে—আমাকে তুমি দেখতে পাচ্ছো না। যদি তোমার চোখে দৃষ্টি থাকতো, দেখতে, আমি কদাকার কুৎসিত। কোনো মেয়ে আমায় বিবাহ করতে চায় না। কোনো মেয়ের বাপ আমার হাতে মেয়ে দেবে না। অথচ বিবাহে আমার সাধ আছে। আমি কত স্বপ্ন দেখি। তোমায় বিবাহ করে আমি মহত্ত্ব দেখাচ্ছি, এ-কথা মনে করো না। তোমার দৃষ্টি নেই—তুমি অন্ধ—এ বিবাহে আমার স্বার্থপরতাই প্রকাশ পাচ্ছে।

আমি বললুম,—তুমি যা হও, আমায় যখন গ্রহণ করচো, কায়-মনে আমি তোমার হবো।…তবে সেবা-পরিচর্য্যা কি বা তুমি পাবে!

সে বললে—আমি শুধু তোমায় চাই। যে-সব মেয়ে আমায় উপেক্ষা করচে, তারা দেখবে তাদের চেয়ে সেরা সুন্দরী আমায় গ্রহণ করেচে! সে গর্ব্বে আমার গৌরবের সীমা থাকবে না।

বুঝচি, বাবার মায়ের এ দুর্দ্দশায় ব্যথা পেয়ে মহা-দায় থেকে তাদের উদ্ধার করতে এসেচে অলোক। দৃষ্টি অন্ধ হলেও আমার মন অন্ধ নয়, লীলা!

৫

দু'মাস বিবাহ হয়েচে। আমার চাইবার আর কিছু নেই! আমি কি না পেয়েচি! স্বামীর অজস্র ভালোবাসা! হাঁটতে পাছে ব্যথা পাই, সে ব্যথা ঘুচোতে তিনি বুক পেতে দিতে পারেন!

স্বামী বলেন, তাঁর চোখে আমার চোখ। তাঁর দেখায় আমার দেখা। সত্য, আমার এ অন্ধ কারায় কোথা থেকে যেন আলোর বন্যা এসেচে! ঐ যে গন্ধ ভেসে আসচে,

আমি জানি, ও আসচে আমার ঘরের বারান্দায় টবে আছে যে জুঁইয়ের রাশ, তা থেকে! ঐ যে পাখীর গান শুনচি, আমি জানি, ও পাখী গাইচে আমারি বারান্দার পাঁচায় বসে। ক্যানারি। ক্যানারির রঙ মিহি-হলদে।

আমার ঘরে আছে মেহগ্নির খাট—তাতে নেটের মশারি! আর আছে সোফা, কৌচ, আয়না-বসানো মস্ত আলমারি।

পূব দিকের দেওয়ালে আছে স্বামীর আর আমার ছবি। বিয়ের পরে তোলা—ব্রোমাইড এন্‌লার্জমেণ্ট।

ঘরের খুঁটিনাটি বর্ণনা আমি দিতে পারি।

আমার স্বামী—আমার আয়না—জানিস্ শীলা। এর একবর্ণ মিথ্যা নয়।

সেদিন আমায় নিয়ে গিয়েছিলেন গঙ্গার ধারে। গঙ্গার বুকে আছে বড় বড় জাহাজ, বোট, নৌকো কত কি! ওপারের আকাশ চিমনীর ধোঁয়ায় কালো হয়ে আছে। এপারে ইডন্ গার্ডন্‌স্—কাঁকর-ফেলা পথ—তারপর বেঞ্চ আছে সার-সার। ব্যাণ্ডষ্ট্যাণ্ড আছে। সন্ধ্যাবেলায় সেখানে ব্যাণ্ড বাজে। আর আছে বর্ম্মীজ প্যাগোডা। স্বামী তার ছোট একটি নক্সা বানিয়ে দিয়েচেন। সেটায় হাত বুলিয়ে আমি বুঝতে পেরেচি—প্যাগোডা জিনিসটা কি! এটা খুব ছোট। আসল প্যাগোডা তার চেয়ে হাজার-হাজার গুণ বড়।

স্বামী বলেন, তিনি কালো, কুৎসিত, কদাকার। তাতে কিছু এসে যায় না। তাঁর এ ভালোবাসা—এ-ভালোবাসার মত সুন্দর পৃথিবীতে আর কিছু নেই!

আমার সুখের কথায় আশা করি তুই খুশী হবি।

৬

বছর খানেক তোকে চিঠি দিতে পারিনি, শীলা।

প্রথম কারণ—এখানে কিছুদিন ছিলুম না।

দ্বিতীয় কারণ—গান শিখছিলুম স্বামীর কাছে। বাজনাও শিখছি। উনি এমন ভালো গাইতে বাজাতে পারেন—শুনলে মুগ্ধ হবি, শীলা।

আর সব-চেয়ে বড় কারণ—শুনলে খুশী হবি। আমি মা হয়েচি। কোলে একটি মেয়ে। সকলে বলে, মেয়ে যেন ফুলের কুঁড়ি!

জানি না, সত্যি কি না। চোখে তো দেখতে পাচ্ছি না। তবে বুকে নিয়ে মনে হয়, কথা মিথ্যা নয়। ফুলের চেয়েও নরম হয় ছেলে-মেয়ে—জানতুম না।

সত্যি, হাসিস্‌নে, শীলা। আমি অন্ধ বলেই হয়তো এমন মনে হয়।

উনি কত আদর করেন। সে আদরে আমি যেন চেতনা হারিয়ে ফেলি। মনে হয়, যেন কোথায় আছি—সেখানে শুধু আরাম! দৃষ্টিহারার সব ব্যথা ভুলে যাই।

৭

আমার স্বামীর তুলনা নেই, শীলা। জানি না, মেয়ে-মানুষের স্বামী কেমন হয়! সবার স্বামী যদি এমন হয়, তাহলে কি করে মান-অভিমান হয়—তাই, আমি বুঝতে পারি না। কাল স্বামী এসে বললেন—তুমি জানো, শান্তি,—আমি কিসের সাধনা করছি এত কাল।

স্বামীর বুকে মাথা রেখে আমি বললুম—কিসের?

—তোমার চোখে যে নানা ওষুধ দি, তোমায় বলি, রঙ কখনো ময়লা হবে না; সে ওষুধ দেবার আসল কারণ তোমার চোখে অস্ত্র হবে, তার আয়োজনে।

—অস্ত্র?

—তাই। বড় বড় ডাক্তাররা বলচেন, তুমি জন্মান্ধ নও—অস্ত্র করলে চোখ সারবে—তোমার দৃষ্টি তুমি ফিরে পাবে।

আনন্দে আমার মাথা থেকে পায়ের আঙুলের ডগা পর্য্যন্ত কেঁপে শিউরে উঠলো। আমি বললুম—সত্যি?

তিনি বললেন—খুব বড় ডাক্তারের সঙ্গে আমার কথা হয়েচে। সাতদিন পরে তিনি অস্ত্র করবেন!…চোখ পেলে তুমি দেখবে…

স্বামী নিশ্বাস ফেললেন। আমার বুক ছমছমিয়ে উঠলো। আমি বললুম—কি দেখবো?

স্বামী বললেন—আমি কালো কদর্য্য কুৎসিত! হয়তো তোমার দারুণ ঘৃণা হবে আমায় দেখলে।

আমার চোখে জল ঠেলে এলো বুক ফেটে! আমি তাঁর বুকে মাথা রেখে বললুম—না, না, না! আমি তোমার দাসী।

স্বামী কিছু বললেন না। বুকে আমায় চেপে ধরলেন। তারপর···

মা বলছিল—মা কালীর ষোড়শোপচারের পুজো দেবো—তাঁকে সোনার চোখ গড়িয়ে দেবো—সত্যনারায়ণের শিন্নী দেবো। ভালোয় ভালোয় চক্ষুরত্ন তুমি ফিরে পাও মা!

মায়ের কাছে অস্ফুটে কোনমতে প্রশ্ন তুললুম—হ্যাঁ মা, সত্যি?

—কি সত্যি, মা?

—উনি যে বলেন, উনি দেখতে খুব কালো—কদর্য্য—কুৎসিত?

হেসে মা বললে,—শুনিস্ কেন পাগলী! তবে মুখে বসন্তর ছোট-ছোট দাগ আছে।

চিঠিখানা লিখতে লিখতে ফেলে রেখেছিলুম—শেষ করা হয়নি। খুকীর শরীর ভালো ছিল না। আমি যে তার পরিচর্য্যা করতুম, তা নয়। তবে ভাবনা হয়েছিল। চোখে না দেখি, আমারি পেটে হয়েচে তো! কি জানি, তার উপর এত মায়া! পলে পলে কত ভাবনা জাগতো। যাই হোক, কাল অস্ত্র হবে।

যদি চোখের দৃষ্টি পাই, তোর লেখা সব চিঠিগুলো পড়তে পাবো। আর নিজের চোখে দেখে তখন যে চিঠি লিখবো, পড়ে তুই সত্যি আশ্চর্য্য হবি।

৮

চিঠির শেষটুকু আগে পড়িস্‌নে। খবর্দার!

এ চিঠি চোখে দেখে নিজের লেখা।

পনেরো দিন আগে চোখে অস্ত্র হয়েচে। এর মধ্যে দুখানা চিঠি তুই লিখেছিলি মায়ের নামে। মা সে চিঠি আমায় পড়ে শোনায়। জবাব দেয়নি। চোখ কাটাবার আগে মাকে আমি বারণ করেছিলুম; বলেছিলুম, শীলা যদি চিঠি দেয়, তাকে জবাব দিয়ো না। সেরে উঠে আমি তাকে চিঠি লিখবো। তাই মা তোকে চিঠি লেখেনি। এর জন্য অভিমান করিস্‌নে, ভাই!

চোখের কথা আগাগোড়া বলি।

বিছানায় পরম যত্নে আমায় উনি শুইয়ে দিলেন। তার আগে সকলকে প্রণাম করে বাবার-মায়ের পায়ের ধূলা মাথায়-চোখে নিলুম। সঙ্কিক্ষণ! মা কাঁদছিল। আমি বললুম—সুখের দিনে কাঁদো কেন, মা? আমি যে ভয় পাবো।

তারপর চোখে-মুখে-গালে স্বামীর কমল-হাতের কোমল পরশ—আঃ! সে পরশে কি আরাম! আমার সব ভয়-ভাবনা সে পরশে মুছে গেল।

সত্যি কথা ভাই, ভয়-ভাবনা মোটে হয়নি। আনন্দে আমার প্রাণ ভরে ছিল। দেখবো—চোখে দেখবো সুন্দর পৃথিবী! আজ বার-তেরো বৎসরে তার রঙ কেমন হয়েছে! আর দেখবো স্বামীকে—মেয়েকে—বাবাকে—মাকে! আলো, ফুল, পাখী, আকাশ, সব—সব আবার দেখতে পাবো!

ডাক্তার এলেন। আমি বললুম—খুকীকে একবার বুকে দিন।

দিলেন। একরাশ ফুলের মত নরম! খুকীকে বুকে চেপে ধরলুম। তার মুখে দিলুম অজস্র চুমো। ওরে ওরে ওরে আমার বুকের মণি—ওরে আমার সাধনার ধন···

তারপর চেতনা গেল মিলিয়ে···

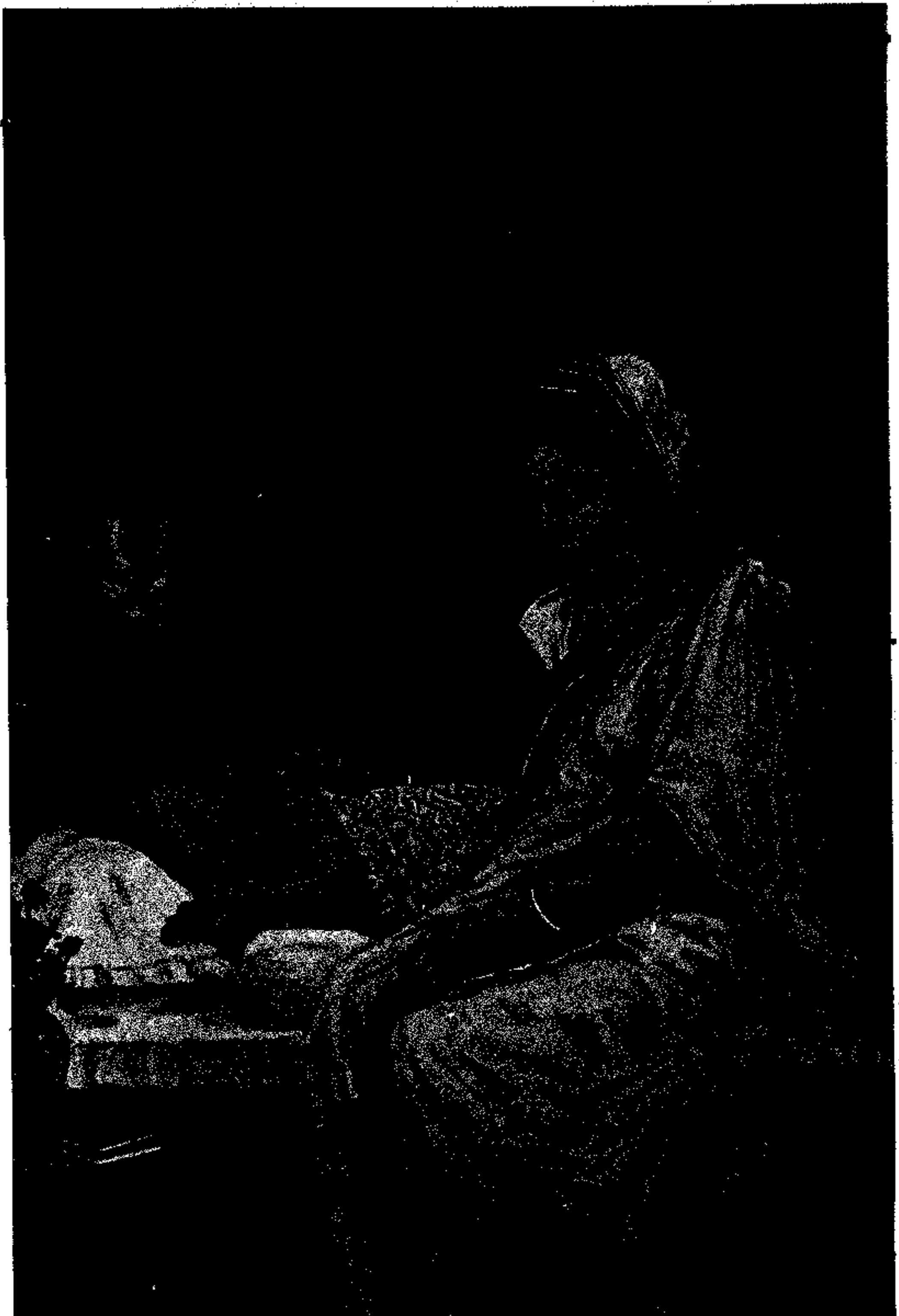
চেতনা কখন্ ফিরলো, জানি না। অন্ধ নয়নে মস্ত বাঁধন। দু'হাত বাড়িয়ে সকলকে চাই—পাশে—হাতের নাগালে!···

একটি একটি দিন কাটতে লাগলো। পনেরো দিন কাটলো।

এ পনেরো দিন শুধু হাওয়া বয়ে গেছে দেহ-মনের উপর দিয়ে—আশায় নিরাশায় মনকে কাঁপিয়ে দুলিয়ে। কখনো হাসির ফুল ফুটে উঠেচে সারা বুক ভরে—কখনো নেমেচে অশ্রুর পশলা!

আজ সকালে ডাক্তার এলেন। চোখের বাঁধনের উপর পেলুম হাতের স্পর্শ! স্বামী বললেন—এবারে তোমার চোখে জেগে উঠবে সমস্ত পৃথিবী।

ব্যাণ্ডেজ খোলা হলো। চোখের সামনে দেখলুম—ছোট একটি নক্ষত্র! আলোর আলো! চেয়ে থাকতে পারলুম না। সে আলোর বিন্দু যেন ছুরির মত বিঁধলো চোখে! তারপর চোখ মেলে চাই—আবার চোখ বুজি।



বসুমতী-চিত্র-বিভাগ]　　চির-জীবনের স্বপ্ন-স্মৃতি　　[শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র সেনগুপ্ত

এমনি চাওয়া—না-চাওয়ার মধ্য দিয়ে কখন বেশ চেয়ে দেখলুম…

শিয়রে ছিল মা। চিনতে কষ্ট হলো না। সেই মুখ—স্নেহে তেমনি টল-টল! মায়ের হাতখানি হাতে চেপে ধরে ডাকলুম—মা—মাগো…

মায়ের হাতখানি মুখে চেপে চোখ বুজলুম।

বাবা ডাকলো—শান্তি মা!

—বাবা!

সেই বাবা! দুঃখ-দুর্দ্দশার মলিনতা মুছে চোখের দৃষ্টিতে স্নেহের সেই জ্যোতি! মা বললে—মেয়েকে ছাখ্…

দেখলুম। ফুলের কুঁড়িই বটে! এ খুকী আমার! আমার! আমার!

বুকে আনন্দ উথলে উঠলো…

সে আনন্দ এমন তীব্র যে মনে হতে লাগলো, আমি আর বেঁচে নেই! পৃথিবী থেকে কোথায় কত দূরে গিয়ে পড়েচি!

মা বললে,—আর একজনকে দেখলিনে, শান্তি?

বুঝলুম, সে আর একজন কে!

চারিদিকে চাই!

ওধারে কে ও? অচেনা মুখ। সে মুখে চেয়ে দৃষ্টি আর ফিরতে চায় না।

মা বললে,—আয়না দেখবি?

আয়না!…

মুখের সামনে মা একখানা আয়না মেলে ধরলো। নিজেকে দেখলুম।

এই আমি!…সত্যি, শীলা, আমি এমন…বিশ্বাস হয় না!

মা বললে—ওকে চিনিস না?

মায়ের মুখে হাসি। মা তাকালো সেই অচেনা লোকটির পানে।

আমি আবার সে মুখের পানে চাইলুম।

বুকের মধ্যে কি হচ্ছিল, কথায় তোকে বোঝাতে পারবো না।

অচেনা লোকটি কাছে এলো। মা বললে—অলোক…

মা চলে গেল ঘর থেকে। স্বামী এসে বসলেন পাশে।

আমার হাত তাঁর নিজের হাতে তুলে নিলেন।

আমি বসতে গেলুম। তিনি বললেন—না, শুয়ে থাকো। ডাক্তার বলে গেছেন, চব্বিশ ঘণ্টা বিছানা থেকে উঠবে না—শুয়ে থাকতে হবে! চোখের শির বড় পল্কা।

তাঁর পানে চেয়ে আছি—অপলক নয়নে।

হেসে স্বামী বললেন—কি দেখচো? আমায় চেনো?

আমি বললুম—না।

—তোমার…

আমি বললুম—মিথ্যা কথা। তুমি স্বামী নও। আমার স্বামী কালো কদর্য্য কুৎসিত। তুমি তো সুন্দর…

হেসে স্বামী বললেন—তুমি আমায় সুন্দর দেখচো। তার কারণ, আমি যে তোমার আয়না! আমার বুকে তুমি নিজেকে দেখচো—তাই সুন্দর মনে হচ্ছে!

আমি বললুম—দুষ্টু…

—আর তুমি লক্ষ্মী!

এই কথা বলে স্বামী একেবারে আমার মুখে মুখ নামিয়ে……

সত্যি শীলা, এত সুখ যদি ভাগ্যে মেলে, জন্ম-জন্ম—অন্ধ হলেও আমার কোনো দুঃখ থাকবে না।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়





সপ্তম পাক

ভূবিবরস্থ কক্ষের বিভীষিকা

অবিশ্রান্ত জলবিন্দু-পতনের টুপটাপ শব্দ শুনিয়া মিঃ প্রীড, চক্ষু উন্মীলন করিয়া বিস্মিতভাবে পূর্ব্বোক্ত কঙ্কালবৎ বিশীর্ণ দেহের পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র টেবলখানির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তাহা চেয়ারের বাঁ-ধারে সংস্থাপিত ছিল।

তিনি দেখিলেন, টেবলের উপর সংরক্ষিত একটি কাচের গ্লাস জলে অর্দ্ধপূর্ণ হইয়াছিল। অদূরবর্ত্তী দেওয়ালে জলের একটি পাইপ ছিল; সেই পাইপ-সংলগ্ন একটি রবারের নলের মুখ হইতে বিন্দু বিন্দু জল টুপ-টুপ শব্দে উক্ত গ্লাসে পড়িতেছিল। সেই শব্দ তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন। টেবলের উপর কতকগুলি বিস্কিট ও লজেন্স্ বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়াছিল। মিঃ প্রীড যে কঙ্কালবৎ মূর্ত্তিকে চেয়ারের সহিত দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় উপবিষ্ট দেখিয়াছিলেন, তাহার বাম বাহুর নিম্নভাগ মুক্ত ছিল, ইহা তিনি পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সেই খাদ্যদ্রব্যগুলি ও জলের গ্লাস দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, অস্থিচর্ম্মসার কয়েদী ক্ষুধায় কাতর হইলে বন্ধন-বিহীন বাঁ-হাত বাড়াইয়া টেবল হইতে বিস্কিট ও লজেন্স্ তুলিয়া লইত; এবং তাহা চর্ব্বণ করিয়া ও সেই গ্লাসের জল পান করিয়া সে জীবিত ছিল।

মিঃ প্রীড বন্দীর অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, সে কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে সেই চেয়ারে আবদ্ধ ছিল। পানাহারে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করা হয় নাই বলিয়াই এত কষ্টেও তাহার মৃত্যু হয় নাই; কিন্তু তাহাকে এই প্রকার যন্ত্রণা দিয়া জীবিত রাখিবার কি প্রয়োজন ছিল, মিঃ প্রীড তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু আত্মরক্ষায় অসমর্থ বিপন্নের প্রতি এই প্রকার নির্য্যাতনের পরিচয় পাইয়া ক্রোধে ক্ষোভে তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, তিনি অদূরবর্ত্তী দ্বার পদাঘাতে উদ্‌ঘাটিত করিয়া, অপর কক্ষে লাফাইয়া পড়িবেন, এবং যে নরপিশাচ এই প্রকার পৈশাচিক নির্য্যাতনের আবিষ্কর্ত্তা, তাহার মুণ্ডপাত করিবেন। সেই শয়তান যে অন্য কক্ষে ছিল, পদশব্দ শুনিয়াই তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

কিন্তু ক্রোধ তাঁহার যতই অধিক হউক, তাঁহার যে আরও অনেক কর্ত্তব্য ছিল, ইহা তিনি বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। তিনি চারিদিকের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে সকল জুরীকে গোপনে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল, তাঁহারা সেই গৃহেই আনীত হইবেন। যদি তিনি, পালের গোদা, দস্যুদলপতি এই নরপশুকে আক্রমণ করেন, যদি সে তাঁহার অস্ত্রাঘাতে নিহত হয়, তাহা হইলে সেই দ্বাদশ জন জুরীকেও অকালে হয় ত প্রাণ হারাইতে হইবে। তিনি ভাবিলেন, দস্যুরা জুরীদের এখানে বাঁধিয়া আনিয়া তাহাদের দলপতির প্রতীক্ষা করিবে, কিন্তু যদি তাহারা দলপতির সাক্ষাৎ না পায়, তাহা হইলে জুরীদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে তাহারা পূর্ব্বেই উপদেশ পাইয়াছিল। সেই উপদেশ যাহাই হউক, তাহারা ইহা সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারিয়াছে যে, জুরীরা সহসা অদৃশ্য হওয়ায়, নগরে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, পুলিসবাহিনী চতুর্দ্দিকে তাঁহাদের অনুসন্ধান করিতেছে। যদি পুলিস এই অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া খানাতল্লাস আরম্ভ করে ও জুরিদিগকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে দস্যুদলের বিপদের সীমা থাকিবে না। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া, তাহারা জুরীদের হত্যা করিয়া, তাঁহাদের মৃতদেহগুলি লুকাইয়া ফেলিবে; তাহার পর পুলিস এখানে আসিবার পূর্ব্বেই তাহারা আত্মরক্ষার জন্য পলায়ন করিবে। তাহারা যে অনন্যোপায় হইয়া এই পন্থা অবলম্বন করিবে, ইহাই মিঃ প্রীডের ধারণা হইল।

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া মিঃ প্রীড আরও কিছুকাল সেখানে অপেক্ষা করাই সঙ্গত মনে করিলেন; কিন্তু নিশ্চেষ্টভাবে সেই কক্ষে বসিয়া না থাকিয়া, সাধ্যানুসারে দলপতির

গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য বলিয়া তাঁহার মনে হইল। তিনি একটি জানালার ফুকরের ভিতর দিয়া পরবর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেই মুহূর্ত্তে অসহ্য দুর্গন্ধে তাঁহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল। তিনি সেই কক্ষের গালিচার উপর দিয়া পরবর্ত্তী কক্ষের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন।

সেই কক্ষের দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত ছিল। মিঃ ব্লীড দ্বারের সেই ফাঁক দিয়া এক জন দীর্ঘাকৃতি শীর্ণকায় লোকের পশ্চাদ্ভাগ দেখিতে পাইলেন। সেই ব্যক্তি উভয় জানুতে ভর দিয়া বসিয়া সম্মুখস্থ গর্ত্তের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, এবং সেই গর্ত্তে দুই হাত প্রবেশ করাইয়া কোন সামগ্রী পরীক্ষা করিতেছিল, দুই এক মিনিট পরে সে সেই গর্ত্তের ভিতর হইতে রাশি রাশি হীরকালঙ্কার এবং স্বর্ণ-নির্ম্মিত প্লেট, পেয়ালা প্রভৃতি মেঝের উপর তুলিলে, তাহাতে বৈদ্যুতিক দীপের উজ্জ্বল আলোক প্রতিফলিত হওয়ায় সেগুলি ঝক্-মক্ করিতে লাগিল। মিঃ ব্লীড সেই মহার্ঘ্য দ্রব্যরাশি দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। হীরক-রত্নালঙ্কারের স্তূপের দিকে চাহিয়া তাঁহার চক্ষু ধাঁধিয়া গেল। সেই সকল দ্রব্যের মূল্য কত, তাহা অনুমান করাও তাঁহার অসাধ্য হইল। তাঁহার মনে হইল, তাহাদের মূল্য দশ লক্ষ পাউণ্ড ত হইবেই, তাহারও অধিক হইতে পারে। সেই ব্যক্তি দুই একখানি হীরকালঙ্কার হাতে লইয়া হীরকগুলি আগ্রহ-ভরে পরীক্ষা করিতে লাগিল। কৃপণ যেমন তাহার সঞ্চিত অর্থরাশি নির্নিমেষ-নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না, সেই লোকটির ভাবভঙ্গী দেখিয়াও তাহার সম্বন্ধে মিঃ ব্লীডের সেইরূপ ধারণা হইল। সে সেই রত্নস্তূপ হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না।

কিছুকাল পরে সেই ব্যক্তি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হীরকরত্ন ও স্বর্ণস্তূপ গর্ত্তের ভিতর নামাইয়া রাখিয়া একটি গুপ্ত স্প্রিংএ আঙ্গুলের খোঁচা দিল। সেই মুহূর্ত্তেই ইস্পাত-নির্ম্মিত একখানি সমতল আবরণ 'খট্' শব্দে সরিয়া গিয়া সেই গর্ত্তের মুখ এ ভাবে আবৃত করিল যে, সেখানে গর্ত্ত ছিল, ইহা বুঝিবার উপায় রহিল না। অবশেষে সেই ব্যক্তি মেঝের উপর হইতে নোটের কতকগুলি বাণ্ডিল তুলিয়া লইয়া, সেগুলি তাহার পরিহিত কোটের ও ট্রাউজারের বিভিন্ন পকেটে পুরিল। এই কার্য্য শেষ হইলে সে সেই কক্ষের মেঝের উপর প্রসারিত গালিচার যে অংশ গুটাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা পুনর্ব্বার মেঝের উপর প্রসারিত করিয়া হীরক, রত্ন ও স্বর্ণপূর্ণ ধনভাণ্ডারের মুখাবরণ আবৃত করিল।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মুখ সেই কক্ষের দ্বারের বিপরীত দিকে ছিল, এইবার সে দ্বারের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইবে বুঝিয়া মিঃ ব্লীড্ বিদ্যুদ্বেগে দ্বারপ্রান্ত হইতে সরিয়া গিয়া অন্য দিকে লুকাইলেন। সেই ব্যক্তি যখন সেই দ্বারের বাহিরে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল এবং তাহার পর ফিরিয়া দাঁড়াইল, মিঃ ব্লীড সেই সময় তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন। তাহার মুখ দেখিয়া তাহার মস্তিষ্কের প্রকৃতিস্থতা সম্বন্ধে মিঃ ব্লীডের সন্দেহ হইল। তাহার কোন কোন বৃত্তি এরূপ অস্বাভাবিক-ভাবে উত্তেজিত হইয়াছিল যে, মস্তিষ্কের বিকৃতিই তাহার পরিণাম। তাহার মুখভাবে সেই অপ্রকৃতিস্থতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মুখখানি দেড়ো কোদালের ফালের মত লম্বা, অক্ষিকোটরস্থিত চক্ষু-তারকা দুই খণ্ড সুগোল জ্বলন্ত কয়লার মত ধ্বক্-ধ্বক্ করিতেছিল। তাহার অধরোষ্ঠ পাতলা এবং কুঞ্চিত, তাহা হইতে পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

সে ধীরে ধীরে সেই কক্ষে অগ্রসর হইয়া চেয়ারের সহিত রজ্জুবদ্ধ অস্থিচর্ম্মসার জীবন্মৃত বন্দীর সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কঠোর স্বরে বলিল, "মুলিন্স, এখনও বাঁচিয়া আছ? কি কাঠ প্রাণ! প্রায় এক মাস পূর্ব্বে তোমাকে ঠিক এই অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিলাম। এত দিন জীবিত থাকিবে, এ সম্ভাবনা মুহূর্ত্তের জন্য আমার মনে স্থান পায় নাই। তোমার জীবনধারণের শক্তির পরিচয় পাইয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি!"

মিঃ ব্লীড্ তাহার শ্লেষ-পূর্ণ নিষ্ঠুর উক্তি শুনিয়া গুপ্তির আঘাতে তাহার কণ্ঠ বিদীর্ণ করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন; কিন্তু অতি কষ্টে সেই অধীরতা দমন করিলেন। সেই নিষ্ঠুর পিশাচ মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, "সেই সময় তোমাকে এখানে বাঁধিয়া রাখিয়া আমাকে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতে হইয়াছিল। ড্যান কার্থু পলায়নের সুযোগ পায়, এরূপ আমার ইচ্ছা ছিল না। আমি তাহাকে ফাঁদে ফেলিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছি; এখন তোমাকে গোটাকত কথা বলিব, তাহা শুনাইবার জন্যই তোমাকে জীবিত রাখিয়াছি।

"তুমি আর সেই শয়তান কাথু আমার সর্ব্বস্ব চুরি করিবার মতলবে এখানে আসিয়াছিলে। তোমরা ঐ দ্বার খুলিতে পারিয়াছিলে বটে, কিন্তু সিন্দুক খুলিতে পার নাই; সিন্দুক ভাঙ্গিবার কৌশলও তোমাদের জানা ছিল না।"

সে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "তুমি আর ড্যান্—তোমরাই দু'জনে যে চুরি করিতে আসিয়াছিলে, ইহা আমি কিরূপে জানিতে পারিলাম, এই প্রশ্ন তোমার মনে উদয় হইতে পারে। মনে করিও না, বিনা প্রমাণে আমি তোমাদের প্রতি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছি। আমার কি প্রমাণ আছে, তাহা তোমাকে দেখাইতেছি।"

সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ অদূরবর্ত্তী ডিক্টাফোনের (শ্রুতি-লিখন যন্ত্রের) নিকট উপস্থিত হইয়া রজ্জুবদ্ধ কয়েদীকে বলিল, "কোন ব্যক্তি বাহিরের দরজা খুলিলেই এই কল আপনা হইতে চলিতে আরম্ভ করে। ইহা লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল, এ জন্য তোমরা ইহা দেখিতে পাও নাই। কিন্তু মোমের উপর এই যন্ত্রের কাঁটা চলিতে থাকায় যে শব্দ হইতেছিল, সেই শব্দ শুনিয়া তোমরা বড় ধাঁধায় পড়িয়াছিলে; শব্দের কারণ স্থির করিতে না পারায় চঞ্চল হইয়াছিলে। কিন্তু তোমরা কি কথা বলিয়াছিলে, এই যন্ত্র হইতেই তাহা শুনিতে পাইবে।"

সে সুইচ টিপিয়া ডিক্টাফোনের কল চালাইয়া দিলে, প্রথমে 'ভনর-ভনর' করিয়া অস্ফুট শব্দ হইল; তাহার পর মনুষ্য-কণ্ঠধ্বনি সুস্পষ্ট হইল। সেই কণ্ঠস্বর এইরূপ,—

"দেখ ড্যান, আমরা ঠিক যায়গাতেই এসেছি। মালগুলো সে এখানে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে।"

মুহূর্ত্ত পরে বিভিন্ন কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইল। তাহা এই—"মুলিন্স, এখন বেশ বুঝতে পারছি—সে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। শেষ কাযটা ত আমিই করেছিলাম। সেই হীরা-জহরৎগুলার দাম পঞ্চাশ হাজার ত বটেই। আর আমাদের সঙ্গের সেই জোগাড়েটো—কি তার নাম? সে সেই ধনী মার্কিণটার ত্রিশ হাজার পাউণ্ডের মাল হাতিয়েছিল। এ ত এক হপ্তার উপার্জ্জন! বখরার সময় কচু পাবো—তা বুঝেই তার ওপর নজর রেখেছিলাম, তাতেই ত জানতে পারি, সে মালগুলো এখানেই সরিয়েছে।"

সেই সময় একটা শব্দ হইল; সেই শব্দ শুনিয়া মুলিন্স সভয়ে বলিল, "ও কিসের শব্দ, ড্যান!"

ড্যান কাথু বলিল, "ও কিছু নয়, বাতাসের সন্‌সনানি। এখন কায আরম্ভ করা যাক। মালগুলা ঘরের ভিতর কোন যায়গায় লুকিয়ে রেখেছে।"

অতঃপর দুপ-দাপ্ পদশব্দ, দ্বারের খিল খুলিবার শব্দও ডিক্টাফোনে শুনিতে পাওয়া গেল। অবশেষে ড্যান উৎসাহভরে বলিল, "এই ঘরে সে মালগুলা লুকিয়ে রেখেছে—আমাদেরই সেই সকল মাল।"

ইহার পর আর কাহারও কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া গেল না। ডিক্টাফোন হইতে অস্ফুট শব্দ বাহির হইল।

লোকটা তখন কয়েদীর চেয়ারের নিকট আসিয়া সক্রোধে বলিল, "তোদের মত কুকুর আমার চোখে ধূলা দিয়া আমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবে? আমি তোদের উপযুক্ত শাস্তি দিয়াছি, এইবার তোকে সাবাড় করিব। কাল সকালে ড্যানেরও সেই দশা হইবে।"

অতঃপর সেই নরপিশাচ হাত বাড়াইয়া চেয়ার স্পর্শ করিল। সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্য বন্দীর সর্ব্বাঙ্গ বিদ্যুদ্বেগে কাঁপিয়া উঠিল। 'খট্' করিয়া শব্দ হইল, মুহূর্ত্তমধ্যে বন্দীর মাথা চেয়ারের কাঁধার উপর ঢলিয়া পড়িল। তাহার সকল যন্ত্রণার অবসান হইল। মিঃ ব্লীড আড়াল হইতে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে পারিলেন, হতভাগ্য মুলিন্সের প্রাণবিহঙ্গ দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিয়াছে।

মিঃ ব্লীড গুঁড়ি মারিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ললাটের ঘর্ম্মরাশি অপসারিত করিলেন। তাহার পর তিনি গুঁড়ি মারিয়া একটি খিলানের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এই ভাবে দশ মিনিট অতীত হইল। তিনি দ্বার রুদ্ধ করিবার শব্দ শুনিতে পাইলেন, তাহার পর অনাবৃত মেঝের উপর লঘু পদশব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি আলোকিত পথ দিয়া দস্যুদলপতিকে ধীরে ধীরে যাইতে দেখিলেন,—নিহত বন্দীর মৃতদেহ সে কাঁধে তুলিয়া লইয়াছিল। মিঃ ব্লীড স্তম্ভশ্রেণীর ছায়ায় ছায়ায় সতর্কভাবে তাহার অনুসরণ করিলেন। অবশেষে দস্যুপতি একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া মৃতদেহটি কাঁধ হইতে সেই কক্ষের মেঝের উপর নিক্ষেপ করিল। দস্যুদলপতি দুই এক মিনিট সেই স্থানে

দাঁড়াইয়া থাকিয়া মেঝের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, এবং দুই হাত বাড়াইয়া একটা আংটা ধরিয়া মেঝের উপর হইতে একখানি বৃহৎ চতুষ্কোণ পাথরের টালি অপসারিত করিল। তাহার পর মৃত দেহটির দুই পা ধরিয়া সেই ভূগর্ভস্থ গহ্বরের কিনারায় লইয়া গিয়া তাহা মুক্তদ্বার বিবরের ভিতর নিক্ষেপ করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে ঝপাং করিয়া একটা শব্দ হইল। কোন ভারী পদার্থ জলের ভিতর নিক্ষেপ করিলে যেরূপ শব্দ হয়—সেইরূপ শব্দ মিঃ ব্লীডের কর্ণগোচর হইল।

দস্যুদলপতি পূর্ব্বোক্ত টালিখান দুই হাতে তুলিয়া মেঝের সুকরের উপর সংস্থাপিত করিল, তাহার পর যে পথে সে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল, সেই পথে ফিরিয়া চলিল। মিঃ ব্লীড স্তম্ভের অন্তরালে যে স্থানে লুকাইয়া থাকিয়া এই লোমহর্ষণ কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন, সেই নরপিশাচ তাহারই পাশ দিয়া চলিয়া গেল। সেই সময় মিঃ ব্লীডের ইচ্ছা হইল, এই সুযোগ তিনি নষ্ট করিবেন না, তাঁহার গুপ্তির এক খোঁচায় তাহার কণ্ঠ চিররুদ্ধ করিবেন, তাহার মৃতদেহ ভূবিবরে নিক্ষেপ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইবে না। সে একাকী, তাঁহার আকস্মিক আক্রমণে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না, তাহার অন্তিম আর্ত্তনাদও কেহ শুনিতে পাইবে না। কিন্তু এই ভাবে নরহত্যা করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া তিনি মানসিক উত্তেজনা দমন করিলেন।

তাঁহার মনে হইল, অপহৃত জুরীর দল সেই অট্টালিকায় আনীত হইবে। দস্যুরা সদলে তাঁহাদিগকে লইয়া আসিবে। সেই বারো জন নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণরক্ষা করাই প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া তাঁহার মনে হইল। তাঁহাদের একমাত্র অপরাধ, জুরী নির্ব্বাচিত হইয়া তাঁহারা কর্ত্তব্য পালন করিবার, আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; এই জন্য তাঁহাদের জীবন বিপন্ন হইয়াছে। তিনি তাঁহাদের উদ্ধারের ভার গ্রহণ না করিলে মৃত্যু-কবল হইতে তাঁহাদের নিষ্কৃতিলাভের কোন উপায়ই তিনি দেখিতে পাইলেন না।

তিনি ভাবিলেন, যদি তিনি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া দস্যুদলপতিকে সেই সুযোগে হত্যা করেন, তাহা হইলে তাহার মৃতদেহ অপসারিত করিবার পূর্ব্বেই দস্যুরা সেখানে আসিয়া পড়িবে না, তাহার নিশ্চয়তা ছিল না। যদি তাহারা দলপতির মৃতদেহ দেখিতে পায়, অথবা যদি দেখিতে না-ও পায়, তাহা হইলে তাহাদের মনের ভাব কিরূপ হইবে? তাহারা প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা বুঝিতে না পারিয়া প্রাণভয়ে ব্যাকুল পশুর ন্যায় ক্ষেপিয়া উঠিবে। তখন তাহারা তাহাদের বন্দীদিগকে হত্যা করিয়া, তাড়াতাড়ি সেই স্থান হইতে পলায়নের জন্য—আত্মরক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। তাহারা তাহাদের অপরাধ সপ্রমাণ করিবার জন্য সেই দ্বাদশ জন বন্দীকে সেখানে জীবিত রাখিয়া পলায়ন করিবে, তাহা সম্ভব বলিয়া তিনি মনে করিতে পারিলেন না। সুতরাং জুরীদিগকে হত্যা করিয়া আত্মরক্ষার পথ মুক্ত করিবার জন্যই তাহাদের আগ্রহ হইবে। আত্মরক্ষায় অসমর্থ নিরস্ত্র বন্দীদিগকে হত্যা করা তাহাদের পক্ষে কঠিন হইবে না। দস্যুরা সেই স্থানে তাঁহাদের প্রাণবধ করিয়া, তাহাদের দলপতি যে ভাবে মুলিনসের মৃতদেহ অপসারিত করিয়াছিল, তাহারাও ঠিক সেই ভাবেই জুরীদের মৃতদেহগুলি ভূবিবরে নিক্ষেপ করিবে; তাঁহাদের অস্তিত্বের কোন নিদর্শন বর্ত্তমান থাকিবে না।

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া মিঃ ব্লীড সুযোগ পাইয়াও দস্যু-দলপতিকে আক্রমণ করিলেন না। তিনি দস্যু-দলপতির অলক্ষ্য থাকিয়া নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে দলপতি একতলার সিঁড়ির গোড়ায় আসিয়া হঠাৎ থামিল। সেই সময় মিঃ ব্লীড পদশব্দে বুঝিতে পারিলেন, সিঁড়ি দিয়া কেহ নামিয়া আসিতেছিল। দলপতি তৎক্ষণাৎ বুকের পকেটস্থিত পিস্তলে হাত দিয়া অন্ধকারে লুকাইল।

মুহূর্ত্ত পরে এক ব্যক্তি সিঁড়ির নীচে আসিয়া অনুচ্চ স্বরে ডাকিল, "সর্দ্দার!"

কণ্ঠস্বর শুনিয়া দলপতি আড়াল হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ির নীচে প্রত্যাগমন করিল। সে আগন্তুককে দেখিয়া প্রফুল্ল হইল; সে কোমল স্বরে বলিল, "ম্যাট কার্থ, তুমি আসিয়াছ? বেশ, আমি তোমারই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, কি সংবাদ বল।"

আগন্তুক বলিল, "এ সময় আপনার এখানে দেখা পাইব কি না, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল। কিন্তু এরোপ্লেন দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, আপনি আসিয়াছেন। আমরা উপরের ঘরগুলিতে আপনার অনুসন্ধান করিয়া

আপনাকে দেখিতে পাই নাই। তখন দলের অন্য সকলে বলিল, আপনি একতলার নীচের গুদামে কোন কারণে নামিয়া গিয়া থাকিবেন। এখানে আপনার দেখা পাইব, এই আশায় সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিলাম। আমরা তাহাদের সকলকে—সেই বারো জনকেই পাকড়াইয়াছি, সর্দ্দার! এই বারো জন একমত হইয়া আমার দাদার গলায় ফাঁস দিতে উদ্যত হইয়াছিল।"

মিঃ ব্লীড অন্ধকারে হঠাৎ যেন আলোক দেখিতে পাইলেন। তিনি আগন্তুকের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, সে ড্যান্ কার্থুর ছোট ভাই। সে এই নিষ্ঠুর, কপট ও বিশ্বাসঘাতক দলপতির অনুচরগণের অন্যতম; সে সরল বিশ্বাসে আশা করিয়াছিল, দলপতি তাহার দাদাকে কঠোরতম রাজদণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিল। এই জন্য সে দলপতির নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ ছিল এবং ড্যান্ কার্থুর বিরুদ্ধে আরোপিত নরহত্যার অভিযোগের বিচারের জন্য যে দ্বাদশ জন জুরী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, দলপতি তাহাদিগকে চুরি করিয়া আনিবার ষড়যন্ত্র করিলে, ম্যাট্ কার্থু এই কঠিন কার্য্যে তাহার সহযোগিবর্গের পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিল।

দলপতি ম্যাট্ কার্থুকে বলিল, "আমি যে তোমার দাদার প্রাণরক্ষার জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতেছি, ইহা কি সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া মনে কর না, ম্যাট্? আমার কার্য্যপ্রণালী ত তোমার অজ্ঞাত নহে। অন্যায় অবিচার আমি সহ্য করিতে পারি না। আমি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি শাস্তি দিই; আমি যে দণ্ড দান করি, তাহা অমোঘ; কিন্তু যাহারা আমার অনুগত, যাহারা বিশ্বস্তভাবে আমার আদেশ পালন করে, আমি তাহাদের কোন অনিষ্ট করি না, প্রাণপণে তাহাদিগকে রক্ষা করি। তোমার দাদা আমার বিশ্বস্ত অনুচর, সে প্রাণপণে আমার প্রত্যেক আদেশ পালন করিয়া আসিয়াছে, এ জন্য তাহার প্রাণরক্ষার চেষ্টায় আজ রাত্রিতে আমাকে বিস্তর ঝুঁকি ঘাড়ে লইতে হইয়াছে।"

মিঃ ব্লীড দস্যুপতির এই প্রকার কপটতায় ও বিশ্বাসঘাতকতায় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। ড্যান কার্থু পরদিন বিচারালয়ে তাহার গুপ্তকথা প্রকাশ করিতে পারে, এই ভয়েই গোপনে সে তাহার সর্ব্বনাশের ব্যবস্থা করিতেছিল। সে মিঃ ব্লীডকে ও মিস্ হ্যালামকে তাহার হিতচেষ্টা করিতে দেখিয়া, তাঁহাদের হত্যার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, এবং তাঁহারা ভূবিবরস্থ সাপের উদরে প্রবেশ করিয়াছেন ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। সে ড্যান্ কার্থুর ভাইকে এই প্রকার মিথ্যা কথায় ভুলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু মিঃ ব্লীড ইহাতে বিস্মিত হইলেন না। তিনি ম্যাট্ কার্থুর কথা শুনিতে লাগিলেন।

ম্যাট্ কার্থু দলপতির স্তোকবাক্যে কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া বলিল, "আপনি ড্যানের ফাঁসি রহিত করিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করিতে পারিলে, আমি চিরজীবন প্রাণপণে আপনার সেবা করিব, সর্দ্দার! আপনি দেখিবেন, কোন দিন আমার এই অঙ্গীকারের অন্যথা হইবে না। আমি জানি, আপনার ষড়যন্ত্র ও সাহায্য ভিন্ন আজ রাত্রিতে আমরা সেই বারো জন জুরীকে ওভাবে স্থানান্তরিত করিতে পারিতাম না। সেই বারো জনকেই আমরা—"

ম্যাট্ কার্থুর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই দলপতি বলিল, "তাহাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে এখানে আনিতে পারিয়াছ, তাহা জানি। তাহাদিগকে অবিলম্বে সাবাড় করিতে হইবে। এই সকল জুরীর অভাবে ড্যানের বিচারের জন্য আবার নূতন এক দল জুরী নির্ব্বাচিত হইবে। আবার নূতন করিয়া ড্যানের বিচার আরম্ভ হইবে। সেই বিচার শেষ হইবার পূর্ব্বে সে যাহাতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, আমি তাহার উপায় করিব।"

দলপতি অতঃপর সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিল। সে ম্যাট্ কার্থুকে আদেশের স্বরে বলিল, "কূপের মুখে যে পাথর আছে, তাহা অবিলম্বে অপসারিত কর। কোন আয়োজন যেন অসমাপ্ত না থাকে। আমি আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই এই স্থান ত্যাগ করিব; স্থানান্তরে আমার জরুরী কায আছে। আমি প্রথমে মিটিং করিয়া বখরার কায শেষ করিব, তার পর ঐ বারো জন জুরীকে তাহাদের রায় প্রকাশের জন্য পরলোকে পাঠাইয়া দিব। কিন্তু আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলে চলিবে না, তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া যাও।"

মিঃ ব্লীড দলপতির কথা শুনিয়া সেই মুহূর্ত্তেই সিঁড়ি দিয়া নামিয়া একটি থামের আড়ালে লুকাইলেন। ক্ষণকাল পরে ম্যাট্ কার্থু নামিয়া গেল। উপরের সিঁড়ির দরজা বন্ধ হইবার শব্দ মিঃ ব্লীডের কর্ণগোচর হইল। তিনি

থামের আড়াল হইতে ম্যাট্ কার্থুকে আলোকিত পথ দিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে দেখিলেন।

মিঃ ব্লীড সেই গুপ্তস্থানে দাঁড়াইয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দুই এক মিনিট চিন্তা করিলেন। তাঁহার ধারণা হইল, ম্যাট্ কার্থু'ই দস্যুদলপতির প্রধান সহযোগী, সে তাহারই হস্তে জুরীদের খুন্ করিবার ভার অর্পণ করিয়াছিল, এবং তাঁহাদিগকে নিহত করিবার জন্য সকল আয়োজন শেষ করিতে তাহাকেই আদেশ করিয়াছে। এ অবস্থায় দলপতির এই প্রতারিত অনুচরকে কোন কৌশলে বশীভূত করাই অপরিহার্য্য বলিয়া তাঁহার মনে হইল।

তিনি স্থির করিলেন, সেই নরপশুর হস্তের অস্ত্র দ্বারাই তাহাকে আক্রমণ করিবেন। দস্যুদল দ্বারা তাহাদের দলপতির সর্ব্বনাশের উপায় করিবেন।

মিঃ ব্লীড কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া নিঃশব্দে ম্যাট্ কার্থুর অনুসরণ করিলেন।

ম্যাট্ কার্থু প্রফুল্ল-চিত্তে পূর্ব্বোক্ত গুদাম-ঘরে প্রবেশ করিয়া সেই কক্ষের মেঝের যে স্থানে কূপের মুখ পাথরের টালির দ্বারা আবৃত ছিল, সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সে যখন সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, উভয় হস্তে সেই ভারী চতুষ্কোণ টালির কড়া ধরিয়া তাহা অপসারিত করিবার চেষ্টা করিল, সেই মুহূর্ত্তে মিঃ ব্লীড তাঁহার তীক্ষ্ণধার গুপ্তি প্রসারিত করিয়া তাহার অগ্রভাগ দ্বারা ম্যাট্ কার্থুর পাঁজরে ঈষৎ খোঁচা দিয়া বলিলেন, "ম্যাট্ কার্থু, তুমি চীৎকার করিয়াছ কি মরিয়াছ! আমার এই গুপ্তির ডগায় তীব্র বিষ আছে, তাহা যে মুহূর্ত্তে তোমার রক্তের সহিত মিশিবে, সেই মুহূর্ত্তে তোমার মৃত্যু হইবে। তুমি পলায়নের চেষ্টা করিলেই আমার এই অস্ত্র তোমার পাঁজরে বিদ্ধ হইবে। তুমি তৎক্ষণাৎ পড়িবে আর মরিবে। এখন তোমার কর্ত্তব্য স্থির কর।"

ম্যাট্ কার্থু কোন শব্দ করিল না, একটুও নড়িল না; সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সে ভাবে দাঁড়াইয়াছিল, সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল। কেবল নিজের অবস্থাটা ঠিক বুঝিবার জন্য মাথা ঘুরাইয়া নিজের পাঁজরের দিকে চাহিল; সে দেখিল, তাহার আততায়ীর হাতের গুপ্তির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ তাহার কোট ফুটা করিয়া, পাঁজরের ত্বক স্পর্শ করিয়াছে, আততায়ী একটু খোঁচা দিলেই তাহা তাহার পাঁজরে বিদ্ধ হইবে, তাহা তাহার শোণিত স্পর্শ করিবে। আতঙ্কে তাহার চক্ষু বিস্ফারিত হইল, তাহার ললাটে স্থূল ঘর্ম্মবিন্দু সকল ফুটিয়া উঠিল।

মিঃ ব্লীড কঠোর স্বরে বলিলেন, "সোজা হইয়া ঘুরিয়া দাঁড়াও।"

ম্যাট্ কার্থু কম্পিত স্বরে বলিল, "ঐ হাতিয়ার আমার পাঁজরে বিঁধিয়া চামড়া ফুটা করিবে না ত?"

মিঃ ব্লীড বলিলেন, "যতক্ষণ আমার আদেশ পালন করিবে, ততক্ষণ তুমি নিরাপদ।"

ম্যাট্ কার্থু এবার মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল। তাহার বুকের ভিতর তখন যেন হাতুড়ি পড়িতেছিল।

মিঃ ব্লীড তাহার পাঁজর হইতে গুপ্তির অগ্রভাগ অপসারিত না করিয়া বলিলেন, "আমার পাশে পাশে চল, পিছাইয়া পড়িয়াছ কি তোমার পাঁজর ফুটা হইয়াছে। তোমার সঙ্গে আমার গোটাকতক জরুরী কথা আছে।"

ম্যাট্ কার্থু তাঁহার পাশে পাশে চলিয়া অদূরবর্ত্তী কক্ষের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল।

মিঃ ব্লীড বলিলেন, "শীঘ্র এই দ্বার খুলিয়া ঐ কামরায় প্রবেশ কর।"

ম্যাট্ বিনা প্রতিবাদে তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশ পালন করিল। অতঃপর তাঁহারা উভয়ে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলে মিঃ ব্লীড ম্যাটের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তিনি পূর্ণ দৃষ্টিতে সেই আতঙ্কবিহ্বল দস্যুর বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিলেন।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।



আগুন নিয়ে খেলা

[গল্প]

১

গাড়ী ষ্টার্ট দিবার পর গৃহিণী বিলাসময়ী প্রসন্নমুখে কর্ত্তাকে বলিলেন, "দিবি৷ ছেলেটি মনীর, না গা? কি সুন্দর নাচে!"

একরাশ সিগারের ধূম উদ্গিরণ করিতে করিতে কর্ত্তা বলিলেন, "কে, মনীরুদ্দিন? খাসা ছেলে!—যেমন নাচে, তেমনই গাহে, আর তেমনই গল্প কবিতায়। ওর মত চমৎকার অভিনয় করতে ওদের ক্লাবের কজন পারে?—যেমন ইংরিজীতে, তেমনই বাঙ্গালায়।"

গৃহিণী বলিলেন, "শেখায়ও কি চমৎকার! ছন্দা কদ্দিনই বা শিখলে, কিন্তু দুটিতে ঠিক যেন এক হয়ে মিশিয়ে গিয়ে নাচলে। কি চমৎকার মানিয়েছিল দুটিতে!"

কর্ত্তা রমণ বাবু বালকের মত উৎসাহভরে বলিলেন, "তবু ত শেষ পর্য্যন্ত দেখলে না। ফুল রিহার্শালটা—আসছে শনিবার যে ওদের ক্লাবের চ্যারিটি পারফরম্যান্স বর্দ্ধমান ...ডের জন্যে।"

...গৃহিণী বলিলেন, "শেষ পর্য্যন্ত শুনি কি ক'রে বল—আমা... ...দের নারী-সংঘেরও যে আজ আটটায় কমিটী মিটিং। অলোকে... ...র সঙ্গে পড়ে এক ক্লাসে, অলোক ওকে বাড়ী নিয়ে আসতো,—ছন্দা ওদের চা টোষ্ট ক'রে দিত—গান শিখতো দেখেছি, ... কিন্তু ছেলেটার পেটে যে এত গুণ, তা ত জানতুম না।

কর্ত্তা বলি...লেন, "লেখাপড়াতেও খুব ভাল—ও-ও ত অলোকদের সঙ্গে ...আলিপুরে বেরুচ্ছে এক বছর। পুরেন্দু ও পঞ্চানন ওদের ...ধ্যে এক বছরের সিনিয়র। হাঁ, ভাল কথা, তোমার ...যাই যে, ছ'মাসের জন্যে বদলী হয়ে আসছে আলিপুরে!"

গৃহিণী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কে, পুরেন্দু? না, তা ত শুনি নি। তা, এই ত সবে বছরও ঘুরলো না বিলেত থেকে এসেছে, এর মধ্যে সদরে বদলি?"

কর্ত্তা বলিলেন, "সরকারের কি একটা বিশেষ কাযে দরকার হয়েছে। সিভিলিয়ানদের ও রকম দু' একটা হয়, ছন্দা কিছু বলে নি? আজ আমায় চিঠি লিখেছে, ভবানীপুর কি আলিপুরের দিকে একখানা বাড়ী ঠিক করতে। এবার এসেই সে ছন্দাকে নিয়ে যাবে।"

গৃহিণী বলিলেন, "তা বেশ ত। এদ্দিন এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ালো, স্থিতভিত হ'তে পারে নি ত—পাঠাই কোথা ছন্দাকে বল? তা, কবে আসছে?"

কর্ত্তা বলিলেন, "শীগ্‌গিরই। ছন্দাকেও জানিয়েছে এ কথা, চিঠিতে লিখেছে।"

গৃহিণী বলিলেন, "না বাবু, আমায় ত কোন কথাই বলে নি মেয়ে।"

নারী-সংঘ কার্য্যালয়ের দ্বারে গাড়ী লাগিলে গৃহিণী নামিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, কর্ত্তা যেন কান্তর মাকে ডাকাইয়া ছেলেমেয়েদের আহার ও শয়নের ব্যবস্থা করেন। কর্ত্তাও যাত্রার পূর্ব্বে বলিয়া গেলেন, তিনিও রাত্রি নয়টার আগে বাড়ী ফিরিতে পারিবেন না, তাঁহাকে একবার তাঁহার প্রেস হইয়া যাইতেই হইবে, সেখানে কয় জন সাহিত্য-বান্ধব ও বান্ধবীর সহিত তাঁহার জরুরী কথা আছে, তাঁহার সাময়িক পত্র বাহির হইবার আর বিলম্ব নাই। গৃহিণী তদুত্তরে অপ্রসন্নমুখে বলিয়া গেলেন, তাঁহার ত নিজের কিছু করিতে হইবে না, দাসদাসী রহিয়াছে, মাষ্টাররা রহিয়াছে কি জন্য? কেবল মুখের হুকুমটা খসাইতে এত আপত্তি?

প্রেসে সাহিত্য-বান্ধব-বান্ধবীদের সহিত জরুরী কায সারিয়া, কর্ত্তা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, দ্বিতলের বৈঠকখানায় উঠিবার সময় একবার উঁকি মারিয়া দেখিলেন, সকাকনিষ্ঠ ছেলে দুইটি পড়িবার ঘরের তক্তপোষে শুইয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে, তাহাদের উপরের দাদা ও দিদিদের একটি তাহার মাষ্টার মহাশয়ের স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়াছে, অপরটি তাঁহার মুখে লাগাম কসিয়া ঘোড়া ঘোড়া খেলিবার জন্য উৎসাহিত করিতেছে—তাহাদের মারামারি-কান্নাকাটির চীৎকার রণদোলের আওয়াজকেও ছাপাইয়া চলিয়াছে। আর সেই সমস্ত কলরবকেও চাপা দিয়া পার্শ্বের কক্ষ হইতে মিউজিক মাষ্টারের কণ্ঠের সঙ্গে মধ্যমা কন্যা গীতার মিঠা গলার গানের সুর ভাসিয়া আসিতেছিল। গানের দুইটি কলি কতকটা এই ভাবেরই ছিল :—

"নাই বা দুজনে হোলো গো বিয়ে
পুরুতে দু'টো মন্তর পড়িয়ে,"—

এ দিকে প্রভুর আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া ভৃত্য-খানসামারা আরাম-শয়ন ও খোসগল্লের মজলিস ছাড়িয়া শশব্যস্তে তাঁহার ফরমাইজ খাটিবার জন্য ছুটাছুটি হাঁকাহাঁকি আরম্ভ করিয়া দিল। বাবু বসিবার ঘরে না গিয়া পার্শ্বের কক্ষে বেশ পরিবর্ত্তন করিতে গেলেন। বয়সে তরুণ না হইলেও তরুণের মত খেয়াল-স্ফূর্ত্তি চরিতার্থ করিবার সখ তাঁহার কম ছিল না এবং সে জন্য তাঁহার পলিত অঙ্গে এবং পলিত মুণ্ডে প্রসাধনের পারিপাট্যও কম ছিল না।

বসিবার ঘর হইতে হুঁকাটানার আওয়াজ আসিতেছিল। ভৃত্যরা জানাইল, পার্শ্বের বাড়ীর কর্ত্তাবাবু এই ক্ষণেক পূর্ব্বে আসিয়াছেন জরুরী কার্য্যে দেখা করিতে। কে,—নেপাল দা? রমণ বাবুর মুখখানা অপ্রসন্ন হইল। এই লোকটি পল্লীর আদিম বাসিন্দা, অবস্থাপন্ন না হইলেও মুরুব্বী—তাঁহারই পুত্র পঞ্চানন তাঁহার পুত্র-কন্যার বন্ধু, আমোদ-প্রমোদের সাথী। লোকটা বড় অপ্রিয়বাদী, অসভ্য, স্পষ্ট-বাদিতার ভাণ করিয়া লোকের আত্মসম্মানে প্রায়ই আঘাত করে। এত রাত্রিতে এই লোকটা এখানে কেন?

বসিবার ঘরে প্রবেশ করিতেই নেপাল বাবু বলিলেন, "এই যে ভায়া, তোমারই জন্যে অপেক্ষা করছিলুম। কি জান, যা বলবার, সামনাসামনি বলাই ভাল—এই বলছিলুম কি, যা রয় সয়, তাই কর, বাড়াবাড়িটা কিছুই নয়।"

কর্ত্তা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—"তার মানে?"

নেপাল বাবু বলিলেন, "মানে আর কি, ভাই। ঐ নীচের ঘরে থেকেই ত মেয়ের গান শুনতে পাচ্ছো।"

কর্ত্তা বলিলেন, "তাতে কি হয়েছে? মাষ্টার মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছে ত ঐ জন্যে"—

নেপাল বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "তা রাখো ভাই, জন্ম জন্ম রাখো, পয়সা রয়েছে তোমার, দু'দশ কুড়ি রাখো, রাখবে না কেন? কিন্তু আমরা এই গরীবগুরবো পাড়া-পড়শীরা যে মারা যাই। কি গান মাষ্টার শেখাচ্ছে, শুনেছো তুমি?"

কর্ত্তা মনে মনে বিষম চটিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে সে ভাব না দেখাইয়া শ্লেষের সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গানের আবার কুলীন মৌলিক আছে না কি? তা ত জানতুম না।"

নেপাল বাবু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "না, তা জানবে কেমন ক'রে? কর্ত্তা গিন্নী বেরুলেন হাওয়া খেতে বাইরে, ছেলেপুলেরা রইলো ঝি-চাকরের জিম্মায়, সোমত্ত ছেলে-মেয়েরা গেলেন ক্লাবে থিয়েটার করতে—বাঃ বাঃ, চমৎকার বন্দোবস্ত!"

রমণ বাবু এবার ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "সে জন্যে ত কারুর পরামর্শ চাওয়া হয় নি—কারুর কাছে হাত পাততেও ত যাওয়া হয়নি—তোমার ছেলেটি বুঝি ধর্ম্মপুত্ত্বুর যুধিষ্ঠির, কেমন, না? মনটাকে একটু বড় করো দিকি, দাদা!"

নেপাল বাবু সংগ্রামে প্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "সেই কথাই ত বলতে এসেছি ভাই।—একটু মনে থাকে আছিই বটে আমরা। তোমরা ভাই খুব উদারমন হও—মোটর আছে, ল্যাণ্ডো আছে, বাবুর্চ্চী-খানসামা আছে, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স আছে—তোমাদের মানায় ভাল। কিন্তু গরীবের ঘরে এ ঘোড়ার রোগ কেন? আমার বাঁদরটাও ওখানে গিয়ে জোটে বলেই না যত কথা!"

কর্ত্তা রমণ বাবুও এ কথার জবাবে নেপাল বাবুর পুত্র পঞ্চাননকে লক্ষ্য করিয়া শ্লেষ-বিদ্রূপের বাণ বর্ষণ করিতে ছাড়িলেন না—সে শিশু, ভাজা মাছটিও উলটাইয়া খাইতে জানে না, ইত্যাদি। নেপাল বাবুও সোপান অবতরণ করিতে করিতে মুখে যাহা আসিল, তাহা বলিয়া রমণ বাবুকে ভর্ৎসনা করিলেন।

রমণ বাবু বিমর্ষমনে বসিয়া মনে তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন,—এই লোকগুলার কি সঙ্কীর্ণ মন! যে বয়সের যাহা,—তাহার স্ফূর্ত্তি না হইলে প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হয় না কি? আর এই অস্বাভাবিক বাঁধন-কষণের জন্যই আমাদের ছেলেপুলেরা ছেলেবয়সেই অকালপক্ক হইয়া যায়, জীবনের কোন আস্বাদ পায় না, যৌবন বলিয়া কোন জিনিষের অনুভূতিই তাদের হয় না। বিশুদ্ধ নাচ-গানে, মিলা-মিশায় কি এমন অপরাধ হয়? পুত্রের মত কন্যা-দেরও কি শিক্ষিত ও লালিত-পালিত করা পিতামাতার কর্ত্তব্য নয়? জামাতা সিভিলিয়ান, কন্যাকে কি তিনি সিভিলিয়ান-পত্নীর উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন না? লেখাপড়া, নাচ-গান, আদব-কায়দা—সকল বিষয়েই তাহার ত ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহিণী হওয়ার প্রয়োজন? তবে লোকের চোখ টাটায় কেন?

সোপানে পদশব্দ হইল। কর্ত্তা ভাবিলেন, গৃহিণী ফিরিয়াছেন। বলিলেন, "কি হ'লো—এবারেও তুমি সেক্রেটারী হ'লে না কি?—আরে, ছন্দা! তুই যে এত সকালে? তোর দাদা? অলোক এল না?"

ছন্দা দেখিবার মত বটে! তাহার উপর সদ্য রিহার্শেল হইতে প্রত্যাগতা, গলায় ফুলের মালা, হাতে ফুলের গহনা,—যেন ছবিখানি! সে বলিল, "আজ শেষ হ'লো না বাপি, হঠাৎ মনীদার কেমন শরীর খারাপ হয়ে পোড়লো, দাদা তাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসতে গেল, ব'লে গেছে, সেই-খানেই খেয়ে দেয়ে থাকবে রাতটা।"

রমণ বাবু বলিলেন, "অসুখ করেছে? মনীরের? ও কিছু নয়, বেশী নাচ-গান—থাক্, ডিনার ঠিক করতে ব'লে দিচ্ছি, তোমরা এসো চট ক'রে, গিন্নীও এলেন ব'লে।"

ছন্দা বলিল, "কার সঙ্গে এলুম বল দিকি, বাপি? পঞ্চুদার সঙ্গে। জান বাপি, কি লেকচারটাই দিলে পঞ্চুদা আসতে আসতে, যেন মাষ্টার মশাই! আর কখ্খনো ওর সঙ্গে কোথাও যাব না ব'লে দিচ্ছি! কি অসভ্য সেকেলে!"

রমণ বাবু বলিলেন, "তা একলা এলেই পারতিস্, রাত আর কটা, সাড়ে নটাও হয় নি এখনও। হাঁ রে, পুরেন্দুর চিঠি পেয়েছিস? কবে আসছে এখানে?"

ছন্দা অন্যমনস্কভাবে বলিল, "তা ত বলতে পারি নি—সে চিঠি ত খোলাই হয় নি এখনও। পারফরম্যান্সটা না চুকলে ত সময় ক'রে উঠতে পারছি না কিছুরই।"

কর্ত্তা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "সে কি রে! পুরেন্দুর চিঠি—"

ছন্দা অবজ্ঞাভরে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "তা ব'লে ত দরকারী কাষ ফেলে রেখে চিঠির জন্যে হত্যে দিয়ে ব'সে থাকা চলে না। চিঠি ওয়েট করতে পারে, পারফরম্যান্স পারে না।"

বেণী দোলাইয়া গর্ব্বিত-পাদবিক্ষেপে ছন্দা ভিতরে চলিয়া গেল। কর্ত্তা কিছুক্ষণ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহার চলন্ত মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঘন ঘন সিগার টানিতে লাগিলেন।

২

পাড়ায় হুলস্থূল! পঞ্চাননের নিন্দায় আর কাণ পাতা যায় না। উঃ, এত বড় মিট্‌মিটে শয়তান? পেটে পেটে হারামের ছুরি? অলোক আর পঞ্চানন, পাড়ার এই দুইটি ছেলে—অভেদাত্মা বলিলেই হয়। অলোকরা বড়লোক, আর পঞ্চাননের বাবা নেপালচন্দ্র অফিসের কেরাণী বাবু, অবস্থায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ হইলেও দুইটি যেন একবৃন্তে দুটি ফুল! ছেলেবেলা হইতে একসঙ্গে দাঁড়া-বসা, পড়া-শোনা, খেলাধূলা। নেপাল বাবু মধ্যবিত্ত অবস্থার হইলেও ছেলেকে বরাবর ভাল লেখাপড়া শিখাইয়াছেন, হিন্দুস্কুলে ও প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াইয়াছেন। তাঁহার ছোট বাড়ী, বৃহৎ পরিবার, অহরহ অশান্তি উপদ্রব, কলহকলরব; তাই পঞ্চানন বন্ধু অলোকদের প্রাসাদের মত বৃহৎ অট্টালিকায় পড়িতে যাইত, অলোকেরই প্রাইভেট টিউটরদের কাছে পড়িত আর সেই সূত্রে প্রায় অহোরাত্র মিলামিশার ফলে সেও ছন্দার জ্যেষ্ঠভ্রাতা অলোকের পর্য্যায়ভুক্তই হইয়া পড়িয়াছিল। এমনও হইয়াছে যে, অলোকের অনুপস্থিতিতে পঞ্চানন কত দিন ছন্দাকে পড়াইয়াছে, কত দিন তাহাকে একাকী লেকে বেড়াইতে লইয়া গিয়াছে, টকি-সিনেমা দেখাইয়া আনিয়াছে। তবে একটা বিষয়ে পঞ্চানন ছন্দাকে তাহার দাদা অলোকের মত অথবা মনীরের মত সন্তুষ্ট করিতে পারিত না। সে সাহিত্যচর্চ্চার পক্ষপাতী ছিল বটে, কিন্তু নাচ-গানে অথবা বাহিরের লোকের সঙ্গে

অভিনয়ে মোটেই রাজী ছিল না। কিন্তু তাহা হইলেও সকলেই তাহাকে অলোকের মত—ছন্দার জ্যেষ্ঠভ্রাতার মতই দেখিত।

এহেন পঞ্চানন একই রজনীতে একই স্থান হইতে একই সময়ে ছন্দার মত অদৃশ্য হইল,—পারফরম্যান্স শেষ হইলে সকলেই পাড়ায় ফিরিল, কেবল ছন্দা ও পঞ্চানন ফিরিল না। এই কথা তোলাপাড়া করিয়া পাড়ার লোকে বিস্মিত, স্তম্ভিত হইল। কত বড় ঘরের মেয়ে, কত উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত মানুষের স্ত্রী,—তাহার এই দুর্মতি? এত লেখাপড়া শিক্ষা—তার এই ফল? বিশুদ্ধ ভাই-ভগিনীর মত মিশামিশি—তার এই অধোগতি?

নেপাল বাবু মর্ম্মাহত—লজ্জায় তিনি কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারেন না, যেন তিনি স্বয়ংই অপরাধী! কিন্তু আশ্চর্য্য—যাঁহাদের লজ্জা ও ভয় হওয়ার সমধিক সম্ভাবনা, ছন্দার সেই পিতামাতা অথবা ভ্রাতা পরম নিশ্চিন্ত, যেন কিছুই হয় নাই, অথবা যাহা হইয়াছে, তাহাতে দোষের এমন কিছু নাই, ছন্দা ফিরিয়া আসিলেই যেমন ছিল, তেমনই হইবে। আসলে তাঁহারা একবারও মনে করিতে পারেন নাই যে, কোন অসৎ অভিপ্রায়ে তাঁহাদের কন্যা বা ভগিনী পঞ্চাননের সঙ্গে একই সময়ে অদৃশ্য হইয়াছে। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ছন্দা তাহার নিজের ভার নিজে লইতে সম্পূর্ণ সমর্থ। হয় ত কোন অনিবার্য্য কারণে তাহারা সেই রাত্রির জন্য অন্যত্র অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছে। যাহাদের মন সঙ্কীর্ণ, যাহারা এখনও গরুর গাড়ীর যুগে পড়িয়া আছে, তাহারাই দৃষ্টিটাকে প্রশস্ত করিতে পারে না, ক্লাব-ইনষ্টিটিউটের খুঁৎ ধরে। কিন্তু এ সব যে তাস-পাশার আড্ডা হইতে ঢের ভাল, এটা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহে না। পরচর্চ্চা-পরনিন্দা হইতে মাঠের খোলা বাতাসের খেলা কত ভাল? এ সকলে যে বিশুদ্ধ বন্ধুত্ব হয়, তার তুলনা কোথায় পাওয়া যায়?

তবে কর্ত্তা রমণ বাবুর মনে নেপালচন্দ্রের এক দিনের একটা কথা কাঁটার মত মাঝে মাঝে বিদ্ধ হইতেছিল। তাঁহার পুত্র-কন্যার লিটারেরী-মিউজিক ক্লাবে নেপালচন্দ্র একটি আপত্তি তুলিয়া বলিয়াছিলেন যে, ক্লাব ইনষ্টিটিউটে ছেলেদের মেশামিশিতে দোষ না থাকিতে পারে, কিন্তু উহার সহিত ঘরের মেয়েছেলেদের লইয়া জড়ান কেন? জগতের সকল জাতিধর্ম্মের লোককে ক্লাবের মেম্বর করা হয়, কৈ, তাহারা ত তাহাদের ঘরের কন্যা-ভগিনীকে লইয়া ক্লাবে জড়াইয়া দেয় না! যদিও তখন তিনি নেপালচন্দ্রকে নিতান্ত 'হোপলেশ' বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তথাপি এখন কথাটা নিতান্ত উপেক্ষার নহে বলিয়া তাঁহার মাঝে মাঝে মনে হইতে লাগিল।

আর একটা ভাবনার কথা, পুরেন্দু। পুরেন্দু কি ভাবিতেছে? সে উচ্চশিক্ষিত, সে নিশ্চিতই নেপালচন্দ্রের মত সঙ্কীর্ণচিত্ত নহে। সে কি বুঝিবে না, কোন এক দৈবদুর্বিপাকে অথবা কোনও অনিবার্য্য কারণে ছন্দা কোথাও আটক পড়িয়াছে, হয় ত পরমুহূর্ত্তেই ফিরিয়া আসিবে? কিন্তু এইরূপ তোলাপাড়া করিবার পরেও যখন সমস্ত রাত্রি এবং পর দিন সকালেও ছন্দা অথবা পঞ্চাননের কোন খবর পাওয়া গেল না, তখন সত্যই কর্ত্তা বাবুর বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল। পুরেন্দু কলিকাতায় আসিয়াছে, আজ দুই দিন হইল, আলিপুরে বাসাও ঠিক করিয়াছে, আজই সন্ধ্যার পর ছন্দাকে লইয়া যাইতে আসিবে। আর ত নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। পুলিসে খবর দেওয়া হইবে কি না, তাহাও ত একবার পুরেন্দুকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন আছে। অলোককেই বার্ত্তাবহ করিয়া আলিপুরে প্রেরণ করা স্থির হইল।

অলোক যখন আলিপুরে পুরেন্দুর বাসায় উপস্থিত হইল, তখন সন্ধ্যার আলোক প্রজ্বালিত হইয়াছে। অলোক ড্রয়িংরুমে গিয়া দেখিল, পুরেন্দু বিষাদক্লিষ্ট গম্ভীর চিন্তা-রেখাঙ্কিত মুখে কক্ষ-মধ্যে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতেছে, কোট ও হ্যাট ছাড়া তাহার অঙ্গ হইতে তখনও কাছারীর পোষাক উন্মোচিত হয় নাই; তাহার দক্ষিণ হস্ত দৃঢ়-মুষ্টিবদ্ধ।

অলোক সহাস্যমুখে হস্তপ্রসারণ করিয়া অগ্রসর হইতে গিয়া তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে, পুরেন্দু?"

পুরেন্দুর মুখে চোখে তখন যে তীব্র মর্ম্মান্তিক যাতনার ও ভর্ৎসনার ভাব ফুটিয়া উঠিল, তাহা অলোক ইহজন্মে ভুলিতে পারিবে কি? ব্যথিত-হৃদয়ে সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে, ভাই পুরেন্দু? ও কিছু নয়, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।"

পুরেন্দু স্বভাবতই একটু গম্ভীরপ্রকৃতির মানুষ, গম্ভীর স্বরেই বলিল, "কি হয়েছে বুঝতে পারছ না, অলোকবাবু? কি আবার সব ঠিক হয়ে যাবে?"

অলোক আমতা আমতা করিয়া ঢোক গিলিয়া বলিল, "কিছু না, ছন্দা কোথায় নিশ্চয় আটকা পড়েছে। বাবা পাঠিয়ে দিলেন তোমায় নিয়ে যেতে—একটা পরামর্শ—পুলিসে—"

বাধা দিয়া কঠোরকণ্ঠে পুরেন্দু বলিল, "পড়।" কথাটা বলিয়া সে মুষ্টিমুক্ত করিয়া একখানা পত্র তাহার দিকে ছুড়িয়া দিল।

পত্রপাঠ করিতে করিতে অলোকের চক্ষু বিস্ফারিত হইল। পত্রখানি এই :— .

"পুরেন্দু বাবু, তোমায় আমায় বিয়ে হয়েছে, এ কথা ঠিক। কিন্তু বিবাহ ও ভালবাসা এক কথা নয়। আমাদের ঠাকুরমা-ঠানদিরা হয় ত তাই মনে করতো। আমরা তা মানতে রাজী নই। পুরুতে দুটো মন্তোর পড়িয়ে আগুন সাক্ষী রেখে বিয়ে দিলেই যে স্বামি-স্ত্রীতে ভালবাসা হবে আর ভালবাসা না থাকলেও যে ঘরকন্না করতে হবে, এমন কোন কথা নেই। আর বাপ-মা ঠিক ক'রে বিয়ের সম্বন্ধ বেঁধে দিলেই যে জন্মে তার নড়চড় হবে না, তারও কোন মানে নেই।

তুমি অনেক লেখাপড়া শিখেছো, অনেক কিছু বোঝো। বল দিকি, তুমি কি আমার কাছে এখনও অপরিচিত নও? আমিও কি তোমার কাছে অপরিচিত নই?

তুমি ম্যাজিষ্ট্রেট, আইন নিয়ে বিচার কর। কোন্ আইনে মনের উপর জোর খাটিয়ে ভালবাসা আদায় করা যায়, বলতে পার আমায়? তুমি সভ্যযুগের শিক্ষা পেয়েছ, অন্ধের মত বলতে পার না, বিয়ে একবার হ'লে জন্মে আর ভাঙ্গে না। যে বিধাতা এই আইন করেছেন, বেছে বেছে তিনি কি কেবল মেয়েছেলেদের জন্যেই করেছেন? এর চেয়ে মুসলমান-খৃষ্টানদের আইন ত ঢের ভাল। তাদের ভালবাসার অভাব হ'লে—মন বিরূপ হ'লে বিয়ে দুই পক্ষেই ভেঙ্গে দেবার কেমন সুন্দর আইন রয়েছে!

তোমায় বেশী বোঝাবার দরকার দেখি না। আমি দেখছি, যখন তোমায় ভালবাসি না, তখন দুজনে মিথ্যে সম্বন্ধ পাতিয়ে ঘর করতে যাওয়া বিড়ম্বনা। এর চেয়ে আমি মনে করছি, আমি মুসলমানই হয়ে যাব।

তোমরা আমায় ঘরে ফেরাবার চেষ্টা করো না। আমি মাইনর নই। আইন-আদালত করেও সুবিধা করতে পারবে না। তোমাদের জোরজবরদস্তির ফলে আমাদের মেয়ে-জাতের কেউ বলছে আদালতে স্বামীকে মুসলমান হ'তে, কেউ বা স্বামীকে স্বামী ব'লে স্বীকার করছে না, বলছে স্বামী অন্য পুরুষ, আবার কেউ বা বাপদাদার কাছে ফিরে যেতে চাইছে না, তার ভালবাসার পাত্রের সঙ্গে যেতে চাইছে অথবা জলে ডুবে মরছে। আমার উপর জবরদস্তি করলে আমিও আদালতে ঐ রকম যা হয় একটা কিছু বোলব। তাতে তোমাদের মান বাড়বে না, মুখও খুব উজ্জ্বল হবে না। ইতি ছন্দা।"

অলোক পত্রপাঠান্তে নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ। সে পুরেন্দুর দিকে চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিতেছিল না। কক্ষের অসম্ভব গাম্ভীর্য্য অসহনীয় হইয়া উঠিতেছিল। ক্ষণপরে অলোক আবার পুরেন্দুর দিকে কম্পিত হস্ত প্রসারণ করিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "ভাই পুরেন্দু—ছেলেমানুষ, কি করতে কি ক'রে বসেছে"—

পুরেন্দু কঠোরকণ্ঠে তিরস্কার করিয়া কহিল, "ছেলেমানুষ? আমি ত তাকে দোষ দিচ্ছি না। আমি তোমাদের উপর ভার দিয়ে যে নিশ্চিন্ত ছিলুম। তোমরা মানুষ?"

পুরেন্দুর কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল। অলোক স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিল, "যা হবার, তা হয়ে গেছে, চল তার সন্ধানে যাই। এত বড় স্কাউণ্ড্রেল যে পঞ্চাননটা"—

পুরেন্দুর চক্ষু ধ্বক্‌ধ্বক্ জ্বলিয়া উঠিল। দন্তে দন্ত নিষ্পীড়ন করিয়া কঠোরস্বরে সে বলিল, "এর তার নামে দোষ দিয়ে নিজেদের দায়িত্ব এড়াতে চাইছ? আগুন নিয়ে খেলতে গেলে হাত পুড়ে যায়, জানতে না কি? তুমি যাও, আমি তোমাদের কোন কথায় থাকতে চাই নি!"

ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে পুরেন্দু কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। অলোক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কাষ্ঠপুত্তলের মত সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল।

"মারো, মারো আমায়—ঐ ছড়ি নিয়ে মারো, যতক্ষণ না মারবে, ততক্ষণ এই পায়ে মাথা কুটে মরবো!"

আলুলায়িতকুন্তলা অশ্রুসিক্তনয়না ছন্দা স্বামীর পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে এই প্রার্থনা করিতেছিল।

বিহ্বলা পত্নীকে দুই হস্তে তুলিয়া ধরিয়া সস্নেহে নয়নাশ্রু মুছাইয়া দিতে দিতে পুরেন্দু বলিল, "ছি, ছন্দা! তুমি কি পাগল হয়েছ?"

ছন্দা ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল, "না, না, পাগল না, সত্যিই আমায় শাস্তি দাও—তোমরা যদি আমাদের শাসন কর—"

পুরেন্দু বাধা দিয়া বলিল, "ছি ছন্দা! শাসন করবার কি আছে এতে? ভুল কি মানুষের হয় না? তুমি লেখা-পড়া শিখেছো—"

উত্তেজিতকণ্ঠে ছন্দা বলিল, "না, না, লেখাপড়া চাইনি আমি। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার সব বই পুড়িয়ে দাও—তুমি আমায় যা শেখাবে, তাই শিখবো।"

ছন্দা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল,—সে কান্নার যেন আর বিরাম নাই। পুরেন্দু সযত্নে তাহাকে তুলিয়া লইয়া সোফার উপর গিয়া বসিল। তাহার নয়নের উপর দিয়া বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হইয়াছে, তবুও তাহার ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই, সে তখন অতীত রজনীর অভাবনীয় ঘটনার কথাই মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতেছিল। দেবদূতের মত কে তাহার ভ্রান্ত পথে চালিত পত্নীকে ছায়ার ন্যায় এক হোটেল হইতে অন্য হোটেলে অনুসরণ করিয়া শেষে দ্বিতীয় রজনীতে বস্তীর সন্ধান পাইয়া অন্ধকারে আলোক দেখাইয়া তাহাকে তাহার পত্নীর সংবাদ দিয়াছিল, পূতিগন্ধময় বস্তীর নিম্নশ্রেণীর নরকনিবাস হইতে দেবদূতের সঙ্গে সে তাহার গুর্খা অনুচরের সহায়তায় কিরূপে পত্নীর উদ্ধারসাধন করিয়াছিল, চরিত্রহীন কপট বন্ধু মনীরের বেতনভুক্ গুণ্ডার হস্তে আহত সেই দেবদূতকে হাঁসপাতালে রাখিয়া সে পত্নীকে লইয়া গভীর নিশীথে কিরূপে বাসায় ফিরিয়াছিল,—ছায়াচিত্রের দৃশ্যের মত সেই সব ঘটনা একটি একটি করিয়া তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

আর ছন্দা? অনুতাপ ও অনুশোচনায় তাহার হৃদয় যেন পুড়িয়া পুড়িয়া উঠিতেছিল। স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও সে তাহার পাপাচরণের কথা না শুনাইয়া যেন তৃপ্তি পাইতেছিল না,—যেন তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছিল না। মনীর তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল, মনীরেরই প্ররোচনায় সে স্বামীকে ঐরূপ পত্র লিখিয়াছিল এবং অভিনয়ভঙ্গের পর শেষ রাত্রিতে গৃহত্যাগ করিয়াছিল। মনীর তাহাকে এক হোটেলে রাখিয়া দিয়াছিল, পরদিন বিবাহান্তে তাহাকে ঘরে লইয়া যাইবে, এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল। যে আবহাওয়ায় সে বাস করিতেছিল, সেখানে তাহাকে সত্যপথ দেখাইয়া দিবার কেহ ছিল না। যৌবনকে রাজটীকা দিবার কথাই সে শুনিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু রাজটীকা দিবার উপযোগী সামর্থ্য পূর্ব্বাহ্নে অর্জ্জন করিবার প্রয়োজনের কথা কেহ তাহাকে বলে নাই।

কেবল এক জন ছিল মানুষ—মানুষের চেয়েও বড়, দেবতা। ভাই, বন্ধু, আত্মীয়, অভিভাবকের মত সে তাহাকে সত্যের আলোক দেখাইবার সাধ্যমত চেষ্টা করিত, কিন্তু তখন সে সেই চেষ্টাকে অপদার্থ লেকচার বলিয়া অবজ্ঞা অনাদর করিয়াছে,—সে সাবধানবাণী তখন বিষের মত বোধ হইয়াছিল।

মনীর যখন পরদিন সন্ধ্যার মধ্যেও তাহাকে তাহার গৃহে না লইয়া গিয়া জঘন্য পল্লীর জঘন্য নরকে আরও জঘন্য প্রকৃতির রূপজীবিনীদের আশ্রয়ে রাখিয়া, বহু চাটুবচনে প্রলুব্ধ করিয়া, মৌলভী-মোল্লার সন্ধানে যাইতেছে বলিয়া চলিয়া গেল, তখনই তাহার মন সন্দেহাকুল হইল, সেই জঘন্য পিঞ্জর হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাহার প্রাণ আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল। বাহির হইতে গিয়াই কিন্তু সে বাধা পাইল,—তখন সে বুঝিল যে, সে বন্দিনী!

সে যে বন্দিনী, সে কথা তাহার রক্ষিণীরা ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিল। আরও বুঝাইয়া দিল, মনীরের পিতা ধর্ম্মভীরু ভদ্র গৃহস্থ, বিবাহিতা হিন্দুনারীকে হরণ করিয়া অথবা ধর্ম্মান্তরিতা করিয়া তাঁহার পুত্র বিবাহ করিবে,—এ ব্যবস্থার তিনি ঘোর বিরোধী! মনীর ইহা জানিত বলিয়াই বস্তীর মধ্যে তাহাকে লইয়া আসিয়াছে। মোল্লা-মৌলভী ডাকিতে যাওয়া তাহার ভাণমাত্র, সে তাহার সহিত রজনী যাপন করিবে বলিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিতে গিয়াছে। এখানে সে চীৎকার করিয়া মরিলেও কেহ তাহাকে সাহায্য করিবে না।

সত্যই সে চীৎকার করিয়া সাহায্য চাহিলে তাহাকে বলপূর্ব্বক মুখে কাপড় বাঁধিয়া ক্ষুদ্র কক্ষমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। তখন সে পাগলের মত হইয়া ঘরের মধ্যে ছুটাছুটি করিয়াছিল, কিসে আত্মহত্যা করিয়া মরিতে পারিবে, তাহারই চেষ্টা করিয়াছিল। সহসা সঙ্কীর্ণ অন্ধকারময় গলির দিকের ক্ষুদ্র গবাক্ষে মৃদু করাঘাত হইল—তাহার পর কি ঘটিয়াছিল, তাহা সে স্মরণ করিতে পারে না।

কথা আর ফুরায় না—স্বামি-স্ত্রী পরস্পর হাত ধরিয়া বসিয়া অতীতের কথা আলোচনা করিতেছিল। বিদেশে বিদ্যার্জ্জনকালে পুরেন্দু তথাকার মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থ পরিবারের সহিত পরিচিত হইয়াছিল। সেই সমস্ত পরিবারে সামাজিক ও পারিবারিক শাসন ও শৃঙ্খলারক্ষা সে দেখিয়াছিল। গৃহস্থ পরিবারের গৃহিনীর কিরূপ সতর্ক দৃষ্টি এবং কঠোর অথচ সহনীয় শাসন ছিল, তাহাও সে লক্ষ্য করিয়াছিল। পুরেন্দু পত্নীকে তাহার পরিচয় দিতেছিল।

রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়া আসিয়াছে দেখিয়া পুরেন্দু পত্নীকে শান্ত মধুর স্বরে বলিল, "এইবার হাত-মুখ ধুয়ে নাও, তোমায় নিয়ে ওদের একবার দেখিয়ে আনি।"

ভীত-চকিত নয়নে স্বামীর দিকে চাহিয়া ছন্দা বলিল, "ওদের ? কাদের দেখিয়ে নিয়ে আসবে আমায় ?"

পুরেন্দু বিস্মিত হইল, বলিল, "তোমার বাপ-মাদের"—

শুষ্ক ম্লানমুখে স্বামীর হাত দুটি ধরিয়া কাতর মিনতিভরা কণ্ঠে ছন্দা বলিল, "না, না, আমি কোথাও যেতে চাইনি— তুমি আর আমায় তোমার কাছ-ছাড়া ক'রো না!"

বলিতে বলিতে ছন্দা পুরেন্দুর পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল। অন্তরে বহুদিনের জমাট-বাঁধা কালো মেঘ হইতে ধারা নামিয়া আসিল। পুরেন্দু আবার তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া অশ্রু মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, "আচ্ছা, তাই হবে। এ বাড়ীর তুমি গৃহিনী,—তোমার হুকুম কে না মানবে ?"

সেই সময়ে ভৃত্যের সহিত ব্যস্তসমস্তভাবে দ্বারপ্রান্তে দেখা দিল অলোকনাথ। সে বলিল, "পুরেন্দু, ভাই,—এই যে ছন্দা!, এইমাত্র শুনে এলুম, তোমরা রাত্তিরেই ফিরে এসেছ। তা বেশ, পরে সব শোনা যাবে'খন, আপাততঃ একসিডেন্ট ওয়ার্ড থেকে খবর পেয়েই ছুটে আসছি বলতে, পঞ্চা না কি খুব চোট খেয়ে হাঁসপাতালে প'ড়ে রয়েছে— পুলিসকে আমার ব'লে দেওয়াই ছিল কি না, ওর কোন সন্ধান পেলেই খবর দিতে—ওঃ, কি বোলবো ব্ল্যাগার্ডটা হাঁসপাতালে, না হ'লে তোমায় আমায় গিয়ে ওকে চাবুকপেটা করতুম।"

তাহার কথা শেষ হইলে পুরেন্দু কঠোরস্বরে বলিল, "অলোক বাবু! যার পিঠে চাবুক কসাতে চাইছ, চাবুকটা তার পিঠে না কসিয়ে তোমার পিঠে কসানই দরকার। তুমি যার পা-ধোওয়া জল খাবারও উপযুক্ত নও, তাকে মারতে চাইছ চাবুক ? তোমার লজ্জা করে না ?"

অলোকনাথ বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "এ্যাঁ, পঞ্চাননের পা-ধোওয়া জল ?"

পুরেন্দু বলিল, "হাঁ, তাই। শোন অলোক বাবু! দেবতা কখনও চোখে দেখিনি, তুমিও নিশ্চয় দেখনি। সত্যি যদি দেখতে চাও, তা হ'লে তোমরা সবাই আমার সঙ্গে বিকেলে হাঁসপাতালে যেও—তার আগে সাক্ষাতের আইন নেই—তোমাদের দেবতা দেখাব।"

অলোকনাথ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "পঞ্চানন দেবতা ? যে—"

পুরেন্দু বলিল, "হাঁ, পঞ্চানন দেবতা, মানুষ হলেও দেবতা। ওদিকে চাইছ কি, অলোক বাবু ? তোমার বোনেরও ঐ মত—হয় না হয়, জিজ্ঞাসা ক'রে দেখতে পার।"

অনাহূত হইয়াও ছন্দা ছলছলনেত্রে গদ্‌গদকণ্ঠে বলিল, "হাঁ, হাজারবার তাই। আমি এখান থেকেই পঞ্চুদাকে হাজারবার দেবতা ব'লে প্রণাম করছি।"

ছন্দা সত্যসত্যই গললগ্নীকৃতবাসে নতজানু হইয়া প্রণাম করিল। অলোকনাথ বিস্মিত, স্তম্ভিত, ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ!

* * *

যখন পুরেন্দু হাঁসপাতালে পঞ্চাননের সহিত দেখা করিতে গেল, তখন সে সুনিদ্রার পর সবেমাত্র জাগরিত হইয়াছে। তাহার বুকে পিঠে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছে। ডাক্তার বলিয়াছেন, তাহার জীবনের আশঙ্কা নাই। পুরেন্দু তাহার জন্য প্রাইভেট রুমের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিল, পরন্তু যাহাতে তাহার চিকিৎসা-সেবার কোন ত্রুটি না হয়, এজন্য মুক্তহস্তে অর্থ বণ্টন করিয়াছিল।

রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অতি সন্তর্পণে সাবধানে তাহার একখানি হস্ত ধারণ করিয়া পুরেন্দু বলিল, "কেমন আছ, দাদা ?"

ক্ষীণকণ্ঠে পঞ্চানন বলিল, "বেশ আছি। ছন্দা-- তোমার স্ত্রী ?"

মৃদু-হাসিয়া পুরেন্দু বলিল, "সকল সময়েই পরের ভাবনা! নিজের ভাবনা কি একবারও ভাবতে নেই ?"

পঞ্চানন অপ্রতিভ হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। পুরেন্দু স্নেহকরুণাসিক্ত কোমল কণ্ঠে বলিল, "কার কাছে লুকুবে ভাই তোমাকে ? আমি কি জানিনি, অন্তরে ব্যর্থ আশার

অনন্ত যন্ত্রণা পলে পলে সহ্য ক'রে আপনাকে মুছে ফেলে ভালবাসার পাত্রের মঙ্গলচিন্তাকেই তোমার মত মানুষ ধ্যান-জ্ঞান জপ-তপ ক'রে থাকে? কবে তোমার মত ভালবাসার অধিকারী হতে পারবো, ভাই!"

পঞ্চাননের নয়নপ্রান্তে অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িল। সে মৃদুস্বরে বলিল, "কাঙাল রাজতক্তের স্বপ্ন দেখেছিল, সে অপরাধ তার ক্ষমা কোরো, ভাই!"

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু (সাহিত্যরত্ন)।



— এই দেখ মা, মাসিক-পত্রে লিখেছে যে, ঘড়ি যতবার টিকটিক করছে, ততবার নাকি পৃথিবীতে একটি ক'রে ছেলে জন্মায়।

—ঘড়িটা ভাঙতে পারিস, সন্তু?

[শিল্পী—শ্রীশৈলেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী।



সত্য-নারায়ণ নাট্য-সমিতি

(গল্প)



১

'বঙ্গবন্ধু' সংবাদপত্রের অফিসে হুলস্থূল কাণ্ড পড়িয়া গিয়াছে। নীচের হল-ঘরখানিতে—যেখানে শ্যাম বাবু বসেন, সেখানে ভীড় জমিয়া গিয়াছে। ভীড় অবশ্য বাহিরের নয়—অফিসেরই কর্ম্মচারিবৃন্দ।

ভীড়ের মধ্যে নানা শ্রেণীর কর্ম্মচারী বর্ত্তমান। দপ্তরী-দরোয়ান হইতে সুরু করিয়া প্রিন্টার, কেসিয়ার পর্য্যন্ত সকলেই আছেন। অর্থাৎ—প্রধান আছেন, অ-প্রধান আছেন; রোগা আছেন, মোটা আছেন; ফর্সা আছেন, কালো আছেন; ঢ্যাঙ্গা আছেন, বেঁটে আছেন—ইত্যাদি ইত্যাদি। ভীড়ের মধ্যে অ-প্রধান, রোগা, কালো এবং ঢ্যাঙ্গার সংখ্যাই বেশী। প্রধান এবং মোটা এবং ফর্সা এবং বেঁটে যাঁরা, তাঁদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। তন্মধ্যে আছেন—নারাণ বাবু, নগেন বাবু, শীতল বাবু, মতি বাবু, সাতকড়ি বাবু, জিতেন বাবু, হলধর বাবু, জলধর বাবু, শ্রীধর বাবু প্রভৃতি। আর—শ্যাম বাবু ত আছেনই। তাঁকে বিরিয়াই ভীড়; এবং শুধুই ত আর ভীড় নহে,—ভীড়, বকা-বকি, প্রশ্ন, উত্তর, তর্ক, উপদেশ, ঠাট্টা, বিদ্রূপ, হাসি প্রভৃতি। সকলের মধ্যে গণ্ডগোল না বাধিলেও যে হট্টগোলটা চলিয়াছিল, তাহা এইরূপ—

"গেল কোথায়?"

"যাবে আর কোথায়? হঠাৎ হয় ত বেরিয়ে পড়বে।"

"এত দিনের অফিস, কিন্তু এমনটা ত কখনও ঘটে নি!"

"তুমি একটি আস্ত ষ্টুপিড্। ঘটে নি, ঘটতে কতক্ষণ?"

"কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার!"

"নিশ্চয়ই।"

"পুলিসে খবর দেওয়া হোক্।"

"আচ্ছা, শ্যাম বাবু, ক'টার সময় ঠিক বলতে পারেন?"

"তুমি একটি গর্দ্দভ। কাযটা কি ওঁর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে হয়েছে যে, ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড উনি সব দেখে রেখেছেন।"

"আচ্ছা, যখন খুব বৃষ্টিটা—"

"তোমার মাথাটা। তুমি থাম।"

"ওরে—ভাই রে নারে নাইরে নারে
ভাই রে নারে—নাইরে না।
নাইরে নারে নাইরে নারে,
ভাই রে নারে—ভাইরে না।"

"থাম, নারাণ বাবু, ফূর্ত্তি বেশী হয়ে থাকে, বাসায় গিয়ে গান করবেন। আচ্ছা, শ্যাম বাবু—"

"না বাবা, ব্যাপার গুরুচরণ! এ রকম ত কখনও হয় নি।"

ব্যাপার—গুরুচরণ অর্থাৎ গুরুতরই বটে। শ্যাম বাবুর আফিংয়ের কৌটা চুরি গিয়াছে। অর্থাৎ শ্যাম বাবুর সর্ব্বস্বই গিয়াছে; এবং সেই সূত্রেই এই জটলা, বকাবকি, তর্ক, যুক্তি, হাসি, বিদ্রূপ, গান।

নীচে যখন এবম্বিধ ব্যাপার, দ্বিতলে খোদ কর্ত্তা তখন আপন অফিস-ঘরে বসিয়া, গভীর মনোযোগের সহিত সমাগত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত।

"পূজোর তিন দিনই আপনাদের থিয়েটার হবে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। 'ক্লাসিকে'র ষ্টেজটা তিন দিনের জন্যেই আমরা ভাড়া নিয়েছি।"

"পালা হবে কি?"

"মেঘদূত। আর একটা প্রহসন গোছের থাকবে—'নব বিদ্যা-সুন্দর'। তিন দিনের টিকিট-বেচা টাকাটা তিন যায়গায় আমরা সাহায্য করব। এক দিনের টাকাটা আমরা দেবো—বন্যা-ফণ্ডে, এক দিনের দেবো—কন্যাদায়-গ্রস্ত এক গরীব ভদ্রলোককে, আর এক দিনের 'বেনিফিট্'—একটা স্কুলের জন্যে। সেই জন্যেই—আপনাদের কাছে থেকে একটু favour চাই। অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের চার্জ্জটা"

"আচ্ছা, সে সম্বন্ধে যথাসাধ্য আমি 'কন্‌সেসন্' দোব। সাত দিন বিজ্ঞাপনে সাত দশে সত্তর টাকা হয়, আপনারা পঞ্চাশ টাকা দেবেন।"

"তাই হবে। আপনি মহাশয় ব্যক্তি, আপনাকে বেশী ক'রে কি আর বলবো? সাধারণের কাযে 'বেনিফিট পারফরম্যান্স'। খানকতক টিকিট আপনার 'ষ্টাফের' মধ্যে

—সে আপনাকে ক'রে দিতেই হবে। আর আপনার নিজের জন্যে 'বক্স' একখানা—সে ত আপনাকে নিতেই হবে, নইলে কিছুতেই ছাড়বো না।"

কেসিয়ার সাতকড়ি বাবু গভীর চিন্তান্বিত হইয়া, ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"টাকা কুড়িটা কি আপনাকে দিয়ে গেছি?"

"কখন্ দিলে?"

"আপনি যখন তে-তলায় গিছলেন, আমার মনে হচ্ছে, যেন টেবিলের ওপর নোট দু'খান পেপার-ওয়েট চাপা দিয়ে রেখে গেছি।"

"বিলক্ষণ! হ্যাঁ মশাই সত্যনারাণ বাবু, আপনার স্লিপ পেয়ে ত আমি নেমে এলুম। নোট-কোট টেবিলের ওপর কি কিছু ছিল? আমি ত পাই নি। সাতকড়ি নাম—সাত ব্যাপারে তোমার মন অস্থির, কোথায় অন্যমনস্ক হয়ে রেখেছ, দেখ গিয়ে। নীচের হলঘরে তোমাদের ও গোলমাল হচ্ছিল কিসের?"

গোলমালের একটুখানি রেশ বোধ হয় উপরে কর্ত্তার কাণে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল।

"কি হয়েছিল, সাতকড়ি?"

"ও শ্যাম বাবুর আফিংয়ের কৌটো হারিয়েছে—তাই।"

"শ্যাম বাবু? আফিংয়ের কৌটো হারিয়েছে? সর্ব্বনাশ! তা হ'লে ত হুলস্থূল প'ড়ে গেছে বল? একসঙ্গে ব'সে কায কর, ওঁর গায়ের বাতাস ত তোমাদের গায়েও এসে লাগে। ও কুড়িটে টাকাও তা হ'লে তুমি হারিয়েছ। এইবার এক দিন বঙ্গবন্ধু অফিসটাই হারাবে। যাও যাও, টাকা কুড়িটা কোথায় রেখেছ—খোঁজ গিয়ে।"

অপ্রসন্ন-মুখে—সাতকড়ি বাবু ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। সত্যনারাণ বাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন —"আজ আসি তা হ'লে,—নমস্কার।"

"নমস্কার।"

২

শ্যামবাজারে 'ক্লাসিক থিয়েটারের' সম্মুখে ভীড় জমিয়াছে। পূজার তিন দিন এখানে সত্যনারায়ণ নাট্য-সমিতি অপূর্ব্ব অভিনয়-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিবেন। পালা হইবে,—যাহা কখনও হয় নাই—হইবার আশা নাই,—'মেঘদূত' আর 'নব বিদ্যা-সুন্দর'।

বেনিফিট্ নাইট্। হু হু করিয়া টিকিট বিক্রয় হইতেছে। কলিকাতার নাট্যামোদিগণের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কালিদাসের চির-সুন্দর অমর কাব্য মেঘদূত—তাহাই নাট্যাকারে, তাহার সঙ্গে মন-মাতানো রসের ফোয়ারা—বিদ্যাসুন্দর, তাহাও আবার—'নব'।

থিয়েটারের বাহিরের দেওয়ালগুলি প্রাচীর-পত্রে ঢাকা পড়িয়াছে। যিনি টিকিট কিনিয়াছেন বা কিনিবেন, তিনি তাহা সোৎসাহে পাঠ করিয়া মনে মনে গভীর তৃপ্তি লাভ করিতেছেন। আর যিনি টিকিট কিনেন নাই বা কিনিবেন না, তিনিও একাগ্রমনে তাহা পাঠ করিয়া বিনা মূল্যে কতক আনন্দের অধিকারী হইতেছেন।

তরুণ-তরুণীর দল, কবি-সাহিত্যিকের দল, কলেজের ছাত্রদের দল, বড়লোকের আদুরে ছেলের দল—এরা ত সব আছেই, এ ছাড়া 'নব্য' দরণের বুড়া-বুড়ী, ব্যবসাদার, দোকানদার, ফেরীওয়ালা, সম্পাদক, স্কুল-মাষ্টার প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর লোকই এই অপূর্ব্ব অভিনয় দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে এবং ইহা লইয়া পাড়ায় পাড়ায় জোর আন্দোলন-আলোচনা চলিতেছে।

মেঘদূত কাব্য হিসাবে অতুলনীয়। কিন্তু কি করিয়া তাহাকে নাট্যরূপ দেওয়া হইয়াছে, তাহা একটা পরম বিস্ময়। অভিনয় না দেখা পর্য্যন্ত দর্শকবৃন্দের চক্ষু-কর্ণের এ দ্বন্দ্ব-বিস্ময় কাটিবে না।

দৈনিকের বিজ্ঞাপনে এবং প্রাচীর-পত্রে ঘোষণা করা হইয়াছে—

যাহা ছিল স্বপ্ন—শুধুই স্বপ্ন

তাহা সত্যে পরিণত হইল!

অসম্ভব সম্ভব হইল!

চিরকালের বিস্ময় ঘুচিয়া গেল।

রূপে-রসে-বর্ণে-বিলাসে সৌন্দর্য্যে-মাধুর্য্যে

অপূর্ব্ব এবং অতুলনীয়।

আসুন—দেখুন—জীবন সার্থক করুন।

সেই যক্ষ

সেই যক্ষ-পত্নী

সেই রামগিরি, সেই মেঘ, সেই সোণার দাঁড়ে ময়ূর—

'যাহাকে নাচাত প্রিয়া
করতালি দিয়া দিয়া।'
তার পর নব-বিদ্যাসুন্দর।
সেই বিদ্যা, সেই সুন্দর, সেই মালিনী।
আর সর্ব্বোপরি—
মালিনীর সেই মন-মাতানো গান ও নাচ!

সত্যনারায়ণ বাবুর নাইবার খাইবার অবসর নাই। সপ্তমীপূজার আর সাতটি দিন মাত্র বাকী। কাযের আর অন্ত নাই। এ দিকে সন্ধ্যার পর হইতে প্রত্যহ জোর রিহার্শেলও চালাইতে হইতেছে। নারায়ণ বাবু তাঁহার সহকারী থাকিলেও একা সত্য বাবুকেই দশ জন হইয়া দশ দিকের কায দেখিতে হইতেছে। সন্ধ্যার সময় ক্লাবে রিহার্শেল দিতে যাইবার পূর্ব্বে তিনি 'বঙ্গবন্ধু' অফিসে আসিয়া দেখা দিলেন, এবং কর্ত্তা যতীশ বাবুকে নমস্কার জানাইয়া একখানা চেয়ার অধিকার করিয়া বসিলেন।

"আপনার কথাই ভাবছিলুম—অনেক দিন বাঁচবেন।"

"দুঃখও তা হ'লে অনেক পেতে হবে।" বলিয়া সত্য বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

"দেখুন, সত্যনারায়ণ বাবু—"

"আজ্ঞে, আমার নাম সত্য বাবু, নারাণ বাবু আমার সহকর্ম্মী। আমাদের দুজনের নাম মিলিয়ে সত্যনারায়ণ নাট্যসমিতির সৃষ্টি।"

"তাই না কি? দেখুন সত্য বাবু, আপনার বিলখানা নিয়ে যান। আমাদের বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ হচ্চে পঞ্চাশ টাকা। আমার 'ষ্টাফের' মধ্যে এক টাকার টিকিট ৩৫ খানা বিক্রী হয়েছে। আর আমার একখানা বক্স—২০ টাকা। তা হ'লে বিলের টাকা আর আপনাকে দিতে হবে না। আমি আপনাকে পাঁচটা টাকা দি আর বিলখানা Paid লিখে সই ক'রে দি।"

হাব-ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া সত্য বাবু বলিলেন—"আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ। Charity performance—করতে গেলে, দান আপনাদেরই,—মারফত আর একটু গতরের পরিশ্রম—শুধু এইটুকুই আমাদের। আচ্ছা, উঠলুম তা হ'লে; এখনই আবার রিহার্শেলে য়্যাটেণ্ড করতে হবে। সৌটা আটেক বাজে বোধ হয়"—বলিয়া সত্য বাবু দেয়ালের ক্লকটির দিকে চাহিলেন। যতীশ বাবু কহিলেন—"হ্যাঁ, ভাল কথা। দেখুন সত্য বাবু, আফিংয়ের কৌটো হারানোর দিন আপনি এখানে ছিলেন, না? সাতকড়ি বাবু—অর্থাৎ আমার কেসিয়ার, সেই কুড়িটে টাকা সে দিন যা হারিয়েছিলেন, তা আর পাওয়া যায় নি। তার পর আমার হাতের সোণার রিষ্ট ওয়াচটা সে দিন এই ড্রয়ারের মধ্যে ছিল—"

"সেটাও গেছে না কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ৮০ টাকা দামের ঘড়ীটা—"

"ড্রয়ারটা কি সে দিন খোলাই ছিল?"

"ড্রয়ার খোলাই থাকে। তবে আমি ঠিক মনে করতে পাচ্ছি না, ড্রয়ারে রেখেছিলাম কি আর কোথায় হারিয়েছি। তাই ও সে দিন বলেছিলুম যে, শ্যাম বাবুর আফিংয়ের কৌটো যখন হারিয়েছে, তখন অনেক কিছুই হারাবে। আর হলও মশাই, ঠিক তাই!—ওর বাতাসটাই হচ্ছে ছোঁয়াচে কি না।"

আরও দুই চারিটি কথার পর সত্য বাবু নমস্কার জানাইয়া সে দিনের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন।

৩

হুলস্থূল ব্যাপার। অভাবনীয় কাণ্ড! গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে,—জ্বর আসে। এমন ঘটনার কথা কেহ কখনও কল্পনাও করিতে পারে না। চুরি নয়, ডাকাতি নয়, বাটপাড়ি নয়— তারও উপর। সাংঘাতিক—ভয়ঙ্কর!

সপ্তমীর সন্ধ্যায় ক্লাসিক থিয়েটরের সম্মুখে রথযাত্রার ভীড় জমিয়া গিয়াছে। কেহ পদব্রজে, কেহ রিক্সায়, কেহ ট্রামে, কেহ ট্যাক্সিতে, কেহ বা মোটরে আসিয়া এই স্থানে জমিয়াছে। কাহারও মুখে উৎসাহ, কাহারও মুখে অবসাদ, কাহারও ঘৃণা, কাহারও বা ক্রোধ। কেহ বলিতেছেন—"উঃ!" কেহ বলিতেছেন—"আঃ!" কেহ বলিতেছেন—"বাপ্!" কেহ বা কিছুই বলিতেছেন না—একেবারেই নীরব। কিন্তু তাঁহার নীরবতার অন্তরালে এই কথাগুলি যেন ঠেলাঠেলি করিতেছে—"কি ধড়িবাজ চোর রে বাবা!"

জনতার আর বিরাম নাই। এক দল যান, অপর দল আসেন। আবার সে দল যান, আর এক দল আসেন। সকলেরই—বিস্ময়, হা-হুতাশ এবং দীর্ঘশ্বাস!

"উঃ! ফাঁকিবাজী বটে বাবা!"

"একেই বলে, মশাই, পুকুর চুরি।"

"সহর শুদ্ধ লোককে ঠকিয়ে গেল—চোর বটে।"

"আরে, তার আর হয়েছে কি! পুজোর সময় একটু রসের যোগান দিয়ে গেল। একটু হেসে নাও বাবা।"

"উঃ! প্রথমে এক টাকার একখানাই কিনেছিলাম মশাই, শেষকালে কি দুর্মতি হ'ল, কুড়ি টাকার একখানা বক্স কিনে ফেললুম।"

"ভালই হয়েছে। দেব-দ্বিজে ত আর কারও ভক্তি নেই। মা তাই পদার্পণ করেই কুড়ি টাকা ফাইন ক'রে দিলেন আর কি।"

"ফাইন্‌টা স্বীকার করলুম, কিন্তু সেটা দেব-দ্বিজে ভক্তি অভক্তির জন্যে নয়, সেটা হচ্ছে—হিন্দু হয়ে, হিন্দুর বৈশিষ্ট্য হারিয়ে—বিদেশের পায়ে আত্মবলি দেবার জন্যে। কেন না—"

"মশাই কি এক জন সাহিত্যিক?"

"কিম্বা কবি?"

"কিম্বা—"

এই লইয়া জন কতকের মধ্যে কথা-কাটাকাটি এবং পরে মারা-মারি হইবার উপক্রম হইল।

ও-দিককার জনকতক লোক হঠাৎ সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"বল হরি—হরিবোল!"

ব্যাপারটা এই যে, সত্যনারায়ণ নাট্য-সমিতি হাজার দেড়েক টাকার টিকিট বেচিয়া সহসা গা-ঢাকা দিয়াছেন। 'বেনিফিট্ নাইট্,' 'চ্যারিটি পারফরম্যান্স,' বন্যা, স্কুল, ভগিনী-দায়, মেঘদুত, নব-বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি সকলই তাঁহাদের ভুয়া। থিয়েটারের দেওয়ালে প্রাচীর-পত্র কয়খানার উপর লাল রংয়ের কাগজে চুণের পোঁচড়া দিয়া বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—

দূতীগিরী করতে গিয়ে, দমকা পূবে বাতাসে
'মেঘ' উড়ে গেল!

মেঘও উড়িয়া গেল এবং সেই সঙ্গে হাজার দেড়েক টাকাও উড়িয়া গেল, কিন্তু মেঘের আশায় চাতকের দল আর উড়িতে চান না, তাঁহারা দলে দলে জমিতে লাগিলেন এবং এই ব্যাপার লইয়া নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিলেন।

সপ্তমীর সন্ধ্যায় এখানে যখন ঐরূপ ঘটনা, তখন মোগলসরাই ষ্টেশনে এক্সপ্রেস ট্রেণ থামিলে মধ্যমশ্রেণীর একখানা কামরা হইতে নামিলেন—সত্য বাবু ও নারাণ বাবু। সত্য বাবুর হাতে একটি স্যুটকেশ, নারাণ বাবুর হাতে ছোট একটি বেডিং।

২

আজ দশ দিন হইল সত্য বাবু এবং নারাণ বাবু কাশী আসিয়াছেন। নারদঘাটে একটি দ্বিতল কক্ষ ভাড়া লইয়া উভয়ে আছেন। কলিকাতায় 'মেঘদূতের' লীলা সমাপ্ত করিয়া দুই বন্ধু বিশ্বনাথ দর্শনে আসিয়াছেন। আর দিন কয়েক মাত্র এখানে কাটাইয়া তাঁহারা অন্যত্র গমন করিবেন।

সন্ধ্যা উৎরাইয়া গিয়াছিল। চারিদিকের দেবালয়গুলি হইতে নহবতের সুর শারদীয় বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। গঙ্গাবক্ষে অসংখ্য ডাউলে ও বজরা দীপমালায় সজ্জিত। অদূরবর্ত্তী গঙ্গার ঘাট হইতে কাহারও রামপ্রসাদী গান কাণে আসিতেছিল:—

"হৃৎকমল-মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা।"

দ্বিতলের নিভৃতকক্ষে দুই বন্ধু মুখোমুখি বসিয়া,—সত্য বাবু এবং নারাণ বাবু। এ নাম যে তাঁহাদের মেঘের মতই মিথ্যা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আসল নামও ত তাঁহাদের অজ্ঞাত। সুতরাং আমাদের কাছে তাঁহারা সত্যও বটে এবং নারায়ণও বটে।

সত্য বাবু পার্শ্বের স্যুটকেশটার মধ্য হইতে হাত-ঘড়ীটা তুলিয়া দেখিয়া কহিলেন—"আটটা। আমি তা হ'লে আগে খেয়ে আসি। ঘড়ীটা দামী ঘড়ী, যতীশ বাবুর মুখে শুনেছি—৮০ টাকা দাম। সুবিধেমত খদ্দের পেলে ঝেড়ে দেওয়া যাবে।"

"সব চেয়ে তা হ'লে যতীশ বাবুরই দেখছি ঘাড় ভেঙ্গেছ বেশী ক'রে।"

"তা মন্দ কি। নগদ কুড়ি আর পাঁচ—পচিশটে টাকা, ৭০ টাকার বিজ্ঞাপন, ৮০ টাকার ঘড়ী, দুটো ফাউন্টেন পেন, আর এক কৌটো আফিং। আফিংয়ের কৌটাটা সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে কুড়িয়ে পাই। ওটা দিয়ে দিলেই পারতুম।"

"দিলে না কেন?"

"কেন এই জন্যে যে, নিতেই মন চায়, দিতে আর মন

চায় না। যাক—পুজোর ঝোঁকটায় নেট চৌদ্দশ' এল ত? আমাকে তোর এক লাখ সাবাস দেওয়া উচিত।"

নারায়ণ বাবু সত্য বাবুর পিঠ চাপড়াইতে চাপড়াইতে কহিল—"বেশী সাবাস দিলে তুই আমাকেই কোন্ দিন চুরি ক'রে বেচে দিয়ে আসবি।"

নেট চৌদ্দশ'র ভিতর এই কয় দিনে প্রায় এক শত ইহাদের খরচ হইয়া গিয়াছে। সুটকেসটির মধ্যে তের শত এখন বর্ত্তমান। সুতরাং সুটকেসটি ঘরে রাখিয়া দুই বন্ধুর একজোটে কোথাও বাহির হওয়া হয় না। কপোত-দম্পতীর ডিমে তা দিবার মত এক জন থাকেন, এক জন যান; আবার তিনি আসেন—ইনি যান।

আসিয়া অবধি হোটেলেই আহারের বন্দোবস্ত। তাই ঘড়ী দেখিয়া সত্য বাবু কহিলেন—"আটটা বেজেছে, আমি আগে খেয়ে আসি।"

সত্য বাবু নূতন-কেনা জাপান-সিল্কের পাঞ্জাবী গায়ে চড়াইয়া হোটেলের উদ্দেশে বাহির হইয়া গেলেন। তিনি ফিরিলে নারায়ণ বাবু খাইয়া আসিবেন।

নারাণ বাবু একটা সিগারেট ধরাইয়া জানালার ধারে আসিয়া বসিলেন। কয় দিন হইতে তাঁহার পবিত্র মনের মধ্যে একটা অপবিত্র চিন্তা আসিয়া দেখা দিয়াছে। উহা এক্ষণে আবার দেখা দিল—

"এখনও তেরশ' মজুত। কিন্তু এখান-সেখান ঘুরে বেড়াতে হয় ত শ'পাচেক বেরিয়ে যাবে; থাকবে আটশ। তার অর্দ্ধেক চার শ আমার, চার শ ওর। শেষ পর্য্যন্ত তাই পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। হয় ত পাক মাথাই সার হবে। নাঃ,—ও যা ভেবেছি, তাই ক'রে ফেলা যাক্। যঃ পলায়তি স জীবতি। আর দেরীও নৈব কর্ত্তব্যং। আজই রাত্রে।"

একটা শেষ টান দিয়া, সিগারেটের শেষ টুক্‌রাটুকু নারাণ বাবু জানালার বাহিরে ফেলিয়া দিলেন।

* * * *

গভীর রাত্রিতে শব্দ হইল—খটাস্।

সত্য বাবুর সজাগ ঘুম। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি রে?"

"ঘড়ীটা দেখছি—রাত কত?"

"শুয়ে পড়—শুয়ে পড়—রাত এখন সাড়ে বত্রিশটা। অন্ধকারে ঘড়ী দেখবি কি রকম?" আফিংখোরের ঘুমের ন্যায় তখনই আবার সত্য বাবুর চোখ বুজিয়া আসিল এবং ধীরে ধীরে নাক-ডাকা সুরু হইয়া গেল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আবার শব্দ হইল—ধপাশ,—ধপ্!

"আবার কি রে?"

"একটা বেরাল, ভাই। মেরেছি বেটাকে সজোরে এক ঘা জুতোর বাড়ি।"

"বেশ করেছিস্।"—সঙ্গে সঙ্গেই নাসিকার মৃদু ডাক।

নারাণ বাবুর হাত হইতে সুটকেসটা মেঝের উপর পড়িয়া গিয়াছিল। এবার তিনি মনে মনে, কাহার উপর জানি না, খুবই বিরক্ত হইলেন এবং আজিকার মত আশা ত্যাগ করিয়া যৎপরোনাস্তি অস্বস্তির সহিত বিছানার এক ধারে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন।

৫

"নমো নারায়ণ—মঙ্গল হোক।"

সত্য বাবু ও নারাণ বাবু মুক্ত দরজার দিকে ফিরিয়া দেখিলেন—গেরুয়া-পরিহিত, মুণ্ডিতমস্তক, দণ্ডধারী এক তরুণ সন্ন্যাসী। গায়ে একখানি উত্তরীয় জড়ান। তন্মধ্যে এক হাতে বোধ হয় কিছু আছে। অন্য হাতে দণ্ড। সত্য বাবু কহিলেন—"কি চাই, বাবা?"

"নমো নারায়ণ—মঙ্গল হোক। কিছু খাদ্য চাই।"

"আমরা ত ঘরে খাই না, সুতরাং খাদ্যদ্রব্য কিছুই নেই।" বলিয়া সত্য বাবু একটি টাকা লইয়া সন্ন্যাসীকে দিতে গেলেন। সন্ন্যাসী কহিলেন,—"অর্থ লওয়া নিষেধ। কিছু খাদ্য ভিক্ষা চাই।"

"এই টাকা দিয়া খাদ্য কিনে নেবেন।"

"অর্থ লওয়া নিষেধ।"

সন্ন্যাসী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

সত্য বাবু কহিলেন,—"আচ্ছা বাবা, আপনি পনর মিনিট এখানে একটু বসুন, আমি চাল, ডাল, আটা, ঘি কিনে আনছি।"

"আচ্ছা, যাও। ভিক্ষা করিতে আসিয়া আসন গ্রহণ নিষেধ, আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিন্তু শীঘ্র আসিবে।"

সত্য বাবু টাকাটি লইয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। সন্ন্যাসী নারাণ বাবুকে কহিলেন,—"এক স্থানে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা আমাদের নিষেধ। তা' ছাড়া আর এক কারণে আমি আশ্রমের বাইরে বেশীক্ষণ থাকতে পারি না,

আমার একটা অসুখ আছে। মাঝে মাঝে বুক ধড়ফড় করে, মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে যাই।"

"আপনি এই মেজেতে একটু বসুন না, বাবা।"

"বলেছি ত ভিক্ষায় আসিয়া বসা আমাদের নিষেধ। গুরুর আদেশ——"

হঠাৎ বোধ হয়, তাঁহার বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল, মাথা ঘুরিয়া উঠিল। হাতের দণ্ড হাত হইতে পড়িয়া গেল।

"বাবা, অসুস্থ বোধ করছেন কি ?"

ধড়াস্ করিয়া সন্ন্যাসী মেজের উপর পড়িয়া গেলেন। নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ, সমস্ত দেহ তাঁহার কাঠের মত শক্ত হইয়া গেল। নারাণ বাবু প্রমাদ গণিলেন। এই বিপদে কি যে করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, সন্ন্যাসীর মুখের দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। হঠাৎ সন্ন্যাসী একটু নড়িয়া উঠিলেন। অত্যন্ত যন্ত্রণার সহিত বলিলেন,—"শীগ্ গির—একটু গুঁড়ো সোডা আর গঙ্গাজল।"

নারাণ বাবু ছুটিয়া নীচে আসিলেন ও গলির মোড়ের ডাক্তারখানাটির মধ্যে ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিলেন।

এ জগতে কখন্ যে কি ঘটে, কিছুই বলা যায় না। সত্য বাবুর যাইবার পর সমস্ত ব্যাপার দুই চারি মিনিটের মধ্যেই ঘটিয়া গেল।

ডাক্তারখানায় মিনিট পাঁচেক দেরী হইল। সেখান হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পার্শ্বের বাটীর এক পণ্ডিত-জীর নিকট হইতে এক লোটা গঙ্গাজল লইয়া নারাণ বাবু ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন।

মনে মনে তাঁহার ভয়—'হয় ত বা কি হইল, হয় ত সন্ন্যাসী এতক্ষণ আছেন কি নাই! সত্য বাবুও বাহির হইয়া গিয়াছেন, এ অবস্থায় তিনি একলা——'

কিন্তু সত্য বাবু আসিয়া পড়িলেন।

দ্রুতপদে সিঁড়ি উঠিতে উঠিতে সংক্ষেপে নারাণ বাবু তাঁহাকে এই সংবাদ শুনাইলেন। তিনি চমকিয়া উঠিলেন,—বোধ হয় তাঁহার পা একটু টলিয়া গেল। হাত হইতে চাউল, দাইল, আটা প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের ঠোঙ্গাগুলি সিঁড়ির উপর ছত্রাকার হইয়া পড়িল। কিন্তু সে দিকে গ্রাহ্য না করিয়া উভয়ে ছুটিয়া উপরে আসিলেন।

কিন্তু নারাণ বাবু যা ভয় করিয়াছিলেন—তাই। সন্ন্যাসী আর নাই। অর্থাৎ স-শরীরেই নাই।

তাড়াতাড়ি দুই বন্ধু তখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং যাহা দেখিলেন, তাহাতে বজ্রাহত হইয়া উভয়ে মেজের উপর বসিয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসীও নাই, সুটকেস্‌ও নাই! তাহার মধ্যেই যে তের শত টাকার নোট প্রভৃতি ছিল!

সুটকেসটি পাওয়া গেল—নীচে, সিঁড়িতে উঠিবার ধারে একটা গলিমত যায়গায়। এ বাড়ীতে আর অন্য ভাড়াটিয়া কেহ ছিল না। অত বড় সুটকেসটি তরুণ সন্ন্যাসী লইয়া যায় নাই। এই নিভৃত স্থানে উহা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাহার উপরের ডালা বরাবর ছুরী দিয়া কাটা। তন্মধ্যে কাপড়-চোপড় যাহা যাহা ছিল, সবই আছে, নাই শুধু তের শত টাকার নোট, রিষ্টওয়াচটি, দুইটা ফাউণ্টেন পেন ও এক কৌটা আফিং। তৎপরিবর্ত্তে যাহা আছে, তাহা একটি অভিনব পদার্থ—কাল রংয়ের প্রকাণ্ড একখানা কাগজ। বোধ হয়, এই কাগজখানিই ভাঁজ করা অবস্থায় উত্তরীয়-মধ্যে সন্ন্যাসী ঠাকুরের হস্তে ছিল। প্রশস্ত কাগজ-খানির ভাঁজ খুলিয়া মেজের উপর বিস্তৃত করা হইল। তাহার কাল রংয়ের জমীর উপর চূণের পোঁচড়া দিয়া লেখা—

পূবের মেঘ পশ্চিমে এসে জমেছিল। ফলে—প্রবল বর্ষণ। তা'তে করে সব ভেসে গেল—মায় সুটকেস্ পর্য্যন্ত! হরি হরি!

(শেষ)

কিন্তু শেষের পরেও আর একটুখানি আছে। যে সপ্তাহে এই ব্যাপারটি ঘটিল, তাহার পরের সপ্তাহের 'বঙ্গবন্ধু' কাগজে নিম্নলিখিত ঘোষণাটি প্রকাশিত হইল!—

'পূজার কিছুদিন পূর্ব্বে, 'সত্যনারায়ণ নাট্য-সমিতি' নাম দিয়া কলিকাতা সহরের বুকে যে এক মহা জুয়াচুরী হইয়া গিয়াছে, তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন। ঐ জাল 'নাট্য-সমিতির' দুই জন মহা-জুয়াচোর মিথ্যা টিকিট বিক্রয় করিয়া যে টাকা উপায় করিয়াছিল—আমাদের অফিসের সুযোগ্য কেসিয়ার শ্রীযুক্ত সাতকড়ি ঘোষালের অপূর্ব্ব বুদ্ধিমত্তা ও পরিশ্রমের ফলে ঐ সমস্ত টাকা উদ্ধার হইয়াছে। এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, যাঁহারা টাকা দিয়া টিকিট ক্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্ব স্ব টিকিটসহ আমাদের অফিসে আসিলে, তাঁহাদের টাকা ফেরৎ পাইবেন এবং সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিবেন। এ ক্ষেত্রে একটি কথা উত্থাপন করা আবশ্যক। পূজার ছুটীতে শ্রীযুক্ত সাতকড়ি বাবু বেনারস বেড়াইতে গিয়াছিলেন এবং সেইখানেই অদ্ভুত কৌশলে টাকাগুলি জুয়াচোরদ্বয়ের নিকট হইতে উদ্ধার করেন। সুতরাং সাতকড়ি বাবুকে সকলের ইচ্ছানুযায়ী কিছু কিছু পুরস্কার দেওয়া কর্ত্তব্য।'

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।



তাঁতির মেয়ে



[গল্প]

১

—এই ঘটা, একটা কায করতে পারিস?

—কি বল্ না।

—দু'পয়সার মুড়ি এনে দিতে পারবি?

—কেন, তুই নবাব হয়েছিস্ না কি? নিজে গিয়ে আনতে পারিস্‌নে?

—তুই যে বড় আমাকে 'তুই' 'তুই' ক'রে কথা কইছিস?

—তুই কেন আমাকে আগে বল্‌লি?

—ফের! আমি যে তোর বড় হই—

—তা হলেই বা। বড় হয়ে মাথা কিনেছেন আর কি!

—উঃ, কি পাজি মেয়েটা! দাঁড়া, তোকে মজা দেখাচ্ছি।

—আচ্ছা। আমিও এখুনি ব'লে দিচ্ছি—

কথাটা বলিয়াই সে থমকিয়া গেল। কাকে বলিবে? তার কেহ যে নাই।

কাশীতে বাঙ্গালী-টোলায় একখানি তিনতলা জীর্ণ বাড়ী। তাহাতে আপাততঃ দুইটি পরিবার বাস করিতেছিল। একতলা এবং দোতলায় দুই ঘর ভাড়াটে ছিল। তিনতলাটি উপস্থিত খালি পড়িয়া রহিয়াছে। একতলায় যাহারা ছিল, তাহাদের মধ্যে একটি মেয়ে ব্যতীত সকলেই বেরিবেরি রোগে মরিয়াছে। দোতলায় এক ব্রাহ্মণ তাঁহার ছেলেকে লইয়া বাস করিতেন। গত বৎসর বসন্ত রোগে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ ঘটে। তখন হইতে তাঁহার অল্প অল্প জ্বর হইতেছিল। অল্প কয়েক দিন হইল ক্ষয়রোগে তিনিও গত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণের ছেলেটি দুই দিন হইতে জ্বরে ভুগিতেছে। এ দু'দিন উপবাসেই কাটিয়াছে, আজ সে ক্ষুধার তাড়নায় দু'টি পয়সার মুড়ির জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। জ্বর যদিও আজ কম, তথাপি বাহিরে গিয়া মুড়ি আনিবে, এমন শক্তি নাই। তাই দোতলা হইতে যখন দেখিল যে, একতলার মেয়েটি উঠানে আসিয়াছে, তখন সে তাহাকেই অনুরোধ করিল। মেয়েটির বয়েস চৌদ্দ-পনেরো হইবে; কিন্তু দারিদ্র্যে ও শোকে তাহাকে এমন করিয়াছে যে, দশ এগারো বৎসরের বেশী অনুমান করা যায় না। ছেলেটির বয়স কুড়ি একুশের কম নয়।

ঘটা যখন মুড়ি আনার পরিবর্ত্তে পিঁচুনি দিল, তখন ছেলেটি হতাশ হইয়া পড়িল। সে আবার বিছানায় গিয়া একটা চাদর টানিয়া মুড়ি দিল। কিন্তু কিছুক্ষণ শুইয়া থাকিয়া অসহ্য বোধ হইল। তখন সে আস্তে আস্তে পয়সা দুটি টেঁকে গুঁজিয়া নীচে নামিয়া আসিল।

বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, চৈত্রের রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে। ঘটা স্নান করিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া ভিজা চুল শুকাইতেছে। ছেলেটিকে দেখিয়াই সে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু একটু আড়-চোখে দেখিতেও ছাড়িল না। আড়-চোখে দেখিয়া সে বুঝিতে পারিল যে, একটা কিছু ঘটিয়াছে। সে দেখিল, উপরতলার ছেলেটি অতি কষ্টে চলিতেছে এবং হাঁপাইতেছে। তখন সে তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল,—মাখনদা, তোমার জ্বর না কি?

মাখন সংক্ষেপে একটা হুঁ বলিয়া আর একটু জোরে চলিবার চেষ্টা করিল।

ঘটা বলিল—মুড়ি আনতে যাচ্ছ বুঝি? তোমায় যেতে হবে না, আমি এনে দিচ্ছি।

—না, তোর আর আনতে হবে না, আমি নিজেই পারব'খন।

—আচ্ছা, বেশ, যাও না। ভালর জন্যে বল্‌লাম,—একবার রাগ দেখ না।

মাখন কিছুই বলিল না, কিন্তু সে জ্বরে রাগে ধুঁকিতেছিল। ঘটা কাছে গিয়া টেঁক হইতে পয়সা খুলিয়া লইল এবং কোনও প্রতিবাদের অপেক্ষা না করিয়া ছুটিয়া মুড়ি আনিতে গেল।

২

কাশী বড় সহর। বাঙ্গালী-টোলায় যাঁহারা থাকেন, তাঁহাদের অনেকেই গরীব অথবা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। যাঁহারা অপরের খরচে কাশীবাসী হইয়াছেন, তাঁহাদের দিন একরূপ কাটে। কিন্তু যাঁরা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া বাবা বিশ্বনাথের পদপ্রান্তে শরণ লইয়াছেন, তাঁহারা ভিক্ষার দ্বারা, নয় ত কোনও সত্রের কৃপায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। কাযেই কেহই বড় হতাশ নহে; সকলেরই আশা যে, দিন কোনও প্রকারে বিশ্বনাথ চালাইয়া দিবেন। ঘটা ও মাখনের মনেও সেই ভরসা—দিন চলিয়া যাইবেই। কারণ, তাহাদের সম্বল বিশেষ ছিল না।

ঘটা প্রথম প্রথম খুব কাঁদিত; কিন্তু মাখন তাহাকে এক দিন ধমকাইয়া দিল; বলিল, "এই, কাঁদিসনে। অকল্যাণ হবে।"

অকল্যাণ কাহার হইবে, সে-কথা দু'জনের কেহ ভাবিল না। দুজনেই বুঝিল যে, কাঁদিলে বিশেষ কিছু একটা হইবে—যাহা হয় ত সুবিধাজনক নহে। গৃহে যাহা সঞ্চিত ছিল, তাহাতে উভয়েরই দশ-পনেরো দিন কাটিয়া গেল। কিন্তু এখন উপায়? মাখন চিন্তা করে—তাহার নিজের অন্নের জন্য। ঘটা বাহির হইয়া দুনিয়াটা দেখিবার জন্য ছুটাছুটি করে। অন্ন খুব আবশ্যক হইলেও ঘটার সে-দিকে বড় চিন্তা নাই। যা' হয় হবে। কোনও দিন অন্ন না জুটিলেও সে ব্যস্ত হয় না। ঘুমাইয়া কাটাইয়া দেয়।

বাড়ীটি যাঁহার, তিনি কাশীতে থাকেন না। কাযেই ভাড়া দিবার ভাবনা উপস্থিত নাই। বে-মেরামতে বাড়ীটি প্রায় বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। তিনতলায় ছাদ পড়িয়াছে, কপাট ভাঙ্গিয়াছে, চূণ-বালি খসিয়া গিয়াছে—কাযেই কেহ সেখানে বাস করিতে পারে না। একতলা দোতলাও জীর্ণ। কেহ তাহা ভাড়া লইবার জন্য ব্যগ্র নহে। কাযেই এই দুইটি প্রাণী বেশ হাত-পা মেলিয়া বাড়ীটিতে বসবাস করিতে লাগিল। মাখন থাকে দ্বিতলে, ঘটা থাকে নীচে। কল চৌবাচ্চা উপরেও আছে, নীচেও আছে।

এক দিন দুপুর পর্য্যন্ত ঘুরিয়া মাখন গোটা কতক পয়সা পাইল এবং তাহার দ্বারা দশাশ্বমেধের বাজার হইতে চাল, ডাল, মাছ, শাক কিনিয়া আনিল। উপরে উঠিবার সময় জানালার ফাঁক দিয়া দেখিল, ঘটা ঘুমাইতেছে। ভাবিল, ঘটার রান্না-খাওয়া হইয়া গিয়াছে। একে সে রোদে তাতিয়া পুড়িয়া, ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলিয়া আসিয়াছে, তার উপর দেখিল যে, আর এক জন তারই মত দশাগ্রস্ত, অথচ সে পরম শান্তিতে নিদ্রা যাইতেছে। মাখনের মেজাজ খারাপ হইয়া গেল। সে ভাবিল, এই দুনিয়ায় কোথাও বিচার নাই!

এইরূপ অবস্থায় যখন সে চুলা ধরাইতে গেল, তখন তাহার কতকগুলি চুল পুড়িয়া গেল। সে চুলা ফেলিয়া মাছ কুটিতে গেল, তাহাতেও সুবিধা হইল না; হাত কাটিয়া রক্তারক্তি হইল। মাখন বিরক্ত হইয়া একবার দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিল এবং গামছা দিয়া হাতের রক্ত মুছিতে লাগিল।

হঠাৎ তাহার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিল। সে গামছা-খানি বাঁ কাঁধে ফেলিয়া দ্রুত সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল এবং 'ঘটা' 'ঘটা' বলিয়া জানালা দিয়া বার কতক ডাকিল। ঘটা উঠিয়া দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল। বলিল, "কি?"

মাখন বলিল, "ঘটা, উনুনটা ধরাতে পারছিনে, তুই একবার দেখবি পারিস কি না?"

ঘটা উত্তর করিল, "ওঃ কপাল, মেয়েমানুষ উনুন ধরাতে পারবে না? কি যে বল, তার ঠিক নেই। আমি এখনই যাচ্ছি।"

মাখন উপরে গেল। ঘটা মুখে চোখে জল দিয়া উপরে আসিল। সে জোরে জোরে ফুঁ দিয়া চুলা ধরাইয়া দিল। বারান্দায় বটি ও মাছ পড়িয়াছিল। ঘটা হাসিয়া উঠিল, বলিল, "ও মা গো, ও কি গো? এমনি ক'রে মাছ কোটে নাকি কেউ?"

মাখন গামছায় হাত ঘষিতে ঘষিতে ভ্যাঙচাইয়া বলিল, "অমনি করে নয় ত আবার কেমন ক'রে কোটে? যা যা, তুই তোর কাযে যা।" মাখনের দিকে চাহিতেই ঘটার হাসি হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। সে দেখিতে পাইল যে, মাখনের হাতের রক্তে গামছা লাল হইয়া গিয়াছে। সে বলিল," ও হরি, হাত কেটেছ বুঝি? খুব ত কাযের লোক!" সে তখন বঁটি লইয়া মাছ কুটিতে বসিল। মাখন ভাত চড়াইতে গেল। ঘটা মাছ কুটিয়া ধুইয়া পরিষ্কার পাত্রে করিয়া মাখনের কাছে লইয়া গেল। মাখন জিজ্ঞাসা করিল, "ঘটা, তোর খাওয়া হয়েছে ত?"

ঘটা ঘাড় নাড়িল। মাখন ধরিয়া লইয়াছিল যে, ঘটা খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া ঘুমাইয়াছিল। কিন্তু এখন সে বিস্মিত হইয়া ঘটার মুখের দিকে চাহিল। সে মুখের পানে তাকাইয়া মাখন বুঝিল যে, ঘটা শুধু আজ নয়, আরও অনেক দিন হয় ত উপবাসে কাটাইয়াছে। মাখন জিজ্ঞাসা করিল, "খাস্‌নি কেন ?"

ঘটা বলিল, "জুটলে তবে ত খাব ?"

"সে কি ?"

"কেন, খাওয়া আর এমন একটা বিষয় কি ? খেলেও হয়, না খেলেও হয়।"

মাখন বলিল, "তবে আমি আর চারটি চাল হাঁড়িতে ছেড়ে দি। তুই চান ক'রে আয়।"

ঘটা স্নান করিতে গেল। হাঁড়িতে আর চাল ছাড়া হইল না, কেন না, আর চাল ছিল না। যে ভাত হইল, তাহাই দুজনে ভাগ করিয়া খাইল।

মাখন বলিল, "দেখ ঘটা, আমি একটা বুদ্ধি ঠাউরেছি। আমরা ত মাত্র দুটি প্রাণী। তা দুজনের দুই হাঁড়ি না হয়ে এক হাঁড়ি হ'লে হয় না ? আমি খেটে খুটে পয়সা আনবো, তুই রেঁধে বেড়ে খাওয়াবি। কেমন ?"

ঘটা হাসিয়া ফেলিল। সে বলিল, "তা কি হয় ? তুমি জেতে বামুন, আমরা তাঁতি।"

মাখন বলিল, "রেখে দে তোর তাঁতি। কাশীতে বাবা বিশ্বনাথের এখানে সব হয়। আমি আর হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে পারব না, তা ব'লে দিচ্ছি।"

ঘটা একটু ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, তুমি কি কায করবে শুনি ? দুজনের খাওয়াতে পয়সা ত কম খরচ হবে না।"

মাখন বলিল, "সে আমি পারব। বামুনের ছেলে, ভিক্ষে করতে পারব। নয় ত চুরি—"

ঘটা বলিল, "দূর ! চুরি করা না শিখলে কি কেউ ইচ্ছে করলেই পারে ? ধরা প'ড়ে যাবে যে !"

"থাক, থাক, এখন সে কথা থাক। কাল থেকে তোর রাঁধতে হবে। আমি আজই তার ব্যবস্থা করছি।"

উনুনে তখনও আগুন ছিল। মাখন বাম হস্ত দিয়া পৈতাগাছটি খুলিয়া ফেলিল এবং ঘটাকে দেখিতে বলিয়া উনুনে সমর্পণ করিল। ঘটা একটু চিন্তিত হইল।

৩

প্রথম দিন কতক ঘটা কিছুতেই রাঁধিতে রাজি হইল না। সে সব যোগাড় করিয়া দিত, রাঁধিত মাখন। কিন্তু মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া সে পয়সা রোজগার করিয়া যখন ঘরে ফিরিত, তখন তাহার দ্বারা রন্ধন কেন, কোনও কার্য্য হওয়াই কঠিন হইয়া উঠিত। ফল হইল এই যে, দিন কতক রাঁধাবাড়া স্থগিত রহিল। খাবার খাইয়া দিন কাটিত ; কিন্তু রোজ দুবেলা খাবারের পয়সা জুটিবে কোথা হইতে ? শেষে ঘটাই রাঁধিত। মাখন মহা সুখে খাইত।

মাখন খাইতে কিছু ভালবাসিত। তাহার প্রকৃতিও ছিল অলস। কোনও দিন এমন বাঁকিয়া বসিত যে, কিছুতেই কায করিতে যাইতে প্রস্তুত হইত না। ফলে দুজনেই উপবাস করিত। তখন মাখনের মেজাজ আবার বিগড়াইয়া যাইত। ঘরে কিছু নাই শুনিলে সে এক এক দিন জ্বলিয়া উঠিত। বলিত, রাক্ষুসে খাওয়া। যা পাবে, তাই খেয়ে নিঃশেষ ক'রে রাখবে।—ঘটা ইহাতে প্রতিবাদ করিত, কিন্তু কোনই ফল হয় না দেখিয়া সে নিজে উপবাস করিতে লাগিল। মাখন কোনও দিন রোজগার করিতে না পারিলেও সে চালাইয়া দিত। মাখন তাহাতে খুসীই হইত। কিন্তু চিরদিন ত এমন লুকোচুরি চলে না। কোনও কোনও দিন ঘটা মাখনকে খাওয়াইয়া গঙ্গাস্নান করিতে যাইত এবং পথে কোনও সত্র হইতে খাইয়া আসিত। এক দিন পুঁটিয়ার সত্র হইতে ঘটা যখন খাইয়া আসিতেছিল, তখন হঠাৎ মাখনের সঙ্গে দেখা হইল। মাখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সে লুকাইবার কোনও চেষ্টা করিল না। স্পষ্টই বলিল, সে পুঁটের রাণীর সত্রে খাইতে গিয়াছিল। মাখন পথে কিছু বলিল না। বাড়ীতে আসিয়া সে প্রথমেই ঘটাকে জোরে এক ধাক্কা দিয়া বলিল, "বাড়ীর ভাতে পেট ভরে না, নচ্ছার কোথাকার !" ঘটা পড়িয়া গেল এবং যখন উঠিল, তখন দেখা গেল, পাথরের উঠানে পড়িয়া গিয়া তাহার নাক দিয়া রক্তধারা ছুটিয়াছে।

মাখন রক্ত দেখিয়া একটু অপ্রতিভ হইল। সে দৌড়িয়া গিয়া চৌবাচ্চায় চাদরটা ভিজাইয়া আনিল ও ঘটার রক্ত-স্রোত বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিয়া গেল। ঘটা তাহার এই যত্ন দেখিয়া চোখের জলের মধ্যেও হাসিয়া ফেলিল। সে

মাখনের হাত হইতে ভিজা চাদরটি লইয়া নিজেই ক্ষতস্থানে চাপিয়া ধরিল।

মাখন নিজের প্রতিজ্ঞা বজায় রাখিবার জন্য বলিল, "আর কোনও দিন গেলে দেখতে পাবি কিন্তু!"

ঘটা বলিল, "কেন, কি হবে?"

মাখনের আবার ক্রোধসঞ্চারের উপক্রম হইল। ঘটা হাসিয়া বলিল, "কেন, মারবে না কি? ইস্—"

মাখন বলিল, "দেখবি?"

ঘটা তেমনই হাসিয়া উত্তর করিল, "মারো না—একটু-খানি রক্ত দেখেই ত দাঁতকপাটী লাগবার জোগাড় হয়েছিল।"

এবারে মাখনও হাসিল; বলিল, "কাযটা অন্যায় করে-ছিলি। ছত্তরে কেন খেতে গেলি?"

ঘটা সংক্ষেপে বলিল, "কেন, তাতে দোষটাই বা কি?"

মাখন বলিল, "তুই ছত্তরে খেতে গেলে আমার নিন্দে হয় না?"

"কেন তোমার নিন্দে হবে? আমি তোমার কে?" বলিয়া ঘটা একটু অভিমান করিল।

মাখন এই কথাটি কখনও ভাবিয়া দেখে নাই। কাশীতে কত লোক থাকে, যে যার মত চলিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। ঘটাই বা বেড়াইবে না কেন? সে সহসা এই সমস্যার উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। ধীরে ধীরে সে দোতলায় চলিয়া গেল। নিজের ঘরের চাবি খুলিয়া কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিল। কিন্তু তাহার মাথার মধ্যে কেবল ঐ কথাটিই শতবার ঘুরিতেছিল—আমি তোমার কে? যে দিন হইতে মাখন ঐ তন্তুবায়-কন্যার হাতে খাইয়াছে, সেই দিন হইতেই যেন তাহার উপর একটা স্বত্ব-স্বামিত্বের ভাব জন্মিয়া গিয়াছে। নানা কাযের মধ্যে সে ভুলিয়াই গিয়াছিল যে, ঘটার কোনও পৃথক্ সত্তা আছে। কিন্তু আজ ঘটা সত্যই বলিয়াছে—"আমি তোমার কে?" মাখন ভাবিতে লাগিল, ঘটাকে কত দিন কত বকিয়াছি, কত দিন তাহাকে অপমান করিয়াছি; কিন্তু ঘটা যে আমার নয়, তাহা ত মনে পড়ে নাই।

এমনই কত কি ভাবিয়া যখন তাহার মাথা গরম হইয়া উঠিল, তখন সে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাহির হইয়া পড়িল এবং কাশীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। শেষে শ্রান্ত-ক্লান্ত অবসন্ন দেহে মণিকর্ণিকার ঘাটের উপর আসিয়া শুইয়া পড়িল।

নিকটেই দুই তিনটি চিতা জ্বলিতেছিল, তাহার উদ্দীপ্ত আলোক মাখনের মুখমণ্ডলে পড়িয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল, শ্মশানের কোলাহল উপেক্ষা করিয়া সে যে কখন্ নিদ্রার কোলে আশ্রয় লাভ করিল, তাহা সে জানিতে পারিল না।

ঘটা অন্য দিনের মত রাঁধিয়া বাড়িয়া যখন মাখনকে ডাকিতে গেল, তখন দেখিল, সে ঘরে নাই। ঘটা কিছুক্ষণ দালানে বসিয়া ঝিমাইতে লাগিল। তার পরে দেখিল যে, প্রদীপটি তৈলাভাবে নিভ-নিভ হইয়া আসিয়াছে। তখন সে দু'বার হাই তুলিয়া, দু'বার চোখ রগড়াইয়া, নীচে নামিয়া আসিল। একবার তাহার মনে হইল, একটু শুইয়া পড়িলে মন্দ হয় না। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল, মাখনদা যদি এর মধ্যে আসিয়া পড়ে এবং তাহাকে না ডাকে! তাহা হইলে ত সে বেচারীর খাওয়াই হবে না।

মাখন আসিল না। ঘটা কিন্তু ভাবিতেছে যে, সে এখনই আসিবে। এইবার হয় ত কড়া নাড়িবে। কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল; কড়া নড়িল না। তখন ঘটা খানিকক্ষণ বসিয়া ঢুলিতে লাগিল। তার পর পা ছড়াইয়া বারান্দাতেই ঘুমাইয়া পড়িল।

৪

পরদিন ঘটা খুব রাগ করিল। মাখন যখন ফিরিয়া আসিল, তার পরমুহূর্ত্তেই সে গঙ্গাস্নানে চলিয়া গেল। মাখন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে রান্নাঘরে গিয়া দেখিল, খাবার সমস্তই পড়িয়া রহিয়াছে। বুঝিল, ঘটারও খাওয়া হয় নাই। কিন্তু কেন? ঘটা ত খাইলে পারিত। সে ত নিজেই বলিয়াছে, "তুমি আমার কে?"

ঘটাও দশাশ্বমেধে স্নান করিতে করিতে ভাবিতেছিল, ইস, ভারি রাগ! কেন, এত রাগ কিসের? সে রাঁধিয়া দিয়াছে, এই ঢের। তার পরে আবার রাগ দেখানো। আর বলেছি বা কি? আমি ছত্তরে খেতে গেলে দোষ হয় যদি, তবে চাকা রোজগার করতে মানা করে কে?

এমনই কত কথা ভাবিতে ভাবিতে সে গঙ্গার জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিল। তার পরে ভাবিল, আজ যদি আবার তার রাগ চড়ে ত খাওয়াই হবে না।

এই ভাবিয়া সে উঠিয়া পড়িল এবং বাড়ীর দিকে চলিল। চলিতে চলিতে কখন্ যে তাহার গতি দ্রুত হইতে দ্রুততর হইয়াছিল, সে তাহা বুঝিতে পারে নাই।

ঘরে গিয়া কাপড় ছাড়িয়া যখন সে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল, তখন তাহার মনে পড়িয়া গেল যে, রন্ধনের মত কিছুই ঘরে নাই। মাখন নিজের ঘরে বসিয়া কাপড় সেলাই করিতেছিল। শতচ্ছিদ্র বস্ত্রে আর ঘরের বাহির হওয়া চলে না। ঘটা দেখিল, তাহাকে কিছু বলা বৃথা। গরম কাল, রাত্রির খাবার অখাদ্য হইয়া গিয়াছে। ঘটা তখন নিজের একখানি গরদের শাড়ী লইয়া জোলাদের পাড়ায় গেল। এক জোলার বধূকে সেই শাড়ীখানি দিয়া ছুইটি টাকা পাইল। শাড়ীখানি গেল পূজার সময় তাহার মা তাহাকে দিয়াছিলেন। আজ অশ্রুধারার সঙ্গে সেই বস্ত্রখানিকে বিদায় দিয়া ঘটার মন অস্থির হইয়া উঠিল। কিন্তু সে মনের অবস্থা গোপন করিয়া চাল-ডাল কিনিয়া ঘরে আসিল এবং রন্ধন করিয়া মাখনকে খাইতে দিল।

মাখন অন্য দিনের মত আজ সোয়াস্তিতে আহার করিতে পারিল না। সে বসিয়া বসিয়া দেখিয়াছে যে, আজ কিরূপে অন্নের জোগাড় হইয়াছিল। সে অল্প কয়েক গ্রাস মুখে দিয়াই উঠিয়া পড়িল। ঘটার চোখে জল আসিল। সে সঙ্কল্প করিল যে, সেও আহার করিবে না।

ঘটা যখন নীচে নামিয়া যাইতেছে, তখন মাখন গিয়া খপ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল।

"না খেয়ে যাস্ না, বলছি।"

ঘটা হাত ছাড়াইতে চেষ্টা করিল না, বলিল, "তুমি কেন খেলে না?"

মাখন বলিল, "আমার খুসী।" ঘটা জবাব দিল, "বেশ, আমারও খুসী।" মাখন নরম হইয়া বলিল, "কাল তুই আমাকে কেন অপমান করলি?"

"সে কি! আমি তোমায় আবার কিসে অপমান করলাম?"

মাখন তাহার জবাব খুঁজিয়া পাইল না। সে বলিল, "নিশ্চয়ই অপমান করেছিস—"

"কিসে অপমান করেছি, তাই বল?"

মাখন চেষ্টা করিয়া বলিল, "কেন তুই বললি, তুই আমার কে?"

"আচ্ছা, আর বল্‌ব না। কিন্তু কথাটা ত ঠিক—"

"না, না, মোটেই না—" বলিয়া মাখন চীৎকার করিয়া উঠিল।

"তবু শুনি, আমি তোমার কে?"

"তুই আমার বো-বো—বোন, তুই এ সংসারে আমার সব।"

মাখন আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু ঘটার চোখে মুখে একটু কুটিল হাসির আভাস দেখিয়া থামিয়া গেল।

৫

সুদীর্ঘ একটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মাখন তাহার চিরাভ্যস্ত আলস্য ত্যাগ করিতে পারে নাই। ঘরে কিছু না থাকিলেই সে ঘটাকে লাঞ্ছিত করিত। ঘটা কোনও উপায় না দেখিয়া পাড়ার সেই জোলা-বধূর শরণ লইত—যাহার নিকট সে শাড়ী বন্ধক রাখিয়াছিল। শাড়ী উদ্ধার করিবার সম্ভাবনা ত কিছুমাত্র ছিল না, বরং পুনরায় ঋণ করিবার প্রয়োজন হইল। সে বধূটি দয়া করিয়া দু'আনা চারি আনা কিছু দিন দিল; কিন্তু প্রত্যহ কে দিতে পারে? তাই সে বধূটি এক দিন বলিল, "বাছা, বেনারসী শাড়ীর কায কর না কেন? দু'পয়সা রোজগার করতে পারবে।"

ঘটা যেন ডুবিতে ডুবিতে ডাঙ্গা পাইল। বলিল, "হাঁ মা, তাই করব। কিন্তু কে আমায় বিশ্বাস ক'রে শাড়ী দেবে?"

জোলার বধূ সে ভাবনা আগেই ভাবিয়া রাখিয়াছিল। সে বলিল, "আমি গোপনে তোমাকে দুই একখানি শাড়ী দিব, তুমি তাই বেচে টাকা এনে আমাকে বুঝিয়ে দিলে আবার তোমাকে দুই একখানা দেব। এমনি ক'রে ফি শাড়ীতে তুমি এক টাকা, আট আনা ক'রে রোজগার করতে পারবে। কেমন?"

ঘটা তখনই সম্মত হইল।

কাশীর মত তীর্থস্থানে ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ কিছু চতুর হয়। ঘটা রীতিমত বেচা-কেনা করিতে লাগিল। পয়সাও কিছু লাভ হইতে লাগিল। সে যাহা পাইত, তাহাতেই সংসার বেশ চালাতে লাগিল। মাখনের উপার্জ্জন-চেষ্টা চিরদিনের মত স্থগিত হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু

তাহার পুরুষোচিত অভিমান তাহাতে কিছুমাত্র না কমিয়া বরং ক্রমাগত বাড়িয়া চলিল। সংসারে কোনও কষ্ট আর নাই।

কিন্তু মাখন সুযোগ পাইলেই ঘটাকে গঞ্জনা দিতে ছাড়িত না। ঘটা দুই এক দিন সহ্য করিতে না পারিয়া দু'কথা শুনাইয়াও দিত। ইহাতে মাখনের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইত যে, ঘটা তাহাকে অবজ্ঞা করে। এমনই ভাবে তাহাদের সংসার চলিতে লাগিল।

কিন্তু বিপদ ঘটিল অন্য দিক হইতে। ঘটা খাটিয়া খায়। সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাহা উপার্জ্জন করে, তাহাতেই তাহার নিজের ও মাখনের পেট চলিয়া যায়। রাঁধিয়া বাড়িয়া মাখনকে খাওয়াইয়া অবশিষ্ট যাহা থাকে, সে পরম তৃপ্তির সঙ্গে আহার করে। দুই এক সময়ে এই শান্তির একটু আধটু ব্যাঘাত ঘটিলেও আবার দু'দণ্ডের মধ্যেই মেঘ কাটিয়া যায়। কিন্তু কুটিল কুচক্রী দেবতাদের ইহা সহ্য হইল না। মদন তাঁহার ধনু বাঁকাইলেন। ঘটার হাসিকান্না-পরিশ্রমের মধ্যে কখন্ যে যৌবনের আবির্ভাব হইল, তাহা সে নিজে বুঝিতেই পারে নাই। কিন্তু মাখন বেচারী টাল সামলাইয়া উঠিতে পারিল না। তাহার কথা, ইঙ্গিত ও ভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া ঘটা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। মাখনের নিকট হইতে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা তাহার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। সে বুঝিতে পারিল না মাখনের অতৃপ্তি ও দৈন্য। সে ভাবিত হইল।

এক দিন রাত্রিতে আহারের পর সে যখন নীচে নামিয়া যাইতেছে, তখন মাখন ডাকিল—"ঘটা, এ দিকে একবার আয় ত—"

ঘটা কিছুদিন হইতে এরূপ আদরের ডাক ভয়ের সহিত শুনিতেছিল। সে বলিল, "কি, বল না ?"

"তুই এ দিকে আয় না।"

"না, আমার বড় ঘুম পাচ্ছে ; কি বলবে, তা বল।"

"বলছি এই যে, নীচেকার ঘরটা ভাড়া দিলে কিছু পাওয়া যায়। আমি এক জনকে কথা দিয়েছি—সে মাসে পাঁচ সিকে ক'রে দেবে।"

"বাঃ রে! আমি কোথায় থাকব ?"

"কেন, তুই উপরে থাকবি আমার কাছে ?"

"দুর!—তোমার যেমন কথা। এক ঘরে বুঝি থাকতে আছে ?"

"খুব আছে। একশ'বার আছে।"—বলিয়া মাখন তাহার দুটি হাত ধরিয়া ফেলিল। ঘটা বুঝিল, মাখনের সঙ্গে জোর করা বৃথা। তাহার দেহযষ্টি মাখনের বুকের বড় কাছে গিয়া পড়িল। সে নীচু হইয়া মাখনের পায়ের কাছে লুটাইতে চাহিল—তাহার আলুলায়িত কেশ মাখনের পায়ে ঠেকিল। ঘটা বলিল, "তোমার দুটি পায়ে পড়ি, মাখনদা, আমায় ছেড়ে দেও। এমন কাম করতে নেই—আমি এখনই চেঁচিয়ে লোক জড়ো করবো।"

মাখন মনে করিল যে, ঘটা তাহাকে মনে মনে ঘৃণা করে; তাই সে এমন ভাবে তাহার অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করিল। সে ঘটার হাত দুখানা ছুড়িয়া ফেলিল। সে চীৎকার করিয়া বলিল, "কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা!—আমার আশ্রয় না পেলে এত দিন কোথায় ভেসে যেতিস্, তার ঠিকানা নেই। আর আমাকে অপমান?—ছোট জাত কি না। আমি বামুনের ছেলে হয়ে তোর হাতে খাই, আর আজ আমাকে এমন ক'রে প্রত্যাখ্যান করলি ?"

মনে মনে ভীত হইলেও মাখনের আদরে ঘটার চোখে জল আসিবার মত হইয়াছিল। তাহার দুর্ব্বলতা একবার হৃদয়ের কোনও ফাটল দিয়া বাহির হইয়া পড়িতে চাহিয়াছিল; কিন্তু এক মুহূর্ত্তে সে পাথরের মত কঠিন হইয়া গেল। চোখে জলের পরিবর্ত্তে আগুনের জ্বালা বাহির হইতে লাগিল। তাহার জীবনের এক লুপ্ত অধ্যায় তাহার সমস্ত বিভীষিকা লইয়া আজ সন্ধ্যায় চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। সে লজ্জায় মরিয়া গেল।

সে রাত্রি কোনও রূপে কাটিয়া গেল। পরদিন সে ভোর হইবার পূর্ব্বেই জোলার বধূকে সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া আসিল। বেনারসী শাড়ী যাহা বিক্রয় হয় নাই, তাহা ফিরাইয়া দিল। বলিল, "মা, আমি দিন কতকের জন্যে বিন্ধ্যাচল যাচ্ছি, তাই সব ফিরিয়ে দিলাম। দয়াময়ী তোমার কথা জীবনে ভুলতে পারব না।"—বলিতে বলিতে ঘটার দু'ফোঁটা চোখের জল গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

জোলা-বধূর নিকট হইতে সে সোজা ষ্টেশনে গেল। সঙ্গে কিছুই লইল না। বিন্ধ্যাচলে মায়ের মন্দিরের দরজায় গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র (এম্, এ)।



উত্তর-আফ্রিকার রমণী

মিশর উত্তর আফ্রিকায়। মিশরে এখন যে-জাতির বাস, তাহাদের রক্তে বহু জাতির রক্ত মিশিয়াছে; কাজেই তাহাদিগকে আদিম-যুগের খাঁটি মিশরী বলা চলে না। আদিম মিশরী জাতের দুটি শাখা এখনো বিক্ষিপ্ত-ভাবে মিশরে বাস করিতেছে। সে দুই জাতির নাম ফেলাহিন ও কপ্ত। মিশরের প্রাচীন মন্দির ও সমাধি-প্রাচীরে যে-সব মূর্ত্তি ক্ষোদিত দেখা যায়, সে সব মূর্ত্তির গঠনের সহিত এ দুই জাতির দেহের গঠনের হুবহু-মিল।

মিশরের নিম্ন মালভূমে নব-মিশরী জাতের বাস। ইহাদের কপাল চওড়া, চ্যাপ্টা; চোখের তারা কালো; নাক সিধা ও সুগঠিত; ঠোঁট পুরু; দেহ লম্বে সাধারণতঃ সাড়ে পাঁচ ফুট। এ জাতির মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত ধনী, তাহাদের মধ্যে কেহ পরে তুর্কি, কেহ মিশরী, কেহ বা য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ। যারা গরীব, তাদের পরিচ্ছদ মামুলি। গরীবের ঘরের মেয়েরা পরে কাপড়—ড্রেশিং গাউনের মত কোমরে বন্ধনী দিয়া। ধনী-ঘরের মেয়েদের পোষাক বিচিত্র। কাঁধ হইতে পা পর্য্যন্ত লম্বা কাপড় ফেরতা দিয়া পরে—কোমরে থাকে বন্ধনী; এ আবরণের নীচে সেমিজ ও ড্রয়ার পরার রেওয়াজ আছে। সেমিজ ও ড্রয়ার হাঁটুর নীচে নামে না। কোনো কোনো পরিবারে তুর্কি-ষ্টাইলের ঢিলা পায়জামার প্রচলন আছে। শীতের দিনে বাড়তি একটা গরম সেমিজ পরে।

বড় ঘরের মেয়েরা—প্রৌঢ়া হইতে বালিকা পর্য্যন্ত—চোখে কাজল দেয়। গায়ে নক্সা কাটার প্রথা একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। মেয়েদের মাথায় চুলের রাশি। সে চুলে নানা ছাঁদে বেণী রচনা করে। সে বেণী কেহ পিঠে ঝুলায়—কেহ-বা মাথায় খোঁপা বাঁধে। গহনার খুব আদর। হার, পিন, বালা, তাগা; গহনা সোনার এবং ওজন বেশ ভারী। মাথার চুলে আঁটে সোনার পিন, চিরুণী; তাছাড়া নানা দেশের মুক্তা-গাঁথা রকমারি মালা খোঁপায় জড়ায়। চুল বাঁধে রেশমী ফিতা দিয়া।

মেয়েরা ঘর-সংসার লইয়া থাকে; বাহিরের পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশার ঝোঁক নাই। মেয়েরা বিবাহের পূর্ব্বে বাপের বাড়ীতে রান্নাবান্না এবং গৃহস্থালী কাজ করে। বহি-র্জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, এমন বাসনা মিশরের নারী-সমাজে এখনো জাগে নাই। তবে পাড়া-বেড়ানোয় বাধা নাই, সকালে বহু গৃহের অন্দরে মেয়ে-মজলিশ বসে। সে মজলিশে চলে গল্প, গুজব, ধূম ও কফিপান, কিম্বা নাচ। বড় ঘরে পেশাদার নাচওয়ালী ডাকাইয়া নাচ দেখার প্রথা মিশরে সুপ্রচলিত। গরীবের ঘরে মেয়েদের স্বাধীনতা বেশী। তারা হাটে-বাজারে বাহির হয়: কাজেই বড় ঘরের মেয়েদের মত পুরুষের ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া চলা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

বড় ঘরের মেয়েরা মাথায় ঘোমটা দেয়। ঘোমটায় মুখ ঢাকিলেও হাটে-বাটে বাহির হইবার নিয়ম নাই। পথে বাহির হইবার সময় বোর্খায় আপাদমস্তক মুড়িয়া বাহির হইতে হয়। কোন্ ঘরের মেয়ে পথে বাহির হইয়াছে, তার বয়স কত, দেখিতে কেমন—বোর্খার আবরণ হেতু তাহা বুঝিবার উপায় থাকে না। গণিকারা পথে বাহির হয়; কিন্তু ঘোমটা খুলিয়া বাহির হইবার রীতি তাদের সমাজেও নাই।

মিশরী মেয়েদের বিবাহ হয় চৌদ্দ বৎসর বয়সে। চৌদ্দ পার হইয়া পনেরোয় পা দিবার জো নাই। চৌদ্দ বৎসরের পর কন্যার বিবাহ দিতে বেশ বেগ পাইতে হয়।

ছেলেদের বিবাহ হয় ষোল-সতেরো বৎসর বয়সে। যদি কেহ বলে, রোজগারের সামর্থ্য ঘটিলে তবে বিবাহ করিব, তাহা হইলে তার নামে পাড়ায় টী-টী পড়িয়া যায়—ছেলেটা বওয়াটে! বেশী বয়সে ভালো ঘরে বিবাহ পুরুষের পক্ষে দায় হইয়া ওঠে। বিবাহ হয় ঘটক-মারফত। নিজেরা পছন্দ করিয়া বিবাহ করিবে, সে ব্যবস্থা মিশরে নাই। মিশরীয় ঘটকের নাম মিশরী ভাষায় 'খ্যৎবে'।

মিশরে নাচের পেশা চলিয়া আসিতেছে বহু প্রাচীন যুগের সেই ফ্যারাওদিগের সময় হইতে। নাচের পেশা একদল নারী বংশ-পরম্পরাক্রমে চালাইয়া আসিতেছে।



কায়রোর পথে মিশর নারী

মিশরের প্রতি নগরে-গ্রামে নর্ত্তকী আছে। তারা বলে, বাদশা হারুণ-উল রশিদের সভায় বারমেক নামে যে প্রসিদ্ধা নর্ত্তকী ছিল, তাহারি বংশে তারা জন্মিয়াছে। এ কথার অবশ্য কোনো ঐতিহাসিক মূল্য নাই।

ভদ্রপল্লীতে নর্ত্তকীদের বাসের অধিকার নাই, তারা বাস করে ভিন্ন পল্লীতে। নাচে ইহারা মধু-পিয়াসীদের মনোরঞ্জন করে; দেহ-দানে তৃপ্ত করে। ভদ্র গৃহে ছোট-বড় সকল অনুষ্ঠানে তাদের ডাক পড়ে। তারা গিয়া নাচ-গান করে। আজ পর্য্যন্ত পারিবারিক উৎসবাদিতে গৃহস্থের সঙ্গে তাদের এ সম্পর্ক বেশ প্রীতি-মধুর এবং অপরিহার্য্য-ভাবে চলিয়া আসিতেছে।

নর্ত্তকী সম্প্রদায়ে অনেকে বেশ ধনশালিনী। তাদের বসনে খুব বৈচিত্র্য ও পারিপাট্য! অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য অপরিসীম। এখন এই নর্ত্তকী সম্প্রদায় সমৃদ্ধ হইয়াছে সুন্দরী বাঁদীদের আবির্ভাবে। দাম দিয়া কিনিয়া তারা এখন বহু সুন্দরী বাঁদী আমদানি করে। তাদের নাচ শিখায়, গান শিখায় এবং তাদের রূপের জোরে এ ব্যবসায়ে আজ শ্রীবৃদ্ধির সীমা নাই।



মুর-নারীর পথ চলা

রাজনীতির দিক দিয়া মরক্কো ও আলজিরিয়ায় পার্থক্য থাকিলেও উভয় প্রদেশের অধিবাসীদের আচারে বা আকারে কোনো পার্থক্য নাই। এ দুই প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে বেশীর ভাগ বার্ব্বার জাতি; অবশিষ্ট অধিবাসীদের মধ্যে ইহুদী আর কাফ্রীর সংখ্যা খুব-বেশী।

বার্ব্বার জাতির নর-নারীর গায়ের বর্ণ গৌর। জাতে তারা ঠিক আরব নয়, তবে ধর্ম্মে মুসলমান; ভাষা আরবী। বার্ব্বার জাতি ও আরব জাতি এক নহে, স্বতন্ত্র জাতি। বার্ব্বার জাতের মেয়েদের পরিচ্ছদ খুব সাদাসিধা; মোটা চাদর কাঁধ হইতে পা পর্য্যন্ত ফেরতা দিয়া জড়ায়; কোমরে থাকে বন্ধনী, তার উপর গায়ে দেয় শাল। এই শাল কোমর পর্য্যন্ত জড়ানো থাকে। আরব রমণীর চেয়ে

বার্ব্বার, নারীর স্বাধীনতা অধিক। বার্ব্বার-রমণীর মুখে ঘোমটার আবরণ নাই; তারা বোর্খায় নিজেদের ঢাকিয়া রাখে না। আরব নারী বোর্খা ব্যতিরেকে ঘরের বাহির হয় না। ছ'জাতের মেয়েই গহনা গায়ে দেয়। গহনা সাধারণতঃ হার, ব্রেসলেট, বালা, ইয়ারিং, নাকছাবি।

আরব রমণীর মধ্যে কাবাইল জাতের মেয়েদের মান-ইজ্জৎ সব-চেয়ে বেশী। তাদের মধ্যে ঘোমটা বা বোর্খার বিধি নাই। পথে বাহির হইতে বা পুরুষের সঙ্গে মেলামেশায় নিষেধ নাই। কাবাইল জাতে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে কোন



মিশরে বেদুইন নারী

বৈষম্য নাই; দুজনের তুল্য-মূল্য। কাবাইল জাতের পুরুষরা বহু বিবাহ করে না;—তা বলিয়া বহু-বিবাহে নিষেধ নাই। নিষেধ না থাকিলেও কাবাইল পুরুষ একটি পত্নী গ্রহণ করিয়াই খুশী থাকে। এক স্ত্রী বিদ্যমানে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিলে সমাজে নিন্দা হয়।

কাবাইল রমণীর পরিচ্ছদ সাদাসিধা। মিহি রঙের বসন আলতোভাবে গায়ে দিয়া অঙ্গ রক্ষা করে; মাথায় থাকে হাল্কা পাগড়ীর ধরণে বস্ত্রাবরণ। তাহাতে মুখের বাহার খোলে।

খৃষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে আরব জাতি মরক্কো এবং আলজিরিয়া জয় করে। বহু আরব সে সময় মরক্কোয় ও আলজিরিয়ায় বাস করিতে আসে। তাদেরি বংশধরগণ এখন এ দুই প্রদেশে প্রধান অধিবাসী।

মরক্কো এখন ফরাসী অধিকারভুক্ত হইলেও তাদের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

আরব রমণীরা বোর্খায় সর্ব্বাঙ্গ আবৃত রাখে। ধন আর সামাজিক ইজ্জৎ হিসাবে এ বোর্খায় বৈচিত্র্য আছে। অর্থাৎ সাধারণ গরীব গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের বোর্খা হয় মোটা কাপড়ের; বড় ঘরের মেয়েদের বোর্খা হয় নানারঙের রেশমী বা মশলিন কাপড়ে। বোর্খার উপর বড় ঘরের



মায়ে-পোয়ে—দক্ষিণ আলজিরিয়া

মেয়েরা রঙীন শাল চাপায়। এ শাল মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত বিলম্বিত থাকে। এ দেশের বহু মুস্লিম রমণী বোর্খায় আত্মগোপন করে, বোর্খার নয়নাংশে ঝালরকাটা বা ফোকর-ওয়ালা থাকে পথ দেখিবার জন্য। নেট লাগানো নয়নাবরণের মধ্যে দিয়া শুধু একজোড়া কালো চোখ দেখা যায়। ঐ কালো আঁখি-তারা না কি বহু পথিককে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তোলে। আরব রমণীদের চোখের তারায় আছে নাকি সম্মোহন বাণ!

মরক্কোর বহু অঞ্চলে বোর্খার এই জালি-কাটা নয়নাবরণের একটা থাকে একদম মুদ্রিত। তার কারণ পুরুষের ভয় আর সংশয়! এক চোখের কালো তারা

দেখিলে পথিকদল মশগুল হইবে না। দুটি আঁখি-তারার বাণে পথিক মজিবে, এক চোখের তারায় সে ভয় নাই —তাই এ ব্যবস্থা। (Where the spirit of jealousy appears more rampant than in others the women are only permitted to leave one eye uncovered).

এই কালো আঁখি-তারার মোহ 'নাশিতে' বহু সন্দিগ্ধ পুরুষ কি করে, শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়! মেয়েদের



আলজিরিয়ার রূপসী

কপালে কালো উলকি কাটিয়া ললাট-শ্রীটুকুকে ভীষণ কদর্য্য করিয়া তোলে; ভ্রূযুগের প্রান্ত হইতে এই উল্‌কির আঁচড় টানিয়া দীর্ঘ করিয়া দেয়—তাহাতে আঁখিতারায় কোনো মাধুরী থাকে না।

বহু আরব পরিবারের মেয়েরা তুর্কি ষ্টাইলের ঢিলা পায়জামা পরে; তাদের গায়ে থাকে পিরহাণ—তার উপর ঝোলে এখানকার শিখ রমণীদের উড়ানির মত শিথিল বসনখণ্ড।

যে সব মেয়েদের গতর খাটাইয়া কাজ করিতে হয়, তারা পরে হাবাইয়া বা শেমিজ, ঢিলা পায়জামা এবং একটা কুর্ত্তা। এ কুর্ত্তার ছাঁট অনেকটা গেঞ্জি বা ওয়েষ্ট কোটের মত। বড় ঘরের মেয়েদের মধ্যে শিল্কের পায়জামা—দামী 'শাস্' এবং লেশ-দেওয়া গেঞ্জি বা ভেষ্ট পরার প্রথা আছে।

আরব রমণীরা হেনা দিয়া নখ রাঙায়; হাতের চেটো মেহেদি-পাতা বা অপর বর্ণে রঞ্জিত করে। কেশ রাঙাইবার প্রথাও সুপ্রচলিত।

অলঙ্কারের উপর প্রীতি প্রগাঢ়। বড় ঘরের মেয়েরা



আলজিরিয়ার বধূ

পরে ইয়ারিং, ব্রেশলেট, সোনার তাগা-বালা, হীরা-চুনি-মণি-সম্বলিত নেকলেশ। গরীবের ঘরের মেয়েরা কাচের চুড়ি ও রূপার গহনা পরে। এমন কি, ভিখারী ঘরের মেয়েরা, অঙ্গে বসন নাই, তবু হাতে তামার তৈয়ারী ভারী চুড়ি-বালা আঁটিয়া থাকে।

গহনার ভারে দেহ ভারী করিয়া বোর্খা-ঢাকা আরব-রমণীরা যখন পথ চলে, তখন গহনার দোলায় বহু বিচিত্র রাগিণীর সৃষ্টি হয়। কোরাণে নাকি নিষেধ আছে, মেয়েদের গহনার ধ্বনি বাড়ীর লোক ছাড়া বাহিরের কেহ শুনিবে না! কিন্তু সে নিষেধ-বাণী মরক্কো ও আলজিরিয়ার আরব রমণীরা কোনোকালে কাণে শুনিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

বহু প্রাচ্য জাতির মেয়েদের তুলনায় এখানকার নারী-সমাজে অনেকখানি স্বাধীনতা আছে। বিবাহের ব্যাপারে পাত্র-নির্ব্বাচনে আরব কুমারীর মতামত তুচ্ছ করিবার নয়। বিবাহের পরেও আরব রমণী স্বামীর সংসারে মাটীর পুতুল বনিয়া বাস করে না।

এদেশের বিবাহ-প্রথায় একটু বৈচিত্র্য আছে।

বড় ঘরের আরবদের মধ্যে ছেলেরা একটু ডাগর হইলে তাদের পাঠানো হয় বেদুইনদের দলে সাহস ও শৌর্য্য-সাধনায়। তাছাড়া ঘরের বাহিরে বেদুইনদের সংসর্গে



কুমারী বালিকা—আলজিরিয়া

তারা কর্ম্মঠ হইবে; নিজেদের সবল করিয়া তুলিবে; ঘরে বসিয়া থাকিয়া ছেলেরা 'নাদুশনুদুশ' নন্দগোপাল বনিবে—ছেলেকে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে পাঠানোর ইহাই হইল উদ্দেশ্য।

কয় বৎসরের পর ছেলেরা গৃহে ফিরিয়া আসে—আত্মনির্ভর হইয়া, শৌর্য্যে-সাহসে দেহ-মন ভরিয়া। তখন বিবাহের ব্যবস্থা হয়। পাড়া ঢুঁড়িয়া ছেলে পাত্রী খোঁজে। পাত্রী বাছা হয় প্রায় বাল্যকালের ক্রীড়া-সহচরীদের দল হইতে। যে পাত্রী ছেলে বাছাই করে, তাকে নিমন্ত্রণ করা হয়। পাত্রী আসে পাত্রের গৃহে ঘোড়ায় বা উটের পিঠে চড়িয়া একজন সঙ্গিনীর সহিত। পাত্রের এই সঙ্গিনীটি 'মিত-কনে'। তাছাড়া পাত্রীর সঙ্গে বহু অনুচর এবং একজন অস্ত্রশস্ত্রধারী রক্ষী আসে। উটের পিঠে বহু যৌতুক আসে। পাত্রীর গৃহ হইতে পাত্রের গৃহ যদি বহু দূরে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে বহু উষ্ট্রপৃষ্ঠে বাদ্যকরের দল বাদ্য-সমারোহ-সহ পাত্রীর সহ-যাত্রী হয়।"

রমণীকে আরব পুরুষ প্রচুর স্বাধীনতা দিয়াছে। সাম্য-মৈত্রী আরব নারী পূর্ণভাবে ভোগ করে। তার উপর রমণীকে আরব পুরুষ এতখানি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের চোখে



রূপসী—মরক্কো

দেখে যে, কোনো রমণীর চরিত্রদোষ ঘটিলে তাহাকে শাস্তি দেয় না—চরিত্রদোষ-হেতু পাছে কুৎসা-কলঙ্ক রটে, সে কুৎসা চাপা দিবার জন্য তাদের সাধনার কোনো সীমা থাকে না। আরব জাতি বলে—মেয়েদের পূর্ণ স্বাধীনতা দাও—তাদের খেয়াল-মত তারা জীবন অতিবাহিত করুক। তারা আমাদের চেয়ে দুর্ব্বল; দুর্ব্বল বলিয়াই প্রলোভনে বড় সহজে ভোলে। রমণী দুর্ব্বল বলিয়া আমরা তাকে সকল সময়ে সকল বিপত্তি-দুর্দ্দৈবে বুক দিয়া রক্ষা করিব।

এখানকার বেদুইন জাতির মধ্যে বিবাহের জন্য নারী-হরণ-প্রথা প্রচলিত আছে। হরণ করিয়া বিবাহ

হইলেও স্ত্রীর মর্য্যাদার যাহাতে কোনো হানি না ঘটে, সে দিকে পুরুষের দৃষ্টি সজাগ থাকে! এ জন্য পারিবারিক জীবনে আরব জাতের অশান্তি বড় নাই।

মরক্কোর অধিবাসীদের মুর নামে অভিহিত করা হয়। মুর-জাতের পুরুষের গায়ের বর্ণ কালো হইলেও মেয়েদের গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল। মুর জাতির রক্তে স্পানীশ রক্তের টাইট আঁটা থাকে। তাহার ফলে পরিপুষ্ট যৌবনের ছাঁদ সুডৌল, নিটোল দেখায়। একটা পা রাখে নগ্ন—আর একটা থাকে আচ্ছাদনে আবৃত। যে পা নগ্ন, সে পায়ে পরে রূপার মল। মেয়েরা মরক্কো-চামড়ার তৈয়ারী লাল শ্লিপার-জুতুয়া পায়ে দেয়।

মুর মেয়েরা গহনার ভক্ত। বড় ঘরের মেয়েরা নীচের হাতে গুগাছা করিয়া ভারী মোটা ব্রেশলেট আঁটিয়া হাত



মুর নর্ত্তকী

সংস্পর্শ আছে। মুর জাতের বহু নারীর গায়ের রঙ সত্যই চাঁপা ফুলের মত—চোখের তারা কালো—ভ্রমর-পাতি ভ্রূ! মনে হয়, কে যেন কালি দিয়া ভ্রূযুগ আঁকিয়া দিয়াছে!

মুর জাতের মেয়ে-পুরুষ সাদা কাপড় পরে। মেয়েরা পরে সাদা মশলিনের সেমিজ,—তার উপর গায়ে দেয় রঙীন জ্যাকেট; জ্যাকেটে সোনালি ও রূপালি জরির বিচিত্র কাজ। কেহ কেহ রঙীন সিল্কের পায়জামা পরে; পায়জামার রঙ সবুজ, নীল, কিম্বা লাল। কোমরে থাকে রেশমের বন্ধনী। জ্যাকেটের প্রান্তভাগ এই বন্ধনীতে বেশ ঢাকিয়া ফেলে; তার উপর গলায় দেয় সোনার হার। যারা গরীব, কিনিবার সামর্থ্য নাই, তারা নানা দেশের সোনা-রূপার মুদ্রা গাথিয়া দীর্ঘ 'চন্দ্রহার' রচিয়া কোমরের নীচে পোষাকে দুলাইয়া দেয়। চলিতে ফিরিতে এ সব গহনায় ঝঙ্কার তুলিতে পারিলে জীবন সার্থক মনে করে।

মুর মেয়েরা আতর ও বিবিধ সুগন্ধি ব্যবহারে পটু। তারা ঠোঁট রাঙায়, গাল রাঙায়, চোখে কাজল-রেখা আঁকে। মুর মেয়েরা দেহকে সুডৌল রাখিতে জানে। স্থূল দেহ মুরের নারী-সমাজে দেখা যায় না। বিবাহের

পূর্ব্বে মোটা হও, ক্ষতি নাই! কিন্তু বিবাহের পর দেহের মেদ-নাশে সাধনা চলে। দেহ যাহাতে স্থূল না হয়, এ জন্য আহার সম্বন্ধে তারা খুব সতর্ক। সুরা-পানের রীতি নর-নারী উভয় সমাজেই আছে; চা চলে সারাক্ষণ।

বিবাহ হইলে পাত্রীকে স্বামীর গৃহে লইয়া যাইতে হয় রাত্রে—এবং সে-রাত্রি হওয়া চাই চাঁদিমা-কিরণ-স্নাত! পাত্রীকে লইয়া যাওয়া হয় কাঠের খাঁচায় বসাইয়া। চাবি হাতে আসিয়া কন্যার অধরে-বক্ষে সে চাবি ছোঁয়ায়—অর্থ, কন্যার মুখ খুলিয়া বরকে ভাষা দিয়া সে অভ্যর্থনা করিবে; এবং গ্রহণ করিবে বক্ষে। সে বক্ষ-কপাট বর ঐ চাবি দিয়া অর্গলমুক্ত করে!

এই অনুষ্ঠানের পর বিবাহ পাকা হয়। বিবাহের পর বর-বধূ একসঙ্গে থাকে দুই দিন। তৃতীয় দিনে কন্যার সেই কাঠের খাঁচাটাকে বাড়ীর ছাদে তুলিয়া দেওয়া হয়। পথে



নব-বধূর খাঁচা, না মহাপায়া!

খাঁচায় চুণকাম করা থাকে। বাদ্য-সমারোহ সহ পাত্রীকে আনা হয়। পাত্রীর সঙ্গে আসে ঘোমটামুখী বহু কুমারী—তারা কন্যার খেলার সঙ্গিনী।

বরের গৃহে পৌঁছিলে কন্যাকে খাঁচা হইতে বাহির করা হয়; বাহির করিয়া তাকে আনা হয় বিবাহ-বাসরে। বাসর-ঘরে কন্যাকে কৌচে বসানো হয়। এ কৌচ বা কন্যার আসন কন্যার সঙ্গিনীরা পত্রপুষ্পে রঙীন রেশমী কাপড়ে সুসজ্জিত করিয়া তোলে। কন্যার হাতে থাকে একটি চাবি। কন্যার এক সঙ্গিনী এই চাবি-কাঠিটি বরের মায়ের হাতে দেয়; বরের মা সেটি দেয় বরের হাতে। বর তখন চলিতে সকলের যাহাতে নজরে পড়ে! এভাবে খাঁচা রাখিবার কারণ—বিবাহের সংবাদ জানানো। ঐ নিশানা দেখিয়া এসো, কে কোথায় আছ উভয়-পক্ষের আত্মীয়-বন্ধু—আসিয়া বর ও বধূকে প্রীতি-উপহারে ভূষিত করো, তৃপ্ত করো।

বহু আত্মীয়-আত্মীয়া বরের গৃহে আসে। আত্মীয়েরা অন্দরে যায় বধূ দেখিতে। তিন-চার দিন ধরিয়া বধূকে আসর সাজাইয়া বসিয়া থাকিতে হয়,—পাঁচজন আত্মীয়-বন্ধু-কুটুম্বিনী আসিয়া তাকে দেখিবে, গৃহের বধূ বলিয়া স্বীকার করিবে! বেচারী কাঠ হইয়া ঠায় বসিয়া থাকে—কে কখন্ আসিবে, ঠিক নাই। আসিয়া বধূর আসন

যেন শূন্য না দেখে। সে আসন শূন্য দেখায় নাকি নানা অমঙ্গল ঘটিতে পারে।

কয়দিন ধরিয়া নাচ গান ভোজের সমারোহ চলিতে থাকে। বিবাহের পরে মুর-রমণী স্বামীর গৃহে হয় বন্দিনী। পর-পুরুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ। স্বামীর সংসারে মুর-নারী বাঁদী বনে। সকল গৃহকর্ম্ম করিতে হয়। তা হোক, স্বামী তবু তাকে মানুষ বলিয়া স্বীকার করে; কাজে কর্ম্মে তার পরামর্শ লয়। এক কথায় মুর-নারী গৃহ-প্রাচীরের বাহিরে না গেলেও গৃহপিঞ্জরে তার কোনো দুঃখ থাকে না। স্বামীর সে গৃহিণী, সচিব, সখী মিথঃ। স্বামী তাকে সুখ-দুঃখের কথা প্রকাশ করিয়া বলে, তার পরামর্শ চায়; দুজনের মনে মনে অন্তরঙ্গতা, বিশ্বাস ও নির্ভরতা বেশ পূর্ণভাবে গড়িয়া ওঠে। স্ত্রী স্বামীর অন্ন রাঁধিয়া দেয়, রোগে সেবা করে, দুঃখে সান্ত্বনা দেয়; আবার স্বামীর তৃপ্তির জন্য বিলাসিনী নায়িকা-বেশে স্বামীর হাতে দেহ-মন দান করে। এ জন্য মুর-জাতির দাম্পত্য জীবনে সাধারণতঃ অপ্রীতি ও কলহের মাত্রা খুব বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

মুর-জাত লেখাপড়ার ধার বড় ধারে না। তা না ধারিলেও সামাজিকতায় মুর-জাতি বহু জাতির শিরোভূষণ-স্বরূপ। একজন সুধী ইংরেজ পর্য্যটক এ জাতির সম্বন্ধে বলিয়াছেন—In social arts they could teach many a Wellesley graduate or Girtonian not a little!

রূপসী

ওগো! ও রূপসী, এ রূপ তুমি
কোথায় পেলে?
শ্যাম রূপ-সাগরের বারতা কে
তোমায় দিলে?
তার বাঁকা দিঠি আঁকা তোমার
চপল চোখে।
তার রং মাধুরী ঝলমলিছে
সলাজ মুখে।
তার অধর-সুধা ঝরে তোমার
অধর বাহি'।
তাই ক্ষণে ক্ষণে, ও সুন্দরি,
তোমায় চাহি।
ওগো! শুধাই আমি—শুধাই তোমায়
পথ দেখিয়ে
সেই সাগর-তীরে যাবে কি গো
আমায় নিয়ে?
আমি সেই রূপ-সাগরে ঝাঁপ দেবো প্রেম-
রতন লাগি'।
ওগো! এই আশাতেই ভর কোরে রাত
দিবস জাগি।

শ্রীযতীশচন্দ্র চৌধুরী।



ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

সপ্ত স্বর

মঙ্গলময়ের গৃহে যাইতে রাধাবিনোদ কোনো আপত্তি তুলিল না। সে কেমন শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বসিয়া চিন্তা করিবে, মনের সে অবস্থা নয়।

আসিয়া দেখে, মঙ্গলময় বিছানায় শুইয়া আছেন। উঠিবার সামর্থ্য নাই। দেহ যেন পাত হইয়া গিয়াছে।

গুরুপদর সঙ্গে দেখা। তিনি আছেন, তাঁর স্ত্রী আছেন; দেখাশুনা করিতেছেন। একটু আগে কবিরাজ আসিয়াছিলেন। আশা তিনি দেন না, তবে যে কয়টা দিন পড়িয়া থাকেন।

গুরুপদ কহিলেন,—তোমার কর্ত্তব্য করো, রাধু। তুমিই ওঁর একমাত্র আত্মীয়। পয়সা-কড়ির সম্বন্ধে মনের কোণে যে-ধারণাই তোমার থাকুক, সেজন্য আত্মীয়তা অস্বীকার করা চলে না। তুমি ছাড়া ওঁকে দেখবেই বা কে? আমরা বাইরের লোক। আমাদের নিজেদের ঘর-সংসার আছে, কাজকর্ম্ম আছে।

রাধাবিনোদ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; কোনো জবাব দিল না।

কণিকা মঙ্গলময়ের কাছে বসিয়াছিল, লীনাকে বসিতে বলিল।

মঙ্গলময়ের পায়ের কাছে বসিয়া লীনা তাঁর পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

মঙ্গলময় কহিলেন,—পায়ের কাছে কেন, মা? এসো আমার পাশে—আমি তোমায় দেখি।

সে স্বরে কি স্নেহ! লীনা উঠিয়া তাঁর পাশে আসিয়া বসিল। লীনার হাতখানি নিজের শীর্ণ হাতে তুলিয়া তা[র] আঙুলগুলি নাড়িতে নাড়িতে মঙ্গলময় বলিলেন,—কণি[কার] কাছে তোমার কথা শুনেচি। তুমি বড় লক্ষ্মী।

লীনা যেন চমকিয়া উঠিল। সে কণিকার পানে চাহিল। কণিকার মলিন মুখে কেমন যেন দীপ্তি! লীনা ভাবিল, এত দুঃখেও কণিকা কি করিয়া এমন হাসি-মুখে থাকে!

সে কহিল,—কণি নিজে লক্ষ্মী বলে আর সকলকে লক্ষ্মী দেখে।

কণিকা কহিল,—প্রতাপবাবু কেমন আছেন?

লীনা কহিল,—ভালো।

কথাটা বলিতে প্রাণে একটু চমক লাগিল। সত্যই ভালো আছেন?

মঙ্গলময় ডাকিলেন,—রাধু...

রাধাবিনোদ তাঁর পানে চাহিল। কণিকা কহিল,—এখানে এসো। বাবা দেখতে পাচ্ছেন না।

সহজ স্বরে এ-কথা বলিয়া কণিকা উঠিয়া দাঁড়াইল। সে স্বরে কি ছিল, রাধাবিনোদ আসিয়া মঙ্গলময়ের পাশে বসিল। মৃদু হাসিয়া মঙ্গলময় বলিলেন,—আমার উপর রাগ আছে এখনো? রাগ রেখো না। পৃথিবীতে তোমার চেয়ে প্রিয় আজ আমার কেউ নয়—কণিকাও নয়। আমাকে ভুল বুঝো না।

রাধাবিনোদ কোনো কথা বলিল না; অবিচল দৃষ্টিতে মঙ্গলময়ের পানে চাহিয়া রহিল। মঙ্গলময় কহিলেন,—বিষয়-আশয়ের কোনো গোলমাল আমার পক্ষে সহ্য করা

এখন সম্ভব নয়। গুরুপদ আছে, তুমি আছো, দুজনে পরামর্শ করে যা হয় দেখাশুনা করো। আমার ছুটী হয়ে গেছে। যে ক'টা দিন আছি, তোমাদের পানে চেয়েই পড়ে থাকবো। আমাকে বোঝবার চেষ্টা করো।

গুরুপদ নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন কহিলেন,—এখনকার মত তত্ত্বালোচনা মুলতুবি রাখুন, মঙ্গলময়বাবু! ওরা দেখতে এসেছে। অন্য পাঁচটা কথা কন্। ও-কথার সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে না।

মঙ্গলময় কহিলেন,—তুমি আমাকে দেখতে এসেচো, এতে আমি কি খুশী হয়েচি, বলে বোঝাতে পারবো না, বাবা। মা লীনা, এখনি যেন কর্ত্তব্য সেরে চলে যেয়ো না, রাত্রে ফিরবে—কেমন ?

লীনা মাথা নাড়িয়া জানাইল—হুঁ।

মঙ্গলময় কহিলেন—প্রতাপ কেমন আছে ?

কোনমতে নিশ্বাস চাপিয়া লীনা কহিল,—এখন ভালো আছেন। তিনি সীলেট চলে গেছেন।

মঙ্গলময় কহিলেন,—ভালো করে সারবার আগে যেতে দিলে কেন, মা ?

এ কি পরীক্ষা! লীনা কহিল,—তিনি কোনো কথা শুনলেন না।

মঙ্গলময় কহিলেন,—তোমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন না ?

কোনমতে লীনা জবাব দিল—না।

মঙ্গলময় ক্ষণেক নীরব থাকিয়া কহিলেন—এ কালের ছেলেদের ঐ বড় দোষ। সব ভয়ঙ্কর জেদী। পরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের এমন ব্যবস্থা করে তাতে ঠিক উল্টো উৎপত্তি হয়। মনে কি নিয়েই যে ছুটে বেড়ায়।

কথাটা বলিয়া তিনি চাহিলেন রাধাবিনোদের দিকে—রাধাবিনোদ চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

সন্ধ্যার দিকে জলযোগের ব্যবস্থা। কণিকা আয়োজন করিতেছিল; নীপুও সেখানে গিয়া জুটিয়াছে। লীনা আসিয়া হাসিয়া বলিল,—একা রামে রক্ষা নেই, সুগ্রীব তাঁর দেশের জুটেচেন !

নীপু কহিল,—বৌঠাকরুণকে জিজ্ঞাসা করো, আমি লুচি কি রকম বেলতে পারি। তার উপর বেগুণ ভাজতে পারি, দুধ জ্বাল দিতে পারি···বুঝলে লীনাদি !

হাসিয়া লীনা কহিল—কি করবে বলো! না শিখে উপায় নেই। লুচি বেলবার লোক তো আনবে না।

নীপু কহিল—লোক আনলে আরাম থাকবে ? লুচি বেলা কি—আমায় শুদ্ধ বেলে ভেজে ছেড়ে দেবে! দেখচি তো ··

লীনার মুখ এ-কথায় গম্ভীর হইয়া উঠিল।

নীপু জবাব না পাইয়া লীনার পানে চাহিল, চাহিবা-মাত্র সে-গাম্ভীর্য্য লক্ষ্য করিল।

কিন্তু চুপচাপ থাকা তার স্বভাব নয়। তাছাড়া যে কথা বলিয়া ফেলিয়াছে···

তাই সে তাড়াতাড়ি কণিকাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—তুমি তো আজ রাত্রে তোমার নিজের বাড়ীতে ফিরচো, বৌঠাকরুণ ?

কণিকা লুচি ভাজিতেছিল, কহিল—তোমার দাদার যা মত হবে...

নীপু কহিল,—রাধদা তোমায় নিতে এসেচে—না লীনাদি ?

লীনা কহিল—এমনি কথা আছে।

নীপু কহিল—বলো, আমি এখানে থাকতে পারি। তোমরা যাও। তোমার বাবা যখন চান, তাঁর গোঁসাই-বাবাজী সে বাড়ীতে অনাথ হয়ে পড়ে আছেন—তাঁকে দেখবার লোক নেই, তোমাকে সেখানে যেতে হবে···

কণিকা এ কথার জবাব দিল না,—আপন-মনে লুচি ভাজিতে লাগিল।

আহারাদি চুকিতে রাত্রি আটটা বাজিল। রাধাবিনোদ আসিয়া মঙ্গলময়কে বলিল—আমরা তাহলে আসি।

মঙ্গলময় কহিলেন—কণিকে নিয়ে যাচ্ছ তো ?

রাধাবিনোদ কহিল—উনি যাবেন ?

মঙ্গলময় কহিলেন—শুনছিলুম, সেই রকমই নাকি বন্দোবস্ত আছে।

রাধাবিনোদ কহিল—আমি তো জানি না।

নীপু আসিয়া কহিল,—রাধদাকে বৌঠাকরুণ একবার ডাকচেন ও-দিকে।

কণিকা ডাকিতেছে···তাকে! রাধাবিনোদ একটু বিস্ময় বোধ করিল।

নীপু কহিল—যাও, রাধদা।

আহারাদি সারিয়া লীনা আসিয়া মঙ্গলময়ের পাশে বসিয়াছিল—তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতেছিল।

রাধাবিনোদ গেল পাশের ঘরে। কণিকা সেখানে আছে।

রাধাবিনোদ কহিল—আমায় ডেকেচো?

কণিকা কহিল,—হ্যাঁ। আমাকে নিয়ে যাবে তো?

রাধাবিনোদ কহিল—তা তো আমি জানি না।

কণিকা কহিল—তুমি জানবে না তো কে জানবে! তুমি স্বামী…তোমার বাড়ী…

রাধাবিনোদ দেখিল, সে কণিকা নয়!

কণিকা কহিল—তুমি যা বলবে, তাই হবে।

রাধাবিনোদ কহিল—কিন্তু বলা কঠিন। ওঁর যে-রকম অবস্থা দেখচি…তাতে ওঁকে একা ফেলে যাওয়া চলে না।

কণিকা কহিল—বাবাকে চৌকি দেবার দরকার খুব আছে, তা নয়। এসে রোজ দেখে যাবো। এখানে লোক-জন আছে যত্ন করবার। তাছাড়া বাবার ইচ্ছা নয়, ওঁর অসুখের জন্য সব সংসার ছেড়ে আমি এখানে পড়ে থাকি!

রাধাবিনোদ কহিল—তাহলে চলো।

কণিকা মাথা নত করিয়া কি ভাবিতেছিল। রাধাবিনোদ তার পানে চাহিয়াছিল। তার মনে হইল, কণিকা কি এমনি পাথরের পুতুল হইয়া থাকিবে? কোনদিন জোর করিয়া নিজের অধিকার আদায় করিতে রুখিয়া দাঁড়াইবে না? তার এই কুণ্ঠিত ভাবেই রাধাবিনোদের মন ছম্‌ছম্ করিয়া ওঠে! এ কুণ্ঠা অবজ্ঞার জন্য? না, অনুকম্পা দেখানো? নীচু হইয়া নিজের শক্তির দর্প বুঝানো?

কণিকা কহিল—তাহলে আমাকে নিয়ে যাচ্ছ?

রাধাবিনোদ কহিল—তোমার বাবা যখন বলেচেন…

কণিকা কি ভাবিল, তারপর কহিল,—বাবার কথা শুনেচি। কিন্তু আমার নিজেরো একটা কথা আছে…

রাধাবিনোদ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার পানে চাহিয়া রহিল। কণিকা কহিল—আমি তোমার স্ত্রী—সে হিসাবে তোমার কাছে আমার একটা মান-ইজ্জত তো আছে! মনে স্বীকার না করো, মানে, লৌকিক দিক দিয়ে অন্ততঃ?

রাধাবিনোদ চুপ করিয়া রহিল। এ প্রশ্নের কি উত্তর দিবে?

কণিকা কহিল—আমার বিশ্রী লাগে। নামে গৃহিণী হলেও—যার গৃহ, তার এমন আড়-ছাড় ভাব—এতে মাথা তুলে বাস করা চলে না। ও বাড়ীতে যেতে পা আমার কাঁপচে: একবার এদের সামনে যদি বলতে, তোমাকে নিতে এসেচি—তুমি চলো। তাতে আমার মন এমন কিছু অবলম্বন পাবে না মানি, তবু যে-জায়গায় বাস করবো, সেখানে বাস করা আমার পক্ষে সহজ হবে—আর পাঁচটা দিক থেকে…

সে চুপ করিল, তারপর কহিল—আগে এ সব কথা মনে উঠতো না। কিন্তু কদিন বাইরে থেকে এই কথাটাই মনে জাগচে। যেন আমার বাড়ী নেই, ঘর নেই—কেউ নেই!…পাঁচ জনের সঙ্গে সেখানে আলাপ হলো। স্বামি-স্ত্রী কেমন বাস করচে…পরস্পরের সকল কাজে পরামর্শ…

বলিতে বলিতে কণিকার স্বর আর্দ্র হইয়া আসিল। স্বরের সে আর্দ্রতা রাধাবিনোদের মনকে স্পর্শ করিল…

উদ্গত নিশ্বাস চাপিয়া রাধাবিনোদ কহিল—বেশ!

দুজনে একসঙ্গে আসিল মঙ্গলময়ের কাছে। কণিকা কহিল—আমি তাহলে আসি, বাবা।

মঙ্গলময় কহিলেন—এসো মা…

কণিকা কহিল—এখানকার ব্যবস্থা যা করে গেনুম, তুমি যেন তার উলটো-পাল্টা করো না…

মৃদু-হাস্যে মঙ্গলময় কহিলেন,—না মা, না। কোন নড়চড় হবে না। তোমার টানা গণ্ডী মেনেই বাকী দিনগুলো কোনো মতে কাটিয়ে দেবো।

নীপু কহিল—আমি থাকি…

মঙ্গলময় কহিলেন,—না, না—এখন নয়। আমি শক্ত নয়। কাছেই তো।

কণিকা কহিল—রোজ আমি একবার করে আসবো—এসে দেখে যাবো।

মঙ্গলময় কহিলেন,—নিশ্চয় আসবে।

কয়জনে গৃহে ফিরিল। কণিকা বলিল,—একবার সকলের সঙ্গে দেখা করে আসি। লীনা গিয়া ঢুকিল তার নিজের ঘরে।

বিন্দু আসিল, আসিয়া বলিল—সেই দাদাবাবু এসেছিল গো দিদিমণি—সন্ধ্যার আগে। আন-মনে বসে ছিল,

শেষে চলে গেল। এই চিঠিটুকু লিখে রেখে গেছে। দিতে বলেছে।

আঁচলের খুঁট খুলিয়া ছোট এক-টুকরা কাগজ বিন্দু দিল লীনার হাতে। ভাঁজ খুলিয়া লীনা কাগজে লেখা চিঠি পড়িল। অজিতের চিঠি। অজিত লিখিয়াছে—

আসিয়া অনেকক্ষণ বসিয়াছিলাম। এম্পায়ারে একখানা ভালো ছবি দেখানো হইতেছে। Love Eternal. আপনি বায়োস্কোপ দেখিতে চাহিয়াছিলেন। আপনাকে ও আমার স্ত্রীকে লইয়া যাইব ভাবিয়াছিলাম। আজ আর উপায় নাই। কাল আমি সকালে আসিব। যদি না যান, খবর দিবেন। নহিলে সন্ধ্যার শো-য়ের জন্য তিনটা শীট রিজার্ভ করিয়া রাখিব।

অজিত

চিঠি পড়িয়া লীনা বিছানায় বসিল। মন কেমন উদাস হইয়া গেল। রাধাবিনোদের কথা মনে পড়িল—বন্ধুর স্থান বাহিরের ঘরে।

মন তাতিয়া উঠিল। রাধদা কি মনে করিয়াছে…সে, তার কোনো দাম নাই? যাকে দেখিবে…

শীকারী যে, সে-ও ছাগল-গরু দেখিলে তীর ছোড়ে না; সে মারে বাঘ, সিংহ…নয়তো মন-ভুলানো মৃগকে! যাইবে বায়োস্কোপে?

কেন যাইবে না? রাধদার ও-কথাগুলাকে তুচ্ছ করিবার জন্যও যাওয়া উচিত। হাঁ, যাইবে!

একটু আগে মনে অন্য কথা জাগিতেছিল। সীলেটের কথা…প্রতাপের কথা…

কিন্তু—সীলেটে যাইবার পূর্ব্বে…

রাধদাকে অন্ততঃ সে কথার জন্য একটা আঘাত… জানাইয়া দিবে, লীনার দাম কত বেশী! তার মনের পরিচয় পাওয়া সহজ নয়!

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

নীল আকাশ

পরের দিন।

কণিকা মঙ্গলময়ের গৃহে গিয়াছে। নীপু সঙ্গে গিয়াছে। রাধাবিনোদ গৃহে নাই।

বেলা সাড়ে পাঁচটা। অজিত আসিয়া দেখা দিল। লীনা সাজিয়া বসিয়া আছে। অজিত আসিলে তার সঙ্গে সে চলিল বায়োস্কোপ দেখিতে।

অজিতের স্ত্রী আসে নাই। লীনা কহিল,—স্ত্রীকে বাড়ী থেকে তুলে নেবেন?

অজিত কহিল,—না, হঠাৎ তার খুব জ্বর আজ দুপুর থেকে। একখানা টিকিট নষ্ট হলো। উপায় কি? আপনাকে কথা দিয়ে গেছি…

লীনা কোনো জবাব দিল না। গাড়ী চলিয়াছে।

সহসা লীনা কহিল,—আপনার বাড়ী হয়ে চলুন। আপনার স্ত্রীকে দেখে যাই।

অজিতের বুকখানা ধ্বক করিয়া উঠিল। সে কহিল,— দেরী হয়ে যাবে না? তার চেয়ে ফেরবার পথে…

লীনা কহিল,—না, না, এমন কিছু দেরী হবে না। যদি হয়, প্রথমে দেখায় টপিকাল্ গেজেট—না হয় সেটুকু দেখা হবে না।

নিশ্বাস রোধ করিয়া অজিত কহিল,—বেশ…

ড্রাইভারকে তাই বলিয়া দিল। গাড়ী চলিল অজিতের বাড়ীর দিকে।

গাড়ী কিছু দূর আসিয়াছে, অজিত বলিল,—আমি বলি, আগে বায়োস্কোপেই যাওয়া যাক…

—কেন?

ছোট কথা। সে কথায় বেশ একটু ঝাঁজ! অজিত ভড়কাইয়া গেল।

লীনা কহিল—আপনার স্ত্রীর সত্যি অসুখ? না…

এ প্রশ্নে অনেকখানি শ্লেষ। অজিত বুঝিল, জবাব দিল না।

লীনা কহিল—আমি বায়োস্কোপই দেখতে চেয়েছিলুম— প্রেমাভিনয় চাইনি, অজিতবাবু!…যাবোই আপনার বাড়ী। আমায় আপনি রুখতে পারবেন না। আপনি…? এই অবধি বলিয়া লীনা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অজিতের পানে চাহিল। সে চাহনির স্পর্শে অজিত যেন পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। লীনা কহিল—ছিঃ!

অজিত মরমে মরিয়া গেল। সে রাত্রের সেই বিহ্বলা নায়িকা…এমন রুদ্রাণী! প্রহেলিকা! সে কোনো কথা বলিতে পারিল না। নামিতে পারিলে সেও যেন বাঁচিয়া যায়! মনে হইল, চলন্ত গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়ে!

পারিল না। গাড়ী ছুটিয়া চলিল বাড়ীর দিকে।

অজিত পাথর হইয়া বসিয়া রহিল। তার যেন চেতনা নাই!

গাড়ী আসিয়া গৃহের দ্বারে দাঁড়াইল। লীনা কহিল,—চলুন আপনার স্ত্রীর কাছে নিয়ে।

আদেশ: অজিতকে সে আদেশ পালন করিতে হইল নিঃশব্দে।

অজিতের স্ত্রী চুল বাঁধিতেছে। সামনে আর্শি। লীনা আসিয়া কহিল,—আপনার সঙ্গে ভাব করতে এলুম। আমার নাম লীনা। আমি রাধাবিনোদ বাবুর বোন। ক'দিন ধরে অজিত বাবুকে বলচি,—নিয়ে চলুন। রোজ বলেন, নিয়ে যাবো! আজ যেমন যাওয়া, ওঁকে আর আড্ডায় বসতে দিই নি—একেবারে ধরে নিয়ে এসেছি!

অজিতের স্ত্রীর বিস্ময়ের সীমা নাই। গায়ে পড়িয়া আলাপ করিতে আসে, এমন মেয়ে সে তার বয়সে দেখে নাই।

লীনা অজিতের পানে চাহিল, কহিল,—আপনি যে ষ্টাচুর মত দাঁড়িয়ে রইলেন! ইন্টে্রাডিউস্ করিয়ে দিলেন না! বাঃ, খাশা স্নোক আপনি!

অজিতের স্ত্রীর নাম প্রভা। প্রভা কহিল,—আমি চট্ করে গা ধুয়ে আসি, ভাই। তুমি বসো।

প্রভা চলিয়া গেল। অজিত তখনো কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। লীনা কহিল—বেশ লোক আপনার স্ত্রী! খাশা! দেখতেও পরী!

তার পর বিছানার দিকে চাহিল, কহিল,—ছেলের বিছানা দেখচি। ছেলে? না, মেয়ে?

যন্ত্রচালিতের মত অজিত কহিল,—ছেলে।

লীনা কহিল,—একটি। ছেলে কোথায়?

অজিত কহিল,—জানি না।

লীনা কহিল,—আপনার তিনটে টিকিটই আজ নষ্ট হলো। আমি বায়োস্কোপে যাবো না! স্ত্রীর অসুখের ছুতো তুললেন হঠাৎ—কি ভেবেছিলেন, অজিত বাবু? মেয়ে-জাত্‌টাকে এমন অসার মনে করেন! কারো সঙ্গে সহজভাবে মিশলেই···তার দুই চোখের দৃষ্টিতে ব্যঙ্গের হাসি ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল।

অজিত যেন পুতুল! মুখে কথা নাই। মনটাকে ছিঁড়িয়া লীনা যেন তার কোনোখানটুকু আর দেখিতে বাকী রাখে নাই!

সত্যই তো, সে কি ভাবিয়াছিল? এমন পাগল! প্রভা আসিল···

এবং কথায়-বার্ত্তায় আলাপ জমাইয়া রাত্রি প্রায় নটায় লীনা কহিল,—চলো ভাই আমার সঙ্গে। আমায় পৌছে দিয়ে আসবে।

প্রভা আসিয়া তাকে রাধাবিনোদের গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া গেল।

কণিকা নীপু তখন বাড়ী ফিরিয়াছে। রাধাবিনোদও গৃহে আছে। লীনা আসিয়া বলিল—কেমন ট্রিপ দিয়ে এলুম অজিতবাবুর বাড়ী···

রাধাবিনোদ তার পানে ফিরিয়া চাহিল। লীনা সে দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া কহিল—ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হলো। চমৎকার মেয়ে। তোমার সঙ্গে আলাপ করতে আসবে এক দিন। সঙ্গে এসেছিল—পৌছে দিয়ে গেল। তুমি ফিরেচো, কি, না ফিরেচো, জানি না বলে নামলুম না! সত্যি রাধুদা, অজিতবাবু তোমার অমন বন্ধু, ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে তোমার স্ত্রীর আলাপ করিয়ে দেওয়া উচিত। এতে পরস্পরের পরিচয় কতখানি পাকা হয় বলো তো···

লীনা যেন সহজ হাসির বন্যা বহাইয়া দিল!···তারপর কহিল—বাবা কেমন আছেন, বৌ?

কণিকা কহিল—তেমনি। ভালো হবার আশা তো কেউ দেয় না। ভয় হয়, এ বয়সে আর কি সারবেন! তবু যদ্দিন এমনি থাকেন, আমাদের ভালো।

নীপু কহিল—নিশ্চয়। বলো কি, পাহাড়ের আড়াল তুলে রেখেচেন! ও পাহাড় সরলে ওদিকে চোখে দেখবে শুধু ধূ-ধূ মরুভূমি! ছায়া নেই, আশ্রয় নেই···খাঁ খাঁ করচে!

সে-দৃশ্য মনে কল্পনা করিয়া কণিকা শিহরিয়া উঠিল।

লীনা কহিল—কাল তোমার সঙ্গে যাবো। তাছাড়া আমি ভাবচি, আমাকেও যেতে হবে···

নীপু কহিল—কোথায়?

লীনা কহিল—সীলেটে।

নীপু কহিল—আমি আপনাকে পৌছে দিয়ে আসবো। কি বলো, লীনাদি? তোমায় সেখানে পৌছে প্রতাপবাবুর সঙ্গে দেখা করে আমিও ছুটীতে কুলষ্টপ্ দিয়ে বোম্বাই যাত্রা করবো।

কণিকা কহিল—শরীর না সারিয়ে ?

নীপু কহিল—কাজেই শরীর সারে, বৌঠাকরুণ। বিশ্রামে বহু বিঘ্ন—এ একেবারে প্রত্যক্ষ সত্য! গাড়ীতে জুতলেই ঘোড়ার জাত থাকে ভালো—আস্তাবলে বসিয়ে দানা-পানি জোগালে ঘোড়া বেতো হয়ে যায়!

হাসিয়া কণিকা কহিল—তুলনা দিয়েচো ভালো! ঘোড়া আর তোমরা!

নীপু কহিল—নয়? এ তুলনায় আমার মৌলিকত্ব নেই বিন্দুমাত্র। পুরুষ-জাতের সঙ্গে ঘোড়ার তুলনা চলে আসচে ঘোড়ার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে। মেয়েরা এই পুরুষ-ঘোড়ার মুখে লাগাম লাগিয়ে ঠিক পথে যদি চালাতে পারেন, তবে তাঁরাও সংসার-পথে টগাবগ্ গতিতে এগুতে পান আর ঘোড়া-পুরুষজাতও তাহলে ঢিট থাকে।

লীনা কহিল,—যা বলেচো!

দুদিন পরের কথা।

রাধাবিনোদ স্নান করিয়া মাথায় ব্রশ চালাইতেছে, কণিকা আসিয়া বলিল—একটা কথা আছে।

রাধাবিনোদ ফিরিল। স্নানান্তে কণিকার মাথার কেশ দীর্ঘ এলায়িত—পরণে গরদের শাড়ী। ঠাকুর-ঘরে কি কাজ করিতেছিল, সে কাজ শেষ করিয়া উপরে আসিয়াছে। মুখে চমৎকার শ্রী!

রাধাবিনোদ কহিল,—কি কথা?

কণিকা কহিল—প্রতাপবাবু যে চলে গেলেন, শুনচি—সে কথা সত্যি? যদি তাই হয়, গিয়ে অবধি একখানা চিঠি লিখলেন না—কেমন আছেন! আমাদের একটা খপর নেওয়া উচিত তো!

রাধাবিনোদ কহিল—উচিত। খুব উচিত।

কণিকা কহিল—একখানা pre-paid টেলিগ্রাম তোমার নিজের নামে পাঠাও আজই।

রাধাবিনোদ কহিল—লীনা বললে?

কণিকা কহিল,—না।

রাধাবিনোদ ক্ষণেক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, পরে কহিল,—বুঝেচি। আমি এখনি টেলিগ্রাম করচি! তুমি একবার সাধুকে ডাকিয়ে দাও।—

কণিকা তখনি গেল সাধুর সন্ধানে। একটু পরে ফিরিয়া আসিল; রাধাবিনোদ তখন কৌচে বসিয়া আছে। সাধু আসিল।

রাধাবিনোদ কহিল—পোষ্ট আফিস থেকে টেলিগ্রামের কাগজ নিয়ে আয় দিকিনি—দৌড়ে যাবি, দৌড়ে আসবি… বুঝলি?

সাধু ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। কণিকা চলিয়া যাইতেছিল, রাধাবিনোদ কহিল—বসো…

কণিকা বিস্ময় বোধ করিল। রাধাবিনোদের স্বর বেশ সহজ। কণিকা কহিল—খাবে না?

রাধাবিনোদ কহিল—খেতে যদি হয়, এইখানে আমার ঠাঁই করতে বলো।

বিস্ময় বাড়িল। সে রাধাবিনোদের পানে চাহিল। হাসিয়া রাধাবিনোদ কহিল—আশ্চর্য্য হচ্ছো?

কণিকার সারা মনের উপর দিয়া একরাশ দক্ষিণ-বাতাস বহিয়া গেল। সে কোনো জবাব দিল না।

রাধাবিনোদ কহিল,—কথা আছে। খেতে খেতে সে কথা বলবো। কথাটা আর পাঁচ জনের শোনবার মত নয়!

কণিকা কহিল—ঠাঁই করে ঠাকুরকে ভাত আনতে বলি।

রাধাবিনোদ কহিল,—তোমার যাবার দরকার কি? তোমার দাসীরা কোথায়?

—আমি বলে আসি।

—শীগ গির এসো। আমি খুশী হবো। …

রাধাবিনোদ খাইতে বসিল। সামনে কণিকা বসিয়া ভাবিতেছিল হঠাৎ এমন হইল কি করিয়া! ঠাকুর-ঘরে প্রণাম করিতে করিতে আজ সে বলিয়াছিল, মনের উপর ভারী পাথর বসিয়া আছে, সে পাথর হে ঠাকুর…

খুব গভীর অর্থ ভাবিয়া এ প্রার্থনা জানায় নাই। ও দিকে বাবার অসুখ—এ দিকে প্রতাপবাবু চলিয়া গিয়াছেন, কোনো সংবাদ পর্য্যন্ত দেন নাই—লীনাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে সে কোন জবাব দিল না। তারপর আকাশে মেঘ করিয়া আছে—মন যেন কেমন হাঁফাইয়া উঠিতেছে; তাই…

কিন্তু সেই প্রার্থনায় বলেই? বড় ভালো লাগিতেছে। স্বামী বসিয়া খাইতেছে। স্ত্রী সামনে বসিয়া…

রাধাবিনোদ কহিল—খেয়ে আজ তৃপ্তি পাচ্ছি।

কণিকা কহিল—যত্ন করে রেঁধেছে বুঝি? না, খিদে পেয়েছে?

রাধাবিনোদ কহিল,—এ দুটি কারণ ছাড়া আর কোনো কারণ থাকতে পারে না? পাশ করেও তোমার মন দেখছি সনাতন রয়ে গেছে।

কণিকা কহিল—তার মানে?

রাধাবিনোদ কহিল—এর মানে বুঝি না। মনস্তত্ত্বের আলোচনা জীবনে কখনো করিনি। তবে খেয়ে তৃপ্তি পাচ্ছি—তার অন্য কারণ আছে। মনে হচ্ছে, আমার খাওয়ার কোনো অসুবিধা না ঘটে, তা চৌকি দেবার জন্য একজন মানুষ আছে এবং সে মানুষটি আমার স্ত্রী!

বুকের কুঞ্জ সত্যই বাতাসে দুলিল। সে বাতাসের স্পর্শে পল্লবের নীচে হইতে কত ম্লান পুষ্প যে ফুটিয়া মাথা তুলিল! আনন্দ…লজ্জা…

কণিকার মাথা ঢুলিয়া উঠিল।

রাধাবিনোদ কহিল—দূরে দূরে কেন আমায় এতদিন রেখেছিলে, বলতে পারো? বলবে, আমি আমল দিইনি—তাই। কেন তুমি আমার ঝুঁটি ধরে টেনে আমায় বলোনি, কিসের দর্পে তুমি এমন সরে থাকো? দুশ্চরিত্র, উড়নচণ্ডী, আকখুটে…বিষয় উড়িয়ে এত অহঙ্কার কিসের?

কণিকা কোনমতে কহিল—বিষম লাগবে। খেতে খেতে হঠাৎ যদি এমন কবিত্বের উচ্ছ্বাস সুরু করো, আমি তাহলে উঠে যাবো।

রাধাবিনোদ কহিল,—উঠে গেলে আমিও মুখের অন্ন ফেলে তোমার পিছু পিছু ছুটবো…

কণিকা কহিল,—এই কথা বলবে, সকাল থেকে বুঝি মনে মনে এঁচে রেখেচো?

—কেন?

—সকালে আজ খাতাপত্র দেখেচো—আগাগোড়া আদায় পত্রের হিসেব মিলিয়েচো…

—তুমি কি করে জানলে?

—আমি খপর রাখি।

—সত্যি? রাধাবিনোদ সবিস্ময়ে তার পানে চাহিল, পরে কহিল—আমার মনে হতো…আরো কি মনে হতো, পরে বলবো,—তার আগে যে কথা ছিল, বলি। তুমি এখানে ছিলে না—কতদিন মনে হয়েচে, থাকলে ভালো হতো।

আনন্দের উত্তেজনায় কণিকার নিশ্বাস বুঝি বন্ধ হইবে। সে কহিল,—কেন?

কথাটা ভালো লাগিল। মনে মনে কতদিন সে চাহিয়াছে…

রাধাবিনোদ কহিল,—লীনা বড় ভাবনায় ফেলেছিল…এই অবধি বলিয়া চুপ করিল; কথাটা শেষ করিতে পারিল না।

কণিকা কহিল, প্রতাপ বাবু যখন চলে যান, তখন কতবার মনে হয়েচে, তোমায় বলি, তুমি ওঁকে ধরে রাখো…

রাধাবিনোদ কহিল—তুমি তো রাখতে পারতে। রাখোনি বলে তোমার উপর আমার অভিমান হয়েছিল।

কণিকা কহিল—আমি কি করে ধরে রাখবো! উনি যে আমায় হাতে ধরে মানা করেছিলেন, সে অনুরোধ যেন না করি।

সাধু টেলিগ্রামের ফরম আনিল। রাধাবিনোদ কহিল,—তুমি লিখে দেবে? দাও…মিছে দেরী কেন?

কণিকা কহিল—তোমার নামেই লিখবো কিন্তু।

—বেশ।

টেলিগ্রাম লিখিয়া সাধুর হাতে পাঠানো হইল। লীনা আসিয়া বলিল—বৌ…আমি আজ সীলেট যাবো।

রাধাবিনোদ ও কণিকা—দুজনেই চমকিয়া উঠিল।

লীনা কহিল—আমার ভালো লাগচে না।

রাধাবিনোদ কহিল—অনেকদিন আগে তোমার যাওয়া উচিত ছিল, ভাই।

লীনা কহিল,—আমায় বলোনি কেন? বুদ্ধির ভুলে যদি কিছু অন্যায় আমি করে থাকি, বলবে না? বকবে না আমায়?

রাধাবিনোদ চমকিয়া উঠিল। এ সেই লীনা?

লীনা কহিল—নীপু রাজী হয়েচে আমায় নিয়ে যেতে, তাই আমি বলতে এসেছিলুম। যাবার আগে বাবাকে প্রণাম করে আসবো।

রাধাবিনোদের আহার চুকিলে কণিকা ডাকিল—বিন্দু!

রাধাবিনোদ কহিল—বিন্দুকে নয়—ডাকো ঠাকুরকে। তোমার আর লীনার ভাত এখানে দিয়ে যাবে। নীপু কোথায়?

কণিকা কহিল—বাবার কাছে গেছে বাবা তাকে কোথায় পাঠাবেন—তাই!

ঠাকুর আসিল দু'থালায় অন্ন বাড়িয়া। থালা নামাইয়া রাখিয়া সে চলিয়া গেল।

লীনা কহিল—আমি আসচি ভাই। ট্রাঙ্কটা খোলা রয়েচে। চাবি দিয়ে এখনি আসচি।···

কণিকা কহিল—শীগ্‌গির এসো।

রাধাবিনোদের পরিত্যক্ত থালা চাছিয়া সাফ করিয়া কণিকা তাহাতে অন্ন বাড়িয়া লইল। রাধাবিনোদ কহিল—ও কি হলো?

কণিকা কহিল—ভাত বাড়চি।

—আমার ঐ এঁটো পাতে?

কণিকা কহিল—তাই আমি খাই স্বামীর পাতে খেতে হয় স্ত্রীকে।

রাধাবিনোদ কহিল—ছি ছি! এ যে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানকে হত্যা করা।

কণিকা কহিল,—বাবা বলে দিয়েছিলেন—স্বামীর পাতে খাবি। তোর মা চিরদিন আমার পাতে খেতেন। তাঁকে মনে করে এ কথা মেনে চলবে চিরদিন।—তাই খাই।

কথার শেষে কণিকা স্বামীর পানে চাহিল। রাধাবিনোদ কহিল,—এতদিন আমরা এ সুখ, এ আনন্দ রোধ করে কি মহা-যজ্ঞ সাধন করেছিলুম, বলতে পারো?

কণিকা কহিল—তুমিই জানো। আমি বড়লোকের মেয়ে বলে···

রাধাবিনোদ কহিল,—হুঁ! কিন্তু আমার মন তোমায় পাবার জন্য লালায়িত করে থেকে—জানো? সেই একদিন···

কণিকা বাধা দিল বলিল;—চুপ! ঠাকুরঝি···

লীনা আসিল। রাধাবিনোদ,—কহিল সাঁলেটে prepaid টেলিগ্রাম পাঠিয়েচি ভাই লীনা। ভালো খপরই আসবে। সে খপর এলে আর একটা টেলিগ্রাম পাঠাবো, তুমি কাল স্টার্ট করচো for সাঁলেট। আজ নয় লীনা। তোমার বৌঠাকরুণ বলচেন, আজ আমরা ক'জনে ছোট একটা পার্টি দেবো। তিনি স্বামী পেয়েছেন, তাই। সে পার্টিতে যে যোগ দেবে, তার এই ইহ-জীবনেই—অন্যকালে নয়—স্বামি সৌভাগ্য স্বরূপ অটুট অমর হবে।

হাসিয়া লীনা কহিল—সত্যি বো?

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সাঁঝের পথিক

বিদায় ব্যথা জেগেছিল গাছের ফাঁকে ফাঁকে
আরতির সুর ভরে আকাশ পাখীর ডাকে ডাকে!
মৌন আমি, উদাস আমি,
আলের পরে নামি—
পথিক আমি চ'লে ছিলাম নদীর বাঁকে বাঁকে!

মেঘের আড়ে আবছা-রবির রঙীন আলিপনা,
বালুচরের মাথায় তখন টাঙায় সামিয়ানা,
দূরের ধূসর ফাঁকা মাঠে—
গাঁয়ের বাটে বাটে,
একটি দুটি পথিক যেন করছে আনাগোনা।

আঁধার নামে কাজল মাখি গাছের ধারে ধারে,
শেষের খেয়ায় ভিড় জমেছে নদীর পারে পারে,
আলের পরে চ'লছি একা
নাইক কারো দেখা,
কে যেন কে দূরের পথে ডাকছে বারে বারে।

কে গো তুমি সুরের নেশায় ভুলিয়ে নিয়ে চলো
মিঠে সুরের কোমল গাঁথা আমার কাণে বলো
তোমার রূপের ডালি,—
ভুলায় আমায় খালি,
কেমন ক'রে যাত্রা শেষে ফিরবো আমি বলো!

শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।



ইটালী এবং ইথিওপিয়া

ইটালী ইথিওপিয়া রাজ্যটি জয় না করিয়া ছাড়িবে না। মুসোলিনী ইংরাজদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, ইটালী একটি সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতে চাহে। ভার্সাইলের সন্ধিসর্তে ইটালীকে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য দেওয়া হয় নাই, সুতরাং ইটালী বাহুবলে তাহার সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতে কৃতসঙ্কল্প। সে জন্য কাহারও বাধা মানিবে না। দ্বিতীয়তঃ, ইথিওপিয়া ইটালীর অধিকৃত ইরিট্রিয়া এবং সোমালিল্যাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। তাহাদের একটি অধিকৃত স্থান হইতে অন্য অধিকৃত স্থানে যাইতে হইলে হয় জলপথ দিয়া যাইতে হয় অথবা ফরাসীদিগের অধিকৃত রাজ্যের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স, ইংলণ্ড এবং ইটালী মিলিত হইয়া এইরূপ একটা সর্ত করিয়াছিলেন যে, ইটালী তাহার অধিকৃত ইরিট্রিয়া এবং সোমালিল্যাণ্ডকে সংযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে আবিসিনিয়ার ভিতর দিয়া এক রেলপথ নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন। নানা কারণে সেই রেলপথ নির্ম্মিত হয় নাই, অতএব এখন আবিসিনিয়াকে বাহুবলে জয় করিয়া সেই রেলপথ প্রস্তুত করিতেই হইবে। তৃতীয়তঃ, আডোয়ার যুদ্ধে কর্ণেল বয়েটিয়ারীর নেতৃত্বাধীনে সুসজ্জিত ইটালীয় সেনা ভীষণভাবে পরাজিত হইয়াছিল। ইটালীর বুকে সেই পরাজয়ের স্মৃতি যেন দারুণ শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সেই অপমানের প্রতিশোধ না দিতে পারিলে ইটালী শান্তিলাভ করিতে পারিতেছে না। যদি আজ সংগ্রামে ইটালী ইথিওপিয়াকে একবারে চূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে, তাহা হইলে সেই অপমানের প্রতিশোধ দিয়া তবে ইটালী শান্তিলাভে সমর্থ হইবে। চতুর্থতঃ আবিসিনিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদও নিতান্ত অল্প নহে। এই রাজ্যটি হাত করিতে পারিলে ইটালীর ঋদ্ধি বৃদ্ধি পাইবে। এই রাজ্যে মৃত্তিকাগর্ভে কয়লা, লোহা, গন্ধক, তামা, সোণা এবং প্লাটিনাম আছে, এখন সেগুলি দুর্লভ বটে, কিন্তু ইটালীর হাতে পড়িলে তাহা বাহির করা কঠিন হইবে না। সাম্রাজ্যগঠনকামী জাতির পক্ষে এরূপ দেশ যে বিশেষ কাম্য, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তদ্ভিন্ন আবিসিনিয়া এখন তাহাদের রাজ্য হইতে কফি, পশুচর্ম্ম, গজদন্ত, অষ্ট্রীচের পালক, গঁদ, মরিচ এবং গন্ধ-গোকুলের দেহ হইতে প্রস্তুত গন্ধদ্রব্য ভূরি পরিমাণে চালান দিতেছে। সেটাও ঐ দেশ জয় করিবার পক্ষে তুচ্ছ প্রলোভন নহে। সকলের উপর ঐ রাজ্যে খনিজ তৈল অনেক আছে। ইটালীর যুদ্ধের কলকব্জার জন্য উহা বড়ই আবশ্যক। এই সকল কারণে ইটালী চাহে আবিসিনিয়া দখল করিতে। সে তাহার এত লাভজনক কার্য্য হইতে কেন বিরত হইবে? অতএব ইটালী যুদ্ধ করিবেই।

ইটালী যে যুদ্ধ না করিয়া কোনমতেই নিরস্ত হইবে না, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। গত ৬ই জুলাই তারিখে সেনর মুসোলিনী তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তিনি স্বয়ং এবং ইটালীয় সরকার যুদ্ধ করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছেন। সে সঙ্কল্প হইতে তাঁহারা বিচ্যুত হইবেন না। তাঁহারা যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা প্রত্যাহার করিয়া লইবেন না। তাহার পর কত কথাই হইল। জাতিসঙ্ঘ যে ভাবে ব্যাপারটা মিটাইয়া দিতে চাহিলেন, তাহা আবিসিনিয়ার বিশেষ অনুকূল না হইলেও ইটালী তাহাতে সম্মত হইলেন না। ইটালীর প্রতিনিধিরা আবিসিনিয়াকে সম্পূর্ণ কুক্ষিগত না করিয়া ছাড়িবেন না,—এইরূপই সঙ্কল্প করিয়া বসিলেন। ইংরাজ এবং ফরাসী প্রতিনিধিরা ইটালীকে বুঝাইয়া উঠিতে পারিলেন না। দৈনিক সংবাদপত্র-পাঠকরা সে সকল সংবাদ অবগত আছেন। এবার স্থানাভাব বশতঃ আমরা ঐ সম্বন্ধে সকল কথা বলিতে পারিলাম না। এ পর্য্যন্ত যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মুসোলিনী একটু নরম হন নাই, বরং যাঁহারা মিটাইয়া দিতে গিয়াছেন, তাঁহারা আবিসিনিয়াবাসীদিগের স্বার্থহানি করিয়াও এ বিষয়টি মিটাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও মুসোলিনী সন্তুষ্ট নহেন। তিনি এই কয়টি সর্ত্তে মিটমাট করিতে চাহেন। যথা :—

(১) ইটালী ইথিওপিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারিবেন।

(২) ইথিওপিয়ার উত্তর অঞ্চলে এবং উত্তরপূর্ব্ব অঞ্চলে ভূগর্ভে যে সমস্ত খনিজ পদার্থ আছে, তাহা ইটালীয়ানরা স্বাধীনভাবে এবং বিনা বাধায় গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) আবিসিনিয়ার পররাষ্ট্র বিভাগের সমস্ত কার্য্যই ইটালীর হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে।

(৪) য়ুরোপে ইটালীই আবিসিনিয়া-সম্রাটের হইয়া কাজ করিবেন।

(৫) আদ্দিস আবাবায় ইটালীয় রাজপুরুষ নিয়োগ দ্বারা রাজকার্য্য পরিচালিত করিতে হইবে। এক কথায় আবিসিনিয়া-সম্রাটকে এবং আবিসিনিয়ার অধিবাসীদিগকে সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা বর্জ্জন করিয়া ক্রীতদাসে পরিণত হইতে হইবে। সম্রাট হাইলাস্ সিলাসি যে এই প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইবেন না,—ইহা তাঁহার উক্তি হইতেই বুঝা যায়। তিনি স্পষ্টই বলিতেছেন যে, তিনি ইটালীর রক্তচক্ষু এবং বজ্রমুষ্টি দেখিয়া ভয় পাইবেন না। তিনি ন্যায়সঙ্গতভাবে বিবাদের মীমাংসা করিয়া লইতে সম্মত আছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার এবং তাঁহার দেহে এক বিন্দু শোণিত থাকিতে তিনি কিছুতে পরাধীনতা স্বীকার করিবেন না। তাঁহার সে কথা সঙ্গত। কিন্তু তিনি কৃষ্ণকায়। সুতরাং তাঁহার ন্যায়সঙ্গত দাবীও স্বার্থের কোলাহলে ভাসিয়া যাইতে বসিয়াছে।

বিলাতের বর্ত্তমান পররাষ্ট্র সচিব সার স্যামুয়েল হোর জেনিভায় জাতিসঙ্ঘের বৈঠকে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, ইটালী তাহাতে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, এই ব্যাপার লইয়া ইটালীর সহিত গ্রেট বৃটেনের বিচ্ছেদ ঘটিতেও পারে। গত ১২ই সেপ্টেম্বর গ্রাইমাথে বক্তৃতাকালে মিষ্টার লয়েড জর্জ্জ সেনর মুসোলিনীর কার্য্যকে নির্লজ্জভাবে পরস্বাপহরণ (Shameless Rapine) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বৃটিশ জাতি এই বিষয়ে বৃটিশ সরকারকে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিবে। এ দিকে মার্কিণের সচিব মিষ্টার কর্ডেল হাল ইটালী এবং ইথিওপিয়া উভয়কেই পরামর্শ দিয়াছেন, যেন তাঁহারা কদাচ যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত না হন। যাঁহারা কেলগ চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে শান্তিভঙ্গ করিয়া সংগ্রাম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া উচিত নহে। তিনি বলিয়াছেন যে, এই যুদ্ধ বাধিলে পৃথিবীর শান্তিভঙ্গ হইতে পারে। রোমের "পপুলো-ডি রোমা" নামক সংবাদপত্র বৃটিশ জাতিকে অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় নিন্দা করিয়াছেন। ফরাসী পররাষ্ট্র সচিব মঁসিয়ে লাভাল যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সার স্যামুয়েল হোরের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন নাই, কিন্তু ইটালীকে তুষ্ট করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। বৃটেনের ন্যায় ফ্রান্সও জাতিসঙ্ঘের মর্য্যাদা রক্ষার্থ ব্যস্ত, এ কথা তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন।

এ দিকে ইটালীয়ানদিগের সহিত আবিসিনিয়ার সামান্য একটু খুটখাট যুদ্ধও হইয়া গিয়াছে শুনা যাইতেছে। সংবাদটা একখানি মার্কিণী সংবাদপত্রে প্রকাশ হইয়াছে। সংবাদটা ইথিওপিয়া হইতে মার্কিণে গিয়াছে। উহাতে প্রকাশ—এক দল ইটালীয় সৈন্য ইথিওপিয়ার মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি ক্ষুদ্র নদীতীরে ছাউনি করিয়াছিল। ইথিওপিয়ানরা সেই নদীর গতি ঘুরাইয়া দেয়। সুতরাং রাত্রির অন্ধকারে ইটালীয় সৈন্যগণ সে স্থান হইতে সরিয়া পড়ে। অন্ধকারে অঙ্গ ঢাকিয়া ইথিওপিয়াবাসীরা ঐ ইটালীয় সৈন্যদিগকে আক্রমণ করে। ফলে ইটালীর পক্ষে ৪০ জন এবং হাবসীদিগের পক্ষে ২০ জন নিহত হইয়াছিল। তৎপরে মোটর-গাড়ী করিয়া ইটালীয়ানদিগকে তুলিয়া লইয়া যাওয়া হয়। আবার এ কথাও শুনা যাইতেছে যে, প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে মিজ্জাটেন উপজাতিরা ইটালীয়ানদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার কারণ, ইটালীয়ানরা দান্দা কাসিম নামক নূতন সামরিক বন্দর হইতে দক্ষিণদিকে একটি রাস্তা প্রস্তুত করিতেছে। কিন্তু তাহাদের বিদ্রোহী হইবার আসল কারণ এই যে, ইটালীয় কর্তৃপক্ষ মোগাডিস্থিও এবং মাসাওয়া নামক স্থানে সৈন্য-দলের সহিত যোগ দিবার জন্য প্রত্যেক সর্দ্দারের নিকট হইতে এক শত করিয়া নারী লইয়াছেন। প্রকাশ—জিবুটির ফরাসীরা এবং বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ডের ইংরাজরা এই সংবাদ সত্য বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। ইটালীয়ানরা এই বিদ্রোহ দমন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এই জন্য অনেক উপজাতি পূর্ব্ব-বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড এবং ওগাডেনে চলিয়া যাইতেছে। অন্যান্য জাতিরাও ওগাডেনে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, এই অভিযান-সম্পর্কিত ব্যাপারে ইটালী যে স্থানীয় লোকদিগের সহানুভূতি পাইবেন, তাহা নহে। মুসোলিনীর মুখপত্র "ডইল পপুলো-ডি ইটালীয়া" নামক সংবাদপত্র স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, "ইটালীর জাতি-গত জীবনের সন্ধিক্ষণ আসিয়াছে; এখন হয় ইটালী বাঁচিবে, না হয় মরিয়া যাইবে।" যে সময় বৃটিশ দূত সার এরিক ড্রামণ্ডকে ইটালীর সহকারী পররাষ্ট্র-সচিব কাস্ভোসুভিক অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঠিক তাহার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে মুসোলিনীর কাগজে এই কথাই প্রকাশ পাইয়াছিল। বলা বাহুল্য, সার এরিক ড্রামণ্ডের স্যাভিকেন কথাবার্ত্তায় এই ব্যাপারের কোন মীমাংসাই হয় নাই।

ইটালী আবিসিনিয়া লইয়া যুদ্ধ করে, এ ইচ্ছা গ্রেট বৃটেনের একবারেই নাই। কিন্তু ফ্রান্স মনে করিতেছেন যে, এই যুদ্ধ না হইলেই ভাল। বিলাতের অনেক লোক বলিতেছেন যে, এই ব্যাপারে জিদ করিতে যাইয়া গ্রেট বৃটেন যেন যুদ্ধে জড়িত হইয়া না পড়েন। তাই কাউণ্ট রথারমিয়ারের কাগজ 'ডেলী মেল' গ্রেট বৃটেনকে জাতি-সঙ্ঘ ছাড়িয়া দিবার কথা বলিতেছেন। লর্ড বিভার ব্রুকের কাগজ 'ডেলী এক্সপ্রেস'ও সেই কথা বলিতেছেন। এই কাগজখানি যেন একটু ভীতিজড়িত স্বরে কথা বলিতেছেন। মুসোলিনীও ইহা বুঝেন যে, গ্রেট বৃটেন সহসা সংগ্রামে লিপ্ত হইতে চাহিবেন না। কাজেই তিনি বাক্যে অজেয় ভাব প্রকটিত করিতেছেন। এখন এই কয় দিন সংবাদ যতই এলোমেলোভাবে প্রকাশিত হউক, হাবসীদেশে যুদ্ধ হইবেই। তবে ফল বিধাতার হস্তে। তিন হাজার বৎসরের প্রাচীন একটি রাজবংশ উচ্ছিন্ন হয়, ইহাই যদি ভগবানের অভিপ্রেত হয়, তাহাই হইবে। মহাপূজার সময় রণদামামা বাজিয়া উঠে কি না, কে বলিতে পারে? "ভবিতব্যং ভবত্যেব যদ্বিধেশ্মনসি স্থিতম্।" মার্কিণের অনেক সংবাদপত্র বলিতেছেন যে, এই ব্যাপার লইয়া আবার হয় ত পৃথিবীব্যাপী এক সমরানল জ্বলিয়া উঠিবে। 'সেণ্টপল ডেলী' নিউজ লিখিয়াছেন :—
The Italian adventure is a pirating expedition. If the rest of the nations support Mussolini they plead guilty to the charge that the league is an organisation of the stronger powers to get what they want. অর্থাৎ ইটালীর অভিযানটা দস্যুতার অভিযান। যদি অন্য সকল শক্তিধর জাতি মুসোলিনীর সমর্থন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা এই

অভিযোগের সত্যতাই সপ্রমাণ করিবেন যে, জাতি-সঙ্ঘ শক্তিশালী জাতিদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র।

য়ুরোপের অবস্থা

ইটালী ত হাবসীদিগের দেশ জয় করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া ছুটিয়াছেন। ইদানীং জাহাজে করিয়া কত সৈন্য যে পূর্ব্ব-আফ্রিকা অভিমুখে ছুটিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে শীঘ্রই যুদ্ধ বাধিতে পারে। কারণ, দুই পক্ষই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে শুনা যাইতেছে। তবে হাবসীরা অর্থহীন, তাহাদের দেশে অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া যাইবার সুবিধা নাই,—সেই জন্য তাহারা যে ঠিক কত দূর সজ্জিত হইয়া উঠিতে পারিয়াছে, তাহা বুঝা যাইতেছে না। যাহা হউক, যুদ্ধ আসন্ন। কিন্তু এই যুদ্ধ যদি বাধে, তাহা হইলে তাহার ফলে য়ুরোপের অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা লইয়া এখন চারিদিকে, বিশেষতঃ য়ুরোপীয় মহলে খুব আন্দোলন এবং আলোচনা চলিতেছে। কারণ, য়ুরোপের অবস্থা এখন ভাল নহে। জার্ম্মাণীতে হার হিটলার গা ঝাড়া দিয়া উঠিতেছেন এবং আপনাদের প্রাপ্য গণ্ডা আদায় করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা পাইতেছেন। এখন ইটালী যদি হাবসী-সংগ্রামে লিপ্ত হন, তাহা হইলে যে শীঘ্র ইটালীর বলক্ষয় হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। উপস্থিত তাহার শক্তিক্ষয় হইবে। কারণ, হাবসীদিগকে যে তাঁহারা অতি সহজে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা মনে হইতেছে না। এরূপ অবস্থায় জার্ম্মাণী এবং ফ্রান্সে যদি বিবাদ বাধিয়া উঠে, তাহা হইলে ফ্রান্সের এক জন সহায় ইটালীর শক্তিক্ষয় হওয়াতে প্রকারান্তরে এবং পরোক্ষভাবে ফ্রান্সেরই শক্তিক্ষয় হইবে। কাযেই বর্ত্তমান সময়ে ফ্রান্স ইটালী অপেক্ষা ইংরাজের পক্ষে অধিক টানিবেন। ইটালী অপেক্ষা বৃটিশ জাতি অধিকতর শক্তিশালী ত বটেনই, অধিকন্তু যুদ্ধ করিয়া ইটালী হীনবল হইলে ইটালীর সহায়তায় ফ্রান্সের বিশেষ সুবিধা হইবে না,—ইটালীও সেই দুঃসময়ে হয় ত ফ্রান্সের বিপদ স্বয়ং স্কন্ধে করিয়া লইতে সম্মত না হইতেও পারেন। সেই জন্য ফ্রান্স ইটালীকে বর্ত্তমান সময়ে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে দিতে চাহিতেছেন না,—বরং তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবারই চেষ্টা করিতেছেন। কারণ, ফ্রান্স বৃটিশ জাতিকে চটাইয়া ইটালীর পক্ষ কোনমতেই সমর্থন করিতে পারেন না।

এখন জিজ্ঞাস্য, যদি জাতিসঙ্ঘ শেষ পর্য্যন্ত এই যুদ্ধের বিরোধী থাকেন,—এবং সেইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া দেন, আর ইটালী যদি জাতিসঙ্ঘ হইতে সম্বন্ধ ছিন্ন করেন, তাহা হইলে কি হইবে? ইংলণ্ড ফ্রান্সকে সুয়েজ খাল বন্ধ করিয়া দিবার জন্য আহ্বান করিতে পারেন। ফ্রান্স তখন ইংলণ্ডের আহ্বানে সাড়া না দিয়া থাকিতে পারিবেন কি? বোধ ত হয় না। কিন্তু তৎপূর্ব্বে ইটালী অনেক সৈন্য ও সমরোপকরণ পূর্ব্ব-আফ্রিকায় লইয়া যাইবে। সুতরাং তখন খাল বন্ধ করিলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না। যুদ্ধ হইবেই।

দ্বিতীয়তঃ, যদি এই অবস্থায় অর্থাৎ ইটালী যুদ্ধে লিপ্ত হইলে জার্ম্মাণী আচম্বিতে অন্য ভাব ধারণ করেন, তাহা হইলে কি হইবে? হার হিটলার ত এই অবস্থার সুবিধা পাইয়া লিথুনিয়ার দিকে একটা ছোট-খাট হাঙ্গামা বাধাইবার চেষ্টা পাইতেছেন, ইহার পর যদি এমন কিছু করিয়া বসেন, যাহা ফ্রান্সের পক্ষে অসহ্য, তখন কি হইবে? ফ্রান্স কি একাকী জার্ম্মাণীর সহিত কলহে বা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে সাহস পাইবেন? তখন তাঁহাকে বৃটিশ জাতির সমর্থন এবং সাহায্য লইতেই হইবে। কিন্তু বৃটিশ জাতি কি এইরূপ অবস্থায় যুদ্ধে লিপ্ত হইতে চাহিবেন? সে কথা বলা বড় কঠিন।

এ দিকে জার্ম্মাণী এই ব্যাপারটা কিরূপ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। হার হিটলার ত বলিতেছেন যে, তিনি শান্তিভঙ্গের পক্ষপাতী নহেন; বরং শান্তিরক্ষারই পক্ষপাতী। কিন্তু রাজনীতিক কৌশলই এই যে, সুবিধা পাইলেই আপনার ইষ্টসিদ্ধি করিয়া লইতে হইবে। সুতরাং এই ব্যাপারের তরঙ্গাভিঘাত কোথায় যাইয়া পড়িবে, তাহা বলা কঠিন। যদি যুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে জাতিসঙ্ঘের সম্মানের বিশেষ হানি হইবেই। সে ব্যাপার য়ুরোপের শান্তিরক্ষার পক্ষে অনুকূল হইবে না।

হার হিটলারের হুম্‌কী

য়ুরোপে কেমন একটা চকিতভাব দেখিয়া হার হিটলার বেশ একটু কূট রাজনীতিক চাল চালিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি নুরেমবার্গ সহরে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে বেশ একটু ভ্রূভঙ্গী আছে। তিনি বলিয়াছেন যে, "জার্ম্মাণীর পক্ষে শান্তিরক্ষা করিয়া যাওয়াই একমাত্র কাম্য। বর্ত্তমানে জার্ম্মাণী শান্তিই ভালবাসেন। অন্যজাতির স্বাধীনতা হরণ করিবার উদ্দেশে আমরা আমাদের সৈন্যদল গঠন করি নাই, পরন্তু আমরা আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্যই আমাদের এই সৈন্যদল গঠিত করিয়াছি। যে সকল ব্যাপারের সহিত জার্ম্মাণীর কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, সে সকল ব্যাপারে জার্ম্মাণী যাইতে চাহে না।" এ কথাগুলি বেশ ভাল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার পরে মেমেল সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা লইয়া বেশ একটু চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। মেমেল বন্দরটি পূর্ব্বে জার্ম্মাণীর ছিল; এখন সেটি জার্ম্মাণীর নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। উহা জাতিসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। এখন উহা লিথুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই বন্দরটিতে জার্ম্মাণদিগের অনেক স্বার্থ নিহিত। ইহাতে অনেক জার্ম্মাণের বাস আছে। হার হিটলার ঐ দিন বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, লিথুনিয়া মেমেলের শান্তি অপহরণ করিয়া লইয়াছে। কয়েক বৎসর ধরিয়া মেমেলের অধিবাসীদিগের উপর অত্যাচার হইয়া আসিতেছে। ঐ দিকে জার্ম্মাণীর অবশ্য দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য। এ দিকে বিদেশী রাজ্যপতিদিগের নিকট আবেদন করিয়া কোন ফলই হয় নাই; মেমেলের নাগরিকদিগের উপর যেরূপ ব্যবহার করা হইতেছে, অপরাধীদিগের উপর সেরূপ ব্যবহার করা হয় না। লিথুনিয়ান সরকারের নিকট এ পর্য্যন্ত যত আবেদন করা হইয়াছে, তাহা সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান নির্ব্বাচনের জন্য যে ব্যবস্থা করা হইতেছে, তাহা একটা পরিহাসমাত্র। হার হিটলার ইহার পর বলিয়াছেন যে, "যে ব্যাপারের জন্য সকলের পরে অনুশোচনা করিতে হইবে, তাহার প্রতিরোধ করিবার জন্য তিনি জাতিসঙ্ঘের নিকট আবেদন করিয়াছেন।" মেমেলের ব্যাপার লইয়া কিছুদিন ধরিয়া জার্ম্মাণীর সহিত সংক্রান্ত জাতির একটু মন-কষাকষি চলিয়া আসিতেছে। জার্ম্মাণরা বলিতেছে যে, মেমেলের অধিবাসীদিগের উপর অন্যায় এবং অসঙ্গত ব্যবহার করা হইতেছে।

হার হিটলারের অভিযোগ সত্য কি না, তাহা অবশ্য আমাদের পক্ষে বুঝিয়া উঠা অসম্ভব। তবে তিনি বলিতেছেন যে, তিনি মেমেলের নাগরিকদিগের উপর অসদ্ব্যবহারের কথা অন্য সকল বিদেশী রাষ্ট্রপতির গোচর করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার অভিযোগ যে একেবারে ভিত্তিহীন, তাহা কোনমতেই মনে করা যাইতে পারে না। তবে হার হিটলার যেরূপ লোক, তাহাতে তাঁহার উক্তি অতিরঞ্জিত হওয়া অসম্ভব নহে। যাহা হউক, হার হিটলারের এই কথা লইয়া য়ুরোপে বেশ একটু সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। অনেকে অনুমান করিতেছেন যে, তিনি লিথুনিয়া সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার ভিতর যুদ্ধ করিবার ভয় প্রদর্শনের ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; গ্রেট বৃটেন হইতে যেরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহারা যেন ঐরূপই মনে করিতেছেন বলিয়া মনে হইতেছে। তাঁহারা বলেন, ইহার ফলে পূর্ব্ব-য়ুরোপের শান্তিভঙ্গ হইবে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও জোর করিয়া বলা হইতেছে যে, মেমেলের নির্ব্বাচন ঠিক আইনসঙ্গতভাবে পরিচালিত হইতেছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রপতিদিগের প্রতিনিধিরা তাহা পরিদর্শন করিতেছেন। তবে হার হিটলার এরূপ অভিযোগ করেন কেন? ব্যাপারটা সামান্য হইলেও উপেক্ষণীয় নহে।

—

রোডেসিয়ায় হাঙ্গামা

রোডেসিয়া ইংরাজ জাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত আফ্রিকার মধ্যবর্ত্তী একটী দেশ। এই দেশটি আফ্রিকার ট্রান্সভালের উত্তরে এবং টাঙ্গানাইকার দক্ষিণে অবস্থিত। রাজ্যটি বৃটিশ সাউথ আফ্রিকান কোম্পানীর শাসনাধীন রহিয়াছে। মিষ্টার সিসিল রোড্‌সের কর্ত্তৃত্বাধীনে এই রাজ্যটি প্রথমে শাসিত হয় বলিয়া তাঁহারই নামানুসারে ইহার নাম রোডেসিয়া হইয়াছে। এই রাজ্যটি আয়তনে সমস্ত জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের তুল্য। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—উত্তর রোডেসিয়া এবং দক্ষিণ রোডেসিয়া। এই রাজ্যে কৃষি-সম্পদ এবং খনিজ সম্পদ যথেষ্ট আছে। লোকসংখ্যা অধিক নহে। ইহার অধিবাসীরা সভ্যতার পথে অধিক অগ্রসর হইতে পারে নাই। বিখ্যাত জেমেসন অভিযানের পর হইতে এই রাজ্যের সামরিক কার্য্য সম্পাদনের ভার লইয়াছেন বৃটিশ সরকার। শাসনকার্য্যের ভার এখনও বৃটিশ সাউথ আফ্রিকান কোম্পানীর হাতেই আছে। বিস্তীর্ণ বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে উত্তর-রোডেসিয়া একটি বিশেষভাবে গণনীয় স্থান বা সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত নহে। এই অঞ্চলের অধিবাসীদিগের মধ্যে ঘোর অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং তাহা দাঙ্গা-হাঙ্গামারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। গত মে মাসের শেষভাগে ঐ অঞ্চলের নূতন রাজধানী লুসাকা নগর খোলা হয়। সেই জন্য লিভিংষ্টোন সহর হইতে সরকারী রাজপুরুষগণ লুসাকা সহরে গমন করে। এই লুসাকা সহরটি একবারে বর্ত্তমান যুগের মত করিয়া গঠিত। যে সময় এই রাজধানী পরিবর্ত্তনের উৎসব হইতেছিল, তাহার কয়েক দিন পূর্ব্বে রানা, গোলা এবং লুয়ানসিয়ার তামার খনির দেশীয় শ্রমিকদিগের মধ্যে একটা বড় রকমের হাঙ্গামা উপস্থিত হইয়াছিল। ২৭শে মে তারিখে চারিখানি সৈন্যবাহী রণবিমান কেপটাউন হইতে কায়রো যাইতেছিল; সেই সময় তাহাদিগকে লুসাকা সহরে নামিয়া অবতরণ করিতে বলা হয়। তথা হইতে তাহারা দুই পল্টন উক্ত রোডেসীয় সেনা লইয়া গোলায় গমন করে। উহার পূর্ব্বদিনেই ঐ অঞ্চলে পুলিসের সহিত দেশীয়দিগের দাঙ্গা হইয়া গিয়াছিল। ২৯শে মে তারিখে দাঙ্গাকারীরা খনির মালেকদিগের সম্পত্তির অনেক ক্ষতি করে, ফলে সৈন্যদিগের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ ঘটে। সেই দাঙ্গায় নাকি সৈনিকদিগের হস্তে ৬ জন মাত্র দেশীয় শ্রমিক নিহত হইয়াছিল। তৎপরে দক্ষিণ-রোডেসিয়া এবং ট্রান্সভাল হইতে দলে দলে সৈন্য রণবিমানে এবং ট্রেণে করিয়া ঐ অঞ্চলে প্রেরিত হইয়াছিল। ১লা জুন তারিখে এই হাঙ্গামা নিবৃত্ত এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ দাঙ্গা উপস্থিত হইবার কারণ, ঐ অঞ্চলে মাথা গুণতি হিসাবে যে কর আছে, ঐ অঞ্চলের কর্ত্তৃপক্ষ তাহার হার বাড়াইয়া দেন। যাঁহারা ঐ দেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, তাঁহারা সরকারকে ঐ কর বাড়াইতে নিষেধ করিয়াছিলেন,—কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ সে কথায় কাণ দেন নাই। ফলে প্রায় ৫ হাজার দেশীয় লোক বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ১লা জুন তারিখে সংবাদ পাওয়া যায় যে, লোক ঐ ট্যাক্স দিতেছে সত্য,—কিন্তু এই সম্বন্ধে সরকার যে অনুসন্ধান-কমিটী গঠিত করিয়াছিলেন, তাহাতে লোক আপত্তি করিয়াছিল। যাহা হউক, তাহাদের আপত্তির ফল কতকটা ফলিয়াছে। তাহাদের আপত্তির প্রধান হেতু ছিল যে, কমিশনে কেবল সরকারী লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে। সরকারের নীতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে রাজপুরুষদিগকে অনুসন্ধান-কার্য্যে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। শুনা যাইতেছে যে, স্থানীয় সরকার তাহাদের সেই আপত্তি শুনিয়াছেন এবং দেশীয়দিগের, সরকার পক্ষের এবং বিচার বিভাগের লোকদিগকে প্রতিনিধিস্বরূপ ঐ অনুসন্ধান সমিতিতে লইতে সম্মত হইয়াছেন।

—

রুমেনিয়ার অবস্থা

রুমেনিয়া পূর্ব্ব-য়ুরোপের একটি মধ্যমাকার রাজ্য। এই রাজ্যে বাহ্যতঃ দৃষ্টিতে শান্তি বিরাজ করিলেও ইহার ভিতরে অশান্তির জ্বালামালা ইহাকে সর্ব্বদাই দগ্ধ করিতেছে। কখন যে এই রাজ্যে একটা বিষম কাণ্ড ঘটিয়া বসে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। তথাকার বড় বড় সহরে এখন সামরিক আইন জারি রহিয়াছে। তথাকার লোকের পক্ষে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করা এখন নিষিদ্ধ। সংবাদপত্র এবং চলচ্চিত্রের উপর সেন্সরের খরদৃষ্টি সর্ব্বদাই পতিত রহিয়াছে। দেশের যাঁহারা বিশিষ্ট এবং মধ্যম রাজনীতিক, পুলিস তাঁহাদিগের উপর খর নজর রাখিয়াছে। এই সমস্ত করিবার বিশেষ কারণ এই কয়টি। (১) বর্ত্তমান রাজা এবং রাজসরকারকে রাজ্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রাখা, (২) বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে যাহাতে ইহুদী-বিদ্বেষ-সূচক হাঙ্গামা না বাধে এবং (৩) তাঁহার সুকেশা উপপত্নী ম্যাডাম ম্যাগডা লুপেস্কুর জন্য কেহ বন্ধী কেরলকে হত্যা বা আক্রমণ না করে, তাহার জন্য এত কড়াকড়ি। এই মুকুটহীন রাণী ফ্রান্সের পঞ্চদশ লুইয়ের উপপত্নী ম্যাডাম জেন পম্পাডুরের ন্যায় রাজা কেরলের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছেন, সেই জন্য এই দেশের লোক ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া রহিয়াছে। দেশের লোক রাজ-সংসারের এই অনাচার অত্যন্ত অসন্তুষ্ট দৃষ্টিতে দেখিয়া

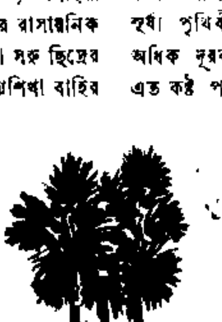
থাকে। গত ১৭ই জুন ব্রেসলভ সহরে জাতীয় কৃষীবল দল সম্মিলিত হইয়া এই ব্যাপারের বিরুদ্ধে অত্যন্ত তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল। তাহাদের নায়ক ডাক্তার জুলিয়াস মানিউ (Dr. Julius Maniu) অত্যন্ত দৃঢ় এবং সংযত ভাষায় বলিয়াছিলেন যে, রুমেনিয়ার কৃষীবলের সমাজে লুপেস্কুকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া আবশ্যক, তাহা হইলেই দেশে শান্তি বিরাজ করিবে। দেশের কৃষীবলরাই সংখ্যায় শতকরা ৮৫ জন। এই প্রকার কদাকার ব্যাপার দেখিয়া তাহারা রাজার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিতেছে। অন্যান্য বক্তাও বলেন যে, এই রুমেনিয়া দেশটি ম্যাডাম লুপেস্কুর ক্ষমতা, সামরিক আইনের প্রাধান্য, সেন্সরী এবং রাজপ্রাসাদের ষড়যন্ত্র প্রভৃতির জন্য পৃথিবীর মধ্যে কলঙ্ক-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই প্রকার অভিযোগ ইহার পূর্ব্বে আরও অনেকবার করা হইয়াছে। একটি ছোট দলের নায়ক সেনাপতি এভারেস্কু এবং যুবক উদারনৈতিক দলের নেতা জর্জ ব্রাটিয়ানু প্রভৃতি এই ধরণের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছেন। কিন্তু রাজা কেরলের সেজন্য চৈতন্যোদয় হইতেছে না। ফ্রান্সের পঞ্চদশ লুইয়েরও তাহা হয় নাই। মানুষ প্রবৃত্তির বশে চালিত হইয়া এইরূপেই কুপথ আশ্রয় করে। তখন তাহারা কোন পরামর্শই শুনিতে চাহে না। অতীতের দৃষ্টান্ত দেখিয়াও মানুষ তাহা বুঝিতে চাহে না। ইহাই পৃথিবীর গতি। এখন এই রুমেনিয়ায় একটা হাঙ্গামা বাধিলে হয়ত পূর্ব্ব-য়ুরোপে সেই হাঙ্গামা বা সেই অশান্তি পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে পারে।

বিস্ময়জনক আবিষ্কার

যত দিন যাইতেছে, ততই পাশ্চাত্য খণ্ডে অনেক বিস্ময়জনক ব্যাপার আবিষ্কৃত হইতেছে। যে যন্ত্রের সাহায্যে এই সকল তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহার নাম স্পেকট্রসকোপ (Spectroscope) বা আলোকবিশ্লেষণ যন্ত্র। প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মাণীর গুষ্টাভ রবার্ট কার্কহফ (Kirch Holf) নামধেয় এক জন পদার্থবিজ্ঞানবিৎ রবার্ট উইলহিম ভিবুনসেনের হিডেলবার্গের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে কায করিতেন। কার্কহফের বৈজ্ঞানিক বলিয়া বিশেষ খ্যাতি ছিল না। তাঁহার প্রতিভার যে বিশেষ প্রাখর্য্য ছিল, তাহাও নহে। এই ব্যক্তি একটি সরু ও লম্বা ছিদ্রের ভিতর একটি ত্রিকোণ কাচের কলম এবং দুইখানি কাচপুট (lense) বসাইয়া এক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার সাহায্যে বস্তু সকলের রাসায়নিক উপাদান কি, তাহা স্থির করিতেন। সেই নলের বা সরু ছিদ্রের সম্মুখে কোন বস্তু দগ্ধ করিলে তাহা হইতে যে অগ্নিশিখা বাহির হইত, তাহার আলোকবিশ্লেষণ করিয়াই সেই জিনিষে কি কি উপাদান আছে, তাহা তিনি স্থির করিতেন। উইলহিম বুনসেন উহার উন্নতিসাধন করিয়া উহার সহিত একটি ছোট টেলিস্কোপ জুড়িয়া উহাকে আলোকবিশ্লেষণ যন্ত্রে পরিণত করেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত ইহার সাহায্যে অনেক নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে। সুদূর গ্রহ-নক্ষত্রে কি কি পদার্থ আছে, তাহা তাহাদের আলোক-বিশ্লেষণ দ্বারা জানা যাইতেছে।

সম্প্রতি আমেরিকার বোষ্টন সহরস্থিত ম্যাসাচুসেট ইনষ্টিটিউট অব টেকনলজির বৈজ্ঞানিকগণ এই যন্ত্রের সাহায্যে অনেক নূতন বিস্ময়কর তথ্য জানিয়া তাহা প্রকাশ করিতেছেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ হইতে এই যন্ত্রের সাহায্যে এবং ইহার সহিত একটি ক্যামেরা যুড়িয়া দিয়া সূর্য্য, নক্ষত্র এবং নীহারিকাগুলির আলোকবিশ্লেষণ করিতেছেন এবং তাহার দ্বারা ঐ সকল আলোক বিকীর্ণকারী জ্যোতিষ্কের ভিতর কি কি উপাদান বিদ্যমান, তাহা স্থির করিয়া দিতেছেন। ইঁহারা মঙ্গল এবং শুক্র গ্রহের বায়ুতত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে পণ্যের উপাদানীভূত পদার্থ অর্থাৎ কাচা মালের নির্ম্মলতা বুঝিবার সুবিধা হইয়াছে। উহাতে অতি সামান্য মলিনতা থাকিলেও এই যন্ত্রের সাহায্যে তাহা ধরা পড়িতেছে। ফিলাডেলফিয়াস্থিত পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর ডেভিড এল ড্রবেকিন জীবন্ত জীবের রক্ত-পরীক্ষায় এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন যে, এই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি রক্তের অতি সামান্য সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তনের কথা জানিতে পারিবেন, এইরূপ আশা হইয়াছে। ইহাতে জীবের স্বাস্থ্য ও পীড়ার অতি সূক্ষ্ম এবং প্রাথমিক অবস্থার কথা জানিতে পারা যাইবে বলিয়া মনে হইতেছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে মৃত্তিকাবিশ্লেষণ করাও সম্ভব হইয়াছে। ইহাতে কৃষির বিশেষ সুবিধা ঘটিবে।

নক্ষত্রাদি সম্বন্ধেও এই যন্ত্র দ্বারা অনেক তথ্য জানিতে পারা যাইতেছে। মার্কিণের পাসাডেনার কালিফোর্ণিয়া ইনষ্টিটিউট অব টেকনলজির অধ্যাপক ডাক্তার আই এস্ বাউয়েন সম্প্রতি একটি অতি দূরবর্ত্তী নক্ষত্রের আলোক এই যন্ত্র দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, সেই নক্ষত্রের তাপপরিমাণ ১ লক্ষ ৮০ হাজার ডিগ্রী (ফারেন হীট) অর্থাৎ ঐ নক্ষত্রটি আমাদের এই সূর্য্যমণ্ডল হইতে আঠার গুণ উত্তপ্ত। এই নক্ষত্রটির নামকরণ করা হয় নাই। সূর্য্য পৃথিবী হইতে প্রায় ৯ কোটি ২১ লক্ষ মাইলের কিছু অধিক দূরবর্ত্তী। সেই সূর্য্যের তাপেই যখন আমরা সময় সময় এত কষ্ট পাই, তখন না জানি এই তারকাটির তাপ কত অধিক।



ধারণ করিতেছে, তাহা দেখিয়া কোন দূরদর্শী শাসকের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। কিন্তু তাহার কারণ কি? তাহার প্রধান কারণ এই যে, এক শ্রেণীর অজ্ঞ মুসলমানের মনে এই ভুল ধারণা জন্মিয়াছে যে, তাহারা যতই কুকর্ম্ম করুক না কেন, অন্ততঃ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক যে কাযই করুক না কেন, রাজপুরুষরা তাহাদের দোষ তত দেখিবেন না বা তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিবেন না। সেইরূপ ধারণার বশে নিম্নশ্রেণীর লোক ভীষণ কাণ্ড করিয়া বসে, শেষটা যখন তাহারা কঠোর শাস্তি পায়, তখন তাহারা একবারে হতভম্ব হইয়া পড়ে। সেই জন্য খোদ্দা গোবিন্দপুর হাঙ্গামায় আসামীরা যখন তাহাদের কঠোর শাস্তির কথা শুনিয়াছিল, তখন তাহারা কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। আসল কথা, "আমরা সরকারের প্রিয় পাত্র, সরকার আমাদিগকে অসন্তুষ্ট করিতে পারিবেন না",—এই ধারণা যদি কোন বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের মনে উদিত হয়, তাহা হইলে এইরূপ অনর্থকর কাণ্ডের সংঘটন অবশ্যম্ভাবী। মুসলমানরা যে সরকারের দুয়া, ইহা কি তাহাদের বুঝিতে বাকী থাকে? যদি তাহারা প্রত্যক্ষ দেখিতে পায় যে, অন্য সম্প্রদায় শতগুণ যোগ্য হইলেও সে যে কায না পায়, এক জন মুসলমান শতগুণে নিকৃষ্ট হইলেও তাহা পায়, তাহা হইলে তাহাদের মনে কি ধারণা হইতে পারে? শিশুরা পর্য্যন্ত ঐ প্রকার বিসদৃশ ব্যবহার বুঝিতে পারে। যদি কোন পিতামাতা কোন সন্তানকে অধিক আদর করেন, তাহার দোষ-ত্রুটি তেমন না দেখেন, তাহাকে ভাল ভাল পোষাক দেন, তাহা হইলে সেই সন্তানটিই হয় আদুরে খোকা (Spoilt child), সেই পরিণামে সংসারে যত অনিষ্ট করে এবং জনকজননীর যত উদ্বেগের কারণ হয়, এমন আর কেহই করে না বা হয় না। সরকারের তাহা বুঝিয়াই কায করা উচিত। শাসনসংস্কারের আইনে যে সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা আছে, তাহাই যত অনর্থের মূল। সুতরাং তাহা যতক্ষণ উচ্ছিন্ন করা না হইতেছে, ততক্ষণ এইরূপ দোষের প্রতিকার হইবে না। ইহা সরকারও বুঝেন, আমরাও বরাবর বলিয়া আসিতেছি। আর অধিক বলা অনাবশ্যক।

খোদ্দা গোবিন্দপুরের অনাচার

গত ৮ই সেপ্টেম্বর রাজসাহীর দায়রা আদালতে খোদ্দা গোবিন্দপুরের সাম্প্রদায়িক মামলার বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। এই মামলার কাহিনী এতই ভীষণ যে, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। তাহার বর্ণনা করিতে অনেক স্থানের প্রয়োজন। উকিল সরকার রায় বাহাদুর ভাইয়া এই মামলার যে বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার কয়েক ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন যে, মামলাটি সাম্প্রদায়িক ভাবের। একটি হিন্দু পরিবারের উপর এই স্থানে মুসলমানরা যে অত্যাচার করিয়াছিল, সেরূপ অত্যাচারের বিবরণ কেবলমাত্র উপন্যাসে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকাশ্য দিবালোকে যে এইরূপ কাণ্ড ঘটিতে পারে, তাহা কেহই কল্পনা করিতেও পারে না অথচ ঐ স্থানটি চারঘাট থানা হইতে এক ক্রোশ মাত্র দূরে অবস্থিত। পুলিস যদি দুই মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে এইরূপ ঘটনা ঘটিলে তাহা জানিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাতে তাহাদের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। সরকারী উকিল বলেন যে, এইরূপ নৃশংস এবং পৈশাচিক অত্যাচার যে বৃটিশ রাজত্বে ঘটিতে পারে, তাহা লোকে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারে না। ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, খোদ্দা গোবিন্দপুরে রাধাবল্লভ মণ্ডলের বাস। রাধাবল্লভের পুত্র হরেন্দ্র মণ্ডল মফিজান-নাম্নী এক মুসলমান বিধবার সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ পায়। মফিজান বিবি পাঁচ ছয়টি সন্তানের জননী। এই আনুমানিক অপরাধের অনুসন্ধান না করিয়া বা কোন পক্ষের দোষ, তাহা সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধান্ত না করিয়া ঐ স্থানের মুসলমান-সমাজ উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং হরেন্দ্রকে সেই জন্য শাস্তি দিতে সংকল্প করিয়াছিল। কয়েক জন হিন্দু এই বিষয়টির মীমাংসা করিবার জন্য গোলাবাড়ীতে যায়। ৫০।৬০ জন মুসলমান হরেন্দ্রকে তথায় হাজির করিয়া দিতে বলে। কিন্তু তাহারা তথা মফিজান বিবিকে হাজির করে নাই। হিন্দুরা হরেন্দ্রকে তথা হাজির করিয়া দেয়। আসামী তখন বলে যে, হরেন্দ্রকে ২৫ ঘা জুতা মারিতে হইবে। নিকুঞ্জ নামক এক জন হিন্দু বলেন যে তিনি হরেন্দ্রকে ২৫ ঘা জুতা তাঁহাদের পক্ষ হইয়া মারিবেন। সে কথা শুনিয়া মুসলমানরা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া হরেন্দ্রকে বাড়ীর মধ্যে টানিয়া লইয়া যায় এবং তাহাকে মারিতে মারিতে প্রায় অজ্ঞান করিয়া ফেলে। পাছে হিন্দুরা তথায় প্রবেশ করে বলিয়া তিন জন আসামী বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়ায়। শেষে গোলাবাড়ীর গোমস্তা যখন চীৎকার করিয়া বলে যে, "তোরা কি আমারে খুনের দায়ে ফেলিবি,"— তখন তাহারা ঘরের দুয়ার খুলিয়া বাহির হয়। হিন্দুরা তখন সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পায় যে, হরেন্দ্র মেঝের উপর পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতেছে। মুসলমানরা তখন বলে, তাহারা এই কথা কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতে পারিবে না, এবং তাহারা যাহা বলিবে, হিন্দুদিগকে তাহাই করিতে হইবে।

এইখানেই ব্যাপারের শেষ হইল না। মুসলমানরা যখন দেখিল যে, তাহাদের ঐ ব্যাপারের কিছুই হইল না,—তখন তাহারা ঐ ঘটনার এক দিন পরে রাধাবল্লভ মণ্ডলের বাড়ীতে প্রবেশ করে। তাহারা স্থির করিয়াছিল যে, হরেন্দ্রের স্ত্রীকে তাহারা নিকা করিবে এবং হরেন্দ্রকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাহার সহিত মফিজান বিবিকে নিকা দিবে। কিন্তু বুধবার শেষ রাত্রিতে রাধাবল্লভ তাহার পুত্রবধূকে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছিল। সে তাহার স্ত্রীকেও পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল; কিন্তু গ্রামের চৌকিদার রূপচাঁদ এবং নরেশ গাড়ীর উপর বসিয়া গাড়ী চালাইতে দেয় নাই। মুসলমানরা গ্রামের বাহিরে যাইবার সমস্ত পথ-ঘাট আটক করিয়াছিল। তাহারা হরেন্দ্রের মাতা কুসুমকে ধরিয়া তাহার স্তনে এবং কোমরে হাত দিয়া তাহাকে অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় সকলের সমক্ষে হাজির করে এবং কয়েক জন আসামী তাহাকে মাঠে লইয়া যাইয়া তাহার উপর উপর্য্যুপরি বলাৎকার করে। ইহা ভিন্ন তাহারা রাধাবল্লভ এবং শশী নামক আর এক জন হিন্দুকে কাণ ধরিয়া ঘুসি ও চড় মারিতে থাকে। এই সকল কথা আদালতে সপ্রমাণ হইয়াছে। আমরা সকল কথা লিখিলাম না, সকল কথা লেখাও আবশ্যক মনে করিলাম না। ইহাতে ব্যাপারটা কি হইয়াছিল, তাহা সকলে বুঝিতে পারিবেন।

রাজসাহীর দায়রা জজ মিষ্টার এস এস আর হাক্কানীর বিচারে উপস্থিত ৪২ জন আসামীর মধ্যে ৪০ জন আসামীকে জুরীর সহিত একমত হইয়া দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে

তিনি এরফান, হুথন, মেড়া, নেশর, পলন, লেকু, আমির এবং মোয়েজ এই আট জনকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দোষী মনে করিয়া ইহাদের প্রত্যেককে দশ বৎসর করিয়া যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন এবং আর ৩২ জন আসামীর প্রত্যেককে দশ বৎসর করিয়া কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। কেবল দুই জন আসামীর দোষ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে বলিয়া জুরীরা মত প্রকাশ করাতে তাহাদিগকে মুক্তি দিয়াছেন। আর এক জন আসামী পীড়িত বলিয়া তাহার অপরাধের বিচার হয় নাই। তাহার বিচার পরে হইবে।

এ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ অনাবশ্যক। আসামীরা কি মনে করিয়াছিল যে, তাহারা অপরাধ করিলে তাহাদিগকে শাস্তি দিবার কেহ নাই? শাস্তির কথা শুনিয়া আসামীরা আদালতে কাঁদিয়া আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, ইহাতে মনে হয় যে, তাহাদের যে এইরূপ শাস্তি হইবে, তাহা ইহারা মনে করে নাই।

পশু-বলিতে বাধা প্রদান

জয়পুরনিবাসী শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মা কালীঘাটে পশুবলি বন্ধ করিবার জন্য গত ১৯শে ভাদ্র হইতে উপবাস করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার এই কার্য্য দ্বারা তিনি যে অন্যের ধর্ম্মাচরণে জোর করিয়া বাধা প্রদানের চেষ্টা করিতেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, শক্তি-পূজায় রাজসিক এবং তামসিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের পক্ষে পশু-বলিদানই শাস্ত্রের বিধি।

হিন্দুর ধর্ম্ম শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট। উহা কাহারও খেয়াল অনুসারে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব অত্যন্ত নিগূঢ়। মানুষ সহজ বুদ্ধিতে তাহা ধরিতে বা বুঝিতে পারে না। সাধারণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ ব্যাপারেই যখন আমরা অনেক বিষয় ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না, বিশেষজ্ঞদিগের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য হই, তখন অপ্রত্যক্ষ ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে আমরা যে সকল কথা সহজ বুদ্ধিতে বা সহজ যুক্তির দ্বারা বুঝিতে সমর্থ হইব, ইহা মনে করা ঘোর বাতুলতা। এখানে বলা আবশ্যক যে, হিন্দুর সকল কার্য্যই ধর্ম্মকার্য্য; সুতরাং শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে কার্য্য করাই হিন্দুর অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা প্রকৃত আনুষ্ঠানিক হিন্দুদিগের কথা। হিন্দুরা অবশ্য যুক্তিহীন বিচারের পক্ষপাতী নহেন, তবে যুক্তি বুঝিবার মত জ্ঞান না থাকিলে যুক্তি বুঝিবার সামর্থ্যই হয় না। যে ব্যক্তি চিকিৎসা-শাস্ত্রের কোন জ্ঞানই অর্জ্জন করে নাই, সে যদি বলে, কুইনাইন খাইলে তাহার জ্বর সারিবে কেন, তাহা হইলে তাহাকে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া চিকিৎসকের সাধ্য হইবে না।

কিন্তু যাহারা বলিদান বন্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাঁহারা ধর্ম্মকর্ম্ম যথাযথভাবে করিবার প্রয়োজন কখনই উপলব্ধি করেন না। ডাক্তার আঙ্গলে সারিফ বড় লাটের নিকট যে তার করিয়াছেন, তাহাতেই তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে, মিস্ মেও কালীঘাটের মন্দিরে ছাগ-বলি দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়াছেন, য়ুরোপে India Speaks নামক চলচ্চিত্রে পশুবলির চিত্র দেখাইয়া ভারতের কুৎসা প্রচার করা হইতেছে, অতএব হে বড় লাট, তুমি সত্বর তোমার অতিরিক্ত ক্ষমতার দ্বারা এই পশুবলি বন্ধ করিয়া দাও! দোহাই হুজুর! আমরা তোমার শরণাগত। এই সকল সংস্কারকের নির্ব্বুদ্ধিতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ইঁহারা রাজনীতিক যূপকাষ্ঠে হিন্দুর ধর্ম্মবিধিকে বলি দিতে চাহেন। ইঁহারা কি মনে করেন যে, শক্তিপূজায় পশুবলি বন্ধ করিলে বিদেশে এইরূপ কুৎসা প্রচার করা বন্ধ হইবে? কখনই না। হিন্দুর যত কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, তাহারই বিকৃত চিত্র দেখাইয়া অনেক প্রকারে কুৎসা প্রচার সম্ভব হইবে। তবে কি হিন্দুদিগকে তাহাদের সর্ব্ববিধ বৈশিষ্ট্যকে বর্জ্জন করিয়া একবারে মেকলে-নির্দ্দিষ্ট ভারতীয় নকল সাহেব বনিয়া যাইতে হইবে?

রামচন্দ্র শর্ম্মার অনুচরবর্গ বলেন যে, আমাদের ধর্ম্ম হইতেছে অহিংসামূলক। কেবল এই বলিদান-ব্যাপারটাই উহাতে বাধ ঘটাইতেছে। অতএব উহা বন্ধ কর। এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। অতি প্রাচীনকাল হইতে—এমন কি, স্মরণাতীত কাল হইতে যজ্ঞে পশুবধ হইয়া আসিতেছে। কেবল শক্তিপূজাতেই পশুবলি বিহিত আছে। তন্মধ্যে যাঁহারা সাত্ত্বিকভাবে পূজা করিবেন, মৎস্য-মাংস খাইবেন না, তাঁহারাই কেবল পশুবলি বিনা শক্তি-পূজা করিবার অধিকারী। যাঁহারা আমিষ ভোজন করেন বা আমিষভোজনের স্পৃহা মনে মনে পোষণ করেন, তাঁহারা সাত্ত্বিক পূজার অধিকারী নহেন। কারণ, হিন্দুর মতে এই মানব-দেহটাই সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র দেবালয়। কারণ, এই দেবালয়ে নির্ম্মল পরমাত্মার বাস। শাস্ত্র বলেন, যেমন একই চন্দ্র ভিন্ন ভিন্ন জলাধারে পতিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকাশ পান, সেইরূপ একই পরমাত্মা ভিন্ন ভিন্ন দেহে অবস্থিতি করেন বলিয়া এক হইলেও বহু রূপে প্রকাশ পান। এখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, তবে জীব অপকর্ম্ম করে কেন? উত্তরে ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন যে, প্রকৃতির গুণরাশির দ্বারা কর্ম্মসকল সর্ব্বতোভাবে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। তবে যাহারা অহঙ্কারে বিচারবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে, তাহারাই স্বয়ং কর্ত্তা অর্থাৎ তাহাদের দেহস্থিত পরমাত্মাই কর্ত্তা, ইহা মনে করে। লোক যদি দেবতার প্রসাদ বোধে মাংস খায়, তাহা হইলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না,—হয়ও না! কিন্তু অমেধ্য মাংস ভোজনে বিশেষ ক্ষতি আছে। প্রথমতঃ হিন্দুর লক্ষ্য জীবাত্মায় ও পরমাত্মায় অভেদ-জ্ঞান। সেই জ্ঞান জন্মাইয়া দিবার জন্য বাহ্যপূজা প্রথম সোপান। তখন সাধকের মনে মায়ার বশে ভেদজ্ঞান থাকিলেও তাহার সাধনপদ্ধতি কখনই সাধনার বিষয় হইতে বিভিন্ন ভাবের হইতে পারিবে না। সে নিজে যাহা খাইবে, তাহার ইষ্টদেবতাকে তাহাই খাইতে দিবে। কারণ, তাহার বাহ্য-দেবতা এবং অন্তরের দেবতা এক এবং অভিন্ন। সেটা তাহার জ্ঞান না হইলেও সে ত সাধনায় তাহার বিপরীত পন্থা ধরিতে পারে না। যাহার বলিদানে অরুচি, সে ত অন্য দেবতার পূজা করিতে পারে। তাহার মিছিমিছি অন্যের সাধনপথে ব্যাঘাত ঘটাইবার প্রয়োজন কি আছে? কেবল পরের ক্ষতি করিবার জন্য এরূপ প্রাণাস্তপণ কেন? মহাত্মাও বলিয়াছেন যে, রাম শর্ম্মার উপবাস ভঙ্গ করা উচিত। তথাপি তিনি জুলুম প্রকাশ করিবেন?

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

সূচিপত্র

১৪শ বর্ষ] ১৩৪২ সালের বৈশাখ হইতে আশ্বিন সংখ্যা পর্য্যন্ত [১ম খণ্ড

বিষয়ানুক্রমিক সূচী

বিষয়	লেখকগণের নাম	পত্রাঙ্ক
ধর্ম্ম-প্রবন্ধ—		
১। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা	শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় (অধ্যাপক)	১, ১৭৭, ৩৬১
২। ব্রহ্মসূত্র	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (এম এ)	৬৯, ৩৭৯, ৫৩০, ৭২৮
৩। বৈষ্ণব মতবিবেক	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)	২২৮, ৪৫৫
৪। শ্রীরামকৃষ্ণদেব	শ্রীদুর্গাপদ মিত্র	৭১৭
৫। বিশ্বজননী দুর্গা	স্বামী প্রেমঘনানন্দ	৯০২
সাহিত্য-সন্দর্ভ—		
১। সাহিত্যে হাস্যরস	শ্রীকালিদাস বাগচী (এম, এস, সি)	১২২, ২৮২, ৪৫৮, ৫৯৮
২। সাহিত্যে ধ্বনির আসন	শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায়	২৭১
৩। ন্যায়দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ	শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ (অধ্যাপক)	৮০২
আলোচনা—(সাহিত্যের বৈঠক)		
১। ভক্তিধর্ম্ম ও রাধাভাব	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র (এম-এ)	৯৪
২। ব্রাহ্মণের জীবনবৃত্তি	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (এম-এ)	১২৯
৩। হিন্দু আইন	শ্রীমতিলাল দাশ (এম-এ, বি-এল)	১৯১
৪। সেকালের আমজি	ঐ	২০১
৫। বিধবা-বিবাহ	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (এম এ)	২৬৯
৬। সাহিত্য ও সমাজ	শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ	২৯৯
৭। ভগবদ্‌গীতা ও বাঙ্গালার প্রেমধর্ম্ম	ঐ	৪১৫
৮। হিন্দু-দণ্ডবিধি	শ্রীমতিলাল দাশ (এম-এ, বি-এল)	৪২৭
৯। সেকালের নবাব	ঐ	৬২২
১০। বৌদ্ধধর্ম্ম ও রবীন্দ্রনাথ	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (এম-এ)	৬২৮
১১। জাতি-সংগ্রহ	ঐ	৮০৫
১২। এক এবং দুই	শ্রীদিগ্বিজয় রায় চৌধুরী	৮০৬
শিক্ষা-নিবন্ধ—		
১। ভারতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৬২
২। নারী—পাশ্চাত্য সমাজে ও হিন্দুসমাজে	শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র (এটর্ণী)	৭৪৫
ইতিহাসের অনুসরণ—		
১। সাবুক্তগীন মহম্মদ ঘোরী	শ্রীগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়	৪৫
২। হুগলী জেলার ইতিহাস	শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (জ্যোতীরত্ন)	৪৬, ৮০৪
৩। জাভার জন্মকথা	শ্রীগৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	১০৮
৪। পৃথিবীর প্রাচীনতম সাম্রাজ্য	ঐ	১৮৮, ৪৮৫, ৬৮৭
৫। সভ্যতার পত্তন	ঐ	৬৪৪
রাজনৈতিক-প্রসঙ্গ—		
১। ভারতে সাধারণতন্ত্র	শ্রীপ্রমথভূষণ পাল চৌধুরী (এম-এ, বি-এল)	৪৩
২। স্বাধীনতা ও যুদ্ধবৃত্তি	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৪১৫
৩। ইটালী ও আবিসিনিয়া	ঐ	৭০১
নারী-মন্দির—		
১। বিচিত্ররূপিণী নারী		৮০
২। স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং		৩০২
৩। সাগরের বুকে নারী		৪৩৬
৪। দ্বীপবাসিনী		৬৭৭
৫। কাঞ্চনের মেয়ে		৮৩৩
৬। উত্তর-আফ্রিকার রমণী		১০৪৪
উপন্যাস—		
১। দান-প্রতিদান	শ্রীমতী গিরিবালা দেবী	১৭, ১৯৩, ৩৪৭, ৫৩৯, ৭৪১, ৯০৭
২। পরীস্থান	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৭৪, ২২২, ৪০৭, ৫৭০, ৭১৬, ৯২৩
৩। জীবন-মৃগয়া	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়	৮৩, ২৮৯, ৫০১, ৬৭১, ৮৭২, ১০১৮
৪। বজ্র-বিদ্যুৎ	শ্রীগৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	১৫৯, ৫৪৪, ৫৫২, ৭৫৪, ১০৪২

বিষয়ানুক্রমিক সূচী

বিষয়	লেখকগণের নাম	পত্রাঙ্ক
গল্প—		
১। বিষের ক্রিয়া	শ্রীপ্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়	২৪
২। রঙ্-ছুট্	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	৩৫
৩। সমর্পণ	শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী	৪৯
৪। স্বার্থ প্রয়াস	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৬২
৫। ভাঙ্গা কপাল	শ্রীকালীপদ ঘটক	১০০
৬। ঘরের বউ	শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ (এম-এ)	২০১, ৪৪৭, ৭৭৫
৭। পাতিরাম পাকড়ে	শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	২১২
৮। চুয়াচন্দন	শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (বি এল)	২৩৪
৯। অতীত	শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল	২৬০
১০। জননী জন্মভূমি	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	২৭৭
১১। বলি দেন	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	৩১০
১২। মুক্তি	শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৮৫, ৫৮৭, ৭৫৪
১৩। আত্মদর্শন	শ্রীসর্ব্বাকুমার মিত্র	৪২২
১৪। সামান্য ভুল	শ্রীহেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৩০
১৫। শেষে	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	৪৭১
১৬। একটি ভুল	শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু	৫৪১
১৭। ভালবাসা	শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়	৬১৪
১৮। ঘাতিনী	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৬৩৭
১৯। অগ্নিবাণ	শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (বি-এল)	৮১৫
২০। বিষকন্যা	ঐ	৯১৩
২১। অসিধারা	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু	৯৩১
২২। ক্ষতিপূরণ	শ্রীবিধুভূষণ বসু	৯৪৫
২৩। স্ত্রী	শ্রীচরণদাস ঘোষ	৯৫১
২৪। ঝড়ের দোলায়	শ্রীমৃণাল সর্ব্বাধিকারী (এম-এ)	৯৬০
২৫। অভিশপ্ত	শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী	৯৭১
২৬। সুদেব-দা	শ্রীসুধাংশুকুমার রায় চৌধুরী	৯৮০
২৭। রূপ ও রূপা	শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু	৯৮৫
২৮। ম[illegible]বির স্থান	শ্রীপ্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়	৯৯১
২৯। বান্ধবী	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	৯৯৬
৩০। সর্ব্বহারার সর্ব্বমঙ্গলা	শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১০০৬
৩১। অন্ধ বালিকা	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	১০১২
৩২। আগুন নিয়ে খেলা	শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু	১০২৪
৩৩। সত্যনারায়ণ নাট্যসমিতি	শ্রীঅনঙ্গ মুখোপাধ্যায়	১০৩২
৩৪। তাঁতির মেয়ে	শ্রীগজেন্দ্রনাথ মিত্র (এম-এ)	১০৩৮
বিদেশী গল্প—		
১। যবদ্বীপে অগ্নিস্তম্ভন	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়	১১২
২। ভানুমতী	ঐ	৬০৮
৩। কুড়ানো ঘড়ি	শ্রীবৈকুণ্ঠ শর্ম্মা	৬২৫
৪। চাকরীর বাজার	ঐ	৯২৬
কৃষি শিল্প বাণিজ্য—		
১। গোধাচর্ম্ম-ব্যবসায়	শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত	৫৮
২। সর্ষপ ও সর্ষপতৈল	ঐ	২৫৫
৩। প্রাচীন ভারতে প্রসাধন দ্রব্যাদি	ঐ	৪৭৮
৪। নারিকেলের ব্যবসায়িক প্রাধান্য	ঐ	৭৭০

কবিতা—	কবি	পত্রাঙ্ক
১। রূপকথা	রিয়াজউদ্দীন চৌধুরী	১৬
২। বৈশাখী সরস্বতী	শ্রীগৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	২৩
৩। নাই বা হ'ল	শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়	৩০
৪। অর্দ্ধ কবি	শ্রীঅন্নপূর্ণ ভট্টাচার্য্য (বি, এস-সি)	৭১
৫। ভোরের ডাক	শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৯
৬। আঙ্গিকে পড়িছে মনে	শ্রীমতী প্রতিভা ঘোষ	১৪৩
৭। অতিথি	শ্রীপ্রমথনাথ রায়	১৭৬
৮। অন্ধ	শ্রীকমলকৃষ্ণ মজুমদার	২০০
৯। বনহেনা	শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য (এম-এ)	২২১
১০। ব্যর্থ নয় ভালবাসা	শ্রীবিশ্বনাথ কাব্যবিনোদ	২৩৩
১১। আজ ও কাল	শ্রীরসময় দাস	২৫৪
১২। আমরা ঘুমায়ে থাকি	শ্রীসুবোধ দাশগুপ্ত	২৬৮
১৩। অদেখা	শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার	২৭৬
১৪। কৃষকের দুঃখ	শ্রীবিষাদ চম্পটী	২৮৮
১৫। শকুন্তলা	শ্রীঅতুলচন্দ্র রায়	৩০১
১৬। সিন্ধুপ্রিয়া	শ্রীকমলাকান্ত কাব্যতীর্থ	৩২০
১৭। অদেখা পৃথিবী	শ্রীকরুণাময় বসু	৩৬৬
১৮। শিমুল	শ্রীমতী প্রতিভা ঘোষ	৩৭৮
১৯। দেশবন্ধু তর্পণ	শ্রীকালিদাস রায়	৩৯৯
২০। দুঃখের গর্ব্ব	শ্রীকমলকৃষ্ণ মজুমদার	৪১৪
২১। কারার ডাক	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস	৪২১
২২। মানবতা	শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	৪০৫
২৩। বর্ষা	শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৪৫৪
২৪। দারিদ্র্য	শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৪৫৭
২৫। মেঘদূত	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মৌলিক	৪৮৪
২৬। উচ্ছ্বাস	শ্রীঅমিয়া সেন	৪৮৯
২৭। ফুলের নেশায়	শ্রীপূর্ণেন্দু রায়	৫০০
২৮। আকাশ-রাণী	শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল (এম-এ)	৫০৭
২৯। বিদেশী নায়ে	শ্রীরাজেন্দু দত্ত	৫৩৮
৩০। চিরদিনের আড়ি	শ্রীঅনঙ্গ মুখোপাধ্যায়	৫৬৪
৩১। রজনীকান্ত	শ্রীধরণীন্দ্রনাথ রায় (এম-এ, বি-এল)	৫৭৯
৩২। ছিন্ন কোরক	শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্ত্তী	৫৮৬
৩৩। আত্মীয়া	শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	৬০৭
৩৪। প্রার্থনা	শ্রীহলধর মুখোপাধ্যায়	৬১৩
৩৫। লোকারণ্যে	শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায়	৬৩০
৩৬। সৃষ্টি	শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল (এম এ)	৬৪৭
৩৭। কাঁদিলে যদি	শ্রীমতী প্রতিভা ঘোষ	৬৮৬
৩৮। বিস্মৃত	শ্রীরসময় দাস	৬৯৩
৩৯। প্রেমের সংজ্ঞা	শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ	৭২৭
৪০। দুঃখিনী কৃষাণ	শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত	৭৪৩
৪১। তুমি শুধু নাই	শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায়	৭৪০
৪২। আকুতি	শ্রীসরোজরঞ্জন চৌধুরী	৭৪৫
৪৩। উদ্দেশে	শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়	৭৫৩
৪৪। শিব-তাণ্ডব	শ্রীসুরেশচন্দ্র কবিরত্ন	৭৬৩
৪৫। পুরাতন বন্ধু	শ্রীঅদ্বৈতকুমার সরকার (বি-এল)	৭৬৯
৪৬। বিদায়	শ্রীহলধর মুখোপাধ্যায়	৭৭৪
৪৭। অন্তর যদি	শ্রীদীপঙ্কর বর্ম্মা	৭৯৫
৪৮। স্মৃতি	শ্রীকরুণাময় বসু	৮০৭
৪৯। কামনা	শ্রীমতী অমিয়া সেন	৮১৪
৫০। পরিক্রমা	শ্রীদেবেন্দ্রকুমার নাগ (বি-এ)	৮৪৩

কবিতা	কবি	পত্রাঙ্ক
৫১। স্মৃতির মোহ	শ্রীকমলাকান্ত কাব্যতীর্থ	৮৪৭
৫২। বিদায়	কুমার ভূপেন্দ্রনাথ দাস	৮৫৭
৫৩। শরৎ বিদায়	বন্দে আলি মিয়া	৮৭১
৫৪। আঁধারে	শ্রীমতী প্রতিভা ঘোষ	৮৭৭
৫৫। শরতে	শ্রীকালিদাস রায়	৯০১
৫৬। আবাহন	শ্রীসুবোধ দাশগুপ্ত	৯০৬
৫৭। ভ্রমর	গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	৯১২
৫৮। শেষ-স্বপন	শ্রীসরোজরঞ্জন চৌধুরী	৯৪৪
৫৯। প্রবাসীর প্রিয়া	শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়	৯৫০
৬০। নির্ভয়	শ্রী—	৯৬২
৬১। চিত্ত মোর অন্তর্মুখী	শ্রীকরুণাময় বসু	৯৭০
৬২। শরতে	শ্রীমতী অনিলবালা দেবী	৯৭৯
৬৩। আগমনী	শ্রীগতীন্দ্র সেনগুপ্ত	৯৮৪
৬৪। এস প্রিয়তম	শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায়	৯৯৫
৬৫। বিত্তহীন	শ্রীদেবপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	১০০৫
৬৬। ঘর সাজানো	শ্রীবৈকুণ্ঠ শর্ম্মা	১০১১
৬৭। রূপসী	শ্রীযতীশচন্দ্র চৌধুরী	১০৫১
৬৮। সাঁঝের পথিক	শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৫৯

স্মৃতিকথা—

১। সেকালের স্মৃতি	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়	৭৮৮

সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী—

১। হিমালয়ে পাঁচধাম	শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১১৩, ৪০০, ৫৮০, ৭০৪
২। নেপাল	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	১৪৪
৩। মেইন্	ঐ	৩২৯
৪। হজেরীর মেজোকোভেজড, সহর	ঐ	৪১০
৫। আফ্রিকার অজ্ঞাত অঞ্চলে	শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়	৬৫৮
৬। বৃহত্তর ভারতের আমোদ-প্রমোদ	স্বামী সদানন্দ	৮০৮
৭। পেনসিলভানিয়া	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	৮৫৮

বিজ্ঞান-জগৎ—

বৈশাখ	সম্পাদক	১২
জ্যৈষ্ঠ	"	১৯০
আষাঢ়	"	৪৬৩
শ্রাবণ	"	৬৫১
ভাদ্র	"	৮৭৮
সবাক চিত্র	শ্রীসুকুমার হালদার ও শ্রীনিতাই ঘোষ	২৭৩

অশ্রু-অর্ঘ্য—

১। অধ্যাপক অভয়চরণ মুখোপাধ্যায়	সম্পাদক	১৭৬
২। কবিবর মুখোপাধ্যায়	ঐ	ঐ
৩। রাজা সার হৃষীকেশ লাহা	ঐ	৩৪৯
৪। সত্যচরণ শাস্ত্রী	ঐ	৩৬০
৫। দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	৫২১
৬। জিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	ঐ	৭০৩
৭। ক্ষীরোদগোপাল মিত্র	ঐ	৭১৩
৮। নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত	ঐ	৭১৪
৯। সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু	ঐ	ঐ
১০। সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী	ঐ	৭১৬

বিষয়	লেখকগণের নাম	পত্রাঙ্ক

স্বরলিপি—

১। আইন শাওয়ন বজুরাগ গান—শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সুর—শ্রীভূদেবর চট্টোপাধ্যায়		৭১৫

সাময়িক প্রসঙ্গ— (বর্ণানুক্রমিক)

১। 'অমৃত-বাজারের' দণ্ড	সম্পাদক	১৬৬
২। অসবর্ণ বিবাহ বিল	ঐ	৭০৬
৩। আলীপুর আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্রের মামলা	ঐ	১৭১
৪। উষারাণী হরণের মামলা	ঐ	৭১০
৫। কোয়েটায় ভীষণ ভূমিকম্প	ঐ	৩৫৭
৬। কারামুক্ত জহরলাল নেহেরু	ঐ	১০০
৭। কুরুক্ষেত্রে মসজেদ নির্ম্মাণ	ঐ	ঐ
৮। খোর্দ্দা গোবিন্দপুরের অনাচার	ঐ	১০৬৭
৯। জিন্নার শঙ্কা	ঐ	১৭২
১০। জনমত উপেক্ষা	ঐ	৫২৫
১১। জনশিক্ষা বিস্তারের পথরোধ	ঐ	৭১২
১২। ঝরিয়া খনিতে দুর্ঘটনা	ঐ	৫৩২
১৩। দিনাজপুর প্রাদেশিক সমিতি	ঐ	১৬৭
১৪। ঐ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ	ঐ	১৬৯
১৫। ঐ কৃষিশিল্প-প্রদর্শনী	ঐ	১৭০
১৬। দমদমায় বিমান-বিপত্তি	ঐ	১৭৪
১৭। দেশবন্ধু স্মৃতি-মন্দির	ঐ	৫৩০
১৮। দামোদরের বন্যা	শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা	৮৮৩
১৯। ধর্ম্মানুষ্ঠান বন্ধ	সম্পাদক	৩৫৫
২০। নারী-বিদ্রোহ	ঐ	৫৩১
২১। প্রমথনাথ সরকারের আত্মহত্যা	ঐ	১৭৫
২২। পার্লামেন্টে ইণ্ডিয়া বিল	ঐ	৫২৬
২৩। পাকিস্থান	ঐ	৭০৪
২৪। পশুবলিতে বাধা প্রদান	ঐ	১০৬৮
২৫। ভারত-সচিবের পদে লর্ড জেটল্যাণ্ড	ঐ	৫২৫
২৬। ভারতের নূতন বড়লাট	ঐ	৫২৯
২৭। ভূমিকম্পে শিক্ষা	ঐ	ঐ
২৮। ভারতের ভাবী বড়লাট	ঐ	৭০৭
২৯। বাঙ্গালীর সম্মান	ঐ	১৭২
৩০। বাঙ্গালার নদীপথ	ঐ	১৭৫
৩১। বিনয়কুমার সরকারের বক্তৃতা	ঐ	৩৫৩
৩২। বাঙ্গালায় অশান্তি	ঐ	৩৫৪
৩৩। বিজ্ঞান ও মহাশক্তি	ঐ	৫২৭
৩৪। বাটোয়ারার ব্যবস্থা অনড়	ঐ	৫১০
৩৫। বাঙ্গালার বিকাশসাধিনী ব্যবস্থা	ঐ	৮৯৮
৩৬। বড়লাটের বক্তৃতা	ঐ	১০৬৫
৩৭। মহরমের দাঙ্গা ও মুসলমান নেতা	ঐ	১৭৩
৩৮। মহানদেশন	ঐ	৩৫২
৩৯। মিলনের চেষ্টা	ঐ	৫২৮
৪০। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ	ঐ	৭০৫
৪১। যৌবন-বিবাহের পরিণাম	ঐ	৭০৬
৪২। রজত-জুবিলী	ঐ	১৭৩

বিষয়	লেখকগণের নাম	পত্রাঙ্ক
৪৩। লর্ড সভায় ইণ্ডিয়া বিল	সম্পাদক	৫২৭
৪৪। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর পদত্যাগ	ঐ	১৭১
৪৫। শরৎচন্দ্রের মুক্তিলাভ	ঐ	৭০৪
৪৬। শিক্ষার সঙ্কোচ	ঐ	৮১৫
৪৭। সহশিক্ষার ফলাফল	ঐ	১৬৬
৪৮। সরকারের দমননীতি	ঐ	১৬১
৪৯। সংবাদ প্রকাশ নিষেধ	ঐ	৩৫২
৫০। সত্যমূর্ত্তি প্রকাশ	ঐ	৩৫৫
৫১। সমাজতন্ত্রবাদীদিগের অভ্যুদয়	ঐ	৩৫৬
৫২। সাম্প্রদায়িক পুরস্কার	ঐ	৭০৫
৫৩। সাহীদগঞ্জের হাঙ্গামা	ঐ	৭০৮
৫৪। সরকারের দান	ঐ	৭১১
৫৫। সরকারী দানের অপব্যয়	ঐ	৮২৬
৫৬। সাধারণের নিরাপত্তা-সাধক আইন	ঐ	৮১৭
৫৭। সাংবাদিক সম্মেলন	ঐ	৮১৮
৫৮। সংশোধিত ফৌজদারী আইন	ঐ	১০৬৪
৫৯। সাম্প্রদায়িক বিবাদের ছায়া	ঐ	১০৬৬

বৈদেশিক প্রসঙ্গ— (বর্ণানুক্রমিক)

বিষয়	লেখকগণের নাম	পত্রাঙ্ক
১। আবিসিনিয়ার ভাগ্য	সম্পাদক	১৩৭
২। আবিসিনিয়া ও ইতালী	ঐ	৫১২
৩। আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার ও গ্রন্থ শ্রী কংগ্রেস	ঐ	৫১৬
৪। আর কি আসিবে ফিরে?	ঐ	৬১৫
৫। আরবদিগের জাতীয় আন্দোলন	ঐ	৮৫০
৬। ইরাণে ভূমিকম্প	ঐ	১২২
৭। ইংরাজ ও রুশ	ঐ	৩২৬
৮। ইটালী ও ইথিওপিয়া	ঐ	৬১১, ১০৬০
৯। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স	ঐ	৮৪১
১০। ইটালী ও আবিসিনিয়া	ঐ	৮৫২
১১। ইংলণ্ড ও আয়ার্লণ্ড	ঐ	৮৫৩
১২। একুয়াডরে বিদ্রোহ	ঐ	১৩১
১৩। এসিয়ায় ধর্ম্মভাব	সম্পাদক	৫১৯
১৪। কিউবার বিপ্লব	ঐ	১৩৬
১৫। গগনে ঘনঘটা	ঐ	৪২০
১৬। গ্রেট ব্রিটেন ও জার্ম্মাণী	ঐ	৬১৭
১৭। চীন ও জাপান	ঐ	৫১৭, ৭০০
১৮। চাকো সংগ্রাম	ঐ	৬১৮
১৯। জাপান ও কোরিয়া	ঐ	৮৪৮
২০। জু-ক্ষের নৌবাহিনী সজ্জা	ঐ	৫১১
২১। পিলসুডস্কির তিরোভাব	ঐ	৩২১
২২। প্রাচীতে রাজনৈতিক মেঘ	ঐ	৩২৮
২৩। পৃথিবীব্যাপী শান্তির পরিচয়	ঐ	৫০৮
২৪। ফর্ম্মোজার ভীষণ ভূকম্পন	ঐ	১৩২
২৫। ফাসিজমের বিরুদ্ধে হাঙ্গেরী	ঐ	১৩৮
২৬। ফ্রান্সে ফাসিজম	ঐ	৪০১
২৭। ফ্রান্সে গোলযোগ	ঐ	৬১৬
২৮। ব্রেজিলে এবং মার্কিণে বাণিজ্য-চুক্তি	ঐ	১৫৩
২৯। বালক রাজা	ঐ	১৩১
৩০। বিলাতী মন্ত্রিমণ্ডলীর পরিবর্ত্তন	ঐ	৪১৪
৩১। বিলাতের নূতন মন্ত্রিমণ্ডল	ঐ	৬১৪
৩২। বিস্ময়জনক আবিষ্কার	ঐ	১০৫৪
৩৩। মার্কিণ এবং ফ্রান্স	ঐ	৫১৮
৩৪। যুদ্ধের পর শান্তি	ঐ	৩২৪
৩৫। য়ুরোপের অবস্থা	ঐ	১০৬২
৩৬। রণচণ্ডীর অট্টহাস	ঐ	১৩৪
৩৭। রণডঙ্কার নিনাদ	ঐ	৩২২
৩৮। রোডেসিয়ায় হাঙ্গামা	ঐ	১০৬৩
৩৯। রুমেনিয়ার অবস্থা	ঐ	ঐ
৪০। শ্যামরাজ্যে গোলযোগ	ঐ	৫১৩
৪১। শ্যামরাজ্যে জাতীয়তাবাদ	ঐ	৮৪১
৪২। হেইতির হাঙ্গামা	ঐ	৩২০
৪৩। হিটলারের বাহাদুরী	ঐ	৩২৫
৪৪। হার হিটলারের হুমকী	ঐ	১০৬২

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী

লেখকগণের নাম	বিষয়	পত্রাঙ্ক
শ্রীঅতুলচন্দ্র রায়		
শকুন্তলা	(কবিতা)	৩০১
শ্রীমতী অনিলবালা দেবী		
শরতে	(কবিতা)	৯৭৯
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য		
মানবতা	(কবিতা)	৪৩৫
আত্মীয়া	ঐ	৬০৭
শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্ত্তী		
ছিন্ন কোরক	(কবিতা)	৫৮৯
শ্রীঅমিয়া সেন		
উচ্ছ্বাস	(কবিতা)	৪৮১
কামনা	ঐ	৮১৪
শ্রীঅখিলকুমার সরকার (বি-এল)		
পুরাতন বন্ধু	(কবিতা)	৭৩১
শ্রীঅশ্রুপূর্ণ ভট্টাচার্য্য (বি, এস-সি)		
অর্ঘ্য কবি	(কবিতা)	৭৩
শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল (এম-এ)		
আকাশ রাণী	(কবিতা)	৫০৭
সৃষ্টি	ঐ	৬৪৭
শ্রীঅসময় মুখোপাধ্যায়		
চিরদিনের আড়ি	(কবিতা)	৪৬৪
সত্যনারায়ণ নাট্যসমিতি	(গল্প)	১০০২
শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যোতীরত্ন		
হুগলী জেলার ইতিহাস	(ঐতিহাসিক)	৪৬, ৮০৪
শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ		
প্রেমের সংজ্ঞা	(কবিতা)	৭২৭
শ্রীকমলকৃষ্ণ মজুমদার		
অন্ধ	(কবিতা)	২০০
দুঃখের গর্ব্ব	ঐ	৪১৪
শ্রীকমলাকান্ত কাব্যতীর্থ		
বিশ্বপ্রেম	(কবিতা)	৩২০
স্মৃতির মোহ	ঐ	৮৪৭
শ্রীকরুণাময় বসু		
অদেখা পৃথিবী	(কবিতা)	৩৬৬
স্মৃতি	ঐ	৮০৭
চিত্ত মোর অন্তর্মুখী	ঐ	৯৭০

লেখকগণের নাম	বিষয়	পত্রাঙ্ক
শ্রীকালিদাস রায়		
দেশবন্ধু-তর্পণ	(কবিতা)	৩১৯
শরতে	ঐ	৯০১
শ্রীকালিদাস বাগচী (এম, এস-সি)		
সাহিত্যে হাস্যরস	(প্রবন্ধ)	১২২, ২৮২, ৪৫৮, ৫১৮
শ্রীকালীপদ ঘটক		
ভাঙ্গা কপাল	(গল্প)	১০০
শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়		
বরষা	(কবিতা)	৪৫৪
শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ (এম-এ)		
ঘরের বউ	(বড় গল্প)	২০১,৪৫৭,৭৭৫
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র (এম-এ রায় বাহাদুর)		
ভক্তি ধর্ম্ম ও রাধাভাব	(প্রবন্ধ)	৯৪
তাঁতির মেয়ে	(গল্প)	১০৩৮
শ্রীমতী গিরিবালা দেবী		
দান-প্রতিদান	(উপন্যাস)	১৭, ১৯৩, ৩৬৭, ৫৩৯, ৭৪১, ৯০৭
স্বর্গীয়া গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী		
অমর	(কবিতা)	৯১২
শ্রীগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়		
সাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী	(ঐতিহাসিক)	৪৫
শ্রীচরণদাস ঘোষ		
স্ত্রী	(গল্প)	৯৫১
শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র (এটর্ণী)		
নারী—পাশ্চাত্য ও হিন্দুসমাজে		৭৪৬
শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়		
দারিদ্র্য	(কবিতা)	৪৫৭
শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়		
নাই বা হ'ল	(কবিতা)	৩০
উদ্দেশ্যে	ঐ	৭৫৩
প্রবাসীর প্রিয়া	ঐ	৯৫০
শ্রীদিগ্বিজয় রায় চৌধুরী		
এক এবং দুই	(আলোচনা)	৮০৬
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়—		
জীবন-যুপথা	(উপন্যাস)	৮৬, ২৮৯, ৫০১, ৬৭১, ৮৭২, ১০০৮
যবদ্বীপে অগ্নিগুঞ্জন	(বিদেশী গল্প)	৯১২
ভানুমতী	ঐ	৬০৮
সেকালের স্মৃতি	(স্মৃতিকথা)	৭৮৮
শ্রীদীপঙ্কর বর্ণী		
অন্তর যদি	(কবিতা)	৭৯৫
শ্রীদুর্গাপদ মিত্র		
শ্রীরামকৃষ্ণদেব	(ধর্ম্ম-প্রবন্ধ)	৭১৭
শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়		
বিত্তহীন	(কবিতা)	১০০৫
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু		
অসিধারা	(গল্প)	৯৩১
শ্রীধীরেন্দ্রকুমার নাগ (বি-এ)		
পরিক্রমা	(কবিতা)	৮৪৩

লেখকগণের নাম	বিষয়	পত্রাঙ্ক
শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত		
ভারতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি	(প্রবন্ধ)	৩১
বর্থ প্রয়াস	(গল্প)	৬২
পরীস্থান	(উপন্যাস)	৭৭, ২২২, ৪০৭, ৫৭৩, ৭৯৬, ৯২৩
জননী জন্মভূমি	(গল্প)	২৭৭
স্বাধীনতা ও যুদ্ধবৃত্তি	(প্রবন্ধ)	৪৫৫
ঘাতিনী	(গল্প)	৬৩৭
ইটালী ও আবিসিনিয়া	(রাজনৈতিক)	৭০১
শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত		
গোচর্ম্ম-ব্যবসায়	(প্রবন্ধ)	৫৮
সর্ষপ ও সর্ষপ তৈল	ঐ	২৫৫
প্রাচীন ভারতে প্রসাধন দ্রব্যাদি	ঐ	৪৭৮
নারিকেলের ব্যবসায়িক প্রাধান্য	ঐ	৭৭০
শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ		
ন্যায়দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ	(প্রবন্ধ)	৮০২
শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়		
আফ্রিকার অজ্ঞাত অঞ্চলে	(ভ্রমণ)	৬৪৮
শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী		
সমর্পণ	(গল্প)	৪১
অভিশপ্ত	ঐ	৯৭১
শ্রীপূর্ণেন্দু রায়		
ভুলের নেশায়	(কবিতা)	৫০০
শ্রীমতী প্রতিভা ঘোষ		
শিমুল	(কবিতা)	৩৭৮
আসিলে যদি	ঐ	৬৮৬
আঁধারে	ঐ	৮৭৭
শ্রীপ্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়		
বিশেষ ক্রিয়া	(গল্প)	২৪
দাবির স্থান	ঐ	৯৯১
শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল		
অতীত	(গল্প)	২৬০
শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু		
রূপ ও রূপা	(গল্প)	৯৮৫
শ্রীপ্রমথনাথ রায়		
অতিথি	(কবিতা)	৯৭৬
শ্রীপ্রমথভূষণ পাল চৌধুরী (এম-এ, বি এল)		
ভারতে সাধারণতন্ত্র	(প্রবন্ধ)	৪১
স্বামী প্রেমঘনানন্দ		
বিশ্বজননী দুর্গা	(প্রবন্ধ)	৯০২
শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায় (এম-এ, বি-এল)		
রজনীকান্ত	(কবিতা)	৫৭৯
বন্দে আলি মিয়া		
শরৎ বিদায়	(কবিতা)	৮৭১
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (এম-এ)		
ব্রহ্মসূত্র	(প্রবন্ধ)	৬৯,৩৭১,৫৩৩,৭২৮
ব্রাহ্মণের জীবনবৃত্তি	(প্রবন্ধ)	১২১
বিধবা বিবাহ	(আলোচনা)	২৩৯
বৌদ্ধধর্ম্ম ও রবীন্দ্রনাথ	ঐ	৬২৮
শ্রুতি-সংগ্রহ	(সমালোচনা)	৮০৫

লেখকগণের নাম	বিষয়	পত্রাঙ্ক
শ্রীবাসন্তীকুমার ভট্টাচার্য্য (এম-এ)		
বসন্তসেনা	(কবিতা)	২২৭
শ্রীবিধুভূষণ বসু		
ফণিভূষণ	(গল্প)	৯৪৫
শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় (অধ্যাপক)		
শ্রীরামকৃষ্ণ কথা	(ভক্তিসন্দর্ভ)	১, ১৭৭, ৩৬১
শ্রীবিশ্বনাথ কাব্যবিনোদ		
বর্থে নয় মোর ভালবাসা	(কবিতা)	২৩৩
শ্রীবিষাদ চক্রবর্তী		
কৃষকের দুঃখ	(কবিতা)	২৮৮
শ্রীবৈকুণ্ঠ শর্ম্মা		
কুড়ানো ঘড়ি	(বিদেশী গল্প)	৬২৪
চাকরীর বাজার	ঐ	৬২৬
ঘর সাজানো	(কবিতা)	১০১১
কুমার ভূপেন্দ্রনাথ দাস		
বিদায়	(কবিতা)	৮৫৭
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়		
পাতিরাম পাকড়ে	(গল্প)	২১২
মুক্তি	(গল্প)	৩৮৫, ৫৮৭, ৭৪৪
সর্ব্বহারার সর্ব্বমঙ্গলা	(গল্প)	১০০৩
শ্রীমতিলাল দাশ (এম-এ, বি-এল)		
হিন্দু আইন	(প্রবন্ধ)	১৪১
সেকালের আরজি	ঐ	২০১
হিন্দুদণ্ডবিধি	ঐ	৪২৭
সেকালের জবাব	ঐ	৬২২
শ্রীমৃণাল সর্ব্বাধিকারী (এম-এ)		
ঝড়ের দোলায়	(গল্প)	৯৬৭
শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায়		
শোকারণ্য	(কবিতা)	৬৩০
তুমি শুধু নাই	ঐ	৭৪০
এস প্রিয়তম	ঐ	৯৯৭
শ্রীযতীন্দ্র সেনগুপ্ত		
আগমনী	(কবিতা)	৯৮৪
শ্রীসতীশচন্দ্র চৌধুরী		
রূপসী	(কবিতা)	১০৫১
শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ (রায় বাহাদুর)		
সাহিত্য ও সমাজ	(আলোচনা)	২১৬
ভগবদ্গীতা ও বাঙ্গালার প্রেমধর্ম্ম	(আলোচনা)	৪১৫
শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়		
আইল শাওন	(গান)	৭১৫
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়		
ভালবাসা	(গল্প)	৬১৪
শ্রীরসময় দাস		
আজ ও কাল	(কবিতা)	২৫৪
বিস্মৃত	ঐ	৬৯৩
শ্রীরাধেন্দু দত্ত		
বিদেশী নায়ে	(কবিতা)	৫৩৮

লেখকগণের নাম	বিষয়	পত্রাঙ্ক
রয়াজ উদ্দীন চৌধুরী		
রূপকথা	(কবিতা)	১৬
শ্রীমতী লতিকা ঘোষ		
আজিকে পড়িছে মনে	(কবিতা)	১৪৩
ঐ—		
নির্ভয়	(কবিতা)	৯৬২
শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (বি-এল)		
চুয়া-চন্দন	(গল্প)	২০৪
অগ্নিবাণ	ঐ	৮১৫
বিষকন্যা	(বড় গল্প)	৯১০
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)		
বৈষ্ণব-মতবিবেক	(প্রবন্ধ)	২২৮, ৫৬৫
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মৌলিক (এম-এ, বি-এল)		
মেঘদূত	(কবিতা)	৪৮৪
শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু (বি-এ, সাহিত্যরত্ন)		
একটি ভুল	(গল্প)	৫৪৯
আগুন নিয়ে খেলা	(গল্প)	১০২৪
শ্রীসরোজনাথ ঘোষ		
নেপাল	(সচিত্র ভ্রমণ)	১৪৫
মেইন	ঐ	৩২৯
হার্জেগীর মেজোকোভেজড	ঐ	৪৯০
পেনসিলভানিয়া	ঐ	৮৫৮
বান্ধবী	(গল্প)	৯৯৬
শ্রীসরোজরঞ্জন চৌধুরী		
আকুতি	(কবিতা)	৭৪৫
শেষ সম্বল	ঐ	৯৪৪
শ্রীসুবোধ দাশগুপ্ত		
আমরা ঘুমায়ে থাকি	(কবিতা)	২৬৮
আবাহন	ঐ	৯০৬
শ্রীসুকুমার হালদার ও শ্রীনিতাই ঘোষ		
সবাক চিত্র	(প্রবন্ধ)	২৭৩
শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার		
অদেখা	(কবিতা)	২৭৬
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস		
কাহার ডাক	(কবিতা)	৫২১
শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ কবিরত্ন		
শিব-তাণ্ডব	(কবিতা)	৭৬৩
শ্রীসুধাংশুকুমার রায় চৌধুরী		
সুদেব-দা	(গল্প)	৯৮০
শ্রীসুধাকুমার মিত্র		
আত্মদর্শন	(গল্প)	৪২২
শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য		
হিমালয়ে পাঁচধাম	(ভ্রমণ)	১১৬, ৪০০, ৫৮০, ৭০৪
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য		
বৈশাখী বসুমতী	(কবিতা)	২০
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়		
রঙ-ছুট	(গল্প)	৩৫
তাহার জন্মকথা	(ঐতিহাসিক)	১০৮
বজ্র-বিদ্যুৎ	(উপন্যাস)	১৫৯, ৩৪৩, ৫২২, ৭০৪, ১০৫২
পৃথিবীর প্রাচীনতম সাম্রাজ্য	(ঐতিহাসিক)	১৮৮, ৪৮৫, ৬৮৭
মলি সেন	(গল্প)	৩১০
শেষে	(গল্প)	৪৭১
সভ্যতার পত্তন	(ঐতিহাসিক)	৮৪৪
অন্ধ বালিকা	(গল্প)	১০১২
স্বামী সদানন্দ		
বৃহত্তর ভারতের আমোদপ্রমোদ	(প্রবন্ধ)	৮০৮
শ্রীহলধর মুখোপাধ্যায়		
প্রার্থনা	(কবিতা)	৬১৩
বিদায়	ঐ	৭৭৪
শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায়		
সাহিত্যের ধ্বনির আসন	(আলোচনা)	২৭১
শ্রীহেমলতাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়		
সামান্য ভুল	(গল্প)	৪৩০
শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়		
ভোরের ডাক	(কবিতা)	৭৯
সাঁঝের পথিক	ঐ	১০৫৯
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত		
দুঃখিনী কৃষ্ণদাস	(কবিতা)	৭৩৩

চিত্রসূচী—বিষয়ানুক্রমিক

চিত্র	শিল্পী	পৃষ্ঠা
সুরঞ্জিত চিত্র ঃ—		
১। ...পাখরী	মিঃ টমাস	১
২। স্নেহাশ্রয়	শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ	৫৩
৩। জীবন-সাথী	শ্রীভূপতিনাথ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী	১২৫
৪ কূয়ার ধারে	মিঃ টমাস	১৭৭
৫। তরঙ্গ-দেবতা	শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২২৯
৬। দীঘির কালো জলে	শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৩১৭
৭। শুধু অকারণ পুলকে	মি. টমাস	৩৬১
৮। মীরা	শ্রীঅরুণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪১৩
৯। খেলার সাথী	শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৪৭৭
১০। হাসিয়েছিল কোন্ কথাতে	মিঃ টমাস	৫৩৩
১১। সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী	শ্রীঅম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তী	৫৯৩
১২। পল্লীবধূ	শ্রীকমলাকান্ত ঠাকুর	৬৪১
১৩। পদ্মপঙ্কজ	মিঃ টমাস	৭১৭
১৪। ধান কাটা হলো সারা	শ্রীইন্দুভূষণ সেন	৭৭৭
১৫। পল্লীর ঘাটে	শ্রীকালী কর	৮২৫
১৬। আনন্দময়ীর আগমনে	শ্রীইন্দুভূষণ সেন	৯০১
১৭। স্নেহ-বারি	মিঃ টমাস	৯৬১
১৮। চিরজীবনের স্বপ্নস্মৃতি	শ্রীচারুচন্দ্র সেন	১০১৭
দেবদেবীর চিত্র ঃ—		
১। শ্রীরামকৃষ্ণদেব		২
২। শ্রীশ্রীভবতারিণী		৯
৩। যীশুখৃষ্ট		১৮০
৪। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব		১৮৩
দেশনায়কগণের চিত্র ঃ—		
১। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়		৫
২। স্বামী বিবেকানন্দ		৭
৩। কেশবচন্দ্র সেন		ঐ
৪। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত		৮
৫। স্বামী ব্রহ্মানন্দ		ঐ
৬। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু		১৭১, ৭৫৪
৭। মিঃ মহম্মদ আলি জিন্না		৭২
৮। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর		১৮২
৯। মহাত্মা গান্ধী		৩৫৫
১০। ডাক্তার আনসারী		৩৫৫
১১। শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তি		ঐ
১২। " রাজা গোপালাচারী		ঐ
১৩। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ		৩৯১, ৫৫০
১৪। নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত		৭১৪
১৫। সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী		৭১৬
১৬। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ		৭৮৮
১৭। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়		৭৯০
১৮। মনোমোহন ঘোষ		ঐ
১৯। লালমোহন ঘোষ		ঐ
২০। আনন্দমোহন বসু		ঐ
২১। কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়		৭৯১
২২। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়		ঐ
২৩। ভূপেন্দ্রনাথ বসু		৭৯২
২৪। দাদা ভাই নৌরোজী		ঐ
২৫। বদরুদ্দীন তায়েবজী		ঐ
২৬। বাল গঙ্গাধর তিলক		ঐ
২৭। ফিরোজ সা মেটা		ঐ
২৮। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়		৮৯৫
২৯। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু		৯০০

চিত্র	পৃষ্ঠা
বৈদেশিক	
দেশনায়ক-চিত্র ঃ—	
। বর্ডেন হাল	১৩৩
। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট	ঐ
৩। হার হিটলার	১৩৪, ৩২৫
৪। সার জন সাইমন	১৩৪, ৫১৫
৫। ম'সিয়ে লাভাল	১৩৫, ৬৯৬, ৮৫৪
৬। প্রেসিডেন্ট কার্লো মেন্ডিয়েটা	১৩৬
৭। জুলিয়াস্ গম্বোস	১৩৮
৮। রাজা প্রজাধিপক	১৩৯
৯। আনস্লাইকল	ঐ
১০। শিশুরাজা পিটার	১৪০
১১। রাজা কেরল	ঐ
১২। সম্রাট পঞ্চম জর্জ	১৭৩
১৩। সাম্রাজ্ঞী মেরী	ঐ
১৪। মার্শাল পিলসুড্স্কি	৩২১
১৫। সেনর মুসোলিনী	৩২২, ৭০২, ৮৫৪
১৬। এমিলিও ডি বোনো	৩২২
১৭। সেনাপতি গ্রেজিয়ানী	৩২৩
১৮। এন্টনি ইডেন	৩২৭, ৫১৪, ৮৫৪
১৯। মোলোটভ	৩২৭
২০। ষ্টালিন	৩২৭, ৮৫২
২১। লিটভিনফ	৩২৭
২২। হিরোটা	৩২৮
২৩। ডুমার্গ	৫১১
২৪। ম'সিয়ে ফ্লাণ্ডিন	৫১১, ৬৯৬
২৫। মিঃ বল্ডুইন	৫১৪
২৬। মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড	ঐ
২৭। লর্ড লেটগাও	ঐ
২৮। লর্ড হেলসাম	৫১৫
২৯। লর্ড হ্যালিফাক্স	ঐ
৩০। লর্ড লণ্ডনডেরী	ঐ
৩১। মিঃ নেভিল চেম্বারলেন	ঐ
৩২। সার স্যামুয়েল হোর	৫২৬, ৮৫১
৩৩। আইনষ্টিন	৫২৮
৩৪। লর্ড উইলিংডন	৫২৯
৩৫। লর্ড লিংলিথগো	৫২৯, ৭০৭
৩৬। হার রিবেনট্রপ	৬৯৭
৩৭। ক্যাপ্টেন রোহম্	৬৯৮
৩৮। আবিসিনিয়ার সম্রাট রাস তফারী	৭০২, ৮৫৫
৩৯। ব্যারণ এলয়সি	৮৫৫
৪০। আবিসিনিয়ার রাণী	৮৫৫
৪১। ডি, ভ্যালেরা	৮৫৬
৪২। ইওইন ওডাফি	৮৫৭

চিত্র	পৃষ্ঠা
বিশিষ্টগণের চিত্র ঃ—	
১। অক্ষয়কুমার সেন	৬
২। দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার	ঐ
৩। শ্রীযুত তুষারকান্তি ঘোষ	১৬৬
৪। ডাক্তার ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত	১৬৮
৫। শ্রীযুত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১৬৯
৬। ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	১৭২
৭। দেবকুমার রায়	১৭৪
৮। বিনয়কুমার দাস	ঐ
৯। মিঃ পি, গুপ্ত	১৭৫
১০। ৺ বরদ মুখোপাধ্যায়	১৭৬
১১। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি	১৭৮
১২। শ্রীযুত বিনয়কুমার সরকার	৩৫৩
১৩। রাজা হৃষীকেশ লাহা	৩৫৯
১৪। পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী	৩৬০
১৫। হৃদয়নাথ	৩৬৬
১৬। ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকার	৩৬৪
১৭। দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫২১
১৮। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭০৩
১৯। ডাক্তার ভগবান দাস	৭০৬
২০। ক্ষীরোদগোপাল মিত্র (কর্ম্মজীবনে)	৭১৩
২১। ঐ (১৮ বৎসর বয়সে)	ঐ
২২। ঐ (৮১ বৎসর বয়সে)	ঐ
২৩। সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু	৭১৪
২৪। নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ	৭১৮
২৫। বরোদার মহারাজ	৭১৯
২৬। শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	৮৯৭
২৭। শ্রীযুত চিন্তামণি	৮৯৯
ভারতীয় নারী চিত্র ঃ—	
১। শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়	৩৫৬
২। শ্রীমতী কমলা নেহরু	৯০০
বিভিন্নদেশের নর-নারী—	
১। মাওরি রমণী	৮০
২। নিউজীল্যাণ্ডের মাওরি নারী	৮১
৩। মাওরি সুন্দরী	৮২
৪। বোর্নিও বালা	ঐ
৫। টোঙ্গা রূপসী	৮৩
৬। সামোয়াদ্বীপের কিশোরী	ঐ
৭। আলজিরিয়ার রূপসী	৮৪
৮। কাফ্রী সুন্দরীর কেশবিন্যাস	ঐ
৯। কেরোলাইন সুন্দরী	৮৫
১০। আরিজোনার কুমারী	ঐ
১১। নেপালের ভর্তা	১৫৭

চিত্র	পৃষ্ঠা
১২। ভারবাহিকা নেপালী রমণী	১৫১
১৩। নেপালী ছাত্র	১৫৭
১৪। হিমালয়বাসী বিভিন্ন উপজাতির প্রতিনিধি	ঐ
১৫। শ্যামদেশীয়া কিশোরী ফুলসাজে	৩০২
১৬। শিশু মোরেল	৩০৩
১৭। জেনাপের জন্ম	ঐ
১৮। কাবিল সুন্দরী	৩০৪
১৯। আলজিরিয়ার সালঙ্কারা বালিকা	ঐ
২০। জাপানের চাষার মেয়ে	৩০৫
২১। আলজিরিয়ার রূপসী	ঐ
২২। ওসিয়োনা কুমারী	৩০৬
২৩। জেকোস্লোভাকিয়ার বিলাসিনী	৩০৭
২৪। জানজিবার-জায়া	৩০৮
২৫। পাথরে সাঁতার-দক্ষা	৩০৯
২৬। 'এক খুন মাফ তোবড়া'	৪৩৮
২৭। তাহিতি কন্যা	ঐ
২৮। টোঙ্গা নারী	৪৩৯
২৯। নুতাঙ্গী হাওয়াই রূপসী	ঐ
৩০। হাওয়াই-নাচের আসর	৪৪০
৩১। শ্যামদেশীয়া নারীর পানীয় রচনা	৪৪১
৩২। " বেশভূষা	৪৪২
৩৩। তৌপন্	৪৪৩
৩৪। পাদেনা নারীর বাহার	[illegible]
৩৫। হাওয়াই দ্বীপে জলনা	৪৪৫
৩৬। শ্যামদেশীয়া প্রেমিকা	৪৪৬
৩৭। বালিসের উপর শিশু	৪১০
৩৮। মোজেকোভেজড্ তরুণী	৪১১
৩৯। " ঐ যুবক	ঐ
৪০। " তরুণীর নামাঙ্কিত শয্যা	৪১২
৪১। " তরুণীগণ	ঐ
৪২। " বিবাহিতাদের বিচিত্র টুপী	৪১৫
৪৩। " বালক-বালিকা	ঐ
৪৪। " মাতা ও পুত্র	৪১৮
৪৫। হাঙ্গেরীর তরুণ-তরুণী	ঐ
৪৬। সুবেশা যুবতী ও যুবক	ঐ
৪৭। হাঙ্গেরীর দম্পতি বিবাহ-বেশে	৪১৯
৪৮। " মাতা পুত্র ও শিশু	ঐ
৪৯। " মাতার তিরস্কার	ঐ
৫০। " পিতামহ ও পৌত্রী	৫০০
৫১। আফ্রিকার সর্দ্দার ও তিন স্ত্রী	৬৫০
৫২। " রমণীদের রূপসজ্জা	৬৫১
৫৩। টারসেবী নারীর পোষাক	ঐ
৫৪। কুলাই রমণীদের গৃহকার্য্য	৬৫২
৫৫। কোয়াগাই যুবক-যুবতী	৬৫৩
৫৬। " রমণীর প্রসাধন	ঐ

চিত্র — পৃষ্ঠা

৫৭। কুলাহ্ নারীর কেশপ্রসাধন — ৬৫৪
৫৮। কুলাহ্ নৃত্যে বিকট ভঙ্গী — ঐ
৫৯। কোদগাই যুবকদল — ৬৫৫
৬০। কুলাহ্ মোরগ-নৃত্য — ঐ
৬১। পোষাক-পরিহিতা রমণী — ৬৫৮
৬২। বানারীর যুবকের শোভা — ৬৫৯
৬৩। বানারীর অলঙ্কার-বৈচিত্র্য — ঐ
৬৪। মল পায়ে বানারী রমণী — ৬৬২
৬৫। মোটবাহকা বানারী নারী — ৬৬৩
৬৬। রন্ধনের পর কায়ুগাই-গৃহিণী — ৬৬৪
৬৭। সাঙ্গালনের নারীর শিরোভূষণ — ৬৬৬
৬৮। 'আলোকপ্রাপ্ত' কোনিয়াগুই যুবক — ঐ
৬৯। কোনিয়াগুই তরুণী — ৬৬৭
৭০। ড্রিয়াকাদের তরুণী — ঐ
৭১। কুলাহ্ তরুণী — ৬৬৮
৭২। নিউজীলাণ্ডে নারীনৃত্য — ৬৭৭
৭৩। ফিজিদ্বীপে জেলের মেয়ে — ৬৭৮
৭৪। ফিজি-কুমারী — ঐ
৭৫। লকা লাকা নাচ — ৬৭৯
৭৬। আডমিরালটি কিশোরী — ৬৮০
৭৭। ফিজি কুমারীর অলক — ৬৮১
৭৮। মিসিরেলের সেরা সুন্দরী — ৬৮২
৭৯। " তরুণী — ঐ
৮০। মার্শালদের বনেদী মেয়ে — ৬৮৩
৮১। 'ঢেকে দিবে সব লাজ' — ৬৮৪
৮২। মাউর দ্বীপের মা ও ছেলে — ঐ
৮৩। সংশোধন-বিলাসিনী — ৬৮৫
৮৪। মাউর যুবতী — ঐ
৮৫। গাঃ সুলতানের পত্নীগণ — ৮৩৬
৮৬। উগাণ্ডা যুবতী — ঐ
৮৭। উগাণ্ডা নারীর কর্ণভূষণ — ঐ
৮৮। কিকুয়ু নারী — ৮৩৭
৮৯। কিকুয় সর্দারের কন্যাগণ — ৮৩৮
৯০। মাশাই কুমারী — ৮৩৯
৯১। মাশাই নারী — ঐ
৯২। শিগমী-জাতের মেয়ে — ৮৪০
৯৩। বকো—সাকারা জাতের মেয়ে — ৮৪১
৯৪। বাঙ্গালা-দম্পতি — ৮৪২
৯৫। শাঙ্কো নারীর কেশদাম — ৮৪৩
৯৬। জাবিলটনের অদ্ভীর কারখানার নারী-শিল্পী — ৮৪৩
৯৭। মিশর নারী—কায়রোর পথে — ১০৪৬
৯৮। মুর-নারীর চলাফেরা — ঐ
৯৯। বেদুইন-নারী—মিশরে — ১০৪৬
১০০। দক্ষিণ আলজিরিয়ার মা ও ছেলে — ঐ
১০১। আলজিরিয়া রূপসী — ১০৪৭
১০২। আলজিরিয়া বধূ — ঐ
১০৩। ঐ কুমারী — ১০৪৮
১০৪। মরক্কো রূপসী — ঐ
১০৫। মুর নর্তকী — ১০৪৯

কাহিনীর চিত্র ঃ—

১। উত্তাপ সহনাতীত — ১১৩
২। জলন্ত অঙ্গারস্তূপ — ১১৪
৩। ত্র্যংশের মিঃ গ্রীড — ৫০২
৪। ফকীর যন্ত্রণায় বে-এক্তার — ৬০১
৫। হাওয়ার ভিতর পুতুল — ৬১০
৬। বক্ষে ওষ্ঠ চেয়া চিহ্ন — ৬১২
৭। অদৃশ্য হস্তের উৎপীড়নে — ঐ

ঐতিহাসিক চিত্র ঃ—

১। সিন্ধুর বুকে সিন্ধু (মানচিত্র) — ৪০৭
২। চীনের প্রাচীর — ৬৮৮
৩। হুয়াং নদীর তীর — ৬৮৯
৪। চীনের সুরাপাত্র — ঐ
৫। ঐ পিত্তলের ঐ — ঐ
৬। প্রাচীন চীনের ঘোরা — ৬৯০
৭। " " রণ-কুঠার — ৬৯১
৮। " " অস্ত্র — ঐ
৯। কাম্বোদেশ (মানচিত্র) — ৮৩৫
১০। আবিসিনিয়ার মানচিত্র — ৮৪৩

অভিনয়-চিত্র ঃ—

১। যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপের ঐকতান বাদন — ৮০৮
২। ভাবের অভিব্যক্তি — ৮০৯
৩। বলিদ্বীপের নৃত্য — ৮১০
৪। ওয়াজাং নর্ত্তক — ৮১১
৫। অভিনেতৃগণের মুখোস — ৮১২
৬। নাদ ও শিবপ্রভার পুতুল-নাচ — ৮১৩
৭। জরাসন্ধের পুতুল-নাচ — ঐ
৮। যবদ্বীপের অভিনেতা — ৮১৪

বৃক্ষলতা-চিত্র ঃ—

১। বাঙ্গালার সরিষা গাছ — ২৫৫
২। " রাই সরিষা গাছ — ২৫৬
৩। অগুরু বৃক্ষ — ৪৮১
৪। কুমুম গাছ — ৪৮২
৫। পদ্মফুল — ঐ
৬। চন্দন গাছ — ৪৮৩
৭। চন্দ্রমুল — ঐ
৮। পাইন ও চীর বৃক্ষ — ৫৮০
৯। কুক্সবার্গের পাইন বৃক্ষ — ৮৪২

চিত্র — পৃষ্ঠা

প্রাণি-চিত্র ঃ—

১। সাধারণ গোধা — ৫৯
২। পিপীলিকাভুক পক্ষী — ৩৩৪
৩। বিচিত্র জীব — ৬০০
৪। সাত ফুট ঈগলপাখী — ৬৬২
৫। গিনির বন্য মোরগ — ৬৬৭
৬। পেনসিলভানিয়ার কুকুর ও শিকারী — ৮৫১
৭। ক্যামেরা-শিক্ষিত কুকুর — ৮৬০

ব্যঙ্গ-চিত্র ঃ—

১। জমের ঝড় শ্রীশৈলেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী বি-এ — ১০৩১

সাময়িক চিত্র ঃ—

১। ভূমিকম্পে আইভগণ স্থানান্তরিত — ৩৫৮
২। কোয়েটার বিমানাশ্রয় — ঐ
৩। স্থানান্তরিত বিশ্বলোর্ধেকার কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় — ৫১৬
৪। লাহোর সাহিদগঞ্জ মসজেদ — ৭০৮
৫। " চিরাগসাহ মসজেদ — ৭০৯
৬। দামোদর বন্যায় বিধ্বস্ত দক্ষিণ-বর্দ্ধমানের গ্রাম — ৮৮৩
৭। মদনপুর গ্রামের ধ্বংসাবশেষ — ৮৮৪
৮। জঙ্গালের নিকটবর্ত্তী গ্রামের গৃহহীনগণ — ৮৮৫
৯। বন্যাবিপন্ন পরিবার — ৮৮৬
১০। গোমতী-প্লাবনে গৃহস্থের অবস্থা — ৮৮৭
১১। বন্যায় একটি গৃহের দৃশ্য — ৮৮৮
১২। বন্যার দৃশ্য — ঐ
১৩। বিধ্বস্ত ঘরের চালে — ৮৮৯
১৪। কেশবগঞ্জের দুর্দ্দশা — ৮৯০
১৫। বন্যাবিপন্ন বর্দ্ধমানের গ্রাম — ৮৯১
১৬। বন্যায় তারকনাথের মন্দির — ৮৯২
১৭। বন্যায় বর্দ্ধমানের অপর দৃশ্য — ৮৯৩
১৮। বন্যাপ্লাবিত গ্রাম — ঐ
১৯। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে জলপ্রবাহ — ৮৯৪

বৈজ্ঞানিক চিত্র ঃ—

১। বহু হাতবিশিষ্ট মোটর — ১২
২। বিচিত্র শ্রী এঞ্জিন — ঐ
৩। বস্ত্র শুকাইবার ব্যবস্থা — ঐ
৪। তিন চাকার অশ্ববাহী গাড়ী — ঐ
৫। অপরাধী ধরবার ফাঁদ — ১৩
৬। জল ও অগ্নি-নিবারক — ঐ
৭। আলোকদীপ্ত পিঞ্জর — ঐ
৮। মোটর-চালিত জলযান — ১৪
৯। বায় বাক্সর বিভিন্ন ব্যবস্থা — ঐ

চিত্র	পৃষ্ঠা
১০। বিংশের জলক্রীড়া	১৪
১১। বালক-নির্ম্মিত দূরবীক্ষণ	১৫
১২। সূর্য্যালোকপ্রভাবে মোটর পরিচালন	ঐ
১৩। ক্ষুদ্র মোটর-যন্ত্রের শক্তি	ঐ
১৪। লক্ষ্যভেদের ব্যবস্থা	১১০
১৫। পীড়িত-বহনকারী যান	ঐ
১৬। চারিতল পথ	ঐ
১৭। চাকার উপর ছাত্রাবাস	১১১
১৮। কাঠের গুঁড়ির কামান	ঐ
১৯। কুক্কুরশাবক বাঁচাইবার ব্যবস্থা	ঐ
২০। [illegible]	ঐ
২১। বিমান-অবতরণের ব্যবস্থা	১১২
২২। বোম্বেটের দুর্গে পান্থনিবাস	ঐ
২৩। সবাক চিত্রপ্রদর্শন যন্ত্র	২৭৩
২৪। " হর্ণ	২৭৪
২৫। " ফেডার	ঐ
২৬। " এ্যামপ্লিফায়ার বোর্ড	২৭৫
২৭। ওয়েষ্টার্ণ ইলেকট্রিক ফটো সেল	ঐ
২৮। ভারী গ্যাস-ট্যাঙ্ক বহন	৪৫৬
২৯। ডাকচিঠিগাহী ট্রেন	ঐ
৩০। তুষাররাজ্যের বিমান	ঐ
৩১। চায়ের চামচে পক্ষী	৪৫৭
৩২। সকল মাথার টুপী	ঐ
৩৩। আলোকোৎপাদক কোমরবন্ধ	ঐ
৩৪। শস্যসঞ্জাত শিল্প	৪৫৮
৩৫। অগ্নিনিবারক বস্ত্রখণ্ড	ঐ
৩৬। মোটরযুক্ত চেয়ার	ঐ
৩৭। মোটর-দৌড়ের মুখোস	ঐ
৩৮। আধ মিনিটে বাঁধান ফটো	৪৬১
৩৯। মৃত্তিকাহীন উদ্যানের গাছপালা	ঐ
৪০। অভিনব বেহালা	ঐ
৪১। কাক তাড়াইবার মার্জ্জার	৪৭০
৪২। আগাছা ধ্বংসের পিস্তল	৪৭০
৪৩। আলোকদীপ্ত ফুল	ঐ
৪৪। আধুনিকতম দ্বিচক্রযান	৬০১
৪৫। বোমাবর্ষণের বিমান	ঐ
৪৬। পক্ষিপালন ব্যবস্থা	ঐ
৪৭। মুক্তাহারের নমুনা	৬০২
৪৮। পৃথিবীর সময়নির্দ্দেশ	ঐ
৪৯। নূতন ধরণের গাড়ী	৬০৩
৫০। ভূপ্রদক্ষিণে অতিকায় বিমান	ঐ
৫১। মোটর-চালিত দ্বিচক্রযান	৬০৪
৫২। জীবনরক্ষক তরণী	ঐ
৫৩ প্যারাসুট ব্যবহার	ঐ
৫৪ নৌকায় আধুনিক পাল	৬০৫
৫৫। সন্তরণ-শিক্ষার উপায়	৬০৫
৫৬। নূতন দ্বিচক্রযান	ঐ
৫৭। মোমবাতির ঘড়ি	৬১৬
৫৮। লতাগুল্মের উচ্ছেদে	ঐ
৫৯। ছবির কৌশল	ঐ
৬০। ক্যামেরা সাহায্যে চতুর দৃশ্য	৮৭৮
৬১। জলে ভাসিয়া মৎস্য শিকার	ঐ
৬২। তুষার-যান	৮৭৯
৬৩। মোটর-সাইকেলে বন্দুক	ঐ
৬৪। ধূলা-নিরোধ মুখোস	ঐ
৬৫। মোটরের আসনে শয্যা	ঐ
৬৬। অভিনব উপাধান	৮৮০
৬৭। বিজ্ঞাপনের কৌশল	ঐ
৬৮। অপরাধী-গ্রেপ্তারে কুকুর	ঐ
৬৯। মুষ্টিযোদ্ধার মুখোস	৮৮১
৭০। দ্রুতগামী মোটর	ঐ
৭১। ডিমভাঙ্গা যন্ত্র	ঐ
৭২। বিমানধ্বংসী কামান	ঐ
৭৩। পিয়ানোর সুর	৮৮২
৭৪। রেশমজাত কাচ	ঐ
৭৫। আবর্জ্জনায় গৃহনির্ম্মাণ	ঐ

দৃশ্য চিত্র ঃ—

চিত্র	পৃষ্ঠা
১। শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির	১
২। তুষার-শোভী পাহাড়	১১৬
৩। জাংলা চটীর ধারে গঙ্গা	১১৭
৪। ভৈরবঘাটীর অধিত্যকা হইতে গঙ্গা	১১৮
৫। ঐ লৌহসেতু	ঐ
৬। গঙ্গোত্রীর গঙ্গামন্দির—পশ্চাৎ দৃশ্য	১১৯
৭। গঙ্গামন্দির—গঙ্গোত্রী	ঐ
৮। গঙ্গোত্রীর গঙ্গা	১২০
৯। তুষারপাতের পর	১২১
১০। কাটামুণ্ড সহর	১৪৪
১১। ঐ পথে পরিব্রাজক	১৪৫
১২। পশুপতিনাথের মন্দির	ঐ
১৩। নেপালী কুলি	১৪৬
১৪। ঐ কৃষক	ঐ
১৫। ঐ গুর্খা	১৪৭
১৬। নেপাল রাজপ্রাসাদ	ঐ
১৭। রাজা ভূপতীন্দ্র মল্লের মূর্ত্তি	১৪৮
১৮। কাটামুণ্ডুর শস্যক্ষেত্র	১৪৯
১৯। হস্তিপৃষ্ঠ সাহায্যে ব্যাঘ্র-শিকার	১৫০
২০। কাটামুণ্ড উপত্যকা-পথে	ঐ
২১। নেপালী সৈন্য	১৫১
২২। বৌদ্ধস্তূপ	১৫২
২৩। নেপালী মন্দির-তৈজস	১৫৩
২৪। নেপালী সং	১৫৪
২৫। ভাটগাঁওয়ের মন্দির	ঐ
২৬। নেপালের সিংহদরজা	১৫৫
২৭। " বারাণসী	ঐ
২৮। মঞ্জুশ্রীর মূর্ত্তি	১৫৬
২৯। গরুড়মূর্ত্তি	ঐ
৩০। বাতায়নের কারুকার্য্য	ঐ
৩১। নেপালী নরসুন্দর	১৫৭
৩২। স্বয়ম্ভুনাথ মন্দিরের বজ্র ও সিংহ	১৫৮
৩৩। নেপালী গায়ক ও বাদকদল	ঐ
৩৪। গুণ্ডিচা মন্দির	১৮৩
৩৫। উইলকাটের ঔপনিবেশিক ভবন	৩২৯
৩৬। কলবির গির্জ্জা	ঐ
৩৭। মেইন অংশে কাষ্ঠ সংগ্রহ	৩৩০
৩৮। নদীতীরবর্ত্তী ওয়েবো	ঐ
৩৯। হ্রদে জলক্রীড়া	৩৩১
৪০। জেমস্ ব্লেনের গভর্ণরের আবাস	ঐ
৪১। নগরদুর্গ	৩৩২
৪২। সামুয়েল স্লিথ ও বরোকের সমাধি	ঐ
৪৩। উইলিয়ম দুর্গ	৩৩৩
৪৪। অরণ্যরক্ষায় সৈন্যদল	ঐ
৪৫। মুসহেড হ্রদ	৩৩৪
৪৬। গু-কুর পাহাড়	ঐ
৪৭। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বন্দর	৩৩৫
৪৮। হবার্ডহল পুস্তকালয়	ঐ
৪৯। মকলি জলপ্রপাত	ঐ
৫০। 'টমকাকার কুটীর' রচনালয়	৩৩৬
৫১। দাসের পোষা বাঘ	ঐ
৫২। দারুদণ্ড হইতে কাগজ	৩৩৭
৫৩। গৃহযুদ্ধকালে নির্ম্মিত সোপান	ঐ
৫৪। আন্তর্জ্জাতিক সীমা-স্তম্ভ	৩৩৮
৫৫। ডেনিস্ গ্রাম	৩৩৯
৫৬। পুরাতন কারাগারে যাদুঘর	৩৪০
৫৭। জাহাজে টার্কিংটনের পাঠাগার	৩৪১
৫৮। আবিষ্কারকের বাসভবন	৩৪২
৫৯। কামারপুকুর	৩৬২
৬০। গঙ্গাতটে কুটীরশ্রেণী	৪০১
৬১। ভৈরবঘাটীর নিকট জাহ্নবী	ঐ
৬২। " " পাইনবন	৪০২
৬৩। ভৃগুনদী	ঐ
৬৪। পাহাড়ের গায়ে বরফ	৪০৩
৬৫। পুলিসের সংবাদ প্রচার	৪১০
৬৬। যন্ত্র হস্তে কৃষক ও নারী	৪১৩
৬৭। জুতার দোকান	ঐ
৬৮। অর্থপ্রিয় কৃষক-যুবক	৪১৪
৬৯। গির্জ্জার বাহিরে	ঐ

চিত্র	পৃষ্ঠা
৭০। বিবাহসভায় সঙ্গীত	৪১৬
৭১। বস্ত্রবয়ন	৪১৬
৭২। বাড়ির সাদা উঠান	৪১৭
৭৩। দেশবন্ধু স্মৃতিমন্দির	৪৩১
৭৪। মোক্ষচটীর পথে	৪৮১
৭৫। তুষারপথে ছাগদল	ঐ
৭৬। পাঁওয়ালীর পথে	ঐ
৭৭। পাঁওয়ালীর কিছুদূরে	৫৮২
৭৮। তুষারের উতরাই পথ	ঐ
৭৯। তুষারের উপত্যকা	৫৮৪
৮০। ত্রিযুগী নারায়ণ	ঐ
৮১। ত্রিযুগী নারায়ণের উত্তরে	৫৮৫
৮২। তুষারের পথে	ঐ
৮৩। ফরাসী গিনির যানবাহন	৬৪৮
৮৪। বসতিহীন বনপথে	ঐ
৮৫। তোমিনি নদীর নৌকা	৬৪৯
৮৬। পশ্চাতিবাহন	ঐ
৮৭। অধিবাসীদের বাসগৃহ	৬৫০
৮৮। কোনিগ্রাওইদের বাসগৃহ	৬৫২
৮৯। পথিমধ্যে রন্ধন	ঐ
৯০। দুই নারী ধর্মগুরুদল	৬৫৩
৯১। আফ্রিকার জলাশয়	৬৫৬
৯২। কামারশালা	৬৫৭
৯৩। ভোজনরত দল	৬৫৮
৯৪। [illegible] বাসারীদের নৃত্য	ঐ
৯৫। [illegible]ারীদের ক্ষৌরকার্য্য	৬৫৯

চিত্র	পৃষ্ঠা
৯৬। স্থানীয় অধিবাসীমধ্যে পুতুলবিদ্	৬৬০
৯৭। সদ্যোজাত গেজেল	৬৬১
৯৮। গাম্বিয়া নদীর মরুস্থান	৬৬৩
৯৯। তাঙ্গাপাতে কাদুপাই যুবক	৬৬৪
১০০। মৃত্তিকা হইতে লবণ	ঐ
১০১। ভারবাহী যুবক	৬৬৫
১০২। প্রস্তরস্তূপে অগ্নিসংযোগ	ঐ
১০৩। ফ্রাগেস নদের জলে ধাতু	ঐ
১০৪। ডাউলাবাদার রোজা	৬৬৬
১০৫। তুরা কু ম্বার সেতু	৬৬৮
১০৬। গাছের গুঁড়ির গহ্বরে	৬৬৯
১০৭। আ কাউতের অধিবাসী মধ্যে	৬৭০
১০৮। যুগীদের শিবমন্দির	৭১১
১০৯। আমুড়ে বিশালাক্ষী মন্দির	৭২৫
১১০। মন্দাকিনীর দৃশ্য	৭৩৪
১১১। তুষারাচ্ছাদিত মন্দাকিনী	ঐ
১১২। গৌরীকুণ্ড	৭৫৫
১১৩। গৌরীকুণ্ডের ডাকবাংলো	ঐ
১১৪। কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সেতু	৭৫৬
১১৫। বরফের মধ্যে মন্দাকিনী	ঐ
১১৬। কেদারের পথে	ঐ
১১৭। জলপ্রপাত	৭৫৭
১১৮। তুষারাদ্রি-শোভিত কেদারমন্দির	ঐ
১১৯। কেদার-পথে প্রপাত	৭৫৮
১২০। কেদার-মন্দির	ঐ
১২১। উদককুণ্ড	ঐ

চিত্র	পৃষ্ঠা
১২২। অর্দ্ধবৃত্তাকার দুয়ার	৭৫৯
১২৩। দুবসজ্জা	৭৬০
১২৪। এটনার টিউব ব্রিজ	৮৪৮
১২৫। কাচ-পালিশের কারখানা	৮৪৯
১২৬। ক্ষকভেন্টের ধারে তুষার দৃশ্য	৮৫০
১২৭। ব্রাসেলসের মহ কলেজ	ঐ
১২৮। ৪৩ ফুট দীর্ঘ বৈদ্যুতিক আলোক	৮৫১
১২৯। টিটুসভিলির তৈলকূপ	ঐ
১৩০। সোয়ার্থমোর কলেজ	ঐ
১৩১। রেডিংএর মোজার কারখানা	৮৫২
১৩২। শিম-বীচি বাছাই	৮৫৩
১৩৩। মোজার কারখানার নারী	৮৫৪
১৩৪। পাহাড়ের মধ্যে কয়লা	ঐ
১৩৫। জলমগ্ন জাহাজ	৮৫৫
১৩৬। ব্রুকলিনের পিরামিড	ঐ
১৩৭ পিটসবার্গের বিমানবন্দর	৮৫৬
১৩৮। সামরিক ভারসাম্য শিক্ষা	৮৫৭
১৩৯। রবার্ট ফুল্টনের জন্মস্থান	৮৫৮
১৪০ ওলবুল প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতালয়	ঐ
১৪১। ২৭ সেকেণ্ডে কাঠকাটা	৮৫৯
১৪২। উলভারিন জাহাজ	ঐ
১৪৩। পিস্তলধারী পুলিসদল	৮৭০
১৪৪। মেনোনাইট গির্জ্জা	ঐ
১৪৫। পেনসিলভানিয়ার ট্রেন	৮৭১
১৪৬। নব-বধূর মহাপারা	১০৫০

শিল্পিগণের নামানুক্রমিক সূচী

শিল্পী	চিত্র	পৃষ্ঠার পূর্ব্বে
শ্রীঅরুণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়		
	মীরা	৪১৩ "
শ্রীঅম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তী		
	সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী	৫১৩ "
শ্রীইন্দুভূষণ সেন		
	ধানকাটা হলো সারা	৭৭৭ "
	আনন্দময়ীর আগমনে	১০১ "
শ্রীকমলাকান্ত ঠাকুর		
	পল্লীবধূ	৬৪১ "
শ্রীকালী কর		
	পল্লীর ঘাটে	৮২৫ "
শ্রীচারুচন্দ্র সেনগুপ্ত		
	চিরজীবনের স্বপ্নস্মৃতি	১০১৭ "
মিষ্টার টমাস		
	লীলাবতী	৬ "
	কূয়ার ধারে	১৭৭ "
	শুধু অকারণ পুলকে	৩৬১ "
	হাসিয়ে ছিল কোন্ কথাতে	৫৩৩ "
	পদপঙ্কজ	৭১৭ "
	স্নেহবারি	৯৬১ "
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী		
	তরঙ্গদেবতা	২২৯ "
শ্রীভূপতিনাথ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী		
	জীবন-সাথী	১২৫ "
শ্রীরথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়		
	দীঘির কাজলজলে	৩১৭ "
	খেলার সাথী	৪৭৭ "
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (বি-এ)		
	জন্মের ঘড়ি (রেখাচিত্র)	১০৩১ "
শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ		
	স্নেহাশ্রয়	৫৩ "